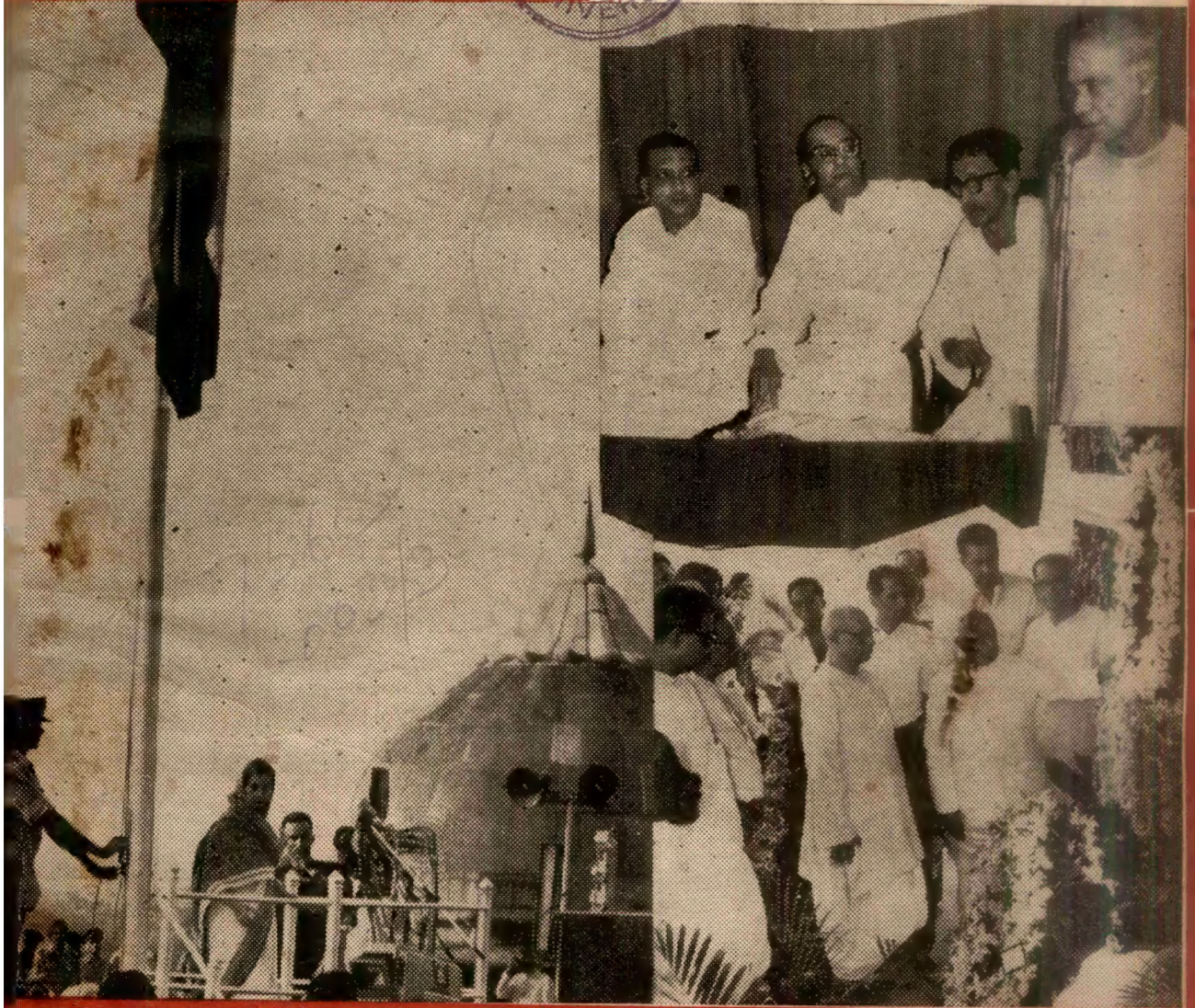


ঐতিহাসিক সম্মতি

স্বাধীনতা দিবসের

অনুষ্ঠান

18



৭২-৪৬

১৯৬৭

১১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ



24th Aug., 1967 * Vol. 72, No



...কিন্তু, এক বিশেষ অঙ্গনি নিশ্চিন্ত—

বোরোলীন

—কান্টো-হেঁড়া-ফাটা হাজা, শূকনো, খস্-খসে কিংবা বর্ণহীন ত্বকের
যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম।



বিষয়	লেখক						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩৩	১	২৪	২৪	২৩	২৩	৬৫৩
আজকের মানুষ	২৪	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	৬৪৮
জগদর্শন	২৪	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	৬৪৬
অবস্থা	২৪	—	চন্দ্রগুপ্ত		২৩	২৩	৬৪৭
আন্তরিকতার অভাবে (কবিতা)	২৪	—	অধীর সরকার		২৩	২৩	৬৪৯
ভারতদর্শন	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	৬৫৩
আন্তর্জাতিক	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	৬৫৬
যা দেবেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	২৪	—	সুখীরঞ্জন দাস		২৩	২৩	৬৫৮
কত মানুষ (কবিতা)	২৪	—	শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়		২৩	২৩	৬৬৩
কাটাডাঙা কালভার্ট (গল্প)	২৪	—	মণিলাল খান		২৩	২৩	৬৬৮
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	২৩	—	ডঃ বৃন্দদেব ভট্টাচার্য		২৩	২৩	৬৬৮

আগামী শারদীয়ার নতুন সাহিত্যসম্রাট

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—ধর্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫
 হারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—জুকসারী কথা ৮
 সৈয়দ মুজিব আলী—পছন্দসই ৬
 জরাসন্ধ—লোহকপাট (সম্পূর্ণ—চারখণ্ড একত্রে। শোভন সং) ২০
 হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—পূর্বাচল ১২
 প্রফুল্ল রায়—কিন্নরী ৫
 প্রফুল্ল রায়—পূর্ব পার্বতী ১২
 কুমুদবল্লভ মল্লিক—কুমুদ কাব্যসম্ভার ১২
 নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়—হিমালয়ের তিব্বতী ৫
 মৈনাক—সুবর্ণরেখার তীরে ৫
 ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১০
 হিরন্ময় ভট্টাচার্য—মহামুদ্র ৫

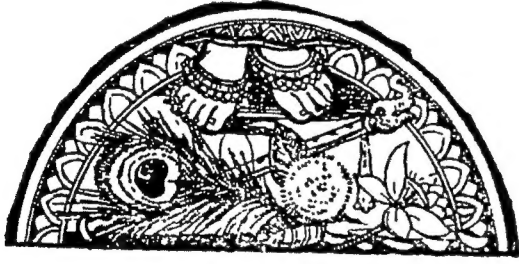
১ ছোটদের ১১

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০
 আশাপূর্ণা দেবী—সেই সব গল্প ৭

এই বইগুলি আগামী সেপ্টেম্বরের মিত্র ও ঘোষের
 মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। উল্লিখিত মূল্য অননুমোদিত



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা	...	৬৭১
অশ্বিনয়গের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৬৭০
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭৮
ফুল ফুটেছে অশ্বকরে (কবিতা)	— সারিৎ শর্মা	৬৮০
পাক-ভারতের রূপরেখা	— প্রভাসচন্দ্র লাইডী	৬৮১
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৬৯০
রূপমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	৬৯২
আকাশবাণী-পরিচয়	— মেঘদূত	৬৯৫
রূপমণ্ড	...	৬৯৬
শেলাখুলা	— শ্রীঅমিতান্ত	৭০২
পরিচীর্ণতা	— শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৪



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলিকনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিরসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য ষোল টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃ—৩.৫০

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃ—৩.৫০

বিশ্বমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-
কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ভূতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—

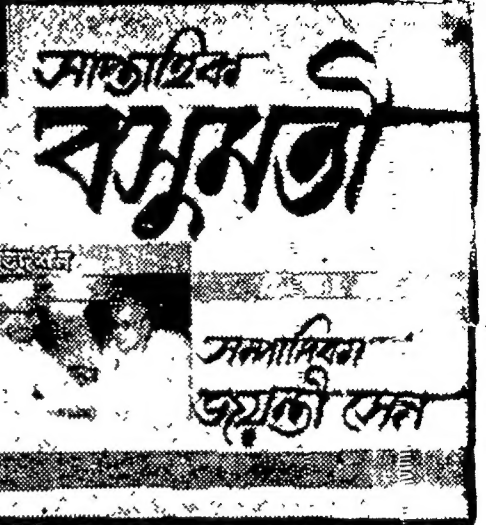
মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য
ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-ক



৭২ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা—মূল্য : ১৩ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৭ই ডান, ১০৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISI.
Thursday, 24th August, 1957

খাদ্যশস্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকার

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য এখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। সামনে এখনও তিন মাস পড়ে রয়েছে। চালের দর কিলো প্রতি এখন চাব টাকার মধ্যে থাকলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই দামে ক্রয় করা সম্ভব নয়।

এখন চালের বদলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহুস্থানে গম ও মাইলো খেতে অভ্যস্ত হয়েছে। গম ও মাইলো—এই দুই খাদ্যশস্যই বা আজ কোথায়? রেশনাগুণ্ডে যদিও বা খাদ্যশস্য কিছু পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য অঞ্চল, যে সব জাবগা বৈশনের আওতার পড়ে না, সেই সব অঞ্চলে একমুঠো খাদ্যের জন্য মানুষের দুর্ভোগের আজ শেষ নেই। একথা ঠিক, যে সব অঞ্চল খরাগ্রস্ত বা দুর্ভিক্ষাবস্থায় সামিল সেই সব অঞ্চলে লংগরখানার ব্যবস্থা হয়েছে। সপ্তে সপ্তে অন্যান্য অঞ্চলেও লংগরখানা খোলার জন্য দাবি উঠেছে। এই দাবির প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকার ওয়াকিবহাল এবং তারা তাদের সদিচ্ছা দ্বারা জনগণকে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছে এবং সরকারের প্রতি অটুট আস্থাশ্রবণত জনগণ বিগত দিনগুলির তুলনায় বিবুদ্ধ হয়ে ওঠে নি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন দলের মন্ত্রিগণও তাদের দায়িত্ব পালনে যে আন্তরিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। জনগণকে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যর্থতা ইতিহাস হচ্ছে ফেলে তাঁরা এগিয়ে যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অতীত ইতিহাস কি? এই ইতিহাস হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ চাল পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভূত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা উচিত ছিল, তা ত্যাগ করতে পাবেন নি। না পারার কারণ বহুবিধ। প্রথম কারণ

এই যে, ধান বা চাল ঝাড়ের হাতে নষ্ট হয়েছে, তারা এই সরকারকে একহাত দেখতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা ধান বা চাল সরকারের কাছে ন্যায্য দামে বিক্রয় করে নি। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এদের বিরুদ্ধে যে রকম কঠোরতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, তা করতে মন্ত্রিসভা সক্ষম হন নি। অবশ্য কঠোরতা অবলম্বন করাও কঠিন ছিল। কারণ, সামান্য কঠোরতা অবলম্বন করলে এদেশে ইটাং গোল, গোল' রব পড়ে যায়।

এতদুসত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্য উচিত ছিল, জনগণ যখন তাদের হাতে শাসনক্ষমতা দিয়েছে, তখন তারা সরকারকে দুর্বল নীতি গ্রহণ করতে বলে নি। বিগত বিশ বছরের দুর্বল নীতির বিরুদ্ধেই তো জনগণের রাষ্ট্র প্রকাশিত হয়েছে এবাবের সাধারণ নির্বাচনে।

মন্ত্রের ভালা এই যে, আউশ ও আমন ধান যাতে ঠিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, সেজন্যে যে সব দলের সাহায্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত, সেই সব দলের মন্ত্রীরা বের হচ্ছেন। আমরা আশা করব, খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারে জনগণও সরকারের সদিচ্ছাকে এবার হাতে-নাতে কাজে লাগাবে। সরকারী ব্যবস্থা যাতে বানচাল হয়ে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জনগণেরই নিজেরদের স্বার্থে প্রয়োজন।

খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আরেকটি সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। মন্ত্রিসভার ছয়জন সদস্য ২০শে আগস্ট থেকে নয়াদিল্লীতে প্রধান-মন্ত্রীর বাসগৃহের সম্মুখে ধর্না দেবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূখেই প্রধান-মন্ত্রী নয়াদিল্লীতে থাকছেন না। সুতরাং 'ধর্না'র দিন এদিক-ওদিক হলেও মন্ত্রি

সভার পক্ষে খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছয়জন মন্ত্রীকে "সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়া"র উদ্দেশ্যে দিল্লী না গঠিয়ে গতান্বিত নেই।

আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বিগত কংগ্রেস সরকার প্রায় কিছুই করে যান নি। এই অবস্থায় খাদ্যশস্য মোচনের জন্য দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া গতান্বিত নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি যথামত করতে পারে নি যদিও ১৯৬৫-৬৬ খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উদ্ভূত হওয়া কেন্দ্রের কাছে প্রচুর খাদ্যশস্য পৌঁছেছে। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচুর খাদ্যশস্য পৌঁছেছে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের সরবরাহ ১,৫৯,৪৬৬ টন। ১৯৬৭ সালের ২ মাস মাসে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে ৪,১০,৭২৮ টন। এ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ফেব্রুয়ারি ১৫ লক্ষ টন। কিন্তু এম্বাং এবং পাওনা বাকি আছে ৮,৮৯,২৭২ টন। অর্থাৎ এ মাসে পাওয়া গেছে মোট ৫২,৬২২ টন। এ সময়ের মধ্যে আরও উচিত ছিল আরও ১০ হাজার টন।

কেন্দ্র যদি বর্তমান খাদ্যশস্যের সমস্ত প্রতিশ্রুতি খাদ্যশস্য না দেয় তাহলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে ধর্না দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় কেউ কি বাৎসরিক দিতে পারেন?

সম্পাদক

আজকের মানুষ

দক্ষিণ রাজনীতিতে অনীহা, আগ্রহ বরং দর্শন, সংস্কৃতি-সংগীতে। তবু ওয়াদিয়ার রাজনীতির উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। জন্মসূত্রে তিনি মহীশূর রাজ্যের মহারাজা, কিন্তু বাইরে তাঁর খ্যাতি ও যশ বিদ্যুৎ পান্ডিত্য হিসেবে। আজ যে আবার ভারতীয় রাজনীতির পাদ-প্রদীপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক খ্যাতিরে। রাজন্যবর্গের ভাড়া ও বিশেষ সুবিধা বাতিল করার যে প্রস্তাব এ আই সি সি-তে গৃহীত হয়েছে মহারাজা ওয়াদিয়ারও তার বিরোধী।

হিজ হাইনেস মহারাজা শ্রীজয়চামরাজা ওয়াদিয়ার বাহাদুর এ আই সি সি'র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের রাজ্যমহারাজাদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার সমর্থক, কিন্তু নিজে খুব একজন উগ্র নায়ক নন। ব্রিটিশ সরকার মহীশূররাজকে একদিন যথেষ্ট খেতাব ও সম্মান দিবেছিলেন। ওয়াদিয়ার বাহাদুরের জি সি বি, জি সি এস আই ইত্যাদি বহু খেতাব জুটেছে। আর পাঁচজন দেশীয় নৃপতির মধ্যে তিনিও একদিন ইংরাজ সরকারের নেক-নজবে ছিলেন। অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁর সৈন্য।

কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পব সমগ্র পরিস্থিতিটা ওলট-পালট হয়ে গেল। ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করতে হলো মহীশূর-প্রধানকেও, মহীশূর ভারতের একটা অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলো। কিন্তু ওয়াদিয়ার কেবল মহীশূরের মহারাজা হয়ে ভোগবিলাসে গা ভাসান নি, তিনি কয়েকটি গুণও অর্জন করেছিলেন। শাসন-কার্যে তাঁর দক্ষতা বরাবরই স্বীকৃতিলাভ করেছে, যেভাবেই হোক প্রজাপদজ্ঞের শ্রম্য ভয় ভালবাসা সবই আদায় করতে জনতেন। তাই ভারত সরকার মহীশূরের রাজপ্রমুখ সবে ওয়াদিয়ারকেই মনোনীত করে-

ছিলেন। তারপর যখন মহীশূর ভারতের একটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে রূপান্তরিত হলো তখন তিনিই মহীশূরের রাজ্যপালের গদি পেয়েছিলেন। একদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হয় নি তাঁর। ছিলেন রাজ্যের কর্তা, তাঁর মুখের কথাই ছিলো মহীশূরের আইন। কিন্তু ভারতের অন্যতম রাজ্য মহীশূরের নিয়ম-



মহ.রাজা ওয়াদিয়ার

তান্ত্রিক রাজ্যপাল হিসেবে তিনি কখনো মহারাজার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধৃষ্টতা বা নিবুদ্বৈধতার পরিচয় দেন নি। মন্ত্রিসভার সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি মহীশূরের উন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন। কংগ্রেস সরকার রাজন্যবর্গের খেতাব ও তাঁদের রাজ্য কেড়ে নিলেও নানাভাবে তাঁদের পুনর্বাসন করেছেন। তাই কোন প্রাক্তন রাজাকে কংগ্রেস টিকিতে নির্বাচন

জিতে মন্ত্রী হতে দেখা গিয়েছে, কাউকে বা রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে। মহারাজা ওয়াদিয়ারও একইভাবে মহীশূর থেকে বৃহত্তর রাজ্যের রাজ্যপালের পদে প্রামোশন পেলেন।

রাজ্যের রাজনীতিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপালের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ। কিন্তু ওয়াদিয়ার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন শিক্ষা-জগতে। প্রচলিত অর্থে শিক্ষকতা তিনি অবশ্য করেন নি, তবে অধ্যাপনা করেছেন যদিও সেটি সাম্মানিক অর্থে। হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির বিবরে ওয়াদিয়ারের অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর কবেকথানা গ্রন্থ দর্শনশাস্ত্রের জগতে অমূল্য সম্পদ। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যেই বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে এল এল ডি, ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ডঃ ওয়াদিয়ার গত ১৯৫৯ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই একবার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন, এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তাঁকে হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্যে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। বাস্তবিক, পাণ্ডিত্য হিসেবে ডঃ ওয়াদিয়ারের খ্যাতি স্বদেশের চেয়ে বিদেশেই বেশি।

সংগীতের প্রতি মহারাজা ওয়াদিয়ারের আকর্ষণ আকস্মিক নয়। মহীশূরের রাজবাড়িতে সংগীতের আদর দীর্ঘ দিন থেকেই। কিন্তু ওয়াদিয়ারের আগ্রহ শ্রুতির মধ্যে নিঃশেষিত হয় নি, তিনি নিজে খুব ভালো গাইতে পাবেন এবং সংগীত রচনা ও সুব সংযোজন করতে পারেন।

কিন্তু সংগীত-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোমল বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ওয়াদিয়ারও আজ ক্ষুদ্র। এতদিন রাজ্য ছিল না, সিংহাসন, রাজতন্ত্র ছিল না, মোটা অঙ্কের ভাড়া ছিল, ছিল বিশেষ সুবিধা। রাজ-প্রাসাদ, বড় বড় বাড়ি, হাতী, ঘোড়া, সোনা গহনা, ব্যাঙ্ক গাচ্ছত টাকা, কিন্তু সেগুণি বাতিল করার প্রস্তাব উঠেছে। প্রাক্তন নৃপতিদের ক্ষোভের কারণ তো সেখানেই। তারা গ্রেড ইউনিয়ন করে তাঁদের 'অধিকার' বা স্বার্থ রক্ষা করবেন। সে আন্দোলনে মহারাজা ওয়াদিয়ার প্রথম সারির সেনাপতি নন সত্যি কথা, কিন্তু তাঁর নৈতিক সমর্থন পুরোমহাঙ্গ রয়েছে।



পথ হতে পথে

কুড়ি বছর ধরে যাঁরা জনগণের জন্য পথে পথে মিছিল করে এসেছেন, কংগ্রেসী শাসন যাদের পথে বসিয়ে মেজরিটির মসনদে বসে 'কৃষ্ণনগর ডুবু-ডুবু' নদে ভেসে যাব রে' বলে ওস্তাদি সং-কীর্তন গেয়েছেন, জনগণ তাঁদের হাতে ধরে মস্তিষ্কের গদিতে বসিয়েছিলেন। কিন্তু পথের ডাক তাঁদের গদিতে অতলে তলিয়ে দিতে পারে নি। মস্তিষ্কের মেকী মর্যাদায় তাঁরা মন্ত্রী ভাঙাগড়ার মালিক গণশত্রুর কথা ভুলে যান নি। যখন প্রয়োজন পথে নেমে এসেছেন, জনতার কাছে মানুষের মতো, প্রয়োজনের সাথীর মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কন্ট্রোল রুম লালবাজার থেকে লালদীঘির পথের ওপর নেমে এসেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নেতৃত্ব কুড়ি বছরের কুশাসনের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই এবার চলেছেন নয়াদিল্লীর রাজপথে বসতে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আমরণ অনশনের শপথ নিয়ে ধর্না দিতে। তেইশে আগস্ট সেই ঐতিহাসিক ধর্মার শূভারম্ভ। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এ সময় নিজ বাসভবনে থাকছেন না। কিন্তু সেই ফাঁকির অবসরে ধর্মার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত করা হয় নি। ছয়জন মন্ত্রী স্বাধূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্মার বসবেন। রাজ্যবাসীর জন্য যে মন্ত্রিসভা প্রতিকূল অবস্থায় পৌঁছে ভাত, গম, মাইলো জোটাতে পারেন নি, সাধারণের পিঠে পদূলিশের লাঠি ভেঙে সে মন্ত্রিসভা ওস্তাদি গানের জলসাও বসাতে পারবেন না। যাঁরা তা পেরোছিলেন তাঁরা ডুগি ভবলায় উল্টো চাঁটি পিটছেন এখন। লোক খোঁপিয়ে দু' টাকার জায়গায় চার টাকা চালের কিলোর ফিরিস্তি হাজির করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের ধর্মার পাঁচটা ধর্না শব্দ করবেন তাঁরা এই

কলকাতায়। অথচ তার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল কার ও কাদের কৃতকর্মের ফলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির এই শোচনীয় দুরবস্থা। তাঁদের সে বোধ না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের তা ছিল এবং আছে। তাই চার টাকাতো পশ্চিমবঙ্গে সেই মারাত্মক খাদ্য আন্দোলন হয় নি। রাজ্যবাসীর আস্থা আছে যাদের ওপর তাঁরাই নামছেন আন্দোলনের পথে, আমরণ অনশনের শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদপ্রাকারের বাইরে ধর্মার বসতে। এবারও পাঁচটা ধর্মার প্রস্তাব পাঁকিয়ে তোলায় পেছনে যে মনোভাব উঁকি মারছে জনগণ বিগত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার তার স্বরূপ জানেন।

ছ'জন অনশনরতী মন্ত্রী হলেন, ধর্না অভিযানের নেতা বর্ষায়ান শ্রীহেমন্তকুমার বসু এবং সর্বশ্রী হরেকৃষ্ণ কোন্ডার, সোমনাথ লাহিড়ী, ননী ভট্টাচার্য, কাশীকান্ত মৈত্র এবং চাবুদারিহর সবকার। মন্ত্রী হিসেবেই এরা অনাহারগ্রস্ত খরাক্রান্ত রাজ্যের জন্য 'হত্যা' দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে দিল্লী যাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাসিক প্রায় ৯৫ হাজার টন গমের সঙ্গে অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ আরও দশ হাজার টন যোগ করে মোট এক লক্ষ পঁচ হাজার টন গম আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসেই প্রয়োজন। এবার হেরফের হওয়ার অর্থ শহরাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থায় ভাঙন। কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের যে পাবনাখাদ্যের দাবি, তা না পাওয়া গেলে বিভিন্ন জেলার শহর-গুলিতে সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা এক্ষেত্রে ভেঙে পড়বে।

দেশে ইতিমধ্যেই দুই খরাপীড়িত অঞ্চলে দুর্য্যবস্থা চলছে। বাকুড়া পদূলিয়ার হাহাকার কলকাতার রাজপথেও ফটো কলাই পাঠ হাতে উপস্থিত হতে শুরুর করেছে। এমন পরিস্থিতিতে

কেন্দ্রের হাত টান করে বসে থাকা অর্থ খাদ্যভাবজনিত পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টলমলে বাঁচাচ্ছে পদূলিয়ার কংগ্রেসী শাসনের জগদন্ডা যা তাঁরাই নামান্তর রাজ্যবাসীর ঘাড়ের গেল চাপিয়ে দেওয়া। অবশ্য জোতনার মনোভাব আড়তদারী চক্রান্তের বাইরে যে বিশাল জনতা তার পূর্ণ সমর্থন মনোভাব পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভোগ করছেন তা উল্লেখ্য। শরিকরা সেই সঙ্গে ঠিক থাকলে এই অপকৌশলও বানচাল হয়ে যাবত। তা না খাদ্য নিয়ে খেলার কার্হিনীটু তন-সাধারণ যথেষ্টই অবগত আছেন। তাই জনা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীগণ আরও মনোপ্রীতি ও মর্যাদার আসনেই সম্মত না আছেন। তাঁরা কন্ট্রোল রুমের নিষেধের ভয়ঙ্কর করেন না, বুদ্ধিমানদের মিছিলে অন্যায়সে আশঙ্কিত হওয়া দাঁড়াবার নৈতিক মনের জোরটুকু অবশ্যই রাখেন।

উদ্ভূত শস্য কোথায় গেল?

যুক্তফ্রন্ট সরকার জোতনার মনোভাবের প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করে তে ভুল করেছেন তার জন্য যতদূর ভোগান্তি তা ভুগতে হচ্ছে অনস্বীকার্য। কিন্তু সেটাকেই ফলাও করে প্রচার করা যদি অভিযান্ত্রিক তাঁরা হয় ভুলে গেছেন না চেপে যাচ্ছেন যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে যে বাম্পার রূপ উঠেছিল সেই অতিবৃষ্টি তদানীন্তন সরকার কিভাবে বিলবায়ন করে গেলেন? যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়তো গ্রহণ করলেন এমন সময় যখন সবকারী সংগ্রহশালায় ভাঙে যা ভবানী অবস্থা। বাকুড়া পদূলিয়ার দুর্য্যবস্থা ঘনঘটা কংগ্রেস সরকারও টেব পেয়ে স্বীকার করে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৎসঙ্গেও ঠিক নির্বাচনের পূর্ব মনুহতে হাটে বাজারে চালের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা গেছিল। পাড়ার পাড়ায় বস্তা বস্তা চাল বিনা বাধায়

সাপ্তাহিক বসুমতী

ব্যাপারী ফিরি করে গেছে। আপনি আমি যে যা পেয়েছি হাবড়ে কঁপে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের ঘরেই বা ক'টা টাকা ছিল। যে হারে চাল বাজারে ছেড়ে দেওয়া হতোছিল সে সমব তার কিসদংশ বাঙালীর ভাড়ারে জমা করে রাখা সম্ভব হয় নি। সে সব চাল রাজ্যের সীমান্ত পৌঁছে পাচার হয়ে গেল। আজকের জনদরদী বিরোধীপক্ষের হাতেই তখন পুঁজি, কড়ানং। তারা সেদিন কি মজা দেখেন নি। দেশটাকে দেউলে করে ভাড়ার শূন্য করে রাজনীতির পাঁচ কমে বান নি। আজও সেই নোংরা রাজনীতির চাল চালছেন মজুতদাররা। মাটির তলাব ঘরগাল খুঁড়ে ফেললে আজও যে তিন নাসের বিপবয় না ঠেকানো যাবে এমন আশ্বাস অনেকেরই নেই।

কিন্তু এই মূহুর্তের চাহিদা তো মেটাতে হবে। সে চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের দায়িত্বই বা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার অস্বীকার করেন যেমন করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কটকালেও কেন্দ্র কি সম্পূর্ণ অব্যাহত হয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে সংস্থান করে দেওয়া কেন্দ্রের কর্তব্য সৌদিকেও কেন্দ্র লক্ষ্য রাখেন নি। উপরন্তু শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী যে হিসেব তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে এই দুঃসময়ে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের পাওনা খাদ্যশস্যও পূর্বোক্ত মিত্রি দেন নি, বেশি দেওয়া দুবের কথা। শ্রীলাহিড়ী জানিয়েছেন, আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য এক লাখ পাঁচ হাজার টন গম। বকেয়া ১৫ হাজার টন এবং গত মাসে বকেয়া ৭ হাজার টন একত্রে এই ২২ হাজার টন বকেয়া চালের দাবি কেন্দ্র এ পর্যন্ত মিটিয়ে দেন নি। পূর্ববর্তে মাত্র ৯৫ হাজার টন গমের আশ্বাসমাত্র দিয়েছেন। এর মধ্যে গত ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত মাত্র বত্রিশ হাজার টন গম এসে পৌঁছেছে। আব চাল এসেছে থাইল্যান্ডের চার হাজার ও উড়িষ্যার দু' হাজার টন মিলে ছয় হাজার টন মাত্র। যদি চালান এই হারেই আসে তাহলে মাসের বাকি ক'টা দিনে ৫৭ হাজার টন গমের বোঁশ আশা করা যায় না। এই অবস্থার দৈনিক হারে চাল ও গম প্রেরণের দাবি জানিয়েছেন রাজ্য সরকার।

এ দাবি অন্যায্য নয়। কিন্তু বিবোধী-পক্ষে একটা কথা খুঁজা তোলা হচ্ছে এই বলে যে, রাজ্য সরকার আপন অক্ষমতা কেন্দ্রের স্বেচ্ছা চাপিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন।

শ্রীলাহিড়ীর পরিষ্কার হিসাবের পবেও এবং কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কট-জনক পরিস্থিতি অবগত থাকার পবেও খাদ্যশস্যের চালানে যে বকেয়া বৃদ্ধি করে

যাচ্ছেন তা জানা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ওপর দোষের বোঝা চাপানোর চেষ্টা কদমিপ্রায়ের লক্ষণ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আব সেই কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য যে জননেতারা দিল্লী 'দেবালয়ে' 'হত্যা' দিতে চললেন তারই জ্বাবে পাল্টা ধর্ণার উদ্যোগ বাংলার স্বাধীনবিরোধী এই চেতনার অভাব দলীয় স্বার্থ পূর্বপন্থে একথাও তাঁদের উপলব্ধি করা উচিত।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দিশেহারা করে দেওয়ার নানান নেপথ্য ষড়যন্ত্রের খবরও দেশবাসীর অজ্ঞাত নেই। মজুতদার-গোষ্ঠীর সেই নোংরা হাত ভেঙে দেওয়ার আয়োজন তাই নতুন করে শব্দ কবতে হবে। কিন্তু তার আগে আগামী তিন মাসের আসন্ন সংকটটাই মূখ্য হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেসী রাজত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে যে পথে না বসলে কংগ্রেসী আত্মতৃপ্ত সরকারকে পথে আনা যায় না।

এতকাল সাধারণ মানুষকে পথে বসিয়ে এসেছেন তারা। এখন অকংগ্রেসী সরকারগুলিকেও সেই পথেই আকর্ষণ

করছেন। ইতিপূর্বে কেরালা রাজ্য থেকে ধর্ণায় বসা হয়েছিল। এবার পশ্চিম-বঙ্গের পালা। ভাবতের মানচিত্রে যে দুটি রাজ্য প্রগতিশীল বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে কেন্দ্রের কোপও সে দুটির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ধুঁইয়ে আছে। দুটি রাজ্যই কংগ্রেসী কানুনে পথে বসলো। কেন্দ্রের টনক যদি তাতেও না নড়ে সেই শালগ্রাম নড়ানোর জন্য হয়ত অন্যতম সংগ্রামও শব্দ হবে। আজকের ধর্ণা হবে তাইই মূখ্যবস্তু।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছাট্টাই ধর্ণা চলবেই কেন না ধর্ণা ছাড়া পথ নেই। প্রচ্যামশ্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রকাশ্যে এক পরিসংখ্যান হাজির করে দাঁখিয়েছেন যে, কংগ্রেসী আমলের চেয়ে কেন্দ্র এখন কত কম হাবে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য সরবরাহ করছেন। পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

১৯৬৬ সালে কংগ্রেসী রাজত্বের জানুয়ারী-জুলাই খাদ্য সরবরাহ ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৬৬ টন। [গম, ৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০৭ টন। চাল, ৭৪ হাজার ৪১৫ টন। মাইলো, ২১ হাজার ৪৪৪ টন।]

অথচ গত বছরের তুলনায় এবার যে রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও

স্বীকার করেছেন। তৎসত্ত্বেও সরবরাহ হ্রাস করলেন পশ্চিমবঙ্গের অধিকতরভাবে অভুক্ত রাখার জন্য। কেন্দ্র যে শব্দ সরবরাহ হ্রাসই করেছেন তাই নয়, যেটুকু দিচ্ছেন তাও টিপে টিপে অভাববৃদ্ধি করে। এই সববরাহ অভাব ও বকেয়া বৃদ্ধি করে রাজ্যের খাদ্যসঙ্কটকে তীব্রতর করে তুলেছে।

কিন্তু পেটে মেরে রাজ্যবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার মতলব ত্যাগ না করা হলে যে অনর্থ বেধে উঠবে তাতে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরার কৌশল কার্যকরী হবে বলে উচ্চাশা রাখা করার কোন যুক্তি নেই। যুক্তফ্রন্টের পেছনে দেশের আপামর জন-সাধারণের শ্রুভেচ্ছা আছে বলেই আজকের সংকট মুহূর্তেও আশ্বিনগড় পশ্চিমবঙ্গ নানাভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় সন্নিবিষ্ট আছেন। সাধারণের এই অটুট মনোবলের কারণ সরকারের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রুভেচ্ছা যাকে নোংরা রাজনীতি বেকায়দা করতে পারবে না।

২৪শে চান্দ্র মাসের হরতাল আগামী ২৪শে আগস্ট যুক্তফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি একত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাবিতে চান্দ্রমাসের সবাত্মক হরতাল আহবান করেছেন। আভনব এই হরতাল। ঐতিহাসিকও বটে। রাজ্য সরকার জনগণের সঙ্গে এক সপ্পে হবতালে নামছেন। মন্ত্রীরা এই সমব মহাকরণে প্রবেশ করবেন না। অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যাবে। পুলিশের সঙ্গে মোকাবেলার কোন প্রশ্নও উঠবে না।

এ হবতাল দিল্লীর আব মজুতদার মুনামফাখোবদেব টনক নড়ানোর হবতাল। সমগ্র বাজ্যের খাদ্যভাবসানিত দিক্ষেত্র প্রদর্শনের হরতাল। এই হরতালেব সাফল্যেও কুচক্রী মজুতদার শ্রেণীর টনক যদি না নড়ে, কেন্দ্র যদি তরাত্ চালানে গোলে হারিবোল দিয়েই চালিয়ে যেতে চান, তবে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মায়িত বাহি কিভাবে বিক্ষোভিত হবে তা এই মুহূর্তে, করুণাও করা যায় না।

যে অসন্তোষ ধুঁইয়ে উঠছে তাতে ছাই চাপা দিয়ে তাই কাজ হবে না। শান্তিবারি সিগনের আয়োজন করতে হবে। মানুষের দুটো দিন সমান চলে

১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমগ্র হ্রাস পেয়েছে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০৮ টন। [গম, ৫ লক্ষ ২ হাজার টন। চাল মাত্র ১৭ হাজার ৯০৩ টন। মাইলো ১,৯০৪ টন।]

না একথা মেনে নিয়েই পার্বতনকেও শান্তভাবেই মেনে নিতে হবে। অন্যথা অনর্থ কপালের লিখন। (১৯।৮।৬৭)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দূনীতি সংক্রান্ত নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর দু-একজন বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে কিছু লিখছেন না কেন? উত্তরে বলেছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যে খুব একটা উন্নত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে খারাপ, সে ইঙ্গিত আমার নিবন্ধাবলীতেই বর্তমান। বাংলা-দেশের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোচনার বিষয়বস্তু করেছিলাম, ইচ্ছে ছিল লেখালেখির মাধ্যমে এই বিখ্যাত শিক্ষাসংস্থার অবস্থার যদি কিছু উন্নতি করা যায়!

দুয়ার হাতে অদূরে, কলকাতা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণীতে, আজ থেকে সাত বছর আগে, যে-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বাঙালী তার অস্তিত্ব অনুভব করল এই প্রথম ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে। সাত বছরেও যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশবাবস্থা কাটে নি, সেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় আজ শিক্ষা-স্বতী ও শিক্ষাগ্রহীদের আলোচ্য বিষয়, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সরকারী সিদ্ধান্তে সেখানকার কলা ও বিজ্ঞান বিষয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্ররা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহান ও কিছুটা সন্দেহিত হয়ে পড়েছেন। ফলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে জল ঘোলা হতে শুরু করেছে, দু'টি শিবিরে বিভক্ত শিক্ষক ও ছাত্ররা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে জটিল করার আনন্দে মেতে উঠেছেন। বলা বাহুল্য, বিবদমান দল দু'টির একটিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্ররা, অন্য দলে কৃষিবিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে চন্দ্রগুপ্তের অবস্থ্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত সমস্যাকে যত জটিল মনে করা হচ্ছে, তা তত জটিল নয় এবং স্থির-মস্তিকে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।

*

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (১৯৬০) সাধারণভাবে কলা ও বিজ্ঞান এবং বিশেষভাবে কৃষি-পশু ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উল্লেখ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এবং আইনের আলোচ্য ধারাটি থেকে মনে হচ্ছে, তদানীন্তন সরকার সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা দিতে চেয়েছিলেন যদিও তারা তাঁদের মৌল উদ্দেশ্য কৃষিশিক্ষার

ভাবগুরু

চন্দ্রগুপ্ত

প্রসাব সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন-রচয়িতাদের দৃষ্টি-বলয়ের মধ্যে ছিল, এটা বিশ্বাস করতে যখন বাধা নেই, তখন তারা কেন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণ চেহারা দিতে চেয়েছিলেন, সেটা ভেবে দেখা দরকার। দু'টি কারণে তাঁরা এ জিনিস করতে পারেন : প্রথম, ভ্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ দান এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কল্যাণীকে আদর্শ শহরে রূপায়ণের ইচ্ছা (এ সুদূর-স্মৃতব্য, কল্যাণীর পরিকল্পনা তদানী-ন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের); দ্বিতীয়, নিছক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে মর্যাদার প্রশ্ন এবং ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন আই-সি-এ-আর (কৃষি গবেষণা পরিষদ) প্রকৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্য অর্থসাহায্য-সংক্রান্ত আইনগত সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা। খুব সম্ভবত এই দু'টি কাবণেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁরা সরাসরি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ঘোষণা না করে শিক্ষারূপে কৃষি-বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

*

কয়েকটি তথ্য আমার উপরিউক্ত অনুমানকে সত্যের সামীপ্য লাভে সাহায্য করে। প্রথমত, ভারতবর্ষে কোন কোন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডিগ্রী দেওয়ার অধিকার নেই (যেমন, উত্তরপ্রদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি-গুলির ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দেওয়ার অক্ষমতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে)। দ্বিতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনি-ভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন অর্থসাহায্য করে না (যেমন, রাজস্থান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিশন আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হয় এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিসহ কলা-বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য ফ্যাকাল্টিগুলি

প্রতিষ্ঠাব পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নামের হয় তখনই কমিশন অর্থসাহায্য দিতে শুরু করে)। তৃতীয়ত, আই-সি-এ-আর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ বংগের অর্থসাহায্য করে থাকে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ কৃষিশিক্ষণ-কেন্দ্র না হলে ঐ অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে, এটি আপাতসত্য। কারণ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির ৭ জানুয়ারী ১৯৬০ সালে কল্যাণী ও হরিণঘাটার অর্থসাহায্যের আলোচনা দেখা যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও আই-সি-এ-আর সাহায্য লাভের যোগ্য এবং সার কথা, আই-সি-এ-আর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে খবর প্রকাশ। শেষত, অধ্যয়নালিত অর্থবিদগু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান-ের ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমবর্ধমান বংগীয় এই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাণাঘাট কাঁচবাগাড়া প্রকৃতি পারদর্শী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চর শিক্ষা-গ্রহণে আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয় যে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

(বর্তমানে কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৎসরে ৩০৫ ও ২৭৮)।

*

অন্য পক্ষের বক্তব্য: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কৃষি ও অনুষঙ্গিক বিজ্ঞানচর্চা উপবিশেষ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যত বৃন্দাবন ইত্যাদি আজ সেখানে অনুষ্ঠিত। দু'টি ফ্যাকাল্টির ছাত্রদের আবার অন্য বিদ্যালয় পরিমাণও পর্যাপ্ত। সুতরাং কল্যাণী শিক্ষাগ্রহী সমাজের বহু বহুপক্ষের প্রশাসনিক অযোগ্যতা-সংক্রান্ত তথ্যাদি দিয়ে দাবি জানাচ্ছেন, কল্যাণী বিশ্ব

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা আমেরিকার ল্যান্ড গ্র্যান্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করার কথা উল্লেখ করেছেন।

দরকার এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাঙ্গিক কৃষিবিজ্ঞান-চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠুক, এ কামনা তাৎপর্যবাহী। কিন্তু গত সাত বছরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক এবং

দ্রুম সংশোধন

গত সংখ্যার 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে (বৃহস্পতিবার ৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'নিবিড় ঘন অধারে' প্রবন্ধে একটি ভুল থেকে গেছে। ৫৯১ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে 'ছয়' অনুলিখিত পনেরো-বোল সংখ্যক পংক্তি এভাবে পড়তে হবে : সার কথা, ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা গ্রহণের সময়ে আমাদের নেতা ছিলেন জওহরলাল নেহরু, যেনেহরু ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকার।

যে-সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তাতে আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে, ব্যাপক তদন্তের ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন ভিন্ন এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির আশা দুরূহ। নামান্তর। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ বিস্তর : হোস্টেলের দুরবস্থা, হোস্টেলে স্থান-স্বল্পতা, অনিয়মিত ক্লাস, শিক্ষকের অভাব, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি। এই সমস্ত অভাব-অভিযোগের অনেকগুলি সহজে প্রতিকারের যোগ্য কিন্তু ছাত্রদের বারংবার উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এতকাল ঔনাসীয়া দেখিয়ে এসেছেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য ঘটেছে এমন বলা যায় না, কারণ সরকার ইউ-জি-সি, আই-সি-এ-আর ইত্যাদির কাছে প্রাপ্ত এবং প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা (১৯৬১-৬৬তে গবেষণার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়াও ১৯৬০-৬৭ সালে কৃষি ফ্যাকাল্টি ৭৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে, আই-সি-এ-আর প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুত ২৫ লক্ষ টাকা, ইউ-জি-সি কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিকে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছে, এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত অর্থসাহায্য তো আছেই) আরও বেশি টাকা পেলে আরও ভালো হতো নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ পর্যন্ত যে-টাকা পাওয়া গেছে তাতে কি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে বিশিষ্ট স্থান হবে দেওয়া যেত না?

সার কথা, বহুপ্রসাবিনী ইউ-জি-সি'র অন্যতম সম্ভান কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে অপরিপুষ্ট। এবং সেই জন্যই যুগপৎ বেদনা ও কৌতুক বোধ করি যখন দেখি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসমাজ এই অপরিপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শাবীরিক উন্নতির সংগ দূরে সরিয়ে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি নামকরণ হবে সেই নিয়ে আন্দোলন করেন। প্রশাসনিক অযোগ্যতা-রূপ ব্যাধি থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির কি সর্বাঙ্গে বিবেচ্য নয়? কলা বিজ্ঞান কৃষি প্রকৃতি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকগণ সবেতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গিক উন্নতির কথা কখনও ভেবেছেন কি? কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগগুলি তো বহুদিনের পুরনো, তাঁদের ঐক্যবন্ধ চেঁচায় এই অভাব-অভিযোগগুলির আংশিক প্রতিকারও কি সম্ভব ছিল না?

সমস্যার মূলে না গিয়ে এমন ব্যাপার নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসমাজ মাতামাতি করছেন, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে মনোযোগের অযোগ্য। এবং কলা ও বিজ্ঞান এবং কৃষি ফ্যাকাল্টির মধ্যে যে-পারিবারিক

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভাঙলগড়ের কৌন্তুভরর, ভগবন্তগুণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদাশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রলাপ ও শিক্ষামূলক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা আভিভ্যক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমদ্বাখনিঃসৃত 'শিক্ষামূলক শ্লোক' তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী'র সুদলিত পদ্যানু-বাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিরচনামৃত।

দুলভসার

শ্রীচৈতন্যমণ্ডল-রচয়িতা শ্রীল গোচন্দ্রদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সুক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রমোদ দাস ঠাকুর বিরচিত।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভক্তনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুবোধ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুদলিত পদ্যানুবাদ।

পারম্ভ-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপন্থন, শ্রীশ্রীগুরুদ্বন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌহিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুদলিত নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৫.০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

আন্তরিকতার অভাবে

অবীর লুৎফার

সব কথা কথা নয়, সব অন্তরঙ্গতা
উত্তপ্ত নয় হৃদয়ের উষ্ণতায়।

অনেক কথাই শুধুমাত্র কথা হয়ে থাকে
সহৃদয়তার অভাবে, অনেক কথাই
ছকবলা বলার জন্যে বলা; অনেক অন্তরঙ্গতাই
চিহ্নর ঘনিষ্ঠ হবার ছল, যেখানে হৃদয়
মেলের ধরে না তার বিপুলতম ঐশ্বর্যকে—
শুধুমাত্র ব্যাকুল করে।

আমরা তাই বারবার এই সব কথা
এই সব অন্তরঙ্গতায় বিশ্বাস করি। বিফল হয়।
আমরা বৃষ্টি না এ সব সেই চোখ-ধাঁধানো মরীচিকা
দ্বা নিম্নত ব্যাকুল করে, আকর্ষণ করে, শুধু
পথ বোঝায়; কিন্তু তৃষ্ণা মেটায় না।

আমরা তবু বারবার আমাদের মৃত্যুকে স্বাগত জানাই।
যে মৃত্যু শরীরকে নয়, আমাদের মনকে
আমাদের স্পন্দনমান হৃদয়কে অসাড় করে তোলে।

সব কথা তাই কথা হয় না আন্তরিকতার অভাবে
সব অন্তরঙ্গতা তাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেন না তা
উত্তপ্ত নয় হৃদয়ের উষ্ণতায়।

বিবাদ ও মনোমালিন্য দেখা যাচ্ছে, যে-কোন
শিক্ষাগ্রহণী তাতে দৃষ্টিত বোধ করবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে সকল বিষয়ই সমান
মর্যাদাসম্পন্ন, সকল বিষয়েরই সার্বিক
বিকাশের অধিকার বর্তমান। অথচ এই
সার সত্য ভুলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা হাস্যকর আন্দোলনে
শরীক হয়েছেন।

কৃষি ফ্যাকাল্টির ছাত্রদের দাবি,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক।
তাদের এই দাবি কেন এবং এ দাবি পূরণ
হলে তাদের কি সুবিধা হবে সে সম্পর্কে
ভারী অস্পষ্ট, প্রায়নির্বাক। মৌল দাবি
ছাড়া তাদের অন্যান্য দাবিঃ পশু-বিজ্ঞান
ফ্যাকাল্টি খোলা হোক, বি-এসসি ও
এম-এসসি কৃষিবিজ্ঞানের ক্লাসে আসন-
সুখ্যা বাড়ানো হোক, হোস্টেলের উন্নতি
চাই, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া
হোক, কৃষিবিজ্ঞান-স্নাতকদের কর্ম-
সংস্থানের নিশ্চয়তা চাই ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, তাদের উপরি-উক্ত দাবি-
গুলির প্রত্যেকটিই যুক্তিসঙ্গত এবং
সহানুভূতির দাবি রাখে। কিন্তু এই দাবি-
গুলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বা
শাসনভিত্তিক কাঠামোর পরিবর্তনের কি
সম্পর্ক তা বোঝা যাচ্ছে না। কল্যাণী
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'কল্যাণী কৃষি বিশ্ব-
বিদ্যালয়' হলেই কি উপরের সব দাবি
পূরণ হয়ে যাবে? তা যদি হয়, তবে আমি
অবিলম্বে নাম পরিবর্তনের পক্ষপাতী।
অন্য পক্ষে, নাম বা শাসনভিত্তিক কাঠামো
পরিবর্তন না করেও উপরের প্রত্যেকটি
দাবি পূরণ সম্ভব অর্থাৎ সমবেত আন্দো-
লনের মাধ্যমে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষকে ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ তাদের
দাবি মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন।

আর এই সহজ ব্যাপারটুকু কেন তাদের
হৃদয়গম্য হয় নি তা বোঝা যাচ্ছে না।

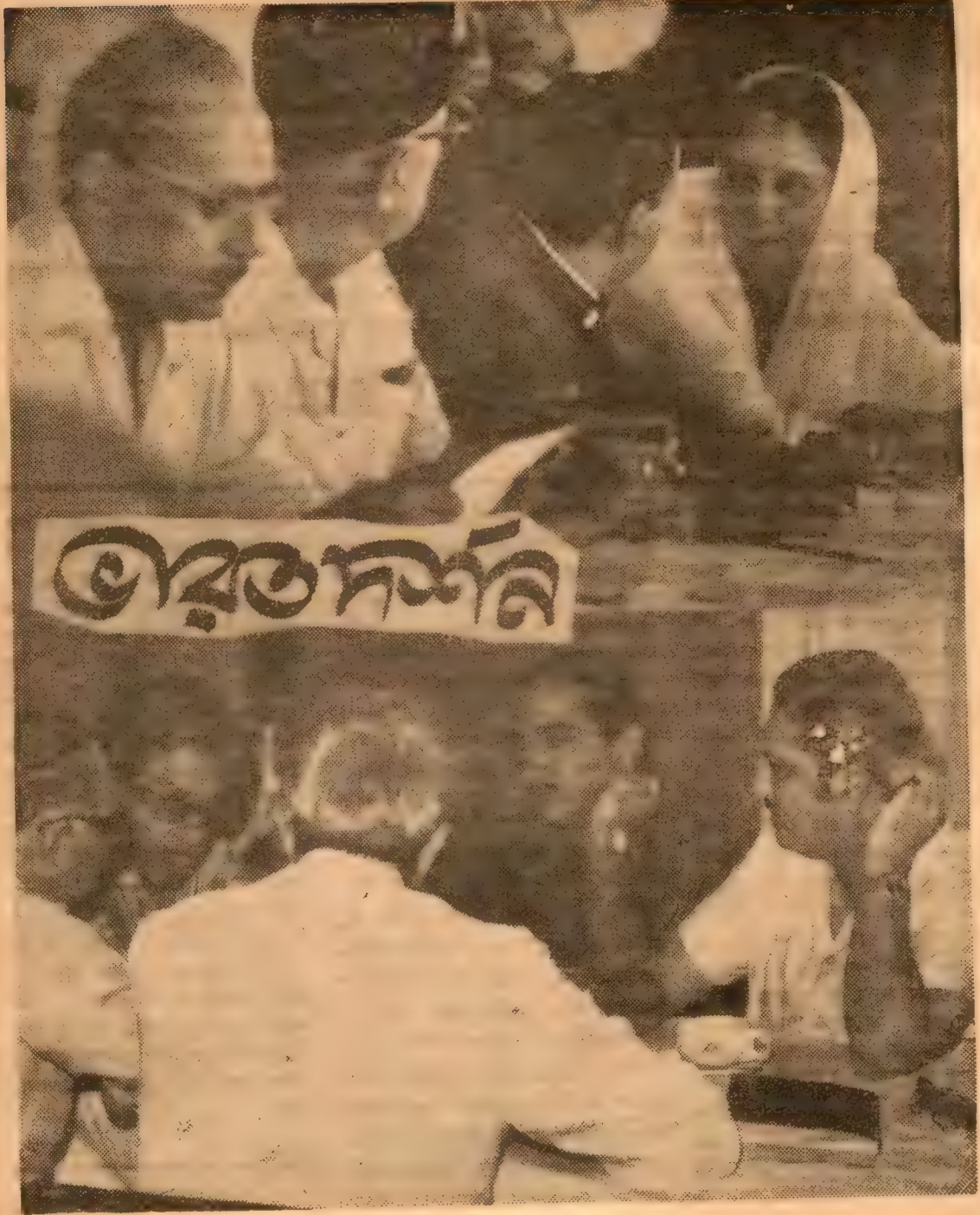
কৃষি ফ্যাকাল্টির ছাত্ররা কয়েকটি প্রশ্ন
তুলেছেন। যেমন, 'অন্যান্য ফ্যাকাল্টির
মাননীয় শিক্ষক এবং প্রিয় ছাত্রবৃন্দরা কি
বলবেন, আই-সি-এ-আর প্রতিশ্রুত ২৫
লক্ষ টাকা খরচ হয় নি কেন? ইউ-জি-সি'র
কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও
কেন তাদের ফ্যাকাল্টি যথাযোগ্য সুযোগ-
সুবিধা পাচ্ছে না? তারা কেন এ ব্যাপারে
ব্যাপক তদন্তের দাবি করছেন না?'
ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলি খুবই সঙ্গত এবং সমরোপ-
যোগী। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির পরি-
প্রেক্ষিতে চন্দ্রগুপ্তের বিনীত প্রশ্নঃ এই
প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার দায়িত্ব বিশ্ব-
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, কোন ফ্যাকাল্টি-
বিশেষের নয়। এবং যেহেতু প্রশ্নগুলি
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট, সেজন্য সকল ফ্যাকাল্টির তরফ
থেকেই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হওয়া প্রয়ো-
জন। কৃষি ফ্যাকাল্টির শিক্ষক-শিক্ষার্থী,
কি ভিন্ন নৌকার যাত্রী? বাড়িতে আগুন
লাগলে সে-আগুন নেভানোর দায়িত্ব
সকলের, না কি, যে-অংশে প্রথম আগুন
লেগেছে, শুধুমাত্র সেই অংশের বাসিন্দা-
দের?

শিক্ষার্থীসমাজ আজ দুটি
শিবিরে বিভক্ত, এবং তুচ্ছ
কারণে এই বিভাগ। এর মূলে
শিক্ষা, রাজনীতি বা এডুকেশনাল পলি-
টিকস, তাতে সন্দেহ নেই।* যে-কারণে যে-
ভাবেই হোক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিশ্বার্থী আন্দোলন সাম্প্রতিক
দৃষ্টিতে হিসাবে শিক্ষাগ্রহণীদের চিহ্নিত
করেছে। এই ধরনের আন্দোলনের ফল
স্বপ্রসারী এবং কালক্রমে ভিন্ন চেহারা
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও
সংক্রামিত হবে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে চন্দ্রগুপ্তের
অনুরোধ, অবিলম্বে আন্দোলন বন্ধ করে
পারম্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত একটি
পরিকল্পনা রচনা করে সরকারের কাছে
অর্পণ করুন। এবং সরকারের কাছে
চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থায় দ্রুতি-বিচ্যুতি
নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত
কমিটি গঠন করুন। সাধারণভাবে শিক্ষার
এবং বিশেষভাবে কৃষির স্বার্থ জড়িত
হলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে অপমৃত্যু
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার এবং
শিক্ষাগ্রহণী মাত্রেরই এগিয়ে আসা সমী-
চীন শব্দ নয়, অবশ্য কর্তব্য বলে মনে
করি।

*সম্প্রতি এই এডুকেশনাল পলি-
টিক্সের একটি কদম দৃষ্টান্ত কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেছে। কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্বতন্ত্র বিশিষ্ট
অধ্যাপকের নিঃসন্দেহ প্রয়াসের ফলে 'বিশ্ব-
বিদ্যালয় আইন' (১৯৬৬) অনুসারে
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি
এবং ঐসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিষয়ে এম-এ উপাধিপ্রাপ্ত কলেজে অধ্যাপনার
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 'সাপ্তাহিক
বসুমতীর পরবর্তী' কোন সংখ্যায় বিস্তা-
রিত তথ্যের ভিত্তিতে এই দৃষ্টান্ত
উন্মোচনের ইচ্ছা আছে।



দিল্লীতে রাজন্যবর্গের মন্ত্রণাসভা

স্বাধীনতার এক দুই তিন

ভারতের কর্ণধারগণ স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত, বিশেষত বিগত পাঁচ বছর যাবৎ যে সকল বাণী বর্ষণ করে আসছেন তন্মধ্যে প্রধান তিনটি সমস্যা পুনরুজ্জারিত হতে শোনা যায় : (এক) সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি, (দুই) আশঙ্কাজনক সীমান্ত আবহাওয়া এবং (তিন) অর্থনৈতিক নৈরাজ্য অর্থাৎ

উদ্বেগজনক মূল্যস্ফূর্ত। বস্তুত এই এক দুই তিন নিয়েই আজকের ভারতবর্ষ। মোটা করে এই এক দুই তিনের মোকাবিলা করা সম্ভব হলে দেশের চেহারা অনেকাংশে রোগোন্মুক্ত হতে পারত। কিন্তু বছরের পর বছর বহুতর ধানাই-পানাই করেও ভারতীয় নেতৃস্থ তার কোন সদ্ভূত সমাধান দ্বরে থাক, সমাধানের পথের হাদিস খুঁজে পান নি।

পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন স্বার্থের টানাপোড়েনে সঠিক পথে বাঁ পা বাড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আমরা খাদ্যসংকট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচারনের কাছে সীমান্তসংস্কার প্রদর্শনে কিছু উপদেশ কিছু সন্দেশ লাভ করোঁছি প্রথাবদ্ধভাবে।

স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু

যেমন শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, আগামী তিন মাস নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাব্য।

যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সীমিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা প্রস্তুত। আর এসব কত্থায় যে কর্মদল মেনে চলতে হয় হৃদয় সেই কর্মদলই তাঁরা সনাতনপন্থীর মতো সোশ্যালিস্টিক বাণী বিতরণ করে করতালি আকর্ষণের প্রয়াসও পেয়েছেন।

যেমন শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, মা ভোঃ! খাদ্যসঙ্কট বড়ই ভীষণ হোক, খাবড়ালে চলবে না। ভয়ে ভীত হয়ো মা ভারত। বরং কর বন্ধ হবে জয়। সাহস, সংকল্প আর উদ্দীপনাকে হাতিয়ার করে চলো সব এগিয়ে। ভাই সব, মনই আসল, তাকে সিন্ধে রাখলেই সব সিন্ধে, সব কিছের অবসান। এই সংগে একটা কংক্রিট কথাও তিনি বলেছেন, এক বছর কোনক্রমে টিকে থাকো তোমরা। আগামী বছর এই সংকটকাল কাটিয়ে ওঠা যাবে অবশ্যই।

কথাসমূহ। আশায় বাঁধিনু ঘর। সকলে মিলে ডন কুইকস্‌জের মতো হাওয়ার সংগে লড়াই-এ নামার সংকল্প গৃহীত হল ১৫ই আগস্ট। নয়াদিল্লীর লাল-কেন্দ্রার সামনে জমায়েত নগরবাসীর প্রতি কেন্দ্রার প্রাকারপ্রদেশ থেকে অভয়বাণী শোনালেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কিন্তু এসব বক্তৃতা ও অভয়বাণীর কস্তাপচাফর প্রমাণস্বরূপ প্রসংগত নিচে গত দুই বছরের স্বাধীনতা দিবসের মেজাজ এই দুই বছরের “ভারতদর্শন” থেকেই উন্মোচন করে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের এক দুই তিনকে মেলে ধরাছি:

“১৯৬৫-র স্বাধীনতা দিবস আমাদের জন্য আনল সমস্যা আর দুঃসংবাদ। ঠিক এই মুহূর্তে কাম্মীরে চলেছে পাক হানাদযাত্রী, রাজধানীতে তৈরি হচ্ছে গরম নির্দেশ, সরকার ব্যস্ত-আছেন প্রতিবাদ-পত্র লুকনায়। যখন বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হচ্ছে আসাম, বিহার। খাদ্য নিয়ে চলছে মাথা গরম, মার খাচ্ছে বিহার। এবং যখন বেরুবাড়ী বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে সর্বোচ্চ বিচারের বিভীষণ রায়, বাংলাদেশ পুনর্বাসন অপারেশন থিয়েটারের ঘোর-গোড়ায়।.....” (ভারতদর্শন)

আগস্ট ১৯৬৫ সালে স্বর্গত প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছিলেন: “বন্ধু রাষ্ট্রের সমগ্রই আমাদের কাম্য। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে আমাদের মতই আমরা প্রয়োগ করব।”—(ভারতদর্শন)

এরপর আমরা ভাস্কর্য চুক্তি মেনে নিয়েছিলাম।

এখনও পাক-ভারত সীমান্তে পাক

ফৌজের রণসজ্জা সমান তালেই চলছে বলে সংবাদ।

এরপর ১৯৬৬ সাল। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কন্যা শ্রীমতী গান্ধী স্বাধীনতার ঊনিশ বছর বয়সে বক্তৃতা করতে উঠে “একটি প্রথাবদ্ধ উপায় অবলম্বন করে সূক্ষ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন জনগণের প্রতি দেশ গঠনের আহ্বান জানিয়ে। অর্থাৎ যথাকর্তব্য জনগণে বিলি করে খুশি হয়েছে।

“স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী চীন ও পাকিস্তান থেকে বিপদাশঙ্কার কথা বলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সংকল্পে দেশ-বাসীকে অটুট থাকার আহ্বান জানিয়ে-ছেন।” (ভারতদর্শন)

“মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্থিক বিপর্যয় রোধ করা হল বলে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আমাদের সাড়স্বরে আশ্বাস দিয়ে আসছেন; মুদ্রামূল্য হ্রাস-জনিত বিপর্যয়েই সাধারণ মানুষকে কিন্তু প্রমাদ গণতে হচ্ছে।...সরকারও ব্যয়হ্রাস সিদ্ধান্তটির বোকা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপিয়েই পরিত্যক্ত হতে চাইছেন।.....কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যবান সিদ্ধান্তে স্থির করা হচ্ছে যে, চাকুরী-ক্ষেত্রে যাবতীয় উন্নতি এবং আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাবতীয় সম্ভাবনাকে স্বার বন্ধ করে দিয়ে একই প্রকোপে আটক রাখা হবে। ...দাম চড়ুক, আয়ের পথ বন্ধ থাক। বেকারের কর্মসংস্থান বন্ধ হোক, উন্নতির আশায় ছাই চাপা থাক, স্বাধীনতার সুপ সাধারণের কৃচ্ছসাধনার মধ্যেই লক্ষ্য।” (ভারতদর্শন, ১৯৬৬)

১৯৬৭ সালে এর চেয়ে কোন কথাটা নেতারা বেশি বলতে পারেন এবং অন্যে তাই টকে নিতে পারেন।

কে বলে আমরা স্বাধীনতার কুড়িটা বছর পার হয়ে এলাম। আমরা একই বেবী ক্রাচে শায়িত। আমাদের প্রয়োজন একজন উপযুক্ত ঠেলদার।

সেই জওহরলালজীর আমল থেকে দেশের একই অসহায় অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি: “That a large number of persons in our midst are trying to make money out of other peoples’ misery.” (১৯৫০-এ স্বাধীনতা দিবসে নেহরুর ভাষণাংশ)।

দশ বছর পরেও একই হতাশা উচ্চারিত হল পণ্ডিতজীর কণ্ঠে: “Independence will be complete only when all four hundred millions receive its full benefits.” (নেহরু, ১৯৬০, স্বাধীনতা দিবস)।

অনেক ভেবেচিন্তে নেহরুজীই বলে-ছিলেন: বর্তমানে না-আমরা পরনির্ভর-শীলতা ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমাদের লাঞ্ছনা এবং অপযশের শিকার হতেই হবে। একথা তিনি ১৯৬৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে বলেছিলেন।

১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা একইভাবে পরের স্বারা ‘ডোমিনেটেড’, শাসিত হয়ে এলাম। ঘরে মজুতদার, আড়তদার, কালোবাজারী-বণিক সম্প্রদায় আর ফিউডাল লর্ডরা, বাইরে আমাদের অস্বাভাব্য অশ্রুদাতারা আমাদের ওপর খবরদারি করে এলেন। স্বাধীনতার এক দুই তিন সংকটকে ভীতভয়ে করে নিয়ে গেল। আর এই নাবিশনের এই অসহায় আত্মনিবেদনের হাত থেকে আজকের অকংগ্রেসী সরকার-গুলিরও মুক্তি নেই। কুড়ি বছর ধরে একভাবে ফসল বোনা হয়েছে, স্নাত্তারান্তি ভিন্নরূপ উৎপন্নের আশা আকাশকুসুম। স্থিতিমূলক অকংগ্রেসী সরকারগুলির মধ্যেও ধোঁকাবাজ স্বার্থবাদীরাও পিল পিল করে ঢুকে পড়েছেন; এদের তৈকানো সম্ভব হয় নি। বিগত কুড়ি বছরের ইতিহাস সে সম্ভাবনা তৈরি করতে কিছুমাত্র সুযোগ গ্রহণ করে নি। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব তাই বছর বছর স্তিমমগ্ন হয়ে এসেছে। স্মৃতিফলকে মাল্য-দানের মতই এদিনটি যেন একটি স্মরণোৎসব দিবসে পরিণতি লাভ করেছে মাত্র।

এবারের স্বাধীনতা দিবস নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের স্মরণে পনেরই আগস্টকে জাগ্রত করেছিল।

উৎসবের শেষে

উৎসবের শেষে মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ লালকেন্দ্রার পতাকা উত্তোলন দৃশ্য দর্শনাধীর্ উৎসাহের স্বাক্ষর বহন করেছে। লালকেন্দ্রা-ফেরৎ জনতা কয়রা ব্রীজের ওপর ধাক্কাধাক্কির আঘাতে জনৈক ষাট বৎসর বয়স্কা দর্শনাধীর্কে পায়ের তলায় পিষে মারে। আরও জনা আশেটক বিভিন্ন-রূপ আঘাত সারাতে আরউইন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন।

আমেরিকায় উৎসাহ উদ্দীপনার পরিমাপক অপঘাত মৃত্যু। বড়দিন সেখানে কত বড় করে পালিত হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় কোন বছর কত লোক মোটর চাপা পড়েছেন সেই তালিকায়।

আমাদের গম্ভীর রুমশ স্তিমমগ্ন স্বাধীনতা উৎসব যে বহু উৎসবাপ্যাসকে বথারীতি আকর্ষণ করেছিল, বৃদ্ধার মৃত্যু তারই যথেষ্ট পরিচায়ক নয় কি?

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর বাণীর সেই অংশ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ শুরু করেন, যে অংশে একদা নেহরুজী বলেছিলেন: “স্বাধীনতা আনে দায়িত্ববোধ এবং বোঝা আর মুক্ত মানুষের শৃঙ্খলাবোধ নিয়েই সে সকলের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।”

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন তাঁর স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নেহরুজীজ্ঞতার ডিফেনসিভ অর্থাৎ আত্মসমর্থনমূলক অংশটিকেই বাছাই করে নিয়েছেন অন্তত তাকে সেইভাবে ব্যবহার করেছেন। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কণ্ঠে সমগ্র জাতি যে তাঁর আত্মসমালোচনার কঠিন বাক্য উচ্চারিত হতে শুনছিলেন, ডঃ হুসেনের কাছে তা যে শোনা যাবে না, তাও ডঃ হুসেনের প্রীতিপ্রদ অংশ চয়নের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ডঃ হুসেন তাঁর ভাষণে পরিতৃপ্তির পথই খুঁজেছেন। সরকারপক্ষ সমর্থনের জন্যই উপরোক্ত অংশ তাই তাঁর ভাষণের মূলবস্তু-রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

কুড়ি বছরের সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, উদ্ভাস্ত সমস্যার সমাধান, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা সামাজিক সাম্য, সমান সুযোগবিধান, অনন্তত শ্রেণীর উন্নয়ন, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রভৃতিই আমাদের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করছে। একটি জাতিকে মহান জাতিতে পরিণত হতে হলে তার দায়িত্ব-বোধ, শৃঙ্খলাবোধ এবং সংঘম দ্বারা চারিদিকের তৈরি করতে হবে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা হর্জন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির মূল লক্ষ্য চিরাচরিত প্রথায় উপদেশ বিতরণের মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধান করেছে।

তিনি সাবধানে সেই সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন যেগুলি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অগ্রগতিকে ক্রমাগত স্তব্ধ করে দিতে চায়েছে। তিনি স্মরণ করেন নি পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্ভাস্ত সম্প্রদায় কেন্দ্রের একদেশাচারিতার জন্য দিনের পর দিন কী ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনা এবং বিভাজনের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি বলতে পারেন নি সামাজিক ন্যায় এবং সর্বজনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনে আমরা কার্যত ব্যর্থ হয়েছি আমাদের ধনিক নির্ভরতার ফলেই। স্বীকার করেন নি প্রশাসনিক দুর্বলতা কুড়ি বছর ধরে দেশে অবাধে একটি জুটেল সম্প্রদায়কে দুর্ভেদ্যে গতির ও ও সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে এসেছে। বলতে পারেন নি, নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেশব্যাপী নৈতিক মানকে চোখের

সামনে তিলে তিলে পশুদন্ত হয়ে যেতে দেখেও সুখে গদি ভোগ করে গেছে। বলেন নি, আমরা : পরনির্ভরশীলতার বেড়ি পায়ে পরে কুড়ি বছর শৃঙ্খলিত হয়েছি, এইবার মাথা তোলার চেষ্টা করতে হবে। মূল্যস্তরকে যথা ইচ্ছা চড়াই ভাঙতে দিয়েছি জনগণের ওপর পরোক্ষ চাপের বোঝা বৃদ্ধি করে, যার ফলে দেশ আজ চরম বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। হুসেন সাহেব সেই সত্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকতে চেয়েছেন যে, দায়িত্ব-বোধ ও শৃঙ্খলাবোধ ছেলের হাতের মোয়া নয়, দেশবাসীর মধ্যে এ দুটি বস্তুকে জাগাতে হলে যারা দেশের কর্ণধার দায়িত্বজ্ঞান প্রয়োজন সর্বাপ্রাে তাঁদেরই। তাঁরা আকেল গড়ম্ব করে কেবল মসনদ আগলেছেন। মসনদ আগলাতে গিয়ে দেশপ্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন এবং দলের মধ্যে দলীয় বিবাদে নিজেরাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

হুসেন সাহেব উপদেশের মধ্যে আত্ম-তৃপ্ত না থেকে যদি দেশকে এই বলে



ডঃ জাকির হুসেন

সতর্ক করতেন যে, ব্যক্তিস্বার্থের পেছনে ছুটে আমরা দেশের সাধকে জঞ্জালে নিক্ষেপ করেছি। তারই চরম ফলশ্রুতি আজকের সার্বিক বিপর্যয়। ক্ষণিক ব্যক্তি-স্বার্থসিদ্ধির পথে কখনো সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্রীবৃদ্ধিহীন দেশে ব্যক্তিস্বার্থও চিরকাল রক্ষিত হয় না। এই আলোকেই আমাদের চিন্তাকে পরি-শীলিত করতে হবে। যদি তিনি তেমন কথা বলতেন, তবে রাষ্ট্রপতি রূপে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁর ভাষণ স্মরণীয় হত। আমরা তাঁর মূখে কংগ্রেসী নেতাদের কয়েকটি ধারহীন ব্যর্থ টেপ

রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি শুনে হতাশ হয়েছি। দুর্ভাগ্য, সেই হতাশা প্রকাশের জন্যই আমাদের মূল্যবান সময়ের ওপর অসহায়-ভাবে আমাদের দাবি জানিয়ে বসতে হচ্ছে আজও—যখন এই জাতীয় বস্তুত সম্পূর্ণভাবে বিগতকালের বহুচর্চায় তার বোধশক্তিটুকুও ক্ষয় করে বসেছে।

রাজ-মুনিয়ন

ভাগ্যচক্র আর কাকে বলে। এতকাল সমাজের নিরাম অংশই পেটের দায়ে সম্ববন্ধ ছিলেন, হিচ্ছিলেন। সমাজের বহু শ্রেণীর পেটমারার অধিকার সংরক্ষণের জন্য তারপর সম্ববন্ধ হয়েছিলেন মূলধনের মালিকরা। বাজারে ফেরার কম্পিটিশনে একের বিরুদ্ধে অপরে যতই কেন না আন-ফেরার হন, শ্রমিক মারতে একজোট তাঁদের হতে হয়েছে। এবার পথে এলেন রাজন্য-বর্গ। রাজন্যবর্গের বসে থাওয়ার উপায়, মোটা অঙ্কের ভাতা বন্ধের জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে অবশেষে তাঁদেরও মুনিয়ন গড়তে হল। ভাগ্যচক্র একেই বলে।

ফতে সিং রাও গায়েকওয়াড় যিনি বরোদার রাজা এবং গুজরাট মন্ত্রিসভার (কংগ্রেসী) সদস্য, সখেদে বলেছেন, কুড়ি বছর আগেই রাজন্যবর্গের উচিত ছিল নিজস্ব একটি সংগঠন তৈরি করা। তা হয় নি। এখন থেকে তাঁরা সম্মিলিত-ভাবে রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে একই শ্লেগানে আওয়াজ তুলবেন।

নয়াদিল্লীতে বসুম্বার প্রকাণ্ডে তাঁরা সেই প্ল্যাটফর্মের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন স্মরণীয় আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তাঁদের দুইদিনব্যাপী মন্ত্রণাসভার পর নিগত ১৩ই আগস্ট একটি ফতোয়া প্রকাশ করে রাজন্যবর্গের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। ফতোয়ার মূল বস্তু : রাজন্য-বর্গের ভাতা বন্ধ করলে কংগ্রেস তার দ্বারা একটি শাসন নৈতিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করবেন। প্রশ্নটা নীতির। প্রশ্নটা ন্যায়-নীতির। বস্তুর একাংশ উন্মারের লোভ জাগে। বরানটি এমনি :

“We as Indians are concerned that moral principles, which are the very basis of society, that justice, which is the very basis of the State, and honour, which is the very basis of the prestige of India, shall prevail. In all this, the princes of India stand united.”

Moral principles, justice and honour সমুদয় বেতে বসেছে আর তাই যে রাজন্যবর্গ প্রজা-সাধারণের প্রতি এই ভিন নীতি বৃপে বৃপে পালন করে এসেছেন, তাঁরা সমবেতভাবে আজ তাই বন্ধ করছে

নৈজাতিকদের আবিষ্কার
মৃতা-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা 'অ্যাসপ্রো' বিসার্ফ ইনস্টিটিউটের
বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার কত আবিষ্কার করেছেন
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার
নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড কত কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-
বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশি
কাজ করে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন আর ১০
কোটি গুলু কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা দূর করার শক্তি বিস্ময়কর ভাবে
সার্বিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুঃখের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

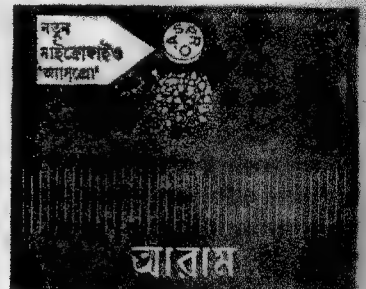
দুঃখের মধ্যে কান্ড শুরু হয়ে যায়—অনেককাল ধরে কান্ড চলতে থাকে।
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার সক্রিয় উপাদানটি অতি সূক্ষ্মকণী
এবং খুবই শীঘ্রির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যে
কাজ করে। সেইজন্মেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা
দূর করে দেয় এবং তার কল অনেককাল স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আগনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনাকে
যেভাবে খুসী খেতে পারেন—চকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। এক গ্লাস জল বা
যে কোনো সরস পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের ব্যর্থার নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' থাকবে:
ব্যথা-বেদনা, মাথাব্যথা, গা-ব্যথা, দাঁতব্যথা, গাঁটে বেদনা, জ্বর-জ্বর-জ্বর, হৃৎ
কেন্দ্র জ্বর, গলাব্যথা।

আমি: প্রাপ্তবয়স্ক: ছোট ট্যাবলেট। অসুস্থ হলে আবার খাবেন। নিম্নের
কাজ: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশনামত।

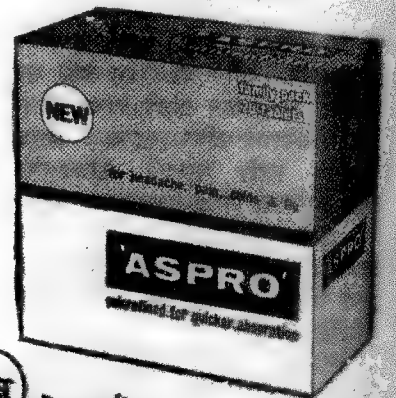
নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কীভাবে কাজ করে দেখুন।



ট্যাবলেটের কণাগুলি জাকার যত বড়
হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে বেশী
কাল লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'র একটি ট্যাবলেটে আর ১০ কোটি গুলু কণা
রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মিশে কাজ করে
খুব তড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

সিঙ্গেল-এস ৩০ টেবী

ASPRO

দাঁড়াবেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের বেশ কিছু সংবাদপত্র, সামাজিক এবং রাজনীতিক উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে শাসনতন্ত্র বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ এই সভা উপলব্ধি করেন স্বতন্ত্র এবং জনসংঘের মত দলগত। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অর্থ বিশ্বাসহীনতার কাজ করা।

রাজন্যবর্গের বংশপরম্পরায় ফালতু সুযোগ ভোগ করার কোন বিশেষ নৈতিক অধিকার আছে এমন কথা বারিা ভাবতে ও বলতে পারেন তাঁরা মধ্যযুগের অন্ধ গৃহস্থ বাসিন্দা। তাঁদের ফসিল হিসেবে মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা যায়, এই মত-চিন্তায় পরিপুষ্ট রাজনীতিক কবর-ফোঁড়া রাজনীতি হিসেবে গণ্য করা যায়। মুস্কিল হল ভারতবর্ষ আজও বিবরমুক্ত হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করে নি। আজও রাজন্যবর্গ সংরক্ষক দল ও ব্যক্তি ভারতের বেশ কিছু অধিবাসীর সমর্থন-পুষ্ট। সমস্যা তাই রাজাদের চাইতে প্রজাদের নিয়েও কম নয়।

কংগ্রেসের যে প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব-মজাত অশুভ নতি-বোধের বস্তুত মৃত্যু আজও ঘটে নি। যদিও জমিদারের জমি-শারিফ ঘুচেছে, নায়েরীর জায়গা দখল করেছে তহশীলদার। রাজন্যবর্গ সেই মোহাম্বা ভারতের মাটির ওপরই পা পেতে দাঁড়িয়েছেন; সে মাটিতে আজও কংগ্রেসপন্যাসকাতর মানুষের বৃকের হুকপুঙ্কি রাজন্যবর্গের পদপদ্মবরণে লম্পণে জ্বাইয়ে আছে। রাজন্যবর্গও তাই সহজে ছাড়বার পাশ নন। বংশধার মন্তগামভায়, তাঁরা মধ্যযুগের সেই সব জীবন্ত শবের মত চেয়েই পুনশ্চ রাজ-বিক্রমে একাবন্ধ প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। দুটো সুস্পষ্ট যুগের শেষ শক্তি পরীক্ষার দিনও সমাগত।

রাজন্যবর্গের মন্ত্রণা কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজন্য স্বার্থরক্ষার জন্য এঁরা শেষ আপোষ চেষ্টা শুরু করবেন। কমিটিতে আছেন:

বরোদার ফতে সিং রাও গায়েকর (আইনজ্ঞ), বিকানীর ডঃ কার্নি সিং (যুক্ত আহ্বায়ক), তেহরী গাড়েয়ালের মহারাজা (কোষাধ্যক্ষ) এবং নাভা, ঠিপুয়া, কালাহান্দি, নালাগড়, নরসিংহ, ধরমারা প্রভৃতির রাজন্যবর্গ এবং ভূপালের নওয়ার বেগম। আগামী অক্টোবরে যে শাসনতন্ত্র চূড়ান্তরূপে গৃহীত হবে তার খসড়াও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

ভারতের বৃকে মধ্যযুগের একটি পুরাতন পাতা নতুন করে উন্মোচিত হচ্ছে। প্রাচীনপন্থীরা লোলচর্মাদিতে তৈল মর্দন শুরু করেছেন। এই অভিনব শক্তি

পরীক্ষার আয়োজন সারা দুনিয়ার দৃষ্টি দিল্লীর প্রতি আকৃষ্ট করবে। আমরাও উদ্বেগ।

কমীভাড়া

কেন্দ্রীয় কমীদের দেয় ভাতার প্রস্তাবটি আজও অমীমাংসিত। জাপান থেকে অর্থ তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই না-ফেরা পর্যন্ত সরকারী মহলও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন না। তবে গজেন্দ্র গদকর কমিশনের সুপারিশকে অর্থদপ্তর এ পর্যন্ত যত্নসহকারে উড়িয়ে দিয়ে আস-ছিছেন। কেন্দ্রীয় কমীরা আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার সরকার এখন বিচার-বিবেচনার নামে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছেন। বর্তমানে কিছু নগদ, বাকি প্রভিডেন্ট ফান্ড দেওয়ার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত রাজ্যের ওপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (অবশ্যই রাজ্য কমীরাও ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাবাব্যবস্থার দাবি তুলবেন) তা নিয়েও পুনঃপুনঃ বৈঠকের সম্ভাবনা। তবে মদ্রা-মুন্সীয়া হুঁস যতকাল সরকার রুখেতে না পারছেন, ততকাল এইভাবেই কাদায় গুণ ফেলে চলতে হবে। অন্য উপায় নেই।

উত্তরপ্রদেশ:

চরণ সিং-এর চেতনা

উত্তরপ্রদেশ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শীর্ষমণি শ্রীযুত চরণ সিং যে এতো তাড়াতাড়ি চেতনা লাভ করবেন তা কেউ আশা করেন নি। কেমন করেই বা করবেন। ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বড় শরিক জনসংঘই যে অধৈর্য হয়ে সর্বনাশা পথে স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেবে এতোটা আন-পলিটিক্যাল তাকেই বা কে ভাবতে পারে। উত্তর ভারতে এখন তার দর-কদর বেড়েছে। কিছু সময়ে চলাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু শ্রীরামপ্রকাশ গুপ্ত, উত্তরপ্রদেশের জনসংঘী উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভেতরের চামড়া গুপ্ত রাখতে পারেন নি, জনসংঘের জমিদারী মনোভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন। মুখ্য-মন্ত্রী চরণ সিং-এর তারই ফলে সন্ধ্যার প্রাকালেই চেতনা লাভ সম্ভব হয়েছে। নচেৎ জনসংঘী কার্যকলাপ সম্পর্কে এখন যে অভিযোগ তার ভিত্তি অনেক আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে সেগুলি সচেতন করে নি। জনসংঘ আর এস এস বাহিনী থেকে বাছাই করে বেশ কিছু ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকার যখন দান করিছিল, যখন জনসংঘী সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে চাগিয়ে তোলা হচ্ছিল, চরণ সিং তখন চপ করেই ছিলেন। ফ্যাসিস্ট আগ্রগতিকে প্রথম পদক্ষেপেই রুখেতে না পারলে তা সর্বগ্রাসী

হবেই এই সচেতনার অভাব সে সময়ে দেখা গেছে। জনসংঘী অনেক বায়না শ্রীমং বসে বসেই হজম করে আসছিলেন; বোধ হয় জনসংঘের দিক থেকে সামাজিক বিপ্লবের ভয়টা কম ভেবেই। আজ তারই মারাত্মক ফল ফলছে। রাজস্থানেও কংগ্রেস এ ভুলই করেছিল, তার জন্য মূল্য কম দিতে হয় নি। মধ্যপ্রদেশেও এ ভুলের মাসুল দিতে হবে। উপায় নেই।

রামপ্রকাশ গুপ্ত যদি এই মূহুর্তেই স্বয়ং চরণ সিংকেই কোণঠাসা করে জন-সংঘের দাপট না জাহির করতেন, কে জানে উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি তাতে আজ কেমন দাঁড়াত। কিন্তু রামপ্রকাশ সৌদিক দিয়ে এগোন নি। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন আপন ঘাঁটি পুরোপুরি শক্ত করার আগেই। ফলত চরণ সিং-কে এখন আপন মর্ষাদা রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করতে হয়েছে। তিনি পদত্যাগপত্র পেশের হুমকী দিয়ে জনসংঘী দাপটকে বাগে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। সাক্ষ্যও দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরাও জনসংঘের তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাম-প্রকাশের বাড়িবাড়িটা ভালো চোখে কখনই দেখাছিলেন না, তাঁরা চরণ সিং-কে মেনে রেখে এই সুযোগে জনসংঘকে কোণঠাসা করার সম্ভারনাকে মাদরে আহ্বান জানালেন। জনসংঘ ১৮ই তারিখের কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং-এ ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে একা হয়ে পড়ে-ছিল। কোন দলই মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেটকে অবহেলা করে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর জেলা শিক্ষা পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের ব্যাপারটা সমর্থন করেন নি। কেন না এই কমিটির সঙ্গে পলিসি সংক্রান্ত বিষয় বিজড়িত আছে। কোন মন্ত্রী ক্যাবিনেটের বিনামুদোদনে পলিসি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিজে দায়িত্ব বিবেচনার অধিকারী নন; জনসংঘ নিরপেক্ষ অন্যান্য শরিকরা এক-বাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাছাড়া বেসরকারী একটি কমিটি যা মুখ্য রামপ্রকাশ গুপ্ত ব্যতীত ক্যাবিনেটের কাছে কোনরূপ দায়বদ্ধ নয়, তার হাতে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষাব্যবস্থার ওপর জনসংঘের কর্তৃত্ব স্থাপন করে শিক্ষার মধ্যে জনসংঘী সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানোই উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের উদ্দেশ্য। অত্যাধি সেটা হতে দেও-য়ার অর্থ একটি সর্বনাশা পথে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালিত করা। যা কোন প্রগতিশীল দলের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মেনে তাঁরা নেনও নি। অবশেষে জনসংঘকেই সর্বসম্মত প্রস্তাব মেনে নিতে হল। কিন্তু বড় শরিকের

গরীবা অত তাড়াতাড় ত্যাগ করা অসম্ভব।
তারাও অভিযোগ তুলেছেন সেক্ষেত্রে।

অভিযোগ, ফ্রন্টে সর্ববৃহৎ দল হয়েও
উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে অন্যতম একজন মন্ত্রীর
মতই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বোম্বাটা
দেওয়া হচ্ছে না।

বথার্থ দুঃখের কথা। জনসংঘ যে
কোন প্রকার সাম্যবাদেরই বিরোধী। তাকে
কি না বৃহৎ দল হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা
দেওয়া হচ্ছে না। এর পরও যে রামপ্রকাশ
গুপ্ত মন্ত্রিসভা লড়াই করে দেন নি,
এটাই যথেষ্ট। তাছাড়া শ্রীগুপ্তের দলের
ওপর শ্রীচরণ সিং অন্যান্য প্রগতিশীল
দলের অপেক্ষা ভরসা রাখেন বেশি।
এমতাবস্থায় জনসংঘ তার নিজস্ব দৃষ্টি-
ভঙ্গিতে কিছু বেশি দাবি অবশ্যই
করবেন।

চরণ সিং তাতেও ঘাবড়াবেন না।
কিন্তু গোটা প্রশাসনে ক্রমাগতই যদি আর
এস এস অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, যদি
মুখ্যমন্ত্রীর ওপর উপ-মুখ্যমন্ত্রী টেকা
দিতে চান, তাহলে গোড়াপন্থীদের দিক
থেকেও ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়।
শ্রীসিং-এর নিজের পজিশনই আলগা হয়ে
পড়ে। সুতরাং তাকে প্রতিবাদে পদত্যাগের
ভয় দেখাতে হয়েছে। চরণ সিং জানেন,
তিনি বেকে বসলে ফ্রন্টের ঐক্যও ভেঙে
পড়বে। তিনি চাপটাও সৈদিক দিয়েই
চাপাতে চান।

চরণ সিং এ পর্যন্ত অনেক বেসামাল
অবস্থায় সামাল দিয়ে আসছেন।
উর্দু নিয়ে জনসংঘ ঘোরতর সংকট ঘনিরে
তুলেছিল। শাস্য সংগ্রহ নীতির ব্যাপারে
কম্যুনিষ্ট সদস্যের সংগ্রহের দায় ছিল।
ভূমিরাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে ভূস্বামী
স্বার্থের চাপ ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে
নানা মূর্খতার নানা দাবি মানিয়ে নিতে
হাছিল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর
মর্যাদাকে অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যই মূখ্য
হয়ে ওঠে নি।

রামপ্রকাশ গুপ্ত চাইলেন মুখ্যমন্ত্রীকেই
আমলে না রেখে ফ্রন্টে সংখ্যাধিক্যের জোরে
জনসংঘের স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করতে। চরণ
সিং-এর সহ্য সীমার শেষ কুটোটি চাপানো
হল।

যাই হোক চরণ সিং-এর পদত্যাগ-
কৌশলিক সংকটকে এড়াবার জন্য ফ্রন্টের
অন্যান্য শরিকরা যথাসাধ্য করলেন। মুখ্য-
মন্ত্রীও তুর্কি হয়ে বললেন, সব ঠিক আছে।
কলই পারিচ্ছেদের মলাট চাপা দেওয়া হল।
পদত্যাগ তিনি করবেন না। করবেন
মন্ত্রীদের জন্য একটি আচরণবিধি
প্রণয়ন। সকলে সম্মত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে
আশ্বাস দিলেন তাঁরা সমবেতভাবে চরণ
সিং-এর নেতৃত্বই মেনে নেবেন।

কিন্তু কথায় বলে ভবী ভোলবার নয়।

রামপ্রকাশ গুপ্তও ভোলবার পাত্র নন।
তিনি গরীষ্ট শরিকের নেতৃত্ব করেন। তিনি
সর্বসম্মত প্রস্তাবের পরেও তাঁর গাওনা
বন্ধ করলেন না। সেক্ষেত্রে বলে বেড়াতে
লাগলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে পার্থক্য সার্থক
কামিশনে নিজের লোক নিয়েছেন, নীতির
প্রশ্নে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
কি তখন তো তিনি ক্যাবিনেট সহযোগী-
দের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। যত সময়
হল উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বেলায়। এমন
ক্যাবিনেটের আদ্যাকাল অবশ্যই সর্ধীকৃত।
বোম্বাটিন আর রাজস্ব করতে হবে না।

মুজাকফরপুর মিরাতে শ্রীগুপ্তের
এহেন উক্তিও সেই মেঘেরেঘির পুনরা-
বৃত্তি দেখে এখন চরণ সিং পুনরায়
পদত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করে সংযুক্ত
মিথারক দলের সম্পাদকের কাছে পত্র প্রেরণ
করেছেন।

রামপ্রকাশ গুপ্তকে নিয়ে যে সংকট
পাকিয়ে উঠেছে তা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার
ভবিষ্যৎকে টলমলে করে তুলেছে। প্রকাশ,
সংযুক্ত বিহারক দলের অন্তর্ভুক্ত করেকটি
দল সর্বনষ্টের মূল উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাম-
প্রকাশ গুপ্তের অপসারণই সমস্যা সমাধানের
উপায় বলে দাবি জানাতে সুরু করেছেন।

এই গুরুতর পরিস্থিতির পরি-
প্রেক্ষিতে নিখিল ভারত জনসংঘের সাধারণ
সম্পাদক শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর দলের
নীতি নির্ধারণের জন্য নেতৃবৃন্দের একটি
জরুরী সভাও আহ্বান করেছেন।

উত্তরপ্রদেশের কাণ্ড কারখানা
অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারগুলির
সামনে একটি সমরোচিত উদাহরণ উপ-
স্থাপিত করল। যুক্ত কমিউনিস্ট নয়,
বিযুক্তভাবে স্ব স্ব দলের স্বার্থসিদ্ধির
চেষ্টাই উত্তরপ্রদেশ যুক্তফ্রন্টের চরিত্রকে
স্বপ্রকাশ হয়ে পড়ায়, অন্যান্য ফ্রন্ট
মন্ত্রিসভাগুলি ইউ পি দপশে আপনাতন
চেষ্টা দেখতে পারেন। কাজে বোঝানো
এগোচ্ছে না সেখানে দলীয় মনোভাবের
তীব্রতাই বাস্তবরূপে হয়ে উঠছে, এই
সত্য উত্তরপ্রদেশে চোখে আঙুল দিয়ে
দেখাচ্ছে।

দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করার আবেগই
যেখানে মূখ্য হয়ে উঠবে, উত্তরপ্রদেশী
সংকট সেখানে দেখা দিতে বাধ্য। আর এই
সংকট জনসাধারণের মন থেকে ক্রমে শেষ
ভরসারূপেও মুছে নেবে। সাধারণের
আশা যুক্তদলের শাসনে প্রশাসন একক
দলনীতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু
ফল যদি উল্টো ফলতে থাকে, অর্থাৎ
রাবণের গোষ্ঠীর চাপেই সাধারণের শ্বাস
কণ্ঠাগত হয়ে এসেছে, এখন যদি অহী-
রাবণ মহীরাবণও জনগণের মাথায় কঠাল
ভাঙতে চেষ্টা করেন তাহলে তাঁরাই বা
দাঁড়াবেন কোথায়। সাধারণের সব আশায়

যাই পড়লে অ-কংগ্রেসী শাসনেরও পাত্র
প্রাপ্তি ঘটবে।

অনেক দলের বর্তমান ধারণা অনুস-
রীতী নির্বাচনে নামলে সবাইকে বন্ধাই
করে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে
বোঁয়ের আসবেন। কিন্তু সেটাও একটা
মস্ত বড় রিস্ক। সেই দুঃশাস্য ফ্রন্ট
মন্ত্রিসভাগুলি ভেঙে দিয়ে শেষে হয়ত
সাধারণের মধ্যে অ-কংগ্রেসীরা শাসনই
হত্যাশার সৃষ্টি করবেন আর আরামের ফল
হবে জনগণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে হাত-পা
বোঁধে টেলে দেওয়া।

উত্তরপ্রদেশে জনসংঘের আশা, মান্য-
সভা ভেঙে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হলে
তাঁরাই মন্ত্রিসভা দ্বাতিয়ে নেবেন। কিন্তু
সেটা উচ্চাশাই। সেই উচ্চাশার শেষে
তাঁদের যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে
হবে না, একথাই বা হলশ করে বলা
যায় ফেমসভাবে। বিগত নির্বাচনে
জনসাধারণ কোন বিশেষ দলের প্রতি
পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন নি। সৈদিক
থেকেও ফ্রন্ট শরিকদের চিন্তা করা
উচিত। পুনরায় নির্বাচন হলে জনগণের
মন্ত্রিসভা-ভাঙানী দলের প্রতি বীভৎস
হয়ে পড়বেন না তাঁরাই বা গ্যারান্টি
কোথায়।

উত্তরপ্রদেশে জনসংঘ যেভাবে সম-
স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ দিয়ে আপন
স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে—হরিয়ানা, রাজ্য-
প্রদেশে তাদের যে চেহারা দেখা যাচ্ছে
তাতে নিতান্ত দুঃখিত না হলে সাধারণের
তথ্য দিয়ে জনসংঘকে কেন যে ক্ষমতা-
রূঢ় করবেন তার পক্ষেও কোন যুক্তি
নেই।

সমগ্র অবস্থায় তাই ধীর পর্যবেক্ষণ
প্রয়োজন আছে। আশা করা যায়, স্বল্প
রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ভ্রান্ত
পথ ত্যাগ করে সাধারণের স্বার্থরক্ষার
স্বাধাই স্বীয় দলকে প্রতিষ্ঠিত করার
মত চেতনা লাভ করবেন।

উত্তরপ্রদেশে সংকীর্ণ স্বার্থের
সংরক্ষক দলকে চিনতে চরণ সিং-এর
সামান্য সময় লেগেছে, জনসাধারণ তাঁরও
থেকে কিছু বেশি সময় পাবেন। সাধারণের
চেতনা যে না জাগবে তাই বা কে বলতে
পারেন। বিগত নির্বাচনে বতর্কৃত গুটি
থেকে গেছে, অতঃপর তাঁরাও তা সংশোধন
করে নিতে পারবেন। সেই সংশোধনীতে
কে বা কারা সম্মার্জিত হবেন, কেউ তাঁর
ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন না। বিগত
নির্বাচনেই প্রথম অপ্রত্যাশিত ঘটনা
ঘটেছে। এরপর তদপেক্ষা অপ্রত্যাশিত
কিছু না ঘটবে এমন গ্যারান্টিও নেই।
সুতরাং সামাল দিয়ে চলাই শ্রেয়। কাজের
মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই নিরাপদ।

আন্তর্জাতিক



নাসের-টিটো সাক্ষাৎকার

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

গত সপ্তাহে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি বোশেফ তিটো কায়রো এসেছিলেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসেরের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। জুন মাসে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের পর থেকেই কায়রোতে চলেছে একটানা নেতৃ-আগমন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সূপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নিকোলাই পদগরিন এসেছেন, এবং আরও এসেছেন প্রায় সব আরব রাষ্ট্রের রাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী। সকলেরই এক উদ্দেশ্য, ইসরায়েলী আক্রমণ এবং আরব অঞ্চল জবরদখলের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কিভাবে তার সুরাহা করা যায়।

টিটো নাসেরের পুরোনো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁরা দু'জন একত্রে, এবং জওহরলাল নেহরু, বোঁচো থাকার সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জোটনিরপেক্ষ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি স্থির করেছেন, বিশ্বের বহু ঘটনাকে এঁরা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, নিজেদের পছন্দমত ধারায় তা প্রবাহিত করেছেন। বিশ্বের অন্যতম প্রবীণ ও বিশিষ্ট রাষ্ট্র-নেতারূপে টিটোর মর্যাদা ও প্রভাবও বিভিন্ন মহলে উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায়, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংকটের

পরিপ্রেক্ষিতে টিটো-নাসের সাক্ষাৎকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

টিটো ১১ই আগস্ট কায়রো এসেছেন, ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত ছ'বার নাসেরের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে। তারপর তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস ও ইরাকের রাজধানী বাগদাদ গিয়েছেন। দামাস্কাস-বাগদাদ থেকে ফেরার পথে তিনি আবার কায়রো আসবেন নাসেরের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

অনেকেরই ধারণা, টিটো কায়রো এসেছিলেন একটি আপোষ-প্রস্তাব নিয়ে। এই প্রস্তাবের পেছনে নার্কি মস্কোর সমর্থন ছিল। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হল :

(১) ইসরায়েল, সিরিয়া, জর্ডান ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের দখল করা ২৬ হাজার বর্গমাইল জায়গা ছেড়ে দেবে— সেখান থেকে ইসরায়েলী সৈন্য সরিয়ে নেবে।

(২) রাষ্ট্রসংঘের প্রধান শক্তিসমূহ ইসরায়েলী সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং এই কথা তারা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করবে।

(৩) তিরান প্রণালীর ওপর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হবে, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে ইসরায়েলী জাহাজকে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ দেয়া হবে।

(৪) সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরায়েলী জাহাজ যেতে দিতে হবে, তবে এই জাহাজের ওপর ইসরায়েলী পতাকা থাকবে না, তৃতীয় কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘের পতাকা থাকবে।

এই আপোষ-প্রস্তাব গৃহীত হলে, ইসরায়েলী দখল থেকে আরব-অঞ্চল মুক্ত হয়, এবং বিপরীত দিকে আরব রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে বিধিবদ্ধভাবে ইসরায়েলকে আইনগত স্বীকৃতি (de jure recognition) না দিলেও কার্যত স্বীকৃতি (de facto recognition) দেয়া হবে।

কিন্তু ইসরায়েল বা আরব জগৎ, কোন পক্ষই এরকম আপোষে রাজী হবে বলে মনে হয় না। টিটোর কায়রো সফরের সমরূপই ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জুন-যুশের বিজয়ী নায়ক মশে ডায়ান সদন্তে ঘোষণা করেছেন, আরব-অঞ্চল থেকে ইসরায়েলী সৈন্য ফিরিয়ে আনার কোন কথাই উঠতে পারে না। তারা আরবদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চায়, এবং দখলের সুযোগ নিয়ে তারা এইবার স্বীকৃতি আদায়ের আশা রাখে। অপরদিকে আরবরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনপ্রকারেই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। তারাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে।

টিটো তাঁর আপোষ-প্রস্তাব নিয়ে নাসেরের সঙ্গে কতটা আলোচনা করেছেন, জানা যায় নি। তবে আলোচনা শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়া সংকটের উভয় নেতা একমত হয়েছেন। আরব-অঞ্চল থেকে বিনা সর্তে ইসরায়েলী সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে, এই দাবি করেছেন টিটো ও নাসের দু'জনেই।

তবু মনে হচ্ছে, টিটো এখনও মীমাংসার নতুন সূত্র স্থানান্তর চেষ্টা করছেন। দামাস্কাস-বাগদাদ থেকে কায়রো ফিরে তিনি কি বলেন দেখা যাক।

নাইজেরিয়া :

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল এই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র যখন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হচ্ছিল, তখনই এখানে গণতন্ত্রের পরি-সমাপ্তি ঘটিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান হল, এবং নাইজেরিয়ার জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী স্যার আবু বকর তফাওয়া বালেয়াকে হত্যা করা হল। তখন থেকে এখানে কেবল গণতন্ত্রেরই অবসান ঘটে নি, জাতীয় সংহতিও নষ্ট হয়েছে। নানা উপজাতি ও ধর্মের দেশ এই নাইজেরিয়ার যু-রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের তীব্র বিক্ষোভ আছে।

এই বিক্ষোভেরই চরম প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বায়ফ্রার বিচ্ছেদ ও স্বাধীনতা ঘোষণা। ওদুমেগুই ওজুকুও'র নেতৃত্বে বায়ফ্রা নিজেকে নাইজেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে।

কিন্তু জেনারেল ইয়াকুব গাউনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বায়ফ্রার এই স্বাধীনতা মানতে প্রস্তুত নন। তারা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যর্থপরিকর। ইয়াকুব গাউন পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে বায়ফ্রার বিদ্রোহ দমনের জন্য এগিয়ে আসছেন। বায়ফ্রার সৈন্যসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সৈন্যের তুলনায় অধিক হলেও তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যরা সুরক্ষা করতে পারে নি। বায়ফ্রার ভেতরে তারা বিশেষ প্রবেশ করতে পারে নি। বরং বায়ফ্রার সৈন্যরাই পাটো আক্রমণে জরী হয়েছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ মধ্য-পশ্চিম রাজ্য দখল করেছে, রাজধানী বেনিনে বায়ফ্রা সমর্থকদের কতৃৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী লাগোনে পর পর কদিন বায়ফ্রার বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

এই বিজয়ে উল্লসিত হয়ে ওজুকুও ঘোষণা করেছেন, বায়ফ্রা থেকে শত্রুদের নিশিচিৎ এবং আরও অঞ্চল নাইজেরিয়ার হাত থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁদের বিশ্রাম নেই।

ইয়াকুব গাউনও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। বৃটেনের কাছ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আনছেন। বায়ফ্রার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ জাহাজে যাতে অস্ত্রশস্ত্র না আনা হয়, তার জন্য ওজুকুও রাষ্ট্রসংঘের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু উ থাট জানিয়ে দিয়েছেন, নাইজেরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বায়ফ্রা রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত নয়, এ অবস্থায় অস্ত্র-চলাচলে বাধা দেবার কোন ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রসংঘের।

বায়ফ্রা-নাইজেরিয়ার সমস্যা সামরিক পন্থা দিয়েই সমাধান হবে না, যে-পন্থা দিয়ে শিরোধার্য রয়েছে এর পশ্চাতে চার মাইলস না করলে গায়ের জোরে

এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে না। গাউন বা ওজুকুও বেই জয়লাভ করুন না কেন, এই হচ্ছে আসল কথা।

মউরিটাস:

আফ্রিকা সীমান্ত থেকে চোন্দ শ' মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বৃটিশ স্বীপ মউরিটাস এখন স্বাধীনতার দিন গড়ছে।

৭২০ বর্গমাইলের এই ছোট্ট স্বীপের লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ, তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ, সোয়া লক্ষের মত মুসলমান এবং ২৫ হাজার চীনা। অধিবাসীদের অধিকাংশই উদ্ভাষী, কিছু ফরাসীভাষীও আছে। হাজার দশেক শ্বেতাঙ্গও এখানে বাস করে।

মউরিটাসের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চিনি



উ-থাট

—বর্তমানে অবশ্য চিনি ব্যবসায় মন্দা চলছে। এখানে বেকার সমস্যা খুবই তীব্র।

দীর্ঘদিন ধরে স্বীপবাসীরা স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছে। স্যার শিউসাগব রামগোলামের নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি এই স্বাধীনতার দাবিকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে লন্ডনে এক বিশেষ শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে মউরিটাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন, মউরিটাসকে প্রথমে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া

হবে। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ এই সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের ঘোষণাও প্রকাশিত হয়। স্থির হয় মউরিটাসে সাধারণ নির্বাচন হবে, এবং নির্বাচনের পর নতুন সরকার ছ' মাস শাসন চালাবেন। তারপর এই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্ণ স্বাধীনতার দিন স্থির করা হবে।

গত সপ্তাহে মউরিটাসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটদাতাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং শতকরা ৯০ জন ভোট দিতে আসে। নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, আইনসভার ৭০টি আসনের মধ্যে তারা ৪০টি আসন লাভ করেছেন। শিউসাগব রামগোলাহ এখন সরকার গঠন করবেন। এই নির্বাচন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে, স্বীপবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

কিন্তু বৃটেন এখনও হাল ছাড়ে নি। তাদের চিরকালের বিভেদনীতি অনুসরণ করে তারা মউরিটাসের স্বাধীনতার বাধা দেবার চেষ্টা করছে। তারা হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে আফ্রিকীয় কৃতদাসদের বংশধরদের গোলমাল বাধাবার সুযোগ খুঁজছে। গয়টান ডুভাল নামে ৩৫ বছর বয়স্ক একজন মূলাটো এটনীর নেতৃত্বে গঠিত 'পার্টি মউরিটাস সোসাল ডেমোক্র্যাট দল' স্বাধীনতার বিরোধিতা করছেন। তাঁদের বক্তব্য, বৃটেন কখন মার্কেটে যোগ দিলে মউরিটাসের চিনি ব্যবসায়ের বিশেষ লাভ হবে। মউরিটাসের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৯৭ ভাগই চিনি। সুতরাং, মউরিটাসের বৃটেনের অধীন থাকা উচিত।

ডুভালের পার্টি আইনসভার বাকি ২৭টি আসন লাভ করেছে। ডুভালের পেছনে আফ্রিকীয় কৃতদাসদের বংশধর, কিছু মুসলমান এবং শ্বেতাঙ্গরা রয়েছে। তাই স্বাধীনতার প্রশ্নে মউরিটাসে দাপ্তরাপত্তা সূত্র, হবার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই গভর্নর স্যার জন শ রেনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

তবু স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। ছ' মাস পরে মউরিটাসকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুপ্রভাঙ্কন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৯ জুলাই

এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। জার্মানরা বেলজিয়াম দখল করে ফরাসী দেশের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। মহাসমুদ্রে তাদের সাবমেরিন, যাকে ইউ বোট বলত, তার আক্রমণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য জাহাজ-গুলি খুব বিপর্যস্ত হতে লাগল। প্রথমে কাগজে 'হিসেব বেরত তাদের আগের দিন কোন কোন জাহাজ ডুবেছে। তারপর ছাপা হোত গত সপ্তাহে কোন কোন জাহাজ গেল। মানুষেরা পাছে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে জাহাজ ডোনার বহর দেখে, সেইজন্য পরে গভর্নমেন্টের নির্দেশে খবরের কাগজগুলি কেবলমাত্র খবর দিত যে, গত সপ্তাহে মোট এত হাজার টন ডুবেছে। জনসাধারণ বুঝতেই পারত না যে, কটা জাহাজ ডুবেছে এবং তাইতে খানিকটা নিশ্চিত থাকত। এই ডুবো জাহাজের দৌরাণ্ড ছাড়া আর এক বিশদ হল আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ। লন্ডনে তখন রাস্তাঘাটের বাতিগুলির সব কাচ আলকাতরা দিয়ে লেপে দিয়েছিল। রাত জ্বলবার আগে ঘরের জানালার কাচ বন্ধ করে পদ্ম পদ্ম টেনে দিতে হত, যাতে করে ঘরের ভিতরের আলোর একটি রশ্মিও বাইরে না দেখা যায়। দেখা গেলেই পাহারাওয়াল দরজা ধাক্কিয়ে সাবধান করে দিয়ে যেত। বার দুই-তিনের বেশি অসাবধান হলে কোর্টে ডাক পড়ত এবং জরিমানাও হত। গ্রামে-বাসে হেডলাইট তো জ্বলতই না, ভেতরের বাতিগুলি সব আলকাতরা দিয়ে লেপে দিয়েছিল, খালি একটা পেনির মাশের ফুটো থাকত বাতিগুলির ঢাকনার নিচের দিকে। সেই ফুটো দিয়ে যে অল্প আলোটুকু আসত তারই নিচে হাত বাড়িয়ে কন্ডাক্টর টিকিট কাটত। লন্ডনের দোকানগুলির জাঁকজমক ও আলোর ঘটী বা বইয়ে পড়া যায়, তার কিছুই ছিল

না। সম্মার পর সারা লন্ডনটাই অন্ধকার থাকত, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই অত বড় শহরটার জীবনযাত্রা চলত। ঘন্টঘন্টে অন্ধকার সারিতে ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়ার মধ্যে বয়স্কগণা কাদার মধ্যে বাসগুলি খুব সন্তপণেই চলত। এক কথায় আমি লন্ডনে পৌঁছেই দেখলাম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে হামলা দিত জার্মান জেপেলিন। য়েই খবর আসত অমনি পল্লিশের লোকেরা নিজ নিজ গভীর রাস্তাগুলিতে বড় বড় পা ফেলে হাঁকত, "Take cover, Take cover" অর্থাৎ 'ভেতরে যাও, ভেতরে যাও'। নির্দেশ ছিল যে, এইরকম সতর্কবাণী শুনলেই নিজ নিজ বাড়ির ভেতরে ঢুকে একেবারে মাটির নিচতলায় (সেলারে) গিয়ে বসতে হবে। নিজ বাড়ি থেকে দূরে যদি বেসাড়ায় থাক, তবে নিকটবর্তী টিউব স্টেশনে মেনে যেতে হবে। অধিষ্ঠা বোমা বাদে নোজা একটা বাড়ির উপর কি টিউব স্টেশনের উপরে পড়ে, তবে টিউবই বা কি, সেলাই বা কি, অল্প দোতলাই বা কি। এইরকম নিচে অস্ত্রের নিলে দূরে যে বোমা পড়ত, তার টুকরো থেকে অন্তত রক্ত শাবার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু দেখছি যে, এইরকম সতর্কবাণী শুনলেই ছেলে-ছোকরারা, বিশেষ করে ভারতীয় ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছেলেরা, বাহবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখত জেপেলিন আসছে কি না। হাওয়াই আক্রমণের সন্কেত এলেই লন্ডনের চারিপাশ থেকে অসংখ্য বৈদ্যুতিক জেরালো সার্চলাইট সারা আকাশটার মধ্যে ঘন আঙুল বুলিয়ে যেত শত্রুর হাওয়াই জাহাজ খুঁজে খুঁজে। সেই না একটা সার্চলাইট সেটাকে ধরেছে অমনি অন্য সব সার্চলাইটগুলি গিয়ে পড়ত তারই উপরে। সেই আলোর ওশানলো জেপেলিনটিকে দেখাত সাদা রঙেরা দিয়ে মোড়া খুব

দাম্পী চুরটের মত। দুই প্রান্ত দেখাত একটু ছুঁচাল। তারপরই শত্রু হাত নিচে থেকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট কামানের গজল, আর তার গোলাগুলি ফেটে যেত আগুনের বিদিক মেয়ে। মাঝে মাঝে এক-একটা ভুস-ভুসে ফাঁকা ফাঁকা আওয়াজ শোনা যেত। সে শব্দটা ছিল উপর থেকে ফেলা বোমার উপর যে পাখা (প্রোপেলার) থাকত তারই ঘোরার আওয়াজ। আমি বিশেষত পৌছবার পর বহুবাহ এইরকম জেপেলিনের হামলা দেখেছি। একবার একটা জেপেলিনকে ঘায়ের করে মাটিতে এনে ফেলাও হয়েছিল। শেষের দিকে আসত লড়ইয়ে হাওয়াই জাহাজ-ফকার বিমান। দেখা গেছে জার্মানরা টেমস নদীর উপর দিয়ে চাঁদের বা তারার আলোর পথ চিনে এসে লন্ডনের পাশে বোমা ফেলে ধ্বংসাত্মক করত। তাদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু ছিল উল্লেখ্যের গোলাবারুদের কারখানাটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাওয়াই জাহাজের ধ্বংসাত্মক কার্যের বা বিবরণ পড়ছি তার তুলনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাওয়াই হামলা বা আমরা দেখছি সেটা কিছুই নয় বলতে হয়। মনে মনে যথেষ্ট ভয়ই হত শত্রু আমাদের বিদেশীদের নয়, ইংরেজদেরও হত। কিন্তু এ জাতীয় অসাবধান আত্মবিশ্বাস দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রতিদিন সকালে দেখা হলেই প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে মূখ গভীর করে বৃষ্টি ইংরেজ, কি শত্রুর, কি মহিলা, বলতেন—'বড়ই দুরসংবাদ, মশায়, আজকে। কিন্তু কিছু ভাববেন না, শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।' এই অসাবধান কিংবাসের জোরেই ইংরেজরা সর্ব স্বার্থত্যাগ করে জয়ী হতে পেরেছিল। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাস শেখবার জিনিস। আমি বিলেতে পৌছবার দেড় মাস কি দুই মাস পরে একদিন লাগু শাবার পর বৈঠকখানা ঘরে বসে গল্প-গাছা করছি এমন সময় দেখলাম একটা কালো

আদমী রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে বাড়ি-
গুলির নম্বর দেখছে। একটু নজর কবে
দেখতেই স্পষ্ট দেখলাম যে আমার ভাঙ্গেন
প্রীমান সূধ্যাংশই বটে। জানালাটা একটু
তুলে ধরে চোঁচিয়ে নাম ধবে ডেকে জানা-
লাম 'আয়, আয়। আমি এক্ষুণি আসছি।'
থলেই সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমেই
দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন
করা গেল। বাড়ির ভেতর নিয়ে এলাম
সূধ্যাংশকে এবং অন্য সবাইয়ের সঙ্গে
ক'র আলোপ করিয়ে দিলাম। কেটল
সম্পতিও খুব খুশি হলেন আর একটা
ছাড়াটে পেয়ে। ঠিক হোল সূধ্যাংশ সেই
দিনই গিয়ে তার জিনিসপত্র স্টেশন থেকে
খালাস কবে আমাদেরই বাড়ি চলে এসে-
ছেন। সূধ্যাংশের সঙ্গে তখন বিশেষ কিছু
কথাবার্তা হোল না দেশে বাড়ির কে কেমন
আছেন ছাড়া। বিকেলেই সূধ্যাংশ চলে
এলেন। উপরের তলায় কাপড়-চোপড়
গোছাতে গোছাতে ও'র সঙ্গে নিভতে
বিশ্রমভালাপ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।
প্রথমেই সূধ্যাংশ বললেন—'আজ্ঞা লোক
তো তুই। আমাকে ফেলে একা চলে
এলি?' হেসে জবাব দিলাম—'দিদিমণি
তোকে বগলদাবা করে হাজারীবাগে নিয়ে
গলে আমি আর কি করব? আমার
আসটা পড় হলে কি-ই বা লাভ হোত
তো'র আব তা' ছাড়া, বুঝলি তো আপনি
খাঁচলে বাপের নাম। আমি চলে না এলে
কতা তোর আসা-ই হোত না।' শেষ
কথাটা খুবই সত্যি, কেন না আমি চলে
আসবার পরই সূধ্যাংশ একেবারে হন্যে
হয়ে উঠল আসবার জন্যে এবং আমি
নির্বিন্দে পৌঁছে গেছি এবং লন্ডনে
বেঁচেও আছি দেখে দিদিমণিও শেষ
পর্যন্ত সূধ্যাংশকে ছেড়ে দিতে রাজী
হয়েছিলেন। একথা-সেকথার পর সূধ্যাংশ
বেশ ভারিচলি চলে বললেন—'হ্যাঁ, দেখ',
চিঠি লিখতে পারিস। তবে বন্ধুভাবে
লিখবি, বুঝলি, প্রেম-প্রেম কবে ফেলিস
নে যেন।' প্রশ্ন কবে যা জানলাম তা এইঃ
বিলেত বওনা হবার আগে সূধ্যাংশ
মজ্জদাবগর্হণী সঙ্গে দেখা করে
আমার আজিটা পেশ করায় তিনি তাঁর
বাল্যবন্ধু আমাদের দিদিমণি তরলার সঙ্গে
দেখা কবে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন।
বলাই বাহুল্য যে দিদিমণি তাঁকে একে-
বারেই উৎসাহ দেন নি, কেন না সাদামাঠা
বি-এ পাশ ছোকরা, মানুষ হয়ে দেগে ফিরব
কি-না কে জানে এবং ওইটুকু মেঝেকে
এখন থেকেই এই অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলা
ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমার বাবা-
মাঝের মত কি হবে কে জানে। এইসব
সাত-পাঁচ ভেবেই সূধ্যাংশের জ্ঞানদা
মাসিমা কোন রকম পাকা কথা না দিয়ে
ঐরকম ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছেন

সূধ্যাংশকে। আমার পক্ষে চিঠি লেখাব
অনুমতিটাই তখন ছিল বড় কথা এবং সে
অনুমতি পেয়ে পাবে মেনেই বুঝকে
নাতিবহু একটি চিঠি লিখলাম। যথা-
সময়ে জবাবও এসে যাওয়ায় বেশ বোঝা
গেল যে বাণিজ্যটা একেবারে আমার এক-
তবফাব নয় এবং তা' অনুভব করে যে
নিতান্তই নিশ্চিত হলাম তা' বলাই
বাহুল্য। সে সময়ে হাওয়াই জাহাজে
ডাক চলাচলের ব্যবস্থা তখনো হয় নি।
প্রতি সপ্তাহে একটি কবে মেল যেতো।
বাড়িতে মা কি বাবার কাছে আমি
নিষমিত একখানা করে চিঠি লিখতাম
প্রতি সপ্তাহে। এবার থেকে দু'খানা করে
চিঠি, বাড়িতে একখানা, বুঝকে একখানা,
লেখা চলতে লাগল একটানা নিয়মিতভাবে
মাঝে মাঝে সূধ্যাংশ গম্ভীর চালে মনে
কবিয়ে দিতেন—'বন্ধুত্বের সীমা ছাড়িয়ে
মাছে না তো?' জবাব দিতাম—'হ্যা, হ্যা।
গার্জেনী কবতে হবে না।'

বুঝের চিঠিগুলিতে বেশ উৎসাহিত
হতাম নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবে দেশে
ফেববার জন্যে। আমি যে আই-সি-এস
পড়লাম না তাতে তাঁর কোন উৎসেগ লক্ষ্য
করি নি। কিন্তু বাবার চিঠিগুলি হোত
একটু ঝাঁঝাল। বাইরের লোকেরা আমার
সম্বন্ধে অন্যভিমত প্রকাশ কবলে বাবার
মনে আঘাত লাগত এবং সেই জ্বলনীব
ঝাঁঝটা এসে পড়ত আমার উপর বাবার
চিঠির মাফত। একটা চিঠির কথা খুব
মনে আছে। বাবা লিখলেন যে "সম্বন্ধভাবে
এক পৃষ্ঠা চিঠি লিখতে তাঁর সময় লাগে
আধ ঘণ্টা। তিনি আশা করেন যে আমি
বুঝকে সম্বন্ধভাবে চিঠি লিখি। তা' হলে
তাঁর সমস্ত মাপকাঠিতে ২২ পাতা চিঠি
লিখতে আমার ১১ ঘণ্টা সময় লাগাব
কথা। যদি সপ্তাহে ১১ ঘণ্টা-ই চিঠি
লিখি তবে পড়াশুনা করছি কখন?"
ভাবলাম এ আবার কি হোল? ঝুন্ড
বিবনু'র সঙ্গে বাবার নাতনী দাদামশায়েব
সম্পর্ক। পরে শুনিয়ে বাবাকে টালাবার
জন্যে ঝুন্ড নাকি বাবাকে বলেছিলেন—
'জ্ঞান, ছোডদাদাবাবু, দেখে এলাম মামু
বুঝকে ২২ পাতা চিঠি লিখেছে।' তা'বা
তো মসকবা কবেই খালাস। ঝালটা এসে
পড়ল আমারই উপরে। একে তো আই-
সি-এস পড়লাম-ই না। তার উপরে ২২
পাতা প্রেমপত্র লেখাব অভিযোগ। যে-কোন
বাপের ধৈর্যচ্যুতি হতেই পারে।

॥ নম ॥

সূধ্যাংশও আমার দেখাদেখি লন্ডনের
গ্রেঞ্জ ইন এবং ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি
হোল। হেমন্ত, অজিত, সূধ্যাংশ এবং
আমি একসঙ্গেই যেতাম গ্রেঞ্জ ইনে সাম্ধ্য-
ভোজ খেতে। আমবা যারা কলেজেও

পড়তাম তাঁদের প্রায় টার্মে তিন দিন করে
নাম্ব ভেজে যেতে হোত এবং যারা
কলেজে পড়ত না কেবল ইনই পড়ত
তাদের প্রতি টার্মে ছয় দিন ইনে যেতে
হোত। কাল পোষাকের উপর ব্যাবিস্টারের
জোখা (গাউন) পরে ডিনার খাওয়াটা
প্রথম প্রথম বেশ মজার বলে মনে হোত।
পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। গ্রেঞ্জ ইনে
সাম্ধ্যভোজে আমাদের খুব চাহিদা ছিল।
ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। গ্রেঞ্জ ইন
খুব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। শুনছি যে এ-
বাড়ির বাড়ি বর্ণা ও দেখালের উপর
কাঠের আস্তাবগুলি তৈরি করা
হয়েছিল রাণী এলিজাবেথের আমলে
স্প্যানিস নৌ-বাহিনী (আরমাদা)-
কে বিধ্বস্ত কবে সেইসব জাহাজের গোটা
কাঠ কেটে ও প্রয়োজনমতে চেটে-ছুলে।
ইংবেজবা খুবই বক্ষণশীল জাত এই সব
ব্যাপারে, অন্যান্য বিষয়ে তা'বা যতই
প্রগতিশীল হোক। কিন্তুদন্তী ছিল যা
গ্রেঞ্জ ইনের মাটির তলায় ঘরে (সেলারে)
এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো স্যাম্পেন
মজুত ছিল। প্রতি সাম্ধ্যভোজে চাই
টেবিলে বসতেন ইনের প্রবীণ বেণ্ডারগণ।
তাঁদের মধ্যে থাকতেন ঘাগি ব্যাবিস্টার
ও জেজবা। আর আড্ডাআডি টেবিল-
গুলিতে ছাত্রেরা চাবজন কবে এক-একটি
মেস করে বসত। প্রত্যেক মেসে এক
বোতল কবে স্যাম্পেন এবং দু' বোতল
কবে সেরি ববান্দ ছিল। এখন চাবজনের
মধ্যে কেউ যদি মদ না খায় তবে বাকি
ক'জন মিলেই সেই তিন বোতল মদ
পবমানদে সেবন কবতেন। আমরা মদ
খেতাম না বলে বাবা পাঁচ তারা আমাদের
সেধে সেধে তাদের মেসে ভাগাভাগি কবে
বসতে অনুবোধ কবত। একবার আমি
কালো কোট না পরে একটা ব্রাউন সুট
পরে গ্রেঞ্জ ইনে গিয়েছিলাম এবং কাপড়ের
ব্রাউন রঙটা যাতে দেখা না যায় তা'র জন্যে
কালো ব্যাবিস্টারের গাউনটা বেশ জড়িয়ে
বসেছিলাম। দু' একজন ঘুরণ ছোকরা
আমার ব্রাউন কোটের সম্বন্ধে একটা
নালিশ ঠুকে দিল বেণ্ডারদের কাছে।
নিয়মভঙ্গ অপরাধে আমার না জানি কি
শাস্তি হয় বলে মনে বেশ একটু ভয়
হোল। বেণ্ডারবা বয় দিলেন যে আমাকে
এক বোতল স্যাম্পেন জরিমানা করা
হোক। আমার খুচায় সেই ফবিবাদী
ছোকরার মেসে এক বোতল বেশ স্যাম্পেন
সেদিন জুটে গেল। তখন বুঝলাম যে
এত সাত তাড়াতাড়ি নালিশের ভিতরকার
কাবগটা কি। এ বকম ভুল আর কখনো
হয় নি।

আমাদের কলকাতা হাইকোর্টে তখন
নিবন্ড ছিল যে সেখানে প্রাকটিস কবতে
হলে ব্যাবিস্টার তো হতেই হবে, তার

উপরে সেখানকার একজন ব্যাবিস্টার কি কোর্টে প্র্যাকটিস করেন তাঁর চেম্বারে এক বছর ডেভিলিং অর্থাৎ বেগার কাজ করেছে বলে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। এই এক বছর ডেভিলিংটা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস করলে তিন বছর পড়তে পড়তেই সেসে নিতে পারে। কিন্তু যারা ডিগ্রী পাবে না তাদের ইনের তিন বছরের পড়ার পর আর এক বছর কোন ব্যাবিস্টারের চেম্বারে পড়তে হবে। ডিগ্রী যে পাব তাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। সুতরাং কলেজে তিন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেম্বারে এক বছর পড়ব ঠিক করলাম। তখন শুনলাম যে এমন সব ইংরেজ ব্যাবিস্টারও খুঁজে পাওয়া যায় যাদের কোর্টে কাজকর্ম কিছুই নেই বলে যে কটা টাকা পাওয়া যায় তাই পেলেই ছাত্র ভর্তি করে বৎসরান্তে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থায় টাকাটাও কম লাগে এবং সত্যি সত্যি চেম্বারেও যেতে হয় না। আমি মনে করলাম যে যখন কলকাতার ফিরে প্র্যাকটিসই করব তখন একজন ভাল লোকের চেম্বারে গিয়ে কাজ শেখাই বিষয়। এতে দক্ষিণাটা বেশি দিতে যদি হয় তাতেই বা আমার অসুবিধে কি, কেননা যা টাকা লাগে তা তো দাদাবাবুই দেবেন। আমাদের আইন ফ্যাকালটির ডীন বৃন্দ ডাঃ মিউরিসন সাহেব-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোন ভাল লোকের স্থান দিতে পারেন কিনা। তিনি বললেন—দেখ, বাবা, যার কোর্টে খুব বেশি কাজ তার কাছে গিয়ে কোন লাভই নেই, কেন না সে তোমার দিকে নজর দেবার সময়ই পাবে না। এমন লোকের কাছে যাওয়া দরকার যার কাজ কিছু আছে কিন্তু বেশি নয়। বললাম ‘সে রকম কাউকে জানেন কি?’ তিনি একটু ভেবে বললেন—‘আমার বন্ধু ফ্রান্সিস ওয়াটের ১নং মিডল টেম্পল লেনে চেম্বার। তুমি তাঁর কাছে বাও।’ মিউরিসন সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলাম ওয়াট সাহেবের চেম্বারে। তিনি বললেন যে তিনি ছাত্র নিতে পাবেন তবে তাঁর ফি হবে একশ গিনি এবং তাঁর মন্থরীকে দিতে হবে এক গিনি, অর্থাৎ ‘সর্বসাকুল্যে একশ’ ছ’ পাউন্ড এক শিলিং। চেক বইটা সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিলাম। চেক কেটে সাহেবের হাতে দিয়ে করমর্দন করে সেদিনের মত বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর দিন থেকে বেশ নির্যমিত ওয়াট সাহেবের চেম্বারে যাওয়া আরম্ভ করলাম। অল্পদিনেই দেখলাম যে তাঁর কোর্টে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অনেকদিন অস্তর দু-চারটে আর্জি মন্থাবদা করবার ব্রীফ আসে। সারা বছরে এসেছিল দুটা ডক

ব্রীফ অর্থাৎ যে মামলার গরীব আসামীর তরফে সরকারই কৌশলী ঠিক করে দেয় তাদের প্যানেল থেকে। মনটা একটু দমে গেল। কি আর করা যাবে। টাকাটা তো দিয়েই ফেলেছি। আমি চেম্বারে গিয়ে আইনের পাঠ্যপুস্তকগুলিই বসে বসে পড়তাম। অল্প পরে ওয়াট সাহেব আমাকে আইন পড়তে সাহায্য করতে লাগলেন। অর্থাৎ তিনি আমার কোচ বা মাস্টারই হয়ে পড়লেন। এটাতে আমার ভালভাবে পাশ করবার পক্ষে সুবিধেই হয়ে গেল। আমি বিকেল পর্যন্ত চেম্বারে তাঁর কাছে পড়ে, রাস্তার কোন রেন্ট্রু-রেন্টে এক পেয়লা চা খেয়ে সন্ধ্যার সময়ে কলেজে এবং পরে ইন্স অব কোর্ট ক্লাশ করে বাড়ি ফিরতাম। কলেজ শুরুর হবার অল্পদিন পরেই অধ্যাপক ডাঃ হিবার্ট রেজিস্টারি খরে নাম ডাকতে গিয়ে যখন ‘গুন্স’ বলে ডাকলেন, পেছন ফিরে দেখি আর একটি কালা আদমী জুটে গেছে ক্লাশে। ক্লাশের শেষে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি কলকাতার নামকরা হারমোনিয়াম নির্মাতা ডোয়রকিন গ্র্যান্ড সপ্স-এর মালিক স্মারিক ঘোষ মশায়ের ছেলে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। সেই যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হোল তা বন্ধুত্ব পরিণত হয়ে অটুট ছিল ষতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ও কলকাতার প্র্যাকটিস করতেন।

II দশ II

আই-সি-এস না পড়ার দরুণ বাড়িতে আমার যে অধ্যাতি হয়েছিল তার জের চলছিল ষতদিন না আমি বেশ ভালভাবে এল-এল-বি পরীক্ষার প্রাথমিক খণ্ডটা পাশ করলাম। এই ভাল পারফরম্যান্সের পেয়ে বাবা, দাদাবাবু ও বোঁঠান বোধ হয় একটু আশ্বস্ত হলেন যে আমি বিলেতে নিছক বকাটেপনা করছি না। তারপর যখন ইন্স অব কোর্টের প্রাথমিক পরীক্ষাগুলিতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হতে লাগলাম বাড়িতে আমার সন্মানের মান স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠে আসতে লাগল। বারের প্রাথমিক পরীক্ষা হোত নিজ নিজ অভিরুচি মত বেছে নেওয়া চারটে বিষয়ে। এই চারটে বিষয়ের পরীক্ষা এক সঙ্গেও দেওয়া যেত কিংবা একটা একটা করেও দেওয়া যেত। প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্রই একটা একটা করে পরীক্ষা দিত। প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষার ফিস ছিল দশ শিলিং। নিয়ম ছিল যে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করলে সে দশ শিলিংটা ফেরত পাওয়া যেত। আমি একটা বিষয় ছাড়া অন্য তিনটে বিষয়েই পরীক্ষার ফিসটা ফেরত পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই দশটা করে শিলিং আমার একার ভোগে কখনো আসে

নি। সুধাংশু বলতেন, ‘তোঁর যা এলেন তাতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ হবার তো কথা নয়। ওটা বেড়ালের ভাগ্যে ফোকেটে হয়ে গেছে। সুতরাং চল যাই থিয়েটার দেখে আসি।’ বুদ্ধি অকাটা বলেই সুধাংশুর বিশ্বাস ছিল বলে তাঁর কথা মেনে নিয়ে আমরা চারজনে থিয়েটার দেখে আসতাম।

বার পরীক্ষার কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ছে। সেবার আমি বারের প্রাথমিক পরীক্ষার ফৌজদারী আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা শেষে মনে হোল যে সেকেন্ড ক্লাশের বেশ ঠুট্টা জায়গা তো পাব-ই, চাই কি প্রথম শ্রেণীও হতে পারে। বাবাকে এবং বুঝকে বেশ ঘটা করে খবরটা জানিয়ে দিলাম। অবশেষে একদিন সকালবেলায় টাইমস্ কাগজে ফল বেরুল। আমার নামই নেই। এত গলাবাজি করে কি না একেবারে ফেল? আ-রে ছ্যাঃ। এখন বন্ধু মহলে মূষ দেখাই কি করে? বাড়িতেই বা সবাই কি ভাববে? নিরুপায়, অপমানটা সহ্য করতেই হবে। বাড়িতে বাবাকে লিখলাম, ‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। টাইমস্ কাগজে দেখছি আমি ফেল হয়ে গেছি।’ পরদিন ওয়াট সাহেবের চেম্বারে গিয়ে কুকুর-মুখো হয়ে দাঁড়ালেম। তিনি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, যে তিনি অত কবে পরিশ্রম করে পড়ান সত্ত্বেও আমি ফেল হলাম দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। আমি আমতা আমতা করে বলে ফেললাম—‘দেখুন, স্যার, আমার হাতের লেখাটা বড় বড় বলে আমি দু’ তিনটে খাতার প্রশ্নের জবাব লিখেছিলাম। তার মধ্যে কোন একটা খাতা কি সেলাই খুলে হারিয়ে যেতে পারে?’ তিনি আমার মূখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন—‘দেখ, ওই রকম ঘটনা তোমাদের দেশে হয় কিনা জানি নে, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না হে।’ আমি তবু বললাম—‘কাউন্সিল অব লিগ্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর ডাঃ ব্রেক অজার্সকে একটু চিঠি দিবে বিষয়টির অনুসন্ধান করতে বললে হয় না?’ তিনি মাথা নেড়ে বললেন—‘ও রকম বোকামি করা ঠিক হবে না।’ আমি তখনো ছাড়ি নে। বললাম—‘দেখুন, মশায়, টাইমস্ কাগজে বলছে এতগুলি ছেলে পাশ করেছে কিন্তু নামগুলি গুণে দেখুন, একটা তো কম দেখছি। আপনি দয়া করে অজার্স সাহেবকে একটা চিঠি দিন।’ আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে তিনি অজার্সের নামে একটা চিঠি আমাকে দিলেন। আমি তৎক্ষণে সে চিঠি নিয়ে অজার্স সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলাম। কার্ড দিতেই তলব এল। ঘরে

চুকে চিঠিখানা দিলাম তাঁর হাতে। তিনি যেন হকচকিয়ে গেলেন। একটা বেল টিপে কাউন্সিলের সেক্রেটারীকে ডাকলেন। সেক্রেটারীকে বললেন ফাইলটা নিয়ে আসতে। সে ভদ্রলোক ফাইল নিয়ে ফিরে এসে সেটা অজ্ঞাস সাহেবের হাতে দিলেন। পাতা উল্টে দেখে অজ্ঞাস সাহেব করমর্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন—“ওহে, দাশ, আমি ভারি খুশি হয়েছি। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি তো প্রথম হয়েছ, যদিও সেকেন্ড ক্লাস। ফাস্ট ক্লাসটা তোমার কানের কাছ দিয়ে গেছে হে।” আমি তখন এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে প্রথমটা মনে কঁধাই বের হচ্ছিল না। খানিকটা সামলিয়ে নিয়ে বললাম—“টাইমস্ কাগজে তো আমার নাম বেরল না।” তিনি যেন অবাক হয়ে বললেন—“তা-ই নাকি?” বলে সেক্রেটারীর দিকে তাকালেন। সেক্রেটারীও হতভম্ব। আমতা আমতা করে বললেন—“হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, ভুলই তো হয়ে গেছে।” চেঁচিয়ে উঠলেন অজ্ঞাস সাহেব—“এ যে মারাত্মক ভুল। কি না হতে পারত। এই ছেলোটি যদি হতাশ হয়ে বেফাঁস কিছুর ফেলত তবে কে তার জন্য দায়ী হোত?” আমার দিকে ফিরে বললেন—“তুমি কি বাড়িতে ফেলের কথাটা লিখে ফেলেছ?” আমি মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলার তিনি বললেন, ‘তুমি এক্ষণি বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দাও যে তুমি ফাস্ট হয়েছ। খরচটা কাউন্সিলই দেবে।’ আমি বললাম—“খরচা কিছুর দিত হবে না, স্যার। পাশ হয়েছি সেটা ছাপা হলেই যথেষ্ট হবে।” সেলাম করে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা গেলাম ওয়াট সাহেবের চেম্বারে। সব বিবরণ শুনে তিনি বিস্ফুরিত নয়নে চেষ্টে বললেন—“বল কি হে? তাম্জব কথা। এমন তো শুনিনি নি কখনো।” মওকা বুঝে বললাম—“স্যার, ভুল-চুক সব দেশেই হয়ে থাকে।” ওয়াট সাহেব বললেন—“হ্যাঁ, তা বলতেই পার। বাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল।” বাড়ি ফিরেই আবার দুখানা চিঠি লিখলাম শুধুবরটা দিয়ে।

৯ এগার ৯

যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল। কে হারে কে জেতে বলা যায় না। খাবার জিনিসের টানাটানি দেখা দিল। রেশনের কড়াকড়ি হতে লাগল। তার উপরে ঝি-চাকরের অভাব হোল। চাকররা তো গেল যুদ্ধে লড়াই করতে। ঝিরেরা গেল গোলা বারুদ তাঁরির কারখানায় বা ফ্যাক্টরিতে বা ষ্ট্রামে, বাসে বা পোস্টাফিসে কাজ নিয়ে। আমাদের বাড়ির এতগুলি অতিথির কাজকর্ম ও খাওয়া

যোগান কেটল্ গৃহীণী আর করে উঠতে পারছিলেন না। খুব দুঃখের সঙ্গে বিনীতভাবে কেটল্ সাহেব আমাদের কাছে তাঁদের অসুবিধের কথা জানিয়ে বললেন যে আমরা যেন কোন বোর্ডিং-এ যাবার বন্দোবস্ত করি। হেমন্ত চলে গেল একটা মেসে যেখানে থাকত যত রাজ্যের ব্যাঙ্ক বা আফিসের বড়ো বড়ো কর্মীরা। সুধাংশু ও আমি প্রথমে ক্ল্যাপ হ্যামেই অন্য একটা বাসায় যেখানে গৃহকর্তী ছিলেন মিসেস টার্নার। অজিত ও ক্ল্যাপ হ্যামেই আর একটা বাড়িতে গেলেন। মিসেস টার্নারের সে বাড়িটা ছোট বলে মিসেস টার্নার আল্‌স কোর্টে, ২৩ নম্বর ট্রেবোভার রোডে একটা বড় বাড়ি নিলেন। অজিতও সেখানে এলেন। এই ট্রেবোভার রোডের মিসেস টার্নারের বাড়িতেই আমরা শেষ পর্যন্ত ছিলাম। ভরমাহলাটি আমাদের খুব যত্ন-আশ্রিত করতেন খাওয়া-দাওয়া থাকা-শোয়া ব্যাপারে। মিসেস টার্নারের স্বামী মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি বোধ হয় গ্রেট ব্রিটেনের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন কারবারের কাজে। তাঁদের ছেলে ছিল না, ছিল একটি মেয়ে—আইরিনি টার্নার সংক্ষেপে রিনি। বেশ গোলগাল মৃদু-স্বভাবসম্পন্ন মেয়েটি। লেখাপড়া বেশি ছিল না। যুদ্ধের বাজারে কি একটা আফিসে কাজ নিয়েছিলেন। এক টিলে দুই পাখীই মারা হোল—অর্থাৎ দেশ সেবাও হোল, কিছুর টাকার ঘরে এল। আমরা ট্রেবোভার রোডে ছিলাম বলে আমাদের জানাশোনা আরো বাঙালী ছেলে ছুটে গেল। সুধাংশু দাশ বোঁঠানের ভ্রাতৃপতি ময়না দাস ব্যারিস্টারের বৈমায়েয় ভাই, এলেন কেম্ব্রিজের পড়া শেষ করে। আর একজন কলকাতায় খুব নামকরা ভাজ ছেলে বীরেন বিশ্বাস। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র। তিনি কলকাতায় ম্যাট্রিকে ও আই-এ পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম কিংবিত্ত হয়েছিলেন। সুযোগ-সুবিধে পেলেই তিনি কেম্ব্রিজের থেকে লন্ডনে আমাদের ট্রেবোভার রোডের বাসায় এসে উঠতেন ও থাকতেন। একজন অবাঙালী মদ্রদেশীয় ছাত্র কে. পি. মেনন—মহীশূর সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে এসেছিলেন জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পে পারদর্শী হতে। মেনন আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়েছিলেন। তাঁর রসবোধ ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উত্তরকালে তিনি দেশে ফিরে মহীশূরে সরকারী উচ্চপদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে এখন অবসর নিয়ে ব্যাংগালোরে নিজ বাড়িতে বসতি করছেন। ট্রেবোভার রোডের বাড়িতে মিসেস টার্নার, যাকে আমরা সবাই ‘মা’ (মাদার)

বলতাম, তাঁর উদ্যোগে খুব ঘটা করে খুশ্টোৎসব পালন করা হোত। টার্নার পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকে আসতেন। একজনকে বেশ মনে আছে যদিও তাঁর নামটা ভুলে গেছি। তিনি আগে একটা ক্যান্টিনের বাহিনীর ক্যান্টিন ছিলেন। আমরা যখন বিলেতে ছিলাম তখন তিনি অবসর নিয়েছেন। সেই ক্যান্টিনটি একেবারে তাঁর পুরা সামরিক পোষাকে সেজে আসতেন। কোর্টের বুকে ও হাতার বুকবুকে করে মাজা বোতাম এবং কাঁধের উপর পালিশ করা তিনটে তারা থেকে যেন আলো ঠিকারিয়ে পড়ত। একটা চামড়ার বেনট ডান কাঁধের উপর থেকে বুক পিঠ ঘিরে বাঁ হাতের তলায় গিয়ে মিশে যেত। তারই উপরে অনেকগুলি খাপে খাপে বন্দুকের গুলী ভরা থাকত। কোর্টের বাঁ হাতের কাঁধ ও বগল ঘিরে মোটা সোনালী দড়ির কি বাহার। চকচকে ব্রাউন বুট জুতা উপরে পালিশ করা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার পা মোড়া গোটের দেখতে অপূর্ব সন্দেহ। সেই বুটের গোড়ালির সঙ্গে জোড়া ছিল চকচকে ইম্পাতের চোখা খোঁচা (স্পার) যার গুতো দিবে ঘোড়াকে দৌড় করতে হয়। সবচেয়ে আরও জাঁদরের লাগত বুকবুকে চামড়ার খাপে প্রকাণ্ড তলোয়াবখানা ও তার হাতলের সে কি বাহার। প্রথম বছরের খুশ্টোৎসবে ভদ্রলোকটি যখন চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড আবৃত্তি করতে করতে বাঁ করে ডান হাত দিয়ে তলোয়াবটা একটানে খুলে ফেললেন তখন আমরা একেবারে মূগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পর পব আরো দু’ বছর ক্যান্টিন সাহেব ঐ একই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বোধ করি তিনি ঐই একটা কবিতাই জানতেন। ঐই আবৃত্তি ছাড়া পিয়ানো বাজিয়ে গান হোত অনেক। আমন্ত্রিত মেয়েবা তাঁর নিজ নিজ গানের স্বরলিপি নিয়ে আসতেন। খুশ্টোৎসব ভোজটা হোত দুর্দান্ত, অর্থাৎ অনেক দিনের সমস্ত সঞ্চিত খাবার দিয়ে। নববর্ষও পালন করা হোত সমারোহ করে। বছরের শেষ দিনে সন্ধ্যা-ভোজের পর গান বাজনাঘ ঘাড়ির কাঁটা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। রাত বারোটা বাজবার যিনিট কয়েক আগে আমাদের মধ্যে একজন কাল আদমীকে বাড়ির বাইবে যেতে হোত। ঠিক বারটা বাজলে সেন্টপলস ক্যাথড্রাল গীর্জার বড় ঘণ্টাটার সঙ্গে অসংখ্য টিনেব ক্যানিস্তাবা বেজে উঠত। ঠিক একই সঙ্গে টেমস্ নদীতে দৃশ্যমান বড় ভোট সব জাহাজের সাইরেনগুলি একযোগে ঐকতান শুরু করত। সঙ্গে সঙ্গে বাইবল কাল আদমীটি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় ঘা দিত। ইংরেজদের নাক

বিশ্বাস যে নতুন বছরে প্রথমক্ষণে কালো মানুষ কি কালো বিভাগ দেখা খুবই শ্রুতলক্ষণ। তাই অজিত, সুধাংশু ও আমার মধ্যে একজনকে ঐ শীতের রাতে দরজার বাইরে দুর্ভোগ ভুগতে হোত। সদর দরজায় যা দিলেই গৃহকর্তা। মিসেস টানার নিজের দরজাটার দুই পাটই একেবারে উন্মুক্ত করে খুলে ধবতেন এবং তাঁর পেছনে বিকশিত দন্ত একদল লোক প্রাণভরে সেই শীতাত কালা মানুষটিকে দেখে শ্রুতলক্ষণ দেখার আনন্দ লাভ করতেন। এই রকম করে পুরনো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে আবাহন করা হোত ট্রোভার রোডে।

৥ বার ৥

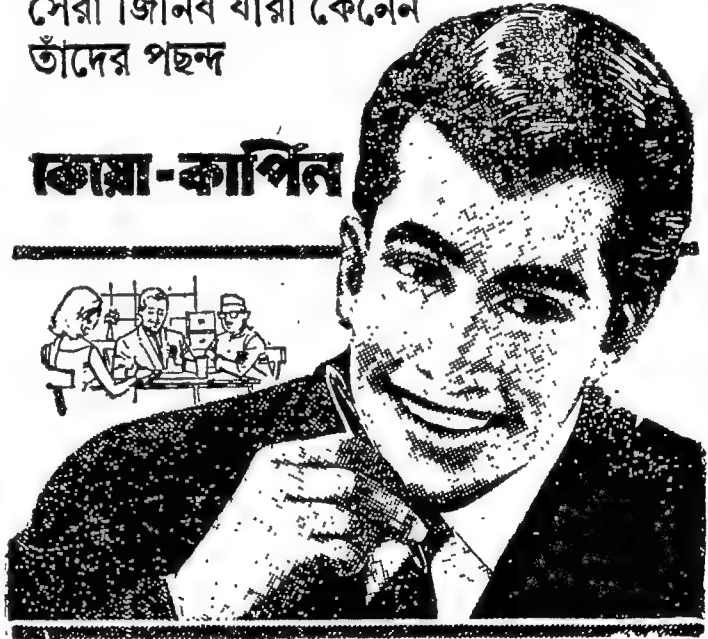
যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড প্রকোপে চলেছে তখন এমন একটা কান্ড হোল ব্যারিস্টারি পড়ুয়া গ্রেজাইনের ছাত্রদের মধ্যে যা ভোলবার নয়। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে গ্রেজাইন লাইব্রেরীর গরম ঘরের মধ্যে বসে পড়তে যেতেন। দারুণ শীতের মধ্যে বাড়ি না ফিরে কিংবা রাস্তার বেরিয়ে কেস্ট্রেটে খেতে না গিয়ে ঐ সব পড়ুয়ারা গিয়ে বসতেন সাধারণ বৈঠকখানায় অর্থাৎ কমন রুমে। সেই কমন রুমে হাজিরা দিত যে এ্যাটর্নিয়েন্ট তার নাম ছিল চার্লস। চার্লসের কাছে চাইলে গরম চা বা কফি এবং টোস্ট, ডিম, জ্যাম ইত্যাদি খাবার সমস্তার পাওয়া যেত। এতে ছেলেদেরও সুবিধে হোত এবং চার্লসেরও দু' পয়সা হোত। এখন হোল কি, বাধ্যতামূলক সময় সেবা আইনানুযায়ী চার্লসের বয়সের লোকদের যুদ্ধে যাবার ডাক এলো। শোনা গেল চার্লসও চলে যাবে যুদ্ধে। চার্লসই ছেলেদের উসকে দিয়েছিল, না ছেলেরা নিজেরাই গুঞ্জন করতে লাগলেন যে চার্লস চলে গেলে তাঁদের অনেক সমস্যা নষ্ট হয়ে যাবে বাইরে গিয়ে শেষে আসতে এবং তাঁদের পড়াশুনার সমস্যা ক্ষতি হবে। ইংবেজ ছেলেরা প্রায় সবাই চলে গেছে যুদ্ধে এবং পড়ুয়াদের মধ্যে ছিল ভারতীয় ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাক্সী ছেলেরা। সুদূর গুঞ্জন আঁচিয়েই স্পর্শতর কোলাহল হয়ে উঠে বেশ একটি ঘোঁটা দেখা দিল। মেমোরিবেল লেখা হয়ে গিয়ে আরম্ভ হোল সেই সংগ্রহের পালা। বহু ছেলে চোখ বুজে সেই করে ফেললেন, মায় আমাদের অজিত ও হেমতা। আমাদের সেই করতে বলায় আমি রাজী হলাম না। বললাম যে এমন কিছু অসুবিধে হবে না যার জন্যে এরকম আবদার করা যায়। সুধাংশুও সেই করেন নি। আমাদের ও আমার মত যারা সেই করতে গররাজী হলেন তাঁদের সবাইকে সেই করা ছেলেরা

সমস্বরে ভীরা (কাওয়ার্ড) বলে আখ্যায়িত করে সেই মেমোরিবেল ইনের সেক্রেটারী ডাউথওয়েট সাহেবের কাছে দাখিল কবে দিয়ে এল। আমরা যাবা সেই করি নি তারা নিজেদের মুখ রক্ষা করবার জন্যে বললাম—তোমাদের ঐ আবেদন না পড়েই ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে ফেলে দেবে। একদিন যাহ, দুদিন যায়। কমন রুমে বেশ গরম গরম বাক্য বিন্যাস চলতে লাগল। সেই না করার দল কদিন কোণঠাসা হয়ে রইল। অবশেষে তৃতীয় দিনে চিঠি এল সেই করার দলেব দলপতির কাছে যে ইনের ট্রেজারার আবেদনকারীদের সবাইয়ের সংগে দেখা করবেন। সে কি উল্লাস তাদের! যেন অর্ধেক যুদ্ধই তারা জিতে ফেলেছেন, 'কি দেখলি ত' ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে না? বাক্সি তো সংঘবন্দ্যভাবে কাজ করলে সিদ্ধি

অবশ্যম্ভাবী।' জবাব দেবার মুখ ছিল না আমাদের। চুপ করেই রইলাম এবং ওদের সাক্ষাৎ মোকাবিলার আগের দিন পর্যন্ত কমন রুমে থেকেই গা ঢাকাই দিলাম, কেন না ওদের হুজুড়ে ও জয়ধ্বনিতে আমরা আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলাম। তখন এফ ই স্মিথ ছিলেন গ্রেজাইনের ট্রেজারার তখনো তিনি লর্ড বাকেন হেড নামে লর্ড চ্যাম্পেলার হন নি। তখন তাঁর নাম ছিল স্যার ফ্রেডারিক স্মিথ। তিনি ছিলেন আইবেশ হোমরুল বিরোধী আলস্টারের অন্যতম নেতা যার ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল গেলপিং স্মিথ। তিনি ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড কার্সনের ডান হাত এবং অতি দুর্দুখ বলে ছিল তাঁর অখ্যাতি। এ হেন গেলপিং স্মিথকে ওরা পেড়ে ফেলেছেন। আমাদের মনটা তখন বেশ দমেই গিয়েছিল। সাক্ষাৎকারের দিন

সেরা জিনিষ যাঁরা কেনেন
তাঁদের পছন্দ

কায়ো-কার্পিন



কেয়োকার্পিন তেলে চুলে আঁঠা হয়না—মাথা ঠাণ্ডা রাখে আর
কুলও পরিপাটি থাকে। কেয়োকার্পিন নিশ্চয় চুলেও স্বাস্থ্য ও
উজ্জলতা এনে দেয়—আর এর গন্ধটাও সত্যি মনোরম।
কেয়োকার্পিন আপনাদের চাই—ইংল্যান্ডই কিনে ফেলুন।

কেয়ো-কার্পিন

একটি মিনিটি ফ্রেন্সে



বেঙ্গল মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • মিলি • রাহাব • পাটনা • পোহাট
ফট • হায়দ্রাবাদ • কলম্বুর • সেকেন্দ্রাবাদ • জায়াগড় • ইন্ডোর



হায়দ্রাবাদ

কত মানুষ

যশ্চুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সব পতনের শব্দ হয় না, দেখছি কত গ্রামে-বাসে
শহরতলির লোকাল ঘ্রেনে নিহত চোখ—
শূন্য হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে, বাঁচাব জন্যে একটা কিছুর
ধরতে চেষ্টা কত মানুষ
কত জীবন গভীর খাদে পড়ে যাচ্ছে

চতুর্দিকে অথচ সব কেমন দূরত আকাশ-ছোঁয়া
বিশাল বাড়ি, নকশা মেঝে, দেওয়াল-শোভা
উড়ন্ত বক...

শ্বেত পাথরের সাত টেবিলে ফলের মতো সাজানো স্নুথ,
আরনা-ভাঙা কাঁচের মতে তীক্ষ্ণ হাসি...
রঙিন মাছের এ্যাকোরিয়াম...
কোথাও কিছুর পতন আছে গোলাপ দেখে মনে হয় না।

সব ভাঙনের শব্দ হয় না, দেখছি কত গ্রামে-হাটে
অশব্দ গাছের ছায়ার নীচে আহত মূখ—
রৌদ্রে হাওয়ায় শেষ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে একটা তিচ্ছ
গড়তে চেষ্টা কত জীবন
কত মানুষ ধুলোর মতো ভেঙে যাচ্ছে

এলো। কেমন যেন কৌতূহল হোল।
ডাবলাম যাই শূন্যে আসি স্মিথ সাহেবের
সঙ্গে ওদের কি রফা হয়। গোলাম কমন
স্নুমে। আবেদনকারীদের মূখে আনন্দের
দাঁপ্তি। দু-একজন ছিলেন একটু
সাবধানী মানুষ। তাঁরা তাঁদের দল-
পতিকে দু'বার তিনবার স্মরণ করিয়ে
দিলেন—দেখো মাথা ঠান্ডা বেখে কথা
বোলো। উত্তেজনা যত গভীরই হোক
না কেন, মাথাটা ঠিক রেখো।
তারা একযোগে সবাই গেল ট্রেজারারের
ঘরের গিঁটের কাছে। আমবা বসে রইলাম কমন
স্নুমে। ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা
যাচ্ছে স্পষ্ট। এক এক মিনিট না যেন
এক যুগ। বেশ মিনিট পনেরো কি কুড়ির
পব দলপতি সদলবলে একে একে কমন
স্নুমে ঢুকলেন। কারো বা হাত দুটো
শূরের উপর জাঁক করা—ডাবনার পড়লে
লোকে যেমন করে রাখে। কারো মূখে
নেই রা। আমরা সই না করার দল সাহস
করে খরচ কি জিজ্ঞাসাও করতে পারছিলাম
না। এমন সময় একজন বাঙালী ছেলে
নিজের মনের ক্ষোভ জাব আটকে ফেলতে
না পেয়ে একটা বড় দম ফেলে খালি
বললেন—‘শালা’। এক মুহূর্তে বৃষ্টি
নিলাম যে বাবুদের সাক্ষাৎকারটা যতসই
হয় নি। হেঁমতা ও অজ্ঞতাকে জিজ্ঞাসা
করে যা জানলাম তার চম্বক হচ্ছে এইঃ
স্মিথ সাহেব মেমোরিয়ালিস্টদের সম্বোধন
করে বললেন—“ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাবা
দু' দেশ-দেশান্তর থেকে আমাদের দেশে
পড়াশুনা করতে এসে আমাদের দেশের
জাতীয় লাভ করেছেন। পৃথিবী জুড়ে
একটা জীবন-মরণ যশ্চ চলছে। আমাদের
ছেলেবা তাদের ঘব-বাড়ি ছেড়ে, পড়াশুনার
জলাঞ্জলি দিয়ে যশ্চ গেছে তাদের বাজা,
ভ্রমণে দেশ এবং সাম্রাজ্য, বেথানকার লোক
আপনাবা, তা বাঁচাবার জন্যে। এই দাবুণ
শীতে নে সব ছেলেরা ক্র্যান্ডার্সের যশ্চ-

ক্ষেত্রে ট্রেসেব মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়ছে।
মাথায় তাদের পড়ছে ববফ এবং সেই
ববফগলা জলের কাদায় গোড়ালী পর্যন্ত
ডুবিয়ে তারা যশ্চ কবছে আপনাদের
জন্যেও। আপনাদের গায়ে এতটুকু আঁচড়
লাগছে না। চার্লসের যশ্চ যাবাব সময়
হুয়েছে। আবার অনেক ইংরেজ মায়েব
ছেলেবই মত সেও যাবে। হাজ্জাবে হাজ্জারে
সৈন্যরা প্রাণ বাঁচ দিচ্ছে। কত পরিবার
তাদের বাপ, ভাই, আত্মীয় হাবিয়েও যশ্চ
বুজ্জ সকল কণ্ঠ সইছে এবং বতটুকু
তাদের সামর্থ্য তারা দেশেব কাজ কয়েছে।
আর আপনাবা নিশ্চিন্ত আরামে বসে
আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। এতই আপনাদের
পড়ার চাড় যে আপনাবা চ্যার্সের লেনে
গিয়ে চাটুকুও খেয়ে আসতে পাববেন না।
আপনাবা ত পড়ে’ জবে’ দিয়েছেন।
আপনি-মিঃ...আপনি বোমান ল-তে দু-
বার, কনস্টিটিউশন ল-এ একবার ফেল।
আপনি মিঃ.....আপনি বাব ফাইনেল
পরীক্ষায় এতাবং চাব বাব ফেল করেছেন।’
এর পব প্রত্যেকটি আবেদনকারীর নাম
ও প্রত্যেকের অকৃতিত্বের লম্বা তালিকা
দিলেন স্মিথ সাহেব। দেখা গেল আমাদের
এক অজিত ধব ছাড়া একটি ছেলেবও
রেকর্ড নিবন্ধ ও অক্ষত ছিল না।
প্রত্যেকেই এক এক কি একাধিক বার ফেল
করা ছেলে। স্মিথ সাহেব কাগজ গুটিয়ে
শেষে বললেন—“এই ত আপনাদের গুণ-
পনা আর পড়াশুনার রেকর্ড। আপনাদের
মত দিগগজ ছেলে আমাদের ইনে থাকার
চেয়ে না থাকাই ভাল। ভদ্রমহোদয়গণ,
আপনাবা এখন যেতে পাবেন।” বাবুরা
হতমান নতশির হয়ে আহত জন্তুব মত
নিজ নিজ ক্ষতস্থান লেহন কবতে করতে
বাড়ি চলে গেলেন। তাঁদের মানসিক
অবস্থা দেখে—কি ভাই কি হোল আবেদন-
পত্র সই করে—এই কথাটা জিভের
আগায় এলেও যশ্চ বলতে পাবলাম না।

শেষ পর্যন্ত চার্লস চলে গেল যশ্চের
ইংলন্ডের হাজ্জাব হাজ্জার অনান্য যুবকদের
সঙ্গে।
এই ঘটনাব অলপদিন পরেই অজিত ধব
এল এল বি পরীক্ষা দিগেন। একটা
বিষয়ে প্রশ্নেব ভালভাবে জ্ঞান না দিতে
পেবে অজিতের মন খুবই বিষন্ন হবে
গিবেছিল এবং তিনি তাঁর বাবা টাকাগুণি
নন্টই করেছেন বলে আশ্রয় বসতে
লাগলেন। আমাকে বললেন যে তিনি আশ
বিষয়গুলির পবীক্ষায় বসবেন না। যশ্চ
ব্যাবস্টার হয়েই দেশে ফিববেন। অজিত
আমাকে খুবই ভালবাসতেন। সেই জন্যে
তাঁর তখনকার মানসিক যশ্চ আমাবো
খুলেই বলেছিলেন। আমি অনেক করে
তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম এবং জোব করলাম
যে বাকী পরীক্ষাগুলিতে বনডেই হবে।
আমি নিজে অজিতের সঙ্গে গিয়ে তাঁকে
পরীক্ষার হলে পৌঁছে দিবে এলাম।
অজিত আমার কথার সব বটা পবীক্ষাই
দিলেন এবং যথাসময়ে দেখা গেল যে তিনি
পাশ হয়ে গেছেন। বারে বনড হবে এল
এল বি পাশ করে অজিত দেশে ফিবে
গেলেন। আমার একটি পরম শত্রুদুশ্মান
বন্ধুকে তখনকার মত হারানাম। পরে
আবাব তাঁকে পেয়েছিলাম কলকাতায়
প্র্যাকটিস করবার সময়। অজিতের পবীর
বেশ কম জোবই ছিল এবং সেইজন্যে
কোর্টের প্র্যাকটিসের ধকল তাঁর ধরী-
রেব পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তৎ-
সত্ত্বেও অজিত হাইকোর্টের এ্যাপেলট
সাইডে ফৌজদারী মামলা বেশ দৈপ্ত্যে
সংগেই করতেন। তিনি বলনাতার এতটি
কলেজে অধ্যাপনাও করতেন এবং সেইটাই
তাঁর ভাল লাগত। ভগবানের অদ্বী
দযাষ অজিত এখনো জীবিত রয়েছেন।
মাঝে মাঝে দেখা পেলে পুরনো দিন
কত কথাই হয় তাঁর সংগে

[চলবে]



কাঁটাডাঙ্গা কালভাট

মারিনাথান

সাপের মত হিলহিলিয়ে এঁকেবেঁকে
মুতপদ খালটা কাঁটাডাঙ্গা কালভাটের
তলায় যেখানে ছোট ছোট বুনো গাছের
ঘষে হারিয়ে যায়; বিল্বপদ আঁধার অস্থির
পায়ে অনেক আগে থেকে সেই কালভাটের
ওপর এসে বসেছে। নাকের ডগার গুঁড়ো
গুঁড়ো ঘামেব বিল্বপদগুলো মিলিয়ে
গিয়েছে। পাঁচটা সতেবব আপ শান্তিপদ
লোকালটা এবাব কার্কিনাড়া স্টেশনে এল।

উন্মিশন চিত্তে বিল্বপদ এখন উঠে
বুঁড়ায়। মাথার ওপরের অশ্বখ গাছটার
দিকে ফিবে অলসতা ঝেড়ে একটু ঝুঁকি
দেয় শরীরটাকে। এই দুর্গম কালভাটটা
এখন ওব কাছে অসহনীয় হয়ে যায়।
টুসকীর অনাবশ্যক কথাগুলো ওব সহ্য
হবে না। তাই ফেরে। টুসকী ওই
শান্তিপদের লোকাল থেকে নেমে এতক্ষণে
লাইন পাব হয়ে পিচের রাস্তা ধরেছে।
দূর জোবে জোবে হাটতেও পারে। ওর
এখানে বসা টুসকী পছন্দ করে না।

এ পাশের বড় পুকুরটার কাছে
আসতে না আসতেই টুসকী ওর কাছে

এসে পড়ে। ওর দিকে চায়। তারপর
হন হন করে সাপের মত চটিতে হিসহিস
শব্দ তুলে সরু গলিটার মধ্যে মিলিয়ে
যায়। বিল্বপদের মুখটা নির্বিকার।
এখন ও বাড়ি যাবে না। ভিলেজ রোড
ধরে টালিখোলা-পুকুরের নির্জন পাড়ে
এসে বসল। মাল ট্রেনেব মত থেমে-থাকা
চিন্তাগুলো এবার ভিড় করে আসে ওর
কাছে। টালিখোলার ছাউনীর ওপাশের
চালাটার গুটিকতক সাঁওতাল-মেয়ে-মরদ
মাণ্ডি আর তাড়ি খাচ্ছে। গদনগদন করে
নেচে-নেচে গান গাইছে। আর তার সঙ্গে
মাদলেব ডিম্বিক ডিম্বিক বোল গমকে
গমকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিল্বপদের চিন্তা-
গুলোও যেন সেই সঙ্গে পাতলা হয়ে
এল। বিকেলের এই খোলা বাতাসটার
জেনোই ওর এখানে আসা। ওর মনটা
এখন ওর কাছে পড়ে নেই।

কাজ থেকে ফিবে আজকাল টুসকী
বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। টালিখোলা পুকুরটা
ঝিলবাগানের তরল অন্ধকারে যখন ডুবে
যাবে, বিল্বপদ তখন বাড়ির দিকে গা

বাড়ায়। আর তখনও টুসকী পাশের
ঘরের ছেঁড়া মাদলের পুর শুরে থাকে।
বিল্বপদ তখন হয়ত মনে মনে ছেলেমানুষ
হয়ে ওঠে। জুলজুল করে তাকিয়ে
তাকিয়ে দেখে। টুসকী যেন দিনে দিনে
পাড়াড়ি মেলছে। আব ওর লোভটাকে
কেমন জারিয়ে তুলেছে। বিল্বপদ পায়ে
পায়ে ওর কাছে সরে এসে গায়ে হাত
দিতে চায়। আর অমনি টুসকী উঠে
পড়ে। শাসনের সুরে ধমকিয়ে ওঠেঃ
'এই না অসুখ থেকে উঠেছো। এখনো
ডাক্তারের বারন।'

বোকার মত ফ্যাকাসে দৃষ্টি দিয়ে
বিল্বপদ তখন হাসতে চায়। কিন্তু জোরে
হাসে না। তাকিয়ে তাকিয়ে টুসকীর
ক্লমশ লাষণে ভরে-ওঠা মুখটাকে লক্ষ্য
করে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। টুসকী ওর
সামনে থেকে ছিটকে যায়। থাকতে চায়
না। ইচ্ছে কবেও না। বিল্বপদ নিজের
ঘরে চলে আসে তখন। সেখান থেকে সে
দেখে টুসকী ঘরে এসে সন্ধ্যা দেয়।
গঙ্গাজল ছিটোয়। আর অনেকক্ষণ ধরে

প্রণাম করে। ল্যাম্পে কেরোসিন তেল পুরে নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে আড়াল হয়। বিল্বপদ হয়ত তখন বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকে। নয়ত বসে বসে পশ্চিমের জানলার বাইরে দৃষ্টি ছাড়িয়ে দেয়। টুসকী তারপর কাঁচের প্লাশে করে এক প্লাশ গরম দুধ, যখন তুলে ধরে তখন বিল্বপদ আর রহস্যময়ী রূপটাকে ওর মধ্যে খুঁজে পায় না।

টীবি স্যানিটোরিয়াম থেকে আসার পর বিল্বপদ এই কদিনেই টুসকীর একটা পরিবর্তন আবিষ্কার করেছে। আর যতই টুসকীকে নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করে দেখেছে, ততই তার ওপর পুরনো চাপা চাপা সন্দেহের কাল মেঘটা নিবিড় করে ওর মনটাকে ঘিরে ধবেছে। সন্দেহটাকে নানা অনুশ্রুতি যতই ভুলতে চেয়েছিল একটা কঠিন প্রগল্ভ পাথরের মত ততই সেটা ওর বুকের ওপর চেপে বসেছে।

টুসকী আজকাল ওর সঙ্গে কথি কথা বলে। রায়ে একা একা পাশের ঘরে ছেঁড়া মাদুরের 'পর কাটায়। অনেক সময় অনাবশ্যক ওর কাছে বসে গল্প-গাছা করতেও বিল্বপদর ইচ্ছে যায়। কেন না, এখন ওর কোনো রোগ নেই। সময় কাটে না। অথচ টুসকী ওকে ধারে কাছে থাকতেই দেয় না। ছুটির দিনে পাশের ঘরে দোর দিয়েই পড়ে থাকে। অভ্যাস-মতে বিল্বপদ যখন বাইরে চলে যায়, তখন টুসকী দোর খোলে। অথচ এমন ও কোনোদিনই ছিল না। বিল্বপদ আজকাল প্রায়ই এসব কথা চিন্তা করে। আর ওর নিশ্বাস গাড়তর হয়ে এসে ওর চার পাশে ঘুরপাক খায়; তখন ও বুঝতে পারে ও যেন কেমন শূন্য আক্রোশে ফুলে উঠেছে।

আজ টালিখোলা-পুকুরপাড় থেকে ফিরতে অকারণ দেরি করল বিল্বপদ। দুখটা এক নিশ্বাসে শেষ করে। তারপরে আজকে আর বিছানায় এসে গা এলিয়ে দেয় না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। দলা দলা চিন্তাগুলো ওর পায়ের চাপে চাপে পিসে যেতে থাকল। টুসকী যেন সে টুসকী নয়। একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী যেন ওকে ঘিরে রয়েছে। যেন দেখা যায়, চেনা যায় না। অনুভব করা যায়, তবু পাওয়া যায় না। মস্তপূর খালের মত রহস্য-ভরা যেন কাঁটাডাল্যা কালভার্টের তলা দিয়ে সাঁওতালিবালায় মত একেবেঁকে ওই খালটা সোজা বুনো ঝোপের মধ্যে হঠাৎ উখাও হয়ে যায়। ওর দেশের মেয়ে টুসকী। ভালবেসে স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে পালিয়ে এসেছে।

তখন চটকলের সামান্য 'হুপ্তার' মজদুর ছিল বিল্বপদ। আরের চেয়ে ব্যয়ই ছিল বেশি। তা সত্ত্বেও টুসকীকে নিয়ে আশায় ঘর পেতেছে। একদিন বিল্বপদ

কাশতে কাশতে এক খাবলা রক্ত মুখ দিয়ে পড়তে দেখলো। কিন্তু ভয় ও প্রায় নি। অবাকও হয় নি। ভেবেছিল চটকলের মজদুরদের এমন একটু-আখটু হরই থাকে। কিন্তু ওর চালে ভুল হল। ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারল যে, মস্তপূর খালের মত একটা ভয়ঙ্কর সাপ ক্রমশঃ আন্টেপস্টে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। তার বিরাট ষাঁটে দাঁতে ওর বুকের কুরে-কুরে খাওয়ার মত স্বাধীন হয়ে উঠছিল। মিলের কাছটা তখনই ওর ছেড়ে গেল। অন্ধকার গহবরে সাপটা তখন যেন ওকে একা পেয়ে বসল। বোয়ের ঘোমটা গসে গেল। তখন থেকে টুসকী বেরিয়ে এল বাইরে। ভয়ঙ্কর সাপটার হাত থেকে ওকে মুক্ত করবার জন্যে। তারপর থেকেই শূন্য হল ওর লড়াই। সামান্য কয়েক গন্ডা পরসার রোজে এনামেল ফ্যাক্টরিতে চাকরী।

ছুটির দিনে টুসকী ফল ও টুকটাকি জিনিষ নিয়ে যাওয়া থেকে নিজের পেট বাঁচানোর সব খরচাই—ওই ক'গন্ডা রোজের মধ্যেই কোনো রকমেই চালিয়ে এসেছে এককাল। স্যানিটোরিয়ামে থাকাকালে বিল্বপদ সেইজন্যে টুসকীর লড়াইকে দেখিয়ে রোগী বন্ধুদের কাছে গর্ব করত। বিল্বপদ আজ রোগমুক্ত। এখন ও সহজে মিলের কাজে লেগে যেতে পারে। টাকা রোজগার করবে, আর পারে টুসকীকে ছুটি দিতে।

আবার বিল্বপদ চণ্ডল হয়ে উঠল। টুসকী যে আজকাল ওর সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চায় না। জানতে ও জানাতেও চায় না। এ সব চিন্তা করতে ওর মোটেই ভাল লাগে না। অথচ চিন্তাগুলো সর্দির মত জট পাকিয়ে ওর মাথাটাকে ঝিমিয়ে রেখেছে।

আর কটা রাত কেটে গেল। ভোরের শুকতারা ডুবে যাবার আগেই উঠে পড়ে বিল্বপদ। বাতাসটা গায়ে লাগায়। আজও সে বেরিয়ে এল। টুসকীর জানলার ধারে সরে এসে দাঁড়ায় একটু। আজ টুসকীর তাড়া নেই কাজের। কারখানার ছুটি। বিল্বপদ প্রাত্যহিক খোলা বাতাসে নিম্ন দাঁজন চিবতে চিবতে বেড়ালো। তারপর রাস্তার কলে মুখটা ধুয়ে নিয়ে ফেরে।

টুসকী আট দিয়েছে। ভয়ঙ্কর একটা দানবের মত ঘোঁরাটা পাকাতে পাকাতে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আকাশটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এখন। টুসকী বাসি কাপড়টা ছেড়ে রেখে রান্নাঘরে ঢুকেছে। অতএব বিল্বপদ দোরের পাশে গিয়ে বসল। টুসকী আটা মাখছে।

ঃ 'তুমি আবার এখানে কেন?' ঘরে বসে, খাবারের দেরি নেইকো।' কথাটা গায়ে মাখে না ও। নির্বিকার-ভাবে বসে থাকে। বোকার মত হাসতেও

যায়। কিন্তু পারে না টুসকীর মুখটা দেখে। এর এ মূর্তিও ওর কাছে যেন নতুন। ফের বললে : 'ওঠো শীগগির। গারে রান্নাঘর আমার কাপড়ের ঠিক নেই।' এগিয়েও এল দোরের কাছে।

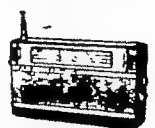
বিল্বপদকে এক রকম জ্বার করেই থাকে। অবাক হয়ে বিল্বপদ চেয়ে থাকে কিছুদ্ধ। তারপর এচটা অশান্ত ব্যতাসের মত চাপা আক্রোশে নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসল। টুসকীর ব্যবহারটা ক্রমশঃ ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে আসছে। অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জনের মধ্যে ক্রমশঃ একটা ব্যবধান রচিত হয়—যা কতই আগে থেকে সংকল্প করে রাখে নি। পুরনো একটা সন্দেহ আবার ওর মনটাকে ঘিরে ধরে।

এক ফাঁকে টুসকী ঘরে ঢোকে। হাতে তার দুখ-মুটি মাথা বিল্বপদ ওগুলো শেষ করে। গায়ে জায়াটা চাপায়। পাশের ঘরে কুলুঙ্গি ষাঁটে ষাঁটে কটা পরসা পকেটে গলিয়ে দেয়। তাবপর নিঃশব্দে রান্নাঘর নেমে আসে। আজ ওর বিড়ি খেতে ইচ্ছে করে। ভাবে, দুটো একটা খেলে মহাভারত অশ্রু-ন হয়ে যাবে না। বিড়ির দোকানে গিয়ে তাই পরসা কটা এগিয়ে দেয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে মূখে পোরে, আর বাকিগুলো রাখে পকেটে। তারপর অনেক দিনকার অভ্যস্ত কায়দায় একমুখ ঘোঁরা ছেড়ে হাটতে লাগল। তিস্ত চিন্তাগুলো যেন সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। আগে টুসকী ওর কারখানার বাবুদের কথা, মোম-শ্রমিকদের কথা শোনাত। এখন সে সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। অথচ বিল্বপদর শোনার উৎসাহ ফুরায় নি। কারখানার বাবু-টাবু বা হোক একটা উপলব্ধি নিয়ে টুসকীর সাথে দুটো সরস কথার সময় কাটাতে ইচ্ছে যায় ওর।

বিড়িটা শেষ করে আবার ও চলে। কোনো একটা কাজে লেগে পড়তে ইচ্ছে হয় ওর। নিরলস্য বসে থাকা দেহট

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টর

২৫৫ টাকা মূল্যের ৩
ব্যাণ্ড অল-ওয়াল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর
"এসকর্ট" মাসিক ২৫



টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।

Japan Agencies (EW-77)
Post Box 1194, Delhi-6.

কেমন করে ওঠে কৰ্মবাস্তব-বাড়ি-ফেরা মাননগদুলোর দিকে চেয়ে। ও যেন শরীরের কোণে কোণে যন্ত্রের বিচিত্র স্বরঃ ধ্বনি শুনতে পায়। টুসকীর দেহ আধখানা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। এবার ওকে মৃত্তি দিতে হয়। একটা ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নেয়া পথ থেকে। রেলা বেগা গাড়িরেছে। এখন ওরা চলতে কষ্ট হচ্ছে। স্টেশনের ওভারব্রীজ পার হয়ে—স্যানা-টোরিয়াম থেকে ফেরার পথ এই প্রথম ও এলো। এবার ফেরে। ওর মনে হয় তিনটে বছর যেন তিনটে যুগ। চেনা-জানা সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

টুসকীর রান্না শেষ হয়েছে। ফান্ড করে এনেছে। বিলপদ। ঘরে এসে জামাটা বুলিয়ে দেয় দড়িতে। ওর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি গন্ধটা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। বিছানার গা এলিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে।

টুসকী ঘরে এসে গন্ধটা যেন অনুভব করে। বিলপদ ওর চোখের ভাবা বুঝতে পারে। ওরই দিকে অবাক দৃষ্টি ছুড়ে দিলে টুসকী। বেশ গম্ভীর। অবশ্য গম্ভীর হয়ে থাকার ওকে মানায়। সেই ভাবেই ছোট করে বলেঃ চান করে এস।

এতক্ষণ পর বিলপদ খিদেটা টের পায়।

তিন বছরের অভ্যাসগুলো বিলপদ আজ প্রথম ভঙ্গ করল। আজ ওর চান, খাওয়া, বিছানার গড়ানো—সবই হলো দ্বিগুণ হয়ে। টায়ার কোম্পানীর পেটাম্ফটায় তিনটে বাজার শব্দ ওর কানে যেতেই বৃষ্টি ভেঙে পেলো। কিন্তু বিছানা ছাড় না। পড়ে থাকে। পাশা ফেরে। টুসকী তখনও ওঠে নি। দেখা যায় না ওকে। দেহের ক্রান্ত অবস্থা ভাবটা এখন আর বিলপদের নেই। এবার বিছানা থেকে নেবে আসে। চেখে মুখে জল দেয়। টুসকীর জানলার ধারে এসে একবার উঁকি দেয়। আবার ঘরে আসে। জামাটা গিলিয়ে নেয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে স্নান করে নেয়। কাঁটাডাঙা কালভার্টের পরে দু-তিনজন হিন্দুস্থানী গল্প করছে। বিলপদ ওদের চেনে। তাদের কিছুটা ঘরে বসে। শান্তিপূর লোকালটা চলে গেছে। ওদের একজনের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে টানতে থাকে। নফরচাঁদ জুট মিল আর টায়ার কোম্পানীর একটানা বিচিত্র শব্দটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। ওর চিন্তার মত যেন।

ওর চোখ দুটো হঠাৎ কুঁচকে ওঠে।

এই মাত্র যে লোকটা ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, লোকটাকে ও চেনে। টুসকীর কারখানার লোক। আজ ওদের ছুটির দিন কি না।

টুসকীর সব কিছু ঢাকা ঢাকা। এর আগেও ওদের একটা বাবুকে ছুটির দিনে এখানে দেখা যেত। চা খেত। ভাত খেত। টুসকীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলত। বিলপদ বিছানায় শুয়ে শুয়েই এসব দেখতে চপত। ওদের টুকরো টুকরো অল্পটুকরা কথাঃ শব্দটা ওকে একতাল অবাকঃ যন্ত্রণার কাঁটা হয়ে আমাত করত। অবশ্য আপত্তিকর কিছু দেখে নি। তবু বিলপদ নিজের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। একদিন বিশ্লেষণ ঘটলো পুস্তক কঠোর অভিব্যক্তি। কিন্তু আশ্চর্য হল বিলপদ। টুসকী ডাঙলো, না, সোটেই। শারীরিক মত নিজেকে কেবল সঙ্কুচিত করে নিল। মাত্র। তারপর বিলপদ বুকতে পেরেছিল। যে-আরঃ ভুল হয়েছিল। তবু ভুলটাকে সে স্বীকার না করলেও মনে মনে কমা চেষ্টা নিয়েছে। সে কথা আজও ওর মনে আছে। আর ও ভুলতে পারে না। কিন্তু এই কি সত্যি যে, টুসকী ওকে আর সহ্য করতে পারছে না। অথচ আজ পর্যন্ত ওকে সম্পর্ক করে জানা হয় নি বিলপদের। মাঝে মাঝে ওরা তাই মনে হয় যেন, সেই না-জানা অবশ্য টুসকী কত ভয়ঙ্করী অথবা রহস্য ভরা এক অশকারের সমুদ্র। হয়ত ঐ কালভার্টের মত কিনা কে জানে।

ওকে একজন, নিপুণ, নায়িকার মত মনে করতে হচ্ছে যার বিলপদ। কিন্তু নায়িকা রূপটাই ত্রোঃ একটা হৃদবিশ। তবে কি টুসকী শিচারিণী। বিলপদ পোড়া বিড়িটা একটা নীরব আক্রোশে কালভার্টের ওপর থেকে সজোরে খালের মধ্যে ছুড়ে দিলে। যেন ওই মৃত্তপূর খালের পচা-পচা পাকের বিস্তীর্ণ গন্ধটা আর ওর সহ্য হয় না।

সেই লোকটাকে দ্রুতবেগে আবার ফিরে যেতে দেখলো বিলপদ। একটা কঠিন দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে লোকটার অভ্যন্তর অবাধ ভরিয়ে ভরিয়ে দেখে নিলে যেন। পাশের দোকান থেকে কয়েকটা কড়া মশলার বিড়ি কিনে নেয় বিলপদ। তারপর দুরন্তে হারিয়ে-খাওয়া মৃত্তপূর খালের দিকে চোখ রেখে সজোরে ছোরে টান দেয়, আর একটার পর একটা শেষ করে। ওর চোখ দুটো কেমন ঘোর ঘোর হয়। এলো-মেলো পান্নে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

আজ ও কড়ায়-গাডায় জোর করে আদায় করতে চায় নিজের অধিকারটুকু। হারিয়ে না, ফিরিয়ে না। জিততেই হবে পৌরুষ স্বপ্নের সমস্ত অহঙ্কার দিয়ে। আজ ও দেখে নিতে চায় টুসকীর জীবননাট্যের নায়ক বিলপদ। নিজেকে না আর কেউ!!

টুসকীর দোরের বাইরে এসে বাধা পেল বিলপদ। দোরটা ভেঙে থেকের বন্ধ করা।

ঃ 'খোলা দরজা' চিহ্নকর করে উঠল বিলপদ। কোনো সাড়া পেলা না। পান্না দুটো ধরে সজোরে নাড়া দেয়ঃ ভেঙেই ফেলবো বলাচি—

এবার টুসকীর দরজাটা খোলে, কিন্তু একটা বাধা চেঁচায় দোরটা আগলিয়ে দাঁড়ায়ঃ 'এ ঘরে নয় লক্ষ্মীটি।'

বিলপদ যেন ভূত দেখলো। টুসকীর চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাসে আব লাল লাল। শাড়ির জমিনে তাজা রক্তের চাপ চাপ দাগ। মৃত্তপূর খালের পচা ডায়াপান্না গন্ধটা এত ঘুরে এসেও ওর নিশ্বাস বৃদ্ধ করে দিতে চাইছে। কিন্তু বিলপদ আজ রোয়ান্না হয়ে এসেছে। ওই রক্ত খেলতেই ভো ও চায় আজ এখনি। একটা নর-খাদক জানোয়ারের মত জান্তব লালসায় টুসকীর মুখোমুখি হয় ও। টুসকীও হাঁপাতে হাঁপাতে বলেঃ 'তোমার পান্নো পড়ি, চলে যাও এ ঘর থেকে।'

টুসকীর কথা আটকে যায়। বিলপদ এবার ফুসে উঠলঃ 'কি চাও কি তুমি? মজা লঠতে শিখেছো।' সাঁড়াশীর মত শব্দ থাবা দুটো দিয়ে টুসকীর কাঁধ দুটো ধরে কাঁকানি দেয়ঃ 'ও লোকটা জোর কে? কেন আসে?'

টুসকী হাঁপিয়ে উঠল। বলেঃ 'তোমার পান্নো পড়ি, চলে যাও এ ঘর থেকে, দেখছো এসব—'

ঃ 'সবই দেখতে পাচ্ছি রে শয়তানী! চলে যাবো।' দাঁত দুটো কড়মড় করে ওঠে বিলপদ। হঠাৎ এক ধাক্কাঃ টুসকীকে ফেলে দেয়। বলেঃ 'মর তুই!'

টুসকী জ্ঞান হারিয়ে ফেলো। বিলপদ এবার সচকিত হয়। সেই লোকটার সঙ্গে একটা ডাক্তার ঘরে ঢুকলো। চমকে উঠল বিলপদ। ডাক্তার আবার কেন! মাথাটা ঘুরে ওঠে যেন। দেওয়ালটা ধরে বসে পড়ে। এতটা না করলেও পারত সে।

ডাক্তারবাবু টুসকীকে দেখে। ইঞ্জেকশন দেয়। লোকটির সঙ্গে ছোট ছোট কথাও বলে। সবই বসে বসে দেখে

বিল্বপদ। ডাক্তারের কথায় ও ফেরে। তারিয়ে থাকে চুপ করে। কি যেন একটা না-শোনা কথা শুনতে চায় ও।

: 'ভয়েব কিছুর নেই।' সামান্য দৈন তিনি। 'হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।' হাতটা ধুয়ে এনে তোয়ালেটা রেখে ঘাবার সময় একটু চিন্তা করে ফের বললেন: 'এতদিনকার টিবি পেসেন্ট ঘরে ফেলে রেখেছেন।'

চমকে ওঠে বিল্বপদ। বিষ-হ্যাঁ ওই রোগটাকে বিল্বপদ সাপের বিষই ভাবে। ওর মাথাটা ঘুরে ওঠে আবার। মৃতপদের খালের মত সাপটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে টুসকীকেও ধবেছে তাহলে। একটা ভয়াবহ ফ্যাকাসে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিবে বিল্বপদ ঘরটা আবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ঘরে এখন আর কেউ নেই। সেই লোকটিও নেই, বোধহয় ডাক্তারবাবুকে এগোতে গিয়েছেন। বিমূঢ় অশ্রুকার কখন জানলা দিয়ে হুড়নুড় করে ঢুকে পড়ে জমাট বেঁধে যায় ঘরের মধ্যে। আজ এই অস্পষ্ট আঁধারে 'এতদিন পর বিল্বপদ টুসকীকে সত্যি করে চিনে নিতে পারে। আর সেই মুহূর্তে ওর দেহের রক্ত আবার ফুটে ওঠে। রাগে নয়, প্রতি-শোধ নিতেও নয়—শান্তির ভারে। ভুলে গেলে নিজের বিস্ময়ের কথা। পেশীগলো দল হলে ওঠে তাই।

বিল্বপদ এগিয়ে গেল টুসকীর আবও কাছে। ঠক কবে দেশলাইকাঠি জ্বেরে আলোটা ধরালে। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপ চাপ রক্তের দলা ঘরময় ছড়ানো দেখতে পায়। এক বালানি জ্বল এনে টুসকীর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিতে থাকে চোখে মুখে। যত্ন করে মুছিয়েও দেয় রক্তের দাগ। এই দলা দলা রক্ত এ যেন ওরই রক্ত। শিরশির করে উঠল ওর সর্বান্ধ। এ সব ঘটিলে ওর অসুখটা আবার রিল্যাপ্স করতে পারে।

বিল্বপদ এবার কঠিন হয়ে এল। নিজের কাজে মন দেয়। স্বার্থপর মত একা বেঁচে থাকতে ও রাজী নয়। হাসপাতালেই ওকে নিয়ে যাবে। টুসকী এতকাল ধরে ওরই বৃকের সব বিষ শুষে নিয়েছে। আজ এই রক্ত-রক্ত ঘরটায় বসে ওর মনে হয় টুসকীর গায়ের সোঁদা-সোঁদা গন্ধটা মোটেই মৃতপদের খালের পচা পচা পাকের মত নয়।

একদিন এই চাপ চাপ রক্তের মধ্যে

মরণের হাতছান দেখে বিল্বপদ ভয় পেরেছিল। আজ সেই রক্তের মধ্যে বসে বিল্বপদ একটা কাঁঠন জমাট প্রাতিজ্ঞায় ডুবে গেল। টুসকীকে বাচরেই ও তুলবে। আবার ও কলে কাজ করবে, টাকা রোজগার করবে। আর টুসকীর কাছে পৌঁছে দেবে

ফল আর ওষুধ। তবু ভয় পাবে না কোনো কিছুর। ভয় পাবে না কাঁটাডাঙা কালভাটের তলায় জমে-ওঠা পচা পচা ভ্যাপসানো গন্ধটাকে অথবা মৃতপদের খালের মত একেবেঁকে হিলহিলিয়ে চলা অদৃশ্য সাপটাকে।



যদি থাকে দাঁত
তবু সুন্দর হাসি

সাদনা
দশন

সাদনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
করিলে কোন দন্তরোগের ভয়
থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল
ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোজাচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., অধ্যাপকসমিতি, এফ.সি.এস. (লণ্ডন),
এম.সি.এস. (আমেস্টার) ডাঙ্গলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেমিস্ট-ড্রাগিস্টস্ট্রাঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিক) প্রাইভেট



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

স্বপ্নতত্ত্ব

স্বপ্ন নিয়ে হাল আমলে যত গবেষণা হয়েছে, তেমন বোধ করি আর কোন-কিছুকে নিরুই নয়। কিন্তু তবু স্বপ্ন সম্বন্ধে কুসংস্কার এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি আমরা। এখনও কোনো দৃঃস্বপ্ন দেখলে ঘুমের ঘোরে যে পরিমাণ চোখের জল ফেলি আমরা, জেগে ফেলি তার চেয়েও বেশি। আর স্বপ্ন যদি সুখের হয়, তবে তো কষ্টই নেই। তবে আর বারবেলা কালবেলা, অশেষা মধ্য অমাবস্যা পূর্ণিমা বিচার করি না; বিশেষ কোনো মূহুর্তে ঘুমের দেশের অভিজ্ঞতার কথাটা প্রিয়জনকে বলে ফেলি। এ ছাড়া কোন স্বপ্ন ফলে আর কোনটি ফলে না, কোনটি দৈব-সংকেত আর কোনটি ভবিষ্যৎবাণী, তা' নিয়েও হাজার রকমের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অথচ মজার কথা এই যে, স্বপ্নাদ্যা অভিজ্ঞতাকে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আজ থেকে শত শত বছর আগেও দেখা যেত। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খৃঃ পূঃ ৪৬০—খৃঃ পূঃ ৩৫৭) বলতেন, স্বপ্ন হল মস্তিস্কের স্বপ্নচালিত অবিরাম কার্য-ক্রমেরই এক বিশেষ পরিণতি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬০—খৃঃ পূঃ ৩৫৭), দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—খৃঃ পূঃ ৩২২) এবং মনোবিদ ফ্রান্সিস বেকন-এর (১৫৬১ খৃঃ ১৬২৬ খৃঃ) ধারণাও প্রায় একই রকম ছিল। এ ছাড়া লুক্রেটিয়াস কেরু (খৃঃ পূঃ ৯৬-৫৫), লামেরিয়ে এবং র্যাডিসচেভ-এর মতো চিন্তাশীলরাও বলে গেছেন, স্বপ্ন অপ্ৰাকৃত কিছু নয়, পুরো-পুরি প্রাকৃত। মস্তিস্কের ক্রিয়া থেকেই এর উদ্ভব।

উপরে উল্লিখিত মহাজনদের ব্যতিক্রম সফ্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯) ও প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭)। ওঁরা অবশ্য স্বপ্নের মধ্যে অলৌকিকতার বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রীক দার্শনিক সফ্রেটিস বলতেন, স্বপ্ন হল এক স্বর্ণাঙ্গ বস্তু। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিধাতার ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হয়। আর প্লেটোর ধারণা ছিল, স্বপ্ন আমাদেরই প্রতিচ্ছবি; শাস্বত সত্যের মূর্তিমান চিত্ররূপ।

অন্তএব দেখছি, সফ্রেটিসের আমল থেকে যত এগিয়েছে সময়, স্বপ্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণাও ততই চিন্তাশীলদের মনে বস্তুমূলে হয়েছে। কিন্তু তবু একথা

অস্বীকার করা চলে না যে, স্বপ্ন সম্বন্ধে পূর্ববর্তীদের ধারণার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল অনুমানের উপর নির্ভরশীল। সেই সব অনুমানকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন যারা, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রুশ-বিজ্ঞানী প্যাভলভ (১৮৪৯—১৯০৬) ও অস্ট্রীয় মনস্তাত্ত্বিক সিগমন্ড ফ্রয়েড-এর (১৮৫৬—১৯০৯) নাম। স্বপ্ন সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এঁদেরই প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়েছে।

প্রশ্ন উঠবে, স্বপ্ন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীরা কি সিদ্ধান্ত করেন? সিদ্ধান্তের মালমশলাই বা ওঁরা পান কোথায়?

এর উত্তর হল, স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার অল্প উপকরণ আমাদের ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বপ্ন-দেখার পর কারও মন ঘুম ভেঙে যায়, যখন সে জেগে ওঠে, তখনও স্বপ্নের অনেক কিছুই মনে থাকে তার। এ ছাড়া ঘুমের ঘোরে অনেকের দেহ-মনেই স্বপ্নের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে কেউ; কেউ আবার বিস্ময়ে-আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গোল্ডাতে থাকে। শিশুরা স্বপ্ন দেখে হাসে কখনও; কখনও আবার চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলে। একদিকে স্বপ্নের এইসব প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া এবং অপর দিকে অগণিত মানুষের স্বপ্ন-লব্ধ অভিজ্ঞতা—প্রধানত এদেরই উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত হল এই যে, জাগ্রত অবস্থায় যেমন, ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠিক ডের্মন আমাদের মানসিক কার্যক্রমে মস্তিস্কের ধর্ম ও ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

বিজ্ঞানীরা বলেন, ঘুম গাঢ় না হলেই স্বপ্ন দেখি আমরা। আর যারা শোওয়া মাথায় গাঢ় ঘুমে লে পড়েন, স্বপ্ন তাঁরা প্রায় দেখেন না বললেই চলে। তাঁরা দেখেন না, কারণ, ঘুমোবার সময় তাঁদের মস্তিস্কের কার্যকলাপ অত্যন্ত ধীর ও মৃদু গতিতে চলে। অর্থাৎ, মস্তিস্কের যে অংশটি আমাদের মানসিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ, তার প্রায় সমস্তটুকুই তখন নিশ্বেদ ও অসাড় হয়ে পড়ে। অপর দিকে ঘুম যদি হয় পাতলা, তবে মানসিক কার্যক্রম স্তম্ভ হয় না কখনও; ঘুমন্ত অবস্থায়ও চলতে থাকে। ফলে, নানা রকম স্বপ্ন দেখে মানুষ। ঘুমের ঘোরে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সম্মুখ করে।

এদিকে ঘুম যদি হয় গাঢ়, তাঁরা সে স্বপ্ন দেখেন না, এ কথা কিছুদিন আগেও অনেকে মানতে চাইতেন না। এমন কি জার্মান-দার্শনিক কান্ট (১৭২৪—১৮০৪) ও লাইবনেৎস (১৬৪৬—১৭১৬) পর্যন্ত বলেছেন, স্বপ্ন ছাড়া ঘুম হতেই পারে না। কারণ, আমাদের কার্যপ্রণালী অবিচ্ছিন্ন পথ ধরে চলে।

জার্মান দার্শনিকদের এইসব ধারণা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা মেনে নিতে পারেন। কেন না অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, এমন মানুষ অনেক আছেন, যারা আদৌ স্বপ্ন দেখেন না। এইখানে প্রশ্ন ওঠে, কোন্ ধরনের ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর? স্বপ্নযুক্ত, না স্বপ্নবিহীন? এক কথায় এর উত্তর হল, স্বপ্ন আমাদের দেহের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। বরং দেখা যায়, প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন, এমন মানুষদের মধ্যে স্বপ্ন যারা কখনও দেখেন না, তাঁদের স্বাস্থ্যের কোনো তফাৎ নেই।

ঠিক কথা। কিন্তু তবু বলবো, স্বপ্নের উৎস কোথায় এবং স্বপ্নের উপাদান-গুলো গড়ে ওঠে কেমন করে, এ সব প্রশ্নের উত্তর এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা পাই না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। সেই সব পরীক্ষার সিদ্ধান্তগুলোকে একত্রিত করলে আমরা দেখি, স্বপ্নের উদ্ভব হয় প্রধানত তিনটি কারণে।

প্রথম কারণটি হল বাইরের জগৎ থেকে সম্ভারিত কিছু প্রতিক্রিয়া। ঘুম যদি হয় পাতলা, তাঁরাই এই সব প্রতিক্রিয়ার শিকার হন। কেমন করে হন, তা' বুঝিয়ে বলা যাক এবার। ধরা যাক, ঘুমন্ত কোনো মানুষের ঠিক পাশেই সানাই বাজছে। রৌড়ও থেকে ভেসে আসছে কোনো মিঠে সুর। এই সুর ঘুমন্ত মানুষটিকে অদ্ভুত কোনো স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেতে পারে। হঠাৎ মনে হতে পারে তাঁর, উল্লাসিত এক উৎসবপূর্ণীর অতিথি হয়েছেন তিনি; সুন্দরী নারীরা তাঁর সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে। আর তিনি কোনো বিশেষ সুন্দরীর হাত ধরে অপরূপ কোনো করনাধারার গা-ঘেঁষে এগোচ্ছেন। গান গাইছে সুন্দরীটি; তিনি নিজেও গাইছেন। আর ধারে-কাছেই কোনো নহবৎখানায় সুরের আসর জম-

গাণ্ঠাহিক বসুমতী

হমাট। সেখানে বসে কে যেন মধুর সুরে সানাই বাজাতে শুরুর করল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই স্বপ্নের সঙ্গে ঘুমন্ত মানুষটির বাস্তব-পরিবেশের কোনো মিল নেই। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, সেই মানুষটি স্বপ্ন-দেখার সঙ্গে সঙ্গে সানাই শুনছে এবং এই সানাই অবাস্তব কিছুর নয়; তার ঠিক পাশেই রেডিওতে তা' বাজছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সানাই-বাজনাই তাঁর মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং স্বপ্নে একের পর এক যে দৃশ্যগুলো তিনি দেখেছেন, তাদের প্রত্যেকটি এই বাজনার সঙ্গে কোনো না কোনো রকমভাবে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এটাও ঠিক যে, বাহ্যিক এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বার বার তিনি যে ঠিক একইরকম স্বপ্ন দেখবেন, এমন কোনো কথা নেই। স্বপ্নে একই প্রতিক্রিয়া এক এক বারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়া মানুষ যদি আলাদা হয়, স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও তবে আলাদা রকম হতে পারে।

এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও বাইরের কোনো কোনো ঘটনা বা শব্দ থেকে অনেকদিন আগেকার সব অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে আমাদের। বিশেষ কোনো শব্দ শুনে আমরা সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে-পড়া চেউয়ের কথা ভাবতে পারি, অথবা ভাবতে পারি ঝড় ও বজ্রপাতের কথা বা অনেক দিন আগে-দেখা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কোনো দৃশ্যের কথা।

এ ছাড়া বাইরের ছোটখাটো প্রতিক্রিয়া স্বপ্নে প্রায়ই খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। যেমন ধরুন, হঠাৎ মনে হল আপনার, বুকে কে যেন ছোঁয়া বাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, কিছই নয়; মশা কামড়াচ্ছিল আপনাকে। আবার মনে করুন, স্বপ্নে দেখলেন, প্রচণ্ড বেগে কে বেন গুলীগোলা ছুঁড়েছে। হঠাৎ একটি গুলী এসে গায়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল আপনার। তাড়াতাড়ি আপনি উঠে বসলেন; এবং দেখতে পেলেন, আপনার বারান্দার স্টোভে চায়ের যে কেটলীটি বসান ছিল, তাতে জল টগবগ করে ফুটছে। -এইবার সহজেই বুঝে নিলেন আপনি, বাষ্পের চাপে কেটলীর ঢাকনাটি ওঠা-নামা করছিল এবং ঘুমের ঘোরে গুলী-গোলায় যে শব্দ আপনি শুনেছেন, তারও মূলে ওই কেটলী। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল-এর একটি শিক্ষামন্তের কথা মনে পড়ছে। তিনি যথার্থই বলেছেন, ছোটখাটো কোনো উদ্বেজক ঘটনাকেও ঘুমের ঘোরে অনেক সময় প্রচণ্ড শক্তিশালী বলে মনে হয়। ঘুমন্ত মানুষ দুর্বল শব্দকেও মেঘ-গর্জন মনে করে; সামান্য উষ্ণতাকে ভাবে প্রাণান্তকর গরম।

এতকণ অবাধ স্বপ্নের একটি বড় কারণ, বাহ্যিক পরিবেশ - এবং ঘুমন্ত মানুষের উপর তার সুরাসরি প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা - গেল। এইবার অপর একটি কারণ, মানবদেহের আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে। হৃদয়ের গোলমাল হলে, যকৃতের দোষ দেখা দিলে, হৃৎপিণ্ডের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে অথবা শ্বাস-কণ্ট দেখা দিলে অনেক সময়েই দৃশ্যস্বপ্ন দেখা আমরা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হৃৎপিণ্ড যদি ঠিকভাবে কাজ না করে, তবে ঘুমের ঘোরে অনেকেই ভাবতে পারেন যে, তাঁর মৃত্যু হচ্ছে। আবার ঘুমোতে গিয়ে কারও যদি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তবে ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখতে পারেন তিনি। তাঁর মনে হতে পারে, কেউ যেন তাঁর গলা টিপে ধরেছে; অথবা চেপে বসেছে তাঁর বুকের উপর।

বিজ্ঞানীরা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে স্বপ্নের যোগসূত্র নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ঘুমন্ত মানুষের উপর নানা রকমের পরীক্ষা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফরাসী পৃথিবীক আলফ্রেড মুরের নাম। আলফ্রেড একবার নির্দেশ দিলেন, তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন যেন তাঁর নাকের ভিতর আভর জাতীয় কোনো দ্রব্য ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল এবং তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেন কায়রোর কোন গম্বুজবোর দোকানে গেছেন। এই প্রসঙ্গে মজার কথা হল এই যে, আলফ্রেড কিছদিন আগেই প্রাচ্য-দেশে এবং কায়রোতে ভ্রমণ করে আসেন।

আর একবারের ঘটনা। তাঁর লাল আলো ফেলা হল ঘুমন্ত আলফ্রেড-এর মুখে। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, বজ্র-বিদ্যুৎসহ, প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে; আর তিনি সেই ঝড়ো আবহাওয়ায় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

নরওয়ের বিজ্ঞানী ভোল্ড মৌর্গ স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে বিচিত্র এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন এমন কয়েকজন লোককে, যাঁরা প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। তারপর জাগ্রত অবস্থাতে সেই সব লোকদের দেহের বিভিন্ন অংশ বেঁধে দিলেন তিনি। লক্ষ্য করলেন, ঘুমিয়ে পড়বার পর লোকগুলোর স্বপ্নে এই বাঁধনের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কি না। দেখা গেল, প্রতিক্রিয়া উদ্বেগযোগ্য পরিমাণেই হয় এবং বাঁধনের শক্তি এবং স্থান অনুযায়ী তার ধরণ বদলায়।

উপরে উল্লিখিত দুটি কারণ ছাড়া স্বপ্নের মূলে তৃতীয় আর একটি কারণ আছে; এবং বিজ্ঞানীদের মতে, সেটিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্মৃতি

থেকে স্বপ্নের এই তৃতীয় উৎসটির উদ্ভব। আবার স্মৃতির গনসত্যিক ভিত্তি গড়ে ওঠে সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে, যেগুলো আমাদের মস্তিষ্কে কিছদিন বা বহুদিন আগে প্রত্যক্ষ করেছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে আছে। স্বপ্নের মধ্যে দুর্বল এই ধারণা-গুলো শক্তিশালী হবে ওঠে এবং বিচিত্র সব স্মৃতি পরিগ্রহ করে। তবে স্বপ্নের জগতে স্মৃতির ভান্ডার থেকে কে যে কোনো কল্পটিকে দেখবার জন্যে বেছে নেবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

অবশ্য প্রায়ই দেখা যায়, স্বপ্নের মধ্যে দৈর্ঘ্যনির্ভর কাজকর্মের প্রভাব পড়ছে। পরীক্ষক যিনি সারা দিন খাতা দেখার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন, তিনি স্বপ্ন দেখলেন, নম্বর দাখলের শেষ তারিখ পেরিয়ে গেল, কিন্তু একটিও খাতা দেখা হয় নি। অপর দিকে পরীক্ষার্থী দেখলেন, খাতা-কলম এবং প্রশ্নপত্র সামনে নিয়ে পরীক্ষার হলে বসে আছেন; কিন্তু একটি কথাও মনে আসছে না বলে কিছই লিখতে পারছেন না। এ ছাড়া ভাল স্বপ্নও অনেকে দেখেন। যে খেলোয়াড় শূন্য স্থান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছেন, তিনি হয়তো দেখলেন সেগুদী করেছেন এবং চার ও ছয়-এব ফুটবল দীর্ঘ ছোটোতে ছোটোতে ডবল সেগুদীর দিকে এগিয়েছেন। এ ব্যাপারে ফুটবল-ভক্তরাও পিছিয়ে নেই। ওঁদের অনেককেই ঘুমের ঘোরে চিৎকার করতে দেখোঁহ। বলতে শুনেছি, গোল! গোল!

এছাড়া এমন অনেক স্বপ্ন আছে যাদের মধ্য দিয়ে অবচেতন মনের অশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সংসার এবং আবেগ-উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। অনেক সময় আবার ভুচ্ছ কোনো অভিজ্ঞতা বা সামান্য কোনো উত্তিকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন গড়ে ওঠে। এই উত্তি বা অভিজ্ঞতা হাল-আমলের হতে পারে। আবার শৈশব বা বৈশ্যের হলেও বিস্ময়ের কিছ নেই। বরং বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে মানুষ হারিয়ে যাওয়া অতীত যুগে ফিরে গেছে।

এই সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, যা' কিছ শূন্য আমরা, যা' কিছ দেখি বা অনুভব করি, তাদের প্রত্যেকেই আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে কিছ না কিছ প্রভাব বেঁধে যায়। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমাদের অবচেতন মনে গেঁথে-যাওয়া এই সব সুক্ষ্মসূক্ষ্ম প্রভাবের অবশেষ স্মৃতি পরিগ্রহ করে, জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং অবিস্মার্য রকমের গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়। অতএব, বলা চলে, স্বপ্নে যাদের দেখি আমরা, তাদের কোনোটাই একেবারে নতুন নয়। অতীতে হয় আমরা তাদের দেখোঁহ; আর না হয় তাদের কথা ভেবোঁহ।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক, তা' প্রমাণিত হয় অশ্বদের স্বপ্নরূপে বিশ্লেষণ করলে। দেবা যায় যারা জন্মান্তর স্বপ্নে তারা কোনো দৃশ্য দেখে না; তারা নদী-নালা, বন-পর্বত ও মানুষজনকে শব্দ ও গন্ধ দিয়ে ঠাণ্ডা করে। জাগ্রত অবস্থায় যেমন ঘুমের ঘোরেও তেমন মানুষকে তাবা চেনে কণ্ঠ-স্বরের মাধ্যমে; আর কোন বস্তুটি দেখতে কেমন, তা' ওরা ঠিক করে স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে।

এই গেল অশ্বদের প্রসঙ্গ। এ ছাড়া বহিরদের স্বপ্নকেও এই একই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যারা অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার প্রতিবিম্বাই যাদের উদ্ভবে সহায়তা করে।

সিগমন্ড ফ্রয়েড বহু-বিচিত্র স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। তার প্রথম সিদ্ধান্ত হল, স্বপ্ন সব সময়েই মানুষের সুপ্ত ও অপূর্ণ কামনা-বাসনাকে প্রতিফলিত করে। ফ্রয়েড সব রকম বাসনাকেই মানুষের যৌন-ভাবনার মধ্যে টেনে এনেছেন।

অতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু ফ্রয়েড-এর এই যুক্তিতে পুরোপুরি স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, মানুষের জীবনে যৌন-প্রবৃত্তিকে অব্যবহার করা চলে না বটে; কিন্তু তাই বলে এমন কথাও বলা চলে না যে, মানব-জীবনের শত-সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার মূলে শুধুমাত্র যৌন-প্রবৃত্তিই কার্যকরী। বরং কার্যত বৈশিষ্ট্য ভাগ ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই দেখা যায়। বিভিন্ন স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি, মানুষের ব্যক্তিত্বের নানা দিক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। মানুষটির কৌতূহল কিসে, অভিজ্ঞতা কী রকমের, কামনা-বাসনা কোন পথ ধরে চলে, দৈনন্দিন জীবনে কী কী সব করেন তিনি, জীবনে তিনি কতখানি বিদোষদুষ্ট রূপ করেছেন এবং তাঁর আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রবণতা কোন দিকে, স্বপ্নের সাহায্যে আমরা অনেক সময় সুসব-কিছুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ইঙ্গিতগুলোর অধিকাংশই যৌন-প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে না। এ ছাড়া গত দিনের অভিজ্ঞতার যখন স্বপ্ন দেখি আমরা, অথবা যখন দেখি অনেকদিন আগে ছাড়িয়ে যাওয়া শৈশবকালের স্বপ্ন তখন তাদেরও যৌন-প্রবৃত্তির আওতায় টেনে আনা চলে না। এর চেয়েও বড় কথা হল, এমন শিল্পী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী অনেক আছেন, যারা নিজ নিজ সৃষ্টি ও আবিষ্কারের জগতে নিমগ্ন। তাঁরা যেসব স্বপ্ন দেখেন, অনেকক্ষেত্রেই সেগুলো বিশেষ কোন আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে

ওঠে। যৌনধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁদের অধিকাংশ স্বপ্নকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রয়েড এই ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, স্বপ্ন সর্বদাই প্রতীক ও রূপকধর্মী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, স্বপ্নের এই সকল বিশেষ ধর্মের ব্যাখ্যা তিনি নিজের উদ্ভাবিত যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই করেছেন। বহুক্ষেত্রেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, স্বপ্নে যে সকল বস্তু দেখি আমরা, সেগুলোর অধিকাংশই হল যৌন-অঙ্গের প্রতীক। যেমন, স্বপ্নে কেউ যদি ছাতা দেখে তো বুঝতে হবে, সেটা পুরুষ অঙ্গের প্রতীক। আর যদি দেখে কোন ঘর তো তাকে নারী অঙ্গের প্রতীক বলে ভাবতে হবে।

সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই ফ্রয়েড-এর এই সকল ব্যাখ্যা মানতে চান না। তাঁরা বলেন, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মহত্তর এ পথ ধরে এগোলে কোনদিনই পাওয়া যাবে না। বরং পুরনো প্রশ্ন-গুলোকেই নতুন করে উপস্থাপিত করতে হবে। আবার নতুন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, স্বপ্নের ঘোরে চিন্তার ধরণ এত বেশি বদলায় কেন? স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুগুলো এত বেশি অতীতভাবে আসে কেন? কেন ওরা পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে? আবার কেন-ই বা ওদের সম্মিলন অস্বাভাবিক ঠেকে? কেন স্বপ্নে দৃষ্ট বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগ এত বেশি অস্বাভাবিক? কোন গুণে ওরা একত্রিত হয় এবং অন্য কোন বস্তুর প্রতীক হিসাবে কাজ করে?

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এদেব মূলে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে সর্বপ্রধান কারণটি হল, মস্তিস্কের ক্রিয়াকলাপের যে একটি সক্রিয় ও সংহত সত্তা আছে, ঘুমের মধ্যে তার ক্রমবর্ধমান ব্যাঘাত সৃষ্টি।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, ঘুম যখন পাতলা থাকে, তখন মস্তিস্কের কতকগুলো অংশ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে; আবার কতকগুলো অংশের কার্যক্রম অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। ফলে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র শিথিল হয়ে পড়ে এবং জাগ্রত অবস্থায় আমরা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝে পাই, যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম আবিষ্কার করি, স্বপ্নে-দেখা ঘটনার মধ্যে সেগুলোর কোনটাই থাকে না। আর এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হল, যোগসূত্র থাকে না বলে স্বপ্ন দেখবার সময় মোটেই বাস্তব হয় না আমরা। বরং পুরুষের সঙ্গীতিবহীন ঘটনাগুলোকে দেখেও মনে ভাবি, যা কিছু দেখছি, তাদের সবই বুদ্ধি সত্য।

স্বপ্নের অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতার আর একটি কারণ হল, ঘুমের সময় আমাদের মস্তিস্কের দ্বিতীয় সারির সঞ্চেত-নির্দেশক ব্যবস্থাটি সকলের আগে বাধা পেয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয় যাদের দিয়ে, তারা যুব সহজেই ক্রান্ত হয়ে পড়ে; তা ছাড়া যুবই সুক্স ও জটিল উপাদান দিয়ে তারা গড়া এবং তার চেয়েও বড় কথা, এই দ্বিতীয় সারির সঞ্চেত-নির্দেশক ব্যবস্থাই আমাদের নিগূঢ় ভাবসমূহের বাহক, আমাদের পূর্বে সঞ্চিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে-দেখা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক। ঘুমের সময় মস্তিস্কের এই গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী যখন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তির মধ্যে যুক্তিধর্মের প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে, ঘুমন্ত মানুষ সম্পূর্ণ অবিবাস্য ঘটনাকেও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। এ-ছাড়া আমাদের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে এই সঞ্চেত ব্যবস্থার হাত আছে। তাই ঘুমের সময় ব্যবস্থাপকের বিভিন্নমূল্যটিই যখন শিথিল হয়ে পড়ে, তখন স্নায়ুর পরিচালনাধীন কাজকর্মেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং এই কারণেই স্বপ্ন দেখবার সময় অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েও আমরা বিস্মিত হই না; এমন কি কার্যকারণ-সম্পর্কবিহীন উদ্ভট সব দৃশ্যকেও সত্য বলে মনে করি।

কিন্তু এত সব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সত্ত্বেও স্বপ্ন সম্বন্ধে এখনও অনেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎবে দেখা যায়।

অস্বীকার করব না, স্বপ্নে-দেখা ঘটনা কখনও কখনও সত্যে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এগুলো নেহাৎ-ই আকস্মিক যোগাযোগ। এদের থেকে মনে নেওয়া যায় না যে স্বপ্ন দৈবশক্তিসম্পন্ন। কারণ, জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের কল্পিত কোন কোন ঘটনা হুবহু সত্য প্রমাণিত হতে দেখা গেছে। এসব সত্যের অধিকাংশই কার্যকারণ সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত। কতকগুলো আবার শুধুমাত্র আকস্মিক যোগাযোগ। অতএব এদের বেলার যেমন, স্বপ্নের ক্ষেত্রেও তেমন অলৌকিকতার স্পর্শ কোথাও নেই।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, প্রকৃত পরিমাণ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ তার আদ্যকালের কুসংস্কারকে পুরোপুরিভাবে কোনদিন ভুলতে পারবে কি? স্বপ্নে রাজা হবার স্বপ্ন দেখলে জাগ্রত অবস্থায় একটিবারের জন্যেও কি মননদ তার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারবে না? একটি মহত্বের জন্যেও কি প্যাভলভ বা ফ্রয়েড-এর তত্ত্বগুলো দূরে সরে গিয়ে আদ্যকালের প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দেবে না?

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম (প্রথম খণ্ড) :
সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজী রিসার্চ বোর্ড,
৩৮/২ লালো লাজপত রায় রোড,
কলিকাতা-২০। মূল্যঃ দশ টাকা।

একুশে

সুভাষচন্দ্রের “ভারতের মুক্তি সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪২)” ইংরাজী গ্রন্থটির এই প্রথম বাংলা অনুবাদ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল। অবশ্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও ১৯২০ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামে কাহিনী প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে রতী শ্রীশিশির-কুমার বসু জানিয়েছেন যে, “দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের বাকি দশটি অধ্যায় এবং পরিশেষে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত নেতাজীর বহু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, অন্যান্য রচনা, পত্র ও সমকালীন কূটনৈতিক দলিল ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ থাকিবে।” বলা বাহুল্য, এইভাবে সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হলে সমগ্র গ্রন্থটির সাহায্যে নেতাজীর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাসও আমরা লাভ করতে পারব। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যে গ্রন্থের লেখক, সে গ্রন্থের মূল্যায়নে এটাই ধরা পড়ে যে তিনি যথাসম্ভব নিজের কথা বিস্তারিত লেখেন নি। অন্তত প্রথম খণ্ড যারা পাঠ করবেন, তারা উপরিউক্ত মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। অথচ গ্রন্থটির মূল্যায়নে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, “এই গ্রন্থের লেখক তাঁহার বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশা করা যায় যে, এই একই কাজে ভবিষ্যতেও লিপ্ত থাকিবেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক হইবে এবং প্রসঙ্গত বিদেশী পর্ববেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে” (২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সালে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের মূখবন্ধঃ লেখক—সুভাষচন্দ্র বসু)।

একটা কথা না বলে থাকা যায় না যে, “ভারতের মুক্তি সংগ্রাম”-এর মতো মূল্যবান গ্রন্থ সুভাষচন্দ্র না লিখলে অনেক ইতিহাস একালের রাজনৈতিক কার্যপার ফলে চাপা পড়া সম্ভব ছিল। কারণ, এখন সবকারী আনুকূল্যে ইতিহাস রচনা কবতে গিয়ে কোন কোন স্বাধীনতা ঐতিহাসিক দলীয় সরকারে গোলামিই করছেন। আর সংগ্রামী ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় যারা ইচ্ছুক, তারা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিতে স্থানলাভ করেও প্রতিবাদ না কবে থাকতে পারেন নি। ফলে আক্ষও সত্যিকারের ইতিহাস রচিত হয় নি। হয় নি বলেই আমরা লক্ষ্য করছি—মাত্র

দু-একটি পত্রিকায় বিপ্লবী ভারতের ইতিহাস প্রকাশ করতে। যা হোক সুভাষচন্দ্র রচিত গ্রন্থের মূল্য সবচেয়ে বেশি এই যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত রাজনৈতিক কাহিনী কোথাও ক্ষুদ্র না করে তিনি প্রায় সমস্ত ঘটনাই লিখে গেছেন। আগামীকালে যারা ভারতের ইতিহাস রচনা করবেন তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ পড়ে পড়ে সাহায্য করবে। আমরাও সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাব শ্রীমতী ই. শেফলকে যার সাহায্য বাতীত সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভিয়েনায় অবস্থানকালে ১৯৩৪ সালে এ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হত না। আলোচ্য গ্রন্থের পরবর্তী অংশ (১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সংগ্রামের বিবরণ) যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে রচিত, নেতাজীর সহ-ধর্মীগণ সৌজন্যেই লাভ করা গেছে বলে সেই মহীয়সী বমণীব কাছে আমাদের ঋণ কম জমে ওঠে নি।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য, কি ছিল, সেই মুক্তি সংগ্রামে কাব কতটুকু দান—তা গ্রন্থটির বিশ্লেষণধর্মী পরিচয় থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র নিজের রাজনৈতিক সংগ্রাম কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় না দিলেও তাঁর ধ্যানধারণাও গ্রন্থটির সাহায্যে আমাদের চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রথম খণ্ডে আছে ভূমিকা ছাড়া মোট বারোটি পরিচ্ছেদ। ভূমিকাটিতে আছে যুগে যুগে ভারত-এক, ও ভারত-সংহতির মূল কোথায়—তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানসহ সিদ্ধান্ত। পূর্বেকার অন্যান্য আক্রমণকারীদের সঙ্গে কূটনৈতিকসম্পন্ন ইংরেজের পার্থক্যটুকুও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, ইংবেজ এ দেশকে কোনদিন স্বদেশ বলে ভাবতে পারে নি। ইংরেজের এ দেশে নিপাতের কারণও তাই বলে আমরা মনে করি। তাবপর ভারতের নবজাগরণ আলোচনায় আছে ক্ষুদ্র ইংলন্ড কর্তৃক বিশাল ভারত অধিকারের নিপুণ কার্যকারণসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উত্থান-কাহিনী, রামমোহন, বিবেকানন্দ যার শীর্ষে। ভারতের অন্যান্য স্থানে নেতৃবৃন্দও যথাযথ আলোচিত হয়েছেন, যেমন

তিলক, গোখলে, আগ্র, রানাভে, সাতান-কার, মালবীষ প্রমুখ। হিমকদল, কৃষকদল, তাদের কার্যধারা এবং প্রযোজন-বোধে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক রাতারাতি নেতা সৃষ্টির যথা, ডাঃ টি, এম, নায়ার, ডাঃ আব্দেকর) কথা—প্রভৃতির এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর আলোচনায় নিরপেক্ষ, নিভীক এবং বিশুদ্ধতার সাহায্যে তার সার সত্য নিষ্কাশিত হয়েছে। ১৯২০ সাল থেকে সংগ্রাম-কাহিনী শব্দ। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস মূল্য অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারই মধ্যে স্বরাজ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের কাছে গান্ধীজী মহাত্মা হলেও—গুটিহীন নন। গান্ধীজী তাঁর বৃহৎ কর্মধারার মধ্যেও বহুবার পশ্চাৎদানও করিয়াছেন সেগদুলি প্রকৃতপক্ষে এতই বিরূপ সাফল্য তিনি সত্য সত্যই অর্জন করিয়াছেন সেগদুলি প্রকৃতপক্ষে এতই বিরূপ যে, তাঁহার দেশবাসী তাঁহার ভুল-প্রাপ্তি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। সত্যগ্রহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শব্দচন্দ্রের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব কাহিনীটুকুর এমন সংস্বপূর্ণ পরিচয় দান করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক কাজের সম্বন্ধ ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই কাজ করা সম্ভব হলে আজ দেশের এমন দুর্দশি হোত না। সুভাষচন্দ্র এই গ্রন্থে তাঁর গুরুত্ব দেশবন্ধুর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, তাঁর পরলোকগমনে এক শ্রেণীর লোকের কী ধরণের সুবিধা ইয়েছিল, আর ভাবতবাসীরা তাঁকে কোন পরিস্থিতিতে হারিয়েছিল। দেশে যখনও আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিলে কংগ্রেস চন্দ্র বিপর্যাস করেছে এবং গান্ধীজী সৃষ্টিতে কার কার অপচেষ্টা ছিল—সে সব আলোচনা একালেও অত্যন্ত মূল্যবান। কাণ সেকালের অনেক দুর্ভরণ এখনও ক্ষত আকাষে বিরাজ করছে সমান্তরে। দেশের পরিবর্তন-মুহুর্তে তাঁর সম্যক পরিচয় রাখা দক্ষতার। বলা বাহুল্য এই স্বল্পবিস্তর স্থানে এই মূল্যবান গ্রন্থের

সামান্যমাত্র আলোচনাও সম্ভব নয়। তবু 'বর্মার বঙ্গজীবনে' আমরা সুভাষচন্দ্রের যুগটুকু পবিচয় পেয়েছি—তা নিয়ে পৃথক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বিভাগ এই সব কাজে কি হাত দিয়েছেন? সরকারী দলিল-দস্তাবেজ এই সব ঘটনা উদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের পর গান্ধী-আরবুইন চুক্তি ও তারপর তিনি যখন কটিকট-পরিহিত অবস্থায় ১৯৩১ সালে লন্ডনে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদ প্রাঞ্জল হলেও গীটলককে তিনিও তিলক এবং 'গোখলে'কে গোখল লেখার দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। 'মদনমোহন মালবীর'-ও 'মদনমোহন মালবা' হয়ে গেছেন। গ্রন্থটিতে নেতাজীর যে আলোকচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে তা ১৯৩৬ সালে ডাবলিনে গৃহীত। আশা করি, গ্রন্থটি বাংলাভাষীরা পড়বার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। আমরা 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'র কাছে অনুরোধ রাখছি, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদের জন্য তাঁরা চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য অবশ্যই তাঁদের পাওয়া উচিত।

বাল্টার পর রোন্দুর ॥ আশা দেবী ॥
প্রকাশক ॥ বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স ॥
মূল্য : দেড় টাকা।

কিশোর পাঠ্য উপন্যাসে যে একটি মর্যাদার দিক অবশ্যই থাকে, কাঁচা হাতে তা শুধু উপদেশমূলক পর্ববাসিত হয়ে গল্পরসটিকে মাটি করে দেয়। বাংলা সাহিত্যে কিশোর পাঠ্য রচনার ক্ষেত্রে এ দোষ যেমন অনেকেই কাটিয়ে উঠতে অসমর্থ, অন্যদিকে অনেক শক্তিশালী শিল্প-সাহিত্যিকই তেমন রচনার প্রসাদ-মুখে সে বাধা অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। বলালীকর। গল্পে মজিয়ে কিশোর-মনকে একটি গল্পোত্তর কল্পনার রাজ্যে ফেলে চিন্তার অনুপ্রাণিত করাতেই বোধহয় কিশোর-সাহিত্যের সার্থকতা। আর সেই সার্থক সৃষ্টির জন্য যে আনুষ্ঠানিক উপাদানের প্রয়োজন, তা হ'ল হৃদয়গ্রাহী ভাষার স্বচ্ছতা এবং কৌতুহলী ঘটনার বিস্তার। 'বাল্টার পর রোন্দুর'-এ কিশোর উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ তিন ভূমির এক্ষ-

ষই একত্রিত হয়েছে। আশা দেবী আশারূপী মটিয়ে দিয়েছেন পুরোপুরি। অবশ্য আশা দেবীর রচনাশৈলী এ-গল্পরসী আমাদের প্রত্যাশিত। তিনি একাধিক বিষয়ে তাঁর সৃষ্টির সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে-ছেন ও প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। কিন্তু 'বাল্টার পর রোন্দুর', (যাকে আমি বলব), 'থরার পর সৃষ্টির' গল্পে তিনি যে সমরোপযোগী প্রশ্ন তুলে ধরে তার একটি সুন্দর সমাধানে উপনীত হয়েছেন, আলোচ্য রচনার কৃতিত্বও বোধহয় সেইখানেই চূড়ান্ত।

যে শব্দর সোনার চামচ মুখে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, মাতৃহীন যে শব্দরকে নিঃসন্তান পিসিমা আদরে আদরে আবৃত, আশ্রয় এবং পার্শ্ববন্ধ করে তুলেছিলেন, ইন্দ্রজিৎ রায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-স্বত্ব সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকার লাভ করেও জীবনের গঠনমূলক সময়টিকে হেলায় হারিয়ে বসল। শৈশবের স্বাভাবিক প্রবণতা সাময়িক আনন্দ আহরণে মগ্নতা। অবশ্য পিসিমার অনিন্দ্যকারী স্নেহের আতিশয্য থেকে পিতা ইন্দ্রজিৎ শব্দরকে রক্ষা করতে পারেন নি। ধনীরা দুলাল চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার বেদনায় কাতর হয়ে ইন্দ্রজিৎ দেহ রাখলেন, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লন্ডনকে মানুষ করে তুলতে না-পারার অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন, একটি উইল করে। সেই নির্বাক উইল সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করল দুর্ভাগিনী শব্দর এবং অপরিণামদর্শী স্নেহের অধিকারিণী পিসিমাকে। প্রাসাদ থেকে শব্দরের হাত ধরে পিসিমাকে এসে উঠতে হ'ল বসতিতে। শব্দর হ'ল দুঃখের দাহনে জীবনকে মৃণালমুখি প্রত্যক্ষ করার শিক্ষা। পারিপার্শ্বিকের নির্যাতন আর নিদারুণ অপমান শব্দরকে কেমনভাবে মানুষ করে তুলল সাবলীল কাহিনী বিন্যাসের স্মারক অতঃপর আশা দেবী সেই মানুষ গড়ার কারখানাকেই তুলে ধরলেন ছবির মতো। মহান দুঃখের সংস্পর্শে এসে মানুষ হ'ল শব্দর। বাস্তব জীবনের সম্মুখীন এসে পিসিমারও কম শিক্ষা হ'ল না। তিনিও যেন নবজীবন লাভ করলেন।

গল্পের চরিত্রকে মনে হতে পারে এ সেই মামুলী নীতিশিক্ষার বর্ণপরিচয়। কিন্তু গল্পের গতিধারায় কখনো তা মনে করার অবসর রাখেন নি লেখিকা। 'বাল্টার পর রোন্দুর' শেষ-রোয়ের অপূর্ণ কাহিনী হয়ে উঠেছে। নিষ্ফল

থরাপীড়িত জীবনে সম্মুখীন এনেছে নতুন ফসলের সমারোহ।

এ গ্রন্থ সমরোপযোগী। আজকের শহুরে আবহাওয়ায় কেন গ্রামাঞ্চলেও কৃষিকার বিশৃঙ্খলা ঘাটি গেড়েছে। কিশোরমনে শব্দরের মতই সময়ের অপব্যবহারের নেশা। অল্প অধিভাবকের প্রভয়ে তারই বিষয় পরিণতি আমাদের চোখের সামনে আগাহার মতো ছেয়ে আছে। এ গ্রন্থ তাই অধিভাবক পাঠ্যও বটে। আজকের কিশোর সমস্যাকে গল্প-ছলে তুলে ধরে তার সমাধানের পথটিও মনোরমভাবে গল্পে গেঁথে দিয়েছেন আশা দেবী।

সত্যজিৎ রায়ের সন্দেশ পত্রিকায় এ রচনার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই রচনাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রচনাটি গ্রন্থাকারে সবার হাতে তুলে দিয়ে গ্রন্থের প্রকাশকও সেজন্য একই সঙ্গে ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। পাইকার ছাপা, বোর্ড বাঁধাই ছয় ফর্মার এ বই-এর দামও সস্তা।

স্বরবর্ণ—সম্পাদক : সময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮।১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭। দাম : এক টাকা (প্রতি সংখ্যা)।

ভালো পত্রিকায় নিরমিত প্রকাশ সম্ভব না হলে, তা অনেক সময় পাঠকদের আগ্রহকে প্রবলভাবে আঘাত দেয়। 'স্বরবর্ণ' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবু মনে হোল, সম্পাদক মহাশয় পত্রিকাটিকে নিরমিত করার জন্যে এখন থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বলা বাহুল্য 'স্বরবর্ণ'-এ যে ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা পাঠকদের নতুন করে ভাবতে শেখাবে। সেই কারণে আশা করবো, বলিষ্ঠ চিন্তার সপক্ষে যারা কথা বলেন, তাঁরা 'স্বরবর্ণ'-এর প্রবন্ধগুলি পড়বেন। এতে আছে সি. আই. এ. ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ, দিকে দিকে ভিয়েতনামের (বহুল তথ্য-সমৃদ্ধ) বিষয়ক প্রবন্ধ। লিখেছেন যথাক্রমে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শরদিন্দু-কুমার ঘোষ ও মিত্রেন। সংগীত, চলচ্চিত্র-নাট্য, প্রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও নাট্য আলোচনা পত্রিকাটির পক্ষে মর্বাদ-সূচক রচনা। গল্প, কাব্য ও অনুবাদ গল্পেও জীবনের বাস্তবরূপেরই পরিচয় পাওয়া গেল।

আমিথাকো একা শ্রমিক

আনন্দ টাই

কামরা থেকে কলকাতা

আমার যে কি নিদারুণ অসহায় অবস্থা
তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না! সন্ধ্যা
একটি পরস্রাও নেই। বন্দীদের বিশেষ
অনুরোধে বাসের কন্ডাক্টর দয়াপরবশ হয়ে
স্প্রিংডাঙা বাসটিতে এই কালা ও বোবা
হাতীটিকে কুমিল্লা পর্যন্ত নিয়ে যেতে
স্বাক্ষর করেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই
কুমিল্লা পৌঁছবে। প্রায় বিশ মাইল পথ-
চলার শেষে বাস কন্ডাক্টর যদি আমার
কাছে ভাড়া চাষ তখন আমি কি করে বাস-
ভাড়া না দিয়ে পার পাবো! যদি ভাড়া
না দিই তবে কি আর করবে তারা—এই-
রূপ ভাবা খুবই সহজ—আমিও ভাড়া না
দিয়েই বাস থেকে অন্যায়সে নেমে পড়তে
পারতাম—যদি নাকি শহুর উদ্যত কুপাণ
আমাব মস্তক লক্ষ্য করে সুযোগের
প্রতীক্ষার না থাকতো! বর্তমান পরি-
স্থিতিতে বাস কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভারের
সঙ্গে ঝগড়া করার ঝুঁকি নেওয়া আমার
পক্ষে কোনমতেই উচিত নয়। তাই
সমস্যাটি ভেবে ভেবে আমার বৃকের
ভেতরটা ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে। আপাতত
সমস্যা যত কঠিনই হোক না কেন—
পরীক্ষার আগেই পরাজয় স্বীকার না
করলে সমাধানের একটা-না-একটা উপায়
নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাস যতই কুমিল্লা টাউনের দিকে
এগোতে লাগলো—মনে মনে ভেবে স্থির
করলাম—কালা বোবার পাট করা আর
চলবে না—এবারে আমার মূখ খুলতেই
হবে। একেবারে বোবা একটি লোক হঠাৎ
কথা বলা শুরু করলে অন্যদের ওপর তার
প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটাও ভাববার কথা।
আই হোক আর চুপ করে থাকার সময়
নেই—তাই অনেক কণ্ঠে বেন বলছি সেই
রকম ভান করে আধো আধো ভাঙা ভাঙা
ভাবে কখনও একটি অক্ষর কখনও বা
একটি শব্দ অস্পষ্ট উচ্চারণে বলে বলে
ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরকে বোঝালাম—ধর্ম-

সাগর, কামিনীবাড়, কামিনীবাড়ের বাড়িতে
বেন আমাকে তারা দয়া করে পৌঁছে দেয়—
আমি রাস্তাঘাট বাড়িঘর কিছুই চিনি
না। সেখানে গিয়ে আমি তাদের বাসভাড়া
ও পারিশ্রমিক দেবো। কথাগুলি অবশ্য
খুব ভয়ে ভয়েই বলছি—পাছে তারা
আমাকে পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে—
যদি বলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তাদের
নয় আবার এ ভয়ও ছিল, যদি সন্দেহ
করে সোজা থানায় নিয়ে যায়! স্বাভাবিক
অবস্থায় এই সমস্ত চিন্তার বিষয়ই নয়
—কিন্তু আমাকে নিয়ে কোন বিস্রাম ঘটুক
তা সবতোভাবেই অব্যবহার্য। তাই এত
সাবধানে ও সস্তর্পণে ভেবে ভেবে পা
ফেলতে হচ্ছে। সুদীর্ঘ বাহ্যিকভাবে সামান্য
ভুলের জন্য যদি বিপর্যয় ঘটে যায়—
তবে তার চাইতে মর্মান্তিক আর কি হতে
পারে! শেষ মুহূর্তের ক্রয় পরাজয়ের
উৎকণ্ঠা—ঘাটে ভেড়ার আগেই নৌকা যদি
ডোবে!

কিন্তু পরে দেখা গেল ভুল আমার
হয় নি। বোবা লোক হঠাৎ কথা বলতে
শুরু করে দিল, অতি দীনবেশধারী
নাম পরিচয়হীন একটা লোক—তাকে
কুমিল্লার সুবিখ্যাত আইনজীবী কামিনী-
বাড়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে বলল, সে
বাড়িতে আমার মত একজন অতি সাধারণ
ব্যবসার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?
কামিনীবাড়েরই বা আমার সঙ্গে কি
সম্পর্ক? যে সেখানে নিয়ে গেলেই তারা
আমার বাসের ভাড়া ও পথপ্রদর্শকের
পারিশ্রমিক দেবেন? বাসচালকেরা দু-
জনেই মুসলমান ভদ্রলোক। দু'জনেরই
বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে হবে। কামিনীবাড়ের
বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব শুনে তারা
কোন প্রতিবাদ তো জানালেনই না—এমন
কি সামান্য একটি প্রশ্নও করলেন না।
তাদের কথায় জানতে পেরেছিলাম যে
কামিনীবাড়ের বাড়ি বাস স্ট্যান্ডের খুবই
নিকটে—মাত্র ৮।১০ মিনিটের পথ।

আমার হাতে মাল্লার কোন নথীপত্র

নেই—কাজেই প্রসিদ্ধ উকিল কামিনী-
বাড়ের বাড়ি আমার যাওয়ার প্রয়োজন যে
মামলার পরামর্শের জন্য নয় তা সহজেই
অনুমোদন। আমার নশন পা, দীনবেশ-
চেহারাতেও বিন্দুমাত্র আভিজাত্যের ছাপ
নেই—তাই অতবড় খ্যাতিমান আইন-
ব্যবসায়ী—কুমিল্লা শহরে বীর প্রকাণ্ড
বাড়ি, গাড়ি ও প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁর সঙ্গে
আমার যে কোন আত্মীয়তা থাকা সম্ভব
তা-ও ভাবা কঠিন। আমাকে কংগ্রেসের
ডল্যান্টার বলে হয়ত অনুমান করা যেত
কিন্তু আমার পরনে নেই ঝুন্দর, মাথায়
নেই গান্ধীটুপি! কামিনীবাড়ের বাড়িতে
সকলেই নির্ভেজাল ঝুন্দর ব্যবহার কর-
তেন। কংগ্রেস আন্দোলনে কুমিল্লার তাঁদের
অবদান সকলের সুবিদিত। আমার সংগী
মুসলমান বাসচালক দু'জনও কামিনী-
বাড় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সকল তথ্যই অবগত
ছিলেন। কাজেই মনে হয় বাসচালক
দু'জন বৃদ্ধকে প্রেরণা—এ আমার
ছদ্মবেশ, না হ'লে কামিনীবাড়ের পরি-
বারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোন
সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার
ছদ্মবেশ ও অভিনয় যদি তারা বুকেই
ফেলে থাকেন তবুও আমার তাতে কোন
ক্ষতি হয় নি। তারা হয়ত অনুমান করে
ছিলেন আমি একজন বিপ্লবী পলাতক—
কারণ চট্টগ্রাম খুব-বিদ্রোহের প্রায় নয় দশ
দিন পরে বাংলার ছোট বড় সব শহরে
সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বহুবিধ রঙীন
আলোচনা হোত। তাই মনে হয় বাস-
চালকেরাও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আলো-
চনায় উদাসীন ছিলেন না। আমার প্রস্তাব
শুনে তারা আমাকে সোজা পুলিশের
কাছে না নিয়ে কামিনীবাড়ের বাড়িতেই
নিয়ে গেলেন।

কুমিল্লা ছোট একটি শহর। এই শহরে
আমার বাবার মামার বাড়ি। খুব ছোট-
বেলায় দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি।
এই কুমিল্লা শহরে নরসিংজীর আখড়ায়
অতি অল্প বয়সে আমার ও আমার দাদার

পিতে হয়েছে। অতঃপর হেলেনের কথা কিছুই প্রায় মনে নেই। রাস্তাঘাট কোনটাই চিনি না। ধর্মসাগর একটা খুব বড় দীঘি। মীথিটির চারিদিকের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কান্দিরপাড় পাড়াটি ধর্মসাগরের কাছাকাছি। কামিনীবাবুর বাড়ি কান্দিরপাড়ে তা আমার জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে আগে কোনদিনই আমার যাওয়ার সুযোগ হয় নি—আজই প্রথম তাঁদের বাড়ি যাবো—কি রকম অভ্যর্থনা পাবো তা ভেবে উঠতে পারছিলাম না। এতবড় প্রতিষ্ঠাবান ও ধনী পরিবার কি আমাকে নিম্ন বাড়িতে স্থান দেবেন? আমাকে আশ্রয় দিয়ে বৃটিশ রাজশক্তির নিষ্ঠুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে কি তারা প্রস্তুত? অহিংসা ধর্মের পবিত্রতা সশস্ত্র বিরোধীর সম্পর্কে কি ক্ষম্য হবে না? সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে কামিনীবাবুর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলাম—বোধ হয় কালিং-বেল বাজিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। বাইরে এলেন ননীদা। এ রকম অপপ্রত্যাশিতভাবে দীন মালিনবেশে আমাকে তাঁদের বাড়ির দরজায় দেখে ননীদা প্রথমে চমকে উঠলেন। ননীদার প্রত্যুৎপন্নাত্মক পরিচয় পেলাম। একটিও কথা না বলে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমাদের দু'জনকে ভেতরে ডেকে নিলেন। আমার বেশকিছু ও সঙ্গী মুসলমান বাসচালককে দেখে ননীদা মহুতই বুকে নিরোইলেন যে ব্যাপারখানা বেশ জটিল। ইতিমধ্যে যদি তিনি ১৮ই তারিখে চট্টগ্রাম দখল, ২২শে জালালাবাদ যুদ্ধ ও সেই রাত্রির ফেণী স্টেশনের সংবাদ না রাখতেন তবে ২৭শে তারিখে আমাদের দেখে ব্যাপার বুঝতে তাঁর হয়তো দৌর হতো।

বাসচালককে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াতে বলে আমাকে সোজা বাড়ির অভ্যন্তরস্থলে নিয়ে গেলেন। ঠিক মনে নেই তিনতলায় বা দোতলায় ছোট একটি চোরকুঠরীতে আমায় বসিয়ে রেখেই বাসচালককে বিদায় করতে ছুটে গেলেন। বাসচালক খুব সন্তুষ্টচিত্তেই বিদায় নিয়েছিলেন।

স্বগত কামিনীবাবু ও আমার বাবা সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল তার তুলনা বহু আত্মীয়দের মধ্যেও বিরল। ননীদা (শ্রীসরোজকুমার দত্ত) Bengal Immunity কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার—কামিনীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বছর দুই আগে ননীদা যাবদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। সেদিন তাঁকে আমি বাড়িতে পাবো আশা করি নি। ননীদা সব সময়ে খন্দর পরতেন। চট্টগ্রামে

আমাদের বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসতেন। তাঁর বন্দুকের ও রিভলভারের নিশানা ছিল অব্যর্থ। উদ্ভূত পাখীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি গুলী ছুড়তেন এবং সেই পাখী গুলীবোঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তিনি আবার তাকে চলন্ত মোটর গাড়ি থেকে লুফেও নিতেন। ননীদার লাইসেন্স করানো বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি ব্যবহার করার আমার বহু সুযোগ ছিল—। মনে মনে খুব ইচ্ছেও ছিল যে ননীদাকে বিপ্লবীদলে যোগ দিতে বলব; কিন্তু বিজ্ঞ জেলার ও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাস—তাই তাঁর কাছে ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করবার বিশেষ সুযোগ পাই নি।

আমার মনে হল ননীদা আমাকে দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছেন—সশস্ত্র যুদ্ধ-বিরোধের বহিঃশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়া যেন একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং তা বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত ঘটেছে বলে তিনি যেন সশস্ত্র বিপ্লবকে স্বাগত জানাচ্ছেন। গান্ধীজীর অহিংস ভাবধারার প্রভাব এই পরিবারকে যতখানি না স্পর্শ করেছে তার চাইতে সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তার গতিপ্রবাহ এঁদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল। সেইরূপ একটি ধারণার বশবর্তী হয়েই এই বাড়িতে সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হতে আমি সাহসী হয়েছিলাম।

সুরেনের মত একজন সাধারণ লোক আমাকে আশ্রয় দিয়েছে জানতে পারলে বৃটিশ রাজপুরুষেরা তাকে একেবারে নিষেধিত করত সত্য কিন্তু বাংলার ও কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা কামিনীবাবুর মত ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও আড়ালে থেকে বিপ্লবীদের সমর্থন করছেন সাহায্য ও আশ্রয় দিচ্ছেন এই সংবাদ জানতে পারলে তারা আরও অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিশোধ নিত।

দাদা, দিদি ও আমি ননীদার মা-বাবাকে কাকাবাবু ও কাকীমা বলে ডাকতাম। ননীদা, অজিতদা (শ্রীঅজিতকুমার দত্ত) ও তাঁদের সব ভাইরা আমার বাবা-মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন ও মাসিমা মোসামমশাই বলে ডাকতেন। শব্দ আমাদের দুই পরিবারের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর নির্ভর করেই যে আমি কামিনীবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিতে সাহসী হয়েছিলাম তা নয়, আমার সাহসের কারণ এই পরিবারটির গভীর স্বদেশপ্রেম। আমরা জ্ঞানি কত ছসড়া ছাড়া বিপ্লবী যুবককে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়তে হয়েছে—তাদের বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে—এমন কি পিতামাতা-ও পুত্রিশের নিগ্রহের ভয়ে আপন পুত্রকে গৃহ হতে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই একবারও যদি মনে

করি আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বর্তমান ছিল বড় কাকাবাবুর (কামিনীবাবুর) বাড়ি, আমার আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল তবে তাঁদের গভীর স্বদেশপ্রেমকে, বাংলা বিপ্লবীদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাকে বিকৃত করে দেখা হবে—স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অপরিণীত অবদানকে অবমাননা করা হবে! একবার গভীর অন্তরে অনুভব করলেই হৃদয়গম্য করা সম্ভব—কতখানি জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম থাকলে পরে আমার মত একজনকে আশ্রয় দিয়ে ও বিভিন্ন সাহায্য করে তাঁরা বিপদ ও নিষ্পেষণের সম্মুখীন হতে ভয় পান নি?

মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির শাখা তাদের বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, সংগঠন ও সীমিত সাফল্যের জন্য কামিনীবাবু বসন্ত মজুমদার, শরৎবাবু (শরৎচন্দ্র বোস), ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত (Bengal Immunity-র মালিক) প্রমুখ দেশবরেণ্যদের নিকট হতে বহু সাহায্য পেয়েছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমরা এইসব সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলাম বলেই সফলতার সপেই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পেরেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ও বৈপ্লবিক সমর্থনের ইতিহাস যতখানি মূল্যবান—এঁদের মত সম্মুখশালী খ্যাতিনামা ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক অবদানের মূল্যও ঠিক ততখানি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সর্বহারা বিপ্লবের সাধক রূপায়ণে সাধারণ মানুষের সপে অভিজাত ঘরের সন্তান ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর অবদানকেও সমান মূল্যবান বলে মনে করা হয়ে থাকে। Analogy-র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, এভাবে তুলনা করাটাও হয়তো সকলের কাছে সমীচীন বলে বোধ হবে না, ভবুও পাঠকজন আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারবেন বলেই আশা করি।

বাসচালককে বিদায় করে ননীদা এসে আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন। আমরা চারজন কিভাবে দৃষ্টি অবস্থায় হিমাংশুকে নিয়ে প্রধান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং ফেণীতে পুনর্লব্ধ বৈশ্বনী ভেদ করে পালাবার সমর আমরা চারজনও আবার যে দলভ্রষ্ট হয়ে পড়ি তার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলাম। তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোন অশ্রুশয় ছাড়াই গত পাঁচদিন আমি কুমিল্লা ও বিলোনিয়ার পথে পথে আত্মগোপন করে আছি তা বললাম। আমার সঙ্গে কোন রিভলভার পিস্তল নেই জেনে ননীদা খুব বিচলিত হয়েছিলেন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রির পর থেকে ২৭শে পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র

সাপ্তাহিক বসন্ত

দেখতে পাই নি—আমাদের কোন খবরই জানি না। ননীদা আমাকে সব খবর দিলেন। ফেব্রুয়ারি ঘটনার পর কেউ ধরা পড়ে নি। ফেব্রুয়ারি স্টেশনে পুলিশ কর্ম-চারীদের আক্রমণ ও গুরুতরভাবে আহত কবার ব্যাপারে আততায়ীদের গ্রেপ্তারের জন্য নোয়াখালির জেলা শাসক প্রত্যেকের মাথাপিছু এক হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। জালালাবাদে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। বিপ্লবীদের দশ-বারোজন মারা গেছে। আর শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে জোর গজব শোনা যাচ্ছে। ননীদা বললেন স্টেশন কর্মচারীদের কাছ থেকে শুনতে পেরে-ছেন—গভীর রাতে আহত ও মৃত সৈন্য বোঝাই দু'খানা ট্রেন কুমিল্লা স্টেশন অতিক্রম করেছে। ননীদা আরো বললেন—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, গণেশ ও আমাকে বন্দী করতে সাহায্য করতে পারলে প্রত্যেকের জন্য জেলা শাসক পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কার দান করবেন। তখনও আমাদের মধ্যে কেউ ধবা পড়ে নি দেখা যাচ্ছে। খবর কিছই পাওয়া যাচ্ছে না বললেই হয়। কেবলমাত্র Statesman সংক্ষিপ্ত censored খবর যা দেখ তা থেকে অর্থ বার করে বোমা ছাড়া উপায় ছিল না। তবু দর্শাদিন পরে আমাদের মোটামুটি সব খবর ননীদার কাছেই প্রথম পেলাম। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা প্রাথমিক তথ্য বিনিময় করলাম। আমার স্নানের ও কাপড়-চোপড়ের সব ব্যবস্থা হোল। স্নান সেরে পার্শ্বকার জামা-কাপড় পরে ভ্রলোক সাজলাম। কাকীমা ধালাহাতে আমব জন্য খবার নিয়ে এলেন। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় দু'হাত রেখে অশীর্বাদ করলেন। অজ্ঞপ্র আবেগ উৎকণ্ঠা স্নেহ গমতায় তার সমস্ত অন্তর উদ্বেলিত! আমার কি হবে। আমাব বাবা মা, দাদা বোঁদি, দিদি তাঁরা কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন? মাস্টারদা ও অন্যান্য ছেলেবা এখন কোথায়? তাদের কি হবে? আমি সারাজীবন বেমন হবে আত্মগোপন করে থাকতে পারবো? আমাকে তিনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? কেমন হবে নিরাপদে রাখবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি কত চিন্তা কত উদ্বেগ সোঁদিন তাঁর প্রতিটি কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর সেই-দিনকার সেই উদ্বেগাকুল মুক্তি এই দীর্ঘ-কাল পরেও চোখে সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে বসেছে! আমি কাকীমাকে যথাব্যস্ত উত্তর দিয়েছি—কখনও ভুল দিইনি, কখনও গীতা উদ্ধৃত করে বলেছি আমরা কৃতকর্মের জন্য ফলের আশা করি না, কখনও বুঝিয়েছি—দেশের জন্য আমাদের মৃত্যুপণ তা ভুলে চলে না—আর মা মাসব এত অশীর্বাদ এত শৃঙ্খলানা

কখনও ব্যর্থ হতে পারে না—তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন—এই কথা বার বার বলে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি।

এই চোরকুঠুরীতে ননীদা ও কাকীমা ছাড়া সাময়িকভাবে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁদের সাহচর্যে এই ঘরে আমি প্রায় রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ছিলাম।

আমি এখানে আসার ঘণ্টা দেড় দুইয়ের মধ্যে কাকাবাবু কোর্ট থেকে ফিরেছেন। কাকাবাবুর সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয় নি। কোন কাজে বা মামলা উপলক্ষে চট্টগ্রাম গেলে তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে আমার খুব সামান্য কথাই হয়েছে। কথা স্বভাবতই তিনি কম বলতেন—খুব রাশভারী লোক ছিলেন। লম্বা-চওড়া ফর্সা চেহারা কণ্ঠে ভারী আওয়াজ—এক কথায় খুব ব্যক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এ বাড়িতে আজ আমার ষেরূপ সমাদর হয়েছে এবং তা যে দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে তারই মাধ্যমে কাকাবাবুর বর্তমান চিত্র আমি মানসপটে এঁকে নিয়েছি। তাঁর সাহায্য সমর্থন ও আন্তরিকতা থেকে যে বাণ্ডিত হব না তা জানাই আছে। এখন প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা এবং কলকাতা পৌঁছবার একটি নিরাপদ পথ ও উপায় উদ্ভাবন করা।

ননীদা ইতিমধ্যে একবার বলে গেছেন—আমার আসাব খবর কাকাবাবু পেয়েছেন। লোকজনদের সবাইকে বিদায় দিবে তিনি রাতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাত প্রায় দশটার সময় ননীদা আমাকে কাকাবাবুর চেম্বারে নিয়ে গেলেন। ঘরে কাকাবাবু ও আরো দু'জন ভ্রলোক বসে আছেন। বসন্ত মজুমদার ও মৌলভী মক্লেস্বর রহমান—ইনি কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী। বসন্তবাবুর (এঁকেও কাকাবাবু বলে ডাকতাম) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না—তবে তিনিও বোধ হয় আমাব বাবার সহপাঠী বা দু'এক বছর আগে-পরে পাশ করেছেন। বসন্তবাবু কুমিল্লার প্রসিদ্ধ জমিদার। বিপ্লবী দলে ছিলেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। আমি ঘরে ঢুকতে তিনজনেই আমাকে বুক জড়িয়ে ধরলেন। তাঁদের অসামান্য ব্যক্তিগত কাছে আমার নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। বোধ হয় মনের অন্তবালে ছিল—আমার পিতাব সমতুল্য কাকাবাবু ও বসন্তকাকা (বসন্ত মজুমদার) যে বিপ্লবী হৃদয়ের আবেগে আমাকে স্নেহ-ভরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তার কাছে আমি অতি নগণ্য। আর মৌলভী মক্লেস্বর রহমানকে যদিও আমি এই প্রথম দেখাছি

তবু যে পরিবেশে কাকাবাবু ও বসন্তবাবুর পাশে দেখলাম তাতে আমার বুকে নিতে একটুও দৌঁর হয় নি তিনি কে! তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে এল। আমার বসবার জন্য একটি সোফা খালি ছিল—আমি সোফায় না বসে কাকাবাবুর সোফা ঘেঁষে তাঁর পাখের কাছে কার্পেটের উপর বসে পড়লাম।

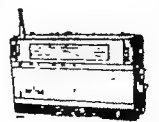
আমার সঙ্গে তাঁদের কথাবাতা হোল। বসন্তকাকা খুব উৎসাহী। আক্রমণ যুদ্ধ ইত্যাদি কেমন হোল, ইংরেজদের ক্ষতি কত পরিমাণ হোল ও তাদের prestige কত-খানি গেল তা নিয়ে ষড়্ঘণ্ট আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা সেই ঘরে ছিলাম। সেইখানেই—২৭শে তাবখ রাতে আমার পরবর্তী কর্মসূচীর প্রায় হয়ে গেল।

আমি মৌলভী মক্লেস্বর রহমানের সঙ্গে ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ পর্যন্ত কংগ্রেস অফিসে থাকব। তারপর যে মাসের প্রথম তারিখে ভোরে মোটবযোগে দাউদকান্দি যাব। মৌলভী এবাদুল্লা (ইনিও একজন কংগ্রেসকর্মী) কলকাতা পৌঁছনো পর্যন্ত আমাব সঙ্গে থাকবেন। নদীপথে নৌকা, ফেরী স্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে নারায়ণগঞ্জ যাব। তারপর বাহা-দুরাবাদ ফুলছাড়ি ঘুরে কলকাতা পৌঁছব এবং কলকাতায় শ্যামবাজারে কাকাবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর নবেন দত্তের বাড়িতে গিয়ে উঠব। সেখানে গিয়ে নবেন কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করব—আব কলকাতায় আমি হরুণ নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

তাব পরদিন আমি মৌলভী মক্লেস্বর রহমানের সঙ্গে চলে গেলাম। তিনদিন তাঁর সঙ্গে কাটল। এক সঙ্গে খেয়েছি, এক বিছানায় ঘুমিয়েছি—সারাটা সময় তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনার কাটিয়েছি—কত কথা—কথা যেন আর ফুরোয় না—সশস্ত্র বিপ্লবের কত রঙীন চিন্তা, কত পরিকল্পনা দু'জনে মিলে করেছি। সময় তো কাটাতে হবে—বাজে কথায় সময়

ট্রানজিস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের
জগৎ বিখ্যাত ও ব্যাণ্ড
অল ওয়াল্ড পোর্টেবল
ট্রানজিস্টার “উইন্ড-
সোর-হিটাচী” মাসিক
২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।
আবেদন করুন।



Swiss Television Co.
(BW-55) P.O. Box 1320,
Delhi-6.

কাজলো বিপ্লবী মনের subjective প্রস্তাবতে তাতে সাহায্য হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের আলোচনা সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হয়েছে কাজেই গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম ও সূভাষের সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদও আলোচিত হোল। অহিংসার কর্মসূচী কৌশল হিসেবে প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের কারও বিমত ছিল না। কিন্তু বিপ্লবী ভারত অহিংসা ধর্মকে যে অবাস্তব মনে করে এবং নীতি হিসেবে তা যে আমরা কখনই গ্রহণ করব না, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হোল। মোটকথা তিনদিন ও তিনটি রাতি মৌলভী সাহেবের সঙ্গে খুব ভালই কাটল। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও বেশ জটিল উঠেছিল। এই তিনদিনে মৌলভী এরাদুল্লাহর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমি যে অনন্ত সিং, সেকথা তাকে তখনও জানানো হয় নি। তাকে বলা হয়েছিল আমি চট্টগ্রাম যুব-বিপ্লবীদের একজন। পরে, বৌদিন আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় রওনা হলাম, সেদিন তিনি আমার সঠিক পরিচয় জেনেছেন।

১লা মে খুব ভোরে মোটরে বেরিয়ে পড়ব। তাই আগের দিন রাতে কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বসন্ত কাকাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথমে কাকীমার সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললাম—“কাকীমা, কল ভোরে যাচ্ছি। কলকাতায় নরেন কাকার কাছে যাব। পথে হয়ত কোন বিপদে পড়তে পারি, আর না হয় সেই বিপদ আমার অজ্ঞাতে অন্য কোথাও অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিপদসাগরে যে ভেসেছে তার এই সমস্ত বিপদকে ভয় ফুরাল চলবে কেন?” আমি সব কথা—মুঃ ‘ই খুব হেসে হেসে হাল্কা করে বলেছিলাম। তারপর আরও বলতে গিয়ে—“কিন্তু আমার অজ্ঞাতেই ভারী হয়ে গেল। বললাম—“আপনাদের সঙ্গে হয়ত আমার আব দেখা হবে না। জীবনের এমন সন্ধিক্ষেপে আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নেবার সুযোগ পাব ভাবি নি। এইটি আমার জীবনের সপ্তয় হয়ে থাকবে। ১৮ই এপ্রিল মায়ের আশিষ নিয়ে ইংরেজদের সৈন্যরাটি আক্রমণ করেছি; আব আজ আপনার পারের ধলো নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাচ্ছি। যদি আর ফিরে না-ও আসি, মার কাছে যদি আর কোনদিন যাওয়া না-ও হয়, আমার মাকে বলবেন আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এখানে এসেছিলাম।”

আমার কথা শুনে কোন মায়ের পক্ষেই হৃদয়বেগ সংবরণ করা সম্ভব নয়। কাকীমাও অভিভূত হলেন। অশ্রুবিগলিত

কণ্ঠে বহু আশীর্বাদ জানালেন—“আমার অন্তরের আশীর্বাদ নাও। তোমরা দীর্ঘ-জীবী হও। তোমার মাকে সব বলব। তাঁর আশীর্বাদই তোমাকে সব সময় সব-কিছু হতে রক্ষা করবে। কাকীমাকে জুলো না।”

কাকীমার কাছে বিদায় নিয়ে বৈঠক-খানা ঘরে ফিরে এলাম। কাকাবাবু ও বসন্ত কাকার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পথে যেসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আলোচনা হোল। মুসলমানের হুমবেশেই আমার যাবার ঠিক ছিল। লুপ্তি, কামিল, লাল ফেজ, ইত্যাদি ইতিমধ্যেই যোগাড় করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে মক্কেশ্বর রহমানের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ৩০ তারিখ রাতিও কাটলো মৌলভী সাহেবের সঙ্গে।

খুব ভোরে নন্দীদা প্রাইভেট মোটর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। গাড়ীটা একটু দূরে ছিল। শব্দ পেয়ে আমরা তিনজন—মৌলভী এরাদুল্লাহ, মৌলভী মক্কেশ্বর রহমান ও আমি, মুসলমান বেশে মোটরে উঠলাম। নন্দীদা-ও গাড়ীতে ছিলেন। গাড়ি ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে—একে-বারে শেষ মাথায় মেঘনার তীরে দাউদ-কাঁধ নৌকা-ঘাটে। কথা ছিল, আমাকে ও মৌলভী এরাদুল্লাহকে সেই নৌকা-ঘাটে নামিয়ে গাড়ি নন্দীদা ও মক্কেশ্বর রহমানকে নিয়ে তক্ষুণি কুমিল্লা ফিরে যাবে। প্রায় পাঁচশ মাইল পথ মোটরে এলাম। নন্দীদাকে নিয়ে গাড়ি ফিরে গেল, মৌলভী মক্কেশ্বর রহমান কিন্তু ফিরলেন না। তাঁর দায়িত্ব আমাকে নিবাপদে কলকাতা পৌঁছে দেওয়া। মৌলভী এরাদুল্লাহ সাহেবই এটি কাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তবু মক্কেশ্বর রহমান মনস্ত করলেন আমাদের জলপথে বৈদ্যবাজার পর্যন্ত এগিয়ে দিগে আসবেন। নৌকাতে আঁকা-বাঁকা পথে নদী ঘুরে, আমরা বৈদ্যবাজার এলাম। তখন বোধ হয় বেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটা হবে।

মনে হয় বৈদ্যবাজারে আমরা কিছু খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম। এখানে পৌঁছে আমরা মৌলভী মক্কেশ্বর রহমানের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাত্র এই চারদিনের জানাশোনা মৌলভী সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ যুগ ধরে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন, বিপ্লবী সাথী ছিলেন। তখন পর্যন্ত যদিও আমরা এক-সঙ্গে ইংবেজের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরি নি বা সেই সুযোগ আমাদের আসে নি, তবু ভবিষ্যতে বন্ধু-বিপদের একান্ত সাথী মৌলভী মক্কেশ্বর রহমানকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল হাতে আমাদের পাশে পাব না, তা ভাবতে পারছিলাম না। বন্ধুর আন্তরিক বিদায়

অভিবাগন জানালেন। আমি বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বললাম—“ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।” তিনি উদ্ভাসিত নয়নে সম্মতিসূচক অভিব্যক্তি-ভরা হাসিমুখে আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন তিনি সবদাই প্রস্তুত।

বৈদ্যবাজার থেকে হেঁটে প্রায় ছ’-সাত মাইল পথ অতিক্রম করে আমাদের একটা ফেরী-স্টীমার ঘাটে আসতে হোল। এই ঘাটটির নাম এখন মনে পড়ছে না। মনে হয় ফেরী-স্টীমারটি ফৌজুলা থেকে ছেড়ে এই ঘাটে থামে এবং এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল নদীপথে ওপারে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে পৌঁছয়। আমরা এই ফেরী-স্টীমার ঘাট থেকে দু’খানা নারায়ণগঞ্জের টিকেট কিনেছি। অপর পারে নারায়ণগঞ্জ দেখা যাচ্ছে। স্টীমারটির এককণ্ঠ এসে পৌঁছনো উচিত ছিল। এখন প্রায় পাঁচটা বেজেছে। নমাজের সময় আতিবাহিত হতে চলেছে। মৌলভী সাহেব নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘাট থেকে নদীতীরে দূরে সরে গেলেন। আমি “মুসলমান” হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আর তিনি একা নমাজ পড়বেন এটা খুবই অস্বাভাবিক। তাই একটু তফাতে থেকে নমাজ পড়লে, আমি যদি ভুল-ভাল করেও তাঁর সঙ্গে নিয়ম অনুসরণ করে নমাজ পড়বার চেষ্টা করি তবে অনুরোধ দূর থেকে তা বৃকতে পারবে না।

মেঘনা নদীতীরে ১লা মে, ১৯৩০ সালে আমিও নমাজ পড়বার অভিনয় করি। আমি কখনও কোন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার স্পর্শ রাখি না। যার যা ধর্ম, তা তার একান্তই নিজস্ব জিনিস—ধর্মের ওপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা বালা বরসেও আমি বুজে পাই নি। কত মুসলমান অভিনেতা-অভিনেত্রী থিয়েটার মন্ডির মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন, আবার কত হিন্দু আর্টিস্ট সিনেমার পর্দায় মসজিদে প্রার্থনা জানাবার অভিনয় করছেন। কাজেই সামান্য একজন যুবক বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রে বাস্তব স্টেজে প্রয়োজন বোধে যদি নমাজ পড়ার অভিনয় করে থাকে সেটা কখনও মৌলভী সাহেব বা মুসলমান ধর্মকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা করবার জন্য নয়।

স্টীমারটি বাঁশ বাজাতে বাজাতে প্রায় সাড়ে ছ’টার নোঙর ফেলল। নৌকা করে গিয়ে জাহাজে উঠতে হোল। জোঁটতে লাগিলে স্টীমার ভেড়াবার ব্যবস্থা নেই, কারণ, নদীর গভীরতা এখানে কম। স্টীমারে ওঠার পর যখন সেটি ছাড়ল, তখন প্রায় সাতটা বেজেছে। চল্লিশ পঁয়-তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জ পৌঁছবো। তারপর বাকি ব্যবস্থা হবে।

গাপ্তাহিক বঙ্গমতী

স্টীমারে এইটুকু পথ আঁতুঙ্গ করা যাবেই যে এমন ভীষণ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে তা'কে ভেবেছিল? শৌ' শৌ' শব্দে প্রবল বায়ু ছুটেছে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাটায় স্টীমারটি দোল খেতে লাগল। স্টীমার থেকে বিপদ-সঙ্কেত বেজে উঠল—বাঁশি একটানা সুরে সব যাত্রীকে হুঁশিয়ার করছে, নারায়ণগঞ্জের কর্তৃপক্ষকে বিপদ-বার্তা জানাচ্ছে। খালাসী ও কর্মচারীরা পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি শুরু করল। জাহাজের ওপরের ডেকের পাশে পাশে যেসব পর্দা খাটানো ছিল বাঁশি আটকাবার জন্য, সব নিমেষে খুলে ফেলা হোল। আমরা ওপরের ডেকে ছিলাম। তাই ওপরের দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখছি। প্রবল বায়ুবেগ কোনমতেই যেন পর্দা যথা না পায় সেজন্য সারেকদের হুকুম নিচেব ডেকের সব পর্দাও সবিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঁশির জলে যাত্রীরা সকলেই একেবারে ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন ভেজার প্রশ্ন বড় নয়, প্রাণ বাঁচাতে হবে—স্টীমার যেন না ডাবে।

খালাসীরা সব বায়ুকে স্টীমারে একে-বারে মাঝখানে এসে বসতে অনুগ্রোধ জানাচ্ছে, জোর করছে, টেনে আনছে। তাদের ভারী ভাবী জিনিসপত্র টেনে-হিঁচড়ে স্টীমারের কেন্দ্রস্থলে আনবার চেষ্টা করছে। চারিদিকেই হৈ-হুলা, চেচামেচি। এইসব ব্যবস্থা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হোল। ঝড়ের দ্রুত বর্ধমান বেগ ও তার গুরুত্ব বোঝা যাত্রীদের পক্ষে একটুও শক্ত ছিল না। স্টীমারটি গন্তব্যপথে এগোতে পারছে না। ঝড়ের ঝাটায় ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে এবড় স্টীমারটি একটা ছোট্ট নৌকার মত ভীষণভাবে সমানে দোল খাচ্ছে।

যাত্রীদের আতঙ্কের সীমা নেই। সে এক নিদারুণ অনিশ্চয়তা, ভয়, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের করুণ দৃশ্য। যাত্রীরা সকলেই চীৎকার করে হিরিনাম, কুকুনাম, কালী নাম জপছে। কয়েকজন মিলে হির-সংকীর্তনও শুরু করেছে। মুসলমান যাত্রীরা সমানে আল্লার নাম করছে। কোন কোন মহিলা যাত্রী চীৎকার করে কাঁদছে। ডেকে যে সব বালক-বালিকা ও বাচ্চা ছিল তাবাও এই ভয়াবহ ও ভীতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিশেহারা হয়ে তাবস্ববে চেঁচাচ্ছে।

স্টীমার আর একটুও এগোতে ভরসা পাচ্ছে না। আর মাত্র দু' একশ' গজ এগোতে পারলেই জেটিতে ভিড়তে পারে। কিন্তু তা' একেবারেই অসম্ভব। কোন মতে তাল রাখা যাচ্ছে না বলে সারেকুরা ড্যানক ভীত—এই বুঝি জেটিব সত্তেগ ভীষণ সংঘর্ষে স্টীমারটি চুরমার হয়! সেখানেই তারা নোঙর ফেলল—ডবল

নোঙর। কড় কড় করে শেকলের আওয়াজ হচ্ছে, যেন শেকল ছিঁড়ে প্রচণ্ড ঝড়ে গোটা স্টীমারটাই উড়ে যাবে। প্রতিটি মুহূর্তে গুরু-বিভীষিকার কাটিবেছে যাত্রীরা। সকলেই প্রাণটি হাতে নিয়ে বসে আছে।

মৌলভী এরাডুল্লা সাহেবের মানসিক অবস্থা আমি সঠিক জানতে পারি নি। তবে তাঁকে ভয়ে বিহ্বল হতে দেখি নি। এখন আমার নিজের কথা বললে মনে হবে খুব বড়াই করছি। কিন্তু যাহ মনে হোক জীবনে এত বড় একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন হোলই, তখন আমার নিজের মতস্তব্ধিটি একটু বলি। আগে “অগ্নিগর্ভ-চট্টগ্রামে” লিখেছি, নজরবন্দী অবস্থায় গোয়ালন্দে চলন্ত স্টীমার থেকে বাঁপ দিতে যাচ্ছিলাম; অন্তরীণ থাকাকালে গ্রামে বাঘ খুঁজে বেড়াইতাম—বাঘ মেরে আমিও “বাঘা যতীন” নাম কিনবো নলে। শারীরিক শক্তির সঠিক অনুমান না করেই বোধ হয় অসম্ভবকেও সম্ভব করবার ইচ্ছে হোত আমার। তাই সেই সময়েও ভাবছিলাম, স্টীমার যদি উল্টে যায়, ডুবে যায়, তবু আমি বাঁচবো—তীরে আমি উঠবই।

এরকম ভয়ঙ্কর ঝড় আমি আর দেখি নি। স্টীমারে বসে তখনও সম্যকরূপে বুঝতে পারি নি যে বাইরে কি ভাণ্ডব ঘটে গেল। প্রায় দেড়ঘণ্টা সেই দুর্ঘটনার

মধ্যে স্টীমার সেখানে বসেই বসেছিল। তাবপরে নাচ এতমত বুঝতে পারি নি ধ্বংস—এ পরিধা কতখানি। এর একদিন সব যাত্রীর কাগজ দেখে জানতে পারলাম প্রচণ্ড বড় বড় স্থান বিন্দস্ত হয়েছে। চাঁদপাল বড় নৌকা ডুববেই, জেটি মেঝে জিপ্ত জলে ভেসে গেছে। ছোট ছোট নৌকা উল্টে গেছে, সংঘর্ষে চুরমার হয়েছে। অনেক প্রাণহানি হয়েছে। সবচেয়ে বড় খবর, ছবি নিয়ে বর্ণনা দিয়েছি—প্রাণ চাক্ষুস্ত নদীতে চলাব মত পলায়ন স্টীমারের সাইডের একটি স্টীমার প্রচণ্ড ঝড়ে যেন পরিবোজা হয়ে নদীতে থেকে তুলে প্রায় মাইলখানেক দূর এল। চড়াব ওপর শূইয়ে দিয়েছে।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর হয় নি। অভিজ্ঞতাই বটে—তাই লিখলাম। যাত্রীদের আতঙ্কে যে দৃশ্য দেখছি, যে বাস্তবতা ও উদ্বেগ সন্দেহ ও খালাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করছি, তা মনে রাখবার মতই। সেদিনের বড় আমারদের স্টীমারটি কেন ডোব নি তব কোন কারণ আমি জানি না। সেদিন স্টীমার ডুবলে ডান অর্ধ হযতো অর্ধ দ সম্মতিচারণ নিবে পাঠবদের সামান উপস্থিত হতে পরতাম না।

[চলবে]

উখিত আফ্রিকা

অংগু দত্ত অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি কলেজ, ঘান্না

বহু বর্ষব্যাপী আফ্রিকাকে শোষণ করেছে বিদেশী রক্তচোষার দল। আফ্রিকার স্বার্থ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাব জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিদেশী এই মহান দেশকে খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে তাদের ইচ্ছে মত। এই শোষণের বিরুদ্ধে শত্রু হল জনজাগরণ। বহু নেতাব কণ্ঠে উচ্চারিত হল শত্রু হল আগোষাহীন গণসংগ্রাম। এবং আফ্রিকাবাসীর হাতে এল ভাঙনিস্তব্ধ-ধিকার। আফ্রিকা আজ আর ছায়াছন্ন নয়, তার দিগন্তে এখন নবসংঘর্ষে উদ্ভাস।

অধ্যাপক দত্ত এই বিশাল গ্রন্থে—আফ্রিকার জনগোষ্ঠী, সমাজ, সংস্কৃতি, দান ব্যবসায়; বিদেশী স্বার্থে আফ্রিকা বিভাজন, ইওবোপীয় ঔপনিবেশিক দাপন আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠন, প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন, মুক্তি-সংগ্রাম ও সমাজিক বদ্যান্তর; আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় মাধ্যমে আফ্রিকার এক সামগ্রিক রূপ উপাধন করেছেন।

বহু মানচিত্র, আর্টপ্রেট এবং ১৪১৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সংবলিত ॥

দাম : ১২.০০

আনন্দধারা প্রকাশন ॥ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২



স্বপ্নাজ্ঞান প্রদ্যোদ্যাত্রা ॥

বিদ্যা বাউলীর হস্তান্তর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পনেরো ॥

বিয়ান থেকে আজ টিপটিপানি বৃষ্টি আর মধ্যে মধ্যে দমকা বাতাস। হাওয়ার ঠেলায় ঘরের বাতা নড়ে খুঁটি নড়ে। দরমাব বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিয়ে জল চোয়ায়। উঠানে কাদা। পথে কাদা। মাঠে কাদা। কাদা কাদায় ভরে গেছে চারদিক। বৃষ্টিবরষাইরা গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টি পড়ছে পড়ছে। কামাই নাই। ধামন নাই। আকাশখান যেন বাক্সরা হইয়া গেছে।

দেহ ভার মন ভার। সগুগলের। শাইর হওন যায় না। হাটবাজারে বেচা-কেনা বন্ধ থাকে। দুটা চারটা চাবী ছেলে তিরতরকাবি মাছ যা নিয়ে আসে, তাতে কাড়কাড়ি পড়ে যাষ বাবুগো মধ্যে। সেখানে আউগায় সাধা কার। ঘরের মধ্যে বসে থাক। কুমড়াবটি আর ভাত খাও। আবার কান্ধা মর্দি দিয়া ঘুমাও।

কাউয়াগলান গাছের পাতার আড়ালে বসে বসে ভিজছে। ছোট ছোট ব্যাঙ লাফালাফি করছে ভিজ্জে ঘাস মাটিতে। কচুপাতার জল জমে জমে ফোটা ফোটা করে পড়ছে। কচুপাতা ভেজে না। আর ভেজে না পদ্মপাতা।

বিয়ানে ওঠা হোল না। উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। সন্ধ্যার সাক্ষাৎ নেই। তিনি এখন কন্দুর ওপরে উঠে বসেছেন কে জানে! উঠল কুমি। উঠে তাকাল চৌকির দিকে। মদন ঘুমোচ্ছে তখন। হাত পা ছাড়িয়ে অটাল মেয়ে।

থাকুক মদন। ঘুমোক। কুমি ঘরের সার্বসেতে ভিজ্জে মাটির মেজে ঝাঁটপাট দিল শব্দ। আজ আর গোবর ছড়া দিয়ে নিকান যাবে না। একেই ভিজ্জা। তার উপর আরও জলবলানি।

দেহখান জ্বালা-জ্বালা করছে কুমির। মাথার চাঁদিটা আর কান দুইটা দিয়া যেন আখার হলকা বেরয়। উননের আঁচের তাপ। জ্বালা-জ্বালা করছে। সেই রাস্তার তেঁস্তাটা এখনো যায় নি। এ তেঁস্তা আর যাওনের কাম নাই। ভোর বিয়ানে এখন জল খাওয়া চলবে না। চান না করে কিছুর করা যাবে না। বরাবরের অভ্যাস।

মাথায় এক খাবলা তেল দিয়ে, গায়ে হাতে একটু তেল বুলিয়ে গামছা নিয়ে চলল কুমি বকুলতলার দিকে। রোজই যায়। কোন কোনদিন দেখাও হয় খেপীর সাথে। খেপী দেখা হলেই ফিক করে হাসে।

কুমি হাসনের কোন জবাব দেয় না। ভারী নিতম্বে একটা জোয়ালো দোলা দিয়ে মূখখানা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে। কথা বলে না খেপীর সঙ্গে। কিন্তু কেন? কেন কে জানে। বোধ হয় খেপীর সামনে টানটান হয়ে দাঁড়াতে ওর ভয় লাগে। খেপীর চোখের ওপর চোখ রাখতে পারে না। কেমন যেন ভয়ও লাগে। রাগও হয়। এ যেন চোবের গৌসা গেরুপথর ওপর। তোর দ্রব্যটি নিয়োজ

বেশ করেছি। তাই বলে তুই আমার চোর ভাববি কেন?

মদনকে কুমি চুরিই করেছে। টালি-বালি দিয়া ঢাপসি-ঢপসী দিয়া নিন্দে এসেছে।

কিন্তু রাখতে পারল কই?

রাজার ঘরের রাজপুত্রের চুরি করে তাকে শেষে রক্ষা করা দার।

কাম নাই ও সগল ঘুপি-ঘাপিতে। কাল রাস্তার পরে আর কুমি মদনকে ধরে রাখতে চায় না। ধরে রাখা যাবে না ও জানে। তাই সেই বৃষ্টি চেষ্টা আর করতে চায় না।

বকুলতলার পুকুরের পাড় পিছল। টিপটিপানি বৃষ্টিতে কাদার।

পা টিপে টিপে নামে কুমি জলে। জলের উপর বুর বুর বালু বরার মত জল পড়ছে। গায়ে মাথায় জল লাগে। তবু উদ্‌লা গায়ে পুকুরে ডুব না দিলে যেন দেহ ঠান্ডা হয় না। পরাণ ঠান্ডা হয় না।

খুব করে অনেকগুলান ডুব দেয় কুমি। ডুব দিয়ে পুকুর পাড়ে উঠে আর গামছা চিপড়ানর দরকার নাই। কাপড় চিপড়ানর কাম নাই। যেতে যেতেই ভিজ্জে যাবে আবার।

আঁচল সাপটে নিয়ে পা বাড়াবে যেমন—অমন ভেসে এল আওয়াজ।

হোই গো খেপী আওয়াজ তুলেছে। ঘরে বসে আওয়াজ তুলেছে।

সাম্প্রতিক বসুমতী

জল গড়ে টাপসটপস
বক্ষে জ্বালাব আইল রে।
সুজন কান্ডারী তুমি কই গ্যালা রে।
কই গ্যালা রে সুজন কই গ্যালা রে—
সুজন কান্ডারী তুমি কই গ্যালা রে।

কুমির পা ধমকে গেল। চক্ষু দুইটা
ধর নিখর। বিরাবির বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে
যার ভিজতে লাগল কুমি।

ম্যাঘে ম্যাঘে জিলকানি দ্যায়,
তুফান ওঠে ভারী।
আর এ তুফানে কই গো সুজন
নাগের কান্ডারী।
কই গ্যালা রে সুজন, কই গ্যালা রে,
সুজন কান্ডারী তুমি কই গ্যালা রে।

বৃকের ভিতর কম্প দিল। চক্ষু
দুইটা বৃষ্টির জলে ভিজল, না চোখের
জলে? কুমি খাড়িয়ে বইল। বৃকের
কম্প ধামে না। বৃকের হাওয়ায় তুফান
তুলে দিয়েছে খেপী। শূন্য আকাশে
তুফানে উথাল-পাখাল।

ঘরে মানুষ রয়েছে। কিন্তু বক্ষে
মানুষ। বৃকের সুজন কোথায় কে
জানে।

মদনের বক্ষে কুমি বসান নাই। কুমির
বক্ষে মদন নাই। তাই নি এই উথাল-
পাখাল।

চক্ষু দুইটা লাল হয়ে গেছে। চান
করার পরে বৃষ্টির জলে চক্ষু লাল হইল
নি। কে জানে! ভারী ভারী গরম শ্বাস
পড়ে। আস্তে আস্তে এগোয় কুমি।
খেপীর ঘরের দিকে এগোয়। বকুলতলার
পিছল কাদার পথে পা টিপে টিপে
এগোব। ঘুরে এসে ওঠে খেপীর চালার
সামনে।

—খেপী আছস নি?

—কেডা

বিদ্যাধরী বেরিয়ে আসে বাইরে।
কুমিকে দেখে হাসে। টলটলে মৃদুখানা
একইবকম। হাসিতে ভবপূর। দৃষ্টি-
ভাবনা নাই। জ্বালা-স্বপ্ন নাই। খেপী
যেন এক স্রোতে ভাসে। স্রোতের আউগান-
পাউগান নাই। জ্বালা ভাইটাল নাই।

কুমিকে ভিলে কাপড়ে দেখে বলে
উঠল—এ কি লো! চান করবার আইছিলি
নি? ভিজ্য দেখি জ্বালা হইছস। আর
ভিতরে ভাষ।

—না। ভিতরে আর যাম্ না। ভিজ্য
কাপড়ে তব ঘরের মাইজ্যা পিছল হইব।

বিদ্যাধরী হাসে।

—তব সাথে দুই একখান কথা কওনের
আছিল।

—ক, কি কথা?

বিদ্যাধরী ঘরের দরজার খাঁপের

ভেতরে। কুমি খাঁপের বাইরে দাঁড়িয়ে ঠায়
ভিজছে। ভাল লাগল না বিদ্যাধরীর।
ও বলল,—আমার একখান শূকনা কাপড়
দিম্?

—দে। তয় দুই দন্ড বইসা যাই।

বিদ্যাধরী ঘর থেকে একখান শূকনো
কাপড় বার করে দিল। কুমি গামছায়
গা মাথা মুছে ভেতরে ঢুকে শূকনো
শাড়িখানা পরে ভিজ্ঞে শাড়িখানা খাঁপের
ধাবে রেখে দিল।

বিদ্যাধরী হাসে।—বিষ্টিবাদলের দিনে
চান করনের কি কাম আছিল?

কুমি শূকনো শাড়িটা পরে মেজের
চাটাইটার ওপর বসে,—মাথাডা নি জ্বইলা
যাইবার নিছিল। ভাবলাম, চান করলে
কইমা যাইব।

একটা কৈফিয়ৎ দিল কুমি।

চান কবতে আসার কৈফিয়ৎ। গাপটা
জ্বলে যাচ্ছিল কুমির।

বিদ্যাধরী ওর পাশে বসে ওর দিকে
বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায়। মাথা
জ্বলে যাচ্ছিল কেন? কি হোল কুমিব?
কুমিব মাথা তো সহজে জ্বলে না। ঠান্ডা
কালো পাথরের মত দেহটি। আরাসে
আরামে কুমি সব সময় ঠান্ডা। তার
আবার জ্বালা কিসের?

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল
বিদ্যাধরী।—কুমির মৃদুখানা আগের চেয়ে
শূকিয়ে গেছে। দেহ কিছু বোগা হয়েছে।
কি হয়েছে কুমির? কোন অসুস্থ করে
নি তো? কুমিকে যেন ওব কেমন কেমন
লাগে। দেখলে কেমন মায়ামায় লাগে।

কুমি কিন্তু বিদ্যাধরীর দিকে তাকাতে
পারছিল না। তাকিয়েছিল চাটাইয়ের
একটা ছেঁড়া জায়গায়। ওর তাকাতে
যেন কেমন একটা ডর-সঙ্কোচ লাগছিল।
কতদিন ও আসে নি খেপীর কাছে। কত-
দিন খেপীর ঘরে বসে নি। দুয়ারে বসে
নি। খেপীর আওয়াজ শুনে কান পাতে
নি। কেন যে আসে নি তা কুমি জানে।
কিন্তু জেনেও কোন, লাভ হোল না।
লোকসান বাড়ল।

চোখ তুলে কোন মতে একটা ঢৌক
গিলে বলল কুমি,—তব কালো মদন কোয়ানে
ছানস নি?

বিদ্যাধরী তাকায় ওর দিকে। এ যেন
কৌতুকের কথা। তামসার কথা। ফিক করে
হাসে। বলে,—জানি।

কুমি আস্তে আস্তে বলে,—জাইনা-
শুইনা নিজের পায়ে নিজের কুড়াল দিলি
কি কামে?

বিদ্যাধরী হাসে ফিক ফিক করে। ওর
যেন মজা লাগছে। আস্তে আস্তে বলে,
—নিজের পায়ে নিজের কুড়াল মারে
সগুগলেই। আমার কুড়াল নাই। মারণ-
ধরণের পথ নাই।

কুমি মুখটা নিচু করল। কথাখান
কুমির বৃকের ভেতর বিশ্বল। ও তদুর্ণিণ
কোন জ্বাব দিতে পারল না।

বিদ্যাধরী ওর হাঁটুতে একখানা হাত
রাখল।

কুমি সঙ্কুচিত হোল। তাকাল। লাল
বর্ণ চোখ দুটো ওব জলে ভরা। বৃকের
হাওয়া ঠেলে উঠেছে কপে। আওয়াজ
বেবোতে চাষ না গলা দিয়ে।

ধবা গলায় বললে,—জ্বইসা না
আমাবে। আমি নি পাপীতাপী মান্হ।
চোখদুটো দিয়ে টসটস করে জল
পড়ল কালো মসৃণ গালের ওপর।

বিদ্যাধরীর মস্ত চক্ষু দুইখান মাথায়
ভরে এল। নরম স্বরে ওর একখানা হাত
ধবে বললে বিদ্যাধরী,—কাদন আনে ক্যান
লো কুমি? কি অইল তর?

কুমির চোখ বেয়ে দরদর করে জল
নামে।

বিদ্যাধরী হাসল তবু।—বুজ্ছি।
উজানের হাওয়া উঠছে তর মনে। পাপ-
তাপ সগুগল উড়াইয়া লইয়া যাইব। দুই
মইয়া গ্যাছস্ কুমি। এমুন দইয়া
মরলি কবে?

হা, কুমি মরেছে। মদনের দরে
ডুবে মরতে বসেছে। উজানের হাওয়া
তাই বোধ হয় ওর বৃকে উথাল-পাখাল।
ঠিকই ধরেছে খেপী। ভিতরের খবর
খেপী সব জানতে পারে। বাইবেল খবরেন
সন্ধান লয় না। নেবার পবেজন
করে না। কুমি মরল কবে?

—হ' মইলাম। জ্বইলা-পুইড়া মইলান



গৌর মোহন দাস এও কোং

২০০, ৩০০ টীনা বাজার প্রসিডি

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

ফুল ফুটেছে অন্ধকারে

স্মরণ শর্মা

এখন আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই

শূন্যতায় নেই হাওয়ার উচ্চারণ...

বোবা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে কুৎসিত ভয়গুলো...

সংশয় নিবন্ধ-নিবন্ধ দুরন্তের কোনো আলো

পরাজিত উদ্যমের মত...

হিতর সময় খুঁটে থাকে বিশ্বাসের খুঁদ-খুঁড়ো প্রহরে প্রহরে...

পাথরে মাটিতে জমাট দানাগুলো ধূয়ে যাচ্ছে দূর্লভ ফাটলে ফাটলে...

প্রতিশ্রুতির শিকড়গুলো বেদিশা উল্ল বড়ের অন্ধ দাগটে শিথিল...

এই অন্ধকারে উদ্ভাস আমাকে

একা বসে বসে গান করতে বোলা না এখানে—

এখন আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই—

শূন্যতায় নেই হাওয়ার উচ্চারণ...

বরং সকলে এসো—

গতকাল যে-বৌদ্ধ বীজ বুন গেছে

শরবিন্দ চেতনার মাঠে—

অভিজ্ঞ বিবর্ণ ডানা মেলে

যে-পাখি হাওয়ার স্রোতে একে গেছে দিনের সংকেত—

সে-সব স্মরণ করি ;

বরং সকলে এসো—

সুন্দরের অন্ধকারে চোখ রাখো, চোখ রাখো আকাশের দিকে...

এখন আমরা একটি দিগন্তরেখা পার হতে চলেছি।

হঠাৎ চুইয়ে-পড়া দৃ-এক ফোটা জ্যোৎস্নায়

কিন্বা নিশিদ্ধ অন্ধকারে

হঠাৎ নক্ষত্রের দৃ-একটা ছিন্ন দিয়ে

নিশ্বাসের দ্রাস্তিকে কারেমী না কমে—

সমন্বিত সামঞ্জস্য বিধৃত করে মূহুর্ত মূল্যকে...

আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—

ফুল ফুটেছে অন্ধকারে!

তরু কাল মদনরে নিয়া।

ধরা ধরা গলায় বলল কুমি।

খুঁপ খুঁপ করে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি
জল। বিদ্যাধরী উঠে ঝাঁপের কাছে যেতেই
একটা কুকুর ভিজতে ভিজতে ঘরের ভেতর
চুকতে চাইল। খেপী তার দিকে তাকিয়ে
হেসে বলল,—আয় আয়, কুত্তাভাও ভিজ্যা
মইল। আয় ঘরে আয়।

কুকুরটা অসহায় চোখে বিদ্যাধরীর
দিকে তাকিয়ে লাজ নাড়িয়ে ঘরের ভেতর
চুকে গা ঝাড়া দিল।

—ইরে। গাও ঝাড়া দিস না।

গা ঝাড়া দিলে গা থেকে গুঁড়ো
গুঁড়ো বৃষ্টির জলের ছিটে আসে। কুকুরটা
এক কোণে গিয়ে বসল। বিদ্যাধরী
তাকাল বাইরে। ইরে বাইরে। অম্ববমানি
বৃষ্টিতে বাইরে কি সব আপসা। বকুল-
গাছটা যেন আনন্দে নৃত্য করতে করতে
স্নান করছে। ডালপালার কি নাচন।
মাঠে ডারহা হয়ে পড়ছে বৃষ্টির ধারা।
পুকুরের জল যেন ফুলে ফেঁপে উঠতে
চাইছে।

কাঁপ বন্ধ করল বিদ্যাধরী।

এসে বসল আবার কুমির কাছে।
সেখল কুমি চোখ মছে মৃদুখানা নিচু
করে হাঁটু মূড়ে বসে রয়েছে।

অল্প হেসে বলল খেপী—আইজ
আজ সাইয়ের নামে ঘুরনা দ্যাওয়া অইল
না।

কাব মানে ভিক্ষাও জুটবে না। ঘরে
তার সগুণ কিছুর থাকে কি না কে জানে।

কুমি বলল,—খাবি কি?

—কি কইর্যা কই?

—ভাঙারে নি কিছুর আছে?

বিদ্যাধরী কুকুরটার দিকে তাকিয়ে
আনন্দে বলল,—বুটকড়াই ভাজা আছে।

কুমির একবার ইচ্ছে হোল বলে,
আমার ঘরে চল। ডাইলে চাউলে ফুটাইয়া
লইয়া খামু অনে। কিন্তু না। বলে কোন
লাভ নেই। ও বিদ্যাধরী খাবে না।
জানে, বিদ্যাধরী তার অন্ন গ্রহণ করবে
না। সে নষ্ট মেরেমানুষ বলে নয়।
বিদ্যাধরী কারো অন্ন গ্রহণ করে না। ভিক্ষা
বা মেলে, তাই খায়। না মিললে খায়
না। তাতে কোন শ্রুক্ষেপ নেই। যেন
খিদে বলে কিছুর নেই ওর।

বরাবরই খেপী এমনতর। আগে
ভাবত, এও বুঝি ওর এক খ্যাপাসী।
কিন্তু এখন কুমি বোঝে। কিছুর যেন
পষ্ট দেখতে পায়। তার মনের জ্বালা
যত বাড়ি খিদের জ্বালা বাড়ি তত।
মনখান যদি খুঁশিতে টাইটু-বুজ থাকে,
তবে কোথায় খিদে। কোথায় তেঙটা!

কুমি বিদ্যাধরীর দিকে তাকায়। বলে,
—তুই তর কাল মদনরে লইয়া আস।

—আমি আনবার যামু কোন দুরখে।

অবাক হয়ে তাকায় কুমি। কথার
মত কথা বলে খেপী। এমন বাকি
খেপীর মুখেই মানায়। মনখান যেন
ওর শীতলপাটি।—আইস। বইস। চলে
যাও তো চলে যাও। তাপ উত্তাপ নেই।

কুমি আনন্দে বলল,—আমিও মইল্যাম।
কাল মদনও মইল।

খেপী তাকাল। চোখে শুধু কৌতুক
আর হাসি।

—তর জন্যে দাকাইয়া মইল কাল
মদন।

খেপী একটু সময় তাকিয়ে রইল,—
তুই বুঝি কি কইর্যা?

কুমি ধরা পড়বার ভয়ে চোখ নিচু
করল,—শুধু বলল,—আমি বুঝি।

কি করে বোঝে?—মন দিয়ে মন
বোঝে। কুমির বোকবার কথা নয়। কুমি
যদি বুঝেই থাকে, তবে কুমি মরেছে।
একবারে মইর্যা গেছে কুমি। হাস রে,
সংসারের আজব কারখানা। কুমির উপরেও
সাইয়ের দয়া হইল। প্রেমের উজান হাওয়ার
কুমি এখন আকুপাকু। চক্ষু দুইডা তারা
ভার।

—আমার বড় হাস আসে রে কুমি।

—তর সগল তাতেই হাসন। মদনরে
তর পাঠাইয়া দিমু।

—ইচ্ছা করে পাঠাইয়া দিবান পারস।
বাইবে মেঘের ডাক শোনা গেল।

বৃষ্টিটা বুঝি ঘরে এল। হ্যাঁ, বৃষ্টি থেমে
এসেছে।

কুমি উঠল। ওর শাড়িটা ছেড়ে
ভিক্ষে শাড়িটা জড়িয়ে নিল গানে।
কাঁপ খুলল। হ্যাঁ, বৃষ্টি ঘরে এসেছে।
এখন চলে যাওয়া যায়। চলে যেতে গিয়ে
খেপীর দিকে একবার তাকাল কুমি। ওর
চোখ ভরা জল।

আনন্দে খিল খিল করে হেসে উঠল
বিদ্যাধরী।

[স্মরণ শর্মা]

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৩ই মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গ-বিধান-সভার দ্বিতীয় পর্বের অধিবেশনে (প্রথম পর্বের অধিবেশন দাঙ্গার জন্য বন্ধ হয়ে যায়) ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট পাশ হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সদস্যরা সকলেই যে ঘর বাড়ির দিকে ছোটেন কিন্তু আমি ঘাই কোথায়? রাজসাহী তো আমার পক্ষে অজ্ঞাত কারণেই তখনও নিষিদ্ধ অঞ্চল। রাজসাহী থেকে তাববাতায় দাঙ্গার সময় আমাকে ঢাকাতেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে কথা আগেই বলেছি। তারপরে ঢাকাতে থাকাকাল পর্বন্ত ঐরূপ নির্দেশ আসার কারণ জানতে পারি নি। রাজসাহীতে যখন যেতে নিষেধ, তখন আমি আগে থেকেই ঠিক করি, বিধানসভা বন্ধ হয়ে গেলে, আমি কলকাতাতেই যাব। তখন 'প্লেনে' কলকাতার টিকেট পাওয়াও এক মস্তবড় দুর্ঘট ব্যাপার। পল্লানোন্মুখ লোকের এত ভিড় যে ১৫ দিন আগেই সব টিকেট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় কীভাবে টিকেট পাওয়া যায়? মধ্যমশ্রী নূরুল আমিন সাহেবকে সব অবস্থা বলার পরে তিনি ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসে ফোনে খবর দিয়ে আমায় জন্য ১৪ই মার্চের তাঁদের সকারেব 'প্লেনে' একটা আসন রিজার্ভ করে দেন। প্রত্যেক প্লেনেই সবকারের জন্য দ্রুত করে আসন শেষ মুহূর্ত পর্বন্ত 'রিজার্ভ' রাখার সত্ত্ব ছিল। তারই একটা আসন আমাকে দেওয়ার জন্য নূরুল আমিন সাহেব ব্যবস্থা করে দেন। আসন তো রিজার্ভ হয়ে আছে কিন্তু 'এরোড্রোম' ঘাই কেমন কবে? দাঙ্গার সময় যৌদিন ট্রেনে অ-মুসলমানগণকে হত্যা করা হয়, সেই-দিনই তেজগাঁর 'এরোড্রোম'ও অ-মুসল-মান বহু যাত্রীকে ছোরা মেবে নিহত ও আহত করা হয়। এ ঘটনাটির কথাও ঢাকা সকলেই শুনিয়েছিলেন। আমরাও শুনিয়েছি। অন্য সকলে যা শুনিয়েছিলেন, আমরা তার চেয়ে বেশি বিস্তারিত খবরই জানতে পারি। আমাদেরই অতীতের এক বিশিষ্ট বিপ্লবী বন্ধু সেইদিনই কলকাতা থেকে ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন এবং প্লেনের যাত্রীরা নামা-ঘাটই তাঁদের উপর যুগপৎ এক অমানুষিক

আক্রমণ আরম্ভ হয়। অনেক যাত্রীই সেই আক্রমণে নিহত হন। আমাদের বন্ধুটি আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে প্রেরিত হন। বন্ধুটির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর ঢাকায় আসার কারণ এবং কীভাবে তিনি, অন্যান্যদের মত নিহত না হয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। বন্ধুটি ছিলেন ঢাকারই লোক। নাম তাঁর, শ্রীগোবিন্দ কর। তিনি বাল্যকালেই ঢাকার বিপ্লবী দলে (অনুশীলন সমিতিতে) যোগ দেন এবং প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ঢাকায় তাঁর মামার বাড়ি থেকে 'ফেরার' হন। তাঁর বাপ-মা অনেককাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি মাতুল-লয়েই প্রতিপালিত হন এবং সেখান থেকেই পড়াশোনা করতেন। সেই অবস্থাতেই তিনি ফেরাবী হয়ে নানাস্থানে থাকার পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই পাবনা জেলাব আট ঘরীয়া গ্রামে এক মাঠের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সাথে তাঁর ও তাঁর সহ-কর্মী—কুমিল্লার নিকুঞ্জ পাল মহাশয়ের এক প্রচণ্ড ঝড়মুষ্ণ হয়। উভয়পক্ষেই আত্মসম্মতি ছিল। বিপ্লবীদের কাছে 'গির্জাভার' ও 'পিস্তল'; এবং পুলিশের কাছে, রাইফেল। সম্বন্ধের পর বিপ্লবী দুইজনেই গুরুতর রকমে আহত হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে, উভয়ের প্রতি 'স্বিপান্তর' দণ্ডেব আদেশ হয় এবং স্বিপান্তরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসার পরে এবারেও গোবিন্দ-বাবু, সু-বিশ্বাস্যত কাকোরী-যুদ্ধের মামলার স্বিপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে পবিচালিত সাধারণ নির্বাচনে "কংগ্রেস" জয়যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে কাকোরী-মামলার দণ্ডিত আসামীদের মুক্তি দেন। গোবিন্দবাবুও সেই সাথে মুক্তি পান। তিনি 'বে-খা' করেছিলেন না। সে অবসরও পান নি। এক জীবনে দুই-দুইবার যাকে স্বিপান্তর খাটতে হয়, তিনি আর 'বে-খা' করেন কখন? তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন বলতে তাঁর মামার পরিবারবর্গই ছিলেন তাঁর একান্ত আপনাতর লোক, যদিও কাছে

তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ ঋণী। কলকাতায় থেকে তিনি যখন ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পান, তখনই তিনি ঠিক করেন যে সেই দুর্দিনে তাঁকে তাঁর মামার বিপ্লব পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাই তিনি কোয় এম্-ছিলেন। আগেই বলেছি, গোবিন্দবাবু ছিলেন ঢাকার লোক; সুতরাং ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল। তাই তিনি মুসলমানের 'লুণ্ঠি' পরেই ঢাকায় আসেন। তারপরে যখন তাঁকেও ছোবা মাবতে থাকে আক্রমণকারীরা, তখন তিনি চিংকার করে তাদের বলেন যে তিনি তো একজন মুসলমান—তাঁকে মেরে ফেলা হচ্ছে কেন? তাই এ কথা শুনলে আক্রমণকারীরা বিদ্রান্ত হয় এবং তাঁর কথার উপর বিশ্বাস করেই তাঁকে তারাই 'ট্যান্ড্রি' করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। হাসপাতালে তিনি মুসল-মান নামেই ভর্তি হন এবং আমাদের বাসায়; তিনি যে একজন হিন্দু সে কথা কোনমতেই প্রকাশ না-করার জন্য সতর্ক কবে খবর দিয়ে দেখা করার জন্য বলে পাঠান। স্বদেশ নাগ ও সুবোধ নাগ, উভয়ে এক সাথে গিয়েই তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে সব ঘটনা শুনেন এসে আমাদের সেদিনকাব তেজগাঁ এরোড্রোমের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিব-রণ দেন। সুতরাং, অন্য সকলে সেই হত্যাকাণ্ডের খবর যতটা জানতেন, আমরা তার চেয়ে কিছু বেশি-ই জানতাম। তাই ঢাকা শহর থেকে তেজগাঁ এরোড্রোমে যাওয়া তখনও আমরা সম্পূর্ণ নিবাপদ মনে কবতে পারি নি। এই অবস্থায় শ্রী "বর্মণ" উপাধিধারী এক হিন্দু, পুলিশ ইন্সপেক্টর (তাঁর নামটি এখন মনে পড়ছে না) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আমার যাত্রার দিন পুলিশের পোষাক পবেই তাঁর 'বিললভাব' নিয়ে আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে 'প্লেনে' তুলে দিয়ে আসবেন। তিনি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক রেখেছিলেনও। এই যে পুলিশ-অফিসারটির কথা বললাম, সেই পুলিশ-অফিসারটিব এবং তাঁর মত আরও ২।১টি হিন্দু সরকারী পদস্থ

কর্মচারীর সম্পর্কে তাঁদের চাকুরীর অবস্থার বিষয় কিছু বলা দরকার মনে করি। তা'তই সকলে বুঝতে পারবেন যে হিন্দু চাকুরীসেবাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পাকিস্তানে কত সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বিভাগের সময় বর্মণবাবু ছিলেন পুন্ড্রিশের একজন সার্কেল ইন্সপেক্টর, অর্থাৎ তাঁর অধীনে কয়েকটি থানার কাজকর্ম দেখা-শোনারও ভার স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল। জ্ঞানি না, কি কারণে তিনি 'অপশান' (Option) দিয়ে ভারতে যান নি। হয়তো দেশ ছেড়ে যেতে চান নি বা ষাওয়ার পক্ষে তাঁর কিছু পারিবারিক অসুবিধা ছিল, অথবা তিনি মনে করেছিলেন হিন্দু ওপরওয়ালারা তো সব চলে যাচ্ছেন, তার ফলে তাঁদের শূন্যস্থান ন্যায়সঙ্গত কারণেই পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে দিয়েই একটি পুরণ করবেন। পূর্ববঙ্গ সরকার কিন্তু তা করেন নি; বরং তাঁকে সার্কেল ইন্সপেক্টরের পদ থেকে সরিয়ে গিডেকটিভ ডিপার্টমেন্টে 'সি, আই, ডির' (C. I. D) ইন্সপেক্টর করেছিলেন। থানার উপর আর তাঁর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। নাজিমুদ্দিন সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আমাদের তৎকালীন দলনেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের সাথে একত্রিত হয়ে যখন আমরা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করে পুন্ড্রিশ বিভাগের অকর্মণ্যতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তখন তিনি হিন্দুদেরই সেজন্য দায়ী করে বলেছিলেন যে হিন্দু অফিসাররা 'অপশান' দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্যই এরূপ অবস্থা হয়েছে—যিনি ছিলেন রাইটার কনস্টেবল, তাঁকে করতে হয়েছে থানার ইন্সপেক্টর অফিসার! কথাটা যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, তা বর্মণবাবুর পদোন্নতি (!) দেখেই কি বোঝা যায় না? শ্রীবীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধীরাজবাবুও দেশ বিভাগের সময়ই ছিলেন, 'এস, ডি, ও' (S. D. O) এবং তিনিও 'অপশান' দিয়ে ভারতে যান নি। তিনিও আর পদমর্যাদায় তার উপরে তো উঠতে পারেনই নি, উপরন্তু ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় তাঁকে একটি বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় শিবিরে নিরাপত্তার জন্য স্থান নিতে হয় এবং দাঙ্গার পরে আর তিনি মহকুমা-শাসনকর্তা S. D. O-র পদেও থাকতে পারেন না—তাঁকে ঢাকার সচিবালয়ে গিয়ে একজন মাননীয় কেরানীর পদ (dignified clerk!) নিতে হয়। আরও অস্তিত্ব দৃষ্টজন প্রধান হিন্দু কর্মচারীকে আমি জ্ঞানি, বাদেব্র একজনের নাম শ্রীঅজিত দত্তচৌধুরী, 'সি-এস-পি' (ভারতের 'আই-এ-এস' সমতুল্য) এবং

অপর জনের নাম—শ্রী এস বি দাশ; তাঁদের কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার এবং তা যথাকালেই বলবো। ইন্সপেক্টর বর্মণবাবুর কথা বলতে গিয়ে এই করটি নাম উল্লেখ করেছি, পাকিস্তানে হিন্দু কর্মচারীদের (অফিসারদের) ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যে কেমনভাবে রুদ্ধ তা-ই দেখানোর জন্য। এখন আমার আগের কথার ফিরে যাই। বর্মণবাবু আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে 'প্লেনে' উঠিয়ে দেন। আমি নিরাপদেই কলকাতায় পৌঁছি। ১৫ই মার্চ তারিখে সকালে উঠেই আমি যাই, ১৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে শ্রীবীরেশ চক্রবর্তীর বাসায়। শ্রীবীরেশের কথা পূর্বেই বলেছি। সে নিজের নীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আর যখন স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে থাকতে পারে না, তখন সে রাজসাহী সম্মেলনী নামে রাজসাহী বাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি কোনও রাজনৈতিক সাথে যুক্ত ছিল না—ওটা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শ্রীবীরেশ আজ আর নেই। ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কাল-ক্যান্সার' রোগে পরলোক-গমন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আজও টিকে আছে এবং তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ১৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীটেই আছে। রাজসাহীর অধিবাসী যিনি যেখানে থেকেই হোক—তা' ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকেই হোক, বা পাকিস্তান থেকেই হোক—কলকাতায় এলেই একবার ঐ বাসায় গিয়ে থাকেন এবং খবরের আদান-প্রদান করেন। কার্যত ঐ বাসাটি হয়েছিল রাজসাহীবাসীদের দুখ-দুঃখের সংবাদ সংগ্রহের একটা কেন্দ্র-স্থল। সেই কারণেই আমি ভোরে উঠেই সেখানে যাই, রাজসাহীতে কী ঘটেছে যার জন্য ঢাকায় আমার কাছে দাঙ্গার সময় এরূপ তার (telegram) যায়, সেই বিষয়টি জ্ঞানার জন্য। কী যে সে সময় রাজসাহীতে ঘটেছিল, তা' তো সেই দুঃখিনীর একজন তথাকথিত প্রধান আসামী শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের চিঠিতে আগেই প্রকাশ করেছি। সেই চিঠিতে যে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে একজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে সেই ঘটনার আংশিক আভাস আমি পাই, শ্রীমান বীরেশের কাছ থেকে। সে বলে—“সৌদীন আপনি রাজসাহী শহরে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই আততায়ীর হাতে নিহত হতেন এবং সমস্ত হিন্দুদের জীবনে এক ভয়াবহ দুর্যোগ দেখা দিত।” সেই খবর শুনেই আমি কলকাতা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জনাব নরেন্দ্র আমিন সাহেবকে বাস্তবগতভাবে এক পত্র লিখে জানাই যে, তাঁর সরকারের আমার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ

থাকে ত' আমাকে জানালে আমি স্বেচ্ছায় গিয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। সে পত্রের আমি অবশ্য কোনও উত্তর পাই নি। সে কথা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি এখানে জ্ঞানাতে চাই যে, পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের সময়ে আমি আমার সেই কথা ঠিকই রেখেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যখন “এবডো” (E B D O) আইনে নোটিশ হয়, তখন আমি বহরমপুর শহরে আমার ছোট ভাইয়ের বাসায় মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছিলাম। সংবাদপত্রে ঐ নোটিশের খবর দেখে আমি তৎক্ষণাৎ রাজসাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং ঢাকায় গিয়ে ঐ মামলার বিচারের জন্য যে “স্ট্রাইব্যানাল” গঠিত হয়েছিল, তার সম্মুখীন হই। যথাকালে, ঐ মামলা সম্পর্কে সমস্ত ইতিহাস বিস্তারিতভাবেই বলবো।

যাক, কয়েকদিন কলকাতায় থাকার পরে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। কলকাতার বেলগুন্ডে স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পরে ট্রেনটি কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিতা ‘খড়’ নদীর (ভৌগোলিক নাম—‘জলঙ্গী’ নদী) রেলের সেতুর কাছে এসে হঠাৎ থেমে যায়। আগেও অনেকবার আমি কলকাতা থেকে বহরমপুরে গিয়েছি কিন্তু কোনও দিনই আমি এখানে ট্রেন দাঁড়াতে দেখি নি। হঠাৎ কেন দাঁড়াল তা' ছেবে দেখারও আমার অবসর হলো না। দেখলাম, বাতীরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন। তঁরাই বলাবলি করছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভাবী সংগ্রামের জন্য সব সৈন্যবাহিনী নদীর ধার দিয়ে ছাউনি ফেলেছেন এবং তাঁরা নদীতে গা ধুতে নেমেছেন। ঐ মিলিটারিদের প্রয়োজনেই গুথানে সব ট্রেন আজকাল থামছে। আমিও কৌতূহলবশেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখি যে, নদীর ধার দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সব ছাউনি ফেলা হয়েছে। ছাউনিগুলোর উপরে ডাল-পালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং পাল্লাবী রৌপ্যমেটের শিখ সৈন্যদের অনেকেই নদীতে নেমেছেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুজী যে ‘অন্যপন্থা’ (other method)-এর কথা বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিরাফ আলী সাহেব তার উপর প্রথমত বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তাই নিরুদ্বেগেই তিনি ছিলেন। অবস্থা দেখে সৌদীন আমার মনে হযেছিল যে, অন্য পন্থার ঐটি প্রথম ধাপ মাত্র! লিরাফ আলী সাহেব বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝলেও কিন্তু ব্রিটিশের ও আমেরিকার ভারতে অবস্থিত দূতাবাসের (embassy) কর্মকর্তারা তার গুরুত্ব স্বত্বেরই বুঝেছিলেন।

শুনোঁছ, তাঁরাই নাকি পাকিস্তানে স্থিত তাঁদের সহকর্মীদের দ্বারা লিয়াকৎ আলি সাহেবকে সমস্ত খবর দিয়ে অবিলম্বে দিল্লীতে গিয়ে নেহরুজীর সাথে চুক্তি করে আসন্ন যুদ্ধ পরিহার করানোর চেষ্টা করতে বলেন এবং সেই খবর পেয়েই, লিয়াকৎ আলি সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের দিল্লীতে না যাওয়ার জন্য কাতর আবেদন সত্ত্বেও দিল্লীতে যান এবং বহু রূপ-বদলের পরে ৮ই এপ্রিল তারিখে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবেই “নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তি”-টি সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের সব ঘটনা দেখে আমার যা মনে হয়েছে, সেই কথাটা আমি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি। একটি বিষয় সাপ, তার ফণা উত্তোলন করে কোনও মানুষকে কামড়ানোর জন্য উদ্যত হয়েছে। সেই অবস্থায় সাপটি কোনও কারণে ফণা নামিয়ে নিয়ে ফিরে চলেতে লাগলে আক্রান্ত ব্যক্তিটির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাই তুলে ধরছি। আক্রান্ত ব্যক্তিটি হিন্দু হলে হিন্দু সংস্কারবশেই আক্রমণকাণ্ডী সাপটিকে চলে যেতে দেয় কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি মুসলমান হন, তাহলে তাঁদেরও ঠিক ধর্মীয় সংস্কারবশেই সেই সাপকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেন। সাধারণত এটা আমি ব্যক্তিগত জীবনে বহুবারই দেখেছি। শুনোঁছ, মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মই নাকি নির্দেশ আছে যে সাপ দেখলেই মারতে হবে—অন্তত তাঁকে মাঝারি জন্য একটা ঢিলও ছুঁড়তে হবে। হিন্দুর ধর্মে কী বলেছে তা’ অত্যন্ত তর্ক-সাপেক্ষ বিষয়; সুতরাং তাব মধ্যে না গিয়ে হিন্দুর সংস্কারের বিষয়ই বলি। সেটি মুসলমানের সংস্কারের ঠিক উল্টো। সাপ হচ্ছে দেবী মনসার সন্তান এবং পূজ্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই মনস্তত্ত্ব দেখতে পাই। নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান নিজের শক্তি বাড়ানোর জন্যই সামরিক জোটে যোগ দিয়ে “সিয়াটো” (SEATO) ও “সেন্টো” (CENTO) চুক্তি করেন এবং নিজের শক্তি বাড়ার সাথে সাথেই সেই চুক্তিগতকে আবর্জনার ঝড়িতে (waste-paper basket) ফেলেই শূন্য দেন না। তার পর থেকে সাপকে (ভারতকে) মারার জন্য নানা দেশের সাথে নানাভাবেই ঘড়ঘড় করে চলে। ভারত কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র (হিন্দু রাষ্ট্র নয়) হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর সংস্কার মতই চলছেন—তিনি পাকিস্তানের ক্রুরতা ও খলতা যে সাপের চেয়েও ভয়াবহ তা বহুবার বহুভাবে প্রমাণ পাওয়ার পরেও তাকে (পাকিস্তানকে) আঘাত করার দিকে ঝুঁকেন না। উভয় দেশের মধ্যে রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এষ্টখানট। ভারতের

অনুসৃত এই আঘাত-না-করার নীতি যে শরাপ, সেকথা আমি বলি না বরং আমি বিশ্বাস করি যে সুদূর ভবিষ্যতে এই নীতিরই জয় অবশ্যই হবে, যদি আঘাতের জবাবে প্রত্যাহাত করার শক্তি ও সামর্থ্যও গড়ে ওঠে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী (Defence-Minister) শ্রীশরণ সিং অবশ্য ভারতীয় সংসদে জোর গলায়ই বলেছেন যে, তাঁরা যে-কোনও আক্রমণকারীই আসুন না, কেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতকে রক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই ঘোষণা যেদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সংসদে করলেন, তার পরদিনই, অর্থাৎ ২।৮।৬৭ তারিখে ‘রেডিও’র সংবাদে শুনলেম ও সংবাদপত্রেও দেখলেম যে ভারতীয় সীমান্তবক্ষী বাহিনীর পদলিখের সাথে বিদ্রোহী মিজোদের এক সত্বে পদলিখবাহিনীর তিনজন মারা গিয়েছিল এবং মিজোদের পক্ষে মারা গিয়েছে মাত্র একজন! এইটাই কি সম্পূর্ণ প্রস্তুতির লক্ষণ? সাধারণতই তাই, জনমানসে সন্দেহ জাগে। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বিদ্রোহী নাগা মিজো প্রভৃতিকে পাকিস্তান-সরকার সব রকমের সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে চলেছেন কিন্তু ভারত সরকার আজ পর্যন্ত সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানকে পাখতুনস্থানের অহিংস সংগ্রামেও কোনও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন বলে তো খবর শুনিনি। আজকে যারা ভারতের শাসন-ক্ষমতায় আছেন, খান সাহেব একদিন তাঁদেরই শূন্য সহযোগিতাই নন, একজন শ্রেষ্ঠ নেতাও ছিলেন; তবু কিন্তু তাঁর করুণ আবেদনেও সাড়া দিতে ভাবত সরকারকে অত্যন্ত স্বেচ্ছাস্থিত দেখা যায়। ভারতের নাগরিকদের মধ্যে আমি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে দুট সঙ্কল্পের প্রেমা দেখেছি, ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ও ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সত্বে সময় তা’ যে-কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন দেশের পক্ষেও গৌরবের জিনিস কিন্তু কথা হচ্ছে, নাগরিকরা যদি ক্রমাগতই দেখতে থাকেন যে ভারতীয় রাজ্যের কোন কোন অংশ শত্রুপক্ষ দখল করে নেওয়া সত্ত্বেও সরকারের কর্তৃপক্ষ যতদিন পেরেছেন, ঘটনাটা জনসাধারণের কাছে গোপন করেই রেখেছেন এবং যখন একান্তই প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখনই কেবলমাত্র স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর আমল থেকেই সকলেই দেখেছেন যে যিনি যখনই প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকেছেন, তিনিই অত্যন্ত জোর গলায়ই ঘোষণা করেছেন যে কোন দেশকেই ভারতের এক ইঞ্চি জমিও দখল করে নিতে দেবেন না, তবু কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চীন ও পাকিস্তান ভারতীয় জমি দখল করেই রেখে-

ছেন। আজই সকালের (৪।৮।৬৭ তারিখের) আকাশবাণীর খবরে শুনলেম যে আসামের লাইটটলা-ডুমাবাড়ি অঞ্চলের চারখানি গ্রাম ১৯৫৯ সাল থেকে বে-আইনীভাবে জবরদখল করে রেখেছেন! এইরূপ ঘটনার খবর অনববত শুনতে শুনতে যদি ভারতবাসীরা তাঁদের সরকারের নেতৃস্থানীয় বাণীদের প্রতিশ্রুতির বা ঘোষণার উপর আস্থা হারান, তাহলে কি তাদের তার জন্য দোষ দেওয়া যায়? সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা একবার ভেঙে গেলে তার পবিগতিতে দেশের উপর যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ও বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে, সে সম্পর্কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক নেতাদের আজ বিশেষভাবেই ভেবে দেখা দরকার। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতের নেহরু সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করেছিলেন কিন্তু অবশেষে পাকিস্তান সরকারের অনুবোধেই দুই দেশই একটা চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল এ চুক্তি সম্পাদিত হয় দিল্লীতে বসেই দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের স্নানকবের মাধ্যমেই। এ চুক্তিকে ‘দিল্লী-চুক্তি’ বা ‘নেহরু-লিয়াকৎ-চুক্তি’ বলা হয়। এ চুক্তিটি যদি স্বাধাভাবে বুঝা যায় হয়ে চলাতো, তাহলে যে দুইটি রাষ্ট্রের পক্ষেই মংগল হতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা’ কি হয়েছে? চুক্তির পরে কিছুকাল অবশ্য পাকিস্তান সরকার তাব প্রতি মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু তার পরেই, অর্থাৎ যখনই পাকিস্তান সরকার সামরিক জোটের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিশালী মনে কবলেন, তখন থেকেই চুক্তিগত আবর্জনার ঝড়িতে টুকরো টুকরো করে নিক্ষেপ হতে থাকলো। অত্যাচারে যেসব কংগ্রেসী বিরোধী দলীয় সদস্য পর্ববংগ বিধানসভায় বা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ছিলেন, তারা সকলেই এই চুক্তিভংগের কথা বহুবার সংসদে তুলে ধরেছেন। ভারতের সংবাদপত্রসমূহেও তা’ প্রকাশিত হয়েছে; তবু কিন্তু ভারত সরকারের মোহ-ভঙ্গ হয় নি। এই অবস্থার প্রতিকার কি? যুদ্ধ? আমি বলি—“না।” আমার চিন্তাতে ‘যা’ এসেছে, তা’ আমি এই প্রবন্ধগুলোতে শেষ পরিচ্ছেদে বলব। আপাতত এখানে শূন্য এইটুকুই বলে রাখতে চাই যে পাকিস্তানে আজ যে গণতন্ত্রের প্রতি আশ্বাসীল বর্তমান আয়ুবী-সরকার-বিরোধী জাতীয়তাবাদী দল গড়ে উঠছে, তাঁদের সংগ্রামে ভাবত সরকারের উচিত সব রকমে সাহায্য করা এবং তাঁদের আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা জাতিপুঞ্জ পরিষদে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে তুলে ধরা। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর

খানও সম্ভবত সেই রকম সাহায্যই চান। জানি না, কি কারণে ভারত সরকার সে পথে পা বাড়তে এত বিধাগ্রস্ত। ১৯৫০ সালের চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে। তার পরেও বহু চুক্তিই হয়েছে। সর্বশেষে তাসখন্দ চুক্তি। একের পর এক চুক্তি হয়ে চলেছে এবং একের পর এক—সব চুক্তিই ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের অ-মুসলমানদের আর পাক-ভারত কোনও চুক্তির উপরই আস্থা নেই। তারা সকলেই বুঝেছেন যে পাকিস্তান তাঁর দেশ বিভাগের স্ব-জ্ঞাতিতত্ত্ব নীতিতেই এখনও আস্থাবান এবং সেই নীতিরই রূপায়ণ করে চলেছেন এবং চলবেন। সেখানে ভারতের বৃকের এক পাউন্ড মাংস ছাড়া কোনও চুক্তিরই স্থান নেই। তাই আজও পাকিস্তানের অ-মুসলমানরা ভারতে চলে আসছেন। চলে আসতে বাধ্য হবেন, কেউ থাকতে পারবেন না। কেন পারবেন না, সে কথা আমি একটু পরেই বলবো।

যাক, কক্সবাজারে নদীর ধারে সৈন্য-সমাবেশ দেখে আমি সেইদিনই রাত ৮টার বহরমপুরে পৌঁছাই। বহরমপুরে কয়েক-দিন থেকে সেখানকার রাজনীতিক নেতাদের মুখও শুনি,—আগাগোড়া সীমান্ত (মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্ববঙ্গের সাথে একটি সীমান্ত জেলা) দিয়ে সৈন্য-সমাবেশ সব হয়ে গিয়েছে; জওয়ানরা সব প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, এখন কেবলমাত্র দিল্লীর হুকুমের প্রতীক্ষা! কিন্তু হুকুম আর এল না। ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে নেহরু-লিলাকৎ চুক্তি হল।

সম্ভবত ১২ই এপ্রিল আমি আবার রাজসাহী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বহরমপুর থেকে রওনা হই। ঈশ্বরদি স্টেশনে গিয়ে রাজসাহী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে আছি। রাজসাহীরই এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তিনি সেইদিনই সম্মার রাজসাহী

ছেড়েছেন, কলকাতার যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন,—“রাজসাহীতে আপনি এখন যাবেন না। গেলেই আপনাকে ‘এক্সেস্ট’ করবে। সেখানে জোর গজব, আপনার বিরুদ্ধে ‘ওয়ারেন্ট’ হয়েছে। আপনার জীবনও বিপন্ন হ’তে পারে।” তাঁর কথার উত্তরে আমি শূন্য বলি,—“সেই জন্যই তো আমি চলেছি।” যথাকালেই আমি রাজসাহীতে পৌঁছাই কিন্তু আমাকে ‘এক্সেস্ট’ করার জন্য তখনও কেউই আসেন না; পরেও কেউই আসেন নি। মজিদ সাহেবই তখনও রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনিও আমাকে বন্দী করার জন্য তাঁর অন্তরে যথেষ্ট উৎসাহ পোষণ করলেও সেইদিকে অগ্রসর হ’তে পারেন নি। এই না-পারার মধ্যে সদ্য-সম্পাদিত নেহরু-লিলাকৎ-চুক্তির অবশ্যই কিছু অবদান ছিল, তা’ ছাড়া পূর্ববঙ্গের মন্বিসভারও যে কিছুটা হাত ছিল, তা’ পুর্নিশ বিভাগের পদস্থ একজন কর্মচারীর কাছ থেকেই পরে শুনিয়েছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেবের সেই ঐতিহাসিক পত্রই নাকি তার মূলে ছিল।

রাজসাহীতে পৌঁছে আবার কাজে মন দিই। সকালের দিকে বেলা ১২—১টা পর্যন্ত আমার আফিসে বসে কাজকর্ম করি এবং লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করি। বিকেলের দিকে ৫টা নাগাদ আবার শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রের, ওরফে ষাগুর বাড়িতে আগের মতই যেতে আরম্ভ করি এবং রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথাবার্তা বলি। কয়েকদিন পর্যন্ত দেখি যে ১০টার সময় আমি যখন ওখান থেকে রওনা হই, তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আমার দুই সহযোগী—চেবু ও বীরেন—কথা বলাতে বলাতে আমার বাড়ি পর্যন্ত চলে। প্রথম দিকে তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি কিন্তু প্রতিদিনই একই অবস্থা

দেখে আমার সন্দেহ হয় যে তারা রোষ হয় আমার নিরাপত্তার জন্যই গল্প করার ছলে আমার বাড়ি পর্যন্ত পাহারা দিয়ে চলে। আমি তাদের আর পাহারা দেওয়ার জন্য না-আসতে বলি। ঘটনাটা খুবই সামান্য; তবু এখানে উল্লেখ করছি এই জন্যই যে দাঙ্গাকালে আমার বিরুদ্ধে রাজসাহী জেলায় যে কিরূপ ভীষণভাবে পাকিস্তানের শত্রু বলে প্রচার করা হয়েছিল, যার ফলে আমার বন্ধুরাও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আমার জীবন সম্পর্কে—সেইটাই দেখানোর উদ্দেশ্য।

যাক, দাঙ্গার সময় ঢাকায় থাকার কালে সেখানকার কিছু কিছু ঘটনা নিয়েই চোখে দেখেছি এবং পূর্ববঙ্গের নানা-স্থানে যে ব্যাপক হত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন হয়েছে তারও বহু খবরই ভুক্ত-ভোগীদের বা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শুনিয়েছি কিন্তু এ দাঙ্গা যে অ-মুসলমানদের সামাজিক জীবনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তা’ তখনও বুঝি নি। রাজসাহী জেলার গ্রামাঞ্চল ঘুরতে গিয়ে আমার সেই সম্পর্কেও বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়। তারই মধ্যকার মাত্র দু’টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি দেখি, পল্লীতলা থানার অধীন ভাতকুন্ড নামক গ্রামীণ অঞ্চলে। এই ভাতকুন্ড গ্রামটি পল্লীতলা ও ধামুরহাট নামক দু’টি থানার সংযোগস্থলে। এ দু’টি থানাই আগে দিনাজপুর জেলার ভেতরেই ছিল; পরে দেশ বিভাগ হওয়ার দিনাজপুর জেলাও বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলা থেকে এ দু’টি থানা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই এ দু’টি থানা রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার সাথে যুক্ত হয়। ভাতকুন্ড গ্রামের একজন প্রধান জোতদার ছিলেন হাজী নজর আলি মীর। তাঁর ছিল পল্লীতলা ও ধামুরহাট থানার হাজার বিঘে জমির একটি ‘ওয়ারেন্ট’ সম্পত্তি। এই ভদ্রলোকের বড় ছেলে, মীর এরশাদ আলি সাহেব একদিন সকালে আমার বাড়িতে এসে আমার সাথে দেখা করে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যে তাঁদের গ্রামে একবার আমাকে যেতেই হবে, সে অঞ্চলের হিন্দুরা যে কি ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থার বিপাকে পড়ে দেশভাগ করেছেন, তা’ তদন্ত করে দেখতে। আমি যেতে তৎক্ষণাৎ রাজী হ’য়ে আমাদের কংগ্রেসী একজন সংগ্রামী বন্ধু শ্রীনিরেন দত্ত মহাশয়কে আমার সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। এখানে নীরেনবাবু সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখি। ভবিষ্যতে তাঁর সনিবেশ পরিচয় জানার জন্য পাঠকদের মধ্যে আগ্রহের কারণ ঘটতে পারে।



কেশ-পরিচর্যায়
হিমালয়ী

হিমালয়

আম্লবর্দীয় কেশ তৈল
অতুলনীয়

কেশচর্চায় অদ্বৈততাকী যের জনপ্রিয়
হিমালয়ী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ‘দেশবন্ধু’ যখন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ‘গোলামখানা’ ছেড়ে বের হয়ে আসতে আহ্বান জানান, তখন নীরেনবাবু আরও অনেকের সাথে, কলকাতার মেডিকেল কলেজ ছেড়ে বের হন। তিনি তখন ছিলেন, মেডিকেল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, অর্থাৎ প্রায় পুরোপুরি একজন ডাক্তার! নীরেন-বাবুর বাবার নাম শ্রীঅপূর্ব দত্ত—‘দত্ত সাহেব’ নামেই সমধিক পরিচিত। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন তিনি রাজসাহী সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে, সিনেট কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান। ‘দত্ত সাহেবের’ পরিবারের সকলেরই জীবন গড়ে উঠেছিল, ‘সাহেবী’ চাল-চলনে ও আদবকায়দায়। নীরেনবাবুর বাবা-মা তো বটেই, তাঁর ভাই-বোনরাও সকলেই বিলাতফেরত এবং কেউ কেউ সরকারী বড় চাকুরে। নীরেনবাবুই যেন ‘দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ’! নীরেনবাবু কলেজ থেকে বের হয়ে প্রথমে আসেন আগ্রাইয়ে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বন্যার পরে যে ‘রিলিফ কমিটি’ হয়, সেই রিলিফ কমিটিতে একজন সহকারী ডাক্তার হিসাবে। প্রধান ডাক্তার ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ ইন্দ্রনাথবাবু সেনগুপ্ত (বর্তমানে পরলোকগত)। নীরেনবাবু ডাক্তারী করেন। অবসর সময়ে চরকা কাটেন ও খন্দর পরেন। কংগ্রেসও করেন এবং আন্দোলন এলেই জেলেও যান। এখনও তিনি আগ্রাইয়েই আছেন।

নীরেনবাবুকে বলতেই তিনি উৎসাহ-ভরেই আমার সাথী হন। আমরা দুইজনে বহু কষ্টে জয়পুবহাট স্টেশন থেকে ১০।১২ মাইল দূরে ভাতকুন্ড গ্রামে গিয়ে হাজি নজর আলি মীর সাহেবের বাড়িতে উঠি। বৃন্দ হাজি সাহেব ও তাঁর ছেলেরা (তাঁর ৪টি ছেলে ছিল) সকলেই উপস্থিত হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে তাদের অতিথিশালায় তোলেন। আমরা যখন ভাতকুন্ড গ্রামে যাই তখন ছিল বর্ষাকাল। সম্ভবত জুন মাস। অকোবধারে থেকে-থেকেই বর্ষা হয়। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় জমিব ‘আইল’ দিখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ষাওয়ারও খুবই অসুবিধা। আমাদের খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ করে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি সব কাজেরই সুব্যবস্থা করে দেন হাজি সাহেব। আমবা হাজি সাহেবের বাড়িতে পৌঁছানোর পরই তিনি, তাঁরই আত্মীয় গয়েসপুর গ্রামের বড় জ্যোতদার চৌধুরী সাহেবদের বাড়িতে তাদের ‘হাতী’ নিয়ে আসেন, আমাদের ঘুরে ফিরে দেখার উদ্দেশ্যে। এই সব ব্যবস্থা শেষ করে, তিনি ঐ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার ও কিভাবে সব হিন্দু-

বিভাজিত হয় তার একটা বিস্তৃত বিবরণ দেন। তিনি বলেন,—“ঐ অঞ্চলটি হিন্দু-প্রধান। হিন্দুরাই এখানকার চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে সব চেয়ে সংখ্যাধিক। আমার জমির ভাগচাষীদের মধ্যে সকলেই প্রায় হিন্দু। কোন জমি যে আমার এবং কোথায় তার অবস্থিতি, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। ঐ ভাগচাষীরাই সব দেখাশোনা করে। তাই, আমি আমার নিজের স্বার্থেই হিন্দুদের এতদিন এ অঞ্চলে আগলিয়ে রেখেছিলাম। এবারের (১৯৫০ সালের) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন যখন সারা দেশ ছুড়ে ‘দাউ দাউ’ করে জ্বলছে, তখন আমিই আমার মুসলমান লোকজন দিয়েই ওদের রক্ষা করছি—ওদের উপরে কোনও অত্যাচার হতে দিই নি। ওরাও চারদিকের অবস্থার কথা শুনে ভয় পেলেও এখানে নিরুদ্বেগেই ছিল। এই ইউনিয়নে ২,১০০ ঘর লোকের বাস; তার মধ্যে ১,৫০০ ঘরই হিন্দু। সবই হয় রাজবংশী, না হয় মাহাতো শ্রেণীর হিন্দু। তারা নিরুদ্বেগেই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলো না। পনের শো ঘর হিন্দুর মধ্যে চোন্দ শো ঘরই দেশত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছে। কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার ঠিক-ঠিকানাও নেই। কেউ কারোই খবর জানে না। আমার জমিদারগণও পতিত পড়ে আছে এবং ঐ কিষাণরা ফিরে না এলে পতিতই পড়ে থাকবে।” তিনি আরো বলেন,—“দাঙ্গার সময় এই সব হিন্দুরা দেশত্যাগ করে নি। দাঙ্গার পরে, ফার্সি-পাড়ার বড় জ্যোতদার জনাব মহম্মদ মুজাফফর রহমান চৌধুরী সাহেব তাঁর নিজস্ব হাতীর উপর তিনি নিজে ও ধামরহাট থানার বড় দারোগা সরকারী পোষাক পরে চড়ে ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে বাড়িতে গো-মাংস উপহার (১) স্বরূপ দিয়ে তাদের খেতে বলেন এবং জানান যে পাকিস্তানে থাকতে হলে তাদের ঐ মাংসও খেতে হবে এবং তাদের ধর্মও বদল হবে ইসলাম—‘কবল’ করতে হবে! দাঙ্গাও যে সব হিন্দুদের দেশত্যাগ-করাতে পারে নি, পোষাক-পর্যায় সরকারী কর্মচারী দারোগার ও চৌধুরী সাহেবের নির্দেশই তা সমাধা কবলো। আপনাকে আমার কথার উপরই বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনাবা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দু-মুসলমান সকলের সাথে দেখা করেই আমার কথা যাচাই করে দেখুন। আমার কথা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন। সেই জন্যই আপনাকে আসতে এবং স্বচক্ষে সব দেখে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানোর জন্য আমিই

আমার বড় ছেলে ‘এরসাদ’কে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আপনি এসেছেন, সেজন্য আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।”

সব কথা শোনার পর আমরা সাত দিন মীর সাহেবের বাড়িতে থেকে ঐ অঞ্চলের অন্তত ২৫।৩০টি গ্রামে ঘুরেছি এবং হিন্দু-মুসলমান বহু লোকের সাথেই দেখা করে তদন্ত করেছি। তদন্তে বৃন্দ মীর সাহেবের কথারই সমর্থন সর্বত্রই পেয়েছি। এখানে একটি কথা জানাতে চাই যে, যে ফার্সি-পাড়ার মহম্মদজাফফর চৌধুরী সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের একজন ‘পাদা’ ব্যক্তি এবং পূর্ববঙ্গ বিধানসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য। তাঁরই হল এই (অপ-কীর্তি) এবং তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন, থানার বড় দারোগা, যার উপরে লোকের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত! তদন্তে আমরা আরও জেনেছিলাম যে পলাতক হিন্দুদের বাড়ি-ঘরও ‘লুট’ করা হয়েছিল এবং ঘরের মেঝে খুঁড়ে বাড়ি বাড়ি থেকে লক্ষ টাকারও বেশি জুতোরাসা নিয়ে গিয়েছিল। রাজবংশী ও মাহাতোরা নোটের বদলে কাঁচা টাকা (ধাতুর) সংগ্রহ করে মেঝে পুতে রাখতো।

তদন্ত শেষ করে রাজসাহীতে ফিরি। আমি যে রীতির ও পদ্ধতির অনুসরণ কবে এতদিন চলেছিলাম, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুসারেই আমার ‘সফরের’ রিপোর্ট তৈরি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশসাহেব, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব, পূর্ববঙ্গের মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখের কাছে পাঠাই। ফল যে তাতে বিশেষ কিছু হয়েছিল, তা’ বুঝতে পারি নি। ‘এম্বেলির’ পরবর্তী অধিবেশনের সময় আমার বক্তৃতায় ঐ ঘটনাগুলো তুলে ধরেছিলাম। আমার বক্তৃতার সময় ডাঃ এ এস মালেক সাহেব মহামান্য অর্ডার আসনে বসে আমার ভাষণ শুনে আমাকে ডেকে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রীর ‘চেম্বারে’। ডাঃ মালেক তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং নেহরু-লিঙ্কাত চুক্তির ফলস্বরূপ সংখ্যা-লব্ধ সম্প্রদায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি আমাকে বলেন,—“ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য আমার একটা সফরসূচী (tour programme) করে দিন। ঐ সফরসূচীতে একটা রাত এনারেতপুর গ্রামে শ্রীআশু খানের বাড়িতে কাটানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। আশু আমার সহপাঠী বৃন্দ। তাঁর বাড়িতে একটা রাত কাটাতে চাই। আপনি যদি আমার সাথে সফরে না যেতে পারেন, তাহলে আপনার একজন লোককে যার ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাকে আমার সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি

মালেক সাহেবের সফরসূচী করে দিই এবং আমার বন্ধু শ্রীনিবাস দত্ত মহাশয়কে (যিনি আমার সাথে ভাতকুন্ড গিয়ে সাত দিন থেকে আমার তদন্তের সাথী ছিলেন) আশাই টেলিগ্রাম করে ডাঃ মালেকের সফর-সাথী হ'তে অনুরোধ জানাই। ডাঃ মালেক ও নীরেনবাবু এক সাথে ঘুরে সব ঘটনারই বিবরণ নেন। পথিমধ্যে একদিন তাঁরা শ্রীআশু খানের বাড়িতে থাকেন। সেই আশু খান মহাশয়ও কিন্তু এখন সপরিবারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়ে পশ্চিম দিনাজপুরে এসেছেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালেকের বন্ধুও তাঁকে—ধন-প্রাণ ও মান সম্পর্কে নিরাপত্তা দিতে পাবে নি!

ডাঃ মালেক সাহেব ঐ সফর শেষে রাজসাহী শহরে ফিরে জুবনমোহন পার্কে একটি জননভার যখন বক্তৃতা করতে উদ্যত হন, তখন রাজসাহীর মুসলিম লীগ নেতা জনাব কছিরুদ্দিন মুখা সাহেব ডাঃ মালেক সাহেবের আগেই বক্তৃতার বলেন, “নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হচ্ছে একটা চোখা কাগজ মাত্র। তার কোনই মূল্য নেই। সেই চোখা কাগজের বলেই মালেক সাহেব সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী হ'য়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন”..... ইত্যাদি ইত্যাদি। মুখা সাহেবের ঐ বক্তৃতার বাধা দিয়ে ডাঃ মালেক তাঁকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়ে যে বক্তৃতা তিনি নিজে দেন, তাব কথা আগেই বলেছি; সুতরাং, এখানে আর তার পুনরুল্লেখ কবতে চাই না।

১৯৫০ সালের দাপ্তার পরে আমার জেলার ফিরে এসে আমার দেখা অভিজ্ঞতার এইটাই প্রথম ঘটনা। এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা বলি। প্রথমটি ঘটে নওগাঁ মহকুমায়। দ্বিতীয়টির স্থান হল, নবাবগঞ্জ মহকুমা। দেশ বিভাগের, তথা বাংলা বিভাগের পরে মালদহ জেলার ছয়টি থানা পাকিস্তানে পড়ে এবং সেই থানাগুলো রাজসাহী জেলাব সাথে যুক্ত হয়। ঐ ছয়টি থানা নিয়ে রাজসাহী জেলায় নতুন একটি মহকুমা গঠিত হয়। সেই মহকুমার নাম—নবাবগঞ্জ। এখন যে ঘটনাটির কথা বলছি, সেটি নবাবগঞ্জ মহকুমার একটি সীমান্ত গ্রামের। রাজসাহী-মালদহ রেল লাইনের পাকিস্তানের শেষ রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে, রোহনপুর। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গেব মালদহ জেলাব স্টেশন, সিংহাবাদ। এই দুই স্টেশনের মধ্য দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হ'বে চলেছে। আমি যে গ্রামটির কথা বলতে যাচ্ছি, তা হল ঐ নদীরই ধারে এবং রোহনপুর স্টেশন থেকে—দুই মাইলের মধ্যেই। গ্রামটির ও ঘটনার মায়কের নাম এখন আমার মনে নেই। এই

ঘটনা সম্পর্কিত সব দলিলপত্রই রাজসাহীতে আমার কাছে ছিল। আজ, এখানে আমার হাতে সে সব কিছুই নেই। তাই নামগুলো দিতে পারলেম না কিন্তু ঘটনাটির সম্পর্কে আমার সব কথাই সঠিক মনে আছে। আমি যা বলছি, তার মধ্যে এক বর্ণও অতিবর্ণিত নেই। এখন ঘটনাটির কথা বলি :

ঐ গ্রামের কয়েকটি লোক এসে একদিন আমাকে বলেন,—“তাঁরা তো আর গ্রামে বাস করতে পারছেন না। একটি মুসলমান ভদ্রলোকের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে বহু হিন্দুই দেশ ছেড়ে যে যেদিকে পেরেছেন চলে গিয়েছেন। তাঁরাও আব থাকতে পারছেন না। ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটি হচ্ছেন একজন হাফুড়ে হোমিওপ্যাথিক গ্রাম্য ডাক্তার এবং মুসলিম লীগের একজন—মহাশক্তি-শালী নেতা। তিনি বলে বেড়ান যে তিনি হচ্ছেন ঐ ছয়টি থানার ভারপ্রাপ্ত ‘লটসাহেব’। সেখানে তিনি যা করবেন তাই হবে। তাতে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার নেই। কেউ তাঁর কাজে বাধা দিতেও পারছেন না। এমন কি পুলিশও না। থানার দারোগা পুলিশশরাও তাঁকে অত্যন্ত ভয় কবেই চলে। এই অবস্থায় আপনি যদি আমাদের রক্ষা না করেন, তাহলে আমাদের দেশত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। দয়া করে আপনি একবার নিজে গিয়ে আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসুন।” তাঁদের সব কথা শুনি। ঘটনার বিবরণ তদন্ত করার ও স্ব-নির্বাচিত সেই ‘লটসাহেব’-কে একবার দেখার আগ্রহ আমার মনেও জেগে ওঠে। আমি সেখানের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা হই। আমার সাথে নিই অতীতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী আমার সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ খাঁকে। আজ সে আর নেই—রাজসাহী শহরে এসেই কিছুকাল আগে হঠাৎ পরলোকগমন করেছে। তার ছিল অত্যন্ত উদার ও মহৎ প্রাণ। বহু ব্যাপারেই তার আমি অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি। সে ছিল নাটোব মহকুমার খাজুরা গ্রামের এক জমিদার বংশের সন্তান। তার জীবন গড়ে উঠেছিল এক গৌরবময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিবেশে। তার বাবা ছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের রাজসাহী জেলার এক প্রগতিশীল নায়ক। জমিদারের ছেলে—ও রাজগণকুলের শিরোমণি—কুলীন রাজগণ হলেও তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই স্বাধীনতা না-হওয়া পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত নেন এবং নিজেই বলদ-চালিত লাঙলের ‘মুঠা’ ধরে জমি চাষ করেন। সে যুগে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে একটা ধর্ম-বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের গরুচালিত

‘হালের মুঠা’ ধরতে নেই। শচীন্যের বাবা স্বর্গীয় আনন্দনাথ খাঁ মহাশয় নিজের কুলীন রাজগণ হলেও ‘হালের মুঠা’ ধরে হিন্দুদের কু-সংস্কারের মূলে বুঠারাম্যাত করেন। এইরূপ বাবারই ছেলে ছিল শচীন। সে ছিল একজন নিষ্ঠুর স্বাধীনতা-বোম্বা এবং চরম ক্রেশ-সহিষ্ণু। তাকে নিয়েই আমি ঐ গ্রামে যাই। গ্রামটিতে দেখি, অনেক ঘর-বাড়ি তখনও খালিই পড়ে আছে। হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদের ডাকিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে দেখি, আমার কাছে যে অভিযোগ এসেছিল—তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। ঐই ভদ্রলোক যে শব্দ হিন্দুদের উপরই অত্যাচার করেছেন তা নয়। যে সব মুসলমান তাঁর দলে যোগ দেন নি বা তাঁর মত সমর্থন করেন নি বা হিন্দুদের তাড়ানোর ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তাঁদেরও তিনি শাস্তি দিয়েছেন এবং সে শাস্তি, আর্থিক এবং কায়িকও। কায়িক শাস্তি বা দিয়েছেন, তার নিম্নমততার একটা চূড়ান্ত রূপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। থানার পুলিশবাও তার কোন প্রতিকার কবতে পারেন নি। কয়েকবার তাঁরা অবশ্য ভদ্রলোককে বিভিন্ন ধাবায় ‘গ্রেপ্তারও’ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকবারই তিনি উচ্চ বাহিনীতক মহলের হস্তক্ষেপে সগোববে মস্তি পেয়েছেন এবং তাব পকেট তাঁর অত্যাচারের মাত্রাও আবও বেড়ে গিয়েছে। ঐ ডাক্তার সাহেব, হয়তো অমাকে সকলের সামনে তালিলা করার মনোডাব নিয়েই আমার সাথেও দেখা করেন এবং সব ঘটনাই স্বীকার কবে বলেন যে ঐ অঞ্চলের সমস্ত দায়িত্ববাহী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁর উপবেই দিয়েছেন। তাঁর যে ক্ষমতা কতদূর সেটা আমাকে বোঝানোর জন্যই হয়তো তিনি এও আমাকে বলেন যে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল গুলাম মহম্মদ সাহেব ঢাকার এলে তিনিই তাঁকে বলেছিলেন যে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করতে এবং গুলাম মহম্মদ সাহেব তাই করলেনও। তিনি ঐরূপ অনেক বড় বড় কথা বলে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছ থেকেই তাদের কাজ করে দেবেন বলে বহু টাকাও চাঁদা হিসাবে তুলেছেন। এই সব ঘটনার কথা পুলিশও সবই জানেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁরাও অত্যন্ত অসহায়—কিছুই করতে পারেন না।

আমি নিজে সবই দেখলেম ও শুনলেম। সেখান থেকে ফিরেই আমার

সফরের রিপোর্ট তৈরি করে যথারীতিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পদলিশ সাহেব প্রমুখকে পাঠাই। তখন সম্ভবত রাজ-সাহীতে পদলিশ সাহেব ছিলেন খন্দকার এন, হোসেন সাহেব। আমার রিপোর্ট পেয়েই তিনি তাঁর পদলিশ বিভাগের দ্বারা তদন্ত করিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আমার কাছেও পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টে পদলিশসাহেবের সইও ছিল। তিনি তাঁর রিপোর্টে আমার রিপোর্টের সব কথাই স্বীকার করে নিয়ে জানিয়ে-ছিলেন যে, তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে পাঁচ-ছয় বার ধরে জেলেও পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে জেলে রাখা যায় নি। ঐ ব্যক্তি যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে বহু হিন্দুকেই দেশ থেকে তাড়িয়েছেন, তাও পদলিশ সাহেবের রিপোর্টে ছিল।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সামরিক শাসন-কালের একটি ঘটনার অল্প কিছুটা আপাতত এখানে তুলে ধরাছি, ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ—যথাকালে দেব। জনাব আমর খান সাহেব ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে পাকিস্তানের উত্তর অংশেই প্রথম শ্রেণীয় বহু রাজ-নীতিক নেতাবি বন্ধুত্ব তাঁরই (আমরুকের) প্রবর্তিত “এব্‌ডো” (E B D O) আইনে মামলা করেন। ঐ মামলার আওতার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু মুসলমান নেতা তো ছিলেনই, পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক প্রথম সারির হিন্দু-নেতাও ছিলেন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আমাবি বন্ধুত্ব যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল যে আমি হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করতে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করছি। সেই অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলি যে আমি বা আমাদের দলের কোন নেতাই হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত মোটেই করেন নি—সরকারী-নীতিই হিন্দুদের বাস্তু-ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। প্রমাণস্বরূপ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেবের কাছে আমার দেওয়া বিবরণী ও বাজসাহীর পদলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট খন্দকার সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্টটি—আক্কা-টাইবুনালের বিচারকমন্ডলীর কাছে তুলে ধরি কিন্তু তাঁরা কোনও যুক্তিই শোনে না। তাঁরা তো বিচার করতে বসেন না—তাঁরা আমর খান সাহেবের নির্দেশে বিচারের একটা প্রহসন করে তাঁর জয়যাত্রার পথ ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। সমর-বিশেষজ্ঞ কৌশলী রাজনীতিক খেলোয়াড় আমর খান সাহেব চেয়েছিলেন ফাঁকা মাঠে গোল দিতে। তাই প্রথম শ্রেণীর সব রাজনীতিক নেতাকেই ‘এব্‌ডো’

আইনে ছয় বছরের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করানোর তাঁর দরকার পড়েছিল। আক্কা সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত ‘টাইবুনাল’ সেই কাজই সু-সম্পাদিত (১) করেছিলেন।

যাঁক, এখন সাধারণত-ই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আপোষে দেশ-বিভাগ করতে রাজী হয়েই পাক-ভারত ‘উপমহাদেশের স্বাধীনতা’ আনলেন, সেখানে আবার পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভাড়াই বা কেন, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই বা কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মুসলিম লীগ অনুসৃত নীতির মধ্যে, যে নীতির কথা আমি আগেই বলেছি। মুসলিম লীগ স্বজাতি-তত্ত্বের নীতিতেই দেশ ভাগ করেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক-বিনিময়েরও প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কাছে করেছিলেন কিন্তু ‘কংগ্রেস’ তাতে রাজী না-হওয়ার সেটা হাতে পারে নি কিন্তু মুসলিম লীগ তার নীতি থেকে সরে যায় নি। যা আপোষে হয় নি, তাই করতে চেয়েছেন এবং করেছেন নানা রকমের কৌশলের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানে চৌদ্দ বছর থেকে আমি যা দেখেছি ও জেনেছি এবং তাতে যা বুঝেছি, তাই আমি এখানে তুলে ধরেছি এবং আরও অনেক কিছুই বলার ইচ্ছা আছে।

আমার ব্যক্তিগত গতামত ছাড়াও বাংলা দেশের আর একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতারা, যারা পাকিস্তান সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁর মতও এখানে তুলে ধরাছি। এই বিপ্লবী নেতা ও আমার বন্ধুটি আর কেউ নন তিনি হলেন ভূতপূর্ব বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের একজন প্রবীণ নেতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়। তিনি পাকিস্তান-পারলামেন্টের ও পরবর্তীকালে, পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভারও সদস্য ছিলেন; সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতও বিশেষ গুরুত্বেরই দাবি রাখে। ভারত সরকার পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের কারণ নির্ধারণের জন্য যে বিচার বিভাগীয় ‘ক্যাপদ-কমিশন’ গড়েছিলেন, সেই কমিশনের কাছে ভূপেন্দ্রবাবু যে বিবৃতি দেন, সেই বিবৃতি থেকে পাকিস্তানের নীতি সম্পর্কিত অংশের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি। সেই নীতিটুকুর কথাটা ভালভাবে মনে রাখলেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘটিত সব ঘটনারই সব প্রহসনই—মাইমাসার সূত্রও তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। ‘ক্যাপদ-কমিশনের’ কাছে ভূপেনবাবু বলেছিলেন :

“....I could not do better than referring here to some inking of the Official policy, pursued in East Bengal since partition. About 1951, I became exceptionally intimate with one of the Central Ministers. He thoroughly disapproved of the policies pursued but was helpless. I cannot divulge his identity. I am quoting him almost word for word to say that the first (or only) Secretary General of Pakistan, supported by the—then Prime Minister was responsible for formulating the two policies :

(1) Sooner or later, East Pakistan is going to walk out of Pakistan. It is therefore, useless straining to develop East Pakistan beyond a nominal routine measure. It would be wiser to develop that West, where necessary and possible without arousing suspicion, at the cost of the East.

(2) the minorities, particularly those of the middle classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get rid of them. But, for obvious reasons, the process must be gradual and circumspect. The political leaders have mostly left. Others will find little support if their immediate followers coming from the middle classes are squeezed out of employment-prospects. This should be effectuated in the name of the poorer Muslim Community. The process must be slow. But if there are upheavals in any area on the part of the masses, the forces must not be allowed to get out of control. But no serious notice need be taken of the subsequent hue and cry, nor of complaints by the minorities or their representatives..”

ভূপেন্দ্রবাবু তাঁর বিবর্তিত বা বলেছেন তাঁর মর্মার্থ দিচ্ছি—তিনি বলেছেন, ১৯৫১ সালে তিনি, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী (তাঁর নাম প্রকাশ করা স্বাভাবিক কারণেই তিনি সন্তুষ্ট মনে করেন নি) বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। সেই বন্ধুটি তাঁকে যা বলেছিলেন, তাই তিনি এখানে হুবহু তুলে ধরছেন। সেই মন্ত্রী বন্ধুটি বলেছিলেন যে, পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল, তদানীন্তন প্রধান-মন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে দুটি নীতি নির্ধারণ করেন। সেই নীতি দুটি হচ্ছে—

(১) দুর্দিন আগে হোক, বা পরে হোক, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বের হচ্ছে যাবেই; সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু খরচ না করে, শুধু ষড়যন্ত্র না-করলেই নয়, ততটুকুই কেবল করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য খরচা কম করে তাই দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাতে যেন সৈদিকে সম্পদের উদ্রেক না হয়।

(২) মধ্যবিন্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কখনই পাকিস্তানের বন্ধু (বা অনুবর্ত্ত নাগরিক) হবে না; সুতরাং তাঁদের সবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সর্ব প্রযত্নেই চালিয়ে যেতে হবে। তবে, বিশেষ কারণেই এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে যে, ঐ সরিয়ে দেওয়ার কাজটা যেন ধীরে ধীরে হয়। হঠাৎ ব্যাপকাণ্ডে দেখা না দেয়। অধিকাংশ রাজনীতিক নেতারা ই দেশত্যাগ করে গিয়েছেন। আজও ধারা আছেন, তাঁদের মধ্যবিন্ত শ্রেণীর সমর্থকদের যদি চাকরি-বাকরি থেকে ক্রমশ সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই সব নেতারাও সমর্থকহারা হীনবল হয়ে পড়বেন। দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়ে এই কাজ ধীরে ধীরে চালিয়ে যেতে হবে। যদি হঠাৎ কোন অঞ্চলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনতা উত্তেজিত হয়ে ব্যাপকভাবে কিছু করতে আরম্ভ করে, তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেই জনতা যেন শাসনের বাইরে একদম চলে না যেতে পারে। ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা তাঁদের নেতারা ষড়যন্ত্র চালায় করুন না কেন, সৈদিকে বিশেষ দুটি দেওয়ার দাবি নেই।...

এটাই হল পাকিস্তানের নীতি। মর্গা এখনও পাকিস্তানে আছেন বা ছিলেন তাঁরা এই নীতির প্রয়োগ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন ও কবেছেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে দেশ-

বিভাগের, তথা স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট তদানীন্তন কালের প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেল মিলে যে নীতির ছক কেটে রেখেছেন এবং যা কয়েক-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহরও আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিল, সেই নীতিরই প্রয়োগ করে চলেছেন সব গভর্নমেন্ট। ছকের বাইরে কোনও মুসলিম লীগ সরকারই—লিয়াকত আলি সাহেবের মুসলিম লীগ থেকে আরম্ভ করে আজকের আয়ুব সাহেবের মুসলিম লীগ সরকার পর্যন্ত—কেউই বান নি। সৈদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে ভারত সরকারের নীতিকেই বখ্যা বা দেউলিয়া নীতি বলতে হয়। তাই শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারত সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে গভীর খেদেই বলেছিলেন যে— “prisoners of in decision” বা সিদ্ধান্ত-সঙ্কটের অন্ধম বন্দী। ভারতে জওহরলাল নেহরুজী ও পাকিস্তানে লিয়াকত আলি খান সাহেব নিজেদের ব্যক্তিত্বের দাপটে প্রধানমন্ত্রিত্ব করে গিয়েছেন—সেখানে আমাদের মাথা তুলতে পারেন নি। তারপর থেকে দুই দেশেই দেখছি, পুরোপুরি আমলাতন্ত্র চলছে—মন্ত্রীর নিজেরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন বলে মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানে তো তাই-ই দেখছি। সেটা দেখেই আমাদের বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একদিন দৃষ্ট করে বলেছিলেন যে, “I pity Nurul Amin. He is nothing but a prisoner of the Centre.” (নূরুল আমিন সাহেবের জন্য আমার দুঃখ হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দী ছাড়া আর কিছুই নন!) আমি নিজেও তাই মনে করি। ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড, গৃহ-দাহ ও লুণ্ঠনের পেছনে যে পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের কোনও হাত ছিল তা আমার মনে হয় না। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা হঠাৎ একদিনে হয় নি। দেশ বিভাগের পর থেকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অতি ধীরে ধীরে ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গার পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, নানা রকমের ছোট-খাট অত্যাচার-উৎপীড়ন-জবরদখল-নারীহরণ প্রভৃতির মাধ্যমে হিন্দুদের মনোবল একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ছিলেন, তাঁদেরও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আব্দু-হোসেন সরকারের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ও মৌলানা আহমেদ আলি সাহেবকে খুনী আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার করে জেলে দিয়ে। এই সব ঘটনাগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ মনে বিচার করে দেখলে প্রত্যেক বন্ধু ভূপেন্দ্রবাবু যে

নীতি দুটির কথা বলেছেন, তারই যথাযথ বর্ণনা-বর্ণ প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব মিলে রাষ্ট্র-পরিচালনার যে নীতির ছক কেটে রেখেছিলেন, তারই সাংখ্যিক রূপায়ণ করেছেন পূর্ববঙ্গে, তথা পূর্ব পাকিস্তানে, মধ্য সচিব জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব। মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্বের ঠাট বজায় রাখতে আজিজ আহমেদ সাহেবকে বিশেষ সমীহ করেই চলতে হতো। জনাব হামিদুল হক সাহেবের প্রোডা (PRODA) মামলার সমবেই আজিজ আহমেদ সাহেব তাঁর সাক্ষাতেই সে কথা বলেছেন। আগেই তা বলেছি। মন্ত্রীদের যে ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গার পেছনে হাত ছিল না, তা মনে করাব আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমত দাঙ্গার প্রথম দিনেই যে আমাদের ঢাকার বাসাও আক্রান্ত হবে, এ কথা শহরে বেশ রটে গিয়েছিল। মন্ত্রীরাও সম্ভবত শুনিয়েছিলেন। তাই, আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা যেনই মনে হয় তিনজন মন্ত্রী সশস্ত্র সিপাহী-সান্ধ্যী নিয়ে সম্ভার পথেই আমাদের বাসায় এসে রাত ১২টা পর্যন্ত কাটিয়ে যান। মনে হয়, এটা সমগ্র মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই হয়েছিল। সেই তিনজন মন্ত্রী আমাদের বিপর্যয় হিন্দুদের উদ্ধার করার জন্য আমাদেরই প্রস্তাবমত পুলিশ সহ একখানি ‘জীপ’ গাড়ি দিতে চেয়েও যে দেন নি, সেটাও মনে হয় দিতে পাবেন নি বলেই দেন নি। মধ্য সচিব আজিজ আহমেদ সাহেবই প্রতিবন্ধক হয়েছেন। পরের ঘটনাকে প্রমাণ হয় যে সংখ্যালঘু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালেক সাহেব ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও সহ আমাদের বন্ধু গণেন্দ্র ভট্টাচার্যের সাথে ধনসম্প্রাপ্ত গ্রামগুড়ুলার ও স্থানীয় হিন্দুদের গৃহহীন অবস্থা দেখে নিজেই সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও সাহেবকে দেওয়া সত্ত্বেও যে কোনরূপ সাহায্য ঐ দুঃস্থ লোকদের দেওয়া হয় নি, তারও মূলে হচ্ছে পাকিস্তানের সেই ছক কাটা নীতি ও তার রূপকার আজিজ আহমেদ সাহেব। মাত্র দুই-একটি ঘটনা নয়; আমি অনেক ঘটনাই জানি, যার ফলে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে মন্ত্রীদের কিন্তু ঘটনার কলকাঠি ঘুরিয়েছেন মধ্য সচিব আজিজ আহমেদ সাহেব। সেসব ঘটনার কিছু কিছু পরে ক্রমশ বলব।

দেশ বিভাগের দিন থেকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সামাজিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়, পাকিস্তানের সূচ-ফোটান নীতির প্রতি দিনেব কাজের মধ্য দিয়ে তারই চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫০

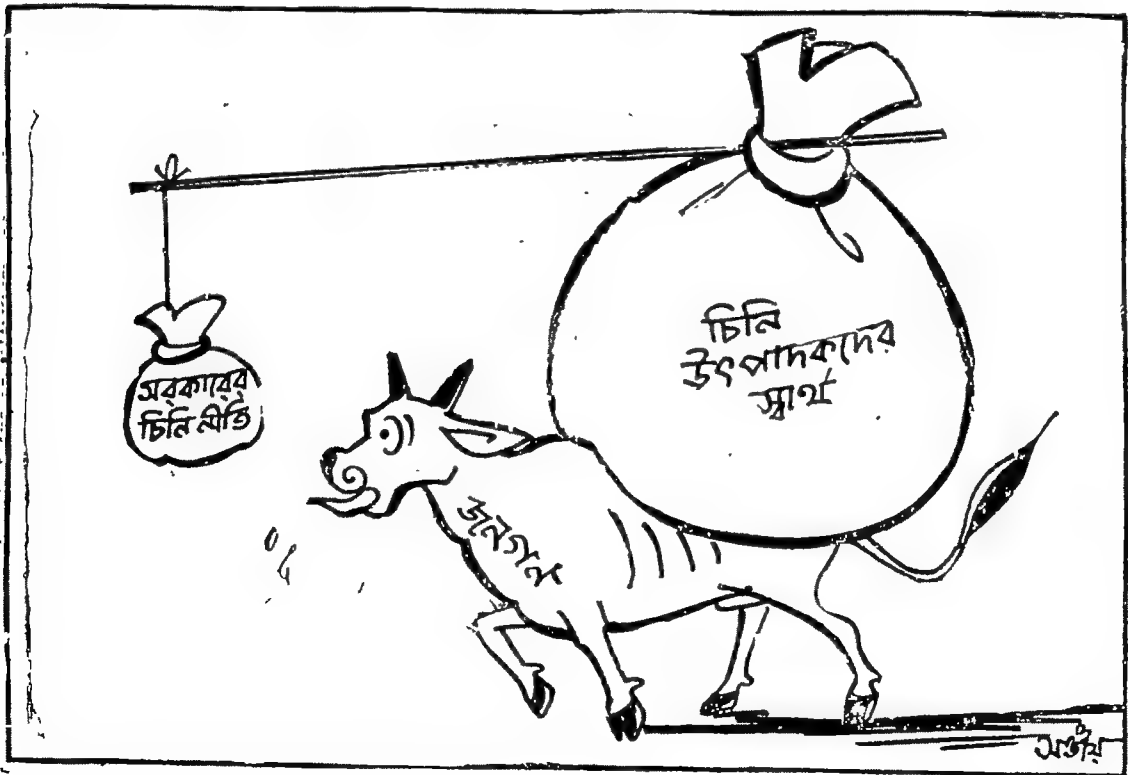
সালের দাপ্তর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ মরলোও অনেক। যারা বেঁচে থাকল, তাদেরও অনেকেই প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল পালালো। বহু ঘটনায় দেখেছি স্বামী পত্নীর কাছ থেকে, ছেলেমেয়ে বাপ-মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে পড়েছে। তাদের সকলেরই যে আশ্রয় পুনর্মিলন হয়েছে, তা বলা যায় না। নিজের বাড়িঘর পেছনে ফেলে এসে দেশান্তরী হয়ে কতজন যে সমাজ-বিরোধীর ভূমিকা বা সমাজে পতিতের অথবা পতিতার বস্তি নিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। যিনি একদিন সমাজে ছিলেন নিজ দেশে মান্য-গণ্য-শ্রদ্ধ ও সংযুক্তি আজ হয়তো তিনিই হয়েছেন চবিরহীন সমাজ-বিরোধীর দালাল। পূর্ববঙ্গ, তথা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সামাজিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে? আমি মনে করি, তার জন্য দায়ী পাকিস্তানের স্বাধীন পরিচালনার সেই ছক্কাটা নীতি,

যা ভূপেনবাবু তাঁর বিবর্তিতে তুলে ধরেছেন এবং পূর্ববঙ্গে সেই নীতির রূপ-কার মধ্য সচিব আজিজ আহমেদ সাহেব। মন্ত্রির মোহের পাশে বন্দী মন্ত্রীদের আমি তাব জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী করি না—ভেতরের ঘটনার কিছু কিছু জ্ঞান বলেই তাঁদের পুরোপুরি দায়ী করতে পারি না। পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন সাহেবকে অত্যন্ত ঘৃণিত লোক বলেই মনে করতেন, আজ যখন তিনি মন্ত্রির বা পদগোরবের সেই মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তখন তাঁর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে একজন বাঙালীর ও দেশসেবকের। আমি জানি, আযুব খাঁ সাহেব বর্তমান গভর্নর মোমেন খাঁ সাহেবেরও আগে নূরুল আমিন সাহেবকেই গভর্নরের পদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। গ্রহণ করলে তাঁকেও হয়তো মোমেন খাঁ সাহেবের ভূমিকাই অভিনয় করে চলতে হত। পদগোরবের মোহই তাঁদের ব্যক্তিকে স্ব-

প্রকাশ করতে বাধ্য দিয়েছে। সেই অক্ষমতার দোষে তাঁরাও অবশ্যই দুষ্ট এবং দোষের কিছুটা ভাগী। এটাই আমার মত। আবাব মুসলিম লীগের কোনও কোনও নেতার মতে ১৯৫০ সালের দাপ্তর জন্য আমিই দায়ী এবং কংগ্রেস-দল গোণত যৌথভাবে দায়ী এবং পূর্ব-বঙ্গ থেকে ক্রমাগত যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস্তবত্যাগ করে চলেছেন, তার জন্যও নাকি আমরাই সকলে, অর্থাৎ অতীতের কংগ্রেসীরাই দায়ী! এখন এর মীমাংসা কবেন কে? পরস্পরবিরোধী দুই দলের এই মতের মধ্যে থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার শক্তি আছে একমাত্র নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের। যদি কোনদিন কোনও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এই সত্য উদ্ঘাটন করতে আগ্রহ হ'য়ে আসেন, তবেই সত্য প্রকাশ পাবে। আমি কেবল এখানে সেই ভাবী-কালের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই লিখে যাচ্ছি। তাই রেখে যেতে চাই।

[ক্রমঃ]

চিনির বলদ—



বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন তর্দীচর্ম

১ পর্ব ১

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য : অপভ্রংশ

বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার 'বিশ্ব'তনের শেষ পর্বটি সচরাচর অপভ্রংশ হিসাবে কথিত হয়। এই বিশেষ পর্বটি এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমূহের জননী। অপভ্রংশ কথাটির প্রথম পরিচয় আমরা পাই পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে যেখানে লেখক বলেছেন যে প্রতিটি শব্দ শব্দেরই কয়েকটি বিকৃত ও আঞ্চলিক রূপ আছে। এগুলিই হচ্ছে অপভ্রংশ। অর্থাৎ এই শব্দ মানতে গেলে, অপভ্রংশ কোন একটি বিশেষ ভাষা নয়, পঞ্চাশতের তা স্বাভাবিক সংস্কৃত শব্দসমূহেরই বিকৃত ও আঞ্চলিক রূপান্তর। সেদিক থেকে মূল চরিত্রের দিক দিয়ে পালি-প্রাকৃতের সঙ্গে অপভ্রংশের প্রভেদ সামান্যই। ভারতের নাট্য-শাস্ত্র বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত ভাষার প্রকাশ তিন ধরনের—সমান, বিকৃত এবং দেশী। দেশী ভাষাগুলিকে আবার সাত-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অধঃমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণাত্যা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই অপভ্রংশসমূহ বিভিন্ন ভাষাভাষীতে গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ভামহ এবং দণ্ডী অপভ্রংশসমূহের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। দণ্ডী অবশ্য অপভ্রংশ বলতে আড়ীর জাতির লোকদের কথাভাষাকেই বুঝিয়েছিলেন। এরা বাস করত উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের একটি তাত্ত্বশাসিন থেকে আমরা জানতে পারি যে, বলভীরাজ গুহসেন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। নবম শতকে রুদ্রট ভাব কাব্যালংকার গ্রন্থে কবিতা রচনাব ছয়টি ভাষার মধ্যে অপভ্রংশকেও একটি বলে স্বীকার করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, বহু প্রকারের অপভ্রংশ তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল।

সংস্কৃত নাটকে অপভ্রংশ

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত অম্ব-যোষের সারিপুত্রপ্রকরণ নাটকে ষষ্ঠী-বিভক্তিবাক্য পদগুলিতে অপভ্রংশের

সুদৃশপট ব্যবহার রয়েছে (যেমন মকড়হো; সংস্কৃত মকটস্য; হো অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য)। ভাস-বিরচিত পশুরায় নাটকে ইতরজনদের সংলাপে মাগধী-প্রাকৃতে রচিত হয়েছে, কিন্তু কর্তৃ ও কর্মকাব্যকে অপভ্রংশের ব্যবহার বেশ প্রকট। মুচ্ছকটিক নাটকে কতিপয় চরিত্রের মুখে যে ভাষা দেওয়া হয়েছে তাকে পণ্ডিতেরা মাগধী-অপভ্রংশ আখ্যা দিয়েছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে ষোলটি শ্লোক অপভ্রংশে রচিত এবং সেগুণি অপভ্রংশ-গীতিকবিতার নিভেজা উদাহরণ। প্রাকৃত ব্যাকরণকার হেমচন্দ্রের সময় অপভ্রংশ সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

আদি অপভ্রংশ কবিতা

কবিতাই অপভ্রংশ সাহিত্যের আদি-রূপ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অপভ্রংশ কবিতায় দোহা ছন্দ ব্যবহৃত হত। বিষয়-বস্তু অনুযায়ী অপভ্রংশ কবিতা দু'রকম, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসাপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর কবিতা মূলত প্রেম, প্রকৃতি, বীরত্ব ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হত। এই জাতীয় কবিতার নিদর্শন হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাসমূহের রচয়িতা ছিলেন জৈন ও বৌদ্ধ সাধক সম্প্রদায়। জৈন অপভ্রংশ রচনার উদাহরণ হিসাবে জোহিন্দু (ষষ্ঠ শতক) রচিত পরম্পপয়াসু এবং জোগসারু, রামসিংহ মূনি রচিত পাহাড়-দোহা, দেবসেন (দশম শতক) রচিত সাবয়বসু-দোহা, এবং সুপ্রভাচার্য রচিত বৈরাগ্যাসার প্রকৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থে ধর্মসাধনের গৃহ্যতত্ত্বসমূহ পরিবেশিত হয়েছে। কথিত আছে দেবসেনের ন্যায়-শাস্ত্রের ওপর রচনা নয়ত প্রথমে অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এরূপ একটি গুরুত্বের বিষয়কে চর্চা দোহা-ছন্দে রচিত হওয়া অসমীচীন মনে করে মাইল-খবল গ্রন্থটিকে প্রাকৃতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ থেকেই স্বেচ্ছা যায়

তৎকালীন পণ্ডিতরা অপভ্রংশ পছন্দ করতেন না।

যে সকল বৌদ্ধ সাধক দোহা-ছন্দে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তিজোপাদ, সরহ-পাদ, কহুপাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা দোহাকোশ-এ সংকলিত হয়েছে, সবপ্রথমে সংকলন করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং পবে নতুন করে সম্পাদনা করেছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। বৌদ্ধ দোহার আরো অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন। এই সকল দোহার এক বিচিত্র ধরনের বৌদ্ধ মরমীরাবাদের পরিচয় মেলে। এই বৌদ্ধ হোদাগুলিকে কেউ কেউ চর্চাপদ বলে থাকেন, এবং বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তাঁদের সাহিত্যের সুত্রপাত এখান থেকেই করেছে বলে মনে করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অপভ্রংশটি সম্বন্ধা-ভাষা নামে পরিচিত। একদিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত ও অপর দিকে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যরেখা হিসাবে এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে।

মহাকাব্য

সংস্কৃত-প্রাকৃতের মত অপভ্রংশেও মহাকাব্য রচিত হয়েছে। অপভ্রংশ মহাকাব্য রচনাব ধরণটি কিন্তু নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অলিঙ্গ বা পঙ্ক-বটিকা ছন্দে রচিত আটটি করে স্তবক নিয়ে একটি কবে কড়ক বা কবিতার সাধারণ একক গঠিত হয়। এই বিশেষ ধরণটি হিন্দী চৌপদী দোহার পূর্বসূরী; জায়সির পদ্মাবত এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে এই বিশেষ ধরণটির পরিচয় পাওয়া যায়। দশ থেকে পনেরটি কড়ক নিয়ে এক-একটি গান্ধি বা সর্গ বা অধ্যায় রচিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধ্যায়গুলির পূর্বে স্তবক ছন্দে কিছুটা করে উপরমণিকা থাকে।

আদি অপভ্রংশ মহাকাব্যসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বয়ম্ভূদেবের পৌমচরিত ও হরিবংশপদ্যরাণ, যেগুলি যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের জৈন সংস্করণ। প্রথম গ্রন্থটিতে ৯০টি সর্গ

এবং ১০০০ কড়ক আছে, অর্থাৎ মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২,০০০। তৃতীয় গ্রন্থটি ১১২টি সন্ধি ও ২০০টি কড়ক নিয়ে গঠিত এবং সেই হিসাবে মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। অবশ্য স্বয়ংস্বত্বের মহাকাব্য দুটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সেই কাজটা করেছিলেন তাঁর পুত্র রত্নবন। এ ছাড়া স্বয়ংস্বত্ব অপভ্রংশ ছন্দ, ব্যাকরণ এবং অলংকার নিয়েও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জৈন-অপভ্রংশ লেখকদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন পদ্মদন্ত যিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের মন্ত্রীদেব পৃষ্ঠপোষকতায় মহাপুরাণ, জগহর-চরিত্র এবং নায়কুমার-চরিত্র রচনা করেছিলেন। পদ্মদন্তের মহাপুরাণে ৬০ জন সাধু-পুরুষের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। পদ্মদন্তের হাতে পড়েই জৈন-অপভ্রংশ যেন সাহিত্যরচনার মাধ্যম হতে পেরেছিল। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ চরিত্রকাব্য ধরনের। জৈনধর্মের নামকরা সাধকদের শলাকা-পুরুষ বলা হত। প্রাকৃতের এই রকম বহু শলাকা-পুরুষের জীবনী রচিত হয়েছে।

কনকমার রচিত করকণ্ড-চরিত্র পদ্মদন্তের রচনার আদর্শেই রচিত হয়েছে। দশম শতকে রচিত এই মহাকাব্যে করক নামক এক সাধকের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে যিনি জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সূচনার লেখক আখ্যায়িকার দিয়েছেন দিগম্বর জৈনমতে বিশ্বাসী চন্দ্রধরি গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে।

ভবিনহস্তকা বাইশটি সন্ধি বা সর্গে রচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য। এতে একটি বণিকের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে যে তার সং-ভাই-এর ঈর্ষার ফলে জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করেছে। এটিও সম্ভবত দশম শতকের রচনা। লেখকের নাম ধনপাল।

হরিভদ্র বিরচিত নৈমিনাহ-চরিত্র অপভ্রংশ কাব্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সচরাচর অপভ্রংশ কবিতা পঞ্চাভিষা (পঞ্জাবীটিকা) ছন্দে রচিত হয়, কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে রড়ুড়া ছন্দ। এই গ্রন্থের সনকুমার-চরিত্র নামক একটি অংশই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির শ্লোকসংখ্যা ৮,০০০। এই কাব্যের নায়ক জৈনধর্মের প্রখ্যাত বারোজন চক্র-মর্তীর একজন।

মাহিল নামক অপর একজন কবির রচিত পোমনির-চরিত্র একজন নারী-ভক্তের জীবন কথা। রচনাকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক। বিদ্যাপতি রচিত কীর্তিলতা চতুর্দশ শতকে রচিত কীর্তি সিংহের জীবনী যিনি জোনপুরের নবাব ইব্রাহিম

শাহের সমকালীন ছিলেন। এই দিক থেকে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও বর্তমান। পদ্মকীর্তি (দশম শতক) রচিত পাশনাহ-চরিত্র বা পাশপুত্রাণ্ড গ্রন্থ-বিংশতিতম জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনী অবলম্বনে ৩,৩০০ শ্লোকে রচিত।

ছোটগল্প

অপভ্রংশ সাহিত্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোটগল্প। পালি এবং জৈন প্রাকৃতের ধর্মীয় নীতিসমূহ শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। অবশ্য এগুলিকে আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ছোটগল্প বলা ঠিক বলা হবে না। এগুলি অনেকটা প্যারাবল ফেবুলযর্মী। অপভ্রংশ সাহিত্যের ছোটগল্পগুলির উদ্দেশ্যও বহুলাংশে ধর্মীয় নীতি শিক্ষাদান। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হরিশ্বেগের ধর্ম-পরিকথার কথা। এই গ্রন্থের লেখক তাঁর পূর্বসূরী জয়রামের গল্পগান করেছেন যিনি পূর্বে প্রাকৃতের ধর্মপরীক্ষা নামক সমজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হরিশ্বেগের জন্মভূমি চিতোর, কিন্তু সেখান থেকে তিনি অচলপুরে (বর্তমান ইলিচপুর) এসে বসবাস শুরু করেছেন। এগারোটি সন্ধি বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই বাগ্মূলক গ্রন্থটি মোটামুটি ২,০০০ শ্লোকে রচিত হয়েছে। রচনাকাল দশম শতাব্দী। এর পর উল্লেখ করতে হয় শ্রীচন্দ্র রচিত কথাকোশ গ্রন্থটির কথা। এই গ্রন্থটিও খৃস্টীয় দশম-একাদশ শতকে রচিত হয়েছিল। মোট ৫০টি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অপরায়ণ অপভ্রংশ রচনা

খৃস্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে অপভ্রংশে আরও কয়েকটি চরিত্রকাব্য রচিত হয়েছিল। এইগুলি হচ্ছে সিংহ রচিত পঞ্চমুখ কথা, পদ্মকীর্তির পার্শ্বপুরাণ, সিরিহরের সনকুমার-চরিত্র, নয়নন্দীর সুনন্দন-চরিত্র, লখনুদেবের নৈমিনাহ-চরিত্র ইত্যাদি।

ষোড়শ শতকে সোমদেব জৈন তীর্থংকর পার্শ্বের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। জিনদন্ত সূরি (১০৭৫-১১৫৪) বত্রিশটি স্তবকে কাশ-স্বর-পকুলম নামক ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই জাতীয় রচনার আরও উদাহরণ হচ্ছে সুপ্রভাচার্য রচিত বৈরাগ্যসার ও যোগিচন্দ্রের দোহাসার।

ষোড়শ শতকে রচিত অমরকীর্তিগণির হরকম্বোদয় (সং-বটকর্মোপদেশ) নীতি-শাস্ত্রের ওপর রচিত গ্রন্থ। এই জাতীয় আরও দুটি রচনা অপভ্রংশ সাহিত্যকে

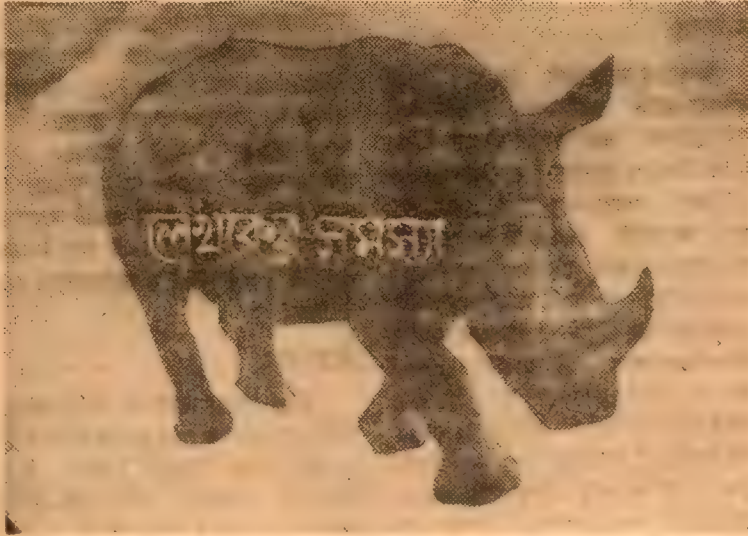
সমৃদ্ধ করেছে। একটি হচ্ছে লক্ষণ রচিত অণুবর-রস-পদেই (সং-অনুবৃত্ত-রসপ্রদ) এবং অপরটি হচ্ছে মহেশ্বর সূরি বিরচিত নজমমঞ্জরী।

একটি মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ অপভ্রংশ সাহিত্যে বর্তমান। সেটি হচ্ছে আব্দুল রহমান বিরচিত সন্দেশরাসক। লেখক মুসলিম তন্তুবার সম্প্রদায়ের, পিতার নাম শ্রীরসেন, সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। ২২০টি স্তবকে রচিত ষোড়শ শতকের এই গ্রন্থটির বিষয়-বস্তু হচ্ছে মেঘদূত ধরনের। নায়ক ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা করেছে এবং তার উদ্দেশ্যে তার পত্নী একটি বাবসায়ীর মারফৎ পত্র পাঠাচ্ছে। এই পত্রে বিপ্রলম্ব রমণীর বেদনা আশ্চর্য সন্দর্ভরূপে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার

যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র তাঁদের পক্ষে অপভ্রংশ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সেই হিসাবে পূর্বে উল্লিখিত অপভ্রংশ সাহিত্যের মূল্যবোধ গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। স্বয়ংস্বত্বের শোম-চরিত্র সিংঘি জৈন সিরিজের গ্রন্থ হিসাবে ভরনির সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পদ্মদন্তের জগহর-চরিত্র এবং মহাপুরাণ বৈদ্যের সম্পাদনায় যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৭-৪১-এ প্রকাশিত হয়েছে। নায়কুমার-চরিত্রের সম্পাদনা করেন জৈন প্রকাশকাল ১৯৩৩। কনকমারের করকণ্ড-চরিত্র গ্রন্থটিও জৈনের সম্পাদনায় ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ধনপালের ভবিনহস্তকা সম্পাদনা করেছেন জ্যাকোবি, মুনচেন থেকে তা ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। হরিশ্বেগের সনকুমার-চরিত্র গ্রন্থটিও জ্যাকোবি সম্পাদনা করেছেন জার্মান অনুবাদ সমেত এবং তা প্রকাশিত হয়েছে ১৯২১ সালে। সুপ্রভাচার্যের বৈরাগ্যসার এবং মহেশ্বর সূরির নজমমঞ্জরী ভাস্করকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। জোইন্দ বা যোগীন্দ্র রচিত পরমপুণ্যসার (পরম-প্রকাশ) এবং যোগসার (যোগসার) ১৯৩৭ সালে উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বরোদার গাইকোয়াড় সিরিজ জিনদন্ত সূরির কাশ-স্বর-পকুলম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭ খৃস্টাব্দে। আরও কয়েকটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে মাঘরম্ম দোহা (করজ, ১৯০২)। নায়ক (বোম্বাই) এবং পাণ্ডুলোহা (অমরাওতি, ১৯৩০) আব্দুল রহমানের সন্দেশরাসক বোম্বাই-এর সিংঘি জৈন সিরিজ প্রকাশ করেছেন ১৯৪৫ সালে।

৪ নম্বর ওদেশে মিলানি এক এদেশে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

যেতো না লেখাই একদিক দিয়ে ভাল। কিন্তু এর থেকে আবার আর এক সমস্যা দেখা দেয়, কিছ, করব অথবা কিছ, করব না, বেঁচে থাকাই ভাল, কি না বাঁচাই উচিত, কাজ করা, বা না কাজ করা, কোনটা ঠিক কে বলে দেবে? আর লেখাটাও তো এক ধরণের কাজ।

আমার বক্তব্যটা কি বিশেষভাবে আমারই নিজস্ব? আমি যা উদ্ভাবন করছি বা মনে করি আমি উদ্ভাবন করছি, বা বর্ণনা বা আবিষ্কার করি, বা ভাবি তাই করছি, তা কি আমি নিজেই করি? জনসাধারণের কি জামাকে নিয়ে বা আমার কাজ নিয়ে কোন দরকার আছে? কোন লোকই কি তাদের পক্ষে অপরিহার্য? আমার সম্বন্ধে চাহিদা আছে বলেই কি আমি তাদের মধ্যে স্থান করে নিতে চাই, না জোর করে নিজেকে তাদের মধ্যে নিষ্কেপ করি? অথ তাই যদি হয়, সে অধিকার কি আমার আছে? অন্য কেউ কি আমার স্থানটা নিতে পারত? একথাটা কাউকে লেখাবার দরকার হয় না যে সাহিত্যিক হলেই তাঁর লেখার ভাষা করা হবে। বিচার করব হবে, তাঁর রচনা হয় গৃহীত, না হয় পরি-
ত্যাগ হবে। সবাই জানেন তিনি একটি কনসার্টের কর্মী এবং এ কনসার্টটি অগ্রগতির পথে চলেছে। লেখকের অস্তিত্বকে অন্তত তাঁর বক্তব্যকেও অস্বীকার কববার জন্য মেনে নেওয়া হয়।

কোন কিছ, না থাকলে তৈরী অস্বীকার করবার দরকার হয় না। সাহিত্যিক নিজেকে নিজেকে বলেন—এইভাবেই আমি নিজেকে অন্যদের ভেতর থেকে খুঁজে পাই। অন্যদের মাঝে থাকি, তাঁর অর্থ হচ্ছে আমি অন্যদের থেকে পৃথক নই, আবার আমি “আমি-ই”। অন্যেরা আমার দ্বারা কথা বলে। আমার পৃথক সত্তা যতটা তার থেকে অনেক বেশি অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার মিলিত-সত্তা। নিজস্ব সত্তাটা কি? এর মানে কি এই যে আমার মধ্যে এসে অনেকগুলোর সত্তা মিলিত হয়েছে? আমি কি অসাধারণ? এক সেই কারণেই কি আমি সবার মধ্যে বিস্ময়ের উদ্ভব করি, কোতাহল জাগিয়ে তুলি? অথবা এর দুই-ই কি সত্তা? নিজস্ব সত্তাটা কি বস্তু? এই যে আমাদের সত্তা, এটা কি স্বল্পস্থ বা অপেক্ষিক? “আমি” (যার চিন্তাশক্তি আছে) অর্থাৎ আমার নির্ধারক সত্তা—তাই তো আমি সজ্ঞা দিতে পারি না; যেসব চিন্তাকে আমি আমার নিজের বলে মনে করি তা ভেে অন্যের দ্বারাও স্থিতিকৃত হতে পারে। আমরা কি একে অনেক স্থান পূরণ করতে পারি? না একের অভাব অন্যে ভরে দিতে পারে না? এর উত্তর বই হোক না কেন এর থেকেই বেশকিছু অস্তিত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্ভা-
পনা পান এবং তাঁর বক্তব্য বলবার বা বলবার চেষ্টা করার জন্য। এই চিন্তাই

তাঁর নিজের পেশা সম্বন্ধে তাঁর অস্বীকৃত দূর করে দেয়; লেখা এবং কাজ করা যদি অস্বীকারের প্রকাশক হয়, তা হলে না-লেখা এবং না-কাজ করাও আর এক ধরণের অস্বীকারের নির্দেশক।

ঈশ্বরতত্ত্ব বা দর্শন থেকে আমি অস্তিত্বের ব্যাখ্যা বিষয়ক কোন সদুত্তর খুঁজে পাই নি। এ সবার ভেতর এমন বিলম্বিতাৎম্য যুক্তিও নেই যা আমাদের অস্তিত্বের সার্থক রূপায়নের জন্য উদ্ভা-
পনা যোগাবে বা এর কোন গভীর অর্থ আমাদের সামনে তুলে ধরবে। জার্নি না পৃথিবীটিকে কাজ সম্পন্ন। কিন্তু কারো হাতে একে কুলে ঝড়তেও আমার মন চায় না—কেমন চায় না নিজেকে অন্যের হাতে কুলে দিতে। পৃথিবীতে থাকতে থাকতে এখানে থাকটাই একটা অভ্যাসের মত হয়ে গেছে—সেই জন্যই কখনই এটাকে ঠিক নিজের গৃহ বলে নিতে পারলাম না—মানে হয় আমার আসল গৃহ অন্য কোথাও। যদি কোথায় জানতে পারতাম, সর্বদিক দিগন্তে ভাল হোত—কিন্তু জার্নি না এ প্রশ্নের উত্তর কি করে পার। যখন অনেকেই মনে এ বিষয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ থাকে, তার থেকেই বোঝা যায় কোথাও না কোথাও এই অন্য জায়গাটা আছে। হয়তো এই পৃথিবীতেও তাকে পাওয়া যেতে পারে—আমি তাকে পরম্পরায়িকার করতে পারছি না। অথবা আমি বা খুঁজছি সে জায়গা এ-পৃথিবীতে নেই। কোন কোন লোক এর উত্তর দিয়েছেন, বা মনে করে-
ছেন যে উত্তর দিতে পেরেছেন এবং সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমি আনন্দিত এবং তাঁদের আমি প্রায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। আমার নিজের তরফ থেকে বলতে পারি আমি—অর্থাৎ যে “আমি”—র সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় দুঃসম্পদ—এখানেই আমি এবং আমি লিখি নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজের চিন্তাধারা অন্যের ভেতর সম্ভাবিত করতে, নিজের কাছে যা কিছু বিস্ময়কর বা বার জন্য তাঁর ব্যাকুল তা অপরকে জানাতে। প্যারিসের রাস্তার চোচাল করবার সময়, বা পৃথিবী পরি-
ভ্রমার যখন বের হই এই “বিস্ময় এবং ব্যাকুলতা” আমার মন জ্বড়ে থাকে। এক-
এক সময় মনে হয় আমার নির্দিষ্টভাবে বলবার কিছু নেই, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় আছে—তারপর এসব কিছুকেই ভিত্তিহীন ছায়ার মত লাগে—শেষ পর্যন্ত তারা বেন মিলিয়ে যায়।

একথা বোধ হয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমার চিন্তাধারার ভেতর একটা পরস্পরবিরোধী ভাব আছে। এর কারণ কি এই যে কৈশোরের ভেতর আমি সংজ্ঞিত সৃষ্টি করতে পারি না? না যেহেতু আমাদের মনের চেতনতার ভেতর নানা স্তর আছে, সেইসব স্তরের পরস্পরবিরোধের থেকেই এই বৈষম্যের সৃষ্টি? হয়তো এই দুটি

সত্যবাদী ঠিক। সময় সময় আমার মনে হয় কোন বিষয়ে আমি বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে উঠি। আমার মনে হয় আমি তখন চিন্তা করতে থাকি। বিবিধ মতবাদের কোন একটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করি। বিশ্লেষণ করতে থাকি। বাছাই করে নিই, বন্ধ করতে থাকি এবং এ সময় যা করি তার ভেতর থাকে প্রচণ্ড আগ্রহ এবং অদম্য জেদ। কিন্তু এ সময়েও আমার অন্তরের অন্ত-লতল থেকে একটা প্রতিবাদ ভেসে ওঠে যা আমাকে বোকাতে চায় যে আমার স্বিরী-কৃত মতবাদ, আমার প্রচণ্ড আগ্রহ এবং জেদের মূলে কেন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। সুতরাং ঐ মতবাদকে এবং আমার ঐ ধরনের মনোভাবকে ত্যাগ করাই বিধেয়। আমার নিজের এত জ্ঞান নেই যে আমার কার্যসারার সঙ্গে আমার অন্তর-মানসের অনিশ্চয়তার যোগাযোগ স্থাপন করি। এসব কথা কেন আমি বলছি? প্রত্যেক লোকই যখন একলা থাকে এসব প্রশ্ন তার মনে ওঠে। মনের এইসব বিধা-সঙ্কেচপূর্ণ অবস্থার ভেতর দিয়েই লেখককে রচনা করে যেতে হয়। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার বক্তব্যের এই হচ্ছে মিতব্যী ব্যক্তি।

আর একটি ব্যাপার পরিক্ষার করে বলতে চাই। স্ক্লেস্টিসিজম বা নন-স্ক্লেস্টি-সিজমকে আমি পেশা করতে চাই না। আবশ্যিকতার সমস্যা নিয়ে আমি তর্ক তুলতে চাই না। বিশ্লেষণ বা বাছাই করে মতবাদ ঠিক করার মূল্য আমার আলোচ্য বিষয় নয়। কেউ কেউ বলেন আমার মনের গভীর অনিশ্চয়তাকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়, আমাকে অমূলক অমূলক প্রেক্ষিতে ফেলা যায়, আমার স্বিরীকৃত বা অস্বিরীকৃত মনোভাব গড়ে উঠেছে আমার ভেতরকার বহুবিধ বৈকল্য-মূলক এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার দ্বারা—ঐতিহাস বা ডায়ালেক্টিক্স এর অর্থ করে দিতে পারে। আমার বক্তব্য এমন সব মহত্ব আসে যখন আমি বাছাই করে নিই, পক্ষপাতী হই। অবশ্য এমনও হতে পারে যে মোহহাস্ত হয়ে আমি ভাবি যে ঐ সব সময়ে আমি ঐ ঐ রকম হয়ে কই। আমি এখনো চেষ্টা করছি আমার মনের গহনের পরিচরিতা তুলে ধরতে। তুলে ধরতে এবং মনের আসল রূপটা প্রতিভাত করতে। ঘটনার দ্ব্যতপ্রতিধাতে আমি হয়তো অবনমিত হয়ে পড়ি, কিন্তু অন্য লোকের তিরস্কা থেকে আঘাত এলে তাতে বাধা দিই। প্রত্যেকের মতই বা বেশির ভাগ লোকের মতই আমার মনে স্বাভাবিক প্রতিতিক্রিয়া হচ্ছে। অন্যের মতবাদের বিরুদ্ধতা করা বা মতবাদের আকারের বক্তব্যের—অবশ্য ওই সব মতবাদ বা

বক্তব্য যদি আমার উদ্দেশ্যে বলা হয়—প্রতিক্রিয়াচরণ কর। I see the negative or mistaken elements in other people's assertions. কোন মতবাদ ভুল, কোনটি নিতুল এর বিচার করবার আমার অধিকার কি? আগেই বলেছি আমি যাচাই করি, লীবনের ছোটখাট বহু ব্যাপারে আমি মেনে নিই, অথবা আমার মতশ্বেষ হয়। আমি বলে থাকি কাল রঙ আমি অপছন্দ করি, নীল রঙ আমি ভালবাসি। হয়তো কি কারণে এ রঙের থেকে ও রঙকে পছন্দ করি তার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব—কিন্তু সে ক্রেতা সময় সাপেক্ষ। ইউজিন স্মুর থেকে বালজাকের লেখা আমার ভাল লাগে—ফেদের থেকে শেক্সপীরারকে। স্পল্টই বোকা বাছে এর পেছনে কয়েকটি কারণ আছে এবং সেগুলি সাহিত্য বিবরক।

মোটামুটি বলা চলে যে ফেদের থেকে শেক্সপীরারকে পছন্দ করার কারণ হল—শেক্সপীরারের জগৎটা অনেক বেশি মূল্যবান, জটিল, মানবতার দিক দিয়ে অনেক বেশি বিরাটাকৃতির। অনেক বেশি সত্যি এবং গভীর, ফেদের জগতের তুলনায়। কিন্তু শেক্সপীরারে কি পাই যা ফেদের ধরা-ছোঁওয়ার অনেক উর্ধ্বে? সেটা হচ্ছে শেক্সপীরারের রচনার সাউন্ড এন্ড ফিউরী, তার রচনার বহু মূল্যবান প্রশ্নসমূহ যা ঐ ক্রেতা হাস্যরসাত্মক লেখকের লেখায় পাওয়া যায় না।

Both my chaos and my bewilderment are missing from Feydean. What I recognise in Shakespeare is not answers but questions and events, together with a number of notations or self evident truths. No final solutions. This is why I say that to ask oneself a question without supplying an answer

self questions at all.

যে সব বই মাঝে মাঝে পড়ি, দেখি তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি। যে সব সময়ের সমাধান দেওয়া হয়েছে তাও ভুলে ভরা।

অস্বাভাবিকভাবে মতবাদ চিরকালই সাময়িক। আমার কাছে এ জাতীয় মতবাদ শব্দ অস্থায়ীই নয়—আমার মনে হয় এরা এক ধরনের প্রকল্প বিশেষ, কোন কিছু পরীক্ষা করবার আগে বুদ্ধিহীন অনুমান—এ ধরনের অনুমান সব সময়েই অন্য ভাবতত্ত্ব বা অন্যভাবে চিন্তার দ্বারা অপসারিত হতে পারে। আমার কোন কিছুতে বিশ্বাস করবার ইচ্ছা হলে নানাভাবে ঐ বিষয়ে নিজেদের প্রত্যয় করবার চেষ্টা করি। ভাবতত্ত্ব-গুলি সামান্য অটো-সাজেশনের সাহায্য পেলে আমাদের কাছে বাস্তব-সত্য বলে



ভারতের
আদিত্য
কনসাল্টন

চ্যবনগ্রাশ



আয়ুর্বেদগোষ্ঠ নিম্নলিখ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনগ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি,
শ্বশ্বক ও বায়বায়ের পীড়ার বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
কোর্কলা ও ক্লান্ততা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
বাহন করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড

মনে হয়—কিন্তু তার পাশে কিছু বিপরীত ভাবতত্ত্ব রাখলেই বোঝা যায় আগের-গালি অবাস্তব শ্রেণীতেই পড়ে। আমি আছি—কিন্তু কে এই “আমি”? আগেই বলেছি, এ বোঝানো কঠিন। এটা একটা প্রচলিত বিশ্বাস—কিন্তু তবু “আমরা” বা “জনসাধারণের” বলতে যা বোঝায় তার থেকে কম অস্পষ্ট।

এ সম্বন্ধে বলবো কিছু কিছু জিনিস সত্যিই আছে। এই সব জিনিস ব্যবহার করা যায়; এদের সাহায্যে অন্য জিনিসও সম্পন্ন হতে পারে—যেমন, শ্রম করা, কাজ করা, রচনা করা। আমি কাজ করতে পারি—আমি লিখি। গৃহনির্মাণ করা হয়ে থাকে, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য যেতে পারি, ইত্যাদি। এ সব ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট নিদিষ্ট। আমরা হিসাব করতে পারি—অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে আমরা নড়তে চড়তে পারি, অথবা যেখানে আছি সেখানেই স্থানান্তরিত হয়ে থাকতে পারি, অথবা বস্তু নিয়ে ব্যবহার করতে পারি।

আমি এ কথাও জানি প্রত্যেক জিনিসই, যা দেখতে পাই বা যা তৈরি করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব আছে, তা চিরকাল ছিল না এবং যে বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভবিষ্যতে তার লয় হবেই হবে। এই প্রামাণ্য গাছটি চেরী গাছ নয়। কিন্তু কে বলতে পারে যন্ত্রের সংগে প্রাথমিক করলে পরে তা হবে না? এবং এই প্রামাণ্য গাছটি কোন না কোন সময়

অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে—অর্থাৎ এর কোন চিহ্নই থাকবে না। যখন এই প্রামাণ্য গাছটি আর থাকবে না, কারোর সাধ্য নেই যে জোর দিয়ে বলে এক সময় এটি ছিল। আমার খিদে আছে, কামনা আছে, কিন্তু এর কারণ কি তা আমি বলতে পারবো না—আমার জানা নেই। আমার ধারণা এই সব ব্যাপারের মূলে যদি যাওয়া সম্ভব হত, কারণ আবিষ্কার করা যেত, তাহলে হয়তো কামনা, বাসনা, ক্ষুধা, ভীতি, প্রেম এবং ঘৃণা প্রভৃতি অপসৃত হত।

আমার মনে হয় কোন কিছুই কোন কারণ নেই এবং বস্তুটির অগম্য কোন শক্তির দ্বারা আমরা চালিত হচ্ছি। কোন কিছুই কোন কারণ নেই। আমাদের অন্তরের সব কিছুই তর্কসাপেক্ষ। আর যা বাইরের বা যাকে আমরা বাইরের বলি, যেমন যা কিছু সত্যিই ঘটছে বা বস্তুরাশি, সে সব নিয়ে তর্ক চলে না। অথচ তাদের স্বাধীনতা বা না থাকার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার নিজের ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনে করি এ সমস্যাটি হচ্ছে অসম্পূর্ণ অথবা মিথ্যা বা অদ্ভুত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু একথাও আমি সন্নিহিতভাবে বলতে পারি না, কেন আমি লিখে চলছি। অথচ চিরদিনই আমি লেখক, যেমন ধরুন আমার স্মৃতিশক্তি বর্তমান ধরে কাজ করছে আমি দেখছি আমি বেঁচে আছি

—আর জীবনের প্রকৃত অর্থ কি এই নিয়ে অবাক-বিস্ময়ে চিন্তা করছি। লেখবার জন্য আমি ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করি, নিজেকে প্রশ্ন করি, নিজের চারদিকে তাকিয়ে যা দেখি তার বর্ণনা করি। কিন্তু যখন আমি মন্দের (আমার কাছে যা মন্দ মনে হয়) নিন্দা করে লিখি, অথবা অন্যকে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ করি এবং তাদের ব্যবহার নিয়ে নীতি উপদেশ দিই—এসবের উপযোগিতা খুব সংকীর্ণ ধরনের বলেই আমার মনে হয়। যখন কারোর পক্ষাবলম্বন করি, সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে আশ্চর্য হই, কেন এরকমটা করছি—আমার মনে হতে থাকে এটা ঠিক হচ্ছে না। আমার সমস্ত সংস্কার এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপারগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার অনুভূতির দ্বারা সূচ্য হয়, কিন্তু সেগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করার তেমন কোন উপায় নেই। আমার যে সব রচনায় বিস্ময় এবং বিহ্বলতাপূর্ণ ভীতির প্রকাশ দেখা যায় সেই সব লেখাই নিখাদ এবং সারগর্ভ। আসলে আমার অন্তরের অন্তিমস্তরে বিরাজ করছে গভীর অন্ধকার—অথবা তাকে চোখ খুলানো তীর আলোও বলা যেতে পারে।

[এই প্রসঙ্গে কবিগুরু প্রান্তিকের ‘দেখি নি অদৃশ্য আলো, যে আলোক নিখিলের স্তরে স্তরে’ লাইনটির কথা মনে পড়ে। এ্যাবসার্ড নাটক যারা লিখেছেন, যেমন—বেকট বা আর্যোনস্কা এঁরা সব জিনিসের একেবারে অন্তিমস্তরে চলে যেতে চান—এই জন্য এঁদের মেটাফিজিসিয়ানও বলা যেতে পারে— কারণ এঁদের আশ্রয়ের বস্তু হচ্ছে Quintessence of Things যদিও এঁরা বলেন সব কিছুই এঁদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য পূর্ণ—সব কিছুই এঁদের কাছে অন্ধকার, তবু আমাদের কাছে এঁরা আলো হাতে চলছেন অধারের যাত্রী। এই জাতীয় দার্শনিকেরাই আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত তুলে ধরেন বস্তুজগৎ এবং প্রাণীজগতের আসল রূপ। থিয়েটার এবং এন্টি-থিয়েটারের পারস্পরিক দোষগুণের বিচারের কথা না তুলে বলবো এঁরা সত্যের সাধক—সেই কারণেই এঁরা বড় এবং অসাধারণ। এঁদের নাটক নাটক হিসাবে কতদিন টিকবে জানি না—তবে ভবিষ্যতেও চিন্তাশীল পাঠক এঁদের রচনা থেকে বহুল পরিমাণে চিন্তার খোরাক পাবেন একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।]

[কুমার]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাণপুত্র

বেঙ্গলুরু - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

আকাশবাণী

মেঘদূত



পরিভ্রমণ

কুদরিমান-বাদল-দীনেশ প্রদর্শিত।
রাজির দুই বন্ধু মিলে রোডিও শুনাই।
এটির হলো শেষ, একটু পরে শব্দ হলো
উপরার্পিত শ্রী তি তি শিরির কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মতন উপসেবের ভাষণের
অংশ-বিশেষ। উদ্দেশ্যবোধ্য অংশ যা কানে
এলো তা হচ্ছে, তিনি বলছেন, ছাত্রদের
রাজনীতি থেকে দূরে থাকে বাছনীয়।

পর পর দুটি অনুষ্ঠানের দুটি উক্তিঃ
শহীদ (ছাত্র) প্রদর্শিত এক উপরার্পিত
ছাত্রদের সম্পর্কে সাবধান বাণী। পরস্পর-
বিরোধী। আমাদের দুই বন্ধুর আলোচ্য
বিষয়টিকে সংক্ষেপে এখানে তুলে দিলে
আশা করি বুঝতে সারিথে হবে, কেন
কান্ডে চাই—পরস্পরবিরোধী।

কুদরিমান-বাদল-দীনেশদের কাছে কে
না মাথা নোয়াবে। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে
বে শৌর্য-বীরের পরিচয় দিয়ে গেলেন এরা
তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে রইল। এদের
কেউ ছিলেন কিশোর, কেউ বা অল্পবয়স্ক
যুবক। সকলেই ছিলেন ছাত্রসম্প্রদায়ভূক্ত।
লেখাপড়া শিখে শব্দ নিজেরা মানুষ হবো
এমন কথা তাঁরা ভাবতে পারেন নি সোদন।
তাঁদের স্মৃতিতে ছিল একটি মাত্র আদর্শ—
দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত
করা। তারই ভাগিদে আগুন জ্বালানেন আর
জ্বললেন নিজেরা। কালজয়ী বীর—এরা
নমস্যা এঁদের আমরা প্রণাম করি।

এই প্রসঙ্গে ছাত্র সূভাষচন্দ্রের বিপ্লবী
আচরণকেও স্মরণ করুন। সোদনের
প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই দামাল ছেলেরটিই
তো পরবর্তী বুলের নেতাজী সূভাষচন্দ্র।
ছাত্র-রাজনীতি স্বীকার না করলে নেতাজী
চরিত্রের কোন অংশে কাঁচি ঢালাবো!

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ছাত্ররা আন্দোলন
করেছেন, নিঃশেষে প্রাণও দিয়েছেন।
জীবিতদের অনেকে পরবর্তীকালে দেশের
নেতৃত্ব করেছেন এবং করছেন। কেউ
আলো দেখিয়েছেন কেউ বা তা দেখাতে
পারলেন না।

রোডিওতে পরস্পরবিরোধী দুটি
অনুষ্ঠান ভালো করে শোনার পর
স্বাভাবিক নিয়মে কথগুলো উঠলো।
মাত্র ক' মিনিটের ব্যবধানে রাজনীতিক
কারণে মৃত্যুবরণকারী ক'টি সর্বভাগী
ছাত্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং
ছাত্রদের রাজনীতি থেকে তফাৎ রাখার
অনুরোধ! অধুনা ছাত্রদের কর্তব্য কি
হতে পারে তা অন্তত রোডিও শ্রবণে আমার
বা বন্ধুর কারুর মগজে ঢুকলো না।

সেজন্য যেতার কণ্ঠশব্দকে দারী করছি
না। সব কিছুর জন্য দারী আমরা প্রতিটি
দেশবাসী। যেন একটা প্যল-ছেঁড়া-
নোকো এমন অবস্থা আমাদের। ভাইনে-
বারে কেন দিকে যে কে টানে—কেন টানে
কি উদ্দেশ্যে টানে তা সর্বত্র অস্পষ্ট। যে
মানুষ মন পেতে রোডিও শুনলো, তার
কি মনে হবে না, যিনি বা যার। কিছু
বললেন তা কি ভেবেচিন্তে বলা হলো।

আমরা হয় মৃদুস্ব স্বীতিহাস আওড়াচ্ছি,
নয় সরমন দিচ্ছি। ইতিহাস পাঠের ক্ষমতা
সকলের থাকে না। থাকলে এলোমেলো
সূত্রগুলো পড়ে ফেলা বেত। তবে আশার
কথা, ইতিহাসের লিখন বড় নিষ্ঠুর, বড়
বা না বড়ি, মানি না মানি, একদিন তা
স্পষ্ট গোটা গোটা অক্ষরে আপন মহিমায়
ফুটে উঠবে। এসব ভেবেচিন্তে মনে হয়
না কি, আমাদের সমস্যাগুলো কলিটপাথরে
মাচাই করলে কি জোর করে বলা যায় যে,
ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।
আর যদি সম্ভব না হয় সেজন্য দারী
কারা?

মানে নেওয়া হলো যে, প্রত্যক্ষভাবে
রাজনীতিক আন্দোলনে ছাত্ররা নিজেদের
জড়াবে না। তারা যে-ছোট গণ্ডিগুলোর
মাথা অধারন করছে সেখানে রাজনীতি
তো রাবণের চিতার মত চিরবাহমান।
তার দহন থেকে কে তাদের মৃত্তি দেবে?
মনে হয়, ছাত্ররা যদি ইট কাঠ পাথর হতো
তবেই সবকিছু এড়িয়ে বেঁচে মরে থাকতে
পারতেন। কিন্তু তারার যে জীবন্ত মানুষ
বোঝনের অঙ্গভূত। বিভিন্ন পার্টির হাত
থেকে ছাত্রজগৎকে মুক্ত রাখা যত কঠিন
ভৌতিক কঠিন হচ্ছে তাদের জগৎকে
শক্তিমত্ত করা। কোমল হাতে পাক সরোভে
চাইলে মারমুখী সহানুভূতিহীন প্রবীণের
হাতে মার খাবে এবং লাঞ্চে। প্রবীণ চায়-
তার পুরনো স্বার্থিক স্বয়ং সেরোক্ত
জগৎকে নবীন চাইছে অচলারতন ভেঙে
কালপৈতাকে বিদায় করতে। যার অবশ্য-
স্বাভাবী কল রাজনীতিক লড়াই। এ-লড়াই
গতকাল ছিল আজও আছে আগামীদিনের
কথ—কে জানে? আর এই রাজনীতিক
কেন্দ্র করেই তো বাইরের পার্টিগুলি ছাত্র-
আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশাধিকারের সংযোগ
পেয়েছে এবং কালক্রমে ছাত্র-আন্দোলন
রাজনীতিক দলীয় আন্দোলনের রূপ
নিতে রূপা হয়েছে। এজন্য যদি দারী
করতে হয় নিশ্চয় ছাত্রসম্প্রদায়কে নয়,
হয়তো বা পার্টিগুলিকেও সম্পূর্ণ দারী

করা যায় না। দারী হচ্ছেন প্রবীণরা,
অচলারতনের মেজাজী পাহারাওয়াল দল।

১৬-৮-৬৭ সকাল ৭-৪৫ মিঃ সূচিয়া
মিঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গাইলেন,
'বাসন্তী, হে ছুবনমোহিনী' এবং
নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন'
শিল্পীর কণ্ঠের প্রাজল সুর, অপূর্ব
ভঙ্গী এবং হারমনিজ মন মাতিয়ে দেয়;
তবু বর্ষার এ দুটি গান কেন তিনি
বাছলেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়।
ক্যালেন্ডারে বর্ষার পালাতে এখনো
দু-একটা দিন বে বাকি। -তা ছাড়া ক'টা
কত্থকে উপকে শ্রীমতী মিত্র এমন করে
বসন্তকে আকর্ষণে চাইলেন কেন? কত্থ
পারবর্তনে প্রাকৃতিক নিয়মে বসন্ত জে
একদিন আসবেই। আর যদি বেতার কত্থ-
পক্ষ শিল্পীর কণ্ঠের পুরনো টেনে বাজিয়ে
থাকেন তবে তাঁদের রসবোধের প্রশংসা না
করে পারি না।

অগ্নিমিত্রের পত্র সাপ্তাহিক বসন্তমতীর
১০ আগস্ট, '৬৭তে প্রকাশ করা হয়েছে।
এ সংখ্যার আমরা আকাশবাণী, কলকাতার
সহকারী অধিকর্তার কাছ থেকে পাওঁ
পত্রাবানি পাঠকদের স্ত্যাতার্থে ছাপালায়।

"সাপ্তাহিক বসন্তমতীর ২৭ জুলাই,
'৬৭ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যার আকাশ-
বাণী পরিভ্রমণ বিভাগে কলকাতা বেতার-
কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি প্রচারিত অগ্নিমিত্র
রচিত নির্বাসন নাটকটি সম্বন্ধে শ্রীমতী
গীতা ঘোষের যে-অভিযোগ আপনার প্রকাশ
করেছেন, তা ঋণ্ডন করে অগ্নিমিত্র ৩১
জুলাই তারিখে আপনার কাছে একখানি
পত্র পাঠিয়েছেন, যার অনুলিপি আমরা
পেয়েছি।

যেহেতু ব্যাপারটি মূলত সভ্যতার
প্রশ্ন, এবং আকাশবাণীর নামও এর সঙ্গে
জড়িত, অগ্নিমিত্রের পত্রাবানি শীঘ্র
আপনার পরিচায় প্রকাশ করলে আমরা
বাহিত হব।

পরিষেবে এই সুযোগে কৃতজ্ঞচিত্রে
জানাই, মেঘদূতের বেতার সমালোচনা
আমাদের কাছে অভ্যন্তর মূল্যবান এবং
আমাদের কাজে সর্বিশেষ সহায়ক। আপনা-
দের আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য অশেষ
ধন্যবাদ।"

—সহকারী কেন্দ্র অধিকর্তা
'আকাশবাণী', কলকাতা
৮ আগস্ট, '৬৭

রক্তচোরা

হলের ভাড়াবন্ধির বিপদ

কলকাতায় চারটি পেশাদারী থিয়েটারের পাশে আরো অসংখ্য আধা-পেশাদারী ও অপেশাদারী নাট্যসংস্থা নিয়মিত অভিনয় করছে। প্রতিদিন শহরের কোথাও না কোথাও নাটক অভিনীত হচ্ছে। পেশাদার মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে মৃৎপতি, শনি ও রবিবার। বাকি চারদিন আধা-পেশাদার, অপেশাদার বা অফিস ক্লাবগুলি ভাড়া নিয়ে অভিনয় করে। স্টার, বিশ্বরূপা, রংমহল ও মিনার্ভা, এই চারটি পেশাদার থিয়েটার। সম্প্রতি কাশীবিশ্বনাথ হল (মাণিকতলা), দ্রুত অগ্নি, থিয়েটার সেন্টার এবং প্রতাপ মেমোরিয়াল হল নিয়মিত নাটক অভিনীত হচ্ছে। এই হলগুলিতেও প্রতিদিন কোন না কোন সম্প্রদায়ের নাটক অভিনীত হচ্ছে

এই মধ্যে মহাজাতিসদন, রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্রভারতী হল, লেক স্টেডিয়াম হল, হিন্দী স্কুল ও প্রীতিকাভূমি হল, প্রভৃতিতে নাটক অভিনয় খুব অনিয়মিত এমন বলা চলে না। রবিবার সকাল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে খালি যায় না। তবুও হল পাওয়া যায় না। হলের অভাব মেটাবার জন্য নাট্য সম্প্রদায়গুলি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শহরের আনাচ কানাচ অনু-সন্ধান করে। এভাবে খুঁজে বার করেছে মহারাষ্ট্র নিবাস হল, তার পরে কলকাতায় প্রবাসী কেরালিয়ানদের নির্মিত হল এবং সম্প্রতি অম্বর হল। এই হলগুলিতেও যখন কুলোর না, তখন এ-বি-টি-এ হল, ইউনিভার্সিটি হল উপস্থিত হয়। কলকাতার মত মহানগরী, বিশেষ করে যেখানে অসংখ্য নাটকের দল ও নাটকপ্রিয় মানুষ রয়েছে সেখানে এই হলগুলিতেও



উত্তমকুমার

গাহিদা মেটাতে পারছে না। আরো হল চাই।

হলের অভাবের সুযোগ গ্রহণ করছে হলের মালিকরা। কয়েক বছর আগে যে হলের ভাড়া ছিল আড়াই-শ-তিনশ এখন হয়েছে সাত-আটশ টাকা। মৃৎপতি যে যত প্রগতিশীল কথা বলেন না হলের ভাড়া আদ্যে ক্যাপিটালিস্ট প্রোপেটারিয়েট ভেদাভেদ নেই। ভার্গবনিয়ন্ত্রিত হল-গুলির ভাড়া আরো বেশি—এক হাজার টাকা। ছোট হলগুলিও তিন-চারশর কমে পাওয়া যায় না। নতুন হলগুলি প্রথমে আগ্রহ করে নাট্যসংস্থাগুলিকে ভাড়া দেয়। উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে হলকে পরিচিত করা, তার পরে কিছদিন পরে বিনা বাক্যব্যয়ে ভাড়ার অঙ্ক বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে অপেশাদার নাট্যসংস্থা-গুলি নতুন নতুন হল খুঁজে বার করতে, কাছাকাছি কোন চম্বরে বা বড় বাড়িতে মঞ্চ স্থাপন করছে, জার ভূতের ভাড়া করার মত ভাড়াবন্ধির অঙ্ক সংস্থাগুলির পেছনে ছুটেছে। পেশাদার থিয়েটারের মালিকদের টাকার চাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য সংস্থাগুলি পাড়ায় পাড়ায় এনেও আশ্রয় দিতে পারছে না। এভাবে ভাড়ার অঙ্ক বাড়তে থাকলে বহু সংস্থার পক্ষে নাটক মঞ্চস্থ করার সাধ্য থাকবে না।

আশ্চর্যের কথা পৌরসভার কোন হল নেই যেখানে কম ভাড়ায় নাটক অভিনয় করা চলে। সরকারী হলগুলি হাজার টাকার নিচে দরজা খোলে না। হলের ভাড়া বন্ধির বিরুদ্ধে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ আইন নেই। নাটকের মহলে অবোধে কালোবাজারী চলছে! অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি বাবে কোথায়?

—সুজন



সোভিয়েট ছবি 'জোসিয়া'র পোলা রাকসা (জোসিয়া) এবং এন, মেরেলিথিন (ভিক্টর)

নাটকের কথা

স্বপ্ন নয়

চলচ্চিত্র গ্রুপের নতুন নাটক 'স্বপ্ন নয়' অভিনীত হচ্ছে। সম্প্রতি অল্প হলে এই নাটকের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। নাটকটি লিখেছেন চলচ্চিত্র গ্রুপের প্রীভোলা দত্ত এবং পরিচালনা করেছেন প্রীরাবি ঘোষ। নাটকের সম-রোপযোগী কাহিনী ও নাটকীয় দৃশ্য পরিচালনা দক্ষতা, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয়-গুণে নাটকটি উপভোগ্যতার দিক থেকে যেমন সার্থক, তেমন চিত্রার বলিষ্ঠতায় এই ভাঙাগড়া ও ইতস্তততার কালে দর্শকদের কাছে একটা বস্তু রাখতে সমর্থ হয়েছে। এই বস্তু প্রকাশের সময় প্রচারের উগ্রতায়, আতিশয্যপূর্ণ সংলাপ প্রয়োগে বা কোন রকমে শিল্পগুরুকে ব্যাহত করা হয় নি, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নাটকের গতি অগ্রসর হয়েছে, এবং স্বপ্নের দৃশ্যে নাট্যকার ও পরিচালক চমৎকার কল্পনাসম্পত্তি ও আঙ্গিক রচনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই স্বপ্ন দৃশ্য দর্শকদের অভিভূত করে রাখে এবং সে সময় মূল-চরিত্র সাহিত্যিকের অনুভূতি আর দর্শক-দের কাছে এই চরিত্রগুলির আবেদন এক হয়ে যায়। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে স্বপ্নে দেখে সাহিত্যিক যেমন তাঁর চেতনা ফিরে পান, দর্শকদের কাছেও এই চরিত্র-গুলির আবেদন সমভাবে এসে পৌঁছায়। দুই ভিন্ন গোষ্ঠীকে একই চেতনাবিন্দুতে এনে উপস্থিত করতে পারা নাটকের সার্থক শিল্পশক্তির পরিচায়ক।

এক সাহিত্যিক একদা গণ-সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন। খ্যাতি ও অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনধারার পরিবর্তন হচ্ছিল, তিনি গণ-সংগ্রাম থেকে সরে গিয়েছিলেন। সারাদিন স্তাবক পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এই সরে যাওয়ায় স্বরাশ্রিত করছিলেন। পুরাতন দিনের একমাত্র স্মৃতি ছিল সময়। যিনি মাঝে মাঝে ঝড়ের মত এসে সাহিত্যিকের চেতনায় নাড়া দিতেন, এবং তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন।

স্বামীর খ্যাতি ও অর্থ কিন্তু স্ত্রীকে ধুব ধুরে টেনে নিতে পারে নি। অতীতের সংগ্রামের দিনগুলিই ছিল তাঁর সুখস্মৃতি। একদিকে স্বামীর সুবিধাবাদী চিন্তা বা



পশ্চিম জার্মানীর বর্ণরঞ্জিত ছবি 'মার্ভার এন্ড ম্যানলাফটর' ছবিতে অভিনেত্রী এনিটা পানবার্গ। এই ছবি কানস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী চিত্ররূপে যোগ দেবে।

বিচ্যুতি আর একদিকে এই বিচ্যুতির পথে একমাত্র কন্যার আঁত আধুনিক হবার সাথ স্ত্রী বিনতাকে বিমর্ষ করে তুলেছিল।

এসময় সময় এল সাহিত্যিকের খেতাব পাবার। স্বদেশী সরকারের খেতাব হলেও এই পুরস্কারের পেছনে কি জমাট আঁধার রয়েছে সে সম্পর্কে বিনতা সজাগ। বিনতা-সাহিত্যিক, সাহিত্যিক-সময় মূল-যুগ্মে ক্লান্ত সাহিত্যিক স্বপ্নে দেখল তারই সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে। জীবনের অভিজ্ঞতায়, সংগ্রামের রক্তক্ষরা দিনগুলিতে যে জীবনকে দেখেছিল, সেই জীবনের প্রতীক চরিত্রগুলি, যারা আজো গ্রামে, বাসিন্দে, মধ্যবিত্ত পল্লীতে ধুঁকছে, অতৃপ্ত কামনা নিয়ে যন্ত্রণাভোগ করছে, জীবনযুদ্ধে লড়ছে। স্বাধীনতা এসেছে, সাহিত্যিক-দের পুরস্কার জুটছে—কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের ভাগ্যের লিখন যেন অখণ্ডনীয় হয়েই রয়েছে। স্বপ্নে দেখা এই বাস্তবমূর্তি সাহিত্যিক নির্মলের চেতনায় আঘাত করল। সকালে উঠে তিনি পুরস্কারের অনুষ্ঠানকে তুচ্ছ করে সময়ের সঙ্গে আবার গণ-সংগ্রামের সরিক হলেন।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের গণ-সংগ্রামের ও সাধারণ মানুষের প্রতি অনুদ্রুতিশীল জীবন থেকে বিচ্যুতি নিয়ে ইতিপূর্বে আরো কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে। একটি নাটকে স্বপ্ন ও বাস্তবের দৃশ্য ছিল। কিন্তু সে নাটকে যে উৎকট বৌদ্র সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে, অনেক সময় কানে আঙুল দিতে হয়। প্রশ্ন জাগে বুদ্ধিজীবীদের গণ-আন্দোলন থেকে সরে যাওয়া বা জন-বিমূর্ষ হওয়াকে আঘাত করে সর্বস্ব ফিরিয়ে আনা এই নাটকের উদ্দেশ্য, ৪১ সংগ্রামের নাম করে বৌদ্রস পরিবেশ উদ্দেশ্য। প্রশংসার কথা, এই নাটকে মঞ্জুরে দিয়ে একটা টাইমস্ট নাচ দেখাবার সুযোগ পেয়েও পরিচালক যথেষ্ট রুচি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে পরিবেশ ও চরিত্র প্রকাশ করেছেন। নাটকের সংলাপগুলি বুদ্ধিবাদী, এবং সহজভাবে অর্থবোধক হয়ে উঠেছে, এবং কবিতা আবৃত্তির অংশ উপভোগ্য হয়েছে।

নাটকটি আমার ভাল লেগেছে, তবে নাটকের শেষটুকু হঠাৎ যেন মিইরে পড়ে। বিনতার সঙ্গে সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার অপরিজ্ঞানীয় এবং অর্থহীন



আর, ডি, বনশাল প্রোডাকসনের 'বদক' গয়া আশমান' ছবিতে সায়রাবানু ও রাজেন্দ্রকুমার

মনে হয়েছে। বিনতা এই পুরস্কারে গর্বিতা ছিল না, তথাকথিত সংবাদের প্রতি যে মোহ আছে এমনও মনে হয় নি। তবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার কেন?

অভিনয়ে চলাচল গ্রুপের দলগত কাজের নৈপুণ্য সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। ব্যক্তিগত অভিনয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রের সার্থক প্রকাশ হয়েছে। বাস্তব অংশে ভোলা দত্ত, অনুভা ঘোষ, অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রণব চক্রবর্তী, নিমাই ঘোষ, রণজিৎ দেব, হৃষী চক্রবর্তী, গোরা চট্টোপাধ্যায়, অর্হিন ভট্টাচার্য, তপন রায়-চৌধুরী, তপন চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চক্রবর্তী, দীপ্তি ঘোষ, স্বর্ণেন্দু রায়-চৌধুরী, মুনাই দত্ত এবং স্বপ্নের অংশে এদের সঙ্গে উমানাথ ভট্টাচার্য, অভিনয় করেছেন।

স্টুডিও

‘আশাবরী’র মহরৎ

গত ১৫ই আগস্ট সম্মান টেকনি-
শিয়ান স্টুডিওতে চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগে

‘আশাবরী’র মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। ছবি পরিচালনা করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

‘অম্ব পৃথিবী’র মহরৎ

গত ১৫ই আগস্ট সূর্য্যাজা প্রোডাক-
সনের ‘অম্ব পৃথিবী’র মহরৎ হয়েছে। পরিচালনা করবেন চিত্ত বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মানবেন্দ্র মদ্যাজী। চিত্রনাট্য লিখেছেন মণি বর্মী।

‘মাস্টারদা’ ছবির মহরৎ

গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পূর্ণ্যলগ্নে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক বিপ্লবী সূর্য সেনের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য “মাস্টারদা” ছবির শূভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়েছে সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। বি, এন, চ্যারজী প্রযো-
জিত এবং আর্ট প্রোডাক্টস নির্বাহিত এই ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করে-
ছেন বিখ্যাত ভট্টাচার্য এবং পরিচালনা করেছেন “বিশ্বকর্মা” ছদ্মনামের অন্তরালে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী। সঙ্গীত পরি-
চালনার দায়িত্ব নিরেছেন রত্ন মদ্যাজী।

পুলক ব্যানার্জী রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় পুত্র দেবকান্তি ভট্টাচার্য।

ছবিটির কিশোর বয়সের মাস্টারদার চরিত্রে রূপদান করার জন্য মনোনীত হয়েছেন নবাগত শ্রীমান তপনকুমার।

কয়েক দিনের মধ্যে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

‘শেষ থেকে সূর্য’র মহরৎ

গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পূর্ণ্যতিথিতে নিউ থিয়েটার্স-এর ‘শেষ থেকে সূর্য’ স্টুডিওতে শ্রীকমলকুমার সাহা, সূর্য্যকুমার সাহা ও সন্তোষকুমার সাহার প্রযোজনায় সাহা চিত্রপটের প্রথম প্রয়াস “শেষ থেকে সূর্য” ছবির শূভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাপস্টিক দেন উত্তমকুমার। “শেষ থেকে সূর্য” মহরৎ শিল্পী ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতিমান অভি-
নেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্যামল গুপ্ত রচিত সঙ্গীতে সুরারোপ করেছেন—অনিল বাগচী ও

নাট্যকেতা ঘোষ। চিত্রশিল্প শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনার আছেন যথাক্রমে রায়মানন্দ সেনগুপ্ত, বটু সেন ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির পরিচালনা করছেন “চিত্রসাথী” ছদ্মনামের অন্তরালে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী। রূপায়ণে : ‘ইগিড’-এর কুশলী শিল্পিবন্দ এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচিত্রারত দত্ত।

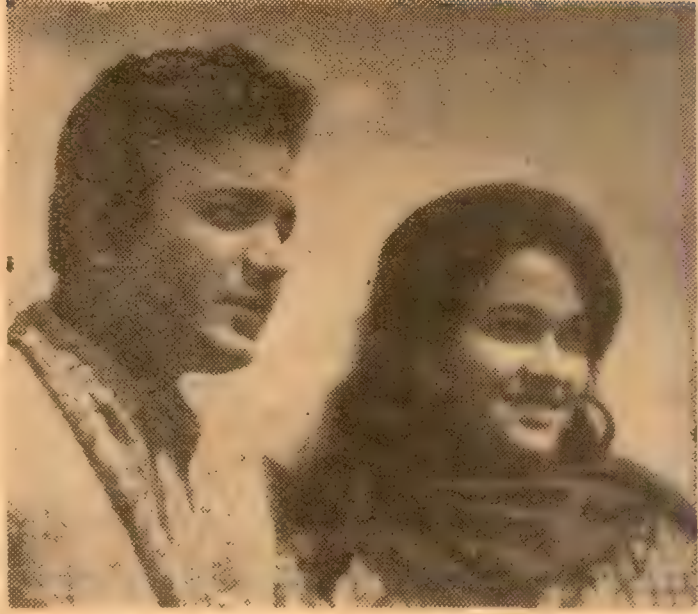
বাংলা ছবিতে ডেইজী ইরানী

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ, আর সি প্রোডাকসন্সের “অম্বিতীয়া” ছবির সংগীত গ্রহণ সম্প্রতি বোম্বাইতে শেষ হয়েছে। মৃকুল দত্ত ও বিমল দত্ত রচিত এবং হেমন্ত মদ্বাজী সুরারোপিত এ ছবির সংগীতাংশে নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন—লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মায়া দে ও স্বয়ং সুরপ্রণীতা হেমন্তকুমার বোম্বাইতে সংগীত গ্রহণকালে প্রযোজক এই ছবির এক বিশিষ্ট চরিত্রের জন্য ডেইজী ইরানীকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। ডেইজী তাঁর প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়ের জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসার কথা। ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেইজী এই চিত্রগ্রহণে উপস্থিত থাকছেন।

ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ রচনা ও পরিচালনা করছেন নবোদ্য চ্যাটার্জী। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—মাধবী মদ্বাজী, সর্বেশ্বর, লিল চক্রবর্তী, সুরতা চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, প্রমথেন্দু বসু।

যেতে নাই দিব

‘অগ্নীকার’-এর পর পরিচালক সুনীল ঘোষ আবার নতুন ছবি আরম্ভ করেছেন। কালী প্রোডাকসন্সের এই নবতম চিত্রের নাম—‘যেতে নাই দিব।’ নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগত সজয়কুমার। অন্যান্য চরিত্রে বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যাবে। গত ৩১শে জুলাই থেকে ছবির শ্যুটিং শুরুর হয়েছে ক্যালকাটা মডার্নটোন স্টুডিওতে। প্রথম দিনের শিল্পী ছিলেন—সজয়কুমার ও সহ-নায়িকা নবাগতা ঞ্জলী সেন।



অগ্রদূত পরিচালিত ‘কখনো মেঘ’ ছবির এক টি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক

অম্বিতীয়া

ছবিটির স্বপ্নজয়ন্তী

‘ছবিটি’ ছবির অসাধারণ সাফল্যে গত ১৫ই আগস্ট বিজলী সিনেমায় স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটির পরিচালনার শ্রীমতী অরুণমতী দেবী ষষ্ঠে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীচুম্বারকান্তি ঘোষ। প্রযোজক নেপাল দত্ত ছবির কলাকুশলী ও শিল্পীদের ধন্যবাদের সঙ্গে স্মারক উপহার দেন।

এশিয়া চলচ্চিত্র সপ্তাহ

আগামী অক্টোবর ২২ থেকে ২৯ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীতে চতুর্থ “এশিয়া চলচ্চিত্র সপ্তাহ” অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সমেত মোট চোদ্দটি প্রাচ্য দেশ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবে। নবাগতদের মধ্যে আছে ইন্দোনেশিয়া, নেপাল এবং কয়েকটি আরব দেশ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর

জনসাধারণের সঙ্গে এশিয়ান ভোলা চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রদ্ধা কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে কতব্য সারা নয়।

বাটা এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত পনেরই আগস্ট বাটা এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি ভাষাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নান্তর’ নাটকটি অভিনয় পরিবেশন করেন ‘রক্তমহল’ গুপ্তগণ। নাটকটির পরিচালনা করেন তারা পদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনন্ত মাইতি, সুবোধ মৌলিক, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয় সকলের প্রশংসা পেয়েছে।

‘জুলাবি চা’

তাজা ও সেরা। একবার
থিয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

ইতিহাসের পাতা

॥ পৃষ্ঠা ২ ॥

সেভোলোভ পুডোভকিন

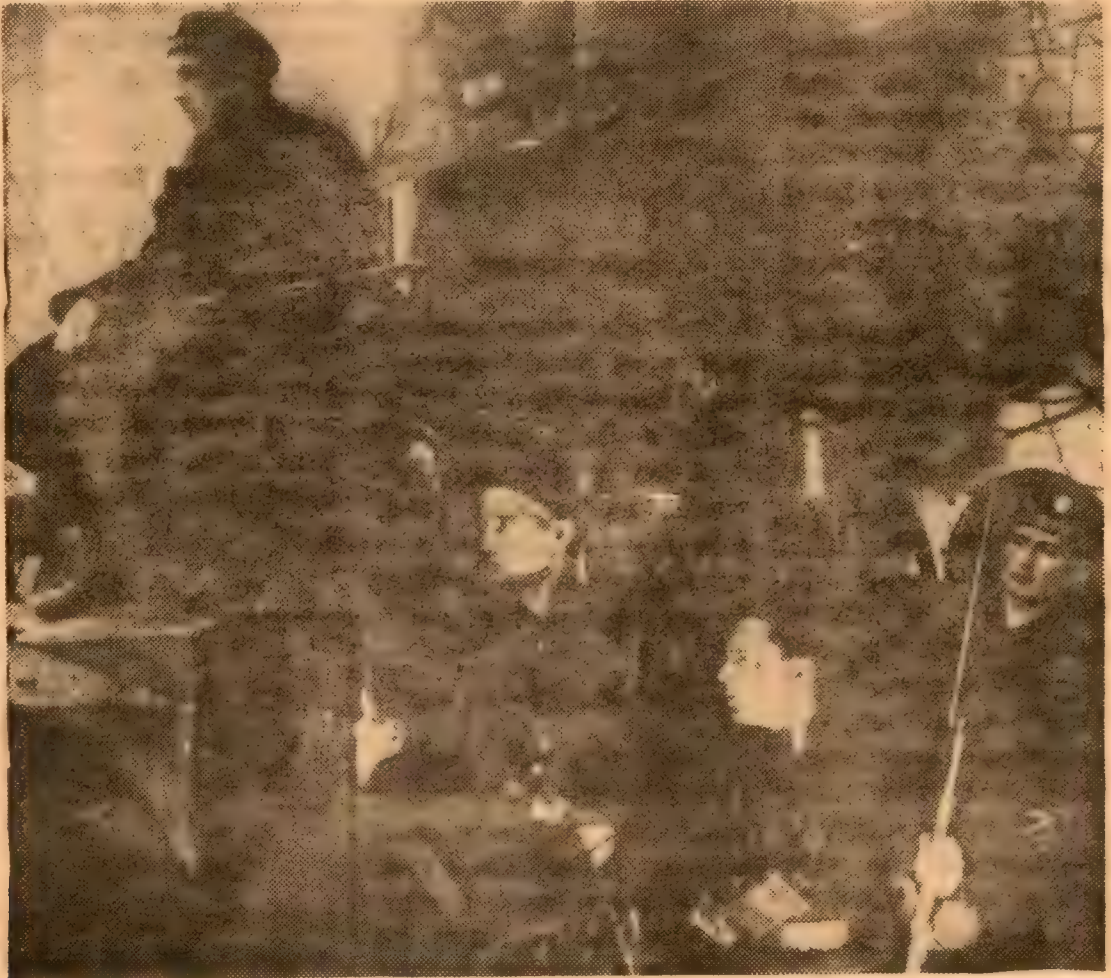
সেগেই আইজেনস্টাইনের বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' যখন মুক্তিলাভ করল সিনেমাকর্মী এবং পর্ষালোচকরা এতে এমন কিছু দেখল যা চলচ্চিত্রে দেখা যায় নি। কয়েকমাস পরে আর একটি ছবি মুক্তিলাভ করল; সেভোলোভ পুডোভকিনের 'দি মাদার'। পুডোভকিন তখনো পরিচালক হিসাবে পরিচিত হন নি। এটি এমন শিল্পপণ্যসম্পন্ন ছবি যা আইজেনস্টাইনের ছবির পাশে দাঁড়াতে পারে। বিপ্লবী আদর্শের ওপর যে নতুন সোভিয়েত সিনেমা পদ্ধতি জন্মলাভ করছিল আইজেনস্টাইনের সঙ্গে পুডোভকিন তার অন্যতম নেতা হবার সম্মানের অংশীদার হন।

পুডোভকিন ১৮৯৩ সালে মস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তার আদর্শ পুরো ছিল লিও টলস্টয় এবং ম্যাক্সিম

গোর্কী। তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, থিয়েটার শিল্পে নতুন আদর্শ সংযোজনায় যে থিয়েটার উৎসর্গীকৃত ছিল। ছোটকাল থেকে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। এই ছবি থেকে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্ক-শাস্ত্র পড়তে যান। তার ইচ্ছা ছিল রসায়নবিদ হবার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তিনি সৈন্য হয়ে ফ্রন্টে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তাকে সর্বকিছু নতুন করে আরম্ভ করতে হয়েছিল। নতুন প্রতিষ্ঠিত সিনেমা স্কুলে তিনি যখন ভর্তি হলেন তখন তার বয়স ২৬ হয়ে গেছে। সিনেমা স্কুলে তার শিক্ষক ছিল ভ্যাডিমির গার্ডিন, বিপ্লবের পূর্বে যিনি বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন।

উদ্যমশীল এবং বহুদিক থেকে প্রতিভাবান পুডোভকিন নিজের সম্পর্কে এবং নিজের শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল ছিলেন। গার্ডিনের 'সিকল এন্ড হ্যামার' ছবিতে তার অভিনয়-নৈপুণ্যে তিনি স্বকৃতি লাভ করেন।

এই ছবিতে তিনি সহকারী পরিচালক হিসাবেও কাজ করেন। উল্কাইনে একটি ছবি করার জন্য গার্ডিনকে দায়িত্ব দিলে তিনি তাঁর প্রতিভাবান ছাত্র পুডোভকিনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুডোভকিন তাঁর আরো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে মনে করে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, এবং এবার লেভ কুলেসেভের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেন। কুলেসেভ তখন সবে কাজ আরম্ভ করেছেন, কিন্তু অনেক পরিকল্পনা নিয়ে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। লেভ কুলেসেভ তাঁর ছাত্র অপেক্ষা বয়সে ছয় বছরের ছোট ছিলেন। কিছুকালের মধ্যে পুডোভকিন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠলেন এবং কুলেসেভের সম্পাদনা বিষয়ে নিরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলেন, ম্যাক্সিম করলেন, দৃশ্যাদি আঁকলেন, এবং চিত্রনাট্য লিখলেন। কুলেসেভের প্রথম বড় ছবি, কমোড চিত্র 'দি আনইউজুয়াল এডভেঞ্চারস অব মিঃ ওয়েস্ট ইন দি কাউন্ট্রি অব দি বলশেভিকস্' (১৯২৪)-এ পুডোভকিন যাবনের ভূমিকায়, ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে



আইজেনস্টাইনের 'অষ্টাবর' ছবিতে উইল্টার প্যালেস আক্রমণের পূর্বে নৌ-সৈন্যগণ

সুপদন করেন। এই চারটিই ছিল কৌতুকপূর্ণ। কুসেসেভের দ্বিতীয় ছবি ডিটেক্টিভ কাহিনী ছেবে রেতে পুডোভস্কিন অভিনেতা এবং চিত্রনাট্যকার হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।

এরপরে পুডোভস্কিন কুসেসেভের স্টাডিও ছেড়ে চলে আসেন, অবশ্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে কুসেসেভের ছাত্র হিসাবে মনে করেছেন। ছেড়ে আসবার কারণ কুসেসেভ প্রধানত নিরীকামূলক করে আগ্রহী ছিলেন, নতুন সোভিয়েত সিনেমার সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু পুডোভস্কিন তখন নিজের সৃষ্টি ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

শীঘ্রই পুডোভস্কিনকে সুবেল দেওয়া হল আর একজন ভরূণ পরিচালক নিকোলাই সিনকোভস্কির সঙ্গে যুক্তভাবে একটা ছবি করার জন্য। এটা ছিল একটি ছোট কমিডি ডির 'চেস কিতার' (১৯২৫)। মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক দাবা খেলা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে শহর-ব্যাপী দাবার উদ্ভাপকে নিয়ে চলচ্চিত্রের ঘটনাপটল এই ছবিতে স্থান পেয়েছে। দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জোসেফ রুটভ ক্যাপাভান্সকা এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। উত্তপ্ত হাস্য-কৌতুকসে ছবিটি মনোরঞ্জনী ছবির শীর্ষস্থান অধিকার করে, এবং আজকের দিনেও এই ছবির আকর্ষণ যথেষ্ট।

তারপরে তরুণ ক্যামেরাম্যান এনাফলি গলোভন্যার 'পরবর্তী' জীবনে তার সব করাট সেরা ছবি এর মধ্যে করেছেন) সহযোগে পুডোভস্কিন তার প্রথম বিজ্ঞান চিত্র 'মিকানিক্স অব হিউম্যান ট্রেন' করেন, কিন্তু বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আইভান পাবলভভের বিশ্লেষণ সম্পর্কে এই ছবি। বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠ তত্ত্ব এবং উপস্থাপনার সহজ পদ্ধতিতে এই ছবি শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লোকবিজ্ঞানচিত্র।

এই দুটি ছবির সাফল্যের পর সেক-ক্যাপ্তার-রুশ স্টাডিও পুডোভস্কিনকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র করার প্রস্তাব করে। প্রতিভামান চিত্রনাট্যকার নথান বার্ক' ম্যাক্সিম গোর্কীর 'আ' অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেন। এতবড় কাহিনীকে নির্বাক ছবিতে অভিধ্বী করা অসম্ভব ছিল, বার্ক' ছিল কাহিনীর সারমর্ম গ্রহণ করে গল্পকে কেটে এক নতুন রূপ দান করেন (এই চিত্রনাট্যে যা তার বিপ্লবী পুত্রের বিরুদ্ধতা করেছিলেন আনিঙ্কাকৃতভাবে)।

আইজেনস্টাইনের অসম্পূর্ণ অনুসরণ পুডোভস্কিন পদ্ধতি অনুসরণে দৌঁড়েছেন। এমন কি 'দি স্ট্রাইক' এবং 'ব্যটালিশপ পুডোভস্কিন-এর প্রচলিত অপেক্ষা তিনি আরো বেশি অগ্রসর হয়েছেন। সুদৃক সম্পাদনা-রূপে তার ছবিতে অসম্ভব উচ্চতর

ভাবাবেগ আছে। সে রূপে দেখান হচ্ছে জারের বিরুদ্ধে প্রতিকার বিবেচিত ক্রমোচ্চ, তার বিপরীত দৃশ্য হিসাবে দেখান হয়েছে ক্রান্তে তুহারগনিত দ্রুত নদীর ব্যাপ-কতা। এই প্রতীক দৃশ্য ছবিতে কার্য-পূর্ণ করে তোলে। জারের পুলিশের নির্যাতনের ঘটনার বর্ণনার দৃশ্যটিও বাস্তব, পুলিশের পায়ের কঁকি দেখান হয়েছে ক্রমোচ্চ অঙ্গের বসন্ত, ভারী হাট্টে নিয়ে সে মাটিতে ঢাপ দিচ্ছে। যা হোক, দৃশ্যাদি ঘটনা এবং সেকালের সম্পাদনা-বৈশিষ্ট্য কেবল পুডোভস্কিনের চরিত্র প্রধান বলে ছিল না। প্রধান ভূমিকা ছিল পুডোভস্কিনের বিপ্লবী তত্ত্ব ও কবিতা প্রকাশের চেষ্টা, কেবল জনতার দৃশ্য এবং প্রতীক দৃশ্য নয়, পারিপার্শ্বিকভাবে চরিত্র সৃষ্টি করে। যেমন: যা এবং মেলে দু'জনই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিদ্বন্দ্বি। এই দুটি চরিত্র দু'জন অভিনেতাকে দিয়ে তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারে ঐতিহ্য অনুসরণে অভিনয় করিয়েছেন—ভেরা ব্যাননভস্কায়া এবং নিকোলাই ব্যাটালভকে (বেরাভনের জনপ্রিয় অভিনেতা আলেক্সি ব্যাটালভের কাকা) দিয়ে। ছবিটি হয়েছে জাশনান রিভলিউশনের ঐতিহ্য ও নব প্রবর্তনের সিন্ধিগিস-এ যা টেলিটর, গোর্কী' এবং স্ট্যানিসলাভস্কি সৃষ্টি করে গেছেন।

১৯২৬ সালে 'দি মাদার'-এর মজির পর পুডোভস্কিন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যান এবং একটি নতুন ছবিতে নাথান বার্ক' এবং এনাভলি গলোভন্যার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন। এই ছবিটি অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের দশক কার্ভিক উপলক্ষে নির্মিত এবং বিষয়বস্তু ছিল বিপ্লবের প্রত্নুতি ও উপলক্ষ। ছবির নাম 'দি রেন্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ' (১৯২৭)।

আইজেনস্টাইনের 'অস্ট্রিয়ার' (টেন ডেজ গ্যাট সাহু দি ওরাল্ড)-এ অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের ঐতিহাসিক দ্বারা বিপরীতী অস-দৃশ পুডোভস্কিনের 'দি এন্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ'-এ একই ঐতিহাসিক দ্বারা দেখান হয়েছে এক ব্যক্তির জীবনের মাধ্যমে। এক কৃষক কুম্ভার তাদুনার গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে সে প্রথমিক হয়েছিল এবং আরো ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিল। মালিকের অনুগ্রহ পাবার আশায় কুম্ভারের সঙ্গী সে তার সহকর্মী প্রতিক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অনেক পরে সে বুঝতে পেরেছিল সে ভুল করেছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রেমের হয়েছিল এবং তাকে ফ্রন্টে পাঠান হয়েছিল। ১৯১৭ সালের শরৎকালে সে ফিরে আসে একজন বসন্তাভিক সৈনিক হয়ে এবং বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তরা প্রাচীনাল সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমোচ্চ অংশ গ্রহণ করে।

এই গল্পের দ্বারা এক ব্যক্তির মনো-বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙে জড়িত হয়ে পড়ল আনিঙ্কাকৃতভাবে, কিন্তু শেষ হল দৃশ্য সম্প্রদায়ের বিপ্লবী হিসাবে। পুডোভস্কিন এই ব্যক্তিচরিত্রে মাধ্যমে বিপ্লববৈকল্যের জাশনান জীবন দেখা-বার সুযোগ এবং অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের ঐতি-হাসিক অনুভূতিবিধা দেখেছিলেন।

তার ঐশিক ভিত্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে বর্ণনা করেছেন বা আই-জেনস্টাইন করেন নি, অতএব এই ছবিতে কম জোর বা প্রামাণিকতা ছিল না। এই দুটি ছবি 'দি রেন্ড অব সেন্ট পিটার্স-বার্গ' এবং 'অস্ট্রিয়ার' সোভিয়েট নির্বাক যুগের মধ্যেই কীর্তি-রূপে স্বাধাভাবে বিবেচিত হয়।

পুডোভস্কিনের তৃতীয় বিখ্যাত ছবি (নির্বাক) 'দি ডিসেম্বার্ট অব জেলিস বান' (স্টেরিও ভার্স এশিয়া—১৯২৮) আরো প্রাচীনাল রীতিতে নির্মিত এক নাট্যীয়তার পূর্ণ। এক পরীক্ষা যোগো-লিয়ান পশ্চিমের দৃশ্য: তার নাম বেইর। বাকি বিশেষী উপনিবেশিকতার তাদের পুতুল সরকারের প্রধান করতে চেয়েছিল। অনেক উত্তরকারক ঘটনার পর, বেইর, উপনিবেশিকতা তাকে যে উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চায় সেই স্বপ্নকারাধার থেকে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করল; এবং এক গোঁরালা ইউনিটে যোগদান করে। ফিল্মের শেষ হয় এমন এক ঘটনায় যা প্রতীকপূর্ণ এবং 'দি মাদার'-এর শেষ দৃশ্যের মত একই রকম শক্তিশালী। মধ্য এশিয়ার স্টেপহুভিতে বড় হয়ে যাচ্ছে, গাছ-গাছের উপড়ে পড়ছে, পাতাগুলি বাতাসে উড়ছে, শাবা তেড়ে পড়ছে, এই ব্যঙের মত আমরা দেখছি এক গোঁরালা ইউনিট, যাদের পুরোভাগে রয়েছে বেইর, ঘোড়ার চেষ্টা চুতবেগে চলে যাচ্ছে।

আজকের দিনেও 'স্টর্ম' ওভার এশিয়ার আকর্ষণ বুঝি বেশি। কারণ বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক অত্যন্ত কৌতুকজনক (মেক্সোলিয়ান' নোমাদের জীবন, বৌদ্ধ মঠে ডিক্কুরা, উপনিবেশিকদের সৈন্য-বারা এক 'আলচ' দেশের ওপর তত্যাচার করতে এসেছিল), এ ছবি সত্যিকার শিল্পের সব রকমের উপাদানে নির্মিত, যাতে কোন রকমেই অবাস্তবতা, উগ্র রকমের দৃশ্যাদি দৌঁধের দৃশ্যকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয় নি।

বিশ দশকের শেষ দিকটা ছিল পুডোভস্কিনের সৃষ্টিশীল কাজের সময়। তিনি তিনটি ছবি করেছেন (যে তিনটি ছবি সিনেমা ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে), এবং সিনেমা আর্ট সম্পর্কে অনেক বই লিখে-ছেন, এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।



মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় থাই ল্যান্ডের বিপক্ষে খেলায় ভারতের গোলরক্ষক ধংগরাজ উচ্চত্রে লাফিয়ে বিপক্ষের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করছেন।

ময়দানে মন্দা ভাব

কলকাতা ময়দানের বাজার এখন মন্দা। নামী দলগুলোর দামী খেলোয়াড়রা দিন কতক হাওয়া বদলাতে গেছেন ফুলালামপুরে, মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলার জন্যে!

সুতরাং কলকাতা ময়দান এখন কিছুটা ফাঁকা! অথচ সব থেকে মজার কথা হলো যে নামী দলগুলোর খেলা কিন্তু প্রায়ই থাকছে। কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ময়দানী ফুটবলের সেই পাগল-করা আকর্ষণ।

তবে কি ফুটবলেও স্টার সিস্টেম চালু হয়ে গেলো?

তবে ব্যতিক্রম যে নেই, এমনও নয়! মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয়, ইস্টবেঙ্গলের খেলাতে এমন কি মোহনবাগানের খেলাতেও!

তবু মাঠে গেলে মনে হয়, কি যেন নেই—সব আছে অথচ অনেক কিছুই নেই! মনে হয় কোথায় যেন গানের সুর কেটে গেছে!

কিন্তু কেন?

তবে কি খেলার মাঠও সিনেমার মতো হলো! অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম

দেখে আমরা সিনেমা দেখতে বাই—নাম না করা আর্টিস্ট ছাড়াও যে ভালো ছবি হতে পারে, এ কথা আমরা যেন চিন্তাও করতে পারি না!

দলসর্বস্ব ফুটবল আকর্ষণ ময়দানী ফুটবলের আসরে বহুদিন থেকেই চালু! অবশ্য এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা বিশেষ একটা নেই! নিজের দলকে সবাই সমর্থন জানাবে, নিজের দলের খেলা দেখতে সবাই যাবে!

কিন্তু এখানে তো ভালো-মন্দ খেলোয়াড়ের বাছবিচার নেই। নেই ভালো

বেঙ্গল, মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং—ময়দানের এই তিন প্রধানের মাত্র দু'-একটা করে খেলা বাকী।

তবু এই বাকী খেলাগুলোর ওপরই নির্ভর করছে এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের সমস্ত প্রশ্ন। তবে যতো লড়াই—সবই ঐ মহামেডান স্পোর্টিং আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। পয়েন্ট সংগ্রহের লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে এই দল দু'টি এবার বড় কাছাকাছি! হয়তো একটি পয়েন্ট নষ্টই শেষ পর্যন্ত বতো আর্নিংয়ের মূল হয়ে দাঁড়াবে।

তবে কার গলায় যে শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য উঠবে, কে জানে! মোহনবাগানের এবার আর কোন চান্স নেই, চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াই-এ যেটুকু আকর্ষণ আছে সবই ঐ মহামেডান স্পোর্টিং আর ইস্টবেঙ্গলের বাকী খেলা কটির ওপর! তবে ইস্টবেঙ্গলের পর্ব মোটামুটি চুকেছে! ২৫টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে তারা সংগ্রহ করেছে ৪০ পয়েন্ট।

তাই এখন মহামেডান স্পোর্টিং-এর প্রতিটি খেলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! তবে লীগ ফুটবলের শেষ পর্বায়ের আসল লড়াই-এ মহামেডানকে অবতীর্ণ হতে হবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে

প্রীতিমিতাভ

খেলা দেখার সামান্য ইচ্ছেটুকুও। যা আছে, তা হলো ঐ শুধু নিজের দলের জয়লাভের প্রশ্ন!

যদি তাই হবে তাহলে কেন হঠাৎ এইভাবে খেলার আকর্ষণ কমে গেলো? কেন ময়দানী ফুটবলের আসর আগের মতো আর সরগরম নেই? কেন ময়দানী ফুটবলের আসরে মন্দা ভাব জেগেছে?

তবে এ বছরের ফুটবল লীগের খেলাগুলিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ইস্ট-

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভারতীয় দলের দেশে ফেরার পর। আর ইন্টবেঙ্গলকে হয়তো শেষ খেলার মিলতে হবে পরিত্যক্ত ফিরতি লীগের মোহন-বাগানের বিরুদ্ধে খেলাটিতে। বলা যায় না শেষ পর্যন্ত হয়তো লীগ চ্যাম্পিয়ান-শীপের চূড়ান্ত ফরসালার জন্যে মহা-মেডান স্পোর্টিংকে আর একবার লড়াইতে হবে ইন্টবেঙ্গলের সঙ্গে।

পাকিস্তান পরাজিত

এ বছর ইংলন্ডের যুদ্ধ সফরে ভারতের শরিক ছিলো পাকিস্তান। পর পর তিনটি টেস্টে পরাজিত হবার পর ভারত এখন আফ্রিকায় গেছে শুভেচ্ছা সফরে! আর পাকিস্তানের টেস্ট লড়াই শুরু হয়ে গেছে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে।

ইংলন্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলার কোন মীমাংসা হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটিকে চিরাচরিত অমীমাংসার মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি পাকিস্তান! দ্বিতীয় টেস্টে তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। ইংলন্ডের হাতে ১০ উইকেটে পরাজিত হয়েছে পাকিস্তান।

তবু বৃষ্টির জন্যে পুরো একটি দিনের খেলা হতে পারে নি। গত রবিবার আর সেমবারের বৃষ্টির ফলে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা অনাশ্রিত হয় নি! কিন্তু পঞ্চম দিনের খেলাও বেশিক্ষণ চলে নি! খুব অল্প রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস! জয়লাভের জন্যে ইংলন্ডের তখন প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩ রানের!

সংক্ষিপ্ত ফলাফল—

পাকিস্তান—১ম ইনিংস—১৪০ রান

—২য় ইনিংস—১১৪ রান

ইংলন্ড—১ম ইনিংস—৮ উইঃ ২৫২ রান

—২য় ইনিংস—কিনা উইঃ ৩ রান

প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত

ভারত ও তানজানিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। অবশ্য খেলার যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে সমর থাকলে ভারতের জয় ছিলো নিশ্চিত।

ভারত প্রথম ইনিংসে ২১৫ রান করে। প্রত্যুত্তরে মাত্র ১৫ রানে শেষ হয়ে যায় তানজানিয়ার প্রথম ইনিংস। চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং-এর জন্যেই তানজানিয়ার এই অবস্থা ঘটে। চন্দ্রশেখর মাত্র ২৫ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৮টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৬ উইকেটে ২০৪ রান করার পর ইনিংস সমাপ্ত ঘোষণা করে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তানজানিয়ার ১ উইকেটে ৭৯ রান করার খেলাটি শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল—

ভারত—১ম ইনিংস—২১৫ (কুন্দরন ৮১)

—২য় ইনিংস—৬ উইঃ ২০৪ (ডিঃ)

তানজানিয়ার—১ম ইনিংস—৯৫ (সুরেশ রাওয়েল ২০; চন্দ্রশেখর ২৫ রানে ৮টি উইকেট।)

—২য় ইনিংস—১ উইকেটে ৭৯।

খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ।

আই এফ এ শীল্ড

আগামী ২৫শে আগস্ট থেকে শুরুর হচ্ছে এবারের আই এফ এ শীল্ডের খেলা। তবে এবার আর ৭০ মিনিটে নয়—১০



অশোক চ্যাটার্জী

মিনিটের খেলা। মোট ৪১টি দল এবার যোগদান করবে আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায়। এর মধ্যে আছে বাইরের ১৬টি দল।

আই এফ এ শীল্ডের খেলাগুলি পরিচালনা করার জন্যে কলকাতার রেফারীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের আরো ৪ জন রেফারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারকার প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে খেলার সূচ্যোগ পেয়েছে চারটি স্থানীয় দল—ইন্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিং ও বি এন আর।

নিচে খেলার তালিকা দেওয়া হলো—

প্রথম রাউন্ড

- ১) ওঃ বেঃ পুর্লিশ : বাটা
- ২) জামসেদপুর : বর্ধমান জেলা
- ৩) টাউনক্রাব-গোহাটি : বান'পুর ইউঃ
- ৪) ইস্টার্ন রেল : কলিঃ জিমখানা
- ৫) আসাম রাইফেলস : জর্জ টেলিগ্রাফস
- ৬) কালীঘাট : টালিগঞ্জ অগ্রগামী
- ৭) স্পোর্টিং ইউনিয়ন : হাওড়া জেলা
- ৮) রাজস্থান : চন্দননগর
- ৯) এরিয়ালস : ২৪ পরগনা
- ১০) কটক কম্বাইন্ড : হাওড়া ইউনিয়ন
- ১১) হুগলী জেলা : বালীপ্রতিভা
- ১২) পোর্ট কমিঃ : খিদিরপুর
- ১৩) উরাড়ি : নিউদিঘী

দ্বিতীয় রাউন্ড

- ক) বিজয়ী (১) : শোলালার স্টার
- খ) বিজয়ী (২) : ভাসকো ক্রাব—গোরা
- গ) বিজয়ী (৩) : লীডার্স ক্রাব
- ঘ) বিজয়ী (৪) : এ এস সি—বাংলার
- ঙ) বিজয়ী (৫) : এয়ার ফোর্স
- চ) বিজয়ী (৬) : উত্তর প্রদেশ
- ছ) বিজয়ী (৭) : মধ্যপ্রদেশ
- জ) বিজয়ী (৮) : বোম্বাই একাদশ
- ঝ) বিজয়ী (৯) : হায়দ্রাবাদ একাদশ
- ঞ) বিজয়ী (১০) : পঞ্জাব পুর্লিশ
- ট) বিজয়ী (১১) : এ ও সি—সেকেন্দ্রাবাদ
- ঠ) বিজয়ী (১২) : বিজয়ী (১০)

তৃতীয় রাউন্ড

- এ) বিজয়ী (ক) : ইন্টবেঙ্গল
- বি) বিজয়ী (খ) : বিজয়ী (গ)
- সি) বিজয়ী (ঘ) : বিজয়ী (ঙ)
- ডি) বিজয়ী (চ) : বি এন আর
- ই) বিজয়ী (ছ) : মহামেডান স্পোর্টিং
- এফ) বিজয়ী (জ) : বিজয়ী (ঝ)
- জি) বিজয়ী (ঞ) : বিজয়ী (ট)
- এইচ) বিজয়ী (ঠ) : মোহনবাগান

পরলোকে প্রভাতকুমার দাশ

প্রখ্যাত রাইফেল সূটার ও ভারতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রভাতকুমার দাশ গত ১৫ই আগস্ট মাত্র ২৯ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। রাইফেল সূটিং-এর গ্রুপ ও স্কিট সূটিং-এ প্রভাত দাশের অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। তিনি ১৯৪৬ সালে পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সূটিং চ্যাম্পিয়ানশীপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ইটালীতে অনুষ্ঠিত অসম বিশ্ব সূটিং প্রতিযোগিতায়ও তাঁর যোগ দেবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু সন্ধ্যাকে স্তম্ভ করে দিয়ে তিনি এখন চলে গেছেন সব কিছুর উদ্দেশ্যে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরিচায়তে

সত্যিকারের বলের কন্ট্রোল আছে কলকাতা ময়দানের এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা বোধ হয় আঙুলে গণে বলা যায়। অবশ্য গণনেও সে সংখ্যা যে দু'চারজনের বেশি খেলোয়াড়কে দলে টেনেতে পারবে না সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই! আর সন্দেহ নেই সীমিত এই খেলোয়াড় তালিকায় কাজল মুখার্জীর স্থান লাভ সম্বন্ধে!

চুনির খেলায় দেখছি ফুটবলের নয়নাভিরাম রূপ, পি কে-র খেলায় আছে দর্শনীয় আক্রমণধারা আর কাজলের খেলায় দেখছি বলের ওপর তাঁর অশ্রুত কন্ট্রোলের ক্ষমতা!

কাজলের খেলায় যদি আর কোন গুণও না থাকতো তাহলেও ঐ একটি গুণের জোরেই কাজল পারতেন বাজী মাং করতে! কিন্তু তার দরকার হয় নি!

কাজলের পায়ে আছে জোরালো শট, মাথায় আছে বুদ্ধি আর আছে নিখুঁত রিসিটিং অর ডিস্ট্রিবিউশনের সঙ্গে তাঁর ফুটবল সেন্স! কিন্তু কাজলের খেলায় একটি জিনিষের অভাব মাঝে মাঝে বড় বেশি পীড়া দিয়েছে আমাদের। সে অভাব আন্তরিকতার!

কিন্তু আন্তরিকতা না থাকলে কাজলের মতো বড় খেলোয়াড় যে হওয়া যায় না, এ কথাটাও বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না! তবে কি কাজলের মধ্যের ঐ অভাবটিকে বলবো, নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রচেষ্টা! না তাও নয়। ঐ অভাবের পেছনে হয়তো আছে কাজলের খেলায় মনের স্বভাব।

তাই কাজল যেদিন মন দিয়ে খেলেন, কাজলের খেলায় সৈন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়—সৈন্য কাজল অনবদ্য, সৈন্য কাজল অতুলনীয়। আর যেদিন গ্যা লাগিয়ে খেলেন না কাজল, সৈন্যই মনে হয় কাজলের খেলায় বৃষ্টি আন্তরিকতার অভাব।

কিন্তু কাজলের মতো খেলোয়াড় ক'জন আছেন—যিনি প্রয়োজনে নিতে পারেন আউট সাইডে কিম্বা ইন সাইডের আক্রমণী খেলোয়াড়ের ভার, আবার হাফ লাইনে দাঁড়িয়ে গড়ে তুলতে পারেন রক্ষণ-ভাগের অবিস্মরণীয় ব্যুহ?

আক্রমণ কিম্বা রক্ষণভাগে খেলতে নেমে কাজল যেভাবে সহজেই নিজেকে

মানিয়ে নিতে পারেন—তার তুলনা মেলা ভার। কাজলের ফুটবল প্রতিভাই বোধ হয় এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

কাজল তাই আজ ভারতীয় ফুটবল দলের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়।

এক সময় কাজলদের বাড়ি ছিল ঢাকায়। কিন্তু কাজলের জন্মের চার বছর পরেই ভারত ভেঙে ভাগ করে এদেশ

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী বংশোদ্ভূত

থেকে পালাবার আগে বৃটেন শেষ কামড় দিয়ে সৃষ্টি করে গেলো আর একটি স্বাধীন দেশ—পাকিস্তান! তাই আর কোনদিনই নিজের দেশে যাবার সুযোগ ঘটলো না কাজলের! জন্ম-কর্ম কাজলের—সবই কলকাতায়।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার এন্টালীতে যে ছেলোটর জন্ম



কাজল মুখার্জী

হয়েছিলো, আর সেলিমপুর বয়েজ ক্লাবে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করেছিল—সেই ছিপছিপে চেহারার ছেলেটাই আজ কাজল মুখার্জী নাম নিয়ে নিয়মিতভাবে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলে যাচ্ছে!

বড় খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা কাজল মুখার্জীর মধ্যে ছিলো! তাই স্কুলে পড়ার সময়ই কাজল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল

সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে পড়ে গেলেন সকলের চোখে। ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে আর পরে আগরতলার জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার বাংলা দলের পক্ষে কাজল দেখালেন নয়নাভিরাম ক্রীড়া-নৈপুণ্য।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো কাজলের! মোহনবাগানের জুনিয়র দলে চলে এলেন কাজল বি ডি চ্যাটার্জীর আহবানে! কিন্তু দু'টি বছর যেতে না যেতে বাধা সোম তাঁকে ইন্টার্ন রেলে নিয়ে এলেন। এ সেই ১৯৬১ সালের কথা!

তারপর শিক্ষার সঙ্গে চললো সাধনা! সেই সঙ্গে তাল দিয়ে চললো নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাল দিয়ে খেলা! কিন্তু মানিয়ে নিলেন—বড় চমৎকারভাবে নিজেকে মানিয়ে নিলেন কাজল মুখার্জী! বড় খেলোয়াড়দের সঙ্গে, নামী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তরুণ কাজলের খেলার তারুণ্য ঘুচে গেলো!

তাই দু'টো বছর যেতে না যেতে কাজল ভারতীয় যুব দলের সঙ্গে পেনাং ঘুরে এলেন! কিন্তু তার পরের বছর ফুটবল কাজলকে এনে দিলো আরো বড় সম্মান। ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার জন্যে নির্বাচিত হলেন কাজল মুখার্জী।

১৯৬৪ সালে তেলআবিবে এশিয়ান কাপের খেলায় ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে এলেন কাজল! দেশে ফেরার পর তাঁকে খেলতে দেখা গেলো প্রাক-অলিম্পিক খেলায়। ইরানের বিরুদ্ধে একবার খেলে এলেন তেহরানে আর একবার কলকাতায়। এ ছাড়া সেই ১৯৬৪ সাল থেকে প্রত্যেক বছরই কাজল ভারতীয় দলের সঙ্গে একবার করে কুয়ালালামপুর ঘুরে আসেন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করার জন্যে!

এবারও গেছেন কাজল কুয়ালালামপুরে! ১৯৬৫ সালে মুখ বদলাবার জন্যে বোধহয় কাজল এসেছিলেন মোহনবাগানে! কিন্তু আবার ফিরে গেছেন রেল দলে! কাজল আজ শব্দে লে দলের খেলোয়াড়ই নন, তিনি ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়!

কাজলের বয়েস বেশি নয় তাই কাজলের ওপর আমাদের আশা এখন অনেক বেশি! আমাদের সেই আশার আলোর পাদপ্রদীপে কাজল জ্বলে উঠুন—আরো উজ্জ্বল হোন, তাঁর নামের ছটার ভুবন ভরুক।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

কালিদাস গ্রন্থাবলী — ১ম —	রেজিন ও বোর্ড বাঁধাই ৮-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—১ম —	বোর্ড বাঁধাই —	৮-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ৩য় —	" — ৮-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—২য় —	" —	৮-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ১ম —	" — ৮-৫০	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	" —	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ২য় —	" — ৮-০০	প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী —	" —	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—উপন্যাস —	১ম — ৩-০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী —	" —	৮-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " —	২য় — ৩-০০	রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী —	" —	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " —	৩য় — ৩-০০	শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী —	" —	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—সাহিত্য —	১ম — ৩-০০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ১ম —	" —	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " —	২য় — ৩-০০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ২য় —	" —	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " —	৩য় — ৩-০০	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী: ২য় —	" —	৩-৫০
(কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই) প্রতি খণ্ড —	৮-৫০	অসমগ্র গ্রন্থাবলী —	" —	৮-০০
বিজ্ঞানলাল গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। কবির প্রতিকৃতি		সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী: — ১ম —	" —	৮-০০
সমন্বিত আর্ট পেপারের সূক্ষ্ম প্রচ্ছদ) ১ম	৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী: ২য়	" —	৮-০০
" " " " " ২য়	৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী: — ৩য় —	" —	৮-০০
সেন্সপীয়ার গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা) ১ম খণ্ড	৮-৫০	সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী: — ৪র্থ —	" —	৩-০০
সেন্সপীয়ার গ্রন্থাবলী " ২য় খণ্ড —	৮-৫০	রামপদ গ্রন্থাবলী —	" —	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম — ৩-০০	হে মঙ্গল রায় গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)	" —	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	২য় — ৩-০০	মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)	" —	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী —	১ম — ৩-০০	জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)	" —	৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী —	২য় — ৩-০০	বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)	" —	৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী —	১ম — ৩-০০	মদনমোহন ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী —	৩য় খণ্ড —	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী —	২য় — ৩-০০	শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী —	২য় ভাগ —	৩-০০
(কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই) প্রতি খণ্ড —	৮-০০	শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৩য় ভাগ —	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী —	১ম — ৮-৫০	স্বর্নকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী—	" —	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী —	৪র্থ — ৮-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৩য়	" —	৮-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম — ৮-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৫ম	" —	৮-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য় — ৮-০০	বিদ্যাসম্মত গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই)	" —	৬-৫০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য় — ৪-০০	কথাসরিৎ সগর —	১ম ভাগ —	৮-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী —	২য় — ৩-০০	কথাসরিৎ সগর —	২য় ভাগ —	৮-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—	" — ৩-৫০	সুকন্দদাসের গ্রন্থাবলী—	" —	৩-০০
রত্নলাল গ্রন্থাবলী —	" — ৩-০০	বালকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী—	" —	৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী	" — ৩-০০	(কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই) —	১ম —	৮-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী —	" — ৩-০০	বালকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী —	৪র্থ —	৮-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—	" — ৫-০০	অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	" —	৩-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—	" — ৩-০০	জ্যোতির্বিজ্ঞান শাক্যের গ্রন্থাবলী—	" —	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী —	২য় — ৩-০০	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ —	প্রতি খণ্ড —	৮-০০
স্কট গ্রন্থাবলী —	৩য় — ৩-০০			



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের খবর নিতে শেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপূরণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসার্থিনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-টাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ বোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (মণ্ডল)

এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর

কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র:

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,

এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

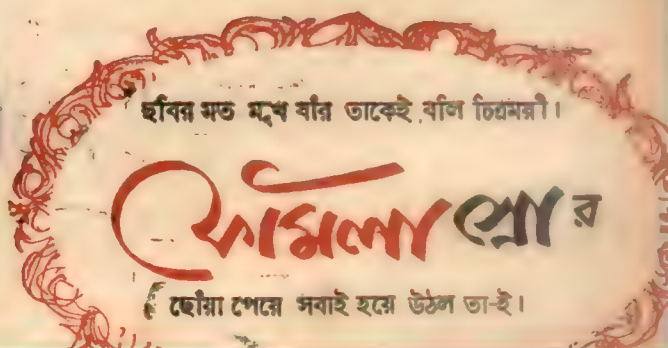
সাপ্তাহিক বাসুমতী

বাদ্যসংগ্ৰহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের বৈঠক
'বাংলা বর্ষ'-এর দিনে কলকাতা



৭২ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

31st Aug., 1967 * Vol. 72, N



ছবিতে মত মত বার তাকেই বলি চিরমরা।

ফার্মা প্রা র

ছোঁরা পেয়ে সবাই হয়ে উঠল ভাই।



বিষয়	মূল্য						পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭০৭
আজকের মানব	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭০৮
মঙ্গলদর্শন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭০৯
অবতাব্য	৩০০	—	চন্দ্রদ্বন্দ্ব	৩০০	৩০০	৩০০	৭১৪
ভারতদর্শন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭১৮
আন্তর্জাতিক	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭২৫
গ্রন্থমেলা	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৭২৮
অনেক আকাশ (ছোট গল্প)	৩০০	—	পূর্ণেন্দু ভৌমিক	৩০০	৩০০	৩০০	৭২৯
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	৩০০	—	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	৩০০	৩০০	৩০০	৭৩০
নতজান, হে ঈশ্বর (কবিতা)	৩০০	—	বেণু দত্তরায়	৩০০	৩০০	৩০০	৭৩৬
রাজকন্যা (কবিতা)	৩০০	—	বিনোদ বেরা	৩০০	৩০০	৩০০	৭৩৬

আগামী শারদীয়ার নতুন সাহিত্য

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ—ষষ্ঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫
 তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—শুকসারী কথা (উপন্যাস) ৮
 সৈয়দ মজুমদার আলী—পছন্দসই ৬
 জরাসন্ধ—লৌহকপাট (সম্পূর্ণ—চারিখণ্ড একত্রে। শোভন ১৭) ২০
 হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—পূর্বাচল (উপন্যাস) ১২
 প্রফুল্ল রায়—কিন্নরী (উপন্যাস) ৫
 প্রফুল্ল রায়—পূর্ব পার্বতী (উপন্যাস) ১২
 সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হিমালয়ের তিব্বতী ৫
 মৈনাক—সূর্যবংশের তীরে (উপন্যাস) ৫
 হিরন্ময় ভট্টাচার্য—মক্ষমধুর ৫

II গ্রন্থসম্ভার II

কুমুদরঞ্জন মজুমদার—কুমুদ কাব্যসম্ভার ১২
 প্রমোদকানন মজুমদার—ব্রহ্মলোক্য রচনাসম্ভার ১০

II ছোটদের II

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০
 আশাপূর্ণা দেবী—সেই সব গল্প ৭

এই বইগুলি আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। উল্লিখিত মূল্য আনুমানিক



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মা দেখেছি, মা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	সুধীরঞ্জন দাস	৭০৭
অগ্নিবর্গের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৭৪০
বিদ্যা বাউলীর দ্বন্দ্বান্ত (উপন্যাস)	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪৮
পাক-ভারতের রূপরেখা	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	৭৫২
সঙ্গরাজ—ওবেশে এবং এদেশে	শ্রীশালি	৭৫৬
পাঠকমন		৭৫৯
সঙ্গরাজ		৭৬০
খেলাহুলা	শ্রীঅমিতাভ	৭৬৫
পরিচীর্ণভে	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৮

—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ্য—

“যদিও মা তোর দিবা আলোকে
যেয়ে আছে আজ আমার ঘোর,
কেটে যবে শেষ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার জ্বলাটে তোর;
আমরা যুঁচাব মা তোর দৈন্য!
জানুষ আমরা নহি তো শেষ!
দেবী আমার! সাধন আমার!
বর্গ আমার! আমার দেশ!”

মাতৃমন্দির স্বত্বিক অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের
স্বন্দরী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড :

মাজাহান, সিংহলবিজয়, সোয়াব রুস্তম, পরপারে।

মূল্য—৬.০০

দ্বিতীয় খণ্ড :

বিরহ, সীতা, ভীষ্ম, বঙ্গনারী, আনন্দবিদ্যার।

মূল্য—৬.০০

তৃতীয় খণ্ড :

চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, কলিক অবতার।

মূল্য—৮.০০

(প্রতিটি খণ্ড মূল্যে পাঁচপাচো ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কাপড় ও
বোড়ে বাঁধা। কবির প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত সদ্‌শ্য আর্ট পেপারের জ্যোতির্ভাষা।)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২



৭২ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৪ই ডায়, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাম্প্রতিক পত্রিকা

Price : 25 PAISI.
Thursday, 31st August, 1971

যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতা

বেশনের চাল আবে কসলো। অর্থাৎ পাঁচ শ' গ্রামের পবিত্র হোল চাব শ' গ্রাম। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের জন্যে আমবা অপেক্ষা করছিলাম। এবং আগামী দু'মাসে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না—সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব না হলেও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিগত দিনগুলির কার্যদায় খাদ্যশস্য সরবরাহে গড়িমসি দেখায়, আউশ ধান যদি এক ছটাকও সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় এবং মজুত ধান-চাল বেব করা না যায়—তাহলে রেশনের পবি-মাণ আবে কমতে পারে।

অথচ নয়া দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার ছয়জন মন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান-মন্ত্রীর আলোচনা ও ২৪শে আগস্ট চাবিশ ঘণ্টাব্যাপী বাংলা বন্ধ ও জেলায় জেলায় মন্ত্রীদের খাদ্যশস্য সংগ্রহের অভিযানের সংবাদ পড়ে ধারণা করা গেছিল যে, খাদ্য সংকটের আশু সমাধান না হলেও এমন একটা ব্যবস্থা হবে যাতে ছা-পোষা মানুষদের চার টাকা কিলো চাল কিনতে হবে না, নিয়মিত ও যথাপরিমিত চাল রেশনে দেওয়া হবে এবং দুর্ভিক্ষাবস্থায় পতিত অঞ্চলগুলিতে লগরখানা খোলা হবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের ধারণা মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। আমরা মরুদ্বীপে ফল্গুধাবাধ কল্পনা করি নি। আমরা চেয়েছিলাম, যে বিশ্বাসে সাধারণ মানুষ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই বিশ্বাসের যোগ্য মূল্য দেওয়া হবে। মজুতদারী, কালোবাজারী, মূল্যবান্ধি, প্রভৃতি বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারটা যে একটা প্রহসনে পরিণত হবে

এ কথাটা যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল সাধারণ মানুষ ভাবতে পারে নি।

দুর্নীতি ও অন্যায় প্রতিবোধে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন যুক্তফ্রন্ট সরকার আজো গঠন করতে পারেন নি। করবেন বলেও কোনো ভবসা নেই। প্রশাসনযন্ত্রের প্রতি স্তরে দুর্ভার বদলে স্থান নিয়েছে দুর্বলতা, অসহায়তা। প্রশ্ন ওঠে, জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে এমন কিছু কি আশা করতে পারে মা, যাতে তাদের মনোবল ক্ষুদ্র ও আশাভঙ্গ না হতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন মানুষ এক মূঠা অমের অভাবে পথের ধারে উজ্জ্বল পাতা চাটেছে, তখন কিছু মানুষ কুছ পরোয়া নেই মনোভাবে গংগার ধারে পনের টাকা কেজি টাটকা ইলিশ কিনে যাচ্ছে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-ককটেলের ভেজপর্বে পোলাও-কোমারি অভাব হচ্ছে না। কোথা থেকে আসছে এতো টাকা, কোথা থেকে আসছে চাল, ঘি, ময়দা, চিনি? মোটকথা, চরম বৈষম্যে সাবা দেশ যখন ভুগছে, তখন কিছু সমাজবিবোধী লোক অর্থের অপ্রতিলিহ পাছাড় গড়ে তারি গুহার বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিবোধে বসবাস করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে লাভ নেই। গত বিশ বছরের শাসনের পর চতুর্থ নির্বাচনও যদি চৈতন্যোদ্রেক হবে না থাকে, তাহলে আমাদের নতুন কিছু বলার নেই। কিন্তু বলার আছে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদেরই অন্যতম।

অবশ্য উড়িয়া, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে খাদ্যসংকট নেই। সে সব স্থলে যতোটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গে ততোটা সম্ভব হয় নি। জনসাধারণের একটি গ্রেপ — যারা গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের বেনামে ধরে ঘরে তাদের চাল লুকিয়ে রেখে খাদ্যসংকট আরো বাড়িয়ে তুলেছে, অসহায় অবস্থায় মধ্যে মজুতদারদের সাহায্য করেছে। বলা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, গ্রাম রাজনীতি কী জটিল এবং সেখানে একালের নকল জমিদারদের রক্তচন্দ্র নী ভয়ঙ্কর। গ্রামবাসীদের সেই ভয় নিবর্তক। তারা একত্র হলে, কোনো শক্তিই তাদের বিবুদ্ধে কিছু করতে সমর্থ হবে না। তবে অ-কংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলিও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের কর্তব্য আইনোব পথেই চালিত করবেন।

জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে দুর্বল নীতির কামনা করে নি। যা? সাদৃশ্য প্রমাণিত হবে তাহলে জনগণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিশ্বাসগ্রস্ত মনোভাবে তান। পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব নয়—আশা কী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি সেই কথা মনে রেখে তাদের নীতি পরিবর্তন করবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

একজনের পদোন্নতিতে পাঁচজনের ক্ষতিগ্ৰস্ত হতে দেখেছি। পাঁচজনকে ডিভিডে কেউ উঁচু পদ পেলে সহকর্মীর চোখও টাটায়। সামরিক বাহিনীতে অবশ্য কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, কিন্তু ডিষ্টোবার ঘটনা একেবারে ঘটে নি এমন কথা বলার উপায় নেই। এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তাই নিয়ে কথাও উঠেছিল, আবার যথারীতি চাপাও পড়েছে। তবে জেনারেল মানেকশ'র পদোন্নতিতে আন্তিনের তলার মূখ লুকিয়ে হাসবেন— এমন সামরিক পুরুষ কি কেউ আছেন? কিশাস হয় না, জেনারেল কুমারমণ্ডলের অনুপস্থিতিকালে জেনারেল মানেকশ' তাঁর দপ্তর পাবার সংবাদ কাউকে ক্ষুধা করতে বলে!

কারণ মানেকশ'র যোগ্যতা আজ প্রশ্নাতীত, চীফ অফ আর্মি স্টাফ-এর ভার সামরিকভাবে বহন করার জন্যে যদি কারো নাম করতে হয়, তবে তাঁরই নাম মনে আসবে আগে। —ইনি যে সেই মানেকশ', সেনাবাহিনীতে বীর অভিজ্ঞতা অধিষ্ঠিত বৈচিত্র্যপূর্ণ, যিনি জাপানী গুলী হজম করে আবার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছেন।

ভারতের সামরিক একাডেমি থেকে যে দলটি প্রথম গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোন, মানেকশ' তাঁদেরই একজন। সেনাবাহিনীতে কমিশন পান তিনি সেই ১৯৩৪ সালে। যখন তিনি ফ্রান্সিসের ফোর্স ব্রাই-ফেলে ছিলেন, যেখানে কেবলমাত্র ব্রিটিশ-দেরই প্রবেশাধিকার ছিল। মানেকশ' অনেক যুদ্ধ দেখেছেন, দু'র থেকে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যখানে বসে। নিজেও লড়েছেন, বীরত্বের জয়মালা অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্যাপটেন মানেকশ' ছিলেন ব্রহ্ম সীমান্তে। জাপানী-দের বিরুদ্ধে তাঁর অতুলনীয় সাহস ও

বীরত্ব তাঁকে এনে দিয়েছিলো সৈন্যদের পক্ষে দলভিত্তি মিলিটারি রস। কিন্তু এই যুদ্ধেই ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি আহত হয়েছিলেন, একজন জাপানী সেনার গুলী তাঁর পাকস্থলী ভেদ করেছিলো। দীর্ঘ ছুটি মাস তাঁকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি মানেকশ'।

এর পরে মানেকশ' কোয়েটার মিলিটারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যকে তিনি ব্রিগেড কমান্ডার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।



মানেকশ'

অধ্যাপনা নিয়ে মানেকশ' অন্ট্রোলিয়াও সফর করেছিলেন। ইন্দোচীনের যুদ্ধ দেখেছেন তিনি। কাশ্মীরে যাতে যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কাশ্মীরযুদ্ধের সময় মানেকশ' ছিলেন সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সে সামরিক কার্যকলাপের প্রধান। আবার রাষ্ট্রসংঘে আলোচনার জন্যে কাশ্মীর প্রসঙ্গটি ওঠে, তখন তিনিও জেনারেল থিমায়ার সঙ্গে ভারতের

প্রতিনিধি বি এল রাওয়ের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৪২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে যখন ভারতীয় বাহিনীর বিপর্যয় ঘটলো তখন জেনারেল মানেকশ'কেই উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সেনাবাহিনী পরিচালনা করবার ভার দেওয়া হয়েছিলো। কাজটা সুকঠিন মনেই নেই, তার ওপর জেনারেল চৌধুরী বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীকে আবার ঢেলে সাজার জন্যে দশ দিনের বেশি সময় দিতে রাজী হন নি। মানেকশ' অপরূপ বিচক্ষণতা ও ব্যুৎক্রিয়তার পরিচয় দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বাহিনীর হৃত মনো-বল ফিরিয়ে এনেছিলেন। অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় রদ-বদল করে মানেকশ' সীমান্ত প্রহরা সুকঠোর করেছিলেন। তারপর থেকে আমরা মানেকশ'কে ইস্টার্ন কমান্ডের জি-ও-সি হিসেবে দেখে আসছি।

সেনানায়ক হিসেবে মানেকশ'র ৫২ বছরের জীবন সার্থক, সাফল্যমণ্ডিত। বন্ধুদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহৃদয়, পরোপকারী, কিন্তু শত্রুর প্রতি তিনি ক্রমহীন, আপোষহীন। তাঁর মত হলো, একজন সৈনিক, সবার ওপরেও সৈনিক। তার স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব সব থাকা সত্ত্বেও সৈনিক-রত থেকে সে কখনো বিচ্যুত হতে পারে না।

মানেকশ'র নেশা একটা নয়। ফটে তোলা, বাগান করা, কুকুর ও মুরগি পালনে তাঁর ঝোঁক খুব। এবং নিজের হাতেই তিনি প্রত্যেকটি ফলগাছ, কুকুর-মুরগির যত্ন নেন, খোঁজবর রাখেন।

সেনাবাহিনীতে মানেকশ'কে একজন ভাবাবিদ বললে বেশি বলা হবে না। কারণ হিন্দী ও ইংরেজী ছাড়াও তিনি পুস্তক, পাজাবী, গুজরাটী, গুজরাতি ইত্যাদি ভাষা জানেন।

স্ত্রী সিল্কা ও দু' মেয়ে শেরী আর মায়াকে নিয়ে মানেকশ'র সুখী পরিবার। স্ত্রী সিল্কাও বহু ভাবাবিদ, ইংরেজী ছাড়া ফরাসীও জানেন। আর জানেন সুন্দর ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তে। মানেকশ' যখন প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভারতকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন তখন সিল্কা কি সেই শক্তিশালী ভারতমাতারই মূর্ত্যু মূর্তি গড়তে ব্যস্ত?



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেগুলেশনের একটি খারার বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির দ্বিত-দ্বিতীয়ের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠিত হবার পর গত ২৪শে আগস্ট সর্বপ্রথম সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে সর্বাত্মক হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হল তার তুলনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। এই ঐতিহাসিক 'বাংলা বন্ধ' অবশ্য বঙ্গবন্ধু সরকারের বিপক্ষে নয়, বরং সরকারী অনুমোদন এর পশ্চাতে ছিল এবং তা ছিল বলেই বোধহয় তা এত সার্থক হতে পেরেছে। চাবিশ ঘণ্টাব্যাপী এই বাংলা বন্ধের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। যে কোন কারণেই হোক যাদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে পর্বাস্ত সাহায্য করছেন না এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে বহুস্থল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য যা মাসিক হরাদ কেন্দ্র তা কোন মাসেই পাঠায় নি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের আদ্যাবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। রেশনে সরবরাহের মত খাদ্য পশ্চিমবঙ্গে নেই। গত বছরও পশ্চিমবঙ্গে এই রকম আকাল পড়েছিল, কিন্তু সেবার কেন্দ্র যে হারে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য জোগিয়েছিল এনারে তার ধারে কাছেও যায় নি। গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা তা তথ্যসহকারে দেখিয়েছি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এই মুহুর্তে খাদ্য ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়

সেদিন ঘোষণা করেছেন যে, দেশবাসীকে ঠিকমত খাদ্য যোগাতে না পারলে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা যাবে না। অবস্থার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কেন্দ্রকে নানাভাবে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়া কেন্দ্র বিশেষ কিছুই করে নি। ফলে খাদ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছ'জন মন্ত্রী দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাতে কিছু ফল ফলেছে বলে মনে হয় কেন না মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার পর কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত দশ হাজার টন খাদ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে পাঠাতে রাজী হয়েছে।

ধর্মঘটের পিছনে কোন বৃদ্ধি ছিল কি না তা নিয়ে অবশ্য অনেকের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। মণ্ডিসভার মধ্যেও অনেকে বাংলা বন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের মতে মন্ত্রীদের অনশনের সিদ্ধান্তের দ্বারাই কেন্দ্রীয় সরকারকে টলানো সম্ভবপর হয়েছে, কাজেই এখন ধর্মঘট করা বাহুল্য মাত্র। পক্ষান্তরে অনেকের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতি প্রতিবাদ জানানোর জন্য বাংলা বন্ধের একান্তই প্রয়োজন ছিল। তা যদি সত্য হয় তা হলে এই বন্ধের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তবে এই

বন্ধের আওতা থেকে সংবাদপত্রকে বাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আজ বন্ধের পরদিন, বঙ্গদর্শন লেখার সময়ে আমরা সংবাদপত্রের অভাবে এখনো পর্যন্ত সারা দেশের অবস্থা, বিশেষ করে বঙ্গ-জানিত পরিণতির কথা কিছুই জানি না। একমাত্র রেডিওকে ভরসা করেই আমাদের চলতে হয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই পশ্চিমবঙ্গের দুরূহ খাদ্য সমস্যার যে সমাধান হবে একথা বলা বাতুলতা মাত্র। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বঙ্গবন্ধু সরকারের সংগ্রহনীতি সার্থক হয়েছে। প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় দ্রুততা অবলম্বন না করার জন্য সরকারী ভাণ্ডারে বঙ্গমান্য ধান-চালই জমা পড়েছে। এখন অবশ্য অনেক কঠোর নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আদায়ের চিহ্নমাত্র নেই। যাদের কাছে চাল আছে তারা এমনভাবে তা লুকিয়ে রেখেছে যে তা বাইরে বার করে আনা দুঃসাধ্য। বর্তমান সম্বন্ধে সর্বাত্মক মজুত উদ্ধারের একটি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় সফর করবেন এমনও স্থির হয়েছে। কিন্তু এতে কতদূর কাজ হবে তাতে বিলম্ব সম্ভব আছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে, যদি সত্যি চাল না থাকত তাহলে অন্য কথা

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তী

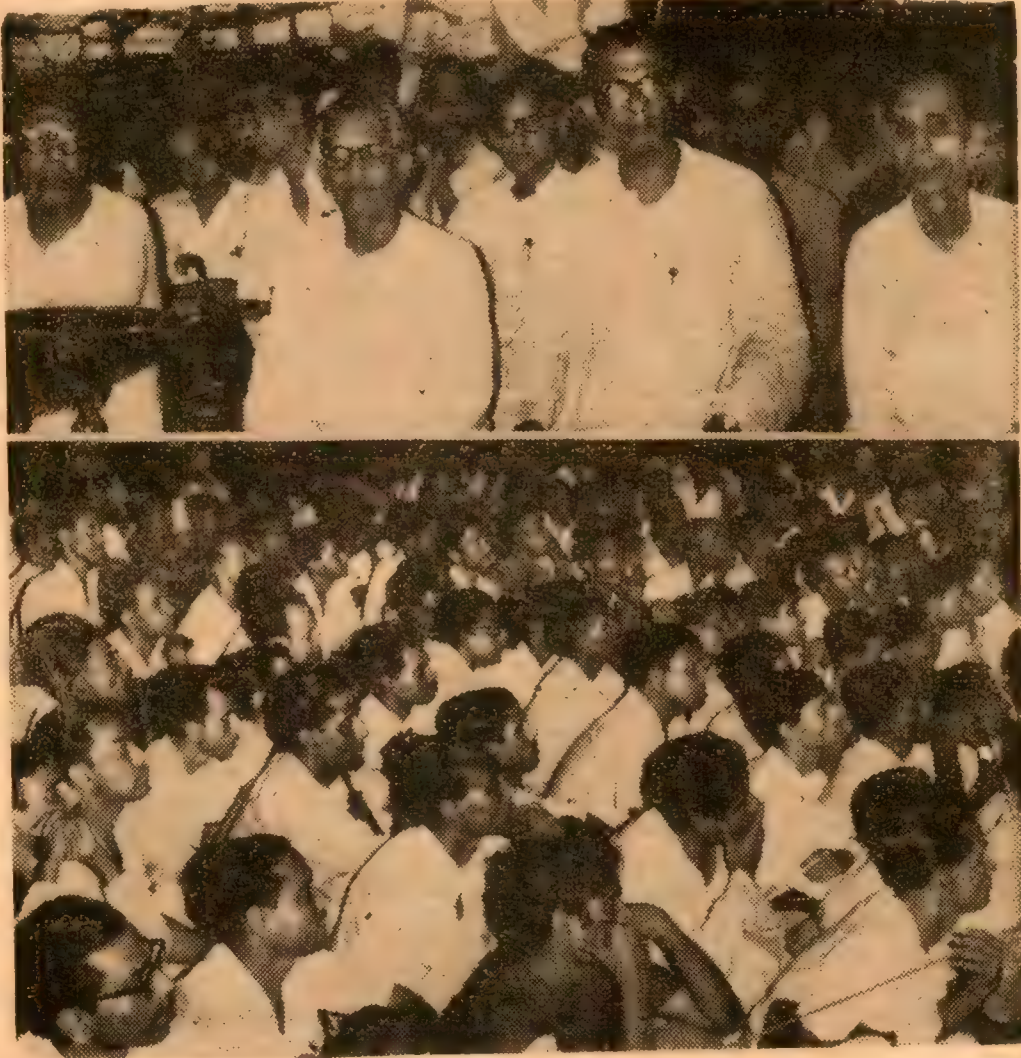
ছিল। কিন্তু চাল এখনো আছে। মনে রাখতে হবে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের নতুন খাদ্যনীতি ঘোষিত হবার পর মজুতদারেরা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে জানিয়েছিল যে, তারা চাল বার করবে না। তারা প্রকাশ্যে এই বলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যে, তারা এক ছটাক চালও দেবে না, সরকার যা করতে পারে করুক। তারা তাদের কথা রেখেছে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে চালের দাম গগনচুম্বী করেছে। এখন যুক্তফ্রন্ট সরকার কি করবেন? মজুত-বিরোধী অভিযানে এখনো কোন রুই-কাংলা ধরা পড়ে নি। এ পর্যন্ত কোন রাববেরায়নকে নিরাপত্তা আইনে প্রেস্তার করা হয় নি। কিছুকাল আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন যে, এদের হাতে সরকার একেবারেই অসহায়। কিন্তু এ

কথা বিশ্বাস করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, কেন না সরকারের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমান এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে আউস ধান উঠতে সুরু করেছে, কিন্তু চালের বাজারে তার কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এবার নাকি আউসের ফলন রীতিমত ভাল, তথাপি বাজারে চালের দাম বিন্দুমাত্র কমে নি। আউস চালের সংগ্রহকাৰ্খ বা সরকার কিভাবে চালাচ্ছেন তা আমরা জানি না। তবে সংগ্রহকাৰ্খ অবশ্যই ভাল হওয়া উচিত, কেন না এখনো পর্যন্ত তা ব্যবসায়ীর গদ্যদমে ঢোকে নি। কেন্দ্র যদি কথা রাখে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মাসিক বরাদ্দ

নিয়মিত পাঠিয়ে যায় এবং রাজ্য সরকার যদি ঠিকমত আউস চাল সংগ্রহ করে উঠতে পারেন তা হলে আগামী কয়েকটা মাস মোটামুটি কেটে যাবে এমন আশা করাটা অযৌক্তিক হবে না।

এবারে বর্ষা ভাল, কাজেই আমন ধানের ফলন যে ভাল হবে সেটা আশা করা যায়, যদিও ধান চাষের চৌদ্দ আনাই অনিশ্চিত। আসছে মরশুমের খাদ্যনীতি কি রকম হবে তা এখন থেকে স্থির করে নেওয়া সরকারের কর্তব্য। বর্তমান ধরনের সংগ্রহনীতির আমূল পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বাগ্রে প্রয়োজন চালকলগুলির জাতীয়করণ। বিগত কংগ্রেস সরকার এই কাজটি করে নি বলেই আশানুরূপ ধান-চাল সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়



যুক্তফ্রন্ট আয়োজিত এই জনসমাবেশে অভিরিক্ত খাদ্যের দাবিতে দিল্লীতে মন্ত্রীদের অনশন ধর্মঘট, মজুতদার ও মুনাব্বির খোরদেবির বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী অভিযানের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

পাশ্চাত্যিক বস্তুমতী



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের বস্তু নিতে শেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের বস্তু পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম কাম সার্বভৌম অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)

এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর

কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের কৃতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,

এম.বি.বি.এম. (কলিঃ)

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

নি। বোশর ভাগ ধানই ভাঙানির জন্য চালকলে আসতে বাধ্য এবং চালকলগুলি সরকারের হাতে থাকলে চাল সংগ্রহে কোন চিন্তা থাকবে না। এই সঙ্গে প্রয়োজন চালের পাইকারী ব্যবসার বিলোপ এবং খুচরো ব্যবসায়ীদের পুনরায় ব্যবসার অনুমতি। অথচ বর্তমানে ব্যাপারটি একে-বারেই উল্টোভাবে চলছে, চালের খুচরো ব্যবসা বে-আইনী কিন্তু পাইকারদের দেহে আঁচড়টি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। গোড়া কেটে আগার জল দেবার বে নীতি কংগ্রেসী আমলে চালু হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের আমলেও সেই নীতি বহাল রয়েছে, এবং এই নীতির আমলে পরিবর্তন ঘটানো ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা

কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির গোপন চক্রান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগের ওপর দুর্বিপাকের কালোছায়া নেমে আসছে। বিভাগ দুটি হচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

এই দুটি বিভাগকে অবলম্বন করার চক্রান্ত আজকের নয়। ১৯৬৩ সালেও অনুরূপ চক্রান্ত জনৈক অধ্যাপকের নেতৃত্বে হয়েছিল। কয়েকটি নোটবই-এর লেখক এই অধ্যাপক-রাজনীতিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ-সাতটি চেয়ার দখল করে বসে আছেন। কোন কমপ্লেক্সের দ্বারা চালিত হয়ে ভদ্রলোক এই দুটি বিভাগের পিছনে লেগেছেন সেকথা বলা শক্ত, কিন্তু তাঁর নেপথ্য প্রচেষ্টার ফল খুবই ভয়ানকভাবে ফলতে চলেছে।

ওই ব্যক্তির চেয়ার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেগুলেশনে একটি নতুন দ্বারা যুক্ত হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতির কোন এক-এ কোন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হতে পারবে না।

ইতিহাসের ওই দুটি শাখা ছাড়া আরও একটি শাখা আছে যা 'আধুনিক ইতিহাস' নামে সচরাচর পরিচিত। এই শাখাটিকেই সুয়োগশীল করা হয়েছে, আর বাকী দুটি হয়েছে অপাংক্ত্যের বা নিষ্কোশ পাশ করলে ছাত্রের জীবনধারণের মত চাকুরী সংগ্রহ করতেও বাধ্য হবে।

কিন্তু ইতিহাসের এই জাত বিচারের ব্যাপারটা অকস্মাৎ কেন ঘটানো হল। এই প্রসঙ্গে একটু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগটি স্যার আশুতোষের নিজের হাতের সৃষ্টি। আগে কোন বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি পড়ানো হত না, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টির পঠন-পাঠন ও গবেষণার সাফল্য দেখে ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই এই বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্বত্র বিষয়টি জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলাদেশের কলেজগুলিতে স্নাতক পর্যায়ে এই বিষয়টি পড়ানো হয় না বলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিভাগে পাশ করা ছাত্ররা কলেজে কাজ পায় না, যদিও পাশ বা অনার্স কোর্সে ভারত ইতিহাসের অনেকখানিই পড়ানো হয় এবং সেই হিসাবে এই বিভাগে পাশ-করা ছাত্ররা কলেজগুলিতে কাজ পেতে পারে। তথাপি নান্য অসুবিধার মধ্যেও জীবিকার শত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এই বিভাগের ছাত্ররা ইতিহাস চর্চার বে নৈপুণ্য দেখিয়ে আসছে তা এককথায় তুলনাহীন।

বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না, আজকের ভারতের বোশর ভাগ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সৃষ্টি। সেই তুলনার আধুনিক ইতিহাসের রেকর্ড কি? কজন জগন্নিখ্যাত ঐতিহাসিক অন্য বিভাগ থেকে বেরিয়েছেন? বিভাগটিকে অবলম্বন করার পিছনের এটাই কি মনস্তত্ত্ব?

প্রাচীন যুগের ইতিহাস ইতিহাস নয়, মধ্য যুগের ইতিহাস ইতিহাস নয়, ইতিহাস শাস্ত্রের এ হেন ব্যাখ্যাকারদের বিরুদ্ধে ওই বিভাগ দুটির ছাত্ররা যে ক্রোধে ফেটে পড়েছেন তা আমরা অত্যন্ত সঙ্গত বলেই মনে করি। এই দুটি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সঙ্গত কারণেই আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের দাবি বাটার দাবি। পৃথিবীর কোন স্থানেই ইতিহাসের এই প্রেশীভেন নেই। কয়েকজন কারেমী স্বার্থবাজের চক্রান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জাতীয় ব্যক্তিকারী মনোবৃত্তির যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে তার প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করব যে ছাত্ররা তাঁদের বাটার সংগ্রামে সাফল্য লাভ করবেন এবং দাবী গোষ্ঠী বা লক্ষ্যবিশেষের স্বার্থে পবিত্র বিদ্যায়তনে এইরকম প্রেশীবিভাগ ঘটতে বাতেন তাঁদের মনোবাঞ্ছা জনসাধারণের সামনে উন্মোচন করে দেবেন।

ভাঙারদের কারেমী স্বার্থ

সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি আদেশে ভাঙারদের কারেমী স্বার্থে একটি সুবৃহৎ আঘাত লেগেছে যার দ্বারা তাঁরা প্রায় কিন্তু হয়ে উঠেছেন।

অথচ আদেশটি এমন কিছু মারাত্মক নয়। যে সব ভাঙারেরা হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের মনোবাঞ্ছা দিয়ে কাজ

করতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন একটা নির্দিষ্ট সময় হাসপাতালে থাকেন। তাঁদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁদের কাছ থেকে সঙ্গতভাবেই আশা করা হয়েছে যে, তাঁরা সেই সময়টুকু হাসপাতালে স্বশরীরে থাকবেন, কেন না তাঁদের সেই জন্য পরিসা দেওয়া হয়।

এতেই ভাঙার সাহেবরা ক্ষেপে গেছেন, এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে। এতখানি অপমান তাঁরা হজম করতে রাজী নন। তাই তাঁরা খোলাখুলি বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছেন।

আমরা সাধারণ লোক, আমরা বুঝি যে, যেখান থেকে পরিসা পাচ্ছি সেখানে কাজ করতে হবে। কিন্তু ভাঙাররা অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁদের ব্যাপারই আলাদা।

একটা কথা আমরা বঙ্গদর্শনে বহুবার বলেছি যে, ডাক্তারীমার্গের সাফল্য লাভের জন্য হাসপাতাল একটি মই-বিশেষ। কলকাতার হাসপাতালগুলি থেকে শব্দ করে জেলা হাসপাতাল সর্বত্রই দেখবেন স্পেসালিস্ট ডাক্তারদের টিকি কোথাও দেখা যায় না, অথচ তাঁরা নাকি হাসপাতালেই চাকরী করেন। সকলেরই জাঁকানো প্রাইভেট প্রাকটিশ আছে, এবং সময়টা তাঁরা বোর্ডিংয়েই ব্যয় করেন। তাঁদের কাছে হাসপাতালটা হচ্ছে বড়ি ছোঁয়ার মত, আর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলেই এমন জমজমাট প্রাইভেট প্রাকটিশ।

দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্পেসালিস্ট মারেই চিকিৎসার কালোবাজারী, হাসপাতালের নাম করে ব্যক্তিগত রোগী টানেন, এবং দিনে পাঁচ মিনিট হাসপাতালে চক্র দিয়েই কতব্য শেষ করেন এবং হাসপাতাল থেকে আসতে মোটা অকের চেক নেন।

সেই প্রখ্যাত স্ট্রোরোগ বিশেষজ্ঞের কাহিনী আমরা বঙ্গদর্শনের পাতায় বহুবার বলেছি যিনি হাসপাতালের মধ্যেই নাকিসূত্রে বলতেন, যারা আমার চেম্বারে আমাকে পরিসা দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁরাই এখানে থাকুন, আর বাকি সকলে চলে যান। ইনি আবার বর্তমান রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ইনি তো একটি প্রতীক, সকলেরই টাইপ এক।

কাজেই সরকার যখন হুকুম দেন যে, পরিসা যখন নিছক তখন সময় হিসাব করে কাজ দিতে হবে, হাসপাতাল ভাঙিয়ে চিকিৎসার কালোবাজার চলবে না তখন এই সম্মানিত বিশেষ সুবিধাভোগীরা যে একযোগে বিদ্রোহে ফেটে পড়বে এতে আর জবাব হবার কি আছে?

শোনা যাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের জনৈক সার্জন এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালের জনৈক মেডিসিনের

অধ্যাপক প্রকাশ্যেই এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতাশ্রী প্রিন্সী ভট্টাচার্যকে আমরা আরও একটি বিষয়ে হুঁসিয়ার করে দিই। ডাক্তারদের এই বিদ্রোহে রাইটার্স' বন্ডিংস থেকে উদ্ভূত নবীন লোকের অভাব নেই। আমরা একজন ডেপুটি সেক্রেটারী আর একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের কথা জানি (যিনি অতীতে নবীন জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য অধিকর্তারূপে কাজ করেছেন) যারা ডাক্তারদের এই বিদ্রোহে পিছন থেকে মদত দিচ্ছেন। এদের বিষয়ে পূর্বাহ্নে সতর্ক না হলে বিপদ আছে। আমরা এজন্য আগে থেকে হুঁসিয়ার করে দিতে চাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। যদি এই সরকারী নির্দেশটি মান্য করতে ডাক্তারদের তিনি বাধ্য করতে পারেন তাহলে তিনি এই অভাগা দেশের একটি চিরন্তন কল্যাণ করবেন। চিকিৎসার নামে শ্রেণী বিশেষের যে গোলাবাজারী চলছে তা দূর করার জন্য এই প্রচেষ্টা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করণে একটি বিল বিধানসভার আগামী অধিবেশনে পেশ করতে চলেছেন। আমাদের সংবিধানে এই বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে লিখিত থাকা সত্ত্বেও কার্যত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এ দেশে কিছুই করা হয় নি। স্বাধীনতা লাভের পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনো শতকরা আঠাশ জনের বেশি নর-নারী লিখতে পড়তে পারেন না। গোটা ভারতের এই চিত্র, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে শৃঙ্খমাত্র কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন করে খুললে, বা বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ করে দিলেই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে না যদি না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম আগাগোড়া পরিবর্তন করা যায়। দূর্ভাগ্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার নাম করে ছাত্র-ছাত্রীদের যা চোখানো হয় তার কোনই ব্যবহারিক মূল্য নেই। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাসও সর্বত্র এক রকম নয়। কলকাতা ও মধ্যবলে গত বিশ বছরে এক জাতীয় নতুন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে, মাসিক মোটা বেতনের বিনিময়ে সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সেখানে গড়ে। এই সব বিদ্যালয়গুলি কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করে চলে না। আর স্কুল বোর্ড বা পৌরসভা পরিচালিত যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি রয়েছে

সেগুলিতে পড়াশোনার মান অতি নিকৃষ্ট ধরনের।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কখনোই সার্থক হতে পারে না যদি না তার পিছনে কোন সুচিন্তিত পদ্ধতি কাজ করে। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। প্রাথমিক পর্বায় শিক্ষাদানের মাধ্যম অবশ্যই বাংলা ছাড়া আর কিছু হবে না। যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে পারে এবং বাংলায় শৃঙ্খলভাবে ভাব-সমূহকে প্রকাশ করতে পারে, সেই ধরনের পাঠক্রম প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাল বই প্রয়োজন, যা সরকারী উদ্যোগে প্রকাশ করা দরকার। তা ছাড়া প্রয়োজন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের। যাতে প্রাথমিক



শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতে তরুণ-তরুণীরা আকৃষ্ট হয় সেই-রকম বেতনক্রমেরও প্রবর্তন করা প্রয়োজন এবং সরকারী ব্যয়ে তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পেতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করা দরকার। দূর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষাজগৎ এইরকম লোকের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে যারা অন্য কোথাও কাজকর্ম না পেয়ে বাধ্য হয়ে এ পথে এসেছেন। এইরকম অসন্তুষ্ট অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষাদানের কাজ কদাপি সার্থক হতে পারে না।

পাট ও পাটচাষী

এবারে পশ্চিমবঙ্গে পাটের ফলন খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু সেজন্য পাটচাষীর মূখে হাসি ফোটে নি, যদিও পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। একটা জিনিস কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমাদের চোখের সামনে বড় শোচনীয়ভাবে ধরা পড়েছে। যে বছরই পাটের

ফলন ভাল হয় সে বছরেই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটি পাটনিীতি গ্রহণ করেন যাতে চাষী তার ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। পাটের বজারে ন্যাক মন্দা যাচ্ছে, অতএব চটকল মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোপটা মারেন দরিদ্র পাটচাষীরই গলায়। সত্যি বিচিত্র এই দেশ এবং বিচিত্রতর এর নীতি। যেখানে প্রতি মুহূর্তে জোর-গলার উৎপাদন বৃদ্ধির উপদেশ দেওয়া হয়—সেখানে যদি বাস্তবিকই কোন পণ্যের উৎপাদন ভাল হয় তাহলে উৎপাদকের রেহাই নেই। বিদেশে পাটের ফল বজারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানী-কারকদের অতি মুনফার লোভ পাটের বজারে মন্দার সৃষ্টি করেছে। এর জন্য খারা দায়ী তাদের শাস্তি হয় না, বরং তারা মন্দাজনিত লোকসান এড়ানোর জন্য সর্বসিঁড়ি পায়। পক্ষান্তরে পাটচাষীকে সুকৌশলে সরকারী নীতির মাৰপাড়ে হকের পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই বিশাল আকরের সৃষ্টি করে যাচ্ছে, সেই পাটচাষীদের যদি প্রতি বছরেই প্রবঞ্চিত হতে হয় তাহলে কালক্রমে এই চাষ তুলে দেওয়া ছাড়া পাটচাষীদের সামনে বিকল্প কোন পথ থাকবে না। ঠিক এই অবস্থা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আখচাষীদের ক্ষেত্রে। চিনি বস্তানী করে এদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দর অপেক্ষা অনেক কম, কাজেই এখন থেকে প্রেরিত চিনি অনেক কম শামেই বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে হয়। তার ফলে যে লোকসান হয়, তা দেশের ভিতর থেকে পুঁজিরে নেওয়া হয় দুর্ভি উপায়ে। প্রথমটি হচ্ছে, ভিতরকার বাজারে দাম চাঁড়িয়ে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আখচাষীকে তার হকের পাওনা না দিয়ে। ফলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা আখচাষ ক্রমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে শৃঙ্খ চিনির উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে না। বোম্বাইয়ের অভাবে স্পিরিট ও অ্যালকোহলের উৎপাদনও পড়ে গেছে এবং বার্মিংহাম-শিল্প, ঔষধশিল্প প্রভৃতিরও রপ্তানিমত ক্ষতি হচ্ছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির মধ্যে ধনিকতোষণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং সেই নীতির বালি হচ্ছে যারা কাচামাল উৎপন্ন করে। তাই দেখা যায় যে, আজ বাংলার প্রতিটি মাঠ পাটে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও পাটচাষী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এর পর আসছে বছরে তারা পকেটের পয়সা খরচ করে কোন আশাতেই বা পাট কিনবে? (২৬।৮।৬৭)

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুশ্রূষা

তখন ইংরেজ আমল। এক বিদেশী এসেছেন কলকাতার। তাকে শহর দেখাচ্ছেন এক বাঙালী গাইড, যিনি অন্যতভাবে বিদেশীর সাহায্যার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইংরেজীর দোঁড় খুব সামান্য হলেও সপ্রতিভ এই গাইড সাহেবকে শহরের যাবতীয় দ্রুত দেখানো শেষ করে নিজের পাড়ায় এক মন্ত ওষুধের দোকানের সামনে নিজে এসেছেন। তারপর দোকানটি দেখিয়ে গাইড বলে চলেছেনঃ দিস ম্যার বিগেস্ট মেডিসিন-শপ ইন ক্যালকাটা, ফাউন্ডেড বাই বটিকমেন্টো অ্যান্ড হিজ টু ব্রাদার্স কোম্পেনী অ্যান্ড ড্রাগিস্টো...

মেডিসিনের সেই স্বায়ংনিযুক্ত ইংরেজী-অটুট, গাইডের পরিবর্তে আজ কিশ্ববিদ্যা-কোষ ডিগ্রীধারী গাইড—যাঁদের দেখা যায় স্ট্রিটসময়, পল্লভান কিংবা আধুনিক দ্রুত স্থানে দেশী-বিদেশী কৌতুহলীর সম্মেলন এবং যাঁরা আজ আর স্বয়ংনিযুক্ত নয়, সরকারী আলা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। সেদিন ট্যারিফের বলে কোন ব্যাপার জ্ঞান ছিল না, ছিল না সরকারের 'ট্যারিফ' বা 'পক্টিন' নামে কোন দপ্তর। সেদিন বিদেশী ট্যারিফটার ভারত-বর্ষে আসত, সে-আসার ভারতবর্ষকে জানার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকত। অন্য পক্ষে, অধিকাংশ ট্যারিফটাই আজ ভারতবর্ষকে জনতে নয়, দেখতে আসেঃ অসংখ্য সমস্যার বিস্তৃত-জটিল ইন্ডিয়া দায়ট ইজ ভারত তাদের যে-কৌতুহলের উদ্বেক করে, তাতে থাকে ব্যঙ্গ, কৌতুক, কখনো বা নির্মম কহণ। কোন ইংরেজ ট্যারিফট কবে যেন বেরাছিলঃ ভোমাদের এমন অবস্থা হবে জানলে আমরা আরও ঘোঁর করে স্বাধীনতা দিতাম।

স্বাধীনতার আরও পরে পেলে যে ভালো হতো এমন কনোভাব অনেক ভারত-সম্ভাবিতরও। অবিশ্বাস্য স্যেনালও বলি একটি সত্য ঘটনাঃ লন্ডনে কাজে কিংবা বেড়াতে গেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সঙ্গে তাঁর নর্মসিগননী, বিবাহিত স্ত্রী। দেশী-বিদেশীর এক পার্টিতে মহিলা সগর্বে ঘোষণা করলেন, লন্ডনে এসে তিনি প্রথম ফ্রেন্স এয়ার

পেলেন, ইন্ডিয়া ইজ সো হারিগুলি সাফোকেটিং।

আমি আপনি বাঁরা এখনো দরিদ্র স্বদেশকে ভালোবাসেন এবং ভালোবেসে প্রতি পদে বোকা বলে প্রতিপন্ন হন, তাঁরা উপরি-বর্ণিত ঘটনা শুনে প্রথম প্রথম মর্মাহত হন, পরে সামান্য পাবার চেষ্টা করেন এই ভেবে, এই ধরণের দেশী সাহেবের সংখ্যা সামান্য। স্পষ্টতই তাঁরা মনকে চোখ ঠারাবার চেষ্টা করেন, কারণ ভারতীয় অভ্যন্তরীণের সংখ্যা সামান্য নয় এবং ক্রমশ বৃদ্ধির পথে। এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয় প্রসঙ্গ ছেড়ে আপাতত দেখা যাক, আমাদের সরকার বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই দায়িত্ব সরকারের, বিশেষভাবে ট্যারিফম দপ্তরের তবু এ দায়িত্ব আমার আপনার সকলের। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যাঁদের দেশের প্রতি মমতা এখনো অটুট, তাঁদের সমবেত চেষ্টায় বিদেশীদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি প্রাণা ও অনুরাগ সঞ্চার সম্ভব।

ভারতের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান প্রকৃতির কেন্দ্র ছেড়ে নির্বাচন করা যাক আশ্চর্য্যকর একটি আধুনিক শহরকে, যার নাম কলকাতা। নির্বাচনের নানা কারণের মধ্যে আছে শহরটির জ্যোতিষাঙ্ক, তাৎপর্ষ্য, গুরুত্ব, সৌভাগ্য এবং দৃষ্টাগ্য। কলকাতার জন্ম মোগল-ইংরেজ আমলের সম্মিলনে, ইংরেজদের হাতে এর পরিচর্যা-লালন-বর্ধন; এশিয়ার সর্ববৃহৎ শহর-গুলির অন্যতম এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতা দীর্ঘকাল ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল, উনিশ শতকের বাংলায় এবং সামগ্রিকভাবে আধুনিক ভারতের সংস্কৃতির পীঠস্থান।

সংক্ষেপে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ভারতীয় জীবন আবির্ভূত-বিবর্তিত হয়েছে। অথচ এত বড় জীবন্ত এই শহর আজ বহু অবাস্তবতার ভাষায় মৃত নগরী। সন্দেহ নেই, কলকাতা আজ দিল্লী-সরকারের দুরোন্নয়ন।

কলকাতার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে সে মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কিংবা কলকাতার এই মৃতপ্রায় অবস্থার জন্য কার কাছে জবাবদিহি চাইতে হবে? দিল্লী সরকার, অন্য ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকার, একাধিকবার কলকাতাকে 'মৃত নগরী' 'মৃতপ্রায় নগরী' 'আবর্জনার শহর' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেছেন? এক-এক সময় সাধারণ ভারতীয় হিসাবে সরকারী মহাজনদের জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা জেগেছেঃ 'কলকাতা কি ভারতবর্ষের বাইরে? কলকাতার দুরবস্থা কি আমাদের সকলের পক্ষে কলঙ্কের কারণ নয়?'

নিষ্করুণ সত্য এই, পূর্ববঙ্গের প্রতি রাওয়ালপিন্ডির যে-মনোভাব, পশ্চিম-বাংলার প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারেরও তাই। নেহরুর আমল থেকেই পশ্চিমবাংলা ও কলকাতা কেন্দ্রের যথাযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হতে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে বেটুকু জুটছে তাও নেতৃস্থানীয় দু-চারজন বাঙালীর আন্তরিক প্রয়াসে ও ব্যক্তিগত মর্বাদায়। পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার দুরবস্থা তাই অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। কলকাতার দুর্দশা আজ শব্দ দিল্লীতে নয়, দিল্লীর বাইরে রূপে আমেরিকার আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি নিউ স্টেটস-ম্যানে প্রকাশিত ও পরান্তরে অনুদিত কলকাতা ভ্রমণকারী জনৈক বিদেশীর একটি প্রবন্ধ থেকে নিচের পঙ্ক্তিগুলি প্রামাণ্যরূপে তুলে দিচ্ছিঃ

খাপা ও কালিঘাট সেরে শহরের কেন্দ্রে এলাম। ভাঙাচোরা ফুটপাথ, খুঁজু, গোবর, মলমূত্রের ঝকঝকে। মাছিতে বিভ্রাট। মাঝে মাঝে ঘেরো ভিখারি। দিনাশেষে এই ফুটপাথেই আবার হাজার গ্রিনেক মানুষের রাত্রির আশ্রয়।

একটি সেমিনারে ব্রিটিশ ও মার্কিন নগর-বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করে প্রবন্ধকার বলছেনঃ 'পৃথিবীর কোন দেশে মানুষের এমন শোচনীয় দুর্দশা আমরা দেখি নি। ঘনবসতি এই শহরে এখনও যেভাবে ভিড় বাড়ছে তাতে করে অর্থ-নীতি, স্বাস্থ্য, পরিবহন, বাসস্থান—বস্তুত সব দিক দিয়েই চরম বিপর্যয় আসছে।...সমগ্র পূর্বাঞ্চলে সত্যাকারের শহর বলতে এই একটিই। গ্রাম-গ্রামাঞ্চল

সাপ্তাহিক বসুমতী

থেকে অনবরত লোক আসছে। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্ভাসত। তবু আর্থিক ও পৌর-ব্যবস্থার দিক দিয়ে শহরের আজ মরণদশা।

হৃদশার পরিচায়ক নানা তথ্য দিয়ে প্রবন্ধকারের উপসংহারঃ 'কলকাতার আর এক নাম বিশ্ব-কলার রাজধানী। কিপলিংয়ের মতে দম-আটকানো এই মারী-মড়কের শহর। একদিক দিয়ে কলকাতা এ যুগেরই প্রতীক। ইংগ-মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেনঃ চরম বিপর্যয় যদি ঘটেই তবে বন্যা বা দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয়ের চেয়ে তা হবে অনেক বেশি দুর্ভাগ্যজনক। কেন না সেটা মানব-প্রতিভার ব্যর্থতারই স্বীকৃতিঃ শহরে মানুষ আসবেই, শহরে ভিড় বাড়বেই—জেনেশেনেও, এই সমস্যার সমাধান করতে পারল না।'

অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংগ-মার্কিন বিশেষজ্ঞরা কলকাতার দুরবস্থার জন্য আমাদের প্রশাসনিক মহাজনদের দায়ী করেছেন। এবং চেষ্টা করলে যে এই দুরবস্থার অবসান ঘটানো যায় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু যা আমাদের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান বিদেশী-দের পক্ষে বতর্টা সহজবোধ্য, আমাদের নেতা ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মাথায় ভুত সহজে তা প্রবেশ করতে চায় না। আজএর মতো নেওয়া যেতে পারে, কলকাতা সম্পর্কে কারো মাথাব্যথা নেই, না রাজ্যের না কেন্দ্রের। ফলত, কলকাতা অশ্রু ভবিষ্যতের মহেঞ্জোদারো—মৃতের 'লুপ', ভবিষ্যতের আবাতালী পুরাতত্ত্ববিদের প্রিয় ধ্বংসাবশেষ বিষয়।

*

কলকাতার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা-উদাসীন্যের সোহাগার কাজ করছে এক শ্রেণীর আবাতালী সরকারী কর্মচারীর স্বর্বাঙ্গ প্রস্তুত চক্রান্ত। এই কর্মচারীদের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র ও পশ্চিম দপ্তরের বিভিন্ন পদে সমাসীন এবং পদাধিকার বলে তাঁরা কলকাতার বিপদের কারণ। আন্তর্জাতিক পশ্চিম-মানচিত্র থেকে কলকাতাকে মছে দেবার জন্য তাঁদের ঐকান্তিক ও নিঃশঙ্ক প্রয়াসের কিছ, কিছ, প্রমাণ কিছকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রচেষ্টার প্রকাশিত সেই প্রমাণগুলি নিচে তুলে দিচ্ছিঃ

নিউ ইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল ট্রাডেল সার্ভিসের টার কন্ডাক্টর মিঃ কে স্যারসন গত নভেম্বর মাসে ২৬ জন মার্কিন পর্যটকের একটি দল নিয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতার এক

পর্যটন পরিচালন সংস্থার কাছে অভিযোগ করেন যে, নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস নাকি তাঁকে কলকাতায় আসার ব্যাপারে যথেষ্ট নিরুৎসাহ করেছে। দিল্লী, জয়পুর, আগ্রা, গোয়ালিয়র, বেনারস থাকতে কলকাতায় কেন, বার বার সে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে তাঁদের। শব্দ তাই নয়, কলকাতায় গেলে ভিসা পেতে দেরি হবে ইত্যাদি নানা কল্যা-কৌশলেও তাঁদের নিরুৎসাহ করার চেষ্টা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো ও টোকিও থেকে আগত পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের কোন প্রতিকার আজও করা সম্ভব হয় নি। বিদেশের এই দূতাবাসগুলি ও ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগগুলি একযোগে কলকাতায় না আসার জন্য পর্যটকদের মধ্যে, খোলা-খুলি না হলেও এক প্রকার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে কলকাতার পর্যটক পরিচালন সংস্থাগুলিও অভিযোগ করেছে।

শব্দ তাই নয়, সানফ্রান্সিসকো থেকে প্রকাশিত প্যারিসফিক ট্রাডেল নিউজের বর্তমান বছরের এপ্রিল সংখ্যার ভারতে পর্যটনের প্রাণকেন্দ্রঃ দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, বারাণসী, এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সানফ্রান্সিসকোর ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ পি এম শেঠ এই প্রবন্ধ রচনার অন্যতম সহযোগী। প্রবন্ধটিতে কোথাও কলকাতার নামমাত্র নেই। আরও উল্লেখযোগ্য হলো, এই প্রবন্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি অংশের ম্যাপ ছাপা হয়েছে। সেই ম্যাপে পর্যটকদের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে দিল্লী, জয়পুর, ভরতপুর, আগ্রা, গোয়ালিয়র ও বারাণসীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু 'দুর্যোগপ্রাণী' কলকাতার ভাগে সে চিহ্ন জোটে নি। প্রবন্ধটিতে দিল্লীর সিস্টার বর্ণনা, ঐতিহাসিক বিকাশ তথা প্রকাশের পটভূমিকা পর্যটকদের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যস্থান, এক কথায় দিল্লীর প্রতিটি মূলকণাকেও যেন পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু করে তোলা হয়েছে। তার পর আগ্রা-জয়পুর-বারাণসী। দিল্লীতে সবচেয়ে বেশি দিন কাটিয়ে আগ্রা-জয়পুর-বারাণসী দেখে দেশে ফেরার উপদেশও দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধে। কিন্তু ভারতের পর্যটন প্রাণকেন্দ্রের তালিকায় কলকাতার কোন স্থান নেই।

শব্দ তাই নয়, প্যারিসফিক ট্রাডেল নিউজের এপ্রিল সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের নিউ ইয়র্ক শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো ও

কানাডা শাখার একটি যাত্রা বিজ্ঞাপন আছেঃ 'দি আর্ট অফ সেলিং ইন্ডিয়া।

ভারত দর্শনের লোভনীয় বিজ্ঞাপন। মার্কিন পর্যটকদের এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ভারতে তাঁদের দেশ দর্শন শব্দ হতে পারে বোম্বাই থেকে। বোম্বাইয়ে দু'দিন থাকার উপদেশ। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেল ও জাহ্নুর সমুদ্র সৈকতে স্নানের বিজ্ঞাপন। অতঃপর কাছাকাছি আরও দু'দিন গুরুপ্রবাস। অজস্তা, ইলোরা। পরের দু'দিন উদয়পুর। থাকার জায়গা লেক প্যালেস হোটেল। জয়পুরে একদিন—হাতি-ট্যাক্সিতে চেপে ভ্রমণের প্রাসাদ দর্শন।

— পরের দু'দিন দিল্লী। এক হাজারের উপর দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান। দু'দিন আগ্রা। তাজমহল, আগ্রা দুর্গ ও ফতেপুর-সিক্রী। পর্যটকদের শেষ দু'দিন কাশ্মীরে হাউস বোটে কাটুক। এই তো ভারত দর্শন। বিজ্ঞাপনেও কলকাতার স্থান নেই! মে মাসের প্যারিসফিক ট্রাডেল নিউজের ৬৮ পৃষ্ঠায় ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের আর একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরের আকর্ষণীয় হোটেল ও খাদ্যের বিজ্ঞাপনও তাতে আছে। কিন্তু কলকাতা—বিদেশে কলকাতার বিজ্ঞাপন 'দৈব, মৈব চ'।

*

কলকাতার প্রতি কেন্দ্রের সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্যের আশা ভারতের প্রাক্তন পাক সরকারের সহৃদয়তার দুর্যোগ সংগেই বৃষ্টি উপমের। এই কঠিন-কঠোর সত্য অস্বপ্নবস্তুর আমাদের সকলেরই জানা। যে একটি প্রবল বাঙালী হিসাবে আমাকে নিভা আহুত করে তা এইঃ আমরা কলকাতাবাসী বাঙালীরা আমাদের প্রিয় শহরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি? পোনে তিন শ' বছর যে শহর 'আধুনিক বাঙালীর লালনে-বর্ধনে ধাত্রীদেবতার ভূমিকা নিয়েছে, সেই কলকাতার ঋণ আমরা কতটুকু শোধ করছি বা করার চেষ্টা করছি? আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে কলকাতার কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করে গেছেন, ঋণশোধের চেষ্টাও করে গেছেন, কিন্তু আমরা, এই ঋণ-বিশ্বশতকের বাঙালীরা, কলকাতার দুর-বস্থা সম্পর্কে কতখানি সজাগ? কলকাতার দেখাশোনার উন্নয়নের ভার মূলত যে সংস্থার হাতে, সেই কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত, অথচ আমাদের কি আশ্চর্য সহনশীলতা, তাও প্রবাদবাক্য-মূলত, আমরা প্রতি বারেই পৌরনির্বাচনে

সাপ্তাহিক বসুমতী

অংশগ্রহণ করে 'পৌরগিজাদের' ('পৌর সং পিতা') হাতে শহরের দায়দায়িত্ব ভুলে দিই, পরে তাঁদের সর্ববিধ অপদার্থ-তার জন্য তাঁদের নিন্দা-পরীবাদ করি, কিন্তু ঠিকপথে চলতে তাঁদের বাধা করতে পারি না। আমরা বর্ষাকালে হাট্ট-বা কোমর-জলে আজ আর বিরক্ত হই না, বরং পূর্নকিত হই, রাস্তায় স্তূপীকৃত আবর্জনার গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দেওয়ার সময় ভাবি, আহা বেরোবার সময় রুমালে সেণ্ট দিতে ভুলে গেলাম! কয়েক মাস কলের জলে সাপের বাচ্চা বা কেঁচো বেরোনার খবর না পেলে অবাক হই, মাসে তিন-চার দিন রাস্তার বাতি না জ্বললে যাবি, এখনো কর্পোরেশন আছে! এ সব অভিজ্ঞতা কলকাতার তাৎসল্যবাসিন্দাদের, এবং এত সহনশীলভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত অসন্তোষ, এ সব নিয়ে আজ আর কেউ প্রতিবাদ জানান না, জানানো অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। অতএব বিদেশী ভ্রমণকারী যখন এই সব শহুরে দুর্গতির কথা তাঁর দেশের পত্রিকায় ছাপেন, তখন আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে, আমরা তখন বলি, কি অন্যায্য, কি অন্যায্য!

আসল কথা, আমরা কলকাতায় থাকি, বাস করি না। কলকাতাকে শহর পরিচয়ে বিশ্বের দরবারে ভুলে ধরার বিন্দুমাত্র বাসনা বা চেষ্টা নেই। কলকাতাকে পরিষ্কার রাখার কর্তব্য যে কলকাতার নাগরিকদের এ বোধ আমাদের আবেদী আছে কি না সন্দেহ। কলকাতার সৌন্দর্য-স্থান বা 'বিউটি স্পট'গুলির প্রতি আমরা উদাসীন। উদাসীন শব্দ নয়, সময় সময় সেগুলি নষ্ট করার বিশেষ আগ্রহী। তা না হলে রবীন্দ্রসদনের মতো একটি ভ্রমণকার প্রেক্ষাগৃহ একাধিকবার জ্বলন্ত হবে কেন? তা না হলে বটানিক্যান্স প্যাডেনের মতো এশিয়ার অন্যতম সূত্রহং ও প্রখ্যাত উন্মিদ্ধ-উন্মাদনের ক্ষতি সাধনে আমরা তৎপর হবো কেন? একাধিক সূত্রহা ভবনকে আমরা প্রাচীরপথে বা পানের পিকে-চুনে কলঙ্কিতই বা করবো না কেন?

বা বিবৃশ মনোভাব সত্ত্বেও আমরা বাঙালীরা কলকাতার স্বাস্থ্যসৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, কিন্তু কারি না, করবার ইচ্ছাও বোধ করি নেই। আমাদের

কর্পোরেশন আছে, রাজ্য সরকারের পবর্চন দপ্তর আছে, আছেন উন্নয়নমন্ত্রী। কর্পোরেশনের কাছে আমাদের আশা সামান্য, নেই বললেও চলে। রাজ্য

বিষয়-বৈচিত্র্যে, চিন্তার ঐশ্বর্যে, লেখক-বৈশিষ্ট্যে অস্বতী

সাপ্তাহিক বসুমতী

১৩৭৪

একালের আশা-নিরাশার স্বপ্নে আবর্তিত মানুষ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক সেই মুহূর্তে এবং যথার্থই উদ্যোগপূর্ণ বিচিত্র মানুষের নিষ্ঠুর-কিংবা সূক্ষ্ম-সামিথ্যে উত্থান-পতনে উজ্জীবিত যে জীবন জটিলতার জট খুলে খুলে আবিষ্কৃত, এবারের সুবহু দৃষ্টি উপন্যাসে সেই সম্মুখী জীবন কাহিনীর সুনিপুণ বিন্যাস খুলে দিয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনার দ্বার। আর এই মহৎ সৃষ্টিতে স্বাক্ষর রেখেছেন সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিতে বিপরীত পটভূমিকার এবার বাংলা

সাহিত্যের দুই প্রান্ত উপন্যাসিক

নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিশ্বদূরে সিংহুর স্বাদ আনতে যিনি অসাধারণ, লিঙ্গকল্পনায় যার হাত ওস্তাদ তীরন্দাজের মত সেই 'তেলেনাপোতা' আর 'বিকৃত ক্ষুধার কাঁদের মহান শিল্পী প্রামেজ মিত্র এবার লিখেছেন এক আশ্চর্য গল্প সাপ্তাহিক বসুমতীতেই।

বর্তমান অন্তঃসংশয়নে দেউলিয়া | পারিবারিক নিখুঁত চিত্রায়ণে
সাহিত্যের উপর তীক্ষ্ণ ও সমালোচনিক | উজ্জ্বল সৃষ্টি হাতের একটি
একটি বড় ব্যঙ্গ গল্প লিখেছেন | সার্বজনীন বড় গল্প লিখেছেন
পরিমল গোস্বামী | আশাপূর্ণা দেবী

বাংলা সাহিত্যের গল্প লেখকদের নাবিক দৃষ্টি আজ নব নব দিগন্ত আবিষ্কারে উন্মূখ। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এক-একটি বৈচিত্র্যময় বড় গল্প লিখেছেন: আশা দেবী, আশুতোষ মৃথোপাধ্যায়, জ্যোতির্ভরপুর নন্দী, প্রাণতোষ ঘটক, বাসী রায়, মেঘদূত, রঞ্জিতকুমার সেন, লীলা সজ্জদার, শক্তিধর রাজগুরু, সুশীল রায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

প্রতিনিধিস্থানীয় দৃষ্টি বিদেশী বড় গল্পের অনুবাদ করেছেন।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও ভবানী মুখোপাধ্যায়

একালের কবিতার গতিপ্রকৃতি | একালের গল্পের গতিপ্রকৃতি
চিত্তরঞ্জন বান্দ্যোপাধ্যায় | ভাদব চৌধুরী

প্রতিকটু হলেও বলতে বাধ্য, কল-কাতার অসুস্থতার জন্য বাঙালীরাও কম দায়ী নন। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈরিতা



অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই কি ১১ই সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট এড়াতে পারবেন?

আবার ধর্মঘট

ভারতীয় জীবনযাত্রা ঘণ্টের মতো ফেন্ড অটল। আর তারই জন্য বোধহয় নিয়মিত ব্যবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটের দুর্ঘটনা পাকিয়ে তোলা হয়। ইতিপূর্বে এক-একটি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে জাতীয় সম্পত্তি, তরুণ বিকাশোন্মুখ প্রাণ, পুলিশের লাঠি গুলী কাদানে গরুর অপচয় হত। ইদানীং ধর্মঘট-প্রিয় সরকার ধর্মঘটকে না ঘাঁটিয়ে এই ফালত অপচয় কিছু পরিমাণ বন্ধ করেছেন বটে, কিন্তু কেবল ধর্মঘটের জন্য দৈনিক হারে যে কোটিটির পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে তাকে নিবারণিত করা যায় নি। ধর্মঘটের ডাক হলে ধর্মঘট হবেই। কারণ ধর্মঘট না করিয়ে সরকার বাহাদুর গত কুড়ি বছর ধরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দূরে থাক সাধারণ সিমান্তেও উপনীত হতে পারেন নি, পারছেনও না। সরকারী শালগ্রামকে নাড়া দেওয়ার জন্যই ধর্মঘট সূত্রাং নাগরিক সাধারণের একটি অবশ্য পালনীয় নাগরিক কর্তব্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মঘটের দরুণ যে পর্বতপ্রমাণ ক্ষতি, তা সাধারণের ক্ষেত্রেই চাপানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধর্মঘট যে সরকারী অকর্মণ্য-ভারই ফলশ্রুতি তা কখনো কেউ উচ্চারণ করে বলেন না। যে সিমান্ত দুর্দিন আগে নিলে ধর্মঘট এড়ানো যায়, সরকার সে সিমান্ত কখনোই আগে গ্রহণ করেন না। কেন করেন না, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। বিপুল আর্থিক ক্ষতিকে জাতির ঘাড়ের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপিয়ে দিয়ে সরকার কেন যে নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, কেন সে এই প্রকাণ্ড দায়িত্ব-হীনতার জন্য সরকারকে কখনো কঠিন জবাবদিহির মুপোদুর্মা হতে হয় না, তাও

আশ্চর্য। ধর্মঘটের পর প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারকে মোটামুটি ধর্মঘটীদের দাবি মেনেই নিতে হয়। কিন্তু আগে সেই দাবি মেনে নিয়ে সরকার ধর্মঘটের দুর্ঘটনা থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করতে অগ্রসর হওয়া আপন নৈতিক দায়িত্ব বলে স্বীকার করেন না। নজীর টেনে ইতিহাস রচনার এ বিয়ে নিশ্চয় কোন প্রয়োজন নেই। কেন না নজীর আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত। সেই সরকারী মহান অকৃত-কার্যভার আরও একটি প্রমাণ উপস্থিত করতে চলেছে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা আহৃত সর্বভারতীয় ধর্মঘট। কেন্দ্রীয় কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্নটি নিয়ে সরকার আজও পর্যন্ত কোন সিমান্তে উপনীত হতে পারেন নি। উপপ্রধান তথা অর্থমন্ত্রী আবার এই সময় জাপান পরিদর্শনে ব্যস্ত। তিনি কয়েকটি কঠিন বক্তব্য অর্থদপ্তরে উপহার দিয়ে ভারত ছেড়েছিলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় কর্মীরা কিন্তু অত সহজে তাঁদের ভাতাবৃদ্ধির দাবি ছাড়তে নারাজ। তাঁরা ধর্মঘট করবেনই এবং সরকারকেও তাঁদের দিয়ে ধর্মঘট করাবেনই। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই কোন রফা হবে। কিন্তু তার আগে অর্থমন্ত্রীর গৌ বজায় রাখতে দেশব্যাপী একটা বিরাট অশ্রের আর্থিক ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। এমনটাই হয়ে আসছে। এমনটাই হবে। প্রতিকারহীন এ লড়াই চলবে যতদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মতো তথাকথিত কঠিন মানুষরাও, (ইংরেজিতে গর্ব করে যাঁদের আইরন ম্যান বলে অভিহিত করা হয়), সমস্যাকে তরল করার আগ্রহ না-অনুভব করছেন।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ চাবিশ ঘণ্টা স্থায়ী ধর্মঘট আহ্বান

করেছেন ১১ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু এই সিমান্ত সত্ত্বেও পরিষদ এখনো আলোচনা চালাতে গররাজি নন। আলোচনার জন্য তারা একটি সপ্ত সদস্যক কমিটিও প্রস্তুত রেখেছেন। ধর্মঘটে যোগদানকারী কর্মীর সংখ্যা জনৈক মূখপাত্রের গণনায় ২৫ লক্ষ। এ ২৫ লক্ষ ছাড়াও সরকারী শিক্ষক, পারিক সেক্টরের কর্মিগণ এবং রাজ্য সরকারী কর্মীবৃন্দকে গণনা করা হলে এই সংখ্যা বিপুলাকার ধারণ করবে। পরিষদ ধর্মঘটে যোগদানের জন্য এঁদেরও আহ্বান জানিয়েছেন আর স্বতন্ত্র ব্যতীত দমস্ত রাজনৈতিক দলই ধর্মঘটের সমর্থক বলে ধর্মঘটী পরিষদের মূখপাত্র দাবি করছেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে, শ্রীযুত দেশাই দিল্লীতে ফিরে সপ্ত সদস্যক কমিটির সঙ্গে এক রাউন্ড বৈঠক করেছেন, তবে নিষ্ফল। ব্যাপারটিকে এখনো কলিয়ে রাখারই চেষ্টা চলছে যার অনিবার্য ফল সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট।

ধর্মঘটের জাতীয় ক্ষতির অংকটা মনে রেখে ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেই অর্থ দপ্তর একটি মোটামুটি সিমান্তে উপনীত হ'ন এটাই কাম্য। কিন্তু শ্রীযুত দেশাই তথা কংগ্রেস সরকার সাধারণ ব্যাপারকে জটিল না করে কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন বলে ভরসা নেই। সূত্রাং তেমন কোন পন্থায় উপনীত না হওয়া গেলে ধর্মঘট যে হবেই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশও নেই। ধর্মঘট হলে পনশচ আর্থিক অপচয়কে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, ধর্মঘটের পর তিনি যা অবশ্যই মেনে নেবেন বলে মনে মনে ইতিমধ্যেই সিমান্তে উপনীত হয়েছেন, কার্কাবিল'ব না করে তা বরং প্রকাশ করে ফেলুন। তাতে অথবা হয়রানির হাত থেকে স্নাত রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৬ই সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী পুনশ্চ বিদেশযাত্রা করছেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য রিও দ্য জেনিরোর পথে তিনি লন্ডন যাত্রা করবেন। তার আগেই শ্রীযুত দেশাই তাঁর প্রিমুখী বন্ধের (মজুরী, আর ও মূল্য) প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করবেন বলে জানিয়েছেন। সূত্রাং এ বিষয়ে কোন-না-কোন সিমান্ত হ্রয় ধর্মঘটের পূর্বেই জানা যাবে। সেই সিমান্তের ফলশ্রুতিতে যদি ধর্মঘট আহ্বানের প্রয়োজন ফরায় তবে একটা কাজের কাজ হতে পারে। তবে অর্থমন্ত্রী নিজে থেকে নইবেন এতটা আশা করা উচিত হবে না।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন বখন অর্থমন্ত্রীর তথাকথিত শক্তমনের শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চায়: চিনি

সাংস্কৃতিক বসন্ত

ও কলার ক্ষেত্রে মূল্যবান্ধি তাঁর মূল্যবান্ধি বসন্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করল কী করে; অর্থমন্ত্রী তখন তার জবাবে বলেছেন: জীবনে সব ব্যক্তি খাটে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু ঘটে যায়। কিন্তু তাই বলে একটা সমাধানের পথও খুঁজে বার করতে হবে বৈ কি।

অর্থমন্ত্রীর আগমন বক্তব্যই প্রকাশ, মূল্যবান্ধি রোধের ব্যাপারে তাঁর সব ব্যক্তি খাটে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘন ঘন মূল্যবান্ধি যথা পূর্ব ঘটবেই। প্রীমুত দেশাই যদি মূল্যবান্ধির প্রবণতাকে সত্যিই রোধ করতে পারতেন, অনেক জবরদস্ত লড়াই-এর পর উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকার মাত্র লাভ করেও ইতিহাসে নাম রেখে যেতেন তিনিই। কিন্তু তাঁর জীবনে তদন্তে যুগান্তকারী কিছু ঘটে ওঠার চান্স খুবই কম।

এই যখন অবস্থা তখন আর আর মজুরীর ব্যাপারে তাঁর নিজের সেই অকম ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এতদূর জবরদস্ত কেন। জীবনে এই ব্যক্তিকেই যে টিকিয়ে রাখতে হবে তারই জন্য বা এমন প্রাপ্য পরিশ্রম কি জন্য। অর্থমন্ত্রীর অসহায় লোহমানবতার মধ্যেই আসল বিরোধটা লুকিয়ে আছে। সরসের মধ্যে ভূত এমনিভাবেই নিজেকে গোপন করতে গিয়ে ফেসে যায়। সাংবাদিক সম্মেলনের প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রীও তদুপ কল্প অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উঠেছিলেন।

আর সেই রূপ প্রকাশিত হওয়ার পর মজুরী কিম্বা ভাতাবান্ধির দাবিকে কোন ব্যক্তিতে পরিহার করা যাবে! অর্থমন্ত্রী শিরভাবে এসব পরশটও ভাবতে পারেন।

ভারতে সাদা মিশনারীর ভবিষ্যৎ

সাদা আলখল্লা, দাঁড়ির বহুর আর বুকুে রুপ নিয়ে একদল সাদা মানুষ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এতকাল অবাধ বসবাসের সুযোগ ভোগ করে আসছিলেন। আজকের তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি সজাগ করার প্রস্ন উঠেছে।

প্রকাশ, ভবিষ্যতে ভারত সরকার একমাত্র মিশনারী সেবাকার্যে বিশেষজ্ঞ বিদেশী ব্যক্তিত্ব অন্য কাউকে ভিসা মঞ্জুর করবেন না। একই নীতি প্রযোজ্য হবে তাঁদের ক্ষেত্রেও যাঁরা বর্তমানে ভারতে বসবাস করছেন। তবে বর্তমানে ভিসা-ধারীদের ভিসা নামঞ্জুর করার (ক্যানসেল) কোন প্রস্তাব নেই।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর মিশনারীদের সম্পর্কে সরকারের এবারের সচেতনতার স্বাভাবিক একটা কাজের কাজ হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মিশনারী সম্প্রদায় জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব সঞ্চার

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন বলে প্রায়ই সংবাদপত্র মারকুম আলোকপাত করা হচ্ছিল। বিষয়টি সাধারণের, সরকারের এবং সংসদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদের পেছনে, জাতীয়তাবিরোধী মিজোদের চিন্তার এবং উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিতে বিদেশী মিশনারীদের প্রভাবের কথা আরও অগত্যা আসে। আরও মাইকেল স্কটের মতো বিশেষ উদ্দেশ্যে ও মিশন নিয়ে মিশনারী স্বেচ্ছা বসে-থাকা কিছু তথাকথিত মিশনারীর কার্যকলাপের সংবাদ জানি। সম্প্রতি ভারত সরকারের আদেশ বলে তিনজন মার্কিনী ও একজন কানাডিয়ান মিশনারীকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ জানানো হয়েছে—তাঁদের দ্বারা জাতীয় স্বাধিবিরোধী কাজ চলছিল বলে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার।

কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের পেছনে যে প্রেরণা মূখ্যত ত্রিাশালি তা হল ভারতীয় মিশনারীদের আবেদন, কোন বিশেষ রাজনৈতিক কারণ নয়। কিছুদিন ধাবং ভারতীয় মিশনারীরা দাবি করে আসছিলেন যে, গাড়ার গাড়ার বিদেশী মিশনারীদের ভারত প্রবেশের অনুমতি দান করে ভারতীয় খৃস্টান সমাজের কোন বিশেষ উন্নতি করা হচ্ছে না। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে হলে ভারতীয় খৃস্টানদের সংকাবে উদ্বেগ করতে তের নদী সন্ত সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে আসারও কোন অর্থ হয় না। কারণ মিশনারীদের যা যা কর'বা, ভারতে অবস্থানকারী বিদেশী মিশনারীরা তদতিরিক্ত অনেক অবাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত থাকেন। অথচ মিশনগুলি পরিচালনার কাজে ভারতীয় মিশনারীরাই যথেষ্ট। বিদেশী মিশনারীদের এদেশে অবস্থানের তাই অপরিহার্য কোন কারণ নেই।

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় মিশনারীদের এ দাবি কোন সুস্থ তেমনই সঙ্গত। কোন ধর্মমত বিদেশ থেকে নীত হতে পারে কিন্তু সেজন্যই সেই ধর্মীয় ব্যাপারে খবরদারি করার জন্য বিদেশী কর্তাব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ থেকেও বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মমন্দিরগুলির ওপর আধিপত্য রাখতে ভারতীয় বৌদ্ধ-বাহিনীর আবশ্যক হয় নি। তেমনই মুসলিম ধর্ম ভারতে তার প্রসারতা বৃদ্ধি করেছে বলেই মুসলিম ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর খবরদারির দরকার হয় নি। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহে মুসলিম ধর্ম ওতপ্রোত হয়ে গেছে। আর বিভিন্ন ধর্মমত, সামাজিক আচার, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এক দেশ থেকে বহু দেশে প্রসারতা লাভ করলে সেই

দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে তা মিলে মিশে সেই দেশের সংস্কৃতিধারীরই অঙ্গীভূত হয়।

খৃস্টান মিশনগুলি বিদেশী বিহীন অচল। ধর্মমতের ওপর এমন পরদেশ-নির্ভরতার তাই কোন সাক্ষ্য বৃদ্ধি নেই। বিদেশী খৃস্টানদেরও তাই কোন অধিকার নেই ভারতীয় খৃস্টান সমাজকে তারা আপন জাতীয় চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের মনে একটা ভূমিহীন অবলম্বনহীন মানসিক ব্যভ্রা সৃষ্টিতে সাহায্য করার। অথচ সংবাদে প্রকাশ, বহু অবাঞ্ছিত বিদেশী খৃস্টান ষ্ট্রিক এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষ ঘাঁটি পেড়ে বসে আছেন। যে ভারতের মহামানবের সাগর তাঁর বিভিন্ন সংস্কৃতি সভ্যতা এবং ধর্মমত অনুকূল আবহাওয়ার একীভূত হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ লাভ করে এসেছে, বৈদেশিক প্রচেষ্টা দেখানো কতিপয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি বপনে তৎপর। এই মহা দিনান্তিকারী চিন্তা ভারতীয় খৃস্টান সমাজের এক শ্রেণীকে হতাশ নিরালম্ব এবং বৈদেশিক মনোভাবে কিন্তিত করে রেখেছে। এই অসুস্থতার হাত থেকে সেই অবাধ ভারতীয় খৃস্টানদের রক্ষা করার অপরিহার্য দায়িত্বও ভারতীয় খৃস্টানগণ মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। একসময় খৃস্টানরা ছিলেন এদেশে রাজার জাত। ধর্মমতের কতিপয় অনুব খৃস্টানও সেকারণ নিজেদের রাজকীয় আশ্রয়ের মোহে দেশীয় সংস্কৃতিধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাববার সুযোগ ও অবকাশ লাভ করে থাকতেন। বিদেশী মিশনারীদের প্রতি তখন অন্যতর মনোভাবের আকর্ষণ ছিল। তাঁদের আওতার অনেক কালতু সুযোগও কারো কারো জীবনে দেখা দিয়েছে। আজ ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ। আজ এতাদৃশ মনোভাবের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই স্বাভাবিক।

ভারতীয় খৃস্টানগণের যে অংশ বিদেশী মিশনারীদের মৌরসী পাটার আপত্তি জানিয়েছেন সে অংশ সেই রাজবংশী ধর্মকে একটি ধর্মমতরূপেই গ্রন্থার সঙ্গে গ্রহণ করে বিদেশী অধীনতামুগ্ধ হয়ে সেই পবিত্র ধর্মকে দেশের জল-হাওয়া-মৃত্তিকার সঙ্গে ওতপ্রোত করতে স্বাভাবিকভাবেই দাবি তুলেছেন।

কোন ধর্মমত কোন দেশীয় বা জাতীয় চেতনার বশবর্তী নয়। যখন তেমন অবস্থা দেখা দেয় তখন সেই ধর্মমতের পবিত্র 'ধর্ম'র দিক বিন্যাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে মনে রাখতে হবে। যে ধর্ম জাতীয়তাবিজাতীয়তার দ্বারা আবদ্ধ তার পবিত্রতা ধারণ করার ক্ষমতাই অবলম্বন হতে বসে।

ধর্মের পবিত্র চেতনা ক্ষুদ্র মানবিক সংস্কারের স্বারা মসীলিপ্ত হয়। ধর্ম তখন আর যা কিছু হতে পারে, পারে না। মানবিক কল্যাণের পথিকৃৎ হতে।

খৃস্টানধর্ম কোনও বিদেশী পর-ওয়ানা বলে বেঁচে থাকে না, থাকতে পারে না। বিদেশী মিশনারীদের সেকারণ সেবাকার্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য নেই যার আকর্ষণে দেশে দেশে মিশন স্থাপন করতেই হবে তাদের। যেখানে মিশনারীরা সেবার উদ্দেশ্যকে স্ববদারীর আকাঙ্ক্ষায় অর্থনৈমিত করেন, সেখানে তাদের সেই ব্যর্থতা সম্বন্ধী-কনসীকেও বিমুখ করে তোলে। ভারতীয় মিশনারীদের অব্যাহ আগমন রোধ করার অণ্ডরাজ তুলছেন, তখন এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মিশনের উদ্দেশ্য বিদেশী মিশনারীদের কাছে আজ গৌণ হয়ে পড়েছে। সেবাকার্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাদের আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বসবাস এবং গভ্যারাতের অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। ভারত সরকার নতুন বিধিনিষেধ কড়াভাবে প্রয়োগ করলে তাতে দেশের মর্যাদা এবং ভারতীয় খৃস্টানদের মর্যাদা উভয়ই রক্ষিত হবে।

বঙ্গাল খৃস্টান কাউন্সিলের বক্তব্য

বঙ্গাল খৃস্টান কাউন্সিলের তরফ থেকে ইতিমধ্যে একটি প্রতিবাদপত্র দৈনিক কসমেতীর পাতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাউন্সিলের বক্তব্য, বিদেশী মিশনারীগণ দেশীয় খৃস্টান চার্চের অস্তিত্বই এদেশে আসেন এবং তাদেরই সহযোগিতায় কাজ করেন। সুতরাং কতি-পয়ের জন্য সমগ্র বিদেশী মিশনারীদের আসা-বাওয়ার পথ বন্ধ করা ভারতের ঐতিহ্য-বিরোধী।

একথা খুবই সত্য যে, দু'একজনের অপকর্মের বোঝা অপরের ক্ষম্বে চাপানো অসঙ্গত। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, যখন ক্রমান্বয়ে বিদেশী খৃস্টান মিশনারীর বেশে কতিপয় বিদেশীকে ভারতীয় জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব প্রচারে উৎসাহী বলে দেখা যাচ্ছে তখন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে এ-বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত প্রশ্ন এখানে এসে পড়ায় সরকারী ব্যবস্থা সেই গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কিছু অসুবিধার কারণ হতেও পারে। কিন্তু তারও থেকে বড় প্রশ্ন জাতীয় সংহতি রক্ষার। সেই প্রস্নেই বিদেশী মিশনারীদের গভ্যারাত নিরন্তরের আবশ্য-কতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে কী অর্থ তাঁরা করেন তা সহজবোধ্য নয়। ভারতবর্ষের লেখক এই

ঐতিহ্যের আলোকেই একটি প্রশ্ন রেখে-ছেন যে, ভারতবর্ষ সর্বধর্মমতসহিত্যতার যে আদর্শ স্থাপন করেছে তারই ফলে এখানে সব ধর্মই এক মহান সংস্কৃতিধারার অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারতীয় খৃস্টানগণও সেই মহান ঐতিহ্যে স্নাত হয়েই পরদেশী মিশনের প্রতি অনুরক্তি শিথিল করে ভারতীয় খৃস্টান সমাজেরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করবেন। ভারতীয় ঐতিহ্য এমন-তর শ্রীবৃদ্ধিকেই চিরকাল সম্মান করে এসেছে।

ছাউন হোটে ছোট সংসার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয় এক ভাস্কর দপ্তর। উল্লেখ্যত কল্পনা এবং মৃত্ত পার-কল্পনা অর্থমন্ত্রী থেকে অর্থ দপ্তরের আবহাওয়াকেই বিমুখ করে তুলেছে। যা অবাস্তব, অর্থ দপ্তরের কোটি টিক সেইদিকে আশ্চর্যভাবে কুলে পড়ে। অর্থমন্ত্রীর ওয়েজ ফ্রীজের প্রস্তাবের পর অর্থ দপ্তর প্রচারিত আর একটি উল্লেখ্য চিন্তার সংবাদ পাওয়া গেলঃ তিন বা ততোধিক সন্তানের জননী যদি অন্তঃসড়া অবস্থায় মেটারনিটি লীভের দরখাস্ত করেন, তবে অর্থ দপ্তরের এক সাকুলার-বলে তা নাকচ করে দেওয়া হবে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে। এই সাকুলার কেবলমাত্র সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উদ্দেশ্য এতদ্বারা পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা করা হবে। কেন না, এদেশে দৈনিক ৬৬,০০০ সন্তানের জন্ম হয়। সরকার ছাউন দিতে কাহিল শৃঙ্খলাই নয়, সরকারের খারগা ছাউন ব্যতীল হলে জনক-জননীর চৈতন্যদায় হবে।

কিন্তু এই যুগান্তকারী সাকুলারের সংবাদে রাজ্যসভার চেতনা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। সভার সকল সদস্য প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। আবহাওয়া এতদূর উত্তপ্ত হয়েছিল যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির অন্যতম সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখরের সঙ্গে ডেপুটি স্প্যান্সামন্ত্রী শ্রী বি এস মূর্তির কথা কাটাকাটি প্রায় সমুদ্রে চড়েছিল। শ্রীমূর্তিকে একবার ধমকে উঠতে হয়েছেঃ 'চেঁচাবেন না বলো।' সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রশেখর চিৎকার করে উঠেছেনঃ 'আমি মন্ত্রীমহোদয়ের কৃপার পাত নই'। ছাড়বার পাত শ্রীমূর্তিও নন। তিনিও তৎক্ষণাৎ হেঁকে উঠেছেনঃ 'আমিও আপনার দয়ার পাত নই'। চন্দ্রশেখর বলেছেনঃ 'অবশ্যই আপনি সভার কৃপাধন্য (এ্যাট দি মারসি অব দি হাউস)।

এই চমকপ্রদ কথা কাটাকাটির উৎস কিন্তু অর্থ দপ্তরের সেই উল্লেখ্য সাকুলারটি। অর্থের মাথা গরম অর্থদপ্তর

অন্যর মাথাও কিভাবে গরম করে তুলতে পারে, এ তারই একটা নিদর্শন।

চন্দ্রশেখর তো বলেইছেন, অর্থনৈতিক অবাস্তব আর অর্থহীন (স্টুপিড) সাকুলার তাঁর কল্পনাতীত। এ সাকুলার কালবিলম্ব না করে প্রত্যাহার করা উচিত।

বস্তুত আন্তর্জাতিক শ্রমবিধির কোথাও এহেন উল্লেখ্য চিন্তার পরিচয় নেই। এমন অ-সাংগঠনিক সাকুলার অর্থ দপ্তর প্রচারই বা করেন কিভাবে সেটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। মূল প্রশ্নাব অবশ্য কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের সুপারিশ-সজাত। কিন্তু অর্থ দপ্তর অবিবেচকের ন্যায় তাকে সাকুলারে বিধিবদ্ধ করবার কল্পনাই বা করেন কি করে!

পরিবার পরিকল্পনার জন্য কোটি মৃত্তা ব্যয় এবং বিভিন্ন ধানাই-পানাইয়েও কোন কলকিনারা না পেয়ে শেষে ছাউন ছাউনই করে ছোট সংসার গঠনের চিন্তার ভূত অর্থ দপ্তরেরই ক্ষম্বে ভর করল!

কেন, পরিবার পরিকল্পনার প্রচারের ব্যর্থতাটা সরকারের চোখে পড়ে না। শিক্ষিত যুবসমাজে আজ একাধিক সন্তানের জনক-জননী হওয়াটা প্রচারের গণে বাস্তবিকই লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অন্যতম শ্রেণীর মধ্যে শহর পেরিয়ে গ্রাম্য এলাকায় সে প্রচার ঠুটো হয়েই আছে। সমস্যা চাকুরিজীবী শিক্ষিতসমাজকে নিয়ে বোধহয় ততটা নয় যতটা শিকার আলোকে বাণিত সংস্কারমুখ শ্রেণীকে নিয়ে। এদের সন্ততিত্ব সংখ্যা বাৎসরিক হারে বেড়েই চলেছে। ফলত জীবনযাত্রার মানও উন্নত হচ্ছে না। এই বিপুল জনসংখ্যার আহ্বারের ব্যবস্থা করতে ছোট সংসারকেও অর্থভুক থাকতে হচ্ছে। সমস্যাতা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার দরকার এবং সাদু-নেকটাই আটা অফিসী প্রচারের বাইরে পরিবার পরিকল্পনার সুফলকে জনে জনে জানানোর প্রয়োজন। সেখানে ব্যর্থ হয়ে কাগজ প্রচারের ওপর নির্ভর-শায় সাহেবী পরিকল্পনা মিশনগুলি বত টাকা ওড়াচ্ছেন তত কাজ গোছাতে পারছেন না। অর্থ দপ্তরের দৃষ্টি যেমন কোন ক্ষেত্রেই সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে নারাজ, এক্ষেত্রেই তাই ঘটেছে। না হল সাকুলার ছেপে এই 'ফুলিস' 'ফ্যান্টাস্টিক' এবং 'অসংবিধানিক' পন্থা গ্রহণ কেন? সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ? উত্তপ্ত প্রতিবাদ তাই একান্ত স্বাভাবিক। আর সেই প্রতিবাদের সামনে অসহায় ডেপুটি স্প্যান্সামন্ত্রীর একমাত্র সম্ভাব্য জবাব সেকারণেই শোনা গেছেঃ 'আই জু নট সো হোরেদার ইট ইজ স্টুপিড অর নট'।

এ সাকুলার মুখের রচনা কিনা প্রতিবাদের প্রবাহে তাও সঠিক নির্ণয় করতে পারেন নি তিনি। শব্দ হস্ত অন্তর্ভব করতে পেরেছেন, উদ্ভট চিন্তার পক্ষে ওকালতি করা অর্থ দপ্তরের মালিক ভিন্ন অন্যে অসম্ভব।

বিহারঃ

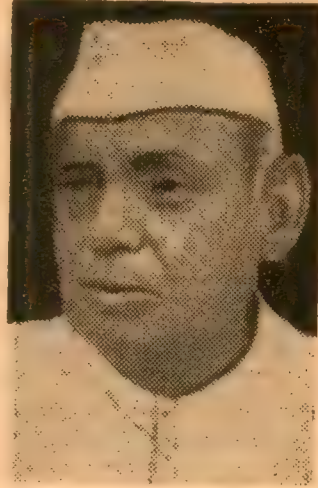
রাঁচীর উম্মাদাগার

উম্মাদের মত কারও আচরণ দেখা গেলে তাকে রাঁচীর উম্মাদাগারে পাঠানোর কথা বলা হয়ে থাকে। রাঁচীর পাগলা গারদ একটি বিশিষ্ট স্থানেই আবদ্ধ আর তা চিকিৎসালয়ও বটে। কিন্তু উর্দু ভাষাকে কেন্দ্র করে রাঁচীতে তিনদিন ধরে যে উন্মত্ততা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাতে মনে হচ্ছে সমগ্র শহরটাই যেন সাময়িকভাবে উম্মাদাগারে পরিণত হয়েছিল। ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত হাঙ্গামার ফলে সাতশত জন মৃত, গ্রন্থজন মৃত এবং বহু হননক্ষম হারিত্যার সংগৃহীত হয়েছে। হাঙ্গামার আকার স্মরণ্য যে দাবানলের মতই বিস্তারলাভ করেছিল তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ কোন উপযুক্ত কারণ অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় নি। কেন না উর্দু ভাষাকে বিহার সরকার স্বাভাবিক রাজ্য সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করবেন বলে কোনও ঘোষণা রাখেন নি। কেবলমাত্র এইটুকু বলা হয়েছিল যে, যদি কেউ সরকারী কোন কাজে উর্দুতে চিঠিপত্র লেখেন তবে তার জবাবে উর্দুই ব্যবহৃত হবে। এটা এমন কিছু মারাত্মক সরকারী ঘোষণা নয় যার ফলে খুন-খারাপি জেহাদের সূত্রপাত হতে পারে। স্পষ্টতই এই ঘটনার পেছনে বিশেষ মানসিক উম্মাদানাই ত্রিাশীল যার চিকিৎসার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে রাঁচীতে শক্বেরাপির প্রয়োজন আছে।

খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র্যের পীড়নে বিহার যখন মৃত্যুমুখী তখন এই সামান্য সরকারী প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করে এমনভাবে আগুন জ্বালিয়ে তোলার পেছনে যে উম্মাদানা কাজ করেছে তা শব্দ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিশিষ্টপ্রণোদিতই নয়, সাধারণের প্রাণধারণের কঠিন সমস্যা থেকে মানুষের মনকে অন্তর্য বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যও তাতে নিহিত আছে। এইই সঙ্গে অন্যতর উদ্দেশ্য হল নতুন প্রত্যাশায় আলোকিত গণ-আন্দোলনের স্রোতকে বিপথচালিত করা। এ সমস্তই একত্রিত হয়ে বিহার রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার মূর্খ উম্মাদনাকে চাণিয়ে তোলা হয়েছে। আর তাই যারা হুজুগে মেতেছেন তারা ভাবপ্রবণতায় উম্মাদ হলেও যারা সেই দুর্বল মানসিকতাকে মূলধন করে দ্রান্তপথে গণ-আন্দো-

লনকে পশ্চাদমুখী করার ষড়যন্ত্রে সর্বদা লিপ্ত আছেন তারা কুটবুদ্ধির চাল চলেছেন সুযোগ পেয়েই। এই সুযোগের স্থান অতঃপর উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যেও করা হতে পারে এবং তা হলেই সংকীর্ণ কায়মী স্বার্থের আশা পূরণ সম্ভব হবে। তার চেষ্ঠা পূর্ণোদ্যমেই চলছে। বিহারই সে চেষ্ঠার প্রথম শিকার। কিন্তু কারা এই মৃত্যুর ফাঁদ পেতেছেন। কারা চাইছেন, প্রগতিশীল গণ-চেতনা পুনরায় পেছন ফিরে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অজগরের মুখে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করুক। জনগণের সেই পশ্চাদাকর্ষণী শক্তিকে সুস্পষ্টরূপে চিনে রাখা উচিত।

এটা স্পষ্ট হয়েই উঠেছে যে, ভাষা-চেতনা এই উম্মাদনার উৎস নয়। উর্দু



শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ

সংবিধান-স্বীকৃত পনেরো ভাষার অন্যতম। তা ছাড়া বিহারে উর্দু ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যাও রাঁচীতে গণনীয়। স্মরণ্য বক্তৃষ্ট সরকার উর্দুকে যতটুকু মূল্য দিতে চেয়েছেন, বস্তুতপক্ষে তারও থেকে কিছু বেশ দেওয়া হলেও আজকের এই উন্মত্ত আপত্তির কারণ উদ্ভূত হয় নি। আসলে এই ঘটনার উৎসস্থল অন্যত্র।

বিহারের সহকারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকপূরী ঠাকুর সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাজনৈতিক উম্মাদ

(কংগ্রেস)

যেখানে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস সেখানে গদির আকাঙ্ক্ষায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাশক্তি

হারিয়ে বসেছে। একের-পর আর-এক বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করে ক্ষমতাসীন সরকারকে নাস্তানাবুদ করার অপপ্রয়াস সেখানে চলছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা জানেন কত অঙ্গ কারণে কী মারাত্মক দুর্ঘটনা নেপথ্য রাজনীতির দ্বারা অকস্মাৎ সংঘটিত হতে পারে। কংগ্রেসকে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি-ক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে রাঁচীতেও দেখা গেছে বলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ স্বয়ং বিশ্বাস করেন। একটি বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠকের পর শ্রীসিংহ উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান যে, কংগ্রেসের একাংশ রাঁচীর সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ইন্দ্রন জড়িয়েছে বলে বিহার সরকারের দৃঢ় মনোভাব গঠিত হয়েছে। তিনি জানান, প্রায় আড়াইশত স্কুল ছাত্রের একটি শোভা-যাত্রা সংগঠন করে উর্দু-বিরোধী ধ্বনি সহযোগে শহর পরিভ্রমণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল পাটনা শহরের পূর্বাঞ্চলেও। এইভাবে উদ্বেজনা ছড়ানোর অহরহ অপ-প্রয়াস চলছে। প্রকাশ এজন্যই সরকার রাঁচী ছাড়াও পাটনা সহ বিভিন্ন শহরে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা বহাল করতে বাধ্য হয়েছেন।

জনসংঘ হাঙ্গামার ইন্দ্রন না উঠল

কিন্তু আসল উম্মাদানাতা বিহার রাজ্য সরকারেরই অন্যতম শরিক হিসাবে বর্তমানে নিঃশেষে উম্মাদনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করছে। সে দলকে এককথার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং নিঃশ্রুত প্রতিক্রিয়াপন্থীরূপে সকলেই চেনেন। তাঁদের স্বমুর্তি শব্দ বিহারেই নয়, উত্তর প্রদেশেও প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁরা প্রকাশ্যে উর্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আসছেন এই দুই রাজ্যেই। তাঁদের স্বরূপ বিহার কম্যানিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ সরকার, এম-এল-সি সর্বসমক্ষে উল্লেখ করে মেলে ধরেছেন। তিনি বলেন, দানাপুরের অধিবেশনেই জনসংঘ দল উর্দুর প্রত্ন নিয়ে সংগ্রাম শুরুর করার হুমকী রেখেছিলেন। মজুতদার দমন এবং বৃত্ত নিরস্ত্রণের সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধা-চরণ করাই জনসংঘের ঘোষিত উদ্দেশ্য। তিনি বলেনঃ আমরা জনসংঘকে এই বলে অনুরোধ জানাব যে, সরকারের কয়েকটি প্রগতিশীল কর্মদামের জন্য তাঁরা যদি বর্তমান সরকারের শরিকানায় অসুবিধা বোধ করেন, তবে সেকথা তাঁরা স্পষ্ট করে প্রকাশ করুন। “But let them not fan the flames of communal riots to cover up their real

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

intention.” কিন্তু দল্ল করে আসল মনোভাব গোপন করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার আগুন বাতাস দেবেন না, ইশন যোগাবেন না।

শ্রীসরকার বর্তমান বিহার সরকারের তেগ্রিশ দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলেছেন, যাঁরা এই কর্মসূচীর বিরোধী তাঁরা রাঁচীর ঘটনায় প্লেবিকিত হবেন। প্লেবিকিত বোধ করবেন সেই সমস্ত হতাশ কংগ্রেসীরাও যাঁরা যে-কোন নোংরা উপায় অবলম্বন করেও ক্ষমতাসীন সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্য সর্বদা চেষ্টিত।

বস্তুতপক্ষে জনসংঘের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ কোনো সন্দেহের অবকাশই রাখে নি যে, তারা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে বিশৃঙ্খলা আহ্বান করে আনতে চায়।

হাঙ্গামার মাত্র কিছুদিন আগে জনসংঘ নেতা (যিনি বর্তমানে একজন মন্ত্রীও বটে) শ্রীজয়দেব মাহাজো উচ্চরঞ্চে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, উপর্য উপর বিশেষ মর্যাদা দান করা হলে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে, যখন উদ্ভাবনোপী উন্নয়নতা দানা বোঁধে উঠল তখন তিনি ও তার দল নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় মুখটি বজ্জে মজ্জা দেখলেন শব্দে। এই অনিষ্টকারী উন্নয়নতাকে বিচার জানাতে তাঁদের মধ্যে গা কাড়ল না। বরং সংঘের রাজ্য কর্মটির সভাপতি সরকারকে সতর্ক করে বললেন: রাঁচীর ঘটনা থেকে সরকারের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এসব ঘটনার পর জনসংঘী কার্যকলাপকে লোকচক্ষের সামনে মখোশহীনভাবে মেলে ধরা সরকারের অন্যান্য শরিকদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালনে রাজ্য কম্যানিস্ট পার্টি যে কিছুমাত্র স্খিযা করেন নি, এই কৃতব্যবোধ প্রশংসনীয়। জনসংঘের সর্বাঙ্গী স্বার্থের দম্ভুর অটুতাস্যে স্থেখানেই জনগণ তাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে সেখানেই উচ্চকিত হয়ে উঠছে। উত্তর প্রদেশে চরণ সিং-সরকার জনসংঘী কায়মী স্বার্থের স্খিযা কিভাবে টালমাটাল হয়েছেন গত সংখ্যার ‘অমৃতদর্শনে’ তারই কিছু নজির আমরা জুড়ে ধরেছিলাম। এবার বিহারে তাঁদের উদ্ভাস মতবাদের সংগ্রামী চেহারাটো স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্যান্য রাজ্যেও বিশেষ করে উত্তর ভারতে এবং রাজধানীতে এঁদের প্রতিভ্রমার পথ কখন যে কোন অনর্থ ব্যধিরে বসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তথাপি গণভ্রান্তিক উদার মানসিকতা জনসংঘী প্রতিভ্রমার কৃত্রমী উদ্ভাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে অল্প উন্নত রাজনীতির কবল হতে দূরীক মনোভাবকে সাবধানে দূরে রাখবেন এবং

জনসংঘের প্রতি বিদ্বেষ উত্তর ভারত যে অবিলম্বে আপন ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হবেন এ বিশ্বাসও প্রত্যেক প্রগতিশীল মানবের আছে। সেই সুস্থ চেতনা পুনরায় বিভ্রান্তিকে দূরে ঠেলে দেবে। রাঁচীতে যা ঘটে গেল অতঃপর অন্যান্য রাজ্যে যাতে সেই বিভ্রান্তিকার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য আজ থেকেই আমাদেরও বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

আসাম:

নিষ্ঠুর বাতী

আসাম সরকার সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকারকে এমন একটি নিষ্ঠুর বাতী প্রেরণ করেছেন যা সমস্ত রকম মানবিক শূন্যবোধ বঞ্চিত এবং ভেদবোধিত পঙ্কল। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আবার দফায় দফায় অত্যাচারিত সমস্ত মানব সীমালঙ্ঘ্য আভিহন করে কহু জাঙ্না ও কটোর পর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন বহু সংবাদ পাঠ্যর মেছে। আসাম সরকার আগ বাড়িয়ে এই অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। ভয়, উদ্ভাস্তুরা ত্রিপুরা হয়ে আসামেও প্রবেশ করতে পারেন।

মানবের মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু মাত্র দুই দশকের মধ্যে ভারতেরই ইতিহাস ভারতেরই কোন রাজ্যের দায়িত্বশীল সরকার বিস্মৃত হতে পারেন, এমন অশুভ ব্যাপার একমাত্র অকৃতজ্ঞতার দ্বারাই সম্ভব। আজ আসামের যে ক্ষমতাসীন সরকার অসহায় কতকগুলি মানবের বোঁচে থাকার উদ্বেষ আগ্রহের মূখের ওপর শব্দ সীমান্তের দরজা বন্ধ করেই দিতে চান না, ত্রিপুরা রাজ্যেও বাতী পাতান অনুপ্রবেশ নিষ্ঠুরতার পথ গ্রহণ করার জন্য, সেই আসাম সরকারের স্বরূপ আছে কি যে, পূর্ব-পাকিস্তানের অ-মুসলিম জনগণ সৈদীন বোঁকে বসলে আজকের রাজস্ব ভোগের সমদ্বিটি হাতিরে নেওয়ার মতকা হয়ত তাঁদের জুটত না। না, আসাম সরকারের অতদূর মানসিক ক্রোধ কাম্পনীর নয়। আসামের নিজস্ব পর্বতীয়দের নিয়েই আসাম সরকার ও আসাম কংগ্রেস যে খেলা দেখাচ্ছেন, তাতে আশানি আর কোশানি কাতীত আসাম সরকার যে অন্য কিছুও ভাবতে পারেন, এমন সম্ভাবনার বিশ্বাস নেই। আসামের সীমান্তরক্ষীবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে পূর্ব-পাক উদ্ভাস্তুর দলকে নিরাপত্তার (?) কারণে সীমান্তের পরপারে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই কদিন আগে আমাদের রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা-দিবসের বাণীতে ফলাও করে বলেছিলেন, ভারত উদ্ভাস্তুর-সমস্যা মিটিয়ে

ফেলেছে। যদি তাই হয়, তবে আবারও উদ্ভাস্তুর কেন? এঁরা কি সাধ করে সীমান্তপথে ঘর-সংসার নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান। আসলে যে অর্থে কোন সমস্যার সমাধান বলে, ভারত সে অর্থে পূর্ব-পাক উদ্ভাস্তুর সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। এই বাধ্যতা হয়ত পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাবী উদ্ভাস্তুরদের বেলার ঘটে নি। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্ভাস্তুরদের খেলায় এ সমস্যাকে মূলত সমাধান করা হয় নি।

সমাধান কথাটা তাই ধোঁপে টিকছে না। সমাধান হতে পারত, যদি পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে লোকবিনিময় করে অ-মুসলিম পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিরাপত্তা বিধানের অবশ্যকর্তব্য ভারতবর্ষ পালন করতে পারত। কিন্তু সে দায়িত্ব পালিত হয় নি। আর হয় নি বলেই আজও উদ্ভাস্তুরদের ঘনপ্রাণ বক্ষার ব্যাকুলতার অবসান ঘটে নি।

এই নিদারুণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আসাম সরকারের ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে অনুরোধ তাই অমানবিক ও নিষ্ঠুর ঠেকল। গৃহিরে নিয়ে যেদিয়ে দেওয়ার এহেন চিত্ত ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও সহজলভ্য নয়। উদ্ভাস্তুরাই শব্দ নয়, আমরাও আকাট দূর্তগা।

মধ্যপ্রদেশ :

জনসংঘের আবারপ্রত্যয়
বিহার, উত্তর প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর সর্বত্রই জনসংঘ তার সর্বাঙ্গীচেষ্টা রাজনৈতিক মতবাদকে এতো প্রকট করে তুলেছে যে, বিহার কমিউনিস্ট দলের জনসংঘকে মূখোশ খোলার আহ্বান একটা অনাবশ্যক ভ্রমতা বলেই মনে হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে জনসংঘীয় সাম্প্রদায়িক জিগিরে অগ্নি-আহুতির ব্যবস্থা করেছেন বিহারের সতই প্রকাশ্যভাবে। এঁদের প্রতিভ্রমণশীল রূপটি উত্তর প্রদেশে এবার একেবারেই সম্ভব সময়ে নেমে পড়ার জন্য উদ্ভব হয়ে উঠেছে। ফলত অ-জনসংঘী কামসংঘী দলগুলিকে একাধারে কংগ্রেস ও জনসংঘের বিপরীতে এখন নতুন করে আরম্ভণ সজাতে হবে। অন্যথা উত্তর ভারতে প্রতিভ্রমার পথে সর্বশক্তি নিয়ে পাড়ি জমাবার চেষ্টা শব্দ করবেন ভারতের প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি, আর তারই মারাত্মক ফলাফল অন্যান্য রাজ্যেও বিস্তার লাভ করতে থাকবে।

উত্তরপ্রদেশের আসাম পৌর নির্বাচনে এই দুই শক্তির একটা সুস্পষ্ট মোকাবিলা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রাজ্যের পঁচিটি বড় বড় শহরে। কানপুর, আগ্রা, বারণসী, এলাহাবাদ ও লকনো-এর আসাম পৌর নির্বাচনে জনসংঘ সংঘ

ইণ্ডিয়ান অয়েল আমার... আর আমার!



ইণ্ডিয়ান অয়েলই আমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে—চাকার কল ঘড়ির পর ঘড়ী আর টোভ ফ্যানের বাসে থাকতে হয় না; এখন আমার প্রচুর সময় হাতে থাকে, শহরের কত কারখানা ঘুরে বেড়াই।
ইণ্ডিয়ান অয়েল তরল পেট্রোলিয়াম বাস 'ইকোন' পোরে আমার চান্দাবাদা এখন খুবই কম সময় পরিভার পরিষ্কার ভাবে সেয়ে তৈরিতে পারি—একটুও অ্যাক্সেলা নেই, এমন তি হাসতপক্ষেও কালো লাগে ঘরে না।

ইণ্ডিয়ান অয়েল থাকায় আমার ও আমার মায়ের ঘরের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। **ইণ্ডিয়ান অয়েল** যেভাবে কোরোসিন আমাদের আলো জ্বলে, চান্দা হয়। আমাদের ঝাড় কোটি কোরোসিন আসে বছরে বাড়িতে কখন। তাছাড়া ও ঘরের সমস্ত ঝাড়ের লোকেরাই হাতে কোরোসিন পায় তার জন্য **ইণ্ডিয়ান অয়েল** সবরকম পরিবহনের সাহায্যই কোরোসিন পাঠিয়ে থাকে—চাকার ওয়াশ ও ট্যাক ট্রাক, ও-চাকার বাড়ীতে ও উঠের পিঠে, গল্ডার টালা ও হাতে টালা বাড়ীতে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল যে আমাদেবই, তাই আমাদেব কাজ তার এত দ্রুত, এত চেষ্টা।



—অর্থনৈতিক সহৃদয়তার জাতীয় বাস

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

চীন:

শিখাচার, শালীনতার শেষ চিহ্ন-
টুকুও হোখর চীন হাতে ফেলে দেবার
জন্যে কণ্ঠস্বর উঠেছে। তা
নইলে পিকিঙের ব্রিটিশ দূতাবাসে
আগুন দেবার দুর্ভাগ্য হবে কেন তার?

এর আগেও অবশ্য পিকিঙস্থ
কয়েকটি বিদেশী দূতাবাস চীনা লাল-
রক্ষীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।
সোভিয়েট, যুগোস্লাভ, ফরাসী, ভারতীয়
দূতাবাস বা দূতাবাসের কর্মচারীরা ইতি-
পূর্বে লালরক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত
হয়েছে। কিন্তু এভাবে টিন-টিন গ্যাসোলিন
তেলে একটা বিদেশী দূতাবাসে বহুত্বসংখ্যক
মৃত্যু এই প্রথম।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য চীন বা
পিকিঙ নয়, ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকংই
ছিল আগুন নিয়ে খেলার উৎসস্থল।
কয়েকদিন আগে হংকংয়ের উগ্রপন্থী চীনা
কমিউনিস্ট দৌরাডা দমন করার উদ্দেশ্যে
হংকং সরকার কিছু চীনা কমিউনিস্টকে
গ্রেপ্তার করেছিলেন। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে
কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন। তিনখানা
কমিউনিস্ট সংবাদপত্রেরও প্রকাশ বন্ধ করে
দিয়েছিলেন হংকং সরকার। তারই
প্রতিবাদে চীন সরকার ব্রিটিশ সরকারকে
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওই তিনখানা সংবাদ-
পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও
মৃত ব্যক্তিদের মজিদানের দাবি জানিয়ে
এক চরমপত্র নিক্ষেপ করেন। বলাই
হাছল্য, সে-চরমপত্রকে ব্রিটিশ সরকার
আমল দিতে রাজী হন নি। তাঁরা ভেবে-
ছিলেন চীনের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে
বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে
যেমন এপর্বন্ত ৪৬৮টি কঠোর সাবধান
বাণী প্রেরণ করেছেন তেমনি এটাও
একটা লোকসংখ্যান চরমপত্র। আসলে সে
চরমপত্রকে কাগজে বাধের চেয়ে বেশি
কিছু মনে করতে পারেন নি ব্রিটিশ
সরকার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে
যে, নির্লিপ্ততার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে
উচ্চমূল্য গণতে হয়েছে। কারণ গত
মঙ্গলবার পিকিঙের স্থানীয় সময় রায়ি
সাড়ে দশটায় চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ
হবার ১৫ মিনিটের মধ্যেই হাজার হাজার
চীনা লালরক্ষী পিকিঙের ব্রিটিশ
দূতাবাস ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন
করেছে। ওই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যেই
যদি লালরক্ষীদের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ
থাকতো তাহলে হয়তো ব্রিটেনের মনে
থবে একটা উদ্বেগ সঞ্চারিত হতো না।
কিন্তু দেখা গেলো যে, লালরক্ষীরা
দূতাবাসের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, হাড়াড
পিটিয়ে কাচের জানালা ভাঙছে, দরজা-
জালসা ভাঙছে এবং শেষ পর্যন্ত গ্যাসো-
লিনের টিন উজাড় করে আগুন লাগিয়ে



পিকিঙে ব্রিটিশ দূতাবাসে লালরক্ষীদের ভাঙতের দৃশ্য

দিয়েছে তখন ব্রিটেনের খানিকটা চৈতন্য
হয়েছে। লালরক্ষীরা দূতাবাসের প্রধান
চার্জ ল্য এ্যাক্সেস মিস্টার হপকিন্সের ওপর
মারধর করেছে আর ফলে তাঁকে মাথায়
ব্যাণ্ডেজ পরে থাকতে হয়েছে। দুটি
ব্রিটিশ তরুণীও নাকি লালরক্ষীদের হাতে
নিস্তার পায় নি। কয়েকদিনের জন্যে
ব্রিটিশ দূতাবাস বহির্জগৎ থেকে একে-
বারে বিচ্ছিন্ন ছিলো।

এ-অভূতপূর্ব ঘটনার খবর পেয়ে
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন এবং পররাষ্ট্র-
মন্ত্রী রডন তাঁদের ছুটির মেয়াদ শেষ
না হতেই লন্ডনে ফিরে এসেছেন এবং
লালরক্ষীদের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ
জানিয়েছেন। এখানকার চীনা দূতের
হাতে প্রতিবাদপত্র গাঙ্গে দিয়েছেন। চীনে
বসবাসকারী সমস্ত ব্রিটিশের নিরাপত্তার
দাবি করেও চীন সরকারের কাছে পত্র
প্রেরণ করেছেন ব্রিটিশ সরকার।

লালরক্ষীরা এখন ব্রিটিশ দূতাবাস
আক্রমণ করে বা ভেতরে ঢুকে পড়ে তখন
চীনা পুলিশ বা প্রহরীরা কোথায় ছিল?
একটা বিদেশী দূতাবাসে অশ্রুচিহ্ন কি
করে ঘটতে দেওয়া হলো? লালরক্ষীদের
পেছনে সরকারের সমর্থন না থাকলে
এত বড় দুর্কার সম্বটিত হতে পারতো
কি? স্ববাদে প্রকাশ, মাদাম মাও-ই
নাকি লালরক্ষীদের এ-খ্যাগারে মদ্য
হাগিয়েছেন, তাঁরই উৎসাহে নাকি ব্রিটিশ
দূতাবাসে আগুন দেওয়া হয়েছিলো। এর
পেছনে সে নিশ্চিত পরিকল্পনা ছিলো তা
অস্বিকার বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়-
সূচী লক্ষ্য করলেই পক্ষিকার বোকা যায়।
অর্থাৎ চরমপত্রের মেয়াদ ফুরোবার ১৫
মিনিটের মধ্যে আক্রমণ শুরু হয়

এবং মাদাম মাও সে এতবড় ষড়ী
নিয়ন্ত্রণে তা নাকি স্বয়ং মাও সে তুও বা
প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী
লিন পিয়াও ইত্যাদি কোন নেতাই
জানতেন না। তা যদি সত্যি হয়, তবে
লালরক্ষীদের ওপর এই প্রাক্তন
অভিনেত্রীটির প্রভাব ও প্রতিপত্তি কত-
খানি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু আগুন লাগানোর ফলে ব্রিটিশ
সরকার কি নতি স্বীকার করেছেন?
লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসের কর্মচারীদের
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্রিটিশ সরকার
আদেশ দিয়েছেন। এ-সংবাদ লেখার
সময় পর্যন্ত হংকং সরকার
কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলোর ওপর
থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় নি
কিন্তু একজন কমিউনিস্ট বন্দীকেও মুক্ত
করেন নি। তবে তার মানে এই নয় যে
আগুন লাগিয়েই লালরক্ষীরা তাদের
বৈপ্লবিক কর্মসূচীর ইতি করবে। হংকং
থেকে ব্রিটেন হাত গুটিয়ে নিক, ব্রিটেন
হংকং ভাগ্য করুক, হংকং চীনের হাতে
চলে যাক, চীনের লক্ষ্য সেন্দিক।
ব্রিটেনকে তার অনেকগুলি উপনিবেশ
থেকে হাত গুটিতে হয়েছে, হংকং
থেকেও যদি তাকে বিদায় নিতে হয়,
তবে তাতে বিস্মিত হবার বেশি কিছু
অবশ্যই থাকবে না। তবে চীনের
হুমকীর কাছে পরাজয় মানতে সে রাজী
হবে কি? পূর্বাংগে নাকি চীনা উপপাত্তে
অতিষ্ঠ হয়ে তার উপনিবেশ
ম্যাকাও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলে
আসবে। কিন্তু পূর্বাংগ পূর্বাংগই
ব্রিটেন তো আর তা নয়। অর্থাৎ হংকং

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

একটা শক্তির পরীক্ষা হয়ে যায়, তবে তাতে আশ্চর্যের বিশেষ কিছু থাকবে কি?

পশ্চিম এশিয়া:

গত জুনের পাঁচ দিনের যুদ্ধের পর এখানে সশস্ত্র শান্তি চলছে। তবে সে-শান্তি সত্যি, কতদিন স্থায়ী হবে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলছে।

প্রথমত রাষ্ট্রসংঘ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করতে পারে নি। ইসরায়েল তার যুদ্ধজয়ের ফল অটুট রেখেছে যা মেনে নিতে আরব রাষ্ট্রগুলো একেবারে নারাজ। দ্বিতীয়ত সুরেজখাল ব্যবহারের সুযোগও সংযুক্ত আরব ইসরায়েলকে দিতে চায় না। ইসরায়েলকে স্বীকৃতি জানাতেও সে এখনো প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ আরব রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইসরায়েলের কাছে অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রচণ্ড মার খেয়েছে, তাদের চরম বিপর্যয় ঘটেছে সত্য, কিন্তু ইসরায়েলকে জয়জয়ের ফল ভোগ করতে দিতে আরব রাষ্ট্রপ্রধানেরা সম্পূর্ণ নারাজ। এজন্যে যদি তাদের আবার অস্ত্রধারণ করতে হয় তাতেও তারা বরং রাজী।

জর্ডানের রাজা হুসেন কার্যত সে কথাই খোলাখুলিভাবে বলেছেন। ইসরায়েল জেরুজালেম দখল করে নিয়েছিল? জর্ডান নদীর ওপরও তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু জর্ডান সে পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। জেরুজালেম কিম্বা জর্ডান নদী—কোনটাই সে হাতছাড়া করবে না। হুসেন বলেছেন, এর জন্য হয়তো আমাদের আবার অস্ত্রধারণ করতে হবে। তা হোক, কিন্তু

জেরুজালেমের প্রশ্নে ইসরায়েলের সঙ্গে কোন মোকামড়ায় আসতে আমরা রাজী নই।

রাষ্ট্রসংঘের সুবিচার না পেয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো যে ইসরায়েলের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তার কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বাগদাদে আরব অর্থমন্ত্রীদের ৬ দিনব্যাপী সম্মেলন শেষ হলো। সম্মেলনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব সবসম্মতি লাভ করেছে। এর পরে আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক বৈঠকে মিলিত হচ্চেন, তার পরে রাষ্ট্রপ্রধানেরা এক ক্ষুদ্র শীর্ষ সম্মেলনে।

ইসরায়েলও অবশ্য চুপ করে বসে আছে মনে করার কোন কারণ নেই। পাঁচ দিনের যুদ্ধে তার অভূতপূর্ব সাফল্যের আনন্দ-বন্যা ইসরায়েলের পথে-প্রান্তরে সমানে প্রবহমান। ওই যুদ্ধে এবং রাষ্ট্রসংঘের বিতর্ক আলোচনার সময় তার বুদ্ধিতে কষ্ট হয় নি যে শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন তার পিছনে অতদূর প্রহরীর মত রয়েছে। কাজেই আবব রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্নে সে অবিচল রয়েছে। জেরুজালেম কিম্বা জর্ডান নদীর ওপর অধিকারও সে ত্যাগ করে নি কিম্বা করার ইচ্ছেও তার নেই। শব্দে তাই নয়, ওই পাঁচ দিনের যুদ্ধে যেখানে যেখানে তার ভূমিগত লাভ হয়েছে তার সূচ্যগ্রমোদিনী ত্যাগ করার কথাও সে বিশেষ ভাবছে না। তবে সুরেজ খালের ব্যবহার এবং তার আগে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেলে সে একটা আপোষরক্ষার সানন্দে রাজী হবে। তাই তার শর্তে সে অটল রয়েছে এখনো। জর্ডানের আরব উদ্বাস্তুদের ইসরায়েল অধিকৃত জর্ডানে ফিরে আসার জন্যে সে যে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল তা বাড়তে সে রাজী হয় নি।

তবে এখানে ইসরায়েল খুব নিরুপদ্রব শাসন চালাতে পারছে বলে মনে করার কারণ নেই। কারণ জেরুজালেমে এক সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গিয়েছে আরব সমর্থনে। ইসরায়েল অবশ্য ২০ জন আরবকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু অসন্তোষের অন্তপ্রবাহ বন্ধ করতে পারে নি। রাজা হুসেন কিম্বা প্রেসিডেন্ট আরিফ সোজাসুজি আরেকবার শক্তির পরীক্ষার কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। প্রেসিডেন্ট নাসেরও তাই চান। আর আলজেরিয়ার বুমোদিন তো মারমুখো হয়েই আছেন। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধবিরাতি ঘটেছে বলে তিনি স্বীকারই করতে চান না। এ অবস্থায় আর একটা রক্তক্ষয়ী



বুমোদিয়েন

সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ার আগে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় আসা যায় না কি? একটা ডিয়েতনামের কারণে সারা বিশ্ব চঞ্চল উদ্ভিন্ন, তখন আর আগুন ছড়িয়ে লাভ কী হবে?

নাইজেরিয়া:

এখানকার গৃহযুদ্ধ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। লেঃ কঃ ওজুকু পূর্ব নাইজেরিয়াকে নাইজেরিয়া ফেডারেল শাসন-মুক্ত বলে বিয়াক্রায় নতুন রাজধানী স্থাপন করলে দুই সংসদের মর্মে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'আন্তর্জাতিক'-এর পাঠক-পাঠিকা আরো জানেন যে শব্দ বিয়াক্রাই নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে নি, মধ্য-পশ্চিম নাইজেরিয়া অঞ্চলও মেরে অলাবার্ট ওকনকোর নেতৃত্বে ফেডারেল নাইজেরিয়া ও বিয়াক্রায় প্রভাব-মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছে। বিয়াক্রা এবং মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহী সৈন্যরা যে গোড়ার দিকে ফেডারেল সৈন্যদের শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছিল 'আন্তর্জাতিকে' তাও আগে বজা হয়েছিল।

গত সোমবার বিয়াক্রায়দের হাতে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন ওর শহরের পতন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওর রাজধানী লাগোস হাবার পথে একটা প্রধান সংযোগ-স্থল—অনেকগুলো রাস্তা এসে এখানে মিশেছে। লাগোস থেকে ওর-এর দূরত্ব মাত্র ১০৫ মাইল। কাজেই শহরটির পতনে ফেডারেল কতৃপক্ষ মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। কারণ রাস্তাটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে





বিয়াক্সান বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতিতে লাগোমের নারীগুরুবেরা পাণ্ডিত্যে পলায়মান

লাগোমের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন হয়। কিন্তু সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতখানি অটুট থাকবে তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিয়াক্সান এবং মধ্য-পশ্চিম নাইজেরিয়ার বিদ্রোহী সৈন্যেরা যৌথভাবে ওর-ওর ওপর আক্রমণ চালিয়ে শহরটি দখল করেছে বলে বিয়াক্সান রেডিও (এনদুগু) দাবি করেছে।

অপরপক্ষে অবশ্য ফেডারেল রেডিও দাবি করেছে যে, ফেডারেল সৈন্যেরা এনদুগুর ১৩ মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছে এবং তারা ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় শহর নামে খ্যাত নদুগু শহরটি দখল করে ফেলেছে। ফেডারেল সরকারের পক্ষে আরো সন্তোষজনক খবর হলো গুরুদ্ব-পূর্ব ওর শহরটি তারা পুনর্দখল করে নিয়েছে। এবং ওর লড়াইয়ে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ফেডারেল রেডিওতে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ গত ৩০শে মে বিয়াক্সান স্বাধীনতা ঘোষণার পর দু'পক্ষে যে লড়াই শুরু হয়েছে আশু অবসানের কোন সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। বরং যুদ্ধটা আরো রক্তক্ষয়ী হবার আশঙ্কা রয়েছে এজন্যে যে বহু শক্তিগুলিও এতে জড়িয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। কারণ ফেডারেল সরকার ইতিমধ্যেই সোভিয়েট শিয়ার কাছ থেকে মিস বিমান সহ

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেছে, চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকেও সে কিছু বিমান সহ অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে। বিয়াক্সানও এদিকে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্টের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। বিয়াক্সান স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পায় নি এখনো বিশেষ কারোর, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্র তো সে নয়-ই। এ অবস্থায় তাকে সাহায্য করার বিধান রাষ্ট্রসংঘের চার্টারে নেই। ব্রিটেনও দোটানায় পড়েছে, ফেডারেল-বিয়াক্সান বিরোধে তার ঘোষিত নিরপেক্ষতা কতদিন সে বজায় রাখতে পারবে তাই নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সোভিয়েট অস্ত্র সাহায্য দানের প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু ফেডারেল সরকারের অভিযোগ বিয়াক্সান গোপনে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে, তা নইলে এতদিন যুদ্ধ চালাবার মত রসদ তার কখনই ছিল না।

এ যুদ্ধ যদি আরো কিছুদিন চলে এবং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবেও যদি বহু শক্তিগুলো এ-পক্ষে বা ও-পক্ষে মদদ দিতে থাকে তবে নাইজেরিয়া যে আবার একটা ভিয়েতনামে পরিণত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। দুই বিবাদমান পক্ষ এ-বিবাদ সম্পর্কে কতখানি

সজাগ বলা মুশকিল। কারণ যদিও শান্তির কথা বলা হচ্ছে, বিয়াক্সান পক্ষ থেকে শান্তি আলোচনা শুরু করার আগে পূর্ব-শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, বিয়াক্সান স্বাধীনতা মেনে নেওয়া না হলে সে আলোচনা-টোবলে যাবে-ই না। ওদিকে ফেডারেল সরকারের পক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে যে বিয়াক্সান স্বাধীনতা সে কখনই স্বীকার করবে না। এ অবস্থায় সহসা শান্তির মুখ দেখবার সম্ভাবনা নাইজেরিয়ার কোথায়?

ব্রিটিশ শাসনমুহুর্ত হবার পর নাইজেরিয়া সর্বতোভাবে তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে এটাই সকলের অশা ছিল। এই বহু রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক বা শিল্প-সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। কিন্তু উপ-জাতিয় কোন্দলের ফলে এখানে একটা-না-একটা হাঙ্গামা মোমা দা বহুর ধরে লেগেই আছে। দেশের এই আন্তর্বিরোধ শাসনব্যবস্থাকেই শিথিল করে দেয়, আর তার সেই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী বিদেশী রাষ্ট্র-গুলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা এমন কি আফ্রিকায়ও এ ঘটনা আগে ঘটেছে। নাইজেরিয়া তবু কেন তার থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না, কেন সে খাল কেটে কুমীরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে?

ইন্ডু মেনা

অজয় বীর অজয়কুমার—রবিদাস
মহারার। বঙ্গ বুক স্টল, ১০, শ্যামাচরণ
মে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : তিন
টাকা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক গ্রীষ্মকানন্দ
মুখোপাধ্যায় এটিকে “একটি সুন্দর
জীবনগ্রন্থ” বলে লেখককে অভিনন্দন
জানিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে জীবনীগ্রন্থ
রচনা করা সহজ কাজ নয়। আবার রাজ-
নৈতিক ব্যক্তির জীবনী রচনা করা আরো
কঠিন। কারণ সেখানে নিছক আবেগের
কোনো মূল্য নেই, এবং জীবনের সঙ্গে
প্রতিটি ঘটনাকে রাজনৈতিক তুল্যদণ্ডে
বিচার করে উপস্থাপিত করতে হয়।
আমরা মনে করি, সেই কাজে গ্রীসাহারার
সাধক হয়েছেন। যদিও অজয়কুমারের
সংগ্রহ-কাহিনীর অনেক কথাই জানা,
তবু গ্রীসাহারার কৃতিত্ব এই যে, কাল-
ভারিসহ তিনি অজয়কুমারের বিপ্লবী-
জীবন তুলে ধরেছেন। অজয়কুমারের
যালাকাল থেকে শুরু করে চতুর্থ নির্বা-
চনের পর ঐতিহাসিক মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণের
সংবাদ পর্যন্ত—জীবনীটি বিস্তৃত। তার
মধ্যে এসেছে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে
অজয়কুমার কর্তৃক মেদিনীপুরে জাতীয়
সরকার প্রতিষ্ঠার রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী,
কংগ্রেসের কাজে আত্মত্যাগ, কংগ্রেস
সরকারের হয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও কামরাজ
পরিচালনার ফলে তা ত্যাগ এবং কংগ্রেসের
নেতৃত্বের বড়স্বস্তির ফলে অজয়কুমার
কর্তৃক বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার
নেতৃত্ব গ্রহণ। সঙ্গে সঙ্গে লেখক তুলে
ধরেছেন আজীবন বিপ্লবীর ন্যায়নিষ্ঠা,
ক্মনিষ্ঠা এবং আশ্চর্যজনক সারাজ্য ও
সাধারণ প্রভুত ব্যক্তিগত গুণাবলীর
একেকটি কাহিনী।

অজয়কুমারের জীবন-কথা লেখার
প্রসঙ্গে এসেছেন তাঁর বিপ্লবীজীবনের
সহকর্মীগণ এবং বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বিনি অজয়কুমারের দুর্দিনে তাঁর পক্ষে
ছিলেন নিষ্ঠুর সমর্থক। প্রসঙ্গত বড়-
স্বস্তির মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও
গ্রন্থটিতে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি যেমন
ছোট-বড় সকলেরই পড়ার উপযুক্ত তেমন
সুখপাঠ্য।

প্রসাদ প্রসঙ্গ : মূল রচনা—দয়ালচন্দ্র
ঘোষ। সম্পাদনা : প্রথমনাথ চৌধুরী।
প্রকাশক : কালিকানাথ চৌধুরী, ৮ বি,
মহেশ চৌধুরী লেন কলিকাতা-২৫ থেকে
প্রকাশিত। দাম : তিন টাকা।

মাক্ সাধক রামপ্রসাদ ও তাঁর রচনা
বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। যেকালে
রামপ্রসাদের মাতৃনামগানে দেশের আকাশ
বাতাস মধুর হয়ে উঠেছিল—সেকালে
আমাদের দেশে আজকের মত মদ্রশ শব্দের
ব্যবস্থা ছিল না। তাই রামপ্রসাদের লোক
গানের মাঝ ১৬২ খ্রিঃ গান আজ পর্যন্ত
সংগৃহীত হয়েছে। আর এই সংগ্রহকারী-
দের মধ্যে সেকালের কবি ইন্দ্রবর গুপ্ত ও
দয়ালচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-
যোগ্য। কিন্তু দয়ালচন্দ্র ঘোষের বহু
গবেষণাপ্রসূত ‘প্রসাদ প্রসঙ্গ’ বইখানিও
দীর্ঘদিন পুনর্মুদ্রণের কোন সুযোগ
লাভ করে নি। তাই সেই সুযোগে একদল
বাবসারী রামপ্রসাদের রচনা বলে রাম-
প্রসাদের আসল রচনার সঙ্গে বেশ কিছু
অন্য রচনা মিশিয়ে চালাচ্ছিলেন। যার
ফলে দেশের বহু পাঠক দিগম্রান্ত হতে
চলেছিল। আলোচ্য বইখানি সংগ্রহ করে
প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যরসিক প্রথম-
নাথ চৌধুরী তার পুনর্মুদ্রণে পাঠকদের
প্রান্তি দূর করতে পেরেছেন বলেই
আমাদের বিশ্বাস।

রামপ্রসাদ ছিলেন স্বভাবকবি—তাই
তিনি কথায় কথায় গান রচনা করতেন।
আর সে গানগুলি সবই প্রায় শ্যামা বিস্ময়ক
মাতৃনাম গান। যে গানে ধনী-বরিশ, চাষী-
মজুর সকলেই একবাক্যে খেজে পায়
তাদের মনের সাড়া। তাই এককালে যে
গান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মগ্ন করেছিল—
শোনা যায় নবাব সিরাজদ্দৌলাও বিহবল
হয়ে শুনছিলেন প্রসাদের মাতৃনাম। শব্দ
তাই নয় পল্লী-বাংলার অকুরন্ত প্রাকৃতিক
সম্পদে অভিভূত হয়েছিল প্রসাদের
প্রত্যেকটি সাধনসংগীত—আর এই গানের
ভেতর দিয়ে যেন তিনি একান্ত হতে পেরে-
ছিলেন জগজ্ঞানী মায়ের সঙ্গে।

বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদী সংগীত
প্রভাত-সুবেশ মতই চিরোজ্জ্বল।
বর্তমান ‘প্রসাদ প্রসঙ্গে’ শব্দ গানই নয়,
রামপ্রসাদের জীবনী ও বহু মূল্যবান ছবি
প্রকাশিত হল। সাহিত্যরসিক মাঝেই
এ বইখানি যত্নে সংগ্রহ করে রাখবার মত।

লোক-শ্রুতি—সম্পাদক : ডক্টর আশু-
তোষ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি
গবেষণা পরিষদ, ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি
রোড, কলিকাতা-৩৪। দাম : এক টাকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই
দ্রৈমাসিক লোক-সাহিত্য সংকলনটিকে
আমরা প্রথমেই অভ্যর্থনা জানাই। এই
ধরনের পত্রিকার কাজ করা ঘরে বসে
সম্ভব নয়, যথার্থ শ্রমলব্ধ সাধনার স্মারাই
বাংলা সাহিত্যের গৌরব উদ্ধার করা
সম্ভব—তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ‘লোক-শ্রুতি’।
বাংলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত
লোক-সাহিত্য কতো ছড়িয়ে রয়েছে, তা
উদ্ধার করার জন্যে বাংলা লোক-সাহিত্যের
একনিষ্ঠ সাধক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্র
ও অনুরাগীদের সাহায্যে সুদূর গ্রামাঞ্চলে
যে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করেছেন ও কর-
বেন, তা নিয়মিতভাবে এই পত্রিকার
প্রকাশিত হবে। বলা বাহুল্য এই পত্রিকার
কাজ বহু আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল।
কারণ নাগরিকতার স্পর্শে এখন লোক-
সাহিত্য সম্পদ লুপ্তপ্রায়। বর্তমান
সংখ্যাটিতে হাতীবাড়ি (মৌদীনীপুর)
লোক-কথা সংগ্রহ স্থান পেয়েছে। নিরক্ষর
মানুষের মূখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া
সত্যেরটি লোক-কথা। প্রতিটি লোক-
কথার বিবরণ, ইতিহাস, পৃথিবীর অন্যান্য
লোক-সাহিত্যের সঙ্গে মিল বা অমিল
দেখিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন
ডঃ ভট্টাচার্য। বলা বাহুল্য এই আলো-
চনার কাজে গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে
দরকার হয়েছে গ্রাম্য মানুষের হৃদয়োপ-
লব্ধ ক্মতা। আমরা মনে করি, গ্রামে
গ্রামে এই পত্রিকা প্রচারিত হবে, প্রতিটি
লাইব্রেরীও এ পত্রিকা সংগ্রহ করবেন।
পত্রিকাটি পড়ে মনে হোল প্রাচীন বাংলার
সমাজ, মানুষ, সংস্কৃতি, নীতিকথা—
আজো লোক-কথায় বিরাজ করছে। এই-
ভাবে সমগ্র লোক-কথা সংগ্রহ করা সম্ভব
হলে বাংলা দেশের ইতিহাস হয়তো নতুন
ধরে লিখতে হবে।

সেই প্রতীক। প্রতিটি মূর্তি
গুণে গুণে, প্রতি পদক্ষেপে সচকিত হয়ে
হয়ে এমনি করে বসে থাকে। সময়ের
কাটা তার নিজের কক্ষপথে ঘুরে চলে।
আর প্রত্যেক দিন ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ
প্রতীকায় সময়ের কাটা সশে ঘুরে

ঘুরতে অনিতার মনে হয়, সেও কেন এই
আবর্তে কতকাল ধরে পথ হাটিছে।
অপরিসীম বিরক্তিতে মন ভরে উঠল।

গভীর ক্রান্তিতে চোখের পাজ ভাঙ হয়ে
আসতে চাইল।

তবু তো রাত বেশি হয় নি।
ভেঙারীর মৃদুধানার বাঁপ এনে
থোলা। এখনও গলিতে মানুষের আনা-
গোনা। সামনের বাড়িটার একতলার ফাটল
দুলা দুলে দুলে এখনও পড়া কমে
কিন্তু আজ এরই মধ্যে অনিতার দেহ
অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে। অথচ
এখনও অনেক সময় গড়িয়ে যাবে। গলির
বাড়িদুলো আগুপিছ এক এক করে
নিবুদ হয়ে যাবে। নানা স্বকীয় টুকু-টুকু

অনেক অনেক

মুনেই উঠিল



আশিষ

পাণ্ডাহিক বসন্ততী

মাল, প্রাস্টকের খেলনা, চুলের রঙ-বেরঙের ফিতে ভর্তি ঠেলাগাড়ীটা ঠেলতে ঠেলতে লোকটা সেদিনের মত ডেরায় ফিরবে। পানের দোকানের রেডিও থেকে হিন্দীগান আর শোনা যাবে না। রাস্তার মোড়ে ডাস্টবিনের চারপাশে দু-একটা ফুকুর মাঝে মাঝে চীৎকার করে নৈঃশব্দ ভেঙে থান্ থান্ করবে। রাস্তার গ্যাসের আলোটা একা একা দাঁড়িয়ে থেকে টিম্-টিম্ করে জ্বলবে। কদাচিৎ কেউ হয়তো দ্রুতপায়ে চলে যাবে শেষ শোর সিনেমা দেখে। তখনও শব্দ অনিতা একা ছানালার পাশে দুই হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে বসে সময়ের পাশাপাশি পথ হাঁটবে। আর এ-বাড়িরই দোতলার নতুন বোটা ল্যাম্বার সোহাগ পেয়ে পেয়ে তখনও খিলখিল করে হেসে উঠবে। এবং ওই গামনের বাড়ির মৃগাল বিছানায় উপড় হয়ে শূন্যে বই পড়ার অছিলায় ঠায় ছানালার দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে অনিতাকে প্রাথবে।

অনিতা মৃগালের ছানালার দিকে তাকাল। সম্ভবত থেকেই বোধহয় ওর ঘরে আলো জ্বলে নি। হয়তো ফেরে নি এখনও ; কিম্বা একটা প্রবল উত্তেজনার আগুন অন্ধকার ঘরটায় শূন্যে শূন্যে নিজের মধ্যে নিজেই দগ্ধ হচ্ছে। অনিতার নিঃসঙ্গতার শরিক হতে চায় মৃগাল। কারণ, আজই সকালের পরে কোন এক সময়ে দরজার ফাঁকে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে গেছে।

চিঠির কথা মনে হতেই অনিতা চণ্ডল হয়ে উঠল। বৃকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করল। সাবাদেহ শিরশির কবে উঠল। সমস্ত ভাবনা বৃষ্টি হিম প্রবাহের স্পর্শ পেয়ে জমাট বেঁধে গেল। ফাঁকের স্থাবিবধ ওকে শিল্পীর আঁকা ছবির মত পটে ধবে রাখল যেন। অনিতা নিজেই এমন একটা ছবি কোন মাসিক পত্রিকার দেখে থাকবে।

বড় অস্বস্তি লাগছিল। কলতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

সেদিনও প্রথম বৈদ্য অনিতারা এই ঘরে এসেছিল, এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে গলিটা বারবার দেখে-ছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই ঘর গোছাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

সেদিন, আবার জানালার পাশে বসে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাবতে চাইল অনিতা, সেদিন নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দুই চোখে। ওর নিজের ঘর, নিজের সংসার। আনন্দ আর আবেগে এই ঘরের মীমান্যর মধ্যেই পায়ে পায়ে হেঁটে খড়াছিল, মাঝে মাঝে কি ভেবে যেন

দাঁড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠে বলেছিল, শোন, শোন, এইখানে দেওয়াল-আলনাটা লাগিয়ে দাও না; আর, আর, হ্যাঁ—আলনাটা ওইখানে।

তখনও বাঁধা বিছানাটার ওপর চেপে বসেছিল মহীতোষ। একটা গভীর দৃষ্টি মেলে অনিতাকে তাকিয়ে দেখেছিল। এই দৃষ্টির ভাষা অনিতা বুঝতে পারে। তাই কিছুই না বোঝার ভান করে বলেছিল, যাই, রান্নাঘরটা দেখে আস।

মহীতোষ ডাকল, শোন।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় বাকিয়ে অনিতা ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করল, কি?

মহীতোষ বলল, কাছে এস।

কৃত্রিম শব্দ ফুটিয়ে অনিতা বলল, না, কি বলবে ওখান থেকে বল।

—না, কাছে না এলে বলব না।

অনিতা যেন আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল। আরও কাছে। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে হবে। মহীতোষ হাত বাড়িয়ে ওকে একান্তভাবে কাছে টানল, দু'হাতে মুখখানা তুলে ধরল।

—ছাড়, ছাড়। তুমি ভারি—

অজস্র আড়ের আদরে ভরিয়ে তুলে অনিতার কথাটা মহীতোষই শেষ করে-ছিল, অসত্য।

অনিতা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে-ছিল, আর ডেকে দেখ একবার, সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলি ধরে ছুট মারব।

মহীতোষ ওর দিকে গুটিগুটি এগুতে এগুতে বলেছিল, দেখা যাক, কে কত জোর ছুটেতে পারে।

এবার কিন্তু অনিতা ইচ্ছে করেই ওর হাতে ধরা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

কতদিন আগে অনিতারা এ বাড়িতে এসেছিল। তিন বছরের বেশি হবে। এই সময়ের মধ্যে অসত্য এই গলিটাব কোন পরিবর্তন হয় নি। মাঝে মাঝে ঠেলায় মাল চাপিয়ে পুরনো ভাড়াটেরা উঠে গেছে। এই গলি থেকে হয়তো আরও সরু গলিতে, কিম্বা বড় রাস্তায়। কিছুদিনের মধ্যে আবার নতুন ভাড়াটে এসেছে। মূলত বাতাসে উড়তে উড়তে যেন এই খাঁচার মধ্যে ধরা পড়েছে। এতে হয়তো সেই সেই বাড়িগুলোর মেজাজ পাশ্চাত্যে; কিন্তু গলিটার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কোন নতুন বাড়ি ওঠে নি, কোন পুরনো বাড়িও ভাঙে নি। কেবল অনিতার স্বপ্নটাই ভেঙে ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে গেছে। পল পল ধরে তিল তিল করে ওর স্বপ্নটা ভেঙেছে—ওর ওই সুন্দর ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

একটা সুন্দর ককরকে সংসার। ওদের সুখের ঘর। যারা আসবে তাদেরই চমক লাগবে সাজান-গোছান সংসার দেখে। ঘনিষ্ঠ যারা, তারা বলবে, কি সুন্দর ঘর ভোর, নিতু। পাশাপাশি দাঁড়ান অবস্থায় অনিতা মহীতোষের মুখের দিকে তাকাবে। মহীতোষের মুখে হাসি ফুটবে। মেঝেতে পাতা বিছানায় অনিতা দু'পুড়ে গড়াতে গড়াতে ভাবাছিল আর আপন মনে হাসছিল। একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে কখন অজান্তেই বৃষ্টি একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। মহীতোষ বিকেলে আফিস থেকে ফিরে আসতেই অনিতা বলেছিল, আমাদের দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট হলে খুব ভাল হত।

গরম চায়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল মহীতোষ, কেন, এতে কি আমরা দু'জনে ধরিছ না।

অনিতা দ্রুতুটি হেনে বলেছিল, তাই বললাম বৃষ্টি।

—তবে?

—মানে একটা শোরার ঘব আর একটা, বসবার ঘর।

মহীতোষ কথাটা শুন্যে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাপের চা ছলকে ডিসে এবং ডিস থেকে কাপড়ে।

অনিতা চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, এত হাসির কি হল?

মহীতোষ এবার গম্ভীর হল। বলল, না, ভাবছিলাম তুমি দু'পুড়ে শূন্যে শূন্যে স্বপ্ন দেখ নিশ্চয়ই।

—একথা বলার মানে?

—মানে আর কি; একখানা ঘরের ভাড়া জোটে না তায় আবার দু'খানা।

অনিতা একটু হতাশ হয়েছিল। ক্ষুদ্র হয়েছিল মহীতোষের ঠাট্টায়। গদ্য কাল্যে করে উঠে গিয়ে রান্নার কাজে লেগেছিল। সেই রায়েই একান্ত নিভুতে অনিতাকে গভীরভাবে কাছে টেনে মহীতোষ বলে-ছিল, রাগ কর না, নিতু। আমার সাধ্য কতটুকু তা তোমার জন্য। কোনমতে যদি দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারি তবেই যথেষ্ট। আর আয় যদি বাড়ি, সঙ্গতি যদি হয়, তবে লেকে বাড়ি নেব, দেখে নিও। দু'খানা ঘর কি বলছ, গোটা বাড়ি।

—তাই বলে বার-অন্দর এক হয়ে যাবে? অনিতা অনুযোগ করেছিল। তোমার কোন বন্ধু এলে আমি ঘরে থাকতে পারব না, একটু শোরার ইচ্ছে হলে শূন্যে পারব না। কোন আত্মীয়-স্বজন এলে একঘরে শোয়া—

—সবই বুঝতে পারছি, নিতু, কিন্তু

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

সাধ্য নেই। মহাতোষ পাশ ফিরে শূন্যে জ্বাব দিবেছিল।

তা নয় না-হল, কিন্তু খানকরের চেয়ার আর একটা টেবিল। একটা খাট, একখানা বড় আয়না, আলনা, দরজা-জানালায় পর্দা। আর বিরেতে পাওয়া বইগুলো যদি একটা ছোট্ট কানের আলমারীতে সাজিয়ে রাখা যায়, তার সঙ্গে টুকটাকি দ্রু-একটা পুস্তকও। বেশ সাজান-গোছান একটা ঘর। একটা ছোট্ট শূন্যের সংসার।

আনতা ভাবতে শূন্য করোঁছিল কোথায় কি রাখবে। ঠিক কোনখানে খাট রাখলে মানাবে। টেবিলটা এখানে; বই-এর ছোট্ট আলমারীটা ওখানে। না, এখানে। প্রত্যেকটি নির্জন অঙ্গ দৃষ্টিতে আনতা ভাবে আর চোখ বুজে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে। কত আর খরচ হবে। আস্তে আস্তে গুঁড়িয়ে তুলবেই।

মহাতোষ সব শূন্যে ওর স্বভাব মত জেরে হেসে উঠেছিল। বলোঁছিল, এত সব জিনিস এ-ঘরে ঢোকালে এমনিতেই দম বন্ধ হয়ে যাবে।

অনিতা বলেছিল, দম বন্ধ হয়ে যাবে না ছাই। আমি সব ঠিক কবে রেখেছি। দেখ না, এখানটার থাকবে খাট, এখানে আলমারী-ছোট্ট মত, বেশি দামের নয়; আর ওখানটার টেবিল।

মহাতোষ অনিতাকে দ্রুচোখ মেলে দেখছিল। হালকা পারে ও তো হাঁটছিল না, যেন নেচে বেড়াচ্ছিল। মহাতোষ বুঝতে পারে, অনিতা একটু একটু করে ওর স্বপ্নের সৌধ গড়ে তুলেছে। বাবার সংসারে প্রাত্যহিক অভাব-আধ্বোনের মধ্যে বাস কবে নিজের সংসারের জন্যে এমনি একটা কল্পনা লালন করেছিল। এখন তাই প্রকাশের পথ খুঁজছে। মহাতোষ আরও বোঝে, এই ঘর গড়ার আনন্দে অনিতা কত সার্থক হয়ে উঠবে। নিজের ক্ষমতার বাইরে জেনেও মহাতোষ এবার অনিতাকে হতাশ করতে পাবল না। সমস্ত দেহে পরিপূর্ণ যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ তুলে অনিতা তখনও ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জীবনের এটুকু বিস্তারের মধ্যে যে হতাশা ধীরে ধীরে ওকে পেয়ে বসছিল অনিতাকে অবলম্বন করে অনায়াসে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে মহাতোষের মনে হল।

মনে মনে হিসেব কষল মহাতোষ। মাঝারী ধরনের একটা সুওদাগরী অফিসে দ্রুশ চার্জিং টাকা মাইনের কেবানী। বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচ, যাওয়া-আসা, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে এসব করা যায় না। বরং ধাব করে আস্তে আস্তে শোধ করে দিলে চলবে। তাগাদা পড়লে যেমন করবে

হোক দেনা শোধ হয়ে যাবে। যদিও বিয়ের সময় সাতশ' টাকা খরচ করেছিল। তার শ' পাঁচেক টাকা এখনও শোধ করতে হবে। তবু একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে মহাতোষকে।

শেরালদার পুরনো বাজারে গিয়েছিল। দরদাম করে একে একে সব ঘরে এনে-ছিল। ঘর সাজিয়েছিল; আর সাজাতে সাজাতে মহাতোষের উৎসাহও ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল।

—না, না, টেবিলটা ওপাশে নয়, এদিকে রাখ। মহাতোষ বলোঁছিল।

আনতা মানতে পারে নই কেন, এদিকে নয় কেন? এখানে রাখলেই ঠিক হবে।

—কি ঠিক হবে?

—দেখাবে ভাল?

—রাস্তাটা জাম হয়ে যাবে না?

অগত্যা অনিতা সায় দিয়েছিল; বেশ, যাবা, বেশ। যখন এসব কিনতে বললাম, তখন কত কথা।

—তাই বন্ধ?

—তাহ তো।

কি একটা মতলব নিয়ে মহাতোষ অনিতার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিল। চোখ পাকিয়ে অনিতা বলেছিল, ভাল হবে না বলাহ।

বোকা বোকা মুখ করে মহাতোষ জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ভাল হবে না?

—বন্ধ গো, মশাই, বন্ধ।

—কি বোঝ?

—আহা! একেবারে হাবাগোবা! উহু, এখন সময় নেই, উনুনে আঁচ দিতে হবে।

অনিতা ঘরের দিকে তাকাল। খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা—সবগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ক্রমশ মহাতোষের জন্যেও একটা গভীর মমতাবোধ জেগে উঠল। কিন্তু আজ মনে হয় এসব না চাইলেই বোধহয় ঠিক ছিল। এমনটা হত না। কারণ, এমনি করে মহাতোষের মনে হত না, এঘরে ওদের কুলাচ্ছে না। দ্রুখানা ঘর, একটু নিম্বাস ফেলার মত বারান্দা। একটু আকাশ দেখা। নিজেদের আরও বেশি করে ছাড়িয়ে দেওয়া।

মহাতোষ একদিন এসে বলল, চাকরীটা ছেড়ে দেব ভাবছি।

অনিতা হঠাৎ যেন হকচাকিয়ে গেল; কেন, কিছু গোলমাল হয়েছে?

মহাতোষ হেসে জ্বাব দিল, তা নয়, এ চাকরী করে কিছু হবে না।

অনিতার চোখে মুখে দারুণ বিস্ময় ফুটে উঠল। মহাতোষের বক্তব্য অস্পষ্ট, ব্যাপসা মনে হল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর বলল, কি করবে তবে?

—ব্যবসা করব।

—টাকা?

—আপাতত দালালী। মানে অডার ধরব আর সাপ্লাই করব। কয়েকটা ছোট-খাট ফার্ম সাহায্য করবে বলেছে।

চাকরী সত্যি, ছেড়ে দিয়েছিল মহাতোষ। সকাল থেকে রাতি পর্যন্ত প্রচণ্ড পারিশ্রম শূন্য করেছিল। ঘর নিল এক সময়ে অফিস পাড়ান। কোম্পানি খুলল। অনিতার শাড়ি এল। গয়না এল। কাচ লাগান বড় আলমারী এল। বোঝা কিন্তু অনিতাই বলেছিল, নিয়ে তো এলে, কিন্তু পা ফেলার জায়গা রইল না; দম ফেলব কি করে।

—হবে, তোমার দ্রুখানা হারান ফ্লাটও হবে। সামনে একটু বুল-বারান্দা। তারপর তোমার যখন মনে ভরবে, তখন আরও বড় ফ্লাট, একটা গাড়ি।

মহাতোষ ছবি আঁকছিল, অনিতা তন্ময় হয়ে দেখছিল। এই ছবি দেখতে দেখতে এক সময় মহাতোষের খুব মাছ ঘেঁষে কানের গোড়ায় মুখ রেখে আঙ্গুরের সুঁরে অনিতা বলেছিল, এই, ভাল সিনেমায় যাবে?

মহাতোষ ওকে আদর করেছিল, তারও গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। বলেছিল, সিনেমায় যাওয়ার এখন সময় কে যায় নিত। আবেকটু গুঁড়িয়ে নিই।

সৌদনের সেই স্বপ্ন মহাতোষে চোখ ঘুরে অনিতার চোখে। একটা অজুহত অবস্থার মধ্য দিয়ে বেশ কটা দিন কটল মহাতোষ উন্নতি করেছে। এই গালি স্বপ্নে উঠে যাবে বড় রাস্তায়। সেখান থেকে বালিগঞ্জ, লেকের কাছে কোথায়ও। প্রচা একটা ছবির মত বাড়ি। সামনে একটু মরশুমী ফুলের বাগান। কেমন সাজানো বাড়িটা। অনিতা ভাবনার মধ্যে ধৈ পাচ্ছিল না। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন খেঁ হারিয়ে ফেলেছিল। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো একটু পবেই জট পাকিয়ে গেল। কাক থেকে রাতি অবধি নিঃসঙ্গ প্রহরগুলো চরম আলস্যের মধ্য দিয়ে মন্দ্রব পাতে চলতে চলতে এক সময় স্বপ্নটাই অহীত মনে হতে লাগল। একটা অব্যক্ত বেদন ভারি পাথরের মত চেপে বসছিল। আভেতরে ভেতরে নিজের অজান্তে মহাতোষের বিরুদ্ধে একটা আত্মব্যা-জমে উঠেছিল।

কাজ আর কাজ। একটু গুঁড়িয়ে নিই। মহাতোষের দিন প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে। অনিতার দিন কাটে প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব কষে কষে। অনিতা যত ছাঁপিয়ে ওঠে, মহাতোষ তত কাছে মাতাল।

একদিন মাতাল না হলেও মহাতোষ

মাস্টারিক বসুমতী

মদ খেয়ে বাড়ি এল। অনিতা শিউরে উঠেছিল। স্বপ্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতার কিছুক্ষণের জন্যে পাথর বলে গিয়েছিল। মহাতোষ ওর ভাবলেশ-হীন মুখেব দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল। যেন কৈফিয়তের সুরেই বলল, আজ একটা বড় ক্লায়েটকে একটু খাওয়াতে হল। মোটা টাকার অর্ডার। তাই ওদের সঙ্গে আমাদেরও একটু—

তথা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করে নি অনিতা। এই জ্ঞানলাটার এসে দাঁড়িয়েছিল। দু'চোখ কখন যেন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। অভিমানের কয়েক দিন কথা বলে নি মহাতোষের সঙ্গে।

কিন্তু অনিতা রুষতে পারে নি। কেঁদে, কগড়া করে, মৌন থেকে, অভিমানের সুরে এসে মহাতোষকে আটকাতে পারেনি। কারণ এটা ব্যবসার খাতের দরকার। তাই মাঝে-মাঝে করে করে এখন এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজার ট্যান্ড এসে দাঁড়াবে, কোনমতে মহাতোষ নেমে আসবে, দেওয়াল ঘরে টাল সামলাবে। অনিতা কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বা হাতটা ওর কাঁধে রেখে চেষ্টা করে করে পা ফেলবে। আর নিজেই কৈফিয়তের সুরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলবে, এটুকু সহ্য করতেই হবে, নিতু। আমি জানি তুমি পছন্দ কর না, কিন্তু আনু ডান। আমি বড় হব, অনেক টাকা রোজগার করব, তোমার বাড়ি হবে, গাড়ি হবে। টাকা চাই, নিতু, আরও টাকা।

কোন জবাব দেবে না অনিতা। অথচ মহাতোষ যতক্ষণ জেগে থাকবে, আপন মনে বকে যাবে। ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি আঁকাব চেষ্টা করবে। কিন্তু অনিতার মনে এ ছবি আর দাগ কাটে না, আর উৎসাহ বোধ করে না।

পানের দোকানের রেডিওটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠেলাডাউর মনিহারী জিনিস নিয়ে সেই লোকটাও নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘিরে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দু'খ থেকে ট্যাক্সি, আওয়াজ ভেসে আসবে। আজকের দিনের মত এই প্রতীক্ষার অব-স্থান ঘটবে।

অনিতা আড়চোখে মৃণালের জ্ঞানলার দিকে তাকাল। আজ আর ওর ঘরে আলো জ্বলছে না। হয়তো ঘর অন্ধকার করে অনিতাকে দেখছে। কিম্বা হঠাৎ সেই চিঠি দেওয়ার লজ্জা ঢাকছে; অথবা আড়ালে থেকে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। মৃণালের চিঠিটা কিন্তু অনিতা ছিঁড়ে ফেলতে পারে নি। প্রথমটা পড়ে খুব রাগ হয়েছিল। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মাথার মধ্যে কেমন কেন করে উঠেছিল। সমস্ত দেহে একটা তোলপাড় অনুভব করেছিল।

অথচ উরপার কয়েকবার পড়ে পড়ে চিঠিটা ভাল লাগতে শুরু করেছিল। একটা রোমান্টিক অনুভূতির উত্তাপ নিঃসঙ্গতার মধ্যে সম্ভবত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাকবে। তাই অনেকবার পড়েছে চিঠিটা। প্রতিটি শব্দ মনস্থ হয়ে গেছে। মৃণাল লিখেছিল, এমনি করে জীবনটা নষ্ট করছ কেন? তোমাকে দেখে মনে হয় যেন চিড়িয়াখানার লোহার গারদে পোরা হরিণী। একটা লোক সকালে বেরিয়ে যায়, অনেক রাত করে মাজল হয়ে ফেরে। কি পাও ওর কাছ থেকে? শব্দ ভাল খাওয়া-পরাই তোমার কাছে সব? তোমার চোখদুটো আমি অনেক করে লক্ষ্য করেছি। ওর ভাষা কিন্তু অন্যরকম। ভাল করে তোমার ভেবে দেখতে বলি। পরে, বেদিন হোক জ্ঞানিও আমাদের।

অনিতার চোখদুটো অস্বাভাবিক মৃণালকে ঝুঁজল। আজ মৃণাল একবারও ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে নি। আসলো কি বলতে চায় ও। জানতে চাইবে, কি ভেবে দেখতে বলছে? যদি বলে, লোহার গারদ ভেঙে চলে এস; নতুন করে আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বঁধব; সেখানে তোমার আমার মস্ত বিচরণ। না, এ ধরনের টোল ফেলা। অনিতা কেঁপে কেঁপে উঠল। অসংখ্য অশ্রুত ধিকার যেন ওকে আহত করল। বিস্কৃত মনের ক্ষতস্থানটা জরিপ করার চেষ্টা করল। চুরে চুরে রক্তঝরা বেদনা সারাদেহে পাক দিচ্ছিল। - তবু অনিতার মনে হল, এই বেদনাটাই ও সবচেয়ে লালন করেছে।

এমন সময় দু'রাগত ট্যাক্সি আওয়াজ ভেসে আসে। কোন ব্যতিক্রম নয়। দর-জায় দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। কোনমতে মহাতোষ নেমে এল। অনিতা উঠে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেল। একটা হাত অনিতার কাঁধে রেখে টাল সামলে সামলে ঘরে ঢুকল মহাতোষ।

—আজ আর খাব না। মহাতোষ জড়ান গলায় বলল। গতানুগতিক ধারার কৈফিয়ত রাখতে চাইল : তোমাকে প্রশং-ষে অর্ডারটার কথা বলেছিলাম, নিতু, সেটা আজ হয়ে গেছে। তাই একটা পার্টি দিতে হয়েছিল।

অনিতা ওর সব কথা শোনার জন্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকে নি। উঠে রান্না-ঘরটা বন্ধ করে এসেছিল। কারণ, এসব কথা বহুবার শোনা হয়ে গেছে। ওর উপার্জন বাড়ছে। বড় হচ্ছে। আরও বড় হবে।

অনিতার খাওয়া হয় নি। প্রায়ই রাগে হয় না। মহাতোষের জন্যে অপেক্ষা

করে। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় সব কিছুর ওপর বিক্ষোভ এসে যায়। খেতে ভাল লাগে না। আজও তাই খায় নি অনিতা।

এ ঘরে এসে জ্ঞানলার কাছে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে আঁচলে মুখ মুছল। শব্দেত খাওয়ার আগে অনিতা ইচ্ছে করেই মৃণালের ঘরের দিকে তাকাল। হঠাৎ যেন মৃণালের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করল। মহাতোষা জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। একটু মোটা হরেক্ষেণ্ড। বলিছিল, প্যান্টগুলো সব অলটার করতে হবে। কিন্তু এই মনোভবে মহাতোষের চেয়ে মৃণালকে অনেক বেশি ভাল লাগে-ছিল। অনিতা আবার ওর জ্ঞানলার দিকে তাকাল। দেখল, মৃণালের ঘরে আলো জ্বলছে। জ্ঞানলার এসে দাঁড়িয়ে অনিতাকেই দেখছে। চাকিতে সরে এসে অনিতা। একটা বোবা আবেগ যেন ওকে তাকিয়ে নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি মহাতোষের পাশে শুরুর পড়ে ও গিয়ে হাত রাখল। বৃক্কের মধ্যে দ্রুততর স্পন্দন অনুভব করল।

মহাতোষ তখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অনিতার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে জোরে চাপ দিতে দিতে বলল, একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, নিতু, নিউ আলিপুর্নে তিনখানা ঘরের সুন্দর ফ্ল্যাট নিয়েছি। দু'চার দিনের মধ্যেই আমরা সেখানে যাব।

এবার যেন সেই বোবা আবেগটা সমস্ত দেহ তোলপাড় কবে সরব হতে চাইল। অনিতা এই উপাত্ত আবেগ রোধ করতে পারল না। মহাতোষের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে এনে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ল। মনের ক্ষতস্থান থেকে চুরান রক্ত দলা দলা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল যেন। মহাতোষ ওর পিঠের ওপর হাত রাখতেই ডুকরে ডুকরে কাঁদল অনিতা।

গলিটাক কবরের শান্তি। দূরে দূরে একটা কুকুরের চিৎকার। মোটরের হর্ন বা তাঁর গতিবেগের চকিত শব্দ। ওপরতলার নতুন বউটার বেহালাপনাও ক্লান্তিতে নীরব। বোধহয়, এখনও মৃণালের ঘরে আলো জ্বলছে।

আর এমন করে কেন কাঁদল—এর যথার্থ উত্তর খুঁজে পেতে অনিতা রাত জাগছিল। অথবা, এই বন্ধ গলিটা ছাড়িয়ে নিউ আলিপুর্নের সুন্দর ফ্ল্যাট-টার কথা ভেবে ভেবে স্বপ্ন আঁকছিল। কারণ ওখানে নাকি অনেক আকাশ।

বিশ্বসাহিত্যের * ৩ঃ নবীন উদ্ভাচাৰ্য আদিপৰ

২ ছাঃশ ২

সংগমসমূহ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য : তামিল

প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠী থেকে যেসকল ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তামিল, তেলুগু, মলয়ালম, কন্নড়, তুলু, কোড়াগু, গোলন্দী, রাহুই ইত্যাদি। তবে এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ ভাষা হচ্ছে তামিল। 'তামিল' কথাটি দ্রাবিড়ের (দ্রাবিড়) সমার্থক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত 'দ্রাবিড়' কথাটি কালক্রমে 'দ্রামিড়', 'দ্রামিল', 'তামিল' বা 'তামিলে' রূপান্তরিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে 'তামিল' আসলে তামিল শব্দই, কালক্রমে তা সংস্কৃত দ্রাবিড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। 'তামিলকম' বা তামিলভূমি বলতে আদিতে বোঝাত উত্তরে বেস্কটম (তিরুপতি পর্বতমালা), দক্ষিণে কুমারী (কুমারিকা অন্তরীপ অথবা কুমারী নদী) পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র, যা বর্তমানে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর।

তামিল সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এই রকম কোন ট্রাডিশন বোধ হ'ব আর কোথাও নেই। আদিকালে যখন শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ হ'চ্ছিল তখন তা দেখার জন্য দক্ষিণের লোকেরা কৈলাসে হাজির হয়, এবং তাদের চাপে পৃথিবী'ব ব্যালান্সটা একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। তখন শিব পৃথিবীকে আবার সিঁধা করার জন্য অগস্ত্যমুনি'কে পাঠান। যাবার আগে অগস্ত্য শিবের কাছ থেকে দ্রবীষা তামিল ভাষা ও তার ব্যাকরণ গিখে নেন। তারপর তামিলভূমিতে উপস্থিত হয়ে তিনি প্রথমেই বারো হাজার শ্লোকে তামিল ভাষার ব্যাকরণ গিখে ফেলেন যার নাম অগস্ত্যম বা অকতিয়ম।

শব্দ পুরাণের গল্পই নয়, সাহিত্য নিয়ে আরও কয়েকটি ট্রাডিশন তামিলভাষীদের আছে। তারা বিশ্বাস করে সুপ্রাচীনকালে তামিলভূমিতে পাণ্ড্যরাজ্যে একটি 'সাহিত্য একাডেমি' ছিল যার অধিবেশনে সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনা-সমূহকে অনুমোদন করাতেন। এই অধিবেশনগুলিকে বলা হত 'সংগম', আদি তামিল ভাষায় 'কুদল'। এইরকম তিনটি সংগমের কথা তামিল লোকমানসে লিপিবদ্ধ আছে।

কথিত আছে প্রথম সংগম বসেছিল পুরাতন মাদুরায়, যা বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এখানে ৪৪৯৯ জন লেখক তাঁদের রচনাবলী অনুমোদন করিয়েছিলেন। সেই সময় রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী ছিল অকতিয়ম, পরিপদাল, মদুরাই, মদুকুরু এবং কল্লিয়ারাই। দ্বিতীয় সংগম বসেছিল কপাটপুত্রম নগরে, অনুমোদনকামী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৩,৭০০ এবং ওই যুগের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ ছিল অকতিয়ম, ভোলকাপ্পিয়াম, জাপদুরাম, ইসই-নুদুঙ্গম, কুত-পুদুগম, কলি, কুরুকু, বেল্পালি এবং ব্যালমালই। তৃতীয় সংগম বসেছিল মাদুরা শহরে। এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত জানাবার প্রয়োজন আছে। তার আগে আরও দু'টি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

তামিল ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রথম সংগমের আয়ুষ্কাল ছিল ৪,৪০০ বছর, দ্বিতীয় সংগমের ৩,৭০০ এবং তৃতীয় সংগমের ১,৮৫০। বলা বাহুল্য এইগুলি অভিরঞ্জন। এও অভিরঞ্জন যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংগমে যথাক্রমে ৪,৪৯৯, ৩,৭০০ এবং ৪৪৯ জন লেখক সমবেত হয়েছিলেন। তবে সংগমগুলির মূল ব্যাপারটা ঐতিহাসিক নয় এবং এই তিনটি সংগমের আয়ুষ্কাল ছিল ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে

একথা বলেছেন তামিল সাহিত্যের নামকরা ঐতিহাসিকগণ।

প্রথম সংগমের যুগে রচিত কোন সাহিত্যকর্মেরই চিহ্নমাত্র নেই। দ্বিতীয় সংগমের যুগে রচিত একটিমাত্র গ্রন্থই টিকে আছে যার নাম ভোলকাপ্পিয়াম। তিন খণ্ডে রচিত এটি একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডের নাম 'এলমুদু' বা শব্দপ্রকরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'সোল' বা শব্দার্থ-প্রকরণ এবং তৃতীয় খণ্ডটি হচ্ছে 'পোরুল' যেখানে আছে ব্যাকরণের অপরাপর নিয়মাবলী। কিন্তু শব্দমাত্র এটিকে ব্যাকরণগ্রন্থ বলা ভুল। তামিলভাষীদের কাছে এই গ্রন্থটি হচ্ছে 'অরণ-পোরুলিনবমবিদু', ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব কিছই এখানে আে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শশতাব্দে

পাদিনেন্ কালিকর

তৃতীয় সংগমের যুগে রচিত সাহিত্যগ্রন্থসমূহের কিছু কিছু অবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। এইগুলিকে উপরি উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দশটি বর্ণনামূলক কবিতার সংকলন। এই দশটির মধ্যে দু'টির রচয়িতা হচ্ছেন নল্লীর, আরও দু'টির রচয়িতা হচ্ছেন কন্ননার এবং বাকি ছয়টি অপরাপর কবিদের রচিত। নল্লীরের প্রথম কবিতাটির নাম তিরুমুরুকান্দুপদই য দেবতা মদুরগের উদ্দেশ্যে রচিত। তা' অপরি কাব্যটি হচ্ছে নেন্দুনজবাদই, যুন্দুর রাজা নেন্দুজোচিয়নের বিপ্রলম্বা পত্নী বেদনা যাতে বিবৃত হয়েছে। রচয়িতা কন্ননারের পেরুন্ম্যানান্দুপদই পাঁচশোটি শ্লোকে লিখিত কাণ্ডীপুত্রমের একটি দীর্ঘ বর্ণনা। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যটির নাম পলিনপ্পালই, বিষয়বস্তু একটি সৈনিক জীবনের অত্মবন্দন, একদিকে রণভেটী আহ্বান অপরিদিকে প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণ। শেষ পর্বত সে দ্বিতীয়টিকে বেছে নিল। বাকি ছয়টি কাব্যের মধ্যে মরুখনারের মদুরাইকাণ্ডি কাণ্ডী-মাদুরা

গৌরবগাথা; কমিস্যারের পোরনরান্দ্রপ-
দাই সাহিত্যিকদের দ্বন্দ্ববস্তার নিখুঁত
চিত্রণ; নখথনাবের সিরদুপানন্দপাদই
তৎকালীন সমাজ জীবনের দর্পণ; এবং
কৌসিনাবের মলইপদুকদাম প্রকৃতি
বিষয়ক কাব্য। এ ছাড়া নন্দুথনারের
মুদ্রইপাদু একটি বিরহিণী রাণীর
কাহিনী ও কপিলাবের কুরিগিপাদু
একটি পাহাড়ী সর্পারের প্রেমোপাখ্যান।

এতদ্ব্যতীত কথ্যটির অর্থ আটটি
সংগ্রহ। প্রথমটির নাম নরিনই যাতে
অহবল ছন্দে রচিত ৪০০টি গীতি-
বিভা আছে। দ্বিতীয়টির নাম
মুদ্রশোকাই; এটিও চারশোটি প্রেমের
বিভাব সংকলন। তৃতীয়টি হচ্ছে পাঁচ-
শ কবির রচনা, নাম অইকুরনরু।
বাকিগুলি হচ্ছে পদিকপাদু, পরিপদাল,
মলিথোকাই, অহনানরু এবং পুরনানরু।

পদিনেনকালিকনকু হচ্ছে আঠারোটি
ভক্তিমূলক কাব্যের সংগ্রহ। এইগুলির
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হচ্ছে তিরু-
বঙ্গবাবের কুরল যা আজও তামিলভাষীদের
বহু প্রেরণার উৎস। এই কাব্যটির বহু
ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে যোগুলির মধ্যে
পোপ, আরার, পপলে এবং রাজা-
গোপালাচার্যীর অনুবাদগুলিই বিখ্যাত।
এইটি ছাড়া বাকি কাব্যগুলির মধ্যে
নালদিয়ার, তিরিকাদুকুম, সিরদুপাঙ্গমলম,
ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই
আঠারোটি কাব্যের মধ্যে চারটি করে
নিরে দুটি পৃথক সংকলন আছে,
না-নারপদু এবং আইনখিনই। তিরুবঙ্গ-
বাবের কুরল ছাড়াও নাগনারের
নানমনিজ্জদৈকই তামিলভাষীদের নিকট
অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। আর বাকি
পাঁচটির নামও বাদ দেবার দরকার
নেই। সেগুলি হচ্ছে : আচারকোবই,
পলমোলি, মদুমোলিক-কাগি, ইয়িলই
এবং এলামি।

মহাকাব্য

তামিলভাষায় মোট পাঁচটি মহাকাব্য
আছে—শিল্পদিকারম, মণিমেকলাই,
জীবকচিত্তামণি, বলয়পতি এবং কুন্ডল-
কেশী। এইগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি
পাওয়া যায়। প্রথম তিনটির মধ্যে আবার
প্রথম দুটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পদিকারমের রচয়িতা হচ্ছেন
ইলাগো-আদিগল। ইনি ছিলেন একজন
শরিরাজক। কথিত আছে একদা প্রমণ-
কালে এর সঙ্গে মণিমেকলাই-এর
রচয়িতা সিওলাই সান্তনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ
হয়। তাঁর মতে মণিমেকলাই মহাকাব্যটি
শুনে ইলাগোর শিল্পদিকারম রচনার
মাথ জাগে। তামিলভাষীদের নিকট এই

দুটি মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত বা
ইলিয়াড-অডিসির তুল্য। বর্তমান লেখক
সঙ্গেই জানাচ্ছেন যে তাঁর একজন তামিল
বন্ধুর সহায়তায় তিনি শিল্পদিকারমের
একটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, কিন্তু তার
কোন প্রকাশক ছোটে নি। এই দুই
মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা
করা যাক।

শিল্পদিকারমের নায়ক কোবলন
এবং নায়িকা কম্বিকি। এরা দুজনে স্বামী-
স্ত্রী এবং এদের ভালবাসা ছিল গভীর।
কিন্তু কোবলনের কি দুর্ভাগ্য হল, সে
মাধবী নাম্নী একটি নর্তকীর প্রেমে
পড়ে সর্বস্ব খোঁসে। শেষ পর্যন্ত সে
অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রী কম্বিকি নিকট ফিরে
এল। কম্বিকিও তাকে ক্ষমা করল। তখন
স্বামী-স্ত্রী মিলে সিম্বান্ত করল যে তারা
মাদুরায় যাবে এবং কম্বিকির পায়ের একটি
মল বেচে সেই টাকায় ব্যবসা করবে।
কোবলন একগাছি মল নিয়ে স্বর্ণকারের
দোকানে গেল। এই স্বর্ণকার রাণীর
পায়ের একগাছি মল চুরি করেছিল, যা
দেশেতে হুবহু কম্বিকির মলের মত। সে
রাজাকে জানাল যে কোবলন রাণীর মল
চুরি করেছে এবং পাশা-রাজ বিশেষ
চিন্তাভাবনা না করে কোবলনকে প্রাণ-
দণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং তা কার্যকরী
হল।

কম্বিকি যখন শুনল যে তার স্বামীকে
বিনা দোষে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে তখন
সে উন্মত্ত হয়ে রাজসভায় গেল এবং তার
নিজের কাছে রক্ষিত অপর একগাছি মল
ভেঙে দোঁখিয়ে দিল যে তার মলের ভিতর-
কার মাল-গঁশলা রাণীর মলের চেয়ে ভিন্ন।
রাজা যখন বুঝলেন যে তিনি বিনাদোষে
কোবলনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন
তখন তিনি দুঃখে হাটফেল করলেন।
কিন্তু কম্বিকির ক্রোধের উপশম তাতে
হল না। সে তার একটি স্তন ছিঁড়ে
নগরীকে অভিশাপ দিল যার ফলে
মাদুরা শহর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।
তারপর শত্রু হল ব্যাপক অজন্মা। শেষ
পর্যন্ত এক হাজার স্বর্ণকারকে বলি
দিয়ে অভিশপ্ত রাজ্যে শান্তি ফিরে এল।

ইতিমধ্যে কম্বিকি পওনিড়াতকুল বা
সতীত্বের দেবীরূপে পরিচিত হয়েছেন।
রাজা সেনগুত্তুন-পেরুমাল উত্তর ভারত
বিজয়ে গিয়ে একটি পবিত্র প্রস্তর নিয়ে
এলেন, যা দিয়ে গড়া হল দেবী কম্বিকির
মূর্তি। সিংহলবাজ গজবাহু সমেত
চারজন তামিল রাজার উপস্থিতিতে কম্বি-
কির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আজও
মাদুরা দক্ষিণে এবং সিংহলে সতীত্বের
দেবীরূপে কম্বিকি পূজিতা হচ্ছেন। এই
দেবীকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে
আরও অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে।

মণিমেকলাই-এর কাহিনী পূর্ববর্তী
কাহিনীর পরবর্তী পর্ব। এই মহাকাব্যে
মণিমেকলাই দুজন, একজন সমুদ্রের
দেবী মণিমেকলাই, অপবজন মানবী মণি-
মেকলাই। আগেই বলেছি কোবলন মাধবী
নাম্নী এক নর্তকীর প্রেমে পড়ে বেশ
কিছুকাল কাটিয়েছিল। সেই মাধবীর
গর্ভে কোবলনের গুঁসে মানবী মণি-
মেকলাই-এর জন্ম। এই মহাকাব্যের
লেখক সান্তনার ছিলেন একজন বৌদ্ধ
সন্ন্যাসী, এবং ধর্মীয় প্রয়োজনেই তিনি
এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। মণি-
মেকলাই যখন তার পিতা কোবলন এবং
বিমাতা কম্বিকির কাহিনী অবগত হল
তখন সে অসার সংসারজীবন ত্যাগ করে
বুধ, সংঘ ও ধর্মের আশ্রয় নিল, এমন
কি সে নিজ প্রেমিক উদয় কুমারকেও
পরিভ্যাগ করল। তার সাধনার পথে নানা
প্রলোভন দেখা দিলে দেবী মণি-
মেকলাই তাকে সাহায্য করেছিলেন এবং
একটি নির্জন স্থানে সাধনার অনুকূল
পরিবেশে তাকে নিয়ে হাজির করেছিলেন।
তপস্যার ফলে সে তার বাঞ্ছিত নির্বাণ লাভ
করতে পেরেছিল।

পদাবলী সাহিত্য

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে তামিলভাষায়
এমন এক ধরনের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত
হয়েছিল যার সঙ্গে বাংলা পদাবলী
সাহিত্যের কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত
হয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দক্ষিণ ভারতে
গোড়া থেকে প্রভাব বিস্তার করলেও কাল-
ক্রমে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম মাদুরা দক্ষিণে
বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। এই
শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের দ্বারা রচিত গীতি-
কবিতাগুলি তামিল সাহিত্যের অক্ষয়
সম্পদ। শৈব ভক্তদের বলা হত নায়মার ও
বৈষ্ণব ভক্তদের বলা হত আড়বার। এঁদের
রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীতসমূহ পরবর্তী-
কালে সংকলিত হয়েছিল। শৈবসঙ্গীত-
গুলি সংকলন করেছিলেন নম্বি-
আম্বাব-নম্বি। এগারো খণ্ডে বিভক্ত
এই সংকলনটির নাম তিরুমুরই। এর
প্রথম সাতটি খণ্ডকে একত্রে বলা হয়
তৈবায়ম যাতে আছে সম্বন্দর, অম্পর ও
সুন্দরর রচিত পদসমূহ; অষ্টম খণ্ডটির
নাম তিরুবাচকম যার লেখক হচ্ছেন
মানিকবাচকর। নবম খণ্ডটির নাম
তিরুইশইপ্পা, এখানে বহু কবির রচনা
আছে। দশম ও একাদশ খণ্ড দুটির
কোন পৃথক নাম নেই। অনুরূপভাবে
বৈষ্ণব পদগুলির সংকলন করেছিলেন
শ্রীনাথমূর্নি। বার জন বৈষ্ণব
ভক্ত বা আড়বারের চার হাজারেরও
অধিক রচনার বৃহদায়তন এই সংকলনটির
নাম নালায়ির-প্রবঞ্চম। এই শৈব

কৈব-ভক্তিগীতিগুলির রচনাকাল খৃস্টীয়-চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে।

শৈব পদকর্তাগণ

শৈব ভক্ত-কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য অম্পরের নাম। তাঁর আসল নাম ছিল মরুণীকিয়্যার, এবং পরবর্তীকালে তিরুবাক্করম্ নামের নামে পরিচিত হয়েছিলেন। গোড়ার দিকে তিনি জৈন-ধর্মাবলম্বী, পরে তিনি শৈবমত গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বোক্ত ভেবারম নামক সংকলনে তাঁর রচিত ৩১০টি পদ আছে। অম্পর কৃষক পরিবারের লোক ছিলেন, এইজন্য তাঁর রচনার মাঝে মাঝে গ্রামের চিত্র ও প্রকৃতি বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনার সামান্য কিছু নমুনা এখানে দেওয়া গেল :

আমরা কারো দাস নই
আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না;
আমরা অপারিবাশ্য, এবং সেহেতু
আমরা নরকের যন্ত্রণা আশ্বাদ করব না।
আমরা গর্বিত কেন না কোন কুমতলব
বা বশ্বনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়
নেই;
আমরা যন্ত্রণা জানি না
আমরা সুখী চিরকালের।

এর পরেই উল্লেখ করা প্রয়োজন কবি সম্বন্দরের নাম। দূর্ভাগ্যক্রমে এই কবি আর বোল বছর বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি ১০,০০০ পদ রচনা করেছিলেন যদিও আমরা মাত্র তাঁর ৩৮৪টি পদের সঙ্গে পরিচিত। সম্বন্দর রচিত শিবের বর্ণনার একটু নমুনা দিচ্ছি :

সপ্ন যার কণ্ঠভূষণ,
যিনি বৃষবাহন, চন্দ্রশেখর
মধুকনানীর বিহুতি যার দেহে
সেই পুষ্পাভরণ ভক্তকণ্ঠপত্র
পিরমপদরমকে যিনি আশীষধনা
করেছেন
সেই তিনি আমার হৃদয়হরশ।

মানিকবাচকর ছিলেন পাণ্ডুরায়ে

প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু পরবর্তীজীবনে তিনি শৈব সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হন। তাঁর তিরুব্বাচকম্ বেনে তাঁর আত্মার আত্ম-জীবনী। গভীর ভাবের ভাবুক ছিলেন এই কবি। তাঁর রচনার একটু নিদর্শন এখানে দিচ্ছি :

আমি হিলাম তুণে, গুন্মে, বৃক্ষে
সকল পশুতে, পক্ষীতে, সপে
পাথরে, মানুষ্যে দৈত্যে। সর্বরূপেই
আমি তোমার সেবা করেছি
কিবা অসদর, কিবা তপস্বী কিবা
দেবতা।
জীবনের সকল স্বাভাবিক জগমে
সর্ব প্রজাতিতে জন্মে আমি ক্লান্ত,
হে প্রভু॥

সুন্দরর নামে আরও একজন শৈব ভক্ত দশ হাজারের অধিক সংগীত রচনা করেছিলেন, যদিও সেগুলির মধ্যে এক-শতটির বেশি এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু আজও পর্বন্ত তাঁর রচিত সংগীত-গুলি অম্লভূত জনপ্রিয়।

এই বারজন ভক্ত-কবির পূর্বসূরী ছিলেন তিরুমুলার যার তিরুমন্দিরম ৩,০০০ শ্লোকে রচিত তামিল সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ইনিই আবার শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শনের মধ্য প্রবক্তা।

উক্ত চারজন ভক্তকবি ছাড়াও আরও অল্পশৈব ভক্তকবি ছিলেন। এইরকম ৬০ জন ভক্তের জীবনী সংকলিত হয়েছিল

পেরিরম্পদ্রাণম নামক গ্রন্থে যার লেখক শেক্টিয়ারের উপর আরোপিত হয়েছে।

আচ্যবার সম্প্রদায়

পূর্বেই বলেছি আচ্যবারগণ ছিলেন বিক্ষুব্ধ। তাঁদের সংখ্যাও ছিল বড় কম নয়, এবং কবিখ্যাতিও সকলের সন্মান ছিল না। যে চারজন আচ্যবার কবির নাম তামিলভূমিতে সর্বত্র উচ্চারিত হয় তাঁরা হচ্ছেন পোয়কই, ভূতন্তার, পেয়াবোর এবং তিরুম্টিশই। এঁরা প্রত্যেকই বেশবা ছন্দে কিছু বা তিরুম্বালের উদ্দেশ্যে শতধিক করে পদ রচনা করেছেন। লৌকিক ঐতিহ্য অনুযায়ী এই চারজকে প্রথম পর্বায়ে ফেলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বারের ভক্ত-কবিদের সংখ্যা পাঁচজন। এঁদের মধ্যে নম্মাচ্যবার এবং মধুরকবির নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় সম্পর্কে এঁরা দু'জনে ছিলেন গুরু-শিষ্য। নম্মাচ্যবার চারটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তিরুব্বায়মোড়ি, তিরুবিরতম তিরুবাসীরমম এবং পেরিয়তিরুব্বতাদি। এর পরেই ষাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হচ্ছেন পেরিয়াচ্যবার ও তাঁর কন্যা আন্ডাল বা কোদই। পেরিয়াচ্যবারের রচনার নাম তিরুম্পল্লাব্দ্য। আন্ডাল বা কোদই-কে সেট্ট বেরেসা বা মীরাবাই-এ-সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর রচিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ এ পর্বন্ত পাওয়া গেছে নাটিক্যার তিরুমোড়ি এবং তিরুম্পবই।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্যক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঘরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পুঁথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস ভ্রমরোজা অনাভম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পণ্ডিতগণের সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ ২

নতজানু, হে ঈশ্বর

বেশু দত্তরায়

আয়োজনগুলি পরিপূর্ণ। হে ঈশ্বর
আমি নতজানু। অসম্ভব ইচ্ছাগুলি
আমাকে দিয়েছিল—আমি সব
তোমার পায়ে কাছ প্রত্যর্পণ করেছি
তুমি ফিরিয়ে নিলে আমি খুশি হবো।

আজ দুই-তিন যুগ আমার জন্ম হয়েছে না
আমি কোলের কাছে প্রিয়তর বেহালাটিকে
নিরে শুনই—
কিন্তু তাতে হাত দিলেই শব্দ বিষাদ ব্যঞ্জে।

আমাকে নরকে ফিরিয়ে দাও
আগুনের লেলিহান জিহ্বাগুলি আমাকে
দংশন করুক, কীটে ছিদ্র করুক
আমার হাড়ের মধ্যে অভাবের বাজনা
বাজুক। আমি বোবা হ'লে গেছি।
ভীষণ ইচ্ছে করে চীৎকার করে উঠি।

এই অসম্ভব বিষমতার মধ্যে
সন্নাট হ'লে কী শব্দ! ধারাল ক্ষুরে
আমার কণ্ঠনালী ছিঁড়েছে ইচ্ছে করে।

ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি পরিচাভা—!

রাজকন্যা

বিনোদ বেরা

ভালোবাসার আতপ লাগে হঠাৎ দেহমনে—
বুকের মাঝে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা, তার
ঘুম ভাঙবে কিসে? চন্দ্র ওঠে হৃদয়গগনে—
ছাড়িয়ে পড়ে জলে-স্থলে সৌরভ জ্যোৎস্নার।

ঘুম ভাঙবে কিসে, আমার স্পর্শ জানা নেই,
ভীরু ছোঁয়ার যদি বা তার ঘুম ভাঙে, রাগ করে
কথা না কর, তখন তাকে বোঝান কিছতেই
সম্ভব হবে কি যাঁচি ভালোবাসায় মরে?

যাইরে রটে দুর্বোধের দারুণ হিম গলা—
সবুজ হিম ঘন ঘূমের প্রহরী আমি, জাগি
দৃশ্য পল মহুতের মোহিনী ছলা-কলা
জানতে চায় আমি কি তার ~~স্বপ্ন~~ ~~অনুভূতি~~।

দৃশ্য আমার ভালবাসার আগুনে গলে যায়
অসম্ভব উদারতার ওঠে হৃদয় দলে,
রয়েছি জেগে প্রতীকার আলোক সুসমার—
রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে বুকের পক্ষ্মকূলে।

আমাদের রচনার কিছু নিদর্শন এখানে
দেওয়া গেল :

শব্দ আজ নয়, সাত জন্ম ধরে
আমরা
গোবিন্দের দাসী। হে প্রিয়-
আমাদের কাছ অন্য সব প্রেম কেড়ে
নাও।

দ্বিতীয় পর্বের পঞ্চম আড়বার
কবির নাম হচ্ছে কুলশেখর—যিনি
দ্রিবাংকুরের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি
তার অত্যাগ্র বিকৃত্তির প্রেরণায় সিংহাসন
ত্যাগ করেছিলেন। তার রচনার সামান্য
একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

তারা (জাগতিক ব্যক্তিত্ব) আমার কাছে
পাগল ছাড়া কিছুই নয়—
আমিও তাদের কাছে তাই।
কিন্তু এ বিতর্কে লাভ কি?
হে কৃষ্ণ, রংগনাথ—
তোমায় পাবার জন্যই আমি পাগল।

পরবর্তী পর্বের আড়বার ভক্ত-
কবিদের মধ্যে তিরুপ্পান, গেন্ডরুড়ি-
ম্পাড়ি, তিরুমঙ্গাই, ইরুলাইনার প্রমুখের
গদ্যাবলী আজও তামিলভূমিতে

জনপ্রিয়। এঁরা ছাড়াও, আরও কয়েকজন
তামিল লেখকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
এঁদের মধ্যে কল্লাড়ম কাব্যের রচয়িতা
কল্লাড়ম, তামিল মহাভারতকাব্যক পেরুণ-
দেবনার, অভিধান রচয়িতা দিবাকরর ও তার
পুত্র ত্রিগড়র, পুদুচেরিগোপালভেনবামালই-
এর সম্পাদক আইয়র-অরিত্তনার, ও প্রখ্যাত
জৈন কবি বামনাচার্যর-এর নাম তামিল-
ভূমিতে প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

কম্বনের যুগ

তামিল সাহিত্যের পরবর্তী যুগটি
কম্বনের যুগ নামে খ্যাত, কেন না তামিল
কবিদের মধ্যে কম্বন একটি উচ্চ আসন
অধিকার করে আছেন। কথিত আছে
কম্বন অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়েছিলেন
কিন্তু নিজ প্রতিভার গুণে তিনি রাজা
কুলোত্তুঙ্গ চোলের সভাকবি হয়েছিলেন
এবং রাজ্যদেশে রামায়ণ অনুবাদ করেন।
অবশ্য কম্বনের রামায়ণ বাস্কীরায়ায়নের
আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং তা বাংলা
কৃষ্ণবাসী রামায়ণের মতই স্বতন্ত্র রচনা।
কম্বনের রামায়ণ আজও তামিলভূমিতে
বিশেষ জনপ্রিয়।

কম্বনের সমকালীন ছিলেন ওটুকুত্তন
এবং পুগলেন্দ্র। তিনজনের মধ্যে প্রতি-

স্বন্দিতাও ছিল রীতিমত। ওটুকুত্তন
রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি পুদুচেরি রচনা
করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও দুটি
কাব্যগ্রন্থ লিখে যশস্বী হয়েছিলেন—
একটির নাম তত্ত-বাস্পস্পরিণ, অপরটির
নাম মূবর-উল। পুগলেন্দ্রের প্রেরিত
কাব্য হচ্ছে নল-বেণবা, মহাভারতের নল-
দময়ন্তীর আখ্যান অবলম্বনে যা রচিত
হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে
তিনি আরও দুটি কাব্য লিখেছিলেন
অগ্নি-জরলানি এবং পবলজোদি। এ ছাড়া
কলম্বকম্ব নামে তার আরও একটি
কাব্যগ্রন্থ আছে। কম্বনের যুগে অম্বই
নামক জনৈক মহিলা কবিও প্রসিদ্ধিলাভ
করেছিলেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির
মধ্যে নম্বরকোবই, কলবিবল্লভকম্ব প্রভৃতি
উল্লেখযোগ্য।

খৃস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে
তামিলভাষায় শৈব সিংহাসন সাহিত্যের
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। এই সকল
গ্রন্থের মধ্যে সেকন্ড-রচিত শিবজ্ঞান-
বোধম এবং অরুচনন্দীর শিবজ্ঞানসিদ্ধির
তামিল শৈবমতের উপর প্রামাণ্য রচনা।
তাছাড়া উমাপতির শিবপ্রকাশম এবং
সকেন্দ্রপনিরাকরণর তামিলদেশীয় শৈব-
দর্শনের উপর মল্যাবান রচনা।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

স্মৃতিচয়ন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১১ জৈব ১১

এই সময় বরাবর অকস্মাৎ ভোম্বল বিলেতে চলে এলেন। ট্রেবোভার রোডেই উঠলেন। শুনলাম যে ব্যবস্থা হয়েছে তিনি অল্পক্ষণে একজন শিক্ষকের বাড়িতে তাঁর তত্ত্বাবধানেই থাকবেন ও ইংরেজী সাহিত্যটা ভাল করে পড়বেন এবং সেই সঙ্গে সুবিধে হলে ইতিহাস ও অর্থনীতির চর্চা করতে পারলে তো কথাই নেই। আমাদের সঙ্গে দিনকতক থেকে ভোম্বল চলে গেলেন সেই গৃহশিক্ষকের বাড়ি। ভোম্বলের মাসিক বরাদ্দ টাকাটা আমার ব্যাঙ্কে আমাবই নামে আসত। ভোম্বল ছিলেন বরাবরই খরচে। হাতে টাকা থাকলে এবং কেউ চাইলে—সে সত্যিকারের দুঃখই হোক, কি, নেহাৎ নছার হোক—সবকিছু টাকা তাকে দিবে দিতে ভোম্বলের এতটুকুও স্বীকাষ হতো না। মনের দয়া এবং দেবাব হাত ভোম্বলের সহজ স্বভাব ছিল। বোধহয় এটা তিনি তাঁর বাপের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। যাই হোক এজন্যে ভোম্বলকে আমি খুব হিসেব করে টাকা দিতাম এবং অনেক সময় নগদ টাকা না দিয়ে যে জিনিস তাঁর দরকার তা কিনে দিতাম। একবার বললেন—‘কাকা একটা প্রাণের ভাল টুপী কিনতে হবে। বোধহয় দু’পাউন্ড লাগবে। টাকাটা দাও না।’ টুপী তাঁর দরকার ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর হাতে দু’পাউন্ড নগদ দিলে বাড়ি থেকে দোকানে পোঁছবার আগেই হযত কাউকে দান করে দেবেন। তাই বললাম—‘চল যাই, টুপী দেখে আসি।’ দু’জনে দোকানে গেলাম। ভোম্বল একটি টুপী পছন্দ করে নিলেন এবং আমি দামটা দিয়ে দিলাম। টুপীটা যে বেশ উচ্চ-দরের দামী জিনিস ছিল তাতে ভুল নেই। ভাল জিনিসে ভোম্বলের সুস্বাদু ছিল নব্বদা। যাই হোক, আমি এই রকম সাবধানে টাকা দিতাম বলে সুখাংশু

আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন—‘পিতা পুত্রের আল কি বাজার হোলো?’ ভালা প্রহরী দেবদত্ত (গার্ডিং এজেন্ট) তিনি সংক্ষেপে গাজেন বলে ডাকতেন আমাকে।

ভোম্বল অল্পফোর্ড চলে যাবার মাস খানেক পর থেকেই দেখতাম ভোম্বল প্রায়ই লন্ডনে আসতেন এবং ফিরবার অব্যবহিত পূর্বে আমাদের বাড়ি এসে কে কেমন আছি জেনে এবং কিছু টাকা নিয়ে অল্পফোর্ড চলে যেতেন। এই অল্পফোর্ড ও লন্ডনে টানাগোড়েন করে এবং নাওয়া-খাওয়ার সমস্ত ঠিক না থাকার রাস্তার রেষ্টুরেটে সামান্য একটু টুক-টুকি খেয়ে ভোম্বলের শরীরটা বেশ খারাপই হতে লাগল। ভোম্বল ছিলেন লম্বা-চওড়া বৃদ্ধক। একটু খস-খসে মোটা বললেও অত্যন্ত হোতো না। সেই ভোম্বল যেন চুপসে গিয়ে রোগাই হয়ে গেলেন এবং তাঁর গালেও যেন টোল দেখা দিল। মাস ছয় পরে ভোম্বল লন্ডনে এসে বললেন—‘কাকা আমার বুকে মাকে মাকে ব্যথা করে।’ আমি তো প্রমাদ গণলাম। ছোট বয়সে ভোম্বলকে একবার শান্তিনিকেতনে পাঠান হয়েছিল রক্ত-চর্বাশ্রমে পড়বার জন্যে। অল্প কিছুদিন পরেই তার শরীর খারাপ হয়েছিল। ভাল ভাল ডাক্তার ঠেকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে ওর হৃদযন্ত্রটা বেড়ে গিয়েছে এবং তখনকার দিনের রক্তচর্বাশ্রমের কৃচ্ছসাধন ঠিক চলবে না। ভোম্বলের হৃদযন্ত্রের এই প্রাচীন ইতিহাসটা আমার জানা ছিল বলে আমি ঠিক স্বাস্থ্যের জন্যে বেশ একটু চিন্তানিবৃত্তই হয়ে পড়েছিলাম। স্থানীয় ডাক্তার পরামর্শ দিলেন একজন বিশেষজ্ঞকে দেখান দরকার। তিনি একজনের নামও দিলেন। সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে টেলিফোনে সময় ঠিক করে গেলাম তাঁর চেম্বারে লন্ডনের বিখ্যাত হার্লে স্ট্রীটে। ডাক্তারের নাম ভুলে গেছি। তিনি খুব বয়স করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন যে তখনো হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসে কোন ক্ষতির দাগ

পাওয়া যাচ্ছে না বটে তবে ঐর জীবনী-শক্তি (ভাইটালিটি) এত দুর্বল হওয়া পড়েছে যে সামনের শীতকালে ঠাণ্ডা বিলেতের মত স্যাংসেতে ঠান্ডা জ্বরগণ্য বাস করা বিপজ্জনক হবে। ডাক্তারটি বললেন যে, ঠিক দেশে ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সুখাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। দু’জনেই মনে করলাম যে বাড়িতে সবকিছু জানিয়ে খবর দেওয়া নিতান্তই কর্তব্য কেন না দৈব অঘটন কিছু ঘটলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। সুখাংশুকে বললাম দ্বিদিগির কাহ চিঠিতে সব কথা লিখে সুখাংশু যেন তাক্ক অনুরোধ জানান দাদাবাবু ও বৌঠানকে ব্যাপারটা বলতে। সুখাংশু দ্বিদিগিরক এর মধ্যে টেনে আনতে রাজী হলেন না এবং টিপ্পন্যী কেটে বললেন—‘তুই গাজেন থাকতে আমি কেন লিখতে যাব।’ ক করা যায়। অগত্যা আমিই বৌঠানকে ক দাদাবাবুকে মস্ত চিঠি লিখে ডাক্তারের মতামত জানিয়ে দিয়ে তাঁদের নির্দেশ চাইলাম। অচিরে তার এলো ভোম্বলকে দেশে পাঠিয়ে দিতে। ভোম্বল দেশে ফিরতে আপত্তি করলে তাঁকে আমরা কিছুতেই পাঠাতে পারতাম না, কেন না তিনি ত’ শিশু ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেশে ফিরতে কোন ওজরই করলেন না। এতেই বুকলাম যে তিনি নিজেই বৃদ্ধ-ছিলেন তাঁর শরীরের দুর্বলতার ক্যা। যাই হোক, অবিলম্বে জাহাজের টিকিট কিনে দিলাম। যাবার দিন গাড়িমসি কন্তে করতে স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল যে টোট ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। অব্যবহিত পরের ট্রেনে টিলবেরী ডকে গিয়ে জানলাম যে জাহাজটাও ছেড়ে গেছে। তবে সেখানকার লোকেরা বলল যে জাহাজটা টেমস্-এর মোহনার কাছে জোয়ারের জন্যে কন্নক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। সেখানে গিয়ে সেটাকে ধরা যেতে পারে। তদুদ্বিগি পাঁচ পাউন্ড দিয়ে একটি টেম্ভার অর্থ্যাৎ স্টীম

জগৎ জাতীর মালের নৌকো ভাড়া করে ছুটলাম জাহাজের পেছনে। জাহাজটা সত্যি সত্যি তখন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের টেন্ডারটা জাহাজের পাশে দাঁড়াতেই জাহাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল— ‘কি চাও?’ টেন্ডার থেকে আমাদের মাঝি চিৎকার করে জানাল যে জাহাজ ফেল করা এক বাতী এসেছে। বড় জাহাজটা থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দিতেই ভোল্ট তার মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠে গেলেন। আমরা খানিকটা অপেক্ষা করে সেই টেন্ডারেই ফিরলাম টিলবেরী ডকে। ভোল্ট জাহাজের ডেক থেকে হাতছানি দিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি নির্বিক্রে দেশে ফিরে বাড়ির আদরে বসে আসতে আসতে সেরে উঠলেন। আমি যে বৌঠানকে চিঠি লিখেছিলাম ভোল্টের অসুখের কথা জানিয়ে তা নিয়ে পরে শুনেছি, দেশে আমার নামে খুবই নিষ্ঠুর সমালোচনা হয়েছিল নানা রকমের এবং অনেক দিন ধরে। কত কথাই নাকি বলেছিল কত লোক। এই সমালোচনা বাবাকে পীড়া দিচ্ছিল এবং তারই ঝাঁক আমি খানিকটা পেতাম বাবার চিঠিতে। ভগবান জানেন, গাপ মনে সেই চিঠি লিখি নি। এবং আমার গভীর সঙ্কল্প এই ছিল যে এ সব সমালোচনার আমার উপর ভোল্টের যে ভালবাসা ছিল তাতে আঁচড় লাগে নি এতটুকুও। পিতা, পুত্র ও পাবিত্র্য প্রাণের ষোড়শটি বরাবরই অটুট ছিল।

২ চোম্প ২

ক্লাপ হ্যাম কমনের বাড়ি থেকে হেমতা যে বাড়িতে চল গিয়েছিলেন সেখানে পড়ার ছেলে কেউই ছিলেন না। সব ভাড়াটে-রাই ছিলেন চাকুরে। সুতরাং সেখানে পড়া-শুনার কোন আবহাওয়াই ছিল না। হেমতা মধ্যে মধ্যে আমাদের ট্রেনোভার রোডের বাড়ি এসে গল্প-গুজব করে যেতেন। পরে ঠিক হলো তিনি আমাদের বাড়ি উঠে আসবেন এবং আমরা দু’জনে একসঙ্গে পড়ব। হেমতা আমাদের বাড়ি আসার পর দেখা গেল যে বারের প্রাথমিক পরীক্ষার চারটির মধ্যে তিনটেতেই তিনি পাশ হয়ে গেছেন। বাকী ছিল হিন্দু ও মহামেডান ল এবং ফাইনাল। হেমতার মতলব ছিল ওই দুই বিষয়েই একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে দেওয়া। আমরাও ছিল ওই দুটো পরীক্ষা বাকী। আমি বললাম যে দুটো বিষয় একসঙ্গে তৈরি করা শক্ত হবে। একটা একটা করে শেষ করলে আধেরে ভাল হবে। শেষ পর্যন্ত হেমতা-ও আমার কথা মেনে নিলেন। আমরা দু’জনে তখন পড়া আরম্ভ করলাম হিন্দু ও মহামেডান ল।

সকালে দুপুরে বেশ পড়া হতো। কোন গোল হতো না। কিন্তু রাতে খাবার পর যখন নিচতলা থেকে গানের কিংবা ভাসের হর্ষধ্বনির রেশটুকু ভেসে আসত উপর-তলার ঘরে যেখানে আমরা পড়তাম তখন হেমতাকে আটকে রাখা হতো এক কঠিন ব্যাপার। তখন বাধ্য হয়ে বলতে হতো— “যাবে ত’ যাও, মর গিয়ে।” কিন্তু আমি তোমার জন্যে পড়া বন্ধ করে বসে থাকব না। আমি পড়েই যাব, তুমি পেছিয়ে থাকবে।” যেচরী কি কম চোখেই না চাইতেন আমার দিকে এবং কি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেই না বলতেন— “গাপিটা কি মজাই না লুটছে।” “গাপি” কথাটা সুধাংশু গুপ্তের পদবিটার অপভ্রংশ। আমি সঙ্কল্প দিতাম— “পরীক্ষার পর আমরাও ফুর্তি করব।” এই রকম করে বেশ কিছুদিন পরে আমরা দু’জনেই পরীক্ষা দিলাম। দু’জনেই পাশ করলাম। হেমতাকে পড়াটা বোঝাতে গিয়ে আমার পড়াটা বেশ পাকা রকমেরই হয়েছিল বলে আমি প্রথম শ্রেণীতেই পাশ করে দশ সিলিং ফিরে পেয়ে তাই দিয়ে আমরা তিনজনে মিলে ‘রোমান্স’ নাকি একটা নাটক দেখে এলাম।

সে আমলে বিলিভী থিয়েটারে অভিনয় দেখবার মত ছিল। যেমন ছিল স্টেজ সাজানর ধরণ তেমনি ছিল অভিনয়-কৌশল। তা ছাড়া জনসাধারণের মনোজ্ঞের চেষ্টা এক-একটা বই এক বছরেরও বেশি সমানে একনাগাড়ে চলতে দেখেছি। চু চিন চাউ বলে একটা নকসা বোধ হয় প্রায় তিন বছর পর্যন্ত চলেছিল। ‘রোমান্স’-ও চলেছিল বহুদিন। নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় তখন দেখেছি: স্যার ফোরব্‌স্‌ ও লেডি রবার্টসন, ম্যাথি-সন ল্যাং, জেরাল্ড ডু মরিয়ে, প্লাভিস্‌ কুপার ইত্যাদিকে নানা ভূমিকায় দেখেছি। কে কম্পটন বলে এক অভিনেত্রীর নামও মনে পড়ে। ১৯১৬ সালে বিলেতের থিয়েটার জগতে এক হৈ-হৈ কাণ্ড লেগে গিয়েছিল—শেক্সপীরের তিনশত বর্ষ পূর্তির আনুষ্ঠানিক উৎসব। স্ট্যাটফোর্ড অন এভনে বিস্তার আয়োজন হয়েছিল এবং জনসমাগমও হয়েছিল এত যে হোটেল জায়গাই হয় নি বহুলোকের ভাগ্যে। আমরা আর এদিকে যাই নি এ সব অসুবিধের জন্যে। লন্ডনেও অনেক আয়োজন হয়েছিল। যে থিয়েটারটাকে বলে “ওল্ড ভিক” সেখানে শেক্সপীরের অনেক নাটক নকসা মণ্ডল করা হয়েছিল। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল একটি অনুষ্ঠান। যে সব প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা শেক্সপীরের নাটকে নানা ভূমিকায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তখন যারা জীবিত ছিলেন তাঁদের

সবাইকে সেই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছিল। সেই সব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অভিনেতা ও অভিনেত্রী শেক্সপীরের যে যে নাটকের যে যে দৃশ্যের অভিনয়ে নাম করেছিলেন তারা সেই সেই দৃশ্য অভিনয় করলেন। সেই রাতে প্রথম ও শেষবারের মত দেখলাম বিশ্ববিখ্যাত এলেন টেরীকে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোরসিয়ার ভূমিকায় তিনি যৌবনে যে অভিনয় করেছিলেন সেই দৃশ্যটাই তিনি অভিনয় করলেন। বরেন্স খুবই বেশি হয়েছিল। চল সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার সেই পুরনো লাল-গাউন ও লাল টুপী পরেছিলেন। বিখ্যাত পোষাকটা বেশ টিলেটলা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়াতেও বোধ হয় একটু কষ্ট হচ্ছিল। তিনি একটা চেয়ারের পিঠটা ধরে দাঁড়িয়ে যখন সেই করুণা (mercy)-র লাইনগুলি বলে বেতে লাগলেন ক্ষণিকের মত তার মুখে-চোখে যেন বিদ্রোহ খেল গেল, গলায় যেন ফিরে এলো যৌবনের সেই হারান সুর। অপূর্ব লাগল। তারপর দেখলাম ম্যাথি-সন ল্যাং-এর সাইলকের ভূমিকায় অভিনয় “Hath not a jew...” বলে যখন তিনি নিজের বৃকের উপর তার দু’হাত মূর্ত্তা করে রাখলেন তখন সেই ভাঙ্গাটি তার বিখ্যাত পোষাক ও চোখে-চাহনীর সঙ্গে অভুলনীর বলে মনে হচ্ছিল। ১৯৫৩ সালে যখন একবার সম্প্রীক বিলেতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখনও দু’চারটে থিয়েটার দেখেছি। সে সব কিন্তু আগের মত লাগে নি। তবে সেটা আমার বিগত যৌবনের দোষ, না, অভিনয়-চাতুর্যের সত্যিকার অভাব তা বলতে পারি না।

৩ পনের ৩

গ্রীষ্মকালে ইংল্যান্ডের সব জায়গাই খুব মনোরম সুন্দর হয়ে ওঠে। শীতের সময় এভারগ্রীন গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছে পাতা বলে কিছু থাকে না। শীতের প্রারম্ভে সব পাতাগুলি হলদে হয়ে সারান দিন টুপ-টাপ পড়েই থাকে। এই হলদে পাতা যখন গাছে থাকে তখন দেখতে বেশ সুন্দর হয় এবং ইংরেজরা এ সব পাতাকে “অটম্‌ লীভস্‌” বলে এবং খুব ভালবাসে। যখন সব পাতাগুলি ঝরে পড়ে তখন গাছগুলি একেবারে নেড়া দেখায়। শীতের সময় বরফ পড়ে মাঠ-ঘাট যখন একেবারে সাদা হয়ে যায় তখন তার উপর এই সব গাছগুলি পরহীন ভালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছে-ডালেও অনেক সময় বরফ জমে যায়। তার পর শীতের প্রকোপটা কমে বসন্ত-সমাগমে নতুন পাতা যখন গজায় তখন বিচিত্র সৌন্দর্য বের হয়ে চোখ জড়িয়ে যায়।

সাপ্তাহিক বসুমতী

মাঠে বরফ গলে যাবার পর কাঁচ দু'বাব্দল দেখা দেয় সমস্ত উঁচু-নিচু ঢালু গাঠময়। বসন্তের বাহার ইংল্যান্ডে সভ্য-সভাই নয়নাভিরাম। এই সময়ে দিনগুলিও বেড়ে যায়। খেলাধুলা চলে শহরের ও গ্রামের পার্কে ও কমনে সন্ধ্যা সাত-আটটা পর্যন্ত। এই সময়ে ইংরেজরা খাবা পারে একবার কিছু না হোক অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে হলেও বাড়িরে আসে। যারা ভা-ও না পারে তারা আগস্ট মাসের ব্যাপক ছুটির দিন অন্তত বৈশিষ্যে পড়ে খুব ভোরবেলা থেকে। আমি যে তিন বছর বিলেতে ছিলাম সে সময় প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে কোন না কোনো জায়গায় বেড়াতে গিছি। প্রথম বছর কোন জায়গায় গিয়েছি এবং তারপর দু'বছর কোন কোন জায়গায় গিয়েছি তা ঠিক করে বলতে পারব না। স্মরণ-শক্তির ক্ষীণতাবশত জায়গাগুলি কাল-ক্রমান্বয়ে আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে।

একবার গিরোছিলাম মনে পড়ে ইলফ্রাবু'ব বলে সমুদ্রতীরে অরক্ষিত একটা ছোট্ট শহর। সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতীব সুন্দর। সমুদ্রের উপর উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ের প্রমত্তরগার। উপর থেকে কোনোবাকসে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। পারে হেঁটে বেড়াবার অনেক নির্জন অলি-গলি ছিল। সকালবেলা প্রাতরাশ সেরেই দল বেঁধে আমরা বেরিয়ে পড়তাম এবং তাজা বাতাসে বেরিয়ে এক পেট ক্ষিদে নিয়ে বাড়ি ফিরে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা পরম উপাদেয় লাগত। যেখানে যেখানে ছুটি কাটাতে লোকেরা যায় সে সব জায়গার ছোট ছোট হোটেল বা বোর্ডিংগলিতে খেতে দিত ভাল অর্থাৎ বৃন্দের মধ্যে যতটা ভাল হয় সেইমত। ইংরেজরা গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে সাঁতার কেটে স্নান করতে ভালবাসে। কিন্তু ইলফ্রাবু'ব-এ তেমন বালকাময় দিগন্ত বিস্তৃত তীরভূমি ছিল না। সেখানে ছিল একটি পাহাড় ঘেঁষা ছোট্ট "বে" অর্থাৎ বড়াকার ছোট্ট একফালি বালু তীর ঘর উপর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়িয়ে পড়ে আর ফিরে যায়। সেই "বে"-টুকুতেই অসংখ্য নবনারী, বালক-বালিকা নানা রঙে বিচিত্র সাঁতবেব কাপড় পরে যায় স্নান করতে। জলে পা দিতেই দেখি জল অসম্ভব ঠান্ডা, যেন কেটে কেটে যায় যেখানে লাগে। চোখ-কান বুজে উপড় হয়ে একটা ঢেউ খেয়ে নিতে ঠান্ডাটা কণ্ঠস্থ সহ্য হয়ে গেল। তারপর সমুদ্রের মধ্যে একটু দূর পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে খাওয়া শরীষটা একটু গরমও হয়ে উঠল। এমন সময় ফিরে দেখি সুধাংশুর মৃদু-চোখ কেমন যেন হয়ে গেছে এবং মনে হোলো যে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। আমাদের

দলের একজন মেয়ে খুব ভাল সাঁতার দিতে জানতেন। তিনি সুধাংশুর কাছাকাছিই ছিলেন। সুধাংশুর অবস্থা দেখামাত্র তিনি সবগে ঠুর কাছে গিয়ে ঠুর স্নানের কাপড়ের ঘাড়ের খারটা ধরে মাথাটা জলের উপর তুলে বেঁধে ঠেলতে ঠেলতে পারের দিকে নিয়ে চললেন। অস্প-ক্ষণ পরেই আমরাও গিয়ে পড়লাম এবং সবাই মিলে সুধাংশুকে ঠেলে পারের বালির উপর তুলে আনলাম। সুধাংশুর কালো মৃদু তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে সুধাংশু ধাতস্থ হোলো। পরে জানা গেল যে সমুদ্রের ঠান্ডা জলে কেমন যেন তাঁর পায়ের শির টেনে ধরেছিল। ঐ মেরেটি কাছে না থাকলে একটা অঘটনই ঘটে যেতে পারত।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা টেমস্ নদীর উপর স্টেন্স বলে ছোট্ট শহরে একটি আসবাবপত্র সমেত বাড়ি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া নিলাম। সমস্ত বন্দোবস্ত আমরা অত্যন্ত গোপনে গোপনে করে ফেললাম। ঠিক হোলো আমরা চারজন, হেমতা, অজিত, সুধাংশু ও আমি তিন সপ্তাহ অজ্ঞাতবাস করব। জানাজানি হয়ে গেলে বন্ধু-বান্ধবরা এসে যে শান্তিভঙ্গ করবেন সে আশঙ্কা খুবই ছিল। তার উপরে খাবারের ভাগে ঘাটতি পড়তে পারে। কাজ-কর্মগুলি একরকম ভাগ্যভাগি করে ফেলা গেল যোগ্যতা হিসেবে। মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জনের রান্না সম্বন্ধে খ্যাতি ছিল। তাঁর কিছু কিছু গুণ সুধাংশুতেও বর্তেছিল। হাজার হোক ভাগনে তা বটে। বাস্তবিকই সুধাংশু রন্ধনে দ্রোণদীবই মত গুণী ছিলেন। ঠিক হোলো যে সুধাংশু আমাদের চরবেলার খাবার তৈরি করবেন। হেমতা নিলেন বাইরের কাজ। অর্থাৎ হট-বাজার করা, খোপা বাড়িতে মথলা কাপড়ের গটরী ঘাড়ু করে বয়ে নিয়ে যাওয়াও হোলো তাঁর করণীয়। আমার অদৃষ্টে পড়ল রান্নাঘরের কাজ অর্থাৎ হাড়ি-কুড়ি, প্লেট, কাঁটা চামচ মাজা। বাকী সব কাজ দেওয়া গেল অজিত ধরকে। অর্থাৎ ঘর বাঁচ দেওয়া, বিছানা পাতা, ঝাড়-পোঁছ করা ইত্যাদি সব কাজই তাকে করতে হোলো। একটা পাণ্ট জাতীয় নৌকাও ঠিক করা হোলো। প্রথমে খুব সুন্দরভাবেই ছুটিটা সুন্দর হোলো। আঁত উপাদেয় দিশী রান্না সুধাংশু দু'পদর ও রাষ্ট্রের জন্যে বানিয়ে তুলতেন। সকালে বিকেলের জলযোগটাও ভোজ্য বললেই চলে। একঘেয়ে রোস্ট, মাংস, মটর বা খরগোসের স্টু ইত্যাদি বিলিভী রান্নার পর সুধাংশুর হাতের বেশ কাল কারী ও পরোটা লাগত যেন অমৃত। আলদ্র

চপটা-ও হোলো অপূর্ব। বিকেলে চায়ের পর আমরা সেই পাশ্বে করে টেমস্ নদীতে বোড়িয়ে আসতাম বেশ খানিকটা। টেমস্ নদীর দু'পাশে চালু পাড় দেখতে ছিল চমৎকার। অনেক বাড়ির পিছনেই থাকত ছোট একটি জোঁটেতে ছোট ডিঙি নৌকা বাঁধা। একদিন আমরা দু'পদ্রে খেতে বসবার তোড়জোড় করছি। সৌন্দ-কার রান্না কারীর গণ্ডে সমস্ত বাড়িটা যেন ঝ'ঝ' করছিল। এরকম চিত্তাকর্ষক গণ্ডে ক্ষিদে না হয়ে যায় না। সুধাংশু তখনো পরোটা ভাজছে। একেবারে আসল ঢাকাই পরোটা, কত পাংলা ছিল তার পরলগুণি। আমরা কখনো বসে পড়লাম আপন আপন চেয়ারে। এমন সময় জানালা দিয়ে দেখি বাড়ির নম্বর দেখে সেখা একটা কালো আদমী দাঁড়াল আমাদেরই সদর দরজার সামনে। নজর করে দেখা গেল আগন্তুকটি অচেনা নম্র, আমাদেরই বীরেন বিশ্বাস ওরফে বানি। সুধাংশু তার বেন ক্রান্তিতে ভরে গিয়ে-ছিল। বেশ বোকা গেল যে, বৈচারা প্রায় কঠিফাটা রোদে আমাদের বাড়ি খুঁজে খুঁজে ঘুরে মরেছেন অনেকটা পথ। চপ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকলে হয়ত তিনি আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শেষে নিরাশ হয়ে এক পেট ক্ষিদে নিয়ে ফিরে যেতেন। মায়ী হোল আমাদের সবাইয়ের মনে। দরজাটা খুলতেই তাঁর সে কি দম্ভাবিস্ময়িত হাসি। সোজা ঘরে ঢুকে টপটী রেখে খাবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। এক প্লাস জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হলে আমরা সম্মুখে জিজ্ঞাসা করলাম কি করে আমাদের ঠিকানা তিনি পেলেন। কিছুতেই সে কথাটা ভাঙলেন না। বললেন যে, মোটামুটি আঁচ করেই এসেছেন। কি আর করা যায়। অজিত আর একটা প্লেট লাগিয়ে জায়গা করে দিলেন। সে-দিনকার ডিমের কাবী আর ঢাকাই পরোটা যে কি অপূর্ব হয়েছিল তা বলবার নয়। মুখে যেন লেগে রয়েছে। সুধাংশু আমি ও অজিত বাঙাল এবং কাল খাওয়ার আমাদের অভোসই ছিল। হেমতাব কাজ খাওয়াটা এর মধ্যে বেশ রপ্ত হয়ে গিয়ে-ছিল। কিন্তু বানি মসমসিং-এর লোক হলে কি হয়, তিনি তেমন কাল খেতে পারতেন না। কিন্তু কাবীটা সৌন্দিন এন্ত সুস্বাদু হয়েছিল যে, বানির চোখে জল করে পড়া সত্ত্বেও তিনি খেয়েই চললেন। খাওয়া শেষ করে বললেন যে, এর পরে কালটা একটু কম দিলেই ভাল হবে। হেমতা সূর করে জ্বাব দিলেন, "কেন, তোমার সুবিধের জন্যে বৃদ্ধি? সে আর হবে না। কালের মাত্রা কিছুতেই কমায় হবে না। কোনো ফল হয় নি, কেন না

ধানি এর পরেও দু'বার এসেছিলেন আমাদের রসভর্ণা করতে এবং তাঁর কাছ থেকে হাদিস পেয়ে সুধীন্দ্র দাশ এবং সুধাংশুর এক বন্ধু যাপ রায়ও একবার করে কারী পরোটা খেয়ে গেছেন। এসব অত্যাচার সত্ত্বেও সেবার স্টেন্স-এ ছুটিটা বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়েই কেটে গিয়েছিল।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় অবস্থিত কন'ওয়ারলের ছোট্ট শহর নিউকীতে একটা ছুটিতে গিয়েছিলাম। শহরের দক্ষিণে ছিল ইংলিস চ্যানেলের মোহনা আর পশ্চিম দিকে ছিল দিগন্ত-বিস্তৃত এ্যাটলান্টিক মহাসাগর। সেবার আমরা মোটর বাসে করে ডেভন ও কন'ওয়ারলটা বেশ ঘুরে দেখেছিলাম। ডেভনে একটা নাম করা ফলের বাগান আছে যাকে বলে ট্রুরো বাগান। এর চাষা পড়েছিলাম ওয়েসেস্ট নভেল সারিঞ্জের রচয়িতা টমাস হার্ডির কি একটা নভেলে। ট্রুরোর বাগানের বর্ণনাটা এমন ভালো লেগেছিল যে, গিয়েছিলাম মোটর বাসে সেই বাগানটা দেখতে। চমৎকার সাজান বাগান। দু'ধারে বেশ ট'চু পাকা ধরণের মাচার মাকুখান দিয়ে রো সড় পায়ে হাঁটা রাস্তা। মাচার উপরে টকটকে লাল রাস্পবেরি ও স্ট্রবেরি থোকা থোকা ঝুলছে দেখলাম। সেখানে একটা চা খাবার জায়গাও আছে। আমরা যেদিন বাই সেদিন চমৎকার শুকনো দিন ছিল। আমরা বেশ করে ঘুরে বেড়িয়ে নিয়ে সেখানে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। বসবার জন্যে বেত না উইকার চেয়ার বাগানে একটা টেবিলের চারিদিকে পেতে দিল। খেতে দিল দুগান থেকে সদ্যতোলা গাছপাকা রাস্প-প'রি ও ডেভর ক্রীম পর্বন্ত পরিমাণে। এই ফল ও ক্রীম যে খেয়েছে একবার সে ক্ষয় ভুলবে না কখনো। এই ছুটিটাও দ্রুত দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

II ষোল II

এই নিউকী বেডানর পর সুরু হোল আমার ফাইন্যাল বার পরীক্ষার প্রস্তুতি-পর্ব। হেমতা ও আমি দু'জনে মাথা গুঁজে পড়তে লেগে গেলাম। আমি ঠিক করলাম যে প্রথমে বার ফাইন্যাল দিয়ে তারপর আবার ফিরে ফিরতি পড়াটা খালিয়ে নিয়ে এল এল বি ফাইন্যাল পরীক্ষা দেব। অর্থাৎ বার ফাইন্যালটা আমার হবে এল এল বি পরীক্ষার ফাইন্যালের ড্রেস রিহার্সেল। উদ্দেশ্য ছিল যে, এল এল বি পরীক্ষার খুব ভাল করে পাশ করতে হবে। হেমতার সঙ্গে

পড়তাম না, যেন আমি তাঁর কাছে কলেজের মাস্টারদের মত বক্তৃতা দিতাম। হেমতার সঙ্গে পড়ায় আমার খুবই উপকার হয়েছিল। দু'জনে একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম। যেদিন সকালে টাইমস কাগজে ফল বেরুবে তার আগের রাতে হেমতার মনটা উচাটন হওয়ায় তিনি গুঁজতে গুঁজতে আমার বিছানায় ঢুকে পড়লেন এবং সারাটি রাত নিজেও ঘুমলেন না, আমাকেও ঘুমতে দিলেন না। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকেই পাশ ফিরতে ফিরতে বলেন, “সুধী, তুমি ভাই, বলছ বটে কিন্তু আমে ঠিক ফেল হবে।” আশ্বাস দিয়ে বললাম, “ভাবছ কেন? ঠিক পাশ হয়ে যাবে।” তবু তার মন মানে না। অল্প পরেই বলে উঠল, “পাশ হতেই পারে না। কেমন করে হবে?” আমি আবার বললাম, “হ্যাঁ আলবাব হবে, নিশ্চয়ই হবে পাশ।” এই রকম করে চলল সারাটা রাত। শেষে হতাশ হয়ে বললাম, “ফেল যদি হবেই তবে আজকে ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। কাল থেকে রাত জেগে পোড়োখন।” তখন বলেন, “সুধী, তুমি বলছ আমি পাশ হবে!” শেষবারের মত বললাম, “হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হবে, হবে, হবে।” বোধ হয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে কিংবা নেহাৎ ক্লান্ত হয়ে বেচারী ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলায় দরজার টোকা মেরে টাইমস কাগজটা হাতে নিয়ে টার্নার গিম্নী ঘরে ঢুকেই—“ও আমার ছেলেরা, তোমাদের আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুপ্রভাত!” হেমতার মুখে তখন হাসি ঢেউ খেলিয়ে চলল এক গাল থেকে আর এক গাল। “বাপস” বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুড় সুড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। আমি আর একজন ছেলের সঙ্গে একযোগে প্রথম হেরেছিলাম স্বিতীয় শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীতে কেউই ছিলেন না। বার ফাইন্যালে প্রথম শ্রেণী পেলেই পঞ্চাশ পাউন্ড প্রাইজ পাওয়া যেত। সেই রুলটা যাতে চাফ না হয়, তাই জন্যে কি আমরা দু'জন প্রথম শ্রেণী পেলাম না? সে কথার জবাব কে বলবে। এইখানে বলে রাখি যে সেই যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী বোধ হয় কাউকেই বার ফাইন্যালে দেওয়া হয় নি। হেমতা পাশ করে বেশ কয়েকদিন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে বারে কন্ড হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। দেশে নাম করা ব্যারিস্টার শৈলেন সেনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ফৌজদারী প্র্যাকটিস করে হেমতা কলকাতার একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে কিছুদিন অবসর জীবন উপভোগ করার পর মারা গেছেন। এরকম

অমায়িক, শূন্যানুধ্যায়ী বন্ধু বিরল এ সংসারে।

অন্তঃপুর আমি আপন মনে নিবিস্ট-চিন্তে এল এল বি ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। সুধাংশুও সেবার প্রার্থীক এল এল বি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। দু'জনেই পরীক্ষা দিলাম। মনে হোল পরীক্ষাটা ভালই হয়েছে। খালি একুইটি পরীক্ষার প্রশ্ন-গুলি এত সহজ মনে হয়েছিল এবং তার জবাব এমন সংক্ষেপে দিয়েছিলাম যে, মনে সন্দেহ হয়েছিল বুঝি বা প্রশ্ন-গুলির তাৎপর্যই বুঝতে পারি নি। এই জন্যে মনের ভেতরটাতে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এই শেষ পরীক্ষার প্রথম শ্রেণী পেলে কলকাতা ল' কলেজে একটা চাকরী পাওয়া যাবে এবং তা হলে প্র্যাকটিসের জন্যে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা সম্ভব হবে। সুধাংশু গম্ভীর-ভাবে মন্তব্য করলেন, “যা হবাব হবে। ভাবিছিস কেন? ভেবে মরলে ত' ফলটার উন্নতি হবে না?” খাঁটি কথা, কিন্তু মন মানে কই।

দু'নলাম যে, অমুক তারিখে সকালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের হলটায় আমাদের পরীক্ষার ফলাফল টাঙিয়ে দেবে। প্রাতরাশ সমাধা হতেই সুধাংশু হুকুম করলেন, “ওঠ, চল! গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি দাঁড়াল।” আমি বললাম, “না ভাই, আমি যাব না। তুই একাই যা। আমার ফলটাও দেখে আসিস।” সুধাংশু মৃদু কামটা দিয়ে কক্ষের দিকে উঠলেন, “নে, নাকামো করিস নে। চল, বর্জাছ।” উঠে পড়লাম। দু'জনে গিয়ে হাজির হলাম সেনেট হলের সামনে। বাপরে, ধাপে ধাপে কতগুলি চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে! তার ওপারে নোটিশ বোর্ডে কি লেখা আছে কে জানে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুধাংশু “ন্যাক্স” কথাটা উচ্চারণ করে লাফিয়ে লাফিয়ে একাই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। হলের ভিতরে ঢুকে আর যেন বেরোয় না। আমার বুকের মধ্যে খড়াস খড়াস আওয়াজটা যেন কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। অল্পক্ষণ পরে সুধাংশু বোরবে এসে সবচেয়ে উপরের ধাপ থেকে একগাল হেসে চোঁচিয়ে বললেন, “ওরে, আমি পাশ হয়ে গেছি।” বলেই চুপ। আমার কি হলো তা আর বললেন না। তখন মনের সমস্ত জ্বোর সঞ্চয় করে আমি খালি দু'টি কথা বের করলাম, “আর আমি?” তখন তিনি বললেন, “তুইও পাশ হয়েছিস।” তখনো বলে নি যে আমি

সাপ্তাহিক বসুধাতী

অনার্স পেয়েছি কি না এবং পেয়ে থাকলে কোন ক্লাশ পেয়েছি। যাই হোক, পাশ হবেই জেনে মানের বিহীনতা খানিকটা কমে যাওয়ার ভবিতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হলে ঢুকলাম। পাশেব তালিকাটাতে দেখলাম যে, কেবল আমিই প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছি। প্রবোধ ঘোষও অনার্স পেয়েছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেটা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। আরামেব নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। হল থেকে বেব হয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে আবার ফিবে হলের মধ্যে গেলাম। কে জানে কোনো ভুল যদি হয়ে থাকে। আবার দেখলাম তালিকাটা। না, ভুল ত' হয় নি। হস্টাটবে সন্ধ্যাশুধু সপ্তাহ হাত মিলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। রাস্তা দিয়ে একটা ট্যান্ডী ব্যাটল দেখে সন্ধ্যাশুধু তাকে হাত বাড়িয়ে থামলেন এবং আমাকে প্রায় টেনে তার মধ্যে তুলে নিলেন। বাড়ির ঠিকানা দিতে ট্যান্ডী রওনা হলো আল'স কোর্টের দিকে। পথে একটা ডাকঘরের সামনে ট্যান্ডীটা দাঁড় করিয়ে সন্ধ্যাশুধু আমাকে নিবে সেখানে ঢুকে বসে করে একটা কেবল লিখে দিলেন সন্ধ্যাশুধু নামে। বসত ঘর মনে আছে লিখে ছিলেন, "পাশড' সলিটারী ফার্স্ট ক্লাস।" হাতে ভুড়ি দিয়ে বললেন টাকাটা দে। মন্তমুখের মত বা চাইলেন দিয়ে দিলাম। নৌরয়ে এসে আবার ট্যান্ডীতে কবে টেবোভার রোডেব বাড়ি পে'ছিলাম। এতক্ষণে আমার সর্নিবত ফিবে এসেছে কিহুটা। ট্যান্ডী থেকে নেমেই আবার সেই ভুড়ি জেবে সন্ধ্যাশুধু হস্তম দিলেন, "ভাড়াটা দিয়ে দে।" আমি তখন আপত্তি জানালাম, "আমি দেব কেন? ট্যান্ডী খরাল তুই, আর ভাড়া দেব আমি? মজা মন্দ নয়।" বাড়ির সদর দরজার সামনের সিঁড়িবে এক ধাপ উঠে ফিরে তাকিয়ে সন্ধ্যাশুধু বললেন, "লজ্জা করে না। ফার্স্ট ক্লাশ গেলি। আর ট্যান্ডী ভাড়া দিবি নে? তুই ত' ফোকটে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিস। যা দিয়ে দে ভাড়াটা।" বলেই সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ওদিকে ট্যান্ডীওয়ালাটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিঃশব্দে টাকাটা দিয়ে দিলাম।

লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে বা ইন্স অব কোর্টে যে সব মাস্টারদের কাছে পড়েছি তাঁদের কার, কার কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। রৈমান ল' পড়াতেব বৃন্দ ডাঃ মিউরিসন, যিনি ছিলেন ইউনিভারসিটি কলেজের ল' ফ্যাকালটির ডীন এবং যার কথা আগেই বলেছি। ডাঃ হিবার্ট পড়াতেব জুডিস প্রডেন্স। ইনিই প্রবোধ ঘোষের নামটা "মিঃ সিগনুস" বলে ডেকে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন।

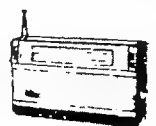
কনস্টিটিউশানাল ল' পড়েছি বিখ্যাত প্রফেসর খোদ জন মর্গেন সাহেবের কাছে। তখনকার দিনে তিনি যে ঐ আইনের শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আইরিস স্বাধীনতা নেতা স্যাব রোজার কেসসেন্ট এবটা জার্মান সাবমেরিন থেকে ছোট এবটা ডিঙি কবে অরুলাণ্ডে নেমেছিলেন সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ কতৃপক্ষ আগে থেকেই খবর পেয়ে তাঁকে ধববার জন্মে ওং পেতে ছিল। স্যাব রোজার কেসসেন্ট ধরা পড়লেন এবং তাঁকে ট্রিজন অর্থাৎ রাজদ্রোহের অভিযোগে আদালতে আসামী করা হলে। সেই কোর্টে বসে ছিলেন তখনকার দিনে ইংল্যান্ডের চীফ জাস্টিস লর্ড রেডিং। তাঁর সঙ্গে আরো এক বা দুইজন বিচারকও বসেছিলেন। স্যাব রোজারের পক্ষে কৌশলী দাঁড়ালেন আইরিস বারের নামকরা নেতা সাজেন্ট ও সালিভ্যান ও আরো অনেকজন ছোট কৌশলী। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের প্রফেসর জন মর্গেন। স্যাব রোজারকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বহু প্রাচীন একটা প্রায়-ভুলে-যাওয়া আইনের কোন একটা ধারায়। কনস্টিটিউশানাল ল'-এব খুব গুঢ় তর্কবিতর্ক উঠেছিল। রাজাব বাজছেব বাইরে অর্থাৎ জার্মানীতে বসে রাজদ্রোহের শুভবন্দ কবলে ব্রিটিশ রাজ্যের আদালতে ট্রিজন চার্জ কবা চলে কি না—এই ছিল একটা প্রশ্ন। মর্গেন সাহেব প্রতি সন্ধ্যায এসে আমাদের শোনাতেন সেদিন কোর্টে কি সওয়াল জবাব হলো। মর্গেন সাহেব বেশ সৌখীন মানুষ ছিলেন। ফিটফাট ছিল তাঁর পোষাক এবং শীতকালে জুতার উপরে একটা চামড়ার কি ফেলটের স্প্যাট পরে পা দুটোকে গরম রাখতেন। ক্লাশে বসুতা দিতে দিতে গবম দুধ খেতেন বলে মনে পড়ে। ইন্স অব কোর্টে একুইটি পড়াতেব নাম করা অধ্যাপক শ্রুহাস সাহেব। ছাত্র-দেব পড়াবার ধবণ ছিল তাঁর খুব চমৎকার। তিনি ক্লাশেব কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে লিখে বিষয়টা বুঝিয়ে দিতেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ কবতেন এবং আমাকে যে একাটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তা আমার খুবই বরণীয় সম্পদ। হিন্দু ও মহামেডান ল' পড়াতেব অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস এবং সিম্বুদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার ওনীল সাহেব। একজন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট জজ আমেদ সাহেব অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন বি সি এল পড়তে। তিনি মাঝে মাঝে ইন্স অব কোর্টে ওনীল সাহেবের ক্লাশে আসতেন। এক এক সময়ে এই আমেদ সাহেব বেশ গোল বাঁধিয়ে

দিতেন। ওনীল সাহেব তাঁর পুত্রকে যেটুকু জানা ছিল তাই বলতেন ক্লাশে। আমেদ সাহেব উঠে পড়তেন এবং বলতেন, "স্যাব, আপনি যে কথাটা বলছেন সেরে" ছিল যে কেসের ভিত্তিবে উপরে সে কেসের উল্লেখ গেছে পবেব এবটা হাইকোর্টে সিদ্ধান্তে। আমি এবটা কোনেব কিনা কবতে গিয়ে এই পবেব কেসটাতে অনুসরণ করেছিলাম। আমার বামের কপটা ধাক্কা আপনাকে দেখাতাম। তিনি যে ছাত্র ছিলেন সে কথাটা মাস্টার ও ট্রান্স শ্রুত ছেলেদের জানিয়ে দিবে আমি জানে। বেশ আনুপ্রসাদ লাভ কবতেন। আমি পরে এল এল বি-তে প্রথম হাফিল করে দেখে তিনি আমাকে গবেষণা মাস্টার জিজ্ঞাস করতেন আমি কি কি বই পড়তাম।

আমার বারে কল হওয়া শুরুই হয় গিয়েছিল। এল এল বি পড়াবার বারের হতেই বাড়ি ফেরাব তোড়জোড় শুরু করলাম। অল্প কদিন পরেই ফরাসি ও উনিশ শ' আঠার সালের এগাবই নভেম্বর খবরের কাগজে বেবহোল যুদ্ধ বিবরণী অভাবনীয় খবর। সেইদিনই বোমা এগ বটাব সময় চন্ডিপুর জই হলে। ইংল্যান্ড ও মিরগোষ্ঠীর জঘতবতার পত্র গেল। ইংল্যান্ডের ছেলে বড়, পুরুষ মেয়েরা সবাই যেন আনন্দে উন্মাদ হয়ে পড়ল। রাস্তায় দলে দলে নন্দাবর ভিড়। ট্রাফালগার স্কোয়ারে লন্ডনের সমস্ত পাক, কমলে সেদিন দাত ধবন্তি করে ছেলে বড়োদের সে নন্দা বহর। কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ ইউনিভার্সিটি জ্যাকব ছোট বড় পতাকা উত্তল প্রতিট দোকানে ও গহচ্ছাদ। এইবারে উন্মাদনা জীবনে কখনো চতে দেখি নি। ইংরেজদের চাবিত্রের দৃঢ়তা, ঐশ্বর্য এবং একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি জব্বব হো। এই বিজয়-সম্মান তাদের সত্যই প্রপ্যা ছিল সর্বাধিক থেকেই। সেদিন থেকেই রাস্তার বাতিব কাচগনিব চন্দ্রা সুরু হলো। রমে রমে বসন্তয আনন্দ দেখা গেল। বড় ছোট লোকপত্রের সামনের জানালা তাঁর অলংকার স্বলমলিয়ে উঠল। আমি বিলেতে ভ্রমণ

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

২৫৫ টাকা মূল্যেব ও
ব্যাণ্ড অল-ওয়ান্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টার
"এসকট" মাসিক ২৫



টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।

Japan Agencies (BW-7)
Post Box 1194, Delhi-C.

সাহিত্যিক বসুধা

পর থেকে এই যুদ্ধাবসারের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত লন্ডন শহরের আলোর বাহার দেখিই নি। আমি লন্ডন ছাড়বার আগে সব বাস্তবগুলির আলকাতরা পুরাপুরিভাবে পরিষ্কার করা হয়ে ওঠে নি।

বুধ থেকে শাওয়ায় জাহাজের টিকিটের চাহিদা বেড়ে গেল। জাহাজই পাওয়া যায় না। নাম লিখিয়ে হা পিতোশ করে বসে থাকতে হবে। আমার বরাতটা সরাবরই সদর দেখেছি। হঠাৎ আমার শ্যাক্স প্রিন্সডলে কোম্পানি থেকে খবর পেলাম যে, গ্র্যাংকার লাইনের ছোট একটি জাহাজ নাকি নভেম্বর মাসের শেষের দিকেই ছাড়বে লিভারপুল থেকে। যদি বাই, তবে অবিলম্বে টিকিট কিনতে হবে। এর আবার সমস্যা কি? বাড়ি যেতে পারলেই হলো। জাহাজ ছোট হলেই স্বাক্ষরিত কি? যুদ্ধ ভ' থেকেই গেছে। স্কটল্যান্ড ডুবো জাহাজের হামলার ভয় আর নেই। খালি ভয় ডাসমান আশ্রয়-খনির (ফ্লোটিং মাইন)। যা থাকে বরাত—রাখে কুঁচ মারে কে। চলে গেলাম ব্যাংকে। টিকিট কেনা হলো। নেহাৎ কপাল গুণে জাহাজ পাওয়া গেল স্ট্রীমারে। আমার সত্যীর্থ প্রবোধ ঘোষকে প্রায় চার মাস বসে বসে জাহাজে জাহাজ পাবার দিন গুণতে হয়েছিল।

চললাম ট্রেন করে লিভারপুল শহরের দিকে। স্টেশনে পৌঁছলাম রাত্রিতে। উঠেছিলাম বোধ হয় লিভারপুল ডকের কাছাকাছি একটা অত্যন্ত সাধারণ হোটেলে। সকালে উঠেই গেলাম জাহাজ-ঘাটার দিকে। রাস্তাটা ছিল বড় বড় পাথরে বাঁধান, যেমন দেখা যায় কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডে। গাড়িটা যেন লাফাতে লাফাতে লম্বা চলে। ঘাটের কাছে নেমে একজন কুলি দিয়ে মালগুলো নিয়ে ছাড়পত্র দেখিয়ে বেড়ার ভেতরে ঢুকে গেলাম। জাহাজে উঠে দেখলাম জাহাজটা খুবই ছোট, হাজার তিনচার টনের জাহাজ। কেমন না জানি দুলবে। কিন্তু ভাবনা করে লাভ ছিল না। মোটা ভেঁপু বাড়িয়ে জাহাজটা মোড় ঘুরে চলতে লাগল। ডেকে একটি ভারতীয় দেখলাম। তিনি আমার জানা—পরেণ গুপ্ত। শুনছিলাম যে তিনি তখনই কলকাতা করপোরেশনের জলকলের বিভাগে বেশ উচ্চপদ পেয়েছেন। পরেণ গুপ্ত খুব গম্ভীর মানুষ। কথা বলতে একে একে সময়ে জিভের একটু জড়তা লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু যখন গান করতেন তখন সে জড়তার লেশও থাকত না। আর পরেণ গান করতেন খুব সুন্দর। বিলেতে রবিবারে রবিবারে নির্মল সেন মশায়ের পবিচালনার যে উপাসনা হতো তাতে পরেণ প্রায়ই গান করতেন। তাকে

জাহাজের ডেকে দেখে আমার মনটা বেশ খুশিতেই ভরে গেল। ভাবলাম ডেকের কোন নিরিবিলি কোণার বসে পরেশের অনেক গান শুনবে নব-মানুষ ভাবে এক হয় আর। জাহাজটা নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রে যেই পড়ল ডেকে আর পরেশের কোন পাতাই পাওয়া গেল না। খোঁজ করে গেলাম তাঁর কেবিনে। দেখলাম বিছানায় কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে তিনি গানছিলেন। ব্যাপার কি? তাকে সামুদ্রিক পীড়ার পেয়ে বসেছে। আমাকে দেখেই কান্ডারকণ্ঠে শ্রদ্ধালেন, “একি, সুধীরজন, তুমি শোও নি এখনো?” আমি জবাব দিলাম, “শোব কেন হে? আমার বমিটাই হয় না।” “তুমি কি সৌভাগ্যবান” বলে পরেশ পাশ ফিরে উপড় হয়ে খানিকটা জল বমি করে ফেললেন। বুঝলাম যে তাঁকে উঠিয়ে উপরের ডেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা পণ্ডিত্য হবে। ভার্য সেই লিভারপুলের নদী থেকে সমুদ্রে পড়ে সেই যে শুলেন গারোখান করলেন একেবারে এডেনে পৌঁছে। পথে জিহ্বালটার এবং পোর্ট সৈরদেও তিনি আপন কেবিনে অজ্ঞাতবাসই কবেছিলেন। একদিনের জন্যেও তিনি খাবার ঘরে গিষে বা ঘরে খাবার আনিষে যেতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গের মহেশ্বরদির মানুষ, খুঁজে খুঁজে জাহাজের চটগ্রামের মঙ্গলমান খালাসীদের ডাকিয়ে এনে তাদের মোটা চালের ভাতের সঙ্গে অল্প একটু শর্টকি মাছের ঝাল তরকারী দিয়ে কোনমতে প্রাণধারণ কবতেন। ঐ শর্টকি মাছে ব্গম্ভটায় নাকি বমিটা একটু দমনে থাকত।

বাড়ি ফেরার পথে জাহাজে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নি। আমরা অবশেষে ২৯শে ডিসেম্বর সকালে বন্দে বন্দবে নোঙর ফেললাম। জাহাজ থেকে নেমে কাস্টমস খোঁয়াড় থেকে বেরিয়েই দেখি সেই ইন্দুরের মার ছেলে ইন্দুর এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করে নিতে। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেশী শাওয়া খেয়ে দুখটা যেন জড়ল। অনেক গল্প হলো। আমার বোন খুকী নাকি কিছুদিন বন্দে না পুনায় ছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। উপেনবাবু তখন ফৌজের অস্থায়ী কমিশনপ্রাপ্ত ক্যান্টন পর্ষদের ডাক্তার। ইন্দুর বললেন খুকীর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে হয়েছে। দুটি সন্তানই নাকি রেশ গোলগাল মোটা-সোটা। নিজের বাঁ হাতটা দেখিয়ে হেসে ইন্দুর বললেন যে তাঁর ডেনাটা কনই পর্বত নাকি খুকীর মেবেব ভাবে বাখা হয়ে গিয়েছিল। আমার তখন ভাঙ্গেন-ভাঙ্গীকে দেখবার খবর জোর ইচ্ছা হলো। বিকেলের দিকে ইন্দুরের সঙ্গে বন্দের সমুদ্রতীরে বেশ খানিকটা বৌড়িয়ে এলাম। সমুদ্রের পরেই

খাওয়া-দাওয়া করে বোধ হয় ভিক্টোরিয়া টেরমিনাসে বন্দে মেল ধরে বাড়ির দিকে ছুটলাম। দুটো দিন নানা ভাবনায় দেখতে দেখতে কেটে গেল। হাওয়া স্টোনে অভ্যর্থনাটা কেমন হবে তা মনে মনে ভাবতে লাগলাম। হাওয়া হোক লন্ডনের প্রথম শ্রেণীর এল-এল-বি তো বটে ঐ! তাঁর উপরে আবার ব্যারিস্টার। বাড়িতে এবং ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে যে পাশা পড়াগা যাবে তাতে সন্দেহ ছিল না মনে মনে।

বেশ রাত্রিতে হাওয়া স্টেশনে নামলাম। বাবা, মা, নন্দু, বুধা, বড়ি সবাই উদ্ভাবিত হয়ে চেয়ে আছেন। বোধ হয় সুধীর, সোনা, ভোম্বল ও বেবীও এসেছিলেন স্টেশনে। সোনার তখন সুধীরের সঙ্গে ফিরে হয়ে গেছে। নেমে বাবা মাঝে প্রণাম করলাম। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রইলেন অলক্ষণ। ভাই বোন ও সোনা ভোম্বল বেবীরা আমাকে স্বাগত জানালেন। সবাইকে বখাযোগ্য সম্ভাষণ জানালাম। তারপর মালপত্র নিয়ে ভাই বোনরা বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি বাবা মায়ের সঙ্গে সোজা স্টেশন থেকে কালী-মোহন আলবে গেলাম দাদাবাবু ও বৌঠানকে প্রণাম করতে। সে রাত্রিতে কত গল্পই না হবোছিল বৌঠানের সঙ্গে। আমি আই-সি-এস না পড়ার জন্যে মায়-বতী বাবার পথে দাদাবাবুর বিরক্তি, বৌঠানের মধ্যস্থতা, বুঝুকে আমার চিঠি লেখা ইত্যাদি কত রকম গল্প-গাছা। দাদাবাবু বললেন—“প্রমটাকে দিন-কতক জ্বিয়ে রেখে কাজে মন দে।” বৌঠান আজ পর্যন্তও এই কথাটা আমাকে বলে খুব হাসাহাসি করেন। কত রণরস হলো সোনা ভোম্বল ও বেবীর সঙ্গে। ভোম্বলের সেই উচ্ছ্বাসিত প্রাণখোলা হানিতে মুগ্ধিত হয়ে উঠেছিল রাত্রিটা। আমি তাঁর মাঝের কাছে তাঁর অসুখের কথা লেখার তাকে যে বিলেত ছেড়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁর জন্যে তাঁর কথাবার্তার তাঁর মনের এতটুকুও বিকার দেখলাম না। মনটা খুবই হাল্কা হয়ে গেল। রাত দুপুর বেজে গেল দেখে আমরা উঠে পড়লাম। আবার দাদাবাবু ও বৌঠানকে প্রণাম করে চলে এলাম নিম্বেদের বাড়ি ১৪নং মল্লিক লেনে। শেষ হলো আমার লেখাপড়ার পালা। ইংরেজী হিসেব মতে তখন এসে গেছে ১লা জানুয়ারী ১৯১১। বুড়ির জন্মদিন।

[কসম]

আমিথাক একটি শব্দ



আমিথাক

দুর্ভোগ শেষে আমার সাফাঃ

খড় শেষেছে। দুর্ভোগ কেটে গেছে।
অবহাওয়া বেশ শান্ত। নোঙর তুলে
স্ট্রামার জেটিতে নিয়ে বাঁধা হলো।
যাত্রীরা সকলেই ভিজে একেবারে বেন
নেয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনের জামা-
কাপড়ও সমস্তই ভিজে সপুসপু। সপোর
পটেলীতে আর একজোড়া লুণ্ডি ও সার্ট
ছিল তাও একেবারে ভিজে—তাই কাপড়
বদলবার কোন হাঙ্গামাই নেই—কাপড়-
চোপড় যা পরনে আছে—গায়েই শুকোতে
হবে। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে অনেক সরাই-
খানা আছে। আমরা দু'জনে একটা
মুসলমান হোটেল গেলাম। মুসলমান
সরাইখানার বসে খাওয়ার ব্যবস্থা
অপেক্ষাকৃত ভাল। আসনে বসে সামনে
প্রায় দশ বারো ইঞ্চি উঁচু লম্বা চৌকিতে
খালা রেখে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে।
তখনকার দিনে একবেলা খুব পেটভরা
ভাল খাবারের মূল্যও কোনমতেই এক
টাকার বেশি হতো না—তাও খেয়ে শেষ
করা যেত না। আমরাও খুব পেটভরেই
খেললাম।

Via বাহাদুরাবাদ ও ফুলছাড়ি—
কলকাতার দুটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট
ফাটা হোল। এখন আমার সঠিক মনে
নেই—একই সঙ্গে কলকাতার through
টিকিট কেটেছিলাম নাকি পর পর বিভিন্ন
স্টেশনে টিকিট করে বাহাদুরাবাদ দিয়ে
বোয়া পথে কলকাতার পৌঁছেছিলাম।
তবে বাহাদুরাবাদ দিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে
দুয়ে আসার কথা আমার স্পষ্ট মনে
আছে। ট্রেন ছাড়বে একেবারে শেষ রাতে।
ভতক্ষণ স্টেশনে বসে সময় কাটলো।
যতদূর মনে পড়ে ভোর চারটে বা সাড়ে
চারটের সময় আমাদের নির্দিষ্ট ট্রেনটি
ছাড়ল। বেলা একটার সময় বাহাদুরাবাদ
ঘাটে এসে পৌঁছলাম।

বাহাদুরাবাদ থেকে ফেরা স্টীমারে
ওপারে ফুলছাড়ি যাওয়ার পথে অন্যান্য

যাত্রীদের সঙ্গে আমি ও এরা দু'জনা সাহেব
ওপরের ডেকে ছিলাম। নদী পার হতে
ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। ইটালী শব্দে
পেলাম আমাদের ব্যাপার নিয়ে যাত্রীদের
মধ্যে খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা
চলছে। ফেণীর গুলীচালনার নাটকীয়
বর্ণনা। আততায়ীরা বোমা ফাটালো,
গুলী চালালো—চতুর্দিক অন্ধকার করে
উঠাও হয়ে গেল! অরো বেশি উদ্দীপনা-
বশে আর একজন বললেন—পাঁচ সাত-
জনকে বিপ্লবীরা গুলী করে মোরে
ফেলছে! তাদের পিছ ধাওয়া করে
গুরুপঙ্কন ও তাদের কাউকেও ধরতে
পারে নি। নোয়াখালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
আততায়ীদের প্রত্যেককে জীবিত বা মৃত
ধরবার জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা
করে পুরস্কার দেবেন বলে বিজ্ঞাপন
দিয়েছেন। আর একজন বললেন, চট্টগ্রামের
জেলা শাসক—অনন্ত সিং, লোকনাথ বসু
ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করতে সাহায্য
করলে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার করে
টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
আলোচনা শুনে খুব মজা লাগছিল।
আমারই সামনে আমাকে নিয়ে কথা—আর
আমি মূখ্য বুঝে সব শুনিছি। এই ভা-
বা তোমাদের সামনেই আমি বসে আছি
—আশ্রয়কার জন্য আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র
কিছুই নেই। এমন সুযোগ তোমরা
আর পাবে না—ধীরেই দিলেই পাঁচটি
হাজার টাকা পুরস্কার।

নেতের লোক এত অকৃতজ্ঞ নয়!
সৈন্যদলকার পাঁচ হাজার টাকার মূল্য যদিও
কম নয়, তবু আমার ধারণা টাকাই সকলের
কাছে সব সময়ে বড় নয়! আমার পরিচয়
পেলেই যে লোকে আমাকে তখনই ধরিয়ে
দিত সেটা আমি বিশ্বাস করি না—
অন্তত বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব
নয়! ১৯২৪ সালে ভাটিয়ারীতে সেই
বংশ নিন্দের জীবন তুচ্ছ করেও আমাকে
কেন আশ্রয় দিয়েছিলেন? নাগরখান্য
পাহাড়ের পুলিশ বেস্টনীর ছিদ্র পথ

দিয়ে সেই রাখাল আমাকে পথের সন্ধান
কেন দিয়েছিল? খুনী ও রাজদ্রোহী
জেনেও অতি সাধারণ গ্রাম্য লোক সুরেনও
নিজ গৃহে আমাকে স্থান দিতে পিছপাও
হয় নি! সুরেনের আশ্রয় সেই কামার
ভদ্রলোকটি আমার সম্বন্ধে সব জেনেশুনে
—আমাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদের বড়িক
নেওয়া থেকেই কেবল সুরেনকে নিরস্ত
করতে চেয়েছেন! এঁদের প্রত্যেকেই ইচ্ছা
করলে কেউ-না-কেউ আমাকে অনায়াসেই
পুলিশের হাতে সমর্পণ করতে পারতেন।
তাই আমার পরিচয় জানলেই সকলে
আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে
উঠবে ও দেশদ্রোহী নাম নেবে তা আমি
ভাবি না—তবু আমাদের সাবধান হতেই
হয়। কারণ বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজের
দায়িত্ববোধ কতকগুলি নিয়ম পালন করতে
আমাদের বাধ্য করে।

যাত্রীদের আলোচনার বিষয়বস্তু
আমরা—তাই খুব মজা লাগারই কথা—
যাদের নিয়ে তাঁদের এত উত্তেজনা তাদেরই
একজন এত নিকটে বসে সব শুনেছে ও
আমোদ অনুভব করছে। যাই হোক মল্ল-
দেড়েক বেশ কাটলো।

বিকেল তিনটে চারটের সময় ফুলছাড়ি
থেকে ট্রেন ছাড়ল। সারা রাত ট্রেনে
কাটল। শেষ রাতে প্রায় চারটার সম-
য়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।
বড় বড় স্টেশনে সাদা পোষাকে পুলিশ
ডিউটি সব সময়ে থাকেই। চট্টগ্রাম খুব
বিশ্রোহের পর পুলিশী তৎপরতা সাধারণ-
ভাবে প্রচুর বেড়েছে এবং তুলনামূলক-
ভাবে স্টেশনে ডিউটি দেওয়ার জন্য বিটকস
পুলিশ কর্মচারীরা নিযুক্ত হয়েছেন তাতে
সন্দেহ ছিল না। আমি ও এরা দু'জনা
সাহেব অনেক পরামর্শ করলাম—আগের
কোন স্টেশনে নেমে পড়লে ভাল হবে
নাকি সোজা শিয়ালদহ স্টেশনেই না।
উচিত হবে? আগের কোন স্টেশনে
নেমে পড়ার চালাকি পুলিশও জানে।
পুলিশের নজর এড়াবার জন্য অনেক

সময় গন্তব্য স্থানের আগেই বিপ্লবীরা পাড়ি থেকে নেমে পড়ার রীতি অনুসরণ করেন। তাই ভাবলাম যেখানে পদলিখিত বর্তমান বড় সৈন্যে তাদের com-
placeance (অলস আত্মতৃপ্তির ভাব) তত বেশি থাকাই সম্ভব। No risk no gain! তাই বলে অসাবধান হলেও চলবে না। অসাবধান না হওয়ার অর্থ আবার false sense of security ভেবে ভেবে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করাও বুদ্ধিসঙ্গত নয়—অনেক ক্ষেত্রে ভাতে ক্ষতিসাধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার false sense of security না থাকার স্লেগান তুলে নিজেদের looseness (চিলেমিক) কে প্রশ্রয় দেবার মনোবৃত্তিকে প্রথম থেকেই শাসন না করলে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করার স্বপ্ন কখনও সফলতার রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তাই সাহসের সঙ্গে, অথচ সাবধানতার হুটি না রেখে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

আমি ও এরা দুজনেই শিরালদহ স্টেশনেই নামলাম। দু'জন মুসলমান ভিড়ের মধ্যে মিশে স্টেশন পার হয়ে এলাম। ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের পদলিখিত হিন্দু যুবকদের গতিবিধি সন্দেহ-জনক মনে করলে তবেই তো তাদের গোপন করবে! মুসলমান সেজে কেউ আসছে মনে করে যদি আন্দাজে ফেবল মুসলমান খুঁজে বেড়াতে হয়, তবে হিন্দু যুবকেরা যে অবাধগতি হয়ে পড়বে। দলের ভিতরের খবর পেলেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যে ওয়াচ করার জন্য পদলিখিত নিয়ন্ত্রণ হয়। তাছাড়া পদলিখিত কি করে জানবে যে, আমাকে সাহায্য করছেন মৌলভী মক্শ্বুর রহমান, মৌলভী এরা দুজনে সাহেব! কি করে জানবে মৌলভী এরা দুজনে সাহেবের সঙ্গেই অনন্ত সিং মুসলমান সেজে আসছে? তাই আমার অভিজ্ঞতা বলে—inner treachery না হলে দু'র থেকে দেখে মনস্তত্ত্ব বুঝে বুঝে চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে পদলিখিত বিপ্লবীদের হাতে নাতে ধরে ফেলেছে, তা কখনই হতে পারে না। পদলিখিতের সম্বন্ধে এই-সকল ভুল ধারণার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আর কিছুই নয়, বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারাভিযান করে রাখা না হয় যে, পদলিখিত সবই বুঝে ফেলে, কিংবা বেচারি দানেশ মিয়া প্রমুখকে scape goat করা না হয়, তবে ইয়ল বা অনিচ্ছা সভাদের কাছে diversion সৃষ্টি করা যাবে কি করে?

তাই concrete case-টি বিবেচনা করে কোন false sense of security-র ওপর অতিরিক্ত জোর না দিয়ে আমি

সোজা পথে শিরালদহ স্টেশনে নামি অন্যায় মনে করি নি।

আমরা একটি ট্যাক্সী নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির একটু দূরে নেমে পড়লাম। এই বাড়ি এরা দুজনে সাহেবের সুপরিচিত। সঞ্জীব দত্ত কামিনীবাবুর তৃতীয় পুত্র। তিনি মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন। আমি সঞ্জীবকে আগে কখনও দেখি নি—সেও আমাকে চিনতো না। এরা দুজনে সাহেবের মারফৎ কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়েছেন এবং মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে সঞ্জীবকে সব শুনিয়ে নিতে লিখেছেন। সঞ্জীব আমার পরিচয় পেল। তার ওপর নির্দেশ ছিল নরেন-কাকাকে সে আমার কথা সব বলবে ও আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। সঞ্জীব সব ভারই নিল।

নরেন কাকার অবিবাহিত। তাঁর দাদার ছেলেরাই তাঁর চোখের মণি—পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র। তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকতেন না—থাকতেন ধর্ম্মজিয়ার Bengal Immunity-র অফিসেই। সঞ্জীব সমস্যার সময় নরেন কাকার সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশ মত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। এরা দুজনে সাহেব তার পরদিন কি সেইদিনই ফিরে গেলেন।

অসময়ের বন্ধু। কত বিপদ মাথায় নিয়ে আমার সঙ্গে এত দূর এসেছেন! তা ছাড়া কে জানতো সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে স্টীমারটি যদি ডুবেই যেতো! সে দিনেও মৌলভী সাহেবের মুখে চোখে এতটুকু বিরক্তি বা অভিযোগের কোন চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখি নি। যদি তাঁর মনে অন্য কোন ভাবের লেশমাত্রও থাকতো, তবে সেই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে তা ধরা পড়ে যেতোই। খাঁটি লোক এরা দুজনে সাহেব! জীবনে তাঁর কথা ভোলা যাবে না! তাঁদের মত লোকের এত সমবেদনা ও সাহায্য পেয়েছি বলেই হয়ত ভবিষ্যৎ আমাকে ডাক দিয়ে বলে—‘ভুলো না তোমার অভীষ্টকে!’ এরা দুজনে সাহেবের সঙ্গে আমার এই কটি দিন সুখে দুখে ও বিপদে যেমনভাবে কেটেছে সেই স্মৃতি আমার বাকী জীবনের মূল্যবান সপ্তর হয়ে থাকবে।

আমি শ্যামবাজারের বাড়িতেই আছি। সেইদিন রাতে সঞ্জীব নরেন কাকার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। পরের দিন রাত আটটাব সময় তিনি তাঁর ধর্ম্মজিয়ার অফিসে তাঁর শোবার ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে পাঠিয়েছেন। পরের দিন পূর্বনির্ধারিত সময়ে আমি নরেন কাকার কাছে গেলাম। এতদিন নরেন কাকার সঙ্গে নামেই পরিচয় ছিল—আজই আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ পরিচয় হলো।

তিনি স্নেহে আমাকে তাঁর সামনের আসনে বসতে বললেন। তিনি নানা সূত্রে আমাদের সংবাদ রাখেন। কাজেই গল্প শোনার চাইতে তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন—আশ্চর্যকর্তব্য—কি করে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়! মনে হলো তিনি ভাবছিলেন Front Line থেকে যারা ফিরে এসেছে তারা আত্মগোপন করে থাকুক—তাদের বাঁচতে হবে আর ভাবীকালের যুবকেরা তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করুক। যদিও সেইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীর ইঙ্গিত তাঁর কথার মাধ্যমে পাচ্ছিলাম, তবু সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোন তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তাঁর সেইরূপ অভিমতের পরিণতি নির্ভর করে যদি আমি সেইরূপ পদক্ষেপে নেওয়া প্রের মনে করি। যদি কাকাবাবু একবার বুঝতেন আমার মন্তব্য-কৃপাণ আমি কটিবন্ধ করবো না—যতদিন স্বাধীন না হই বা স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদ না হই—তবে কি তিনি উন্মত্ত কৃপাণ হস্তে আমার মরণ সংকল্পকে বিসর্জন দিতে বলতেন? তবে কি বলতেন, তোমার এখন বাঁচতে হবে—আত্মগোপন করে থাকতে হবে?

স্নেহাঙ্ক পিতামাতা বা তত্ত্বল্য অস্বীকৃত হইত কখনও সেইরূপ প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু নরেন কাকাকে যে রূপ practical বলে আমার মনে হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম তিনি আমাকে কখনও মাক্সের স্নেহ বা স্ত্রীর অশ্রুতে আবদ্ধ থাকতে পরামর্শ দিতেন না। বাংলা দেশের বরেন্দ্র বিপ্লবী নেতাদের অবসর-প্রাপ্ত জীবনযাপনের ইতিহাস বিচার করেই হয়ত ভাবছিলেন—আমি হয়ত অবসর নিতে চাই—আত্মগোপন করে থাকাই হয়ত বর্তমানে প্রের মনে করছি। আমি একেবারে চুপ করেই ছিলাম—কোন মতামতই প্রকাশ করি নি। অদৃষ্ট! তিনি আমাকে বললেন—‘তুমি এক কাজ কর। দু'একদিনের ভিতর office hours-এর মধ্যেই তুমি আমার কাছে চাকরীর জন্য একটি দরখাস্ত দাও। আবেদন-পত্রের নকলটি আমি সঞ্জীবের হাতে তেনাকে পাঠাবো। তোমার দরখাস্ত পেয়েই আমি তোমাকে officially appointment letter পাঠাবো। তুমি চাকরীতে যোগ দেবে। একেবারে ছোট একটি গবেষণাগারে তোমার কাজ নির্দিষ্ট থাকবে। সেখানে তেমন কেউ যাবে না। তুমি একা বসেই গবেষণার কাজের তান করবে। তারপর তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় কিভাবে হবে তাও বলবো।’

তাঁর কথা আমি অবাক হয়ে শুনলাম। কতখানি দরদ! কতখানি স্বদেশপ্রেম!

চতুর্থানি স্মৃতিভাষ্যের পরাক্রান্ত! কত-
খানি বিপদ মাথায় তুলে নিতে সাহসী
হয়েছেন! আরও ভাল লাগল এই ভেবে,
আমরা মাস্টারদার নেতৃত্বে সীমিত
ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি বলেই
এবং আমাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার
কোন আশঙ্কা নেই স্থির জেনেই নরেন
জাকার মত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও সেইরূপ
ম্যাস করতে পারেন।

সৌদীন আমি বুকেছিলাম বাংলার
যুব সমৃদ্ধশালী লোকের বাড়ি আমরা
“দুর্গে” পরিণত করতে পারি, যদি তাঁদের
মনে একবার প্রত্যয় জন্মান সম্ভব হয়
যে তাঁদের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত হবে
না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার
কোন ভয় নেই।

সৌদীনকার বৈঠক আমাদের শেষ হল।
মরেন কাককে আমার কোন অভিমত
জানালাম না, তিনিও আমার কি মত জা-
নতে চান নি। তিনি বুকেছিলেন
আপাতত প্রথম কাজ আমার নিরাপত্তা-
বিধান। তাই তাঁর সূচিন্তিত প্র্যান
আমাকে দিলেন। আমি শ্যামবাজারের
ঘাড়তে ফিরে এলাম।

আত্মগোপনের জন্য তাঁর প্র্যান
ভুলনাহীন। Bengal Immunity-র
মালিক স্বয়ং সব ব্যবস্থা করছেন। এত
দুর্যোগ কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু
তখন আমার মনে শ্রুতমাত্র আত্মগোপনের
কারিকপনা বা কর্মসূচীর স্থান ছিল না।
অগ্রদূতের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পূর্ণ করার
জন্য প্রায় একপক্ষকাল নানা দুর্যোগের
মধ্যে পড়েও শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে
পৌঁছেছি। ফেণী shooting-এর পর
এই হলো দ্বিতীয় round সফলতা
—মাখন, গণেশ ও আনন্দ যখন কেউ তখনও
ধরা পড়ে নি, তখন অনুমান করা কঠিন
ময় যে, তারাও ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছে
বা এসে পৌঁছেবে। তাই আমার তৃতীয়
round কর্মসূচী—যে কোন উপায়ে
তাদের খুঁজে বার করা।

নরেন কাকার কাছ থেকে চলে
আসার পরদিন আমি সঞ্জীবের হাত-
খাড়াটি ও সাইকেলটি চেয়ে নিলাম।
সন্ধ্যার সময় সাইকেলে চেপে বেরোলাম।
জ্যাকারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার
সময়ে আমি খুব সাইকেল ব্যবহার
করতাম। কাজেই কলকাতার বাস্তবায়
সাইকেল চালাতে আমি বেশ অভ্যস্ত।
পকেটে তেমন টাকার জোর নেই যে টাক্সী
চড়বো। ট্রামে বাসে ঘোবা সর্বতোভাবে
খরজানীয়। কারণ যে কোন মহতের চেনা
লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে;
আর শত্রুদের সঙ্গেও হঠাৎ মোলাকাৎ
হয়ে যাবে না তাও কেউ বলতে পারে না।

তাই সাইকেল সম্বল করেই বেরিয়ে
পড়লাম।

মনস্থ করলাম অনুকূলদার সঙ্গে
দেখা করব। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কয়েক
মাস আগে যখন জোর গুজব রটে গেল
যে, আমি অনুকূলদার মারফৎ আগ্নেয়াস্ত্র
জোগাড় করছি, তখন পলিশ কতৃপক্ষ
হয়জন watcher-কে সব সময় আমাদের
সঙ্গে সঙ্গে থাকবার নির্দেশ দিয়ে
আমাদের চিনিয়ে দের—এবং আমাদের
সামনেই watcher-দের duty বুঝিয়ে
দেয়। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ
হয়ে গেছে। ফেণীতে পলিশের সঙ্গে
সংঘর্ষ হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর
সবাই আত্মগোপন করে আছে।
এমতাবস্থায় আমরা একে একে এসে হস্ত
কলকাতায় একত্র হবো পলিশ সেইরকম
অনুমান করেছে। সেই ইতিমধ্যে তারা
ফেণীর ঘটনা থেকেই পেয়েছে। সেই
জন্ম তারা যে বিশেষ কবে অনুকূলদার
উপর সবচাইতে বেশি নজর রাখবে তাতে
কোন সন্দেহ নেই। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ
ঘটাব পরও পলিশ অনুকূলদাকে গ্রেপ্তার
করে নি। কাঁদ পেতে রাখা-হয়েছিল—
আমরা অনুকূলদার কাছে নিশ্চয়ই
আসব এবং সেই সুযোগে আমাদের বন্দী
করবে। তাদের সেইরূপ ফাঁদ সত্যিই
নির্ভুল ছিল—বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই
সেই সব ফাঁদে পা দিয়েছি। আমাদের
সঙ্গে যাদেরই পুরনো পরিচয় বা সম্পর্ক
ছিল তাদের সঙ্গে পলিশ সংযোগ স্থাপন
করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ
করেছে। পলিশের এইরূপ ব্যাপক
প্রচেষ্টার methodology-র তথ্য আমরা
পরে খুব ভালভাবেই জেনেছি।

অনুকূলদার বাড়ি এই কারণে সব
চাইতে যে বেশি vulnerable ও ভয়ের
সে সম্বন্ধে আমার বাস্তব ধারণা ছিল।
কিন্তু তবু risk না নিয়ে আমার কোন
উপায় ছিল না। স্বাক্ষর আনন্দরাও
অনুকূলদাকে চিনত। তারা তেমন ঘনিষ্ঠ-
ভাবে আর কাউকে জানত না যাঁর সাহায্যে
আমাদের বা আমাব খোঁজ পাবে। গণেশও
অনুকূলদার কাছেই আমার খবর নেবে
বলে আমার ধারণা ছিল। যতদূর সম্ভব
সাবধানতা অবলম্বন কবে অনুকূলদার
বাড়িতে গেলাম। পলিশ watcher-রা
থাকলেই যে তাদের ফাঁকি দেওয়া যায় না
তা নয়। সৌদীন আমি তাদের ফাঁকি
দিলাম। তাঁর প্রাচুর্য্যে প্রীগোপাল
মুখার্জী সেই সময় বাড়িতে উপস্থিত
ছিলেন। আমাকে দেখে গোপালবাবু খুব
খুশি হয়েছিলেন। বয়স কম হলেও—
তাঁর কাকার সঙ্গে আমার যে এক ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক রয়েছে গোপালবাবু তা জানতেন।
গোপালবাবু বললেন তাঁর কাকা বলে

দিয়েছেন আমরা কেউ এলে যেন তাঁর
সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করি। পরে আবার
আসব বলে আমি ফিরে এলাম।

তারপর আমাদের পুরনো বন্ধু
সুকুমার বিশ্বাসের restaurant-
যাই। সুকুমার আমাদের সববয়সী
দেখা হওয়াতে সে খুব আনন্দ প্রকাশ
করল। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে বহু বছর
তার কোন যোগাযোগ ছিল না। চট্টগ্রামে
তাবা নন্দন-কাননে—আমাদের সংলগ্ন
পাড়ার থাকতো ও তাদের সঙ্গে আমাদের
সামাজিক সম্পর্ক ছিল। প্রেমানন্দ তারই
মামা। এইরূপ বাস্তবতাব পরিপ্রেক্ষিতে
তার কাছ থেকে কিছু সাহায্য নেবো আশা
করে তার কাছে যাই। সুকুমারকে সঙ্গে
নিয়ে জুলদার বাড়ি গেলাম—তখন রাত
প্রায় আটটা। আমি একটু দূরে দাঁড়ালম
—সুকুমার জুলদাকে ডেকে আনলো।
জুলদা আমাকে দেখে খুব উৎসাহিত বোনা
করছেন বলে মনে হোল। কিন্তু কথ-
বার্তা তখন বিশেষ কিছু হলো না—পাড়ে
কেউ দেখে ফেলে সেইজন্য চারিদিকে তাঁর
সতর্ক সচরিত দৃষ্টি ছিল। পাঁচ মিনিটের
মধ্যেই বিদায় নেওয়া তিনি সমীচীন মনে
করলেন। ঠিক হলো পরের দিন সকালে
সুকুমারের সঙ্গে আবার তাঁর কাছে যাবে
—সুকুমার তাঁকে ডেকে আনবে তাবপর হা-
হা একটা কিছু করবেন। আমরা সৌদীন
রাতের মত বিদায় নিলাম।

সুকুমারকে—আমি একটু কাছে যাছি
ও ঘন্টখানেকের মধ্যেই তার বাড়িতে ফিরে
আসছি বলে—আবার অনুকূলদার সঙ্গে
দেখা করতে গেলাম। অনুকূলদা
এবারে বাড়িতেই পেলাম—নমস্কার করে
তাঁর পায়ে ধুলো নিতেই তিনি আমাকে
বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও প্রথম প্রশ্ন কর-
লেন—“বুড়োর ব্যাক্ষতা মেবে দিলি ন-
কেন?” Arban Co-operatives
Bank-এর কথাই তিনি বলছিলেন
কংগ্রেসে আমাদের বিরুদ্ধ দলের নেতা
“মহিমচন্দ্র দাস মহাশয় এই ব্যাক্ষতা
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই অনুকূলদা
এই উক্তি। কিন্তু অনুকূলদা এই
প্রশ্নের ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত আকোশের কণ্ঠ-
পাথরে ঘাচাই করলে আমরা ভুল করব
বাংলাব বিপ্লবীদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন
ছিল। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সত্যি
যদি কেউ কয়েক কোটি টাকা জোগাতে
পারত, তবে সহস্র গুণ বেশি বৈপ্লবিক
কর্মসূচী কাজে পরিণত হত। টাকা
থাকলে অস্ত্রের অভাব থাকত না—
shelter, custody সবই হতো। তাই
নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম চালিয়ে
যেতে হলে টাকাব উৎস থাকা চাই। ছুটকে
ছাটকা ডাকতি করার পব পলিশের
আক্রমণ সামাল দিতেই সব শক্তি কম হয়ে

থায়। তাই অনুকূলদার জিজ্ঞাসা—এত সুযোগ পেয়েও বাংলার বিপ্লবীদের অর্থ-সমস্যা দূর করার প্রোগ্রাম নিলাম না কেন?

অনুকূলদার সেই জিজ্ঞাসার বৌদ্ধিকতা ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষেও এই বিষয়ে যুক্তি ছিল যার জন্য কোন ব্যাঙ্ক লুট করা ছাড়াই প্রায় আমাদের নিতে পারি নি। যদি সামরিক বিপ্লবী সরকার শহরের বৃকে স্থাপিত হতো, তবে সব ব্যাঙ্কই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম। কিন্তু যদি টাকা লুট করে নিয়ে যেতাম তবে যুব-বিদ্রোহের character-টি দেশবাসীর কাছে অন্য রূপ নিত। আমরা যুব-বিদ্রোহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেরেছিলাম।

তা ছাড়া দু' বছরের "মৃত্যু সংকল্প" প্রাণের মধ্যে কয়েক কোটি টাকা মজুত করে বাংলার বিপ্লবী দলের financial problem দূর করার একটি ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা নেওয়া বাস্তবে সম্ভব ছিল না। কয়েক কোটি টাকার জিন্মা কে বা কারা নেবে? অত টাকা কোথায় জমা রাখা হবে? কাদের বা কোন কোন সংগঠনকে টাকা দেওয়া হবে? তারা কারা যারা সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠনের জন্য টাকা ঠিক ঠিক ব্যয় করবে? ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এই পবিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই ব্যাঙ্ক লুট করার কর্মসূচী যত্ন কবতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কেবল টাকা লুট করলেই প্রোগ্রাম শেষ হয় না—কি করে সেই টাকার গুরুদায়িত্ব বহন করে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা যাবে তার সূচীভূত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী পূর্বাঙ্কে নির্ভুলভাবে ঠিক করা না হলে সেইরূপ ডাকাতির প্রোগ্রাম নেওয়ার নৈতিক অধিকার কারো বা কেন সংগঠনেরই থাকে না। আমাদের যুব বিদ্রোহের "মৃত্যুপন প্রোগ্রামের" সঙ্গে এইরূপ কোন কর্মসূচী খাপ খায় না বলে টাকা লুট করার কোন চেষ্টাই আমাদের ছিল না।

অনুকূলদার কাছে জানতে পারলাম, —জাফন ও আনন্দ কলকাতায় এসে গেছে ও তারা ভাল আছে। গণেশও এসে গেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবেন বলেন—আমি যেন পরে এসে তাঁর কাছ থেকে সব খবর জেনে যাই।

অনুকূলদার সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করার পর আমি আবার সুকুমারের কাছে ফিরে গেলাম। ভবানী-পূর রাজসংস্রাজের উপাসনা হলের ওপরের তলায় সুকুমারের বাবা সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আগেই বলেছি। তাই কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় আমি সুকুমারকে বললাম যে যেন নিজের উপাসনা ঘরে রাখে আমার সঙ্গে ঘুমোয়। আমরা রেস্টোরাঁর মাংস পরোটা খেয়ে—উপাসনা ঘরে দু'টি বেঞ্চে দু'জনে পাশাপাশি শূরে পড়লাম।

আমার সতর্ক থাকার অভ্যাসবশত আমি সুকুমারের খুঁতির এক প্রান্ত আমার হাতে বেঁধে রেখেছি। সে যদি টের পায় তবে আমাকে কি ভাববে? হয়ত অপমানিত বোধ করবে—হয়তো রাগ করবে—অন্তত মনঃক্ষুব্ধ তো নিশ্চয়ই হবে! কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মতে কোন আপোষই চলে না—সুকুমার যদি রাগও করে তবু আমার সাবধান থাকতেই হবে।

আজ সন্ধ্যা হওয়ার পর সুকুমারই কথায় কথায় বলেছিল—স্পেশাল সুপারিন-টেন্ডেন্ট স্বর্গত রায় নলিনী মজুমদার বাহাদুর মহাশয় তাদের কিরূপ আশ্রয় হন। তিনি সুকুমারকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন—আমাদের কোন খোঁজ পেলেই তাঁদের যেন খবর দেয়—এতে যেন কোন ভুল না হয়। এই কথাটি সব সময় রাখে বাবে আমার মনে হচ্ছিল। বুকেছিলাম স্বয়ং নলিনীবাবু আমাদের ধরতে চেষ্টা করছেন এবং সেই জন্য সুকুমারকে সম্ভাব্য source মনে করে টোপ ফেলে রেখেছেন। একটি ভাত টিপলে হাঁড়ির সব ভাতের অবস্থা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে আমি বাংলার আই. বি ডিপার্ট-মেন্টের তখনকার বিশেষ methodology বুঝতে চেষ্টা করেছি। কেবল সুকুমার নয়—আমাদের পূর্ব পরিচয়সূত্রে পলিশের খাতায় যাদেরই নাম আছে—তাদের সবাইকেই তারা এইরূপ অনুরোধ জানিয়েছে—অবশ্য যাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রস্তাব করার মত সম্পর্ক আছে।

সুকুমার সরল মনে আমাকে যখন সব বলেই দিল—তারপরেও সাব্বারাত তার খুঁতিব খুঁটি ঘরে রাখা কি আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি নয়? মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার খেলা। ভুল হয়ত আমি অনেক করেছি, কিন্তু মানুষের মনের বৈচিত্র্যের নিদান অজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, আজ যে সরল, নিভীক ও নিঃস্বার্থ সেই হয়ত 'কাল' না 'কাল নয়', কয়েকটি মহত্বের মধ্যেই একেবারে আশ্চর্যরূপে বদলে যেতে পারে! তবু সেইরূপ প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও আমাদের বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র-মজক কাজ করতে হয়েছে—কেবল লক্ষ্য রেখেছি—this far and no farther! অর্থাৎ লক্ষ্য করার কথা সেই Zero hour-টি—যার পর তার সঙ্গে আর

conspiracy করা চলে না। যদি দু'দলের কেউ পলিশের এজেন্ট হয় তবে exposed না হয়েই তাকে পলিশকে সাহায্য করতে হবে। তাই একজন দল-দ্রোহীর কাছ থেকে খবরাখবর পেয়ে—সেই ভাথের উপর ভিত্তি করে পলিশ তৎক্ষণি action নিতে পারে না তাহলে তাদের এজেন্টরা exposed হয়ে পড়ে। এজেন্টরা যদি আতঙ্কে থাকে এই বৃক exposed হয়ে গেলাম—তবে সরকার আর agents পাবে না। এই কারণে আমার conspiracy করার অভিধানে কাউকে কখনও চিরন্তন-ভাবে বিশ্বাস করার কথা নেই আবার পলিশের চর জেনেও তার সঙ্গে সব রকম ভয়াবহ কাজ করেছি শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতি যখন betray করলেই সে exposed হচ্ছে। আর diversion সৃষ্টি করে ধরাবার সুযোগ কোন এজেন্টকেই দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না—। তাই conspiracy-র সফলতার জন্য সেই zero hour-টি বেছে নেওয়া সার্থক conspirator-দের অপরিহার্য গুণ। আজ আমার এই কথাগুলি জেনে কেবল তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে তাদের আমি নিভুলভাবে চিনতে পেরেছিলাম—এবং zero hour-টি ঠিক বেছে নিয়ে তাদের অপচেষ্টাকে নিরুল করেছি—diversion সৃষ্টি করে বিচার সুযোগ দিই নি।

সুকুমারের সঙ্গে আজ রাতে আমি এই বাড়িতে থাকবো তা জানতাম মাত্র আমবা তিনজন—আমি জুলুদা ও সুকুমার। 'অগ্নিগর্ভ' চট্টগ্রামে এক স্থানে লিখেছি—মাত্র দু'বছর আগে একজন Retired Police Officer বলেছেন, স্বয়ং Sir Charles Taggart সেই দিনটিতে আমাকে 'dead or alive' ধরবার নির্দেশ দিয়ে সেই রাজসংস্রাজের চারপাশের রাস্তা পাহারা দিতে সাধা পোষাকে তাঁদের মোতায়েন করেছিলেন। সাধা পোষাকে কেন? —লাল পল্টন যদি সোজাসুজি বাড়ি ঘেরাও করে তবে যে দলের গোয়েন্দা exposed হয়ে পড়বে। তাই diversion প্রয়োজন—সাধা পোষাকে পলিশ আমাকে দেখে ফেলল আর অর্মানি উপ করে ধরে ফেলল। যা টেগার্ট সাহেবের চমৎকার ফাঁদ—অনন্ত সিং কিছুতেই তাহলে বুঝতে পরতো না তাঁদের agent-কে। কে সেই খবর পলিশকে দিয়েছিল?—আমরা তিনজনে—না হয় দু'জনে—নয়তো একজনে! পলিশের কাছে আমি শিখেছি—কোন তথ্য যদি তারা দু'জনের কাছ থেকে জানতে পারেন তবে গুরুত্ব বৃক action নেন—বেশ্যে কেবলমাত্র একজন agent-এর কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যায়—তার exposed হওয়ার

আশঙ্কা থাকে বলে—যতদূর বা যতক্ষণ অন্য কোন source থেকে সেই খবর পাওয়া না যায় সাধ্যমত ততদিন বা ততদূর পুর্লিঙ্গ সেই action স্বাগিত রাখার চেষ্টা করেন। গুরুত্ব বৃদ্ধি অবশ্য এর ব্যতিক্রমও তাঁরা করে থাকেন।

“অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়” লিখতে যেন এই সমস্ত অবাস্তব প্রসঙ্গে বইয়ের পৃষ্ঠা বাড়িয়ে পাঠকবর্গের ঐশ্বর্যচ্যুতি ঘটানো কেন? এইরূপ প্রতিবাদের গুঞ্জন বিদ্রোহিত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোথেকে জন্ম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে তার সম্যক উপলব্ধি আমার আছে। C I A সংগঠন ও তারই সংশ্লিষ্ট ব্যাপক intelligence ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের এজেন্টরাই যে সব চাইতে বেশি দৃষ্টিভঙ্গী-প্ৰস্তুত হয়ে পড়বেন এবং তাঁরাই প্রচাৰ করবেন “অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ের” পৃষ্ঠায় এই সমস্ত অবাস্তব প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে অনন্ত সিংহের নিজস্ব প্রচারমূলক “অভিসন্ধির” উদ্দেশ্য যতখানি প্রথর—ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ততখানি ম্লান। এই মত সত্যই বারী পোষণ করবেন—তাদের উদ্দেশ্যে এই চৌবাটী বংসব বয়সে আমি লিখতে বসি নি। আমার লেখার মধ্যে এই বিশেষ দিকের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ “অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ের” বিশেষ একটি অপরিহার্য ঐতিহাসিক অঙ্গ। তাই কালির পরিবর্তে শব্দের রক্ত দিয়েই আমার এই ইতিহাস রচনা প্রয়াস! বিশেষ করে তাঁদের জন্যই এই লেখা বারী গল্পের বসির্দর্শনের চাইতে অন্তর্নিহিত মূল ঐতিহাসিক ভাষার অপরিহার্য বৈপ্লবিক দিকগুলিকে উপেক্ষা করে যাবেন না। বইটিকে সর্বজন সমাদৃত কববার উদ্দেশ্যে আপোষের মনোভাব নিয়ে লেখা আর নিজেকে প্রভাৱণা কবা আমার কাছে এক কথা। তাই বইয়ের commercial value বাড়ানোর চাইতেও Revolutionary intrinsic value-র উপযুক্ত মূল্য দিতে সামান্য গাণ্ডির মধ্যেই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বারী আমার লেখাকে খাচাই করবেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

সকালবেলা জুলুদার সঙ্গে পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে দেখা হলো। জুলুদা ঘড়ি ও সাইকেলটি সজীবকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে সুকুমারকে বললেন—। আমাকে বলে দিলেন আমি যেন আব সেখানে না যাই। আমি রিস্ট-ওয়ার্চিট ও সাইকেলটি সুকুমারের জিম্বাশ ছেড়ে দিলাম। তারপর আমাকে নিয়ে জুলুদা একদিকে আব সাইকেল চেপে সুকুমার অন্যদিকে চলে গেল। পরে আমার পরিভাষ ও অনুশোচনার সীমা

ছিল না যখন ভেবেছি কেন আমি নিজে গিয়ে সজীবকে সাইকেল ও ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এলাম না! সজীবের কথা যথাস্থানে বলা হবে। সে এখন কোথায়—এই বিরাট জিজ্ঞাসার বে উত্তর চাই।

জুলুদা আমাকে নিয়ে একটি বাড়ির নিচের তলার ছোট একটি ঘরে বসতে দিবে চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে আমাকে নিয়ে আর একটি বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আমি পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে দেখতে পাই। সেও বোধহয় সেখানে আত্মগোপন করে ছিল। তার সহোদর অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ বংশ প্রাণ দিয়েছে। আর এক ভাই সুখেন্দু দস্তিদার স্বািপাল্লার দণ্ড নিয়ে আমাদের সঙ্গে কালাপানি ঘুরে এসে বর্তমানে পাকিস্তানে আছে। পূর্ণেন্দুর অন্যান্য সব ক’টি ভাই-ই সমরোপযোগী রাজনীতিতে এখনও সক্রিয় আছে বলে শুনছি। Morning shows the Day! ১৯২৮—১৯৩০ সালেই বৃষ্টি-ছিলাম তাদের সবার revolutionary potentiality-র পরিধি কতখানি। পূর্ণেন্দুকে কাছে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আবার হয়ত আসবেন বলে জুলুদা ১৫।২০ মিনিট পরে চলে গেলেন।

প্রায় একটা-দুটোর সময় মনোরঞ্জন রাধ—ইনি বর্তমানে অনেকের কাছে কেবলাদা নামে সুপরিচিত) বিনি এখন BPTUC-র সেক্রেটারী—সেই বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হওয়াতে আমার আরো ভালো লাগল। চট্টগ্রামের আমাদের দলেব বারী কলকাতায় ছিলেন তাঁরা কিরূপ ভাবছেন—কিরূপ উৎসাহিত হয়েছেন তার বিবরণ পেলাম।

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় জুলুদা আবার এলেন। খুব দ্ব্যমাতিকভাবে বললেন—চট করে চলে এসো—একটুও দেরি কবা চলবে না। সেই বাড়িতে বৃষ্টি মাসীমা রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন—তা আর খাওয়া হলো না—জুলুদার সঙ্গে বোরিয়ে এলাম।

ভূপেনদা (দত্ত) রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন—আমরা দুজনে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়িতে ভূপেনদা সাবাক্ষণ আমার হাত দৃঢ়ভাবে ধরে যেন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আমবা তিনজন একটি বাড়িতে ভূপেনদাব shelter-এ যাই। গণেশ সেখানে ছিল।

২২শে এপ্রিল রাতে ফেণীতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—আজ মে মাসেব ছয় সাত তাবিত্ব হবে—মাক্ষানে মাত্র এই কয়টি দিনের ব্যবধান—তবু মনে হচ্ছিল

যেন বহু বছর পরে গণেশের সঙ্গে দেখা হলো! কি দুর্ভাগ্যের মধ্যে—কতখানি উৎকণ্ঠা ও বিগদের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে! আমরা বেঁচে থাকবো আবার অক্ষত দেহে পরস্পর মিলিত হবো—এ কথা কখনও ভাবি নি! যেন এ এক স্বপ্নজগৎ বলে মনে হচ্ছিল! আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা একের পর এক মনের মধ্যে সাজিয়ে দেখলাম—না স্বপ্ন নয়, সত্যই গণেশ আমার সমনে দাঁড়িয়ে! মনুর্ভে ভবিষ্যতের চিন্তার মন আবিষ্ট হলো।

ভূপেনদা ও জুলুদা তখন চলে যাবেন—কথাবার্তা সামান্যই হলো। মাখন ও আনন্দ কলকাতায় এসেছে সেই খবব দিলাম। ভূপেনদা বললেন—দু—এক দিনেব মধ্যে আমাদের থাকার ভালো বন্দোবস্ত করে তাদেরও নিয়ে আসবেন। আপাতত হাল্কা কথাই হলো। ভূপেনদা কথায় কথায় ফেণী থেকে আমাদের আশ্চর্যভাবে পালাবার কথা তুললেন। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—“first fire open করল কে?” ইতিমধ্যে মাখন ও আনন্দের কাছে গণেশ সব শুনিয়ে তাই সে বলল—“অনন্ত”।

ভূপেনদা উৎসাহভাবে আমাকে বৃষ্টি জড়িয়ে ধরলেন। পাঠকবর্গের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বড়াই কবার উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রসঙ্গে তোলা। চৌবাটী বংসব বয়সেও বড়াই কবার সুযোগ পেলে হয়ত কেউই তা ছাড়ে না। তাই আমিও বা ব্যতিক্রম হবো কেন? সেইজন্য কেউ যদি আমাকে এইরূপ ভাবেন তবে সোঁটি তাঁব পক্ষে দোষের নয়। আমি নিজের defence-এ কিছু বলবো না। প্রত্যেকেরই নিজ মত গঠন কবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার নিজের ইচ্ছা—জাননো—first fire open করার অর্থটি কি? ভূপেনদা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতেন তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে first fire open করেছে? আমার জিজ্ঞাসাও তাই—first fire open করবে কে? বিপ্লবীর কাছে এই চিরন্তন সত্যোব মৃত্যু নেই! [ক্রমশঃ]

রক্তযুগের বিপ্লবী গবে

উপেক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উপপত্তাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিভ্রম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২



স্বপ্নাত প্রত্যেকদ্যাত্রা ॥

বিদ্যা বাউলীর মৃত্যু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

II বোল II

আকাশখান পশ্চিমে স্তোলা বোলা।
সূর্যটা ধেমি গেছে। সূর্য নিচের দিকে
নেমে চলেছেন। দূরে গাছ-গাছালীর
আবছা ছায়ার ওপর সিঁদবে আভা।

ইরে। রামখন উঠেছে। বাহারের
রঙে রঙে আকাশের পশ্চিমট হেসে
উঠেছে। আকাশের হাসন দ্যাখে কে!
এই কাদন এই হাসন। এই মেঘে মেঘে
কালো। আবার হাসনের আলো বগুন।
সূর্য লুকিয়ে আছেন। এক-আধবার তার
মুখে জিলকান দেখা যায়। মেঘের ফাঁকে
আলো ফেটে বেরোর।

হারেরে সাইরের ছিটি! দেখে বুক
উলসাইয়া ওঠে। খেপী বিদ্যাধরী চোখ
দুটে-মেলেই থাকে। চক্ষে আর পলক
পড়ে না। শ্বাস আর বয় না।

ভেবেছিল, বিকেলে খলিকানলী দিবে
একতারা নিয়ে ঘুরনা দিতে বোরয়ে পড়বে।
কিন্তু তা'বুকি আর হোল না। সারাটা
দিন বসে দেখে কাউল। এখন আবার
মাঘ-রোশ্নরের খেলা। দেইখ্যা আর আশ
মেটে না।

দিনভর পেটে কিছু পড়ে নি। বট-
কলাই দুটিখান চিবোবে ভেবেছিল।
তাও হয়ে ওঠে নি। এবেলা কি হবে কে
জানো। কে অত ভাবে? ভাবনের কাম
ভার নয়। তার ভাবনা সাইরের কণ্ঠে।
খেপী ভাবনা-চিন্তা সব সাইরের ওপর
ছেড়ে দিয়েছে। তোমার ছিটি। তোমার
ভাবন ভূমি ভাব। আমি খান্দ-দাম,
বেড়া-হাসন, চক্ মেইল্যা তোমার কার-
খানা দেখুই।

—বলে, অ খেপী, কি করস?

—বিদ্যাধরী চোখ ফিরিয়ে তাকার।

ওমা, এ যে দাশ খলিকা। খলিকার
এখানে কি কাম? এখানে তো পিরান
বানানের কাম নাই। গাঙ্গা, মদ মিলে না।
খলিকা ধুম-ধুম চোখে তাকিয়ে রইছে।
মুখে আর চোটে চাপা একখান হাসি।
দেখলেই মনে হয় কঙ্কাতীর হাসি।

ধুম-ধুম চোখদুটোর দিকে তাকালে
খেপী বকতে পারে। চোখের দুটিতে
জিলাপী চক্কর। কাউলার নাগাল শোনান।
হ' ঠিক কক্কর মতঃ

—বলে, অ খেপী, করস কি?

বলে তার দুব্বারের পাশে ছোট পেয়ারা
গাছটার ধুম-ধুম চোখে পা দিকে একটা
টোকা মারল খলিকা। বিদ্যাধরী তাকাল।

সে কি করে তা দিয় খলিকার কি
কাম? খলিকা তো কখনো তার সম্মান
নিতে আসে না। হঠাৎ আজ এক কদ
উলসে উঠল কেন? কৌতুক লাগে বিদ্যা-
ধরী। ফিক ফিক করে হাসির কিলিক
ওঠে। খলিকার কাম কুমির ঘরে। এ
ঘরে খলিকার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে
না।

তবু খলিকার আলগা কথাধানের
উলস দিতে গিয়ে ফিক করে হাসে বিদ্যা-
ধরী।—ভূমি দেখি আকাম করো।

—কি আকাম করলাম?

—সবাই আমে গাছটারে দিল্য শ্যাক
কইয়া।

সত্যিই খলিকা ততক্ষণে পেয়ারা
গাছের ছোট চারাটকে পারের ঠালায় কাত
করে দিয়েছে।

ধুম-ধুম চোখে হাসে খলিকা।—আরে

দুরদ। কষ্টা সবাই আমের চরা। এড
উলসইয়া ফ্যালগ। এই বড় বড় সবাই আম
গাছেক চাবা দিমু কত চাগ।

এ সব কথার কথা। কত দেবে
খলিকা জানা আছে। বড় বড় পেয়ারা
গাছের চরা দেবে খলিকা। এ কথাও
বিশ্বাস করতে হবে? বিদ্যাধরীর মজা
লাগে। হাসে ফিক ফিক করে।

—গা দেখ। একখান নাম শুন।
তর গাওনা শানি না কতকাল।

খলিক টুক টুক করে এগিয়ে এসে
দুব্বারের কাঁপের পাশে শুকনো মাটি দেখে
বসে। বেশ জুত কবে বসে। বিদ্যাধরী
বসেই ছিল একখানা চটের ওপর। চট-
খানা ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—খাউক, খাউক, শাজ মাটিতে বইতে
ভালই লাগে।

হাসে আবার বিদ্যাধরী—ক্যান ভিতরে
কুকি আখার আচ উঠে?

খলিকা সরেস মানুষ। মিচাকি হাসি
হেসে বলে,—ভরে দেইখ্যা আচ ওঠে
আচ্চনা না।

বাইরা কথা কর খলিকা। খেপীকে
দেখে গরম লাগছে ওর। কিন্তু সে গরমে
জ্বালায় পড়ে মবতে হবে। লাভ নাই
কিছু। বিদ্যাধরী বদ উননের আঁচ।
খলিকা তবে গোকা-মাকড।

—আখার আচ পুইড়া মর তর।

একটা নিশ্বাস ফেলে খলিকা।—
পুইড়া অনেক মিয়াই মইল। নাটা জুড়ানা
মইল। তর বাপে মইল। মদনা আলা
মইল। অখন মদন তরে মাইরা মরক।

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী।
—কও কি কথা।

সাম্প্রতিক বসন্তমতী

—হ! ঠিক কথাই কই। খপর নি জানস?

ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।—
পাচ খপরে আমার কাম কি খলিফা ডাই।
এউগা খপর জানতেই জন্ম কাইটা গ্যাল
গা।

—কিসের খপরের কথা কস?

—রসের খপর পাইলাম না। রসিক
সুজনের খপর পাইলাম না।

দাশু খলিফা জুত করে পায়ের ওপর
পা দিয়ে বসে। ঘুম-ঘুম চোখে মিচকি
মিচকি হাসে। শূরু হোল বাউলীর
খ্যাপাতী। রসের খপর চায়। নাটা
জুড়ান মরল। মদন গেল। কেউ তো
বাউলীর ঘরে টেকে না। বাউলী রসের
খপর পাবে কোথা থেকে। ঘর সংসার
কবুক। মানুস ঘরে আসুক। তবে তো
রসের খপর জানবে? খেপীর কাছে

এগোনার সাখি নেই কোন ব্যাটা-মানুষের।
অশ্বত কেমন করে খেপী রসের খপর চায়?
ঘুম-ঘুম চোখে মিচকি-মিচকি তাকায়

দাশু খলিফা। বাউলীর ঘোঁবনের বাহার
আছে। অঙ্গ থেকে চোখ ফেরান যায় না।
এমন সোনার যৌবন কবর দিয়ে দিল
খেপী বিদ্যাধরী। এর দিকে তাকালে
কুমি বেন চোখেই লাগে না। এমন অটুট
অঙ্গের শোভা কুমি পাবে কোথায়?

নাঃ! মদন আলাব পছন্দ আছে।
ব্যাপারীও পছন্দ আছে।

পছন্দ কারই বা নেই। কিন্তু কাছে
এগোয় কাব সাখি! কাছে এগোতে গেলে
ব্যাকাত্যাড়া কথা কয়। ফোঁস করে ওঠে।
আলাব জাত সপ। ল্যাঙ্গে হাত দিলে
তোড়িবেড়ি করে ওঠে।

খেপী বিদ্যাধরীকে ভোলান অত সহজ
নয়।

নাটা জুড়ান মরল। খেপীর বাপ
মরল। মদন আলাও গরবে।

ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী।—এক-
খান কথা ভুল কইলা খলিফা ডাই।

—কি কথা?

—যে ঘর নিজের আগুনে পুইড়া
মবে। অন্যর আগুনে কেউ পোড়ে না।

বাসা কথা কয় খেপী। কসখান
অম্বীকার কবনের উপায় নাই। সাতা
ডাই। আগুন জ্বলে নিজের মধ্যে।
আগুন যে জ্বলে চের পাওরা যায়। সে
আগুন মাঝেমাঝে মাথাষ চড়ে বসলে মাথা
গরম হয়ে যায়। মানুস যা মন ন্যায় তাই
করতে পারে।

তবু খলিফা বলে,—মিথ্যা কিছু কই
নাই রে। তবে আগুনে পুড়ানোর চেষ্টা
করতেছে মদন।

—উঃ হ! হইবার পারে না। মদনের
সাখি নাই আমাবে পুড়ায়।

—ভর শোন বিদ্যাধরী!

—কয়ের বিস্তান্ত? কোন বিস্তান্ত
শুননের আমার কাম নাই।

—তবু তোড়িবেড়ি জারিজুরি ভাইগা
যাইব দেখিস অনে।

বিদ্যাধরী তাকায় খলিফাব দিকে।
কি বলতে চায় খলিফা। কি বিস্তান্ত
তাকে শোনাতে চায়? তার কি আছে?
বাইরের খপর শোনবার কোন ইচ্ছা তার
নেই। নিজেকে জানা হোল না। আর
বাইরের জানা। ঘরের খপর না নিখে
গাঁয়ের খপর নিতে যায় কে? ঘর গুছান
পড়ে রইল বাইরের খপরে বেলা কাটিয়ে
লাভ ঠিক তার। শুনতে চায় না সে।
হাবিজাবি বিস্তান্ত শুনতে জানতে চায় না।

বিদ্যাধরী বলল,—সাইয়ের নামে বাইব
হমু ভাবাছিলাম।

বিদ্যাধরী বলতে চাইল, সে এখন নাম
করে ঘুরতে বেরোবে। ভিক্ষায় বেরোবে।
এখন খলিফা ইচ্ছা কবলে চলে যেতে
পারে। ভাল লাগছিল না ওর। বিরানে
কুমি এসেছিল। সে কিছু বিস্তান্ত
শুনিয়ে গেছে। যে সব কথা শুনতে সে
চায় না। জানতে চায় না। তবু কুমি
শুনিয়ে গেছে। তার কলা মদনের তুই
লইয়া আষ।

সে আনতে চায় না। বাসু করে
দিতেও চায় না। বাইরে তার আবাহনও
নেই। বিসর্জনও নেই। সে ডেতরে তার
সুজনের সন্ধান চায়। কালো মদনকে
প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে রসে প্রেমে তার
বুকের পৈঠায়। বাইরের জাল যদি
ডেতরে ঢেকে, তবে সে জালে সে নিজেই
জড়িয়ে পড়বে। অধর মানুস সে জালে
থরা পড়বে না।

কালো মদনকে সে ভালবাসে। প্রেমের
রসে ভিজিয়ে নিয়েছে সে মদনের ভাসনা।
মদন তার মনের মানুস। কিন্তু মনের
মানুসকে সে বাইবে চেনে এনে সংসাবেব
জালে হারাতে চায় না।

মানুষেব সম্বন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ
সাধনে। এ সাধনে সে কোন বিষু চায় না।

মদন ভাল থাক। তার কালো মদন
যাতে সুখ পায়। যেখানে সুখী হয়।
তাই করুক। তার তাতে কিছুই আসে
যায় না। তার ভাল সে চায়। তার
সুখ সে চায়। এত পবনতই তাব চাওয়া।

পিল্লেরেব পক্ষীকে সে যদি বাইরে
আনে তবে ফড়িং করে উড়াল দিয়ে চলে
যাবে। আর তাকে পিল্লেরে আনা যাবে না।
কেন এই সহজ কথাটা এরা বোঝে না?
কেন এরা সহজ হতে পারে না? সহজ
হতে চায় না? মানুস কি সহজ হতে ভুলে
গেল?

—বিপদ-আপদ মানুষের আসতে কত-

খলিফা বলে,—তাই কই বিপদ-আপ-
দের কথা আগে শুননা রাখন ভাল।

একটা নিম্বাস ফেলে খলিফা বেশ
বড় করে।—তবে নি কতকাল ধইয়া জানি।
খপবটা শুননা মনডা খাবাপ হইয়া গ্যাল।
তবে জানাইবার আইলাম।

বিদ্যাধরী মাঠের সীমানায় আকাশের
দিকে তাকিয়েছিল। মেঘ সরে সরে
যাচ্ছে। সূর্য বোধ হয় নেমে গেছেন।
রঙের আভা নাই। আকাশের রঙিল
বাহার নাই। ঘোব-ঘোব অন্ধকার হয়ে
আসছে। বাতাস বইছে বেশ জোরে।
মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে ভিজে মাটির
সৌন্দর্য আসছে ভেসে। বড় মিঠা গন্ধ।
ভিজে মাটি আর ভিজে গাছ-পাতার গন্ধ।

—কালাকান্দার ব্যাপারীকে চিনস?

খেপী তাকায় খলিফার দিকে।

হাসে, বলে,—সে খপরে তোমার কি
কাম?

—বিস্তান্তখান শুনইয়া ল। আগেই
তোড়িবেড়ি করিস না। কালাকান্দার
ব্যাপারীর কাছে মদন তরে লইয়া গেছিল?
ওয়ানে মনছুরেব সঙ্গে প্যান্ডা-পেন্ডি
করছিল নি?

অবাক হয়ে তাকায় বিদ্যাধরী।
খলিফা ঘুম-ঘুম চোখে মিচকি হাসছে।
খলিফা কি করে জানল এ সব কথা।
কালাকান্দার ব্যাপারীর কাছে মদন তাকে
সিঁটাই নিয়ে গিয়েছিল। মনছুর ভাইয়ের
সঙ্গে গারামাবিও হয়েছিল। এ সব কথা
তো খলিফার জ্ঞানার কথা নয়।

—তবে নিছিল ক্যান জানস!

খেপী তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে।
শিশুর মত অবোধ দুটো চোখ মেলে।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার ফ্রিট্রি
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

সাপ্তাহিক বসন্তমতী

—নদীর পাড়ে ব্যাডাইবার গেছিলাম।

—না, তরে চাপসী দিয়া নিয়া গেছিল।

ব্যাপারীর সাথে আগে কথা আছিল। তরে

ব্যাপারীর কাছে নিয়া যাইব। তার

গদ্যমে রাইখ্যা আসনের কথা আছিল।

খেপীর চোখদুটো শিশুর মত।—
ক্যান! কি কামে?

খলিফা হাসে।—তুই এটা আবোদা
ছাই। ক্যান নিছিল। এয়াও নি ভাইপা
কওনের কথা!

বিদ্যার্থী তাকিয়ে থাকে খলিফার
দিকে। সে চাউনীতে ভর-ভর নেই, শঙ্কা-
জাশঙ্কা নেই। টলটলা চাউনী যেন নিখব
দীঘির জল। ময়লা আবজনা নেই।
টলটলে পরিস্কার।

কৌতুক যদি বা কিছু থাকে।
কৌতুহল নেই।

অন্তে আস্তে বলে খেপী,—বাপাবী
হানুযডা ভাল।

—তব মাথা! ব্যাপাবী তরে টাহা
দিয়া কিনবাব চাইছিল।

কথাটা যেন ভারি মজার। খিল খিল
করে হেসে উঠল খেপী।—কও কি কথা।
জামার নি দাগ আছে?

পলিমা হাস। মিচকি হেসে বলে,—
দইনা আলার টাহাব বড টান পড়ছে!

—ক্যান?

অ জালায় কিচায়াত্রাব দল বানাইবার
গয়। তার ব্যাপাবীর হাতে তইল্যা শত

দুয়েক টাহা পাওনের কথা আছিল। ওই
টাহা দিয়া দল বানাইব ভাবছিল।

বিস্তান্ত সব খুলেই বলল খলিফা।
কিছু গোপন কবল না।

—অয়, ফিয়া আবাব তরে নিয়া
যাইব।

—আবার নিয়া যাইব?

—অয়। কথাবাত্তা পাকাপাকি হইয়া
গ্যাছে গা। মনছুরের কাছে আগাম টাহা
নিব মদইনা।

বিদ্যার্থী ফিক ফিক করে হাসছিল।
মাঝে মাঝে শিশুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে
তাকাচ্ছিল। এ সকল বড় মজার বিস্তান্ত।
সংসাবে সাইয়ের লীলা বোঝা ভাব।

তার কালা মদন তাকে অন্য মানুষের
কাছে বিক্রি কবতে চায়। কিন্তু বিক্রি
কবতে চার কি? এই খাঁচাটা। এই
পিঞ্জরটা। এয়া লইয়া কি কববে
ব্যাপারী। কিছই পাবে না। খাঁচার
ভেতর বে খেপী পক্ষীটা আছে। সেটা
ব্যাপারী ধরবে কেমন করে? সে পাখী
থেকে থেকে উধাও। আকাশে-বাতাসে
উজ্জানে। সে পক্ষীর সম্ভান ব্যাপারী
পাবে না। খাঁচাটা নিষে সে ঠকবে।
মদন ব্যাপারীকে ঠকাতে। নিজেও ঠকবে।

মদন তার খাঁচাটা দেখল। পক্ষী
দেখল না।

যদি দেখত। মদন দেখতে পেত।
সে পক্ষী মদনের ভাবনার রসে-বশে

বেসামাল। তাকে বশে আনতে পারে
মদন আর কেউ নয়। মদন জানল না যে
মদন তার সবটুকু পেয়েছে। তা যদি
জানত। তবে তার জ্বালা-যন্ত্রণা থাকত
না। রসের ছোঁয়ার রসিয়ে উঠত।

সাইয়ের লীলা বোঝা ভার।

খলিফার দিকে তাকিয়ে বড় কৌতুক
লাগল খেপী। খলিফার ঘুম-ঘুম চোখ
তার মিচকি হাস।

—একখান কথা জিগাই।—বলল
খেপী।

—কও।

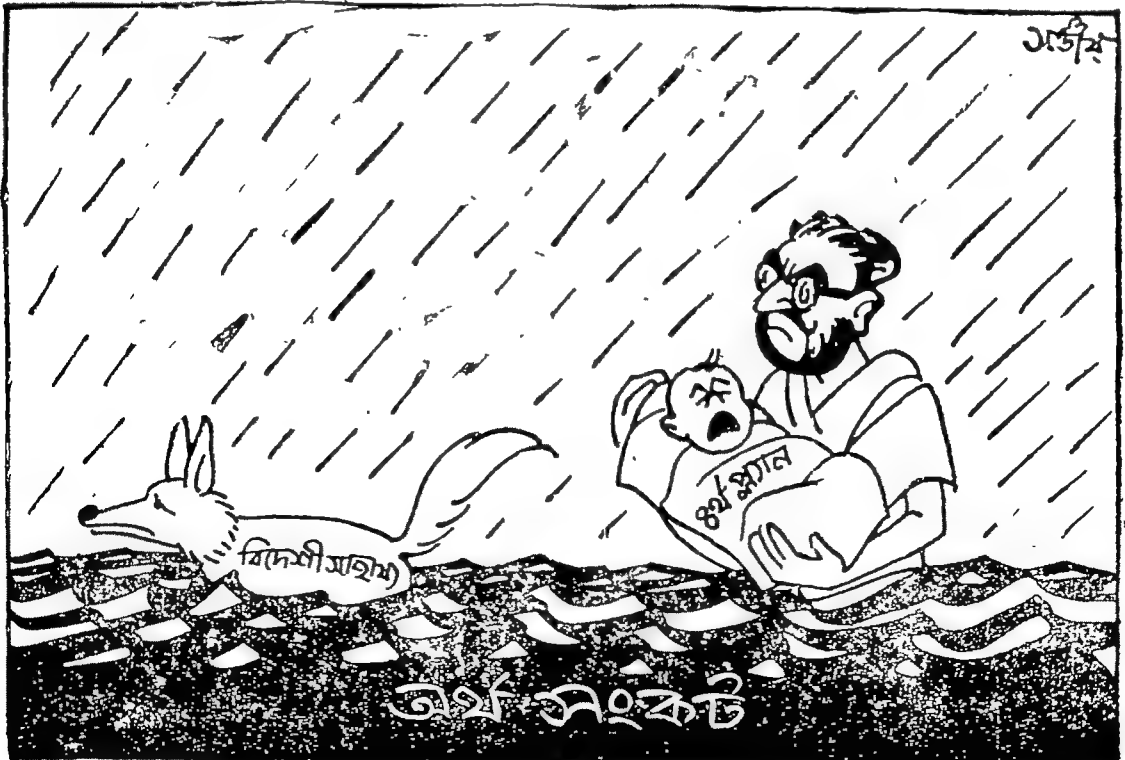
—তোমার মতলবখান কি? তুমি এ
সগল কথায কি লাভের সম্ভান করো?

খলিফা উস্খুস্ কবে উঠল। বড়
জ্বর প্রশ্ন কবেছে খেপী। ও যে এমন
একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পাবে খলিফা
ভবতেও পাবে নি। একটু ভেবে বলল,—
কিছই না। আমাব আর কি? তরে নি
ছোটকাল থিক্যা দেখত্যাছি। তাই সাবধান
কইয়া দিয়া গালাম। অখন উঠি।

গুটিগুটি উঠে পড়ল খলিফা।
ভাবল। এইবাব মদন আলা জঙ্গ
হবে। কৃষিবে ঘবে বসবাস কবার ফল
পাবে। খেপীকে ব্যাপারীর হাতে তুলে
দিতে পারবে না। মনছুরের কাছে মার
থাবে। বেদম-মাব থাবে।

[ক্রমশঃ]

জগন্নাটমী---



পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র নাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্বেই বলেছি যে, ১৯৫০ সালের
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়—রাজসাহী
জেলায় ধামুরহাট থানার কয়েকটি হিন্দু-
প্রধান অঞ্চলের হিন্দুদের কে এবং
কিভাবে বাস্তব ও স্থানচ্যুত করতে বাধ্য
করেন, তা' আমি ও আমার বন্ধু শ্রীনিরেন
দত্ত, বেশ ভালভাবে তদন্ত করে দেখে
এসে আমি আমার গৃহীত বরাবরের নীতি
অনুসারেই সফর-বিবরণী তৈরী করে
স্বাক্ষরীতই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ
সাহেব প্রত্যেক পাঠিয়েছিলাম। এইবার
কিছুটা ফল ফলতে দেখা গেল। জেলা-
ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এমদাদ আলি আমাকে
জানালেন যে, তিনি পুলিশ সাহেব—জনাব
মহসীন সাহেবকে নিয়ে ধামুরহাট ও
পত্নীতলা থানার হিন্দুদের অবস্থা দেখতে
যাবেন এবং আমাকেও অনুবোধ করলেন
তাদের সঙ্গে যেতে। নির্দিষ্ট দিনে
জেলায় দুই প্রধানের সঙ্গে তাদেরই
'জুপি' গাড়িতে আমিও যাই। ৬।৭ দিন
ধরে আমরা মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও
ধামুরহাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে
ঘুরে সব অবস্থা দেখি। আমিই উদ্যোগী
হয়ে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কী
অবস্থা হয়েছে, তা তাদের দেখাই। আমি
আগে যে বিবরণী তাদের দিয়েছিলাম,
স্বার ভিত্তিতেই তারা আমার বিবরণের
সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়েছিলেন, সে
সবই তাদের দেখাই। কোনও কোনও
স্থানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাস্তব-
ভাষী মুসলমানগণ যে সকল বাড়ি জবর-
দখল করেছিলেন, তারও কিছু কিছু
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ-সাহেব,
উভয়ের চেষ্টাতে মৃত্ত হয়। আর একটি
কাজ হয়—ধামুরহাট থানায়। থানার বড়
দারোগাকে, যিনি ফার্সি-পাড়ার বড়
জোতদার মিঃ মুজাফ্ফর রহমান চৌধুরী,
'এম-এল-এ'র (মুসলিম লীগের) সঙ্গে
তারই হাতীতে চড়ে গিয়ে হিন্দুদের
বাড়িতে বাড়িতে গো-মাংস উপহার (১)
দিয়ে তাদের খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে-
ছিলেন, ডেকে আমার ও জেলা-
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই পুলিশ সাহেব খুব
গলাগালি দিলেন এবং জানালেন যে

তাকে অবিলম্বে জেলার বাইরে বদলি করা
হবে। সেই দারোগাটির আর কোনও
সাজা হয়েছিল কি না, জানি না; তবে,
তিনি রাজসাহী জেলা থেকে বদলি হয়ে-
ছিলেন ঠিকই কিন্তু অভিনব পন্থায়
হিন্দু-বিতাড়ন-কাজের নাটকের গুরু, যে
মুজাফ্ফর চৌধুরী তাঁর কিছুই হয় নি।
আর হয়ই বা কেনন করে? তিনি হলেন
মুসলিম লীগ দলের 'এম-এল-এ'; সুতরাং
ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের আইনের
চাতার ক্ষমতার বাইরে! আর, মুসলিম
লীগ রাজনীতিক সংস্কার কাছে তো
তিনি বিনা রক্তপাতে একেবারে অহিংস
পন্থায় (১) মুসলিম লীগ নির্দিষ্ট সেই
হিন্দু-বিতাড়নের মহৎ (১) কাজটি
সম্পাদন করে একেবারে "পীর"
হয়েছেন। সেই 'পীরের' বিরুদ্ধে
'সরকার'ও কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ
করতে একেবারে নারাজ। 'সরকার' বলতে
পূর্ববঙ্গে তখন একটিমাত্র ব্যক্তিকেই
বোঝায়। তিনি হলেন, জবরদস্ত মুখ্য-
সচিব জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব।
পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী
জনাব লিয়াকত আলি ও তৎকালীন
সেক্রেটারি জেনারেল জনাব চৌধুরী
মহম্মদ আলি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজ-
নীতিক কর্মপন্থার ও কর্মসূচির যে
জুকেটে রেখে যান—পূর্ববঙ্গে জনাব
আজিজ আহমেদ তারই সার্থক রূপকার।
মন্ত্রীদেবের সেখানে নাক-গলানোর কোন
ক্ষমতাই ছিল না। তারা ছিলেন,
মন্ত্রীদের মোহ-পাশে আবদ্ধ কেন্দ্রীয়
সরকারের, তথ্য মুখ্যসচিব আজিজ
আহমেদের হাতে অক্ষম বন্দী। যদিও
কোনও বিষয়ে সিম্ফাল নেওয়ার সংবিধান-
গত ক্ষমতা ছিল মন্ত্রীদের ও মন্ত্রিসভার
কিন্তু কার্যত তাদের চলতে হত, আজিজ
আহমেদের নির্দেশ মত এবং সেজন্য, জন-
সাধারণের কাছে যত কিছু দুষ্কারের
জন্য দায়ী হতে হত মন্ত্রীদেরই।
পরবর্তী অনেক ঘটনাই সেই-সত্যই
প্রকাশ করে। ক্রমশ-তা' দেখাব।
যাক, আজিজ আহমেদ সাহেবের ইচ্ছাই
পূরণ করেছিলেন, জনাব মুজাফ্ফর

চৌধুরী সাহেব; সুতরাং, তাঁর গারে হাউ
দিতে পারে এমন ক্ষমতা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট
বা পুলিশ সাহেবের তো ছিলই না, মন্ত্রী-
দেবও ছিল না। সে কথার প্রমাণ পেরেছি
আমরা; নবাবগঞ্জ মহকুমার সেই স্বনাম-
ধন্য (১) অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসকের বেলার, যিনি
নিজেকে ছয়টি থানার (নবাবগঞ্জ মহকুমার)
'প্লাট-সাহেব' বলে জাহির করতেন এবং
পুলিশ যাকে কয়েকবার গ্রেপ্তার
করে 'জেল' পাঠিয়েও যাকে 'জেল'
আবস্থা রাখতে পারেন নি? পুলিশ
সাহেব জনাব খন্দকার সাহেব, তাঁর যে
রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন,
তাতে সে কথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলে-
ছিলেন। অদৃশ্য হস্তের নির্দেশে তিনি
(জাম্বাসাহেব) বার-বারই মর্জি পেয়েছেন।
সুতরাং, এ ক্ষেত্রেও মুজাফ্ফর চৌধুরী
সাহেবেরও কিছু শাস্তি হবে, তা' মনে
করা মুখের স্বর্গবাসের পরিকল্পনার
মতই একান্ত অর্থহীন। আমিও সে
আশা করি নি। দারোগাটির যে শাস্তি
হয়েছিল এবং তার ফলে থানার পুলিশ-
মহলে যে কিছুটা সম্ভ্রাস সৃষ্টি হয়েছিল
তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।
তা' ছাড়া আর উপায় কী ছিল? এটুকু
শাস্তি যে হতে পেরেছিল, তা-ও কেবল
সদা-সম্পাদিত 'দিল্লী-হুজি' বা 'নৈহর'-
লিয়াকত চুক্তির ফলে। 'নৈহর'-লিয়াকত-
চুক্তির যদি পরিপূর্ণ মর্বাদ দিয়ে
পাকিস্তান সরকার সফল করে তুলতে
চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়তো সংখ্যালঘু-
সম্প্রদায়ের যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক দেশত্যাগ
করে ভারতে এ যাবৎ এসেছেন, তাদের
অনেকেই যে আসক্তন না সে সম্পর্কে
আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা' হয় নি—
হতে পারে নি। পাকিস্তান সরকার এ
যাবৎ যত চুক্তিই করেছেন, তার সবই
তারা ভঙ্গ করেছেন। দেশ-বিতাগের
অববাহিতপূর্বে ১৯৪৭ সালের ২২শে
জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের তদানীন্তন
রাজ্যপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারেল, লর্ড
মন্টগোমেরির সভাপতিত্বে সর্বভারতীয়
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে

সাম্প্রদায়িক বস্তুমতী

প্রথম একটি পবিত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের ভাবী কংগ্রেস সরকারের এবং পাকিস্তানের ভাবী মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে যথাক্রমে আব্দুল রজ্জেক্স প্রসাদ ও সর্দার প্যাটেল এবং মিঃ এম এ জিন্নাহ ও নবাবজাদা লিয়াকত আলী সাহেব ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। নিম্ন সেই পবিত্র চুক্তিটাই হুবহু তুলে ধরিছিঃ—

"Both the Congress and the Moslem League have undertaken to give fair and equitable treatment to the minorities after the transfer of Power. The two future Governments reaffirm these assurances. It is their intention to safeguard the legitimate interests of all citizens, irrespective of religion, caste or sex. In the exercise of their normal civic rights all citizens will be regarded as equal, and both the Governments will assure to all people within their territories the exercise of liberties such as freedom of speech, the right to form associations, the right to worship in their own way and the protection of their language and culture."

The guarantee of protection which both Governments give to the citizens of the respective countries implies that in no circumstances will violence be tolerated in any form in either territory. The two Governments wish to emphasise that they are united in this determination."

উপরের এই উদ্ধৃতির ভাবার্থটা হচ্ছে, 'কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে উভয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়-সঙ্গত ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন (সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের সাথে) ব্যবহার করবেন। ভাবীকালের দু'টি সরকারই এই প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ়তার সাথেই দিচ্ছেন। দু'টি সরকারই আন্তরিক ইচ্ছা যে, সকল নাগরিকেরই ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা, শ্রম-পূর্বক এবং ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে, রক্ষা করে চলবেন। নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে উভয় সরকারই তাঁদের নিজ নিজ

দেশের সমস্ত নাগরিককেই সমান অধিকার-সম্পন্ন বলে গণ্য করবেন এবং তাঁদের সকলকেই স্বাধীন মতামত প্রকাশের ও নিজ নিজ ধর্ম-পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন এবং তাঁদের সকলেরই নিজ নিজ ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

এই যে জনগণকে রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি উভয় সরকারই দিচ্ছেন, তার উপরে লক্ষ্য রেখেই বিশেষভাবে তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, ভাবীকালের দু'টি সরকারই হিংসার পথকে কখনই বরদাস্ত করবেন না এবং এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উভয়েই সন্তুষ্টিপূর্ণ ও অটল থাকবেন।

উপরের ঐ পবিত্র ঘোষণার পবিত্রতা কিভাবে উভয়দেশের সরকার রক্ষা করেছেন। দেশ বিভাগের আগে বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে আমরা দেখেছি যে, অশ্রবণীকালীন সরকারের উদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুরূপী পাটনার এসে দাঙ্গাকারীদের উপর আকাশ থেকে বোমা ফেলার কথা দৃষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালেও ভারতে দেখেছি যে যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা হিংসার পথ নিয়েছে, সেখানেই ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকার চরম কড়া ব্যবস্থা নিয়েই পুর্লিশ বা সামরিক বাহিনীর লোকদের বেপরোয়াভাবে 'হত্যার জন্যই গুলী করতে' আওঁর দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে থেকে সেখানে আমি কী দেখেছি? দেখেছি যে, রাজসাহী শহরেই ১৯৪৮ সালের সরস্বতী পূজার শোভা-যাত্রা নিয়ে হিন্দুরা শহর প্রদক্ষিণ করে প্রতিমাগুলো পক্ষ্মার ঘাটে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে প্রতিমাগুলো রাস্তার উপরে ফেলে রেখেই প্রাণভয়ে শোভাযাত্রাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন কে? তৎকালীন শান্তিরক্ষাকারী অ-বাঙালী বন্দুকধারী পুর্লিশরাই সেদিন—শোভাযাত্রাকারীদের নিঃশঙ্কে ও সাহেব বাজারের মসজিদের কাছ দিয়ে যেতে দেন নি, যদিও শোভাযাত্রাকারীদের ঐ পথে যাওয়ার বৈধ 'লাইসেন্স' ছিল। শোভাযাত্রার সাথে যাওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত পুর্লিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটও সেদিন বন্দুকধারী পুর্লিশকে বহুভাবে ব্যর্থিয়েও শান্ত করতে পাবেন নি। তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দেন নি; উপবস্তু, তাঁদের হাতের বন্দুক উঁচিয়ে গুলী করার জন্য শোভা-যাত্রাকারীদের দিকে 'তাক' করেছিলেন, যার ফলে শোভাযাত্রাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে, রাজসাহী শহরের সবস্বতী পূজার শোভাযাত্রা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। শহরের সবগুলো প্রতিমা,

প্রায় দেড়শো থেকে দু'শো, একত্রিত হয়ে এক সাথে শোভাযাত্রা করে চিরকালই শহর প্রদক্ষিণ করে অবশেষে প্রতিমাগুলো পক্ষ্মা নদীতে বিসর্জন দিতেন। এই শোভা-যাত্রা দেখার জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই বিস্তর লোক-সমাগম হত। ১৯৪৮ সালেও যথারীতিই হয়েছিল। কিন্তু প্রতিমা-বিসর্জন কেউই দেখতে পান নি। ঢাকাতে জম্মাশ্রমীর মিছিলও বাংলা-দেশের একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল। এই মিছিল দেখার জন্য সারা বাংলাদেশের বহু জেলা থেকেই লোকজন যেতেন। কিন্তু স্বাধীনতাব পরে, হিন্দুরা সেই ঐতিহাসিক মিছিলটিও আর চালাতে পারেন নি—বন্ধ করে দিতে তাঁরা বাধ্য হন। সেখানেও বাধাদানকারীরা হিংসার আগ্রহই নৈয়। মৃত্যুমুখী স্বয়ং নাজিমুদ্দিন সাহেবের সামনেই সেই ঘটনাটি ঘটে। আরও কত ঘটনাই না দেখেছি। আমার জেলা রাজসাহীতেই দেখেছি যে, বৈশাখ মাসে সম্মার পরে চিরাচরিত প্রথা-অনুসারে হিন্দুরা যখন 'খোল' বাজিয়ে কীর্তন করে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন তাঁদের উপর আক্রমণ করে তাঁদের 'খোল' ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শব্দ 'খোল'ই নয়—'খোলের' কীর্তনীয়ার মাথাও। এইরূপ একটি ঘটনার সন্দেহের নিকটবর্তী ইসবপুর নামক একটি গ্রামে আমি স্বয়ং গিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করে আসি এবং পরে, সহকারী পুর্লিশ সাহেবকে নিয়ে গিয়ে সেই গ্রামে সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য একটা মুরক্ষাকারী (!) আপোষ করে আসি। আমাব জেলাতেই আমি এ-ও দেখেছি যে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় নিজ বাড়িতে পূজো করতেও বাড়ির মালিক বাধা পেয়েছেন। মুসলমান জনতা এসে দাবি করেছেন যে সম্মার আবির্ভাব সময় এবং সন্ধ-পূজার সময়টা নমাজের সময় তাই পাড়ায় বাজনা বাজিয়ে পূজো করা চলবে না। চলেও নি। হিন্দুদের নৈতিক মনোবল, হিংসার আগ্রহে প্রতিদিনকার নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়নে সম্পূর্ণ-রূপেই ভেঙে পড়েছিল। কোনওরূপ প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার শক্তি আঁ তাঁদের মোটেই ছিল না। এটা যে শব্দ আমার জেলা রাজসাহীতেই হচ্ছে, তা নয়। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা! আনও অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথাও এই প্রসঙ্গে এখানেই বলে রাখছি। কুমিল্লা শহরেই ছিল, হ্রিপরা এস্টেটের জমিদারি। সেখানকার 'টাউন হল'টিও হ্রিপবার মহারাজারই দান। এই 'হলের' চতুর্দিকের দেওয়ালে ভারত-বিখ্যাত বহু নেতার ও সাধু মহাপুরুষদের বড় বড় ছবি ছিল। একদিন মুসলমান জনতা গিয়ে

এই ছবিগুলো জোর করেই নামিয়ে তাকে ভেঙে ফেলে। কলকাতার সংবাদপত্রে সেই খবরটি প্রকাশের পরে, কুমিল্লার তৎকালীন তিনজন নেতা মিলে একটি প্রতিবাদপত্র দিতে বাধ্য হন। আমি আমাদের কুমিল্লার জনৈক প্রমুখ বন্ধুকে একদিন ঢাকায় এই বিষয়টির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছিলেন যে—“এইরূপ প্রতিবাদপত্র দেওয়া ছাড়া আমাদের গতানুগতিক ছিল না। ম্যাঞ্জিস্ট্রেট সাহেব আমাদের ডেকে নিয়ে তার চেম্বারে বলেন যে, এই সংবাদটির প্রতিবাদ তাঁদের এখনই করতে হবে, নচেৎ কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড হবে। তিনি সেই জন্য একটা প্রতিবাদপত্র টাইপ করিয়েও রেখেছেন। টাইপ করা প্রতিবাদপত্রটি তিনি আমাদের দেখান। আমরা ওতে সই দিতে প্রথমত রাজী হই নি। যখন ম্যাঞ্জিস্ট্রেট সাহেবের ‘চেম্বারে’ আমাদের সাথে এই সব আলোচনা হচ্ছে, তখন প্রায় দশ হাজার মুসলমানের এক জনতা ‘চেম্বারটি’ ঘিরে ফেলে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চিৎকার করতে থাকে। ম্যাঞ্জিস্ট্রেট সাহেব বলেন যে, আপনারা যদি বিবৃতিটিতে সই না-দেন, তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকান যাবে না। তখন এই অবস্থা দেখে, আমাদের আর কী করার উপায় ছিল? আমাদের কাজের উপরে হাজার-হাজার হিন্দুর ধন-প্রাণ সবই নির্ভর করছিল; সুতরাং, আমরা ম্যাঞ্জিস্ট্রেট সাহেবের এই বিবৃতিতে বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর করেছিলাম।” এইরূপ অবস্থাই পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই চলছিল। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই যে পবিত্র ঘোষণাটি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা করেছিলেন, সেই ঘোষণার পবিত্রতা যদি পাকিস্তান সরকার রক্ষা করে চলতেন, তাহলে ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির আর প্রয়োজন হত না। তা হয় নি; সুতরাং, আবারও আর একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হল। সেই চুক্তিটিরও মূখবন্দ্য সহ ২।১টি ধারার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

A. “The Governments of India and Pakistan Solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory, complete equality of Citizenship, irrespective all religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and free-

dom of occupation, speech and worship, subject to law and morality. Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to

participate in the public life of the country, to hold political or other office, and to serve in their country's civil and armed forces. Both Governments declare these rights to

সায়োনারা আপনার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে



ভ্যানিসিং ক্রীম
ক্রোমোফিল ভ্যানিসিং ক্রীম
ফাউন্ডেশন ক্রীম
হোয়াইটটোনিং ক্রীম
লিকুইড ফাউন্ডেশন ক্রীম
ক্রীমসিং ক্রীম
কম্পেক্সন ক্রীম
স্নো
হাই ফাই লিকুইড
নেইল পলিশ
লিপস্টিক

সায়োনারা

প্রসাধনে অতুলনীয়

be fundamental and undertake to enforce them effectively. The Prime Minister of India has drawn attention to the fact that these rights are guaranteed to all minorities in India by its Constitution. The Prime Minister of Pakistan has pointed out that similar provision exists in the Objective Resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan. It is the policy of both Governments that the enjoyment of these democratic rights shall be assured to all their nationals without distinction."

এটাই ছিল, ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তির (নেহরু-লিয়াকত চুক্তির) মূখ্যবাক্য (preamble)।

এখন 'B' (বি, অর্থাৎ "খ") ধারার ছয় নম্বর (VI) উপ-ধারাটি ও 'C' (সি, অর্থাৎ "গ") ধারার ১ ও ২নং উপ-ধারাটি মাত্র, এখানে তুলে ধরাছি:

B. (VI) That in the case of a migrant who decides not to return, ownership of all his immovable property shall continue to vest in him and he shall have unrestricted right to dispose of it by sale, by exchange with an evacuee in the other country or otherwise....

C. As regards the province of East Bengal and each of the states of West Bengal, Assam and Tripura respectively, the two Governments further agree that they shall :

(1) Continue their efforts to restore normal conditions and shall take suitable measures to prevent recurrence of disorder.

(2) Punish all those who are found guilty of offences against persons and property and of other criminal offences. In view of their deterrent effect, collective fines shall be imposed where necessary. Special courts will, where necessary, be appointed to

ensure that wrong doers are promptly punished....

উপরে যে উল্লেখগুলো তুলে ধরাছি, তার সারমর্ম দিচ্ছি:

"ক" ধারার মূখ্যবাক্যে বলা হয়েছে:

"ভারত ও পাকিস্তান সরকার-দ্বয় আন্তরিকতার সাথেই একমত হয়ে ঘোষণা করছেন যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণ নাগরিকত্ব দেবেন; তাদের তাদের ধর্ম-প্রাণ ও ব্যক্তিগত মান-সম্মান ও কৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপত্তা, নিজ নিজ দেশে ইচ্ছামতভাবে চলে-ফিরে বেড়ান ও নিজ নিজ ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্য, পূজা-পার্বণ-উপাসনা প্রভৃতি করার ও ন্যায়-নীতি এবং আইনের মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের নিরাপত্তাও দেবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকের মত সমানভাবেই সাধারণ নাগরিক জীবন-যাপনের, রাজনৈতিক বা যে কোনও রূপই হোক না কেন সকলরকম পদেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং দেশের সামরিক ও অ-সামরিক সকলরকম কাজেই যোগ দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। উভয় সরকারই উপরে বর্ণিত এই সব অধিকারকেই নাগরিক জীবনের অত্যাৱশ্যক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন এবং তার পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন যে এই সব অধিকারই ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও জানান যে, এই সমস্ত অধিকারই পাকিস্তানের সংবিধান-গঠনকারী সভা সংবিধানের আদর্শ হিসাবে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে আগেই ঘোষণা করেছেন, (তখনও পাকিস্তানের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয় নি)। এই দুই সরকারেরই (ভারত ও পাকিস্তান) এটাই নীতি যে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগে অধিকার নিজ নিজ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককেই কোনওরূপ ভারতম্য না করেই দেওয়া হবে।"

উপরের এই পবিত্র (১) ঘোষণারই "খ" ধারার ৬নং উপ-ধারায় এবং "গ" ধারায় ১নং ও ২নং উপ-ধারায় যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মর্ম তুলে ধরাছি:

"খ" (৬): যে ব্যক্তি দেশ ছেড়ে বাস্তুত্যাগী হয়ে অপর দেশে চলে গিয়েছেন এবং আব ফিরে আসতে চান না, তার স্বাবর সম্পত্তি যা তাঁর পূর্বতন দেশে ফেলে গিয়েছেন তার উপরও তার পূর্ণ স্বাধীন স্বীকার করে নিয়ে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথেষ্ট

বিক্রি করার বা অপর দেশের বাস্তু-ত্যাগেচ্ছা লোকের ভূ-সম্পত্তির সাথে হেওয়াজ বদলের পূর্ণ অধিকার তাঁকে দেওয়া হবে।

"গ" ধারায় ১নং ও ২নং উপ-ধারায় ঘোষণা করা হয় যে:

"পাকিস্তানের পূর্বরূপ, ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যতে যাতে আর এরূপ ঘটনা না ঘটে পারে তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, উভয় সরকারই করবেন এবং যেখানেই দেখা যাবে যে, কোন ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম-সম্পত্তির উপর আক্রমণ করেছে, তাঁকেই শাস্তি দেওয়া হবে; প্রয়োজন বোধে সেই ক্ষমতা পাইকারী করা যাবে বা বিশেষ আদালত গঠন করে অপরাধীকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হবে। এটাও উভয় সরকারই ঘোষণা করছেন।"

এখন দেখা যাক, এই পবিত্র চুক্তির মর্যাদা ভারত ও পাকিস্তান সরকার কেমন-ভাবে রক্ষা করেছেন।

ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে সমান মর্যাদাই ভোগ করছেন এবং উচ্চস্তরের রাজনৈতিক পদ-সাজেও তাদের পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেইরূপ পদও লাভ করছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে এবং তা' দেওয়া যায়। সব তলে ধরতে গেলে 'অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত' হয়ে যাবে; নুতরাং সৈদিক দিয়ে না গিয়ে শুধু একটি মাত্র উদাহরণই এখানে তুলে ধরাছি। সম্প্রতি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পদের (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 'প্রেসিডেন্ট' পদের) নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এই পদের জন্য দুইজন প্রার্থী ছিলেন; একজন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একজন হিন্দু—শ্রীসুখা রাও, আর অপরজন ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মুসলমান—ডঃ জাকির হোসেন। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডঃ জাকির হোসেন সাহেবই 'প্রেসিডেন্ট' নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের সংবিধানেও কোন বাধা হয় নি, জনমতও তাতে কোনও বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে নি (যদিও ভোটারের সংখ্যা বিপুলভাবে অধিক সংখ্যকই ছিলেন হিন্দু)। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তিতে যে কথা বলেছিলেন, ভারতের জনগণই সে কথার মর্যাদা পরিপূর্ণভাবেই রক্ষা করেছেন।

কিন্তু পাকিস্তান? পাকিস্তান তার আদর্শবাদের প্রস্তাবকে নস্যাত করে দিয়ে তার সংবিধানে নির্দ্বন্দ্বভাবে ঘোষণা করেছে যে, কোনও অ-মুসলমানই

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থাৎ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের 'প্রেসিডেন্ট' হতে পারবেন না। মুসলিম লীগের আমলে ঐ সংবিধান তৈরি হয়েছিল। তার পরে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব ইক্ষান্দার মীরজা সংবিধান বাতিল করে দেন। জনাব আব্দু খাঁ সাহেবের সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষে, একটা সংবিধানও আব্দু খাঁ সাহেব ফরমায়ের মত করিয়েছেন এবং সেই সংবিধানানুযায়ী একটা আব্দু খাঁ গণতন্ত্র (!)-ও (মৌলিক গণতন্ত্র!) তিনি করেছেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নারক বদল হয়েছে। সংবিধানও বদল হয়েছে কিন্তু অ-মুসলমান যে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না, সেটা কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানে ঠিকই আছে। কোনও অ-মুসলমানই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের 'প্রেসিডেন্ট' হনও নি—কখন হতেও পারবেন না। সংবিধানেরই বাধা। এটাই দিল্লী-চুক্তির ঘোষিত সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান অধিকারের পবিত্র ঘোষণা।

তার পরে, ভারতে রাজনৈতিক পদে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় সকল রকম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকই জনকেই আছেন কিন্তু পাকিস্তানে পরবর্তীকালে মাত্র একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দু কর্মচারী কর্মায় রাষ্ট্রদূত হয়েছেন। তা-ও সবে ধন নীলমণি! সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও রাজনৈতিক নেতাই রাষ্ট্রদূতের মর্যাদার পল পান নি।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান-ই যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমান, তা-ই শব্দ নয়। প্রধানমন্ত্রীর পদের পরেই মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী। সেই পদটিতেও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই আর একজন বিশিষ্ট মুসলমান—জনাব এম. সি. চাগলা। প্রতিরক্ষা বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই আর একজন সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের নেতা সদীর শরণ সিং। শাসন ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে শিল্পবিভাগ। এই বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। তিনিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই একজন মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে যে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কার্যভার দেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারেরই যে পূর্ণ সমর্থন আছে, শব্দ তা-ই নয়—যে দেশকে পাকিস্তান সরকার দেশ-বিদেশে "হিন্দুস্থান" বলে প্রচার করে বিদেশের জনমতকে বরাবর বিভ্রান্ত করতে হানি প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন, সেই দেশেরই হিন্দু-প্রধান জনসাধারণেরও কিন্তু

ঐসব নিয়োগের পেছনে সমর্থন তো আছেই—কোন কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণ এই নিয়োগ সম্পর্কে আন্তরিক অভিনন্দনও জানিয়েছেন, যেমন জনাব মহম্মদ করিম চাগলা সম্পর্কে।

এখন একবার পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তির (যাকে বলা হয়, নেহরু-লিয়াকত চুক্তি) পরেও কিন্তু বর্তমানের পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট আব্দু খাঁ সাহেব মনোনীত মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তিকেই দেখা যায় না! যারা ভেতরের খবর জানেন, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে আব্দু খাঁ মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ না থাকলেও, তাতে আছেন এমন সব মাননীয় (!) ব্যক্তি যারা ভারত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বেষে ভরপুর। আমি নিজে যাদের চিনি ও জানি, এখানে কয়েকজনের নাম মাত্র উল্লেখ করছি: (১) জনাব আব্দুস সবুর খান, (২) জনাব সামসুদ্দোহা, (৩) খাজা সাহাবুদ্দিন। এই তিনটি নামের সাথে জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবের নামও যোগ দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁকে আমি না জানলেও করাচির 'ডান' (Dawn) পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাথে অপ্রত্যক্ষ পরিচয় অস্তিত আমার এবং ভারতের আরও বহু অধিবাসীর আছে। জনাব সবুর খান সাহেবকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি ও জানি। তিনি মুসলিম

লীগের আমলে পূর্ববঙ্গ বিধানসভার লীগ-দলীয় সদস্য ছিলেন। তাঁর একদিনের বিধানসভার একটি বক্তৃতার স্বর ও মূর আজও আমার কানে বাজছে। সেই বক্তৃতার ভারত ও নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে তো তাঁর বঙ্গোপসংহারে তিনি দৃষ্ট সিংহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের "চলো, চলো, দিল্লী চলো"—গজ্ঞানের অকম অনুরোধে "আওয়াজ" তুলেছিলেন। এই ভুললোকই আব্দু খাঁ সাহেবের সামরিক শাসনের আমলে একজন মাজে-রারী হিন্দু বহু লক্ষ টাকার একটি ব্যবসায়ী শ্রুতি গ্রাস করেন নি, সরকারকে কয় কাকি দেওয়ার জন্য হিসাবের সব খাতাপত্র পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর ঐ দুর্নীতিপূর্ণ কাজ ধরা পড়ে এবং বিচারে তাঁর ছয় মাসের কারাদণ্ডও হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আব্দু খাঁ সাহেবের 'লেক-নজরে' পড়েন ও তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন! আব্দু খাঁ সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেই তিনি ১৯৫৩ সালের যশোর, খুলনা ও ঢাকা জেলার ব্যাপক হিন্দু-হত্যার প্রধান 'প্লোরোইডের' ভূমিকা নিয়ে পাকিস্তানের হিন্দু ও ভারতের জনসাধারণের কাছে কুখ্যাতি অর্জন করলেও, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আব্দু খাঁ সাহেব তাঁর যৌগাত্মক নিদর্শন-স্বরূপ নিশ্চয়ই সুখ্যাতিই পেয়ে থাকবেন।

[কমপ্লি]

। গান্ধী স্মারক'নিধির কী

বাহির হইল
মহাত্মা গান্ধীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ
আত্মকথা
বা
সত্যের প্রকাশ

সত্যনিষ্ঠায় ও অকপট স্বীকারোক্তিতে যে গ্রন্থের কোনো তুলনা নাই, আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিচারের প্রতিটি স্তরে যে গ্রন্থের মূকুরে স্বচ্ছ রশ্মির ন্যায় প্রতিফলিত, সমগ্র বিশ্ব-জীবনীসাহিত্যে যে গ্রন্থ ইতোমধ্যেই ক্লাসিক-এর মর্যাদা লাভ করিয়াছে, মহাত্মাজীর সেট প্রসিদ্ধ আত্মজীবনীর সচিত্র নূতন বাংলা সংস্করণ।

মূল গুজরাটী হইতে অনূদিত

অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

মূল্য : ১২-০০

আমাদের সম্পূর্ণ পুস্তকভালিকার জন্য পত্র লিখুন

প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক'নিধি, বাংলা

১২টি, পুস্তক ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৪-৩৩৬১

বঙ্গদেশে মিলন এক এদেশ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সমস্ত বুদ্ধির সমস্যা—তা সহজই হোক বা জটিলই হোক, সাদা-সিধাই হোক বা সূক্ষ্মই হোক—আসলে হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট বা প্রাথমিক ধাক্কা, যার বেগে লেখক লিখতে শুরু করেন—পরে হয়তো এসব প্রশ্ন পেছনে পড়ে থাকে। কিন্তু এরা আমাদের যাত্রা শুরু করবার, পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং পৃথক-পৃথকভাবে বিচার-বিবেচনার কাজ গ্রহণ করবার সহায়ক—শেষ ফল কি হবে তা অবশ্য আমরা জানি না। নীতিবাচক সাহিত্যিকেরা আগে থেকেই তাঁদের সাহিত্যপথের ভ্রমণ-ভালিকা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন।

‘আবিষ্কার করাটা’ অবশ্য তাঁদের কর্তব্যের ভেতর নয়—কারণ অন্য লোকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং আবিষ্কারগুলোরই তাঁরা পুনরাবৃত্তি করেন। আগে থেকেই যা জানা আছে—যা রেভাইভ তাই নিয়েই তাঁদের কাজ। পরের ভ্রমণ-বিবরণ এবং আবিষ্কার সম্বন্ধেই যখন তাঁরা আলোচনা করেন—তখন তাঁদের এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণের কোন আবশ্যকতাই নেই। এ ধরনের সাহিত্যিকের সত্যিই দেবার মত কিছু থাকে না। সাহিত্যিকের দলে এরা অনাবশ্যক সংখ্যাতিরতির দলে—বাহুল্যের মত। নিজেদের উপলব্ধিত

অভিজ্ঞতাকে এঁরা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন না—কারণ সত্যিকার অভিজ্ঞতা বলে কোন কিছু এঁদের থাকে না।

জীবনের আগে মনে প্রশ্ন আসাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। যে সাহিত্যিকেরা নীতিমূলক বা রাজনীতিমূলক রচনা করেন, তাঁরা জোর করে আগে থেকেই কতগুলো উত্তর আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চান—প্রশ্নের কথা ওঠে এর পরে—সেই জন্যই এঁদের কাছ থেকে প্রাণবেগ-পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। ধরুন একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হল—উত্তর আমরা পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তর পাওয়া বা না-পাওয়াটাই বড় কথা নয়।

যিনি প্রশ্ন তুললেন এবং সঙ্গে আবার উত্তরও যোগালেন, এবং যিনি শুধু প্রশ্ন উত্থাপন করেই কান্ত, দুঃখেরই সাহিত্যিক অস্তিত্ব মেনে নেন পাঠকের। লেখার ওজন দিয়েই এঁদের রচনার মূল্য যাচাই করা হয়। রচনা জীবন্ত কি না এবং কতটা জীবন্ত সেটাই আসল বিচার।

A work—a play, for instance—is not a questionnaire with questions and answers.

সত্যের, সাহিত্যিক রচনা—যথা উপন্যাস, ছোট গল্প, কাব্যতা, স্মৃতিচারণ, প্রবন্ধ, সিনারিও বা নাটক—করতে হলে একটা সহজ পূর্ণ লেখকের ঝাকা দরকার—অর্থাৎ আন্তরিকতা। বস্তুর আন্তরিক হলে আপনা থেকেই বোকা যায় এবং সহজেই মর্মস্পর্শী হয়। সোজা কথার বলতে হয় আন্তরিকতার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। অবশ্য লেখকের কথা কানে গেলেও সে কথা যে অনুধাবন করা হবে তার কোন মানে নেই। বরং প্রথমবার এর উল্টো দিকটাই দেখা যায়। যখন লেখক এমন কিছু বলবেন বা সবাদক দিয়ে সত্য—অর্থাৎ যে সত্য তাঁর অনুভূতিমূলক, এবং অভিজ্ঞতামূলক, তখন পাঠক তাঁকে বিশ্বাস করবে না বা বিশ্বাস করতে চাইবে না। অথবা এমনও হতে পারে যে, সময় সময় মনে হয় ঐ সত্যের প্রকাশযোগ্যতা নেই, ওটি অতি সাধারণ এবং শূন্যগত। শব্দত সত্যকে লোকে সহজে বুঝতে পারে না, চোখে অন্ধকার দেখে। এখন পর্যন্ত দেখতে পায় না বটে—তবে পরে নিশ্চয় এক সময় দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে। যা সত্য এবং যার ভেতর কৃষ্ণতা নেই—তাকে ঠিক সাধারণের শ্রেণীতে ফেলা যায় না—তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মিথ্যা জিনিষটো অতি-সাধারণের সমস্তকে।

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের মত কল্যাণশীল এবং কথাশীলপণীও আন্তরিকতার সঙ্গে গবেষণা এবং পৃথক-পৃথকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সত্যকে আবিষ্কার করেন, তাঁর নিজ-স্বস্বাধীন সত্য বা আসল বাস্তবকে, অবশ্য এই বাস্তবতা কিন্তু অপ্ৰত্যাশিত, তাঁর নিজের দিক থেকেও এ যেন একটা আবিষ্কার। এই বাস্তবতার ভেতর গুরুত্ব থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। সে বাই হোক এটা সব সময়েই অপ্ৰত্যাশিত এবং অশান্তিপূর্ণ। সাধারণভাবে এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সবাই একে অস্বীকার করতে চায়; কারণ জনসাধারণের মনোভাব হচ্ছে যে অকথ্য যে জ্ঞান নিয়ে আছি তাই নিয়েই সুষে থাকা ভাল। নতুনের প্রচেষ্টা করে আবিষ্কারের দ্বারা মনকে ব্যতিব্যস্ত করে লাভ কি? বাই হোক, হত বাধাই আসুক, সত্য আবিষ্কারের পর শিশুণী ক্রমশ নিজের পরিবর্তিত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত লোকে তাঁর কথার কান দিতে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়, তাঁর সম্বন্ধে হাসিঠাট্টার পালটা শেষ করে, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনে, তাঁর কথার প্রতি মূল্য দিতে থাকে। তারা বুঝতে পারে যাকে নকল এবং কৃত্রিম মনে করেছিল সেটা আসলে সত্য। ক্রমশ এই উপলব্ধি তাদের ভেতর আসে যে লেখক নতুন

সত্যিক কল্পনা

কল্পিতরূপ থেকে রিয়ালকে দেখছেন, রিয়ালের পার্থক্যে তিনি কল্পিতরূপে করছেন এবং গভীর দিচ্ছেন। শিল্পী নিয়ে ভাবেন তিনি উদ্ভাবক, আসলে তিনি আবিষ্কারক। যাকে তিনি মনে করছিলেন তাঁর কল্পনাপ্রসঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট, আসলে সেটা ছিল অবজ্ঞাক্রান্ত রিয়ালিটি—আর এ সত্যকে অন্য লোকে বুঝবেই বুঝবে এবং তখন আর তাদের একে মনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। এই অবস্থার অর্থটি যখন তারা এই বাস্তব সত্যকে চিনতে পারবে, তারপর তাদের মনে হবে এ সত্যকে তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। এর সূত্রে তাদের পরিচয় চিরকালের। এইবার তারা ভাবতে থাকে যে এই নতুন সত্যটি অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

Strangeness becomes normality, the incomprehensible becomes clear, the impossible is taken for granted.

লেখকের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং আবিষ্কৃত নতুন জগৎকে পরিহার করে চলা যায় না। সমগ্ররূপ একে গ্রহণ করে নেয়, নিজের করে নেয়।

And often the novel truth then appears in its true light as a forgotten one, as a world that had been concealed and is now again revealed to the view.

তারপর একে এত স্বাভাবিক করে দেয় মনে হয় এ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। এ নিয়ে পরে নানা ধরনের লেখ্য এবং লেখকগণের বই প্রকাশিত হতে থাকে—এতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা থাকে লেখকের অবদান সর্বশেষ। এ লেখার বিশ্লেষণ করা হয়, হরফে মজারি গ্রন্থ-লেখক নয় বলে হয়। কেউ কেউ বলেন লেখক বা প্রমাণ করতে চান তার পেছনে ন্যায়শাস্ত্রাদিতে কোন যুক্তি নেই। আবার কারোর কারোর মতে লেখকের গ্রন্থিক বা ওদিক নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল এই সব ধরনের মতবাদও দেওয়া হয়। অতীত সমালোচকেরা নিজেরা কেউভাবে ভাবেন যা বেইভারে ভাষা দেন সেই অমসৌহার্য লেখককে পরিচালিত করতে চান।

আমি নিয়ে যতটা লিখেছি, পরিমাণের দিক থেকে তার থেকে অনেক বেশি লেখা হয়েছে আমার রচনা সম্বন্ধে। এই সব ভাষা বা আমার রচনা সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে—তা এত শিক্ষামূলক যে আমার যদি ভাষা স্মরণশক্তি এবং methodical mind হোত তাহলে আমার কাজের উপরই আমি ডক্টরেটের

খিসিস লিখতে পারতাম। আমার সমালোচকেরা কোন কল্পনাত্মক-সামাজিক পরিবেশে জীবনযাপন করেন, তাই নিয়েই বুঝে ফেলেন সামাজিক একটি খিসিস আমি রচনা করতে পারি। আরও কথা হচ্ছে অনেক রচনারই বিকৃত ভাষা দিয়ে থাকেন ভাষা-লেখকরা। এসব পড়ে মনে হবে মনে রচনা কোন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলছেন (কেননা কোনও রচনার যদি নিজের সত্তা ছাড়া অন্য কোন ভাষা না থাকে তাহলে সে রচনাত্মক হলো যে কতটা জা ত্রো মজারই অমমেন করা যায়)—তবে অনেক আমার রচনা সম্বন্ধে যা ভাষা লেখে তাই কি শব্দসম গ্রহণীয়? যদি সমালোচকের সামাজিক পটভূমি জানতে পারি, বা তিনি এমন কালের কাগজ বা মাধ্যমিকের লেখক বুঝতে পারি, তাহলে আমি আগেই বলে দিতে পারি আমার নতুন নাটক তিনি পছন্দ করবেন, কি করবেন না। তেমনি আমার নাটকের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা দেখে আমি সমালোচক কোন রাজনীতিক দলের বা তাঁর আদর্শবাদ কি ভাও খরে ফেলতে পারি। অতি মজারই আমি তাই মৈত্রিক দিক এবং বুদ্ধিমত্তার দিকের একটা স্পষ্ট স্কেচ দিতে পারি।

আসল কথা হচ্ছে, রচনা নতুন হতে পারে—কিন্তু যে সব নিয়মকানুন খাতির করে বিচার করা হয় সেগুলো হরফে পরিচয়—attitudes are pre-determined, rigid, সুতরাং সমালোচনার আইনগত বদলানো না পর্যন্ত নতুন

ভাষার রচনার প্রকৃত বিচার হওয়া মুশকিল।

লেখক অনেক অনেক উপর তাঁর রচনার প্রতিভা নিয়ে বিশ্বাসিত হন। অবশ্য এতে তাঁর ভাষাই আগে, ভাল ভাষা এই কারণে যে, আন্তরিকতার সঙ্গে লিখলেও সে আন্তরিকতার ভেতর অস্বস্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি—নিজেকেও নিয়ে ঠিকিয়েছেন কি না এ বিষয়ে মনে দ্বিধা ছিল। আমার মনে হয় আমি বেশ পরিশ্রমের সাথে যোগাতে পেরেছি যে, নতুনই হচ্ছে আন্তরিকতা এবং সত্যের নিখারক। যা মৌলিক, তাই সত্য। অন্যান্য লেখার সঙ্গে যার মিল দেখা যায় তা মিথ্যা কারণ গভীর মৌলিকতা হচ্ছে মৌলিক মিথ্যারূপে। আন্তরিকতা এবং সত্যের সঙ্গে আসল কাজ থেকে শেখা যায় না।

A parrot is not sincere. What it says does not concern it, remains incomprehensible to it.

The artist, in his profound subjectiveness, is essentially objective.

সেই কারণেই তিনি একই সত্যকে পুরাতন এবং নতুন, অর্থটি পরিচিত এবং অপরিচিত। ঠিক একই কথা সমালোচনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমালোচক যখন রচনাকে নতুনভাবে, আন্তরিকভাবে এবং অবজ্ঞাক্রান্ত ভাষায়

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫৫

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের এগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমাজ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বৈজ্ঞানিক - জীবনগত - পোহাজী



বঙ্গীয় নাট্য সংসদ কর্তৃক অভিনীত 'গম্ভীর' নাটকের একটি দৃশ্য

করবেন তখনই তিনি তাঁর কাজ সঠিক-ভাবে সম্পন্ন করেন।

খালি অবজেকটিভ হলেই চলবে না—যেমন রচয়িতা শুদ্ধ সাবজেকটিভ হলেই রচনার মান উচ্চস্তরে উঠতে পারে না। যারাপ সমালোচক হচ্ছেন উৎসাহিত প্রকৃতির—যিনি অন্যায়ভাবে রচনার দোষত্রুটি খুঁজে বের করতে চান—একটা উচ্চস্তর থেকে লেখার আলোচনার প্রবৃত্তি হন। শুল্কমাস্টারী টং-এ বিচার করতে না বসে, সমালোচকের মনের ভণিগটা হওয়া দরকার ছাত্রজনোচিত—যেমন রচনা থেকে যা কিছু শিক্ষণীয় তাকে গ্রহণ করতে এসেছেন।

নিজেকে প্রতিভাত করা এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখা দুটোই শব্দ জিনিস। বিচারের নিয়ম বা মাপকাঠি থাকলেই অবজেকটিভ হওয়া যায় না। আর এত রকমের বিচারের মাপজোক আছে যে,

ভাতেও সব কিছু গুলিয়ে যায়। এমন ধরনের সমালোচনাও হতে পারে যাতে বিচারের আইনকানুন বা মাপকাঠি কিছুই থাকে না। রচনার বর্ণনাত্মক ব্যাখ্যাও এক ধরনের সমালোচনা। এ জাতীয় সমালোচনার, রচনার নিজস্ব স্বাধীনতা অনুধাবনই এর ব্যাখ্যা করা হয়। একে হয়তো ঠিক বিচার বলা চলে না—এর প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। সমালোচকেরা দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক নীতিজ্ঞ বা সমাজ-তত্ত্ববিদ হতে পারেন—কিন্তু যৌদিক থেকে বিশেষ বিশেষভাবে তাঁরা লেখার বিচার করেন তাকে ঠিক সমালোচনার আইনানু-মোদিত কাজ বলা চলে না—সে কাজ অন্য স্তরের।

It is not criticism of the work; it is something different.

যে সমালোচক রচনার বর্ণনা করেন—অর্থাৎ যিনি ধাপে ধাপে লেখার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যান তিনিই সত্যিকার রচনার উপর আলোক-সম্পাত করতে পারেন—আর লেখার মূল্যমূল্য বিচারে এটারই সব থেকে বেশি দরকার।

লিখতে বসে লেখক সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে মনে মনে বিচার, বিবেচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতে থাকে। ক্রিটিকের কাজ

হচ্ছে কবির ভ্রমণ-তালিকার পুনর্বর্ণনা করা। অনেক সময় কবি তাঁর রচনার পথে এগিয়ে চলেন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বা গোথলির আলোয়। সেই তাঁর যাত্রাপথটাকে আলোর আলোকিত করাই হচ্ছে সমালোচকের কাজ। আমি আগেই বলেছি সাহিত্যিকের কাজটা যেন অট্টালিকা নির্মাণের মত। এ অট্টালিকা খুব মজবুতভাবে তৈরি করা দরকার। সমালোচকের কাজ হল এই সব দিকে নজর রাখা—ছাদটায় যেন কোন ফুটো না থাকে, সিঁড়ি যেন না ভেঙে পড়ে। দরজা-গুলো যেন বন্ধ করে রাখা হয়, কতক-গুলো যের যেন প্রবেশাধিকার না থাকে ইত্যাদি।

কবি যখন লিখতে থাকবেন তখন তাঁর অন্য সবরকমের সাহিত্য ভুলে থাকা উচিত। সমালোচকের কিন্তু অন্য সব ধরনের সাহিত্যের কথা স্মরণে রাখা দরকার—তাহলেই তিনি বলতে পারবেন কবির সৃষ্টি পুনরনুষ্ঠিতের পর্যায় পড়ে কি না। পুনরাবৃত্তি না হলেই যে কবির রচনা জ্ঞাত সীমানার বাইরের জিনিস একথাও সঠিক নয়। একটা সাধারণ নকশার ভেতর এটা পড়তে পারে—তবুও এর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—সেই হিসাবে এর একটা নিজস্ব বাস্তবতা থাকাও সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের বিশ্লেষণ কি সাহিত্যিক সমালোচনা? বরং একে সাহিত্যের ইতিহাস বা তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনা বলাই ভাল। যে সৃষ্টির বর্ণনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তাঁর রচনার ঘনিষ্ঠ আলোচনার সময়েও তিনি রচনাটি পছন্দ করেন বা অপছন্দ করেন, অথবা অন্য লেখার তুলনায় এটি তাঁর বেশি অনুমোদন পায় কি না—এসব কথা তিনি বলবেন না। কারণ এ ধরনের উজ্জ্বলতা তাঁর সাপেক্ষতার দিকটাই প্রকট হয়ে উঠবে—আর ব্যক্তিগত রুচির কথা নিয়ে তো তর্ক করা চলে না। বর্ণনার দিকটাই হওয়া উচিত তাঁর সমালোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু। এর থেকেই তাঁর মতবাদ পাওয়া যায়।

Criticism is the registering of the reality of a work, of its logic; it is a task of verification and confirmation.

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা কমিশনে বিখ্যাত "এসকর্ট" অল ওয়াল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার বিক্রেতার জন্য এজেন্ট আবশ্যক। সত্যাবলী এবং স্যাম্পেল ট্রানজিস্টারের জন্য পত্র লিখুন।



Jagee Co. (57),
Post Box 1115, Delhi-6

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের বীর যোদ্ধা জনন সিংহ মহাশয় তাঁর ‘অশ্বিন’ পত্রের একটি অধ্যায়’ ধারাবাহিক বিবরণীতে একের পর এক যে শৌর্য-বীর্যের কথা স্মরণে লেখনীর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলছেন—তার তুলনা বোধ করি যুব কমই আছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই বিবরণী পাঠ করে আমরা কি পাচ্ছি, কি শিখি? স্বাধীনতা লাভ করার জন্য তৎকালীন সংগ্রামী বাংলার যুবকবৃন্দ জীবন-মৃত্যুকে পারের ভূতা করে নিঃশঙ্কচিত্তে একের পর এক দুঃসাহসিক কাজ করেছে। আজ বিশ বছর হয়ে গেল আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আত্মত্বের কথা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা কেন কেমন গিইয়ে গেলাম, তার অল্প প্রমাণ নানা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে ধরনের এক-একটা সংগঠনী শক্তি ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর তা আর দেখা যায় না। এখন দেখা যায় পার্টিতে পার্টিতে মল্লযুদ্ধ।

জনন সিংহ মহাশয়ের বিবরণী পড়ে মনে হয় না তিনি নিছক গল্পের খাত্তরে এই বিবরণী লিখছেন। তাঁর এই বিবরণী পড়ে আমার মনে হয়েছে যে তিনি বর্তমান বাংলার যুবকবৃন্দকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের উজ্জীবিত করার অভিপ্রায় এতে ব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যুবক পাঠকগণ একে ছরত নিছক বিবরণী বলেই পাঠ করে থাকেন। জানি না ভুল বলাই কি না। কিন্তু আমার কাছে এই অধ্যায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার চাবিকাঠি ও পথপ্রদর্শক।

—দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
রাণী পার্ক, কলি-৫৬।

* * *

১৭ই আগস্টের “সাপ্তাহিক বসুমতী” আমার হাতে এল। প্রথমেই চোখে পড়ল সবশ্রী বিবেকানন্দ গ্রন্থোপাধ্যায়-এর “দল ভাঙ্গের রাজনীতি না দুনীতি”। বিবেকানন্দবাবুর লেখা চিরদিন স্বস্তি-পূর্ণ। এখন তিনি যে প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন তা কেবল ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান সমস্যা নয়, আজ নাগরিকদেরও একটি মূল সমস্যা, এবং সকলেই এ-নিরে অল্প-বিস্তর চিন্তা করছেন। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্রগুলির কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সাপ্তাহিক বসুমতীর এই লেখাটি সবাইকে আনন্দ দেবে। ২২শে জুলাই ১৯৬৭-তে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ধরনের কথা লিখে জানিয়েছিলাম, এবং তাঁকে অনুদ্রোহ করেছিলাম—তিনি যেন দল-ভাঙ্গীদের পুনর্নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত



মণ্ডলীর সভ্য থাকার ওপর সুপ্রীম কোর্টের রুল দান করার ব্যবস্থা করবেন, কারণ এটা জনস্বার্থের পরিপন্থী।

এর আর একটি দিক আছে সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। ভারতে দলীয় রাজনীতি প্রচলিত আছে। নির্বাচনের সময় প্রতি দলের একটি কর্মসূচী এবং নির্বাচনীচিহ্ন বা প্রতীক থাকে। এটা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, দলের প্রতি সদস্যের। এর ওপর প্রতি দলের আনুগত্য থাকে। সেই জন্য দলের কোন প্রার্থীর নিজস্ব চিহ্ন বা নাম ব্যালট বাজের ওপর থাকে না। এতে প্রমাণ হয় ভোট দলের ব্যক্তির নয়। কিন্তু নির্দলীয় সদস্যের নিজস্ব কর্মসূচী এবং চিহ্ন থাকে। এখন ব্যক্তিকে দেখে লোকে ভোট দেয়। তাই নির্বাচিত সদস্য সরকারী দলে যোগ দিতে পারেন অথবা বিরোধী দলে।

দলভাঙ্গার পুনর্নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব দলের সমর্থকদের প্রতি-নির্ভর কিভাবে করেন? এটা আইনত শব্দে দুনীতি নয়, জলম। আমরা সকলেই বিবেকানন্দবাবুর সঙ্গে একমত। আজ এর ফলে গণতন্ত্র বিপন্ন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন সরকার সুস্থভাবে কাজ করতে পারছেন না সকলেই সকলকে সন্দেহ করেন। তাঁরা জনতাকে ভয় করেন না কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে সব সুবিধাবাদী দুনীতিপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, তাঁদের থেকে সাবধান হবার চেষ্টা করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি দলের জনমত গঠন করা উচিত।

—ডাঃ প্রজাত সরকার
গোমিয়া (হাজারীবাগ)

কোনও থেকে মাঝে মাঝে যে সব উচ্চারণ ও তথ্য প্রচার করা হয়, তার আগে

একবার করে বলে দিলে বোধহয় ভাল হয় যে, “প্রোভারা দ্বারা করে আমাদের তথ্য ও উচ্চারণকে যদি নির্ভুল মনে না করেন তা’ হলে বাধিত হব। এবং এর উপর কেউ গুরুত্ব আরোপ করে ভারত সরকারকে বিরত করবেন না।”

গত ২০শে অগস্ট ও ২৪শে অগস্ট—এই দু’দিনই রাত ১০টার সংবাদ পরিচরমায় চিরশ্রীচিত “রেনেসাঁ” শব্দটিকে উচ্চারণ করা হল “রেনেসাঁ”!

২০শে অগস্ট সংবাদ সমীক্ষার বলা হল “ফাইলোরিয়া রোগ।”—কিন্তু ফাইলোরিয়া কি একটি রোগ? ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট কি একটা রোগ? টিউবারকুলাম কি একটা রোগ? কমাব্যাসিলাস কি একটা রোগ? এক কথাই কেনো রোগের জীবাণু কি একটা রোগ? ডাক্তাররা অবশ্য তা বলেন না। তাঁরা ফাইলোরিয়াসিসকে রোগ বলেন, ম্যালেরিয়াকে রোগ বলেন, টিউবারকুলামসিসকে রোগ বলেন, কলেরাকে রোগ বলেন। অর্থাৎ আমের অর্ধিকে আমগাছ বলেন না। কিন্তু রেডিওতে বলতে বাধা দিয়ে কে? ইতি—

—জনৈক কাল্‌জমান জোজ

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বার্ষিক	টাকা (মাত্র)	১৪-০০
ত্রৈমাসিক	" "	৭-০০
মাসিক	" "	৩-৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপনাকে জরুরী প্রমাণ দিতে অথবা মনিজমদীকে পাঠাতে হবে।

—কর্মসূচী

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুদ্রোহ করা যাচ্ছে

যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানা সহ ডাকটিকিটসহ খাম থাকলে এক্ষণে মনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

স্বপ্নজ্যোত

ঋত্বিক ঘটকের ছবি

সম্প্রতি কলকাতা এবং বোম্বাইতে ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ফাইন আর্টস একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে, বোম্বাইয়ের উৎসব মেরিনগার্ডের তারাবাস্টে হলে। চলচ্চিত্র-আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের দিক থেকে কলকাতার তুলনায় বোম্বাইয়ের উৎসবকে অধিক সার্থক বলা চলে। উদ্যোক্তারা যেভাবে প্রচার এবং আয়োজন করেছেন—ইতিপূর্বে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কোন পরিচালকের ছবি নিয়ে এরূপ হয় নি। প্রমথেশ বড়ুয়া এবং বিমল রায়ের ছবির উৎসব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সৃষ্টিকাল খুব বেশি দিনের নয়, কিন্তু তাকে নিয়ে আলোচনা-আলোচনা, পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। প্রথম প্রথম সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়েও তুলনা আলোচনা হত। আজ সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে স্বীকৃত, সত্তরং বিরুদ্ধ আলোচনার তাপ স্তিমিত। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে এখনো দুই মতের লড়াই প্রবল। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল ‘কোমল গান্ধার’। ‘সুবর্ণরেখা’ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার গঠনশৈলী এবং শিল্পসৌন্দর্যের কথা সকলে স্বীকার করেছেন। সাধারণ দর্শকরা তাঁর ছবিকে কিছুটা জটিল মনে করেন, সত্তরং তাঁর সকল ছবি জনপ্রিয় হতে পারে নি। সমালোচক এবং বাস্তবজীবীদের একাংশ তাঁর রাজনৈতিক মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন, এবং তাঁর কোন ছবিই রাজনৈতিক বদ্ব্যবহীন নয়। এ কারণে কারো কারো কাছে তিনি অসহ্য। বিশেষ করে পণ্যচিত্রের ব্যাপারে তিনি খুব নিভর-শীল না হওয়ায় প্রযোজকদের সমর্থন তিনি আশানুরূপ পান না।

এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও ঋত্বিক ঘটক এ পর্যন্ত বহু ছবি করেছেন। তরুণ বয়সে তিনি গণনাট্য সম্বন্ধে সঙ্গো যুক্ত হয়েছিলেন। ফিল্মে আসেন ১৯৫০ সালে ‘তথ্যপিপ’র (পরিচালনা—মনোজ ডাট্টাচার্য) সহ-পরিচালক হিসাবে। ১৯৫১ সালে তাঁর নিজস্ব ছবি ‘বেদেনী’ (মুক্তিলাভ করে নি)। ১৯৫২ সালে পরিচালনা করেন ‘নাগরিক’ (মুক্তিলাভ করে নি) ১৯৫৮ সালে তাঁর ‘অযান্ত্রিক’ প্রথম মুক্তিলাভ করে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মতা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। ১৯৫৯ সালে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ মুক্তিলাভ করে; একই বছরে ‘কত অজানারে’ নির্মিত হয়েও মুক্তিলাভ করে নি। ১৯৬০ সালে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ বিষয়বস্তু এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে সার্থক বিবেচিত হয়। এই বছরেই ‘কোমল গান্ধার’ প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং দু-সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বিদায় নেয়। তাঁর ‘বগলার বগদর্শন’ কিছুদূর কাজ অগ্রসর হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরে ১৯৬৫ সালে মুক্তিলাভ করে ‘সুবর্ণ-রেখা’। বাস্তব দীপ্তিতে যে ছবি উজ্জ্বল, এবং বর্তমান বাংলাকে যেখানে অনুভব করা যায়। এই পূর্ণাঙ্গ ছবি ছাড়া ‘স্বপ্নজ্যোত’র ক্ষেত্রে তাঁর ‘সিজন’ (১৯৬০) ‘রঙিনজুজ’ (১৯৬৫), ‘ফিয়ার’ (১৯৬৫), এবং নিম্নীর্ণমাণ ‘সাইনটিস্ট অব টমরো’ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের কাহিনী অথবা সিনারিও লেখক হিসাবে তাঁর নাম মৃসারিক, মধুমতী, স্বরলিপি, কুমারীমিন, স্বীপের নাম টিয়ারড, বলিদান (মুক্তি পায় নি) এবং রাজকন্যার সঙ্গো যুক্ত। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে চোদ্দ-পনের বছর সময়ের মধ্যে তাঁর কাজের গুরুত্ব যথেষ্ট।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে বাংলার সাহিত্য যখন চোরাগলিতে আটকে পড়েছে, সে সময় সত্যজিৎ রায়ের মত ঋত্বিক ঘটকের ছবির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের মহৎ জীবিত্যের পরিপূর্ণ ঘটছে। শ্রীঘটক আরো স্পষ্ট, জরো সাহসের সঙ্গো বিভক্ত বাংলার অন্তরবস্তুরা, ভাঙা দেশে বাঙালী মেয়েদের কথা এবং ভূমিকাকে বড় প্রশংসনীয় করে তুলে ধরেছেন। অথচ সাহিত্যিকরা এই বাঙালী মেয়েদের ঝুঁজে বার করেছেন চৌরগারীর আলোপাশে, রেন্টুরেন্টে। সত্যনিষ্ঠার দিক থেকে সাহিত্যের তুলনায়—হাঁদের ছবি বর্তমান বাঙালী সমাজের কথা বলতে পেরেছে শ্রীঘটক সেই অগ্রগামীদের একজন। —সজল।



ঋত্বিক ঘটক

নাটকের কথা

ধ্রুব বহি

থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে গত ২২শে আগস্ট সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে ‘ধ্রুব বহি’ নাটক অভিনীত হয়েছে। কল্যাণ অমর শহীদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা পেট্রিস লুমুম্বার জীবনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীকালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। বেলজিয়াম প্রতীতি দেশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে সদ্যমুক্ত কল্যাণকে নতুনভাবে ঔপনিবেশিক দাসত্বের বন্ধনে বাঁধবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে অমিত সাহসে লড়েছিলেন লুমুম্বা। তাই লুমুম্বার নাম আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঋত্বিকসংগত-ভাবে ভারতের জনসামর্যের লুমুম্বার প্রতি প্রশ্রয়শীল, এবং তাঁর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছে। ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামে আফ্রিকার এই বীর নামকের জীবনী অবলম্বন করে থিয়েটার গ্রুপের এই নাট্যরূপ দেবার আগ্রহ অভিনন্দনীয়। সম্প্রতি আরো কয়েকটি নাট্যসংস্থা মুক্তি সংগ্রামের নায়কদের কেন্দ্র করে নাটক গুপ্তস্থ করতে অগ্রসর হয়েছেন। এরূপ প্রচেষ্টা বাংলার নাট্যক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। এই প্রচেষ্টায় হাজার হাজার দর্শক নাট্যরূপ উপভোগের সঙ্গো ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃংখলমুক্তির সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত হন এবং এতে আমাদের গণ-তন্ত্রের চেতনা আরো দৃঢ় হয়।

‘ধ্রুব বহি’ নাটকে নাট্যকার জেল জীবনের ওপর বেশি নিভর করেছেন। ফলে কিছু গতানুগতিক ঘটনা ও কথা এসে গেছে, যা আজকাল এ ধরনের প্রায় সব নাটকে দেখা যাচ্ছে। লুমুম্বার কথা

মাসিক বসন্ত

খুব বেশি দিনের নয়, সংবাদপত্রের পাঠকরা এখনো তাঁর নাটকীয়ভাবে জেল থেকে পলায়ন এবং শোস্বেবের হাতে মৃত্যুর কথা ভুলে যান নি। নাটকটির আরো রিহাসাল হওয়া, এবং উপস্থাপনা সম্পর্কে নাট্যকার ও পরিচালক নতুন করে চিন্তা করলে আরো কার্যকরী হতে পারে। নাটকটিতে আফ্রিকার পরিবেশোপযোগী সংগীত সংযোজন প্রয়োজন আছে। এ ধরনের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুসম্পন্ন নাটকে সংগীত বিশেষ রিলিফের কাজ করে।

আধুনিক নাটকে বিচ্ছিন্নতা

পাভলভ ইনস্টিটিউট 'আধুনিক নাটকে বিচ্ছিন্নতা' সম্পর্কে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। গত ২২শে আগস্ট এই আলোচনা সভার উন্মোচন হয়েছে শ্যামবাজার পার্ক ইনস্টিটিউট হলে। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর এই আলোচনার তৃতীয় অধিবেশন হবে।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

বাটানগর ২০শে আগস্ট (রবিবার) সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে উক্ত ক্লাবের সৌজন্যে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। আলো বাগচি (বজ্রসেন),



শেখপীরওয়াল হাবিতে দশী কাপ্তার ও মাদুর জাকার

উমা দত্ত (শ্যামা), সুতপা দত্ত (উত্তরী), অনুপশঙ্কর (কোটাল), নন্দিতা চক্রবর্তী (বন্দু), কৃষ্ণা রায় (আলারিপদ, নটরাজ বন্দনা—ভরতনাট্যম) নীরেন্দ্রনাথ ও অরুণা দে (তারকাসুর বধ—কথাকালি), কৃষ্ণা ঘোষ (কথক), সুচারিতা ঘোষ, মানসী ঘোষ, শেলী দাস, শ্রদ্ধা পাণ্ডুলী, মহুয়া ভৌমিক, মিতা হোপ (পাঞ্জাবী ভাষায়) দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। সহকারী নৃত্যপরিচালকরূপে ছিলেন অনুপশঙ্কর

ও স্বপ্না সেনগুপ্তা। সংগীত পরিচালনা করেন বিপুল ঘোষ। বন্দুসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অরবিন্দ মিত্র, ফেলু চন্দ, ডিল চন্দ প্রমুখ।

সুডিও থ্রু

মালয়ালি ছবি 'চেম্ন'

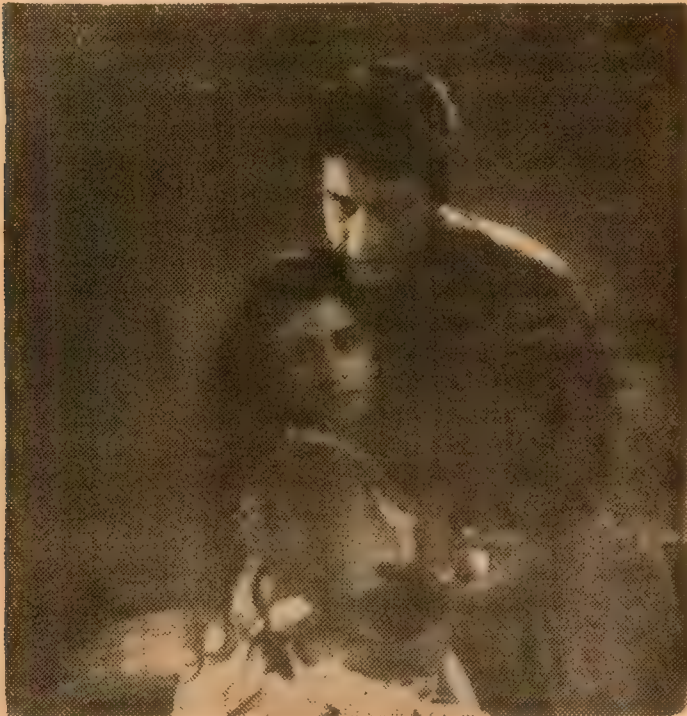
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'চেম্ন' ফেরালা ছাড়া ভারতের সর্বত্র পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে রাজশ্রী পিকচার্স। এই মালয়ালম ছবিটি ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। ছবিটি মালয়ালি ভাষায় হলেও মাদ্রাজ, বাঙ্গালার প্রভাব অঞ্চলেও জনপ্রিয় হয়েছে। ছবিটি বৃহত্তর ভাষা অসুবিধার সৃষ্টি করে না। 'চেম্ন'-এর দৃশ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে কেরালার পশ্চিম উপকূলে।

মারাঠি নাটকের চিত্ররূপ

রাজশ্রী পিকচার্স মারাঠি নাটক 'তম্বা' তো হি ধরুডাচি জুড়ির চলচ্চিত্র রূপে তৈরি করেছে। এই নাটকটির লেখক রাল কোলাত্‌কর; নাটকটি সম্মানানন্দ হলে ৫০৯ রজনী অভিনীত হয়েছে।

তর্কদীর

রাজশ্রী পিকচার্সের হিন্দী ছবি 'তর্কদীর' ছয়টি ভাষায় দীপালির সমস্ত মন্ত্রীভাষ্য করবে। প্রথমে ছবিটি কেরলার হিন্দীতে করা হয়েছিল। সম্প্রতি তামিল, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, অসমীয়া, ওড়িয়া ভাষায় ডাব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে।



উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত 'রত্নরেখা' বিজয়া চৌধুরী ও শ্রীভেন্দু চ্যাটার্জী



শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত "হৃদয়, প্রজাপতি" ছবিতে তনুজা

তিন অধ্যায়

অস্ফরা ফিল্মসের "তিন অধ্যায়" ছবির চিত্রগ্রহণ ছবিটির নামক উত্তমকুমারের অসুস্থতার জন্যে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর গত ২৬শে জুলাই থেকে আবার পুনরায় শুরু হয়েছে। শৈলেশ দে রচিত একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। সম্প্রতি মাদ্রাসা দেবী গাওয়া কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী ছবিটির নামক-নামিকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—অনুপকুমার, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, ছায়া দেবী, ছন্দা দেবী, বসন্ত খোন্স, বিদ্যা রাও, সীতা মুখার্জী, ধীরেন ব্যানার্জী, সদানন্দ চক্রবর্তী, বিদিশা চৌধুরী, মিতা দত্ত, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, মীরা ব্যানার্জী, মাঃ জয়দীপ এবং সুপর্ণা সেন। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন বথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ নামক, এবং প্রসাদ মিত্র।

অস্ফরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

শেরপায়ের ওয়ালা

মার্শেট আইভার প্রোডাকশন্সের শেরপায়ের ওয়ালা ছবিটি আগামী ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির কাহিনী ও সংলাপ লিখেছিলেন

মিসেস আর পি জাভাওয়ালা। যুক্তরাজ্যের এক শেরপায়ের নাটক অভিনয়ের দলের ভারত পরিভ্রমণ এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে এই কাহিনী লিখিত। ছবিটি বালিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার বিয়ার লাভ করেছে, এবং ইউরোপ আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিতে অভিনয়ে আছেন : শশী কাপুর, ফেলিসিটি কেম্ভল, মধুর জাফরি, জিওপ্রে কেম্ভল, জেনিফার কাপুর, উৎপল দত্ত। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জেমস আইভার। গুডউইন পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি লাভ করবে।

অনুবাদকণী

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র উৎসব

বোম্বাইতে ফিল্ম ফোরামের উদ্যোগে গত ১৭ই থেকে ২০শে জুলাই ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবস্থান ছিল মেরিন ড্রাইভের তারাবাগি হল। অবান্তিক, মেঘেচাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা ছবি উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর ছবি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ এই

পুস্তিকা লেখা এবং সজ্জার দিক থেকে বিশেষ আকর্ষণীয়। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র চিন্তার কয়েকটি প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকারে এই পুস্তিকা চলচ্চিত্র-আগ্রহীদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হবার যোগ্য। ঋত্বিক ঘটক বাংলার মানুষ, অথচ বাংলার এরূপ পুস্তিকা কখনো প্রকাশিত হয় নি। কেবল ঋত্বিক ঘটক নয়, সত্যজিৎ রায় বা অন্য কোন পরিচালকের চলচ্চিত্র চিন্তাসম্পন্ন এমন পুস্তিকা প্রকাশিত হয় নি। এদিক থেকে ফিল্ম ফোরাম একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেছেন অরুণ কাউল এবং বান্দু চ্যাটার্জী। তাঁরা এই কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদভাজন।

বাদ্যকর সম্মেলন

জুলাই মাসে এই সর্বপ্রথম পশ্চিম জার্মানিতে পৃথিবীর বাদ্যকরদের সম্মেলন হয়েছে। সাতাশটি দেশের প্রায় হাজারখানেক বাদ্যকর এই সম্মেলনে যোগ দেবেন ও রন্ধকক্ষে নতুন নতুন খেলা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবেন।

পশ্চিম জার্মানীর শ্রেষ্ঠ বাদ্যকর হলেন ইয়ুগেন উলফগ্রাম; অবশ্য বাদ্যমহলে তিনি মিস্টার ককস নামে পরিচিত। ১৯৬৪ সালে বারিসেলোনায়া বাদ্যকর সম্মেলনে "ইন্টারন্যাশানাল ম্যাজিক বার" খেলা দেখিয়ে তিনি বাদ্যসম্রাট উপাধি পেয়েছিলেন। বাদ্যর খেলা দেখানো মিস্টার ককসের শখ হলেও আসলে তিনি কাজ করেন চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমায়েস ধরায়। গুণী তরুণ বাদ্যকরদের ম্যাজিক শেখবার জন্যে হানবুর্গের কাছে তাঁর একটি স্কুল আছে।

নর্ব ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নর্ব ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে গত ২১শে ও ২২শে আগস্ট "ডায়মন্ড অব দি মাইট" এবং "দ্য টাই" দুটি চেকোস্লোভাক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ২৭শে আগস্ট সেখানে হয়েছে "অবান্তিক" (ঋত্বিক ঘটক)।

"বাদ্যকর সম্মেলন"

বাদ্যকর সংস্থা "বাদ্যকর" পশ্চিমবঙ্গ বাদ্যকর সম্মেলনের আয়োজন করেছেন সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। এই সম্মেলন থেকে সংগৃহীত সমস্ত টাকাই খরচা তহবিলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাদ্যকরগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। বিশেষ আকর্ষণ হবে বাদ্যকর দি গ্রেট সুশীলের বিচিত্র ইন্সট্রাল। এই সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা প্রচার সচিব, "বাদ্যকর" ১৫এ, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, কলিকাতা-২৫ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ইতিহাসের পাতা

২২

আলেকজান্দার ডবকেঙ্কা

সোভিয়েত সিনেমার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক—তার বহু জাতিক চরিত্র। অতীতে বিশ্ব দশকের দিকে সোভিয়েত ছবির সাফল্য কেবলমাত্র রুশীয় স্টুডিওতে নয়, উক্রেইনিয়ান, জার্মান, এবং আরো অন্যান্য স্টুডিওতে প্রতিফলিত হয়েছে।

উক্রেইনিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টর আলেকজান্দার ডবকেঙ্কা সোভিয়েত শিপের উপর গভীর রেখাপাত করেন। তিনি জন্মেছিলেন উক্রেইনিয়ার কুবক পরিবারে; বহু বছর তাকে নিজের যোগ্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি হেরোজেন শিক্ষক। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আগ্রহী হলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাল দিকগুলি আছে তাকে সর্বসমক্ষে কি করে উপস্থিত করা যায় তার জন্য চিন্তা করতে শুরু করলেন। এই আগ্রহ তাঁর সব কাজে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিচালিত করেছে। বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সোভিয়েত পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সংগ্রাম তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন।

কূটনৈতিক মিশনে জার্মানী থাকাকালে ডবকেঙ্কা চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা

করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে এসে অনেকগুলি পত্রিকায় তিনি কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। সারা জীবন তিনি চিত্রাঙ্কনে তাঁর আগ্রহ রক্ষা করে গেছেন, এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে চলচ্চিত্রের কম্পোজিশনে। ১৯২৬ সালে, যখন চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর বেশ নাম হয়েছে, অতীতের বন্ধন পেছনে ফেলে তিনি সম্পূর্ণভাবে চলচ্চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করলেন।

নতুন নতুন রীতি ও পথের অনুসন্ধানীর কাছে এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখনকার দিনের পণ্য চলচ্চিত্র, যাতে কেবলমাত্র সাহিত্য এবং মঞ্চের দুর্বল প্রতিফলন ছিল, তা ডবকেঙ্কাকে আকর্ষণ করে নি। তিনি চিন্তা করেছিলেন সিনেমাকে এক স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে, এই শিল্প নিজের সমস্যা নিজের ধারার সমাধান করবে।

তাঁর প্রথম ছবি স্বল্পদৈর্ঘ্যের কমেডি চিত্র “দি লাভ-বেরি” (১৯২৬), দ্বিতীয় ছবি “দি ডিপ্লোমেটিক কুরিয়েরস ব্যাগ” (১৯২৭), বাস্তব ঘটনানির্ভর ডিটেকটিভ ছবি, একদল প্রাতিবিপ্লবী কর্তৃক সোভিয়েত কুরিয়েরকে হত্যার ঘটনা। দুটি ছবিই জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু ডবকেঙ্কা ছবি দুটির ততটুকু মূল্যই দিলেন—যা করতে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এইভাবে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর ডবকেঙ্কা তাঁর নিজস্ব কল্পনা এবং বিষয়বস্তুর বিষয়ে মনোযোগ দিলেন, যা তাঁকে চলচ্চিত্রশিল্পের দিকে টেনেছে। ১৯২৮ সালে প্রথম সত্যিকার “ডবকেঙ্কা” ছবি মূল্য লাভ করে। ছবির নাম, “কোনি-



আলেকজান্দার ডবকেঙ্কা

গোরা”। এই ছবিতে গৃহযুদ্ধের অনুসন্ধান সম্বন্ধে উক্রেইনির লোককাহিনীর তিনি এক দার্শনিক বিশ্লেষণ যত করেন, মানব অবিরাম সৃষ্টির অনুসন্ধান করে চলেছে; তিনি জোর দিয়ে বললেন একমাত্র স্বাধীনতা মানুষের সৃষ্টির পথ মৃত্ত করছে পারে। ছবির এ্যাকশনে উক্রেইনিয়ার ইতিহাস জড়িত হয়ে পড়েছে, যাতে দেখান হয়েছে স্কাইথিয়ান ও ভারানজিয়ানদের আক্রমণ, পোলিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, উক্রেইনিয়ার সোভিয়েতের শক্তিশালতের সংগ্রাম। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক সংগ্রামের নায়ক একই জন, এক ব্যক্তি কুবক, উক্রেইনির কুবকের প্রতিনিধি।

নবীন সোভিয়েত সিনেমা বিরাট ঐতিহাসিক পটভূমিকে আঁকিত করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিল; ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল। ‘অক্টোবর’ ছবিতে



ডবকেঙ্কা ‘সাইডান’ ছবির চিত্রগ্রহণ পরিচালনা করছেন

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

আইজেনস্টাইন চেয়েছিলেন প্রথম মহাদেশ থেকে বিপ্লবের দশম বার্ষিক পবনত দেশের অবস্থার কথা বলতে। তেমন পদার্থোক্তিকন তাঁর 'দি য়েণ্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ' ছবিতে রাশিয়ার দু-শত বছরের ইতিহাসকে টেনে এনেছেন। ডববেঙ্কোই সফল হয়েছিলেন ইতিহাসকে বিরাটভাবে উপস্থিত করতে। কিন্তু ছবিগুলি কিছুটা জটিল হয়ে পড়ে এবং ডববেঙ্কোর কাব্যিক প্রয়োগ-রীতি তখনো এমন সহজ হয়ে ওঠে নি, যা তাঁর পরবর্তী কাজে দেখা গেছে। কিন্তু এসব ছবি থেকে নিঃসন্দেহে ঘোরা গেছে যে একজন মহৎ চলচ্চিত্র স্রষ্টার জন্ম হয়েছে।

তাঁর পরবর্তী ছবি 'আর্সেনাল' (১৯২৯) আরো আশ্চর্যকর সীমাবদ্ধ ছিল। ছবির এ্যাকশন কিয়েভের আর্সেনাল শ্রমিকদের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যারা উক্রেনে প্রতিব্রজ্যবী সেন্সরাল রাজ্য কৃৎক ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু এই ছবিও একটি ঘটনায় দ্বারা এ্যাকশনের যোগসূত্র রচনা করতে পারে নি। এটি অনেক ঘটনায় বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকটি গল্পের নিজস্ব বস্তব্য



‘আর্থ’ ছবির একটি দৃশ্য

রয়েছে। উক্রেনীয় লোককাহিনী অবলম্বনে আবার ডববেঙ্কো কাব্যিক মেজাজ প্রকাশ করলেন। ‘দি আর্সেনাল’-এ ডববেঙ্কো সমসাময়িকদের বিপ্লবী কার্যকলাপকে তেমনভাবে প্রকাশ করলেন, যেমন করে

অতীতের নায়কদের লোকগাথায় ও মহাকাব্যে প্রকাশ করেছে। এই ছবি, যা ক্লাশিকের পরিণত হয়েছে, প্রমাণ করেছে যে, আধুনিক শিল্পীদের কাছে লোকশিল্পের ঐতিহ্যের মূল্য অনেক। ‘আর্থ’ মন্ডিলাভ করে ১৯৩০ সালে। এই চলচ্চিত্র কবির শিল্পীজনাচিত সাফল্য প্রমাণ করে। যৌথ খামার গড়ে তোলার সময় উক্রেনীয় কৃষকদের সম্পর্কে এই ছবি। এখানে কাব্যিক ধারণা প্রত্যেকে প্রকাশিত হয় নি, যেমন আগেকার ছবিতে হয়েছে; এখানে হয়েছে জীবনের ছবিতে। তাঁর সম্পাদনারীতি অত্যন্ত সহজ সরল। একক চরিত্রচিত্রে এখানে উক্রেনীয় কৃষকজীবনের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা ডববেঙ্কো ছবির বিশেষত্ব, এখানে প্রেম ও চিরন্তন জীবনাত্ম দেখান হয়েছে। শ্রেণী-সংগ্রামকে দার্শনিকতার জেনেরালিজেসনে দেখান হয়েছে। ডববেঙ্কোর সব ছবির মত ‘আর্থ’ একটা বাণী উপস্থিত করেছে, কিন্তু এই বাণী এমন ধীর স্থিরভাবে দেখান হয়েছে যা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, মানুষের জীবনে যা দেখা যায়। এখানেই এই ছবির শক্তি, যা বছরের পর বছর তার শিল্পসম্মত আবেদন রক্ষা করে চলেছে।

‘আর্থ’-এ ডববেঙ্কো শিল্পী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন; শিল্পী, কবি, চিন্তাশীল, ইতিহাসবিদ এবং প্রচারক হিসাবে এখানে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বচলচ্চিত্রে ‘আর্থ’ একটি অস্বাভাবিক সন্দের সাফল্য।

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যের / অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌতুভরত, ভগবন্তত্ত্বগণের সাধনার ধন ‘ভক্তের তুলসী-মালা’ সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ ও শিক্ষাটেক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণভাবের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই ‘প্রলাপে’ ভাষা অভিভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমদুদ্যানঃসূত ‘শিক্ষাটেক শৈলকই’ তাহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুসুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

মূলভাসার

শ্রীচৈতন্যমণ্ডল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আশ্রয়তত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনসিকা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুসুললিত পদ্যানুবাদ।

পার্বত-দলন

মুর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহরী-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীজীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌরিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুসুভাষিত নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৫.০০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিনোবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

মার্ভে'কা ফুটবল

কুমাললামপুরের মার্ভে'কা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর থেকে এবারও ভারতীয় ফুটবল শূন্য হাতেই দেশে ফিরেছে। জয়লক্ষ্যীর আশিস্ বঞ্চিত ভারতীয় ফুটবল দল কুমাললামপুরের মাঠে চেষ্টার কোন ঘটি রাখে নি। ভারতীয় ফুটবল দলকে বলতে গেলে প্রায় অর্ধ-প্রস্তুত অবস্থায় আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে অবতীর্ণ হতে হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম হল অলিম্পিক সংক্রান্ত খেলাগুলি। এবার অবশ্য মার্ভে'কা যাত্রার পূর্বে ভারতীয় ফুটবল দলের একটা শিক্ষাশিবির খোলা হয় কলকাতায় ইডেন উদ্যানে, কিন্তু এত অল্প সময়ে বিভিন্ন স্থানের খেলোয়াড়দের একত্রিত হয়ে একটা দলীয় সংহতি সৃষ্টির মত পরিবেশ কি তৈরি হয়? ভারতীয় ফুটবলের পরিচালকবৃন্দের যদি শুধুমাত্র দল প্রেরণের মনোভাবই থাকে তবে আমাদের বলার কিছুই নেই; কিন্তু সম্মানের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে তবে প্রস্তুতিপর্ব এবং নির্বাচনপর্ব একটু যত্ন সহকারে করতে হবে। সামনেই আসছে ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক। প্রাক-অলিম্পিক খেলাগুলির সময় বলতে গেলে সমাগত। প্রাক-অলিম্পিকের বাধা ভারতের পক্ষে অতিক্রম করার মত মান বর্তমানে আছে কি না সন্দেহ!

মার্ভে'কা প্রতিযোগিতায় "এ" গ্রুপের শেষ দু'টি খেলায় ভারত মিলিত হয় মালয়েশিয়া এবং গতবারের বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে। ভারত এবং মালয়েশিয়ার খেলাটি শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। এইদিন মার্ভে'কার কুড়ি হাজার দর্শকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মালয়ের রাজা-রাণী এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ টঙ্কু আবদুল রহমান।

খেলার সূর্যুতে ভারতীয় দলের ফরোয়ার্ডরাই বলতে গেলে প্রধানত খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে মালয়েশিয়া দলও ভারতীয় গোলে পাণ্টা আক্রমণ চালাতে থাকে। উভয় পক্ষই কয়েকটি গোলের সুবর্ণসুযোগের অপব্যবহার করে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে একটি কর্নার কিক থেকে ওমর গোল করেন কিন্তু দানী অফ সাইডে থাকায় মালয়েশিয়ার এই গোলটি রেফারী নাকচ করে দেন। এরপর আসে ভারতীয় দলের পাণা। ইন্দার সিংয়ের একটি সুন্দর শট মালয়েশিয়ার গোলরক্ষককে পরাস্ত করে গোল লাইন অতিক্রম করে। কিন্তু রেফারী বল গোল লাইন অতিক্রম করে নি বলে গোলাট নাকচ করে দেন। খেলা শেষ হবার মাত্র দু'মিনিট পূর্বে ভারতীয় দলের অধিনায়ক



দ্বিতীয়বার দায় পারগ্রহ করছেন নহম্মদ আলি ক্রে; সঙ্গে নবপারগাঁতা বহু এবং প্রযোজক।

জর্নেল সিং আহত হয়ে মাঠ পরিত্যাগ করেন।

গ্রুপের শেষ খেলায় ভারত একটি পেনাল্টি গোলে পরাজিত হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের কাছে। খেলার প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। পঁচাত্তর মিনিটের সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে অরুণ ঘোষ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে বাধা দিলে বার্মার রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ভারতীয় দলের

ঘোষ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে হাত দিয়ে বল স্পর্শ করলে রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দেন এবং পেনাল্টি থেকে তাইওয়ান গোলটি পারিশোধ করে।

শীল্ডের খেলা সূর্য

ময়মনসুর লীগ ফুটবল শূর্য একদল সমাপ্তির অপেক্ষায়। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের সম্মানের নিকটবর্তী, যদিও দুই রেল ইস্টার্ন এবং বি, এন, আরের সঙ্গে দু'টি খেলায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। ময়মনসুর ফুটবলের আসরে এখন কেমন যেন মন্দা ভাব। শীল্ডের খেলা সবে সূর্য হলেছে, তবে আসর জমে উঠতে এখনও দেরি আছে।

ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং পুরোপুরি দু'টি করে পয়েন্ট লাভ করেছে, রাজস্থান ক্লাব এইদুটি দলের বিপক্ষে মাঠে অবতীর্ণ না হওয়ার আই, এফ, এ লীগ সাব-কমিটি ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানকে দু'টি করে পয়েন্ট দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বি, এন, রেল এবং মোহনবাগানের অর্ধপথে পরিত্যক্ত খেলাটি আবার অনর্দিত হবার কথা ছিল, কিন্তু বি, এন, রেল আই, এফ, এ'কে, জ্ঞানর যে তাদের পক্ষে দল মাঠে নামান সম্ভব হবে না এবং তাই ওই দু'টি পয়েন্ট মোহনবাগান লাভ করল। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের যে ফিরতি চারিটি ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য অসমাপ্ত থাকে সে খেলাটি সম্বন্ধে আই, এফ, এ'র লীগ কমিটি

শ্রীঅমিতাভ

খেলোয়াড়েরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আবেদন করতে থাকেন এবং গোলরক্ষক খণ্ডরাজ মালয়েশিয়ার লাইসেন্সম্যানের কাছেও আবেদন জানান। কিন্তু রেফারীর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে এবং ভিয়েতনাম পেনাল্টি থেকেই একমাত্র বিজয়সূচক গোল দিয়ে সেমি-ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেমি-ফাইন্যালে গতবারের বিজিত দল বার্মা গতবারের বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামকে শোচনীয়ভাবে ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে পূর্বে পরাজয়ের যোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থান নির্ধারণের খেলায় ভারত তাইওয়ানের সঙ্গে খেলা অসীমাসিদ্ধভাবে শেষ করে এবং শেষ পর্যন্ত টসে পরাজিত হয়। প্রথমার্ধে ভারত ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল; দ্বিতীয়ার্ধে অরুণ

সাধারণ বসন্ত

এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তবে পদলিখের অনুমতি লাভ করলে এই ম্যাচটি পুনরায় চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত আন্তঃরেল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টার্ন রেল দল ২-০ গোলে সাদার্ন রেলকে পরাজিত করে রেনী কাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ইংল্যান্ডের ফুটবল মরশুম

ইংল্যান্ডের ফুটবল মরশুম আবার শুরু হয়েছে। মরশুমের প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্য হল বদলী খেলোয়াড় সম্পর্কিত নতুন আইন নিয়ে। নানা মর্নির নানা মত; তাই এই নতুন আইনকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ফুটবল খেলার সময় বদলী খেলোয়াড় মাঠে নামার আইন ইংল্যান্ডের মাঠে প্রচলিত হয়েছে মাত্র গত দু' বছর; ইতিপূর্বে রক্ষণশীল মনোভাবের ফুটবল পরিচালকেরা ইংল্যান্ড ফুটবল লীগে পুরাতন আইন পরিত্যাগ করে নতুন আইনকে গ্রহণ করতে কিছুটা বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ইতিপূর্বে একজন খেলোয়াড়

আহত হলেই একজন বদলী খেলোয়াড় মাঠে অবতীর্ণ হতে পারতেন। কিন্তু এবছর নতুন আইনের বলে ফুটবল দলগুলি খেলার যে কোন সময়ে একজন বদলী খেলোয়াড় মাঠে পাঠাতে পারবেন।

ইংল্যান্ডের ফুটবল মাঠের অধিকাংশই কিন্তু এই নতুন বদলী খেলোয়াড়ের আইনকে ভালমতে গ্রহণ করতে পারছেন না। টটেনহাম হটস্পারের ম্যানেজার বিল নিকলসন বলেছেন যে, তিনি এই নতুন আইনের ব্যবহার করবেন না যতকণ না পর্যন্ত তার কোন খেলোয়াড় আহত হন।

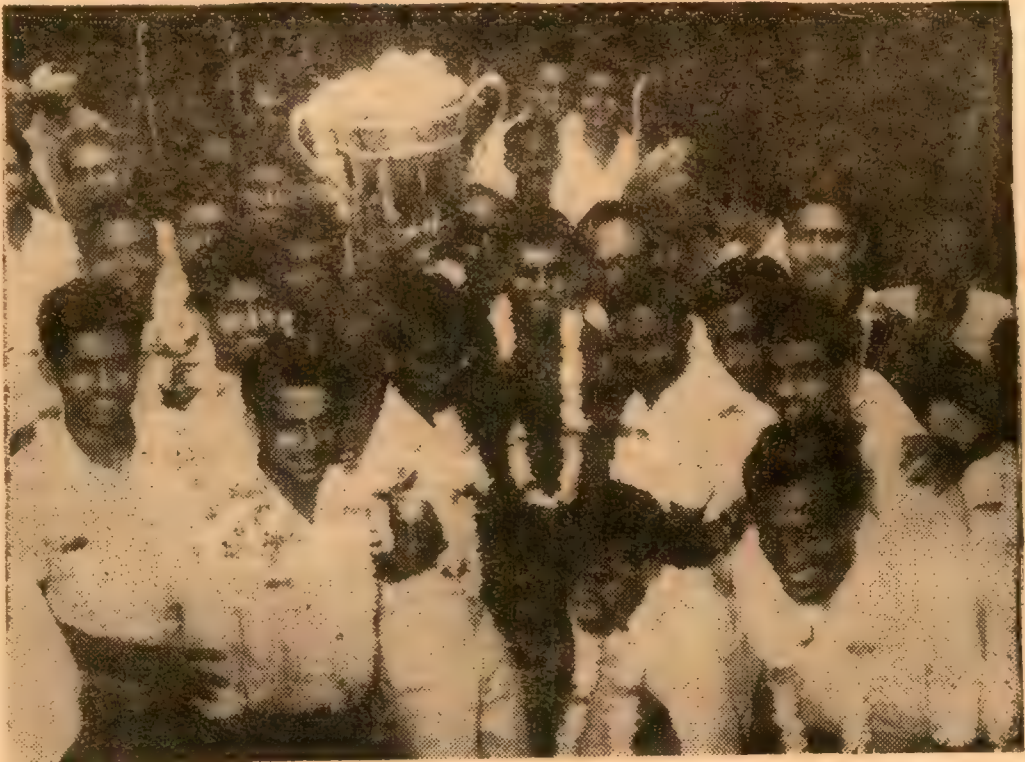
কারণ খেলার মাঝে একজন খেলোয়াড় ভাল খেলেছে না বলে ফিরিয়ে আনা অপমানজনক এবং খেলোয়াড়ের মনোবল নষ্ট করা। অন্যান্য ফুটবল দলগুলির ম্যানেজাররাও বিল নিকলসনের সঙ্গে বলতে গেলে একমত।

আমাদের কলকাতা ময়দানে বদলী খেলোয়াড়ের যে নিয়ম প্রচলিত আছে, বলতে গেলে তার অপব্যবহারই বেশি হয়। বড় ক্লাব, ছোট ক্লাব নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি দলেরই বদলী খেলোয়াড় মাঠে নাগানোর দিকে ঝোঁক আছে। একজন খেলোয়াড় একটু খারাপ খেলতে

থাকলেই, তাকে ডেকে নিয়ে সাইড লাইনে বসিয়ে দেওয়া কত বড় মারাত্মক ভুল তা আমাদের ক্লাব কর্তৃপক্ষ ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। এর ফলে খেলোয়াড়ের মনোবল নষ্ট হয় এবং নিজের প্রতি আস্থা সে ধীরে ধীরে হারায় এবং বলতে গেলে পরোক্ষভাবে এতে দলেরও ক্ষতি হয়।

স্বিতীয় স্কুল টেস্ট

ভারতীয় স্কুল এবং ইংল্যান্ড স্কুল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস ৭ উইকেটে ৩০১ রান সংগ্রহ করে এবং স্বিতীয় ইনিংসেও ৩ উইকেটে ৬০ রান সংগ্রহের পর ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ড স্কুল দল ৭ উইকেটে ২২১ রান সংগ্রহের পর প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং স্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১০০ রান সংগ্রহ করলে খেলা শেষ হয়। ভারতীয় দলের পক্ষে রাজা মুখার্জী একটি সুন্দর সেঞ্চুরী করেন ১২৪ রান সংগ্রহ করে।



অন্তঃরেল ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ইস্টার্ন রেল দল রেনী কাপ।

সাপ্তাহিক বসমতী

ক্রে'র দ্বিতীয় বিবাহ

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন বিশ্ব হেভীওয়েট ম্ুষ্টিবৃদ্ধ চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আলি ক্রে। অবশ্য বিশ্ব বক্সিং সংস্থা ক্রে'র কাছ থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব কেড়ে নিয়েছেন তাঁর বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তের পর। আমেরিকান ব্র্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন বড় সমর্থক ক্রে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে অস্বীকার করায় পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

ক্রে'র প্রথমা পত্নী ছিলেন সোনজী রয়; সোনজীর আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি ব্র্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের অদর্শ বিরোধী বলে ক্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেন এবং তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। গত কয়েক মাস ক্রে'র বিবাহ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্বন্ত গত ২০শে আগস্ট ক্রে সপ্তদশী সুন্দরী বেলিঙা বয়েডকে বিবাহ করেছেন।

হালপাতালে সুব্রত গুহ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য বাংলার সুব্রত গুহ হাটুতে অস্ত্রোপচারের পর

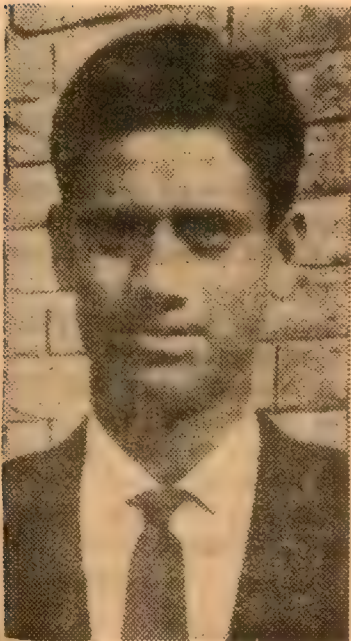


রাজা মুখার্জী

সুস্থ আছেন। ইংল্যান্ডের লীডসে প্রথম টেস্ট খেলার অংশগ্রহণের সময় তাঁর হাটুতে আঘাত লাগে। ইংল্যান্ডের খেলা শেষ হবার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ব আফ্রিকা সফরে তাঁর আর বাওয়া হয়ে ওঠে নি। আমরা আশ্চর্য

হয়ে যাচ্ছি যে, ইংল্যান্ডে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না কেন? সামান্য আঘাতের জন্য সরদেশাইকেই বা কেন ভারতে ফেরৎ পাঠান হল? কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিমানের মত কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কি দলের ম্যানেজারের নেই এবং এই ধরনের ব্যক্তিকে ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে পাঠানোরই বা অর্থ কি? এছাড়া ট্রেজারারের নামে দলের বোকা হয়ে একজন তো একগাদা বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করলেন অনর্থক।

আমাদের সি. এ. বি'রও কেরামতির তুলনা নেই? বোম্বাই থেকে সুব্রত গুহ কলকাতা এসে পৌঁছানোর কথা বোদিন, বোদিন সি. এ. বি'র অফিসে অনুসন্ধান করে কোন খবর পাওয়া যায় নি; আমার মনে হয় সুব্রতর অস্ত্রোপচারের সংবাদও সি. এ. বি'র কতৃপক্ষ রাখেন না। সি. এ. বি'র একমাত্র কাজ কি টেস্ট ম্যাচ খেলানো এবং কোনক্রমে দায়সারাভাবে অন্যান্য রণজী ট্রফির ম্যাচগুলির ব্যবস্থা করা। সি. এ. বি'র কবে যে এই "পিঠে বেঁধেছি কুলো আর কানে দিয়েছি তুলো"র মনো-ভাব ত্যাগ করবেন জানি না।



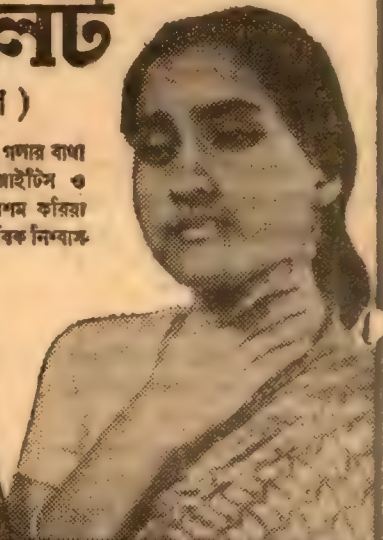
সুব্রত গুহ

গলার ব্যথা ও কাশি দ্রুত উপশম করে

পিউমিলেট

(গোট লজেন্স)

ভেবজগুণে সম্পন্ন এই গোট লজেন্স গলার ব্যথা ও কাশিতে আরাম দেয়। ফ্যারাজাইটিস ও জ্যারাজাইটিস জনিত প্রদাহকে উপশম করিয়া শ্বাসযন্ত্রকে শিথিল করে এবং স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে।



BENGAL CHEMICAL

CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR • DELHI

চুনী গোস্বামী

চুনী.....

চুনী গোস্বামী একটি নাম। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়। ফুটবল প্রতিভার উজ্জ্বলতায় অবিস্মরণীয়, রমণীয় ক্রীড়াঙ্গনের স্মরণীয় নাম।

শুদ্ধ কলকাতা নয়, ভারতীয় ফুট-বলঙ্গনের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন চুনী গোস্বামী, তার প্রমাণ চুনীর অকম্পনীয় জনপ্রিয়তা। চুনী গোস্বামীর মতো জনপ্রিয়তা আর কোন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়ের ভাগ্যে জুটেছে কি না সন্দেহ। তাই চুনীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি গণদেবতার দেওয়া এই রায়!

সেই রায়ের বলে চুনী আজো অপ্রতিবন্দনী, চুনী অতুলনীয়, চুনী ফুটবল রঙ্গমঞ্চে চিরস্মরণীয় শিল্পী!

ফুটবল আর ক্রিকেট...! ফুটবলে চুনী অপ্রতিবন্দনী, ফুটবলে চুনীর প্রতিভা অসাধারণগে উদ্ভাসিত, কিন্তু ক্রিকেটের চুনী গোস্বামী সাধারণগে সীমান্বশ!

সুবিনয়ল ডেনিস কম্পটন হতে পারেন নি, হয়েছেন চুনী গোস্বামী! ফুটবলার কম্পটন হারিয়ে গিয়েছিলেন উজ্জ্বল ক্রিকেটের আলোর ছটায়। তাই কম্পটন বলতে আমরা প্রধানত ক্রিকেট খেলোয়াড়-কেই বোঝি। যদিও এই কলকাতাতেই বসে যারা কম্পটনকে গোল লক্ষ্য করে শট করতে দেখেছেন আবার ইডেনে দেখে-ছেন ইংল্যান্ডের পক্ষে সেগুদরী হাঁকাতে, তারা আজো দোঁটনায় আছেন—তারা আজো চিন্তা করেন, ফুটবল না ক্রিকেট,—কোন বিষয়ে কম্পটন শ্রেষ্ঠ!

চুনী গোস্বামী আমাদের চিন্তাধারাকে অন্তর্দরে টেনে নিয়ে যান নি! তবু যারা চুনীর দাঁড়ি রূপ দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে ফুট-বলার চুনী অবিস্মরণীয় হলেও, ক্রিকেটের চুনীও স্মরণীয়!

চুনীর এই বৈভব নিপুণতা সম্ভব হয়েছে তার ক্রীড়াপ্রতিভার বলেই।

পরিচয়তে বিভাগে চুনীর কথা লিখতে বাওয়া বাড়ুলতা! এই সীমিত সীমার মধ্যে চুনীর প্রতিভাকে ধরে রাখা দায়! তাই ভেবেছিলাম লিখবো না। জানতাম, না লিখলেও চুনীর কিছুর যার আসে না। কিন্তু ক্ষতি আমাদেরই! কারণ যার পরিচয় দেওয়া উচিত সবার আগে, তাঁকেই কি না দিতে বর্সেছিলুম যাদ! তবু এই স্বল্প পরিসরে চুনীকে তোনো সম্ভব নয়, সে কথাটা আগেই বলে রাখি। চুনীকে চিনতে গেলে তাঁকে নিয়ে লিখতে হবে মস্ত বড় একটা বই!

তবু ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে

পরিচয়তে

ময়মনসিংহে না জন্মে এই শহর কলকাতার বৃকে জন্মেছিলো যে ছেলেটি, আর তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে পড়তে গিয়ে দেশপ্রিয় পাকের দিকে তাকিয়ে যে বড় ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন দেখতো, সেই সুবিনয়ল গোস্বামী, ওরফে চুনীই

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যে একদিন ভারতের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করবে—এ কথা সেদিন কে আর ভেবেছিলেন।

তাই ছোটবেলা থেকেই দেখা গিয়ে-ছিলো খেলাধুলার ওপর চুনী গোস্বামীর



চুনী গোস্বামী

অদম্য উৎসাহ। আর চুনীর প্রতিভার প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিলো তাঁর স্কুল জীবন থেকেই!

আর তার পরই চুনী পড়লেন মোহনবাগানের বি ডি চ্যাটার্জীর চোখে! চিনতে ভুল করেন নি তিনি। চুনীর মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ তিনি দেখে-ছিলেন, দেখতে দেখতে সেই বীজ অস্কুরিত হয়ে পরিণত হলো বিরাট বৃক্ষে। দেখতে দেখতে সুবিনয়ল পর্ববাসিত হলেন চুনী গোস্বামীতে। মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো চুনীর দাঁড়িপুতে উদ্ভাসিত কলকাতা ময়দান কলতানে মুখরিত হয়ে উঠলো।

সকলে মেতে উঠলেন চুনীর খেলা নিয়ে! তাঁর সে খেলা ছিলো আশ্চর্যবাসে ভরা। চুনীর খেলায় আছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, আছে নয়নাভিরাম ভাঁগমায় বল আয়ত্তে রেখে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বোকা বানাবার অকম্পনীয় ক্ষমতা। তাঁর শটের সংগে আছে তীক্ষ্ণ ফুটবল সেন্স। আর আছে গোল করার সহজ ক্ষমতা!

অথচ এই অভাবটাই কলকাতার তথা ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকেই একের পর এক সাফল্য এসে ঘিরে ধরলো চুনী গোস্বামীকে।

১৯৩৪ সাল থেকে চুনী গোস্বামী মোহনবাগানে খেলছেন। এর মধ্যে বার-বার এসেছে অমূল্য সম্মান। চুনী হয়ে-ছেন বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক, মোহনবাগান ক্লাবের অধিনায়ক, বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক আর শেষকালে তাঁকে করতে হয়েছে ভারতীয় দল পরি-চালনা। দেশ-বিদেশে একের পর এক খেলায় যোগদান করেছেন চুনী!

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা, এশিয়ান কাপ আর সবশেষে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় শুদ্ধ যোগদানই নয়, ভারতীয় দলের নেতৃত্বও করতে হয়েছে তাঁকে।

১৯৬৪ সালে অর্জুন পুরস্কার লাভ করলেন চুনী গোস্বামী আর ১৯৬৮ সালে চুনী গোস্বামী ভেটোরেন্স ফুটবল ক্লাবের দেওয়া সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছিলেন!

শুদ্ধ এই নয়, ফুটবল তাঁকে বার বার এনে দিয়েছে অভাবনীয় সম্মান। এসেছে সুনাম, এসেছে বশ, প্রতিপত্তি।

চুনী গোস্বামী আর হয়তো বেশি-দিন খেলবেন না! ধরতে গেলে খেলা তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছেন—একমাত্র ক্লাবের খেলাগুন্ডিতেই তাঁকে খেলতে দেখা যায়!

তাই আজ দুঃখ হয়, যখন মনে পড়ে ভারতের ফুটবল ইতিহাসে চুনী অধ্যায়ের ওপর ইতির দাঁড়ি টানার সময় বোধহয় হয়ে এলো!

তবু সান্ত্বনা, মাঠে চুনীকে দেখতে পাবো—ফুটবল না হয়—ক্রিকেট মাঠে তো বটেই। ১৯২৬ সাল থেকে রণজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চুনী খেলে আসছেন! মনে হয় আরো অনেকদিন ক্রিকেট খেলবেন চুনী। তাই খেলুন—খেলোয়াড় চুনী গোস্বামীকে আমরা আরো অনেকদিন দেখতে চাই...!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

(১)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাক্তল, প্রাণবয়।
বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের
সারাংশসার। হারীত, মেদী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত,
জীবনমুক্তি, মজুমদার হংস, নকি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী,
সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধা,
গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি
গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আবশ্যপাঠ্য
গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবলা, কঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাস্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরক্ত,
চুলকি, আত্মপ্রেম, কল্মষশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটকর,
তুণ্ড, শিকা, বৃদ্ধবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়া-
তীত, বাহুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়,
পাণ্ডিত-বুদ্ধ, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন গরুড়, শ্রীরামপূর্ব-
তাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চবক্ষ্য, কালাগ্নিকর,
যাজ্ঞবল্ক্য, রামহংস, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তর-
তাপনীয়, কৌষীতকা, অমৃতবিল্ব, কালিকা সর্বমার ও
অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—
৪-০০ টাকা।

হ্যাম্বেগ্যা-উপনিষদ :

সামবোধের তাৎপাখ্য হ্যাম্বেগ্যাশাস্ত্রের অন্তর্গত।
মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থি ও গ্রন্থির অনুবাদ।
শঙ্করাচার্যের মহাভাষা, শঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ।
তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে
বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাম্প্রদায়িক দর্শন :

মহাশি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ বসুপাধ্যায় অনুদিত।
সাম্প্রদায়িক দর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।
মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহাশি কণাদ প্রণীত। বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৩-০০
টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমহি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—পারমর্থ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা,
বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি
সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থ-
নুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোক-
বাত্তিক ও তত্ত্ববাত্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত।
পণ্ডিত ভুটনাথ মহন্তীর্থের দীর্ঘকালের সাধনার অনূদিত,
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—
৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্য-
কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পরম্পর
প্রতিভির তৎপূর্ব সংকলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম, দীক্ষাপদ্ধতি, দ্বীপুত্র, মন্ত্রমালা
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাক্তম্ :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতন্ত্র-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত
বৃহদায়তন দ্বলিত গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকাল সাধনার
নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। কাপড় ও
বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল
বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাম্ভারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ
জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

আচরিত চরিত-ভাষা চরিত-ভাষা



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে আমাদের জন্ম
মানুষ আনন্দে যেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ম।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ম সাধনার
অব্যর্থ মহোষ্য প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মুভসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ কসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে রক্ত দূর করে,
বিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা



অব্যর্থ ডাঃ বোমেল চন্ড বোম, এম-এ,
আম্বুরেবশাখী, এম, সি, এস, (লন্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্ড বোম,
এম-বি, ডি-এস, আম্বুরেবশাখী।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

সাপ্তাহিক বসুমতী

রেশন ভ্রাস নিয়ে যুক্তফ্রন্টে ছড়াস্ত বিরোধ
খাদ্যনীতির বার্থভায় দায়িত্ব কার? এক খাদ্যমন্ত্রীর,
না যৌথভাবে সমগ্র মন্ত্রিসভার?



৭২ বর্ষ : ১০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১শে/ভাদ্র ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

7th Sept., 1967 * Vol. 72, No.



...কিন্তু, এক বিষয়ে আপনি নিশ্চিত—

বোরোলীন

—কান্নে-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শূকনো, খস-খসে কিংবা বর্ণহীন হকের
যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম।



বিষয়	লেখক						পৃষ্ঠা
লংপাদকী	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৭৭১
স্বাক্ষরের মানদণ্ড	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৭৭২
মঙ্গদর্শন	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৭৭৩
ভারতবর্ষ	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৭৭৭
আন্তর্জাতিক	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৭৮২
দ্য বেসেছি, দ্য পেসেছি (স্মৃতিচরন)	১০৮	— সুধীরজন দাস				১০৮	৭৮৭
পাক-ভারতের রূপরেখা	১০৮	— প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী				১০৮	৭৯২
অগ্নিবর্গের একটি অধ্যায়	১০৮	— জনন্ত সিংহ				১০৮	৭৯৬
আধুনিক গণতন্ত্র ও জন-স্ট্রাক্ট মিন (প্রবন্ধ)	— অশোককুমার মল্লোপাধ্যায়						৮০৬

জরাসন্ধের সেই বিখ্যাত
লৌহকপাট (৪র্থ পর্ব) ৭১

বিকৃতিকৃষ্ণ মল্লোপাধ্যায়ের
দোলগোবিন্দের কড়চা ৬১

ভারতবর্ষ
বঙ্গোপাধ্যায়ের
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

গল্পাবেগম প্রতিভাধর লেখকের
আশচর্য সৃষ্টি ৮১

দহন ও দোষ্টি ৬১
অনোজ বসু

শিলাপটে লেখা ৮১
আশুতোষ মল্লোপাধ্যায়ের

মাজবদল ৫৥ বায়স্কোপের বাক্স ৬১ **কাঞ্চনময়ী** ৬১
শচীন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায়ের

চেটে ওঠে পড়ে ৬১ **আলোর অরণ্য** ৬৥
শচীন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায়ের

চেরীফুলের দেশে ৪৥ **দুই জার্মানী** ৩৥
শচীন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায়ের

চ্যোতিকুমার চৌধুরীর হিমালয় ভ্রমণ
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪৥

পরিতোষ মজুমদারের **অবধূতের** **শরদীন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়ের**
দান পাউলির মেয়ে ৩৥ কলিতীর্থ কালীঘাট ৫৥ **অনুভবনাক** ৪৥



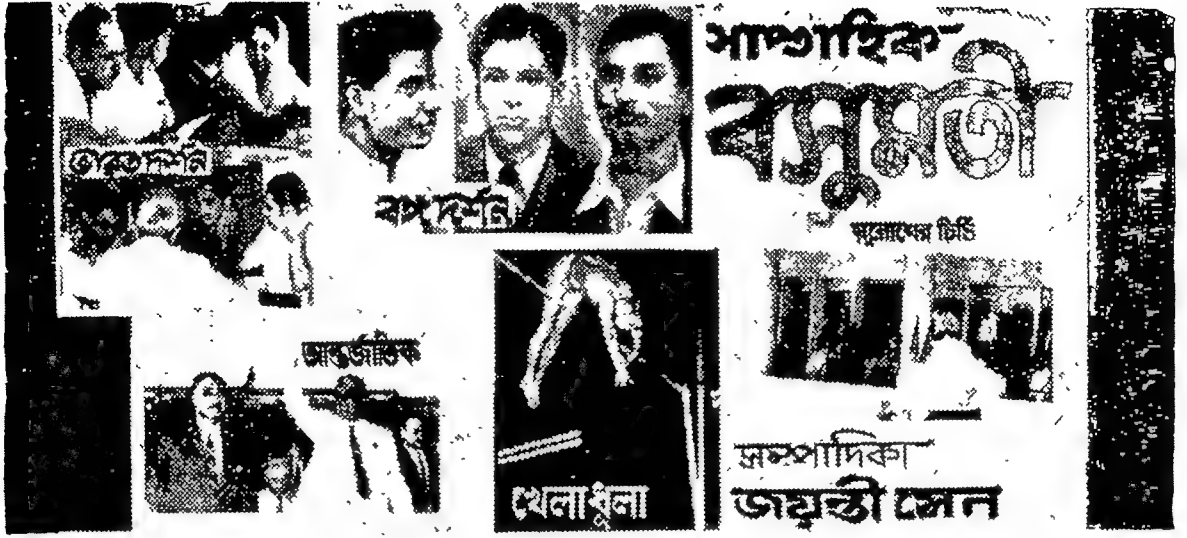
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদ্যা বাউলীর স্বভাস্ত (উপন্যাস)	— স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৬
বেহুলা, তোমায় (কবিতা)	— বরুণ মজুমদার	৪০৮
লজকর্তা (কবিতা)	— কিতীশদেব সিকদার	৪০৮
লালগোলা প্যালেঞ্জার (গল্প)	— জীবন দে	৪০৯
লক্ষ্মণ—ওবেশে এবং এবেশে	— শিলালি	৪১৭
আকাশবাণী-পরিচয়	— মেঘদূত	৪২০
লুপ্তজগৎ	—	৪২১
খেলোয়াড় নিম্ন বস্ত্র	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৭
বেলাখুলা	— প্রীতমিতা	৪২৯

বিভাদয়ের বই

নগেন্দ্রনাথ মিত্রের	
শতাব্দীর শিশু সাহিত্য ১০.০০	
[১৮১৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত]	
মোহিতলাল মজুমদারের	
কবি গ্রীষ্মসুন্দর ১০.৫০	
সাহিত্য-বিচার ৮.৫০	
বাংলার নবযুগ ৮.০০	
সাহিত্য-বিতান ৯.৫০	
বিশ্বকোষ-বরণ ৮.৫০	
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের	
নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১০.০০	
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের	
অলিম্বিকের ইতিকথা ২৫.০০	
ডঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের	
পঞ্চিকুণ্ড রাসেন্দ্রসুন্দর ৮.০০	
সংকলন	
বিজ্ঞানী কবি জগদীশচন্দ্র ৮.০০	
সুপ্রকাশ রায়ের	
ভারতের কৃষক-বিপ্লব ও	
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম :	
প্রথম খণ্ড ১৬.০০	
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের	
ভারত মহিলা ৩.৮০	

আগামী প্রকাশ	
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
১৯০৫-১৯৪৭ বিপ্লবাব্দে লেখিত স্মৃতিচিহ্ন	
বিপ্লবের সন্ধানে ১৩.০০	
প্রেমেন্দ্র মিত্রের	
অত্যাধুনিক রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা উপন্যাস	
গোয়েন্দা হলে	
পরশর বর্মা	
অনন্ত সিংহের লেখনীতে	
ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিপ্লবের কাহিনী	
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম	
নগেন্দ্রনাথ সোমের বহুশ্রুতনাম মহাগ্রন্থ :	
মহাকাব্য মধুসূদনের বিস্তারিত জীবনী	
মধু-স্মৃতি	
পূর্ব প্রকাশিত	
সুখীর করণের বলিষ্ঠ কাহিনী	
অরুণ্যপুরুষ ৪.০০	
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে	
মীর আশ্বানের অমর কাহিনী	
চাহার দরবেশ ৩.৫০	

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস ও গল্প	
শুধু যারা গিয়েছিল ৩.০০	
জ্যাগনের নিঃশ্বাস ২.২৫	
গল্প আর গল্প ২.২৫	
শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পসংকলন	
চোলের পান্নায় চকরবর্তি ৩.০০	
জামার ভালুক শিকার ৩.০০	
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের	
ভারতের জীবন-কথা ২.২৫	
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বড় গল্প	
নাবিক রাজপুত্র ও	
সাগর রাজকন্যা ২.০০	
সুখলতা রাও-এর গল্পসংকলন	
আলি ভুলির দেশে ৩.০০	
স্বপনবড়োর গল্পসংকলন	
স্বপনবড়োর কৌতুক কাহিনী ২.৮০	
গোপেন্দ্র বসুর উপন্যাস	
স্বপ্নবৃক্কট ২.৫০	
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস	
বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২.৫০	



৭২ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২১শে ভাদ্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISAS
Thursday, 7th September, 1957

সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি

স্বাধীন ভাবতে সংবাদপত্রের উপর দায়িত্ব খুব বেশি পরিমাণেই পড়েছে। দেশ-গঠনের সমগ্র বিবরণ দেশের মানুষের কাছে যদি তুলে ধরা না হয়, তাহলে তাদের জন্মকাবেই বাধা হবে এবং নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনাও তারা লাভ করবে না। ভারত যখন পরাধীন ছিল, তখন ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেভাবে মসী চালনা করা হতো, তাতে প্রমাণ পাওয়া যেত যে, অসির ধাবও তার কাছে তুচ্ছ।

স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের ধারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। ভাবতবাসীর মধ্যে যে দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা তাব বিরুদ্ধে অভিযান চরাও সংবাদপত্রের কাজ। মোট কথা মানসচেতনো যা দেওয়াও দরকার।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে সংবাদপত্রের লক্ষাধিক প্রচাবেই আমরা উজ্জসিত হই, সংবাদপত্রের প্রচাৰ সংখ্যা তুলনায়, এ দেশের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা হস্যাকর মনে হতে পারে। কিন্তু যে দেশে দীর্ঘ কুড়ি বছরে স্বদেশীদের শাসনের মধ্যে মোট জনসংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশ শিক্ষিত বলে জানা যায় সেদেশে সংবাদপত্রের প্রচারের সঙ্গে দেশের মানুষের সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগাযোগটুকুও তাৎপর্যমণ্ডিত। বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত শিক্ষিতের হাবের মধ্যে একটা মোটা অংশ মাত্র সাক্ষরসম্পন্ন অর্থাৎ কোনো মতে নামটা সই করতে পারে।

এতদসত্ত্বেও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, যে স্বল্প সংখ্যক লোকের কাছে সংবাদপত্র যাচ্ছে, সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ শুধু কি তাদের মনের মতোই হবে? এবং সমাজের যারা মূঢ় মূক স্থান

—তাদের উপযোগী কিছু সংবাদ থাকবে না।

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ নিখিল ভারত সংবাদপত্র-সম্মেলন উন্মোচন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সংবাদপত্রগুলির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, সংবাদপত্রগুলিতে রাজনৈতিক খবরের প্রতি ঐক্য একটু কমিয়ে তাতে দেশগঠনের জন্যে যে কাজকর্ম চলেছে তার খবর যথোচিতভাবে পরিবেশন করলে ভালো হয়। কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষ এখন সংবাদপত্রগুলির উপর যথায় খবরের জন্য নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রপতি যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, তা কী পরিমাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে, সে-ব্যাপার নির্ভর করছে তাঁদের উপর যারা সংবাদপত্র পরিচালনা করছেন। দ্বিতীয়ত দেশের বুদ্ধিজীবী-মহল, যারা আরাম চোঁকিতে বসে জল্পনা-কল্পনা করতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে রাজনৈতিক খবরই অধিক প্রিয়। আবার একথাও ঠিক যে, এ যুগে বাস করে সচেতন মানুষ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে রাজনৈতিক চর্চার দ্বারা উন্মোচনার আগুনে গা পুড়িয়ে তারা মনের আল কিছটা মেটায়। অবশ্য দেশের অধিকাংশ মানুষ এ দলে নয়। তা ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে নিরক্ষর। আর যারা নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের পক্ষে একটা সংবাদপত্র প্রতিদিন নগদ পয়সা দিয়ে কেনার সাধ্য থাকে না। সেই কারণে বলা যায়, সংবাদপত্রের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি দায়িত্ব আছে আমাদের সরকারের—যে সরকার দীর্ঘ কুড়ি

বছরের মধ্যে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পাকা বাড়িই তৈরি করেছে মানুষকে সচেতন কবে তুলে দেয় পারে নি। দেশ-গঠনের কাজ কিভাবে চলেছে, দেশবাসীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জানা সহজ ব্যাপার নয়। হয়তো সবসময় কিছু ভারী শিল্প ও বড় বড় বাঁধ দেখতে পাবেন, কিন্তু তাতে তো পেটও ভরে না, কলমও তৈরি হয় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের প্রচার-হাট গুলিও সৌদি দিয়ে ব্যর্থ। সে ইনফরমেশন ব্ল্যারো সম্পর্কে চন্দ্র কমিসি রিপোর্ট সুখবর নয়। অপিচ 'আকন-বাণী' নামক যে প্রচার যন্ত্রটি রয়েছে এর মাধ্যমে দেশের আপামর শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের জন্য যথোচিত ও উপযুক্ত সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব। অতঃপর দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আকাশবাণীর সংবাদ প্রচারে মাঝে মাঝে এমন নমুনা মেলে যা দেশের মানুষ গ্রহণ করে নিতে ইচ্ছুক হয় না। তা ছাড়া ধান ভানতে দিয়ে গাঁত গাইলে, তা সংবাদ পরিবেশক ও সংবাদ-গ্রাহক-দুইপক্ষেরই পুনঃপুন হয়। উপরন্তু বেডিও পরিবেশিত সংবাদের ভাষাও সাধারণ-জ্ঞানোন্মোচনী নয়।

এই বিচারে সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি অধিকতর বিম্বস্ত। সংবাদপত্রগুলি যাতে দূর পল্লীর মানুষের কাছে আবেগ সহকলিত হয়, তার ব্যবস্থাও করা দরকার।

সংবাদপত্র

যোগ্যতার মানুষ

রাজনীতি যারা করবেন, তাঁদের কি নীতির বালাই থাকতে নেই? যারা একদিন বাজা হবার আশায় রাজনীতিতে আসেন তাঁদের কাছে নীতিধর্ম বিসর্জন করাটা মলিন বসন ত্যাগেরই মতো। দেশ বাঁচে ভালো, রসাতলে যায় ক্ষতি নেই—আগে নিজের আখের গুছানোর দিকেই তাঁদের দৃষ্টি থাকে বেশি। ক্ষমতার গদি পাবার জন্যে তাঁরা রাতকে দিন করতে পারেন, সাদাকে কালো বলতে পারেন, দল পাটাতো পারেন, ভোলও। এ চরিত্রের দর্শন কম-বেশি প্রায় সব দেশেই মিলবে, তবে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এখানে যেন দল-বদলের মরশুম পড়ে গিয়েছে। বিহারের বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদ মন্ডল তার বোধ হয় সর্বশেষ দৃষ্টান্ত, যদিও এখানেই শেষ মনে করার কারণ নেই।

শ্রী বি পি মন্ডল বিহারের যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কিন্তু তাঁর যোগ্যতার তুলনায় স্বাস্থ্যদপ্তরটিকে তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন, তাই মধ্যমন্ত্রী বনবার সাধ হয়েছে তাঁর। গালভরা শোষিত দল নাম দিয়ে নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন তিনি বিহারে। উদ্দেশ্য : যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে এখানে নতুন সরকার গঠন। আর স্বয়ং মন্ডলমশাই তার মধ্য ভূমিকা নেন। মন্ডল সাংবাদিকদের জ্ঞানিয়েছেন যে, এখানে তিনি কংগ্রেস-শোষিত দল কোয়ালিশন সরকার বানাবেন এবং মধ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব অবশ্যই তাঁর চাই। তিনি দাবি করেছেন যে ৩১৮ অসম্মতিবিশিষ্ট কংগ্রেস-বিধনসভার কংগ্রেস-শোষিত দলের যৌথ শক্তি ১৬৮টি, কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে স্থায়ী সরকার গঠনে তাঁর কোন বাধা নেই। শ্রীমন্ডল ইতিমধ্যে ২৫ জন এম-এল-এর এক লিফট বার করে ঘোরণা করেছেন যে ওরা সব বিভিন্ন দল ত্যাগ করে শোষিত দলে যোগদান করেছেন। এবং তাঁর পক্ষেই আরো একটা লিফট আছে, সম্মতিমতো তা প্রকাশ করে তাঁর দলগত শক্তির পরিচয় দেবেন।

শ্রী বি পি মন্ডল সেখানেই থাকেন নি। রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে যেহেতু বিধানসভার যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, সেহেতু মধ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিনহার সরকারকে

এখনি পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হোক এবং কোয়ালিশন দলের নেতা হিসেবে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হোক। বিধানসভার কংগ্রেসের মোট আসন সংখ্যা ১২৯টি। কাজেই শ্রীমন্ডল যদি সত্যি উপযুক্তসংখ্যক এম-এল-একে ভাঙতে পারেন, তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আরু ফরোবে। মধ্যমন্ত্রী গদি পাবার জন্যে তাঁর আশাবাদিতার আরো কারণ হলো কংগ্রেসের আশীর্বাদের ভরসা তিনি পেয়েছেন।

কিন্তু শ্রীমন্ডলের ওপর বিহারের জনগণের ভরসা কতখানি? বিহারবাসী তাঁকে



বি পি মন্ডল

দেখেছে একজন সুবিধাবাদী নেতার ভূমিকায়। জমিদার বংশের ছেলে বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদ। আজ যিনি শোষিত দল গঠন করেছেন তাঁর পিতৃপুরুষকে একদিন শোষক হিসেবেই দেখেছে গ্রামবাসী। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কিন্তু রাজনীতির নেশা হঠাৎ পেয়ে বসলো তাঁকে। জ্ঞান না রাজনীতি বলতে তিনি ঠিক ঠিক বোঝেন : দেশসেবা না আত্মসেবা। প্রথম নির্বাচনে জয়লাভ করে বিধানসভায় ঢুকলেন কংগ্রেসের টিকিটে। কিন্তু ওই যাওয়ারই সার, গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কোন

ছামলা তাঁর ছিলো না। তাই স্বিত্তীয় নির্বাচনে তাঁকে পরাজয় মানতে হলো স্বসম্প্রদায়ের একজন এস-এস-পি প্রার্থী ভূপেন্দ্রনারায়ণ মন্ডলের কাছে।

কিন্তু রাজনীতির অস্ফম্বর স্বাদ ভরন তিনি পেয়ে গিয়েছেন, হয়তো লেগেছে নেশাও। তাই ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জিতে তিনি মধ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায়ের কাছে হাত কচলাতে সুরু করে দিয়েছিলেন। এখানে মন্ত্রি বণ্টন হতো সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। আর বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদ মনে করতেন গোয়ালান্দপ্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে মন্ত্রিসভার স্থান পাবার যোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি শ্রীসহায়। মন্ত্রিসভায় নিয়োগে তিনি গোয়ালান্দপ্রদায়ের রামলক্ষণ সিং যাদবকে।

হতাশা না কি মানুষকে পাগল করে দেয়, আত্মহত্যাও করে ফেলে মানুষ। বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদের অবশ্য মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বলে কোন মনসমীক্ষক রায় দিতে রাজি হবেন না। কিম্বা আত্মহত্যার দ্রাব্য নির্বন্ধিতার পথও তিনি বেছে নেন নি। তিনি কেবল নিঃশব্দে দল-বদল করলেন। কংগ্রেস থেকে এস-এস-পি দলে গিয়ে নাম লেখালেন। আশা বামপন্থী দলে ভিড়ে তিনি সত্যিকারের জননেতা বনবেন। কিন্তু এসে দেখলেন এখানেও তিনি লেট লিভার। দলনেতা শ্রীরাম মনোহর লোহিয়ার অকুপণ স্নেহদৃষ্টি তাঁর পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভূপেন মন্ডলেরই ওপর।

বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে এস-এস-পি দলও বিরক্ত তাঁর ওপর। এবারকার নির্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। দলনেতৃত্ব তাঁর মন্ত্রিস্থ পদ গ্রহণ খুশিমনে অনুমোদন করতে পারেন নি, বিধানসভার সদস্য তিনি নন। তাই এস-এস-পি হাই কমান্ড চেরেছিলেন তিনি এম-পি হিসেবে লোকসভায় যান। কিন্তু সে-উপদেশ কানে তোলে নি তিনি। এখন মন্ত্রি রাখতে হলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে বিধানসভা বা পরিষদের সদস্যপদ অর্জন করতে হবে। সে ৬ মাসের মেয়াদ শেষ হবার মুখেই বিদ্যেশ্বরীপ্রসাদ নতুন শোষিত দল গড়ে মধ্যমন্ত্রীর পদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। এস-এস-পি দল থেকে তিনি বহিষ্কৃত, মধ্যমন্ত্রী শ্রী এম পি সিনহাও তাঁকে মন্ত্রিপদ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সারা ভারতের উৎসব দর্শক দেখবেন শেষ পর্যন্ত কে কাকে ছাড়ান।

পশ্চিমবঙ্গে রেশনের চালের বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশবাসীর কাছে তা যদিও বিশেষ কষ্টকর ও বেদনাদায়ক তথাপি তা সহ্যের অতীত নয়। কেন না গত বছরেও এই সময় চালের বরাদ্দ এর চেয়েও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দু' সপ্তাহ রেশনে চাল দেওয়া একেবারেই বন্ধ ছিল। গত বছরের নিদারুণ অভিজ্ঞতাকে ভুলে যাবেন জনসাধারণ নিশ্চয়ই এতটা বিশ্বাসিত্ববশত নন। সৌদিক থেকে বিচার করলে, রেশনে চালের বরাদ্দ কতন করা হলেও, জনসাধারণ সকলের স্বার্থে তা সহ্য করে নিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু যেটা সহ্য করা যায় না তা হচ্ছে এই বিষয়কে উপলব্ধ করে যুক্তফ্রন্টের শরিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের শাখা-শৃঙ্খল। যারা নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করে অপরের ঘাড় বদনাম দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে তাদের প্রতি কোন ভদ্র বিশেষণ প্রয়োগ করা সত্যিই কষ্টকর হয়ে ওঠে।

সোজা কথায় বলতে গেলে যে দুটি রাজনৈতিক দল বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের সূযোগে চটুল নৃবিধাবাদী রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে তারা হচ্ছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার। বর্তমান সরকারের খাদ্যনীতিকে এই দুটি দল রীতিমত সমালোচনা করেছে। ক্ষান্ত হয় নি, প্রত্যক্ষ আন্দোলনেরও হুমকি দিয়েছে। এরা ভুলে গেছে যে, এরাও যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক এবং খাদ্যনীতির ব্যর্থতার দায়িত্ব এদের উপরেও বর্তায়, এবং এরা তা এড়াতে পারে না।

গাছেরও খাব তলারও কুড়োবো এই বিপজ্জনক নীতি যারা অবলম্বন করতে চাইছে তাদের মতোস খুলে দেবার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি। সরকারী তত্ত্বে আসীন হয়ে গরম গরম বুলি দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজের কাজ করব না আর বাইরে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে সস্তা হাততালি আদায় করব এই নীতি যারা অবলম্বন করতে চায়, তারা জনসাধারণের মিত্রদেরই পাত্র।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য—মজুত উদ্ধারের জন্য তারা এ পর্যন্ত কি করেছে? লোক জুটিয়ে বি-ডি-ও অফিস ঘেরাও করা বা কলকাতার রাস্তায় মিছিল করে গড়ের মাঠে লোক জোটানো এক জিনিস, আর লোকানো মান-চাল বার করা আর এক জিনিস। বর্তমান মুহূর্তে শেষের কাজটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং এখানেই বিপ্লবী-বুলি বলনেওয়ালারা একেবারেই ঠান্ডা মেয়ে বলে আছে।

সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যে কারণে কংগ্রেস বিগত বছরগুলিতে মজুত উদ্ধারে



হাওড়ার সমরায় বিপদীর উদ্বেগন : মজুতদার ও মুনাকাবাজদের দৃঢ়হস্তে দরদার জন্য রাজ্যপাল প্রীধরমবীরের আহ্বান

ব্যর্থ হয়েছে, সেই একই কারণে মার্ক্সীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য পার্টিরও এখন ব্যর্থ হচ্ছে। কারণটি খুব স্পষ্ট সেই একই দলীয় স্বার্থ। কাজেই ওপথে যা গিয়ে বরং সরকারী নীতি ও খাদ্য-মন্ত্রীর গালাগালি দাও, আর লোককে বোকাও যে, কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল লোক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় রয়েছে যাদের জন্য খাদ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের পাছা বিপ্লবী পার্টি এখন ক্ষমতায় আসীন হবে তখন আমরা দেখিয়ে দেব কিভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে হয়।

কিন্তু এই সস্তা শ্লোগান সর্বস্বতাকে পুঁজি করে এই পার্টিগুলি যে কতদূর রাজনৈতিক মুনাকা অর্জন করতে পারবে এরাই জানে, আমরা জানি না। আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, আমরা না খেয়েও থাকতে রাজী আছি, তবে এমন সরকারের অধীনে যা জনসাধারণের প্রাণ আকর্ষণ করবে, এক মুখে দু'কথা বলনে-ওয়ালাদের অধীনে নয়।

এখনো পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও চাল মজুত আছে। একটি জেলার কথা বলছি, সেটা হলো বর্ধমান জেলা। এটি আজও পশ্চিমবঙ্গের আভি-উদ্ভূত জেলা এবং এখানে এখনো যে চাল আছে তা উদ্ধার করতে পারলে আগামী তিন মাস দীর্ঘ চলে যাবে। ওই জেলায় মার্ক্সীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব রীতিমত আছে, অথচ ওখান থেকেই সংগৃহীত চালের পরি-

মাণ সবচেয়ে কম। এ থেকেই বোঝা যায় মজুত উদ্ধারের ব্যাপারে ওই পার্টি কতদূর নিষ্সহ। কারণটিও খুব সহজ। মজুত উদ্ধার করতে গেলে অপ্রিয় হতে হবে, পার্টি ফান্ডে চাঁদা জুটবে না, পার্টির ক্ষতি হবে। ঠিক যে কারণে কংগ্রেসীয় জোতদারদের গায়ে হাত দেয় নি, সেই একই কারণ এদের ক্ষেত্রেও কাজ করছে, যদিও মুখে জোতদারদের নিন্দা করার ভাষার অভাব এদের নেই।

নার্সগ্রামের ঘটনাতেই বোঝা যায় যে মজুত উদ্ধারের কাজে সরকার কতটা অসহায়। সরকারী সংগ্রহকারীদের ওই গ্রামে ঢুকতেই দেওয়া হয় নি, অথচ মার্ক্সীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবই ওখানে বেশি। তারা সরকারী সংগ্রহকারীদের কতদূর এই বিষয়ে সাহায্য করেছিল? ...

কাজে কলমে জনসাধারণের কাছে সহযোগিতা আশা করা হলেও, ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের পক্ষে তা করার কোন উপায় নেই। এ সব ক্ষেত্রে পার্টি স্তরেই কাজ কর্ম হয়, এবং জনসাধারণের সহযোগিতা বলতে কার্যত পার্টির সহযোগিতাই বোঝায়। কিন্তু সেই রকম কোন সহযোগিতা সত্যি কি এই সব বিভ্রম-কামী পার্টিগুলি করেছে? যুক্তফ্রন্ট সরকারে তারা যোগ দিয়েছে পার্টির স্বার্থ গোছানোর জন্য। অন্ততপক্ষে খাদ্যের ব্যাপারেই তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বোষণা

সামাজিক বঙ্গবর্তী

করেছে বাধ্যবদ্ধতার আরও অবনতি ঘটলে তারা আর দায়িত্ব নেবে না। সরকারের শরিক হয়ে একথা বলতে যাদের মধ্যে অটকায় না তাদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে কোন আশ্বা পোষণ করা কি প্রকারে সম্ভব? মাস্ত্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির দেখাদেখি আরও কতকগুলি 'সাদা বিপ্লবী পার্টি' একই সুরে সানাই-এর পৌঁ ধরেছে। এস-ইউ-সি'র সুবোধবাবুর উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন যে, বাংলা আন্দোলনের মূল না দিয়ে নিজের দপ্তর দেখান। 'সেরাও' প্রসঙ্গে তিনি খুব মৃত্যু দেখিয়েছিলেন, এবং জনপ্রিয়তাও একদা পেয়েছেন, তাঁর পার্টিরও কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ তিনি কি করেছেন? আজ যে পশ্চিমবঙ্গজোড়া লক-আউটের এবং লে-অফের বন্যা চলছে তার প্রতিকার তিনি করতে পেরেছেন কি? কাজের কাজ করা একটু করিন।

খাদ্য প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা থাক। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন কি করবেন? একথা মূল কথা: মজুত ধান-চাল উদ্ধার করা যাবে না। এই বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের সংশ্লিষ্ট সব পার্টিই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও মজুত উদ্ধারের দায়িত্ব এরা নেবে না, কেন না জাতে পার্টি স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। আর এই পার্টিগুলি সাহায্য না করলে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষেও চাল সংগ্রহ করা অসম্ভব। বর্মান্বনের দ্রুত জতি-উন্নতি জেলা থেকেই যেখানে সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায়, সেখানে বাকি সব জেলা থেকে কতটুকু যে সংগ্রহ হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আউশ ধান ওঠার পরেও সরকার তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নব্বায়া জেলা খোলাখুলি বলে দিয়েছে যে, জেলার বাইরে আউশ চাল যাবে না। আগামী মরশুমে আমন না ওঠা পর্যন্ত সরকারের গৃহ্যে এক হুটকি চালও জমা পড়বে বলে মনে হয় না। রেশনের চালের বরাদ্দই বা আর কতদূর কতন করা যাবে? অথচ চাল যে দেশে নেই তা নয়, কিন্তু আইন বা বল প্রয়োগের স্মারা তা বেরবার কোন সম্ভাবনা নেই। মজুত-দারেরা নিজেরের কাছে ধান-চাল রাখে নি, বিশ্বস্ত লোকের বাড়িতে কিছু, কিছু করে রেখে দিয়েছে, আইনসম্মতভাবে স্বত্বা করে রাখা যায়। কাজেই কিভাবে সরকার তা উদ্ধার করবেন? এখন একটি জাগ্রত পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে খোলা-বাজারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া, কর্তন ব্যবস্থা প্রত্যাহার, এবং অবশ্যে ধান-চাল পরিবহনের অধিকার দান। তাহলে লোকের ধান-চাল আলোর দৃশ্য দেখাবে, বাজারে চাল আসবে, দামও কমবে। সরকার যদি মজুত উদ্ধার করতে

পারতেন তা হলে আমরা এই প্রস্তাব দিচ্ছি না, কিন্তু তা যখন তাঁরা পারবেনই না, তখন যদি অন্য কোন উপায়ে লোকেরা চাল বেরায় তার জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় এই একমাত্র পন্থাটি যাতে কিছুটা সফল পাওয়া বর্তমান অবস্থায় সম্ভব।

কালোবাজারী ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমহারী হাওড়ায় একটি সমবায় বিপণির উদ্বোধন উপলক্ষে খোলাখুলি জানিয়েছেন যে, মজুতদারী, মুনাকাবািজ ও কালোবাজারী বর্তমান না পর্যন্ত দৃঢ়হস্তে দমন করা হচ্ছে ততদিন এ দেশের উন্নতি বিলম্বিত সম্ভব হবে না। এর জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের তরফ থেকে কঠোরতম আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকরী করা প্রয়োজন, এবং রাজ্যপাল কোডের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটিই সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হয়ে আছে। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে আসছি যে শ্রীধরমহারী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিষ্পত্তি হবার পর থেকেই মজুতদারী ও কালোবাজারী দমনে আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন, এবং পাঞ্জাবে রাজ্যপাল থাকাকালীনও তিনি এই বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে কিছু কাজ করেছিলেন। রাজ্যপালের এই স্পিরিট নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, এবং যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিকে নজর দেন তাহলে এই দৃষ্টেই এই বর্ণিত সামাজিক পাপীদের অবলম্বন করা সম্ভব। দুঃখের বিষয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা এ বিষয়ে বড় একটা নজর দিচ্ছেন না। যে দুর্নীতি ও সামাজিক পাপকে সম্বন্ধে জিইয়ে রেখেছিল বলেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসকে উৎখাত করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করিয়েছে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কিন্তু সেই পুরাতন কংগ্রেসী পন্থারই অনুসরণ করে চলেছে, আজও পর্যন্ত কোন এই জাতীয় সামাজিক অপরাধীদের দণ্ড হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বয়স বিচার করে আর কতদিন জনসাধারণ এই বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকবেন? মুনাকাবার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কেন কোন দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন এখনো পর্যন্ত করছেন না এই অভিযোগ ইতিমধ্যেই শ্রমায়িত হতে শুরুর করেছে। মন্ত্রীরা এদিকে নির্বিকার। তাঁরা একে অন্যকে দোষারোপ করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ করছেন না। এদের পারস্পরিক কাশা-মোড়াহাড়ি বেধে জনসাধারণ ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ ও সংশ্লিষ্ট দলগুলির প্রতি তাই আমাদের নিবেদন যে, শূন্য নিজের এবং নিজের

দলের সতীপনা জাহির এবং অপর দল-গুলির অসতীপ প্রতিপাদনের অপচেষ্টা ত্যাগ করে একত্রে গে তাঁরা কিছু কাজকর্ম করুন, সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি ও কালোবাজারীর মূলোচ্ছেদ করুন। ব্যক্তিগতভাবে কোন মন্ত্রীই যোগ্যতার ঘাটতি নেই, অথচ সামগ্রিকভাবে তাঁরা কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, এতে সেই শ্রেণীর মানুষদের প্রতিই জঘন্য ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে যারা যুক্তফ্রন্ট গড়তে সাহায্য করেছেন এবং যারা আজও যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মত বাঁচিয়ে রাখতে চান।

হাওড়া সেকসনে বিপ্লব

বিষয়টি নিয়ে আমরা কোন মন্তব্য করব না ভেবেছিলাম, কেন না আমাদের ধারণা ছিল পূর্ব রেওয়ের হাওড়া সেকসনে ইন্টারলকিং প্রথা চালু করতে গিয়ে কিছু ব্যাপ্তিক গোলাবোম্ব ঘটেছে, যে কারণে ট্রেন চলাচল বিঘ্ন ঘটছে। যেখানে ব্যাপারটি বর্ণনাচিত সেখানে কোন ব্যাপ্তিক ঘটনা ঘটলে তা মোরামত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেই স্বাভাবিক।

কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে, দুঃসম্বাদেও ব্যাপারটি মিটল না, প্রত্যহই ট্রেন চলাচল একান্তই অনিয়মিত, যাত্রী-সাধারণের বিশেষ করে লক্ষাধিক ডোলি প্যাসেঞ্জারের দুঃভোগের শেষ নেই, যাত্রীরাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, এবং রেলকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বিষয়টি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন পড়েছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেছে, তাতে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধোয়া তুলসীপাতা বলা যায় না। ইন্টারলকিং-এর ব্যাপ্তিক দুটির চেয়ে পরিচালন ব্যবস্থার দুটিই এই অনর্থের জন্য দায়ী। এই উন্নতিতর পন্থাটি প্রয়োগ করতে গেলে কর্মীদের যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তা মোটেই দেওয়া হয় নি। কিন্তু শিয়ালদহ সেকসনে ওই একই কাজ অনেক দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছিল। এই কাজে পর্যাপ্ত কর্মীও নিয়োগ করা হয় নি। অর্থাৎ দুটিটা ব্যবস্থাপনার, অথচ ব্যাপ্তিক দুটির নামে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করেছেন, এবং যাত্রীদের ঘাড় চাপিয়ে দিয়েছেন বহু দুঃভোগের বোঝা।

ইন্টারলকিং ছাড়াও আরও একটি কারণে হাওড়া সেকসনে ট্রেন অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এই সেকসনে বৈদ্যুতিক ট্রেনসমূহ ডি সি কারেন্টে চলাচল করত, এবং তাতে কোনই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের মাথার কিছু কুমতলব আছে। যাত্রীদের পকেট কেটে

শাস্ত্রাঙ্ক বঙ্গদেশী

(এত বেশি রেলভাড়া পৃথিবীর কোন
মুঠা দেশে নেই) রেলওয়ে যে মোটা টাকা
অর্জন করেন, তার কিছু ভাগ তাঁরা
তাঁদের অনুগৃহীত কোন কোন কন্সট্রাক্টকে
দিতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সিদ্ধান্ত
করেছেন যে, তাঁরা হাওড়া সেকসনে
এ সি কারেন্টে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালাবেন,
এবং এই জন্য সমগ্র ব্যবস্থার খোল-নলচে
বদলাতে হবে। অর্থাৎ নতুন করে
বৃহদায়তন অঙ্কের অর্থব্যয় করা হবে,
এবং যাত্রীদের পকেট কাটা এই টাকার
গুটিকর কন্সট্রাক্ট ছাড়া আর কে যে
লাভবান হবেন বোঝা যাচ্ছে না। এই কাজ
ইতিমধ্যেই শুরুর হয়ে গেছে।

ফলে অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে
যে, আগনি যদি ওই সেকসনের ট্রেনে
চাপেন তা হলে কখন যে গন্তব্যস্থলে
গিয়ে পৌঁছবেন তার কোনই স্থিরতা
নেই। এর ফলে যদি যাত্রীসামগ্রণ উত্তে-
জিত হয়ে ওঠেন, রেলকর্মী ও ড্রাইভার-
দের মারধোর করেন, বা প্রায় প্রাত্যহিক
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে তাঁদের
মোঁব দেওয়া যায় না। নানান কারণে পারি-
শাসনিক অবস্থার প্রভাবে মানুষের
জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে
অল্পে উত্তেজিত সহজেই তারা হয়ে পড়ে।
আইনসংগত পথে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন
মাত্র সেই সেকথা যাত্রীরা হাড়ে হাড়ে
বোঝেন, কাজেই তাঁরা বাকি আঙুলে ঘি
তুলতে চান। অফিসে সময়মত হাজিরা
দিতে না পারার কি যন্ত্রণা সেকথা কাউকেই
হাঁকিয়ে বলতে হবে না। অথচ তা যদি
দিনের পর দিন ঘটে তাহলে যাত্রী-
সামগ্রণ কতদিন তা মৃদু বুঝে সহ্য
করবেন?

ইতিহাসের জাত বিচার

গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে আমরা
জানিয়েছিলাম যে, কলকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের একটি স্বার্থান্বেষী মহল
ইতিহাস বিভাগের তিনটি শাখার দুটি
শাখাকে অবলুপ্ত করার এক চক্রান্ত
লিপ্ত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-
গঠিত নিরাম্বলীর একটি ধারার বলা
হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও
সংস্কৃতি এবং ইসলামীয় ইতিহাস ও
সংস্কৃতিতে এমন-এ পাশ করা কোন ছাত্র
কোন কলেজে অধ্যাপনার যোগ্য বলে
নির্বাচিত হবে না।

এইরূপ বিধি যারা প্রণয়ন করতে
পেরেছে তাদের উদ্দেশ্যটা কি তা জানলে
শিকড়সমাজের প্রতিই সার্বিকভাবে
সাধারণ মানুষের মন বিতৃপ্ত ও হৃদয়
দুঃখিত হয়ে আসবে। উদ্দেশ্যটি বিবাদী
একটি বৈষয়িক, অপরটি মনস্তাত্ত্বিক।

আগে বৈষয়িক দিকটির কথাই বলা
যাক। আধুনিক ইতিহাস বিভাগের যিনি
নেপথ্য পরিচালক, যিনি কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ-সাতটি চেয়ার
জাঁকিয়ে বসে আছেন, সেই তিনি রাজ-
নীতিতেও বিশেষ দক্ষ এবং একজন রাজ-
নৈতিক নেতার কুপার ওই চেয়ারগুলির
অধিকারী, (যদিও গবেষণার কয়েকটি
নোটবই ছিন্ন আর কিছুই যিনি লেখেন
নি,) সেই তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের
সেনেট ও এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল নিজে
দলের লোকদের দিয়ে কুক্ষিগত করতে
চান এবং সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক ইতিহাস
বিভাগের কয়েক ব্যক্তিকে করারত করে যে
সুচতুর রাজনীতির খেলায় নেমেছেন
তা হচ্ছে এই যে, যে সব নতুন কলেজ
চারদিকে খোলা হচ্ছে সেইগুলিকে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশন নিতে হলে
এবং অনার্স কোর্স খুলতে গেলে এই
ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয় এবং সেই
সুযোগে এঁরা নিজেদের লোকদের এই
সব কলেজের অধ্যাপনার জন্য সুপারিশ
করেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষও অনুরোধে
চৌকি গিলতে বাধ্য হন। যারা এইভাবে
কলেজে কাজ পাচ্ছেন তারা পদাধিকারবলে
যখন সেনেট ও এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের
সদস্য নির্বাচিত করার জন্য ভোট দেন,
বলাই বাহুল্য সেই ভোটসমূহ এই
মহাশ্বাসের দলীয় স্বার্থে প্রযুক্ত হয়।
এখন এই ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বার্থ তাঁরা
এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, কেন
না ইতিহাস বিভাগের আরও দুটি শাখা
আছে এবং সেই শাখাগুলিতে যারা পাশ
করে কলেজে অধ্যাপনা করেন তাঁরা এই
মহাশ্বাসের আরম্ভের বাইরে থাকার দরুন
এঁরা কিছু অসুবিধাম পড়েছেন। কাজেই
পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা চোরাগোস্তা পথে
তাঁরা করে নিয়েছেন যে, ইতিহাসের অপর
দুটি শাখায় পাশ করে কোন ছাত্র কলেজে
অধ্যাপনা করতে পারবে না।

দরদটা নিঃসন্দেহে আধুনিক ইতি-
হাসের উপর নয়, বরং নিজেদের দলীয়
স্বার্থের উপর। ইতিহাস নিয়ে যারা
কিছু পড়াশোনা করেন তাঁরা জানেন যে,
ভারতবর্ষে প্রকৃত ঐতিহাসিক সৃষ্টি
করেছে ওই বহু অবহেলিত প্রাচীন
ভারতীয় ও ইসলামিক ইতিহাসের শাখা
দুটি।

ভারতের গর্বস্বরূপ, তথা জগতের
জনাতে প্রস্তুত ঐতিহাসিক স্যার বঙ্গদেব
সরকার মাস্টার্স যুগের ইতিহাস নিয়েই
ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। প্রাচীন ভারতীয়
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যবাহী-
কেন অধ্যাপকের পদে যারা বিরাজ করে-
ছেন, সেই খিট, ডান্ডারকর, হেমচন্দ্র রায়-
চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ বসুসহায়ার,

নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সরকার
প্রমুখের নাম জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক যে
বিভাগ থেকে সৃষ্ট হয়েছেন সেই বিভাগকে
যারা ইতিহাসের নামে অবলুপ্ত করতে চায়
তাদের হরত অনেকে উদ্ভাবন বলে খারিজ
করবেন, কিন্তু এই উদ্ভাবতার গিহনে
একটি মৃণ্মেধ কাজ করছে। এঁরা
নিজেরাই ভাল করে জানেন যে, যে
‘আধুনিক ইতিহাস’ নিয়ে তাঁরা আজ
ইতিহাসের জাত বিচারে নেমেছেন, সেই
আধুনিক ইউরোপীয় ও জগতের ইতি-
হাসে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁদের কারোই
কোন অবদান নেই, ইউরোপের ইতিহাস
নিয়ে গবেষণা করলেও তারা কোন ব্যক্তি
এদেশে নেই এবং ওদেশী পণ্ডিতদের
তুলনায় তাদের যে ঘাটতি তা পূরণের
কোন উপায়ই নেই, এবং এও জেনে রাখার
কথা যে, আধুনিক ইতিহাস বিভাগে যারা
গবেষণা করে ভট্টরেট হয়েছেন তাঁদের

মফতলাল গ্রুপ



দশটি মিলের কাগড় লব্ধা

মিলের নির্ধারিত মূল্যে

পাওয়া যায়

গুরুত্বপূর্ণের রুমাল ও পুজার জন্য
নতুন নতুন মালের আমদানি করা
হইয়াছে।

সুবিধা দরে কার্টাপস ও পাওয়া যায়

অনুমোদিত রিটেল শো রুমস্ :

পার্বতী স্টোরস্

২এ, গিরিশ এভিনিউ (যতীন্দ্রমোহন
এভিনিউ এবং ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ-
এর সংযোগস্থলের নিকট), কলিকতা-৩
বাস রুট-২বি, ১ এবং ৩২ নম্বর বাসে
রাজবল্লভপাড়া স্টপেজে নামুন।

গাড়ীয়াহাট সোসাইটি

পি-১১, গাড়ীয়াহাট রোড (গোল পার্কের
নিকট), কলিকতা-২৯ ৪৬-৭৮০৮

মিলের শেয়ার হোল্ডারদের ৩০-৯-৬৭
পর্যন্ত শতকরা ৮ টাকা হারে ডিসকাউন্ট
দেওয়া হইবে। শেষ মর্হুতের ভাঁড়
বাঁচাইবার জন্য পুর্বেই খরিদ করিতে
অনুরোধ করি।

মতকরা একশো ভাগকেই ভারত ইতিহাসকেই পালি করতে হয়েছে। কাজেই যখন উক্ত মহাত্মা জনসমক্ষে সগর্বে বলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগকে তিনি এমন করে দেবেন যাতে কয়েকটি ডিগ্রি-প্রার্থী মেয়ে ছাড়া আর কেউ পড়বে না, তখন বিবেকবান যে কোন লোকই যে আতঙ্কে শিউরে উঠবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কেন না শিক্ষিত মান্যগণ্য লোক যখন শূন্যলব্ধির দ্বারা চালিত হয় তার নিম্নসের বিষ সমগ্র পরিবেশকেই ক্রোধিত করে তোলে। বাস্তবিকই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ কয়েকটি লোকের জন্য ক্রোধিত হয়ে উঠেছে, নইলে স্যার আশুতোষের নিজের হাতে গড়া বিভাগের নামনে আজ এই দুর্যোগ আসবে কেন?

দুর্গাপুর প্রকল্প

দুর্গাপুর প্রকল্প ও দুর্গাপুর কেমিকাল নিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভের অভাব নেই, কেন না দীর্ঘকাল এই বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ ধুমায়িত হচ্ছিল। ফলে যুক্তকট সরকার গত মে মাসে দুর্গাপুর প্রকল্প (লিঃ) এবং দুর্গাপুর কেমিকাল (লিঃ) নামক দুটি সরকারী উদ্যোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি গত তিন মাস ধরে উক্ত দুটি সংস্থার কার্য-বলীর বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এবং তাদের ৩৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে, উক্ত সংস্থা দুটিতে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অযোগ্যতা, অর্থের অপচয় প্রভৃতি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড সম্বন্ধে কমিটি মন্তব্য করেছেন যে, ওই প্রকল্পের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক গলদের সীমা নেই; টেন্ডার গ্রহণ ও অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিপূর্ণ; ওই সংস্থার পরিচালক বোর্ড মোটেই কাজ করে না; আভ্যন্তরীণ অডিট বা কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্স কোন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেন নি; ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজকর্ম ট্রান্সপারেন্ট; কর্মচারীদের চাকুরীর কোন স্থায়িত্ব নেই; উৎপাদনের হারের সঙ্গে বোনাসের সঙ্গতি নেই; জরুরী-মূলক ওভারটাইম; কোন বাৎসরিক আর্থিক রিপোর্ট নেই ইত্যাদি ১৬ দফা অভিযোগ। এমন কি মোট কর্মীদের সংখ্যা সেখানে যে কত তারও কোন হিসাব নেই। কমিটি অবশ্য কয়েক দফা সুপারিশ করছেন ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে, এবং শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসংশীল খাড়া সেগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন এরকম আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু অভি-

জ্ঞতার দেখা গেছে, তদন্ত কার্যই কলনে আর বাই বন্ধন, শেষ পর্যন্ত সবই কড়ক-গুলি অনুষ্ঠান সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। আমলা-তান্ত্রিক শিকড় এমন অস্ত্রোপাশের মত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে ঘিরে আছে যে সেগুলির পক্ষে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা কদাপি সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে অপচয়, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা আজ গগনশূন্য হয়ে গেছে। সর্বস্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিবর্তন না করলে অবস্থার কোন উন্নতি নেই। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের শীর্ষে বারী বিরাজ করেন, আইন করে প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির জন্য তাদের দায়ী থাকতে বাধ্য রাখা উচিত। এরা নৈবেদ্যের চুড়ার সম্প্রদায়ের মত বিরাজ করবেন, আজ রাষ্ট্রীয় পরিবহনে, কাল কলকাতা দুগ্ধ প্রকল্পে পরশু ব্যাঙ্কল ধামল প্রায়ন্টে, এই রকম ব্যবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ এই রকমই বড়িয়ে চলবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে আজ সবচেয়ে অভাব দক্ষতার।

নিম্নশ্রেণী শ্রমিকদের

সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে সমস্যার স্রোত নেই, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দাবি মেটাতে যেখানে মানুষ উদ্যস্ত থাকছে, প্রতি মুহূর্তে যেখানে যে কোন বিষয় উপলব্ধ করে বিক্ষোভের ঘটনা সম্ভাবনা, মন্ত্রীরা যেখানে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছেন, একমুঠো ভাতের জন্য যেখানে মানুষ হনো হয়ে উঠেছে, সেই নিরন্তর চঞ্চল, নিরন্তর অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি কাজ কিন্তু নিঃশব্দে চলছে, জগৎসংসার উল্টে বাক তথাপি যার কালিত নেই, বিরতি নেই। এ এক আশ্চর্য কর্মদক্ষতা। গত বিশ বছরে পাকিস্তানে বহু সরকারের ওলোটপালোট হয়েছে, কিন্তু যে সরকারই গদিতে আসুক না কেন, তার ভারত বিশেষের নীতি যেমন বদলায় নি, ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এত টানা পোড়েন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ওলোট-পালোট সত্ত্বেও পূর্ব রেল দপ্তর একটি নীতি অবিচলভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন, যা হচ্ছে স্টেশনগুলির নামসমূহের হিন্দীকরণ। এবং একই সঙ্গে আরও একটি শ্রেণী সেই হিন্দী অক্ষরগুলির উপর আলকাতরা বালিয়ে চলেছে, ওই একইভাবে, নিঃশব্দে। রেল কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে দেবনাগরী লিপি না শিখিয়ে ছাড়বেন না, জনসাধারণও বিনামূল্যে লিপি শিখতে আগ্রহী নয়, তাই তারাও একান্ত বয়োদপ্তর মতই আলকাতরা বালিয়ে রেল দপ্তরের সাধের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চেষ্টা করছে।

গল্পটি বলাইলেন আমাদেরই একজন বিশিষ্ট বন্ধু বিনি মফস্বল থেকে প্রত্যাহ আসেন। তিনি যে স্টেশন থেকে গাড়িতে ওঠেন, একদিন দেখা গেল সেখানকার নেমপ্লেটগুলি ঘসে মেজে সেগুলিতে হলদে রং ধরানো হচ্ছে। শ্বিতীয় দিনে দেখা গেল সেই হলদে নেমপ্লেটগুলিতে স্টেশনটির নাম লেখা হয়েছে, খুব সুন্দর করে, তবে বাংলা লিপিতে নয় দেবনাগরী লিপিতে। তৃতীয় দিনে দেখা গেল প্রতিটি নামই আলকাতরা দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বন্ধুটি আরও জানালেন যে, লিলুয়া থেকে শব্দ করে ব্যাঙ্কল পর্যন্ত তিনি দেখেছেন যে প্রতিটি স্টেশনে এইভাবে নতুন করে নাম লেখা হয়েছে এবং যথারীতি তা মুছেও দেওয়া হয়েছে। এর পরের স্টেশনগুলিতেও নিশ্চয়ই অনুপ কর্ম ইতিমধ্যে করা হয়েছে বা হচ্ছে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই একটি বিষয়কে উপলব্ধ করে কত অর্থ ও প্রেমের অপচয় রেল দপ্তর ঘটানো যাত্রী-সাধারণের পকেট কাটা টাকার? সারা পশ্চিমবঙ্গের স্টেশনসমূহের নেমপ্লেট তৈরি করতে যে রং লাগে তার দাম কত? লেখানোর জন্য যে মজুরী লাগে তার পরিমাণ কত? গত কয়েক বছরে অন্যান্য পন্থার এই রকম নতুন করে নেমপ্লেট লিখতে যাত্রীদের পকেটকাটা টাকা কত-গুলি ব্যয় করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে? রেল দপ্তর কি একথা জানেন না যে, যতদিন না পশ্চিমবঙ্গে স্টেশনগুলির নাম লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে ততদিন এই বার বার লেখা ও মোছার খেলা বন্ধ হবে না? না কি কোন অনুগ্রহ-ভাজন কোম্পানীকে কিছু টাকা পাওয়ানোর জন্যই রেলদপ্তর জেনে শুনেন এই খেলা খেলছেন? সারা পশ্চিমবঙ্গের অল্প রেল স্টেশনের নেমপ্লেট লেখার কষ্টকট বড় কম টাকার নয় কাজেই বিষয়টিকে সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

রেলদপ্তরের নিকট আমাদের বক্তব্য, জনসাধারণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার তার নেই। জেনে শুনেন ন্যাকামি করার কোন প্রয়োজন রেলদপ্তরের নেই। পশ্চিমবঙ্গের রেল স্টেশনগুলির নেমপ্লেট লেখার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর ন্যায্য সেন্টিমেন্টকে সম্মান দেখান। তাহলে স্টেশনের নেমপ্লেটগুলিকে বার বার লেখানোর প্রয়োজন হবে না, এবং অনাবশ্যক অর্থের অপচয় বন্ধ হবে। কিন্তু চোরা ধর্মের কাহিনী শুনবে কি? বিশেষ করে রেলদপ্তরের এই কাজের পিছনে যখন একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে?

ভারত দর্শন

বিস্ফোটক

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে অগ্নিগর্ভ অবস্থা ধূমায়িত হয়ে উঠছে তৎপ্রতি জাতির দুর্ভিত আকর্ষণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চীচাবন সাংবাদিকদের কাছে সম্প্রতি গভীর উবেগ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক জিগির ধারা তুলছেন সেইসব নেপথ্যাচারী চক্রান্ত-কারীদের হাতিশই আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে। এ-জাতীয় দুর্ঘটনার পেছনে বিশেষ বিশেষ সংগঠিত শক্তি যে ক্রিয়াশীল এ বিষয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু চীচাবন এই প্রসঙ্গে কোন বিশেষ দল ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে চান নি। বরং বিহার মন্ত্রিসভার কোনও এক শরিকদল এই নিম্নমাগারী চক্রান্তের নাটের গুরু কি-না তার কাছে এমন প্রশ্ন তোলা হলে তিনি সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন তখন কোনও বিশেষ দলকে চিহ্নিত করা অনুচিত। তিনি ঘটনার অধোগতি নিবারণে বিহার পদলিখমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রীয় অবস্থা আয়ত্তে আসছে।

বস্তুত খুবই তৎপরতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মাগা চক্রান্তকে বিহার মন্ত্রিসভা আয়ত্তে এনেছেন এবং পূর্ব পরিকল্পিত একটি হাঙ্গামার অবসান ঘটানোর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দেখামাত্র (হাঙ্গামা-কারীকে) গুলী করার আদেশও বিহারের হাঙ্গামা দমনে কার্যকরী হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনে কেন্দ্রীয় তৎপরতারও খুৎ ধরায় উপায় নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত রকম সাহায্য ভরান্বিত করার আশ্বাস দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন ঠাণ্ডাকার্যের জন্য তাৎক্ষণিক অবস্থায় এক লাখ টাকার সাহায্য। তা ছাড়াও তহবিল প্রস্তুত আছে সাহায্যের জন্য। স্মরণীয় দুর্ভিক্ষপিড়িত মানুষের পক্ষে বিলম্বিত সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের প্রতি ধন্যনই অভিযোগ থাক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সরকারী সাহায্যের প্রশ্নে কখনো কোনও অভিযোগ রাখতে পারেন না। সর্বদা সর্বদাই সংখ্যালঘু সমাজের নিরা-

পত্তা রক্ষার আর সমস্ত বিষয়ের চেয়ে ঢের বেশি সতর্ক। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য যারা দায়ী তাঁদের ব্যবস্থাও যথাসময়েই গ্রহণ করা হবে, এ প্রশ্নেও সন্দেহের অবকাশ কম। উত্তপ্ত প্রচার-পুস্তিকা বিলির জন্য দায়ী এক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারী তরফে কোথাও কোন অনুষ্ঠানের ঘৃণা নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রশ্ন তুলে হাঙ্গামার প্রসঙ্গে কাউকে চিহ্নিত করতে গররাজি হয়ে খুবই সঙ্গত কাজ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন যে তিনি এই প্রসঙ্গেই ভারতীয় তরুণ সমাজের প্রতি অবান্তর উজ্জ্বা প্রকাশ



চাবন

করলেন বদ্বতে পারলাম না। তিনি কোপ খুবই কোপ মারলেন তরুণ ভারতের ওপর। বক্তব্য: প্রবর্তমান তরুণ দুর্ভিনয়কে খতম করার আয়োজন করতে হবে। যিনি চোখের সামনে জম্মু, কাশ্মীর, বিহার, দিল্লীতে ফ্যাসিস্ট জনসম্ম এবং বোম্বেতে ফ্যাসিস্ট শিব সেনার রক্ত মূর্তি দর্শন করছেন, তিনি প্রসঙ্গাতরে প্রবেশ করে তরুণ-ভারতের অবদমনের জন্য ছটফট করে উঠলেন, ব্যাপারটার মধ্যে অন্যতর একটি পচা ডিমের গন্ধ ভেসে এল।

প্রকাশ, ইতিমধ্যেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম পি সিংহ নাকি চাবন সাহেবকে জানিয়েছেন যে রাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার নেপথ্যে কতিপয় কংগ্রেসসেবার নোংরা হাত আছে এবং সময় মত মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে প্রমাণাদিও দাখিল করতে পরাজয় নন। দুঃখের বিষয়, এইসব ব্যবসায়ী রাজনীতি-ওয়ালাদের দমন করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী পদ্ধতি গ্রহণ করছেন, চাবন সাহেবের বক্তৃতা সৈদিক মাড়ায় নি।

চাবন সাহেব জাতির দেহে ঠিক কোন স্থানে বিস্ফোটক চিহ্নিত করলেন আশঙ্কর কথা সেটাও কম নয়। আজ যে শিব সেনার উপায়ে মহারাষ্ট্রে 'ভারতীয় সংহতি' নামক বহু চক্রানির্মানিত প্রত্যা-টির সঙ্গীন অবস্থা দেখা দিয়েছে, এই চাবন সাহেবই সেই শিব সেনার সরকারী মুখপত্র মারাঠী সাপ্তাহিক 'শর্মিক' এর উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬০ সালে। তখন চীচাবন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অবশ্যই শিব সেনা অভ্যন্তরেকের নিম্না করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্তই। শিব সেনা দমনের জন্য কংগ্রেস কটকটু করছেন! বরং গত তেরই আগস্ট 'শর্মিক'ের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে কংগ্রেসী নেতা শ্রীবসন্তরাও পাতিল প্রধান অতিথি হিসেবে শিব সেনাবাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অথচ উক্ত মাঝামাঝী প্রদর্শনে শিব সেনার হুমকী মাত্র ২১শে জুলাই দক্ষিণ বোম্বের পরিষদ হলের সামনেই দেখা গেল এবং রেল কন্ট্রোল পনেরই আগস্টের মধ্যেই সেই হুমকী তামিল করতে বাধ্য হয়েছেন। বেশি কি, কংগ্রেস নৈতা স্বয়ং মোহন ধারিয়াই মন্তব্য করেছেন যে, কংগ্রেস শিব সেনার নিম্নাবাদ করলেও বোম্বের নাগরিকমন্ডে আশ্রয় সঞ্চয় করতে পারেন নি। অ-মহারাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ বোম্বেতে প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের মতোই সশস্ত্র জীবনযাপন করছেন শিব সেনা-বর্গীর ভয়ে। উত্তর বোম্বের দক্ষিণ ভারতীয় নাগরিকগণের ওপর চলেছে উপর্যুপরি হামলা। সরকার ব্যবস্থা গ্রহণে অলস। শিব সেনা-বর্গী আসছে শুনলেই প্রাণভরে মানুষ পালাচ্ছে, দোকান হাটের বাপ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে সংবিধানপ্রদত্ত নাগরিক অধিকার ভেদ

সাহাধিক বসুমতী



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের বড় নিতে দেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের হক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, লখনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (মণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের কৃতপূর্ণ অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদশাস্ত্র



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

SP-4/67

করার সুযোগে বঞ্চিত হইলেন অ-মহা-
রাস্ত্রীয় সম্প্রদায়। জিজ্ঞাসা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এদের
সনাক্ত করতে ইতস্তত করলেন কেন, আর
কেনই বা তাঁর কোপ বিশেষভাবে চিহ্নিত
দোষীদের টপকে তরুণসমাজের মধ্যে
সাধারণীকৃত হল।

জাতির দেহে যথার্থ স্থানে বিস্ফোটক
আবিষ্কারের চেষ্টা করাটা এমন কিছু
বিধান রায়ী চিকিৎসকের প্রতিভার
প্রয়োজন হয় না। যে-কোন হাতুড়ে
চিকিৎসকও একটু চেষ্টা করলেই তা
চাক্ষুঃ করতে পারেন। চোখ বন্ধ করে
কেমন ভ্রমটাকে রোখা যায় না, মৃদু বন্ধ
রোধে ভেতন সত্যকে বিভ্রান্তও করা যায়
না। দেশের অগ্নিগত পরিস্থিতিতে
যদি দেশনেতৃগণ যে-কোনও উদ্ভূত গোপন
কারণে অব্যাহতি বাড়তে দেন তবে তার
ফলশ্রুতিতে আপন প্রাণ বাচানোও
(স্বাধাধা) রক্ষাও কালে অসম্ভব হয়ে
দাঁড়াবে। আর তার কিছু কিছু পরিচর
কংগ্রেস ইতিমধ্যে দু-একটি রাজ্যে লাভও
করেছেন।

প্রয়োজন সুতরাং দেশের ইতিপ্ৰমাণ
মার্টিডেও বর্বর ফ্যাসিস্ট উত্থানের আয়ো-
জনকে আঁতুড় ঘরেই শেষ করে দেওয়া।
অন্যথা বিপৎকালে সামাল দেওয়া ভার
হবে।

শিব সেনার নয়া হিটলার

শিব সেনার জন্ম মাত্র ১৯৬৬ সালের
জুন মাসে। প্রতিষ্ঠাতা চম্পক বহুরের
কৃষ্ণকায় রাগী সাংবাদিক বালাসাহেব
ঠাকরে। শিব সেনার জন্মের পর যার
সাম্প্রদায়িক শিব সেনা মূখপত্র 'মর্মিক'
বেশ দু'পরসার মৃদু দেখেছে এবং ঠাকরের
নিজের সংসার রাজার হালে চলছে তারপর
থেকেই। নিজের জীবনে দক্ষিণ ভারতীয়-
দের সঙ্গে তাঁর বিনিবনা হয় নি। শিব
সেনার দক্ষিণী-বিরাগের মূলে তাঁর ব্যক্তি-
গত রাগও ত্রিাশীল এমন সন্দেহ স্বতই
জাগতে পারে। কার্টুনিস্ট বাল ঠাকরে
মারাঠী তরুণ সমাজের হতাশার ডোবার
ছিপ ফেলে প্রায় রাতারাতি সাম্রাজ্যের
মুই-কাংলা শিকার করেছেন। শিবাজীর
নামে শিব সেনার প্রতিষ্ঠার পরে দলে দলে
বেকার হতাশ সমাজজীবনে অপ্রতিষ্ঠিত
বুঝ মারাঠীরা বাল ঠাকরের আহ্বানে
আশ্রয় দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে।
সেনা বাহিনীর লক্ষ্য বেশ সমর্থ বুঝককে
দলে ভেড়ানো এবং কেবলমাত্র মারাঠী-
দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। কেন না মহা-
রাস্ত্র মারাঠার, সেনাবাহিনীর প্রধান
শ্লোগান এই। শিব সেনা বা এস এস
বাহিনীর লক্ষ্য বোম্বাই থেকে অ-মারাঠী

বিভাজন বা বোম্বাই-এ মারাঠা আধিপত্য
এককভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বেকার মারাঠা
যুবসমাজকে প্রলুব্ধ করতে এ শ্লোগানের
জুড়ি নেই। বিশেষ মাত্রায়ে শব্দ
ভাষাকে নিয়েই যখন ডি এম কে এতদূর
এগিয়েছে, তখন শিব সেনা মারাঠাদের
মধ্যে অর্থনৈতিক হতাশাকে ক্যাপিটল
করে যে দ্বিতীয় মহারাস্ত্র জীবন প্রভাতের
সূচনা করবে, সহজ বিচারে তা স্বাভাবিক।
আর সে লাইনে বাল ঠাকরে সর্বশেষ
সুবিধে করে নিয়েছেন দেশের বর্তমান
রাজনৈতিক পরিস্থিতির আনুকুল্যেই।
কিন্তু সেসব প্রশ্নে পরে আসা যাবে।
প্রথমে এস এস চরিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা
করা যাক।

কুখ্যাত এস এস বাহিনী

বর্তমানে এস এস বাহিনীর সৈনিক
সংখ্যা লাখ থাকেন। প্রধান নেতা প্রমুখ
(বর্তমানে ঠাকরে)। শাখা প্রতিষ্ঠানের
নেতারা শাখা প্রমুখ। প্রমুখের আদেশ
শিরোধার্য। স্বয়ং হিটলার-প্রমাণ ক্ষমতার
অধিকারী তিনি-ই। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ
স্বার্থ-চেতনাকে উত্তেজিত করেই যেমন
ফ্যাসিস্ট শক্তির জাগরণ হয়েছিল, প্রমুখ
ঠাকরেও তেমন মারাঠা যুবকদের মনে
সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-চেতনার উস্কানী
দিবে শিব সেনার বিশীর্ণ জেনেরাল
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই
কৃষ্ণকায় ক্ষীণজীবী কার্টুনিস্টের অগাধ
হুম্ময়। ইনি ভারতে একজন ডিক্টেটরের
প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে করেন
এবং একই সঙ্গে নিজেকে ডিক্টেটররূপে
চিহ্নিত করতে গর্ববোধ করেন। এস এস
সেনার এই রুদ্র নেতাটির বিশ্বাস, দেশে
আজ এক হিটলারের প্রয়োজন। শিব সেনা
হের ঠাকরে ধূনি দিতে শব্দ বাকি
রাখছে। কার্বত ইনি সোঁদনেরই স্বপ্ন-
বিলাসী। কুখ্যাত এস এস বাহিনী যে

নর-রাক্ষস হিটলারের বাসনা কুপ্ত করে-
ছিল, রুদ্র বাল ঠাকরে সেই কুখ্যাত
নামটি বাছাই করেই গঠন করেছেন
মারাঠা এস এস বাহিনী। ইতিহাসের
সেই বীভৎস দিনগুলিকে এস এস শব্দময়
আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলে,
যখন মানুষের চামড়ার জানালা দরজার
পর্দা, মানুষের মাথার খুলিতে এস এস
বাহিনীর পেপার-ওয়ার্ড হয়েছে আর লক্ষ
লক্ষ শিশু এবং নরনারীকে নিয়ে শর-
তানের নৃশংস খেলায় মেতেছে নর-
রাক্ষসেরা। এর পর হের বাল ঠাকরে,
এক শীর্ণকায় কার্টুনিস্ট, বৃহত্তর মানব-
কল্যাণের পরিপন্থী ব্যাঙের মতো মাথা
তোলার চেষ্টা করছেন এবং তাঁর পেছনে
কোটিগুণিত অর্থপিশাচের অর্থবল আর
ক্ষমতালোভী কুচক্রী রাজনীতিকের মদৎ
কাজ করছে। এই সর্বনাশা এস এস
বাহিনী বোম্বে পুলিশের প্রশ্রয়, বোম্বে
কংগ্রেসের নেহের ছায়ায় দিনে দিনে
কালকেতুর মত আকারে বাড়ছে। দেশের
ভাবে প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মস্তিষ্ক-
যন্ত্রণার কারণ হয়েছে এবং ভারতবর্ষের
বুকে ঝাটে সঙ্কীর্ণচেতা কোন অনর্থকারী
শক্তি মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, প্রগতি-
শীল রাজনীতি তাই পাণ্ডা সংগঠন সৃষ্টির
আশু প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন।
এই উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয়
সংরক্ষণা সমিতি গঠন করে অল্পত দু'
লক্ষ মদস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে
গেছে। আর এতো কাজ হচ্ছে তাঁদের
নাকের ডগায় মারী কেন্দ্র ক্ষমতার
অধীশ্বর হয়ে হাত গুটিয়ে চেপে বসে
আছেন ও খামকা সামগ্রিকভাবে তরুণ-
সমাজের প্রতি এলোমেলো দোষারোপ
করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভয়ঙ্কর
প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

সম্প্রতি বোম্বে কংগ্রেস নিরপায় হয়ে
শিব সেনা অতিরেকের বিষয়টি নাড়াচাড়া
করেছেন বটে তবে তা-ও প্রভাবের সুরেই।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং

কারিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কালি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩

০, রাধামোহন পাল সেন, কলি-১২ :

অফিস-ফোন—৩৪-৪৪৪৬

স্বাধীনতা

নতুন কংগ্রেসী কার্যকরশীল প্রমাণ রাখছে যে এম এল উগ্রপন্থার কংগ্রেসের সমর্থন আছে।

কমর স্বার্থের সহযোগ

সেনার নির্বাচনে এস এস বাহিনীর উগ্র বিরোধিতায় প্যারিস প্রমুখ নেতার সমর্থন ছিল, একথা আজ অভিজ্ঞ রাজ-নৈতিক মহলে আলোচ্য হয়েছে। রাজ্য-সভায় প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে শিব সেনাকে কেন্দ্র করে। স্বতন্ত্রী প্রীলোকনাথ মিশ্র পূর্বত অভিমোগ উত্থাপন করে বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বাধারতীয় নেতৃত্বে আসীন হয়েও মূলত বোম্বে কংগ্রেসে আপন প্রভাব টিকিয়ে রাখতেই অধিকতর চিন্তিত, আর তাই তিনি শিব সেনার লেপথ্য মদৎ দার। কম্যুনিষ্ট নেত্রী প্রী পি কুমারন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, থানা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে শিব সেনা প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দিয়ে কংগ্রেস এই নির্বাচনে শিব সেনার সংখ্যা-ধিক্য লাভে সহায়তা করেছে। বস্তুত থানা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দুইধর শিশু শিব সেনার বিরূপ সাফল্য ভানু-মতীর খেলের মতই বিস্ময়কর আর এই সাফল্য বাল ঠাকরের ফ্যাসিস্ট মনোভাবে অধিকতর প্রভাব জাগরুকেও সহায়ক হয়েছে। ঠাকরে নিজেকে হিটলার ভাবতে শুরু করেছেন। কেবলমাত্র তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় দান করবার জন্যই নয়, রীতিমত আত্মবিশ্বাস জ্ঞাভ করার পরই। আর এই আত্মবিশ্বাস তো সহজে আসে নি। এর পেছনে অনেক দিকের অনেক শক্তি ক্রিয়াশীল জেনেই ঠাকরের ঠাট বেড়ে গেছে। এস এস পি নেত্রী শ্রীমতী লিমায়ের তাঁর গুপ্ত সংবাদ ভাণ্ডার থেকে যে লেটেষ্ট চমক ছাড়বেন বলেছেন, সে সংবাদ নাকি আগামী লোকসভা অধিবেশনে এক ক্রোড়-পতিত নেপথ্যে শিব সেনা-বাহিনী গঠনে টাকা ঢালার প্রমাণ হাজির করবে। শ্রীলিমায়ের এই কোটিপতির নামও ফাঁস করে দেবেন।

বাল ঠাকরের উত্তিতে এখনই হিটলারী গরম উত্তাপ ছড়াচ্ছে। তিনি বলেছেন: থানা মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে মহারাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার আঁকস। একথা কোনও এস এস প্রতিনিধি (মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত) বিস্মত হলে তাঁকে চরম মূল্য দিতে হবে। ঠাকরের এ জাতীয় আশ্ফা-লনের মাঝে থানা জেলা পরিষদ কংগ্রেসের ভূমিকা কি? না মহারাষ্ট্রীয়দের হতাশার ছবি একে শিব সেনার অগ্রগতির পক্ষে হস্তি সাজানো। অথচ স্বীকৃত হওয়ার ব্যর্থতা কারণ যে কংগ্রেসের নেই এমন আত্ম-প্রসাদেরও কোন মানে হয় না। মাদ্রাজে

কংগ্রেসের চূড়ান্ত পরাক্রম বর্তীকল আঞ্চলিক সংস্থায় হাতে। যোগ্যেতে ঠাকরের অগ্রগতি মেনন তথা দক্ষিণী খেলও আন্দোলন করেছে বলেই কংগ্রেসকে মাথায় তুলে রাখবে এমন উদ্ভট চিন্তা না থাকাই ভাল। আর আজ কতকগুলি হতাশ ও নিবোধ যুবককে দলে টানতে সক্ষম হচ্ছে ঠাকরে—হিটলার বলেই সেই সূরে সূর মিলিয়ে মহারাষ্ট্রীয় হতাশার জাবর কাটলেও মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের গদি টেকসই হবে এমন নন-পলিটিক্যাল চিন্তাও নিশ্চয় ধূরন্ধর কংগ্রেসী নেতারা করেন না। তবে কেন শিব সেনার প্রতি কংগ্রেসী প্রগ্রয়ের কথা উঠছে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের পরি-বর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের



শ্রী লিমায়ের

আপন হতাশারই বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ বছর পরে একটা ধাক্কা যেন কংগ্রেসের সমস্ত চিন্তাই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ভুবন মানদুয়ের মত সে এখন হাজের কাছে যে-কোন খড়-কুটো আঁকড়ে ধরার জন্য অধৈর্য। দুরাগত ফলাফলের দুঃসংস্টিও কতিপয় কংগ্রেসী নেত্রী হারিয়ে ফেলছেন। এতো মানসিক দৌর্বল্য নিয়ে রাজনীতি করা সত্যিই বিস্ময়কর। শিব সেনা বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পো-রেশনের বৃদ্ধি ছায়ে রাজাব্যাপী আসন দখলের লক্ষ্য স্থির করেছে যেখানে, তখন

শিব সেনার পেছনে শক্তি বৃদ্ধির কোন দলীর উদ্দেশ্য সিন্ধ হবে না। মহা-রাজ্যীয় সেন্ট্রালিস্টকে দলে টানার জন্য কংগ্রেস নিজেই অন্যতর পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু শিব সেনার বিভীষিকা অবিলম্বে আর পাঁচটি প্রগতি-শীল গণতন্ত্রী দলের সঙ্গে একত্র হয়ে এই মহাত্মে রোখায় দরকার। কতিপয় কংগ্রেসী নেত্রী যদি ক্ষমতাস্বতায় প্রান্ত পথ গ্রহণও করেন, দল হিসেবে কংগ্রেসের শক্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধেও এককাটা হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা কংগ্রেসের ওপর সাধারণের বিশ্বাস আহত হবে।

শিব সেনাকে মদৎ দিয়ে কিছু প্রতি-ক্রিয়াশীল দল ও ব্যক্তি দেশে নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে সোৎসুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনসংঘের সংকীর্ণ ফ্যাসিবাদী হামলার টেকনিকই শিব সেনার রণ-কৌশল। একই রকম উগ্র আঞ্চলিকতার মধ্যে জাতীয় সংহতিবিরোধী আন্দোলনে জনসংঘীরা হীন প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে বেড়াচ্ছেন। বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী জম্মু-কাশ্মীরে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যে ভারতীয় সংহতির জন্য কংগ্রেস আজন্মকাল বক্তৃতা করে আসছে, সেই জাতীয় সংহিতিকে যে-সমস্ত দল-উপদল নষ্ট করতে উদ্যত, কংগ্রেসের সুস্থ চৈতন্যকেই সমুদয় নোংরা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ো-জিত করবে এটাই আকাঙ্ক্ষিত। কতিপয় ক্ষমতালোভীর পাকচক্রে পড়ে কংগ্রেসকে আজ অধোবদন হতে হয়েছে। এ-পথ কংগ্রেসের পথ নয়, এই উপলক্ষটাই জাতির মনে কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব করতে পারে। উল্টো পথে অস্থায়ী উত্তেজনার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কংগ্রেসকে যারা পুরোপুরি কবরস্থ করতে চান, শত্রু হিসেবে তাঁদেরই সর্বাপ্রণ গণ্য করতে হবে আজ।

আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ মনোভাবে ভাঙিয়ে কংগ্রেসের মত একটি সর্বাধারতীয় দল যে পরিণামে কতিপয়গ্রন্থই হবে এই বোধ নস্য্য হরে যাওয়ার ফলেই উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ কংগ্রেসের ছাতছাড়া হয়েছে। জনসংঘের সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভে কতিপয় কংগ্রেসী নেত্রী হবনবিং কংগ্রেসী ক্ষমতার মৃত্যু পর-ওয়ানা স্বহস্তে রচনা করেছে। বোম্বেতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে যদি শিব সেনার আঁনকুণ্ডে গিয়ে কংগ্রেসী নেত্রীরা পতঙ্গের মত হুড়োহুড়ি করে ঝাঁপ দিতে চান।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

শিব সেনা

শিব সেনা হাঙ্গামাকারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের নরম তেমনমূলক মনোভাবও কমতাসীন দলের ধানবিক ভারসাম্যের অভাবকেই প্রমাণ করছে। যেখানে আইন শৃঙ্খলা এমন অসহায়ভাবে অ-মহারাষ্ট্রীদের নাগরিক অধিকার হরণ করছে প্রকাশ্য দিবাগোকে এবং পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের শাস্তোক্ত না করে হুকুমী দিচ্ছে নিরীহ অ-মহারাষ্ট্রীদের, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সেখানে নিষ্কর্তৃক দৃষ্টিকোণে পাজন করে থাকেন এ-ও কম আশ্চর্যের কথা নয়।

শুভই আজ এই প্রশ্ন জেগেছে, বোম্বাই-এ অসঙ্গে কোনও সরকারের অস্তিত্ব বহাল আছে কি-না। প্রাক্তন উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী এন এন কৈলাস এ প্রশ্নে বলেছেন: ওখানে কী ধরনের সরকার কমতাসীন যার অধীনস্থ পুলিশ হাঙ্গামাকারী এস এস বাহিনীকে কিছু না বলে ব্যাপারীদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়! এ প্রশ্ন এবং একই অভিযোগ অনেকেরই আছে। মন্ত্রিসভার অক্ষমতা নিয়ে এবার কি রাষ্ট্রপতির শাসন দাবি করা হবে?

এস এস গতিরোধের আয়োজন

আর এস এস বাহিনীকে আশঙ্কায় নিয়ে মাথার তোলা হয়েছিল, এস এস বাহিনীকেও তেমন করেই বাড়তে দেওয়া হচ্ছে সর্বরকম প্রগতি আন্দোলনের মারাত্মক শত্রুরূপে প্রতিভিমানীল কম্যুনিষ্ট ছাত্র শক্ত করার জন্যই এবং রাজ্য হাঙ্গামা অব্যাহত রেখে রাজ্য সরকারের অক্ষমতা চাপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে। কম্যুনিষ্ট তরফ থেকে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। আর এস এস অগেঞ্চা শিব সেনাকে যে দেশের বৃহৎ বৃহত্তর বিক্ষোভকে রূপে আশঙ্কায় করা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এস-কোম্পানি গভীর চিন্তাভেড়ই তা পরিষ্কৃত। মার্কসিস্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি মাদ্রাসাইতে গভীর দৃষ্টান্ত প্রকাশ করে বোম্বাইতে প্রতিনিষি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিব সেনা-বিভাগীকায় নিয়ে আলোচনার জন্য পার্টি'র কমিটি গঠন করেন তার সদস্যবর্গ প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, নান্দ্রিপাদ, গোপালন, রামমূর্তি প্রমুখ।

শ্রীমদ্রাষ্ট্র শিব সেনাই নয়, সংকীর্ণ-চেতনা থেকে বিভিন্ন রাজ্যেই আঞ্চলিক স্বাধীনবাদীরা মাথার তোলার চেষ্টা করছে। 'বঙ্গাল বেদাও'ওয়ালারা নতুন করে আসাম অসমীয়াদের আওরাজ্য তুলছেন। মহাশয়ের ভাগ্যে আঞ্চলিক

স্বাধীনতা বাসব দল। ইতস্তত অসমত জন্মই প্রভাব পড়ছে। যদি এমনই চক্রে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতেই যে ভারতীয় সংহতি নামক মহৎ চেতনাটি চাঁটি হয়ে যাবে, ভারতীয় রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ এবং সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন ভারতবাসীর সেই দুর্দিনের কথা এখনই ভেবে দেখা দরকার আর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভ্রূণাবস্থায় এই আঞ্চলিকতাবাদী দলগুলিকে নির্মমভাবে খতম করা উচিত। অন্যথা ভারতের সর্বাগ্রে এরা স্বাধীন একজিমার মত চবড় বধিবে। তখন যে চিকিৎসা-সংকট দেখা দেবে, সমস্যাশীড়িত ভারতের পক্ষে সে ধকল সামলানো কষ্টকর হয়ে উঠবে।

শিব সেনা প্রশ্ন

সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে একজন শিব সেনাকে এই কটি শর্ত পালনের শপথ নিতে হয়: মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রীদের জন্য। এ-কারণ মহারাষ্ট্রীদের সঙ্গে সর্বতোপ্রকার সহযোগিতা করতে হবে। কখনো কোনও মহারাষ্ট্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার চলবে না। একমাত্র মহারাষ্ট্রীয় দোকান বাজার থেকেই হাট-বাজার করতে হবে এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, স্কুল কলেজ, ক্লাব সাম্প্রতিক উৎসবে উৎসাহ দিতে হবে। দক্ষিণী ডোজনালয় বর্জন করতে হবে। মহারাষ্ট্রীদের জন্য আশি শতাংশ দুর্বিধা আদায়ের লড়াই চালাতে হবে। কোন অ-মহারাষ্ট্রীকে জমি বাড়ি দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া চলবে না। একমাত্র মহারাষ্ট্রীদেরই বিভিন্ন সংস্থায় কর্ম-সংস্থান করতে হবে। বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার অগ্রণী হতে হবে।

কিন্তু এইসব কড়া আওরাজ্য নিত্যন্তই ফাঁকা আওরাজ্যে পরিণত হয়, যখনই অ-মহারাষ্ট্রীয় ধনী মালিকদের প্রশ্ন ওঠে। বাল ঠাকরে কুবেরের পেছনে লাগেন না। তাঁর লক্ষ্য দরিদ্র অ-মহারাষ্ট্রীয় জন-সাধারণকে এবং স্বল্প মূলধনের অ-মহারাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বৃহত্তর বোম্ব থেকে উৎখাত করা।

পরিণাম ভয়াবহ

স্বভাবতই চাকরি প্রমোশন এবং সুযোগের প্রলোভনে সেনাবাহিনী বেড়ে উঠছে দিনে দিনে। কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে একটা সাময়িক সুযোগ লাভের আশা রাজ্যবাসীর চোখের সামনে উজ্জল

হয়ে উঠেছে এই আঞ্চলিক আদর্শ তত্ত্ব কনই রাজ্যবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজন সম্বন্ধে সক্ষম বক্তব্য দরিদ্র ভিন্ন রাজ্যবাসীর ওপর ডাকঘাতি সন্দেহ। দক্ষিণ লাভের কড়ি পরিসরে চূড়ান্ত হতাশারই কারণ হয়। কেন-না কোনও আঞ্চলিক মতাদর্শ সেই অঞ্চলের সাধারণ জনজীবনের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। এরা যেমন বৃহৎ মনোভাববাহির খপ্পর থেকে সাধারণের প্রাপ্য ছিনিয়ে আনতে অক্ষম, নিজ অঞ্চলে নিশ্চিন্ত ভিন্ন রাজ্যবাসী উৎখাতের পর সাধারণের জন্য কিছু করার মর্যাদাও তেমনই এদের নেই। এরা বিনিকম্বাধের দ্বারাই পরিচালিত এবং সেই স্বার্থ পূরণের জন্যই সাধারণের কাছে তত্ত্বপ প্রলোভনের কোলা নিয়ে উপস্থিত বক্তব্য বিনিকম্বাধ পুরোপুরি গুচ্ছিয়ে না নিচ্ছে। এরা মাছের তেলেই মাছ ভাজে। ভিন্ন রাজ্যবাসী গরীব উৎখাত করে স্বরাজ্যবাসী গরীব হুকুম-দাস তৈরি করে এবং ক্রমশ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব করেমের দিকেই এগিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, চরম অর্থনৈতিক দুর্যোগই ফ্যাসিবাদ সৃষ্টির পরম সহায়ক। বিভ্রান্ত নিরাশাগ্রস্ত মানুষ তখন এক টুকরো রুটির জন্য সমস্ত রকম মানবিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

কুমারেশ

লিভার ও পেটের
পীড়ায়

সালফা-ডারমিন

কচা পোড়া
ত্রণওচন্দ্ররোগে

রেসপেরোসিন

সর্দি ও কাশিতে

ও-আর.সি.এল. হাওড়া-৬



অতীতের স্মৃতি : হোলিসিংকিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে মূলকরাজ আনন্দের সঙ্গে এরেনবুর্গ (বামদিক থেকে দ্বিতীয়)।

মুদ্রণ :

খাত্তম চারদিনব্যাপী আরব শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। ১৯৬৫ সালের পর এই প্রথম আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা একটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হলেন।

জুন মাসে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের পর থেকেই একটি সর্বাঙ্গিক আরব শীর্ষ বৈঠকের চেষ্টা চলছিল। এই উপলক্ষে কায়রোতে অনেকগুলি বৈঠক হয়ে গেছে। লুণ্ঠাণ সম্মেলনের প্রত্নতত্ত্বরূপ আরব রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনও হয়েছে। আরবদের মধ্যে মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এরূপ একটা শীর্ষ সম্মেলনের পথে প্রধান বাধা ছিল। একদিকে আলজিরিয়া, ইরাক ও সিরিয়ার মত প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আরব রাষ্ট্র, আর অপরদিকে সৌদি আরব, কুবাইত, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও জর্ডানের মত রক্ষণশীল ও পশ্চিমঘেঁষা রাষ্ট্র—এদের মধ্যে ঐক্য হবে কি করে? তবু নাসের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সবাইকে এক করতে। ইহুদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সব আরব রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে, তার জন্য নিজেদের পারস্পরিক ভ্রতপার্থক্য ও বিরোধ আপাতত ভুলে যেতে হবে।

আরব ঐক্যের উৎসাহী সমর্থকদের

চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সুদানের রাজধানী খাত্তমে ২৯শে আগস্ট থেকে আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন বসল। কিন্তু সম্মেলন খুব একটা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। তেরটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র আটটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা রাজা এসেছিলেন, অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী এসেছিলেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি ডঃ নুরদ্দিন আটাসি খাত্তম আসেনই নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাখোস এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, নাসের সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের সঙ্গে আপোষ করছেন, এবং অধিকাংশ আরব নেতা ইরাক ও আলজিরিয়ার প্রস্তাবমত পশ্চিমী দেশগুলিকে তেল সরবরাহ চিরকালের মত বন্ধ করতে কিংবা বৃটিশ ও মার্কিন তেল কোম্পানীর জাতীয়করণের প্রস্তাব মানতে রাজী নন, তখন তিনি ও সিরিয়ার অন্য প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ না দিয়ে দামাস্কাস ফিরে গেলেন। নাসের নিজে, এবং সুদানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আহমেদ মাহগুবে অনেক চেষ্টা করেছিলেন সিরীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন বজ্রনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে, কিন্তু পারেন নি। এইভাবে অনৈক্যের মধ্যে আরব শীর্ষ সম্মেলন সুদ, হ'ল, শেষও হ'ল। ইসরায়েলের

বিরুদ্ধে যখন আরব ঐক্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তখন সবাই একজোট হতে পারলেন না।

তবু সম্মেলন হয়েছে। কতকগুলি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, আরব অঞ্চল থেকে আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ উৎসাদন এবং প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীদের স্বাধীনতা, এই দুই মূল প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে কোন সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধানে আরব নেতারা রাজী আছেন। জেরুজালেম শহর যাতে পুরোপুরি আরবদের হাতছাড়া না হয়, তার জন্যও তাঁরা প্রস্তাব করেছেন। শীর্ষ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তও হয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনীকে আরও দৃঢ় ও সংহত করা হবে। পশ্চিম এশিয়া থেকে সকল বৈদেশিক ঘাঁটির বিলোপের জন্যও সম্মেলনে দাবি জানানো হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই অঞ্চলে এখনও বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি আছে।

খাত্তম সম্মেলনে কয়েকটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে। সুয়েজ খাল বন্ধ রাখা হলেও, তেল অবরোধের অবসান ঘটানো হবে। তেল অবরোধের

ফলে কুবাইত, সৌদি আরব ও লিবিয়ার খুব বেশি আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। ইসরায়েলী আক্রমণের ফলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও সিরিয়ার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য তৈলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলি এদের অর্থ সাহায্য করবে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ৯৫ কোটি স্টার্লিং, জর্ডান ৪ কোটি এবং সিরিয়া ৫০ লক্ষ স্টার্লিং অর্থ সাহায্য পাবে। তাছাড়া আবব সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের জন্যও এরা ১০৫ কোটি স্টার্লিং দেবে।

শীর্ষ সম্মেলনে নাসের মোটামুটি নরমপন্থা অনুসরণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে রাজী আছেন, কিন্তু তার আগে আরবদের মধ্যে ঐক্য চাই, এবং সৈন্যদলের পুনর্গঠন চাই। এ দুটিই অভাবে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা যায় না। তাই তিনি আপোষের পথ খুঁজছেন। এ ব্যাপারে মার্শাল টিটোর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, তা তিনি আরব নেতাদের জানিয়েছেন।

আরব ঐক্যের জন্যও নাসের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আববের সঙ্গে বিবোধ মেটাবার জন্য তিনি প্রস্তুত। এর আগেও কথা হয়েছে। এবার খাতুমে রাজা ফযলার সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি করেছেন। ঠিক হয়েছে, ইয়েমেনে যে চল্লিশ হাজার মিশরীয় সৈন্য আছে, ছয় মাসের মধ্যে তা সবিয়ে আনা হবে। সৌদি আববও বিদ্রোহীদের সাহায্যদান বন্ধ করবে। তারপর সূদান, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার সৈন্যদের নিয়ে গঠিত একটি তদারকি দল অনবর্তীকালীন শাসন ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজ দেখাশুনা করবে। এই আপোষ-প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য ইরাক, মরক্কো ও সূদানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মধ্যস্থতা কমিশন গঠন করা হয়েছে। চরমপন্থী আরবরা এই আপোষে খুশি নন, প্রজাতন্ত্রী ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা সালালও একে মানতে অস্বীকার করেছেন। তবু এই আপোষের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য টিটোর প্রস্তাব নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কে নিকোজিক বেলগ্রেড থেকে ওয়াশিংটন ছুটেছেন। সেখানে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিটোর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরে তিনি নিউ ইয়র্ক গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাটের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

টিটোর প্রস্তাব : (১) আরব অঞ্চল থেকে সকল ইসরায়েলী সৈন্যের অপসারণ

করতে হবে; (২) রাষ্ট্রসংঘের শান্তি-বাহিনী এই অঞ্চলে পুনরায় বসাতে হবে; (৩) বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়কে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্স) ইসরায়েলের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে; (৪) আরব রাষ্ট্রগুলি ইসরায়েলকে স্বীকার না করলেও ইসরায়েল সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করবে; এবং (৫) তিরান প্রণালী দিয়ে ইসরায়েলী জাহাজ যেতে দেয়া হবে।

টিটোর এই শান্তি-প্রস্তাবের পেছনে সোভিয়েট নেতাদের সমর্থন তো আছেই, খাতুমে শীর্ষ সম্মেলনের পর মনে হচ্ছে নাসেরেরও সমর্থন আছে এর পশ্চাতে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন, গত মাসে টিটো কায়রো, বাগদাদ ও দামাস্কাস এসে আরব রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে গেছেন।

কিন্তু ওয়াশিংটনের খবরে দেখা যাচ্ছে, জনসন টিটোর প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত নন। তাঁর মতে, আরব রাষ্ট্রগুলির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা এই শান্তি-পারিকল্পনায় নেই। তাছাড়া সিনাই উপদ্বীপ সৈন্যমুক্ত করতে হবে, গাজা আশুজর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

সম্মানজনক আপোষের পথে যেতে আবব নেতারা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এ পথে সমাধান সম্ভব না হলে, যুদ্ধের পথে যেতে হবে। আবব নেতারা তার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

আমেরিকান নাৎসী পার্টির নেতা 'আধ-পেনী হিটলার' জর্জ লিস্কন রকওয়েল গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনের শহরতলী আর্লিংটনের বাজারে গুলীবর্ষা হয়ে মারা গেছেন। রকওয়েলের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, সম্প্রতি দল থেকে বিভাজিত, জন প্যাটলারের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও মার্কিন নৌবাহিনীর এককালেব পাইলট রকওয়েল তীব্র জাতিবিশ্বেষের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। জাতিবিশ্বেষ থেকেই তাঁর নাৎসীবাদে উদ্ভব। হিটলারের 'মেইন ক্যামফ' পড়ে তিনি উৎসাহিত হন, এবং বলেন, গত দু'হাজার বছরের মধ্যে হিটলাবের চেয়ে বড় কোন মনীষী পৃথিবীতে জন্মান নি! ১৯৫৮ সালে তিনি আমেরিকান নাৎসী পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং কিছুসংখ্যক যুবককে দলে টানেন। তিনি তাঁর অত্যাশাহী কর্মীদের নিয়ে রাস্তায় সভা করেছেন, নিগো পঞ্জীতে হামলা করেছেন, এবং মার্কিন নেতাদের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন

করেছেন। চিকাগো ও লাস এঞ্জেলসে দলের শাখা রয়েছে। সারা দেশ ছুড়ে এই দলের হাজারখানেক সভা হয়েছে। দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি রকওয়েল দলের নাম নাৎসী পার্টির বদলে 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট হোয়াইট পিপলস পার্টি' রেখেছেন।

রকওয়েলের বক্তব্যে মধ্যে তাঁর উগ্র নাৎসীবাদ প্রতিফলিত। তাঁর আত্মবাহিনী 'দিস টাইম দি ওয়াল্ড' হিটলারের 'মেইন ক্যামফ'-এর এক ব্যর্থ অনুবরণ। তাঁর বক্তব্য : আমেরিকার দুই কোটি নিগ্রেকে জাহাজে করে আফ্রিকার ফেরত পাঠাতে হবে, এবং ইহুদীদের গ্যাস-চেম্বারে পুড়ে হত্যা করতে হবে। তাঁর আশা ছিল, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবেন, এবং তারপর তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবেন। ১৯৬৫ সালে তিনি অবশ্য ভার্জিনিয়ার গভর্নর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এবং কয়েক হাজার ভোটলাভেও সমর্থ হন।

এই যুগেও রকওয়েলের সমর্থনে লোক পাওয়া যায়, এই আশ্চর্য। ফুরুরারের মৃত্যুর পর এখন মার্কিন নাৎসী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ কবেছেন গ্যাট কোহেল। রকওয়েলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কোহেল বলেছেন, 'ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গরূপে রকওয়েল চিরকাল বেঁচে থাকবেন'।

*

ইরানের শাহ মহম্মদ রেজা পহলভী গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্ক এবং সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন।

শাহের প্রধান বক্তব্য ছিল : ইরান এবং পশ্চিম এশিয়ায় অন্যান্য বৃহৎ বাস্তু-দের আরও বেশি কবে মার্কিন অস্ত্রসাহায্য দিতে হবে। না হলে তাবা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সোভিয়েট প্রভাব প্রতিরোধ করতে গলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ বাড়তে হবে।

শাহ সঙ্গে করে জর্ডানের বাজা হুসেন এবং কুবাইতের প্রধানমন্ত্রী শেখ জাফর আল-আহমদ আস সাবাব চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। শাহের বক্তব্য, আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষ সম্পর্কে নবমপন্থী আরব নেতাদের প্রস্তাব মার্কিন নেতারা মেনে নিন, তা না হলে বিপ্লবী ও পশ্চিমী-বিরোধী আববদেরই শক্তি বৃদ্ধি হবে, এবং পরিণামে আমেরিকার ক্ষতি হবে।

মার্কিন নেতারা বৃদ্ধির কথা কতটা রাখেন দেখা যাক।

আনন্দপ্রদ অনুপম সুযোগ



ম্যাগনাল
একো

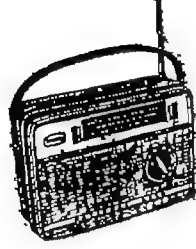
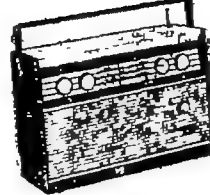
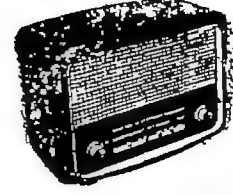
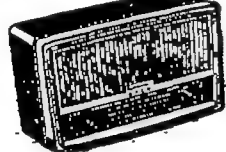
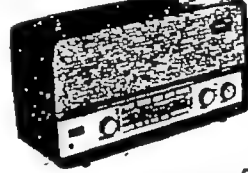
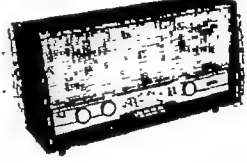
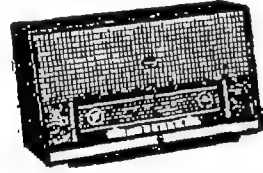
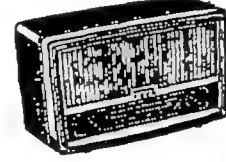
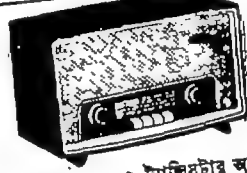
রেডিও কিনুন।

Kleertone ক্লিয়ারটোন

সাজসরঞ্জাম কিনে

50% বিশেষ বাটা লাভ করুন

সাপ্তাহিক বসন্ত

 পি টি-১৫০৩ ২ ট্রান্সিস্টার ও ডায়োড ৩ ব্যাণ্ডের। ৩৬৫ টাকা।	 এম বি টি-১৫০৪ ১০ ট্রান্সিস্টার ও ডায়োড ৪ ব্যাণ্ডের। এ.সি/ব্যাটারী। ৫৪১ টাকা।	 ইউ-১৫১৩ ৩ বাব, ৩ ব্যাণ্ডের। এ.সি/ব্যাটারী। ২৯৮ টাকা।
 ইউ-৮১১৯ ৩ বাব, ৩ ব্যাণ্ডের-এ.সি/ডিসি। ৩০০ টাকা।	 এ-১৫১২ ৩ বাব। ৩ ব্যাণ্ডের এ.সি। ৩৩৫ টাকা।	 এ-১৫১৪ ৩ বাব। ৩ ব্যাণ্ডের। এ.সি। ৪১৫ টাকা।
 এ-৭৮৬ ৩ বাব। ৩ ব্যাণ্ডের। এ.সি। ৩৬৮ টাকা।	 বি টি-১৫০০ ২ ট্রান্সিস্টার আর ডায়োড ৩ ব্যাণ্ডের। ব্যাটারী। ৩২৮ টাকা।	 বি টি-১৫০৩ ২ ট্রান্সিস্টার আর ডায়োড ৩ ব্যাণ্ডের। ব্যাটারী। ৪১৫ টাকা।

আজই কিছুন গ্রাশনাল একো। আর কিছুন ক্লীয়ারটোনের সাজ সবসময়। পরেরটিতে, শতকরা ১০ ভাগ কম দামে কেনাব বিশেষ সুবিধা পাবেন।

 ইসি ১৭.০০ পঃ ও তার বেদী	 টোস্টার ৩৪.০০ ও তার বেদী	 কেটলী ৪৪.০০ ও তার বেদী	 কফি পানকোলেটর ৭০.০০	 ইউ মাইন্স ১২৫.০০ ও তার বেদী
 ঘড়ি ৬২.০০ ও তার বেদী	 ট্রলী ১৫.০০	 বেকিং ওভেন ৮৪.০০	 মিশ্রার কারি গ্রাইণ্ডার ১২৫.০০	এমনি আরও অনেক।

(দাম-উপাদান শুদ্ধ সমেত। নব কর অন্তর্ভুক্ত।)

আজই আপনার ব্যাশনাল-একো ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

GRA জেনারেল রেডিও এন্ড এপ্লায়েন্সেস লিমিটেড।
 বোম্বাই - কলিকাতা - মাদ্রাস - দিল্লী - বাঙ্গালোর - সেকেন্দ্রাবাদ - পাটনা

LPE Aljara NE 169, BN

সোভিয়েট ইউনিয়নঃ

লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ, সংগ্রামী এরেনবুর্গ, শান্তির সেনানায়ক এরেনবুর্গ, সমাজতান্ত্রিক পরিব্রাজক এরেনবুর্গ, ভারত-বন্দু এরেনবুর্গ-এর বিরাট কর্ম-জীবনের অবসান ঘটেছে। আজ মনে পড়ছে তাঁর সেই কথা। তিনি বলেছেন, লেখকের বার্ষিক্য বলে কিছু নেই। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মন তার চিরতরুণ। একমাত্র মৃত্যুতেই তার অবসান।

স্বল্প বয়সেই লেখা সুরু করে যিনি সৃষ্টির ধারার মধ্যে প্রবহমান ছিলেন, ঐ সময়ের মধ্যে যিনি লিখেছেন কম পক্ষে আশিটি বই—তাঁর জীবনাত্মকের যবনিকা-পাত হলেও, তাঁর চিন্তা, ইচ্ছা, আদর্শ আমাদের কাছে প্রেরণার অনিবার্য অঙ্গ-রূপে অমর হয়ে থাকবে।

রচনার বিষয় ও ধারাও তাঁর বিচিত্র। গল্প-কবিতা-উপন্যাস, সৌন্দর্যভাব বিষয়ক সম্পর্কিত প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা, স্মৃতি-চয়ন, ভ্রমণ-কাহিনী, এমন কি, জনচেতন্য উদ্দীপকরণে ইস্তাহারগুলি পর্যন্ত একে একে শাখার একেক বিস্তার। সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচিত, লাক্ষিত শোষিত মানুষের কথাই যার সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়, তাঁর সাহিত্য কোথাও বিস্মৃতির শিল্পবোধে ক্ষুণ্ণ নয়। বরং যেখানে শিল্প ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটেছে, সেখানে তাঁর কলম ছিল দৃষ্টান্তসাহসিক প্রতিবাদ। আবার সত্য কথনেও কোনদিন পশ্চাদ্দপদ হন নি তিনি। রাষ্ট্রনায়ক যেখানে ভিন্ন মত পোষণ করেছে, সেখানেও তিনি নিজের অভিমতের বদল ঘটান নি কখনো।

এই কারণে রাশিয়ার জার-এর শাসনে কারারুদ্ধ হয়েছেন ইলিয়া এরেনবুর্গ, সোভিয়েট বিপ্লব সফল করার জন্যে করেছেন প্রাণপাত পরিশ্রম। মস্তিষ্কাভের পর প্যারিসে চলে গিয়েও সেই এক চিন্তা। অবশ্য সেখানে শুরু হয় তাঁর কাব্য-জীবন (১৯০৯)। তবে সেখান থেকে প্রথমবার স্বদেশে ফেরার পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-সংকলন ‘পোয়েমস্ এন্ড উট দি ইভস্’—মা মস্কা থেকে প্রকাশিত সেই গ্রন্থই সৃষ্টি করে বিরাট এক আলো-জ্বল। তখন আর কোনমতেই চিনে নিতে ভুল হয় না কবি এরেনবুর্গকে, যার সেই কাব্যের মূল বিষয় হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের নারকীয় তাণ্ডব। নাৎসীদের তান্ডব, জুর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুব্ধ। ‘ফল অব প্যারিস’ তাঁর এক অসামান্য কীর্তি। এই উপন্যাসের জন্য তাঁকে ‘স্টালিন’ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভও একদা মস্কো পড়েছিলেন এরেনবুর্গের স্মৃতি-চয়ন পাঠ করে। এরেনবুর্গ বলে-

জিলেন যে স্টালিনের আমলে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরই দৃষ্ট দেখা হয়েছিল। এ ভিন্ন মত পোষণ করতেন ক্রুশ্চভ। পরে ক্রুশ্চভও স্বীকার করেছিলেন যে, দৃষ্ট ব্যক্তিরা অপরাধী নয়, নিরপরাধ-ই ছিলেন। এভাবেই সংগ্রামী এরেনবুর্গ সাহিত্যের সত্যের মাধ্যমে শত্রু জীবন-সত্যকেই নয়, রাষ্ট্রীয় সত্যকেও প্রকাশ করতে বিস্মৃতির কুণ্ঠিত হন নি। এর-পর ১৯৬১তে তিনি পান সর্বোচ্চ উপাধি—অর্ডার অব লেনিন। এ কথাটিও প্রসঙ্গত স্মরণীয় রাজনৈতিক কারণে ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত প্যারিসে থাকলেও, রাশিয়ায় যাবার পরও ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময় প্যারিসেই অতিবাহিত করেছেন। আবার শান্তির সেনানায়ক এরেনবুর্গকে এর পর বহু দেশ-বিদেশে শান্তির উদ্দেশ্যে পরিব্রাজকের মতোই ভ্রমণ করতে হয়েছে।

এরেনবুর্গের ভারতভ্রমণ কাহিনীটি আজ আমরা স্মরণ করতে পারি। বন্দুর হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন সারা ভারত। শুধু চোখ দিয়েই নয়, হৃদয় দিয়ে তিনি ভারতের মানুষকে ভালবেসেছেন, তাদের চলার ছন্দ, অনুভব করেছেন কান পেতে তাদের হৃদ-স্পন্দন। তিনি বলেছেন, ১৯৫৬ সালে ভারতে আসার আগে ভারত সম্পর্কিত অনেক কিছুই জানতে চেষ্টা করেছেন। সেই কারণে দেখেছেন ভারতের প্রাচীন চিত্রাবলী, পড়েছেন ভারতীয় কবিদের কাব্য। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, এই বিশাল দেশের তিনি কতটুকুই বা জানেন। তিনি বলেছেন, ভারতে এসেই তিনি ভারতকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছেন। তবু তাঁর ভ্রমণ কাহিনীটি পড়লে আমরা জানতে পারি নিরাস্র দৃষ্টিতেই তিনি ভারত-বিচার করেন নি। কবির হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসেছেন ঠিকই, কিন্তু অনুসন্ধানসহ মন নিয়ে ছুটে গেছেন সেখানে, যেখানে প্রস্তুতগায়ে খোদিত রয়েছে প্রাচীন চিত্র-গুলি, গেছেন মন্দিরে, মসজিদে, মঠে। তবু ঐতিহ্য-বিলাস তাঁর চেতনার প্রশ্ন পাষ নি, সত্যিকারের ভারতকে সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিতে বুঝে পেতে চেয়েছেন বলেই, আলোচনা করেছেন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প, সিনেমা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নিরঙ্করতা, আচার-আচরণ, নদী-লালিত মাঠ ভারতের দৃশ্য বহুরূপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-কাহিনী। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন মহাকাবি কালিদাসের সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টির চরম নৈপুণ্য। বিচার করেছেন প্রেম জ্বলের সাহিত্যের মৌলান্দ-ভূতি কি—সেই বিষয়ে। জানিয়েছেন, কি

বিশাল ঐশ্বর্য নিহিত আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তো শত্রু সাহিত্যিক-ই নয়, তিনি সমাজকর্মী। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন না বললেও তিনি যে কত বড় সংগ্রামী তার নিঃসংশয় বিশ্লেষণ করেছেন এরেনবুর্গ। তাঁর দৃষ্টিতে—

“Rabindranath Tagore became not only India's national poet, he became her conscience, her soul.”

কিপলিঙের মত ছিল এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোনদিন এক হতে পারে না। এরেনবুর্গের ব্যঙ্গোক্তি হচ্ছে, তবে ভারতকে শোষণ করতে বোধ হয় পাশ্চাত্য দেশের বাধ্য ছিল না। আর পাশ্চাত্যরাই তো প্রাচ্যের সংস্কৃতির ভরাডুবি করে রুরো-পীয় আদর্শ প্রচারে আগ্রহী। এরেনবুর্গের অভিমতে, ভারতের সংস্কৃতি ভাবতের নিজস্ব, তা নিবেই বিশ্বের সঙ্গে তাব সাক্ষর।

এরেনবুর্গ ভাবতের প্রচণ্ড রকমের দারিদ্র্যদশার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

“The British robbed her and lived on her riches for two hundred years. At the same time they spoke about her scornfully as a country of abject poverty, pestilence and filth.”

ভারতের অত্যধিক জনসংখ্যা ও তার দারিদ্র্য নিয়ে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতামতেরও প্রতিবাদ করেছেন এরেনবুর্গ। তিনি বলেছেনঃ

“They did not ask the colonisers why they were ruining the country but wondered how Indian women dared give birth to children.”

সেই কোম্পানী আমল থেকে ভারতকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য একদেশদর্শী বিচারে কিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্রলাপ বকা হয়েছে, এমন যুক্তি ও তথ্যমূলক আলোচনা এরেনবুর্গের পক্ষেই সম্ভব যিনি ভারতকে দেখেছেন হৃদয় দিয়ে। এইভাবে দেখতে পেরেছেন বলেই, ব্যাথা-বেদনা বলতে পেয়েছেন, কলকাতা শহরের ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের এমন দশা কেন! উত্তর ভারতে উদ্ভাস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হলেও পূর্ব ভারতে এ কি অবস্থা!

বহু অট্টালিকার পাশে কলকাতার বস্ত্রী দেখে এরেনবুর্গ ব্যথিত হয়েছেন। কলকাতার রাজপথে ঘোড়া গাড়ি, এমন কি, যুদ্ধরত যানটি পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকে নি।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখীরঞ্জন দাস

পূর্ব-প্রখ্যানভেদ পর

১ চতুর্থ পর্ব

কর্মজীবন

সম্পদ অধ্যায়

কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ

উনিশ শ' উনিশের পঞ্চমা জানুয়ারী সকাল কাটল বাড়িকে নিয়ে। তিনি তখন সাত বছর পূর্ণ হয়ে আটে পা দিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন খুব টর-টরে মেয়ে মা থাকে বলতেন “কথার সাগর”। ঘুমার সঙ্গে তাঁর খুঁটিনাটি তখনই সুরু হয়ে গেছে। একেবারে কোলের মেয়ে বলে তাঁর নালিশ-আশার মার ও বাবার কাছে বেশ সহজেই আমল পেত এবং বুধা বেচারী সব সময়েই খেত বকুনি শেষ পর্যন্ত। সোঁদিন সকালে-আমরা ভাই-বোনরা একসঙ্গে বসে হুগোড় করে জলযোগ সমাধা করলাম। ষতদূর মনে পড়ে গুগুর বর হেমবাবুও সোঁদিন ছিলেন আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি যে আমাদের বাড়ির খাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কিছুই ব্যতিক্রম হয় নি। মস্ত বড় বাটিতে সদ্য জ্বাল দেওয়া ঈষদুষ্ণ যে দুধ ছিল তার থেকে বয়স অনুপাতে কম হাতা এবং বড় বড় বোয়েম থেকে এক-খানা কি দু'খানা গোল গোল বেলেব মোরশ্বা বার যেমন অভিরুচি। এই খরপের খাওয়া ছিল আমার ছেলে বয়সে এবং দেখলাম যে ভাই-বোনদের সেই খরপের খাওয়াই বসান্ড কামছে। সোঁদিন আমার বাড়ি ফেব্রুয়ারি জনাই বোধহয় এর ঠিকপরে পাওয়া গেল পাউরুটি আব কি একটা ছেঁচকী। আমি যেদিন বিলেত-রওনা হয়েছিলাম তারপব থেকে তিন বছরেরও উপর আমি আর দুধ খাই নি চুমুক দিয়ে। মা'র দিকে চাইতেই মা ঘুমকলেন ব্যাপারটা এবং আমার জন্যে দুধের বদলে চায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। মা সোঁদিন বেশ হাসি-তর্কি মশে আমাদের

জবাইকে খাওয়ালেন। বাবা মধ্যে মধ্যে তাঁর বিছানায় শুয়েই গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে এটা-ওটা প্রশ্ন করছিলেন এবং আমাদের কথাবার্তার ভোগ দিচ্ছিলেন। গম্পে গুগুবে যে খাওয়াটা সোঁদিন সকালে বেশ জমোঁছিল তা এখনো খুব স্পষ্ট মনে আছে।

সেইদিন সকালেই একটি নতুন মানুসকে দেখলাম আমাদের বাড়িতে। মাঝবয়সী স্ত্রীলোক, না বেঁটে না লম্বা, রঙ খুবই ফরসা, এবং কপালে ছিল একটি উৎকীর টিপ। পরিখানে ছিল থান কাপড় যেমন পরে থাকেন হিন্দু বিধবারা। মহিলা-টির কথাবার্তা খুব সংঘত এবং তাঁর চালচলন ছিল বেশ ভদ্র। আমার ভাই-বোনরা এবং এমন কি হেমবাবু পর্যন্ত তাঁকে “ক্ষীরোদি” বলে সম্বোধন কর-ছিলেন। আমাদের জলটলের ব্যবস্থা করে তিনি প্রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে মায়ের গুগুর দিকে প্রশ্নসূচক চোখে চাইতেই মা জানালেন ইনি আমাদের তেলিরাবাগ গ্রামের নিকটবর্তী অন্য কোন একটি গ্রামের—ভরাকর, না অন্য কিছু—একটি কাম্প পরিবারের একটি বিধবা কন্যা বা বধু। আশ্রয়হীন হয়ে ইনি কল-কাতার এসে পড়েন। আমাদের কালীঘাটের বাড়ির জোঠিমা'র কাছে খবর পেয়ে যে আমাদের বাড়িতে মাকে সাহায্য করার জন্যে একজন মেয়েমানুষ দরকার হয়েছে ইনি আমাদের মায়ের শরণাপন্ন হয়ে আমাদের বাড়িতেই বছর দুই আগে এসে স্বকন্মার কাজে মাকে সাহায্য করছেন। এই পরিচায়িকাটিকে আমারও বেশ ভাল লাগল এবং আমিও ভাই-বোনদের মতই তাঁকে “ক্ষীরোদি” বলে ডাকতে সুরু করলাম। সেইদিন থেকেই ক্ষীরোদি বহু বছর আমাদের বাড়িতে কাজ করে গেছেন। একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর কাজের পর ক্ষীরোদি অবসর নিয়ে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের কাছেই থাকতেন। মা বেঁচে থাকাকালে প্রতি

মাসে একবার করে মাকে দেখে যাওয়া ছিল ক্ষীরোদির রেওয়াজ। মা'র মৃত্যুর প-ক্ষীরোদি নিয়মিত আসতেন আমাদের-বাড়িতে এবং আমার সহধর্মিণীও তাঁকে খুব আদর-যত্ন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন। আমাদের তিনটি ছেলে-মেয়েকেই “ক্ষীরোদি” আদরে যত্ন বড় করে দিয়ে গেছেন। অবসর জীবনে মেয়ে-নাতি-নাভনী নিয়ে ক্ষীরোদি বেশ ভালই ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। স্মৃতিপটে আজও স্পষ্ট আঁকা আছে “ক্ষীরোদি”র সন্নেহ সেবা ও আত্মীয়তা।

সকালবেলার জলযোগের পর মনে হোল যে একবার ৭৮ নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটা ঘুরে আসি। কিন্তু বেলো নটা-দশটার সময় অন্য বাড়িতে যাওয়াটা সামাজিক হবে কি-না সন্দেহ হোল। তা ছাড়া ঐ বাড়িতে যাছি একথা মাকে বল-তেও যেন একটু বাধ-বাধ ঠেকল। সুতরাং মনে হোল যে এই দেখা করা ব্যাপারটাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মূলত্ববি রাখাই বৃষ্টি-মানের কাজ হবে। সারা সকালটা বাড়ির সকলের সঙ্গে কথার-বার্তার কাটিয়ে দিয়ে দুপুরে মায়ের হাতের বন্ডা দিয়ে ভূরি-ভোজন করে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে বিকেল প্রায় চারটের সময় ওঠা গেল। শীতের বেলায় রোদের বাকি চলে গিয়ে-ছিল কিন্তু দিনের আলো তখনো সন্ধ্যার অন্ধকারে নিমীলিত হয়ে যায় নি। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বিকেলে এক পেয়লা চা খেয়ে পাঞ্জাবী ও পাম্প জুতা পরে সেজে-গুজে মাকে বললাম—“মা, বোঁঠাইনের লগে দেখা কইয়া আসি।” মা বললেন—“হ, ঠিকই কইছস্—ঘুইয়া আয় গিয়া।” আমার যে মতলব ছিল বোঁঠানের সঙ্গে দেখা করে ৭৮ নং বাড়িতে যাব তা মাকে খুলে বলতে একটু বাধ বাধ ঠেকছিল বলে আর বলি নি। তবে মা সেটা অনুমান করেছিলেন কি-না তা বলতে পারব না।

বেলতলার বাড়িতে বোঁঠানের ঘরে বসে অনেক খোসগল্পটম্প হোল। মোনা

বেবী ও ভোসল একসঙ্গে নানান কথা বলেই চললেন। আমি বোঁঠানের খাটে তাঁর পায়ে পাশেই বসে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম যে আকাশ খুসর হয়ে গেছে এবং সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। শহরটার উপরে যেন একটা ধোঁয়ার আবরণ নেমে আসবার উপক্রম করছিল। আকাশটাতে গোখলির আমেজ দেখা দিয়েছিল মাত্র। রসা রোডে গ্যাসের আলো তখনো জ্বলে ওঠে নি। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায় দেখে খাট থেকে উঠে পড়লাম। অমনি বোঁঠান বললেন—“বোস, কোথায় যাবি?” আবার বসে পড়লাম এবং তাঁর পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম। অল্পক্ষণ পরেই আবার উঠে দাঁড়াতেই বোঁঠান বললেন—“ভাবিস্ আমি জানি না কোথায় যাবি? তর দাদা না বলেছেন প্রেমটা জিয়াইবা রাখতে?” “কি যে বলেন” বলে পাজাবীটা একটু হাত দিয়ে টেনে ভাঁজ ভাঙিয়ে নিলাম। বোঁঠান তখনো ছাড়েন না। হেসে বললেন—“মাইনুসে শ্বশুরবাড়ি যাব কি কেবল পাজাবী পইর্যা নেকি? শীতের সন্ধ্যায় একটা চাদর কি র্যাপারও ত’ আনছ নাই। ঠান্ডা লাগাইয়া একটা অনর্থ ঘটাবি বুঝি?” বাস্তবিকই একটু শীত শীত করছিল। কিন্তু তবু মূখে বললাম—“কই, শীত কই? কিছু হৈব না।” বোঁঠান নিঃশব্দে উঠে তাঁর আলমারী খুলে দাদাবাবুর ব্যবহারের চমৎকার পেশাজী রঙের চণ্ডা পাড় ও জমকালো ছিলে-ওয়ালা নরম একখানা কামীরী শাল বের করে আমার কাঁধে দিয়ে বললেন—“নে গায়ে দে।” শালখানার ভাঁজ খুলে বেশ কেতাদুরস্তভাবে গায়ে জড়িয়ে ফেললাম। ফল যা দাঁড়াল সেটা দেখে খুশি হয়ে বোঁঠান হেসে বললেন—“এইবার তবু জামাই জামাই দেখাইতে আছে। দ্যাখ তরে বুবু আর জ্ঞানদাদাদিদের পছন্দ হয় কি-না”—বলেই মাথাটা ধরে আদর করে নেড়ে দিলেন। আমিও বেশ হৃদ্যচিন্তে পেছনের বড় সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেলতলা বাড়ির পেছনের ফটক দিয়ে বেলতলা রোড বরে চললাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের উদ্দেশ্যে কামীরী শাল উড়িয়ে। সেই যে শালখানা আমার কাঁধে উঠল সে আর নামল না—অর্থাৎ সে শালখানা এখন পর্যন্ত আমার নিজস্ব সম্পত্তি এবং পরম সম্পদ হয়ে রয়েছে। যখনই সেই শালখানা গায়ে দিই তখনই মনে পড়ে যায় সেই উনিশ শ’ উনিশ সালের পঞ্চা জ্ঞানদারায়ী খুসর সন্ধ্যায় আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা এবং তখনই স্পষ্ট অনুভব করি আমার সর্বাগে আমার জননীপ্রতিম বোঁঠানের শূদ্রাশীর্বাণের পবিত্র স্পর্শ।

বেলতলা রোড দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম পুরনো চেনা বাড়িগুলি। প্রথমেই পড়ল ২ নং বাড়ি যেখানে গিয়ে উঠেছেন সোনা ও সুধীর। তার উল্টো দিকেই ছিল স্বনামখ্যাত চণ্ডীচরণ সেন মশায়ের বাড়ি যেখানে থাকতেন নামকরা ব্যারিস্টার নিশীথ সেন ও তাঁর ভাইয়েরা। তারপর ছাড়িয়ে চললাম ৪ নং বাড়ি যেখানে বহুদিন আগে থাকতেন নর্দাদি ও শরৎবাবু। কিছু এগিয়ে ছিল বাল্যকালের খেলার সাক্ষী পাস্তি ও কালিপদদের বাড়ি। আরো এগিয়ে একটা চৌমাথা পেরিয়ে বাঁয়ে দেখলাম ঠাকুরবাড়ি যেখানে প্রায়ই কীর্তন হোত সাবেককালে। উত্তরে সোড় ঘুরতেই এলো ডান দিকে একটি শিবমন্দির যার দরজার মাথায় প্রস্তরফলকে লেখা ছিল এবং এখনো আছে—

“মাঘসাদ্য দিনে সৌরে বৃষহে
শিবমন্দিরং
ঈশানবিনতা দেবী নিমমে
ভবতারিণী।”

মন্দিরের পাশ দিয়ে ল্যান্সডাউন লেন বেয়ে পায়ে হাটা গলি দিয়ে গিয়ে পড়লাম ল্যান্সডাউন রোডে। বাঁয়ে মোড় ঘুরে উত্তর দিকে ডান হাতে ছিল সেই মস্ত খালি মাঠটা। সেই মাঠের উত্তর গা দিয়ে পূর্ব মুখে চলে গেছে পালিত স্ত্রীট। সেই রাস্তার প্রথম বাড়িই হোল ৭৮ নং বাড়ি। সাহসে ভর করে ঢুকে পড়লাম সেই বাড়িতে। বেশ স্পষ্টই বোকা গেল যে সে বাড়ির লোকেরাও ভাবছিলেন যে আমি আসব, কেন না গাড়িবারান্দার কাছেই বুবুর একমাত্র ভাই দেবকুমার, যাকে খোকা বলেই ডাকা হোত এবং দুটি ছোট মেয়ে আপু ও ছোটকোন। আপু ও ছোটকোনের চোখে যে হঠাৎ একটা ঝিলিক দেখা গেল বলে মনে হোল সেটা বাস্তব, না, আমার উচ্চ মস্তিস্কের কল্পনা তা বলতে পারি না। তাঁরা আমাকে সম্বর্ধনা করে গাড়িবারান্দার নিচ দিয়ে চণ্ডা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি একটি আরাম কেদারায় মজুমদার মশায় বসে আছেন এবং তাঁর পাশেই চেয়ারে বসা দেখলাম জ্ঞানদা দেবী এবং তাঁর তৃতীয়া কন্যা এবং ওষফে মলিনা। বুবুকে দেখতে না পেয়ে মনটা কেমন যেন দমে গেল। যাই হোক, প্রথমেই প্রণামাদি সেরে চেয়ার আনতে আনতেই আমি বসে পড়লাম বারান্দার দক্ষিণের লোহার রেলিং-এর গায়ে খিলানের নিচে ঈষৎ উঁচু সিমেন্ট বাঁধান একফালি সরু রকটার উপরে। অঁরে বের হয়ে এলেন একটি কণীসী মহিলা। জ্ঞানদা দেবী পরিচয়

করিয়ে দিলেন যে বৃষাটি তারই জ্যোত্যা ভগিনী—মার্ভাঙ্গনী চৌধুরাণী। পরে শুনছি এই বড় দিদিই জ্ঞানদা দেবীকে মানুষ করে তুলেছিলেন। তিনি ঐ বাড়ি-তেই শেষ বয়সে থাকতেন এবং সেখানেই মারা যান। মজুমদার মশায় আরাম কেদারায় খাড়া হয়ে বসে আমার সঙ্গে নানা কথা বললেন। বুবুর সময় বিলেতে কি হোত, জেপেলীনের এবং পরে হাওয়াই-জাহাজের হামলা, খাওয়া-শাওয়া কি ব্যবস্থা ইত্যাদি। জ্ঞানদা দেবীরও মৃৎখানা বেশ খুশি খুশি দেখে মনে অনেকটা বললাভ করা গেল। কিছু পরে হাসতে হাসতে তিনি বললেন যে বুবু সেইদিনই মধুপুর্ন থেকে ফিরে এসেছেন একটু সর্দিজ্বর নিয়ে। তাঁর নির্দেশে ছোটকোন, না, আপু আমাকে সিঁড়ি বেয়ে ভেতলার একটি দক্ষিণ খোলা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই ‘কি কেমন আছ’ বলতেই বুবু বিছানার উঠে বসলেন। আমি পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বুবু বললেন যে তাঁর বেশ সর্দি লেগেছে এবং বোধ হয় একটু জ্বরও এসেছে। দার্জিলিং মহারাণী স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবার পর দিনকতক কলকাতার কলেজে আই. এ. পড়বার পর বুবুর শরীরটা খাবার হওয়ার কলেজে পড়া বন্ধ করতে হয়েছিল। এ খবর আমি চিঠিতে আগে জেনেছিলাম। তারপর ঘরে বসেই কিছু পড়াশুনা চলছিল এবং তাঁর মাঝের সঙ্গে সঙ্গে ঘবকমার কাজও দেখাশোনা করা হচ্ছিল। ইদানীং শরীরটা কিছু খারাপ বোধ করার তাকে মধুপুর্নে তাঁর ন’ মাসীমাব কাছে হাওয়া বদলের জন্যে পাঠান হয়েছিল। সেখানে তিনি বেশ ভালই ছিলেন। কিন্তু আমি ফিরে আসছি শূনে তাঁকে কলকাতার আসতে হোল। আসাটার যা ইতিহাস শোনা গেল সেটা এইঃ—যখন খবর গেল যে আমি খুব সম্ভবত পরলা জ্ঞানদারায়ীতেই কলকাতার পৌঁছে যাব তখন তাঁরা মধুপুর্নে খবর নিতে লাগলেন যে সেই দিনের আগে জানাশোনা কেউ কলকাতার আসবেন কি-না। সংবাদ পাওয়া গেল যে কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা প্রবীণ একজন উকিল তিরিশ কি একতরিশ তারিখে কলকাতায় ফিরবেন। অমনি বুবুর ন’মাসীমার পূর্বাতন কি মোক্ষদা গেলেন সেই উকিল-বাবুর বাড়ি জিজ্ঞাসা করতে যে তাঁর সঙ্গে বুবু কলকাতায় ফিরতে পারেন কি-না। সেই বৃষ ভ্রমলোক বললেন—“যেতে নিশ্চয়ই পারত। তবে কি না আমি যাব ফাস্ট ক্লাসে—এই হয়েছি গোরা।” বৃষাটি ভেবেছিলেন যে এ কথা বললে ভ্রমতাও রক্ষা হবে, বলাউও বাঁচবে। কিন্তু

মোক্ষদা ছাড়বার পাঠী নয়। শোনামাত্র শুনিয়ে দিল—“হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমাদের মেয়েও ফাস্ট কেলান্শেই যাবে। ওরা তাই গিয়ে থাকে।” ভয়লোক তখন নিরুপায় হয়ে বললেন—“বেশ স্টেশনে পৌঁছে দিও সময়মত। দেখো দেরিটোরি না হয়।” কাজ ফতে করে মোক্ষদা সুসংবাদটা বাড়িতে দিলে বুঝে তাড়াতাড়ি করে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে একদিন ডিসেম্বরের রাতের গাড়িতে সেই বন্ধুটিকলের সঙ্গে কলকাতায় পয়লা তারিখেই এসে পড়েছেন। পথে ধূলোয় ও রেলের দরজা-জানালার ফাঁকে ফাঁকে ফুবুর করে যে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল তাইতে বুঝে সর্দি লেগে গিয়েছে। আমি আসছি বলে বুঝেও ফিরে আসতেই হোল কথাটা শুনে মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম তা বলাই বাহুল্য। তারপর বুঝে জিজ্ঞাসা করলেন পথে আমার কোন কষ্ট হয়েছে কি না, ভাগ্যস্বপ্নটা খেমে গিয়েছিল নাইলে ডুবোজাহাজে কি ফাসাদই না জ্বানি হোত ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে বাবা-মা, ভাইবোনেরা কেমন আছেন তা-ও বুঝে জিজ্ঞাসা করতে ভালেন নি। সেদিন সন্ধ্যায় খুব বেশিক্ষণ সে বাড়িতে ছিলাম না। বুঝে কাছে বিদায় চাইতেই বুঝে চোখে সেই পরিচিত চাহনীটা হঠাৎ ঝিলক মেয়ে অনেক কথার চেয়েও অনেক স্পষ্টতরূপে জ্ঞানিয়ে গেল—“আবার এসো।” নিচে মঞ্জুমদার মশায় ও জ্ঞানদা দেবীর কাছে যখন বিদায় নিলাম তাঁরাও বললেন—“মাঝে মাঝে সময় পেলে এসো।” নিচে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়িলাম। বেশ স্পষ্টই অনুভব করলাম যে এ বাড়িতে আমার প্রবেশাধিকার মঞ্জুর হয়ে গেছে এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার পথে এদিক থেকে কোনো ওজর-আপত্তিই হবে না। খুব প্রফুল্ল মন নিয়েই সেদিন সন্ধ্যায় বেলতলা রোড দিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত আটটার সময়। মাথার উপরে ধূসর আকাশে বেশ কটা তারা মিট মিট করে জ্বলছিল। বাড়ি ফিরে বেশ সহজভাবেই মাকে সন্ধ্যাপনে বললাম যে বোঁঠানের কাছ থেকে বোঁয়ে একবার ৭৮ নং ল্যান্সডাউন রোড হয়ে এলাম। মা কোনো কথা না বলে আমার মাথায় তাঁর ডান হাতটি বুলিয়ে দিলেন আপন মনের সমস্ত আশীর্বাদ জ্ঞানিয়ে। খুব হাল্কা মন নিয়ে সেদিন রাতে খাবার পব শুতে গেলাম। মনের মধ্যে বুঝে চোখের সেই অবিস্মরণীয় চাহনীটি ঊর্ধ্বদিক মেয়ে বারবার বলছিল—“আবার এসো, আবার এসো।” যতদূর মনে আছে সেবার বড়দিনের ছুটিব পর কলকাতা হাইকোর্ট খুলল ২রা জানুয়ারীতে। সেদিন সকাল সকাল

জ্ঞান সেয়ে খেয়ে-দেয়ে বাবা-মাকে ও বোঁঠানকে প্রণাম করে জামাই সুধীরের সঙ্গে গেলাম বার লাইব্রেরীতে, আবার সেই প্রকাণ্ড হাইকোর্ট বার মাথার চুড়ায় উড়াছিল ইংরেজদের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। সেই খিলানওয়ালা বারান্দা এবং চকমেলানো প্রাসাদ। মাঝের প্রকাণ্ড উঠানটার ছিল ফোয়ারা এবং সুন্দর সাজান বাগান। এবার হাইকোর্টে ঢুকলাম পূর্ব দিকের খিলানকরা বড় প্রবেশদ্বার দিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে বাঁয়ে মোড় ঘুরেই যে প্রকাণ্ড সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার তারই ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গেলাম বার লাইব্রেরীর বড় ঘরটার যেখানে বহুর আন্টেক আগে আমি প্রথম গিয়েছিলাম। সেই আগেরই মত লাল পাগড়িপরা পুলিশ ও শক্ত টুপি মাথায় ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী সার্জেন্টদের হাঁটহাঁটি এবং অগণ্য লোক-সমাগম। সেই কালো পোষাক পরা আইনজীবী দলের ব্যস্ততা। বার-লাইব্রেরীতে চেনার মধ্যে দেখলাম সুধীর রায়, দেবেন সেন যিনি আমাদের বিলেত প্রবাসের গোড়ার দিকে বিলেতে ছিলেন এবং আমাদের কিছু আগেই দেশে ফিরে-ছিলেন। আর দেখলাম আমার পুরাতন বন্ধু হেমন্ত দে ও অজিত ধরকে। এঁরা দুজনেই আমাকে দেখে বেশ খুশি হলেন—আজ্ঞার আর একজন জুটল বলেই বোধ হয়। বড়দের মধ্যে চেনা দেখলাম নিশীথ সেন ও বিজয় চ্যাটার্জি বাদির দাদাবাবুর বাড়িতে অনেকবারই দেখেছি। সুধীর

রায়ের কোর্টে কি কাজ ছিল বলে তিনি আমাকে দেখেন সেন, হেমন্তা ও অজিত ধরের জিম্মায় রেখে গেলেন। এঁরা তিনজন আমাকে সংক্ষেপে বুলিয়ে দিলেন হাইকোর্টে ভর্তি হতে গেলে আমাকে কি করতে হবে। শুনলাম যে হাইকোর্টে নাম লেখাতে হলে দক্ষিণা দিতে হবে সরকারকে পঁচিশ টাকা এবং বার-লাইব্রেরীতে সভ্য হবার মাসুল বাবদ ঐদেতে হবে নগদ আড়াইশ টাকা। রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করে একটা দরখাস্তের ফর্ম এনে সৈটার মধ্যে যা লেখবার সব লেখ এবং ব্যারিস্টারী পাশের সনদখানা এবং ওয়াট সাহেবের চেম্বারে পড়ার স্টিফিকেটখানা এঁটে দিবে দাখিল করে জিাম ইন্সবরের নাম নিয়ে। শুনলাম যে সেই দরখাস্তখানা একে একে সব জজ সাহেবের কাছে পেশ করা হবে এবং তাঁরা সবাই বরখাস্ত মঞ্জুর করলে তখন পঁচিশ টাকা জমা দিলেই কোর্টের খাতায় অর্থাৎ অড-ভোকেটদের বোলে আমার নাম উঠে যাবে এবং তখন আমি স্বচ্ছন্দে যে কোন কোর্টে হাজির হয়ে প্র্যাকটিস করতে পারব। বর-লাইব্রেরীতে ঢুকবার দরখাস্তটাও মুনসিফ করে নিলাম। পরের দিন বোঁঠানের কাছ থেকে আড়াইশ টাকা নিয়ে বারলাইব্রেরীতে গিয়ে সেটি হেড লাইব্রেরিয়ান দীন্দু বাবুর হাতে দিলাম। তিনি জানােন যে, বারলাইব্রেরীর ট্রেমাসিক চাঁদা দিতে হবে পঁচিশ টাকা কবে। তিনি আমার হাতে বারলাইব্রেরীর নিয়মাবলীর একখা

শরৎচন্দ্রের পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে

শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ

রাখার অভিনব ও অভাবনীয় আয়োজন

[২২শে ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর) হইতে ৪ঠা আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত]

সমুদ্রিত রয়েল সাইজের রেজিনে বাঁধাই এই গ্রন্থাবলী ১৩টি

সুবহুৎ খণ্ডে সমাপ্ত

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০.০০ টাকা; উপযুক্ত তারিখের মধ্যে ৮.৫০ পয়সায় পাবেন।

(বর্তমানে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ সংখ্যক খণ্ডগুলি পাওয়া যায়)

আমাদের নিকট হতে এই গ্রন্থাবলীর স্বতন্ত্র ও সমগ্র খণ্ড যারা ক্রয় করবেন উপযুক্ত তারিখের মধ্যে, তাঁরা শতকরা ১৫.০০ টাকা হারে কমিশন পাবেন। যারা একত্রে বর্তমানে প্রকাশিত সমগ্র খণ্ডগুলি ক্রয় করবেন, তাঁরা অপ্রকাশিত অন্য ৩টি খণ্ডের উপরেও সমহারে কমিশন পাবেন।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বিষ্ণু চাট্জো স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কপি দিয়ে “গুড লাক, স্যার” বলে সেলাম করলেন। প্রতিদমস্কাব করে সেদিন তাড়াহাড়িই বাড়ি ফিরলাম।

এরপর শব্দ হোলো হা-পিগতোশ করে আকাশ চেয়ে বসে থাকে কবে আমার এনরোলমেন্টের দরখাস্ত জজ সাহেবরা মঞ্জুর করবেন এই আশা। আমি আগে থেকেই জানতাম যে হাইকোর্টের আদম বিভাগে অর্থাৎ ওরিজিন্যাল সাইডে প্রাক-টিস করতে হলে একজন বড় কৌশলীর চেম্বারে গিয়ে “ডেভিলিং” অর্থাৎ বেগার খাটতে হবে বছর কতক। এই ডেভিলিং করতে করতে এটর্নীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে এবং তাঁদের কারো সুনজরে পড়লেই ছোটখাট ব্রীফ আসতে আরম্ভ করবে। তারপর বরাত আর ভগবানের অনুকম্পা। কথা হোলো কার কাছে ডেভিলিং করা যায়। শুনলাম অনেক চেম্বারে ডেভিলের খুব ভিড় এবং সেখানে ঢোকাও শক্ত। দাদাবাবু একদিন কথার কথার বললেন নিজেকে দেখেছেন একজন ভাল কৌশলী বেছে নিয়ে তাঁর চেম্বারে কাজ আরম্ভ করে দিতে। তিনি বললেন যে প্রত্যেককে নিজের এলেমেই নিজের পথ করে নিতে হবে। তাছাড়া নিজের আত্মীয়ের সঙ্গে কাজ করে কোন লাভ নেই কেন না নিজের আত্মীয়ের জন্যে এটর্নীদের কাছে সুপারিশ করতে পারা যায় না। সুতরাং অন্যায়ের একজন ভাল কৌশলী ধরতে হবে। এই পরামর্শ অনুসারে আমি রোজ সকালে সাড়ে দশটার সময় হাইকোর্টে গিয়ে বারলাইব্রেরীতে আমার এ্যাটর্নি কেস ও ট্রপীটা রেখে ওরিজিন্যাল সাইড কোর্টে গিয়ে সামনের টেবিলের একধারে চুপটি করে বসে ক্রাকটের কাজ নজর করে দেখতে লেগে গেলাম। সে সময়ে ওরিজিন্যাল সাইডে স্থায়ীভাবে একটিনার জজ বসতেন সারা বছর। জজের ভিড় হলে আর একজন জজও ওরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। এই জুইটি কোর্টই তখন ছোকরা ব্যারিস্টারদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। একটি ওরিজিন্যাল সাইড আপীল কোর্ট বসত মাঝে মাঝে। সেখানে তখনকার দিনে তিনজন জজ বসতেন আপীল বিচার করতে। সেখানে প্রবীণ ব্যারিস্টারদেরই আনাগোনা ছিল। ছোকরা ব্যারিস্টারদের সেখানে দম্ভস্কাট করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ক্রমে ওরিজিন্যাল সাইডের কাজ বেড়ে যাওয়ার দৃষ্টি কোর্ট ত নিয়মিত বসতই, মধ্যে

মাঝে তৃতীয় একটি কোর্টও বসত। এখন শুনতে পাই ওরিজিন্যাল সাইডে গোটা সাত-আট কোর্ট হয়েও কাজ ফুরোর না। বাই হোক আমি নিয়মিত ওরিজিন্যাল সাইডের প্রথম কোর্টতে গিয়ে বসতাম। সেটাকে বলত “মোসন কোর্ট”। একটা মামলাকে শুনানী পর্যন্ত টেনে আনতে গেলে মাঝে মাঝে যে সব ছোটখাট ব্যবস্থা দরকার হয় তারই দর-খাস্তকে বলা হয় “মোসন”। যেমন ধর মামলার বিষয়বস্তু যে সম্পত্তি তা রক্ষা করার জন্যে একজন রিসিভার নিয়োগ, কি অপর পক্ষ কোন অন্যান্য কাজ করার যোগাড় করছে দেখে তার উপর ইনজাংশন অর্থাৎ নিবেদন জারি ইত্যাদি। এই সব “মোসনে” কৌশলীদের কাজের কৃতিত্ব বেশ খোঁষা যায়।

দু’জনের কাজ আমার বেশ পছন্দ হোলো—প্রথম স্যার বিনোদ মিটার এবং দ্বিতীয় নূপেন সরকার। জামাই সুধীরের তখন নিজের কাজ হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি স্যার বিনোদের চেম্বারে কাজ করতে যেতেন মাঝে মাঝে। সুতরাং সে দিকে আর খেঁসলাম না তখন। নিজেই চলে গেলাম বাবলাইব্রেরী ছোট ঘরে যেখানে বসতেন এ্যাডভোকেট জেনারেল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যারিস্টার। নূপেন সরকারও বসতেন সেখানে। শুনছিলাম লোকটি রগচটা ও রক্ত মেজাজী এবং খোসমেজাজে ধবতে না পারলে চাই কি মুখরামটাও দিতে পারেন। কিন্তু মরার বাড়ি ত গাল নেই। মন ঠিক করে অচিরেই তাঁর সঙ্গে বার-লাইব্রেরীর ছোট ঘরেই দেখা করলাম। বিনা ভূমিকার তাঁর চেম্বারে কাজ করার অনুমতি চেয়ে ফেললাম। তিনি বাড়ি যাচ্ছিলেন কোর্টের পর। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—“আপনি এয়েছেন শুনছি। আপনি ত খুব ভালভাবে এল-এল-বি পাশ করেছেন। তবে মুশকিল হচ্ছে যে আমার চেম্বারে ত বহু জুনিয়র আসেন। এত লোকের মধ্যে কি সুবিধে হবে? আচ্ছা, আপনাকে আমার চেম্বারে আসবার কে দরামশ দিল?” বললাম, “কেউ পরামর্শ দেন নি। আমি নিজেই কোর্টে বসে আপনার কাজ দেখছি। আপনার ব্রীফগুলি পড়া থাকলে আপনার কাজ আরো ভাল করে বুঝবার ও শেখবার সুবিধে হবে ভেবে আমি নিজেই চলে এসেছি।” কথাটা ভুললোকের যেন মনে ধরল। আপন খুতুনীতে নিজের দুটো আঙুল বুলিয়ে বললেন—“তা যদি হচ্ছে করেন তবে আমার চেম্বারে আসতে পারেন। আমি বাড়িতেই কাজ করি।” ঘাম দিয়ে যেন জর ছাড়ল। লেগে গেলাম তার

পরদিন থেকেই সরকার সাহেবের এলগিন রোডের বাড়িতে আনাগোনা করতে।

এরিকে খবর পাওয়া গেল যে জজ সাহেবরা আমার এনরোলমেন্টের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। বৌঠানের কাছ থেকে পাঁচ শ টাকা নিয়ে ট্রেজারীতে জমা দিয়ে চালানটি রেজিস্টার সাহেবের সেরেস্টার দাখল করলাম। তাঁরা জানালেন যে উনিশে জানুয়ারী ওরিজিন্যাল সাইডের প্রথম কোর্টে জজ সাহেব আশুতোষ চৌধুরীর সামনে আমাকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। বাবা মা ও বৌঠানকে প্রণাম করে একটি নীল রঙের কাপড়ের ব্যাগ ধা বিলম্ব থেকেই এনেছিলাম তাতে আমার কাল কোট, গাউন ও ব্যান্ড ভরে জামাই সুধীরের সঙ্গে আমি হাইকোর্টে পৌঁছে গেলাম। গলার টাইটা খুলে সাদা ব্যান্ডের ফিতোটা বেঁধে, কালো কোট পরে, কাঁধে ব্যান্ডের কালো গাউনটা চাড়িয়ে গেলাম বারলাইব্রেরীর ছোট ঘরের সামনে পুরনো সেসস্ফের মস্ত বড় ঘরটিতে। দেখলাম সেখানে উচ্চ মণ্ডের উপর প্রকাশ্যে একটা উঁচু পিঠওয়ালা বেতের চেয়ারে বসেছেন জজ সাহেব স্যার আশুতোষ চৌধুরী। প্রশান্ত মুখ, বেশ ফরসা তাঁর গায়ের রঙ এবং চমৎকার সাদা একজোড়া গোঁফে তাঁর ঠোঁট ঢাকা। রেজিস্টার সাহেব এগিয়ে গিয়ে কি বললেন এবং জজ সাহেব মাথা নেড়ে অনুমতি দেওয়ার রেজিস্টার সাহেব আমাকে চোখে ইসারা করার আমি এগিয়ে জজ সাহেবের সামনে দাঁড়িলাম। একটা অনির্দিষ্ট ভাবনা বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছিল। রেজিস্টার সাহেব আমার হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললেন—“বা দেখা আছে তা পড়ে হৃদয় নিন।” আমি ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক সহজ ও স্বাভাবিক সুরে হৃদয়টা পাঠ করে ফেললাম। জজ সাহেব অমনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম। জজ সাহেব দেড়টার সময় মধ্যাহ্ন-বিরতি করে নিজের চেম্বারে নেমে গেলেন। রেজিস্টার সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে কি সব কাগজপত্র সই করে বোয়ালে আসবার সময় তিনি আমাকে তাঁর শুলেজ্ঞা জ্ঞাপন করলেন। তখন আমাদের রেজিস্টার ছিলেন বোধ হয় হেকল সাহেব। অন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করে ফিরে এলাম বারলাইব্রেরীতে। আমার বাবা হোল শব্দ। আমি ভগবানের নাম নিয়ে কর্ম-জীবনের অক্লান্ত সমুদ্রে ভাসলাম। সে দিন কে জানত যে আমার জীবন-তরণীর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর সকল বড়-তুফান থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ব্যবহারজীবীর মহান আকাশের চরম চরিতার্থতার উপকূলে নির্দিষ্ট দিনে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেবেন।

[কম্পাঃ]

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জনাব সামসুদ্দোহা সম্পর্কে সকলেই জানেন যে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সক্রিয় সংগ্রাম (Direct action) উদ্যোগে তাঁর একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার হিসাবে কলকাতার দাঙ্গায় কী ভূমিকা ছিল।

ঢাকা লোক মাগ্রেই জানেন যে খাজা সাহাবুদ্দিন সাহেবের ঢাকায় পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি কী ভূমিকা নিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিককালের একটি কাজও তাঁকে রাতারাতি বিশ্ব-বিখ্যাত (!) করেছে। রবীন্দ্রনাথ শব্দে বাংলার বা ভারতের কবিই নন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বকবি। সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানও তিনি পাকিস্তান-রোডও-তে নিষিদ্ধ কবেছেন! বিশ্বকবিকে নিষিদ্ধ ও বিস্মৃত কবতে গিয়ে তিনি শব্দে নিজেকেই বিশ্ববাসীর কাছে নিষিদ্ধ ও বিস্মৃত করেন নি, একটা দেশের গৌরব-ও ধ্বংস লুটিয়ে দিয়েছেন।

এইসব লোক নিয়েই পাকিস্তান সরকার দিল্লী-চুক্তির মর্ষাদা রক্ষা করে চলেছেন। দিল্লী-চুক্তির “গ” ধারার ১নং উপ-ধারায় বলা হয়েছিল যে উভয় সরকার-ই (ভারত ও পাকিস্তান) “shall take suitable measures to prevent recurrence of disorder.” অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাতে উভয় দেশেই এরূপ অশান্তি আর ঘটতে না পাবে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা উভয় সরকার-ই গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি ১৯৬২ সালে রাজসাহী জেলায় ব্যাপকভাবে গৃহ-লাহ, লুণ্ঠন ও হিন্দুহত্যা হয়েছে।

১৯৬৪ সালেরও সারা পূর্ব

১৯৬০ সালের-ই দা

করা হয়েছিল

কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। একটি হচ্ছে দিল্লীর ও অপরাট পশ্চিম বাংলার শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে। দিল্লীর পররাষ্ট্র বিভাগের ‘জয়েন্ট-সেক্রেটারী’ হচ্ছেন জনাব আমজাদ হোসেন সাহেব। তিনি সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়েই একজন সম্মানিত মুসলমান কর্মচারী। পাকিস্তানের দিল্লীস্থিত রাষ্ট্রদূত (হাই-কমিশনার) জনাব আরসাদ হোসেন সাহেবের তিনি ভাই। ডব্লু কিন্তু ভারত সরকারের বা ভারতের জনসাধারণের কেউ-ই জনাব আমজাদ হোসেন সাহেবের ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার মোটেই বিরোধী হন নি; বরং, হিন্দু, হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক বা খৃস্টান হোক—ভারতের নাগরিক মাগ্রেই যে ভারতবাসী এবং সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, তাবই সফল রূপায়ণ দেখে প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্ব বোধ করার যথেষ্ট ন্যায়-সঙ্গত কারণ আছে এবং কবেন-ও। অপর দিকে পাকিস্তানে আমি দেখেছি যে রাজসাহী-বিখ্যাত উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসনৎ মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রী কলকাতায় থাকেন বলে শ্রীমান সনৎ-এর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব লোপ পেয়েছে এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ-ও ‘খারিজ’ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে কেবলমাত্র হিন্দুর বেলাতেই আমি দেখেছি যে, সে দেশের নাগরিকত্বের মাপকাঠি-ই হল তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সব পাকিস্তানেই থাকেন, না ভাবতে? সেই বিচারের উপরই অনেকক্ষেত্রেই নাগরিকত্বের

এইবার পাকিস্তানের দিকে একবার তাকান যাক। পুন্ড্রিশের ইন্সপেক্টার বহন-বাবুর ও ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা আেই বলছি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে কয়েকটি ঘটনার কথা বিশেষ ভালভাবে জানি, তারই মধ্যে থেকে আরও কয়েকটি কথা এখানে তুলে ধরি। রাজসাহী থেকে আর একজন ‘সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট’—শ্রী ডি, এন, মিস্ত্রী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী) মহাশয়কে স্বনামধন্য মর্ষাব সাহেব—ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচাবেই চাকুরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। আর এজন্য সবকারী কর্মচারী—রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরাখাল চক্রবর্তী মহাশয়কেও তাঁর সমস্ত পাওনা ত্যাগ করেই চাকুরি ছেড়ে ভারত আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি আত্মপবলোকগত। আর এজন্য পদস্থ জাতি সারকে ও আমি জানতেম। তিনি হলেন শ্রী এস, বি, দাস (তাঁর পুরো নাম সম্ভবত শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস)। জনাব আব্দ হোসেন সবকারী যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য-মন্ত্রীর তখন তিনিই ঐ ভদ্রলোককে রাজসাহী সদর মহকুমার ‘এস-ডি-ও’ (S. D. O.) করে পাঠান। দাসবাবুর ঐ নিয়োগের বিরুদ্ধে সেই সমসকার রক্ত-ফ্রন্ট দলের ৪ জন মুসলমান ‘এম-এল-এ’ মুখ্যমন্ত্রীর সবকার সাহেবের কাছে এত তারবার্তার মাধ্যমে সমান্তবর্তী জেলায় একজন হিন্দুকে ‘এস-ডি-ও’ করে পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এইসব

গান্ধাহিক বঙ্গদমতী

দেশে এসেছিলাম। সম্প্রতি শুনলাম, তিনি সপরিবারে ভারতে এসে কৃষ্ণনগরে আছেন। সম্ভবত ১৯৬২ সালের রাজ-সাহাব ব্যাপক গৃহদাহ, লুণ্ঠ ও হত্যা-কাণ্ডে 'সরকারের' চুমিকা দেখেই তাঁর পেটের পিলে চমকে থাকবে। কী কারণে তিনি এসেছেন তা সঠিক জ্ঞান না কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রেই শুনেছি যে তিনি এসেছেন এবং কৃষ্ণনগরে আছেন।

এইবার সর্ব শেষে আর একজন অত্যন্ত পদস্থ সরকারী কর্মচারীর কথা বলছি। তাঁর সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবেই বলার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি হলেন, প্রীতজিত দত্তচৌধুরী। পাকিস্তানের একজন 'সি-এস-পি' (C.S.P.) অফিসার। ভারতের 'আই-এ-এস' (I.A.S.), আর পাকিস্তানের 'সি-এস-পি' (C.S.P.) একই গোত্রীয়-সমপর্ষ্যবৃত্ত কর্মচারী। ইংরেজ আমলের 'আই-সি-এস' (I.C.S.) জাতীয়। এই ভ্রমলোককে আমি বিশেষ ভালভাবেই চিনি ও জানি। তিনি পাকিস্তানের সিলেট জেলার লোক। আমাদের বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবসন্ত-কুমার দাস মশায়ের আত্মীয় কিনা, তা আমি সঠিকভাবে জানি না। তবে এইটে জানি যে তিনি স্বাভাবিক কারণেই বসন্তবাবুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। দেশ বিভাগের আগে বসন্তবাবু আসাম এসে-ফলি বঙ্গপীকার ও পবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বসন্তবাবুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠান এবং উচ্চ পদ-গৌরব, তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়েছিল। বসন্ত-বাবুর সৈদিনের সম্মানে প্রত্যেক সিলেট-বাসীরই গৌরব বোধ করা অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল। অজিতবাবুও যদি সিলেটবাসী হিসাবে বসন্তবাবুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন, তাহলে সেটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে সেইটাই দেখা দিয়েছিল অজিতবাবুর দিক থেকে

উঠতে পারবে না। তিনি মনে করেন, দেশকে সেবা করার সেইটাই উপযুক্ত সময়; তাই তিনি দেশেই বরাবর থেকে যাবেন এই মনোভাব নিয়েই থাকেন এবং পাকিস্তানের 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সাথেই তাতেই উত্তীর্ণ হন। তারপরে, তিনি দেশে ও বিদেশে—বহু স্থানেই শাসন বিভাগের সমস্ত রকম কাজের শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিদেশে শিক্ষার জন্য তাঁকে পাকিস্তান সরকার-ই নানা দেশে পাঠিয়েছেন। তিনি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, লেবানন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, তাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বহু দেশেই 'সরকার' কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে-ছিলেন। দেশেও তিনি সচিবালয়ে উচ্চ-পদে এবং ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহ-কুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাধরগঞ্জ জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছেন কিন্তু বোধ হয়, পাকিস্তান সরকারের কাছে তাঁর ধর্মই একটি প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল; তাই কোথাও তিনি দীর্ঘকাল অর্থাৎ সরকারী কর্ম-চারীদের স্বাভাবিকভাবে একস্থানে স্থিতি-কাল পর্যন্ত থাকতে পারেন নি। তাঁকে এক সময়ে সংখ্যালঘু দপ্তরের কাজকর্ম দেখার জন্য 'বিশেষ অফিসার' হিসাবেও নিয়োগ করা হয়েছিল। বোধ হয়, সরকারের উদ্দেশ্য ছিল যে একজন পদস্থ হিন্দু কর্মচারীর মূখ দিয়ে বের করান যে হিন্দুরা পাকিস্তানে বেশ ভালই এবং সুখেই আছেন। আদর্শবাদী যুবক অজিত দত্তচৌধুরী অন্যান্য ও অবিচারের সাথে আপোষ করে সভ্যকে গোপন করতে পারেন নি। তিনি মনঃসলমান যেখানে অন্যান্য করেছেন সেখানে তাঁদেরও বিরুদ্ধে যেমন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি-ভাবে তিনি সময়ে সময়ে প্রতিবাদ করে-ছেন আমাদেরও বিরুদ্ধে, যেখানে আমরা ভুল পথে পা বাড়িয়ে কোনরূপে অন্যান্য করতে গিয়েছি! কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর,

হোসেন সাহেবের, তথা পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে—সাম্প্রদায়িকতাবাদী কর্ম-চারী নন। অজিতবাবুই একমাত্র কর্মচারী যিনি হলেন মহা সাম্প্রদায়িকতাবাদী! পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি এটাই স্বেচছারের নমুন। অজিতবাবুকে লাহোরে বিচার-বিভাগীয় পদে পাঠানোর পেছনে গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আরও গভীরে। গভীর জাকিব হোসেন সাহেব মুখ্যসচিব আসফার সাহেব ও বিভাগীয় কমিশনার কাহ্ন সাহেব মিলে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে গভীর এক ষড়যন্ত্র করেন। সাময়িক শাসনকালে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যখন "এবডো" (EBDO) মামলা হয়, তখন কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত-বাবুর বিরুদ্ধেও মামলা হয়। বসন্ত-বাবুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে তিনি অজিত দত্তচৌধুরী মহাশয়ের মাধ্যমে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে গোপন-পুঁলিশেব রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন। এই অণবাদের চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। অজিতবাবুর কাছ থেকে বসন্তবাবুর কোনও রিপোর্ট সংগ্রহ করারই দরকার হত না। তিনি নিজেও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজেও জানতেন, পাকিস্তানের গোপন-পুঁলিশ (আই বি পুঁলিশ) কেমন সব আজগুবি খবর হিন্দুদের সম্পর্কে দিয়ে থাকেন। আমিও জানি। আমার বিরুদ্ধে যখন "এবডো" (EBDO) মামলা হয় তখন আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দেওয়া হয় যে আমার না কি নিজস্ব একটা গোপন সাময়িক সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য দল ছিল। সেই দলের মাধ্যমে আমি সেই সব সাময়িক তথ্য সংগ্রহ করে ভারত সরকারের কাছে পাঠাতেম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমি যখন সেই আদালতকে জিজ্ঞাসা করি যে কবে এবং কী উপায়ে ঐ মহান্ তথ্যটি সরকার আবিষ্কার করলেন, তখন আমাকে সে সম্বন্ধে কিছুই জানান হল না। আমি যখন বলি যে এত বড় সরকারী কর্মচারী

গাণ্ধ্যিক বসমতী

জুমার সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের গোপন-পুলিশ বিভাগের কী রিপোর্ট ছিল। সে খবর আমাদের চোখে করে সংগ্রহ করতে হয় নি। আমার মস্তিষ্ককালে পুলিশ বিভাগই মন্ত্রীর কাছে সেই রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এটাই সীতি। পনের দিন পর পর পুলিশের একটা গোপন রিপোর্ট মন্ত্রীদের কাছে দেওয়া হয়। সেই রিপোর্টের সব কথা আমি প্রকাশ করতে চাই না; তবে, শুধু এইটুকু বল রাখছি যে সেই রিপোর্টের মাঝে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও ভারত সরকারও যুক্ত ছিলেন। আর এরূপ একটা অ-প্রকৃত হীন অভিযোগেরই দাম দিতে হয়েছে, একজন মহাপ্রাণ দেশনায়ককে জীবন দিয়ে। সতীনবাবুকে জেলে থাকা ফালেই প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রাণকুমার-বাবুও আজ পরলোকগত। তাঁরা উভয়েই আজ এমন এক দেশে গিয়েছেন যেখানে পাকিস্তানের 'নেকড়ে'রা আর তাঁদের মনঃসুরণ করতে পারবেন না। ঈশপের গম্পে সকলেই, 'মেঘশাবক ও নেকড়ে' ফাহিনী পড়েছেন। মেঘশাবককে বধ করতে হবে; সুতরাং, একটা কাল্পনিক অভিযোগও তার জন্য সৃষ্টি করে নিতে হবে। পাকিস্তানও স্বাধীনতার সংগ্রামী জনতাদের বিরুদ্ধে সেই নেকড়ে-নীতিই অনুসরণ করে চলে। তাই খান আব্দুল গফ্ফার খান সাহেব বড় দুঃখেই কয়েকজন ভারতীয়কে বলেছিলেন—“আমাদের নেকড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে তোমরা আজ স্বাধীনতা ভোগ করছো এবং আমাদের ভুলে গিয়েছো।”

বসন্তবাবুর বিরুদ্ধেও সেই 'নেকড়ে'-দের অভিযোগ ছিল এবং তার মাথের যুক্তি হয়েছিলেন, অজিত দত্তচৌধুরী মহাশয়েরও মাম। তাঁকে লাহোরে বদলি করার পাছনের উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দূরে সরিয়ে রেখে সাক্ষী তৈরি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা ও বিচারের একটা প্রহসন করে কয়েক বছরের জন্য জেলে পাঠান। অজিতবাবু, তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মুসলমান অফিসারের কাছ থেকে এই সংবাদটি পেয়ে পাকিস্তান থেকে মাত্র একটি 'স্টুটকেশ' সম্বল করে ভারতে কেটে পড়েন। একজন আদর্শ-বাদী যুবকের এই হীন যড়যন্ত্রের ফলেই পাকিস্তানের কর্মজীবন শেষ হবে যায়। ভারতের কংগ্রেস নেতারা বা রাজনীতিক নেতারা কি পাকিস্তানের হিন্দুদের এই সব দুঃখ-দুর্দশার 'খোঁজ-খবর' কিছু রাখেন? শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের খোঁজ-খবর জানালেও কী তাঁরা তার প্রতিকারের বা এই সব নিপৃহীত ব্যক্তিদের উপর সুবিচার করার চেষ্টা করেন? তাঁরা মোহ হয় পাকিস্তানের

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও সমস্ত হিন্দুকেই স্বাধীনতার বলি হিসাবেই ধরে নিয়েছেন; তাই আর তাঁদের জন্য কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই।

অজিতবাবু, এদিকে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটা চাকরি পেয়েছেন মাত্র কিন্তু তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত পদ ও পদমর্যাদা আজও পান নি।

এতক্ষণ পাকিস্তানের হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের কথাই বললেম। এইবার আধা-সরকারী ও বে-সরকারী হিন্দু কর্মচারীদের সম্পর্কেও দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেখানে কী অবস্থা হয়েছে দেখা যাক। একদিন রাজসাহী থেকে আমি ঢাকায় যাচ্ছিলেম। রাজসাহী স্টেশনেই দেখা, আই এইচ জুবেরি (I. H. Zuberi) সাহেবের সাথে। জনাব জুবেরি সাহেব, একজন প্রবীণ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি তখন রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। দুজনেই ট্রেনে একই কামরাতেই উঠি। সারা রাত্তি যতক্ষণ আমরা জেগেছিলাম ততক্ষণ পর্বস্ত নানা বিষয়েই আলোচনা করি। কথা প্রসঙ্গে জুবেরি সাহেব বলেন—“শিক্ষক ও শিক্ষার উৎকর্ষতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গৌরবের বস্তু ছিল কিন্তু দেশ বিভাগের তথা স্বাধীনতার পরে শিক্ষা বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিক নেতারা রাজনীতিক প্রভাব ও রাজনীতি আমদানি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে পঙ্গু করে দিলেন। এই রাজনীতিরই ফলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্বার্স বিভাগের নাম-করা অধ্যাপক শ্রীমতিলাল দাস মহাশয়কে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ ছিল কি? ভারত যখন প্রথমবার তাঁর টাকার মূল্যমান হ্রাস করেন, তখন তাঁর ছাত্রদের মূল্যমান হ্রাস করা হয় কেন, তা বোঝাতে গিয়ে ভারতের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে পাকিস্তান যদি মূল্যমান ভারতের সমপরিমাণে না আনেন—তাহলে পাকিস্তান ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর যায় কোথায়? অধ্যাপক দাসের সেই অপরাধে চাকুরিই গেল। সম্ভূত বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ লাহিড়ীকে কোন-না-কোন অজুহাতে বিদায় করা হয়েছিল। আর ডাঃ পি সি চক্রবর্তী মহাশয়কে তো রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলেই পাঠান হয়েছিল। এই সব প্রতিভাবশী নামকরা অধ্যাপকদের অবস্থা দেখেই আরও অনেকেই 'চাচা, আপন-প্রাণ বাঁচা'-নীতি অনুসরণ করে ক্রমশ কেটে পড়েছেন।”

পাকিস্তানের হিন্দু ছাত্রদের উপর

সরকারের হিন্দু-সম্পর্কিত নীতির প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে। ছাত্ররা দেখছেন যে তাঁরা লেখাপড়া শিখেও সবকানী বা আধ-সরকারী কোন বিভাগেই তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুযোগ বা চাকরির স্থায়ী মিলবে না; সুতরাং তাঁরাও কলেজ-শিক্ষার আওতা অসার প্রাক্কালেই পাড়ি-স্থান ছেড়ে ভরতে চলে যাবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখেই মুসলিম লীগ সরকারের আমলেই রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের 'বিলটি' বিধানসভায় এসেছিল, তখন আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রস্তাব তুলেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, গভর্নর হতে পারবেন না; কারণ, গভর্নর সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার উপদেশ মতই কাজ করতে বাধ্য। মন্ত্রিসভা কোন-না-কোন রাজনীতিক দল দিয়েই গঠিত; সুতরাং তাঁরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করেই গভর্নরকে উপদেশ দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুগ্ধ রাখতে হলে আমার মতে, গভর্নরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বাইরে রাখা দরকার। আমার সে প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয় নি; বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতিমুগ্ধ হতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে এখানে বলতে চাই যে, ভারতে এসে দেখেছি এদিকেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যথেষ্ট রাজনীতিক প্রভাব পড়েছে। একদিন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পদার্থ-বিদ্যার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্বরদস্ত ইংরেজ শাসকদের কাছেও নতি স্বীকার করেন নি, আজ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অবস্থা দেখলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

যাক, বাংলাদেশে হিন্দুরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায় থেকে অনেকটাই অগ্রসর ছিলেন এবং শিক্ষার জন্য তাঁদের অনেকের দানেই বাংলার অনেক কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও হিন্দুই ছিলেন বেশি। এখন কিন্তু পাকিস্তানে ঢাকা উল্টা দিকে ঘুরেছে। কোন-না-কোন অজুহাতে সুযোগ পেলেই হিন্দু শিক্ষকদের সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে উপযুক্ততার মানে অনেক খাটো মুসলমানকেও উপরের চাপে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা বিভাগের কথা মোটামুটি বললেম। এইবার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানবো কথা কিছুটা বলা দরকার মনে করি। আমি পাকিস্তানে থাকাকালেই দেখে এসেছি যে হিন্দু-পরিচালিত বে-সরকারী ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা প্রভৃতিতে শতকরা হারে একটা সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়ে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে

এ সংখ্যায় ‘পাকিস্তানী মুসলমান’ নিয়োগ করতে হবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ‘পাকিস্তানী’ হলে চলবে না—‘পাকিস্তানী মুসলমান’ হতে হবে; সুতরাং সেক্ষেত্র কিছুর পাকিস্তানী হিন্দুকে বিদায় করতে হবে। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে সম্পাদিত নেহরু-লিয়ারকৃত চুক্তি, যাতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যে সমান অধিকারের স্বীকৃতি পায়, তারই রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে, তা দেখানোর জন্যই এত কথা বলতে হল। উপরে এতক্ষণ আমি যে সব উদাহরণগুলো তুলে ধরেছি, সেগুলোই কথায় কথায় এখনি একবার আমাদের প্রেমের বন্ধু শ্রীভূপেন্দ্র-কুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জৈনিক মন্ত্রী যা বলেছিলেন, সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সব বিষয়টি ভালভাবে বিচার করে দেখতে আমি সকলকে অনুরোধ জানাই। পাকিস্তানী মন্ত্রী মহাশয় ভূপেনবাবুকে যা বলেছিলেন, তা ভূপেনবাবুর উক্তি সহ আগেই বলেছি। তবে তার একটি অংশ সকলের সুবিধার জন্য আবারও বর্ণনা। ঐ অংশটি হচ্ছে,—“The minorities, particularly those of the middle classes can never prove friendly to Pakistan. Every means should, therefore, be sought to get rid of them.”^১ অর্থাৎ “সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—বিশেষত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘুরা কখনই পাকিস্তানের বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং যেন-তেন-প্রকারেই হোক তাদের সমাভেই হবে..” পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সেক্রেটারী-জেনারেল উভয়ে পবামর্শ করে এই নীতিরই ‘ছক’ সোঁতেন কেটে রেখেছিলেন। সেই ছকে পাকিস্তানেই আজও পাকিস্তান সরকার চলছেন; সেই জন্যই আজও পাকিস্তানী হিন্দুদের বাস্তবত্যাগী হয়ে ভারতে আসা বধ্য হয় নি বা ভারত-পাকিস্তানে বধ্যও গড়ে উঠতে পারে নি। আমরা যারা পাকিস্তানে ছিলাম তাঁরা জানি যে পাকিস্তান একটা নির্দিষ্ট ছক-কাটা নীতি নিয়ে চলছেন। সেই নীতির মধ্যেই আছে, ভারতের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাদ বাধিয়েই রাখা এবং ভারত, তাঁর সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে একটা এক ও অখণ্ড জাতি (nation) গড়ে তুলতে না পারেন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এই নীতির ফলেই আমরা শুনেছি যে লিয়ারকৃত আলি সাহেব তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের যে ইদেয় ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি বলেছিলেন যে “ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান আজ স্বাধীনতার মধ্যে তাঁদের পবিত্র ঈদ

উদ্‌যাপন করতে পারছেন না।” পাকিস্তানের নীতি বড় কিছু ভারত সরকার যে কোন নীতি নিয়ে চলছেন তাই ঠিক বৃত্তে পারি না। দেশ বিভাগের পরে যখন পূর্ববঙ্গে থেকে বহু সংখ্যক হিন্দুই বাস্তবত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, তখন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাঁর রাজ্যে কোনও বাস্তবত্যাগীর সমস্যা নেই। আবার দেখেছি পশ্চিম বাংলার গভর্নর শ্রীকাটজ্জ্ব তিন দিনের জন্য প্রমোদ-সফরে সরকারীভাবে ঢাকায় গিয়ে সেখান থেকে ফিরেই বলেছেন,—“সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে বেশ ভালভাবেই আছেন।” এই তথ্য তিনি কার কাছে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। আমরাও তখন ঢাকাতেই ছিলাম। তিনি আমাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে ভো মনেও পড়ে না—জানিও না। ভারত যদি প্রথম থেকেই একটা নীতি নির্ধারণ করে চলতেন, তাহলে ভারতের কতৃস্থানীয় সব নেতাই একই সুরে কথা বলতেন, যেমন বলেন পাকিস্তান সরকারের নেতারা। আজও আমরা দেখছি, ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এক-একজন ভিন্ন ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। পাকিস্তানে কিন্তু তা হয় নি—হতে পারে নি। দেশ বিভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরই মুসলিম লীগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কয়েদ-ই-আজম জিনাহ সাহেবের বাস্তববাদী নেতৃত্বে পাকিস্তান সরকার তাঁদের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেন। সেই নীতির উপর নির্ধারিত কর্মপন্থা আজও পাকিস্তান সরকার অনুসরণ করে চলছেন।

দেশ বিভাগ হল। মুসলিম লীগের দাবি ‘পাকিস্তান’ও হল; কিন্তু জিনাহ সাহেব যে ‘পাকিস্তান’ দাবি করেছিলেন, সেই ‘পাকিস্তান’ হল না। যে ‘পাকিস্তান’ হল, জিনাহ সাহেব তাকে বলেন, পোকান-খাওয়া কীটদন্ট (moth-eaten) পাকিস্তান! কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁকে সেই পোকান-খাওয়া পাকিস্তানই স্বীকার করে নিতে হল। তাই জিনাহ সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের নেতারা তখনই পাকিস্তানের জন্য ভবিষ্যৎ একটা নীতি ও কর্মপন্থা ঠিক করেন। তাঁরা ঠিক করেন, পাকিস্তান অজ্ঞানের সংগ্রাম শেষ হয় নি। সেই সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে; তবে সংগ্রামের পন্থাতির কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। সংগ্রামের পন্থাতি হিসাবেই তাঁরা ঠিক করেন, একটা স্বাধীন নীতি। সেই নীতির মূল কথা হল, একটা সুস্থ-সবল পাকিস্তান অর্জন করার সংগ্রাম একদিকে যেমন চালাবেন, অপর দিকে আবার বিপাকে বা বে-কার্যায় পড়লেই একটা চুক্তি সম্পাদন করে নতুন শক্তি

সংগ্রহের জন্য সাময়িকভাবে সংগ্রামের বিরতি ঘটতে হবে। সেই বিরতিতে সংগ্রামের শেষ হবে না। এই স্বাধীন নীতি, পাকিস্তানের জন্মের সাথে সাথেই পাকিস্তান সরকার ঠিক করেন। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পরেই ১৯৪৭ সালেরই ২২শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান সরকার-ই সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় লোকদের দ্বারা পাকিস্তানের অধীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে কাম্মীর আক্রমণ করার সুযোগ করে দেন। ঐ আক্রমণকারীদের যুদ্ধাস্ত্র ও বাসবাহন দিয়ে-ও পাকিস্তান সরকার সক্রিয় সাহায্য দান করেন। এই আক্রমণ উপলক্ষেই ভারত সরকারের সাথে আক্রমণ-করীদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে যখন আক্রমণকারীদের, তথা পাকিস্তানের অবস্থা ততান্ত কাহিল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ আর কয়েকদিন যুদ্ধ চললেই আক্রমণকারীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং কাম্মীর রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চল মৃত্ত হয়। তখন-ই পাকিস্তানের ‘মুদ্রাঙ্কিত’-রের চেষ্টায় একটা যুদ্ধবিরতি হয়। আজও সেই যুদ্ধ-বিরতিই আছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিচুক্তি বা যুদ্ধ-নয় চুক্তি হয়তো নেই-ই, পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে আবারও সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে কাম্মীর আক্রমণ করে পূর্বদিক হওয়ার মধ্যে আবারও তাসখন্দ-চুক্তি করেছেন। এই-চুক্তিও শান্তি স্থাপনের জন্য হয় নি। মাত্র একটু ‘দম’ নেওয়ার জন্যই হয়েছে।

পাকিস্তানের এই দুঃস্থ নীতির ফলেই ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে ভারত যখন তাঁর সৈন্য সমাবেশ করে প্রস্তুত, তখন অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়ারকৃত আলি খান নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটোছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর পদপ্রান্তে! ৮ই এপ্রিল রাই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা মিলে একটা চুক্তিতে সই-ও করলেন। সেই চুক্তি-ই হল দিল্লী-চুক্তি বা নেহরু-লিয়ারকৃত চুক্তি। এই চুক্তির মর্মাদাই বা কেমনভাবে রক্ষিত হয়েছে, তা-ই বলছি। দিল্লীর ঐ চুক্তিতে বা ‘সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা’ যদি আন্তরিকতার সাথে পাকিস্তান রূপায়ণ করতেন, তা হলে হয়তো পাক-ভারতের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু পাকিস্তানের স্থিরীকৃত নীতিই ছিল তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী; তাই তা হয় নি—হতে পারে নি। পাকিস্তান সরকার যে তা করতে চান নি, তার অকাটা প্রমাণ একটু পরেই তুলে ধরেছি। তবে, একথা আমি স্বীকার

সাপ্তাহিক বসুমতী

করি যে এই চুক্তি-সম্পাদনের পর কিছুদিন পর্যন্ত—প্রায় বছরমানেককাল চুক্তির ফলে কিছু কাজ হয়েছে। হঠাৎ বলেই আমি দেখছি যে ধর্মের হাট খানার দারোগার শাস্তি কিছুটা অস্তিত্ব হতে পেরেছিল। কিছু কিছু জবরদখল-করা ধর্ম ও বাড়িঘর এবং অন্যান্য ভূ-সম্পত্তিও জবরদখলকারী মুসলমানের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। নারীহরণের ১০।১২টি অভিযোগ আমার কাছে যা এসেছিল, তার অনেকগুলো সম্পর্কেই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজে তদন্ত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাতের ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমি যে রিপোর্ট দিই, তার কোন কোনক্ষেত্রে ফলও কিছু হয়েছিল। পৃথিবী থেকে তাহের-পুর যাওয়ার পথে একটি গ্রামে শ্রীঅম্বদা সরকারের মেরেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি নিজে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিই, তার ফলও কিছু হয়েছিল। রাজসাহী শহরের শ্রীশান্তি সেনের মেরেকেও অপহরণকারীর কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তাকে ফলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেম। সরদহের কাছে একটি চাই-মন্ডলের মেরের উপরও পার্শ্বিক অত্যাচার করা হয়। সেই মেঘোটির ক্ষত-বিক্ষত দেহ আমি দেখেছি। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনাটির বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিই এবং তিনি একটা মামলাও দাখল করেছিলেন। কিন্তু আবেদনকারী মেয়েটি গ্রামের লোকের ভয় দেখানোর ফলে পক্ষা পার হয়ে পশ্চিম বাংলার মুন্সিপুরে চলে আসে। এখন কোথায় আছে, জানি না। নারীহরণ সম্পর্কে তদন্ত করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে বলতে পারি যে, যখন নারীহরণ সম্পর্কে থানায় 'এজেন্ট' দেওয়া হয়, তখন তখনই যদি সেই অপহৃত নারীকে উদ্ধার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহলে হিন্দুর মনে আস্থা ফিরে আসতে পারে কিন্তু তা হয় নি। মাসের পর মাস যায়, অপহৃত নারীকে পুঁজি উদ্ধার করতে পারে না বা করে না। তারপরে যখন 'খাঁচার পাখী' সম্পূর্ণভাবে পোষ মেনে শেখান বুলি বলতে থাকে, তখন সে কোটে হাজির হয়ে বলে যে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম-কবুল করেছে! বাস, সেখানেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। ভাঙার সাংগঠনিকটেও দেখা যায় (!) যে নারীটি প্রাপ্তবয়স্ক। এই অবস্থাই পাকিস্তানে চলতে আমি দেখেছি। তবু আবারও বলি, চুক্তির ফলে প্রথমদিকে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এখানে গভীর দুঃখের সাথেই

একটা কথা জানাই যে আমাদের-ই সহ-কর্মী পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার একজন কংগ্রেসদলের 'ভূতপূর্ব' সদস্য ও মৈমনসিংহ জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য শ্রীসুধাংশু কুমার সাহা, একটি নারীহরণ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গুলীতে নিহত হন। আততায়ী ধরা পড়ে না। ঘটনাটি ঘটে আয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে। পাকিস্তানের দায়িত্বশীল হিন্দু নেতাদের এইসব বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সেখানে কাজ করতে হয়; অথচ, সে কথাটা ভারতের শাসনকর্তার অধীকৃত বন্ধুরা মোটেই একবারও ভেবে দেখেন বলে মনে হয় না। অজিত দত্তচৌধুরীর ব্যাপার ও অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে যে পাকিস্তানের হিন্দুরা 'ঘরেরও না, বাটেরও না' পাকিস্তানে তাঁরা সন্দেহভাজন ভারতের চর; আর ভারতে তাঁরা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। এই তো অবস্থা।

যাক, দিল্লী-চুক্তির আর একটি ধারার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। "খ" ধারার ৬নং উপ-ধারার বলা হয়েছিল যে বাস্তবত্যাগী যদি নিজ দেশে আর ফিরে না যায়; তাহলেও তার স্বাবর সম্পত্তির উপর তার স্বত্ব-স্বাধীন হারাবেন না। তিনি ইচ্ছামত তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় বা বদল করতে পারবেন। এই ধারাটিও যেমন মেনে চলা হয় নি, তেমনই মুসলিম লীগ সরকার-ই আইন করেছিলেন যে কোনও ব্যক্তি-ই দশ বিঘার বেশি জমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিনা আদেশে বিক্রি করতে পারবেন না। গোপন সাক্ষ্যে ছিল হিন্দুর বেলায় যেন এই আদেশ পরতপক্ষে না দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের তবু তো একটু চক্ষুলাঙ্কা ছিল, তাই এই আইন লোক-দেখান হিসাবে শৃঙ্খল হিন্দুর জন্যেই করেন নি। আইন ছিল সকলের জন্যেই কিন্তু গোপন সাক্ষ্যে শৃঙ্খল হিন্দুরই বেলায় এই আইন প্রযোজ্য হল। বর্তমানের আয়ুবী সরকারের সেই চক্ষুলাঙ্কাও নেই। তাঁরা সরাসরিই আইন তৈরিছেন যে কোন হিন্দুই তাঁর স্বাবর বা অস্বাবর কোন সম্পত্তিই বিক্রি করতে পারবেন না—করলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই আইনত দণ্ডনীয় হবে।

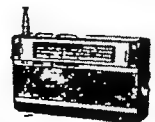
আগেই বলেছি যে দিল্লী-চুক্তির প্রথমদিকে কিছু কিছু কাজ হয়েছিল কিন্তু পরে আর তেমন কিছু হতে পারে নি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগপত্র উপস্থিত করলেই তিনি বলতেন—“এটা তো দেওয়ানী মামলার বা কোনটার সম্পর্কে বলতেন যে সেটা ফৌজদারী মামলার আওতার পড়ে; সুতরাং কোর্টে মামলা দায়ের করে যেন।” কোর্টের বিচার হয় সাক্ষীর উপর কিন্তু

হিন্দু মামলা করলে তার সাক্ষী দেবে কে? হিন্দু ভরে সাক্ষী দেবে না; আব মুসলমান, এমনিতেই দেবে না। সুতরাং অভিযোগকারী হিন্দু মামলাও করে না; হয় নিঃশব্দে সবকিছু সহ্য করে যায়, অথবা না পারলে দেশত্যাগ করে। এটাই হয়েছিল পাকিস্তানে হিন্দুর অবস্থা। এই অবস্থা দেখেই আমি এসেছি। এইটাই হওয়া শৃঙ্খলই স্বাভাবিক; কারণ, পাকিস্তানের সংগ্রাম তো শেষ হয় নি। পাকিস্তানের নেতাদের অভিরূচি অনুযায়ী স্বত্ব ও সবল 'পাকিস্তান' অর্জন করতেই হবে; তাই স্বত্ব ও স্বত্ববিবর্তিত তাঁদের নীতির-ই আধিকার। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিলের দিল্লী-চুক্তিতে স্থায়ী-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হয় নি—হয়েছিল একটা সাময়িক স্বত্ববিবর্তিত হিসাবেই। তার অকাটা প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পেয়েছি আয়ুব খান সাহেবের লেখা সত্য-প্রকাশিত তাঁরই জীবনীর তথ্যে। তিনি লিখেছেন—“In 1951 he (Ayub Khan) res-trained Mr. Liaquat Ali and other politicians and even members of the Army, who were itching for a fight with India (Statesman).” অর্থাৎ ১৯৫১ সালে তিনি (অর্থাৎ আয়ুব খান সাহেব) মিঃ লিয়াকত আলি খান ও কতিপয় রাজনীতিক নেতা এবং সৈন্যবাহিনীর লোকজনের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিবর্ত রাখেন। লিয়াকত আলি সাহেব, রাজনীতিক নেতারা ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা নাকি ১৯৫১ সালেই ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এক-পারে খাড়া হয়েছিলেন! এটা অসম্ভব নয়। গল্প না-ও হতে পারে। সকলে মনে রাখবেন যে এই লিয়াকত আলি সাহেবই ৮ই এপ্রিলের চুক্তি করার জন্য দিল্লীতে ছুটে গিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত, সকলে ভেবে দেখলেই পাকিস্তানের নীতির কথা সত্যক বুঝবেন।

[কম্বাঃ]

কিন্তুবন্দাতে ট্রানজিস্টার

২৫৫ টাকা মূল্যের ৩
ব্যাণ্ড অল-ওয়ান্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টার
“এসকট” মাসিক ২৫
টাকা কিন্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।



Japan Agencies (BW-77)
Post Box 1194, Delhi-6.

আমিথাক সেই শ্রমিক



স্বাক্ষর

গণেশ ও আমার থাকবার ব্যবস্থা সেই বাড়িতেই হল। জুলাই ও জুলাই আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। আমরা কার বাড়িতে এবং কার আশ্রয়ে ছিলাম তা আজ আর মনে নেই। মনে না থাকার কারণ হচ্ছে, আমরা সেই বাড়িতে বোধহয় দু'এক দিনের বেশি ছিলাম না এবং ষড়যন্ত্রমূলক কাজের রীতি অনুযায়ী সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ নিয়মবাহিত ছিল। আমরা এইটুকুই শব্দ জানতাম যে, জুলাইর সূত্রেই বাড়িটি আমাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে যোগাড় করা হয়েছে।

সেই রাতেই আমি গণেশের কাছে ফেণীর ঘটনার পর থেকে এই পর্যন্ত যে সংকটময় অবস্থা সে অতিক্রম করে এসেছে, তার প্রাথমিক বিবরণ শোনবার কৌতুহল প্রকাশ করলাম। কি করে ফেণীতে সে পুলিশের কবল থেকে মুক্তি পেল, আবার ঘটনাচক্রে অবাস্তব ঔপন্যাসিক কল্পনাকেও স্মান করে, কি ভাবে সে মাখন ও আনন্দের সঙ্গে মিলিত হল, আর কেমন করেই বা এই দু'বোটা মাথায় নিয়ে কোন পথে সে কলকাতা এসে পৌঁছালো এবং এলই যদি তবে সর্গো মাখন ও আনন্দই বা থাকলো না কেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানবার এত অদম্য আগ্রহ ছিল যে, সব না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকা মিলছিল না। বলা বাহুল্য আমার আদ্যোপান্ত ব্যস্তত গণেশকে বলছি আগেই।

গণেশের মধ্যে যখন তাদের কলকাতা আসার পথে বিভিন্ন ছোটখাটো ও অতি সংকটময় ঘটনার বর্ণনা শুনেছি, তখন এক একবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল—ভয়ে বা অত্যন্ত নয়, উৎকণ্ঠায়। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুদ্ধি ধরা পড় গেছে। কিন্তু তারা আশ্চর্যজনকভাবে

একটুর জন্য বেঁচে গেছে—প্রায় বন্দী হওয়ার মধ্যে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

মাখন ও আনন্দের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, তারা গাছতলার একটু বসেছে। অমানুষিক পরিশ্রম ও ক্রান্তির শেষে যে তারা নিশ্চিন্তে বেশ কিছুক্ষণ গাছতলার বসে কাটাবে তার উপায় ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সন্ধ্যা হবে, বড় রাস্তার ওপর লোক-চলচল শব্দ হবে। ফেণী স্টেশনের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে, স্ট্রোক রোডের ওপর, পুলিশ পাহারা দেবে না বা "আর্ততায়ী" অনুসন্ধানের ব্যাপৃত থাকবে না—এইরূপ ভাববার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কাজেই, ভোরের আগেই বড় রাস্তা বাদ দিয়ে, মাঠের অজানা যেটো পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করলো তারা।

১৮ই এপ্রিল, ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর সৈন্যদের একটি বিষয়ে সকলেরই নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। জালালাবাদ পাহাড়ে প্রধান বাহিনীর প্রত্যেককে, এবং ফেণী স্টেশনে সংঘর্ষের পর গণেশ ও আমাদের প্রত্যেককেই কোন-না-কোন সময়ে একটা বুদ্ধিগত নিদারুণ তুষ্কার জ্বালায় ছটফট করতে হয়েছে। জালালাবাদে বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ তুষ্কা নিবারণের জন্য গাছের পাতা ও ঘাস চিবিয়েছে এবং mobil oil খেয়েছে। ফেণী সংঘর্ষের পর আমিও লতাপাতা চিবিয়েছি, আর খেয়েছি আখ-খাওয়া পথে-ফেলা আম এবং পচা নর্দমার জল। গণেশও বলছিল, মাঝে মাঝে এমনও সময় এসেছে যে, তুষ্কার ঠোঁট, গলা ও বুক একেবারে শুকিয়ে গেছে। এক ফোঁটা জলের অভাবে হাত পা যেন একেবারে অবশ হয়ে আসছিল; মনে হয়েছে যে, আর বুদ্ধি হাটা যাবে না—মাঠেই পড়ে মরতে হবে। তুষ্কার জ্বালা যে কি ভীষণ ও কতখানি হতে পারে তা বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠিক বোঝা যাবে না। উপন্যাসে, ইতিহাসে, স্বপ্নক্ষেত্রের বর্ণনায় হয়ত আমরা সৈন্যদের জলের বিদ্রোহ ও পিপাসার

বন্দনার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা জানি। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এববার খিয়েটার মধ্যে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে সিরাজের জীবনরক্ষার জন্য শিহরণ জাগানো করণ সূত্রে আত্ননাদ করতে শুনেছিলাম—“কে আছ কোথায়, আমার সিরাজকে বাঁচাও! এক বিন্দু জল দিয়ে সিরাজের জীবন রক্ষা কর। এক বিন্দু জলের বিনিময়ে আমি বাংলার মনসদ তার হাতে তুলে দেব।” আমি খিয়েটারের এই অভিনয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁর সামান্য এক কণা জলের বদলে বাংলার মনসদ ছেড়ে দেবার অভিপ্রায়ে মনে খুব পীড়া অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সৌন্দর্য গণেশের কাছে বুদ্ধিগত তুষ্কার বাস্তব চিত্রটির কথা যখন শুনেছিলাম, তখন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও মনে হচ্ছিল নবাব আলিবর্দি খাঁর আত্ননাদ অভিনয় হলেও তার মধ্যে সত্য আছে।

প্রথম রৌদ্র মাথায় নিয়ে বিপ্লবী মাথারী পথ চলেছে। অনাহারে, অনিদ্রায়, পরিশ্রমে ও তুষ্কার বুক শুকিয়ে গেছে। পথ চলা কালে লতাপাতা বা ঘাস, সামনে বা পেয়েছে, চিবিয়ে শুষ্ক জিহবার তারা জল এনেছে। মাঠ বা পথের ধারে ছোট ছোট গর্তে জমা পচা পাতার দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা জল পান করতেও তারা স্বেচ্ছা বোধ করে নি। এভাবে বুদ্ধিগত পিপাসা ও ক্ষুধা নিয়ে রোদে পড়ে পথ চলতে চলতে তারা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। ক্ষুধা মেটতে অসমর্থ কিছু হলেও খাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু জগলে ও ফেণী পাহাড়ের রাস্তায় খাবার পাবে কোথায়? বড় রাস্তা ছাড়া দোকানপাট মিলবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অথচ প্রায় চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে বড় রাস্তায় খাবারের সম্ভানে যাওয়া একেবারে চিন্তার বাইরে।

এই এলাকায় ছোট ছোট টিলা বা পাহাড়ের মাঝে মাঝে বিন্তীর্ণ মাঠ। এখানকার বাসিন্দা বেশির ভাগই সাঁওতাল।

সাপ্তাহিক বসুমতী

ছোট ছোট কাপড় পরা খালি গায় তীর জনক হাতে সাঁওতালদের এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা গণেশদের চোখে পড়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় অমত্যা গণেশ একজন সাঁওতালকে ডেকে বলল—“দেখ ভাই, আমাদের বন্ধ ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে আমাদের?” এইরূপ প্রশ্নে সাঁওতালটি তার জীবনে বোধহয় প্রথম শুনল। সে ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করে গণেশরা কোথেকে আসছে জানতে চাইল। ইতিমধ্যে তাদের কথাবার্তা শুন্যে আরও চার-পাঁচজন সেখানে ভিড় করেছে। সকলেই নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল এবং তাদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হ'ল—ইতলে সন্দেহ বাড়তে পারে। ভাগ্যে ফেদী সংঘর্ষের বিবরণ তখনও এদের কানে পৌঁছয় নি। ঘুণাকরও যদি তারা সেই দুর্ঘটনার কথা জানতো, তাহলে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ হতো না।

না হোক, সাঁওতালটি সব কথা শুন্যে গণেশকে জানালো যে, যদি গণেশরা সাঁওতাল সর্দারের বাড়ি যায় তবে হয়ত সাঁওতাল ব্যবস্থা করে দিতে পারে। ক্ষুধার জ্বালায় নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গণেশ, মাখন ও আনন্দ সর্দারের বাড়ি যেতে রাজী হল। সাঁওতালটির সঙ্গে দু-চারজন গ্রামবাসীও সর্দারের বাড়ি এসে হাজির হয়েছে। সর্দারের বাড়ি একটি ছোট টিলার ওপর। গণেশদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাঁওতালটি সর্দারকে তাদের খাবার দেবার কথা জানাল।

সর্দারকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব কাঙ্ক্ষসম্পন্ন ব্যক্তি। সে যে খুব বিচক্ষণ তাতে সন্দেহ ছিল না। সর্দার পদলিখের মত জায়ের জেরা করছিল এবং ঘন ঘন সন্দেহের দৃষ্টিতে সকলের আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল। গণেশদের নিশ্চাস ফেলবার অবকাশ না দিয়ে তারা কোথেকে আসছে, কি করে, সেখানে তাদের কে ধরক অথবা কি প্ররোজনে তারা এল, কি জাত—ইত্যাদি নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে ফেললো। গণেশ হতদ্রু সম্ভব ব্যক্তি খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর সাঁওতাল সর্দার যে তার সব কথা বিশ্বাস করছে না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। সর্দার গণেশের কাছে কখন শুনল যে, তারা ধোপা, তখন কিছুতেই সে বিশ্বাস করলো না। মাখন ও আনন্দকে ধোপা বলে চালানো সত্যিই সহজসাধ্য নয়। ধপধপে ফসী রং সূর্যের চেহারা, কম বয়স—দেখার মাত্রই ফুলে-পড়া ভদ্রবরের ছেলে ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে নেওয়া মস্কিল। সর্দারও

ভাই বুঝছে। গণেশরা মিথ্যে বলছে বুঝে সে প্রশ্ন করল—“ওর গায়ে রক্তের দাগ কেন? তোমরা ধোপা নও—ডাকু আছ.....!” ধোপা না হতে পারি কিন্তু একেবারে ডাকু ভাবল কি করে?

গণেশ বৃদ্ধল অবস্থা বড়ই বেগতিক। সময়মত psychologically react করতে না পারলে অবস্থা হয়ত আরও ভয়ঙ্কর হয়ে চলে যাবে। কাজেই, সর্দারের অপমানসূচক নানা ভিত্তি কথা শোনবার পর স্বীয় মস্তিষ্কে খুব দুর্কভাবে সর্দারের বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্তকে একটু আঘাত দিয়ে বলল—“একি বলছ সর্দার? তোমার মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কি করে ভাবলে যে এই দু'টি বালক কখনও ডাকাতি করতে পারে। আমরা ধোপা তো বটেই, তবে এই খোকরা এখনও পড়ে। পাহাড়ে রাস্তার দায়িত্বে

পড়ে গিরে মাঝার চোট লেগেছে। তুমি সর্দার, জীবনে ভাল মন্দ বহু লোক দেখেছ—আমার বিশ্বাস তুমি লোক দেখলেই চিনতে পার। তুমি না হলে অন্য কেউ যদি আমাদের ডাকাত বলত, তাহলে আমাদের খুব রাগ হতো। কিন্তু তোমার মত লোকের মুখে ঐ কথা শুন্যে খুব দুঃখ পেয়েছি। তোমার মত বিজ্ঞ লোক কি কখনও ভাবতে পারে যে, এই ছোট ছোট ছেলেরা ডাকাত?”

ওখুঁ কাজে লাগলো। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সাঁওতাল সর্দার এককণে তার ভুল বুঝতে পারলো। তার কথার সুর বদলে গেল। সে খুব লজ্জিত হয়ে কমা চাইল। তারপর গণেশদের বসতে বসে আতিথ্য আপ্যায়নে তার ঘরের সব চাইতে উপাদেয় খাদ্য নিয়ে এল—খালসা করে অখেষ্ট পরিমাণে আসেখ চাউ ও এক ঘটি



আপনার কেশজঙ্ঘ দীর্ঘ সুন্দর করার
আপনাকে রূপ-লাবণ্য উজ্জ্বল করাবে

বেঙ্গল কেমিক্যালের
সুवासিত

তিল তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কমিকাতা • বোম্বাই • কলকাতা • দিল্লী



জল। ও বাবা! চাল চিবোতে হবে? অবশ্য তাতে ক্ষতি কিছু হয় না—এমন এমন সময় গেছে যখন কিছু কাঁচা চাল ও জল খেয়ে ডন কুস্তি করেছি। ক্ষিদের তখন পাকস্থলী চোঁ চোঁ করছে, সেই আসস্থে চাল ও ঘটি ভর্তি জলই তারা অমৃত মনে করে খেয়ে নিল।

ইতিমধ্যে সদার ও গ্রামবাসীরা গণেশদের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। খাওয়ার পর সদার তাদের বিগ্রাম করতে বলল। এরূপ পরিপ্রান্ত অবস্থার বিগ্রাম নিতে পারলে খুবই আরামের হোত, কিন্তু গণেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই স্থান পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। প্রত্যেকটি খানার সঙ্গে চৌকিদার দফাদার ও বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল ও সদারেরা বোগাযোগ রেখে চলে এবং তারা বৃটিশ রাজত্বের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে থানা-পুলিশকে সাধ্যমত সাহায্য করে। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান গণেশকে সেই স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। সুতরাং তারা সদার ও অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল।

মাঠ ভেঙে আবার হাটা শুরু হল। প্রায় মাইলখানেক হাটবার পর একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গাছের ছায়ায় তারা একটু বিশ্রামের জন্য বসলো। তাদের ইচ্ছে সুবর্ষ ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা আরম্ভ করবে।

ফেশ্বর পাহাড় জুগলে ও মাঠে মাঠে হাটলে চলবে না, যে কোন মতে হোক কলকাতা পৌঁছতেই হবে। কাজেই কোন স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা চাই। কিছু আগেই একটা ট্রেন গেছে। সেইজন্যে বোঝা গেল কাছেই কোন একটা স্টেশন নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যেকেই নিদারুণ পরিপ্রান্ত ছিল এবং দিনের বেলা হেঁটে স্টেশনে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় পথান্ত প্রায় দু-তিন ঘণ্টা তারা সেখানেই বিশ্রাম করেছে। তারপর ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে ট্রেনের শব্দ লক্ষ্য করে মাঠ ধরে সোজা পথে স্টেশন পাওয়ার আশায় আবার হাটা শুরু করল। স্টেশনের কাছে বাজার হাট বা কিছু দোকানপাট থাকার সম্ভাবনা বলেই তারা আশা করেছিল সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার কোন-না-কোন বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করা যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্ভো হয়ে গেল। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। সামনে একটা গেরস্ত বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল। সেখানে সেই গ্রাম ও পাশের গ্রামের লোকেরাও জড়ো হয়ে আসর জমিয়েছে। গণেশ ভাবলো, কীর্তন যখন হচ্ছে, তখন

প্রসাদ হিসেবে চাইলে অন্তত বাতাসা ও জল তো পাওয়া যাবে! কীর্তন শেষ হতে যদি দেরিও হয় তবে সেখানে কাউকে অনুরোধ জানাবে একটু প্রসাদ ও জল দিতে। কীর্তনের আবহাওয়ার ধর্মপ্রাপ ব্যক্তিরা হয়ত তাদের সেইরূপ সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করবে না! এই আশা নিয়ে তারা তিনজন সোজা কীর্তনের আসরে উপস্থিত হল। সেখানে যাওয়া মাত্রই তাদের প্রতি গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একজন উৎসাহী ব্যক্তি ছুটে এসে তাঁদের প্রশ্ন করলো—“তোমরা কারা?” গণেশ বলল—“আমরা পাশের গ্রামে থাকি।” লোকটি গণেশের কথা অবিশ্বাস করে অভদ্র ভাষায় বলল—“পাশের গ্রামের সব লোকদেরই আমরা চিনি। তোমাদের তো সেখানে কখনও দেখি নি! তোমরা মিথ্যা বলছ। কে তোমরা?”

গণেশ বললো এখানে নরম হলে চলবে না। তাই সেও মেজাজ দেখিয়ে বলল—“দেখুন, আমরা আপনার এই ধরনের কথা শুনতে রাজী নই। আপনি যদি আমাদের কোনদিন নাও দেখে থাকেন, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই।” গ্রামবাসীরা সংখ্যায় বহু। গণেশের কথা শুনে তারা নিরস্ত হল না। তাদের সামনেই নানাভাবে সন্দেহ প্রকাশ করলো এবং মাঝে মাঝে অভদ্র ভাষায় কথাও শোনাল। কয়েকজন আবার গণেশের কর্কশ কথার প্রতিবাদ জানায় এবং তাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করে—“আপনি যত বড় গলার বলুন না কেন, আপনারা পাশের গ্রামে থাকেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না.....!” অপর একজন যুবক গণেশদের উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে—“আপনাদের বাড়ি যখন পাশের গ্রামে, নিশ্চয়ই দিক চিনতে জুল হবে না—আচ্চা, শুনুন তদা উত্তর কোন দিকে?”

এ কি ব্যামো! তাদের কাছে প্রমাণ দিতে হবে—পাশের গ্রামে থাকে বলে উত্তর কোন দিকে? যুবকের ভীক। প্রশ্নে গ্রামবাসীরা সকলেই খুব উত্তেজিত—এবার ধরা পড়ে যাবে তারা মিথ্যা বলছে। সমানে প্রশ্ন চললো—“বলুন না মশাই, চুপ করে আছেন কেন? পাশের গ্রামে বাড়ি, উত্তর দিক ঠিক করতে পারছেন না.....?” এই প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ার কারণ নেই—হয় মূখ্য বলতে হবে, নয়ত দেখাতে হবে উত্তর দিক কোনটি। এই সময় আনন্দ বালকসুলভ বুদ্ধি খাড়িয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুড়লো। সে বললো—“বা রে! আপনারা তো বেশ লোক—এ দেখুন উত্তর দিক।” সকলে একসঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠলো। আনন্দের ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। গ্রাম-

বাসী সুযোগ পেয়ে ঠাট্টা, অসংলগ্ন কথা ও নানাপ্রকার বিদ্বেষ করতে ছাড়ল না। শব্দ ঠাট্টা বিদ্বেষ করেই যদি লোকেরা ক্ষান্ত হোত তাহলে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাদের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে! কাজেই, কোন যুক্তিতর্ক বা বোকাবার চেষ্টা নয়, কোনমতে পালানোই প্রের।

পালাতে হলেও মানানসই একটা অজুহাত তো চাই! নিমেষের মধ্যে গণেশ আরও রাগভাব দেখিয়ে বলল—“ছোট ছেলে দিক নির্ণয়ে ভুল করেছে, তা বলে এত হাসি ঠাট্টারই বা কি আছে? এরকম অভদ্র ব্যবহার কেন করছেন? আমি একদুটি খানায় ডায়েরী করব। আর, চল, আমরা যাই।” এই বলে রাগে গরগর করতে করতে আনন্দ ও মাখনকে ডেকে দ্রুতপদে গণেশ হাটতে লাগলো। ভাবখানা এমন, যেন সত্যিই খানায় রিপোর্ট না করে ছাড়বে না।

স্থানীয় লোকদের অত বোকা ভাবতে চলবে কেন? পেছন থেকে একজন চোঁচিয়ে বলল—“ও কর্তা! রাগ কইরা যান কৈ? ‘উত্তর পান’ এঁ মূহে না—এই পানে।” গণেশ কিছুই যেন শুনতে পায় নি—চোখ কান বন্ধ করে ছুটলো। এই ঘটনার অবশ্য এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। ভাগ্যে সেখানে কেউ তেমন জবরদস্ত লোক ছিল না।

অন্ধকারে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা মোটো পথে মিশে গেল। প্রায় মাইল দুয়েক পথ অতিক্রম করার পর তারা রেল স্টেশনের কাছাকাছি এসেছে। স্টেশনের কাছে একটা ছোট বাজারও আছে। বাজারে যদি কিছু খাবারের চেষ্টা করা যায় তবে হয়ত এই অভূত অবস্থায় কিছু আহাৰ মিলেও যেতে পারে। কিন্তু স্টেশনে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক নানা উদ্দেশ্যে ঘুরছে—কার মনে কি সন্দেহ হবে কে জানে! বাজারে ও স্টেশনে পুলিশের সামনে পড়বারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভয় ভাবনা মাথায় নিয়েই পথ চলা শুরু হয়েছে—মাঝপথে থেমে যাওয়া গণেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যতই আশঙ্কা থাকুক না কেন এগোতেই হবে। আদ্যোপান্ত সব ভেবে তারা স্থির করে যে শিলং ঘুরে তারপর কলকাতা যাবে। আনন্দের হাসীমা শিলং-এ থাকতেন। তিনি গভর্নমেন্টের শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ নারী কর্মচারী—District Inspectress of Schools.

প্রায় স্থির করে ফেলবার পর অনেক কাজ—খাওয়া-দাওয়া সারা, টিকেট কাটা, ট্রেনে চাপা ইত্যাদি। টিকেট কিনতে আবার স্টেশনে যেতে হবে! ঘরপোড়া

সাপ্তাহিক বসুমতী

গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। এবারে তাই আরও সাবধানতার সঙ্গে আট-ছোট বেঁধে তবে টিকেট কিনতে যেতে হবে।

জামাকাপড়ের যা অবস্থা তাদের, তার ওপর অনাহারে ও অনিদ্রায় রোদে ঘুরে ঘুরে চেহারা যা হয়েছে তাতে কোনমতে পুলিশের সামনে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। তাই তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল পোষাক বদলে একটু ভদ্রস্ব হওয়া। মধ্য প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা বেজেছে। অশ্বকরে গ্রামের বাজার ও স্টেশনের আশে-পাশে পথ চলায় খুব অসুবিধে ছিল না কিন্তু আনন্দ ও মাখনকে সঙ্গে নেওয়া গণেশ উচিত মনে করে নি। সে একাই একটা কাপড়ের দোকান থেকে তিন জোড়া লুঙ্গি ও তিনটি টুপি কিনে নিয়ে এল। মাখন ও আনন্দ সঙ্গে গেলো পোষাক কেনা হোত কিনা সন্দেহ তবে পুলিশ হাজতে যে যেতে হোত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাদের তিনজনকে এরূপ বিধবস্ত অবস্থায় লুঙ্গি ও টুপি কিনতে দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না যে তারা মুসলমান। মুসলমান কেবল সাজলেই হয় না—তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে না পারলে যে কোন মহুতের ধরা পড়বার সম্ভাবনা। যা হোক, তিনজনেই মুসলমান সোজা পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক করে নিয়েছে। চাল-চলনও সামান্য কিছু বদলাতে চেষ্টা করেছে। তবু মাখন ও আনন্দকে খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে গণেশ একাই টিকেট কাটতে স্টেশনে গেল।

ভালোম ভালোম টিকেট কেনা হ'ল। ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি ছিল। ইতিমধ্যে তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। স্টেশনের নাম বোধহয় দরিয়াগঞ্জ। ট্রেন রাতেই ছেড়েছে। পরের দিন সকালে তিনজনে আখাউড়া জংসনে পৌঁছাল। স্টেশনে পুলিশের তৎপরতা খুব বেড়েছে মনে হ'ল। ফেনীর ঘটনার পর 'চারজন আততায়ীকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের কাছে নির্দেশ গেছে। নোয়াখালির গ্যাজেট্টেট এক হাজার করে টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন আততায়ীদের বন্দী করার বিনিময়ে। তাই বড় বড় স্টেশনে ও জংসনে পুলিশ যাতে কড়া দৃষ্টি রাখা তার ব্যবস্থাও কতৃপক্ষ করেছে।

মাখন ও আনন্দ ট্রেনে জানালার ধারে বসেছিল। একজন কনস্টেবল আনন্দের পাশ দিয়ে কয়েকবার পায়চারী করার পর তাকে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে। আনন্দ যে মুসলমান তা' পুলিশ বিশ্বাস করতে চাইছিল না। সেই কনস্টেবল ডেকে আনলো হাবিলদারকে। হাবিলদার মাখনকেও জেরা করতে থাকে। মাখন ও আনন্দের সঙ্গে আর কে আছে—এই

খোঁজটাই তখন পুলিশের কাছে প্রধান মনে হয়েছিল। ফেনী স্টেশন থেকে চারজন আততায়ী উধাও হয়েছে। দু'জনকে তো পাওয়া গেছে। বিবরণ যা পুলিশের জানা আছে, তাতে আনন্দ ও মাখনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তারা মুসলমান বেশে আছে বলেই পুলিশদের হিসেব মিলছে না। বাকি আর দু'জনকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তারা মুসলমান কি না তখন পরখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের ধানায় যেতেও বাধ্য করবে পুলিশ। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সঙ্গে আরো দু'জন সেই ট্রেনেই কোথাও আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে মাখন ও আনন্দকে বার বার ঘমক দিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে—“আপনাদের সঙ্গে আর কে আছে বলুন?” গণেশ ওপরের Bunk-এ শুয়ে ছিল। তার সমস্ত শরীরে চিকেন-পল্ল দেখা দিয়েছে। তাই সে ট্রেন যাত্রীদের চোখের আড়ালে থাকবার চেষ্টা করছিল। চিকেন-পল্ল আক্রান্ত যাত্রীকে কতৃপক্ষ ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে বলে তৃতীয় শ্রেণীর Bunk কন্ট্রকর হলেও গণেশ সেইটিকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করেছিল। কিন্তু পুলিশের হুক-ডাক শুনে এবং উত্তেজিতভাবে মাখন ও আনন্দকে জেরা করতে দেখে Bunk-এর ওপর থেকেই পুলিশদের একটু ঘমকে গণেশ বলল—“আপনারা পেরেছেন কি? কেন ছোট ছেলেদের এভাবে জ্বালাতন করছেন? ওরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আপনারা যাত্রীদের অবস্থা হয়রান করবেন না।” পুলিশেরা কামরায় ঢুকলো। তারা গণেশকে দেখলো এবং তার সঙ্গে দু'-চারটা কথা বলে তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই—তারা মাত্র তিনজন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে হাবিলদার সাহেব ট্রেন থেকে নেমে গেল। সে ধরেই নিল যে এরা 'আততায়ী' হতেই পারে না—আততায়ীরা যে চারজন।

ট্রেন ছাড়তে আরো কিছু দেরি আছে। এই বিদ্রোহের পর গণেশ উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখলো যে কলকাতা পৌঁছতে আরও অনেকটা পথ। এর মধ্যে এই প্রকার বিদ্রোহ, বাধা, বিপত্তি ও অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। সবক্ষেত্রে হয়ত পরিণামও পাওয়া যাবে না। এইজন্য গণেশের মনে হয়েছে, আনন্দ ও মাখনের সঙ্গে রিভলভার না রাখাই যুক্তিসঙ্গত হবে। গণেশ একাই সব কণ্ঠি রিভলভার তার নিজস্ব দুর্দৃষ্টি ও তাদের তিনটি রিভলভার, নিজের সঙ্গে রাখবে স্থির করল। কোনক্ষেত্রে যদি আনন্দ ও মাখনকে সন্দেহবশে বন্দীও করে তবু সঙ্গে অস্ত্র পাওয়া না গেলে তাদের ছেড়ে দেবার প্রশ্ন আসবে। এইসব ভেবে গণেশ আনন্দ ও মাখনকে তার প্রস্তাবটি দিল।

স্বাভাবিক নিয়মেই তারা প্রথমে গণেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। বিপ্লবী যুবক তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব পরিত্যাগ করেছে কিন্তু তাই বলে প্রাণের চেয়েও প্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রকে বিদায় দিতে কোনমতেই সম্মত হল না। গণেশ তখন নিরুপায় হয়ে বলল—“দেখ, আমি আদেশ করছি উপস্থিত তোমরা তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্র আমাকে দাও। কোনমতে নিরাপদে এক-বার কলকাতায় পৌঁছলে তোমাদের রিভলভারের অভাব হবে না। এখন যদি ধরা পড়ি আমাদের কাউকেই পুলিশ ছাড়বে না। সেইক্ষেত্রে আমি চাই সর্বাক্ষয় আমার ওপর দিয়ে থাক এবং অন্তত তোমরা নিরাপদে কলকাতা পৌঁছে আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ কবে যাও। যুব-বিদ্রোহের আগুন এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র বৈপ্লবিক অ্যাকশনের মারফত জ্বইয়ে রাখতে হবে। তাই আশা করি আমার সিদ্ধান্ত তোমরা মেনে নেবে।”

মাখন ও আনন্দ গণেশের 'আদেশ' মেনে নিল। সবসম্মত পিচিটা রিভলভার ও প্রচুর কাঁচুজ জামা-কাপড়ের ছোট্ট একটা পেটিলার মধ্যে গণেশ বেঁধে নিল। তখন পর্যন্ত তারা একই ট্রেনের যাত্রী। বদরপুর জংসনে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ থামে। স্থির হল, সেখানে রেল-কোয়ার্টারে গণেশের এক আত্মীয় থাকেন, তাঁর কাছ থেকে গণেশ কিছু টাকা নেবে। তারপর মাখন ও আনন্দ শিলং ঘুরে কলকাতা যাবে এবং গণেশ অন্য পথে বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ করবে।

বিকেলের দিকে বদরপুরে ট্রেন পৌঁছলো। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে তারাও খুব দ্রুত নেমে পড়লো। গণেশের আত্মীয়ের কোয়ার্টার খুব দূরে না হলেও অন্তত মিনিট পনেরোর পথ। তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসতে হবে। কাজেই তার বদরপুর জংসনের রেল-লাইন আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে short cut পথে কোয়ার্টারে যাচ্ছিল।

হায় রে ! যেখানে বাবের ভয় সেখানেই সম্ভ্য হয়। চাঁৎকার কানে এল—“Halt! ম্যাগাজিন রাইফেল সঙ্গীন আঁটা একজন Railway Battalion-এর ইংরেজ অফিসার দশ-বারোজন ভারতীয় সৈন্য সঙ্গে নিয়ে কিছু পাহারা দিচ্ছিল অথবা কোন বিশেষ নির্দেশ মত হয়ত 'আততায়ীদের' অনুসন্ধান ব্যাপ্ত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে কেউ আবার চোঁচিয়ে বলল—“কোন দায়? কাঁহা বাতা? ইয়ার আও?” সেপাইরা High-post-এ বাইফেড উঁচিয়ে ধরেছে। স্থির দৃষ্টিতে ত্রা তাকিয়ে আছে—পালাবার কোন উপায় নেই। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ছুঁড়বে—বারোটা রাইফেল প্রস্তুত। বাহ

সাপ্তাহিক বসুমতী

হয়ে তিনজনই সৈন্যদের হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল। স্বতন্ত্র স্বাস ততক্ষণ আশ! তাই তারা ভেবেছে কথামত কাছে গেলে যদি সাধারণ লোক ভেবে নিশ্চুতি বের তাহলেই বাঁচোরা। সৈন্যদের নেতা—সাহেবটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। গোঁফ ছিল। ছোট গোঁফ বটে তবু এমনভাবে সাহেব তাঁর গোঁফে তা দিবে রেখেছেন যেন সবাইকে তিনি চ্যালেঞ্জ কবছেন। গণেশ বলেছিল, ইংরেজ সৈনিকপুরুষের চোখ দুটি বাঘের মত জ্বলছিল। সাহেব যে পবিমাণ ঔষ্ণ্য নিয়ে ও দৃষ্ট ভাঙ্গতে সেখানে দাঁড়িয়ে, ঠিক সেই পবিমাণে নম্র, বিনয়ী ও সবল তিনজন নিরীহ যাত্রী তাদের উদ্ভূত সঙ্গীনের মূখে এসে দাঁড়াল।

সাহেব ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। বিচক্ষণ ইংরেজ অফিসার স্বয়ং প্রশ্ন কবলেন—“কাঁহা যাতা?” গণেশ “হৃৎকণাৎ উত্তর দিল—“মামাবাড়ি, Uncl & house Sir!” এই উত্তর দিতে দিতে হাতেব তালু কপালে ঠেকিয়ে সাহেবকে সেলাম করেই গণেশ সটান মাটিতে বসে পড়ল।

সাহেব—“উধাবসে কিউ যাতা?”

গণেশ—“Short cut Sir!”

সাহেব—“Suit-case কাঁহা?”

গণেশ—“Poor man Sir, no suit-case!”

সাহেব—“উস্মে ক্যা হায়?”

গণেশের সঙ্গে সেই “কাপড়ের পোটলাটি”—র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাহেবেব এই প্রশ্ন এল এতক্ষণে। প্রথম থেকেই গণেশ এই ভয় করে এসেছে—এই বুদ্ধি “পোটলাটি” search করবে। পোটলার দিকে লক্ষ্য করে যখন প্রশ্ন করেছে এবং সুদক্ষ ইংরেজ সৈনিকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন পোটলা ও তার অধিকারীর অন্ততল পর্যন্ত সব দেখে ফেলেছে, তখন কি আর নিস্তাবে আছে? অপেক্ষা না করেই গণেশ মূহুর্তে তার “কাপড়ের পোটলাটি” নিজের পাশ থেকে সামনে টেনে এনে সাহেবকে খুলে দেখাবার ভান করে বলল—“See Sir, cloth Sir, আর কুছ নাই স্যার!”

সাহেব—“আচ্ছা ঠিক হায়—চলে যাও।”

বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ সৈনিক “সাধারণ, নিরীহ, গরীব যাত্রীদের” চিনতে ভুল করেন নি। তিনি একে-বাবে নিঃসন্দেহ হয়ে দুঃস্থ যাত্রীদের পোটলা খুলে হররানি না করে মৃদু দিলেন। সাহেবের অপরিচয় দয়া! সাহেবের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে যদি কেউ নারাজ হন তবু তাঁর অসীম দয়া ভুললে চলবে না—পোটলা পরীক্ষা না করেই যাত্রীদের চলে যেতে বসেছেন। হায় রে সাহেব! যাদের খোজে তুমি অতন্দ্র

প্রহরী হয়ে বসে আছ, তারাই যে তোমার আশ্রিতা দিয়ে চলে গেল! সাহেবের জ্ঞানবার বোধ হয় সন্ধ্যোগ হয় নি যে, ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনী চট্টগ্রাম শাখার ফিল্ড মার্শাল তাবই উদ্ভূত ও উদাত্ত সঙ্গীনের মুখ থেকে এই মাত্র পালিয়ে গেল—তাদের তিনজনকে ধবতে পাবলে তিনি অনেক টাকা পুরস্কারও পেতেন!

এই ঘটনা একটুও অতিরঞ্জিত বা সাল্লানো নয়। মাখন ও আনন্দের কাছে এই বিবরণ আমি আরও বিশদভাবে শুনেছিলাম। সৈন্যদের সামনে দাঁড়াবার সময় তারা কি ভীষণ উৎকণ্ঠায় ছিল, তা ঘটনার বিবরণ দেবার সময় আমাকে তারা বলেছে। আরও বলেছিল—“সাহেব গণেশদাকে পোটলা লক্ষ্য করে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল—‘উস্মে ক্যা হায়’—তখন আমাদের বুক দুব-দুব করছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল—মনে হচ্ছিল, আব বুদ্ধি রক্ষা নেই। তারপর গণেশদার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহজ সরল যাত্রীর অভিনয় যখন ইংরেজ সৈনিককে বোকা বানালো তখন আমাদের যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা’ আর কি বলবো ...।’ কত যুগ পবে, এই সামান্য একটি ঘটনার বিবরণ লিখতে গিয়ে আজ আমারও খুব ভাল লাগছে। কি জানি কেন মনে প্রশ্ন উঠছে—আমি হলে কি পাবতাম?

একটি দুরন্ত অভিযান—



আধুনিক গণতন্ত্র ও জন স্টুয়ার্ট মিল

অজোককুমার
মুখোপাধ্যায়

II ১ II

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্য-
দেশেই মোটামুটি ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন-
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আজকের দিনে
গণতন্ত্রের কথা বলার মধ্যে বৈশ্বিক কিছুই
নেই। অথচ এমন একদিন ছিল প্রাচীন
দেশেই যখন গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করার
অর্থ সমাজ সংক্রান্ত চিন্তাধারার মধ্যে
প্রগতির সূচনা করা। এ কথা খুবই
আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে মানবের
জাতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে গণ-
তন্ত্রের আদর্শ বহু প্রাচীন অথচ এর
আধুনিক রূপের আবিষ্কার সাম্প্রতিক
কালেই ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীসে বা ভারত-
দেশে, অথবা মধ্যযুগে কোন কোন ক্ষুদ্র
রাষ্ট্রে যে সকল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার
কথা জানা যায় তাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক
কালের পশ্চিমী গণতন্ত্রের পার্থক্য অনেক।
আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ, প্রশাসন এবং
সমস্যা কোন কিছুর সঙ্গেই প্রাচীন বা
মধ্যযুগের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার
মিল খুঁজে পাওয়া দুস্কর। দুই কালের
উৎপাদন ব্যবস্থা, জনসংখ্যা, সামাজিক
সংগঠন প্রভৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল
পার্থক্য থাকার ইহা খুবই স্বাভাবিক যে
তাদের ওপর নির্ভরশীল শাসন কাঠামো
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিরই হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে,
বিশেষ করে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটার
কিছদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে সামাজিক
ও অর্থনৈতিক শক্তির নেতৃত্ব ধীরে ধীরে
সমাজের একটি নতুন শক্তির হাতে চলে
যাচ্ছে। পূর্বোক্ত সামন্ত প্রভু ও অভিজাত
শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমশই দুর্বল
হয়ে পড়ছে। এরই ফলস্বরূপ আরম্ভ হয়
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই।
ইংলন্ডের লর্ড সভা ও কমন্স সভার মধ্যে
প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরবর্তী কালে কমন্স
সভাই বেশি শক্তিশালী হয়, কেন না প্রথমে
নতুন পুঁজিবাদের নেতৃত্ব ও আরো পরে
শ্রমিকশ্রেণী সমাজে প্রাধান্য পাওয়ার লর্ড
সভা ও তার সমর্থকদের পিছু হটতে হয়।
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তৎকালীন
ইংলন্ডের সমাজে রাষ্ট্রশক্তির এই গতি-
প্রকৃতির রূপ স্পষ্ট ধরা পড়ে। বৈশ্বাধিক ও

তার উপযোগবাদ এই রাজনৈতিক-সামাজিক
পরিবর্তনের পক্ষে এক জোরালো বক্তব্য
উপস্থিত করেন। আধুনিক গণতন্ত্রের
সাংগঠনিক নানান প্রশ্ন সাধারণে আলোচিত
হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের
সমাজব্যবস্থার গণতন্ত্রের আদর্শ স্পষ্ট
রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সে সময় যে সকল
চিন্তাবিদ এই আলোচনার বিশিষ্ট অংশ
গ্রহণ করে আধুনিক গণতন্ত্রের রূপায়ণে
যথেষ্ট সাহায্য করেন তাদের মধ্যে
নিঃসন্দেহে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন জন
স্টুয়ার্ট মিল।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃত গণতন্ত্রের
স্বরূপ, গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য
ইত্যাদি বিষয়ে মিলের সূচিন্তিত আলো-
চনা অনেক সময়েই গণতন্ত্রবাদী ব্যক্তি বা
দলমাতার কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে
বিবেচিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন-
ব্যবস্থার সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যাবলী
নিষে তিনি আলোচনা করেছেন এবং
সাথে সাথেই সেগুলি সমাধানের জন্য
নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সেই
যুগে সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
তার সুপারিশ খুবই জরুরী ছিল,
আবার অন্যান্য অনেক বিষয়ে তার
অনুমোদিত ব্যবস্থা চমকপ্রদ হলেও
ব্যবহারিকক্ষেত্রে গ্রহণীর বলে মনে হয়
নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিকাশের
প্রথম যুগে ইংলন্ডে জন স্টুয়ার্ট মিল
গণতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রধান প্রবক্তা হিসেবে
বিবেচিত হয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত
তার আলোচনাসমূহ ক্রাসিকাল পর্বায়-
ভূক্ত বলেই গণ্য হয়েছে। বর্তমান যুগে
যেখানেই সদ্যজাগ্রত মানব গণতন্ত্রের
আদর্শে নিজেদের সংগঠিত ও পরিচালিত
করবার জন্য বন্ধপরিকর সেখানেই মিল-
এর মূল্যবান আলোচনাসমূহ বিশেষভাবে
অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা আছে।
তার সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক-
রাজনৈতিক অবস্থা আজ আর কোথাও
খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং খুব
স্বাভাবিক কারণেই তার প্রদর্শিত পথ
চোখ বুজে অনুসরণ করার কথাও ওঠে
না। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে
বিশেষ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে তার মতামত
গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই প্রামা

দ্যাব করে এবং সেগুলি পুনর্বীর চিন্তা
করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

II ২ II

গণতান্ত্রিক আদর্শে গঠিত প্রা-
নিধিমূলক সরকারকে তিনি প্রশংসা
করেছেন, অথচ একই সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব
ব্যবস্থার একটি বিরাট ত্রুটি বা অসম্পূর্ণ-
তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-
ছেন। মিল-এর মতে গণতন্ত্রের লক্ষ্য
যদি সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে সংখ্যা-
গুরু প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে উহার বিকৃতি
ঘটে। কারণ ভোটদাতাদের সংখ্যাগুরু
অংশের পছন্দমত প্রতিনিধিগণই শাসন
ক্ষমতা ভোগ করেন না, তাহাদের মধ্যে
আবার বাঁহাঙ্গ সংখ্যাগুরু শাসন ক্ষমতা
শুধু তাহাদের হাতেই কুক্ষিগত হয়।
সুতরাং প্রতিনিধিমূলক সরকার গণ-
তন্ত্রের নীতি অনুসারে গঠিত হলেও এর
মধ্যে প্রতিটি মানবের, এমন কি অধি-
কাংশের মতামত পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়
না। এখানে মিল যে সমস্যার কথা
বলেছেন তা আজও রয়েছে। সংসদীয়
গণতন্ত্রের অধিকাংশ দেশেই এইভাবে
জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃতপক্ষে
ক্ষমতা ভোগ করে। এর প্রতিকার হিসেবে
মিল সংখ্যাগুরু শ্রেণীর জন্য সমান-
পািতক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার ওপর জোর
দিয়েছেন। তার মতে “যদি সকল সংখ্যা-
গুরু দল তাদের সংখ্যার অনুপাতে ভি-
নিধি প্রেরণ করিতে না পারে তবে তা
সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের
পরিবর্তে অসাম্য ও বিশেষ সুযোগ-
সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারে
পরিণত হয়।” মিল আবার দেখিয়েছেন
কিভাবে দলপ্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন দল
কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে
স্বল্প-পরিচিত অথবা সবচেয়ে কম
আপত্তিকর কোন প্রার্থীকে পছন্দ করা
ছাড়া ভোটদাতাদের আর কোন গতান্ত
থাকে না; ফলত তাদের প্রতিনিধিত্ব
মনোমত বা সঠিক হয় না। অনেকে এমন
কথাও বলেন যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক
সরকার লাভ করতে গেলে এটুকু মূল্য
দিতে হবে। কিন্তু এ-বস্তুত্বের যুক্তিকে

তিনি মানেন না, কেন না স্বাধীনতা জাতির অর্থ সংখ্যালঘুকে প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বোঝায় না, যার গণতন্ত্রের প্রধানতম নীতিই হল সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। এই সকল দিক বিবেচনা করে তিনি টমাস হোয়ার প্রস্তাবিত সমান্দ-পাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মোট ভোটদাতার সংখ্যাকে মোট আসন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেটাই হবে 'কোটা' অর্থাৎ নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভোটের সংখ্যা। ভোটদাতাগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবেন যার ফলে আর কাহারো ভোট নষ্ট হবে না। যদি কোন প্রার্থী ন্যূনতম ভোটসংখ্যা পেয়ে পূর্বেই নির্বাচিত হলে বাকি ভোট গণনা পছন্দের ক্ষমানুসারে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টিত হবে; এইভাবে সকল আসন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ভোট গণনা চলবে। শব্দে তার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বইটিতেই নয়, তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এবং সংসদ সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টের বক্তৃতায় তিনি অনেকবার এই মতবাদের স্বপক্ষে বলেছেন।

কিন্তু এই বিষয়ে জন শূর্যাট মিল-এর বক্তব্যের প্রতি অনেকের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তার প্রস্তাবিত সমান্দপাতিক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থা পরবর্তীকালের রাষ্ট্র-নীতিবিদগণ সমর্থন করেন নি। তার নিজের দেশ ইংল্যান্ডেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। বেঞ্জামিন ডিস্ট্রিক্টের মত শাসনতন্ত্র-বিশারদ এবং হ্যারল্ড ল্যাম্পিক ও হারমান ফাইনার-এর মত রাষ্ট্রনীতির পণ্ডিতগণ হোয়ার-প্রস্তাবিত ও মিল-সমর্থিত উপরোক্ত ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন মনে করেন নি। এঁদের প্রত্যেকেরই মত যে, এই ব্যবস্থার জটিলতা বাড়বে, একজন সদস্যবিধি নির্বাচন কেন্দ্রের সুফল নষ্ট হবে, গোষ্ঠী ও উপ-গোষ্ঠীর পারস্পরিক ঝেঁঝেঁমি অহেতুক বেড়ে যাবে এবং এই ব্যবস্থার বিভিন্ন দল বা উপদলের সম্মিলিত সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি থাকায় প্রশাসনের স্বাধীন ও কর্মক্ষমতা ক্ষয় হবে। তা ছাড়া একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সমান্দপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকলেই সকল সংখ্যালঘু দলই তাদের প্রতিনিধিত্ব পাবে। আর উপরোক্ত নির্বাচন পদ্ধতি নিঃসন্দেহেই এক জটিল যে আধুনিক বড় বড় রাষ্ট্রে সাধারণ ভোটদাতাগণ এর পদ্ধতিটাই বুদ্ধিতে পারবে না, এবং পারলেও সঠিক পছন্দ জানাতে পারবে না। এই সকল দিক বিবেচনা করে ইংল্যান্ড এবং প্রায় সব গণতান্ত্রিক

দেশই আইনসভার নির্বাচনে মিল-প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নি। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন ভারত-বর্ষে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে, বা স্কটল্যান্ডে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে এই প্রথা চলে। আয়ারল্যান্ডে আইনসভার নির্বাচন সমান্দপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ৩ ॥

প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়া নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার সম্বন্ধেও মিল মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তিনি একই সঙ্গে ভোটদানের অধিকারকে সম্প্রসারিত এবং সীমিত করতে চেয়েছেন। তিনি স্বাধীনতার ভোটাধিকারের পক্ষে ওকালতি করেছেন, আবার শিক্ষাগত গুণের ভিত্তিতে ভোটাধিকারকে সীমিত করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমটি আধুনিক গণতন্ত্রে স্বীকৃত হলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিল-এর মতবাদ আধুনিক যুগে গ্রহণ করা হয় নি। গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তার গভীর নিষ্ঠার জন্যই তিনি যুগেতে পারেন যে পূর্ণ বিকশিত এবং সুসভ্য জাতির মধ্যে কাউকেই অপারত্বের করে রাখা উচিত নয়। সাধারণভাবে তিনি ভোটাধিকারকে যতদূর সম্ভব সার্বিক করার পক্ষে এবং সেই সূত্রেই তিনি স্বাধীনতাকে এই মূল্যবান সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করতে চান। তিনি যে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা সম্পর্কে কতটা আগ্রহী ছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে তার নানান বক্তব্যের মধ্যে। ন্যায়নীতির প্রাথমিক বিচারের দিক থেকে তিনি স্বাধীনতার স্বাধীনতা দাবি করেন এবং স্বাধীনতার স্বাধীন সত্তাকে রক্ষা করার জন্যই তাদের ভোটাধিকারের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেন। তার মতে পুরুষদের মতই স্ত্রীলোকদেরও রাজনৈতিক অনায়াস ও অবিচারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ভোট দেওয়ার অধিকার একান্ত প্রয়োজন। মিল-এর এই মতবাদ আজ প্রায় প্রতিটি দেশে স্বীকৃত; শব্দে সুইজারল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের দু'একটি দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা হিসেবে তার যে কয়টি অবদানের উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে স্বাধীনতার অধিকারের স্বপক্ষে তার জোরালো বক্তব্য অন্যতম।

গণতন্ত্রকে দেশের সকল মানুষের জীবনে জীবন্ত, অন্তত অর্থবহ করে তুলতে হলে ভোটাধিকারকে সম্প্রসারিত করা উচিত। এ বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তা-বিদগণ একমত হলেও ভোটাধিকারের

যোগ্যতার প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের প্রাথমিক অধিকার (Natural Rights) সম্পর্কিত ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে এই ধৃষ্টিই সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের দাবিতে পরিণত হয়। যেহেতু জনগণই চূড়ান্তভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেইহেতু ভোট দেওয়ার ক্ষমতা জন্মগত অধিকার। পূর্বসূরীগণের এই সকল যুক্তি ছাড়াও মিল-এর মতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে রাজনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলার জন্যই প্রত্যেকের ভোটাধিকার থাকা উচিত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের যৌক্তিকতা ভোট দেওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমেই সমর্থিত হয়। এইভাবে মিল সার্বিক ভোটাধিকারের আদর্শকে সমর্থন করা সত্ত্বেও উহার প্রয়োগে তিনি কয়েকটি সতর্কতারোপ করতে চান। তাঁর মতে সার্বিক ভোটাধিকারের আগে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষাই ভোটাধিকারের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড এবং লেখাপড়া ও গাণিতিক হিসাবের প্রাথমিক শিক্ষাই যার নেই তাকে ভোটাধিকার দেওয়া অযৌক্তিক। তা ছাড়া সরকারকে কর বা খাজনা দেওয়ারকেও তিনি অপর একটি যোগ্যতা বলে মনে করেন, কেন না তাঁর মতে যারা কর দেয় না তাদের হাতে ক্ষমতা গেলে জনসাধারণের অর্থ অমিতব্যয়িতার সঙ্গে খরচ করা হবে।

ভোট দেওয়ার যোগ্যতার এই মাপকাঠি সম্বন্ধে মিল-এর বক্তব্য অনেকের সমালোচনার বস্তু হয়েছে এবং গণতন্ত্রের বিকাশে পরবর্তী যুগ এগুলিকে গ্রহণীয় বলে মনে করে নি। শব্দে মিল অক্ষরজ্ঞান বা প্রাথমিক শিক্ষা থাকলেই মানুষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ও নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে সক্ষম হয়ে ওঠে না। তার মিল-প্রস্তাবিত অর্শীকৃত ব্যক্তিমাটাই নিরেট বোকা এই ধারণাও অমূলক। অজ্ঞের পৃথিবীতে বিভিন্ন অনুরূপ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। ভারতবর্ষের মত দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্য এখনও অনেক কিছু করণীয় আছে, এদেশে অনেকেরই আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তবু সেই কারণেই যে ভারতীয় গণতন্ত্র দুর্বল তা নয়, তার দুর্বলতা অন্যদিকে। আর মিল-এর দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে বলা যায় যে, আধুনিক গণতন্ত্র কেন প্রকারের সম্পত্তি বা আয় সংক্রান্ত যোগ্যতাকে স্বীকার করে না। কারণ জনগণের সরকারকে

কোনমতেই বিস্তারিত কৃষিগত হতে দেওয়া উচিত নয়, তাতে গণতন্ত্রের বিকৃতি ও পরোক্ষভাবে অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া একথা মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে অনেক নাগরিক প্রত্যক্ষ কর না দিলেও প্রত্যেককেই পরোক্ষ কর কিছু না কিছু দিতেই হয়। সুতরাং মিল্-এর দৃষ্টি মেনে নিলেও আধুনিক গণতন্ত্রের নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, গণতন্ত্রে অশিক্ষিত স্বার্থান্বেষী গণগোষ্ঠীর শ্রেণী-স্বার্থের চাপে যাতে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত না হয় এবং তাদের শ্রেণী-স্বার্থে প্রণীত আইনের ফলে সমাজের শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান অংশের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য মিল্ ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত গুণের ভিত্তিতে শিক্ষিত ব্যক্তিকে একাধিক (plural) ভোটাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন স্তর না থাকার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যগত গুণের ভিত্তিতেই তিনি ব্যক্তিগত মানসিক সৌকর্যের মান নির্ধারণের এবং সেই অনুযায়ী একাধিক ভোট প্রয়োগের পক্ষপাতী। মিল্-এর এই মতকে অনেকেরই গণতন্ত্র-বিরোধী সম্প্রদায় শ্রেণীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসলে তিনি যে গণতন্ত্রের বিবোধিতা করার বদলে বরং তাকে সুদৃষ্টিভুক্ত করতেই চেয়েছেন তার প্রমাণ আছে। মিল্ একাধিক ভোট প্রয়োগের সুবিধাকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কবচ হিসেবে দেখেন নি, পরন্তু তাঁর মতে যখনই কেউ নিজের শিক্ষাগত গুণ দেখাতে পারবে তখনই সে একাধিক ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর একথাও তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা জগতের সুযোগ যাতে সকলে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কয়েকজনের একাধিক ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে যাতে সাধারণ ভোটাভাষার মিলিত শক্তিকে খর্ব করে নতুন কোন শ্রেণীস্বার্থ জন্মাতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সম্প্রদায় মালিকানা বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে বহু ভোটাধিকারের ব্যবস্থা কোনমতেই তিনি স্বীকার করেন নি।

মিল্-এর এই মতবাদে গণতন্ত্রকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্য তার চেষ্টা লক্ষণীয়। অবশ্য পরবর্তী কালে তার এই সুপারিশ গৃহীত হয় নি। ইংলন্ডে স্নাতকদের জন্য বিশেষ ভোটাধিকার ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শৃঙ্খলা নানা বিদ্যায় পারদর্শী

হওয়ার জন্যই একজন অপূর্ণতার চেয়ে বৌদ্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করবে এই ধারণা আধুনিক গণতন্ত্রের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী অচল।

১৪

গণতন্ত্রের আলোচনার মিল্-এর ভাবনা যে কতদূর নিবিড় তার পরিচয় পাওয়া যায় নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রতি-নিধি-নির্বাচক সম্পর্কের আলোচনার মধ্য। নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হবে, না পরোক্ষ হবে এবং ভোটদান গোপনে হবে, না সর্বসাধারণের সামনেই হবে—এ বিষয়ে মিল্-এর বক্তব্য আধুনিক গণতন্ত্র-বাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির তিনি দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেন। এই ব্যবস্থার ভোট-দাতাগণ প্রথম পর্বারে কয়েকজন মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন এবং ঐ মধ্যবর্তীগণ (intermediaries) দ্বিতীয় পর্বারে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং এই ব্যবস্থার প্রথম পর্বারের পরই ভোটদাতাগণ নিজদের কর্তব্য শেষ বলে মনে করেন এবং মধ্যবর্তীগণকে তাহাদের পক্ষ থেকে বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করবার সাধারণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ফলে পরোক্ষ নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে ভোটদাতাদের কোন হাত থাকে না। মিল্-এর মতে এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে ভোটদাতাদের মানসিক উদ্যোগ নষ্ট হয় এবং অপর দিকে জনগণের শক্তি ও রাজনৈতিক বুদ্ধির বিকাশ করা, সাধারণের ব্যাপারে জনগণকে আগ্রহী করে তোলা এবং সচেতনভাবে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করতে শেখান ইত্যাদি যে সকল উদ্দেশ্যে জনগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় সেগুলিও ব্যাহত হয়। এইভাবে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটদাতাদের দায়বোধ শূন্যতার পর্বেবসিত হয়। আর নীতির দিক দিয়েও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অযৌক্তিক; যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী নির্বাচককে নির্বাচিত করার যোগ্য তার চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে অপারগ হওয়ার কোন কারণ নেই। আবার দলপ্রথার দরুণ পর্বোক্ত নির্বাচন ব্যবহারিকক্ষেত্রে একটি অপপ্রয়োজনীয় বহিঃপ্রণেয় পরিণত হতে পারে। কারণ মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ প্রাথমিক ভোটদাতাদের কাছে তাদের দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। আর মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ সংখ্যায় অল্প হওয়ার প্রার্থীর পক্ষে তাদের দলীয় প্রার্থীর মাধ্যমে প্রভাবান্বিত করা সহজ। সুতরাং মিল্ বক্তব্যই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরোক্ষ নির্বাচনের যদি

কোন গুণ থাকে তবে তা প্রত্যক্ষ নির্বাচনেও পাওয়া যায়, উপরন্তু পর্বোক্ত পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে না থাকায় নির্বাচন সর্বদাই প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য আধুনিক গণতন্ত্র মিল্-এর সিদ্ধান্ত দ্বারা পুরোপুরিই মেনে নিয়েছে।

এরপর নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্নটি আলোচনা দাবি করে তা হচ্ছে ভোটদান গোপনে হবে, অথবা প্রকাশ্যে হবে। পরোক্ষ নির্বাচনের মতই গোপনে ভোটদেওয়ার ব্যবস্থাকে মিল্ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে ভোটদান একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এবং এই ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভোটদাতা অনেক ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। ভোট দেওয়ার ক্ষমতাকে তিনি ভোটদাতার ব্যক্তিগত "অধিকার" বলে স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে ভোটদান নাগরিকের একটি কর্তব্য বিশেষ এবং তার নিজস্ব বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী সর্বসাধারণের হিতার্থেই ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত। সুতরাং জনগণের স্বার্থসম্পর্কিত অন্যান্য কর্তব্যের মতন ভোটদানের কর্তব্য জনগণের সামনেই ও জনগণের সমালোচনার মুখেই সম্পাদন করা উচিত। এইভাবে মিল্ গোপনে ভোটদান ব্যবস্থার বদলে প্রকাশ্যে ভোটদান ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটদাতার ব্যক্তিগত স্বার্থের কলুষিত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা উচিত এবং সেটা সম্ভব হয় যদি অন্য সকলের চোখের সামনে ভোটদাতা তা মতামত প্রকাশ করে। এইভাবে গণতন্ত্রে শ্রেণীস্বার্থে আইনপ্রণয়নের দৃষ্টিকে কিছুটা দূর করা যেতে পারে বলে তিনি ধারণা।

কিন্তু জন স্ট্রাট মিল্-এর এই বক্তব্য পরবর্তীকালে কোন গণতান্ত্রিক দেশেই অনুসৃত হয় নি। কেন না প্রকাশ্যে ভোটদানের মাধ্যমে ভোটদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোন ভোটদাতাই প্রকাশ্যে মতামত প্রকাশ করে নিজের শত্রুসংখ্যা বাড়াতে কিম্বা জীবন বিপন্ন করতে রাজী হবে না; ফলে প্রকাশ্যে ভোটদানের ফলে প্রায়ই ভোটদাতার প্রকৃত মত বা ইচ্ছা প্রকাশ পাবে না। মিল্-এর জীবদ্দশাতেই (মৃত্যুর এক বছর আগে) তাঁর নিজের দেশ ইংলন্ডে গোপনে ভোটদানের পক্ষেই এই প্রবন্ধের মীমাংসা হয়ে যায় যখন প্যারিসের শান্তিচুক্তির প্রয়োজনীয় আইনটি গৃহীত হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিল্ তাঁর প্রজ্ঞাসুলভ আলোচনার মাধ্যমে

সাংগঠনিক বসুমতী

শাসনতান্ত্রিক নৈতিকতার প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি ও নির্বাচক ভোটদাতার মধ্যে সম্পর্ক কি ধরনের হওয়া উচিত—এই প্রশ্নের রাজনৈতিক দিক অপেক্ষা নৈতিক দিকটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিনিধি-গণের পক্ষে ভোটদাতাদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা উচিত কি-না এই প্রশ্নে মিল্-এর অভিমত সংঘত। তাঁর মতে প্রতিনিধি যদি পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে তবে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি আর কিছুই থাকে না। কিন্তু উন্নততর মানসিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভা যদি প্রতিনিধির মধ্যে আশা করা হয় তাহলে এই ধরনের গুরুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই যদি প্রতিনিধির কাছ থেকে পূর্বেই অঙ্গীকার আদায় করা হয় তবে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রতিনিধি পাওয়া খুবই মশকিল হবে। সুতরাং প্রতিনিধির অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার নীতিকে তিনি পছন্দ করেন না। অথচ সংগে সংগে একথাও বলেন যে মৌলিক নীতির প্রশ্নে যদি প্রতিনিধি ও নির্বাচকদের মধ্যে মতৈক্য না থাকে তবে অঙ্গীকার দাবি করাকে সমর্থন করা যেতে পারে। মিল্-এর এই মতের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ পাওয়া যায় ইংরেজ চিন্তাবিদ এডমান্ড বার্কের উক্তি। বার্কের মতে প্রতিনিধির আচরণকে ভোটদাতাদের চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা অযৌক্তিক এবং কোনমতেই তা কাম্য নয়; কারণ সংসদের সদস্যগণ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধির দায়িত্ব সংগে নিয়ে আসেন, তাঁরা কোনমতেই ভোটদাতাদের আজ্ঞাবহ প্রতিভূ মাত্র নন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য গণ-তান্ত্রিক দেশে অঙ্গীকার প্রদানের প্রথা অব্যাহত ও অযৌক্তিক বলে পরিত্যক্ত হয়। শ্রদ্ধা সহজারল্যান্ডের কোন কোন অংশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার (Recall) যে ব্যবস্থা আছে তাঁর মধ্যে অঙ্গীকার প্রদান ব্যবস্থার কিছু চিহ্ন চোখে পড়ে। অবশ্য অধ্যাপক ল্যাস্ক প্রমুখ চিন্তাবিদগণও গণ-নিরস্ত্রের আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করেছেন।

২৫

গণতন্ত্রের আলোচনায় মিল্-এর চিন্তাধারার অন্য আর একটি দিক আছে যেখানে রাষ্ট্রজীবনের কয়েকটি মৌলিক সাংগঠনিক প্রশ্ন গুরুত্বস্বাক্ষর করেছে। আইনসভায় স্থিতীয় কক্ষ থাকা উচিত কি-না, রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়োগ ও চাকুরির সর্তাবলী কি হওয়া উচিত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্থ কি ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উহার মূল্য কি, এমন কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও

উন্নততর শাসন কর্তৃপক্ষের সংগে উহার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মূল্যবান আলোচনা আধুনিক গণতন্ত্রের প্রশাসনিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

আইনসভায় স্থিতীয় কক্ষ ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু স্থি-পরিষদের ব্যবস্থার অন্যান্য সমর্থকগণের প্রদত্ত কারণ অপেক্ষা তাঁর কারণ ভিন্ন, অভিনব এবং মৌলিক। আইনসভা একটি পরিষদ নিয়ে গঠিত হলে ঐ সভা স্বেচ্ছাচারী হ'ল উঠবে, সুতরাং প্রথম পরিষদের স্বেচ্ছাচারকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই স্থিতীয় পরিষদ থাকা উচিত—লর্ড রাইসের এই যুক্তিকে মিল্ কোন মূল্যই দেন না। আবার প্রথম পরিষদে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে যদি আইন প্রণয়ন করা হয় তবে উহার পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাওয়া যায় স্থিতীয় কক্ষে আলোচনার মাধ্যমে—এই যুক্তির সারবত্তাও তিনি মানতে চান না, কেন না তিনি মনে করেন যদি প্রথম কক্ষের প্রস্তাবিত আইনের সকল দিক বিবেচনার সুযোগ ও সামর্থ্য না থাকে তবে বুঝতে হবে যে উহার সংগঠনেই গোলমাল আছে এবং শ্রদ্ধা সেই কারণেই স্থিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা কষ্টকর। স্থিতীয় কক্ষের পক্ষে তাঁর অভিনব যুক্তি হল যে কোন আইনসভাকে অবিভক্ত ক্ষমতা ভোগের দৃষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্যই স্থিতীয় কক্ষের প্রয়োজন; সেই একই কারণে রোমের শাসনব্যবস্থায় দু'জন 'কনসাল' নিয়োগের প্রথা ছিল। স্থিতীয়ত, তিনি মনে করেন, প্রথম কক্ষের প্রণেতাচার্য স্থিতীয় কক্ষের প্রণেতাচার্য থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত; প্রথম কক্ষে প্রণীত আইনের প্রণেতাস্বার্থকে সংযত করা ও প্রয়োজন হলে বাধা দেওয়ার জন্য স্থিতীয় কক্ষের মূল্যবান ভূমিকা আছে। তৃতীয়ত, তিনি এমন একটি স্থিতীয় কক্ষ পছন্দ করেন যেখানে অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ লাভবান হবেন। এই যুক্তিগুলির ভিত্তিতে স্থিতীয় কক্ষের গঠন সম্বন্ধেও মিল্ একাধিক প্রস্তাব করেছেন।

আধুনিক গণতন্ত্রে মিল্-প্রস্তাবিত উপায়ে স্থিতীয় কক্ষ সংগঠিত না হলেও স্থিতীয় কক্ষের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য মিল্-এর কাছে আধুনিক গণতন্ত্রের স্থান সুস্পষ্ট। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে “হাউস অব্ বিপ্রেজেন্টেটিভ্”—এর হাতে সকল ক্ষমতা তুলে না দিয়ে স্থিতীয় কক্ষ “সিনেট”—কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বৃটেনের লর্ড সভায় ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, প্রখ্যাত দার্শনিক বা অর্থনীতিবিদগণকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার মধ্যে মিল্-প্রস্তাবিত স্থিতীয় কক্ষের

সাংগঠনিক আদর্শ অনেকটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও স্থিতীয় কক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

আইনসভার পর স্বভাবতই রাষ্ট্রের প্রশাসন বিভাগ সংস্কারপন্থী জন স্টুয়ার্ট মিল্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রশাসনিক সংগঠনে তিনি বিষয়ানুযায়ী দায়িত্ব বণ্টনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে প্রশাসনকার্য এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত হয় অথচ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ হয় সব-চেহে বেশি। বেস্লামের মতন তিনিও প্রশাসনিক সংস্থা বা ‘বোর্ড’ গঠনের বিরোধী, কারণ উহা দায়িত্ব এড়াইবার উপায় মাত্র। অবশ্য সরকারের প্রয়োজনমত ‘পরামর্শদাতা’ নিয়োগে তাঁর কোন আপত্তি নেই। আধুনিক ইংল্যান্ড সরকারী প্রশাসনে মিল্-এর মত গৃহীত হয় নি। গত স্থিতীয় মহাযুদ্ধের পর শ্রমিক দলের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধানত সরকারী কাজকর্মে প্রশাসনিক সংস্থার ‘বোর্ড’ বা ‘কর্পোরেশন্স’ সাহায্য ক্রমশই বেশি করে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সরকারের দায়িত্ব বিনর্জন না দিয়েও কর্মক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়। ভারতবর্ষের মত উন্নতি-কাণ্ডী যে সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেখানে এই ধরনের প্রশাসনিক সংস্থার নীতি গৃহীত হয়েছে।

স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যক যে, আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় অবশ্য প্রয়োজনীয় মিল্-এর এই মত আজ সর্বজনস্বীকৃত। জনগণের স্বাধীন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়, সুতরাং সরকারী বিভাগের কার্য-পরিচালনায় মন্ত্রীদের ‘বিশেষজ্ঞ’ হওয়ার উপায় নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই। তাঁদের সাহায্য করার জন্যই স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকের সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইহা বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। জনগণের স্বাধীন নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা প্রশাসনের অনুপষদ এবং আইন প্রণয়নের বেশি আর কিছুতেই প্রশাসনে মাথা গলানো তার উচিত নয়—এই নীতিতে মিল্ ছিলেন দৃঢ়াবস্থাসী। নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকদের নির্বাচিত করার নীতিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। এই বিষয়ে মিল্-এর মত একরকম সঠিক বলেই মনে হয়। স্ল্যাডস্টোনের আমলেই এই নীতি স্বীকৃতি পায় ইংল্যান্ড। পরবর্তীকালে প্রতিটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশের শাসনব্যবস্থাতেই এই প্রশাসনিক নীতি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছে: এমন কি

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও অংশত এই নীতি
আজ স্বীকৃতিলাভ করেছে। ব্যক্তি-
স্বাভাব্যবাদের বিলোপ, সমষ্টিবাদ ও
কলাগরতী রাষ্ট্রের আদর্শ প্রসার, সমাজে
অর্থনৈতিক সংকটের বৃদ্ধি ও তার ফল-
স্বরূপ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি
কারণে প্রযোজনীয় সুবিস্তৃত আইন
প্রণয়ন করা কোন প্রতিনিধিসভার পক্ষেই
সম্ভব নয়। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে
আধুনিক গণতন্ত্রে প্রশাসন বিভাগকে
'অধস্তন আইন' অর্থাৎ মূল আইনের
নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় নিয়মকানুন ও
আদেশ নির্দেশ প্রণয়ন করার ভার
দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আইনসভার কতব্য
শুদ্ধ লক্ষ্য রাখা ষাতে প্রশাসন বিভাগ
আইনের নীতি লঙ্ঘন না করে, অথবা
অপিত ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ
না পায়। প্রতিনিধিসভার এই বিশেষ
দায়িত্বের প্রতিও মিল্ বহুপদেই
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। এ
বিষয়ে তাঁর সূচিন্তিত বক্তব্যের সারমর্ম
আধুনিক গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

এরপূর্বে বিচার বিভাগের সাংগঠনিক
বিষয়ে মিল্-এর বক্তব্য লক্ষণীয়। স্বাধীন
ও উন্নত বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা
ও উহার সম্ভাব্য নৈতিক সুফল সম্বন্ধে
তাঁর সূচিন্তিত বক্তব্য আজ সর্বজন-
স্বীকৃত। লর্ড রাইস, হেনরি সিজু-
উইক বা হ্যাবল্ড ল্যাম্বার্ড মত সকল
রাষ্ট্রনীতিবিদগণই স্বীকার করেন যে
সভ্য দেশে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা
ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা সামাজিক উন্নতি
বিচারের শ্রেয়তর মানদণ্ড আর কিছু
নেই। আবার সেই সংগে মিল্ স্মরণ
করিয়ে দিয়েছেন যে, নাগরিকদের নৈতিক
মূল্যবোধের ওপর ন্যায়বিচারের সাফল্য
অনেকটাই নির্ভর করে। সমাজের
মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে
ন্যায়বিচার প্রবর্তনের কাজে তাদের সাহায্য
গ্রহণ করার ওপরই নির্ভর করে বিচার-
ব্যবস্থা ভালো হবে না মন্দ হবে। সেইজন্য
মিল্ বিচারকগণের নিয়োগের গুণাবলী
ও সর্তাদি, বিচার ব্যবস্থার প্রশাসন
পদ্ধতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাক্ষ্য
গ্রহণের পদ্ধতি, অপরাধ নিরূপণের পদ্ধতি
প্রভৃতির ওপর জোর দিয়েছেন। জন-
সাধারণের ভোটে বিচারপতিগণকে নিযুক্ত
করার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।
বিচারপতির যোগ্যতা বিচারের ক্ষমতা
সাধারণ ভোটাভাওর থাকে না, এবং অপর-
দিকে বিচারপতিকে জনগণের মর্জির
ওপর নির্ভর করতে হলে তাঁর দ্বারা
ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। পরবর্তী-
কালে ল্যাম্বার্ড প্রায় একই সিদ্ধান্তে
আসেন। নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে
আধুনিক গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত মিল্-এর
মত অনুসরণ করেছে। প্রায় অধিকাংশ

গণতান্ত্রিক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রিসভার
পরামর্শ অনুসারে এবং প্রয়োজনবোধে
বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণের সংগে পরামর্শ করে
বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের
বিচারপতি নিয়োগে সিনেট সভার
অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আবার
জাপানের যুদ্ধোত্তর শাসনতন্ত্রে বিচারপতি-
গণকে মন্ত্রিসভা নিয়োগ করলেও দশ
বৎসর অন্তর জনগণ তাঁদের কার্যকলাপ
সমালোচনা করে দেখে এবং জনগণের
পছন্দ না হলে সেই বিচারপতিকে
পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বিচার
ব্যবস্থার অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে মিল্-এর
আলোচনা আধুনিক গণতন্ত্রে খুবই
মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়; বিশেষ করে
নাগরিকদের নৈতিকতার সাধারণ মানের
সংগে বিচার ব্যবস্থার সুনাম ও কর্মক্ষমতা
যে বহুলাংশে জড়িত এ কথা আজ
সর্বজনস্বীকৃত।

II 6 II

এইভাবে দেখা যায় যে আধুনিক
কালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে যে
সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তাদের
অনেকগুলিই মিল্-এর মনে বহুদিন
আগেই ধরা পড়েছিল। বেশ কিছু
বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা আধুনিক
গণতন্ত্রে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি বটে,
কিন্তু তবুও উনবিংশ শতকে উদারনীতির
রাজনীতিতে বিবাসী গণতান্ত্রিক আদর্শের
অন্যতম পথিকৃৎ জন স্টুয়ার্ট মিল্-এর
কাছে পরবর্তীকালের গণতন্ত্রের ও তার
নেতৃবৃন্দের ঋণ কিছু কম নয়। শিক্ষার
ভিত্তিতে একাধিক ভোটে দেওয়ার ক্ষমতা,
উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন প্রার্থীদের কাছ থেকে
অণুগীকার দাবি না করা, গণতন্ত্রে সংখ্যা-
গুরু অংশের সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারের কথা
বলা, আইনসভার বিতর্কিত পরিষদে অভিজ্ঞ
ও যোগ্য রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত ব্যক্তি-
দের প্রতিনিধিত্বের জন্য ওকালতি করা
এবং প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিতে ভোটাধি-
কারকে সীমিত করতে চাওয়া ইত্যাদি
মতাদর্শের দ্রুত অনেকেরই জন স্টুয়ার্ট
মিল্কে 'অভিজ্ঞাতভ্রষ্ট' আখ্যা দিয়েছেন;
কেউ কেউ তাঁকে 'পেলটোর অনুগামী'
আদর্শবাদী বলে বর্ণনা করেছেন। এসব
মতের মধ্যে সত্যের অংশ একেবারেই নেই
তা নয়, তবে এভাবে তাঁর রাজনৈতিক
দর্শনের মূল্যায়ন করলে তাঁর ওপর
অবিচার করা হবে। একথা ঠিক যে
মানসিক সৌকর্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন
ব্যক্তিকে তিনি প্রাথমিক করতেন এবং যতদূর
সম্ভব অশিক্ষিত সংখ্যাগুরু হাত থেকে
উন্নতমত্না সংখ্যালঘুর স্বার্থকে রক্ষা করার
ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার
যে চিরকালের জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক

সুযোগ-সুবিধা থেকে কাউকে তিনি বঞ্চিত
করতে চান নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার
মূল লক্ষ্য যদি সকলের জন্য সমান
সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে
সেই বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক আদর্শের পূজাবী
ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল্। অজ্ঞান,
অশিক্ষিত, অভাবগ্রস্ত, বিবেচনাহীন লোক
লক্ষ ভোটাভাওর বিপথে চালিত করে
রাজনৈতিক দলবাজির মাধ্যমে কতিপয়ের
স্বার্থসিদ্ধির যে দাবাখেলা গণতন্ত্রের
নামে সাংপ্রাতিক কালে নানান অনুরূপ
দেশে প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার
কথা মনে পড়লে মিল্-এর দৃষ্টান্ত ও
বিবেচনাশক্তির পারচয় পাওয়া যায়।
জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেই
যে কোন শাসনব্যবস্থাই যদি 'গণতান্ত্রিক'
হত তবে হিটলারের শাসনকেও গণতান্ত্রিক
বলতে হয়। মিল্-এর আলোচনা অনুযায়ী
আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিকৃতি ঘটেছে
তা স্বীকার করতে হয়। কেন না শ্রেণী-
স্বার্থে আইনপ্রণয়ন সেখানে চূড়ান্ত বৃপ
পরিগ্রহ করেছে, এমন কি উপদলের
স্বেচ্ছাচার সাধারণ নাগরিক জীবন বিপন্ন
করেছে এমন উদাহরণও বিরল নয়।
জনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বর্তমানে যে
গণতন্ত্র চালু রয়েছে তাও সর্বোৎসাহে
মিল্-এর প্রশংসা দাবি করতে পারে না।
আমোরিকায় অর্থ বা পুঁজির আধিপত্য
সমানাধিকার ও সমান সুযোগের গণ-
তান্ত্রিক আদর্শকে পথভ্রষ্ট করেছে একথা
বহু আধুনিক লেখকের লেখাতেই স্পষ্ট।
বর্ণগত কুসংস্কার আমেরিকার রাজনৈতিক
জীবনের একটি কলঙ্ক।

জন স্টুয়ার্ট মিল্ স্ট্রীজাতির
ভোটাধিকারের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ
অবদান রেখে গেছেন। স্কটলেই যাতে
প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করে
ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য হলে ওঠে
সেজন্য তিনি নিজেই বক্তব্য সর্বদাই
জোরের সঙ্গে পেশ করেছেন, এবং
সমষ্টির কল্যাণের কথা চিন্তা করেও
ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে যত্নবান
হয়েছেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের একটা
উচ্চতর মান প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সচেষ্ট
হয়েছেন যা অনুসরণ করলে আধুনিক
গণতন্ত্রের পক্ষে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে
পৌঁছানোর পথ সুগম হবে তাতে কোন
সন্দেহ নেই। স্বেচ্ছাচার ও গণতন্ত্রের মধ্যে
লড়াইয়ে গণতন্ত্রের একাধিকবার জয়লাভ
হয়েছে এবং প্রতিবারই তাব নতুন নতুন
দিগদর্শন ঘটেছে। উনিশ শতকের
সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গণতন্ত্রের
এক আশ্চর্য দিগদর্শন ঘটিয়েছিলেন জন
স্টুয়ার্ট মিল্, এ কথাটি গভীর অনুধ্যানেই
মিল্-এর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনার
সার্থকতা।



স্রব্জ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যা বাউলীর হস্তান্তর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দাশু খলিফার পরাগটা নেচে উঠল। খুব জ্বদ হবে এবার মদন। এতদিন পরে সে মদনের উপর তার জমা করা রাগের শোধ নেবে। মদনকে বিদ্যাধরী খেদিয়ে দেবে। মনছুরের কাছে টাকা আগাম নিলে মনছুর ধরে মার দেবে। মনছুর বাবুদের বাড়ির বরকন্দাজ। হতে পারে হস্ততো তার লাঠির একখান বাড়িতে মদইনা আলায় মাথাখান দু-ফাঁক হয়ে যেতে পারে। হস্ততো বিলে নিয়ে পুতে ফেলবে মদনকে।

এ দ্যাশের মানুস মদন চিনে না। এ দ্যাশের শ্যামের লাঠি বড় জোরালো।

খলিফা বিদ্যাধরীর দয়ার থেকে উঠে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। বকুলতলাব পুকুরে আর ডোবায়-মোপায় অনববত ব্যাঙ ডেকে চলেছে। একসঙ্গে যেন শত শত ব্যাঙ ডাকছে। হাওয়া দিচ্ছে ঠান্ডা-ঠান্ডা।

খলিফা এগোল। কুমির ঘরের দিকে একবার গেলে কেমন হয়। অনেকদিন কুমিকে দেখা হয় নি। একবার দেখে আসতে পাবত। মদনের সঙ্গে দুটো কথা বলে মদনকে চোঁতখে আসতে পারত।

কুমির ঘরের দিকেই এগিয়ে চলল খলিফা।

ওই তো চালতেতলা। গাছ-গাছালীর ছায়া ঘন হবে এসেছে। বাঁ-পাশে পায়ে-চলা সরু রাস্তাটা চলে গেছে পচা পুকুর পর্যন্ত। সম্ভার মূখে চতুর্দিকে ব্যাঙের লাফালাফি। আকাশ এখনও ঘোলা-

ঘোলা। আরও বৃষ্টি হবে কি না কে জানে। হতে পারে রাত্তিরের দিকে। ঘরের চৌকিখানা আজ সারিয়ে নিতে হবে। পাবের কাছটাতে টিনের চাল বেয়ে জল পড়ে টপ্ টপ্ করে। দুপুড়ে জল পড়ল তো পড়ল। রাত্তিরে চৌকিখানা সরাতে হবে। কে জানে যদি কুমকুমাইয়া বৃষ্টি আসে। মন্দ লাগে না। টিনের চালার ওপর বৃষ্টির কুমকুম শব্দ আর চৌকির ওপর কাঁথা মড়ি দিয়ে ঘুম।

চালতে বাগানে ঢুকল খলিফা।

অন্ধকারে দু-তিনটে ব্যাঙের বাচ্চা মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে ফেলল। পায়ে কাদা। কি মাড়াচ্ছে। আর কি মাড়াচ্ছে না ভাল করে বোঝাই যায় না। দু-তিনটে কুল কাঁটাও যদি বিধে থাকে দিন চারেক। কিছ্ বোকবাব উপায় নেই। খুলো আর কাদার একটা মোটা আস্তরণ সর্বদাই থাকে পায়ের নিচে।

কেঁচো আর ব্যাঙের বাচ্চার জাঙাল এ দিকটার। মাছ ধরতে যায়। পচা পুকুরের ধার থেকে নারকেলের মালাইয়ে কেঁচো ভর্তি করে নিয়ে যায়। বড়শীতে কেঁচো গেঁথে জলে ফ্যাল, টপাটপ উঠবে গোলশা ট্যাংরা আব সবপুটি। খালই ভর্তিও হয়ে যেতে পারে যদি কার্তিক মাসের টাসের দিনে বড়শী ফেলে বসা যায়। বর্ষায় মাছ পালায়। জলে থৈ-থৈ বিল পুকুরে তাদের পাক্তা পাওয়া যায় না।

গাঞ্জার দমটা এই সব দিনে জমে ভাল।

কুমির ঘরের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায় খলিফা। কথা কর কেডা? বেশ জোরেই কথা কইছে।

মদইনা আলায় গলার জোরটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

—যাম্ না আমি। তুই আমারে কি কইরবার পারস?

কুমির গলা যেন ঢেঁকির চিপির কিচ্ কিচ্ আওয়াজ।

—এখানে থাকলে ধম্মকম্ম তোমার সগ্গল নষ্ঠ অইব।

—হউক। ধম্মকম্ম আমার কাম নাই। দল বানাইয়া হুইয়া বেড়াম্।

—গোসা কর কি কামে। কথা কই শোন। দল বানানের কাম নাই। নিশা-ভাঙ কইরা দল লইয়া থাইক না। থেপীর ঘরে থাইয়া সুখে দিন কাটাও গা।

—থেপীর সাথে আমার সম্প-নেউলে। ওয়ার ভাবগতি কিছ্ বুঝবার পারি না। চাত্-ভাত্ নাই।

দাশু খলিফা খুদু খুদু করে প্রায় হেসে ফেলেছিল।

অতিকণ্ঠে হাসি চেপে কান পাড়ল আবার। আলা মদন জবর জাতা থাকে। কুমির কাছ থেকে থাকে গুতো। থেপীর কাছে গেলেও গুতো থাকে। জানে না বাইরা, থেপীরে খ্যাপাইয়া দিয়া এসেছে খলিফা। ঘরের দুয়ারে গেলে পিছা নিয়া ভাড়া করবে।

এ দিকেও পিছার বাড়ি—ও দিকেও পিছার বাড়ি।

ঝাঁটা খেতে খেতে এধার ওধার ছুটো-ছুটি করবে আলা মদইন্যা। ওর কপালে

সম্মুখের ঝাঁটার বাড়ি। জয় মা বেশ-ময়ী। এ্যান্ডিনে মদনকে জরুরা জ্বল করা গেল।

কুমি যেন ওকে খেঁদিয়ে দেয় মা। তার চোখের সামনে পিছার বাড়ি দিতে দিতে খেঁদিয়ে দেয়। চক্ষু দুটো সার্থক কববে দাশু খলিফা। কালাকান্দির করালী তাম্বিককে চারটে লাল আলখালা বানিয়ে দেবে। একটা পুরো বোতল দিয়ে আসবে মায়ের পুজোর জন্যে। জয় মা, বেশময়ী।

কুমির গলা শোনা গেল,—এখানে থাইকা কি করবা তুমি?

—কইলাম, দল বানাম, তরে নিয়া থাকুম।

—আমি তোমার সাথে থাকুম না।

—হে কথা আগে কইলি না কান?

—আগে অত তলাইবা বুঝি নাই।

—আরে আমার তলানি বুঝনি।

১. তরে জোর কইবা রাখুম।

কুমির চিৎকার শোনা গেল।—আমি তোমাবে একনি খ্যাদাইয়া দিমু। দিন-রাইত ঘবে বইয়া বুলবুলানি খিচখিচানি। তোমার নি ঘিমা-পান্তি নাই, আমার নাগাল নষ্ট পচা মাইয়া মানুষের সাথে রইছ। আমি অইলে কোনদিন লাখ দিয়া চইলা ঘাইতাম।

—কি কইলি খ্যাদাইয়া দিমু।

—দিমু, একশবাব দিমু।

দাশু খলিফা মখে হাত চাপা দিয়ে হাটবে অশ্বকারে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাসি চাপে।

জয় মা বেশময়ী! লাগিয়ে দিয়েছে। এবার আলা মদন্যারে পার করে পথে দাঁড় কবাও মা। ঘুম-ঘুম চোখদুটো খলিফাব সজল হবে ওঠে।

কিয়া কেঁদে ফেলেছে। ফোঁপানির শব্দ।—ঘিমা নাই। এটো জাইর্যা মাইয়ার ঘান বইছ। তাব ভাত খাইয়া দিন-বাইত, পেয়াইতাছ। তুমি যে এমুন ইইয়া আমি ছাবি নাই।

কমিষ কাদনের আওয়াজটা বড় রেশি কানে ঠাকে। এয়ার মধ্যে আবার কাদনের লি হোল? খলিফা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলা মদনের জন্য ওর এত দবদ কিয়ের?

—তুমি নষ্ট হইবার পারবা না। কিছুতেই তোমারে নষ্ট হইবার দিমু না।

মদনের গলার আওয়াজটাও যেন ভার ভার শোনায়।

—আমি নষ্ট অইলে তর দঃখুডা কিয়ের?

কুমির কোন জবাব শোনা যায় না। শূন্য কামার শব্দ শোনা যায়।

খলিফা পা বাড়ে। পায়ের হাটুর

কাছে কি একটা উঠেছে মনে হচ্ছে। চুল-কোতে গিয়ে হাতে লাগল। আর একবার হাত দিয়ে চুলকোল খলিফা। ওরে বাপুরে, তিন-চারটে জোঁক উঠেছে হাটুর কাছে। চামড়া কামড়ে ধরে রয়েছে। জোর করে টেনে ছাড়ান যায় না।

জোঁক কটা ছাড়িয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল খলিফা। কিন্তু ওখান থেকে সরে যেতে পারল না। আবার কান পেতে সেখানেই অশ্বকারে কাদার দাঁড়িয়ে রইল। মদনের গলা শোনা গেল।—খেপীর ওয়ানে গ্যালে তুই সইবার পারবি?

—কান পারুম না।

মদনের গলা ভার ভার।—সত্যি কথা ক।—তুই আমারে, এয়ানে তর কাছে টাইনা আনিছিলি।

কামার শব্দটা আর শোনা যায় না।

কুমির বিষয় গলার আওয়াজ শোনা যায়।—হা কথা মিথ্যা না। তয় কামডা ভাল করি নাই।

—অথন তুই আমারে ঘাইবার কস?

—হা, যা হওনের অইয়া গ্যাছে। অখন ভালব ভালয় চইল্যা যাও।

মদনের ভারি গম্‌গমা গলার আওয়াজ শোনা যায়।—যামু, তুই যখন কইতাছস, যামু আমি। তয় আমি নিচ্চ কইবার পারি। খেপীর সাথে থাকন আমার অইব না। খেপী যদি খ্যাদাইয়া দায়।

—খ্যাদাইয়া দিব না।

কুমি মদনকে আশ্বস্ত করে। বাইরে অশ্বকারে দাঁড়িয়ে দাশু খলিফার ঘুম-ঘুম চোখ কোঁতুকে ভরে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে হাসি চাপতে হয়। কথাখান মদন ঠিকই করেছে। খেপী তাকে খেঁদিয়ে দেবে। তার ব্যবস্থা সে সবই করে এসেছে। খেপী যতই ভাববে। ততই রেগে টং হয়ে যাবে। মদন একবার খেপীর ঘরে গেলে বুঝতে পারবে। কত খানে কত চাল।

—যাওয়ার আগে একখান কথা শুনাই। মিথ্যা ভাবিস না।

একটু চুপচাপ। কুমির কোন উত্তর শোনা যায় না।

—এয়ানে তুই ছাড়া আমার আপন আর কেউ নাই।

মদনের গলার গম্‌গমানি কম। যেন একটু ভিজা ভিজা। আওয়াজ যান ভিজা গাম্‌হার সপ্পপানি।

কুমির কোন উত্তর শোনা যায় না। সামান্য কামার শব্দ কানে আসে।

এই অশ্বকার রাতে চালাতে বাগানের চালায় এক জাইরা মেয়েমানুষের প্রেম-পীরিতের গাওনা শুনতে ভালই লাগে। দাশু খলিফার ঘুম-ঘুম চোখদুটো একটু বিষয় মনে হয়। কুমির কাদনের জন্যে, না

কি এই নিজনি স্তম্ভ রাতে এই পালাগানের একমাত্র শ্রোতা বলে।—ঠিক বোঝে না খলিফা। মনডা যান একটু জোলো-জোলো মনে হয়। ব্যাপারখান কি?

মদন চালাঘরের দুরার খুলল। লণ্টনের আলো পড়ল বাইবে। আবছা আলোয় দেখল। মদন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটু। চারদিকে তাকাল।

দাশু খলিফা চমকে ঘরের পেছনে সরে গেল। পেছনে আরও ঘন অশ্বকার। গোটা তিনেক বিশাল চালতেগাছ ডালে ডালে জড়াজড়ি করে নিচেব মাটিকে অশ্বকার করে রেখেছে দিনবাত। মাটি আবও ভিজে। পা চাপলে নবম মাটিতে পা নেমে যায়।

চুপ করে দাঁড়াল খলিফা। দেখল মদন বাগানে নামল। তাবপব হনহন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। কোনদিকে গেল? বোধহয় খেপীর চালার দিকে। যাউক আলা মদন।

খলিফা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেড়া ঘুরে দুরারের দাওয়ার কাছে এল। না। দুরার বন্ধ হয় নি। লণ্টনের আলো এসে পড়েছে বাইবে। খোলা দুরার দিয়ে ভেতরে কিছই দেখা যায় না। দাওয়ার ওপর উঠল খলিফা। চালতে নিম্ন কুল গাছের পাতার ঝিঝিঝ শব্দ। হাওয়া দিচ্ছে বোধহয় জোবে। জোরালো হাওয়া থাকলে আর বুঁচি হবে না। আকাশটা তবু ঘোলা ঘোলা। মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাওয়ায়। রাতে বোধহয় তারা উঠবে আকাশে। মেঘ কেটে গেলে এক ফালি চন্দ্র উঠতে পারেন।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২০০, ৩০০ টিনা বাজার ফ্রীড
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৫০

বেহুলা, তোমায়

বরুণ মজুমদার

এই ক্রান্ত রজনীর অন্ধকারে কে তুমি রমণী
গাভীরের নীল জলে আনমনে ভাসিয়েছো ভেলা।
চেয়ে দ্যাখো এই বেলা শব্দহীন ছায়ার অভলে
মালা হাতে ডাক দেয় তোমাদের সম্ভ্রান্ত প্রেমিক

কে তুমি রমণী, একা নদীর কিনারে বসে আছে
অগণিত ঢেউ শব্দ হৃদয়েতে তোলে আলোড়ন?
অদূরে জলের শব্দে শোনো সেই প্রতিহত ধ্বনি
আম্রার গভীরে ডাকে আশ্রয় তোমার।

এখন তাহলে বন্ধু ফিরে যাও পরিচিত ঘরে
হৃদয়ের অন্ধকার ভেসে যাক স্রোতের ভেলায়
ভোরবেলা জাফরান রঙের নেশার কথা ভূলে
এখন ফোটাবো আমি শব্দহীন আলোর বকুল।

সব আলো সব স্মৃতি যার যদি থাক মুছে যাক
পৃথিবীতে বেঁচে থাক চিরদিন মানুষের নাম।

সতর্কতা

কিতাবীশেব সিকদার

মরো মরো সাপের ছোবলেও বিষ আছে
এই রকম উদাহরণ বা নজির বিরল নয়
এটাই স্বাভাবিক, কেন না
মরার আগে সকলেই একবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা কর
সং বা অসং সবারই যে বেঁচে থাকার দিকেই বোঁক,
(মরতে মরতে বেঁচে থাকার বোঁক আরও প্রবল হয়)
শাস্ত্র আছে
শব্দের শেষ রাখতে নেই
আর আমাদের বাংলাদেশের লোকাচার তো সকলের জানা
সাপকে আঘাত দিয়ে ছেড়ে দিতে নেই
মেরে দাহন করতে হয়।

তবে দেখবেন দড়িকে স্রাণ ভেবে পড়িয়ে মারবেন না
শাস্ত্র আছে
যা করবে ভেবে, করার পর ভাববে না

এবং সাবধান অনেক আহত সাপ পথে দড়ির পত্ন শব্দে থাকতে পারে।

গাঙ্গার দম দিয়ে এলে জমত আজ।
ঐশ্বর্যে যেন বিশ্বাস লাগছে। মাথাটা
খালি খালি।

কুমির দেহখানা ঘুম-ঘুম চোখে
কল্পনার দেখবার চেষ্টা করতেই মুখখানা
আবার মিচকি হাসিতে ভরে উঠল। কুমির
সঙ্গে একটু কথা কওনের কাম। তারপর
সোঁকানে গিয়ে খানিকটা দিশী মদ গলার
চলে আশ্বাসে আশ্বাসে চলে আসবে এই
চালার। ফিরবে ভোর বিয়ানে।

মদইনা আলা খেপীর কাঁটা খেয়ে পড়ে
থাকবে কোন গাছতলায়। থাক, শালা
গাছতলায় পড়ে থাক। যেমন কক্ষ তেমনি
ফল। দাশু খলিফার পেছনে লাগার
প্রতিফল পাবে এইবার।

খলিফা দুয়ারের ভেতরে ঢুকল।
লণ্টনটা জ্বলছে চৌকির এক কোণে।
ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর চাটাই
বিছিয়ে উপড়ে হয়ে পড়ে রয়েছে কুমি।
পিঠের আঁচল নাই। কালো কুচকুচা পিছল
পিঠখানা টান টান হয়ে রয়েছে।

আরও একটু এগোল খলিফা। কুমি
নি ফোঁপার।

হ'। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কুমি।
এত কাঁদনের কি হোল ওর। এক
কারণানা।

আর একটু এগোল খলিফা। কুমির
জন্য ওর মনটা টনটন করে। আহা, মদন
চলে যাবার পর বোধহয় ভাবছে, ও
অসহায়। ওর কেউ নেই। আর কেউ না
থাকুক। খলিফা আছে।

—অ, কুমি। কুমি।

এক ডাকেই উঠে বসল কুমি। চোখ-
মুখ চোখের জলে ভিজা। চকচক।

—কেডা? তুমি এখানে কি কামে?

খলিফা নরম গলায় বলল,—মদইনা
আলা গেল গিয়া।

কুমির চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণের
বলে উঠল,—তাতে তোমার কি? তোমার
এখানে কি কাম।

—আইলাম, তর কাছে থাকুম। অখন
তর কেউ নাই।

কুমি উঠে দাঁড়াল। দুয়ারের দিকে
আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল।—বাইরও।
বাইরও এমান খিকা।

খলিফা অবাক। বলে কি কুমি।
তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কেন, এখন তো
মদন নেই। এখন তো কুমি তার সঙ্গে
দিব্যা থাকতে পারে।

—বাইরও। পিছা দিয়া বাইড়িয়া
খাদ্যাদ তোমারে। সকলে বাইরিয়া বাও।
হতভম্ব হয়ে কিছক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল
খলিফা।

হারামজাদীর আশ্পন্দা কম না। তাকে
কাঁটা মেরে তাড়াবে।

মেজাজ গরম হয়ে গেল খলিফার।—
কামডা কইল্ ভাল করলি না।

বলে ঘর থেকে খাদ্যাদ কুকুরের মত
বেরিয়ে অন্ধকার বাগানে নেমে সোজা
হাটের পথ ধরল।

দুয়ার বন্ধ করে কুমি আবার উপড়ে
হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

[ক্রমশঃ]



লালগানি শ্রীজীবন

মেঘতে দেখতে বর্ষা কেটে যায়।
কিন্তু বৃষ্টির নাম নেই। বরুণদেব
পলাতক। পবনদেব পরাভূত। দম বশ-
করা ভ্যাপসা গরম। আগুনের হলুকা
লেলিহান শিখা বিস্তার করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-
টাকেই লোপাটে করে দিতে চায়। রৌদ্র-
বন্যার প্রাবনে মানুষ আই-চাই করে।
আসমানের মুখ-প্রত্যাশী জমিনের

বুক ফেটে চোঁচির। যেন তেরচা থেকে
চোঁকো নানা সাইজের খণ্ড-বিখণ্ড সতী-
দেহের উৎকট প্রদর্শনী। কুকুরের জিভ
লম্বা হয়ে ঝুলছে। আর একটুতেই
মাটিতে গিয়ে ঠেকবে। ভূষিত নরনারীর
বুকফাটা কল্যা, ফটিকজল-প্রত্যাশী চাতক
পাখীকেও হার মানায়। 'আল্লা মোঘ দে,
পানি দে ছায়া দে রে তুই।' কিন্তু কার

পানি কে দেয়? আল্লাই কি আর সে
দিনকাল আছে?

বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা। তপতী
আর দেবর বিনয়। মাত্র একদিনের জন্য।
বিপদে পড়েছেন এখন। মূর্শিদাবাদের
পথে রাতটা বহরমপুরেই কাটিয়ে সাত-
সকালে বোরিয়ে পড়বেন কথা ছিল। কিন্তু
এটা কি আর একটা বাড়ি? হাসপাতাল
তবে কি?

একজন ছাড়া সবাই শয়্যাগত। কোন্
বেড়-এ কে আছে, কার কি রোগ, চার্ট
মিলিয়ে দেখতেই রাত্রি গভীর হয়ে এল।
নইলে ভাইঝি অসীমাই পারত সবকিছু
দেখিয়ে শুনিয়ে আনতে। হাজারদুয়ারী,
মতিঝিল, আবদুল বাগ আর ইমামবাড়ার
কত কাহিনী শুনবেন তাব কাছে? গাইডের
কোন প্রয়োজন ছিল না।

কাটরাব মসজিদ, মানে নবাব মূর্শিদ-
কুলী খাঁর কবর কোথায় এবং কি অবস্থায়
গিয়েছে, মতিঝিলের চারদিকে কত বিবে
জমি হাল আমলে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত
হয়েছে, সব তার কণ্ঠস্থ। সর্বোপরি
খোসবাগ অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী এবং
সিরাজ প্রমুখের কবর সংস্কারের অভাবে
ধ্বংসোদ্ভূত। এজন্য সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী
অসীমার দৃষ্টি অস্তহীন। স্বাধীন দেশও
নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি সূবিচার করত

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পারল না, এ-দৃশ্য সে রাখবে কোথায়? অসীমার কাছে শুনলে মনে হবে সিরাজ বুঝি এই পরিবারেরই কেউ একজন ছিলেন। অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে সমগ্র পরিবারটাকে বাঁচাতে গিয়ে যিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। সমস্ত অপঘাত একাকী মাথা পেতে নিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

তিন দিনের জ্বরে প্রলাপ বকছে অসীমা। —জান পিসি, মৃশিদকুলী খাঁ'র ক্ষর প্রথমেই পড়বে। 'শি'ড়ির একদম নিচে। তার ওপর দিয়েই উঠে যেতে হবে সবাইকে। সবার পদমূল পড়ুক তার মাথায় এই নীকি ছিল আদেশের অভিশ্রাব। সকলের পারের নিচে থাকবেন তিনি।

যারা এসব জানে না জ্বতো পারে অনারাসেই তারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। অন্যদের পা কাঁপে। তাই ঘুরে যান ক্ষির পথে।

ভাইপোটিকে পাঠান হয়েছে হাস-পাতালে। উচিত ছিল আর সাতজনকেও ভর্তি করা। কিন্তু সিট পাওয়া যায় নি। তপতী ছাড়া এ বাড়িতে সম্মাদীপও জ্বলত কিনা তা কে জানে?

বিনয়-ই ভেঙে পড়ল বেশি। একদম শূন্যে পড়ল সে। তপতী গেলেন হাস-পাতালে। ফিরে যখন আসেন, রাত তখন একটা। বৌদি তো দিশেহারা। এখানে পা দিয়েই তপতী সেটা উপলব্ধি করেছেন। সবই জ্বল আর গোলমাল করে ফেলছেন তিনি। একটা ঘটি চাই, হাস-পাতালের জরুরী জাগিদা একজোড়া খড়ম এঁরায়ে দিলেন বৌদি।

সহজ কথাবলার মাধ্যমে বজ্রবাত হলো। মৃশিদারাদের মহামূল্যবান অতীত, আর হতভাগ্য নবাব সিরাজের ঐতিহ্য মাথায় রেখে সে যাত্রার কারানগরী ক্রমপুর্বেই কুঁচি করে ফিরে চললেন তারা।

লালবাগ ছেড়ে পান্সার তীরে লাল-খোলায় রাজবাড়িটাই ভেঙ্গে ওঠে তপতীর চোখের সামনে। সিনেমার সাদৃশ্য-এ তোলা 'প্রমত্তা নদী' পান্সার-ই সম্ভবত ষ্টিটার নাম। অন্যটা যে কি বই আজ আর মনে পড়ছে না তা।

বাড়ির পথে বাঙালী ধার,
কার পানে কে চায়?

বিনয় হাসে আপন মনে। তেরো ডিগ্রী তাপে তৃতীয় শ্রেণীর সেড্‌ উল-পশাশ ডিগ্রী তেতে আছে। বোদে দেওয়া আদাবাড়ির তামাকের মতই দেখায় প্র্যাট-ফরমাটা। বিশেষ করে আরামপ্রদ এক প্রান্তের ঐ ছায়াটুকু। একটা পাতাঝরা পাহাড়ী গাছের আশ্রয়। বায়রের প্রলেপ-

বর্জিত, পঞ্জিরার ছাউনির মতই উজ্জ্বল যাওয়া চেহারা। বিনয় একটা কাগজ কিনে ভুবে গেল তার মধ্যে।

একটু খেতে দেবে মা? বৃষ্টিা ভিখারীর দীপ্তহীন আশাহত চোখে ক্ষণিকের তামাটে আলো কালিক দিবে যায়। মহা-শূন্য পথ-অনুসন্ধানকারী সে দৃষ্টি। জরাগ্রস্ত হাতখানা তপতী আর বিনয়ের মাঝখানে রেখে অপেক্ষমাণ।

এককালের বনেদী মুসলিম পরিবারের মেয়ে। তপতী এক নজরে চেয়ে থাকেন তার প্রতি।

এ লাইনে বে নতুন, কুঠা আর লম্বাই তার প্রমাণ। মায়ের ছবিখানাই অক্ষমাৎ ভেসে ওঠে তার। মনে পড়ে জাতকুল রক্ষার জন্য রাতির অশ্রুকারে তাদের পলায়ন কাহিনী। দেশ বিভাগের শেষ বর্নিকা। কিন্তু মা?

মায়ের কথা ভাবতে গেলে আজও তার চেতনা লোপ হয়ে আসে। পুরুষরা সব এক লাইনে দাঁড়ায়। মেয়েরা আর এক লাইন। জহাদদের সে হাঁক শুনলে, গাছের পাতাগুলো অবধি ভরে শির-শির করে ওঠে। স্বপ্নক্ষেপ বা স্বপ্নবন্দী নয়। প্রতিবেশী পুরুষ অধিবাসীদের বধ্যভূমি।

বোরা এ-জীবনের মত চললাম। দিদির শব্দে ষাটোষ্ঠী বৃষ্টিই প্রথম সাজা দিলেন প্রেতের হাতছানিতে। বলির পাঠার মতই কাঁপতে কাঁপতে পিতার অনুসরণ করেন পুত্র, অর্থাৎ তপতীর জামাইবাবু। তাপর?

তারপর মা আর দিদি চোখ না বুজতেই জামাইবাবুর ছিন্ন মস্তক মাটিতে পড়ে শিখর হবে যায়। রক্তের টেউ-কবল রক্ত। ফিল্মিক নিয়ে ছিটল বস্ত্র-নদীর ধারা। ফোরাতেও কুলে নয়, কীতনখোলা আর তেতুলিয়ার জলে ধুয়ে-মুছে না নেওয়া পবনত।

অভিযোগ পেশ হলো না, কিন্তু প্রাপ-তত্ত্ব কার্যকরী করা শেষ। এক-দুই করে অনেক। সমস্ত পরিবারের মাথা পুরুষদেরই এই হাল। হার হাসান, হার হোসেন করতে করতে এরপর মায়ের বুক চাপড়ে কপাল খাপড়ে মরবার পালা, সৌন্দর্যের খেসারত হিসেবে লুটের মালের মতই লোপাট হলেন তারা।

এবার ছেলে আছে কার কার কোলে দিয়ে যাও। কারবালায় যোর অশ্বকারে লক্ষ পিশাচ যেন একসঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বিকট হাসির উৎকট ডরঙ্গ না মিলাবার আগেই দিদির অচৈতন্য দেহটা মাটিতে পড়ল। আর মাথা তোলেন নি দিদি।

বরিশাল জেলার মূলদি গ্রাম। মায়ের মতই একান্ত আপনজন তাদের কাছে। মা আর মাটি আদিকাল থেকেই একান্ত

খাটি। মাটি মা-ই শেষ আশ্রয় হিসেবে কোলে টেনে নিলেন দিদিকে।

কোলের বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা এগিয়ে গেলেন ফরেক পা। ছেলে না বাবা মেয়ে! চোখ বন্ধ করে বললেন তিনি।

কাজ হলো তাতেই। বেঁচে গেল সত্য, ছোট্ট এই মিথোচকুর বিনিময়ে। দেশ বিভাগের শহীদ পিতামাতার একমাত্র স্মৃতি। কিন্তু মার প্রায়শ্চিত্তের তখনও অনেক বাকী। সত্য আর তপতী আছে না? তাদের পার করতে পারার মাস-খানেকের মধ্যেই বিদায় নিলেন মা। অম-জল ত্যাগ করে শূন্যের মরলেন তিনি। কীতনখোলা আর তেতুলিয়া, বরিশাল আর মূলদিকে ত্যাগ করলেন না তবু। বাড়ির চাকর ছিল কালু। কালু-ই তার নিল মায়ের মরবস্থা দৃষ্টে তপতী আর সত্যকে নিরাপদে পেঁহা দেবার। জানো-য়াররা যখন টের পেলে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, এক কোপেই কালুর স্ত্রীর দেহ থেকে মৃশুটাকে তফাৎ করে রেখে বিদেয় হলো তাবা। জগতে কোন ভাল কাজই শাস্তিতে নির্বাহ করে কার সাধ্য? মা পাকিস্তান ত্যাগ করেন নি কেন, সেটা বরং বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কালু? কি ছিল কালুর এই দেশে? এ যে এল, কালুও আর কিছু যেতে চাইল না ফিরে। স্ত্রীর অপমৃত্যু কেমন যেন ছবছাড়া করে দিয়েছে তাকে।

অসময়ের সেরা বৃষ্টি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি জোর-জবরদস্তিতে ফেরার পাঠান যায়? কলকাতার কাছেই সন্ধিবাগানে তাকে ঘর তুলে দেয় সুখাময়। তুমি তো চাকর নও কালু, তুমি-ই আমাদের অভিভাবক।

নিজের ঘরে সামান্য কিছু পুড়ি নিয়েই সেই থেকে বেঁচে ছিল কালু। প্রায়ই এসে তপতী আর তার ছেলোপিলে-দের সে দেখে যায়। কোলে নিয়ে আসর করে। পান্সা, মেঘনা আর বুড়িগঙ্গার জন্য দু'এক ফোটা চোখের জলও ফেলে কিনা তার সাথে, সে-ই জানে। কালুকে দেখলেই তপতীর অভিশপ্ত জীবনের কথা নানা রিগ্রহের আকারে সামনে এসে দাঁড়ায়। কতটুকু দাম আছে তার মত সামান্য জীবনের? খেসারতের কথা ভাবতে গেলে ঠিকই তখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কালু তার নিজ হাতে তাঁর ঘুটে, বাবুদের বাড়ি বাড়ি পেঁহা দিয়ে যায়। আর মাথায় করে-রয়ে আনে-করলো। ভাল আছে দিদি। ঝগড়া-বিবাদ কিছু নেই এর মধ্যে। ঝগড়াপরা ভালই চলছে আপনার আশীর্বাদে।

সে ভাবার চেহারা-ই যে এমন কদাকার ছিলও কেউ তা ভাবতে পারে নি কোন-দিন। কথা নেই বার্তা নেই কলকাতায়

সাম্প্রতিক বসন্ত

লাগা লেগে গেল। সন্ধ্যা লাগতেই ছোরাছুরি, রামদা-ভলোরার আর বোমা-পটকার ছড়াছড়ি। সশস্ত্র মানুষ সর্বত্র হানা দিয়ে বেড়ায়। রাত্রির অন্ধকারেই লুটের মাল জমতে জমতে ছোটখাট পাহাড় যেন মাথা তুলে দাঁড়ায। কড়া, বালাতি, মরুজা জানালা-ট্রাক স্ট্রাকস থেকে তুলোর বস্তা পর্যন্ত বাদ পড়ে না লুট-পাটের হাত থেকে। রাতের সমস্ত রাত-রাতিই বিক্রয় করা শেষ। প্রতি ক্ষেপ দশ টাকা। একজন লোক একবার মাথায় বয়ে যা নিতে পারবে তার দাম এ। সে যদি এক বস্তা চাল কিংবা চিনি হয়, তবে। রাত্রির অন্ধকারে যা ভীতির সম্ভার করে, দিনের আলোতে দেখা যায় বেশির ভাগই তার গুঁজব কিংবা আতঙ্ক। তাই বলে খুনোখুনি হানাহানি হাস পায় না। বরং বেড়েই চলে উত্তরোত্তর। প্রথম বলিই হয় তার কালু খাঁ! খানার পেছনে বেলা চারটের সময় কানফাটা শব্দধ্বনির মধ্যে ঘরে ঢুকেই আমল ছুরির ফলাটা কে বা কারা বাসিয়ে দিল কালুব হৃপিণ্ড লক্ষ্য করে, নিখুঁতভাবে। মরেই ছিল বেচারি, বেঁচে গেল এবার!

সংসারে কোন মা-ই চিরদিন থাকেন না। কিন্তু তপতীর মত না আর দাঁদি এবং ভ্রমপতি কতজন পায় এবং হারায়? বৃথা নয়, ভিখিরীও নয়, মা-ই বৃদ্ধি হাত পেতে রয়েছেন, মনে হলো তপতীর। মা-মাগো! চোখ দুটো জলে ভরে আসে, টের পাবার আগেই।

বিনয় একটা সিকি নিয়ে বৌদির হাতে দিল, বিদেয় কর।

সুখে থাক মা। ছেলে-পুতে হোক। মদ্রাটো কপালে ছুইয়ে বৃথা কৃতজ্ঞতার ভেঙে পড়েন।

আছে, আর লাগবে না। টোটের কোণে মদ্রা হাসি টেনে তপতী আপত্তি করেন। বিনয় কাগজের হারানো লাইনটা পুনরু-স্থানের জন্য হাতড়াতে থাকে।

আরও হোক। দুই কোল ভরে থাকুক। বৃথা যেন শেষ থেকে শব্দ করতে বন্ধ-পারিকর।

খাওয়ার কি? তপতী আরো কি সব বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, বিনয়ের বাধায়।

অন্য দেখুন। আবো কিছু পেতে হবে না? গাড়ির শব্দ কানে গিয়েছে তার।

যাত্রীরা চম্পল হয়ে আউটার সিগ-ন্যালের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গাড়ি হোম সিগন্যাল পার হতেই তীক্ষ্ণ স্বরে হুইসল দিল একটা। একরাশ সাদা পেঁজা তুলোব মতই ঘন বাষ্প নলের মুখ দিয়ে উগরে দিল এই অবকাশে। অধিক আহ্বানের বদ অভ্যাস থেকে দেশের রেল স্টেশন-

গুলোকেও বাদ দিতে পারে না বিনয়। আগুনে-প্র্যাটফর্মটার বৃকে ব্রেক কষে গাড়ি এসে দাঁড়ায় লালগোলা প্যাসেঞ্জার। কম্পজরের রোগীর মতই সমবেত যাত্রী-দের তাতে খাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

বিনয় কাঠবেড়ালীর কায়দায় উঠে পড়ল সপ্তে সপ্তে। ফলো মি, বৌদিকে বলল। অর্ডার মাসিক কুইক্ মাচের পারবড়ে তপতী জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেন বৃথা তখনও তাদেরকেই ধুঁজছেন।

আজকের
আগামীকালের

মিতব্যয়ী
আজকে বাঁচায়
তার কালও বাঁচে।
অমিতব্যয়ী
খরচ করে ফেলে আজ,
খুইয়ে ফেলে
কালও।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ১
৪, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১।



আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিম বঙ্গে ১০টিরও অধিক শাখা আছে

বিড় বিড় করে কি বেন বললেন কিংবা
আজ্ঞার দরবারে মোনাজাত করলেন মনে
হলো।

পাওয়া গেছে। একদম কোদে একফালি
জায়গা দেখে বেড়কভারটা পেতে দিল
বিনয়। সোয়ান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে
সে। সাফল্যের প্রাথমিক আনন্দ, সান্নিধ্যের
প্রলেপ বুলিয়ে দেয় তার চোখেমুখে। যা
ভিড়, খুশি হবারই কথা। তৃতীয় শ্রেণী
হলে হবে কি, মানুষ যদি থাকে, আজো
এদের মধ্যেই আছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে
যায় কথাটা। নিজের কানেই একান্ত—
বেথাপ্পা শোনায যা। কেন না আবেগও
একটা বোগ তার মতে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। পেছনে পড়ে
মইলেন ব্যাং, রোদে-পোড়া বহরমপুর
কোর্ট স্টেশন আর দম্ধ প্র্যাটেকরম।

ও মা! একটা অক্ষুদ্র আত্মনাদের মধ্যে
বোঁদ তার পা দুটো একদম সিটের ওপর
ছুলে রাখেন।

কি হলো? হাতের কাগজটা বগল-
দাবা করে বিনয় প্রশ্ন করে।

মানুষ! চোখে অপার বিস্ময়ের ঢেউ
ছুলে সিটের নিচটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে
দিলেন তপতী।

বিনয় বুকু পড়ে দেখে, সত্যি কে
একটা শূন্যে আছে সেখানে। মানুষ নয়,
তবে মানুষের মতই। চাল পাচারকারী,
বললে বিনয়। বুকেছে?

বুকেছি। কিন্তু কেমন একটা বিস্তী
লাগছে না? মুখের ঘাম রুমাল দিয়ে
মুছে নিলেন তপতী।

বিস্তী মানে? একেবারে যাচ্ছেতাই।
বসবাব কথা বারোজন। কতজন আছি
আমরা?

তা অনেক হবে। বিশ-বিশজন।
তপতী উত্তর দিলেন।

এরপরও শ্রী খুঁজতে চাও? বোনা-
ফাইড প্যাসেঞ্জার কিন্তু পাঁচ কি সাত।

আমার কিন্তু টিকেট আছে দিদি।
সামনের সিটে বসা, মধ্যবয়সী চোখ টারায়
মহিলাটি বললেন। কত হাতে-পায়ে
ধরলাম রেলের লোকসেব, তা ছাড়লে না
কিছুতেই। পোড়াকপাল আমার। খাব
কি আজ? কার গুধু দেখে যে উঠেছি—
বিড় বিড় করে বকতে থাকেন তিনি।

গাড়ির মধ্যে, আগে পিছে, ওপরে-নিচে
যেদিকে তাকাও কেবল মানুষ আর মাংস।
তরিতরকারী, শাক-সব্জি। ছোট-বড় হরেক
রকমের চালের পেটীলা। আলু আর
পটলের বস্তা।

কার কার জিনিস এতসব?

কেউ জানে না। চম্পল চোখে এ ওর
মুখের দিকে চাইছে।

গাড়ির দরজার দিক থেকেই শব্দটা ভেসে

আসে। ঠাট্টা আর বিদ্বেষের ভরস্ব্য খেলে
যায় গাড়িটাকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে।

শুকনো মুখ, কোটরাগত চোখ,
প্যাকাটির মত চেহারার মা-মমের আর
ছেলে। রুদ্ধ চুল, অর্থোলজ বেষবাস।
শ্রী-ছাঁদ বলতে নেই। খড়ি উড়ছে সর্বাঙ্গ
দিয়ে—ধাম করছে অবিকল ধারায়।

একটা দিন এদের নিয়েই কাটাতে
হবে? ভাবতে গিয়েই অন্ধকার দেখে
বিনয়। বেন মৃত সন্তান বুকু নিয়ে রাত
কাটাবার পালা। দেশের কাগজগুলো
যেমন হয়েছে—একটু যদি নজর দিত এ-
দিকে! তা দেবে না কেউ।

চট্ চট্ কেন ঠাকুরপো?

খবরের কাগজগুলোর কথা ভাবছি।
সমালোচনার নামে আজ্ঞে-বাজ্ঞে কি-সব
লিখে সময় অর জায়গা নষ্ট করে গড়ে
দেখ। অথচ গাড়ির এমন দূরবস্থাটা
নিয়ে যদি কিছু লিখত, তা লিখবে না।
কাগজটা বোঁদর হাতে ছুলে দিল বিনয়।

তপতী আগাগোড়া পড়েও কিছু ধরতে
পারেন না।

আমার চাকুরিটাকে কেবল নিন্দে
করতেই শিখেছি। শোন তবে কি লিখেছে।
পড়তে শব্দ করে বিনয়।

.....মহিলাদের জন্য, মহিলাদের পরি-
চালিত, মেয়েদের লেখা মাসিক পত্রিকা।
তবু চলতি সংখ্যায় একমেবান্বিতীয়ম্
পুস্তকের লেখাটাই একাধিক কারণে
উল্লেখযোগ্য। সেই হিসাবে শ্রীমান পক্ষ
আচার্যের লেখাটা না দেওয়াই বোধ করি
সঙ্গত ছিল।

আসল খবরটা কি জান? শ্রীমান নয়,
শ্রীমতী আচার্য। আর সমালোচক সেটা
জেনে শব্দেই ন্যাকামো করেছেন। ভদ্র-
মহিলা একজন হেডমিস্ট্রেস—এম-এ,
বি-টি।

সত্যি? বিস্ময়াহত তপতী হাসতে
হাসতে বলেন।

তোমাদেরও বাপু দোষ আছে। নয়-
ধামগুলো একটু পাল্টাও। বললে বিনয়।
সামনের সিটে বসা, চোখ টারায় মহিলাটি
কি শব্দেতে কি শব্দে একগাল হেসে
বললেন—এমন তো ঘরে ঘরে কতই হচ্ছে
আজকাল। বামুনের মেয়ে আর বামুনের
হাতে পড়ে কটা? সবই না কায়ত
কিংবা বৈদ্য ভাগাভাগি করে নেয়। কিছু
অসুবিধা থাকলে প্রাইভেট হাসপাতার রাখ।
পাস্। বড় বোন যদি পড়ল কায়তের
হাতে, ছোটটার বিয়ে হলো সাহার
সাথেই। কত দেখলাম!

অনেক দেখা এই মহিলাটিকে ঘেন
কেমন কেমন লাগে তপতীর। কোন
জবাবের পাববর্তে একটু হাসলেন কেবল।
বাইরে গরম বাতাস আগুনের শ্বাস-
প্রশ্বাসের মতই এসে গাড়ির গায়ে আছড়ে

পড়ে। অসংখ্য সুপারি গাছ বিনা-পার্গা-
তেই রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির আর গৈরিক
রং ধারণ করে বানপ্রস্থের পথে এগিয়ে
চলেছে। অসহ্য গরম আর গাদাগাদিতে
কিছুই ভাল লাগছে না। বাইরে হাত
রাখলে পুড়ে যেতে চায়। গাড়ির গায়ে
গা লাগতেই ছাঁই করে ওঠে।

ভিড় ঠেলে তেলমুড়ি বিক্রেতা ছেলেটা
উঠে পড়ে গাড়িতে। মুড়ি চাই মুড়ি?
হাতে গরম মচমচে মুড়ি। মুড়ি খেলে
হবে ছুড়ি। মুড়ি লাগবে খুড়ি?

পিছা মার তোর কপালে। হারামজাদা
ঠগ্ কোথাকার। কাঁকিয়ে ওঠেন খুড়ি।
অর্থাৎ চোখ টারায় সেই মহিলা। মানুষ-
গুলোও হয়েছে যেমন পেশাজের কাঙাল।
এই মুড়িওয়ালারা-ও তেমন পেয়ে বসেছে।
মুড়ির তো নাম-গন্ধও নেই, একচাকা
পেশাজ কুঁচো করে দিয়েই এখন ফেল দশ
পরস্যা প্রত্যেকে। এই বাদির, জমির ধানের
মুড়ি বলে কাকে জানিস? তোর মা
আবাগী বেঁচে থাকলে শুনিস তার কাছে।
আমারও একদিন জমি আর ঘরবাড়ি ছিল,
ঐ পাকিস্তানে। একটা নিশ্বাস ছাড়েন
তিনি। দশটা তেলমুড়িওয়ালা এক মাসে
বা বিক্রি করিস, একদিনেই সেই মুড়ি
আমরা ভেজেছি।

উত্তর না দিয়ে মুড়ি বিক্রেতা একগাল
হেসে নেমে যায় গাড়ি থেকে।

আমটা কত হইল বে মলিনা?

দু' আনা খুড়ি, খুব সস্তা! একটু
বাগী ছিল কিনা। চোন্দ-পনের বছর
বয়সী মলিনা জানায়।

আগুন লেগেছে আমারে বাজারেও।
একটা পচা আম তারই দাম দু' আনা।
বাঁটা মার অমন আমার কপালে। খুড়ি
মুখ বামটা দিয়ে বলেন।

মলিনার মুখের কষ বেয়ে আমার
রস গড়ায়। চট করে মুখের মধ্যে টেনে
নিষে কোঁ করে গিলে ফেলে সে। বুদ্ধক
স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা অপূর্ণ আমেজ ঢেউ
খেলে যায়। কিন্তু মাছি এসে হাজির
কষেক কুড়ি। কার আগে কে খায় তারই
ভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাছি আর মানুষে।

হাতের কনুই অবধি চাটতে থাকে
মলিনা। খুব হুঁশিয়ার বলতে হবে তাকে
—বাকি হাতটা দিয়ে যতদূর পারছে
বেরাড়া মাছিগুলোকে ঠেকিয়ে রাখছে।

গাড়ি বেলডাঙা স্টেশন ধরল। প্ল্যাট-
ফরমে একটা রোয়া-ওঠা কুকুর মাছির
তাড়নায় অস্থির হয়ে চক্কা করে ঘুরছে।
বারংবার চেষ্টা করছে হাঁ করে ধরে একদম
গিলে ফেলতে।

মড়কের বাহন এতসব মাছি আর
পোকা-মাকড়। খুড়ি আপন মনেই বলে
চলেন।

জলদি পরস্যা লাগাও সবাই। দশ

পান্থাহিক বন্দনতী

পরসা প্রত্যেকে। কে একজন গাড়িতে উঠে বলতেই যে যার পরসা বের করে জমা দিতে থাকে।

খুব লেগে গেছে স্টেশন স্টাফ আর পুলিশের মধ্যে। আদায়কারী বলতে থাকে। স্টাফ বলে চাল ধরতে যেয়ে জান দেব নাকি? সত্যি সাবিত্রী যত! আসল কথা পুলিশও এখন মাঠে নামায় ভাগ দিতে হচ্ছে যে। একজন আর একজনকে ভাই কলা দেখায়। মাঝখানে ডবল পরসা দিয়ে আমাদের এখন মরতে হয়। সবই গরীব-মারী কল। কে একজন মন্তব্য করে এক কোণ থেকে। পরসা বা ওঠে সবই জমা পড়ে কিনা কে জানে? কে যায় তা দেখতে! কানে যেতেই কাঁকিয়ে ওঠে আদায়কারী। নিজে গেলেই পারিস। পছন্দ না হয় অন্য ব্যবস্থা কর গে আজ থেকে। আমি আর পারব না ভুতের বেগার খাটতে। ঝগড়া-কাঁটির মধ্যেই মলিনার পরসাটা কেবল মকুব করে দিয়ে নেমে গেল সে-গাড়ি থেকে।

আরো পরসা? দেড় টাকা গেছে আমার বাগাঘাটের টিকেটেই। তোরা তো দশ পরসাতেই খালাস। খুঁড়ি পারলে টিকেটটাতেই একটা ছোবল মারেন যেন।

তোমরা টিকেট কর না কেন? প্রশ্ন করে বিনয়।

আমরা টিকেট কাটলে ওরা সব খাবে কি? মলিনা জবাব দেয়। ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাইতে আঁচাইতে, ঠাকুর-বিকে নিয়া গেল নাচাইতে নাচাইতে। ফোড়ন কাটেন খুঁড়ি। উকুন ভর্তি মাথা-টাকে খাবলা খাবলা করেন দু'হাতে চুসকিয়ে।

ভেল পড়ে নি তিন মাসেও। কিন্তু কি চুলের গোছ। তপতীর দৃষ্টি এড়ায় না সেটা।

হ্যাঁলো খুঁড়ি আম খাওয়া হলো? দে দাঁখি মাথাটা একটু বিলি দিয়ে দে। আর পারি নে বাপু। সাবি কই সাবিত্রী?

ভুতে ধরেছে। জবাব দেয় মলিনা। চালের নাকি কণ্ডোল থাকবে না, কে তাকে বলেছে। তোট না কি আসছে—তার আগেই।

কি বললি? ছাঁৎ করে ওঠেন খুঁড়ি। মধ্যে আগুন মূখপোড়াদের। আজ বলবে ফর্ডন নাই, কাশ থাকবে না কণ্ডোল, কি থাকবে তবে শুনি? জাহান্নামে যাক, যমেরও অরুচি যত। ভোলা তোর পরসা পড়ে যাবে। গিট দিয়ে রাখ বাবা।

ভোলা তো অর্ধেক চাল খেয়েই ফেলল। মলিনা জানায়।

চিলের মতো ছোঁ মেরে ভোলার পেট-লাটা কেড়ে নেয় খুঁড়ি। সেই সঙ্গে এক চড়।

কাঁদতে থাকে ভোলা।

কেঁদে চলেছে সাবিত্রী। ঐ বাড়িতেই আবার যদি যেতে হয় তার আগে ঠিক লাইনের উপর মাথা দিয়ে মরব।

বড় দুঃখী মেয়ে এই সাবিত্রী। বলেন খুঁড়ি। স্বামী একজন দিনমজুর। এক-দিন যদি কাজ পায়, বসে থাকতে যায় দুই দিন। পরসা বা পায়—শব্দুর-শাশুড়িরই কুলোয় না। সারাদিন মেয়েটার যায় উপোস দিতে। তার ওপর মাতাল স্বামীর মারপিট—কাঁহাতক সহ্য হয় কার? সাবিত্রী ভাই চালের লাইনে নেমেছে। কিছুর না হোক পেটে ভাতে ভো আছে? দম নিলেন খুঁড়ি।

এই ছুঁড়ি হাঁ করে কাবে খুঁজিস? নেমে গেছে। খুঁড়ি তার বাক্যবাণে বিশ্ব করেন মলিনাকে। মূড়িওয়ালা ছেলেটাকে কেমন লাগল বল দেখি? পছন্দ হয়ে থাকে তো বল।

খুঁড়ির ভিরস্কারটা বরং ভাল ছিল। কিন্তু সর্বশেষ রসিকতার মেয়েটা একদম এতটুকু হয়ে যায়। ছেঁড়া কাপড়টার দেহের কোন অংশ সামলাবে বুঝতে না পারায় ঘামতে থাকে অবিরাম।

চলন্ত ট্রেনের মাধ্যম একরাশ কড়ুই পাতা বুর বুর করে বুরে পড়ে। ছুঁড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টির মতোই। জানালা দিয়ে ভেতরেরও এসে ঢোকে গুটিকয়েক।

তপতী কুড়িয়ে নিলেন কয়েকটা। গাছের পাতা চেনা যায় না গাড়ি তখন এত বেশি জোরে ছুটে চলেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়—কেবল খাঁ-খাঁ করে রোদ। কেরানীমারা দু'রের কথা, বোঁ-নাচানী বৃষ্টিও কোনদিন যে ছিল, এখনকার এ দৃশ্য দেখে কার সাধ্য তা স্মরণ কবে? হৃদপিণ্ডের মতোই এখানে-সেখানে এতটুকু জলও যদি কোথাও তখন অবশিষ্ট থেকে থাকে, মেনে-মবদে, ছেলে-বড়ো গরু-বাহুর ভেঙে পড়েছে সেখানে। কোমর জলে ডুব আছে কেউ। জায়গা অভাবে ছটফট করছে অনেকে। কুকুর আছে, কাক-চিলেরও অমৃত নেই। মেলা বসে গেছে বারুণীস্নানের।

না করে যায় কোথায়? জল তো নয়, প্রকৃতির অমৃতধারা। মাড়ুলতল্যের মতোই দুর্লভ। পৃথিবী থেকে হঠাৎ কোনদিন জল অদৃশ্য হয়ে গেলে কি হবে অবস্থাটা? সৌদনের সেই প্রলয়ঙ্করী দৃশ্যটা পেয়ে বসল তপতীকে।

খুঁড়িরও নজর পড়ল সেদিকে। জল খাওয়া নয় দিদি, মাটি চুষে রস খাওয়া। সংক্ষেপে মন্তব্য কবেন তিনি। তার নজর সর্বত্র।

একটু জল খাওয়াতে পার ঠাকুরপো? তপতী বললেন।

জল? ভাই তো, ভর দু'দু'রেও

অম্বকার দেখে বিনয়। জল কোথায় পাবে? গাড়ি তো স্টেশনে গিয়ে দাঁড়-বার আগেই ছুট দিচ্ছে। তারপর যেখান চেন টেনে থামার, সেখানেই পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জল কোথায় সেখানে? বিনয় মিইয়ে গেল একদম।

একটা হুইসল দিয়ে রেজিনগর ছেড়ে গাড়ি মাইল দেড়েক দূরে থেমে গেল।... এই রে গেছে-গেছে। হায় হায় রব উঠন একটা।

কি হলো ঠাকুরপো? তপতী ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বিনয় জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল দুটো বাচ্চাই একসাথে পড়ে গেছে। একদম চাকার নিচে।

কিমুচ্ছিল খোলা দরজায় বসে। নি থেকে কে একজন সংখ্যে চিৎকার করে বলল। দুটোই চাল পাচারকাবী দেহের বুদ্ধের দুঃখ খাওয়াও ছাড়ে নি এত বচি মনে হয়। কাবাব বনে গেছে এবদম-শিউরে ওঠেন তপতী। একদম চাকা নিচে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর মাড়হদর উজাড় করে।

সবে শূন্য নদীয়াই পড়ল না এখনও। কাল মরেছে তিন-তিনটে। পুলিশ দে-লাফ দিতে গিবে তিনটেই খতম। বোঁ-গেছে বাবা। আর ভাড়া গুণতে বিং-লাঠির বাড়ি খেতে হবে না। ভোর চালে নাম জানি। খুঁড়ির চোখের দৃষ্টিতে শাণিত ছুরির ফলা-চক্-চক্ করে।

গাড়ি চলতে শুরুর কবে। একই পুলের ওপর উঠতেই খুঁড়ি বদলে গেলেন একদম। মা পাগলাচণ্ডী, আদি গঙ্গা। একমুঠো চাল কপালে ছুঁই-নদীতে ফেলেন তিনি। মা দুঃগা, তুমিই সাক্ষী।

কোন মোকদ্দমা সেটা, খুঁজতে গিবে বিনয় জলের কথা ভুলেই গেল একদম।

আর্থনিক নাটক

মনোজ মিত্রের
জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ—৩.০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের হাসির নাটক
মনপতি গ্রেপ্তার—৩.০০
রমেন লাহিড়ীর
আমেন—২.০০
জিতেন ঘোষের
দাগ—৩.০০

পাথপ্রতিম চৌধুরীর হাসির নাটক

দি আঁতলেক চুয়ালস—৩.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের

জোনাকির কান্না—২.৭৫

পরিবেশক

মিতালি প্রকাশনী

২১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সাম্প্রতিক বসন্ত

গাড়ি একটা স্টেশন ধরতেই জনৈক রেল কর্মচারী এগিয়ে আসেন। জানালা ফেলে দিল। কাঠেরটা। তপতীকেই লক্ষ্য করে বললেন।

কেন বলুন তো? এই পরমে জানালা বন্ধ করে মবব নাকি সব? বিনয় প্রশ্ন করে।

ইট-পাটকেল মাথায় পড়ার চাইতে তাও বরং ভাল। এটা তো আর গাড়ি নয়, চালপাচারকারী স্পেশাল। গাড়ি ছেড়ে দিল। হুমশ গতি বাড়তে বাড়তে এগিয়ে চলে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। প্রতি পবেই আর অশান্তি আর গোলমালে ঠাসা।

এই বা—জলের কথা তো বলাই হলো না! রাগে বিনয়ের মাথার চুল পর্বন্ত বেরনেটের মতো খাড়া হয়ে ওঠে।

থাক, আর ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই। কলকাতা গিয়েই থেলে চলবে। তাছাড়া কোন আঘাটের জল খাওয়াবে ঠিক আছে কেন?

ঠিক বলেছেন দিদি,—‘দাদাভাইয়ের মল’ নেই—সে চিন্তায় আমার মদ নেই। কলকাতার যেতে হবে জল যদি খেতে চান। খুঁড়ি বলেন, এটা কি আর একটা গাড়ি নাকি? মানব-মারা কল! সবাই ব্যস্ত চল ধরতে আর চোর ঠাণ্ডাতে; কিংবা ঘুমে খেতে। জল দেবে কে?

দেখো খুঁড়ি মেঘ মেঘ করছে? সাবিত্রী আশার প্রদীপ জ্বালে।

ভোর বেমন কথা, মাগ্ন বৃক্কের দুই খেতে দিতে চায় না, নাকি আছে এখন আকাশ-গলা ক্ষীর। খুঁড়ি তার মৃদুখানা এ্যাপেল করে বলেন। বিরক্তিতে ঠোট খুঁটো তাঁর বাঁকা হয়ে আসে।

পলাশী স্টেশন।

এসে গেছি খুঁড়ি, নেমে পড়ি আমরা।

মলিনার পেটলাটা জানালা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিলেন খুঁড়ি।

সেই পলাশী। মনে পড়তেই বৃক্কের ভিতরটা ছাঁক করে ওঠে ভপতীর। রাজা রাজবল্লভ থেকে, ধনকুবের জগৎশেষ্ট, পরমাশ্রী মিরজাফর সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন নবাবের প্রতি। কিন্তু রাণী ভবানী তো পারলেন না? অথচ প্রবাদ আছে সিরাজের ভয়েই নিজের মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন তিনি। মেয়ের মা নয়, দেশের মা ছিলেন রাণী ভবানী। সেই আমবাগানটা কোথায় বলতে পার?

স্টেশনের উত্তরে। বিনয় জবাব দিল। পলাশী কিন্তু মর্শিদাবাদ জেলায় নয়—জান বোর্ডিং?

কোথায় তবে?

নদীয়ায়। একটা আগেই ছিল মর্শিদাবাদ, এ জায়গাটা নদীয়া।

তাতেই কে-জি প্রতি এক টাকা

ফারাক! পরিশিষ্টটুকু জুড়ে দিলেন খুঁড়ি। অতীতের সিরাজ আর বর্তমানের ভাঙ-কাপড়ের মধ্যে তার কাছে কোন প্রভেদ আছে কি না বুঝতে পারা যায় না।

প্রাটফর্মের বিপরীত দিকটাই তখন দেখাব মতো। বিরাট শোভাযাত্রা অঙ্গ-গরের মতোই একেবেকে চলেছে গানের পথে। স্বাধীন পলাশীই বটে! ভিক্ষায়ে জীবনধারণের এক কলম্বিকৃত অধ্যায়। জীবন-সংগ্রামে পিষ্ট, পরগাহার নিশীড়নে অতিষ্ঠ—উজ্জ্বল জনজীবনের কলকাল।—রাণী ভবানী ছিলেন সেখানে বাংলার কৃষ্টি এবং দেশমাতৃকার প্রতীক। তোষামোদপ্রিয় আরেসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য তিনি যদি শাখা সিঁদুর এবং শাড়ি পাঠিয়ে থাকেন, উঠিত কাজই করেছেন। বেরাড়া একটা কল্লার টুকরো চোখের মধ্যে পড়তেই খচ করে উঠল। পলায়নপর জনতার শেষ দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করা বাকি থেকে যাবে। মনের দরজা-জানালা খুলে দিলেন তপতী। লোডী সেনাপতি থেকে সুদিনের বখশুরা,—নবাবের পাঠ-মিতরা সেখানে ভিড় করে দাঁড়ালেন। মিলিত চক্রান্তে ছত্রভঙ্গ নবাবের বাহিনী এসে মিশে গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মা-পলাতক বাঙালী আর মগদের সাথে। নারী-শিশু নির্বিশেষে ভীত, বিবস্ত্র জনতার মিছিল। শেষ সম্বলের ভ্রূণাংশ মাথায় কিংবা বৃক্কের আঁকড়ে ধাবমান। বৌদিকে দু’চোখ যায় নতুন ইহুদি। এন-ডি-এফ-এ-র লোকেরা কিছু পেটলা ধরে ফেলেছে এর মধ্যে। হ্যাঁচকা টানে তারই একটা কেড়ে নিয়ে উধাও হলো কে একজন। পাশের পল্লিশটা ধাক্কা বসিয়ে দিল এক বা। হাতে মাথা সাড়ে তিন হাত লাঠিতে।

মা গো, গেছি গো, একটা আত্ননাদ করেই বসে পড়ে মলিনা। পেটলার চাল ছড়িয়ে পড়ল স্টেশনের কুচি কালো পাথরের গায়ে। মলিনা নয়, লুফা, আলোয়া প্রভৃতি সিরাজের সহচরীদের বৃক্কফাটা কামাই স্পন্ট থেকে স্পন্টের হয়ে ওঠে। জাফর আলি খাঁ বেইমানী আর শেঠজীদের সৌজন্যে বারুদ ভিজে গেছে একদম। ক্রাইভের কামান কিন্তু গর্জে চলেছে তখনও।

একদল পল্লিশ বিজয়গর্বে গাড়িতে এসে ঢুকল। বৃক্কের শব্দে চমকে ওঠেন তপতী। সিরাজের সহচর নয়, স্বদেশী সবকাবেব চাল-সন্ধানকারী অনুচর। সব ক’টা সিন্ধুর ডালিই আটকে দিলেন তারা। নিচে চাল, উপরে সবজি। দাবিদারবিহীন বে-ওয়ানিশ মাল। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কৈফিয়ত কেউ দাবি করবে না। একদম হাতে পাওয়া স্বর্গ।

জানালা বেরে টপাটপ লাফিয়ে পড়ল জনৈক। সাবিত্রীর পেটলাটা বৃক্ক দিয়ে চেপে ধরেছে পল্লিশ। সবটো পা-টা বৃক্ক জড়িয়ে ধরে কাদছে সাবিত্রী। মরে যাব বাবু স্রেফ মারা পড়ব। তার চাইতে মেরেই ফেল আমাকে। চাল নিও না বাপু। তোমার পায়ে পড়ি।

তপতীর বৃক্কের ভিতরটা টিপ-টিপ করতে থাকে। হঠাৎ সিন্টের ওপর কয়েকটা পেটলা তুলে বসে পড়লেন তার ওপর।

গাড়ি থেকে বিনয়ের এবার লাফিয়ে পড়ার পালা। বোর্ডিংর যদি কিছুমাত্র কন্ডুজান থাকতো! দাদা কুড় ডিপার্ট-মেন্ট আর নিজে সে সিন্টের সার্ভিসের লোক। তাতে বোর্ডিং যা করলেন, চমৎকার! মনে হলো বোর্ডিং নয়, চাল পাচারকাবীদেরই রাণী তিনি।

খুঁড়ি গজরতে থাকেন। রেশন দেবে না, আবার চাল আনতেও বাধা? নদীয়া তো ঘাটীত জেলা, মানব খাবে কি? মাটি, মা ভোদের মাথা?

পল্লিশ একটা থিথিত করে ধমক দিল। সাবিত্রীর কবল থেকে চালের পেটলা কাড়তে গিয়ে শাড়ির আঁচল ধরেই টান দিল একটা। ছাড় বলাই।

কাপড়টা খুলে গেল তাতে।

নাও, মান, গরীবের ইচ্ছা, সব নাও। কিন্তু চালাটা ছেড়ে দাও। সাবিত্রী তখনও কাদছে।

বিনয় চোখ বন্ধ করে বাপুজীর নাম জপ করতে থাকে। কত করে বললাম—ফাস্ট ক্লাশে চল, তা শুনবে না, এখন সামলাও যতসব ছোটলোক কারবার। না বোর্ডিংর সাথে আর নয়। শপথ করে বিনয়।

গাড়িতে দেখুন আমরাও কিন্তু ঘাটী। একটা মেথেকে এমনি করে হেনস্তা করতে বিবেকে বাধে না আপনাদের? তপতী ক্রোভ প্রকাশ করেন। রঙের চাপে কান দুটো তাঁর শাঁ শাঁ করতে লাগল। যারা চোবাকারবার করে কেউ তারা পায়ে ধরে না—কান ধরেই কাজ আদায় করে। আর বলতে পারেন না তিনি। এতটা যে পারবেন তাও ভাবতে পারেন নি কোনোদিন।

টিপ-ঢাপ শব্দে একরাশ ঢিল এসে গড়ে গাড়ির ওপর এবং গায়ে।

বুঝুন এবাব। পল্লিশ অফিসারটি মন্তব্য কবেন, তপতীকে লক্ষ্য করে। ছেড়ে দে মেয়েটাকে। ঢিল মারছে কারা, ধর তাদের। সঙ্গীদের বললেন।

হ্যাঁ, চেপে ধরে উপড় হলে তখনও ডুকরে কাদছে মলিনা।

সাপ্তাহিক বসন্ত

‘মুক্তকেশের মুক্ত মোহে

মুক্তকেশের মুক্ত মোহে



সাধনার

মহাভূজরাজ তৈল

সেবের মত ঘন কুণ্ডল কেশদাম নারীদের
আভিলাষের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
“চুল তার কবোকার অস্তিত্ব বিদিশার নিশা”
সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনীরা এই ব্যবহার
করেন সাধনার মহাভূজরাজ তৈল
বিশুদ্ধ অম্লবেদে গড়ে প্রস্তুত সিন্ধ ও
শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর
কাড় নেই।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬ সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অধ্যাপক (মি.এস.এল.এস.)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাঙলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি.) অধ্যাপক

সামাজিক বসুমতা

পলাশী ঘুরে দেখার সাথ খুঁচে গেল তপতীর।

রেখে দে অমন ভদ্রলোক অনেক দেখছি। রূপ আর গয়না থাকলেই ভদ্র হয় না আজকাল। চোরদেরই সাক্ষেদ কি না দেখ গে। এন, ভি, এফ-এর ছেলেটা গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে সঙ্গীকে উৎসাহ যোগায়। আফিম স্মাগলারদের কথা শুনিস নি?

বিনয় কানে আঙুল দেয়। নিজেকে একটা ঢেঁকি বলেই মনে হয় তার সেই হুহুতে। না পারছে এক প্লাস জল খাওয়াতে। না মা-বোদের সম্প্রদায় বাঁচাতে।

চলতি গাড়ির চাকার চাকার তখন স্বর্ভা বিনিময় চলছে। বিনয় শুনতে পেলে সিক্রেট সার্ভিস কোড। জরুরী সঙ্কেতে হুঁশিয়ার করে চলেছে চেক-পোস্টগুলো। স্ট্রীমার থেকে রেল সবাইকে। চম চাল, খরো চাল, মে চাল, খরো চাল।

সোনাডাঙা, বেথুয়াডাঙার, মড়া-খাছা একটার পর একটা স্টেশন এল। একটু থেমেই আবার ছুটে চলতে শুরু করল। জন্মকাল থেকে এমন বেকারদার ট্রেনটা কোনদিন পড়েছে বলে মনে হয় না।

এক সময় আসামে ছিল বিনয়। ঐ অঞ্চলে নতুন রেল সেবামাত্র চালু হয়েছে তখন। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস মহা-শক্তির কোন দৈত্য ছাড়া এঞ্জিনটা আর কিছুই নয়। খুঁশ করতে প্রায়ই সেজন্য ছাগল-পাঠা এনে লাইনে বেঁধে রাখত। ধানব-দৈত্যের নৈবেদ্য।

কিছুদিন অস্তে সে ট্রেনেই যখন গরু-বাছুর কচুকাটা হাতে থাকে, কৃষকদের চিন্তাজগতে বিপ্লব শুরু হয় তখন। দুটো রেলের ফাঁকে একটা কুঠার বসিয়ে দিয়ে পোন্ট-হাতে দু'র থেকে সব লক্ষ্য করে। লাইনের ওপর কুঠার দেখতেই পাড়ি থেমে যায়। কিন্তু জ্বাইভার নেমে আসতেই কৃষকটি পারলে, তাকে লাঠি-পেটা কবে। এতবড় গরুটা তুমি চোখে দেখলে না কিন্তু এতটুকু লোহা দেখলে কিভাবে?

সেটা বরং বুঝতে-পাবা যায়। কিন্তু চালপাচাবকাবী, পুঁলিশ কিংবা যাত্রী, ট্রেনটা আজ কার মন জুগিয়ে চলবে? তপতীর জন্য চিন্তায় পড়ে বিনয়।

জান বোঁদি দাদা কি বলেন?

কি? তপতী ফিরে চান।

তার বোঁদি তার মুরগীগুলোকে যে ঘর করে, তার এক আনাও এই গরীব বোচারার জন্য করলে—মাগু-গী-গন্ডার দিনেও বেঁচে-বর্তে যেতাম।

বলেছেন তোমাকে?

বলেছেন কিনা—প্রশ্ন করলেই

জানতে পারবে। বিনয় জবাব দেয়। মৃদু হাসির আভাস ফোটে তপতীর মুখের ভাঁজে। যেমন ক্রান্ত তেমন বিষন্ন।

গাড়ি কুশনগর ধরল।

এক লাফে নেমে বিনয় মিস্টার ভেন্ডারকে ধরে নিয়ে আসে। দুটো মিস্টার আর এক প্লাস জল বোঁদির হাতে দিতে গিয়েই চমকে ওঠে রীতিমত। জরুরে পা পুড়ে যাচ্ছে! হাত কেঁপে চলাকে গিয়ে জল পড়ে বোঁদির শাড়িতে। পরের-মেয়ে তো, না ভুগিয়ে ছাড়বে কেন?

তপতী জানেন রাগলেই বিনয় তাকে পরের মেয়ে সম্বোধন করে। আরো কিছু মিস্টার নিয়ে বিনয়ের হাতে দিয়ে তপতী বললেন—এবার খাও আর যত খুঁশি মড়া-পাত কর।

ট্রেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে। কিন্তু আউটার সিগন্যাল পার না হ'তেই থেমে যায় পুনরায়।

তিস্ত-বিরক্ত বিনয় জানালা দিয়ে মাথা বের করে। চালপাচারকারীদেরই কান্ড ভেবে প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করে না আর।

নেমে আসেন পূর্বেকার সেই রেল কর্মচারী। বিনয়কে দেখতে পেয়েই আপ-শোষ করেন। কিছু চাল নামলেও বুঝতে পারতাম কাজ হলো একটা। চাল-টাল নয়। বাড়ির কাছে এসে চেন চেনে নেমে পড়েন এক ভদ্রলোক। সিনেমার প্রোগ্রাম আছে সম্ভবত।

হাসি পায় তপতীর। দু'লকি চালে ট্রেন চলতে থাকে। তাহেরপদর ছাড়তেই থেমে গেল যথারীতি। মাইল কয়েকের মধ্যেই পর পর কয়েকবার। তিস্ত-বিরক্ত এঞ্জিনটা নিদারুণ আকোশে ফুঁসতে থাকে। এবার আর হুইসল দিয়েও জানতে চায় না, কি হয়েছে? নতুন কেউ পড়ে গেছে, না চাপা পড়েছে দু-একটা।

কি আবার হবে? লাইনের ওপর হলদিঘাটের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দু'জন সেপাই বনাম দু'শত চাল পাচারকারী। মেয়েরা পালাচ্ছে যে যৌদিকে পারে। ছেলেরা মোকাবিলা করছে শত্রুকে, সম্মুখ সমরে। জলে কাঁপিলে পড়ছে কেউ, জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে অনেকে। গ্রামবাসী ছেলে-মেয়ে-বোঁরা কত ভাগ্যান্বিত! পলাশীর যুদ্ধ তারা দেখতে পায় নি। কিন্তু লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আদি-অন্ত উপভোগ করছে এই পর্বের। রেশন যুগের ইতিহাস।

হেঁ-হেঁ পড়ল একটা। তার সঙ্গে পথের বৃষ্টি।

খুঁড়ি বললেন, শুনছেন দিদি? বোঁদাদের পোষাকটাই খাঁটি। কিন্তু রঙটা খারি হলো আসলে নাকি একবারেই মোকি! ঠগ! ভয় দেখিয়েই কাজ হাসিল

করতে চেষ্টাছিল। নইলে দুটো পুঁলিশ আসে কখনও এমন জায়গায় মরতে?

নাটকেব যবানকা ঘটল, গ্রামবাসীরাও যখন যোগ দিলেন নকল পুঁলিশ ধরে ট্যাঙাতে। বিজয়ী জনতার জয়োল্লাস তখন কে দেখে? গাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। যাত্রীরা ঘামে ভিজতে লাগল। ক্ষুদ্র একটা ভদ্রভাসুচক নমস্কারান্তে খুঁড়িও নেমে পড়লেন এখানে।

ফার্নেসের তপ্ত গহবরে গুণে গেঁথে লাভ কোদাল করল। ঢেলে দিল—ফিফটিং ফায়ারম্যান। পলাতক হরিণীর মতোই উদ্‌বাসে ছুটে চলল লালগোলা প্যাসে-জার। তিন ঘণ্টা তখন লেট। শট কাট আর মেক-আপ করা ছাড়া শ্বিতীর উদ্দেশ্য নেই যার। দ্রুততালে ফেটে পড়ার আরোজন এখন চাকার চাকার। আর নয়, চুলোয় থাক, চাল-ডালের স্বকমারি।

শিল্পাঙ্গলে ঢুকতেই, দিনের অবসানে গতির স্পন্দন ভোরের আমেজ বয়ে আনে। শ্রান্ত-ক্লান্ত যাত্রীকুল ঢুলতে থাকে নিদ্রা-দেবীর অপঘাতে। টের পাবার আগেই তপতীও তার শিকার হয়ে পড়েন। স্বপ্ন দেখেন তিনি।

হার্ডিজ ব্রীজ দিয়ে হু হু হুঁকারে ছুটে চলেছে আসাম-মেল। পশ্চার বৃকে ভরা বন্যা উখাল-পাখাল করছে। গাঙ-লি আর হিট্টি-টি-পাখীরা যথারীতি চক্কা-কাবে ঘুরছে। ঢেউয়ের তালে তালে জেলে-ভিঙি নাচছে, ডুবছে, পরস্পরেই ভেসে উঠছে। হাসি আর খুঁশিতে ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ। মাঝপথে ফেটে গিয়ে ভেঙে পড়ছে কেউ। লাল-নীল আর হলদে রঙের পাল তুলে হাজার হাজার পানসী আর গয়না বনোকা পাড়ি জমিয়েছে মনের খেরালো। দিক থেকে দিশন্তের জ্বলন্ত মুখ।

অবাক হলেন তপতী বিগত দিনের এতটুকু চিহ্নও খুঁজেপেতে না পেয়ে। প্রশস্ত পশ্চার বৃকে সব সমান। সবই আগের মতো। স্ট্রীমারগুলো ছুটে আসছে, দু'রে বিলীন হচ্ছে দ্রুততালে। বৃষ্টি পড়ছে, ইলিশগুড়ি বৃষ্টি। কিন্তু হানাহানি-মাবামারি, চাল নিয়ে ইন্সপেক্ষ ধরে, জান নিয়ে টানাটানির কোন চিহ্নই নেই! কালু খাঁ থেকে মা, এমন কি ভাগ-বাঁটোয়ারার পরোয়া করে না বেপরোয়া নদী পশ্চা। একটা ধাক্কা খেলেন তপতী। তন্দ্রাও পালিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

হেসে ফেলে বিনয়। নিলে তো সুদ সন্মত উসুলা করে?

ভাঙা গলার শেষবারের মতোই সঙ্কেত জানিয়ে শিয়ালদহে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লালগোলা প্যাসেজার। তপতী মুখ খোলবার আগেই।

বঙ্গদেশে শিল্পের উদ্দেশ্য



[পূর্ব-প্রকাশনের পর।]

ইউজেন আয়োনস্কা : লেখক ও তাঁর
সাম্রাজ্য

আমার মতে রচনার দোষত্রুটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে। এই অর্থেই বর্ণনাকে সমালোচকের “রায়” হিসাবে ধরা যায়। এই সব দোষত্রুটি হচ্ছে রচনার গঠন সংক্রান্ত। গঠন শব্দটির ঠিক মপটার্থ পাওয়া যায় না। গঠনের অভাবও এক ধরনের গঠন হতে পারে। সুতরাং একথা বলাই বোধহয় ভাল লেখার দোষত্রুটি দেখা দেয় সঠিক রচনার অভাবে। অসম্পূর্ণতার প্রশ্ন তুলছি না—ওই শব্দটিও অস্পষ্ট। কৃষ্ণমতার দিকটাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রচনার নিম্ন সামঞ্জস্য না থাকলেই ত্রুটি দেখা দিতে বাধ্য। এতে বোঝা যায় যে লেখা অনুমোদিত নিয়ম অনুসারে রচিত হয় নি—কলাশিল্পের নিয়মকানুন মেনে চলে নি। অবশ্য এই কলাশিল্পের নিয়মকানুনগুলো কি তা কেউ জানে না—কারণ এ ধরনের অনেক রকম নিয়মকানুন এবং সৌন্দর্যশাস্ত্রের পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। তবে যে রচনার নিজস্ব সামঞ্জস্য নেই—তার নিজস্ব নিয়মকেই সে ব্যাহত করে এবং সেই কারণেই তা অসার্থক। প্রত্যেক লেখারই একটা নিজস্ব মূল্য আছে এই কারণে যে

সে তার নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে। আসলে যে কোন শিল্পবস্তু, সৌন্দর্য-পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতির আইনকানুন সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষমতা রাখে। আবার ভিন্ন শিল্পবস্তু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে অন্য ধরনের নিয়মের প্রবর্তন করতে পারে। এই জনাই সৌন্দর্য-পদ্ধতিগুলির ভেতর অসাম্য দেখা যায়। শিল্পবস্তুর বাইরেটা দেখে যে নিয়মের প্রবর্তন করা হয় তার মূল্য অনেক কম।

হয়তো শিল্প সম্বন্ধে কতগুলো সর্বব্যাপী এবং মূল্য নিয়ম থাকতে পারে—কিন্তু এগুলো এখন পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। আর্টের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এখনও কেউ দিতে পারেন নি। শিল্পের অসার্থকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ভেতরকার বৈব্যঙ্গ্যগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—এর ফলে বোঝা যায় শিল্পবস্তুর গাঠনিক দিকটা দৃঢ়-সংবদ্ধ নয় এবং এটি প্রাণবন্ত সৃষ্টির স্তরে উঠতে পারে নি। যে কোন সৃষ্টি যখন নিজস্ব রূপে প্রতিভাত হতে অসমর্থ হয় তখন তাকে বলা হয় অনা-সৃষ্টি। প্রকৃত শিল্প হতে হলে তাকে হতে হবে অনুপম একটা পৃথক সত্তা—যা অপরের উপর নির্ভরশীল নয়।

শিল্প সব সময়েই একটা সাংগঠনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—শিল্প এক সত্যের ভেতর কোন অমিল নেই। সত্য বলতে এখানে সাবজেক্টিভ টুথকেই বোঝাচ্ছে—শিল্পী সত্য বলতে এই সাব-জেক্টিভ টুথকেই বোঝেন। এই সাব-জেক্টিভ দিকটা এত গভীর এবং সম্পূর্ণ যে শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গে অবজেক্টিভের কোন তফাৎ থাকে না। শিল্পীকে অবজেক্টিভ অর্থাৎ সত্যিকার সাবজেক্টিভের সেরক হতেই হবে।

শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের ভঙ্গীর প্রকাশ বা আকৃতি—এর গাঠনিক দিকটার ওপর নির্ভর করেই এটা গড়ে ওঠে। শিল্প হচ্ছে—“a living organism containing within itself all the antagonisms which must enter into its make-up without destroying it. The more complex and numerous the contrasts, the tensions and passions, the more important the work, and since the work is like a living organism, like a being or an entity, by the same token it is invention and discovery, imaginary and real, useful and useless, necessary, and superfluous, objective and subjective, literature and truth. It is the outcome of a play-activity which is free from falsehood. Ofcourse, you may reject the work or consider it harmful, just as you may condemn or kill a human being.”

শেষ কর্তব্যটি সমালোচকের নয়—এ হচ্ছে নীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববাদী বা ঈশ্বরতত্ত্ববিদের অথবা সমালোচনী পত্রিকার কাজ। সমালোচক বা বর্ণনাকারীর কাজ এ নয়। সমালোচক এ কথা কখনও বলবেন না যে অপরের জন্য কোন অমূল্য শিল্পসত্তাটি রয়েছে বা জনসাধারণের শিল্পসত্তাটি সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কেন। আমি বলছি না যে এ ধরনের পরীক্ষার কোন আবশ্যকতা নেই বা এ অর্থহীন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এটা অন্য ধরনের কাজ।

আমার মনে হয় এখন আমি বলতে পারি যে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি কতকগুলো সূত্রের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছি। এই বাস্তব সত্যও আমার নজর এড়ায় নি যে আবেগপ্রবণতা, খামখেয়ালী-পনা, যে সব কার্যকারণের অভাব বা অস্তিত্ব লেখককে রচনার প্রবৃত্তি করে, এ সবের কোন মূল্য নেই, এ সবকে ছাপিয়ে অন্য কিছু ঘটে। এই অন্য

কিছু ঘটনা হচ্ছে, একটা উদ্ভাসগামী প্রকৃতি-শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটা শিল্পীর আরম্ভাধীন কাজ নয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি নিজের যা করতে চেয়েছিলেন, আসল রচনার সঙ্গে তার মিল নেই। সৃষ্টিরও একটা নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকে। যারা লেখকের রচনার একটা উদ্দেশ্যের দিকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তারা এ ক্ষেত্রে বিপথগামী। কিন্তু আবার কেউ যদি লেখাটিকে অগ্রাহ্য করতে চান, তার দ্বারা এর অন্তর্ভুক্ত কোন ক্ষতি হবে না—যেমন কোন মানুষকে আপনি পছন্দ করুন বা অপছন্দ করুন তার দ্বারা তার বেঁচে থাকার কোন বাধা হবে না। সে যা—সে ঠিক তাই। সে বেঁচে আছে—সে এখানে রয়েছে—সুতরাং তার আন্তরিক মেনে নিতে হবে।

The administrative authorities the descriptive critic have registered the birth of the person or the work, have noted his or its peculiarities in their records, have verified that it is not someone else's child, that it is a human creature and not a cat or a fish. What is to be done with it? That is another matter.

তাহলে সমালোচনা বলতে বোঝায় প্রভেদ দেখানো। প্রভেদ দেখানো মানেই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা বা আলাদা করা। সত্যিকার সমালোচক বলবেন, "এই হচ্ছে আমাদের কাজ। ব্যাপারটা আমি তোমাদের ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি। এর ভেতরে কিভাবে কি হচ্ছে তা প্রতিভাত করেছি; এই হচ্ছে এটির এক-রে কোটোগ্রাফ—আইডেনটিটি কার্ড।" এ ধরনের সমালোচনা—অর্থাৎ যাতে প্রভেদ দেখানো হয়—হচ্ছে এক বিশেষ শ্রেণীর কার্যক্রম। আমি আবার বলছি সমালোচক একই সঙ্গে কলা-বিষয়ক দার্শনিক বা শব্দ-দার্শনিকও হতে পারেন। তাছাড়াও তিনি মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিবিদের কাজেও এগিয়ে যান এমনও দেখা যায়। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভুলনামূলক সাহিত্যের প্রতিও গভীর প্রীতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সমালোচককে প্রথম অবজ্ঞিত ক্রিটিসিজমের কথা ভাবতে হবে—তার পরে দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির কথা উঠলে আপত্তি করবার কিছু নেই।

বর্ণনা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা হয়—আর এই হওয়া দরকার—অর্থাৎ নির্বিঘ্নভাবে যদি শিল্পকর্মের অনুসরণ করা হয়, তাহলে শিল্পের অন্তর স্পন্দনগুলো অনুভব করে সমালোচক তার

সমগ্রতা এবং ঐক্যের দিকটা প্রাতিভাত করতে পারেন। এ-ধরনের সমালোচনার আমরা শিল্পের গতির দিকটা এবং কার্যক্রমের দিকটা ভালভাবে দেখতে পারি—এর দ্বারা শিল্পের উদ্দেশ্য এবং যথার্থতার দিকটা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে। যে-কোন শিল্পের বর্ণনাত্মক আলোচনার তার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে এবং কোন চিরন্তন সাধারণ মানবিক ভিত্তির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত তার স্পষ্ট করে তোলে। প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টিই একটি বিশেষ প্রকাশ—কারণ প্রত্যেক শিল্পই হচ্ছে অনুপম এবং তা সত্ত্বেও আমাদের কাছে পরিচিত।

আসল কথা, সমালোচনার নামে যা চলে তা হোল শিল্পের বাইরের দিকটা নিয়ে আলোচনা, এসব সমালোচনার শিল্পের মনস্থানে পবেশ করে তার বিশেষ মৌলিকতার সঙ্গে দেবার কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। একটি বিশেষ শিল্প বিষয়ে এই জাতীয় একটি সমালোচনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন—দেখবেন অন্যান্য কিছু শিল্প সম্বন্ধেও ঐ সমালোচনাটিকে আরোপ করে দেওয়া যায় অত্যন্ত সহজভাবে। এর একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি—কোন সাহিত্য বা নাট্য-রচনা, অথবা কোন ছবি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর একটি সমালোচনা সংগ্রহ করুন। তারপর ঐ সাহিত্য বা নাট্য বা ছবির সত্যিকার যোগাড় করে সমালোচনাটির ভেতরকার নাম-ধামগুলো এবং কোটেশন ইত্যাদির একটু অদল-বদল করে দিন—দেখবেন সমালোচকের মন্তব্য প্রতিক্রমের

ক্ষেত্রেও ঘটবে। কেউ বলতেও পারবে না কিভাবে কি করা হয়েছে। এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কিভাবে হতে পারে? সেটা হল এই—সমালোচক এক্ষেত্রে শিল্পের মূল্যবোধ পূর্ণাঙ্গ গুণাগুণের ওপর নির্ভর করেই সমালোচনা করেছেন—প্রধান গুণাবলী তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে—আর সেই কারণেই তাঁর মতামতগুলোও হয়েছে অস্পষ্ট। শিল্পের আসল দিকটা সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়ে নি, কতকগুলো দার্শনিক এবং নৈতিক নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে তিনি মোটামুটি ভাবধারার ব্যাখ্যা করেছেন। এই জাতীয় ভাবধারা আর বহু শিল্পের ভেতরই থাকে সম্ভব। আমার এই কথা প্রমাণ অতি সহজেই দিতে পারি। আর্ট ক্রিটিসিজমের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—নিচে একটি ছবি সম্বন্ধে আর্ট লোভের মতামত ভুলে দিচ্ছি:

It will be noticed with what care the painter avoids repetition and excessive thickness or thinness of pigment, those common vices of painting. Each object is reduced to a pure sign, which is particularised in the extreme and stands in the sharpest contrast to its neighbour. The differentiation is just as marked between objects as between surfaces: there are no two alike in shape or size.

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানাবুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাণপুৰ

বেজওয়াড - শ্রীনগর - গোহাটী

সমালোচক কলহ

The necessary reminders of the relationship between the masses are given by means of elements which are equivalent but of different natures....

আমি অবাক হয়ে ভাবি এই বিশ্লেষণটি কি আরও অনেক ছবি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়?—বেসব ছবিতে পুনরুজ্জ্বল দোষ নেই বা সাধারণত বেসব দোষ পেইন্টিং-এ দেখা যায় সেসব নেই?

হরভো শেষ পর্বত একমাত্র সম্ভাব্য সমালোচনা হবে শিল্পকারের সঙ্কল্পসার দেখা।

Or give an account of it, or better still, to show the picture in question or reproduce the poem or novel in its entirety.

সেক্ষেত্রে একমাত্র আলোচনা বা শিল্প-বস্তুকে বিকৃত করবে না, তা হচ্ছে “আলোচনা না-করা।” আমি অবশ্য অতদূর ক্ষেত্রে চাই না—আমার মত হচ্ছে সমালোচক হবেন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণ-বিদ।

সমালোচক হচ্ছেন এমন একজন লোক যার স্মৃতিশক্তি খুব প্রবল এবং শিল্প-রচনা দেখে যিনি বলে দিতে পারেন এটি নতুন বা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। শিল্প-সৃষ্টি হতে হলে তাকে হতে হবে নতুন এবং সঙ্গো সঙ্গো সত্য। এখানে সত্য বলতে শিল্পীর গভীর আন্তরিকতার প্রকাশকেই বোঝায়। শিল্পের মূল্যমূল্য বিচারে, অর্থাৎ শিল্প বড় কি ছোট এর পরিমাপের জন্য এই গভীরত্বের দিকটা থেকেই বিচার করতে হয়। শিল্পসৃষ্টি একটি ধারা অনুসারে চলে—নতুন সৃষ্টির পেছনে থাকে আগেকার সৃষ্টি আরও অনেক শিল্পরচনা—এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শিল্পের ক্ষেত্রেও একটা হেরিডিটারি ব্যাপার আছে—কিন্তু নতুন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখা দরকার—

It is the child of its parents, but that it is not its parents.

সমালোচনা ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে অনেক কিছুই সংমিশ্রণ। সৃষ্টিশীল শিল্পী আত্মবাদ দিয়ে শুরু করেন এবং আত্মবাদকে প্রকাশ করতে গিয়ে বিবরণ-মুখীন হয়ে পড়েন। তাঁর সৃষ্টি—যাকে তিনি অন্তরের গভীর থেকে এনেছেন এবং বাইরে রূপায়িত করেছেন—একটা নিজস্ব স্বাধীন সত্তা লাভ করে। লেখক—যিনি মনে করছিলেন যে নিজেকে তিনি বেশ বেশে রাখতে সমর্থ হয়েছেন, আবিষ্কার করেন যে নিজের কাছ থেকে নিজেকে তিনি অব্যাহতি দিয়েছেন। আর এর চিত্রটি হয় সমালোচকের বেলায়—সে মনে

করে সে বিবরণ-মুখীন। কিন্তু হয়ে পড়ে আত্মবাদী।

একই নাটক সম্বন্ধে এমন কথাও শোনা যায় যে, লেখক যে নাটক লিখেছেন, অভিনেতার যার অভিনয় করছেন এবং দর্শকেরা যা দেখছেন তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন তিনটি নাটক। একটি শিল্প-বস্তুর ভেতর নানা টুকরো টুকরো সত্যের সংমিশ্রণ থাকতে পারে—এই বিভিন্ন টুকরো সত্যগুলোর পরস্পরের ভেতর পার্থক্য থাকে, বৈষম্য থাকে, একে অন্যের বিপরীত হতে পারে—কলে এ শিল্পবস্তুর নানা ধরণের ভাষা হতে বাধ্য—শিল্প-বস্তুটি যেন আসলে এ বিভিন্ন জাতীয় ভাষার সম্মিলনকেন্দ্র—তার সামগ্রিক সত্তার রূপটা যেন এর পরে অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। ভাষাকারদের প্রচেষ্টা দেখে মনে হয় শিল্পবস্তুটির আসল অর্থ থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যই যে তাঁরা প্রাণপণে প্রয়াস করছেন। ভাষাকারেরা যখন ক্রান্ত হন—অর্থাৎ শিল্প-বস্তুটির সংজ্ঞা এবং শ্রেণী যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায়—তখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না—

Once a work has been defined and classified, it is dead.

একে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নতুন ভাষার দরকার হয়—তার মানে একে এমন একটা রূপ দিতে হয়, যে রূপ এর আগে ছিল না। শিল্পকাজ বলতে বোঝায় অন্যেরা এর সম্বন্ধে যেভাবে ভাবেন বা চিন্তা করেন।

Or, alternatively, it is no more than a kind of source of radiation.

কারণ সমালোচকেরা যখন মনে করেন তাঁরা অন্যের কথা বলছেন, আসলে তাঁরা নিজেদের কথাই বলতে থাকেন—নিজেদের অহংবোধের চাপ থেকে তাঁরা কখনই অব্যাহতি পান না। তাঁদের সমালোচনায় লেখকের রচনা সম্বন্ধে যা থাকে তার থেকে অনেক বেশি প্রতিভা হয় তাঁদের নিজস্ব সাইকোলজিক্যাল মেক-আপ। রচনার ভেতর লেখকের মনের চেহারার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়—তেমনি সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণভাবে সমালোচকের মানসিক আকৃতিটা দেখতে পাই—

In practice, criticism is a document about critics much more than a document about, or an account of, the work.

সমালোচক যেন নিজের কাছেই নিজে বন্দী। তাঁর লেখায় প্রকাশ করেন তাঁর সমস্ত অনুভূতি, তাঁর চিন্তা-প্রণালী, তাঁর সময়ের জনসাধারণের মনোবৃত্তি যার দ্বারা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা, ভাবাবেগ

এক সংস্কার ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। আমাদের সময়ের সমস্ত সমালোচকই দলাদলিতে অংশ গ্রহণ করেন। নিজের ইচ্ছা এবং চিন্তাগুলি লেখকের রচনার প্রতিভা হলেই সমালোচক আকৃষ্ট হন এবং এসব ব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে লেখকের চিন্তাধারার মিল এবং জমিল অনুসারেই লোক তাঁর অনুমোদন বা প্রতিকূলতা লাভ করেন।

শিল্পকাজে সমসাময়িক চিন্তাধারার রূপায়ণ থাকে, কিন্তু শিল্পী তাকে এমন একটা সার্বজনীন এবং অপার্থিব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেন যার ফলে তাঁর রচনা চিরন্তনের স্তরে আশ্রয় পায়। সমালোচকেরা কাজ বিশেষকে নিয়ে, বর্তমান বিষয়ক—তিনি অ-সার্বজনীন এবং অ-বস্তু-তান্ত্রিক ধারায় আত্মবাদের প্রচার করেন নিজের রচনায়। প্রত্যেক সমালোচনাই একটা বিশেষ বুদ্ধিবাদের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে রচিত হয়—সেই কাঠামো থেকে তাকে আত্মপা করা যায় না। এই কারণে সব সমালোচনাই এক ধরণের সাংবাদিকতা। সমালোচনা পক্ষপাতসূচী মনোভাবের পরিচায়ক এবং আত্মবাদসূচী এবং সেই কারণেই বিকৃত চিন্তাধারার দ্বারা সৃষ্ট।

হেসব মান বা নীতির দ্বারা সমালোচনা করা হয় সেগুলো অবজ্ঞাজনিত ক্রিটিকিজম করার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এইসব মান বা নীতি সৌন্দর্যতত্ত্বমূলক, নৈতিক বা দার্শনিক উৎসমতে গিয়ে পর্যবসিত হয়। অথচ আমরা দেখেছি সমালোচকের শিল্পবস্তুকে পরীক্ষা করে সেই পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-বিচারের পদ্ধতি বা মান নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু তা না করে তিনি শিল্প-বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন পূর্বপ্রচলিত এবং বিচারাত্মক শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকটি সমালোচনার নিয়মকানুনের সাহায্যে।

এইসব নিয়মকানুন হরভো প্রথমে কোন শিল্পবস্তুর বিচার করতে গিয়ে তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপরে অভ্যাসবশে, বাধাবর্ধিতভাবে চলে এসেছে বলে, মানসিক আলস্যহেতু নিয়মাবলী-গুলো সম্বন্ধে সমালোচক আর পরে কোন বিচার-বিবেচনা করেন নি। এক্ষেত্রে একটা ভুল বোঝাবুঝির দরুন বিচার-বিদ্ভাট হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে আরেক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিভ্রম দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সমালোচক কোন বিশেষ নৈতিক, দৈববৃত্ত বা রাজনীতিক পদ্ধতির পরিপোষক এবং প্রচারক—এ সবার পরিপন্থী হলেই তবে সমালোচক শিল্পরচনাকে অনুমোদন বা অগ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করে থাকেন। [কুমার]

আকাশবাণী



পরিচয়

মেঘদূত

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা বিদ্যার নিলেন। জনমতের জয় ধ্বনিত হলো। দু-একটি বাদ দিলে প্রধান সংবাদ-পত্র-পত্রিকাগুলি অধিকর্তার মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। আমরা বারে বারে জানিয়ে এসেছি যে, বেতার প্রতিষ্ঠান জাতির সম্পত্তি, কোন ব্যক্তি-বিশেষের খেয়ালখুশির সামগ্রী নয়। এবং শেষ পর্যন্ত তথ্য ও বেতারমন্ত্রী যে জনমতের দাবি মেনে নিতে পারলেন সেজন্য তিনি সকলের এবং বিশেষ করে প্রোতাদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এই প্রসঙ্গে উদ্ভূত কণ্ঠস্বকে সজাগ করে দিতে চাই। কে না জানে যে, একটি প্রতিষ্ঠানে অনাচার যখন প্রবেশ করে তার শেকড় অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার ছায়াতলে, আগাছাও জন্মায়, আর তা উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন বিপদের সম্ভাবনা থেকে বেতে পারে। পরে দেখা যায় যে, নতুন সূরা পুরনো রোতলে পুরে দেওয়া হয়েছে মাত্র। এমনটি কেন না ঘটে। তাই অনুরোধ করি, মাটি কেটে শেকড় উৎপাটিত হোক। শেকড় যে কোমর লুকিয়ে আছে একটু চেষ্টা করলেই তো তা জানা যাবে। এ-গুরুদায়িত্ব নিতে হবে নব-নিযুক্ত অধিকর্তাকে। তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই।

এবার অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গুলি পরি-বর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। প্রতিটি বিভাগের সংস্কারসাধন অনা-কর্তব্য। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, হয়তো এক পক্ষের মধ্যে একই ব্যক্তি গল্পলেখক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার হয়ে বসে আছেন। তারপর, পুরনো বস্তার বর্ত-মানে কেন হারিয়ে গেলেন?—এ প্রশ্নের উত্তরও প্রত্যাশা করি। মাত্র কয়েকজন বস্তার একটি চক্র আবর্তিত হচ্ছে। ফলে, আলোচনা অত্রান্ত একঘেয়ে বিরক্তিকর এবং কণ্ঠস্বর অতি-পরিচিত হয়ে গেছে। এঁরা জানেন যে, বক্তৃকার মন যাই হোক না কেন প্রোগ্রাম পাবেই। নব-নিযুক্ত অধিকর্তাকে 'মহান' বক্তৃকার হাত থেকে প্রোতাদের রক্ষার ভার নিতে হবে।

গল্পমাদুর আসর, ছোটদের আসর, পল্লীমঞ্চ, মজদুরমঞ্চ, মহিলামহল প্রভৃতি বিভাগগুলির মান নানা কারণে

নেনে গেছে। যুগোপযোগী অনুষ্ঠান-সূচীর ব্যবস্থা করা চাই। এ সম্পর্কে মেঘদূত তার মতামত বিভিন্ন সংখ্যায় জানিয়েছে। কোন বিভাগীয় কতী মনে মনে না করেন যে, বিভাগটির তিনিই একমাত্র হত্যাকর্তা। বিভাগটিকে চালিত করবেন স্বয়ং তিনি। এমনতরো কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, তাঁদের কল্যাণে বিভাগগুলি পরিচালিত হবে না, জাতির কল্যাণে তাঁরা কাজ করছেন। সুতরাং অনুষ্ঠানসূচীর ভালোমন্দ বিচা-রের শেষ চাবিকাঠি শুধুমাত্র তাঁদের হাতে থাকতে পারে না। জনমতের ন্যায্য দাবি-গুলি ভেবেচিন্তে অনুষ্ঠানসূচীর রব-বদল হওয়া চাই। প্রতিটি বিভাগের কর্মসূচী যেন গঠনমূলক হয়। জাতি যেন লাভবান হয়।

সংগীত বিভাগ সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে। সময়ে সময়ে এমন সব শিল্পীদের বেতারে সাক্ষাৎ মেলে, মনে হয়, এঁরা পরীক্ষায় পাশ করে কীভাবে প্রোগ্রাম সংগঠন করলেন। এঁদের ধরা-পড়ার আর্টের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এমনতরো একজন শিল্পী পাওয়া গেল ২৪-৮-৬৭-তে, রাত ৮-৪৫ মিনিটে গাইলেন রবীন্দ্রসংগীত। বিস্ময় বোধ হলো, রবীন্দ্রসংগীত এইভাবে পরিবেশিত হলে তার জাত-কুল-মান মেঝে আনতে বেশি সময় নেবে না। এজন্য শিল্পীকে হস্তোত্তোলন আনা দরকারী করা যায় না। গান শিখতে না শিখতে অভিনয়কারী ইডেন-গার্ডেনমুখী হয়ে থাকেন। আর যদি শিড়িকের রাস্তা জানা থাকে তবে তো শিল্পী হতে দেরি হয় না। শিড়িকের পথে কড়া পাছারা দরকার। ভাঙাড়া, এমন হামেশাই ঘটে থাকে একই শিল্পী অভিনয় ঘন ঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। শিল্পী উদ্-দরের হলে বজার হস্তোত্তোলন কিছ্র থাকে না। তবু চঞ্চলবল্লভ বলে তো একটা জিনিস আছে। ২২-৮ এবং ২৬-৮-৬৭ মাত্র কদিনের ব্যবধানে পুরকী দস্ত তিনবার রবীন্দ্রসংগীত এবং একবার নজরুল-গীতি পরিবেশন করলেন। অভিযোগ আমাদের শ্রীমতী দস্তের বিরুদ্ধে নয়। তিনি সুগায়িকা, তাঁর গান ভালোই লাগে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলো কদিনের ব্যবধানে করা মেতে পারতো নাকি! তাতে প্রোতাদের হাতে শিল্পীদের সুবিচার পারার সম্ভাবনাও থাকে বেশি করে।

এও দেখা যায়, এমন অনেক শিল্পী আছেন যারা সত্যিই উচ্চশরের রস পরি-বেশনের ক্ষমতা রাখেন, যেহেতু তাঁরা তথাকথিত এ-গ্রেড প্রতীকিত মন তাই তাঁরা প্রতি তিন মাস অন্তর মাত্র একদিন দু'বার সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পেতে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনাময় শিল্পী রয়েছেন।

অভিনয়ে কোন সম্ভাবনাময় শিল্পী পাশের সুযোগ থেকে যেন কোন কারণে বঞ্চিত না হন।

সংবাদসমীক্ষা এবং সংবাদ-পরিচয় সম্পর্কে মেঘদূত স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছে যে, অনেক সময়ে এই দুটি অনুষ্ঠানে সব কিছ্র বলা হয় শুধু বাদ পড়ে সংবাদটুকু। কখনো কখনো আলোচনার বিষয়বস্তু এত জলো হয় যে খুঁজেপেতেও সারটুকু বার করা সম্ভব হয় না। শোনা শেষ হলে মনে হয়, কার বুদ্ধি লোপ পেল—প্রোতারা না বজার। সংবাদ পরি-বেশনের ভাষা সাধারণের মূগ্ধ চেয়ে কোন যে সহজ সরল করা হচ্ছে না তা বুঝে ওঠা দু'করা। তৎসময়হল শব্দ আর জটিল ব্যাক্য নিরাকর জনসাধারণ কোন দিন বুঝবে না। বেতার কণ্ঠস্ব এঁদের প্রতি অবিচার কতকাল করবেন তা জানি না। ভাষার স্বরূপ কেমনতরো হওয়া উচিত তা নিয়ে মেঘদূত পূর্বে অনেকবার আলোচনা করেছে। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে একটি অনুষ্ঠানের সমস্ত অংশটি ছাপিয়ে আলোচনা করার।

এ তো গেল অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে দু-চার কথা। এই প্রসঙ্গে মনে করি অনুষ্ঠানসূচীগুলির মান উন্নীত তুলতে হলে এবং আভ্যন্তরীণ চূড়ান্তিকার মাত্র কখনো বিভাগীয় প্রধানদের একটি বিভাগে, দু'বক্তার অধিক নিযুক্ত করা উচিত নয়। নতুন অধিকর্তার কলকাতা কেন্দ্রের পরিচালনার এই দিকটি সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বিভাগ পরি-চালনার ব্যাপারে আমলে পরিবর্তন আনতে না পারলে অনুষ্ঠানসূচীর উন্নতি সম্ভব নয়। যিনি বা যারা একটি বিভাগে দু'বক্তার ওপর রয়েছেন তাঁদের অন্য বিভাগে অথবা অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করার কথা ভেবে দেখা উচিত। আমরা চাই কলকাতা বেতারকেন্দ্র ত্রেমদূত হোক, নাগালী সংস্কারের প্রতিভা হোক।



নজরুল সঙ্গীত

নজরুল সঙ্গীতের সুর বিকৃত হচ্ছে, এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এ নিয়ে কিছু লেখালেখিও হয়েছে। সুর বিকৃত করা করছে, কিভাবে করছে—সেসব কথা বললেও প্রতিকারের কোন উপায় আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ত্রিশদশকে বাংলা-দেশে নজরুল সঙ্গীত অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল; এই সঙ্গীত বহু শিল্পীকে জন-সমাজে পরিচিত করেছে, নজরুল সঙ্গীতের গুণে গ্রামোফোন কোম্পানীর মত প্রতিষ্ঠান বিরাট হয়ে উঠেছে। ত্রিশদশকে বাংলার নাটক-সিনেমা নজরুল সঙ্গীতে উপভোগ্য হয়েছিল।

অথচ দশ-পনের বছর অতিক্রম করতে না করতেই শোনা যাচ্ছে নজরুল সঙ্গীতের সুরবিবর্তিত ঘটছে। কেউ কেউ নজরুলের সুরকে নিজের নামে চালাতেও ইতস্তত করে নি। অসংখ্য গান হারিয়ে গেছে; কোনটা অন্য কারো নামে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে এমন অভিযোগও শোনা যায়। কাজী নজরুল দীর্ঘদিন থেকে সম্মতহারা, তিনি বেঁচে থাকলেও—এই বিবর্তিত বা চুরির প্রতিবাদ করার মত শক্তি তাঁর নেই। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে মাঝে ভুল ধরিয়ে দেন বটে, তা-ও বৈঠকখানার আলোচনায়। তার বেশ কিছু করার মত লোক কম-ই আছেন!

নজরুল সঙ্গীতের চাহিদা সঙ্গীত আবার বেড়েছে। চাহিদা হবারই কথা; কথায়, সুরে নজরুল সঙ্গীতের পরিপূরণ করার ক্ষমতা আধুনিক কোন গীতিকারের নেই। এই চাহিদার জন্যই গ্রামোফোন কোম্পানী কয়েকটি লঙ-প্লেইং রেকর্ড করেছেন, মতুন শিল্পীদের দিয়ে গাইয়ে। সঙ্গীতরসিকরা আরো খুশি হতেন যদি আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রমুখ শিল্পীদের পুরনো নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি পুনঃপ্রকাশ করা হত। রেডিওতে আজকাল প্রায় প্রতিদিন নজরুল সঙ্গীত গাওয়া হয়। রেডিও কর্তৃপক্ষ একাত্তরে ধন্যবাদভাজন। কিন্তু যে গানগুলি গাওয়া হয়—সেগুলি ঠিক ঠিক সুরে গাওয়া হয় কিনা বা শিল্পীরা যথার্থ যোগ্য কিনা প্রশ্ন এখানে। কয়েকদিন আগে রেডিও-র সকালের প্রোগ্রামে সঙ্গীতশিক্ষা শুনছিলাম; ‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।’ এ গান মহুবার শোনা। শ্রীধীরেন্দ্র মিত্র, শ্রীসিমেশ্বর মুখার্জী, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী প্রমুখ এবং তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের মূর্খও শুনছি। প্রত্যেকের গানে একই গায়কী প্রোজেক্টে তৃপ্ত করেছে: সে গানে অপূর্ণ দরদ, অপূর্ণ তার সুরমায়া। কিন্তু সেন-বিনের শিক্ষার আসরে সে গায়কী গাওয়া যাচ্ছিল না সুর বখাষ থাকে সত্ত্বেও। রেডিওতে যারা নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাঁদের কারো কারো কণ্ঠে এই অপূর্ণতা অনুভব করা যায়। গায়কীর অভাবে গানগুলি নিঃপ্রাণ হয়ে ওঠে। এ ছদ্ম ঝাইরে বিভিন্ন গানের আসরেও এই অপূর্ণতা অনুভব করা যায়। নজরুল সঙ্গীতের এই অপূর্ণতায় অনেক সঙ্গীতরসিক হতাশ হন। একই গান সুপ্রভা সরকার, রাধারাণী দেবী, ধীরেন্দ্র মিত্র, ধীরেন বোস প্রমুখের কণ্ঠে কত প্রাণময় হয়ে ওঠে।

নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অপূর্ণতা বা বিবর্তিত বাস্তবিক দৃষ্টির বিষয়। আজো গায়কদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা নজরুলের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন, অথবা নজরুলের কাছ থেকে গান শিক্ষা করেছেন। তারা নজরুল সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে সাংগঠনিক। প্রসঙ্গত আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমল দাশগুপ্ত, সিমেশ্বর মুখার্জী, ধীরেন্দ্র মিত্র, অনিল বাগচী প্রমুখ অনেকের নাম করা যায়। যারা রেডিও কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারেন।

—সুজন



ডান, ব্যানার্জী

চিত্রশ্রী আলোচনা

সেঙ্গুপীর ওয়ালা

দেশে-বিদেশে বহু আলোচিত এক পুরস্কারপ্রাপ্ত ‘সেঙ্গুপীর ওয়ালা’ ছবিটি কলকাতার মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য মাধুর জাকফরী (মঞ্জুলা) বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সম্মান লাভ করেছেন। বৃটিশ এবং ভারতীয় অভিনেতা সমন্বয়ে নির্মিত এই ছবিটি ইন্দো-বৃটিশ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ভারতীয় প্রযোজিত ছবির আন্তর্জাতিক ব্যবসার দিক থেকেও ‘সেঙ্গুপীর ওয়ালা’ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ছবিটি সম্পর্কে আলোচনা উৎসাহজনক। ‘সেঙ্গুপীর ওয়ালা’ আরো আকর্ষণীয় এ কারণে যে ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের সমন্বয়ে তিনি যথার্থ পরিবেশ রচনা এবং মেজাজ সৃষ্টি করেছেন। যার জন্য ছবির উপভোগ্যতা আরো বেড়েছে। চিত্রগ্রহণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুব্রত মিত্র। ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যসজ্জা, মেজাজ, সঙ্গীত, কুয়াশার মধ্যে পাহাড় অঞ্চলের দৃশ্য তিনি অপূর্ণ দক্ষতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এককথায় ছবিটি মনোমুগ্ধকর এবং শিল্পবোধসম্পন্ন।

‘সেঙ্গুপীর ওয়ালা’র কাহিনী এক



‘সেঙ্গপীয়র ওয়ালা’ ছবিতে লিজির ভূমিকায় ফেলিসিটি কেম্‌ডাল

দ্রাম্যমাণ নাটকের দলকে অবলম্বন করে। মিঃ বাকিংহামের নাটকের দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেঙ্গপীয়রের নাটক অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। এই দলে তার সঙ্গে আছেন স্ত্রী ও কন্যা লিজি। ভারতে এসে তারা এক নাটকপ্রিয় মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপরে শুরুর হয় তাদের সফর। পথে দুর্ঘটনার মধ্যে সঞ্জুর সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয় থেকে লিজি ও সঞ্জুর মধ্যে প্রণয় জন্মে। যখন তাদের প্রেম গভীর হয়ে উঠেছে এমন সময় লিজি জানতে পারে সঞ্জুর পূর্ব-প্রণয়ী মঞ্জুলার কথা। লিজি অভিমানে ঘুরে সরে যেতে চায়, কিন্তু সঞ্জু নিজের প্রাণচাঞ্চল্যে তাকে জয় করে নেয়। রংগা-লয়ে লিজির প্রতি হালকা মনের দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও উজ্জ্বল সঞ্জু রাগে ফেটে পড়ে একটা কান্ড বাধায়। লিজিকে সে অভিনেত্রীজীবন থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে একান্তভাবে নিজের করে নিতে চায়। কিন্তু লিজি স্পষ্ট জবাব দেয় অভিনেত্রী হওয়াকে সে গোরবের মনে করে। এখানে বাধে শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সংঘাত। যদিও লিজি এতদিন ভারতে থেকে যাবার কথা ভেবে এসেছে—কিন্তু সঞ্জুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর প্রাণভরা ভাল-বাসা নিয়ে সে একাকী পাড়ি দিল ইংলন্ডের পথে।

পরিচালক জেমস আইভারি কাহিনীর প্রস্তাবনা করেছেন এপিক নাটকের রীতিতে। তারপরে বিদেশাগতদের চোখ দিয়ে ভারতের মাটি ও প্রকৃতিকে দেখেছেন। প্রথমে ছবির গতি ধীর, অভিনয় মণ্ডমোঁষা মনে হবে। কিন্তু পরক্ষণেই নাটকীয় ম্বন্দে গতি দ্রুত হয়ে ওঠে এবং রসোত্তীর্ণতার আনন্দ লাভ করা যায়। চলচ্চিত্র অভিনয় এবং মণ্ড অভিনয় দুই রীতি পাশাপাশি চলেছে। এই সঙ্গে ম্বন্দ দেখা গেছে দুই শিল্প-জগতের, একদিকে লিজি আর একদিকে মঞ্জুলার মধ্যে। দু’জন দুই শিল্প-জগতের প্রতীক। মঞ্জুলার সাদৃটিং-এর দৃশ্যে, তার ব্যক্তিজীবন ও ধ্যান-ধারণা এবং জনপ্রিয় হবার সীমাহীন তৃষ্ণার মধ্যে কেবল ভারতীয় চিত্রতারকা নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্র তারকারাই প্রতিফলিত হয়েছে শ্লেষের মধ্যে। এই শ্লেষ শিল্পপর্যবেক্ষণ। শেষ ম্বন্দে লিজির শিল্পসত্তার সঙ্গে সঞ্জুর ব্যক্তিসত্তার। লিজির কাছে জীবনের সর্বস্বের বিনিময়েও শিল্পজীবন বড়।

পরিচালক দক্ষতার সঙ্গে শিল্পীর গর্বকে জয়ী করেছেন। এই ম্বন্দে সময় পরিচালক কখনো নাটকের দর্শকের

দিকে, কখনো মণ্ডে সেঙ্গপীয়র নাটকের দৃশ্যভিনয়ে, কখনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অপূর্ব রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যে গভীর চন্দ্রন এবং বাধরুমে দৃশ্যে পরিচালক ভারতীয় ছবির বা অতিক্রম করলেও স্থূলভাবে অগ্রসর হই নি।

অভিনয়ে মিঃ ও মিসেস বাকিংহামের চরিত্রে জিওফ্রে কেম্‌ডাল এবং লোরা লিডেলের অভিনয় বিশ্বস্ত। লিজির চরিত্রে ফেলিসিটি কেম্‌ডালের অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করে। সঞ্জুর ভূমিকায় শশী কাপুরের সপ্রতিভ চরিত্র সৃষ্টি সকলের ভাল লাগবে। মঞ্জুলার ভূমিকায় মাধুর জাফরী নিখুঁতভাবে ভারতীয় এক চিত্রতারকাকে উপস্থিত করেছেন, এই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রজগৎ ও তারকাদের মানসিক চিত্র উদ্ঘাটিত। মহারাজার চরিত্রে যথেষ্ট গরুড় এবং নাট্যরসের পরিচয় দিয়ে প্রকাশ করেছেন উৎপল দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে প্রত্যেক অভিনেতা প্রশংসনীয়।

শিল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ‘সেঙ্গপীয়র ওয়ালা’ একটি সার্থকদর্শন ও উপভোগ্য ছবি।

মিস প্রিয়ংবদা

[পরিচালনা : রবি বসু ও বৃন্দাবন চৌধুরী]

একটি প্রবন্ধে জটিল অভিনেতা চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, বোম্বাই ছবি থেকে শিক্ষাবোধ বিদায় নিয়েছে, বাংলা ছবিও প্রায়-বোম্বাই ছবি হয়ে উঠেছে। এই মন্তব্যের সঙ্গে শিক্ষিত চলচ্চিত্র-দর্শকদের ত্রকের অবকাশ নেই। বাংলা ছবির ভাব-ধরণ কত যে বোম্বাই-বে'বা হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক ছবিগুলি দেখলে তা বোঝা যায়। সম্প্রতি মূল্যপ্রাপ্ত 'মিস প্রিয়ংবদা' ছবিটি তার একটি আতি নিকট দৃষ্টান্ত। সম্ভবত একারণে পরিবেশক ও প্রযোজক রীতিমত প্রেস শোর ব্যবস্থা করতে ভয় পেয়েছেন। বিশেষ করে যারা স্পষ্ট চিত্র-পর্যালোচনা করেন তাঁদের ছবিটি দেখাতে সাহস পান নি।

দুঃসম্ভব চৌধুরী স্বয়ং এ ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ভাষনীর কেন্দ্র করে এক অপক প্রেমচক্র ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তাদের উদ্ধার করতে এসেছে নারীবৈশ যাক্স করে এক পুরুষ—নাম নিয়েছে মিস প্রিয়ংবদা। তার প্রেম পড়েছে মামা। এ নিয়ে নাকি রস। হায়রে রস!

ছবির প্রযোজক পুরুষোত্তম দাস হালওয়াসিয়া এবং আরো কয়েকজন। এমন রসিক না হলে কি এই রস সৃষ্টি হয়।

অভিনয়ে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখার্জী, লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, দীপিকা দাস, অজিত চ্যাটার্জী, শিখা ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু, রাজলক্ষ্মী দেবী, বেলা সরকার, মিজু ভাওয়াল, তপতী ঘোষ, মণি শ্রীমান প্রমুখ। ও'রা মঞ্চে এবং সিনেমায় সত্যিই রসসৃষ্টি করে থাকেন। তবে এ ছবির ক্ষেত্রে এদের যোগ্যতাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরা যায় নি। প্রচারপদ্ধতিকার ক্যাম্পশন দেওয়া হয়েছে 'উন্মত্ত প্রহসন', ছবি দেখে মনে হল সত্যিই ছবিটি উন্মত্ত প্রহসন।

সুডিও থাট

ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট

"ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট"
বাংলা ছবির ইতিহাসে দমফাটা হাসির



মহা 'বেগম' হিন্দী ছাভতে মাল্যবন্দী

মাধ্যমে রহস্য-রোমাঞ্চকর চিত্ররূপ এই প্রথম। বাদলরাজ সিন'হা প্রযোজিত ও জয়দীপ পিকচার্সের এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীত রচনা করেছেন প্রণব রায়। পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ও শ্যামল মিত্র সুরারোপিত এই ছবিতে গান গেয়েছেন : শ্যামল মিত্র, মৃদা মুখার্জী ও লীনা ঘটক। দু'টি মৃদা চরিত্রে আছেন : জহর রায় ও ভানু ব্যানার্জী। এ ছাড়া শুভেন্দু চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন চ্যাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, রেণুকা রায়, পঙ্কজ দেবী, কল্যাণী ঘোষ ও আরও অনেকে।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

আদ্যাশক্তি মহামায়া

অর্ণিমা রায় প্রযোজিত অর্ণিমা চিত্রমের
"আদ্যাশক্তি মহামায়া"-র চিত্রগ্রহণ প্রায়

কিনিস্তবন্দীতে সান' কস্টার

মাসিক ৩০ টাকায়
অভিন্দুর প্রাস্টিক
ক্যাশিনেটে 'ন্যাশ-
নাল' পোর্টেবল



৩ ব্যান্ড অল ওয়ান্ড ট্রানজিস্টার।
আবেদন করুন।

Jagson Agencies (WBC-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

অমৃতকলা

নজরুল সন্ধ্যা

গত ৩১শে আগস্ট বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গৃহে সন্ধ্যায় 'নজরুল-সন্ধ্যায়' অধিবেশন বসে। কবিকে সামনে রেখে গান পরিবেশন করেন বিখ্যাতা নজরুল সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার। অপূর্ব দরদী কণ্ঠে তিনি কাবেরী নদীকুলে, ভুলি কেমনে—আজো যে মনে, যদি দূরে চলে যাই, সন্ধ্যা মালতী বনে প্রভৃতি এবং ঝুমুর গান করেন। নজরুল জ্ঞানের কথার মাধুর্য ও সুরের মাদকতার তাঁর গান বর্ষশিস্ত সন্ধ্যায় এমন এক সুরেলা পরিবেশ রচনা করেছিল যে—শ্রোতাদের কাছে তা অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা হয়ে থাকবে। বাস্তবিকপক্ষে এমন ঘরোয়া পরিবেশে, একান্তভাবে শ্রীমতী সরকারের গান শোনা সৌভাগ্যের কথা। শ্রীমতী সরকারের গানের সঙ্গে তবলা সংগত করেন শ্রীমধুসূদন সরকার।

ম্যাগসেসে পুরস্কার

গত ৩১শে আগস্ট ম্যানিলায় সত্য-জিৎ রায় ম্যাগসেসে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য ৭৫ হাজার টাকা।

গলমুনির জীবনাবসান

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গলমুনির মৃত্যু হয়েছে গত ২৫শে আগস্ট, কালিফোর্নিয়ার সান্তাবারবারায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর পাস্তুর, গুড আর্থ ছবিতে চাষী, এমিল-জোলা প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। একাধিক পুরস্কারে বিশ্ববাসী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

চেকোস্লোভাক ফিল্ম সেন্সন

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে চেকোস্লোভাক ফিল্ম সেন্সন শ্রদ্ধা হবে আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর হতে। সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে চারটি ছবি দেখান হবে। ছবি চারটি—ইনটিমেট লাইটনিং, অন দি রুফ, এভার ইয়ং ম্যান, দি নেল অব ডি বোয়ারফুটেড।



প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত 'ওহি লেড়কী' ছবিতে মলিতা চ্যাটার্জী

শেষ হয়ে এসেছে। সম্প্রতি এই ছবির পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী শিল্পী ও কলাকুশলীসহ বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ছবির বিহীন্য গ্রহণ করছেন। ছ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা

করেছেন : অনন্ত চ্যাটার্জী। সন্তোষ মুখার্জী সুরকৃত এবং সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ম্বিজেন মুখার্জী ও স্বয়ং সুরকার কর্তৃক গীত সঙ্গীতাত্মক এই ছবির প্রধান সম্পদ। সম্পাদনা, চিত্র-গ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও শব্দ গ্রহণে আছেন যথাক্রমে : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী, রামানন্দ সেনগুপ্ত, সুবোধ দাস এবং সৌমেন চ্যাটার্জী।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন : লীলা চক্রবর্তী, গুরুদাস ব্যানার্জী, অসিতবরণ, জহর রায়, হরিনন্দন মুখার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, ম্বিজু ভাওয়াল, রেণুকা রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, আশা দেবী, মাঃ বাপী, মলিনা দেবী ও নবাগতা সুপর্ণা চ্যাটার্জী।

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

‘গুলাবি চ’।

তাজা ও সেরা। একবার
থায় দেখুন।

৪৫নং ষ্ট্রীট স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

ইতিহাসের পাতা

॥ সাত ॥

জর্জিয়ান সিনেমা

বিপ্লবের ফলে জর্জিয়ান শিল্প (পদ্য, গদ্য, চিত্রাংকন) নতুন জীবনে রসপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন চিন্তা ও রীতি পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে আঁগকে মিলেমিশে যায়। মঞ্চ পরিচালক ফনস্টাটিন মার্জিনিসভিলি মস্কো আর্ট থিয়েটারের সদস্য ছিলেন, তিনি জর্জিয়া ফিরে এসে নিজের দেশের মঞ্চ-শিল্পকে সংস্কার করেন। অভিনেতা, পরিচালকদের শিক্ষা দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন জেনারেশন তৈরি করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবী শিল্পের সঙ্গে, চলচ্চিত্র-শিল্পের নতুন ভাবরীতি-বার পুরোভাগে ছিলেন সেগেই আইজেন-স্টাইন, সেভেলোভ পদোভাভিকন এবং আলেকজান্দার ডবঝেকো, তার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেন।

পুরনো জেনারেশনের পরিচালক



জর্জ সেনগেলের পরিচালিত জর্জিয়ান ছবি 'টুয়েন্টিসিক্স কমিশার'-এর একটি দৃশ্য।

আইভান পেরেসভিয়ানি, আমোবেক-নাজারভ (বেক-নাজারভ পরবর্তীকালে আর্মেনীয় ফিল্ম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন)

কর্তৃক নির্মিত প্রথম জর্জিয়ান ছবিগল্প সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়।



মস্কোর হ্যামিটেল থিয়েটারে ভারতীয় শিল্পীদের ডাঙরা নাচের দৃশ্য

নতুন পথ এবং রীতি উদ্ভাবনে, সমসাময়িক বিপ্লবী বিষয়বস্তু উপস্থাপনে মবগতদের দান যথেষ্ট। তাঁদের একজন নিকোলাই সেনগেলয়, এই তরুণ কবি মায়ান্ডিস্কির প্রতি অনুরক্ত এবং মার্জিনিসভিলের ছাত্র ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর প্রথম ছবির ('ইলিশো'—১৯২৮) বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন প্রাক বিপ্লবকালের কিন্তু উপস্থাপিত করেছিলেন আধুনিক চলাচল রীতি-চিন্তাধারায়। কাহিনী নিয়েছিলেন জর্জির ক্লাসিক লেখক আলেকজান্ডার কাজ্বেগির লেখা একই নামের গল্প থেকে যাতে নিজেদের গ্রাম থেকে বিভাঙিত একমল পর্বতারোহী এবং এক মুসলমান তরুণীর সঙ্গে খৃস্টান জর্জির যুবকের প্রেমের কথা বলা হয়েছে। এই ছবিতে পরিচালক সেনগেলয় এবং চিত্রনাট্যকার প্রতিভাবান নাট্যকার, কবি এবং সাংবাদিক সেগেই ট্রেটিয়াকভ ধর্ম ও জাতিত্বের সঙ্কল সঙ্গীতের মধ্যে বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। পর্বতারোহীদের জীবন বর্ণনা হয়েছে এপিগর গতিতে এবং জনতার চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে।

সেনগেলয়ের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ছবি 'দি টুরেনটিসিস কমিশারস্' (১৯৩২) আকারবাইজানে নির্মিত হয়। এই ছবির কাহিনী ১৯১৮ সালে ট্রান্স



জর্জি সেনগেলয় পরিচালিত 'এলিসের' এক দৃশ্য

ককেশিয়ায় সোভিয়েট শক্তি দখলের লড়াই, যে লড়াইতে বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার ২৬ জন কমিশারকে বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের হাতে দেওয়া হয়। পরিপূর্ণ রোমাঞ্চে ভরা এই ছবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের চিন্তাধারার এক নিখুঁত ছবি দেওয়া হয়। কয়েকটি ঘটনায় দৃশ্য, যেমন কমিশারদের গুলী করে মারা, বাবু কমিশনের পতনের পর বুর্জোয়াদের উদ্ভাস ইত্যাদি চলচ্চিত্র-শিল্পে ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

জর্জিয়ান নির্বাচ ছবির আর একজন প্রমুখা মিখাইল চিয়ারেলি, এক প্রতিভাবান অভিনেতা, শিল্পী এবং পরিচালক। তিনি প্রথম সোভিয়েট জর্জিয়ান ছবিতে (আসেন জর্জি়াসভিলি—১৯২১) প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৯২৮ সালে ইয়েফিম ডিগনের সহযোগিতা করেন লোকহীতিহাসবস্তু বিপ্লবী ছবি 'স্ট্রেনসনজ, ফার্ট কনেট' ছবি তৈরি করতে। তাঁর পরবর্তী ছবি 'সাবা' এক শিল্পীজ্ঞানোচিত সাফল্য। ছবির মূল দৃষ্টি ছিল না মেলেড্রামাটিক গল্পের ওপর (এক মাতাল মত্ত অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের সন্তানকে হত্যা করে), চিয়ারেলি অত্যন্ত সুকৌশলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক উপর জোর দিয়েছিলেন। চিয়ারেলির

প্রহসন ছবি করার ক্ষমতা এবং অবদানের পরিচয় মেলে 'হাবার্ড' ছবিতে (১৯৩১—চিত্রনাট্য ট্রেটিয়াকভ)। অস্বস্ত এবং মৌলিকভাবে পরিচালক তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে খুঁজে খুঁজে যারা নতুনের প্রতি বিরুদ্ধ ধারণা গোপন করেন—অথচ নিজের আসল চেহারা গোপন করেন।

সেকালে মিখাইল কালাটোবোভ—যিনি পরবর্তীকালে "ক্রেনস আর ফ্লাইং" পরিচালনা করে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি কামেরম্যান এবং প্রামাণ্য ছবির পরিচালক হিসাবে জর্জিয়ান চলচ্চিত্রে সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করেছেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রমুখচিত 'সল্ট অব ম্বানোটিয়া'য় জর্জিয়ান পর্বতভাঙলের অধিবাসীদের জীবন দেখান হয়, যারা শত শত বছর বাহিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের পূর্বপুরুষের রক্ষণশীল জীবনধারা পরিবর্তন করে সোভিয়েট জনগণের নতুন জীবনের অংশীদার হতে চাচ্ছে।

সবাক ছবি আসার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ জর্জিয়ান পরিচালকরা এমন কয়েকটি চমৎকার ছবি তৈরি করলেন যোগ্য জি সোভিয়েট ইউনিয়নের বহুজাতিক শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

—ক-স-গ।

**ON EASY
INSTALMENTS**

Varieties of
RADIO, RADIOGRAMS,
RECORD-PLAYERS

RECORD-REPRODUCERS.

TRANSISTOR
RADIOS,

REFRIGERATORS,
P. A. EQUIPMENTS.

TAPE RECORDERS,
RECORDS, ETC.

are available at

RADIO & PHOTO STORES
65, GANESH CH. AVENUE,
CALCUTTA-13 Phone: 24,4793

খেলোয়াড় নিধন যজ্ঞ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ময়দানে এবার আরম্ভ হয়েছে খেলোয়াড় নিধন যজ্ঞ।

হয়তো বা খেলোয়াড় নিধন যজ্ঞ কথাটা বলা একটু বেশিই হয়ে গেলো। হয়তো কথাটা ঘুরিয়ে কিংবা অন্য কোন-ভাবে বলা উচিত ছিলো। কিন্তু আমাদের মনে হয় খেলোয়াড় নিধন যজ্ঞ কথাটা বলাই সংগত। কারণ এতোদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই যজ্ঞের সমর্থনে কতো লেখালেখিই না দেখলাম। কিন্তু বিপক্ষে রা-কাড়ছেন না কেউ! অথচ খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে এই নিরমের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলার আছে। জানি আমাদের এই যুক্তিগুলো সকলের মনের মতো হবে না। সুতরাং বাদ-প্রতিবাদের কাড় উঠবেই। তবে খেলোয়াড়দের স্বার্থে কথাগুলো বলার যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন আই. এফ. এ ও ক্লাব কর্তৃ-পক্ষদের কাছে এই বিষয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন তুলে ধরার।

আমাদের এই আলোচনা আই. এফ. এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় বর্ধিত সময়-সীমা প্রসংগেই!

বেশ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা। তবে এবারে খেলার সময় বেড়ে এক লাফে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নম্বুই মিনিটে!

নম্বুই মিনিট ধরে খেলার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়। এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। কারণ আন্তর্জাতিক ফুট-বলঙ্গানে লাড়তে গেলে নম্বুই মিনিটের খেলার অভ্যাস নিতান্তই দরকার। আর বোধহয় সেইদিকে তাকিয়েই এবারে আই. এফ. এ শীল্ডে খেলার সময় বেড়েছে!

তবে এই বর্ধিত সময় খেলা যদি শূন্যমাত্র আই. এফ. এ শীল্ডেই সীমা-বদ্ধ থাকে তাহলে বিশেষ কিছু বলার নেই। এর বিরুদ্ধে মন্তব্যও নিম্নপ্রয়োজন।

কিন্তু এই নম্বুই মিনিটের খেলা সম্বন্ধে আমরা বড় বেশি হাততালি দিয়ে মাতামাতি করছি। অনেকে আবার এ কথাও বলতে চাইছেন যে এখন থেকে সব খেলাই নম্বুই মিনিট ধরে চলুক। তাদের মতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবলের সব কিছুই যেন নির্ভর করছে ঐ নম্বুই মিনিটের খেলার ওপর। যেন নম্বুই মিনিটের খেলা হলেই আমরা রাতারাতি সাংঘাতিক কিছু একটা সাফল্য লাভ করে বসবো। তাই তারা আনন্দে আটখানা

হয়ে হাততালি দিয়ে বাজার গরম করে ফেলেছেন!

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সত্যিই কি শূন্য মাত্র নম্বুই মিনিটের খেলা হলেই চ্যাম্পিয়নশীপের চাবিকাঠি হাতে এসে যাবে?

কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। শূন্য মাত্র খেলার সময় বাড়িয়েই ফুটবল খেলার উন্নতি করা যায় না, এ কথা বোধ হয় না বললেও চলে। আর সেই জন্যই এই নম্বুই মিনিটের খেলার প্রস্তাব যেমন হাস্যকর, তেমনিই অনিষ্টকরও বটে।

কারণ নম্বুই মিনিটের খেলা হলে সমস্ত চাপটাই এসে পড়বে খেলোয়াড়দের ওপর। আর এই চাপই যে সাধারণ খেলোয়াড়দের পক্ষে কি সাংঘাতিক প্রকম অনিষ্টকর তা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। কিন্তু সব থেকে দৃষ্টান্তের বিষয়, যারা নম্বুই মিনিটের খেলা নিয়ে লাফালাফি করছেন, তাদের খেলোয়াড়দের দিকেও যে একটু তাকাবার প্রয়োজন আছে—এ কথা অবলেন না!

কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন দেখি আমাদের মতো এই গ্রীষ্মপ্রধান

চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য
ফিরে পেতে হলে

কোয়া-

কার্পিন

ব্যবহার করুন

কোয়া-কার্পিন

একটি মিনিট ফেম জেল

কোয়া-কার্পিন ডেলটা মোটেই চটচটে নয়—
অবশ্য এতে চুল এখন ভাবে বসে যায় যে সারাঘিনেও

এলোমেলো হয়না, এর গন্ধটিও মনোহর।

কোয়া-কার্পিনে চুলের পোড়া পড় হয়
খার চুলও ভাল থাকে।



কোয়া-কার্পিনে চুলের

আইডেট নিঃ

কলিকাতা-বোম্বাই-দিল্লী

রাহুল-পাটনা-গোহাটি

কটক-জয়পুর-কানপুর

আমলা-পেকুরাবাদ

ইন্দোর

Beys

22-DM/EP-9/14

দেশে নব্বুই মিনিট ধরে একটিনা ফুটবল খেলা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতোটা সংগত। সে কথা আজ চিন্তা করার দরকার।

নব্বুই মিনিটের খেলার প্রসঙ্গে অনেকেই অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করে থাকেন। বলেন, ওরা যদি নব্বুই মিনিট ধরে খেলে খেলার উন্নতি করতে পারে, দম বাড়াতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারবো না। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যাই যে শীতপ্রধান দেশের লোকদের পক্ষে যা সম্ভব, ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তা একেবারেই অসম্ভব।

এর পরেই দেখতে হবে নব্বুই মিনিটের খেলায় অংশগ্রহণ করার মতো শারীরিক যোগ্যতা আমাদের খেলোয়াড়দের আছে কি না। এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলতে কেউই বোধহয় ইতস্তত করবেন না। অর্থাৎ নব্বুই মিনিট ধরে খেলার ধকল সহ্য করার মতো শারীরিক কুশলতা আমাদের দেশের অধিকাংশ খেলোয়াড়দের নেই। এ কথাটা যথার্থভাবে প্রমাণিত হবে খেলোয়াড়দের চোঁহরার দিকে তাকালেই।

এ ছাড়া নব্বুই মিনিট ধরে খেলার ধকল সামলাবার জন্যে যে খাদ্যের প্রয়োজন—তা কি আমাদের খেলোয়াড়দের জোটে? চারপাশ ঘাম চাল আর অপ্রচুর গমে দু'বোলা পেট ভরা তো দু'রেক কথা শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পূর্ব্বত হয় না। সুতরাং আম-পেটা থেকে অতো পরিশ্রম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতোদূর সংগত আশা করি যে কোন ডাক্তারের সংগে এ বিষয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

শুধু তাই নয়! ধরা যাক কোন একজন খেলোয়াড় কলকাতার শহরভিত্তিতে থাকেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁকে হয়তো বাজার কিম্বা রাস্তার মোকাবেলাই লাগতে হয়। তারপর নেরে-থেরে সাততাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দু'গাল খিচুড়ি কিম্বা ক'খানা রুটি গুজে টেনে কিম্বা বাসে বসে বসে তাঁকে প্রাণটি হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে, গিলে হাজিরা দিতে হবে অফিসে। তারপর দু'পূর পড়াতে না গড়াতে ছুটেতে হবে মাঠে! সেখানে নব্বুই মিনিটের যশের পর কিছু জুটলো তো ভালো আর না জুটলো তো বাড়ি গিয়ে রুটি চিবিয়ে ঘুম!

বলুন এর পরেও কি তাঁদের শরীর থাকবে?

অথচ ওদের পাশেই দেখুন আর এক জন খেলোয়াড়ের রাজসিক অবস্থা! খেলার দিক দিয়ে ওদের চেয়ে নিপুণ হোন কিম্বা না হোন কিছু যায় আসে না, যেহেতু তাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন—সেই কারণে তাঁদের জন্যে রাজসিক আয়োজন। তাঁরা থাকেন কলকাতার বড় হোটেল।

চাকরি-বাকরির ধার ধারেন না। প্রয়োজনও নেই। খেলাই তাঁদের যশ আর প্রতিপত্তির সংগে অর্ধও জোলাচ্ছে। তাই তাঁদের আছে নিশ্চিন্ত অবসর আর খাওয়া-দাওয়ার বাদসাহী ব্যবস্থা। তাঁদের জন্যে পান থেকে চুন ঝরার উপায় নেই!

সুতরাং নব্বুই মিনিটের খেলায় এঁদের হয়তো কিছু যায় আসে না।

আরো একটা বিষয় আছে—যার কথা আমরা আদর্শেও চিন্তা করি না। অন্যান্য দেশে খেলোয়াড়দের খেলার সংঘ্য খুবই কম। হস্তায় দু-তিনটির বেশি খেলায় তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হয় না! কিন্তু আমাদের দেশে?

আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের আছে ক্লাবের খেলা, আছে অফিসের খেলা, আর আছে পাড়ার কিম্বা দাম-পড়ে খেলা। ফলে দেখা যায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ই হয়ে-দরে হস্তায় পাঁচ-ছ'টি খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের খেলা আর কতোদিন থাকবে বলুন। এর ওপর যদি আবার নব্বুই মিনিটের জুজু, ভর করে তাহলে আর দেখতে হবে না। সোনায় সোহাগা।

খেলোয়াড়দের খেলার সময় যেমন কমবে, তেমনি সেই সংগে ভাল দিলে ভাগবে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য। অতি পরিশ্রমের ফলে ভরাবই যে হ্রাগটি হবার সম্ভাবনা থাকে—তার হাত থেকে রেহাই পেতে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে।

তা নাহলে একদিন হয়তো দেখা যাবে যে সব হারিয়ে তাঁরা দেউলিয়া হয়ে বসে আছেন! কারণ বিপদে পড়লে আই-এফ-এ তো দু'জনের কথা নিজের ক্লাবও ফিরে আসার না সাধারণ খেলোয়াড়দের দিকে!

কলকাতাতে যেমন দেহ-পট্টই সব, তেমনি খেলোয়াড়দের সব কিছুই হলো খেলা। যতোদিন খেলা আছে ততোদিনই তাঁদের দাম। একমাত্র অসামান্য নামীরা ছাড়া খেলা ছাড়লে খেলোয়াড়রা হয়ে পড়েন মল্যাহীন! একদিন তাঁদের নিয়ে যারা মাতামাতি করেছেন, তাঁরাই আর চিনতে পারেন না—শুধুসে দিনের খেলোয়াড়দের। খেলোয়াড়দের জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে!

ফলে খেলোয়াড়রা আগ্রাশ চেষ্টা করেন চট করে খেলা ছেড়ে না দিতে, কিম্বা যতোদিন সম্ভব খেলার অংশগ্রহণ করতে! কিন্তু নব্বুই মিনিটের খেলার ধকল সামলাতে খেলোয়াড়দের নিপুণতা যে দিনের পর দিন কমে শূন্য করবে সে

বিষয়ের কোন সন্দেহ নেই। ফলে যার দশ বছর খেলার সম্ভাবনা ছিলো, তিনি পাঁচ বছরও খেলতে পারবেন কি না সন্দেহ!

এর পরেও যদি বলি আই-এফ-এর এই সিদ্ধান্ত খেলোয়াড় নিখন যজ্ঞের সামিল তাহলে কি অন্যায় করা হবে?

অনেকে হয়তো এই আলোচনার সমালোচনা করে বলবেন, আমরা ফুটবল খেলার উন্নতি চাই না।

তাঁদের কি আমরা সর্নিয়ে জিজ্ঞাস্য করতে পারি যে লীগের খেলায় ওটা-নামা বন্ধ করে, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কদম্ব নোংরামি চালিয়ে যে ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষরা ফুটবল খেলার উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছেন, নব্বুই মিনিটের খেলার ব্যবস্থায় সাধারণ খেলোয়াড়দের নিখন বজ্র উত্থাপিত করে তাঁরাই যে আবার বাহবা কুড়োতে চাইছেন, এ কথাটা কেন আমাদের মাথায় ঢুকছে না?

নব্বুই মিনিটের খেলা আমরাও চাই! কিন্তু তার আগে আই-এফ-এ এক ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আমাদের আদর করতে হবে যে তাঁরা খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন, খেলোয়াড়রা যাতে অতিরিক্ত খেলায় অংশগ্রহণ করে অথবা পরিশ্রম করে শরীর ভেঙে না যেমন সৈনিককে দৃষ্টি দিতে হবে আর খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, অসুখ-বিসুখে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে আর প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্যে 'ইনজুরি ইনস্যুরেন্স' করে আহত হবার ভয় থেকে তাঁদের অন্তত কিছুটা নিশ্চিন্ত করতে হবে।

এই সব ব্যবস্থার গ্যারান্টি যদি তাঁরা দেন তবেই তাঁরা খেলোয়াড়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন বলে হাততালি কুড়োতে পারবেন।

আর তা না হলে নব্বুই মিনিট ধরে খেলিয়ে এই বাজারে খেলোয়াড়দের যদি তাঁরা নষ্ট করতে চান তাহলে এই কলকাতা আমাদের খেলোয়াড় নিখন বজ্র না বলে পারবো না!

বাংলা দেশের ক্রীড়াসিকদের কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা যেন খেলোয়াড়দের দিকে মহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে এ বিষয়ে একটু তৎপর হন, তা নাহলে বাংলা দেশের ফুটবল জগতের ওপর যে অশঙ্ক্যের কালিমা নেমে আসবে, ভবিষ্যতের হাজার চেষ্টাতেও সে বিপদ থেকে আমরা আর পার পেতে পারবো না!

এবার লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া

ইংলণ্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটের সম্মান ভুলুনিষ্ঠ করে ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে আবার ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের সফরসূচীও তৈরি হয়েছে। আগামী নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখে মাদ্রাজ থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ অতিমুখে ভারতীয় দল যাত্রা করবে। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দল খেলবে চারটি টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ড সফর শেষ করে ভারতীয় দল ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি দেশে ফিরবে।

ইংলণ্ডের মাঠে ভারতীয় দল যে শেডনীর ব্যর্থতার ছাপ রেখে এসেছে, আশা করছি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেই ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলার চেষ্টা তারা করবে। ইংলণ্ডের প্রতিকূল আবহাওয়ার দোহাই আর অস্ট্রেলিয়ায় দেওয়া চলবে না।

যে ভারতীয় দলটি ইংলণ্ড সফর শেষ করে এলেন, এর মধ্যে থেকে মনে হচ্ছে পাঁচ-ছয়জন বাদ পড়বেন অস্ট্রেলিয়া যাবার দল থেকে। নতুন দ্ব-একটি মুখ দেখা গেলেও একথা প্রায় নিশ্চিত যে জয়সীমা আবার ভারতীয় দলে ফিরে আসবেন।

ভারতীয় দলের তরুণ পেস বোলার সুব্রত গুহ অস্ট্রেলিয়ার মাঠে যে ভাল বল করতে পারবেন এ সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞরাই একমত। বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক আলেক্স ব্যালিস্টার স্পণ্ডভাবেই লিখেছেন যে সুব্রত গুহর বল অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে অনেক বেশি কর্মকরী হবে। ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের মাঝামাঝি সময় ব্যালিস্টার এই অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু দুঃখের কথা যে সুব্রত হাট্টেতে চোট পান লীডস টেস্টের পর। ইংলণ্ডে যদি যথা সময়ে সুব্রতর অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হত, তবে এতদিনে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হল হাট্টেতে এবং এখনও অন্তত ক্রমপক্ষে তাঁকে এক মাস থেকে দেড় মাস বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। পূর্বাঙ্গলের পক্ষে প্রথম খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন কি না সন্দেহ অবশ্য উত্তরাঙ্গলের বিপক্ষে পূর্বাঙ্গল জয়ী হলে সুব্রত কিছ্র সময় পাবেন এবং তাঁর একমাত্র খেলার সুযোগ থাকবে ইরানী ট্রফিতে।

রমেশ লাক্কনা এবং সুব্রহ্মণিয়ম অস্ট্রেলিয়া দলে থাকবেন কিনা বলা খুব মুশ্কিল। সদানন্দ মোহল এবং রুসী স্মিতির মধ্যে একজন মনে হচ্ছে বাদ যাবেন এবং ভেঙ্কটরাঘবন বোধ হয় টিকে যাবেন শেষ পর্যন্ত। বাংলা থেকে অম্বর রায়েব একমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে,



গঙ্গাবকে অনুষ্ঠিত বাহাদুর কিলোমিটার দস্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানীয়কারী বৈদ্যনাথ নাথ ও রাজিত ভালুকদার; উনিশ কিলোমিটারে দ্বিতীয় চিত্তপুরার রত্নরজন ধর এবং তাঁর ভ্রাতৃ রায়বলী ধর।

কিন্তু তাঁকে অবশ্যই দলীপ ট্রফিতে উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে এবং লড়ে ইরানী ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশে স্থান করে নিতে হবে।

ম্যানেজার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে একটু সতর্ক হতে হবে। অপদার্থ ম্যানেজাররা দলের বোঝা এবং খুবই ক্ষতির কারণ ঘটান। মিঃ তারাপোরের মত লোককে ম্যানেজারের গুরুত্বপূর্ণ পদ দিলে ক্রিকেট কন্ট্রোল

প্রীতিভিত্তিক

বোর্ড বিরাট ভুল করবে। ম্যানেজাররা যেন ভুলে না যান যে প্রমোদ ভ্রমণ বা দেশ ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্ত করতে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে না; দলের সঙ্গে অনর্থক একজন ট্রেনারর না পাঠিয়ে একজন খেলোয়াড় পাঠালে বোধ হয় অনেক বেশি উপকার হয়।

অবশ্য নিশ্চয় বলে যে প্রতিবাদ করে কোন ফল হবে না। কারণ এটাও ন্যাক কোটার ব্যাপার; নিখরচায় বিদেশ ঘুরিয়ে আনার একটা ন্যাক বোঝাপড়া কন্ট্রোল বোর্ডের কন্ট্রোলারদের মধ্যে আছে।

দলীপ ট্রফির খেলা এবার নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং বোম্বাই দল বনাম অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের ইরানী

ট্রফির খেলা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটি খেলার পর ভারতীয় ক্রিকেট দল ঘোষণা করা হবে।

নিরুত্তাপ শীল্ডের আসর

শীল্ডের খেলা গুটি গুটি পারে এগোচ্ছে; বোধ হয় লীগের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির অপেক্ষায়। আর তর পরই শীল্ডের আসর কিছ্রদিনের জন্য অন্তত আবার জন্মে উঠবে। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা তাই এফ এ শীল্ডের বর্তমানে অনেকটা জেগে ওঠে এসেছে। কারণ কলকাতার লাইগের দলগুলি আই এফ এ শীল্ডে এখনও আর আসতে চান না। কারণ বর্ধমান কলকাতা ময়দানের সঙ্গে হাপ হাইগে নেওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়। কিন্তু দিল্লীর ডুরান্ড এবং কোম্পানীর রোভার্স কাপের খেলায় অনেক বেশি দলের সমাগম হয়। তবে একথা ঠিক যে আই এফ এ শীল্ডের কোলীন এখনও নষ্ট হয় নি, কারণ স্থানীয় দলগুলির মধ্যে আছে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মহামোডান, বি এন রেল এবং ইস্টার্ন রেল প্রভৃতি দলগুলি। যাই হোক অন্যদের স্থানীয় ফুটবল পরিচালকদের একটু সক্রিয় হওয়া উচিত; এবং চেষ্টা করা উচিত যাতে অন্যান্য প্রদেশের নামজাদা দলগুলি আই এফ এ শীল্ডের আসরে শক্তি পরীক্ষা করতে আসেন।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

আই এফ এ শীল্ডের প্রথম রাউন্ডের কয়েকটি খেলা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটে নি। শীল্ডের উদ্‌বোধনী খেলায় এ বছর শীল্ডের প্রথম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বাটার পি বিশ্বাস। বাটা ৭-২ গোলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে পরাজিত করে।

খেলার ফলাফল:

প্রথম রাউন্ড:

বাটা (৭) : ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ (২)
ইস্টার্ন রেল (৪) : ক্যালকাটা জিমখানা (০)
খিদিরপুর (১) : পোর্ট কমিশনার্স (১)
কালীঘাট (০) : টালীগঞ্জ অগ্রগামী (০)
রাজস্থান (৩) : চন্দননগর স্পোর্টিং (০)
স্পোর্টিং ইউ (৪) : হাওড়া জেলা দল (২)
বালীপ্রতিভা (১) : হুগলী জেলা দল (১)

ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর প্রতীক হিসাবে রাশিয়ান ভাইস কনসুলেটের পক্ষ থেকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি আই এফ এ-কে প্রদান করা হয়। এই “সোভিয়েত দেশ” ট্রফি আই এফ এ শীল্ড বিজয়ীকে প্রদান করা হবে।

বৈদ্যনাথকে ইংলিশ চ্যানেলে পাঠান হোক

নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে বর্তমানে ভারতের দূরপাল্লার শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হলেন বৈদ্যনাথ নাথ। সম্প্রতি মর্শিদ্‌বাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৭২ কিলোমিটার গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পক-প্রণালী বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথ। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেছেন তিনি মাত্র নয় ঘণ্টা একশ মিনিট সময়ে। গত বছর এই ৭২ কিলোমিটার

সন্তরণে প্রথম স্থান অধিকার করে তরুণ বৈদ্যনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈদ্যনাথের সতীর্থ রঞ্জিত তালুকদার দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। ক্যালকাটা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের এবার জয়-জয়কার। এঁদের বৈদ্যনাথ এবং রঞ্জিতের সাফল্য ছাড়াও উনিশ কিলোমিটারে প্রথম স্থান দখলেরও সৌভাগ্য হয়েছে কালী-কিষ্কর মন্ডলের সাফল্যের মাধ্যমে।

ক্যালকাটা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন না। কিন্তু সত্যি বলতে কি এই সংস্থাটি একটি রহস্যময়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে ক্যালকাটা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন বৈদ্যনাথ, রঞ্জিত এবং কালীকিষ্করের মত অনেক সাঁতারুই দেশকে উপহার দিতে পারবে। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া লেক অধুনা রবীন্দ্র সরোবরে সাধারণের স্নানের জন্য নির্দুর্ভাগ্য স্থানের এক পাশে জায়গা করে নিয়েছে এই সংস্থার ছেলেরা। বহু অসুবিধার মধ্যেও এঁদের ছেলেরা কিন্তু নিয়মিত অনুশীলন করতে দেখা যায়।

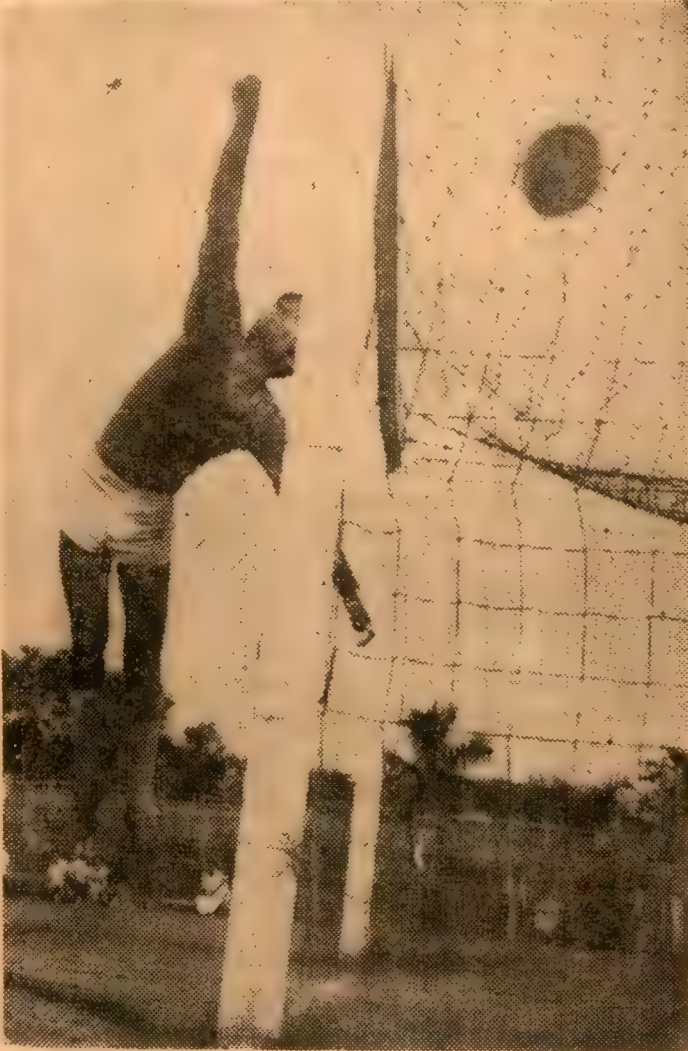
গত বছর পক-প্রণালীতে সাঁতার দেবার জন্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে রঞ্জিতেরও যাবার কথা ছিল এবং সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হলেও শেষ সময়ে কোন কারণে তাঁর আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পক-প্রণালীর জলে নামলে রঞ্জিতও উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারতেন।

বৈদ্যনাথ এখন পারদর্শিতার শীর্ষে এখন তাঁকে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করতে পাঠালে তিনি নিশ্চয়ই জয় করে আসতে পারতেন ইংলিশ চ্যানেল। কিন্তু বৈদ্যনাথ যদি এই সুযোগ না পান তবে সে দুর্ভাগ্য শূন্য তাঁরই হবে না, হবে আমাদের দেশেরও।

৭২ কিলোমিটার সন্তরণ শুরুর হয় জগদীপুর থেকে এবং ১১ কিলোমিটার সন্তরণ জিয়াগঞ্জ থেকে এবং শেষ সীমা ছিল গোড়াবাজার ঘাটে। আগরতলার কুমারী রস্মারাণী ধর উনিশ মাইল সন্তরণে অংশ গ্রহণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য সময়ের মধ্যেই শেষ সীমায় উপনীত হন। রস্মাবলীর সহোদর ভ্রাতা রত্নরঞ্জন ধর ১১ কিলোমিটারে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। প্রথম স্থানাধিকারী কালীকিষ্কর মন্ডলের সময় লাগে ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ।

অবশেষে টনক নড়েছে

অনেক দূঃখে ভারতীয় ফুটবল দলে কোচ গ্রীহোসেন স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় দলের আরও বেশিদিন কোচিং-এর প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে ভারতীয় দল শক্তিশালী হলেও, অল্প সময়ের জন্য



আই-এফ-এ শীল্ডের প্রথম রাউন্ডে রাজস্থান এবং চন্দননগর দলের খেলার একটি দৃশ্য।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

উপযুক্ত কোচিং-এর অভাবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই দুর্দশা। ভারতীয় ক্রিকেট তৈরি করার জন্যে তিনি নাকি মাত্র তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছেন।



লোভিতোত বেশ কাশ

অগামী বছর তিনি পাঁচ সপ্তাহের শিক্ষাদান পূর্বের জন্যে সুপারিশ করবেন। গত সপ্তাহে আমরা মাডেকা ক্রিকেট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই লিখেছিলাম যে এত অল্প সময়ে একটা ভারতীয় দল খাড়া করাই যায়, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। যাই হোক আমাদের আনন্দের কথা যে লেটে বৃদ্ধলও অন্তত কোচ হোসেন সাহেব এই সত্যটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পরলোকে অতীতের টেন্ট ক্রিকেটার

অবিজ্ঞত ভারতের টেন্ট খেলোয়াড় দিলওয়ার হোসেন পরলোক গমন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দিলওয়ার হোসেন ছিলেন ভারতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষক এবং ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। জার্ডিনের নেতৃত্বে আগত ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলটির বিপক্ষে তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে খেলেন। ১৯০৬ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় দলের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। বর্তমান ইংল্যান্ড সফররত পাকিস্তান দলের খেলোয়াড় ওয়াকার আমেদ হলেন দিলওয়ারের পুত্র। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ওয়াকার ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। আমরা অতীতের এই দিকপাল ক্রিকেটারের স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্রাটের বর্ণন

ওডালের তৃতীয় এবং শেষ টেন্ট খেলার ইংল্যান্ড পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে আট উইকেটে। আসিফ ইকবালের ব্যক্তিগত ১৪৬ রান পাকিস্তানকে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আসিফ এবং ইমতিয়ান নবম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। পূর্বের বিশ্ব রেকর্ডটি ছিল কলিন কাউন্ট এবং অ্যালান স্মিথের।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটদল তৃতীয় এবং শেষ টেন্টে স্কটিশ স্কুলকে এক ইনিংস এবং ৮৫ রানে পরাজিত করেছে। ভারতীয় দলের লক্ষণ সিং ১১২ রান সংগ্রহ করে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ভারতীয় দলের জয়ে সাহায্য করে দীপক সরকার এবং বশবীর সিংয়ের সুন্দর বোলিং। লিস্কান সায়ার কাউন্ট কোন্টস দলের বিপক্ষেও লক্ষণ সিং সেঞ্চুরী করেন ১৪৮ রান সংগ্রহ করে। রাজ মুখার্জী এবং লক্ষণ সিং প্রথম উইকেট জুটিতে মাত্র তিন ঘণ্টার ২১৮ রান সংগ্রহ করেন।

প্রথম অনুষ্ঠিত পেশাদার উইমবলডেন টেনিস প্রতিযোগিতার রড লেভার বিজয়ী হয়ে তিন হাজার পাউন্ডের নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬১-৬২ সালের অপেশাদার উইমবলডেন বিজয়ী রড লেভার ফাইনালে তারাই সতীর্থ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করেন।

টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে পঞ্চম বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জাপানের রাজপুত্র অকিজিডো। এই প্রতিযোগিতা ১৯৬৪ সালের ঐতিহাসিক অলিম্পিক ট্র্যাকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্রিটিশ দেশের প্রায় এক হাজার প্রতিনিধী এবার অংশ গ্রহণ করছেন।



ওনিশ ক্রিকেটারের দ্বন্দ্ববনে বিজয়ী কলীকিন্দর দ্বন্দ্বল সাতারের শেষ সীমানার

পরিচয়

এই তো সেদিনের কথা! মাস দু'য়েক হয়েছে বোধহয়। খেলা ছিলো ইন্সটিটিউটের সঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিং-এর। অসীম মৌলিকের দূর পাল্লায় চকিত শটে পরাস্ত হলেন মহামেডান দলের গোলরক্ষক। আর চমৎকৃত হলেন ইডেন উদ্যানে সমবেত হাজার হাজার দর্শক! অসীমের গোলে এগিয়ে গেলো ইন্সটিটিউট!

কিন্তু অগ্রগতি অব্যাহত রইলো না! দ্বিতীয়বারে মহামেডান স্পোর্টিং দল পর পর দু'টি গোল করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করলো তখনো পর্যন্ত অপরাজিত দল ইন্সটিটিউটকে!

সেদিন খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এমন এক দৃশ্য যা আগে কোনদিন দেখি নি—ভবিষ্যতেও দেখবো কিনা সন্দেহ। দেখলাম ভাঙা মাঠে মৌলিক অসীম দুঃখে কাদছেন।

পরাজয়ের জ্বালা, পরাজয়ের দুঃখ বড় কষ্টের। আশা ভগ্নের হতাশায় মন-প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে কান্না! না এর আগে কখনো দেখি নি। তবে এটুকু বুঝি যে কতো আন্তরিকতা থাকলে, আর কতো দুঃখ পেলে তবেই কষ্টগুলো কান্না হয়ে নেমে আসে।

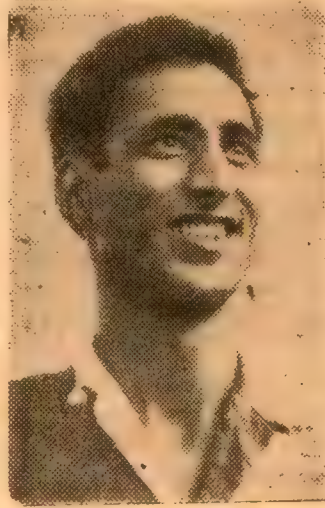
তাই অসীম মৌলিকের তুলনা হয় না। খেলাধূলিকে এতো ভালোবাসতে খুব কম খেলোয়াড়কেই দেখেছি। তবু অসীম ব্যতিক্রম! আজকালকার খেলোয়াড়দের খেলেয়াড়ী মনোভাবের পাশে অসীম সত্যিই ব্যতিক্রম। তাই বারবার দেখেছি মাঠে একটু গোলমাল হলে সবার আগে অসীমই ছুটে যান সে গন্ডগোল থামাতে!

কারণ শ্যামবাজারের এই ছেলেরা যে জানেন গন্ডগোলে লাভ হয় না কারো এবং ক্ষতির পরিমাণই বাড়ে!

জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্টই পেয়েছেন অসীম! আজ ফুটবলই তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এনে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য! কিন্তু এখনো তো তাঁর মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা! মনে পড়ে অভাবের জ্বালায় একদিন তাঁকে অতি সাধারণ কাজ নিয়ে যেতে হয়েছিলো বাইরে।

তবু শ্যামবাজারের এই ছেলেরা, ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে যার এক অস্বাভাবিক পরিবারে জন্ম, ছোটবেলা থেকে পাড়াশোনার সঙ্গে খেলাধূলি করে উজ্জ্বল

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন, তারপর জীবনের বাস্তবতা তাঁকে এনে ফেলেছে দুঃখ আর নিষ্ঠুর শোকের মধ্যে, তাঁর মনোবল ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছে, সংসার তাঁকে নিয়ে খেলতে চেয়েছে ছিনিমিনি—তবু তিনি ভেঙে পড়েন নি, নতি স্বীকার করেন নি। নিজের আত্ম-বিশ্বাস আর পৌরুষ আজ তাঁকে টেনে এনেছে প্রতিষ্ঠিত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে।



অসীম মৌলিক

ছোটবেলায় অসীম পড়তেন পাক ইন্সটিটিউশনে। সেখান থেকে এলেন বিদ্যাসাগর স্কুলে, আর তারপর বিদ্যাসাগর কলেজে! কিন্তু বোঁশদুর পড়তে পারলেন না অসীম! পিতার মৃত্যুর পর পুরো সংসারের জোয়াল কাঁধে করে রেলের চাকরি নিয়ে যেতে হলো গয়ায়।

কিন্তু তারপর! যে সংসার একদিন তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরুর করেছিলো, সেই বাস্তবই তাঁকে ফিরিয়ে দিলো প্রতিষ্ঠিত ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে!

কলকাতা ময়দানে অসীম খেলতে এসেছিলেন তৃতীয় ডিভিশনে এলবার্ট ক্লাবের পক্ষে। ১৯৬১ সালে তাঁকে দেখা

গেলো এরিসাস দলের হয়ে প্রথম ডিভিশনে খেলতে! কিন্তু দু'টি বছর গেলো না ইন্সটিটিউট ক্লাব অসীম মৌলিককে টেনে নিলো নিজের দলে। আর ইন্সটিটিউটের পক্ষে প্রথম খেলাতেই বাজী মাং করে অসীম দিলেন আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। রাতারাতি অসীম মৌলিক হয়ে উঠলেন বিখ্যাত। তারপর কয়েকটা বছর কেটে গেলো ইন্সটিটিউটের জার্সি গায়ে দিয়ে। তবে গত বছর অসীম এসেছিলেন মোহনবাগানে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবার ফিরে গেছেন নিজের পুরনো ক্লাব—ইন্সটিটিউটে।

সন্তোষ ট্রাফিকে অসীম বাংলার পক্ষে খেলেছেন ১৯৬২ আর ১৯৬৬ সালে। মধ্যের বছর কটা তাঁকে খেলতে হয়েছে রেল দলের পক্ষে। ১৯৬৪ আর '৬৫ সালে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে অসীম গিয়েছিলেন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে। এ ছাড়া অসীম খেলেছেন হাঙ্গেরী, চেকো-স্লোভাকিয়া আর রুশ দলের বিরুদ্ধেও।

অসীমের খেলা আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে যখন দাঁখি পরম আন্তরিকতায় অসীম মৌলিক মাঠের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত ছুটোছুটি করে চলেছেন প্রচণ্ড পরিশ্রম করা সত্ত্বেও!

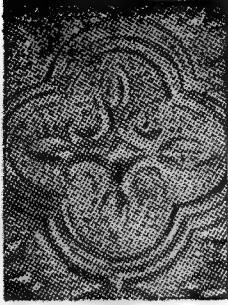
অসীমের খেলার সব থেকে বড় গুণ হলো তাঁর ঐ আন্তরিকতা! এ ছাড়া আছে তাঁর দু'পায়ে জোরাল শট, আছে অফুরন্ত দম। অনেকে বলেন, অসীমের ফুটবল সেন্স বুঝি একটু কম! কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই! কারণ অসীমের ফুটবল সেন্স ক'হলে তাঁর ঐ নিখুঁত পজিশন জ্ঞান আর চমৎকার পাসিং—কিছুতেই সম্ভব হতো না!

অসীম মৌলিক আজ কলকাতা ময়দানের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়। নামী এবং দামী খেলোয়াড়দের তালিকাভুক্ত কিন্তু আমরা চাই ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে মৌলিকের অসীম বিকাশ! আমরা চাই অসীম আরো ভালো খেলুন, অর্জন করুন আরো সুনাম। শৃঙ্খল বাংলা দেশ নয়, সমস্ত ভারতের নাম উজ্জ্বল করে দেশে বিদেশে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ছড়িয়ে পড়ুক মৌলিকের নাম! আমরা জানি সে সম্ভাবনা অসীমের মধ্যে আছে। কিন্তু চাই তার ক্রমবিকাশ।

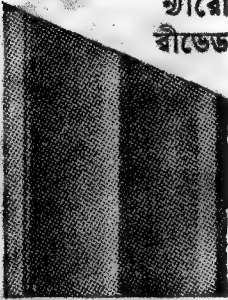
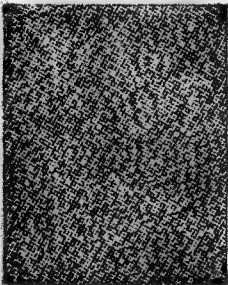
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুদমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২

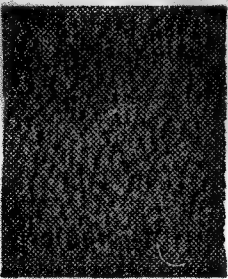
বসুদমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।



মরেক

চারো
বীভেড

মরকো পিন্‌হেড



রাফকাট

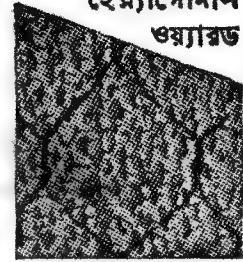
18 SEP 1967

আজকালকার স্বপতির বৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্রাস ব্যবহার করেন

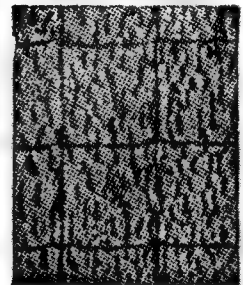
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইকুল ও হাসপাতালে স্বপক ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্রাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্রাস উৎকর্ষের নিষ্ঠুর মান দ্বারা যথেষ্ট তৈরী হয়। বিশেষতঃ শতাব্দিক শ্রমের কাচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিসকিংটন ব্রাথার্স-এর কারিগরী কৃৎসলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিসকিংটন গ্রাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্রাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাসু ভিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিসকিংটন
গ্রাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হেল্পাগোনাল
ওয়ার্ড

শীট গ্রাস



জর্জিয়ান ওয়ার্ড



ছামাড

হ্যান্ডেলিং এজেন্টস
ভালুকবার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাডমিনিষ্ট্রি,
কলিকাতা-১০

সাপ্তাহিক বাসুমতী

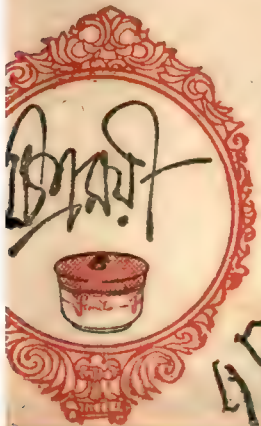
মেদিনীপুরের বন্যায় লক্ষ লক্ষ
মানুষ বিপন্ন



বর্ষ : ১৪৮ সংখ্যা. বৃহস্পতিবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ



14th Sept., 1967 * Vol. 72, No.



ছবিতে মৃত মৃগ যার তাকেই বলি চিহ্নমণী।

ফার্মাশো প্রা

(ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।)

মোহনগোবিন্দ হাট, কলিকতা



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
জন্মদায়কীয়	১০০	৮৩৬
জন্মকের মন্মথ	১০০	৮৩৬
জন্মদর্শন	১০০	৮৩৭
জন্মতত্ত্ব	— চন্দ্রগুপ্ত	৮৪১
মা মেথেরি, যা মেথেরি (স্মৃতিচয়ন)	— সূর্যসুন্দর দাস	৮৪৬
ভারতদর্শন	—	৮৪৮
জান্তর্জাতিক	—	৮৫২
নদী জপমালা (শ্রমণ-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	৮৫৬
জগদ্বিশ্বের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৮৬০
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৮৬৬
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	৮৭০

আগামী শারদীয় নতুন সাহিত্য

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ—ষষ্ঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫
 তারাকর বন্দ্যোপাধ্যায়—শুকসারী কথা (উপন্যাস) ৮
 সৈয়দ মুজতবা আলী—পছন্দসই ৭
 জরাসন্ধ—লৌহকপাট (সম্পূর্ণ—চারিখণ্ড একত্রে। শোভন সং) ২০
 হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—পূর্বাচল (উপন্যাস) ১২
 প্রফুল্ল রায়—কিন্নরী (উপন্যাস) ৫
 প্রফুল্ল রায়—পূর্ব-পার্বতী (উপন্যাস) ১০
 সূর্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়—হিমালয়ের তিব্বতী তীর্থ ৩
 মৈনাক—সুবর্ণরেখার তীরে (উপন্যাস) ৫
 হিরন্ময় ভট্টাচার্য—মহামুগুর ৪

II গ্রন্থসম্ভার II

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—কুমুদ কাব্যসম্ভার ১০
 ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১০

II ছোটদের II

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০
 আশাপূর্ণা দেবী—সেই সব গল্প ৭

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮

II দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হ'ল II

বিমল মিত্রের

সখী সমাচার ৬

II দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হ'ল II

মিঃ ও বোম্ব : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ : ৩৪-৮৭৯১



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মূল্য
হবেই দেখা (কবিতা)	— আশিস মদ্যোপাধ্যায়	৪৭৫	৪৭৫
বিদ্যা বাউলীর বসন্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৬	৪৭৬
মনের গহনে (গল্প)	— ছবি বসু	৪৭৭	৪৭৭
ইতিহাস থেকে (কবিতা)	— দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৪৮১	৪৮১
সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্ত হলে (কবিতা)	— সূচেনা ভট্টাচার্য	৪৮২	৪৮২
প্রথমিকা	—	৪৮২	৪৮২
প্রথমিক—ওমেসে এবং এমেসে	— শিল্পালি	৪৮৪	৪৮৪
প্রথমিকগণ	—	৪৮৭	৪৮৭
পাঠকমন	—	৪৯৫	৪৯৫
খেলাঘরা	— শ্রীআমতা	৪৯৮	৪৯৮
পরিচীর্ণ	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯৬	৪৯৬

—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ্য—

“যদিও মা তোর দিবা আলোকে
যেহে আছে আজ আঁধার ঘোর;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে হোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।
মানুষ আমরা নহি তো মেঘ।
দেবী আমার! সাধন আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!”

মাকুলন্ডের ঐক্য অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের
স্বপ্নদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড :

সাজাহান, সিংহলবিজয়, সোরাব রত্নতম, পরপারে।

মূল্য—৬.০০

দ্বিতীয় খণ্ড :

বিরহ, সীতা, ভীষ্ম, বঙ্গনারী, আনন্দবিদ্যায়।

মূল্য—৬.০০

তৃতীয় খণ্ড :

চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, কলিক অবতারণ।

মূল্য—৮.০০

(প্রতিটি খণ্ড মূদ্রণ পারিপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্ষে মনোহর। কাপড় ও
বোর্ডে বাঁধা। কবির প্রতিষ্ঠিত সমন্বিত সদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যেষ্ঠ।)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২



৭২ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
মাস্টার্স পত্রিকা

Price : 25 PAISE
Thursday, 14th September, 1967

ভাষা-নীতি

কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা-নীতির ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা পদত্যাগ করেছেন। শিক্ষাসংক্রান্ত ভাষা-নীতির বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ। শিক্ষাদপ্তরে গৃহীত কোনো বিষয়ের উপর শ্রীচাগলার দরাসার দাবি নেই। তবু মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বোধ। সেই কারণে শিক্ষাসংক্রান্ত ভাষা-নীতিতে জন্মে তিনি নিজেকেও দায়ী মনে করেছেন এবং সেই নীতি জাতির সংহতি বিরোধী মনে হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর এই ধারণার পদ-ত্যাগের জন্যে মূলত দায়ী কারা বা কে সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না। কিন্তু শ্রীচাগলার পদত্যাগের পর ভাবতের বহু আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ ভাষা-নীতিতে বিরুদ্ধে মূর্খ হইয়াছেন। তাঁদের অভিমতে, আঞ্চলিক ভাষায় তাড়াতাড়ি করে আদালতের কাজ-কর্ম সুরু করলে এবং প্রাচীন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করলে দেশে আইন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে। সব চেয়ে বড় কথা, দেশের সংহতি বিনষ্ট হবে। অবশ্য পদত্যাগপত্রে শ্রীচাগলাও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করেন নি, তিনি চেয়েছেন ঐ ভাষা বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগের আগেই ভাষার উন্নতির জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে দেশের উচ্চশিক্ষা কোনোমতেই ব্যাহত না হয়।

আমরাও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা (বা আঞ্চলিক ভাষা) ব্যবহারের বিরোধী নই। বলা বাহুল্য, গত বিশ বছর ভাষা নিয়ে যেভাবে ধানাই-পানাই করা হয়েছে, হিন্দীঅলারা যেভাবে অহিন্দী-ভাষীদের হিন্দী ভাষা গ্রহণের

জন্যে শাসন দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে হিন্দীর প্রতি আর্থিক কৃপা বর্ষণ করেছেন এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলি অবহেলিত হয়েছে, তাতে মাতৃভাষাকে (বা আঞ্চলিক ভাষাকে) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দাপট এমনই যে, উগ্র হিন্দী সমর্থকগণ ভাবতের উচ্চ আদালত ও বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি বা মাতৃভাষাকে গ্রহণের পরিবর্তে হিন্দী চালাবার দৃষ্টিপন দেখেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী নাগরিকের ট্যাক্সে পরিচালিত সরকারের অর্থ হিন্দীর জন্যে অর্পণ করা হয়েছে। যে কোনো রাজ্যের স্টেশনে পোস্ট আপসে, কেন্দ্রীয় সরকারের আপসে, আকাশবাণীতে এবং রাজ্য সরকারের অনেক শাখায় তাই হিন্দীর প্রয়োগ দেখা গেছে। সে সব স্থলে অন্যান্য ভাষাগুলি অস্তিত্ব রূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন কি, পরলোকগত দুই প্রধানমন্ত্রী—শ্রীনেহরু ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (অহিন্দীভাষীরা) হিন্দীকে যতোদিন না গ্রহণ কবছে ততোদিন ইংরেজি থাকবেই) পালন করার ব্যাপারে অনেক গড়িমসি দেখানো হচ্ছে।

সেই কারণে সংসদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি দ্বিভাষা নীতি গ্রহণের সুপারিশ নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা সুরু কবেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভাষা-নীতি পনরই আগস্ট প্রকাশ্যে জানা-বার কথা বললেও তা কবতে পাবেন নি।

শিক্ষামন্ত্রী যাই বলুন না কেন, একোয় নামে হিন্দী কায়ম করা হিন্দী-ভাষীদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে উপ-

প্রধানমন্ত্রী নাছোড়বন্দা। প্রধানমন্ত্রীও প্রায় অসহায় অবস্থায় হিন্দীঅলাদের জিদ মেনে নিতে এখন আব দ্বিভাষ্যন্ত ন'ন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রিয়দূনা সেনও উচ্চশিক্ষা পর্ষায়ে এখন হিন্দীই সমর্থক। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে সরকারের ভাষা-নীতি এখন অন্দরমহলে আলোড়িত হচ্ছে এবং সংসদে বিল আনার ব্যাপারেও বার বার ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

বলা নিস্প্রয়োজন, আমরা হিন্দীই বিরোধী নই। আমাদের বিরোধিতা উগ্র হিন্দীঅলাদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। আমরা মনে করি, মাতৃভাষায় (বা আঞ্চলিক ভাষা) উচ্চস্তরে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীকে বিদ্যায় দেওয়াও অকম্পনীয়। কারণ বিভিন্ন মূল পুস্তক পাঠ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য যদি ইংরেজী অপরিহার্য হয়, তাহলে হিন্দীকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান অনুচিত।

দেশে যখন বৈচিত্র্যের মধ্যে একা স্থাপনের কথা বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর গোড়া হিন্দীঅলাব জন্যে দেশের একা ভাঙতে বসেছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। দক্ষিণাঞ্চল এখন তিস্ত, পূর্বাঞ্চলও তৃপ্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা-নীতি কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বাধা পরিচালিত না হলেই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বার্থপর মহলের প্রয়োচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা-ভাষা ভাষা-নীতি গৃহীত হলে দেশের একা ক্ষুব্ধ হবে।

সিদ্ধান্তকায়

আজকের মানুষ

১৯৫৮ সাল। এল-আহ-সার বিনিয়োগ ও লেনদেনের কথা উল্লেখ করে এক চাণ্ডালকর রিপোর্ট বেরুল। সারা দেশে পড়ল সাড়া। নেহরু কোবিনেটের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠল, বিদায় নিতে হল অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে। হরিদাস মুন্সীর চাভুরী ফাঁস হল। এমন 'সর্বনাশা' রিপোর্ট দিলেন কে? না, শ্রী এম সি চাগলা, বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মহম্মদ আলি করিম চাগলা। সেদিন সারা ভারতে তিনি একটা সংবাদ চাঁকে নিয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে অফিসে-আদালতে, হোটেল-রেস্তোরাঁর আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের ঝড়। আজ নব্বইয়ের পরে আরেকবার উত্তাল হল ভারতভূমি। শ্রীচাগলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। একঘণ্টা আগেও কাউকে অনুমান করতে দেন নি কী কঠোর নিষ্পত্তি তিনি নিতে চলেছেন। কিন্তু তার বৈদেশিক দপ্তরের অস্তিত্ব কোন বিষয়ে মতভেদ হবার মরুণ্ড তার পদত্যাগ নয়, শ্রীচাগলা ইন্দিরা-মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন ভাষার প্রশ্নে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করার স্বপক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ চন্দ্ৰগুপ্ত সেনের ঘোষণার পবিত্রক্ষেত্রেই শ্রীচাগলা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন। আজকের মন্ত্রিসভা ত্যাগের মত মন্ত্রিসভার শ্রীচাগলার যোগদানও সেদিন আকস্মিক ছিল। বোগ্যতার প্রশ্ন নয়, কারণ যখনই যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তখনই তিনি নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করেছেন। শ্রীনেহরু একদিন তাঁকে মন্ত্রিসভায় এনেছিলেন, তার দিয়েছিলেন শিক্ষাদপ্তরের। সেদিন নেহরু যে প্রার্থী নির্বাচনে ছল করেন নি, শ্রীচাগলা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে বার বার তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই থেকে তিনি কেন্দ্রীয়

মন্ত্রিসভায় ছিলেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কেবিনেটেও তাঁর অনিবার্য উপস্থিতি ঘটতে দেখা গিয়েছে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই শ্রীচাগলা নানাদিকে মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। বোম্বাইয়ের সেন্ট জোভিয়াল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেত পাড়ি দেন। লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে ১৯২২ সালে ব্যারিস্টারি পাস করলেন চাগলা, কিন্তু দেশে ফিরে হঠাৎ সঙ্গে গিয়ে কালো কোট ফুলে



শ্রীচাগলা

নিতে পারেন নি। বোম্বে সরকারী ল' কলেজে অধ্যাপনা করেছেন বরং কিছুকাল। বছর দশেক ব্যারিস্টারি করেছেন তিনি বোম্বে হাইকোর্টে, তার মধ্যে আট বছরই বার কাউন্সিলের সেক্রেটারি ছিলেন।

বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ নিযুক্ত হলেন চাগলা ১৯৪১ সালে, ঐ পদে '৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তারপর '৫৮ সাল পর্যন্ত এগারো বছর ধরে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। বৃহৎ উপস্থাপনার তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা, বিরোধীপক্ষের যুক্তিখণ্ডনে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা, তাঁর সামনে উন্নতির সোপান রচনা করেছে। তাঁর সুক্ষ্ম বিচারদৃষ্টি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি শীগগিরই তাঁকে নতুন নতুন সম্মান এনে দিল। লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ পেলে তিনি, ল' কমিশনের সদস্যপদও। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি।

এর পর আন্তর্জাতিক সম্মান জুটতেও দৌঁড়ি হল না। ১৯৫৭-৬০ সাল পর্যন্ত তিনি হেগ-এর আন্তর্জাতিক কিডারালয়ের অন্যতম জজ নির্বাচিত হলেন। তারপর রাজনীতিতে এলেন তিনি, যদিও গোড়ায় সক্রিয়ভাবে নয়। ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত শ্রীচাগলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেখান থেকে লন্ডনে ভারতের হাই কমিশনার (১৯৬২-৬৩)। এ ছাড়াও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে কয়েকবার রাষ্ট্রসংঘে যাবার কৃতিত্বও তাঁর রয়েছে।

শ্রীনেহরু তাঁকে শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানীয় পদ দিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে, সেই থেকে রাজ্যসভারও সদস্য তিনি। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি যে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন তাতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। বস্তুত তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভা এবং রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গে নিয়ে তাঁর দৃষ্ট ভাষণ ইত্যাদি দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদটি দেন।

বৈদেশিক দপ্তরের ভার নিয়েও শ্রীচাগলা দপ্তরটিতে নতুন আবহাওয়া এবং ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তিনি মাত্র ক'দিন আগে বক্তৃতা দিয়েছেন, এবং ভারতবাসী আশা করছিলেন, ঐ দুটো রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ মেটাবার পথে নতুন পদক্ষেপ নেবেন এবার ভারত সরকার। কিন্তু তার আগেই তিনি বিদায় নিলেন।

চাগলা কি স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা ছাড়লেন, না ছাড়তে বাধ্য হলেন? রাজনৈতিক পিণ্ডিতদের ধারণা, একজন নতুন তরুণ প্রার্থীর স্থান করে দেবার জন্যে নাকি শ্রীমতী গান্ধীর-ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল শ্রীচাগলার বিরুদ্ধে। বৈদেশিক দপ্তরটি আপাতত প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন। ঐ পদে নতুন ভরদণ্ডটি কি দীনেশ সিং?

অবশ্য রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা পার্থসারথীর নামও শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদেব জন্ম একটি আচরণবিধি রচিত হয়েছে যার মূল বক্তব্য হল একজন মন্ত্রী অপর কোন মন্ত্রী বা তাঁর দপ্তর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করবেন না, এবং সংশ্লিষ্ট দলগলিও এ ব্যাপারে সংবাদের পরিচয় দেবেন। বস্তুত বেশ কিছুকাল ধরে মন্ত্রী-দেব মধ্যে পারস্পরিক কামড়া-কামাড়ির মনোভাব এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা একে অন্যের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে যেমন বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে চল-ছিলেন তাতে সাধারণ মানুষের মনে সরকার সম্বন্ধে অনাস্থার ভাবটাই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রীদেব অনেকেই একটি বিশ্বয় কোনদিনই খেয়াল করেন নি, বা কর-বার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন নি যে, ক্যাবিনেটের দায়িত্ব যৌগ; কাজেই যে দপ্তরের সমালোচনা মন্ত্রীমহাশয় করছেন তার জন্য তাঁরও দায়িত্ব আছে। বহুক্ষেত্রে তাঁরা একে অন্যের দপ্তর সম্বন্ধে যে সব মতামত প্রকাশ করেছেন তা ভব্যতা ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। এর প্রতিভিত্তি জনচিন্তে মোটেই সফলপ্রসূ হয় নি।

খোদ মন্ত্রীদেব আচরণেই যদি পারস্পরিক কামড়া-কামাড়ির মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহলে সেই গভর্নমেন্টকে কে প্রশংসা করবে, বা তার নির্দেশ কে মেনে চলবে? এরই সুযোগ নিয়ে কয়েকটি সংবাদপত্র তারস্বরে চাঁৎকার জুড়ে দিয়েছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আয়, আর বেশিফণ নয়, একটি সংবাদপত্র তো ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড মেপে ভবিষ্যৎবাণী করে চলেছিল। এই সমস্তের প্রভাব জনচিন্তের উপর নিশ্চয়ই পড়েছে, এবং তার ফলে সর্বত্র একটা অনাস্থার ভাব বিরাজ করছিল। সুখের বিষয়, বর্তমান আচরণবিধি যদি মন্ত্রীমহাশয় মেনে চলেন, তাহলে ভবি-ষ্যতে তাঁরা অনেক কামেলা থেকে অব্যাহতি পাবেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই মন্ত্রীদেব পরস্পরবিরোধী উত্তিসমূহ কোন সমস্যারই সমাধান করে নি, উল্টে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে যার ধাক্কা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্রমাগত অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। সমাজবিরোধী ব্যক্তির, মালিক, মজুতদার-কালোবাজারীরা যদি এই ধারণা করতে সমর্থ হয় যে, মন্ত্রিসভায় কোন একা নেই তাহলে তারা যে আইনকে ব্যর্থগার্ভে দেখাবে এতে আর সন্দেহের কি আছে? এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছে। যাই হোক মন্ত্রীদেব যে বিলম্বেও চৈতন্যো-দগ্ন হয়েছেন এটাই আনন্দের কথা। এই প্রলোভন আমরা পূর্বে একবার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে, মন্ত্রীদেব জিহ্বা শাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি বাস্তবিকই তাঁরা তা করতে সমর্থ হন, তাহলে আজকে দেশ জুড়ে যে অনাস্থার মনোভাব গড়ে



মেদিনীপুরের কন্যার সর্বস্বাস্তবের একজন—

উঠেছে তার পরিবর্তন হবে। দায়িত্ব এড়িয়ে অপরের ঘাড় দোষ চাপানোর মধ্যে কোন কৃতিত্ব বা পৌরুষ নেই একথা মন্ত্রীদেব জানা উচিত। তাঁরা যেখানে যেখানে সফল হয়েছেন তার কৃতিত্ব সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভারই প্রাপ্য এবং যেখানে যেখানে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, সে ব্যর্থতার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কোন সদস্যকে স্ক্রিপগোট করলেই ব্যাপারটা সরল হয় না, শোভনও হয় না; পক্ষান্তরে নিজে-দেরই জনচক্ষে খেলো হতে হয়, যা তাঁরা হয়েছেন। এখন এই আচরণবিধি প্রণীত হবার পর মন্ত্রিবর্গের কর্তব্য যেসব রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে তাঁরা এসেছেন সেই সব দলকেও এ বিষয়ে

সজাগ করা। চৈতন্যোদয় বিলম্বে হলেও ভাল, বেটার লেট দ্যান নেভার।

মেদিনীপুরের কন্যা

সংবাদপত্র মারফত সকলেই অবগত হয়েছেন যে, মেদিনীপুরের কন্যার পাশ্চিম-বঙ্গের নিদারুণ কৃতি হয়েছে। এই কন্যার যে ক্ষমতি হয়েছে তার পরিমাণ বিশ কোটি টাকারও বেশি আর যে মনুষ্য-সম্পদ নষ্ট হয়েছে (যেটা গ্যারান্টি এদেশে মানুষকে সম্পদ বলে মনে করা হয় না) তা তো পূরণ হবার নয়।

‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর কয়েক হাত নেই’ বা ‘ভগবান মেরেছেন কি করা যাবে’ এই জাতীয় স্তোকবাক্য উচ্চারণ করা আমরা মহাপাপ বলে মনে করি।

হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তিন তিনটে তথাকথিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার করতে যারা বিশ বছরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত একটা অতি সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি তাদের নিন্দাবাদ করার মত ভাষা আমাদের নেই। এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় সারা ভারতেরই সমস্যা, আজ থেকে নয়, আবহমান কাল ধরে। অথচ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মনোনিবেশ এবং প্রাণিক কমিশনের অনারেল সদস্যরা গত বিশ বছরে নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন এবং পরিকল্পনার নামে পরী-কল্পনা বানিয়ে অনুগ্রহভাজনদের পকেটে টাকা ভুলে দিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ তাদের ছিল না।

প্রাণিক কমিশন আসলে একটি পুনর্বাসন দপ্তর, যেখানে নির্বাচনে ধরাশায়ী মন্ত্রীদেব পুনর্বাসন দেওয়া হয়, এটা একজন খুবই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের মন্তব্য। কাজেই তাঁদের মগজ থেকে কার্যকরী কিছু বেরবে এটা আমাদের আশা করা অন্যায়। রাজা হবচন্দ্রের পারে খুলো লাগবে, অভাব 'চর্ম' দিয়া মূড়িয়া দাও পৃথবী' এবং তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার ঋণ নিয়ে দেশবাসীর অধস্তন সাত পুরুষের মাথার সব ক'গাছা চুল বন্দক দিয়ে রাখো কোন আপত্তি নেই, কিন্তু 'নিজের চরণ দুটি ঢাকলেই' যে এই খুলো লাগার সমস্যা মিটেছে এটা যদি কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাহলেই সর্বনাশ।

বন্যা হয় কেন। সহজ উত্তর, নদীগুলি

ঝেঁগে গেছে, তাদের জল বহনের ক্ষমতা নেই। সমাধান একটাই, নদীগুলির সংস্কার করা। বিশ বছরেও তা হল না। জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে বৃষ্টি বেশি হলেই সেই বন্য জল ফসল-ভরা মাঠ ভেঁগাবে। প্রতিকারের পথ একটাই, খাল কেটে বন্য জল বার করে দেওয়া এবং খালের দ্বারা নদীগুলিকে সংযুক্ত করা। তাহলেই বাড়তি জল খালে ধরা থাকবে এবং জলের আধিক্য হলে ছোট নদীগুলির দ্বারা বাহিত হয়ে তা বড় নদীতে এসে পড়বে। এই সোজা মূল কথাটা একান্ত মূল বলে এবং মথেষ্ট ইনটেলেকচুয়াল নয় বলেই প্রাণিক কমিশনের কর্তাদের মাথায় ঢোকে নি। তাঁরা 'চর্ম' দিয়া মূড়িয়া দাও পৃথবী' এই নীতি অবলম্বন করে ড্যাম (ইংরাজীতে কথাটির আরও একটি অর্থ আছে, বানানটা একটু ভিন্ন হলেও উচ্চারণটা এক) বানিয়েছেন, যার কাজ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বন্যা ঘটানো। বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে যে বাধগুলি বানানো হয়েছে তাদের জল বহনের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ যে, একটা ভারি বর্ষা হলেই স্লাইস গেট খুলে দিয়ে চাষের জমিতে বাড়তি জল ঢুকিয়ে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি না করা ভিন্ন উপায় নেই, যা আমরা ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে দেখেছি। প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে কৃষক এক ফোঁটা জল পায় না, আর যখন ভগবানের দয়ার জলে ক্ষেত টই-টুঁন্দর, তখন বাঁধের জল ছেড়ে দিয়ে চাষের সর্বনাশ করাই এই বাধওয়ালাদের পেশা।

আসলে বাড়ির যেমন ড্রেন না থাকলে চলে না তেমনি কৃষিক্ষেত্রেরও ড্রেনেজ ব্যবস্থা দরকার, নতুবা প্রতি বছরেই একটু চেপে বৃষ্টি হলেই বন্যা হবে। কেমন করে কৃষি-

ক্ষেত্রে জল নিকাশী ব্যবস্থা চালু করতে হয় তার জন্য বিদেশ থেকে স্পেসিালিস্ট আনার প্রয়োজন নেই। সরকারী কর্তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, হুগলী জেলায় বেহুলা নামক যে নদীটি আছে তা আসলে মনুয়াসুট্ট একটি খাল যা সুপ্রাচীন যুগে কাটা হয়েছিল। ডারউইন নাকি বলেছিলেন যে বাঁদর থেকে মানুষ এসেছে, এবং যত দিন যাচ্ছে তত তাদের বৃদ্ধিবৃদ্ধি উন্নত হচ্ছে। তিনি বোধহয় ভারতবর্ষ দেখেন নি, দেখলে লিখতেন, সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম আছে বলেই তা নিয়ম। এই একটি দেশ যেখানে বিবর্তনের নিয়মটা উল্টো।

পশ্চিমবঙ্গে এখন যুক্তফ্রন্ট সরকার আসীন হয়েছেন। গত বিশ বছরের সৃষ্ট পাপের প্রারম্ভিত করার দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়ে এসেছে। সেচমন্ত্রীর আমরা একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশকে নদীমাতৃক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা ছাড়া নদী নেই, এবং গঙ্গার অবস্থাও জলাভাবে শোচনীয়। এখন নদীসমূহ সে দেশের মাতারূপে পরিগণিত সেই দেশে যদি সেগুলি জীবিত না থাকে তাহলে সে দেশের অবস্থা যে কি হয় তা সহজেই অনুমেয়, এবং সে অবস্থা আমরা হাড়ে হাড়ে বোধ করছি। তাই সেচমন্ত্রীর নিকট আমাদের নিবেদন—তিনি এই মজ্জ-বাওয়া নদীগুলির সংস্কার করিয়ে তাদের জল বহনের ও ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন। তাহলে বন্যাও হবে না এবং সারা বছর নদীগুলিতে জল টই-টুঁন্দর থাকলে সেচেরও মহা উপকার হবে। এবং এই বিভিন্ন নদীকে খাল কেটে সংযুক্ত করতে হবে যাতে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় নি সেখানকার চাষীরাও জল পেতে পারে। এই নদী ও খালগুলিতে মাছের চাষও ভাল হতে পারে। এবং এই একমাত্র পন্থা যা দিয়ে বন্যা সমস্যার চিরকালের মত সমাধান হতে পারে। খুঁস্টের জন্মের কয়েক সহস্র বছর আগে মিশরীয়রা যা পেয়েছিল, বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে আমাদের দেশ তা করতে পারল না এর চেয়ে লজ্জা আর দুঃখের বিষয় কিছু নেই।

বাবেল স্তম্ভের উল্টো পুরাণ

সরকারী ভাষানীতির সুপে মত-বৈধতার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীচাগলার পদত্যাগের বিষয়টা যদিও বঙ্গদর্শনের আওতায় পড়ে না, তথাপি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এখানে তা ক্রিপ্ত আলোচনা করার তাগিদ বোধ করছি, কেন না বাংলা ভাষাও এখানে একটি সংশ্লিষ্ট পক্ষ।



কাঁথার বন্যায় বিপন্ন একটি পারবার আশ্রয়ের স্থানে চলেছে

সাইবেলে গল্প আছে ব্যাবলিন দেশের কারিগরেরা একবার একটি বিরাট স্বর্ণ-ছোয়া টাওয়ার তৈরির কাজে হাত দিয়ে-ছিল যা দেখে শক্তিত হয়ে খোদ ঈশ্বর ওই মিস্ত্রীদের প্রত্যেককার ভাষা বদলে দিলেন, ফলে কারো কথা কেউ বুঝতে না পারায় দরুণ টাওয়ার তৈরি করা আর সম্ভবপর হল না, উল্টে বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়ে যাবার দরুণ জগতজোড়া অনেকা ও বিবাদের সৃষ্টি হল।

আমাদের দেশে চিরকালই উল্টো পদোপ। ভারত সরকার ঈশ্বরের ওই বিধানটি উল্টে দিয়ে একটি মাত্র ভাষার মারফত সারা ভারতে একা ও সংহতি আনার চেষ্টা করলেন, আর সেই ভাষা হল হিন্দী। ফল হল এই যে ব্রিটিশ আমলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা থাকা সত্ত্বেও যে ভারতীয়ত্ব বোধ ছিল, সে একা ও সংহতি ছিল, তার মূলে কুঠারের আঘাত পড়ল। এয কারণটা কি?

উত্তরটা খুবই সহজ। হিন্দী ভাষার অন্তরালে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ যেটা অহিন্দীভাষীরা বদামস্ত করতে একেবারেই নারাজ। আর সেই সাম্রাজ্যবাদের শিশু মহারাবণটির যে নমনা এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে অহিন্দীভাষী লোকের মনে আর কোন সন্দেহ নেই যে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এই মহারাবণ রাবণ রাজাকেও শতগুণে ছাপিয়ে যাবে।

ঘটা করে ঘোষণা করা হল যে, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা হবে। কিন্তু গ্রীচাগলা হাতে হাড়ি ডেঙে দিয়েছেন। তিনি যুক্তির সাহায্যে সপ্রমাণ করেছেন যে, আসলে আঞ্চলিক ভাষার দোহাই দিয়ে হিন্দীকেই চাপিয়ে দেবার এ একটা ফিকির ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাবের মিলিট বরানব টোপ গিলে আঞ্চলিক ভাষা আঞ্চলিক ভাষা করে লাফাচ্ছেন, ভেতরকার ম্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

গ্রীচাগলার বক্তব্য অনুযায়ী যে সব আঞ্চলিক ভাষাগুলির বনিয়াদ মোটামুটি মজবুত (অবশ্য সেগুলি আঙুলে গোনা যায়, ১৪টি প্রধান ভাষা ছাড়া অপ্রধান ভাষার সংখ্যা দুশোরও বেশি) সেগুলি হয়ত গোড়ার দিকে মার খাবে না, কিন্তু এই দুশো অপ্রধান ভাষা, যেগুলির উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, সেখানে ইংরাজী তুলে দিয়ে আঞ্চলিক ভাষার নাম করেই হিন্দী চাপানো হবে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুশো অপ্রধান ভাষাকে অবলুপ্ত করে হিন্দীর মহারাবণ গদাহস্তে জেগে উঠবে। তখন অহিন্দীভাষী প্রতিটি রাজ্যেই আত্মরক্ষার তাগিদে গড়ে উঠবে এক-একটি ডি. এম. কে। এবং তার অর্থই হবে ভারতবর্ষের

বলকানাইজেশন, ভারত বলে আর একটা দেশ থাকবে না।

কিন্তু গ্রীচাগলার প্রস্তাবিত সমাধানটির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না, যদিও আপাতত তা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। তিনি ইংরাজীকেই বজায় রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরাজী ভাষা বরাবর বহাল থাকলে আঞ্চলিক ভাষাগুলির সর্বনাশ কেন না সেগুলিকে চিরকালই নাবালক ভাষা হিসাবেই থাকতে হবে। যতদিন ইংরাজী থাকবে ততদিন মূল গ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থ সমূহ ইংরাজীতেই রচিত হবে, এবং আঞ্চলিক ভাষাকে গল্প-উপন্যাস-কবিতা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে। তার নাবালকত্ব কোনদিনই ঘুচবে না। তার চেয়ে যদি গ্রীচাগলা এই ক্ষত্রিট দাবি করতেন যে, যেভাবে হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য দরাজ হাতে টাকা ঢালা হচ্ছে, অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করা হোক, প্রতিটি ভাষার পিছনের সমান অঙ্কের টাকা ব্যয় করা হোক তাহলে আঞ্চলিক ভাষাগুলির পক্ষে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবার মত সাবালকত্ব অর্জন করা সম্ভবপর হবে। একথা খুবই সত্য যে ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবার পক্ষে অপূর্ণতা আছে।

ভাষার পিছনে অর্থব্যয় করার অর্থ কি? অর্থাৎ প্রতিটি ভাষার মূল গ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থ লেখার মত লেখকের অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা লেখেন না এই কারণে যে তা ছাপার মত প্রকাশক নেই। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই সব গ্রন্থের প্রকাশার্থে প্রতিটি রাজ্যকে সমান অর্থ মঞ্জুর করেন তাহলে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে ভাল ভাল গ্রন্থ রচিত হবে এবং তা হলে আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হতে কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু হিন্দীকে সুরোরাণী করে আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিসাধনের যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন তাতে গ্রীচাগলার আশংকা যে সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই। দুরভাগ্যক্রমে এদেশে ভাষা সমস্যাটা ভাষার সমস্যা নয়, রাজনীতির সমস্যা। আমরা ইনটেলেকচুয়াল নই মোটা বুদ্ধির মানুষ। আর সেই মোটা বুদ্ধি এই কথাই বলছে যে সম্প্রতি ভাষার স্পর্শকাতর প্রশ্নটি যে কেন্দ্রীয় সরকার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন, তারও কারণ রাজনৈতিক। আজ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে জনসংঘের দ্রুত অভ্যুত্থানকে ঠেকানোর কোন পথই কংগ্রেসের সামনে খোলা নেই, একমাত্র তা করা যেতে পারে কংগ্রেসকেই বহুলাংশে জনসংঘী করে তুলতে পারলে। আর উত্তর ভারতে জনসংঘের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় উপাদানই হচ্ছে এই হিন্দী-

বাদ। নেহরু আমলে ভাষা সম্বন্ধে যে নমনীয় নীতি অবলম্বিত হয়েছিল আজ কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় নেতৃশ্রেণী পক্ষে তা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। দুরদর্শী গ্রীচাগলার দৃষ্টিতে এটা এড়ায় নি।

এবার পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসা যাক। গ্রীচাগলা আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধী নন, তবে তিনি বলছেন যে এই আঞ্চলিক ভাষার নাম করে হিন্দীকে চাপিয়ে দেবারই চেষ্টা চলবে, যেটার তিনি বিরোধী, এবং সমাধান হিসাবে তিনি ইংরাজী ভাষাকেই আপাতত বহাল রাখতে চান।

কিন্তু বাংলা ভাষার আজ যে অবস্থা তাতে এই ভাষার পক্ষে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হতে কোন অসুবিধা নেই, এবং তা নেই বলেই এখানে বাংলাতেই সর্বস্বত্বের শিক্ষাদান চলতে পারে। পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন

মফতলাল গ্রুপ



দশটি মিলের কাপড় সর্বদা

মিলের নির্ধারিত মূল্যে

পাওয়া যায়

পুরুষদের নুদান ও পুজার জন্য নতুন নতুন মালের আমদানি করা হইয়াছে।

সুবিধা দরে কাটাপসও পাওয়া যায় অনুরোধিত রিটেল শো রুমস্ :

পার্বতী স্টোরস্

২এ, -গিরিশ এডিনউ (যতীন্দ্রমোহন এডিনউ এবং ভূপেন্দ্র বসু এডিনউ-এর সংযোগস্থলের নিকট), কলিঃ-৩
বালু রুট-২বি, ৯ এবং ৩২ নম্বর বাসে রাজবল্লভপাড়া-স্টপেজ নামদন।

গাড়ীঘাট সোসাইটি

পি-১১, গাড়ীঘাট রোড (গোল পার্কে'ব নিকট), কলিকাতা-২২ ৪৬-৭৪০৮

শেয়ার হোল্ডারদের ৩০-৯-৬৭ পর্যন্ত শতকরা ৮ টাকা হারে ডিসকাউন্ট নেওয়া হইবে। শেষ মাহুতের ভীড় বাঁচাইবার জন্য পুর্বেই খরিদ করিতে অনুরোধ করি।

বিষয়ে পিছনের অভাব নেই, শুধুমাত্র সরকার যদি তাঁদের রচিত প্রামাণ্য পাঠ্য-পুস্তক ও গবেষণা গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ব্যয় বহন করতে-রাজী থাকেন তাহলেই সব সমস্যা মিটে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেবেন কি? হিন্দীর গর্ভে তো বহু টাকাই ঢালা হয়েছে। আজ যখন কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক ভাষার জন্য দরদ দেখাতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তা মুখে দেখালেই হবে না, গগদ ব্যর করতে হবে।

শিখা, গ্রিভা, চতুর্ভাষা যে নীতিই অবলম্বিত হোক না কেন তার ঝিকটো রাজনীতিবিদদের পোহাতে হয় না, বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বলে খ্যাতিশ্রুত মানুষকে পোহাতে হয় না, তা পোহাতে হয় ইংল্যান্ডের হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের। আজকের ইংল্যান্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত এই চারটি ভাষার পিছনে শুধুমাত্র সময় ও শক্তির অপব্যয় ঘটতে হয়। কোন কাউন্সিল সম্পন্ন জাতি এই রকম অপচয় বরদাস্ত করে না। বর্তমান শিক্ষানীতিতে চারটি ভাষা শেখানো হচ্ছে, এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বারো আনা সময় নষ্ট হচ্ছে, বিস্তৃত বস্তৃত শেখা কিছুই হচ্ছে না, কেন না তা সম্ভব নয়। বারো-তের বছরের ছেলের হরিনাথ দে বানাবার যে উদ্ভট নীতি শিক্ষা দপ্তর নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে একটা স্থূল বক্তব্য আমাদের আছে। আজ যদি ওপরে বসে চারটি ভাষা ছেলের ঘাড়ের চাপিয়ে দিয়েছেন বর্তমান সিলেবাস অনুসরণ করে তারা যদি বালকবয়সে পড়াশুনা করতেন, তাহলে এঁদের অনেককেই 'টপে' বসতে হত না। আজকের হাজার সেকেন্ডারী বা ইংস্কুল ফাইনালে যে সব বিষয়ে পড়তে হয় সেগুলি আগের তুলনায় যথেষ্ট ভারী। আজ থেকে দু' দশক আগে আমরা যারা ইংস্কুলে পড়েছিলাম, আজকের ছাত্ররা যা পড়ে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। আমরা একটু ইংরাজীটাই যা পড়েছিলাম আর তো ভারী বিষয় পাঠ্য ছিল না, মামুলি ধরণের কিছু অংক, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার স্কুল-সতরে আরো অনেক কম পড়েছিলেন, একালের তুলনায় তা কিছুই নয়, তবে তারা বাংলাটুকুও ইংরাজীতে পড়েছিলেন। তা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই, তাঁদেরও আমাদেরও। কিন্তু আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে অনেক অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয়, যেখানে চারটি ভাষা শিক্ষা তাদের কোন সাহায্য তো করছেই না, উল্টে এই আপদ-গুলির জন্য মূল্যবান বিষয়গুলির প্রতি

তারা পর্যাপ্ত মনোযোগ ও সময় দিতে পারে না।

কাজেই ইংস্কুল সতরে গ্রিভা, শিখা উভয় আপদকেই বিতাড়ন করে শুধুমাত্র মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করা হোক। এর ফলে যে মূল্যবান সময় এবং শক্তি বাঁচবে তা অপরাপর বিষয়ের প্রতি নিষ্পত্তি হলে জ্ঞান ও দক্ষতা দুই-ই বাড়বে। জিম্মা ভাষা শেখার যার দরকার সে ঠিকই তা শিখে নেবে, তবে তা শেখার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এখন যেমন জিন' বছরের কোর্সে ফরাসী, জার্মান, রুশ ইত্যাদি শেখাবার প্রতিষ্ঠান হয়েছে, তেমনি ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী ইত্যাদি শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান খুলে দিলেই হবে। তিন বছরের কোর্স, যার শেখার ইচ্ছা বা গরজ সে নিশ্চয়ই এই ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ভর্তি হবে যে কোন বয়সেই। সবই সহ্য করা যায়, শুধু সহ্য করা যায় না, শুধুমাত্রমতি বালক-বালিকাদের শক্তি ও সময়ের অপচয়। আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক দাবার চালে দেশের ভবিষ্যৎ-স্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীরা কেন ঘুটি হবে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার

প্রাচীন ভারতীয় ও ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্ররা কি শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যায় করে ছাড়ল? সংবাদে প্রকাশ যে, ভাইস-চ্যান্সেলর লম্বা ছুটি নিয়ে রাজ্যান্তরে যাত্রা করেছেন, রেজিস্ট্রার তাঁর প্রাক্ত অবসরকালীন ছুটির জন্য আবেদন করেছেন এবং প্রেক্ষারার মেডিক্যাল জীভ নিয়েছেন। আমরা অভিজ্ঞতার দেখছি যে, যখনই কোন জটিল সমস্যার উদয় হয়, তখনই ভাইস-চ্যান্সেলর মহাশয় ছুটি নেন। গত বছরে এমন সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ ঘটিত ব্যাপারে যখন মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরারে তালো কুল-ছিল, তখনও তিনি পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে কলকাতার বাইরে ছিলেন।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত যে সর্বনাশা রেগুলেশন, যাতে অর্থোজিক মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় ও ইসলামীয় ইতিহাসের পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে অধ্যাপনার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেই রেগুলেশন প্রণয়নে এঁদের দায়িত্ব সর্বাধিক। রেজিস্ট্রার মহাশয় নিজে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁর ক্ষেত্র ভ্রাতা স্বর্গত ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, যিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক ছিলেন, বরণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। এই পরিবেশে যার মানসিকত

লালিত-পালিত হয়ে এসেছে সেই তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগটিকে তুলে দেবার প্রচেষ্টার অংশীদার কেন হলেন সেটাই ব্যস্তির অগম্য।

ছাত্ররা রেগুলেশন থেকে ওই ধারাটি বাতিল করার জন্য যখন প্রেক্ষারার নিকট ডেপুটেশন দেন তখন তিনি নাকি তাঁদের সামনেই প্রাচীন ভারতীয় ও ইসলামীয় ইতিহাস বিভাগ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য ছাত্ররা তাঁকে ধরোও করে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ দুটির ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, আর্থনিক ইতিহাসে পাশ করা ছাত্রের প্রাচীন ইতিহাস পড়বার যোগ্যতা আছে বলে ধরা হচ্ছে অথচ প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রদের সে যোগ্যতা নেই একথা বলে ধরা ওই আইনটি পাশ করেছেন তাদের আসল মতলবটা কি? প্রেক্ষারার মহাশয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ দুটির ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অভিযোগ আছে, যার পদুম্বর জনসাধারণ অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি করতে পারেন। অভিযোগটি হচ্ছে এই : কোষাধ্যক্ষ মহাশয় একই সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নামক বিষয়ের অধ্যাপক। তাঁর কাছে ছাত্রদের প্রশ্ন : তিনি বি-এ কিংবা এম-এ কোন পর্যায়েই কি এই বিষয়টি পড়েছিলেন? অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়নই যখন এখানে বিষয়বাস্তব মানদণ্ড বলে বিবেচিত ও গৃহীত, এবং অধ্যাপনার ক্ষেত্রে জা যখন নিয়োগের আপেক্ষিক হিসাবে চিহ্নিত, সে ক্ষেত্রে এই লিম্বাস্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, তিনি কি করে ওই পরীক্ষা অলঙ্কৃত করে আছেন? নিজের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন আইনই থাকে না, অথচ ইতিহাসের এক শাখায় পাশ করা ছাত্ররা অন্য শাখায় পড়তে পারবে না এ এক অশুভ দৃষ্টি!

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ দুটির ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেছেন যে, প্রতিটি কলেজের নিযুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে ওই দুই বিভাগের দুজন রাখতে হবে সে দাবি কোনক্রমেই অর্থোজিক নয়। এদেশে ভাল কথায় কানে জল ঢোকে না তবুও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ তারা ছাত্রদের এই সঙ্গত দাবি মেনে নিন। নতুবা ছাত্রদের আন্দোলনের পথেই পা বাড়তে হবে এবং সেই আন্দোলনকে সমর্থন না করাটাই অর্থম হবে।

বিদ্যালয়গণ বলতে যেমন ইংল্যান্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এবং এখনও এই ১৯৬৭ সালেও দেশে-বিদেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অক্ষান। সেই কারণেই এই ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রাচীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক অবাবস্থা ও আভ্যন্তরীণ দুনীতি শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয়েরই দুঃখের এবং উদ্বেগের কারণ। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষা এবং প্রশাসনগত দুটি-বিচারিত কিস্তি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুটি-বিচারিত পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ তুষ্ট বোধ করতে পারেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন না।

ইতিপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও আভ্যন্তরীণ দুনীতি নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত কিছ্র আলোচনা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই আলোচনাগুলিকে সাধারণ পাঠক ও শিক্ষা-প্রার্থীরা যেভাবে অভিনন্দিত করেছেন, সন্ধ্যা চন্দ্রগুপ্ত কৃতজ্ঞ। একাধিক রচনায় চন্দ্রগুপ্ত সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনাগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বিরক্তি ও প্রকোপের কারণ হ'লেও শিক্ষা-প্রার্থী জনসাধারণের যে ভালো লেগেছে, তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে কিছ্র কিছ্র 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আরও কিছ্র তথ্য ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এবং আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধানুধারীদের সক্রিয় সহযোগিতায় ভবিষ্যতে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও বাংলাদেশের তথা বাঙালী শিক্ষিতসমাজের সহযোগিতা আমাদের সর্বদা প্রার্থনীয়।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট চন্দ্রগুপ্ত আইন প্রণীত হিসাবপত্র ইত্যাদি বিশেষ বোঝেন না। ফলে সম্প্রতি-প্রাপ্ত একটি দীর্ঘ তথ্য-বহুল নিবন্ধ লেখকঃ ভূদেব চক্রবর্তী, ঠিকানাঃ ৮।১ সি আই টি রোড, কলকাতা) বিনা মন্তব্যে হুবহু প্রকাশ করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট-সংক্রান্ত এই নিবন্ধ পড়ে চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত ও বিমূঢ় বোধ করছেন। তাঁর এই বিস্ময় ও বিমূঢ়তা দূর করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন কি না জানি না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষীরা নিচের এই রচনার অন্তর্গত তথ্যগুলির সত্যতা নিবৃপণে এগিয়ে আসবেন-বলে তাঁর বিশ্বাস। এবং চন্দ্রগুপ্তের আরও বিশ্বাস, তথ্যগুলি সত্য প্রমাণিত হ'লে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের কাছে যথাযথ্য উত্তর দাবি করবেন।

অবজ্ঞা

চন্দ্রগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রসঙ্গে

ইতিপূর্বে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'অবজ্ঞা' পর্বাণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে দুনীতি ও ক্ষমতাচক্রের বিষয় আলোচিত হয়েছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উৎসাহী ও শিক্ষিত-মহলে-স্বশেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত সিনেট সভায় (২১শে জুন ১৯৬৭) এই বসুমতীর একটি সংখ্যা বেশ কয়েকজন মাননীয় সদস্যের হাতে হাতে ঘুরতে দেখা যায়। একজন সদস্য তো স্পষ্টতই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ যা ঘটছে সে সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীণ তদন্তের ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। দীর্ঘকালের অপশাসন, দুনীতি ও ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে বাংলার জনসাধারণ গত নির্বাচনে এক যুগপরিবর্তনের সূচনা করলে সমাজ-দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে কায়মী স্বার্থ প্রথম চমকে মহামান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার দাঁত নখে শাণ দিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব দৃঢ়তর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। জনসাধারণ জানে কলকাতা কর্পোরেশনের মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কায়মী স্বার্থের দৃষ্টান্তের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি। বিগত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা ঔপনিবেশিক পরাধীনতার যুগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে স্বাভাবিক ভোগ করতেন তার অবসান ঘটান হয় এবং শিক্ষাবিভাগগুলিকে সিণ্ডিকেট নামক ক্ষমতাচক্রের দাসে পরিণত করা হয়। তথাকথিত নির্বাচনের খিড়কী দরজার সাহায্যে এই সিণ্ডিকেটে আজ কায়মী স্বার্থের আধিপত্য সীমাহীন। এই চক্রের আজ যিনি মধ্যমাণি গত দশ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এই প্রতিভাধর ব্যক্তিটিরই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। দীর্ঘকাল এই কায়মী স্বার্থের অন্যতম নেতা থাকার পর গত বছর তৎকালীন কোষাধ্যক্ষের রহস্যজনক অপসারণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ এক যুগসন্ধির অবস্থা। ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে তৎকালীন সরকার প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ

করেন। এই আইনে ক্ষমতাচক্রের আধিপত্যকে দৃঢ়তর করার এবং শিক্ষককুলকে আত্মবাহী ভূত্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত দলগুলির সভোরা সে সময় এই আইনকে অত্যন্ত প্রবলভাবে বাধা দিয়ে থাকলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীনা শিক্ষিতমহলে এক প্রবল অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে কায়মী স্বার্থ যে চক্রান্ত করে চলেছে এবং ভোল পালটে জনপ্রিয় সরকারের খিদমদগারী করে যে কুহেলিকাভাল সৃষ্টি করেছে তার নিরাকরণ না করলে বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দকেও একদিন জনতার সামনে 'কৈফিয়ৎ' দিতে হবে সন্দেহ নেই। নির্বাচনের প্রাক্তক্ষে সরকার বিরোধীদের জনসমক্ষে বিশেষ করে শিক্ষিতমহলে হেয় করবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনা নিয়ে যে রাজনৈতিক খেলার অবতারণা করা হয় সেদিনের বিরোধী নেতারা আজও তার উপযুক্ত জবাব দেন নি। তাঁরা হয়ত জানেনই না যে সেই রাজনৈতিক পাশা খেলার দান পরিচালিত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এই মবশদূর্বে পরীক্ষা ভণ্ডুলের আতিশয্য, পরীক্ষা-সমূহের কন্ট্রোলারকে আক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত এই সব পরিবেশের সুযোগ নিয়ে কৌশলে পরীক্ষাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এক প্রবল অনিশ্চয়তা সৃষ্টির মধ্যে এ একই ক্রীড়নচক্রের সুদক্ষ কর্ম-কৌশলের পরিচয় লক্ষ্য করা কি খুব কষ্টকর? বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বছরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বাজেটের রচনা কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোকে পরীক্ষা করে দেখলে আরও বহু রহস্যের সম্মান পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

সিনেট সভায় বাজেট

গত ২১শে জুন শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট বরাব্দ পেশ করলে এই বাজেটে ঘাটতির বহু সিনেটের সভ্যদের একত্রে সংবাদপত্রগুলিকে উচ্চকিত করে তোলে। বাজেটে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাপ্তাহিক বসন্ত

সাধারণ রাজস্ব খাতে কোন অর্থ উৎস নেই বরং খণ ধাক্কা ১৪,৫১৫ টাকা। আর সম্বৎসরব্যাপী আয় হবে ধরা হয়েছে ১,১২,২৩,০৫০ টাকা আর ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে একুনে ১,৫৬,৫৪,৮৪৪ টাকা; ফলে ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ৪৩,৬১,৭৯৪ টাকা। এই ঘাটতি বাজেটে থাকায় যে সম্ভবতঃ জনক পরিমিত দেখা দিয়েছে তা একটু গভীর উবেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে অনুদপভাবে ১৯৬৬-৬৭'র বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৭,৯৯,৫৬৭ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬'র বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৯,২০,৪৬৮ টাকা। অতএব এই ঘাটতির ক্ষয়িত অক্ষ কিছু নতুন নয় এবং যদিও সাধারণ লোক-স্বত্বীতের স্মৃতির বাহক না হওয়ায় আত্মিকত বোধ করবে কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির এতে হঠাৎ উদ্ভব হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃত আত্মিকতার কারণ সত্যিই আছে এবং সে আছে বাজেটের মধ্যে অতি বিচিত্র এবং রহস্যজনকভাবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ধরনের ঘাটতি বাজেট নিয়ে কাজ চালিয়ে পূর্বকার কোষাধ্যক্ষ বৎসরান্তে কিছু পরিমাণে অর্থ উৎস খাতিয়ে পারতেন। কিন্তু তিনি নাকি বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ ছবি দিতেন না; বর্তমান বাজেট পেশ করে চলতি কোষাধ্যক্ষ যে বিবরণ দেন তাতে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার একটা সম্পূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে এবং এর জন্য তাঁকে রাহবাও দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে (১লা জুলাই-১৯৬৬) যে ২৪,৬৪,৮৩২ টাকা উৎস নিয়ে বৎসর সূচনা করা হয়েছিল ১লা জুলাই ১৯৬৭ সালে সে অর্থ সম্পূর্ণ উবে গেল কি করে কোন সিনেট সদস্যই সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না। অবশ্য হিসাববিদ্রা জানেন এর সরটাই উবে যায় নি, কিন্তু একটা মোটা অংশ যে নতুন কোষাধ্যক্ষের আমলে উবে গেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া বর্তমান কোষাধ্যক্ষ বাজেটে ঘাটতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নখাতে যে বিপুল অর্থ নতুন করে বরাদ্দ ধরেছেন (Budget estimates B. I. 75C 375D) সে সম্বন্ধে রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন অন্য কেউই কোন কথা বললেন না। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কোষাধ্যক্ষ বেশ ক্রোর দিয়েই বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে বরাদ্দ এই টাকার একটি পরসাত শিক্ষণ ব্যাপারে ব্যয় হবে না, ব্যয় হবে "নন-টিচিং" খাতে।

প্রকৃত শিক্ষণ ও গবেষণাখাতে ব্যয়

যে আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আছে ও এই সংস্থা পরিচালিত হয় তাঁকে

বলা হয় "Advancement of learning"। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে প্রত্যক্ষভাবে এর ওপর শিক্ষণ ব্যবস্থার কোন দায়িত্ব ছিল না কিন্তু ১৯০৪ খৃস্টাব্দের আইনকে কার্যকরী করে স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণায় কেন্দ্রে পরিণত করা অবধি স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য দায়িত্ব তা স্বীকৃত হয়ে আসছে; আর বিশ্বব্যাপী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চ মানের জন্য। আইন (Law), শিক্ষা (Education), চিকিৎসা (Medicine) সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা (Arts), বাণিজ্য (Commerce), বিজ্ঞান (Science), ও ফলিত বিজ্ঞানে (Technology) স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে আইন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কিছু রাজস্ব আহরণ করে; বাণিজ্য বিভাগেরও ছাত্র-বেতনে আয় বিভাগীয় ব্যয় অপেক্ষা বেশি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U.G.C.) নানা বিষয় শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নয়নকল্পে কলা-বিভাগসমূহে প্রায় দু' লক্ষ টাকা এবং বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা খাতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পাওয়া এই ধরনের মোট সাধারণত পাঁচ বছর কাল; এর পরে সম পরিমাণ অর্থ রাজ্যসরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে সম্ভুলান করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের সোভে মঞ্জুরী কমিশনের শরয়াতে নতুন নতুন পরিকল্পনায় হাত দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরে সেই পরিকল্পনায় ব্যয়ভার বহনের জন্য দৃষ্টিচলিত প্রস্তুত হতে হচ্ছে।

মঞ্জুরী কমিশনের শরয়াতে ছাড়া এ কমিশনের দানে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে সৃষ্ট কয়েকটি প্রফেসরের পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব অর্জিত রাজস্ব থেকে কোন ব্যয় করতে হয় না। এ ছাড়া অর্মান শরয়াটি দান আশুতোষের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু পরিমাণে লাভ করেছিল। ঐ সব দানের মধ্যে স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ, স্বর্গীয় তারকনাথ পাণ্ডিত ও শরয়ার রাজার বিপুল দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষাবিভাগের অনেকগুলি প্রফেসরের পদ ও তাঁদের গবেষণা ব্যয় বাবদ একটা বড় অঙ্কের টাকা প্রায় তিন লক্ষ টাকা এই সব দানের সূদ থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র-বেতন বাবদ পাওয়া যায় আনুমানিক ৭,৫০,০০০ টাকা

[B.I. 35(1)] প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগগুলির খাতে এই সমস্ত পর্ষাফে আয় দেখান হয়েছে ২০,০৮,৬৫০ টাকা (B.I. 35:1-4)। এর সঙ্গে মঞ্জুরী কমিশন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদির স্থায়ী দানের আয় বা ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার মত (General Account) বা সাধারণ খাতে দেখান হয়েছিল তা বর্তমান বছরের বাজেটে আলাদা করে দেখান হয়েছে [B.I. 79A(1) এ Corpus ৬,৯৯,৮৯৮ টাকা ও 79A(2) ৩০,৫৫,০৫৮ টাকার একটা অংশ—এ থেকে আয় আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা] যোগ করলে একুনে আয় হয় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

এখন দেখা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ ব্যয় এই শিক্ষণ ব্যয়দেশে কত হয়ে থাকে। এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে শিক্ষকদের বেতন ও গবেষণাখাতে ব্যয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য ব্যয়। এই সব খাতে বর্তমান বৎসরের বাজেটে কলাবিভাগের পনেরটি বিষয়ের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২,৮৪,৪০০ টাকা; বিজ্ঞান বিভাগের পনেরটি বিষয়ের জন্য ১৮,৪১,৮৫০ টাকা এবং ফলিত বিজ্ঞানের চারটি বিষয়ের জন্য ৪,৫৫,৯০০ টাকা (B.I. 36-51)। একুনে খরচ ৩৫,৮২,১৫০ টাকা। প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার এই ব্যয় বরাদ্দ যা বাজেটে ধরা আছে তার সঙ্গে গবেষণার ব্যয়ও যোগ করা যেতে পারে। এই উপলক্ষে বাজেটে ধরা আছে আর্টস বিভাগের জন্য ২৫ হাজার টাকা। (B.I. 53) আর বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৮২,০০০ টাকা। (B.I. 54-60) ও ফলিত বিজ্ঞানে ৫০,৫০০ টাকা (B.I. 67-69)। এর মধ্যে কলা বিভাগের জন্য বরাদ্দ শ্যামাপ্রসাদ প্রফেসর অব সোশিওলজির জন্য বরাদ্দ ১২,০০০ টাকা ও ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন বিভাগীয় জার্নাল না থাকায় ১০,০০০ টাকার ৮,০০০ টাকা ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। আর সাধারণ বরাদ্দ ৭,০০০ টাকাও গত বছর বছর ধাবংই মজুত থেকে যাচ্ছে ৭ থেকে শিক্ষকেরা এক কপর্দকও গবেষণার জন্য পান না। যা হোক শিক্ষণ খাতে ব্যয়ের সঙ্গে গবেষণা খাতে ১,৬০,০০০ টাকা যোগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যয় দাঁড়ায় ৩৭,৪২,১৫০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয়বরাদ্দ ৩,০০,৪৮,৯৪৫ টাকার মধ্যে শিক্ষণ খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয় ৩৭,৪২,১৫০ টাকা। ধরলে গড়পড়তা ব্যয় দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১২% ভাগ। এর অভ্যন্তরিত ব্যয়কে নানা প্রকারের প্রশাসনিক ব্যয় ও নানা প্রকার বরাদ্দ আয় থেকে ব্যয় বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

দাপ্তরিক বসুমতী

মিও বাজেটে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ দেখান হয়েছে ৩৭,৪২,১৫০ টাকা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বেই দেখান হয়েছে যে, এই ব্যয়ের একটা মোটা অংশ ছাত্র-বেতন ও স্থায়ী দান থেকে আহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ছাত্র-বেতনের ৭,৫০,০০০, বিভিন্ন ফান্ডের আর বাবদ ৩ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য বাবদ ৫ লক্ষ টাকা মোট ১৫ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ আয়ও আছে। আর সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতিপূরণের জন্য বছরের পর বছর শিক্ষণখাতে বরাদ্দের একটা বৃহৎ অংশ বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের অনেক পদ খালি রেখে ব্যয়সম্ভোচ সাধন করা হয়ে থাকে। বর্তমান বাজেটের সঙ্গে প্রদত্ত একটি তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে একুনে ১৪০টি খালি পদের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুসারে ১১টি পদ প্রফেসরের, ৩০টি রিডারের, ৩১টি লেকচারারের ও ৬৮টি পার্টটাইম লেকচারারের। এই সমস্ত পদের জন্য মোট বরাদ্দ ধরা আছে ১০,০৪,০০০ টাকা। গত কয়েক বছরই কলেজগুলিতে এই পদগুলি খালি রয়েছে এবং এই বাবদ ঐ পরিমাণ টাকা বাঁচিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৩৭-৪২ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচা হবে না। আর ছাত্র-বেতন ইত্যাদি বাবদ আয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষণখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ রাজস্ব থেকে ব্যয় হবে মাত্র ১২ লক্ষ টাকা।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার

জানুয়ারিগত ব্যয়

গ্রন্থাগার ল্যাবরেটরী ও মিউজিয়াম ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ এ বিষয়ে কাবো খিঁমত থাকা উচিত নয়। আমাদের ল্যাবরেটরীসমূহের জন্য ব্যয় বরাদ্দ আলাদা করে দেখান নেই। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য দশ-তলা বাড়িব সংস্থান হলেও বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় আলাদা হবে যাওয়ার এই গ্রন্থাগারকে আর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ৩,৫০,০০০ টাকা—এর মধ্যে পুস্তক ক্রয়ের ব্যয় মাত্র ৮০,০০০ টাকা। আশুতোষ মিউজিয়ামের জন্য বরাদ্দ ৭২,১০০ টাকা। সংস্কৃতি-মূলক কার্যকলাপ গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও ল্যাবরেটরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়কে কোনক্রমেই আশানুরূপ বলা চলে না।

প্রশাসনিক ব্যয়

শিক্ষাখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রাজকীয় (!!) ব্যয়ের বহর দেখা গেল তার সঙ্গে তলনায় প্রশাসনিক ব্যয়ের কিছু তুলনা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি-

উন্নতির স্বরূপ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ব্যয়ের খাতে আছে আপিস পরিচালনার খরচ। এর মধ্যে উচ্চতর কর্মচারীদের জন্য (Vice-Chancellor, Registrar, Inspector of Colleges ইত্যাদি) বরাদ্দ ধরা আছে ১,৭৯,২০০ টাকা ও তাদের আপিসের কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য ১৫,৯১,৮১৮ টাকা। অর্থাৎ যেখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণাখাতে প্রকৃত ব্যয় হবে ১২ লক্ষ টাকা সেখানে প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় ষোল লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আছে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যয় ২৯,৭৯,০০০ টাকা, প্রেসের খরচ ৯,৫৬,০০০ টাকা, বোর্ড অব হেলথ ১,৯১,৪৮০ টাকা, স্টুডেন্টস হল বাবদ ২,০৫,০২০ টাকা ও Supply Service ও Contingency বাবদ ৪,৫৪,১০০ টাকা—সর্বমোট ৮০,৫৫,৫৯৫ টাকা। — এই টাকার কোন অংশেরই স্নাতকোত্তর ও গবেষণার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

অন্যান্য ব্যয়

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ উত্তরস্বাধীনতা যুগের ভারতে এক নতুন দিগ্‌দর্শন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিক্ষাপ্রকল্পে উন্নয়ন পরিকল্পনা কিছু নতুন নয়। আশুতোষের দূরদৃষ্টি, উদ্যম ও ব্যক্তিত্বের সহায়তায় নানা বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গবেষণার প্রেরণা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্বপ্রধান শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তাঁর সামনেই স্মারভাঙ্গা সৌধ ও সাকুল্যার রোডের সায়েন্স কলেজ বিল্ডিং নির্মিত হয় এবং আশুতোষ বিল্ডিং-এর পুনর্নয়ন হয়। তখন U. G. C. ছিল না এবং তৎকালীন সরকার সহায়তা করার পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতেই পটু ছিলেন। ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নয়ন খাতে এক কোটি টাকা দান করেন। ঐ অর্থে পুরাতন সিনেট হাউস অপসারিত করে নতুন শতবার্ষিকী ভবন নির্মিত হয়। আজ দশ বছর পরেও ঐ শতবার্ষিকী সৌধ পবীক্ষার্থীদের হাতে নিখোঁজ হওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগে নি। এর পরে নির্মিত হয়েছে বালিগঞ্জে আটতলা সায়েন্স কলেজ ভবন, দশতলা গ্রন্থাগার ভবন, সাকুল্যার রোডের কিছু গৃহ, বেসিক মেডিকেল কলেজ ভবন। কয়েকটি স্টুডেন্ট হল, ওয়ালিউল্লা রোডের বোর্ড অব হেলথের বাড়ি, আকিওলজি ভবন ইত্যাদি। গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণখাতে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকার মত ব্যয় হয়েছে এই সব অট্টালিকা নির্মাণে; সেই অনুপাতে

আসবাবপত্র ইত্যাদিও এসেছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার। হতদরিদ্র এই দেশের বহু ছাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই কোটি কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও কোন শিক্ষণ বিভাগে সামান্যাত্র অতিরিক্ত ছাত্রের জন্যও স্থান সঙ্কুলান হয় নি। এই কি তবে অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং?

বর্তমান বাজেট বহুভারও অনুরূপ ব্যয়ের প্রস্তাব আছে। এর অন্যতম ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমহাস্ট স্ট্রীটের রামমোহন বায়ের বাসভবন সংগ্রহ ও ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের বি টি কলেজ ভবন সংগ্রহের প্রস্তাব। আধুনিক ভারতীয় জাতীয় অন্যতম ব্রহ্মা রাজা রামমোহনের বাসগৃহ জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করা মহান বর্তব্য সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যে এই জাতীয় কর্মে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকারের পরিবর্তে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজা রামমোহনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না তার শিবপীড়া ঘটলো সে সম্পর্কে যুক্তি নিতান্তই জ্বলো ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। এ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান বাজেটে নতুন পরিকল্পনার মূলে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে (B. I. 75C & D) এই টাকার আনুমানিক ৮,৫০,০০০ টাকা বেজিন্দ্রপুরের বিভাগে, ৪,৮০,০০০ কলেজসমূহে এবং ১,৮০,০০০ টাকা লাইব্রেরীখাতে ব্যয় হবে। এর সবটাই যাবে নতুন নতুন কর্মচারী নিয়োগে এবং equipment ও Contingency-তে। একমাত্র লাইব্রেরীতেই ১০০টি নতুন পদের ব্যবস্থা ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচী পরিচালন নাকি এই সব নতুন কর্মচারী না হলে সম্ভব নয়; আর কর্মচারী এলেই চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নিতান্তই দরকার। কিন্তু লক্ষ্য কববার বিষয় এই যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাখাতে যেখানে বাব লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় না সেখানে কোন নতুন আয়ের সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও ১৪ লক্ষ টাকার এক কর্মচারী বাহিনী সৃষ্টি করবার প্রস্তাবে বাজেট স্তম্ভীত করা হল; আর সিনেটের অতিরিক্ত সভ্যের দল কেবা বাৎ কেবা বাৎ বলে ঐ বাজেট পাশ কবে ঘবে ফিবে গেলেন। শব্দ তাই নয়, বাজেটের বিপুল ঘাটতি নিবাকরণে যে ব্যবস্থা করা হল তাতেও তাঁরা সায় দিয়ে গেলেন। বাজেটে ঘাটতি দেখিয়ে করদাতাদের ওপর বর্ধিতহারে করের বোকা চাপাবাব ফিকির বর্তমান শোষণমূলক অর্থনীতিব একটা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে এবার ঘাটতি দেখান হয়েছে ৪০,৬১,৭৯৪ টাকা; এই ঘাটতি অংশত পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ছাত্রের

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত দ্রুত

মাকশিট বাবদ অতিরিক্ত দুই টাকা এবং ননকলেজিয়েট পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের অতিরিক্ত দশ টাকা এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি ফি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কোষাধ্যক্ষের প্রায় ষোল লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির প্রস্তাবও সিনেট বিনা বিচারে এবং বিনা আলোচনায় পাশ করে দিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বাজেটে (১৯৬৬-৬৭) ঘাটতি দেখান ছিল ৪৭,৯৯,৫৬৭ টাকা এবং তার পূর্বে বৎসর (১৯৬৫-৬৬) ঘাটতি দেখান ছিল ৩৯,২০,৪৬৮ টাকা। এর পূর্বে পূর্বে বছরেও ঘাটতির পরিমাণ প্রায় অনুরূপ থাকা সত্ত্বেও কোন নতুন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব হয় নি। কারণ নানা ব্যয়সম্প্রসারণ প্রাতি বছরই বেশ কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ভূত থেকে যায়। এইভাবে প্রতি বছরই পূর্বে বৎসর বছরের যে উদ্ভূত নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে তার পরিমাণ ছিল ১৯৬০-এ ক্রিঃ ৭ অধিক ২০ লক্ষ টাকা, ৬১-তে ২৭ লক্ষ টাকা, ৬২-তে ৩৪ লক্ষ টাকা, ৬৩-তে ৩৯ লক্ষ টাকা, ৬৪-তে ৩৯ লক্ষ টাকা, ৬৫-তে ২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় প্রতি বছরই আয় অপেক্ষা ব্যয় কিছু কম থাকায় opening balance-এ কিছু উদ্ভূত থাকত। ১৯৬৫-৬৬-তে পরীক্ষার্থীর ফি খাতে আয় কিছু কম হওয়ায় এবং কর্মচারীদের বেতনহার বৃদ্ধি ঘরভাড়া ও ডিমারনেস অ্যালাউন্স মঞ্জুর করার আয় থেকে ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পায়, প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা; গত বছর নতুন কোষাধ্যক্ষের আমলে এই ব্যয়বৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত দাঁড় করান হয়েছে। শিক্ষণ-বা গবেষণা-খাতে কতটা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে? প্রায় কিছুই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৬১ খৃস্টাব্দে; বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত কার্য-পরিচালক সংস্থাগুলি জরাজনিত। সিন্ডিকেট সভায় অনুপস্থিত সভ্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় একাধিক ব্যক্তি সিন্ডিকেটের একাধিক আসন অধিকার করে আছে। এই ধরনের সিন্ডিকেট ও সিনেটে যে কার্যমী স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল হয়ে বসবে তাতে সন্দেহ কি? প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ছাড়া অন্য সব বিষয়েই এদেব উৎসাহ অপ্রমের। বর্তমান বাজেটে নতুন জমি সংগ্রহ, নতুন অট্টালিকা নির্মাণ, অট্টালিকার সম্প্রসারণ, Supply service এবং Contingency-তে প্রভূত অর্থের সংস্থান স্বভাবতই অগ্রাধিকার লাভ করেছে। নতুন দুটি অফিসারের পদের সংস্থান ছাড়া ১৪ লক্ষ টাকার নতুন কর্মচারী

বাহিনী সৃষ্টির প্রস্তাবও এই বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সিনেটে এই বাজেট রচনাকারী কার্যমী স্বার্থের তম্পনী-বাহকেরও অভাব নেই। তাদেরই একজনের প্রস্তাবক্রমে সিনেট একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি রাজ্যসরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে দরবার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি নিরাকরণে তাদের যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবে এবং সরকারের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় খাতে অধিকতর অর্থবরাদ্দের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। আশা করি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কতৃপক্ষকে জমি সংগ্রহ, অট্টালিকা নির্মাণ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি অবশ্যকরণীর কাজগুলিকে ব্যাপকভাবে সাক্ষ্যমণ্ডিত করবার জন্য যথেষ্ট অর্থবরাদ্দ করে শিক্ষার অন্তর্গতিতে সাহায্য করবেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের নিকট যে দাবি পেশ করা হয়েছে, তাতেও এই সব ব্যয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আশা করি তাঁরাও এ বিষয়ে সুবিবেচনা করতে পেছপা হবেন না।

শেষ কথা

ইতিপূর্বে দেখান হয়েছে যে পুরো বাজেটের অতি অল্প অংশই (১১%) স্নাতকোত্তর শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। পুরো বরাদ্দ খরচ ধরলেও সাধারণ ব্যয়ের খাতে ১,৫৭,৫৪,৮৪৪ টাকার মধ্যে প্রশিক্ষণ ব্যয় ৩৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ২.৫% ভাগ মাত্র। এর মধ্যে নানা ধরনের দান এবং ছাত্র-বেতনের আয় ধরলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফান্ড থেকে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাখাতে ১২ লক্ষ টাকার বেশি হয় না। এর সঙ্গে কলেজগুলির আপিস পরিচালনার খরচ ধরলে আরও ৩ লক্ষ টাকার (B. I. 75) অর্থাৎ মোট ঘাটতি ১৫ লক্ষ টাকা। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী সাহায্য দেন বাৎসরিক ১৬ লক্ষ টাকা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা বাবদ ক্ষতিপূরণ ৫,৫২,০০০ টাকা। অর্থাৎ সরকারের বাৎসরিক সাহায্যের দ্বারা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সম্পূর্ণ ব্যয় সম্বলান হয়েও অন্যান্য খাতে ব্যয় করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আরও বহু অর্থ থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষকদের নিকট থেকে সমস্ত দায়দায়িত্ব প্রশাসনিক কতৃপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার শিক্ষকদের মধ্যে গুরুতর হীনমন্যতা ও ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের গর্বভর অবনতি ঘটেছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক কতৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে দুর্নীতি, পেটোয়াপোষণ ইত্যাদি প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা নিরাকরণের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ বিভাগগুলির হত

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত দ্রুত হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই প্রত্যেকটি স্নাতকোত্তর শিক্ষা বোর্ড Post-Graduate Board of studies-গুলিকে সুগঠিত স্বয়ং-শাসিত মণ্ডলসম্পন্ন পরিচালক সংস্থায় পরিণত করা প্রয়োজন। এই বোর্ডগুলি পূর্বের মত নিজেদের প্রয়োজন মাফিক বাজেট প্রস্তুত করবে, ঘন ঘন মিলিত হয়ে বছরের পটনপটন সম্বন্ধে আলোচনা করবে, বিষয়টি সম্পর্কে নতুন প্রকাশিত সংবাদ ও গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করবে, মাঝে মাঝে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত বৈঠকে পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পরীক্ষা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বোর্ডগুলির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত কলেজ কাউন্সিল; কলেজ কাউন্সিলগুলি তাদের কর্মকর্তা নির্বাচন করে কলেজের প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করবে। আর কলেজ কাউন্সিলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টি। এই পোস্ট-গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত হবে। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পরিচালন ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক থাকবে না; পবগাহার মত সিন্ডিকেটকে এই শিক্ষণ ব্যবস্থার ওপর কোন সদারী করতে দেওয়া হবে না। এই পোস্ট-গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষাও পরিচালনা করবে এবং স্বনির্ভর এই ফ্যাকাল্টির প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে ভাইস-চ্যান্সেলার বা প্রেসিডেন্ট এই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। অন্যদিকে সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ কাউন্সিলগুলির প্রতি-নিধি নিয়ে গঠিত আন্ডার গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টিগুলি আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ব্যবস্থার একাডেমিক কাউন্সিল নামক আর্টস সার্ভিস এজি-নিয়ারিং মেডিসিন ইত্যাদি সববিদ্যায় পারগাম পরগাহাটির কোন প্রয়োজন থাকবে না। নীতি নির্ধারণ, আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারণ এবং সর্বাঙ্গীণ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফ্যাকাল্টিগুলির প্রতিনিধি নিয়ে সর্বোচ্চ সংস্থা সিনেট গঠন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে সচলতা ও দৃঢ়তা ফিরে আসবে এবং কার্যমী স্বার্থের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ব্যবস্থাও মুক্তিলাভ করবে। এই বিষয়ে জনসাধারণ ও কার্যমী স্বার্থ-বিরোধী সরকার সচেতন হবেন কি?

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুদ্রারঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অস্টাদান অধ্যায়

কলকাতায় ল কলেজে মাস্টারী

ল কলেজের চাকরি ও হাইকোর্টে ভর্তি হবার পরই আমাদের ১৪নং মাল্লিক লেনের বাড়ির সদর বৈঠকখানা ঘর দেখানে আমি কলেজে পড়বার সময় পড়তাম সেই ঘরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিলাম। বোঁঠানই কিনিয়ে দিলেন একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানচারেক চেয়ার। বোঁঠানের কাছে আবদার জানালাম যে দাদাবাবুর ব্যবহৃত কোন আসবাবপত্র দিয়ে আমার অফিস ঘর সাজালে পষমন্ত হবে। বেলতলার বাড়ির গদ্যাম্বর খুলিয়ে একটা জম্বত বড় চেয়ারের কাঠামোটা পাওয়া গেল। কি ভয়ানক চওড়া কাঠের পায়া, হাতল ও পিঠের ঠেসান দেবার ফ্রেমটা ছিল ঐ চেয়ারের। সেটাকে ঝেড়েঝেড়ে তাতে নতুন চামড়ার গদি এঁটে ও তাকে চকচকে পালিশ করিয়ে বোঁঠান সেটিকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। চেয়ারটার পিঠটা একেবারে সিঁথে খাড়া। শুনছি দাদাবাবু ঐ রকম করেই ওটাকে বানিয়েছিলেন বাতে করে কাছ করতে করতে তাঁর ঘুম না পায়। বোঁঠানের দেওয়া টেবিল-চেয়ার নিয়ে আমার প্র্যাকটিশের প্রচেষ্টা আরম্ভ হলো। সেই টেবিল ও সেই চেয়ার এখনো আমার অফিস ঘরে রয়েছে। কত বিনিময়জননী গেছে ঐ টেবিলের সামনে ঐ চেয়ারে বসে। আজকের এই স্মৃতিচয়নও লিপিবদ্ধ করছি ঐ টেবিলের সামনে ঐ চেয়ারে বসে। পাড়াপ্রতিবেশীদের মেয়েব বিয়েতে ঐ চেয়ারটি তাঁরা চেয়ে নিয়ে গেছেন-বরকে অভ্যর্থনা করে বসাবার জন্য। ঐ টেবিল ও ঐ চেয়ারের উপর এখন নজর পড়েছে আমার ছোট দাদুভাই আদিত্যকুমারের যিনি আইনের ব্যবসা করবেন বলে মনঃস্থির করেছেন।

যখন আমি আমার অফিস ঘর গুঁড়িয়ে সবে বসেছি তখন একদিন ছিপ-ছিপে বোঁগা অল্পবয়সী একটি লোক আমার ঘরে এলেন। নাম বললেন এবফান। নাম শুন্যে মনে হলো মুসলমান। নিবাস

বললেন খুলনার কাছে। তাঁর একটা ধান কাটার ফোঁজদারী মামলার আমাকে নিষ্পত্তি করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে করলেন আমার ফিস কৃত হবে। আমি তখন এক মাসও হয় নি সবে হাইকোর্টে ভর্তি হয়েছি। তিনি আমার নামডাক শুন্যে খুলনা থেকে সোজা আমার ১৪নং মাল্লিক লেনের বাড়ি এসে হাজির হয়েছেন ইত্যাদি শুন্যে মনে খটকা লাগল। কথাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন বিশ্বাস-যোগ্য যে নয় তা বুঝবার সুবুদ্ধিটুকু আমার তখন হয়েছিল। মনের কথাটা না ভেঙে তাঁকে বললাম যে আমি ফোঁজদারী প্র্যাকটিশ করি নে। তা ছাড়া ব্যারিস্টারের কাছে আসতে গেলে উকিল কি এটর্নী মারফৎ না এলে চলবে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোন কথা বলা সংগত হবে না। বিধম্ব মূখে ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। আমার প্রথম মস্তেলকে বিদায় দিয়ে মনটা যতটা খারাপ হওয়া উচিত ছিল ততটা কিন্তু খারাপ হোল না। একটা শ্রুতি থেকে বেঁচে গেলাম সেই বোঁঠা বংশ অনুভব কবলাম। পরে জানলাম যে ঐ বাঙালি বুড়ের জ্যেষ্ঠত্ব ভাই। নিবাস খুলনা শহরের পাশের গ্রাম মহেশ্বরপাশা এবং নাম বাধিকারজন মজুমদার যাব ডাকনাম সিতাই ছিল এরফান। ধান কাটার মামলার কথাটা ছাড়া ভদ্রলোক আব একটাও মিথ্যে কথা বলেন নি। মস্তুরা করতে এসে নিজেই ঠকে গেছেন বলে পরে তাঁকে অনেক চিসারাত সইতে হয়েছিল।

হাইকোর্টে ভর্তি হবার পর আমার প্রথম ভাবনা হোল যে প্র্যাকটিশ ত' ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং হবে তা ভাবিতবাই জানেন, সুতরাং অবিলম্বে একটা চাকরি যোগাড় কবা দরকার। একটু রোজগার না হলে বারলাইব্রেরীর চাঁদাই বা আসবে কোথা থেকে আর হাইকোর্টে যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া ও পান চুরুটের পয়সাটাই বা দেবে কে? তা ছাড়া কোঁসুলী সাহেব যখন হয়েছি তখন একজন মূহুরী বা "বাবু" রাখা প্রয়োজন। বাবার ঘাড়

সমস্ত সংসারের খবরের মে জগন্মল ডাব রয়েছে তার উপর আবাব আমার খরচা চালানর দায়িত্ব ফেলে দেওয়া বুদ্ধিযুক্ত হবে না। এমন সময খবর পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজে একটি লেকচারারের চাকরি খালি রয়েছে। এটা সবজনবিদিত কথাই ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ পূরণের কর্তাব্যক্তি ছিলেন স্যাব আশুতোষ মূহুরী। বাবাকে কর্ম-খালির কথাটা জানিয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম আশুবাবুর কাছে তিনি আমাকে নিয়ে নেতে পারেন কি-না। বাবা বললেন যে, একটু ভেবে বলবেন। দিন কয়েক পরে বাবার কথামত রূপচাঁদ মূহুরী লেনের হীরালালবাবুর সঙ্গে স্যাব আশুতোষের রসা রোডের বাড়িতে চলে গেলাম। বাবার কাছে শুন্যেছিলাম যে এই ভদ্রলোকটিকে আশুবাবু বেশ খাতির কবতেন এবং ইনি আশুবাবুকে "তুমি" বলেই কথা বলে থাকেন। সকালবেলায় আশুবাবু তাঁর অফিস ঘরে বসেছিলেন। নিচের তলায় ও উপরে বিস্তর লোক বসে রয়েছে দেখলাম। যে ঘরে তিনি বসেছিলেন তার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু আলমারিতে কত যে বই তা গুণে শেষ কবা সহজ নয়। উপরে যেতেই হীরালালবাবু বললেন—"এই দেখ, একজন ফাস্ট ক্লাশ ছেলেকে এনেছি তোমাকে দেখাতে।" আশুবাবুর চোখ দুটি ছিল খুব ভাবব্যঞ্জক। ইয়ং হেসে বললেন—"তুমি না লন্ডনের এল এল বি-তে ফাস্ট হয়েছ? খুব ভাল। কি চাই?" বুঝলাম যে হীরালালবাবু আগে থেকেই জানিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। পদখলি নিয়ে বললাম যে ল কলেজে একটা চাকরি হলে খুবই সুবিধে হয়। শুন্যেই আশুবাবু বললেন—"তুমি ত' হে সবে পাশ করেছ-একেবাবে কাঁচ-প্র্যাকটিশের বা পড়ানব কোনো অভিজ্ঞতাই ত' তোমাব নেই।" শুন্যেই হীরালালবাবু বললেন—"কেন? তাতে আর হয়েছে কি? তুমি নিজেই ত' য়েবার এম এ পাশ করলে তার পরের বছরই এম এ-র একজামিনার হয়েছিলে অঙ্কতে। তোমারই বা বি

অভিজ্ঞতা হয়েছিল তখন?" একদর লোকের সামনে ঐ রকম করে কথাটা বলার আমার মনে হোল যে আমার কেসটাই খাটি হয়ে গেল। কিন্তু তা হোল না। আশুবাবুর চোখের উপর একটা যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বেশ বোঝা গেল যে হীরালালবাবুর কথাটার তাঁর বিরক্তি হয় নি এতটুকুও। মচকি হেসে বললেন—“আজ্ঞা, আজ্ঞা, দেখব'খন।” হীরালাল-বাবুর ইশিগতে আশুবাবুকে আবার প্রণাম করে নিচে নেমে রসা রোড দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। হীরালালবাবুর দেখলাম খোস মেজাজ। আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন—“বাবাজী, জহুরী জহুরী চেনে হে। তোমার আর ভাবনা নেই।” হীরালালবাবুকে বাড়ি পেঁপীছিরে দিয়ে আপন বাড়ি গিয়ে বাবাকে সান্নাৎ-করের কথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললাম। সোদিন সন্ধ্যার সময় সুসমাচারটা ৭৮নং জ্যান্সডাউন রোডেও পেঁপীছে দিলাম বুঝুর মারফৎ। আমার খাতির যে ভারী শব্দবাবুতে একটু ভেঙে গেল তা তাঁদের ধরবেই বোঝা গেল।

দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়। ল কলেজের গভর্নিং বডির মিটিংই হয় না। আমি যেন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। এমন সময় শুনলাম যে সে বছর আই সি এস চাকরিতে একজন উপবৃত্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন (নমিনেট) করা হবে। তখনকার দিনের ব্যারিস্টারদের মধ্যে একমাত্র আমারই বহু ছিল অব্যবহিত পূর্বের জন্মদিনে চব্বিশ বছর। স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট তখন ছিলেন ভারত সরকারের হোম মেম্বর। সতীশদাদার সঙ্গে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল, কেন না বড়দিনের সময় বড়লাট বখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে ইনিও আসতেন এবং মধ্যে মধ্যে সতীশ-দাদার বাড়িতেই থাকতেন। সতীশদাদা যদি একটু সুপারিশ করতে রাজী হন তবে সে চাকরিটা আমার হয়েও যেতে পারে। আমার তখন আব তর সন্ন না। শাবার তেমন উৎসাহ দেখলাম না। তাঁর ধারণা ছিল যে ল কলেজে যদি চাকরিটা হয়ে যায় তবে মুখ গুঁজে খেতে কাজ করলে আমার প্র্যাকটিশ হবেই এবং তখন এ্যাডভোকেট জেনারেলশীপ বা জজিয়তী মারে কে। বললেন—“একবার সরকার গাহেবরে জিজ্ঞাসা করলে পারছ।” সোদিন সন্ধ্যা নুপেন সরকার সাহেবকে কথাটা বললাম। তিনি বললেন—“দেখ, আমি একটু ভীরা মানুষ। উকিল হবার পর প্র্যাকটিশ করব, না, চাকরি নেব এই মোটানার পড়ে গিয়েছিলাম। অনিশ্চিত আশার আলোর পিছনে দৌড়বার সাহস ছিল না আমার। তাই আমি তখন

মুসেসফী চাকরি নিয়েছিলাম। পরে স্যার বিনোদের প্রবোচনার আমি সে চাকরি ছেড়ে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে একরকম উৎসে গেলি। তবে তখনকার দিনে বারের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আমি যদি তোমার জামগাষ হতুম তবে আমি বোধ হয় আই সি এস চাকরিটাই নিয়ে নিতুম। এ বিষয়ে তোমার নিজেকেই সিদ্ধান্তে দায়িত্ব নিতে হবে।” রিপোর্ট দিলাম বাবাকে আর বুঝুকে। বাবা বললেন—“একবার আশুবাবুর পরামর্শ নিলে হয়।” হীরালালবাবুর সঙ্গে বাবা ও আমি গেলাম আশুবাবুর বাড়িতে। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন বাবা। আমাদের পারিবারিক অশ্বচ্ছলতাব কথা আশুবাবুর অজানা ছিল না। বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে আশুবাবু বিশ্বাহীন কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—“My answer is an emphatic ‘No’—না, না, না।” নিজের মনো-গত ইচ্ছায় স্যার পেয়ে বাবা বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। আমি চলে এলাম প্রণাম জানিয়ে। রাস্তায় নেমে হীরালালবাবু বললেন—“তোমার ল কলেজের চাকরিটা পাকা হয়ে গেল, বাবা।” সন্ধ্যার সময়ে বুঝুকে কথাটা বলায় তিনিও উৎসাহ দিলেন প্র্যাকটিশ করবে। সুতরাং এই দ্বিতীয় বারের জন্যে আই সি এস চাকরিব মোহ আমাকে ছাড়তে হোল। আমি সে চাকরির জন্যে আর দবখাস্তই করলাম না। আমার বাপ-মায়ের অন্তরের আশীর্বাদ ও বুঝুর উৎসাহপূর্ণ শব্দেজ্ঞা নিয়ে আমি ঠিক করলাম প্র্যাকটিশেই মনোনিবেশ করব।

কর্মদিন পর দুঃসংবাদ দিলেন হীরালালবাবু যে যদিও আশুবাবুর ইচ্ছা ছিল ল কলেজের চাকরিটা আমাকেই দেবার কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না, কেন না এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একজন ব্যারিস্টারের জন্যে সুপারিশ করবেছেন যা অগ্রাহ্য করা আশুবাবুর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিটির নাম শুনেই বেশ বুঝলাম যে আমার সমস্যাটা খুবই কঠিন। আই সি এস চাকরিটাও গেল, এখন ল কলেজেও আশা নেই। মনটা যে ভীষণ দমে গেল ভাঙতে আব সন্দেহ নেই। দাদাবাবু বখন শুনলেন যে কৃত্তিব হিসেবে আমার কাছেও লাগেন না এমন একজন ডিগ্রীহীন ব্যারিস্টারের ঐ কাজটা হবে তখন তিনি বেশ কুণ্ঠিতই হলেন। ল কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ছিলেন সে সময়ে হাইকোর্টের জজ উইলিয়াম ইওয়ার্ড গ্রীভস। দাদাবাবুর উপদেশমতে গেলাম গ্রীভস সাহেবের সর্ট স্ট্রীট আর হাণ্ডার-ফোর্ড স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িতে। আমাদের

তামলে কৌশলীদের জজের বাড়ি দহরমহরম করা অবিধেয় বলেই বিবেচিত হতো। তবে আমার কাজটা ছিল ল কলেজ সংক্রান্ত এবং কোর্টেব কাঙ্ক্ষের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। সেই জন্যেই—গির্গেছিলাম সাহস করে। জীবনে আমি বার চারেক জজের বাড়ি গিয়েছিলাম—দুবাব আশুবাবুর বাড়ি ল কলেজের চাকরির জন্যে। একবার চারু-চন্দ্র খোষের বাড়িতে এক বিয়ের সামাজিক নিমন্ত্রণে এবং এইবার গ্রীভস সাহেবের বাড়িতে ল কলেজের চাকরির উমেন্দারীতে। শেষ বার যাই স্যার হ্যারোন্ড ডার্বিশায়রের বাড়িতে বখন তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি ভেঁকে জিজ্ঞাস্তা নৈবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই পাঁচবার ছাড়া কোনো জজের বাড়িতে আমি কখনো যাই নি। গ্রীভস সাহেব সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর বর্ষারসী ভগিনীর সঙ্গে তিনি আমার আলাপ করিয়ে দিলেন এবং টেনিস খেলার পর য়র করে চা খাওয়ালেন। ঠিক বোঝা গেল না ব্যাপারটা কি দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত মার্চ মাস ববাবর ল কলেজ গভর্নিং বডির মিটিং হোল। পরে শুনলাম যে যেই আশুবাবু অন্য ব্যারিস্টারটির নাম প্রস্তাব করলেন তখন অন্যান্য সভ্যরা মুখ চাওয়া-চাওঁয় করতে লাগলেন। একমাত্র গ্রীভস সাহেব আমাকে ঐ চাকরিটা দেবার জন্যে আড় হয়ে দাঁড়ালেন। দুঃজনের কৃত্তিবের তুলনা করে তিনি বললেন যে আমাকে যদি চাকরিটা দেওয়া না হয় তবে সেটা নিছক পক্ষপাতিত্ব করা-ই হবে। আশুবাবুর আমাকে-ই চাকরিটা দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুপারিশের জন্যে তাঁর হাত-পা যেন বাধা পড়েছিল। গ্রীভস সাহেবের নাছোড়বন্দা ভাব দেখে একটু মচকি হাসি হেসে তিনি প্রস্তাব করলেন যে ঐ একটা চাকরিকে দু' ভাগ করে আমাদের দু'জনকেই দেওয়া হোক। অর্থাৎ আমি একদিন পড়াব, অন্য ব্যারিস্টার তার পর-দিন পড়াবেন এই রকম ক্রমান্বয়ে কাজ চলেবে এবং দু' শ' টাকা দক্ষিণাটা ভাগ করে আমাদের দু'জনকে এক-এক শ' করে দিলেই চলবে। সাপও মববে, লাঠিও ভাঙবে না এই দেখে সবাই রাজী হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। কার্যকালে এই রকম রফা আশুবাবুকে মাঝে মাঝে করতেই হোত। যাই হোক, আমি ল কলেজে চাকরি পেলাম—মাস গেলে মাইনে একশ' টাকা। চাকরির মেয়াদ শুরুর হবে জুলাই মাস থেকে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ল কলেজে সব সময়ে দু'একজন অধ্যাপক ছুটিতে থাকতেন। তাঁদের ক্রাশ-গুলিও আমাদের নিতে হোত। সেইজন্যে

বে কয় বছর আমি ল' কলেজে পড়িয়েছিলাম তার মধ্যে দু'-চার মাস ছাড়া আমি বরাবরই পুরো দু'-শ টাকা মাইনেই পেয়েছি। ল' কলেজে লেকচারারের চাকরিটা হয়ে যাওয়ার মনটা যে বেশ হালকা হয়ে গেল তা বলাই বাহুল্য।

একটু পরের কথা এখানেই বলে রাখি। ল' কলেজে নতুন সেসন শুরুর হোল জুলাই মাসের গোড়ায়। আমার ভাগে পড়ল সুকালের ক্লাস। খুব ভোরে স্নান করে কাপড়-চোপড় পরে এগুটি কেস হাতে করে ট্রামে যেতে হোত ল' কলেজে লেকচার দিতে। ক্লাস হয়ে গেলে সেখান থেকে আবার ট্রামে চলে যেতাম সোজা ব্যারলাই-রোডে। নামতাম ছোট আদালতের সামনে হেয়ার স্ট্রীটে। সেখান থেকে চার্চ স্ট্রেন দিয়ে গিয়ে উইডার হাইকোর্টে। একদিন হয়েছে কি, আমি এগুটি কেস হাতে চার্চ স্ট্রেনের ফুটপাথ দিয়ে যাছি। একটা পারিক্যাডি উল্টো দিক থেকে আসছিল। যে জয়লোকটি গাড়িতে সোয়ারী হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি একেবারে সন্মানের বেঞ্চটা পর্যন্ত মাথা নুইয়ে সেলাম করলেন। একেবারে সাদাচোপে প্রণামের মত। চেরে দেখলাম আর কেউ নয় আমার "বস" সরকার সাহেবের "বাবু", নাম সত্য মিথিরা। সেকালে বড় কৌশলীদের "বাবু"-রা বেশ দু' পরসা রোজগার করতেন এবং গাড়িও হাঁকাতে। বলতেই হবে যে তারা যত বর্ধিক-ই হোন না কেন জুনিয়ার কৌশলীদের প্রাধা-সম্মত দেখতে হুটি করতেন না। তবে এ ক্ষেত্রে সেলামের বহরটা যে একটু বেশি-ই হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু যে অপ্রস্তুতভাব মনে হয় নি তা-ও বলতে পারি নে।

সেই সময় কয়েকবারই ট্রামের স্ট্রাইক হয়েছিল। সেজন্য আমার কলেজে হাজিরা দেওয়ার খুবই অসুবিধা হোত। আমাদের সিনিয়র ব্যারিস্টার সূত্রে দস্ত সাহেব যিনি ছোট আদালতে প্র্যাকটিস করতেন তিনি থাকতেন হরিশ মুখার্জী রোডে। আমি হেঁটে তার বাড়ি গিয়ে তারই টিমসে গিয়ে কলেজে হাজিরা দিতাম। এই একসঙ্গে কলেজে যাওয়ার সূত্রে সূত্রে দস্ত সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করেছেন তার মৃত্যু পর্যন্ত। তিনি খুবই স্পোর্টসম্যান ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে খুঁচোড়ও বলত। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার বরাবরই সৌজন্যপূর্ণ ছিল।

আমাকে কণ্ট্রী আইন পড়াতে বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিলিটী আইনটা ভালই পড়া ছিল। ক্লাসে লেকচার দেবার জন্যে আমাদের দেশী Contract Act-টা ভাল করে ব্যাড়াতে পড়ে নিলাম। তখনকার দিনে Pollock and Mulla-র লেখা

ইখানার নামভাক ছিল। সেটাকে আদ্যোপান্ত পড়ে তৈরি হয়েছিলাম লেকচার দেবার জন্যে। প্রতিদিনের লেকচার বেশ তৈরি করেই ক্লাসে যেতাম। পড়াভাক কেমন তা ছাত্ররাই বলতে পারেন। ল' কলেজে পড়াবার সময় দুটো ঘটনা যা ঘটেছিল তা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমদিন যখন কলেজে সেলাম তখন অধ্যাপকদের কমনরুম আমার এগুটি কেস ও রেইন কোটটা রেখে ক্লাসে সেলাম রোল কলের বেকিংশি খাতাটা নিয়ে। ক্লাসে ঢুকে নাম ডেকে ছেলেরদের ছোয়ারা চিনে রাখবার জন্যে তাদের মুখের দিকে চেরে দেখছিলাম। একটা নাম ডাকতেই যে ছেলেরি উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলেন চেরে বেশি যে তিনি আমায়ই সত্যি-সত্যি কি বঙ্গবাসীতে আমারই সপ্নে পড়তেন। আমি তো মনে প্রমাণ গলালাম। ডাবলাম কণ্ঠের তো আমার এলোম বেশ ভালই জানেন এবং সেইজন্যে বাকি বা ক্লাসে হাঙ্গামা করে অন্য খ' ঘটকেন। বাই হোক, উপায় নেই। দেখা যাক কি হয় বলে রোল কল শেষ করে প্রথম কতুতা দিয়ে ফেললাম। ক্লাসের পর কণ্ঠটি আমার কাছে এসে দাঁড়িলেন বারান্দায়। শুনলাম বি-এ পাশ করে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্যী শূনে বাণিজ্যের গান্দায় বছর তিনেক কাটিরে এখন ল' কলেজে ঢুকে তাঁর পৈতৃক ব্যবসার চোকবার ইচ্ছে করেছেন। খুব বিনীতভাবে তিনি বললেন—"ভাই, আমাকে মলকে থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আসতে হয়। ক্লাসে আসতে কখনো অসুখা করব না। তবে দু'-চার মিনিট যদি কোনদিন দেরি হয়ে যায় তবে দস্ত করে আমাকে এ্যব-সেন্ট মার্কা যেন কোরো না, ভাই।" আমি মগুকা পেয়ে বললাম—"তা বেশ। দু'-চার মিনিটের দেরিতে আর কি ক'ত হবে। ঠিক আছে—তবে এসো কিন্তু প্রত্যেকদিন। আর হ্যাঁ দেখ—তুমিও ভাই ক্লাসে কিন্তু কোন গোলযোগ বাখিয়ে না। কি বল?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার শারা তোমার কোন অসন্মান হবে না।" আমার কনটা যেন মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল। একথা বলতেই হবে যে কণ্ঠটি তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

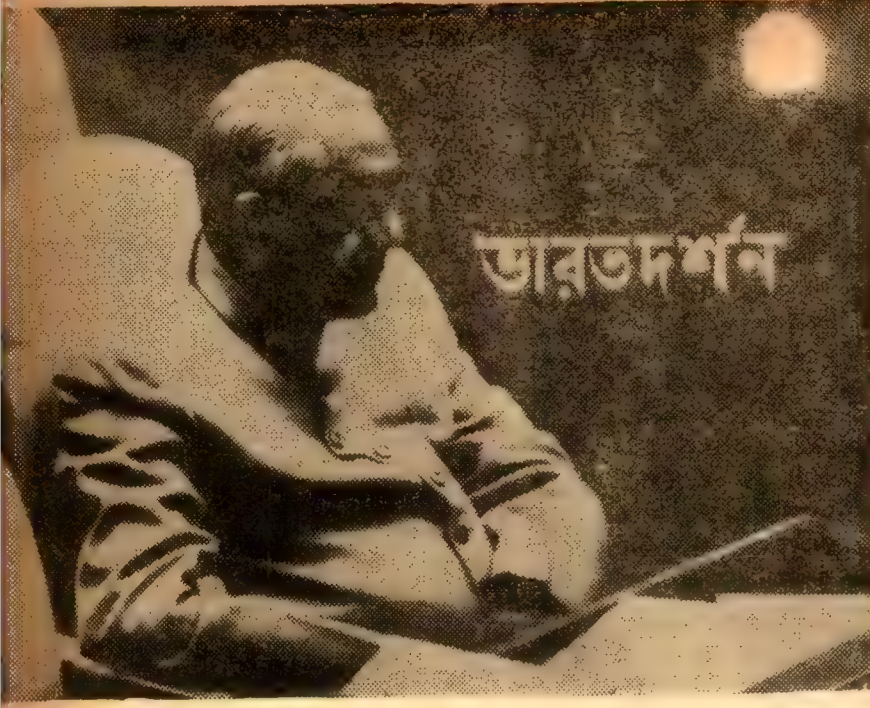
আমাদের সময় ল' কলেজে প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়েল পরীক্ষা হোত। নিয়ম ছিল যে ছেলেরদের টিউটোরিয়েল খাতা দেখে ডল সংশোধন করে নম্বর দিয়ে সেইসব খাতা আশুবাবুর কাছে পাঠাতে হবে। খাতা যখন ফিরে আসত তখন ছেলেরদের কাছে খাতা ফেরত দেবার আগে পাড়া উল্টিয়ে দেখেছি প্রত্যেক খাতার প্রশ্নোত্তরের নিচে দু'টি অক্ষর "এ" এবং

ইংরেজীতে লেখা। ল' কলেজে তখন ছাত্রসংখ্যার সীমা নেই। তিনটি বছরে প্রত্যেক বছরে অনেকগুলি করে সেক্সন। সারাদিন জিজ্ঞাসী করে সম্ভার কিন-বিদ্যালয়ের নানা বিভাগের কাজ দেখে আশুবাবু যে এইসব টিউটোরিয়েল খাতা পড়তেন সেটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। কতুত যাদুী অধ্যাপকেরা বলতেন—"ও একটা ভাল মশার। আমার বাতে সোজা পায় খেটে বাই তার জন্যে রাশ টেনে রাখার প্রয়াস।" অকিও ভেবেছিলাম যে এটা একটা দেখান ব্যাপার মাত্র।

আমার ক্লাসে একটি মহোদয়গী ছিলে পড়তেন—নাম ছিল তাঁর চণ্ডীপ্রসাদ খেতান। নামকরা এটর্নী দেবীপ্রসাদ ও ব্যারিস্টার কালীপ্রসাদ খেতানের এক ভাই। অত্যন্ত সজা ছিল ছেলেরি কথাকতা ও কব-হার। পড়ার ছিল তাঁর পতীর মনোযোগ এককথায় পড়াবুনার চণ্ডীপ্রসাদ ছিলেন খুবই ভাল ছেলে। একবার টিউটোরিয়েল পরীক্ষার চণ্ডীপ্রসাদের উত্তর হারোছিল অসাধারণ ভাল। আমি তাঁকে একেবারে পুরো নম্বর দিয়ে তাঁর খাতার নিচের দিকে লিখে দিলাম—"Excellent: I suggest you read the following books on this topic." কতকগুলি বইয়ের নাম লিখে নিজের নাম সই করে দিলাম। যেমন প্রত্যেক সপ্তাহে যার তেমন নিয়ম মোতাবেক সব খাতাগুলি গেল "কতা"-র কাছে। কথারীতি খাতা-গুলি ফিরে এল। পাড়া ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি চণ্ডীপ্রসাদের খাতার তলার ইংরেজীতে লেখা—"I further recommend the following books."

গোটাটিনেক বইয়ের নামের তলায় সেই পরি-চিত "এ এম" লেখা ইংরেজী হরফে। খাতার মধ্যে আমার নামে একটা চিহ্নকুট ছিল। ভাঁজ খুলে পড়লাম—... Mr. Das, please keep an eye on this boy and give him every encouragement and help in his studies." অবাক হয়ে গেলাম আশুবাবুর কর্মকমতা ও ছেলেরদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেখে। এ তো কেবল লোক দেখান ভাঁওতা নয়। এ যে হাড়ভাঙা পরিপ্রায়। এই রকমটি না হলে কি অত বড় হওয়া যায়। আশুবাবুর কথা ভেবে সন্দেহে মাথা নুয়ে গেল। সব-চেয়ে বড় দুঃখের কথা হোল চণ্ডীপ্রসাদ অতি অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। একটি জীবন যা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে অসাধারণ সুগন্ধ ছাড়িয়ে রেখে যেতে পারত তা হুটে উঠতেই পারল না।

বছর তিনেক ল' কলেজে কাজ করবার পর আমার কোর্টে অল্প অল্প কাজ হতে শুরুর হওয়ার আমি ল' কলেজ ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিশে মনোনিবেশ করলাম। [কল্যাণ]



খ্রীষ্টাব্দের পদত্যাগ

অগ্নিতে আগুন

হুমকি-বকম সার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে কত দুর্বল আর কত অসহায় সম্প্রতি অগ্নি বিরাটের মধ্যে দুর্দৃষ্টি ঘটনা তার প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরল। আমাদের কঠিন তথাকথিত লৌহমানব উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী মাহিনা মজদুরী এবং মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার প্রতিজ্ঞা বার বার বড় করে ব্যক্ত করেছিলেন। মূল্যবৃদ্ধি রহিত করার প্রশ্নটিতে অবশ্য প্রথমাধিকই অর্থমন্ত্রীর বিশ্বাস শিথিল ছিল। কিন্তু তাঁর মতো কঠিন মানুষ যে যুদ্ধারম্ভের আগেই মজদুরী বৃদ্ধির প্রস্তাবে রণে ভগ্ন দেবেন এমন কথা কেউ ভাবতে পারেন নি। অথচ সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্নে অর্থমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত নমনীয় হতেই হল।

এই নমনীয়তার জন্য অর্থমন্ত্রীর বিবেচনার প্রশংসা করতেই হয় (কেন না বিবেচনা বস্তুটি নেতৃত্বহলে ইদানীং দুর্লভ)। কেন না বাজারের আগুন যখন তিনি নেভাতে পারেন নি তখন কর্মীদের মনে বিক্ষোভ ধর্মায়িত হতে দিলে সে আগুন লাগার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে চিরাচরিত নিয়মে। উদ্যোগগামী বাজার দরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মীদের ক্ষেত্রে একটা জোড়া-তালির ব্যবস্থা হলেও রাজ্য-কর্মীদের দুর্বলতা নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা থামান নি। সম্প্রতি অবশ্য অকংগ্রেসী

সরকারের কৃপার অনেক রাজ্য-কর্মীগণ কেন্দ্রীয় কর্মীর সমাহারে ভাতা পাচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে অর্থাভাবের ও অক্ষমতার দরুণ রাজ্য-কর্মীদের বাঁচার দাবিকে রাজ্য সরকার পুরোপুরি আমল দেন নি। কেন্দ্রীয় কর্মীদের পুনরায় আরবৃদ্ধির জন্য রাজ্য কর্মচারীদের পুনশ্চ বিপাকে পড়তে হবে, কেন না বাজার উদ্যোগগামী। সুতরাং সর্ব অনিষ্টের সর্বশেষ ফলভাগী রাজ্য-কর্মীরাও চাইবেন তাদের আর-বৃদ্ধির দাবি তুলে ধরতে আর এই ন্যায়-সঙ্গত দাবিকে নস্যাত করে দেওয়ার পক্ষে রাজ্য-সরকারের অক্ষমতা প্রদর্শন ভিন্ন অন্যতর যুক্তি নেই।

কিন্তু এ সমস্টই যুক্তি এবং পাণ্ডা যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। এ পথে প্রচণ্ড নিষ্প্রাণ ঘটিয়ে সব ওলট-পালট করে দিলেন আমাদের দুর্বল শাসকের প্রশ্নে ধূমকেতুর মতো অবাধে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত মূল্যবৃদ্ধির বলিকসমাজ। কয়লা খনির মালিকরা খনি-প্রাথমিক সম্পর্কিত ওয়েজ বোর্ডের রায় প্রকাশ পাওয়ার পর কয়লার দর বাড়ানোর জন্য সরকারের ওপর এক তরফা চাপ সৃষ্টি করলেন। এমন অতর্কিতে এমন অসৌজন্যের সপে জোটবন্ধ খনি-মালিকরা অগ্নিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন যে বেসামাল সরকার চোখে সর্বপূর্ণ অবলোকন করে অভ্যন্তরে রেলগাড়ির চাকা বন্ধের জন্য অত্যাৱশ্যক অস্বাৱশ্যক টেনের তালিকা বাছাই শুরু করে দিলেন।

খনি-মালিকদের ধন্যবাদ, একটি মোক্ষম ধাক্কা তীরা বক্তৃতা-সর্বস্ব সরকারের নিদারুণ বলিক-নিষ্ঠর অসহায় শাসনযন্ত্রটির স্বরূপ জনসমক্ষে হাতে

হাঁড়ি ভাঙার মতো হকিডাক সহকারে উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। সরকারী হুমকি-বকমের স্বরূপটি গ্রহণ-গ্রাসিত সূর্যের মতোই স্তান হয়ে গেল। প্রথম ধাক্কাই সরকার চরম হার স্বীকার করে টেনের তালিকা ছাঁট-কাট করতে বসলেন। অথচ শ্রমিক ঘেরাও নয়, ধর্মঘট নয়, দেশে অস্বাভাবিক অবস্থাও নয়। দেশের যারা প্রকৃত মালিক সেই বলিককুলের হুমকীতে হেঁদিয়ে পড়লেন সরকার। এর চেয়ে অবমাননাকর পরিস্থিতি কল্পনাতীত, এমন মালিকানী দুর্বিনের ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নি।

ওয়েজ বোর্ডের রায়ের ফলে শ্রমিকদের দেয় বাড়তি টাকার শতভাগই দাম বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার জন্য এই মালিকী চাপ যে-কোনো ঘেরাও আন্দোলনের থেকে ভয়াবহ হলেও সরকার এ হুমকীর জবাবে অনতিবিলম্বে দাম বাড়ানোর বায়না-কেই চুক্তিবদ্ধ করলেন।

ইস্পাত-মন্ত্রীদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মালিক দাবিকে কমিয়ে টন প্রতি পাঁচ টাকা মূল্য বৃদ্ধির চুক্তিতে প্রকৃত-পক্ষে সরকারেরই জয় হয়েছে। কেন না কয়লার মূল্য বিনিয়ন্ত্রণের পর সরকার টন প্রতি পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পরিস্য বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মালিকগোষ্ঠী চেয়েছিলেন সাত টাকা আট পরিস্য বৃদ্ধি। আর এই দাবি সরকার ও ইস্পাত শিল্প (পাবলিক সেক্টর) না মানা পর্যন্ত কয়লা সরবরাহ তাঁরা বন্ধও করেছিলেন। উত্তরে টেন বন্ধ করে সরকার এক যুগান্তকারী খেলা খেলে মালিকগোষ্ঠীকে গো-হারান হারিয়ে দিলেন বলে সরকারী মহলে আশ্ব-প্রসাদ দেখা দিয়েছে। ইস্পাত মন্ত্রী-দপ্তরের মুখপাত্রের বিবৃতিতে সরকারী উল্লিখিত আশ্বপ্রসাদের যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তা কিন্তু আসলে সরকারের দৌর্বল্যকেই আরও প্রকট করে তুলল। টেন বন্ধ করে অগণিত জনসাধারণের অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে সরকারকে বশে আনতে হল বেপরোয়া মালিকগোষ্ঠীর হুমকীকে। এর চেয়ে দৌর্বল্যের নজির আর কী হতে পারে। তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি মেনে নিয়ে তলনামূলকভাবে কত অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার মালিকস্বার্থের ক্ষেত্রে আনত শিরদাঁড়া হতে পারেন, এ ঘটনা তারও একটা টাটকা প্রমাণ রাখল। মোরারজী দেশাই-এর মূল্যবৃদ্ধি রহিত করণের ফাঁকা আওয়াজ পণ্ডভূতে বিলীন হয়ে গেল। বেসরকারী ক্ষেত্রে এখনো কোনো নির্দিষ্ট বৃদ্ধির পক্ষে মীমাংসা হয় নি।

ভারতের অর্থনীতির সমগ্র ব্যাপারটা মূল্যবৃদ্ধির দাপটেই লাট খাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মীদের আরবৃদ্ধির কোনো অর্থই হয় না যখন তারই সঙ্গে ততোধিক মূল্য-বৃদ্ধি সেই আরবৃদ্ধিকে নাকচ ফেলে

এগিয়ে যায়। বরং আরবীশ্ব প্রকৃতপক্ষে অধিকতর আর হ্রাসেরই কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর যে কোনো এক শ্রেণীর কর্মী বা শ্রমিকের আরবীশ্বজনিত মূল্য বৃদ্ধির চাপে দরভোগ ভুগতে হচ্ছে সর্ব শ্রেণীর সাধারণ মানদুশকে।

পরলা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই কলকাতার কোনো কোনো কয়লার দোকান দৃশ' সত্তর পরস্যা থেকে মূল্যবৃদ্ধি করে তিন শ' পঞ্চাশ পরসার দর বেঁধে দিলেন। বলবার ধরবার না-করবার উপায় নেই। দুর্বল শাসকদের হাতে জনসাধারণ আজ দুর্গতির চরম সীমার উপনীত হয়েছেন। সরকারের বণিক তোষণের বন্যায় সাধারণের নাভিস্তবাস উদ্ভাসিত হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি মহতে। এই প্রতিকারহীন অরাজকতার হাতে আমরা মার খাচ্ছি, যখন সরকারের হাতে অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের ক্ষমতা কেবলমাত্র ক্রিকেট সাধারণকে তড়ুনা করবার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্বল শাসকগোষ্ঠী যে যখন গদিত্তে বসছেন জনগণের দুর্গতির প্রতি তিনি তখনই নির্বিকার শালগ্রামে রূপান্তরিত।

এমতাবস্থায় দেশের পরিস্থিতির ওপর কলমবাজি করতে বসে কলম-মবীশদেরও আলস্য এবং জাডো ভ্রমশ আক্রমণ করছে। তাঁদের শাণিত শঙ্কাবলী আজ কুড়িটা বছর অপব্যয়িত অপচরিত হয়েছে। জন-স্বার্থের পক্ষে দু'টো কথা সাজাতেও তাঁরা দিশাহারা। কেন না শাসকের ভাষ্যরও ফুরিয়ে এসেছে। কোন শব্দই আজ আর কাউকে আঘাত করে না।

শিল্প-মালিকরা মূল্যের অগ্নারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। দাবানলের মতো সে আগুন চতুর্দিক পুড়িয়ে ছার-খার করছে আর অসহায় সাধারণ মানদুশ হচ্ছেল পতঙ্গের মতো সেই লেলিহান শিখার শিকার। অন্যদিকে প্রদর্শনীর দর্শকের মতো মর্ষাদার আসনে বসে নিষ্ঠুর রোমক রাজপরিবারের মতো আমা-দের শাসকবৃন্দ আপনাপন মনসদের বিলাসে গা এলিয়ে দিয়েছেন। সেই মনসদের জন্যই রাজ্যে রাজ্যে লোলুপ কাড়াকাড়ি হানাহানি নিলঞ্জ ক্ষমতা-লোভী চক্রের জয়-পরাজয় এদেশের বিকারগ্রস্ত রাজনীতি হয়েছে।

অগ্নারের আগুন বহু-ব্যবহারে বিস্ফোরণের ক্ষমতাও বাকি হারিয়ে ফেলেছে। জাতির জীবনে এমন দুর্দিন অবশ্য একটা চরম হেষ্টনেন্তর অপেক্ষায় বেশ কিছুকাল ধুইয়ে ধুইয়ে ফুঁসতে থাকে। কিন্তু এদেশে লোভের অগ্নার যেভাবে জ্বলছে তাতে উত্তাপ এতো তীব্র যে ধোঁয়ার সৃষ্টিও হয় না। টাটকা আগুন গনগন করছে। তারই আঁচে আমরা

পরস্পরের কলসানো মুখ দেখছি। আগুন ধোঁয়াচ্ছে না, গুমরাচ্ছে না একেবারে ফেটে পড়ার অপেক্ষায় তপ্ত হচ্ছে। আর তাই হতে দেওয়া হচ্ছে অবিস্ময়কারী হঠকারী শাসকের ক্ষমাহীন দুর্বলতার জন্য।

যেভাবে কয়লা খনি কার্টেল সরকারী বাগাড়ম্বর নস্যাত করে দিলেন, তার পরও খনি ও ইম্পাতদপ্তরের মুখ দেখাবার উপায় থাকে কি?

খনি-ইম্পাতদপ্তরের মন্ত্রী প্রীচেন্দ্র রেড্ডি লোকসভায় বড় মুখ করে কয়লা বিনিয়ন্ত্রণের আয়োজন করে ঘোষণা করে-ছিলেন, মূল্যবৃদ্ধি হবে না। অথচ এই আশ্বাস যে কত ঠুনকো সম্ভবত তিনি নিজেরও তা জানতেন। তবু এটুকু ধোঁকা বজায় রাখার লোভ দুর্বল শাসন-মন্ড কখনই সম্বরণ করতে পারে না। তিনিও পারেন নি। এখন এরা কাদুনি গাইছেন। কয়লা-খনিমালিকরা সরকারের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে। যে সরকার কুড়ি বছর ধরে লোভীর লোভ, কালোবাজারীর মনোমার আকাঙ্ক্ষা চক্রাকারে বাড়তে দিয়েছেন, সে সরকার যে আপন হাতে তৈরি শয়তানের দ্বারা লাঞ্চিত হবেন এতে আর বিচির কি।

সরকারের আগেই অবহিত হওয়ার মতো কারণ কয়লা মালিকরাই সৃষ্টি করেছিলেন। কয়লা বিনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংগেই কয়লা উৎপাদক সমিতি একটি মার্কেটিং কার্টেল গঠন করেন। অর্থাৎ এককোটা বেনিয়া চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ তখনই শুরু হয়।

এই কার্টেল সরকারের তোয়াক্কা না রেখেই টন পিছ সাড়ে সাত টাকা মূল্য-বৃদ্ধির একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ছাড়া কার্টেল রিবেট ডিসকাউন্টও বাতিল করে দিলেন। ইম্পাতমন্ত্রক এই অতর্কিত মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণাতে যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং সরকার এই ঘোষণার পরিত্রেক্ষিতে টেন বম্বের যে আয়োজন করলেন তা সরকারী কার্য-কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে কেউ অভিযোগ করলেও এখন আর বলবার কিছু নেই। নিয়ন্ত্রণ তোলায় সময়ই মালিকগোষ্ঠীর মনোমার আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল। হয়ত সরকার ভেবেছিলেন মালিকপক্ষের স্বার্থ সরকার যখন দেখেই আসেন তখন মালিকপক্ষ অন্তত সৌজন্য বজায় রাখবে। কিন্তু কালসপের আবার সৌজন্যবোধ। সরকার যদি দৃষ্টি কদলী সহযোগে কালভুজলকে বশীভূত রাখবেন বলে ভেবে থাকেন তবে এতোকাল ভুলই করে এসেছেন। আজ তার মামুল গণে দিতে হচ্ছে।

পাঁচের কোঠায় মালিকগোষ্ঠীকে অতঃপর রাজ্যী করিয়ে দর তুলে বাঁধার যে

খেলাটা হয়ে গেল তার পরেও সরকারী তরফে আত্মপ্রসাদ ঘোষণা করার মধ্যে অধিকতর দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে। লজ্জা এবং ঘৃণা দুই-ই যখন বরবাদ হয়ে যায় দুর্বলতা তখন অবশ্য নিজের পক্ষে যুক্তি সাজায়। এও তেমনি ঘটনা।

কয়লার মূল্যবৃদ্ধির খেলাটা কিন্তু সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির ঘোড়দৌড়ের মতো অন্যতর একটি ঘোড়ার বাজিমাং রূপে দেখা চলে না। কারণ এই প্রথম একটি শিল্পগোষ্ঠী সরকারের কিছুমাত্র তোয়াক্কা না রেখে আপন জিন্দকে চাপিয়ে দেওয়ার গোঁরাভূমি প্রদর্শন করলেন। প্রকৃতপক্ষে কোন সরকার চালাতে হলে, এ ঘটনাত সুদূরপ্রসারী ফলাফল চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ইতিপূর্বে সিমেন্ট উৎপাদক কার্টেলও এতেন্দুর স্পর্ধা প্রকাশ করার দোসাহস দেখাতে পারেন নি।

কয়লা-খনিমালিকদের সমুচিত জবাব দেওয়া সম্ভব হ'ত যদি সরকার বণিক-শাসিত না হয়ে বণিক-শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন। কয়লার মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদকে বেসরকারী সংস্থার খোলাখলি হাতে ছেড়ে দিয়ে যে সরকার সরকারী কড়িয়ে শিপোন্নয়নের স্বন দেখেন, গোড়ায় গলদ রাখাই যে সেই সরকারের নীতি অতঃপর তারও প্রমাণ কার্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা গেল। উন্নত ধনাত্মিক দেশেও কয়লাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। আর ভারতের মধ্যে একটি দেশে, যেখানে চেম্বার অব কমার্স চটে গেলে যে কোনো মন্ত্রীর গদি টলতে পারে (শ্রীনন্দার কলকাতা আগমন এক চেম্বার অব কমার্সের মান-ভাঙানোর স্বাধি রোমশ্বনীয়) সেখানে কয়লার জাতীয়-করণের জন্য কোনো চিন্তাই করা হয় নি আজ যদি কয়লা উৎপাদকরা কয়লা তোলা বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, সরকারী সংস্থাও তাহলে উৎপাদন বন্ধ করে আকাশের তারা গণনা করতে হবে। অভট্টা এ বাস্তব করতে হয় নি। ট্রেনের চাকা বন্ধ করেই যে এবার তরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, এটাই যথেষ্ট এবং সেই হিসেবে সরকারপক্ষে কিছু আত্মপ্রসাদ ঘটে থাকলেও দেশ-কাল-পাত বিচারে তার যথার্থ্যও স্বীকার্য। কিন্তু এই আত্ম-প্রসাদ ভরাবহও বটে।

কয়লা-শিল্পে আজ যেভাবে অগ্নারে আগুন ধরানো হ'ল এবং সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ পরিসর ফলে সর্বত্র ব্যবসায়ী-কুলের খপ্পরে যেভাবে সুযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে পরিণাম সাম্প্রতিক হতে পারে যে কোনো মহতে যে কোনো শিল্পেই।

এই অভিজ্ঞতার পর সরকারী পরিচর

দ্বাখতে হলে সব কটি উপাদানের চারি-
কটি সরকারের আপন আঁচলে বেঁধে
নেওয়ার দরকার। কয়লার মতো গুরুত্ব-
পূর্ণ উপাদানকে তো কোনক্রমেই আর
বেসরকারী খোয়ালখুশির কবলিত হয়ে
ধাকতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ খনি-
মালিক কার্টেলকে সমুচিত জবাব দিতে
হলে এখনই কয়লা জাতীয়করণের প্রশ্নটি
উত্থাপিত হওয়ার দরকার।

পরমা সেপ্টেম্বর থেকে যে টাগ অব
ওয়ার চলল তার চাপটা কিন্তু শেষ বেশ
জনসাধারণের ঘাড়ে চাপতেই চেষ্টা করবে।
ইতিমধ্যেই বাজারে কয়লার দাম চড়েছে
(অবশ্য দাম এইভাবেই চড়ে দেওয়া হয়),
এখন চড়া দাম কতদূর জেঁকে বসবে
সেটাই প্রশ্ন। এ বিষয়ে সরকার কী সেক-
গার্ডের ব্যবস্থা করছেন সাধারণ মানুষের
মাঝে সে প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করেছে।
ধুরো ব্যবসায়ীরা এক-একটা কাগজী
লড়াই-এর সুযোগে সাধারণের পকেট মেরে
এক-একটা অট্টালিকা হাঁকাবার ফালতু
দুরোগ লটে চলেছেন, বড় ব্যবসায়ীরা
এক-এক শাক্তর লক্ষপতি বনে যাচ্ছেন
আর চাকুরে মানুষ বৃকের ওপর কেঁলি
হস্তীপ জানোয়ারের চাপ অনুভব
করছেন। এর প্রতিকার না করা গেলে
উত্তম অপার এক সময় ফাটবেই এ সত্যটা
কোনো আত্মপ্রসাদের স্বপ্নজালেই কিন্তু
আচ্ছন্ন করা যায় না।

শ্রীচাগলা পদত্যাগ

শ্রীযুত এম সি চাগলা যে একদিন
কেন্দ্রীয় ক্ষমতাচ্যুত থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাধ্য
হবেন এমন আশঙ্কা এবং জল্পনা-কল্পনা
আভিজ্ঞানহলে গুঞ্জনিত থাকলেও, তিনি
যে প্রশ্নে পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে
অকস্মাৎ এবং কার্যবিলম্ব না করে ইস্তফা
দিলেন তাতে সকলেই বস্তুত আশ্চর্যবোধ
করছেন। শ্রীচাগলা বলেছেন, তিনি
ভারতের একো বিশ্বাসী এবং ভারতের
একো প্রশ্নই (সরকারের ভাষা ও শিক্ষা-
নীতির ক্ষেত্রে) আজ বিচ্যুত হতে বসেছে
বলে তিনি পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর
দেখছেন না। তিনি সরকারী নীতির
সমালোচনা করতে চান নি। সরকারী
মর্বাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন। অথচ
যেহেতু তাঁর পদত্যাগের কারণ নীতিগত
এজন্য তিনি নীতির প্রশ্নে সরকারী
নীতির সমালোচনা করতে চান। সে কাজ
মন্ত্রী হিসেবে করা যায় না। তাই
পদত্যাগ।

বস্তুত সরকার ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে
যে নীতি গ্রহণ করতে চলেছেন, পররাষ্ট্র-
মন্ত্রণালয়ের আবডালে বসে সে সম্পর্কে
তাঁর চূপ করে বসে থাকার সম্ভব নয়।
কারণ তিনি মন্ত্রীদের বোধ দায়িত্বে
বিশ্বাসী। যে সরকারী নীতিতে তাঁর

মান নেই তাকে বিভাগীয় নীতিরূপে এক-
পাশে রেখে নিজ দপ্তর তিনি চোখ বুজে
চালিয়ে যেতে পারেন না। কারণ সরকারী
নীতি পদাধিকার বলে তাঁরও নীতি, যদি
মন্ত্রীদের বোধ দায়িত্ব গদির মোহে
অস্বীকৃত না হয়। গদির মোহে চাগলা
সাহেব এই নীতিবিগাহিত কাজটি না করে
মন্ত্রিকূলের সামনে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত
করে গেলেন। অবশ্য নীতির প্রশ্নে পদ-
ত্যাগ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে নেহরু
আমলে শ্রী ভি ভি গিরি প্রমমন্ত্রকের এবং
শ্রী সি ডি দেশমুখ অর্থমন্ত্রকের মন্ত্রীপদে
ইস্তফা দিয়েছেন।

শ্রীচাগলা পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত
হয়ে শিক্ষামন্ত্রকের নীতির প্রশ্নে পদত্যাগ
করলেন এটাই লক্ষণীয়।

শ্রীচাগলার পদত্যাগে অনেকে আশ্চর্য
হলেও যেমন তাঁর ভাড়া ভাড়া অবস্থার তাঁর
পদত্যাগগ্রহণ করা হ'ল সেটাও কম
লক্ষণীয় নয়। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ গ্রহণ
করে কিছু বিরক্তিও সেই সপ্তে উপহার
দিয়ে মলত্যাগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং
ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য সময় না দিয়ে
শ্রীচাগলা তাঁর পদত্যাগের ইচ্ছা সাধারণ্যে
প্রকাশ করে অনুচিত কাজ করেছেন।
যাকগে (অর্থাৎ কথা বাড়িয়ে কাজ কি)
শ্রীচাগলার পদত্যাগ গ্রহণের জন্য প্রধান-
মন্ত্রী সুপারিশ করেছেন।

ভারতের একা এবং শ্রীচাগলা

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরিত গতিতে শিক্ষার
মাধ্যম পরিবর্তনে শ্রদ্ধা শিক্ষাক্ষেত্রেই যে
সংকটের সৃষ্টি হবে তাই নয়, শ্রীচাগলা
মনে করেন, এতদ্বারা ভারতের একা-
চেতনাও বিচ্যুত হবে।

সংবিধান-স্বীকৃত ভারতীয় আঞ্চলিক
ভাষাদলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে
অত্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রবর্তন করা যে
একটা গোলজামিলের ব্যাপার, পাঠ্যবস্তুকে
প্রচুর অর্থব্যয়ে ভাষান্তরিত করার প্রশ্ন
বহন উঠেছিল তখন অনেকেই এ বিষয়ে
চিন্তা করেছিলেন। শ্রীচাগলাও মনে
করেন, স্বরিত ভাষান্তর একটা অসম্ভব
গোলজামিলের ব্যবস্থা। তার দ্বারা শিক্ষা-
নিকেতন খুব জোর স্নাতক তৈরির কার-
খানায় পর্ববাসিত হবে বলে শ্রীচাগলা মনে
করেন।

তিনি মনে করেনঃ আঞ্চলিকতার বশ
প্রকোষ্ঠে শিক্ষাকে আবদ্ধ করা হলে
বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষকের মূল্যবান
সহায়তা থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত হবেন।
যাকে ইংরেজিতে 'মোবিলিটি' বা সঞ্চরণ-
শীলতা বলে সেই মোবিলিটি অব টীচারস
শিক্ষকগণের সহজ গতি অবরুদ্ধ হবে।
ফলত শিক্ষার মানও অধঃপাতিত হবে।

তিনি বলেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই
একটা ব্যবস্থাকে আরোপ করে আমরা

লাভবান হতে পারি না। এছাড়া সংযোগ
রক্ষী ভাষার বা লিঙ্গ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রশ্ন
তো আছেই। আঞ্চলিক ভাষার ফলে সংযোগ-
বিচ্ছিন্ন অনেকের প্রাণলাই বেড়ে যাবে
আর ভারতের একা তাতে ব্যাহত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, এ সব যুক্তি
ফালতু। বিভেদের মধ্যে একা বজায়
রাখাই ভারত সরকারের নীতি।

ভারতের একা সম্পর্কে ইদানীং বহু
গালভরা উত্ত প্রত্যাশী শোনা যাচ্ছে বটে
কিন্তু আদৌ একা সংস্থাপনার কোথাও
কোন আগ্রহের চিহ্ন লক্ষিত হচ্ছে না।
ভারতদর্শনে ইতিপূর্বে এ প্রশ্নে আমরা
বলছি, যে দেশে ব্যক্তিগত জাতীয়
স্বার্থকে পর্যদস্ত করে এগিয়ে গিয়ে
ক্ষমতার আসন আগলানোর জন্য আঁকপাক
করছে সে দেশে একো আশা তিরোহিত
হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যস্বার্থ
এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে যে অপর
রাজ্যে দুর্ভিক্ষজনিত অনাহারাক্রান্ত অবস্থা
দেখেও পার্শ্ববর্তী রাজ্য তার উদ্বেগের
জ্ঞাপ দিতে গররাজি হন। রাজ্যে রাজ্যে
শিব সেনার মতো রাজ্যস্বার্থবাদীরা
চাড়া দিয়ে উঠছে। একা অপেক্ষা
অনেককেই আমরা বরদাস্ত করে আসছি
বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে।
আর সেজন্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দায়িত্ব
অস্বীকার করার পথ নেই। তথাপি
একো কথা কেন্দ্রীয় নেতারা ফলাও করে
বলে থাকেন। অনেকের চেতনাকে প্রশস্ত
দিয়ে একো বাণী বিতরণের এই আত্ম-
প্রত্যরণাই বিভেদের মধ্যে একো স্বপ্ন
কিনা জানি না। তবে বর্তমান নেতৃত্ব
এইভাবেই আত্মতৃপ্ত থাকতে চান।

ভাষার প্রশ্নে একাবোধ কী মারাত্মক-
ভাবে বিচ্যুত হতে পারে, দক্ষিণ ভারতের
ভাষা আন্দোলন তার প্রমাণ রেখেছে।
তামিলনাড়ু সম্পূর্ণভাবে এমন একটি রাজ-
নৈতিক নল্লের হাতে ক্ষমতা তুলে
দিয়েছেন বা আঞ্চলিক শোষণানের
ভিত্তিতেই নির্বাচনে সকলকে দাবিয়ে
নিজে প্রাতিষ্ঠিত করেছে। মহারাষ্ট্রেও
সেই অগ্রগতি লাভ করতে চলেছে শিব
সেনা। অন্যান্য রাজ্যেও তারই অনুগমন
অসম্ভব নয়। এর পরেও একো প্রশ্নে
বুলিসর্বস্বভার আর বিশ্বাস রাখা যায়
না। ভারতে আর্থিক সাহায্য একো
যেমনতর রূপই থাক, রাজনৈতিক জীবনে
কখনো একাবোধ ছিল এমনতর আত্মপ্রসাদ
আমাদের না রাখাই ভালো। রাজনৈতিক
একা থাকলে সম্পদশালিনী লোকবল
সমৃদ্ধ ভারত বার বার বহিঃশত্রুর দ্বারা
অবাধে আক্রান্ত এবং বিজিত হতে পারত
না।

বরণ স্বীকার করা ভালো ভারতে
এখনও একা সংস্থাপনার জন্যই বিশেষ
চেতনা সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।

কেবলমাত্র ভাষার প্রশ্নেই যে ভারতীয় একাধিক বিনষ্ট হবে সেজন্য এই ক্ষতিতে সমস্যার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে আঞ্চলিকতার যে আবেগ ও ক্ষুব্ধতা দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা সেই আবেগের ডিমে অতিরিক্ত উত্তাপ প্রদানের ব্যবস্থা অবশ্যই পাকা করবে এবং সে হিসেবে শ্রীচাগলার আশঙ্কাও অমূলক নয়। কয়েকটি রাজ্য, যারা প্রগতিশীল চিন্তার বিশ্বাসী, দূর্বোধ হবে সেখানেই অধিকতর। কেন না সম্পূর্ণ রাজস্বার্থ রক্ষার জন্য সে সব রাজ্য উন্নত হয়ে উঠতে নীতিগতভাবে পারবে না ফলত স্বার্থত্যাগের দারিদ্র কাঁধে নিয়ে তাকে কেবলই লোকসানের ভাগী হতে হবে। আর হিন্দী-ওয়ারালা সেক্ষা ভালোভাবেই জানেন। আঞ্চলিক ভাষার প্রতি তাদের দরদও একটি লক্ষ্য-বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে। আঞ্চলিক ভাষার হাত ধরে সহজেই তারা হিন্দীকে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেবেন আর তাহলেই তাদের মালিকানা মনোবৃত্তি চরিতার্থের পথ সহজতর হবে। শ্রীচাগলা এসব সম্পর্কের কথা ভেবেছেন। ভেবেছেন বলেই ক্ষমতাসিদ্ধি কেন্ট্রী হিন্দীবাদীরা তার পদত্যাগ ঘুরিতে গ্রহণ করে ব্যাপারটার ইতি করতে চেয়েছেন। কিন্তু উগ্র হিন্দীবাদের মূখ্য উদ্দেশ্য সাধন যে খুব সহজে হবে এতোটা আশা রাখা ঠিক নয়। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মতো লোক কেন্ট্রীর তহবিল ভাষান্তরের প্রয়োজনে শূন্য শূন্যই উজাড় করতে চান নি, চেয়েছেন হিন্দী সাম্রাজ্যকে সমগ্র ভারতের অর্জিত সম্পদের অপব্যয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিতে। এই চক্রান্ত আঞ্চলিক ভাষার আড়ালে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছে একথা আজ আর গোপন নেই। শ্রীচাগলা ইংরেজকে অনির্দিষ্টকাল বন্ধায় রাখার পক্ষপাতী, যদিও তিনি হিন্দী-বিরোধী নন। হিন্দী-বিরোধিতার প্রশ্নও কোথাও উঠতই না যদি না উগ্র হিন্দী-বাদীরা হিন্দী চাপিয়ে তাদের গোপন আকাঙ্ক্ষার তীরতাকে প্রকাশ করার জন্য এমন মরিয়া হয়ে না উঠতেন। উত্তর ভারত ভারতবাসীর ওপর হিন্দী চাপানোর যে চক্রান্ত চালাচ্ছে, আর কোথাও না হোক (বিশেষ আত্মরক্ষাকাতর পশ্চিমবঙ্গে না হোক) দক্ষিণ ভারতে তার তীব্র প্রতিবাদ যে অনর্থ সৃষ্টি করবেই সাম্রাজ্যের মূখ্য-মন্ত্রী শ্রীআমলাদেবীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে সে প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন, তামিলনাড়ু এই অনাচারকে শেষ সর্বশক্তি দিয়ে রুদ্ধবেই। নিজেকে দুর্বল জ্ঞান যারা না করেন তারাই হিন্দীর দুর্ভিতসম্বন্ধে আপ্রাণ চিন্তাবার চেষ্টা ন্যায়সঙ্গতভাবেই করে

যাবেন। আর সে চেষ্টাকে একাবিরোধী, না বললেই পারা যায় অসংখ্য সর্বপ্রাণী সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ভারত জুড়ে বাধবেই, হিন্দীনা তা সমগ্র ভারত পেলেই। যারা না পারেন নি, উগ্র ইংরেজি ভাষা বিরোধ (ইংরেজিয়ানা বিরোধিতা নয়) তাদের উৎসাহিত করে তুলেছে। শ্রীচাগলাকে তাই নিঃশঙ্ক বিদায় নিতে হ'ল। কিন্তু এই সমস্যা যে অচিরকালের মধ্যেই শান্তি হয়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ না রাখাই ভালো। অকারণ আত্মতৃপ্তি কোনো কাজের কথা নয়, বালির কথা হতে পারে। আমরা যেহেতু বুলিসর্বস্ব জীবনব্যাপনে বিগত দু'দশ বছর অভ্যস্ত হয়ে আসছি, সুতরাং বড় বড় বালি বেশ চমকপ্রদ ঠেকছে। কিন্তু এতদ্বারা বাস্তবকে চোখ ঠারাই একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

শ্রীচাগলা কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষা অভ্যস্ত অনগ্রসর বলে যে মন্তব্য করেছেন, বালির দ্বারা সে সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

কিন্তু শ্রীচাগলা যে গুরুতর প্রশ্নটি আদৌ উত্থাপন করেন নি সেটা হল যে দেশ দুর্ভিত বন্যা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বেসামান্য, সে দেশ পরামর্জাজী ভিক্ষুক মাত্র, ভাষান্তরের পোষাকী সমস্যা নিয়ে সে দেশের এই মহাভেদে এতোদূর মাথা ব্যথার আদৌ কোনো যুক্তি নেই। বিশেষ ভাষান্তরের প্রশ্ন যখন বিরাট বায়ু-সাপেক্ষ ব্যাপার।

দেশের এখন প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা। গৃহহীন অগ্রহীন ভিক্ষুক ভারতের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। সে সব সমস্যা একই ভিত্তিতে রেখে ইঠকরাই হিন্দীবাদীদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য অর্থমন্ত্রীর অপচরের ইচ্ছাকে রূপদানের জন্য আমাদের ভরস্কর আগ্রহী হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। দেশ গঠনের কথা শিকের তুলে সমস্যা আহ্বানের জন্য এই উদগ্র বাসনার পশ্চাতে দেশের আসল সমস্যা ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে নেই একথাও অনেকে বিশ্বাস করতে পারাজ। আসলে আমরা সমস্যার অগাধিকারের প্রশ্নটা কোনদিনই ভেবে দেখি না। এলোমেলো এবং খামচা-খামচি করে দেশকে উপর্যুপরি বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার আবর্তনেই আমরা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার সংসারে সুস্থির হয়ে কালহরণ করে যেতে চাই।

ব্যস্তির বর্তমানটাই দেশে আজ বড় কথা জাতির ভবিষ্যতটাই নিয়ে যেন কারও কোন মাথাব্যথাই নেই। যেদিন দেশে সত্যকার জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছিল, যখন দেশাভিব্যক্তি বললে একটি বিশেষ শব্দের অর্থ

উপলব্ধি করার মত চেতনা ছিল আমাদের সেদিন যদি ইংরেজি ভাষা এ দুয়ের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকে তবে জীবনে আশে-পাশে বিদেশীয়ানাকে অবলম্বন করে একমাত্র ইংরেজি ভাষা হটানোর জন্য উত্তেজিত হওয়ার বস্তুত কোন কারণ নেই। সে কারণ বিশেষ অভিসন্ধি পূরণেরই মাটিতে শেকড় গেড়েছে। এই সাদা কথাটা চেপে গিয়ে আজ কোন লাভ নেই। কারণ এটা আজ উন্মুক্ত-গোপন (open secret) তত্ত্ব। বরং দেশের অন্যতর মূখ্য সমস্যা সমাধানের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত ছিল।

কোনো মানবের স্থান নেই

আজ হোক, কাল হোক শ্রীচাগলাকে সরে যেতেই হোত, দুর্ভিত অভিজ্ঞমহল তা ইতিপূর্বেই জানতেন। সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকরাও জানেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী-রূপে শ্রীচাগলার স্থায়িত্ব কিছুকাল যাবৎ নানা মহলে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীচাগলা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দল্য-দলির মধ্যে অসহায় এবং একক ছিলেন। আর বার দল নেই, ক্ষমতাচক্রে তিনি যেমনই হোন) তার স্থান নেই। শ্রীচাগলার আসন তাই টলমল করছিল। অভিজ্ঞমহল বলছিলেন, হয়ত শ্রীচাগলাকে অন্যতর দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হবে। নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ই শ্রীচাগলার পররাষ্ট্র-দপ্তর যে একটি অস্থায়ী পোর্টফোলিও হল এমন মন্তব্যের কথাও এখন স্মরণে আসছে। শ্রীচাগলার দপ্তরে সরকারী অফিসার মহলেও চাগলা-সমর্থক ও চাগলা-বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল। অপেক্ষাকৃত তরুণমহলে চাগলা ছিলেন সত্যকারের গুণী ব্যক্তি। কিন্তু বৃদ্ধ বদ্রোক্তাদের কাছে চাগলার প্রগতিশীল প্রশাসনিক ধ্যানধারণা খুব আদরণীয় বলে গণ্য হয় নি। শ্রীচাগলা তরুণ অফিসারদের চিন্তার ও পলিসি নির্ধারণের যে সুযোগ দিয়েছিলেন অনেকেই তা মনঃপূত হয় নি। সর্বোপরি চাগলা কোন বিশেষ ক্ষমতা-কৃচ্চকের দ্বারা সমর্থিত ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে আগেই হোক আর বিলম্বেই হোক নোংরা রাজনীতির ক্ষমতা কাড়াকাড়ির আওতা থেকে অবসর গ্রহণ করতেই হেত। শ্রীচাগলা একটি নীতির প্রশ্নে সেই ক্ষমতার খেলোয়াড়দের সংশ্রব ত্যাগ করে আপন মর্বাদ রক্ষা করে গেলেন। শ্রীচাগলার মত যারা আপন দপ্তরকে ক্ষমতাচক্রে হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করতে চান তারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার নিজেকে টিকিয়ে রাখতে তাঁরই মত অসুবিধা ভোগ করবেন আর অতীতে এমন ভুলভোগীদের অবসর গ্রহণও করতে হয়েছে।



সংকটের মোকাবিলায় জন্য প্রধানমন্ত্রী ডঃললন অর্থনৈতিক দপ্তরের মন্ত্রি-
ভারও গ্রহণ করছেন

বুটেন :

বুটেন এখন গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। মজুরী, মূল্য, ডিভিডেন্ড সব কিছুর বৃদ্ধিই বন্ধ। বিনিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১। গত মাসে ৫,৫৯,০০০ লোক বেকার হয়েছে। ২৭ বৎসরের মধ্যে বুটেনে কখনও এত বেশি লোক এক সঙ্গে বেকার হয় নি। আগামী শীতে এই সংখ্যা গিরে দাঁড়াতে সাড়ে সাত লক্ষে। আমদানী-রপ্তানী ব্যালান্সের অবস্থাও খুব খারাপ।

প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য নিজে অর্থনৈতিক সম্পর্ক দপ্তরের মন্ত্রিভার গ্রহণ করেছেন। গত সপ্তাহে তিনি মন্ত্রি-সভায় যে বড় রকমের রদ-বদল করেন, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটা। মাইকেল স্ট্রাটের হাত থেকে

তিনি নিজে এই অর্থনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন। অবশ্য দপ্তরের প্রতি-দিনের কাজকর্ম দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কেম্ব্রিজের বুদ্ধিজীবী পিটার শোরের ওপর।

শান্তির সময় এর আগে কখনও কোন প্রধানমন্ত্রী কোন অর্থনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব নেন নি। উইলসন নিজের হাতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে খুব বড় বড়কি নিয়েছেন। যদি তিনি বুটেনের অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে পারেন তবে ইতিহাসে তিনি অন্যতম বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রীর সম্মান পাবেন, আর যদি তিনি ব্যর্থ হন তবে কেবল নিজের নয়, দলেরও সর্বনাশ করবেন। আগামী ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচন এদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক দপ্তরেরই নয়, বাণিজ্যদপ্তরেরও পরিবর্তন করে-ছেন উইলসন। বোর্ড অব ট্রেডের

সভাপতিপদ থেকে ডগলাস জেকে সরিয়ে সেখানে তিনি অ্যান্থনি ক্রসল্যান্ডকে নিয়োগ করেছেন। জে স্টুটেনের কমন মার্কেটে যোগদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, অপর পক্ষে ক্রসল্যান্ড যুরোপের বাজারে প্রবেশের উৎসাহী সমর্থক। উইলসন কমন মার্কেটে যোগ-দানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন, বাণিজ্যদপ্তরের এই পরিবর্তন থেকে সে-কথাই মনে হয়।

অবশ্য উইলসন নিজের দলের থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। রেল-প্রমিক ইউনিয়ন সরকারী নীতির প্রতি-বাদে ২৪ ঘণ্টার জন্য ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন। উইলসন সরকারের শ্রম ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতাদের বিক্ষোভ এত বেড়েছে যে, টি-ইউ-সি'র বার্ষিক সম্মেলনে উইলসনকে তারা নিয়মমাফিক স্বত্তা করার জন্য পর্যন্ত ডাবেন নি।

দক্ষিণ আরব :

ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছেন, আগামী বছর ৯ই জানুয়ারী তারা দক্ষিণ-আরব যুক্তরাষ্ট্রের হাতে স্বাধীনতা অর্পণ করবেন। এর ফলে এডেনে এক শত বৎসরেরও বেশি দিনের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে।

এডেন থেকে ইংরেজ শাসনের দাবিতে খাস এডেনে এবং সমগ্র আরব জগতে জনমত অত্যন্ত তীব্র। ইংরেজরাও বুঝেছে, এখানে তাদের আর থাকা চলাবে না। সুয়েজের পূর্বে ইংরেজ দায়িত্ব কমানোর জন্য উইলসন যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তারই অন্যতম কর্মসূচী হল পর্যায়ক্রমে এডেনের স্বাধীনতাদান। কিন্তু যাবার আগে ইংরেজ বাণিজ্য-স্বার্থ বজায় রাখার পাকপাকি বন্দবস্ত করতে হবে তা? তাছাড়া ইংরেজের শত্রু নাসেরের খপ্পরে যেন না পড়ে এই অঞ্চল। তাই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পরামর্শমত এডেনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট ১৬টি সেখ ও অমীর শাসিত রাজ্য যোগ করে গঠন করা হ'ল দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্র। বন্দর-উপনিবেশে এডেন আধুনিক, আর সেখ ও অমীরদের তপালগাুলি গণ্যযোগ্য—তবু এদের মধ্যে গাটিছড়া বাঁধা হ'ল। ঠিক হল, প্রত্যেক রাজ্যের প্রধান পালা করে প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হবেন।

স্বাধীনতাকামী আরবদের কাছে ইংরেজদের এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা পছন্দ হয় নি। তারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আর বরা দুটি পরস্পর-বিরোধী দিবি-বিশ্বস্ত। একদল নাসেরের অনুগাম তাদের সংগঠনের নাম 'ফ্রন্ট ত লিবারেশন অব অকুগয়েত সা'

ইংরেজ'। আর বিরোধীরা নাসের তথা
মিশরের প্রভাব থেকে বৃত্ত থাকতে চায়—
এদের দলের নাম 'ন্যাশনাল লিবারেশন
ফ্রন্ট'।

গত সপ্তাহে ন্যাশনাল লিবারেশন
ফ্রন্টের জঙ্গী অনুগামীরা অতর্কিত
আক্রমণ করে দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্রের
সুপ্রীম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখ আলি
আতিক আল-কালাদিকে বন্দী করে
নিরে গেলো। কালাদির পর সেখ আলি
মুসাঈস আল-বাকারি সুপ্রীম
কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।
কিন্তু তাঁর কথামত যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ
ও সৈন্য এন-এন-এফ বিদ্রোহীদের
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ
করায় তিনিও পদত্যাগ করেছেন। আল-
বাকারির পর ইয়াফর সুলাতান চেয়ার-
ম্যান হয়েছেন। কিন্তু তাঁরও কোন
নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে মনে হয় না। যুক্ত-
রাষ্ট্রের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১২টি এখন
এন-এন-এফ-এর দখলে, আর ১টি
এফ-এন-ও-এস-ওয়াই-এর হাতে। এডেন
সহ ৪টি রাজ্য মাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের
কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় কথা
উঠেছে, ইংরেজরা এখনই দক্ষিণ আরব
ত্যাগ করবে এবং এন-এন-এফ-এর হাতে
শাসনের ভার দিয়ে বাবে। এডেনের ব্রিটিশ
হাই-কমিশনার হাফসে ট্রেভেলিয়ান এই
বিষয়ে আলোচনার জন্য লন্ডন গিয়েছেন,
এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য
লর্ড স্যাকলটন এডেন ঘুরে গিয়েছেন।
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে
দক্ষিণ আরবে নাসেরপন্থীদের তুলনায়
নাসের-বিরোধীদের শক্তি এখন বেশি।
বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র শাসনের বিরোধিতা করা
এবং সন্তাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হবার
জন্য ইংরেজরা এন-এন-এফকে প্রকাশ্যে
কতই নিন্দা করুক না কেন, আসলে
নাসেরপন্থীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা
এদেরই সমর্থন করছে, এমন সন্দেহ
করার কারণ আছে।

ইসরায়েল :

খাতুম শীখ বৈঠকের পর আরবদের
একোর সম্ভাবনা যখন কিছুটা স্থান, তখন
সেখা যাচ্ছে ইসরায়েলে বিরোধী ইহুদী
রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে একোর
প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে।



জয়ন

আলম ও এসকল

ইসরায়েলের তিনটি প্রতিদ্বন্দী
রাজনৈতিক দল মাপাই পার্টি, আহদুত
হাভোদা ও রফি পার্টি মিলিত হয়ে একটি
সংযুক্ত দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এডী
এসকল মাপাই পার্টির নেতা। প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন মাপাই
পার্টি থেকে বেরিয়ে পাষ্টা দল রফি
পার্টি গঠন করেছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী
মশে ভায়ান বেন-গুরিয়নের প্রধান
সহকর্মী। বর্তমান সরকারের প্রথমন্ত্রী
ইগাল আলম ছোট সমাজতন্ত্রী দল
আহদুত হাভোদার নেতা। এরা এখন
ঠিক করেছেন, নিজেদের সব মতবিরোধ
ভুলে সবাই একত্রে কাজ করবেন। ইহুদী
এক্স এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
জুন মাসে আরবদের বিরুদ্ধে
ইসরায়েলের যুদ্ধের পর সরকার যে-সব
কাজ করেছে দেশব্যাপী এক গণভোটে
ইসরায়েলবাসীর শতকরা ৯৪ ভোটে তা
সমর্থন করেছে।
আরবদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে
ঐক্যবদ্ধ হবার পণ গ্রহণ করেছে ইহুদীরা।
অথচ আরবরা এখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে
নি।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম :

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের
সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। গত সপ্তাহে
অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দী
দশ জন প্রার্থীকে হারিয়ে লেফটেন্যান্ট
জেনারেল নুয়েন ভান খিউ দক্ষিণ ভিয়েত-

নামের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন,
এয়ার মার্শাল নুয়েন কাও কি। এ ভোটে
সেনেটের জন্য ৬০ জন সদস্য নির্বাচিত
হয়েছেন।

খিউ ও কি, দুজনেই দক্ষিণ ভিয়েত-
নামের ক্ষমতাসীন সামরিকচক্রের
প্রতিনিধি। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এদের
সমর্থন করেছেন। নির্বাচনের ফল যে
এদের পক্ষে বাবে, তা আগে থেকেই

সাপ্তাহিক প্রগতি প্রকাশিত হচ্ছে।

লিখেছেন : নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়,
প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডঃ আব্দু-
তোব ডট্টাচার্য, অনন্ত সিংহ, ভুবানী
মুখোপাধ্যায় (উপন্যাস), নরেন্দ্রনাথ মিত্র,
নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ডাঃ বিশ্বনাথ রায়,
গোপাল ভৌমিক, রাম বসু, দুর্গাদাস
সরকার, জয়ন্তী সেন, বীরেন্দ্র মিত্র,
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতপ (উপন্যাস),
মানবেন্দ্র পাল, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়,
জ্যে, কে, শীল, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়,
পুষ্পেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীকান্ত প্রভৃতি।

সম্পাদক : মৃদাল চট্টোপাধ্যায়

নবনির্দেশন, ৩৯বি, ডেপুটি মিশন রোড,
কলি-২০ ফোন : ৪৬-১১২৪

মূল্য-২, অতিরিক্ত ডাক মাসুল-৫০ পঃ

* এজেন্টরা সতর্ক যোগাযোগ করুন *

জানা ছিল। আসলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই নির্বাচন নির্বাচনের নামে একটা মস্ত প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টদের অর্থাৎ মৃত্তিকামী ভিয়েত কংদের প্রতি বার সামান্য সহানুভূতি আছে, তাকে ভোটের করা হয় নি। সর্বত্র সৈন্যদের দিয়ে সম্ভ্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। যে-সব প্রতিস্বন্দী প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের প্রচারে বাধা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিস্বন্দিতায় অন্যতম প্রতিস্বন্দী হুং দিন জু সহ বহু প্রার্থী অভিযোগ করেছেন স্বাধীন নির্বাচন হয় নি, সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধামত নির্বাচন করেছেন—এই নির্বাচন অবৈধ।

তবু জনসনের মতে ভিয়েতনামের এই নির্বাচন গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করেছে। নির্বাচনের পর মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর এই কথাই বলেছেন। জনসন ২২ জন পর্ববৈক্ষক পাঠিয়েছিলেন নির্বাচন দেখার জন্য—এদের মধ্যে রাজ্যের গভর্নর, সেনেটের সদস্য এবং অন্যান্য নেতা ছিলেন। অন্য সব দেশ থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। তারা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, শতকরা ৮৫ জন ভোটের ভোট দিয়েছে, ভিয়েত কং সেরিলাদের হুমকী অগ্রাহ্য করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় ভিয়েতনামবাসীরা থিউ ও কিংদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছে—এর থেকে কিছু কথা আর কি হতে পারে! এদের দেখাদেখি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড হোল্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের নির্বাচনের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এই প্রচারে কেউ ভুলবে না। লক্ষ লক্ষ মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিতে, বহু নাগরিককে ভোটাদিকার থেকে বঞ্চিত করে, জঙ্গী শাসনের ভেতরে থেকে সাম-



প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন নরেন ভান থিউ

রিক কর্তাদের এই নির্বাচনজয় আর যাই হোক—গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিশ্চয়ই নয়। উত্তর ভিয়েতনাম, চীন কিংবা সোভিয়েট ইউনিয়নই কেবল নয়, ফ্রান্সের সংবাদ-পত্রগুলিও এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছে।

সংগী উঁচিয়ে এই যে ভোটের প্রহসন, তারই বা ফল কি? মার্কিন কর্তাদের প্রার্থী থিউ মোট ভোটের মাত্র শতকরা ৩৫ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ, শতকরা ৬৫ জন ভোটদাতা মার্কিন নীতি ও সাম-

রিক শাসনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। অবিলম্বে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে হুং দিন জু নামে যে আইনজীবী থিউ-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি শতকরা ১৭টি ভোট পেয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ মেকং বন্দীপে থিউ ভোট পান নি বললেই চলে। আর খাস সারণনে থিউ খুব কম ভোট পেয়েছেন—এখানে মোট ভোটের অর্ধেকেরও বেশি পেয়েছেন হান ভান হুয়াং।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ বর্তমান সামরিকতন্ত্র ও মার্কিন যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে কতটা বিক্ষুব্ধ, এই নির্বাচনের ফল সে কথাই প্রমাণ করছে।

এদিকে আবার নির্বাচনের পরেই সূর্য হয়েছে থিউ ও কিং মধ্যে মনোমালিন্য। জয়লাভের পর এঁরা একত্র টেলিভিশনে হাজির পর্যন্ত হতে সম্মত হন নি। পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনা এখনই সূর্য হয়ে গেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাস্কার ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড এঁদের কর্তাদিন এক সপ্তে রাখতে পরবেন, বলা শব্দ।

॥ দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হ'ল ॥

বিবর্তন

সাধন চট্টোপাধ্যায়

ভূমিহীন কৃষকদের উপর একটি অনবদ্য উপন্যাস

দাম—৩,

প্রকাশক

: প্রাপ্তিস্থান :

দে বুক হাউস

বিস্বাস পাবলিশিং হাউস

রবীন্দ্র এভিনিউ

৫।১ এ, কলেজ রো,

সোদপদুর, ২৪ পরগনা

কলিকাতা-১



ছোটদের বাড়ন্তু পায়ের জন্য

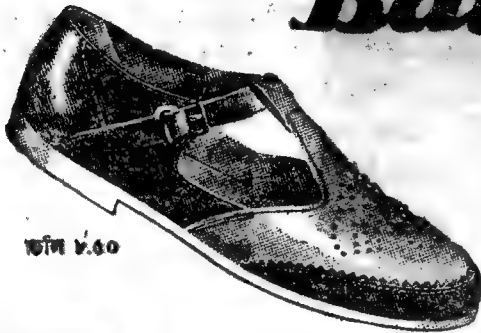
হাল্কা, হাল্কা, খেলক-ছোটদের কদমতা
পায়ের সব জায়গায় চাই বাটল
এই নকশার, সজ্জার, ফিটকর কদমতা।
প্রত্যেকটিতে চমককার প্রসঙ্গ দেও-চোখেরই
মোহনময়, পায়ের খেঁচ-ওঠার
জায়গা পরিহার। অলঙ্কার ভাব
অস্বাভাবিক ফোঁড়ানি।
অলঙ্কার পায়ের চাহিদা মোহিত
অভিজিৎ নকশার।
ছোটদের জন্যই তৈরি।
অস্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক
সেই যেমনটি চিক যেনটি চাই।

কালো ২.৯৫



Bata

কালো ৮.৫০



কালো ৮.৫০



কালো ডাবি ৪.৭৫



হাল্কা ৮.৯৫





চম্পার হিমবা হ—মন্দনোতী

ছাত্রজীবনের গোড়ার দিকের কথা। কতটুকুই বা আমার বয়স। পরিচিতা এক বংশা উত্তরধামের তীর্থপরিভ্রমণ শেষে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তাঁর কাছে শুনি গাঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, কৈদারনাথ ও বদরিধামের কথা। দ্বিতীয় মহাবিশ্বের অনেক আগে, সে সময় এইসব অঞ্চলে যানবাহনের কোনও সুবিধাই ছিল না। হরিম্ভার থেকে পদযাত্রা শুরু করতে হতো। পথ-ঘাটও বিশেষ কিছু ছিল না। ছিল শুধু পথের সর্ববিধ কষ্ট। রোগ-ভোগ আর জন্তুজানোয়ারের ভয়। জীবন সংশয় এই মহাতীর্থপথে তবু ব্যতীত অভাব হতো না। দেবতাম্বা হিমালয়ের কান্সন সারা ভারতের দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থকামীরা দূর-দূর-কঠিন মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে গেছেন শত বাধা তেলে। বহু মগ ধরে উত্তরধামের এই তীর্থপথ অশিষ্কিত ধারায় সকল শ্রেণীর ভারত-বাসীকে টেনে নিয়ে গিয়েছে দেবলোক আর তপোলোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোকের দিকে। সংসারবিরাগী আর আনন্দভিদ্ধ নরনারীর দল। নিরঙ্কর চারী বৃন্দ বৃন্দ

আর প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যরাজ্যাদের পরিবারবর্গ। ধনী ব্যবসায়ী আর ভিখারী বাড়িডুলে। সাধু মহাত্মা আর পরিব্রাজক। এপথে সবাই যেন একাকার হয়েছে। এক চিন্তা: একই উদ্দেশ্যের মহাসম্মিলন। মহাভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার শাস্বত বাণী, তুমারমৌলী গিরিশংগ থেকে করে পড়েছে সহস্র ধারায়। গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী আর অলকানন্দার উৎসসমুখে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ব-বিস্তৃত দেবস্থান। মর্তের মানুষ্যের শেষ লক্ষ্য।

বয়সের ভারে আর সুদীর্ঘকাল বৈধব্যের কঠোর তিতিকায় শীর্ণকায় বৃদ্ধার নুয়ে-পড়া শরীরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির অনুপ্রেরণায় পশু-ভগ্নের দেহে, দুর্গম পদ-যাত্রা আমার কিশোরমনে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। তার মধ্যে শূন্যছিলুম ব্যাপথের বিবরণ। বুকভাঙা চড়াই আর উৎরাইয়ের কষ্ট। রোদপোড়া, জলেভেজা আর দারুণ শীতে জমে যাওয়ার কাহিনী। তীর্থপথের সংগী-সাথীদের পরিচয়। পথের ধারে ব্যাতিবাহের বিলাসিতা-বর্জিত

কদ্রু চটি আর ধর্মশালা। আর দীনতর আহার্যের সংস্থান। কিন্তু এ সকলের অন্তরালে তীর্থযাত্রীর মনের গোপনপট্রে সর্বত্র বাজতে থাকে দেবাদিদেবের সুমধুর আনন্দসঙ্গীত। সব বাধাই সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রান্তির মাঝে মানুষ শান্তি খুঁজে পায়। পরিক্রমা শেষে তৃপ্ত মনে ঘরে ফেরে পথিক। পথের ভীষণতা আর কষ্টভোগের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। মনে জেগে থাকে শুধু অনন্ত সৌন্দর্যময় হিমালির ধ্যান-গম্ভীর রূপ।

সুদূর অতীতের সেই চিন্তাধারা তাই বৃষ্টি আমার বারে বারে ঘরছাড়া করে হিমালয়ের দিকে টানে। বাধাধরা জীবনের সঙ্কীর্ণ গম্ভীর বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে যাঁচি। নিজেকে নিঃশেষে ছাড়িয়ে দিই দেবভূমির পথে পথে। অনভ্যস্ত কষ্টকর পরিভ্রমণ দেহ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু মন ভরে ওঠে বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। স্মৃতির ডান্ডারে জমা হয় মহামূল্য সম্পদ। অর্বে মনীষীদের বর্ণিত স্বর্গলোকের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। হিমগিরির ভুবন-ভোলান অতুলনীয় শোভা। কাশ্মীর থেকে সিকিম-মাজিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই। সমগ্র হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অধিবাসীদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আপন আপন মহিমা আমার মনে নব নব অনুভূতির সঞ্চার করে। বিশাল ভারতবর্ষের মুকুটমণি গোটা উত্তর সীমান্ত জুড়ে অসংখ্য গিরি-নিবাসী, অরণ্য আকরিক সম্পদে জৈবিক সমৃদ্ধি বাড়ানো ছাড়াও যুগে যুগে নগাধিরাজ আমাদের প্রেরণা দিয়েছে বিরাকটের সাধনায়। মহান গিরিদেবতার পাদস্পর্শে দূর হয়ে যায় মানুষ্যমনের ক্ষুদ্র বস্তুগলি। অন্তরে ফুটে ওঠে সচিদানন্দের দিব্যরূপ।

হিমালয়ের পথে পথে কত বিস্ময় আর বৈচিত্র্য। নাম-না-জানা কত পর্বত, কত ফুল, ফল আর পাখী। সমাজের বিভিন্ন স্তরের কত লোকের পরিচয় আর জীবনের কত রূপ। সংসারের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমালয় ভ্রমণের স্মৃতিটুকু সমাজজল হয়ে থাকে, চিন্তার জগতে। ক্রান্তিহীন সুখে স্মরণ করি প্রতিটি দিনের ঘটনা।

এমনি পরিভ্রমণ পথে পরিচয় হয় বাবাজির সংগে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত পরিব্রাজকের একনিষ্ঠ সাধনা—হিমালয় ভ্রমণ আর সাধুসঙ্গ। শান্ত, মধুর স্বভাব এই বৃদ্ধের কাছে শুনি অসংখ্য তীর্থস্থান আর দুর্গম অঞ্চলের কথা। সমগ্র হিমালয়ে ছড়িয়ে আছে কত আশ্চর্য সুন্দর স্বর্গীয় শোভা। সভ্য জগতের অগোচরে অলকাপুত্রীর স্বপ্নময় জগৎ আর আশ্চর্য অধিদের আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মলোক। হিমগিরি শিখরে নিজের নিভৃত গহবায় আর হৃদের তীরে, তপোবন

পাদ্যাহিক বসুমতী

আর প্রয়াসসম্মে দেববাহিত মতের
স্বপ্নভূমি। পুতসলিলা জাহবী, স্বপ্নের
মতে আবিস্কার আর সিম্ব যোগীদের
তপস্চারমক্ষে। স্বপ্ন-স্বপ্নান্তব্যাপী কত
ইতিহাস আর ঐতিহ্য, কত গান-আর
মহাকাব্য রচিত হয়েছে হিমালয়ের
উদ্দেশে।

‘হিমাবন্তী মহিমা সম্বো নদঃ
সম্বো ন পর্বতাঃ’
(ঋগ্বেদ)

বৈদিক যুগে উত্তরাখণ্ডের নাম ছিল
ব্রহ্মপুত্রী। এই পথ ধরেই একদা পণ্ড-
পাণ্ডব গিয়েছিলেন ব্রহ্মলোকে—মহা-
প্রস্থানের পথে। বৈদিকে গোমুখী
নিম্নপ্রবিতা জাহবী। মধ্যে কেদার-পদ-
চুখী মন্দাকিনী আর দক্ষিণে মানসো-
ভৈদে প্রকাশিতা অলকানন্দা। মহাভারতীয়
যুগ থেকে এই তিনটি পবিত্রতম নদীর
উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মলোক নামে পুঙ্খিত।
এই ত্রিধারাই ভারতের তথা পৃথিবীর
শ্রেষ্ঠ নদী মতে গঙ্গা নামে আবিস্কার।
মহাকাব্য কালিদাসের বর্ণনায়—

উদারদূরিতোদগারহারিণী দূরভারিণী।
হৃদেবর-জটাজুট-বাসিনী পাপ-নাশিনী—
গগনস্বৰ্ণ-নিবর্ণ-কারিণী ধর্মধারিণী॥

বিক্রপাদোদকোদভূতা ব্রহ্মলোকাদপাগতা,
দ্বিজিহ্নোভোভিরপ্রাস্তব পুনান্না
ভুবনপ্রসব ॥
(কুমারসম্ভব—দশম সর্গ)

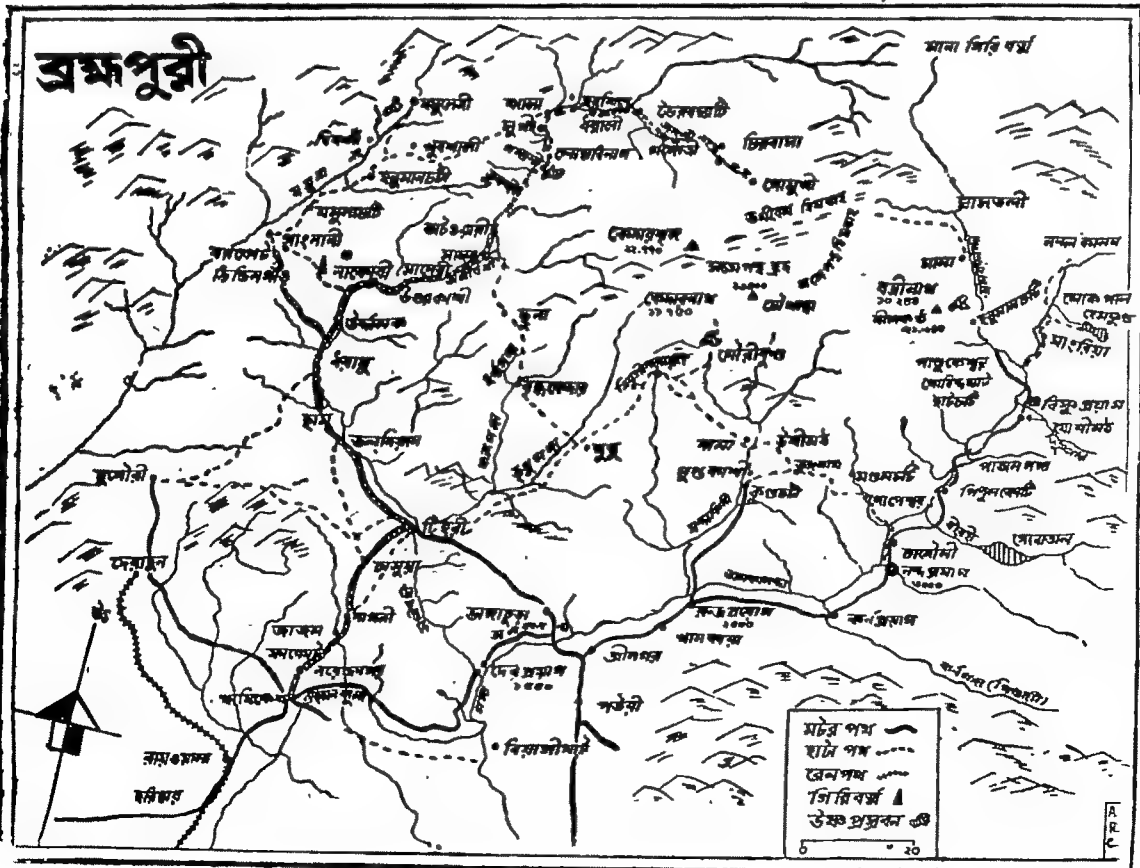
১২

‘সংসারের সূক্ষ্ণভোগ আর জ্ঞানলাভ
এ দুটো জিনিস একসঙ্গে মেলে না।
একটাকে ছাড়তে হয়।’ কণ্ঠিপাথরের মত
নিকষ কালো মুখখানির ওপরে উজ্জ্বল
দুটি চোখ। তরুণ যুবকের মুখের পানে
অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকি।

চারিদিকে স্বচ্ছতা আর বিশৃঙ্খলা।
স্বল্পপারিসর সারি সারি খাচার মধ্যে নান্দ
বয়সের সর্বভারতীয় যাত্রীদের ভিড়।
দেহাদুলগামী রেলগাড়ির খাড়রাস স্লীপার
কামরাটিতে সহযাত্রী নিরঞ্জন নায়েকের
সঙ্গে গল্প করছিলুম। সুদূর গঞ্জাম
জেলার অবহেলিত হরিজন পরিবারের
ছেলে নিরঞ্জন। হরিষ্বারে গুরুকুল বিদ্যা-
লয়ের ছাত্র। ছুটিতে দেশে গিয়েছিল।

বিপুল পান্সাবিনী ততোধিক বিশাল
মালপত্র আর ছেলেপুলে নিয়ে রাতে ছয়-
জনের শোবার স্থান সাড়ে তিনটি টিকিটের
বিনিময়ে অধিকার করেছে। একপাশে
জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে নিরঞ্জন, করুণ
মুখে। তাকে কাছে ডেকে বসাই। দীর্ঘ

দুঃব্রাতের সহযাত্রী আলাপ ক্রমে জমে
ওঠে। শূন্য তার জীবনের আশা-
আকাঙ্ক্ষা, আর ছোট অভিযানের কাহিনী।
বিমাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ বালক ঘর
ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আশ্রয়হীন
উদ্দেশ্যহীন ক্ষুদ্র বালকের কানে কে যাবি
শোনার প্রাচীন ভারতের মর্মবাণী। বেদ
উপনিষদ পাঠের আগ্রহ নিয়ে সে ছুটে
বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু সহায়
সম্বলহীন হরিজন শিশুর স্বপ্নাবিলাস
শোনবার সময় কার আছে? ভাসতে ভাসতে
বালক একদিন এসে পৌঁছয় কলকাতা।
উপকণ্ঠে বেলুড় মঠে। মিশনের জীব্য
তার ভাল লাগে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা
ব্যবস্থায় ব্যাকুল হয়ে আবার পথে বোরের
পড়ে। বেলুড়ে থাকতেই সে শূন্যচিত্ত
আবিসমাজ স্থাপিত গুরুকুলের কথ।
সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের দেবভাষা শিক্ষা
ব্যবস্থা আছে সেখানে। কিন্তু হি-
ভাবে সেখানে বাবে, কোথায় সে গুরু-
কুল বিদ্যালয়—কে তাকে পথ দেখাবে?
হাওড়া স্টেশনে বিনা টিকিটের যাত্রী
নিরঞ্জন একদিন এই প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল
মিসিং স্কোয়ার্ডের অফিসে। প্রবীণ স্টেশন
সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সে বলেছিল তার
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর্থ ঋণের
রচিত শাস্ত্রজ্ঞান লাভের উচ্চাশা। মৃদু, কু-
বিদ্যাখারী প্রানের আবেগ সোঁদন সবুজ



জাগিয়েছিল রেল কর্মচারীর মনে। তিনি ছেলেটিকে হারানোর পর্যন্ত একটি রেল-পথের পাস ও দশটি টাকা হাতে দিয়ে সাহায্য করেন। নিরঞ্জন বলে, হাওড়া স্টেশনের অধ্যক্ষ সেদিন ইস্তবরপ্রাপ্ত হয়ে তার জীবনের গতি নির্ধারণিত করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন। গভীর প্রশংসার তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে।

হিন্দুদের কাংড়ী গুরুকুলে বিদ্যার্থীদের মানসিক বৈতন ইত্যাদি দিতে হয়। সামান্য ১০।১৫ টাকাও সংগ্রহ করা নিরঞ্জনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সে ব্যবস্থাও ভগবান করে দেন। মাত্র কয়েক মাইল দূরে জলাপুর্বে গুরুকুল বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অশ্রয় মেলে। শ্রু হয় ব্রহ্মচর্য শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস। সম্মানসী-দের সাহচর্যে আর শিক্ষায় মাত্র আঠার বছর বয়সে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেছে। আরও আট বছরের পাঠক্রম বিদ্যানিধি, বিদ্যাভাস্কর এবং স্ববিশেষে আচার্য উপাধি লাভ করার সাধনার একাগ্রচিত্তে নিরঞ্জন মগ্ন হয়ে আছে। বৃদ্ধ পিতার কাতর আহ্বান, সংসারে ফেরা এ-সবই তার কাছে মূল্যহীন। ত্যাগ আর তীতিষ্কার অমর্য তার জীবনে ক্রমে ক্রমে উঠছে। গুরুকুলে সর্বভারতীয় ছাত্রদের সংসর্গে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাশিক্ষা-ও গভীর আগ্রহের

সঙ্গে করে চলেছে। মারাঠী, তেলুগু, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও ইংরাজী ভাষায় ইতিমধ্যেই বেশ দখল জমেছে।

ভাবি এমন করেই বৃদ্ধি সবার অলক্ষিতে আর্থ-ভারতের প্রাণধারা আজও বেঁচে আছে তার আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে। শত স্পট্‌নিক্‌ আর এ্যাটম বোমার অন্বেষিত অগ্রাহ্য করে উদ্ভাসিত, অশান্ত মানুষের কানে শোনার অমৃতের কথা—

“বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাত্মমাবিত্য-
বর্ণং তমসঃ পরমাত্মং।

তমেব বিদিত্বাত্মত্বমোতি
নান্যঃ পন্থাবিদতেহন্নায়॥”

স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্ব-ব্যাপী, আদিভাবণ পুরুষকে জানলেই (লোকে) মৃত্যু অতিক্রম করতে পারে। কারণ পরমার্থ জ্ঞানের আর কোনও উপায় নেই।

মনবাস্তবের অমর মহিমার বাণী।
ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন শাস্ত্রীর চোখ দুটিতে সেদিন দেখেছিলুম প্রকৃত জ্ঞানের আলো। মন, পরাশর, বাস্পাতীক, বেদব্যাস প্রজ্বলিত জ্ঞানময় প্রদীপের শিখা।

১০৪

আবার হৃষীকেশ।

সমগ্র উত্তরাখণ্ডের প্রবেশদ্বার এই হৃষীকেশ। যদিও কোটেশ্বর থেকে পড়মী হয়ে কৈদারনাথ, বদরীধাম, শ্রীনগর এবং উত্তরকাশী যাবার মোটরবাস পাওয়া যায়। তবু এ-পথে যেতে হলে হৃষীকেশের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। যাত্রাপথের সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি হিসাবেও হৃষীকেশ এ-পথের প্রধান ঘাঁটি। তা ছাড়া নিজস্ব আকর্ষণও তার কম নয়। শহরের প্রান্তে মূনি-কি-রোতি, লছমনকুলা, ওপারে স্বর্গাশ্রম। প্রাচীন আশ্রম আর মন্দিরগুলিও কোনদিনই যে পুরনো হয় না। হৃষীকেশ সন্ধ্যা চমককার একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে। হোতা যুগের কাহিনী। সীতা উদ্ধারের পরে শ্রীরামচন্দ্র অসোধ্যায় ফিরে রাজা হয়েছেন। লক্ষ্মণের দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির কারণ নির্ণয় করলেন রাজকুন্দ। দেবচর্চারত ইন্দ্রজিৎকে অন্যান্য যুদ্ধে হত্যার পাপে সূদ্রহানন্দনের ব্যাধি। হিমালয়ে মহাদেবের আরাধনার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলেন বিশিষ্ট মূনি। সূদীর্ঘ স্বাদশবর্ষ তপস্যায় রামানন্দ হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এই হৃষীকেশে। তাই বৃদ্ধি, যত কুষ্ঠরোগীর ভিড় লছমনকুলার পথের দু'ধারে।

জুন মাসের শেষে, হৃষীকেশের পথে, দিনের বেলায় বেরুনই মৃদুশব্দ। প্রচন্দ

গ্রীষ্মের সাবদাহে সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তার ওপরে, মাছি। পঙ্ক-পালের মত মাছির দল সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। কালিকমলি, ক্ষেত্রের নতুন বাড়িটা বাজারের একপ্রান্তে। পাশেই তীর্থযাত্রার মোটরবাস ডিপোগুলো। আশেপাশে ভাল ভাল হোটেলেরও অভাব নেই। দেশ বিভাগের পরে স্রুতি দ্রুত শহর প্রসারিত হচ্ছে। লোকসংখ্যা এবং বাড়িঘর বেড়ে চলেছে। নানা রকম কল-কারখানা, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি হৃষীকেশের প্রাচীনত্বও হ্রাস করেছে। তবে আশার কথা, চন্দ্রভাগার রীজ পেরিয়ে, পাহাড়ের কোলের মধ্যে এখনও পৌরাণিক যুগের সনাতন আদর্শ বজায় রেখেছে। মূনি-কি-রোতি, শেষধারা শিবালয় আর লছমনকুলায় তীর্থযাত্রী আর সাধুসন্ন্যাসী-দের ভিড় অব্যাহত রয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মন্দিরগুলিতে যথারীতি পূজারতি, অতিথিসেবা চলেছে সমা-রোহে। দর্শনপ্রার্থীর ভিড় আর ভিহারী বাড়িগুলোদের আচ্ছাদিত। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণই আছে।

আজকাল রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে এবং দ্রুতগামী যানবাহন চলার প্রসারতাও বেড়েছে। সুদূর দেবাদুন, পাজাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতাহ লোকে সপরিবারে মোটরযোগে হৃষীকেশ, লছমনকুলা পরিভ্রমণে আসেন। টেনেও আসার ব্যবস্থা হয়েছে।

শুকনো চন্দ্রভাগা নদীর ওপর দিয়ে কক্ষ্মীটের রীজ। পাহাড়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ। বর্ষাকালে পাবনা নদী ভীম-বেগে প্রবাহিত হয়। পথ ভিঙিয়ে পদ-রজে এগিয়ে চলি। ধর্মশালা আর ছোট-খাটো মন্দিরগুলো পার হয়ে পথ ক্রমে পাহাড়ের ওপরে উঠতে থাকে। শেষধারার কাছে মহাত্মা শিবানন্দ স্থাপিত—

Divine Life Society-র বিরাট আশ্রম। রাস্তার বাঁদিকে পাহাড়ের ওপরে মন্দির আর ভোজনালয়। রাস্তা পেরিয়ে গাধার কুলে লাইব্রেরী আর বাসস্থান দোভলা বড় বাড়ি। অনেক বিদেশী আর বিদেশিনীরা অনাগোনা এইখানে। সুদূর আমেরিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা থেকে অনেক সাহেব, মেম এখানে এসে বাস করছেন যৌগিক সাধনার জন্য। ‘পার্থিব’ ভোগবিলাসে বাঁতপ্রস্থ মানুষের মন শান্তির খোঁজে ফেরে? অর্থ ভারতের শাস্বত বাণী বৃদ্ধি তাদের কানে পৌঁছেছে—আত্মানং বিদিত্ব।

শিবালয় ছাড়িয়ে ওপারে স্বর্গাশ্রমে যাবার খোঁয়াঘাট। দুটি মোটরবোট অবিরত পারাপার করে অগণিত যাত্রী নিয়ে। ওপারে গীতাভবনের ব্যবস্থা-পনাম এ দুটি খেয়ার একটিতে বিনামূল্যে

নতুন!
‘ইকনমি প্যাকে’
টিনোপাল



‘ভাছাড়া’ এক বাসতির এক প্যাকেট
এবং ‘রেগুলার প্যাক’

পর্বাধিক শুভ্রতার জন্য টিনোপাল

মুহুর গায়গী নিমিটেড, বোম্বাই-১

৩১/৬/৬৭ BN

সাংগাহিক বসুমতী

অন্যদিকে দশপত্রসা মাশুল লাগে পার হতে। গীতাভবনের পরিবেশটি অপূর্ব। গঙ্গা এখানে বাক ঘুরে খরবেগে প্রবাহিত। নদীগর্ভের সন্নিহিত সুদীর্ঘ হর্ম্যরাজি। নদীতটে সারি সারি ঘর-গুলির দেওয়ালে উৎকীর্ণ গীতার শ্লেোক। মধ্যভাগে সযত্ন রচিত ফুলের বাগান এবং তার পাশে দেবমন্দির।

গেহরক্ষপুত্রের গীতাপ্রস মালিকদের প্রতিষ্ঠিত এই গীতাভবন বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন। শূনি এখানে না কি এককালীন ২২০০ টাকা দিলে একখানি ঘর এবং তৎসংলগ্ন স্নানের ঘর ও একফালি বারান্দা মেলে সারাজীবনের জন্য। বানপ্রস্থের সুব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্জনতা মিলবে না মোটেই। সুবিশাল এই ধর্মশালায় যাত্রী সমাগম লেগেই আছে। সাধু মহাত্মাও অনেকে থাকেন শূনি। আশে-পাশে করেকটি নিরামিষ ভোজনালয়ে সর্বাধিক আহবের সুব্যবস্থাও বর্তমান। ধর্মশালাতে গুজরাটী, পাজাবী ও মারওরাড়ী যাত্রী।

গীতাভবন প্রদক্ষিণ সেরে হাটিতে থাকি লছমনঝুলার উদ্দেশে। জঙ্গল পেরিয়ে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছে। ছায়াশীতল নির্জন বনপথ ক্রমে নদীর সন্নিহিত হয়। নদীগর্ভ পথ থেকে বেশ শানিকটা উঠে। বাক ঘুরেই

লছমনঝুলার পাশে সারি সারি মন্দির-গুলোর কাছে পৌঁছে বাই। শ্রেণিবদ্ধ বটপাকুড় গাছের তলার সাধু সম্যাসীরা আসন বিছিয়ে বসে আছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। একজনকে দেখলুম, বড় বড় চোখ মেলে নিম্পলক দৃষ্টিতে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

মন্দিরগুলোর বাইরে ইতস্তত বিচরণরত ষাঁড়গুলিকে জিলাপিভোগ দিতে মাঝেমাঝে যাত্রীরা ব্যস্ত। বাবা বিশ্বনাথের বাহনকে সন্তুষ্ট করে কালো-বাজারের পাপমুক্তি সাধন হবে হয়ত।

লছমনঝুলার প্রকাণ্ড কোলানো লোহার সেতু পার হয়ে এপাশে আসি। বেলা এগারটা বেজেছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তেজ তার ওপরে মাছির আক্ৰমণ।

এপাশে কিছু চড়াই পথ—কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ভিক্ষুদের সারি সারি পাতার ছাউনী পার হয়ে মোটরবাসের পথে এসে অপেক্ষা করি। এখান থেকে হরীকেশ এবং হরিন্দারের বাস ছাড়বে। সরকারী বাসগুলো খালি বাবে, ভবু মাক পথ থেকে কাউকে তুলবে না। এটাই না কি নিয়ম। ফলে তিন আনার পথ অতিক্রম করতে টাঙ্গা ভাড়া দিতে হয় দুটাকা। এপথে আসবার সময় চন্দ্রভাগার সেতু পেরিয়ে পুলিশ চৌকিতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, বাস ধরতে। পর পর কয়েকটা বাস চলে গেল। যথেষ্ট

সীট খালি সত্ত্বেও আমরা তুললে না ওদের না কি নিয়ম নেই।

গাছের ছাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকি নদীর দিকে। সুরধুনীর গর্ভে পদাপণে ক্ষেত্র। যুগে যুগে গঙ্গাম্বার লক্ষ-কোটি মানুষের মুক্তিপ্রদায়িনী দেবী সুরেশ্বরী। গাঙ্গোয় উত্তরাখণ্ডের চিরতুষারগুলে গঙ্গা ও যমুনার উৎসমুখ, দুর্গাম, দুর্গাবোহ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে এবার। হরীকেশ থেকে মোটর বাস যোগে ১০৪ মাইল দূরে ভিন্ডি-গাঁও। সেখান থেকে পদক্ষেপে ২৬ মাইল দূরে যমুনার উৎসমুখ—বন্দরপুণ্ড শূণ্য থেকে সূঁচ চম্পাসর হিমবাহ বিগলিত যমুনার উৎস—যমুনোত্রী। মোটর পট্টর ২৯ মাইল ফিরতি পথে ধরাসু থেকে আবার অন্যপথে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী। তারপর গোমুখী।

পর্বতের বহু উচ্চস্থান থেকে তুষারগলা জল শত-সহস্র ধারায় ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে। এখানি অসংখ্য ঝরনার সমষ্টি নদীতে পতিত হয়ে দূরন্ত বেগে সমতলের দিকে ধাবত হয় পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ভেদ বর। সেই নদীপথ অবলম্বন করেই যেতে হবে হিমালয়ের গভীর অঞ্চলে। যমুন ও ভাগীরথীর অববাহিকা ধরে আমাব শ্রা-পথ, দুটি প্রধান নদীর উৎস সম্বন্ধে।

[ক্রমশঃ]

সুবর্ণ সুযোগ !

নগদ অথবা সহজ কিস্তিতে

সুবর্ণ সুযোগ !!

H.M.V.

১২ই Sept. '67 হইতে ১১ই October '67-এর মধ্যে একটি H.M.V. "Conquest" অথবা Transistor রেডিওগ্রাম, (H.M.V.-ই ভারতের একমাত্র Transistor রেডিওগ্রাম প্রস্তুত কারক) ক্রয় করিলে উহার সাথে আপনার পছন্দমত তিনখানি L.P. রেকর্ড বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। (রেকর্ডের মূল্য মোট ১০৮.১০ পরস) আশাকরি এই সুযোগ হারাইবেন না। আজই নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ইহা ছাড়াও

অনেক রকমের রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, রেকর্ড চেঞ্জার, ট্যানজিস্টর রেডিও, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি আমাদের নিকটে পাইবেন।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩



"Conquest"

ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩

আমরা একটি সম্প্রদায়



ভানু চিত্র

হাীদের শোণিত তপ

আমি ও গণেশ সেই রাতে ভূপেনদার এই আশ্রয়ে খুব আরামে ও নিরাপদেই ছিলাম। আমরা পরস্পর খবরা-খবর আদান-প্রদানের পর যুগ্মেতে গেছি অনেক রাতে। পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে আশু কর্মসূচী নিয়ে সর্বস্তরের আলোচনা হল। কিন্তু সর্বপ্রথমে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত না করে কোনরকম কর্মসূচী গ্রহণ করাই সম্ভব ছিল না। এইজন্যই মাখন ও আনন্দের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা ও চট্টগ্রামে মাস্টারদাদের সঙ্গে কার্যকরীভাবে সংগ্রহ রচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ভূপেনদার পরামর্শ ছাড়া আমরা দু'জনে আলাপ-আলোচনা করে এই সমস্ত বিষয় ঠিক করবার কোন ইয়ার ছিল না। ভূপেনদাও অনুমান করেছিলেন যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর আমরা কলকাতাতেই আসব এবং সেই বুকে তিনি সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আমরাও এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে করেছি।

চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার পর সারা বাংলার বিভিন্ন দিকে বিপ্লবী যুব-সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা গেল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর চিরদাসত্ব-মূলক হিন্দু-বিচ্ছিন্ন করবার জন্য বিপ্লবী প্রাণে সাড়া জেগেছে। ভূপেনদা সাম্প্রতিক "স্বাধীনতার" সম্পাদকীয়তে "শুধু চট্টগ্রাম" শিরোনাম দিয়ে বীর শহীদদের আত্মদানের প্রতি প্রাণী জানালেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় তরুণ বাংলাকে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন। ইংরেজ সরকার প্রেস-আইনে যুগান্তর পার্টি পরিচালিত সাম্প্রতিক পত্রিকা "স্বাধীনতাকে" বে-আইনী ঘোষণা করল। এদিকে তখন

"লবণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলন" তাঁর আকার ধারণ করেছে। বিপ্লবীদের বোম্ব-পিস্তলের গর্জন ইংরেজ প্রভুদের অন্তরে বিভীষিকা সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ শাসক-বর্গ দিশেহারা—বৈপ্লবিক প্রাচ্যর বন্ধ করে ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা চাই। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার প্রেস-আইনের জোরে সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র-পত্রিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চেষ্টা করল। প্রতিবাদে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। দৈনিক খবর জানতে না পেরে দেশবাসী, বিশেষ করে বাংলার রাজধানী কলকাতার নাগরিক, নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার দিন অতিবাহিত করছিল। এই অবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা গোপনে, সাইক্লো করে, যুলোটিন ছেপে খবর সরবরাহ করেছে। যথারীতি খবরের অভাবে নানারকম গুজবের জন্ম হতে লাগল—স্লামহর্ষক সংবাদ সব মূখে মূখে চারিদিকে ছড়াল। অহেতুক কৌতূহল ও উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে গেল। সে এক অস্বাভাবিক অবস্থা—অশুভ অভিজ্ঞতা।

এই সময় ভূপেনদা আম্মগোপন করে বিপ্লবীদল পরিচালনা করছিলেন। তিনি আমাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ও ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগঠনকে যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম করে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন।

ভূপেনদা দ্বিতীয় দিন এই বাড়িতেই আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তিনি জানান যে আমরা চারজন একত্রে থাকার পক্ষে উপযুক্ত একটা বাড়ি তিনি ঠিক করেছেন এবং দু'এক দিনের মধ্যেই আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করতে পারবেন। ইতিমধ্যে আনন্দ ও মাখনের সঙ্গেও যোগাযোগের ব্যবস্থা হল এবং অনুকূলতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সাহায্যে আমি মাখন ও আনন্দকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। পাঠকবর্গ আগেই জেনেছেন ওরা দু'জন গণেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আনন্দের মাসির বাড়ি শিলং ঘুরে হাত-মধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁচেছে।

খিদিরপুর বস্তি অঞ্চলে এক সাধারণ ক্রীড়ান পরিবারের আতিথেয় আমাদের চারজনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবনের সেই কণ্ঠ দিনের স্মৃতি এখনও মানসপটে ছবির মতই ভাসছে। সাইক্লিশ বছর পরে আজ লিখতে বসে প্রীমতী কাগুনলতা চক্রবর্তীর প্রতি প্রাণী ও কৃতজ্ঞতার আমার অন্তর ভরে উঠছে। কতখানি নিবিড় স্বদেশপ্রেম, কত গভীর দেশভক্তির অনুভূতি এবং স্বার্থত্যাগের মহান আদর্শ এই সাধারণ ক্রীড়ান পরিবারের প্রাণের কাগুনলতাকে উদ্ভূত করেছিল শত-বিপদ অগ্রাহ্য করে স্বিধাহীন-চিত্তে আমাদের আশ্রয় দিতে! স্কুলে শিক্ষয়িত্রী চাকরি বজায় রেখে স্বামী ও দু'টি সন্তানের পরিচর্যা পরেও তিনি অশ্রানবদনে আমাদের থাকা-খাওয়ার সব ভার নিলেন। কোন বি-চাকর তাঁরা রাখেন নি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই সংসারের বাবতায় কাজ করতেন—রান্না বাজার সবই। বস্তিতে খোলার বাড়ি। পাশের বাড়ির সকলেই আমাদের দেখেছে। তাঁরা আমাদের আশ্রয় বলেই সবার কাছে পরিচয় দিয়েছেন। আমরাও তাঁদের কাকাবাবু ও কাকীমা বলে সম্বোধন করেছি এবং আমাদের প্রতি তাঁদের অপরি-সীম স্নেহ ও ভালবাসার অভিজ্ঞত হয়েছি। এক-এক সময় অবাক-বিস্ময়ে ভেবেছি, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা কি করে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন? আমাদের ঘরের বাইরে প্রায় আসতেই দিতেন না। একটা মাত্র বড় ঘর আর তার সামনে ছোট একটা বারান্দা। আমাদের চারজনকে ঘরজোড়া একটা বড় খাটে শুতে দিয়ে তাঁরা মেঝেতে বা যারামদায় শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তিতে হঠাৎ কোন চেনা লোক আমাদের দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় তাঁরা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেন এবং এই

।সাপ্তাহিক বসন্তমতী

জানাই খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বাংলা-
যাসন সব তাঁরাই মাজতেন। এই দৃষ্টান্ত
পরিবারের দৈন্য যেমন দেখেছি, তেমনি
আবার অন্তর দিয়ে অনুভব করছি যে,
বাহ্যিক দৈন্যের অন্তরালে কি মহান ও
দুর্মূল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন এই
কীচান দম্পতি। মনে মনে ভাবি, শহীদ-
দের চরম আত্মত্যাগের ইতিহাস যে মহান
আদর্শের গ্রন্থিতে গাঁথা, স্বদেশপ্রেমের
সেই একই সঙ্কল্পভিত্তিতে গাঁথা এইসব
মহাপ্রাণ—যাঁরা অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট
হাসিমুখে সহ্য করেছেন, চরম বিপদও
যাঁদের উপেক্ষার কল, প্রতি মুহূর্তে
সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণনাশের আশঙ্কাও
যাঁদের কাতর করে নি, তাঁদের অবদানও
কি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণা-
ক্ষরে লেখা থাকবে না?

এই বাড়িতে থাকাকালীনও গণেশের
চিকেন পর সম্পূর্ণ সাড়ে নি। একটা ঘরে
আমরা প্রায় দিনরাত বসে আছি। চিকেন
পর খুব ছোঁয়াচে রোগ। কাজেই দিনের
পর দিন এত নিকট সংস্পর্শে থেকে
আমরাও এই সংক্রামক রোগের কুপদন্টি
হতে বিপদে হলাম না। মাখন ও আনন্দ
যথার্থ চিকেন পক্ষে অক্লান্ত হল। এই
বাড়িতেই কাকীমার ছোট ছোট দুটি
ছেলে আছে, বাস্তু অঞ্চলে সব পাশাপাশি
বাড়ি—আলোবাতাসেব একান্ত অভাব।
আমাদের আশঙ্কা ছিল যে চিকেন পক্ষ
এই বাড়ি ও বাস্তুতে সহজেই ছড়িয়ে
পড়বে।

ভূপেনদাকেই এই সমস্যার সমাধান
করতে হয়েছে। সরকার আমাদের চাম-
ছনের মাঝার মূল্যে মোট ষোল হাজার
টাকা ঘোষণা করেছে। পুলিশ ও ছদ্ম-
বেশী বন্দু-বান্ধব আমাদের খোঁজখবরের
জনা যে খুব তৎপর হয়ে উঠেছে, সে
সংবাদ মাঝে মাঝে আমাদের কাছে
আসছে। বহুদিনের পুরনো বন্দুরা, যাঁরা
বাংলার বাইরে আত্মগোপন করে ছিল,
কেউ কেউ বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
অন্তরের আবেগে আমাদের সঙ্গে দেখা
করবার জন্য সেই দূরদেশ থেকেও ছুটে
এসেছে এবং পুরনো গোপন সূত্রে তাদের
সঙ্গে দেখা করতে খবর পাঠিয়েছে।

আমাদের চারজনকে সশস্ত্র অবস্থায়
কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রাখাই এক সমস্যা।
কারণ, যে-কোন সময়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে
আমাদের খণ্ডবন্দু হতে পারে এবং তাতে
আশ্রয়দাতা ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবন
বিপন্ন হওয়ার সম্ভাব্য আশঙ্কা। এইরূপ
সম্ভাবনা জেনেও যাঁরা আমাদের আশ্রয়
দেবেন, তাঁদের সংখ্যা নিশ্চয়ই প্রচুর নয়।
তার ওপর গণেশের চিকেন পক্ষ। কাজেই
এই অবস্থায় বিদ্রোহীদের কাকীমার
বাড়ি খুবই নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল।
কিন্তু আরো দু'জন মাখন ও আনন্দ,

চিকেন পক্ষে অক্লান্ত হওয়াতে এই বাড়ি
ও বাস্তু নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে
ভূপেনদা আমাদের অন্যতর থাকবার ব্যবস্থা
করলেন। কাকীমার বাড়ির মায়া কাটিয়ে
আমরা অপর একটি বাড়িতে উঠে গেলাম।

এই বাড়িটি ঠিক কোথায় ছিল তা
আজ আর আমার সঠিক মনে নেই। তবু
যতদূর মনে পড়ছে বোধ হয় প্রাধানন্দ
পাকের কাছে কোথাও হবে। বাড়িটা কাঁচ
সেটা আমাদের জানাব কোন কারণ ছিল
না। এখনও পর্যন্ত আমি সেই গৃহ-
স্বামীর পরিচয় কিছুই জানি না বলেই
তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারলাম না।
এ-রকম আরও কত অনামী বন্দু, কত
স্বদেশপ্রেমী, কত নীরব কর্মী গোপনে
সাধারণের অজ্ঞাতে যবানকার অন্তরালে
নিজদের প্রচুর রেখে জীবন তুলে করে,
বাংলার ও ভারতের বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ
সমর্থন জানিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য
করেছেন—এদের সকলের হিসেব আমরা
হয়ত রাখি না। ভারতের বিপ্লবীযুগের
ইতিহাস কখনই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে
না যদি এইসব নীরব দেশভক্তের স্বার্থ-
ত্যাগ অনুল্ল থেকে যায়। আমাদের অনামী
গৃহস্বামীর প্রতি আমার অন্তরের গভীর
শ্রদ্ধা জানাই। তবে আশা করি কোনদিন
হয়ত তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে স্বাধী-
নতা যুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধিশালী
করবে।

এই বাড়িতে ভূপেনদা মাখন ও
আনন্দকে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন।
ডালহৌসী বোমা মালার প্রখ্যাত
সীতাংশু সরকার, মোড়িকেল কলেজের
বর্ত্তাবার্ষিক প্রোগ্রাম ছাত্র, প্রতিদিনই মাখন
ও আনন্দকে দেখে তাদের জন্য প্রয়ো-
জনীয় ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করত।
সীতাংশু খুব ছোট বয়সে চট্টগ্রামে
আমাদের একটা বাড়ির ভাড়াটে হিসেবে
তার মা-বাবা সঙ্গে থাকত। তার পিতা
শ্রীশরীষচন্দ্র সরকার চট্টগ্রামে একজন
পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। আমি বোধ
হয় তখন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পঞ্চম
শ্রেণীর ছাত্র আন সীতাংশু পড়ত চট্টগ্রাম
গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয়
শ্রেণিতে। তারপর বহু বছরের ব্যবধান।
তাই সে আমাকে দেখেও চিনতে পারে নি
এবং আমিও আমার পরিচয় দিই নি।
মাখন, আনন্দ ও আমার সঙ্গে আলাপের
মধ্যে সীতাংশু চট্টগ্রামে তার অল্প বয়সের
অভিজ্ঞতা ও অনন্ত সিংহের দুরন্তপনার
কথা বলত। আমরাও সেসব কথা খুব
মনোযোগ সহকারে শুনছি এবং মজাও
পেয়েছি প্রচুর তবু কিছু নিজের
পরিচয় দিই নি। গুপ্ত-সমিতির তাই
নিয়ম ছিল।

মাখন ও আনন্দের আরোগ্য লাভের
পর ভূপেনদা আমাদের আরো নিরাপদ ও

সুদৃঢ় কোন ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করার
পরিকল্পনা করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে
যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভা ও সভাস্থে
মধ্যে একজন ছেলে ও মেয়েকে স্বামী-
স্ত্রী হিসাবে সাজিয়ে তাদেরই তত্ত্বাবধানে
কোন বাড়ি ভাড়া নিয়ে একটা নিরাপদ
আশ্রয় তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ কার্য-
করী করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।
আনন্দ ও মাখন আযোগ্য লাভ করে ওঠার
পর অবশ্য আমরা পালি। আমি যেভল
বসন্তে অক্লান্ত হব না এ আমরা বেউ
ভাবতে পারি নি। খুবই অশুভের বিষয়
যে বসন্ত একটি ঘরে সর্বজন একত্রে
থেকেও আমি কি করে মৃত্যু দীর্ঘতা-
দেবীর কৃপা হতে বাঁচত হলাম—অন্য
চিকেন পক্ষ হল না।

খুব-বিদ্রোহের পর প্রায় এক মাস ৭৩
হতে চলল—বিস্তারিত খবর আমরা
এখনও ভেগন কিছু জানতে পারি নি।
২২শে এপ্রিলে ছালালাবাবের যুদ্ধ-সংবাদ
জেনেছি, কিন্তু এখনও সঠিক জানি না—
যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন সেই ব্যক্তিদের
শহীদ করা! বিপ্লবী দলের আহুত
সংখ্যাও আমাদের অজানা। তবে নেতৃ-
স্থানীয় কেউ-ই যে বন্দী হন নি ও
সরকার পক্ষের কেউ-ই হত বা আহত হয়
নি এ-খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছে।
ঐ তারিখের ফেণী সম্মেলনের বিবরণও
আমাদের কাছে পৌঁছায়। আন ও একটি
ঘটনার খবর পেলাম যে—অমরেন্দ্র নন্দী
তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বন্দীরা ৭৩
রাজত হয়েছেন। আমাদের অতি প্রিয় সার্বী
অমরেন্দ্র—তার ওপর আমাদের ভরসা
আস্থা ছিল। ছালালাবাব যুদ্ধের আগে
নাটোরদা পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে বাছাই
করে অমরেন্দ্রকে আমাদের সঙ্গে দেওয়া
যোগ্য স্থাপনের চেষ্টা পাঠিয়েছিলেন
সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাদের খোঁজ
পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি—উপন্যাস
পাহাড়ের ফিরে গিয়ে সে ‘অমরেন্দ্র’
দেখাও পায় নি—ভাবা তখন স্থানত্যাগ
করে অন্যত্র চলে গেছে। কাজেই ভাবা
সে শহরে ফিরে আসে এং ২৩শে
তারিখে তার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।
আমাদের মাঝেমাঝে সময়েই এই ঘটনা
পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারি। সে-
কাব্যী কর্মচারী, পুলিশ এবং আমাদের
আত্মীয়-স্বজনদের কাছে শুনাই—এই
অমরেন্দ্র—তার অগণিত পুলিশ ও সৈন্য
তাকে ঘিরে ফেলেছে। আত্মসমর্পণ করার
জন্য শত্রুপক্ষ অমরেন্দ্রের কাছে চরম দাবি
জানায়—স্বৈচ্ছায় ধরা না দিলে রাইবেডেন
গুলিতে তার বাক বিবরণ হবে!

প্রবল শক্তির অধিকারী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ
—শত্রুদের যার আত্মসমর্পণ দাবি করত
—জানেন না যে স্বয়ং সর্ব সেন প্রধন
বাহিনীর সবার মাঝে থেকে শহুরে গার্ড-

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

যায় জন্য অমরেন্দ্র নন্দীকেই বাছাই করেছিলেন। অমরেন্দ্র শহরে এসে ভারী উদ্বেগ বোধ করতেন। গৃহ, যাকে সে নিজেই দলভুক্ত করেছিল এবং যাকে আমরা প্রচার-পত্র বিলি করার ভার দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। অর্ধেক ইতিমধ্যে বন্দী হয়েছে কাজেই তার সঙ্গে দেখা হল না। সে তার নিজের বাড়িতে বা ভবতোষের বাড়িতে যেতেও সাহস করল না। সে ভেবেছিল ভবতোষের বাবা, তার বাবা ও মাশবেব বাবা আমাদের ওপর খুবই বিরক্ত কাজেই তাঁদের কাছে সে কোন সাহায্যের আশাও করে নি। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভিযানের পর আমাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও স্নেহশীল হন। আমাদের মামলার সময় দেখেছি মাসের পর মাস নানাভাবে তাঁরা আমাদের মামলার তদন্ত করেছেন। অমরেন্দ্র কেন তাঁদের কাছে গেল না দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছি। তাঁরা বলেছেন অমরেন্দ্র যদি তাঁদের কারো কাছে যেতো তবে পুলিশের পক্ষে তাকে পাওয়া সহজ হতো না—এবং আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ব্যাপারেও তাঁরা অমরেন্দ্রকে সাহায্য করতে পারতেন।

অমরেন্দ্র ভুল করেছিল না ঠিক করেছিল তা এখন বলা যায় না। মা বাবার নিছক স্বার্থ ও অন্ধ স্নেহ যদি অমরেন্দ্রকে আবদ্ধ করতে চাইত এবং সেইরূপ কোন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উপলব্ধিই যদি তাকে নিজ বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রেখে থাকে—তবে হয়ত অমরেন্দ্র ঠিকই করেছিল।

২০ তারিখ রাতে তাদের বাড়ির কাছেই কোন এক ভদ্রলোকের গোয়ালঘরের মধ্যেই সে আত্মগোপন করে ছিল। ২৪ তারিখ সকালে সেখানে তাকে কেউ কেউ দেখে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহান হলে সে সদরঘাট রাস্তা ওপর যাত্রামোহন সেন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডের পাঁচিল উপরে স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেই সময় লবণ-আইন-ভঙ্গের আন্দোলন তীব্রভাবে চলেছে। এই স্কুল ও কংগ্রেস আন্দোলন ও সশস্ত্র যুদ্ধ-বিদ্রোহের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষাভবন বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। সেই পরিত্যক্ত স্কুলের নিজন কক্ষের একটিতে অমরেন্দ্র আশ্রয় নিয়েছে। সকাল আটটা হবে। শহরের রাস্তা গাড়ি-বোড়া ও লোক চলাচলে মন্থরিত। অমরেন্দ্র সেই পাড়ার সেরা ছেলে—লেখা-পড়া ভাল—সদরঘাট ক্লাবের সদস্য—শিল্পিত দেহ—শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলে প্রায় অংশ গ্রহণ করে। ভলি-বল-ব্যাটম্যান বাহিনীতে সামরিক গোষাকে পাড়ার

সবাই তাকে দেখেছে—সকলেই তাকে চেনে।

সরকারিপক্ষের কথা—একজন চেনা পুলিশ কনস্টেবল সেই স্কুলগৃহে তাকে দেখতে পায় এবং ছুটে গিয়ে সদরঘাট পুলিশ বিটে খবর দেয়—সে অমরেন্দ্রকে চেনে, যাত্রামোহন স্কুল ভবনে সে অমরেন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে এবং কেবল যে অমরেন্দ্রকে দেখেছে তা নয়—অমরেন্দ্রের এক হাতে পিস্তল ও অন্য হাতে রিভলবার আছে তাও দেখে এসেছে। “এই খবর” পেয়ে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ জনসনকে খবর পাঠান ইত্যাদি।

পুলিশের বিবরণ থেকে আমরা এইটাই পাচ্ছি যে, পুলিশ কনস্টেবল একেবারে রাস্তা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে পুলিশ বিটে খবর দিয়েছে। আমাদের মতে এইট একটি সাজান বিবরণ। প্রকৃত কারণ—তাদের গুলুচরকে আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যেই কনস্টেবলের অকস্মাৎ দৃষ্টি আকর্ষণের গল্পটির আয়দান। আমরা জানি পরিচিত লোক অমরেন্দ্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের মামলা চলার সময় আমরা আমাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, গোশালা থেকে পালিয়ে স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় অমরেন্দ্রকে যারা দেখতে পেরেছিল তাদের মধ্যেই কোন একজন তাকে ধরিয়ে দেয়। পুলিশের বক্তব্য থেকে যখন আমাদের জানান হচ্ছে যে, কনস্টেবল অমরেন্দ্রের দৃষ্টি হাতে দুটি পিস্তল ও রিভলবার দেখেছে—সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তখনই হবে নেওয়া যায় যে, পুলিশের শিক্ষানুযায়ীই কনস্টেবল মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছে।

অমরেন্দ্রের কাছে সত্যিই একটি অটোমেটিক পিস্তল ও একটি আর্মি রিভলবার ছিল। সেই দুটি অস্ত্র তার বিপদের একমাত্র বন্ধু ও বিশ্বাসী সাথী। তাই বলে কনস্টেবলটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কি সে দৃষ্টি হাতে খোলা রিভলবার নিয়ে বসে ছিল। এই কাহিনী পুলিশের নিছক উদ্দেশ্যমূলক ও সত্যের অপজ্ঞাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের মামলার রায়েতে জজসাহেব লিখেছেন—

“On the morning of 24th April Constable Chandra Kumar De Saw Amarendra Nandy with a pistol in either hand inside the empty house of J. M. Sengupta on Sadarghat road. He ran to the Sadarghat beat house and informed Macdonald who went

to Kotwali P. S. and informed the superintendent of Police.”

কনস্টেবল চন্দ্রকুমার দে বাহাদুর বটে। দৃষ্টি হাতে দুটি পিস্তল দেখেই ছুটে গিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেবকে খবর দিয়েছে। তারপর যথারীতি জেলা পুলিশ সাহেব খবর পেলেন। সংবাদটি পেয়েই কুখ্যাত জেলা পুলিশ সাহেব মিঃ জনসন তৎক্ষণাৎ তাঁর লুপ্ত মর্দাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। তাঁর নাকের ডগার ওপর দিয়ে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল গোপনে প্রস্থত হয়েছে, মিঃ জনসনের অসংখ্য গুলুচরের দৃষ্টি ও পুলিশ-বাহিনীর সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ-বাহিনী শহর দখল করেছে—বিপ্লবী সরকার স্থাপন করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে বিপ্লবীদের মরণপণ প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের কাছে পরাস্ত হয়ে পুলিশসাহেবকে নত শিরে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে, ফেণীতে চট্টগ্রামের যুদ্ধ দলের এক অংশ পুলিশকন্ট্রোল ভেঙে করে তাদের চোখের সামনেই যেন অশরীরী জীবের মত বাতাসে মিলিয়ে গেল—এর প্রতিটিই তো জনসন সাহেবের পক্ষে একেবারে মর্মান্তিক! আজ আবার সশস্ত্র অমরেন্দ্র একা শহরের বৃকে—অসহ্য! অসম্ভব! এখন প্রতিকার করতে হবে! কিন্তু পাগলের মত জনসন সাহেব পুলিশ ও মিলিটারী ফোর্স বাদের সমিবেশিত করতে পারলেন তাদের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে অমরেন্দ্রের সমস্ত গতিপথ বন্ধ করে দিলেন। সদরঘাট রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে মিঃ সূটার ও মিঃ জুইস দুটি সৈন্যদল নিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। একই সঙ্গে মেজর বেকার আর একটি সৈন্যদল নিয়ে গণেশ-দেব কাপড়ের দোকানের সম্মুখ দিয়ে সদরঘাট রাস্তার পূর্ব হতে পশ্চিমে ছুটে গেলেন যেন অমরেন্দ্র এই দিকে পালানোর কোন সুযোগ না পায়। যাত্রামোহন স্কুলের প্রায় পাঁচ শ' গজ দূরে পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ করে আলকরণ রোডে সৈন্য মোতায়েন হল। ক্যাপ্টেন টেইট ও ক্যাপ্টেন রবিনসন এই সৈন্যদলের পরিচালনার ভার নিলেন। একটি গলিপথ সদরঘাট ও আলকরণ রোড দুটিকে সংযুক্ত করেছে। এই গলিপথে ডি আই জি মিঃ ফারমার ও স্বয়ং জেলা পুলিশ সাহেব মিঃ জনসন বীরদর্পে আর একটি সৈন্যদল নিয়ে প্রবেশ করলেন। কি অপূর্ব সমাবেশ! একা অমরেন্দ্র—অচল-অটল-নির্ভীক! আর তার চারি পাশে—মিঃ জুইস, মিঃ সূটার, মেজর বেকার, ক্যাপ্টেন টেইট, ক্যাপ্টেন রবিনসন, মিঃ ফারমার ও মিঃ জনসন প্রত্যেকেই এক-একটি সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্থত! এ যেন

স্বাধীনতা-বঙ্গভাষা

স্বাধীনতা-বঙ্গভাষা: সপ্তদশম দর্শন-বঙ্গ
রচনা।

এই বেড়াভাল, পাতা সমাপ্ত করে
জনসন সাহেব বাছাই করা একদল সৈন্য
নিম্নে প্রত্যেক-রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল
রেখে অমরেন্দ্রের আগ্রহকক্ষ লক্ষ্য করে

অগ্রসর হলেন। মিলিটারী কামদায় গছে
প্রবেশ করে তাঁদের দর্ভাগ্যবশত
অমরেন্দ্রকে চস ঘরে পাওয়া গেল না। তবে
তাড়াতাড়িতে অমরেন্দ্র সব জিনিস গুছিয়ে
নিতে পারে নি বলে সেখানে অতি সামান্য
এমন কটি বস্তু ফেলে যায় যা তার

অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছিল।
Judgement-এ মিঃ জে ইউনী
লিখেছেন—

“Mr. Johnson with an
armed force surrounded and
searched the house but found

স্বলেখা

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

১৯৬৬-এর ফলাফল

প্রথম : শ্রীঅশোককুমার সেনগুপ্ত

২৭, কালিকুণ্ড লেন, হাওড়া।

দ্বিতীয় : শ্রীসুদরশন দত্তরায়

আলিপুরদুয়া, জলপাইগুড়ি।

তৃতীয় : শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

নিরানাবাস, জলপাইগুড়ি।

৪। মস-উদ-আর রহমান
বলিপুর, জি: হুগলী।

৫। শ্রীমিলনেন্দু বিশ্বাস
পো:—ধর্মদা, জি: নদীয়া।

৬। শ্রীযশীপদ চট্টোপাধ্যায়
২০, গোপাল ব্যানার্জি লেন, হাওড়া।

৭। শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়
৩২, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন,
কলিকাতা-২৫।

৮। শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়
পি৫৫, বাঘপুর, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

৯। শ্রীবিশ্ববল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবধবপাড়া, কালি, মুন্সিবাড়।

১০। শ্রীনবেন দত্ত
৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭।

১১। শ্রীরঞ্জন ভাদুড়ী
১০৭, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা-৪।

১২। শ্রীবৈদ্যানাথ মুখোপাধ্যায়
বড়াল লেন, পো: ও জি: হুগলী।

১৩। শ্রীচিহ্ন ভট্টাচার্য
পিলখানা লেন, বর্ধমান।

১৪। শ্রীরথীন সরকার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

১৫। শ্রীঅপর্ণা মজুমদার
বিধান রোড, শিলিগুড়ি,
দার্জিলিং।

১৬। শ্রীপার্বতীম চৌধুরী
২, নাবাগণচন্দ্র চৌধুরী রোড,
কলিকাতা-৪২।

১৭। শ্রীআশিস বসু মলিক
৭২।৪, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা-৩৫।

১৮। শ্রীহিমালয় নির্ঝর হাইট
শ্রীরামপুর, জি: মেদিনীপুর।

১৯। শ্রীপরিচয় গুপ্ত
৪-১-২এ, রাধাপ্রসাদ লেন, কলিকাতা-৯।

২০। শ্রীসমুদ্র ঘোষ
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

২১। শ্রীকুন্তলকুমার ঘোষ
C/o বিমলকুমার ঘোষ, দার্জিলিং।

২২। শ্রীসরীশ দাশগুপ্ত
ব্যানার্জিপাড়া, নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

২৩। শ্রীসুখ মুখোপাধ্যায়
C/o ওয়েস্ট বোকারো লি:
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১।

২৪। শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায়
সি-এন-৬৫, দুর্গাপুর-২, বর্ধমান।

২৫। শ্রীশঙ্কু রক্ষিত
C/o 'মা' পত্রিকা,
১১, ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন,
হাওড়া।

স্বা: শ্রীনাগরায় ঘোষ

সম্পাদক

পূর্বসূত গল্পগুলির সংকলন “স্বলেখা ছোট গল্প সংকলন” দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে।

স্বা: জরায়বন্ধক বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি

স্বলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি

স্বলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২।

nobody there. In a small room on the ground floor, however a khaki tunic, dhuti, bedsheet and a broad green belt were discovered. The neighbourhood and some houses were searched...."

আমরা সরকারী ভাষা থেকে স্পষ্ট জানতে পারছি তারা অমরেন্দ্রের বাড়ি ঘেঁরাও করেছিল এবং অমরেন্দ্রকে সেখানে না পেয়ে আশেপাশের এলাকার কতকগুলি বাড়িতে 'অনুসন্ধান' করেছে। বাস্তবে যা হটেছিল—তা কেবল অনুসন্ধান নয়, ক্ষিপ্ত জন্তুর মত জনসন সাহেব তার পদূলি বহর নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি "আক্রমণ" করেছে—প্রতিটি বাড়ি তখনই করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেচুরে লুণ্ঠন করে দিয়েছে। বাড়ির মেয়েদের প্রতি ভুল আচরণে জনসন সাহেব উদাসীন তো ছিলেনই উপরন্তু কোন কোন বাড়িতে চরম অভদ্রতাও করেছেন।

অমরেন্দ্র শাহামোহন স্কুল থেকে ঠিক ঘরে উঠাও হয়ে প্রতিবেশীদের কারও বাড়িতে সাহেবদের অজ্ঞাতে আশ্রয় নিয়েছিল। পদূলিশের অত্যাচার ও পীড়নের নমুনা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে এবং ভেবেছে যে, যতক্ষণ সে শত্রুবাহরের মধ্যে আছে, ততক্ষণ সাধারণ ও নিরীহ লোকের ওপর এই পদূলিশী জুলুম ও তাণ্ডবের পরিসমাপ্তি হবে না। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অমরেন্দ্র সেই ভেবেই বেপারোয়া হয়ে দিনের আলোতেই প্রতিবেশীদের বাড়ি পরিভ্রমণ করে বেরিয়ে এসেছে। কারও বাড়ির দেওয়ালের আড়াল থেকে বুদ্ধি কবলেও জনমান শক্তির মোকাবিলায় অসামান্য ফলাফলের বাস্তব উপলব্ধি থেকেই অমরেন্দ্র বুঝেছিল যুদ্ধে তার মৃত্যুর পর বা আগেও গুলী বিনিময়ের দময় সেই বাড়ির নিরীহ লোকদের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এই উপলব্ধি থেকেই অমরেন্দ্র শেষ চেষ্টা হিসেবে দুইশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যত দূর সম্ভব নিজেকে লোকচক্ষুর অস্তরালে রেখে আলকরণের অপেক্ষাকৃত নির্জন গলিপথ অনুসরণ করে সৈন্য ও পদূলি রচিত ব্যহের শেষ প্রান্তে ছুটে গেছে। সামনের রাস্তার ওপর প্রবল শক্তিশালী পদূলিবাহিনী উদ্যত বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। পাহারায় নিযুক্ত সৈন্য-ঘাঁটিটি অতিক্রম করতে পারলে অমরেন্দ্র হয়ত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু দিনের আলোয় অত বড় সৈন্যদলের দৃষ্টির অগোচরে রাস্তাটি অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সামনে রাস্তার ওপর পদূলিশের 'কর্ডন' আর পেছনে ক্ষিপ্ত জনসনের পদূলি বহর—অমরেন্দ্র এই

দুইয়ের একেবারে শেষ সীমায় এসে উপস্থিত। এই উত্তর বেণ্টনীর মাঝে পড়ে তার এগোবার বা পেছোবার কোন উপায় নেই। এই অবস্থায় অমরেন্দ্র বৃকে গাড়িয়ে মিলিটারী কারখানার রাস্তার ওপরের একটি সরু কালভার্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। এই কালভার্টের ভেতর অমরেন্দ্র যদি গোপনে সম্মা পর্বন্ত নিরাপদে প্রবেশ করে পারত, তবে হয়ত রাস্তার অশ্বকারে পদূলিবাহিনী ভেদ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্বন্ত তা সম্ভব হল না।

একটি নিরীহ বালকের অহেতুক কোড়হল অমরেন্দ্রকে সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে। একটি বালক অমরেন্দ্রকে ঐরূপ অস্বাভাবিক ছোট একটি ভ্রুনের সূড়ঙ্গে প্রবেশ করতে দেখে কোড়হলভরে হঠাৎ চীৎকার করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনসন সাহেব তার পদূলিবাহিনী সমেত কাছাকাছিই উপস্থিত ছিলেন। বালকের চীৎকার ও আশেপাশের লোকদের মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন লক্ষ্য করে পদূলিবাহিনী সেশানে ছুটে আসে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে যে, একজন যুবক ঐ সূড়ঙ্গে আত্মগোপন করে আছে। জনসন সাহেব হুইসেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে long blast-এ (লম্বা টানে) চারিদিক থেকে পর পর হুইসেল বাজিয়ে শত্রুপক্ষ সঙ্কেতধ্বনি দিতে লাগল। তারপর জনসন সাহেবের হুকুমে সেপাইরা দশ-বার রাউন্ড রাইফেল ফায়ার করল। একটা বিধীষিকাময় অবস্থায় সৃষ্টি হল। পদূলিশের উদ্দেশ্যে, অমরেন্দ্রকে বৃষ্টির দেওয়া যে, তার পক্ষে পলায়নের চেষ্টা বৃথা—আত্মসমর্পণ করতাই হবে, নইলে বরণ করতে হবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

ইতিমধ্যে জনসন সাহেবের ফোর্স সাবধানতার সঙ্গে আড়ালে, থেকে বৃকে হেঁটে কালভার্টের কাছে উপস্থিত হল। তখনও তারা অমরেন্দ্রের দৃষ্টির বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। জনসন সাহেবের এখন চিন্তা কি করে অমরেন্দ্রকে বন্দী করবেন। তিনি হেম দারোগাকে আদেশ দিলেন সে বেন চাঁচিয়ে অমরেন্দ্রকে জানায় আত্মসমর্পণ করতে। বথাবীতি আদেশ অনুযায়ী কতব্য পালিত হল। দারোগা মহাশয় কাগজের চোঙার মাধ্যমে চীৎকার করে বলল—“দেখ, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার ওপর কোন অত্যাচার হবে না। তুমি ধরা দাও। তোমার ভালর জন্যই বলছি—তুমি ধরা দাও।” কালভার্টের নিচ থেকে জবাবের আশায় পদূলি কান খাড়া করে আছে। মর্খ পদূলিশের দল—ততোষিক মর্খ জনসন সাহেব; ভেবেছে বিপ্লবী অমরেন্দ্র গুলীর ভয়ে বা প্রাণের মায়ার পদূলিশের কাছে ধরা দেবে। চাকুরে জনসন সাহেব ও

ভাড়াটে সৈন্যদল অতলস্পর্শী স্বদেশ-প্রেমের গভীরতার সম্মান কেমন করে পাবে? মোহে অশ্ব জনসন সাহেব তখনও আশায় আছেন অমরেন্দ্রকে জীবন্ত প্রেরণ করবেন; তাই সাহেব স্বয়ং একবার শেষ চেষ্টা করলেন। সেই নিমিত্ত কালভার্টের উদ্দেশ্যে জনসন সাহেব নিজে চীৎকার করে বললেন—“দেখ, তুমি ডর মাং। তুমি হারা কৈ খাবারী নই হোগী। তুমি surrender কর। তুমি হারা ভাগ্নেকা কৈ রাস্তা নই হায়। ভাগ্নেকা কোশিশ মং কর। গোলিসে মর যাওগে। তুমি নিকাল আও। তুমি কো বহুং মদং করগে। আ যাও—নিকাল আও—surrender কর.....!” কি আকুল আবেদন? কি করুণ মিনতি—“একবার তুমি ধরা দাও?”

সকলের দৃষ্টি কালভার্টের দিকে নিবদ্ধ—এই বৃকি আসামী বোঝিয়ে আসবে। সকলেই উত্তরেব প্রতীক্ষায় উদগীরিত হয়ে আছে। কিন্তু হায়রে দুঃশা! নিমিত্তবৎ বোধই করে উত্তর এল—“গুড়ুম্” “গুড়ুম্”। “সম্মরণীয় চক্রবাহকে বিদ্রূপ করে অমরেন্দ্রের হাতের পিস্তল ও রিভলভার গর্জন করে উঠল। বিপ্লবী অমরেন্দ্র আত্মসমর্পণ করতে পারে না—স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক অমরেন্দ্র দেশজন্যই চরণে আত্মদান করেছে।

আমাদের মামলার জাজ্জমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—
“Eventually Amarendra was found hiding in a culvert, a short distance off in Alkaran lane. He was called upon to surrender but the only response was the report of a pistol—shot fired from inside the culvert. Mr. Johnson then fired two shots at the culvert. The culvert was eventually broken open and Amarendra Nandy was brought out mortally wounded. He had a revolver in one hand and a small automatic pistol in the other.”

আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাবের উত্তরে কালভার্টের নিচ থেকে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল—অমরেন্দ্র নিজেই নিজেকে গুলী করেছে ধরা দেবার বদলে। তবু জনসন সাহেব কালভার্ট লক্ষ্য করে দুবার গুলী ছুড়লেন—কিন্তু, কেন? অবশেষে কালভার্টটি ভেঙে ফেলে মৃত্যুহীন প্রাণ শহীদ অমরেন্দ্রের নশ্বর দেহটিকে বাইরে টেনে আনা হল, তখনও তার এক হাতে একটি রিভলভার, অন্য হাতে একটি ছোট আটোমেটিক পিস্তল। [ক্রমশঃ]



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

টিসিওল্‌কোভ্‌স্কি

১৯০৬ জন্মবার্ষিকী স্মরণে

টিসিওল্‌কোভ্‌স্কিকে আমরা ভুলে গেছি। যদি না ভুলতুম, তবে গ্যাগারিন যৌদীন স্পুটনিক-ভ্রমণ সেরে পৃথিবীতে ফিরে এলেন সৌদীন রাশিয়ার কাল্দুগার টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির সমাধি-স্তম্ভটি ফুলের তলায় হারিয়ে যেত নিশ্চয়। কিন্তু তা তো হয় নি। সৌদীন মস্কোর রেড-স্কোয়ারে গ্যাগারিনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল লক্ষ ফুলের মালা দিয়ে; কিন্তু কাল্দুগার কথা কারও মনে পড়ে নি। টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির জীবনব্যাপী সাধনার কথা সৌদীন কেউ ভুলে ধরে নি জগৎ সমক্ষে। অথচ সত্যিকারের এক মহাবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। প্রধানত তাঁরই প্রদর্শিত সূত্র ধরে রাশিয়া রকেট গড়েছে; মহাকাশে স্পুটনিক পাঠিয়েছে। আর সত্য বলতে কি, আধুনিক রকেট-বিজ্ঞানের জনক ছিলেন তিনি; ছিলেন স্পুটনিক-পারিকল্পনার অগ্রদূত। অতএব, তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে যে আত্মপ্রবণতা করা, এ কথা নিশ্চয় আজ আর কাউকে বদ্বিষে বলতে হবে না।

কিন্তু আজ কোভের কথা এই যে, প্রবণতার আয়োজনটাই ঘটা করে হচ্ছে। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'Chambers' Dictionary of Scientists' দেখলাম। সেখানে হাজার জন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর জীবন-কথা সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির নাম পর্যন্ত সেখানে নেই। এই বৈজ্ঞানিক জীবনী-কোষের সংকলকদের সাধুবাদ জানাই। শুধুমাত্র টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির নামই ওঁরা বাদ দেন নি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামও বাদ দিয়ে ওঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন, কোষ-গ্রন্থেও একদেশদর্শিতা কতদূর অবধি যেতে পারে।

তবে এ ধরনের গ্রন্থকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। কারণ, বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে যে প্রকার সত্যদর্শনের উপর, হাজার কোষ-গ্রন্থের হাজারটি করে সংস্করণ একত্র জুড়লেও তার সমান হবে না। অতএব, টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির জন্যে আমরা-আপনারা দৃষ্টি

করা অর্থহীন। তিনি তাঁর নিজস্ব সত্যের আলোকেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর আমি-আপনি খুশি হবো সেই সত্য-সাধকের জীবনকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে। সুতরাং টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির কে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে, বা দেয় নি, সে কথা থাক এখন; এখন বরং তাঁর লোকোত্তর জীবনকথার সান্নিধ্যে আসা যাক।

কন্‌স্ট্যান্টিন্‌ টিসিওল্‌কোভ্‌স্কির

জন্ম হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান সোভিয়েট রাশিয়ার একটি গ্রাম ইজ্‌হেভ্‌স্কোয়ে। কন্‌স্ট্যান্টিন্‌-এর পিতা ইগ্নাতাইয়েভিচ্‌ বন-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। ভদ্রলোক কাজ করতেন একমনে; আর যখন কারও দিকে তাকাতেন তখন মনে হত, বনের সমস্ত বিভীষিকা তাঁর দুই চোখের মতো স্তম্ভ হয়ে আছে। এককথায় কাণ্ডোড়া ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ইগ্না-



টিসিওল্‌কোভ্‌স্কি (১৯২৪ সালে তোলা)

উইয়েভিচ, আর তাঁর স্ত্রী অ্যানা টিসওল্‌কোভ্‌স্কির মা ছিলেন ঠিক এর উল্টো। তিনি হাসভেন যখন-তখন, আর সুযোগ পেলেই গল্পে-গল্পে সবাইকে মাতারে ভুলতেন। টিসওল্‌কোভ্‌স্কি তাঁর জীবনকাহিনীতে লিখেছেন, “আমার মা ছিলেন প্রতিভাময়ী। স্বভাবজাত অনুপ্রেরণার তাগিদেই চলতেন তিনি। হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসতেন আর বাবার বৈশিষ্ট্য ছিল চরিত্রিক কঠিন্য এবং মানসিক দৃঢ়তা”।

টিসওল্‌কোভ্‌স্কি উত্তরাধিকারসূত্রে একদিকে তাঁর মায়ের প্রতিভা এবং অপর দিকে তাঁর পিতার দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। ফলে, ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে বৃদ্ধির দীর্ঘ ও জীবনের উচ্ছ্বাস ছুঁজে পাওয়া গেল। দেখা গেল নিত্য-নতুন সব স্বপ্নে মগন হল তিনি। চললেন-বললেন, চিন্তায়-ভাবনায় তাঁর মধ্যে থেকে অফুরন্ত জীবনরস উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে। প্রথমে মধ্যম পরিচয় মিলছে তাঁর এমন কি অতি তুচ্ছ কার্যকলাপ থেকেও।

প্রসঙ্গত দু-একটি কার্যকলাপের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ঘড়ি ওড়াতে ভালোবাসতেন কিশোর টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। প্রায়ই দেখা যেত, ঘড়ির সুড়ের সঙ্গে ছোট্ট একটি ব্যগ বেঁধে-নেন তিনি। আর ব্যগের মধ্যে একটি আরশোলা পুরে দিয়েছেন। টিসওল্‌কোভ্‌স্কির মতে, ক্ষুদ্রাকার এই জীবটিই হল মহাকাশের বাসী। ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পরিভ্রম্য করবে সে এবং তারপর নেমে আসবে ঘড়িরূপ স্বকণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী।

এ ছাড়া কোনো-কালের ব্যাপারেও টিসওল্‌কোভ্‌স্কির ছিল প্রবল উৎসাহ। বহুবল শব্দপ্রায় পাতলা কাগজ দিয়ে বেতুন গড়েছেন তিনি। তারপর ব্যয়োগ শেষেই গুলির আকর্ষণে উড়িয়েছেন।

একবার বায়ুচাপিত একটি বন্দ্য গুললেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। সেই ক্ষণের সাহায্যে এমন কি প্রতিভুল বায়ুতেও তাঁর ক্ষুদ্র গাড়িটি চলত। গাড়ির চলক-বলটি কার্যকরী থাকত ঠিক।

আর একবারের ঘটনা। টিসওল্‌কোভ্‌স্কির বয়স তখন ১৪ বছর। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তিনি তখন যেতে উঠেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচিত্র সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের কথা শুনে চমকিত হচ্ছেন গল্পে গল্পে। একদিন জানলেন, ‘আলগোরিথম’-এর সাহায্যে এমন সব বস্তুই দুঃস্বপ্ন নির্গত করা যায়, যেগুলো আমাদের বরাহের বাইরে। এই সিদ্ধান্তটিকে হাতে-কলমে প্রমাণিত করলেন তিনি। পরীক্ষণীয় বস্তু হিসেবে বেছে নিলেন তাঁর কক্ষ থেকে ১২০০

কুই বস্তুটী একটি পান এবং তারপর দেখলেন, ‘আলগোরিথম’-এর সান্দ্রতক মাপের সঙ্গে গজকাটির চিত্রাচারিত মাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার পর থেকেই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা খুঁজে পেলেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি।

ওসিহু এই কিশোর-বিজ্ঞানীর প্রতিও তাঁর পিতা-মাতার আস্থা বাড়ল। ওরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, কিশোরটির বৃদ্ধি ক্রমোন্নয়ন, আবিষ্কারের প্রতি ক্রোড়হল অদম্য। যখন-তখন নিজস্ব চিন্তার জগতে মগ্ন হয়ে থাকে সে। তার প্রতিভা বিচিত্র পথ ধরে বিকাশের পথ খোঁজে। অতএব তাকে ভালোভাবে লেখাপড়া শেখান দরকার। লক্ষ্য রাখা দরকার, যে যাতে শিল্পবিজ্ঞানের কথা-কৌশলের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হতে পারে।

পরিচয় স্থাপনের ব্যবস্থা আচিরেই হল। ১৪ বছরের কিশোর ‘টিসওল্‌কোভ্‌স্কিকে পাঠান হল মস্কো শহরে।

মস্কো গিয়ে দারুণ এক আঘাত পেলেন কিশোর। দেখলেন, ‘আমি’ না থাকার এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহানুভূতির অভাব তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের ঘরের মতো ভাঙবার উপক্রম করছে। একাড্যাকানে খাটো ছিলেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। ১ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর প্রবর্ণোন্মুখ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার জন্যে মস্কোর প্রতিভুল খরিশেলে প্রতি মুহূর্তে তিনি অগনন্থ হতে লাগলেন। এদিকে অর্থের দূর্ব টানটানি। দক্ষিণা হিসেবে মাসে ১০ থেকে ১৫ রুব্‌ল্‌ ‘মা’ তিনি পান, তার প্রায় সবটাই বইশ্য এবং ঐকজানিক সাজ-সরাসর কিনতে গিয়ে খরচ হয়ে যায়। ‘আমি’ বাকি সামান্য ‘মা’ কিছু ‘আমি’ হাতে থাকে তা দিয়ে হলেন কক্ষ-এর বাসি শাউরিটি ছাড়া অন্য কিছু কেনা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে টিসওল্‌কোভ্‌স্কি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন,

“আমি স্পষ্টই স্মরণ করতে পারি, হলেন শাউরিটি ও ভাল ছাড়া আর কিছুই খেতে পেরতাম না। দুটি-ওরালার দোকানে সন্ধ্যাে তিনবার যেতাম আমি এবং ৯ কোপেক মূল্যের দুটি কিনতাম। এমনি করে দুটির জন্যে মাসে ১০ কোপেক খরচ হত আমার। কিন্তু এ সব কিছু সন্তোষ নিজস্ব ভাবনার জগতে শান্তিতেই ছিল। আমি এবং হলেন দুটি আমার উদ্ভাসকে অবশ্যিত করতে পারে নি”।

টিসওল্‌কোভ্‌স্কির এই উত্ত অক্ষরে অক্ষরে গাথা। মস্কো থাকবার সময়

জগদান ও শব্দবিজ্ঞান-বিষয়ক বিচিত্র সব পরীক্ষার মেতেছিলেন তিনি। আর নির্বিন্দুভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন প্রাথমিক ও উচ্চতর গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি এবং বীজগণিত।

এই সময়েই মহাকাশ-বিজয়ের ভাবনা তাঁর মনে আসে। তিনি ভাবলেন, কেন্দ্রাতিগ শক্তিকে এ ব্যাপারে কাজে লাগান যেতে পারে।

আচিরেই নতুন উন্মাদে পরীক্ষা সুরু করলেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। একটি বস্ত্র ব্যস্তের মধ্যে দুটি দোলক রাখলেন। দোলক দুটির উচ্চতর প্রান্তে একটি করে বলা সংযুক্ত হল। বলগুলো চলবার সময় বৃত্তাকার চাপ রচনা করত। টিসওল্‌কোভ্‌স্কি ভাবলেন, ওদের কেন্দ্রাতিগ শক্তির সাহায্যেই বায়ুটি ওপরে উঠবে এবং হয়তো বা মাত্রা করবে মহাশূন্যের পথে।

বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষাটি সাফল্য-মণ্ডিত হয় নি। কিন্তু আজকের অনেক কিছু সাফল্যের বীজ যে এরই মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ কথাও নিশ্চয় অস্বীকার করা চলে না। ভুলে যাওয়া চলে না যে, টিসওল্‌কোভ্‌স্কি শুধুমাত্র আপন কল্পনের অনিবাণ আদর্শকে ধ্রুবতারার কয়েই নিজস্বনিয়মের অনুকরণে বস্তু পথ ধরে এগিয়েছিলেন। শিক্ষকদের সহযোগিতা তিনি পান নি, ল্যাবরেটরীর দক্ষিণ্য তাকে অনুপ্রাণিত করে নি। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক। নিজের জড়ো করা সন্ত্রপাতিগুলোই ছিল তাঁর ল্যাবরেটরী। এ সম্পর্কে টিসওল্‌কোভ্‌স্কি বলেছেন, “আমার কোনো শিক্ষক ছিল না। বলা যেতে পারে, শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে আমি নিজের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি”।

তবে নিজের শিক্ষক নিজে হতে গিয়ে বড় বেশি উন্মাদ হয়ে থাকতেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। প্রায়ই দেখা যেত, মস্কোর রাস্তা-পথে তিনি চলছেন; তাঁর মাথার দীর্ঘ রুম্ব চুলের অরণ্য, মুখ-ভর্তি দাড়ির রাঙাটা, আর পরনে শতজিহ্ম একটি ট্রাউজার; অ্যান্ড পড়ে পড়ে তার বহু জায়গা পড়ে গেছে।

এই অশুভ দৃশ্য দেখে ছোটদের অনেকেই চিৎকার করে উঠতো, “ই-দুরে তোমার প্যাণ্ট খেয়ে নিল নাকি”?

টিসওল্‌কোভ্‌স্কি এ সব প্রশ্নের কোনো জবাব দিতেন না। বরং হাসতেন মৃদু-মৃদু, আর ভাবতেন, ‘ই-দুরের মতো বস্ত্রজীবন থেকে মুক্ত হবে মানুষ? করে পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহান্তরের দিকে অভিমান করবে?’

মস্কোর তিন বছর থাকলেন টিসওল্‌কোভ্‌স্কি। তারপর দেশে ফিরে

এলেন। ফিরে এসে অক্ষাশ্বর ও পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষকতা সুরু করলেন। তার ছাত্ররা অল্পদিনের মধ্যেই লেখাপড়ায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাল। টিসওল্-কোভস্কি তাই শিক্ষকতাকে জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন।

এরপর থেকে নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষকরূপে গড়ে তুলবেন বলে প্রস্তুত হতে লাগলেন তিনি। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে 'পিপল্‌স্‌ স্কুল টিচার' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাজ পেলেন কালুগা প্রদেশের অন্তর্গত বরোভস্ক-এর জেলা স্কুলে।

উনিবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বরোভস্ক ছিল অতি ক্ষুদ্র এক শহর। রাশিয়ার নাগরিক সভ্যতার ঢেউ এই শহরকে তখনও আঘাত করে নি। জাঁকজমক বা বিলাস-বাসনের আলো তখনও প্রকীর্তন হয় নি এর ওপর। এমন কি নাগরিক জীবনের সাধারণ সুখ-সুবিধাগুলোও এতে অনুপস্থিত ছিল। তখন বরোভস্ক না ছিল কোনো লাইব্রেরী; না ছিল ল্যাবরেটরী। টিসওল্‌কোভস্কিকে তাই বহু-বিচিত্র অসুবিধার মধ্য দিয়ে গবেষণা চালাতে হল। কিন্তু তবু কিছুতেই দমলেন না তিনি। নিত্য নতুন গবেষণায় মেতে রইলেন। তার শ্বিতীয় গবেষণা-পত্র 'দি মেক্যানিকস্‌ অব এ লিভিং অরগ্যানিজম' বিজ্ঞানীসমাজে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অচিরেই সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর 'সোসাইটি অব ফিজিকস্‌ অ্যান্ড কেমিস্ট্রীর' ফেলো মনোনীত হলেন তিনি।

এই সম্মান তাঁকে অনুপ্রেরণা যোগাল। তিনি মহাকাশ-পরিভ্রমার নানা দিক নিয়ে ভাবতে সুরু করলেন। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে 'ফ্রী স্পেস' নামক প্রবন্ধে লিখলেন এমন সব কথা, যা পড়তে গিয়ে আজকের দিনের মানুষ আমরাও স্তম্ভিত হই। লিখলেন, মাধ্যাকর্ষণ এবং বাইরের শক্তিসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত মহাশূন্যে গিয়ে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

টিসওল্‌কোভস্কির লেখা থেকে খানিকটা উদ্ভূত করা যাক এখানে। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি লিখেছেন,

"মুক্ত মহাশূন্যে পরীক্ষণীর কোনো বস্তু তার অবলম্বনের ওপর কোনোপ্রকার চাপ সৃষ্টি করবে না এবং বস্তুটিকেও এতটুকু চাপ সহ্য করতে হবে না। অতএব, মহাশূন্যে যদি ঘর-বাড়ি থাকে, তবে নিজেদের ভারে ওরা ভেঙে পড়বে না। যত বড়ই হোক না কেন, কিছুতেই ভাঙবে না ওরা। আস্ত সব পর্বত অথবা

যে কোনো আকৃতির সব প্রাসাদ অবলম্বনের সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগ বা কোনোপ্রকার খুঁটি ছাড়াই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। ভূপৃষ্ঠে আমি যদি কোনো ছুঁচের অগ্রভাগের ওপর দাঁড়াতে চাই, তবে আমার পায়ে ছিদ্র হতে বাধ্য; কিন্তু মহাশূন্যে এ কাজ করলে ছুঁচের ওপর আমার দেহের কোনো চাপ পড়বে না এবং সমস্তল মেঝের ওপর যেমন, সেখানেও ঠিক তেমন স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে দাঁড়াতে পারবো।...

"মুক্ত মহাশূন্যে উপরিভাগ এবং উলদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তুমি বলতে পারবে না, 'আমি ওপরে উঠছি' অথবা 'নামাছি তলার'; অথবা 'আমি উঁচুতে আছি' আর 'তুমি আছ নিচুতে'। সেখানে দোলক

দুলবে না, ঘড়ি চলবে না। সমস্ত সেখানে মাপা যাবে শুধুমাত্র সেই শ্রেণীর ঘড়ির সাহায্যে যাদের দোলক মাধ্যাকর্ষণের জন্যে স্পন্দিত হয় না, হয় ইম্পাল্‌স-গজা স্প্রিং-এর স্থিতিস্থাপকতার জন্যে।"

টিসওল্‌কোভস্কির এইসব অনুমানের অনেক কিছুই সাম্প্রতিককালে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুক্ত মহাশূন্যের বৃকে ঘুরে বেড়াতে হলে কোনো বস্তুকে যে শূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিতে হবে, এ সত্যটিও তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার গোড়ার দিকেই তিনি বৃকতে পেরেছিলেন যে, রকেটকে সম্মুখদিকে চালনা করে আকাশে পাঠাতে না পারলে মহাশূন্য-পরিভ্রমণ অসম্ভব। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে এ নিয়ে ফর্মুলাও প্রকাশ করলেন তিনি। গণিতের

সেরা জিনিষ যাঁরা কেনেন
তাঁদের পছন্দ

কেয়ো-কার্পিন



কেয়োকার্পিন তেলে চুলে আঠা হয়না-মাথা ঠাণ্ডা রাখে আর
চুলও পরিপাটি থাকে। কেয়োকার্পিন নিশ্চয় চুলেও স্বাস্থ্য ও
উজ্জ্বলতা এনে দেয়,-আর এর গন্ধটিও সত্যি মনোরম।
কেয়োকার্পিন আপনার চাই-ই; আজই কিনে ফেলুন।

কেয়ো-কার্পিন

একটি ট্রিস্টে ফেম তেল



কে.ও. কেভিকেল ট্রোস্ট্রাইটেট লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • রাহাব • পাটনা • পৌষা
কটক • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা • কলকাতা



সাহায্যে বন্ধিয়ে দিলেন, মহাশূন্য-পরিভ্রমার ক্ষেত্রে রকেটকে ব্যবহার করার সুবিধে কী কী।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, টিসিওলকোভস্কির গবেষণা মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। পর্যায় তিনটি হল, পুরোপুরি ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিমান-পরিচালনা সম্পর্কে গবেষণা, বিমানের আকৃতি, প্রকৃতি ও ড্রেট-বিমান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং রকেট-বিষয়ক আবিষ্কার। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রকেটের গঠন, পরিচালনা ও গতিবেগ সম্পর্কে টিসিওলকোভস্কির অবদান।

মহাশূন্যযানে গতিবেগ সঞ্চারিত করার জন্যে রকেট-মোটর ব্যবহার করা যেতে পারে, রকেট ব্যবহৃত হতে পারে, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে,— এই সব সত্য প্রথম যারা হৃদয়ঙ্গম করেন, টিসিওলকোভস্কি তাঁদের অন্যতম।

অবশ্য গবেষণার খোঁজার দিকে আমাদের এই বিজ্ঞানীটি রকেট নিয়ে যাব বেশি মাথা ঘামান নি। তখন তাঁর বৃত্তি নিবন্ধ ছিল প্রধানত বিমান-বিজ্ঞানের দিকে।

বারোভাস্কি থাকবার সময় বিমান-সম্প্রদায় গবেষণার অনুশ্রম যেতে থাকতেন টিসিওলকোভস্কি। প্রায়ই দেখা যেত, চেনা-জানা লোক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তিনি। অন্যর কথনও দেখা যেত, কী যেন ভাবতে ভাবতে পথ চলেছেন; পরিচিত লোককেও চিনতে পারছেন না। বারোভাস্কি-এর লোকেরা অবাক হ'ত টিসিওলকোভস্কিকে দেখে। ভাবত, লোকটির মাথা ঠিক আছে তো?

একবার বরোভাস্কি-এর নার্সিকরা টিসিওলকোভস্কির কাণ্ড দেখে মাথার হাত দিয়ে বলল। ওরা দেখল, এই খেরালী বিজ্ঞানীটি ৭০ সেন্টিমিটার পাখায় এক শব্দ তৈরি করেছেন এবং মহা উৎসাহে

সেটিকে আকাশে ওড়ানোর আয়োজন করেছেন।

শব্দ উড়ল শেষ অবধি। এইবার বরোভাস্কি-এর ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সবাই তারিফ করল ওই আপনভোলা বিজ্ঞানীকে। কিন্তু বিজ্ঞানীটি বরোভাস্কি-এ বৈশিষ্ট্য থাকলেন না। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে সপরিবারে চলে গেলেন 'কালুগার'।

সেখানে নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলল তাঁর গবেষণা। 'উইন্ড-টানেল' ও 'কার্টি-লিভার মনো-প্রেইন' সম্পর্কে নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন তিনি। কিন্তু অর্থের তখন দারুণ টানটানি চলছে তাঁর। জার-শাসিত রাশিয়ায় যথার্থ জ্ঞানী-গুরুদ্বারা কদর পাচ্ছেন না। টিসিওলকোভস্কি গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতি মাসেই অপদস্থ হচ্ছেন। শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে 'অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স'-এর কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্যে আবেদন করলেন তিনি। অনেক টালবাহানার পর শেষ অবধি সাহায্য মিলল মাত্র ৪৭০ রুবল। জার-শাসিত রাশিয়ায় এই প্রথম এবং এই শেষ সরকারী সাহায্য লাভ করেছিলেন টিসিওলকোভস্কি। কিন্তু বিশ্বাসের কথা এই যে, অর্থের বতই অভাব থাকুক, অল্প বাধা বতই তাঁকে অসীমপথের মতো ঘিরে ধরুক, কিছুতেই তিনি হার মানেন নি। 'কালুগার' রকেট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর দুঃখে-সুখে ভরা দিন-গুলো স্বপ্নের মতো কেটে গেছে। অনেক সময় নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করতেন তিনি, রকেট কেমন করে ছুটবে? নিশ্চেষ্টের মধ্যে বিশেষ একটা কৌণিক হ্রস্ব বক্রর মধ্যে যদি তাকে আকাশে পঠানো যায়, তবে কতদূর অবধি যাবে সে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে হানুই বা কেমন করে মুক্তি পাবে?

'কালুগার' এক অশ্রুত-অজ্ঞাত ল্যাবরেটরীতে এই সকল প্রশ্ন হৃদয়শাই মনে এসেছিল টিসিওলকোভস্কির এবং সাফল্যজনক গবেষণার সাহায্যে তিনি এদের সমস্তই মিছেছিলেন। কিন্তু জার-শাসিত রাশিয়ায় তাঁর কোনো আবিষ্কারের প্রতিই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনোরূপ সুরক্ষা প্রদর্শন করা হয় নি। সেই মর্যাদা তিনি পেলেন দীর্ঘদিন পর: অক্টোবর-বিপ্লবের অবসানে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে 'সোভিয়েট সোস্যালিস্ট' আকাডেমীর সভ্য মনোনীত করা হল তাঁকে। তাঁর গবেষণার জন্যে অকাভের অর্থ-সাহায্য করা হল। এরপর থেকে টিসিওলকোভস্কিকে আর মূল-শিক্ষকতা করতে হল না। তাই পুরো সময়টা তিনি বৈজ্ঞানিক-গবেষণার কাজে লাগালেন। কিন্তু গবেষণা নিয়ে মার জীবন

মেতে থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কথা এই মহান বিজ্ঞানীটি-কোনোদিনই ভুলে যান নি। মানুষের সুখ ও মানুষের শান্তি, মাতৃভূমির কল্যাণ ও মাতৃভূমির সমৃদ্ধি সব সময়েই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি লিখেছেন,

"যাতে মানুষের দুঃখকষ্ট দূর হয়, মানুষ শান্তি জ্ঞান ও স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে যাতে, আমার কৌতূহল সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সেই সব দিকেই নিবন্ধ ছিল।"

টিসিওলকোভস্কির এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি বলেছেন যে কথা, হাতে-কলমে সাধ্যমত তা প্রমাণ করতে ছাড়েন নি। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ। 'কালুগার' জেলা-পার্টি কমিটি জনশিক্ষার উদ্যোগী হয়েছেন। এ কাজে তাঁদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করছেন প্রাভুদা নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগ। যৌথ খামারের কৃষকদের কাছে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কিছু কল্পনার ব্যাখ্যা করতে চান তাঁরা। অঁচরে কালুগার বাসিন্দাদের কাছে উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে আবেদন জানান হল। বলা হল, কল্পনা ও জনশিক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করতে চান খাঁরা, তাঁরা অবিলম্বে উদ্যোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এই আহ্বানে সকলের আগে সাড়া দিয়েছিলেন টিসিওলকোভস্কি। তিনি বলেছিলেন,

"এ এক চমককার প্রস্তাব। যৌথ খামারে প্রায়ই আসতে হবে বিজ্ঞানীদের। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্তরগুলো সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর কৃষকদের অবহিত করবেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার পক্ষে এই হল প্রেরণ পথ।"

এইভাবে সারা জীবন ধরে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখিয়ে একদিন পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন টিসিওলকোভস্কি। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হল।

মৃত্যুর পর কালুগার নির্জন এক উদ্যানের প্রান্তে সমাধিস্থ করা হল তাঁকে। সেই সমাধিভূমিটি আজও আছে। কিন্তু ফুলের মালা গাণ্যারনের গলায় পড়ে আজ; সেই সমাধিভূমিতে নয়। তাই কলহিলসে, টিসিওলকোভস্কিকে আমরা ভুলে যাই।

সুইস টেলিভিশন কোম্পানি

২৬৫ টাকা মূল্যের
জগৎ বিখ্যাত ও ব্যাড
কর্ড ওয়াল্ট পোর্টেবল
ট্রানজিস্টর "উইন্ড-
সোর-হিটচী" মাসিক
২৫ টাকা কিস্তিভাণ্ডাতে ক্রয় করুন।
আবেদন করুন।



Swiss Television Co.
(BW-55) P.O. Box 1330,
Delhi-6.



মন আজ
খুশিতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জীবনের জন্ম
আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সন্ধ্যার
অব্যর্থ মহোৎসব প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে চুঁচামচ লুভসক্রীম সজে
তার চামচ মহাজাকারিট (৬ বৎসরের
পূরাতন) খাবেন। এতে হ্রাসিত হয় করে,
বিশেষ ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাধারণ উদ্ভিদগোষ্ঠীর চাকি



অব্যর্থ ডাঃ মোহন চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আইসিএসআই, এক, সি, এস, (লন্ডন),
এই, সি, এস, (আমেরিকা), ভারতীয়
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ণপূর্ণ
অধ্যাপক ও

কলিকাতা কলেজ ডাঃ মচেন চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আইসিএসআই।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪০

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্ববঙ্গের ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা আংশিকভাবে আগেই বলেছি। সব কথা বলা হয় নি। আমার পক্ষে বলা সম্ভবপরও নয়। প্রথমত আমার একার পক্ষে পূর্ববঙ্গের সত্তেরটি জেলার সব 'খুঁটিনাটি' খবর জানাও সম্ভবপর নয়। যা-ও বা কিছ্, কিছ্, জানতেম, তা-ও আজ তার অনেকগুলোই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গিয়েছে। অনেক জেলার অনেক লিখিত বিবরণীও, যা আমার কাছে ছিল, তার সবই পূর্ব পাকিস্তানে আমার বাসাতেই ফেলে এসেছি। সংগে করে আনি নি। আগেই বলেছি যে আমি পাকিস্তান ছেড়ে যে চিরদিনের মত চলে আসব, তা' মনে কবে পশ্চিমবঙ্গে (ভারতে) আসি নি। কথায় আছে, মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করেন আর এক! আমার বেলায় অন্তত এক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। আমার আর ফিরে যাওয়া হয় নি। নানা কারণেই যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, আমি যা' জানতেম তার কিছ্, কিছ্, কথা আজ আর এতদিন পরে ঠিক-মত মনে করে উঠতে পারছি না এবং যে-সব বিবরণী আমার কাছে ছিল, তা-ও ফেলে আসার তার সঠিক বিবরণ দেওয়াও আজ আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। তবু সাপ্তাহিক বসুমতীর মুননীরীয়া সম্পাদিকা মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকায় লেখার সুযোগ পাওয়ায় বাস্তবত্যাগী বসুমতীর অনেক পাঠকই নানা ধরনের নানা কথা ও তাঁদের মধোকার কারো কারো নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে দুই-একখানি পত্রের অংশবিশেষ আমি পরে-উল্লেখ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরবো। যারা এইভাবে পত্র লিখে আমি যে কাজে হাত দিয়েছি তাতে সাহায্য করছেন, তাঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যে কাজে হাত দিয়েছি, সে কাজটা আমার একার কোনও ব্যক্তিগত কাজ নয়। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী বা পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তবত্যাগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকলেরই কাজ। এদিকে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের ও খণ্ডিত ভারতের

আদি নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের আসল স্বরূপ সম্পর্কে অনেক কিছ্,ই অ-জানা আছে; সুতরাং, কিছ্, কিছ্, ভুল ধারণাও। আমি মনে করি, আজ আসল অবস্থার স্বরূপ শুধু ভারতে ভারতবাসীর কাছেই নয়, বিশ্ব-বাসীর কাছেও তুলে ধরা একান্ত দরকার। এইদিক দিয়ে ভারতে জনমতকে যদি উদ্বেগ্ন করা যায়, তাহলে তঁরাই ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তৃপক্ষের উপর চাপ-সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতের দুর্ভাবাসীদের মাধ্যমে আসল সত্য প্রকাশ করতে তাঁদের বাধ্য করতে পারবেন। পাকিস্তান সরকার মিথ্যার বেসাতি নিয়ে বিশ্বের বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করে চলেছেন, আর ভারত কি আসল সত্যটাও পাশাপাশি তুলে ধরবেন না? তাঁরা না তুলতে চাইলে, তাঁদের বাধ্য করতে হবে এবং সরকারকে সেই বাধ্য করানোর কাজ, গণতান্ত্রিক দেশে একমাত্র জনমতই করতে পারে। সেজন্য চাই, জনগণকে সত্যিক অবিহত করা। আমার ইচ্ছা সেই কাজই করা কিন্তু আমার শক্তি অত্যন্ত সীমিত; তাই আজ আমি নতুনভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তবত্যাগী জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে এবং সাধারণ মানুষের কাছেও তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে হঠাৎ একদিনে হয় নি, সে কথাও আগেই বলেছি। এই ব্যাপক দাঙ্গার পটভূমি, দেশ বিভাগের দিন থেকেই স্-পারিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা অনু-যায়ী (according to the plan) সূর্য হয়। মুসলিম লীগ দলের সাহায্যে মুসলিম লীগ সরকারের কর্তৃপক্ষ অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে সর্বাধিক দিয়েই যুগপৎ আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয়—কোনও দিকই সেই আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। হিন্দুদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তদুৎসর্গিত প্রতিষ্ঠানগুলোও সেই আক্রমণের আওতা থেকে বাদ যায় না। সেইসব আক্রমণের কিছ্, কিছ্,

উদাহরণ আগেই দিয়েছি। সিলেটের ও রাজসাহীর সংস্কৃত কলেজ দুটির বাড়ি ও রাজসাহীর "ভোলানাথ বিবেকেশ্বর হিন্দু একাডেমির নিজস্ব বাড়ি ও ছাত্র-বাসটির হুকুম-দখল করে নেওয়ার কথা আগেই বলেছি। রাজসাহীর ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের বাড়ি আজ পর্যন্তও পাকিস্তান সরকার ছাড়েন নি। ১৯৪৮ সালে রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বাড়ি দুটি 'রিকুইজিশন' করে নেন, আর আজ ১৯৬৭ সাল! এ পর্যন্ত তাদের 'রাহু-মুক্তি' হয় নি। কোনও দিনই আর হবে বলেও মনে করতে পারি না। পূর্ববঙ্গের 'এসেম্বলি'তে বহুবারই ঐ বিষয় তুলে ধরেছিলাম কিন্তু কোনও ফলই তাতে হয় নি। রাজসাহীর হিন্দুদের ঐ দুটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান দুটো হুকুম-দখল করেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মজিদ সাহেব সন্তুষ্ট থাকতে প নি। তিনি আরও একটি সাংস্কৃতিক গবেষণাগারও হুকুম-দখল করে নেওয়ার হীন চক্রান্ত করেছিলেন কিন্তু সেটা আর শেষ পর্যন্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কেন হয় নি, সে কথা ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত এক বন্ধুর কাছ থেকে সম্প্রতি পাওয়া চিঠিটা উদ্ধৃত কবলেই সকলে বুঝতে পারবেন। যে প্রতিষ্ঠানটি নেওয়ার ষড়যন্ত্র মজিদ সাহেব করেছিলেন, তার নাম—'বাবেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু রাজসাহীরই গৌরব ছিল না—এটি ছিল, অথবা ভারতবর্ষেরই গৌরবের বস্তু এবং বিশ্বের ও বহু দেশের সাংস্কৃতিক গবেষণাকাবীদের কাছেও অতি সমাদরের ও গোবিরের বস্তু। সাম্প্রতিককালে সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় "পাক-ভারতের রূপরেখা" পড়ে যে বন্ধু আমাকে পত্র লিখে ঐ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নাম—শ্রীকান্তীশ-চন্দ্র সরকার। তিনি ছিলেন, রাজসাহী শহরের একজন "এম-এ, বি-এল" ডিক্রি এবং "বাবেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি"র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এখন তাঁর পরবর্ত্তন কিছ্, অংশ হুবহু উদ্ধৃত করছি:

"...সাপ্তাহিক বসুমতী ২১শে আষাঢ়

ও ২৪শে শ্রাবণ; ১৩৭৪ সংখ্যায় আপনার 'পাক-ভারতের রূপরেখা' হঠাৎ হাতে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে পড়ে অশেষ প্রীতি লাভ করলাম—সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। রাজসাহীতে ১৯৪৯—৫০ সালে পাক্সাবী রাজপুত্রের আশ্রমে মজিদ সাহেবের ইসলামিক আদর্শের নানা অগকীর্তির কাহিনী সবাই হাড়ে হাড়ে অনুভব তখন আমরা করেছিলাম। হিন্দুর অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে আপনার তদন্ত বর্ণনার উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে ষ্ট্রে বাংলার মূল্যবান কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র 'বারেন্দ্র বিদ্যাচাঁ নোসাইটি' ও তার সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হিন্দু-দেবদেবীর ভাস্কর্যের ও শিল্পকলায় নিদর্শন কী অভিনব পদ্ধতিতে মজিদ সাহেব ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তার আনুপূর্বিক বর্ণনায় আর একটি 'মহাভারত' সৃষ্টি হবে। তবে এ ব্যাপারে আপনার পাদ-পূরণ কবা প্রয়োজন—নতুবা তথ্যগূর্ণ আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। ক্রিষ্টাশ্রাব্যের দেওয়া এই ব্যাপারটির বিবরণ আমি খুব ভালভাবেই জানতেম। কিন্তু অনেক ঘটনার মত এই ঘটনাটিও আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ক্রিষ্টাশ্রাব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি তুলে ধরায় আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং হিন্দু-মুসলমান সমগ্র বাঙালী জাতিই তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে থাকলাম।)

মজিদ সাহেব ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ক তখন Assistant Director of Public

Health—Dr. Jabbar (ডাঃ জব্বার) এর উদ্দেশ্য—মিউজিয়ামের দুইটি মূল অট্টালিকা ও সুবহু Hall ঘরটি নব-প্রতিষ্ঠিত Unaffiliated Medical Institute-এর জন্য হুকুম-দখল করে নিয়ে মড়া কাটার ঘর করার, বাব পুণ্ডিগণ্ডে মানুষ তো দুরের কথা, ভূতও পালিয়ে যেত! অনেকেই জানেন, রাজসাহীর দিঘা-পাতিষার রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের তথ্যানুকূলে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তার সহায়তা ও প্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১০ সালে স্থাপিত হয়ে প্রায় ত্রিশ সংখ্যায় বেশি গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ আন্তর্জাতিক সুধিজ্ঞদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে। আমি নগণ্য হলেও পরলোকগত অক্ষয়কুমারের প্রেরণায় স্বক বয়সেই ১৯২১ সাল থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত কর্মী ছিলেন এবং বৃথাবস্খায় ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি পর্বন্ত নানা-ভাবে রাজসাহীতে যুক্ত ছিলেম। বহু-দিন Honorary Secretary ভাবে সম্পাদকতা করায়, আইনের খুঁটিনাটি ও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সব বিষয়ের সাথেই পরিচিত হওয়ায় এবং শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে ও উচ্চস্তরের কোন কোন ব্যক্তির সহায়তায় মজিদ সাহেবকে একটু বে-কায়দা ফেলা হয়। সে অনেক কথা। সেই সময়কার মজিদ সাহেবের বক্তৃচ্ছন্দ ও সাবধানবাণী শ্রবণ করে হাসি পায়। ঝাক, তবুও সংক্ষিপ্তভাবে যদি চান

বা উৎসাহ থাকে, তাহলে এ সম্পর্কে আরও একটু আলোকপাত করতে পারব। (আমি, ক্রিষ্টাশ্রাব্যকে তাঁর সংগ্রহীত তথ্যাদি পাঠাতে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছি। গেলে, ভবিষ্যতে তা বঙ্গমতীর পৃষ্ঠায় বের করার জন্য যথাকালে গাঠ্যব)। মালমশলা আমার কাছে লিখ, অঃহ।

হিন্দু-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উন্নতির পথে যে সংগ্রাম মুসলিম লীগ সংবাদ শব্দ করেছিল, তা আজও পূর্ব পাকিস্তানের অব্যাহত গতিতেই চলছে। গভর্নমেন্ট (সরকার) বদল হয়েছে। আগের মুসলিম লীগ সরকার আর নেই। তার জারগায় সামরিক শাসনের অবসানের পর—পরবর্তীকালে, আগের দিনের মুসলিম লীগের 'অভ্যুত্থান' মধ্য থেকে আশ্রয় খান সাহেবের নতুন এক কনভেনশন-পন্থী মুসলিম লীগ গলিয়ে উঠে এখন পাকিস্তানের শাসন চালাচ্ছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সেই জেহাদী নীতি বদলায় নি; বরং, অতীতের মুসলিম লীগের চেয়ে আরও উগ্রতা নিয়ে আত্ম-লীগ তার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। আগের দিনের মুসলিম লীগ যা করেন নি বা করে উঠতে পারেন নি, তা বর্তমানে আয়ুবের মুসলিম লীগ। তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরিঃ

কুমিল্লার (পূর্ব পাকিস্তান) পরলোক-গত দরিদ্র বাধ্য কর্মযোগী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত। তিনি নিজে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায় ও

সাপেক্ষ সহজ সাঙ্গে



চলতো রূপকথার নায়ক নায়িকারা...। উৎসবের দিনগুলিতে আপনার পা হুটিও চায় অমনি হালকা পায়ে চলার আরাম। পালকের মত নরম ফোম রবারে সেই আরাম দিয়ে গড়া—

মুগুর ছাপ

অজন্তা

হাওয়াই চপ্পল

কি ঘরে কি বাইরে— সব সময়ে সবার জুতা
॥ অজন্তা হাওয়াই ॥

প্রস্তুতকারক :— ইন্টার্নাল রবার ওয়ার্কস
৭/এ, বেকিষ্ট্রীট, কলিকাতা-১



মোলে এবং স্ট্রাপে
'অজন্তা'মার্কা
ও
'মুগুর ছাপ'
এই দুইই দেখে নেবেন-
ঠকবেন না।

স্ট্রাপের জুতা ৩ মাস ও মোলের জুতা ৬ মাস গ্যারান্টি

উদ্যমে সৌভাগ্যের উচ্চ-শিখরে উঠেছিলেন। কিন্তু দরিদ্রকে কখনও ভোজেন নি। তাদের জন্য তাঁর অন্তরে ছিল এক অতি কোমল স্থান। তিনি দাতা ছিলেন। দান করতেন, দেশ ও জাতি গঠনের কাজে। দরিদ্র অথচ মেধাবী হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাই তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে 'ঈশ্বর পাঠশালা' নামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, 'রাম-মালা' নামে একটি ছাত্রাবাস ও সুবহু একটি পাঠাগার (লাইব্রেরী) এবং 'নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়' (গার্লস স্কুল) কুমিল্লা শহরে স্থাপন করে যান। ১৯১৪ সালে স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বিশেষ যোগ্যতার ও পারদর্শিতার সাথেই দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত চলে আসছিল। স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হত এবং স্কুলটি তাঁর বসতবাড়ির প্রাঙ্গণের মধ্যেই ছিল। স্কুল সংলগ্ন একটি স্থানে একটি হিন্দু-দেব-মন্দিরও ছিল। এ মন্দিরে প্রতিদিন ভোগ-পূজা প্রভৃতিও যথারীতিই হত। করেক বছর আগে, মুসলিম লীগের শাসনকালে 'রাম-মালা' ছাত্রাবাসটির উপর মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ হয়। এ ছাত্রাবাসে একশত জন দরিদ্র ছাত্র, বিনা-খরচায় থেকে ও খেয়ে স্কুলে পড়ত। এখানকার ছাত্রদের, নিজেদের সব কাজই—এমন কি বাজার করা, পাক করা ও থালা-বাসন প্রভৃতি ঘোষা পর্যন্ত নিজেদের করতে হত। এখানকার শিক্ষাই ছিল এই যে প্রত্যেকটি ছাত্রকেই আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার উপর গড়ে উঠতে হবে। এইভাবেই এখান থেকে আগামীদিনের স্বাধীন দেশের উপযোগী নাগরিক গড়ে তোলাব কাজ নিঃশেষে এগিয়ে চলাছিল। এই ছাত্রাবাসে অনেক প্রাক্তন ছাত্রই ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ অবদান জুগিয়েছিলেন। স্বাধীন দেশের উপযোগী জাতীয় চরিত্রকে গড়ে তোলার কাজকে বানচাল করার জন্যই সম্ভবত মুসলিম লীগ সরকার 'রামমালা-ছাত্রাবাস' ও 'রামমালা পুস্তকাগার' দুটি তাঁর প্রাঙ্গণ-সহ হুকুম-দখল (রিকুইজিশন) করে নেন। ফলে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে বসতবাড়িতে স্থানান্তরিত করতে হয়। মুসলিম লীগ সরকার এই হুকুম-দখল করেই ক্ষান্ত হন না। 'সরকার' রামমালা-ছাত্রাবাসটি বে-আইনীভাবে একেবারে দখলই করে নেন। মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীহরেন্দ্র-চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ মত এ প্রতিষ্ঠান-গুণো যথারীতি চালিয়ে যাওয়ার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থা বে-গতিক দেখে

মাননীয় ঢাকা হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে মামলা দায়ের করেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে এ হুকুম-দখল ও দখল বে-আইনী বলে নাকচ করে দেন। কিন্তু হাইকোর্ট আদেশ দিলে কি হবে? 'সরকার' এ আদেশকে 'অস্বীকার' দেখিয়ে দখল ছাড়েন না। এই অবস্থার প্রতিকার কি? হিন্দুরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা আর কবেন কীভাবে? ভারত-সরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে ভারতের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 'কংগ্রেস' দলের অনেক নেতাকেই বলতে শুনছি যে, পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসেন কেন? তাঁদের এ পরাজয়ের মনোভাব কেন? বিপদ-সংকুল ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনেকই ভাল-ভাল কথা বলা বাধ এবং নিরাপদে থেকে যারা সে সব কথা শোনেন, তাঁরাও হয়তো 'ভালই' বলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভুক্তভোগীই জানেন—কি যাতনা বিধে, দুঃখের সেকিসে, কতু আত্মবিশ্বাসে দংশনিত যারে? যাকে বিষধর সাপে কেটেছে তিনিই শৃঙ্খল বোঝেন সাপের বিষের যাতনাত কত তীব্র। এই প্রসঙ্গে একজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নেতার কথা আজ মনে পড়ে। সেই নেতা ছিলেন, শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মহাশয়। বর্তমানে তিনি পরলোকগত। তিনি দেশ বিভাগের পরে একদিন আমাকে বলেছিলেন,—“প্রভাসবাবু, পাকিস্তানে শেষ পর্যন্ত কোনও হিন্দুই হিন্দু হিসাবে থাকতে পারবে না। আপনি এখনি চলে আসুন।” আমি তাকে সেদিন বলেছিলাম,—“আমার স্ত্রী-পুত্র-পুত্রিবার কিছুই নেই। আমার এক কাঠা জমিও নেই; সুতরাং আমার কিছুই হারানোর ভয়ও নেই। আমি সেখানে থাকতে চাই শৃঙ্খল এই জন্যই যে, যে সব অন্যান্য অত্যাচার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সৌদিকে হবে, সেগুলোকে তো কতৃপক্ষেব তথা জগন্নাথীদের কাছে তুলে ধরতে পারবো; ফলে হয়তো একদিন পাকিস্তানে একটা সুন্দর জাতীয়তাবোধ জেগে উঠে একটা ‘জাতি’ গড়ে উঠতে পারবে। আমরা সবাই যদি চলে আসি, তাহলে তো সে পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।”

কিঞ্চবাবু তখন বন্ধুভাবে আমাকে বলেছিলেন, “থাকতে চান, থাকুন; তবে একটা কথা মনে রাখবেন যে, যারা এসে পাকিস্তানে থাকবে, না ভাবতে চলে আসবে, সে সম্বন্ধে আপনার মত জানতে চাইবেন, তাঁদের অন্তত বলবেন যে, আপনি আছেন ও থাকবেন। কিন্তু তাঁরা থাকবে, না ভারতে যাবে তা তাদেরই ভেবে ঠিক করতে হবে। আপনি কাউকেই থাকতেও

বলবেন না, পাকিস্তান ছেড়ে বলবেন না। থাকতে বললে কোনও দুঃখিনী তাদের কোন হলে তারা আপনার উপরেই। করে বলবে যে, আপনার কথা তো আমার এই সর্বনাশ হল; এদিকে এসে, এদিকের সরকারে সাহায্য না পেয়ে অনাহারে অতাদের আত্মীয়-স্বজনের কেউ মৃত্যন আবার আপনার উপরেই। করে তারা বলবে যে, দেশে থাকা এই অবস্থায় পড়তে হত না বাড়িতে একটা ঘরের ভেতর থেকে পারতেন—গাছতলায় বা রেল ‘প্ল্যাটফর্মে’ পড়ে মরতে হত। আমি তাঁর যুক্তির সারবত্তা অন্তরে বুঝি; সত্যিই তো, অক্ষম করতে পারব না, তাই বলার আমার কী অধিকার থাকে। পাকিস্তানে আমরা যে কংগ্রেসী হিন্দু নেতা ছিলাম, আমাদের প্রায় সকলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। দুই-একজন নে এই দিকটার দিকে বিশেষ নজর পাকিস্তানে থেকে যে কীভাবে সেখানে কাজ করতে হয়েছে, সে বুঝবেন কেবল তাঁরাই নারা অল্প দিনে সমস্ত বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা কিছুতেই বুঝবেন না বা বুঝে না, সেই সব নেতা যারা পাকিস্তানের এক কোটি বিশ লক্ষ সম্প্রদায়ের লোককে ‘বলি খাউড’ ভারতের স্বাধীন পেয়েছেন।

পাকিস্তান সরকারের কা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পেয়ে থাকেন তার কথা বলে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তেই এই বলতে হল।

যাক, আদি ও অকৃত্রিম মুসলিম সরকারের তবু কিছুটা চক্ষুলাল হয়তো বা তাঁরাও বাঙালী বড়ো বাংলার হিন্দুদের উপর এম ছিল। কিন্তু বর্তমানের কংগ্রেস আমল-লীগের সে ‘বোম্বাই’ মে আদি মুসলিম লীগ সরকার পারেন নি, বা করতে লজ্জা বোতা’ বর্তমানের আমল-লীগ সসঙ্কেচেই করেছেন। এর বং পরে যথাস্থানে তুলে ধরব। শৃঙ্খল কুমিল্লার মহেশ-প্রাঙ্গণ পাঠশালা ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা অংশই আপাতত তুলে ধরি। সালের ৮ই জুলাই তারিখে, প্রা মুসলমান বাস্তুত্যাগী জোর ব পাঠশালা প্রাঙ্গণে ঢুকে

(স্কুলের) দক্ষিণের অংশ জবর দখল করে। তার পরে, ক্রমশই ঐ সব ভারত থেকে বিভাজিত পাকিস্তানী মুসলমানরা, যাদের সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার "ভারতীয় মুসলমান" বলে দাবি জানান, জবর পঠশালার ছাত্রাবাস, শরীর চর্চার আখুড়া,

মন্দিরের সম্মুখের 'নার্টমন্দির' দখল করে নেয়। প্রথমে যে জবর-দখলকারীদের সংখ্যা ছিল একশত, তা' বেড়ে এখন দাঁড়ায় পাঁচশো'তে। ১৯৬৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রায় শতখানেক বাস্তুত্যাগী মুসলমান লাঠি-সোটা প্রভৃতি মারাত্মক

অস্ত্র-শস্ত্র সহ বেশ সুসংহতভাবে রামমালা ছাত্রাবাস ও রামমালা ছাত্রী-নিবাস দু'টি দখল করে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু এবারে ঐ বে-আইনী জবরদখলের চেষ্টার বাধা আসে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের এবং শহরের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-



আমি ডাক্তার হ'তে চাই

১০০ আর ওকে সে শিকার সুযোগ
দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। এর জন্য
চাই টাকা। সুপরিকল্পিত সফলতায়
মাধ্যমেই টাকার সংস্থান হয়। পান্নাব
শ্রাশনাল ব্যাঙ্কের সেভিংস ও
রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনায় টাকা
জমান। ওর আশা আপনি অবশ্যই
পূর্ণ করতে পারবেন।

পান্নাব
ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক

দের কাছ থেকে; ফলে তাঁরা নির্ধরভাবে প্রহৃত হয়ে অনেকেই গুরুতররূপে আহত হন। ক্রীমিজা ভিক্টোরিয়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও ঈশ্বর-পাঠশালার ব্যবস্থাপক কর্মিটির সভাপতি—শ্রীমণীন্দ্র দেব মহাশয়ের তো প্রহারের চোটে হাড়ই ভেঙে যায়। যখন এই অবস্থা চলাছিল তখন "টেলিফোনে" পুনঃপুন খানায় ও পুলিশ সাহেবের আফিসে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ঘটনার সময় কোনও পুলিশেরই সাহায্য পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনা নির্বিবাদে শেষ হওয়ার পরে পুলিশ দেখা দেন। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ক্রীমিজার ডেপুটি কমিশনার (পূর্বকার ভাষায়, ম্যাজিস্ট্রেট) বিভাগীয় ক্রীমিশনার, শিক্ষামন্ত্রী ও গভর্নরের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে ও প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে সব ঘটনার বিষয় জানিয়েও কোনই ফল পাওয়া যায় না। মনে হয়, হিন্দু-কৃষ্টির ও হিন্দু-শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিকে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার ফলে গভর্নমেন্ট বন্ধই করে দিতে চান। যেমন তাঁরা করেছেন, রাজসাহী শহরের "বি, বি, হিন্দু-একাডেমি"-কে ও মহারাজী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজকে। শহরে তো আরও অনেকই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় বাড়ি ছিল, কিন্তু তাদের উপর হামলা না করে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য নির্দিষ্ট সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই হামলা হয় কেন? এই কথাটাই আজ ভারত-সরকারকে ও ভারতের জনগণকে একবার গভীরভাবে ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ জানাই। আরও একটি কথা—ও তাঁদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি যে, একটি জেলা-শহরের বৃক্কের ওপর অবাস্থ্যত মহেশ-প্রাঙ্গণের মত একটা প্রসিদ্ধ স্থানেই যখন এরূপ ঘটনা ঘটে পারে, তারই যখন কোনও নিরাপত্তার ব্যৱস্থা করা যায় না, তখন গ্রাম-দেশের লোকের নিরাপত্তার কি নিশ্চয়তা দেওয়া যায়? আমরা দেখছি, গ্রামের লোকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। তাই, দেশ বিভাগের দিন থেকে পাকিস্তান থেকে হিন্দুর যে বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছে, আজও তার শেষ হয় নি। ভারতে যেসব লোক বাস্তুত্যাগী হয়ে এসেছেন, তাঁদেরও বাড়িঘর ছিল, অনেকের জোত-জমাও ছিল, তাঁদেরও অনেকেই তাঁদের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত গেলে তাঁরা যথারীতি মর্যাদার সাথেই তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন, সেইসব লোকই আজ ভিখারীর বেশে ভারতে এসে কেউ বা 'ফুটপাথে', কেউ বা গাছতলার আশ্রয় নিচ্ছেন! প্রস্তরের দরদ দিয়ে আমি এ-দিকের জনগণের ও ভারত-সরকারের কাছে আবারও আমার কণিকণেত্র-আওয়াজ তুলে

আবেদন জানিয়ে তাঁদের একবার ঐ সব হতভাগ্যদের অবস্থার কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আজও দেখছি, পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যখন ভারতের সীমান্ত দ্বার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ তখনও পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার থেকে এগার শো লোক প্রতি মাসে আসাম ও ত্রিপুরায় চলে আসছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরা কি এ-দিকের সরকারের ও জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা শোনেন নি? এদিকে ভারতের দুরবস্থা একটু কিছু হলেও পাকিস্তানে তার দশগুণ বাড়িয়েই সেখানকার সরকার তা প্রচার করেন। সেসব শুনেও তাঁরা আসছেন। নিশ্চয়ই বিরাট একটা সুখভোগের পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন না। তাঁরা আসছেন জীবনের ও ইচ্ছাভেদে একটা নিরাপত্তার আশাতেই। যখন দেখছি, ভারতের আসাম সরকার ঐ সব বাস্তুত্যাগীদের সেই আশাতেও বাদ সেখেছেন। তাঁরা বাস্তুত্যাগীদের মুখের সামনে তাঁদের রাজ্যের সীমান্তের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ তো দিচ্ছেন-ই; তা' দিচ্ছেই তাঁরা নিরস্ত হন নি। ত্রিপুরা সরকারকেও তাঁরা নাকি অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁরাও যেন তাঁদের রাজ্যে কাউকে ঢুকতে না দেন। এই স্বাধীনতাই পাকিস্তানের হিন্দুরা, তাঁদের গুপ্ত-তাজা রক্তের বিনিময়ে পেয়েছেন। তাঁদের পক্ষে দেখছি, 'জলে কুমারী, ডাঙায় বাঘ' এখন তাঁদের পক্ষে 'রল মা তারা দাঁড়ই কোথা?' বলে ভগবানের কাছে কীতর প্রার্থনা জানানো ছাড়া আর পথ কি? ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র সিংহকে একদিন বলতে শুনেছিলাম যে—"আমি স্বাধীনতার সৈনিক হিসাবে যখন ইংরেজ আমলে 'ফেরারী' অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে কুমিল্লা ও নোয়াখালির বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছি, তখন তাঁরা সরিষা-বিপদের বড়িক মাথা পেতে নিয়েও আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন; আর আজ সেইসব লোকই প্রাণের দায়ে আমার কাছে আশ্রয়-প্রার্থী হয়ে এসেছেন ও আসছেন, আমি তাঁদের ফেরাই কেমন করে, বা আমার রাজ্যের দরজা তাদের মুখের সামনে বন্ধ করে দিই কেমন করে?" তিনি আজও অতীতের উপকারী বন্ধুদের দান ভোলেন নি। কিন্তু জানি না, আর কতজন ভারতীয় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের দান আজও মনে করেন? আসাম সরকার যে মনে রাখেন নি, তার নমুনা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আসাম সরকার এই অশুভ জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব আজ নতুন হয়ে দেখা দেয় নি। গোপীনাথ বরদলুই মন্ত্রকের আমলের অনুসৃত 'সংকীর্ণ' দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই

সিলেটকে একরকম জোর করেই পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। একটা আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলেই সিলেটের গণভোটের ফল অন্য রকম হতো এবং সিলেট আসামেরই অঙ্গ হিসাবেই ভারতের মধ্যেই থাকত। তা' হয় নি। হতে দেওয়া হয় নি। আসামের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয়ের কাছেই আমি সেকথা শুনেছিলাম। তার বিষয় আগেই বলাই। তারপর ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আসামে বাঙালী-নিধনের সংবাদ, আজ আর কারোই অজ্ঞাত নয়। আসামের পার্বত্য অঞ্চলেরও ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি আসাম সরকার প্রথম অবস্থায় কোনও আমল-ই দেন নি; ফলে আজ তাঁদের দাবি অনেক উপরে উঠেছে। কোন কোন পার্বত্য জাতি তো ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই শুরু করেছেন। আমি মনে করি, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে একটা দৃঢ় মনোভাব নিতেন, তাহলে আর আজকের এই পরিস্থিতি দেখা দিত না। কেন্দ্রীয় সরকারও তা করেন নি, সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-ও, যে প্রতিষ্ঠান আজও ভারত-সরকার চালাচ্ছেন তা করেন নি। এখনও যদি তাঁরা জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী যেসব শক্তি কাজ করছে, তা' কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই হোক, বা রাইরেই হোক, তাদের শক্তিতে শাসনে আনেন, তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়তো হতে পারে। আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথেই লক্ষ্য করছি যে 'সরকারের' ও সরকার-পরিচালক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ তাঁদের ভেতরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। এই না-পারার জন্যই তাঁরা না পাচ্ছেন তাঁদের অন্তরের দরদ নিয়ে এসে কোনও আত্মসন্ত্রাসী বা বাহিরাজ্য সম্পর্কে কোনও বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে সম্মুখীন হতে। পাকিস্তানের সম্পর্কে ভারতের নীতি তারই একটা নিদর্শন মাত্র। সেই দুর্বলতার জন্যই খান আব্দুল গফর খান, তাঁর পাশ্চাত্যবাদের সংগ্রামে ভারতের কোন সাহায্য পাচ্ছেন না। ছোট্ট একটা দেশ আফগানিস্তান। সে দেশের রাজা জাহির শাহ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে হুঁশিয়াব করে দিয়েই সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা পাশ্চাত্যবাদের সংগ্রামে পুরো 'মদ' দেবেন। অতি বহু ডারত কিন্তু তা' দিতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদেরও তাঁদের দেশে নিরাপত্তার বাস করার কোনও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না, যদিও দেশ বিভাগের অব্যবহিত আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে বহু চুক্তি ও পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। সেসব কথা

হবেই দেখা

জামিল মদুখাপানয়ন

কড় বাদলে রাস্তা ঘাটে
দিন দুপরে হাটের পথে
এমনি আমার এগিয়ে চলা
পিছন থেকে ডাকলে পরে
থমকে দাঁড়াই
কইসে বিবি?
ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যায় যে দেখা।

পুকুরঘাটে প্রদীপ জ্বললে
ফাদের বিবি কাপড় কাচে,
কড় বাদলের, একটি তারা
হারিয়ে গেছে
ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যায় যে দেখা।

এমনি আমার এগিয়ে চলা
গোপনতায়, শুনলে আওয়াজ
রঙবেরঙের কাচের চুড়ি
থমকে দাঁড়াই
কইসে বিবি
ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যায় যে দেখা।

হকের মধ্যে কে যেন কে
বললে ডেকে,
এমনিভাবেই আরেকটু পথ
এগিয়ে চল, হবেই দেখা
আঙুর বনে,
ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যায় যে দেখা।

আগেই কিছু কিছু বলেছি। ভারত সরকারের ও ভারতের রাজনৈতিক সব দল-গুলোর-ই দরদভরা মন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কথা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে আদি মুসলিম লীগ ও বর্তমানের আরবী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেশ বিভাগের দিন থেকেই একটা সর্বাঙ্গিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের 'জৈহাদের' সামান্য একটু নমনা ওপরে তুলে ধরেছি। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঐ সরকারের সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন আজ বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু, রাজনৈতিক জীবনে আজ তাঁরা 'পারিয়া' বা অন্তর্জ, বর্তমানের আরব সরকারের মৌলিক গণতন্ত্রের মহিমায পাকিস্তানের পার্লামেন্টে (ন্যাশনাল এসেমবলিতে) একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নেই, পূর্ব পাকিস্তানের ১৫০ জন সদস্যের প্রাদেশিক বিধানসভার মাত্র তিনজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'জৈ-হুদুম' সদস্য, রাষ্ট্রিক জীবনে অ-মুসলমান সম্প্রদায় আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এই অবস্থাটা যদি ভারত সরকার ও ভারতের রাজনৈতিক নেতারা মনে রেখে চলেন, তাহলে আমার বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানেরও

সুদূর খুঁজে তাঁরা পাবেন। আমি সেই সম্পর্কেই ক্রমশ বলব। বলব, কিভাবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐ অবস্থা হল এবং কি-ই বা তার প্রতিকারের পথ; অবশ্য, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।

যাই হোক, ১৯৫০ সালের ব্যাপক দাঙ্গার পরে দিল্লী-চুক্তি হওয়ায় সাময়িক কালের জন্য হলেও একটা শান্তির বাতাস বরণ আবার সৃষ্টি হওয়ার পথে চলতে শুরু করেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নেতা প্রীসতীন সেন মহাশয় তো শত্রুবৃদ্ধি-সম্পন্ন মুসলমান নেতাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন বরিশালের বাস্তুত্যাগীদের আবার নিজ দেশে ফিবিবে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাস্তুত্যাগীরা কেউ ফিরে গিয়েছিলেন কি-না এবং গেলেও কতজন গিয়েছিলেন, তা আমি সঠিক জানি না। তবে আমার জেলা রাজসাহীতে ধামরাহাট ও পন্নীতলা থানার বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে কিছু কিছু যে স্বেচ্ছায়ই ফিরে এসেছিলেন তা আমি জানি। আমার জেলার যাবা ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের সকলেই তাঁদের বাড়ি-ঘর ও জোত-জমাও ফিবে পান নি। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্যই তখন আমাকে অনবরত কতৃপক্ষমহলে রাজসাহীতে ও ঢাকায় ঘোরাফেরা করতে হয়। আমার বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জেলাতেই কংগ্রেসী হিন্দু জনপ্রতিনিধিগণকে একই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। তারপরেও

আর একটি উপসর্গ দেখা দেয়। ঘা-খাওয়া লোক একটুতেই ঘাবড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালের প্রচণ্ড ঘা খাওয়ার পরে সর্বত্রই হিন্দুদেবও সেই অবস্থাই হয়েছিল। তাই, অভ্যোগের দরখাস্তও দিন দিন বেড়েই যেতে থাকে। হিন্দুর এই দুর্বল মনো-বলেরও পূর্ণ সুযোগ কিছু কিছু সর্গ-বিবোধী মুসলমানও নিয়েছিল; ফলে ছোট-খাট 'সুচ-ফোটান' ঘটনাও চলছিল। এই তো গেল একটা দিক; আবার এও দেখেছি যে হিন্দুর উপরে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন কোন মুসলমানপ্রধান-ই অত্যাচারিত অভিযোগী হিন্দুকে আমাব কাছে নিয়ে এসে তার দরখাস্ত দাখিল করে গিয়েছেন; সুতরাং এইসব কাজ নিয়েই আরও বছর দেড়েক এমনিভাবেই কাটে। হিন্দুদেব মধ্যে আবার নতুনভাবে একটা মনোবল ক্রমশ ফিরে আসতে শুরু করে কিন্তু তা বেশি-দিন টিকে থেকে স্থায়ীকলাত করতে পারে না।

১৯৫২ সালেই আবার নতুন সংকট দেখা দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে এসেমবলির অধিবেশনের 'নোটিশ' পাই। সেই উদ্দেশ্যে ঢাকায় ২১ দিন আগেই রওনা হই। সেখানে গিয়ে কি নতুন সংকটের সম্মুখীন আমাদের সকলকেই এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান-বাসীকেই যে হতে হয়, তারই কথা পরের সংখ্যাতে বলতে চাই।

[ক্রমশঃ]



স্বপ্নাত্ত বন্দ্যোদ্যাত্রা ॥

বিদ্যা বাউলীর হৃদয়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৷ সতেরো ॥

বিদ্যাধরীর চোখের কোলদুটো ফুলো ফুলো। দু'পরে একটু গড়িয়ে উঠে একতারার তার বঁধছে। বং বং দ্বন্দ্ব উঠছে একতারার থেকে। পরশু রাতে মদন তার ঘরে এসেছে। হঠাৎ মদন যে ভাব ঘরে এসে উপস্থিত হবে ভারতে পারে নি বিদ্যাধরী। অবশ্য ভাবন-চিন্তন মাই ওর। আইল আইল গেল গেল। কিছুতেই কিছু আসে যায় না ওর।

পরশু দিনটা বড় অশুভ। সকালে খম্বুম বৃষ্টি। আইল কুমি। স্তারপর উপস্থিত দাশু খলিফা। তার চার দশ পরে মদন। দিনটা যেন মানুষ আসনের দিন। জুয়ারের পানি যখন আসে, তখন এমনিই আসে।

সব মিলিয়ে একটা গেরো পড়েছে। গেরোটা পরিষ্কার দেখতে পায়। মনের মধ্যে মনের গেরো। কুমি খলিফা মদন। তিন-সুতায় গেরো পড়েছে।

এ বড় জ্বর গেরো। ছিড়নের সাধি নাই। প্রাণ টনটন করে।

বিদ্যাধরীর জট পাকায় না। জড়িয়ে পড়ে না। গেরো পড়ে না ওর মনের সুতায়। অথচ আইস-রইস, সবই জ্বালগা-আলগা। মনমানকে বাইরে টেনে আনে না। তাই বাইরের সসোষের অসংখ্য সুতার জ্বালে জড়ায় না। নিজের মধ্যে নিজের সন্ধান। এ সম্মানে সর মেলে। কে তার খপর রাখে।

আজ দু'দিন হোল, রয়েছে মদন। মদন সন্ধ্যার পরে যখন এল। ও

একটু অবাক হয়েছিল বই কি। খুশি হয়েছিল। মানুষজন আসন-বাওন। কার না খুশি লাগে। আসনেও খুশি। বাওনেও খুশি।

বিদ্যাধরী তখন ভিজে কাঠে ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে খানিকটা মটর কলাই সেশ্য করে নিচ্ছিল। সঙ্গে দু'টুকুরো কুমড়া সেশ্য। গোটা চারেক কাঁচা লঙ্কা একটু লবণ। রাতে এই আহারের ব্যরস্থা ছিল। খলিফা এল। খুশি নিয়ে ঘরখা দেওয়া হোল না। পাঁচ দুয়ারে না গেলে মিলবে কি! ঘরে আর কিই বা থাকে!

মদন এসে হাজির। এসে চুপচাপ বসল রাধনের ছাপরার সামনে উবু হয়ে। কথাবার্তা নেই। চক্ষু দুটো উদ্ভ্রান্ত। তারা তারা তাকানি। একটু যেন ভয় সজ্জাচ।

—আউগাইয়া বইও।

এগিয়ে বসতে বসল বিদ্যাধরী। কেন এসেছে। কোথা থেকে এসেছে। কোন কথাই জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করা ওর স্বভাব নয়। কোন কারখানার কোন কৌতুহল ওর নেই। মদন এসেছে। এসে বসেছে। এইটাই সত্য। এইটাই ঘটনা। যে কোন ঘটনায় খুশি না হয়ে তার উপায় কি? মন যে তার জুয়ারে বাঁধা। খুশির জুয়ার।

মদন এগিয়ে বসল না। আস্তে আস্তে বলল—তোমার কাছে আইলাম।

—ভালই করছ।

বাসু। ওইটুকুই কথার মত কথা। মদনও আর কোন কথা বলল না। কেন এল। ঠিককিমত দেয়া বা তাই নিয়ে বেশ

গবেষণা করে বিশ-তিরিশটা কথা বলা— কিছু নয়। খেপার কাছে ও সব কথার কোন মূল্য নেই। মদন জানে।

একটু সময় চুপ করে মস থেকে আর একবার বলল—রাক্ষস ও ঘরে রাখছি। —ভালই করছ।

আবার বলল বিদ্যাধরী। যেন ব্যাপারটা কিছুই নব। চলে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। এইটুকুই ঘটনা। এইটুকুই সত্য। বাকী আর সব কথা অরাস্তর। ও কথা শোনবার বলবার কোন প্রয়োজন নেই। মটর কলাই সেশ্য একটা খুশি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বিদ্যাধরী তাকাল মদনের দিকে। বরাবরের মত ফিক ফিক করে হাসল। কাঠে ফুঁ দিয়ে মুখ তুলল।

—কি প্যাক করো?

হেসেই বলল বিদ্যাধরী—মটর কলাই সিম্ব। কুমড়া সিম্ব। রাইতের খাওন।

রাত্রের খাওয়ার বিবরণটা খুব মনো-পূত হোল না মদনের। ও বুদ্ধি, ঘরে চাল নেই। ও জানে চাল না থাকলে সেশ্য-সেশ্য-খেয়েই দিন কাটায় রাত কাটায় খেপা। উপায় কি। পাবেই না কোথায়? বর্ষা-বাদলের দিন খেপার কণ্ট বেশি।

মদনেরও তাই ছিল। বর্ষার পরো তিনটে মাস কোথাও যাত্রাপান হবে না। তিন মাস যে যার দেশে ঘরে চলে যেত। মদনও যেত তার দেশে। বেতুলগঞ্জ, মুন্ডিয়ালগাঁও। রিভির কিরিকিরানি। টিপটিপানি। উঠানে কদা বাগানে হাঁটু জল। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেতে গেলে ডোঙায় চড়ে যেতে হয়। জলে জলাকার।

ঘরে বসে থাকি; তামুক খাও। ডাঁটা বা কুমড়া ছেঁচকি ভাত খাও। বাস্। কোন কর্ম নেই। কোথাও বেরোবার উপায় নেই। এখানে তবু জল কম। মন্ডিরালগাঁওয়ে জল জমত আরও বেশি। পাশেই ছিল সোনামুখী নদী। খাল বিল মাঠ জলে ভাসিয়ে দিত।

তিন মাস পরে আশ্বিনের প্রথম দিকেই আবার চলে যেতে হোত যাত্রাগানের দলে। বাস্ পুজোর মরশুমে শীতে-গরমে পুরোদমে চলত গাওনা। আবার রাতের পর রাত জেগে পাঁচ গাঁওয়ের মানুষকে মূগ্ধ করে রাখা। এ এক নেশা। কিস্ট-মাত্রার পালা গাইলে মূল গায়ের থাকত মদন ভুইয়া।

সেই মদন ভুইয়া। এক ডাকে থাকে পাঁচ গাঁওয়ের মানুষ চিনত। সে আজ এক বাউলানীর ছাপড়ায় উবু হয়ে বসে মটর সিঁধ করা দেখছে। সবই অদৃষ্ট!

—বলি খেপী, আহস না কি লো? অলো অ খেপী!

মদন গলা শুনেই বোকে, পশ্মাদিদি এসেছে।

গয়লা পশ্মভূষণ কোমর দু'লিয়ে কাঁধের বাঁক নামাল। হাতখানাকে বেকিসে মেরেলীহস্তে কপালের ঘাম মুছল। মদনের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হোল।

—ভূমি উদয় হইলা কখন? কুমির ঘরে নি আছিল?

মদন একটু সঙ্কুচিত হোল। কথাটা ধীরে বলল।—ভাঙে নি কিছু আছে?

—ক্ষীর আছে পোয়াটুক। বিলিট হাদলে ক্ষীর খাইব কেডা?

—আমি খাম্। দিয়া যাও ক্ষীরটুক। হাসল পশ্মাদিদি। ধূতির আঁচল ধীরে গারে তুলে একটা জুগুয়া টিনের কোটা থেকে বাড়ি বার করল। নিজে একটা নিল। মদনকে একটা দিল।

—এটু আগুন দ্যাও। কাঠের উনুন থেকে একখানা কাঠ টেনে বার করল মদন। পশ্মাদিদি বাড়ি ধরাল। মদনও ধরাল।

—খপর শুনছ নি?

বিদ্যাধরী ফটন্ত মটর কলাইয়ের হাঁড়ি থেকে চোখ ফেরাল।

পশ্মাদিদি বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে বলল।—হুনাহুন কথাটা কানে আইল।

মদন বাড়িতে একটা জোর টান দিয়ে বলল।—কি কথা?

—আলো ধড়ে আমার প্রাণ নাই। শুমলাম মোজারা ঘোপে-ঘোপে সব একগুঁড়ি অইয়া মিট্ কইরত্যাছে। কলকাতায় নি শ্যাখে গো কাইট্যা কুচিকুচি করছে লো?

মদন বিদ্যাধরী দৃষ্টিতেই অবাক হয়ে তাকাল, জানি না তো। দৃষ্টির চোখেই বিস্ময়।

কলকাতায় শেখ ভাইদের কেটে ফেলেছে। এ খপর তারা জানবে কোথেকে? কোথায় কি হচ্ছে, অত খপর কে রাখে। খপর অত পাবার উপায়ই বা কি! কলকাতা থেকে মাকে মধ্যে এক-আধজন মানুষ বাবুদের বাড়ি আসে। তারাই হয়তো খবর এনেছে। আর মদন জানে, খবরের এক রকম কাগজ বেরোয়। তাতে সব খপর ছাপা থাকে। সে কাগজ যদি বাবুদের বাড়ি এসে থাকে।

—খপর শুনিনা মোজারা চেইতা গ্যাছে গা। এখন এয়ালে কাইজা করনের ফন্দী করত্যাছে।

—কও কি কথা? কিসের কাইজা?

বিদ্যাধরী গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করল। এ আবার কি কথা! মারামারি। কার সঙ্গে মারামারি? কিসের মারামারি। এমন কথা তো জন্মে শোনে নি তারা। জমিদারে জমিদাবে কাইজা হয়। চর দখল নিয়ে রামদা শড়কি নিয়ে মারামারি হয়। দু'চার দশটা খুন-জখম হয়ে যায়। কিন্তু সে মারামারিতে শ্যাখ হিন্দু একই সঙ্গে রামদা ঘোরায়। পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে।

—হ, খপর শুনিনা ধড়ে আর পরাণ নাই। কলকাতায় কাইজা লাগছে। এয়ালে তার কি সম্পর্ক? হুনাহুন কানে আইল। কইলকাতার খিকা ছুরাবন্দী ছায়েব মানুষ পাঠাইছে মোজাগো কাছে।

কি যে হাবর-জাবর কথা বলে পশ্মাদিদি!

মদন বাড়িতে টান দিয়ে হাসে।—কেউ নি তোমারে ঢাপসি দিছে। এয়াও কি হইবার পারে?

—আলো, নিজ কর্ণে শুনিনা আইলাম। মদন বলে,—ও হগল কথা ছাড়ান দ্যাও। ক্ষীরটুক বাইর করো।

বাড়িতে শেষটান দিয়ে পশ্মাদিদি কোমর বেকিসে উঠে বসল।—হ, রাইত বেশি করুম না। লও, ক্ষীরটুক দিয়া যাই।

—কয় পইসা?

মদনের কথায় পশ্মাদিদি হাসল এত-জ্ঞে।—খেপীর ঘরে জিনিষ দিয়া দাম লই না।

বিদ্যাধরী হাসল।

মদন ওষবে চলে গেল। একটা কলাইয়ের বাটি নিয়ে এল। মাটির হাঁড়ি থেকে এক বাটি ক্ষীর ঢেলে দিল পশ্মাদিদি। তারপর বাকটা কাঁধে উঠিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে কোমর দু'লিয়ে বেরিয়ে গেল।

মদন ক্ষীরটা পাশে বেখে পোড়া বাড়িটা আবার ধরাল। খাওয়াটা আজ ভালই হবে। মটর কলাই সেস্খ, কুমড়া সেস্খ, ক্ষীর। ভাতের আর দরকারটা কি?

পরসা নিজ না পশ্মাদিদি। খেপীর ঘরে জিনিষ দিয়ে পরসা নেয় না। খেপী বিদ্যাধরীর, একি মর্যাদা না ভাল-বাসা? বিদ্যাধরী যেন সংসারটাকে বশ কবে রেখেছে! কুমির সঙ্গে বিদ্যাধরীর কোন তুলনাই হয় না।

কুমির হাতে লক্ষাবাটা দিবে পে'বাজ দিয়ে পুঁটি মাছের ঝাল। আশ খেপীর ঘরে মটর সেস্খ। যেন আকাশ-পাতাল তফাত। ও খাওয়াব বুক খেট জ্বলে। দেহটা গরম হয়ে ওঠে। তাব এখানে এই সামান্য আয়েজ্ঞন। কিন্তু তার স্বাদ বেন পরাণটাকে ঠান্ডা কবে দেয়।

খেপীর আলো-আলো দেহখানা যেন চন্দ্র দিয়ে মাজা। চন্দ্রর আলো নিরে মেজে দিয়েছে ওর দেহখানা। ঠান্ডা। নরম। রসে টইটুদর। খেপী বিদ্যাধরীর তুলনা নেই।

মদন পোড়া বাড়ি দুটো টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। বিদ্যাধরীর হাসি হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঠের উনুনের আগুনে চোখদুটো জ্বলো ভরা। মুখখানা লাল আভা। আরও একরকম কাঁসার থালার মত। মদন তাকিয়ে থাকে। দেখতে দেখতে ওর মনের ভাবনা-চিন্তার ওঠাপড়া যেন স্থির হয়ে আসে।

আস্তে বলে মদন,—একখান কথা জিগাম?

বিদ্যাধরী তাকায়।

—তোমার মনে কোন দৃশ-বস্ত্র নাই?

ফিক কবে হাসে বিদ্যাধরী। সেই হাসি। আকাশের চন্দ্রর মত হাসি।



গৌর মোহন দাস প্রু কোং.
২০৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

পাকা ধানের শীষেব দোলানী হাসি। পাঁচ ঘন্টার মাইয়ার টাণ্ডা গালের হাসি।

উত্তর দিতে হয় না। বিদ্যাধরীর হাসিই জ্ঞান দেয়। দৃষ্টি-কণ্ট তাব মনের দ্বিসীমানায় নেই। দৃষ্টি-কণ্ট কাকে বলে জানে না বিদ্যাধরী। ওর ভাবগতিক মদন ঠিক ঠিক ধরতে পারে না।

কি পায় বিদ্যাধরী? কি আছে ওর? কিছুই তো নেই। চাল-চলো নেই। ধান-কুলো নেই। জমিজমার নেই। সব না পাওয়ার কোন দৃষ্টি নেই। কিছুই নেই। তাই কি দৃষ্টি নেই।

বিদ্যাধরী মটর সেন্স নামাল।—তোমারই বা কণ্টা কিরের?

—কি কণ্টা? আমি কি আছিলাম। কি অইছি। কণ্টাব্যাপ্য কণ্ট আছিলাম। পাঁচশান গাওয়ার মানদ্র চিনবার পারত। আমার এটা মান অছিল। কি হইয়া গেছি আমি!

বিদ্যাধরী খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসন আর থামে না। এ য্যান একখান

হাসনের কথা। তামাসার কথা। হায়রে কপাল। খোলস লইয়া মইল। ভিতরের মানদ্র চিনল না।

এত অকারণ হাসি ভাল লাগে না মদনের। এই খেপীর পাগলামী! কিছুর ভেতর কিছুর নষ। বেদম হাসতে শব্দ করেছে। হাসনের কি হল ভাল করে বোঝে না মদন।

হাসতে হাসতে বলে বিদ্যাধরী।—তোমার বড় অংখাব আছিল।

অহংকার! হ্যাঁ, একে অহংকার বলা যায়। এ অহংকার কি ষ্যামন-ভ্যামন। কত মান-সম্মানের!

—সাইয়ের দমায় অংখার ধূলোয় মিশ্যা গ্যাছে। এযাতে দৃষ্টির কি?

মদন অবাক হয়ে তাকায়। কথার ভাবগতিক বোঝে। এই জনোই খেপীর সঙ্গে বনে না ওর। তার অহংকার ধূলোয় মিশে গ্যাছে। কথাটা কি ভাল বলা হল।

—সাইয়ের ইচ্ছা অইলে আবাস হইব।

—হ, এ কথাখান বেশ। সাইয়ের দয়া হলে আবার সব হবে। আবার তার দল হবে। আবার তার মান সম্মান হবে। পাঁচ গাঁওয়ের মানদ্র একডাকে চিনবে। সে হবে দলের অধিকারী!

মনছুরের টাকা দেবার কথা কাল। আগাম টাকা দেবে।

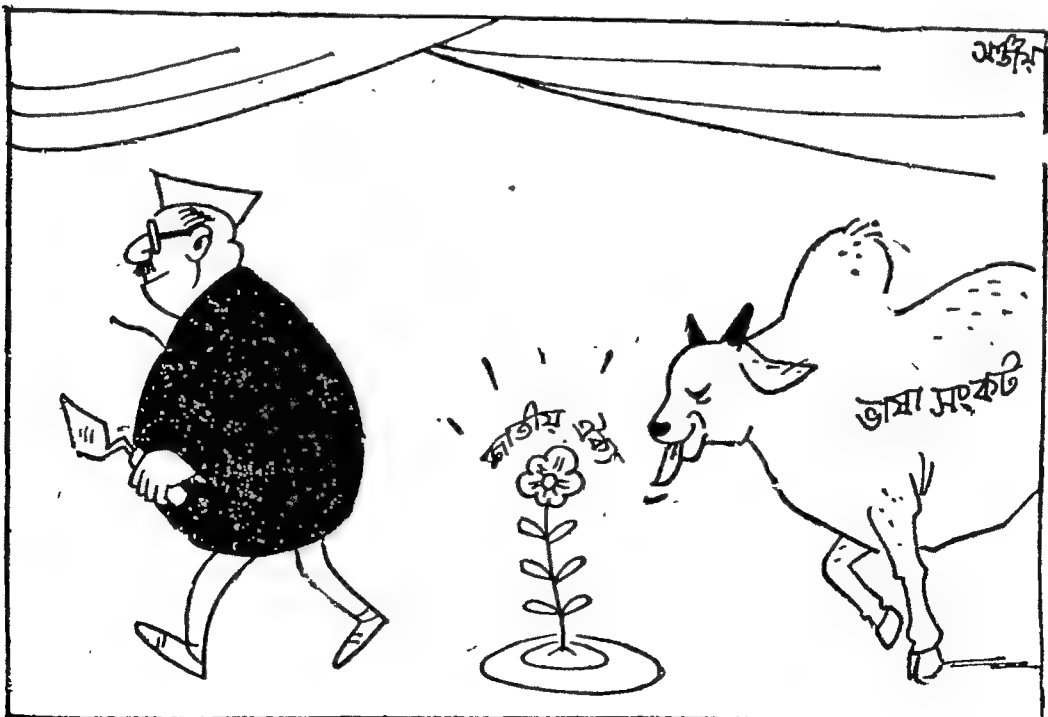
মনে পড়ল মদনের।

কলাকান্দ্র ব্যাপারীর কাছে নিয়ে যেতে হবে খেপীকে। এবারে হাতে হাতে টাকা। তাবপর দলের ডেছ, বাকস্। গাওনাদার ছ্যামডা জোগাড় করা। মাস দুয়েক দিন-বাত খেটে একখান জবব পালা তৈরি করে ফেলতে হবে। পুজোর সপ্তমীতে প্রথমবার পালাগান শব্দ হবে। প্রথম গান গাইবে বিনে পয়সায় এখানকার বাবুদের বাড়িতে।

স্বপ্ন দেখে মদন। বিদ্যাধরী খাবাস জোগাড় করে।

[ক্রমশঃ]

বনমহোৎসব (?)



কবিতার সঙ্গে যে আমার কি সূত্রে
আজাপ, হয়েছিল তা ঠিক স্মৃতির আলো-
অধারে পথ হাতড়ে আর ঝুঞ্জে বার
করতে পারব না।

তবে একই সময় আমরা ইউনি-
ভাসিটিতে পড়তাম। ও এক ক্লাস, নিচে
সংস্কৃত নিয়ে, পড়ত আর আমার ছিল
ইকনমিক্স। নেহাৎই মধুচেনা, কোনদিন
হয়তো লিফটে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি
নয়তো বা কমনরুমে একসঙ্গে বসেছি তবে
পরিচয় হয়ে ঘনিষ্ঠতা কোনদিনই দানা
বাঁধতে পারে নি।

আশ্চর্য লাগে, ভাবতে যে, বহুদিন
বাসে যে বয়সে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, মনের
ছোট বখন কৈবল্যই ঘরপাক খেয়ে পাকাতে
থাকে সেই বয়সে আবার দৃষ্টি, মূখো-
মুখি হলাম।

শরতের, আশ্চর্য নীল, আকাশের
প্রসন্নতার মত কবিতা এল, আমার সমস্ত
মিথ্যা-স্কাচকে দূরে সরিয়ে।

আমি বোকা মধুচোর। মানদুঃ। কলকল
ছলছল করে কথার অন্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে
ধাওয়ার বয়সেও মধু রা-টি ফোটে নি,
পাড়ার পিসী মাসীরা বলতেন—কি নিরীহ
শান্ত মেয়ে দেখ দিকি? এত লেখাপড়া
শিখেছে কে বলবে?

তখন তখন কথাটার ভায়ে মধু হয়েছি
পবেই বুঝেছি নিরীহ ঐ বিশেষণটা-ই
আমার, কাল হয়েছে, সাজিয়ে-গুছিয়ে
শব্দেব, পর শব্দের মালা গেথে, কথা সৃষ্টি
করাটা-ও ত্রো আর্ট। আমার বদলিতে
শুধুই রিভুতা, কি নিয়েই বা মানুষের
মুখ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবে?

নিজের এই সীমাবদ্ধতা, সঙ্কেও
লোকেব সঙ্গে মিশতে হয়েছে। পড়াশুনোর
পাট সাঙ্গ করে কাজ করছি এক মাকে-
স্টাইল ফ্রামে আমারই মত শত শত মেয়ে-
পুরুষেরানীর পাশে বসে।

প্রথম প্রথম বুক ধড়ফড় করত, ক্রবল
বসে বসে ঘামতুম, সবাই বুঝি আমার সব
ভুলচুক ধরে ফেলবে। ক্রমশ, সরল হয়ে
গেছে। আমিও মানিয়ে নিয়েছি এই জীবন-
ধারার সঙ্গে। এমন কি আশেপাশের টেবিলে
কারণ ফাইল জমে উঠলে নিজের অবসর মত
তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি, সেটা
যে ওপরে ওঠবার তালে তা মনে করলে
আমাকে ভুল বোঝা হবে। আপিসে আমার
রেকর্ড ভাল। ওপবওয়ালারা জানেন, যে
অসীমা মৌলিক কাজে ফাঁকি দেবার মেয়ে
নয়। সহকর্মীরা বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা করে।
তাদের সংসারের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভি-
যোগ কিছুই আমার অজানা নয়। তবে
একটা কথা বলি—আজই না হয় রপোলি
চুল দু-একটা অসুতক হয়ে আমার
কপালের এধার-ওধার আত্মপ্রকাশ করতে
পারে কিন্তু এমন তো চিরদিন ছিল না।
চাকরিতে যখন প্রথম ঢুকি তখন আমার
বয়স আর কতই বা হবে। তবু মিস



মানুষ
সহনে

ছবি

মৌলিককে সবাই দিদি বা মাসীর আসনে
বসাল। কারণ প্রেমসী হবার যোগ্যতা
হারালুম কেন তা আজও ঠিক উপলব্ধি
করতে পারি না।

কবিতাকে শুধু মনের কথা বলতে
পারি। ও বলে কলেজে পড়বাব সময়
আমার চেহারায় নাকি বেশ একটা চটক

ছিল। মিথ্যে কথা। এ তো মনরাখা কথা।
তবে কুৎসিত ছিলাম না সেটা বলতে
পারি।

ও বলে—চেহারায় কিছু হয় না। এই
তো অমূল্য মেয়ের জন্যে কে যেন সম্যাসী
হয়ে গেল। কি বিদ্রী দেখতে সে মেয়ে।
আসল কথা কি জান পুরুষের চোখ।
খালি—পুরুষের চোখে যেটুকু চোখে

শুধু আর আমার মত পশ্চফুল নজর এড়াল এই তো?

কবিতা কবিত্ব করে বলে—ভোরের শিউলি, সে শুধু বহুজনের অর্ধা লাভ করে, দেবতার অঞ্জলিদানে সে তৃপ্ত।

—যদি বলি এই দশ বছর চাকরি করে শুধু অর্ধা পেয়ে সে সুখী নয়। কবিতাকে রাগাবার জন্যেই বোধ হয় একটু প্রগল্ভ হয়ে উঠি।

কবিতা বলে—নিজেকে ছোট্ট কোর না অসীমাদি, তোমার হৃদয়ের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করবার মত.....

—এখনও পুরুষ জন্মায় নি! ওর হৃদয়ের কথা কেড়ে নিয়েই বলি।

—ঠিক তাই। খিল খিল করে হেসে ওঠে কবিতা।

কবিতার সঙ্গে বন্ধুহুতা জমেছে একই ছোট্টেলে দু'জনে এক ঘরে রুমমেট হয়ে থাকার ফলে।

এতকাল শুধু ধৈর্যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করে আপিস করেছে কিন্তু আর যেন পৌঁছাচ্ছিল না। মা মারা গেছেন যত্নকাল আগে। বাবা মারা যাবার পর পরিবারের সঙ্গে বোম্বাইয়েটা কেমন করে যেন ছিন্ন হয়ে গেল। এতদিন তবু বাবা-ই একমাত্র বন্ধন ছিলেন।

চাকরি করতাম তাতে বাবারই আগ্রহ ছিল। বিরাগ ছিল না।

বাবার কাছে শিখিছিলাম—কাজের প্রতি নিষ্ঠা, কোথাও যেন ফাঁকি না দিই, পরের চাকরি করতে গেলে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ সততা হতে স্রষ্ট হওয়া।

পরকে ফাঁকি দিই নি, নিজেকে দিয়েছি কিনা কে জানে। কিন্তু বাবা আমার নিষ্ঠায় হুঁশ ছিলেন। দশ বছর চাকরি জীবনে আমি একদিনও কামাই করি নি কিংবা ছুটি নিই নি।

বাবারও আমাকে নিয়ে গর্ব ছিল। আমি ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মত নই। বাবার বড় ছেলের মত তাঁর পাশে ধাঁড়িয়েছি। ছোট ভাই-বোনেরদের মানুষ করেছে, পর পর দুটি বোনের বিয়ে আমি-ই দিয়েছি। বাবা বেশ তৃপ্তি নিয়েই তারপর মারা গেলেন।

তৃপ্তি আমারও কম হয় নি। আত্ম-পানের নেশা আমার কেমন পেয়ে বসেছিল। সমস্ত সংসারটাই কি যেন 'বাদ'—র কাঠির পেশ ছিল।

নেশাটা উবে গেল বাবা মারা যাবার পর।

তারপরেই খোঁজ-খবর নিয়ে দক্ষিণ ফলকাতায় মেয়েদের থাকবার এই পরি-কল্প হোস্টেলটায় এসে উঠেছি।

কবিতা যাব চেষ্টার একটা স্কুলে প্রসারিত করতে। ছিপ্রাছিপে গড়ন আর লম্বা গলায় একটু কেমন কুঁচো হয়ে

চলে। একটু চ্যাপটা পুরুষালি চেহারায় কোথায় যেন একটা আলগা স্ত্রী ওকে জড়িয়ে রয়েছে। বলি—যাও তো মেয়ে ঠেঙাতে অতো সাজের ঘটা কেন?

নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বিস্মিত হবার ভান করে ও বলে—ও-মা এই বুঝি সাজ। তা' আমি তোমার মত বিধবা সাজতে পারব না। সাথে কি আব কেউ ধারে-কাছে মাড়ায় না!

—না মাড়াক। আমি কারও করমাসী কবিতা নই। অন্যের চোখের দিকে চেয়ে নিজেকে সাজাতে হবে.....

বাধা দিয়ে কবিতা বলে—তোমার মরণ। জন্মেই বুঝি জরা দেবতার পুজো করবেছিলে?

হাসতে হাসতে কি একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে কবিতা চলে যায়।

মেয়েটার যেন সবকিছতেই রহস্য। একেবারে বিপবীত চরিত্র তাই ওকে যতই আঘাত করি ততই যেন ওকে ভালবাসি। কাজ ও ভালবাসে। কত নিষ্ঠা ও ভাল-বাসা নিয়ে ও ছাত্রীদের খাতা-দেখে, ভুল সংশোধন করে। আমার বাবা ঠিক এমনি নিয়মানুবর্তিতার ভক্ত ছিলেন।

তবু সব নিয়ম বাতিল করে কবিতার মন যে কোথায় বাধা রয়েছে তা আমার অজানা নয়। শীতকালের গঙ্গার মত নিরুদ্ভিশ ওর মন, কোন শব্দ-ভাবনায় যেন দুলছে না।

মন কোথাও বাধা পড়লে কি এত উষ্মগহীন মানুষ হতে পারে? প্রশ্নটা করেই ফেলি, শুনে সে বলে—

অনিশ্চয়তাই তো আমাদের জীবনের অঙ্গ অসীমাদি। নিজের অঙ্গ নিয়ে কি আর কেউ সচেতন হয়? চাকরিটা আজ আছে, কাল হয়ত আর থাকবে না, ভিন-জনের ওপব নোটিশ অর্ডার রয়েছে। যেদিন একেবারে ছাঁটাই হবে সেদিন অরুণাচলের হাত ধরে তার ঘরে ঢুকব। তুমিও নিশ্চুত পাবে।

—ছাঁটাই হবার আগেই আমার নিশ্চুতি দাও না।

কবিতা একটু বা অস্বস্তি হয়—পরক্ষণেই বেশ সপ্রতিভ হয়ে আবৃত্তি করে—

“সমস্ত যেদিন আসিবে,
তখনই যাইব তোমার কুঞ্জে।”

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—সীতা অসীমাদি ভেবে দেখ না, ভাল না বাস-লেও ভাল লেগেও তো থাকতে পারে তোমার কোনদিন কাউকে।

হাতড়ে হাতড়ে স্মৃতি রোমন্থন করি—
—ভাল লেগেছিল বৈ কি অনেক কিছুকে। আমার ছেলেবেলার সেই বাড়ির লাগোয়া আমবাগান; পুরুষঘাট আর

শিউলিডল। মনে পড়ছে আরও পশ্চিমে, শরৎকালের পাশ দিয়ে আল ধরে কালী-মন্দির তলায় যেতে পড়ত মিঠা বৌদির দোতলা বাড়ি।

—শুধুই মাঠ-ঘাট? মানুষ নয়?

কবিতার অসহিষ্ণু গলায় বিরক্ত হই। নিজের মনে মনে আত্ননাদ করে উঠি—হ্যাঁ হ্যাঁ কে যেন? অনেক দিন অনেক রাতে তার কথা আমার মনে হয়েছে, ভেবে শুধু পেয়েছি, সে হচ্ছে মিঠা বৌদির রাঙাদা। এসেছিল ছুটিতে বোনের কাছে। কবিতা ঘন হয়ে বসে—বল না লক্ষ্মীটি রাঙাদার কথা।

—কি বলব? স্মৃতি আর স্বপ্নে মেশা-মেশি হয়ে গেছে যে। অঘাণের নবামের গন্ধেভরা আকাশ-বাতাস। মিঠা বৌদির ঘরে রাঙাদাকে দেখলাম যেন হিমালি শিখরে কাঁটা সোনার মত।

মিঠা বৌদি বলে—রাঙাদা এই দেখ অসীমা। এখানকার স্কুলের সেরা মেয়ে। আর দেখ দিক কি শান্ত-স্নিগ্ধ মুখ। আগার চিবুক যেন আলতো করে তুলে ধরেন মিঠা বৌদি। লজ্জার আড়ম্বল হয়ে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

—বাপস দম্ভুরমত রোমান্টিক। ভাল লাগাটা তারপর কোন পরিণতির দিকে এগেল?

—এগোতে পারল আর কই। পর পর তিন-চার বার রাঙাদা এসেছিলেন। প্রত্যেকবারই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মিঠা বৌদির কাছে শুনছি রাঙাদা নাকি স্কলারশিপ নিয়ে পড়ছেন আবার কাগজেও ওর লেখা বার হয়.....

—একটি নিটোল প্রেমের গল্প। কবিতা বাধা দেয়।

—দূর বোকা! প্রেম আর জন্মল কোথায়? দুম করে হঠাৎ মিঠা বৌদির স্বামী কি এক দূরদেশে বদলি হয়ে গেলেন।

—স্ট্রাজেভি। কবিতা হতাশভাবে বলে। কবিতাকে রাগাবার জন্য বলি—স্ট্রাজেভি হয় তখনই যখন বেদনা রাখবার ঠাই মেলে না। আজ কিন্তু রাঙাদা আমার কাছে প্রাণোত্তীর্ণ।

—কি রকম?

—ভাবতে গেলে মনে হয় একদিনের সেই ভাললাগার মানুষটি একটি স্মৃতি-দর গোলাগাল গেরস্থ মানুষ। মাঝার বেশ খানিকটা জুড়ে চকচকে টাক পড়েছে। সকালবেলা নাকে-মুখে গুঁজে আপিস ছোটেন নয়ত কলেজে মাস্টারী করতে যান।

গিন্নীর জন্য বরাদ্দ একগোছ পান কোনদিন আনতে ভুলে গেলেই খিটিখিটি বেধে স্মৃতি রসাতল।

কবিতা বলে—অসীমাদি লিখে ফেল না

ইতিহাস থেকে

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্ত হলে

দুর্ভোগা ভট্টাচার্য

দুর্যশ্চর্য এই এক দেশ : শ্যামল এখানে বিবর্ণ দেহ।
নদীতটে নেই জোয়ারের ঢেউ, নৌকা গরুরে, চরে কাঁটাবন,
রুদ্ধ ধূসর মাঠ মরুভূমি তেপান্তরের সীমান্তেও দেখি,
দ্রিষ্যমা তামসী আভংক শূন্য, কবর শ্মশান ছড়ানো রয়েছে।

ট্রেন বাতায়নে পরিচয় : দেশ, কামা করুণে রূপকথা বলে—
ভাঙা ইমারত জীর্ণ দেউল ঘন অরণ্যে শ্বেত শিলালিপি
নিগূঢ় সাক্ষী, সাপের কুটিল বিবাক্ত শ্বাস ধ্বনিত এখনো,
ধানক্ষেতে নেই মৃত আমবন মাটির রক্ত কঠিন পাথর।
প্রতারণা করে গড়ে উঠেছিল নতুন রাজ্য এ দেশকে ঘিরে,
গুমটে ক্ষুধা আজো সেই ব্যর্থ পাক দিবে আছে সমাজজীবনো
কলকাতা-ম্ন হাঁপায় এখানে, কোলাহলে সেই বন্দর কই?

এ এক আলোয়া ছুটে চলি দূরে কোথায় সবুজ স্নিগ্ধ প্রদেশে,
পূর্বনো কাহিনী বদলে গিয়েছে, নতুন সৃষ্টি প্রগতি চলছে
পৃথিবী নবীন, কোথায় তবুও সন্ধ্যা নতুন রঙ সমাবেশ?
ঐতিহাসিক কলমের কালি ভুলবে না ভব, ইতিহাস তাই
সবারে শোনায়, যদি এইখানে কেউ এনে দেয় শীর্ষ সবুজ!

সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্ত হয়ে গেলে
পৃথিবীর সেই রঙ সত্য হয় শূন্য,
আমি সেই রূপ রঙ ধ্যানের বিশ্বাসে
এনে রাখি। সেই রঙ চেতনার কূল
থেকে দূরে সরে যায়। আচ্ছন্ন আনন্দ
এক আমি শূন্য করি অনুভব।

সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ—সীমার অতীত
সেই রঙ অন্ধকার। আদিম পৃথিবী
জন্মের প্রথম শব্দ, শোনে সে আভাস
প্রথম রূপের পায় পরিচয় যেন।
চারিদিকে এত রঙ এত উজ্জ্বলতা
কোলাহল-গম্ভীর-স্পর্শ ঘনিষ্ঠ সন্তারা
মনে হয় সব মিথ্যা। সব শূন্য হবে।
এত আলো এত রঙ দৃষ্টি অন্ধ করে
শ্রবণ-বিশ্বের সব আত্ম কোলাহলে
সব গম্ভীর হয়ে যায় অসংখ্য বস্তুতে
সব স্পর্শ নিরুদ্ভাপ, স্থবির অনড়।

এখন একান্ত সত্য সেই অন্ধকার
রূপ-রঙ-শব্দ-গম্ভীর-স্পর্শের অতীত
জন্মমূহুর্তের যেন প্রাগুয়া সে কাল
আমি তার কথা ভাবি উৎসুক আগ্রহে।

একটি নিটোল প্রেমের গম্প। আপিসের
সেই একঘেরে নীল ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে
জীবনটা তো নেহাৎই গদ্য করে ফেলে-
ছিল। ভাগ্যিস আমি এসে তোমার হাড়-
মাসে তবু একটু বসন্তের দখিন হাওয়ার
ছোঁয়া লাগলুম।

—তুমি না বাঙালী।

দুঃখনেই সরবে হেসে উঠি।

বেশ চলছিল এভাবে জীবন। আচম্ভক
মুহুর্তেই তোমার ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে
জীবনটা তো নেহাৎই গদ্য করে ফেলে-
ছিল। ভাগ্যিস আমি এসে তোমার হাড়-
মাসে তবু একটু বসন্তের দখিন হাওয়ার
ছোঁয়া লাগলুম।

সমবেদনা জানাব কাকে? মেয়েটার
মুখে তেমনি তার স্বভাবসিদ্ধ হাসির
উজ্জ্বল। বলে—মুখ গোমড়া কবে আছে
কেন? সামনের মাচা থেকে জুটে গেছে
মানসোবী নেতাজী কলোনীর এক স্কুলে।
শুধু আমি নয়, আমবা তিনজন।

—এখনও তিন মাস দেরি। গম্ভীর-
ভাবে বলি।

—এই তিন মাস জোর সংসার করব।
উজ্জ্বলিত হাসিতে কবিতা ভেঙে পড়ে।

—ভবে দেখলাম অরুণাচলের কাঁধে
এই বেলা কুলে পড়ব। আর দেরি করলে—
—হারেমে প্রবেশ করা আর হবে না।

প্রচণ্ড জ্বালা নিয়ে বলে ফেলি। কিন্তু
কবিতা একটুও ক্ষুণ্ণ হল না। আশ্চর্য
নবম গলার ওর ভাসা-ভাসা চোখভরা
আবেদন নিয়ে আমাকে বলে—গেট পাস
নিলে তুমিও সরাসরি চলে এস না
অসীমাদি। কে জানে হয়ত বা হারান
জগৎটা দেখা মিলবে।

মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠি। একটা
প্রচণ্ড আঘাতে গুমরে মরি। দুঃখিন
আপিস কামাই করলাম, জানি না বাবা
বেঁচে থাকলে কি বলতেন।

কবিতা চলে গেল জিনিসপত্র গাছিরে
নিরে। মনে মনে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত
করি। কবিতা বিয়ে করবে, সুখী হবে।
তবে আমার মনে অনুযোগ কেন? ও তো
কোন অন্যায় করে নি। এ তো আমি জান-
তাম। তবে কেন-ই বা আশাভঙ্গের
বেদনা? আমি কি আমার মত ওকে
বঞ্চিত দেখতে চেয়েছিলাম?

নিজের অপরাধ বুঝলেও কোথায় যেন
কাঁটা বিঁধেছিল। কবিতা যেন হঠাৎ আমাকে
ফেলে চলে গেল। আমার সঙ্গীহীন
অবরুদ্ধ জীবনে কয়েকটি আবর্ত সৃষ্টি
করেই ও কোথায় ভেসে গেল।

অভিমান করে সত্যি ওর বিয়েতে
গেলাম না। কোন চিঠিরই ওর জবাব
দিলাম না। বাবার উপদেশ মনে পড়ল—

নিয়ম, নিষ্ঠা, কর্তব্য। আরও আগ্রহ ও
পরিশ্রম করে কাজ করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত অভিমান বজায় রাখতে
পারলাম না। ভাবলাম সত্যি দেখে আসি
হারেমের রাণীকে। ম্যাবপালের পবোয়া
কবি না। দবজার কড়া নাড়তে কবিতা
নিজেই দবজা খুলে দিল। কিন্তু কী যে
বোকা মেয়েটা। আনন্দে লোকে হাসেই
জানি। অমন বেপবোয়া মেয়ে আমায়
জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে। শান্ত হয়ে
বলে—

—সত্যি অসীমাদি, পারলে তুমি রাগ
করে থাকতে?

—কেনই বা পারব না?

—বেশ, তবে পবিচয় হোক অরুণা-
চলের সঙ্গে। দেখি সে কী বলে?

—কে হারেমের একচ্ছত্র নামক?

—না গো না ম্যাবপাল। তাকে জিজ্ঞাসে
এসেছে? কম সাহস নব তো তোমার?

অরুণাচল এসে দুঃহাত কপালে ঠোঁট
নমস্কাব করলে।

অতীর্কিতে আমার মুখে একটা ডাক
চাপা দিতে আত্ননাদের মত ঠেকে।

পূরণ করে কবিতা বলে—রাঙাদা।

—হ্যাঁ তাই, কিন্তু কেমন করে জানলে?

—আমি জানতাম।

কবিতা তেমনি উজ্জ্বলিত হেসে আমার
হাত ধরে।

ইচ্ছা মেলা

সন্ধ্যার পাখি—হরেন ঘোষ।

এডারেন্ট বুক হাউস, কলকাতা-১৫।
মাক্‌ট। কলিকাতা-বারো। মূল্যঃ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলাদেশের মেয়েরা শব্দ সন্তানের জন্ম দিতে জানে। তারা ভীরা, তারা দুর্বল—অবলা। বাংলাদেশের মেয়েদের এই বদনাম বোচাতে চায় বাণ্যাপাণি দেবীর বড়মেয়ে মায়ী সরকার। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অফিসের চাকরি করে চলেছে মায়ী। বিকেলে বাড়ি ফিরে আবার একটা টুই-সানি করতে হয়। মায়ী প্রাপ্তবয়স্ক করে যা এবং ছোট দুইটি বোন মীনা আর রীনার জন্য। অফিসে পাশের টেবিলের সদালাপী, পবোপকারী যুবক-পুরুষ অশোক মায়ীকে অফিসের কাজ শিখিয়েছে। কিন্তু তবুও অশোকের অসংযত কথাবার্তা মায়ী সহ্য করে না—বেশ দূরটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয় অশোককে। মায়ীর বাস্তবিক গম্ভীর অফিসের সবাই ওকে সম্মান করে চলে। কিন্তু অফিস-সুপার ভূতনাথবাবুর কাছে অশোকের জীবনকথা শোনার পর থেকে মায়ী মনটা বেন কেন হতে থাকে। অশোকও মায়ীর মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হয়। এরপর অশোক এবং মায়ীর সম্পর্ক জমে ওঠার প্রতি ধাপে মায়ীর মনের ভাঙা-গড়া লেখক সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। মায়ীর মনের স্বপ্নের আঘাতে পাঠকের মনও দুলতে দুলতে উপন্যাসের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। একদিকে মায়ীর কামনা-বাসনা অপরিণতের মা-বোনদের ভবিষ্যৎ—এই দুইয়ের টানা-পোড়নে শেষ পর্যন্ত মায়ী তার মা-বোনদের ভবিষ্যৎকেই উজ্জ্বল করবার রত গ্রহণ করেছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। উপন্যাসের শিল্পসম্মত পরিণতিতে পাঠক-মনে মৌলো লাগে। মায়ীর ত্যাগ ও মহত্ব মায়ী পাঠকের কাছে নতুনভাবে পরিচিত হয়। বাংলা উপন্যাসের হাজার চরিত্র-পরিচিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—‘ছায়ার-পাখি’র মায়ীর পরিচয়। মায়ীর মনের গভীরে ডুব দিয়ে লেখক মায়ীর অন্তর্দ্বন্দ্বের শিল্প-সৌন্দর্যের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা স্মরণীয়। বিচিত্র মানবচরিত্রের জটিল চিত্র অক্ষণেও লেখকের কুশলতা প্রমাণিত। ব্যক্তি-

চারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রবীর সেন, কপটতার পরিচয় মণিমালা চরিত্রে, বাঙালী ঘরের সর্বসহা নারী মৃতিমুর প্রতীক বাণ্যাপাণি দেবীর চরিত্রটি। এছাড়া সরল-সহজ কমালাল অফিস-সুপার ভূতনাথবাবু, প্রেমের ব্যর্থতার মানসিক বিকারগ্রস্ত চরিত্র অমিতাভ। লেখকের অভিনব রচনা-রীতির গুরুত্ব, নিখুঁত চরিত্র বিশ্লেষণে, বিস্ময়কর রসসৃষ্টির মৌলিকতার এবং নব আঙ্গিকে কাহিনী পরিচালনার সার্থকতার ‘ছায়ার-পাখি’ বাংলা উপন্যাস পাঠকের মনে স্থায়ী রেখা-পাত করবে।

রূপের নেশা—অরুণা সেন।

পরিচয় পাবলিশার্স। ৩১, নফর কোলে ব্রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্যঃ দুই টাকা।

রূপপ্রেম-প্রধান গল্পগ্রন্থ। মোট একাদশটি গল্প স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। প্রথম গল্প ‘রূপের নেশা’র লেখিকা এক-রাশ চরিত্র এবং বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ করে কাহিনীকে জটিল করে তুলেছেন। ‘রূপের নেশা’, ‘রাণী জয়ন্তীর ঘাট’, ‘মন দেউল’, ‘নতকী’ নিম্নতর পরিহাস, এবং ‘বিপরীত’ প্রভৃতি গল্পগুলোর প্রধান বক্তব্য রূপপ্রেম। বাকি গল্প-গুলোর মধ্যে ‘অপরিণামদর্শী’তে লেখিকা অসংলোকে অসং কন্ঠের ফলাভোগের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ‘হীরের ছটায়’ ধনী এবং তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুখোশ খুলে তাঁদের আসল রূপ প্রকাশ করেছেন সেই সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের সরল মনের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষ গল্প ‘মিঃ ও কে রয়’, ‘অপ্রত্যাশিত’, এবং ‘জ্যোৎস্না’ এর তেমন কোন বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বক্তব্য না থাকলেও রচনারীতির গুরুত্ব কিংবা রসসৃষ্টির গুরুত্ব যদি না মন সন্তুষ্ট হয় তবে কিসের আশায় পাঠক শেষ গল্প পর্যন্ত ধৈর্য রক্ষা করবেন? ‘নতকী’ গল্পে স্পেনের বিখ্যাত নতকী ইসাবেলার জীবনকাহিনীর বেদনাধন পরিণতি রূপায়িত হয়েছে। ‘বিপরীত’ মোটামুটি মন্দ হয় নি—বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার রজত চ্যাটার্জী সরল-সহজ

পঞ্জীয়মানদের সহৃদয়তার মূগ্ধ হর অপরিণতের পঞ্জীমালা মলিনা বিয়ের পর পঞ্জীর-প্রতি, পঞ্জীর মানুষদের প্রতি বিতুষ হয়ে পড়েন। আশা করি, পরবর্তী-কালে মনস্তাত্ত্বিকতার দিকে আরো বেশি জোরে দেবেন।

সাধক কবি কমলাকান্ত—সুবোধ মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ, বর্ধমান, শ্রীদেউল কোঠার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্যঃ অষ্টাড়াই টাকা।

কবিরা কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁদের কাব্যজীবন কম নাটকীয় নয়। আবার কবির জীবনী জানলে, কবির কবিতা বুঝতে সুবিধা হয়। নাট্যকার সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অবশ্য, সে পথে পা বাড়ান নি। সাধক কবিদের সম্বন্ধে নতুন কথা বলার জন্যে সাহসের দরকার হয়। নাট্য-কার তাঁর নাটকটিতে, ঘাত-প্রতিঘাত ও স্থানে স্থানে কৌতুহলের সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন, ভক্ত-প্রাণ কমলাকান্ত সাধারণ মানুষেরই অন্যতম। জীবনে হিংসা-শেষে তিনিও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, রাজ-পরিবারবর্গের অমৃতস্বপ্নের আঘাতে তিনিও নিষাতিত। এবং সবার উদ্দেশ্য বড় কথা এই ‘নাচগো শ্যামা! আমার অমৃতের’ কমলাকান্তের এই আকৃতি বর্ণন। কিন্তু, মানুষ কমলাকান্তের এই প্রার্থনাও মিথ্যা নয়: ‘কমলাকান্তের এই কামনা করুন-ময়ী/এ তনু সফল কর মা। দৃষ্ট যটুকু দুরে!’

আসলে, শঙ্করদাবজীতে কবিদের গানে রাজ্যীয়, সমাজ ও তদানীন্তন জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই কবিরাও তাই ভীষণ সংশয়ী। তাছাড়া, তখনকার প্রধান সমস্যা—আধুনিক ও প্রাচীন—এই দুই যুগের টানা-হপাড়ে এই সব কবিদের প্রাণ ছটফট করেছে। নাট্যকার সুবোধ মুখোপাধ্যায় তাঁর নাটকে এ সব বিষয় আনেন নি। হয়তো তাহলে নাটক জন্মতো না। সেকলেব পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তদানীন্তন চরিত্রগুলিকে তিনি স্বচ্ছন্দভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সব কারণে উপরোক্ত নাটকটি ভক্তচিহ্নে আনন্দের দোলা দেবে।

রাজা—শ্রীশিবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রকালী মঞ্চ হইতে প্রকাশিত। দামঃ ০০-৬২ পয়সা।

রাজা নাটকটি দ্বিতীয়শ্রেণীর হলেও, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এখানে নাটকের কয়েকটি অভাব্যবসিক উপাদান দেখা যায়। দৃঢ় চরিত্র, সংকল্পে কঠোর নয় ও নারী এবং তাঁদের আদর্শের পার্থক্য নিয়ে সম্বাদ। নাটকের পটভূমিকায় আছে সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসন প্রণালী, রাজার

যেচ্ছাচার ও প্রজার মধ্যে নিম্ন উপেক্ষা।
মগধের রাজা সিংহবাহু ও মহিষী অলকানন্দার আদর্শ ভিন্ন কোটিতে অবস্থিত। এই বৈপরীত্য নাটকের প্রাণ হতে পারত। কিন্তু তা কেবল বহিঃগম্য লোক সংসাজনার পর্য্যবসিত হয়েছে, নাটকীয় তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। মলয়রাজ চরিত্র মাটিকার বোধ ধর্মের প্রতি অবিচলিত নির্ভর চিত্র এঁকেছেন। সিংহবাহুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে মলয়রাজ অস্বীকৃত। কারণ যুদ্ধ তার কাছে হত্যা ভিন্ন আর কিছু নয়। শেষ পর্য্যন্ত অজের সিংহবাহু বোধ ধর্মের প্রতি এতদিন আসক্তহীন ছিলেন তিনি এখন বোধ ধর্মের কাছে প্রাণ নত করলেন। রাণী অলকানন্দার বোধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও অনুপ্রাণিত হতেই ছিল। কিন্তু তার অভিব্যক্তি নাটকীয় সংঘাতের মাধ্যমে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু দেশের স্বরাজ্য লক্ষ্যপাণি ও মগধ-রাজকুমারী মেঘমালার প্রণয়কাহিনী মাটিকাকে গতিদান করেছে এবং এটা নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সংসারকে উপেক্ষা করে ধর্মসাধনা করা নির্বাক। তাই ভগবান বৃষ্ণের নির্দিষ্ট স্থানে পূজার চেয়ে যখন ঘরে ঘরে তার আরাতির মঙ্গলশব্দ বাজবে তখন দেবতা সকলের হবেন আপনার, আরও নিকটতর, আরও প্রিয়। নাটকের যে সমস্ত গান দেওয়া হয়েছে তাদের মাধুর্য ও তাৎপর্য অপূরণ্য।

ও গীতা মহারসী: শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বপ্রবণ অভ্যুত্থান (শ্রীশ্রীমহারাজ)। ও, ইন্দ্রবর দত্ত লেন, হাওড়া। দাম: তিন টাকা।

অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার বাংলা ভাষার পদ্যানুবাদ। সংস্কৃত ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষা যে আরো কঠিন অনুবাদের দ্বারা লেখক প্রায় প্রতিটি শ্লোকে তার প্রমাণ রেখেছেন। যেমন:

“সৌখ্য পাণ্ডব-আনন্দীক বৃদ্ধ দুর্বোধন তদা।

আচার্য উপসংগমি রাজা বচন বলিল॥”

উৎসুক পাঠকরা অভিধানের সাহায্যে মগধবাদকৃত শ্লোকের মর্ম উদ্ধার করতে অবশ্যই পারবেন।

পুলিশ—কিত্তীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিভূতি প্রকাশন, ২২ এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পুলিশ-জীবনের কয়েকটি বিচিত্র দৃষ্টান্তের সার্থক রূপায়ণ। পুলিশের

স্থিতিপটে জেগে থাকা কতগুলো নিষিদ্ধ মানুষের কয়েকটি মূহুর্ত সৌন্দর্যময় হয়ে উঠেছে লেখকের সজাগ লিঙ্গ-দৃষ্টির গুণে। দঃখের অভিজ্ঞতার পাঠকের চেতনাকে আলোড়িত করবে তিনটি বিয়োগান্তক কাহিনীর করণ পরিণতি। মরিয়মের প্রেমের নৈসর্গিক নিষ্ঠা, অধ্যাপক শোভান আলির বেদনা-ময় কাহিনী এবং কয়েদী প্রশান্তের অপূর্ব প্রীতি পাঠককে মুগ্ধ করবে। তিনটি মূল কাহিনীর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতার লেখক বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারেন। প্রথম কাহিনীটিতে এক ফিরিঙ্গি সাহেবের প্রবৃত্তির তাড়নার ফলভোগ করতে হয়েছে তার অধৈর্য সন্তান মরিয়মকে। অন্ধকারময় জীবনে আলোর আশায় মরিয়ম গোবিন্দ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছে—কিন্তু নিঃসীম অন্ধকারই মরিয়মের জীবনের ভাগ্যের লিখন। দ্বিতীয় কাহিনীর অধ্যাপক শোভান আলির অন্তরের হাহাকারকে তার বিবি মেহেরা স্টিমিত করতে পারে নি, শোভান অশিক্ষিতা, সহজ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মেহেরাকে ছেড়ে উচ্চশিক্ষিতা সোমালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, অতঃপর সোমালীর মধ্যেও শান্তি না পেয়ে পুনরায় মেহেরার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। শোভানের অন্তঃস্বপ্নের প্রকাশনৈপুণ্য লেখকের শক্তির পরিচায়ক। তৃতীয় কাহিনীর নামক প্রশান্ত টাকা জাল করার অভিযোগে আঠারো বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই কয়েদীর জীবনের মাধুর্যময় দিকটা লেখক দেখিয়েছেন। এই সমস্ত নিষিদ্ধ মানুষের চরিত্র চিত্রণে লেখকের সমবেদনার অভাব ঘটে নি।

বৈতানিক—সম্পদক: ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: এক টাকা।

এই সাহিত্য সংকলনটি ইতিমধ্যে বিদগ্ধ সমাজে সমাদর লাভ করেছে। আলোচ্য দ্বাদশ সংখ্যক সংকলনটিতেও এমন কয়েকটি আলোচনা ও প্রবন্ধ বের হয়েছে, যা বহু প্রচারিত পত্রিকার প্রকাশিত হলে হয়তো তকের ঝড় তুলতো। কারণ সেই সব আলোচনার আছে স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বুদ্ধি। অবশ্য সব প্রবন্ধই যে একেবারে অকাটা বুদ্ধিমূলক তা নয়, এই পৃথিবীর রাজনৈতিক বন্ধি দিয়ে এক দেশের বিচারে বুদ্ধিজীবীদের জয়গান করে, আরেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের হেয় করা বন্ধি-মানের কাজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই বিচারে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি-

জীবী রচনাটির সম্পর্কে বলতে বাধ্য যে যুক্তিরও বুদ্ধি আছে। সাহিত্যে ‘পাপপুণ্য’ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রই চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যথার্থ পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৈতানিকের অন্যান্য প্রবন্ধ বিভিন্ন চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা, বিহার গীত, বেঙ্গালী থিয়েটার, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা, বিদ্রোহী কবি কামিন্স প্রভৃতি লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল, অভয়কর গোস্বামী ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চারটি মৌলিক গল্প একালের গল্পলেখকদের জীবনবোধ ও সমাজ-সমস্যাই ধরা পড়েছে। দুটি অনুবাদ-গল্পও সুনির্বাচিত। সংখ্যাটি দামেও সস্তা। আমরা মনে করি, বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের সাহিত্য-আলোচনামর্মী একটি পত্রিকার দ্বারা পাঠকরা বিশেষ উপকৃত বোধ করবেন।

স্বামী: (ষষ্ঠ বার্ষিক সংকলন)—ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট এ্যাসোসিয়েশন, উত্তর পাড়া-র মুখপত্র। গ্রন্থনা—মনোমোহন ঘোষ।

ভ্রমণ-বিষয়ক এই বার্ষিক সংকলনটি পত্রপত্রিকা জগতে অভিনবত্বের দাবি করতে পারে। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন যথাক্রমে প্রণব চৌধুরী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রাণেশ চক্রবর্তী, কুমারেশ ঘোষ, অমিয় কুমার হাটি, মনোমোহন ঘোষ ও কামিনী পাঠক। সুনির্বাচিত প্রবন্ধগুলি ভ্রমণ-পিপাসুদের আনন্দ দান করবে।

গৌরচন্দ্রিকা: পথিক। ৬৮।৪, মোগলী পাড়া রোড, কলিকাতা-২৮। দাম: তিন টাকা।

ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ এই গ্রন্থখানি ভ্রমণের ভালো লাগতে পারে। জীবন-পরিভ্রমণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা লেখকের উদ্দেশ্য। অবশ্য তত্ত্বকে রস মণ্ডিত করার মধ্যে লেখকের কৃতিত্ব আছে। অনেক বড় পণ্ডিতদের মতামত গ্রন্থটিতে অগ্রে ও পশ্চাতে রয়েছে, কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বড় একটা কেউ কিছু না বললেও বৈজ্ঞানিক প্রশংসা তাঁর গ্রন্থসহ গ্রন্থকারের করেছে।

বঙ্গদ্রষ্টব্য ওদেশে শিল্পীরাও এদেশে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বেশির ভাগ সময় সমালোচকের রচনায় তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার একটা প্রতিফলন দেখা যায়। তিক্ততা, বিস্ময়, হিংসা, ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা সহানুভূতির অভাব—এইসব অন্তরের সঞ্চিত ক্ষণিকভাবগুলি তাঁর সাহিত্যবিচারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মতবাদমূলক ব্যাপারে লেখক সমালোচকের বন্ধুস্থানীয় কি শত্রুস্থানীয় এইওপন নির্ভর করে রচনার সমালোচনা করা হয়—সুতরাং এ-জাতীয় সমালোচনা যে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যিকগোষ্ঠী, অর্থাৎ লেখক ও সমালোচকের দল একটি শ্রেণীর সমাজ, এ যেন এক ধরনের সংসার এবং অন্যান্য সংসারেও যেমন হয়, এ সংসারেও ছোট ছোট কারণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরস্পর পরস্পরের ওপর বিরক্ত। নিজেদের নোখের কাপড়-চোপড় সংসারের সীমানার ভেতর ফেলাই-মলাই না করে সমালোচকেরা সেগুলিকে বাইরে তুলে ধরেন—ফলে সমস্ত পৃথিবীর চোখের সামনে সর্বত্রই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর বিপদ হল, জনসাধারণ এইসব ব্যক্তিগত হিংসা-স্বার্থ-বিরক্তি বিষয়ে অবহিত না থাকতে তারা এ সব সমালোচকের মতবাদকে সত্যিকারি বিচার হিসাবে গ্রহণ করে এবং জঙ্গ প্রভাবিত হয়; শত্রু জনসাধারণই যে এভাবে প্রভাবিত হয় তা নয়, প্রফে-

সারের দল, রিসার্চ ওয়ার্কাস্ এবং অন্য সমালোচকেরাও একইভাবে বিভ্রান্ত হন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সমালোচকের ঐ মতবাদ মূল রচনার অবজেক্টিভ স্ট্যান্ড—সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। এরাও ঐ সমালোচকের যুক্তিতর্ক এবং ব্যাখ্যাকে ব্যবহার এবং প্রচার করতে শুরু করেন। অনেক সময়েই এমন হয় যে মূল রচনার থেকে সমালোচকের মতামতের ওপর নির্ভর করেই রচনার মূল্য যাচাই করা হয়। যথেষ্ট পণ্ডিত লোকও এর পর স্বাধীনভাবে মূল মন নিয়ে ঐ মূল রচনা পড়তে চেষ্টা করেন না। নাটক সমালোচনার সময় এই জাতীয় ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। এর ফলে সমালোচনার নামে বহু মিথ্যা সাহিত্যের সমাবেশ ঘটে এবং পাঠকমন বিপথে পরিচালিত হয়।

আগেই বলেছি সত্যিকার সৃজনশিল্পী তাঁর রচনার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ। যা তিনি বলেন তার ভেতর মিথ্যার কোন স্থান থাকে না। কিন্তু যে সত্য এবং যে আন্তরিকতা তাঁর রচনার মূর্ত হয়ে ওঠে তার প্রকৃতি কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

লেখক বেসব কাহিনী আমাদের বলেন তার সবই উদ্ভাবিত; সুতরাং সেগুলি তো অসত্য। কিন্তু যেহেতু লেখক কাহিনী উদ্ভাবন করেছেন, সুতরাং সে কাহিনী মিথ্যা এ যুক্তিকে গ্রহণ করা যায় না—উদ্ভাবন করার মানেই হচ্ছে সৃষ্টি করা

এবং নিজেকে আবিষ্কার করা। সৃষ্টি রচনা, হয় উদ্ভাবিত না হয় কল্পিত—এবং তার একটা প্রাণবন্ত অস্তিত্ব থাকবেই থাকবে। শিল্পবস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই—এ একটা অখণ্ডনীয় সৃষ্টির মত।

সৃজনশিল্পী তাঁর সৃষ্টি, কল্পিত এবং উদ্ভাবিত শিল্পবস্তুর ভেতর নিজেকে দেখতে পান। ফ্লোরায়ের সেই বিখ্যাত উক্তির 'Madame Bovary, C'est Moi', সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। শিল্পী মিথ্যাশ্রয়ীর মত একের স্থানে অন্যকে বসাতে চান না—তাঁর সৃষ্টির একটা নিজস্ব সত্তা এবং নিজস্ব পরিচয় থাকে। এই কারণেই বলা হয় সত্যের মূল আকর হচ্ছে কল্পনার রাজ্য। মাদাম বোভারীর সবটাই ফ্লোরায়ের নয়—তিনি ফ্লোরায়েরের লুইজা—এবং জন্মগ্রহণের পর থেকেই তিনি ফ্লোরায়েরের শাসনমুখে—অর্থাৎ তাঁর বশীভূত নন।

যে লেখক আগে থেকে সব কিছু নির্ধারিত করে নিয়ে লিখতে বসেন তিনি হচ্ছেন স্ট্রোমার। পূর্বনির্দিষ্ট মডেল অনুসারে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেন—এক বিশেষ পদ্ধতিতে তিনি চরিত্রগুলিকে চলতে বাধা করেন। তিনি আগে থেকেই জানেন তারা কি আকার নেবে। চরিত্রদের ভেতরকার স্বাধীন গতি তিনি বন্ধ করে দেন এবং নিজের সৃজনশীল শক্তিকেও কার্যকরী করতে পারেন না। তাঁর শিল্প-সৃষ্টির কাজে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা আবিষ্কারের স্থান থাকে না—তাঁর চরিত্রগুলো হয়ে দাঁড়ায় প্রাণহীন পুতুল-মানুষ। তাঁর লেখায় কোন নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায় না—শত্রু নজাকাটা রচনার প্রতিষ্ঠার কতকগুলো উদাহরণের উল্লেখ করতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। প্রথম থেকেই কিভাবে কি লিখবেন, বলবেন, তিনি ঠিক করে রাখেন। যে লেখক এভাবে নিজের খিসিসের প্রতিষ্ঠার জন্য রচনা করেন, তাঁকে সং শিল্পী বলা চলে না—কারণ তাঁর রচনায় কিছুতেই আন্তরিকতা আসতে পারে না। তাঁর রচনা বা চরিত্র রূপায়ণ আমাদের মনে কিস্ময়ের উল্লেখ করতে পারে না। কোন খিসিসই সম্পূর্ণভাবে বা কতৃগতভাবে সত্য হতে পারে না। যে লেখক তাঁর রচনায় খিসিসকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, লেখার সময় তাঁকে অন্য সব সত্যের ওপর খিসিসকে প্রাধান্য দিতে হয়। অবশ্য খিসিসের সমর্থকশিল্পী নিজেও অকৃত্রিম সৃজনশিল্পী হতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নির্ধারিত ধারায় লেখবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁর রচনা, নিজের গোচরে বা অগোচরে, খিসিসকে ছাপিয়ে ওঠে এবং তাঁর রচিত চরিত্রগুলি প্রাণস্পন্দনে জীবন্ত মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। আমি আগেই বলেছি প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই বেশির ভাগ লেখক লিখতে

শুরু করেন—কিন্তু বারি বড় লেখক তাঁরা প্রচারধর্মী হিসাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। In the last resort, their characters get the better of them.

পিপল'স থিয়েটারের আবশ্যকতা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বহু তর্কবিতর্ক চলেছে। কিন্তু এর দ্বারা ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। এ কি কোন এক ধরনের থিয়েটার যার উৎপত্তি আদিমতার গহনরের অভ্যন্তর থেকে? অথবা এক ধরনের থিয়েটার যার রচয়িতা জনসাধারণ—তাই যদি হয় তবে এই জনসাধারণ বলতে কাদের বোঝায় অথবা এ একজাতীয় থিয়েটার যা সাধারণ লোকের জন্য রচিত, যার উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া বা রাজনীতিক-শিক্ষার প্রচার? তাহলে তো আবার সেই প্রচারধর্মী কমিটেট' থিয়েটারের কথায় ফিরে আসতে হয়—যে থিয়েটারের আন্তরিকতা, সত্যাসত্য এবং মূল্যমূল্য শূন্যের কোটায় বলে আমি আগেই মত প্রকাশ করেছি। রাষ্ট্রশক্তি যখন intellectual tyranny দ্বারা জনমনকে বশে রাখতে চান তখনই রাষ্ট্রপরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রচারধর্মী থিয়েটারের প্রসারের ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেখা যায় সরকারের তরফ থেকে।

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার কথা বলছি এই ক্ষেত্রে যে, থিয়েটারের কাজে কোনরকম পরিকল্পনা থাকবে না বা তার ভেতর অন্তর্নিহিত কোন অর্থ থাকবে না, এমন কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু পরিকল্পনার সঙ্গে থিয়েটারের আন্তরিক বোগ থাকা দরকার—বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দিলে চলবে না। জোর করে চাপালে থিয়েটারের আসল উদ্দেশ্যই যাবে বর্ষ হয়ে, এর অন্তর্নিহিত অর্থ বিকৃতভাবে লোকের সামনে প্রতিভাত হবে। আপনারা, আমরা, আমি—জনগণ বলতে এদেরই তো বোঝায়। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করবার। হাস্যবিকপক্ষে আমরা একে অন্যের থেকে আলাদা নই।

We reveal ourselves in our literature... each of us in all the others and that is why the work of art is so telling. It speaks out with a new voice. It astonishes. It is an unidentified but identifiable being or entity.

বাগ্জাত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চিন্তা, ভাবনা, বেদনা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর প্রাধান্য না দিয়ে লেখককে তাঁর ক্রিয়েটিভ ইম-



আলেনোন্সের 'একটি দি কিং' নাটকে রাজার ভূমিকায় স্যার অ্যান্ড্রু মেনশন-
তাঁর দুই রাণীর চরিত্রে নোমোছলেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী : গুগি উইদার্স
এবং নাট্যা প্যারী।

(জাগুস্ট ১৯৬৩ সাল)

পাল'সের দ্বারা নিজেকে শিল্পসৃষ্টির কাজে পরিচালিত হতে হবে। মন যখন সৃষ্টির প্রেরণায় উত্তেজিত তখন লেখকের হঠাৎ মনে হবে সারা জগৎটা প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত এবং প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। যে পৃথিবীতে তিনি বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সেই পৃথিবীকেই নতুন দৃষ্টিতে দেখলে অনেক কিছুই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর বলে মনে হবে।

এই চিরপরিচিত জগৎকে চিরনতুন এবং রহস্যময় হিসেবে দেখতে শিখতে হবে সাহিত্যিককে।

It is a true and fragile world.

লেখক এ-জগৎকে বদলাতে চেষ্টা করবেন না, বা এর কাজে কোন ব্যয়সাধন সৃষ্টির প্রয়াস থেকে বিরত থাকবেন। এ পৃথিবীকে তিনি পতীরভাবে নজর করে দেখবেন, এর সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে চিন্তা করবেন। এ-বিষয়ে তিনি সজাগ

থাকবেন যে চরিত্রগুলো যেন নিজের কথাই বলে, ঘটনাগুলো যেন তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবেই ঘটে।

He acts as a spectator of his own subjectivity and stands back from it.

পরে এ-বিষয়ে যা মনে হয় বলতে পারেন—কারণ নিজের সৃষ্টির নিজেই তিনি বিচারক, নীতিজ্ঞ, দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক হতে পারেন। কিন্তু এই সময় তার চিন্তা করবার অবসর থাকে না। সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করে তোলাটাই তার এখনকার কাজ। লেখক যদি মনঃসংযোগ এবং কল্পনাবদ্ধ মনে সৃষ্টিকে দেখেন তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন তার সৃষ্ট জগৎ আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিল নিজস্ব নিয়মকানুন, যুক্তি এবং ভাবিতব্য অনুসারে। কিন্তু তাকে এই সৃষ্টিকে প্রতিভাত হতে দিতে হবে, এর নিজস্ব ধরণে, অর্থাৎ যেভাবে এটি পরিষ্কৃত হতে চাইবে সেইভাবে, অর্থাৎ এর পরিষ্কৃটেই বাধা দিয়ে চলবে না, একে নিজের মতভাবে গড়ে উঠতে দিতে হবে।

রচনায় ব্যাপ্ত থাকার সময় সাহিত্যিক নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাগুলোকে অতিক্রম করে এক অলৌকিক স্তরে অবস্থান করতে থাকেন। তখন তার ছোট

ছোট সমস্যার আর কোন গুরুত্ব থাকে না। যার অশ্বেষণে তিনি ব্যাপ্ত হয়েছিলেন, তাকে তখন আবিষ্কার করতে পেরেছেন, দেখতে পেরেছেন। একটা নতুন জগৎ আবির্ভূত হয়েছে—কিন্তু তার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারলে তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না। এই পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক একই সঙ্গে বিস্মিত এবং অ-বিস্মিত, মনে মনে তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, এ-ব্যাপারে তিনি শূন্য প্রাথমিক ধারারটাই দিয়েছিলেন—বাকিটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছে—তিনি শূন্য অস্তরের দ্বার অর্পণমুদ্র করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে বোরের এসেছে এই নতুন জগৎ এবং সেখানকার অধিবাসীরা—তারা এখন প্রাণবন্ত হতে চায়, বাঁচতে চায় তাদের নিজস্ব জীবনরসে ভরপুর হয়ে।

And this perhaps makes it plain that the work of the imagination, which transcends falsehood and truth, or rather falsehood and truth as rigidly defined by moral systems based on abstract ideology, is the only kind of work to have its roots in that fundamental reality we call life;

the only work which continues to be present, the permanence of its nature being unaffected by transmutations and its construction unshakeable because, although it may be diversely appreciated, the continuously changing factors will be the sensibilities and attitudes of the public, while the work itself will remain invulnerable, intact, and unharmed.

It is in this sense that we can talk, to a certain extent, about the "eternity" of a work of art, whereas all other things being subject to change—outmoded ideologies, hypotheses that have been verified and then disproved, ruined thoughts—collapse and decay.

[The Writer and His Problems—Engene Ionesco. Encounter—September 1964.]

১৯৬৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'সানডে টাইমস'-এ 'Lord Harewood Writes' এই শিরোনামের আয়োনেস্কা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার শুরুতে ছিল: এডিনবারা ফেস্টিভ্যালের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর যিনি এ সমগ্র আয়োনেস্কার 'এক্সিট দি কিং' নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, এ নাটকের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আলোচনা করেছেন 'সানডে টাইমস'-এ:

এক-একটি বিষয়বস্তু যেন শিল্পীদের পেয়ে বসে—কোন না কোনভাবে এ বিষয়কে তাদের নানা লেখায় দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ শিল্পীর রচনায় বিশেষ বা নির্দিষ্ট মতবাদ অন্য সর্বকছকে ছাপিয়ে ওঠে। এ জাতীয় শিল্পীদের জীবনী-কারেরা এর কার্যকারণ দেখতে পারেন তাদের জীবনের ঘটনাবলীর প্রভাব প্রভূতির বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যার সাহায্যে। যে সমস্যাটি আয়োনেস্কার প্রায় সব রচনাত্রেই আলোচিত হয়েছে তার একটি সম্পর্ক সমাধান আমি দেখতে পেরেছি 'এক্সিট দি কিং' নাটকে—এ সমস্যাটি হচ্ছে 'অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব?' আয়োনেস্কার ভবিষ্যৎ রচনা থেকেও এ-সমস্যা বাদ পড়বে না—তবে এর কোন সমাধান নেই এভাবে এ ব্যাপারের পুনরুদ্ভি ঘটেবে না।

[কুমার:]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্ব - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - গোয়া



প্রমোদকের আক্রমণ

আবার প্রমোদকের আক্রমণ শুরু হয়েছে। বিহারে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রমোদক বৃদ্ধি হয়েছে। প্রতিবাদে সিনেমার মালিকরা গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমা বন্ধ রেখেছে। বিহারের ২২০টি সিনেমায় ছবি দেখান বন্ধ রয়েছে। এই বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য; যতদিন এ ব্যাপারে একটা সম্মতজনক মীমাংসা না হয়। মহারাষ্ট্রেও শতকরা ৭৫ ভাগ প্রমোদক বৃদ্ধির প্রতিবাদে দীর্ঘদিন সরকারের সঙ্গে প্রাঙ্গণ-আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সরকার জানিয়ে দিয়েছে, প্রমোদকের হার কমানো সম্ভব নয়। প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে মহারাষ্ট্রের সকল সিনেমা বন্ধ থাকার কথা। মহারাষ্ট্রের সিনেমার সংখ্যা সাত শতাধিক।

বিহারে ও মহারাষ্ট্রে সিনেমা বন্ধ থাকার ফলে সরকারের প্রাপ্য কিছুটা যেমন কমবে, শো বন্ধ থাকার দরুন প্রমোদকের টাকাটা তাঁরা পাবেন না। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সিনেমা থেকে প্রতি শোর জন্য যে পৌরসভার আদায় করে—তা থেকে পৌরসভা ধারণত হবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে সরকার এবং পৌরসভার আয় কিছুটা কমছে। তার মধ্যে আলো কার্বন ইত্যাদি বারী সরবরাহ করেন তাঁদের ব্যবসাভেও আঘাত পড়ছে। সিনেমা কর্তৃপক্ষ এই আঘাত দেবার জন্যই প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখছেন, এ ছাড়া প্রতিবাদ জানাবার তাঁদের কোন উপায় নেই। প্রমোদক থেকে বিহার সরকারের আয় হয় ১৪০ লক্ষ টাকা; মহারাষ্ট্র সরকারের আয় ৭৮০ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ের হিসাব ধরলে প্রমোদকের হার খুবই বেশি। জনসাধারণের আয়-কমতা নিম্নাভিমুখী, অথচ প্রমোদকের হার ক্রমে বাড়ছে। এক আশ্চর্য অর্থনীতিতে আমরা রয়েছি। বিহারে জনসংখ্যা ৪৮০ লক্ষ, প্রমোদক আদায় করা হয় ১৪০ লক্ষ টাকা; মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৪৮০ লক্ষ, প্রমোদক আদায় হয় ৭৮০ লক্ষ টাকা; পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ৩৮০ লক্ষ, প্রমোদক আদায় হয়—৩২৫ লক্ষ টাকা। গড়পড়তা হিসাব করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষে জনপ্রতি এক টাকা হারে প্রমোদক আদায় করা হয়। যে দেশে সরকার জনসাধারণের শিক্ষার জন্য মাথাপিছু এক টাকা ব্যয় করতে পারে না, যে দেশে জনসাধারণকে জন্ম বস্ত্র ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না সে দেশে আনন্দ উপভোগের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উপাদানের উপর এত চড়া হারে ট্যাক্স ধার্য অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার।

যদিও ট্যাক্সটা সিনেমা হাউসগুলি থেকে আদায় করা হয়। কিন্তু ট্যাক্স ধার্য হয় টিকেট হিসাবে। সুতরাং প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা—করের টাকা জনসাধারণ অর্থাৎ মর্শকদের নিকট হতেই আদায় করেন (পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সকল ট্যাক্স জনসাধারণই নিজে থাকে)। এই ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত সিনেমার মালিকরা টিকেটের দাম বাড়িয়ে দিলে বাড়তি টাকাটা আদায় করবে। ফলে মর্শকদের শিকার, চাউল আটা সংগ্রহে ক্রান্ত, বস্ত্র ও ওষুধ কিনতে অপারদ, শিক্ষাগ্রহণে ব্যর্থ জনসাধারণ মহাশয় হতাশা ও ক্রান্তির দর করার জন্য যদি মর্শবৃদ্ধিবশত সিনেমার প্রবেশ করেন, তখনি মর্শখাদক বাঘের মত প্রমোদক তার ঘাড় চেপে পড়বে। জনসাধারণের সিনেমা দেখার সব মিটিয়ে তারকাদের সন্দর মুখ ধ্যান করতে করতে দুর্দিন উপোস দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বারে বারে সরকার প্রমোদক বৃদ্ধি করেছে। অথচ যখনই মোড়গোড়, বড় বড় হোটেলের ক্যাবারে নাচ, নাইট ক্লাব এবং বারগুলির উপর কর ধার্য করে সিনেমাকে বাড়তি প্রমোদক থেকে রেহাই দিতে বলা হয়েছে, সরকারগুলি তার জবাব দেন নি।

করক বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদক বৃদ্ধি হয়েছে; মৃত্যুশ্রুত সরকার থাকায় এ-যাত্রা বেঁচে গেলো। —সুজন।



‘মহাশেভতা’ চিত্রে নবগতা সাদাস্তনী রায়

নাটকের কথা

‘চারণকবি মদুন্দ দাস’-এর
নির্মিত মণ্ডাভিনয়

আর একটি জীবনী নাটকের নির্মিত অভিনয় শুরু হচ্ছে প্রতাপ মেমোরিয়াল রংগগৃহে রংগবাণীর প্রযোজনায়। এই নাটকটি হল ‘চারণকবি মদুন্দ দাস’। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পূজারী বিপ্লবী চারণকবি মদুন্দ দাস যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ করে অমর হয়েছেন। তাঁর পুত্র জীবনী ‘চারণকবি মদুন্দ দাস’ নাটকের বিষয়বস্তু। নাটক রচনা করেছেন মন্মথ রায়। নাটকে সুরসৃষ্টি করেছেন সরকার অনিল বাগচী। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নিচ্ছেন অর্ধেন্দু মজুমদারী। আলোক-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন তাপস সেন।

চারণকবির পুত্র চরিত্র রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলার এক প্রখ্যাত গায়ক-অভিনেতা।

চতুর্মুখের নতুন নাটক

সাফল্যের সঙ্গে ‘জৈনকের মৃত্যু’ মঞ্চস্থ করার পর চতুর্মুখ গোষ্ঠী আর্থার মিলার-এর আর একটি নাটক মর্শকদের উপহার দিচ্ছেন। নাটকটি ‘আফটার দ্য ফল’



রাগিনীর 'আফ্রিকা' নৃত্যনাট্যে অসিত চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুপ্রাণিত সাধন মৈত্র রচিত "পতনের শ্রু"। 'জন্মকের মৃত্যু' যাঁদের মন্থন করেছে এই নাটকটি তাঁদের বিমূগ্ধ করেছে। অসীম চক্রবর্তীর নির্দেশনায় এই নাটকটি মূল-অঙ্গন রংগালয়ে বারোই ও সপ্তেরোই সেপ্টেম্বর মণ্ডস্থ হবে। বিভিন্ন চুমিকায় অভিনয় করছেন : চিত্রিতা মণ্ডল, অনুরাধা ভট্টাচার্য, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা গগোপাধ্যায়, সুলেখা দে, রাগী হালদার, অসীম চক্রবর্তী, জগৎ মিত্র, গোপাল মিত্র, দীপঙ্কর দে, জিতেন ঘোষ, বারীন মুখার্জী, মোহন মুখার্জী, জয়ন্ত বোস, পরিমল বিশ্বাস, তপন বিশ্বাস, দীপ্য বানার্জী, প্রদীপ চক্রবর্তী, মাণিক বর্মণ, মাণিক ও সমীর ধর।

নৃত্যনাট্য

আফ্রিকা ও ক্ষুধিত পাবাণ

গত ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর ফাইন গার্টেন একাডেমি হলে রাগিনী সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দু'দিনে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাবাণ' গল্প ও 'আফ্রিকা' কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ পরিবেশনের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল 'চরম মূল্য' ও 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কাব্য-কল্পনার সঙ্গীতরূপ সৃষ্টি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। অসিত চট্টোপাধ্যায় উদয়শঙ্কর গ্রুপের সাহচর্যে এবং বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার নৃত্য-রীতিতে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছেন।

আফ্রিকা

এই অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁর পক্ষে 'আফ্রিকা' কাব্যকল্পনাকে নৃত্যে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই নৃত্যরূপ নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন চিন্তা ও অনুশীলন করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে একদিকে যেমন শোষিত মানুষের প্রতি ভালবাসা জানিয়ে শোষকদের খিঙ্কার দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য-কল্পনায় আফ্রিকার আদিম মানবতার যুগ-বন্ধ জীবনের উল্লাস ও কৃষিজীবনে প্রতিষ্ঠার পর দেখা দিল সভ্যতার মূখোস-পরা সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের আধ্যাত্মিক পরিচালকদের। শৃঙ্খলিত হল প্রকৃতির কোলে পালিত মানুষের দল, বিভক্ত হল তাদের যৌথ জীবনের ঐক্য। নির্যাতিতা আফ্রিকা-মায়ের ধৈর্যের বধন টুটল, শোষণ ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন সন্তানদের প্রতি। শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রাম শুরু হল আফ্রিকায়, নিবেদিত হল বহু অগ্রদূত, বহু রক্ত। আফ্রিকা-মা গর্বিতা হলেন বিজয়ের গৌরবে; সে গৌরব ব্যাপ্ত হল দেশে ঔপনিবেশিক মূর্তিসংগ্রামে।

কথাকলি, লোকনৃত্য ও ব্যালে নাচের



রাগিনীর 'ক্ষুধিত পাবাণ' চিত্রনাট্যে বন্দনা সেন, পশ্চিমী দাশগুপ্ত ও দেবকুমার ভট্টাচার্য

প্রীতিতে এই নৃত্যনাট্য রূপ লাভ করেছে। সমবেত নৃত্যগদ্যের মধ্যে শিকারজীবন থেকে কৃষিজীবনে উত্তরণ এবং কৃষির বিভিন্ন কাজ, আফ্রিকা-মাত্র প্রতিরোধ আহরন এবং শেষে বিপ্লবের প্রতীক মশাল-নৃত্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রূপসজ্জায় শিল্পীরা শুরুর দিকে যৌবন সম্পর্কিত দেহ আবরণ ও পরে বিদেশীদের প্রভাবে এসে বিবর্তনের ধারানুযায়ী পোশাক ব্যবহার করেছেন, যা ইতিহাসসম্মত।

সঙ্গীত সর্বদা অত্যন্ত উচ্চস্বরে থাকায় মাঝে মাঝে অসুবিধা বোধ হয়েছে, এ ছাড়া যথাসাধ্য আফ্রিকার লোকসঙ্গীতের প্রীতি অনুসরণ করতে পারলেই ভাল হত। এ ব্যাপারে পরিচালক কলকাতাপ্রবাসী আফ্রিকান ছাত্রদের সহযোগিতা গ্রহণ করলে সঙ্গীত আরও উপভোগ্য হত।

এই নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, এন কে শিবশঙ্কর, অসিত চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত, সাধন গুহ, দেবকুমার ভট্টাচার্য, রূপজিৎ রায়, খগেন চক্রবর্তী, বট্ট পাল, রামগোপাল ভট্টাচার্য, অমল বসু, কমলেশ চক্রবর্তী, মনোজ মজুমদার, লীলা চৌধুরী, জয়শ্রী রায়, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত।

নৃত্যনাট্যটি পরিকল্পনা ও রূপায়ণে সার্থক; তবে প্রথমার্ধের মেক-আপে ক্ষণিক ব্যবহারের পরিবর্তে মৃদু ধোঁয়া ব্যবহার ও ঐতিহ্যগত লোকনৃত্য আরও অর্থবোধক হতে সহায়ক হবে কিনা পরিচালক চিন্তা করতে পারেন।



হংসমিথুন-এর নায়িকা অপর্ণা সেন (দাশগুপ্তা)

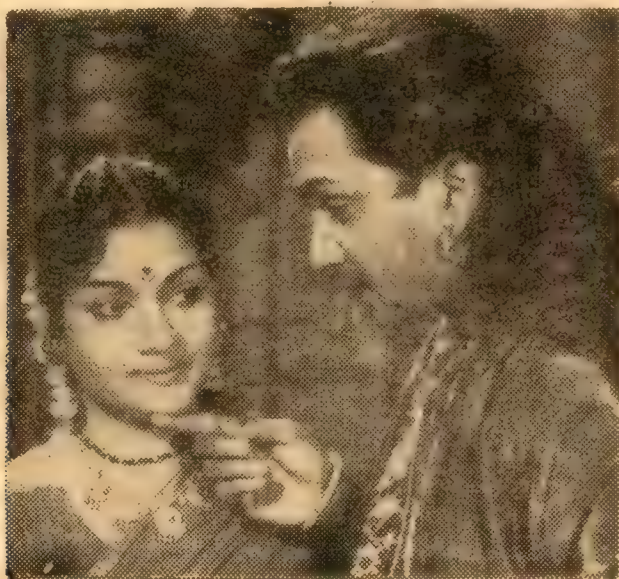
কুখ্যাত পাষণ্ড

এখানকার পরিবেশিত হয়েছে 'কুখ্যাত পাষণ্ড'। রাগিণীর যে শিল্পিদল দেখা গেল, তারা বয়সের দিক থেকে অনেকে কিশোরী। সুতরাং 'কুখ্যাত পাষণ্ড'-এর মত বিষয় এদের উপযোগী কিনা, এই প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হয়েছে। 'কুখ্যাত পাষণ্ড' একটি কাল্পনিক গল্প, যে কল্পনার জাল বিস্তারিত হয়েছে অতীতের নবাবদের ভোগবিলাসের বলি, অতৃপ্ত কামনা, গভীর চিন্তা, অপরিপূর্ণ বাসনাকে নিয়ে। যে নিষ্ফল কামনার অভিধানে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তর-

খণ্ড কুখ্যাত হয়ে আছে। অতীতের স্মৃতিচারণের সঙ্গে পাগলা মেহের আলির আত্মনাদ নাটকীয়তাকে যেমন ঘনীভূত করেছে, তেমনি রহস্যজাল থেকে মূল বস্তুকে ছাড়িয়ে এনেছে। যে চিন্তা, যে রহস্য উদ্ঘাটনের আনন্দরস বরষকদের উপভোগ্য তা যদি ছোটদের দ্বারা পরিবেশিত হয়, তাহলে কিছটা অপূর্ণতা যেন থেকেই যায়।

এই নৃত্যনাট্যের রূপায়ণে পশ্চিমী দাশগুপ্ত ইরাণী বালিকার চরিত্রে এবং নর্তকীর নৃত্যে বন্দনা সেন বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে দেবকুমার ভট্টাচার্য, ধুব মিত্র, অসীম ঘোষ, সাধন গুহ, বট্ট পাল, সোচন দে, নীহার গুহঠাকুরতা, মনোজ মজুমদার, বাশরী চক্রবর্তী, বর্ষা দত্ত, জয়শ্রী রায়, শিবানী দাশগুপ্ত, অমিতা দত্ত, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত এবং অসিত চট্টোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। এরা প্রত্যেকেই নিজের চরিত্র রূপায়ণে সার্থক। বিশেষ করে অসিত চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব এবং এক প্রেমিকহৃদয়ের অভিব্যক্তি উপভোগ্য। প্রাসাদ-নর্তকীদের রহস্যময় আগমন-নিগমন এবং আলো-আঁধারীতে নৃত্যজন্দের লীলা সর্বক্ষেপে রচয়িতার সৃষ্টি করে রেখেছিল। নৃত্য পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গীত এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দুদিনই আলোকসম্পাতে আশ্চর্য বাদ্যকরী কাজ দেখিয়েছেন তাপস সেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে অরণ্যানীর রহস্যময়তা সৃষ্টিতে এবং আফ্রিকার সরল মানুষগুলির বিপ্লবের বর্হি প্রকাশে যেমন তেমনি দক্ষতার সঙ্গে এম পরিভাষা



'পাষণ্ড-জয়সেব' ছবিতে নাগেশ্বর রাও ও অমলি দেবী



সত্যজিৎ রায়ের 'চাঁড়িয়াখানা' ছবিতে উত্তমকুমার ও শৈলেন মৃধাজী

প্রাসাদে অতৃপ্ত ক্ষুধার রহস্যজালবিস্তারে তাঁর আলোর কাজ নৃত্যনাট্যের সার্থকতায় সহায়ক হয়েছে।

এই দুটি নৃত্যনাট্যের নাট্যরূপ রচনা করেছেন মিহির সেন।

অব্যবহার্য সঙ্গীতরূপ

রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" ও চরম মূল্যকে ভাবলোক থেকে সঙ্গীত-লোকে উপস্থিত করে রাগিণী আর একটি প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান করেছে। এরূপ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে সার্বকভাবে করেন-ছিলেন ভি বালসারা, ইউরোপীয় সঙ্গীত-রীতিতে। রাগিণীর শিল্পীরা ভারতীয়

রাগ-রাগিণী অবলম্বনে প্রথম দিন ভাল-বাসে, দ্বিতীয় দিন বেহালা ও বাঁশী সহযোগে অপূর্ব এক রসসৃষ্টি করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

করছেন সম্ভবত উত্তমকুমার ও মাধবী মৃধাজী এবং অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, কালী ব্যানার্জী, সুমিত্রা সান্যাল, প্রসাদ মৃধাজী, শিপ্রা সাহা, রত্না ঘোষাল প্রমুখ শিল্পীরা।

ছবিটির বিশ্ব পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন মৃত্তী লিংকার্স।

সুটি ও শব্দ

লিপিকা

পূর্ণেন্দু মৃধাজী ও ফণী ব্যানার্জী প্রযোজিত চার ফিল্মস-এর পতাকাতলে নিম্নলিখিত "লিপিকা" অরবিন্দ মৃধাজীর পরবর্তী ছবি। ছবিটিতে সুদারোপ করেছেন পূর্ণেন্দু মৃধাজী। ইতিমধ্যে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গীত রচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে আছেন : হেমন্ত মৃধাজী, মামা দে, শ্যামল মিত্র, শিপ্রা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত। ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মৃধাজী। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়

অমৃতকলী

শিল্প স্বর্গ

শিল্প স্বর্গের নিরমিত অনুষ্ঠান আগামী রবিবার সকাল ৯টায় বসবে মহাজাতি সদনের মূল মঞ্চে। এদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সোভিয়েট রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করছে, আর সেদিন ঐ দেশেরই একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি "চুক আর গেক" দেখানো হবে। অপর অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে থাকছে রবিরূপের 'জুতা আবিষ্কার' আর সপ্তাডিঙার 'তারকাসুর বধ'।

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা কমিশনে বিখ্যাত "এসকর্ট" অল ওয়াল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার বিক্রয় করুন। মতাবলী ও স্যাম্পেল ট্রানজিস্টারের জন্য পত্র লিখুন।



Jagee Co. (W.B.C. 57),
Post Box 1115, Delhi-6

ইতিহাসের পাতা

II আট II

কোজিনিৎসেব এবং ট্রাউবার্গ

বিশ দশকের সোভিয়েট সিনেমার গ্রিগরি কোজিনিৎসেব এবং লিওনিড ট্রাউবার্গ পরিচালিত 'স্টুডিও অব ইকসেনট্রিক ক্রিমিকস' বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ স্থান এ কারণে যে অন্যান্য অগ্রগামীরা সাহিত্যের এই দিকটাকে বর্জন করেছেন, কিন্তু কোজিনিৎসেব এবং ট্রাউবার্গ দেখলেন উৎকেন্দ্রিকতা বা খামখেয়ালীপনা নিয়ে যে সাহিত্য তার মধ্যে এমন জিনিস আছে যাকে নিয়ে ভাল ছবি করা যেতে পারে।

তারা একদিনেই যে এই সম্ভাবনা দেখেছিলেন এমন নয়। তারা আইজেনস্টাইনের মত থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। আইজেনস্টাইন অস্ট্রোভস্কির ক্লাসিক কমেডিকে প্যারোডি করে 'দি সেজ' মঞ্চস্থ করেছিলেন; কোজিনিৎসেব ট্রাউবার্গ গোগলের 'ম্যারেজ'-কে নিয়ে প্রহসন তৈরি করলেন। আইজেনস্টাইনের মত তারাও মনে করলেন থিয়েটার বুদ্ধোন্মাদিত্ব-প্রধান, সুতরাং আনন্দ পরিবেশনের আরো গণতান্ত্রিক মাধ্যম হিসাবে তারা সার্কাস, সমসাময়িক ঘটনার অসংবদ্ধ নাটক এবং সিনেমাকে গণ্য করলেন। কিন্তু এরা যাই মনে করুন থিয়েটার নত হতে রাজী নয়, মরতেও প্রস্তুত নয়। আইজেনস্টাইনের 'দি সেজ' একটা কলেঙ্কারী কাণ্ড বাধালো, 'ম্যারেজ' শেষ হল ঠগের বার্থটার অগোরব নিয়ে। আইজেনস্টাইন তার চিন্তাকে প্রসারিত করে নিয়ে গেলেন সিনেমায়, সেখানে নিউজ রীল করার নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি নতুন শিল্প-রীতির জন্ম দিলেন। কোজিনিৎসেব এবং ট্রাউবার্গ তাদের নিরীক্ষামূলক থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন সিনেমায়, এবং তাদের উৎকেন্দ্রিক ছবি 'এডভেঞ্চার অব ওকটিয়ারিনা'-র (১৯২৪) ব্যর্থতার পর তারা স্থির করলেন—স্টাইলিজেশন বিষয়ে কাজ করবেন। তারা বিশেষ মেজাজে এবং স্টাইলে তাদের ছবি করলেন "দি ডেভিলস হুইল" (১৯২৬), আসলে এটি একটি ডিটেকটিভ কাহিনী-চিত্রের সমগোত্রীয় হয়েছিল। তাদের মতে বিশেষ কালকে, কালের মেজাজ ধরতে পেয়েছে সেই ছবি। কিন্তু প্রতীক প্লট বিশ দশকে পেট্রোগ্রাডের জীবনের একটি



‘দি নিউ ব্যাবিলন’ ছবির কয়েকটি দৃশ্য

দিক দ্বারা প্রকাশ করতে পেরেছিল। যদি ডিটেকটিভ গল্পের সমস্ত গুণ, সূনিপূর্ণ অভিনয় এবং কন্সপাজিশনের দক্ষতা ইত্যাদি ছিল। সেগেই গেরাসিমভ ভিলেইন এবং লুডমিলা

সেমিওনোভা ছিলেন নায়িকা; তারা যত বেশি বাস্তব মানুষকে রূপ দিতে পেরেছেন, তার চেয়ে বেশি গতানুগতিক ডিটেকটিভ ছবির মত ভিলেইন এবং তার আক্রমণের বস্তু হিসাবে কাজ করেছেন।

পরিচালকদের সম্মতিতেই এরূপ হয়েছে, তাঁরা এভাবে ডিটেকটিভ গণেশের স্টাইলে কাজ করেছেন, যদিও করা উচিত ছিল ডিটেকটিভ গণেশের অবলম্বনে সমসাময়িক ঘটনা বা চরিত্রচিত্রণে।

পরবর্তী ছবি ছিল 'দি ওভারকোট' (১৯২৬) গোগলের এক বিখ্যাত গণেশের চলচ্চিত্ররূপ—যে গণেশ নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে অনেক ছবি হয়েছে। এখানে তাঁদের কাজ ছিল খুব শক্ত। তাঁদের গোগলের স্টাইল এবং গণেশের উদার মানবিকতার দিক—যা রাশিয়ার সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে একসঙ্গে প্রকাশ করতে হবে। এই দুটি বিষয়েই পরিচালকেরা লেখকের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছেন। ফল হয়েছে ইতিহাসের কাল সময়হীন অসংযত রোমান্টিকতায় নিষ্ঠুর

সমাজে খুঁদে লোকটির ট্রাজেডি মানবিকতাহীন হয়ে পড়ে এবং গম্ভীর ছায়ামূর্তিতে পরিণত হয়। গোগলের উপন্যাসের মত না হয়ে এই ছবি সমাজের বিরুদ্ধে লোকটি ব্যর্থতার ও হতাশার জন্য ক্রোধ সৃষ্টি না করে, হতাশা সৃষ্টি করে। তখন লোকে বলেছিল এই ছবি হয়েছে হফম্যানের রীতিতে, কিন্তু আসলে এটি অনেক বেশি নিকটতর ছিল 'কাফকা'-র 'দি ট্রায়াল'-এর সঙ্গে, যদিও পরিচালক তখনো সেই ছবি দেখেন নি বা তার কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।

তার পরের ছবি—'সোসাইটি অব গ্রেট কব' (১৯২৭), ছবিতে আরো অনুসন্ধানী মন নিয়ে অগ্রসর হলেন, তবে

পথটা নতুন ছিল না। এই ছবির অবলম্বনে কোন উপন্যাস ছিল না; ছবিটি ১৮২৫ সালে ডিসেম্বরিস্ট উত্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। কিন্তু পরিচালকরা এই মহান ঘটনাকে এবং অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদাত্মক পরিণতিককে অত্যন্ত একঘেয়ে মেলোড্রামায় চিত্রিত করেছেন যার জন্য ঐতিহাসিক স্বেচ্ছার গভীরতা প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু চমৎকার ফটোগ্রাফির গুণে সময় এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি প্রকাশ হয়েছিল; ক্যামেরাম্যান ছিলেন আন্দ্রেই মস্কভিন, সোভিয়েটের একজন অতি দক্ষ ক্যামেরাম্যান, তিনি এই দু-জন পরিচালকের সঙ্গে বরাবর কাজ করেছেন। কোজিনিৎসেব ট্রাউবার্গের দ্বারা শিক্ষিত অভিনেতার চমৎকার অভিনয় করে। এই ছবিতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পরিচালকের স্টাইলিজেশনের জন্য স্বাধীনভাবে শেষ বস্তব্য প্রকাশ হল না। তাঁদের শেষ নির্বাক ছবি 'দি নিউ ব্যাবলন' (১৯২৯)-এ স্টাইলিজেশন—ছিল একমাত্র শিল্পমাধ্যম। এটি একটি ফিল্ম এপিক,—প্যারিস কমিউনের ঘটনা। অন্যান্য সোভিয়েট এপিক ছবিতে—আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' এবং পুডোভকিন-এর 'য়েভ অব সেন্ট পিটার্সবার্গ'—এ ইতিহাসকে দেখান হয়েছে গণসংগ্রামের দৃষ্টিতে। এই ছবিতে ব্যক্তিগত চরিত্রে ইমেল তৈরির আধুনিক স্টাইলিজেশনে পরিপূরণ করা হয়েছে। 'দি নিউ ব্যাবলন' সোভিয়েটের অন্যতম চমৎকার নির্বাক ছবিতে ক্যামেরাম্যান মস্কভিন ইম্প্রেশনিস্ট ঐতিহ্য অনুসরণ করেন, এবং অভিনয় হয়েছে সেকালের ফরাসী থিয়েটারের রোমান্টিক স্টাইলে।

পরবর্তীকালে কোজিনিৎসেব এবং ট্রাউবার্গ তাঁদের নিরীকার চরম দিকগুলি ত্যাগ করেন, কিন্তু খেয়ালী কমেডির দিকটা স্টাইলিজেশন এবং অন্যান্য কৌশল রেখে দেন। এ সব এখন আর প্রধান নেই, এবং জটিল শিল্পধারণা প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে। এভাবে নির্বাক ছবি ঐতিহাসিক বিষয়ী ট্রিলজির জন্য পথ পরিষ্কার করে গেছে—যার কথা সকলে জানেন—('ম্যাক্সিমস ইয়ুথ', 'দি রিটার্ন অব ম্যাক্সিম', 'দি ভাইবোর্গ' ডিস্ট্রিট—১৯৩৫—১৯৩৮); এবং সেই 'আর্চ' সুন্দর ছবি 'হ্যামলেট' (১৯৬৪), যা কোজিনিৎসেব এককভাবে করেছেন।

ক-ন-ব।



আপনিও পেতে পারেন বৈকি
নিয়মিত ভাবে রোজ রাত্রে মাখুন



বঙ্গল কেমিক্যাল

প্রিয়া
কোল্ড ক্রীম

কলিকাতা • বোম্বাই
চানপুর • দিল্লী

পাদ্যাহিক বসুমতী-র ৪র্থ সংখ্যায় (৬ই জুলাই, ১৯৬৭) চন্দ্রগুপ্তের অবস্থায় কলমে উঠেই সম্পর্কে রচনাটি বেশ যুক্তিপূর্ণ ও প্রাধান্যবোধ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত থিসিসের পরীক্ষার বিদেশী পরীক্ষকের নিয়োগ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

চন্দ্রগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—“স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের মানসিক পরাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। এই মানসিক ব্যাধি এতই দূরবিস্তৃত, আমরা বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা ভাষাতত্ত্বের থিসিস পর্যন্ত অভ্যর্থনায় অধ্যাপকের কাছে পাঠাচ্ছি, পাঠাচ্ছি তখন বিদেশী অধ্যাপকের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যার জ্ঞান আদৌ সন্দেহাতীত নয়।” কিন্তু শব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও একথা সমানভাবেই খাটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ের থিসিস-ই অন্তত একজন বিদেশী পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়ে থাকে। ধরে নেওয়া গেল, যে বিষয়ের থিসিস কোন একজন বিদেশী পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হোল, সেই বিষয়ে তিনি সুপারিশ করত। কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধানেই যদি কোন ছাত্র ঠিক ঐ বিষয়েই গবেষণা করত থাকে? সেক্ষেত্রে এসেশের ছাত্রটির অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এটাই সব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী পরীক্ষকদের কাছে থিসিস পাঠিয়ে থাকেন—কিন্তু জিজ্ঞাস্য কখনো বিদেশী থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য এসেছে? যতদূর জানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি প্রায় সকল দেশই তাদের গবেষণার থিসিস দেশের বাইরে পাঠাতে ইচ্ছুক নয়। এই অবস্থায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি-ই বা বিদেশে এখানকার থিসিস পাঠাবেন কেন? আমাদের রাজনৈতিক অধীনতা গেছে, কিন্তু অনাবশ্যক সাংস্কৃতিক অধীনতা এখনও রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে সুধীজন নীরব কেন?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল থিসিসের কথাই ধরা যাক। বিদেশী পরীক্ষক দূর থেকে থিসিস কোন রকমে দেখে তাঁর মন্তব্য পাঠিয়ে দেন, একসঙ্গে তিনজন পরীক্ষকের (এঁদের মধ্যে দু'জন ভারতীয়) একত্রে বসে কোন আলোচনা করার বা কোন সিদ্ধান্তে আসার কোন উপায় নেই। কিন্তু অল্পোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন থিসিসের কল চোষণ করার পূর্বে পরীক্ষকরা সকলে একত্রে সমবেত হয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত



উপনীত হয়ে থাকেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ কোন সুবিধা না থাকায় তিনজন পরীক্ষকের মাত্র একজনও যদি ছাত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন তাহলে সেই মতই সিদ্ধান্তে পরিণত হয়—এতে ছাত্রটিকে যে শব্দ নিরাস হতে হয় তাই নয়, অপর দু'জন পরীক্ষকের মতের প্রতি সম্মান দেখানো হয় না। এ সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্ত কিছ্, আলোকপাত করবেন কি? চন্দ্রগুপ্তের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে কলকাতার “The Quarterly Review of Historical Studies” নামক পত্রিকাটি এ-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন (Vol. VI., 1966-67, No. 1)। এই পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিছ্, অংশ উল্লেখযোগ্যঃ

“In the matter of examination of thesis, there is no provision for reference to a fourth examiner, if the original three examiners differ. This, we are afraid, does not ensure proper justice to a candidate, whose fate may be sealed by the note of dissent of one examiner against the opinions of the other two. Nor is it fair to the two examiners recommending the thesis for their judgement to be subjected to the veto of the third examiner.”

এই পত্রিকাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী পরীক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ

“At the University of Calcutta there is not only no provision for reference of a thesis to a fourth examiner, there is also the peculiar convention that one of the examiners must always be from

outside India. . . . We wish, this attitude had changed long ago, at least by 1947. There is no other country in the world where a thesis is sent out to a foreign examiner.”

মোট কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল থিসিস নিয়মাবলী বর্তমানে আকাজো ও অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং তা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করা দরকার। এর জন্য সুধীসমাজকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে হবে। এ সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্তকে কিছ্, আলোকপাত করতে অনুরোধ জানাই।

—জনৈক পাঠক

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ (বঙ্গাব্দ ১৩৭৪, ২১শে ভাদ্র) প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় “আকাশবাণী পরিচয়”-র আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনি যে সুচিন্তিত ও জোরালো মন্তব্য আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরেছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। জনমতের প্রতি অবহেলার আর একটি দৃষ্টান্ত আপনার সোচ্চারে জানাই।

হয়তো আপনি জানেন, জোর হঠাৎ যখন আকাশবাণীর কলকাতার কেন্দ্র দিনের অনুষ্ঠান শুরু করেন, তখন কেবলমাত্র ইংরেজীতে ও শকাব্দে বার, তারিখ, মাস ঘোষণা করা হয়—বঙ্গাব্দের কোন স্থান নেই। আমি এ ব্যাপারে আকাশবাণীর প্রচারিত “সবিনয় নিবেদন” আসরে তিনবার পরম্বারা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁরা প্রতিবারই ব্যাশ্যারটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে থাকেন ঐ আসরে নাকি প্রোডাক্টের প্রদর্শনের উত্তর দেওয়া হয়। উত্তর দেয়া না দেয়া সবই নির্ভর করে তাঁদের মজির উপর। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আপনার বহুল প্রচারিত পরিচয় মাধ্যমে ইংরেজী ও শকাব্দের সঙ্গে বাঙালি বঙ্গাব্দ প্রচারিত হয়, তার জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের নিকট চাপ সৃষ্টি করে প্রস্তাবটির বাস্তব রূপায়ণ করুন।

ঐতিহাসিক রায়

পোস্ট কলামকল্যাণ (রহস্য), ২৪ পরগনা



মহামেডান স্পোর্টিং এবং বি এন রেল দলের লীগ খেলার একটি দৃশ্য

মহামেডান লীগ জয়ের পথে

লীগের সম্মানের প্রশ্নের এখনও কোন ফয়সালা হয় নি। অবশ্য মহামেডান দল যে লীগের সম্মানের সবচেয়ে নিকটবর্তী একথা অস্বীকার করা চলে না। গত সপ্তাহে মহামেডান দল ৩-১ গোলে বি এন রেলকে পরাজিত করে লীগ জয়ের পথ সুগম করেছে। ৩০ ই সেপ্টেম্বর লীগের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। এদিন মোহনবাগান মিলিত হবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবং মহামেডান দল ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। এই দুটি খেলাই ১৯৬৭ সালের ফুটবল লীগের শেষ খেলা।

খেলার সূর্যতেই তৃতীয় মিনিটে রাজেন্দ্রমোহন প্রথম গোল করে বি এন রেলকে অগ্রগামী করেন। সাতাশ মিনিটে এ্যান্টনি এ্যামরুজ গোলটি পরিশোধ

করেন। দ্বিতীয়ার্ধে পাম্পানা এবং সাদাতুজা গোল করেন। খেলার বিরাতির সময় মহামেডান দলের পক্ষ থেকে বি এন রেলের খেলোয়াড়দের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে এক অস্বস্তিকর পরি-

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

স্থিতির উদ্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সূর্য হতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে।

খেলায় ফলাফল :			
এরিয়ান্স	২	২৪. পরগনা জেলা একাদশ	১
বালীপ্রতিভা	৫	হুগলী জেলা একাদশ	১
খিদিরপুর	২	পোর্ট কমিশনার্স	১
কালীঘাট	৬	টালীগঞ্জ অগ্রগামী	১
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	২	মধ্যপ্রদেশ ফুটবল একাদশ	১
ইস্টবেঙ্গল	৫	বাটা	১
হাওড়া ইউনিয়ন	২	কটক কম্বাইন্ড	১

অবশ্য অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত খেলা পুনরায় সূর্য হয়।

শীল্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গল

শীল্ডের আসরে এখন আকর্ষণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল দলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং অন্যান্য নামজাদা দলগুলিরও শক্তি পরীক্ষার সময় হয়ে এসেছে। বাংলার বাইরের দলগুলি কিন্তু পূর্বের মত কলকাতার বর্ষণসিক্ত মাঠে সুবিধে করে উঠতে পারছে না, এক এক করে তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে। গত সপ্তাহে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাঠে শীল্ডের কোন খেলাই অনুষ্ঠিত হয় নি। এইদিন বাটা এবং ইস্টবেঙ্গল ও হাওড়া ইউনিয়ন এবং কটক কম্বাইন্ড দলের খেলা ছিল। বৃষ্টির জলে মাঠের একাংশ জলমগ্ন হওয়ায় ইস্টবেঙ্গল-বাটা খেলাটি অনুষ্ঠিত হতে পারে নি এবং বন্যার জন্যে রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কটক কম্বাইন্ড দল মাঝপথে আটকা পড়ে নির্ধারিত সময়ে কলকাতার উপস্থিত হতে পারেন নি।

শীল্ডের খেলায় ইতিমধ্যে আরও দুটি হ্যাট্রিক হয়েছে। বালীপ্রতিভার টি গাঙ্গুলী এবং কালীঘাটের বলই ব্যানাজী হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্য ফলাফল হল কালীঘাটের ৮-১ গোলে টালীগঞ্জ অগ্রগামীর বিপক্ষে জয়লাভ। কালীঘাট এবং টালীগঞ্জ দলের মধ্যে প্রথম দিনের খেলা অসমীমার মাঠে শেষ হয়।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অনায়াসে বাটার ৪-০ গোলে পরাজিত করে পৌঁচ গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। খ্যাতনাম খেলোয়াড় আফজল মরশুমে এই প্রথম খেলায় অংশ গ্রহণ করে উইথড্রন সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মার্ভেকা প্রত্যাগত নষ্ট্রম এইদিন খেলার অংশগ্রহণ করেন নি। হাওড়া ইউনিয়ন এবং কটক কম্বাইন্ডের খেলায় শেষে মাঠে কিছুটা গোলযোগ হয়। একটি বিতর্কমূলক পেনাল্টিতে গোল দিয়ে হাওড়া ইউনিয়ন ২-১ গোলে জয়ী হয়। পেনাল্টির সিদ্ধান্তে কটক দলের খেলোয়াড়েরা রেফারীর কাছে প্রতিবাদ করেন। খেলার শেষে একদল উত্তেজিত দর্শক রেফারী এবং লাইন্সম্যানকে ঘিরে ধরেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রেফারী এবং লাইন্সম্যানদের নিরাপদেই ভাবতে প্রত্যাবর্তন করেন।

নির্বাচনী বিশ্লেষণ

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট জগতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। ব্রায়ান ক্রোজ অধিনায়ক পদচ্যুত হয়েছেন এবং সুগে সগে টেস্টদল থেকেও বাদ পড়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব করবেন কলিন কাউড্রে। সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল যখন ইংল্যান্ডের মাঠে, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের মান-সম্মান ক্ষেতে বসেছিল সেই সময় প্রবীণ খেলোয়াড় ব্রায়ান ক্রোজ নিলেন অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব। শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে ব্রায়ান ক্রোজ ইংল্যান্ডকে ভরাডুবি থেকে বাঁচালেন। সেই ক্রোজ এরপর ভারত এবং পাকিস্তানের বিপক্ষেও যোগ্যতার সন্ধ্যা অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করলেন। এ পর্যন্ত সাতটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে জয় এবং একটিতে ড্র এই হল ক্রোজের স্বল্পকালীন টেস্ট অধিনায়কত্ব জীবনের রেকর্ড।

অল্প কয়েকদিন আগে ইয়র্ক স্যার এবং ওয়ারউইক স্যারের খেলায় ইয়র্ক স্যারের অধিনায়ক ক্রোজ না কি ইচ্ছাকৃতভাবে খেলা ছ' করার চেষ্টা করেন এবং একজন দর্শককে কলার ধরে মারতে বান। ক্রোজের এই আচরণের অবশ্য খুবই বিরূপ সমালোচনা হয়। শ্রুতমাত্র এই ঘটনার জন্য ক্রোজকে এই শাস্তি দেওয়া লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেবারই সামিল। ক্রোজ অবশ্য বলেছেন যে তাঁর আসা ছিল দলের অধিনায়ক হওয়া, বাদ পড়ে তিনি নিরাশই হয়েছেন।

নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যরা ক্রোজকে নেতৃত্বদানে রাজী থাকলেও, এম সি সির পূর্ণ কমিটির অন্যান্য সভ্যদের তাঁর প্রতিবাদের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

অতীতের ব্যাটনামা ক্রিকেটের কিথ মিলার ডেলী এক্সপ্রেসের পাতায় ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তাদের তাঁর সমালোচনা করেছেন। অন্যান্য সংবাদপত্রেও মিলারের আক্রমণকে অনুসরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ডেরেক আন্ডারউড এবং জিওফ আর্নল্ডের দলভুক্তি না হওয়াও যথেষ্ট কিস্মির সন্ধান করেছে। এই দল দেখে কিন্তু ইংল্যান্ডের ক্রিকেট পাণ্ডিতরা তেমন আশাবাদী নয় এবং প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সংক্রামক ব্যাধি

ইংল্যান্ডের ফুটবল মাঠেও দেখাছি অব্যব দর্শকের অভাব নেই। আমরা শুধু আমাদের খেলার মাঠের সবুজ গ্যালারীর অব্যব দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হই। অবশ্য একথা ঠিক যে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ খেলার মাঠের আনন্দকে বহুমাংশে ক্ষুণ্ণ করে। এ বছর কলকাতা ময়দানে ফুটবলের আসরে প্রায় শব্দ থেকেই এক ভ্রূণীর দর্শকের অসভ্য আচরণ খুবই চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল, কিন্তু সূত্রের বিষয় যে বর্তমানে অবস্থা শান্ত আছে, অবশ্য একটা বিস্ফোরণ ঘটতে আর কতক্ষণ?

ইংল্যান্ডের ফুটবল লীগ অলপ কিছুদিন হল শব্দ হয়েছে। কিন্তু শব্দতেই শব্দ হয়েছে দর্শক-হাঙ্গামা। আর সংক্রামক ব্যাধির মত এই গণ্ডগোল



ব্রায়ান ক্রোজ

ইংল্যান্ডের এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে ছাড়িয়ে পড়ছে, পুলিশ হির্মাসি থেয়ে যাচ্ছে ঠেলা সামলাতে।

গত ২রা সেপ্টেম্বর বলতে গেলে ইংল্যান্ডের ফুটবল মাঠের ওপর দিয়ে বড় বয়ে গিয়েছে। অপ্রত্যাশিত ফলাফল; নামজাদা দলের পরাজয় এবং বিভিন্ন মাঠে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। টটেনহাম হটস্পার, চেলসা ইংল্যান্ড ফুটবলের অন্যতম সেরা দল, এদের শোচনীয় পরাজয় গোলযোগের মাধ্যমে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেফিল্ড ওয়েডনেসডে এবং সেফিল্ড ইউনাইটেডের খেলায় গণ্ডগোলে পাঁচজন দর্শক গুরুতর আহত, লীডস আর ফুলহামের খেলায় দু'জন দর্শকের আঘাত

মারাত্মক। এ ছাড়া চেলসার মাঠে, টটেনহামের খেলায় আর ম্যাগেস্তার ইউনাইটেডের খেলাতেও খণ্ডবৃদ্ধ।

ম্যাগেস্তারের প্রায় দুই দল সমর্থক হঠাৎ ঠিক করে বসেন যে চীনা দুতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। চীন-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে বান। মনে হয় ম্যাগেস্তার দলের জয়ে পূর্নকিত ওই সমর্থকবৃন্দ আনন্দের চোটেই চীনা দুতাবাসের দিক হাটা দিয়েছিল।

স্কুলের ছেলেরা কি করেছে

ইংল্যান্ড সফর শেষে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটদল গত ১লা সেপ্টেম্বর সকালে বোম্বাইয়ে বিমান থেকে অবতরণ করেন। দলের ম্যানেজার হেমু অধিকারী দলের সকলের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে খুবই গৌরবের কথা যে ইংল্যান্ডের আবহাওয়া এবং পরিবেশের মধ্যে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে এই স্কুলের ছেলেরা। স্কুল দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান লক্ষ্ম সিংয়ের উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা করেন তিনি।

এই দিনই বোম্বাই থেকে বিমানে কলকাতা এসে পৌঁছন ভারতীয় স্কুল দলের বাংলার দু'জন খেলোয়াড় রাজা মৃধাজী এবং দীপঙ্কর সরকার। সি-এ-বির পক্ষ থেকে বিমান বন্দরে উপস্থিত থেকে এঁদের মালাভূষিত করেন শ্রী এন, সি, হালে।

পরে এক স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকারে রাজা এবং দীপঙ্করকে প্রশ্ন করলে তাঁরা আমাকে জানান যে তাঁদের দলীয় কৃতিত্ব একমাত্র ম্যানেজার হেমু অধিকারীর জন্যে। দীপঙ্করকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে ইংল্যান্ডের উইকেটে বল করে তিনি খুবই আনন্দ পেরেছেন। কারণ ইংল্যান্ডের উইকেটে তাঁর বল লিপন করেছে অনেকটা করে। রাজা বলেন যে রোজ খেলার প্রায় এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে তাঁদের ফিল্ডিং অনুশীলন করতে হত। লর্ডসের মাঠের স্মরণীয় খেলাটিতে তাঁরা একটি ক্যাচও নষ্ট করেন নি। রাজা এবং দীপঙ্কর জানান যে ইংল্যান্ডে তাঁরা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন সর্বত্র। অবশ্য ইংল্যান্ডের কাগজগুলো তেমন কোন গুরুত্ব দেয় নি তাঁদের সফরের ওপর।

পরিচয়

শান্তিপ্রিয় বঙ্গোপাধ্যায়

একদিন ছেলের কাছা ভুলোতে, ছেলের মুখে হাসি ফুটতে বাবা যে রবারের বলটা কিনে দিয়েছিলেন, সেই রবারের ছোট বলটা দিয়েই ফুটবল খেলার হাতে-খড়ি হয়েছিল কলকাতা ময়দানের এখনকার দুই নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়ের।

রামানাই ছিলেন দাদা আর পাপ্পানা তাঁর ছোট ভাই।

মা নেই, তাই বাচ্চা পাপ্পনাকে সামলাতে বাড়িসুদ্ধ সকলেই অস্থির। তার কাছা থামাতে, তার মুখে হাসি ফুটতে সকলেই হিমসিম খেয়ে যান। কিন্তু মায়ের অভাব পূর্ণ করা কি আর অতোই সহজ!

তবু সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে বয়েস বাড়তে পাপ্পানার। সেই সঙ্গে মনের কোণে বাড়তে থাকে মা-কে না-পাবার দুঃখ। ছেলে সামলাতে নাজেহাল হয়ে ওঠেন সকলে! কে যে কি করবেন ভেবেই পান না!

আর সেই সময়-ই পাপ্পানার বায়না ভুলোতে ওয় বাবা এনে দিলেন একটা রবারের বল। ছোট বল, খেলোয়াড়ও ছোট! পাপ্পানা বল খেলার নতুন স্বাদ পেয়ে যেতে উঠলো। সঙ্গে তার দাদা রামানাই।

কিন্তু সেদিন কি আর কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে রবারের বলে সেই দুই বাচ্চা খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়-জীবন শুরু হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁরাই একদিন ময়দানী ফুটবলের আসরে হাজার হাজার দর্শকের মন ভুলোবেন! তাঁদের নয়নাভিরাম ক্রীড়া-ছন্দে ছন্দিত হবে ক্রীড়াঙ্গন। তাঁদের প্রশংসার কলতানে মূর্খারিত হয়ে উঠবে মাঠ-ময়দান!

অথচ কতই বা বয়েস পাপ্পানার। মাত্র একশ। জন্ম ১৯৪৬ সালের জুন মাসে—মহাশূরের চেমিজতে! কিন্তু অল্প বয়সেই পাপ্পানা কড়িয়েছেন অভাবনীয় সম্মান! ফুটবল প্রতিভাই তাঁকে এনে দিয়েছে সম্মানের পর সম্মান!

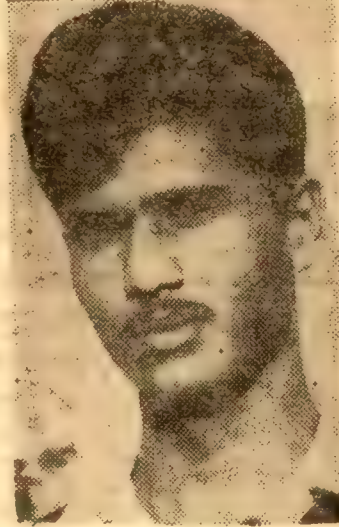
আব পাপ্পানার ভাগ্যে এ সম্মান জুটছে সেই স্কুল-জীবন থেকেই। রবারের বলে খেলতে খেলতে হঠাৎ একদিন পাপ্পানার পায়ে এল চামড়ার বল! তখন সে স্কুলের ছাত্র। শূন্য তাই নয় দেখতে দেখতে সে হয়ে গেল স্কুল দলের খেলোয়াড়—সেরা খেলোয়াড়!

ফলে স্কুলের ছেলে পাপ্পানা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে খাঁটি ফুটবলার হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠল আশে-পাশের

বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। অথচ ঠিকমত খেলা শেখার সুযোগ তার তখনো হয় নি।

১৯৬৩ সালের কথা। পাপ্পানার তখন বয়েস সতেরো বছর। মহাশূরের কে, আর, মিলস্ দল পাপ্পনাকে নিজেদের দলে খেলার জন্য আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে পাপ্পানার সামনে খুলে গেল আর এক জগতের স্বার, ফুটবল রণ-মণ্ডির দুয়ার!

পাপ্পানা সেই বছর-ই এলাহাবাদে গেল জাতীয় ফুটবলের স্ব-বিভাগে মহা-



পাপ্পানা

শূর দলের পক্ষে খেলতে। মহাশূর সেবার দিল্লীর সঙ্গে বৃন্দ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছিল।

পরের বছর পাপ্পানা পেল আরো বড় সম্মান। মহাশূর রাজ্য দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেল পাপ্পানা! রাতারাতি যোগ্য সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। ১৯৬৪ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাই পাপ্পানা ছিল মহাশূরের রাজ্য দলের খেলোয়াড়।

আর তার পরের বছরই পাপ্পানা পা বাড়াল ভারতের সেরা ফুটবল রণাঙ্গন কলকাতা ময়দানের দিকে! কলকাতা

ময়দানে সে খেলতে আরম্ভ করল মহা-মেডান স্পোর্টিং দলের জার্সি গায়ে দিয়ে।

তবে সে বছর কলকাতা ময়দানে এই তরুণ খেলোয়াড়টিকে বিশেষ একটা খুঁজে পাই নি। কথায় বলে কলকাতার মাঠ-গুলোর ঘাস চিনতেই নাকি বাইরের খেলোয়াড়দের পুরে। একটা বছর লাগে।

কিন্তু রহিম সাহেবের আশা পূরণে না-পূরণে আর কলকাতা মাঠের ঘাস চিনতে-না-চিনতে পাপ্পানা চলে গেল বাঙ্গালোরে। ১৯৬৬ সালে বাঙ্গালোরের সি-আই-এল দলে খেলল পাপ্পানা। কিন্তু সেখানেও একটি বছরের বেশি মন টিকল না তার।

১৯৬৭ সালেই পাপ্পানা আবার ফিরে এল কলকাতায়—তার পুরনো দল মহা-মেডান স্পোর্টিং-এ। আর এক বছরেই যে কলকাতার মাঠগুলোকে সে বেশ ভাল-ভাবেই চিনে গিয়েছিল তার প্রমাণ প্রথম ডিভিশনের বিভিন্ন খেলায় তার উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য!

অনেকদিন পরে মহামেডান স্পোর্টিং আবার এসেছে কলকাতার ফুটবল লীগের 'লাইম লাইটে'। লীগের খেলায় এবার তারা হিরো। আর মহামেডান স্পোর্টিং দলের হিরো হলেন পাপ্পানা! আজ বোধ হয় একথা আর কেউই অস্বীকার করবেন না যে মহামেডান স্পোর্টিং দলের এই সাফল্যের পেছনে আছে তাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড পাপ্পানার অবিস্মরণীয় অবদান।

পাপ্পানার খেলা দেখে এখন আর মনে হয় না যে তরুণ পাপ্পানার খেলায় আছে তারুণ্যের এতটুকুও ছোঁয়া। তার খেলায় আমরা দেখছি বৃদ্ধিদীপ্ত খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা।

তাই আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে মহাশূরের কোচ ব্যাসার পাপ্পানার মধ্যে ফুটিয়েছেন বসরাই গোলাপ। আর সেই গোলাপের গন্ধে কলকাতা ময়দান আজ ম-ম করছে!

আর আমরা খেলার মাঠে অবাক-বিস্ময়ে একুশ বছরের ছেলের খেলায় দেখি দুরন্ত গতি, দেখি বল দেয়া-নেয়ার সঙ্গে জোরাল শট ক্লার চিলের মত ছোঁ মেয়ে হেড দেবার কায়দা। আর এতদিন ধরে দেখছি মহামেডান স্পোর্টিং দলের মূল নায়ক পাপ্পনাকে একের-পর-এক গোল দিয়ে মহামেডান স্পোর্টিংকে আজকের এই সাফল্যের পথে টেনে আনতে।

আজকের এ সাফল্য শূন্য মহামেডান স্পোর্টিং-এরই নয়, এ সাফল্য পাপ্পানার-ও।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

(১)

শ্রীমত্তগব্গীতা :

(মূল, বাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহনিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়।
বিশুদ্ধ সংস্করণ। জ্বলন্ত বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমত্তগব্গীতা
যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের
সারাংশ। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত,
জীবনমুক্তি, ষড়্জ, হংস, নকি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী,
সর্বশ্রোত্রী, রাম, পরাশর, শাস্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য,
গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাম, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি
গীতার সমাহার, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য
গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, মন্ব্যাস, নীলরত্ন,
চুলকি, আরাণ্যক, কঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আশ্ব, ঘটচক্র,
ভৃগু, শিফা, বৃদ্ধবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়া-
তীত, বাহুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়,
পাণ্ডপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন গরুড়, শ্রীরামপূর্ব-
তাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগিরুজ,
যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তর-
তাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও
অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—
৪-০০ টাকা।

ছানোগ্য-উপনিষদ :

সামবোধের তাণ্ড্যশাখার ছানোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত।
মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ।
শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ।
তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সহনিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে
বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহাশি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ ম্খোপাধ্যায় অনুদিত।
সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।
মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহাশি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০
টাকা।

জৈমিনির নীমাণো-দর্শন :

৥ পরমহি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—পারমর্থ সূত্র, পূর্ব নীমাংসা,
বেদার্থবিচার, ধর্ম নীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতর, জৈমিনি
সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামী ভাষ্যের ভাবার্থ-
নুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্রোত-
বাত্তিক ও তত্ত্ববাত্তিক টাকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত
পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনুদিত
নুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—
৮-০০ টাকা।

শ্রীশঙ্কর-দর্শন :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের বক্তব্য-
কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পরম্পর
প্রভৃতির ব্যাপ্ত সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্র, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাসনতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতন্ত্র-প্রদীপিকা-সহনিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, বাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত
বৃহদায়তন দ্বন্দ্বিত গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার
নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। কাপড় ও
বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল
বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বামীরাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ
জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 14th September, 1967

SAPTANIK BASUMATI

Regd. No. C71

PRICE : 25 PAISE

GRAM : "BASUMATI"

PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

15 SEP 1967



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের স্বপ্ন নিয়ে পোষান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের স্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপূর্ণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসার্বনায়ে অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৬

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (মণ্ডন)

এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর

কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র!

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,

এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)

আয়ুর্বেদচর্চা



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

সাপ্তাহিক বসুমতা

কলকাতা ও হাওড়ার বিগত
সপ্তাহের একটি চিত্ররূপ



সংখ্যা : ১৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

21st Sept., 1967 * Vol. 72 No. 1



...কিন্তু, এক বিষয়ে আপনি নিশ্চিত -

বোরোলীন

-কাটি-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শূকনো, খস-খসে কিংবা বর্ণহীন হুকব
যে কোন বিভ্রাটে-বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক, ক্রিম।

বোরোলীন হ্যান্ড স্যানিটাইজার



বিষয়	লোক						পৃষ্ঠা
মঙ্গলাদকাঁঠ	১০০	১০৫	১০৮	১১০	১১৫	১১৮	৮৯৯
জাহ্নবীর আনন্দ	১০৫	১০৮	১১০	১১২	১১৫	১১৮	৯০০
মঙ্গলদর্শন	১০৮	১১০	১১২	১১৫	১১৮	১২০	৯০১
জব্বার	১০৮	—	চন্দ্রদেব	১১৫	১১৮	১২০	৯০৬
মরাত্মক (কবিতা)	১১০	—	শঙ্কর চক্রবর্তী	১১৫	১১৮	১২০	৯০৭
মরে ফেরা (কবিতা)	১১২	—	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	১১৫	১১৮	১২০	৯০৭
মৃত্যুশয্যা (অনুবাদ-কবিতা)	১১৫	—	অক্ষয়কুমার চন্দ্র	১১৫	১১৮	১২০	৯০৮
ভারতদর্শন	১১৮	১২০	১২২	১২৫	১২৮	১৩০	৯০৯
আন্তর্জাতিক	১২০	১২২	১২৫	১২৮	১৩০	১৩২	৯১০
বিশ্বনাথিত্যের আদিশব	১২২	—	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১২৫	১২৮	১৩০	৯১৬
অর্থ-মানব (কবিতা)	১২৫	—	সুকুমার মুনোপাধ্যায়	১২৫	১২৮	১৩০	৯১৮
পদ্মলিয়ার চিঠি	১২৮	—	অপরাজিতা সোম্পী	১২৮	১৩০	১৩২	৯১৯

আগামী শতাব্দীর নতুন সাহিত্য

- ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ—স্বর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫৭
 তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়—শুকসারী কথা (উপন্যাস) ৮৥
 সৈয়দ মুজিব আলী—পছন্দসই ৭৭
 জরাসন্ধ—লৌহকপাট (সম্পদ—চারিখণ্ড একত্রে। শোভন সং) ১০৭
 হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—পূর্বচল (উপন্যাস) ১২৭
 প্রফুল্ল রায়—কিন্নরী (উপন্যাস) ৫৭
 প্রফুল্ল রায়—পূর্ব-পার্বত্য (উপন্যাস) ১০৭
 সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—হিমালয়ের তিব্বতী তীর্থ ৩৥
 সৈনাক—সুবর্ণশেখর তীরে (উপন্যাস) ৫৥
 হিরণ্ময় ভট্টাচার্য—মঙ্গলমুখ (স্মরণচনা) ৪৥
 কুমুদরঞ্জন মল্লিক—কুমুদ কাব্যসম্ভার ১০৭
 বৈলোক্যনাথ মুনোপাধ্যায়—বৈলোক্য রচনাসম্ভার ১০৭
 উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০৭
 আশাপূর্ণা দেবী—সেই সব গল্প ৬৭

বিমল কল্লের আশুতোষ মুনোপাধ্যায়ের শঙ্কু মহারাজের
 ষাটুকর ৫৥ সাঁঝের মল্লিকা ৫৭ গিরিকান্তার ৯৭

মিঃ ও বোম্ব : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ : ৩৪-৮৭১১



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অশ্বিনমুগের একটি অভিযান	— অনন্ত সিংহ	১২২
রিদ্যা হাউলীর বৃত্তান্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬
মা দেখেছি, যা পেরেছি (স্মৃতিচরন)	— সুধীরজন দাস	১২৯
নদী জগন্নাথ (প্রমথ-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১৩২
দরবীচিকা (গল্প)	— অচ্যুৎ গোস্বামী	১৩৬
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	১৩৯
রূপসমুদ্র—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পালি	১৪৪
আকাশবাণী-পরিচয়	— মেঘদূত	১৪৭
কবোক্ত হৃদয় (কবিতা)	— প্রবীর চট্টোপাধ্যায়	১৪৮
রূপজগৎ	— ...	১৪৯
কেউ শেষে কেউ শেষে নয়	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৬
খেলাহুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৫৭

বিভাদায়ের বই

মোহিতলাল মজুমদারের

সাহিত্য-বিচার

৮-৫০

কবি শ্রীমধুসূদন

১০-৫০

বাংলার নবযুগ

৮-০০

সাহিত্য-বিতান

১-৫০

বন্ধু-বরণ

৬-৫০

রাজকুমার মদ্যোপাধ্যায়ের

শুভ ও কলেকের

০-৭৫

গ্রন্থাগার পরিচালনা

০-৭৫

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা

১-০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন

২৫-০০

ভূজগভূষণ ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন

১০-০০

সংকলন

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র

৬-০০

নামস্মরণ চৌধুরীর

সাহিত্য ও সমাজ-মানস

৬-০০

ভোলানাথ মদ্যোপাধ্যায়ের

লেখকদের প্রেম

০-০০

কপিল ভট্টাচার্যের

বাংলা দেশের নদ-নদী

৮-৫০

ও পরিকল্পনা

৮-৫০

আলমারী প্রকাশ

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

১৯০৫-১৯৪৭ বিপ্লবাব্দে লেখার স্মৃতিচরিত্র

বিপ্লবের সন্ধানে ১৩-০০

প্রমোদ মিত্রের

অত্যাধুনিক রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা উপন্যাস

গোয়েন্দা হালে

পরশুর বর্মা ৪-৫০

অনন্ত সিংহের লেখনীতে

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

নগেন্দ্রনাথ সোমের বহুপ্রদত্ত নাম মহাগ্রন্থ :

মহাকবি মধুসূদনের বিস্তারিত জীবনী

মধু-স্মৃতি

পূর্ব প্রকাশিত

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচরিত্র

চলমান জীবনঃ প্রথম খণ্ড ৫-০০

মণীশ ঘটকের উপন্যাস

কনকল ৭-০০

উপন্যাস ও গল্প

ব্রজনাথ ভট্টাচার্যের

মধুস্মৃতি ৩-৫০

সুশীল জ্ঞানার

বেলাভূমির গান

৬-০০

সুধাশ্রম

০-৭৫

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের

পদুমিকা

০-২৫

সুধীর করপের

অরণ্যপদুম

৪-০০

উপন্যাস ও গল্প

ব্রজনাথ ভট্টাচার্যের

মধুস্মৃতি ৩-৫০

সুশীল জ্ঞানার

বেলাভূমির গান

৬-০০

সুধাশ্রম

০-৭৫

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের

পদুমিকা

০-২৫

সুধীর করপের

অরণ্যপদুম

৪-০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে

মীর আশ্রানের অমর কাহিনী

চাহার দরবেশ

০-৫০

বেদাইনের

পথে প্রান্তরে

[প্রথম পর্ব ০-৫০ দ্বিতীয় পর্ব ৪-৫০]

সুশীল জ্ঞানার

মধুস্মৃতি ৩-৫০

বেগম-নাঈম ফারুকাইন

০-৫০

শ্রীমন্তের

নাম তার রূপসী

০-৫০

আনা লাইস্ স্ট্রং-এর

দুর্ভাগ্য নদী [অনুবাদ]

৪-৫০

গুণময় মাস্তার

লখীন্দর দিগার

৫-০০



৭২ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা—মূল্য: ২৫ পয়সা
মঙ্গলবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 21st September, 1957

দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাওয়াই

কেন্দ্রীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন—তিনি মূল্য, মজুরী ও মুনাক্কা বেধে দেবেন। কিন্তু উপ-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। কারণ তাঁর সাদিচ্ছার মূলে হুতারাবাত করেছেন সামান্য কেরানীরাই গুরুত্ব নয়, বাবা-বাবা শিল্পপতিবা ও মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য। বলা বাহুল্য, এদেশে মুনাক্কা বেধে দেওয়ার ব্যাপার স্বপ্নেরও অগোচর। যাদের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয় বলে শোনা যায়, তাঁদের আঁতে যা দিতে পাববে—এমন সং সাহস আছে কার?

শ্রীদেশাই-এর ঘোষণা অঙ্কুরে বিনষ্ট হলেও তিনি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন; সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাধ্যতামূলক আমানতের পরিকল্পনাটি প্রসারিত হয়েছে এবং যৌথ কারবার কর্তৃক আদর-আপ্যারন বাবদ কর-রহিত ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্যে দমদম দাওয়াই-এর পর আইনঘটিত যে দাওয়াই-এর আশা করা হয়েছিল, তা না থাকায় মুনাক্কা কিংবা মজুরী কিছুই দায়িত্বভার ১৩ই সেপ্টেম্বরের অর্ডিন্যান্সে বেধে দেওয়া হয় নি। সুতরাং আমরা যে ভিত্তিতে ছিলাম, শ্রীদেশাই-এর বহু-দুর্ভাবিত প্রতিশ্রুতির পব আমবা সেই ভিত্তিরেই থাকলাম।

ব্যর্থপতি অন্য একটি অর্ডিন্যান্স দায়ী করেছেন ১৬ই সেপ্টেম্বর। অর্ডিন্যান্স জারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা। ওতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের ভোগ্যবস্তু

অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান বজায় রাখার ও সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে সরকার আইনের বিধান কঠোরতর করার সিদ্ধান্ত করেছেন। অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সংশোধনে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ভঙ্গ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার অপরাধই আদালতের এস্তিয়ারখীন ও জামিনের স্বেচ্ছায় হবে। অপরাধীর সম্মানে ও স্বেচ্ছায় অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য অপবাদের গুরুত্ব নির্ণয় করা হবে। অর্ডিন্যান্সের নির্দেশ লঙ্ঘন করলে তপরাধীর মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। অপরাধের জন্যে অপরাধীর শাস্তির মেরাদও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অর্ডিন্যান্সের মূল বসান আমাদের হাতে না থাকলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরটুকু পড়েও জনসাধারণের পক্ষে উজ্জিসিত হবার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ অত্যাবশ্যক জিনিসগুলির মান ও মূল্য বতর্কণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা ন্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্ডিন্যান্সকে তরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে। এই অর্ডিন্যান্সেও মজুরী সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। শিল্পপতিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের মজুরী হ্রাস কবতে বাধ্য করবে এবং গম্ভ্যাগেলেব সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের কারবার করে এবং অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান যা অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—উভয় জাতীর প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে এবং এর সুদূরপ্রসারী ফল হওয়া সম্ভব নয়।

এতাবৎকাল আমাদের সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে অনেক হেঁচ-চৈ করেছেন। কিন্তু যে সরকারের রাজনৈতিক দলটি কাজকর্ম চালাবার জন্যে ধনিকের অর্থ ওপর নির্ভর করে সেই সরকারের পক্ষে কি মুনাক্কালাভীদের অসন্তুষ্ট করা সম্ভব। অথবা দেশে কংগ্রেসের বতমায় বা অবস্থা সেই দুঃবস্থা থেকে বাঁচবার জন্যে এটা একটা নামমাত্র দাওয়াই এমন ধরনের সংশোধনী বৈশ্বিক অর্ডিন্যান্স জনগণের মন্থরোচক হবে, সরকারে মন্থরোচক করবে—এর বেশি কিছু হতে বলে আমরা মনে করি না।

তবে বোধ হয় দেশে পণ্যদ্রব্য গড়া গড়ি বাবে—যদি শ্রীমোবারজীর কথা বৈদেশিক ব্যবসায়ীদৃষ্টি এদেশে মূলধন নিয়োগের জন্যে হস্ত প্রসারিত করে। এদেশের মাটিতে নাকি বৈদেশী ফসল ভালই ফলবে। ফলবে বলেই শ্রীদেশাই 'ভবে অব আমেরিকা' মারফৎ এমন কথা বলতে পেরেছেন, বৈদেশিক মূলধন জুটলে এদেশ খাদ্যে ১৯৭১ সালের মধ্যে স্বাবলম্বী হবে।

আমরা এতকাল সরকারী কর্তাব্যক্তির মধ্যে শব্দে এসেছি যে, আমরা ১৯৭০-এর মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী হব। এক বছর যদি বেশিই লাগে আপত্তি নেই। কিন্তু মাঠের ফসল বৈদেশিক দ্বারা শোষণ করতে গিয়ে শেষ হলে বৈদেশীর পেট কি ভরবে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

...যখন যেদিকে চাই, তোমার করুণা-রাশি কেবলই দেখিতে পাই—কথাটা জর্জ রোম্যানির মত আর কেউ যেন উপলব্ধি করতে পারে না। আমেরিকা?—সে তো ইশ্বরের ইচ্ছায় আবিস্কৃত হয়েছিল। ইংরেজরা?—ভায়া তো এখানে বসতি স্থাপন করেছিল ভগবানের নির্দেশে।—সংবিধান? সেখানে তো ভগবানের ইচ্ছা রূপ পেয়েছে। সংবিধান সংশোধন অবশ্যই অনুচিত, তবে তার মধ্যেও ইশ্বরের ইচ্ছা নিশ্চয়ই রয়েছে। আজকের দিনেও, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও এ-ধরনের চিন্তা-ধারা মানুষের রয়েছে। আর রয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দুনিয়ার আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবং এমন একজন লোক বিশেষ করে এ-বিশ্বাস আঁকড়ে রয়েছেন যার হাতে রয়েছে রাজদণ্ড, রাজনীতি যার পেশা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ-রাজ্য মিচিগানের গভর্নর, আবার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট পদলাভের জন্যে যিনি প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেতে চাইছেন। ইনি সেই জর্জ রোম্যানি।

জর্জ রোম্যানি সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমন এক উক্তি করেছেন যে ফলে সারা দেশে বিবম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রোম্যানি বলেছেন যে ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন সৈন্য তার মগজ খোলাই করেছিলেন। এ-উক্তি শুনে কর্তব্যাসিরা তো বটেই তার মনের অনেক দায়িত্বশীল নেতাও চটেছেন। তাঁদের ক্ষোভের কারণ হলো রোম্যানির মত একজন নেতা, যিনি প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী হতে চলেছেন তার এ-ধরনের উল্টো-পাল্টা কথা বলা শোভন হয় নি। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যের গভর্নর ভিয়েতনাম সফরে যান সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করার জন্য। সেদিন ফিরে এসে রোম্যানি বলেছিলেন যে, ভিয়েতনামে লড়াই করা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন পথ নেই। অর্থাৎ দু বছর আগে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনী হস্তক্ষেপের উগ্র সমর্থক ছিলেন। আর আজ তিনি বলছেন যে, সেদিন তার মগজ খোলাই করা হয়েছিল বলেই ও-কথা বলতে বাধ্য

হয়েছিলেন; আসলে তিনি ন্যাক মনে করেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়া মোটেই উচিত হয় নি।

মত পরিবর্তন হতেই পারে, আজ যাকে সত্য বলে জানি, কাল তা অসত্য প্রমাণিত হতে কে না দেখেছে? জর্জ রোম্যানির দু বছর আগে যাকে ঠিক ও ন্যায় বলে মনে হয়েছে, দু বছর বাদে তাকেই ভুল ও অন্যায় বলে বিশ্বাস জন্মাতে বাধাই বা কোথায়? কিন্তু তবুও রিপাবলিকান দলে তার ক্ষোভের সঞ্চার



হয়েছে তার 'মগজ খোলাই' উক্তি শুনে। অনেক নেতা এত ক্লেশ হয়েছেন যে, তাঁরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে, রোম্যানিকে দলের মনোনয়ন দেওয়াই হবে না। এ-সমালোচনা তার কানেও পৌঁছেছে, তাই নিজেকে একটু সংশোধন করে নিয়েছেন তিনি। পরে আর একটা সাংবাদিক সম্মেলনে রোম্যানি বলেছেন যে তার মগজ খোলাইটা জনসনীর কার্যদক্ষ হয়েছিল, ঠিক রুশ কার্যদক্ষ নয়।

শেষ পর্যন্ত রোম্যানি দলের মনোনয়ন পান কি না এখনই বলা-শক্ত, যদিও তার জারগায় গভর্নর নেলসন রকফেলারকে মনোনয়ন দেবার দাবি ইতিমধ্যেই উঠেছে।

জর্জ জনসাধারণের আভির্ভাব মূল্যে প্রবাববাক্য হয়েছে। তা যদি সত্য হয়, তবে রোম্যানি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতেও পারেন।

তা ছাড়া মার্কিন ভোটারদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তাও তো কম নেই। যেমন পূর্বদৃষ্টিতে চেহারা তেমনি বিস্তারিত চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ। এককালে আইসেন হাওয়ারের প্রিয়পাত্র হিসেবে লাখ লাখ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্মভীরু লোক বলেও সাধারণ লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন রোম্যানি। কাজেই ফল-সদস্যদের ভোট জুড়োবার জন্যে বিশেষ বেগ তাকে পেতে হবে না।

জর্জ রোম্যানির পরস্পরবিরোধী উক্তিতে আজ যারা ক্লেশ-ভরা হয়তো তার অতীত বিস্মৃত হয়েছেন। একদা তিনি ছিলেন মিশনারী, ধর্মপ্রচারক, তারপর পেশা পাণ্টে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ব্যবসায় অর্থ, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তার মধ্যে রোপণ করেছে ক্ষমতার প্রতি নেশা। অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়া ক্ষমতার মূল্য যে সীমাবদ্ধ এ-ধারণা তার মধ্যে বস্তুমূল্য হলো। কিন্তু আজ রাজনীতির পাঁকে আকৃষ্ট ডুববে থাকলেও রোম্যানির ধর্মভাব বিদায় নেয় নি। সব কিছুর মধ্যে এখনও তিনি ভগবানের অনিবার্য হস্তস্থানি অনুভব করেন। মিচিগান-এর গভর্নর পদের জন্যে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরুর হবার আগে রোম্যানি ২৪ ঘণ্টা উপবাস করেছিলেন; উপবাসের মধ্য দিয়ে তিনি ইশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন।

আমেরিকার বিখ্যাত এ্যাডমিনিস্ট্রাম কোম্পানীতে যোগদান করে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর মোটরের ব্যবসা করলেন, আমেরিকান মোটরস-এর প্রেসিডেন্ট হলেন। কিন্তু বৃহৎ ব্যবসায় দিকে তার ঝোঁক নেই, বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নও তার অপছন্দ। দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য আজকাল যে শ্রমিকরা সংগঠিত হচ্ছে এতে রোম্যানি খুবই আতঙ্কিত বোধ করেন। রোম্যানি সম্ভাব্য প্রচার আস্থাবান—তিনি চান সরকারী ও বেসরকারী শিল্পের সম্ভাব্য গড়ে উঠক।

মনোনয়ন চাওয়ার পর থেকে রোম্যানি প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরুদ্ধে খুব প্রচার শুরুর করে দিয়েছেন। মাত্র কয়েক দিন আগে জনসনকে তিনি 'রাজনৈতিক জীব বিশেষরূপে বিভূষিত করেছিলেন। কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও রোম্যানি দল্লব মনো-নয়ন পাবেন কি?



হাওড়া স্টেশনের বাইরে পুর্লিশের বেপরোয়া লাঠিচালনার কলে সন্তুষ্ট নিরীহ বাসিন্দা এমিকে-সেমিকে পারাচ্ছেন

হাওড়া স্টেশনের ঘটনা

পত্নী এই সেপ্টেম্বরের বঙ্গদর্শনে আমরা যে কথাটির ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলাম তা এক সপ্তাহের মধ্যে মর্মান্তিক-ভাবে বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। আমরা লিখেছিলাম, “যদি অবস্থা আর এমন দাঁড়িয়েছে যে, আপনি যদি ওই লোকসনের (হাওড়া) ট্রেনে চাপেন তাহলে কখন যে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছবেন তার কোনই স্থিরতা নেই। এর কলে যদি যাত্রী-সাধারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, রেলকর্মী ও ড্রাইভারদের মারধোর করেন তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। নানান কারণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানবের জীবনের তারসাল্য নষ্ট হয়ে গেছে, কলে অগ্নে উত্তেজিত সহজেই তারা হয়ে পড়ে। আইনসম্মত পথে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন লাভ নেই সে কথা যাত্রীরা হাড়ে হাড়ে বোঝেন, কাজেই তাঁরা বাঁকা পথে যে তুলতে চান। অফিসে সময়-মত হাজিরা দিতে না পারার কি কষ্টগা সে কথা কাউকেই বলিয়ে বলতে হবে না। অথচ তা যদি দিনের পর দিন ঘটে তাহলে যাত্রীসাধারণ কতদিন তা মনে বুঝে সহ্য করবেন?” (সাপ্তাহিক বঙ্গমতী, ১৩শ সংখ্যা, ২১শে ভাদ্র)।

ব্যাপারটি আরও আগে ঘটলে আমরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হতাম না। সমগ্র

বিষয়টির বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় কলমে যাত্রীদের অচিরগের নিন্দা করা হয়েছে, কেউ কেউ আবার ব্যাপারটির রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন, আবার কোন কোন কাগজে দেখাছি ফলাও করে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ছাপানো হচ্ছে (যদিও প্রত্যক্ষদর্শী মাঝেই সত্যের অপলাপ করেন বলেই আমাদের বিশ্বাস, কেন না তাঁরা যে ঘটনা দেখেন না তা নয়, তবে যখন তাঁরা তা বর্ণনা করেন তখন ঘটনাসমূহকে নিজেদের ধ্যান-ধারণার আলোকে কিয়দংশে যে বিকৃত করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই)।

ঘটনাটি অতিশয় সহজ ও সরল, যারা এই ঘটনাটির পিছনে কোন রাজনৈতিক মতলব বার করতে চাইছেন, বোধ হয় তাঁরা তা চাইছেন পেশাগতভাবে। ভিড়ের মধ্যে যদি কোন কংগ্রেস সমর্থক এই মণ্ডকার শ্লোগান দেয় যে, বৃক্ষফলট নিপাত যাক, বা যদি কোন নকশালপন্থী কমিউনিস্ট জ্যোতি বসু সুস্বখে অশালীন উক্তি করে কলে তাহলেই ব্যাপারটা রাজ-নৈতিক হয়ে যায় না।

একটি খুব সোজা কথা বলাছি। কলকাতার চোখ দিয়ে বঙ্গদেশ অবলোকন করা যায় না, বিভিন্ন সংবাদপত্রে হাওড়া স্টেশনের ঘটনা সম্বন্ধে বিবরণ দেখে এই কথাটা মনে হচ্ছে। মফস্বলের লক্ষ লক্ষ

মানুষকে বৃজি-রোজকরের জন্য প্রতিদিন কলকাতা যেতে হয়, কেন না কলকাতা ছাড়া অন্যত্র বৃজি-রোজকরের ক্ষেত্র সামান্য। তাঁরা যে কি অবস্থার বাতায়ত করেন সেটা কলকাতাবাসী সংবাদিকদের কম্পনার বাইরে, তবে যারা মফস্বল থেকে বাওয়া-আসা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই বোঝেন। ট্রেনে কলে আমরা বা যাবার সৌভাগ্য খুব কম যাত্রীই হয়, ট্রেনে যারা বর্ধমানে বা শান্তিপুরে ফিরবেন তাঁদের মেমারী বা রানাঘাটের আগে বসার সুযোগ হবে না, অর্থাৎ তাঁকে প্রায় পদ্মাশ মাইল পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে, প্রত্যহ নির্যমিত। এবং হুল স্টেশন থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে ট্রেন ছাড়ছে, সেখান থেকে গাড়িতে উঠতে না পারলে তাঁকে সারাটা পথ দাঁড়িয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ রানাঘাট থেকে যদি কেউ শান্তিপুরে লোকালে ওঠেন বা মেমারী থেকে বর্ধমান লোকালে ওঠেন তাঁকে সারাটা পথ দাঁড়িয়ে আসতে হবে। যাত্রীরা প্রতিদিনের এই কষ্টশাকে বহুদিন ধরে মেনে নিয়েছেন (রেল দপ্তরের উপাভ্যাসের সিংহভাগটা কিন্তু এই হতভাগ্যদেরই পকেট থেকে আসে)।

কিন্তু এই ধকলের পরেও যদি ট্রেন নির্যমিত না চলে? একদিন নয়, দুদিন নয়, সাতদিন নয়, বাসের পর মাস? যাত্রীরা যে এত দিন কি করে এ অবস্থা সহ্য

করে এসেছিলেন এটাই আশ্চর্য। আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম বিক্ষোভের ঘটনাই। গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনই তার প্রমাণ। আমাদের দেশে যখন হিংসার পথে না গেলে কথা কেউ কানেই নেবে না, তখন এইটাই হয়তো প্রকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু যাত্রীরা কতটুকু হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন? সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী তারা নাকি বেধড়ক ইটপাথর ছুড়েছিলেন, কিন্তু কাঁচের তৈরি রুট রীলে কেবিন থাকে কেন্দ্র করে এই সব ইটপাথর ছোড়াছড়ি হিঙ্গল বলে প্রকাশ, তার তো একটি কাঁচও ভাঙে নি? তাহলে হয় কাঁচগুঁড়ি বজ্রের তৈরি, না হয় ইটপাথর-গুঁড়ি সাবানের ফেনা দিয়ে গড়া।

সংবাদপত্রের ভাষা অনুযায়ী হাওড়া স্টেশন নাকি তখনই করে দেওয়া হয়েছে এবং রেলের সম্পত্তির নাকি বহু ক্ষতি করা হয়েছে। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের এইরূপ তছনছাকৃত রূপ কে দেখেছেন জানি না, তবে এই অধম বঙ্গদর্শন লেখক নিশ্চয়ই দেখে নি। চোদ্দটি প্রাটকর্মের একটি টিউবলাইট ভাঙে নি, একটি ঘড়িও নষ্ট হয় নি, একটি ফ্যানও বোঁকে যায় নি। সবগুঁড়িই বখারীটি সার্ভিস দিচ্ছে। প্রাটকর্মের প্রবেশ স্মারগুলির ওপরের কাঁচের ফ্রেমগুলিও সম্পূর্ণ অক্ষত। পাবলিক টেলিফোনের ঘরগুলির কাঁচের ময়লাগুলিও বখাপূর্ব্ব, টেলিফোনগুলিও স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। কোন জায়গায় কোন আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই। স্টেশনে যাত্রীরা সত্যিই হামলা করলে বা প্রথমেই ক্ষতি-গ্ৰস্ত হত তা হচ্ছে কাঁচের তৈরি জিনিস-গুলি, ঘড়ি ও অন্যান্য আসবাবপত্র। সবই অক্ষত পরিষ্কার স্বচ্ছ রইল, অথচ যাত্রীরা নাকি স্টেশনের সর্বনাশ করলেন এটা কি করে সম্ভব? তবে ক্ষতি যে একেবারে কিছু হয় নি সেটা অবশ্য বলা যায় না, তবে তা একান্তই গোপন।

আসলে কুকুরটাকে মারার আগে একটা বদনাম দাও, যাত্রীরা যা করে নি, তা তাদের ওপর আরোপ করে পেটাও এই নীতিই হাওড়া স্টেশনে আচারিত হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ বললেন, রেলের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, এবং যাত্রীদের ঘাড়ের সেটা আরোপ করার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য কোন কোন সাংবাদিক আবার সমাজবিরোধী লোকদের ঘটনাস্থলে হাজির করিয়ে দিলেন। তারা কি এই রকম একটা ঘটনা ঘটবে এটা আঁচ করে সময়মত রুট রীলে কেবিনের পিছন দিকের পাঁচিলের পিছনে আপেক্ষা করছিল, এবং লম্বা বাঁশ নিয়ে পোল ভন্ট দিয়ে টকাটক ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে গিয়েছিল? তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন হাঙ্গামার কেন্দ্র-স্থল আরও দক্ষিণে হাওড়া স্টেশনের দিকে

সরে এসেছিল তখন কিছু সমাজবিরোধী লোকের পক্ষে এই গোলযোগের সুযোগ নেওয়া অসম্ভব নয়।

আসলে একটি স্থূল সত্য যেটা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সেটি হচ্ছে এই যে, সকালের দিকে যত লোকাল গাড়ি হাওড়া স্টেশনে আসে সেগুলির যাত্রীরা সেই পর্যায়ে পড়েন যারা নিছক চাকুরী-জীবী ভদ্রলোক। এদের পক্ষে মারমুখী হওয়া কদাচ সম্ভব নয়, এবং জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এদের দ্বারা কখনোই সম্ভবপর নয়। আপনারা অবস্থানটি কম্পনা করুন। হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র আশ মাইল দূরে তিলধারপেঠে স্থান নেই এত পরিমাণ যাত্রী নিয়ে চার-চারখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই অবস্থার ধৈর্যচ্যুত হয়ে কয়েকজন যাত্রী রুট রীলে কেবিনের কতদূর কাছে এই বিলম্বের কৈফিয়ত দাবি করে থাকেন, তাহলে দোষের নিশ্চয়ই কিছু হয় নি। রেলরক্ষীদের ভয়ক থেকেই যে প্রথম আক্রমণ হয়েছিল এটাই সত্য। এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল, শেষ পর্যন্ত তারা পুলিশের হাতে বেদম মার খেল, তারা বুঝতেও পারে নি কোন অপরাধে তাদের এই শাস্তি।

বস্তৃত সেই দিনকার ঘটনার এইটাই সবচেয়ে বড় গ্রাজেডী। স্টেশনের অভ্যন্তরে ঘটনা ঘটান সময় পুলিশ নির্বিকার ছিল। এমন কি দুজন এম এল এ ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিগ্রহ দেখেও তাদের কোন কত'বা বোধ জাগে নি। দু' ঘণ্টা পরে তারা হঠাৎ কর্তব্যপারায়ণ হয়ে উঠল এবং পূর্ব্ব উদাসীনতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্টেশনের ভিতরে ও বাইরে তারা আর এক ভাঙব শব্দ করল, নিরীহ পথচারী থেকে শব্দ করে প্রেস-ফটোগ্রাফার পর্যন্ত কেউই পুলিশের লাঠিবাঁজির হাত থেকে রেহাই পেলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, বিষয়টির উদ্ভব হতে পারে। সে হরত একদিন হবে, তার রিপোর্টও প্রকাশিত হবে এমন সময়ে যখন এই ঘটনাটি বিশ্বস্তির অন্তরালে চলে যাবে। কিন্তু এই ঘটনার পরেও যে ট্রেন নিয়মিত চলেবে এমন ভরসা রেল কর্তৃপক্ষ দিলেও সে কথার যাত্রীরা নির্ভর করতে ভরসা পাচ্ছেন না। কাজেই বর্তমান ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবার বহু সম্ভাবনা এখনো আছে।

যাযা প্রসঙ্গ

আমরা দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গদর্শনে একটা কথা বার বার বলে আসছি যে আমরার দান না ওঠা পর্যন্ত সরকারের পক্ষে জোড়স্বাক্ষরের দর থেকে এক ছটাক চাল

আদায় করাও সম্ভবপর নয়। আউশ সংগ্রহেও সরকার সফললাভ করতে পারেন নি। কাজেই আপাতত যখন সরকার কিছুই সংগ্রহ করতে পারছেন না, তখন কতকগুলি আইন বজায় রেখে চালের খোলাবাজারকে পুরোদস্তুর কালো-বাজার করে রেখে দেবার সাধ'কতা কি? বস্তৃত প্রত্যেকেই চার টাকা কিলো দরে চাল কিনে খাচ্ছেন, কালোবাজার থেকে। এবং সরকারী আইনই এই কালোবাজার গুঁটির প্রধানতম সহায়ক। এখন যদি সরকার পুরনো আইনগুলি তুলে নিয়ে বা সেগুলির প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে খোলাবাজারকে রেশনের পাশাপাশি থাকতে স্বীকৃতি দেন তাহলেই স্বাভাবিক নিয়মে চালের দাম কমবে। তার ফলে মানবের জীবনে কিছুটা স্বস্তি আসবে। বস্তৃত যখন চাল বেশি দাম দিলে সবটাই পাওয়া যাচ্ছে, যখন পুলিশের নাকের ডগা কলকাতার রাস্তাভেঁই চাল ঢেলে বিক্রি করা হচ্ছে তখন এই ব্যবস্থাটাকেই আইনসিদ্ধ করে নিতে দেয়াটা কোথায়? কর্তন প্রথা এবং চেক-পোস্টগুলি তুলে নিলে এবং রেশনের পাশাপাশি খোলা-বাজার চাল হতে দিলে চালের দর যে বেশ কমে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লক্ষ্য করছি যে, কয়েকটি সংবাদপত্রে আমাদেরই বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। একটি দৈনিকে সম্প্রতি বলা হয়েছে যে রেশন এলাকা যখন কার্ভ মডিফায়েড রেশনিং এলাকার পরিণত হয়েছে তখন চালের খোলাবাজার চাল করতে আপত্তি কি? বস্তৃত এখন চালের খোলাবাজার চাল হলে লোকোনা চাল আলোর মত দেখাবে, যার সম্ভাবনা বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে একেবারেই নেই। শোনা যাচ্ছে মন্ত্রিসভাতেও ঠিক এই কথাই কেউ কেউ তুলেছিলেন, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে সে কথা অবশ্য আমরা জানি না।

আমর ওঠার পর খাদ্যনীতি কি হবে তা নিয়ে মন্ত্রিসভা এখনো পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ণয় করতে পারেন নি। অথচ এই বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক কালহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের অনুরোধ পূর্ব্বতন কংগ্রেস সচিবকে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুল বৃদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা না করেন। কংগ্রেস সরকার খুচরো চাল বিক্রি বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু চালের পাইকারী বিক্রয়ব্যবস্থা রক্ষা করতেন নি। সমাধান তো এই-খানেকই নিহিত। বৃদ্ধান্ত সরকার আগে থেকে আইন করে ধানচালের পাইকারী কারবার নিষিদ্ধ করুন, যাতে এই ব্যাপারে সরকারের একচেটিয়াধার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ না হতে পারে। আইন করে সরকার ছাড়া অন্য কাউকে চাল বিক্রি করা চলবে

না, এটা ঘোষণা করা হোক, এবং পাইকার-দের লাইসেন্স বাতিল করা হোক, এবং এই আইনভঙ্গকারীদের জন্য কঠোর দণ্ড ঘোষণা করা হোক। কিন্তু সোহাই, খুচরো বিক্রির ব্যাপারে সরকার যেন মাথা না গলান—তাহলেই সামালানো মুশকিল হবে। যে কোন মাদারী দোকান মারফৎই খুচরা চাল বিক্রি হোক। তফাৎটা এই হবে যে যারা আগে পাইকারদের কাছ থেকে কিনে চাল বিক্রি করত তারা সরকারের কাছ থেকে কিনে বিক্রি করবে। খুচরো বিক্রেতাদের ন্যায়সঙ্গত লাভে বিক্রির অধিকার দেওয়া হোক, এবং যেখানে তারা সরকারের কাছ থেকে চাল কিনে বিক্রি করবে সে ক্ষেত্রে অতি লাভের প্রভাব করতে গেলেই ধরা পড়বে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে স্টেট ট্রেডিং। আমাদের ধারণা আগামী মরশুমে সরকার যদি এই নীতি অবলম্বন করেন তাহলে চাল নিয়ে চালবازির মাদারীকালের ধুনীতির চির-সমাপ্তি অবসান ঘটবে।

হাইকোর্টে হামলা

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট ভবনে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা একান্তই অতৃপ্ত এবং নজীর হিসাবেও খুব বিপজ্জনক। ওইদিন হাইকোর্টের ফলস্বরূপে ঘেরাও সম্পর্কে ইনজাংশনের মামলাগুলির শুনানী ছিল। আদালতের কাজ শুরুর হবার আগে থেকেই বেশ কিছু লোক কোর্ট ঘরের মধ্যে বসে ছিল এবং ঘরের বাইরেও কিছু লোক জমায়েত করেছিল। প্রধান বিচারপতি ঘরে প্রবেশ করার সময় চারদিক থেকে তেলাগান উঠতে থাকে মালিক পক্ষের হালালী করা চলবে না, ইত্যাদি। বিস্মিত বিচারপতি তখন আদালতের আধিবেশন হলুতুবী রেখে দেন এবং মধ্যমস্তরী সপ্তে টোলমোনে যোগাযোগ করেন। ঘটনাস্থলে অবিলম্বে পুলিশবাহিনী প্রেরিত হয়, এবং হাইকোর্টের চারদিকে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

যারা এইভাবে ধর্মাত্মিকরণের মর্ষাদা করার করেছেন তাঁদের এই কাজকে হঠকাইতা ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ঘেরাও প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় প্রামাণিক স্বার্থের বিপক্ষে যাবে—তাহলেও এজন্য বিচারপতিকে দোষ দেওয়া যায় না, কেন না প্রচলিত আইন মেনেই তাঁকে কাজ করতে হবে। কাজেই বিচারপতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুধু নিরর্থক নয়, নিরুদ্ভিষ্টতারও পরিচায়ক। এভাবে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন না করে আইনপ্রণেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

করলে আমাদের কিছুই করার ছিল না। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ করেছেন সেই উদ্দেশ্যে সিন্দে হতে পারে ঘেরাও-এর অনুকূলে আইন পাশ করাতে পারলে। অর্থাৎ ব্যাপারটা আইনসভা ঘটিত, বিচারালয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার সার্থকতা কি?

প্রশ্নোত্তর

পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি কারখানার লক-আউট চলছে এবং ৪০টি কারখানাকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে দশ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে বসে আছেন এবং তাঁদের পারিবারিক

চরমতম দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় প্রথমন্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন যে যাতে ওই কর্মচ্যুত ব্যক্তিরা পুনরায় কাজে যোগদান করতে পারেন, এবং যাতে কারখানাগুলির বন্ধ দ্বারা আবার উন্নয়ন হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের উদ্যোগে পাঁচটি করে দ্বিগণাঙ্ক বৈঠক বসাবেন। যাতে উভয় তরফের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। প্রথমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টা বিলম্ব হলেও ভাল। পুজোর পূর্বেই এই বিষয়গুলির নিষ্পত্তি আমাদের কাম্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আমরা বঙ্গদর্শনে বহু পূর্বেই এই বিষয়ে প্রথমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কল্লুত হাটাই, লে অফ এ লক-আউট আজ দেশ-

॥ সম্মাধান ॥

কি এত ভাবছ? মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত:

আমার বলো না ভাই... পুজা এসে গেছে অলট এখনও কিছু কেনাকাটা করতে উঠতে পারি নি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ত জানই—কি যে ওদের পছন্দ তা বুঝানো উপায় নেই। এদিকে আমারও সময়ের অনটন।

এই কথা?

কথা নয় ভাই। আমার কাছে এটা একটা মস্ত সমস্যা।

সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে।

তুমি বলতে চাইছো কি?

আমি আর আমার প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই মফতলাল গ্রুপের সদস্য। সদস্যরা ডিজাইন এবং রঙের নানা রকমের কাপড় কিনেছি মফতলালের মনোনীত বিপণি থেকে—শাহাদী টোটারস, উত্তর কলিকাতার আর গড়িয়াহাট সোলাইটি, দক্ষিণ কলিকাতায়। ওখান থেকে কেনাকাটা করলে তুমিও খুশী হবে আর তোমার ছেলেমেয়েদের মুখেও হাসি ফুটবে।



মফতলাল

(নিউ শরক, নিউ চারনা, সাসন, মফতলাল ইত্যাদি)

প্রাপের দশটি মিলের কাপড়

সর্বদা মিলের নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায়

একবার মনোনীত রিটেল শো-রুমস্ :-

উত্তর কলিকাতায়

পার্বতী টোটারস

২এ, গিরিশ এভিনিউ (যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ ও ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ-এর সংযোগস্থলের নিকট), কলিকাতা-৩ (৫৫-৯৫০৮)

দাল রুট ১-২বি, ৯ এবং ৩২ নম্বর বাসে রাজকলতপাড়া স্টপেজে নামুন।

দক্ষিণ কলিকাতায়

গাড়িয়াহাট সোলাইটি

পি- ১২, গাড়িয়াহাট রোড, গোল পার্কের নিকট

কলিকাতা-২৯ (৪৬-৭৮০৮)

শেয়ার-হোল্ডারদের ৩০-৯-৬৭ পর্যন্ত শতকরা ৮ টাকা হারে ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। শেষ মর্হতের তীড় বাঁচাবার জন্য পূর্বেই কেনাকাটা করতে অনুরোধ করি।

পুজা উপলক্ষে প্রত্যহ সকাল ১০-৩০ মি: থেকে রাত্রি ৯-৩০ মি: পর্যন্ত (ব্রহ্মসপ্তাহ) সোফা খোলা থাকবে।

জোড়া যে সংকটের সীল করেছে তার সম্যক মোকাবিলা আজও পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয় নি। কোন সুস্পষ্ট শ্রম-নীতি অবলম্বিত না হওয়ার ফলে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারতেই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদয় হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুণি ডি-ভ্যালুয়েশনের পর থেকেই সংকটে ভুগছে, এবং শ্রম-স্বার্থকেই এর জন্য জবাই করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ওপরেই চোট সবচেয়ে বেশি পড়েছে। সে যাই হোক না কেন, শ্রমমন্ত্রী আপাতত বন্ধ কারখানাগুলি চালু করার জন্য যে প্রচেষ্টা করছেন তা যেন সফল হয় এটাই আমাদের কাম্য।

বন্যাত মেদিনীপুর

গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে মেদিনী-পুরের বন্যার কথা লিখিত হয়েছিল। বন্যার পর বিশেষ করে কাঁথি মহকুমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছে। সব, নারায়ণগড়, ভগবানপুর, পটীশপুর প্রভৃতি থানার হাজার হাজার মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করছেন। গ্রামের সব রাস্তা-ঘাট ভুবে গেছে, কোথাও কোমর পর্যন্ত, কোথাও বুক পর্যন্ত জল। কাঁথি মহকুমা প্রকৃতপক্ষে বহিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ডাক যাতায়াতও বন্ধ। ইন্সকুল কলেজ বন্ধ। মাটির গৃহ-গুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমন ধান, পান ও পাটের ক্ষতি ব্যাপকভাবে হয়েছে। রামনগর, পটীশপুর, এগরা, ভগবানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধানগাছগুলি তিন-চার ফুট জলের তলায় ভুবে গেছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা। সরকারী সাহায্য পর্বাণ্ড নয়। নিরাশ্রয় পরিবারদের দু' টাকা করে দেওয়া হচ্ছে মাত্র। নৌকার অভাবের জন্য হাণকাব' বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরকারী সাহায্য এলেও সরকারী কর্মীদের গাফি-

লতির জন্য নাকি এখনো সাহায্য কতি-গ্রস্ত অঞ্চলে পৌঁছতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার বন্যাতদের জন্য বাড়তি গম দিতে নারাজ, তবে খাদ্যমন্ত্রী বন্যা-প্রাণিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে এসে ওই এলাকায় মাথা পিছু ১৭৫০ গ্রাম গম দেবার সংকল্প করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরও মেদিনীপুরের বন্যাত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন।

অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এই মর্মেতে বন্যাক্রান্ত নরনারীগুণির মূখ চেয়ে অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন হাণকাব' পরি-চালনা করা সরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। এই বিষয়ে হাণমন্ত্রীর নিকট আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর বন্যাক্রান্ত অঞ্চল-গুলি পূর্ববিক্ষেপ করে সখেদে জানিয়েছেন যে বন্যার সুযোগে ব্যবসায়ীরা আকস্মিক-ভাবে প্রতিটি প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম বৃদ্ধি করে দিয়েছে, অথচ এদের শাস্তি-দানের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। বন্যার জল কমে গেলে সেখানে আবার চাষ করা যেতে পারে কিনা, এ-বিষয়েও রাজ্যপাল আগ্রহ দেখিয়েছেন। আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন। বিগত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে আমরা এই বন্যার কারণ এবং কি করলে তা একেবারে বন্ধ করা যায় সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখন তার পুনরাবৃত্তি নিম্নপ্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ

ব্রিটিশ মারফি এবারেও পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের সর্বত্র পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ পালিত হল। এতে সরকারী অর্থের অপব্যয় বড় কম হয় না, অথচ এই জাতীয় আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা যে মূল পরি-কল্পনাটি কতদূর উপকৃত হবে তা বলা শক্ত। আমাদের এই সমস্যাযুক্ত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমানোর অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে বসেছেন বা কর-ছেন তা এতই দুর্ভাগ্যবশত যে তা এই পরি-কল্পনার মূল উদ্দেশ্যটিকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। পরিবার পরিকল্পনাখাতে এ পর্যন্ত ব্যয় কম হয় নি, কিন্তু শ্রম-জীবী ও কৃষক সম্প্রদায় দ্বারা ভারতের জনসংখ্যার সমস্ত শতাংশ তাদের খুব অল্প অংশই এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য কোন প্রচারণাই

প্রয়োজন নেই এবং দ্বারা কে-কোন উপায়ে হোক পরিকল্পিত পরিবারের পক্ষপাতী একমাত্র তারা ছাড়া সমাজের বহুস্তর জনসমষ্টি এই পরিকল্পনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং সেইখানেই এই পরিকল্পনার চরম ব্যর্থতা। তা ছাড়া যে উপকরণের সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনা চালানো হচ্ছে তার সাফল্যতাও বড় দেখা যাচ্ছে না। বহুল বিজ্ঞাপিত 'লুপ' কার্ভত ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এগুলি ব্যবহৃত হয় নি, ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে নানা প্রকার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে যে কারণে অনেক, দ্বারা লুপ ধারণ করেছেন, তাঁরা তা পরি-ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের একমাত্র নিত্যযোগ্য যে পন্থা তা হচ্ছে ভ্যাসেকটমি, যা পুরুষেরা করতে পারে। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পুরুষপ্রধান হবার দরুনই তা এখনো বিশেষ কার্যকরী নয়, কেন না এ-বিষয়ের দ্ব্যবতীয় কামেলা মেয়ে-দের ঘাড়ো চাপাভেই পুরুষেরা অভ্যস্ত। অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে অপারেশনে বৃদ্ধি অনেক, পুরুষের বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি নেই। তা সত্ত্বেও ভ্যাসেকটমিকে যে জনপ্রিয় করা যায় নি তার মূল কারণ মেয়েদের প্রতি বহুস্তর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আজও পরি-বর্তিত হয় নি এবং যে শিক্ষা পেলে সেটা হওয়া সম্ভব তা দিতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজকে বিশেষভাবে ব্যাহত করছে, এ-বিষয়েও আজও পর্যন্ত সর্বভারতীয় কোন আইন প্রণীত হল না। ঘটা করে ক্যাম্প করে আর কিছু লোক জুটিয়ে বহুতা দিলেই দেশের গৃহগুলি যে পরিকল্পিত পরিবারে ভরে উঠবে না এই মূল কথাটা সরকার উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তদুপরি আরও একটি কথা বলার আছে। দ্বারা স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাঁরা যাতে সহজে ও বিনা কামেলার তা করতে পারেন সে রকম কোন ব্যবস্থাও এ পর্যন্ত করা হয় নি। হাস-পাতালে গেলে অন্য রোগীর মতই এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এবং নানা অস্থিলায় তাঁদের বারবার ঘোরান হয়। এই রকম কয়েকটি কেসের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। এই রকম কামেলা দেখেই অনেকে অগ্রসর হতে রাজী হন না। কাজেই পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে নতুনভাবে চিন্তা করে সেই অনুযায়ী যথাকর্তব্য নিরূপণ করা উচিত। বর্তমানে যা চলছে, যদি এভাবেই তা চলে তাহলে ভ্রমশ্রম চালা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

(১৬।১।৫৭)

পূজার নাটক

মনোজ মিত্রের	
জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ	৩'০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের	
ধনপতি প্রেমতার	৩'০০
জিতেন ঘোষের	
দাগ	৩'০০

মিতালি প্রকাশনী

২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-২

সাপ্তাহিক পত্রিকা

ইণ্ডিয়ান অয়েল

আমাদের... আর সমগ্র জাতির !



আমরা, প্রতিরক্ষার সৈনিকরা। আমাদের স্বদেশকে অক্ষিপণ (ধাক্কা) করতে ভাল, স্থান ও অন্তরীক্ষ ইণ্ডিয়ান অয়েলের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করি। সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ইণ্ডিয়ান অয়েল এক প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা দিনে রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ভারতীয় বিমানবাহরর এভিয়েশন ক্যুয়ালের প্রয়োজন মেটাতে এবং যে কোন ধরনের প্রতিরক্ষা বিমানের প্রয়োজন মেটাতে অসম্ভব কম সময়ে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। ইণ্ডিয়ান অয়েলের হাই স্পিড জিকেন চালিত ট্রাক ও ট্যাঙ্কই যোগাযোগ এবং সরবরাহ অক্লান্ত রেখেছিল। ইণ্ডিয়ান অয়েল আমাদের স্বাধীনতার দীপশিখা উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করেছে। ইণ্ডিয়ান অয়েল এত কাজ করতে সমর্থ কারণ এটি যে আমাদেরই কোম্পানী।



—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকর জাতীয় ব্যাপ

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর উত্তর হাওড়া কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন পূর্ববর্তী মনো-পাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করেন। পূর্ববর্তী ডেমো-ক্রাসিতে সমালোচনার গুরুত্ব অনন্য, ফলত ক্ষমতাসীন সরকার আত্মসংশোধনের সুযোগ পান। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অংশীদার দলগুলির মধ্যে দলীয় মনোভাবের উগ্রতা ও অন্তর্বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করেও বলতে হয়, ন্যূনতম ছ' মাসের মধ্যে এই সরকার এমন দু'চারটি জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে, গত কুড়ি বছরে কংগ্রেসী সরকার যা করতে পারে নি। পরন্তু, কংগ্রেসী সরকারের শাসনের (না কি রাজত্বের?) শেষ পর্যায়ে অপশাসন ও দুর্নীতি এতই আকাশচুম্বী হতে চলেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র কংগ্রেসের বিপর্ষয় ইতিহাসের শিক্ষার মতো অনিবার্য হ'লে দেখা দিয়েছিল।

সংবাদে প্রকাশ, সভাস্থলের উপর যখন প্রাক্তন মন্ত্রীমণ্ডলী উঠছিলেন, তখন সভার না কি 'বাংলার মানুষ প্রফুল্ল সেনকে ফিরে চায়' স্লোগান দিয়েছিলেন। কারা এই স্লোগান দিয়েছিলেন, সংবাদে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। চন্দ্রশুভ্রের অনুমান, স্লোগানদাতারা সেন মশায়ের আত্মীয় ও প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত বন্ধু-পরিজনবর্গ। কিন্তু এই স্লোগান কি সভাস্থলের ছোট জায়গাটি অতিক্রম করে দূর-বিস্তৃত হতে পারবে? আপাতত এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতেও তার কোন সম্ভাবনা নেই। সে বাই হোক, গদিচ্যুত সেনাবাদ বলেছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে খাদ্য-সমস্যা মেটে নি, দুঃখের পর দুঃখ বেড়ে চলেছে। পথ-ঘাট তৈরি হয় নি, একটাও স্কুল-কলেজ হাসপাতাল গড়ে ওঠে নি। সেনাবাদ সমালোচনার প্রথমার্শ অর্থাৎ খাদ্যসমস্যা সমাধানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু সেনাবাদের সরকার কি এই সমস্যাকে জটিল করে যান নি? যুক্তফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসী-সরকারের কাছ থেকে যে ব্যাধিজর্জর বাংলা দেশকে

পেরেছেন, মায় ছ' মাসের মধ্যেই কি তাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলতে পারবেন? গত ছ' মাসের মধ্যে পথ-ঘাট তৈরি হয় নি, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল স্থাপিত হয় নি (দু'একটি ছাড়া) সভা, কিন্তু পথ-ঘাটে মানুষ না চললে, স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার বা হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হ'লে এ সব করে কি লাভ, ও কার লাভ? কতৃপক্ষের প্রীতিভাজন অনুগ্রহপূর্ণ কিছু, ঠিকাদারের কিছু, ব্যক্তির বা গোষ্ঠীকিশেবের লাভ হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ যে-তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করে। কংগ্রেসী আমলে স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল তৈরি হয়েছে সভা, কিন্তু দুর্নীতি ও অপশাসনের দৌলতে সেগুলির অবস্থা অনেকটা 'হাসিন্দুশির' দেয়াত আছে কালি নাই।

পশ্চিমবঙ্গে অরাজক অবস্থার কারণ-গুলি মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং অনেক সময় সাধারণ মানুষ যে-দুর্গতির মুখোমুখী হন, আর বা-ই হোক রপ্ত ও সমাজের অস্থিরতার স্বীকৃতিসূচক নয়। কিন্তু এই অরাজক অবস্থা কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন সময়েই অসম্ভব আশঙ্কাজনক হয়েছিল? নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বেলঘরির প্রায়শ সের-ধরনের ঘটনার মুখোমুখী হ'লে এ অস্তরের শান্তিপ্রিয় জনগণ, তাকে কি শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রমাণ বলবেন কংগ্রেসী নেতৃবর্গ? সের-ধরনের অরাজকতার পরিচয় এখন মাঝেমাঝে পাওয়া যায়, তা পূর্ববর্তী অবস্থারই অনুসৃতি এবং অনারাসে নিবারণযোগ্য এই অরাজকতা দমনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা যতটা সরকারী অক্ষমতা প্রকাশ করে, তার চাইতে বেশি প্রকাশ করে জনগণের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস।

সার কথা, পরাজয়পূর্ব কংগ্রেসের নেতৃবর্গ জনসাধারণকে দেখতেন ভূত্যা হিসাবে এবং সদ্যোবিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকারের সদস্যরা সর্বত্রই জনগণকে দেখেন প্রভু হিসাবে, ফলত ক্ষমতাপ্রাপ্তির উৎসাহ

সাহের আতিশয্যে জনতা নামে জনসাধারণের একাংশ আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে ভুলে নিতে চাইছে। পৃথিবীর সর্বত্রই জনতার চরিত্র এক—অস্থির ও নির্বোধ এই সহজ সত্য উপলব্ধি না করে যুক্তফ্রন্ট সরকার জনতাকেই দেশের জনসাধারণ বলে ধরে নিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক জনতা যারা দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন, তাঁদের মধ্যে একটি অংশের আদৌ কোন চিন্তাশক্তি নেই, অন্য অংশ নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অনেক চিন্তা করে কাজে নেমেছেন। এবং এই জনতা আজ সারা দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বহু দলের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু এই সমবায়ে এখনও শিথিল-ভিত্তিক, দলগুলির একাধোদ্বা একনও স্পষ্ট রূপ নিয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না। পরন্তু কোন কোন দল সরকার-বিরোধী তথা স্ববিরোধী উত্তী-প্রভৃতি ও কর্মকর্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুনরুত্থানের পথ তৈরি করছেন। মাকে মাকে সন্দেহ হয়, এই সব দলের নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ কংগ্রেসের এবং কালোবাজারী মালিকদের প্রভুত্বের সঙ্গে গোপন বড়লেন্সে লিপ্ত। বাংলা দেশে এ ঘটনা কিছুই আশ্চর্য নয়, রাজনৈতিক পলাশী-প্রান্তরে যুদ্ধের নানি যুদ্ধের অভিনয়ে গীরজাফর অভয়াম্বর। প্রগতির নামে পশ্চাদ্গতির পথে দেশকে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব নেই, অভাব তাদের চেনার ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের, তাদের শাস্তিবিধান করার মতো লোকের।

গত ছ' মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক দলগুলির কোন কোনটির সদস্য বদল ছেড়ে বিরোধী শিবিরে এসেছেন, কোন কোন দল প্রকাশ্যেই অন্য দলের সমালোচনার উচ্চকণ্ঠ, নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ নতুন দল গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন, আর্মিবার মতো কোন দল বা একাধিক উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই রাজনৈতিক দলাদলির বলি হতে চলেছে জনসাধারণ, পেশায় রাজনৈতিক না হয়েও তারা রাজনৈতিক চেতনার কটুশালী। আমাদের পেশাদারী রাজনৈতিক নেতারা এই সহজ সত্যকে বিস্মৃত হয়েছেন, ফলে চালের দাম আজ চার টাকা কিলোর দাঁড়িয়েছে, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম উধামুখী, দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও নৈরাজ্য। অসাধারণ নেতাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ চন্দ্রশুভ্রের সতর্কবাণী, সময় থাকতে আপনারা সাবধান হোন, সাপের হাতে ওঝার মতীর প্রবাদ ভুলে যাবেন না।

বরাভয়

শব্দক চরিত্র

কিছু কথা তবু থাকে, থেকে যায় মনে
নাড়াচাড়া করি তাদের সন্ধ্যাপনে
অলস হাওয়ায় রোদ্দরে কাঁপে দিন—
কী হবে বলো না সে কথার আলোচনে।

তবু যদি তাকে কাছে পাই দুটো কথা
বলি তাকে, বত হোক না সে উদাসীন—
শীতের শিশিরে থমকানো কথকতা
বসন্তে খোঁজে প্রার্থিত সফলতা।

আবার ঝড়ের আবর্ত-সংকুল
ভেঙে চরমার জাহাজের মাস্তুল
আকস্মিকের উধাও আকাশে নীল—
কিছু আশ্বাস, কিছু বা মনের ভুল।

কথা বলি, বলা হয় না যে সংশয়
থেকে যায়, মাচে দুটি হৃদয়ের মিল
জীবন কণিক, প্রেম শাব্যত নয়—
ভোমারে খুঁজিছ শান্তির বরাভয়।

ঘরে ফেরা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

মাকে মনে পড়ে না, মাটিকে—
হাতে প্রাণ রুদ্ধশ্বাস
জীবন ভরে শুধুই হাস
কোথাও নেই চটি দশদিকে।

কেমন ভুলে যাই মায়ের মুখ
স্মৃতির ছবি আঁকা হাজার নাম
হারিয়ে যায় চেনা শহর গ্রাম;
এ-পোড়া কপাল, নেই সন্ধ্যা।

বেদনা হতে কী নেই গাণ?
রয়েছে ক্ষত বৃকে দম্ব ঘর,
সময় বৃকে শত বিম্ব শর—
হারানো গৃহকোণ কাদায় প্রাণ।

পড়ে না মনে মাকে; রুদ্ধশ্বাস—
হবে কি ঘরে ফেরা? শুধু যে হাস।

অবাক লাগে যখন দেখি, বাম
কম্যুনিষ্ট দলের একাংশ দলের নেতা ও
সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে কদর্য
ভাষায় নির্দিষ্ট করেন, জ্যোতি বসু ও তাঁর
মন্ত্রুরা সহকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সমা-
লোচনার প্রবৃত্তি হন, আর-এস-পি নেতা
বিদ্যুৎ বর্ষণ করেন শ্রমমন্ত্রী সুবোধ
বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং শেষতম না হলেও
পরিশেষে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল
রাইটাস' বিল্ডিংস অর্ডিন্যান্স সরকার-
বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।
সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে
সাধারণ চম্পকত্তের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস ও
বৃহত্তর সর্বকালের শরিক দলগুলির
অধিকাংশই ভিন্ন পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে
যেতে উদ্ভূত : জনসাধারণের স্বার্থের
বিনিময়ে নিজের নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে
যাওয়া। অর্থাৎ দলমতানির্ভরশে নেতা-
দের অনাকারিত বক্তব্য : দল বাঁচলে দেশের
নাম এবং আপনি বাঁচলে দলের নাম।

অতএব জনসাধারণের দুর্দশা
অনিবার্য। যদিচ আশাবাদী চম্পকত্তের
কিন্দাস, এই নৈরাজ্য থেকেই জন্ম নেবে
নতুন নেতৃত্ব, তবু জনসাধারণের মধ্যে
যারা সক্রিয় তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিনীত
আবেদন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সময়
তাঁরা যেন দলমতের কথা একটিবারও না
ভাবেন, অন্যায় অন্যায়ই, তা যে দলের
হাতেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন।

দু-একটি অন্যায়ের দৃষ্টান্ত তুলে
দরি : দলত্যাগের অন্যায় বা দলনীতি

জনসাধারণ অন্যায়ের বন্ধ করতে পারেন।
যদি কেউ বলেন, গণতন্ত্রে দলত্যাগ বিধি-
সম্মত, তবে তার উত্তরে বলব, একটি দলের
পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচনে জয়লাভের
দুর্ভাগ্যের মধ্যে যিনি অন্য দলের আশ্রয়
গ্রহণ করেন, তিনি আসলে গণতন্ত্রের
নামে গণিকাতন্ত্রের অনুসারী। দলত্যাগের
নির্মিত সময়-সীমা এখন নেই, তখন
এই নব গণিকাতান্ত্রিক রাজনীতিজীবীদের
পুনর্নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা
জনসাধারণের অবশ্যকর্তব্যের তালিকাভুক্ত।
কলকাতা কর্পোরেশনকে আর একটি
দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।
সম্প্রতি কলকাতার সাধারণ দুর্দশাকে
অবর্ণনীয় করে তুলেছে বিভিন্ন অঞ্চলের
পর্বতপ্রমাণ জঞ্জাল। কলকাতার প্রায়
রাজপথই আজ সাধারণ পথিকের চলার
অযোগ্য, প্রায় রাজপথেই কর্পোরেশনের
অলিখিত এপিটফ 'পালাও' পথিকবর
বাস যদি তব কলকাতার। কিন্তু কলকাতার
এই সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্য বর্ধনের কারণ
দূর করার দু-চারটি সহজ সহজ পন্থা
বিদ্যমান। এক, জনসাধারণ বিশেষত
উৎসাহী ছাত্রসমাজ প্রত্যেক পৌরপিতার
বাড়ির সামনে সেই জঞ্জাল এনে জমা
করুন; দুই, মোটর ভিহিকলস
ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা যদি এই দুর্দশার
জন্য দায়ী হন, তবে তাঁদের উপর
ঘেরাও দাওয়াই প্রযুক্ত হোক; তিন, এই
ঘেরাও দাওয়াই তাদেরও দেওয়া হোক,
যেমন তাদের অপরাধী প্রমাণ করতে

পারবেন অথচ নানা কারণে যিনি তাদের
টিট করতে পারবেন না; চতুর্থ, বর্ষা
দিনে বর্ষাপ্লাবিত পথগুলিতে মেয়র
সমের সময় পৌরপিতাদের অন্তত এক
মাইল পথ হটিতে বাধ্য করা হোক।
ভাবলে আরও পন্থা আবিষ্কৃত হতে
পারে, আপাতত সে আবিষ্কারের ভার
তরুণদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

অন্যায় আজ দেশের সর্বত্র, কর্পো-
রেশন থেকে শুরু করে পবিত্র শিক্ষামন্দির
পর্যন্ত অন্যায়ের বাহন প্রসারিত। বৃহ-
ত্তর সরকারের মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সাধুতা
ও কর্মমিষণ প্রশ্নাতীত। কিন্তু শুধু
সাধুতা ও সদিচ্ছা দিয়ে যে শাসনযন্ত্র
চালনা করা যায় না, তার প্রমাণ একাধিক
ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রীর ব্যর্থতা। সন্দেহ
নেই, অধিকাংশ মন্ত্রীই আজ প্রশাসনিক
কর্মচক্রের হাতে ধরা দিয়েছেন, মন্ত্রিপদের
পরিবর্তে আসলে তাঁরা সুপার-
সেক্রেটারীর নিরাপদ পদই বেছে
নিরেছেন। তবল্য টেকা দিলেই রেমন্স
তবল্যই হওয়া যায় না, মন্ত্রী নাম নিলেই
রেমন্স হওয়া যায় না মন্ত্রী। দলমত
নির্ভরশে বৃহত্তর সরকারের মন্ত্রীরা
নিজেদের মন্ত্রী বলে পরিচয় দিতে
সচেষ্ট হোন, একমাত্র দেশের কল্যাণকে
লক্ষ্য করে শত হাতে বিভিন্ন সমস্যার
মোকাবেলা করে তাঁরা প্রমাণ করুন, বৃহ-
ত্তর সরকার বৃহত্তর শ্রেণী নামে নয়,
কল্যাণকে।

মৃত্যুশয্যায় সিগ্‌ফ্রাউ সোসদন

[কাব্য-পরিচিতি : জন্ম—১৮৮৬, মৃত্যু—৮১ বৎসর বয়সে, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭। শিক্ষা—কেমব্রিজের মার্গবরো ও ক্রোয়ার কলেজে। বোদ্ধ-জীবন—সাসসেক্স ইয়োম্যানরী ওরয়েল ওয়েল্চ ফুর্সলিঙ্গস-এ, ফ্রান্স ও প্যালেস্টাইন-এ যুদ্ধে দুইবার আহত; মিলিটারী ক্রশ লাভ; ক্রেলক হাটের হাসপাতালে সহ-যুদ্ধকবি আওয়েনের সান্নিধ্য লাভ। হাসপাতাল পত্রিকা 'হাইড্রা'র কবিতা প্রকাশ। যুদ্ধান্তে কিছু কাল 'ডেলী হেরাল্ডের' সাহিত্য-সম্পাদকতা; 'মেমইস' অব এ ফক্স হাটিংম্যান'-এর জন্য 'হখন'ডেন' ও 'জেমস টেটর্যাক মেমোরিয়াল' পুরস্কার লাভ (১৯২৯); উক্ত 'মেমইস' আর দুইটি অনুবৃপ গদ্য রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'কমপ্লিট মেমইস' অব জর্জ শেরটন' প্রকাশ (১৯৩৭); 'সীম্‌ফ্রাউস জানি' (১৯৪৫); সংকলিত কবিতাবলী (১৯৪৬); আর একখানি পরবর্তী সংকলন 'সিকোয়েন্সেস' (১৯৫৬)। 'কম্যান্ডার অব দি ব্রিটিশ কম্যান্ডার' উপাধি লাভ—১৯৫১; কাব্যের জন্য 'রয়েল গোল্ড' পদক ১৯৫৭। এ

বৎসরই রোম্যান কেরলিক ধর্মমতে দীক্ষা। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হতে ২য় মহাযুদ্ধের অবসানের প্রাক্কালে মারগাস্ত হিসাবে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ ও তারও পরে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ মানবের ভাব ও ভাবনাকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। তাই যুদ্ধ সম্বন্ধে রচনা এত অজস্র। তবু এই রচনাবলীর মধ্যে কাব্য-রসোত্তীর্ণ রূপ সুলভ নয়। ইংরেজির মত সম্মুখ কাব্যেও যুদ্ধকবিরূপে চারিটি নাম প্রখ্যাত—ব্লক, আওয়েন, সোসদন ও রোজেনবার্গ। ব্লকের কবিতার এই অশুভ নরস্বরের মানবিক দিক একবারে উপেক্ষিত নয়, তবু তা রোম্যান্টিক বর্ণবিমুক্ত নয়। শেষোক্ত কবি তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী, অথচ সম্পূর্ণ স্বকীয়। দৃষ্টান্তরূপে তুলনামূলক সমালোচনার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে—আওয়েনের Futility কবিতাটিকে ও সোসদনের বর্তমানে অনুদিত The Death Bed কবিতাটিকে আওয়েন। সোসদন সম্বন্ধে যে প্রশস্তিবাণী পুস্তক করেন, শব্দ হৃদয়বান কবিই সত্যিই সম্বন্ধে এমন

উচ্চরাস প্রকাশ করতে পারেন।

যোদ্ধাজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুদ্ধের প্রতি সোসদনের ঘৃণা ছিল অপরিসীম। রয়টারের বিবরণে প্রকাশ—তিনি নাতিসুলভ মিলিটারী ক্রশের প্রতীকটি তাঁর উর্দ্বি হতে ছিঁড়ে নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। তবু সৈনিক হিসাবে নিজের জীবনের প্রতি মায়ী তাঁর অস্পষ্ট ছিল। তাই এর পরেও আমরা তাঁকে যোদ্ধারূপে দেখেছি। তাঁর নিজের কথায়—“যুদ্ধ খেমে যাওয়া উচিত”—এই কথা বলে ঝরা বাঁচার পথ বেছে নেয়, তাদের মত বেঁচে থাকার চেয়ে আমি বরং মৃত্যুবরণ করব।” যেমন যোদ্ধাজীবনে তেমন সাহিত্যসেবায় দুলভ সততা ও বিনয় তাঁর চরিত্রকে মহিমাম্বিত করেছে। নিজের কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—টেকনিক ও আভিযুক্তিতে তিনি প্রাক-এলিয়ট যুগের। জীবনের শেষে ১২ বৎসর না লেখার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেছেন—তাঁর যা বলা তা বলে শেষ করেছেন।]

সে তখন তন্দ্রায় ও এই চেতনার মন—তার চারিদিকে
শতপাকার স্তম্ভতা, অকম্পিত অটল দেওয়ালের মত;
হলধি আলোর ভেসে-চল্য রশ্মির মত তরল,
কখনও উদ্বেগে উড়ছিল, কখনও কাঁপছিল ঘূমের পাখার ভরা দিয়ে।
স্তম্ভতা আর নিরাপত্তা; আর তার মত উপকূল
চন্দ্রবাহিনী মৃত্যুতরঙ্গের লেহনে ভিতরে ভিতরে করে যাচ্ছিল।

কেউ তার মূখে জলের পেয়ালটি ধরেছিল,
বিনা বাধায় সে গিলল; গোণ্ডির ঢলে পড়ল
আরক্তিম আধো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে; জুলে গেল
তার আফিম-মন্দির স্পন্দন ও যন্ত্রণা—তার ক্ষত।
জল—বাঁধের উদ্বেগে ধীরে-বহা শান্ত শ্যাম ধারা।
জল—আকাশ-আলোর রাঙানো পথ তার নাওখানির জন্য,
পাখীর কণ্ঠকলিত; তার দু'ধারে প্রতিফলিত ফুল
আর গ্রীষ্মের-বরা রঙ ছড়ানো; ভাটুমেখে ভাসতে ভাসতে
সে প্রসন্নমনে দাঁড়ি ডুবাল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আর ঘূমিরে পড়ল।

হাসপাতাল ওয়ার্ডে রাষ্ট্রটি ছিল দমকা কোয়েল,
পর্দাটি উড়িয়েছিল ঝিক-ঝিকে বতাসের আকারে।
রাতি। সে অন্ধ; সে দেখতে পারি নি তারাদলিকে—
সেগলি তখন চলন্ত মেঘের প্রেতপুঞ্জের মধ্যে মিট-মিট করছিল,
অশুভ বর্ণবিবন্দু সব—রক্তিম, লোহিত, সবুজ—
ঝিক্‌ঝিকিয়ে উঠল ও মূছে গেল তার ডুবন্ত চোখদুটি হতে।

বৃষ্টি—সে শুনতে পাচ্ছিল—করো করো করছিল
সেই অন্ধকারের মধ্যে;
বেল সুরটি ও তন্দ্রাসর সঙ্গীত এক করে বোনা;

কবোক্ত বর্ষা করে-পড়ো-পড়ো গোলাপের উপর; বল-ভিজানো
স্বপ্ন কর ধারাবর্ষণ; বস্ত্রের পিছনে কোঁটিলে-চল্য
নিষ্করণে বৃষ্টি নয়, চুইয়ে-পড়া শান্তিমারা;
জীবনকে যা ধীরে, অতি ধীরে ঘুঁয়ে নিয়ে যায়।

সে নড়ে-চড়ে উঠল; তারপর সেই যন্ত্রণাটা
লাক দিল শিকারসম্মানী পশুর মত, আর আঁকড়ে ধরে
ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল
তার হাতাড়িয়ে-ফেরা স্বপ্নগুলিকে, পিষে-ফেলা ধাবা ও দাঁত দিয়ে,
কিন্তু কেউ একজন তার পাশেই ছিল; তখনই সে শূরে
কাঁপতে লাগল, কারণ সেই অশুভ সন্তাটি চলে গিয়েছিল।
আর বে মৃত্যু তার দিকে পা বাড়িয়েছিল সেও থমকে
চেয়ে রইল।

অনেক আলো জ্বালাও আর ওর বিজ্ঞানার চারিধারে জড়ো হও।
ওকে দাও তোমাদের চোখ, উক রক্ত, আর বাঁচবার ইচ্ছা;
ওর সঙ্গে কথা কও; ওকে জাগাও; ওকে এখনও বাঁচাতে পারো;
নবীন সে; যুদ্ধকে সে ঘৃণা করত; কেন সে মরবে,
নির্মম প্রবীণ অভিবাদীরা যদি জিতে ফেরে?

কিন্তু মৃত্যু জবাব দিল—‘আমি তাকে বেছে নিয়েছি’
তাই সে চলে গেল,

আর গ্রীষ্মের সেই রাতি ছেয়ে ছিল স্তম্ভতা;
স্তম্ভতা ও নিরাপত্তা; আর ঘূমের ঘোমটা।

তারপর, বহুদূরে, কামানের গোলায় ধূম-দাম শব্দ।

অনুবাদক—জয়দেবী ৮-৭

উপাচার্য সম্মেলন

রাজধানীতে গত বুধবার উপাচার্য সম্মেলন সমাপ্ত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হ'ল ভারতে ভাষা-বিভক্তির এক অধ্যায়। সম্মেলনের ভাষা বিষয়ক চিন্তাকে পরিসমাপ্তিতে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী অভিনন্দিত করে এই সম্মেলনকে যুগান্তকারী আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ডঃ ত্রিগুণা সেন ভারতের প্রখ্যাত উপাচার্যগণের অন্যতম। স্বয়ং শিক্ষাবিদ হিসেবেও তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষাবিদ-জীবনের কথা স্মরণ করে সমাপ্তি ভাষণে ডঃ সেন তাই বলেছেন: আমি আপনাদেরই একজন আর সেই অন্যতমটি হয়েই থাকতে চাই। শিক্ষার উন্নতিই তাঁর সর্বকর্মের মূল প্রেরণা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এহেন ভাষণের পর আশা করা যেতে পারে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে উপাচার্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে তিনি তাঁর শিক্ষানীতি পুনর্বিবাস্ত করবেন। ভাষার প্রশ্নে যদি শিক্ষানীতির পুনর্বিবাস্ত সম্ভব হয়, তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং পরবর্তীকালের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলার যজ্ঞব্যাকেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বজায় রাখতে বাধ্য হবেন। যদি তাই হয় তবে শ্রীযুত চাগলার মন্ত্রণ ত্যাগ এবং সেই পদত্যাগ গ্রহণের ব্যাপারটিই একটি অকারণ অথচ অ-সামান্য ঘটনার নজির হয়ে থাকবে।

ভাষান্তরের ভাষা বাধা অবাস্তব

উপাচার্য সম্মেলন ভাষান্তরের জন্য (ইংরেজি থেকে আঞ্চলিক ভাষা) কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণের যৌক্তিকতা অস্বীকার করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব রেখেছে। এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁরা। সেজন্য একাজ শুধু যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিরই মূদ্রাশেক্ষী তাই নয়, বিভিন্ন পঠনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্যানুসারে ভাষান্তরের কাজ কম-বেশি দ্রুততী মাত্র করতে পারে। এমন কি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সুবিধানসারে ভাষান্তরের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্নাতকোত্তর বিভাগে এক গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জ্ঞানভান্ডারের গবাক্ষ উন্মুক্ত রাখতেই হবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সেজন্যই উপাচার্যগণ প্রাক-স্নাতক-



ভারতদর্শন

উপাচার্য সম্মেলন

স্তরেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে একমত।

যেহেতু শিক্ষার মানোন্নয়নই ভাষান্তরের মূল লক্ষ্য, এজন্য সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত যাতে না হতে হয় কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে সেই দিকেই চোখ রেখে। প্রকৃত শিক্ষাবিদরা তাই ইংরেজি হটাৎ আন্দোলনের হঠকারী দ্রুততাকে আদর্শেই আমল দিলেন না। আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন উপাচার্যগণ। তাঁরা ভাষাটাকে বড় করে না দেখে শিক্ষার উন্নতি সাধনে, জাতীয় সংহতি সাধনে এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ভাষার ক্ষমতাকে সর্বাগ্রে বিচার করে দেখতে বলেছেন, অর্থাৎ মন্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ, আঞ্চলিক ভাষার শক্তি বিচার করেই সেই ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত ভাষা নিয়ে উন্মাদনা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ভাষাকে প্রয়োজনানুগ করে নেওয়াই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন আরোপিত খেয়াল-খুশিকে চাপিয়ে দেওয়া চলে না, কারণ তারই সঙ্গে সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন আছে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে।

কেন্দ্রীয় সরকারী নীতির সঙ্গে এক সুরে কথা উপাচার্যগণ বলেন নি। শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত বলেই তাঁরা

একটি যথার্থ নীতি মেনে চলতে চেয়েছেন, কোন শিক্ষানীতি চালু করে চমক সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্য সাধনকে মূলমন্ত্র করেন নি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি উচ্চশিক্ষার স্তরেও পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ভাষান্তরের ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। লাগে টাকা দেবে গোরা সেন এটাই মূল চিন্তা। শিক্ষাবিদরা কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিকে এমন আর্থিক অঙ্কের হিসেবে মিলিয়ে দিতে নারাজ। প্রাক-স্নাতক স্তরেও এই সময়-সীমা বাধ্যতামূলক হ'ক, উপাচার্যগণ এমন মনোভাবও সমর্থন করেন না। তাঁরা জানেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কলে-ভর্তির (মেসিন-মেড) প্রোডাক্ট অসম্ভব। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপরই তাঁরা চেয়েছেন ভাষান্তরের ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে। অতীত সেই সঙ্গেই বলেছেন, ইংরেজিকে অকপাশাপাশি বহাল রাখা উচিত।

তাঁরা ভেবে দেখেছেন, বহু ভাষাভাষী বড় শহরে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বহাল রাখার প্রয়োজন আছে। কলকাতার অ-বাংলাভাষীদের জন্য যেমন, পাটনার অ-হিন্দীভাষীদের জন্য তেমনি ব্যবস্থা রাখতে হবে বৈকি। শিক্ষা কমিশনও তাড়া করে ভাষার দেওয়াল তুলে ভারতের সর্বত্র একটা এলোমেলো কান্ড ঘটিয়ে তুলতে চান নি।

একমাত্র উগ্র এবং অন্ধ মূর্খের

সম্প্রদায়িক ছাড়া সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কেউ একটা জবরদস্তি অনাচারের হাতে লিপে দিতে পারেন না। ভারতের প্রমুখ শিক্ষাবিদগণের সতর্কীকরণের পরও সেই একই উগ্রভাবকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই নয় দেশের রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও চরম দুর্যোগ আসন্ন হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী উপাচার্যগণের পরামর্শ প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনেই একরূপ মেনে নিয়েছেন। এখন অল্প হিন্দীওয়ালাদের দুর্ভাগ্যের উদ্বেগ হলেই সংকট এড়ানো যেতে পারে। কেন না সংকট প্রায় ঘনিষ্ঠে এসেছে।

বিশিষ্ট মতামত

কে হনুমন্তিয়ায়, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন: ভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জি ত্রিগুণা সেন 'অবিবেচকের কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, ইংরেজিকে বাদ দিলে দেশের পক্ষে সমৃদ্ধ ফলিত সম্ভাবনা।

শ্রীযুত চাগলার ভাষার প্রশ্নে পদত্যাগ বিষয়েও শ্রীহনুমন্তিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বলেন যে, তিনি এই পদত্যাগকে কিছুতেই ভাল মনে মেনে নিতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস মোরারজীর উগ্র হিন্দীপ্রেম সত্ত্বেও চাগলা অনেক সমর্থন পেতেন যদি তিনি পদত্যাগ না করে ভাষার প্রশ্নটি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে উত্থাপন করতেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: শ্রীচাবন ত্রিভাষাসূত্রের সমর্থক। তিনি চান, মাতৃভাষাকে ক্রমে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হ'ক। না হলে সাধারণের ভাষা এবং শিক্ষা আইনগণের ভাষার ফারাক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেজন্যও তিনি কখনই 'ইংরেজি হটাও' শ্লোগান-ধারীদের সমর্থন জানাবেন না।

নাগরিকশাসন: ইংরেজি বহাল রাখারই পক্ষপাতী। কেরালার মধ্যমন্ত্রী মনে করেন, অ-হিন্দী রাজ্যগুলিতে হিন্দী রূপে দেওয়ার এক নয়া মতলব সাধন হবে আঞ্চলিক ভাষা। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে দ্রুত হিন্দীভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় সাহায্য করছেন। কলে হিন্দীভাষী রাজ্য খুব শীঘ্রই হিন্দীর প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে আর ঐ সময়ের মধ্যে কন্যারা আঞ্চলিক ভাষা আপনাপন রাজ্যে ইংরেজির স্থান দখল করতে সক্ষম হবে। কলত ক্রমে তাদের হিন্দীকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা খরচ করে হিন্দীকে এইভাবেই সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার

আছেন এবং ভারতের সমস্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে হিন্দীকে ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

ই এম এস বলেন: এ সমস্যাতেই হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ারই প্রচেষ্টা।

এস কে পাতিল চান ত্রিভাষাসূত্র মানতে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনে করেন, দেশের সামনে এখন খাদ্য এবং প্রতিরক্ষার মতো বড় বড় সমস্যা। এই কি ভাষা নিয়ে মাতামাতি করার সময়।

কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন বলেন, আইনমন্ত্রী সম্মেলনে উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর ক্ষিপ্ত ভাষণ ভাষা বিতর্কে নতুন করে শাণ দিয়েছে। কেন্দ্রের বিপথ-চালিত ভাষানীতি দেশের একা চিন্তাকে বিধ্বস্ত করেছে।

জনসংঘ নেতা শ্রীবলরাজ মাধোকে ইংরেজি শিক্ষা বহাল রাখার পক্ষে ভারতের সর্বজন প্রমুখ ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সর্বশ্রী সি ডি দেশমুখ, এম সি শীতলবাদ, এ এল মদালিয়র, এইচ এন কুজর, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং বি শিব রাও) যে বিবৃতি দিয়েছেন তারই জের টেনে বলেন: ইংরেজি হটিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠা না দিলে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে একাধোখ সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

ভাষা নিয়ে নতুন করে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে রাজ্যে নয়া অনৈক্যের সৃষ্টিতে সহায়তা করলেন। কয়েকটি অতি শিষ্ট রাজ্য ছাড়া (শিষ্টতা অনেকাংশে দুর্বলতার লক্ষণ) প্রায় রাজ্যেই ভাষা নিয়ে ভিন্নরাজ্যবাসীকে কোণঠাসার আয়োজন এইবার বৃদ্ধি চিহ্নে শুরু হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা ছাড়া ভারতবর্ষ টিকতে পারে না। শান্তি স্থির পরিবেশ মানুষকে আরম্ভ কতব্য করতে শেখায়। ভারত চায় ফাঁকিভাবে আসল করণীরকে তাড়িয়ে নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে আপন অক্ষমতা-গুলিকে চুপড়ি চাপা দিয়ে রাখতে। সমস্যার খলো উড়িয়ে তাই নিত্য নতুনভাবে অক্ষম পণ্ডিতের লজ্জাকে এইভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা চলবেই। দুর্নিয়ন্ত্রিত অক্ষম শাসন সাধারণের চোখে এইভাবেই খলো দিয়ে চলছে।

সীমান্ত হামলা

পত্রেরই সেপ্টেম্বর প্রভাতী স্ববাদপত্রে দেখা গেল: নাখুলা শান্ত। কিন্তু ভারতের বুদ্ধিবীরতির প্রস্তাব তথা আঞ্চলিক কম্যাডারদের বৈঠকের প্রত্যুত্তরে চীনা মহল এ-পর্যন্ত কোন জবাব দেন নি। তবে পিকিং বেতার সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছে, সিকিম-তিব্বত সীমান্তে নাকি চীনের বিরুদ্ধে ভারত একটি বড় রকমের

মশস্ত প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে। ভারতের সরকারী মুদ্রাপত্র এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, ভারত এই সীমান্ত সংঘর্ষকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বৈ অন্য কিছু মনে করে না। কারণ সংঘর্ষ একটি বিশেষ পর্যায়েই আবদ্ধ থাকায় অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হতে হয়। তবে বর্তমান স্তম্ভতা যে আগামীকাল অপেক্ষাকৃত গুরুতর হামলার আকার ধারণ করবে না, এমন নিশ্চিন্তিও রাখা অনুচিত।

চীনা বেতারে ভারতের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নিয়ে কিছুদিন যে প্রচার চালানো হচ্ছিল, ভারতীয় মহলের দৃষ্টি তৎপ্রতিও আকৃষ্ট হয়। অবশ্য চীনা প্রচারের লক্ষ্য যেহেতু তামাম দুর্নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবি সমাজের বিরুদ্ধেই এজন্য এই বিশেষ প্রচারকে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ অভিসন্ধিরূপে গ্রহণ না করলেও হয়ত চলে। চৈনিক প্রচার সম্প্রতি উন্মত্ততার পথ ধরে চলেছে তাতে পাক কৌশলের স্থূলতা প্রচারের ধার কমিয়ে দিচ্ছে। প্রচার-অস্ত্রে চীন যে দুর্বল এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশই। ভারতে কিছু উগ্রপন্থী উত্থানের সমর্থনে চীনের প্রচার উগ্রপন্থীদের সাহায্য দূরে ধাক্কা দিচ্ছে। দেশীয় সমস্যা সমাধানের মানসে উগ্রপন্থীরা কোনও আন্দোলনে নেমেছেন, চৈনিক প্রচারের পর সাধারণ মানুষের মনে সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ায় যেটুকু জনসমর্থন উগ্রপন্থীরা পেলেও পেতে পারতেন, তা বরং হারিয়ে বসেছেন। সুতরাং চৈনিক প্রচারের স্থূলতার জন্যই ঐ প্রচারকে আদৌ পাতা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। প্রচার করতে গিয়ে চীনারা যে উন্মাদনার স্বরূপ প্রকট করে তুলেছেন, তাতে অসুস্থতার লক্ষণই প্রকাশ পায়। অন্তরে দুর্বলতা বোধ করলেই, হীনমন্যতার উদ্বেগ হলেই ক্ষিপ্ত চীৎকারের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে রক্ত মন। লাল চীনের উন্মত্ততায় সেই অসুখেরই গন্ধ। চৈনিক প্রচারের গুরুত্ব সেকারণে অধতব্য।

কিন্তু সীমান্তে চীন-পাক তরফ থেকে থেকে যে উস্কানিমূলক গোলাগুলি বিনিময় ঘটে থাকে তার ফলশ্রুতিতে আর কিছু না হোক, উভয়পক্ষে অকারণে দেশ-রক্ষী সীমান্ত সেনার প্রাণহানি ঘটে। সৈনিকের প্রাণহানিকে সংখ্যা ম্বারা গণনা করে জীবনের মূল্যকে তুচ্ছ করা হয়। এই অগচর সভ্য মানুষ অম্বা কিভাবে সহ্য করেন এটাই আশ্চর্য। উভয়পক্ষে কতগুলি তরুণ প্রাণপ্রদীপ হঠাৎ হঠ-কারিতার নিভিয়ে দেওয়া কেমনভর শক্তি প্রদর্শন তা আদেশজারী ক্ষমতাধারীরাই জানেন। এবারের সংঘর্ষও হতাশের সংখ্যা শব্দের কোঠায়। অথচ ঐ প্রাণহানি

मासिक कम्पनी

চীনারা যদি শবে অপপ্রচারেই আনন্দ
লাভ করতে চায় তবে তাতে বাধ সাধার
বাতলভায় কাজ নেই।

কালিতদলের কল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তিদলকে তাই মদ্য
মন্ত্রী শ্রীঅজয় মদ্যোপাখ্যায়ের সমর্থন
লাভের চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু সম্ভব

উদিত হয়ে বাংলা কংগ্রেসের মাথায় ভাঙন
ধরাবার ভেতর ভেতর প্রাচেষ্টাকে অনেক দূর
এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অজর মনোযোগ্য
পশ্চিমবঙ্গে কালীঝরবুদের এই পুরক
প্রাচেষ্টায় অবাধ এবং অসম্ভব।

[illegible]

সাপ্তাহিক বসুমতী

এই নয়া জোট বাংলা কংগ্রেস থেকে পনের জন এম-এল-এ ভাগিয়ে নিতে পারবে বলেও বলছে। কিন্তু চম্বিশ পরগণা ছাড়া ক্রান্তিদলের অনুগামী সংগ্রহ অন্যত্র কতদূর সফলকাম হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর একথা জানা আছে বলেই কবীর গোস্বামীকে অজয়বাবুর সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিহারেও একই অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের সহযোগিতা না পেলে ক্রান্তিদল সেখানেও জুঁৎ করতে পারবে না। কিন্তু মহামায়াপ্রসাদও অজয়বাবুর মত এ-পর্যন্ত সাংগঠনিক ব্যাপারে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

ক্রান্তিদল কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ল ভারতের রাজনৈতিক প্রাণগণে সাধারণের কাছে তা অস্পষ্ট। কমুনিষ্ট অগ্রগতি মুখবার জন্যেই কিন্তু ক্রান্তিদল সৃষ্টির বা সেখানেই নেতৃত্বের লড়াই লড়তে যাওয়ার তাঁর কোন কারণ ছিল না, কমুনিজম রোখবার দল এদেশে অপ্রতুল নয়। কংগ্রেসও তাদেরই অন্যতম।

রাজস্থান।

ভাষা নিয়ে নয়া সংকট

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়কে দুয়ার বন্ধ করে দিতে হ'ল উগ্র ইংরেজিবিরাগের উদ্ভা থেকে শিক্ষানিকেতন রক্ষা করার জন্য। আগামী ২রা অক্টোবর পর্যন্ত জয়পুরের সমস্ত ডিগ্রী কলেজের ফটক বন্ধ থাকবে। কেন না ছাত্ররা উদ্ভাদ হয়ে ইংরেজি হটাতে শুরুর করেছেন এবং ইংরেজি হটানোর দাবি তুলেছেন। ইংরেজি হটাও শ্লোগানধারীরা কোটা অঞ্চলে এমন বিক্ষোভ প্রদর্শন

করলেন যার ফলে সেখানকার শিক্ষায়তন-গুলি ধপ ধপ করে দোর বন্ধ করতে বাধ্য হ'ল। জয়পুরে হাজার ছেলের কাণ্ড। বাধ্যতামূলক ইংরেজি পাঠ্যসূচী আভিতি বাতিল করা দাবি। রাজপথে ইংরেজি সাইনবোর্ড বথেন্ট ভাঙচুর এবং গাড়ির নাম্বার প্লেট অপসারণের তাণ্ডব চলছে।

অকস্মাৎ প্যাণ্টসুটধারী ছাত্ররা সেখানে ভাষাপ্রেমে পাগল হয়েছেন। ছাত্ররা রাজ্যপাল হুকুম সিং-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের নয়া দেশপ্রেমের খবরও দিয়ে এসেছেন।

ভাষাপ্রেমের আর একটি টাটকা সংবাদঃ রাজস্থানের চীফ সেক্রেটারী গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এক আদেশ জারি করে ঘোষণা করেন যে, রাজস্থানে চাকরীর নিয়োগ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত সব রকম প্রশাসনিক আদেশ অতঃপর একমাত্র হিন্দীতে প্রচারিত হলেই তাকে সরকার অনুমোদিত বলে গ্রাহ্য করা হবে



শ্রীকবীর

অন্যথা নয়। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজে হিন্দী ছাড়া গতানুগত নেই। যারা হিন্দী না-জানেন, প্রশাসনিক দপ্তর থেকে তাঁদের কি এবার উদ্ভাস্ত হতে হবে?

মাদ্রাজঃ

তামিলনাড়ু হিন্দীবিরোধী আন্দোলন পরিষদ তামিলনাড়ু পুনশ্চ হিন্দী হটাও

আন্দোলনে নেমেছেন। সম্প্রতি হিন্দী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ রাখার দাবি এক বিজ্ঞাপিত্ত দ্বারা সিনেমা গৃহের মালিকদের উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রচারও করেছেন। দাবি, আগামী ১০ই অক্টোবর থেকে হিন্দী ছবি প্রদর্শন বন্ধ করা হ'ক। যদি এই দাবি পূরণ করা না হয় তবে কেমন করে প্রদর্শনী বন্ধ করা হবে সে সম্পর্কে কর্ম-সূচী স্থির করা হবে পরিষদের সম্মেলনেই। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী-প্রচার সভা বন্ধ করে দেবার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন পরিষদ। এখানে বিভিন্ন স্টেশনে হিন্দী হরফ মুছে দেওয়ার জন্যও কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করা হবে।

স্মরণ থাকতে পারে, তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন দল ডি এম কে ইতিপূর্বে আঞ্চলিক মনোভাব ত্যাগ করে ক্রমশ সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হ'ছিলেন। যদিও হিন্দীবিরোধিতা এবং আঞ্চলিকতা রক্ষাই ছিল ডি এম কে'র প্রধান শ্লোগান, কিন্তু সেই শ্লোগানের ভিত্তিতে বিগত নির্বাচনে অকল্পনীয় জয়লাভ করেও ডি এম কে'র সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের এই সিদ্ধান্ত আশার আলো দেখা গেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি পুনরায় ভাঙার প্রশ্নকে উদ্ভাপন করে তামিলনাড়ুকে আবার আঞ্চলিকতা রক্ষার আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে ঠেলে দিল। অতঃপর তামিলনাড়ু পুনশ্চ তেমন কোন ভাষান্দোলন হলে তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরেই বর্তাবে। এই অবিস্মার্যকারিতার জবাবদিহি তখন কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে।

উগ্র আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাস নিয়ে ডি এম কে নেতৃত্ব দিলেও আজকের ভাষান্তরের উদ্ভাদনা সম্পর্কে প্রীযুত আম্মাদুরাই বলছেনঃ আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা চলে সাজানো ছেলের হাতের মোয়ার মতো কোনো আন্দারের ব্যাপার নয়। ইংরেজিকে কনুই করে আঞ্চলিক ভাষার রাতারাতি অগ্রগতিও অসম্ভব। তাই তিনি তামিলকে তামিলনাড়ু উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম করার মতো আজগুবী চিন্তা করেন না। তিনি জানেন ব্যাপারটা অনেক সময় সাপেক্ষ।

(১৬।১২।৬৭)

কিস্তিবদ্ধীতে ট্রানজিস্টার

২৫৫ টাকা মূল্যের ও

ব্যান্ড অল-ওয়ান্ড

পোর্টেবল ট্রানজিস্টার

"এসকট" মাসিক ২৫.

টাকা কিস্তিবদ্ধীতে ক্রয় করুন।

Japan Agencies (BW-77)

Post Box 1194, Delhi-6.



পোল্যান্ড :

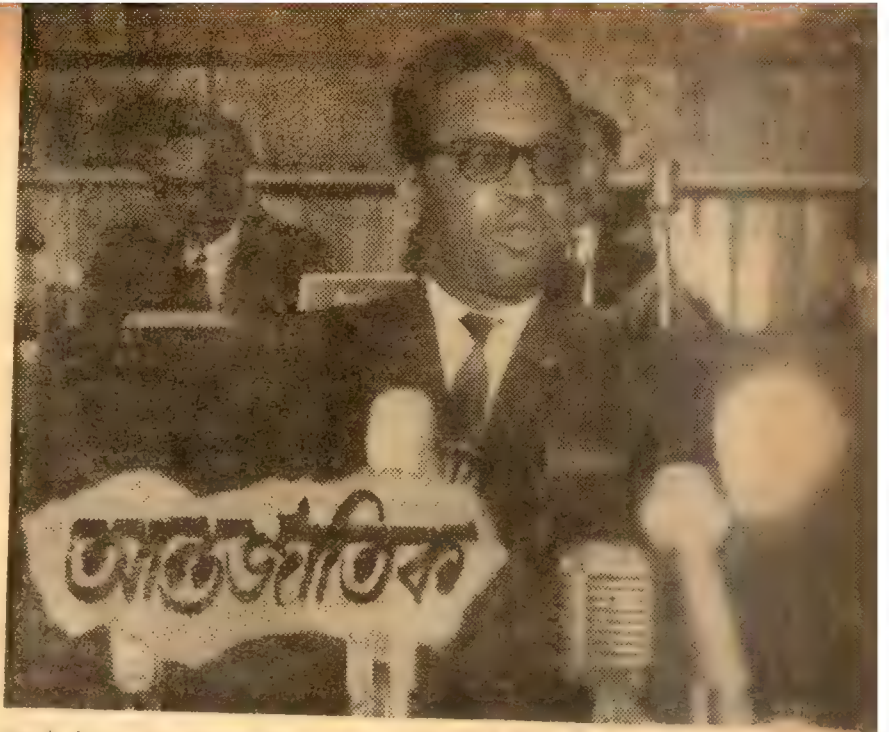
ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল ৭ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ছ' দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পোল্যান্ড সফর করে প্যারিস ফিরে গিয়েছেন। এটা হল দ্য গলের দ্বিতীয় পোল সফর। এর আগের-বার তিনি এসেছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯১৯ সালে একটি ফরাসী সামরিক মিশনের সদস্যরূপে। রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার নতুন কমিউনিস্ট শাসকদের সঙ্গে পোল্যান্ডের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে সাহায্য করার জন্য এই সামরিক মিশন এসেছিল।

দ্য গলের এবারের সফর সম্পূর্ণ শূভেচ্ছামূলক হলেও, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব থেকে পোল্যান্ডকে মুক্ত করার বাসনা তাঁর মনে যে ছিল না, তা নয়। ইউরোপের রাজনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েরই প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে, এই হল দ্য গলের কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নকে তিনি ঠিক ইউরোপীয় শক্তি বলে স্বীকার করতে চান না। এ ছাড়াও তিনি পূর্বে ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপের মধ্যে তফাৎ বজায় রাখতে চান।

দ্য গল পোল্যান্ডের জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল সমর্থনা লাভ করেছেন। তাঁকে সমর্থনা জানানোর জন্য ওয়ারশ'র অধিক লোক রাস্তায় নেমে এসেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতা পোল্যান্ডে এরূপ জনসমর্থনা পান নি। ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘদিনের মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। জার্মানী ও রাশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত বলে পোল্যান্ড বরাবর ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর সরকারী পর্যায়ে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বর্তমানে ফ্রান্স নানা ব্যাপারে মার্কিন বিরোধী নীতি গ্রহণ করায়, সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সকল কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গেই তার সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে।

পোল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে দ্য গল যে-সব ভাষণ দেন, তার মূল কথা হল : স্নায়ুযুদ্ধের দিন শেষ হয়েছে। প্রত্যেক দেশেরই এখন স্বাধীন নীতি অনুসরণ করা উচিত। তিনি আকারে-ইঙ্গিতে এই কথাই বলতে চেয়েছেন, পোল্যান্ডের সোভিয়েট প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

স্বাভাবিকভাবেই পোল সরকার এবং তাঁদের নেতা গোলমুলকার দ্য গলের এই মাতঙ্গরি ভাল লাগে নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে পোল্যান্ডের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট



মোবুটু, কিনসাসায় আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন।

আন্দোলনে ও কূটনীতিতে সোভিয়েটের এক বিশ্বস্ত সমর্থক হল পোল্যান্ড। এই কারণেই সম্ভবত, দ্য গলের সঙ্গে পোল সরকারের নেতাদের বৈঠকগুলি খুব জমে নি।

তবু, দ্য গলের এই রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের পক্ষ থেকে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, দ্য গলের এই সফরের ফলে পোল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে দ্য গল ও গোলমুলকা, উভয়েই বলেছেন, ইউরোপের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। ভিয়েতনামে মার্কিনী নীতির নিন্দা করে, অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ ও মার্কিনী সৈন্য অপসারণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে হবে।

দ্য গল পোল নেতাদের সঙ্গে জার্মান সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। দুই জার্মানীর মিলনের ওপরেই তিনি জোর দিয়েছেন।

বৃটেন .

উইলসন সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিপুল ভোটাদিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গত সপ্তাহে রাইটনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৪৮,৮৩,০০০—৩৫,০২,০০০ ভোটে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবে শ্রমিক দলের সরকারের বিরুদ্ধে নব্বই লক্ষ শ্রমিকের এই কেন্দ্রীয় সংগঠন কার্যত অনাস্থা প্রকাশ

করেছে। যদিও তার পরেই সম্মেলন আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে জানিয়েছে, এখনও তারা উইলসন সরকারকেই সমর্থন করবে!

ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলের শক্তির প্রধান উৎস এই শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এঁদের সমর্থন ছাড়া সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা, কিম্বা আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করা একরূপ অসম্ভব। হ্যারল্ড উইলসন কর্তৃক সরকার গঠনের পর থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ সূত্র হয়েছে, একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মন্থিত ত্যাগ করে গিয়েছেন। উইলসন সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য। বর্তমানে বৃটেনে অর্থনৈতিক সংকট ঘেরা তীব্র হয়েছে তাতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ব্যক্তি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উইলসন যখন আশা করছেন, এই সংকট উত্তরণে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নেতাদের সহযোগিতা পাবেন, তখন তাঁরা তাঁর বিরোধিতা সূত্র করলেন।

গত বৎসরও ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রতিনিধিরা উইলসনের বক্তৃতা শুনিয়েছেন, এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী নীতির সমর্থনে প্রস্তাবও প্রাশ করেছেন। কিন্তু এবার তাঁরা উইলসন বা তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকে সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্যও ডাকেন নি। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে কখনও ঘটে নি।

কেবল অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধেই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলন থেকে উইলসন সরকারের পররাষ্ট্রনীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সম্মেলনে

বিপুল ভোটখিকে গৃহীত প্রস্তাবে, ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করার জন্য উইলসন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে অবিলম্বে সকল মার্কিন সৈন্যের অপসারণের জন্যও দাবি জানানো হয়েছে।

উইলসনের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই সমালোচনা একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার পথে চার দিনের জন্য মস্কো সম্মত এসেছেন। কথা ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা আসবেন। কিন্তু শ্রীচাগলা হঠাৎ পদত্যাগ করায় তাঁর জায়গায় স্বরণ সিংকে আসতে হয়েছে।

সিকিম সীমান্তে নাথুলায় চীনা গুলীবর্ষণ শুরু হবার ফলে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে স্বরণ সিং-এর এবারে আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে এই আলোচনার কর্মসূচী আগে থেকেই স্থির করা ছিল। তাই নাথুলায় ঘটনা তথা নতুন করে চীনা আক্রমণের আশঙ্কার কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য স্বরণ সিং মস্কো আসেন নি।

তবে স্বরণ সিং সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আলেক্সে গ্রোমিকোর সঙ্গে নাথুলায় গুলীবর্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্ভাব্য চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা

হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নেতাদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। সর্দার স্বরণ সিং-এর সঙ্গে আলোচনার সময় পররাষ্ট্রদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীরাজেশ্বর দয়াল ও জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীজয়পাল উপস্থিত ছিলেন।

গ্রোমিকোর সঙ্গে স্বরণ সিং রাষ্ট্র-সংঘ অধিবেশনের আলোচ্য সূচী, পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সঙ্গেও স্বরণ সিং কথা বলেছেন।

কানাডা :

কমন্সওয়েলথ পার্টির নেতৃপদ থেকে ৭১ বৎসর বয়স্ক জন জর্জ ডিফেন-বেকার অপসারিত হয়েছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে গত ১১ বৎসর ডিফেনবেকার এক-টানা রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করেছেন, একবার তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন।

কিন্তু কিছুদিন ধরেই ডিফেনবেকারের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে গত সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল বিপর্যস্ত হবার পর সাধারণ সদস্যদের ধারণা হয়েছে, ডিফেনবেকারের মত অর্থর্ব, গতিহীন, পুরনো নেতাকে দিয়ে আর চলবে না। তাই গত কয়েক মাস ধরেই নতুন নেতার সন্ধান চলছে।

গত সপ্তাহে টরোন্টোর ম্যাপল লীফ গার্ডেনসে রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলন বসেছিল। সকলেরই ধারণা ছিল, ডিফেনবেকার এবার আর নেতৃপদে থাক-

বেন না, স্বেচ্ছায় সম্মানের সঙ্গে তিনি সরে দাঁড়াবেন। গত কয়েক মাস ধরে নতুন নেতার জন্য দলের মধ্যে যে আলো-চনা শুরু হয়েছে, সে-সম্পর্কে ডিফেন-বেকার পূর্ণ নীরবতা পালন করায় এই ধারণা আরও জোরদার হয়েছে।

কিন্তু সম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্তম্ভিত করে দিয়ে ডিফেনবেকার ঘোষণা করলেন, তিনি আর একবার নেতৃপদে থাকতে চান। ক্ষুদ্র প্রতিনিধিরা ডিফেন-বেকারের এই ইচ্ছার জবাব দিয়েছেন তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তিন তিন-বার ভোট হয়, আর প্রতিবারই তিনি ব্যালটে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ডিফেনবেকার ও অন্যান্য প্রার্থীদের হারিয়ে রক্ষণশীল দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন নোভাস্কশিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট স্ট্যানফিল্ড।

স্ট্যানফিল্ডের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল নতুন উদ্যমে কাজ করে ক্ষমতা দখলের আশা করছে। নির্বাচনের সুবিধার কথা ভেবে রক্ষণশীল দলের সম্মেলন থেকে ফরাসীভাষী কুইবেকের জন্য আরও বেশি স্বাভাব্য দাবি করা হয়েছে। কুইবেকের মানুষ লিস্টার পিয়ারসনের সরকারের ওপর ক্ষুদ্র। রক্ষণশীল দল তাই ভাবছে, ফরাসীভাষীর দাবি মেনে নিয়ে তাদের দলে টানতে পারলে আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করা যাবে।

কঙ্গো :

কঙ্গোর রাজধানী কিনসাসার 'আফ্রিকা এক্স সংস্থার' (অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি) বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনের আগে আফ্রিকার ৩৮টি দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরা আর একটি বৈঠকে বসে আফ্রিকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কিনসাসা সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাপারে আফ্রিকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি জোসেফ মোবুটু অনেক দিন ধরেই কিনসাসাতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছেন। সমস্যা-জর্জরিত, অন্তর্দ্বন্দ্বের খণ্ড-বিখণ্ড কঙ্গোতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে মোবুটু'র মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তিনি প্রায় দুই কোটি ডলার খরচ করে সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। কঙ্গো নদীর তীরে এই উদ্দেশ্যে ৪১টি সুরমা ও সুসজ্জিত গৃহ নির্মিত হয়েছে, একটি বিরাট সুইমিং পুল হয়েছে, এবং একটি গল্ফ খেলার মাঠও হয়েছে!

কিনসাসা সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ এখনও এসে পৌঁছয় নি।



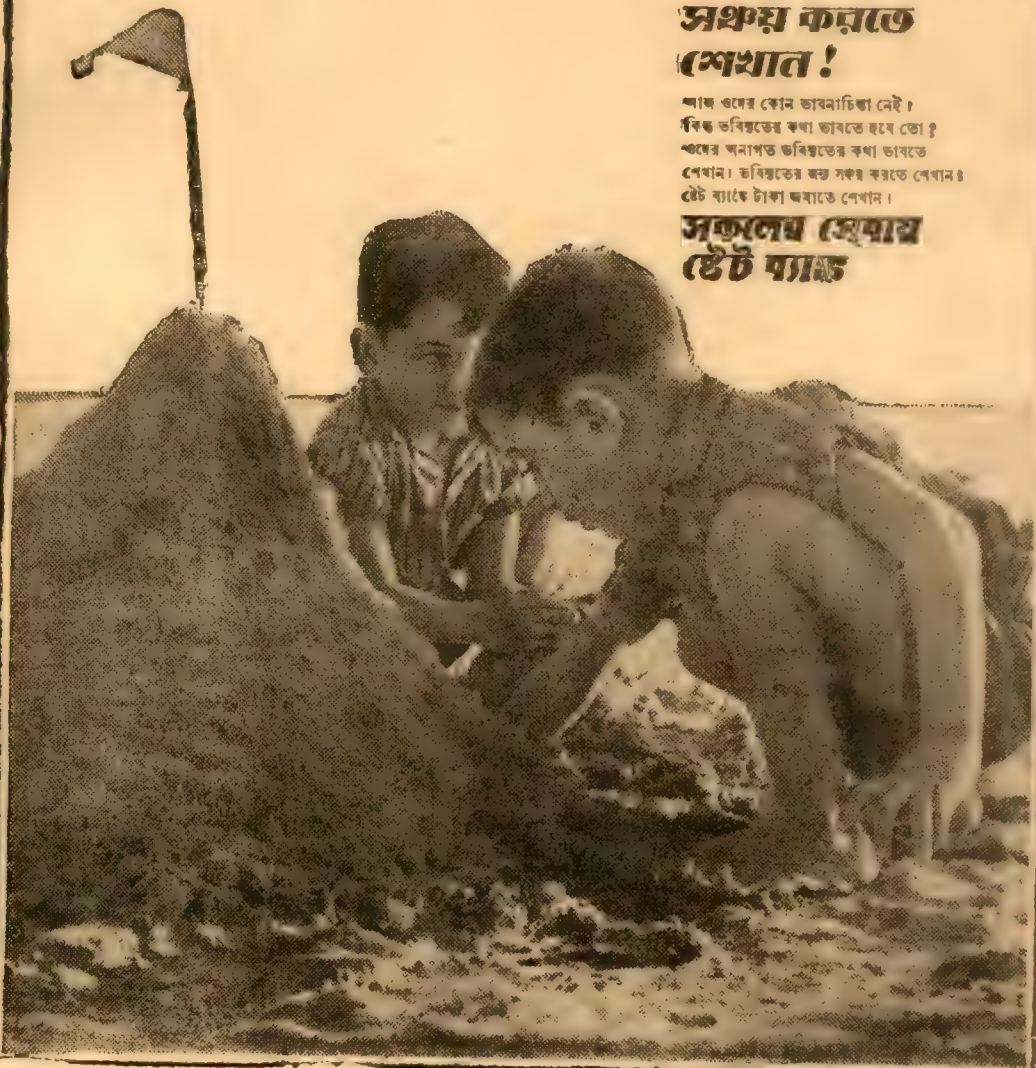
মস্কোয় গ্রোমিকো-স্বরণ সিং সাক্ষাৎকার

ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে

সঞ্চয় করতে শেখান!

শাক ওদের কোন ভাবনাচিন্তা নেই।
বিশ্ব ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো?
ওদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে
শেখান। ভবিষ্যতের স্তর স্তর করতে শেখান।
ট্রেট ব্যাঙ্ক টাকা জমাতে শেখান।

**সকলের সেবার
ট্রেট ব্যাঙ্ক**



১৫/৫/৫০ ১৫/৫/৫০

বিশ্বসাহিত্যের * প্রাদিপর্ষ

ডঃ নরেন ডেব্রাচার্য

॥ সাতাশ ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য : কন্নড় ও তেলুগু

প্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা-সমূহের মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক থেকে তামিলের পরেই কন্নড়ের স্থান। কন্নড় শব্দটি সম্ভবত কণ্ঠটক বা কন্নুনাড় থেকে এসেছে। বর্তমান মহীশূর এবং তার নিকটবর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসীরা কন্নড়ভাষী। মহারাজের ধারওয়ার, বেলগাও এবং বিজাপুর জেলাগুলিতেও কন্নড় ভাষার প্রচলন খুব বেশি। কন্নড় লিপির মধ্যে তামিল লিপির সাদৃশ্য আছে, এবং উভয় ভাষার ব্যাকরণও প্রায় একই ধরনের। তবে কন্নড় ভাষার তামিলের চেয়ে সংস্কৃতের প্রভাব বেশি। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে কন্নড়ের ঊনপঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু কলা শত, তবে ওই ভাষার প্রাপ্ত লেখমালাসমূহ এ বিষয়ে আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করে পাঁচতেরা শতাব্দীতে এসেছেন যে খৃস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই প্রকৃতপক্ষে কন্নড় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৮৫০ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত কোন কন্নড় সাহিত্যগ্রন্থ আমাদের হাতে আসে নি।

কবিরাজবর্ষ

কন্নড় সাহিত্যের এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটিই সম্ভবত এই সাহিত্যের আদি গ্রন্থ বার রচনাকাল ৮৫০ খৃস্টাব্দ বলে অনুমিত। এই গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ যিনি নৃপভূষণ নামেও বিখ্যাত। বিখ্যাত সংস্কৃত লেখক দণ্ডীর কাব্যাদর্শের অনুসরণে নৃপভূষণ এই গ্রন্থ রচনা করছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে

কন্যা সমালোচনার রীতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রন্থটির অন্য আকর্ষণ আছে কেন না এই গ্রন্থে কয়েকজন প্রাচীন কন্নড় লেখকের নাম, আছে যদিও তাঁদের রচনা-বলী আজও পর্বন্ত পাওয়া যায় নি। এই সকল লেখকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সমন্তভদ্র ও পূজাপাদের কথা। এঁরা উভয়েই ছিলেন জৈন পণ্ডিত। এ ছাড়া জনৈক কবিপরমোষ্ঠির নাম নৃপভূষণ তাঁর গ্রন্থে করেছেন। অপরাপর প্রাচীন কন্নড় লেখকদের মধ্যে উদয়, বিমল, জয়বন্ধু, দূর্বিনীত এবং শ্রীবিজয়ের নাম নৃপভূষণ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং দূর্বিনীতের এঁদের কোন রচনাই আমরা পাই নি।

নৃপভূষণের কবিরাজবর্ষের সমকালীন একটি গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম মোন্দারায়ন, লেখকের নাম শিবকোটাচার্য। রচনাকাল ৮৫০ খৃস্টাব্দ। গ্রন্থটি গদ্যে রচিত, বিষয়কতু ভিত্তিমূলক। লেখক জৈনধর্মের অনুসারী ছিলেন। খৃস্টীয় নবম শতকের আরও কন্নড় সাহিত্যের লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর নাম গুনবর্মী এবং ইনি দু'খানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, একটির নাম শূরক, অপরাটির নাম নেমিনাথপুরাণ। ধর্মমতের দিক থেকে এই লেখকও জৈন ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি নৃপভূষণের বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন ছিলেন।

দশম শতকের কন্নড় সাহিত্য

খৃস্টীয় দশম শতকে কন্নড় সাহিত্যে জোয়ার আসে। এই সময় কন্নড় সাহিত্যে তিনজন শক্তিমান লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন—পম্প, পোন্ন ও রন্ন। পম্প বা আদি পম্পকে কন্নড় সাহিত্যের সবচেয়ে

শক্তিমান কবি বলা হয়। হান অরিকেশরী নামক একজন সামন্ত রাজার সভাকবি ছিলেন। ৯৪১ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, নাম আদিপদ্যরণ। এই কাব্যগ্রন্থে প্রথম জৈন তীর্থংকর আদি-নাথ বা ধ্বজনাথের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। পম্পের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটির নাম বিজয়জর্জুন বিজয়। জনপ্রিয় এই কাব্যগ্রন্থটিটি সচরাচর পম্পভারত নামেই অধিকতর প্রচলিত। কাব্যের কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্জুনের বীরত্ব-বর্ণন এই কাব্যের বিষয়-বস্তু। তবে অর্জুন প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কবি নিজ পুস্ত্রপোষক রাজা অরিকেশরীর গুণানুশঙ্গ করেছেন।

পোন্ন ছিলেন পম্পের সমকালীন যিনি ষোড়শতম জৈন তীর্থংকর শান্তিনাথের জীবনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন শান্তিপদ্যরণ নামক কাব্য। রন্ন ছিলেন জাতিতে মল্লিকার এবং চাবুড় রায় নামক জনৈক সামন্ত রাজার আশ্রিত। ইনি মোট তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথমটি নিজ পুস্ত্রপোষকের নামে গদ্যে লিখিত, নাম চাবুড় রায় পদ্যরণ। এতে চাবুড়রাজ জৈন তীর্থংকরের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি কবিতায় রচিত, নাম জিজ্ঞাস্যপদ্যরণ, বিষয়কতু হচ্ছে দ্বিতীয় জৈন তীর্থংকরের জীবনকথা। কিন্তু রনের বিশেষ জনপ্রিয়তা হচ্ছে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের জন্য। এই গ্রন্থটির নাম সাহস-ভীম-বিজয়, চলতি নাম গদ্যাদ্যন্থ। নামের দ্বারাও কাব্যটির বিষয়বস্তু বোঝা যায়।

এই তিনজন কবি ছাড়া দশম শতকের আরও একজন কন্নড় লেখকের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি হচ্ছেন নাগবর্ম যিনি ছন্দোশাস্ত্রের উপর ছন্দোমুদ্রি নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

একাদশ শতকে কব্জ সাহিত্যের প্রাণ-প্রবাহ আবার ক্ষীণতর হয়ে আসে। এই শতকে দু'জন ব্রাহ্মণ লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম জন হচ্ছেন নাগবর্মাচার্য যিনি চন্দ্রচূড়ামণি-শতক নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন চন্দ্ররাজ, যার রচিত গ্রন্থের নাম মদনভিলাক।

বীরশৈব সাহিত্য

বীরশৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভবের সঙ্গে কব্জ সাহিত্যের নতুন করে প্রীতিবিশ্বের সূত্রপাত হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন বসব যিনি ১১২৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোবনে তিনি কল্যাণের রাজা বিজ্ঞলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কালক্রমে বীরশৈব ধর্মমতের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সম্প্রদায়ে প্রায় ২১০ জন লেখক বা পদকর্তা ছিলেন যাদের রচিত পদাবলীসমূহকে বচনশাস্ত্র বলা হত। এই বচন-সাহিত্যের সঙ্গে তামিল ভক্ত পদকর্তাগণ রচিত তেবারম ও তিরুব্বাচকমের সাদৃশ্য আছে। বসবের নিজের রচিত বচনের সংখ্যা সাতশোরও বেশি। এইগুলি তাঁর উপাস্য দেবতা কুড়ল সঙ্গমের উদ্দেশ্যে রচিত। অন্তঃসুপভাবে মহাদেবী অম্ব তাঁর উপাস্য মাল্লিকার্জুনদেবের অনেকগুলি বচন রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত একটি বচনের নমুনা এখানে দেওয়া হল—

ওগো কব্জতরের দল যারা আনন্দে
গান গাইছে,
ওগো হাঁসের দল যারা সরোবর
আলো করে আছ,
ওগো সুখী কোকিল আর
গর্বিত ময়ূরের দল,
সাহাড়-উপত্যকা আর
আকাশ-বাতাস
যারা মৃত্যুরিত করে রেখেছে—
তোমারা বল, একে এবং সকলে
আমার পরম প্রেমিক মাল্লিকার্জুন
কোথায় ?

অপরূপ বীরশৈব লেখকদের মধ্যে প্রভুদের বা জন্ম প্রভু এবং হরিহর বিখ্যাত। শেষোক্ত লেখক গিরিজা-কল্যাণ এবং শিবশরণ রণলেগল নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথমটির কাহিনী হচ্ছে শিবপার্বতীর বিবাহ এবং দ্বিতীয়টি

হচ্ছে নামকরা শিবভক্তদের জীবনকথা। হরিহরের ভাণ্ডে রাঘবাক্ষ একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন যার তিনটি কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যেগুলির নাম যথাক্রমে হরিশচন্দ্র কাব্য, সোমনাথচরিতে এবং হরিহরমহত্মব। রাঘবাক্ষ ষষ্ঠপদী নামক একটি বিশেষ ধরনের ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন। অপরূপ বীরশৈব লেখকদের মধ্যে কেরের পঞ্চরস বা তার্কিক চক্রবর্তী, সরণ কবি, সোমেশ্বর প্রমুখের নাম বিখ্যাত। এঁরা সকলেই ভক্তিসম্মত রচনা লিখেছেন। আরও দু'জন, দেবকবি ও সোমবাক্ষ, প্রেমের কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

জৈন লেখকগণ

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে বীরশৈব বচনকারদের পাশাপাশি জৈন লেখকরাও

কব্জ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নাগচন্দ্র বা দ্বিতীয় পম্প বা অভিনব পম্পের নাম। ইনি ঊনবিংশতিতম জৈন তীর্থংকর মল্লিনাথের জীবনী অবলম্বনে মল্লিনাম পুরাণ এবং রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রামচন্দ্র-চরিত পুরাণ রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি পাম্প-রামায়ণ নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। বাস্মীক-রামায়ণের সঙ্গে অবশ্য এই রামায়ণের পার্থক্য বহুক্ষেত্রে বিদ্যমান। অপরূপ জৈন লেখকদের মধ্যে নেমিচন্দ্র লীলাবতী নামে একটি রোমান্স রচনা করেছিলেন। চতুর্দশতম তীর্থংকরের জীবনী অবলম্বনে জম্ব নামে এক লেখক যশোবর-চরিতে নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কান্তি নামে জনৈক মহিলা কবি নাগচন্দ্র বা দ্বিতীয় পম্পের সমকালীন ছিলেন। এ ছাড়া নরসেন নামক জনৈক

অধ্যাত্ম সাহিত্য

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের শাস্ত্রত অবদান

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

[সম্মার্জিত বিশুদ্ধ সংস্করণ]

পরমভক্ত শ্রীমৎ লাভাজীউ কর্তৃক হিন্দী ভাষায় রচিত ভক্তমাল গ্রন্থ ও শ্রীমৎ প্রিয়দাস কর্তৃক রচিত টীকা অবলম্বনে পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্তৃক স্থলবিত্ত ছন্দে অনূদিত। বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের এই অমূল্য রত্ন।

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

[শ্রীশ্রীবাসাবতার মহাকবি শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত :

আদি, মধ্য, অন্ত্য খণ্ড]

অবতারভক্তের নিগূঢ় রহস্য এই গ্রন্থে নিহিত। যিনি অনন্ত শক্তির আধার ইচ্ছাময় পরমেশ্বর, বাঁহার ইচ্ছামাত্রই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিপ্রলয় সংঘটিত হইতে পারে, কেন যে সেই পরাংপর ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যোচিত কর্মে সংলিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা মধুর ছন্দে এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত।

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১৬

অর্থ-মানব

দুঃখানার মনোপাখ্যায়

তবুও বলতে হবে, ওরা মানবজাতি! যখন দেখি, ওদের ভয়ে ভীতহস্ত যত অসহায় মানুষের কলি গৃহহারা হয়ে, অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল শ্বাপদের প্রত্যন্ত প্রদেশ ও পর্বতগুহায়, যেখানে সূর্যের আলোর আঁজো ঘটে নি প্রবেশ, সেখানে আশ্রয় নিতে করে নি সংশয়। বিকৃত সভ্যতার রাজবে, নারীর সম্ভ্রম বাঁচাতে, মরণকে স্বেচ্ছায় করেছে বরণ।

শুনোছি,—পশুর রূপান্তর ঘটে আজকের মানুষ। মনে হয়,— ওরা বৃক্কি সর্বশেষ রূপান্তর; অর্ধেক পাশব আর অর্ধেক মানব। ওদের হিংস্র লোলুপ দৃষ্টির ছুরিতে নারীর সূকোমল তন্দ্রুটি ক্ষত-বিক্ষত। মানবের সভ্যতার অপমৃত্যু আর রক্তের অপব্যয় বটিয়ে ওরা তৃপ্ত।

তবুও বলতে হবে, ওরা সভ্য সমাজের জীব? যখন দেখি, জন্ম নিয়েছে শিশু হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের কোড়ে,

বাঝে নি মঙ্গলশঙ্ক শিশুর জন্ম-মহুড়ে, জন্মেই শূন্যে সে হিংস্র ব্যাঘ্রের হৃৎকার। হিংস্র,—তবু সেই দৃষ্টিতে ছিল এক করুণ বিষয়। রক্ষা পেয়েছে শিশু হিংস্র ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ দল্ট ও নখর থেকে কিন্তু দেয় নি রক্ষা ঐ অর্থ-মানবের হিংস্র দৃষ্টির ছুরিকা।

শুনোছি,— কোথায় নাকি আছে তুমার মানব। দূরন্ত সাহসী অভিব্যক্তির সত্যক' দৃষ্টির আড়াল থেকে নিষ্ঠুর আক্রমণ তা দেব। শুনোছি তাদের নাম, দেখি নি কখনো। কিন্তু দেখেছি সেই অর্থ-মানব, জন্ম হয়েছে যাদের পশুর উরসে।

স্বর্গ দেখছ তুমি, নরক দেখ নি? মরণের পরে নয়, এই জন্মেই দেখেছি নরক ঐ ওখানে, যেখানে চলেছে নিত্য অপমৃত্যু আর রক্তের অপব্যয়। শুনোছি, বিকৃত এক "শান্তির ললিত বাণী"কে পরিহাস করে ইতিহাস।

শুনোছি,—পশুর রূপান্তর ঘটে আজকের মানুষ। মনে হয়,— ওরা বৃক্কি সর্বশেষ রূপান্তর; অর্ধেক পাশব আর অর্ধেক মানব।

লেখক নীতিশাস্ত্রের উপর লিখেছিলেন স্বাক্ষর। দ্বিতীয় নাগবর্ম ও কেশরীকাজ লিখেছিলেন দু'টি ব্যাকরণগ্রন্থ কণ্ঠাটক-জম্বা-ভূষণ ও শব্দমণিদর্পণ। দ্বিতীয় নাগবর্ম কাব্যবিচার সংক্রান্ত একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন, নাম কাব্যলোকন। দ্বয়োদশ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে মল্লিকার্জুন কন্ড কবিতাসমূহের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন বা সৃষ্টি-সুধাকর নামে খ্যাত।

তেলুগু সাহিত্যের কথা

তেলুগু দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর তৃতীয় ভাষা, অল্পপ্রদেশ ও তার চারপাশেব এলাকায় তেলুগুর প্রচলন বেশ। তেলুগু দশটি সম্ভবত দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তেলুগু লিপির সৃষ্টি কন্ড লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তামিল ভাষার উদ্ভব সংক্রান্ত যেমন একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তেলুগু ভাষার উদ্ভব সংক্রান্ত অন্যরূপ একটি কাহিনী বর্তমান। অশ্বিনমিথ নামক জনৈক ব্যক্তি অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে যায় এবং সূর্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করে। তখন সূর্যের তাকে একটি নতুন ভাষা শিক্ষা করান যার ফলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। এই নতুন ভাষার নাম আশ্বিনমিথ। অশ্বিনমিথের কাছ থেকে এই ভাষা শিক্ষা করেন নন্দিবর্ধন এবং তর্পিন্য দেবল যার।

তেলুগু সাহিত্যের দু'টি ধারা, দেশী এবং মাগী। দেশী ধারাটি স্থানীয় এবং সংস্কৃত-নিরপেক্ষ। এই ধারাটিকে লোক-সাহিত্যও বলা যেতে পারে। তিন ধরণের কবিতা এই ধারাটিকে সম্বন্ধ করেছে—জালি পাডলু বা ছেলে ভুলানো গান, জব্বিললু বা প্রেমের গান এবং উম্মুদু পাডলু বা ফসলের গান। মাগী ধারাটি

সংস্কৃত প্রভাবিত, শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যবহৃত লেখ্য ভাষা। একাদশ শতকে নমিয়া রচিত বিখ্যাত তেলুগু মহাভারত মাগী ধারার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ব্যাসের মহাভারত অবলম্বনে নমিয়া তেলুগু মহাভারতের মাত্র দু'টি পর্ব সম্পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন। দ্বয়োদশ শতকে তিব্বত এই অসমাপ্ত মহাভারতকে সমাপ্ত করেছেন। তিব্বত ছাড়া আরও একজনের হাতের স্পর্শ তেলুগু মহাভারতে আছে। তিনি হচ্ছেন এরুপ্রগদ বা এরুবন। এই তিনজনকে একত্রে 'কবিগয়' বলা হয়।

তিব্বত মহাভারতে তাঁর রচিত অংশ ছাড়াও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রামচন্দ্রের লক্ষা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরের কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অন্যরূপভাবে এরুবন হরিবংশ এবং নৃসিংহপুরাণ বা জহোবজ-জাহোজ রচনা করেছিলেন। নমিয়া-তিব্বত-এরুবন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং 'বাগালুশাসন', 'কবিগয়', 'প্রবন্ধ-পরমেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি পেয়েছিলেন।

একাদশ শতকে পাবলুদু মল্লম এবং একাদশ শতকে পেম্ভর অংকশাস্ত্রের উপর তেলুগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকের বীরশৈব ধর্মমত তেলুগু সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সোমনাথ নামক জনৈক বীরশৈব লেখক তেলুগু ভাষায় বসব-পুঁরাণ এবং অন্তঃকলার নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে নম্মেচোদ নামক জনৈক কবি কুমারলম্বন কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যটি কবি কালিদাসের বিখ্যাত রচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

রামায়ণের দু'টি তেলুগু সংস্করণ রচিত হয়েছিল দ্বয়োদশ শতকে। একটির

লেখক ছিলেন রঙ্গনাথ, অপরটির রচয়িতা ছিলেন চারজন—লুল্লিক ভাস্কর, মল্লিকা জুন ভট্ট, অম্বালাব এবং রুদ্রদেব। দ্বয়োদশ শতকে আরও কয়েকজন প্রখ্যাত তেলুগু লেখক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অধ্বন লিখেছিলেন তেলুগু ব্যাকরণ। দশদীর বিখ্যাত দশকুমার-চরিতের তেলুগু অনুবাদ করেছিলেন কেতন। ইনিও দ্বয়োদশ শতকের লোক ছিলেন। এ ছাড়া ওই সময় রচিত আরও দু'টি গ্রন্থের পরিচয় পাই—একটি হচ্ছে জনৈক মরণ বিচিত্র মাকেশ্বর পুরাণ এবং মঙ্গল রচিত কেম্বরবাহুচরিত।

কন্ড ও তেলুগু সাহিত্যের পরিসর তামিলের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। বসবের দিক দিয়েও তামিলের তুলনায় কন্ড ও তেলুগু অর্বাচীন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কন্ড সাহিত্য যেখানে ধর্মপ্রধান, তেলুগু সাহিত্য সেখানে বহুলাংশে ধর্মনিরপেক্ষ। আমাদের বর্তমান আলোচনাগুলি থেকে আরও একটি বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বেশিরভাগ লেখকই জৈন ধর্মাবলম্বী, এবং জৈন মহাপুরুষদের জীবনকথাই, কি উত্তর ভারত কি দক্ষিণ ভারত, সকল স্থানের আঞ্চলিক সাহিত্যেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে নিবিড় বোঝাযোগ রাখার দরুণই কি জৈনধর্ম এদেশে এতটা স্থায়িত্বলাভ করেছে বা বৌদ্ধধর্ম পারে নি?

তামিল তেলুগু ও কন্ড ছাড়া দক্ষিণ ভারতে আরও একটি প্রধান ভাষা আছে যার নাম মলয়লম। তা ছাড়া আরও কয়েকটি দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত উপভাষা দক্ষিণ ভারতে বর্তমান। বারান্তরে এই বিষয় আমরা আলোচনা করব।

গুরুলিয়ার চিঠি

[বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীঅপরাজিতা গোস্বামী প্রেরিত]

আতের সেবা মানবধর্ম। কোথাও কোন দুর্ঘটনা, বন্যা অথবা দর্ভঙ্কের সংবাদ ছাড়িয়ে পড়লে চারিদিক থেকে মানুষ ছুটে এসেছে, মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য। একজনের মৃত্যুকে আর একজন নিজেব জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। চিরকাল করেছে। আজও করছে। এটাই চিরন্তন—এটাই শাস্বত।

এ কথা আমার বার বার মনে হয়েছে—পদ্মলিয়ার, বিস্তীর্ণ দর্ভঙ্কপীড়িত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে। পদ্মলিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেও তাই আমি হতাশ হই নি—আমি দেখছি এই সব অসহায় মানুষের পাশে আশ্বাসের চুটতা নিয়ে শত শত মানুষ ছুটে এসেছে। দিনের পর দিন নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত রিগ্রমে মৃত্যুর সঙ্গে তারাও যেন পাক্সা দেছে এবং এখনও লড়ছে। নিজের দুঃখ, নিজের প্রতিদিনের জীবনযাপনের দুঃসহ যা থাকে তুচ্ছ করেও তাই দেখি পথে পথে মানুষ বৌবিয়েছে ভিকার ঝুলি নিয়ে—বাঁকুড়া-পদ্মলিয়া-বিহারের তাই-বোনেদের বাঁচাবার আবেদন নিয়ে।

এমনি এক আবেদন নিয়ে আমাকেও একদিন ছুটে আসতে হোল পদ্মলিয়ার সেই আত-অসহায় মানুষের বুদ্ধিকার সামনে। আমার মত অনেকেই এসেছেন, কেউ আজ নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে বসে থাকতে পারছেন না।

যে অঞ্চলটা আজ পদ্মলিয়া বলে পরিচিত সেই অঞ্চলটি ১৯৫৬ সালে মানভূমের কিছু অঞ্চল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু শিল্পাঞ্চল ধান-বাদ বিহারের সঙ্গেই থেকে যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাই পদ্মলিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমস্ত পদ্মলিয়া জেলায় শিল্প বলতে আর কিছু না থাকার দরুন জমির উপর নিষ্ঠুরশীলতা মানুষের বেড়ে যায়। লাক্ষাশিল্প এক সময় এই অঞ্চলে নামকরা অর্থকরী শিল্প ছিল, কিন্তু দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর চাহিদা কমে যাওয়ার দরুন এই শিল্পও আজ ধ্বংসের পাশে এগিয়ে চলেছে। লাক্ষার দাম কমে যাওয়ার দরুন অধিকাংশ কৃষক আজকাল আর লাক্ষার চাষ করেন না। যানই এখানকার প্রধান উপায় ফসল।

পাহাড় আর গভীর জঙ্গল সমস্ত

জেলাকে ছেয়ে রেখেছে। এখানকার কঠিন লাল মাটি—বাংলার সবুজ ভেজা মাটিকে বুদ্ধতার ওদাসীনা উপহাস করে এসেছে চিরকাল। একদিকে বিহার আর একদিকে বাংলার সবুজ প্রান্তের ছোঁয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই জেলাকে লোভনীয় করে তুললেও সুবর্ণ-রেখা নদী, কঁসাই নদী, অকুপণ হস্তে পাথরের কঠিন বৃক ছুঁয়ে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে কোনদিনও সবুজ আর সোনালি ধানের বন্যা এনে দিতে পারে নি। এখানকার মানুষকে তাই প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয় সব সময়ই। মৌসুমী বায়ুর ছোঁয়া এখানে নেই, সুবর্ণবেখা নদী, কঁসাই নদী, তাই বর্ষার ঢলে অকুপণ হতে পারে না কোনদিনও—বর্ষার পাহাড়ের সুকঠিন বাধা অতিক্রম করে জল ষখন নামে তখন সামনে যা-কিছু পায় ভেঙে গড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে নদীর বৃক কূলে উপড়ে পড়ে কিন্তু সেই বৃষ্ট থেকে গেলে নদী আবার শান্ত সমাহিত। হেঁটে তখন নদী পার হওয়া যায়। এ দৃশ্য পদ্মলিয়াতে আমি বার বার দেখেছি। চারিদিকে পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। পলাশের রক্তিম আভা আর মহুয়ার গম্ব, বছরের এক-একটি সমবে অধোধ্য আর বাঘমুণ্ডি, পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জ্বালা থেকে ভুলিয়ে রাখে। কত সময় চোখে পড়েছে—এত দুঃখ, এত দারিদ্র্যের মধ্যেও আদিবাসী সাঁওতালরা মহুয়ার রস খেয়ে নিশ্চিন্তে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। এদের কাছে জীবন অনেক সহজ—অনেক সুন্দর। দুঃখ-বেদনাকে এরা হাসিমুখে প্রতিহত করেছে বার বার—কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সাল আর বৃষ্টি প্রতিহত করা সম্ভব হোল না।

জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম এবার বৃষ্টি প্রকৃতির দুরন্ত খেপালে মৃত্যুর হুকুমি নিয়ে স্মারে স্মারে উপস্থিত হোল, আর সেই মৃত্যুর কঠিন সংগ্রামে রক্ত ধানের ক্ষেত ফেটে চৌচির, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, কোথাও জল নেই, কৃষক লাঙল ছেড়ে রক্ত মাঠে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। পাহাড়ের কঠিন শিলা রোদের দীপ্ত তেজে আগুনের হস্কা ছড়াচ্ছে। চারিদিকে উষর মরুভূমির শূন্যতা, অনাহারাক্রান্ত মানুষের হাহাকারে সমস্ত আকাশ-ব্যতাস স্তম্ভ। মৃত্যু-পথযাত্রী-

দের সামনে সেবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের এসে দাঁড়াতে হোল।

পদ্মলিয়া—পদ্মলিয়া নামটি সুন্দর। আরও সুন্দর এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। পদ্মলিয়া শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথ ধরলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন আপনি ভরে ওঠে। পদ্মলিয়া শহর থেকে পদ্মলিয়া প্রায় ১০ মাইল। বাসে কাটাড়ি গিয়ে ওখান থেকে হাটা পথে অথবা গরুর গাড়িতে আরও দু' মাইল গিয়ে তবে পদ্মলিয়া। এই পদ্মলিয়াতে আমাদের তৃতীয় লগ্নরখানা এবং সেই লগ্নরখানার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আসতে হোল। সঙ্গে রিলিফের জিনিসপত্র ছিল—তাই ট্যান্ডি ভাড়া করে চলে এলাম।

হারিমন্দিবে আমাদের লগ্নরখানা খোলা হয়েছে। স্থানীয় যুবক এবং স্কুলের শিক্ষকরা এর দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষক মন্মথননাথ কুইবী তিনিই সব দেখাশুনা করেন। আমরা যেতে সবাই এগিয়ে এলেন। মন্মথনবাবুর বাড়িতে আমরা সবাই গিয়ে বসলাম। এখানকার সমস্ত খবর তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে, চা খেয়েই বোরিয়ে পড়লাম গ্রামটা দেখতে। পথ চলতে চলতে মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা মাস্টারমশাই, এখানে লগ্নরখানা খোলবার জন্য আপনি এত চাপ দিয়েছিলেন কেন? এখানকার মানুষের অবস্থা কি আরসা ধানার মধ্যে খুব খারাপ?

—খারাপ কি বলছেন! এখানকার অধিকাংশ মানুষ আজ দু'-মাস হোল অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। ৫।৬টি পরিবার ছাড়া প্রায় কারও ঘরেই এক দানা চাল পর্যন্ত নেই। গত বছর খবর জন্য মাঠে একদম কাজই হয় নি। মাঠে কাজ না হবার দরুন ভূমিহীন কৃষক, মজুর এদের হাতে পরসাত নেই তাই খোলা বাজারে চাল কেনার ক্ষমতাও তাদের নেই।

—এখানে লোকসংখ্যা কত?

—প্রায় তিন হাজার এবং অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। অবস্থাপার কৃষক, বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার এই অঞ্চলে নেই বললেই চলে।

কথা বলতে বলতে আমরা গ্রামের মধ্যে এসে পড়লাম। নতুন আগম্ভুক দেবে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যে পেছনে পেছনে

কখন মিছিল শুরুর করেছে বুঝতে পারি নি।

এটা বাম্পী পাড়া। বাম্পী পাড়ায় ধুকে দাঁড়িলাম। চারিদিকেই কেমন যেন ছন্দছাড়া ভাব। বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে, কোন কোন ঘরের চালো একদম ধড় নেই—একদম উন্মত্ত। মৃচি আর হরিজন পাড়ায় এ দৃশ্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে কেউ বাস করে মনে হয় না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এসব বাড়িতে লোক থাকে? মাস্টারমশাই পাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে আমি আরও প্রবাক হয়ে গেলাম। লোক যদি বাস করবে তবে এমন অবস্থা কেন? অধিকাংশ ঘরের চালো তো খড় দেখছি না?

আমার প্রশ্ন শুনে করুণ হেসে তিনি উত্তর দিলেন—মাস্টার এবার খান হয় নি তাই কারও ঘরে খড় ওঠে নি। এরা সবাই দিনমজুর—হাতে পরসা নেই যে বাজার থেকে অত দাম দিয়ে খড় কিনে ঘরে ছাউনি দেবে।

আমি বললাম—কেন সরকার থেকে এসব ব্যাপারে কোন সাহায্য দিচ্ছে না? আপনারা এ সব ব্যাপার নিয়ে ডি-সি বা বি-ডি-ও'কে বলছেন না কেন? আমার কথা শুনে পাশ থেকে একটি ছেলে বলে উঠলো—‘এ ব্যাপার আমরা বি-ডি-ও’কে বলছি। তাছাড়া আপনি হয়ত জানেন না সরকার থেকে এসব ব্যাপার তদারক করবার জন্য প্রত্যেক ব্লকে V. L. W-রা রয়েছে। এবং এই অঞ্চলের যিনি V. L. W-তিনি এসব বাড়ি নিজে দেখে লিস্টও তৈরি করেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত। তারপর যেমন—তেমনি সব রয়েছে। তারপর ছেলোটো একটু ইচ্ছাকৃত করে আবার বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। যুক্তশ্রুতি সরকার হওয়াতে আমরা যা আশা করেছিলাম তা কিন্তু মোটেও সফল হচ্ছে না।

V. L. W. সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না তাই একটু অশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম—V. L. W-টা আবার কি?

আমার কথা শুনে মাস্টারমশাই মৃদু হেসে বললেন—গ্রামের অসহায় মানুষদের নিয়ে শহরের শিক্ষিত মানুষ এবং সরকারের অনেক চিন্তা। গ্রামের মানুষের যাতে স্বাভাবিক উন্নতি হয় তার জন্য কত ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। বি-ডি-ও, গ্রামসেবিকা, ভি-এল-ডারিউ, কত ‘পদে’র দৃষ্টি হোল—এনারা সব গাড়ির ধোঁয়া ঠাড়িয়ে গ্রামে গ্রামে ছোটোছোটো করতে শুরুর করলেন। আজ কুড়ি বছর থেকে এই দেখছি আর তারই পাশাপাশি ঐ যে—বলে দূরে ঐ ভাঙা বাড়িগুলো দেখিয়ে ফেলেন—ঐ দেখছি—আর দেখছি নিজে

মানুষের মিছিল। ভি-এল-ডারিউ পদাধিকারীরা এলেন এই অসহায় মানুষদের বাঁচাবার জন্য। এঁরা বন্দু। কিন্তু কেমন বন্দু তা দুর্দিন থাকলে আপনার বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে না।

কথাগুলো শুনে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। কংগ্রেসের আমলে সমস্ত দেশ জুড়ে যে দুর্নীতির পাহাড় গড়ে উঠেছিল, যে দুর্নীতির আজ গোটা জাতিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে—তার হাত থেকে মৃতি কি আমাদের হবে না। ঐ যে ছেলোটো আশাভঙ্গের কথা কিছুক্ষণ আগে বললে—সত্যি কি যুক্তশ্রুতি সরকার এই কুড়ি বছরের অভিশ্রুত জীবনের পাক থেকে এইসব মানুষগুলোকে টেনে তুলতে পারবে না। তারাও কি ব্যর্থ হবে! অসহায় মানুষদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বারা আজ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হয়ে বসেছে তাদের বিচার কি কোনদিন হবে না?

এই গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ, কায়ত, এবং মাঝও রয়েছে। গ্রাম ছাড়িয়ে প্রায় পঁচ মাইল দূরে টেন্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে। পুরান্না থেকে ধুঁড়া, টি-আর রোড। দেখলাম—গ্রামের আবালবৃন্দবনিতা কার্ণিপরে পড়েছে এই কাজে, কারণ বাঁচবার এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। হাটতে হাটতে ওখানে গেলাম। অশ্রুত অনাহারক্রান্ত বৃন্দ সেও দেখি হুকতে হুকতে মাটির চূপড়ি মাথায় নিয়ে টি-আর-এ কাজ করছে। একজন দুর্জন নয় শত শত বৃন্দরা দুর্বল হাতে জমিন করে কাঁপতে কাঁপতে ডালি মাথায় করে মাটি আনছে। এ দৃশ্য আমার কাছে মোটেও আনন্দদায়ক নয়। এদের প্রচণ্ড রোদে এইভাবে কাজ করতে দেখে মনের কোথায় যেন ষড়-চ্চ করে ওঠে। মনে পড়ে যায় নিজেদের বাড়ির কথা—দাদু-দিদিমার কোল ঘেসে গল্প শোনা, তারাও যেন এই হট্টমেলা না থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আর এখানে দেখছি—নাতি-নাতিনির হাত ধরে দাদু-দিদিমারা টেন্ট রিলিফের কাজ করছেন। চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। বৃন্দের কাছে-গিয়ে বললাম—আপনারা কেন এ কাজ করছেন? আপনারা এ কাজ করবেন না।

আপনারা লগরখানায় প্রতিদিন খেতে পারেন, আপনারা ওখানে চন্দন।

আমার কথা শুনে বৃন্দে চোখদুটো—ছল ছল করে উঠলো, আঙুল দিয়ে দূরে কর্মরত ছেলেকে দেখিয়ে বললে—“ও একা খাটলে অতবড় সংসার চলবে কি করে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা ঘরে না খেয়ে থাকবে আর আমি লগরখানায় খাব তা কি করে হয় মা—!” আমরা যখন প্রশ্ন এই অঞ্চলে

লগরখানা খুলেছিলাম তখন সেই লগরখানায় বৃন্দ, শিশু এবং অশ্রুত লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম—পরে অবশ্য সরকারী লগরখানা চালু হওয়াতে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে।

একটি ৩।৪ বছরের ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ ধরে কাঁদছিল, কাছে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করলাম—“এই রোদে এই সব বাচ্চাদের দিয়ে কেন তোমরা মাটির কাজ করছ, ছোট শিশুরা কি এ সব কাজ করতে পারে।” ছেলোটো তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, হাতে একটি ছোট টুকুরি, সারা গা দিয়ে দর দর করে ধামা পড়ছে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ—পায়ের তলে উত্তপ্ত মাটি।

আমার কথা শুনে মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, বললে—কি করবো মা—ঘরে কার কাছে রেখে আসবো? আর ঘরে রেখেই বা কি করবো? ঘরে তো একদানা খাবার পর্যন্ত নেই যে খেতে দেব বরং আমার সঙ্গে কাজের মধ্যে থাকলে ক্ষিপের কথা ভুলে থাকবে। লগরখানায় সেই তো ১২টার আগে খেতে দেবে না—আর সেও-তো একবেলা মাত্র—কিন্তু ধুম থেকে উঠেই যে ওরা ক্ষিপের জন্য কান্না জুড়ে দেয় তখন ওদের কি দিয়ে তুলিয়ে রাখবো বলুন? তাই তো কষ্ট হলেও সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি।” কথা বলছে আর মায়ের চোখ দিয়ে বর বর করে জল পড়ছে। সত্যি এ এক অসহনীয় অবস্থা—কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই। সারা পুরুলিয়া জেলাতেই আজ মায়েরদের আর শিশুদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। সারা পুরুলিয়া জেলা আজ যেন লগরখানায় পরিণত হয়েছে—পথে পথে শব্দ অনাহারক্রান্ত মানুষের মিছিল। প্রত্যেকের হাতে একটি থালা অথবা বাটি। সারাদিন পর একবেলা ঐ গমের খিচুড়ি খাওয়ার জন্য কত দূর দূর থেকে এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও তারা আসছে। ছোট ঠেলা গাড়ি করে একটি ১৬।১৭ বছরের নুলো ছেলেকে তার মা আনছে। মা এবং ছেলের, উভয়েরই বৃকের হাড় গোনা যায়। নুলো ছেলোটোর নাম হাবু কৈবর্ত। বাবা নেই। একমাস তারা ভাত খায় না, অবশ্য এখনও ভাত পাচ্ছে না তবে একটু খেতে পাচ্ছে। ৩।৪ দিন পেটে কিছু পড়ে নি এমন লোকের সংখ্যা পুরুলিয়া-বাকুড়াতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে।

চাঁড়না—পুরুরাকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম চাঁড়নার দিকে। চাঁড়না এখান থেকে ৩০ মাইল। চাঁড়না বাঘমন্ডি থানায় অবস্থিত। বাঘমন্ডি পাহাড়কে বারি রেখে আরও দেড় মাইল পশ্চিমে

হেঁটে গিয়ে চাঁড়মা কেন্দ্রে এসে পৌঁছ-
লাম। চাঁড়মা মৃত্যুশয্যা এবং কাগজের
পত্রগুলির জন্য বিখ্যাত। শব্দ পদ্রুপালিয়া
নয় বাংলাদেশের আর কোথাও এ শিল্প
নেই। এই গ্রামটা এই শিল্পীদের বাস।
শতকরা প্রায় ৭০ জন ভূমিহীন কৃষক এই
অঞ্চলে বাস করে। বর্ষার সময় এই
অঞ্চলটি একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন
হাঁটা পথেও এখানে আসা দুঃসাধ্য ব্যাপার।
এখানকার লগরখানার দারিদ্র্য যিনি
আছেন সেই মদন রায়কে সঙ্গে নিয়ে গ্রামটি
দেখতে বেরুলাম। একই দৃশ্য—একই
অবস্থা বরং আরও যেন দারিদ্র্য আরও
কষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছে। কারও গায়ে
জামা নেই—পরলে শতচ্ছিন্ন কাপড়।
মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। শব্দ
নিয়ে জানলাম অনেক মেয়ে লগরখানার
আসতে পারে না তার লজ্জানিবারণের
কিছু নেই বলে। একেই অনাহার তার
উপর লজ্জানিবারণের এই দুঃসহ যন্ত্রণা—
সব মিলিয়ে এখানকার মানুষকে যেন আরও
অসহিষ্ণু করে তুলেছে। তাদের অনেক
অভিযোগ তাই ধৈর্য ধরে শুনতে হোল—
প্রতিকার কি হবে জানি না। তবে আশ্বাস
দিতে ভুলি নি। বিশেষ করে এই অঞ্চলের
শিল্পীদের কথাই ধরুন। তাদের বক্তব্য—
তারা এভাবে লগরখানায় খেতে চায় না
এবং খাবেও না কিন্তু সরকার যদি এ সময়ে
তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য না করে তবে
তারা কেমন করে বাঁচবে? লগরখানায়
খেতে চায় না এমন পরিবার অনেক রয়েছে।
এই অঞ্চলের মধ্যবিস্তৃত পরিবারগুলোর
অবস্থা আরও সংগীন হয়ে উঠেছে—না
তারা লগরখানায় খেতে আসতে পাচ্ছে
না ঘরে বসে খেতে পাচ্ছে—তারা কি করবে
আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। যুক্তফ্রন্ট
সরকার তাঁদের জন্য কি ব্যবস্থা করছে সে
কথাও তাঁরা জানতে চাইলেন।

নোয়াড—এবপর এলাম নোয়াড। চাঁড়মা
থেকে নোয়াড ৮ মাইল। এই ৮ মাইল
পথ গোবরগাড়িতে আসতে হোল।
বর্ষার জন্য বাস বন্ধ। এই গ্রামে মোটা-
মুটি মানুষের অবস্থা একটু ভাল। তবে
আমাদের লগরখানা যেখানে খোলা হয়েছে
সেখানে—ভূনতুরি, সুইসা, মাচাঁ, গাংগি
প্রতিদিন এইসব অঞ্চল থেকে দলে দলে
লোক আসছে। কাটাঁড়—সাগদা, ভূন-
তুরি.....শব্দ লগরখানা আর লগরখানা।
খরাষ মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির—কোথাও
একফোঁটা চাষ-আবাদ কিছু হয় নি, বিশ
বছর কংগ্রেসী শাসনে এত বড় একটি
জেলাতে কোথাও জলসেচের এতটুকু
কোন ব্যবস্থা হয় নি। কেন হয় নি, কি
তাদের অসুবিধা এর উত্তর বিশেষজ্ঞরা
দেবেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে স্বাধীন
দেশে এখনও যদি প্রকৃতির ওপর নির্ভর
করে পৃথিবীর সঙ্গে ভাল মিলতে যাই
তবে কি আমরা ব্যর্থ হব না।

আনাহারক্লান্ত মানুষের এই শোভা-
যাত্রা এবং এক লগরখানা থেকে আর এক
লগরখানায় থালা নিয়ে জীবনের সঙ্গে
এই সংগ্রাম আশ্চর্য লাগে বৈকি? কোন
স্বাধীন দেশে মানুষকে এমনভাবে লগর-
খানায় লগরখানায় বাঁচবার সংগ্রাম করতে
হয়েছে এ ইতিহাস আমার জানা নেই বা
বিশ বছর বাদে পদ্রুপালিয়া-বাঁকুড়ায় দেখ-
লাম। লগরখানার সামনে দাঁড়ালে মনে
হয় যেন কংকালের মিছিল চলেছে।
দীর্ঘদিনের অনাহারে—২৪।২৫ বছরের
বৃদ্ধদের দেখে মনে হয় যেন ৫০ বছরের
বৃদ্ধ। হাঁটতে পারে না—কথা পর্বন্ত
ভালভাবে বলতে পারে না। সারাদিন
ওদের দেখতে দেখতে আমার যেন মনে
হোল হঠাৎ আমি কোন এক অচেনা দেশে
চলে এসেছি—যে দেশে প্রাণভরে নিশ্বাস
নেওয়া যায় না, যে দেশে হাসি নেই, গান
নেই, আলো নেই, শব্দ ব্যথার স্তম্ভতা
সমস্ত জীবনকে শুষে নিচ্ছে। যে দেশে
লগরখানায় লগরখানায় দুঃবছরের শিশু
থেকে ৮০।৯০ বছরের বৃদ্ধ পর্বন্ত থালা
আর বাটি নিয়ে শব্দ মিছিলই করে—
জীবনের সমস্ত অনুভূতি যেন স্তম্ভ হয়ে
গেছে। এ দেশ যেন আমার চেনা নয়—
এ মানুষগুলো যেন রাত্রির অন্ধকারের
দুঃস্বপ্ন—ঘুম ভাঙলেই যেন সব মিলিয়ে
যাবে।

সমস্ত জেলার প্রাইমারি স্কুলগুলোতে
কৈরারি ফুড বিলি করছে। এই আধ-
ভাতা গমের খিচুড়ি—আর কৈরারি
ফুড খেয়ে স্বাধীন ভারতের
মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশকে আমরা নতুন করে
গড়বার স্বপ্ন দেখছি। এ যেন চোরাবালির
উপর ঘর তৈরি করা।

পদ্রুপালিয়া জেলা দারিদ্র্য অঞ্চল

চিরকালের। সরকারের শুদাসীনো ১৯৫৬
সালের পর এ জেলার কোন উন্নতি হয় নি।
অর্থনৈতিক সংকট সৈনিক ও যা ছিল
আজও তেমনি রয়েছে এবং আরও বেড়েছে।
শিল্প বলতে কিছুই নেই—পাশেই
টাটা, রাঁচী, ধানবাদ—এখানকার মানুষকে
প্রলুব্ধ করে ঘরছাড়া করেছে। কৃষক
বন্দনার। শিক্ষার অনগ্রসর জেলা। বাংলাদেশের
অন্যান্য জেলা থেকে শিক্ষিতের
সংখ্যা এখানে অনেক কম। দৈব—ভুক্ত-
তাক এবং ভগবানের উপর বিশ্বাস করে
এরা জীবন অতিবাহিত করে। রাজনীতির
চেউ ইদানীং এখানকার মানুষকে কিছুটা
আকর্ষণে তুলেছে—মেয়েরা
পিছিয়ে আছে অনেক।

কুড়ি বছরের অভিশাপ—সারা বাংলা-
দেশের মানুষকে যেমন দুর্নীতির পাকৈ
ঠেলে দিয়েছে—এই অঞ্চলে সে অভিশাপ
যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। লগরখানা
চালাতে গিয়ে প্রতিপদে এ দুর্ভোগ আমা-
দের ভুগতে হচ্ছে। তারা যেমন নিজেদের
উপর আস্থা হারিয়েছে তেমনি বাইরের
লোকদের প্রতিও তাদের সে বিশ্বাস নেই।
প্রবন্ধনার ধুলোয় পড়ে তাদের চোখে তাই
শব্দ অবিশ্বাসের ছায়া। খালি চোখে
আজ যেটা তাঁর সমস্যা বলে মনে হচ্ছে
আমার মতে সেটাই সব নয়—এ দুর্ভিক্ষ
সাময়িক—কিন্তু এ রোগ, এ ব্যাধি সাময়িক
নয়। এর হাত থেকে গোটা জাতটাকে
আজ বাঁচাতে হলে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং
আত্মত্যাগের প্রয়োজন। এ না হলে
পদ্রুপালিয়া বাঁচবে না—বাংলাও বাঁচবে না।
এ কথাই আজ এইসব মানুষকে দেখে বার
বার আমার মনে হয়েছে—

মনে হয়েছে—

“তারি লাগি রাগি অন্ধকারে
চলেছে মানবধর্মী যুগ-যুগান্তর পানে
ঝড়-কল্যাণ বজ্রাঘাতে, জ্বালালে যার
সাধানে

অন্তর প্রদীপখানি”।

বি, সি, যাইতি এও কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং
কারিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শৌ রুম :- ৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কাল-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭০
৩, রাধামোহন পাল লেন, কাল-১২ : অফিস-ফোন-৩৪-৪৮৪৬

আমরেন্দ্রের কলকাতা অভিযান



কলকাতা থেকে চমকনগর

আজ সাইরিশ বছর পরেও আমি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর কুখ্যাত পুলিশ সুপারিশ্টেন্টেণ্ট মিঃ জনসনের অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভুলতে পারি নি। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন মনোভাবের জন্যই অতীতকে ভুলতে চাই না। ভূপেনদার কলকাতার shelter-এ থাকার সময় অমরেন্দ্র নন্দীর—'No surrender', কর্মসূচীর লোমহর্ষক কাহিনী লিখেছি। অমরেন্দ্রের মৃতদেহ লক্ষ্য করে জনসন সাহেব দু'বার গুলী ছোঁড়ে। জনসনের সেই কুকীর্তির কথা সরকারপক্ষ খুব সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গোপন করতে চেয়েছে।

আমাদের মামলার সময় পুলিশের একজন বৃদ্ধ কোর্ট ইন্সপেক্টর (তার নাম ভুলে গেছি) আমাকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কালভার্টের নীচ থেকে অমরেন্দ্রের মৃতদেহ টেনে বার করা হলে জনসন ক্রোধে উদ্ভূত হয়ে নিশ্চল নিষ্পন্দ মৃতদেহের ওপর বার বার বুটের লাথি মেরেছে এবং গুলী করেছে। ভারতের বুট ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারের স্বত নির্যম এবং ঘৃণিত ইতিহাস আছে সে তুলনায় এটা হয়ত তেমন কিছুই নয়। তবু সেই বৃদ্ধ কোর্ট-ইন্সপেক্টর বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন—“কি বলবো মশাই, একটি স্কুজের ছাত্র—কি বা তার বয়স! Surrender করে নি—এই তার অপরাধ। তাই বলে মৃতদেহের ওপরে পদাঘাত! জনসন ব্যাটা সেই নিষাপ তরুণ ছাত্রটির মৃতদেহকে গুলীবিদ্ধ করেছে—শবেব ওপর বুটের লাথি মেরেছে—যে কেউ দেখবে তাবই অস্তর ক্রোধে ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদেরও রাগ হয়েছে—ঘৃণা হয়েছে—কিন্তু কি করবো পেটের দায়ে আমরা আজ সরকারের গোলাম! নিজের চোখে এই অমানুষিক অত্যাচার দেখেও—মুখ বুজে

সমস্ত সহ্য করে যেতে আমাদের দাস্ত-বোধই আমাদের বাধ্য করেছে।”

আমাদের মামলার সময় এই জনসন সাহেবকে সাক্ষীর কঠিনভাৱ জেরা করবার সুযোগ পেয়ে তার ও তাদের মৃত্যুস খুলে দেবার জন্য আমি তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে তুলেছি। আমার জেরার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ—

“I—However, Mr. Johnson do you consider this to be sheer discredit on your part that you completely failed to stop this armed upsurge of the youth?

Johnson—I did my duty.

I—I see, Mr. Johnson, you did your duty! But did you do your duty after the kick you got?

President—I disallow the question.

I—If that pleases your honour certainly your honour may disallow the question but the glaring fact remains. well tell me now why, did you fire two shots at the “culvert?”

Johnson—It was necessary!

I—Was it necessary for your self-protection? Did Amarendra fired at your direction?

Johnson—I heard the report of a pistol fire inside the culvert.

I—I put it to you that you definitely heard that the revolver bugged twice inside the culvert

Johnson—Might be that inside the culvert Amarendra used his revolver twice. But I remember one distinct sound.

I—Did you get any other response from inside the culvert in reply to your shouts for surrender?

Johnson—No. We did not get any response.

I—Did you not infer that Amarendra was refusing to surrender and was turning a deaf ear to your repeated command and allurements?

Johnson—Probably we made such inferences about him.

.....

I—That is right. Now tell me, did you not similarly feel that he fired shots inside the culvert to kill himself rather than surrender to the British imperialist agents?

Johnson—I was not sure of his suicide.

I—I put it to you, Mr. Johnson, you were absolutely sure that Amarendra did not shot aimlessly in the absence of any visible target, but he fired two successive shots inside the culvert to kill himself. Do you deny this?

Johnson—Probably it was so.

I—Mr. Johnson, I put it to you squarely that even knowing fully well that Amarendra committed suicide you fired two shots at his dead body out of nervous apprehensions lest the ghost of Amarendra might shoot you.

President—The question is disallowed.

I—If your honour has objection to my suggestion that Mr. Johnson had a nervous apprehension to be shot by the ghost of Amarendra then I may put the next question.

Well Mr. Johnson, if it was not any apprehension about the ghost, then was it for punishing him that you fired two shots at the corps of Amarendra.

President—I disallow the question.

I—I see !"

বিচারককে প্রেস ও সাধারণের সম্মুখে জনসন সাহেবের অপকীর্তি উদ্ঘাটিত করেই বিপ্লবীদের কর্মসূচীর শেষ তা' আমরা কেউ মনে করি নি। তবু সুযোগ পেয়েছি বলেই দেশবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করার অভিপ্রায়ে জনসন সাহেবকে এভাবে জেরা করে পর্যদন্ত করতে চেষ্টা করেছি।

ভূপেনদার আশ্রয়ে কলকাতার থাকা-কালে ফিরঙ্গীবাড়ারে পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় অমরেন্দ্রের আত্মহত্যার কাহিনী আমরা শুনেছিলাম। তার প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে আদালতে জনসন সাহেবকে জেরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কলকাতার বাড়িতে উদ্ভূত বুলেটিন ও নানা সূত্রে চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর খবর আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছিল। স্বতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র আলিপুত্র সেন্ট্রাল জেলে বন্দী—সেই সময়কার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এই খবরে বাংলার জনসাধারণ বিচলিত—উদ্বেলিত! কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন দূর্বীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলা তথা ভারতের সমস্ত জেলখানা ভর্তি হয়ে গেছে। বাইরে শোনা যাচ্ছে—আলিপুত্র জেলের পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো—জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন কারণে রাজনৈতিক

বন্দীদের গোলযোগ ঘটেছে। তারপরেই একদিন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ ও জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সোম দত্ত সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর লাঠি ও গুলী চালিয়েছে আর সুভাষ বন্দু আহত হয়েছেন—এই সংবাদ বাংলার যুবকবৃন্দকে বিশেষভাবে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে।

ভূপেনদার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা স্থির করলাম—আপাতত চন্দ্রনগরে একটি নিরাপদ ঘাঁটিতে আমাদের শক্ত হয়ে বসা দরকার, চট্টগ্রামে মাস্টারদার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা চাই এবং একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নেওয়া চাই।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভূপেনদা তাঁর প্রত্যক্ষ নিরস্ত্রিত যুগ্মান্তর পার্টির এক অংশের সমর্থনে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জন্য চন্দ্রনগরে একটি আশ্রয় ভবন যোগাড় করলেন। যোগাড় করেছেন বললে ভুল হবে—প্রায় করে নিজ বিপ্লবী-দলের বাহাই করা একজন সভ্য ও সভ্যকে বাড়ির কর্তা ও কর্তা সাজিয়ে বসালেন। এই বাড়ি দরদী বন্দুর বাড়ি নয়—এই বাড়িটি বিপ্লবীদের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আশ্রয়গোপনকালীন অবস্থায় পূর্ব স্বাধীনতার সঙ্গে যড়যন্ত্র-মূলক কাজের প্রস্তুতি ও শিক্ষা প্রদত্তির জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এইরূপ একটি বাড়ির প্রয়োজন আমরা সকলেই অনুভব করেছি—বহু বাধা ও বিপদের মধ্যেও ভূপেনদা আমাদের সেই অভাব মিটিয়েছেন।

কলকাতার আশ্রয়স্থল ছেড়ে আমাদের নিরাপদে চন্দ্রনগর পৌঁছাতে হবে। সম্ভার পর গ্রান্ড-ট্রান্স রোড দিয়ে মোটরে চন্দ্রনগর রওনা হওয়া স্থির হলো।

আমাদের পথ-প্রদর্শক হিসাবে গাড়িতে থাকবেন চন্দ্রনগর গোমলপাড়ার অধিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওখানকার বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ও মাননীয় ব্যক্তি—বয়স পঞ্চাশের কিছু উর্ধ্ব। সোম্য-সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা—বন্ধ জুড়ে ছড়ানো কালো দাড়ি। বসন্তদাকে আমরা আগে কখনও দেখি নি—ভূপেনদাও তাঁর কথা আমাদের কখনও বলেন নি। তাঁরই বিশেষ চেষ্টার আমাদের জন্য চন্দ্রনগরের এই বাড়িটির ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের এই বাড়িটিও গোমলপাড়ার বসন্তদার বাড়ির নিকটেই।

সম্ভা আতিক্রান্ত। আমাদের কলকাতার বাসস্থানের দরজার একটি কালো রং-এর প্রাইভেট মোটরগাড়ি এসে থামল। আমরা চারজন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ভূপেনদা একটু আগেই এসে-

ছেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তিনি বসন্তদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন।

কলকাতার রাস্তা ধরে শৌ শৌ করে গাড়ি ছুটে চলল—কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ট্রান্স রোডে এসে পড়লাম। ফরাসী চন্দ্রনগরে যাওয়া-আসার পথে Border Police Out-Post অতিক্রম করতে হয় আমাদের এই অভিজ্ঞতা ছিল। বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ইংরেজ সীমান্তরক্ষীরা বরাবরই নিয়মমায়িক প্রত্যেকটি গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে। চন্দ্রনগরের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ঐতিহ্যের কারণবশত, চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পর ও বাংলাদেশে সমকালের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য চন্দ্রনগরের সীমান্তরক্ষীরা অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপরতার সঙ্গে পাহারা দেয়। প্রতিদিনই শত শত গাড়ি আসা-যাওয়া করে। সীমান্তরক্ষীরা সাধারণভাবেই পাহারা দেয়। খুব কিছু একটা জরুর বা ভাবনার তেমন কারণ নেই, তবু কেন জানি না—ট্রান্স রোডে পড়েই আমার মনে একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্ক হচ্ছিল—হয়ত বা গণেশ, মাধন ও আনন্দের মনো অনুরূপ অজানা আশংকার অনুভূতি ছিল।

আমাদের সঙ্গে গাড়িতে বসন্তদা ছিলেন। বসন্ত না হলেও তাঁর দাড়ি-গোঁক সব মিলিয়ে প্রথম দর্শনেই তাঁকে বেশ বয়স্ক বলেই মনে হয়। সীমান্ত প্রহরীর দল যদি বিশেষ কোন নির্দেশ না পেয়ে থাকে যে অত নম্বর গাড়িটিকে তাদের রূপেতে হবে—তবে গাড়িতে বসন্তদার উপস্থিতিই যথেষ্ট—পুলিশ আমাদের সন্দেহ করবে না।

আমাদের চারজনের কাছে পাঁচটি রিভলভার—গণেশের কাছে দুটি। আর দু'এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রনগরে প্রবেশ করব। তার আগেই বৃটিশ সীমান্তরক্ষী ও ফরাসী চন্দ্রনগর সীমান্তরক্ষীর দল routine duty করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তা' হলোই বা—তাতে এত ভাববার কি আছে? কত গাড়ি তো আসছে যাচ্ছে সবাইকে কি ধরছে? কালে-ভদ্রে হয়ত কাউকে সন্দেহ করেছে বা ধরেছে! আমাদের তারা কেন ধরবে? কেন সন্দেহ করবে? তবু আমাদের বুক দুর্দ দুর্দ করছে—সহস্র ভাবনায় মন তোলপাড়! পাঁচটি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে চলেছি তদুপার আমাদের প্রতিটি মস্তকের জন্য বহু সহস্র টাকার পুরুষকার খোঁষিত—হয়ত বা সেই জন্যই আমাদের সহজ ভাবের এত অভাব ঘটেছে।

সীমান্তরক্ষীরা যথারীতি গাড়ি থামাল—আমাদের নিরীক্ষণ করল—গাড়ি অবরোধ করার কোন কারণ পেল না।

সাপ্তাহিক বসন্ত

বসন্তদার বয়স ও বড় বড় কল্যাণ চাপ
বাড়ি আমাদের পাশপাশে।

বসন্তদার নির্দেশিত চন্দনগরের
পথে ঘুরে ঘুরে গাড়িটি একস্থানে থামল।
বসন্তদা বললেন—“একটু হেঁটে যেতে
হবে—বাড়ির সামনে পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার

স্বস্তি রাস্তা প্রশস্ত নয়।” আমরা গাড়ি
থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে
বিছানাপত্র কিছুই নেই—আমাদের হেঁটে
যেতেও কোন অসুবিধা নেই! তবে গাড়ি
বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাওয়ার পক্ষে রাস্তা
বেশ প্রশস্তই ছিল। সব সময়ে সেই

রাস্তার গাড়ি চলে এবং সেই বাড়ির
সামনেও গাড়ি দাঁড়বার ব্যবস্থা ছিল।
কলকাতার ড্রাইভার এই বাড়িটির বিশেষ
অবস্থানটি যেন জানতে না পারে তার
জন্যই বসন্তদা ড্রাইভারকে অতদূরে গাড়ি
দাঁড় করাতে বললেন।

ISN'T SHE
BEAUTIFUL?
OF COURSE,
SHE IS!



she owes her beauty to AFGHAN SNOW Beauty Aids—
the aids to beauty that have aided millions of
maidens to glamour and irresistible charm.

AFGHAN SNOW—AN EXCELLENT ALL ROUND COMPLEXION AID.
AFGHAN SNOW—AN IDEAL SKIN TONIC THAT VANISHES
PIMPLES AND WRINKLES. PRESERVES THE PETAL SOFT DEWY
COMPLEXION. AVAILABLE IN 4 SIZES.
AFGHAN FACE POWDER—AVAILABLE IN 4 SHADES FOR
FLAWLESS COVERAGE AND SMOOTHNESS.
AFGHAN LIPSTICK—A WIDE RANGE OF SHADES TO KEEP
YOUR LIPS LUSTROUS AND MOIST.
AFGHAN NAIL POLISH—IN SPARKLING COLOURS FOR EVERY
TASTE. IT HELPS PROTECT BRITTLE NAILS.
AFGHAN CREAM CAKE—A CREAM BLENDED POWDER IN A
HANDY COMPACT. AN INSTANT BEAUTY AID THAT ADDS A
SOFT MATTE FINISH TO ANY MAKE-UP, IMPARTING DELICATE
NATURAL BEAUTY

AFGHAN SNOW BEAUTY AIDS

E. S. PATANWALA BOMBAY-77 (INDIA)



বসন্তদার সঙ্গে আমরা একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িলাম। মজবুত কাঠের প্রকাণ্ড দরজা বাড়ির ফটক দুরীক্ষিত করে দণ্ডায়মান। বসন্তদা ফটকের দরজার কড়া নাড়লেন বিশেষ সাস্কাতিক শব্দে, ভেতর থেকে ফটকের বিশাল দুটি ভারী কাঠের কপাট খুলে গেল। গৃহ-স্বামী আমাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বসন্তদাও আমাদের সঙ্গে ওপরে দোতলায় এলেন। দু-তিন মিনিট পর বসন্তদা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমাদের জন্য আলাদা দুটি কামরা রাখিত ছিল। রান্নার জন্য পাশে একটি ছোট ঘরও ছিল। এই ঘর তিনটির সামনে দিয়ে বারান্দা-বারান্দার নিচে ছোট উঠোন—প্রায় ১৮।২০ ফুট উঁচু পর্চিল দিয়ে এই উঠোনটি ঘেরা। বাড়ির ভেতরে—এমন কি দোতলার বারান্দার ওপরেও আমাদের চলা-ফেরা বাইরে থেকে দেখার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের এই তিনটি ঘরের দক্ষিণে আরও দুটি কামরা ছিল। বাড়ির “কর্তা” ও তাঁর “স্বামী” সেই ঘর দুটিতে থাকতেন। যদি কোনদিন ধরা পড়ি সেই অবস্থার জন্য আমরা সবুজের ঠিক করে রেখেছিলাম—যে বাড়ির কর্তা ওই ঘর দুটি ও রান্নাঘর আমাদের Sub-let করেছেন। তাই রান্নার বন্দোবস্তও আমাদের প্রস্তুত ছিল যেন প্রতিকূল অবস্থার আমরা প্রমাণ করতে পারি যে—আমাদের ও বাড়িওয়ালার মধ্যে অন্য কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আমরা রান্না-বাগ্না কিছুই করতাম না আমাদের খাওয়ার-দাওয়া সবই সেই পরি-ষরের সঙ্গেই চলত। এই বাড়িতে কোন চাকর-বাকর বা ঝি রাখা চলত না। পশ্চানবাবু—দলেব একজন সভ্য—ভূপেন-দার নির্দেশমত মাঝে মাঝে এসে বাজার করে দিয়ে যাবেন সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বসন্তদা চলে যাওয়ার পর বাড়ির “কর্তা” আমাদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। প্রায় রাত দশটার আমাদের খাবার ডাক এল। গৃহকর্তা এতক্ষণ রান্না-বাগ্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের রান্না ও খাওয়ার ঘর নিচের তলায়। আমরা চারজন ও গৃহস্বামী নিচে খাওয়ার ঘরে পাঁচটি আসনে খেতে বসলাম। ঘরে ইলেকট্রিক কানেকশান আছে—খুব কম পাওয়ারের একটি বাম্ব জ্বলছে—খাওয়ার ঘরের এক কোণেই রান্নার ব্যবস্থা। খাওয়ার সময় তেমন কিছু কথাবার্তা হলো না। গৃহকর্তা বিনয় সহকারে করেকবারই বললেন—“রান্না হয়ত ভাল হয় নি, আপনাদের খেতে কষ্ট হচ্ছে” ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবতই আমবাও বিনয় উত্তর দিবাঁছি—“অপূর্ব রান্না। কত পদ কবে-ছেন?—কি যে বলেন। আমাদের খুব

সঙ্কোচ হচ্ছে সারা সময় আপনি একা একা এত পরিশ্রম করেছেন আর আমরা দিবা আরায়ে বসে বসে খাঁছি”—ইত্যাদি প্রথম দিনে আর বেশি কথাবার্তার সুযোগ হব নি। রাতও হয়েছে—সবাই নিজেদের ঘরে ঘবে শুতে চলে গেলাম।

তার পরের দিন আমরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলাম। Imperson-ification-এর চার্জে পাছে অভিব্যক্তি হন সেই জন্য তাঁদের পরিচয় তাঁরা গোপন করেন নি। “শশধর আচার্য” রেল চাকরি করতেন আর তাঁর “স্বামী” সুহাসিনী গাঙ্গুলী চন্দননগরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদে নিযুক্তা ছিলেন। বসন্তদা বোধ হয় সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে প্রধান পদেই আসীন ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেই স্কুলে সুহাসিনীদির চাকরি হল—“স্বামী” স্কুলে চাকরি করবেন তাই তো তাঁর “স্বামী” শশধর আচার্য চন্দননগরে বাড়ি ভাড়া নিলেন। এত সব গ্লান করে তবেই ভূপেনদা এই বাড়ির বন্দোবস্ত করেছেন। উত্তর ভূপেন দত্ত নয়—সেই যুগের “স্বাধীনতা” পত্রিকার সম্পাদক ও যুগান্তর পত্রটির অন্যতম নায়ক।

বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। তাঁদের শ্রদ্ধা বলা হয়েছিল—আমরা বিপ্লবী, আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে—তাই আমাদের আত্মগোপন কবে থাকতে হবে—এবং তাঁরাই সেইজন্য আমাদের গোপনে ও নিরাপদে রাখার জন্য সবপ্রকার সাহায্য করতেন। আমাদের নাম তাঁদের বলা হয় নি।

দু-তিনদিন পরে এই বাড়িতে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব কাঁপিয়ে জ্বর উঠেছে—প্রায় সময়েই একশ° চাল-পাচ ডিগ্রী জ্বর উঠত। ভূপেনদা ডাক্তারের ব্যবস্থা কবেছেন। ডাক্তার ইনজেকশান দিয়ে যেতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ডাঃ নারায়ণ রাও বোধ হয় একবার পরীক্ষা কবে আমাব ওষুধ ও পথের প্রেসক্রিপশান দিবাঁছিলেন। আমাব অসুস্থতার সময় সুহাসিনীদি ও শশধরদা আমাব ওষুধ পথ্য ও শ্রুত্বাদির জন্য নানাভাবে ব্যস্ত থাকতেন। আমার আশ্রয় মনে আছে—আমার বামি ভরতি পাঠখানা সুহাসিনীদি যখন অবলীলাক্রমে হাতে করে পাবিকাষ করবার জন্য নিচে নিয়ে যেতেন আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতাম এবং লজ্জিত হতাম।

আগে যখনই কোন অসুখ হয়েছে—মা ও দিদি ছাড়া কারো কাছ থেকেই কোন সেবা-যত্ন আমি নিই নি। পরিচিতি বা অপরিচিতি কোন তত্ত্বাবধায় সাঙ্গিয়েই আমি এব পূর্বে কখনও আসি নি। সুহাসিনীদি বিদ্যুৎ, স্কুলের শিক্ষিকা,

চাল-চলন কথাবার্তা পোষাক-পরিচ্ছদ এত মার্জিত এত সুন্দর!—তার ফর্সা সুন্দর দুটি হাতে আমাব ঘরের মেঝে পরিষ্কার করবেন—আমার বামি-করা পাঠ পাবিকাষ করবেন—তা যেন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না! মনে মনে নিদারুণ লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।

সেই সময় একদিন বামি বসেই—তখন আমাব ঘবে কেউ ছিল না। পাছে সুহাসিনীদি এসে পড়েন সেই ভবে আমি ভাড়াভাড়ি বামির পটটি পাবিকাষ করবার জন্য নিজেই নিচে নিবে গেলাম। আমার টেপারেচার তখন ১০৫ ডিগ্রী। তার ওপর পাঁচ-ছয়দিন পর্যন্ত ভূগ ভূগ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি—আমার প্লেসিটি ডেপে নিচে নামা কোনমতেই উচিত হয় নি—তা ছাড়া ঐ বামিতেই আমাকে সব-চেয়ে বেশি কাঁদ করে! কখন আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই নাকি দংশন হয়। এমনই কপাল ফিরে আনাব সময় সিঁড়ির গোড়ায় সুহাসিনীদি পট-হাতে আমাকে দেখে ফেললেন। আদ যাই কোথায়। তিনি ভীষণ চটে গেলেন—রাগ করে অনেক বকলেন আমাকে—“কে আপনাকে নিচে আসতে বলেছে? বামিতে কি আর কেউই ছিল না যে আপনাকেই পট ধুতে আসতে হোল? আপনাদ যদি এত সঙ্কোচ, এত বিশ্বাস, এত সন্ত্রস্ত ভাব—তবে লোকের বাড়িতে থাকা কেন? রান্নার বা ফুটপাতে থাকলেই পট ধুতে ভেবে দেখুন আপনি আমাকে বহুদিন অপরাধী করেছেন—এই প্রচণ্ড জ্বর গায়ে আপনি কিনা নিচে নেমে এসেছেন বিনয় পাঠ পাবিকাষ করতে? যদি মনে ধুয়ে পড়ে যেতেন তাহলে কি হতো?”

সুহাসিনীদি অতি কঠোরভাবে আমাকে তিরস্কার করছিলেন। আমি দুঃ-এবাব আমাব অপরাধ স্বীকার করতে চেষ্টা করিবাঁছি—কিন্তু বলবার সুযোগ পাই নি—তিনিই আমাকে নমানে বকাঝকি করে গেলেন। আনাব হাত থেকে পটটি টান দিয়ে নিয়ে গড়-গড় করে ওপরে চলে গেলেন। শুনেতে পেলাম—“বেশ তো তুমিই হোল। ভূপেনদাকে বলবো—এখন তুমিই আর প্রয়োজন নেই।”

তখনও জানি না—যদি নি বে এই স্নেহশীলা দরদী তবুগী? স্নেহ সেই বয়সে বাইরের সব আকর্ষণ, চার্জ-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে বিবাহীদের একাট গোপন ঘাঁটিব ভাবে নিবে আমাদের সব রকম ভাল-মনের ভাগী হইছেন! অথচ, অচেনা চাবতন গ্রন্থে বিপ্লবীর—বাদের প্রকৃত পরিচয় তাঁর জন্য নেই—মণ্ডলের জন্য ভূপেনদার কথার জীবন উৎসর্গ করেছেন! কে তিনি—কি তাঁর অবদান ভারতের মুক্তিসংগ্রামে।

[তদনঃ]



স্বপ্নাভ্যাসে ॥ বিদ্যা বাউলীর মৃত্যু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূরো দুটো দিন কেটে গেছে।
মদন এসেছে বিদ্যাধরীর ঘরে। মদন
ভাবে, এক কাজে দু'কাজ হয়েছে। কুটির
কথা রাখা হয়েছে। বিদ্যাধরীকে কালা-
কান্দি নিয়ে যাবার সুবিধেও হয়েছে।
এখন বিদ্যাধরীকে কালাকান্দির নদীর
ঝরে নিয়ে যাওয়া হবে অসুবিধে হবে না।
পূর্নচন্দ্র পর্বন্ত হে'টে গিয়ে একটা
নৌকো করে যাবে ওরা। কালাকান্দি
পর্বন্ত পুরো পথ এই বর্ষায় হে'টে
যাওয়া যাবে না। খানিকটা হে'টে,
খানিকটা নৌকায়।

নৌকোর ব্যবস্থা মদন কাল রাতে করে
এসেছে।

হাটখোলায় গির্বাছিল কাল। মনছুব
চাইয়ের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে
নিরেছে। টাকাটা গোপনে সন্তপণে
ঘাস্তে রেখেছে। খেপীকে নিয়ে যাবার কথা
আছে আসছে কাল।

একটা ফাঁড় লক্ষ্য করেছে মদন।
ফাল রাতে হাটখোলাটা যেন ধমধমা।
দোকান সব বন্ধ ছিল। একমাত্র খলিফার
দোকানের একটা কাঁপ খেলা ছিল।
খ্যাপাবানা কি? মনছুব এলো। মুখ-
খানা যেন ব্যাঙ্গার। চক্ষু দুটো এমনিতেই
ওর লাল। কাল যেন আরও রক্ত চাউনী।
তাকানির ভাবগতিক ভাল না।

মনছুব আসামাত্র পরমা হালুইকর
বলল,—আলা কাদের বে কইস্। আলা
আমারে ডগ্‌ফাই দ্যাখাইবার আইছিল।
স্বামদাওয়ের একুক কোপে দুইখান কইরা
ক্যালাম্।

মনছুবের হলদে দাঁত বেরোল একট-

খানি।—আস্তে বলল,—সাবথানে কথা
কইও। হাওয়া কইল্ ভাল না। কাদের
একা না। কাদেরের পেছনে মাইজার
মোম্বা রইছে। সমজিয়া কথা কইও।

পরমার ছোট ছোট চোখে বাঁকা হাসি।
—ভর দেখি কাদেরের উপর বড় পরাণের
টান।

আর কোন কথা বলে নি মনছুব।
ভাবগতিক ভাল লাগল না মদনের।
হাটখোলার হাওরাটা যেন ধমধমা। ঘন
অন্ধকার চারদিকে। ব্যাঙের ডাক শোনা
যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে
শেরালের ডাক। দূর থেকে অস্পষ্ট।
দু'চারজন মনিষা যা দেখা যাচ্ছে।
সকলের চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট
আশঙ্কা। কারো বা চোখে-মুখে
উত্তেজনা।

মাটির ভাঁড়ে সবাই ঝাঁজ জলীয় প্রব
খেয়ে টুং হোল।

—সও ইচা মাছের ঝাল খাও।

একটা বাটিতে করে সরবেটা চিড়ি
মাছের ঝাল বাব কবল খলিফা। খলিফার
ঘুম-ঘুম চোখদুটো একটু যেন সতর্ক।
এক-একবার টান টান করবার চেষ্টা করছে।
মদন খেল না। দিশী পচাই খেল না।
ইচা মাছের ঝালও খেল না।

বলে মদনভাই বৈরাগী হইলা নি?
টিপনি কাটল খলিফা। চোখে-মুখে
একটা কঠিন ছুঁচোল ভাব। যেন বিধতে
চাইছে।

মদন কথা বলল না। চুপ করে
রইল। ও ভেবেছিল নেশা সে এখন দিন-
কতক করবে না। বিদ্যাধরীকে ব্যাপারীর

হাতে তুলে দিয়ে দল বানাবার বিক-
ব্যবস্থা যখন শুরু করবে, তখন থেকে
নেশা করতে শুরু করবে। তখন নেশা
জমবে। দুটো পরসার মুখও দেখবে
হয়তো।

এক-আধদিন সে এদের সবাইকে
খাইয়ে দেবে। প্রাণ খুলে খাওয়াবে।
দেখবে যে তার পরাগজা ইন্দুরের মত
ছোট পরাগ না। সে খেতে জানে খাওয়াতে
জানে। গুণী-মানী হওনের পথ কেমন।
সে জানে।

মনছুব টাকাটা দিল মদনের হাতে।
ওদের সামনেই।

—তোমরা সাক্ষী রইলা। হক্ কথা
শুইনা নিলা।

সাক্ষী রাখল মনছুব পরমা আর
খলিফাকে। পবমা ভাল করে তাকাল না
মনছুবের দিকে। কেমন যেন একটা
আড়াআড়ি ভাব বলে মনে হোল। মদন
টাকা নিল। কিন্তু টাকা নেবার পর
থেকেই তার বৃকের ভেতরটা যেন উখাল-
পাখাল।

পেট কোমরে গেরো দিয়ে টাকা বাম্বা
রয়েছে। টাকার ছোঁয়াতেই যেন দেহটা
গরম হয়ে উঠল। মাথার নানা রাস্তায়
ভাবন-চিন্তন। বিদ্যাধরীকে নিতেই হবে
কালাকান্দিতে। আর কোন উপায় নেই।
টাকা নিয়েছে।

বিদ্যাধরী যদি না যেতে চায়?

ভুবিয়-বুবিয় যদি না নিতে পারে।
বেঁধে নিতে হবে। মেরে নিতে হবে।
যেমন করে হোক নিতে হবে। বিদ্যাধরী
গেল না বললে আর কেউ শুনবে না।

দাপ্তারিক

ওর ভারবান্ধি দেহটাকে নিয়ে যেমন করে হোক ব্যাপারীর গদ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। ওই দেহটাই তো সওদা করেছে ব্যাপারী। যেমন পাটের বোকা সওদা করে।

ভন্ করে মাথাটার ভেতর কেমন গুলট-পালট হয়ে গেল। হাটখোলা থেকে ফেরার পথে মাঠে নেমে অকস্মাৎ অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে মদনের মাথাটা যেন গুলট-পালট হয়ে গেল। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। খেপীর দেহটাকে সওদা করেছে ব্যাপারী। দেহের মধ্যে ঘুপটি মেরে বসে খেপী ফিক ফিক করে হাসছে। সেই হাসন। আশমানের চন্দ্র যেমন আলো-আলো হাসে। ম্যাঘ নাই। জিলিক নাই। রাজ্য ভয়া খেপীর আলোয় ভরা।

মাথাটা জানি কেমন করে। সে নিশা-ভাঙ কবে নাই। তন্ন এমন ইহল ক্যান?

কয়েকবাব মাথাটা ঝাঁকায় মদন। জোবে জোবে পা ফেলে। ওর কালা মস্ত মস্ত কাদাভাবা পা দু'খান টালমাটাল। ছাই ছাই করে হেঁটে চলেছে মদন।

বকুলতলা থেকে সোজা এসে চালাঘরে ঢোকে। তার সেই গোলাপকুল আঁকা রঙচটা বাস্কাটা খোলে। টাকা কটা রাখে তানার ভাঁজে। ভাল করে বন্ধ করে বাস্কাটা। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে বৃকে-পিঠে। বাঁশের মাচাটার ওপর কান্থা পাতা। তার শোওনের জায়গা।

বসে হাঁপায় মদন। মোষের মত হাঁপায়। দু'দু' জিরিয়ে নেয়।

হ্যাঁ। তার ভাত ডাইল ঢেকে রেখেছে বিদ্যাধরী ঘরে। কলাইয়ের থালাটা একটা চুর্বাড়ি দিয়ে ঢাকা।

খেবে শূরে পড়বে মদন। খেপী শোবে পাক ঘরে। খেপী কি শোবে? কে জানে। ও দেখেছে। খেপী গভীর স্নাত্রে ঘুমোয় না। সাধনের কাম করে। দমের কাজ। কি যে করে মদন জানে না। কিন্তু দেখেছে সকল রাজ্য যখন ঘুমে, খেপী তখন ঘুমায় না।

যা মন নের করুক। ও জানে খেপী তার খপর নিতে আসবে না। সেও খেপীর খপর নিতে যাবে না। রাত কাটবে দিন কাটবে। একইভাবে কাটবে।

একভাবে কাটতে দেবে না মদন। আসছে কাল বিদ্যাধরীকে কালাকান্দি নিয়ে যেতেই হবে। যেমন করে হোক বিদ্যাধরীর ওই নখর দেহখান পৌঁছে দিতে হবে। টাকা তার চাই। দল তাকে বানাতেই হবে। দলের অধিকারী হবে মদন দুইয়া।

বেলা পড়ে এসেছে। সূর্য গাছের আগা থেকে বেশ খানিকটা নেমেছেন।

মাঝে মাঝে ছেঁড়া মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রোদ্দর।

বিদ্যাধরী ঘরের বাইরে একটা চ্যাটাই-য়ের ওপর বসে একতারার তার বাঁধছে।

বঙ-বঙ-আওয়াজ উঠছে একতারায়। পা ছাড়িয়ে বসেছে বিদ্যাধরী। কলা-গাছের খোড়ের মত পা দু'খানার ওপর এক-তারার লাউয়ের ডোলটা রয়েছে। তার বাঁধছে বিদ্যাধরী।

লাউয়ের ডোলটা বদলাতে হবে। পূরনো হলে বাজে ভাল। কিন্তু বোধহয় ভেতরে পোকা ধরেছে। ডোলটা দু'হাতে ধরে, ঝাঁকায় বিদ্যাধরী। না। ভেতরে কোন শব্দ নেই।

তবে আওয়াজটা গুমগুমাইয়া ওঠে না ক্যান?

কালা মদন বাজে না। এইবারে কালা মদনকে বাজাতেই হবে। একতারাতাকে কালা মদন ভেবে নিয়েছে বিদ্যাধরী। তার পাল্টাবে। মেরামত করবে। বাজাবে কালা মদনকে।

আগন মনেই ফিক ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী। চোখেব কোলদুটো ফুলো ফুলো।

একতাবাটা এতক্ষণে একটু পদে এসেছে। চাঁচা বাঁশের ঠোঁটে চাপ দেয় আঙুল দিয়ে। এক আঙুলে তারে ঘা দেয় — বঙা-বঙ-বঙা-বঙ-বঙা-বঙ-আওয়াজ উঠেছে। এইবারে বেজেছে কালা মদন।

“সাইয়ের নামে আওয়াজ তুলিয়া

ভাসরে মদন সংসারে।

মিঠা রসে মজাবি যদি অন্তরে।

অ কালা মদনারে—মদন আমার—”

পিঠের ওপর একখানা হাতের ছোঁরা পেয়ে খেপীর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাল। ডান হাতে একটা বিড়ি ধরিয়ে মদন বাঁ হাতখানা ওর পিঠের ওপর রেখেছে। মদনের চোখে টালা টালা তাকানি। একটু যেন ভর-সম্ভ্রান্ত। বিদ্যাধরী হাসল—সুদুখে আইস।

মদন সামনে এল না। পেছনে বসে রইল। হাতখানা পিঠ থেকে নামাল না। পিঠের ওপর হাতের চাপ দিল। চাপটা অনুভব করল বিদ্যাধরী। মদন কখনো এমন কবে তাব গায়ে হাত দেয় নি। এমন করে কখনো তার হাতে পিঠে চাপ দেয় নি। এক-আধ সময় চলতে চলতে হয়তো তার হাতখানা ধরেছে। কিন্তু সে হাত ধরায় কোন সম্ভ্রান্ত ছিল না। সহজ মানুষের স্পর্শ বলে মনে হয়েছিল।

আজকের এ স্পর্শ যেন বাঁকা-ত্যাড়া। পিঠের ওপর হাতের চাপ। দেহের ভেতরে যেন কিলকিল করে ওঠে। ওর হাতের ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে মদন তার নিজের

মনের কিলকিলানি ওব মনে ঢুকিয়ে দিতে চায়।

আলগা হাসি খেপীর মুখে।

তাকায় মদনের দিকে। আনতে বলে,—কিছু কইবার চাপ?

মদন বলতে কিছু চায় কি? না। মদন কিছু বলে না। কিছু বলতে চায় না। উত্তরে হাতখানা আর একটু নানিয়ে খেপীর কোমবটা জড়িয়ে ধরে কাহে টানতে চায়।

এদিক-ওদিক তাকায় মদন।

সামনে বকুলতলায় খোঁটায় একটা গরু বাঁধা রয়েছে। পুঁকুরপাড়ে কনুমানিষ্য নাই। বাঁ ধারে নিচু ঘরের মাঠ ঘু-ঘু-দূরে গাছ-গাছালীর ছায়ারেখা আন মস্ত আকাশখানা।

—কি চাপ?

আরও একবার বলে খেপী বিদ্যাধরী: ও জানে না। মদন এক অসঙ্গ সাহসের মতলব করেছে আজ।

দু'পূরে ঘুমোয় নি। শূয়ে শূয়ে শূয়ে ভেবেছে। ভেবেছে যেমন করে খেপীকে কালাকান্দির ব্যাপারীনি কাহে নেয়া যায়। ভাবতে ভাবতে নিজেব বোকামিতে হাসি পেয়েছে তার। সে একটা বোগদা মাধাই। নিজে সে একটা সাঁই য়য়ান পুঁকুরপাড়ে। কখনো কি সে খেপীকে জোর করে ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। খেপীকে জোর করে ধরে টেনে নিয়ে এসেছে? কেন। কেন সে জোর করে নি। গায়ের জোর তাব কম নয়। আর জুরিজুরি তো কববে মদন-মানুষ। মাইয়ামানুষ তব নি বশে আসবে। সে আজ পর্যন্ত খেপীকে বশে আনতে



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

পারে নি। তার একমাত্র কারণ এইটাই।
সে একটা ভাড়া। খেপী তার কাছ
থেকে একটু জোর চায়। একটু আউগান
চায়। সে না এগিয়ে গেলে খেপী এগোবে
কেন? হাজার হোক বিদ্যাধরী মাইয়া-
মানুষ।

বড় ভুল করেছে মদন।

একটু জোর করলে এতদিনে খেপীকে
সে পুরো দখলে আনতে পারত। তার
কিনা বাদী হয়ে থাকত। সে যা বলত,
তাই করত। তার কথার ওপর কথা বলতে
সাহস পেত না।

কেন যে সে খেপীকে এতদিন ভয়
করে চলেছে। নিজেই বুকে উঠতে পারে
না। আরে রাম। রাম। ভয়-ভয়ের
আছে কি। খেপী আস্ত একটা মাইয়া-
মানুষ। তাকে এত ভয়-ভয় করাটা মোটেই
উচিত কাম হয় নাই। একবার খেপীকে
নষ্ট করে ফেলতে পারলে খেপীর ডুমফাই
বেরিয়ে যাবে। তখন সে যা বলবে, তাই
শুনবে।

—কি চাও?

খেপী তার-তার চোখে তাকাল।
মদনের হাতখানা নিজের কোমর থেকে
ছাড়াবার কোন চেষ্টা করল না।

মদন মৃদুটা ওর কানের কাছে এনে
বলল,—ঘরের মধ্যে আইস।

না। কথা অমান্য করল না বিদ্যাধরী।
একতারার ডোলটা কোল থেকে নামিয়ে
উঠে দাঁড়াল।

মদন ওর হাতটা ধরে টেনে ঘরে
ঢুকিয়ে ঘরের ঝাপটা বন্ধ করে দিল।

বিদ্যাধরী বড় বড় চোখদুটো মেলে
তাকাল মদনের দিকে। যেন কি একখান
সর্বনাইশা কান্ড দেখছে বিদ্যাধরী। একটা
বিভূষণি কিছু প্রত্যক্ষ করছে। ও দেখছে।
দেখছে তো দেখছে। ওর দেহে যেন ও
নেই। ও দেহ থেকে আলাদা হয়ে দেখছে।
ওর দেহটাকে জোর করে দহাতে নিজের
বুকের কাছে টেনে নিল মদন।

মদনের চোখে আগুন। সর্বনাইশা
আগুন। যে আগুনে সংসার পোড়ে।
পরাণ জ্বলে। সর্বক্স ছারেখারে যায়।
হায়রে। আগুনের নিশা

তার কালা মদন তার চোখের সামনে
আগুনে পড়ে মরতে চাইছে। এ আগুন
নিভানোর ক্স বিদ্যাধরীর নাই। বিদ্যা-
ধরী সে চেষ্টাও করল না। ও যেন বিবশ

অবশ হয়ে গেল। দেহের মধ্যে ও উপরের
পৈঠায় উঠে টালার মত তাকাল।

মদন উম্মাসে উম্মাস্ত হয়ে উঠেছে।

এতদিন সে ছিল বোগদা মাধাই।
মাইয়ালোকেরে ঘাড়দানা দিয়া কাছে টানতে
পারে নাই। আ রাম। রাম। সে কি
পুরুষমানুষ আছিল? এইবার আর যাইব
কোথায়? খেপীর নছর-বছর সব ভাইয়া
যাইব।

মদনের গায়ে তখন অসুন্দের শক্তি।
মদনের আর বাধা দেওন যাবে না। আর
আটকান যাবে না।

তার কালা মদন আগুনে পুইড়া
মইল। বড় বড় চক্ষুদুইটা জ্বলে ভরে
উঠল খেপীর।

নরম গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের
ধারা নামল।

হায়রে আগুনের নিশা!

গুম্বস্তরে বিদ্যাধরী চোঁচিয়ে উঠল।—

আগুন—আগুন।

মদন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।
কোথায় আগুন?

[ক্রমশঃ]



যা পেয়েছি

শ্রীসুধীরজন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

II উনিবিংশ অধ্যায় II

ম্যারিটারীর শিক্ষানবিশী আরম্ভ

II এক II

কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে পশার জমতে হলে গোড়াপত্তনটা ভাল হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন হোত একজন সিনিয়ার কেশসুলী চেস্বারে কাজ শেখা। বিজ্ঞেতে একে বলে "ডেভেলিং"। অন্যান্য অনেকগুলি রেও-মাজেব মধ্যে এই ডেভেলিং-এর ব্যবস্থাটাও কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে প্রচলিত ছিল। যারা সত্যি সত্যি কাজ শিখতে চাইতেন তাঁদের সিনিয়রের চেস্বাবে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হোত। তাবপর সিনিয়রের অসুবিধে থাকলে তাঁর কোর্টের কাজগুলি অপব পক্ষের কৌসুলীকে জপিয়ে মত করিয়ে জজ সাহেবের কাছে মূলতুবা করান ছিল "ডেভেলিং"-এর একটা কাজ। তারপর সিনিয়রের জন্য আজির খসড়া মসাবিদা তৈরি করা, তাঁর ব্রীফেব সব আইনের তর্ক সম্বন্ধে নজির খুঁজে নোট করে দেওয়া ছিল নিত্যকর্মপন্থা। অনেক সময় সিনিয়র যদি সে খসড়া বা নোট না দেখেই ছেড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দেন তাহলে মন খারাপ হলেও ঐ রকম খসড়া ও নোট কবেই যেতে হবে। কে জানে, যদি কোনদিন কোন খসড়া বা নোট সিনিয়রের নেক-নজরে পড়ে যায তবে ত' কেমনা ফতে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এই হাড়ভাঙা বেগার খাটুনি বছর পাঁচেক কর্তেই হবে।

কোর্টে বসে কৌসুলীদের কাজের ধরন লক্ষ্য করে আমি নিজেই নতুন সরকারের চেস্বারে কাজ কববার প্রস্তাব নিজেই তাঁর কাছে করেছিলাম এবং তিনি আমার প্রস্তাবে রাজীও হয়েছিলেন। এই বন্দোবস্তটা হয়েছিল উনিশ শ' উনিশের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায়। তারপর থেকেই

নিয়মিত সন্ধ্যার পর তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি গিয়ে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে একলাটি বসে আমি কাজ সুরু করে দিলাম। সরকার সাহেবকে সন্ধ্যার আফিস ঘরে কদিন দেখলামই না। এটনীর ও মক্কেল-রও দেখা নেই। কেমন খটকা লাগল। অনুসন্ধানে জানলাম যে সে সময় সরকার সাহেবের শরীর খুবই খারাপ হওয়ায় তিনি কোর্ট ফেরতা বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেশ খানিকটা হাওয়া খেয়ে সাতটার মধ্যেই ঘাটব খাওয়া সেরে শুষে পড়তেন এবং প্রত্যহ ভোর চারটেব সময় উঠে আফিস ঘবে নিজে একলা বসে কাজ করে গোটা ছয়েকের সময় বোরিষে ঘণ্টাখানেক গড়ের গাঠে হেটে এসে এটনীর ও মক্কেল নিয়ে কনসাল্টেশন কবতেন এবং তার পরই স্প্যানাদি সেরে থেয়ে দেবে কোর্টে যেতেন সারা দিনেব মত। আমি ত' প্রমাদ গণলাম। তখনই শুনোইলাম যে জুলাই মাস থেকে আমাকে সকালেই ল কলেজে যেতে হবে। সূতরাং সকালে ডেভেলিং ত' আমার চলবে না। আর তিনি যদি সন্ধ্যায় কাজই না করেন তবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগা-যোগ হবে কেমন করে? তবু দাঁত কামড়ে কাজ করে চললাম যে যদি কোনো শৃঙ্-লমেন আমার তৈরি কোনো নোট তাঁর সুনজবে পড়ে। দিন সাতেক পর এফদিন বসে আছি সবকার সাহেবের লাইব্রেরী ঘবে বাতি জ্বালিয়ে। একটা ব্রীফ আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখে পড়ে-ছিলাম। তার পরদিন সকালে দাদাবাবুর লাইব্রেরীতে সেই মামলা-যে সব আইন-সংক্রান্ত কথা উঠতে পারে সেগুলি দেখে নিয়েছিলাম। অনেকগুলি নজির ঘেটে একটা নোটও বানিয়েছিলাম। সেটাকেই একটু অদল-বদল কবাছিলাম সোদিন সন্ধ্যায় সবকার সাহেবের লাইব্রেরীতে বসে। হঠাৎ খাবার ঘর থেকে খোদ সরকার সাহেব লাইব্রেরীর মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন শ্রুতে যাবার জন্যে। আমাকে

দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—"আপনি এখনো কাজ করছেন?" বললাম—"অমুক মামলাটার ব্রীফটা পড়ছিলাম।" তিনি—"দেখি ত'" বলে খপ করে ব্রীফটা ও আমার নোটটা হাতে করে দাঁড়িয়েই নোট-টার উপর চোখ বোলাতে লাগলেন। হঠাৎ থেমে একটা নজিব ঘেটা আমি অনেক খুঁজে বের করেছিলাম সকালে সেটা তাঁর আলমারী থেকে আনতে বলে একটা চেয়ারে বসে আমার নোটটা পড়েই চললেন। ল রিপোর্টটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি তার হেড নোটটা পড়ে বেশ খুশি খুশি ভাবে বললেন—"এই নতুন নজিব আপনি পেলেন কোথায়? এটা ত' এখনো টেকস্ট-বুকে ওঠে নি।" বললাম যে দাদাবাবুর লাইব্রেরীতে বসে একটা নজিব থেকে আর একটা নজির দেখে দেখে এই শেষ নজিরটা পেয়েছি।" তিনি—"বেশ, বেশ" বলে আমার দিকে চেয়ে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি না লন্ডনের এল এল-বি-তে ফাস্ট ক্লাশ ফাস্ট হয়েছেন?" মাথা নেড়ে সাথ দিলাম—"হ্যাঁ"। তিনি প্রশ্ন করলেন—"কোন কোন এটনীদের আপনি জানেন?" নাম বলুন ত'।" বললাম—"কোন এটনীরকেই চিনি নে এক কুমাব দত্ত ছাড়া। তাঁকে দাদাবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখেছি—এই যা।" সবকার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এটনীর জন্যে ভাবনা কবতে হবে না। আমি-ই আপনাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পাব। আপনি ঘন দিনে কাজ কবে যান।" বলেই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপবে উঠে গেলেন। আমার মনেব উপর থেকে জগন্দল একটা বোঝা বেন নেমে গেল। ভাবলাম আমার হয়ত কপাল ফিরেই গেল। সোজা ৭৮নং ল্যান্ডডাউন রোডে গিয়ে বদুর কাছে সুখববটা দিলাম। কত না জল্পনা হোল প্র্যাকটিসটা জমলে কি সুখেরই না হবে। বাড়ি ফিবে খেতে বসে বাবা মাকে খবরটা দিলাম। বাবার মুখখানা বেশ খুশি দেখে মায়ের চোখ

মনে সৌদন রাতে ঘুমিয়ে গেলাম।

উৎসাহে লেগে গেলাম ডেভেলিং করতে সরকার সাহেবের লাইব্রেরী ঘরে বাতি জ্বালিয়ে একলা বসে। আরো দিন সাতেকের পর দুঃসংবাদ শুনলাম। সরকার সাহেব দিন কতকের মধ্যেই আরাতে যাবেন ডোমরাওন রাজ্যের বিরুদ্ধে হরিজ্ঞার হয়ে মাগলা করতে এবং সেখানে তাঁর বছর-খানেকও লাগতে পারে। যখন সবে আশার উচ্চ শিখরে উঠেছিলাম তখনই দড়াম করে ভূপতিত হয়ে সকল আশা চূরমা হয়ে গেল। আমার সরকার সাহেবের সঙ্গে পনেরো দিনের ডেভেলিং অকালেই বন্ধ হয়ে গেল। মনটা যে খুবই খারাপ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে পরে জেনেছি যে জুনিয়ার কৌসলীর এই রকম দৈব-দুর্বিপাক হয়েই থাকে এবং তার চরিত্র গঠনে এই রকম বিকল মনোরথেরও প্রয়োজন আছে।

অল্প দিন পরেই দাদাবাবুও ঐ একই মামলার ডোমরাওন মহারাজের পক্ষে ব্যারিস্টার নিযুক্ত হয়ে আয়ার চলে গেলেন। এই গামলাতেই দাদাবাবু আবার থাকার খরচ-খরচা বাদে মাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে ফীস নিরেয়েছিলেন, যার গুণ্যের বোঁঠান আমাদের কাছে অনেকবারই করেছেন। গর্ব হবারই কথা। এত ফীস এত মাস ধরে কলকাতা হাইকোর্টে কোন উকিল কৌসলী কখনও রোজগার করেছেন বলে শুনিনি। আমি তখন মাতৃহারা গোবৎসের মত যার সঙ্গে ডেভেলিং করা যার এমন একজন কৌসলী খুঁজে বেড়াচ্ছি। সতীশদাদা তখনও এ্যাডভোকেট জেনারেল হন নি। সতীশদাদা তখন ছিলেন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে। তাঁকে বলে তাঁর ব্রীফ দেখতে লেগে গেলাম প্রত্যহ সকালে। সকালে স্নান সেরে যেতাম তাঁর বাড়িতে। সেইখানে ভাল করে আলাপ হোল। ব্রজকিশোর চৌধুরী বলে তাঁর আর একজন ডেভিলের সঙ্গে। অতি চমৎকার লোক ছিলেন ব্রজকিশোর চৌধুরী। বিদ্বান কিন্তু অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দ্য হয়েছিল। সম্ভাব্য সময় বাবলাইবেরীতে স্টাডি গ্রুপের তিনি ছিলেন অধিকর্তা। আমরা সতীশদাদার সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে তাঁর গাড়িতেই কোর্টে যেতাম। বোঁঠান বনলতা—যাকে আমরা ডাকতাম বনি বোঁঠান বলে তিনি আমাদের বেশ যত্ন করেই খাওয়াতেন। সতীশদাদার ব্রীফ প্রায় সবগুলিই ছিল অরিজিন্যাল সাইডের আপীল ব্রীফ কিংবা মফস্সলের আপীল ব্রীফ। সেগুলি নিয়ে একজন জুনিয়ার কৌসলী যার পেশায় অভিজ্ঞতা তখন

কাজ ছিল আর্জেন্ট।

কোর্টে টুকটাক দরখাস্ত লড়া, সাক্ষীসাব্দু জেরা করে অরিজিন্যাল মামলা চালান। সে কাজের ধরণ একেবারে অন্যরকম। সতীশদাদার মত সিনিয়ার কৌসলীরা আর্জি মূসাবিদার কাজ করেনই না। বেশ বুঝলাম যে আমার মত জুনিয়ার কৌসলীর ডেভেলিং করা দরকার অরিজিন্যাল সাইডে যার প্র্যাকটিস আছে এমন একজন মাঝারী শ্রেণীর কৌসলীর সঙ্গে। কার কাছে যাওয়া যায় এই চিন্তাই করতে লাগলাম। সরকার সাহেবের প্রিয় ছাত্র শরণ বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কোর্টেও তাঁর কাজ দেখে ভাল লেগেছিল। ভাবলাম যে তাঁর চেম্বারেই কাজ করবার অনুমতি চেয়ে নেব।

যখন আমি শিখংকুর মত ভাগ্যাকাশে বুলাছি সেই সময় আমার এক মজার ব্রীফ এল। তখন বিজ্ঞানীর রাণীরা মারা গেলে গদির জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। একজন দাবিদারের পক্ষে তম্বির সূর্য করলেন বাবার চেনা প্রকাশ দাস বলে এক ভদ্রলোক। মামলার খরচা চালাবার জন্যে একজন মহাজনও ঠিক হোল। তেলিরাগের দক্ষিণের বাড়ির জেন্দুকা আর্জির খসড়া মূসাবিদা করলেন। দাদাবাবু সেটিকে দেখে দিলেন। একটা আঁচড়ও নাকি কাটেন নি। দক্ষিণা নিরেছিলেন শুনেনি বিশ হাজার টাকা। সেই আর্জিটা গোয়ালপাড়া না খুবড়ির ইংরেজ হাকিমের কোর্টে দাখিল করতে হবে। এর জন্যে এল ই পিউ সাহেব—যাকে বলা হোল লাল পিউ—তাকে ব্রীফ করা হোল। আর্জি দাখিল করতে সিনিয়ার কৌসলী কেন দরকার হোল বুঝলাম না এবং তাঁকে কত দক্ষিণা দেওয়া হোল তাও জানলাম না। বেশ বোঝা গেল ঘটা করে বাজা বাজিয়ে মামলাটা দায়ের করে বিপক্ষ দলকে অভিভূত করে দেবার আয়োজন হলো। কিন্তু লাল পিউ-এর মত বড় কৌসলী জুনিয়ার সঙ্গে না থাকলে ব্রীফই নেবেন না। অতএব একজন জুনিয়ারের খোঁজ পড়ল। প্রকাশবাবু বেশ খুঁলেই বললেন যে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়ার খরচা বাদে কিছু দিতে পারবেন না। এই বুকে যদি আমি যেতে রাজী হই তবে তাঁদের অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। বাবা বললেন—“ভর ত’ কাম নাই। ঘুইরা আইলে পারছ’ অন্তত পিউ সাহেবের লগে ত’ আলাপ-পরিচয় হৈব এবং কিছু শিখতেও পারবি।” কাজকর্ম আমার ত’ ছিলই না। এমন কি কারুর সঙ্গে তখন ডেভেলিং-ও করছিলাম না। সূতরাং রাজী। খুঁশিতেই বোঁড়িয়ে

করতে পিউ সাহেবের ঐ...

সাহেব রইলেন একটা গোটা কম্পার্টমেন্ট দখল করে এবং আমি ও প্রকাশবাবু আর একটা কম্পার্টমেন্টে জায়গা করে নিলাম। পিউ সাহেব কথাবার্তা খুবই কম বলতেন। পরে দেখেছি যে হাইকোর্টে তিনি জজের দিকে না চেয়ে ঘরের ছানের দিকে বা দক্ষিণের বড় দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তারিকের সওয়াল জবাব করতেন। বলতেন যা তা খুবই মোক্ষম কথা কিন্তু কোন তাপ-উত্তাপ ছিল না তাঁর ভাষণে। তাঁর ধারণটা বোধ হয় ছিল যে “আমি বলেই খালাস, তুমি, জজ, বুঝলে ত’ তোমারই উপকার হোল, নইলে আমি আর কি করতে পারি।” অনেক দূরের পথ একই মেনে গেলাম পিউ সাহেবের সঙ্গে। কেবল রেস্টুর্যান্ট কারে বা রিসেসমেন্ট রুমে খাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হোত। নমস্কারাদি ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হোতো না। একদিন খেতে খেতে বললেন—“তুমি কোন আফিস থেকে কাজ পাও?” জবাব দিলাম—“এটর্নীদেব চিনি না এবং কেউ কাজও দেন না।” সেই দূর-নিবন্ধ-দৃষ্টিতে পিউ সাহেব নিজেই বললেন—“কেনই বা দেবে? তারা যাদের সাধারণত কাজ দেয় সে সব কৌসলীরা ত’ কোন দোষ করে নি। অতএব তাদের ছেড়ে তোমাকে দেবে কেন?” ভাবলাম তাই যদি হবে তবে কে কাজ দেয় তা’ জিজ্ঞাসাই বা করা কেন। আরও মনে হোল যে তাই যদি সত্য হয় তবে ত’ কোন নতুন কৌসলী কোন দিনই কাজ পাবে না। সে কখন হয়? পিউ সাহেবের সঙ্গে তক’ করলাম না। আর্জি পেশ করে ফিরে এলাম। প্রকাশবাবু পরে একদিন একটি রূপার উপরে আমার নামের মনো-গ্রাম খোদাই করা সিগারেট কেস এবং মাথায় গোলাকৃতি রূপার হাতলে আমার মনোগ্রাম খোদাই করা একটি লাল বেতের লাঠি উপহার দিয়ে গেলেন। কেসটার কি হোল আর কিছু শুনিনি। কিন্তু ফীস বাবদে পাওয়া ঐ সিগারেট কেস ও লাঠিগাছা এখনো আমার কাছে রয়েছে।

৯ দুই ৯

আসাম থেকে ফিরে এসে গেলাম শরণ বোস সাহেবের বাড়ি। তখন তিনি তাঁর পৈয়িক বাড়ি ৩৮।২ নং এলগিন রোডেই থাকতেন। আমার মনের বাসনা ব্যক্ত করতেই তিনি যেন বেশ সংকুচিত হয়ে পড়লেন। কিন্নর করে বললেন—“আমি

নিজেই জুনিয়ার। আমার আবার ডৌল কি করে হবে?" সেই সময়েই শরৎ বোস ও অন্য চারজন ব্যারিস্টারের বেশ পড়তা পড়ে গেছে। এই পাঁচজনের নাম হোল বট, ঘোষ, অশোক রায়, বিমল ঘোষ, শরৎ বোস ও সুধাংশু বোস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁচটি allis-দের চলতি নামের অন্তর্করণ করে সরকার সাহেব এঁদের নাম দিয়েছিলেন "বিগ ফাইভ"। আমি জোর করে বললাম যে আমি তাঁর কোর্টের কাজ দেখছি এবং আমার ইচ্ছে তাঁরই প্রাকটিস কাজটা ভাল করে শেখবার। নাছোড়বন্দা দেখে শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন। ফেরারীর শেষে কি মার্চ মাসের গোড়ায় আমি শরৎ বোসের তখনকার দিনের বসত বাড়ি এলগিন রোডে যেতে সুরু করে দিলাম। আমি তাঁর প্রথম ছাত্র হয়েছিলাম বলে তিনি আমাকে অন্যান্য যারা আমার পরে তাঁর টেন্সারে এলেন তাদের চেয়ে একটু বেশি স্নেহ করতেন। পরে আমার যখন প্রাকটিস হতে সুরু করল এবং আরও পরে যখন জিজরতীতে একটা ছেড়ে আরেকটার উন্নতি হতে লাগল তখন শরৎ বোস সাহেব খুবই আশ্বাসদায়ক লাভ করতেন এবং "আমার প্রথম ছাত্র" কথাটা বেশ জোর গলাতেই বলতেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটি মধুর আত্মিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। "Devil" ও "Boss" সম্পর্ক ছাড়িয়ে ঢের অন্তরঙ্গ হয়েছিল আমাদের প্রীতির বন্ধন। তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসে বেশ বৃদ্ধিতে পারলাম তাঁর হৃদয়ের বিশালতার প্রসার। কত বে দৃষ্টি ছাত্র ও গরীব লোকদের তিনি অর্থ সাহায্য করতেন তার কোন হিসেবই ছিল না। মাসেব প্রথমে কতজনকে দেখেছি নিয়মিত এসে মাসোহারা নিয়ে যেতেন বোস সাহেবের কাছে থেকে। খুবই আত্মাভিমानी পুরুষ তিনি ছিলেন। কারো খাতিরে বা প্ররোচনার বা সত্য বলে জানতেন তার ব্যত্যয় হতে দিতেন না। প্রবলের কাছে কখনো নতি-স্বীকার করতে দেখি নি। অসংগত কথার সাফ জবাব দিতে পারতেন। বাইরের লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝে দাম্ভিক ও অহংকারী আখ্যায় কুখ্যাত করতেন। কিন্তু তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসে আমি তাঁকে। যেটুকু দেখেছিলাম তাতে নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে তাঁর বাহ্যিক ব্যবহারের নিচে অতি সঙ্গোপনে ছিল করুণায় সিক্ত বিশাল মানবতা। শরৎ বোস তাঁর স্বল্প-পরিসর কর্মজীবনে আইনজগতে, রাজ-নীতিক্রেত্রে ও দেশের জনসাধারণের চিন্তে খুব বড় স্থান অধিকার করেছিলেন। একাধিকবার তাঁকে ব্রিটিশ সরকার আটক করে রেখে তাঁর প্রাকটিস ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাকটিস তাঁর এতটুকুও কমে নি কিন্তু জেলের

অস্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্য পরিবেশে তাঁর স্বাস্থ্য কম নিশ্চয়ই হয়েছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আমার সঙ্গে কালিম্পং-এ হস্তা তিনেক ছিলেন কি আনন্দেই না সেই তিন সপ্তাহ কেটেছিল। কিন্তু অল্প পরেই তিনি চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন। এটা মস্ত বড় উল্কাপাত বেন হয়ে গেল ভারতবর্ষের আকাশে। এখনো মনে পড়ে শরৎ বোসের বুদ্ধিদীপ্ত মতাবলম্ব এবং সন্দেশ কণ্ঠস্বর। আর মনে পড়ে তাঁর সহধর্মীণীকে ধিনি নীরবে তাঁর স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে গেছেন। শরৎ বোস সাহেবের ছেলেলিপেরা ছিলেন আমার আপনজনের মত। তাঁর সব ছেলে কটিই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। বিশেষ করে মধ্যম পুত্র অমিয়নাথ কৃতী ব্যারিস্টার এবং এক্ষণে M.P.

শরৎ বোসের আত্মবিস্মৃতি বোঝের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। আর্থার পেজ বলে একজন ব্যারিস্টার বিলেত থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কোর্টে একটা মামলার শরৎ বোস সাহেবকে বহাস করছিলেন। শরৎ বোস সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার জজ পেজ সাহেব শরৎ বোস সাহেবকে কোর্ট থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। জজ সাহেব বোস সাহেবের সততার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন বলে বোস সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে কেস ফেলে চলে গেলেন। বারলাইব্রেরীতে হে-হে পড়ে গেল—“অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় কথা বলেছেন জজ সাহেব। এর প্রতিবাদ করা

অবশ্য প্রকার।” বলে অনেক ব্যারিস্টাররা এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেবের ঘরে ছুটল। সত্যীশদাদা তখন কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আইনজীবীদের অগ্রণী। তিনি সব শ্রুতি তক্ষুণি পেজ সাহেবের এজলাসে গিয়ে ব্যারিস্টারদের মনোভাব জানিয়ে বেশ সংযত ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে এলেন। এখানেই ব্যাপারটার শেষ হোল না। বিশিষ্ট জনসাধারণের প্রেক্ষাগৃহে পড়ায় কলকাতার সেরাফ হাইকোর্টের পাশে অবস্থিত কলকাতা টাউন হল মিটিং ডাকলেন। বিস্তারিত লোকসমাগম হয়েছিল এবং অনেক বক্তা জজ সাহেবের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করলেন। সবাই বললেন যে কৌসলী যদি কোর্টে অসম্মানিত হন তবে মজেলের স্বাধীনতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাতে করে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় অবদান ন্যায় বিচারের মর্যাদা ধ্বংস লুটিয়ে পড়বে। সবসম্মতিক্রমে জজ পেজ সাহেবের ব্যবহারের বিরুদ্ধে রেজল্যুশন পাশ হয়ে গেল। একজন মাকার ক্রাশের কৌসলীর স্বপক্ষে এত জনমত দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা এইখানেই পর্যবসিত হয় নি। এর কিছুদিন পরেই জাস্টিস আর্থার পেজকে রেগালি হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস করে বদলি করে দেওয়া হোল তাতে করে পেজ সাহেবেরও মধুরতা করা হোল এবং জনমতের স্বীকৃতি দেওয়া হোল।

[কলকাতা]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বেলগাড়া - শ্রীনগর - গোহাটী



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৪১

* যমুনোত্তীর পথে মোটরবাস চলে ডিউলগাঁও হয়ে বড়কোট পর্যন্ত। হৃষীকেশ থেকে প্রভুঘরের প্রথম গেট ছাড়ে সকাল পাঁচটায়। একদিনেই ডিউলগাঁও পৌঁছে দেয় প্রথম গেটের বাস।

ভোর সাড়ে চারটেয় বাসে উঠে বসে আছি। আগের দিনই টিকিট কিনে রেখেছিলাম। এ-সময়টার যাত্রীদের ভিড় থাকে। রাজস্থানীদের একটা প্রকাণ্ড দল মাজ আমার সংগী। তাদের সঙ্গে আছে তীর্থপাণ্ডার ছড়িদার।

ত্রোতা ও ম্বাপরে হিমালয় ভ্রমণের যানবাহন ব্যবস্থা কি রকম ছিল জানি না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ পার্বত্যপথে তীর্থ-যাত্রীর পা দু'খানাই ছিল সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য বাহন। মোটরবাস চলাচল শুরুর হয়েছে বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এবং ক্রমশ তাদের গতিবিধি বিস্তৃত হয়ে চলেছে বিখ্যাত তীর্থগুলির কছ বরাবর। বিশেষত সীমান্তবর্তী সমগ্র উত্তরাখণ্ডে

লালচীনের অনুপ্রবেশের ফলে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে পথ-ঘাট তৈরির কাজে সরকার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সীমান্তে সৈন্য ও রসদ চলাচলের পুরন্ব তীর্থযাত্রার চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু মাটি আর পাথরে মেশানো এই সব পার্বত্য উপত্যকায় উপযুক্ত রাজপথ ও সেতু নির্মাণ সহজ কথা নয়। সমতলের সড়ক নির্মাণ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। উন্নত যান্ত্রিককুশলতা ছাড়াও প্রকৃতির নিরন্তর ধ্বংসলীলার সঙ্গে সংগ্রাম করে সেই পথ চালু রাখা এক বিষম কঠিন কাজ। কোন কোন অঞ্চল বছরে আটমাসই বরফে ঢাকা থাকে। বর্ষার জল পড়লে বরফ গলতে শুরুর হয়। এবং তার সঙ্গে চলে অবিরাম ধ্বস নামা। পলকে নিশ্চিন্দ হয়ে যায় পথের নিশানা। ক্ষীণ পার্বত্য প্রোতস্বিনী বর্ষায় ভয়ঙ্করী সংহারিণী মূর্তিতে দুই কূল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। ভারী ভারী লোহার সেতু ভেঙে চলে যায় মস্ত-মাতাঙ্গিনীর ভেজে।

এ বছরে মোটরবাসের প্রয়োজনীয় ডিজেল তেল সরবরাহ অনিয়মিত। তার

ওপরে বিদ্যুৎশক্তির ঘন ঘন বিরতি—ঘাটতির জন্য। ফলে আমাদের মোটর-বাসটি যাত্রীবোঝাই হয়ে তেলের পাম্পে অপেক্ষা করছে। বিদ্যুৎচালিত পাম্প চালু হয়ে ডিজেল মিলতে বেলা প্রায় নটা বাজলো। প্রথম গেট বহুক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা দ্বিতীয় গেটের জন্য অপেক্ষার থাকতে হয়।

এই পার্বত্য পথে সর্বত্রই গেট প্রথা। পথের প্রসারতা একটিমাত্র গাড়ি চলবার উপযোগী। সুতরাং ওপর থেকে নিচে অথবা নিচে থেকে ওপরে নির্দিষ্ট সময় চলাচল করে। দুইদিকের গাড়িগুলো পরস্পরকে আতিক্রম করে শব্দ বিশেষ স্থানগুণিতে। সকাল পাঁচটার পরে আবার গেট খুলবে বেলা নটার। পথের ওপর থেকে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের মতো লোহার আগড়টা তুলে দেবে প্রহরারত পুলিশ এবং তার হুইসলের সঙ্গে সংগেই সব গাড়িগুলো ছাড়তে হবে। দু-মিনিটের মধ্যেই আবার গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

বিরক্তির সময়ক্ষেপ। থেকে থেকে সহযাত্রী বৃন্দ রাজস্থানী জানতে চায় আর কত দেরি, কখন গাড়ি ছাড়বে? অপেক্ষমাণ গাড়ির সামনে পথের পাশে একটা পাথরের টিবিয় ওপরে বসে গগ্গার অনন্ত জলপ্রবাহ লক্ষ্য করি। দূরে নদীর ওপারে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু সড়কের মতো গায়ে-চলা-পথ নজরে পড়ে। অধুনা পরিত্যক্ত সাবেককালের তীর্থপথ। প্রশস্ত রাজপথ তৈরি হবার অনেক আগে লহমন-ঝুলার মারাত্মক দড়ির সেতু অতিক্রম করে সেকালের যাত্রীরা যেতেন দীর্ঘ পরিক্রমায়। যান্ত্রিক-সভ্যতার কল্যাণে সূবিধা হয়েছে অনেক। কিন্তু পথের মহিমাও ক্রমে অবলুপ্তির পথে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিই। রাজস্থানীদের দলটি ইতিমধ্যে পথের ধারে বসে প্রাতরাশ সেয়ে নিচ্ছে। দুর্গম তীর্থপথে এমন বাহুল্য-বর্জিত এবং সংক্ষিপ্ত বেশভূষা আর আহাৰ্যের নমুনা বোধ করি অন্য কোনও প্রদেশবাসীর ধারণাতীত। দলটিতে বৃন্দ ও বৃন্দার সংখ্যাই বেশি, দুটি অপেক্ষবয়সী মেয়ে ছাড়া। প্রত্যেকের মাথায় অথবা পিঠে একটি কাপড়ের পুটুলি আর হাতে একগাছি সরু বাঁশের লাঠি। পুরুষের পরশে ধূতি ও বেনিয়ান আর মেয়েদের ঘাঁগরা ও আঁটোসাটো রাউজ। পুরুষের মাথায় পাগড়ি আর মেয়েদের ময়লা ওড়না। পুটুলিতে আছে বাড়তি একটিমাত্র কাপড় আর একটা গরম চাদর অথবা কম্বল। আর আছে সারা পথের খোরাক কিছ্র চানাডা আর আটা। আর একটা ছোট পেতলের লোটা। এই সম্বল করে তুষারচ্ছন্ন হিমালয়ের লোকালয়বর্জিত দুর্গম তীর্থপথে চলেছে ওরা পায়ে হেঁটে। সুদীর্ঘ পদ-যাত্রার কালে দেখেছি ওদের কন্টসহিষ্ণুতা আর নিরলস জীবনযাত্রা। পথের ভীষণতা

প্রকৃতির অনিশ্চয়তা আর দিনান্তে আগ্রাস-
স্থানের স্বল্পতায় সম্পূর্ণ নির্বিকার
নিরুদ্বেগ। একমুখী বৃদ্ধাঙ্কের মতো
সঙ্কপে অবচল এই শান্ত, সরল
বিকানীরবাসী গ্রাম্য চাষীদের প্রতি শ্রদ্ধায়
মন ভরে ওঠে। কত অঙ্গের ওরা ভুঁট।
আশুতোষের আশীর্বাদ বৃদ্ধি শৃঙ্খল ওদেরই
প্রাপ্য। সার্থক ওদের লক্ষ্যভার তীর্থ-বাটা,
ধন্য ওদের সামান্য চাহিদা।

অবশেষে বাস ছাড়লো। ইতিমধ্যে
মুনি-কি-রোডের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে
কলারার টিকাপর্ব যথারীতি সমাধা
হয়েছে। ছাড়পত্র ছাড়া বাকী সবাইকে
প্রবল আপত্তির মধ্যে সুই দেওয়াও
হয়েছে। লাল নিশানধারী আমাদের মোটর-
বাসটি বাহিনীর পুরোধা। পেছনে
কয়েকটা মালবোঝাই লরী। শেষ গাড়ি-
টায় আছে সবুজ পতাকা। পরবর্তী
ঘাঁটিতে সবুজ পতাকা পৌঁছলে তবেই
ফিরতি পথের বাহিনী ছাড়া পাবে।
একেই বলে, 'গেটপ্রথা'। অপ্রশস্ত পার্বত্য-
পথ, একেবেঁকে ঘুরে ঘুরে পাহাড়কে
বেটন করে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে।
এপথে পাশাপাশি দু'খানা গাড়ি চলে না।
একদিকে সুগভীর খাদ, অন্যদিকে খাড়া
দেওয়ালের মতো পাহাড়। শেষধারার কাছে

দুটি পথের মোহনা। বাঁদিকে ঘুরে জংলা-
কীর্ণ পাহাড় ভেদ করে আমরা চলছি
নরেন্দ্রনগরের দিকে। ডানদিকের পথটি
চলেছে গঙ্গার অববাহিকা ধরে দেব-
প্রসাদের পথে। কেদারবদরীর তীর্থপথ।
সে পথের স্মৃতি আজও সমুদ্রতল হয়ে
আছে মনের মধ্যে। বতবারই আস, বতাই
দেখি, কোনওদিনই কেন পুরনো হয় না।
বাহ্যশেষে মনকে প্রবোধ দিই, আবার
আসবো, যদি বেঁচে থাকি।

দশ মাইল পথ অতিক্রম করে বাস এসে
দাঁড়ালো নরেন্দ্রনগরে বেলা সাড়ে দশটার।
আধঘণ্টা বিরতি। কর্মচঞ্চল পার্বত্য
সহর। শেষ গারওয়াল রাজের আবাস-
স্থল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আধুনিক
কামদার তৈরি রাজপ্রাসাদ। পথের ধারে
বাজার, দোকান, পার্ক, সিনেমা হল।
দূরে দেখা যায় বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল
সমতলভূমি। শিবালিক পর্বতমালার
পাদদেশে পর্বতদুহিতা গঙ্গার মতো
অবতরণিকা।

নরেন্দ্রনগরে দুটি জিনিস দৃষ্টি
আকর্ষণ করে। একটি হলো পথের ধারে
বিরাটকায় প্রস্তর নির্মিত বৃক্ষমূর্তি।
অন্যটি দূর হতে সমতলের শোভা।
টিহ্লির শেষ রাজা নরেন্দ্র শাহ প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন এই নগর। ডাকবাংলো, থানা
হাসপাতাল ইত্যাদি আধুনিক ভবনের সব
ব্যবস্থাই হয়েছে এখানে। শনৈতে পাই
অনতিদূরে জলাবিদ্যুতের কারখানা হতে
চলেছে। বর্তমান সরকার উঠে-পড়ে
লেগেছেন শিল্পায়ন করে এই অঞ্চলের
প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে। আর
দেশের দারিদ্র্যমোচনও হবে। কিন্তু সেই
সঙ্গে হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যও
অন্তহিত প্রায়। সাধু-সন্ন্যাসী আর
উদাসী বাড়িগুলোর পথে চলেছে ভীষণগাঙ্ক,
মোটরবাস আর লরী। পথের ধারে
দোকানে বাজে রেডিওসঙ্গীত। মাগুত-
পূর্ণরশ্মি কীচকবনে গম্বুজকিরণের
বাণীর সুর আর বৃষ্টি শোনা যাবে না।
ভালই হবে। যুগে যুগে বনজগলুলো
নিষ্কর্মা ভাবকের আকর্ষণীয় জেনো
ক্ষুধার্ত জনতার প্রয়োজন ব্যাহত থাকতে
পারে না। বাঁধনছোঁড়া দুরন্ত নরীকে
শাসন করতে হবে। ভূমিস্বত্ব নিশ্চয়িত
হবে। দেশের বনসম্পদ বজায় রাখতে
হবে। জঙ্গলের শেকড়-বাকড় ছেড়ে
দিনে এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি হবে।
এখানে মনোবিলাসের স্থান কোথায়?
বেদব্যাস কালিদাসের যুগ বহুদূর গত
হয়েছে। তাঁদের স্থান এখন মিষ্টি ক্যান্ডির



হুদনোবীর পথে

ফার্সিলের কামরায়। সম্প্রতি ভারতের এক সর্বজনপ্রিয় জননায়ক না কি বলছিলেন যে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকলে হবে 'Stagnation of Culture'—অগ্রগতির অপমৃত্যু! এই সব দেখে-শুনে দিশেহারা হয়ে যাই। উল্লসের মতো ছোট্ট বেড়াই হিমালয়ের পথে পথে। সম্প্রতি নিলামে ওঠবার আগে শেষবারের মতো দেখে নিই। অনুভব করে নিই কঠোর তীতিফায় পাওয়া পরম সাধনার বস্তু। দ্রুত অপসারণ্য পৌরাণিক যুগের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দোর করলে চলবে না। এখনও বে দেখার ক্ষমতা বাকী।

■ ■ ■

ঘন ঘন হর্নের ডাকে চমক ভাঙে। ভাড়াভাড়া মোটরবাসে উঠে নিজের জায়গা-টিতে বসি। গেট খুলেছে। এবারে লম্বা পাড়ি বাইশ মাইল একটানা পথ দেড় ঘণ্টার চলে মধ্যাহ্নে 'নাগনী'তে এসে দম নেয় বেচারা মোটর গাড়ির ইঞ্জিনগুলো। উন্নত পাহাড়গুলোর বৃক্কের মধ্যে স্বল্প-পরিসর সবুজ উপত্যকা। বাসাউপোর কাছে প্রকাণ্ড বরগার ধারা। ধানের ক্ষেত-গুলোর পাশ দিয়ে ক্যানালের মতো টেনে নেওয়া হয়েছে। পথের দু-পাশে কয়েকটা

চারের দোকান। ছোলালেশ আয় পকোড়ার সঙ্গে গরম চা—পিস্তরকার পকে যথেষ্ট। পনের মিনিট বিরতির পর আবার যাত্রা শুরুর। এবারে শব্দই চড়াই। যুগ্মে যুগ্মে পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী পথ। বিকট গর্জন করে ডিজেল ইঞ্জিনের গাড়িগুলো চলেছে খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। বাসের মধ্যে তার প্রতিব্রজাও শুরুর হয়ে গেছে। মরুভূমির বাসিন্দারা পাহাড়ের ঘুরনিপথ আর ডিজেলের গম্ব বরদাস্ত করতে পারে না। বেশি কাতর হয় বেচারী মেয়েরা। পাশের সিটে মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে বমি করছিল। তার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে সন্তপণে জানালার ধারে হাওয়ায় বসিয়ে দিই। আর একটা টক লজেন্সও দিই চুষতে। সকাল থেকেই 'গঙ্গা-বন্দনা মাইক' জরদহনীতে আমাদের গাড়িটা বেশ সরগরম ছিল। এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী পাণ্ডাজীর ছাড়িদার। এখন মাথা ঘুরনি আর বমির ঠেলায় জর-গান স্তিমিত প্রায়। ভক্তরা কিঞ্চিৎ কাহিল হয়ে পড়েছেন। সম্পূর্ণ নিবিচার আমাদের ড্রাইভারটি। গাড়িতে কে উঠছে, কে নামছে দুকপাত নেই। কলারর সুই দেওয়া হলো কি না। কে কার পুটুলির ওপর বসেছে অথবা বাসের দোলানিতে ঘাড়ের ওপরে পড়ছে, বমি করে ভাসিয়ে দিচ্ছে, ড্রাইভারজী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। তার একমাত্র চিন্তা 'গেট-ছুট' জায়গা। তুমি মরো বাঁচো ক্ষতি নেই। নির্দিষ্ট সময়ে এক ঘাঁটি থেকে পরবর্তী ঘাঁটি পর্যন্ত বেতে হবে। মোটা মারওয়াড়ী সবে লোটা হাতে পাথরের আড়ালে ঢুকেছে। অমনি গেট খোলার বাঁশী বেজে উঠলো। মৃতকচ্ছ শেঠজী উর্ধ্ববাসে ছুটছেন বাসের পেছনে। সময় জলপ্রোত আর গেটের মোটর গাড়ি কারও অপেক্ষায় থাকে না।

নাগনী থেকে ছয় মাইল চড়াইপথে 'চম্বা'তে হাজির হলুম বেলা দেড়টার। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এস্থানের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট (৪৪৫০ ফিট)। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে নিচে এতদিন পচে মরিছিলুম। হিমালয়ের স্নেহস্পর্শে দেহ-মন যেন জড়িয়ে গেল। ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট অঞ্চল চম্বা। দেহাতী নাম চামুয়া। এখান থেকে অসুন্দরী পাহাড়ে যাবার হাঁটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। এগার মাইল দূরে প্রসিদ্ধ কানা-তাল পিকনিক করবার সুন্দর স্থান। টিহরী-গাড়োয়ালের 'চম্বা'তে দাঁড়িয়ে হিমাচল প্রদেশের 'চম্বা'র কথা মনে পড়ে যায়। ইরাবতী নদীর তীরে রূপমতী চম্বা সহর। হিমালয়ের প্রাচীন (ত্রিগত) হিন্দু রাজ্যের রাজধানী চম্বা। প্রকৃতির

খেয়ালে রূক্ষপ্রোত ইরাবতীর জল ফাঁরিয়ে আনবার তপস্যায় আত্মাহুতি দিলেন রাজ-পুত্রী চম্বাবতী। নদীতে আবার বান এলো। ফলে, ফুলে আর ফসলে দেশ হেসে উঠলো। কৃতজ্ঞ রাজাবাসী তাই অমর করে রাখলেন প্রিয় রাজকন্যাকে।

গাড়োয়ালের সর্বত্র পথের ধারের ঘাঁটি-গুলোতে গাড়িকয়েক চারের দোকান আর এক-আধটা Departmental Store-এর দেশীয় সংকরণ। অর্থাৎ ছোট্ট ঢালার নিচে মুদিখানা-কাম-মশলা-কাম কাপড়-চোপড় ইত্যাদির 'হরেকরকম্বা'। আর আছে একটি পুলিশ চৌকী। জমাদারজী এ-অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ড্রাইভারজীর গেট-এর মালিক। এককথায় এলাকার মধ্যে একজন অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য লোক। ইংরেজ আমলে 'লালপাগড়ী' বলতে একটা ভাঁটির চিহ্নই শব্দ মনে জাগে। এযুগের উত্তরপ্রদেশীয় পুলিশ বহুদিনের বন্দমূল ধারণাটা পাল্টে দেয় তাদের প্রাতিপূর্ণ সর্বিনয় ব্যবহারে। গাড়ি থামতেই ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে জমাদারজীর পাশে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে চারের ফরমাস করে। এতকণে মিশরের বমি প্রাণ ফিরে পায় বেন। মুখে ফোটে বুলি আর মৃদু হাসি। নিচের খবর এনে দেয় ড্রাইভার। জমাদারজী জানতে চান লক্ষ্য-দিল্লীর সমাচার। ডিজেল তেলের অভাব মেটতে সচেতা কৃপালনীর প্রয়াস। তীর্থযাত্রীরা ভিড় করে অপেক্ষা করছে হৃষীকেশ আর কোটম্বারে। বাস চলাচল ব্যাহত হওয়ার রূদ্রপ্রসঙ্গ, শ্রীনগর আর গুপ্তকাশীতে অবর্ণনীয় কটে পড়েছেন যাত্রীরা। এ বছরে পথ-ঘাট মেরামতী কাজ বিশেষ ত্বরান্বিত, মিলিটারীর কল্যাণে। দেশে এবার ফসল ভালো হয় নি। চারের গেলাস হাতে নিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনি। সেপাইজী জানতে চান কলকাতার খবর। পাকিস্তান নাকি বাংলা মূল্যকে হামলা করছে? চীনাদের খবর কি? কথাবার্তা ক্রমে পৌছয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যমানে জমাদারজীর দৃষ্টি করে বলেন দূরপ্রান্তের এই পাহাড়মূল্যকেও নিজ-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আগুন। আর সেই সঙ্গে লোকের চাহিদাও যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। জাতীয় সরকার দেশে শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টায় তৎপর। দূরগম পাহাড়ী গ্রামাঞ্চলেও স্কুল স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ছেলেরা বুদ্ধি শিখেছে শব্দ বোম্বাই-মার্কা গান। বিয়ে করতে চলেছে হাওয়াই সার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট পরে। সেই সঙ্গে সস্তা সিগারেট 'ত' আছেই। আট শ বছরের বদম এবারে ভেঙেছে।

【সমাপ্ত】

নতুন!
'ইকনমি প্যাকে'
টিনোপাল

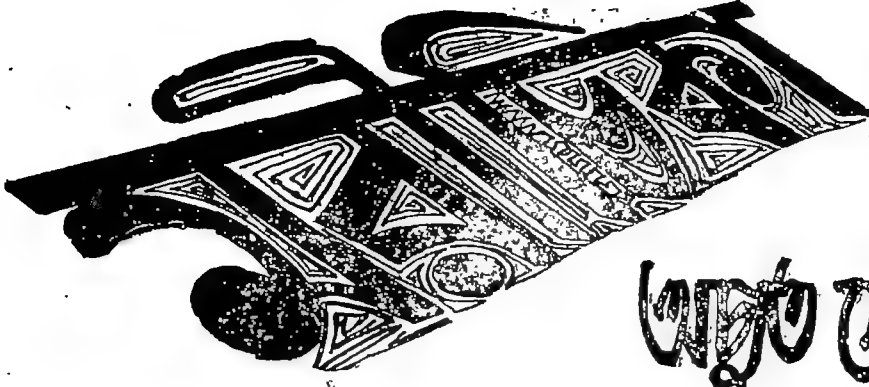


ভাড়াভাড়া 'এক বালতির এক প্যাকেট'
এবং 'রেগুলার প্যাক'

সর্বাধিক গুণবতার জন্য টিনোপাল

সুন্দর গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

৪৪১ ৩১/৬৭ ৪৪৮



আজুত গোপাল

গাড়ি চলছে। এক দুই তিন চার। পাঁচ ছয়। কখনও তিনটে চাকা দেখা যাচ্ছে, কখনও দুটো। যদিও আমরা জানি, প্রত্যেকটি গাড়ির চারটে করে চাকা আছে। জানি না, অনুমান করি। প্রত্যেকটা গাড়ি কেউ কারখানায় কারখানায় গিয়ে দেখে আসি নি।

আকাশে তিন-চার খণ্ড সাদা মেঘ। অথবা বেশি। অথবা কম। মেঘগুলো কানার ভাঙা ভাঙা। মানচিত্রের মত। নীলের উপর কেউ অসতর্কভাবে সাদা রঙ তুলি দিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

গাড়িগুলো এগিয়ে চলছে, রাস্তাটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথবা, গাড়িগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তাটা চুপি চুপি নিঃশব্দে পিছিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িগুলো চলছে বেগে, প্রচণ্ড বেগে। প্রতিবেগের দাপটে কাঁপছে ধরনের কত্রে। পরস্পরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলছে গাড়ি-গুলো। অথবা কোন অদৃশ্য বস্তুকে। যাকে আমরা দেখি নি, জ্ঞানি না। যার কোন অস্তিত্ব নেই, অথচ তবু আছে। অথবা, গাড়িগুলোকেই কেউ তাড়িয়ে নিচ্ছে বেড়াচ্ছে। তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে চলছে গাড়িগুলো।

একটি গাড়ির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল শঙ্কু। দূর থেকে আসছে গাড়িটা। সামনের দুটো চাকা দেখা যাচ্ছে। আর ইঞ্জিনটা। গাড়িটার পিছনের অংশ, এবং আর একটি চাকার আভাস-মাত্র। গাড়িটা কাছে এল, অনেক কাছে।। কী চমৎকার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ! যেন কোকিলের ডানা। অথবা কাছিমের পিঠ। পিছনের দীর্ঘ প্রসারিত বনেটটা যেন ময়ূরের লেজ। এখন তিনটে চাকা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘুরছে; ঘুরছে বলেই মাঝখানের সাদা গোল দাগটা একটু একটু নড়ছে। গাড়ির চাকা প্রতি মূহুর্তের প্রতিটি ভ্রমণে মাটির সঙ্গে লেগে লেগে চলছে একসাথে নড়ছে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে ঢাকাগুলো। এক সেকেন্ডের জন্য এক শব্দ

ভাগের এক ভাগা সমস্তের জন্য হয়তো সমস্ত গাড়িটা মাটি ছেড়ে শূন্যে অবস্থান করে। ঢাকাগুলো ভয়ে আড়চোখে ভয়। যদি আর মাটি ফিরে না পায় এই ভয়ে।

যদিও জোরে চলছে গাড়িটা। কাউকে তাড়িয়ে নিবে চলছে। অথবা, কেউ তাড়া করছে পিছন থেকে। গতিবেগে গাড়িটা ধরনের করে কাঁপছে। ভিতরের যাত্রীরা ভয়ে জড়োসড়ো। যদি এত কাঁপুনির ফলে গাড়িটার অংশগুলো পরস্পরের বাঁধন ভেঙে আলগা হয়ে যায়! যদি রাস্তার উপর ছাড়িয়ে পড়ে ছরখান হয়ে! আর ইঞ্জিনটা পবন অবস্থার ওদের পিছনে ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে যায়। যাত্রীদের চেহারায় কিম্বা ওরা যে ভয় পেয়েছে তাব চিহ্ন নেই। তিনজন যাত্রী। পেছনের সীটে দু'জন, সামনে একজন। পেছনের ছেলের টির মাথার একাংশ ও মেয়েটির মূর্ধ্ব প্রোফাইল দেখা যাচ্ছে। সামনের লোকটি দুইভারেক পাশ দিয়ে মৃদু মৃদুরে নিঃশব্দে পেছনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পেছনের দু'জনকে ও কখনো চোখের আড়াল করবে না। পাছে মূহুর্তের অমনোযোগিতায় কোন অঘটন ঘটে! যেন ওর চোখের সামনে অঘটন ঘটতে পারে না।

গাড়িটা এখন দূরে সরে যাচ্ছে। জোরে, আরও জোরে। আসলে গাড়ির মধ্যে যারা বসে আছে তারা মানুস নয়। ব্যতাসের গায়ের কতকগুলি এলোমেলো রেখা। একটা মিলিয়ে বাবে বেখাগলি। গেলও। চাকরির যার রেলওয়ে ওভারব্রিজের কাছে এসে গাড়িটা বাক নিল। নিতেই হবে। সোজা বাসভায়া ওভারব্রিজের ওঠাব উপায় নেই। সেকালের নবাবদের সামনে যেমন কুর্নিশ না কবে যাওয়ার উপায় ছিল না। গাড়িটা ওভারব্রিজ ধরে উপরের দিকে উঠছে। উঠতে উঠতে হঠাৎ হাবিয়ে গেল। তলিয়ে গেল কোন অতলানত খাদে। সেইবকমই মনে হল; কিন্তু আসলে ওখানে কোন খাদ নেই।

সেই অকালশঃ শঙ্কু কক্ষার দিকে

তাকাল। আড়চোখে। বৃষ্টিতে পেরে কক্ষা শঙ্কুর দিকে তাকালো। আড়চোখে।

দাঁড়িয়ে পড়লে যে? বাড়ি বেতে হবে না?

যেতে হবে কি না জানি না। তবে যাওয়া উচিত।

উচিত? উচিত কেন?

সমাজের লোকেরা তাই প্রত্যাশা করো।

সূর্যের আলোর বৃষ্টি পড়ছে সাবায় গিয়ে। শরীরের কোন কোন অংশে কুট কুট করছে—যে সব জায়গায় সূর্যের বাসিন্দা ক্রমশঃ করে অনুপ্রবেশ করতে গিয়েছে। আমার তলাব পিঠে রেখে আমের একটি ক্ষীণ রেখা পাহাড়ের গায়ের ক্ষীণ স্রোত-স্বিনীর মত নিজের দিকে নেমে আসছে। চোখ দিয়ে না দেখে, হাত দিয়ে না ছুঁয়ে শঙ্কু বৃষ্টিতে পারছে আমার রেখাটি কতদূর অবধি নেমে এসেছে। কিন্তু রেখাটি যে কতবার কত জায়গায় বাক নিয়েছে গুরু তা জানে না, জানতে পারবে না কোনদিন। পিঠের দিকে ঘাম বেশি হচ্ছে; সূর্যের নিশ্চয় কাঁধের উপর সূর্যের বাসিন্দা বেশি করে পড়ছে।

সূর্যেরা রশ্মি ছাড়াও আবও কিছু রশ্মি এখন কাঁধের উপর পড়ছে। কক্ষা নিশ্চয় এখন কাঁধের উপর যেখানদায় বেশি সমস্ত কুঁজো হয়ে পড়াশুনা করার দরুন একটা হাড় উচু হয়ে রয়েছে স্বেদানটর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পিঠের উপবটর অর্ধাৎ মানচিত্রের যে-দিকটাকে উত্তর দিব বলে ঠিক চিহ্নে রূপ দিয়ে ব্যাটা তাল অংশটা যেখানে বেমালুমভাবে চামড়ার সঙ্গে মিশেছে তাব নিচে, ঐ হাড়টা ভাল দেখায় না। কিন্তু কক্ষা নিশ্চয় হাড়টাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

অন্ত তাড়াতাড়ি হাঁটছে কেন শঙ্কু? হাঁপিয়ে যাচ্ছে যে?

(মনে মনে) গলা ভো নব, যেন মিছরির পানা। একটু আগে ঐ গলাটাই মনে হাচ্ছিল ছবিব ফলা। (জোরে) ভাল লাগছে না। বারিড ফিরতে হবে।

একটু দাঁড়িয়ে যান মশাই। আমিও বাড়ি ফিরব।

শব্দু দাঁড়াল। শব্দুকে দাঁড়াতেই হত। কতকণ সে একটা মেয়েকে শির-দাঁড়ার উঁচু হাড়টা দেখার সুযোগ দিতে পারে?

কম্বা এগিয়ে এসে তার ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতে নিল। খুব আলগোছে। মশাই কেন অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন তা জানি।

(মনে মনে) ছাই জ্ঞান। (জোরে) কেন?

একটু স্পষ্ট কথা বলছিলাম, তাই ছেলের মেজাজ দেখানো হচ্ছে। বুদ্ধি না বুদ্ধি ভেবেছ

কিছু বোঝ নি। আসল কথা, বাড়ি যেতে হবে, বস্তু রোদ।

বাড়ি! বাড়ি! বাড়ি! যদি বাড়িতে গিয়ে দেখে সেখানে তোমার বাড়ি নেই, তা হলে কী হবে!

আমার বাড়ি আমার বাড়িতে থাকবে না?

না। কী করে থাকবে?—কম্বা চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল যে খুব কাছাকাছি কেউ নেই।—তোমার বাড়ি যে আমার মধ্যে। শব্দু, বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি।

শব্দুর সারা মুখে একটা শাদা শব্দ-হানি হাসি ছাড়িয়ে পড়ল। নিজের মুখের এই কতকগুলো বিশেষ সময়ের জন্য রিজার্ভ করা হাসিটা শব্দু চিনতে পারল। হাসিটা না হাসলে ভাল ছিল। শব্দুর হাত হঠাৎ কম্বার হাতখানা জোরে চেপে ধরল।

কম্বা মৃদু বিকৃত করল।—লাগছে।

শব্দু ভয় পেয়ে হাতের মাংসপেশীতে একটু শিথিলতা আনল। কম্বার চোখের নিচে চাপা হাসি। সুযোগ পেয়ে কটকা টান মেরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। হাত-খানা বাতাসে ঝাঁকিতে লাগল। যেন কত না ব্যথা লেগেছে!

বোকা ছেলে! এটা রাস্তা না।

তাতে কী হয়েছে! নিছক হাত ধরার মধ্যে কি কোন অসভ্যতা আছে?

না। তুমি আমার হাত ধরবে না শব্দু।

তুমি যে আমার হাত ধরেছিলে একটু আগে?

সুতরাং ওটা আমার উপর তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন তোমার হাত ধরব। তোমার যত তাঁর ইচ্ছাই হোক কখনো আমার হাত ধরবে না।

শব্দুর মুখের মাংসপেশীগুলোতে জ্বালা করছে। তখন সেই শাদা হাসিটা হাসার জন্য নিশ্চয়। শাদা হাসি তার

সয় না। কম্বা বুদ্ধিতে পেরেছে সে খুব শস্তা। ঐ শাদা হাসিটার জন্য।

কলকাতার শরহতলীর রাস্তাও বিগ্রাম করে। গ্রীষ্মকালের দুপুরের নির্মেষ নীলিমার বর্ষণে যখন পীচ গলে। ফুটপাথে এখন বেশি ভিড় নেই। এখন একজন একজন কবে লোক গোণা যায়। শব্দু অবশ্য গুণবে না, কারণ সে গুণতে জানে।

বাস্তার গলা পীচের উপর দিয়ে একটিমাত্র গাড়ি টারারের আলপনা-বেথা সৃষ্টি কবে ওভারব্রীজের ঢাল বেয়ে উঠছে। ধীর মন্থর গতিতে। পলাতক, অথবা পরিত্যক্ত।

.....কম্বা পলাতক। শব্দু পরিত্যক্ত। কম্বা এখন শব্দুর কাছ থেকে ন' শো নিরানন্দই মাইল (ইংলন্ডীয় মাপে পুরো এক ফুট) দূর দিয়ে চলেছে। চেষ্টা করলে যে ছোঁয়া যায় না এমন না। যদি হাত দুটোকে দেহ থেকে এক ফুট দূর অবধি বিস্তৃত করে হাঁটার প্রচলন থাকত, অথবা যদি দূর পায়ের মাঝখানে দূর ফুটের ব্যবধান রেখে হাঁটলে দোষের না হত, তবে অহংকারী মেয়েটা নিজেকে এত-খানি-নিরাপদ বলে ভাবতে পারত না। শিশুরা অনায়াসে ওরকম ভঙ্গি করে হাঁটতে পারে। বড়রা পারে না। ওরকম ভঙ্গি করে হাঁটলে কারও কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু হাঁটা বারশ। কোর্টে কেস উঠলে হাকিম অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেবেন কেসটা। শব্দু তা জানে; তবু শব্দু ওরকম-ভঙ্গি করে হাঁটতে পারবে না।

শব্দু, চুপ করে থেক না। চুপ করে থাকাটা তোমার একটা বদ স্বভাব।

তাও ভাল। বেশি কথা বললে বেশি বেফাঁস কথা বলার আশঙ্কা থাকে।

ভয় করো না লক্ষ্মীটি। তুমি যদি একটামাত্র কথা বল তো সেই একটিই বেফাঁস কথা হবে। সুতরাং ভয় করে কোন লাভ নেই।

ধু ধু আকাশের মরুভূমি দিয়ে একটি-মাত্র পাখী উড়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে না শব্দু। আমি মাটিতে থাকি।

নিষেধ করছ?—শব্দু এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কম্বার দিকে তাকালো। কোথায় কম্বা? শব্দু শ্যাম্পু দিয়ে ফোলালো চুলের খোঁপার আধেকটা দেখা যাচ্ছে। আধখানা চোখ, কপালের চার ভাগের এক ভাগ, আর চোয়ালের উঁচু জায়গাটা। শাড়ির আঁচলের কয়েকটা ভাঁজ বাতাসে উড়ছে। র' কটনের শাড়ি। র' কটন কাকে বলে শব্দু জানে না। এই কটা উপাদানের যোগফলকে কি একটি পুরো মেয়েমনুষ্য কল্পনা করতে হবে?

শব্দু, আজকের সকালটা নষ্ট হল।।

তোমার ধারণা।

নষ্ট হল বৈকি! শব্দু তো গল্প করে কাটিয়ে দিলে!

তবে নষ্ট হল বলছ কেন?

ডেপো ছেলে! নষ্ট না বলে নষ্টমী বললে ঠিক হতো বোধ করি? শোনো, আবার কবে দেখা হচ্ছে?

যে বিখ্যাত নারী সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন।

আর শব্দু জানে! ঠাট্টা নয়। আজ তোমার সেই আবৃত্তিটা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। শিখিয়েছে?

বলোছলে?

জানি তো—শেষ পর্যন্ত তুমি সব দোষ আমার উপরই চাপাবে। কিন্তু ঐ জনাই তোমাকে আসতে বলোছিলাম—মনে আছে? কান্ট্রাপাটগনে আমাকে আবৃত্তি করতেই হবে। সুতরাং কাল তোমাকে আবার আনতে হবে। লক্ষ্মীটি!

কিন্তু কখন? কাল আপন আছে। দেড়টার সময়। আপন থেকে পালিয়ে। কিংবা ছুটির পর। অমান আসবার পথে হাফ্ পাউন্ড ম্যার্ল রঙের উল নিয়ে এসো। বিলাতি। পরশা পরে দিয়ে দোব। পেয়েই হোয়েনের।

উল দিয়ে কী হবে? এহ গরমে?

দিদির মেয়ের জন্য একটা সোরেটার বানাব। বানাতে বানাতে শীত এসে যাবে।

আকাশের ধু ধু মরুভূমি দিয়ে একটি পাখী ফিরে আসছে। হয়তো সেই পাখী-টাই ফিরছে। হয়তো আর কোন পাখী। কিন্তু সেই মেঘের খন্ডগুলো কোথায় গেল?

বছর তিনেক ধরে শব্দুই তুমি আমাকে একটা সোরেটার বানিয়ে দিচ্ছ।

হবে হবে। তোমারাই তো বল কলকাতার শীতে সোরেটার লাগে না। আর শোনো, পরশু সন্ধ্যার শোর দুখানা টিকিট কেটে এনো। এলিট সিনেমার।

সঙ্গে কে যাবে? আমি?

তোমার সঙ্গে রাত করে সিনেমা দেখতে গেলাম আর কি! কেউ যদি দেখে ফেলে? আমি আর মা যাব।—

কম্বার গালের চড়াইটা আরও প্রসারিত হয়েছে, উৎরাইটা আরও খায়ে নেমেছে। ফলে ভুরু ভিজে ঠোঁটের পাশে একটা ভাঁজ ধরেছে। মুখের এই বিকৃতির নাম হাসি। অর্থাৎ শব্দুকে ধরে নিতে হবে, কম্বা ঠাট্টাচ্ছে কথটা বলছে।

পর পর তিনখানা দোতলা বাস এদিক পানে আসছে। বাসগুলিতে তেমন ভিড় নেই। শব্দু শানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাসগুলির দিকে। একটা বাসের কটা জানলা গুণতে চেষ্টা করল।



মেঘের ছোটবেলা থেকেই
রকের বস নিতে শেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের বহু পরিচর্যা তাঁর এই অপূর্ণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম কদমার্ধনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের-ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

42/44/45

পাদ্যাত্মিক বসুমতী

পাবল না। মনে হল, কোন কোন জানলা দ্বার করে গোণা হয়ে যাচ্ছে।

পর পর তিনটে বাস প্রচণ্ডরকমের কাঁচ-কোঁচ করে ব্রেকের শব্দ করে ওপারের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। নিশ্চয় ওখানটার বাস স্টপ আছে।

শঙ্কু ঘুরে দাঁড়াল টার্ন রাইট করে। কক্ষাও একটু ঘুরল ওর দিকে। কক্ষার মূর্ধের তিন-চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে। মেয়েলী মূর্ধ বোদে লাল হয়ে উঠেছে।

একটা পল্টাপলি কথা জিজ্ঞেস করব কক্ষা। তুমি আমাকে ভালবাস?

রাস্তার মাঝখানে নাটক শব্দ করলে শঙ্কু?—কক্ষা উদ্ভাসভাবে ফুটপাথের উত্তর দিকে তাকাল—বাসি। কিন্তু তোমরা পদব্রজে ভুলে যাও ভালবাসা অনেক রকমের আছে।

সেই তিনটে দৈত্যাকার বাস আবার এক এক করে স্টার্ট নিল। নীল ঘোঁরা ছাড়ল অনেকখানি করে—নীল ঘোঁরা গায়ে লাগলে নাকি ক্যান্সার হয়। ইঞ্জিনের ঘর-ঘর শব্দটা হঠাৎ স্কেল বদলিয়ে উদারিতে চলে গেল। ড্রাইভারের মূর্ধে কতকগুলি নতুন রেখা ফুটে উঠল; দৃষ্টি দিয়ে প্রকাশ্যে স্টিয়ারিংটো জোরে ঘোঁরাতে গিয়ে শরীরটা একদিকে একটু বেকে গেল। ধামধাম সময় গাড়িটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করছিল; রওয়ানা হওয়ার সময় গাড়িটা ধীরে নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হল।

ধীর, প্রায় শব্দহীন কণ্ঠে শঙ্কু বলল : কোন ধরণের ভালবাসার কথা বলছি তা তুমি জান কক্ষা।

শঙ্কু করে ধানিকটা নীল ঘোঁরার ছাঁচ ছিটিয়ে দিয়ে কক্ষা বলল : তবে অপেক্ষা কর। আমার অনেক পদব্রজে-বন্ধ আছে। তবে তোমার মন খোলা। যে আমাকে সবচেঁের বেশি দেবে আমি তার।

একটা গাড়ি ওভারটেক দিয়ে নেমে এসে গোল চব্বরটা ঘুরে আবার ফিরে গেল। কোন তাড়াহুড়ো নেই গাড়িটার। ড্রাইভার বেশ জোরের সঙ্গে স্টিয়ারিংটোকে ক্রমাগত একদিকে চাপতে লাগল, আর গাড়িটা ধ্বলল।

ধীরে নিঃশব্দ গতিতে শঙ্কু এবার হাঁটতে শুরু করল। দৃষ্টিপাশের দুটি অলুন্ড হাত দেহের সঙ্গে তোগে-রইল; তারা বুঝতে পারল না তাদের এখন ঘাড়ের পেছলোম হওয়া উচিত কি না।

কক্ষা, তোমার ভালবাসা কুড়ির ফুল হয়ে ওঠা নয়। অথবা নয় পাখীর হঠাৎ গান গেয়ে ওঠা। অথবা নয় শরৎকালের হঠাৎ বৃষ্টি নামা।

হঠাৎ-কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না। এই পৃথিবীটা পরিকল্পিত, চাতকের অসহায় প্রতীক্ষা নয়। আবার হাঁটছে কেন শঙ্কু? দাঁড়ো। এই তো বাস স্টপ।

আর বাসে উঠব না। এই তো কাছেই আমার বাড়ি।

আমাকে একা বাসে যেতে হবে?

সেই শাদা মেঘের খণ্ডগুলিকে শঙ্কু আবার দেখতে পেয়েছে। অনেক দূরে, প্রায় দিগন্তের কাছাকাছি। সেই মেঘ খণ্ডগুলিই নিশ্চয়। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কারও ভয়ে নয়, কাউকে এড়ানোর জন্য নয়।

ক্ষতি কি! এখন বাসে বেশি ভিড় হবে না।

বাসে চলতে আমার ভাল লাগে না। আমি কেন জনতার একজন হবে? আমার কেন স্বাভাব্য থাকবে না? একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও না শঙ্কু। ভাড়াটাও অবশ্য তোমাকেই দিয়ে দিতে হবে।

শঙ্কু দাঁড়ালো। কক্ষা এখন প্রায় গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অত চূপচাপ হয়ে গেলে কেন শঙ্কু? তোমরা আজকালকার ছেলেরা কেবল কামনা করতে জান। পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে কেন চেষ্টা কর না বল তুমি?

একটা বাস আসছে। আগে আগে একটা ছোট গাড়ি আসছে। ডিন-চারটি লোক কোথেকে কেন ছুটে এল বাস ধরতে। পাস থেকে একটা ধাক্কা লাগল শঙ্কুর গায়ে। অথবা ধাক্কা নয়, শব্দ গায়ের সঙ্গে গায়ের স্পর্শ। হয়তো শঙ্কু চেষ্টা করলে টাল সামলিয়ে নিতে পারত। কিন্তু শঙ্কুর দেহ অনেকখানি কাত হয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগল কক্ষার দেহেতে। হয়তো শঙ্কু হাত দিয়ে বেড়া দিয়ে কক্ষাকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু শঙ্কু কক্ষার গায়ে ধাক্কা খেয়ে সামলিয়ে নিল। আর কক্ষা পড়ে গেল প্রথমে ফুটপাথ থেকে নিচে। রাস্তার উপর একটা গা পড়ল। তারপর দুটো পা-ই-স্বী করে অনেকখানি গিছলিয়ে গেল; তারপর পা-জোড়া আকাশে উঠে গেল আর দেহটা বঁকা হয়ে বয়ে পড়ল গ্রন্থন নরম পীচের উপর। তার ঠিক পিছনে ছোট গাড়িটা কাঁচ কোঁচ শব্দ করে স্লেক কক্ষা।

কক্ষার চির-প্রস্তুত অশ্রুজল গাড়িরে এনে স্বামীর সঙ্গে মিশল।

এলোমেলো শব্দ। বাতাসের কতকগুলি এলোপাখারি ঢেউ।

গেল! গেল!

ধরুন! ধরুন না মশাই।

ছোট গাড়িটা থেকে একটা মোটা ঘি-মাস দিয়ে পোষা প্রকাশ্যে-শরীরী অস্তিত্ব বেরিয়ে এসে শঙ্কুর মূর্ধোমুখি দাঁড়াল।

মশাই কন্ডিন ধরে এ-সব কায়দা শিখেছেন?

জনতার যা করা উচিত জনতা তাই কবেছে। গাণিতিক ব্যাপার! এতে বিশ্বাসের কিছু নেই, শঙ্কুর উচিত আত্মরক্ষার জন্য

চেষ্টা করা। কিন্তু আলো আর বাতাসের হাজার হাজার রেখার এই-যে-বিশৃঙ্খল ছট, এ কী শঙ্কুর মনের বাইরে ঘটেছে, না মনের মধ্যে?

মূর্ধতে শাড়ি সামলিয়ে নিয়ে কক্ষা উঠে এগিয়ে এসে শঙ্কুর গালে চড় মারল। বিশ্বাস কর, কক্ষা, আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দেই নি।

তা' তুমি পারো। তুমি সব পারো। বাসটা এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লোকজন ছুটোছুটি করে বাসে গিয়ে উঠল। মোটা শরীরী অস্তিত্বটা ছোট গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল : দে সিম টু নো ইচ্ছা আদার।

শাদা মেঘ খণ্ডগুলিকে কক্ষা দেখতে পায় নি। শঙ্কু দেখেছে। শঙ্কু আবার দেখল। ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ে ভয়ে। কাউকে এড়ানোর জন্য নয়। কিন্তু শঙ্কু ওদের একজন নয়।

উইল্ ইউ প্রীজ গীড্ হার এ লিফ্ট? দূরে নয়। গাড়িরাহাট ছাড়িয়ে। ডোভার লেনে ওদের বাড়ি।—শঙ্কু বলল মোটা ভদ্রলোকের পিঠের সিলেক্ট পাঞ্জাবির মেঘের দিকে তাকিয়ে।

অব্ কোর্স। আসুন। আসুন মিস্—।

কক্ষা এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। পিছনের দিকে। ভদ্রলোক দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

কক্ষা ভিতরে বসল। শঙ্কু এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ছাদ ধরে ঈষৎ কঁজো হয়ে দাঁড়াল।

বিশেষ লাগে নি আমার, জানলে? রাগের মাথায় চড মেবোছি বলে রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি!

তোমাকে একটা কথা বলা দবকার কক্ষা। স্বাক্ষরটা আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলাম। কেন দিয়েছিলাম ঠিক জানি না।

যাঃ! মিছে কথা—কক্ষা শব্দ করে হাসল।—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। আর কালকে অবশ্য আসবে। যা চেয়েছিলে তা জোমমই। তোমারই থাকবে। কালকে এসো কিন্তু। টা টা।

কক্ষা জানল। দিয়ে বাইরে হাত বাড়াল। হাতটা নাড়ল। ছড়িয়ে দেওয়া আঙ্গুলগুলো নাড়ল। পার্শ্বের লম্বা ছড়ালো আঙ্গুলগুলো।

এক রাশ নীল ঘোঁরা ছেড়ে গাড়িটা রওয়ানা হল। নীল ঘোঁরা গায়ে লাগলে নাকি ক্যান্সার হয়। ধীরে প্রায় নিঃশব্দ গতিতে গাড়িটা রওয়ানা হল। হঠাৎ গতিটা বেড়ে গেল। অর্ধবৃত্তাকারে রাস্তাটা ঘুরে ওভারটেক উঠল। একটু পরে হঠাৎ হারিয়ে যাবে দৃষ্টির সামনে থেকে যদিও খাদে পড়বে না। খাদ নেই ওখানে। শঙ্কু দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল। আজ থেকে পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় (এসেম্বলিতে) ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতেই ঢাকার ছাত্ররা 'হরতাল' আহ্বান করেছেন। তাঁরা আরও ঘোষণা করেছেন যে, 'এসেম্বলি'-র অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই তাঁরা বিধানসভাকে 'ঘেরাও' করে 'বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা' করতে হবে এই দাবি তুলবেন। ছাত্রসমাজের মধ্যেও যেমন তোড়জোড় চলেছে, সরকার পক্ষও তাকে প্রতিরোধ করা বহু সমানেই তোড়জোড় করেছেন। 'এসেম্বলি হাউসের' চতুর্দিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং রাস্তায় অবাস্থিত লোকদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য শালকাঠের খুঁটির সাথে কাঁটাভারের ঘেরা রাস্তা-আটকানোর বেড়া (road-block) নিয়ে এসে বিভিন্ন দিকের রাস্তায় বসিয়েছেন ও বিরাট পুলিশবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন করেছেন। উভয় পক্ষই সমানে প্রস্তুত। ছাত্ররাও প্রস্তুত, তাঁদের সিমান্ত অনুরায়ী কাজ করে যেতে এবং সরকারপক্ষও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত, ছাত্রদের ঘোষিত 'ঘেরাও'-কে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ ও ব্যর্থ করতে। সাবা শহরে সকাল থেকেই একটা থমথমে ভাব দেখা দিয়েছে। বিকেল তিনটের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা। আমাদের বাসা 'এসেম্বলি হাউস' থেকে অনেকটা দূরে। আমরা থাকি বাংলা-বাজারের ডাল-পাট্টিতে, আর 'এসেম্বলি হাউস' হচ্ছে রমনার প্রায় শেষ প্রান্তে। দুপুরের মধ্যের দুবন্ধ অন্তত দুই মাইলের বেশি ছাড়া কম হবে না। কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আমি একটি রিক্সা নিয়ে বেলা দুটোর পরই এসেম্বলি হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাস্তায় কোথায়ও বাধা পাই নি। বাধা পাই এসেম্বলি হাউসের কছাকাছি গিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে। ছাত্ররা তখনও রাস্তায় নামেন নি। মেডিকেল কলেজের গেটে-র মধ্যেই অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের রিক্সায় যেতে দেখে তাঁরা আমাদের রিক্সা থেকে নামতে বলেন। আমরা সাথে সাথেই নেমে পড়ি। মামার উদ্যোগ করতেই পুলিশের ডি-আই-

জি জনাব ওবেদুল্লা সাহেব ছুটে এসে আমাদের বলেন,—“নামবেন না, স্যার। আপনারা চলে যান।” ধীরেনবাবু তার উত্তরে ওবেদুল্লা সাহেবের পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে বলেন—“Let us obey the boys first” (ছেলেদের হুকুমই আগে ভাবিল করি)। এর মধ্যে দুটি ছেলে এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বেশ অভ্যর্থনা সহকারেই আমাদের কলেজের প্রাঙ্গণে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দেখি শত শত ছাত্ররা অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় জমায়েত হয়ে আছেন। সেই উত্তেজিত ছাত্রের দলের মধ্যে থেকে একটি ছাত্র বলে ওঠেন—“এদের বেঁধে রাখ। বেঁধে দিও না।”

ধীরেনবাবু ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেন,—“My dear boys, you don't know, who am I. It was I—Dhiren Dutt—who first raised the claim of Bengali as one of our State-languages in the Pakistan Constituent Assembly. It was I who set the ball rolling. অর্থাৎ, আমাব প্রিয় ছেলেবা, তোমরা জান না যে আমি কে? আমি-ই সেই ধীরেন দত্ত 'বিনি' পাকিস্তানের সংবিধান-সংসদে সর্বপ্রথমে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বলে দাবি উত্থিষ্টি করেছিলাম। আমি-ধীরেন দত্ত-ই এই আন্দোলনের সূত্রপাত করি।”

এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছে, তখন একটি ছেলে আমার পাশে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি প্রভাস লাহিড়ী কি না। আমি তার উত্তরে 'হ্যাঁ', বলায় তিনি বলেন,—“আপনারা ফরিদপুর জেলায় সফরে গিয়ে যখন 'ভাঙ্গা'-র গিয়েছিলেন, তখন আমি ভাঙ্গা স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তাম এবং আপনাদের সাথে আমাদের কয়েকজনেব আলাপও হয়েছিল।” আমারও তখন মনে পড়ে যায় যে সেই কয়েকটি ছাত্রই আমাদের মালপত্র নিজেরাই বয়ে আমাদের লগে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সোঁদিন যাকে স্কুলের ছাত্র দেখেছিলেন, তিনি-ই এখন মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। এই ছাত্রটি আমার পরিচয় পাওয়ার পরে তার ছাত্র-বন্ধুদের বলেন,

“এঁদের দোষ কি? এঁরা তো হিংদু কংগ্রেসী এম-এল-এ। এঁদের কথা কি মুসলিম লীগ সরকার শোনে?” এই কথা শোনার পরই হাওয়া পাণ্টে যায়। তাঁরা আমাদের সঙ্গে তার পরে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারই করেন। আমরা দেখি, ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা যথেষ্টই আছে এবং সেই উত্তেজনাবও ন্যায়সঙ্গত কারণই আছে। একটি ছাত্র এগিয়ে এসে একটি কাঁদুনে গ্যাসের খালি খোল (empty shell) ধীরেনবাবুর হাতে দিয়ে বলেন,—“আপনাবা দেখছেন তো, আমরা আমাদের প্রাঙ্গণের বাইরে রাস্তায় যাই নি। আমরা আমাদের প্রাঙ্গণেই সভা কবছিলাম। তখন পুলিশবাহিনী আমাদের সীমানার ভেতনে ঢুকে কাঁদুনে গোলা ছুড়েছে। এই একটি খোল তার নমুনা হিসাবে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি এসেম্বলিতে গিয়ে এই তথ্যটা প্রকাশ করবেন।” ধীরেনবাবু বাজী হয়ে খোলাটি নেন। তখন ছাত্রবাই উদ্যোগী হয়ে আমাদের সদর ফটক দিয়ে বেতে না দিয়ে যেখানে পুলিশ-পাহারা নেই, একটি স্থান দিয়ে—কাঁটাভারের বেড়া ফাঁক করে ধরে বের করে দেন। সদর 'গেট' দিয়ে আমাদের যেতে দেন না, সম্ভবত এই কারণেই যে তাঁরা আশঙ্কা কবিয়েছিলেন যে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাসের ঐ খালি খোলাটি হয় তো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন মনে কবে। মৌদিক দিয়ে আমরা তারের বেড়া পাব হই, তার সামনের রাস্তাটা পার হলেই 'এসেম্বলি হাউস।' রাস্তা পার হই আমরা এসেম্বলি হাউসে গিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট আসন নিয়ে বসি। সময় হয়ে গিয়েছিল। স্পীকার এসে তাঁর আসনে বসেন। তারপরে যথারীতি কোরান 'তেলাও' ববাব পরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হয়। প্রশ্নোত্তরবে ঘণ্টা তখনও শেষ হয় নি। এমন সময় আমাদের দুইজন কংগ্রেসী বন্ধু—(১) শ্রীমদোবজ্ঞন ধর ও (২) শ্রীমদোবজ্ঞন বন্দোপাধ্যায় স্বড়ের বেগে বিধানসভার মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঢুকে যেন বোমার মত ফেটে পড়েন। মনোরঞ্জনবাবু বলেন,—“মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে পুলিশ গুলী চালিয়েছে এবং একটি ছাত্র নিহত হয়েছেন।” গোবিন্দবাবুও সেইটি

সমর্থন করে বলেন যে তারা উভয়েই নিহত ছাত্রটিকে দেখে এসেছেন। তদন্তের মধ্যমস্থানী জনাব নূরুল আমিন সাহেব অনেক কথাই তখন বলেছিলেন। আমার সব কথা মনে নেই; তবে তাঁর একটি কথাই-আজ্ঞেও যেন আমার কানে বাজে। সেই কথাটি হচ্ছে—“It is a phantastic story.” অর্থাৎ এটা একটি অবিশ্বাস্য গল্প। আমাদের দলের নেতা তখন বলেন যে নূরুল আমিন সাহেবকে তাঁর বিশ্বস্ত কোনও এসেম্বলির সদস্যকে পাঠিয়ে সঠিক সংবাদ আনতে বলেন। এই কথা বলার সাথে সাথেই শাসক মুসলিম লীগ দলেবই একটি বৃহৎ অংশ মোলানা আব্দুল রাসিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ফেটে পড়েন। তাঁরা বলেন,—“না, অন্য কেউ গিয়ে খবর আনবে না। নূরুল আমিন সাহেবকে স্বয়ং গিয়ে দেখে খবর নিয়ে আসতে হবে। তা’ না-হলে আমরা এসেম্বলির কাজ কিছুতেই চালাতে দেব না।” তখন এসেম্বলির বাইরে ছাত্রদের মধ্যে যে উত্তেজনা চলাছিল, সেই অবস্থায় নূরুল আমিন সাহেব খবর আনতে গেলে তাঁর আর ফিরে এসে সে খবর দেওয়ার সুযোগ মিলতো না। ছাত্ররা এসেম্বলির দিকে ‘লাউড-স্পীকারের’ চোঙার মধ্য করে কেবল বলে চলেছেন, পুলিশের গুলীতে কতজন ছাত্র নিহত হয়েছেন। সে স্বর ‘এসেম্বলি চেম্বারের’ বম্ব দরজার ভেতর দিকেও ভেসে আসছে। সে এক কী কবচ অচ্য উত্তেজনাকর যে অবস্থা আমাদের মধ্যেও দেখা দিবেছে, তা’ আর আজ এতদিন পরে ‘ভাষা প্রকাশ’ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়তো সেদিনেও আমার অক্ষম ভাষার দৈন্য, আমাদের মনের তৎকালীন অবস্থা সম্যক প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোত। এই-রূপ উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডা চলার পরে আমাদের নেতা বসন্তাবাদ ঘোষণা করেন যে, “বিরোধী দলের আমরা—কংগ্রেসীরা ঐ অবস্থার আর বিধানসভার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি না; সুতরাং আমরা এসেম্বলি থেকে বের হয়ে যাচ্ছি।” আমরা বের হয়ে যাই। ঐ দিনের এসেম্বলি থেকে বের হয়ে যাওয়ার মধ্যে আমরাই শব্দ একক দল ছিলাম না। আমরা ছিলাম পথ-প্রদর্শক। আমাদের দেখাদেখি তপশীল-জুস্ত ফেডারেশনের সদস্যরাও বের হন। মোলানা তর্কবাগীশের নেতৃত্বে মুসলিম লীগেরও একটি অংশ আরও কিছুটা সময় হৈ-হল্লা, চিৎকার ও তর্কাতর্কির পর বেরিয়ে যান। শাসক দল মুসলিম লীগের মধ্যে এই সবপ্রথম একটু ‘চিড়’ দেখা দেয়; অবশ্য ঐ চিড় তখনই একটা মুস্পট রূপ নিয়ে ফেটে ভেঙে পড়ে

না—আরও কিছুদিন পরে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় একেবারে ভেঙে ধসে পড়ে। যাক সে পরের কথা। এখন ঐ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিরোধী দলের সব সদস্যই ও মুসলিম লীগেবও একটা অংশ বের হয়ে গেলে বিধানসভার অধিবেশনও বন্ধ হয়ে যায়।

বের হওয়ার পরে শ্রীধীরেন দত্ত মহাশয় ও আমি মেডিকেল কলেজের ভেতরে বাই। ফটক (গেট) দিয়ে ঢুকেই অল্প কিছুটা গিবেই রাস্তার কাছেই ডানদিকে একখানি ছোট দো-চালা ঘর দেখি। ঘরটি চেউতোলা টিনের, কি খাপরার তা’ ঠিক মনে পড়ছে না; তবে তার মেজেটা সিমেন্ট করা বাঁধান ছিল। সেই ঘরের বারান্দার ওখানে বেশ কিছুটা ছাত্রদের ভিড় দেখে আমরাও সেদিকে এগিয়ে যাই। গিয়ে যে দৃশ্য দেখি, তা’ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। জীবনে মৃত্যু আমি অনেকই দেখেছি, হত্যাও কিছু কিছু দেখেছি কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ, বাঁদের হাতে জন-জীবনের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ন্যস্ত; যাঁরা নাগরিকদেরই আপনজন, পরাধীন দেশের পুলিশের মত আজ আর যাঁরা শব্দ বেতনভুক্ত হুকুমবরদার ও বিদেশীর চাকর নন, তাঁরা যে এমন নৃশংসভাবে নিরীহ ও নিরস্ত্র তরুণ নাগরিকদের বাসস্থানে ঢুকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে, তা’ কম্পনাও করতে পারি নি: কিন্তু তাই দেখতে হল। দেখলাম। ব্রিটিশ আমলে আরও একবার এই ঢাকাতেই ১৯৪২ সালে ঢাকা জেলের ভেতরে নিরস্ত্র কয়েদীদের পুলিশকে হত্যা করতে দেখেছিলাম—সেদিন তারা প্রাণভয়ে বেসব কয়েদী গাছের উপর উঠে লুকিয়ে ছিল, তাদের পাখী শিকার করার মত করে গুলী করে হত্যা করেছিল এবং তাদের গুলীতে আহত বা নিহত হয়ে যে কয়েদী গাছ থেকে মাটিতে পড়তো তার নিম্পন্দ দেহকে ঘিরে পুলিশের সৈন্য তান্ডব নৃত্যও দেখেছি কিন্তু সেদিনের পুলিশ ছিল বেতনভুক্ত বিদেশী সরকারের চাকর কিন্তু আজকের পুলিশ তো তা’ নয়। তারা আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই স্বজন, আমাদেরই একান্ত আপনজন। আমি ধারণা করেছিলাম, স্বাধীন দেশের পুলিশের কাজ হবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের মত জনসেবা কিন্তু সেদিনে যে অবস্থা দেখেলাম, তাতে আমার বহুদিনের সবচেয়ে পোষিত স্বাধীন দেশের পুলিশের কাজ সম্পর্কীয় ধারণা যে কত ভুল, তা’ বুঝেলাম। বুঝেলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু লোহ-কাঠামো যা বিদেশী ইংরেজ সরকার রেখে গিয়েছিলেন, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই

আমলাতন্ত্র আগেও যেমন চলছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাই চলছে।

যাক, বারান্দায় গিয়ে আমরা একটি তরুণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। ছেলোটর মাথার খুলির উপরের খানিকটা অংশ সম্পূর্ণভাবে উড়ে গিয়েছে। মাথার ভেতরের ‘বিশল’ সব ওখানেই গাড়িয়ে পড়েছে। মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহটির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে যে-কোনও ব্যক্তিই বলবেন যে ছেলোটিকে ওখানেই হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু সব সময়ই বেদনাদায়ক, হত্যা আরও বেদনাদায়ক ও ভয়ঙ্কর; কিন্তু সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা’ আমার কাছে অত্যন্ত বাঁধনস্বরূপে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছিল। আর দেখতে পারলেম না। ধীরেনবাবু ও আমি তারপরে যাই হাসপাতালের দোতলায়, যেখানে আরও সব আহত ছাত্ররা ছিলেন। প্রথমে যে ‘হল’ ঘরটিতে যাই, সেখানে ছিলেন প্রায় ২০।২২ জন গুরুতররূপে গুলীতে আহত ছাত্ররা। শুনেলাম, তাঁরাই নাকি কম আহত! সেই কম আহতদের (১) কাতর আত্নাদে ও চাঁৎকাবে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই ভারী বাতাসে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল; তাই সেখান থেকে পাশের অপর একটি ‘হল’ ঘরে যেখানে নাকি গুরুত্বপূর্ণভাবে আহতেরা ছিলেন যাই। সেখানেও দাঁড়াই ১৫।২০ জন আহত ছাত্র। একটিরও জ্ঞান নেই। চাঁৎকারও নেই। সকলকেই ‘অক্সিজেন’ দেওয়া হচ্ছে। দেখে আমার মনে হয়, ঐ আহতদের একজনও বোধ হয় বাঁচবেন না। কতজন যে বেঁচেছিলেন জানি না। সরকারী তথ্য প্রকাশ পেরেছিল যে সেইদিনের গুলী চালনায় নাকি মাত্র তিনজন মারা গিয়েছেন। সংবাদপত্রে দেখেছি মোট তেরজন। ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছি আরও অনেক বেশি। পুলিশ যখন গুলী করে জনসাধারণকে হত্যা করে, তখন তার সঠিক খবর আগেও কোনও দিন পাওয়া যায় নি; আজও তা’ জানা যায় না। সুতরাং সেদিনকার গুলী চালনায় কতজন মারা গিয়েছিলেন তা’ সঠিকভাবে আজ বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসপাতালে যখন আহতদের দেখেছিলাম তখন অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমি বোধ হয় কোনও বৃদ্ধকে গিয়ে সেখানকার হাসপাতালে গিয়েছি। সে দৃশ্য আর সহ্য করতে মোটেই পারিছিলাম না। ধীরেনবাবুকে তাই বলি,—চলুন, এখন আমরা বাসায় যাই। ধীরেনবাবুর অবস্থা তো আমার চাইতেও খারাপ। তিনি তো ঘোরতর অহিংস গান্ধী-কংগ্রেসের রাজনীতিই বরাবর করে এসেছেন; সুতরাং তিনি আমার

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

কথার বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হন এবং আমাদের বাসার পথে ছেঁটেই রওনা হই। সেইদিন গভীর রাতেই 'রেডিও'-তে ঘোষণা করা হয় যে এসেম্বলির অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। পরদিন সকালে 'রেডিও'-তে সেই সংবাদের সাথে সাথে আরও শুনি, মধ্যাহ্নেই নূরুল আমিন সাহেবের বিবৃতি। তিনি ঘোষণা করেছেন যে—ছাত্রদের ঐ ভাষা-আন্দোলনের উদ্যোক্তা আসলে নাকি ছাত্ররা ছিলেন না। তার প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'কম্যুনিষ্টরা' এসে এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুরা মুসলমানের লুণ্ঠি ও পারজামা পরে ছদ্মবেশ ধরে। তখনও বুঝি নি যে ঐ ঘোষণার পেছনের গুঢ় উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কে-ই বা নূরুল আমিন সাহেবের ঐ ঘোষণার পেছনে প্রেরণা ও প্ররোচনা জড়িগেয়েছিলেন। পরে অবশ্য তা' ভালভাবেই জেগেছি। যাক, ঘোষণা তো হল কিন্তু তার সমর্থনে তো কিছু করা দরকার। করাও হল। প্রথম দিনেই দুই কংগ্রেস নেতা—শ্রীমনোরঞ্জন ধরকে ও শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জীকে পাকিস্তানের নিষাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে নেওয়া হল। এই মনোরঞ্জনবাবু ও গোবিন্দবাবুই এসেম্বলিতে সর্ব প্রথমে পুলিশের গুলী-চালনার ও একটি ছাত্রের তাতে নিহত হওয়াব কথা প্রকাশ করেছিলেন। তার পরের দিন অনেক ভেবে-চিন্তেই আব একজন কংগ্রেসের নেতা বরিশালের শ্রীসতীন সেন মহাশয়কেও গ্রেপ্তার করা হল। ভাবটা যেন এই যে ও'রাই লুণ্ঠি বা পারজামা পরে মুসলমান ছাত্রদেব মধ্যমিগে গিয়ে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন। আসলে কিন্তু ঐ ভাষা-আন্দোলনের সাথে কংগ্রেসের তো নয়—ই—অন্য কোনও রাজনীতিক দলের নেতাদেরও কোনই সক্রিয় বা পরোক্ষ সংস্রব ছিল বলে ঢাকার থেকেও আমরা কেউ-ই জানি না। নূরুল আমিন সাহেবের ঐ ঘোষণার পেছনে কোনও সত্য আদৌ ছিল বলে আমি মনে করি না। আমি মনে না করলে কি হবে? এই হাঙ্গামা ও আন্দোলনের পেছনে যে অদৃশ্য হাতের খেলা সুপার-কম্পিত পরিকল্পনা অনুসারে চলাছিল, তার জন্যই প্রয়োজন, কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার ও ভারতের 'কম্যুনিষ্ট'-দের ঘাড়ু ঐ আন্দোলনের সব দোষ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করে পরিকল্পনার পেছনের অদৃশ্য নাথক 'এক চিলে দুই পাখি' মাঝতে চেরেছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু, গোবিন্দবাবু ও সতীনবাবুর মত নামকরা কংগ্রেস নেতাদেব গ্রেপ্তার করে একদিকে হিন্দুদের মনোবল

আবার ভেঙে দিতে চেরেছিলেন এবং অপরাধকে দেশের মুসলমান জনসাধারণকে ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে বোঝাতে চেরেছিলেন যে কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী আগেও যেমন ছিলেন, ঘটনার চাপে পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হলেও এখনও পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কাজেই লিপ্ত আছেন। পাকিস্তান সরকারের পরিচালক রাজনীতিক নেতাদের মতে পাকিস্তান যে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে—“পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস”—সেই প্রতিষ্ঠানটি ছদ্মনামে “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের”—ই একটি অংশ হিসাবেই কাজ করছেন। ভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশেই তাঁরা চলেন। এই হল আসল উদ্দেশ্য; তা ছাড়া আরও ব্যক্তিগত আকোশ ও ওঁদের উপর থাকা অসম্ভব নয়। মনোরঞ্জনবাবু ও গোবিন্দবাবু পুলিশের গুলীচালনার ও ছাত্রকে নিহত করার কথা প্রকাশ কবে দেওয়াতেই এসেম্বলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ করে দিতে হয়। সতীনবাবু, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে বরিশালের তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফারুক সাহেবকে বরিশালের হিন্দুমুখ যজ্ঞের জন্য প্রকাশ্যভাবে দায়ী করেন; সুতরাং তাঁর উপরও আকোশ থাকা অসম্ভব নয়। এখন একটা কথা উঠতে পারে যে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে যে তিনজন কংগ্রেসের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের ক্রেসেও কংগ্রেসে আবও উচ্চ স্তরের নেতা ছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার কবলে তো কংগ্রেসীদের ঐ আন্দোলনের সাথে যোগাযোগের প্রমাণ আবও জোরদার হোত, কিন্তু তা' করলেন না কেন ‘সরকার’? তার কারণ, উচ্চ স্তরের নেতা বসন্তবাবু বা ধীরেনবাবুর গায়ে হাত দিলে ভারতে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার অশঙ্কা তাতে ছিল। পাকিস্তানের নীতির কথা বলতে গিয়ে আগেই বলেছি যে তাঁদের নীতিই ছিল নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া, যাতে ভারতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। “সাপও মরলো, লারিও ভাঙলো না।” সেইটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পাকিস্তানও তাই কবেছেন। কংগ্রেসের ঐ দিন নেতাকে গ্রেপ্তার করে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে হিন্দু যে মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল সেই ভাঙা মন আবার যখন ধীরে ধীরে নেহরু-লিয়াকত-চক্রির পরে জোড়া লাগতে শুরু কবেছে, অর্থাৎ হিন্দু যখন আবার মনে করতে শুরু করেছেন যে এবারে হয়তো এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিজের দেশে, নিজের বাড়ি-ঘর থাকতে পারবেন, তখনই আবার তাঁদের মনে আঘাত দিয়ে তাঁদের কোন

রকমে জোড়া দেওয়া মনকে ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করেছেন পাকিস্তানের উচ্চ স্তরের ছককাটা নীতির (যা'র কথা পূর্বেই বলেছি) পূর্ববঙ্গের সর্ভদ্রব্যপকার মধ্য-সচিব মশায়। আমি পাকিস্তানে থেকে পুনঃপুনঃ দেখেছি যে যখনই এক-একটা ধাক্কায় পরে অনেক হিন্দুই চলে যান এবং পরে আবার কিছু হিন্দু ফিরেও আসেন, অবস্থা একটু শান্ত হলেই নতুন আশা বৃদ্ধি নিয়ে তখনই আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসে আরও অনেককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করার। এই লুকোচড়ি খেলাই সেখানে এষাবৎ চলে আসছে। এই কথাটা ভারত-সরকার ও ভারতের নাগরিকরা যত শীঘ্র বোঝেন, ততই দেশের অশান্ততা ও অস্তিত্বের বজ্রাঘাত একটা পথ ও উপায় দেখা দেবে বলে আমি মনে করি।

পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁর মধ্যাহ্নেই নূরুল আমিন সাহেবের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন সম্পর্কিত ঘোষণা ভারত থেকে যে ‘কম্যুনিষ্ট’-দের আমদানি করেছিলেন, তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাসপোর্ট প্রথা চালু করে আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে দেওয়া। সে সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা কবব। যা'ক, এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ঢাকার বসে থেকে আর কি কববো? তাই ঢাকা থেকে রাজসাহীতেই রওনা হই। যাওয়ার পথে ঢাকা থেকে রাজসাহী পর্বন্ত প্রান্ত বেল স্টেশনেই দাঁখি, ছাত্রদের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ-প্রদর্শন। প্রতি স্টেশনেই সৈনিক বিক্ষোভকারীদের মুখে শুনেছি শব্দ, একটি আওযাজ একটাই ধ্বনি। সে ধ্বনি ছিল—“খুনী নূরুল আমিনের রক্ত চাই।” রেলগাড়ির কামলায় কামলায় ঐ একটি ‘শ্লোগান’ লেখা দেখেছি। ঘটনাক্রমে নূরুল আমিন সাহেব খুনী হলেন কিন্তু সত্যিই কি তিনি খুনী ছিলেন? ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে মেলা-মেশা করে কিন্তু আমার তাকে অতটা স্বাধীন লোক বলে মনে হয় নি। আসল খুনী যিনি তিনি ছিলেন পরোক্ষে অদৃশ্য। গণতন্ত্রে আমরা ধরা-ছোঁবাব মধ্যে আসেন না। তাঁদের সব দুর্ব্বাক্যের জন্য দায়ী হতে হবে মন্ত্রীদের। মন্ত্রীরা যদি ব্যক্তিগতভাবে হন তাহলেই তাঁদের আমলাতন্ত্রের জাঁতা-কলে পড়তে হয়। মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত তখনই লোপ পায়, যখন তাঁদের মধ্যে দেবা দেয়—গোভ। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—“লোভ থেকেই আসে মোহ, মোহ থেকেই পাপ, পাপ থেকেই বুদ্ধি-ব্রহ্ম এবং বুদ্ধি-ব্রহ্ম হলেই মৃত্যু।” অর্থাৎ মতে নূরুল আমিন সাহেবের মধ্যেও সেই দোষই দেখা

দিয়েছিল এবং সেই দোষে তিনি দুঃস্থ অবশ্যই হয়েছিলেন। প্রথমে এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর লোভ; সেই লোভ থেকেই দেখা দিয়েছিল, গদি-রক্ষার মোহ; সেই মোহের মধ্য দিয়েই তাঁর শরীরে ঢুকেছিল পাপ; আর ঐ পাপ থেকেই তাঁর ঘটেছিল বৃদ্ধি-দ্রব্ধ এবং সেই বৃদ্ধি-দ্রব্ধের ফলেই তিনি হয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে খুনী এবং তার ফলেই তাঁর ও তাঁর দল মুসলিম লীগের হয়েছিল রাজনীতিক জীবনের অপমৃত্যু। আজ নূরুল আমিন সাহেব সেই লোভ কাটিয়ে উঠেছেন, তাই মোহ আর তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এখন তাই তিনি রাজনীতিক জীবনে আবার নবজন্ম লাভ করে ইতি-হাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অংশ নিতে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এসে এখানেও আমি সেই একই দৃশ্য দেখেছি। তাই আমার অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বন্ধু এবং বাংলায় রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন প্রেরণা কৰ্মী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়কেও দেখেছি, যে তিনিও নূরুল সাহেবের মতই রাজনীতিক মৃত্যু বা অপমৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন। এমনিভাবেই রাজনীতিক নেতাদের ও দলের উত্থান ও পতন সর্বত্রই হবে চলেছে। যতদিন মানব লোভমুক্ত থাকেন, ততদিন তাঁর উত্থানের গতি সমানেই চলতে থাকে; আবার যখন দেখা দেয়, তাঁর মধ্যে লোভ তখনই পতন আর কিছুতেই ঠেকান যায় না। নূরুল আমিন সাহেবেরও যার নি, প্রফুল্লবাবুও পতন ঠেকান যায় নি।

যাক, রাজসাহীতে গিয়ে তো পৌঁছে-লেম। কিছুদিন পরেই একজন আতি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী—রাজসাহী বিভাগের পুলিশের ডি আই জি (D. I. G.) জনাব এফ আব খন্দকার আসেন রাজসাহীতে। তাঁকে আমি বহু-দিন আগে থেকেই জানতেম। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আমলের আই পি এস (I. P. S.) কর্মচারী। পরাধীনতার যুগে আমি পুলিশকে যে চোখে দেখতেম, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমার দৃষ্টি-ভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমার ধারণা, স্বাধীন দেশের পুলিশ হবে স্বেচ্ছাসেবকের মত সেবা-পরায়ণ। তা' অবশ্য আজও হয় নি; তবু তাঁদের হুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমি তাঁদের বশ্চর্য্যভাবেই দেখতে চেষ্টা করি এবং এখনও আশা রাখি যে, আজও পুলিশের মধ্যে যে হুটি-বিচ্যুতি আছে—আজও ব্রিটিশের শেখান যে শোষণ ও দাস্তিকতার প্রবৃত্তির রেশ তাঁদের অনেকের মধ্যেই আছে তা' একদিন অবশ্যই সংশোধিত হবে। খন্দকার সাহেবের মধ্যে

এই দৃষ্টান্তের প্রবৃত্তি আমি দেখি নি। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িকতারও কোন চিহ্ন দেখি নি; তাই তিনি যখনই রাজসাহীতে আসেন, তখনই আমাকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান এবং আমিও ডাক পেলেই দেখা কবতে যাই ও বন্দু-ভাবেই আলাপ-আলোচনাও করি। এবারেও খন্দকার সাহেব এসেই আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমিও দেখা কবতে যাই। একজন অত্যন্ত দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবেই তিনি যখন যে জেলাতেই যান বা যেখানেই থাকেন, সেখানেই তাঁকে দেখেছি, তিনি স্থানীয় জননেতাদের অর্থাৎ যাদের সাথে জনসাধারণের যোগাযোগ আছে তাঁদের সাথে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করেন। ঢাকাতে যখন তিনি পুলিশের আই বি (I. B.) বিভাগের ডি আই জি তখনও তাঁকে দেখেছি, বাংলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা “হাজারাজ” কে (শ্রীপ্রলোকাশনা চক্রবর্তী মহাশয়কে) ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক দিনই নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। রাজসাহীতে এসে এবারে আমার সাথে যে কথাবার্তা হয়, তার যতটা আজ এতদিন পরেও মনে পড়ে তাই এখানে তুলে ধরিছি:

খন্দকার—ঢাকাতে এবারে কি দেখে এলেন?

আমি—যা' দেখে এলেম, তাতে একটা আশার আলোই দেখেছি। আপনার অর্থাৎ পুলিশের লোকেরা গুলী-চালালেন, ছাত্ররা মরলেনও, তবু যে আবার তাঁরা গুলীর সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ালেন, এইটোতেই আমি আশার আলো দেখেছি।

খঃ—আপনার সাথে আমি একমত হতে এখনও পারছি না। কেন যে পারছি না, তা' বলার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আজ্ঞা আপনাকে যদি এই ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হতো, তা' হলে আপনি মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনও বন্ড (bond) দিতেন কি?

আঃ—না, কিছুতেই দিতেম না।

খঃ—তা' আমি জানি। আপনি জানেন, ব্রিটিশ আমলে আমি কলকাতায় কেন্দ্রীয় আই বি অফিসেও ছিলাম। আপনাদের ফাইলগুলোও আমি দেখেছি। তার ভেতর দিয়ে আপনাদের যে অটুট সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়েছি, তাতেই জানি যে আপনারা গ্রেপ্তার হলে মুক্তির জন্য ‘বন্ড’ দিতেন না। কিন্তু এখানেই দেখেন, আপনাদের একজন সহকর্মী মুসলিম লীগের এম এল এ মাদার বঙ্গ সাহেব গ্রেপ্তার হওয়ার পনের দিনের মধ্যেই ‘বন্ড’ দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। জেলাখানার

তাঁর তো কোনও অসুবিধাই ছিল না। জেলাখানার পাশেই তাঁর বাড়ি। বাড়ি থেকেই প্রতিদিন দুই বেলা তাঁর খাবার জেলাখানার যেত; তবু তিনি ‘বন্ড’ দিলেন। তাতেই বৃদ্ধবেন, আপনাদের সেই অটুট সঙ্কল্প পেতে মুসলমানদেব এখনও বহু—বহুদিন লাগবে; আরও পঞ্চাশ বছরও লাগতে পারে।

আঃ—আপনি ‘নজির’ দেখালেন, সেই দলের একজন নেতার, যে দল কখনও রাজনীতিক কারণ উপলক্ষে অর্থাৎ তাঁদের প্রার্থিত ‘পাকিস্তান’ অর্জনের জন্য কখনও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নি। তাঁরা যে সংগ্রাম করেছেন, তা' হচ্ছে—ভাই-এর ভাই-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সংগ্রাম। তাঁদের ভাবটা যেন এই ছিল যে, হিন্দুরাই দেশটা দখল করে রেখেছেন! তাঁদের নিজেদের শক্তির উপর যদি বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তাঁরা সর্বপ্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতেন এবং দেশকে স্বাধীন করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যদি হিন্দু বা মুসলমানকে বঞ্চিত করে তাঁদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন, তখন তাঁরা হিন্দুর বিরুদ্ধেও আবার সংগ্রাম চালাতেন। আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন জাতি তাই করে থাকেন। তাঁদের সে বিশ্বাস ছিল না। মাদার বঙ্গ সাহেব সেই সংগ্রাম-শক্তি মুসলিম লীগ দলেরই একজন নাযক। তাঁর কাছ থেকে মুক্তির জন্য ‘বন্ড’ দেওয়ার বেশি আর কী আশা করা যায়? কিন্তু সংগ্রামমুখী যে ছাত্রদলকে ঢাকায় দেখে এলেম, তাঁরা তো তা' নন। তাঁরা একটা অদম্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে বৃকের রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃ-ভাষার সম্মানপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের বৃকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম একটা নতুন দৃষ্টান্ত নয় কি? আমার বিশ্বাস, এ'রা দেশান্ত-বোধে উদ্ভূত হয়ে একটা জাতি (nation) ও তার একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন।

আজ যে চলার পথে তাঁরা যাত্রা করলেন, সে চলা তাঁদের স্তম্ভ হবে না। চলতি পথে তাঁদের সামনে অনেক বাধাবিপত্তিও আসবে, সময়ে সময়ে তাঁরা দিক্‌স্রান্তও হবেন, তবু আবার ঠিক পথের সন্ধান নিয়ে

এগিয়ে চলবেন। কারম-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব, স্বাধীনতার পর-মহুর্ভে সংবিধান সংসদের (Constituent Assembly) প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কথা একদিন হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, অর্থাৎ তিনি যে বলেছিলেন—‘রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে হিন্দুও আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানও আর মুসলমান থাকবে না—ধর্ম থাকবে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার; রাষ্ট্র-শাসনে সব জাতি মিলে একটা নতুন ‘জাতি’ হবে এবং সেটা হবে, ‘পাকিস্তানী-জাতি’, এই ছেলের দলই দেখবেন একদিন জিন্নাহ সাহেবের সেই বাণীর সফল রূপায়ণ করবেন।’ এমনি ধরণের আরও অনেক কথাই সেদিন আলোচনা করেছিলাম। সব কথা আজ আর মনে নেই। আমার সেই দিনের সেই বিশ্বাস আজও পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নি ঠিকই, তবে আমার বিশ্বাস আজও তেমনি অটুটই আছে। পাকিস্তানে আজ যা চলছে, দূরে থেকে তার যে খবর পাচ্ছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, পাকিস্তানেই—বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তানে একটা বিপ্লব আসছে। ভৌগোলিক দিক থেকে একটা অখণ্ড দেশকে ভেঙে রাজনীতিক ক্ষেত্রে দুটো দেশ করা যেতে পারে—করা হয়েছেও কিন্তু তার ভাষা, তার সংস্কৃতি ভেঙে আলাদা করা যায় না। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, দুটো পৃথক রাষ্ট্র আজ হলোও, একের প্রভাব অন্যের উপর পড়বেই। কেউ তা’ রোধ করতে পারবেন না। ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে যদি অর্থনৈতিক বিপ্লব আগে হয়, তবে তার প্রভাব পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে পড়বেই পড়বে—সেখানেও বিপ্লব হবে; আবার পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবের প্রভাব, পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের উপরও অবশ্যই পড়বে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিপ্লবটা আসে হবে কোথায়? একদিন বাংলাদেশ ভারতকে নেতৃত্ব দিতেন। মহামতি গোল্ডেন একদিন বলেছিলেন, ‘বাংলা আজ যা ভাবেন, অবশিষ্ট ভারত কাল তাই ভাবেন’। এমনি ছিল ভারতে বাংলার নেতৃত্ব; আর সেই নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের দানও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। দেশ বিভাগ হওয়ার পর, আগেকার বাংলার ভারতীয় অংশ পশ্চিম বাংলার ভারতের রাজ-নীতিতে আজ আর সেই নেতৃত্ব নেই। অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে, বাংলার পূর্বতন নেতৃত্ব আজ পূর্ব বাংলার তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। পূর্ব বাংলার

ছাত্ররা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাণ দিয়ে সে দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, পূর্ব বাংলার নেতারা সাধারণ নির্বাচনের আগেই এক সম্মিলিত ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করেছিলেন, যা ভারতে আজও হয় নি—পশ্চিম বাংলাতেও না। এখানে যে সব ‘যুক্তফ্রন্ট’ সরকার হয়েছে, তা’ সাধারণ নির্বাচনের পরে; তাই ভারতে শাসন-কমতার অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দল—কংগ্রেস-এর অন্তিম একেবারে যুঁছে যায় নি। কিন্তু পূর্ব বাংলার ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগেই সেখানকার নেতারা ‘যুক্তফ্রন্ট’ গড়েই নির্বাচন চালিয়ে-ছিলেন এবং শাসক দল মুসলিম লীগকে—পূর্ব পাকিস্তান থেকে একদম মুছে দিয়েছিলেন; তাই আমার মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানেই হয়তো বিপ্লব আগে আসবে এবং তারই প্রবল ধাক্কা এসে লাগবে পশ্চিম বাংলার ও ভারতে। এই কথাই সেদিন আমার চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছিল এবং তাই ছাত্রদের ভাষা-আন্দোলন দেখে, আমি অতটা আশাবিস্ত হইনি। সেই আশা নিরুই আজও আমি দিন গুণিচ্ছি। এই ভাষাটিকে আরও ঘরানিত করা যায়, যদি ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু অবহিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে সেই পথে পা বাড়ান। কিন্তু তাঁরা কি তা করবেন? কোনও কোনও নেতার বর্তমান চলাফেরা ও মতিগতি দেখে আমার আশঙ্কা হয়, ভারতে হয়তো দুই এক সাসের মধ্যেই একটা বিরাট পরিবর্তন হবে—এবং সে পরিবর্তনে, দেশের অগ্রগতি না-হবে হয়তো পশ্চাৎগতিই হতে পারে। সেই দুর্ভাগ্য যদি আসে তাহলে, পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবের ধাক্কা ভারতকে ‘তখনই’ করে দিতে পারে। ভারতের বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব চাগলার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের মধ্যে আমি সেই আশঙ্কারই বীজ দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা অমলক হলে আমিই সব চেয়ে বেশি দুশিঁ হব। প্রার্থনা করি ভগবান যেন তাই করেন।

সেদিনের আমার চিন্তাধারার কথা বলতে গিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তাধারা এসেও একটা ‘জট’ পাকিয়ে ফেলার এই কথাগুলো এসে পড়েছে। এখন আমাদের আশেকার আখ্যায়িকাতেই আবার ফিরে যাই।

ভাষা-আন্দোলন সেদিন যে ছাত্ররা করেছিলেন, তাঁদের সেদিনের নেতৃত্বও তাঁদের মধ্যে থেকেই এসেছিল। বাইরের কারোরই কোনও হাত ছিল না। নূরুল আমিন সাহেব যে ঐ আন্দোলনের সাথে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট বা হিন্দুদের জড়িয়ে

ছিলেন তার পেছনে কোন সত্য ছিল না। উনি ঐ সব কথা বলেছিলেন বা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজনীতিক কারণেই। সেদিনের ছাত্র-হত্যার পরই ছাত্ররাই সারারাত ধরে ইট, সিমেন্ট প্রভৃতি দিয়ে মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যেই রাস্তার ধারে একটা শহীদ-স্মৃতি গড়ে তোলেন। তার পেছনেও বাইরের কোন দলের বা নেতার নেতৃত্ব ছিল না। সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্বই ছিল ছাত্রদেরই হাতে। পুলিশ দিয়ে পরদিনই কিন্তু ঐ শহীদ-স্মৃতি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনে বা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, আজ সেখানে সেই শহীদ-স্মৃতিই বিরাট আকারে বিরাজ করছে এবং বড় বড় রাজনীতিক নেতারাও প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সেখানে দিয়ে শহীদদের উদ্দেশ্যে মালা দিয়ে আসছেন। এইভাবেই ইতিহাস রচনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও হচ্ছে।

যাক, এর পরে মার্চ মাস শেষ হওয়ার করোদিন আগে ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট পাশ করার জন্য আবার এসেম্বলির অধিবেশন ডাকা হয়। মার্চের মধ্যেই বাজেট তো পাশ কীভাবেই হবে। হলেও—কোনও রকমে ‘নমো নমো’ করে, অর্থাৎ বিশেষ কোন বিষয়েই কিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় ও সুযোগ মিললো না। ঐ বাজেট-আলোচনার মধ্যেই একবার পুলিশের গুলী চালানার বিষয় উঠেছিল। সেই বিতর্কের উত্তর দেওয়ার সময় মন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন সাহেব কল-কাতার তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির তৈরিক মন্ত্রপত্রে—‘স্বাধীনতা’ পত্রিকা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি দাবি করছেন যে ঐ আন্দোলন নাজি তাঁরাই তাঁদের নেতৃত্বে চালিয়েছিলেন। ‘স্বাধীনতা’, পূর্ব পাকিস্তানের ‘চিহ্ন’ নিষিদ্ধ পত্রিকা। আমরা সে পত্রিকা পড়ি নি। তাতে কী ছিল, তা’ আমরা দেখি নি। নূরুল আমিন সাহেব পড়েছিলেন। তাই শুনিয়ে মাত্র। সত্যসত্যের কথা কিছু বলতে পারবো না। পরে দেখছি নূরুল আমিন সাহেবের সরকার ঐ স্বাধীনতা পত্রিকার তথাকথিত প্রকাশক তাঁর সরকারের রাজনীতিক উদ্দেশ্যে লাগিয়েছিলেন। ঐ অজুহাতেই ঐ ১৯৫২ সালেই কয়েক মাস পরেই পাক-ভারতে বাতায়ত করার জন্য ‘পাশপোর্ট’ প্রথা চালু করা হল। এটা ছিল, হিন্দু-বিতাড়নের মধ্যসচিব আজিজ আহমেদ সাহেবের শেষ ব্রহ্মস্পন্দ। আজিজ আহমেদ সাহেবের সেই বহু পূর্বনো ছক-কাট নীতির শেষ প্রয়োগ।

বঙ্গবন্ধু ওদেশে শিল্পীরা একে এদেশে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মৃত্যুর অন্তর-বাহিরের ছবি-ই দেখান হয়েছে 'একজিট দি কিং' নাটকে। লন্ডনে ৬১।৬২ সালে মৃত্যু বিষয়ক কয়েকটি আলোচনায় ভেরা এবং জন রাসেলের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল আয়োনোস্কেকে এবং তারই প্রভাবে নাটকটি রচিত হয়। সেই সব আলোচনা থেকে কিছু উদ্ভূত তুলে দেওয়া গেল:

আয়োনোস্কে—মৃত্যু জিনিসটা এমন থাকে মনে নেওয়া যায় না। আমাদের যদি মরতে না হতো তা হলে আমরা আরও বেশি দরলু এবং খীরস্থির হতে পারতাম। মানুষ যদি অমর হতো, তা হলে সে আরও বেশি আনন্দ করত এবং উন্নত স্বভাবের পরিচয় দিত। আমরা অমর নই—সেই কারণেই আমার মনে একটা তীব্র নিরাপত্তার অভাবের ভাব বিরাজ করে। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমি প্রথম সচেতন হই—তখন আমার বয়স বোধ হয় চোদ্দ বা পনেরো, কিম্বা ষোল বা সতেরো—আমি অবাক বিস্ময়ে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ভাবতে থাকি—এটা কি করে সম্ভব হল? এও উপলব্ধি করি যে এই বোঁচে থাকটা যে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে। আজও মনে হয় এই ভয়াবহ পরিণতি যে-কোন সময়ে আসতে পারে এবং আমার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে পারে।

আর একথা তো ঠিক যে ঐশ্বর্য পর্যন্ত আমরা কেউ-ই রেহাই পাব না। কোন কোন লোক এর থেকে একটু এগিয়ে যাবার জন্য প্রচণ্ড রকমের প্রেরণা পান—আমাকে কিন্তু এ-চিন্তা অবশ্য করে দেয় দেহমানে।

প্রশ্ন—আগাগোড়াই কি এইভাবে ব্যাপারটাকে ভাবতেন?

আয়োনোস্কে—এর শুরুর হয় যখন আমার পাঁচ বছর বয়স—তখন-ই একটি শব্দধারা দেখে ব্যাপারটা বদ্বতে পারি। মানুষের মৃত্যু হতে দেখলে মাকে প্রশ্ন করতাম, কেন এমন হোল? তিনি জবাবে বলতেন, অসুস্থ হয়েছিল, বা অমুকে চিরদিনই অসুস্থে ভুগতেন, বা উনি ক্রমশ শরীর খারাপ হতে হতে মারা গেলেন। এরপর ভাবতে শুরুর করলাম কোন কারণেই অসুস্থ হলে চলবে না। সহজ কথা—অসুস্থ যদি না হই, তা হলে আমাকে মরতেও হবে না। কিন্তু প্রত্যেকেই তো বুড়ো হয়। বুড়ো, আরও বুড়ো এবং তার থেকেও বুড়ো—তারপর নুরে পড়তে থাকে, ক্রমশ মাথাটা মাটির দিকে হেলে পড়ে, আর দাড়ির আকৃতি বড় হতে থাকে। এভাবে চিরকাল চলতে পারে না—সে-কথাও ঠিক। এরপর এক ভয়াবহ সন্দেহ আমার মনে এল—মাকে জিজ্ঞেস করলাম—“আমাকে সত্যি কথা বলতে হবে—আমা-

দের প্রত্যেককেই কি মরতে হবে?” মা বললেন, “হ্যাঁ, এই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম। আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে।” একথা শুনে আমার মনটা নৈরাশ্যে ভরে গেল। পরে আরও শুনলাম যে মানুষ সত্যিকার মরে না—মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যায়। এই সময় একদিন রাস্তার আমার একটি ছোট বন্ধুর সঙ্গে খেলা করছিলাম—তার পোলিও রোগ হয়েছিল। আমার মনে হয়—সে যাই হোক তার শরীরটা একটু বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং একটি তামার পাতের সাহায্যে তার কব্জি এবং ডান হাতটা ঠিকমত জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল—সে আমাকে বললে যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কারণ, সে বললে, ভগবান যদি সত্যিই স্বর্গে থাকতেন তা হলে যেসব দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকে সে সময় আমরা ভগবানের পা দুটো দেখতে পেতাম। এই কথা শোনার পর একদিন যখন আকাশে কোন মেঘ ছিল না আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের পা দুটো দেখবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। এরপর কিছুকাল আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম—সে সময় আমার বয়স বোধ হয় পাঁচ, ছয় বছর।

প্রশ্ন—এ কিন্তু অনেকটা আপনার নিজস্ব নাটকের কাহিনীর মত। এটা কাল্পনিক কাহিনী নয় এ-বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?

আয়োনোস্কে—এ-বিষয়ে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। আমাকে আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটির যুক্তিভাল চমৎকৃত করেছিল। এমন কি আমার মনে হয় ঐ ঘটনাটাই আমার সমস্ত রচনার, অনুভূতির এবং চিন্তাধারার মূলে।

প্রশ্ন—এই ঘটনা ঘটবার সঙ্গে স্কেই কি আপনি লিখতে শুরুর করেন—তা যদি না হয় তাহলে কিভাবে লেখা আরম্ভ হয়?

আয়োনোস্কে—আমার সাত-আট বছরের সময় থেকে লিখতে শুরুর করি—সে সময় গ্রামে থাকতাম। এই সময় আমার মনটা সব সময় আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকত। এই সময় একটা সর্বাঙ্গীণ মৃত্তির অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসেছিল। কোন উদ্দেশ্য ছাড়াও মনে সব সময় আনন্দ থাকত—যদিও তখনও কোন সোনালী ভবিষ্যতের ছবি দেখবার অবকাশ ঘটে নি। এই সময় স্কুলে প্রবন্ধ লেখবার ব্যাপারটা আমার খুব সহজ মনে হতো এবং এই জাতীয় রচনা লিখতে খুবই ভাল লাগত—রচনা লেখার ব্যাপারে ক্লাসে আমারই স্থান ছিল সবার ওপরে। এরপর আমার এগারো বছর বয়সের সময় আমার প্যারিসে ফিরে আসি—আমাদের ফর্ম-মাস্টার একদিন আমাদের বললেন গেনেলে যে গ্রাম্য-মাণ মেলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে

তার বর্ণনা দিয়ে একটি রচনা লেখ। আমি জানতাম না কি করে সম্ভব হল— কারণ তখনও পর্যন্ত সংলাপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না, আর আমরা থিয়েটারেও কখন যাই নি—কিন্তু আমি রচনাটি লিখলাম সংলাপের সাহায্যে। আমি লিখলাম আমার মা আমাকে গোলাতে নিয়ে গেলেন—আমি তাকে নানা প্রশ্ন কবলাম এবং তিনি তার উত্তর দিয়ে গেলেন। প্রথমটা মনে হয়েছিল খুব বোকাম মত কাজ করেছি, কিন্তু আমাদের শিক্ষক এম' লোয়াসো' আমার রচনাটি ক্লাসে চিৎকার করে পড়ে শোনালেন এবং বললেন, 'দেখ সব ব্যাপারটা কি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি জীবন্ত বচনা।' যা লিখেছিলাম আসলে তা হয়েছিল একটি ছোট একাক্ষ নাটক। আমার তখন মনে হয়েছিল আমি যেন আগার লেখার মাধ্যম উদ্ভাবন করে ফেলেছি।

প্রশ্ন—পূর্বাভাস দেবার গুণাগুণ বোধহয় এর পরে আসে?

আয়োনেস্কা—হ্যাঁ, যখন আমরা রুমিনিয়া যাই। অল্পদিনের ভেতরই আমি রুমিনিয়ান ভাষা শিখে ফেলি। এ ভাষা শিখতে আমার বেশ মজাই লাগতো—আমার বাবা আমাকে রুমিনিয়ান ক্লাসিকস পড়তে দিলেন এবং তার ভেতর কতকগুলি ছিল ভারি সুন্দরভাবে লেখা। আমার অসুবিধা হোত এই ভাষায় আমার বয়সী ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। আমি ওদের মত আর—এর উচ্চারণ করতে পারতাম না। আমি প্রায়-কে বোল করে উচ্চারণ করে ফেলতাম—এবং যেহেতু রুমিনিয়ান জুজুরা সব সময় রোল করে আর—এর উচ্চারণ করত, সে কারণে গুণা ভাবত আমিও জু। রুমিনিয়ানে সে সময় প্রচণ্ডভাবে ইহুদি-বিশেষ বর্তমান ছিল এবং এই প্রথম আমার অত্যন্ত বিদ্রী়া অভিজ্ঞতা হোল এই জাতীয় অকারণ বিশেষ এবং ঘৃণা সম্বন্ধে। আমার ক্লাসের ইহুদি ছাত্রদের প্রতি অবশ্য কোন অত্যাচার হোত না, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে অন্যেরা যে মনে মনে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব পোষণ করত—এবং আমিও এই দলে পড়তাম—সে কথা বেশ বোঝা যেত। আমি বিদেশী এবং অপরিচিত—সুতরাং এরা আমাকে পছন্দ করত না। প্রথমটা আমি ওদের সঙ্গে মিলবার চেষ্টা করতাম—তারপর এই পরিস্থিতিতে মেনে নিয়ে সচেতনভাবে নিজেকে আলাদা করে নিলাম এইসব ছেলেদের থেকে, বয়স্কদের থেকে, শিক্ষকদের থেকে, এবং এমন কি নিজের পরিবার এবং আমার সংসারের পরিবারের থেকেও

.....আমি তখনই অনুভব করতাম যে অন্য জাতের লোকদের প্রতি ঘৃণার ভাব মনে পোষণ করাটা এক ধরনের অসুস্থতা—আমি চাইতাম না যে এই রোগের দ্বারা আমিও আক্রান্ত হই।

প্রশ্ন—এ ব্যাপারটা সাধারণ ইহুদি-বিশ্বব্ধের থেকেও জটিল ব্যাপার ছিল, নয় কি?

আয়োনেস্কা—ঠিক তাই। রুমিনিয়ানরা তাদের প্রতিবেশীদের ঘৃণা করত। সব থেকে বেশি ভাষা বিরূপ ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাশিয়ান, জার্মান, বুলগেরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, সার্ব এদের প্রত্যেকের প্রতি-ই ভাষা বিরূপ ছিল। ইংরাজ এবং ফরাসীদের প্রতি তাদের বিশেষ ছিল না—কারণ এরা তাদের দেশ থেকে অনেক দূরে বাস করত। এ দুটি জাতকে তারা জানত না, তাদের সঙ্গে রুমিনিয়ানদের কোন যোগাযোগ ছিল না—সুতরাং ওদের শ্রদ্ধা করত। ইটালিয়ানদের প্রতি এদের শ্রদ্ধা ছিল অনেক কম—কারণ রুমিনিয়ানে অনেক ইটালিয়ান রাজমিস্ত্রির কাজ করতে আসত। এরা গ্রীকদেরও পছন্দ করত না।

প্রশ্ন—কিন্তু এটা অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, তাই নয় কি? ইটালিয়ান এবং গ্রীকরা ওদের দেশে আসত ওদের মুখের দুটি কোড নিতে—

আয়োনেস্কা—অর্থনৈতিক সমস্যা তো বটেই, কিন্তু সেটাই প্রধান কারণ নয়। আমার মতন আপনাবা যদি সর্বত্র বিদেশী এবং অপরিচিত বলে বিবেচিত হতেন তাহলে উপলব্ধি করতে পারতেন মানুষের ব্যবহারে নিষ্ঠুরতা এবং ঘৃণা কতটা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আমার এই আবিষ্কারকে—অর্থাৎ মানুষ মানুষকে হত্যা কববার জন্য সদাই উদগ্রীব (প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্ৰত্যক্ষভাবে)—আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হোল যেন অপবকে হত্যা করা এবং এভাবে সে নিজেও আত্মহত্যা করছে—কারণ অপবকে ঘৃণা করার মতোই হচ্ছে নিজেকেও ঘৃণা করা।

আমি আমার 'দি কিলার' নাটকে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি। প্রধান চরিত্র বেরেঙ্গার (যাকে আমার 'একজিট দি কিং'-এ দেখা যায়) খুঁজে দেপতে চায় কেন মানুষ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন না কাটিয়ে এক অপবকে ঘৃণা করে এবং হত্যা করতে উদগ্রীব। কেউ কেউ মনে করেন বেরেঙ্গার একটি করণ বস-আক চরিত্র। আমি যখন 'দি কিলার' নাটকটি লিখি—তখন আমার মানসপটে ছিল আর একটি চরিত্র—এটি হচ্ছে ডব্লিউ-ভিস্কির 'দি ইডিয়টের' প্রিন্স মিস্কিন চরিত্রটি—মিস্কিনেরও অনুসন্ধিৎসা হচ্ছে—

বাংলা ভাষায় এই প্রথম!

বিজ্ঞানের

এনসাইক্লোপেডিয়া

সচিত্র

বিজ্ঞান কোষ

সচিত্র

বিজ্ঞান কোষ

সচিত্র

বিজ্ঞান কোষ

সচিত্র

বিজ্ঞান কোষ

॥ ভূমিকা লিখেছেন ॥

ডঃ হিগুণা সেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য,

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী

এই প্রথম খণ্ডে রয়েছে আদিমতম পরিবহন ব্যবস্থা থেকে মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত সবরকম যান-বাহনের আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশের কাহিনী।

॥ ১১'x৯' ॥ ২২০ পৃষ্ঠা ॥ প্রায়

৭০০ রঙীন ছবি ॥ বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ ॥

বোর্ড বাঁধাই ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতি কপি দাম ধার্য হয়েছে মাত্র ১২। ডাক খরচ অতিরিক্ত।

মাত্র ২০০০ কপি

ছাপা হয়েছে!

আজই দু' টাকা পাঠিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে আপনার কপি সুনিশ্চিত করুন। বই পূজোর আগেই আপনার কাছে পৌঁছবে।

প্রকাশক :-

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ

১৬।৩, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

ফোন ৪৪৬-২৬২৬

Why society is as it is. People say that I'm not an intellectual because I've no ready-made system to give me an answer. But I don't think one's any the less an intellectual for rejecting systems which stand like a screen between oneself and reality.

প্রশ্ন—এমন কোন লেখক আছেন যিনি আপনার মতবাদ গঠনে সহায়তা করেছেন?

আরোনেস্কা—আছেন বৈ কি। কাফ্কা। তিনিই একমাত্র লেখক যিনি সত্যিকার আমাকে প্রভাবিত করেছেন। কাফ্কা বলতে শুধু মাত্র তাঁর সাহিত্যকেই বোঝায় না—তিনি একজন পুরো মানুষ—যে মানুষ পৃথিবীতে তাঁর আত্মা সস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, যাকে সবাই শিকার করতে উদ্যত, কি তাঁর অপরাধ তা কেউ জানে না, এমন মানুষ যিনি তাঁর ধর্ম, অধিবাদ্য (মেটাফিজিক্স) সবের থেকে বিচ্ছিন্ন, যিনি তাঁর অলৌকিক মূল শিকড়গুলি থেকে পর্বন্ত নিজে থেকে বের করে এনেছেন। যিনি পঞ্চদশ অযাত্রাপথের একা যাত্রী, জটিল ও সর্পিলা পথসমষ্টিতে পড়ে যিনি বিপথগামী—এইভাবেই আমি কাফ্কা থেকে বড়ি এবং তাঁর অন্তরের চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত বলেই তাঁকে আমি নিজের সহোদর ভাই—এর মতন মনে করি।

আমার কুড়ি বছর বয়সের সময় বঙ্গোপসাগরে প্রথম তার লেখা পাড়ি—দী. মেটা—মোরফোসিস, যাতে একটি মানুষ একটি ভয়াবহ বিস্মৃতি কীটে পরিণত হয়—এর জন্য তার নিজের যতটা দোষ ছিল, তার থেকে ঢের বেশি দোষ ছিল অন্যদের।

They make a monster of him because he is precisely what I was : a stranger, a foreigner.

তাঁর অন্যান্য বইও একই কারণে আমার মনের ওপর গভীর ছাপ রাখতে সমর্থ

পলল সাহিত্যগোষ্ঠীর তরুণ লেখক

কালকালের তৃতীয় বিবর

সত্য ঘটনা অবলম্বনে। শারদীয়া

সংখ্যায় পড়ুন। সডাক ২.০০

সাপ্তাহিক (রেজিঃ) পাবলিক গনিকা

২২/১, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড,

কলিকাতা-৬ :: ফোন: ৩৫-৮২৩৪

চাকদহ, নদীয়া। ফোন—চাক ৪৬

হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'আমেরিকান' নাম করা যেতে পারে। বিশেষভাবে আটলান্টিক লাইনারের অংশটি, যেখানে নায়ক হোন্ডের একদিক থেকে অন্য অংশে যাত্রায় করেন, এক কোবিন থেকে পাশের কোবিনে যান এবং ক্রমাগত জটিল এবং সর্পিলা পথসমষ্টিতে অর্থাৎ লাইনার বা আমেরিকাতে বা, সমসাময়িককাল, যা জগতে নিজে থেকে ক্রমান্বয়ে অধিকতরভাবে হারিয়ে ফেলতে থাকেন। কিন্তু যেখানেই যাই, আমি পরদেশী—এই উপলব্ধি আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটায় না—বরং এ ভাবটা আমার ভালই লাগে।

It's a question of ethics with me. a way of life..

প্রশ্ন—এই জীবনধারণার সঙ্গে আপনার নাট্য রচনা কিভাবে খাপ খায়?

আরোনেস্কা—নাটক লেখার সময় আমি আমার ভাবধারাকে প্রত্যক্ষভাবে বলতে পারি না—যেমনটা চলে আর্টিকল, প্রবন্ধ বা সাধারণ কাগজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। আমার ধারণা হচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টির ম্বা বা সত্যকে আবিষ্কার করা হয়, যে সত্য সাধারণত আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে, এবং সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে জগৎকে তুলে ধরা হয় তা আমাদের দৈনন্দিন জগতের থেকে আরও অনেক বেশি সত্য। এইজন্যই জগতের এই আসল পরিচয় পেতে আমাদের কম দক্ষতা সহ্য করতে হয় না।

কোন নাটক আরম্ভ করার সময় আমি অনুভব করি শূন্য এবং অজানা থেকে শুরু করেছি এবং রচনা হয়তো সূক্ষ্মভাবে শেষ করতে পারব না। বস্তুর দিক থেকে দেখে মনে হয় সামনে সবকিছু ফাঁকা এবং এই শূন্যগর্ভ থেকেই আমাকে একটা জগতের সৃষ্টি করতে হবে। আমার মনোসংযোগ নষ্ট হয়ে গেলেই আমাকে পরাজয় মানতে হবে এবং সে পরাজয়কে কখনও সামলাতে পারব না।

It's more a matter of discovery than of invention.

এখন যখন বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছি—এখন আমি মোটামুটি বন্ধুতে পারি আমি কি করছি এবং অস্পষ্টভাবে লেখার পরিণতিটাও দেখতে পাই, কিন্তু আমার নাটকের যা কিছু ভাল, সেসব আমি যখন লিখতে বাস আগে থেকেই আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। এটা এখনও আমার কাছে একটা খুঁজে বের করার প্রশ্ন আমার অজ্ঞাতভাবে কোন বস্তু এসে আমার অন্তরে আশ্রয় নিয়েছে।

The play seems to come from nothing, and yet when it's finished, and I read it through, and it seems so clear

and natural and inevitable, I know that "nothing" was a nothing of the head, not of the heart. It's like when a child is born to you. It's someone you've never known and someone you've known for ever—both at once.

আর সত্য কথা বলতে কি, যদিও আইডিয়া প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা শুরু করা হয় না, অনেক সময়েই পরিণতিতে একটা পরিচিত শিক্ষা বা পাঠ যুক্ত করে দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'একজিট-দি কিং'-এর একটি শিক্ষা হল এই—বিশ্বের ভাগ লোক নিজেদের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠে যখন তারা বন্ধুতে পারে যে তারা মরতে চলেছে।

আমার জীবনদর্শন হল এই—পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব সবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। মানুষ নিজে যে পরিস্থিতিতে আছে তাকে ধূলা করে—এবং তার ফলে নিজেদেরও প্রতি ধূলা করা হয়। এক-এক সময় পৃথিবীর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দাঁখি যে মনে হয় এর আগে একে কখনও দেখি নি, এবং এরকমটা যখন ঘটে—

I am simply overwhelmed at the strangeness and the wonder and the marvellousness of it all.

এইসব সময় ভালমন্দের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই—মনে হয় নতুনভাবে পৃথিবীর আবার জন্ম হয়েছে—এ পৃথিবী সম্প্রদায় সম্পর্কের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত, এর ভেতর সম্পূর্ণতা আছে, এর থেকে শুধু শূন্য আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমাদের আচরণে যখন মনে হয় পৃথিবীটা একটা সাধারণ জায়গা, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, তখনই আমাদের মনে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনার কথা জেগে ওঠে এবং আমাদের সামনে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—আমাদের প্রথম সচেতনতার বিস্ময় অর্থাৎ যখন প্রথম আমরা বিস্মিত পূর্নকে নিজেদের প্রশ্ন করি কিভাবে আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি—সেই মনোভাব আমরা আর ফিরে পাই না। সেই আদি কেন্দ্রবিন্দুতে আবার ফিরে যেতে হবে যখন একটা চেয়ার দেখে আমরা বন্ধুতে পারি না সেটা কি—একটা দেয়ালের দিকে তাকাই অথচ জানি না দেয়াল জিনিসটা কি—প্রশ্ন করি—

"Why, that's a wall!"

প্রশ্নকারী—এই জিনিসটাই থিয়েটার—অন্তত আপনার থিয়েটার থেকে আমরা পাবার প্রত্যাশা করি।

[ক্রমশঃ]

আকাশবাণী



পরিভ্রমণ

মেঘদূত

পাকিস্তানের রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ হওয়ার 'আকাশবাণী-পরিভ্রমণ' আমরা ১৩ই জুলাই সংখ্যায় বেদনা প্রকাশ করেছিলাম।

পূর্ব পাকিস্তানের রেডিওতে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচাৰ আবার সূর্য হইছে। এর দ্বারা জনগণের জয় সুচিত হইছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সূর্য করে দেন। প্রবীণ পণ্ডিত ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ধানি তোলেন, 'পাকিস্তান জিম্মাবাদ, রবীন্দ্রনাথ জিম্মাবাদ।' এইসূত্রে মনে পড়ে যায় প্রায় বছর আটেক পূর্বের কথা, ডঃ শহীদুল্লাহ এসেছেন কলকাতায়, তাঁর লগ্নে মেঘদূতের হলো প্রথম পরিচয়। বৃন্দ মনীবী যখন বিদায় নিচ্ছেন মেঘদূতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাঙালী জাতি ও বাঙালী ভাষার মঙ্গলেব জন্য কাজ করবেন।' বাঙালী জাতি রাজনীতিক কারণে বিধা-বিভক্ত তবে তার মন-প্রাণ আবিভক্ত থাকবে—এমনটি আশা করা অন্যায্য হবে না। দুটি রাষ্ট্রে বাঙালী সংস্কৃতি কোথাও দুই প্রবাহে—কোথাও-বা এক প্রবাহে বইবে। তা'বলে প্রমাণ করবে না, বাঙালী সত্তা খণ্ডিত। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের যেতারা রবীন্দ্রসংগীতের পুনঃপ্রচার। রবীন্দ্রনাথ জাতি-ধর্ম ভৌগোলিক সীমায় উর্ধ্ব জনমানসের প্রতিনিধি। পশ্চিম বাঙালার বাঙালীরা তাদের পূর্ব পাকিস্তানের ভাই-বোনদের স্বাগত জানাচ্ছে।

* * *

ঘরে বসে পড়াশুনো করছি। পাশের একটা টেবিলে রেডিওটা বাজছে। শুনছি রবীন্দ্রসংগীত। হঠাৎ হৃদয়স্পর্শে পাড়ায় ঘুরে গেলে ঘরে ঢুকে পড়লো। জিগ্যাস করার কোন বালাই নেই। ওদের একজন তো রেডিওর নবুটা জোর জোর ঘোরাচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীত চাপা পড়ে গেল, বেজে উঠলো হিন্দী ছায়াছবির একটা গান। ওদের কথায় বদলান্ন যে, পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটে এই গানটা বাজতে বাজতে বন্ধ হয়ে গেছে। ছুটে এসেছে আমার ঘবে। তাই আমার ওপর এই জ্বলন্ত—না, খুঁড়ি, ভালোবাসা! আমি তো জ্বলন্ত ভয়ে থ' হয়ে বসে আছি। প্যান্ট এতো সরু আর জু ছাটের বহর যে-সকল তাকে করে বেশি

কিছু বলি তো সখের রেডিওটাও হয়তো মাঝে।

'দাদা, ফাস্ট কেলস গান, এক্ষণি মিস্ হাঞ্জল' বলে বিবিধভারতীয় পেট্রনরা দুটো চেয়ারে বসে ভুড়ি দিচ্ছে, মাথা নাড়ছে। বিবিধভারতীয়-কলকটোরের কি অপূর্ব মহিমা। গান শেষে দে'তো হাসি হেসে 'ভাইদের' বিদায় করে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দুই বাড়লার দুই চিত। একাংশে পাই জনগণের রবীন্দ্রসংগীতকে যেতারা ফিরিয়ে আনার লড়াই; অপরাংশে দেখি, অন্তত একপ্রণীর কিশোর-যুবকের রবীন্দ্রসংগীতের গঙ্গা টিপে জলো হালকা হিন্দী গানের প্রতি অহেতুক মোহ! বৃকের ভেতরটা টনটনিয়ে ওঠে না কি।

হ্যামেলিন শহরের বংশীবাদক যেমন শহরকে মত্ত করতে পেরেছিল ইন্দুরদের হাত থেকে, বিবিধভারতীয়ও তেমন দেশের ছেলেদের ওই বংশীবাদকটির মতো কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে, তাবলে জাতকে উঠতে হয়। জেন পাইপ, জু ছাট, হিন্দী ছবি, বিবিধভারতীয়—মোফলাভের চোরগণী!

* * *

এবার প্রশ্ন করছি, 'বিবিধভারতীয় বলতে কি শুধু হিন্দীভাষাকেই বোঝাবে? মাত্র একটি ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রচার হচ্ছে অথচ তার নাম দেওয়া হলো 'বিবিধভারতীয়'। 'বিবিধ' অর্থে হিন্দী, হয়তো কোন সরকারী আঁচশানে এমনতরো মাধ্যম মিলতেও পারে। আমাদের প্রথম আপত্তি নামকরণের বিরুদ্ধে। বলা হোক 'হিন্দীভারতীয়' : অন্তত নামের দিক দিয়ে তখন কারুর কোন আপত্তি উঠবে না।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। জনগণের দাবি উপেক্ষা করে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গান, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে অপরের ওপর জোর করে চাপাতে চাইলে সংহতি আনা যায় না। মহৎ কিছুও জোর-জবরদস্তির দ্বারা কি গ্রহণ করানো সম্ভব? ভাষা হিসাবে হিন্দী আজও এমন স্তরে পৌঁছতে পারে নি যা সর্বভারতীয় হবার যোগ্যতা রাখে। হিন্দীর বিরুদ্ধে তো আমাদের কোন বিরাগ-বিরোধ নেই। মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দীরও প্রীতি হোক

এটা শুধু মেঘদূত নয়, প্রতিটি দেশ-বাসীর মনের কথা। ঘূর্ণা করি হিন্দীর স্টীম রোলারকে। ভুল করি তার আগ্রাসী প্রতিপক্ষ। জম্মবিবর্তনের দ্বারা কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা একদিন পায় তা পাক না। যোগ্যতার বিচারে, প্রয়োজনের তাগিদে, সংহতির স্বার্থে একটি ভাষাকে মনে নিতে তো কোন বাধা নেই। তবে ভাষাগত যোগ্যতার বিচারে হিন্দী এখনো তেমন স্তরে পৌঁছতে পারে নি, এ কথা উগ্র হিন্দী-ওলারা বোঝেন না কেন।

* *

বিবিধভারতীয় প্রোগ্রাম একটি ভিন্ন মিটারে প্রচার করা হয়। তবু বলাকাতা

সালফার

গায়েরমাখা সাবান



গন্ধক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। মেঘদূত এই সাবান নিত্য ব্যবহারে। বিশেষতঃ গরুর দিনে, খোসা, কোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কবোঞ্চ ছাদয়

প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

হয়তো বিদ্যুৎ.....

এলায়িত কুন্তলের বিসর্পিত রূপ

দিগ্ভ্রষ্ট নায়িকার ব্যর্থ যাত্রা যেন

দুঃচোখু আগুন হানে

ভবাত জিজ্ঞাসা।

শেষ হ'লে আরম্ভ

সূর্য অস্তাচলে,

মৃত্যু-মন ঘোঁবনের ব্যর্থ হাহাকার

ফিরে চায়... নাহি পায়

বাঁচার সংগ্রাম

দুর্বা যেন স্থান চায় পৃথিবীর বুকে।

মৌন মন সচেতনতার

ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ে খোঁজে ডানার উত্তাপ

হিম-শীতলেই শেষ

যাত্রা পুনর্বীর;

রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর দিক হতে দিকে!!

কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে ১২-৩০ মিঃ এবং বিকেল ৪-৩০ থেকে ৫টা পর্যন্ত আলাদা করে গানের মাধ্যমে হিন্দী প্রচার করা হচ্ছে কেন? কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠান-সূচী থেকে, আমাদের একান্ত অনুরোধ, এ অনুষ্ঠান উঠিয়ে নেওয়া হোক। বিবিধ-ভারতীয় দেশের কোন কল্যাণে লাগছে? শুধু ছেলেদের মাথা গাবার রাস্তা খুলে দিয়েছে। আপনারা যাচাই করে দেখুন—যারা অনর্গল বিবিধভারতীয় শুনছে আর যারা কালে-ভদ্রে শুনেন থাকে; এদের দু'দলকে দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হবে না কি। এই দুই শ্রেণীর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি চাল-চলন কী ভিন্ন ধরনের নয়? তাই বলে, যে-সংস্কৃতি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল এবং সমাজবিরোধীও বটে তাকে সমর্থন করি কেমন করে? এসব কথার হয়তো উগ্রপন্থী হিন্দী-ভাইদের গোঁসা বাড়বে। তবে মেঘদূত জ্ঞাতীর স্বার্থে সত্যাপ্রসঙ্গী, যা সত্য বলে মনে করবে না তাকে কোনদিন সমর্থন জানাতে পারবে না।

আমরা হিন্দী গানের বিরোধিতা করছি না। হিন্দী সুগম সংগীত যা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে আমাদের বিরোধ নেই। সাংস্কৃতিক সংগীতের প্রচার তো সুখের কথা। বিবিধভারতীয় নামে যা চলছে সে শুধু সুভদ্রা-দেওয়া উত্তেজক দাওরাই; যা খাইয়ে ছেলে ভোলানো হচ্ছে—নেশায় চুর কবে রাখা শব্দ।

আকাশবাণী-পরিচরমা পর্বের সূর্য থেকে এ পর্যন্ত আমাদের কাছে বিবিধ-ভারতীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মতামত জানিয়ে অনেকে লিখেছেন। স্বল্প পরি-সরের মধ্যে চিঠিগুলি প্রকাশ করা গেল না বলে পত্রলেখক-লেখিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কয়েকজন পত্রলেখক জানিয়েছেন যে,

হিন্দী ছায়াচিত্রের রেকর্ডের পরিবর্তে বাংলা ছায়াচিত্রের গান, শ্যামাসংগীত, ভক্তিমূলক গান, পদাবলী কীর্তন, বাড়ল, পল্লীগীতি, ব্যালাড, অতুলপ্রসাদ, রজনী-কান্ত, নজরুল ইত্যাদি সাতদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজানো হোক না?

আর একজন পত্রলেখক (রমেশনাথ দত্ত) কৃষ্ণনগর থেকে লিখছেন, আমার ছেলে বড় হচ্ছে, বাড়ির বেড়িওতে তার বাঙলা গান পছন্দ হয় না। সর্বদা বলে, রাস্তার দোকানে যে-গান হয় তাই বাজাও অর্থাৎ বিবিধভারতীয়। আমি তো ভয় পাচ্ছি, ছেলে যদি বিবিধভারতীয়-ভক্ত হয়ে ওঠে তবে আমার কী হবে। আপনারা জোরালো কসমে বিবিধভারতীয় বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থে প্রতিবাদ করুন।

* * *

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পূর্বী সিংহ রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন। অনেক আশা নিয়ে শুনতে বসলাম কিন্তু সূর্য ঠিক-ঠিক থেকেও গায়কীর অভাবে গানগুলি নিঃপ্রাণ হয়ে উঠলো। এ-গ্রেড শিল্পীদের গানে অনেক সময়ে এই ধরনের দুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বোধহয় প্রোতাদের ভালোমন্দ লাগা-না-লাগা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না সব সময়ে। তাই যারা একেবারে 'টপ' আর্টিস্ট নন তাঁদের গান শোলে ভালো। রেডিওতে গাইবার পূর্বে সাধনা করে নেন, ধরো-আর-মারো ভাব থাকে না তাঁদের। জানি না শ্রীমতী সিংহ এখন 'টপ' আর্টিস্ট কি না! তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা এত শীগগির ফেরায় নি কিন্তু।

* * *

"নাগা অসমীয়া ভাষার একটি বন্যরূপ"

বাংলা সংবাদে "পররাষ্ট্রকে—'পরাস্ট্র' বলে পড়তে শুনলে প্রোতারা নিশ্চয়ই

বিরক্ত হন। এমন ছুরিছুরি ভুল উচ্চারণ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার বেতারে প্রচারিত বাংলা সংবাদে একটি প্রাণান্তক ভুলের উল্লেখ করছি শুধু নয়, তার প্রতিবিধানও দাবি করছি।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সকাল ৭-৩০ মিঃ বাংলা সংবাদে বলা হলো 'নাগা অস-মীয়া ভাষার একটি বন্যরূপ'। এমন কথা কে বলেছে! রাজধানী থেকে এ খবর প্রচার করা হলো কি বলে। নাগা ভোট-বমী গোষ্ঠীকৃত ভাষা। অসমীয়া বলতে ভারতীয়-আর্থ ভাষাগোষ্ঠীর একটি ভাষাকে বুঝিয়ে থাকে। কোন বিশেষী পণ্ডিত নাগা-বোড়ো প্রকৃতিতে মধ্য এবং দক্ষিণ অসমীর নামে বর্ণনা করেছেন বটে, তবে তা বলতে বাঙলার ভূগোলীয় অসমীয়া ভাষাকে বোঝান নি, বুঝিয়েছেন আসামরাজ্যের অন্তর্গত ভোট-বমীর গোষ্ঠীকে। এবং 'নাগা অসমীয়া ভাষার বন্যরূপ' এমন অর্থহীন উক্তি কোথাও মিলবে বলে মনে করি না। এ উক্তি স্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? কোন ভাষাকে 'বন্য' বলা অনুচিত, বলতে পারি 'আদিম' রূপ। এমনতরো বিকৃতরূচিকর সংবাদ পরিবেশন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নয় কি? এ শুধু লজ্জার নয়, এমন উক্তি নাগাবাসীদের কাছে মর্মান্বাহানিকর বলে মনে হতে পারে। পিছনে থেকে যিনি বা যারা সংবাদ তৈরি করে মোষকের হাতে তুলে দিচ্ছেন তাঁরা যে এমন অজ্ঞতার পরি-চয় দিতে পারেন তা জানা ছিল না। এ বিষয়ে আমরা তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এবং বিশেষ করে বিভাগীয় সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীঅশোক মিত্রকে আমরা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলেই জানি, তাছাড়া তিনি বাঙালী; সুতরাং তাঁর বিভাগে যখন-তখন বাঙলা সংবাদ পরিবেশনে যে ভুল হচ্ছে তার প্রতিকার হবে বলে মেঘদূত আশা রাখে।



আরো সিনেমা চাই

জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা হলের সংখ্যা বেশি নয়। পশ্চিমবঙ্গে আরো বেশি সিনেমা হলের দরকার আছে। কলকাতা এবং শহরতলীতে সিনেমার অবস্থান এমন, নিজের পাড়ায় বা নিকটবর্তী পাড়ায় গিয়ে ছবি দেখার সুযোগ সকলের ঘটে না। সিনেমা দেখতে হলে ট্রাম-বাসের ভিড় তৈলে সময় ব্যয় করে ক্লান্ত হয়ে যেতে হবে, যাবার পথে কাপড়-জামা ছিঁড়বে, পকেটমার হবে, নানা বিপদ। এই অবস্থায় গিয়েও টিকেট পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হস্ত ফিরে আসতে হবে, অথবা আবার অন্য পাড়ায় ছুঁতে হবে টিকেটের আশায়। তারপরে ফেরার অসুবিধা। ম্যাটিনী ও সন্ধ্যা শোতে দেখলে এই অসুবিধা নেই, কিন্তু পাড়ার লোক ছাড়া রাতের শো দেখতে সাহস হয় না ফেরবার পথে যানবাহনের কথা চিন্তা করে। কলকাতা এবং শহরতলীতে সিনেমাগুলি অভ্যন্তরীণ অপরিকল্পিতভাবে রয়েছে। যেমন পূর্বে কলকাতার সার্কুলার রোডের ওপারে সিনেমা নেই বললেই চলে। যে দু-তিনটি আছে তার মধ্যে দুটি নামোন্নত। সেখানে গিয়ে আনন্দের চেয়ে নিরানন্দের সম্ভাবনা বেশি। নেই ভাল আসনের ব্যবস্থা, নেই প্রজেকশনের উপযুক্ত যন্ত্র। ছবি আসে সেরকমই। অথচ এই শিল্পাঙ্গুলে লোক গিজ গিজ করছে, এবং লোকে ছবি দেখতে ছুটেছে—ধর্মভাষ্য-শ্যামবাজারের দিকে। গত ক'বছরে নতুন গড়ে-ওঠা শিল্পাঙ্গুলে প্রয়োজন অনুসূচি সিনেমা হয় নি। এই অবস্থার দরুণ মধ্য কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার সিনেমাগুলিতে সর্বত্র কিছু দেখা যায়; টিকেট নিয়ে চোরাকারবার, দর্শকদের প্রতি প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের দারিদ্রবোধহীন ব্যবহার প্রভৃতি দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৩,৮০ লক্ষ, সিনেমা রয়েছে (সামান্য সিনেমা সহ) মাত্র ৫০২টি। তুলনামূলকভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দিকে দেখলে দেখা যায় : (লক্ষের হিসাবে জনসংখ্যা) মাদ্রাজে ৩৬০, সিনেমা—১০১১; অন্ধ্র ৩৮০, সিনেমা—৭৪২; মহারাষ্ট্র ৪৫০, সিনেমা—৭১৩; মহীশূর ২৬০, সিনেমা—৪৬৪; ইউ, পি ৫৪০, সিনেমা—৩৫০; কেরালা ১১০, সিনেমা—৩৫০; গুজরাট ২০০, সিনেমা—২২০; পানজাব ২০০, সিনেমা—১৮০টি। জনসংখ্যার হিসাবে ভারতে সিনেমার সংখ্যা নগণ্য। একমাত্র মাদ্রাজে এক হাজারের অধিক সিনেমা রয়েছে, সাড়ে তিন কোটি লোকের জন্য এই সংখ্যাকেও বেশি বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে শিল্পাঙ্গুলে ভিন্ন রাজ্যের লোকের সংখ্যা অধিক, এবং সারাদিনের ভ্রমের পরে তাদের একমাত্র আনন্দ উপভোগের মাধ্যম সিনেমা। কিন্তু শিল্পাঙ্গুলে সিনেমার সংখ্যা কম, এবং যে কয়টি সিনেমা আছে সেগুলি রোহনতি মানুষকে আনন্দদানের কোন দারিদ্র পালন করে না।

কলকাতায় পরিকল্পিতভাবে সিনেমার সংখ্যা বর্ধিত জন্য শিল্পাঙ্গুলে এবং নতুন গড়ে-ওঠা শহরগুলিতে লাইসেন্স মঞ্জুরের আবেদন দীর্ঘদিন বিবেচনাধীন পড়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে বা কংগ্রেসী শাসনকালে শহরের আগোদ-প্রমোদের ব্যাপারে কোন সুপারিকল্পনা ছিল না, বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন মন্ত্রিসভার কাছে মানুষ সর্ববিষয়ে সুপারিকল্পনার আশা করে। কিন্তু আগোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে এখনো তাঁরা কোন সুপারিকল্পনার আশার খবর দেন নি। শিল্পাঙ্গুলের সিনেমাগুলির উন্নতিবিধান, এবং সুপারিকল্পিতভাবে নতুন লাইসেন্স নিয়ে বহুতর কলকাতায় ও বিভিন্ন শহরে আরো সিনেমার ব্যবস্থা করলে মানুষ সারাদিনের জীবিকা ও বাঁচার সংগ্রামে উদ্বিগ্নবাসে ছোটাছুটি পর—অন্তত নিশ্চিন্তে বসে আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাবে।

—সুজন



‘দর্শিত’ ছবিতে হেলেন

চিরত্নানোচনা

ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র

সারা বিশ্বের দাঁষ্ট আজ ভিয়েতনামের দিকে। ভিয়েতনামে আগুন জ্বলছে, রক্ত ঝরছে। ভিয়েতনামের জনগণের সমর্থনে খোদ আমেরিকায় বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে, পৃথিবীর দেশে দেশে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গর্জে উঠছে। একালে ভিয়েতনাম এমন এক নাম—যা ঔপনিবেশিক মূল্য-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই ভিয়েতনামের—অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে মন্ত্র অঞ্চল হয়েছে, সেই মন্ত্র অঞ্চলের তিনটি চলচ্চিত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ছবি তিনটি দেখে মনে হল—প্রতিরোধ সংগ্রামে যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন,



‘প্রীতিচৈতন্য’ ছবিতে নবাগতা সুপর্ণা দেবনাথ

গ্রাম পুনর্গঠন করল। যেই গ্রাম ছিল সেই গ্রাম। তবে পদ্ম-নারী সবাই বন্দুক কাঁধে তৈরি হয়ে চাষ-বাস করছে, মৃত্তিফোজের সতর্ক পাহারা রয়েছে।

দ্বিতীয় ছবি ‘হাউ লিবারেশন ফ্রন্ট’। প্রধানত মৃত্তিফোজের যানবাহন ব্যবস্থা নিয়ে এই প্রামাণিক ছবি। একদিকে মার্কিন বোমারু রাস্তাঘাট ভেঙে দিচ্ছে, ব্রীজ উড়িয়ে যোগাযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে। আরেক দিকে মৃত্তিফোজ বিকল্প রাস্তা তৈরি করছে। বিরাট ব্রীজ তৈরি করছে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর ওপর দিয়ে। তার ওপর দিয়ে চলেছে লরীর বিরাট কনভয়—খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র, ওষুধ ও অস্ত্র নিয়ে। এমন কি মৃত্তিফোজ নিজেদের রেল লাইন ও রেলগাড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়েছে। মৃত্তিফোজের পাহারায় স্বাভাবিকভাবে মানুষ রেল ও লরীতে করে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাতায়াত করছে। চিঠিপত্রের বিলি ব্যবস্থা করছে। সাধারণ মানুষ যদি দেশাত্মবোধে উদ্বেগ হর, তারা যদি বুকতে পারে যে এই লড়াইয়ের পরে শোষণ থেকে মুক্তি পাবে তবে তারা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে এই ছবি তার এক নিদর্শন।

আর একটি ছবি ‘ভ্যানগ্রা’—এক শহীদের জীবন নিয়ে নির্মিত ছবি। গতানুগতিক জীবনীচিত্র এটি নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারের হাতে ‘ভ্যানগ্রা’ শহীদ হয়। অমানুষিক নিষ্ঠুরতার মধ্যে মৃত্যু-মুহুর্তে আত্ম-

ভেদমনি বিস্ময়ের জিনিস তাঁদের এই তিনটি ছবি। ছবি তিনটি নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মৃত্তিফোজ অঞ্চলে। আশ্চর্যের কথা যে এই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও সেখানে ফিল্ম স্টুডিও, ফিল্ম স্যারনাগার ইত্যাদি যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। এঁরা যে ছবিগুলি তুলেছেন তার কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে, এবং পুরস্কারলাভ করেছে।

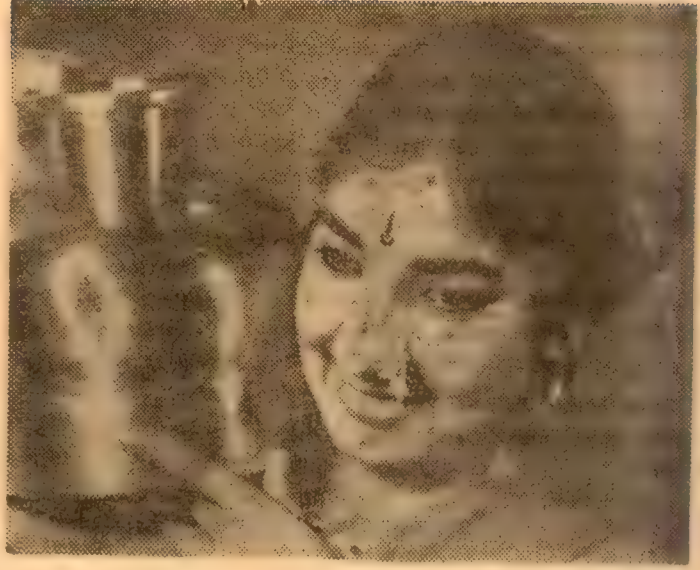
এরূপ একটি ছবি ‘চি-ভিলেজ’। মস্কো পশ্চিম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রামাণ্য বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সাধারণ থেকে পনের মাইল দূরে কু-চি নামক একটি গ্রামের কথা। প্রথমে দেখা গেল হাসিখুশি ভরা ছেলে-মেয়ে, হাট-বাজার, মানুষের বাস্তবতা, ফলের ফুলের বাগান ভরা স্বাভাবিক একটি গ্রাম। একদিন এই গ্রামে মার্কিন বোমারু বিমানের হামলা হল। গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল। মৃত্তিফোজ লড়লো মার্কিন ও তাদের পুতুল সরকারের ফোজের বিরুদ্ধে। ওদের হাটিয়ে দিয়ে আবার তারা



লতাজিৎ রায় পরিচালিত ‘চিড়িয়াখানা’ ছবিতে শৈলেন মুখার্জী ও উত্তমকুমার

সমর্পণের পরিবর্তে তার মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল 'হো-চি মিন জিন্দাবাদ' 'ভিয়েত-নাম জিন্দাবাদ'। এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে। শহীদ 'তানগ্রন' হয়ে উঠলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক।

তিনটি ছবিই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ, এবং ছবি তিনটি দেখে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পুতুল সরকারের দিন ঘনিষ্ঠে এসেছে, তারা জনগণের দ্বারা ধিকৃত; ভিয়েত কংদের জয় সুনিশ্চিত। চলচ্চিত্র নির্মাণের কলা-কৌশলের দিক থেকেও ছবি তিনটি ধারণাত্মক সুন্দর ও সার্থক। চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি, পরিচালনা এবং শব্দ-ব্যবহার, সংগীতের কাজ অতুলনীয়। সম্পাদনার কাজ ছবিগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃত অণুর মধ্যে কিভাবে এমন উন্নতমানের ছবি সম্ভব—সে কথা ভেবে ভিয়েত কংদের কারিগরি ক্ষমতার প্রতি প্রস্থা জাগে।



'রেওয়াল' ছবিতে আর্ডি 'ভট্টাচার্য'

নাটকের কথা

বঙ্গবিধ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্বব্রূপা মধ্যে মণ্ডলভারতীয় সদস্যরা (ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্মসূচী সমিতির—কলিকাতা শাখার

সদস্যগণ) মণি দত্তের 'শব্দবিধ' নাটক অভিনয় করে। এই নাটকে অসং উপায়ে অর্জিত এক ধনী ব্যবসায়ীর সংসারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। ব্যবসায়ীর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে পিতার উপার্জিত অর্থকে নিয়ে শত্রু হই গোপন চক্রান্ত এবং সেই পরস্পরবিরোধিতায় পাপের ধনের পরিণতি এবং সত্যের জয়ের কথা বলা হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন চিন্ময় বিশ্বাস।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন জীবনলাল ব্যানার্জী, সমর চ্যাটার্জী, গগন মিত্র, কান্দুয়া পাল, প্রভাস দত্ত, প্রদীপ পাল, লীতিকা দাশগুপ্ত, সাধনা পাল, মেনকা দাস প্রমুখ।

লংগীতবীথি

সংগীতবীথির সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে গত ২৯শে ও ৩০শে আগস্ট মহাজাতি সদনে নৃত্য-গীত ও মঞ্চাভিনয় ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাটনার একাঙ্ক নাট্য উৎসব

পাটনা যুনিভার্সিটি কালচারাল এসোসিয়েশন, লার্লস ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আগামী ১৭ই থেকে ১৯শে নভেম্বর পাটনার একটি ইংরাজী ও হিন্দী একাঙ্ক নাট্যকার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নাট্য উৎসবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নাট্যকার ও পরিচালক ব্রজেননাথনাথ মধুপাধ্যায়। সেক্রেটারী ব্রজেন এ সাল্লাম।

পাটনার মগধ মহিলা কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স বিদ্যালয়, সেন্ট জোসেফ কলেজ, সেন্ট মাইকেলস বিদ্যালয়, পাটনা মেডিকেল কলেজ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাণা বং, অশোক ক্লাব এবং অরবিন্দা গার্লস কলেজ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য



বি-কে প্রোডাকশন্সের 'মহাশব্দতা' ছবিতে সৌমিত্র চর্যাচার্য ও অঞ্জনা ভৌমিক

মোটের মহড়া আরম্ভ করেছে। অন্যান্য
স্থানীয় নাট্য প্রতিষ্ঠানরাও যোগ দেবে
আশা করা যায়।

ওনাম উৎসবে বহরুপী

বিহার আর্ট থিয়েটারের বিখ্যাত
মিডাষী নাটক বহরুপী আগামী ১৭ই
সেপ্টেম্বর কেরাল কালচারাল এসোসিয়ে-
শনের বাৎসরিক 'ওনাম' উৎসবে পাটনার
রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। নাটক-
টির জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে
পাটনার আশে-পাশের গ্রাম হতে আগামী
দশহরায় মঞ্চস্থ করবার জন্য তাগিদ
আসছে।

সুডিও শব্দ

চিড়িয়াখানা

ম্যানিলা থেকে ম্যাগসেসে পুরস্কার
নিয়ে আসার পর সত্যজিৎ রায় 'চিড়িয়া-
খানা' ছবির শেষ কাজগুলি করার জন্য

কুমারেশ
লিভার ও পেটের
সীড়ায়

সালফা-ডারমিন
কাটা পোড়া
ব্রন ও চর্মরোগে

রেস্পেরোসিন
সর্দি ও কাশিতে

ও-আর.সি.এল. হাওড়া-৬



রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাউন্ড অব মিউজিক-এর নৃত্যকলা বিভাগের ছাটীদেও
গজরাটি নৃত্যের দৃশ্য।

দ্রাস্ত হয়ে পড়েছেন। ছবিটি শারদীয়
উৎসবের কালে মুক্তিলাভ করবে। এই
ছবিতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব্যোমকেশের
চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার।
'চিড়িয়াখানা' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম
অপরোধমণী ছবি। একটি 'কলোনী'কে
কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী। অন্যান্য যারা
এই ছবিতে আছেন তাদের মধ্যে রয়েছেনঃ
সুশীল মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন
মুখার্জী, শ্যামল ঘোষাল, শ্রুভেন্দ্র
চ্যাটার্জী, প্রসাদ মুখার্জী, নৃপতি
চ্যাটার্জী, কালিপদ চক্রবর্তী, দেবী
নিয়োগী, নীলোৎপল দে, অশোক মিত্র,

বাল্কম ঘোষ, কাগকা মজুমদার, গীতালি
রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুবীরা রায়, কলিন
ম্যান্ডিস। সংগীতের কাজ শ্রীরায় নিজেই
করছেন। ছবিটির প্রযোজক হরেন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য।

ঘাপনজন

তখন ঈশ্বরের পরবর্তী ছবি 'আপন-

জন'-এর মহরৎ গত ৮ই সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া
ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে হয়েছে। ইন্দ্র মিত্র
রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির
চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে।



‘দুস্ট-প্রজাপতি’ ছবিতে কিশোরকুমার ও তনুজা

আন্দোলনে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন কলকাতার মুরুন্দ দাসের যাত্রা ও স্বদেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্র মুরখোপাধ্যায় ও সুপ্রদায়। অনুষ্ঠান উন্মোচন করবেন বোস্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ সত্যী হিরান্ময়ানন্দ। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি করা হয়েছে,— যার সভাপতি হলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্রীশচীনন্দেব বর্মণ।

‘কোরক’-এর অনুষ্ঠান

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ইউনি-ভার্সিটি-ইনস্টিটিউটে হলে সম্ভা সাংসার ‘কোরক’ প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের “ভূ-ধ্বংস” গীতি, নৃত্যনাট্য ও লোক-সঙ্গীত এবং অনুকার প্রযোজিত “পূরবী” একাঙ্ক নাটক অনুষ্ঠিত হবে।

কানাডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

কানাডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

দিনেরন্যব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে কানাডিয়ান হাই-কমিশনারের সহযোগিতায় আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত কানাডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে যে চারটি ছবি দেখান হবে তার মধ্যে রয়েছে (১) হেলিকপ্টার কানাডা, (২) ড্রাইল্যান্ডারস, (৩) মেরীওয়ার্ড অব লিওপোল্ড, (৪) নোবোডি ওরেভড গুডবাই। শোভা ছবিটি ১৯৬৫ সালে ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয়েছিল। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির মধ্যে বান্টার কীটন এবং নর্মান ম্যাকলারেনের ছবি থাকবে।

বোম্বেতে চারপকবি মুরুন্দ দাসের ৯০তম জন্ম-জয়ন্তী

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর বোম্বেতে চার্চগেটে “মাচেন্ট-চেম্বার” হলে দুর্দিনব্যাপী বাংলার চারপকবি মুরুন্দ দাসের ৯০তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে দুর্দিন স্বদেশী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, শিবজেন্দ্রলাল, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি, মুরুন্দ দাস প্রমুখ কবিগণের স্বদেশী গান, যা এক সময় আমাদের স্বদেশী



শুভযুক্তি
২৯
সেপ্টেম্বর

বিক্রম-প্রকাশকমন্ডের
মুকুন্দ

কাহিনী-অবাসক

পিতামহ-মিতালী মুখার্জী-সম্পাদক-রাজেন্দ্রসরকার

দেখানোদ্যত এই কাল সর্বক হওয়ার

উত্তরা. উজ্জ্বলা. পূরবী ও সহরকীর অমর্যচিহ্ন

ইতিহাসের পাতা

সোভিয়েট কার্টুন ফিল্মস

II নম্বর

আইনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পাটমকিন' যখন সারা জগতকে বিস্মিত করছিল আলোড়িত করছিল, তখন সোভিয়েটের নবজাত কার্টুন ফিল্মসের প্রতি নজর দেবার কারো অবসর ছিল না। তখন কার্টুন ফিল্মসের অবস্থা ছিল পাখীর বাসায় শাবকের মত। সাধারণত যে সন্তান অবজ্ঞার মধ্যে বড় হয় হঠাৎ সে পরিবারের লোকজনকে বিস্মিত করে দেয় জীবনের সার্থকতার। সোভিয়েট কার্টুন ফিল্মসের এই অবস্থা।

এমন একটা সময় ছিল যখন শিল্পী ও পরিচালকদের বুঝিয়ে কার্টুন ফিল্মসের কাজে আনতে হয়েছে। ১৯৩৬ সালে ছেলেদের জন্য কার্টুন ফিল্ম করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্টুডিও নির্মাণ করা হয়। প্রথম বছরে সাতটি কার্টুন ফিল্ম তৈরি হয়। সে সময় সারা ইউরোপে এটি ছিল সর্বাধিক বড় কার্টুন ফিল্মস স্টুডিও। এই স্টুডিওর কাজ আরম্ভ হয়েছিল পরীর গল্প, শিশু-সাহিত্য, এবং লোক-গাথা নিয়ে। ছবির অবলম্বন ছিল ব্যাপক, পুঁথিকিনের লেখা গল্প থেকে এন্ডারসন, এবং ভারতের পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী পর্যন্ত।

ক্লেবেলমার শিশুদের জন্য কার্টুন

ছবি করার সমীক্ষণতার মধ্যে না থেকে বড়দের জন্য কার্টুন করার কাজ শুরু হল। গত দশ বছরে এই স্টুডিও থেকে শিশু-চিত্র ছাড়াও দর্শনের তত্ত্বসম্মত কথা, রাজনৈতিক ঘটনার ওপর, কান্য এবং সম-সাময়িক ঘটনাকে নিয়ে শিল্পগদ্যসম্মত কার্টুন নির্মিত হয়েছে। এই ছবিগুলি করতে গিয়ে কার্টুন-চিত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা বিশ্বের কার্টুন-চিত্রের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'লেক্টার কথা'। বিখ্যাত লেখক নিকোলাই লেসকভের লেখা গল্প অবলম্বনে আইভান আইভানভ ভালো ছবিটি করেছেন। মূল গল্প লেখা হয়েছে লোক-গাথার ধরণে। পরিচালক চিত্ররূপায়ণ রীতি নিয়েছেন পুরনো দিনের লোক-চিত্রের অনুসরণে। ফলে সাহিত্যমূল্য ও লোকচিত্রের সমন্বয়ে ছবিটি এক অভিনব রূপ লাভ করেছে।

পরিচালক সেগেই ইয়ুৎকোভিচ এবং প্যাপেট বিশেষজ্ঞ আনাতল কারানোভিচ আধুনিক রীতির অম্লত মূর্তির ধরণে মায়াকভস্কির 'দি বাথ হাউস' ব্যঙ্গ রচনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হলেন।

১৯৬৩ সালে এ্যানোঁস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শিশুদের ছবি 'হু সেইড—মিস্সাও' বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। শিশুদের জালনপালন সম্পর্কিত বিগ

টাবল ছবিটি নির্মিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কনের অনুরূপ ধারায়। শিল্পপটুটি এবং কৌতুহলের দিক থেকে এই পদ্ধতি দর্শকদের ভাল লেগেছে, কারণ গল্পটা বলাই এক ছোট্ট মেয়ে।

রুমানিয়ার গত বছর তিনটি সোভিয়েত কার্টুন পুরস্কার পেয়েছে। এই তিনটি 'বোনিফেসেস হালিড', 'গুজ আর দি ফির কোনস ইন দি ফ্রেন্ড ও দি উইনডো'। বিচারকরা ছবির স্টাইল এবং শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন, বিশেষ করে 'দি উইনডো' ছবিতে স্বপ্ন ও বাস্তবের সন্ধ্যাত চমৎকার ফুটে উঠেছে। মাত্র দুটি চিত্র: এক তরুণ ও তরুণী; কোন কথা তাদের নেই; দর্শকরা শুনেছে কেবল সঙ্গীত। এই সঙ্গীত রচনা করেছেন প্রকোফিভেভ। বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যিক ছবি।

'এ বাণ্ড অব ফ্রাওয়ার্স' এক স্বামীর দশম বিবাহ বার্ষিকীতে দুইটানা সম্পর্কিত কমেডি চিত্র। স্বামী মহোদয় স্ত্রীকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে একটু বিহার করতে যান। বাস্তবীর সঙ্গে আনন্দে সমন্বিত কাটবে মনে করে আগেভাগেই এক-গুচ্ছ ফুল কেনেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তবী আসে না, অনেক ঘটনার পর অগত্যা স্ত্রীকেই সেই ফুল উপহার দেন। 'মাই গ্রীন ক্রোকোডাইল' ছবিটিও বেশ উপভোগ্য। এখানে কাব্য এবং শ্লেষ চমৎকার মিশেছে। এক কুমীরের একটি সুন্দর গল্পের প্রতি ভালবাসার কমিক কাহিনীচিত্র।

এ রকম অসংখ্য ছবির নাম করা যায় বেগুনি কার্টুন ছবির ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও স্টাইলের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত পরিচালকরা তার জন্য আশ্চর্য-সমৃদ্ধি নিয়ে বসে নেই। তারা মনে করেন লেখকের চিন্তা ও কল্পনাকে রূপ দেবার জন্যই এসব স্টাইল ও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারা ছবি করেন মানুষের প্রতি ভালবাসা নিয়ে, মানুষের নৈতিক শক্তির বিজয়ে বিশ্বাস রেখে, জীবনকে ভালবেসে—গভীর আশ্রয় নিয়ে। এই সঙ্গে তারা মনে করেন কার্টুন ছবি এক-ঘেরে হবে না, এবং দর্শকদের প্রতি আবেদনশীল হতে হবে। কারণ ছবি বতই ভাল হোক, বতই টেকনিক্যাল দিক থেকে সুন্দর হোক, উদ্দেশ্য বতই ভাল হোক যদি দর্শকরা তা বুঝতে না পারেন তবে তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলতে হবে।



'অজানা শপথ' চিত্রে গঞ্জকুমার, গাহাড়ী সান্যাল ও শিবানী বসু

‘মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে

মুকুতাংশন



সাধনার

মহাভারত তৈল

মেঘের মত ঘন কুতল কেশদাম নারীদের
আভিলাষের নিলম্বন। তাই কবি বলেছেন—
“তুল তার কবকের অঙ্কুর বিদিশার নিশা”
সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী যাহেই ব্যবহার
করেন সাধনার মহাভারত তৈল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত সিন্দূর ও
শীতল। কেশ উৎসাহনে ও সংরক্ষণে এর
জড়ি দেই।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৬৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন),
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাঙলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি) আয়ুর্বেদশাস্ত্র

কেউ শেখে কেউ শেখে না

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ দেখে শেখে, আর কেউ ঠেকে। অর্থাৎ দেখা আর ঠেকার মধ্যের সম্পর্কটা বড় কাছাকাছি। দেখে না শিখলে, ঠেকে শেখার সম্ভাবনাই থাকে বেশি। কিন্তু বারি দেখে তো শিখবেনই না, আবার ঠেকেও না, তাঁদের কি বলা বাবে?

কি বলা যাবে জানি নে। কেউ জ্ঞানেন বলেও মনে হয় না! হলে অন্তত এইভাবে দেশের সম্মান নিয়ে বিদেশের মাটিতে ছেলেখেলা চলতো না।

কথায় বলে লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়! অর্থাৎ কোন বিষয়েই লজ্জা করা চলবে না—লোকে ঘৃণা করুক কি না করুক কিছু খার আসে না, আর ভয় ও জিনিষটাকে সবার আগেই হাওয়ার মিলিয়ে দিতে হবে!

সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরাজিত নায়ক পর্তোদির নবাব যে এখন শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে হাত ধরা-ধরি করে দিল্লীর কনট প্রেসে ঘুরে বেড়াবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। কারণ ভারতীয় ক্রীড়া কতৃপক্ষের সঙ্গে ভাল দিয়ে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় যে পর্তোদি রাজাজীরও নেই!

থাকলে অন্তত কলঙ্কিত সফরের ঠিক পরেই সর্বজনসমক্ষে এইভাবে তিনি হাজির হতে পারতেন না। অন্তত লজ্জার টানহাই দিয়ে কিছদিন ভো আড়ালে থাকতেন।

কিন্তু ও সব লজ্জা-টল্লা তো আর আমাদের নেই। থাকলে কি আর আমরা কোন তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে ঘুরতে পারি? কিন্তু সব কিছই একটা সীমা আছে—এ কথাটা তো ভুলে শেখে চলে না। চলবেই বা কি করে?

অতীতের শিক্ষাকে কেন আমরা কাজে লাগাই না? আমাদের মনে রাখা উচিত ছিলো যে এর আগের বারের ইংলন্ড সফরে গিয়ে আমরা পর পর পাঁচটা টেস্টে গো-হারা হেরে এসেছিলাম। শূন্য ইংলন্ড নয়—ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও আমাদের একই ফলাফলের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

তবু ইংলন্ডে যবার আগে সে বিষয়ে এতোটুকুও চিন্তা করা হলো না, গুরুত্ব দেওয়া হলো না এতোটুকুও। তাই এবারও ইংলন্ড সফরে গিয়ে ভারত পর পর তিনটে টেস্টে হেরে যেমন হারালো 'প্লাবার' তেমনি খুইয়ে এলো দেশের সম্মান।

অথচ এমন তো হবার কথা ছিলো না। কিন্তু বা হয়ে গেছে তাকে 'গতসা শোচনা ন্যাস্ত' বলে ধরে নিয়ে ভবিষ্যৎ

প্রস্তুতির দিকে নজর দিলে অনেক কাজ হয়।

কিন্তু তা হো হবার নয়! হলে ভারতীয় ক্রিকেটের মান যে অনেক উন্নত হয়ে বাবে। তাই অধিনায়ক পর্তোদি এখন কনট প্রেসের আশেপাশে ঘুরছেন, খেলোয়াড়রা ফিরে গেছেন যে বার বাড়িতে, আর ভারতীয় দলের অযোগ্য ম্যানেজার প্রীতান্মোহের নিজের 'অপসারণ' প্রমাণ করার জন্যে করে চলেছেন বৃষ্টিহীনীর মতো রক্তভা।

কিন্তু কি করলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতি হবে, কেন তাঁরা ইংলন্ডে গিয়ে খেলতে পারেন নি, গলদ কোথায় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যদি অধিনায়ক আর ম্যানেজার আলোকসম্পাত করতে পারতেন তাহলে বৃক্কতাম তাঁরা একটা কাজের মতো কাজ করেছেন।

কিন্তু সে গুড়ে বালি! খেলার উন্নতির চেয়ে বাস্তবত 'স্বার্থ' তাঁদের কাছে অনেক বড়। তাই আজ-বাজে কথার মারপ্যাচে সাফাই গেয়ে নিজেরদের দোষ ঢাকতে চাইছেন তাঁরা। অন্তত ভারতীয় দলের ম্যানেজার যে তাই চাইছেন, এ বিষয়ে আজ আর কারো সন্দেহ নেই।

অথচ তার পানেই দেখা যাবে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ম্যানেজার কর্নেল হিম্ম অধিকারীকে। প্রায় একই সময় ইংলন্ড সফরে গিয়ে ভারতীয় দল যখন দিয়ে এসেছে চরম ব্যর্থতার পরিচয়, ঠিক তখনই ভারতীয় স্কুল দল প্রদর্শন করেছে ক্রিকেট খেলার নরনাভিরাম রূপ। অবশ্য তার পেছনে ছিলো কর্নেল অধিকারীর সুযোগ্য নেতৃত্ব।

দেখে আমরা শিখি না—ঠেকেও না। কিন্তু ইংলন্ড সফরের ঐ শোচনীয় কলাফলের পর দেশের নাম অন্তত কিছুটা রাখতে হলে আলামী অস্ট্রেলিয়া সফরে আমাদের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতেই হবে।

আর সেই জন্যে সবার আগে দরকার এমন একজন ম্যানেজার যিনি প্রয়োজন হলে কোচের কাজও করতে পারবেন। আমাদের মনে হয় হিম্ম অধিকারী, অমরনাথ মানিকম উমরিগড় প্রমুখের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের ওপরই এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

এতে দলের খেলোয়াড়রা নিরমল-বতী হবে, কারণ চট করে তাঁরা ওদের ওপর কথা বলতে সাহস করবেন না। তা ছাড়া কোন খেলোয়াড়ের কি গলদ তা এরা সহজেই ধরতে পারবেন এবং পারবেন

শুধরে দিতে। আর সব থেকে বড় কথা হলো এদের সামনে বর্তমানের খেলোয়াড়রা কোন মতেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না!

তাই আজ ভারতীয় ক্রিকেট কতৃপক্ষের কাছে আমরা বিনীতভাবে আবেদন জানাই যে ভারতের স্বার্থে এবার অন্তত তাঁরা যেন অস্ট্রেলিয়া সফরের ম্যানেজার নির্বাচন-পর্বের আগে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করেন।

দেশের স্বার্থে অনেক সময় যে অনেক কিছই করতে হয়, তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ইংলন্ডের অধিনায়ক রায়াল ক্রোজের দলের অধিনায়কত্ব থেকে অপসারণ আর দলে স্থান না পাওয়া।

অথচ ক্রোজের যোগ্য নেতৃত্বে ইংলন্ড ভারত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ ভালো ফলাফলই প্রদর্শন করেছিলো। ক্রোজ তো ভারতকে পর পর তিনটে টেস্টেই হারিয়ে দিয়েছিলেন।

আর এখন কিছ বছর ক্রোজই যে ইংলন্ডের অধিনায়ক থাকবেন সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই ছিলো না। এও এক বৃক্কম ঠিক ছিলো যে ক্রোজ আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইংলন্ড দল পরিচালনা করবেন!

কিন্তু ক্রোজের এবং সকলের সব আশার মুখে ছাই দিলো ক্রোজের একটি ভুল। খেলার মাঠে অশালীন ব্যবহারের জন্যে ক্রোজকে হারাতে হলো ইংলন্ড দলের অধিনায়কের সম্মান। শূন্য তাই নয় ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী ইংলন্ড দলে স্থান লাভও করতে পারলেন না ক্রোজ!

অথচ এমনটি যে হবে, কে আর সে কথা আগে ভেবেছিল! কে আর ভেবেছিল যে কার্ডিন্ট খেলার সামান্য ঘটনা নিয়ে এমন কাণ্ড হবে!

কিছদিন আগের কথা! খেলা হচ্ছিল ইয়ক'শায়ারের সঙ্গে ওয়ার-উইকশায়ারের। দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ইয়ক'শায়ারের অধিনায়ক ক্রোজ ইচ্ছে করেই চেঁচা করছিলেন খেলা থা করার।

সেই সময় জনৈক দর্শক ক্রোজকে গালাগালি দেওয়ার মাথা গরম হয়ে ওঠে তাঁর। তিনি দর্শক আসনের মধ্যে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের জামার কলার ধরে মারতে যান!

এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। আর তার জের টেনে শেষ পর্যন্ত দল থেকে বাদ পড়লেন রাবার বিজয়ী অধিনায়ক ক্রোজ।

ক্রোজের এই অপসারণ থেকে আমরা কি কিছই শিখতে পারি না...?



কলকাতা ফুটবল লীগ বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং দল

মহামেডান লীগ বিজয়ী

অবশেষে মহামেডান স্পোর্টিং তুলে নিয়ে গেল ১৯৬৭ সালের ফুটবল লীগের সন্মান। সব ভাল যার শেষ ভাল এই কথাই প্রমাণ করে দিল জনের নেতৃত্বে মহামেডানের খেলোয়াড়েরা। কারণ এই মরশুমের সূচনায় মহামেডান হোঁচট খেয়ে যখন লীগের যাত্রা শুরুর করে তখন, তাদের দলের অতি বড় সমর্থকও লীগের চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের আশা ঠিক করতে পারে নি। মোহনবাগানের ভাগ্য-বিপর্যয় এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কয়েকটি বাধার সুযোগের মাঝে লীগের মাঝপথে দেখা গেল মহামেডান স্পোর্টিং এ বছর লীগের অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠেছে। মোহনবাগানের লীগের আশা অন্তর্হিত হল; দৌড় চলল ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডানের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত আঠাশটি খেলায় ৪৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে মহামেডান লীগ চ্যাম্পিয়ান, আর ৪৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রানার্স হয়েই এবার সন্তুষ্ট হতে হল ইস্টবেঙ্গলকে।

ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং দল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ আর গোরা দলগুলির গৌরবসূর্য অস্তমিত হবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কলকাতা ফুটবলের রণমঞ্চে পূর্ণাঙ্গীয় আবির্ভূত হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৮৮৭ সালে নবাবজাদা আমিনুল

ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন জুবিলি ক্লাবের; ক্রিসেন্ট ক্লাব এবং হার্মিডিয়া ক্লাব নাম পরিবর্তন করে শেষে ১৮৯১ সালে সৃষ্টি হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ১৯০৯ সালে কুচবিহার কাপ জিতে মহামেডান কলকাতা ফুটবলে কিছুটা পরিচিতি লাভ করল। ১৯২৮ সালে প্রথম কলকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল মহামেডান দল।

শ্রীঅমিতাভ

কিন্তু কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখে কয়েকটা বছর কাটাতে হল তাদের। ১৯৩০ সালে মহামেডান ক্লাবের ফুটবলকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় এস এ আজিজ। আজিজ সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান পেল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৯৩৪ সালে মহামেডান প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেল। আজিজ সাহেব মরিয়্য হয়ে লাগলেন ক্লাবকে দাঁড় করানোর জন্যে। ১৯৩৪ সালে প্রথম আবির্ভাবেই সকলকে টপকে ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পাঁচ বছর লীগ জয় করে সৃষ্টি করল মহামেডান এক নতুন রেকর্ড। আজ পর্যন্ত এই রেকর্ড স্পর্শ করতে পারে নি কোন দল। একমাত্র পর পর চারবার লীগ জয়ী হয়েছে

মোহনবাগান ক্লাব। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত মহামেডান লীগ জয়ী হয়েছে মোট দশ বার। ইতিপূর্বে শেষ লীগ বিজয়ী হয়েছে মহামেডান দল দশ বছর আগে ১৯৫৭ সালে।

১৯৬৭ সালের শেষ দৃষ্টি মেলার মিলিত হয় মহামেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল রেল এবং মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল রেল খেলা গোলশূন্যভাবে সমাপ্ত হবার শেষ হয়। মাদ্রাজের আনন্দবল বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল রেল আনন্দের বরদসনে টফি জয় করে অড়াটাড়ি বিমানে কলকাতা ফিরে আসেন এই গুরুত্বপূর্ণ খেলার আশা

কিশ্তবন্দিতে ট্রান্সমিটার

মাসিক ২৫ টাকা কিশ্তবন্দিতে টেলিটোন ট্রান্সমিটার। ট্রান্সমিটার ছোট সাইজের অভ্যন্তরীণ প্রস্টিক ক্যাপাসিট ফিট করা। মূল্য ১৬৫ টাকা মাত্র। ২ বৎসরের জন্য গ্যারান্টি প্রদত্ত। আদেশ করুন:

Tokyo Television Co.,
(W. B. C.)
Post Box 1307, Delhi 6

গ্রহণ করার জন্য। দশ বছর পর লাগ জয়ের ফলে এইদিন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-প্রাঙ্গণ সমর্থকদের বাঁধাভাঙা আনন্দের দ্ব্যন্য প্রাপ্ত হয়।

শীল্ডের আসর

শীল্ডের খেলায় গোলের ছড়াছড়ি; এত গোলেও কিন্তু হ্যাট্রিকের অঙ্ক বৃদ্ধি হয় নি। শম্ভু আপ্পালা রাজু লাভ করেছেন শীল্ডের চতুর্থ হ্যাট্রিক। লীগ বিজয়ী মহামেডান দল শীল্ডের প্রথম খেলায় প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়েও শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করেছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে।

গোয়ার ভাস্কা ক্লাব কলকাতা দশক-দের মন জয় করেছে। শীল্ডের প্রথম খেলায় ভাস্কা ক্লাব ৮-০ গোলে পরাজিত করে বর্ধমান জেলা একাদশকে এবং পরবর্তী তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় জলন্ধরের শক্তিশালী লিডার্স ক্লাবকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্সটেব্গলের সম্মুখীন হয়েছে। জর্জ টেলগ্রাফ এবং শিলংয়ের আসাম রাইফেলসের খেলার মীমাংসা হয়েছে দীর্ঘ দু'শো আটান মিনিটে, তিন দিনের খেলার পর। খ্যাতনামা হায়দ্রাবাদ একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় এরিসাল্লের সম্মুখীন হয়। হায়দ্রাবাদের খেলা দেখার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হয়। কিন্তু হায়দ্রাবাদের ভাঙা টিম দর্শকদের নিরাশ করে। যোগ্য দল হিসাবেই এরিসাল্ল ২-১ গোলে হায়দ্রাবাদ একাদশকে পরাজিত করে। খিদিরপুর ৪-১ গোলে উরাড়ীকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউন্ডে মোহন-বাগানের সঙ্গে খেলবে।

খেলার ফলাফল—

পাজাব পদলিশ	০
মহামেডান স্পোর্টিং	১
কালীঘাট	৫
বার্নপুর ইউনাইটেড	৪
বি. এন. রেল	৫
জর্জ টেলগ্রাফ	০, ২, ২
এ. ও. সি সেকেন্দ্রাবাদ	১, ২
ভাস্কা ক্লাব (গোয়া)	৮
লিডার্স ক্লাব (জলন্ধর)	১
ইন্সটান রেল	৮
ভাস্কা ক্লাব (গোয়া)	০
এরিসাল্ল	২
খিদিরপুর	৪

দুই প্রধানের সাক্ষাৎ

এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে দুই প্রধান ইন্সটেব্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের এই মরশুমের লীগের শেষ সাক্ষাৎ হল। এই লীগের ফিরতি খেলা বৃষ্টির জন্য মাক-পথে পরিভ্রমণ হয়। এইদিনও মাঠে অবস্থা ছিল পিচ্ছিল। মোহনবাগান ১-০ গোলে জয়ী হয়ে পূর্ণ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মোহনবাগানের পক্ষে দ্বিতীয়বারে মাত মিনিটে বিজয়-সূচক গোলটি করেন চুনী গোম্বামী। এইদিন মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক কমল সরকার, স্টপার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ এবং পুরোভাগে চুনী গোম্বামীর খেলা অনবদ্য হয়। গোলরক্ষক কমল সরকার তিনটি প্রায় অবধারিত গোল রক্ষা করে মোহন-বাগান দলকে বিগতমুক্ত করেন।

ইন্সটেব্গল দল খেলার সুরুতে মোহনবাগানের গোলে হানা দেয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের আক্রমণের ধার কমেতে থাকে। মোহন-বাগানের পুরোভাগে চুনী গোম্বামী যে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এই পিচ্ছিল মাঠে তা সত্যিই অতুলনীয়।

অনুশীলন কবে শুরু হবে

পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফির খেলা আগামী অক্টোবর মাসের সুরুতেই দিল্লীর মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা যে মনে হচ্ছে আমাদের ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিদের নিদ্রা এখনও ভগ্ন হয় নি। খেলা হতে এখন মাত্র দিন পনেরো বাকি। এর মধ্যেই কবেই বা হবে ইন্সাল, কবেই বা হবে অনুশীলন আর

কবেই বা হবে দল গঠন। বা বোঝা যাচ্ছে পূর্বের মত এবারও কোনক্রমে একটা দল খাড়া করে দিল্লীর মাঠে পূর্বাঞ্চলকে পাঠান হবে। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় মধ্যে দিল্লীর মাঠে খেলতে নেমে আমাদের খেলোয়াড়েরা যে কতটুকু নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারবেন তা জানি না। অবশ্য আমাদের ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিরা হয়ত বলতে পারেন যে, বৃষ্টির জন্য খেলোয়াড়দের অনুশীলন করাবেন কোথায়। অনুশীলনের একটা স্থান অবশ্য আছে ইন্ডেনের ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একফালি জায়গা। কিন্তু ওই জায়গায় ছেলে খেলা চলে ক্রিকেট অনুশীলন চলে না। যাদব-পুরের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একবার পূর্বাঞ্চল ক্রিকেটের অনুশীলন অবশ্য হয়েছিল কিন্তু এবছর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চল ফুটবল প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে বলে যাদবপুরের স্টেডিয়াম পাওয়া যাবে না। এই সমস্যা মনে পড়ছে সি. এ. বি'র একজন তথ্য-কথিত হোমরা চোমরা কর্মকর্তার বড় বড় কথা। বছর দুয়েক আগে তিনি অনেক বড় মুখে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে কলকাতায় ক্রিকেট অনুশীলনের জন্য একটা নয় দুটো নয় খান তিনেক ইন্ডোর স্টেডিয়াম হবে।

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে তখনও আমাদের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন খবরই পাওয়া যায় নি দলীপ ট্রফির প্রায়াল সম্বন্ধে।

সেন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত

সেন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত ১লা জানুয়ারী ইন্ডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ভারত-ওয়েস্ট-ইন্ডিজের টেস্ট খেলার আসরে যে হাঙ্গামা হয়, তার তদন্তের জন্য বিচারপতি প্রী কে, সি, সেনের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। সেন তদন্ত কমিশন প্রায় ১৮১ জনের সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে ক্রীড়াসংস্থা-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ দর্শক, ক্রীড়ামোদী এবং অন্যান্য সংস্থার লোকজন ছিলেন।

সেন কমিশনের ১৯৪ পাতার রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে ১লা জানুয়ারীর ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে ক্রিকেট এ্যাসোস-

সিগ্রেসন অব বেঙ্গালকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সি, এ, বি নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার জন্য যদিও সমস্ত দোষ পদলিখের ওপর চাপাতে চেয়েছে তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রাথমিকভাবে দায়ী হল সি, এ, বি-ই। সি, এ, বি-র চরম অব্যবস্থা এবং তাদেরই দোষে মাঠের মধ্যে অভাবিক ভিড় ১লা জানুয়ারীর হাঙ্গামার অন্যতম প্রধান কারণ। এরপর পদলিখের দর্শকদের ওপর বেরোয়া লাঠি-চালনা, একজন দর্শক প্রীতীতেশ রায়ের ওপর অমানুষিক আক্রমণ এবং পরে দর্শকপূর্ণ খেলার মাঠের মধ্যে চিয়ার গ্যাস ফাটানো অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে।

সেন কমিশনের রিপোর্ট ভবিষ্যতের টেস্ট ম্যাচগুলির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধেও কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব রাখা হয়েছে। হোমগার্ডদের খেলার মাঠে আসা বন্ধ করতে হবে; মাঠে থাকবে অল্প সংখ্যক পদলিখ এবং একদল স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। সি, এ, বি-র কর্তৃত্বভার রাখলেও সরকারের ক্ষমতা থাকবে কয়েকটি বিষয় নিয়ন্ত্রণের।

এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে সেন তমস কামিশনের রিপোর্ট সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। আগামী সংখ্যায় রিপোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

অরুণ ঘোষ সম্মানিত

জ্যেষ্ঠ অরুণ ঘোষের পক্ষ থেকে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য বি, এম, রেল দলের অরুণ ঘোষ ফুটবলার অফ দি ইয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি সর্বভারতীয় ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জুন প্রদর্শনকারী স্মারক সম্মানিত হয়েছেন।

নীতিন রায়ের বিশ্ব রেকর্ড

ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করে এক নতুন বিশ্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করেছেন সাতাশ বৎসর বয়স্ক সাতারু বাংলার নীতিন রায়। এবার নীতিন রায় ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমেছিলেন এপার-ওপার সন্তরণ করার জন্যে। কিন্তু ফ্রান্সের উপকূলে উপনীত হবার পর



নীতিন রায়

পেশী সংকোচন এবং ব্যকের ব্যথার জন্য তিনি তাঁর সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য এই সময়ে তিনি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ইংল্যান্ডের সেরগুয়ার বে থেকে যাত্রা সুরু করে দশ ঘণ্টা একুশ মিনিট সন্তরণের পর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে তিনি ফ্রান্সের উপকূলে উপনীত হন। ইতিপূর্বে বিশ্ব রেকর্ড ছিল কানাডার হেলোজ জেনসেনের; সময় ছিল দশ ঘণ্টা তেইশ মিনিট। অবশ্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দ্রুততম রেকর্ড হল ইংল্যান্ডের ব্যারী ওয়াটসনের। ১৯৬৪ সালে ওয়াসটন ফ্রান্সের দিক থেকে সাতারু দিয়ে ন'ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে চ্যানেল অতিক্রম করেন। বাংলার নীতিন রায়ই প্রথম ভারতীয় সাতারু যিনি ১৯৬১ সালে

প্রথম ইংলিশ চ্যানেল এপার-ওপার করেন প্রথমে ফ্রান্সের দিক থেকে যাত্রা সুরু করে।

বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক

ভারতীয় বঙ্গোপাধ্যায়ের

হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

বাড় ও বরা পাতা

(কাপড় ও মোর্টে বাঁধা

মুদ্রণ সংস্করণ)

মূল্য—৩ ০০ টাকা

বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর হাড়লো।
প্রত্যদিনের কতো দুশ্চিন্তা, এতদিনের
কতো দুর্ভাবনার অবসান। আশা-
নিরাশার দোলায় আর দুলতে হবে না।
আর নেই কোন চিন্তা, নেই কোন ভাবনা।
আজ শুধু আনন্দ-হাসি-গান। ফিরে
পাওয়ার আনন্দ।

আর সেই আনন্দ মজলিশের নায়ক
হলেন অধিনায়ক জন। উদ্যম উচ্ছলতায়
উদ্বেলিত হৃদয়ে জন উত্তেজিত। কিন্তু
এ উত্তেজনা উৎসাহের, এ উত্তেজনা
মানবের!

১৯৩৭ সালে পেয়েছে, ১৯৪৭ সালে
খেলা হয় নি, তাই পেয়েছিলো '৪৮
সালে, তারপর পেয়েছে ১৯৫৭ সালেও।
নতুনরা ১৯৬৭ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন-
শীপের সম্মান তাদের একান্ত অপরি-
হার্য!

আর শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্ব চাপলো
অধিনায়ক জনের ওপরই! সে দায়িত্ব
সম্বন্ধে জন যে কতোটা সচেতন
ছিলেন, তার প্রমাণ লীগের খেলায়
মহামেডান স্পোর্টিং দলের স্থান! ১৯৬৭
সালের লীগের খেলার অপরাধিতভাবে
চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব অর্জন করেছে
মহামেডান স্পোর্টিং।

আর গত রবিবার ১০ই সেপ্টেম্বর
হয়েছে সকল দুশ্চিন্তার অবসান। হয়েছে
অধিনায়ক জনের স্বপ্ন সার্থক। দীর্ঘ
দশ বছর পরে জন আবার মহামেডান
স্পোর্টিংকে নিয়ে এসেছেন কলকাতা
ফুটবলের লাইম লাইটে!

অথচ কি বা আর বয়স জনের, কি
বা তার অভিজ্ঞতা? কলকাতার অভিজ্ঞ
আর নামী খেলোয়াড়দের তালিকায় এখনো
তো জন নিজের নামটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে
পারেন নি!

আর জনের কলকাতা আগমনও বেশি
দিনের নয়। সব দু'টো বছর পুরেছে।
১৯৬৪ সালে ঊরুগু কাপের খেলার পর
মহামেডান স্পোর্টিং দল তাকে নিজের
দলে খেলার জন্যে আহ্বান জানালেন!

কলকাতায় ফুটবল খেলার আমন্ত্রণ
পায়ে ঠেলার ক্ষমতা বোধহয় কোন ভারতীয়
কোন ফুটবলারেরই নেই। বাংলা দেশের

পরিচায়ত্রে

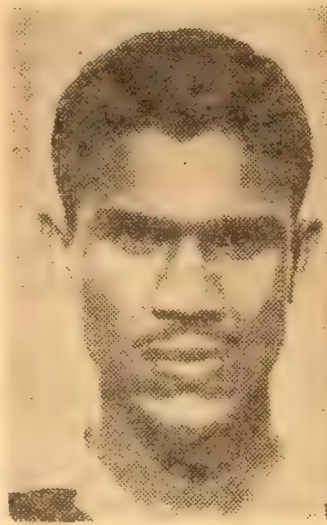
বাইরের সব খেলোয়াড়ই স্বপ্ন দেখেন
কলকাতার মাঠে খেলার! সর্বভারতীয়
সম্মান আর কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে
তাদের কলকাতায় খেলতেই হবে!

তাই এক ডাকেই মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়

প্রীশান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জন পুন্য ছেড়ে এসে হাজির হলেন
কলকাতায়।

তারপর মধ্যে গেছে ১৯৬৫ আর
'৬৬। '৬৭ সালে মহামেডান স্পোর্টিং
দলের অধিনায়কের দায়িত্ব চাপলো জনের



লীগ বিজয়ী মহামেডানের অধিনায়ক জন

ওপর। চাপলো প্রতি দশকের সপ্তম সালে
ক্লাবের চ্যাম্পিয়নশীপের ধারাটি অক্ষুণ্ণ
রাখার।

খেলোয়াড় জন স্টপার, আর অধি-
নায়ক জন দলীয় ফুটবলের কর্ণধার।
দলের পুরো দায়িত্ব মাথার ওপর নিয়ে
একের পর এক খেলায় জন দিয়েছেন
প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়।

প্রতিপক্ষ দলগুলির সমস্ত আক্রমণ-
ধারা প্রতিহত করে অধিনায়ক জন মহা-
মেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগে হিমা-
লয়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিজের দলকে
রক্ষা করতেন সমস্ত আক্রমণের ঝড়
থেকে!

জনের খেলায় আছে অশ্রুত আশ্চ-
নির্ভরতা, আছে তাঁর মনোবলের সঙ্গে
মিলেমিশে একাকার হয়ে সংগ্রামী খেলো-
য়াড়ের রূপ! অপরূপ, নয়নাভিরাম তাঁর
ভীষণতা। ফুটবল রণাঙ্গনে একাই একশ
হয়ে দক্ষ নাবিকের মতো জন একভাবে
সামলে চলেছিলেন মহামেডান স্পোর্টিং
দলের অগ্রগতির হাল।

ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলার
ওপর জনের ছিলো ভীষণ আগ্রহ। ফুট-
বলের মধ্যেই বোধহয় নিজেকে খুঁজে
পেয়েছিলেন জন। আর সেই স্কুলে
পড়ার সময় থেকেই শুরু হয়েছিলো তাঁর
খেলোয়াড় জীবন।

তবে বড় খেলায় জনের যোগদান
খুব একটা বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু
তার থেকে অনেক বড় কথা হলো,
খেলোয়াড় হিসেবে জনের এই প্রতিষ্ঠা
লাভের পেছনে আর এক জনের অবদানের
কথা! পূনার কোচ তুলসীরামই নিজের
হাতে করে গড়েপাঠে জনকে তৈরি
করেছেন দুর্দমনীয় খেলোয়াড় হিসেবে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় জন
ছিলেন মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়। এ ছাড়া
ভারতের প্রায় প্রতিটি নাম করা প্রতি-
যোগিতায় যোগদানের সুযোগ ঘটেছে
জনের। সেই সঙ্গে জন সঞ্চয় করেছেন
অপরিসীম অভিজ্ঞতা!

কিন্তু খেলা শেখা আর অভিজ্ঞতা
সঞ্চয়ের শেষ নেই। তাই জন আজো
ছাত্র—ফুটবল খেলা আরো ভালোভাবে
শেখার উৎসাহে জন বিভোর।

মহামেডান স্পোর্টিং দল পরিচালনার
দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়েছে সত্যি, কিন্তু
অধিনায়ক জনের মধ্যে আজো আছে খেলা
শেখার উৎসাহ!

কলকাতা ময়দানের তরুণ খেলোয়াড়-
দের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর নিয়ে
স্টপার জন আছেন ভারতীয় ফুটবল দলের
প্রতিনিধিত্ব করার আশায়! জানি তার
আর বেশি দেরি নেই। মহামেডান
স্পোর্টিং দলের অধিনায়ক জনকে হয়তো
খুব শীঘ্রই দেখা যাবে ভারতীয় ফুটবলের
মধ্যমাণি হিসেবে! দিন আগত ঐ.....!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে প্রীসকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

ধনুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত।
বহু আয়াসে তান্ত্রিকের প্রাচীন দৃশ্যপা পুথির সংগ্রহশালা,
কাশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল
গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মশাস্ত্র
প্রচার-বৃত্তি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (স্ববোধিনী-
টাকা সংযুক্ত)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান
ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবক্ষিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোন্নয়ন :

বশিষ্ঠানন্দ পরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিষয়-প্রসঙ্গ-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
অনূদিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি
খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত
ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা।
৩য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, শরৎসংহিতা, বৃক্ষসংহিতা, অষ্টাবক্র-
সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, দস্তাভ্রেরপ্রোক্ত যোগরহস্যম্,
পরশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দৃশ্যপা সাতবানি যোগী
গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও রোডে বাঁধ।
মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয়
নিস্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত।
মহামূল্য বতের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০
পরস।

শাস্ত্রল্যঙ্গন :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২-০০ টাকা।

ক্লিয়াকান্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বত্র হইতে সঙ্কলিত।
সংবোধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে
মুদ্রিত অর্থি সংকলনানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই
নিরাট গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয়
হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃতা প্রকরণ, পূজা
প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত্ত প্রকরণ,
যজ্ঞ প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সম্মিলিত মূল বিষয়-
সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০
টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (বন্ধন)।

তৃতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (বন্ধন)।

শবন-বিজয়-স্বরোপন :

বায়ু জয়ই যে গর শ্রেণী মাঘনা। অলৌকিক মত
নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিদ্যার শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-
নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পরস।

পদ্যচরণ রনোন্নয়ন :

(দুর্লভ তাত্ত্বিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায়)।
মূল্য—৩-০০ টাকা।

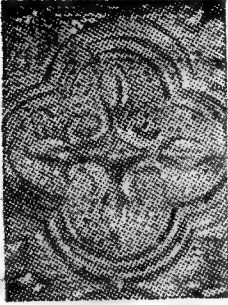
যোগী রাজবল্লভ :

যোগীপ্রবর মহাশি শ্রীযজ্ঞবল্লভ বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত,
বঙ্গানুবাদ ও বাধ্যাসম্বন্ধিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

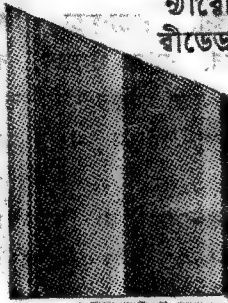
গণ্ডতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্য, শ্রীগয়ামাহাত্ম্য, শ্রীঐন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য
শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্য, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য। মূল সংস্কৃত ও
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকাশীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০
টাকা।

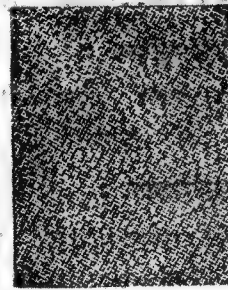
আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন



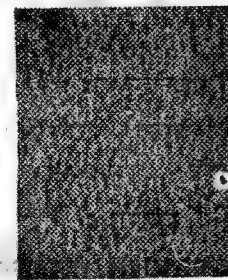
মরেক্স



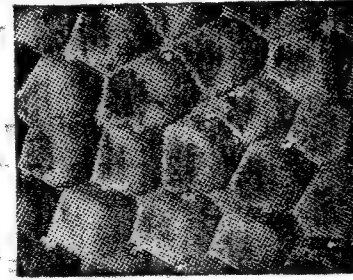
চারো বীডেড



মরক্কো পিনহেড



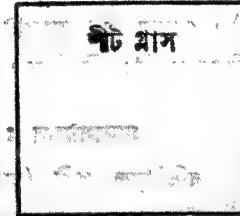
রাফকাস্ট



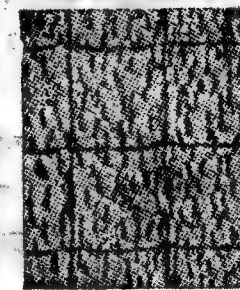
হামার্ড



হেল্প্যাগোনাল ওয়্যারড



শিট গ্লাস



জর্জিয়ান ওয়্যারড

ম্যানেজিং এজেন্টস
ডালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিডিং
৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১০

সাপ্তাহিক বঙ্গুমতী

থান্ডের দাবিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

পাল্টা বিক্ষোভকারীদের প্রতি

পুলিশের লাঠিচার্জ



২ বর্ষ: ১৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

28th Sept., 1967 * Vol. 72, No. 1



হাবির মত মদ্য হার তাকেই বলি চিত্রময়ী।

কামিনী প্রাণ

ছোয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।

বোরোলীন হাউস, কলিকতা-৩



বিষয়	মূল্য						পৃষ্ঠা
জন্মপাণ্ডকীয়	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৩
আজকের মানুস	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৪
জন্মদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৫
জীবনব্য	১০০	চন্দ্রপুস্ত				১০০	১৬৬
ভারতদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৭
আন্তর্জাতিক	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৮
গ্রন্থমেলা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১৬৯
মা দেবোহি, মা পেয়োহি (স্মৃতিচরন)	১০০	— সুধীরজন দাস				১০০	১৭০
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	১০০	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য				১০০	১৭১
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	১০০	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহিড়ী				১০০	১৭২
ভোমার প্রতিমা (গল্প)	১০০	— জুবায়ের রামচৌধুরী				১০০	১৭৩
নদী জপমালা (স্রবণ-কাহিনী)	১০০	— জ্যোতি চৌধুরী				১০০	১৭৪

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের
ধর্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫০

প্রফুল্ল রায়ের
কিন্নরী ৪৥ পূর্ব পার্বতী ১১২

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
পূর্বাচল ১১০

সৈয়দ মুজিব আলী
পছন্দসই ৭০

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জুকসারী কথা ৮৥

অনাক্ষর
সুবর্ণরেখার তীরে ৫৥ বহুবলয় ৮৥

হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের
মল্লমধুর (রম্যরচনা) ৪৥

জরাসন্ধের
লৌহকপাট ২০০

চারিখণ্ড একত্রে : শোভন সংস্করণ

জরাসন্ধের
পরশমণি ৫০

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পূণ্যতীর্থ ভারত ১০০

বিশ্বনাথ কবির

যাদুকর ৫৥

শঙ্কর মহারাজের

গিরিকান্তার ৯০

সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের তিন তীর্থ ৩৥

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সাঁঝের মল্লিকা ৫০

উদ্যোতক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ৫০

—ছোটদের—

রামচৌধুরীর

উপেক্ষিকিশোর গ্রন্থাবলী ১০০

[চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—সমস্ত মৌলিক রতিন চিত্র সহ]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমল্লভদ্রার

ঠাকুরদার বুলি ৪০

ঠাকুরদার বুলি (নতুন সংস্করণ) ৪৥

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪০

আশাপূর্ণা দেবীর

সেই সব গল্প ৬৥

[চিত্র গল্পসংকলন]

দাদামশাইয়ের খালে ৪৥

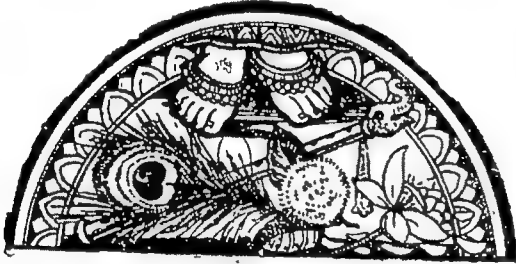
মিষ্ণ ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ : ৩৪-৮৭৯১



লেখক

পৃষ্ঠা

বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (উপন্যাস)	—	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৫	২০০	১০০০
অগ্নিসংগের একটি অধ্যায়	১০৫	—	অনন্ত সিংহ	২০০	১০০০
সাবাস গোলাম, সাবাস (কবিতা)	১০০	—	উলুখড়	২০০	১০০৬
একমাত্র জৈবিক চর্চায় (কবিতা)	২০০	—	নন্দিতা ভৌমিক	২০০	১০০৬
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	১০০	—	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২০০	১০০৭
স্বপ্নমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	১০০	—	শিল্পাল	২০০	১০১১
স্বপ্নমঞ্চ	১০৫	১০০	১০৫	১০০	১০১৪
পাঠকমন	১০৫	১০০	১০৫	১০০	১০২০
বৈশাখ	১০৫	—	শ্রীঅমিতাভ	১০০	১০২১
পরিচয়	১০৫	—	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	১০২৪



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির গম্যাকিনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিরসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য বোল টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমদ্বিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩.৫০

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩.৫০

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-
কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ভূতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাখ্যা এই রাজ্য
ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে
তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

সাপ্তাহিক চিহ্ন



৭২ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায়

প্রচারিত

সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE

Thursday, 28th September, 1961

শারদোৎসব সমাগত

শারদোৎসব সমাগত। কিন্তু উৎসবের আনন্দ কই? শহরে না হোক, গ্রামময় বাংলার দিকে দিকে ফুটেছে এখন কাশফুল; সন্ধ্যার আগমনে নিঃশব্দ বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ সেখানে পবিত্র করে তোলে মন, আকাশের নীলিমায় ছিন্ন মেঘের ভেলায় উদাস হয় চিত্ত।

এমন একদিন ছিল, বাংলা দেশের কবিরা শবৎকালের ঋতুতে শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। এই শারদোৎসবেই খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মিলন-সূত্রটি।

সেই দিনগুলি এখন যেন আমাদের জীবন থেকে অন্তর্হিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য আজো যেটুকু আছে, মনের সঙ্গে তাব যোগ সামান্যই।

হয়তো প্রকৃতিব সৌন্দর্য-এর পাশাপাশি তার নিষ্ঠুরতাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এক শ্রেণীর মানুষও প্রকৃতির প্রতি করুণায় নয়। প্রকৃতিকে আমবা জয় করতে চেয়েছি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি মৃত সত্য যে, ভরাবহ ঋতুর মারণাস্ত্রে এক শ্রেণীর মানুষ প্রকৃতিকে ঝুঁড় ঝুঁড় করে হত্যা করেছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে প্রকৃতির মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আমরা লক্ষ্য করছি, তা স্বভাবজ কি না। এক শ্রেণীর মানুষই কি এব জন্মো দাষী নয়? তাদেরই স্বার্থপরতার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পরস্পর মিলন-সূত্রটি কি ছিন্ন হচ্ছে না?

আব এক দল মানুষ আছে, শারদোৎসবের গৌরবকে যাবা ক্ষুণ্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসবের লক্ষ্যে চারটিটি এদের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসব নাটক-প্রসঙ্গে বলেছেন :
‘তাই নব ঋতুর অভ্যাসে যখন সমস্ত

জগৎ নতুন রঙে উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে; সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ না লাগে, কোন গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষ্যস্বর—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সবলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে।’

আমরা এমন এক কালে বাস করছি যখন দেখা যাচ্ছে চারিদিকে নিবন্ধের হাহাকাব, অর্থনৈশ নাবী ও পুরুষের লক্ষ্যনত মুখ। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ অপ্রলিহ সৌধের সর্বোচ্চ কোঠায় বাস করে শূন্যতে পায় না এই কাল্মা, আর অর্থনৈশ মানুষের লক্ষ্য কাড়তে এদের মতো দক্ষ পুরুষ আর নেই। কিন্তু কে না জানে, কিভাবে গড়ে উঠছে এ সৌধ, কাদের ঘামে সিঞ্চিত হয়েছে প্রতিটি ইঞ্চিক্ষণ্ড।

আর কে অমনভাবে বলবে, সোনার বাংলা আমি তোমার ভালোবাসি। সোনার বাংলা তো এখন ওজন কবা সোনার গোপনে সিঞ্চিত থাকছে খনিকের গহু।

কবিই বলেছেন, মাতৃহা বা মা যদি না পাষ, তবে আজ কিসের উৎসব।

সোনার বাংলাকে আমরা যদি মাতৃ-রূপেও পজ্ঞা কবি, এবং সেই মায়ের চরণ

ফেলার চিহ্নে যদি তার সন্তানের অধিকার না থাকে, সোনার বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত শরণ সৌন্দর্য তার সন্তানকে যদি শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা দান করে—তাহলে শারদোৎসবে সড়া দেবে যে? শারদোৎসব তো খনিকের মন যোগাবার একমাত্র দুলভ বস্তু নয়। আর এই শারদোৎসবের মণ্ডকায় গরীবের দুঃখ-দৈন্য অধিকতর বাড়িয়ে চতুর্গুণ মদ্যফা লাভ করে অসাধুর দল।

সমাজে আজ আকাশ-পাতাল ফারাক, রাষ্ট্র-পরিচালনাতেও অস্বার্থপর ভাব। এই অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষ হচ্ছে পিষ্ট পদদলিত।

এই দুরবস্থা থেকে মানুষকে উদ্ধার করবে কে? শারদোৎসবকে ফিরে পাবার সাধনা আছে কোনখানে? আবার কবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হবে? আর সেই সম্পর্ক স্থাপনের পুরোহিত হবেনই বা কে? লোভ এগল এমন করালগ্রাস নিরে দণ্ডায়মান যে—সে শারদোৎসবকেই গলাধঃকরণ করতে চায়।

তাই শারদোৎসবকেই আপন বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এব মগেই আছে আমাদের দৈন্যমুক্তির মন্ত্র, বন্ধনের থেকে বন্ধনছেদনের আনন্দ। যদিও পুণাতন স্মৃতির মধ্যে শারদোৎসবের যে আনন্দ বিবাজমান, তাকে বাস্তবে ফিবে পাওয়া আজ সম্পূর্ণ সম্ভব নয়, তবু লোভের অবসান হলে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। সেই স্বস্তির মধ্যে সে ফিবে পাবে তার হারানো ধন—স্বার্থ শারদোৎসব।

সিঙ্গাদকী

ভোগ্যের মানুষ

উঁচু পদের পুরস্কার আজকাল যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় কোথায়? বিশেষত পদটির যদি রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে। গৃহপন্য, যোগ্যতা বা প্রার্থীর কর্মক্ষমতার চেয়েও সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থটাই বড়, পদের টোপ গিলিয়ে প্রার্থীকে হাতে রাখার চিন্তাই সেখানে প্রধান। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে কনৌলিউ মানেস্কুর নির্বাচনের পেছনেও রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা বা স্বার্থ স্বত্থানি কাজ করেছে, তাঁর যোগ্যতা ক্ষমতা ততখানি নয়। যেহেতু রাষ্ট্রসংঘ একটা বিশ্বসংগঠন, সেহেতু মানেস্কুরকে ব্যক্তিগতভাবে খুশি করার প্রশ্ন ছিল না, ছিল তাঁর দেশ সদস্য-রাষ্ট্র রুম্যানিয়াকে খুশি করার।

পূর্বে ইয়োরোপের ছোট দেশ রুম্যানিয়াকে খুশি করার, তাকে পুরস্কৃত করার প্রয়োজন বোধ করেছে রাষ্ট্রসংঘের ইংগ-মার্কিন শিবির, বোধ করেছে সোভিয়েট শিবিরও। কারণ রুম্যানিয়া যে চীনের অন্তরঙ্গ ইয়োরোপীয় বন্ধু-রাষ্ট্র, যে চীনের সামাল দিতে দুই শক্তিশিবিরই হিমসিম খাচ্ছে। এ অবস্থায় রুম্যানিয়াকে তো হাতে রাখতেই হবে, মন পেতে হবে না চীনের?

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, মানেস্কুর রুম্যানিয়ার বাম-শ্যাম-বদ-মধুর চেয়ে বেশি কিছু নয়! কূটনীতিক হিসেবে মানেস্কুর অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। অপর পক্ষের বক্তব্যে যতই যুক্তি থাকুক না কেন, নিজের সরকারের নীতি যে নিভুল এবং বেশি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বশান্তির সহায়ক—মিঃ মানেস্কুর যে কোন দেশের কূটনীতিককে একথা বোঝাতে বেশি সময় নেন না। অপর রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর কথা তিনি চিন্তাই করেন না, কিন্তু তাঁর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি যে আরো ভালো ও উপযোগী এ যুক্তিতেই তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকেন। সাধারণ পরিষদে যখন এবার পশ্চিম এশিয়া সংক্রান্ত বিতর্কমূলক বিষয়টির আলোচনা হতে চলেছে তখন সমাজতান্ত্রিক, ছোট-নিরপেক্ষ, আফ্রোশীয় এবং লাতিন আমেরিকার দেশগণের মিঃ মানেস্কুরকে

সভার সভাপতি পেনে অবশ্যই উৎসাহিত বোধ করবে। সেজন্যই তো সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছেন রুম্যানীয় মানেস্কুর নাম। সভার কাজ পরিচালনা করা ছাড়া অবশ্য মিঃ মানেস্কুর আলাদা কিছু করার অবকাশ অল্পই, তবুও পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে বিরোধ মীমাংসায় তিনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করবেন—এ ভরসা আছে বহু সদস্যরাষ্ট্রের।

রুম্যানিয়ার প্রায়োন্সিত্তে ১৯১৫ সালে মানেস্কুর জন্ম। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করেছেন এবং এ বিষয়ে একজন



মানেস্কুর

বিশেষজ্ঞ বলে অল্প দিনের মধ্যে স্বীকৃতিও লাভ করেছেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বশীল পদে কাজও করেছেন বহুদিন। কিন্তু বড় পদ পেলেন তিনি অনেক দিন পরে, ১৯৪৮ সালে। এবং সে পদও তাঁর অর্থনীতিবিদের স্বীকৃতিসূচক নয়, তাঁকে লেঃ জেনারেল করে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দপ্তরে উপরাষ্ট্রীয় পদ দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর এ পদে থাকার পর তাঁকে নিজের ক্ষেত্রে

ফিরিয়ে আনা হয়েছিল পরিকল্পনা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট করে।

মানেস্কুর কূটনীতিক জীবনের শুরু এই সোদিন মাত্র, ১৯৬০ সালে। প্রথমে বেশি দূরে তাকে পাঠানো হয় নি. প্রতি-বেশ সমমতাদর্শী রাষ্ট্র হাঙ্গেরীতে রাষ্ট্র-দূত করে। তাও মাত্র এক বছর। তারপর তাঁকে বৈদেশিক দপ্তরে প্রধানের পদ দেওয়া হলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মিঃ মানেস্কুর অপরূপ যোগ্যতা দেখিয়েছেন। এ পদে থেকেই তিনি রুম্যানিয়ার বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছেন, যেনীতির বিশেষত্ব এখানে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট শিবিরে থেকেও রুম্যানিয়া করেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বৈদেশিক নীতিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অস্বভাবে অনুসরণ করে না, নিজস্ব স্বাধীন নীতি মেনে চলে।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি-নিধিদের কাছেও মানেস্কুর মনুষ্যতা অপরি-চিত নয়, বহুবার তিনি এখানে তাঁর দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আন্তর্জাতিক সমস্যার ওপর জালামারী ভাষণ দিয়েছেন। বস্তুত গত ১৯৬১ সাল থেকে তিনিই রাষ্ট্রসংঘে রুম্যানিয়া প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করে এসেছেন। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং বক্তব্য উপস্থাপনে তাঁর বিশেষ ক্ষমতার জন্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তাঁকেই পাঠানো হয়েছে রুম্যানিয়ার পক্ষ থেকে, ১৮-রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেও তাই মানেস্কুরকেই দেখা গিয়েছে বার বার।

কনৌলিউ মানেস্কুর বিবাত দায়িত্ব নিয়েছেন, ১২১টি রাষ্ট্রের বিশ্বসংস্থার সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট তিনি আজ। পশ্চিম এশিয়া প্রশ্নগণি হিতপূর্বে নিরা-পত্তা পরিষদে আলোচিত হয়েছে, তর্ক-উত্তাল ঝড় উঠেছে, মীমাংসা হয় নি। ইন্টারেল তার যুদ্ধের পুরো ফল ভোগ করতে চায়, যুদ্ধ করে যে পররাষ্ট্রগুলো দখল করেছে তা স্বীয় অধিকারে রাখতে চায়, আরব পক্ষ তা মানতে রাজী নয়, তারা চায় ইন্টারেল যুদ্ধপূর্বে সীমানায় ফিরে যাক। রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব এই দুই পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের। মিঃ মানেস্কুর কি তা পারবেন? অবশ্য সাধারণ পরিষদের সম্মুখে ইন্টারেল মেনে নেবে এমন ভরসাও কম। তবুও নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগতপূর্বে, সুপ্রভাব খাটিয়ে যদি কিছুটাও লাভ করতে পারেন তার মূল্যও কম হবে না।



কংগ্রেসের মিছিল

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার কংগ্রেস দল আয়োজিত একটি বিরাট মিছিল খাদ্যের দাবিতে রাইটার্স' বিন্ডিংসে অভিযান করে। এ দৃশ্যটি অবশ্য আমাদের কাছে নতুন। কেন না যে দল ইতিপূর্বে এই 'রাজপথের রাজনীতিতে' আত্মশাশীল নয় বলে বারবার সাড়বরে ঘোষণা করেছে, সেই দলের তরফ থেকে খাদ্যের দাবিতে রাইটার্স' বিন্ডিংস ঘেরাও-এর ঘটনা নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে মিছিলে যে রকম জনসমাগম আশা করা গিয়েছিল প্রকৃত জনসমাগম তার থেকে অনেক বেশি হয়েছিল, এটা অবশ্যই মিছিলের উদ্যোক্তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। কংগ্রেস যে এতদূরীণ লোক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল তার কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্রাব্ধ খাদ্যনীতি এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে অক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার অর্থাৎ হচ্ছে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি দেশশাসনের চেয়ে নিজেদের ঘর গোছানোর ব্যাপারে বেশি তৎপর হওয়ায় একদিনের পরিত্যক্ত কংগ্রেস যে ধীরে ধীরে শক্তিবৃদ্ধি করেছে এবং বর্তমান অবস্থা চললে, তারা যে রাজনৈতিক আসরের পুরোভাগে একদিন আবার হাজির হবে, যুক্তফ্রন্ট নেতারা এটা বোধহয় খোয়াল করছেন না।

তবে মিছিলে প্রচুর জনসমাগম করাটাই প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক নয়, কেন না যে কথা আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি, এইরকম বড় বড় মিছিল অন্যান্য পার্টির আওতায় বহুবার বাব করেছে, আর দুই কমিউনিস্ট পার্টি তো পরম্পরের সংগে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ময়দানে বিশাল বিশাল জনসমাগম ঘটানোর ট্রাডিশন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে সম্পর্কেও আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে, লোক জড়ো করলেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তার উৎস অন্তর। এগুলির প্রদর্শন মূল্য ছাড়া আর কিছু নেই। বিরাট মিছিল একথা প্রমাণ করে না যে, লোকেরা যুক্তফ্রন্টকে বরবাদ করে কংগ্রেসের নামিলা হয়েছে। তা ছাড়া এই মিছিল বার করার পিছনে খাদ্যের দাবি ছাড়াও আরও কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যবক্ষারও একটা প্রয়োজন ছিল, কেন না পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পরের দিন অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দার কলকাতায় আসার কথা ছিল এবং শ্রীনন্দা এসেও ছিলেন। শ্রীনন্দার সামনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সংগঠনের শক্তির বহুটা প্রদর্শন করানোরও একটা প্রার্থ ছিল। সেইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই মিছিলের পিছনে সর্বশক্তি ও প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন।

বিশাল মিছিল শান্তিপূর্ণ আচরণ করেছিল। তার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে। সে কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু সেই সংগে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে প্রতিটি রাজপথে ব্যাপকভাবে পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল। কোন মিছিলের আশেপাশে শান্তিরক্ষার জন্য এত পুলিশের সমাবেশ কখনো করা হয় নি, যা থেকে বোঝা যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারও গোড়া থেকে শান্তি-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা

অবলম্বন করে রেখেছিলেন। বরং শান্তি বজায় রাখার কৃতিত্বটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপরন্তু শান্তি বজায় রাখার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার এতদূর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলেন যে, তাঁদেরই সর্বাধিক কিছু কৃতিত্ব পুলিশ লাঠিপেটা করেছে।

আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার মিছিলের পরিচালনা নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তাঁর ছয়টি বসেছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীর ঘরে এজন্য আগে থেকেই বসে চায়ের রাখা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, কোন কারণে মিছিল আনন্দবানী নেতাদের সঙ্গে মধ্যস্থতাবী স্থানগত হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে বিরোধী দলকে সরকারের এখানে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা কংগ্রেসী আমলে কোন বিরোধী দল পায় নি।

এর পর কংগ্রেসী মিছিল যে দাবি-দাওয়া সম্বন্ধিত সরকারের দায়িত্ব থেকে সেই বিষয়ে কিছু বলা যাক। কংগ্রেসের তরফ থেকে মাথাপিছু তিন দাবিদাওয়া চাল দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিমত, কংগ্রেসী আমলে কি এই পরিমাণ চাল দেওয়া হত? বিত্তীয় দাবি পিছন ফিরে চাল দেবার দাবি প্রত্যাশিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আটার দান কর্মসূচীর মধ্যে আছে কি? কোন কংগ্রেসবিরোধী দলের নির্বাচনী ইচ্ছাবাদে মাথা পিছন ফিরে চাল দেবার কথা আছে কি? যুক্তফ্রন্ট সরকার তিন দিয়ে চাল দেবার কথা কোনদিন ঘোষণা করেনি বলে আমরা জানি না। বর্তমান অবস্থায় এইরকম অব্যবহৃত চালের পিছনে রাজনীতি আছে, বুদ্ধিমান মানুষকে প্রকৃত বাধ্য যোগানোর মনোভাব নেই।

যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের ঘোষণা

मासाहिक समग्रता

আজার দফা কর্মসূচী পালনে ব্যর্থ হলে আমরা নিশ্চয়ই তা সম্মোচনা করব। কিন্তু, তা আমরা করছিও। কিন্তু যে আশ্বাস তারা কোনদিনই দেন নি এবং জেনেশুনেই তাদের সাধারণ মানুষ শাসন-ভার দিয়েছেন, তা নিয়ে বিক্ষোভ করা অর্থহীন। এই কারণেই আমরা আগে বলছি দাবি-দাওয়াগুলি বাস্তবতাশূন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজকে চালের ঘাটতি স্বত্বতে চালের সর্বোচ্চ বাজার দর চার টাকায় দাঁড়িয়েছে, যে ব্রহ্মমূল্যবোধ আগে হয় নি। কিন্তু গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, যখন চালের প্রাচুর্যের সময়, তখনও দাম পৌনে দু'টাকার কম ছিল না। এবং ঐ স্বত্বতে অত্যাধিক দামও একটি রেকর্ড, এবং হয়েছিল কংগ্রেসী আমলে। পোষ মাসে দু'টাকা কিলো হলে ভাদ্র-আশ্বিনে দামটা কোথায় যেতে পারে সেটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাজেই যাদের আমলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে চালের দামটা চার টাকায় উঠেছে তারা যতটা না দোষী, তার থেকে ভের বেশি দোষী হচ্ছে তারা, যাদের আমলে পোষমাসেই চাল দু'টাকা দরে বিক্রিয়েছে। কাজেই যে অবস্থার জন্য কংগ্রেস নিজেই সর্বভাভাবে দায়ী, সেই কংগ্রেসকেই যখন দেখা যায়, যাদের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, তখন একটি চিন্তাই মনে উদয় হয় যে, রাজনীতির খেলা ঝড় বিচিত্র।

આગામી શાક્યનીંડ

আগামী খাদ্যনীতি সম্পর্কে যুক্ত-
ফ্রন্টের সভার কয়েকটি বিশেষ ধরনের
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত ২১শ
তারিখে। (১) খুচরো চালের ব্যবসা
রাস্ত্রায়ত্ত্ব করা হবে না। (২) সেচ
এলাকায় ছয় একর এবং অ-সেচ এলাকায়
চার একর জমির মালিকদের উপর লেভির
নোটিশ পড়বে। (৩) পরিবারের মাথা-
পিছ নয় মণ এবং চালের জন্য একর-প্রতি
তিন মণ বাদ দিয়ে জমির-মালিকদের
বাদবাকি সব ধান সরকারকে দিতে হবে।
(৪) বি-ডি-ও এবং স্থানীয় খাদ্য ও দ্রব্য
কমিটি লেভির পরিমাণ স্থির করবেন।
(৫) ধানের ক্রয়মূল্য ২১, ২২ ও ২৩
টাকা হবে, তবে সময়মত ধান দিলে চাষী-
দের মণ-প্রতি দু' টাকা বোনাস দেওয়া
হবে। (৬) এবং সবচেয়ে বড় কথা
আগামী মরশুম থেকে ধান-চালের
পাইকারী কারবার রাস্ত্রায়ত্ত্ব হবে। ধান-
চালের পাইকারী ব্যবসার রাস্ত্রীয়করণের
কথা আমরা বরাবর বলে আসছি। বিপত
কংগ্রেস সরকারের খাদ্যনীতির এটাই ছিল

সমসংক্ষেপে বড় ধরাট। কিন্তু খান-চালের পাইকারী কারবার কিভাবে নিষিদ্ধ করা হবে সে সম্পর্কে আমরা কোন খবর পাই নি। যদি এই মর্মে আইন করা হয় যে, উৎপাদকদের কাছ থেকে এক সরকার ছাড়া আর কেউ খান-চাল কেনার অধিকারী নয়, তবেই বোঝা যাবে যে, পাইকারী কারবার রাস্তায় সরেছে। এবং তাহলে নন-রেশনিং এলাকাগুলির দোকানে দোকানেও চাল যোগানোর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যদি সত্য-সত্যিই চালের পাইকারী কারবার রাস্তায় সরে যায়, তাহলে হয়ত রেশন দোকান মারফত তা বিলি করার প্রয়োজন হবে না। আমরা আরও বহুবার একথা বলছি যে, সরকার যদি চালের পাইকারী ব্যবসা একচেটিয়াভাবে করেন, তাহলে খুচরো বিক্রেতাগণ সরকারী গুদাম থেকেই চাল কিনে বিক্রয় করতে পারবেন। রেশন দোকান মারফত গম ও চিনির যোগানটা দিতে পারলেই চলবে। তা ছাড়া সার্থকভাবে চালের একচেটিয়া কারবার করতে গেলে, খানকলগুলির জাতীয়করণও অবিলম্বে প্রয়োজন, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সে বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেন নি। অথচ পাইকারী ব্যবসা রাস্তায় সরে গেলে পূর্ব-বস্থা হিসাবে এটা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। উৎপাদকদের যে দাম দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে, সেটা কতদূর সঙ্গত, তা ঠিক এই মুহূর্তে বলা যায় না, তবে যারা সময়মত লোভ দেবে, তাদের মণ-করা দু'টাকা বোনাস দেবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেটা কার্যকর হবে বলেই আমাদের ধারণা। বাই হোক, যুক্তফ্রন্ট প্রস্তাবিত খাদ্যনীতির এই খসড়া মন্ত্রিসভার আলোচনা-সাপেক্ষ, এখনও তা পাকা হয় নি।

কাঁচরাগাড় বনঙ্গা হামগাতাল

: এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই ষ্কারা-হাস-পাতালটি সম্বন্ধে কয়েকটি অনুলৃত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে বেগদলির তদন্ত হওয়া এই ম্হুহুত্বে প্রয়োজন। এই হাস-পাতালে ১০০টি বেড, রোগীর পরিমাণও তাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এদের মধ্যে দুশো জনেরও বেশি লোক আছে, যারা রোগমুক্ত, যাদের চিকিৎসা শেষ হয়েছে এবং তারা আছে শয্যাগদলি জ্বর-দখল করে। রোগীদের মত এরাও দৈনিক দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সার খাদ্য, ঔষধপত্র, জামাকাপড় প্রভৃতি পাচ্ছে। এদের অন্য বাইরের রোগী ভর্তি হতে পারছে না। নানারূপ অসামাজিক দৃষ্টকর্ম ও সত্যাকারের রোগীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং হাসপাতালটিকে পাপপন্থী করে তুলেছে।

চাউট মারফুত এরা সুদে টাকা খাটায়, হাসপাতালে নিজেদের বরাদ্দ থেকে ডিম, চিনি ইত্যাদি বাইরে বিক্রি করছে লোক মারফুত, হাসপাতালের দেওরাল টপকে নিত্য সিনেমার যাচ্ছে এবং ফিরে এসে সৈবিকাদের উপর জ্বল্জ্বলবাঁজি চালাচ্ছে, তাদের বধ্যাযোগ্য সেবাবস্থ করা হচ্ছে না, এই অজুহাতে হাসপাতালের মধ্যে হাঙ্গামা হুজুতও করছে। এদের ভরে প্রকৃত রোগীর জুড়সড়, পেটের দায়ে বশ্ম্ম হাসপাতালে চাকুরী করতে যাওয়া সৈবিকারা তত্স্থ। অথচ প্রকৃত রোগী হাসপাতালে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না এদেরই দৌলতে। বছরের পর বছর জোর করে শয্যা আটকে রেখে চর্ব-চোষা-লেহ্য-পেষ খেয়ে এরা যে এই গু-ডামি করে বেড়াচ্ছে সাধারণ মানুষ তার প্রতি-বিধান অবশ্যই দাবি করতে পারেন। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বিষয়ে নজর দেবার সময় হবে কি ?

उत्थमग्वी टैलर

করেকর্ডিন আগে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান্দাই শাহের সঙ্গে রাজ্য তখনমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর যে বৈঠক হয়ে গেল তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি বলে জানা গেছে। পাঠকদের হরত স্মরণ আছে, গত ১লা মে, 'মে দিবস' উপলক্ষে পাঁচমবঙ্গের প্রথমমন্ত্রীর যে বেতার ভাষণ দেবার কথা ছিল, আকাশবাণী কলকাতা কর্তৃপক্ষ তার কিছুটা অংশ প্রচারিত করতে দিতে আপত্তি করার ঐ কল্পিত শেষ পর্বন্ত দেওয়া হয় নি এবং বিষয়টি একটি মর্খাদার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। তদবধি পাঁচমবঙ্গের মন্ত্রীরা বেতার ভাষণ দিতে বিরত আছেন, এমন কি স্বাধীনতা দিবসেও মন্ত্রীদের কোন বেতার ভাষণ প্রচারিত হয় নি। ব্যাপারটা শুধু একটি মর্খাদার প্রশ্ন হলে হরত ইতিমধ্যেই তার মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে আরও কতকগুলি প্রশ্ন উঠছে বেঙ্গালির গুরুত্ব বড় কম নয়। ইতিপূর্বে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যই কংগ্রেসের শাসনাধীনে ছিল, কাজেই কংগ্রেস সরকারের ঢাকের কাঠি হয়ে আকাশবাণী দিবা চলত। কিন্তু বিগত নির্বাচনের পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার স্থাপিত হবার পরেই স্বাভাবিক ভাবে নতুন সমস্যার উদয় হয়েছে, কেন না বিভিন্ন রাজ্যের অ-কংগ্রেসী শাসকেরা বহু বিষয়েই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধী মত পোষণ করেন, এবং তাঁদের বক্তব্যগুলিও আকাশবাণী মারফত প্রচারিত হোক এইটাই তারা চান এবং তাঁদের এই চাওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যান্য নয়। এহেন

অবস্থায় আকাশবাণীকে কেন্দ্র করে প্রতি মূহুর্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র পথ আছে। আকাশবাণীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতা থেকে বাদ করে তাকে বি-বি-সি'ব মত একটি স্বয়ংশাসিত সার্বভৌম প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা। আর তা না হলে আকাশবাণীর বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব আকাশবাণী। এ ভিন্ন আর কোন পথ নেই, আর এ সমস্যার সমাধান জোড়াতালি দিয়ে দাবাবও নয়।

মহানগরীর আবর্জনা

কলকাতা মহানগরীর যুগসংগত আবর্জনার সমস্যা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু গত দু' সপ্তাহ ধরে বিষয়টি নিয়ে যেভাবে তোলপাড় চলছে এ রকমটি আগে দেখা যায় নি। কি কৃষ্ণে মহামান্য মেয়র মহাশয় এপথ নির্ধারিতেন যে, মহানগরীকে তিনদিনের মধ্যেই আবর্জনা মুক্ত করবেন। এখন যা দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতার আবর্জনা-মুক্তির সমস্যা অনেক গভীর। যে হাতিবাব দিবে তা মুক্ত করা হবে সেখানেই ভেজাল বসেছে। অনুসন্ধানের ধরা পড়েছে যে—কলকাতা কর্পোরেশনের যতগুলি নিজস্ব লবী আছে তার মাত্র এক-দশমাংশ চালু অবস্থায় রয়েছে। বাকি-গুলি কি অবস্থায় গ্যারেজে পড়ে আছে সে খবর একমাত্র ভগবানই জানেন। যে সব শ্রমিকদের সাহায্যে এই অপসারণ-কার্য চলার কথা, অনুসন্ধানের জানা গেছে যে, তাদের বাবো আনা অংশই ভুল। কলকাতা কর্পোরেশনের ভিতরকার হাল যদি এ-ই হয়, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা নাগরিকদের কোন স্বার্থসিদ্ধ হতে পারে? এই কারণেই আমরা পূর্বে বার বার বলেছি বয়স এবং আবর্জনার ভারে জীর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে একেবারে ভুলে দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে এক-একটি মিউনিসিপ্যালিটি চালু করা হোক।

ইক্ষু-ঘটিত

কেন্দ্রীয় সরকারের আজব বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির ফলে দেশজোড়া চিনি এবং ইক্ষুজাত সামগ্রীর যে সংকট দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে তার ফল অতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। রেশনের দোকানে যে চিনি পাওয়া যায়, তাতে হয়ত গৃহস্থের

শিশুদের প্রয়োজন মিটেতে পারে, কিন্তু তাতে সংসাবেব অপরাপর প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সর্বাধিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীগণ এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিকেরা। বাইরে থেকে অর্থাৎ কালোবাজার থেকে চিনি না কিনলে তাঁদের চলে না এবং চিনির কালোবাজারী দাম পাঁচ টাকা কিলোর গিয়ে পৌঁছেছে। অবশ্য তাঁরা লোকসান দেবার পাথ নন, সেই ঘাট্টিটা তাঁরা পুঁজিরে নিচ্ছেন খরন্দারদেরই ষাড় ভেঙে, দশ পয়সা কাপের চা পনের

পয়সায় বিক্রি করে। গ্রামাঞ্চলে তো চিনি একেবারেই পাওয়া যায় না, গ্রামে মানুষদের যেন চিনির কোন প্রয়োজন নেই! অথচ ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদক দেশ! চিনির মধ্যে পান্না দিয়ে গড়ুও বাজাব থেকে উদ্ধার হয়েছে, কোলাগুড়ের অভাবে স্পিরিট, অ্যালকোহল প্রভৃতির কাবখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঔষধশিল্পও প্রচণ্ড মান খাচ্ছে। অথচ এই সংকট একান্তই কৃত্রিম। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রান্ত নীতির প্রায়শ্চিত্ত কি জনসাধারণকে এইভাবেই করতে হবে?

২২-৯-৫৬

॥ সমাধান ॥

কি এত ভাবছ? মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত?

আর বলো না ভাই...পুজা এসে গেছে অথচ এখনও কিছু কেনাকাটা ক'বে উঠতে পারি নি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ত জানই—কি যে ওদের পছন্দ তা বুদ্ধবাব উপায় নেই। এদিকে আমারও সময়ের অনটন।

এই কথা?

কথা নয় ভাই। আমার কাছে এটা একটা মস্ত সমস্যা।

সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে।

তুমি বলতে চাইছো কি?

আমি আর আমার প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই মফতলাল গ্রুপের সুন্দর সুন্দর তৈরি-ই-এ এবং বস্তুর নানা রকমের কাপড় কিনেছি মফতলালের মনোনীত বিপণি থেকে—গার্মেন্টা স্টোরস, উত্তর কলিকাতায় আব গড়িয়াহাট সোসাইটি, দক্ষিণ কলিকাতায়। ওখান থেকে কেনাকাটা করলে তুমিও খুশী হবে আর তোমার ছেলেমেয়েদের গুণেও হাসি ফুটেবে।



মফতলাল

(নিউ শরক, নিউ চায়না, সাসুন, মফতলাল ইত্যাদি)

গ্রুপের দশটি মিলের কাপড়

সর্বদা মিলের নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায়

সুবিধা দরে কার্টিপস পাওয়া যায়

একমাত্র মনোনীত: রিটেল শো-রুমস্ :-

উত্তর কলিকাতায়

পার্বতী স্টোরস

২এ, গিরিশ এভিনিউ (যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ ও ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ-এর সংযোগস্থলের নিকট), কলিকাতা-৩
(৫৫-৯৫০৮)

বাস রুট :- ২বি, ১ এবং ৩২ নম্বর বাসে রাজবল্লভপাড়া স্টপেজে নামুন।

পুজা উপলক্ষে প্রত্যহ সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত (রবিবার সহ) দোকান খোলা থাকবে।

দক্ষিণ কলিকাতায়

গড়িয়াহাট সোসাইটি

পি- ১১, গড়িয়াহাট বেড, গোল পার্কের নিকট

কলিকাতা-২৯ (৪৬-৭৮৩৮)

শেয়াব-হোল্ডারদের ৩০-৯-৬৭ পর্যন্ত শতকরা ৮ টাকা হারে ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। শেষ মূহুর্তের ভীড় বাঁচাবার জন্য পূর্বেই কেনাকাটা করতে অনুরোধ করি।

পুজা উপলক্ষে প্রত্যহ সকাল ১০-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত (রবিবার সহ) দোকান খোলা থাকবে।

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

কলেজ প্রিন্সিপাল : নতুন জমিদার আমার এক সাহিত্যিক-বন্ধু তাঁর স্ত্রীকে ভর্তি করবার জন্য একটি মেয়ে-কলেজে গিয়েছিলেন। মেয়ে-কলেজের পদ্রুপ প্রিন্সিপাল তাঁকে প্রায় ধমকের সুরেই বলেন, আপনি এসেছেন কেন? বন্ধুটি ভালো মানুষ, আক্ষরিক অর্থেই সরল প্রকৃতির, আপাত-রাশভারী প্রৌঢ় প্রিন্সিপালের ধমকে ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, আজ, প্রথম দিন তো, ভর্তি করানোর সময় অভিভাবককে থাকতে হয়, তাই; তা ছাড়া, আপনার দু-একটা উপদেশ ও পরামর্শ চাইতেও এসেছিলাম।

বন্ধুর কণ্ঠস্বর নরম হওয়ার প্রিন্সিপাল আরও গরম হয়ে বললেন: মেয়েদের কলেজে মেয়েরা নিজেরাই সব করে নেয়, করে নিতে পারে, কোন পদ্রুপের দরকার হয় না; আপনার ক্যান্ডিডেট সরাসরি আমার কাছে আসতে পারত, আপনার আসার কোন দরকার ছিল না; এখন আপনি যেতে পারেন, ক্যান্ডিডেটকে পরে আমার সঙ্গে আলাদা দেখা করতে বলবেন।

বন্ধুর মুখে জবাব এসে গিয়েছিল, মেয়েদের কলেজে পদ্রুপের দরকার না হলে আপনি প্রিন্সিপাল হয়ে বসে আছেন কেন? কিন্তু সৌজন্যের জন্য খ্যাত সেই বন্ধু সে জবাব না দিয়ে প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সামনে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে-ছিলেন, এ কলেজে তোমার ভর্তি হওয়া ভাল মনে করি না, চল অন্য কোন কলেজে যাই। এবং তারপর প্রিন্সিপালকে নমস্কার করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

পৃথিবীতে 'ফাউ' বলে একটি পদার্থ আছে, যার প্রতি দেশ-কাল-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অরোধ্য আকর্ষণ। পাঁচ টাকার বাজার করে একটি 'ফাউ' পাবার জন্য তরুণ বালকের আগ্রহের চাইতে অনেক বেশি উদ্গত বিবাহিত পদ্রুপের অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ: গৃহে তো গৃহিণী আছেই, সে তো আমার ন্যায্য অধিকার, বাইরে দু-চারটি 'ফাউ' পেলে মন্দ কি! অতএব বিবাহিত-পদ্রুপ কোন মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যাপক বা গান-বাজনার শিক্ষক স্ব স্ব

গৃহিণী সমেত 'ফাউ' পেতে আগ্রহী হবেন, এতে আর আশ্চর্য কি।

বিবাহিত পদ্রুপের এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের সুযোগ-বাহির্ভূত। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব এতই সত্য, এতই প্রতিষ্ঠিত যে এ নিয়ে আজ আর স্মিত্তির অবকাশ নেই। ভারতবর্ষের সমাজ এখনও পদ্রুপপ্রধান, নারীদের মর্যাদা বা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এখনও সম্ভব হয় নি। অতএব ঢালের-উল্টোদিক, অর্থাৎ অন্য পদ্রুপের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণের সহজ-স্বভাবী প্রবৃত্তি এখনও অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ কোন তরুণের প্রতি কোন বিবাহিতা মহিলার আকর্ষণের ঘটনা এ-দেশে এখনও অসম্প্রদৃত।

যে-কথা বলাইলাম। আমাদের আলোচ্য মেয়ে-কলেজের পৌঢ় পদ্রুপ-প্রিন্সিপালকে কলেজের মেয়েরা ভিন্ন অর্থে সমীহ করেন। গত দশ বছর যাবৎ একাধিক মেয়ের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে যে একধরনের অভিযোগ শুনে এসেছি, তাতে আমার ধারণা জন্মেছে, এ-দেশের মেয়ে আত্মঘাতী হতে জানে, হত্যা করতে জানে না। দু-একটি মেয়েকে প্রশ্ন করেছি, তোমাদের মধ্যে একজনও কি তোমাদের অমর্যাদার শোধ নিতে পার না? যে-কোন কারণেই হোক, প্রতি বছরেই প্রৌঢ় প্রিন্সিপাল মেয়েদের 'দুর্ভাগ্য' সুযোগ নেন এবং স্বয়ং অক্ষত দেহে অন্য পদ্রুপকে মেজাজ দেখান।

এই প্রিন্সিপালই কিছুদিন আগে অন্য একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপককে তাঁর কলেজে ঢোকার জন্য অপমানিত করে-ছিলেন। অধ্যাপক ভ্রলোকের অপরাধ, কলেজ-অফিসের কেরানীর সঙ্গে যখন তাঁর বন্ধু কথা বলাইলেন, তখন তিনি অফিসের বাইরে বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পৃথিবীতে অহরহ বহু অন্যান্য হচ্ছে যা তথ্য-সাক্ষ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। কোন প্রিন্সিপাল বা অধ্যাপক যদি তাঁর কক্ষ সামান্যতম নিজনতার সুযোগে তাঁর কোন ছাত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, তবে তাঁর প্রতিবিধান কিভাবে সম্ভব? ছাত্রীটি কি আদালতে যেতে পারবে, আদা-

লতে সে কি তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপ্ত করবে? সমাজ-শাসিত তার পিতামাতা অভি-ভাষকেরাই বা কি তাকে নিয়ে আদালতে হাজির হতে সাহসী হবেন? কিংবা যে-দরিদ্রা ছাত্রীটি অর্থ-বেতনে বা কিনা-বেতনে কলেজে পড়ার সুযোগের জন্য অধ্যক্ষের কৃপাপ্রার্থী, তার মর্যাদাহানিতে যদি অধ্যক্ষ ভৎসন দেখান, তবে সেই হতভাগ্য মেয়েটির অশ্রুবর্ষণ ছাড়া গতান্তর কি? বস্তুত অন্যান্য হচ্ছে জেনেও কৃটি অন্যান্যের প্রতিকার আমরা করেছি স্ব করতে পেরেছি?।

ক্ষেত্রান্তরের অন্যান্য ছেড়ে আপাতত কলেজ বা অনুরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথাই ধরা যাক। স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রের প্রিভিলেজ প্রেণী। এঁদের ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রবাদবাক্য-সুলভ এবং ক্ষমতাপ্রয়োগের গন্ডী সীমা-বদ্ধ বলে এঁরা সময় সময় এমন সব কাজ করেন, পদলিঙ্গের চিহ্নিত দাগী আসাম্য ও বা শূনে লক্ষিত বোধ করবেন। পূর্বের কোন একটি লেখায় একবার বলেছিলাম, সময় সময় ঐক্যেশানাল পলিটিক্স পলিটিক্যাল পলিটিক্সের চাইতে কদম্বতর হতে পারে। আমাদের স্কুল-কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যেসব কান্ডকারখানা ঘটেছে বা ঘটে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে, তার কাহিনী রচনার জন্য নতুন ব্যাসাচাষের প্রয়োজন। ধরা যাক, কোন কলেজের প্রিন্সিপাল কোন অধ্যাপকের পেছনে লাগতে শুরুর করলেন, ফলে অধ্যাপক বোচারাকে পড়ানোর ব্যাপার থেকে মন সরিয়ে এনে প্রিন্সিপালের মন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে, কিংবা অন্য কোন কলেজে চাকরি যোগাড়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জমীন্দার জঘ্যাপক সহকর্মীদের প্রতি প্রিন্সিপালদের মনোভাব প্রায় সর্বত্রই এক, এ ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী, ছোট-বড় কলেজে নানিক প্রভেদ, নিখিল-কলেজ প্রিন্সিপালময়।

সরকারী বলেই হয়তো সরকারী কলেজে 'সি-আব' বা 'কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট' নামক এক বিচিত্র বস্তু আছে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে যার জন্ম এবং বিদেশী শাসকদের ভারত-ভাগের কুড়ি বছর পরেও বা দেশী কর্তাদের কৃপার অর্থোক্তিকভাবে বেঁচে আছে। কলেজের

১। সম্প্রতি হাওড়ার বাকসারা অঞ্চলে জনৈক মহিলার রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় পা দুটি কাটা যায়। পা কাটা যাওয়ার পরও প্রাণরক্ষার ঘটনা অবিস্মৃত নয়, কিন্তু জনৈক রেলবন্দী সিপাহীর গোঁরাভূমির ফলে মহিলাটিকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি এবং ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়, এই সার শিক্ষা কি সেদিন রেলবন্দীটিকে দেওয়া যেত না?

প্রিন্সিপাল স্বয়ং কিংবা বিভাগীয় প্রধান-
দের সহায়তায় বিভিন্ন অধ্যাপকদের গণ-
গ্রন্থ সম্পর্কে ডি-পি-আই অফিসে গোপনে
যে-বিবরণী পাঠান, সরকারী ভাষায় তা-ই
‘কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট’। রিপোর্ট
ভাল হলে ভবিষ্যতে চাকুরিতে উন্নতির
সম্ভাবনা, খারাপ হলে চাকুরি না বাক
অন্তত নির্দিষ্ট সময়-সীমার পর বার্ষিক
বেতনবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। কুৎসিত এই

কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টের জন্য অধিকাংশ
সরকারী কলেজে প্রিন্সিপাল নতুন কালের
জমিদারের ভূমিকা গ্রহণ করেন, ফলত
তাকে ঘিরে যে-রাজনীতি চলে, প্রকৃতি-
বিচারে সেকালের চণ্ডীমণ্ডপের রাজনীতি
যার কাছে নগণ্য। জনৈক সরকারী
কলেজের অধ্যক্ষের কথা শুনোছি, যিনি
তার অপ্রীতিভাজন সম্পর্কে ছাত্রদের
জিজ্ঞেস করতেন, ‘অমুক শিক্ষক তোমাদের

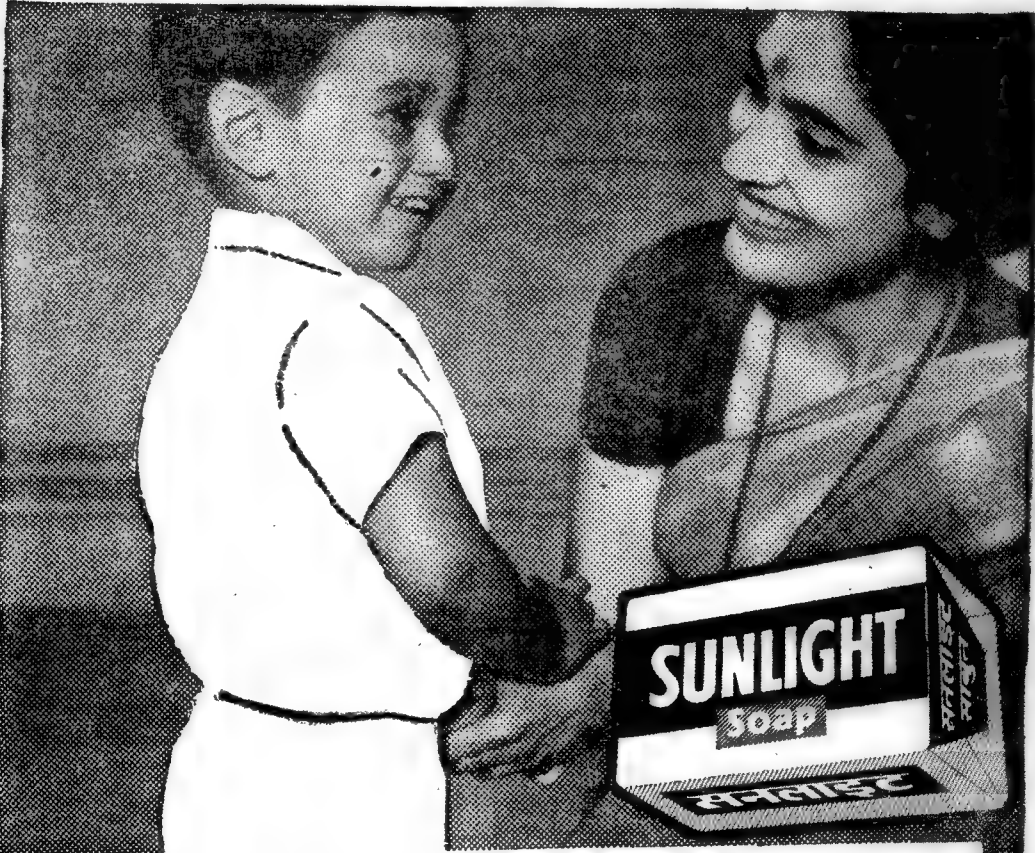
ঠিকমত শড়তে পারছেন তো?’ কখনও
কখনও তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য
দরজার পেছনে আত্মগোপন করে শিক্ষক
বিশেষের পড়ানো শুনতেন। আর একজন
অধ্যাপক একসঙ্গে উনিশজন অধ্যাপকের
বিরুদ্ধে সরকারী শিক্ষাদপ্তরে নালিশ
জানিয়েছিলেন বলে শুনোছি। সরকারী
কলেজে অপ্রীতিভাজন অধ্যাপককে বরখাস্ত

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে করে কাচে



সানলাইট সাবিন একবার নিজেই ব্যবহার করে
দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়।
দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার
জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জল হয়ে

ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজল ফেনা হবে, আর
সেই ফেনা কাপড়চোপড় অন্যরাসে স্বন্দর পরিষ্কার
ঝলমলে করে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই
সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার

প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

করা সহজ নয়।^১ সি-আর-এর ঘরে আহত করা গেলেও বে-সরকারী বা প্রাইভেট কলেজে সি-আর জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকলেও অধ্যাপকদের চাকরির স্থায়িত্ব প্রিন্সিপাল তথা গভর্নর বাডির মজির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সে কারণে বে-সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল সরকারী কলেজের প্রিন্সিপালের চেয়ে কিছুদূরিক শক্তিশালী। গভর্নর বাডির কৃপায়—কোন কোন বে-সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল দোদুল-প্রতাপ জমিদার, ফলে তাঁর কুনজরে পড়লে রক্ষা নেই।

সম্প্রতি এমন একজন হতভাগ্য কলেজীয় অধ্যাপকের কাহিনী আমাদের কণ্ঠগোচর হয়েছে, প্রিন্সিপালের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এই অধ্যাপক অন্য কোন গবেষণায় দেখে যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের আসল দখল করতেন। কিন্তু স্বাধীনচিত্ত অধ্যাপকচিহ্ন এই অধ্যাপক অথবা একটি মেয়ে-কলেজের সামান্য অধ্যাপক নার। আলোচ্য অধ্যাপক

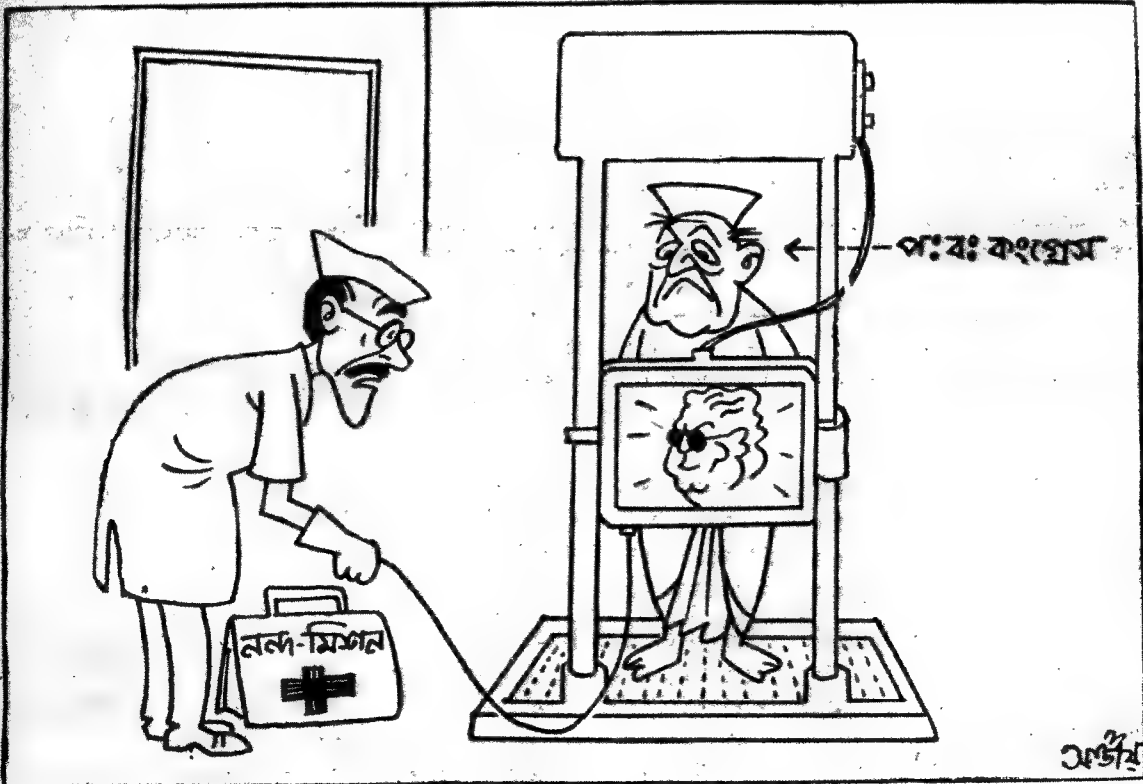
বহুস্থানিক আগে উক্ত কলেজের বিভাগীয় প্রধানের পক্ষে করা দরখাস্ত করেছিলেন, সিলেকশন কমিটি তাঁকে বিভাগীয় প্রধান-রূপে মনোনয়নও দেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় প্রধানের পদমর্যাদা অর্জন করতে পারেন নি। খোঁজখবরে জানা গেল, উক্ত মেয়ে-কলেজের পদব-প্রিন্সিপালের একজন প্রীতিভাজন ইংরেজী অধ্যাপক ঐ পদের প্রার্থী এবং তাঁকে ঐ পদ দেবার জন্য প্রিন্সিপাল দৃঢ়সংকল্প। কিছুদিন আগে উত্তর অধ্যাপক সম্পর্কে ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত চাওয়া হলে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিন্সিপালের অপ্রীতিভাজন অধ্যাপকের সমর্থনে বলেন, এঁর সঙ্গে অন্যায়ের গুণগত ব্যবধান সাধারণতঃ। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে অধ্যাপক মহোদয় মুগ্ধ হয়ে পড়েন, কিন্তু সহজে ভেঙে পড়ার লোক তিনি নন। অতএব তিনি তাঁর বাড়িতে এমন গতিবেগ সঞ্চার করতে শুরু করেন, যাতে তাঁর অপ্রিয় অধ্যাপক নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। অধিক কি, তাঁর পিছনে গাড়া লাগাবার মত দৃশ্য পৃথিবীতে অবলম্বনেও শিক্ষাবিস্তারবী এই বিখ্যাত প্রিন্সিপাল বিশ্বদ্রুমের দ্বিধা করেন নি।

অতএব চন্দ্রগুপ্তের সিদ্ধান্ত, বড় বড় কলেজের দোদুল-প্রতাপ প্রিন্সিপালদের

দুনীতিমূলক করার জন্য মাঝে মাঝে 'ঘেরাও' দাওয়াই দেওয়া দরকার। কিন্তু যেহেতু এই দাওয়াই যখন-তখন যত্র-তত্র অপ্রযোজ্য, কোন প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করার আগে ভেবে দেখা দরকার, সত্যি তিনি ঘেরাও হবার যোগ্য কি-না। অর্থাৎ প্রিন্সিপালকে শাস্তি দেওয়ার আগে ব্যাপক তদন্ত হওয়া দরকার, কারণ আইনের মূল সূত্রানুসারে শত-সহস্র অপরাধী ছাড়া যায় পাক, কিন্তু একটি নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়। একথা মানি কলেজের অধ্যাপক বা যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পক্ষে সর্বসময়ে সর্বজনপ্রিয় হওয়া সম্ভব নয়, আর কলেজের অধ্যাপকরাই অন্যায়-অবিচারের প্রতিমূর্তি এমন কথা বলার মত মূঢ়তা আমার নেই। কিন্তু যে-অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গিতে খ্যাতি দীর্ঘদিনের, যে-অধ্যাপকের সৌজন্যবোধ সন্দেহের বিষয়, যে-অধ্যাপক তাঁর সহকর্মীকে অগদগ্ধ করার জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বনে দ্বিধাহীন, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কলেজের গভর্নর বা ডি বাইর না হন, তবে জনস্বার্থের খাতিরে সেই অপরাধী অধ্যাপকের উপর 'ঘেরাও' নামক প্রতিবাদ-পেনিসিলিন প্রয়োগ কোন অপরাধ নয়।

১। যখন-তখন যত্র-তত্র বদলী করে শাস্তি দেওয়ার সুবিধিত পন্থা এ সূত্রে অনুল্লেক্য।

দিকিৎসা সংকট—



ভারত দর্শন

বিদেশ সফর এবং শূভেচ্ছা চুক্তি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গেছেন সিংহলে; উপ-প্রধান-মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছাড়াও আমাদের সেনানায়কও বহিঃভারতে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। বিদেশ সফরে বে-বৈদেশিক মন্ত্রীর ব্যয় হয়ে থাকে ক্ষমতাসীন নেতাদের বিদেশ সফরে তা বাধা স্বরূপ পথ আগলে দাঁড়াতে পারে না। এরা যান কতশত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাদির জন্য, কত বৈদেশিক রথী-মহারথীর সঙ্গে ভোজনে-গল্পে কালটিপাত করতে হয়। এখন বৈদেশিক মন্ত্রীর অনটনের কথা ভাবতে বসলে, সেই সব শূভেচ্ছা সফর কিম্বা অপরের কদমিত্রায় সম্পর্কে প্রতি-বেশিসমাজের সঙ্গে সলাপারামশাদি করা তো বন্ধ করে দিতে হয়। অবশ্য কেউ কেউ হয়ত বলবেন : তা বাপু আরও পচিটা দেশ তো আছে, কৈ সেসব দেশের নেতৃবৃন্দকে তো তিনদিন অন্তর বিদেশের ডিনার টেবিলে খানাপিনা করার জন্য সদলবলে বোরিয়ে পড়তে হয় না। এসব বড় জটিল প্রশ্ন, একমাত্র ডঃ লোহিয়াইর মতো: হিসেবী-মানুষই হয়ত লম্বা ফর্দ হাজির করে এই সব আয়-ব্যয়ের সৌষ্টিকতা বিচার করতে পারেন। আমরা নির্বিচারে মেনে নিই। সফরের ফলপ্রসূতিতে কোন যুক্তিবিবৃতি বা চুক্তির জন্ম হলে তাই নিয়ে সাংবাদিকরা বাধাগ্রস্তত্বক রচনা করেন। প্রমোদ সাংবাদিক সম্মেলনে বহুদফা উচ্চারিত বাণীসমষ্টি পুনশ্চ উচ্চারিত হয়। এই-ই নিষম।

শ্রীমতী গান্ধীর সফরান্তে সেই নিয়ম কথাবিহিত মেনে নিয়েই এবারেও তাঁর সফরের সাফল্য নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোচনার তুফান উঠেছে। শূদ্ৰ ভারতে নয়, সিংহলেও। সেখানকার পত্র-পত্রিকা তো ইন্দিরা-সফরের প্রভাব সম্পর্কে পঞ্চ-মুখ। এখানকার পত্রিকায় সে সফরকে সফল না বললে সিংহলের উদ্ভাপকেও অস্বীকার করা হয়।

সিংহলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাঙ্গলে সেনানায়ক এবং শ্রীমতী গান্ধীর যে যুক্তিবিবৃতি প্রচারিত হয়েছে, কল্পিত তার অন্ততপক্ষে বিবৃতিগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

দুই প্রধানমন্ত্রীই শাস্ত্রী-বন্দরনায়ক চুক্তির ওপর যুক্তিবিবৃতিতে বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যার অর্থ সিংহলে ভারতপ্রবাসী ভারতবাসীদের সুব্যবস্থার অঙ্গীকারকে স্থিতীয়বার স্বীকৃতি জানানো হল।

শাস্ত্রী-বন্দরনায়ক চুক্তি অনুসারে তিন লক্ষ ভারতীয় ষংশোন্মভব সিংহল-প্রবাসী ভারতীয়কে সিংহল সরকার নাগরিক অধিকার দান করতে প্রতিশ্রুত। পনের বছরের মধ্যে ভারত সরকার সিংহল চুক্তি প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে পাঁচ লক্ষ পাঁচশ হাজার ভারতীয়কে ভারতে পুনর্বাসিত করবেন এবং বাকি দেড় লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসীর ব্যবস্থা পরবর্তী-কালে নির্ধারিত হবে।

প্রবাসী-ভারতীয়দের নিয়ে এক সময় সিংহলের সঙ্গে ভারতের মন কষাকষির ইতি এই চুক্তির মাধ্যমেই হয়েছিল। আজ সেই চুক্তিকে পুনরায় গুরুত্ব দান করে উভয় দেশের সম্পর্কে মধুর করে তোলা হল। শূদ্ৰ লিখিত চুক্তি নয়, এই চুক্তি কার্যকরী করার সঙ্কল্পও বাস্তব হয়েছে। অবশ্য সফরকালে আবেগের বশে বহু ক্ষেত্রে অনেক শূদ্ৰ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে থাকে, পরে আবার যে-কে-সেই অবস্থাই দেখা দেয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, যুক্তিবিবৃতিতে সিংহলী জনসাধারণও বিশেষ গুরুত্ব দান করেছেন।

দুই প্রধানমন্ত্রী তাসখন্দ চুক্তি রূপায়ণ এবং জোট-নিরপেক্ষতা নীতির ওপরও সর্বশেষ গুরুত্ব দান করেছেন।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের সঙ্গে সিংহলের সম্পর্ক বর্তমান অপেক্ষা কোনদিন আরও ভাল ছিল এমন কথা তাঁর জানা নেই। সিংহলে ভারতীয়দের প্রশ্ন সম্পর্কে উভয় দেশ শতদিন চুক্তি অনুসারে কাজ করবেন ততদিন দুই দেশের সৌহার্দ্য কান ফাটলই সৃষ্টি হবে না।

শ্রীযুক্ত ডাডলে সেনানায়কের এবাম্বিধ আশাবাদী উক্তি পর শ্রীমতী গান্ধীর সফরকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত বলেই আখ্যাত করতে হয়। চুক্তি এবং উক্তি বাখ্যার্থ্য এই দুটি ক্রুর পালনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্রীসেনানায়কের উক্তি বিরাট আশাবাদেরই সঞ্চার করে এবং দুই দেশের এই সম্প্রীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

তাসখন্দ চুক্তির গুরুত্ব অবশ্য কারও স্বীকৃতি অস্বীকৃতিতে উনিশ-বিশ হচ্ছে

না যতক্ষণ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পাকিস্তান এই চুক্তিকে ভারতের ন্যায় সমান গুরুত্ব দান করছে। তবে প্রতিবেশী সিংহলের এই চুক্তির প্রতি গুরুত্ব দান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সিংহলকে বিশেষ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে।

দলাদলি

আদর্শের বৈচিত্র্যই রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করে। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে দলবান্ধির চেহারাটাই পাশে গেছে। কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ায় জন্য দলবিচ্ছেদের মূল্য আজ কমে এসেছে। ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণও দল গড়া হচ্ছে, আবার গড়ে-ওঠা দলে ভাঙনও দেখা দিচ্ছে একই কারণে। পি এস পি, এস এস পি কিম্বা দক্ষিণ বাম এবং অতিবাম কম্যু-নিস্ট দলের সৃষ্টি মতাদর্শের সংঘাতে সংঘটিত। কিন্তু কংগ্রেসে ভাঙন কোন নয়া মতাদর্শের ভিত্তিতে দেখা দেয় নি। সেখানে ক্ষমতারই সংঘাত মন্ডির আকাক্ষা বা সংশোধনের শূভেচ্ছা একটা বহিঃপ্রবেশ মেনাগান মাত্র। হয়ত কতিপয়ের কাছে দলভাগ্য মতাদর্শের সংঘাতেই অনিবার্য ছিল, কিন্তু দলভাগ্যী মাত্রেই আদর্শের উন্মেষজনা অনুভব করেছেন, এতোবড় অসত্য কথাটা আদর্শেই স্বীকার্য নয়। কতকগুলি স্বার্থচক্রকে কেন্দ্র করেই দল ও উপদলের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে। সুতরাং সাধারণের শ্রীষ্মিধ জন্য আদৌ নয়, আসলে স্বার্থ বা গোষ্ঠীর স্বার্থসিঁদ্ধি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়া দলাদলির সৃষ্টি।

এমনি দুটি দল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিহাব ও হিরিয়ানা। কোন বিশেষ আদর্শ নয়, দলীয় উদ্দেশ্যেই এদের উদ্ভব।

হিরিয়ানা :

হিরিয়ানার যে নবদলেব সৃষ্টি হতে চলল তার নাম বিশাল হিরিয়ানা পার্টি। যার নেতৃত্বে দেখা দিয়েছেন হিরিয়ানাব বর্তমান মন্ত্রামন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং।

রাও বীরেন্দ্র সিং বিশাল হিরিয়ানা দলের প্রয়োজন অনুভব করেছেন রাহো আপন ক্ষমতাকে বলবৎ রাখার জন্য। লোকের মনে কংগ্রেস-নিরোধিতা চরমে

উল্লে তঁরা অন্যত্র একটী দলের হাতে রাজ্যের ভাগ্যান্বেষণের ভার ছেড়ে দেওয়া জনা উদ্দেশ্য হয়ে উঠছিল। যদিও হিরিয়ানার পরিস্থিতি সাধারণের দিক দিয়ে এতোটা হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। কারণ কংগ্রেস সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই অর্জন করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ভগবৎদয়াল শর্মা। কিন্তু কংগ্রেসীরাই শ্রীশর্মার নেতৃত্বে প্রত্যাখ্যান করে বেরিয়ে এলেন রাও-এর নেতৃত্বে। রাও হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস তাদের সপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীরই মুখ্যরূপে দেখা দিল। কিন্তু দলহীন রাওকে কতকগুলি দলত্যাগী এম এল এ এর ভরসার বসে থাকতে হলে তাঁর গদিও অদূর ভবিষ্যতে টেল উঠতে পারে। কংগ্রেস তো সব সময় চেষ্টাই করেছে। ক্ষমতালোভী কেরিয়ার-শিকারীরা অথবা আইনসভার টিকেটকেই পদোন্নতির প্রবেশপথরূপে ব্যবহার করছেন। পুরো আদর্শহীন, নীতিহীন কামড়াকামড়ি আর অবিশ্বাসের ওপর চলছে রাজ্যপাট। কখন কে গদির দিকে কীভাবে নজর দেবেন আর মন্ত্রিদের টোপ ফেলে আপন জালে কতজন এম এল এ পুরে ফেলবেন প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাই চিন্তার মুখ্যমন্ত্রিকুল নিখুঁত। স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক, দৌঁছে মিলি মন্ত্রী হই—এই-ই যখন অবস্থা তখন দেশ ডুবিয়ে দল-অঁকড়ানোর বাস্তব মন্ত্রাই টানবে বেশি। তিনি রাও বীরেন্দ্র সিং-ই হোন আর উচ্চাভিলাষী বি পি মন্ডলই হোন, উদ্দেশ্য একই। একটি ভালো রাখাল হওয়া। দল পরিচালনার দক্ষতাই দেশরক্ত। দলই শক্তি, দলই জীবন, দলভায়ে অপ-মৃত্যু।

রাও বীরেন্দ্র সিং এই সভ্যতা সম্প্রতি বড় বেশি করে উপলব্ধি করেছেন। কারণ তিনি নিজেও জেনেন, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কীভাবে আন্দোলিত করে আসছে ১৯৫৪ সাল থেকে, যখন পেপসু রাজ্যে প্রথম তিনি উপমন্ত্রীরূপে উদিত হয়েছিলেন। এর পর পাঞ্জাবের ছৌঁচ মানব সদাঁর কায়রৌকে বীরেন্দ্র সিং কতবার কতভাবে বেকাশা করেছেন। সবই দলা-দাঁলির কৌশল।

বর্তমান হিরিয়ানার ক্ষমতাসীন সংঘর্ষ ফ্রন্টেও সেই দলের হাত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। জনসংঘ ফ্রন্টের বড় শরিক হিসাবে বেশ বেগ সৃষ্টি করে চলেছে বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে নিশ্চিতভে। তাই বীরেন্দ্র সিং চান নয় দল গঠন করে আপন প্রভাবের পরিধি বিস্তার করতে। বিশাল হিরিয়ানা দল তাইই প্রস্তাবনা। দল করতে না পারলে ক্রমে হিরিয়ানা জন-সংঘেরই কুক্ষিগত হবে পড়বে। এই 'সংঘ'-শব্দের অগ্রগতিককে রুখতে হলে তাই একটা দল চাই। বিশাল হিরিয়ানা সৃষ্টির

মূলে কারণও প্রধানত সেটাই। দলের নামকরণে যে ক্রান্তির পরিচয় রয়েছে তা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী বটে। ভারত জুড়ে খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাজ্য-স্বার্থ মাথা তোলবার প্রয়াস পাচ্ছে। বিশাল হিরিয়ানার নামেই হিরিয়ানা রাজ্যের বিশিষ্ট বিস্তারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আঞ্চলিকতার লক্ষণটি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। সেদিক দিয়ে মানুষের মন দখলে বিশাল হিরিয়ানার হাত বেশ শক্ত।

কংগ্রেসের প্রভাব-সম্প্রতি ম্লান হয়ে আসতে শুরু করলে, উদ্ভব ভারতের রক্ষণ-শীল চিন্তা আন্ডার দক্ষিণপন্থী দলের সম্মান করাছিল। হিরিয়ানায় সে দলের মর্বাদা ক্রমেই লাভ করছিল জনসংঘ। বীরেন্দ্র সিং-এর বিশাল হিরিয়ানা সেই একমুখী প্রোভকে রুখতে চায়।

হিরিয়ানার রাজনৈতিক জট তীব্র আকার ধারণ করলেও বীরেন্দ্র সিং নিজস্ব দল গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন। এই দল গঠনে অন্যতর আদর্শের সম্মান করা তাই পণ্ডিত্য। ছিলেন কংগ্রেস, ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রিদের সম্ভাবনার হলেন বিচলিত এবং বেরিয়ে এলেন দলত্যাগ করে। এখন নয়া দল সংগঠিত করে রাও তাঁর রাজ্যপাট বজায় রাখতে উৎসুক।

বিশাল হিরিয়ানা রাজ্য সীমানা ব্যুৎ-করণের জন্য যে দাবি নিয়ে হাজির হবে ইতিমধ্যেই তা রাজ্যব্যাপী সাড়া তুলেছে। হিরিয়ানা কম্যুনিষ্ট পার্টিও সীমানা ব্যুৎ-করণের পক্ষে। তবে কম্যুনিষ্টরা রাজ্য-দাবিকেও সূক্ষ্ম ব্যুৎ-করণের মধ্যে সাজিয়ে ধরতে চান। তাই হিরিয়ানা দলের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে কম্যুনিষ্ট নেতা টিঙ্গা রাম সুধান এই দলের চরিত্রে কতকগুলি শব্দগত 'পরিভ্রাতার' অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। অর্থাৎ, এ দল যথেষ্ট 'প্রগ্রেসিভ' এবং 'সেকুলার' কি না। রাজনীতির অঙ্গানে কোনও আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষী দল (বা আবার ব্যক্তি-ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যই সমাধিক উৎসুক) প্রকৃতপক্ষে কোনও 'প্রগ্রেসিভ' চিন্তা লালন করতে পারে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। শ্রীসুধান সম্ভবত সেদিকটা চিন্তা করেন নি। তিনি বলেছেন : বিশাল হিরিয়ানা দল নিজেকে সূক্ষ্ম উদ্ভব বলে প্রমাণ করতে পারে যদি বর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব অখ-যিত রাজ্যে সে প্রগ্রেসিভ ও সেকুলার চিন্তা সৃষ্টিতে সার্থক হয়।

কেন কম্যুনিষ্টের এ হেন ব্যুৎ-প্রদর্শন বিস্ময়কর। যে দল আঞ্চলিকতা ও কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমতারক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত তার কাছ থেকে দশজন বাই পাক গোটা দেশ কী আশা করতে পারে। আন্তর্জাতিকতার বিশ্বাস যে কম্যুনিষ্টের

ধর্ম সেই কম্যুনিজমে বিশ্বাসী বলে কথিত কোনও নেতা এমনতর আঞ্চলিক স্বার্থ-রক্ষী দলের কাছেও সূক্ষ্ম 'প্রগ্রেস' আশা করেন, অবাক না হয়ে উঠার নেই। অবশ্য কম্যুনিষ্ট সোসিয়ালিস্ট কেউই আর বহুতর ওদার্ব নিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে রাজ-নীতি করতে ভরসা পাচ্ছেন না। জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কা। বিশাল হিরিয়ানা, হিরিয়ানা রাজ্যের স্বার্থ সম্প্রসারণের আওয়াজ তুলতে চায় (সে হিসেবে শিব সেনাদেরই বা দোষ কী)। কম্যুনিষ্ট সোসিয়ালিস্টরাও সেই স্লোগানে সূর দিয়েছেন। ক্ষুদ্র রাজ্য হিরিয়ানার সীমানা সম্প্রসারণের প্রয়োজন, হতে পারে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাকে সর্বভারতীয় সমস্যার আলোকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া উচিত যে কোন সর্বভারতীয় দলের। না হলে আঞ্চলিক-তার কুক্ষিগত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এই আঞ্চলিকতাই আজ দল ও দলবাজির সুযোগ করে দিচ্ছে। এ সম্পর্কে 'সত্যক' উজ্জির প্রয়োজন আছে।

বীরেন্দ্র সিং-এর নীতিহীন (অর্থাৎ সামনে কোনো আদর্শের আহবানে বিচলিত না হয়ে) দলত্যাগ, এবং একটি সূক্ষ্ম মতবাদের জন্যই দল গঠন না করে কতক-গুলি স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে নব দলের আশ্রয় গ্রহণ, কোনটাই প্রগ্রেসের লক্ষণ বলে স্বীকার করা যায় না।

বিহার :

বিহারের শোষিত দল বস্তুত কী কারণে এবং কার দ্বারা শোষিত হয়েছে, বোঝা ভার। একটা জিনিস স্পষ্ট, শ্রীমন্ত বি পি মন্ডল মন্ত্রি হয়ে বস্তুত হয়েছেন। সেটাই যদি শোষণের লক্ষণ বলে স্বীকার করতে হয়, তবে শ্রীমন্ডল এবং তাঁর পার্শ্ব-চররা সত্যিই নিদারুণভাবে শোষিত।

শ্রীমন্ডলও বীরেন্দ্র সিং-এর মত কংগ্রেসে প্রবেশ করেন রাজনীতির প্রথম জীবনে। ১৯৫২ সালে শ্রীমন্ডল কংগ্রেস টিকেটেই আইনসভায় আসন অধিকার কবলেন। ১৯৫৭-র হেরে গিয়ে পুনশ্চ ১৯৬২-তে ফিরে এলেন। কিন্তু শ্রী কে বি সহায় মুখ্যমন্ত্রী হলে কংগ্রেসে তাঁর প্রতিপত্তি কমতে থাকে। সূযোগের অপেক্ষার থেকে ১৯৬৬-তে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে চুকে পড়লেন এস এস পি-তে। কিন্তু ডঃ লোহরী এবং অন্যতম এস এস পি নেতা বি এন মন্ডলের বিবৃদ্ধতার শ্রী বি পি মন্ডলের পক্ষে ছা-মাসের বেশি মন্ত্রিত্ব করার সুখ ভোগ করা সম্ভব হল না। ফলত নিজেকে শোষিত মনে করে তিনি বিহার শোষিত দল গঠন করে ফেললেন। বর্তমানে শ্রীমন্ডলের একমাত্র উদ্দেশ্য কী করে মুখ্যমন্ত্রীর গদিটা দখল

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

করা যায়। কংগ্রেসের কার্যকর্মীরাও দেখলেন বি পি মন্ডলকে সামনে নিয়ে এগোতে পারলে হারানো গদি পুনরুদ্ধার সম্ভব।

কংগ্রেসীরা দল ছেড়ে যদি ভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্টের মধ্যমন্ত্রী হতে পারেন, তবে আর চক্ষুলাঙ্কার বালাই কেন। এক-কালের কংগ্রেসী ক্ষমতার পক্ষা বদলে অভ্যন্তরীণ মন্ডলকে পুনরায় নেতা মেনে নিলেও যখন গদি মেলে তখন কোয়ালিশন সরকারই গঠিত হ'ক। কিন্তু মুস্কল হ'ল, শ্রী বি পি মন্ডল তো রাজ্যের কোন সভারই সদস্য নন। তিনি তালিকা হাজির করলেই রাজ্যপাল রাজ্যসভার জনৈক দল বদলকাবী সদস্যকে রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান কী করে। তাছাড়া বর্তমান মধ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শ্রীমন্ডলের তালিকায় অনেক নামই ভুলো। বিহার কংগ্রেস তখন দরখোশের মত সদর্পে ঘোষণা করল, শ্রীমন্ডলকে রাজ্য মন্ত্রিসভার পাণ্ডিত্য করার জন্য যদি আসনটাই বড় কথা হয়, তবে কুছ পরোয়া নেই, নির্বাচিত কোন সদস্য

আপন আসন ত্যাগ করে সেইখানে বি পি মন্ডলকে জায়গা দেবেন। এ হেন ক্ষেত্রে, সাধারণের ভোটাধিকার নিয়ে এই প্রহসনের সমুচিত জবাব নাগরিকবৃন্দ দিতে পারেন। দলের কথা না ভেবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে হলে সুবিধাবাদী প্রাধীকে ভোটারবৃন্দ অনায়াসে প্রত্যাহ্বান করতে পারেন। সুবিধাবাদ খতম করার জন্য পুন-নির্বাচনের অধিকার থেকে ক্ষমতাবানরা যখন জনগণকে বঞ্চিতই করে রেখেছেন তখন সুযোগমাত্র তার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ জানাতে পারে আর তা হলেই সুবিধাবাদী রাজনীতির পায়ের তলার মাটি সরে যাবে।

দেশ আজ যেভাবে ব্যক্তি ও দল স্বার্থরক্ষার জন্য অশ্বভাবে ছুটেছে, তখন একমাত্র গণচেতনাই সেই মন্ত্রিস্ব-অশ্ব রাজ-নীতির দৌড় খতম করতে পারেন। কিন্তু অতটা ভরসা জনগণের ওপরও রাখতে পারি না এটাই সববোঝা দৃষ্ট। রাখতে পারলে আদর্শের প্রশ্ন ভিন্ন মন্ত্রিস্বের প্রশ্ন কোন বি পি মন্ডলই আর জনগণের

ভোটকে নিয়ে এ জাতীয় ব্যঙ্গ করার সাহস ভবিষ্যতে পাবেন না, তা তিনি যে কোন দল ও গোষ্ঠীর মনোনীতই হোন না কেন।

দলের জন্য, দলবাজির জন্য দেশ নয়। দেশের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই দলের প্রয়োজন। এই কথাটা গণ-তান্ত্রিক দেশে সর্বোচ্চ উপলব্ধি করার প্রয়োজন। অন্যথা গণতন্ত্র ব্যর্থ।

বীরা বলছেন, গণতন্ত্র-বিরোধী দল সর্বদাই ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করবেন এতে কোন অপরোধ নেই। তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকাকে যথার্থ ব্যাখ্যা করছেন না। তাছাড়া যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতাচ্যুত করার খেলাটাই যদি আইনসভার পৌঁছানোর উদ্দেশ্য হয় তবে, দেশের কাজের জায়গাটা টাগ অব ওয়ারের ময়দানে পরিণত হবে। আশা করি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমন্টা এমেন আদর্শ দেশের সামনে ভুলে ধরলেও দেশবাসী সমস্বরে বলবেন, গণতন্ত্রের অর্থ জন-গণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে হা-ডু-ডু খেলা নয়। গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

এই গ্রন্থে প্রাচীনতম বাংলা কাব্য থেকে নবীনতম বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত, খুব সংক্ষেপে, কিন্তু ধারাবাহিকতার রূপ রক্ষা করে আলোচনা করা হয়েছে। ৯"×৫½" : পৃষ্ঠা ৭৮৬ : মূল্য ১০.০০।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)

আদি ও প্রাকচৈতন্যযুগ (ঐতিহাসিক সংস্করণ)

এতে একটি নতুন অধ্যায় ও অন্যান্য নানা তথ্য সংযোজিত হওয়ার বাঙালী মানসের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনধারাটি সুপরিষ্কৃত হয়েছে। শিকগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া-ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড ডিমক দুটি খণ্ড পড়ে লেখককে জানিয়েছেন—"Your work seems to me an exceptional piece of scholarship, complete and well-documented and with a large number of illustrative passages, which I particularly appreciate." ৯"×৫½" : পৃষ্ঠা ৬৭২ : মূল্য ১৫.০০।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)

চৈতন্যযুগ

ঐতিহাসিক খণ্ডে মূলতঃ চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইলেও, ইহাতে সে যুগের দেশ, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে সমকালীন যুরোপীয় এবং ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনামূলক পরিচয় দেওয়ার ফলে বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকতর পটভূমিকায় স্থাপন করিবার সুবিধা হইয়াছে। ৯"×৫½" : পৃষ্ঠা ৭৮১ : মূল্য ১৫.০০।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড)

উত্তর-চৈতন্য যুগ ও

অষ্টাদশ শতাব্দী

তৃতীয় খণ্ডে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা করা হইয়াছে এবং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপ নির্ধারণের জন্য বাঙালী জাতির সমাজ, সংস্কৃতি ও মননধারারও উল্লেখ আছে। ৯"×৫½" : পৃষ্ঠা ১৩৪৭ : মূল্য ২৫.০০।

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড : ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন-৩৪-৩১০৫ : ৩৪-৮৪৫১

গ্রাম-বিবলিওফিল

নেপথ্য নির্দেশে পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা।

এদেশী গণতন্ত্রে জনগণ নেপথ্যেই পড়ে রইলেন। নির্বাচনে উৎসে গিয়ে নির্বিচারে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির জন্য গণ-ভোটের মর্যাদাকে যথেষ্ট পদদলিত করতে থাকলেন তথাকথিত ভোট-ভিখারীরা যারা জনগণকে প্রবঞ্চিত করে বিশেষ ম্যানিফেস্টো নিয়ে একদিন ভোট ভিক্ষার নেমেছিলেন। জনগণের প্রতি এতাবড় বিশ্বাসঘাতকতা; এতাবড় উপ-হাস এবং নাগরিক অধিকারকে এইভাবে বেমালুম বাতিল করে দেওয়ার পরেও একটা দেশে গণতন্ত্র বজায় আছে, জনগণের সাংবিধানিক অধিকারকে আইনসভার সদস্যরাই ধ্বংস করছেন না এ কথা মনে নেওয়া যায় না। পুরো ব্যাপারটাই একটা বিবট প্রহসন।

দল আর দলবাজির দাপটে গণতন্ত্র এবং জনগণ অসভ্যভাবে পর্য্যদস্ত। আর ভৎসনো আমাদের একটি বৃহৎ সভ্য শিক্ষিত গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী বলে অতঃসাবধানে গর্ব অনুভব করছি।

কোন শোষিত দলের অস্তিত্ব নেই।

শোষিত যদি কেউ থাকেন তবে তারা হলেন নাগরিকবৃন্দ, যাদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ওপরই আজকের দল ও দলবাজি দাঁড়িয়ে আছে।

মণিপুর :

কেবলমাত্র দলত্যাগের দ্বারা ভাঙ-

নবীন চন্দ্রের কবিকৃতি-প্রণেতা ও বাদবন্দুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন-স্মৃতি কবিতামালার তৃতীয় বক্তা এবং গবেষণার ডি-ফেল উপাধিপ্রাপ্ত

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় প্রণীত

কবি নবীন সেনের রৈবতক

গভীর গবেষণামূলক ক্রমিকা, মূল এবং বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনী ও উদ্ধৃতির আলোচনী-সম্মিলিত, সুন্দর বাঁধাই।

মূল্য : ৬ টাকা।

বি.বি. ব্রাদার্স এন্ড কোং

১৬/১ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
গ্রন্থ : কলেজ হোস্টেল রোড, পোহাটী-১

মুড় মন্ত্রিসভা পরিবর্তনের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা দেখা গেল মণিপুরে। পার্বত্য জাতির সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের গাড়ি-মসি যদিও মণিপুরে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অসম্মত পতনের কোনও উপাদান নয়; কিন্তু পর্বতীয়া অসম্মত যে কংগ্রেসের বিবৃতি দানা বাঁধছে, মণিপুরে বৃহৎ-ফ্রন্টের আহ্বানে পালিত হরতাল তার কিছু প্রমাণ রাখে। বার ঘণ্টাব্যাপী হরতালে একটি ব্যতীত কোন সংঘর্ষের খবর নেই। অথচ রাজ্যের অবস্থা অশান্ত-গর্ভ। মন্ত্রিসভার কংগ্রেস দলে অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত বিরাট ভাঙন ঘটে রাজ্যবাসীর মনেই প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি করে নি। কংগ্রেস হাই কমান্ড পর্যন্ত হতরাক ও-বিস্মিত।

কংগ্রেসী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারে যে সাতজন কংগ্রেসী, এম এল এর-ও প্রত্যেক হাত ছিল তাঁরাও পরে অপর একজন কংগ্রেসী সদস্যসহ দলত্যাগ করে বৃহৎফ্রন্টে যোগ দিলেন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বটনা এ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। তিনি বলছেন, কংগ্রেস এখনও বহিষ্কৃত সদস্যক সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আবে সেনেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু বৃহৎফ্রন্ট তাঁদের সমর্থক সদস্য-বৃন্দ নিয়ে (বোল জন) মণিপুরের চীফ কমিশনারের কাছে হাজির হয়ে ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেন। রাষ্ট্রপতি সকাশে হাজির হওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। কমিশনারের আদেশে অধিবেশন স্বাগিত হওয়ার বিধানসভায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ফ্রন্টের সতের জন সদস্যই। এঁরা বিধানসভার উপস্থিত হওয়ার স্বাগিত সভা নিজেরাই চালু রাখেন এবং সেখানেই তাঁদের মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। চারজন দলত্যাগী কংগ্রেসী এবং একজন নির্দলীয়কে নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা তাঁরা গঠন করবেন বলে জানা গেছে।

এই প্রথম একটি পার্বত্য অঞ্চলে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

কিন্তু সব থেকে বড় কথা কোথাও কেউ নিরমকান্দন শৃঙ্খলার ধার ধারছেন

না। চীফ কমিশনার যেমন কোন কারণ প্রদর্শন না করেই সভা স্বাগিত রাখেন, দলত্যাগীদের নিয়ে পুষ্টি নয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও তেমনি চীফ কমিশনারের নির্দেশকে অ-গণতান্ত্রিক বলে নিজেরাই সভা চালু রাখার ব্যবস্থা করছেন। স্বেচ্ছাচার দেশ-জুড়ে, একটা বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। আর তারই মাঝে কুঁকি মিজোরা নতুন করে মাথা তোলবার সুযোগ সম্মান করেছে।

সীমাস্তে সংকটের ইশারা। দেশের অভ্যন্তরে সংকট নিত্য ঘটনা। আমরা ঠিক কোথায় কোনদিকে কী উদ্দেশ্যে ছুটছি, অনেকের কাছেই তা অস্পষ্ট।

নির্বাচনের পর যেটা কেবলমাত্র কংগ্রেস-বিরোধিতা ছিল, ক্রমশ সেটা সুযোগ সম্মান ও ক্ষমতালিপ্সার পরিণতি লাভ করেছে। এই ক্ষমতালিপ্সা কতদূর পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়, ভারতের ইতিহাসে তার নজীরের অভাব নেই। কিন্তু দেশের সর্বত্র ভয়াবহ এবং সর্বগ্রাসী বন্যার মতই, ক্ষমতালিপ্সার স্রোত চতুর্দিক ভাসিয়ে বিশ্বাসের তটরেখা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।

আমরা যেমন বন্যারোধের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইনি, আমরা তেমনি এই দায়িত্ব-হীন ক্ষমতালিপ্সার সংঘর্ষ এড়ানো ব্যর্থ হব, যদি ক্ষমতার উৎস জনগণকে বাদ দিয়ে কতিপয়ের মধ্যে ক্ষমতাস্বত্ব স্বেচ্ছাচারকে নির্বিচারে বাড়তে দিই।

দেশকে কতকগুলি দুর্বল দায়িত্বহীন, স্বার্থপরায়ণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির বস্তু বা অবজ্ঞেই হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিলে, বহিঃগত কোন উদ্ভূত চিলের শিকারী চোখ এবং নখর দেশ নামক এই ভোগ্য-বস্তুটিকে যে কোনো অসতর্ক মূহুর্তে ছোঁ মেরে নেবে না, একথা সাধারণ মানুষ আজ আর ভাবতে পারছে না।

দেশবাসী এই ক্ষমতালিপ্সার অগল-হীন অগ্রগতিককে উদ্বেগের সঞ্চে লক্ষ্য করছেন, এবং একটি সংহত নিরমের দ্বারা এই উদ্বেগটিকে জাতির স্বার্থে অবিস্মৃতি চিকিৎসিত করার প্রয়োজন অনুভব করছেন। আর সেই চিকিৎসা বোধহয় একমাত্র জনগণই করতে পারেন।

রোগ শিরা-উপশিরা পরিবাস্ত হইলে, রোগীর রোগও থর পড়েছে, এখন চিকিৎসকের শরণ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২০-৯-৬৭

কপো:

গত সপ্তাহে কপোর রাজধানী কিনসাসাতে (আগে নাম ছিল লিওপোল্ডভিল) 'আফ্রিকা একা সংস্থার' (অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি) চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৎসর আফ্রিস আবাবায় আগের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চার দিন ধরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আফ্রিকা একা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ৩৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। একমাত্র মালাউই থেকে কেউ আসে নি। বিভিন্ন মূদ্রে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে মনে হচ্ছে, মালাউই কৃষ্ণ আফ্রিকার সংহতির মধ্যে থাকবে না। মালাউই-এর রাষ্ট্রপতি হেন্সিৎসে বাণ্ডা সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা শীগগিরই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধেই আফ্রিকার বিদ্রোহ। এ কথা বাণ্ডা ভাল করেই জানেন, তবু সারা আফ্রিকার কৃষ্ণকারদের স্বার্থের চেয়ে আপাতত তিনি তাঁর নিজের দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকেই বড় বলে মনে করছেন। তার জন্য তিনি অন্য সহযোগীদের ছাড়তেও প্রস্তুত।

কিনসাসা সম্মেলনে ১৭ জন আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইথিওপিয়ার দম্রাট হাইলে সেলাসী, জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা, ঘানার রাষ্ট্রপতি জোসেফ আনকারা, উগান্ডার রাষ্ট্রপতি মিলটন ওবোটে ও লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টাকমান। কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াটো ও তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি জোসেফ নিয়েরে অবশ্য আসতে পারেন নি। কপোর গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যের গোলামালের ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত এতজন রাষ্ট্রনেতা যে উপস্থিত হয়েছেন, তা সম্মেলনের দিক থেকে এক মস্ত সাফল্য। কপোর রাষ্ট্রপতি জোসেফ মোবুটু'র মর্মানী এতে বিশেষভাবে বর্ধিত পেয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আফ্রিকার নবোদিত রাষ্ট্রের নেতারা মোবুটুকে গ্রাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বশব্দ ভুতা বলেই মনে করতেন। আজ কিন্তু তাঁরা সবাই মোবুটুকে জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

সম্মেলনের শেষ দিন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাট উপস্থিত হয়ে আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাদের সম্মুখে বিশ্বের নানা সমস্যা ও আফ্রিকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বর্তমানে



আন্তর্জাতিক

মস্কোগামী বিমানে ওঠার আগে অসুস্থ এবং বিবর্ষ রুশ পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ কচেচেকোকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা দাচ্ছে

জনসাধারণের একাংশের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যে চেষ্টা চলছে, কিনসাসা সম্মেলন থেকে তার নিন্দা করা হয়। নাইজেরিয়া থেকে বিয়াকুরের বিচ্ছেদের চেষ্টাকেও সম্মেলন পছন্দ করে নি। স্থির হয়েছে, সম্মেলনের পক্ষ থেকে ছয়জন রাষ্ট্রনেতা নাইজেরিয়ার যাবেন, সেখানকার গৃহযুদ্ধ মেটাবার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইলে সেলাসী প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এতটা চরম পন্থা গ্রহণ না করলেও সম্মেলন থেকে স্থির করা হয়েছে, রোডেশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হবে।

কপো থেকে অবিলম্বে বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যদের অপসারণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। যদি এই ভাড়াটে সৈন্যরা কপো ত্যাগে সম্মত না হয় তবে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যে যে-সব সীমান্ত সমস্যা রয়েছে, তার মীমাংসার জন্য আগামী মাসে এই তিনটি দেশের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে মিলিত হবেন বলে স্থির হয়েছে। কেনিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল। আফ্রিকার দায়িত্বশীল নেতাদের মধ্যস্থতায় এই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কিনসাসা সম্মেলনে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন।

আরবদের সঙ্গে কৃষ্ণ-আফ্রিকার মন

কবাকবি কিনসাসা সম্মেলনেও মিটল না। আরব-ইসরায়েল বিরোধের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘে অধিকাংশ আফ্রিকার রাষ্ট্র আরবদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আমেরিকা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রস্তাব সমর্থন করেছে। নাসের আফ্রিকা একা সংস্থার একজন উৎসাহী নেতা হওয়া সত্ত্বেও এবার তিনি কিনসাসা সম্মেলনে আসেন নি। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবেও কেবলমাত্র সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলী জবরদখল অবসানের কথা বলা হয়েছে। আফ্রিকা একা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে সিরিয়া ও জর্ডানের কথা বলা হয় নি, ইসরায়েলী আক্রমণেরও নিন্দা করা হয় নি।

বুটেন:

লন্ডনে অধারনরত পঁচিশ বৎসর বয়স্ক রুশ পদার্থবিজ্ঞানী ছাত্র ডঃ ভ্যাডিমির কাচেচেকোকে নিজে বেশ এক নাটক হয়ে গেল।

১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার লন্ডনের এক কর্মব্যস্ত রাজপথ থেকে সোভিয়েট দূতাবাসের কর্মীরা জোর করে কাচেচেকোকে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে, এই খবর পেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের কর্তারা ছুটোছুটি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দরে একটি মস্কোগামী বিমান থেকে জোর করে ইংরেজ পুলিশ কাচেচেকোকে নামিয়ে আনে। নামানোর সময় রুশ বিমানের ক্যাপ্টেন ও কাচেচেকার স্ত্রী গালিনার সঙ্গে পুলিশের দু'ব একটা খন্দাখন্ডিত চলে।

এর পর শব্দ হয় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-
কর্ত্তর ও সোভিয়েট দূতাবাসের মধ্যে
প্রতিবাদ ও পাল্টা-প্রতিবাদের পাল্লা।
সোভিয়েট পক্ষের বক্তব্য, তাঁদের একজন
নাগরিককে জোর করে আটকে রাখা
হয়েছে, এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার অশালীন
ব্যবহার করা হয়েছে। গালিনাও তাঁর
স্বামীর প্রতি অসম্মতবাহারের জন্য তাঁর
কোড প্রকাশ করেছেন, এবং ব্রিটিশ প্রধান-
মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের কাছে ব্যক্তিগত-
ভাবে পত্র লিখেছেন।

ইংরেজদের বক্তব্য, সোভিয়েট দূতাবাসের
কর্মীরা কাচেকোকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তাঁকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং
এই ব্যাপারে ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গ
যে কূটনৈতিক শিষ্টাচার পালন করা
প্রয়োজন সোভিয়েট দূতাবাসের কর্মীরা
তা করেন নি।

সবাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮ই সেপ্টেম্বর
ইংরেজরা কাচেকোকে ছেড়ে দিয়েছে,
এবং তিনি সম্পূর্ণ মস্কো ফিরে গিয়েছেন।
বর্তমানে কাচেকো অসম্মত। সমগ্র

ব্যাপারটিই বেশ সন্দেহজনক বলে মনে
হয়।

জিরাফটার

রুরোপের একমাত্র বিদেশী উপনিবেশ
জিরাফটার। স্পেনের ভূখণ্ডের মধ্যে
অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের দ্বারস্বরূপ সোমো
দুই বর্গমাইলের এই জিরাফটার বন্দর
১৭০৪ সাল থেকে ইংরেজদের দখলে।

২৬৩ বৎসরের ইংরেজ শাসনের অবসান
ঘটিয়ে জিরাফটারকে স্পেনে ফিরিয়ে দেবার
জন্য অনেক দিন থেকে দাবি জানানো
হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের উপনিবেশবাদ-বিরোধী
কমিটিও স্পেনের এই দাবি সমর্থন
করেছে। কিন্তু এইরূপ একটি গুরুত্ব-
পূর্ণ স্থান ইংরেজরা সহজে ছাড়তে রাজী
নয়। তাই দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা
চলেছে। এই সম্পর্কে স্পেন সরকারের
সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা চলাছিল, তাও
ভেঙে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার একটা
গণভোট নেবার ব্যবস্থা করেন। জিরাফটারের

প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীরা ভোট দিয়ে স্থির
করবে, তারা ইংরেজ শাসনেই থাকবে, না
স্পেনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গত সপ্তাহে
এই গণভোট নেয়া হয়েছে। ১২,১০৮
জন ইংরেজ শাসনে থাকবার পক্ষে মত
প্রকাশ করেছে। আর মাত্র ৪৪ জন
স্পেনে যেতে চেয়েছে। শতকরা ৯৯.২
ভোটদাতা বিদেশী শাসন বজায় রাখার
পক্ষে মত দিয়েছে।

এই ভোটের ফলে ইংরেজরা স্বাভাবিক-
ভাবেই খুব উল্লসিত। তারা বলছে,
জিরাফটারের লোকেরা জ্যাঙ্কোর এক-
নায়কতন্ত্রের অধীন হতে চায় না বলেই
তারা ইংরেজ শাসনে থাকার পক্ষে মত
প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই অভিমত
মেনে নেয়া শক্ত। গণতন্ত্রই হোক, আর
একনায়কতন্ত্রই হোক, সবাই নিজের দেশের
সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, স্বাধীনতা চায়—
বিদেশী কর্তৃত্ব কেউ চায় না।

আসল কথা, জিরাফটারের বর্তমান
অধিবাসীরা অধিকাংশই বাইরে থেকে
আসা লোক। এখানকার আদি অধিবাসীরা
এখন জিরাফটারের পাশে দুটি গ্রাম লা
লিনিয়া ও সান রকেতে বাস করে। এদের
বাদ দিয়ে মূলতঃই কর্তৃত্বাধীন লোকের
ভোটে যে মত জানা গেছে, তা কখনও
গণতান্ত্রিক মত হতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘও
একই অভিমত প্রকাশ করেছে।

লিহেল :

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চার দিন যবে
সরকারীভাবে সিংহল সফরের পর ভারতে
ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী গান্ধী এর
আগে বহুবার সিংহল এলেও, প্রধানমন্ত্রী
হবার পর এই তাঁর প্রথম সিংহল আসা।
কলম্বো, কান্ডি এবং সিংহলের
অন্যান্য সর্বত্র, শ্রীমতী গান্ধী যেখানেই
গিয়েছেন, সেখানেই তিনি বিপুল
সম্বর্ধনা পেয়েছেন। ভারত ও সিংহলের
মধ্যে ঘনিষ্ঠতম মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে,
তাছাড়া সিংহলীদের কাছে জওহরলাল
নেহরু ও তাঁর কন্যা খুবই জনপ্রিয়।
রত্নমালানা বিমানবন্দরে যখন শ্রীমতী
গান্ধীর বিমান এসে পৌঁছয়, তখন কেবল
প্রধানমন্ত্রী ডাডলি সেনানায়ক ও সরকার
পক্ষের নেতারা উপস্থিত ছিলেন না,
বিরোধী দলের নেতারাও অনেকে তাঁকে
সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এসেছিলেন।
এঁদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী
সিরিমাভো বন্দরনায়কও ছিলেন।
কমিউনিস্ট পার্টি ও লঙ্কা সমসামাজ
পার্টির বিশিষ্ট নেতারাও উপস্থিত
ছিলেন। এর আগে সিংহলে কখনও
কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতার সম্বর্ধনা উপলক্ষে

সাপ্তাহিক বসুমতী

প্রকাশিত হয়েছে

অধ্যাত্র সাহিত্য

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের আশ্রিত অবদান

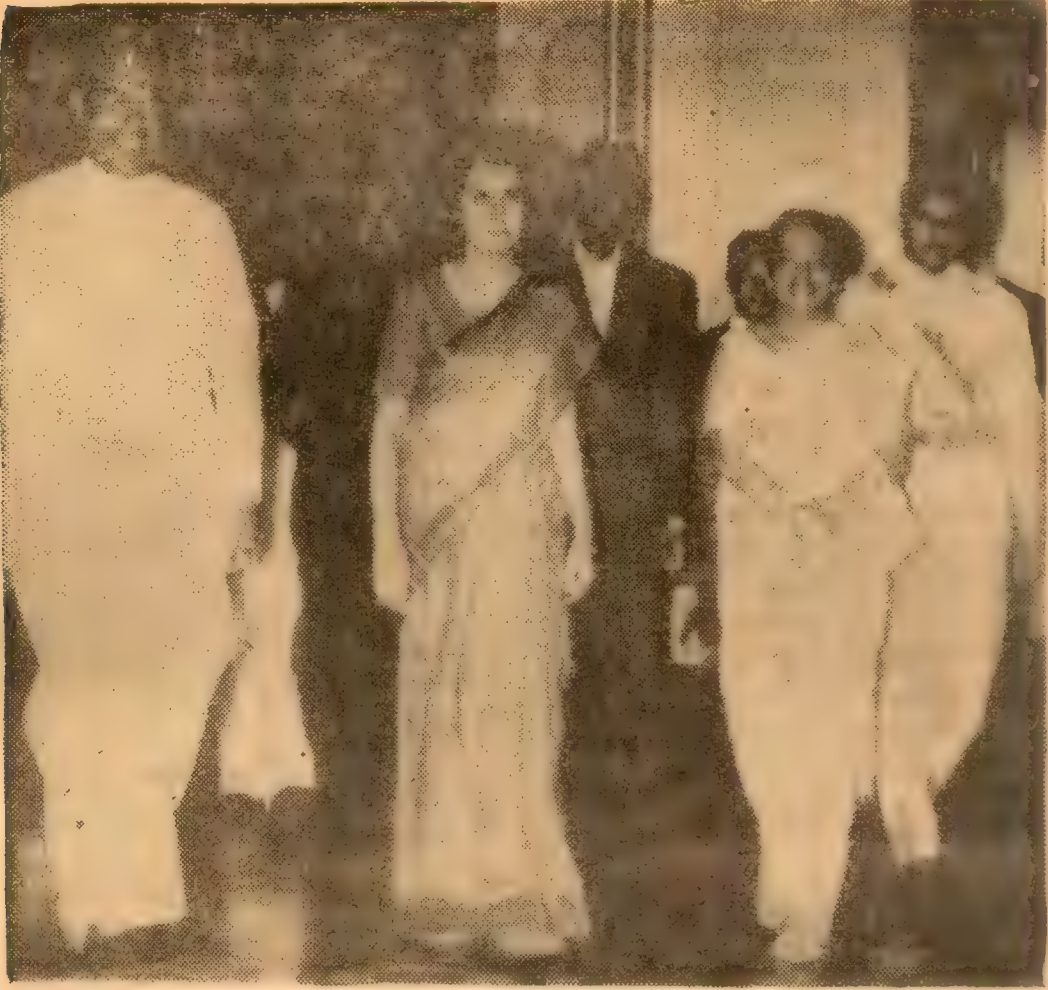
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

[সংস্কৃতি বিশুদ্ধ সংস্করণ]

পরমভক্ত শ্রীমৎ লাভাজীউ কর্তৃক হিন্দী ভাষায় রচিত ভক্তমাল গ্রন্থ ও
শ্রীমৎ প্রিয়দাস কর্তৃক রচিত টীকা অবলম্বনে পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী
কর্তৃক স্থললিত ছন্দে অনূদিত। বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের এই অমূল্য রত্ন।

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



সিংহল সফরে শ্রী মতী ইন্দিরা গান্ধী

সরকার ও বিরোধীপক্ষের নেতাদের এরূপ বড় সমাবেশ হয় নি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ডাডলি সেনানায়কের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার ওপর, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার সংকট ও ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীনা আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীসেনানায়ককে ভাল করে বুঝিয়ে মলেছেন। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং দুই দেশের স্বার্থে ব্যবসায়িকজোর প্রশ্ন নিয়েও দু'জনে আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে চা-এর দাম কি করে স্থির রাখা যায়, এটা এখন সিংহল ও ভারত দুই দেশেরই একটি বড় সমস্যা। বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

রাষ্ট্রসংঘ কমিটির আসন্ন অধিবেশনে সিংহল ও ভারত একত্র বক্তব্য রাখবে বলে স্থির হয়েছে।

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মধ্য আলোচ্য বিষয় অবশ্য ছিল সিংহলের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা। এ সম্পর্কে সিংহল ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৪ সালে যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, তা' কতদূর কার্যকরী করা হয়েছে, সে বিষয়ে দু'জনের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়। দুই দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পর উভয় প্রধানমন্ত্রীই একমত হয়েছেন, সন্তোষজনকভাবে এই চুক্তিকে কার্যকরী করা হচ্ছে। এই চুক্তির আওতায় পড়েন না, এমন আরও যে প্রায় দেড় লক্ষ

ভারতীয় এখানে আছেন তাঁদের সম্পর্কে কি করা যায় সে-বিষয়েও দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে।

আলোচনা শেষে দুই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর দু'জনেই জোর দিয়েছেন। এই সফরের ফলে দুই দেশের সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি হয়েছে এবং এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মৈত্রী সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে-সব আলোচনা হয়েছে, তাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য আগামী মাসে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে এক বৈঠক হবে।

ইন্দু মেলা

রবীন্দ্রনাথের রাজা—শ্রীসুন্দর চার্য। সাহিত্য প্রকাশ, ৪৭/২ রমেন্দ্র-প্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। মূল্য : চার টাকা।

বাংলা দেশে যে সময় পত্র-পত্রিকার নাটক প্রায় প্রকাশিত হচ্ছে না, নাটক সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাদুলি উঠে যাচ্ছে এবং উপন্যাস বা গল্পের কাহিনীকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করে মঞ্চস্থ করা বা পর্দায় প্রতি-ফলিত করা ক্যানন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনো রবীন্দ্র নাটক অবহেলিত বোধ না হওয়ার মনে হয়, দেশে এখনো সত্যিকারের নাটকের সমাদর আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটিকে শব্দ, বস্তু দিয়েই নয়, হৃদয় দিয়েও বঝতে হয়। রাজা নাটকটির মর্ম অনুধাবন করাও বেশ কিছুটা কঠিন। রাজা নাটকটি নিয়ে রবীন্দ্র-নাট্যবিশেষজ্ঞরা অনেক রকম আলোচনা করেছেন। সর্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্য-

সন্দেশ শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

এতে আছে
উপেন্দ্রকিশোর রায় ও সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত গল্প, সত্যজিৎ রায়ের সচিত্র গ্রন্থ—সিনেমার কথা, তিনটি রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ উপন্যাস ও বড়গল্প, দুইটি ছোট-দের উপন্যাস, দুইটি নাটিকা। তাছাড়া অজস্র ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া ও প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলার প্রখ্যাত শিল্প-সাহিত্যিকেরা।

আর
সম্পূর্ণ নতুন ধরণের পুরস্কার প্রতি-যোগিতা। মূল্য : ০.৫০
সাধারণ সংখ্যা—৭৫, বার্ষিক চাঁদা ৯৯,
সডাক ৯.৫০

প্রাপ্তিস্থান—সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এডিনউ, কলিকাতা—২৯
নিউ স্ট্রিট : এ/১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা—১২

শব্দ ও রসমন্ড্র আলোচনা করেছিলেন শ্রীঅশোক সেন তাঁর 'রবীন্দ্র-নাট্য পরি-ক্রমার'। বসতে বিধা নেই, তাঁর আলোচনা বিশেষ উপকার সাধন করে-ছিল। বহু সমালোচক তাঁর আলোচনার পক্ষেই 'রাজা' নাটকটির আলোচনা বিস্তৃত করেছেন। আবার কেউ কেউ 'রাজা' নাটক সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষা নাটকের অনুসরণকারী বলে দাবী করে-ছেন। শ্রীসেন বলেছেন, "যে অধ্যায়রস ও ভাববতঃপ্রসার ব্যাকুলতা কাব্যাদুলিকে চরম মর্যাদা দিয়া শ্রেষ্ঠ কিম্ব-সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়াছে তাহাই নাটকের মাধ্যমে নবরূপে পরিবেশিত হইয়াছে 'রাজা' প্রভৃতিতে।

"আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে এমন পরি-পূর্ণভাবে নাটকের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিতে কোনো দেশের সাহিত্যেই আর দেখা যায় নাই। ত্রেকের 'দি ম্যারেজ অব হেন্ডেন অ্যান্ড হেল' বা টম্পসনের 'দি হাউস অব হেন্ডেন' প্রভৃতি কাব্যে আধ্যা-ত্মিকতাকে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহা প্রচেষ্টার অধিক আর কিছুই নহে—পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকগুলির সহিত ইহাদের কোনো তুলনাই হইতে পারে না।"

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমান সমালোচিত গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন, "...ধর্ম ও সমাজ-জীবনে আমাদের দেশে বাহা সত্য, পাশ্চাত্য দেশে তাহা সত্য নহে।" তিনি নাটকটির ইংরেজি নাম-করণে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, এর নাম 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার'-এর পরিবর্তে হওয়া উচিত ছিল—'দি বিল্য-ভেড'।

অধ্যাপক সুবন্ধু ভট্টাচার্য পূর্ব-সূরীদের সমগ্র আলোচনাকে ভিত্তিবস্থাপ গ্রহণ করে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের রাজা' গ্রন্থের সৌম্য নির্মাণ করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন—যাতে সর্বমস্তর সমন্বয় সাধন করে রাজা নাটকটিকে পাঠকদের কাছে অধিকতর প্রাঞ্জল করে তোলা সম্ভব হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাধারণ পরি-

চয় দিয়ে রাজা নাটকের ভাববস্তু, কাহিনী তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া রাজা নাটকটি কোন শ্রেণীর নাটক, নাটকটির উৎস, চরিত্র, গান ও সংলাপের সহজবোধ্য আলোচনা করেছেন। উপরোক্ত গ্রন্থটি রবীন্দ্র-নাট্য-মোদীদের তুষ্ট করতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

ট্রেড ইউনিয়ন দেশে ও বিদেশে :
লেখক—শ্রীসুধেন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তি-স্থান—২ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫। মূল্য : ২.৫০।

ইংরাজী ভাষার ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত গ্রন্থের অভাব নেই। ওদেশের ট্রেড ইউনিয়নের কথাবার দিলাম, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়েও বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ নেই। সেই দিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য গ্রন্থটির লেখক শ্রীসুধেন চট্টোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে তিনি নিজে দীর্ঘকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পো-কনসমূহের সাথে যুক্ত আছেন। ক্যুজুই এই বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বর্তমান গ্রন্থটির মধ্যেও বর্তমান। প্রথম পাঠটি অধ্যায়ে লেখক ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের উদ্ভব ও কর্মময়কাল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাঙালী পাঠকের নিকট এইগুলি সত্যই আকর্ষণীয় হবে। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করেছেন এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন। তা ছাড়া শ্রমিক আইন জাতীয় লেবার কমিশন, শ্রমিকদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর লেখক মূল্যায়ন আলোকপাত করেছেন।

তবে গ্রন্থটির একটি বড় দুটি আছে। ভারতে বর্তমান বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার ইতিহাস আরও অনেক বিশদ হওয়া উচিত ছিল। সম্ভবত অত্যন্ত দ্রুত-তার মধ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে যে কারণে ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কার লেখকের যতটা মনোযোগ ও দক্ষতা প্রদর্শন হয়েছে অপর অধ্যায়গুলির প্রতি ততটা হয় নি। প্রচ্ছদপট অভ্যন্তরিত হতাশাজনক এবং বানান ভুলের সংখ্যাও বড় কম নয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক গ্রন্থ-টির আকার আরও বর্ধিত করবেন, এবং উপরিউক্ত দুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করবেন। বইটি পাঠ করে একটি আক্ষেপ মনে জাগে লেখক আর একটু পরিচয় করলে গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থে পরি-ণত করতে পারতেন। আমরা এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখীরঞ্জন দাস

॥ বিংশ অধ্যায় ॥

॥ ১ ॥

আমার বিয়ে

শরৎ বোল সাহেবের চেম্বারে আমি খুবই উৎসাহের সঙ্গে ডেভিলিং শুরু করে দেওয়ার ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে আমার হাজিরটা ক্রমশই কমতে লাগল। বৃদ্ধ কিন্তু বিষয়টাকে বেশ শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আমরা দুজনেই তখন নিশ্চিত করে বুঝেছিলাম যে আমার প্র্যাকটিসের উপরই নির্ভর করছে আমাদের সংসার ও আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখসমৃদ্ধি। বক্ত না ভবিষ্যতের উদ্বেগে চিত্ত আমরা একে তুলতাম আমাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডলের ফাঁকে ফাঁকে। ওদিকে বেলতলার কালীমোহন আলায়ে বোঠানের দরবারেও আমার অনুপস্থিতিটা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। মোনা, বেবী ও ভোম্বলরা স্পষ্টই ইঙ্গিত করতেন যে কাকা কোর্ট-শিপ করে আর সময় পায় না আমাদের কাছে দেখা দেবার। কিছুদিন পরে পরে বোঠানের কাছে গেলেই মোনারা কথাটা জুলে আমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করতেন। আমি যত বলি যে ৭৮নং বাড়িতেও আমার ব্যতীয়া খুবই কম, কেন না আমি ডেভিলিং-এর চাপে ইতোদ্রষ্ট ততোদ্রষ্ট হয়ে আছি, কে তাঁর কথা শোনে।

দাদাবাবু তাঁর বড় মেয়ে মোনার বিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুমতে যদিও অসবর্ণে। দাদাবাবু খ্রীশ হবেন ভেবে কয়েকজন দাদাবাবুর কানে কথাটা জুললেন যে দাদাবাবুর হিন্দুধর্মে মতি দেখেও সখীরঞ্জন তাঁকে অপদম্ব করবার জন্যেই রাস্তা পরি-হারে বিয়ে করতে চলেছে। এটা তাঁদের মতে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃঢ়চর্য্য মিন এ রকম কথা শুনে শুনে দাদাবাবুর মেজাজ বোধ হয় খারাপ হচ্ছিল। একদিন বলে দিলেন—“আমি - খোঁকাঁকে বিলাত পাঠাইয়া পড়াইয়া আনিছি বইলা

কি আমি অর মাথা কিনিছি? হ্যাঁত আই বট হিজ সোল?” তখন সবাই নিরুত্তর। আর কখনো দাদাবাবুর কাছে ঐ ধরণের কথা কেউ বলেন নি। দাদাবাবু ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া পুরুষ।

একদিন একটা সৌভাগ্য এসে গেল দমকা দক্ষিণে হাওয়ার মত। দাদাবাবু একদিন যে মন্তব্য করলেন তার ভাবার্থ হোলো এই—যে ব্যারিস্টার খেটেখুটে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাকে অনেক মেয়েই বিয়ে করতে পারে। তাতে সে মেয়ের কৃতিত্ব কিছুই নেই। কিন্তু যে ব্যারিস্টার জীবন-সংগ্রামে প্রাণসংশয় করে লড়াই করেছে এবং তার ভবিষ্যতে কি হবে যখন তা কেউই বলতে পারে না তখন যে মেয়ে সেই ব্যারিস্টারকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্বামীকে সাহচর্য্য ও উৎসাহ দিয়ে উদ্বেগ কবে দেন, বিনি সমানভাগে স্বামীর সুখস্বপ্ন সম্ভোগ করেন ও স্বামীর দুঃখ নৈরাশ্যকেও বহন করেন—সেই মেয়েই সত্যিকারের সহধর্ম্মিণী আখ্যা অর্জন করতে পারেন। কথাটা বোঠানেরও মনে লাগল—বোধ হয় নিজের ঘোবনের কঠিন সংগ্রামের কথা স্মরণ কবেই। তিনিও বললেন যে দুজনে একসঙ্গে বেড়ে উঠলে পরস্পরকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। ভোম্বলের - মূর্খে কিছু বাধত না। তিনি অকস্মাৎ বলেই ফেললেন—“তবে ত’ কাকা ও বৃদ্ধ খুড়িমার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত।” বোঠান বললেন—“করলেই ত’ পারে। কে বাগ্ন করছে।” উৎফুল্লচিত্তে বাড়ি এসে মায়ের কাছে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। গরম পড়ে এসেছে। মা আমাকে হাতপাখা দিয়ে ব্যাভাস করতে লাগলেন যেমন করতেন আমার ছোট-বয়সে। মার সঙ্গে আমার মন খুলে কথা বলার অভ্যাস ছিল বাল্যকাল থেকেই। সেদিন সম্ভ্রাম বেলতলার কালীমোহন আলায়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল বেশ ফলাও কবে মাকে বললাম। সব কথা শুনে মা বললেন—“ভাসুর-পুত্র

ঠিক কথাই কইছেন। বাসন্তীর যখন অমৃত নাই তখন শশীবাবুর লগে কথা কইলে হয়। দেখি, অনরে কইয়া দেখি।” শুনে যে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা বলাই বাহুল্য।

এর উপর আর একটা কাণ্ড হোলো। বৃদ্ধর মা জ্ঞানদাদেবী ছোটকোন ও খোঁকাঁকে নিয়ে বিনা খবরেই আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ি এসে গাড়ি থেকে নামলেন। পরে আমাদের ভাগনে সুধাংশু গুপ্ত মন্তব্য করবেছিলেন—“লোকাল ইন্সপেকসন করতে আসাছিলেন আর কি। দেইখ্যা গেলেন ৭৮নং থেকে ১৪নং-এ আইস্যা মাইঘাটার কি দশা হয়।” আমি তখন হাইকোর্ট থেকে শরৎ বোস সাহেবের সঙ্গে ডেভিলিং কবে বাড়ি ফিরি নি। শুনলাম যে জ্ঞানদা দেবীও আমার মায়ের কাছে আমাদের বিয়েটা যাতে হয়ে যায় সেইরকম ইঞ্জিত করে গিয়েছেন। আরো শুনলাম যে আমাদের আপন দিদিমা বিনি তখন আমাদের বাড়ি ছিলেন এবং আমার কায়স্থকন্যাকে বিয়ে করাটা বিনি তখনো বরদাস্ত কবতে পারেন নি তিনি নাকি ছোটকোনকে লক্ষ্য করে নেপথ্যে—“নাইকানীরা আইছেন” বলে ফেলেছিলেন। কথাটা ছোটকোনেব কানে গিয়েছিল কি-না এবং গিয়ে থাকলে তাব তাৎপর্য্যটা তিনি তখন বুঝেছিলেন কি না তা ভগবানই জানেন।

জ্ঞানদা দেবীও আমাদের বাড়ি আসার পর বাবার সঙ্গে মায়ের নিশ্চয়ই আবার কথাবার্তা হয়েছিল আমার বিয়ের সম্বন্ধে। বৃদ্ধর সঙ্গে আমার বিয়েটা বাবার তেমন মনঃপূত হয় নি ওঁরা রাস্তা বলে নয়, কায়স্থ বলে। আমার নিরক্ষর মায়ের মনের প্রসার দেখে অবাক হয়েছি। তাঁর মনে এতটুকুও স্বেচ্ছা ছিল না। তিনি বললেন—“অরা যখন ভাইব্যা-চিন্ত্যা নিজে-রাই মন ঠিক করছে, আমরা কদিন আছি, আমরা ক্যান বাধা দিমু। অরা আমাগো আশীর্বাদ পাইবই।” ভগবান জানেন এত

উদ্ভাস্তা আমার মা কোথা থেকে গেলেন। কথাটা আমার মামাবাড়ির লোকদের কারো পছন্দ হয় নি। অনেকে এসে মাকে নানা রকম বাগড়াও দিয়ে গেলেন। একদিন আমাদের ঠাকুরমামা মারের দাদা যোগেশ এসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেই ফেললেন—“এক সন্ধ্যা ভাইগুনা বাড়ি খাওনও বন্ধ হৈল।” মা তখন মন ঠিক করেই ফেলেছেন। ঠাকুরমামার কথাটা শুনেই বললেন—“ক্যান, সিলেট আর চট্টগ্রামে শূদ্রে-বৈদ্যে কি বিরা হয় না? না, তাগ মাগা খাওন বন্ধ হয় ভাইগুনা বাড়িতে?” ঠাকুরমামা তখনও ছাড়েন না। বললেন—“কি কও তুমি বিনদা? পান্ডববর্জিত দেশের লোকের লগে কি তুলনা চলে?” কথাটা এখানেই থেমে গেল। আমার মামা-বাড়ির লোকেরা মন খুলে আমার বিয়েতে বোধ হয় যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু ভগবানের এমনি বিধান যে এই মাতুল-গোষ্ঠীই শেষে বৃদ্ধের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধ সব রকমে তাঁদের সেবা-স্বয় করে তাঁদের বিমুখ মনকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। যাই হোক, সেটা পরেব কথা।

আপাতত জ্ঞানদা দেবীর আমাদের বাড়ি আসায় মাকেও একবার তাঁদের এচনং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি যেতে হোল। আমাকে কিছু না বলে একদিন বিকেলে মা নন্দা, বুমা ও বৃড়িকে নিয়ে মঙ্গলদার বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধ এসে মাকে প্রণাম কবতেই মা তাঁর নিজের গলা থেকে হার-ছড়াটা খুলে বৃদ্ধের গলায় পরিয়ে দিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার মাকের অন্তরের সকল শূভ কামনা সেদিন বৃদ্ধের মাথায় পড়েছিল। সেটা ছিল একটা মামদুলী প্যাটর্নের মাটমেটে সোনার গড়ি হার। বোধ হয় ওই ধরণের হার তখনকার দিনের আধুনিক মেয়েরা পর-তেমই না। কিন্তু দেখেছি বৃদ্ধ মাঝের-দেওয়া এই হার অতি প্রাচ্যার সপ্তে পরতেন এবং খুব সযত্নে সেটিকে রেখে দিতেন পাছে খোয়া যায় এই ভয়ে। বহুদিন পরে আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জনের যখন জ্ঞানাকুর দে মশায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তখন বৃদ্ধ এই হারটি সেই মেয়েটির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁদের ছেলের যখন বিয়ে ঠিক হবে তখন সেই কন্যাটিকে যেন এই হারটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সেদিন দুই বৈবাহিকার মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের বিয়ের একটা শূভলক্ষ্য দেখবার পরামর্শ চাষাছিল।

আমার বিয়ের কথাটা উঠল যেমন আচমকা। দিনও ঠিক হয়ে গেল কটপট। তখন বৈশাখ মাস সবে শুব্দ হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণের বিরে অবিধের। সুতরাং ঠিক হোল যে শূভকর্মটা বৈশাখ মাসেই হয়ে থাক। মা বৈদিক পূরুত-ঠাকুরকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়ে ২৯শে বৈশাখ ১৩২৬ (ইং ১২ই মে ১৯১৯) আমার বিবাহের দিন ঠিক করলেন। আমাদের বাড়িতে বিয়ের আরোজন অল্প-বিস্তর শুব্দ হয়ে গেল। একে আমাদের সঙ্গতি অল্প, তার ছেলের বিয়ে। সুতরাং আমাদের বেশ কিছু করণীয় ছিল না, খরচারও বিশেষ কোন প্রশ্নই ছিল না। মা খুব সাধারণভাবেই অধিবাস ও বৃন্দ্র এবং গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠবার আরো-জন করলেন। বোঁঠান (বাসন্তী) নববধূর জন্যে কিসব গহনা এবং বেনাবসী শাড়ি কিনলেন। বড়দিদির (অমলা) তখন শরীর খুবই খারাপ। তখন আমরা সকলেই জানতাম যে বড়দিদির দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বিছানায় বাগিশে ঠেসান দিয়ে একটু বসবার চেষ্টা করলেন। নতুন বোঁ এলে তার ফুলশয্যার শাড়ি ব্লাউজ কেমন কবে পরাতে হবে, কেমন করে তার চুল বাঁধতে হবে এই নিয়ে তিনি অনেক নির্দেশ দিলেন। আমাদের বাড়িতে নায়রী সমাগম হতে শুব্দ হোল। আমার কোন কোন বোঁঠান সম্পর্কিতা আত্মীয়ারা আমাকে দিয়ে বিয়ের আগের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিয়ে আমাকে হিন্দুধর্মের বশ্যতা স্বীকার না করে ছাড়বেনই না বলে মন-স্থির করেছেন বৃদ্ধকে পারলাম। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমাকে খানিকটা অপ্ৰস্তুত করে মজা দেখবার মতলব। আমাকে খোলাখুলি বললে আমি মাকে খুঁশি করবার জন্যে অনেক আচার-অনুষ্ঠান মেনেই চলতাম। কিন্তু আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে সেইগুঁলি করিয়ে নেবার প্রচেষ্টাকে আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারাছিলাম না। সমস্ত গোল এক নিমেষে মিটে গেল। বড়দিদি খুব পাঠালেন যে ১১ই মে সকালবেলায় তিনি স্টীমারে করে ফিরবেন এবং তাঁর হুকুম হোল যে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে চরণদার হয়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্পষ্ট বোঝা গেল যে একটা বিষম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করতেই বড়দিদি এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

সকাল সকাল স্নান করে চা-টা খেয়ে বেলভলার কালীমোহন আলয়ে বড়দিদির

ঘরে গিয়ে উঠলাম। তিনি এমই মধ্যে তৈরি হয়ে বসেছিলেন। সঙ্গে একজন দাসী নিয়ে আমার গঙ্গার উপর জাহাজ-ঘাটে গেলাম। বোধ হয় সেটা ছিল জগন্নাথ ঘাট। টিকিট কিনে বড়দিদিকে ডেকের উপর একটা আরাম কেরামায় বসিয়ে আমি আর একটা চেয়ারে বসে বড়দিদির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। দাসীটি সঙ্গেই থাকারের টিফিন-কারিয়ার ও সতরাশি ও কটা তাকিরাকে একপাশে সরিয়ে রাখল। জাহাজ ছাড়ল। আমরা গঙ্গাবক্ষে ভেসে চললাম উত্তর দিকে। দুই ঘণ্টা বাড়ি-ঘর, মাঝে মাঝে ইটখোলা ও কারখানা যেন বায়স্কাপের ছবির মত আমাদের দুই পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পেছিয়ে চলেতে লাগল। দূরে দূরে সাদা বা গেরুয়া রঙের পালতোলা নৌকাগুলি ধীর-মন্দ্র গতিতে ভেসে চলেছে তাদের যাত্রী বা পশরা নিয়ে। এক-এক সময় ছোট ছোট দুই-একটা লম্ব তরতর করে বাস্তুসমস্ত হয়ে ঢেউ তুলে অচিরে পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। মালবোকাই গাথা-বোটা দুদিকে বেঁধে একটা ক্ল্যাট গজেন্দ্র-গমনে সিঁটি দিতে দিতে গেল। কি বিচিত্র ও নয়নাভিরাম বাংলা দেশের গঙ্গার বন্ধের ও পারের দৃশ্য। মন অভিভূত হয়ে পড়-ছিল। আসছে কাল আমার বিয়ে। আমার জীবন-তরণী এইরকম করেই সংসারসাগরে ভাসবে। কোন ঘাটে আমার কণ্ঠার আমাকে নিয়ে পেঁপে দেবেন কে জানে। কে জানে।

স্টীমারটা একটা কি দুটো জাহাজ-ঘাটার থেমে যাত্রী নামিয়ে নতুন যাত্রী তুলে আবার চলল দুপাশে ঢেউয়ের ফেনা তুলে। স্টীমারটা বেশ যখন খানিকটা পথ পার হয়েছে তখন হঠাৎ বড়দিদির দিকে চেয়ে দেখি তাঁর মুখখানা কালো হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করতেই আমার বাঁ হাত-খানা ধরে বললেন—“খোকা, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে রে। জাহাজটা থামিয়ে আমাকে পায়ে নামাতে পারিস?” চলে গেলাম উপরে সারেঙের ঘরে। দাদাবাবুর পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা বলতেই সারেঙ বললেন সামনেই একটা জেটি আছে। যদিও সেই ঘাটের কোন যাত্রী নেই, তবু সেখানে সে জাহাজ ভাড়িয়ে আমাদের নামিয়ে দেবে এবং ফিরতি পথে আমাদের ফুলে নেবে। জাহাজ থামল। একজন খালাসী আমাদের জিনিসগুলি জেটিতে নামিয়ে দিল। আমি বড়দিদিকে ধরে ধরে জাহাজ থেকে নামলাম। জাহাজ ছেড়ে দিল। বেলা তখন প্রায় বারটা। আমি পায়ে উঠে একটু ঘুরে দেখে এলাম কোন সুবিধে মত বসবার জায়গা পাওয়া যায় কিনা। একটা বাগানবাড়ি জাহাজ ঘাটের খুব কাছেই ছিল। সে বাড়ির বারান্দাও

বেশ চওড়াই দেখাল। আমরা জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে গেলাম। দাসীটি গাছের ডাল ভেঙে বারান্দাটা একরকম কাঁট দিয়ে সাফ করল। সেখানে মত্তরগুটি বিছিয়ে কুসান দিয়ে বড়দিদিকে শুইয়ে বাতাস করলাম। একটু শান্ত হয়ে বড়দিদি উঠে বসে বারান্দার কিনারে মৃদু বাড়িয়ে মাথায় ও মূখে জল দিয়ে একটু আরাম বোধ করলেন। আরো খানিকটা বিশ্রাম করে বড়দিদি সত্তরগুটিতে উঠে বসে বললেন—“ওরে তোর তো খাওয়া হব নি!” দাসীকে ইসারা করে টিফিন-কারিয়ারটা কাছে আনিতে নিলেন। বললেন—“আর, তরে আমি খাওয়াইয়া দেই।” আমি ইতস্তত করতাই বললেন—“না রে, আমি বেশ ভাল আছি।” নানা রকমের খাবার ছিল। মেখে-টেখে আমাকে গ্রাসের-পর-গ্রাস বড়দিদি খাইয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর যে আরাগন্ধ অসুখ এবং আমার যে ছোঁয়াচ লাগতে পারে সে চিন্তা আমার মনে সেদিন একবারও ওঠে নি। বড়দিদির ভাল-বাসা ও মমতা তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে উঠেছিল। প্রতিটি গ্রাসে তিনি যেন আমাকে ক্ষুধার অমর মধ্য দিয়ে সুগভীর প্রীতি-সুখা পরিবেশন করে গেলেন। সে দরদী মনের দানের তুলনা নেই। আমার খাওয়া হয়ে গেলে বড়দিদি নিজে সামান্য একটু সরবং খেলেন এবং দাসীকে বললেন খেয়ে নিতে। সে খেয়ে নিয়ে বাসনগুলি গঙ্গার ঘাটে মেজে সাজিয়ে রেখে দিল। বড়দিদি একটু কাৎ হয়ে আবার বিশ্রাম করতে লাগলেন।

বেলা গাড়িয়ে আসতে লাগল। তখন আমার মনে হতে লাগল সারঙ যদি ভুলে গিয়ে থাকে? জাহাজ যদি না দাঁড়ায়? কি উপায় হবে? বড়দিদির শরীর খাবাপ। তাঁকে কি করে বাড়ি নিফে যাব? আবার কাল তো আমার বিকে। হাসব, না, কাঁদব? কি আর করা হবে। বরাতের উপর নির্ভর করে বড়দিদির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। কত আমর ছেলেবেলার কথা। চোখ কিন্তু আমার রয়েছে গঙ্গার উপরে। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের গম্ভীর ভেঁপু শোনা গেল। থেমে থেমে জাহাজের ভেঁপুটা বাজছিল। বুঝলাম যে আমাদের প্রস্তুত থাকবার জন্যে ঐ ভেঁপু সিগন্যাল। জাহাজ দেখতে পেলাম না। হঠাৎ নদীর মোড় ঘুরে জাহাজটা দূরে দেখা গেল। বড়দিদিকে ধরে ধরে জেটিতে নিয়ে গেলাম। দাসী মালগুলি গুছিয়ে নিয়ে এল। জাহাজ ভিড়ল। আমরা ত্যাগাতাড়ি উঠে পড়লাম জাহাজে। সূর্যাস্তের তখনো একটু দেরি আছে। আকাশের রঙ বদলাচ্ছিল। শেষে সূর্যের রশ্মি লাল হয়ে জলটাকে বাঙিয়ে তুলল। জাহাজ চলেছে তো চলেছে। আবার সেই দুখারের

অনুপম দৃশ্য। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়িও জ্বলে উঠল। পালতোলা নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। পৌছলাম জগন্নাথ ঘাটে। দাদাবাবুর বালিয়েট গাড়ি নিয়ে রাজুঠাকুর হাজির ছিলেন। আমরা সারঙকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গাড়িতে চেপে বাড়িমুখে রওনা হলাম। রাস্তায় তখন একটা-একটা করে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠল। ইডেন গার্ডেনে বিচিত্র আলোক-মালা দেখলাম। ব্যাঙ বাজছিল কিনা মনে নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে, রেস কোর্সের পাশ দিয়ে হারিশ মৃদুখাঁর রোড ধরে চাউলপাটি দিয়ে রসা রোডে উঠে যখন গাড়ি আমাদের মল্লিক লেনের গলির মুখে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে। আকাশে বেশ ক’টা তারা জ্বল-জ্বল করে যেন আমার দিকে হাতছানি দিতে লাগল। আমি তখন গাড়ি থেকে নামলাম বড়দিদি আমার হাতটা একটু শক্ত করে ধরে বললেন—“অনেক হাল্গামা থেকে বাইচ্যা গেলি। যাঃ।” বড়দিদি চলে গেলেন। আমি মল্লিক লেনে ঢুকে আমাদের ১৪নং বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

আমার সারা দিনের এ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ শুনে বাবার তো চক্ষু স্থির। বাবা অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে একটু পিট-পিটে মানুষ ছিলেন বরাবরই। এতক্ষণ বড়দিদির নিকট সান্নিধ্যে থাকা এবং তার উপরে বড়দিদির হাতে গ্রাসের-পর-গ্রাস জন্মবাজন খাওয়ার কথা শুনে বাবার মুখে বিলক্ষণ বিপদের আশঙ্কা যেন ফুটে উঠল। মুখে কিন্তু কিছুই বললেন না। তবে আমাকে নির্দেশ দিলেন খুব ভাল করে লাইসল দিয়ে স্নান করে কাপড় চোপড়গুলি একেবারে আলাদা করে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর ধোপাবাড়ি দিতে হবে। বাইরবাড়ির উঠানটায় যে কলচৌবাচ্চা ছিল সেখানে আছা করে স্নান সেরে ভেতরে গেলাম। শুনলাম তারপর আমাদের ঢাকুরিয়ার অবকাঁকা সারাদিন উপবাস করে অধিবাস ও বৃষ্টি অনুষ্ঠান সাঙ্গ করেছেন। এইসব ক্লিয়াকর্মে নাকি বরের উপস্থিতি বা যোগদান অত্যাবশ্যকীয় নয়। সেসব কাজ নির্বিন্দে হয়ে যাওয়ায় আমার মা, জ্যোতি, খুড়ি, দিদিমা ও ঠাকুমা বাকি বলভায় তিনি বেশ খুশিই ছিলেন। আমার এক বোঠান হাসতে হাসতে বললেন—“আইচ্ছা ঠাকুবোপা, আউজকা তো গ্যা ঢাকা দিয়া বাইচ্যা গেলেন। কাইল কে আপনারে রক্ষা কবে দেখুম অখন।” একেবারে সরাসরি আন্টিমেটাম। বুঝলাম কাল সকালে হবে আমার সঙ্গীন অবস্থা। পবদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ঠাকুমা, বোনরা ও বোঠানদের হুকুম হোল স্নান সেরে এসে পূবমুখো হয়ে

দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করতে হবে। বোঠানরা ভেবেছিলেন যে ওই আচরণটা হিন্দুয়ানী বলে আমি হয়ত গাই-গুঁই কব। কিন্তু সূর্যদেবকে প্রণাম করতে আমার এতটুকুও আপত্তি ছিল না। সূর্যোদয় ছেলের মত স্নান সেরে বাড়ির পেছনের বারান্দার পূবমুখো হয়ে সূর্য প্রণাম করলাম। মনে পড়ে গেল বছর সাতেক আগের এক স্মরণীয় দিনের সূর্যোদয় ও বৃন্দ ও আমার সূর্যপ্রণাম। বোঠানরা এবং খুড়ী ও গুদু যেন হকচকিয়ে গেলেন আমার ব্যবহারে। একটা যে গুদুজন করবার মন্তব্য তাঁদের ছিল সেটা ভেস্তে যেতে তাঁরা যেন মনে মনে মূর্খিয়েই গেলেন। তাঁরা তো আর জানতেন না আমাদের সূর্যপ্রণাম উনিশ শ’ বার সালের চত্বর্শে অক্টোবরেই হবে গেছে। সূর্যপ্রণামের পর আমার হাতে একটা চকচকে হাতল-ওয়াল দর্পণ ছুঁইয়ে সেটা চিরকরা কুলার একপাশে রাখা হোল। মা এতেই খুশি হলেন। অন্যদের বললেন—“খুব হইছে। আরে আর জ্বালাইস না।” আপন ও জ্ঞাতি ভাই-বোন ও বোঠানদের সঙ্গে মিলে বেশ হুজুড় করে সকালে ও মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়া করা গেল।

নতুন!

‘ইকনমি প্যাকে’

টিনোপাল



ভাছাড়া ‘এক বালতির এক প্যাকেট’ এবং ‘রেগুলার প্যাক’

সর্বাধিক শুভ্রতার জন্য টিনোপাল

মুখ্য গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

sgt 31/67 BN

বেলা শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ আগে এলো কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়। বেশ খানিকটা বৃষ্টি ও অশনিপাত হয়ে ঝড়টা যেমন আচমকা এসেছিল ভেমন তাড়াতাড়িই চলে গেল। গরমটা অনেকটা কমে গেল। কয়েকজন করে বরষাত্রী আসতে শুরু করলেন। বেশ খানিকটা আগেই এলেন সতীশদাদা। পরনে ছিল তাঁর শান্তিপুত্রী কোঁচান হুঁত, নরম মাসিরাইজ্জু টাইল সার্ট, কাঁধে ছিল মোটা দড়ির মত কোঁচান চাদর জলার দু'দিক দিয়ে ঝোলান আর পুরনো ব্যারিস্টারদের রীতি অনুসারে কালো সিলেক্স মোজার উপরে পেটেন্ট লেদারের পাম্প-সু। সেকালের প্রচলিত ব্যারিস্টারেরা "ন্যাংটো" পায়ের জুতা পরতেন না এবং কোর্টে বাবার সময় প্রায়ই পরতেন বুট জুতা। সতীশদাদা এসেই হেঁটে লাগিয়ে দিলেন কৈন দেবির হাচ্ছে বলে। ও বাড়িতে নিমন্ত্রিতেরা বিবাহবাসরে বসে থাকবে যে। আমার কাপড় ছাড়া হয় নি দেখে বললেন—“এক্স্‌গি যাও, তাঁর হাচ্ছে নাও।” আমি বুটপেট ভেতরে গিয়ে কোঁচান শান্তিপুত্রী হুঁত, গেঞ্জি ও পাজাবী পরে ফেললাম। পড়ে গেলাম বোন ও বোঁঠানদের পক্ষায়। আমার সারা কপাল ভরে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হোল। তারপর এলো স্ত্রী আচারের পালা। চিরিত কলাটার মধ্যে সরা দিয়ে অর্ধেক ঢাকা ঘরের প্রদীপটাকে উল্কে দিয়ে ধান-দুর্বা আমার মাথায় দিলেন আমার মা ও উপস্থিত অন্যান্য গুরুজনেরা। মা আমার মাথা আত্মাণ করে ধীরে ধীরে ক'বার আমার মাথায় বুলে পিঠে হাত বোলালেন। সমস্ত হৃদয়মন লুটিয়ে মাকে সেদিন প্রণাম করেছিলাম। তারপর হোল ছোট্টদের প্রণামের ঘটা। আমার পায়ে ধান-দুর্বা দিয়ে। শেষের পর্ব হোল আমার কপালে সেই কলাটার আগাটা দিয়ে কেন ও বোঁঠানদের বেশ বার কতক ঠোকাঠকি ও হাসাহাসি। ওদিকে বাইরবাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সতীশদাদা “দেবির হৈরা গেল, বসু দেবির হৈরা গেল। সুখী, আর তাড়াতাড়ি।” বলে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন। অগত্যা মেরেরা আমাকে রেহাই দিলেন। বাইরে আসতেই সতীশদাদা আমাকে একপ্রকার ঠেলেঠেলেই বরের জন্যে যে গাড়ি এসেছিল তাতে তুলে দিলেন। নস, বুধা ও বড়ি সেরেগুজে আগেভাগেই সেই গাড়িতে জারগা দখল করে বসেছিল। সতীশদাদার ব্যগ্রতার চোটে বাবাকে একটা প্রণামও করতে পারলাম না। শীঘ্র বাজল, বোনেরা ও বোঁঠানেরা উদ্‌যতন করে উঠলেন। গাড়ি

সশব্দে স্টার্ট হোল। আমি চললাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের মজুমদার বাড়ির মেজ মেরে স্বপ্না ওরফে বুবুকে বিয়ে করতে।

বেলতলা রোড দিয়ে ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে পালিত স্ট্রীটের বাঁ দিকের প্রথমে ছিল ৭৮নং বাড়ির গেট। ৭৮নং বাড়ির উল্টো দিকের প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে ঝড় বাদলের দিন বলে শব্দ করে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। একপাশে ছিল বিবাহবাসর এবং অন্যপাশে ছিল খাবার জারগা। আমাকে নিয়ে তুলল একেবারে ৭৮নং বাড়িতে। লোকজন গিজ্‌ গিজ্‌ করছিল। বুবুর পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে ভাইবোনদের ছড়াছড়ি এবং সকলেই বাতায়ত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। এরকম জমাট পরিবার খুব কমই দেখেছি। বুবুর মাসতুতো বোনদের মধ্যে তরুদিদি, সুবুদিদি, বিভা-দিদি ও নলুদিদিরা ছিলেন বুবুর চেয়ে অনেক বড় এবং ভারি কষ্ট ধরনের মানুষ। তাঁরা সবাই ছিলেন আমাদের বিয়েতে। বুবুর অন্য এক মাসতুত বোন বড় বড়িদি আমাদের বিয়ের সময় ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁকে অনেকবার দেখেছি। বড় বড়িদির চোখ-মুখে যে অনাবল হাসি দেখেছি নানা দৈবদুর্বিপাকে ও বয়সের জন্যে কিছুটা মলিন হলেও এখনও তার রেশ-টুকু দেখা যায়। বড় বড়িদি খুবই হাসি-খুশি মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে পরে খুব হাসি-ঠাট্টাও হোত। বড় বড়িদির চোখটা খারাপ মনে করার তাঁর স্যামী রাসবিহারীবাবুর চশমাটা ব্যবহার করে নিজের চোখ দুটিকে সেই চশমার উপস্থাপন করে তুলেছেন বলে কত না ঠাটা করেছি। ছোট বড়িদি ছোটখাট মানুষ। টেপুদিদির আনন্দোচ্ছল মুখোচ্ছবি ভোলবার নয়, অফুরন্ত ছিল তাঁর স্মৃতি। এঁরা সব হলেন বুবুর মাসতুত বোন। দাদুদির ছিল শান্ত মুখশ্রী এবং তাঁর পরের দুই বোন হাসু ও বেবী ছিলেন বুবুর ছোট। ক্রিটি তখন নেহাৎ নাবালিকা বলে পাক্সাই পান নি। এঁরা হলেন বুবুর মামাত বোন। জ্যেষ্ঠত্ব বোনদের মধ্যে মনে আছে মনুদিদিকে। এতগুলি শালির পাজায় আমার যে সেদিন ও তার পরের দিন আনন্দে হুজুড়ে কেটেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তখন আমাকে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত “শালীবাহন দি গ্রেট” বললেও অতৃপ্তি হবে না। বুবুর দিদি প্রতিভা ও বোন এবং ছোটকোন ও আপুর কথা আগেই বলেছি। তাঁরা দুটা কবে আমাকে আগলিয়ে রাখছিলেন। বুবুর ভাই খোকা ছিল খুব ছোট। হুঁত পাজাবী পরে পান খেয়ে এবং পানের পিক সর্বাপেক্ষে লাগিয়ে পরমানন্দে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছি-

লেন। মাসতুত ভাই সুরুদাদা, ছপুদাদা, নীরুদাদা, খোকাদাদা (উষারজন) ফনা, পটকা, মামাত ভাই তাতু বা দেব-প্রসাদ ও জ্যেষ্ঠত্ব ভাই মনোরজন দাদা ও আমার প্রাক্তন মকেল এরফান এঁরা সবাই সেদিন কর্মকর্তা। বুবুর মাসীমারা যাঁরা তখন বেঁচে ছিলেন সবাই এসে-ছিলেন সেদিন ৭৮নং বাড়িতে। মজুমদার বাড়ি সেদিন আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শুনোছি এই রকম “ফ্যামিলি গ্যাদারিং” নাকি প্রতিভাদিদের বিয়েতেও হয় নি। বাই হোক, রান্না বাড়িতে স্ত্রী আচারের বাহুল্যটা তেমন ছিল না। কাপড়, জুতা ছেড়ে গরদের জোড় ও নরম মোটা সিলেক্স পাজাবী ও নতুন পাম্প-সু পরে নিলাম। তারপর আমাকে আমার শালিবা বিবাহবাসরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে দেখলাম নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলায় প্যাণ্ডেলটা ভরে গিয়েছে। সামনের লাইনেই বাবা, দাদাবাবু, সতীশদাদা ও চাকুরিয়ার, কাশীঘাটের ও অন্যান্য বাড়ির জ্যেষ্ঠাংশায়রা ও দাদারা সমাসীন এবং মজুমদারবংশীয় ও তাঁর বাড়ির কেউ কেউ বরষাত্রীদের আপ্যায়ন করছিলেন। পরে লাইনেই ছিলেন বার লাইব্রেরীতে আমাদের গোল টেবিলটায় বসতেন যে ক্রিটি জুনিয়ার ব্যারিস্টার বম্‌দু, যথা হেমতা দে, অজিত ধর, দেবেন সেন, ব্রজকিশোর চৌধুরী ও বনবিহারী দাস। জামাই সুধীর ও ভোম্বল সেখানেই মাতব্বরী করছিলেন। তত্ত্বপোশ পেতে একটু উঁচু মণ্ড করে বিবাহবাসর করা হয়েছিল। তার একপাশে ছিল গানের ছেলেমেয়েদের জারগা। অন্য দিকে বসে-ছিলেন আমার শ্রুতার্থিনী বড়িদিদি অমলা, ছুটকীদিদি উর্মিলা, ছোড়াদিদি মুরলা বা বেবলা। মোনা বেবীও ভোম্বল ত' ছিলেনই। বড়িদিদির তখন প্রায় শেষ সময় হয়ে এসেছে। আমার বিয়েতে তিনি গান করতে পারলেন না বলে তাঁর খুবই আক্ষেপ হয়েছিল কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্যে সকলে যখন তাঁকে বিবাহসভায় যেতে বারণ করলেন তখন বড়িদিদি সেকথা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি ক্লান্ত দেহে প্রান্ত মনে আমার বিয়েতে এসে বসেছিলেন ও আমাদের মনপ্রাণ দিয়ে শেষ আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন।

আমি প্যাণ্ডেলে ঢুকেই বাবাকে সামনে দেখেই তাঁকে, দাদাবাবুকে, সতীশদাদাকে ও অন্যান্য গুরুজনের প্রণাম করে কাছাকাছি একটা জারগায় বসলাম। কনে আর আসে না। সভাস্থ সকলে একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। সতীশদাদাও দেবির দেখে উল্লেখ্য করছিলেন। এমন সময়

উৎসবের দিক উলি আবার মেলো ফিফি

ঊৎসবের দিনগুলি আবার ফিবে এসেছে। প্রতিটি
যবে নিয়ে এসেছে আনন্দ আব খুসী বন্যা। কিন্তু
প্রত্যেকেই সমান খুসীতে মেতে উঠতে পারছে না।
কেউবা খুব খুসী, কেউবা নয়। যে বাড়ীতে ছেলেমেয়ে
কম তাদের বাড়ীতে আনন্দ বেশী কারণ তাদের
আনন্দের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি কাটা বেশী নেই।
পরিবারে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার উপায় হল
পরিবার পরিকল্পনা। আপনার বাড়ীর কাছাকাছি
পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র গিয়ে পরামর্শ নিন।
সেখানে বিনামূল্যে পরামর্শাদি দেওয়া হয়।
পরিবার পরিকল্পনার পরিচিতি হল লাল রিকোণ।



ছেলেমেয়ে
কম হওয়াই ভালো হুটি সন্তানই স্বাস্থ্য

প্রবীণ শাস্ত্র ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যমশায় উচ্চস্বরে বললেন—“কন্যা অসুস্থ। তাই তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হচ্ছে গেল। আপনারা শান্ত হোন। কন্যা এলেন ধলো।” স্পষ্ট শব্দে বনবিহারীর কণ্ঠে—“ছোকরার চেহারা দেখেই মেয়ে ভড়কে গেছে আর কি।” কিছুক্ষণ বাদেই বড়কে তাঁর বোনরা ধরে ধরে নিয়ে এসে একেবারে মগ্ধে উঠিয়ে কনেকে আসনে বসিয়ে দিলেন। কে যেন ইঙ্গিত করলেন—এবং আমি কনের উত্তোদিকের আসনে বসলাম। দুজনেব মাঝখানে আচাষ হয়ে বসলেন নবম্পীচন্দ্র দাস। বিবাহের কার্যারম্ভের আগে একটি অনুষ্ঠান হোলো যেটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটি হোলো গুরুনো জামাতাবরণ। মজুদদারমশায় একটি রূপার থালায় গরদের জোড় ও ধানদুর্বা ও চন্দনের বাটি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর প্রথম জামাতা ডাক্তার সত্যশচন্দ্র সেনগুপ্তকে। এ বাড়ির সব কটি মেয়েব বিয়েতে এই অনুষ্ঠান হয়েছে এবং আমিও তিনবার ঐ রকম অনুষ্ঠানে যুত হয়েছি। তারপর আরম্ভ হোলো আমাদের বিবাহের পক্ষাতি। সঙ্গীত সহ-যোগে ব্রহ্মোপাসনা, উম্মাহপ্রতিজ্ঞা পাঠ ও আচার্যের উপদেশ যথারীতি শেষ হলে আমরা উম্মাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আমাদের বিয়েতে ম্যারেজ বোজিস্ট্রাব ছিলেন বরদা-কান্ত বসু এবং সাক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলেন বোঠানের দাদা সুদেব হালদার সাহেব। আমাদের বিয়েতে গান করেছিলেন দিদিমণি (তরলা)-র মেয়ে বৃন্দা বার ভাল নাম ছিল নলীনা। নাটেব গুরুদেব বিবন ও বৃন্দাও ছিলেন গানের দলে। কি চমৎকার দরদ দিয়ে যে তাঁরা সেদিন গান করেছিলেন তা ভোলবার নয়। আমার সমস্ত অন্তর ভরে উঠেছিল সেদিন ব্রহ্ম-সঙ্গীতের উল্বেলিত মূর্ত্তনায় ও ভগবৎ-কুরুদার শান্ত-স্নিগ্ধ স্পর্শে। সে দিন চন্দ্রবানের যে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল আমাদের দুজনের মস্তকে সেই আশীর্বাদই আজ পর্বন্ত অভিসিঙ্গিত করে রেখেছে আমাদের উভয়ের হৃদয় প্রাণ মন।

পরের দিন শালাশালি নিয়ে বেশ হৈ হৈ করে মহাযাত্রা পর্বন্ত কেটে গেল। বেলা যেমন গড়িয়ে পড়তে লাগল সারা বাড়িময় বেশ বৃষ্টিতে পারলাম কি রকম যেন একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে লাগল। গুরুদেবের কারো কারো চোখ যেন ছল ছল দেখাল। সময় যেন আর যায় না। আমাদের এ-বাড়ি থেকে আমাদের নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে কারুর যেন গা দেখা যাচ্ছিল না। কেন দেরি হচ্ছে? যত বেলা যায় এতই বাড়ির লোকেরা যেন ততই ঘুঘুড়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে

জামাই সুধীর ও ভোম্বল, নসু, বৃদ্ধাকে নিয়ে গোটা দুই-তিন গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সংঘের সমস্ত বধি ভেঙে পড়ল। গুরুদেব, ছেলেমেয়ে সবাই চোখ মুছতে লাগলেন। বারান্দায় নবম্পীচ-বাবু এবং শ্বশুরমশায় একটু উপাসনা করে আমাদের বিদায় দিলেন। এতক্ষণে শ্বশুরমশায়ও যেন ভেঙে পড়লেন। পিতামাতা ও কন্যার সে কি অবারিত অশ্রুবিসর্জন। আমার যেন কেমন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। সবাইয়ের দুর্ভিক্ষই যেন আমার উপর এবং সবাই যেন বলছেন, “এঁর জন্যেই তু এই হোলো।” বিয়ে করে বৌ নিয়ে শ্বশুর-বাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালে বরের যে অবস্থানীয় অবস্থা ঘটে সেটা সেদিন বেশ অনুভব করেছিলাম। বাই হোক এইসব আবেগ-উত্তেজনা কাটিয়ে আমরা গিয়ে গাড়িতে বসলাম। উল্লেখ্যনি হোলো, শাখ বাজল এবং গাড়ি ছেড়ে দিল।

ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে পরিচিত বেলতলা রোড দিয়ে চলল আমাদের গাড়ি। বেলতলা রোডের প্রায় শেষে বেলতলা কালীমোহন আলয়ের পেছনের গেট পেরিয়ে ১৪৭নং রসা রোডের বাড়ি—যেখানে আমি জন্মেছিলাম এবং যেখানে তখন থাকতেন কুসুমের জামাই সত্যেন্দ্রনাথ রায়—সে বাড়ি বায়ে বেথে রসা রোডে পড়ে ডাইনে মোড় ফিরে মল্লিক লেনে ঢুকতে হবে—এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু ডাইনে মোড় না নিয়ে বায়ে ঘুরে গাড়ি কালী-মোহন আলয়েব গেটের মধ্যে ঢুকল। ওমা, এ কি? সারাটা ড্রাইভে বাঁশ-পুতে দেবদারু পাতা দিয়ে তাকে মুড়ে লাল নীল ও সাদা কাগজের চেন বা শিকল এবং ফুলের মালা লাটকিয়ে মাঝে মাঝে ভিতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে জাপানী লণ্ঠন বুলিবে সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃদ্ধে নিলাম যে এই সব ভোম্বলেরই ব্যবস্থা। হোলি ট্রিনিটির টান যাবে কোথায়। গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পেছনের গাড়িবারান্দায়। শাখ বেজে উঠল। বোনরা ও বোঠানেরা উল্লেখ্যনি কবলেন। আমরা গাড়ি থেকে নামামাত্র মা এগিয়ে এসে সেই চিহ্নিত কলাটা দুজনের মাথার ঠেকিয়ে বৃদ্ধকে হাত ধরে নামালেন। তারপর সামনে বিছিয়ে দিলেন একজোড়া আনকোরা নতুন কাপড়। তার উপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। কাপড়টা দুজনে মিলে ক্রমাগত পেছন থেকে সামনে টেনে নিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছিল। এই রকম করে দোতলার বড় বারান্দাটা পেরিয়ে পশ্চিমবিকের অর্ধাং রসা বোডের সামনের গাড়িবারান্দার উপরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম একখানা কালো

পাথরের থালায় দুধ দিয়ে রেখেছে। বৃদ্ধকে সেই থালায় দাঁড় করিয়ে একবার বরণ করা হোলো। ভোম্বলের ধারণা ছিল যে সম্ভব হলে আমাদের বংশের নতুন বউদের কালীমোহন আলয়ের সামনের ঐ গাড়িবারান্দায় তুলে অভ্যর্থনা করা উচিত। ভোম্বলের মনটা ছিল দুঃখ এবং তিনি আমাদের তাঁদের বাড়ির অন্যতম বলেই জানতেন। এ মমতা বড় দুর্লভ এ জগতে। আমার বিবাহের বেশ কিছুদিন পর ভোম্বলের বিয়ে হয় এবং তাঁর বৌ সজ্জাতাকেও ঐ বারান্দায় ঐ জায়গায় দুধের থালায় দাঁড় করিয়ে বরণ করা হয়েছিল। তারপর সে বাড়ি চলে গেলে দেশমাতৃকার সেবার এবং সেখানে বদনন্দ বংশজাত দাশগোষ্ঠীর কোন সন্তানের নববধুবরণ আর হয় নি। সে দিন সন্ধ্যার উপরের হল ঘরে বরবৃদ্ধকে বসিয়ে নানা রকম স্ত্রী-আচার চলল রাত দুপুর পর্যন্ত।

সে রাতটা আমরা দুজনে কালীমোহন আলয়েই রয়ে গেলাম আলাদা ঘরে, কেন না সেটা নাকি ছিল কালরাত্রী। আমাদের সংসারের অস্বচ্ছলতার জন্যে ঠিক হয়েছিল যে আমরা বোভাতের কিছু বেশি আয়োজ্য করব না। কিন্তু কে কার কথা শোনে ভোম্বলের উৎসাহে ঐ কালীমোহন আলয়ে পর্বদিন বেশ ঘটা করেই আমার বোভাত হয়েছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং শ্বশুরবাড়ির অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ছুরিভোজন সেরে আস্তে আস্তে যখন নিমন্ত্রিতেরা যে বার বাড়ি চলে গেলেন আমিও ১৪৭নং মল্লিক লেনের বাড়ি বাবার উদ্যোগ করলাম। কে যেন বললেন যে রায়ে ভীষণ গরম, মল্লিক লেনের বাড়িতে ইলেকট্রিক পাখা নেই বৃদ্ধর কণ্ঠ হবে। বৃদ্ধ আমাকে চুপে চুপে বললেন যে কোন কণ্ঠই তাঁর হবে না। তখন আমি বললাম যে যেখানে বরাবর থাকতে হবে সেখানে যাওয়াই ভাল। আজকে না গেলে, কালকে ত সেখানে ফ্যান আসবে না। ছটকাদিদি, উম্মিলা আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন, বললেন—“থোকা সেনসিবল কথাই বলছে।” এই রকম সায় পেয়ে আমরা সেই বোভাতের রায়েই চলে এলাম ১৪৭নং মল্লিক লেনের বাড়িতে।

বিশ্বসাহিত্যের * ৩ঃ নবীন ভট্টাচার্য আদিপর্ব

॥ আটশ ॥

ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের উদ্ভব
১। মলয়ালম সাহিত্যের আদিরূপ
মলয়ালম দ্রাবিড় পরিবারের চতুর্থ ভাষা, বর্তমান কেরল ও তার আশেপাশের এলাকায় মলয়ালম ভাষা প্রচলিত। আজ থেকে হাজার বছর আগেও ওই অঞ্চলের ভাষা ছিল তামিল, এবং সত্য কথা বলতে কি মলয়ালম আসলে তামিল ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ। কথিত আছে তামিল রামায়ণ রচায়তা কবন কেরল দেশেরই লোক ছিলেন। তামিল ভাষার এই আঞ্চলিক রূপটির সঙ্গে নান্দুদিদির স্নাক্ষণেবা কিছুটা সংস্কৃতের খাদ মিশিয়ে-ছিলেন, তা ছাড়া রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ ভারতের অপরাপব অঞ্চল থেকে উকরল অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন ছিল, যে কারণে এখানে প্রচলিত তামিল ভাষাই স্থানীয় ইথকে অধিকতর স্থানীয় হতে হতে একটি পৃথক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। মলয়ালম সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে রাম-চরিতম, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে যা চতুর্দশ শতকে রচিত। যেমন নান্নিয়া রচিত মহাভারত মগনী-তেলুগু সাহিত্যের সূচক, বর্তমান গ্রন্থটিও তাই। তবে এই গ্রন্থটি কতটা তামিল আর কতটা মলয়ালম তা বোঝবার উপায় নেই। আদি মলয়ালম সাহিত্য লৌকিক কথা ও কাহিনী ছাড়া কিছুই নয় যা লোকমুখে কথিত বা গীত হত। রাম-চরিতম-ই বলতে গেলে মলয়ালম সাহিত্যের প্রথম লিখিত গ্রন্থ। পৃথক ভাষা হিসাবে মলয়ালম পঞ্চদশ শতকের আগে স্বীকৃত হয় নি, পণ্ডিতবর শ্রীনিবাস আরেঙ্গারের এই ধারণা।

২। হিন্দী সাহিত্য
হিন্দী সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত—পশ্চিমা হিন্দী ও কোশলী বা আওয়াধি বা পূর্বদেশীয় হিন্দী। পশ্চিমা হিন্দীর উদ্ভব খ্রিস্টীয় ১০০০ থেকে ১৩০০ অব্দের মধ্যে এবং তা বিবর্তিত হয়েছে, মালা ভাষার মতই, অপভ্রংশ থেকে।

পশ্চিমা হিন্দীর জাত অবশ্য বহু। রাজ-পুত্র বীবগাথাসমূহ অবলম্বনে রচিত পৃথক-পৃথক-রাসৌ, বিশালদেব-রাসৌ, ধুম্রা-রাসৌ, আলহা-উদল প্রভৃতি গ্রন্থের মূল কাহিনীগুলি চারণকাব্যেরা এখানে-ওখানে গান করে বেড়াতেন এবং বিচ্ছিন্ন স্থানীয় প্রভাবে পশ্চিমা হিন্দীর আঞ্চলিক রূপ-গুলির প্রাথমিক পর্যায় এইভাবে গড়ে উঠেছিল। এই সব আঞ্চলিক রূপগুলির মধ্যে শৌবসেনী অপভ্রংশ থেকে বিবর্তিত ধারাটিই প্রাধান্য লাভ করে। মুসলিম সূফী মতবাদ আদি হিন্দী সাহিত্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এবং পার-সিক ভাষার বিখ্যাত কবি আমির খুসরু (১২৫৩-১৩২৫) হিন্দী ভাষার একটি আঞ্চলিক ধারা অবলম্বনে কিছু গান ও ধাঁধা লিখেছিলেন। তিনি খালিক-বারী নামক একটি অভিধানও লিখেছিলেন যেখানে আরবী-পারসী শব্দসমূহের সমার্থকভাবে হিন্দী শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন। আমির খুসরুর সমকালীন ছিলেন গোপাল নায়ক, রজ-ভাষায় লিখিত যার ধ্রুপদ গানগুলি আজও প্রচলিত আছে। খাজা-বন্দ-নওয়াজ (১৩২১-১৪২২) দখনী-হিন্দীতে মির-আট-উল-জসিফিন নামক সূফী মতবাদের উপর একটি গ্রন্থ গদ্যে রচনা করেন। এই গ্রন্থে আরবী-পারসী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি বলে অনেকে গ্রন্থটিকে আদিতম উর্দু গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে কবীর হিন্দী সাহিত্যে জোয়ার নিয়ে আসেন এবং তাঁর রচিত দোহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের পরম সম্পদ। কবীর ভোজপুরী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং স্থানীয় ভোজপুরী ভাষাতেই লিখেছিলেন, এবং পরবর্তী তাঁর রচনাবলী বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তদের হাতে পড়ে রজ্জভাষা, খরিবলি এবং আওয়াধিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মীরাবাই (১৪৯২-১৫৪৬) রাজস্থানী ভাষায় যে সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন তাও কাল-ক্রমে রজ্জভাষা, খরিবলি এবং গুজরাভীতে

রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। রজ্জভাষার আরও একজন বিখ্যাত ভক্তকবি ছিলেন সুরদাস (১৪৮৩-১৫৬৩) যাকে কেন্দ্র করে মথুরা ও বৃন্দাবনে একটি ভক্তকবি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যার অণ্টচাপ নামে পরিচিত। কোশলী বা আওয়াধি বা পূর্ব-াঞ্চলীয় হিন্দীর আদি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল দ্বাদশ শতকে। গ্রন্থটি হচ্ছে দামোদর পণ্ডিতের উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ, আওয়াধি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখ্যাদানের উদ্দেশ্যে যা রচিত হয়েছিল। আওয়াধি ভাষার ম্বিতীয় সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে একটি বোমাস্টিক কবিতা, মোলানা দাউদ (১৩৭০) রচিত চন্দ্রান, নায়ক লৌকিক ও নায়িকা চন্দার প্রেমোপাখ্যান। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে সলিম চিস্তার শিষ্য শেখ বুরহান আওয়াধিতে লিখেছিলেন মৃগাবতী কাব্য, যা রাজপুত্র বীবগাথা অবলম্বনে রচিত। বুরহানের সমবালীন ছিলেন মানিহন, যার রচিত মধুমালাভী অসমাপ্ত আকারে পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে আওয়াধি সাহিত্য সাবালক স্বর্জন করতে শুরুর করে। হিন্দী ভাষা একটি ভাষা নয়, কোনোদিক না ছিলও না। ভারতের সরকারী হিন্দী আসলে খাড়িবলী ভাষা, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়, এবং যা ১৮৫০-এর আগে সাহিত্য-রচনায় ব্যবহৃত হয় নি।

৩। রাজস্থানী ও গুজরাভী সাহিত্য

প্রাচীন রাজস্থানী বীবগাথাসমূহ একটি প্রাচীন ধবনের মাজেয়াবী ভাষায় রচিত হয়েছিল, যা ডিগল নামে পরি-চিত এবং যার সঙ্গে প্রাচীন গুজরাভীর পার্থক্য সামান্য। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'টি ভাষা মোটামুটি অভিন্ন ছিল। রাজপুত্র বীবগাথা কানহন্যপ্রবন্ধ, বা-স্থানী ও গুজরাভী উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের সাহিত্য বলে দাবি করে। এখ গ্রন্থে পান্সনীর উপাখ্যান এবং রাজা কণ

নাট্যাহিক বঙ্গমতী

কৃত্তিক আলাউদ্দিন খলজীর চিত্তোন্নয়ন প্রতিরোধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আমরা পূর্বে দেখেছি রাজস্থানী ভাষাগীতি লেখিকা মীরাবাই-এর দাঁড়-দার গুজরাতী, রাজস্থানী ও হিন্দী—এই তিন ভাষার সাহিত্যই।

গুজরাতী সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলতে বোঝায় ১০০০ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, সাধু ও ব্যাকরণবিদ হেমচন্দ্র (১০৮৮—১১৭০) সংগৃহীত শতাধিক অপভ্রংশ পদকে গুজরাতী, হিন্দী ও মার্ভোরারী এই তিন ভাষার ইতিহাসকারগণই নিজেদের বলে দাবি করেন। আদি গুজরাতী সাহিত্য জৈনধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও, অজৈন গ্রন্থও ওই ভাষায় কম রচিত হয় নি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-আশ্রয়ী কিছু প্রাচীন গদ্যরচনা এবং ধর্মনিরপেক্ষ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কাব্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কল্কটবিলাস যা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত। অপরাপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে রণজয়চন্দ্র, উদাহরণ, সীতাহরণ ও প্রবোধচিন্তামণি। ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত জৈন সাধু তদুদ্রপভ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বালাবোধ রচনা করেছিলেন। গুজরাতে বসবাসকারী পার্সী সম্প্রদায় চতুর্দশ শতকে তাঁদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থসমূহ গুজরাতী ভাষায় অনুবাদ করেন। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে নেমিচন্দ্র জাম্ভারী জৈনধর্মের উপর ১৬০টি গাথা রচনা করেছিলেন, যার দুটি গুজরাতী গদ্য টীকাগ্রন্থ ১৫৫০ থেকে ১৫৬০-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে গুজরাতী সাহিত্যে রীতিমত স্রীবৃন্দী দেখা যায়। এই-শতকে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পুণ্ডরীচসুন্দরী-এর। গদ্যে রচিত এই গ্রন্থের লেখকের নাম অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু হচ্ছে এক রাজকুমারের প্রেমোপাখ্যান। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় বিখ্যাত ভক্তকবি নরসিংহ মেহতার নাম। হর্যোদশ শতক থেকে গুজরাতে ভক্তিবাদ প্রচলিত হতে শুরুর করে, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এই ধারার প্রসার ছিলেন নরসিংহ। মীরাবাই-এর রচনাবলীও গুজরাতে জনপ্রিয় হয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে আরও একজন ভক্ত লেখক, যার নাম ভালন, ভাগবতপুরাণের দশম অধ্যায় অবলম্বনে কৃষ্ণকথা লিখেছিলেন। পশ্চিমাভ রচিত যে কানহন্যপ্রবন্ধ গ্রন্থটি একই সঙ্গে গুজরাতী ও রাজস্থানীরা নিজেদের বলে দাবি করেন, তা ষোড়শ শতকে রচিত।

৪। বঙ্গবুলি, মৈথিলী ও অসমীয়া সাহিত্য

ষোড়শ শতকে একটি কৃত্রিম ভাষা বাংলা দেশ আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচলিত হয়েছিল যা বঙ্গবুলি নামে পরিচিত। বঙ্গবুলি প্রকৃতপক্ষে মৈথিলার ভাষা, যা কিছুটা বাংলার মত দেখায়। পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্যে মৈথিল গীতিকবিতার প্রভাব একদা বেশ কিছুটা পড়েছিল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্গবুলি কবিতার প্রথম লেখক সম্ভবত রামানন্দ রায়, যিনি ষোড়শ শতকের লোক ছিলেন, এবং ধর্মে চৈতন্য মতাবলম্বী ছিলেন। মৈথিলী সাহিত্য উদ্ভবের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের সমকালীন। জনশ্রুতি অনুযায়ী স্বাদশ-হর্যোদশ শতকের কবি উমাপতি ধর তাঁর সংস্কৃত পারিজাতহরণ নাটকে মৈথিলী সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ওই-গুলির লেখক সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। আদিতম মৈথিলী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে। গ্রন্থটির নাম বর্ণরসাকর, লেখক জ্যোতিষীশ্বর ঠাকুর। বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতকের শ্রেষ্ঠ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় নতুন করে দেবার নয়। বিদ্যাপতি সংস্কৃতও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং পুণ্ডরীচসুন্দরী নামক একটি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া অবহট্ট নামক একটি পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষায় তিনি কীর্তিভজা নামক একটি ঐতিহাসিক কাব্যও রচনা করেছিলেন। কিন্তু পদাবলী লেখক হিসাবেই তিনি অধিকতর জনপ্রিয়। তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন কথা জোর করে বলা যায় না। কেন না শিব ও দেবীকে নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন, যা আজও মৈথিলার বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর কামাক্ষ্য বিষয়ক পদাবলীর জন্য বৈষ্ণবদের নিকট তিনি মহাজন পদবাচ্য। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারগণও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের মতই চর্যাপদকে নিজেদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন বলে দাবি করেন। অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম লেখক হর্যোদশ শতকের হেম সরস্বতী যিনি বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে প্রহ্লাদচরিত নামক কাব্য লিখেছিলেন। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে হরির বিপ্লব ও কবিরাজ সরস্বতী মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীকে অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। ওই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কবিরাজ মাধব কন্দলি যিনি রামায়ণের অসমীয়া সংস্করণ রচনা করেছিলেন এবং কৃষ্ণকথা অবলম্বনে দেবজিৎ নামক কাব্য লিখে-

ছিলেন। পঞ্চদশ শতকে দুর্গাবর সঙ্গীতের আকারে লিখেছিলেন গীত রামায়ণ। উষা ও অনিরুদ্ধের প্রেমোপাখ্যান নিয়ে পীতাম্বর লিখেছিলেন উষাপরিণয় কাব্য, এবং বেহলা-লখিমদরের কাহিনী অবলম্বনে মানকর লিখেছিলেন বিহলা-লখিমদর কাব্য। অসমীয়া সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রাবল্য এনেছিলেন শংকরদেব (১৪৪৯—১৫৬৮)। শংকরদেবের রচনার সংখ্যা বহু। রামায়ণের শেষ অধ্যায় এবং ভাগবতপুরাণের কিছু অংশ তিনি অসমীয়াতে অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া ২০৯৮ শ্লোকে ৩০টি কবিতায় তিনি কৃষ্ণকথা লিখেছিলেন, কাব্যটির নাম কীর্তনঘোষা। তাঁর অপরাপর কাব্য হচ্ছে রুক্মিণীহরণ, ভক্তিপ্রদীপ এবং নিম্ন-নব-সিদ্ধ-সংবাদ। অসমীয়া সাহিত্যে একাংক নাটকের (অংকিয়া নাট) তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত রাম-বিজয়, কালীদহন, পারিজাতহরণ, পদ্মীপ্রলাপ ইত্যাদি নাটক আসামে আজও জনপ্রিয়। এক নতুন ধরনের পদাবলী সাহিত্যেরও তিনি সুরপাত করেছিলেন যা বর্গগীত নামে খ্যাত। শংকরদেবের শিষ্য মাধবদাসও কবিত্যাহিত সজ্জন করেছিলেন।

৫। ওড়িয়া সাহিত্য

ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ চর্যাপদসমূহকে তাঁদের আদিতম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে দাবি করেন। আদি ওড়িয়া সাহিত্যগ্রন্থ স্বাদশ শতকে রচিত হয়েছিল নাম মাদলাপাঞ্জী। চতুর্দশ শতকে বঙ্গদাস রচনা করেছিলেন কল্কট-চৌতিসা, যার বিষয়বস্তু শিব-পার্বতীর বিবাহকথা। ওই একই সময় নারায়ণানন্দ অবধূত স্বামী রচনা করেছিলেন রত্ন সূর্য্যনিধি, একটি প্রেমোপাখ্যান যার উদ্দেশ্য অবশ্য ধর্মীয়। চতুর্দশ শতকেই উড়িষ্যার প্রথম বিখ্যাত কবি সারদাদাস চণ্ডীপুরাণ ও বাস্কীক-রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া সাতশো শ্লোকে তিনি মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেছিলেন। চতুর্দশ শতকেই উড়িষ্যায় ভক্তিবাদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তকবি মাক্‌শুদাস এই সময় লিখেছিলেন রামের কাহিনী অবলম্বনে মহাভাষা, এবং যশোদার বাৎসল্য অবলম্বনে কেশব-কোইটী। পঞ্চদশ শতকে অজুনালাস রচিত

রামবিড়া ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম দীর্ঘ কবিতা। ওই শতকের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন নীলাম্বরদাস, মহাদেবদাস, গোবিন্দ ভঞ্জ ও দামোদরদাস। নীলাম্বরদাস জৈমিনীভারত ও পদ্মপুরাণের ওড়িয়া অনুবাদ করেছিলেন। চৈতন্য-শিষ্যদের মধ্যে বলরামদাস ওড়িয়ায় রামায়ণ, ভগবদ্গীতা ও বেদান্তসারের অনুবাদ করেছিলেন, তা ছাড়া তাঁর মৌলিক রচনা ছিল গুপ্তবর্তী, ভবসমুদ্র এবং ব্রহ্মসংহতগোল। চৈতন্যদেবের অপর শিষ্য জগন্নাথদাস, ভাগবতপুরাণের ওড়িয়া অনুবাদ করেছিলেন যা আজও উড়িষ্যা বিশেষ জনপ্রিয়।

৬। মারাঠী সাহিত্য

মারাঠী সাহিত্যের সূত্রপা ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে হলেও ত্রয়োদশ শতক থেকে এর শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল। মারাঠী একটি পুরাতন প্রাকৃত ভাষা এবং পরবর্তীকালে কোংকনী ভাষারীতির কিয়দংশও মারাঠীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। মারাঠী সাহিত্যের আদি লেখক মুকুন্দবাজ ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে বিবেকসিঙ্হ নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর নামে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যথা পরমামৃত, পর্বনবিজয়, পাণ্ডকরণ ইত্যাদি। দশম শতকের শেষের দিক থেকে মহারাষ্ট্রে নাথ সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে, এবং এই সম্প্রদায়ের কোন লেখক বিরচিত গোরক্ষ-জ্ঞাননাথ-সংবাদ মারাঠী গদ্যসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। জ্ঞানদেব এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন এবং তিনি জ্ঞানেশ্বরী নামক ভগবদ্গীতার একটি টীকা কবিতায় রচনা করেছিলেন। তাঁর অপর রচনা হচ্ছে অমৃতানুভব যার বিষয়বস্তু ঔপনিষাদিক দর্শন। তা ছাড়া তিনি অভঙ্গ ছন্দে সহস্রাধিক কবিতা রচনা করেছিলেন যা প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ত্রয়োদশ শতকে মহারাষ্ট্রে চক্রধর নামক একজন ধর্মসংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বাংলা দেশে যেমন চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, এক্ষেত্রেও তাই। কেসোবাস (১২৮০) রচিত চক্রধর-সিদ্ধান্ত-সূত্রে চক্রধর প্রবর্তিত ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ওই লেখকের আরও একটি গ্রন্থ আছে যার নাম দ্যুতান্ত পাঠ। ওই সম্প্রদায়ের অপরাপর গ্রন্থ হচ্ছে মহিমভট (১২৮৮) বিরচিত লীলাচরিত, দামোদর

(১২৭৮) বিরচিত বহুহরণ, নরেন্দ্র বিরচিত বুদ্ধিশীলস্বয়ম্বর, এবং ভাস্করভট্ট বিরচিত শিশুপালবধ। ভাস্করভট্ট বিরচিত উদ্ভবশীতা ভাগবতপুরাণের একাদশ অধ্যায়ের একটি মারাঠী ভাষ্যগ্রন্থ। মহিলা কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মহাদেবীসি যিনি বহু নামক বিশেষ ধরনের বিবাহসঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নবম শতক থেকেই মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদ প্রচারিত হতে থাকে এবং জ্ঞানদেবের সমকালীন যৈকব ভক্তকবি নামদেব তাঁর বিখ্যাত পদাবলী সাহিত্যের স্বারা মারাঠী সাহিত্যে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। নামদেবের শিষ্য তুকারাম রচিত পদাবলীও মারাঠী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নামদেবের শিষ্য জনাবাইও ভক্তিমূলক কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। ভক্তিবাদেব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রে রামায়ণ-মহাভারত চর্চারও প্রাবল্য ঘটেছিল। মারাঠী কাব্যসাহিত্যের বারো আনা উপরকণই ওই দুই মহাকাব্য থেকে নেওয়া। মহাভারতের কুড়িটি সংক্ষিপ্তসার, এবং ছোট-বড় মিলিয়ে রামায়ণের একশো কুড়ি সংস্করণ মারাঠীভাষায় রচিত হয়েছিল। মারাঠী পদাবলী সাহিত্যে পরবর্তীকালে নরসিংহ সরস্বতী, জনার্দন স্বামী একনাথ প্রমুখ মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন।

৭। অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা

অপরাপর আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে পঞ্জাবী ও সিন্ধী দিয়েই আরম্ভ করা যাক। পঞ্জাবী ভাষা দুরকম, পশ্চিমা ও পূর্বী। পশ্চিমা পঞ্জাবীকে বলা হয় হিন্দিক বা লহণ্ডি, পূর্বী পঞ্জাবীর সঙ্গে হিন্দীর পার্থক্য সামান্য। পঞ্জাবী সাহিত্যের আদি লেখক হিসাবে মূলতানের বাবা ফরিদ-উদ্দীনের নাম করা হয়, কিন্তু তাঁর রচনা ঠিক পঞ্জাবীভাষায় নয়। পঞ্জাবীভাষার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বালা (১৫০৮) রচিত জনমসার্থী, গুরুদ নানকের জীবনকথা অবলম্বনে যা রচিত। শিখধর্মের আদিগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল গুরুজীর্ননের সময়ে, ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। সিন্ধীভাষার উদ্ভব হচ্ছে ব্রাহ্ম উপপ্রাংশ থেকে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দেই সিন্ধীভাষায় মহাভারত রচিত হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধী সাহিত্যের স্বকীয় সম্পদ বলতে বীরগাথা ও প্রেমোপাখ্যান বেগুনি রচিত হয়েছিল

একাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। সিন্ধীভাষা প্রাচীন হলেও সিন্ধী সাহিত্যের বিকাশ বলিষ্ঠ। সত্য বলতে কি মুসলিম সূফী সাধক শাহ লতিফের (১৭৪৮) পূর্বে কোন শক্তিমান সিন্ধী লেখকের পরিচয় আমরা পাই নি। দ্রাবিড় থেকে উৎপন্ন তুলু, কোদাগু, কোট, টোডা, কোলাসি, গোন্দী, কুড়ি, ওরাও, মান্টো ও ব্রাহুই প্রভৃতি ভাষার কোন লিখিত সাহিত্য নেই। একথা সাঁওতালী, মন্ডারি, হো, ভূমিজ ইত্যাদি খেরওয়ারী প্রেণীর ভাষা, এবং কোল ও কোকু পরিবারের ভাষাসমূহ এবং সেই সঙ্গে বোসো, রুভা, মেচ কোচ, গারো, কাছাবী বা দিমাসা, টিপরা বা মুরাং, নাগা ভাষা-গোষ্ঠী, কুকী বা চিন ভাষাগোষ্ঠী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্য। তবে এই সব ভাষার কথা ও কাহিনী এবং সংগীতের অভাব নেই, যা নৃত্তবিদেরা সংগ্রহ করেছেন ও আঙ্কণ পর্যন্ত করছেন। বর্তমানে অবশ্য কোচ, টিপরা এবং কাছারী ভাষাবলম্বীরা বাংলাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা গ্রন্থদ্বারা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। ত্রয়োদশ শতকে আহোমবা আসাম অধিকার করেছিল, তাদের নিজস্ব লিপি ছিল এবং জাতীয় ইতিহাস রাখার অভ্যাসও ছিল। তাদের রচিত ইতিবৃত্ত বৃহজ্জি নামে পরিচিত। ষোড়শ শতকে এই বৃহজ্জি-সাহিত্য অসমীয়া ভাষায় আওতাধ চলে আসে। মণিপুরীদের একটি বর্ষমালা অবশ্য ছিল, এবং তাদের দুটি ইতিবৃত্তের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে, তবে লক্ষ্যন্য এবং লক্ষ্যলোকসম্প্রদায়, কিন্তু এগুলির তারিখ জানা যায় না। মণিপুরী লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ, বিশেষ করে খম্ব ও রাজকুমারী খোইবির প্রেমোপাখ্যান ওখানে বিশেষ জনপ্রিয়। এই কাহিনী প্ৰাদেশ শতকে রচিত হয়েছিল। খাসি এবং জয়ন্তিন্দ্রাদেবও কোন লিপি নেই, অষ্টাদশ শতক থেকে খাসিদের মধ্যে বাংলা লিপি প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবে তারা রোমক লিপি গ্রহণ করেছে। নেপালের নেওয়ারী ভাষা কিন্তু সাহিত্যসম্পদ-বিগত নয়। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এই ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে, যদিও নেওয়ারী ভাষার আদিগ্রন্থ, একটি ইতিবৃত্ত, যা আম্মদেশ হাতে এসেছে—চতুর্দশ শতকের পূর্বে রচিত নয়।

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলন অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' করতে হবে, এই দাবি নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন উপলক্ষে পুর্লিশেব গুলীচালনায় যে অনেক ছাত্র নিহত ও আহত হন, সে কথা আগেই বলেছি। বলা হয় নি, আর একজন অতি নামী ব্যক্তির নিহত হওয়ার কথা। ইনিও ঐ ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষেই নিহত হন। তাঁর মৃত্যুকে আমি 'নিহত' হওয়াই বলতে চাই এবং কেন বলতে চাই সে কথা বলার আগে একটি কথা বলতে চাই যে ঐ ভুললোক মারা গিয়েছেন ভাষা-আন্দোলনের অনেক পরে এবং বাইরের লোকের অনেকেই তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্যক জানেন না কিন্তু আমি কিছু কিছু জানি। পুর্লিশের গুলী ছাত্রদের দেহকে বিম্ব করোঁছিল কিছু এর দেহকে বিম্ব না করে, করেছিল মর্মস্থলকে গভীরভাবে বিম্ব। মমাহত হয়ে সেই যে তিনি চিন্তের ও মস্তিস্কের স্বেদ্য হারিয়ে ফেলোঁছিলেন, তা থেকে আর তিনি আরোগ্যলাভ করতে পারেন নি। তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ইনিই হচ্ছেন, "বাহার সাহেব" নামে সর্বসাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। তাঁর পুরো নাম—মহম্মদ হাবিবুল্লা চৌধুরী। তিনি ছিলেন জনাব নূরুল আমিন সাহেবের ভৎকালীন মন্ত্রিসভারও সদস্য এবং জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি নিজে এবং তাঁর ভৎপী সামসুদ্দাহার সাহেব ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ও কবি ও সাহিত্যিক নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্য। 'বাহার' সাহেব স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে আহত ছাত্রদের দেখেছেন এবং নিহতদেরও সম্পর্কে সম্যক সঠিক তথ্য নেওয়ার তাঁর সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার একজন ঐকান্তিক সমর্থক 'বাহার' সাহেব একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী থেকেও বাংলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাদেরই পুর্লিশ বাহিনী ছাত্রদের উপরে যে তীব্র চালিয়েছিলেন, তা ঠেকাতে পারেন নি। এইটাই তাঁর মনের উপর ভীষণ এক প্রতিক্রিয়া আনে এবং তারই

ফলে তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটে। এই ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষেই আর একবার প্রমাণ হয় যে গণতন্ত্রের নামে যে আমলা-তান্ত্রিক সরকার তখন পূর্ববঙ্গে চালাছিল তাতে মন্ত্রীরা 'রবার-স্ট্যাম্প' ছাড়া আর কিছুই নন। আসল ক্ষমতার মালিক মুখ্য-সচিব জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব ও তাঁর অধীনস্থ প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা। তাঁরা যা করবেন, তাই হবে এবং তাঁদের কৃতকার্যের সব দায়িত্ব মন্ত্রীরা নিজের ঘাড়েরে নিয়ে জনসাধারণের কাছে নিমিস্তের ভাগী হবেন। আজিজ আহমেদ সাহেবের অপকর্মে নূরুল আমিন সাহেবও তাঁর মন্ত্রিসভার 'রবার-স্ট্যাম্প' হিসাবে 'সীল' দেওয়া ছাড়া গভ্যন্তর ছিল না। দিয়েছিলেনও। এই দেওয়াটাই 'বাহার' সাহেবের বিবেককে যে পীড়া জনবরত দিতে থাকে, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে, তাঁর মস্তিস্কবিকৃতি ও অবশেষে তাতেই মৃত্যু। সেদিনের সেই গুলীচালনায় পরেই তিনি যে নির্বাক হয়ে যান, তার পব থেকে সদা হাস্যময় অতি-মুখর 'বাহার' সাহেবকে তাঁর পূর্বাবস্থায় আর কেউ দেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু আমবা যারা এসেম্বলিতে বিরোধীদের তাঁর সহকর্মী ছিলেম, তাঁরা কেউই তাঁকে তাঁর মনের পূর্বাবস্থায় আর দেখি নি। তার পর থেকে খুব কমই তিনি এসেম্বলিতে উপস্থিত হতেন। যা দুই-একদিন তাঁকে এসেম্বলিতে দেখেছি তখন তাঁকে মনমরা অবস্থাতেই দেখেছি, সুতরাং, আমার বিশ্বাস যে সেদিন পুর্লিশের গুলী ছাত্রদের দেহ বিম্ব করেছিল, আর করেছিল বাহার সাহেবের মর্মভেদ এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু। সেই জনাই আমি তাঁকেও মনে করি নিহত ছাত্রদের মতই তিনিও একজন বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার আন্দোলনের শহীদ। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার যে সব বীর সন্তান তাদের বৃকের তপ্ত-তাজা রক্ত-মূল্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন, সেই সব শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অতীতের বাংলার অন্য আর এক প্রান্ত—পশ্চিমবং

থেকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও 'সেলাম' জানাই। যারা মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁরা পূর্ববাংলার বাঙালীদের সামনে এক নতুন আদর্শ রেখে গিয়েছেন। সেই আদর্শ হচ্ছে, মাতৃভাষার মত মাতৃভূমিরও সম্মান রক্ষার আদর্শ। আজ পূর্ববাংলার বাঙালীদের উপর সেই আদর্শ রূপায়ণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসেছে। আমি বিশ্বাস করি সেই দায়িত্ব পূর্ববাংলার সন্তানেরা পরিপূর্ণ সফলতার সাথেই রূপায়ণ করবেন এবং সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে সম্মিলিত একটি নতুন পাকিস্তানী জাতি গড়ে তুলবেন। পূর্ববাংলার লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ যতই জেগে উঠবে, ততই তাঁরা বুঝবেন যে পূর্ববাংলার স্বাধেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে। শত্রুতার পথে পূর্ববংগ ক্রমশই রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বলই হয়ে পড়বেন। একথাটা তাঁরা এখনই বুঝতে শুরুর করেছেন যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই হল, পূর্ববংগকে শক্তি-হীন ও দুর্বল করে রাখা এবং আয়-ব-সরকার সেই কাজটিই জনকয়েক তাবদার বাঙালী মন্ত্রী ও সুবিধাভোগীদের সাহায্যে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা' চিরদিন চলতে পারে না—কিন্তুতেই চলবেও না। আয়-বের তরবারির শাসন ব্যর্থ হয়ে যাবেই। সেদিন আর খুব বেশি দূরেও নয়। বাঙালীর স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তা-বোধকে এককালের মহাশক্তিশালী ইংরেজ সরকারও দাবিয়ে রাখতে পারে নি। ইংরেজ যা পারে নি তাদেরই বহু পুরাতন ভৃত্য তাবদাররাও তা পাবেন না। পূর্ব-বাংলার ছাত্রসমাজ সেই ইংগিতই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সামনে রেখে গিয়েছেন।

পূর্ববাংলায় ভাষা-আন্দোলনকে উপ-লক্ষ করে যে আন্দোলন গড়ে উঠতে আমরা বিভিন্ন জেলায় দেখেছি, তা ব্যাপকতার দিক দিয়ে 'পাকিস্তান-আন্দোলনের' মতই ব্যাপক। বিভিন্ন জেলায় জেলায় দুর্-দুরান্তরেও এমন কোনও গ্রাম ছিল না যেখানে আন্দোলন ও বিক্ষোভ-মিছিল না হয়েছে। সর্বত্রই মিছিলে মিছিলে

‘আওয়াজ’ উঠেছে—‘পাকিস্তান-জিন্দাবাদ’, ‘মুসলিম লীগ বরবাদ’, ‘মুদ্বল আর্মিনের রক্ত চাই।’ এই আন্দোলন ও মিছিলের মধ্য দিয়ে সৈদিন পূর্ববাংলায় যে জনমত গড়ে উঠেছিল, সেই জনমতই পরবর্তী ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পূর্ববঙ্গে থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিল। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা যথাকালে করবো।

পূর্ববাংলায় এই আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে যদি কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দল ঐ আন্দোলন সৃষ্টির কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চান, তাহলে আমি দুঃখের সাথে জানাতে চাই যে আমি তাঁদের সেই দাবির সাথে একমত হ’তে পারছি না। আমি মনে করি, ভাষা-আন্দোলন ছাত্র-সেবাই আন্দোলন ছিল এবং তার নায়কও ছিলেন ছাত্ররাই। ভাষা-আন্দোলনের প্রথম ‘আওয়াজ’ ওঠে ছাত্রদেরই এক সভায়, যেখানে ‘কায়দ-ই-আজম’ জিন্নাহ সাহেব ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস। পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ডাকিয়েছেন ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট পাশ করানোর জন্য। ‘জগন্নাথ হলে’ অধিবেশন বসেছে। নাজিমুদ্দিন সাহেব তিন দিন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতার জন মুখই খুলতে পাবেন না। যাই বলতে যান, তাতেই চতুর্দিক থেকে ‘হে হে’। এই বিরোধিতা কিন্তু কংগ্রেসের বিবোধী দলের সদস্যরা করছেন না। তখন পর্যন্ত বিধানসভায় একমাত্র কংগ্রেস দলই বিরোধী দল। তাঁরা সকলেই হিন্দু বা উৎকালীন সংবিধান মতে অ-মুসলমান সম্প্রদায়। মুসলমান সদস্যেরা তখন পর্যন্ত সকলেই মুসলিম লীগের সদস্য। এই মুসলিম লীগের সদস্যদের এক অংশ সৈদিনে খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন, তাতে তাঁরা আমাদেরও তিনদিন পর্যন্ত কিছু বলতেই দেন নি। আমরাও দেখে যাচ্ছিলাম, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। নাজিমুদ্দিন সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে কায়দ-ই-আজমের কাছে অবিলম্বে ঢাকায় আসাব জন্য S.O.S. (জরুরী আহ্বান) জানান। কায়দ-ই-আজম আসেন এবং কয়েকদিনের আলাপ-আলোচনার পর তিনজনকে মন্ত্রী ও একজনকে বার্মার রাষ্ট্রদূত করা ব্যবস্থা করে অবস্থা আশ্বস্তে আনেন। সে কথা আগেই বলেছি। তারপরে বিজয়ী কায়দ-ই-আজম গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের — প্রাণগে জমায়েত ছাত্রদের সভায় ভাষণ দিতে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন,—“Urdu-and nothing but Urdu, shall be the State-

language of Pakistan.” অর্থাৎ একমাত্র উর্দু-ই এবং উর্দু ছাড়া আর কোন ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে না। বলাব সাথে সাথেই ছাত্রদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্র ‘আওয়াজ’ তোলেন,— “কায়দ-ই-আজম জিন্দাবাদ”, “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ও “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি হঠাৎই জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় তোলেন। ছাত্রবাও সেক্ষণ্য প্রস্তুত হয়ে যান নি সুতরাং তারা যে কোনও রাজনৈতিক দলের বা নেতার সাথে পবামর্শ কবে সৈদিন সেখানে যান নি তা’ সহজেই অনুমান করা যায়। জিন্নাহ সাহেবের ভাষণে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন হঠাৎই সৈদিন ছাত্র-প্রত্যাগতদের কাছে এসেছিল এবং ছাত্রদের এক অংশও সাথে সাথেই তার জবাব দিয়েছিলেন। তাঁরা সৈদিন জিন্নাহ সাহেবের প্রতি কোন-রূপই অসম্মান তো’ দেখান-ই নি, তাঁর এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের “জিন্দাবাদ” ধ্বনিই দিয়েছিলেন, কিন্তু সাথে সাথেই তাঁরা তাঁদের বলিষ্ঠ দাবির—“রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”—কথাও অত্যন্ত জোরের সাথেই তুলে ধরেছিলেন। যখন তাঁরা এই দাবির কথা তুলে ধরেন, তখনও সংবিধান তৈরিব গণ-পরিষদে ভাষার প্রশ্ন ওঠে নি এবং কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীমীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও গণ-পরিষদে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরেন নি। পরে অবশ্য গণ-পরিষদে ধীবেনাবাবু স্বাক্ষরিত সহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। স্বাক্ষরিত ঐ দাবির পেছনে যতই থাক না কেন, সৈদিন গণ-পরিষদে ভোটের জোবে ধীবেনাবাবুর দাবি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”— এই দাবি ছাত্রদের মুখ থেকেই সর্ব প্রথমে ওঠে এবং তার সমর্থন পূর্ববাংলার প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাবাও করেছেন, তা’ দেখেছি। পূর্ববঙ্গ বিধানসভায়ও দেখেছি বিধানসভায় নিষম লগ্নন করেই যেন জনাব ফজলুল হক, জনাব মহম্মদ আলি (বগুড়ার), জনাব তফাজ্জল আলি, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহাব, ডাঃ মালেক প্রমুখের মত নেতাবাও বিধানসভায় কয়েকদিন বাংলাতে বক্তৃতা কবেছেন। বিধানসভায় নিষম হচ্ছে, যেসব সদস্য ইংরাজি জানেন ও বলতে পাবেন, তাঁদের ইংরাজিতেই বক্তৃতা দিতে হবে। এই নিষম থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু দিন পর্যন্ত ঐ সব নেতারা যাঁদের প্রত্যেকেই ইংরাজি ভাষায় ভাল বক্তা ছিলেন তাঁরা সকলেই ছাত্রদের দাবি সমর্থন কবেই যেন বাংলাতেই বক্তৃতা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই পূর্ববাংলার জেলায় জেলায় একটা জনমতও বাংলা ভাষার স্বপক্ষে গড়ে উঠতে থাকে। এই জনমত গড়ে ওঠার পেছনে যুক্তিও ছিল অকাট্য এবং

এই ভাষার প্রশ্নের সাপেক্ষে জড়িত ছিল ভাষাকালের বাঙালী তত্ত্বাবধে ও অর্থনৈতিক সমস্যাও। যুক্তিব দিক দিয়ে প্রধান যুক্তিই হল পাকিস্তানের যা’ জনসংখ্যা তার অধিকাংশই বেশি হচ্ছে পূর্ববঙ্গেই আধ-বাসী। বাঙালীদের গণতান্ত্রিক গণ্যতা অনুসারে যদি ভাষার প্রশ্ন সমাধান ভোটের মাধ্যমে করা হয় তাহলে বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হয়। কিন্তু অ-বাঙালী মুসলিম লীগ নেতারা তা’ করতে রাজী নন। মুসলিম লীগের প্রসাদভোজী ক্ষমতালোভী দুই-চার জন বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদেরও অ-বাঙালী নেতারা তাঁদের দলে ভেড়ান। মুসলিম লীগ নেতাদের বরাবরের আশংকা পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সাথে শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও পোশাক-পরিচ্ছদে এতই ঘনিষ্ঠ-ভাবে একীভূত যে তা’ ভাঙতে না পারলে পূর্ববঙ্গ দু’ দিন আগে বা পরে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। সেই মিলন ভাঙার প্রথম ও প্রধান কাজ হিসেবেই তাঁরা পূর্ববঙ্গের ভাষার (বাংলার) প্রাধান্য দিতে চান না। সৈদিনও চান নি, আজও চাইছেন না; তাই নানা ফিকির-ফন্দিই তাঁরা নিচ্ছেন পূর্ববাংলার ভাষার রূপ বদলিয়ে দিতে। কিন্তু কোনও ফিকির-ফন্দিই আজকের বাত-নৈতিকসচেতন বাঙালীর কাছে পাতা পাচ্ছে না। সৈদিনও পায় নি। তত্ত্ব ছাত্ররাই সৈদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কায়দ-ই-আজমের সেই স্মরণীয় বক্তৃতা পর তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধে যে সৈদিন ছাত্রদের মুখ থেকেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল, তা’ বাইনে থেকে দেখে মনে তোত যে সেটা ছিল সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত একটি ধ্বনি এবং সে ধ্বনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আসলে কিন্তু তা হয় নি। বাইরে তাব প্রকাশ ছিল না কিন্তু ভেতরে ভেতরে অন্তঃসলিলা ‘স্বপ্ন’ মত তা’ রয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত শহর ও গ্রামগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আস বৈদন কবে? বাঙালী বুঝেছিলেন যে ঐ দাবির সাথে বাঙালী তরুণদের সব বর্ষা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিযোগিতা-মূলক চাকুরি প্রাপ্তির বিবরণটি বৈধভাবে জড়িত; সুতরাং গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার-বিবেচনা কবে বাঙালী ছাত্ররা ঠিক কবেছিলেন যে তাঁদের দাবির সার্থক রূপায়ণ তাঁদের কবতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যেই জনমত তৈরি করার দায়িত্ব নিঃসন্দেহ ভেতরে ভেতরে চলতে গকে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেব নিহত হন

এবং থান্ডা নাজিমুদ্দিন সাহেব গভর্নর জেনারেলের গদি ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ১৯৫১ সালের একেবারে শেষভাগে অথবা ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে (আমার ঠিক মনে নেই) ঢাকায় আসেন। নাজিম-

মুদ্দিন সাহেব উদ্‌ভাষী বাঙালী। বাংলা দেশে এইরূপ কিছু পরিবার বরাবরই আছেন। পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদেও এইরূপ পরিবার অনেকই দেখোঁছি। যাক, নাদিমুদ্দিন সাহেব ঢাকায় এসেছেন। তিনি ঢাকারই লোক এবং তার উপরে

পাকিস্তান রাষ্ট্রতরঙ্গীর সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠধার প্রথম বাঙালী প্রধানমন্ত্রী; সুতরাং ঢাকার তীর জ্বষ-জ্বষকার পড়ে যায়। পল্টন ময়দানে বিঘাট সভাব আয়োজন হয়েছে। দলে দলে কাতারে কাতারে প্রোতার এগে বিঘাট মাঠকে ভরে ফেলেছেন। নাজিমুদ্দিন সাহেব বস্তুত দিচ্ছেন। বস্তুত দিতে দিতে তিনি বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা! আব যাষ কোথায়? ময়দানে সমবেত বিঘাট জনতা ছাত্রদের নেতৃত্বে সম্ভবে সৈদিন 'ধরনি' (জেলগান) দিয়ে উঠেছিলেন—“রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।” সে ধরনিতে ঢাকার আকাশ-বাতাস কেপে উঠেছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ও মুদ্যামন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেবের 'সবকারের' মুদ্যা স্তম্ভ বধাত্তমে চৌধুরী মহম্মদ আলি সাহেবের ও জনাব আজিজ আহমেদ সাহেবের বৃক সৈদিন মোটেই কাপে নি; সুতরাং নাজিমুদ্দিন সাহেবেরও 'না', নূরুল আমিন সাহেবেরও 'না'। এই ঘটনার পরই পূর্ববংগ বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে (১৯৫২ সালের)। শহরে গৃহব রটেছে বিধানসভার অধিবেশনে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা কবা হবে। তারই প্রতিবাদে বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই ছাত্ররা 'হরতাক' ডেকেছেন এবং পরিকল্পনা করেছেন যে বিধানসভার সামনে তাঁরা এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাবেন। সরকারপক্ষ ও মুদ্যাসচিব আজিজ আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে ডাকে প্রতিরোধ করতে। তাঁরা 'এসেন্সাল হাউসের' চতুষ্পার্শ্বে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন, রাস্তার রাস্তার কাঁটাতারের বেড়া ও বেষ্ট পত্রিমাণে সশস্ত্র পলিশ মোতায়েন করেছেন। সেকথা আগেই বলেছি। এ-ও আগেই বলেছি যে নূরুল আমিন সাহেব নাকি প্রথমে ১৪৪ ধারা জারি করতে নারাজ ছিলেন কিন্তু ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পলিশ সাহেব ও সর্বোপরি মুদ্যাসচিব আজিজ আহমেদ সাহেব যখন প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা আইনভঙ্গকারীদের উপর অস্ত্রের সাহায্যে কোনরূপ বলপ্রয়োগ করবেন না; যদি ছাত্ররা আইনভঙ্গ করে নিষিদ্ধ এলাকার প্রবেশ করেন তাহলে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে মোটর ট্রাকে কবে নিয়ে গিয়ে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেই আমি যতটা শুনছি তাতে জেনেছি যে নূরুল আমিন সাহেব তাঁদের প্রস্তাবে মত দেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল পলিশ তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন-ই নি তাঁরাই অস্ত্রধারী হয়ে ম্যডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণের মধ্যে



সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার
কৰিলে কোন দন্তৰোগেৰ ভয়
থাকে না। দন্তৰাজী সুস্থ, সবল
ও সুন্দৰ হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে
ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ও মঞ্চালয়, ঢাকা

৩৬,সার্থনা ঔষধালয় রোড,সার্থনা নগর,কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এম, অধ্যাপকদাস্ত্রী, এফ.সি, এস(লণ্ডন),
এম,সি, এস(আমেরিকী) ডাঙলপুৰ কলেজের ব্রাহ্মণ্যনাশ্ৰয়
ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক।
কলিকাতাকেন্দ্ৰ-জ: নবোশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস(কলি:) অধ্যাপকদাস্ত্রী

ঢুকে গিয়ে 'কাদিনে গ্যাম' এবং অবশেষে গুলী পর্যন্ত চালিয়েছেন।

বিশেষ তথ্যানুসন্ধানের পর আমি যতটা শুনছি তাতে ভেনেছি যে এটাই ছিল সৈন্যদের ভাষা-আন্দোলন শব্দ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরই সাথে কংগ্রেসের বা কোনও হিন্দুরই কোনরূপই যোগাযোগ তো ছিলই না, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের বা অন্য কোন রাজনৈতিক নেতাদেরও কোনরূপ যোগাযোগ ছিল বলে আমি মনে করি না। এটাই সত্য ঘটনা। ঘটনার সত্যতা যা-ই হোক না কেন, আজিজ আহমেদ সাহেবের তথ্য পাকিস্তানের ছক-কাটা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তো করতই হবে। তাই নূরুল আমিন সাহেব বললেন বা বলতে বাধ্য হলেন যে এ আন্দোলন আসলে নিছক ছাত্রদেরই আন্দোলন ছিল না; তার সাথে যুক্ত ছিল হিন্দু বা ও পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্টরা! নূরুল আমিন সাহেব বলেছিলেন হিন্দু বা লিঙ্ক, পারজামা প্রভৃতি পরে মুসলমানের ছদ্মবেশে এবং কম্যুনিষ্টরাই এ আন্দোলন পরিচালনা করেন! শব্দ 'কম্যুনিষ্ট' হলেই তো অসল উদ্দেশ্য রূপায়ণ করা যায় না। তাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করতেই হবে; তাহলেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের একটা অজুহাত খাড়া করা যাবে! তা-ই করা হল। অনেক হিন্দুকেই বিভিন্ন জেলায় জেলায় গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেস নেতা ও বিধানসভার সদস্যরাও গ্রেপ্তার থেকে বাদ যান নি। কংগ্রেস বলের মাননীয় শ্রীমতী সেন, শ্রীমতী বজ্রন ধব ও শ্রীমতী বিন্দুলাল ব্যানার্জি প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শব্দ এই কারণেই যে ভারতে ও বিশ্বের কাছে প্রচার করা যে কংগ্রেসও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সরকারপক্ষ কিন্তু একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে 'কংগ্রেস' একটা সম্প্রদায়-নিয়মানবর্তী অতি সুশৃঙ্খল (well-disciplined) রাজনৈতিক দল। সেই দলের কোনও সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে দলের নির্দেশ ছাড়া কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনেই যোগ দিতে পারেন না। যদি দলেরই নির্দেশ থেকে থাকে এ আন্দোলন পরিচালনা করার তাহলে দলের নেতা ও সহকারী নেতা শ্রীমতী কুমার দাসকে ও শ্রীমতী রেন্না দত্তকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল নাকি? তা' কথা হয় নি; কারণ তাঁদের ধবলে তা' নিয়ে একটা 'ভোলপাড়' হতে পারে। সুতরাং সে পথে না গিয়ে এমন পথ ধরতে হবে যাতে সাপও মরে কিন্তু লাঠিও না ভাঙে। সেই পথই বুদ্ধিমান মুখ্যসচিব বেছে নিয়েছিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম্যুনিষ্ট আমদানি করার উদ্দেশ্য ছিল সরকারী পরিকল্পনার পর-

বর্তী। পর্বতারের অবশিষ্ট কাজটুকু শেষ করার একটা অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য। সে কাজটা আর কিছু নয়—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে লোকচলাচলে, যা দেশ বিভাগের পরও এতাদন চলে আসছিল তাতে বাধা সৃষ্টি করা মাত্র। দেশ বিভাগের পর থেকে ক্রমাগত নানা রকমের অত্যাচার ও দফায় দফায় ছোট-বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হাঙ্গামায় হিন্দুর মন এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল—তারা ভাবতে শব্দ করছিলেন যে নিজ দেশে ও নিজ গৃহে বোধ হয় আর তারা সম্মানে বসবাস করতে পারবেন না; তাই কিছু কিছু হিন্দু আগেই দেশ ছেড়ে ভাবতে চলে এসেছিলেন এবং আসছিলেন; তবু বহুসংখ্যক হিন্দুই দো-মনা মন নিয়েই পূর্ববঙ্গেই ছিলেন এই ভেবে যে তারা থাকতেই চেষ্টা করবেন কিন্তু কোনও কারণে যদি আর থাকতে না-ই পারেন তখন দেশ ছেড়ে যাবেন। যাওয়া তো এখন শব্দ তখনই যাওয়া-যাবে—কোনও বাধা নেই। এই মনোভাব নিয়েই বেশির ভাগ হিন্দুই নিজ দেশে নিজ ঘরে ছিলেন। এইবার অঘাত এল এই শ্রেণীর দোদুল্যমান চিত্তের লোকদের উপরে। পাকিস্তান সরকার জেদ ধরেছেন যে তারা ভারত-পাকিস্তানে-যাতায়াতে 'পাশপোর্ট' ও 'ভিসা' প্রথা প্রবর্তন করতে চান। ভারত সরকার যুক্তিতর্ক দিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবে ও যখন কিছুতেই পাকিস্তানের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না, তখন তাঁদেরও রাজী-ই হতে হল। ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করলেন যে ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতে 'পাশপোর্ট' ও 'ভিসা' চালু হবে। এ তারিখ থেকে বিনা পাশপোর্টে ও ভিসায় দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত চলেবে না বলে ভারত ও পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর যেন বাধা ভেঙে গেল—বাঁধভাঙা জলপ্রোতের মত হিন্দুরা যিনি যৌদিক দিকে পাবেন সেই দিক দিয়েই সীমান্তের পরপারে ভারতে আসার পথে পা বাড়ালেন। যেসব হিন্দু তখন-পর্বন্ত পাকিস্তানে থাকা যাবে কি-না—এই লংশয়ে দোদুল্যমান চিত্ত ছিলেন তাঁদের মনের স্থৈর্য একদমই ভেঙে গেল। তারা মনে করলেন যে এইবার পাকিস্তান সরকার তাঁদের বেধে রেখে মারবেন। অবস্থা বেগতিক দেখলে আর চলে যাওয়া যাবে না। এই মনোভাব ব্যাপকভাবে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেওয়ার যখন প্রতিদিন হাজার হাজার লোক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসছেন, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ছুটে যান

ঢাকায়। তার সরকারেরও তর যে ব্যাপকভাবে একই সময়ে যাদ হিন্দু বাধ্য-ত্যাগ করে যান, তাহলে বিশেষ পাকিস্তানের দুর্নামই শব্দ ঘটবে না, ভাষাও থেবে-ও এই সব বাস্তবত্যাগীদের তত্ত্বাবধায় উৎপীড়িত হয়ে ভারতের মুসলমান জনগণ চলে আসতে বাধ্য হতে পাবেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন বাস্তবত্যাগীদের বিমুখী অভিযান হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, পূর্ববঙ্গেও হয়তো সেই অবস্থাই দেখা দেবে। গাবিস্তান সরকার সে অবস্থা চান না। তারা হিন্দুদের তাড়াতে চাইলেও ভারত থেকে যে মুসলমান পাকিস্তানে যান তা' চান না। ভারত সরকার ও ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ও নাগরিকদের বৃহৎ অংশই তা' চান না। সেরূপ যারা চান, তাঁদের মত আমি আগেও কোনদিন সমর্থন করতে পারি নি—আজও করি না। শব্দ নয়, সেই মনোভাব যদি কোনও দলের বা তাঁদের সমর্থক কোন নাগরিকের থাকে, তার আমি মৌরতর বিরোধী এবং এই মতবাদের আমি অত্যন্ত তীব্রভাবেই প্রতিবাদ করি। আমি সাবা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে এই পথে পাক-ভারতের সমাধান হবে না, হবে না। আমার অভিজ্ঞতা ও চিন্তায় আমি যে পথে সমস্যার সমাধানের সূত্র দেখতে পাচ্ছি, তাই পণ আলাদা এবং সে পথের কথা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব। এম গৃহ সংক্ষেপে এই কথাটাই বলে রাখতে চাই যে ভারতে পূর্ববঙ্গ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবনের মান বেড়ে যাবে—কোনও সাম্প্রদায়িকতাই তার মধ্যে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমানের এক নতুন ভারত গড়ে উঠবে যার প্রভাব পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপরও অবশ্যই পড়বে, রাজনৈতিক কারণে একটা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অখণ্ড দেশকে ভাগ করা যেতে পারে কিন্তু একেব ওপর অপবেব প্রভাব ঠেঁকান যায় না—এক্ষেত্রেও যাবে না। পাকিস্তান সরকার এই প্রভাব থেকে পাকিস্তানে রক্ষা করার জন্য আজ পর্বন্ত নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারেন নি। পাক-বেঙ-ও-ও রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার পরও তা' স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারেন না; বাংলা ভাষাকে 'ইসলামি ভাষা' নামে বিকৃত করার চেষ্টা বন্ধ করতে পারেন নি। আজ সকালে (১৬-৯-৫৭ তারিখের) 'পাক-রেডিও'র খবরে শুনলেম পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনাম খাঁ সাহেব তাঁর হাস-পথনা বেতাবে ভাষণে বলেছেন যে '১৯৫৬ সালে পাক-

জ্ঞানের শত্রুদেহ (অর্থাৎ তাঁদের ভাষায়—
‘হিন্দুস্থান’) পশ্চিম পাকিস্তানে সশস্ত্র
আক্রমণ করে ব্যর্থ হওয়ার এখন তাঁরা
যুদ্ধের পশ্চাতি পরিবর্তন করে পূর্ব-
পাকিস্তানে সংস্কৃতির নামে এক সংগ্রাম
শুরু করেছেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান-
বাসীগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন,—
“এই যে সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে
কোন অংশে কম নয়।” মোনেন খাঁ
সাহেবের এই উক্তি মধ্যই পথের সম্ভান
পাওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তা-
রিত আলোচনা বধ্যাকালে করব। এখন
শুধু কথা প্রসঙ্গেই এইটুকু বলে রাখছি।
যাক, যা’ বলছিলাম তাতেই আবার
ফিরে যাই। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন
সাহেব ঢাকার এসে কংগ্রেসের বিধানসভার
সদস্যদের সাথে এক সভার মিলিত হয়ে
তিনি আমাদের অনুরোধ জানালেন যে
আমরা যেন আমাদের প্রভাব বিস্তার করে
আত্মকৃত হিন্দু-নর-নারীর এই বাস্তবত্যাগ
বন্ধ করি। তিনি বলেন যে “পাশপোট”টা
কিছুই নয়—ওটা কেবল নাগরিকত্বের
চিহ্ন। বিনি পাশপোটের দরখাস্ত কর-

বেন, তিনিই পাশপোট পাবেন; আর
পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে আসাম, ত্রিপুরা
ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা ব্যবস্থা
হয়েছে যে পাশপোটধারীরা বছরে ৮
(আটবার) যাতায়াতের জন্য ‘ভিসা’ পাবেন
এবং এইসব অঞ্চলের জন্য পাশপোট ও
পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হবে। এই পাবার
প্রতিশ্রুতিই সৈদিন পাকিস্তানের প্রধান-
মন্ত্রী আমাদের কাছে দিয়েছিলেন কিন্তু
অন্যান্য অনেক পবিত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির
মতই এই প্রতিশ্রুতিটিও পাক সরকার
নস্যাৎ করে দিয়েছেন। স্বাধীনতার এক-
জন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা “মহারাজ”
(শ্রেষ্ঠের শ্রীমুখ্য প্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী)
আজ অশীতিপর বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তিনি
তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসার
পাশপোটের দরখাস্ত করেও পাশ-
পোট পাচ্ছেন না। ঐ সম্পর্কে ভারতের
প্রধানমন্ত্রীর ও তাঁর সরকারের বিশেষ
অনুরোধও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব
খাঁ সাহেবের অন্তরে সাড়া জাগাতে পারে
নি। আমি আমার আরও অনেক বন্ধুরই
নাম জানি, যারা পাশপোটের দরখাস্ত
করেও পাশপোট পান নি। তাঁদের নাম
আর আমি বলতে চাই না। কেন বলতে
চাই না তা সহজেই অনুমেয়। পাঠকরা
বুঝে নেবেন।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব আজিজ
আহমেদ সাহেবের হাতের এই শেষ অস্ত্র
—পাশপোট প্রথা—চালু করার জন্যই
জনাব নূরুল আমিন সাহেবকে ভাষা-
আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গে থেকে ‘কম্যুনিষ্ট’
আমদানি করতে হয়েছিল।

এইভাবেই ১৯৫২ সাল শেষ হয়ে
যায়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী
শুধু পাকিস্তানের ইতিহাসেই নয়—
পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ইতিহাসেই
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইদিন পাকি-
স্তানে যে বিপ্লব তরুণ মুসলমান ছাত্র-
সমাজ সৈদিন শুরুর করেছেন, সেই বিপ্লবের
জয়যাত্রা কেউই রুদ্ধতে পারবেন না, যেমন
সৈদিন পারেন নি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা
করার দাবিকে রুদ্ধতে। আমি আমার
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই সেইসব তরুণ
বিপ্লবীদের। তাঁরা দীর্ঘজীবী হোন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

পাশপোট প্রথা চালু হওয়ার বেশ
কিছুকাল পরে পাকিস্তানে নিযুক্ত
ভারতের ‘হাই কমিশনার’ ডঃ মোহন সিং
মেহতা একবার রাজসাহীতে গিয়েছিলেন।
তাঁর সেই যাওয়া উপলক্ষে রাজসাহীতে

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হিন্দু ও মুসল-
মান নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কয়েক
জনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ডঃ মেহতার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ-আলোচনা
করতে। মুসলমান নেতৃস্থানীয় বন্ধুদের
সাথে হিন্দুদের তরফ থেকে আমিও গিয়ে-
ছিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সৈদিন
ডঃ মেহতাকে পাশপোট প্রথা চালু হওয়ার
হিন্দুদের মধ্যে যে নতুন এক সমস্যা দেখা
দিয়েছে তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ
করবার জন্য বলেছিলাম—“আপনি জানেন
হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আছে
আবার প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অনেক ছোট
ছোট গণ্ডী আছে। যেমন ধরুন যে
ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক
প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে; আবার ঐ
সব শ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন গোত্র ও সামা-
জিক হিসাবে ছোট-বড় আছে। কাপ, কুলীন, গৌড়ীয় প্রভৃতি সামাজিক মর্যাদার
ছোট-বড় আছে। স্বগোত্র এবং এই
গণ্ডীর ছেলেমেয়ের মধ্যে অপর গণ্ডীর
ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না। সেই জন্য দেশ
বিভাগের আগেই এক গণ্ডীর ছেলেমেয়ের
বিয়ের জন্য সারা বাংলা দেশে ও বাংলার
বাইরেও খোঁজ খুঁজতে হতো। এখন
পাশপোট প্রথা চালু হওয়ার পাশপোট-
ধারী বছরে ৮ বার মাত্র নিজ দেশের
বাইরে যেতে পারেন। ছেলেরা তো আধ-
কাংশই পড়া উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে-
ছেন; কারণ এখানে তাঁদের পাশ করার
পরও বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ নেই দেখে।
সুতরাং একজনের মেয়ের বিয়ে দিতে
হলে তাকে অনেকবারই যেতে হতে পারে।
তা যদি তাঁদের যেতে না দেওয়া হয়,
তাহলে আমি আশঙ্কা করি আরও অনেক
হিন্দুই ভারতে চলে যাবেন।” আমি সৈদিন
ঐ কথা ডঃ মেহতাকে বলেছিলাম তারও
অনেকদিন পর পর্যন্ত আমি পূর্ব-পাকি-
স্তানে ছিলাম। আমি সেখানে থাকতেই
দেখে এসেছি ‘পাশপোট’ দেওয়া সম্পূর্ণ-
ভাবে বন্ধ না হলেও খুব কম লোককেই
—সংখ্যায় তাকে নগণ্যই বলা যায়—পাশ-
পোট দেওয়া শুরু হয়েছিল আজ তো
প্রায় মোটেই দেওয়া হচ্ছে না। পূর্ববঙ্গে
এইরূপ কত যে সমস্যার সম্মুখীন সেখান-
কার হিন্দুদের হতে হয়েছে এবং তাঁদের
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তার প্রতিকারের
জন্য কতই যে বেগ পেতে হয়েছে তা
তাঁরাই জানেন যারা সেসব বিষয় নিয়ে
কাজ করে চলেছিলেন।

[কম্বাক]

পাশপোট প্রথা
চলার আরাধ্য



মুদ্রণ দ্বারা

অজন্তা
হাওয়াই চম্পল

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

আজকাল তোমার চোখের তারার আলো দেখা যায় না। আমার ভয় করে। আর ভয় করতে ভাল লাগে না আমার। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। তোমাদের সবুজ রঙের বাড়িটার ছাতে উঠে শাড়ির আঁচল আলতো উড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার মধ্যে আর কার্নিশের ওপরে রাখা নরম ফুল-গাছগুলোর টবের অনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে ঈষৎ মৃদু দৃষ্টিতে রাস্তার গাড়ি চলাচল দেখ না আজকাল। অথচ আমি আমাদের বাড়ি ব অন্ধকার ঘরের মধ্যে আড়াল হয়ে তোমাকে দেখব-দেখব করি। তখন সবোমাত্র বিকেল পেরিয়ে অন্ধকার শুরুর হল। রাস্তার আলো ঝলমল। লোকে বলে, এ অশুভলতা ভীষণ বনেদী। বাড়ি পাব না পাব না কবে অনেকদিন কেটে গিয়েছিল আমাদের। এখন হাল ছাড়ব-ছাড়ব হয়েছি, তখন হঠাৎ আমাদের ভাগ্যে জুটে গেল তোমাদের এই বনেদী পাড়াটা। আমি কতক্ষণ থেকে তোমাদের এই বনেদী পাড়ার একটা ঘরের মধ্যে আলো নিভিয়ে ধসে

আছি। অনেকটা শিকারীর মত আমার চোখদুটো। হাটের মধ্যে বড় গুঁজে বসেছিলাম, বড়ের মধ্যে হাট। আমার বালিশ আমি আঁকোশে বিছানার ও-প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তোমাদের বাড়ির ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠল। তুমি আঁকুও তাহলে আর ছাতে এলে না।

আমার মা ঘরে ঢুকে খমকে গেলেন, কি রে, অন্ধকারে বসে আছিস ভূতের মত?

আমি মায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমাদের বারান্দায় আলো জ্বলেছে। মা ঘরে ঢুকে সুইচ খুঁজে আলো জ্বালালেন। ঘরটা হঠাৎ-ই কেমন জ্বলে উঠল। আমার চোখ ঝলসে গেল। আমি জানলা থেকে সরে এসে বিছানা থেকে ফেলে দেওয়া বালিশটাকে দু'হাতের তালুদর মধ্যে রেখে চশমার আড়াল দিয়ে তাকলাম আমার মায়ের দিকে। বললাম, 'এ পাড়াটা ভীষণ বনেদী, না মা? তাই মাঝে মাঝে আমার ভাল লাগে না।' বালিশটাকে নিয়ে বিছানার এক প্রান্তে বসলাম। মা আমার দিকে

চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ভাগ্যম নেত্র শোঁছি এ পাড়াটা। নইলে কোণায় নিজে পড়তাম তার ঠিক নেই। শোভন হয়েছিল। যেখানে-সেখানে উঠতে তব লাগে।' মা ধামলেন। আমি কিছ, না বলে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালাম। ওখানে শোভন আব আলোর শিশু-বয়েসেব একটা ছবি টাঙানো আছে।

তোমাদের বাড়ির অনেকগুলো আলো যেন পর পর সাজিয়ে সাজিয়ে জ্বলনা হয়েছে। বড় অমিতব্যয়ী তোমরা। যে ঘরে থাকো না, সে ঘরেও আলো জ্বেলে রাখ। একবার কে যেন বাইরের বারান্দায় এসে ঘরে চলে গেলেন।

মা বললেন, আজ শরীরটা কেমন বোম হচ্ছে খোকন? বিকেলের দিকে তব এয়েছিল কি?

না বোধহয়।

মা তব আমার কপালের ওপরে হাত রাখার পর নিশ্চিন্ত হলেন।

বললাম, একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে মা।

তোমার চোখ

শ্রীশ্রী রায়চৌধুরী

পাদ্যাহিক বসমতী

খাবি? আচ্ছা, আমি করে আনিছি।
মা ঘুরে দাঁড়ালেন। আমি বললাম,
শোভন কোথায় মা?
বারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়ে মা বল-
লেন, গান শিখতে গেছে। এখনও বাড়ি
ফেরে নি।

১লা অক্টোবর, ১৯৬৬।

আজ বাবা মাইনে পেলেন। তুমি
ঘুঝবে না এই দিনটি আমাদের কাছে কত
প্রত্যাশার আর আনন্দের। আমরা সবাই
বাবাব আসবার পথের দিকে চেয়ে থাকি।
অনেকদিন আগে একবার বাবার সমস্ত
মাইনের টাকাটাই পকেটমার হয়েছিল।
সে মাসটা যে আমাদের কত দুঃখে আর
কষ্টে কেটেছে, তা তোমাদের এই বনেদী
পাড়ার একটা মানুষকেও আমি হয়ত
বোঝাতে পারব না। আর সেইজনেই এই
বয়েসেও বাবা এই দিনটিতে অফিস থেকে
হেঁটে-হেঁটে আসেন। মাইনের টাকাগুলো
শরীরের নানা জায়গায় লুকিয়ে রাখেন।

জানো, এ বছর বাবা পুজোর বোনাস
পান নি। অফিসের না কি ভীষণ লোক-
সান হয়ে গেল। আর আমাদেরও কি ভীষণ
লোকসান হয়ে গেল! শোভন বড় হয়েছে,
তোমাদের বনেদী পাড়ায় দু-একটা মেয়ে
ওর বন্ধু হয়েছে, তা সত্ত্বেও ওকে সাধারণ
দুঃখানা শাড়ির বেশি কিছু কিনে দিতে
বাবা পারলেন না। আমার অসুখ, তবু
জোর করে বাবা আমাকে একটা পায়জামা
করিয়া দিলেন। আমি বলছিলাম, 'আমি
ত' বেরতে পারব না বাবা। আমার কি
দরকার? তুমি ওই টাকায় শোভনকে কিছু
কিনে দাও।'

বাবা উঁচু গলায় কিছু বললেন না।
শুধু ঠোঁট নেড়ে বিড় বিড় কবে কি বেন
ধলতে বলতে বাইরে চলে গেলেন। আমি
পায়জামাটা হাতে ধরে নিঃশব্দে বসে
রইলাম। তোমাদের বাড়ির আলোগুলো
তখন বোজকাব মত অনাবশ্যক জ্বলে
উঠেছে। দেখতে লাগছিল বেশ। আমার
চোখের পলক পড়ছিল না। শোভন কখন
একসময় ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসল।
আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম, 'কি হল,
বসলি বে?' শাড়ির আঁচলে শোভন
নিঃশব্দে আঙুল জড়াতে লাগল। আমি
মদু হেসে পায়জামাটা তুলে ধরে বললাম,
আমার একটা পায়জামা হয়েছে। বলছিলাম
বাবাকে, আমাব জন্মে কি দরকার? তুমি
বরং এই টাকায়—'

শোভন আরো মাথা নমিয়ে বললে,
বাবা ঘরের মধ্যে দেওয়ালে মূখ রেখে
কাঁদছেন রে!

আমাব শরীর টাল-মাটাল হয়ে গেল।
আমি পায়জামাটা বুকের মধ্যে চেপে
তোমাদের বাড়ির দিকে তাকালাম। তুমি

ঘরের মধ্যে আছ কি নেই, তুমি ঘরের বাইরে
গেছ কি যাও নি, আমার জানতে তারি
ইচ্ছা করল।

১০ই অক্টোবর, ১৯৬৬।

সকালে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।
আমার তখন ভালমত জ্ঞান ছিল না। ভোর
থেকে বুকের ব্যাথাটা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে
কেমন যেন ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেব-
লই মনে হচ্ছিল, আমার ডান পাটা ক্রমশ
ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর সেটা ছোট হতে হতে
পেটের গর্তের ভিতর একসময় ঢুকে গেল।
আমি ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাকে
ডাকলাম।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার অনেকক্ষণ পর
আমার আচ্ছন্নতা কাটল। চোখ চেয়ে দেখ-
লাম, মা পাশে বসে আছেন আমার মাথার
ওপরে হাত রেখে। আমি দুটিটা তুলে
তার দিকে করতাই মা আমার মূখের
ওপরে ঝুঁকে পড়ে বললেন, এখন কেমন
মনে হচ্ছে থাকেন?

ভাল মা। আমি জড়িয়ে জড়িয়ে
বললাম।

মা বললেন, খাবি কিছু?
একটু কিছু দাও।

তাবপর তোমাদের বাড়ির দিকে চোখ
করতে গিয়ে দেখলাম, জানলা বন্ধ। খুব
খাবাপ লাগল। মাকে ডাকলাম, মা।

মা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আমার
পাশে বসে কপালে হাত রেখে বললেন,
কি রে?

জানলাটা খুলে দাও না, মা।

কিন্তু ওটা দিয়ে যে ঠান্ডা হাওয়া
আসছে, থাকেন।

তা হোক মা। তবু খুলে দাও।

আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন জেদের মত
শোনাল। মা জানলাটা খুলে দিতে
তোমাদের বনেদী বাড়িটা পরিষ্কার আমার
চোখের ওপরে ধরা পড়ল। বিকেল সবোন্ন
শুরু হয়েছে। আর সেই বিকেলের সোনা
রোদে ঝকঝক করছে তোমাদের বড় বাড়িটা।
কিন্তু অত বড় বাড়িটায় একটা মাত্র জানলা
খোলা ছিল। তারি বিশ্রী লাগল। তবু
যদি তুমি ওই জানলায় এসে দাঁড়াও আমার
খুব ভাল লাগে।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৬।

বিকালে শোভনের কয়েকজন বাম্ববী
আমাদের কামায় এসেছে। তারা পাশের
ঘরে বসে বেশ গল্প জমিয়ে ফেলেছে। মাঝে
মাঝে মায়ের কণ্ঠও তাদের সঙ্গে শুনতে
পাচ্ছি। আমি বালিশে বুকে রেখে তাদের
কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু
বুঝতে পারলাম না। তারা সবাই কথা
বলছে। আর তাদের কণ্ঠস্বরে আমাদের
বাসাবাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শুনছিলাম, এটা কোন জমিদারের অন্দর-
মহল। ভাগ ভাগ হয়ে এখন শতধা
হয়ে গেছে। আমরা সেই শত টুকরোর
এক টুকরোর মধ্যে থেকে নিজেদের
অসম্ভব ভাগ্যবান মনে করছি। তোমরা
বোঝহয় কোনকালে জমিদার ছিলে না।
তাই তোমাদের বাড়িটা এ বাড়ির মত এমন
ভেঙে পড়ে নি। বাড়ির সবুজ রঙটা
তাই চোখের ওপরে অসম্ভব ধবা পড়ে।
আমি সেই সবুজ রঙের মধ্যে তোমাকে
হাতড়ে হাতড়ে খুঁজি।

শোভনের বন্ধুগুলো এতক্ষণে চলে
গেল। আমার জানলাটা বারদরজার পিছ-
নের দিকে আর তোমাদের বাড়ির সামনে।
তাই গলির মধ্যে দিয়ে তারা কখন চলে
গেল, দেখতে পেলাম না।

শোভন ঘরে ঢুকে বললে, তোর জন্যে
লেবুর রসটা নিয়ে আসব, দাদা?

আমি চমকে তার দিকে চাইলাম।
শোভন বেশ বড় হয়ে গেছে। দেওয়ালে
টঙানো ছবিটার সঙ্গে তার মিল যেন
ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। বললাম, আমার
কাছে একটু বোস না রে।

শোভনের চোখ দুটো কেমন হঠাৎ
করুণ হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে আমার
পাশে বসে আমার গায়ে একটা হাত
চাপালো। বললে, শরীরটা কি ভাল নেই
তোর?

আমি ম্লান হেসে বললাম, খুব ভাল
আছে।

শোভন নিঃশব্দে আমার গায়ে হাত
বুলোতে লাগল। বাইরে তখন প্রখর
বিকেল। জানলার ফাঁক দিয়ে এই
শরৎকালের বিকেলটাকে তারি ভাল লাগ-
ছিল। তুমি যদি এ সময় তোমাদের
বারান্দায় এসে দাঁড়াতে তাহলে বিকেলটা
আরো বলমলে হয়ে উঠত। শোভনকে
বললাম, ঠিক পুজোর সময় অসুখটা যেন
বাড়ে। কতদিন যে প্রতিমা-দর্শন করি নি।

শোভনের হাতটা হঠাৎ থেমে গেল।
আমি ওর দিকে তাকাতে ও মৃদু কণ্ঠে
বললে, সামনের বছর ঠিক ভাল হয়ে যাবি
দাদা।

কি করে জানলি রে?

আমি জানি। শোভন মাথা নিচু
করল। দেখে আমার খুব হাসি এল।
আসলে ও কিছুই জানে না। সামনের
বছর আমি হয়ত আর নাও থাকতে
পারি।

শোভন চিবুকটা নিজের বুকের ওপরে
রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি
বললাম, ছিঃ, পুজো আসছে। এখন
কাঁদতে নেই।

তাতেও শোভনের কান্না থামে না। অন্য
কথা বলে তাকে ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা
করলাম, ছেলেকে কথা মনে পড়ে। তুমি

পান্থাহিক বঙ্গমতী

আর আমি একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে যেতাম। চাট্‌জোকাকাকে মনে আছে? আগে আমরা যেখানে থাকতাম, তার পাশের বাড়িতে উনি থাকতেন। আমাদের দু'জনকে ভালবাসতেন খুব। মনে আছে, আমরা দু'জনে তাঁর হাত ধরে পুজো দেখতে বেরিয়ে কত কি যেতাম। আবার সামনের বছর বেরুত।

তবু শোভন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। মা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। আমি ঈষৎ অসহায়ের ভঙ্গিতে মাকে বললাম, তুমি শোভনকে নিয়ে যাও মা। তবু কাদে।

মনে হল, আমাদের সারা বাড়িটা একবার দূলে উঠল। শোভন টলতে টলতে ঘরের বাইরে চলে গেল। মা আমার মূখের কাছে লেবুর রসটা তুলে ধরে বললেন, এটা খেয়ে নে বাবা।

মায়ের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে তাতে চুমুক দিলাম। মনে হল, বিষ খাচ্ছি। বললাম, বড় ভেতো মা।

মা সাড়া দিলেন না। আমার দিকে কেমন অদ্ভুত কাতরভাবে চেয়ে রইলেন। আমি লেবুর রসটুকু অতি কন্টেই শেষ করে গেলাসটা মায়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, আসলে মূখে কোন স্বাদ নেই। সব কিছু বিস্বাদ লাগে। তারপর বালিশের ওপর মাথাটা ফেলে দিয়ে বললাম, পুজোর আর কত দেরি আছে মা?

‘ফিসফিস করে মা বললেন, আর ত’ দেরি নেই, এসে গেল।

শুনে আমার বৃকের ভেতরটা কেমন দুঃস্বপ্ন করতে লাগল। আর ত’ দেরি নেই। আর ত’ দেরি নেই।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৬।

তোমাদের এবং আমাদের বাড়ির মাঝখানে যে পাকটা আছে, সেখানে মাঝে-মাঝে যেতে ইচ্ছা করে আমাদের। তোমাকে কখনও কখনও সেই গোল পাকটার মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখেছি। তখন প্রথমে বিকেলবেলা। তুমি একটা বেঞ্চে বসামাত্র হেঁচক করতে করতে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের দল তোমার কাছে এসে ভিড় করে টিফন লোভে। আমারও খুব লোভ হয়। কিন্তু আমি কিছুতেই জানলা পেরিয়ে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি না। কি যে আনন্দান করে শরীরটা তখন আমার! আমি জানলার গরাদের মধ্যে বাবুবন্ধ হয়ে সজল চোখে দেখি।

আজও তুমি এসেছ ওখানে। রাজকুমারীর মত তুমি শিশুদের মেলার মাঝখানে বসে আছ। একে-ওকে টিফ দিচ্ছ। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে উঠছ। বড় ভাল লাগছে তোমাকে।

আমার এ বন্ধন কবে ঘুচেবে বল ত?

আমি যে আর পারি না। ঘরের মধ্যে থেকে থেকে আমার কোমরে বাখা ধরে গেছে। বড় কষ্ট আমার। আমি ভীষণ কষ্ট পাই।

২০শে অক্টোবর, ১৯৬৬।

আজ বোধহয় সপ্তমী। রাস্তায় কি প্রচণ্ড চিংকার শব্দ হচ্ছে। অনেকগুলো মাইকের ককর্শ হৃদয়বিদারক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। তোমাদের বাড়ির বড়ো চাকরটা পট্ পট্ করে জানলাগুলো সব খুলে ফেলল। রাস্তার আলো ঘরের মধ্যে ছাড়িয়ে গেছে, ঘরের আলো রাস্তায়। শোভন এখনই সেজেগুজে দু-একজন বান্ধবীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ষাবার সময় আমার ঘরে এসেছিল। দেখলাম, শাড়িটা সত্যি সাধারণ হয়ে গেছে। পুজোর সময় এই বয়েসের মেয়েদের এ শাড়ি মানায় না। কিন্তু বাবাই বা করবেন কি? একে বোনাস পান নি, তার ওপরে জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁরা। এদিকে আমার মত একটা পূর্ণবয়স্ক ছেলে দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে বিছানার পড়ে আছে। বাবাকে দেখলে তাই মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট হয় আমার।

শোভন বললে, একটু বেরুচ্ছি দাদা।

আমি হেসে বললাম, অন্তত বেশ কিছু ঠাকুর দেখে আসবি। গম্প শোনা যাবে তোর কাছ থেকে।

শোভন বেশ অনামনস্কভাবে ঘর থেকে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল।

আমি তোমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। সাধ ছিল, তুমি এখন বেরুবে, তখন তোমাকে দেখব। কিন্তু প্রতীক্ষা করাই সার হল। ঘণ্টাখানেক পর বৃকেব ব্যাটা একটু বেড়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে বিছানার পুরে শুয়ে পড়লাম।

২২শে অক্টোবর, ১৯৬৬।

তোমাদের এই বনেদী পাড়াটা আমার মাঝে মাঝে ভাল লাগে না। সবাই কেমন যেন ছাড়ো-ছাড়ো। এত কাছাকাছি সবাই থাকে, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পার না। আমি তোমাকে দেখি, কিন্তু তুমি আমাকে দেখ না। আজ একটু রাত করে তোমাকে দেখলাম। তুমি সেজে-গুজে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছ। রেজিঙের ওপর ডব দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছ। অথচ আমি তোমার কত কাছাকাছি, আমাকে তুমি দেখছ না।

তোমাকে বেশ লাগছে আজ। তোমার সাজের মধ্যেই তোমাদের বনেদী পাড়ার সুবন্ধু পাওয়া যায় যেন। আচ্ছা, তুমি কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছ? কোন রাজপুত্রের জন্যে? সে কি তোমাকে

ঘোড়ায় চড়িয়ে পথের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে?

আমি জানলার রেজিঙ দুটো চেপে ধরলাম। মূখ রাখলাম লোহার রডের ওপরে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। মূখটা লোহার রডের চাপে খেঁতলে গেছে। তাদের চিংকারে কারও কণ্ঠস্বর বৃকবার উপায় নেই। আমি বোকার মত তোমার দিকে চেয়ে রইলাম।

তুমি জান না, আমি বেশ কিছুকাল থেকে বিছানার শুরে আছি। আমার পা চলে না, বৃকে ভীষণ ব্যথা ধরে, বৈশিষ্ট্য কথা বললে হাঁপিয়ে উঠি। সব মিলিয়ে আমার বড় কষ্ট। এই প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে তোমাদের বনেদী পাড়ার এসেছি।

দেখলাম, কে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলল। তুমি তার দিকে চেয়ে হাসলে। রাজপুত্রের মত লাগছিল তাকে। তুমি সেই রাজপুত্রের গলার টাইটা একবার নেড়ে দিলে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল। দেখলাম তোমরা দু'জনে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছ। ও ফুটে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছেলোটো শব্দ হাতে স্টীয়ারিং চেপে ধরল। তুমি তার পাশে গিয়ে বসলে। হঠাৎ একটু হাসলে। আমি জানলার ওপর মাথা রাখলাম। ঘুরে রঙের গাড়িটা ছেড়ে দিল। ও তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল, কে জানে। আমি টলটলে চোখ দিয়ে আমার রূপন বিছানাটাকে দেখলাম। সেটা যেন মড়ার মত পড়ে আছে একধারে। নিজের ওপরেই ভীষণ ঘেমা ধরে গেল আমার। মা লেবুর রসের গেলাসটা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখ-দুটো কেমন যেন অদ্ভুত স্থিতিমত যেন হল। হাতের ওপরে গেলাসটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘরের আলোটা দপদপ করে উঠল। আমি বললাম, ওসব আর ভাল লাগে না মা। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে গুটিসুটি মেয়ে শুরে পড়লাম।

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা কমিশনে বিখ্যাত “এসকর্ড” অল ওয়াল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার বিক্রয় জন্য। সত্যাবলী ও স্যাম্পেল ট্রানজিস্টারের জন্য পত্র লিখুন।



Jagee Co. (W.B.C. 57),
Post Box 1115, Delhi-6



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১ ৬ ১

ভারতে মুসলমান অধিকারের আমলে কিছুসংখ্যক রাজপুত ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ ধর্মনাশের ভয়ে মধ্য হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে রাজ্যস্থাপনা করেন। এক একটি সর্দারের অধীনে ক্ষুদ্র এলাকা গড় জম্বা দুর্গের আকারে সুরক্ষিত করে বাস করতে থাকেন তারা। অনেকগুলো গড় একত্র হয়ে গাড়োয়াল রাজ্যের উৎপত্তি। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সূদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের (কামগড়?) কিছু লোক কি করে জানি না এই গড়াধীশদের অধীনে বাস করতে আসে। প্রধানত হৃদয়বিদ্যা আর শ্রমজীবীরূপেই তারা দেখা দেয়। কালের প্রভাবে দুই রক্তের ধারা এক হয়ে মিশে যায়। নিরবচ্ছিন্ন শাসিতর মধ্যে কয়েক শতাব্দী কাটে। বিপদ ধনিয়ে আসে উনিশ শতকের গোড়ায়। রাজা প্রদ্যুম্ন শাহের সেনাপতি বিদ্রোহী হলেন। ঘরের শত্রু বিভীষণ গুর্খা-স্রীর

প্ররোচনায় নেপালীদের ডেকে আনলেন। গুর্খারা আক্রমণ কবলো গাড়োয়াল। রাজ্যেব কিছু অংশ আর প্রাণ হারালেন গাড়োয়ালরাজ। সর্বনাশের শেষটুকু করলেন প্রদ্যুম্ন শাহের পুত্র সূদর্শন শাহ ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে। বৃটিশরা গুর্খামুক্ত কবলো গাড়োয়াল। সেই সঙ্গে মূল্য হিসাবে অর্ধেক রাজ্য গ্রাস করলেন তারা। দেবাদুন থেকে গাংগায় উত্তরা-খন্ডের বিস্তীর্ণ পর্বত অঞ্চলে ইংরেজ অধিকার কয়েম হলো। বাকী অর্ধেকের মালিক টিহরীরাজ নিষ্কর সামন্তরাজের ভূমিকায় টিকে রইলেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি।

শস্যশ্যামলা উপত্যকার বৃক চিরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। দু' পাশের পর্বতশ্রেণী দু'বে সেরে গিয়ে মধ্যভাগ প্রায় সমতলের আকৃতি। চম্বা থেকে তের মাইল অতিক্রম করে বাস এসে দাঁড়ালো টিহরীর চৌমোহনীতে। এখান থেকে টিহরী শহর মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের

গায়ে ছবির মতো সুন্দর। ভীলাঙ্গনা আর গঙ্গার সংগমে টিহরীরাজের রাজধানী। চৌমোহনীর একটি প্রধান সড়ক গেছে গংগাতীর-খমুনোতীর পথে। আর অন্যটি শ্রীনগর। ফেদার-বদরী পথে সুবিখ্যাত প্রাচীন শহর। বেলা আড়াইটে বেজেছে। পথের ধারে সারি সারি দোকানগুলোতে মধ্যাহ্নের আহার জুটলো না। পাওয়া গেল লেংড়া আম আর রাবড়ি। মিষ্টি স্বাদের পাহাড়ী আমও প্রচুর পাওয়া যায়। ওজন দবে কিনতে হয় হরিস্বার-হৃষীকেশের মতো। দাম দেড় টাকা প্রতি কিলো।

চম্বা থেকে অনেকটা নিচে অর্থাৎ আড়াই হাজার ফিট উঁচুতে টিহরী। অতএব প্রচণ্ড গরম আর অসংখ্য মাছি। তার সঙ্গে আবার ধুলোর ঝড়। সুখের কথা আশ ধুঁটির স্থান ত্যাগ করা গেল। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করি নি। গাড়ির পেছনের দিকে একটা ছোট দলে কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় ঘাঘী ছিলেন। সুর করে তাঁরা ধরলেন শিবের স্তোত্র। সেই সঙ্গে তালে তালে সমবেত হাততালি। ডিঙেলের গর্জন ছাপিয়ে একটানা সুরে মারাতী ভজন ডমরুপাণির সামিধা স্মরণ কবায়। ভাষার গাড়ি ছাড়িয়ে গভীর আগ্রহে শুনানি হিন্দু ভারতের প্রাণের বাণী। শুনতে পাই হিমালয়নিবাস গংগা-খমুনোর প্রতি কোটি মানুষের স্তুতি। দেখতে পাই দেবতাত্মা শিবভূমির ঢানে সারা ভারতের মিছিল। প্রাদেশিকতা আর দুর্যয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে একসূত্রে গাঁথা হবে গেছে মহাতীর্থ পথের শতসহস্র পথিক। গৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, শিখের মহা সম্মিলন ভারত ভাগ্যবিধাতার পথে পথে।

টিহরী ছাড়িয়ে ভাগীরথীর সাক্ষাৎ মেলে। হৃষীকেশ থেকে ছাড়াছাড়ি। পথ এবার নদীর ডান ধার দিয়ে পাহাড়ে চড়তে থাকে। গংগার ঘোলা জলের স্রোত ফেনিল উচ্ছ্বাসে ধাবিত। জলের রূপটি অবিকল কাশী কলকাতায় দেখা গংগাজল। সর্বাগে মাটিমাথা পর্বতদুহিতার মর্ত্যে অভিযান, বিপ্লবস্তবসনা আলদুলায়িত-কুন্তলা ভৈরবীর বেণে। একমাত্র দেবাদিন দেব মহেশ্বর ছাড়া সে অমিতবেগ ধারণের ক্ষমতা ত্রিভুবনে কোথা? পৌবাণিক বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করি। নদীর দুই কূলে সারি সারি পর্বতশ্রেণী, ছায়াম-বহুল ঘন জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে পাহাড়ের থাকে থাকে শস্যক্ষেত্র। কবিবর, ভাষার:

‘শ্যাম-বর্টিপ-ঘন-তট-বিপ্লাবিন
দুসর-উরণ-ভঙ্গে।’

আকাশ কালো করে বাদলের মেঘ ঘনিয়ে আসে। অপরাহ্ন গাড়িয়ে রুমে

দিনের আলো কমেতে থাকে। সেই সন্ধ্যা টিপটিপ করে বৃষ্টি। একটানা আটশ মাইল পাড়ি দিয়ে ৫-১৫ মিনিটে ধরাসু। যমুনোত্তী আর গঙ্গোত্রী পথের জংশন স্টেশন। হাটিকেশ থেকে দূরত্ব ৭৫ মাইল। গঙ্গোত্রীর পথে উত্তর কাশী এখন থেকে মাত্র আটশ মাইল। পাহাড়ী পথে রাত্রিকালে পাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। ডিজেল তেলের অভাবে সকালে চার ঘণ্টা দেরি হওয়ায় আজ আর ডিডিউলগাঁও পৌঁছানো গেল না। অতএব বৃষ্টির মধ্যে গাথে নেমে মাথা গেজিবার স্থান সংগ্রহ করতে হয়। এ বিষয়ে ভাবনার বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র উত্তরাখণ্ডের তীর্থপথে বাবা কালী-কমলীওয়ালার পদ্মায়ৈভক্তের ছড়িয়ে আছে। বিনামূল্যে রাত কাটানোর নিরাপদ ব্যবস্থা। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, সাক্ষী-কৃষ্ণের অব্যাহত স্নান আশ্রয়স্থান। তবে একটু অপরিচ্ছন্ন এবং বিলাসিতা-বিহীন। কিন্তু এ যে শৃঙ্খলা কল্যাণের পথ। বাবা ভোলানাথের তপস্চারণ-ভূমি। সৌখীন হিলস্টেশন দেখে যারা অভ্যস্ত, এ পথ তাদের কাছে কষ্টকর। কেউ নিম্নের কি করে, কষ্ট না করলে?

ধর্মশালার সামনে প্রশান্ত নদীতট উপলব্ধিও ভরা। এক পাশে যাত্রীদের জন্য তৈরি অস্থায়ী শৌচাগার, সাদা রং চটের পর্দা ঘেরা। বৃষ্টির মধ্যে হিমশীতল নদীর জলে মধু হাত ধরে ডেরায় ফিরলুম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। রাজস্থানীয়া ধর্মশালার নিচের তলাটা অধিকার করেছে। তাদের দিনান্তের আহ্বানাদি অনেকক্ষণ সমাধা হয়েছে। জঙ্গল থেকে কঠকুটো জড়িয়ে আঙিনার এক পাশে আগুন জ্বালিয়ে করেকটা হাতে-গড়া চাপাটি সেকে নিরেছে তারা। পাশের দোকানে দুটি আর পেঁয়াজের কোল খেয়ে আমিও শূন্যে পাড়ি দোতলার বারান্দার। ধর্মশালার কাঠের বাড়িটা আজ যাত্রী সমাগমে পরিপূর্ণ। আকাশে বিদ্যুতের ঘনঘটা। পাহাড়ের গায়ে তার প্রতিধ্বনি। সেই সন্ধ্যা কলনাদিনী নদীর একটানা গজন। শূন্যে শূন্যে ঘুম আসে.....

১৭১

বিশ্বচরাচর মহাসুদৃষ্টিমণ্ডন। যমুনা প্রকৃতি, নিখর, নিষ্পন্দ পবন। নিষিদ্ধ অন্ধকারের মহাসমুদ্রে শৃঙ্খলা জাগে তিনটি মূর্তি! হিমালয়ের তিন শিখরে সমাসীন সৃষ্টি স্থিতি আর লয়ের দেবতা! আপন আপন তেজঃপূর্ণ উন্মাদিত। অমৃত-লোকের মহাসংগীতবাসরে ভেসে ওঠে মেঘগম্ভীরনাদ। থেকে থেকে বাজে ডমরুধ্বনি। পিনাকী কণ্ঠনিঃসৃত সুরের মূর্ছনায় রাগ-রাগিণীদের পুনরুজ্জীবন!

চৈতন্য সমাহিত! অনিবর্তনীয় মধু ভগবান বিকর হৃদয় দ্রবীভূত! প্রকম্পী সুরমধু, বিকচরগোষ্ঠতা দেবী গঙ্গার আবির্ভাব। ভগীরথ শল্যনিম্নাদে অকণ্ট করুণাধারার সিংহিত শূণ্যভূমি! অককারের অবসান। পূর্বের আকাশ নবানুগম্যে রঙিন হয়ে ওঠে। শস্যশ্যামলা ধর্মীর বৃকে নবজীবনের সূচনা। অব্যক্তকণ্ঠের সন্ন্যাসনে মধুরিত নদীতট। অকিকণ্ঠে বেদবাণী ধ্বনিত হয়:

...মধু করান্ত সিম্বধু মাধবী সন্তোষধী।
ও মধু ও মধু ও মধু...

—যমু ভাঙে। চোখ বুজে শনি বারান্দার এক পাশ থেকে উদাত্ত সুরে ভজন গান। কমে মধুর হয়ে ওঠে কর্মশালা। Strike the tent। যাত্রীরা প্রস্তুত হতে থাকে। চরৈবোত। আবার চলা শুরু করো। থামলে চলবে না। শয্যাভ্যাগ করে নদীর ধারে একশৃঙ্খল পাথরের ওপরে বসে দেখি চারিদিকের শোভা। গত রাত্রির বৃষ্টির ফলে নদী কেন আরও প্রমত্ত। ঘোলাটে জলের মাকে ছোট ছোট মূর্তি। এক রাতেই অনেকটা এগিয়ে এসেছে নদী। প্রবল স্রোতের মধ্যে জলে নামা অসম্ভব। তীরে বসে

আনন্দপ্রদ অনুপম সুযোগ



ন্যাশনাল
একো

রেডিও কিনুন।

Kleertone ক্লীয়ারটোন

সাজসরঞ্জাম কিনে
১০% বিশেষ বাটা
লাভ করুন

আজিই আপনার ন্যাশনাল-একো ভিনায়ল রেকর্ড সমগ্র যোগাযোগ করুন।

GRA

ফেনারেল রেডিও এন্ড এপ্লায়েকস লিমিটেড।

বোম্বাই . কলিকাতা - যাত্রাব - দিল্লী - বাকালোর - সেকেন্দ্রাবাদ - পাটনা

UPE Always NE 176 816

হাট ডুবিয়ে স্নান করে সবাই। রাজ-
ধানীরা স্নান শেষে ভেজা কাপড় হাওয়ার
শুকোর দুই প্রান্ত ধরে। গাড়িতে
সীঁড়িতা মেয়েট আমায় দেখে স্বল্পবাস
লামলে নের মদু হেসে। জননীর স্নেহ-
শীতল স্পর্শে তার শরীরের সব স্নান
দূর হয়েছে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে আসি নদী-
তীর থেকে। যাত্রার আরোজন করতে
হবে। সামনেই পথের ওপরে প্রকাণ্ড
লোহার সেতু। এখানে পূর্বদিক থেকে
আর একটি প্রকাণ্ড ধারা (খুসৌলা) এসে
মিশেছে ভাগীরথীতে। তার ওপর দিয়ে
সেতু পার হয়ে ছোট পাহাড়ের গায়ে কিছু
দোকানপাট। অনতিদূরে পাহাড়ের মাথায়
জাকবাংলো। সেতুর পাশে পলিশচৌকী।
সশস্ত্র প্রহরার বতমানে ব্রীজের ছাঁচ তোলা
নিষিদ্ধ। পথের ধারে সাইনবোর্ডে লেখা
হুসৈফা, টিহরী, উত্তর কাশী আর
ডিউলগাঁও ছাড়িয়ে 'বড়কোট'-এর (টর-
মিনাস) দূরত্ব। মদুসুরী যাবার হাটপথ
ধরাসু থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ।

বিদায় নেবার আগে ধর্মশালার সামনে
শিবমন্দিরের চাতালে মাথা ঠেকিয়ে বলি,
ঠাকুর অনেক দিনেছো, বাকীটুকুও যেন
পাই।

ব্রাহ্মভারতীকে জিজ্ঞেস করে জানলুম,
নিচের গাড়িগুলো এলে গেট খুলবে।
অর্থাৎ টিহরী থেকে প্রত্যয়ের প্রথম
কার্যভান এখানে পৌঁছলে তবেই ওপরের
যাত্রা শুরু হবে। পাহাড়ের মাথার ওপর
দিয়ে সূর্যালোকের দেখা মেলে বেলা
সাতটার পরে। আজ আকাশ নিমল।
তবে পাহাড়ের বিচিত্র আবহাওয়ার কখন
বে অতিক্রান্তে প্রবল বর্ষন শুরু হয়
কিছুই স্থির নেই। বিশেষত এটা যখন
বর্ষাকাল। হিমালয়ে দুটি মাত্র প্রধান
ঋতু। বর্ষা আর শীত। জুন মাস থেকে
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির সময়। তবে
বর্ষার তান্ডব তুষারাম্বল পর্যন্ত পৌঁছয়
না। জলভারাক্রান্ত মেঘ পাহাড়ের বেশি
উঁচুতে উঠতে পারে না।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমালিন্যে
সান্দ্রং
বপ্রকীড়া-পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদশ।
(মেঘদূত)

বেলা ৭-৪০ মিনিটে গঙ্গা-যমুনায়
জয়ধ্বনির মধ্যে ধরাসু ত্যাগ করে
আমাদের বাহিনী রওনা হলো যমুনোত্রীর
পথে। এখান থেকে আর মাত্র আটশ

মাইল এগিয়ে ডিউলগাঁও পর্যন্ত বাস-
যাত্রা। এক রাত বিশ্রামের ফলে সবাই
আবার নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে। দুটি
নতুন সহযাত্রী আজ আমাদের সঙ্গে
মিলিত হয়েছে। একতারা হাতে উদাসী
বাউল আর তার সঙ্গিনী বৈকবী।

পাহাড়ের গা বেয়ে এক মাইল উজ্জ্বল
গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী পথের সংগমে এসে
পড়লুম অল্পক্ষণেই। বাঁ হাতি পথে
আমাদের গাড়ি চড়তে থাকে ওপরের দিকে
যমুনোত্রী অভিমুখে। গঙ্গাকে ছাড়লুম
এইখানে। পথ উর্ধ্বমুখী। পাহাড়ের
গায়ে শৃঙ্খল পাইন গাছ। দীর্ঘ সরল-
রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আট মাইল
এগিয়ে 'বরম থাল' বেলা ৮-২০ মিনিটে।
ছোট জায়গায় ক্ষণিক বিরতির পর আবার
চলা শুরু। ক্রমেই পাহাড়ের মাথায়
চড়ছি ঘুরে ঘুরে। পাইনের জঙ্গল
ঘনতর হয়ে আসে। ছ' মাইল পাড়ি
দিয়ে 'সিল কিয়ারা'। বন বিভাগের
রেন্ট হাউস আর একটা স্কুল ছাড়া বসতি-
বিরল পর্বতের উচ্চভূমি। ধারে কাছে
জলাশয় দেখলুম না। দূর পাহাড়ের
করণার জল পাইপযোগে এখানে আনা
হয়েছে। শূনি, সিল কিয়ারা থেকে
মদুসুরী আর চক্কাভার পায়ে-চলা পথ



গাংনানী যমুনোত্রীর পথে

আছে। মোটর বাস চলাচলের আগে যমুনোদীর পথে অনেক আমতেন মসুদী হয়ে। সে পথে শুনছি অরণ্যের শোভা অতুলনীয়। তবে বড় কঠিন, প্রবাসনা আর মলকট ছিল।

দিল কিয়ারার পাহাড়ের অবশেষে গেরিজে যমুনোদীতে প্রবেশ করতে হবে। গিরিবেশের সর্বোচ্চস্থান সাড়ে সাত হাজার ফিট অতিক্রম করি ঝাউবনের ভেতর দিয়ে। অনেক দূরে যমুনার নীল-ধারা চাকিতের মতো দেখা দিয়ে আবার পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। আরও প্রায় সাড়ে ২ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ডিউডলগাঁও পৌঁছলুম। বেলা ১০-৪৫ মিনিটে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল এ পথের শেষ সীমা সাড়ে তিন মাইল দূরে বড়কোট অভিমুখে। (আপাতত যন্ত্রের ব্যাধা থেকে মুক্তি)।

কয়েকটি নেপালী দোতিয়াল আর একটা মাত্র বড়গাড়ি ছাড়া গ্রামের চিহ্নও নেই ডিউডলগাঁওতে। দূর নেপাল থেকে আগত দোতিয়ালরা মালবাহীর কাজ করে। তা ছাড়া রাস্তা তৈরি আর মেরামত কাজও ওরাই সম্বল। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই দোতিয়ালরা এসে ঘিরে ধরে। লালসিং গোখার জিম্মায় মালপত্র দিয়ে পথের পাশে বড়গাড়িতে ঢুকে চায়ের ফরমাস দিলুম। এখান থেকেই পদযাত্রা শুরু। চলবার আগে চা-নামক চিনিদুধ-যোগে গরম জল বেশ stimulant-এর কাজও করে।

বেলা এগারটা নাগাদ চাঁড়বনের মধ্য দিয়ে উত্তরাই পথে হাটা শুরু। ডিউডলগাঁও থেকে গানোদী মাত্র তিন মাইল। ছায়ার ঢাকা পথে চলার ঢালু পথ যনের মধ্যে দিয়ে pin needles পাতা মিছানো। অসাবধান শা পিছলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা আছে। লোহার নাল লাগানো মোটা বেতের লাঠিখানা ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলি। বেলা স্নিপ্রহরের মধ্যে গানোদীতে হাজির না হলে আহার জোটা মুশকিল। উত্তরাধ্বস্তের ভীষণপথে তৈরি খাবার পেতে হলে বেলা বারটার বততি সম্ভব আগে হয় ততই মঙ্গল। গরীব দোকানদার অনিশ্চিত। ধন্দেলের আশায় মাল্যবান জরাজীর্ণ অপব্যয় করে না। তাছাড়া অধিকাংশ শ্রমিকেরা নিজেরাই রান্না করে। আমার মতো অকর্মী বাউডলেদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সকাল সকাল সেয়ে নেওয়াই ভাল। রেখে থাওয়ার কাজটা কোনওকালেই পারলুম না। হিমালয়ের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করবার সময় ব্যথা অপব্যয় করার চেয়ে, পথের ধারে যেখানে যা জোটে নির্বিচারে পেটে পুরে অস্বাস্থ্যজনক হয়েছে অনেক।

কিন্তু কখনও বলে 'আরেকা না হ'ল ম'লে...'

বেলা বারটার অল্প পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলুম গানোদীতে। পুড়িকয়েক দোকান ধর্মশালার আশেপাশে সবগুলোই যথারীতি বন্ধ। শুধু বানানোর মজুররা মাত্র গ্রামের কুতুরটাও স্নিপ্রাহারিক siesta-তে মসগল। একটা নিশ্বাস ফেলে কাঁথের কোলাটা আবার তুলে নিয়ে পথে নেমে পড়ি। মোটাইয়ের দোকানী লালাজী বোধহয় আমাকে লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। দোকানের সামনে বসে স্নানের জোয়াড় করছিল সে। হাডের ইসারায় কাছে ডেকে করেকটা রুটী আর সবজি দিলে।

হমীকেশ থেকে মোটর গাড়ির বিক্রাটে খরি হওয়ায় পূর্বপরিচয়সম্মত গানোদীতে রাতটা থাকা হোল না। পাহাড়ে থেরা বিস্তৃত উলভাকার মধ্যে দিয়ে যমুনার প্রোত বয়ে চলেছে। কিছুদূর পর্বন্ত প্রায় সমতল। পরিবেশটি চমৎকার। অনতিদূরে ডাকবাংলো আছে। ফেরবার পথে এখানে কিছু বিশ্রাম করবার ইচ্ছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মধ্যাহ্ন পায় হয়ে বেলা গড়িয়ে চলেছে। আরও প্রায় সাত মাইল পাড়ি দিতে হবে আজ। যমুনার পূর্বতীর ধরে পথ। জলালাকীর্ণ পাবত্য পথে সন্ধ্যার আগেই কোনও আগ্রয়ে পৌঁছতে হবে। অশ্বকারের মধ্যে পথ চলা অসম্ভব। তাছাড়া হিংস্র কস্তু-জানোয়ারের ভয় ত' আছেই।

প্রাপ্ত রক্তপথ কাউবনের পাল দিয়ে। শী দিকে অল্প দূরে অনেকটা নিচে দিয়ে যমুনার ধারা চলেছে তার সাড়ে আটশ মাইল পরিভ্রমার পথে। রক্ত গ্রাম, জনপদ আর রাজপুত্রীর ঐতিহ্য বৃকে নিয়ে বয়ে চলেছে নদী স্রবণাতীত কাল ধরে। রক্ত ওঠানামা, হাসিকামা আর জন্মমৃত্যুর সাক্ষী হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা, গোপীদের অশ্রুজল আর বিরহী সন্তানের দীর্ঘনিশ্বাস মিশে গেছে যমুনার কালো জলে। কলংকের কালি মুছে নিতে যমুনার শ্যাম অঙ্গে মৃত্যুপুত্রী প্রস্রাশিত।

মধ্য হিমালয়ে সামান্য দূরত্বের স্ববন্ধানে উৎসারিত গঙ্গা আর যমুনায় দুই স্বতন্ত্র রূপ। গঙ্গার খোলা জলে সংসার-বিবাগী ভোলা মহেশের জটাল্পর্শ। যমুনায় স্বচ্ছনীল জলে স্বর্গরাজ্যের বৈদূর্ঘ্যবর্ণিত প্রভা। গঙ্গা প্রমত্তা, ভীষণা ভৈরবী। যমুনা যৌবনমদভারে মস্তকধ্বজিত রাজপুত্রী। অভিসারের পথে প্রস্রাশিত জলরীং উল্লস নৃত্যচ্ছন্দে মুগ্ধ

নামিকার প্রগল্ভতা। পাপনাশিনী, মৃতিপ্রদায়িনী গঙ্গার সঙ্গে যমুনায় প্রভেদ অনেক।

ব্যসের সহযাত্রীরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। জনবিরল পাহাড়ের পথে একা চলছি এলোসেলো চিন্তার বোকা নিয়ে। হিমালয়ের আকাশে বাতাসে বৃষ্টি ঝাদ আছে। হারিয়ে-বাওয়া মনকে যেন ফিরে পাই নতুন করে। আশায়, আনন্দে আর পুলকে ভরে ওঠে মন। ... শত সহস্র রূপ ধরে আমি চলছি এই পথে। সেই আমি আর আজকের আমি কি এক, অভিন্ন? কোন সংস্কারের টানে চলছি কে জানে। হিমালয়ের পথে দেখা বৃন্দ সম্মানসূরী কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'ফিরে আবার আসতেই হবে, এ যে বাবা ব্যাডীর টান। জীবনের খেলা যেখানে ফেলে গেছ, আবার ফিরে আসতে হবে ঠিক সেই-খানে, বর্তদিন ভোগ না খড়ায়।' এমনি আসা-সাওয়ার মাঝে শেষ যাত্রার ইঙ্গিত বৃষ্টি শব্দ এই পথে। কি জানি?

[ক্রমশঃ]



(উন্নত কঠিন
বাংলা মাসিকপত্র)

সম্পাদক:—সাধনা সোম

শারদায়া সংখ্যা ও
গান্ধী-জয়ন্তী সংখ্যা

একযোগে

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক, জননায়ক,

কবি এবং অনেক নূতন লেখকের

চিত্তাঞ্চারপুষ্টি এবারের

আশ্বিন সংখ্যা

মূল্য—২ টাকা মাত্র

—যোগাযোগের কান—

'সবিতা কাঞ্চালয়'

৮৬৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,

কলিকাতা—১৪



স্বপ্নাজ্ঞান প্রদ্যোদ্যাত ॥ বিদ্যা বাউলীর রহস্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কোথায় আগুন?

ভয়ে-তরসে মদনের বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। একি কাণ্ড! খেপী চোঁচিয়ে উঠল, আগুন, আগুন!

টলমল জল-ভরা চোখদুটো মেলে তাকিয়ে আছে বিদ্যাধরী চালের বাতার দিকে। আগুন, আগুন!

সত্যিই চারদিকে আগুন দেখছে বিদ্যাধরী। মদনের চোখের আগুন ছাড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কুমির ঘরে, জার ঘরে। ঝলিফার দোকানে। হাটে-মাঠে। সবত্র।

কেন যে এমন দেখছে খেপী জানে না।

টলিবাঁলি চোখে তাকায় মদন। আগুন কোথায়?

—কোয়ানে? আগুন কোয়ানে?

আপনমনেই বলে বিদ্যাধরী।—সব-খানে। আগুনে সব পুইড়া গ্যাল।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকাল খেপীর দিকে। থাইছে! খেপীর মাথাটাই বুঝি গোলমাল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে এসে বাঁশের মাচার ওপর বসল মদন। খেপীও এতক্ষণে উঠে বসল।

মদনের দিকে তাকাল।—তুমি নিজের আগুনে নিজেকে পুইড়া মইলা!

বিদ্যাধরীর মস্ত ডাগর চোখদুটো দিয়ে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

মদন অবাক। এই প্রথম ও খেপী বিদ্যাধরীর চোখে জল দেখছে।

—তয় শোন কথা। এই গাওয়ে

নাটা জুড়ান আছিল। আমার বাপে আছিল তখন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মদন। এতদিন রয়েছে বিদ্যাধরীর সঙ্গে। বিদ্যাধরী কোনদিন তার অতীতের কোন বিস্তারিত তাকে বলে নি। কখনো কোন কারণে বিদ্যাধরীর মুখে এমন কথা শোনে নি মদন। যা হয়ে গ্যাছে, তা গ্যাছে। তা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যর্থ কখনো দ্যাখে নি। বিদ্যাধরী শোক করতে জানে না। কাঁদতে জানে না। মনের খুঁশিতে নাচে গায়। বেড়ায়। ভিক্ষে করে। খায় আর ফিকফিক করে হাসে।

এই নি বাউল-বাউলানীর ধর্ম। যা গ্যাছে, যাইবার দ্যাও। দুষ্টু কিসের। শোক কিসের? সাইরের সংসারে হাজার লীলা। শুষ্টু চোখ মেলে দ্যাখ আর মনের খুঁশিতে নাচ গাও ভুগভুগি বাজাও। বাউলীর কোন বস্ত্রা থাকতে নাই। বাউলীর কাঁদন নাই। আফশোষ নাই।

আজ বড় দাগা দিয়েছ তুমি। আমার কালা মদন। তোমার দুষ্টু দুষ্টু হইয়া আমার চক্ষে জল আইছে। আমার কোন দুষ্টু নাই।

তবে শোন কথা। আমার বাপ ছিল আর ছিল নাটা জুড়ান।

নাটা জুড়ানের বিস্তারিত কেউ জানে না।

হ্যাঁ। এমন করেই নাটা জুড়ান তাকে একদিন জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল। কেউ জানে না সে বিস্তারিত। নাটা জুড়ানের চোখেও এমনি আগুন ছিল। সেদিন কিন্তু বিদ্যাধরী আগুন দ্যাখে নি।

পালিয়ে গিয়েছিল বকুলতলার দিকে। যেতে যেতে দেখেছিল, নাটা জুড়ানের জিবখানা এক হাত বেরিয়ে গেছে। আর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোছে। সে স্পষ্ট দেখেছিল।

তিন রাত পেলালো না। নাটা জুড়ান মুখে দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল। কেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল বিদ্যাধরী জানে না। সত্যি সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে দেখেছিল। বকুলতলার দোড়ে যেতে যেতে পরিস্কার দেখেছিল।

লোকে বলে, সে গুণতুক জানে। লোকের অনিন্দিত করতে জানে। কিন্তু অনিন্দিত সে কারো কখনো করে নি। সে শুষ্টু দেখেছিল। নাটা জুড়ান মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল।

পিকিত লইয়া সাধন করতে চাইছিল নাটা জুড়ান। চার চাঁদের সাধন। এক বীজ মলমল লইয়া সাধন। পাঁচ বাণের সাধন। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্ভোহন। এ সাধন বড় কঠিন সাধন।

দমের জোরে পিকিতর কাছ থিকা রক্ত শোষণ কইরা লইয়া বীজে মিশান। নীরে-ক্ষীরে মিশাইয়া জ্বাল দ্যাওনের কাম। রসের জ্বাল হইলে ঘন হইব। তখন অমর্ত্য রস। এয়া কি নাটা জুড়ানের কাম? নাটা জুড়ান সাধন চার নাই। চাইছিল বিদ্যাধরীর দেহখানা।

দ্যাখ, কই কথা শোন। বাউল-বাউলী যারা দেহের সুখে সুখের সন্ধান করে। বাইর দুয়ারে যাগো নজর। তাগো জনো এই পিকিত সাধন। তারা পিকিত লইয়া সাধন করতে করতে ধীরে ধীরে

কামের দ্বারা তালা লাগাইয়া দায়।
তখন পশ্বে আলি বসে। কিন্তু মধু পান
করে না। কামের গন্ধ উইড়া যায়।

যাগো মনে কামের গন্ধ নাই। তাগো
ও সাধনে কি কাম। তারা সাইয়ের নামে
বাদাম ভুইলা উজানে আঁক্রে পিড়ি দিব।
তাগো দেহের সম্বন্ধ কামের গন্ধ কোন-
ভারই প্রয়োজন নাই।

কি বা কর্ম তোমারে। রসের সাধনে
যে কি আনন্দ জা বলনের না, কওনের না।
বিস্তান্ত জ্ঞান। তুমি আমার কালা
মদন। তোমারে আমি বৃকের পৈঠায়
বসাইছি। তুমি আমি হইলে তবেই নি
রসের সাধন। শূন্য আমিতে সাধন হইব
না। তুমি আমি, তবেই নি প্রেম, তবেই
নি রস আর আনন্দ।

তাই বৃহল্যা তোমার দেহের সাথে
সম্বন্ধ নাই। বাইর দ্বারা কপাট দিছি
অনেক কাল। অথন যা কিছু সব
অন্তরে। বৃকলা নি বিস্তান্ত। এ
বিস্তান্ত কওনের না, বলনের না। কইলে
মানবে কিবাস করব না।

তুমি আমার কালা মদন। তোমারে
আটকানর কামতা আমার নাই। তুমি
যদি আমার দেহখান চাও, দিবার পারি।
তুমি চাইলে আমার না কওনের শক্তি নাই।
কিন্তু তোমার পায়ে ধরি, আগুন পুইড়া
মইরো না। তুমি আমার প্রেমের মর্বাদা
মষ্ট কইরো না।

জাগর ভাগর চোখদুটো বেয়ে টপটপ
করে জল বরছে। বিদ্যাধরী কাদিছে।

মদন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।
কিছু বোঝে। কিছু বা বোঝে না।
তবে এইটুকু বোঝে যেখানে কামের
গন্ধ সেখানে প্রেমের গন্ধ নাই।
মাউল সাধনের এ ভক্ত-বিস্তান্ত তার জানা
ছিল না।

তুমি আমার কালা মদন। তুমি এই
ত্রি-সংসারে আমার একমাত্র মনুষ্য, তোমার
জন্মে আমি সু করতে পারি। তুমি যা
চাও, তা আমাকে দিতেই হবে। না বলার
শক্তি নাই।

আমি অসহায় নিঃসম্বল এক বাউলী।
তুমি আমাকে প্রেম ভিক্ষা দাও।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তুমি আমার কালা মদন—আমার
অন্তরের সব সম্পদ। এ সম্পদ তুমি
কেড়ে নিও না।

মদনের চোখদুটো ভিজে ভিজে লাগে।
বৃকখানার ভেতরে মোচড়ায়। কিসের
সাথে সে কি করতে গিয়েছিল—আকাশের
চন্দ্রকে মাটির পচা পাকে টেনে নামিয়ে-
ছিল। ফুটন্ত পশ্ম—একে কুস্তার মধ্যে
ভুলে দিয়েছিল।

মদন ধম ধরে রইল। মধ্যে আর
শাও বাকি নেই।

আমার নি ভয় করে। সত্যি বৃকি
আগুন লাগব সম্ব দিকে।

কে জানে! লাগতে পারে। খেপী
বিদ্যাধরীর দর্শন মিথ্যা হয় না। কে
জানে আগুন লাগবে কি না।

মদন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।
কখন যে স্বর্ষ পশ্চিমে নেমে গেছেন।

ওরা জানে না।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। মদন
ঝাড়ার মাথা রেখে বসে বসে ভাবে।
বিদ্যাধরী দু'হাট মূড়ে মুখ গুঁজে বসে
থাকে। কথা নাই। আওরাজ নাই।
আল্খার ঘরে দুটো সদ্য দগ্ধ পরাণ।

কিন্তু কালাকান্দির ব্যাপারী!
মদনের বৃকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে।
কি জবাব দেবে সে মনছুরকে?

কালাকান্দিতে কাল বিদ্যাধরীকে নিয়ে
যাবার কথা। ব্যাপারীর হাতে ওকে তুলে
দেবার কথা। তারপর ওর কপালে কি
হবে, সে ভগবানই জানে! ওই মনছুর
হঠাৎ খাবাশী দিয়া বাইড়িয়া ওর পিঠের
চামড়া তুলে দেবে। রক্তাক্ত পিঠখানা নিয়ে
উপড় হয়ে পড়ে থাকবে বিদ্যাধরী।
পিটুনি খেয়ে মুখ দিয়ে হয়তো গ্যাজিলা
উঠবে।

উরে বাপুরে। সে ভাবতে পারছে
না। ভাবতে ভাবতে তার দেহটা কপিছে।
যেন তাকেই ধরে পিটুনি দিচ্ছে মনছুর।
পারবে না। সে আর পারবে না। মন-
ছুর আর ব্যাপারীর হাতে ওকে তুলে
দিতে পারবে না।

এখন ইচ্ছে করলেই সে ওকে নিয়ে
যেতে পারে কালাকান্দিতে।

তুমি যা কইবা, আমি তাই করম।
কথা অমান্য করার সাধ্য নাই। না।
বিদ্যাধরীকে তার কথা শুনতেই হবে।
সে ব্যাপারীর গদ্যমে তাকে থাকতে
বললে তাই থাকবে।

তুমি আমার কালা মাণিক। তুমি যা
চাও, তাই দিম।

ইস বৃকটা আর মাথাটা যেন
পাষাণের মত ভারী। মাথাটা নাড়ার
মদন। চুল এসে পড়ে কপালে চোখের
ওপর। হাত দিয়ে সরায় না মদন।
কাকড়া যান দাড়া বসিয়েছে তার বৃকের
স্থানে স্থানে। কি অসহ্য যন্ত্রণা! এ
যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না।

ব্যাপারীর গদ্যমে উপড় হয়ে পড়ে
রয়েছে খেপী। খেপীর নরম নখর পিঠ-
খান খাবাশীর ঘারে রক্তাক্ত। ব্যাপারী
হাসছে আর মনছুরকে বলছে চিৎকার করে।
—বাগা পিটি। মাণিক বৃক, কুসু, ভাইয়া
দে। হাঁপাচ্ছে বিদ্যাধরী। হাঁ করে
শ্বাস নিতে নিতে তাকাচ্ছে তার দিকে।

না। পারম না। পারম না আমি।
বিদ্যাধরী বাঁশের মাটার ওপর দ

হাটতে মুখ গুঁজে বসে ছিল। হঠাৎ
মদনের ফিসফিসানিতে চমকে মুখ তুলল।
তাকাল মদনের দিকে।

মদন আপনমনে বলছে,—আমি শালা
কুস্তা। নরকের কুস্তা।

খেপীর হাটুদুখানার ওপর মাথা
নামাল মদন।

হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।
—আমি আলা নরকের কীট।

আমারে পিটাইয়া মাইরা ফালাও। আমি
তোমার সাতজন্মের শত্রু।

হাট, নামাল খেপী। ওর কোলের
ওপর মদনের মাথাটা টেনে নিল।

কি হল মদনের কিছু বুঝতে পারছে
না। হঠাৎ এমন করে কেঁদে উঠল কেন?
কাননের কি হইল?

মদন ভেউ ভেউ করে কান্দতে লাগল।
মাথা বৃকের মধ্যে যে পাষণ জমেছিল,
সেটা যেন গলে গলে পড়তে লাগল চোখ
বেয়ে।

—তুমি জান না। আমি তোমার
শত্রু।

খেপী বিদ্যাধরী বড় বড় চক্ষুদুটোর
অপার মমতা। মদনের মাথাটার ওপর
হাত রাখল। কোন কথা বলতে পারল
না। মদনের কান্না দেখে ওর কাঁয়া
পাচ্ছিল। চোখদুটো যান আবার ভিজা
ভিজা ঠাকে। ওর ঠোঁটদুটো ধর ধর করে
কপিছে।

—মদন খব কান্দল। তারপর মুখটা
না তুলে বলল,—তুমি জান না, আমি
তোমার কি সম্বনাশ কইরবার গিচ্ছলাম।
বিদ্যাধরী কথা বলল না। ওর মুখ



চুল মাথার চাঁদ্র ওপর চুড়ার মত খোঁপা
বাঁধা। মসৃণ কপালখানার বিন্দু বিন্দু
ঘাম। ওষ্ঠ দুইটো তখনো ধরধরাইয়া
কাঁপে।

—তোমারে কালাকান্দির ব্যাপারীর
হাতে তুলিয়া দিবার চাইছিলাম। তোমারে

বেইচা দুইশত টাংরা পাইতাম।

টাংরা দ্যাওনের কথা আছিল।

মদন অব্যব কৈদে উঠল।

বিদ্যাধরী ওর মাথায় হাত রাখল।

খুব আস্তে বলল,—আমি জানি।

—তুমি জান?

কাইল

ওর কোলের ওপর থেকে উঠে পড়ল
মদন। মদনের কালো মিশামিশে মূখখানা
ভিজ্জ। চোখের জলে আর ঘামে। ঠোঁটের
ফাঁকে লাল। কপালের ওপর চুল।
অবাক হয়ে গেছে মদন। বিদ্যাধরী
জানে! ও জানে যে ওকে কালাকান্দির
ব্যাপারীর কাছে দু'শত টাকায় বিক্রি
করতে চেয়েছিল মদন। এ কথা জেনেও
বিদ্যাধরী তার সঙ্গে কথা বলেছে। তার
সঙ্গে হেসেছে। তাকে দুর্দিন রেখে
খাইয়েছে।

বিদ্যাধরী কি মনিষ্য!

—হু, আমি জানি। ভয়ডর করি
নাই। আমি জানতাম। ব্যাপারী আমার
কিছু কইরব্যার পারব না।

কথাটা অবিশ্বাস করা যায় না।
ব্যাপারী যে ওর কিছু করতে পারবে না।
এ কথা বিশ্বাস করা যায়। কিছু করতে
পারেও নি। আগে যেদিন নিয়ে গিয়ে-
ছিল। সেদিন ব্যাপারী ওর গাওনা শব্দে
ওকে টাকা দিয়ে ছেড়ে দিল। কিছুই
করতে পারল না। মদন নিজেও জানে।
বিদ্যাধরীকে বশে আনা ব্যাপারীর কন্ম
নয়। তবু সে চেষ্টা করেছিল।

বিদ্যাধরী আস্তে আস্তে উঠল।

মদনের দিকে তাকাল একবার।
চোখদুটোয় অপার মমতা ঝরে পড়ছে।
আন্ধার ঘরেও সে চোখের আলো-আলো
মমতা-মাথা দৃষ্টি চোখে পড়ে। মদন
চোরের মত বসে রইল।

বিদ্যাধরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আন্ধার ঘরে বসে রইল মদন। একা
একা বসে রইল।

না। এই কারখানার পর এ ঘরে
আর তার থাকা চলে না। চলেই যাবে
মদন। আর যাত্রাদল বানানের কাম নাই।
টালিবালি করণের কাম নাই। চলে যাবে
সে। কুমির সঙ্গে একবার দেখা করে
চলে যাবে। কোথায় যাবে জানে না।
বেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। শব্দ
চলবে আর চলবে। পথে পথে চলতে
চলতে দিন কাটাতে আর বিদ্যাধরীর বানান
গান গাইবে।

মনছুরের টাকাটা ফেরত দিতে হবে।

মাচা থেকে নেমে বাস্তব বলে টাকাটা
বার করল মদন।

বিদ্যাধরী কোথায় গেল কে জানে।

মদন ঘর থেকে বেরোল। কোনদিকে
আর তাকাল না। সোজা পায়ে হাটা
জংলা পথ ধরল। এই পথ গিয়ে শেষ
হলেছে চালতেবাগান ছাড়িয়ে পড়া পদকুর
ছাড়িয়ে বাবুদের বাড়ির পেছনে।

মদন হাটতে শব্দ করল।



লাইফবুয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবুয় যেনে মনি করলেই তাঙ্গা স্বরস্বরে হবেন। এই
চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
কুণ্ডিত আছে। লাইফবুয়, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে!

লাইফবুয় ধুলোময়লার রোগবীজনা ধুয়ে দেয়

আমরা হোক একটি শ্রমিক আন্দোলন

জালালাবাদের পর গ্রামাঞ্চলে

চন্দননগরের বাড়ির নিরাপদ আগ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আমরা চাবজন—মাখন, আনন্দ, গণেশ ও আমি, পর্বতী কন্সট্রাক্ট গ্রুপের চেষ্টা করছি। কিন্তু জালালাবাদ যুদ্ধের গণতন্ত্রবাহিনীর সাথীদের জন্যই আমাদের ভয়ানক দুশ্চিন্তা। আমরা কেবল চিন্তা করছি তারা বর্তমানে কোথায়? ভবিষ্যৎ কন্সট্রাক্ট কাজে পরিণত করবার জন্য তাদের পক্ষেও নিরাপদ ও শক্ত ঘাঁটিব একান্ত প্রয়োজন। আমাদের চন্দননগরের আস্তানার বিবরণ দেবার আগে প্রধান বাহিনীর পরিস্থিতি ও অবস্থানের কথা যা জেনেছিলাম সেই সংক্ষেপে একটু লিখছি।

আগেই বলছি, জালালাবাদ যুদ্ধের পর সেই পর্বত-শিখরে বাবোজন শহীদকে স্মরণের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে থাকি চর্যাল্লিশজন বিপ্লবী সৈনিক পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল। প্রথমে একজন বাদে তেতাশ্লিশজন এক সঙ্গেই নেমে আসে। অশ্বকাদা প্রায় দু-তিন ঘণ্টা পরে স্তান ফিরে পেরে, একা একা সেই দুর্গম পাহাড়ের পথ কিছুটা অভিক্রম করে একটা নির্জন ও নিবাপদ স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। বাকী তেতাশ্লিশ-জনের মধ্যে দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে পা ফেলে মার্চ করে চলেছে। এই প্রধান বাহিনীও মার্চ করার সময় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল লোকনাথ, কালী চক্রবর্তী ও সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে একাদিকে গেল এবং অপর দল মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে ভিন্ন পথে গ্রামের উদ্দেশ্যে পাহাড়ী পথ অভিক্রম কবে অগ্রসর হ'ল। মাস্টারদা ও নির্মলদাব নেতৃত্বে যারা মার্চ করছিল তাদের কথাই আমি আগে লিখছি। লোকনাথের বোমাশুকের অভিজ্ঞতার বিষয়ও পরে আমি বলতে চেষ্টা করবো।

নির্মলদার পরিচালনায় প্রায় কুড়ি-একশজন সাথী পাহাড়, জঙ্গল ও মাঠ ভেঙে চলেছে। ভোর হবার আগেই কোন একটি নির্জন ও নিরাপদ পাহাড়ে আশ্রয় নিতেই হবে। ভোবের মাত্র আর দু'তিন ঘণ্টা বাকি। সকলেই এত ক্লান্ত যে তাদের হাটার গতি ঘণ্টায় দু'মাইলের বেশি নয়। তবু ভোর হওয়ার বেশ কিছু আগে, জালালাবাদ পাহাড়ের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যেই, চাষী বা গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় এরকম একটি নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে শিবির স্থাপন কবলো। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই হ'ল না। লতাপাতা চিবানো ছাড়া কাঁচা আম ও তরমুজ খাওয়ার সামান্য যেটুকু সুযোগ হয়েছে তাতেই তারা ক্ষুধাভুকা মিটিয়েছে। সকলেই জলের অভাবে নিদারুণ কষ্ট পেয়েছে। দু'পুত্রের রৌদ্র যখন তাদের মাথার ওপর আগুনের হুঁকা ছড়াচ্ছে, তখন বিনিময় রক্তনীর ক্লান্তি, অনাহারে অতৃপ্ত দেহ, সামান্যতম বারিবিপ্লবের অভাবে শূন্য বুক বার বার বিদ্রোহ করেছে মানসিক ধৈর্যের বিরুদ্ধে—বিপ্লবী দৃঢ়তার প্রতিকূলে! সে এক চরম মহত্ব! তবু মাস্টারদা ও নির্মলদাব নেতৃত্বের সম্মোহনী শক্তি সবাইকে উজ্জীবিত করেছে—প্রেরণা দিয়েছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থাকেই গণতন্ত্রবাহিনীর সৈনিকেরা জয় করেছে।

রাতের অন্ধকারে আবার তারা মার্চ শুরু কবলো। এবারেও তারা ভোরের আগেই আর একটি পাহাড় নির্বাচন করে আশ্রয় নিল এবং এই স্থিতায় পাহাড়টিতে সারাদিন ক্ষুধা-ভুকা, অনিদ্রা, শ্রান্তি ও ক্লান্তির সঙ্গে অবিবাক সংগ্রাম করে চলেছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—একটু অন্ধকার হয়েছে। এই সুযোগে বিপ্লবী সাথীরাও পাহাড় পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। আজ রাতে তারা সুপরিচিত গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করবে। পুন্নিশের

তালিকার বাইরে দলের সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং দলের নিরাপদ ঘাঁটিগুলির অবস্থাও দেখতে হবে। কিন্তু তাদের পরিধানে মিলিটারী পোষাক, হাতে রাইফেল এবং কোমরে বন্দুক। এই অবস্থায় কাবও বাড়িতে যা' সাময়িকভাবে আশ্রয় পাওয়া যাব এবং সেখানে বেশভূষা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে, তবেই ছোট ছোট দলে ও ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষে নিবাপত্তা বজায় রেখে ভবিষ্যতের কন্সট্রাক্ট স্থির করা সম্ভব। কাজেই এখন প্রধান ও একমাত্র সমস্যা হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল যোগাড় করা।

মাস্টারদা উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাস্য করলেন—“এমন কেউ আছে কি যে নিজ বাড়ি বা আশ্রয়স্থল বাড়ি অথবা কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হলেও আমাদের সকলের অন্তত একদিনের জন্য থাকবার ব্যবস্থা কবতে পাব? প্রকৃত প্রভাব না থাকলে আন্দাজে কারও বাড়িতে উপস্থিত হলে কিন্তু নানা বিস্ময় ঘটতে পারে। তাই আমার জানবার উদ্দেশ্য নিবাপদে থাকবার কোন বাড়ি কারো সম্মানে আছে কি?” সবাই নীরব—সকলেই চিন্তা করছে। সবাই বুঝেছে সাময়িক আস্তানায় আশ্রয় প্রয়োজনীয়তা। অবশেষে দলের মধ্যে যে সকলের ছোট, সেই নিশ্চিন্ততা ভাগ কবলো। সে বলল—“মাস্টারদা, আমি বয়সে ছোট—মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র। এই বয়সে বাড়ির ওপর আমার প্রভাব বা ক্ষমতা কতটুকুই বা থাকতে পারে। আপনার মনে এইরূপ প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। আপনার কথা শুনে আমি খুব চিন্তা কবে দেখলাম আমার প্রভাব বাড়ির ওপর কতখানি—আমি সত্যিই আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যেতে পারি কিনা। সব দিক ভেবেই বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাড়িতে আমবা সকলেই যেতে পারি এবং বাড়ি থেকে সাহায্যও পাবো।” সবার দৃষ্টি এই

সাথীর দিকেই নিবন্ধ। এত ছোট—তবু কি করে সাহস কবছে এত বড় দায়িত্ব নিতে? মাস্টারদা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা বললেন—“আমি তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখি। তুমি নিজ বাড়ির অবস্থা এবং তোমার বাবা-মার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই এই গুরু কৰ্মভার নিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছ। এই দায়িত্ব আমরা তোমায় দিলাম। বন্ধু, তুমি এখন আমাদের পরিচালনা কর।” সুবোধ রায়—বালক বন্ধু, বিশজন সশস্ত্র বিপ্লবী সাথীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সুবোধ রায়ের (বন্ধু) বাড়ি নগাপাড়া গ্রামে। দু’তিন মাইল দূরে হালদা নদী তাদের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করে প্রবাহিত হয়েছে। রাত প্রায় বারোটা বেজেছে। নদী পার হতে হবে। খেয়াঘাটে এত রাত্রে মাঝি পাওয়া যাবে কি না ভাবনার কথা। তা’ ছাড়া সশস্ত্র মিলিটারী পোষাকে বিশজন লোক দেখে মাঝিরা কি ভাবে এবং তাদের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন যদি হতে হয় তবে সে আবার নতুন বিভ্রাট। এই সব সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে সকলে খেয়াঘাটে উপস্থিত হল। অদূরে তীরে কয়েকটি নৌকো বাধা ছিল। সবগুলাই কিন্তু খালি, একজন মাঝিকেও সেখানে দেখা গেল না। আপাতদৃষ্টিতে অসুবিধে মনে হলেও বাস্তবে এইটাই হল তাদের কাছে সব চাইতে মঙ্গলের। একটুও সন্দেহ না করে নিজেরাই দু’টি নৌকো বেয়ে হালদা নদীর ওপারে গেল। কেউ তো দেখতে পেলই না। উপরন্তু পরের দিনও কেউ বুঝতে পারলো না যে, কী নৌকো নিয়ে গেছে বা কি করে নৌকো দু’টি ওপারে গেল? পুলিশে খবর নিয়েছিল কি না তা’ আমাদের জ্ঞান নেই। পুলিশ ডাকলে যত না সুবিধে, তাঁর চাইতে অসুবিধে আরও অনেক বেশি। তাই বোধহয় এই ছোট ব্যাপারে কেউ আর পুলিশে খবর দেয় নি।

হালদা নদীর এই খেয়াঘাট থেকে সুবোধ রায়ের (বন্ধু) বাড়ির দূরত্ব প্রায় চার মাইল। সুবোধ রায় চট্টগ্রাম জজ-কোর্টের প্রখ্যাত উকিল রাতুলকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাতুলবাবুর শহরে বাড়ি, গ্রামে বাড়ি এবং জায়গা-জমি ছিল প্রচুর—জমিদার বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮ই এপ্রিল সকলের চোখের আড়ালে সুবোধ তার বাবার দোনলা বন্দুকটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আর আজ ২৪শে তারিখ রাতে বাড়ি ফিরে এল যাবাকৈ তাঁর একটি দোনলা বন্দুকের বিনিময়ে ইংরেজ সুরক্ষিত অস্ত্রাগারের বিশটি রাইফেল ও বিশটি রিভলভার

উপঢৌকন দিতে! পিতা-মাতার কাছে পুত্রের স্নেহমমতায় দাবি অস্ত্র থেকে অনুভব করেছে বলেই এবং বাড়ির ওপর বিশেষ প্রভাব থাকায় বন্ধু সাহস করে মাস্টারদাকে বলতে পেরেছে—“...সে ভার আমি নিতে চাই, আমাকে বিশ্বাস করে সে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।”

বড় বাড়ি। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভংগ না করে চুপি চুপি তারা বিশজন বাইরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সুবোধ একটা ঘরের দরজার মৃদু ক্রাখাত করে ডাকলো—“যষ্ঠীদা! যষ্ঠীদা!” দু’তিন বা ডাকার পর যষ্ঠীদা দোর খুলে বাইরে এলেন। বন্ধু যষ্ঠীদা, বাড়ির পুরনো চাকর। কিন্তু বাড়ির বড় ছেলের কাছেও যখন উনি যষ্ঠীদা, তখন তিনি যে কেবল মাত্র ভূতাল্পনানী নন, তা’ আমাদের কাছে সহজেই অনুমেয়। যষ্ঠীদা বাইরে এসেই হকচকিয়ে গেলেন। এ কি! বিশজন সৈনিকবেশী রাইফেলধারী নওজোয়ানের পুরোভাগে তাঁর দাদাবাবু! ১৮ই তারিখের শুব-বিদ্রোহের রণরোল ২৪শে তারিখেও যষ্ঠীদার কানে পৌঁছয় নি—এ হতে পারে না। তা’ ছাড়া, সেই দিন থেকেই দাদাবাবু উধাও, বাড়ির বন্দুক নিখোঁজ, মা-বাবার দৃশিচলতা—এই সব মিলিয়ে বিশজন সৈনিকের সাথে দাদাবাবুর আজ রাত্রের উপস্থিতি যে সম্পূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছে, তাতে যষ্ঠীদার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আজ যষ্ঠীদার মহা আনন্দ—দাদাবাবু ও চট্টলার বীর সন্তানদের তিনি সেবা করবেন। গর্বভরে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যষ্ঠীদা সবার দীর্ঘজীবন কামনা কবলেন।

সুবোধ একটু চুপি চুপি যষ্ঠীদাকে আশু প্রয়োজন জানাতে চাইল। যষ্ঠীদা তার মস্তুর কথা কেড়ে নিয়ে শুব চাপা কণ্ঠে বললেন—“আচ্ছা, আর বলতে হবে না। আমার পেছন পেছন তোমরা এস।” এই বলে যষ্ঠীদা একটু এগিয়ে গিয়ে একটা খালি বড় ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সবাইকে সেখানে বসতে বললেন। একে একে বিশজন এই অশ্বকার ঘরে প্রবেশ করলে যষ্ঠীদা বাইরে থেকে একটা মস্ত বড় তালা লাগিয়ে দিলেন। ঘরের চারিদিকের জানালা দরজা বন্ধ। বিশজনের পক্ষে ঘরটি ‘অশ্বকূপ’ বললেও অত্যুষ্টি হবে না। কিন্তু উপায় নেই, সেখানে তাদের ২৫শে তারিখ পর্যন্ত থাকতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধু ঘরে যষ্ঠীদা দু’তিন কলসী জল, কিছু চিড়ে ও গুড় পৌঁছে দিলেন। বন্ধু বাড়ির ভেতরে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করলো। “হারানো” ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা-বাবা মুহূর্তে সব দৃশ্য ভুলে গেলেন। রাতুল-

বাবু তখনও তাঁর বন্দুক চুরির সংবাদ পুলিশে জানান নি। পুলিশও সুবোধ রায়ের খোঁজে তাঁর বাড়ি তল্লাসী করতে পারে এমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি। সুবোধ রায় দলের অত্যন্ত গোপন বিভাগের সভ্য ছিল বলেই তার নাম তখনও বাইরে প্রকাশ পায় নি। সুবোধ প্রথম থেকেই নির্মলদার কাছে বৈপ্রবিক জীবনের শিক্ষা পেয়েছে। মাস্টারদা ও নির্মলদা পরামর্শ করে স্থির করলেন সুবোধ বাড়িতেই থাকবে। মিহিরের বাড়ির বন্দুক মতি কানুনগো নিয়ে এসেছে। মিহিরকে আমরা আশ্রয় গোপন করে থাকার নির্দেশ দিই নি। তবু পুলিশ নিখোঁজ বন্দুকের ব্যাপারে মিহিরকে গ্রেপ্তার করে নি। তাই সম্ভবত সুবোধকেও তারা বন্দী করবে না। আর যদি প্রথম থেকেই সে আশ্রয়গোপন করে থাকে তবে সুবোধের বিরুদ্ধে হয়ত হুঁলিয়া বার হবে। মাঝার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে কখনই পুরোদস্তুর কান্ন করা যায় না। তাই মাস্টারদা ও নির্মলদা বন্ধুকে নিরীহ ছেলের মত বাড়িতেই থাকতে আদেশ দিলেন।

পুলিশ-মাস্কেট বিশটি এক-এক ভাগে পাঁচটি করে চারটি বোঁচকা করা হল। মাস্টারদারা এইগুলি চারটি নিরাপদ স্থানে পাঠাবারও ব্যবস্থা করলেন। যাদের নিজ বাড়িতে বা আশ্রয়-বাড়িতে নিরাপদে থাকার সুবিধে আছে তাদের সেই সেই স্থানে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। বাড়িতে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে আশ্রয়স্থল রাখা সমীচীন নয় মনে করে তাদের রিভলভারগুলি কেবল সেই গ্রুপের হেপাজতেই রাখা হ’ল যারা পুলিশের কাছে আগে থেকেই সুপরিচিত এবং যারা আশ্রয়গোপন করে ভবিষ্যতের সশস্ত্র আক্রমণের কর্মসূচী পরিচালনা করবে। প্রাথমিক-ব্যবস্থাাদি সমাপ্ত হওয়ার পর সবাই থাকী পোষাক পরিবর্তন করলো। বলাই বাহুল্য, ধূতি-শার্টের ব্যবস্থা যষ্ঠীদার মারকতেই সম্ভব হয়েছে।

এই বিশজন সৈনিকের মধ্যে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে যাত্রা আশ্রয় নিল তারা বাপে থাকি যে ক’জন রইল, তাদের সঙ্গে মাস্টারদা ও নির্মলদা গেলেন—বিনয় সেনের বাড়িতে। বিনয় আমাদের বয়সী এবং সেও আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রথম গ্রুপেরই সদস্য। প্রথম প্রেরণী-কয়েকজন বিশেষ কর্মী প্রথম আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে নি। এর প্রধান কারণ ১৮ই এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরদিন অর্থাৎ ১৯শে তারিখ সকালে ছাত্র-শুবকদের নিয়ে তারা (বিনয়, বোমেশ, গোবিন্দ) ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক হিসেবে প্রণাম

বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে এইরকম প্রায় ছিল। এরা তিনজনই আমাদের সম-বয়সী। শচীন সেন ও অর্ধেন্দু দত্তও ছিল পরের ধাক্কা সামলাবার জন্য। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু দত্ত একই সপ্তে বি-এ পড়ত। আমি এই অর্ধেন্দু দত্তের কথাই আগে লিখেছি। জেল থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গেই আমি প্রথম সংযোগ স্থাপন করি। সেছাড়া প্রথম ছুটি মাস আমি অন্য কাউকেই আমার আস্থাভাজন মনে করে নি। অর্ধেন্দুকে আমার বিশ্বাস করার কারণও ছিল। তারই হেপাজতে দলের “অমূল্য ধন” গদ্যস্থানে সুরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ, আমরা যখন ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী হয়ে জেলে ছিলাম, তখন এই অর্ধেন্দুই রিভলভার ও পিস্তল সামলে রাখে। কাজেই তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই থাকতে পারে না। জালালাবাদ যুদ্ধোত্তর সময়ে অর্ধেন্দু দত্তের অবদান অতুলনীয়। যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, সেই সব বিপ্লবী সাথীদের নিয়ে মাস্টারদা ও নির্মলদা সারা চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে বাহু রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার মিলিটারী ও পুলিশের বিরুদ্ধে মাস্টারদার নেতৃত্বে যে শক্তিশালী আক্রমণ ও প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে ওঠে তার মূল ভিত্তি হিসেবে ছিল দলের এই প্রচ্ছন্ন শক্তি। যথাসময়ে এই শক্তির সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল বলেই চার বছর ধরে অত্যাচার ও নিপেষণের মধ্যেও আমরা আমাদের বৈপ্লবিক আকশন অক্ষুর রাখতে পেরেছিলাম। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির মূলে বার্মা ছিল তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, অনেকের সঙ্গে আমার পরে আর দেখাই হয় নি। আমি বাইরে ও জেলে থাকাকালীন প্রত্যক্ষভাবে মেলা-মেশার মাধ্যমে দলের সভাদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞানবার সুযোগ পেয়েছি তারই ভেতর আমার লেখা সীমাবদ্ধ। যদি অনেক কথা বাদও পড়ে, তবে তা আমার ইচ্ছাকৃত হ্রাস নয়। একজনের পক্ষে সকলের সম্বন্ধে সব কথা লেখা সম্ভব নয়। এ কাজের ভার যোগ্যতার আর কেউ গ্রহণ করলে সুখী হবো।

বিনয় সেনের বাড়ি সুবোধের একই গ্রামে—নয়াপাড়ার। নির্মলদা প্রথমে একই গেলেন বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে—তার বাড়ির অবস্থা, চট্টগ্রামবাসীর মনোভাব এবং পুলিশ ও মিলিটারীর ভৎসনাত্মক রূপ তার একটা মোটামুটি রিপোর্ট নিতে। বিনয় জানালো যে বিপ্লবীবাহিনী তাদের বাড়ির ও চট্টগ্রামবাসীদের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছে। তাদের বাড়িটি আশ্রয়-প্রাপনের আস্তানা হিসেবে অনায়াসে

ব্যবহার করতে পারা যায়। পুলিশ তার বর্তমান গতিবিধি ও কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তাছাড়া পুলিশ তখনও শহরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত আছে—সদুর বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে বাওয়ার তাদের সময় নেই এবং অত সৈন্যও নেই যে আন্দাজে সব গ্রামে বিপ্লবীদের চাইতে অধিক শক্তি নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। শহর আরও অন্য যদিও বা সম্ভব কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রামে ও গ্রামান্তরে সৈন্য মোতায়েন করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাংলা দেশে ইংরেজ সরকারের পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মলদা, মাস্টারদা ও আরও কয়েকজন প্রথম সারির বিপ্লবীদের বিনয়ের বাড়িতেই থাকবার ব্যবস্থা হল। বিনয়ের বাড়িটি বর্তমানের কিম্বদন্তি হেডকোয়ার্টার বললেই চলে। এই কেন্দ্র থেকেই মাস্টারদা ও নির্মলদা চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে দলের সমর্থক ও সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন।

এবার আমরা আবার জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাই। আমাদের বিপ্লবীসাথীরা সবাই এখনও নিরাপদ আগ্রারে ফিরে আসে নি। মাস্টারদার সঙ্গে দলের প্রায় অর্ধেক অংশ যখন গ্রামেরা উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন বিনোদ চৌধুরী গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করছে। গলায় ডান পাশ দিয়ে রাইফেল বা লুইস-গানের ৩০০ বোরের গুলী প্রবেশ করে গলার বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখনও অনবরত রক্ত ঝরছে। বিনোদ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। যারা তার দুর্বল দেখে নিঃশব্দে ও বাহুতে support দিচ্ছে তারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বনবিহারী দত্ত বিনোদের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। সে এবং অপর একজন সাথী যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন বিনোদকে নিয়ে যাবেই। বিনোদও বুঝতে পারছিল যে ভাব্য হয়ত তাকে ফেলে যাবে না কিন্তু সে ভাবছিল, তবে কি তার প্রধান বাহিনীর গতির সঙ্গে মিল রেখে কদম ফেলতে পারবে? এক হতে পারে যে তাদের তিনজনকেই পেছনে পড়ে থাকতে হবে, আর নরু তো, প্রধান বাহিনীর সকলেই বিনোদের অক্ষমতার জন্য গতি মন্ডর করতে বাধ্য হবে। এর কোনটাই বাহিনীর নয়। বিনোদের আহত অবস্থার জন্য দু'জন সাথীকে যে কোন সময়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে পেছনে পড়ে থাকতে হবে?—এইরূপ অর্থহীন sentiment বনবিহারী ও অপর সাথীকে

আজ্ঞার করুক, এটা বিনোদ কোনমতেই মানতে পারাছিল না।

বিনোদ আর এক পাও চলতে পারাছিল না। সে বনবিহারীকে সম্বোধন করে বলল—“দেখ তোমরা অনেক পেছনে পড়ে আছ। আমাকে কোনমতে নিচে নামিয়ে দিয়েই তোমরা দ্রুত প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দাও।” বিনোদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে ক্রমেই কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলাছিল। শরীরে একেবারেই balance নেই—চুলে চুলে পড়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে আর যেন দাঁড়ানও সম্ভব নয়। এরকম শোচনীয় অবস্থা দেখে বনবিহারীর মনে হল বিনোদ হয়ত আর বাঁচবে না। ভাই বনবিহারী খুব ব্যথিত কণ্ঠে বলল—“দেখ ভাই, মাস্টারদা সবাইকে বলেছেন যদি কন্টের সীমা ছাড়িয়ে যার এবং জীবনের কোন আশাই না থাকে তবে প্রয়োজনবোধে সেইরূপ মর্মেদ সাথীকে বুক গুলী করে তার কন্টের চির-উপশমন করবে। বিনোদ, ভাই, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? যদি বল তবে ভাই তোমার ইচ্ছার তোমার বুক গুলী করতে আমি প্রস্তুত।” বনবিহারীর উৎকণ্ঠা এবং বন্ধুর প্রতি বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনের আজ্ঞার প্রতীকার সেই বন্ধুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বিনোদ কোনমতে উত্তর দিল—“দেখ বনবিহারী, এখনও আমার হাতে রিভলভার ধরা আছে। যদিও প্রচুর শক্তিকম হলেছে, তবে রিভলভার টেপার শক্তি আমি হারাই নি। তুমি বিশ্বাস কর বন্ধু, মরতে আমার একটুও ভয় নেই। জীবন্ত আমাকে ইংবেজ দস্যুরা বন্দী করতে পারবে না—এ কথা তুমি নিশ্চিত জেনো। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে আত্মহত্যার কথা ভাবা ভুল। এই শিক্ষা আমি স্বয়ং মাস্টারদার কাছেই পেয়েছি। ১৯২০ সালে নাগবখান যুদ্ধের সময় তিনি, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস তাঁর বিষ খেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত মারা যান নি এবং কেঁচে থেকে আজও বিপ্লব পরিচালনা করছেন। ভাই

কিস্তিবন্দীতে ট্রান জস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের
জগৎ বিখ্যাত ৩ ব্যান্ড
অল ওয়াল্ড পোর্টেবল
ট্রানজিস্টার “উইন্ড-
সোর-হিটচা” মাসিক
২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।
আবেদন করুন।



Swiss Television Co.
(BW-55), P.O. Box 1320,
Delhi-6.

সাবাস গোলাম, সাবাস

উল্লেখ্য

সাবাস গোলাম! তুইও মেরি সেলাম কুড়াল।
তোর অসহ্য বেহালাপনা, চরিত্রহীনতাই
আশ্চর্য এই দেশে
ভক্তেরা আজ মাথায় নিচ্ছে গুজার ফুল ভেবে ;
যদিও ফুল তাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ লুকায়।

সাবাস গোলাম! কালোবাজারের মস্তানদের নিম্নক থেকে
লেখক হলি ; এবার নাকি আমেরিকাও ঘুরে আসবি,
তুই যে ডার ক্রীতদাসদের পায়ে নচে শূয়ে তাদের প্রসাদ টাটিস
ডাটার মাফিক লিখিস নাটক, কবিতা, উপন্যাস
নর্দমার অভিজ্ঞতা : কী করে কবে কোন মহিলার
সর্বনাশ করেছিস তুই, নাটকের গুরু, রোমাণ্টিকর তার কাহিনী!

সাবাস গোলাম! নিরন্ন উল্লেখের দেশে ছুড়ে দিচ্ছিস
কুমারী দেখলে কুকুর হবার সর্বনাশ ইচ্ছে। তুই
এইভাবেই সাহিত্যের সম্রাটের মূকুট পরবি ;
জন্ম বোঝা বধির আমার জন্মভূমির নগর শূণ্য এক পয়সায় কেনা।

একমাত্র জৈবিক চর্চায়

দ্বন্দ্বিতা ভৌতিক

যদিও সবাই বলছি : বলিষ্ঠ জীবনবোধ চাই,—
চারিদিকে লোভাভুর স্বেচ্ছাকৃত ছেঁড়া সামিয়ানা,
মর্কট বৃষ্টির দৈন্য, চক্ষুমান জেনেশুনে কানা।
যদিও সবাই বলছি : ঘরে নেই কড়া-কাস্তি-পাই
জব্ব ও মিছিলে যেতে, এমন কি চকুর গোসাই
কান পেতে শুনতে চায় বই বিক্রি হোল কতখানা?
কেমন প্রচ্ছদ? তার মূল্য কত টাকা কত আনা?
জীবন দর্শন যেন একমাত্র জৈবিক চর্চায়।

না। না। না : সবাই বলছি। প্রতিবাদে কে তবু মৃদু?
ঘরং সেলফের থেকে ছুড়ে ফেলে লিও তলস্তয়,
শেকস, রবীন্দ্রনাথ—আনা হয় রঙিন মলাটে
ভীষণ বিকারগ্রস্ত লেখকের মনের খবর।
বাধা দিতে কেউ নেই। নেই ছেলেদেরো লজ্জা-ভয়,
শিশুরাশ্রয়ে বৃদ্ধরাই জ্ঞাননেত্র পা-টি পা-টি হাঁটো।

বলছি আমার ওপর ভরসা রাখ। আমাকে
কোনমতে নিচে নামিয়ে দিয়ে তোমরা ছুটে
প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও। আমার
সঙ্গে রিভলভার তো আছেই—ভয় কি?
ধরা আমি কোনমতেই দেব না। তোমরা
নিশ্চিন্ত মনে চলে যেও। মাস্টারবদাকে
আমাব কথা বোলো—তার জীবনের
অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা শিখেছি তাই
কাজে পরিণত করবো—শেষ পর্যন্ত
লড়বো। মরবার আগের মুহূর্তেও মৃত্যু-
আশঙ্কায় আত্মহত্যা আমি করবো না।
মাস্টারদা যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন।

বিনোদের মানসিক শক্তির সঠিক
পরিচয় বনবিহারী এর আগে কখনও
পায় নি বা পরস্পরকে এত ভালভাবে
চেনবার সুযোগও আগে আসে নি। বন-
বিহারী বিনোদকে বলল—“তুমি যখন আর

হাটতে পারবে না, তখন না হয় বসে
পড়বে। এখন চল যতদূর পারি তোমাকে
নিয়ে যাই।” বিনোদ এবার সত্যিই রেগে
বলল—“তোমাদের বলছি তোমরা আমাকে
এখানে ছেড়ে দিবে তাড়াতাড়ি প্রধান
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও—তোমরা তা
শুনছ না কেন? আমাদের সীমিত
শক্তির ক্ষয় যাতে কম হয় তা’ কি যুক্তি-
যুক্ত নয়। তবে sentiment থেকে
তোমরা এখনও মুক্ত হতে পারছ না কেন?”
এই বলে বিনোদ সেখানে বসে পড়লো।
তার হাতে দৃঢ়মুষ্টিবন্ধ রিভলভার। সে
মুখে আর কথা বলতে পারলো না। ঘন
ঘন হাতের ইসারায বৃষ্টিয়ে দিল—বিন্দু-
মাগ দেরি না করে দ্রুত প্রধান বাহিনীর
সঙ্গে মিলিত হও। বনবিহারী ও তার
সাথী বিনোদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে বিদায় নিল, ভেবেছিল বিনোদের
সঙ্গে আর তাদের দেখা হবে না।
বিনোদও নিশ্চয়ই তাই ধবে নিবোছিল।

প্রকৃত বিপ্লবীর সূদৃঢ় মনোবলই
বিনোদের মধ্যে ছিল। মৃত্যুভয়ে সে ভীত
নয়, আবার অকারণে আত্মহত্যাও সে
পক্ষপাতী নয়। শেষ পর্যন্ত বিনোদেব
অনমনীয় মনোভাব জন্মবৃত্ত হল। ধরা
সে পড়ে নি, আত্মহত্যাও তাকে কবতে
হয় নি। শৃঙ্খলা মনের জোরে ঠিক
সময় মত সেই স্থান পরিত্যাগে সমর্থ
হয়েছে। বহু বাধাবিধা অতিক্রম করে
নিরাপদ স্থানে নিজেকে লুকিয়ে রেখে
বিনোদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।
বিনোদ আজও সুস্থ দেখে বেঁচে আছে।

[ক্রমশঃ]



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জ্যৈষ্ঠ-৫ ও চাঁদের বিচিত্র জগৎ

মার্কিন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৫ শেখরক্ষা করল ঠিক। পড়তে পড়তেও ঠিক টিকে থাকল। শেষ অবধি চাঁদের দেশে ধীরেস্থল নামল সে; ১১ই সেপ্টেম্বর নামল।

১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রে সার্ভেয়ার-এর এই বিজয়-অভিযানের কথা ফলাও করে ছাপা হয়। সংবাদে বলা হয়, মহাকাশযানটির সাফল্যের আশা ছিল না মোটেই; কারণ, মাঝপথে একটি 'ভাল্‌ব' থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসতে সুরু করে। তবে শেষ অবধি অস্বাভাবিক এই গ্যাস-নিগমন বন্ধ হয় এবং সার্ভেয়ারও লক্ষ্য-স্থল থেকে দু'মাইল মাত্র দূরে অবতরণ করে।

সার্ভেয়ার-৫ চাঁদের বাহরাবরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে। এ ছাড়া ঐ উপগ্রহটিতে মহাকাশচারীদের অবতরণ-ক্ষেত্র সম্বন্ধেও মূল্যবান গবেষণা চালাবে। এই গবেষণার কথা শুনে, আর শুনে সার্ভেয়ার-৫-এর শেখরক্ষার কাহিনী—চাঁদেব বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে আসছে।

মনে হচ্ছে বয়স হল চাঁদের। পাঁচশতাব্দে বসেন, ৪৫০ কোটি বছর। বলেন, এই দীর্ঘ যুগ ধরে পৃথিবীর সঙ্গী সে। সে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করছে আমাদের নিকট প্রতিবেশী হিসেবে।

পৃথিবীর জন্মলগ্নে চাঁদেরও জন্ম। পৃথিবী যখন গড়ে উঠছিল, চাঁদও তখন গড়ার পথে। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর তফাৎ হল এই যে, পৃথিবী ধীরে ধীরে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করল; ধীরে ধীরে অনেক কিছু পরি-বর্তন হল তার। অপরদিকে চাঁদের শৈশব আর কাটল না। শৈশবেই জল-বাতাসকে ছুটি দিয়ে সেই যে সে-নিঃস্ব হয়ে বসল সে নিঃস্বতা থেকে আর মুক্তি পেল না কিছুতেই। অতএব, আজও চাঁদকে যখন আমরা দেখি, তখন তার ৪৫০ কোটি বছর আগেকার শৈশবের কথাই আমাদের মনে পড়ে। মনে হয়, জন্ম-লগ্নেই জল-বাতাসকে হারিয়ে বসে আছে বলে উপগ্রহটিতে পরিবর্তনের ঝড় বয় নি কখনও। কখনও ক্ষয় ও ভাঙনের তাড়ব দেখা দেয় নি। তাই এখনও তার দিকে

তাকালে কোটি কোটি বছর আগেকার শৈশবের স্মৃতিগদ্যলো খুঁজে পাওয়া যাবে।

পৃথিবী বা তার প্রতিবেশী গ্রহ-গুলোর শৈশবকে খুঁজে পাওয়া আজ বড় কঠিন। কারণ, জল-বাতাস আছে ওদের মধ্যে; এবং আছে বলেই ওদের বহিরা-বরণে অহরহ পরিবর্তনের ঢেউ উঠছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পরিবর্তন অনেক কিছু অনর্থের মূলে। এদেরই জন্যে ওরা সৌরজগতের খাঁটি জন্মঠিকুজী তৈরি করতে পারছেন না। কিন্তু যদি চাঁদে যাওয়া যেত একবার, যদি তার বাহরাবরণকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করা যেত, তবে হয়তো সৌর-জগতের ঠিকুজীটা গড়া সম্ভব হত নিখুঁতভাবে।

সবাই জানেন, এই ঠিকুজী গড়ার আয়োজন আজ ভালভাবেই চলছে; চাঁদে পাড়ি দেবে বলে মানুষ আজ বশ্পরিকর। এদিকে চাঁদের দেশ সম্বন্ধে বিচিত্র সব খবর সংগৃহীত হচ্ছে; এবং এরই মধ্যে সে দেশ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি আমরা, তা দিয়ে সেখানকার একটা ছবি অঁকা যেতে পারে। ছবিটা স্পষ্ট হবে না হয়তো; কিন্তু যা হবে, বৈচিত্র্য-সৃষ্টির দিক দিয়ে তাও বড় কম নয়।

চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রধানত দু'প্রকার শিলাস্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর শিলাস্তর এবড়ো-খেবড়ো এবং উচ্চনিচু। দেখতে এরা হালকা রঙের। কারণ, যে পরিমাণ সূর্যকিরণ এরা পায়, তার শতকরা ১৮ ভাগ পর্যন্ত এদের থেকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অপর এক শ্রেণীর শিলাস্তরের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গাঢ়। এরা সূর্যকিরণের শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ পর্যন্ত প্রতি-ফলিত করার ক্ষমতাবিশিষ্ট এবং আকৃতির দিক দিয়ে এরা বেশ মসৃণ; এত মসৃণ যে এদের হঠাৎ দেখলে কোন ভুল পদার্থের উপরিভাগ বলে ভ্রম হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিলাস্তরগুলোকে বলা যেতে পারে চাঁদের পর্বতমালা। বিরাট এক-একটি অঙ্গুল জুড়ে এদের অবস্থান। তবে চাঁদের দক্ষিণ গোলাধর্মেই এদের সংখ্যাধিক্য। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উপ-গ্রহটির দৃশ্য অংশের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে এরা; আর চাপা ও প্রায় সমতল ভূভাগগুলো জুড়ে আছে সে দেশের এক-

তৃতীয়াংশ। প্রাচীন যুগের জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা ভুল করে এদের 'ম্যারিয়া' বা সমুদ্র বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে সমুদ্র এরা নয়। শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকালেই বোকা যায়, এরা হল পর্বত প্রাচীরে ঘেরা গোলাকার এক-একটি অঙ্গুল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'ক্রেইটার'। এই ক্রেইটারগুলো চাঁদের চাপা অংশগুলোতে যেমন আছে, ঠিক তেমনি আছে পার্বত্য অংশেও। সে দেশের সর্বত্র এদের ছড়া-ছড়ি। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে বলছেন, শুধুমাত্র চাঁদের দৃশ্য অংশেই ১ কিলো-মিটারের চেয়ে বেশি ব্যাসবিশিষ্ট 'ক্রেইটার'-এর সংখ্যা ৩ লক্ষ। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক 'ক্রেইটার' আছে সেখানে; এত বেশি আছে যাদের গুণে শেষ করা আজও অবশি সম্ভব হয় নি। চাঁদে ২০০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ব্যাসবিশিষ্ট 'ক্রেইটার'-এর সংখ্যা পাঁচ। সবচেয়ে বড় 'ক্রেইটার' ক্রেভিয়াস-এর ব্যাস হল ২৩০ কিলোমিটার। এ ছাড়া ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ৩২টি 'ক্রেইটার' আছে চাঁদে।

তবে চাঁদের দেশের কোনো একটি ক্রেইটার বা পর্বতের সঙ্গেই অপরটির হুবহু মিল নেই। সেখানকার সর্বত্র সামঞ্জস্যহীনভাবে ছড়িয়ে আছে ওরা। শ্বিতীয়ত, যে সব প্রাচীর ওদের ঘিরে রেখেছে তাদের সবই 'ক্রেইটার'-গুলোর আয়তনের তুলনায় খুব কম উচ্চতা-বিশিষ্ট।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, চাঁদের রাজ্যে পর্বতের উচ্চতা আমরা মাপছি কি কবে? বিশেষজ্ঞরা বলবেন, এর জবাব অতি সহজ। উচ্চতা আমরা মাপছি পর্বত-গুলোর ছায়ার সাহায্য নিয়ে। শব্দ পর্বত কেন, উচ্চ-নিচু আরও যত জায়গা আছে চাঁদে, আশেপাশে তাদের ছায়া পড়ে থাকে। চাঁদের দিগন্ত থেকে সূর্যের উচ্চতা অনুযায়ী এই সব ছায়ার দৃশ্যবিন্দি ঘটে। ছায়াগুলো সবচেয়ে দীর্ঘ হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়। এদিকে চাঁদের আকাশে সূর্য কোথায় কখন থাকে, তা খুব নিখুঁতভাবে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। অতএব ছায়াগুলোর দ্বা-বিন্দি ঘটছে কেমনভাবে সূর্যোদয় ও

সূর্যাস্তের সময় ওরা কী আকৃতি ধারণ করছে, তা যদি আমরা জ্ঞানতে পারি তবে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে ওদের উচ্চতার হিসেব করা কঠিন কিছু নয়।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, চাঁদের দেশের পাহাড়-পর্বত ও উঁচু-নিচু স্থানগুলোর হিসেবও বিজ্ঞানীরা খুব সঠিকভাবেই করছেন এবং হিসেবে ১০ মিটারের চেয়ে বেশি ভুলচুক হচ্ছে হচ্ছে না। এ ছাড়া 'ক্রেইটার'গুলোর আয়তন মাপবার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা পিছিয়ে নেই। পৃথিবী থেকে চাঁদের বিভিন্ন অংশের কৌণিক দূরত্বের কথা স্মরণ রেখে এই আয়তনের হিসেব কষছেন ওরা। ওদের হিসেব থেকেই পাচ্ছি, 'ক্রেইটার' বা খাটির মতো গোলাকার গর্তগুলোর চারিদিকে আছে দুর্গাকার যে সব পাহাড়-প্রাচীর তাদের কোনটিই খুব-একটা উঁচু নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্রেভিয়াস নামক অভিকার "ক্রেইটার"-টির প্রাচীর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে বড় জোর ১,৬০০ মিটার উঁচু। আর 'ক্রেইটার'-টির সর্বনিম্ন তলদেশ থেকে প্রাচীরের সর্বোচ্চ অংশের উচ্চতা হল ৪,৯০০ মিটার। অতএব দেখছি, ২০০ কিলোমিটার ব্যাসবৃত্ত 'ক্রেভিয়াস'-এব বিরাট গর্ত ও বিপুল আয়তনের ভুলনায় তার প্রাচীরটিকে নেহাৎই নগণ্য বলা যায়। এত নগণ্য যে কেউ যদি এর মাঝখানে দাঁড়ান তাহলে এই প্রাচীরকে দেখতেই পাবেন না। কেন না, প্রাচীর তখন দিগন্তেব অন্তবালে হারিয়ে যাবে।

এ ছাড়া চাঁদের দেশের এই 'ক্রেইটার'গুলোর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের তলদেশ আশেপাশের স্থানগুলোর ভুলনায় নিচে নেমে গেছে অনেকখানি; এবং যতটা কবে নিচে নেমেছে ওরা, নামতে গিয়ে যে পরিমাণ জায়গা দখল করেছে, পাহাড়-প্রাচীরগুলোর আয়তন হিসেব

করলেও ঠিক সেই পরিমাণ জায়গাই পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, প্রাচীরগুলোর উপাদান এসেছে গোলাকার ঐ সব গর্ত থেকে। আর মনে হয়, ঐ সব গর্ত এবং প্রাচীর একই শক্তির প্রভাব থেকে জাত; অর্থাৎ, যে শক্তি গর্তগুলোকে সৃষ্টি করেছে ঠিক সেই শক্তিই আবার গড়ে তুলেছে ঐ প্রাচীরগুলোকে।

খুব ছোট 'ক্রেইটার'-গুলোর চারিপাশে অবশ্য কোন প্রাচীর নেই। ওদের দেখলে মনে হয়, শূন্যমাত্র গর্ত ওরা, চাঁদের দেশের শানিকটা করে জায়গা ওরা দখল করে আছে।

অতএব দেখছি, চাঁদের 'ক্রেইটার'-গুলোকে সত্যিকারের কোন পর্বত বলা যায় না। বরং বলা যায়, গর্তটিকার মতো চিহ্নে আচ্ছন্ন অস্বত কতকগুলো জায়গা। এ ধরনের জায়গার বিশিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ হল ১৪৪ কিলোমিটার ব্যাসবৃত্ত 'টেলিমিয়াস', 'অ্যালকনাস' (১২০ কিলোমিটার), 'থিয়োসিলাস' (১০৬ কিলোমিটার), 'কোপারনিকাস' (৯০ কিলোমিটার), 'আর্কিমিডিস' (৮০ কিলোমিটার), 'অ্যারিস্টিলাস' (৫৬ কিলোমিটার) প্রভৃতি।

স্পষ্ট উচ্চতা এবং বিরাট ঢাল চাঁদের 'ক্রেইটার'-প্রাচীরগুলোরই শূন্য বৈশিষ্ট্য নয়, সেখানে আরও যে সব পাহাড় আছে, তাদের মাঝেও এই বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে চাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য পাহাড় 'পিটন'-এর কথা ধরা যাক। দুই-তিন মিলিয়ন বছরের ভিতর দিয়ে দেখলে একে একটি উন্নত পর্বতশৃঙ্গ বলে মনে হয়। মনে হয়, এ যেন বিস্তীর্ণ এক সমতলভূমির উপর একাকী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। যেন খুব খাড়া এই শৃঙ্গটি। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাক্সটাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ছায়াব যে পরিমাপ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, খাড়া এ মোটেই নয়; বরং চাঁদে গিয়ে কেউ যদি দাঁড়ায় তাহলে দেখবে এ হল চ্যাপ্টা আকারের অতি সাধারণ একটি পাহাড়। কারণ, 'পিটন'-এর উচ্চতা ২,০০০ মিটার হলেও তার ভূমিদেশের বিস্তৃতি প্রায় ২৮ কিলোমিটার। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোন চূড়া নেই 'পিটন'-এর এবং চাঁদে গিয়ে এ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে দাঁড়ালে তারও মনে হবে, পাহাড়টির শিখরদেশ চোখে পড়ছে না।

চাঁদের অন্যান্য পাহাড়-পর্বতগুলোকে বিশ্লেষণ করেও বিজ্ঞানীরা ঠিক এই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অর্থাৎ ওরা বলতে চেয়েছেন, যথার্থ খাড়া কোন পর্বতশৃঙ্গ সেখানে আদৌ নেই। বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত থেকে অসম্ভব করে নিতে হয়, চাঁদে গিয়ে পাহাড়-পর্বতের কোন

চিত্তাকর্ষক দৃশ্য চোখে পড়বে না। বরং চোখে পড়বে চ্যাপ্টা, গম্বুজাকৃতি ও টিবির মতো যে সব পাহাড় সেগুলো নেহাৎই মৃদু ও একঘেয়ে। তাই সন্দেহ হয় এক-একবার, পৃথিবীর দুঃসাহসী পর্বত-অভিযাত্রীরা চাঁদে গিয়ে রহস্য ও রোমাণ্টের খোঁরাক খুঁজে পাবেন না। অভিযানে বেরিয়ে তুবার বা হিমবাহের সাক্ষাৎ পাবেন না ওরা, প্রকৃতির কোন হঠাৎ-পরিবর্তন বা হঠাৎ কোন তুফান-ঝড় ওদের সঙ্গে শত্রুতা কববে না; এবং এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা, এমন কিছু দুর্গম স্থান বা খাড়া পর্বতপ্রদেশ ওদের অতিক্রম করতে হবে না, দশ জন সাধারণ লোকের চোখে যেগুলো ভীতিকর। অর্থাৎ চাঁদের দেশের পর্বত-অভিযানে বৈচিত্র্য থাকবে না কোথাও; এবং থাকবে না বলেই অসাধারণ কোন বীরত্বের জন্যে অভিযাত্রীদের ভাগ্যে বাহবাও জুটবে না। অথচ ওদের পরিগ্রহ করতে হবে প্রচুর। মাইলের পর মাইল এগোতে হবে এবং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পবও ওঁরা দেখবেন, শিখর মনে করে পাহাড়ের যে অংশে এসে পৌঁচেছেন তা'কে পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশ বলে ভেবে নিতে কিছুতেই মন চাইছে না। মনে বলছে, পৃথিবীতে উন্নত কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে অপরূপ সব দৃশ্য চোখে পড়ে; কিন্তু এখানে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না তার। এদিকে শিখরের সম্মুখে বেরিয়ে দুর্ভোগের একশেষ। প্রতি মুহূর্তে অকসিজেনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। এ ছাড়া শীত যদি হয় তাহলে সূর্যের শাসনে আর রাতি হলে শীতের অত্যাচারে পারিস্থিতি প্রতি মুহূর্তেই প্রাণান্তকর হয়ে উঠছে। অবশ্য সন্দেহ নেই, চাঁদের দেশে পাহাড় বেধে উঠতে অভিযাত্রীদের কম পরিগ্রহ হবে কারণ মাধ্যাকর্ষণ সেখানে স্বল্প। কিন্তু সমস্যা হল, সেই স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের সুযোগ নিয়ে উল্লসিত হবার মতো শূন্য মুহূর্ত আদৌ সেখানে আসবে কি? সেখানকাব ভরাবহ দিন-রাতি পর্বত-অভিযাত্রীদের সামনে আদৌ কি কোন আশার জ্বল বদতে পাবে?

বিশেষজ্ঞরা বলেন, না। আশান্বিত হবার মতো কোন উপকরণ চাঁদের পর্বত-অভিযান থেকে মিলবে না। অভিযাত্রীরা কোন দিক দিয়েই উৎসাহিত বোধ কববেন না সেখানে। বরং সেখানে বসে দুই-তিন মিলিয়ন বছরের ভিতর কেউ যদি ফেল-আসা পৃথিবীর দিকে তাকান, তবে তার অনুশোচনাই হবে। মনে হবে, বড় ভুল করেছি; পৃথিবীকে উপেক্ষা করা ঠিক হয় নি। তার হিমালয়ের হাজার ভাগের এক ভাগ বৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত। তবে বৈচিত্র্য চাঁদের দেশে একেবারেই যে নেই তা নয়। 'ক্রেইটার' এবং 'ম্যারিয়া'

রক্তযুগের বিপ্লবী গদ্য

উপেক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উপপঞ্চাশী, সিমফি, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সম্মান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১০৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

গল্লো ছাড়া সেখানে আছে গম্বুজাক্রান্ত এক ধরনের পদার্থ এবং বিচিত্র সব আলোকবিশ্মি। কিন্তু খুবই নগণ্য পরিমাণে আছে এরা। চাঁদের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে 'ক্রেইটার' এবং 'ম্যারিযা'।

'ক্রেইটার'গুলোর উৎপত্তি কী করে হল, তা' নিয়ে এ যাবৎ অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ওদের সব কটি উৎপত্তি একভাবে হয় নি; এ ছাড়া একই সময়ে গড়ে ওঠে নি ওরা। 'ক্রেইটার'গুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে দু' প্রকার মতবাদ চালু আছে। প্রথমোক্ত মতবাদে বিশ্বাসীরা বলছেন, বাহ্যিক কোন শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে ওবা—চাঁদের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে উল্কা, ধূমকেতু বা গ্রহিকার (asteroids) সংঘর্ষের ফলে ওদের উৎপত্তি হয়েছে; আব শেষোক্ত মতবাদে আশ্বাশানীদের ধারণা, চাঁদের আভ্যন্তরীণ প্রভাবেই এ সব ক্রেইটার-সৃষ্টির মূলে। ওরা বলে থাকেন, চাঁদের তরল পদার্থ ও 'গ্যাস'গুলো ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল যখন, যখন ওরা উপগ্রহটির আশ্রয় থেকে মক্ত হয়ে বাহ্যিক শক্তি ছাড়িয়ে পড়ছিল, তখনই এ সব 'ক্রেইটার'

গড়ে ওঠে। এ ছাড়া এদের দৃষ্টিতে চাঁদের দেশের আশ্রয়গরিব অবদান থাকাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গ্যালিলিও-ই প্রথম চাঁদের পৃষ্ঠদেশের অসমতলতার কথা উল্লেখ করেন। ১৬১০ খৃস্টাব্দে এ-সম্পর্কে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের কথা যখন তিনি ঘোষণা করেন তখন বিশ্বজোড়া বিতর্কের তুফান উঠেছিল। এই ঘটনার ৫৭ বছর পর রবার্ট হুক চাঁদের দেশের 'ক্রেইটার'দের কথা আরও বিস্তারিতভাবে জানানেন। হয়তো বা বাইরের কোন কোন বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ওদের সৃষ্টি হয়েছে, এই কথা বললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই মতবাদ নিয়ে দেখা দিল তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা। বাইরের শক্তির প্রভাবে একদল লোক বিনা বিশ্বাসের মেনে নিলেন। অপর এক দল এ নিয়ে সন্দেহ করলেন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখানে শেষোক্তদের পথ ধরেই এগোব আমরা। আমরা দেখবার চেষ্টা করব, বাইরের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সংঘাতের অবকাশ চাঁদের আছে কি না।

এই আলোচনা সন্দেহ কবতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার,

মহাশূন্যে যে পথ ধরে পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য-প্রদক্ষিণ করে তা' একেবারে ফাঁকা নয়; একেবারে পুরোপুরি শূন্যও নেই সেখানে। বরং সেখানে আছে নান্য আকৃতির ও নানা ওজনের বিচিত্র সব বস্তু। সূর্যলোক থেকে আগত ইলেকট্রনরা আছে সেখানে। আবার আছে অতি ক্ষুদ্রকার ধূলিকণাজাতীয় বস্তু। সৌর-জগতের উৎপত্তির সময়কাল অবশেষ ওরা। ওদের অব্যাহত পদসম্ভার প্রধানত বায়ুশূন্য স্থানে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাশূন্যে এই ধূলিকণাজাতীয় পদার্থ, ও ইলেকট্রনরা তো আছেই, এ ছাড়া আছে ছোট-বড় উল্কা, গ্রহিকা এবং ধূমকেতু। এদের কক্ষপথের আওতার চাঁদ পড়তে পারে কখনও; এবং যদি পড়ে তো এদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়। চাঁদ বায়ুশূন্য বলে সংঘর্ষটা সেখানে পৃথিবীর তুলনায় বড় আকারের হবে এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে, ৪৫০ কোটি বছর ধরে সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে এই ধরনের সংঘর্ষ সেখানে বহুবার হয়েছে।

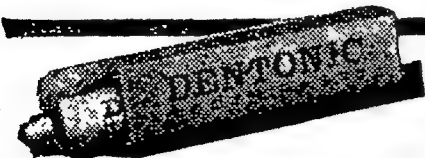
এবার উদাহরণের সাহায্যে এই সংঘর্ষের স্বরূপ-উপলব্ধির চেষ্টা করি

মুক্তার মত ঝকঝক উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেন্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্রোরোফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয় সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্টি ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জরুরি ডেন্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্টি বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মন-ভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেন্টনিক টুথ পেষ্টি।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা-১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১২২, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৭, ১২৪৮, ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫১, ১২৫২, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৬, ১২৫৭, ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭, ১২৬৮, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১২৮৬, ১২৮৭, ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০, ১২৯১, ১২৯২, ১২৯৩, ১২৯৪, ১২৯৫, ১২৯৬, ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০০, ১৩০১, ১৩০২, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮

যাক। ধরে নেওয়া যাক, ১০ লক্ষ টন ওজনবিশিষ্ট একটি উল্কা সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিবেগে চাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন এই ধরণের একটা বিরাট বস্তু যদি এই প্রকার প্রচণ্ড গতিবেগে চাঁদকে এসে আঘাত করে তবে ধামধামের আগে অবশিষ্ট উপগ্রহটির পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেশ খানিকদূর এগোবে সে; এবং এগোবে বুলেটের গতিতে। এদিকে সংঘর্ষের পূর্বে উল্কাপিণ্ডটির মধ্যে যে শক্তি সংহত ছিল, তা হারিয়ে যেতে পারে না। অন্য এক মর্মেতে আত্মপ্রকাশ ঘটবে তার। প্রধানত উত্তাপের আকারে দেখা দেবে এই শক্তি এবং এই উত্তাপ এত মারাত্মক হবে যে সংঘর্ষের সঙ্গে সরাসরি লিপ্ত চাঁদের বিশেষ অঞ্চলটি বাষ্পে পরিণত হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন; এই বাষ্পের তাপমাত্রা হবে ১,০০০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

বলা বাহুল্য; দারুণ উত্তপ্ত এই বাষ্প উল্কাপিণ্ডের তলার চাপা পড়ে থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াবহ বিস্ফো-
রণ ঘটবে তার এবং তার প্রভাবে সংঘর্ষ-
স্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে মারাত্মক
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আর উল্কাপিণ্ডের
চারদিকে যে কঠিন পদার্থ পড়ে থাকবে,
পরিমাণে তা খুব বেশি হবে না। কারণ,
সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ পদার্থই
বাষ্পীভূত হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে মহা-

শূন্যে। এ ছাড়া স্রোতের কিছু অংশ
চাঁদের বিরাট কোন এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে
পড়াও বিচর নয়।

এদিকে বিস্ফোবক পদার্থের সাহায্যে
পৃথিবীতে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাদের
সাহায্যে চাঁদের কোন কোন 'ক্রেইটার'-
সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা যায়। দেখা যায়,
অনেক 'ক্রেইটার'-এর জন্ম উল্কাপিণ্ডের
সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে হলেও হতে পারে।
কিন্তু এইভাবে চাঁদের বিভিন্ন শ্রেণীর
'ক্রেইটার' উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না।
কারণ 'থিয়োফিলাস', 'কোপারনিকাস'
প্রভৃতি কিছু 'ক্রেইটার' আছে চাঁদে যাদের
আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার বাটির মতো এবং
যাদের মাঝখানে আছে পর্বতশৃঙ্গের মতো
উঁচু জায়গা। আর 'ক্রেভিয়াস', 'টলেমি',
'অ্যালফনসাস' প্রভৃতি 'ক্রেইটার'গুলোর
ভূমিদেশ সম্পূর্ণ সমতল। এদের মাঝখানে
কেন্দ্রীয় কোন পর্বতশৃঙ্গ চোখে পড়ে
না। বরং এদের দিকে তাকালে মনে হয়,
পার্মবর্তী 'ম্যারিয়া'গুলোর মতোই
এরাও যুগের বর্ণের। এই শেষোক্ত শ্রেণীর
'ক্রেইটার'গুলোর সৃষ্টি উল্কা থেকে
হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন না।
উপরন্তু অনেককেই বলতে শোনা যায়,
পৃথিবীর পরীক্ষাগুলো থেকে উল্কার
সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের যে কাল্পনিক চিত্র
উদ্ঘাটিত হয় তার সঙ্গে প্রথমোক্ত 'ক্রেই-

টার'দের কিছুটা মিল আছে। অবশ্য
এই মিল এমন কিছু নয় যা আমাদের কোন
স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

কারণ, প্রথমোক্ত শ্রেণীর 'ক্রেইটার'গুলোর
মধ্যেও অনেক সময় প্রকৃতিগত বিভিন্নতা
চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'কোপার-
নিকাস' জাতীয় কয়েকটি গভীর
'ক্রেইটার' বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই
শ্রেণীর 'ক্রেইটার'-এর কোন কোনটির
কেন্দ্রীয় উচ্চাংশ থেকে আলোকরশ্মি
বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। স্পষ্ট চোখে
পড়ে, সেই রশ্মিগুলো শৃঙ্গের মতো
চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকটা
দূর অবধি ছড়িয়েছে ওরা এবং কেন্দ্রীয়
উচ্চাংশটিকে ভিস্তিমূল করে ওরা বেন
বৃত্তাকার খানিকটা জায়গা জুড়ে
ডোরা কাটা কাটা রশ্মিজালের সৃষ্টি
করেছে। এই দৃশ্য দেখে অনুমান করা
অন্যায় নয় যে, উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষের
ইলাভ মিলছে এখানে এবং এই সংঘর্ষ
থেকেই চাঁদের পৃষ্ঠদেশের বেশ খানিকটা
অংশ যে একদিন ছিটকে বেরিয়ে এসে-
ছিল, তারও প্রমাণ মিলছে। কিন্তু এই
প্রসঙ্গে অসুবিধে হল যে, এ-জাতের সব
রকম 'ক্রেইটার'-এর ব্যাখ্যা উল্লিখিত
উপায়ে করা চলে না। উদাহরণ হিসেবে
বলা যায়, 'থিয়োফিলাস' নামক 'ক্রেই-
টার'টি গভীর; কিন্তু ওতে এ ধরণের
আলোকরশ্মি একেবারেই অনুপস্থিত।

এ ছাড়া উল্কার সঙ্গে জড়িয়ে চাঁদের
'ক্রেইটার'-দের ব্যাখ্যা করার পথে অন্য
অন্তরায়ও আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,
অন্তরায়টি ভূকম্পনসংক্রান্ত সমস্যার
মধ্যে নিবদ্ধ। ওদের ধারণা, জটিল
সব উল্কা চাঁদকে আঘাত করে থাকলে
তাদের প্রভার ভূকম্পনের আকারে সমগ্র
উপগ্রহটিতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য; এবং এ
ধরণের কম্পন সত্যি যদি সেখানে বার বার
হরে থাকে, তবে চাঁদের 'ক্রেইটার' প্রাচীর-
গুলো বা পাহাড়-পর্বতগুলো নিশ্চয়
আতঙ্কিত অবস্থিতিতে থাকত না।

অতএব দেখছি, চাঁদের জগৎ নিয়ে
ভারনার অবশিষ্ট নেই। যুগে যুগে অনেক
গবেষণা হয়েছে সে দেশ নিয়ে। তাই
এখন প্রশ্ন করছেন অনেকেই, সার্ভে-
য়ার-ও কি সে গবেষণায় নতুন কিছু
আলোকপাত করতে পারবে? কয়েক
শতাব্দী ধরে পৃথিবীভূত হয়েছে যে ভাবনা,
সার্ভেয়ার সিরিজের মহাকাশযান পারবে
তার জট খুলতে?

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা-৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

কোম্বা - মাদ্রাজ - দিল্লী - নবগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - পোহান্না

বঙ্গদেশ ও দেশে শিল্পীরা এক এদেশ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এ্যাবসার্ড নাটক : ইউনেস্কো সম্মুখে গত কয়েক সপ্তাহ থেকে সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে আলোচনা শুরু করবার পর প্যাভলভ ইনস্টিটিউটের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের তরফ থেকে আমন্ত্রণ এল তাঁদের আয়োজিত 'আধুনিক নাটকে বিচ্ছিন্নতা'-র আলোচনায় যোগ দিতে। এ্যাবসার্ড নাটকের রচয়িতাদের—যথ্যা, বেক্ট, ইউনেস্কো, এডাম্ভ, এরাবেল, এলবি, পিণ্ডার প্রমুখের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ যে এঁরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাটক লিখছেন। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত হল এইসব নাট্যকারেরা মানবজীবনের ওপর ভিত্তি করেই অনেক ভ্রু এবং তথ্য পরিবেশন করছেন নিজেদের রচনায়—কিন্তু তাঁদের রচনাপদ্ধতি অত্যন্ত abstract ও একঘেয়ে। এ-জাতীয় লেখার কাহিনী, বৃত্তিপূর্ণ সংলাপ, স্বাভাবিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বলতে কিছু নেই—এসব নাটকে জীবন প্রতিবিস্তৃত নয়—সুতরাং জনসাধারণ এ জাতের রচনায় আকৃষ্ট হতে পারে না—এসব রচনা মৃদুশব্দময়ের জন্য—এ জাতীয় নাট্যকারদের মেটাফিজিক্যাল প্লে' রাইট বলাই বিধেয়।

সে যাই হোক, বাংলা নাটকে বিচ্ছিন্নতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না—কারণ বাংলায় যে দুটি বা একটি এ্যাবসার্ড নাটক হয়েছে

তা দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয় নি। তাই সেদিন বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক শ্রীযুত সূধী প্রদানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে একটা দিন ঠিক করে নিলাম এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শোনবার জন্য। আই, পি, টি-এর প্রথম যুগের প্রধান কর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন এই সূধী প্রধান। সূধীবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, তুলসী লাহিড়ী মশাই ছিলেন সত্যিকার আদর্শবাদী শ্রেণীর লোক—আই, পি, টি-এর সাহায্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে পরে যেসব লোকেরা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে নিজেদের আখের তৈরি করেছে তাদের সঙ্গে সূধীবাবুদের কোনদিক থেকেই মেলে নি। এ রকম একটি দলের লোক এক নাট্যসংস্থা তৈরি করে তুলসীবাবুদের নানাবিধ সাহায্যের স্কারাই বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন তথাকথিত কেন্ট্রিস্ট হয়ে ওঠেন। অথচ তুলসী লাহিড়ী মশাই যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে জীবনের শেষ ক'টা দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং তাঁর অর্থ সাহায্যের দরকার ছিল তখন সূধীবাবু ওই কেন্ট্রিস্ট মন্ত্রণার কাছে গিয়ে তুলসীবাবুর জন্য সাহায্য রজনীর অভিনয়ের প্রস্তাব করতে গিয়ে কিভাবে নাজেহাল হয়েছিলেন, সে বিবরণ আমি পরে সূধীবাবুর বর্ণনা থেকে বঙ্গমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরব।

নাটকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সূধীবাবুকে যে-ভাবে প্রশ্ন করি এবং তিনি বা উত্তর দেন তা নিচে দেওয়া হল :

প্রশ্ন—বাংলা নাটকে বিচ্ছিন্নতা বলতে আমরা কি বুঝি?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে সকলেই দমাম বোঝেন না। গত বছর থেকে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন একটা নাট্য প্রতিষ্ঠান—যার মধ্যে কিছু মানসিক রোগের চিকিৎসকও আছেন। সেই কারণে ইংরাজী শব্দ এলিনিয়েশনের অর্থ কেবল বিচ্ছিন্নতা ধরতে রাজী নই—এর সঙ্গে মানসিক রোগের আলোচনাও জড়িত থাকা স্বাভাবিক। অতীত ডিকসনারীতে তাই আছে—এলিয়েনজম অর্থে। অবশ্য ডাক্তারবাবুরা সাহিত্য প্রসঙ্গে রোগের কথা তুললেন বটে—(এখানে সূধীবাবু প্যাভলভ ইনস্টিটিউটের একদিনের বক্তার বিষয় উল্লেখ করছেন) কিন্তু তাঁরা এবং অন্যান্য বক্তারা বিচ্ছিন্নতাকে নিঃসঙ্গতার সমার্থক করলেন—এমন কি একজন চিকিৎসক বললেন যে শিল্পকার্যের জন্য নিঃসঙ্গতা প্রয়োজনও বটে। অর্থাৎ লেখকমারাই যখন রচনা করেন—তখন তা ভিড়ের মধ্যে বসে করেন না—বা ভিড়ের মধ্যে বসে বড়জোর সাংবাদিকতা করা যায়—মহৎ শিল্পকার্য করা যায় না। কিন্তু এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন—তাহলে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে কি উত্তর ভদ্রলোকেরা অকারণে চেঁচামেচি করছেন? সাহিত্যে বা বিশেষ করে নাটকে রচয়িতার বিচ্ছিন্নতাবোধ কি সম্প্রতিকালে প্রকট নয়?

উত্তর—বিচ্ছিন্নতাকে যদি সংযোগহীনতা বলতে দেওয়া হয় তাহলে সে সমস্যা সাহিত্যের আদিকালের সমস্যা। আর সে সমস্যার দুটি দিক আদিকাল থেকেই আছে। একটি হচ্ছে লেখকের ইচ্ছা বা চেতনাগত এবং আর একটি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগত। অবশ্য আলোচনার জন্য এ দুটিকে পৃথক করে দেখলে এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময়ই মনে রাখা দরকার। লেখক ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষিত এবং অবসরভোগী শ্রেণী থেকে আসেন। এই অবসর কথাতার ওপর জোর দেওয়া দরকার। বই লিখে জীবিকা নির্বাহ করার অবস্থার আশার আগে তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় থাকা চাই, যার তিনি চিন্তা ও অভ্যাসের স্কারা রচনাকার্যে ব্যাপ্ত থাকতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর এমন অর্থনৈতিক অবস্থা থাকা চাই—যে কলম ধরার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আহার ও বাসস্থানের জন্য সদানিয়ত চিন্তিত না হন। এরপর তিনি যদি উপন্যাস লিখতে ইচ্ছুক হন—তাহলে অধিকাংশ

কেউই তিনি যে সমাজের মধ্যে বাস করেন—তার অভিজ্ঞতা এবং নিজ জীবন-দর্শনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া থেকে লিপ্ত থাকবেন—এই আশা করা যায়। এর অর্থ লেখক হিসাবে তিনি সমাজের সঙ্গে সংযোগ করছেন বা সংযোগ বৃদ্ধি

করছেন—এই কথা বলা যায়। এই কাজ তিনি যত নিষ্ঠার সঙ্গে করবেন ততই তাঁর রচনা বিচ্ছিন্নতার দায় থেকে মুক্ত হবে এবং তাঁর অভিজ্ঞতার পারিধি মত বাড়বে, তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধিশালী করবে, ততই তিনি প্রভাবশালী লেখক হিসেবে

পরিচিত হবেন। আমি প্রভাবশালী কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করছি যে তিনি প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া যার পক্ষেই কলম ধরুন না কেন—পাঠকসমাজ তার প্রভাব বোধ করবে। আমি আগেই বলেছি যে লেখকের ইচ্ছা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে



পি এন বি ট্রাভেলার্স চেক

যখনই প্রবাসে যাবেন পি এন বি-র
ট্রাভেলার্স চেক সংগ্রহ নিতে ভুলবেন না।
কোন ঝুঁকি নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই।
নিশ্চিত্তমনে বেড়িয়ে বেড়ান। হারিয়ে গেলে
আবার নতুন ট্রাভেলার্স চেক দেওয়া হবে।
বিভিন্ন পরিমাপের ট্রাভেলার্স চেক পাওয়া যায়।

পি এন বি-র ট্রাভেলার্স চেক বিনা
কমিশনে দেওয়া হয়।

গাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লেখক প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রাণীর আবেগ ও তাকে প্রভাবান্বিত করে—কিন্তু পশুর সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য, তা হচ্ছে এই যে মানুষ প্রবল ইচ্ছায় তার পারিপার্শ্বিকে অতিক্রম করতে পারে, পরিবর্তনও করতে পারে। এই পরিবর্তনের কাজে একক মানুষকে বহু জনের যত্ন প্রচেষ্টার আসতে হয় যে লেখক সেই পরিবর্তনের বোধ চেষ্টার নিষ্পত্তি—সে কদাচিৎ বিচ্ছিন্নতার রোগে ভোগে।

আমি এইবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের কথা বলি। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ জন নিরক্ষর। আমাদের সাময়িক পত্র এবং পুস্তক প্রকাশালয়গুলি কোন আদর্শ অপেক্ষা প্রধানত মনোযাজ্ঞের জন্য নিষ্পত্ত—যদিচ বাইরে কোন-না-কোন আদর্শের ভেতল নিয়ে তারা আছে। আগাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও এমন একদেশদর্শী যে তার ফলে জনসাধারণের সামান্য যে অংশ লেখাপড়া শেখে—তাদের মানসিকতার প্রসার অপেক্ষা বিপ্রান্তিই বেশি হয়। আর তা ছাড়া গরুর গাড়ি থেকে জেট সেনের এই যুগে এদেশে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের সঙ্গে অতি আধুনিক বিটলেপনা—এই বাড়ির আবহাওয়ায় বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়।

লেখক বা নাট্যকার এই অবস্থার মধ্যে থেকে তাড়াতাড়ি সাফলাল্য করতে চাইলে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার বিস্তার সম্পর্কে তাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

এই কৌশলকে আমি সেলসুম্যান-শিপের সঙ্গে তুলনা করতে চাই—একে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা বলতে চাই না—যা বলতে চাইছেন মানসিক রোগের ডাক্তাররা। রোগ বা রোগী বললে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের সাহিত্যিক নামের কৌশলবাজেরা কেউই রোগী নন—প্রত্যেকেই জ্ঞানগাপী। পুরনো দিনের ইতিহাসের নামে সাহেব-বিবি-বাদশা-বেগম নিয়ে হাঁরা বিশপ'চিশ টাকা দামের সাহিত্য সৃষ্টি করছেন—তারা কি জানেন না কোনটা বর্তমান জীবনের নাটকীয় বিষয়বস্তু। সেসব বিষয়বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তো একটা মত প্রকাশ করতে হতে পারে—‘কমিটেড’ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু তাহলে যে যারা পরস্যা দিতে পারে, যেভাবে দিতে পারে—তারা চটে যাবে। আর ‘বাজারের’ মালিকরা চটে মেলে রাতারাতি বাংলা উপন্যাসের দশখানার মধ্যে একখানার লেখক হবার

সৌভাগ্য হবে না—অর্থাৎ সমস্ত প্রচেষ্টার ফলও যে তাদের হাতে।

এইসব কারণে এদেশের পুরনো ইতিহাস ও ইউরোপীয় অবক্ষারী সাহিত্যের আস্তাকুঁড় থেকে নানা রকমারি মালপত্র যোগাড় করে তার ওপর আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর তা কেবল কথা-সাহিত্যে নয়—নাটকেও কয়েক বছর ধরে শুরু হয়ে গেছে।

স্বভাববাদী এবং কিমতিবাদী নাটকের নামে পশ্চিম ইউরোপের অবক্ষারী ধন-তান্ত্রিক সভ্যতাজাত নাটকগুলিকে এদেশের কাপড়-চোপড় পরিণে ঘষে-মেজে পরিবেশন করা হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় পূর্বোক্ত সাহিত্যচর্চার বাঁরা ধারক ও বাহক—তারা এইসব নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ‘বিবর’-কে নিয়ে বাঁরা বেশি মাতামাতি করেছেন—তারা ই বাদল সরকার আর পিরানদেল্লোর বিকার-গ্রস্ত নাটকের সোচ্চার পৃষ্ঠপোষক। এঁদের কেউ-ই বিচ্ছিন্নতার রোগে ভুগছেন না—এঁরা জেনে-শুনেই একাজ করছেন। জনসাধারণ প্রতিদিন জীবনের নানাক্ষেত্রে পরিবর্তনের তাগিদে যে নাটক সৃষ্টি করছেন তার থেকে এঁরা সবচেয়ে দূরে সরে গিয়ে সমাজের নগণ্য উচ্চশ্রেণীর বিকৃত জীবনযাত্রার ছবিতে জনসাধারণের জীবনের ছবি বলে ঢালাবার চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য বৃশ্চিকারী প্রাণী দোদুল্যমান অংশকে করিষ্ক মতবাদের জারকে মোহাজ্জম করা, নিষ্কিয় করা বা নিরপেক্ষ করা।

এই প্রসঙ্গে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর মশায়েরা কৃষক প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কিত নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কি হল—বাংলা নাট্য ইতিহাসে তা জানা যায় না। তবে মাইকেল ও দীনবন্ধুর এই ধরনের চেষ্টার জমিদার পৃষ্ঠপোষক এবং সাহেবরা চট্টাইলেন। জমিদার আত্মীয়ের অনুকরণে এক বিদ্যুৎপাতক ভূমিকার অভিনয় করার জন্য নটগুরু অর্ধেন্দ্রশেখর মস্তাফীকেও আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিগাহীত হতে হয়েছিল। ঐ যুগের আরও কয়েকটি ঘটনার পর নাট্যকার ও শিল্পীরা বেশিদূর অগ্রসর হন নি। কিন্তু এই ঘটনাগুলির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ইচ্ছাকৃত বেদীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সংস্কারবাদী আবহাওয়ার স্বয়ং দেশে সংগঠিত জাতীয় যুগান্ত আন্দোলন প্রবল হয় নি, তখন লেখকরা বাধার সম্মুখে পড়ে সরে গেলেন

এইমাত্র। সেই হিসাবে গিরিশ ঘোষের ‘চৈতন্যলীলা’ অভিনয়—অর্থাৎ স্বভাববাদের মারকতে নৈতিক প্রচার করে সংস্কার বৃশ্চিকার একটি প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

আধুনিক যুগের অনেক প্রগতিশীল নাটকেও এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোনেশিয়া, কিউবা, কঙ্গো বা ভিয়েতনাম নিয়ে যে নাটক—তার বিষয়বস্তু এই-দেশের ঘটনা, চরিত্র এবং সংঘাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নিয়ে। এই সকল প্রবল জনসাধারণকে বতাই সচেতন করা যায়—ততই মঙ্গল। কিন্তু এইসব দেশের সমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্যার যে যোগাযোগ আছে, তা না থাকায় এই নাটকগুলির অধিকাংশ দর্শক আসে সচেতন রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্য থেকে—যারা সংখ্যায় খুব অল্প। আর ব্যাপক নাট্যরসিক জনসাধারণকে অবক্ষয়বাদী সূনারকোটের বিষের বাড়ি খাওয়াচ্ছেন—স্বভাববাদী ও কিমতিবাদী নাটকের মারফতে।

আমেরিকার সঙ্গে কিউবার বিরোধ—তাই সে কিউবার চিনি কিনবে না—আর আমার দেশের চিনি অত্যন্ত কম দামে আমেরিকার পাঠিয়ে আমরা চিনির স্বাভাবিক অকারণ পরস্যা বার করি। ভিয়েতনামের ধানের ক্ষেতে মার্কিন বিমান ফেরিফেরি ফল নষ্ট করছে—আর মার্কিনীদের চাপে আমরা ভিয়েতনামের সঙ্গে সাধারণ ব্যবসা করতে পারছি না। এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে কি আমরা নাটক লিখতে পারি না—যা আমাদের ব্যাপক জনসাধারণের শিক্ষণত্বকে মেটাতে পারে? এও কি এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা—যার অপরদিকে আছে বাদল সরকার আর পিরানদেল্লো মার্কী অবক্ষয়বাদ?

কিন্তু প্রথমটাকে আমি অক্ষমতার সমস্যা—অথবা সরকারী বাধা অনুমেন করে ভিন্ন দেশের ঘটনার মারকতে বর্তমান অবস্থা প্রকাশ করার চেষ্টা বলতে পারি—যা কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে আন্তরিক—আর কিছু কিছু লোকের পক্ষে ব্যবসাগত। অপর পক্ষের প্রধানরাত্তি নিশ্চয় ব্যবসার উদ্দেশ্যেই স্বভাববাদ ও উদ্দেশ্যহীন নাটক করছেন—এমন চটকদার বালির আড়ালে যার ফলে সেটাকে ইউরোপের সর্বাধুনিক বিষয় বলে কিছু কিছু অনুকরণকারীরা অনুকরণ করতে লেগে গেছেন। কাজেই এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কোন সম্পর্ক নেই।

এইভাবেই সুধীব্যব তার বক্তব্য শেষ করেছেন।



ফিল্ম ফাইনালস কর্পোরেশনের লোকসান

ভারতের ফিল্ম ফাইনালস কর্পোরেশনের চলতি বছরে (১৯৬৬-৬৭) পাঁচ লক্ষাধিক টাকা লোকসান হয়েছে। ফিল্ম কর্পোরেশনের বার্ষিক রিপোর্টে একথা প্রকাশ করেছে। এই কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত এক লোকসানের কারবার বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। গত বছর এই কর্পোরেশনের লোকসানের অঙ্ক ছিল দুই লক্ষ টাকার বেশি। ফিল্ম কর্পোরেশনের জন্মের পর থেকেই কিছুটা লোকসান প্রতি বছরই হচ্ছে। এতে আর্থিক ক্ষতি নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন গঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে বিবেচনা করলে এমন বিচলিত হবার কিছু ছিল না।

ফিল্ম ফাইনালস কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য ছিল নতুন প্রতিভাধর পরিচালক এবং উন্নত চিন্তার প্রযোজকদের ছবি করতে উৎসাহ দেওয়া; চলচ্চিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দেওয়া। এই উদ্দেশ্য যে একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে এমন বলা চলে না। কয়েকজন প্রগতিশীল ও নতুনচিন্তার প্রযোজক ছবি নির্মাণের জন্য কর্পোরেশনের সহযোগিতা লাভ করেছেন। তাদের কারো কারো ছবি বক্স অফিসের দিক থেকে সার্থক হয়েছে, কারো ব্যর্থ হয়েছে। যাদের ব্যর্থ হয়েছে তাদের টাকা ফিরে পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছে। চলচ্চিত্র বিকাশের সহায়তার জন্য অর্থ খরচ করে সে অর্থ যদি ফিরে পাওয়া না যায় তার একটা হুতি ও সাহসনা থাকে। লোকসান হলেও চলচ্চিত্রের সামগ্রিক উন্নতির বিবেচনায় এটা আসলে লোকসান নয়।

কিন্তু ফাইনালস কর্পোরেশনের লোকসান একারণে হয়েছে কিনা সেদিকেই লক্ষ্য রাখা। আমরা গতদূর জানি অনেক প্রগতিশীল ও প্রতিভাধর পরিচালক কর্পোরেশনের টাকার ব্যাপারে জটিলতা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য লাভ করেন নি, বা গ্রহণ করতে পেরেন নি। কর্পোরেশন এতদূর জটিলতা সৃষ্টি করেছেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যারা ভারতে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, যাদের ছবির জন্য ভারত ছাড়াও বৈদেশিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যাদের ছবি ভারতের বাইরের বিভিন্ন দর্শকদের মনে ভারত সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়—তারা কি ফিল্ম কর্পোরেশনের আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেছেন?

ফিল্ম কর্পোরেশনের গঠনের সময় থেকে লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পর্যায়ক্রমে জন্য টাকা খাটাবার ব্যাপারে তারা বেশি উৎসাহী। পর্যায়ক্রমে টাকা খরচ করলে সে টাকা তাড়াতাড়ি উঠে আসতে পারে। এতে কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক না হলেও—কর্পোরেশনকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করান যায়। সম্ভবত কর্পোরেশনের পরিচালকরা এখন এদিক থেকে বিবেচনা করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হল কেন? ভাল কাজের জন্য লোকসান হলে হতাশ হবার কিছু নেই, কিন্তু পর্যায়ক্রমে উৎসাহ যোগাতে লোকসান হয়েছে কিনা সেটা জানা দরকার। আসলে ফিল্ম ফাইনালস কর্পোরেশন না-লাভ, না-লোকসান এই নীতিতে পরিচালিত হওয়া দরকার। এই নীতিতে সূদের ব্যাপারে কিছু তারতম্য থাকা উচিত। প্রগতিশীল বিষয় ও প্রতিভাবান প্রযোজকদের ক্ষেত্রে সূদের হার কম থাকবে, কিন্তু পর্যায়ক্রমে প্রযোজকদের ক্ষেত্রে বেশি সূদ নেওয়া যায়। কারণ তারা ব্যবসার জন্য ছবি করছে। তার সংগে শিল্পের বিকাশের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত মনোভাষা যেখানে প্রেরণা সেক্ষেত্রে সংগে আদর্শের প্রেরণায় যারা ছবি করতে আসে তাদের এক পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। প্রগতিশীল বিষয়ে ছবি নির্মাণে উৎসাহ দেওয়াই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য। কাজেই পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হত তবে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু এখন ব্যাপারটা অনুসন্ধানযোগ্য যে ব্যক্তিগত মনোভাষালোভীদের উৎসাহ দিতে এই লোকসান হচ্ছে কি-না।



অরুণাত মজুমদার

সুপরিচিত মূকাভিনেতা অরুণাত মজুমদার গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে মূকাভিনয় প্রচলনের ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী—অরুণাত তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কয়েকটি অনুষ্ঠান শিল্প-চিন্তার দিক থেকে রসিকজনের ম্বারা বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল এবং শিল্পী হিসাবে তিনি মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শহরতলীতেও তিনি মূকাভিনয় প্রদর্শন করে এই শিল্প-রীতিকে জনপ্রিয় করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে মূকাভিনয় শিল্পরীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

গত ১৬ই এপ্রিল একটি অনুষ্ঠান হতে ফেরবার পথে কয়েকজন শিল্পীসহ তিনি মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁর সপ্নে যারা ছিলেন তাঁরা নিহত হন, তিনি সংগ্রাহী অবস্থায় এম্বাং হাসপাতালে ছিলেন। হাসপাতালের চিকিৎসকগণ তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, শিল্পসমাজ এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আমরা এই শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।



মুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এন্টনী ফিরিংগী' ছবিতে তন্মজা

নাটকের কথা

যখন এক

পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে নান্দীকার নাট্যসংস্থা এক সুপরিচিত নাম। এই সংস্থা উপস্থাপনা রীতি ও অভিনয় উৎকর্ষতার গুণে নাট্যরসিকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এঁদের নির্বাচিত নাটকগুলিকে যদিও প্রগতিশীল নাটক বলে অভিনন্দন জানান চলে না, কিন্তু অভিনয়, পরিচালনা দক্ষতা, সংলাপ রচনা এবং মঞ্চ কলাকৌশলে দর্শকদের কাছে

উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এদিক থেকে নান্দীকারের নাটক দেখতে দর্শকরা কোতুলক প্রকাশ করেন। পিরানদেজোর 'নাট্যকারের সম্মানে ছয়টি চরিত্র' এবং 'শের আফগান'-এর মত নাটকের মণ্ডরূপ দিয়েছেন; কিন্তু শিল্পস্বীকৃতি লাভ করেছে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (চেবব)-তে। এবার এঁদের নতুন নাটক 'যখন এক'।

আনন্ড ওয়েস্কার-এর নাটক অবলম্বনে এই নাটকের বাংলা রূপান্তর করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কালোপযোগী পটভূমিকায় মূল নাটককে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এক দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবার, কালের চিন্তার দিক থেকে এরা পেছনে পড়ে আছে। যদিও এরা সকলেই বাসের

ড্রাইভার বা কর্মী কিন্তু ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনে বিশ্বাসী না। সম্মতি যোগদান করে না। শ্রেণী চেতনা নেই। এই পরিবারের ছোট্ট মেয়ে পিতার জন্ম-পড়া শিখে দিল্লীতে চাকরী করতে গিয়ে এক নতুন চিন্তারাজ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। চিন্ময় নামক এক যুবককে সে ভালবাসে, এই চিন্ময়ের প্রতি তার প্রেম এবং চিন্ময়ের জীবন-দর্শন ওর কান্না একাকার হয়ে যায়। বীথির বহিঃপ্রাণ চিন্ময়ের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। যে নতুন জীবনচিন্তায় সে উন্মুখ হয়েছে, তার কতটা চিন্ময়ের প্রতি প্রেমের সন্ধান। তার কতটা তার নিজস্ব উপলব্ধি এবং চেতনা তার তফাৎ বোঝা যায় না। বীথি ছোট বাড়িতে এসে তার নতুন চিন্তার একটা চমক সৃষ্টি করল, কিন্তু নবজীবনের অনুপ্রেরণা জাগাতে পারল না। বীথির লোকের কাছে বীথির অনুপ্রেরণার মূল, নতুন পথের দিশারী চিন্ময় আপেক্ষা বীথির প্রেমিকই প্রধান। একদিন এই চিন্ময় আসবে বলে বাড়ির সকলের প্রস্তুতি শূন্য হল—সবার অনেক আশা নতুন আত্মীয়কে বরণ করার উৎসাহ। কিন্তু নির্দিষ্ট মূহুর্ত অতিক্রম করাব পর চিঠি এল চিন্ময় আসবে না। নিজের আত্মসমালোচনা করে চিন্ময় ঠিক নির্দেশ দিল। সবাই হতাশায় ভেঙে পড়ল। বীথিও প্রথমে ভেঙে পড়ল, কিন্তু সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে যেন সম্মত হিশব পেলে; চিন্ময়ের প্রেমের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এবার সে বলল নিজস্ব উপলব্ধির কথা। তার ব্যক্তিসত্তা জন্মগত লাল মখন সে একা। আত্মীয়দের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে—নতুন আলোকজগতের অবগাহন করল।

নাটকটি সংলাপ প্রধান। এট সংলাপ যুদ্ধিদীপ্ত এবং দর্শকদের চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে। বীথি কেবল তার পরিবারের লোকদের নয়, দর্শকদেরও চিন্তা করায়। এবং প্রশংসার কথা যে এই সংলাপ সহজ সরলভাবে ব্যাং হওয়ার কোথাও কেতাবী মনে হয় নি। চিন্ময়ের জন্য প্রতীক্ষা এবং পরিণতি দেখার আগ্রহে যেমন দর্শকদের আগ্রহ ছিল, তেমনি সংলাপ ও অভিনয় উপভোগ করে তৃপ্ত হয়েছে। এদিক থেকে 'যখন এক' অভিনয় সার্থক নাটক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই নাটকের পরিণতি দৃশ্যে। বীথি যখন নতুন চিন্তার আলোকজগতের ব্যক্তি লাভ করল তখন সে একা হয়ে গেল কেন? তার চিন্তা কি পরিবারে পরিবর্তন ঘটাবে না? এবং সে কি ওদের অন্ধতা থেকে বাইরে আনবে না? দর্শককে ছেড়ে



‘দুর্ভাগ্য প্রজাপতি’ ছবির একটি দৃশ্যে কিশোরকুমার ও সবিতা চ্যাটার্জী:

শাস্ত্রের বিকাশ হয় না, দশজনের মধ্যেই মানবের বিকাশ। এদিক থেকে নাটকের শেষ একটা প্রশ্নের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রযোজনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। পরিচালকের ওপর যে

প্রকৃতিবাদের প্রভাব তা আপ্যিক রচনার বোঝা যায়।

‘বখন একা’ নাটকে সকলের অভিনয় ও দলগত কাজ প্রশংসনীয়। একমাত্র রুদ্র-প্রসাদ সেনগুপ্ত (জামাইবাবু) দুর্বল

অভিনয় করেছেন। কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন: মঞ্জু ভট্টাচার্য (দিদি), শেলী পাল (বীথি), দীপালি চক্রবর্তী (মা), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সরকারদাদা), বরুণ সেন (বাবা), কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বৌদি), কমল ভট্টাচার্য (দাদা)। নাটকটি পরিচালনা করেছেন: অর্জিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্টুডিও থ্রু

দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগারটায় অরোরা স্টুডিও-তে মিত্র প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্র ‘দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন’ ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্র্যাপস্টিক দৈন্য পরিচালক বিজয় বসু এবং ক্যামেরা সুইচ অন করেন অরোরা ফিল্মসের কর্ণধার অর্জিত বসু। মহরৎ শিল্পী ছিলেন: অনিল চ্যাটার্জী (চিত্ররঞ্জন) এবং নির্মল চ্যাটার্জী (অরবিন্দ)।



সত্যজিৎ রায়ের ‘চিড়িয়াখানা’ ছবিতে উত্তমকুমার, শৈলেন মদ্যাজী ও সুশীল মজুমদার।



পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত 'মহাভারত' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অজনা ভৌমিক :

মানকতলা বোমার মামলার আসামী হিসাবে জেলে আটক বিপ্লবী অরবিন্দ; তাঁর সপ্নে দেখা করতে এসেছেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন। বৃটিশ শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে যখন দেশের কোন ব্যারিস্টার উচ্চ মামলার আইন পরামর্শদাতার দায়িত্ব নিতে সাহস করেন নি ঠিক সেই মুহূর্তে সদা বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ বিপ্লবী অরবিন্দ বোমার হয়ে মামলা লড়ে তাঁকে ফাঁসী থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এই ছিল প্রথম দিনের দৃশ্য গ্রহণ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কথাসিদ্ধপী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন : অধেন্দু মুখার্জী, এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিরেছেন হেমন্ত মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ করেছেন : অজয় মিত্র। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর চরিত্রে রূপদান করেছেন : লিলা চক্রবর্তী।

‘অধিতীয়া’ ডেইজী ইরানী

অরুণ রায় চৌধুরী প্রযোজিত ‘অধিতীয়া’ ছবির চিত্রগ্রহণে অংশ গ্রহণ

করার জন্য বোম্বাইয়ের বেবী ডেইজী—এখন তরুণী ডেইজী ইরানী কলকাতা এসেছেন। তিনি অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতায় থেকে চিত্রগ্রহণে অংশ গ্রহণ করবেন। নবেন্দু ব্যানার্জী রচিত ও পরিচালিত সঙ্গীতবহুল বাংলা ছবি ‘অধিতীয়া’র একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন ডেইজী ইরানী। ছবিতে তাঁর একটি নাচও থাকবে। হেমন্ত মুখার্জীর পরিচালনার এই ছবির সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন : লতা মুগেশ-কর, আশা ভৌশলে, মদ্রা দে, হেমন্ত-কুমার। ‘অধিতীয়া’র অভিনয় করছেন : মাধবী মুখার্জী, লিলা চক্রবর্তী, সুব্রতা, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, গীতা দে ও নবাগতা সোনালী ভট্টাচার্য। ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

তিন অধ্যায়

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ‘তিন অধ্যায়’ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হবার পক্ষে। শৈলেশ দে রচিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। ছবিতে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেছেন পোপেন মল্লিক। চিত্রগ্রহণ করছেন : রামানন্দ সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়

করছেন : উত্তমকুমার, সুপ্রিয় দেবী, বিকাশ রায়, অন্দপকুমার, জহর রায়, জয়া দেবী, বিদ্যা রায়, অজয় গান্ধী প্রমুখ।

লিপিকা

পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জীর পরবর্তী ছবি ‘লিপিকা’। ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন নুপেন্দ্র মুখার্জী এবং গান গেয়েছেন : হেমন্ত মুখার্জী, মামা বে, শ্যামল মিত্র, শিপ্রা বসু, বনপ্রী সেনগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ করবেন বখাত্রমে : রামানন্দ সেনগুপ্ত, অমিয় মুখার্জী। নায়ক-নায়িকা হবেন : উত্তমকুমার ও মাধবী মুখার্জী। অন্যান্য চরিত্রে থাকবেন : বিকাশ রায়, কালী ব্যানার্জী, সুমিত্রা সান্যাল, শিপ্রা সাহা, রজা ঘোষাল প্রমুখ।

‘জীবনমৃত্যুর তেলঙ্গা ও তামিলরূপ

বাংলাছবি ‘জীবনমৃত্যুর তেলঙ্গা ও তামিল চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে রাজশ্রী পিকচার্সের প্রযোজনায়। তামিল ও তেলঙ্গা দুই চিত্ররূপই পরিচালনা করবেন ভীম সিং। এ বাবৎ তিনি হিন্দী ও তামিল ছবি পরিচালনা করেছেন, এবার তিনি



ম্যাটারিয়ান নাচের একটি দৃশ্য

তেলেগুতে হাত লাগালেন। ছবি দুটি হবে ইন্সট্যান্স বর্ণে। তেলেগু ছবিতে মায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এন টি রমা রাও চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

অবসাদকণী

শাপমোচন

সুদূরহৃদয় সংস্থার প্রযোজনায় গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে স্বাধীনতার 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন হয়েছে। এই নৃত্যনাট্যে নির্দেশনা ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন অসিত চট্টোপাধ্যায়, এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন প্রণব চৌধুরী।

ইন্ডের রাজসভায় শাপমোচন সৌর সেন ও তার প্রেমসী মধ্যস্থীকে নিয়ে রূপ ও ছাব, প্রেম ও মোহের স্বপ্নের কাহিনীকে নিয়ে রচিত এই নৃত্যনাট্যে—অবশেষে প্রেম ও ভাব জয়ী হয়েছে। বাইরের রূপের চেয়ে অন্তরের রূপই কাম্য, এবং মোহের মেঘ কেটে গিয়ে উদ্ভাসিত হয় প্রেম। অন্তররূপ আর প্রেমের জয় জীবনে এনে দেয় সৌন্দর্য ও শান্তি। বিকাশিত করে তোলে জীবনকে। জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্যের এই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে। নৃত্য পরিকল্পনাকার বিশেষ কোন রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল নৃত্যরীতির সমন্বয়ে এই কাহিনীকে নৃত্যে রূপায়িত করেছেন, সংগীতের সহযোগিতায়। যদিও মঞ্চের সংকীর্ণতার জন্য নৃত্যশিল্পীদের অঙ্গ সঞ্চালনে যথেষ্ট বাধা হয়েছে তা সত্ত্বেও প্রতিটি শিল্পী এখানে যে নৃত্যকলাত্মক দর্শন রেছেন তা পরম উপভোগ্য হয়েছে। মধ্যস্থী ও কলিকাকার রূপে গায়ত্রী

চট্টোপাধ্যায়, সৌর সেন ও অরুণেশ্বর রূপে অসিত চট্টোপাধ্যায় নৃত্য পারদর্শিতার তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অংসরা ও কমলিকার সহচরীরূপে শিবানী ও পদ্মিনী দাশগুপ্তা, সুদীক্ষিতা দত্ত ও বুল-বুল বিশ্বাস প্রশংসনীয়। উর্বশীর ভূমিকায় চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরতনাট্য রীতিতে নৃত্যটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ও আনন্দময়।

নৃত্যায়নের সাক্ষ্য সত্ত্বেও 'শাপমোচন' এর পরিপূর্ণ সফল হতে পারে না যথা-যোগ্য সঙ্গীত না হলে। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কমলা বসু, অঞ্জনা জাহিড়ী, মঞ্জু সরকার, সুপ্রিয় ঘোষ ও প্রণব চৌধুরী এবং দীপিকা গুহঠাকুরতা, অলিভা চৌধুরী, দেবদ্বানী সেনগুপ্ত প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছেন। গানগুলি সুগীত এবং দর্শকদের হৃদয় দান করেছে। সংগীত ও নৃত্যের সার্থক সমন্বয়ে 'শাপমোচন' পরম উপভোগ্য নৃত্যনাট্য; সার্থক রূপায়নের জন্য আমরা সুদূরহৃদয় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাগন্তুক

বিশ্বরূপা থিয়েটারে নতুন নাটক 'জাগন্তুক'—এর প্রস্তুতি চলেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগী যুগ্মভাবে নাটকটি লিখেছেন। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে কত স্বপ্নের রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, হোটেল গোপন তথ্য পাচার হচ্ছে, যার ফলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে—এরূপ এক রহস্যময় কাহিনী নিয়ে তরুণ রায় এই নাটকটি পরিচালনা করছেন। এই নাটকে অভিনয় করছেন : স্বপ্নী মজুমদার, স্বপ্নান্বিতা রায়, সুলভা চৌধুরী, তরুণ রায়। আবহ-সঙ্গীতে ডি. বালসার।

সম্মিলিত ম্যাটারিয়ান

আগামী ২রা অক্টোবর মহাজাতি সদনে দুটি ম্যাটারিয়ানের ব্যবস্থা হয়েছে। বেনা ওটল অভিনীত হবে, 'বাজালী', সম্মান্য অভিনীত হবে 'সোনাই দীপিকা'। এই দুটি ম্যাটারিয়ানে অংশ গ্রহণ করবেন স্বপনকুমার, সুজিৎ পাঠক, ভোলা পাল, জ্যোৎস্না দত্ত, ফণি বিদ্যাবিনোদ, পণ্ড সেন, দিলীপ চ্যাটার্জী।

বর্ধমান রেলওয়ে মঞ্চে 'শাস্বত'

আজকাল বাংলাদেশে সৌখীন শিল্পীগণ বেসব নাটকের অভিনয় করেন, শ্রীঅমূল্য সেনের 'শাস্বত' নাটকটি তা থেকে ভিন্ন স্বাদের। আধুনিকতার পরিবেশে বাংলার নারীর চিরন্তন মাত্ররূপ এ—নাটকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি বর্ধমান শহরে এই নাটক অভিনীত হয়েছে। একদা কলকাতার 'অগণন' সৌখীন শিল্পিসংস্থা বিশ্বরূপা মঞ্চে এটি অভিনয় করেছিল।

শিল্পীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রভা

দুজন ছিলেন : শ্রীহরিশ্রী মধুপাধ্যায় (স্পট নিবারণের ভূমিকায়) এবং শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী (চারুর ভূমিকায়)। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীরাও সমানে ভাল রেখেছেন। শ্রীতপন মুখার্জীর বাউল সেজে তিনটি গান এবং কুমারী শিশ্রা ঘোষের কল্যাণীরাপে দুটি গান এ-নাটকের অভিনয়ের বিশিষ্ট সম্পদ। পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

চারপকবি মকুন্দ দাসের নতুন রেকর্ড চারপকবি মকুন্দ দাস সংগীতের স্বনামধন্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্রের মধুপাধ্যায় তাঁর কন্ঠকণ্ঠে মকুন্দ দাসের দুখানি গান "এখনো খোলে নি আঁখি যার" এবং "মা আমার বিস্মরণী" সম্প্রতি H.M.V. কোম্পানীতে রেকর্ড করেছেন। Record No. হলো N83227। সত্যেন্দ্রবাবুর দরদভরা উদাত্তকণ্ঠে গান দুখানি সার্থক হয়েছে ও রসিক শ্রোতার মন জয় করবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ অ্যান্ড্রোলজি
ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ প্রযোজনায় আগামী এই অক্টোবর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরী রচিত বিগত দিনের গণ-সংগীত, কাব্যধর্মী সংগীত ও সাম্প্রতিক রচনা-গুলি পরিবেশন করা হবে। শ্রীচৌধুরী-কৃত সংগীত অনুসারী নৃত্যনাট্য ও ব্যালেও প্রযোজিত হবে। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পবান্ধু ছাড়াও বাংলাদেশের ও ভারতের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন।

একটি চিঠি

সম্পাদিকা, 'সাপ্তাহিক বঙ্গমতী' গমীপেছ,—

সেদিন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। আট বছর আগে এম. সি. সরকার থেকে প্রকাশিত 'প্রেমভারা' নামে সার্কাসের পটভূমিতে আমার একটি উপন্যাস আছে। মাস-খিয়েটাস বলে একটি দল 'এরিনা' বলে যে-নাটকটি ফলকাতার বহুদিন ধরে অভিনয় করছে, গিয়ে দেখলাম সেই নাটকটি হুবহু আমার বই থেকে নেওয়া। কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র, ঘটনা সবই আমার এই বই থেকে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আত্মসাৎ করা হয়েছে। এতদিন ধরে তারা যে-অভিনয় করছেন তার জন্য আমার অনুমতি নেন নি। আমার নাম ব্যবহার করেন নি কোথাও, অন্য লোককে নাট্যকার খাড়া করেছেন এবং বলাই বাহুল্য একটিও পয়সা দেন নি। আপনাদের এই খবরটি জানাবার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছি

সংগীতের চলিতচেহে

সংগীতের এক মা, জীবনকে ভাসিয়ে জীবন-মুখে হারতে চায় নি। জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড ভাবাবেগময় ও দুর্বার নাটকীয় সঙ্গীত কাহিনীর চিত্র-রূপায়ণ



সঙ্গীত: জরাসন্ধ
গীতিকার: পিনাকী মুখার্জী-শ্রী রাজেন সরকার
অভিনয়: চিত্রাঙ্গী বিশ্বাস

সহ-ভূমিকায়: মলিনা, ছায়া, রেণুকা, শমিতা, গীতা, জহর গাঙ্গুলী, কান্দু ধোলাই, উৎপল দত্ত, জহর রায়, আনন্দ মুখার্জী, সুধেন দাস, মাঃ সৌমিত্র, মাঃ মলয় প্রভৃতি

উত্তরা ০ পূর্বী ০ উজ্জ্বলা ০ আলোছায়া

আরো এই জন্য যে, অন্য লেখক-লেখিকারা যেন সাবধান হতে পারেন এবং আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত না হ'ন। একদিক থেকে আমার বদনামও হয়েছে। কারণ, আমার কাহিনী, সংলাপ, ও চরিত্র ছাড়া তাঁরা নিজেরা যে-সব জিনিসপত্র ঢুকিয়েছেন সেগুলি এত মামুলী, সস্তা, এবং অরুচিকর অশ্লীল ধরণের যে, পরোক্ষে আমার কাছে তার দুর্ভার এসে পড়তে পারে। তা ছাড়া আরো অবাক কাণ্ড, আমরা সেদিন এই কথাটা ভালভাবে জানতে গিয়ে 'মাস খিয়েটাস'-এর

কয়েকটি ছেলের যে-আচরণ লক্ষ্য করেছি তা খুবই আশঙ্কাজনক। তারা সেদিন পরিষ্কার স্বীকার করেছে যে, আমাদের অভিযোগ ঠিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা আমাদের আইনের সাহায্য নিতে বলেছে। এখন এই সমস্ত কাণ্ডটির মধ্যে যে একটি স্বৈরাচারী মনোভাব কাজ করছে তা কি নেহাৎ বালকোচিত সৌখীনতা বলে তুচ্ছ করা চলে ?

—মহাশ্বেতা দেবী
৩৬, বিপিন পাল রোড,
কলকাতা—২৬

আমি আপনার সম্প্রদিত "সাপ্তাহিক কলম্বিতী"-র একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক এবং এই পত্রিকার সম্পাদকীয়, নানা বিষয়ের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ-উপন্যাস ইত্যাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই।

সম্প্রতি আপনার ১৩শ সংখ্যা ২১শে ভাদ্রের সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শনের 'বঙ্গদর্শন'ের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'ট্রেন নিয়মিত দৌরতে পৌঁছানোর ফলে যদি ব্যাতিসাধারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, রেলকর্মীদের ও ড্রাইভারদের মারধোর করেন তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।' এই সংখ্যার ১৫শ সংখ্যা ৪ঠা আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন'ের পৃষ্ঠায় হাওড়া স্টেশনের গোলমালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বে লিখিত উক্তির সমর্থনে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমরা কোনমতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে ট্রেনের দৌরিত জন-রেলকর্মীরা (এখানে সাধারণ রেলকর্মীদের কথাই বলা হইতেছে) ও ড্রাইভারদের মারধোর করা হইবে কেন এবং তাহাতে এই জটিল সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইবে? আপনারা ইহাদের মারধোর করার জন্য ব্যক্তিদের দোষ দিবেন না কিন্তু সাধারণ রেলকর্মী বা ড্রাইভার যদি সিগন্যাল না পায় তাহা হইলেও কি ট্রেন চালাইয়া যাইবে? এর ফলে যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলেও তা ড্রাইভারই দোষী হইবে। এভাবে সিগন্যাল দ্বারা দেয়া কন্ট্রোলমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এরূপ নানা কারণে পাঠ, টিকিট কালেক্টর প্রভৃতি সাধারণ রেলকর্মীদের পক্ষে ট্রেন কেন দৌরিতে আসা-যাওয়া করে তাহার কোনও জবাবদিহি করা সম্ভব হয় না অথবা কোনও হাশেই তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। অবশ্য ২১টি ক্ষেত্রে হয়তো কোনও একজন সাধারণ রেলকর্মী যথা ড্রাইভার, গার্ড, স্টেশনমাস্টার বা সিগন্যালম্যান দায়ী হইতে পারে; কিন্তু সে তো বহুর মধ্যে ২১টি ক্ষেত্রে মাত্র। আসলে বোধ হয় ব্যাতিসাধারণ রূপ প্রকাশ করিতে চায়, বড় বড় রেলওয়ে অফিসার দ্বারা রেলপথ পরিচালনা করে যেমন জেনারেল ম্যানেজার, চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতিদের উপর—কিন্তু তাহাদিগকে হাতের কাছে পায় না কলেই সামনে পাওয়া সাধারণ রেলকর্মীদের মারধোর করে। তাই বলিয়া এই মারধোর করাকেই ঠিক বলা যায় কি? সাধারণ রেলকর্মীরা কি আপনারদের এবং ব্যাতিসাধারণের সামান্য সহানুভূতি দাবি করিতে পারেন না?



প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রতিবাদপত্রের দ্বারা গুলীচালনার কোনও সমর্থন করা হইতেছে না কারণ গুলীচালনাই সকল সমস্যার সমাধান নয়; আবার রেলকর্মীদের মারধোর করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীর ও চিন্তাশীল নেতাদের কিছু করার প্রয়োজন আছে। সাধারণ লোকদের মতই সাধারণ রেলকর্মীদেরও অস-বস্ত-শিক্ষা প্রভৃতির কষ্ট আছে, তার উপর ব্যক্তিদের মারধোর খেলে সে কষ্ট শূন্য বাড়বে; সমস্যার সমাধান হবে না।

—জবনীকৃষ্ণ রায়

সম্পাদকীয় বক্তব্য

পত্রলেখক প্রীরারের বক্তব্য সম্বন্ধে বিমত হবার কোন কারণ নেই। সাধারণ রেলকর্মীদের মারধোর করলে সমস্যা মেটে না এ আঁত সত্য কথা। তবে পত্রলেখক মহাশয় আমাদের বক্তব্যকে কিছুটা ভুল বুঝেছেন। দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে যদি রোজকার ব্যতীরা হয়রান হন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি তাঁদের শ্বাসরোধকারী কামরার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়, একদিন নয়, দু'দিন নয়, প্রায় প্রত্যহ, তাহলে ব্যক্তিদের উত্তেজনার ক্রোশটা সাধারণ রেলকর্মীদেরই ঘাড়ে গিয়ে পড়ে এবং অব্যাহত হলেও সর্বদা রোশ করা যায় না। যারা মারধোর করেন স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁরাও যেকোন যে সাধারণ রেলকর্মীদের কিছু করার নেই, কিন্তু উত্তেজনার মাধ্যম তাঁরা কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এটাই আমরা বলতে চেয়েছি। আমরা একথা বলেছি যে নানান কারণে আজ মানুষের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হছে পেছে, রেশনের দোকানে লাইন, অগ্নিমূল্য বাজার, ছেলেমেয়ের মধ্যে দুটি অন্ন তুলে দেবার অক্ষমতা, সব মিলিয়ে মানুষের মানসিক অবস্থা আজ একটা

এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে জাতি অগ্নি কারণেই বিস্ফোরণ ঘটে। তখন সামনে যেই থাকুক, সে দোষী হোক বা নির্দোষ হোক, তার আর রেহাই থাকে না। সমগ্র সমাজদেহে যে গচন ধরেছে এটা তারই অভিব্যক্তি। আমরা সেই দিক থেকেই কথাটা বলছি।

আপনার জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকার প্রখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদাই হয়েছেন। অগ্নিযুগের কাহিনী রহস্যোপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা এই কাহিনীর বেশ কিছু অংশই আজো জানতে পারি নি—এই কাহিনীর অনেক নেতাই আমাদের অজানা রয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি একজন নেতার কথা উল্লেখ করছি যার সম্পর্কে বিশদ তথ্য আমি অনেক অনুসন্ধান করেও পাই নি। এই নেতার নাম বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী বিনি বহুদিন বিদেশে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর একটি জীবনী রচনাও ব্যাঙ্গারে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি নিরাশ হয়েছি। এ বিষয়ে আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকার কেউ যদি আলোকপাত করেন তো বিশেষ উপকৃত হবো। আপনার পত্রিকা মারফৎ এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৭-৯-৬৭ তারিখের সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শন মতীতে প্রকাশিত জীবন দে লিখিত "লালগোলা প্যাসেঞ্জার" গল্পটি চমৎকার; বাস্তবধর্মী, এবং "জনমানুষের দর্পণ"। এইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি এবং প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রতিরোধ করিতে পারে। এ ছাড়া সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শন মতী সস্তা মনোরঞ্জন পথ না গ্রহণ করিয়া, একদাখ্যাত কিন্তু বর্তমানে অধঃগত প্রবীণ সাহিত্যিকদের শ্বাসস্থল হইয়া যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে—তাহাই কাম্য। এই আদর্শ বজায় থাকুক।

—বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

২৮ ই, নদীনা এডিনউ, কলিকাতা-৩০



মোহনবাগান এবং পাকিস্তান পুর্লিশের শীল্ড কোর্টার ফাইনাল খেলার দৃশ্য

আবার দর্শকের উচ্ছ্বলতা

হাঙ্গামা দেখছি আমাদের ফুটবল মাঠের একটি অন্যতম সমস্যা হয়ে উঠেছে। রেকর্ডারী আর লাইসেন্সমানদের ওপর হামলা চালানো তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, আবার খেলোয়াড়রাও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। ফুটবল মাঠে এক ধরনের স্থূল মস্তিস্কের দর্শক আছেন যাদের অন্ধ বিশ্বাস এবং দৃঢ় ধারণা যে তাঁদের দল ছাড়া অন্য কোন দল ভাল খেলতে পারে না এবং জয় যেন তাদের স্বাভিগত সম্পত্তি অনেকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত। কলকাতা ময়দানের ছোট দলগুলির তাই সবচেয়ে বিপদ ভাল খেলেই।

১৯৬৭ সালে আই এফ এ শীল্ডের খেলা বেশ নির্বিঘ্নেই চলছিল, কিন্তু গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মহামেডান স্পোর্টিং আর রাজস্থানের খেলার শেষে একদল চরম উচ্ছ্বল দর্শকের অর্থহীন তাণ্ডবনতা শীল্ডের খেলাকে অনিশ্চরতার পথে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে কলকাতা পুর্লিশ নানা কারণে খুবই ব্যস্ত এবং সেইজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুর্লিশ মাঠে বর্তমানে পাঠানো পুর্লিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে খুবই দুর্দশ। পুর্লিশের উপস্থিতিতেই এ বছর লীগের দূরত্বে মোহনবাগান ইস্টার্ন রেলের খেলার যে কান্ড ঘটে গিয়েছে সে তো স্বাচক্ষে স্মরণ থেকে শেষ পর্বন্ত দেখেছি। অতএব পুর্লিশের ওপর খুব বেশি ভরসা করা ঠিক নয়। আর ঘোড়-

সওয়ার পুর্লিশ মাঠের বাইরে কার্যকরী হলেও মাঠের মধ্যে গণ্ডগোলের সময় তাদের পক্ষে কোন কিছু করা খুবই দুর্দশ।

খুবই দূরত্বের কথা যে, মহামেডান-রাজস্থান খেলার সভ্যদের গ্যালারী থেকেও আক্রমণ চলেছে। সভ্যদের অসভ্যতা ক্লাবের

প্রীতিভিত্তিক

সম্মান এবং মর্যাদা কলঙ্কিত করে। সভ্যদের উচিত গণ্ডগোল প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হওয়া। ময়দানের বড় ক্রমগুলির একটি করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করা উচিত।

মহামেডান রাজস্থানের খেলায় মাঠে পুর্লিশ ছিল না। মহামেডান ক্লাবের এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং কয়েকজন সভ্যর আন্তরিক চেঁচায় এবং কয়েকজন খেলোয়াড়ের আবেদনে সভ্য আসন থেকে ইটক বর্ষণ বন্ধ হয়। গণ্ডগোলের প্রথম সূত্রপাত দ্বিতীয়ার্ধের একাদশ মিনিটে এস রায়ের সঙ্গে এক সম্বন্ধে মহামেডানের রামালা আহত হবার পর। খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হতে চলেছে এই সময় খেলার শেষভাগে আবার দর্শক গ্যালারী থেকে মাঠে ইটক বর্ষণ শুরু হয়। এই সময় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার পুর্লিশ মাঠে প্রবেশ করলে ইটক বর্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ হয় কিন্তু পুর্লিশরা মঠ ত্যাগ করলে দর্শকরা আবার গণ্ডগোল শুরু করে।

এই সময় খেলার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে নষ্ট সময় অথবা অতিরিক্ত সময় খেলানোর চেষ্টা না করে রেকর্ডারী বিরতির বাঁশ বাঁজরে দ্রুত মাঠ ত্যাগ করেন। মাঠে পুর্লিশের ঘোড়সওয়ার পুর্লিশ প্রবেশ করে কিন্তু এই সময় সভ্য আসন থেকে এবং পূর্বদিকের গ্যালারী থেকে বোতল এবং ইস্ট ছুড়ে রেকর্ডারী, লাইসেন্সমান এবং রাজস্থানের খেলোয়াড়দের আক্রমণ করতে মাঠে নেমে পড়েছে অগণিত দর্শক। এই উচ্ছ্বল দর্শকদের আক্রমণে আহত হলেন উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সভ্য গ্যালারীর বেশ কিছু দর্শক। উচ্ছ্বল দর্শকরা দুটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং এদের আক্রমণে হাওড়া ইউনিয়ন তাঁব দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে অবশ্য অনুসন্ধান নিয়ে জানা যায় যে, রেকর্ডারী, লাইসেন্সমান এবং খেলোয়াড়েরা নিরাপদ আশ্রয়লাভে সক্ষম হন।

আই এক এর আবেগ

আই এফ এ-র গভর্নিং বডি'র সভ্যর অনির্দিষ্টকালের জন্য শীল্ডের খেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। থবরে প্রকাশ যে, আই এফ এ-র বৃহৎ সম্পাদক প্রীতিবিনোদ দত্ত এবং প্রীতীর-কুমার মুখার্জী মহামেডান-রাজস্থান খেলার গণ্ডগোলের পর পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু পরে আই এফ এ সভাপতির অনুরোধে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত হন।

আই এফ এ-র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে মাঠে উপযুক্ত পদলিখ ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট খেলাগুলি ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত করার জন্য অনুরোধ প্রার্থনা করা হয়েছে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব, সি এ বি এবং রাজ্য সরকারের কাছে। বর্তমানে অন্য কাজে কলকাতা পদলিখ ব্যস্ত থাকার জন্য পদলিখ কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-কে মাঠে উপযুক্ত পদলিখবাহিনী প্রেরণে অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন। শীল্ডের অবশিষ্ট খেলাগুলি যাতে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত করা

থবর এসেছে যে আই, এফ, এ-র গভর্নর ভিডি এক সভায় আই, এফ, এ-র শীল্ডের অবশিষ্ট খেলাগুলি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বহিরাগত দলগুলির ব্যর্থতা

আই এফ এ শীল্ডে অংশগ্রহণকারী শেষ বহিরাগত দল-গ্রয়ী রিডার গ্রহণ করেছে কলকাতার তিনটি অন্যতম শক্তির কাছে শক্তি পরীক্ষার নতি স্বীকার করে। মোহনবাগান পরাজিত করেছে পাঞ্জাব পদলিখকে, ইস্টবেঙ্গল গোয়ার ভাস্কো ক্লাবকে এবং ইস্টার্ন রেলদল ভারতীয় বিমানবাহিনীকে।

মোহনবাগান শীল্ডের দুটি খেলাতেই লাভ করেছে অনায়াস সাফল্য। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় মোহনবাগান ৬-০ গোলে পরাজিত করে খিদিরপুরকে। বর্ষগণিস্ত্র মাঠে মোহনবাগান একটানা প্রাধান্য বিস্তার করে। সীতেশ দাস হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী পাঞ্জাব পদলিখকে শোচনীয়ভাবে ৫-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান পেঁচেছে সেমিফাইনালে। দর্শকরা একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা দেখার আশা নিয়ে মাঠে গিয়ে নিরাশ হয়। সূর্য থেকে মোহনবাগানের আক্রমণের ঢেউয়ে পাঞ্জাব পদলিখের রক্ষণভাগ 'ভেঙে' পড়ে। আরও বেশি গোলে মোহনবাগান জয়ী হতে পারত। পি গাঙ্গুলী দুটি, সীতেশ, চুনি এবং অশোক একটি করে গোল করেন।

অন্য একটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাতে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে জয়ী হয় গোয়ার ভাস্কো ক্লাবের বিপক্ষে।

হারিব একাই দুটি গোল করেন। হারিবকে হ্যাট্রিক করানোর চেষ্টায় ইস্টবেঙ্গলের কয়েকটি গোলার সুযোগ নষ্ট হয়। সূর্য থেকে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভাস্কোকে পর্যুদস্ত করেছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে ইস্টার্ন রেল কোয়ার্টার ফাইনালে বি এন রেলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইস্টার্ন রেলের পক্ষে এইদিন হ্যাট্রিক করেন প্রদীপ ব্যানার্জী। শীল্ডের খেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য



সীতেশ দাস

মায় তার জন্য আই এফ এ কলকাতার ক্রীড়াকর্মীদের কাছেও আবেদন জানিয়েছে।

শীল্ডের খেলা আবার শুরুর

শীল্ডের খেলা আবার শুরুর হয়েছে। লেখা প্রেসে দেবার সময় আমাদের কাছে



প্রদীপ ব্যানার্জী

ফলাফল হল রাজস্থানের কাছে এরিয়ান্সের পরাজয়। বোম্বাই একাদশকে ২-০ গোলে পরাজিত করে, তৃতীয় রাউন্ডে এরিয়ান্সের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী হয়ে রাজস্থান কোয়ার্টার ফাইনালে মহামেডানের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে।

কি শুবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে টেলিটোন ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারটি ছোট সাইজের অভ্যন্তরীণ প্রস্টিক ক্যাবিনেটে ফিট করা। মূল্য ১৬৫ টাকা মাত্র। ২ বৎসরের জন্য গ্যারান্টি প্রদত্ত। আবেদন করুন:

Tokyo Television Co.,
(W. B. C.)
Post Box 1307, Delhi-6

খেলার ফলাফল :-

রাজস্থান-২
পাঞ্জাব পদলিখ-৩
মোহনবাগান-৬
মহামেডান স্পোর্টিং-৩, ৩
ভারতীয় বিমানবাহিনী-০
রাজস্থান-২
মোহনবাগান-৫
ইস্টবেঙ্গল-২
ইস্টার্ন রেল-৫
মহামেডান স্পোর্টিং-৩

বোম্বাই একাদশ-০
এ ও সি সেকেন্দ্রাবাদ-১
খিদিরপুর-০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০, ৫
জর্জ টেলিগ্রাফ-২
এরিয়ান্স-১
পাঞ্জাব পদলিখ-০
ভাস্কো ক্লাব গোয়া-০
ভারতীয় বিমানবাহিনী-০
রাজস্থান-০

অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন

সেন উদ্যত কমিশনের অভিমত হল যে, টেন্ট ম্যাচের পরিচালনা এবং কতৃষ্ণতার সম্পূর্ণভাবে একটি সংস্থার ওপর অর্পণ করতে হবে। এই কতৃষ্ণতার কোন সংস্থার ওপর অর্পণ করা চলে এই প্রশ্নের উত্তরে কমিশনের বক্তব্য হল যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিভাগের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলে। অথবা সচিবালয় বন্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সি এ বি এবং সি এ বি-র ওপর কতৃষ্ণতার অর্পণ করা চলে; কিন্তু রাজ্য সরকারের অধিকার অবশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে।

ইডেন উদ্যানে ১লা জানুয়ারী হাঙ্গামা সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য হল যে, ঘটনার সমস্ত দায়দায়িত্ব সি এ বি বন্টন পদ্ধতির ওপর চাপিয়েছে, কিন্তু সমস্ত ঘটনার জন্য সি এ বি যে প্রাথমিকভাবে দায়ী এই সিদ্ধান্তে আসার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য এবং প্রমাণাদি কমিশনের সম্মুখে এসেছে। ক্রিকেট-প্রিয় দর্শকদের সুখ-সুবিধার দিকে সি এ বি কতৃষ্ণতা বিলম্বিত দৃষ্টিপাত করে নি। সি এ বি-র গ্রাউন্ড কমিটি কোন কাজই করে নি এবং সমস্ত কিছুই করেছেন গ্রীসীতেশ দত্ত এবং পরে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছেন সি এ বি-র সম্পাদক গ্রীসীতেশ চৌধুরী ওপর।

দর্শকদের বসার যদি সুবন্দোবস্ত করা হত যেমন হয়েছিল ওরা, ৪টা এবং ৫ই জানুয়ারী তবে দর্শকরা মাঠের মধ্যে উপচে পড়ত না এবং প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রীসীতেশ রায়কে পুলিশ এবং হোমগার্ডের হাতে নশংসভাবে নিগৃহীত হতোও হত না। গ্রীসীতেশ রায়ের মত একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের ওপর শুই অমানুষিক অত্যাচার চলতে দেখেই দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে হাতে আইন নিতে বাধ্য হয়েছিল। সি এ বি-র লোকদের মাথা বাঁচাবার জন্যেই পুলিশ বেপারোরা লাঠি চার্জ করেছিল দর্শকদের ওপর।

অর্থ দিয়ে মাঠে ফেলা দেখতে এসে দর্শকরা লাঠির বাড়ি খেলে তা তাদের প্রতি চরম অবমাননাকর ঘটনা। এমন কি লাঠি দিয়ে ঠেলা দেওয়াও প্রকৃত দর্শকদের অপমান করা এবং অব্যাহার আঘাত করা, কারণ, নিরুপায় হয়ে তাদের বেড়ার ধার পর্যন্ত আসতে হয়। এই দর্শকরা কোন অবৈধ সমাবেশের সৃষ্টি করেন নি এবং কোন অবৈধ কাজ অথবা কার্যরত পুলিশদেরও ওপর কোন হামলা করেন নি।

মাঠের মধ্যে কাদানে গ্যাস ছোড়ার

প্রসঙ্গে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গ্যাস ছোড়ার পূর্বে পুলিশের গোল-মাল সৃষ্টিকারী দর্শকদের সতর্ক করা উচিত ছিল। পুলিশের এই অববেচকের মত কাজের সমালোচনা না করে পারা যায় না। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আলোকচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, অন্তত কয়েকজন পুলিশ তাদের মানবিকতা বোধের কথা বিস্মৃত হন নি।

কমিশনের মতে গ্রীসীতেশ রায়ের ওপর পুলিশের অত্যাচার চরম নশংসতার পরিচয়; এই অত্যাচার প্রধানত চালিয়েছেন হোমগার্ডের দল। এই নশংস অত্যাচার করে হোমগার্ডরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, তাদেরও ক্ষমতা আছে এবং তাদের অস্তিত্ব অবহেলা করার মত নয়। কমিশনের মতে এই ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে



হাবিব

হোমগার্ডরা দায়ী, কিন্তু হোমগার্ডদের ভার একজন দায়িত্বশীল অফিসারের ওপর ন্যস্ত থাকে।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, একথা বোঝা যায় নি যে, কেন আলোকচিত্র থেকে দৃষ্টিভঙ্গীদের সনাক্ত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনরূপ সহযোগিতা করা হয় নি। এখন ঘটনার জন্য দায়ী দোষী হোমগার্ড এবং পুলিশদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা না করা নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের কার্যের ওপর।

টিকিট বিক্রয়ের ব্যাপারে কমিশন রিপোর্টে বলেছেন যে, যেভাবে টিকিট বন্টন করা হয়েছে অন্তত চোন্দ হাজার টিকিট যার মূল্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা যা সি এ বি-র চরম হুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় পরিচালক এবং সি এ বি-র

কার্যকরী কমিটি এবং টুর কমিটি চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

যদিও সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকের দল গেটে যথাযথভাবে টিকিট পরীক্ষা করেছেন, মাঠের ভিড় প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে স্থানের অতিরিক্ত টিকিট ছাপান এবং বন্টন করার জন্যে। প্রচুর পরিমাণে ফলান্টিয়ার ব্যাক, নানা ধরনের পাশ এবং স্লিপ ছেড়ে ভিড় বাড়িয়ে তোলার জন্যে, প্রকৃত দর্শকদের স্থান সঙ্কুলান না হবার ফলেই পান্ডোগাড়ের সূত্র।

কমিশনের মতে ইডেন উদ্যানের দর্শক গ্যালারী এবং কংক্রিট স্টেডিয়ামের কিছু পরিবর্তন করতে হবে নতুনভাবে দর্শক-ক্রম সুখ-সুবিধা এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে। রাজ্য সরকার রঞ্জী স্টেডিয়াম নির্মাণের ভার গ্রহণ করতে পারেন অথবা সি এ বি-র ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা চলে অবশ্য রাজ্য সরকারের মতামত গ্রহণে সি এ বি বাধ্য থাকবে।

সেন কমিশনের মতে ইডেন উদ্যানে টেন্ট ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বভার সি এ বি-র ওপর অর্পণ করা চলে, রাজ্য সরকার কতৃষ্ণ আরোপিত কয়েকটি মর্মে সাপেক্ষে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হল যে, সি এ বিকে একটি বড় আকারের টুর সার-কমিটি গঠন করতে হবে এবং এর মধ্যে অন্তত দুজন রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন এবং কয়েকজন প্রবীণ ক্রিকেটারকেও স্থান দিতে হবে। এই কমিটি টেন্ট ম্যাচ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করবেন।

এই কমিটি টিকিট মূল্য এবং সুস্থ ঘটনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যাতে আসন সংখ্যার বেশি টিকিট বিলি না হয়। সিজন্ টিকিট এবং দৈনিক টিকিট অগ্রিম বিক্রীর ব্যবস্থা থাকবে। কমপক্ষে অর্ধেক টিকিট সংরক্ষিত থাকবে সি এ বি-র অনুমোদিত বিভিন্ন ক্লাব এবং ক্লাবসংস্থার জন্যে এবং সভ্য সংখ্যার ভিত্তিতে ক্লাবগুলিকে টিকিট দেওয়া হবে। অবশিষ্ট টিকিট ইডেন উদ্যান থেকে জনসাধারণের কাছে বিক্রী করতে হবে। সি এ বি-র সাধারণ সদস্যদের কোন অতিরিক্ত টিকিট দেওয়া চলবে না। কমপ্লিমেন্টারী টিকিট এবং ভি আই সি কার্ড বিতরণ সম্পূর্ণভাবে বিলম্বিত করতে হবে। টুর কমিটির অনুমতিক্রমে সি এ বি-র সম্পাদক পাঁচশত পর্যন্ত টিকিট নিজের ইচ্ছামত বিলি করতে পারেন।

পরিচায়ত

কলকাতা। মরদানো এখন সেবা।
বাঙালী গোলরক্ষক কে, কিম্বা খগরাজ
যদি ভারতের এক নম্বর গোলরক্ষক হন,
তাহলে তাঁর পুরের স্থানটি কার? কেউ
স্বীকার করুন বা না করুন, আমরা জোর
গলায় বলবোই যে আর দু-এক বছরের
মধ্যেই বলাই দে খগরাজকে টেকা দিয়ে
ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকের সম্মান অর্জন
করবেন!

অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের এই সম্মান বলাই
দেব কিছড় আর নতুন নয়! এরই মধ্যে
বলাই দে আর একটি দেশের এক নম্বর
গোলরক্ষক হিসেবে কুড়িয়ে এসেছেন
অনেক সুনাম।

তাই সুনামের মোহ আজ আর বলাই
দেব নেই। ইচ্ছে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত
সুনামের যোগ্য অধিকারী হবার! শুধু
ইচ্ছেই নয়, বলাই দেব সে বিষয়ে আছে
আন্তরিকতা, আছে ঐকান্তিক ইচ্ছা।
তাই আমরা বিশ্বাস করি যে এই
আন্তরিকতা আর ইচ্ছার জোরেই বলাই
দে একদিন তাঁর অভীষ্ট স্থানাভিষিক্ত হয়ে
তাঁর পরম পাওরাকে পাবেন!

তাই ভালো লাগে যখন প্রায়ই বিকেলে
মরদানোর আঙিনায় বলাই দেকে দেখি
লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন।
পাতলাটে গড়নের লম্বা চেহারায় বলাই
দেকে এখনো বেশ ছোট্টই মনে হয়।
এখনো তাঁর মধ্যে থেকে তারুণ্যের স্পর্শ-
টুকু মুছে যায় নি! তাই আমরা ভালো
লাগে ভাবতে যখন বলাই দেব পূর্ব পরি-
চয়ের কথা ভুলে গিয়ে, নতুন করে মনে হয়
যে তারুণ্য বলাই দে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল
স্বাক্ষর নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কীড়া-
নেপুণ্যের ভাস্কর আর এক জগতের
দিকে?

কিন্তু তাই বলে তো আর বলাই দেব
পূর্ব পরিচয়ের কথা ভোলা যায় না।
স্বর্ণপীয় সেই স্মৃতি চিরকালই বলাই দেব
কাছে স্মরণীয়। ফুটবলারগণের শ্রেষ্ঠত্বের
সম্মানে ভূষিত।

বলাই দে ছিলেন পাকিস্তান ফুটবল
দলের এক নম্বর গোলরক্ষক-শুধু তাই
নয় একমাত্র হিন্দু খেলোয়াড়ও ছিলেন।

বলাই দে কলকাতায় এসেছেন এই
তো সৈদিন। হিসেবের কোঠায় বছর
তিনেক হবে বোধহয়! সুতরাং বলাই দেব

কথা বলতে হলে ইছামতী পেরিয়ে আমা-
দের যেতে হবে বড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরীর
ধারে ধারে!

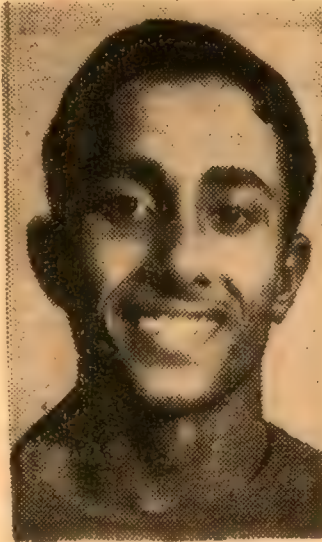
এই তো সৈদিনের কথা। যশোরের
ছেলে বলাই মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়াতে।
যতদূর মনে পড়ছে তার সংগে থাকতো
দাদা কনাই।

তারপর একদিন মাঠ-ঘাটের আঙিনা
পেরিয়ে চলে এলো হিরোজ দলে! এ সেই

শান্তিপ্রিয় বঙ্গেশ্বরাধ্যায়

১৯৬১ সালের কথা। কিন্তু দৃঢ়তা বছর
যেতে না যেতে বলাই দে আরো বড়
আহবানে যোগ দিলেন ঢাকার মহামেডান
ক্লাবে।

কিন্তু তারপর ক্লাবের গন্ডী আর



বলাই দে

তাকে বোঁধে রাখতে পারলো না। শুধু
ঢাকার মহামেডান দল নয় সমস্ত পাকি-
স্তান দলের মধ্যে সে, দেখতে না দেখতে
হয়ে উঠলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষক!

১৯৬১ সালে যে ছেলেটি হিরোজ
দলে খেলতে শুরু করেছিলো ১৯৬৪
নালেই সেই হয়ে দাঁড়ালো পাকিস্তান
জাতীয় দলের এক নম্বর গোলরক্ষক।

১৯৬৪ সালে চীন সফরে গেলেন
বলাই দে। তারপরেই রাশিয়ান ফুটবল
দল এলো পাকিস্তানে। সেবারেও বলাই
দে পাকিস্তান দলের সেরা গোলরক্ষক।
এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, বর্মা
প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধেও খেলার সুযোগ
লাভ করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-
ছেন বলাই দে।

কিন্তু এই বলাই দেই কলকাতার
এসে নির্মিত খেলার সুযোগই পেলেন
না! পাবেনই বা কি করে, ইন্টবেঙ্গল
ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন বলাই দে আর সে
দলের গোলরক্ষক হলেন খগরাজ।
ভারতীয় ফুটবলে আজো গোলরক্ষকদের
রাজা তিনি!

তাই খেলার সময় জুস করে মাঠের
বাইরে বসেই কাটাতে হলো সিজিন।
আর তাই খেলার নেশায় নামের মোহ
কাটিয়ে ইন্টবেঙ্গল থেকে বলাই দে চলে
এলেন এরিয়ান্স ক্লাবে!

এই বছর লীসের খেলার বলাই দেব
দে রূপ আমরা দেখেছি ত্য ভোলার নয়।
বলাই দেকে পাকিস্তানে সকলে জানতো
'ফ্লাইংবার্ড' বলে। এ বছর বলাই দেব
খেলা দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, সাতা
বাকি বলাই উড়তে পারেন। চিলের মতো
হোঁ মেরে উড়ন্ত বল ধরতে পারেন, পারেন
নিজের দলকে নির্যাত পতনের হাত থেকে
বাঁচাতে!

বলাই দেব খেলার দেখেছি অস্বাভূত
রকমের আত্মবিশ্বাস, দেখেছি অপূর্ব
বোধ-শক্তির সংগে মিলেমিশে আছে অভূত-
পূর্ব প্রতিরোধ-ক্ষমতা। আর সেই সংগে
আছে খেলাধুলার উন্নতি করার জন্যে
প্রাণান্ত প্রচেষ্টা!

তাই আমরা আশা রাখি পাকিস্তানের
এক নম্বর গোলরক্ষক বলাই দে খুব
শীগগিরই বাংলা তথা ভারতবর্ষের সেরা
গোলরক্ষকের সম্মান অর্জন করে পাকি-
স্তানে যে সুনাম, যে প্রতিষ্ঠা ফেলে এসে-
ছেন, ফিরে পাবেন তাঁর সেই পরম পাওনা!

শুধু বলাই দে নন, তাঁর সেই শক্ত
দিনের অপেক্ষায় যে আমরাও আছি...!

সম্পাদিকা—স্বপ্নন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১১

বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসদুসার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—॥ वैष्णव साहित्य वस्तुमतीर शाम्भत अवदान ॥—

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

(श्रीमद् भक्तानंद कविराज गोस्वामी विरचित)

(आदिलीला, मधालीला, अन्तलीला)

मूल संस्कृत श्लोक ७ श्लोकैश्च मूलं ब्रह्मवर्णनम् । अपूर्व
काव्यामूर्धन्यमिदम् । पद्मार्च ७ त्रिपदीयं कठिनं कठिनं ह्यनेन
टीका । शास्त्र प्रचारकोशेन नाममात्रं मूलो विज्ञेय इति चेत्तदेह ।
कापड ७ बोर्डे बांधा । मूल्य : आठ टाका ।

श्रीश्रीभक्तमाल ग्रन्थ

(संयोजित विद्वत् संस्करण)

परमतुल्य श्रीमद् नाट्यजी किन्नी तायार भक्तमाल ग्रन्थ रचना
करेन, श्रीमद् प्रह्लादनाथ तातार टीका रचयित्वा । मूलग्रन्थ ७
टीका अक्षरानुसृत्य श्रीमद् भक्तानंद बाबाजी वरदाचार्य एव अपूर्व
हस्तोद्धार ग्रन्थ रचना करिष्यामहे । एवै ग्रन्थ पाठि वा प्रवर्ण
करिष्ये भक्तवत्सल्येन अक्षरानुसृत्य आनन्द भव । वैष्णव धर्म-
ग्रन्थसमूहस्य मध्ये भक्तमाल अत्यन्तं श्रेष्ठं ग्रन्थ । मूल्य : दस टाका ।

श्रीश्रीचैतन्य भागवत

(श्रीश्रीबागवतार मठाकवि श्रीमद् भक्तानंदनाथ ठाकुर विरचित)

(आदि, मध्य ७ अन्त भाग)

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतस्य चारु श्रीश्रीचैतन्य भागवत
वैष्णवस्य परमं पवित्रं ग्रन्थ । अवतारवत्सल्येन निरूप्यं इत्यत्र
एवै विहितम् । विभिन्न अनेक पञ्चिमान ईश्वरस्य परमेश्वर,
शिवस्य ईश्वरान्तेवै कोटि कोटि प्रयाणस्य ईश्वरस्य प्रलय
संयोजितं इति चेत्तदेह पाठे, केन ये सैव परमेश्वरस्य प्रत्यक्षरूपेण
अकृत्यं इति चेत्तदेह मत्तव्योचितं कर्तुं सगलितं इति चेत्तदेह, एवै ग्रन्थ
पाठि सैव इत्यत्र मत्तव्योचितं इति चेत्तदेह । मूल्य : दस टाका ।

वैष्णव प्रह्लादजी

(प्राचीन भागवतचरितस्य उत्कृष्टसंस्करणं ग्रन्थविधि)

(सहाय्यनाथ वर, एम-ए, बि-एल सम्पादित)

- १ । श्रीमद्भागवतस्य प्रस्तावना ७ शिखण्डिक ।
- २ । नरसिंहस्य विज्ञानम् । ३ । तुलसीदास
- ४ । आनन्दस्य । ५ । मनोविज्ञानम् ।
- ६ । चमत्कार चरितम् । ७ । पाञ्चदशिका ।
- ८ । भक्तिवत्सलम् ।

समग्र प्रह्लादजीस्य मूल्य—पाँच टाका ।

(ब्रिक्म ७ बोर्डे बांधा)—६'५० पयसा ।

श्रीश्रीगीतागोविन्दम्

उत्कृष्टवि श्रीमद् श्रीकृष्णदेव गोस्वामी विरचितं मूलग्रन्थ ।
सहाय्यनाथ-प्रचार-व्रत उपेक्षनाथ मुखोपाध्यायस्य मूलग्रन्थ
व्याख्यान ७ श्रीपूजारी गोस्वामीर टीका ; तन्मध्ये कृष्णजीस्य
सुष्ठु व्याख्यान—रसमयं नामकृतं सुललितं गद्यव्याख्यानम् ।

कापड ७ बोर्डे बांधा । मूल्य : चार टाका ।

विद्वत्समाधेय

(श्रीरूप गोस्वामी विरचित ७ विद्वत्समाधेय चरितवत्सल्युक्त टीका)

श्रीचैतन्यदेव, श्रीश्रीनारायणदेव अत्राकृत प्रेमलीलास्य वरदा
प्रकाश करिष्यार इत्येवै श्रीरूप गोस्वामीर बाबा श्रीविद्वत्समाधेय
नाटक रचना करिष्यारिष्येम । महाप्रबुध विज्ञानात्मेन —

‘मय्यस्य ईश्वर काया मलिका ।

एवै कविष्य विना नरे नरेन प्रचार ।

कापड ७ बोर्डे बांधा । मूल्य—चार टाका ।

इन्दु-सूक्तम्

(श्रीमद् रूपगोस्वामिना विरचितम्)

श्रीरूप-व्याख्यान लीलायाधुनी । संस्कृत भाषायां रचितं
ननोक्तं काव्यम् । मूल श्लोक ७ ब्रह्मवर्णनम् । शास्त्र-प्रचार-व्रत
उपेक्षनाथ मुखोपाध्याय सम्पादितम् । मूल्य : छह टाका बांधा ।

पदावली

ज्ञानानन्द पदावली	२'००
गोविन्दानन्दस्य पदावली	२'००
चतुर्दशस्य पदावली	४'००
विद्यापतिस्य पदावली	४'००

नीलाचार्य श्रीकृष्णचरितम्

चैतन्य-चरितवत्सल्यस्य पदावली अक्षरानुसृत्य महाप्रबुध ‘नीलाचार्य’
जीलार’ अपूर्व रचना, वैष्णवविशेषस्य कर्तव्यम् ।

मूल्य : (बोर्डे बांधा) दस टाका बांधा ।

सोनाब बाणलार सोनाब काव्य

कृष्णवामी रामायण

आदि कविष्य महाकाव्य सहाय्ये सहाय्य करिते नान्यथा
इति नास्ति । महाकवि कृष्णवामस्य एवै सहाय्यस्य चरितवत्सल्य-
चरितं सुपरिचितं वाङ्मयस्य सहाय्य सहाय्य सहाय्य विज्ञान-
प्रकाशितम् । उपेक्षनाथ प्रियव्रतस्य १००० विभिन्न चित्रे चित्रितम् ।

मूल्य आठ टाका ।

29 SEP 1967



যেদের ছোটবেলা থেকেই
কঁকর বড় নিতে শেখান।



তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের বক পরিচর্যা তার এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসর্বিণায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আবুবেদাশাউ, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলকাতার রসায়ন-শাস্ত্রের স্নাতকপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.ডি.বি.এস. (কলি):
আবুবেদাচার্য



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

সাপ্তাহিক বাসুমতী

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের স্থলে একটি অগাধ
হক কমিটি গঠনে নন্দাজীর প্রস্তাবে
কামরাজের সম্মতি



বর্ষ: ১৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৪ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

5th Oct., 1967 * Vol. 72, No.



...কিন্তু, এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিত -

বোরোলীন

-কমরে ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শূকনো, খসখসে কিংবা বর্ণহীন ত্বক-
যে কোন বিভ্রাটে-বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক, স্ট্রিক

বোরোলীন হাউস, কলকাতা



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১০২৭
আজকের মানুষ		১০২৮
বঙ্গদর্শন		১০২৯
অবতাব্য	চন্দ্রশেখর	১০৩০
ভারতদর্শন		১০৩১
আন্তর্জাতিক		১০৩২
গ্রন্থসংলগ্ন		১০৩৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১০৩৪
সৌদীন আসছে (কবিতা)	— জয়ন্তী রায়	১০৩৫
মা দেখেছি, মা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	— সুধীরজেন দাস	১০৩৬

ডঃ রাধাকৃষ্ণশেখর	ত্রৈলোক্যনাথ মৃধোপাধ্যায়ের	ভারতবর্ষের মৃধোপাধ্যায়ের
ধর্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫	ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার ১০	জুকসারী কথা ৮
প্রফুল্ল রায়ের		সৈন্যকের
কিন্নরী ৪৥ পূর্ব-পার্বতী ১১	সুবর্ণরেখার তীরে ৫	বক্রিবলয় ৮
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	সৈয়দ মুজিব আলীর	হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের রচনাবলী
পূর্বাচল ১১	পছন্দসই ৭	মন্দমধুর ৪৥
কুমুদরঞ্জন মল্লিকের	জরাসন্ধের	মতীন্দ্রনাথ মেনগাডেকার
কুমুদরঞ্জন রচনাসম্ভার	লৌহকপাট ২০	স্বতীন্দ্র কাব্যসম্ভার
৥ দশ টাকা ৥	চারিখণ্ড একত্রে : শোভন সংস্করণ	৥ বারো টাকা ৥
জরাসন্ধের	বিমল কবির	শঙ্কু মহারাজের
পরশমণি ৫	যাতুকর ৫	গিরিকান্তার ৯
স্বামী দিব্যানন্দদেবের	সুধাকর মৃধোপাধ্যায়ের	আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়ের
পুণ্যতীর্থ ভারত ১০	হিমালয়ের তিন তীর্থ ৩৥	সাঁঝের মঞ্জিকা ৫
	—ছোটদের—	উমাপ্রসাদ মৃধোপাধ্যায়ের
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর		হিমালয়ের পাশে পাশে ৫
উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী ১০		
[চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—সমস্ত মৌলিক রঙিনচিত্র সহ]		
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের		
ঠাকুরমার ঝুলি (নৃতন সংস্করণ) ৪৥		
ঠাকুরদার ঝুলি ৪	কিশোর গ্রন্থাবলী ৪	দাদামশাইয়ের খালে ৪৥



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদ্যা বাউলীর কৃতান্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬৪
ভাত (গল্প)	— সুনীল গহ্ব	১০৬৭
দশী জপমালা (হ্রস্ব-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১০৬০
শাক-ভারতের সুপরিচয় (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র লাহিড়ী	১০৬৬
অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে গোড়ার ইতিহাস	— রমেন মজুমদার	১০৭০
হুগলি—ওয়েস্ট এন্ড এয়েস	— শিলালি	১০৭৫
আকাশবাণী পরিচয়	— মেঘনুজ	১০৭৮
হুগলি	—	১০৮০
বেলাঘাটা	— শ্রীঅমিতাক	১০৮৫
পরিচয়	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮৮

বিভোদয়ের বই

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধের বিপ্লবাব্দোলনের স্মৃতিকথা

বিপ্লবের সন্ধান ১৩'০০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বসমীক্ষা ১০'০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫'০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পঞ্চকুণ্ড রামেন্দ্রসুন্দর ৮'০০

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ

ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ

প্রথম খণ্ড ১৬'০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

ভারত মহিলা ৩'৮০

মোহিতলাল মজুমদারের

কবি শ্রীমধুসূদন ১০'৫০

সাহিত্য-বিচার ৮'৫০

বাংলার নবযুগ ৮'০০

সাহিত্য-বিতান ২'৫০

বাস্কর-বরণ ৬'৫০

যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

[১৮১৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত] ১০'০০

প্রকাশিত হল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

অত্যাধুনিক রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা উপন্যাস

গোয়েন্দা হলেন

পরাশর বর্মা ৪'৫০

আমার প্রকাশ

অনন্ত সিংহের লেখনীতে

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

নগেন্দ্রনাথ সোমের বহুশ্রুতনাম মহাগ্রন্থঃ

মহাকাব্য মধুসূদনের বিস্তারিত জীবনী

মধু-স্মৃতি

পদ্য প্রকাশিত

নেপাল মজুমদারের

ভারতে জাতীয়তা ও

আন্তর্জাতিকতা এবং

রবীন্দ্রনাথঃ প্রথম খণ্ড ১০'০০

আনা লুইস্ স্ট্রং-এর

স্তালিন যুগ ৩'২৫

অবনীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীমন্তগবদগীতা ৩'৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস ও গল্প

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস ২'২৫

শুদ্ধে যারা গিয়েছিল ০'০০

গল্প আর গল্প ২'২৫

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

বিভ্রাণের দৃশ্য ২'৫০

সুখলতা রাও-এর গল্পসংকলন

জালিভুলির দেশে ০'০০

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পসংকলন

আমার ভালুক শিকার ০'০০

চোরের পাল্লায়

চক্রবর্তী ৩'০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বড় গল্প

নারিক রাজপুত্র ও ২'০০

সাগর রাজকন্যা

স্বপনবৃদ্ধার গল্পসংকলন

স্বপনবৃদ্ধার কৌতুক কাহিনী ২'৮০

গোপেন্দ্র বসুর উপন্যাস

স্বর্ণমুকুট ২'৫০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা ২'৫০

শ্রীকথাকাকুরের গল্পের বই

অথ ভারত কথকতা [বহুখণ্ড]



৭২ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পরলা
বৃহস্পতিবার, ১৮ই অক্টোবর, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 5th October, 1967

গান্ধীজীর ৯৮তম জন্মদিনে

২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মদিন। অনাড়ম্বরে পালিত হল। তাঁর ৯৮তম জন্মদিনে এই কথা স্মরণ হয় যে, আমৃত্যু যিনি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিতপ্রাণ ছিলেন, তাঁর তিরোধানের পর আমরা শ্রদ্ধা স্মৃতি সত্ত্বয় করেছি, না, যে আদর্শের প্রচার তিনি করে গেছেন, সেই আদর্শকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পেরেছি।

একমাত্র গান্ধীজীব পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল, আমরা জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ। দেশের সমস্ত মানুষ যদি না-ই হয়, অন্তত দেশের সর্বাধিক মানুষ গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল যদিও স্বাধীনতার জন্যে, তবু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র। খাদির ব্যবহার তিনি করতেন, কিন্তু খাদি ছিল তাঁর কাছে স্বাবলম্বিতার একটি প্রতীক। এখন সেই খাদির ব্যবহার হয় না, তা নয়, মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মদিনস কালে খাদি ব্যবহারকারীদের জন্যে সুসভে খাদিবস্ত্র বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়, কোথাও কোথাও বা সূত্রযজ্ঞও হয়; কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে যেন তার কোনোপক্ষ আবেদন নেই। না থাকার কারণ এই যে, গান্ধীজী যে-উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার শ্রদ্ধা করেছিলেন, তাঁর বহু শিষ্যদের মধ্যে খাদি ব্যবহারের সঙ্গে নীতিহীন কর্মসূচীর অসামঞ্জস্য দেখে একালের জনসাধারণ খাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

গান্ধী-শিষ্যরা এখন কি করছেন? দেশ স্বাধীন হলে পর, আশা করা গেছিল

যে, তাঁরা এই দেশকে অর্থনৈতিক সম্প্রদায় থেকে মুক্ত করতে পারবেন। শিক্ষা, কুসংস্কার ও অত্যাচারের অবসান হবে। গ্রামাভিত্তিক ভারতের রূপের বদল হবে। হার, আশা বড়ই ছিলোনারী। কিন্তু গান্ধীজী যে কাজ সমাধা করার জন্যে স্বয়ং আত্মদান করে গেছেন, তারই ব্যতিক্রম ফলসলা হয়েছে। তাঁর আদর্শ যখন খলোবলদৃষ্টিভ, তখন ক'জন গান্ধীবাদী নেতা এগিয়ে এসেছেন মরণপণ করে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার তাগিদে? গান্ধীজী স্বয়ং নির্দেশ করে গেছিলেন, যে দল স্বাধীনতা-সংগ্রাম করে দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করেছে, স্বাধীনতা লাভের পর তার কার্যকলাপ কি প্রকাব হবে।

গান্ধীজীব নির্দেশ শোনার মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ায় দু'একজন তখনো ছিলেন, কিন্তু দলীয় মোহ তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত। তাই যে দলো মধ্যে থেকে মহাত্মা গান্ধী ভারতকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছেন, সেই দলই হলো সর্বেসর্ব। স্বাভাবতই গান্ধীজীর অনুবর্ত্ত শিষ্যরাও দলের হাতিয়াব হলেন। এবং যে স্বার্থ দৃষ্টিগণের মতো কাজ করে, সেই স্বার্থ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ওয়াকিব-হাল না হয়েও তাঁরা দেশের চেয়ে অনেক সময় দলকেই বড় করে ভাবলেন। বলা বাহুল্য, দল রক্ষার জন্য জনসাধারণের সমর্থন অপেক্ষা লোকচক্ষুর অন্তরালে আর্থিক সমর্থনই প্রায় বোধ হোল। আর অর্থ দিয়ে যারা সমর্থন করে তাবা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় বলে মনে করে। সেই ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার যারা ধারক ভার

হলো মুনাকালোভী ও কালোবাজাদারী দল। এই কারণে সৃষ্টি হলো দেশের শ্রমের অসাম্য। এবং শ্রমের অসাম্যই সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বৈষম্য। তাই দেশ থেকে বিশ্বাসবোধ যেন বিলীনমান।

দেশের এই সম্প্রদায়ভেদ, সাধারণ মানুষ যখন অবহেলিত, গ্রামাঞ্চল যখন ধ্বংসপ্রায়—তখন আমরা যার উপর নির্ভর করতে পারি? গান্ধীজীব জন্মদিনেই আমাদের শ্রুতে হচ্ছে ভবংগ রাজনৈতিক সংকটের কথা। নাগরিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা কবাব চেয়ে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাহায্যে গাঁ দখল করাতেই যেন সব সিদ্ধিলাভ। কিন্তু জনসাধারণের পেট ভাবাবে কে? কিংবা অধীনস্থ মানুষগুলিকে পরিবেশ বদল দেবে কে? গান্ধীজী চেয়েছিলেন কৃষক, শ্রমিক তথা সর্ব মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান কিন্তু তা এখন স্বপ্নমাত্র। কারণ রাজনীতিই এখন সাবমর্ম। আমরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে পাচ্ছি? সেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত কবে নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠার জন্যে শক্তির অপচয়। এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ কতটুকু হবে? গান্ধীজীর নাম যাঁরা গ্রহণ করেন—তাঁদের কাছে আজো আমাদের অনুরোধ মানুষের নৈতিক শক্তিকে তাঁরা জাগ্রত কবে তুলুন এবং দেশের শক্তি যে বড় শক্তি সেই জ্ঞানটুকু যেন রাজনীতিবিদদের মধ্যে থাকে।

সম্পাদক

আজকের মানুষ

চতুর্থ নির্বাচন ভারতকে যা উপহার দিয়েছে তা হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। নির্বাচনের পর সমস্ত রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ঠিকই এবং সে সরকার, নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, কোথাও হয়েছে কংগ্রেসী কোথাও অ-কংগ্রেসী, কিন্তু তবুও গাটিকয়েক রাজ্য ছাড়া বাকী প্রায় সব রাজ্যেই সরকারগুলো একটা-না-একটা অস্থিরতায় ভুগছে। একটা অনিশ্চয়তা, সংশয়ের ভাব যেন রয়েছে তাদের সামনে। ওই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তার একটা প্রধান কারণ যে ব্যাপক হারে দলভাগের হিড়িক তা কি আজ আর কাউকে বলে দিতে হবে? ওই দল-বদলের সর্বশেষ পালা অভিনীত হতে দেখা গেল পূর্ব সীমান্তের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরে। আর অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের সুতোয় ঝুলছে কোইরেং সিং-এর ভাগ্য। কোইরেং সিং-মণিপুর রাজ্যের প্রথম মধ্যমন্ত্রী।

নির্বাচনে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও এজন নিদর্শনীয় সদস্যের সমর্থন পেয়ে মণিপুরে সরকার গঠন করেছিল কোইরেং সিং-এর নেতৃত্বে। বেশ চলছিল, কিন্তু হঠাৎ নামল ধস। স্পীকার সালাম তোম্বি সিং-এর সংগে ঝগ মিলিয়ে একসঙ্গে ৮জন এম-এল-এ কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। ৯ জন সদস্যের সংখ্যালঘু বিরোধী দল রাতারাতি ৩২ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় ৬৭ জন সদস্য পেয়ে সংখ্যাগুরু দলে পরিণত হলো। সংযুক্ত বিধায়ক দল চীফ কমিশনার বালেশ্বর প্রসাদের কাছে দাবি জানালেন তিনি কেন সংখ্যাগুরু দলের নেতাকে থেকে নতুন সরকার গঠনের সুযোগ দেন। নতুন সরকার হয়তো এখানে দেখা দেবে, কিন্তু মধ্যমন্ত্রী কোইরেং সিং-এর অপরাধটা কোথায়? কী দোষ করেছেন তিনি? বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এ-সম্পর্কে একটা কথাও বলা হয় নি। তবে একটা ঘটনা এই যে, স্পীকার প্রীতোম্বি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিক। মধ্যমন্ত্রীর পদের জন্যে তিনিও একজন

দাবিদার ছিলেন এবং সে-আশাতেই তিনি এবার পার্লামেন্ট ছেড়ে বিধানসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। বিধানসভার নেতৃপদের জন্যে প্রীকোইরেং সিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা তিনি গোপন করেন নি, যদিও শেষ পর্যন্ত একটা আপোষরফার এসে তিনি স্পীকারের পদ নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন পারিস্কার হলো যে-সে কেবল সাময়িক কালের জন্যে। মধ্যমন্ত্রীর গদিতে প্রীকোইরেং আসীন-এ-চিহ্ন তাঁর চোখে পীড়াদায়ক ঠেকছে। দল পাকালেন তিনি,



কোইরেং সিং

কংগ্রেসে উপদলীয় কৌদলেব রাজনীতি আমদানী করে দলটিকে ভাঙলেন।

এই উপদলীয় রাজনীতিটাই এবার কোইরেং সিং বোঝেন কম, তিনি সোজা পথে চলতে শিখেছেন, সবাইকে সরল মনে নিতে শিখেছেন। নির্বাচিত রাজনৈতিক কর্মী কোইরেং, ছাত্র বয়স থেকে নির্যাতন, নিপীড়ন সয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু প্রজ্ঞা হন নি, হার মানেন নি। রাজনীতিতে যখন তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হয় তখন কোইরেং ছাত্র মাত্র। কিন্তু সেদিনকার রাজনীতির ক্ষেত্র ছিল অপারিসর, ক্ষুদ্র মণিপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

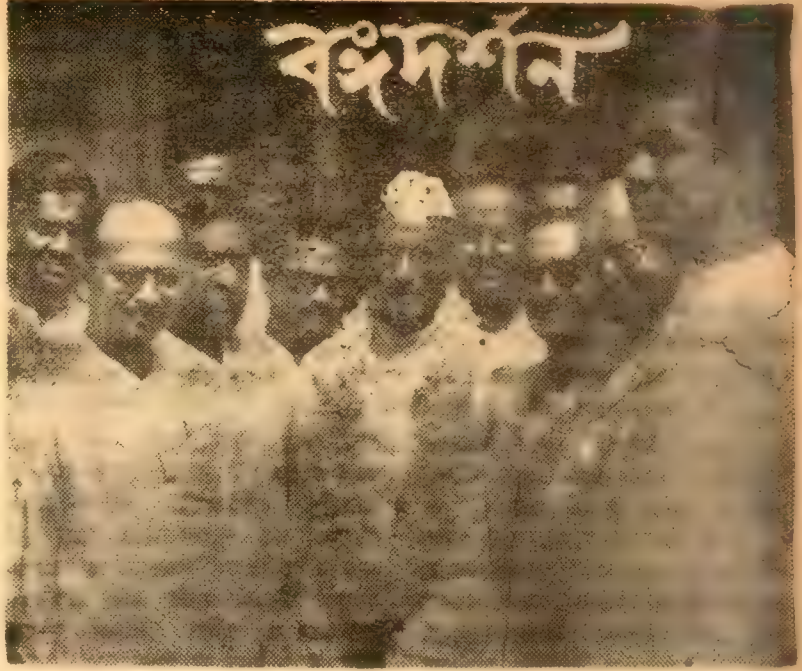
সেদিনকার রাজনীতি সরকারের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ করত ছিল না, বডটা ছিল সমাজের চেহারা পরিবর্তনের। কারণ মণিপুর সেদিন অন্যতম দেশীয় রাজ্য ছিল, কাজেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রশ্ন সেদিন অজ্ঞাবিত ছিল। সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাই কোইরেং সিং-এর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। দেশীয় রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার পথে নানান সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কোইরেং প্রজাদের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই লড়াইছিলেন।

তারপর যখন এখানে নিখিল মণিপুরী মহাসভা গঠিত হল তখন কোইরেং সুযোগ পেলেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসার, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেবার। অর্থাৎ শুরু হলো তাঁর নির্যাতনের পালা। গোয়েন্দা পুলিশ অটপ্রহর লেগে রইল তাঁর পেছনে, তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম, তাঁর আন্দোলন পরিচালনার কর্মসূচী ওলট-পালট করে দিল টিকিটিকর দল। কোইরেং আত্মগোপন করলেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। কিন্তু সেদিন ওই গোয়েন্দার উৎপাত কোইরেং-এর পক্ষে আশীর্বাদই হয়েছিল। কারণ, এরপর তিনি সম্পর্কে আসতে পেরেছিলেন নেতাজী সুভাষের ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। কোইরেং তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন রমা মন্ডলকে যার মাটি সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মিলিত পদধ্বনিত গুথর হয়ে উঠেছিল। বটিশরা যখন বার্মা দখল করল তখন কোইরেং-ও তাঁর সংগীদের নিয়ে ধবা পড়েছিলেন। রাজদ্রোহিতার অপবাধে কলকাতায় কোইরেং-এরও বিচার হয়েছিল আই-এন-এর নেতাদের সঙ্গে।

ইক্ষল ফিরে গিয়ে কোইরেং সিং এবার যথারীতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। স্বাধীনতার পর তাই এই প্রবীণ নেতাকেই প্রতিটি আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা গিয়েছে। ১৯৬২ সালে কেন্দ্র-শাসিত মণিপুর আঞ্চলিক পরিষদের তিনিই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পুরোদস্তুর রাজ্যের মর্যাদা পাবার পর মণিপুরের তিনিই প্রথম মধ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই ক্ষমতা কি আজ তিনি হারাতে বসেছেন? মণিপুর বিধানসভার শাসকদলের নেতাকে কি এবার আমাদের বিরোধী দলের মধ্যমন্ত্রীর পদের জন্যে তিনিও একজন

গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এমন কয়েকটি দলক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে তা পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর গঞ্জে অত্যন্ত উদ্বেগ ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বিশ বছরের কংগ্রেসী অগশাসনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিগত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গত কয়েক মাসের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট, আকাশ-ছোঁয়া মূল্য-বৃদ্ধি, চার টাকা কিলো চাল এত কিছু সহ্য করেও জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চাখের মণির মত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েকদিনে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়ী সম্পর্কেই একটা গভীর সন্দেহ সর্বত্র উৎকীর্ণ হতে শুরু করেছে। প্রতি মুহূর্তেই নিত্য নতুন চাপলারকর সংবাদ শোনা যাচ্ছে। যেমন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমনিষ্ঠে কংগ্রেসের সমর্থনে বাংলা কংগ্রেস, গোখাঁলী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও আর কয়েকজন নির্দলীয় এম-এল-এ-কে নিয়ে অকমিউনিষ্ট সরকার হতে চলেছে; আবার শোনা যাচ্ছে যে, হুমায়ুন কবীরের মধ্যমনিষ্ঠে বাংলা কংগ্রেসের একাংশ (জনজাগ্রিত দল) ও কংগ্রেস দলের সহযোগে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে। আবার শুনছি যে, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বেই নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়ে উঠছে। নানারকম সত্য ও অর্ধসত্য। ঘটনার একটি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা যায় আশঙ্কার সংকট। দরিদ্র জনসাধারণ বিভ্রান্ত বিমূঢ়, কংগ্রেস ভবনে ও জনজাগ্রিত দলে অসম্ভব তরুণতা। মন্ত্রীরা রাইটাস' বিল্ডিংস-এ আসছেন চোখে মূখে আনন্দ-তার ছাপ নিয়ে—কে বলতে পারে কাল তাঁরা আসছেন কি না? সরকারী দপ্তর-গুলিতে কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, এবং তা এমন একটি রাজ্যে বা ভারতের সবচেয়ে বেশি সমস্যা জর্জরিত।

একটা যে চরান্ত কিছুকাল ধরে চালু হয়েছে, এ বিষয়ে আশা করি শ্রমিত হবার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, কাজেই নতুন করে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এবং কোন কোন কংগ্রেসী রাজ্যে এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও এখানকার আইন শৃঙ্খলার সমস্যা নিয়ে কেন কোন মহল থেকে বিশেষ সোরগোল তোলা হচ্ছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে এও নাকি বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীঅতুল ঘোষ প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা একদা তাঁর অসম্মান করে-



পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের পরিবর্তে' অ্যাড হক কমিটি গঠনের সমর্থক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নন্দালী।

ছিলেন অ্যাড হক কমিটি গঠন করে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে তাঁদের হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই ধরেন ছেলের ঘরে ফিরতে দোষ কি, এমন কি তাঁর মধ্যমনিষ্ঠ কংগ্রেস স্বীকার করে নিতেও রাজী। আর যদি একান্তই তাঁর চক্-লজ্জার বাধে তাহলে তিনি কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে একটি অকমিউনিষ্ট কোয়ালিশন সরকার গঠন করুন। পাশাপাশি তাঁকে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে, যদি তিনি এই প্রস্তাবে রাজী না হন তাহলে বাংলা কংগ্রেস থেকে ক্রান্তি দল কিছু সদস্য বার করে এনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবে কংগ্রেস-ক্রান্তি দল সম্বন্ধে নতুন সরকার গঠন করা হবে। ফলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে এক উভয়-সংকট দেখা দিয়েছে। যদি তিনি কংগ্রেস-ক্রান্তি দলের দৌপ গিলে অকমিউনিষ্ট কোয়ালিশন সরকারের মধ্যমনিষ্ঠ গ্রহণ করতে রাজী হন, তাহলে জনসাধারণের চোখে তাঁর যে ইমেজ এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে তা বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি তিনি এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তাহলে বাংলা কংগ্রেস থেকে তেড়ে ক্রান্তি দল বোগদানকারী সদস্যরা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবে। এই উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে মধ্যমনিষ্ঠ ও কতকটা বিভ্রান্ত।

এই বিভ্রান্তি যুক্তফ্রন্টের শরিক দল একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেও এসেছে। তবে তারা কিছুতেই যুক্তফ্রন্ট

সরকারকে ধ্বংসের মূখে ঠেলে দিতে রাজী নন। কয়েকজন যুক্তফ্রন্ট নেতা স্থির করেছেন যে, যে কমিউনিষ্টদের আচরণ সম্পর্কে মধ্যমনিষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ, তাঁদের জন্যই নাকি রাজ্যে শিশু অশান্ত ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি, তাঁরা গিয়ে মধ্যমনিষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার প্রতি-শ্রুতি দেবেন। এদের এই সিদ্ধান্তে মধ্যমনিষ্ঠী অবশ্যই খারি পাবেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্যত্র। বিধানসভার সেই কজন সদস্যের উপরেই সমগ্র বিষয়টা নির্ভর করছে; যাঁরা ক্রান্তি দলের নেতার সঙ্গে ইতিমধ্যেই মনের দিক থেকে যুক্ত হয়ে গিয়ে তাঁর হাতের তুরপে তাগে পরিণত হয়েছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনমত কি অকমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার নামে এই পরিবর্তন মেনে নেবে? আমরা স্বীকার করি যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেক কিছুই করতে পারে নি, বাংলা সংকটের সমাধানে যৌচনীভাবে কণ্ঠ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রয়োজনীয়তা এখনো কুঁড়িয়ে যায় নি। দেশেরই স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখা দরকার।

মধ্যমনিষ্ঠী সম্মেলন

সাহসের সঙ্গে কোন অবস্থার মোকা-বিলা করার মত মেরুদণ্ড আমাদের দেশের

নেতাদের যে নেই সে কথা নয়াদিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আর একবার প্রমাণিত হল। এবং এই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হল যে ভারত এখন আর একটা অখণ্ড দেশ বা জাতি নয়। তা' যদি হত তাহলে এবারের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে খাদ্য অঞ্চল নীতি পরিত্যক্ত হত।

এ কথাটা সকলেই বোঝেন যে সার্বিকভাবে ভারতবর্ষে যে ফসল জন্মায় তা' দিয়ে সমগ্র দেশেরই খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব, এবং খাদ্য অঞ্চল বিলোপ করে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এটা অনুমান নয়, পরীক্ষিত সত্য। রফি আহমেদ কিদোয়াই স্বয়ং ভারতের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই নীতির সাফল্যের পরিচয় পাওয়া গেছে।

কিন্তু কিদোয়াই সাহেব মারা যাবার পর জৈন ও প্যাতিলের খাদ্যমন্ত্রিত্বকালে এই খাদ্য অঞ্চল সৃষ্টি করে আরও একবার দেশ বিভাগ করা হল। চরম মূল্যে আমরা স্বর্গের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রারম্ভ করছি। নেতাদের আহ্বানমুখে ভাষা নিয়ে আর একবার দেশ বিভাগের লক্ষণ ফুটে উঠছে। আর খাদ্য অঞ্চল হিসাবে দেশটিকে ভাগ করে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের যে পথ এই সব অদূরদর্শী নেতারা পরি-

ষ্কার করে দিয়েছেন, তা' বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না, এটা আতংকের সঙ্গে লক্ষ্য করছি।

উন্মত্ত মার্কিনী ফসলের ভাল বজার যাতে ভারতবর্ষে হয় সেই উদ্দেশ্যেই মার্কিন বণিবাদ জৈন ও প্যাতিল এবং পরে সুব্রহ্মনিয়ম এই খাদ্য অঞ্চল রীতি চালু রেখেছিলেন যাতে দ্বার্টা অঞ্চলগুলিতে চিরকাল কৃত্রিম অভাব জাইয়ে রাখা যায়। এবারে মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এই রীতি বিলোপ করার কথা উঠেছিল, কিন্তু উন্মত্ত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা এতে রাজী নন। অর্থাৎ খাদ্যের মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তারা সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে নারাজ। গত দু'শো বছরে গড়ে ওঠা জাতীয় সংহতি যে কিভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এটা তারই একটা নমুনা উদাহরণ। তাই মনে হয় ব্রিটিশ আমলই বোধহয় ভাল ছিল, কেন না তখন সারা দেশ জুড়েই একটা জাতীয়তার মনোভাব ছিল, ভারতের প্রতিটি প্রদেশের লোকেরই একটা ভারতীয় বোধ ছিল, এবং এই মূল্যবান সম্পত্তিটুকু আমরা স্বাধীন ভারতের জুই-ফোড় নেতাদের কপার হারিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে রাজ্যগুলিকে মোট ৭০ লক্ষ টন ফসল সংগ্রহ করতে হবে আগামী বছরের জন্য। তার থেকে অনেকগুণ বেশি ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা আগামী মরশুমে থাকলেও রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে ওই পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর হবে না এ কথা হালফ করেই বলা যায়। বিভিন্ন রাজ্যকে সংগ্রহের কোঠা বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বলে দেওয়া হলোই যে 'বাস্তবে তা' ঘটবে একথা কিভাবে বলা যায়? সকল রাজ্যেই যদি পাইকারী ব্যবসা রাস্তায় করা হয় তবেই হয়ত সংগ্রহ নীতি সাফল্য লাভ করতে পারে। অর্থাৎ এ কার্য করা যেতে পারে একটি সুপরি-কল্পিত নীতির মাধ্যমে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ কৃৎসি নিতে চাইছেন না, রাজ্যগুলির ঘাড় দিয়ে দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন, এবং দায়িত্ব পালন করা রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে অসম্ভব।

আগামী মরশুমে ভাল ফসল জন্মা-বার সম্ভাবনা থাকলেও রাজ্য সরকার-গুলির সংগ্রহ নীতি সর্বোৎসাহিত ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে। কেন না যথার্থ মূল্য না দিলে কোন চাহীই ফসল



মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্ল বোস

দেবে না। ফুড কর্পোরেশন সংগ্রহ মূল্য বাড়তে চাচ্ছেন অথচ খাদ্যদ্রব্যের তাতে হ্রাস। এ অবস্থায় কিভাবে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে? বথার্থ মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দিয়ে কেনা তো জুলুমবাজী।

বস্তৃত পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাতেই আগামী পরিষ্কার হবে। এখনো আগামী মরশুমের খাদ্যনীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। তবে বস্তৃতের সচিব খাদ্যনীতির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে কম হারে যে কৃষকের কাছ থেকে ২১, ২২, ২৩ টাকা দরে ধান সংগ্রহ করবেন। পুরাতন কংগ্রেসী চিন্তাধারা থেকে বস্তৃতও আর এক পা এগুতে পারেন নি। আগামী মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের ধানের কলন ভাল হলেও, এই ধান দিয়ে যদি তা' সরকার সংগ্রহের চেষ্টা করেন বলা বাহুল্য সরকারের ডাকারে কিছুই জমা পড়বে না।

বাইশ টাকা মণ ধানের অর্থ ০৫ টাকা মণ চাল। চাষী যখন দেখছে যে লম্বককালে চালের দর চার টাকা কিলোতে ওঠে, তখন এমন মূর্খ কে আছে ওই জলের দরে সরকারকে ধান-চাল বেচবে? কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে চার টাকা কিলো চাল বেচে অর্থাৎ মূল্য লাভ হয়, এক সেমি লম্বক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ কথা কবার নৈতিক অধিকার কার আছে যখন উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতি-মূল্য লাভ হচ্ছে? বস্তৃত-নেতাদের যদি কিছুমাত্র কান্ডজান থাকে তাহলে আগামীর অনুরোধ যে চালের সংগ্রহ মূল্য বাড়ান, নতুন প্রচুর কলন সত্ত্বেও আগামী মরশুমেও এ বছরের মতই অবস্থা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যি রাজ্যগুলিকে দিয়ে সমস্ত লক্ষ টন ফসল সংগ্রহ করতে চান তাহলে যাতে রাজ্যগুলি বর্ধিত মূল্যে তা সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য অল্পও অধিক অর্থ মঞ্জুর করতে হবে রাজ্যগুলিকে। আর যদি সত্যি তাঁদের খাদ্যসমস্যা সমাধান করার মতলব থাকে তাহলে সোজা পথ আছে। সমগ্র ভারতকে একটি খাদ্য অঞ্চলে পরিণত করলেই চূড়ান্ত সমাধান সৃষ্টিকর্মী প্রাচীরগুলি ভাঙানো পড়বে, যার ফলে সকল রাজ্যই ধান-চালের প্রায় একরকম দাম হয়ে যাবার দরুণ আন্তঃপ্রাদেশিক কালো-বাজারী দূর হবে। মনে রাখতে হবে যে উৎস ও ঘাটতি অল্পের মতোভাবেই ব্যবধান শূন্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই ঘটছে না; পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি যে, জেলায় জেলায়ও এই মনোভাবের ব্যাপ্তি ঘটছে। উৎস জেলাগুলি জেলার বাইরে ফসল বেতে না দিতে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অ-উৎসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে জেলাগুলির নিকট রাজ্য সরকারকে পরামর্শ স্বীকার করতে হয়েছে, যেমন কয়েকটি উৎস রাজ্যের ক্ষেত্রে নিকট কেন্দ্রীয় সরকার হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি এবং সেই জন্যই খাদ্যভাব জারতের কোন সমস্যা হতে পারে না। দেশের এই খাদ্য পরিস্থিতি জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মিশ্রিত ও মেরুদণ্ডহীন নীতিই একমাত্র দায়ী।

নন-প্রাকটিশ চিকিৎসক সমিতি

আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর সরকারী চিকিৎসকদের নিয়োগ, বদলী ও কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্কে নিরক্ষরমূলক প্রণয়ন করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, সরকারী হাসপাতালে নিযুক্ত চিকিৎসকদের প্রত্যেক নির্দিষ্ট কর্তৃক বস্তু কাজ করতে হবে, হাসপাতালে এসে একটা চক্র দিয়ে গেলেই চলবে না। এই ঘোষণার সপক্ষে সচিব অতীতের ন্যায় এখানেও চিকিৎসকদের কার্যে স্বার্থে সন্তান সন্তান-মহল থেকে এসব নিরক্ষরমূলক বানচাল করার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং এই বিষয়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মনুষ্য হুমিকা গ্রহণ করেছেন।

এই স্থল কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বড় বড় পসার-ওয়ালা চিকিৎসকেরা সরকারী হাসপাতাল-গুলিতে একটি চক্রের সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং তাঁরা নিজদের প্রাকটিশের দিকে, যতটা নজর দেন হাসপাতালের রোগীদের দিকে ততটা নজর দেন না, হাসপাতালের চাকরিকে নিজদের পসার বাড়াবার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং হাসপাতালের বাইরে যারা তাঁদের ফি দেন না তাঁদের এই সব মহৎ ব্যক্তিদের হাতে চিকিৎসা পাবার কোন সুযোগ থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত দু'একজন ডাক্তার এর ব্যতিক্রম। কিন্তু অধিকাংশই এই মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এই কার্যে স্বার্থ প্রত্যাবর্তিত। মাত্র কিছুকাল আগেই এই প্রতিষ্ঠানের একজন বড় কর্তা মন্তব্য করেছেন যে, দেশে নাকি চিকিৎসকের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। অতএব আর নতুন মেডিক্যাল কলেজ খোলার দরকার নেই। কেন না ডাক্তারের সংখ্যা বেশি হলেই এঁদের কার্যে স্বার্থ ব্যাঘাত ঘটবে। ডাক্তারী মানের সকল গোপন রহস্যপথ এঁরা এমনভাবে আগলে আছেন যে, এঁদের কার্যে স্বার্থের বিলম্বিত ব্যাঘাত ঘটে না। এমন

কি পাছে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়বে এই আশংকার উচ্চতর ডিগ্রীলাভের সুযোগ থেকেও মেডিক্যাল গ্রেডুয়েটদের সুপার-কল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হয়। এম-ডি হওয়া তো আশ্চিতমূলক অনুগ্রহীত ভাগ্যবানদেরই বরতে জোট, ভুক্তভোগী আরেই তা জানেন। অতীতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যে স্বার্থের এই চক্র ভাঙার অনেক চেষ্টা হয়েছে, নামডাকওয়ালা চিকিৎসকদের সরকারী চাকরীর নিয়মকানুনের মধ্যে বীথক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই সব চিকিৎসকদের সংযম প্রতিক্রিয়ায় ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু কালের চাকা কখনো পিছন দিকে ঘোরে না। কাল উত্তরণের সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত তরুণ জাতি এই কার্যে স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সরকারী হাসপাতালের নন-প্রাকটিশ ডাক্তারদের একটি পৃথক সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এই সমিতি স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রস্তাবিত নতুন সরকারী নিয়ম সমর্থন করেছেন। বস্তৃত এই নন-প্রাকটিশ চিকিৎসকগণ এতদিনকার মেজাজে কাজ করে চলেছেন যা সরকারী নতুন নিয়মের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এঁদের কাজ থেকে দেশবাসী অনেক কিছুই প্রত্যাশা করতে পারেন। তবে আমাদের একটা বড় ভয় হচ্ছে এই যে, যে সকল জাতীয় চিকিৎসক ওরেন্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে কাজ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম অঞ্চলেও আগ্রহ ও নিষ্ঠার সপক্ষে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ স্বীকৃতি বাড়ানো উচিত। একথা আমরা সর্বোচ্চ কব্জার বলেছি, আবার বলাছি। আমরা এই নতুন সমিতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ট্যাক্স-চালকদের বিক্ষোভ

কলকাতার রাজপথে জমিন দুশো ট্যাক্স একটা শোভাযাত্রা করে কলকাতার খারাপ রাস্তা মেরামত করানোর দাবিতে বেশ কিছুক্ষণ শহরের যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত করেছিল। এইরকম একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন ট্যাক্স-চালকদের না তাদের মারিকদের সৈতী আমরা ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের দেশের সকল ধরনের বিরোধের মূল্য সঠিকভাবে নেহেতু অর্থনীতি সংক্রান্ত, এবং রাস্তাঘাট মেরামতের মত একটা আদর্শবাদী দাবি নিয়ে যারা শোভাযাত্রা করেছেন তাঁদের যা তাঁদের মারিকদের এই আকস্মিক আচরণে আমাদের মত দুঃখী মানবের একটি অর্থনীতির স্বার্থেই জন মণ পাছে বলে মনে হচ্ছে। এটা কি ট্যাক্সের ভাড়া বৃদ্ধির দাবির একটা প্রাথমিক ব্যাক-গ্রাউন্ড? ধরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। ট্যাক্সের মালিকদের সন্ধিরে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে

আপনি কি জানেন

যে যাঁদের নতুন শিল্প স্থাপনা করার
মুহূর্ত পরিকল্পনা আছে, যাঁদের
প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানের
অভাব নেই, এবং সর্বোপরি,
যাঁদের রয়েছে সাফল্যের সঙ্গে
কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা, অথচ
নেই পর্যাপ্ত টাকার সংস্থান, তাঁরা
যদি ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ে নামতে
চান, তাহলে এখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক
থেকে তাঁরা ঋণ পেতে পারেন।



যদি আপনার হাতে লাভজনক কোন
পরিকল্পনা থাকে, তাহলে আমাদের
সাথে এসে দেখা করুন-যে কোন সময়ে

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

সাম্প্রতিক বহুদলীয়

কলকাতার রাস্তাঘাট অতিশয় খারাপ, কিন্তু পাঁচ বছর আগে তা অতিশয়তর খারাপ ছিল এবং দশ বছর অতিশয়তর খারাপ ছিল। জ্ঞান কবি জ্যোতি চন্দ্রের মালিকদের লোকসান না হয়ে থাকে এখনো তা হবার কোন কারণ নেই। কলকাতার ট্যান্ডিওয়ালারা যে দাম নিচ্ছেন তা তো গলাকাটা দামই, আবার রাস্তাঘাটের ধূয়া ভুলে আর এক প্রসঙ্গ জনসাধারণের গলা কাটার অপচেষ্টা কেন? দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্বে অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা ট্যান্ডিওয়ালাদের অনুকূলে যাবে না। কলকাতার রাস্তাঘাটের সমস্যা ট্যান্ডিওয়ালাদেরই একার সমস্যা নয়, আপনার আমার মত পথচারীকেও মাঝে মাঝে হেঁচকি খেতে হয়। আসুন না, আমরাও একটা মিছিল করে হেঁচকি খাওয়া পায়ের তেল-মালিশের জন্য সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার দাবি করি।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বহুদলীয় দৃষ্টান্ত

গত বহুস্পতিবার ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাউন আসাম মেল যে দৃষ্টান্তের পতিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এইরকম দৃষ্টান্তের নজীর নেই। আহত ব্যক্তিদের আরোগ্য কামনা এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় পরিজনদের শ্রমবেদনা জানানো ছাড়া আমাদের আর কিছই করণীয় নেই। দৃষ্টান্তের উপর মানুষের হাত নেই বলে চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই। অবশ্য বক্তব্যাতের মত প্রাথমিক দৃষ্টান্তের কথা জ্বালাদ। ট্রেন দৃষ্টান্ত আক্রমণ প্রায় ভয়তর প্রবর্তনের ঘটনা হয়ে গেছে এবং এভাবে নিরত যে প্রাকগমিত অবস্থার প্রায় প্রত্যহই ঘটছে এমতাবস্থায় অবহেলাই দায়ী। অভিজ্ঞতার দেখা গেছে রেল কর্তৃপক্ষের অবহেলাই প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টান্তের জন্য দায়ী হয়। আমাদের শ্রমরশে আছে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী একদা যখন রেল-মন্ত্রী ছিলেন, মাদ্রাজের একটি ট্রেন দৃষ্টান্তের দায়িত্ব নিজের কাঁধে গ্রহণ করে পদত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কিন্তু এই মনোভাব রক্ষিত হয় নি। এস ক্রেপাতিলের রেলমন্ত্রীকালে অনেকগুলি বড় বড় ট্রেন দৃষ্টান্ত হয়েছিল, শ্রীপাতিজ সেগলির দায়িত্ব গ্রহণবানের উপর অর্পণ করে সর্বদা বলেছিলেন যে, পদত্যাগ তো গোমর্থে করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই যদি তার দায়িত্ব স্বীকার করে তবে না হয় তাহলে সমগ্র দপ্তরই যে আলস্য ও কর্ম-বিমুখতার পীঠস্থান হয়ে উঠবে এতে আর সন্দেহ কি আছে? বহুত এত-

গুলি দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও রেলদপ্তর দৃষ্টান্ত প্রতীতিবানের কোন চেষ্টাই করেন নি। আমার অভিজ্ঞতার দেখাছি যে কোন দৃষ্টান্ত আরম্ভ হবার পর ঘটা করে তদন্ত করা হয়, তার রিপোর্টও হয়ত প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কিছু টাকার প্রাপ্য হয়। কিন্তু দৃষ্টান্তের নিবৃত্তি নেই। তা ছাড়া রেলদপ্তরের কর্মকর্তাদের যে সকল নজীর আমরা অন্য পেরেছি, তাতে একটা কথাই প্রকটিত হয়ে ওঠে যে রেলের পরিচালন ব্যবস্থার ঘৃণ ধরেছে। তার নিদর্শন আমরা পেরেছি সাম্প্রতিক হাওড়া স্টেশনের ইন্টারলকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়। যে কর্মকর্তাকে ভিত্তি করে প্রতিদিন ট্রেনের চাকা ঘোরে তা আসলে এতই অসুস্থস্বাস্থ্য এবং দুটিবহুল যে, জেহাং ভায়ায় উল্লর নিভর করা ছাড়া স্বাস্থ্যের আর কোন গতি নেই। পর পর এতগুলি ট্রেন দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও রেলের বড়কর্তাদের বিদ্যমান নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নি। আমরা জানতে চাই এই জাতীয় দৃষ্টান্ত মোকাবেলা জন্য ইতিপূর্বে রেলদপ্তরের বড়কর্তারা কি করেছেন? গত কয়েক বছরের মধ্যে কতটুকু সাবধানতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? বহু দূর জানি, কিছই হয় নি, কেন না অ্যাক্সিডেন্টের ধাক্কা মাঝে মাঝে রেলদপ্তরের কৃন্তনকর্মের নিদ্রাভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তা পলকের জন্য।

করকটি অভিযোগ

সাম্প্রতিক (বর্তমান) থেকে শ্রীপাতি গোপাল রায় লিখেছেন যে, গ্রাম-পণ্ডারত-গুলির মধ্যে করকজন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অধিকাংশ গ্রাম্য রাস্তাকে নিজদের জমির অঙ্গীভূত করেছেন। যার ফলে গ্রাম্য রাস্তাগুলি সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছে। শব্দ রাস্তাই নয়, রাস্তার স্বাধীন, জগাভ প্রভৃতি স্থানের জমিগুলিও এই গ্রাম্য করকর্মী স্বার্থের কর্কশিত হতে চলছে দিনের পর দিন। বহুত কংগ্রেসী আমলে যে পণ্ডারত পন্থায় প্রবর্তিত হয়েছে তাতে কিছ ধূস্রতার অর্থবান স্বার্থপর মানুষকেই অপরাপর গ্রামবাসীর মাথায় চড়ে বসবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং নিজের অর্থ কমতা ও প্রতিপত্তির কল্যাণে এই শ্রেণীর জীবেরা সাধারণের সম্পত্তিসমূহকে নিজদের দখলের এলাকায় নিয়ে আসছে। এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করাও দ্রিষ্ট মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল কোর্টের ব্যয় বহন করতে গেলে ভিটেমাটি আর থাকে না, কাজেই বাধ্য না গেলে এই রক্তচোষা "ভিলেজ এগ্রিস্ট্রাক্সার" দাপট প্রতি-নিরতই সাধারণ গ্রাম্য মানুষের নিকট দূর্বহ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে আমরা

পূর্বেও বহুদলনে আলোচনা করেছিলাম, তার কোন ফল কংগ্রেস আমলে হয় নি। বহুদলনের আমলেও কি কিছ হবে না?

হুগলী জেলার একটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সদস্যদের এক অংশের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করকটি অভিযোগ প্রকাশ সোচ্চার হচ্ছে। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তারা নাথি প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। ঋণ প্রদান ব্যাপারে সদস্যদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ এসেছে। যে সব সদস্য ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সেনহভাঙন একমাত্র ভারাই নাথি ওখান থেকে ঋণ পেতে পারেন এবং বারি তা নন তারা সম্পত্তি বন্ধক ও উপবৃত্ত জামিনদার দেওয়া সত্ত্বেও ঋণলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তদুপরি সোসাইটির তরফ থেকে বারি ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে নিকট ইনস্পেকশনে আসেন তাদের উৎকোচপ্রিয়তার অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। হাজার টাকা ঋণ পেতে গেলে পণ্ডার টাকা ইনস্পেকশনওয়ালাকে বহু নাকি ন দিতেই নয়। বারিদের একান্ত প্রয়োজন ভারি এইভাবেই টাকা নিতে বাধ্য হন। অথচ এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি একদা এই সব পক্ষপাত থেকে মুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সব অভিযোগ কেন উঠছে সেই জন্য বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হুগলী ধরমপুরের মহামায়া কলোনী নিবাসিনী জনৈকা ভদ্রমহিলা আমাদের শ্রবণে জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বামী রেশন বহিষ্ঠত এলাকা রবীন্দ্রনগরে একটি মাদারি দোকান করে কামরূপে জীবিকার নিবাহ করতেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁকে পি ডি অ্যাক্টে ধরা হয়েছে। মজুদদারী অভিযোগে। তাঁর মতে এই প্রেক্ষণ নাকি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কেন না মজুদদারের কোন সংজ্ঞাতে তাঁকে ফেলা যায় না, তাঁর দোকান ও মলধনের পরিধি এতই ক্ষুদ্র। পছলখিকার ধারণা যে জনৈক পুলিশ কর্মচারী কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই এই একটি ক্ষেত্রে পি ডি অ্যাক্টের অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বহু দূর জানি পি ডি অ্যাক্টের বলে প্রতিহিংসাবশত নির্দোষ লোককেও আটক রাখার ক্ষমতা পুলিশের আছে। বর্তমান ঘটনাটি যদি সেইরূপ হয় তাহলে তা শব্দ দৃষ্টজনকই হবে না, ওই আইনের মূল উদ্দেশ্যটিকেও ব্যর্থ করে দেবে।

(৩০।১২।৬৭)

কতই বা বয়স হবে? বড় জোর বারো। দক্ষিণ কলকাতার একটি মেয়ে-স্কুলের ক্লাস সিকুনের ছাত্রী। দিনিমণিকে খই দিয়েছে, হঠাৎ বই থেকে একটি ছোট্ট মালিচ কাগজ পড়ে যেতে দিনিমণি সেটি কুড়িয়ে নিনেন। কাগজের ভাঁজ খুলে যেতে হঠাৎ একটি শব্দ দিনিমণির চোখ আটকে দেল। অতি-পরিচিত সনাতন 'প্রিয়বরেন্দ্র' লিপ্যন্তিত শিক্ষিত্রীকে পুরো চিঠি পড়তে বাধ্য (কিংবা অগ্রহী!) করলো। চিঠিটি এই :

প্রিয়ভগ্নেশ্বর, তুমি কি নিষ্ঠুর! কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো তো। সেই পরশুর আগের দিন লেকের পাড়ে বসে কত কথা হলো—তুমি বলছিলাম, তুমি আমাকে না দেখে চাকতে পারো না! তাই যদি হয়, তবে আর সাড়াশব্দ নেই কেন? আচ্ছা রমেনদা, তুমি চাকার পাছ কবে? জানো, আমি রোজ ভগবানের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি। শোনো, আগামী মণ্ডলবার দৈন্যপ্রিয় পাকের বাস-স্টপের কাছে ছুটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার পছন্দ আকাশী রঙের শাড়ি পরেই কিন্তু। অনেক অনেক ...' (লেখিকার মামসহ বাকিটা উষা রাখলাম)।

অপরিণত হাতের লেখায় পরিণত মনের চিঠি। যে-সহজতায় মানুষ মা-বাবাকে সম্বোধন করে, সেই সহজতাতেই বোধ হয় সে তার হৃদয়ের ভাষা খুলে পায়। 'অশিক্ষিতপদ' প্রেমের চিঠি লেখায় স্বতথ্যনি সত্য, তেমনিটি বোধ হয় আর কোথাও নয়। আর এ ব্যাপারে কিশোর-বন্ধে নাহিক প্রভেদ, নিখিল ছুবন প্রেমিকময়!

উপরের ঘটনাটির পরের অংশ বাংলা-দেশে (তথা ভারতবর্ষে) কল্পনা-অসাধ্য নয় : কিশোরী প্রেমিকাকে স্কুল থেকে বিভাড়ন করে শাস্তি দেওয়া হতো। শিক্ষিত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনারা মেয়েটিকে কোন্ অপরাধে ভাড়া করেন?'
কি বলছেন! বারো বছর বয়সে প্রেমপত্র লেখে, এমন পাজী মেয়েকে স্কুলে রাখতে বলেন আপনি? ও-মেয়ে তো বাকিসের মাথা খাবে—অবিবাহিতা শিক্ষিত্রীর বিস্ময়গম্ভীর জবাব।

অর্থাৎ আপনার মতে, প্রেমপত্র লেখা একটা অপরাধ, এবং সেটা যদি কম বয়সের কেউ লেখে তা' হলে তার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

না, ঠিক তা' নয়। প্রেমপত্র লেখা অপরাধ নয়, কিন্তু অপরিণত ছেলে-মেয়েরা যদি তা' লেখে তবে অপরাধ খই কি!

আপনার মতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যাই হোক অপরিণত?

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

হ্যাঁ, নিষ্ঠুরই!

স্কুলের বাইরে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর যে-জীবন, তার উপর আগমাদের কি কোন নিয়ন্ত্রণ-কমতা আছে?

আমার প্রশ্নটি ভুল বুঝে শিক্ষিত্রী বললেন, 'ছেলে-মেয়েদের নৈতিক জীবনের দায়িত্ব আমাদের নেওয়া উচিত নয়, এইটিই কি আপনি বলতে চান?'

নিজের অজ্ঞাতে আমার চিন্তাকে মহিলা আর-একটু উসকে দিলেন। পূর্বের প্রশ্ন বিস্ময় করে বললাম, 'ছেলেমেয়েদের চাকি তৈরি হয় বাড়িতে, তার মা-বাবার কাছে। ছেলেমেয়েদের পারিবারিক জীবনের ও পরিপাক্ষের উপর যখন আপনারা কোন হাত নেই, তখন শূন্যায় স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা করে লাভ কি? স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে কোন ছেলে-মেয়ে অশোভন বা অন্যায় আচরণ করলে আপনি আপনার বথাকর্তব্য করবেন, অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিবিধান করবেন, কিন্তু স্কুলের বাইরে কোন ছেলে-মেয়ে কি করছে না করছে দেখার দায়িত্ব আপনার নয়।'

ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হাস্ত্যার আমি যদি কোন ছাত্রীকে অশোভন আচরণ করতে দেখি, তাহলে কি আমি চোখ বুজে থাকব?'

মৃদু হেসে বললাম, 'বাংলাদেশের (ভারতবর্ষেরও বলতে পারি) ছেলেমেয়েরা কতখানি অশোভন হ'তে পারে বলে আপনার ধারণা? বড় জোর, আপনি আপনার কোন ছাত্রীকে লেকের পাড়ে কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রমাণাংশে বাস্তব দেখতে পারেন। যৌবনস্পর্শী বয়সে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সংগতিসা যখন স্বাভাবী ঘটনা, তখন তাকে অপরাধ বলবেন কি করে? আর ট্রান্সকাল আব-হাওয়ায় এই আসংগতিসা যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে দেখা দেয়, এ তো আমাদের অজানা নয়। অতএব আপনার বারো বছরের ছাত্রীটির পক্ষে প্রেমে পড়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।'

একটু পরেই রেশ টেনে বললাম,

'তা ছাড়া, ছাত্রীটির পারিবারিক জীবন অর্থাৎ বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনদের এবং পারিবারিক অবস্থার খোঁজখবর নিলে আপনি এমন কিছু তথ্য পেতেন, যা যথেষ্ট আপনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা-স্নেহে কাছে টেনে নিতে পারতেন। খোঁজখবরে আপনি হয়তো জানতেন, প্রণয়াদিব ব্যাপারে মেয়েটির বাড়ি হয়তো উদার, কিংবা তার বাড়িতে প্রণয়-ব্যাপার ঘটেছে বা ঘটছে, যা তার চোখ এড়ায় নি। তার উপর আছে আমাদের বর্তমান সমাজের নানা প্রভাব। অতএব তার ভাগ্যে যখন প্রেমের বাস্তব ফল এলো, তখন সে সহজ নারীর মতো তাকে গ্রহণ কবতে স্বেচ্ছা করে নি।'

অবিবাহিতা শিক্ষিত্রীর মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য কবলাম। ভদ্রমহিলাকে কেমন যেন উদাস মনে হলো: তবে কি তিনি নিজের জীবনের কোন বিষয় অধ্যায় পুনর্বীর পড়ার চেষ্টা কবছেন, তিনিও কি সহজ নারীর মতো পুরুষের ভালোবাসা চেয়েছিলেন, যা কি চেয়ে পান নি যা পেয়ে হাতছাড়া করতে বাধ্য হবছেন? কিছুদ্ধণ নীরবতার পর শিক্ষিত্রী আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তা' হলে মেয়েটির প্রতি কি আমি অন্যায় করেছি?'

সাম্ব্যনার সুবে বললাম, 'আব-দ-দশজন যা করেন, আপনিও তাই কবেছেন, সে দিক থেকে হয়তো কিছু অন্যায় হয়েছে নি। কিন্তু আমরা বড়রা যারা ছেলে-মেয়েদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সদাই বাস্তব তাদের আত্মানুসন্ধান করা দরকার। অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা গোজায় যাচ্ছে বলে চিৎকারে



মা করে গোজান্ন যাবার কারণগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদের যেন সচেতন হওয়া দরকার, তেমন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে তাদের অভাব-আঁতরণ সমস্যাগুলি যদি দেখা চেষ্টা করি, তবে তাতে আমরা স্বস্তি পাবো আর তারাও লাভবান হবে।

‘আমি’ মাঝে মাঝে বলে থাকি, ছোটরা আজ আর ছোট নেই, রূপকথা উপকথার প্রতি তাদের আকর্ষণ ক্রমশ কমে আসছে, বড়দের গল্প বড়দের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ এখন অনেক বেশি। এমনি-তেই ছোটরা কোঁতাহলী, কাজেই তারা যখন পথে-ঘাটে কাগজ-পত্রে বিচিত্র দৃশ্যের বা ভাবের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে বড়দের অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। বাংলা খবরের কাগজে ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট পাতা শেষ করে আমার ছোট ভাইপো পরিবার-পরিরক্ষণ-সংক্রান্ত বিশেষ ক্রোড়পত্রে যখন মনঃসংযোগ করে, তখন আমি কীটংগ বিমূঢ় বোধ করি। আমার কপালে ঘাস দেখা দেয় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চায় যখন সে জিজ্ঞেস করে, কাকু, যোনির বাইরে বাঁধ ত্যাগ করা মানে কি? বিব্রত হয়ে ঘলেছিলাম, ডিকশনারী দেখে পড়ে য়লাম। ইচ্ছে হবোঁছিল, খবরের কাগজে টেলিফোন করে অনুরোধ করি, আপনাদের দোহাই, পরিবার-পরিরক্ষণ নিয়ে অ্যার মাতামাতি করবেন না, অন্তত ষাগামাদিনের নাগরিকদের কথা ভেবে। এক এক সময় মনে হয় আমাদের দরকার ও সংবাদপত্র পরিবার-নিরক্ষর করতে গিবে পরিবার বৃদ্ধির পথই বৃদ্ধি প্রশস্ত করছেন।

প্রশ্ন উঠবে, বেভাবে সংবাদপত্রে সরকারী বিজ্ঞাপনে পরিবার-পরিরক্ষণের কথা যদি প্রচারিত না হয়, তাহলে জন-সাধারণকে এ ব্যাপারে সচেতন করা বাবে কিভাবে? চন্দ্রগুপ্তের বিনীত স্বরশা, পরিবার-পরিরক্ষণের বিষয়টি ছোটদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রচার করা কিছ্ অসম্ভব নয়। যেহেতু বিষয়টি বিবাহিত দম্পতি-দের ও বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষের সরকার সরাসরি তাদের মধ্যে কি সংযোগ স্থাপন করতে পারেন না? যে-পন্থাভিতে লোক-গণনা হয়, সেই পন্থাভিতে কি বিবাহিত দম্পতিদের বা যুবক-যুবতীদের পরিবার-পরিরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা যায় না? পরিবার-পরিরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচার-কর্মের জন্য যে বিশৃঙ্খল পরিমাণ অর্থব্যয় হচ্ছে, এতে কি তাঁর চাইতে বেশি অর্থব্যয় হবে, নিশ্চয়ই নয়।

শিক্ষিত্রী আমার কথায় সাম দিবে বললেন, ‘সত্যি, পরিবার-পরিরক্ষণ-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যেভাবে ফলাও করে রাস্তার-ঘাটে-খবরের কাগজে প্রচারিত হচ্ছে, তাতে বড়দের জ্ঞান ছোটরাই অনেক বেশি আহরণ করছে। আমার খারণ, আমার স্কুলের অনেক মেয়েই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে করেক ঘণ্টা সাবলীল বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারবে।’

‘এইখানেই দরখের শেষ নয়’ আমি আবার শুরু করি। আমাদের পত্র-পত্রিকা-সিনেমা ইত্যাদিও সোনায় সোহাগাব কাজ করছে। পথে-ঘাটে হিন্দী সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখুন; সিনেমা পত্রিকাগুলি ওড়াল, বেতানে নাটক, শুনুন সর্বদা সর্বত্র একটাই স্থায়ী সুরঃ যোঁতা। সমাজ-দেহকে বিধিরে দেওয়ার এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার উন্নয়ন রোধিবে কে?’

ভদ্রমহিলা একটি বহু প্রচারিত সাপ্তাহিকের নাম করে বললেন, ‘সিনেমা-পত্রিকার চিরন্তন বৃদ্ধি, বৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না, কিন্তু সাহিত্যের ভ্রু বেষ্টের অন্তরালে যারা গাঁদকাঁড়ি করে, তাদের চিনতে অনেক সময়-দোঁর হয়।’ এই বলে শিক্ষিত্রী তাঁর টেবিল থেকে এ পত্রিকার সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ‘গল্প পড়তে বললেন। এবং কি আশ্চর্য, পত্রিকাটি খুলতেই চোখে পড়ল এমন একটি অংশ, যেখানে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের বিনীত বর্ণনা (রুচির স্বার্থে উদ্ভূত করতে পারছি না) প্রসঙ্গে লেখক বলছেন, ‘পুঙ্জন খেলতে আশ্রিত করেছিল। এখানে ‘খেলা’ শব্দটাই প্রয়োগ করলাম। এমন খেলা আমি জীবনে দেখি নি। কোনদিন ফুলব না।’

আমার বাড়িতে সার্ক ভিম ফেনাইল ইত্যাদির মতো আলোচ্য সাপ্তাহিকটিও আসে। এবং ও-সব জিনিসের আসা-যাওয়ার আমার আগ্রহ যতশানি, সাপ্তাহিক-টির ক্ষেত্রেও তার বেশি নয়। রুচিৎ-কর্দাচৎ ওটি আমি নাড়াচাড়া করি, দু-চারটি ফাঁচার পড়ি, এবং ততোধিক বিজ্ঞাপন। এ গল্প পড়ার পব আমি আমার বাড়িতে সাপ্তাহিকটির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছি, এবং কাগজওয়ালা ডেকে পুরনো সমস্ত সংখ্যা-গুলি কেটে দিবেছি। তবু এখনও ভ্রু খায় নি, কি জানি ছোট ভাইপো কোনদিন আবার উক্ত ‘খেলার কলাকৌশল সম্পর্কে’ প্রশ্ন করে বসে!

বৌনজ্ঞান বিতরণের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একাধিক পত্রিকা বেরিয়েছে ও বেরোচ্ছে। স্বভাবতই এসেব প্রতি কিশোর-কিশোরীদের আকর্ষণ। তার উপর পথেঘাটে বৌন-পুস্তক-পণ্ডিতকায় এতই হুড়াহুড়ি, অনেক সময় ছটিতে বিব্রত বোধ করি। অথাক লাগে

তাবতে, আমাদের পুঁলিশ-দপ্তর, রাজনৈতিক কমিশনের টিট করতে সদা তৎপর, কিন্তু নৈতিক দুরাচারীদের আশ্রয় দিতে কি আশ্চর্য উদার! ফুটপাথে আলু বিক্রি করতে বসলে আলুওয়ালাকে এরা করেদী-গাড়িতে তোলেন, ফুটপাথের অশ্লীল বই-বিক্রেতার দিকে দ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। আমাদের সমাজপতি, শিক্ষাগতী, রাজনৈতিক নেতারা ছেলেমেয়েদের নৈতিক ক্রমাবনতি নিয়ে দুঃশিঁচিন্ত, ক্রমাবনতির কারণগুলি সম্পর্কে বাঁচচিন্ত।

শিক্ষিত্রীর সঙ্গে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনার শেষে সোঁদন আমার শেষ প্রশ্ন ছিল: ‘এবার বলুন, প্রেমপত্র লেখার জন্য ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত করে আপনি তাকে লখু পাগে গুরু দণ্ড দিয়ে ফেলেন নি কি? কিংবা আর-একটু উদার হতে পারলে ভেবে দেখুন, আমরা বড়রা অহরহ যে-সব অনায়া করছি, সেখানে একটি মেয়ের একটি ছেলেকে প্রেমপত্র লেখা আদৌ অনায়া কি না। হয়তো আপনার ছাত্রীর বয়স কিছুটা কম, কিন্তু আজকের ছেলেমেয়েদের দ্রুত মানসিক পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েটির প্রণয়-সচেতন হওয়া কি এমন অস্বাভাবিক?’

ভদ্রমহিলা স্বীকার করলেন, ‘দীর্ঘ-কাল শিক্ষকতা করার জন্য জীবনের স্বাভাবিক হৃদযোষ তিনি হারিয়ে ফেলে-ছেন এবং তারই ফলে তিনি মেয়েটিকে তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছেন।’

আমাদের সুরে বললাম, ‘দীর্ঘ-কাল শিক্ষকতা করেও মনকে সহজ সজীব রাখা যায়। আপনি সে চেষ্টা করুন, নিশ্চয়ই সফল হবেন। ছেলেমেয়েদের ভালোবাসুন, দেখবেন তারাও আপনাকে ভালোবাসছে। জানবেন, সেকালের তুলনার আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি দৃষ্টি, দৃষ্টি-কণ্ঠের জলপ্রোতে আঁকড়ে ধরার মতো কোন আদর্শের সামান্য খড়কুটোও তারা পাচ্ছে না, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আমরা যথাযথ যতক্ষণ না করতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।’

পিতামাতা ও গুরুজনদের আদর্শ-হীন আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক সঙ্কটের উন্নয়ন, ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতি, শিল্প ও সাহিত্যে যৌনতার উৎসব-আজকের এই ডেজাল জীবনে যদি কোন কিশোরী কোন কিশোরকে তার নিভেঁজাল হৃদয় অর্পণ করে, তখন সেই কিশোরীকে সাহায্য দেব না শাস্তি দেব, তাবৎ সহৃদয় বংশিজীবীর কাছে চন্দ্রগুপ্তের এই বিনীত জিজ্ঞাসা।

ভারত দর্শন

মুখ্য বন্ধে থাকলেই সবংশে ধ্বংস

হয় সংগ্রহ কর, নয় ধ্বংস হও।

এ শ্লোগান কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের। অবশ্য এ শ্লোগানের অর্থ যদি কেউ এমন করেন যে, হয় ছিনিয়ে নাও, নয় ধ্বংস হও, তবে ভুল করবেন। বিপ্লবের শ্লোগান নয়, এ হল উপদেশের সায়গান।

এই সাময়িকীটির গাওনা বসেছিল মল্লানিজীতে সমবেত মধ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে। প্রধান গায়ক খাদ্যমন্ত্রী সঙ্গো কোরানে কণ্ঠ মিলিয়ে রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীরও খাদ্য সংগ্রহের গান গেয়েছেন। মিউজিক ডিরেক্টরের ছিঁড়িটি শুন্যে আন্দোলিত করে প্রধানমন্ত্রী কী করা উচিত আর কী করতে হবে ইত্যাদি প্রথাবদ্ধ নির্দেশ নিয়মমাফিক প্রদান করেন।

রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীর অত্যুপর ৭০ লক্ষ টন খারিপ শস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং এজন্য এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল প্রথা চালু রাখার পক্ষেই ত্রায় দেন। বিশ-দশ লক্ষ টনের একটি আপংকালীন ভান্ডার গঠনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি লাভ করে।

সাধারণের বিন্দি রজনীর দৃশ্যশ্রবণ আর এককটি বিভীষিকাময়ী হয়ে ওঠে আগামী বছরে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাসের সংবাদে।

এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল

কিন্তু এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল ব্যবস্থাটা ঘাটতি রাজ্যগুলির পক্ষে। যে মারাত্মক এ প্রশ্নটাও একই সঙ্গো কোনো কোনো চিন্তাশীল মধ্যমন্ত্রীকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু কেরালার শ্রীযুত ই এম এস নান্দুদ্রিপাদ বলেছেন : সংগ্রহ ব্যবস্থার সঙ্গো এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চলের প্রশ্নটি অনিবার্যরূপে বিজড়িত। সংগ্রহ করতে হলে, আন্তঃরাজ্য শস্য চলাচলেও কড়া বাঁধনের প্রয়োজন।

তবে থাক! সবাই সমস্বরে বললেন, তবে থাক প্রথাটা।

কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সেই মারাত্মক প্রশ্নটি উত্থাপন করতে ভোলেন নি। বলেছেন, এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল প্রথা

বজায় রাখতে হলে উদ্ভূত, রাজ্যগুলিকে অবশ্যই ঘাটতি। রাজ্যে যতদূর সম্ভব উদ্ভূত শস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় শস্য ভান্ডারেও উদ্ভূত রাজ্যগুলি প্রতিশ্রুত পরিমাণ খাদ্যশস্য জমা না দিলে, ঘাটতি পূরণে অপারগ হবে কেন্দ্রীয় ভান্ডার। তদুপরি আগামী বছরে আমদানী হ্রাস পেলে অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠবে। সুতরাং এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল প্রথার সর্বশেষ সাফল্য উদ্ভূত রাজ্যগুলির সুস্বাসিত ওপরই নির্ভরশীল। এজন্য অনেক রাজ্যই এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চলের পরিধাম-সাফল্যে সন্দেহান।

বর্ষিক ফেডারেশনের সতর্কবাণী

এক রাজ্য খাদ্যাঞ্চল প্রথা চালু থাকলে উৎপাদন দক্ষতা হ্রাস এবং ফলত প্রান্তিক উদ্ভূত রাজ্য ঘাটতি রাজ্যে এবং উদ্ভূত রাজ্যের প্রান্তিক উদ্ভূত রাজ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে সতর্ক করেন ভারতীয় বর্ষিক ও শিল্পপতি ফেডারেশন।

শিল্পপতিরা আবও আশঙ্কা করেন, আঞ্চলিক বিধিনিষেধের ফলে সমাজ-বিরোধীরা উদ্ভূত শস্য সরিয়ে ফেলবে।

অসদুপায়ে শস্য পাচারের দৃষ্টিক্রিয়া প্রতিরোধের জন্য খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন : সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তি নিয়োজিত করার প্রয়োজন একেবারে ফসল কাটার আগেই। অন্যথা মজুতদারের অশ্ধকাব যক্ষপদুরীতে ফসলের অপমৃত্যু ঘটবে।

আসল সমস্যা বস্তৃতপক্ষে অত্যধিক মুনাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গোই জড়িত; তাই কোনও বণিকগোষ্ঠীই এই আকাশছোঁয়া আকাঙ্ক্ষার অন্যতর ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারেন না।

খাদ্য ব্যবসায়ীর বাস্তব

খাদ্যশস্যের চালান ও বিক্রয়ের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ অপসারিত করে স্বাভাবিক বাণিজ্যের অধিকার দানের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছে বারং জানিয়েছেন নিঃ ভাঃ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ফেডারেশন। অর্থাৎ ঔদের খাদ্য নিয়ে ব্যবসা কবাব অবাধ অধিকার দেওয়া হ'ক। বাধ্য থাকলেও ব্যবসায়ীরা অবশ্য ডরান না

তবে খোলামেলা মোজবের অবাধ ব্যবস্থা থাকলে হাঙ্গামা কম। অত্যধিক মুনাকার আকাঙ্ক্ষা তখন নির্বিঘ্নে। সাদা বাজারই জ্বাকিরে বসতে পারবে।

আকাশ মাটির আশীর্বাদ

কিন্তু ফসল সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি ততপক্ষে আকাশ মাটির আনুকূল্যের র নির্ভরশীল। ভালো বর্ষণ এবং গম ফলনটা প্রকৃতির বদান্যতার ধাপেক্ষী। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সাহায্যে নাহায্যে নামে নি আজও। খরা বন্য়ার খেয়ালখুশির হাতে মার খাচ্ছি আমরা। তাই রাজ্যের প্রতি সন্তর লক্ষ টন সংগ্রহের কড়া নির্দেশ পালিত হতে পারে তখনই, যখন আকাশ মাটি অনুগ্রহ করে আমাদের সাবেকী কৃষিক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

সংগ্রহের খুঁটিনাটি

কিন্তু সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থাদি বা খুঁটিনাটি বিচারের জন্য কোনও চিন্তাব রেখা খাদ্য সম্মেলনের কপালে ফুটে ওঠে নি। মোটা করে সংগ্রহের দায়িত্ব রাজ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্র কাড়া হাত-পা হতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সবাই সব জোগাড় কবে দিলে কেন্দ্র তখন উদ্ভূত রাজ্যের কাটা ফসল নিয়ে ঘাটতি রাজ্যের ক্ষুধার অমের সন্ধান করার সময় বেশ খানিক পাঁচ খেলতে পারবেন। খাদ্য নিয়ে রাজনীতির পাঁচ খেলাব সব সূতো কেন্দ্রীয় লাটাই-য়ে গুটিয়ে ফেলা হবে।

সংগ্রহ-মূল্য ও সংগ্রহ পদ্ধতির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনে হয় নি। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী নির্বিড় চাষের মাধ্যমে তিন বছরেই (১৯৭০-এব মধ্যে) খাদ্য আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা সম্পর্কে ফাঁকা আশাবাদ প্রচার করেছেন।

ফলশ্রুতি

সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে নতুনতর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হবেছে এমন কথা বলা অসম্ভব। আমরা কিছ্র ঔচিত্যনোদক শব্দসমষ্টির পুনরুজ্জরণ শুনলাম মাত্র।

সংগ্রহের ব্যাপারটা গোড়া থেকে শূন্য করা এবং নিবিড় সংগ্রহে লক্ষ্য রাখা—এ ছাড়া সংগ্রহের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি সম্মেলন নির্ধারণ করতে পারে নি। অথচ দ্বিবার্ষিক কালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আশা রাখা হয়েছে। গত বছর খারিপ শস্যের সংগ্রহ—হীত পরিমাণ সেখানে ছিল ২৯ লক্ষ টন, সেখানে সত্তর লক্ষের চারগুণে পৌঁছানো মন্ত বড় আশার কথা। আশা, আশ্বাস ও কাজে আসমান-জমিন ফারাক। এদিকটা সচেতনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন সাধারণ অনুভব করেন। মন্দা পর্বতের প্রস্তাব গ্রহণই শেষ কথা।

কিন্তু কেরালার মধ্যমন্ত্রী সম্মেলনের কল্যাণিত হতাশার অন্ধকারই দেখেছেন। তিনি বলেন : সম্মেলনের নিট ফল, ঘাটতি রাজ্যের কপালে আরো কম খাদ্য এবং সেই রাজ্যের জন্য ক্রেতাকে দিতে হবে আরো বেশি মূল্য।

শিক্ষিত বেকার ও শিক্ষার মর্যাদাহানি

একটি শিক্ষিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধীর দশজনই বেকার। তাও এ সংখ্যা পাওয়া হচ্ছে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে তালিকাভুক্তদের সংখ্যা গণনা করেই। যদিও এই গণনা নির্ভুল নয়। কারণ আধা-বেকারের সংখ্যাও এই আধা-গণনার লক্ষিত হওয়ার কথা নয়। তাতেই যখন চিত্রটা এতোদূর জ্বল-জ্বলে তখন ঘরে ঘরে বেকারের অবস্থানটা টের পেতে কষ্ট হয় না।

শিক্ষার বাজারে যাই হোক, কর্ম-সংস্থানের বাজারে একজন প্রবেশিকা উত্তীর্ণ অপেক্ষা একজন স্নাতকোত্তর ছাত্রের মূল্যে উনিশ-বিশ নেই। উনিশ-বিশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। তাও ইদানীং সে দর-কদরেও মন্দা দেখা দিয়েছে। অথচ অশুভ, অভিজাতবাদের নিষ্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য এদেশে হুড়েহুড়ির অন্ত নেই। মোট প্রাপ্ত সংখ্যা এক কোটি বেকারের মধ্যে দশ লক্ষ শিক্ষিত বেকার রাস্তাঘাটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে। ভবু চৈতন্য নেই। কলেজে বিদ্যার্থীদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা নেই। ব্যব-হাবিক জ্ঞানার্জনের দিকে আকর্ষণের লক্ষণ নেই।

কিন্তু কেন? এর মূলে কি সকলেরই বিদ্যাভিগ্গঞ্জ হওয়ার কামনা? দেশের বিভিন্ন কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের প্রতিবেদনে চোখ দিলে কিন্তু অন্যতর উত্তরই মেলে। দেখা যাচ্ছে, যে কাজের জন্য প্রবেশিকা উত্তীর্ণের প্রয়োজন সেখানে হাজারটি স্নাতকোত্তরের আবেদনপত্র পড়ছে। আর দেশে যে কাজটা আর্থমিক শিক্ষার ধারাই কাটতে পারে নিয়োগকারীরা সেজন্য এম-এ খুঁজছেন। প্রতিযোগিতা ভাই

সামান্য ডেসপ্যাচ ক্রাকের জন্য এম-এ অবধি গড়ায়। মাধ্যমিকরা পাস্তা পাবেন কী করে! অগত্যা একটি ডেসপ্যাচ ক্রাক হওয়ার জন্য একজনকে পঁচিশ-ছাশিগাটা বছর কঠোর পরিশ্রম ও অজস্র পরসার অপব্যয় করে এম-এ হতেই হয়। অর্থাৎ যেমনি দেশ, তার তেমনি নিয়োগকারী আর সেজন্যই শিক্ষার তেমনি মান। আসলে ব্যাপারটার শেষ পরিণতিতে শিক্ষার মান-মর্যাদাই পথে বসতে বসেছে, নিদেনপক্ষে বাসের কড়াইয়ের হয়ে হাওয়ারই গাড়িতে প্রমথ করছে। সমগ্র প্রশাসনিক এবং সামাজিক ধ্যান-ধারণার বিবেচনাহীনভায় শিক্ষার মান গলদঘর্ম। একজন সামাজিকের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক ডিগ্রীটা কেন যে একান্ত প্রয়োজন তারও কোন যথার্থ ব্যাখ্যা নেই।

এদেশে সাধারণ জ্ঞান, ব্যবহারিক জ্ঞানকে কোণঠাসা করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পটীপড়া বিদ্যাই। বছরে একবার দুটা কবে যে ডিগ্রী বিতরণের বদান্যতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখিয়ে থাকে তার স্মার্য পরকালের কাজ-কর্তব্য হয় জামি না, ইহকালে কাজ-কর্তব্যই কর্ম-দায়।

সমাবর্তনে “আই চাজ দী” বলে উপাচার্য মশায়ের গালভরা বাঁধা গং কল্পতাবই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর চূড়ান্ত মর্যাদা। এর পর খরচের হিসাবের মতো ইলেকট্রিক বিল কিম্বা গ্যাস বিল অপেক্ষা ডিগ্রীর কাগজটির অন্যতর মূল্য কোথাও স্বীকৃতি পায় না। কেন না কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বলে জীবনে কর্ম-সংস্থান অসম্ভব। কর্ম-লাভের জন্য আর একদফা পরীক্ষার বসতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকুরও মর্যাদা দেয় মা নিয়োগকারীরা। এমন কি পি. এস. সি-ও বিশ্ববিদ্যালয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে এই কেরারী করে ছাপা কাগজটির মূল্য কি? খতিয়ে দেখলে ওটা প্রায়টুকটুকটুক ছাড়া আর কিছু নয়। ওর দ্বারা কোন কাজই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভরসা করে বসে নেই কেউ। নিয়োগকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়কেও নিষ্প্রায় বাতিল করে আসছেন। ফলত ডিগ্রী দানের ছেলেখেলায় ছাত্র-সমাজও শিক্ষার মর্যাদার ওপর আস্থা হারিয়েছেন। উত্তরপথে দশ টাকার নোট সেলাই করে দেওয়ার এ কারণে তাঁদের কি খুব বেশি দোষ দেওয়া যায়?

যদিও দেশে যদাচার। তোমরা যেমন দেখাচ্ছে, তারা তেমনি শিখছে। মালিকের নেকটাই-অটি ম্যাট্রিকুলেট বংশধর যদি

এক হাজার এম-এ, এম-এসসি, এক-কম এজিনারীর গ্রাজুয়েটকে পরীক্ষার দরসাহস রাখে, সে দেশে শিক্ষিত হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সাধনা করার বাতুলতা কে করবেন! প্রায়টুকটুকটুক মূল্য (পরীক্ষা ফী) গুলে দিলেই তো হয়। তাতেও নাহলে, নাহর উত্তরপথে টাকা। কোন অন্যায় নেই। শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা? পকেটে নোটের তাড়া না থাকলে ও বস্তুরও দুলভ। তদাচ শিক্ষিত বেকার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ্যহীন, ক্রান্ত অবস্থাবোধে। এই বিরাট অপচয় হতে দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র শিক্ষিত ভরণের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে পড়ায়।

যদি সাধারণ কাজের জন্য উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট ডিস-কোয়ালিফিকেশনরূপে গণ্য করার রীতি থাকত তাহলে প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় গণ্ডার গণ্ডার ছেলে-মেয়েরা গ্রাজুয়েট হতে ছুটতেন না। ভুললোক ফেরিওয়ালা বা সেলসম্যানের জন্য ইদানীং যে জাতের বিশ্ববিদ্যালয়ই ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়ে থাকে তাতে করেও সমস্যাটার মূলে চোখ ফেলা কঠিন নয়। যে অনার্স গ্রাজুয়েট না হলে কোন কোন সরকারী কেরানীর পদে চাকরি পাওয়া ভার হয়, সে চাকরিতে অনার্সের অনার কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে তা সহজেই অনুমের। উদাহরণ বাঁধ করার প্রয়োজন নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে কর্তারাই দেশ-ব্যাপী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি কবছেন, শিক্ষার মর্যাদাকে ধূলি-ধূসরিত করছেন দেশে বেকার সমস্যার পাঁকে চুকিয়ে। আবার এই কর্তারাই লক্ষ্যহীনভাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিড় বাতানোর সমস্যা নিয়ে দারিদ্রহীনের মতো অধিকার অপরাধের চিহ্ন হুড়ে বহুতাবাজ করছেন। দেশের কর্তাদের লক্ষ্যহীন ভাবনাই নিরিচালনার ঘড়িই দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ম্যান-পাওয়ার বা লোক-বলের অপচয় করে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মূল্য তার আপন কোটিতে নিপীত হোক আগন্ত নেই; কিন্তু যে কোনো শ্রেণীর প্রমের মর্যাদাকে ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে যথার্থভাবে গুরুত্ব দান করা হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষম ডিগ্রীর প্রতি মোহ হ্রাস পাবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার মর্যাদাহানিরও সংখ্যা কমবে।

আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সম্মান ছিল। কেন না ডিগ্রী প্রাপ্তের যোগান ছিল চাহিদার তুলনার কম। আজ চাহিদার



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের স্বপ্ন নিতে দেখান।



তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের স্বক পরিচর্যা তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ডুতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য



সাধনা বিউটি ক্রীম

অনুপাতে যোগান যত বাড়ছে; ডিগ্রীর অসম্মানেও কর্মক্ষেত্রে ততই দাপটশালিনী হয়ে উঠছে। চাহিদা যোগানের ক্ষেত্রে সরকার কিছু করে উঠতে পারবেন, এতো-বড় দুঃস্বপ্ন কেউ দেখি না আমরা, কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্যাটা-

গোরিতে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ছাপকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষিতের নিয়োগও রোখা যায়।

এইভাবে প্রতিযোগিতার অসাম্য

হাস ও ইংটারহুস নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে চ্যালেঞ্জ করার প্রীতি বন্ধ করা না হলে ডিগ্রীর আভিজাত্যও রক্ষিত হতে পারে না, শিক্ষার্থীর মনেও শিক্ষার মর্যাদার প্রাণ্থা জাগানো সম্ভব নয়।

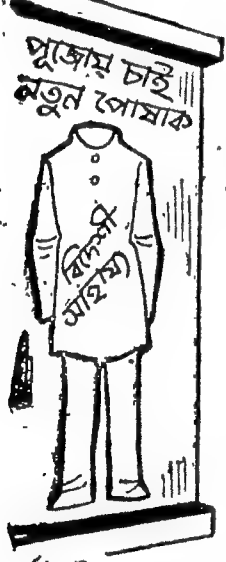
(৩০।৯।৬৭)

আনন্দময়ীর আগমনে..

অজীম



জাতীয় ঐক্য



অর্থ



জনস্বাক্ষরী নীতি



বোল বাধা বোল

তথ্য ও
বিত্ত



অপ্রাপ্ত
নিওনা, মা

খাদ্য

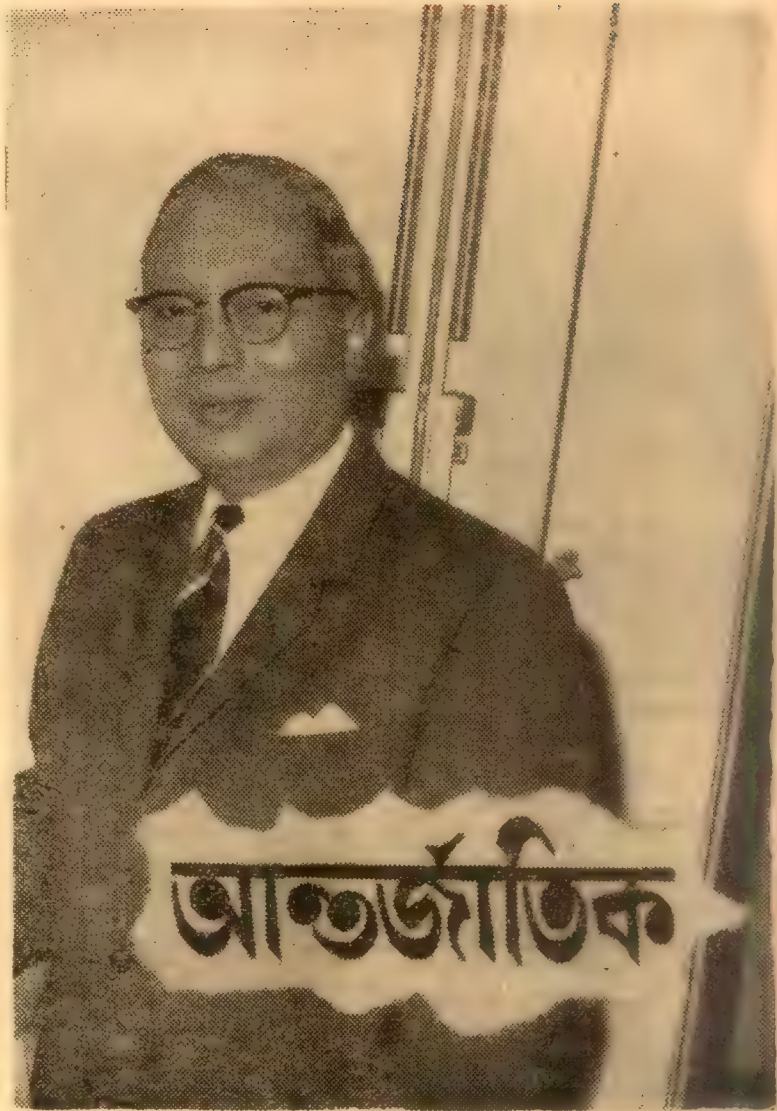


রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ২২তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। ১২২টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন, প্রায় প্রতি রাষ্ট্র থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসেছেন তাঁদের প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে।

এবার সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রুম্যানিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কনস্টান্টিনে মানেস্কু। এই নির্বাচন মানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম কোন একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। এর আগেও দু'একবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানেস্কুর নির্বাচনে আপত্তি করে নি। রাষ্ট্রসংঘ পরিচালনায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, এই নির্বাচনে সম্মতি জানানোর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে-কথাই আর একবার পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করল।

মানেস্কু সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। পূর্বে যুরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুম্যানিয়াই এখন সব চেয়ে বেশি রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত। মানেস্কু নিজেকে উদ্যোগী হয়ে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, বিভিন্ন পশ্চিমী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন, আবার বিপরীত দিকে চীনের সঙ্গেও রুম্যানিয়ার সম্পর্ক আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রও মানেস্কুকে সানন্দে মেনে নিয়েছে, কারণ তারা জানে, তাদের মধ্যে মানেস্কুই পশ্চিমীদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। আর যাই হোক, রুম্যানিয়া কমিউনিস্ট-রাষ্ট্র এবং মানেস্কু দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট ও একজন খাঁটি মার্কসবাদী। ১৯৩৬ সালে মানেস্কু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন থেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এখন তাঁর বয়স ৫১। কনস্টান্টিনে মানেস্কু ছিলেন রুম্যানিয়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট বেশ ভাল করেই জানেন, সাধারণ পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশন কিংবা নিষ্পত্তা পরিষদের বৈঠকের আলোচনার স্বাধীন কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনার প্রয়োজন। তাই তিনি নিজেকে উদ্যোগী হয়ে চতুর্দিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। এরা সবাই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য নিউ ইয়র্কে এসেছেন। উ থাণ্টের আহবানে ভোজসভায় আলোচনার



উ থাণ্ট

জনা মিলিত হয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্ক, সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো, বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্লাউন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস কুতু দ্য মারভিল। এই ঘরোয়া ভোজসভায় উ থাণ্ট ছাড়া আর একজন মাত্র উপস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন থাণ্টের ক্যাবিনেট-প্রধান সি ভি নরসিংহম। কোন দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই এরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেছেন। জানা গেছে, ভিয়েতনাম নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি, তবে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পশ্চিম এশিয়া, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

পরে অবশ্য ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা আলোচনা হয়েছে আন্দ্রে

গ্রোমিকো ও ডিন রাস্কের মধ্যে আর একা কৈঠকে। রাস্ক রাষ্ট্রসংঘের সোভিয়েট দূতাবাসে এসে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন গ্রোমিকোর সঙ্গে গ্রোমিকোর মস্কো প্রত্যাবর্তনের ঠিক আগের দিন।

রাষ্ট্রসংঘের কূটনীতিক মহলে এই সব আলোচনার ওপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তাঁদের ধারণা, এই সব আলোচনার মধ্য থেকে সমস্যা সমাধানের সূত্র বের করা সম্ভব হবে।

ভারতের প্রতিনিধিত্বমন্ত্রী স্বরণ সি এবার সাধারণ পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক পৌঁছে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতাদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে কথা বলবেন।

বুটেন:

হায়ন্ড উইলসনের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক দলের সময়টা এখন মোটেই ভাল যাচ্ছে না। বুটেনের অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র হয়েছে, যে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ অত্যন্ত স্পষ্ট। বুটেনের বিভিন্ন পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরোধিত 'গ্যালপ পোলে' বলা হয়েছে, এখনই যদি দেশে সাধারণ নির্বাচন হয় তবে উইলসন ও তাঁর শ্রমিক দল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে এবং রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসবে।

সম্প্রতি দু'টি উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলের কাছে শ্রমিক দলের পরাজয়ের পর এই ধারণা অনেকের মনে আরও দৃঢ় হয়েছে। কেমব্রিজ ও ওয়ালথামস্টো, দু'টি কেন্দ্রই রক্ষণশীল দল জয়লাভ করবে, এতটা রক্ষণশীল দলের আশাবাদী নেতারাও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি। বিশেষ করে ওয়ালথামস্টো কেন্দ্রে জয়লাভ রক্ষণশীল দলের কাছে এক মস্ত জয়। কারণ, এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে ছিল শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রিমেন্ট এটলীর। এটলী লর্ডসভার সদস্য হবার আগে পর্যন্ত কমন্সসভায় এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই এই কেন্দ্রে শ্রমিক দলের পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর।

শ্রমিক দলের মহল থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে, এই দু'টি উপনির্বাচনের ফলকে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। উইলসন সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে অসন্তুষ্ট শ্রমিক দলের বহু সমর্থক ভোটদানে বিরত ছিল, কিন্তু তাই বলে তারা শ্রমিক দল ছেড়ে চলে যায় নি। শ্রমিক দলের সম্পাদক লেন উইলিয়ামস বলেছেন, উইলসন ও তাঁর দল খুব ভাল করেছে জানেন, সরকারের অর্থনৈতিক নীতির জন্য জন-সাধারণ বিক্ষুব্ধ, কিন্তু এ বিষয়েও তাঁদের জ্ঞাণা আছে, বর্তমান অর্থনৈতিক নীতির অবসরগের ফলে দেশের সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে, এবং শেষ পর্যন্ত জন-সাধারণের সমর্থন তাঁরাই পাবেন। আগামী নির্বাচনেও শ্রমিক দলই জয়লাভ করবে।

রক্ষণশীল দলের প্রাক্তন সভাপতি এডওয়ার্ড ডু কানেরও ধারণা অনেকটা এইরকম। দু'টি উপনির্বাচনের ফল দেখেই খুব বেশি উল্লসিত না হবার জন্য তিনি রক্ষণশীল দলের সদস্যদের পরামর্শ দিয়ে-ছেন। তাঁর মতে, এখনও ভোটদাতারা রক্ষণশীল দলকে ক্ষমতায় বসাবার ব্যাপারে মনোনিবেশ করে নি।

তা ছাড়া রক্ষণশীল দলের বর্তমান নেতা হিথের পক্ষে জনসাধারণের মনে কোন আশ্বাস ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

অথচ, নতুন কোন আকর্ষণীয় আস্থাভাজন নেতাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন:

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আরবু খাঁ সরকারীভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করে এলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিরজাদাকে নিয়ে আরবু খাঁ মস্কো শৌহান। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাসখন্দ সম্মেলনে বোঙ্গ দিতে আসার পর আরবু খাঁ আর সোভিয়েট ইউনিয়নে আসেন নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি পদগারনি প্রধানমন্ত্রী কোর্সিগিন ও



আরবু খাঁ

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ব্রেকনেভ, সকলের সঙ্গেই আলোচনার সময় স্വാভাবিকভাবেই আরবু খাঁ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে কথাবাতা বলে-ছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাড়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছে। তাসখন্দ সম্মেলনও এই উদ্দেশ্য নিয়েই ডাকা হয়েছিল। আরবু খাঁ এবারের মস্কো সফরের ঠিক আগে স্বরণ সিং-এর মস্কো গমন ও সোভিয়েট নেতা-দের সঙ্গে আলোচনা এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

মস্কোতে সরকারী ভোজসভায় আরবু খাঁ বলেছেন, পাকিস্তান ভারত সহ সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে চায়। তাসখন্দ সিংস্থানত অনুসারে

ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পাকিস্তান সব সময় প্রস্তুত।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আরবু খাঁ এই কথাও বলেছেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা' ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শোনা যায়, আরবু খাঁ নাকি সোভিয়েট নেতাদের বলেছেন, ভারতকে কোনরূপ সামরিক দ্রব্য সরবরাহ করা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে উচিত হবে না। তবে সোভিয়েট নেতারা এই পরামর্শের ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

আরবু খাঁ সোভিয়েট সফরের ফলে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কের কোনরূপ অবনতির কোন আশঙ্কা নেই, এ বিষয়ে মস্কো ও দিল্লীর সংশ্লিষ্ট মহল নিশ্চিত।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম :

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের বিরুদ্ধে অব্যাহত নতুন করে সংগ্রামের ডাক দিয়েছে, 'জঙ্গী' বৌদ্ধ সময়সীরা। ষিট্রি কুয়াং-এর নেতৃত্বে এই বৌদ্ধরাই গত বৎসর সাধারণ ব্যাপক গোলামাল শুরু করেছিল।

ষিট্রি কুয়াং বলেছেন, তিনি নুয়েন ভান ষিট্রি ও নুয়েন কাও কিং নির্বাচনকে স্বীকার করেন না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সম্প্রতি যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তা একটি বিরাট প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুয়াং ঘোষণা করেছেন, বৌদ্ধরা ষিট্রি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। ছাত্ররাও বৌদ্ধ সময়সীদের পেছনে রয়েছে।

গত সপ্তাহে পার্টিশনেরও বৌদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাধারণে তাঁদের প্রধান ঘাঁটি আল কোয়াং প্যাগোডা থেকে মিছিল করে ইনভিপেনডেন্স প্যালাস ও ন্যাশনাল এ্যাসেমবলী হাউসে বিক্ষোভ জানাতে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ষিট্রি তাঁদের বাদ দিয়ে অপর একটি বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলকে দেশের প্রধান ধর্মসম্মেল রূপে ঘোষণা করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ, এবং এই সিংস্থানতের বিরুদ্ধেই তাঁদের বিক্ষোভ।

বিক্ষোভের দিন সাধারণের পথেই সর্বত্র ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা ছিল। পুলিশ অবশ্য বিক্ষোভকারীদের কোন বাধা দেয় নি। তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার ও মার্কিন কতারা জঙ্গী বৌদ্ধ-দের রাজনীতির এই নতুন পটপরিবর্তনে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

পদ্মপাখার দিন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
জারি। ২৬, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২।
দাম : সাড়ে চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন সাহিত্যিক নিরবধি কালের স্বীকৃতি লাভ করবেন বলে ভরসা করা যেতে পারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবেই তিনি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং ইহাই তাঁর চরম পরিচয়। তাঁর সাহিত্য-কৃতির একটি লক্ষণ এই যে তিনি একাধারে উপন্যাস ও ছোট গল্পরচনার সিদ্ধান্ত। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটি আধুনিক কালের সচিত্র বহু উপন্যাসের পর্বে পড়ে না। ইহার মধ্যে ছোট গল্পের আকস্মিকতা ও উপন্যাসের বিস্তৃতি আছে। এই উপন্যাসে তীক্ষ্ণ মননশক্তির সঙ্গে খাঁটি ঔপন্যাসিকের মনোগুণের আশ্চর্যরকম সমাবেশ হয়েছে। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর আবেগের সঙ্গে মনীষাদীপ্ত বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। হৃদয়দীপ্ত সমাজায়ত্ত সংবেদনশীল শিক্ষিত যুবকের প্রেম কিরূপে জঘন্য পরিবেশের মধ্যে প্রতিহিংসার রূপান্তরিত হয়, তারই বিশ্লেষণ রয়েছে গ্রন্থের প্রতিটি পাতায়।

প্রীগঙ্গোপাধ্যায় নামকের অবাঞ্ছিত অতীতকে উদ্ঘাটিত করে এই উপন্যাসের কাহিনী আবদ্ধ কবেছেন। কাশিমপুরে সুপারনিউমারি চাকরি করতে এসে ডাক্তার প্রশান্তদেব লাহিড়ী এক অবাঞ্ছিত নাটকের মধ্যে পা দিলেন। জেলাবোর্ডের চারিটেবল ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডার তাকে জানাজানির অভিযুক্ত। আবার এই কম্পাউন্ডারই গল্পে সমস্ত অসামাজিক কাজের সংগে লিপ্ত। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ তার চরিত্রকে জটিলতর করে তুলেছে। চন্দনা তারই মেয়ে। তার চরিত্রের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। চন্দনার সরলতা ডাক্তারকে আকৃষ্ট করেছে। প্রশান্ত ডাক্তার ও চন্দনার প্রেম ফলের মতই বর্ণে গন্ধে বিকশিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সমাজের ক্রুরতম আচার ব্যবহার যেখানে—সেখানে বিবাক্ত প্রভাবে পবিত্র প্রেম নিষ্ঠুর জ্বাংসার রূপান্তরিত হয়। সমাজের অন্যান্য চরিত্রের জঘন্যতম কার্য-কলাপ শিক্ষিত যুবক ডাক্তার সচা কবলেও ফসতে পারত, কিন্তু কম্পাউন্ডারের অবিশ্রান্ত সমাজবিবোধী কার্যকলাপ তার ঐশ্বর্যের বন্ধনকে ছিন্ন করেছে।

লেখক এই উপন্যাসে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে ঘটে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি কবেছে যাদের বিষ সমাজের অস্পষ্টমন্ডার ছড়িয়ে পড়ে তার স্বাভাব্য ও শক্তির মূলোচ্ছেদ করছে সেই সমস্ত দৃষ্টান্তের কলকর্চিহেব প্রতি লেখক সমৃদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

ইন্দু মেলা

আধুনিক সমাজব্যবস্থা যে মদোন্মত্ত ধন-গর্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সেইটি লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটিমাত্র সুনির্বাচিত দৃশ্যের সাহায্যে এই জঘন্য সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও বিস্মারবোধ জাগিয়ে দিয়েছেন।

শ্যামরতন মহাবীরপ্রসাদ প্রভৃতি খল-চরিত্রগুলি এই উপন্যাসে জীবন্ত বলে মনে হয়। প্রশান্ত ডাক্তার ও চন্দনার জীবনে প্রথম প্রেমের রহস্যানুভূতি ও রোমাঞ্চ শিহরণ অপরূপভাবে বিস্ময়মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মোট কথা কাহিনীর অভিনবত্ব, চরিত্রচিত্রণের নিবিড়-তায় এই উপন্যাস লেখকের অসাধারণ প্রতিভার সূচক পরিচয় দেয়।

কীতদাস প্রথার রূপান্তর—নন্দলাল রায়। মহাগড়, ১১৭, পূর্ব সিঁধি, দমদম, কলিকাতা-৩০। মূল্য : তিন টাকা।

লেখক নিজেই দাবি করেছেন, এই গ্রন্থ রচনার তাঁর মৌলিক কৃতিত্ব নেই। তবে আমরা মনে করি, লেখক কীতদাস তথা শ্রমিকের জনসাধারণ, মর্মবেদনা হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাছাড়া এই লেখককে উদ্ভাবিতকারক (যা লেখক নিজেকে বলতে চেয়েছেন!) বলে মনে হয়ে থাকলেও একথা সত্য যে কীতদাস প্রথাটি ধীরে ধীরে কিভাবে ভিন্নরূপে চলে আসছে, তার ইতিহাস কালানুক্রমিক তুলে ধরতে শ্রীয়াস সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরার জন্য তাঁকে দলভ গ্রন্থ পাঠ করতে হয়েছে, দলভ ছবি সংগ্রহ করতে হয়েছে। কীতদাস প্রথার আমলে কাহিনী জানার জন্যে বারা আগ্রহান্বিত, এই গ্রন্থ তাদের খুবই কাজে লাগবে। বলা বাহুল্য, একালের কোনো ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু সংগ্রহেও এই বই কাজে লাগতে পারে। তবে কীতদাস প্রথার রূপান্তর-এবং কথা জানাই বড় কথা নয়, সেই প্রথা মানবতার কি কীতি করেছে তা জানাও দরকার। কারণ এখনো পশ্চিম রাষ্ট্রে, সমাজে যেভাবে শোষণ ও নিপীড়ন চলেছে, তা থেকে মুক্ত হবার পথ খুঁজে নিতে হবে। অতীতের কীতদাসদের চেয়ে একালের সাধারণ মানুষ কতোটা সুখী তার বিচার চাই বৈকি। গ্রন্থটি

পাঠ করলে পথানুসন্ধান সম্ভব না হোক, সাধারণ মানুষ নিজেদের দৈন্য অবস্থার কার্য-কারণটুকু বুঝতে পারবে। শ্রীয়াস পারম্পর্য ও ঐতিহাসিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে গ্রন্থটিকে যেভাবে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করেছেন, তাও বিজ্ঞানসম্মত। 'কীতদাসের আবশ্যকাল' থেকে সূর্য করে 'পুঞ্জিবাদী গণতন্ত্র' রচনার বহু বিভক্ত মানব-পৃথিবীর আসল রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তাবি ফলে কীতদাস প্রথার রূপান্তর সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। আমবা আণা করি গ্রন্থটি পাঠকরা পড়বেন, কারণ তাদের জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই এ থেকে জানা যাবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	টাকা	পয়সা
বার্ষিক	১৪.০০	
ত্রৈমাসিক	৭.০০	
মাসিক	৩.৬০	

ডিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকার জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মদাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকশা রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানা সহ ডাকটিকিটসহ পাম থাকলে একমাত্র জমেনোনিও গল্প ক্ষেত্রে পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ক্ষেত্রে পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

আমিথাক একটি মহা আনন্দ টাই

নিরাপত্তার আশ্রয়

জালালাবাদ, বৃন্দ শেখ। ব্রিটিশ সৈন্য
রণে ভঙ্গ দিয়ে শহরে প্রস্থান করেছে।
রণক্রান্ত বিপ্লবী সৈন্যরাও গভীর রাত্রে
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাদেরই এক অংশ
মাস্টারদা ও নির্মলদার পরিচালনার প্রায়
দু-তিনদিন পরে নিরাপদে গ্রামাঞ্চলে এসে
পৌঁছয়। গুরুতর আহত অবস্থায়
বিনোদ চৌধুরীও নিজ বৃন্দ-বিবেচনার
ওপর নির্ভর করে শেখ পর্যন্ত কোন
দবদী গ্রামবাসীর গৃহে আশ্রয়পান করে
তাদেরই শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ সুস্থ
হয়। অম্বিকাদাকে আমরা জালালাবাদের
অদূরে একটি পাহাড়ের পাদদেশে নিজ
ঝোপের আড়ালে ছেড়ে এসেছি। অম্বিকাদা
সেখানে ক্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম
ভাঙতেই দেখেন বেশ রোদ উঠেছে। তাঁর
মনে হল জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের
খোঁজে শত্রুসৈন্যে এসে পড়েছে।
তাদের বাঁশির সঙ্কেত এবং কখনও কখনও
সামান্য হাঁকডাক শুনে অম্বিকাদার স্পষ্ট
ধারণা হল জালালাবাদ পাহাড় তারা ঘিরে
ফেলেছে। শত্রুবেশত্নী থেকে অম্বিকাদা
খুব বেশি দূরে ছিলেন না। কাজেই আর
বৌদ্ধ সৈন্যে নিরাপদে থাকারও আশা
ছিল না। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর অনিশ্চয়-
তার মধ্যে কেটেছে। সৈন্যরা, অফি-
সারের বিপ্লবীদের মতদেহ নিয়ে ব্যস্ত
থাকার অধিক বৃন্দমানের কাজ মনে
করেছে। বন্দুকেরা বিপ্লবীদের সম্মু-
খীন হওয়া কি ভাল! গতকালের বৃন্দের
ভিন্ন স্বাদ এত শীঘ্র ভোলা সহজ নয়
ভাই চলার পথে বিপ্লবীদের পারের চিহ্ন
অনুসরণ করে অনুসন্ধান কার্য না চালিয়ে
সেনাধ্যক্ষ ও পুলিশ অফিসারেরা শহীদ-
দের মৃতদেহের ফটো তুলতেই ব্যস্ত।
পাহাড়ের ওপরে বিপ্লবীদের পরিভাষ্য
কাত্তরের খোঁজ, জলপাত্র, টপ্পী, ব্যাজ
প্রভৃতিও তারা সংগ্রহ করা কর্তব্য মনে
করেছে। ধন্য তাদের কর্তব্যজ্ঞান! তা'

নইলে সামান্য একটু দূরেই সম্পূর্ণ নিরা-
পদে অম্বিকাদা কি নিশ্চেষ্টভাবে বসে
থাকতে পারতেন?

সারাটা দিন এইভাবে কাটল। পশ্চিম
গগন লাল করে সূর্য অস্ত গেল।
অম্বিকাদা অক্ষত দেহে সবার চোখ এড়িয়ে
ওই একই ঝোপের আড়ালে বসে রইলেন—
একটি পুলিশও সেদিকে আসে নি।
মিলিটারী বাহিনী চারিদিকে অনুসন্ধান
করেছে কিন্তু অম্বিকাদার সেই ঝোপটি
বাদ দিয়ে গেছে।

অম্বিকাদার হঠাৎ মনে হল ঝোপের
দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। বস্ বস্
শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ আরো স্পষ্ট
হয়ে উঠল। কে আসছে? কাঁব এই শত্রু-
গমন? যে-কোন অবস্থার জন্যই অম্বিকাদা
প্রস্তুত। রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল
রেখে অজানা আগন্তুককে প্রতীক্ষার
অম্বিকাদা উৎকর্ণ হয়ে আছেন। হঠাৎ
বর্ষাহতে বিন্দুকার আগন্তুক একেবারে
অম্বিকাদার সামনে এসে হাজির। সে এক-
জন চৌকিদার। অম্বিকাদাকে অপ্রত্যাশিত-
ভাবে সেখানে দেখে সে প্রথমে একেবারে
হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। চৌকিদার কর্তব্য
স্থির করবার আগেই অম্বিকাদা তার বুক
লক্ষ্য করে রিভলভার ধরে কঠিন কণ্ঠে
হুকুম করলেন—“বর্ষা ফেল। হাত তুলে
দাড়াও।” হুকুম তামিল করা ছাড়া চৌকি-
দারের আর কোন উপায় ছিল না। সে
বর্ষা ফেলে খালি হাত মাথার ওপর তুলে
দাঁড়াল।

অম্বিকাদা তারপর খুব ভদ্র ও নম্র-
ভাবে চৌকিদারকে সম্বোধন করে বললেন—
“ভাই, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে
অপমান করা বা গুলী করার কথা আমি
ভাবতেই পারি না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে,
আমরা দেশবাসীকে ভালবাসি—দেশের
মুক্তির জন্য আমরা প্রাণ বলি দেব। তুমি
আমার দেশবাসী—তুমি আমার ভাই। তুমি
আমার শত্রু নও—আমিও তোমার শত্রু
নই। আমাদের উভয়েরই শত্রু ইংরেজ।

বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো! বল, তুমি
আমার ওপর রাগ কর নি?” অম্বিকাদার
অন্তরের স্বদেশ-প্রেমের উত্তাপ চৌকি-
দারকে অভিভূত করল। সে তখন অম্বিকা-
দাকে বোকাতে চাইল যে, তাঁকে সে একে-
বারেই ভুল বোকা নি এবং তার মনে
একটুও ক্ষোভ নেই। চৌকিদার বার বার
জানাল যে, অম্বিকাদাকে সর্বতোভাবে
সাহায্য করতে সে প্রস্তুত।

অম্বিকাদার কাছে রুমালে বাঁধা
সামান্য কটি টাকা ছিল। তিনি চৌকি-
দারকে ডেকে সসম্মানে বললেন—“ভাই,
আমার কাছে এই সামান্য কটি টাকা আছে
—তুমি নাও। দেখ, আমার সঙ্গে আরো
একজন বৃন্দ ছিল। খুব বেশি আহত
হওয়ায় সে আমার সঙ্গে আসতে পারে নি
—পাহাড়ের ঢালুতে হয়ত কোথাও পড়ে
আছে। যদি সম্ভব হয় তুমি একবার তাঁর
খোঁজ করে দেখবে কি? পুলিশ বোধ হয়
এতক্ষণে চলে গেছে। আহত অবস্থায়
তাকে যদি দেখতে পাও তবে কোনমতে
আহত বৃন্দকে কি আমার কাছে আনতে
পারবে ভাই?” টাকার পোটলাটি চৌকি-
দারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অম্বিকাদা
তাকে তাঁর আবেদন জানালেন। আহতকণ্ঠে
আবেগভরে চৌকিদার অম্বিকাদাকে জানাল
—“বাবু, আমি জাতিতে মুসলমান—গরীব
চাষী। পেটের দায়ে আজ সরকারের
গোলাম। গরীব হতে পারি। কিন্তু তা'
বলে আমার দেশের ভাইকে এই অসময়ে
একটু সাহায্য করব বলে কি টাকা নিতে
পারি? তাহলে যে আমার গৃহস্থ হবে—
বেহেশতে আমার স্থান হবে না। আপনার
থেকে টাকা নিয়ে আর অপরাধী হতে চাই
না। বলুন আর কি সাহায্য আমি করতে
পারি? এখনই আমি আপনার আহত
বৃন্দ খোঁজে যাব।” চৌকিদার টাকা নিল
না। অম্বিকাদা-ও তার কথা শুনে আর
টাকার কথা বলতে পারলেন না। গরীব
চাষীর মহত্ত্ব ও স্বদেশপ্রেমের গভীরতার
কাছে অম্বিকাদার নিজেকে ছোট বলে মনে

হল। চৌকিদারের প্রাণ প্রাণ্য তিনি অতিভূত হলেন। ‘অম্বিকাদা আবেগবদ্ধ-কণ্ঠে চৌকিদারকে সম্বোধন করে বললেন—“তাই, তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি। তোমার অন্তরের স্পর্শ পেয়ে বাংলার একজন বিপ্লবী সৈনিক আজ ধন্য। তোমার কাছে আমার অপরাধের ক্ষমা নেই। নিজগুণে তুমি আমার ক্ষমা কর। তাই, এখানে বহুক্ষণ থেকে বসে আছি। শত্রুপক্ষ খুব বাহ্যাকাঙ্ক্ষি এসেছে তবু এই স্থানটি তাদের চোখে পড়ে নি—আমাকে দেখতে পার নি। তুমি আমাকে আরো কিছুটা দূরে নিয়ে চল। তারপর তুমি আহত বন্ধুর খোঁজে যাও!”

চৌকিদার অম্বিকাদাকে হাত ধরে তুলল। চৌকিদারের বলিষ্ঠ কাঁধে ভর দিয়ে অম্বিকাদা ধীরে ধীরে এগোলেন। কিছুক্ষণ আগে এই চৌকিদারের বুক লক্ষ্য করেই বিভলভার বাগিয়ে অম্বিকাদা হুকুম করেছিলেন বর্শা ফেলে দিতে। এখন সেই বর্শা হাতেই চৌকিদার অম্বিকাদার ক্ষণিক দুর্বল দেহ বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে হাটিছে। তার সবল বাহুর নিষ্পেষণে এখন সে অনাবাসে অম্বিকাদাকে কবল করতে পারে। তা ছাড়া, ভাগ্যে এমনই পরিচাস—অম্বিকাদা তখনও জানতেন না, তার বিভলভাবে একাটিও কার্যকর ছিল না, চাঁটি টোটাই আগে তিনি ফায়ার করেছিলেন। চেষ্টা করে ছাঁটি কেবল খালি খোল পড়ে ছিল। অনেক পরে নিবাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছে তিনি এই তথ্য জানতে পাবেন।

প্রায় চার-পাঁচ শ’ গজ দূরে একটি অল্পপারিসর খালের পাড় পর্যন্ত তারা এল। খালটি উঁচু টিলা ও সামনের নিচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। এই খালের ধারে একটা নির্জন স্থান বেছে অম্বিকাদা বসলেন। চৌকিদার এবার আহত অর্ধেকদুকে খুঁজতে গেল। অম্বিকাদা তাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিবে আসতে বললেন।

চৌকিদার চলে গেল অম্বিকাদা নিরাপত্তার প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী সেই স্থানটি ছেড়ে আর একটু দূরে একটি কোপের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখলেন। সেখান থেকে তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন চৌকিদার একাই ফিবে আসে না—কি তার সঙ্গে পুলিশ দলেরও অবির্ভাব হয়। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল কিন্তু চৌকিদার তখনও ফেরে নি। আবার পনেরো মিনিট কাটল—চৌকিদারের দেখা নেই। তাই এই বিলম্বের কারণ কি? সে কি অর্ধেকদুকে নিয়ে আসবার সময় কোন বিপদে পড়েছে? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে আবার দাঁড় করা সমীচীন নয় মনে করে অম্বিকাদা বহু কণ্ঠে খালটি

পেরোলেন। তার খুব শীত করছিল। অর্ধনগ্ন বেশ। রিভলভারটা কলাপাতা দিয়ে মূড়ে নিয়েছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের নির্জন-প্রাঙ্গণ রাস্তা দিয়ে অম্বিকাদা চলেছেন। এই গ্রামের নাম ফতেয়াবাদ—অম্বিকাদার পূর্ব পরিচিত অঞ্চল। ফতেয়াবাদ থানার অম্বিকাদার বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব বাস করেন। তিনি এই গ্রামের ডাক্তার বগলা চক্রবর্তীর বাড়িতে অথবা চেষ্টা করে যাওয়া মনস্থ করলেন। বগলাবাবুর ছোট ভাই আমাদের বিপ্লবী দলের সদস্য। ডাক্তারবাবু অম্বিকাদাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তাই বা কে জানে? তবু অম্বিকাদা স্থির করলেন ডাক্তারবাবুর সাহায্য নিতে একবার চেষ্টা করে দেখবেন।

অম্বিকাদার কপালের ক্ষতস্থান সেলাই করে ব্যান্ডেজ করা প্রয়োজন। তারপর কিছু জামা-কাপড় ও টাকা-পয়সার ব্যবস্থাও না হলেই নয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাহসে ভর করে রাত প্রায় আটটা-নটার সময় অম্বিকাদা ডাঃ বগলা চক্রবর্তীর গৃহে প্রবেশ করলেন। অসময়ে হঠাৎ অর্ধনগ্ন বেশে অম্বিকাদাকে দেখে ডাক্তারবাবু চমকে গেলেন। খুব-বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ, জালালাবাদ যুদ্ধ, ফেশী সংঘর্ষ প্রভৃতির সব খবর ডাক্তারবাবু রাখেন। অম্বিকাদার বিবরণে প্রেরণারী পথোয়ানা এবং তার সংবাদে বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণার কথাও ডাক্তারবাবু অবগিত নয়। ডাক্তার অম্বিকাদাকে দেখে বলতে পারছিলেন না—“আপনি আসুন।” তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে অম্বিকাদার উপস্থিতিতে তিনি খুব বিব্রত বোধ করছেন। ডাক্তারের ভয়, যদি পুলিশ জানতে পাবে তিনি অম্বিকাদাকে সাহায্য করেছেন তবে হযত তাঁকে পুলিশের কাছে প্রচুর নিগ্রহ ও নিপীড়ন ভোগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত চক্কেলজ্ঞা কাটিয়ে তিনি বললেন—“দেখুন অম্বিকাদাবাবু, আমি সংসারী মানুষ—ছেলেপিলে নিয়ে ঘর কবি। আপনাকে সাহায্য করছি খুব পেনে পুলিশ আমাকে ছাড়বে না—সাজা দিয়ে জেল খাটাবে। তাই বলি, আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না—আপনি দয়া করে এবার আসুন।”

পুলিশের ভয়ে ডাক্তারবাবুর কি কবণ আবেদন। ডাক্তারের প্রতি সমবেদনা অনুভব করা ছাড়া অম্বিকাদার অবস্থা আর কিছুই বলবার ছিল না। কিন্তু অম্বিকাদার Medical aid না পেলেই নয়। তাই ডাক্তারকে তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, পুলিশের জানবার কোন আশংকাই নেই এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর বাড়ি এসে কি গ্রাম ছেড়েও চলে যাবেন। এমন সময় ডাক্তারের ছোট ভাই এসে উপস্থিত।

অম্বিকাদাকে দেখে সে খুব উৎসাহা হয়ে উঠল। সে-ও তার দাদাকে অনুবাস করল অম্বিকাদাকে First-aid দিতে ও কাপড়-জামা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে:

ডাক্তারবাবু ভাইবের অনুবোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি আবার বিবুদ্ধি না করে অম্বিকাদার ক্ষতস্থানটি সেলাই করে ভালভাবে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তখন রাত প্রায় এগারোটা। অর্ধনগ্ন ডাক্তারবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। ডাক্তারের ছোট ভাই আমাদের খুবক-সার্থী, অম্বিকাদাকে সামান্য কিছু টাকা এবং একজোড়া বাপড় ও কটা জামাও দিল। সাধারণ গ্রামবাসীর মত পোষাক নিয়ে অম্বিকাদা নোয়াপাড় গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রাত প্রায় বারোটা হবে। গ্রামের পয়-ঘাট একবারে নির্জন। অদূরে খবরভাত হালদা নদী বয়ে চলেছে। এই নদী পায় হয়ে তবেই নোয়াপাড়া যাওয়া বাবে। দেয়ানজী ঘাটে ফেরী নৌবোটে নদী পার হবার ব্যবস্থা আছে। অম্বিকাদা সেই দিকেই এগোলেন। কিন্তু অত রাতে ঘাটে আসার আগেই দু’তিনজন পুলিশ অম্বিকাদাকে দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ করে বসলো—“এই শাল্লা, কোন হায় রে? কাঁহাসে আতা হায়?” অম্বিকাদা উত্তর দিলেন—“আমি এখানে থাকি না। ফতেয়াবাদে আমার এক আত্মীয় বাড়িতে নৈমন্তিক খেতে গিয়েছিলাম; এখন নোয়াপাড়া ফিরে যাচ্ছি।” “হা হা—ভাগ শাল্লা!”—এইবুণ নথুর সম্বোধন করে পুলিশ অম্বিকাদাকে বিদায় দিল। যাবার সময় তারা পিঠে একটা ধাক্কাও দিল। কি আবার কবল! গালাগাল ও ধাক্কা নিঃশব্দে হৃদয় করে অম্বিকাদা ঘাটে গেলেন। এত রাতে ঘাটে ফেরী নৌকোর কোন মাঝিই উপস্থিত ছিল না। অগত্যা এক জেলে-নৌকো করে, জেলেকে আট আনা পয়সা দিয়ে তিনি নদী পার হলেন। সেই সময়ে ১৯৩০ সালে, আমি আনা পয়সা পেয়েই জেল মহা খুশি।

রাত প্রায় দুটো বেজেছে। ভোর হবার আগেই আশ্রয় একটা পাওয়া চাই-ই, নোয়াপাড়া থানার সহবদা গ্রামে দলের দবদী বন্ধু নিবারণ দে-র বাড়ি। সেখানে যাওয়াই অম্বিকাদার ইচ্ছে। কিন্তু এটি কোন কারণে নিবারণ বাড়িতে না পড়ে তাহলে কি হবে? নিবারণ সত্যিই ছিল না। অম্বিকাদা বিফলমনোবশ হয়ে ফিরে এলেন। নিবারণের পাশের বাড়িও অম্বিকাদার একজন পরিচিত “সহ” থাকত। কিন্তু সেই “বন্ধু”—এ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করলেন না। অম্বিকাদার আশ্রয় জটিল না। এদিকে ভোর হয়েও আবার বেশি বাকী নেই। এখন কি করবেন তিনি?

অম্বিকাদার পিসিমা এই গ্রামেরই পাশে, ভেঁরাপাড়া গ্রামে থাকতেন। পিসিমার বড় ছেলে সরকারী চাকুরে—বড় পোস্টে আছেন। কাজেই সেখানে যেতে অম্বিকাদার ভয়, পিসিমা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হয়ে তাঁর আবেদন হয়ত প্রত্যাখ্যান করবেন। পিসিমাই হচ্ছেন সমস্যা—পিসেমশাইকে মনে হয় রাজী করানো যাবে। এ-সবই হচ্ছে কেবলমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে চিন্তা করা—প্রকৃত অবস্থা কি হবে তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদিকে হাতে সময় একেবারেই নেই—ভোর বে হচ্ছে এল!

ভেঁরাপাড়া গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়ির লোকেই অম্বিকাদাকে চেনে। পিসিমার বাড়ির নানা সমস্যা ও অনিশ্চয়তা শুধুও অম্বিকাদা সেই বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে প্রবেশ করামাত্র পিসিমার সঙ্গেই প্রথম দেখা—পিসিমাকে পরিহার করার কথা অবশ্য ওঠেই না। তবু একেবারে দোর-গোড়ায় পিসিমার সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাৎটা মা হলেই বেন ভাল ছিল। ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে, অম্বিকাদাকে দেখামাত্রই পিসিমা ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। অম্বিকাদার আগমন তাঁর কাছে বেন এক নিভীকিকা সৃষ্টি করেছে—তাঁর ছেলের বেন শুদ্ধিগণ সর্বনাশ হয়ে গেল। পিসিমা ধপ করে মাটিতে বসেই দু'টি পা সামনে ছাড়িয়ে সর করে কাদতে লাগলেন—“ও গো কি সর্বনাশ! আমার কি হবে গো! আমার ছেলের কতি করতে তুই এখানে এলি কেন? ও রে বাবা রে! আমার ঘর-বাড়ি সব বাবে, সংসার বাবে—আমার ছেলের চাকরি বাবে রে.....!” তাঁর এই আকস্মিক চেঁচামেচিতে পিসেমশাই হুটে

এলেন—বাড়ির অন্যান্য সকলেও ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল। পিসিমার এই অপ্রত্যাশিত “ভোরের সঞ্জীত”-কে কোন মনঃসংবাদ বা অমঙ্গলের সূচনা মনে করেই বাড়ির সকলেই বিচলিত। পিসেমশাই এসে অম্বিকাদাকে সামনে দেখে তাঁর স্ত্রীর এই বৃকফাটা আত্নাদের কারণ সহজেই বুঝে ফেললেন। অম্বিকাদা-ও ঠিক এইরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হবেন বলে আগের থেকে ভাবতেই পারেন নি। এখন কি করা যায়? অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত-পূর্ব অবস্থার জন্য ব্যবস্থাও তদনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

এই অবস্থার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য অম্বিকাদা মূহুর্তে কঠোর হলেন। পিসেমশাইয়ের সামনেই পিসিমাকে সম্বোধন করে বললেন—“পিসিমা তুমি চেঁচাবে না। ভাল চাও তো একেবারে চুপ কর। আমি আজ রাত পর্যন্ত এখানে গোপনে থাকব। কেউ বেন আমার উপস্থিতি জানতে না পারে। আমি তোমাদের সাহায্য চাই। যদি এর অন্যথা হয় তবে আমি একা মরব না। তোমাদের সবাইকে—তোমার ছেলেকেও জড়িয়ে আমি পুঁদলিশকে বলব যে, তোমরা বহুদিন থেকেই আমাদের বিপ্লবী দলে আছ।” অম্বিকাদার এইরূপ কঠোরবাব ও অশ্রু-মূর্তি দেখে পিসিমা কান্না বন্ধ করলেন—জ্ঞান ফিরে গেলেন। চেঁচামেচি ও কান্না-কাটিতে বেন কোন ফল হবে না তা তিনি বুঝলেন। রাত পর্যন্ত অম্বিকাদাকে নিরাপদে গোপন আশ্রয় দিতেই হবে—এ কথাটা পিসেমশাই-ও উপলব্ধি করলেন। স্বাস্থ্য অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পিসেমশাই ও পিসিমার মূহুর্তে ভাবান্তর ঘটল—ভাতিজার জন্য দরম উল্লে উঠল। অম্বিকাদা দেখলেন মূহুর্তে লাঠোঁবাধি—ওষুধ খরেছে।

পিসিমা অম্বিকাদাকে একটা গোপন কামরায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁর কোন ভয় নেই বলে আশ্বাস দিলেন।

রাতি পর্যন্ত সেই ঘরে স্নান, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম—সবই হল। কিন্তু বিকেল থেকেই অম্বিকাদার খুব জ্বর এসেছিল। অথচ এখানে কোনমতেই আর থাকা যাবে না। অগত্যা জ্বর গারেই রাত ন’টার সময় পিসিমা ও পিসেমশাইকে মজি দিয়ে অম্বিকাদা বিদায় নিলেন। তাঁরা অম্বিকাদাকে দু’হাত তুলে অজ্ঞত আশীর্বাদ করলেন।

অম্বিকাদা এখন কোথায় যাবেন? কে স্থান দেবে? কেউ ভয় পাচ্ছে, কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছে না; আবার কেউ হয়ত সাময়িকভাবে আশ্রয় দিচ্ছে। ভাতারবাবু অম্বিকাদাকে বিদায় করেছেন; নিবারণের অনুষ্ঠানস্থিতিতে সে বাড়িতেও কোন সন্নিবে

পাওয়া গেল না; পাশের বাড়িতেও স্থান হল না; নিজের পিসিমা-ও আজ বিশেষ পরিস্থিতিতে অম্বিকাদাকে আশ্রয় দিতে পরাম্ভুষ। এই অবস্থায় কি করবেন, কার কাছে যাবেন তিনি? বাংলা দেশে, চট্টলার মাটিতে আজ কি এমন একজনও নেই অম্বিকাদাকে যে এই অসময়ে একটু আশ্রয় দেয়? কেউ কি নেই তাকে একটু সাহায্য করবে, তাঁর ক্ষতস্থান শুকিয়ে ওঠা পর্যন্ত একটু পরিচর্যা করবে?

যুব-বিদ্রোহের পর চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে—প্রতিটি মানুষের অন্তরে অবাক নীরব দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। বিপ্লবীরা তার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছে—দেখেছে, হিন্দু, মুসলমান, ক্রিস্চান—জাতিধর্ম নির্বিশেষে, সকলকেই তারা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিনা বিধায় সাধ্যমত সাহায্য করেছে।

অম্বিকাদা এই ভেঁরাপাড়া গ্রামে বহুকাল কাটিয়েছেন। এই গ্রামেরই একজন বরষক চাষী আমজাদ আলীর কথা তাঁর মনে এল। এই দুঃসময়ে হঠাৎ আমজাদ আলীর কথাই বা কেন বার বার তাঁর মনে আসছে? এত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন থাকতে, সকলকে বাদ দিয়ে তাঁর মানসপটে আমজাদ আলীর চেহারার ভেসে উঠল কেন?

অম্বিকাদা মনঃমুগ্ধের মত চাষী আমজাদ আলীর বাড়ির দরজার এসে দাঁড়ালেন। ভোর হতে তখনও কিছু থাকী। একটু ইতস্তত করে অম্বিকাদা ডাকলেন—“আমজাদ চাচা! আমজাদ চাচা!” ভেতর থেকে প্রশ্ন শোনা গেল—“কে? কি চান?” অম্বিকাদা বললেন—“আমজাদ চাচা, একটু বাইরে আসুন—কথা আছে।”

ভোর রাত—পাখী ডাকার আগে আমজাদ চাচাকে কে ডাকলো? আমজাদ আলীর হঠাত মনে হরৌছিল চেনাগলা—তবু সে নিশ্চরই ভাবতে পারে নি তাঁরই দরজার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই অতি পরিচিত বীর সন্তান—অম্বিকাদা চক্রবর্তী!

আমজাদ আলী চোখ কচলে প্রায় ঘুম-চোখেই বাইরে এলেন। প্রথমটা আবহা আঁধারে অম্বিকাদাকে দেখে চিনতে পারেন নি তিনি। তাই প্রশ্ন করলেন—“কে আপনি? এত ভোরে কি চাই আপনার?” অম্বিকাদা বললেন—“চাচা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি যে আপনাদের অম্বিকাদা!” “কি? কি বললে? তুমি অম্বিকাদা?”—আমজাদ অম্বিকাদার কাছে এগিয়ে গেলেন—চিনতে পারলেন। অম্বিকাদাকে সামনে উপস্থিত দেখে আমজাদ আলী অভিভূত হলেন। তারপর অশ্রুচর হয়ে প্রশ্ন করেন—“তুমি।

পুজার কিশোরীদের শ্রেষ্ঠ উপহার কিশোরী

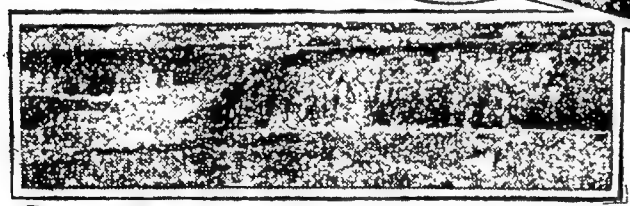
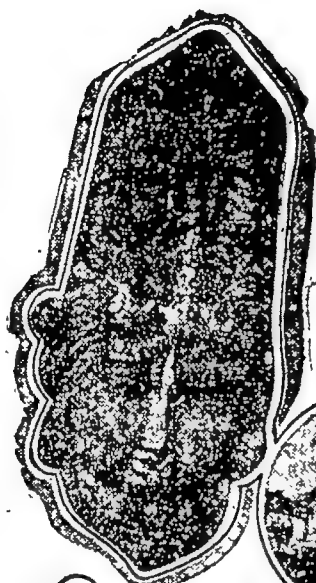
কিশোরীমনের উপযুক্ত একজার সাহিত্য-পত্র-অপূর্ব রচনা ও চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এতে আছে—হেমলতা দেবী, রমা চৌধুরী, সৈয়দী দেবী, সুরচি দেবীচৌধুরাণী, জয়ন্তী সেন, নরেন্দ্র দেব, স্বপনবড়ো, অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রজাল বর প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের লেখা—আর আছে গগনেন্দ্র ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃশ্যচিহ্ন চমৎকার রঙিন ছবি।

(প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তক হিসাবে ৭২ বর্ণা সরকার কর্তৃক মনোনীত)

মাম—২.৫০

সম্পাদনায়—জীন্সবা সেন
৫০এ সেরগার সর্গা-১৭



ত্রিপুরার উত্তম পরিবর্তন হচ্ছে। ভারতের অন্তর্ভুক্ত
প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরা আধুনিকতা ও সমৃদ্ধির পথে
যেথের অগ্রগতি অবলম্বন করে সমান-ভাবে এগিয়ে
চলেছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ 'শ্রম', 'ভূমি',
'জনশ্রমপাত', উনকোটি পাহাড় বা
'জম্মুই পাহাড়' কেমনে বৈশ্ব
জ্ঞান লাভ পাচ্ছে
আপনার অর্থ ব্যয়
স্বার্থক হবে।

বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু

প্রচার-বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

সদিন আসছে

জয়ন্তী রায়

চাড়ালের হাতে দিয়া গোড়াও পুস্তকে,
করি ডম্বরশি ফেল কর্মনাশা জলে।"

একদল ঈশ্বর ঈশ্বর বলে কেবল চেঁচাচ্ছে।
অন্যদল বিকৃত ফুঁবার ফাঁদ পেতে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাঠকদের লটকাবে
ফাঁসির রজ্জুতে।
দূরে কটা রুহন উটকো ফুকুর বিড়াল গোরু হাচে,
ভাড়াটে লেখক তার অশালীন বর্ণনায় ভীষণ ওস্তাদ।
রঙিন মলাট জুড়ে বিকৃত যৌবন,
শারদীয় বুকস্টলে কালো প্রজাপতি,
ঘভো ছন্দ সং, ছন্দ সত্যী।
কেউ বলে বৈদেশিক মদ্যম চালিত,
অর্থলোভে অপরের স্বার্থে নিয়োজিত,
কাগজ কসম কালি পত্রিকাভর
অর্থনৈতিক অন্নরিক্ত জনতার মৃত্যুর কবর।
আশ্চর্য, নগদ মূল্যে অনেকেই ক্রয় করে সে সব পত্রিকা।
কোথাও বিক্ষোভ নেই, কিংবা প্রতিবাদ।

অথচ সভার মধ্যে আছেন তাত্ত্বিক,
কৃষ্ণ নেতা, নৈয়ামিক, জালচক্র ছাত্রদল।
হাতে হাতে কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস, হেগেল ;
বর্ষ শেষ হলে আসে পঁচিশে বৈশাখ।
মন্য এই বুদ্ধিজীবীরাই।
কেবল এটাই সত্য
নিরক্ষর
ঘাটের কৃষক আর মিলের মালিক
এখনো দ্যাখে নি ফাঁদ ;
যে ফাঁদ তারাই পারে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো করে দিতে।
সদিন আসছে। তবে বুদ্ধিজীবী কেন মৌন রয় ?

অম্বিকা—তুমি এখনও বেঁচে আছ?
আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতে
পাব না। এস, এস, ভেতরে এস। কোন
সম্বোধ বা কুঠার প্রয়োজন নেই—এ বাড়ি
তোমারই বাড়ি। এ কি! তোমার কপালে
পটি বাঁধা কেন?, গুলী লেগেছে? পড়ে
গেছে? এখন ভাল আছ তো? এস, এস,
এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।
আমরা মুসলমান বলে সরকারের একটু
মনস্বরে আছি। বর্তমানে আমার বাড়িই
তোমার পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ স্থান।
এস, বাড়ির ভেতরে এস।"

আমজাদ চাচা কেন বহুদিন থেকে
অপেক্ষা করে আছেন অম্বিকাদাকে
অভ্যর্থনা করতে। তিনি প্রায়ের একজন
মুসলমান চাষী। বিপ্লবীদের কোন জ্ঞাত
নেই—হিন্দু, মুসলমান জাতিভেদ তার
মানে না। তারা মানুষের স্বাধীনতা চায়
—দেশের স্বাধীনতা চায়। আমজাদ চাচা
অম্বিকাদাকে বিপ্লবী বলেই জানতেন।
চক্রবর্তী-ব্রাহ্মণের আভিজাত্য বহুরা রাখা
অপেক্ষা অম্বিকাদা আমজাদ আলীর ঘরে
আতিথ্য গ্রহণ যে অনেকগুণ প্রিয় মনে
করবেন, আমজাদ কৃষক পরিবারের সেই
ধারণা ছিল।

৬ই মে পর্যন্ত এই মুসলমান কৃষক
পরিবারে অম্বিকাদা নির্বিঘ্নে ও
নিরাপদেই ছিলেন। আমজাদ চাচার ছেলে
ও স্ত্রী সেবা শূদ্ররা করে অম্বিকাদাকে
সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তোলেন। যুব-
বিদ্রোহের দিনটি থেকে এই ১৮ দিন ধরে
পুলিশ ও মিলিটারীর দৌরাত্ম্য ক্রমেই
বেড়ে চলেছিল। অম্বিকাদার গ্রোপারের
বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার
ঘোষণা হয়েছে। ইতিমধ্যে সকলেই এ
কথা জানে। আমজাদ পরিবারেও এ খবর
অজ্ঞাত ছিল না। আমজাদ গরীব হতে
পারে, কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের সূক্ষ্ম বর্ম
চাকা আমজাদ পরিবারকে কোন প্রলোভনই
কোন অবস্থায় স্পর্শ করতে পারে নি।

জালালাবাদ যুদ্ধ হয়েছে ২২শে
এপ্রিল। সেই রাতে অম্বিকাদাকে প্রায়
মৃত অবস্থায় পাহাড়ে বিদায় দিয়ে এসে-
ছিল সবাই। অম্বিকাদাকে ফেলে আসা
ছাড়া বিপ্লবীদের অন্য কোন উপায় ছিল
না—এ কথা আমরা আগেই জেনেছি।
মাস্টারদা নির্মলদা তারপর থেকেই
অম্বিকাদার কোন খবর না পেয়ে খুব
চিন্তিত ছিলেন। মৃত বিপ্লবীদের
স্বাক্ষরী তালিকায়ও অম্বিকাদার নামের

কোন উল্লেখ ছিল না। তারপর দুটি
সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। মাস্টারদা
চারিদিকে খবর পাঠিয়েও অম্বিকাদার
কোন খোঁজই পান নি।

অম্বিকাদা সুস্থ হয়ে আমজাদ চাচার
ছেলের সাহায্যে নানা স্থানে সংযোগ
স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অবশেষে
মাস্টারদার সংযোগসূত্রের মারফত খবর
পেয়ে অম্বিকাদা ছোট্ট একটা চিঠি
পাঠালেন—

"মাস্টারবাবু, আমি মরি নি। সম্পূর্ণ
আরোগ্যলাভ করেছি। যোগাযোগের
ব্যবস্থা করবেন—সাথী।"

অম্বিকাদার এই ছোট্ট চিঠিখানি পেয়ে
সবার আনন্দের সীমা ছিল না।—"মৃত
বন্ধুকে" ফিরে পেয়েছে। অম্বিকাবাবু
বেঁচে আছে? কি আনন্দ?

১৯৪৬ সালে মৃত্তি পেয়ে অম্বিকাদার
সঙ্গে আমজাদ চাচা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে
আমরা দেখা করেছি। তাঁর ও তাঁর
পরিবারের স্বদেশ-প্রেমের প্রতি আমরা
আমাদের আন্তরিক প্রণাম জানাই। আমজাদ
পরিবার দীর্ঘজীবী হোক।

[কমন্স]

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

খ্রীস্টপূর্বজন দায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্বশুরমশায় যে সব খাট-পালঙ্ক, আলমারী ও ড্রেসিং টেবিল যৌতুক দিয়ে-ছিলেন তাঁর কন্যাকে-সেগুলি মালিক লেনের অপারিসর বাড়ির ছোট দরজা দিয়ে ঢুকবে না বলে ৭৮নং-এই পড়ে রইল। আমা-দের নতুন বিছানা আমাদের পুরনো খাটে বিছিয়ে আমবা পরমানন্দে আমাদের বিবাহিত জীবনযাপন শুরুর করলাম। খাটা পারখানা, রোড়ির তেলের বা কেরোসিনের বাতি বা লণ্ঠন, সামনের কলতলার হোগলা দিয়ে ঝিৎ আরু করে স্নানের ব্যবস্থা এবং রায়ে ইলেকট্রিক পাখার অভাবে বৃদ্ধর যদি কোন কষ্ট হয়েও থাকে মূর্খে তাঁকে একদিনের জন্যেও অভ্যোগ করতে শুনিনি। খুব বোশি গরমের দিনে আমরা অন্দরমহলের ছাদে গিয়ে বিছানা পেতে পাতাম। মন যদি অনুকূল থাকে তবে শ্বশুরবাড়ির সকল অসুখ-অসুখিখাই শ্বশুর হাটসমূখে সহ্য করে নেন। অস্তিত্ব বৃদ্ধকে তাই করতে দেখেছি। আমি এখন এক-একদিন যদি জিজ্ঞাসা করি-“বৃদ্ধ, তোমার সে সময়ে খুব কষ্ট হতো, না?” তিনি আমার মূখের দিকে চেয়ে বিস্ময়জনক স্বরে জবাব দেন-“হই, কোন কষ্টই ত’ বোধ করি নি।” আমার মায়’ মন ভরে উঠল নববধূকে নিয়ে। ধীরে ধীরে আমার বাবাব বাবতীর স্বরোয়া পরামর্শ চলতে লাগল বৃদ্ধর সঙ্গে। আমার মাতুলদেবও ঐ বোমা ছাড়া চলতই না। বৃদ্ধ কার্যস্থের সন্তান বলে একজন কে যেন-মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-“বিনদা, তুমি কি বৌয়ের হাতে খাও নেকি?” মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন-“ও আমার খোকার বউ। অরু থনে আমার আপন আর কে আছে? আপনজনের হাতের ছোয়া খাইমু না ত’ কি? খাই-ই ত’।” আমার মায়ের হৃদয়ের ও মনের উদারের অস্ত ছিল না। বৃদ্ধ এবং আমি উদ্ভাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হলাম দুজনে দুজনের হাত ধরে। সম্ভল মইল আমাদের দুজনের বাপমায়ের অঙ্গ

আশীর্বাদ এবং অন্তর্ভাবী ভগবানের করুণা।

১৪১

আমার বিয়ের সমস্ত আমাদের পার-বারের আর্থিক সম্বল ছিল বাবার মাইনে আর আমার ল’ কলেজের বেতনের আশ্বাস। আশ্বাস বলছি-এইজন্যে যে যদিচ ল’ কলেজে অধ্যাপকের একটি পদের আধ-খানা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম, কাজ আমার তখনো আরম্ভই হয় নি। কাজেই মাইনেও আরম্ভ হয় নি। আমার বিবাহ হোলো ১২ই মে ১৯১৯ এবং আমার ল’ কলেজের কাজ শুরুর হোলো জুলাইয়ের গোড়া থেকে। যদিও চাকরিটা ছিল একশ’ টাকার তবু, প্রায় বরাবরই আমি ও শচীন ভট্টাচার্য মশায় দু’শ’ টাকাই পেয়েছি। কেন না অত বড় কলেজে কোন না কোন অধ্যাপক ছুটিতে থাকতেনই এবং সে জায়গায় আমি ও শচীন ভট্টাচার্য দু’জনেই কাজ করতাম। আমার বিয়ের পর বেশ বছর কতক আমি ডেভেলপাই করেছি মন দিয়ে। নিজের Practice থেকে আর বলে প্রায় কিছুই ছিল না। আমি খুব পরিশ্রম করতাম দেখে বাবা চাইতেন যে হাইকোর্ট ছুটি হলোই আমি যাতে বাইরে কোন জায়গায় ঘুরে আসি। বস্তুত বাবার নির্বশ্যতিশয্যে আমি কখনো ছুটিতে Vocation Bench-এ কাজ করি নি। গোড়ার দিকে আমার নিজের রোজগারে বৃদ্ধকে নিয়ে বাইরে যাওয়া বদল করে আসবার ক্ষমতাই ছিল না। তবু বাইরে যাবার সুযোগ আমার হয়েই যেতো শ্বশুরমশায়ের দাক্ষিণ্যে। তিনি পুজার ছুটির সময় প্রায় প্রতি বছরই কোন-না-কোন ভাল জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আগে আমার শ্বশুরমাতা ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিতেন এবং পরে নিজের আপিস ছুটি হলে নিজেও চলে যেতেন। আমার উপরে আমার শ্বশুর-

শাশুড়ীর বেশ একটু মমতাজনিত দুর্বলতা ছিল তা বরাবরই দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের বিয়ের পর প্রতি বছরই তাঁরা চাইতেন যে বৃদ্ধ ও আমি ছুটিতে তাঁদের সঙ্গে বাইরে ঘুরে আসি। তাঁদের সঙ্গে আমি রাঁচি, দার্জিলিং, দেওঘর, ঢাকা, গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য জায়গায় চেঞ্জ গিয়েছি বেশ কয়েকটা পুজোর ছুটিতে। পরে যখন আমার প্র্যাকটিস হতে লাগল তখন আমরা নিজ খরচার প্রতিবারেই কোন-না-কোন জায়গায় যেতামই। গোড়ার দিকে শ্বশুরমশায়ের আনুগত্যে আমরা দু’জনে দার্জিলিং গিয়েছি একাধিক বার। সেইখানে একজন মহীয়সী নারীর সঙ্গে আমার পারচম-লাভের সুযোগ হয়েছিল যার কথা স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই বংশ-বয়সেও।

সে মহিলাটি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তম্পরণীয় ও সর্বজনপ্রথের আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের বিদুষী কন্যা ও আমার স্নেহময়ী শ্বশুরমাতা ঠাকুরাণীর সহপাঠিনী বন্দু খ্রীষক্তা হেমলতা দেবী। হেমলতা দেবী, বাকি বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হেমমাসীমা বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন শাস্ত্রী-মশায়ের নিজ হাতে গড়া পরম প্রিয় কন্যা। পিতার বহু সদৃশ্য তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। সরল, স্বচ্ছ ছিল তাঁর অন্তর এবং প্রীতি ও সৌজন্যভরা ছিল তাঁর ব্যবহার। সদাহাস্যময়ী ও করুণায় ভরপুর ছিলেন তিনি। এতটুকু ক্ষুদ্রতা বা নিচতা কখনো লক্ষ্য করি নি তাঁর স্বভাবে। ভগবদভক্তি ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয় মন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বাস ডায় বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে। ডায় সরকার এক সময়ে কিছুকাল নেপাল রাজবাড়ির ডায়াররূপে কাজ করে পরে দার্জিলিং-এ এসে বসবাস ও প্র্যাকটিস করতেন। তাঁরা থাকতেন দার্জিলিং রেল স্টেশনের কাছেই

Cart Road-এর উপর "North View" বলে একটি বাড়িতে। হেম-মাসীমা নিজেও কাজ করতেন Maharani Girls' School-এ। বহুদিন তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরই সুযোগ্য গার্লস্‌স্কুলের বিদ্যালয়টির খুবই সন্মান হয়েছিল। এই ধর্মপারায়ণা রক্তানিশ্চ মহাশয় সম্প্রতি পুণ্যে স্বর্গলোকের প্রবেশাধি-কার ছিল। তাঁদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে দার্জিলিং প্রবাসী রাস্তা, অজ্ঞান বাঙালী ঘাই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে যারা এখনো জীবিত আছেন তাঁরা প্রমাণ্য তাঁদের স্মরণ করে থাকেন। ডাঃ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নি কিন্তু হেমমাসীমা ও তাঁর ছেলেকেদের সঙ্গে খুবই মাধ্যমে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল।

আমি যখন কিলেত বাই বড় তখন দার্জিলিংয়ের Maharani Girls' School-এর প্রথম ছাত্রী এবং বেশ উচ্চ ক্রমেই পড়তেন। তিনি থাকতেন সে বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। খুবকি এক ভাঁর ছোট দুই বোনকে সেখানে দিয়ে তাঁর বাবা মা নিশ্চিন্ত ছিলেন, কেন না অসুখে-বিসুখে ডাঃ সরকার ও হেমমাসীমা দুই মেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবেন ছিল। আমি যখন আমার ভাবী স্বামীর ও শাশুড়ির কাছ থেকে খুবকি চিঠি লেখার অনুমতি পেলাম তখন প্রাণ উঠেছিল যে খুবকি কাছ লেখা আমার চিঠি আমি কোন ঠিকানায় পাঠাব। পড়ুরা দুয়ের কাছে লেখা প্রেমপত্র মেয়েদের হোস্টেলে নির্যাসিত গেলে অন্য মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারই কথা এবং সেটা শাহুনির হবে না। নির্দেশ পেলাম যে খুবকি নামের চিঠি আমাকে North View-র ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সে আমলে Air Mail বলে কিছু ছিল না। কিলেত থেকে চিঠিপত্র আসত জাহাজে মধ্যাহ্নে একবার করে। বিলিতি ডাক যেত দ্রুত বৃহস্পতিবার এবং বিলিতি ডাক বিলি হাত প্রত্যেক রবিবারে। ব্যবস্থা হোল যে খুবকি প্রত্যেক শনিবার বিকেলে হোস্টেল থেকে North View-তে এসে থাকবেন এবং রবিবারদিন সেখানে থেকে সোমবার-দিন ভোরে হোস্টেলে ফিরে যাবেন। এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল খুবকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার খুব সমস্ত মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতার চলে যান এবং আমার চিঠিপত্র তখন কলকাতাতেই যেত। খুবকি মুখে শুনেছি যে আমি যে খুবকি চিঠি লিখতাম এবং খুবকি নির্যাসিত এসে সেই চিঠি পেয়ে তৎক্ষণি জবাব দিতেন—

এই ব্যাপারটাতে হেমমাসীমা খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। একটি ভদ্রসন্তান যে অপর একটি ভদ্র-পরিবারের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে আপন জীবনসঙ্গিনী করে নেবার জন্যে উপযুক্ত হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং সেই কন্যাটিও যে এ বিষয়ে সন্তোষ সাধ দিয়েছেন—এই স্বাভা-বিক মনোভাবই হেমমাসীর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে হেমমাসীমা নিজে খুবকি জন্যে চিঠি লেখার জায়গা ও টেবিল North View-র একটি নিভৃতকক্ষে ঠিক করে দিয়েছিলেন। হেমমাসীমার এই নীরব আশীর্বাদ খুবকি ও আমার জীবনে আজও অক্ষর হয়ে আছে।

প্রতি রবিবার সকালে দার্জিলিং-এর রক্তমন্দিরে যে উপাসনা হোত, সেখানে হেমমাসীমাই প্রধানত আচার্যের কাজ করতেন। তাঁর ছোটমেয়ে মীরা ওরফে খুকী ও অন্যান্য মেয়েরা গান করতেন। এমন প্রাণপূর্ণী রক্তোপাসনা আমি খুব কমই শুনেছি। অলংকারবিহীন প্রাক্কল জবায় হেমমাসীমা তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও প্রাণ্য নিবেদন করে দিতেন ভগবৎ চরণে। সে আন্তরিকতা এসে সহজেই স্পর্শ করত উপাসকমণ্ডলীর অন্তরগতালি অন্তত সাময়িকভাবে। রাস্তা অরাস্তা বহু শিক্ষিত নরনারী তখন আসতেন দার্জিলিং রক্তমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতে। ভক্তি-মতী, চরিত্রবতী বিদুষী রমণীর চোখে-মুখে যে স্বর্গীয় আভা দেখেছি উপাসনার সময় তা ডোলবার নয়। সত্যই হেম-মাসীমা তাঁর সকল হৃদয়-প্রাণ-মন মন্দিরে দিয়ে প্রণতি জানাতেন ভগবানের কাছে। সেই প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মাথা নত হয়ে যেত এবং ভগবানের আশীর্বাদ আমাদেরও উপর বর্ষিত হোত। খুবকি ও আমার দার্জিলিং যাবার প্রধান আকর্ষণই ছিল হেমমাসীমা ও তাঁর মুখের রক্তা-নাম। হেমমাসীমার রক্তোপাসনা ছোট শিশুদেরও মনে ধরত। বহু বছর আগে একবার খুব North View-তে আমা-দের বড় ছেলে সুরজন ও মেয়ে কাজলকে নিয়ে পুজোর ছুটির পরও দার্জিলিং-এ থেকে গিয়েছিলেন। সে সময়টা খুব North View-তে হেমমাসীমার কাছেই ছিলেন। খুবকি ও আমাদের ছেলে-মেয়েকে হেমমাসীমা কত যে আদরবয় করেছেন সেকথা খুবকি মুখে শুনেছি। নিজের বাড়িতে হেমমাসীমা নিত্য রক্তোপাসনা করতেন এবং গুরুশ্রদ্ধা করে গানও করতেন। কাজলের তখন বছর তিনেক বয়েস হবে। হেমমাসীমাকে গান করতে শুনে মেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—“হেমদিদা, তুমি গান কোরো না—তুমি উপাসনা কর।” শুনে সবাই

হেসে কুটিপাটি। এটুকু শিশুরও হেম-মাসীমার উপাসনা ভাল লাগত।

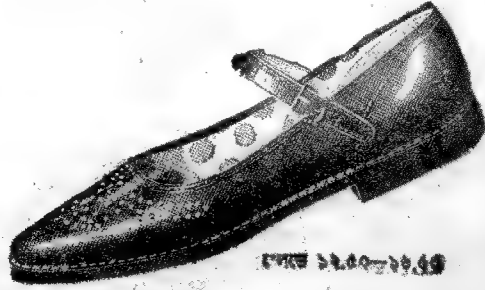
হেমমাসীমার ছিল দুটি ছেলে বিজলী ও বিনয় এবং তিনটি কন্যা—পারুল (বীণা), ইলা ও মীরা। এই ক'টি সন্তানের চরিত্রের মাধুর্যের তুলনা হয় না। এমন সাদামান সচরাচর দেখা যায় না। বড় ছেলে ডাঃ বিজলীবহারী ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এখন তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি বিবাহ করে-ছেন নামকরা সাহিত্যিক স্বর্গীর বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবীকে। কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়বিহারী পুনার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন মধ্য প্রদেশের জম্মল-পুরের সিভিলসার্জন লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর কন্যা কিতিকে। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। ভাগ্যক্রমে হেম-মাসীমার তিনটি কন্যাই বেঁচে আছেন। বড়জন পারুল (বীণা), খুবকি প্রায় সন্-বয়সী এবং উভয়ের মধ্যে খুবকি সৌহার্দ্য লক্ষ্য করেছি। তাঁর বিবাহ হয়েছিল স্বর্গীর মোহিনীমোহন বসুর মধ্যম পুত্র রেণুদেবের ব্যারিস্টার সুরেশমোহনের সঙ্গে। রেণুদেব যখন তিনি বেশ প্রাক্ক-টিস জমিরে ভূদেহছিলেন তখনই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই বৈদীন তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। সেজ মেয়ে ইলার বিবাহ হয়েছে নামকরা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অমলচন্দ্র হোম মশায়ের সঙ্গে। ছোট মেয়ে মীরা বিবাহ করেছেন সুসাহিত্যিক হীরেনকুমার সান্যালকে। এরই বাড়িতে হেমমাসীমার মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ অসুখের সময় আমি একদিন মীরার বাড়িতে হেম-মাসীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন শয্যাগত এবং রোগে খুবকি কাতর। আমি যেতেই তিনি ইঙ্গিত করে বিছানার প্রায় গায়ে-জাগান একটি চেয়ারে বসতে বললেন। আমি বসবার পর আমার এর-খানা হাত নিজের দৃষ্টান্তে ধরে রইলেন বহুক্ষণ। অবশেষে স্তিমিতচোখে উচ্চৈশ্বর্য ভাবাবেগ সংবত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—“You are the man after my heart।” খুবকি ভাগ্যবতী। মাথা আমার মূলে এল সেই মহিমময়ী রমণীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রাণ্য ও সম্ভ্রমে। তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মহাপ্রয়াণ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর কুসুমকোমল ব্যবহার ও আন্তরিক মমতার স্মৃতির সৌরভটুকু এখনো খুবকি ও আমার জীবনকে ভরে রেখেছে তাঁর বিলিতি স্নেহের করুণা-থারায় ও আনন্দবিজ্যোলে।



দৌড় ঝাঁপ,
লাথি লাফ, চিৎপটাং
ছেলেমেয়েদের
যে-কোনো দুরন্তপনায়
সমানে পাল্লা দেবে

স্কুলে আর খেলার মাঠে, প্রতিদিনকার হাটা-চলার
ঠিক যেমনটি চাই, সেইভাবেই তৈরি বাটার
ছোটোদের জুতো। ফিটফাট, শোভন
শটাইল, নরম চামড়ার প্রশস্ত ঘের,
আঙুল মেলার অবাধ পরিসর। মজবুত তালি,
আর গোড়ালিও তেমনি—লাগসই, আরামপ্রদ,
আশ্চর্য টেকসই। বাটার ছোটোদের জুতোর
বৈশিষ্ট্যই এই। আপনার ছেলেমেয়েদের
সঙ্গে নিয়ে বাটার দোকানে আসুন,
আপনতো ঠিক জোড়াটি আমরাই বেছে দেব।
আজই আসুন, এই জুতোগুলোর
চাহিদা পূবে বেশ।

Bata



মোডেল ১২.৫০-১৩.৫০



স্যান্ডাল ৫.৯৫-৬.৯৫



জারনা ১০.৯৫-১১.৯৫



মাইমা ১২.৫০-১৩.৫০



চ্যাম্পিয়ন ১২.৫০-১৩.৫০



স্টার ১২.৫০-১৩.৫০



একবিংশ অধ্যায়

দারো ভেঁতালি

৯ এক

বায়ের পরই আমার ভেঁতালি-এ মনোনিবেশ করতে হোলো। বড় পাশে থেকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। দিন শেষে শ্রুতে গিয়ে সারাদিনের স্মৃতি-স্মরণ কত আলোচনাই না হতো। বড়ের স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমরা একদিন না একদিন সূর্য্যদেবের মুখ দেখবই। এই আস্থা এবং উৎসাহ আমাকে নিত্য উদ্বেগ করে ছে। জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার জন্য। আমার জীবনে যখন যেটুকু উন্নতি হয়েছে যেমন ছোট গাভি বা পুত্র-নিয়মে ছোট বাড়ি কেনা হোলো। আমরা দু'জনে বলতাম—“এ-ও হোলো।” এবং বলে খুব আত্ম-প্রসাদ লাভ করতাম।

জুলাই মাসের পয়লা না দোসরা ল কলেজ খুলল। আমি সৌদি খুব উৎসাহে কলেজে গেলাম পড়াতে সে কথা আমিই বলেছি। এখন আমার কাজ হোলো সকালে স্নানাদি সেরে কিছু খেয়েই ল কলেজে যাওয়া, লেখান থেকে সোজা হাই-কোর্ট-এ পৌঁছিয়ে ব্যাণ্ড ও কাল কোর্ট পরে তার উপর গাউন চাপিয়ে কোর্টে কোর্টে শরণ বোস সাহেবের কাজ দেখা, দুপুরে লাগুমে শবুর বাড়ি থেকে যে খাবার আসত তাই লাগুমা বিকেলে নিক-দার টি ক্রাবের চা ও কিছুটা খেয়ে স্টাডি ক্রাশে ঘণ্টাখানেক পড়ে শরণ বোস সাহেবের এলগিন রোডের বাড়ি ভেঁতালি করে রাত সাতটার পর হেঁটে বাড়ি ফেরা। কিছুদিন পর আমরা মজিক লেনের বাড়ি ছেড়ে বাড়িওয়ালা রামবাহাদুর রামতারণ দ্যানার্জির হাজরা রোডের বাড়ির উল্টো দিকের ৮৮ নং জোড়াবাড়ির পুত্রের দিকটা ভাড়া নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠলাম। আমরা একই বাড়িওয়ালার আওতাধর ১৪ নং মজিক লেনে প্রায় পনের বছর এবং ৮৮এ হাজরা রোডে আরো দশ বছর ভাড়াটে ছিলাম। খুব স্নেহ করতেন তিনি বাবাকে ও আমাদের। ৮৮বি-তে এলেন একই সময়ে প্রসন্ন দাশগুপ্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার দাশগুপ্ত। পাশাপাশি একসঙ্গে অনেক দিন থাকায় এই পরিবারটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয়ে গিয়েছিল তা আজও অচ্ছেদ্যবন্ধনে আমাদের বেঁধে রেখেছে। সুকুমারবাবু ও তার স্ত্রী নীরুদী হয়ে গেলেন যেন আমাদের আপন ভাই ও বোঠান। এদের একটি বোন রেণু খুব হাসিখুশি মেয়ে ছিলেন। লোককে হক-কথা শুনিয়ে দিতে পারতেন বলে আমরা তাঁকে বগডাটি মেয়ে বলতাম—দেখা হলে

এখনো বলি। তিনি বিয়ে করলেন নীরু-দির ছোট ভাই সুকুমারবাবুকে যাকে মুনসেফ হবার পর আমরা বলতাম “ইগুর অনার”।

ডর কঠা প্রসন্নবাবুকে আমি দেখে নি। কিন্তু সুকুমারবাবুর মাকে দেখেছি খুব কাছাকাছি। অত্যন্ত ভক্তি-মাতী মহিলা তিনি ছিলেন। নিত্য উপাসনা করতেন সকালে ও সন্ধ্যায়। সুকুমারবাবুর ছোট ভাই পটুদাবু সে-সময়ে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন। এমন সরল ও দরদী মানুষ কদাচ দেখা যায়। এঁদের খড়তুত কজন ভাই-বোনও থাকতেন ঠুঁদের সঙ্গে। তা ছাড়া ছিলেন প্রসন্নবাবুর ভাগনে। বিশাল পরিবারটির মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধন দেখেছি যা আজকাল বিরল হয়ে এসেছে।

সকালে হাইকোর্টের বড় ছুটি (লং ডেকেশন) হোত শারদীয়া পূজা-পার্বণের সময়। ছুটিটা তখন হোত সাতাইশ লম্বা, প্রায় একটানা আড়াই মাস। সাধারণত আগস্ট মাসের শেষ বৃহস্পতিবার থেকে সে ছুটি আরম্ভ হয়ে হাইকোর্ট খুলত জগন্নাথী পূজার পরে। সে আমলে অনেক ইংরেজ জজ ও ব্যারিস্টার ছিলেন হাই-কোর্টে। তাঁরা সবাই বিলেতে যে যার বাড়ি ঘুরে আসতেন সেখানে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের দেখে। পরে অনেক রোজগার করেন এমন দিশী ব্যারিস্টাররাও এই লং ডেকেশনে জাহাজে করে বিলেত ঘুরে দেহ-মন চাঙা করে আনতেন। বৃহস্পতি-বারটাই ছিল ইংলিস মেইলের দিন। বিলাতযাত্রীরা বৃহস্পতিবার কলকাতা ছেড়ে রবিবার বম্বেতে জাহাজে উঠতেন। আগস্ট মাসের শেষ রবিবারে যে পি. গ্র্যান্ড ও কোম্পানীর জাহাজ বম্বে থেকে বিলেতে যায় তাকে বলা হোত “জাজস্ বোট”।

আমি যখন হাইকোর্টে কাজ সুদূর করি সে সময় সোমবার সোমবার একতরফা মামলা অর্থাৎ প্রতিবাদী যে মামলা লড়তে হাজির হন নি—সে সব মামলা হোত। উনিশ শ’ উনিশ সালের শেষ বৃহস্পতি-বার ঠিক আগে যে শনিবার ছিল সেই শনিবার আমি প্রথম এক একতরফা মাম-লার ব্রীফ পেলাম পরের সোমবার কোর্টে যার ডাক পড়বে। ব্রীফের উপরে থাকে কৌশলীরা বলে ব্যাক সীট ভাঙে আমার নাম লেখা—সুখী আর দাস। মজিলা দুই গোড় মোহর। সুখী আর দাস লেখবার একটা কারণ আছে। বিলেত থেকে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে যোগ দেবার অব্যবহিত পরেই সতীশদাদা বললেন—“ওহে তুমি এস-আর-দাস-দাস খরলে আমার নামের সঙ্গে গোলযোগ হতে পারে। তুমি এটনীর আফিসে, ব্রীফের উপরে এবং ব্যাঙ্কের বইতে এস-আর-

দাস নাম না লেখে সুখী আর দাস লিখো।” যতদিন তাঁর বড় ভাই সত্যরঞ্জন বেঁচে ছিলেন সতীশদাদাও নাকি সতীশ আর দাস বলেই নাম সই করতেন। কি আর করা যায়। সতীশ দাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার সব ব্রীফেই নাম থাকত সুখী আর দাস। পরে এটনীর এস-আর-দাস নামেই ব্রীফ পাঠাতেন। কিন্তু সেই যে ব্যাঙ্কে সুখী আর দাস সই করতে শুরু করলাম আজ পর্যন্তও তাই চলেছে।

উনিশ জানুয়ারীতে হাইকোর্টে নাম লিখিয়েছিলাম। প্রায় সাত মাস আমার নিজের বলে কোনো কাজকর্মই ছিল না। এতদিন সিনিয়রের ব্রীফ নিয়েই নাড়াচাড়া করে ডেভেলপ করে এসেছি। এই প্রথম ব্রীফটা পেয়ে যে কী পরিমাণ ক্ষুধিত হয়েছিল তা বলা যায় না। হঠাৎ বিখ্যাত চারচন্দ্র বসুর আফিস থেকে আমার কাছে ব্রীফ এলো কেন? এটা ঠিকই জানতাম যে ঐ ব্রীফটা আমার এলেমে আসে নি। বস্তুত একতরফা মামলার জন্যে এলেম দরকার হয় না। যা দরকার হয় তা এটনীদের কাছে সুপারিশ করান জানাশোনা কাউকে দিয়ে। আমার হয়ে কে কাকে সুপারিশ করলে? পরে যা জানলাম তা এই : প্রবীণ এটনীর চারচন্দ্র বসুর মেজ ছেলে সৌরীন ঠিক সেই সময়ে তাঁর পিতার আর্টিকেল ক্লাক হয়ে তাঁরই আফিসে বের হতে শুরু করেছিলেন। সেই সৌরীন বিবাহ করেছিলেন নামকর কণ্টার অশুবকু আদিত্য মশায়ের কন্যাকে। অপূর্ববাবুর সঙ্গে শব্দর মশায়ের ছিল জানাশুনা এবং একদিন কথায় কথায় শবুর মশায়ই অপূর্ববাবুকে বলেছিলেন আমার কথা। যাই হোক, ঠিক সেই সময়ে ব্রীফটা দেখে মনটা নিশ্চয়ই চাঙা হয়ে উঠেছিল। জীবনের প্রথম কাজের ফাঁসের চোঁট্রিশ টাকার চেকখানা মার হাতে দিয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম। যা বাবাকে সেই চেকটা দিলে বাবা সেটাকে তাঁর ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। সেই চোঁট্রিশ টাকটা মা বোঠানকে দিতে বলেছিলেন বলে মনে পড়ে। সাহস করে বোঠানকে দিয়েছিলাম কি না সঠিক মনে নেই। আমি যখন পরে সমৃদ্ধির পথে অনেকটা এগিয়েছি এবং সেই সৌরীন বসুও যখন তাঁর বাপের আফিসের কঠা হয়ে বসলেন তখন মাঝে মাঝে পুরানো কথার আলো-চনা করতে করতে তিনি অনেকবার বলেছেন—“দাস সাহেব, মনে আছে সেই প্রথম দুই মোহরের আনন্ডফেন্ডেড ব্রীফ? কি কিনেই গেছে।”

অপূর্ববাবুর সুপারিশে আমার চার-বসুর আফিসে চেষ্টারও হোল। কোর্টের পর চেষ্টারে কিছুক্ষণ থেকে শরণ বোস

পাদ্যাহিক বঙ্গভাষী

সাহেবের বাড়ি যেতাম। আর একজন এটেনশী সলো শব্দর মশায়ের মারফৎ আলাপ হোল। তাঁর নাম ছিল যামিনী-কান্ত সরকার। তাঁর বড় ভাই নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে শব্দর মশাবের জানাশুনা ছিল। সে সুবাদে জে. কে. সরকারের আফিস থেকে আমার কিছু কাজ আসতে সুবিধা হোল। ভাগ্যকুলের ডিউংভূষণ রায় হাইকোর্টে এটেনশী ছিলেন। হাটখোলায় ছিল তাঁর বাসা। সেজন্যদা প্রফুল্লরঞ্জনর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল কাজকর্মসূত্রে। সেজন্যদার সুপারিশেই বোধ হয় টি. বি. রায়ের আফিসের টেকিটাকি কাজ আমি পেতে অবশ্য কবলাম। বাবা সেই সময়ে কর্পোরেশন আফিসের চাকরি থেকে অনেকবার একস্টেনশন গেয়ে অবসর নিলেন। তখন আমাদের সংসার চলত বাবার পেনসন, আগাব ল কলেজের মাইনে আর কালেভদ্রে যে দু-চারটে একতবফা মামলা বা আর্জি মসাবিদা বা ছোট-খাট মোসন ব্রীক থেকে যা কয় মোহর পেতাম তাইতে। কাজের সুবিধাব জন্যে চারুচন্দ্র বসুর আফিস থেকে চেম্বার বদলিয়ে আমি গেলাম জে. কে. সরকারের আফিসে নতুন চেম্বারে। সেখানে বেশ কিছুকাল ছিলাম।

এই সময় বরাবর আমার মূহুরী হলেন একটি অস্প বসের ছেলে-নাম ছিল তার বিধুভূষণ মিত্র। একে আমার কাছে জুটিবোঁছিলেন সৌখীন বসু। বিধুর পিতা চারুবাবুর খুব সুহৃদ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর বাড়ির কাছেই বাস করতেন। এই বিধুভূষণই ছিলেন আমার মূহুরী শেষ পর্যন্ত। এমন সং, সংযত ও নির্ভরযোগ্য ক্লার্ক কমই দেখা যায়। আমার স্বার্থ বিধুর সবচেয়ে বড় প্রিন্স ছিল। আমার ফীস আদায়ের জন্যে সে সৌখিনের সঙ্গেও লড়াই করে তাঁর সুদজর থেকে দ্রুত হন। তাতে বিধুর কোনই ক্ষোভ ছিল না। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন কবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এরকম সুহৃদ ও অনুরাগ প্রভুবৎসল কমই আজকাল বিরল। বিধুর চোখ সামান্য একটু বাকি ছিল। তিনি যখন জে. কে. সরকারের সঙ্গে পূজার সময় আমার ফীস আদায়ের জন্যে বচসা করতেন তখন জে. কে. সরকার হেসে আমাকে বলেছিলেন—“দাস সাহেব, ওই বংকিম নয়নের চাহনীর সঙ্গে আব ত লড়তে পাবি নে। যা বলে তাতেই রাজী হতে হয়।” বাস্তবিক বিধু আমার স্বার্থরক্ষার্থে নাছোড়বান্দাই ছিলেন। বিধুর অন্তঃকরণও খুব স্নেহ-শীল ও উদার ছিল। তিনি আমার যাবত লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। বিধুর বিষ খুব মনে আছে। সুদক্ষণা বউটি এলে বিধুর বাড়ির শ্রী ফিরে গেল।

আমার কাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিধুরও অল্পখাব কিছুটা উন্নতি হোল। বিধু থাকতেন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে মেছুয়াবাজারের ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে। তিনি টাকা জমিয়ে একটি ছোট বাড়ি কিনলেন এবং আমাদের সকলকে ডেকে ঘটা করে গৃহপ্রবেশ করলেন। সে দিন তাঁদের নতুন বাড়ির ভাড়ার ঘণে, বিধু ও তাঁর সহধর্মিণী আমার স্ত্রীকে একবার দাঁড়াতে অনুরোধ করেছিলেন বলে বেশ মনে আছে। বিধুকে তাঁরা লক্ষ্যীও অংশ মনে করতেন বোধহয়।

আমি জিজ্ঞাস্যতী নেওয়ায় বিধু বিরূপ হয়েছিলেন খানিকটা। হবারই কথা। প্রায় উনিশ-বিশ বছর ধরে খেটে আমাকে সেই সমৃদ্ধির পথে দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজের সমৃদ্ধির মূখ দেখেছেন ঠিক সেই সময়েই সব বোজগার বশ হয়ে গেলে মনটা দমে যাবারই কথা। বিধুকে আমি জিজ্ঞাস্যতী তাঁর মাইনেটা দিতাম বটে কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টারের মূহুরীর মাইনেই চেয়ে তহুরীটাই হোত চের বোঁশ। বিধু অনেকদিন আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন নি। তাঁর সাহেব জিজ্ঞাস্যতী, ভাল জিজ্ঞাস্যতী বলে একটু একটু নামও হচ্ছে দেখে বিধু মনে মনে খুশিই হতেন কিন্তু আবার যখন আবার অংকট; নজবে পড়ত তখন দুঃখও পেতেন। অব-

শেষ আমার সিনিয়র শরণ বোস সাহেব যখন জেল থেকে খালাস হয়ে আবার প্র্যাকটিস সুবিধা করলেন তখন আমি তাঁরই কাছে বিধুকে জুটিয়ে দিয়ে তাব ফাঁত-পূরণ করার চেষ্টা করলাম। বিধুর মন বেশ ভাল হয়ে গেল। কিন্তু বিধু বাঁচলেন না বোঁশাদিন। অবশেষে তিনি চলে গেলেন। এখন যখন এক এক সময় জীবনের বিগত দিনগুলি বিধে বিধে তাকাই তখন যে সকল সুহৃদ বন্ধুর কথা মনে জেগে ওঠে বিধুও তার মধ্যে একজন। বিধুর স্ত্রী পাতলা নেটের উপরে লাল, সবুজ, কালো পশম দিয়ে রূপ যেনে ক্রমে বাঁধিয়ে আমাকে একটি উপহার দেন। তাতে লেখা আছে—“They will be done.” বিধুর স্ত্রীর হাতেই এই অমূল্য দান আমার আফিস ঘরের দেয়ালে আমার চোখের সামনে সেই থেকেই টাঙান রয়েছে এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিধু ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহ-মমতা ও ভগবান ষাঁড়ুর পবিত্র উক্তি—“They will be done.” এই বশ বসে জীবনে আমার এসেছে নিদাঘ দর্শন। ঐ রূপের আঁকা ছবির দিকে তাকাই আর মনে মনে প্রার্থনা করি—“They will be done.”

(হুমায়ূন)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নোতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নারায়ণপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - পোতাঙ্গী



স্রবাজ প্রদ্যোদ্যপ্রাণ

বিদ্যা বাউলীর রহস্য

[পূর্ব-প্রকাশের পর]

॥ আঠারো ॥

কাদামাথা শূকনো পাতার সচমচ শব্দ হোল চালতে বাগানে।

কুমি কান পাতল শূরে শূরে। কেড়া আইল। আবার কি খলিফা এল? বড় ব্যাকার বিরক্ত হোল কুমি। আর সবাইকে এ ঘরের বার করে দিয়েছে। শূধু এই খলিফা এখনও তার পেছন ছাড়ে নি।

না, আর নয়। পচা আমের মত নষ্ট হয়ে গেছে কুমি। আর নয়। আর পচনের কাম নাই। এখন দু'দু'ত রোদে হাওয়ায় শুকিয়ে যদি ঝরঝরে হতে পারে, তবেই যথেষ্ট। একবার নষ্ট হলে আব ভাল হওন যায় না। তবু জ্বলেপুড়ে শূকনো হওয়া যায়। পচনের জ্বালা আর থাকে না।

কুমি মদনকেও বিদেয় করে দিয়েছে। সবাইকে খেদিরে দিয়েছে। এবার যেমন করে হোক, দাসীবাউলি করেও নিজের দিন কাটাতে। তবু আর ওই নষ্টামী-খটামীর মধ্যে মাঝে না।

উঃ! জ্বালাল এই খলিফা। আবার বাইরে শূকনো পাতার পা মড় মড় শব্দ। আজ বাউলি হয় নি। কাদামাথা পাতা-গলান শুকিয়ে উঠেছে। পায়ের চাপের শব্দ। গরু-হাগলের আসন-বাওনের শব্দ নয়।

দু'দিন কুমির যে কিভাবে কেটেছে ডগবান জানে। মদন চলে যাবার পরের দিন ঘর থেকে বেরোর নি কুমি। স্নান-বাড়ন করে নি। সমস্ত দিন কেঁদেছে। আফটি কেঁদেছে, তারপর বিকেলে উঠে দুটি মড়ি চিবিয়ে খেয়েছে। কেমন যে লাগছে ওর, ও বলতে পারবে না কাউকে। শুকনু ভেতরটা খাঁ খাঁ করছে। ভিতরে

বেন আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। খাঁ খাঁ শূন্য বুকখানা। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মদনকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করেই তাড়িয়ে দিয়েছে। মদন জানে না যে মদন তার কতখানি। তার বুকখানা জুড়ে বসে ছিল মদন। এই ঘর এই বাগান সব বেন ভরাভরন্ত হয়ে ছিল। আজ সব শূন্য।

মাঝে মাঝে বড় বড় শ্বাস পড়ে কুমির। ভেতরটা বেন আখার আগুনের মত গরম লাগে। গারে আঁচল রাখতে পারে না।

ওই আবার মচ মচ শব্দ।

খলিফাকে একটু ধারকানি দ্যাওনের কাম।

উঠে পড়ল কুমি। দরজাটা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

খলিফা নয়। মদন। মদন এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে বয়েছে দরজার সামনে। মাথাব চুল আলুখালু। চোখদুটোর ফ্যালফ্যালানি চাউনি। বেন চুপসে গেছে মানুষটা। কোথায় বেন বেদম পিটি খেয়ে এসেছে। মদনের চেহারা এমন কেন?

কুমি বুক থেকে একটা হাওয়ার থমক গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে।

ও কোনমতে বলে,—ভিতরে আইও। ঘরের বাইর ভিটাটুক আশ্বাস। ভিতরেও লণ্ঠন জ্বালায় নি কুমি।

অন্ধকার থমথমা বাতাসে মদন আস্তে বলে,—ভিতরে যামু না।

—তবে আইল্যা ক্যান?

—একবার দ্যাখা দিবার আইলাম।

কুমির গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল সেই ভিজা হাওয়ার কম্পন। চকুদুটো জলে

ভরে উঠল। এগিয়ে এসে মদনের এক-খানা হাত ধরে টানল।—ঘরে আইসা কন্য কও।

মদনকে ঘরে নিয়ে এসে চৌকিতে বসাল।

লণ্ঠন জ্বালাল হোল না। নিজে মাটির ওপর কাঁদতে বসল। কামা চাপতে পারছে না কুমি। কিছুতেই কামা চাপতে পারছে না। লণ্ঠন জ্বালালে পাহে ওর কাঁদন মদন দেখে ফেলে, সেই ভরে ও লণ্ঠন জ্বালাল না।

অন্ধকার হবে চৌকির ওপর বলে মদন একটা বড় শ্বাস ফেলল। ওর গলার আওয়াজটা দুর্বল শোনাল।

—এ দ্যাশে আর থাকু না কুমি! চইল্যা যামু।

কুমি কোন জবাব দিল না, পাছে ডার কামা ধরা পড়ে।

—এই কথাখান কইবার আইলাম। একটু সময় নিল কুমি। একটু সামলে নিয়ে বলল,—কার উপর গোস্য কইর্যা চইল্যা যাইবা?

মদন কোন কথা বলল না।

ভিজা গলার আওয়াজ কুমির।—গোস্য কইরো না। পরাণডা যদি ছিড়া দ্যাখাই-বার পারতাম।

বেন ফিস ফিস আত্নাদ করে উঠল কুমি।

অন্ধকার ঘরের থমথমা বাতাস কেঁপে উঠল। কথাখান বেন শুনে বেড়াতে লাগল আনাচে-কানাচে।

পরাণডা যদি ছিড়া দ্যাখাইবার পারতাম!

কুমির এ আক্ষেপের কোন জবাব নেই। এ স্কোভ মোহবার শক্তি নেই মদনের। শত্ব হয়ে অন্ধকার ঘরে বলে

রইল মদন। কুমির আর কোন শব্দ নেই। আশ্রয় ঘরে একচাপ অন্ধকার কালো মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে মাটির ওপর। এ মাংসপিণ্ডের কোন দাম নেই মদনের কাছে। মদন চাহে। জব্দ কুমির অন্তরখানা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় আত্ম।

না, অসহ্য এই অবস্থা। বিদ্যাবরী কুমি দৃষ্টির কাছে থেকেই তাকে পালাতে হবে। নইলে সে মৃত্যু যাবে। আগুন জ্বলবে যাবে। হ্যাঁ, মদনও যেন দেখতে পেল আগুন জ্বলবে যাবে। বিদ্যাবরীর কথাটাই সত্যি হবে শেষ পর্যন্ত। আগুন জ্বলবে যাবে।

ঘরে বড় ভাগসানি গরম। আকাশটা কি মেঘে ঢাকা না কি বৃষ্টি নেই বলেই গরম পড়েছে?

মদন উঠল ঢৌকি থেকে। আস্তে আস্তে দুয়ারের কাছে বেরিয়ে এল। ও আশঙ্কা করছিল কুমি হয়ত উঠে আসবে। তাকে ধরবে। তাকে যেতে দেবে না।

না। কিছুই করল না কুমি। অন্ধকার ঘরে যেমন ছিল। তেমনি রইল।

মদন দুয়ার পেরিয়ে নামল চালতে বাগানে। ভূত-ভূতুম্ বোধহয় কোন চালতে-গাছের ওপর বসে একটানা ডেকে চলেছে। ফাদামাথা পাতাগুলো শব্দ করে গেছে। পারের নিচে মড় মড় আওয়াজ।

এখন তাকে যেতে হবে হাটখোলার। রাত বেশি হয় নি। খলিফার দোকান নিশ্চয় খোলা আছে। আর সেখানে মনছুর পরমাকে নিয়ে গাভী অথবা মদ চলেছে। নিদেনপক্ষে তামুক।

হাটখোলার বাবে। মনছুরকে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। খলিফা পরমার সামনেই টাকা ফেরত দেবে। নয়তো যদি ফলে টাকা পায় নি। ওরা সাক্ষী ছিল।

মনছুর হয়তো মানতে চাইবে না। টাকা দিয়ে সে কি করবে। বিদ্যাবরীকে তার চাই। ব্যাপারীর কাছে তার কথা খেলাপ হবে। ব্যাপারীকে সে টাকা ফেরত দিতে গেলে ধারকি খাবে। টাকা ব্যাপারীর—অনেক আছে, টাকা সে কি স্ববে। যে দুব্যাটি আনতে বলেছিল, সে ব্যাটি চাই।

না। পারবে না। মদন স্পষ্ট বলে দেবে,—বিদ্যাবরীকে কালাকান্দি নিয়ে যেতে সে পারবে না। টাকা ফেরত নিতে হয় নাও, না নিতে হয় নিও না। বিদ্যাবরীকে পাবে না।

মনছুর রেগে যাবে। হয়তো মারপিট করতে আসবে। নয়তো শাসাবে। যা খুশি করুক। তাকে যদি মেরেও ফেলে তবু বিদ্যাবরীকে নিয়ে সে আর কালাকান্দি যেতে পারবে না। অসম্ভব।

মদন টাকা ফেরত দিয়ে খলিফার

দোকানে আজ রাত কাটাবে। তাবপর কাল ভোরে উঠে কোথাও চলে যাবে। এ দেশে আর থাকবে না।

মুখখানা শব্দ করে উঠেছে মদনের। পা-হাত যেন দুর্বল লাগছে। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাগাদল করা আর হোল না। অধিকারী হওয়ার বাসনা এ জন্মের মত স্থায়ী রইল। কিস্টখানার মদন ভুইয়া শ্যামায়া ভিখারী অইল। লোকে যা মন ন্যায় তাই বলুক। কিছু আসে যায় না।

হাটখোলার দিকে এগিয়ে এল মদন। মাঠ পেরিয়ে সড়ক পার হয়ে হাটখোলার ওপর উঠল।

খলিফার দোকানের সামনে অত গভীর গোল কিসের? চারদিকে ভাল করে তাকাল মদন। হাটখোলা আশ্রয়। সব যেন টাপুটুপু বজ্রার টপু। একখান দোকানের খাপ খোলা নাই। জনমনিষ্য নাই।

খলিফার দোকানের সন্মুখে পাঁচ-সাতজন মানুষ। ফিসফিসানি। গজ-গজানি।

এগোল মদন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

হায় রে। ইকি বীভৎস ফাশ। জনা পাঁচেক শ্যাখ। কাউর হাতে নড়ি, কাউর হাতে লাঠি। হ' খলিফাও নি রইছে। কি দ্যাখে ওরা?

আরও এগিয়ে এল মদন।

ইরে। রক্তে বালুমাটি লাল হয়ে গেছে। কানের মিরার গলার পাশ দিয়ে কাম্বের উপর একখান কোপ বসাইছে। এক কোপে এক বিষত কেটে গিয়ে কানের মিরার একখান হাত ঝুলে পড়েছে। কি সম্বনাশ। এ কাম্ব করলে কেভা?

মনছুরের হাতে একখান মোটা লাঠি।

—আউক যুগীর ঘোপার মোজা ছায়েব। এচুপার-ওচুপার অইয়া বাইব আইজ।

খলিফা ঘুম ঘুম চক্ষু দুইটা ভরে বড় বড় হয়ে উঠেছে—পরমা। পরমা আলোয় কোপ বসাইয়া পলাইছে। আলোয় পাইলে ওরা কাইটা কুচি-কুচি কইয়া ফালাইব।

মোজা নি আইল। হ'। অল্লা অল্লা আওয়াজ উঠল। বাতাসে লাঠি আর নড়ি চব্বিকর মত ঘুরতে লাগল। সব হালারে নিকাশ কইয়া ফালামু।

ভয়ে বৃক্কের ভেতর খড়াস খড়াস করছে। মদন সরে এল ওখান থেকে। সড়ক পেরিয়ে মাঠে নামল। একটু সময় দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল হাটখোলার দিকে

ভীষণ আওয়াজ উঠতে লাগল। শ্যাখদের অল্লা অল্লা চিৎকার। নিকাশ করো। মারো। কাটো।—সব মিলিয়ে অন্ধকার চিরে চিরে ভয়ানক চিৎকার ভেসে আসতে লাগল।

আগুন—আগুন!

পরমা হালুইকরের দোকানে আগুন জ্বলছে। পরমা পালিয়েছে। তার দোকানে আগুন জ্বলছে। সইসাই করে বাঁশের মাচা আর বেড়া জ্বলে আগুনের জিভ বেরিয়ে পড়ল। আরও দু'খানা দোকানে আগুন লেগেছে। দাঁকিগের আকাশটা লাল হয়ে উঠল।

আরও মানুষ জমল না কি? চিৎকারটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বিদ্যাবরীর কথা যে এমন করে সত্যি হবে ভাবতেও পারে নি মদন। আগুন লাগল। ভীষণ আগুন। শব্দ বাইরে নয়। মানুষের মনে আগুন ধরে গেছে।

আওয়াজটা যেন এগিয়ে আসছে। ঘাঠের দিকে এগিয়ে আসছে।

চোখদুটো তারা-তারা করে দেখল মদন। লাঠি, সড়কি, রামদা আগুনের আড়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। শ্যাখরা বীভৎস চিৎকার করতে করতে চতুর্দিকে ছুটছে।

হাটখোলাটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে?

মদন দৌড়োল। মাঠের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে চলল। দক্ষিণ দিক থেকে সোজা উত্তর দিকে দৌড়ে চলল মদন। কোনদিকে তাকাল না। কোথায় যাযে ভাববার মত সময়ও পেল না। উত্তরের ঘোষপাড়ার কোপ-জঙ্গলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

একি সম্বনাশ! এদিকেও চিৎকার। হো-হো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কোপের ওপারে। ভীষণ আওয়াজ। অনেক মানুষের একত চিৎকার।

দাঁড়িয়ে পড়ল মদন।

কি করবে ভেবে না পেয়ে সামনে



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩ ওন্ড টীনা বাজার ফ্রিডি

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

সাহিত্যিক বসুমতী

একটা কঠাল গাছ ছিল। তার ওপর বেয়ে উঠতে লাগল। এই গাছের ওপর উঠে বসে থাকা ছাড়া এখন আর অন্য কোন উপায় নেই। বিরটে কঠাল গাছটা। অনেকটা ওপরে উঠল মদন। কিন্তু একেবারে আগডালে উঠল না। কঠালের ডাল পলকা। ভেঙে নিচে মাটিতে পড়লে এখনি মৃত্যু।

একখানা মোটা ডালের ওপর বসে ঘোপের ওপাশে তাকাল। ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাছগাছালী জঙ্গল ভোবার জ্বা আশ্বাস। কিন্তু ঘোষপাড়ার ওই জায়গাটার মশালের আলোর সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক দণ্ডল মনিষ্য। সব যেন ক্ষেপে উন্মত্ত হয়ে গেছে। তাদের হো-হো চিৎকারে বাতাস আশ্বাস কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ইরে আলার হাতে, রামদা, লাঠি,

কুড়াল—একদণ্ডল মনিষ্য। এখানেও নি কাইজা লাগল। ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে। হায়রে হায়। ফনফনাইয়া আগুনের জিহ্বা বাডাসে উঠছে উপরের দিকে। পাড়াখানই বৃষ্টি ছারেখারে গেল।

ও কেডা? ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল একজন। চলার ভঙ্গি আর দৌড়ানর ভঙ্গি যেন পশ্মদিদির মতন। পেছনে দুটো বাচ্চা। আর একজন মাইয়া।

মার—মার—ভীষণ ডাক চিৎকার শব্দ হোল।

হ' ওই তো পশ্মদিদি। ধরেছে, ধরেছে পশ্মদিদিকে। ত্যাগদুটো ধরেছে একজন। স্টেন থানিকটা হিচফু আনতেই পাশ থেকে একটা লাঠি পড়ল। ফটাং—ফট্—ফট্—মাথার খুলিখানা দু'ফাঁক হয়ে গেল।

গাছের ডাল থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মদন। রক্ত ভেঙে গেল পশ্ম-

দিদির মুখখানা।

হস্ত-পা সর্বশরীর ধরধর করে কাঁপছে মদনের। গাছের ডাল থেকে বৃষ্টি মাটিতে পড়ে যাবে। ও জানে পড়বার শব্দ হলেই ওরা ছুটে আসবে তার দিকে। তার মাথাটাও নিমেষে দু' ফাঁক হয়ে যাবে।

চোখ বুজল মদন। না। আর দেখতে পাচ্ছে না। এ আর দেখা যায় না।

পশ্মদিদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। রক্তাক্ত মুখখানা। পশ্মদিদি মরতে চায় নি। প্রাণ নিয়ে পালাতে চেরেছিল। ওরা তাকে পালাতে দিল না।

এই পুরো সংসারটা কি আজ পাগল হয়ে গেল। তার নিজেরও কেমন পাগল-পাগল ঠেকছে। মাথাটা কেমন জানি করে।

ও বৃষ্টি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবার। [ক্লমশঃ]

ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্টে খোলার এখনই উপযুক্ত সময়। প্রতিমাসে টা ৫ জমা দিলে আগামী পূজার সময় টা ৬৯.৫০ হবে। পাঁচ টাকার ওণ্ডিত প্রতিক পরিমাণ টাকাও জমা লাগে।



আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ব্রাইড বাট স্ট্রিট, কলিকাতা-১



১৫৫

পশ্চিমবঙ্গে ৯০টিরও অধিক শাখা আছে

ভাড়া

জুনিয়র

—‘সেবারের কথা মনে আছে?’

—‘আছে।’

—‘নেতাবাবুর ঘরে যেতিস?’

—‘যেতুম।’

—‘কাজ করতিস?’

—‘করতুম।’

—‘আর কি করতিস?’ এবারে একটা

জানোয়ারের মত খেঁকিয়ে ওঠে বেচারাম। মরামাছের মত ফ্যাকাশে চোখ নিয়ে তাকায় একবার যশোদার দিকে, তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ফুঁসতে থাকে। যশোদা ভরে পিছিরে যায়।

সেবারের সেই বড় আকালের বারের কথা মনে পড়ল বেচারামের। সেই স্মৃতি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল, আবার ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকল। সেই দুর্দিন, অনাহার, যন্ত্রণা। যন্ত্রণা মানে পেটের জ্বালা। আর মনের জ্বালাটা অনেক পরে ধরা পড়েছিল। সেই দুর্দিন খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পরে, পেটের জ্বালা খানিক নিবৃত্তির পরে, হাত-পায়ের অসাড়তা একটু কমতির দিকে এলে বৃষ্টিতে পেরেছিল যশোদা কেন কাজে গিয়েছিল নেতাবাবুর ঘরে। মনে মনে দশ গ্রামে এক ঘর নেতাবাবুর।

সেবারেই প্রথম ধাক্কা লেগেছিল গায়ে।

এটা শব্দ হরেছিল দেহটা সেবার থেকেই। আর মাংস জড়ো হয় নি দেখে। তবু এই ভাঙা দেহ নিয়ে সেই আকাল থেকে এই আকাল পর্যন্ত জনে জনের ক্ষেত-খামারের কাজ করেছে, পেটে ভাত যোগান দিয়ে কোন রকমে বেঁচে বেঁচে এতদূর এসেছে।

আকাশ থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে আবার বলল,—‘আবার আগুন লেগেছে, জানিস?’ জানে যশোদা। তারও জানতে কিছু বাকি নেই। আগুনটা শব্দ দেখতে পায় না বলেই দ্রুততা তার বোঁটা। যদি আগুন লেগে নেতাবাবুর ঘানের গোলাটা পড়ে যেত, যদি আগুন লাগত ওদের পেটেও, তা হলে বোধ হয় এই অদৃশ্য আগুনের জ্বালা হাসিমুখেই সইতে পারত।

আজো যশোদার সেই ভয়ঙ্কর মানুষটির কথা মনে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর মানুষটি আজ অবশ্য বড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন এই বড়োটা এই একটা ক্ষুধিত জানোয়ারের মত ক্ষেপে যেত মাঝে মাঝে। দু’মুঠো চালের পরিবর্তে ঘেন কেড়ে খেয়ে নিতে চাইত সব কিছু। আজো সে সব কথা কাজকে খুলে বলতে পারে না যশোদা। নিজের ভিতরে নিজের সেই কাহিনী চাপা পড়েই আছে। বেচারাম

অবশ্য, দু’হাতে পেরেছিল সবই, কিন্তু মন ফুটে কিছু বলে নি। পেটের জ্বালায় সবই সরে গেছে।

আজ আবার সেই পেটের জ্বালায় ভুগছে। আবার তেমন খিদে পায়। সেই অনাহার। আর সেই নেই নেই ভাবনা।

এখন ওরাও দু’জনে হয়েছে বড়ো-বড়ি। সেই দুই যুগ আগের কথা। একটা ভয়ঙ্কর কড় মেছে ওদের জীবনের ওপর সেই পড়াশোনা। আবার এখন সেই বড়ি বইছে। আবার সেই কাপড়ের আতঙ্ক। সেই ত’ ভাঙনের শব্দ। তারপর থেকে ত’ আর কোন আশার আলো দেখতে পায় নি চোখে। দিনের পর দিন হতাশার মধ্য দিয়ে এসে আবার ভাঙনের সামনে পড়েছে।

বেচারাম আবার বলে,—‘এখন নিয়ে নেতাবাবুর সামনে দাঁড়ালে তোর গায়ে খুঁত দেবে, জানিস?’

—‘জানি।’

—‘কেন জানিস?’

যশোদা বলতে যাচ্ছিল—‘গায়ে-গায়ে যে মাংস নেই, তাই। কিন্তু বলতে পারব না সেটা। আটকে গেল মুখে। বলল,—‘এখন ত’ বড়ি হয়ে গেছি, তাই।’

তা বটে। যশোদা যে বড়ি হয়েছে আতে কোন সন্দেহ নেই। বড়ি ডি

শুধু বয়সে হয়েছে, দু' দুটো আকালও
যে গেল এই গল্পের ওপর দিয়ে। নেতা-
বাবুও বয়স হয়েছে, তবে গোলাপী ধানে
মানুষ কি না, সেইটা চকচক করে এখনো
তাঁর।

বেচারাম স্বপ্নও ভাবে নি যে, এমন
একটা দুঃসময়ের মতোমুখি হতে হবে
আবার। যশোদাকে সেবারে সে পিঁজের
পাঠিয়েছিল তাগিদ দিয়ে। ক্ষুধার খনলা
বড় বিষম লাগছিল তখন। তাই খানিকটা
কাণ্ডজ্ঞানহীনও হয়ে পড়েছিল। তারপর
এই দুই বৃগ ধরে বহুদিন মনে হয়েছে,
ভালো করে দি সে কাজটা। ভাতের
আশার সে যশোদাকে পাঠিয়েছিল নেতা-
বাবুর কাছে। সত্যি ভালো করে দি
কাজটা। কিন্তু সেদিন নেতাবাবুর দরায়
বেঁচে যে গিয়েছিল, তা-ও ত' সত্য।

যাওয়ারটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
ভেতরের ভয়ে হাত পা যেন আরো অবশ
হয়ে আসছে। আবার ভাবে, এমন করে
না বাঁচলে কি হয়। বাঁচাটাই শালার এক
পাপ। এর চেয়ে মরে গেলেও ভালো।
কিন্তু হাড়সাস না জরাজীর্ণ মরল কি
আসবে সহজে?

পাঁচ দিন আগে তবু পেটটা একবার
জ্বরেছিল। ঝিদের জরালার সেদিন সারা-
রাত ঘুমোতে পারে নি। ঘুম আসে নি।
শুধু ঘাপটি মেরে পড়েছিল। হঠাৎ শেষ
রাগের দিকে উঠে বাইরে গেল বেচারাম।

নতুন!

**'ইকলিমি প্যাকে'
টিনোপাল**



তাছাড়া এক-বালতির এক প্যাকেট
এবং রেস্তোরাঁর প্যাক

সর্বাধিক শুভতার জন্য টিনোপাল

সুখ পাওয়া নিমিটেড, বোম্বাই

Ref 31/67 BM

যশোদা বুঝতে পারে নি কিছু, তারও
ঘুম আসে নি। সে-ও পড়ে ছিল ভেঁমনি
মুখ খুঁড়ড়ে। কিন্তু কোন বাধাও 'দি
না। জানে ত' বেচারামকে। হয়ত
উত্তেজিত হয়ে উঠবে। সেই উত্তেজনার
বশে হয়ত দিয়েই বসবে 'দু' ঘা। এই
শরীরে হয়ত তা অসহ্য লাগবে।

এই রাতের অসহ্যকারে শুয়ে শুয়ে
অনেক কথাই ভাবতে লাগল যশোদা।
হায় রে, দিনরাত গায়ে পেটেও দুঃখ
ভাত ওদের ভাগ্যে জ্বাটে না। অথচ
নেতাবাবুর, খেয়েও থাকে। রেচে দেয়
শহরের মানুষের কাছে। সাঁরোঁশি থাকে তা
থেকে টাঁকা আসে। দালানে মরে ক্ষেতে-
আমারে, ধনে জনে কোথাও কোন জন্ম
নেই। সেই আকালের বার, ওকে পারলে
যেন খেয়ে ফেঁবাত নেতাবাবু। নিজের জন্য
নিশ্চয় ও জ্বাটো অত্যাচার সহ্য করত না।
শুধু করেছে বেচারামের জন্য। ও ত'
জানে, ভাত না পেলে মানুষটা পাগল হয়ে
সায়। সেবারে সেই আকালের সময়
দিনের পর দিন নেতাবাবুর মন জ্বাগিয়ে
চলেছে।

সেই নেতাবাবুর কাছে ও গোপনে
কাল একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি
দয়া হয়। যদি সেবারের কথা মনে পড়ে।
সে সব কথা মনে করে যদি দু' দুটো চাল
দেয়। তা' হলেও বেচারামকে রেখে
দিতে পারে একদিনের জন্য। ইস, ওরা
আরাম সেই কতদিন ভাত খায় নি। এমনি
করেই মরে যাবে বোধ হয়। তাই এমনি
করে মরবার আগে একবার বাঁচবার জন্যেই
গিয়েছিল সেখানে।

নেতাবাবু ওকে দ্রুতই খেঁচিয়ে
উঠেছিলেন—'এই মাগী, তুই এখানে কি
চাস?'

ও ভয়ে পিঁচিয়ে এসেছিল এক পা।
তারপর মরিয়া হয়ে বলল—'খিদে পেয়েছে
বাবু, দু' দুটো চাল পেলে বাঁচি।'

শুনে নেতাবাবু বরিশটি দাঁত বার
করে খিঁচিয়ে ছিঁকেন ওকে। বলছিলেন—
'তোরা বাঁচলে কি আমার চোপপদুব
উদ্ধার হবে, বেরো, শিগুগির বেরো
বলছি।'

চলে এসেছিল যশোদা সেখান থেকে।
এখন শুয়ে শুয়ে সেই জানোয়ারের ছবিটা
মনে পড়তে লাগল ওর। সেই সেদিনের
কোন কথাই মনে পড়ল না বাবুর।
মমের দুঃখটা ওর কান্নার জ্বরে উঠেছিল।
অথচ সেবারে ত' আদর করে বিছানার
পবিত্র কসতে দিয়েছিলেন। বলছিলেন,
—'ভয় লাগার কি আছে, আমি কি আর
তোদের বাইরের ঢোক ভাবি।'

সত্যি সেদিন ও ভুলে গিয়েছিল সব।
তাই এই অসহ্যকারে শুয়ে শুয়ে অক্ষুণ্ণভাবে
চলে উঠে—'জানোয়ার!'

সেই সেই সময়ই মরে ঢুকল বেচারাম।
খিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে। তার ওপর
মরে ঢুকবার মুখে এ রকম একটা শব্দ
শুনে প্রমত্তে দাঁড়াল। বলল—'কাকে
জানোয়ার বলি তুই?'

চমকে উঠল যশোদা-ও। বেচারাম যে
মরে ঢুকেছে সেও টের পার নি এতক্ষণ।
কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—
'যারা আমাদের খেতে দেয় না, খাবার
আটকে রেখে কষ্ট দেয় তাদের বললাম।'

বেচারামের মাথার ভিতরটা গরম হয়ে
উঠেছিল। এবারে যেন একটু ঠান্ডা হল।
তারপর যশোদার দিকে হাত বাড়িয়ে
বলল—'এই নে পেপে দুটো লেখ করে
দে দিকি নি, একটু শাই।'

যশোদা তাঁকরে দেখল সত্যি বেচা-
রামের হাতে দুটো আন্ত পেপে এক
অবাক হয়েছে আর কোন রকম কথা না
রাড়িয়ে পেপে লিখ বসতে গেল। ও
জানে বেচারাম নিশ্চয় মৃত্যুঞ্জয়ের বাগান
থেকে এ-দুটো চুরি করে এনেছে। যদি
ধরা পড়ত তাহলে বেচারামের দু'বল
শরীরের হাড় নিশ্চয় গড়ো গড়ো হয়ে
যেত।

যশোদা দেখল খাবার সময় বেচারাম
দেড়খানা পেপে একাই খেয়ে ফেলেছে।
ও ভেবেছিল একটা বেচারাম খাবে
আরেকটা ওর জন্য বরাদ্দ হবে। কিন্তু শেষ
পর্যন্ত মোটে আধখানা ওর জন্য বরাদ্দ
হল।

বেচারাম বলল—'একটু বেশি খেয়ে
ফেললাম, ঝিদেরা এমন যে.....'

—'বেশ করেছে।' যশোদা বলল। কথা
বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ওর।

মাঠে সোনার ধান কোথায় গেল?
বেচারাম বলে বসে ভাবছিল। সারাটা বছর
ধরে মাটিতে সোনা ফলিয়েছে সে। তার
মত আরো অনেক চাষী। ইস, ঝিদের জন্য
যে আবারো এমন জরালার সইতে হবে,
সেটা জানলে ভখন থেকেই চুরি করে
এখন গড়িয়ে রাখত নিজেরটা। সেই পাঁচ-
দিন আগে দেড়খানা পেপে খেয়ে পেটটাকে
একটু শক্ত করেছিল। তারপর থেকে এ
পর্বন্ত আর পেটটাকে শক্ত করতে পারে
নি। রাখখানে একদিন শাকের ডাটা লেখ
করে খেয়েছিল, তাতে কি পেট শক্ত হয়,
না ঝিদের জরালার মেটে।

মুখ গুঁজে পড়ে থাকে যশোদা। কোন
কথা বলে না। কেন না, কথা বললেই যে
বেচারাম সেই আগের-পরের কথা তোলে।

'আকালের ভরস্কর আক্রমণে যেন ওরা
মুটিতেই নিমন্ত হয়ে পড়েছে। তবু
যশোদা একবার মুখ খুলে বলে, 'আমার
আমরা ভাত কবে পাব গো?'

খেঁচিয়ে ওঠে বেচারাম। বলে, 'যমের

সাহিত্যিক বঙ্গমতী

হাড়ি গিয়ে নেই দ্দ' বেলা পেট ভরে ভাত খাব, বুকলি?"

কথা বললেই বেচারামের মেজাজ গরম। এই গরম মেজাজের জন্যই ত' কোন কথা বলে না যশোদা। নইলে মরদ বেটা যে ভাত জোগাতে পারে না সেটা কি কম রাগের কথা!

আর এদিকে ভাতের কথায় যেন চনমন করে ওঠে বেচারামের মন। হ্যাঁ, ভাত চাই। দ্দ' মূঠো ভাত। আজ কতদিন ভাত খায় নি ওরা। ভাতের কথা যেন জ্বলেই গিয়েছিল। আহা, ভাত কি ভালো জিনিস।

যশোদা আবার বলে, "নেতাবাবুরা রোজ ভাত খায় না?"

—“খাবে না, খাওয়াটা ত' ওদের জমাই।” বলতে বলতে হঠাৎ বেচারামের দ্দ' চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে। মনের মধ্যে নতুন মতলব গজায়। হ্যাঁ, ভাত খেতে হবে দ্দ'টি। নেতাবাবু যদি খায়, তা হলে ওরাই বা খাবে না কেন? খেতে হবে, যেমন করেই হোক পেটের জ্বালা কিছুটা কমাতে হবে। ধীরে ধীরে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ছিল বেচারাম। ভাতের চিন্তা!

যশোদা বলছিল,—“সেবারেও ত' দ্দ'টি ভাত পেরেছিলাম।”

—“পেরেছিলাম ত'।” বেচারাম অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিচ্ছিল।

—“নেতাবাবু, ভাত দিয়েছিলক্‌

—“দিয়েছিল।”

—“এবারে দেবে না কেন?”

—“তোমার গায়ে কি মাংস আছে যে, তার বদলে ভাত দেবে তোকে।”

যশোদা চুপ করে যায়। বোকার ওপর শাকের আঁটির মত মনে হয় বেচারামের কথাগুলি। একে পেটে খিদের জ্বালা তার ওপর আবার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিতে চায় যেন বেচারাম।

দ্দ'জনে আরো অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। দিন দিন যেন বেশি করে বেকে পড়েছে বেচারাম। যশোদা দেখে বেচারামকে আর দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে। বাচবার মত দ্দ' মূঠো ভাত, যা ন্যাকি ওদের জীবন বাঁচাতে পারে, কাজের ক্ষমতা জোগাতে পারে, যা পাওয়ার জন্য ওরা দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজী আছে, তা ওদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আর পারছে না যে, আর পারবে না। বেচারামের দিকে তাকালে ওর বড় কষ্ট হয়, কিন্তু মুখে ফুটে কিছু বলতে পারে না। কথা বলতে বলতে আজকাল বেচারাম হঠাৎ রেগে যায়। পুরনো যা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড় করে। এই খিদের যন্ত্রণার মধ্যে তা একেবারে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

পরদিন মাঝরাতে কখন একদু চোখ জড়িয়ে এসেছিল যশোদার। খিদেতে ঘুমটা ঠিক আসে না। কিন্তু দুর্বলতার জন্য মাঝে মাঝে তন্দ্রার মত আসে। একটুখানি তন্দ্রা মাত্র। আর কিছু নয়। পরমুহুর্তেই আবার জেগে ওঠে। হঠাৎ তন্দ্রাটা সরে যেতেই দেখল বেচারাম নেই ঘরে। আশ্চর্য, ওর মনটা যেন আরো খারাপ লাগল। এমন ছিল না ত' আগে! সেদিনও মুখজোড়ের বাড়ির বাগান থেকে পেঁপে চুরি করে এনেছিল। আরো দ্দ' একদিনের কথা মনে পড়ল। তবে কি ওর স্বামী শেষ পর্যন্ত চোর হয়ে গেল।

বেচারাম ফিরে এলো। রাত অনেক। গভীর অন্ধকারে পৃথিবী নিরুদ্ম। যশোদার মনে হল বেচারাম যেন ছুটে এসেছে। চোখে মুখে একটা সত্যক ভাব। এ কি, বেচারামের হাতে এটা কি? চমকে

ওঠে যশোদা। বড়মড়িয়ে উঠে বলে। বলে,—হাতে কি শো।”

—“চুপ।” বেচারাম নিজের ঘরে বসেই সত্যক হতে চায়। যশোদার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে,—ভাত খাবি, ভাত, নেতাবাবুর হাড়ি নিয়ে এসেছি, ওরা সব ঘুমিয়ে ছিল, রান্না ঘরে ঢুকে দেখি হাড়িটা রয়েছে, নিয়ে এলাম, আর আর এদিকে আয়।”

তারপর দুটিতে পাশাপাশি বসে। পৃথিবী অচেতন। অনেক রাত। ওরা হাড়ির ঢাকনা খুলে দেখল, রয়েছে। খনিরকটা রয়েছে। বেচারাম আর দেখি করে না। খাবলা খাবলা জ্বলে মুখে পুরতে থাকে। মুখ ভরে ওঠে। যশোদার চোখ চক্‌চক করে ওঠে। হাতাতে বেচারামের কাঁড়কাঁড়ানা দেখে এই দুজনের মধ্যে হাসি পায়।

বেঙ্গল কেমিক্যালেন্স



স্বাস্থ্য বাক্ষী
হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়
আমূল্যবান-মিষ্ট শিথ উপকরণ এবং



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • গোয়াই • কলকাতা • দিল্লী



【পূর্ব-প্রকাশনের পর】

১১৮

১৯৭৪ সালে ছোট্ট কপড়ের মধ্যে
কুটির। কোলাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে
গায়ে গুঁড়িয়ে ওপরে বসে চায়ের ফরাস
দিই। জায়গার নাম খরলালী। গাংনানী
থেকে দু' মাইল এসেছি। চায়ের গেলানটা
এগিয়ে দিয়ে দোকানী বলে, 'বাবুজী, এক
মাখ পথ চলতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
কিছু দাওয়াই দিতে পারো?' দোকানের
পেছনে ঢালার নিচে রুপন সাধুটির গায়ে
হাত দিয়ে দেখি, প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে
পড়েছে। বড়লি থেকে কয়েকটা বাড়ি বের
করে দিই। পথ চলতে কিছু ওষুধপত্র
সর্বদাই সঙ্গে থাকে। সেগুলোর সদগতি
হলে নিশ্চিন্ত হই। নার্সিং জীবনে
অভ্যন্ত আমার চেয়েও বেশি কার্যকরিতা
দেখেছি এ বাড়িগুলোর গ্রাম্য লোকদের
ওপরে। তবে স্থানীয় আবহাওয়ার গুণে
অসুখী শরীরের শক্তি ফিরে আসে।

খরলালীতে আলাপ হলো মৃত্যুশয্যা
খায়ের সঙ্গে। এখানকার বাসিন্দা তারা।

সমগ্র উত্তরাখণ্ডের দু' একটা শহরগুল
ছাড়া মুসলমান বসতি আর কোথাও দেখি
নি। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মীতে সাহেবরাও
চকতে সাহস করে নি। দেখি নি সর্বত্র
বিরাজমান মিশনারীদের। যমুনাতালীর
দু' গম অটলে মৃত্যুকা খাঁ আমার মনে
বিশ্বয়ের সত্তার করে। স্ত্রী তরুণ যুবক-
টির অবস্থে পুরোপুরি আর্থশোগিতের
প্রভাব স্পষ্ট। শুনি সে নাকি সৈন্য
বিভাগে চাকরি করে। ছুটিতে দেশে
ফিরছে সদুর আসাম থেকে। কুটিরের
আঙিনায় সন্দেরী স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে
তার স্ত্রী বলে ডাক করেছিলুম। ওটি তার
মা। সহজ সরল এই পরিবারের শান্তিপূর্ণ
জীবনযাত্রা, দেশ বিভাগরত নেতাদের
দেখবার যোগ্য।

স্বপ্ন বিভ্রামের পর আবার চলা
শুরু। সন্ধ্যার আগেই রাতের ডেরায়
মেতে হবে। এ পথে আগ্রসংখ্য ৮১২
মাইলের ব্যবধান ছাড়া মেলে না। তাহাড়া
পথে জলাভাবও আছে। নদীগর্ভের
অনেকটা উঁচু দিয়ে চলবার পথ। আর
আছে কঠিন চড়াই-উৎরাই। এদিকেও

সরকার চেষ্টা করছেন গাড়ি চলাচলের
উপযোগী সড়ক নির্মাণে।

খরলালী। ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল
শুধুই একটানা কঠিন চড়াই। পড়ন্ত
বেলার কড়া সোদ আর ঘুরে ঘুরে ওপরে
ওঠা। চলতে কষ্ট হয়। আবার তাড়া-
তাড়ি করাও যায় না। শনৈঃ পন্থা...। পাহা-
ড়ের পথে ধীরে না চললেই বিপদ। গুরু-
তর পরিশ্রম ত আছেই, তার ওপরে আসমান
পথে সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। বৃষ্টির
পথে পায়ে চোট লাগলে চলার কষ্ট বেড়েই
যাবে। সারা শরীরের মধ্যে পায়ের যন্ত্র
সবচেয়ে বেশি করতে হয়। কাপড়ের জুতো
পুরু রবারের দাঁতওয়ালা সবচেয়ে ভালো।
এবং বেশ একটু ঢিলা জুতো দরকার।
কারণ দীর্ঘ পথ চলতে চলতে পা দু'খানা
ফুলবেই, ঠিক সাইজের জুতো শেষ
পর্যন্ত পায়ে রাখাই যায় না। আবার
খালি পায়েও চলা প্রায় অসম্ভব। ব্যতিক্রম
শুধু রাজস্থানীদের বেলার। মোটা চাম-
ড়ার শক্ত নগরা পায়ে অবলীলাক্রমে
চলেছে তারা। মেদমাংসহীন লোহার মতো
শক্ত নীরস পা দু'খানার দিকে তাকিয়ে
তাকিয়ে ভাবি 'চেতনাবিহীন শিলীভূত
ফসিল' যেন।

মাইলখানেক চড়াই পাড়ি দিয়ে এবার
নামতে শুরু করছি। এ পথের দলতুরই
এই, বুকভাঙা চড়াই আর তার পরেই
উৎরাই। গড়গড় করে নামতে ততটা
কষ্ট নেই, কিন্তু আলন্দও নেই কারণ
সামনেই আবার দুরন্ত চড়াই অবধারিত।
পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নদী লাফাতে
লাফাতে নামে। তার গতিপথ ধরে পাহাড়
পর্বত ডিঙিয়ে চলবার সড়কও উঁচু-
নিচু। সমতলের জীবনে অভ্যস্ত শরীর
ক্লান্তিতে ভরে ওঠে। অসুখেই হাঁফ ধরে।
মাঝে মাঝে পথের ধারে বসে পাড়ি গাছের
ছায়ায়। হিমালয়ের নির্মল কাতাসে অসুখী
ক্লান্তি দূর হয়। আবার উঠে পড়ি।
এমন রয়ে বসেই আমি চলি। তরুণ
চারিদিকটা ভাল করে দেখাও হয়।
সবুজের সমারোহ উপভাওয়ার পাহাড়
অটলে। নাম না জানা অজস্র ফুল ফুটে
আছে পথের দু'ধারে। প্রায় দু' মাইল
উৎরাইয়ের শেষে প্রকাণ্ড একটা বরষা গুল
হই কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে। ওপরে
একটা চায়ের দোকান। আর মাত্র এক
মাইল দূরে যমুনা চটী। আমার রাতের
ডেরা। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। আকাশেও
মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। টিপটিপ করে বৃষ্টির
মধ্যে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলি যমুনা
চটীর দিকে। সাকো পেরিয়ে অল্প দূরেই
করলালী যমুনার মিশেছে। তারই কাছে
বনবিভাগের বিশ্রামগৃহ। কিন্তু আহা! বন
সংস্থান ধারে-কাছে কোথাও মিলবে না।
এ বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তারা সর্বদাই
তীর্থযাত্রীদের সম্ভ্রব বাঁচিয়ে লোকালয়
থেকে কিছুদূরে অথবা পাহাড়ের মাথার



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জীবনের
মাসুখ আনন্দে মেতে ওঠে অকৃত্রিম সৌন্দর্য
উপভোগ করবার ক্ষমতা।

আগ্নিনিও সারা ভাল রাখাও ক্ষমতা সাধনার
অন্যতম মনোযোগ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মাস্টারিক লসে
চার চামচ মাস্টারিক (৬ বৎসরের
পুষ্টিজনক) রাখেন। এতে রুগি দূর করে,
বিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, যদি কাশি
থেকে বেঁচেই থাকেন।

সামান্য মাস্টারিক ঢাকা



মাস্টারিক ড্রাগ স্টোর, কলকাতা।
মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।
মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।
মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।

মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।
মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।

মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।
মাস্টারিক স্টোর, কলকাতা।

সাম্প্রতিক বসন্তভী

ভাকবাংলো স্থাপনা করেছেন সর্বত্র।
উদ্দেশ্য বোধহয় পাছে স্থানাভাবে সাধারণ
লোক বিরক্ত করে। আরও মজার কথা
যদিও সরকারী আইন আছে যে পূর্বাঙ্কে
অনুমতিপত্র সংগে না রাখলেও যে কোনও
ডাকবাংলোতে নির্দিষ্ট মাংশুলে যে কেউ
থাকতে পারে, খালি থাকলে। একটিমাত্র
সত্তে যে সরকারী কাজে সফররত কর্মচারী
এলে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু উত্তরা-
খণ্ডের ডাকবাংলোর চৌকীদার পারমিট
ছাড়া কথা বলাও প্ররোজন বোধ করে না।
নানাসূত্রে খোঁজ করে জেনেছি যে এইসব
এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা চৌকী-
দারদের ওপরে কড়া আদেশ জারী করে
রেখেছেন। বিনা পারমিটে প্রবেশ নিষেধ।
স্থান থাকুক আর নাই থাকুক। উদ্দেশ্য,
হঠাৎ যদি কোনও V. I. P. কেউ এদিকে
এসে পড়েন! এবং সিজন্ সময়ে লেখা-
লেখি করে পারমিট সংগ্রহ করাও অত্যন্ত
দুঃসাধ্য। প্রথমত চিঠির জবাবই পাওয়া
যায় না। প্রধান কার্যালয়ে সশরীরে ধর্না
দিলে পরিষ্কার মিথ্যা কথা শুনতে হয়—
স্থান খালি নেই। পূর্বাঙ্কে রিজার্ভ হয়ে
আছে। অথচ পরীক্ষা করলে অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই দেখা যায় খালি রয়েছে। তবে এর
হাতিভ্রমও আছে। সহদয় বিবেচক অফি-

সারও গিয়েছেন যদিও সাহায্য পাওয়া
যায় নানাভাবে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় যমুনা চটীতে
হাজির হলাম ভিজতে ভিজতে। ধর্মশালার
দোকানে একটা ঘরও মিললো। সামনের
দোকানে জুটল ভাত আর আলুর সবজী।
চাদর মর্দি দিয়ে শুষে পড়ি। ঝির ঝিরে
বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়ার আরামে চোখ
বুজে এলো নিমেষে.....

* * *

১১

৩০শে জুন—

যমুনার তীরে যমুনা চটী। ভোরের
শীতে আপনি ধূম ভাঙে। এ জায়গার
উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। রাতে বৃষ্টি
হওয়ার বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ এখনও
কাটে নি। ধর্মশালার অদূরে নদীগর্ভ।
তীরে অজস্র পাথরের ঢেলা। সাদা চুণা-
পাথরের বোল্ডার (boulder) নানা
আকৃতির। জলের বেগ বেশ তীব্র। বড়
বড় পাথরের ফাঁকে জল কিছু স্থির। ঘটি
ডুবিরে তুষারশীতল জলে স্নানরত
সকলে। বাতীরা সবাই ব্যস্ত। এগিয়ে
চলার সময়ক্ষেপ এ পথে হয়রানি বাড়ায়।
বেলা বাড়লে প্রথর সূর্যের তাপে চলতে

কষ্ট হবে। পাহাড়ের গারে আটকে থাকা
মেঘগুলো গরমে ওপরে উঠে বৃষ্টি
নামায় সাধারণত বিকেলের দিকে। কাজেই
নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে পৌঁছতে হলে সকালে
যথাসম্ভব আগেভাগে বেরনই ভালো।
এ বিষয়ে আমার অভ্যাস সম্পূর্ণ বিপ-
রীত। আলসেমি ভেঙে ধীরে সুস্থে
পথে নামতে বেশ দেরি হয়ে যায়। কোনও
জায়গা ভাল লাগলেই বসে পড়ি। এমন
সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাল করে উপভোগ
করতে করতে সময়ের হিসেব থাকে না।
ফলে সারাদিন খাওয়া দাওয়াটা হয়
অত্যন্ত অনিয়মিত এবং সংকল্প। আর
দিনের শেষভালে যত তাড়াহুড়ো। বাতীরা
সাধারণত ভোর ছটির যাত্রা শুরুর
দশটা নাগাদ কোনও স্থানে আহারাদির
জন্য ২।৪ ঘণ্টা বিশ্রাম করে। আমার
নিয়ম উল্টো। সকালে ভারি প্রাতরাশ।
এবং চলবার সময় চা আর যদি মেলে
পোয়াটাক গরম দুধ। সন্ধ্যায় আশ্রয়
মিললে তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা। সেটাও
পরমুখাপেক্ষী। অর্থাৎ স্থানীয় চায়ের
দোকানে ভাত; রুটি যা জোটে। দীনহীন
এই পাহাড়ী অঞ্চলে স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও
ব্যবস্থা নেই। দরিদ্র দোকানগুলিতে
অপরিষ্কার খাওয়ার ব্যবস্থা আর



উপকরণ: মাছ, মাংস, ডিম্ব দ্বারা থাকুক অধিকাংশ স্থানে সামান্য একটু ডালও মেলে না। অথবা ভাত অথবা মোটা মোটা হাতেগড়া রুটি আর আমুর মদ্যজী। তরকারী মানে ম্বাদ-গম্বাহীন একবাটি কোলের মধ্যে কয়েক টুকরো আলু। অন্যান্য ভীষণের তুলনায় যমুনো-টার পথে যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ নিজ আহাৰ্য সঙ্গে রাখেন। অতএব আমার মতো দু-চারজন হতভাগ্যের প্রাপ্যন্ত পরিচ্ছদ। খালি পেটে পাহাড় চলা যায় না। বেশি খেলে পেট খারাপ হবার সম্ভাবনা। একবার আমাশায় ধরলে আর ক্ষমা নেই। সমতলে না নামলে রোগ সারবে না। এবং অতি দ্রুত শরীর দুর্বল করে দেবে। ইরাত বাজা অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যেতে হবে। দেবলোকে যতে হাশামা অনেক।

যমুনা চটীতে ধর্মশালার আশেপাশে দু-চারটে দোকান। সেগুলো ছাড়িয়ে এক ফাল্গুন দূরে কাঠের সেতু। তার পরেই প্রচণ্ড চড়াই শুরু। নদীর ওপর দিয়ে মোটরগাড়ি চলাচলের চওড়া সড়ক তৈরি হচ্ছে। সম্ভবত দু-এক বছরের মধ্যেই পথ প্রস্তুত হবে। ঘন ঘন ডিনামাইটের শব্দে পাহাড়-জঙ্গল কেঁপে ওঠে। পাথর কাটিয়ে পথ বের হবে। গাড়ি আসবে। ট্রিক্সম্ব বাড়বে। সমতলের কৃষ্টি বিশালকার্য অঙ্গারের মতো এগিয়ে আসছে। দীর্ঘ পথে ধীরে মন্থর পায়ে চলার বদলে ভীষণগতিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হবে। পথের ধারে দীনদারিত চটীগুলো উঠে যাবে। কদরিয়ে বাবে ত্যাগের মহিমা। এ যুগে সময়ের দাম যে অনেক।

একটা মন্ত চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে উঠে কোপের ধারে ছায়ার শূন্যে শড়ি টান হয়ে। মনে হয় বৃষ্টি আজকের মধ্যে এইখানেই জমি নিতে হবে। কাঁধের কুলিটার স্ট্যাপেবাধা হাত দুটো ফলে উঠেছে। বাড়ির কাছে শিরায় টান করেছে। আর পা দুখানার অবস্থা সঙ্গীন। পাহাড়ে নতুন সড়ক বানানোর জন্যে পুরনো পথ কিছুটা ঘুরিয়ে দেও-রার ফলে পাকদণ্ডী দিয়ে খাড়া পথে ওঠা-নামার পরিমাণও বেড়েছে। জলের ফ্লাকস্টো খালি। আজকের মতো পড়ে আছি নিজ পথের পাশে। কপালে নরম হাতের ছৌওয়া পোকে চোখ মেলে তাকাই। সেই মৃৎচেনা রাজস্থানী মেয়েটি। আমার মথের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একটু জল চাইতে চপল পারে সে জল নিয়ে আসে কাছেই কোনও বরণ থেকে। আমার উত্তে ভারণ করে মথের কাছে ঘটিটা ধরে লম্বা। জলটুকু খেয়ে প্রাণ ফিরে পাই। শরীরের ভেতরটা যেন শুকিয়ে গিয়েছিল।

মৃৎচেনা জলের হাত বুলিয়ে মো মেয়েটি। অপ্রস্তুতের মতো শুনলো মৃৎ হালি আনতে চেষ্টা করি। বড় বড় চোখ দুটি মেলে সে আমার দিকে তেরে আছে। কদিন আগে মোটরবাসে সারা পথ বসি করতে করতে আসছিলাম। নিজের কায়গাটা ছেড়ে দিয়ে তাকে একটু সাহায্য করতে করেছিলাম। সামান্য সৌজন্যের প্রতিদানে আজ সে আমার গ্রামকর্তী। মৃৎ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে হাঁটিতে পারবো কি না। অবসর নেহে ধীরে ধীরে উঠে তার সঙ্গে চলতে শুরু করি। চলতে চলতে শূনি মা-বাগ মরা মেয়েটি দিদিমার কাছে মানুষ। বড়িকে নিয়ে ভীষণে চলেছে। ওদের দলটি কিছু এগিয়ে গেছে। জলের সম্মানে ঘুরেছিল মেয়েটি। আমার বেহুস হয়ে পড়ে থাকতে দেখে কাছে আসে। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আমার জিজ্ঞেস করে, একা চলছি, আমার বড়ি কেউ

নেই এ দুনিয়ায়। কি করে বোঝাবো এই সজল গ্রাম মেয়েটিকে, সঙ্গীহীন চিত্তের ভগ্নত মন আমার ছুটে বেড়ার হিমালয়ের শিখরে-শিখরে। আমার থবর কে রাখবে সংসারে?

পথের ধারে গাছের ডালে ধরে আছে অজস্র খোবানী। পাহাড়ীরা বলে চুড়া। একখোকা হলুদ রঙের পাখা চুড়া পেড়ে আনে মেয়েটি। আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় নিচশব্দে। কি করে ও জানলো আমার প্রচণ্ড ক্ষিপে পোয়েছে।

গ্রামের নাম তিরখালী। পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো কুলের আর কুলের বাগানে থেরা গুটিকয়েক কাঠের বাড়ি। এ অঞ্চলের সব বাড়ি-ঘরই কাঠের তৈরি। জঙ্গলে অক্লান্ত কাঠ। শীতপ্রধান পাহাড়ী অঞ্চলে অসামান্যক এবং সুবিধা-জনক। মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। যমুনা চটী থেকে প্রায় চার মাইল এসে প্রচণ্ড

চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য
ফিরে পেতে হলে

কৈয়ো-

কার্পিন

ব্যবহার করুন

কৈয়ো-কার্পিন

একটি হিমিট ফ্রেন্ড

কৈয়ো-কার্পিন ডেসট্রাক্টাইট চট্টে বহু-
জরত এতে ফুল এমন ভাবে বসে যায় যে সাধারণত
এলোমেলো হয়না, এর গন্ধটিও মনোরম।
কৈয়ো-কার্পিনে চুলের গোড়া শক্ত হয়
আর চুলও ভাল থাকে।



বেশ মেজাজের হোক
এইসবটো মিঃ
কলিকাতা-বোম্বাই-মিল্লী
মাদ্রাস-পাটনা-গোহাটি
কটক-ভরপুর-কানপুর
আবালী-সেকেন্দ্রাবাদ
ইশোব



তিরখালী গ্রাম—হন্দুনোদীর পথে

কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে হন্দুনা পার হয়েছি। নদীগর্ভ পথ থেকে অনেকটা নিচে। পার হয়েই আবার খাড়া চড়াই। একটা নিম্বাস ফেলে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। থামতে হলো পিছন ডাকে। 'স্বাধেয়'। হুঁপাড়ির ভেতর থেকে বৈরাগী ডাকে। চায়ের গেলাস হাতে শূনি বাংলার প্রাণের গান। একতারা বাজিয়ে জুমিস্ট কণ্ঠে গান ধরে তারা—

‘এই হন্দুনাই তীরে,

মুরলী বাজাতো শ্যাম রাধা রাধা
বোলে।’

গাইতে গাইতে ভাবাবেশে বৈরাগীর চোখে নামে ধারা। অবাধ হয়ে চেয়ে থাকে পাহাড়ী দোকানদারের মেয়েটা। লাল টুকটুকে মুখখানির ওপরে কালো চাখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

তিরখালী গ্রামে অনেক গাছে পাকা চুরী ধরে আছে। গাছগুলো আমাদের দেশের আমড়া গাছের আকৃতি। পাতা অনেকটা জবাফুল গাছের মতো। পত্র-বিরল ডালে থোকায় থোকায় অজস্র ফল। চড়াই শেষে পেটও খালি। অতএব করেকটা পাকা ফল কুড়িয়ে গাছভল্লায় হাসি। পর্বতের উচ্চভূমিতে মনোরম শীতল বিরুঝিরে বাতাসে ক্লান্তি দূর হয়। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘিরে ধরে। পাহাড়ের জল-হাওয়ার সূত্রী চেহারার শিশুদের রূপ যেন ফেটে পড়ছে। হৃদয় হয়ে ওদের দেখি। মাটি থেকে কুড়িয়ে ফল খেতে ওরা আমার নিষেধ করে। বলে, জাটিতে পশুদের বিষ্ঠা থাকে। নোংরা ফল খেলে অসুখ করবে।

কদলি কাঁধে নিয়ে উঠে পড়ি। আরও অনেক পথ বাকী। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাগান আর ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছি। এ অঞ্চলে মেয়েরাই ক্ষেতের আর সংসারের সব কাজ করে। জঙ্গল থেকে প্রকান্ড কাঠ অথবা ঘাসের বোকা পিঠে নিয়ে চলেছে মেয়েরা। পুরুষদের কোনও পরিশ্রমের কাজ দেখি না। সে সময়টা দোকানে চটীতে আড্ডা দিয়ে আলসেমিতে বেশ কাটায় ওরা। ধরে দ্রোপদীর মতো পাঁচ ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তারপর গরু, ছাগল, মানুষ আর ক্ষেত-খামারের যাবতীয় কাজ সেই মেয়েটার কাঁধে চাপিয়ে দেয়। বিরক্তির চিহ্ন তবু দেখি না মেয়েদের মুখে। বেশ আছে ওরা।

শুধুই চড়াই। পা দু'খানা যেন আর চলে না। যন্ত্রণার হাঁটু টনটন করে। নাইলনের ঝোলাটার স্ট্র্যাপ কাঁধের ওপরে কেটে বসেছে। বা-হাতটা অসম্ভব ফুলেছে। বেলা প্রায় দু'টোর সময় 'সানা' চটীতে হাজির হলাম। অবসন্ন দেহে কোনওরকমে একটা দোকানে ঢুকে বসে-পাড়ি কাঠের বেঞ্চিতে। দোকানী দেয় মোটা মোটা দু'খানা আধপোড়া আর আধ কাটা ভুট্টার রুটি। সঙ্গে আনা আমসত্ত্ব দিয়ে পরম উৎসাহে চিবুতে থাকি। এখন বাঘের ধান খাওয়ার মতো অবস্থা। ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি আর নেই। ফলাফল সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নির্বিকার, নিরুদ্বেগ। সাংখ্যযোগের ভাষায় '...স্থিতীযীঃ হৃদনিরুচ্যতে'।

‘সানা’ থেকে পথ যেন কিছুটা

উদ্বুদ্ধ। সামান্য চড়াই নদীর বাঁদিক ধরে। ওপারে নতুন পথের কাজ চলেছে। ডিনা-মাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানোর শব্দ মাঝে মাঝে শূনি। চারিপাশের পর্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনি হয় গদ্‌ম্‌ গদ্‌ম্‌ করে। আরও প্রায় দু' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হন্দুমান গঙ্গার সেতু পার হই সন্তপণে। জীর্ণ কাঠের পুরনো সেতু। কত শত যাত্রীদের পারাপার করেছে কতকাল ধরে। ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। কংক্রিট আর লোহার সেতু তৈরি হচ্ছে। পারাপার হবে যাত্রীবোঝাই মোটরগাড়ি। ডিনলোপিলোর গদি আঁটা সিটে বসে টার্নিস্টরা জানক্য দিয়ে সিনারী দেখবেন আর বলবেন 'How beautiful'! দুরন্ত বেগবতী পাহাড়ী নদী পার হতে হবে না ভয়ে ভয়ে। 'মাগো পার করে দে' বলে দুর্গগন্য আর জপতে হবে না!

বেলা পাঁচটার হন্দুমান চটী। আমার ধর্মশালার নিরাপদ আগ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। আজকের নয় মাইল পথ বড়ই কণ্ঠে পার হয়েছি। কৃপা করে হিমালয় বৃষ্টিটুকু আর আনেন নি পথের মধ্যে। একটু শোবার যোগাড় করছি। একটি বৃক্ষ পাহাড়ী সঙ্কুচিত-ভাবে ধরে প্রবেশ করলেন। অতি বিনীত-ভাবে পেশ করলেন তাঁর ছেলোটো অত্যন্ত অসুস্থ। আমি কি একটু কণ্ঠ করে তাকে দেখবো? বৃথাই বৃক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমি ডাক্তার নই। প্রচারকার্যটি করে বুঝলুম না। অগত্যা নিজের শরীরের শত যন্ত্রণা নিয়ে উঠতে হলো। বৃক্ষের কাতর অসহায় মুখের দিকে চেয়ে মায়া হয়। যদি কোনও উপকার করতে পারি। যেতে যেতে শূনি বৃক্ষের ছেলে মরণাপন্ন। তার পেটে ফোঁড়া হয়েছে। কাছেই ওদের বাড়ি। অন্ধকার কাঠের ছোট ঘরখানিতে মলিন বিছানায় শূন্যে একটি যুবক! হাতুড়ে বিদ্যা আর আন্দাজে বুঝলুম দান্ত বৃক্ষ হয়ে পেট ফুলে উঠেছে। এখন কি? আমার সঙ্গে ওষুধ আছে আমাশয় আর পেটের অসুখের। Pergative-এর ব্যবস্থা তো সঙ্গে নেই। ঝোলা থেকে একমুঠো কিস্-মিস্ বের করে বৃক্ষের হাতে দিয়ে নির্দেশ দিই গরম দুধের সঙ্গে খেলে দান্ত হয়ে আরাম হবে। দুর্দুর্গম এই সব পাহাড় অঞ্চলে সম্প্রতি সরকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছেন। আমদুর্ভাগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত এইসব দাতব্য চিকিৎসালয়ে আছে অধিশিক্ষিত কম্পাউন্ডার প্রণবীর কর্মচারী। দুঃখ অনুভব করি। সেই সঙ্গে নিজের অক্ষমতাও বড় লাগে।

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কড় আসে, আবার কড় খেমেও যায়; কিন্তু রেখে যায় তার ক্ষতিচিহ্ন। মানুষের অন্তরে ও বাইরে। ঋড়ে বাইরে যে ক্ষতিচিহ্ন রেখে যায় তাতে দেখা যায়—গাছ-পালা ভেঙে পড়েছে, বাড়ি-ঘর উড়ে গিয়েছে, মানুষকেও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ফরিদপুর জেলার একটা ঋড়ের খবর একবার সংবাদপত্রে পড়েছিলেম যে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে ভুলেছিল। সেখানে তার মৃতদেহ ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। সেটা ছিল একটা প্রাকৃতিক ঋড়। রাজনৈতিক ঋড়ের ফলও দেখা গিয়েছে, একই রূপ হয়েছে। এই ঋড়ে কত যে বাড়ির উড়ে (পুড়ে) গিয়েছে, কত টাকার সম্পত্তি যে বিনষ্ট হয়েছে, কত মানুষ যে মরেছেন এবং কতজন যে এখার-ওখারে ছিটকে পড়েছেন, তার কোনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না—পাওয়া সম্ভবপর হয় নি। গতকাল রাতে (১৮-৯-৬৭) এই মূর্শিদাবাদ জেলার কামির এক বন্ধু—শ্রীগোবিন্দ ঘটক মহাশয়—কথাপ্রসঙ্গে ছিটকে-পড়া একটি ছেলের কথা বললেন। তিনি বললেন,—“বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। একদিন একটি ফুটফুটে সুন্দর চেহারার ৭/৮ বছরের ছেলে তাঁদের বাড়িতে এসে পড়ে এবং তার জীবনের করুণ কাহিনী বলে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করে। তারা ছিল পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের বাসিন্দা। বেশ ভালভাবেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল। তার পরে একদিন সেখানে দেখা দেয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড। প্রাণের ভয়ে তাদের পরিবারের সকলেই পালিয়ে যান। কে-যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার বাবা-মা আজও বেঁচে আছেন কি না তা আর ছেলোটি জানে না। তার কথা শুনে গোবিন্দবাবুর দাদা ছেলোটিকে আশ্রয় তো দেনই, তিনি তাঁর ছেলোদের সাথে ডাকেও স্কুলে ভর্তি করে দেন। পঁচ-ছয় বছর কাল ছেলোটি তাঁদের বাড়িতে ছিল। ঋষ্ট বার্ষিক শ্রেনী পর্বন্ত স্কুলেও উঠেছিল। এই সময়ে তার বাবা-মা ছেলের খোঁজ করতে করতে কোথা থেকে কোঁজ পেয়ে একদিন তাঁদের বাড়িতে আসেন। বাপ-মাও

ছেলেকে দেখেই চেনেন এবং ছেলেও তাঁদের চেনে। এইভাবেই তাঁদের সুখের পুনর্মিলন হয় এবং ছেলেকে নিয়ে তার বাবা-মা চলে যান।” এটা তো হ'ল, একটা সুখের পুনর্মিলনের ঘটনা; কিন্তু পুনর্মিলন আর হয় নি, কোনও দিনই আর হবেও না, এমন আরও কত যে ঘটনা আছে তার খবর কে রাখে? হয়তো বা অনেক ছোট শিশু-গুণ্ডাদের হাতে পড়েছে। তাদের দিলে ভিক্ষা-ব্যবসা চালানোর জন্য গুণ্ডারা হয়তো তাদের হাত-পা ভেঙে চিরতরে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে, কত শিশু-হয়তো-চোখ উপড়ে ফেলে চিরদিনের জন্য অন্ধ-আতুর করে দিয়েছে, তার ঠিক কি? এই সবই ঋড়ের বাইরের চিহ্ন। দেশ বিভাগের ফলে দুই দেশেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই এইরূপ পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর থেকে আমি পূর্ববঙ্গে, তথা পূর্ব পাকিস্তানে দেখে এসেছি যে কখন দমকা হাওয়া, কখন বা ঝড়, কখন প্রবল ঝড়, কখনও বা ঘূর্ণিঝড় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর দিয়ে বমে গিয়েছে। ভারতেও যে কিছু কিছু না হয়েছে তা নয়। এই তো সোদিনে রাঁচিতে হয়ে গেল; তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সব রাজনৈতিক ঋড়ের উপসি ও তার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতের উপর দিয়ে যে ঝড় (দাঙ্গা) বয়ে যায়, তা করে একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাগরিক, এখানে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একেবারেই নেই, তা নয়—কিছু কিছু লোকের মধ্যে এখনও তা আছে তবে তাদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে; তবু যারা আছে—ভারতের জন-সংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা খুব কম হলেও তাদের অনিষ্ট করার বা ক্ষয়ক্ষতি করার শক্তি একেবারে লোপ পায় নি। তারা তা' আজও করতে পারে এবং করে; কিন্তু “সরকার” এদের কঠোর হাতে দমন করতে একটুও বিধা করেন না। ১৯৬৪ সালে কলকাতার দাঙ্গাতে এবং ১৯৬৭ সালে রাঁচির দাঙ্গায় তা' দেখা গিয়েছে। ভারতের “সরকার” সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীদের কঠোর হাতে দমন করেন ঠিকই; তবু

আমি বলতে চাই, দেশ স্বাধীন হওয়ার ২০ বছর পরেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে তাহলে তা' ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে গোরবের তো মোটেই নয় বরং, আমি মনে করি, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিপদেরই সূচনা করে। স্বাধীনতাও তাতে বিপর্য-হওয়ার স্বপেটই সম্ভাবনা আছে। পাকিস্তানে চৌদ্দ বছর থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি বলতে পারি—অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে পারি যে, যে সব লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইশ্বন বোলাবেন, তাঁরা ভারতের তো অমণ্ডল করবেনই, পাকিস্তানের হিন্দুদেরও মণ্ডল করবেন না। তাঁদেরও বিপন্ন করবেন। সাম্প্রতিক কালের রাঁচির দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে আমি এখানে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটা সাবধানবাণী বলতে চাই। ভারতে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান; পাকিস্তানের মহা পরিকল্পনারই কথাটা সকলে জেনে রাখবেন। সুতরাং অ-মুসলমানরা যদি মুসলমানের উপর আক্রমণকারী হন, তাহলে তাঁরা পাকিস্তানের মহা-পরিকল্পনার ফাঁদেই দেবেন। প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তান নিজেই তাঁদের চর দিয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবেন। সেই দিক থেকে বিচার করে, আমি ভারতের সরকার-পক্ষকেও হুঁশিয়ারী দিতে চাই। “সরকার” যেন সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত সতর্ক দৃষ্টি এই অবস্থার উপর রাখেন। সাম্প্রদায়িক অপরাধের মনোবৃত্তির সামান্যতম ফুটুর্শি দেখা দিতেই যেন তাকে কঠোর হাতে দমন করেন। এখানে অপবাধীর ধর্মো বিচার করে কঠোর বা কোমল হওয়া মোটেই উচিত নয় বলে আমি মনে করি। অপরাধী অপবাধী। সে হিন্দু, কি মুসলমান সে বিচার সম্পূর্ণ নিরর্থক। পাকিস্তানে থাকতে আমি দেখেছি যে দুই-একটি হিন্দু পুলিশ বা অন্য রকমের সরকারী কর্মচারী, এমন একটা মানসিক ব্যাধিতে (Complex) ভোগেন যে সেখানে মুসলমান অপরাধী হলে তার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভরসা পান না;

সং মুসলমান অফিসারগণ কিন্তু ঐরূপ মানসিক ব্যাধিতে ভোগেন না। এখানেও দেখছি, ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী জনাব মহম্মদ করিম চাগলা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে যা' বলার সাহস দেখিয়েছেন, সেই সাহস ভারতের প্রধানমন্ত্রীও দেখাতে পারেন নি। তাঁরা হিন্দু হওয়াতেই এবং ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হওয়াতেই বোধহয় নির্বাচনে ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরাও বোধহয় সেই একই মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। সরকার পক্ষ যদি ধর্মের বিচার না করে প্রথমেই অপরাধীর মতোপন্থা শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তাহলে অপর সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিজের হাতে শাস্তি বিধানের দায়িত্ব তুলে নিতে হয় না এবং তাতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমি এদিকে এসে এই মূর্খিদাবাদ জেলাতেই দেখেছি যে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য স্থানীয় পুলিশ হিন্দুকেও যেমন সময়ে সময়ে গ্রেপ্তার করেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করেছেন কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস পক্ষ থেকে মুসলমানের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মন্ত্রীদের কাছে তাম্বির কবেছেন। এই জেলায়ই একজন মুসলমান কংগ্রেস 'এম এল এ'-কে পুলিশ রাষ্ট্রবিরোধিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করার তাঁর সম্পর্কে কংগ্রেস পক্ষ থেকে বিশেষ তাম্বির করা হয়; কলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ফেঁসে যায়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের কিছু আগে সেই ভদ্রলোক যে পাকিস্তানে চলে যান, আজও বোধহয় আর ফেরেন নি; অস্তিত্ব আমি জানি যে বহুদিন পর্যন্ত তিনি ফেরেন নি। আজকে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা বলছেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকারেব আমলে পুলিশকে ক্ষমতাচ্যুত করে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের মনোবল ভাঙাব প্রথম দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারের ঘাড়ের পড়ে কি না, আমি সকলকে একবার নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করে দেখতে অনুরোধ জানাই। প্রথম একটি 'সবকার' যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেন, তাই বলেই যে সেই অজুহাতে পরবর্তী সবকারও সেই নীতিই অনুসরণ করে চলাবেন, তারও কোনও মানেই হয় না; সুতরাং কোন 'সরকার' ভাল কবেছেন, আর কোন 'সরকার' মন্দ কবেছেন, সে কথা এখানে আমি মোটেই তুলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে যখন যে 'সরকার'ই গতিতে থাকুন না কেন, তাঁরই নিরপেক্ষ মন নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি সত্যক দৃষ্টি রেখে চলা বিশেষ

দরকার, বিশেষত বর্তমানের বিস্ফোরণমুখী সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে।

এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি সর্বশেষে ভারতীয় মুসলমানগণের কাছেও একটি নিবেদন করতে চাই। পাকিস্তানকে বতাই একটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে জাহির করা হোক না কেন এবং সেই ইসলামী রাষ্ট্রের বর্তমান অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান সাহেব বতাই ধর্মের একঘের কথা বলে বন্দুকের জিগির তুলুন না কেন, ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয় না যে ধর্ম এক হওয়াতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় থাকে। ইউরোপের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একই খৃষ্টধর্ম থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ববিগ্রহ অতীতেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার আশঙ্কা আছে। মুসলমানের ইতিহাসেও সেই একই কথা বলতে হবে। ধর্মের উচ্চমার্গের মনোনিবেশেও রাজনীতিক স্বার্থকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে পারে নি। এমন কি, পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুব খান সাহেবও ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরেই তাঁর রাজনীতিক স্বার্থেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও বেলুচিস্তানের পাঠানদের উপর কী অমানুষিক নির্যাতন না করেছেন। ঐ পাঠানরাও কিন্তু শুধু মুসলমানই ছিলেন না, স্বয়ং আয়ুব খানের স্বগোত্রই ছিলেন। আয়ুব খান সাহেবও একজন পাঠান। পূর্বে পাকিস্তানের মুসলমান রাজনীতিক কর্মীদের উপরও তিনি কম দমনমূলক ব্যবস্থা দেন নি। আজও তার সাক্ষ্য পূর্বে পাকিস্তান জেলখানাগুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে। সুতরাং ধর্মের ভাঁওতা দিয়ে আয়ুব খান সাহেব বতাই উভয় দেশের মুসলমানের মধ্যে একঘের ও বন্ধুত্বের বুলি কপচান না কেন, আসলে কিন্তু তাঁর পেছনে আছে বিরাট একটা রাজনীতিক চাপ। তাঁর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিম্প্রির জনাই তিনি চান ভারতের কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে পূর্বে সীমান্তের আসাম পর্যন্ত ভারতের সর্বত্রই একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাক। সেই দাঙ্গায় ২।৪ লক্ষ মুসলমান মলেও তিনি অস্তরে কোনও বাধা অনুভব করবেন বলে আমি মনে করি না; তবে সেই অবস্থা ঘটলে, তিনি হাপস-নয়নে কেঁপে বিশ্বের দরবারে এবং বিশ্ববাসীর কাছে ভারতে মুসলমানদের উপর কী অত্যাচার হচ্ছে তা বলে তাঁর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিম্প্রির পথে এক পা এগুতে পারবেন। সুতরাং মুসলমান নাগরিকদের কাছেও আমি নিবেদন করতে চাই যে তাঁরা যেন পাকিস্তানের প্রচারে বিভ্রান্ত না হন।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়েই ভারত সরকারের ও ভারতীয় নাগরিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এত কথা বললুম। এইবার আমরা একবার পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখি। সেখানে কী হচ্ছে? আমি দেখেছি সেখানে বত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হয়েছে, তার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উচ্চাঙ্গ ও সাহায্য করেছেন, সেখানকার "সরকার"ই। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরতের পবিত্র কেশ হারানো উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সাহেব স্বয়ংই ইংগিত করলেন যে ঐ দুস্কারের নায়ক হলেন হিন্দুরাই! আব আমনি তাঁরই একজন মন্ত্রী জনাব সবুর খান যশোর ও খুলনায় দাঙ্গা শুরু করিয়ে দিলেন এবং সেই দাঙ্গাই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়লো ঢাকার ও সারা পূর্বে পাকিস্তানে। বৃটিশ আমলেও দেখেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমি তৈরি করার জন্য ঢাকার পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ২।৩ দিন যাবৎ বেশ জোরেই চলছে। তার পরে একদিন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন মহান্না-সরদার-গণকে ডেকে বলেন,—"বাস, বন্দ করো।" আর সাথে সাথেই দাঙ্গা বন্ধও হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার পাকিস্তানের পটভূমি সৃষ্টি করতে যে নীতি, যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও পাক-সরকার সেই নীতিরই অনুসরণ করে চলেছেন। তাই আজও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হয় নি। সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের জন্যই দেশ বিভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যায়, তাঁরা তত্ত্ব-তেলের কড়াই থেকে একেবারে আগুনে পড়েছেন (from frying pan to fire)। দেশ বিভাগের আগেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতায় কবে ভিত্তারী বশে অন্যায় যাওয়ার কথা কেউ তো তখন কল্পনাও করেন নি। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

এই যে অবস্থা আজ দেখতে পাই, তা' সবই হ'ল আগে যে কুডেব কথা বলেছি, সেই ঝড়ের পরে রেখে-যাওয়া বাইরের ক্ষতচিহ্ন। এই ক্ষতচিহ্নেরও কিছু কিছু সময়ে ক্রমশ মিলিবে যেতে থাকে। ভাঙা ঘর আগলে যাঁবা পড়েই থাকেন, তাঁরা ভাঙা ঘরও আবার খাড়া করেন; কিন্তু ঝড়ে (দাঙ্গায়) বিধ্বস্ত মানুষের মনে যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়, তা' তো সহসা মুছে যায় না। মনের মধ্যে তুর্কের আগুনের মত তা' অনেক কাল পর্যন্তই যিকিঞ্চি জ্বলতে থাকে। ঐ

আপনাদের ফলকি বন্ধু নিয়ে যারা দেশ-
ত্যাগ করেন—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে
এক দেশ থেকে অন্য দেশে যান, তাঁদেরই
মনের আগনের ফলকিই একদিন তাঁদের
বাওয়া নতুন দেশেও আগুন জ্বালিয়ে
তুলতে পারে। ভারতের কোনও কোণেও
জ্বলন্ত এই অবস্থাকে রোধ করার জন্য
বাস্তুত্যাগীদের মূখের উপর সীমান্তের
দরজা বন্ধ করে দেন। সম্প্রতি আসাম
সরকার দিয়েছেন। সীমান্তের দরজা
বন্ধ করে দেওয়াটা সমস্যার কোন সমাধানই
নয়; বরং আমি মনে করি পরিস্থিতিতে
আরও বিক্ষোভের মূখ্য কবে তোলা হয়।
এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হচ্ছে,
কর্তৃপক্ষমহলের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে
একটা সুবন্দোবস্ত করা। ভারত সরকার
অর্থ খরচ করেছেন ঠিকই, তা' পুরোপুরি
সফল হয় নি, দরদী মনেন অভাবে। এই
দিক দিয়ে বিচার করে পশ্চিমবঙ্গের
মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের এবং
তার সরকারের মুখ্যসচিব প্রমথের
শ্রীসুধাকুমার সেন, (আই সি এস) মহাশয়ের
সংবেদনশীল মনের ও গঠনমূলক কাজের
আমরা পরিচয় পাই। তাঁদেরই উদ্যোগে
ভারত সরকারেরই অর্থে পশ্চিমবঙ্গের
চিফসেক্রেটারি ও দুর্গাপুরে দুইটি বড় কার-
খানা স্থাপিত হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার যুবকদের ও
বাস্তুত্যাগীদেরও অনেকের কাজের সংস্থান
ভারী করেছিলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় এই
মুর্শিদাবাদ জেলায়ও মণীন্দ্র মিলসের
(কাপড়ের কল) কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্র থেকে
করক লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা
করে দিয়ে এ মিলসের সাথেই নতুন একটা
সূতা কল (বেংগল টেক্সটাইল মিলস)
করার ব্যবস্থা করে দেন। সত্য ছিল,
বাস্তুত্যাগীদের কাজে লাগাতে হবে। কাজে
লাগানও হয়েছিল কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য
ও বাস্তুত্যাগীদেরও চরম দুর্ভাগ্য যে
বাংলার এ দুই পুরবাসিহই আজ
পরলোকগত। তাঁদের তিরোধানের পর,
পশ্চিম বাংলায় দারিদ্র্যভার তাদের হাতে
আসে। তারা কেন্দ্রের উপর প্রভাব এমন
কিছু খাটাতে পারেন নি যে যাতে অনিচ্ছুক
কেন্দ্রকে কাজে লাগান যায়; ফলে দীর্ঘ-
কাল ধরে মণীন্দ্র মিলস বন্ধ হয়ে আছে।
বি টি মিলসও বন্ধ হয়েছিল। প্রায়
৭।৮ শত বাস্তুত্যাগী কর্মচারী হয়ে
আবার বেকার হয়ে পড়েছে। শ্রীঅমল
স্বায় এম এল এ এইজন্যে তিন
সপ্তাহ কাল অনশন করে ছিলেন।
শ্রীতিলক চৌধুরী এম পিও অনেক চেষ্টা
করাছেন কিন্তু মণীন্দ্র মিলস আর চাল
হয় নি : ফলে কর্মচারী বাস্তুত্যাগীদের
অনেকেই ব্যবসা হয়েছে, চালের চোরা-
কারবার। বাস্তুত্যাগীর জীবনরক্ষার

ভাগিদেই বাড়ি-ঘর-দেশ ছেড়ে অনির্দিষ্টের
পথে একদিন পা বাড়িয়েছিলেন, আবার
আজ তাঁদেরই সেই জীবনরক্ষার ভাগিদেই
সমাজবিরোধী কাজও করতে হচ্ছে। দেশ-
প্রেমের দিক দিয়ে এ'দেরও দেশপ্রেম
একদিন এদিকের কারো চেয়ে কম ছিল
না। এটাই কি অদৃষ্টলিপি, না, নেতাদেরই
ঔদাসীন্য ও দরদহীনতার ফল! ভারত
সরকার বাস্তুত্যাগীদের জন্য পরিকল্পনা
অনেকই করেছেন, সরকারের টাকা খরচও
কম হয় নি কিন্তু সে সব টাকার অধিকাংশই
“বারফুতে” খেয়েছে; কাজ বিশেষ কিছুই
হয় নি। ‘সরকার’ বিরাট দণ্ডকারখানা-
পরিকল্পনা করে কাজও আরম্ভ করে-
ছিলেন। অনেক বাস্তুত্যাগীদের সেখানে
নিরেও গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের হাতে এ
পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার ছিল, তাঁদের
দারিদ্র্যহীনতার ও হুসরহীনতার জন্য সে
পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠতে
পারে নি। বাস্তুত্যাগীদের অনেকেই
সেখানে থেকে ফিরে আসতে আরম্ভ করে-
ছিলেন। সেই অবস্থার বাংলার একজন
স্ববসরপ্রাপ্ত ‘আই সি এস’ অফিসার—
প্রমথের শ্রীশৈবাল গুপ্ত মহাশয়কে দণ্ডকারখানা
পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য
সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীযুত গুপ্ত
মহাশয়ের নির্ভীক স্বাধীনচেতা বিচারক
হিসাবে ইংরাজ আমলেও সারা দেশে
যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি গিয়ে-
ছিলেন; অত্যন্ত দরদভরা মন নিয়েই
গিয়েছিলেন। শুনছি, তিনি যথেষ্ট আন্ত-
রিকতার সাথেই কাজও আরম্ভ
করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও একজন সমাজ-
সেবিকা। শুনছি, তিনি ও শ্রীগুপ্ত
মহাশয় বাস্তুত্যাগীদের কুটিরে কুটিরে
হুয়ে তাঁদের নিজীব দেহে আবার প্রাণের
এবং আশাহত মনে আবার নতুন আশার
সঞ্চার করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা
আবার নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে সাহসে
যুক বেঁধে কাজে মন দিতে আরম্ভ করে-
ছিলেন কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা ছিল,
তা' জানি না; তবে অবস্থা দেখে মনে
হয় একদল কর্তৃস্থানীয় মানবের বোধহয়
সেটা ইচ্ছা ছিল না। সং নার্যনিষ্ঠ ও
নির্ভীক কর্মচারী শৈবালবাবুর কাজ
তাঁদের পছন্দ হ'ল না। শৈবালবাবু সব
অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষকে জানান যে কিভাবে
কত টাকা কে বা কারা অপচয় অথবা
অপব্যবহার করেছেন। এই নিয়েই তাঁর
সাথে কর্তৃপক্ষের অববিনবনাও হয় এবং
তিনি আর এ সব চ্যুতি ও দুর্নীতিপূর্ণ
শাসনব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতে চান না।
তিনি কাজ ছেড়ে চলে আসেন। বাস্তু-
ত্যাগীদের সমস্যা আবার আগেও যেমন
ছিল, তেমনই অবস্থার ফিরে যায়। ভারত
সরকার আবার নতুনভাবে কাজ আরম্ভ

করেছেন বলে শুনছি। দেখা যাক,
এবারে কতদূর কী হয়। কর্তৃপক্ষের মধ্যে
সংবেদনশীল মন দেখা না দিলে, বিশেষ
কিছু হবে বলে আমি আশা করতে পারি
না। বাই হোক ভারত সরকার বাস্তুত্যাগী-
দের পুনর্বাসনের একটা চেষ্টা সরকারী
অর্থব্যয় করেই এখানে চালিয়ে আসছেন।
কিন্তু পাকিস্তান? পাকিস্তান ভারত
থেকে সে দেশে যাওয়া বাস্তুত্যাগীদের
সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করেছেন? বিশেষ
কিছুই—বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে আগত
বাস্তুত্যাগীদের জন্য করেছেন বলে আমি
জানি না ও দেখি নি। তাঁরা অবশ্য
বাস্তুত্যাগীদের উপলক্ষ করে দেশ
বিভাগের কিছুকাল পর থেকেই বাস্তু-
ত্যাগীদের জন্য একটা ‘ট্যাক্স’ আদায় করে
চলেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ট্রেনে, বাসে
যেখানেই কেউ যাবেন, তাঁকেই তাঁর টিকেট
কাটার সাথে সাথেই ‘রিফার্ডি-ট্যাক্স’-ও
দিতে হবে। এইভাবে আদায়ীকৃত ট্যাক্সের
পরিমাণও কয়েক শো কোটি টাকাই হবে।
সঠিক কত জানি না; কারন, এ ‘ট্যাক্স’
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। কিন্তু পূর্ব
পাকিস্তানে আগত বাস্তুত্যাগীদের ভাগ্য
তার ছিটেফোঁটাও পড়ে নি। জেলায়
জেলায় কর্তৃস্থানীয় বাস্তবায়ন অফিসি-
নির্দেশে তাঁদের দেখিয়ে দিচ্ছেন;
হিন্দুদের বাড়িঘর, হিন্দুদের জোত-জমা
এবং পরোক্ষ জানিয়েছেন,—তোমরা
তোমাদের অভাব নিজেদের চেষ্টাতেই (!)
পূরণ করে নাও। আমরা নীরব আছি,
নীরবই থাকবো। তারই ফলে পূর্ব
পাকিস্তানে কখন দেখা দিচ্ছে বড়ো
দমকা হাওয়া, কখন ঝড়, কখনও প্রবল
ঝড়, আবার কখনও বা ঘূর্ণি ঝড়।
১৯৫০ সালে এইভাবেই দেখা দেয় পূর্ব
পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবনে এক
ঘূর্ণি ঝড়। সেই ঘূর্ণিঘর জের কাটিয়ে
উঠতে না উঠতেই পূর্ব পাকিস্তান সরকার
১৯৫২ সালেই আবার ভাষা-আন্দোলনকে
উপলক্ষ করেই এ সালেরই অক্টোবর
মাসেই প্যাসপোর্ট প্রথা চালু করে সংখ্যা-
লঘু সম্প্রদায়ের মনে তোলেন, আবার এক
প্রবল ঝড়! এমনিভাবেই ১৯৫২ সাল
কেটে যায়। দেখা দেয় ১৯৫৩ সাল।
১৯৫৩ সালের বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা
হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের
তোড়জোড়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ
বিভক্ত হবে দুইটি রাষ্ট্র হয়েছে। ব্রিটিশ-
ভারতের শেষ সাধারণ নির্বাচন হয়
১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তার
পরে ভাবভেব সংবিধান তৈরি হওয়ার পরে
১৯৫২ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে
‘প্রজাতন্ত্র ভারতের’ প্রথম সাধারণ নির্বাচন
হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান
তখনও তৈরি শেষ হয় নি; তাই ১৯৫৪

সালের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত 'এসেম্বলি-কেই' টানেতে টানেতে এতদূরও আনা হইবে। আরও টানেতে গেলে দেশে ও বিদেশে বিরুদ্ধা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে; তাই নূরুল আমিন সাহেবের সরকার ঠিক করলেন; ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শেষ করতে হবে। অমনি মুসলিম লীগের ভাঙা টোল—“আজাদ” পত্রিকার কাঠি পড়লো। বেজে উঠলো নির্বাচনের রাজনী। “আজাদ” পত্রিকা ২২ টি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে ফেললেন, যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করে। তখন তাঁরা ভেবেছিলেন ‘কে’ হিন্দুদের তাহলে খুব বে-কারদার ফেলা হবে। মুসলমান সংখ্যাধিকার ভোটে হিন্দুকে উইনিং নির্বাচিত হতেই পাবেন না। যুক্তির দিক দিয়ে যে এই ধারণার মধ্যে সত্য ছিল না, তা বলা যায় না; বরং তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য ছিল। আমরাও তা জানতাম। তা সত্ত্বেও আমরা কয়েক বর্ষই কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে ঠিক করি যে, তবুও আমরা যৌথ নির্বাচনই দাবি করবো। নির্বাচনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবগুলো দলের মধ্যেই একটা নতুনভাবে ভাঙা-গড়ার মনোভাব দেখা দেয়। সরকারী দল, মুসলিম লীগের ও বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। ধীরেন্দ্র বাবু পাকিস্তানের সংবিধান গঠনকারী সংসদের সদস্য ছিলেন। তিনি করাচিতে সীমান্তগামী খান আব্দুল গফুর খান সাহেবের সাথে ‘কংগ্রেস’ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দেশ বিভাগের আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ‘কংগ্রেস’ই ছিল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং মস্তিষ্ক ছিল। কংগ্রেসেরই হাতে দেশ বিভাগের পরে গফুর খান সাহেব ঠিক করেন যে ‘কংগ্রেস’ গাম্ভীর্যবান আদর্শ ঠিক। যেখান থেকে তিনি দলের নাম পরিবর্তন করেন। তিনি করলেনও তাই তাঁর দলের নাম রাখলেন—‘পিপলস’ পার্টি

(People's Party); ধীরেন্দ্র বাবু কাছে সব কথা শুনলেন; প্রশ্নের শ্রীহারান ঘোষণাধরী (বর্তমানে পবলোকগত); আমি ও ধীরেন্দ্র বাবু সাবাস্ত করি যে, আমরাও ‘কংগ্রেস’ নামের মোহ ত্যাগ করে কংগ্রেসের সেবা ও ত্যাগের আদর্শকে অর্কিত রেখে খান সাহেবের ‘পিপলস’ পার্টির বাংলা ভাষায় দলের নাম রাখবো—‘গণসমিতি’। কংগ্রেসের অন্যান্য বর্ষদের কাছে আমাদের প্রস্তাব দিই কিন্তু তাঁরা ‘কংগ্রেস’ নাম ত্যাগ করতে রাজী হন না। আমাদের যুক্তি ছিল যে, নূরুল আমিন সাহেবের বেরূপ মত প্রকাশ করেছেন; তাতেও মুসলিম লীগ যৌথ নির্বাচন প্রমাণিত হইত; প্রবর্তন করবেন না, ‘আজাদ’ পত্রিকা যেতেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখুন না কেন। পৃথক নির্বাচন প্রথাই যদি চালু হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে ‘কংগ্রেস’ নামের মোহ ত্যাগ কবে আমাদের মনকে এমনভাবে গড়তে হবে যে যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যখন অসম্প্রদায়িক দল গড়ে উঠবে তখন তাঁদের সাথে যাতে সম্পর্কভাবে মিলে যেতে পারে; নচেৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে আমরা তো চিরকালই সংসদে ও বিধানসভায়ও সংখ্যালঘু দল হয়েই থাকবো। সে অবস্থায় আমাদের পক্ষে কখনও শাসন ক্ষমতা ও শাসন বহন দখল করা সম্ভবপব হবে না। সংখ্যালঘু দল থেকে আমরা না পাবো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও উপকার করতে; না পাবো সংখ্যাগুরু দলকে প্রভাবিত করে আমাদের অদর্শ বৃথা গণ্য করবে।

আমাদের এই যুক্তির নিরর্থকত্ব কালীন ‘পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস’ এর অর্থ (তখন শুধু) আমাদের দলের সম্পাদক বন্দু শ্রীমিনোরজনা ধবের সাথেও আমি আলোচনা করি। তিনি আমায় মন্তঃসমন করবেন না। তিনি বলেন; পৃথক নির্বাচনই যদি হয় তবে হিন্দুদের মধ্যে ‘কংগ্রেস’ নামের প্রভাব খুবই বেশি আছে এবং সেজন্য কংগ্রেস প্রাঙ্গণী হিসাবে আমরা যদি বদল দাঁড় করান তাহলে নির্বাচিত হবেন। আমি সে কথা মনে নিতে পারি না এবং বলি যে খান আব্দুল গফুর খান সাহেব ভোটে অল্প কংগ্রেসের সদস্যও নন; তাই সবে কি কেউ তাঁকে ‘কংগ্রেস’ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পাবেন? তিনি অতীতের আদর্শবাদী কংগ্রেস নেতা ছিলেন; এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমাদের সম্বন্ধে জনসাধারণ বেশ ভাল ভাবে জানেন যে আমরা কংগ্রেসেরই লোক। যে দলের নামেই আমরা দাঁড়াই না কেন, দেশের লোকও আমাদেরই কংগ্রেসী হিসাবে ভোট দেবেন। আমরা যুক্তি মেনে গণসমিতি গ্রহণ করতে পারলেন

না; সুতরাং আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

মুসলিম লীগের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। জনাব ফজলুল হক সাহেব আবার তাঁর কৃষক-প্রজা দল গড়েন। জনাব সুবাবদী ও মোলানা ভাসানি একত্রিত হয়ে ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ দল’ গঠন করেন এবং ঐ তিন প্রধান পবপবের মধ্যে আলোচনা-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন, যাতে তাঁদের দুই দল মিলে একটা ‘যুক্ত ফ্রন্ট’ দল গড়া যায়।

যখন আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল—ই তখন শ্রমের নেতা শ্রীকামিনী কুমার দত্ত মহাশয় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই প্রধান উদ্যোগী হয়ে কুমিল্লা শহরে একটা সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান কামিনী বাবু নির্বাচিত হন এবং তাঁর বন্ধু শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যথাকালে সম্মেলন হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ‘গণসমিতি’ জন্ম গ্রহণ কবে। কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁর প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ নতুন দল গঠনের খুব সুখ্যাতি করেন। অগ্নি-সেই সম্মেলনে যেতে পারি নি তবে আমার পূর্ণ সম্মতি ঐ দল গঠনে ছিল।

দল তো হল। এখন নির্বাচন প্রথা নিলে আবার সব হিন্দু বন্ধুদের সাথেই আলোচনা-আলোচনা চলল ‘কংগ্রেস’ ও ‘গণসমিতি’ যৌথ নির্বাচন প্রথা দাবি করেই তাঁদের দলের সভ্য প্রস্তাব পাশ করেন। সমস্যা দেখা দেয়; তদ্রূপী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে। তাঁদের একটা নিম্নবন্দন:—“সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন (Scheduled Caste Federation) নামে।” তাহা কিছুতেই যৌথ নির্বাচনে প্রস্তাব রাখাই হতে চান না। বাহাদুর ধীরেন্দ্র বাবু। তিনি তাঁর বন্ধুত্বের সাথে তাঁর আর্থিক ব্যবহার দিয়ে এবং কামিনী বাবু তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব দিয়ে বন্ধুদের মত অবশেষে পাশটোলেন। তাহাও তাঁদের দলের সভ্য যৌথ নির্বাচনই দাবি করলেন; ফলে: অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল সদস্যই যৌথ নির্বাচন দাবি করলেন। এইবার ‘আজাদ’ পত্রিকাও তাঁর সুর বদলালেন। আজাদে আবার হিন্দুদের গভীর ষড়যন্ত্রের কাহিনী কল্পনা করে নিয়ে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করা শুরু করলেন।

ধীরেন্দ্র বাবু যৌথ নির্বাচনের দাবিদার সদস্যদের দাবির ভিত্তিতেই নিয়ে করাচিতে ছুটলেন; গণপরিষদের সভায় যোগ দিতে। সেখানে গিয়ে তিনি অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল দলেরই যৌথ নির্বাচনের দাবি তুলে ধরেন কিন্তু

কিন্তু বঙ্গীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ২৫৫ টাকা কিন্তরদীতে টেলিটোন ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারটি ছোট সাইজের অভ্যন্তরীণ প্রস্টিক ক্যাবিনেটে ফিট করা। মূল্য ১৬৫ টাকা মাত্র। ২ বৎসরের জন্য গ্যারান্টি প্রদত্ত। আবেদন করুন:

Tokyo Television Co.,
(W. B. C.)
Post. Box 1307, Delhi-6

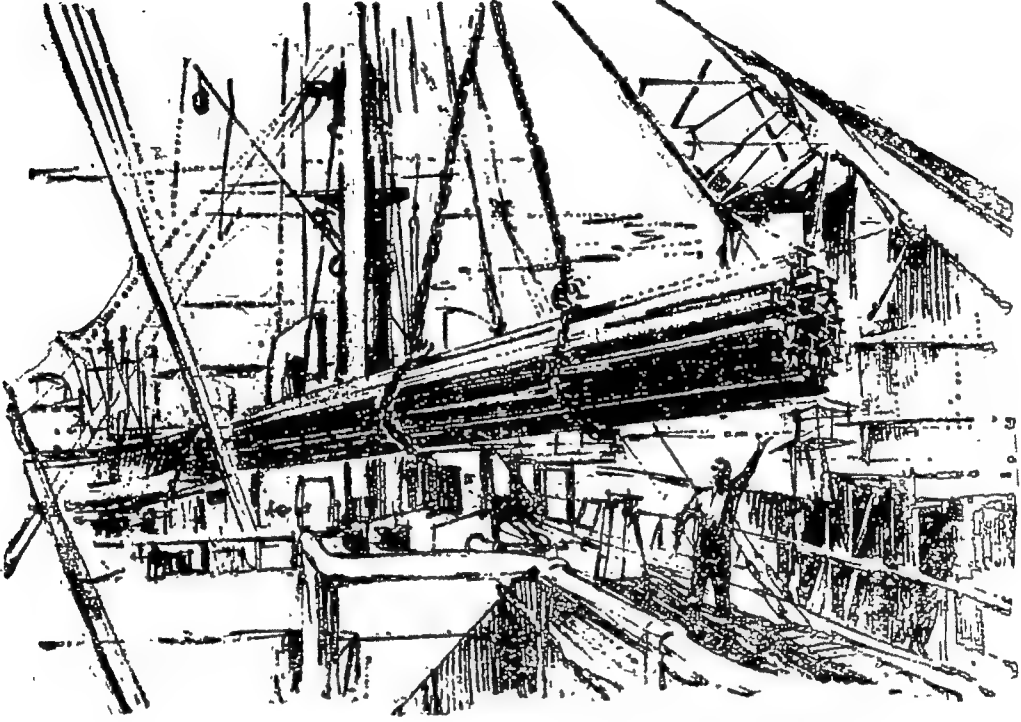
সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ভাব তাতে ভোলে না। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলিম লীগের দরদ উপলিয়ে ওঠে। তাঁরা ইংরাজ আমলের সংবিধানে যে অ-মুসলমান-বলে একটি-মাত্র বিভাগ ছিল তাকে ভেঙে তার মধ্যে (১) বর্ণ হিন্দু, (২) তপশিলী হিন্দু,

(৩) বৌদ্ধ ও (৪) খৃস্টান—এই চারটি ভাগ করে তাঁদের ন্যায়বিচারের (১) পরাক্রান্ত দেখালেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচকমণ্ডলী এইভাবেই পাকিস্তান-সংবিধান গঠন পরিষদ ঠিক করলেন। আদি মুসলিম লীগের কার্যকাল

এখানেই শেষ করছি। এর পরে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ও “বৃহৎ-ফ্রন্ট” সরকারের সম্পর্কে বলব। তখন থেকে চলবে “পাক-ভারতের রূপরেখা”-র দ্বিতীয় পর্ব।

[ব্রহ্মণ্য]



টাটা স্টীলের রপ্তানী বাড়ছে

জামশেদপুরে তৈরী অ্যাক্সেল ও চ্যানেল, বার ও স্ক্রয়েস্ট ইত্যাদি নানান ধরনের ইস্পাতের জিনিস আজকাল কোলকাতা থেকে নিয়মিত পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য ও পূর্বপ্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়ায় চালান যাচ্ছে। টাটার ইস্পাত এই সব দেশে ফলকারখানা ও শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

এই ইস্পাত টাটা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুমোদিত রপ্তানী ফার্ম কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড মারক্‌স ক্রেমবর্ধমান পরিমাণে চালান হচ্ছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৬,৫০০ টন থেকে

রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭ সালে ৪৩,০০০ টন-এ দাঁড়িয়েছে আর বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়েছে ৯৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ইস্পাতের রপ্তানী বাড়াতে টাটা স্টীল অক্লান্ত চেষ্টা করছে কারণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় না করতে পারলে আমাদের পরিকল্পিত শিল্পোন্নতি সম্ভব হবে না।

টাটা স্টীল

অল ইন্ডিয়া র‍্যডিওর জোড়ার ইতিহাস রমেন মজুমদার

ইংল্যান্ডে প্রথম রেডিও প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় ১৯২০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি, চেম্‌স্‌ফোর্ডের এক ট্রান্সমিটার থেকে। প্রচার করেন মার্কোনি কোম্পানি। ...এরপর নিয়মিত প্রচার শুরু হয় ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে।

১৯২২ সালে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয় “ব্রিটিশ র‍্যডকাস্টিং কোম্পানি”। জে, সি, ডাব্লিউ, র‍্যথ হন তার জেনারেল ম্যানেজার। এই বেসরকারী কোম্পানিটি সরকারী কর্পোরেশনে পরি-
বর্তিত হয় ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারি। র‍্যথই তার প্রথম ডিরেক্টর-জেনারেল।

র‍্যথের ব্যক্তিগত ছিল আকর্ষণীয় কর্ম-
ক্ষমতা প্রচণ্ড। তিনি তাঁর স্বচ্ছ বুদ্ধিতে
পেরেছিলেন বেতার-সম্প্রচারের এই নতুন
মাধ্যমের গুরুত্ব। তিনি কেবল রিটেনেই
এক কর্মদক্ষ, শক্তিশালী এবং স্বতন্ত্র বেতার
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন নি, পৃথিবীর
অন্যান্য দেশও যাতে বেতার-সম্প্রচারের
গুরুত্ব বোধে তা গ্রহণ করে সেজন্য বধা-
লম্বা চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ বেতার-
সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এবং
এ বিষয়ে মার্কোনি কোম্পানির কর্নেল
সিম্পসনের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।
১৯১০ সালের ২৭শে নভেম্বর তিনি তাঁর
ডায়েরিতে লিখেছেন : “আমি এখান
থেকেই ভারতের বেতার-সম্প্রচারব্যবস্থা
গড়ে তুলতে চাই।”

কিন্তু ভারতের কাছ থেকে তিনি
তেমন সাড়া পান নি। তিনি তাঁর স্মৃতি-
কথায় লিখেছেন : “ভারতে একটা মস্ত
ঝড়ো সূর্য্যাগ নষ্ট হল। ১৯২৪ সালে
ইন্ডিয়া অফিসকে আমি বেতার-সম্প্রচারে
সম্ভাবনা ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা
করেছি; পনের বছর ভাইসরয়কে
লিখেছি—কিন্তু কোনো ফল হয় নি।
১৯২৬ সালে একটি ব্যবসায়িক
কোম্পানি চালু করা হয়েছে। তার চেয়ার-
ম্যান আর অন্যদের আমি এর গুরুদায়িত্ব
সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করেছি।
তারা আমাকে একজন মধ্যকারীবাঁক

মনোনীত করতে বলেছেন, কিন্তু সরকারী
সমর্থন আর আগ্রহ ছাড়া বেশি অগ্রগতি
যে হয় নি তাতে আশ্চর্য্যেব কিছু নেই।
পরে লর্ড উইলিংডন জিনিসটাকে একটা
সঠিক ভিত্তি উপর স্থাপন করতে তাঁর
বধাসাধ্য করেছেন...। কিন্তু অনেক দেরি
হয়ে গেছে। ১৯২৪ সালেই যদি বেতার-
সম্প্রচারকে গভীরভাবে গ্রহণ করা হত
তাহলে ভারতে পরের ঘটনাগুলি হয়তো
অন্য রকম হত।”

সুতরাং সরকারের অনগ্রহের দরুনই
ভারতে বেতার-সম্প্রচার শুরু হয়েছে
দেরিতে। র‍্যথ ১৯২৬ সালের কথা বলে-
ছেন, ভারতে বেতার-সম্প্রচার আরম্ভের
ইতিহাস খুঁজতে হবে এ ১৯২৬ সালে,
যখন “ইন্ডিয়া র‍্যডকাস্টিং কোম্পানি
লিমিটেড” নামে একটি বেসরকারী প্রতি-
ষ্ঠান ভারত সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিতে
আবদ্ধ হয়েছিল, যে-চুক্তিবলে তারা বোম্বাই
আর কলকাতায় দুটি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের
অনুমতি লাভ করেছিল।

কিন্তু তার আগেও ইতিহাস আছে।
সে-ইতিহাস শেষের রেডিও ক্লাবের।
নির্মিত বেতার-সম্প্রচার গড়ে ওঠার আগে
ভারতের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি
শৌখিন রেডিও ক্লাব ছিল, তারা রেডিও
প্রোগ্রাম প্রচার করত।

এই রকম প্রথম ক্লাব হচ্ছে “মাদ্রাজ
প্রেসিডেন্সি ব‍্যডিও ক্লাব”। এটি গঠিত
হয় ১৯২৪ সালের ১৬ই মে, এবং বেতার-
সম্প্রচার চালু করে তার আড়াই মাস পরে
৩১শে জুলাই। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার
জন্য ক্লাবটি ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে
বন্ধ হয়ে যায়। ট্রান্সমিটারটি দিয়ে দেয়
মাদ্রাজ কর্পোরেশনকে।

মাদ্রাজ কর্পোরেশন কিন্তু বেশ সুদৃঢ়-
ভাবেই কাজ চালাতে লাগল। ১৯৩০
সালের ১লা এপ্রিল নিষিদ্ধ প্রচার আরম্ভ
করল। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা
থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সঙ্গীত
প্রচার করত, মাসে এক সোমবার কেবল
পাশ্চাত্য সঙ্গীত হত। ছুটি দিন ছাড়া

সপ্তাহেব অনাসব দিনে বিকেল চারটে
থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র
ছাত্রীদের জন্য গল্প আর সঙ্গীতশিক্ষা
আসর বসত। রবিবার আর ছুটির দিনে
বেলা দশটা থেকে এগারটা গ্র্যামোফোন
রেকর্ড বাজত। অপেশাদার প্রতিষ্ঠানের
পক্ষে এ বড়ো কর্ম কঠিন নয়...এই রকম
চলছিল ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানু-
য়ারি পর্যন্ত, “অল ইন্ডিয়া ব‍্যডিওর” মাদ্রাজ
স্টেশন চালু না হওয়া পর্যন্ত।

এই রকম আর-একটি শৌখিন রেডিও
ক্লাব গঠিত হয়েছিল লাহোরে, গঠন করে
ছিলেন “ইয়ং মেন্স ব্রিটিশিয়ান অ্যাসোসিয়ে-
শন”। এই ক্লাবটি বেতার-সম্প্রচার শুরু
করেছিল ১৯২৮ সালে। এর খবর
চালাবার জন্যে পঞ্জাব টেরিটরি বোর্ড কমিটি
বন্ধের দেড় হাজার টাকা করে দিতেন,
যাকটা আসত পঞ্জাব সরকারের কাছ
থেকে। এই সম্প্রচার চালু ছিল ১৯৩৭
সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তার আড়াই
মাস পরে ১৬ই ডিসেম্বর লাহোরে
“অল ইন্ডিয়া ব‍্যডিওর” একটি স্টেশন
স্থাপিত হল।

কলকাতায় ব‍্যডিও নিয়ে গবেষণা শুরু
হয়েছিল ১৯২৫-২৬ সালে, স্যারেন্স
কলেজে, ডঃ শিশিবকুমার মিত্রের পরি-
চালনায়। তখন মাঝে মাঝে রাত্রের দিকে
একটি ছোট ট্রান্সমিটারে করে রেডিও
প্রোগ্রাম প্রচারিত হত। প্রোগ্রাম বলতে
গান, তা-ও রেকর্ডে।

১৯২৫-২৬ সালেই মার্কোনি
কোম্পানি কলকাতায় হাই কোর্টের
বিপরীত দিকে তাদের অফিস টেম্পল
চেম্বার্সের একেবারে উপর তলায় একটা
স্টুডিও খুলেছিলেন। সন্ধ্যা ছটা থেকে
সাতটা পর্যন্ত ছোট্ট একটি ট্রান্সমিটারের
সহায্যে সেখান থেকে প্রোগ্রাম প্রচার করা
হত। দেশী-বিলাতী সব রকম প্রোগ্রাম।
শৌখিন শিল্পীবাই সেইসব প্রোগ্রাম কর-
তেন। স্টুডিও ডিরেক্টর ছিলেন মার্কোনি
কোম্পানিরই বড়ো অফিসার জে, আর,
স্টেপলটন। ভারতীয় প্রোগ্রামের তত্ত্বাব-
ধারক ছিলেন অমর বসু।

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

মার্কোনি কোম্পানির এই স্টুডিও খোলার উদ্দেশ্য ছিল তাদের কিছু সেট আর হেডফোন বিক্রি করা। তখন লাউড-স্পীকার ছিল না বলে রেডিও প্রোগ্রাম শুনতে হ'ত ক্রিস্টাল সেটে হেডফোন লাগিয়ে। তাই সকলের এতে আগ্রহ ছিল না। মাত্র জন পঞ্চাশেক লোক শখ করে শৌখিন রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রাম শুনত।

পেশেয়্যে বেতার-সম্প্রচার চালু হয়েছিল ১৯৩৫ সালে, মার্কোনি কোম্পানির সাহায্যে। মার্কোনি কোম্পানি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকারকে একটি ট্রান্সমিটার আর কয়েকটি কমিউনিটি সেট খার দিবেছিল। শর্ত ছিল, পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা বেতার-সম্প্রচার যদি সফল হয় তাহলে সরকার সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে নেবেন। ...উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকার ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল রেডিও স্টেশনটি ভাবত সরকারের হাতে দিয়ে দিলেন।

এলাহাবাদেও পরীক্ষামূলকভাবে বেতার-সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। এলাহাবাদ অ্যাগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল ১৯৩৫ সালে একটি লাইসেন্স পেয়েছিলেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ঐ ইন্সটিটিউট থেকে প্রোগ্রাম প্রচার করা হ'ত। এই রকম চলছিল ১৯৪৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, “অল ইন্ডিয়া রেডিও” এলাহাবাদ স্টেশন চালু না হওয়া পর্যন্ত।

ডেরাডুনেব সুপারইন্টেনডেন্ট আর জনসাধারণ স্বেচ্ছায় চাঁদা তুলে সেখানে একটি শৌখিন বোর্ডিং স্টেশন স্থাপন করেছিলেন। সেই স্টেশন থেকে বেতার-সম্প্রচার শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে। কিন্তু চাঁদা তুলে আর কতদিন চলে? কত টাকা ওঠে চাঁদার? তাই টাকাব অভাবে ১৯৩৮ সালের ১০ই মে বন্ধ করে দিতে হ'ল সেখানকার বেতার-সম্প্রচার।

“নির্মিত” বেতার-সম্প্রচার শুরুর হবার পূর্বেও যে শৌখিন ক্লাবগুলিকে চালু থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সে অকারণে নয়। কতকগুলি সম্পর্ক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, প্রথম কয়েক বছর বেতার-সম্প্রচার ছিল একেবারে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে, “নির্মিত সম্প্রচারের” অল্প কয়েকটি ট্রান্সমিটার এই বিরাট দেশের সর্বত্র বেতাব্যবর্তী পৌঁছে দিতে পারত না, অনেক জায়গাই থাকত অন্ধ। শৌখিন ক্লাবগুলি যদি তাদের নিজস্বের স্টেশন মাধ্যমে এইসব অন্ধ জায়গায় বেতাব্যবর্তী শোনাতে পারে, শোনাক না।

সরকার যখন বিভিন্ন কারণে স্থির করে উঠতে পারছিলেন না বেতার-সম্প্রচারকে নির্মিত জন-উপযোগী বিষয়

করবেন কিনা তখন এই শৌখিন রেডিও ক্লাবগুলির ভূমিকা ছিল অনেক বড়ো। আসলে এগুলি ছিল নির্মিত রেডিও স্টেশনের অগ্রদূত। কিন্তু এই শৌখিন রেডিও ক্লাবগুলির আর্থিক অবস্থা কখনই ভালো ছিল না। থাকবে কি থাকবে না, উঠবে কি উঠবে না—এই নিয়েই সব সময় টাল-মাটাল। কারণ, হাতী পোষা সহজ কথা নয়।

নির্মিত রেডিও স্টেশন চালু হলে এগুলি উঠে গিবে যেন বেঁচে গেল। গাটের পরস্যা খরচ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, তখন সেই গোড়ার দিনে অনেকে আবার নিজস্ব রিসিভিং সেন্টার আর ট্রান্সমিটার চালাবার জন্য লাইসেন্স নিয়ে ছিল। যে-জিনিস চাঁদা তুলে হয় না, দশ-জনে মিলে হয় না, সে-জিনিস একার জোরে চলে কী করে? চলে না বলেই একে একে সব উঠে গেল, নির্মিত রেডিও স্টেশন চালু হতে লাগল আর শৌখিন বেতাব্যবস্থার উঠে যেতে লাগল।

উঠে থাক, তবু, ভাবভেব বেতার-সম্প্রচারের ইতিহাসে এই শৌখিন রেডিও ক্লাবগুলির ভূমিকা ভুলবার নয়। অগ্রদূতের কথা অগ্রহেই মনে পড়ে।

ভারতে নির্মিত বেতার-সম্প্রচারের ইতিহাসের আরম্ভ ঋজুতে বলাই ১৯২৬ সালে; কারণ ১৯২৬ সালের আগে পর্যন্ত নির্মিত বেতার-সম্প্রচারের কম্পনা দানা বাঁধে নি।

১৯২৬ সালে বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত পাশী ব্যবসায়ী এফ, এম, চিনয়েব উদ্যোগে গঠিত হয় একটি বেসরকারী বেতার প্রতিষ্ঠান—“ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড”।

১৯২৬ সালেই ভারত সরকার আব “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেডের” মধ্যে এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার এই কোম্পানিকে বোম্বাই আর কলকাতায় দুটি স্টেশন তৈরিব লাইসেন্স দেন।

“ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির” ইংরেজী মূখপত্র “ইন্ডিয়ান রেডিও টাইমস্” ১৯২৭ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত তাব প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করল, ২০শে জুলাই বোম্বাই স্টেশনটি খোলা হবে।

১৯২৭ সালের ২০শে জুলাই ভারতের বেতাব্যবস্থার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আবম্ভ হয়েছিল নির্মিত বেতাব্যবস্থার, ঐ দিন “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানিব” বোম্বাই স্টেশনটির উদ্ভোধন হয়েছিল। উদ্ভোধন করেছিলেন ভাবতের ভাইসরয় লর্ড আর্চবিশপ... আর, তার চৌত্রিশদিন পূর্বে ২৬শে আগস্ট

উদ্ভোধন হয়েছিল কলকাতা স্টেশন। কলকাতার স্টেশন উদ্ভোধন করেছিলেন বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জনসন। ...দুটিই দেড় কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ ট্রান্সমিটার, প্রোগ্রাম শোনা হেত মাত্র তিরিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে। তিরিশ মাইলের পরে অস্পষ্ট, তারপরে বিহীন না। তখন রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু কম। ১৯২৭ সালের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ল ৩,৫৯৪; ১৯২৮ সালের শেষে হ'ল ৬,১৫২। কিন্তু ১৯২৯ সাল থেকে বৃদ্ধির হার কমতে লাগল—১৯২৯ সালের শেষে হ'ল ৭,৭৭৫; ১৯৩০ সালের শেষে ৭,৭১১।

“ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি” গঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে, পনের লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে; কিন্তু শেয়ার বিলি করা হয়েছিল মাত্র হাজার টাকার, আর তার সবটাই আদায় হয়েছিল। এই ছ' লক্ষ টাকার মধ্যে গড় চার লক্ষ টাকা সঙ্গে সঙ্গে গড়েই শেষ হয়ে গিয়েছিল বোম্বাই আর কলকাতায় দুটি স্টেশন তৈরি করতে আর অন্যতম প্রাথমিক খরচ মেটাতে। সব খরচ-খরচা মিটিয়ে দেখা গেল কোম্পানির সংরক্ষিত তহবিলে আছে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার কিছু বেশি। সুতরাং বোম্বাই যে অচিরে সবসে ফুল দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কী। মাসিক খরচও তো কম নয়, প্রায় তেরিশ হাজার টাকা। অতএব বলতে লাইসেন্স পিছদ বছরে দশ টাকা হারে সরকারের আদায় করা লাইসেন্স যদি শতকরা আশি ভাগ, আর বিদেশ থেকে আমদানি করা বেতার গ্রাহক যন্ত্রের চালান-মূল্যেব শতকরা দশ ভাগ “কর”, যেটা কোম্পানিকেই ডীলারদের কাছ থেকে আদায় করতে হ'ত।

সুতরাং জমায় অনেক আর খরচে অল্পে অনেক ফারাক, ফারাকটা বোঝা যাযে ১৯৩০ সালের শেষার্শ্বে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা যখন কমে ৭,৭১১য়ে দাঁড়িয়েছে। জমায় উপর বাড়তি খরচটা মেটাতে হ'ত উদ্ভূত তহবিল থেকে আর “ইন্ডিয়ান বোর্ডিং টেলিগ্রাফ কোম্পানি” কাছে মূলধনী সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা ধাব নিয়ে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না। অল্পকাল পরেই বোঝা গেল, আদা দিয়ে ব্যর্থ মেটানো, সে অনেক দিনের ধাত, —খুব ভাড়াভাড়ি নয়। ধান্দাটা আরও বাড়ল, লাইসেন্স ফী ফাঁকি পড়তে থাকল আর কোম্পানি “কর” আদায়ে এসবর্বা হওয়ায়।

এই দুটি সমস্যা সমাধানের জন্য কোম্পানি ভারত সরকারের স্মরণীয় হ'ল। কিন্তু ভারত সরকার বিশ্বাস করলো না

বে, বিনা লাইসেন্সে খুব বেশি রেডিও-সেট আছে বা আমদানিকারকরা কোম্পানিকে তাদের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যে বেতার-সম্প্রচার চালু রাখার জন্য “ইন্ডিয়ান রেডিও টেলিগ্রাফ কোম্পানির” কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে মাসিক খরচও তেত্রিশ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে চব্বিশ হাজার টাকায় আনা হয়েছে। ১৯২৯ সালে লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, লাইসেন্সের আর্থিক ভবিষ্যৎ খুব সম্ভবতঃ জনক হবে না, আর আর ও ব্যয়ের মধ্যে দ্রুততর ব্যবধানটা বেশ কিছুকাল চলেবে। এই অবস্থায় সরাসরি আর্থিক সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হ’ল। কিন্তু ভারত সরকার দ্বিধাকায় বা অন্য কোনো রকম সাহায্য দিতে স্বীকার করলেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষার্ধ্বে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তটা কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সকে জানিয়ে দেওয়া হ’ল। কোম্পানির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আবার, “ইন্ডিয়ান রেডিও টেলিগ্রাফ কোম্পানি” যে-ঋণ দিয়েছিল তার অঙ্কও তখন তিন লক্ষ টাকার পেঁছে গিয়েছিল। ডিরেক্টররা তাই শেরারহোল্ডারদের অবিলম্বে কোম্পানি গুলোটোতে পরামর্শ দিলেন। “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি” ১৯৩০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্থির করল ঐ বছরের ১লা মার্চ থেকে লিকুইডেশনে যাবে।

১৯৩০ সালের ১লা মার্চ “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি” উঠে গেল। ভারতে বেতার-সম্প্রচার ভেঙে পড়ল বলে মনে হ’ল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেতার-সম্প্রচার যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে, ভারতে তখন তা ভেঙে পড়া আশ্চর্যের বিষয় বৈকি!

আশ্চর্যের বিষয় হলেও তার কারণ-গুলি দুর্য্যোগ নয়। কোম্পানি উঠে যাবার চারটি বড়ো কারণ দেখা যায় :

প্রথম কারণ, কোম্পানি আরম্ভই হয়েছিল অপব্যয় মূলধন নিয়ে। অন্যান্য দেশে লাইসেন্স ফী বৃদ্ধির হার এত দ্রুত ছিল যে, সেই গোড়ার দিকে খুব তাড়াতাড়ি বেতার-সম্প্রচার গড়ে তোলার ও তার উন্নতিসাধন করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বেশি টাকা পাওয়া যেত। ফলে প্রোত-সংখ্যায় বাড়ানো যেত খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু ভাবতে ব্যাপারটা ছিল ঠিক এর বিপরীত। গোড়া থেকেই মূলধন আর ছায় ছিল কম।

দ্বিতীয় কারণ, রেডিও সেন্টার ঘাস

ছিল অনেক বেশি। চার ভল্টের একটি সাধারণ সেটেরই দাম ছিল প্রায় পাঁচ শ’ টাকা।

তৃতীয় কারণ, লাইসেন্স ফী আর “কর” আদায় করা ছিল অনেক কষ্টকর।

চতুর্থ কারণ, লায়োনেল ফিল্ডেনের রিপোর্ট থেকেই উদ্ভূত করা যেতে পারে : It may perhaps be said—although this did not apply as acutely in Bombay and Calcutta as in other parts of India—that Indian conditions and traditions were by no means as favourable to the rapid growth of broadcasting as those of the West. In the West, broadcasting was a convenient channel for an already established tradition of concerts, theatres, lectures and news; whereas in India, public interest in all these activities was apathetic and severely limited.

ফিল্ডেনের এই মন্তব্য কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। ভারতের পরিবেশ ও ঐতিহ্য বেতার-সম্প্রচারের দ্রুত উন্নতির অনুকূল ছিল না, এ কথা মানা যায় না। নৃত্য-গীত-নাটক-যাত্রা-মেলা-উৎসব-পালপাৰ্ণ ভারতের গ্রামজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এসবের সমাদর। সুতরাং ফিল্ডেন অন্য কথা বললে কী হবে! “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি” এই দিকটার তেমন খোঁজখবর করোঁছিল কিনা সেইটেই সন্দেহ। কোম্পানি উঠে যাবার আসল কারণ হ’ল বেতার-সম্প্রচারের উন্নতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আর উপযুক্ত লোকের অভাব।

কারণ যা-ই হোক আর যতগুলোই হোক, ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ কোম্পানি লিকুইডেশনে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিক থেকে দাবি উঠল সরকারী হস্তক্ষেপের। রেডিও-সেট যাদের ছিল আর যারা রেডিও-সেট কিনবে বলে স্থির করেছিল তারা ই কেবল বেতার-সম্প্রচার চালু রাখার দাবি জানায় নি, সারা ভারতের বেতার যন্ত্রপাতিতে ব্যবসায়ীরা, যাদের কাছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি মজুত ছিল, তারাও সরকারের কাছে জোর দরবার করল—সরকার যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে তাদের ব্যবসার উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়বে, অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তাদের। অ্যাসেম্ব্লির বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতা আর

উপনেতারা সরকারের শিল্প ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে অনেক করে বোঝালেন, বেতার-সম্প্রচার অব্যাহত রাখা বৈধ অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন। একথাও বললেন যে, দরকার হলে সরকারের নিজেব হাতেই বেতার-সম্প্রচারের ভার নিতে হবে।

এইসব দরবারে আর অনুরোধে-উপ-রোধে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, বেতার-সম্প্রচার নিজের হাতেই নিয়ে নেবেন, দু-বছর পরীক্ষামূলকভাবে শিল্প ও শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে চালাবেন।

১লা মার্চ কোম্পানি লিকুইডেশনে যাবার পর পুরো মার্চ মাসটা সরকারী খরচে কোম্পানির লিকুইডেটর মারফৎ বেতার-সম্প্রচার চালু রইল। ১লা এপ্রিল থেকে সরকারের শিল্প ও শ্রম দপ্তরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। নতুন নাম হ’ল “ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস”।

ভারতে সম্প্রচারব্যবস্থার পরিচালনা আর উন্নতি সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য গঠিত হ’ল “সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং অ্যাডভাইজরি কমিটি”। কিন্তু টাকা না থাকলে শব্দ পরামর্শ দিয়ে কী হবে? টাকার অভাবে প্রোগ্রামের খরচ ক্রমশ কমতে লাগল। “ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি” ১৯২৭ সালে মাসে তেত্রিশ হাজার টাকা খরচ দিয়ে প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছিল। অর্থাভাবের দরুন ১৯২৯ সালে তা কমিয়ে করা হয়েছিল চব্বিশ হাজার টাকা—১৯৩০ সালে ভারত সরকার ভার গ্রহণ করার পর আরও কমিয়ে করা হ’ল বাইশ হাজার টাকা। পৃথিবীর কোনো দেশে এমনটি হয় নি। সব দেশেই খরচ ক্রমশ বেড়েছে আর তার ফলস্বরূপ প্রোগ্রামের মান উন্নত হয়েছে দ্রুত তালে। কিন্তু “ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের” প্রোগ্রামের মান ক্রমশ নিচে থেকে আরও নিচে নেমেছে।

১৯৩১ সাল। দেশে তখন দারুণ অর্থসঙ্কট। জোর ব্যয়সঙ্কোচ চলছে—জেনারেল রিট্রেন্সমেন্ট কম্পেন্সি। রিট্রেন্সমেন্ট কমিটিও গঠিত হয়েছে। রিট্রেন্সমেন্ট কমিটির কাছে “ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের” জন্য অনেক সুপারিশ করা হ’ল। সার্ভিস চালু রাখার সপক্ষে অনেক বুদ্ধি উপস্থাপিত করা হ’ল—বিশেষ করে, তাব সম্ভাব্য “পরম্পরাগত আর্থিক মূল্য সম্পর্কে”, তার শিক্ষাসংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের সম্ভাবনা সম্পর্কে, দেশে গোলযোগের সময় তার উপযোগিতা সম্পর্কে, এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে ছোট ছোট স্বাধীন বেতার সংস্থা গড়ে উঠতে দেবার বিকল্প অবস্থায় আপত্তি সম্পর্কে। সার্ভিস বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তে যে ব্যবসায়ী আর অন্যদের অনেক

ক্ষতি হবে সৌদকেও কমিটির দৃঢ় আকর্ষণ করা হ'ল।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। ব্যয়সম্প্রচারের প্রবুরী তাগিদে আর আর্থিক ক্ষতির উপর দিবে সার্ভিস চলার তাড়নার সরকার সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করলেন। সরকার বেতার-সম্প্রচার চালানোর মতো গুরুদায়িত্ব সামলাতে পারবেন না বলে মনে করলেন। ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে সরকারী সিমান্ত ঘোষণা করে এক ইস্তাহার প্রকাশ করা হ'ল।...পাঁচ বছরের মধ্যে এই স্বতায়ীবার ভারতের বেতার-সম্প্রচার অবলুপ্তির সম্মুখীন হ'ল।

এই ঘোষণার ফলে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল—বিশেষ করে বাংলাদেশে। আর, আগের মতোই আবার এগিয়ে এলেন আইনসভার সদস্যরা, সংবাদপত্রগুলি এবং জনপ্রতিনিধিরা। সরকার আবার নরম হলেন। শিশু ও প্রম-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্বাধীনসম্পর্কিত সকল পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবং অনেক স্থিতি-স্থিরের পর ১৯৩১ সালের ২০শে নভেম্বর স্থির হল, সরকার এক অস্থায়ী কালের জন্য সার্ভিস চালু রাখবেন এবং এই সময়ে বেসরকারী প্রচেষ্টায় তার পরিচালনার প্রস্তাব ঠিক করে ও তা পরীক্ষা করে ফেলতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হ'ল না এবং ঠিক হল, সার্ভিস যদি চালাতেই হয় তাহলে তা সরকারকেই চালাতে হবে। আরও ঠিক হল, প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে অর্থগত নতুন পথ বার করতে হবে। প্রধান এবং একমাত্র পথ দেখা গেল রেডিও-সেট আর আনুষঙ্গিক সব জিনিসের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি—সরকার রেডিও ভালভ, গ্র্যামোফোন ভালভ, বাল্ব আর রেডিও-সেটের উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিলেন।

১৯৩১ সালের ২০শে নভেম্বর বোম্বাই আর কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টরদের কাছে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বেতার-সম্প্রচার চালু রাখার আদেশ পাঠানো হল।

১৯৩২ সালের ৫ই মে চূড়ান্তভাবে স্থির হ'ল, "ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস" সরকারী পরিচালনাধীন হ'বে।

আর যাতে আরও বাড়ি সেজন্য কাস্টমস্ ডিউটি অর্থাৎ বহিঃশুল্ক আর লাইসেন্স ফী আদায়ের ব্যবস্থা করার ইরকাম হইবে পড়ল। "ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি" এটা ঠিকভাবে করতে পারেন নি। লাইসেন্স ফী ফাঁকি বন্ধ করার একটা অসুবিধা ছিল তখনকার

চলতি আইন—১৮৮৫ সালের "ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট" শব্দ বেতার যন্ত্রের স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ আর ক্রিয়াকলাপের উপরই নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের ক্ষমতা ছিল, বেতার যন্ত্র রাখার উপর কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। তাই কেউ বেতার যন্ত্র রাখলে সেটা রিসেপশনের জন্য রেখেছে, না ট্রান্সমিশনের জন্য রেখেছে তা প্রমাণ না করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ১৯০২ সালে একটি বিল খসড়া করা হল। তাতে বেতারযন্ত্র রাখার উপরও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৯০৩ সালে "ইন্ডিয়ান ওয়্যার-লেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট" পাস হল, আর সেই আইন চালু হল ১৯০৪ সালের ১লা জানুয়ারি।

তবু লাইসেন্স ফী ফাঁকি একেবারে বন্ধ হ'ল না, এতবড়ো দেশে এত লোকের মধ্যে সেটা সম্ভবও ছিল না।

কিন্তু ১৯০২ সাল থেকেই মোড় ঘুরতে আরম্ভ করেছিল। সম্প্রচার ব্যবস্থা কমানো হয়েছিল, এখন কাস্টমস্ থেকে আর স্বিগড়ন হল। আগে যেমন শুল্ক ক্ষতিই হত, এখন থেকে লাভ হতে লাগল। ১৯০০-০১, ১৯০১-০২, ১৯০২-০৩ আর ১৯০৩-০৪ এই চার বছরে দু'লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা লাভ হল। তার একটা বড়ো কারণ ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে "ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন" এম্পায়ার সার্ভিস চালু করেছিল, তাতে ভারতে অবস্থিত ইয়োরোপীয়দের মধ্যে রেডিও-সেট বিক্রি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯০৪ সালের শেষে রেডিও-সেটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ষোল হাজার—দু' বছরে আট হাজার বৃদ্ধি।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি যে কারণেই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, ১৯০৪ সালের আরম্ভ থেকেই বেতার-সম্প্রচারের প্রতি সরকারের আগ্রহ খুব দ্রুত তালে বাড়ছিল। আর এই আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে কতকগুলি বড়ো ব্যাপারে:

১৯০৪ সালেই ভারত সরকার বেতার-সম্প্রচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ আর উন্নতি-সাধনের সিমান্ত নিলেন, এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দিল্লীতে একটি স্টেশন স্থাপনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। ১৯০৪ সালে পি জি এড্-মান্ডস্ প্রথম কেন্দ্রীয় তত্ত্ব ব্রডকাস্টিং নিযুক্ত হলেন। বি-বি-সি থেকে একজন অভিজ্ঞ লোক ধার নেবার ব্যবস্থা হল, আর তার ফল হল সুদৃঢ়প্রসারী। দক্ষিণে মাদ্রাজ সরকার রাজ্যের বেতার-সম্প্রচারব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পরি-কল্পনা রচনা করার জন্য ১৯০৪ সালের

গোড়ার দিকে একজন অভিজ্ঞ লোককে নিযুক্ত করেছিলেন। আর, একেবারে উত্তরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বেতার-সম্প্রচার, বিশেষ করে পঞ্জী সম্প্রচারের উন্নতির জন্য মার্কোনি কোম্পানি ১৯০৫ সালের গোড়ায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকারকে একটি ট্রান্সমিটার আর কয়েকটি কমিউনিটি সেট ধার দিয়েছিলেন—অবশ্য নিঃশর্তে নয়। শর্ত ছিল, এক বছর পরীক্ষার পর ব্যবস্থাপনা যদি সফল প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ ট্রান্সমিটার ইত্যাদি সব কিনে নিতে হবে। সরকার তাতেই রাজী হয়েছিলেন।

ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেতার-সম্প্রচার সম্বন্ধে অনাগ্রহের কথা রীথ অনেক আগেই বলেছেন। লর্ড উইলিংডনও স্বীকার করেছেন যে, বেতার-সম্প্রচারে তিনি বেশি আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু রীথের বোঝানোর পর তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং ১৯০৪ সালে অগস্ট মাসে আইনসভায় ভাষণ দেবার সময় বেতার-সম্প্রচারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। রীথ ইন্ডিয়া অফিসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, পররাষ্ট্র-সচিবের সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ...কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি অশুভ ছায়া দেখা দিল। বেতার-সম্প্রচারকে প্রাদেশিক বিষয় করার জন্য শিল্প ও প্রম দপ্তরের উপর রাজনৈতিক চাপ পড়তে লাগল। রীথ এর বিরুদ্ধেও লড়াই করলেন। বললেন, বেতার-সম্প্রচার একেবারে নতুন জিনিস, এ জিনিসটা কেন্দ্রীয় সরকার, এমন কি ভাইসরয়ের হাতেই থাকা দরকার।

তা-ই থাকল। ইন্ডিয়া বিল সংশোধন করে বেতার-সম্প্রচারকে কেন্দ্রের অধীনেই রাখা হল।...প্রোগ্রামের ব্যাপারে প্রদেশ-গুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হল, সম্প্রচারব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বিষয় রইল। নীতি নির্ধারিত হতে লাগল কেন্দ্র থেকে। ভারতীয় বজায় রাখতে লাগলেন ভাইসরয় নিজে।

১৯০৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর লর্ড উইলিংডন রীথকে পাঁচ বছরের চুক্তিতে একজন বিশেষজ্ঞ দিতে লিখলেন।

১৯০৫ সালের অগস্ট মাসে বি-বি-সি'র লায়োনেল ফিল্ডেন এলেন ভারতে, কলকাতার অভ্যন্তরীণ হয়ে। তাঁর আগমনে ভারতে বেতার-সম্প্রচারের সুসংহত উন্নতি গুচিত হল। আজকের বহু পুরাতন রীতিনীতিব মূল খুঁজতে গেলে ফিল্ডেনকে পাওয়া যাবে।

এক ব্যাপক উন্নয়ন পবিকল্পনা রচনার জন্য ফিল্ডেন শিল্পবিষয়ক পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডন থেকে বি-বি-সি'র গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ এইচ এল কার্কে আনা হল। কার্ক ভারতের বিভিন্ন অংশে সফর করে এসে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ কবলেন, যাতে মিডিয়ম-ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসানোর উপর জোর দেওয়া হল।

পাঁচ মাস পরে কার্ক ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। তারপরে এলেন সি, ডাব্লিউ, গয়ডাব। এলেন বি-বি-সি থেকে, ১৯৩৬ সালের অগস্ট মাসে চীফ এঞ্জিনীয়ার হিসাবে। গয়ডাব কার্কের পরিকল্পনা পুরোপুরি মানলেন না। তাঁর মতে, কেবল মিডিয়ম-ওয়েভ ট্রান্সমিটারই যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে সমগ্র ভারতের অতি সামান্য অংশেই বেতারবাহী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, বাকি অংশ পড়ে থাকবে ফাঁকা। তার চেয়ে বরং প্রথমে শর্ট-ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসিয়ে সারা ভারতকে স্বতীয় শ্রেণীর সার্ভিস দেওয়া ভালো—পরে, আরও টাকা পেলে না হয় বড়ো বড়ো কেন্দ্রে শর্ট-ওয়েভ সার্ভিসের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিডিয়ম-ওয়েভ সার্ভিস যোগ করা যাবে।

গয়ডাবের পরিকল্পনা মতোই উন্নতি হতে লাগল। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারি দিল্লী স্টেশন চালু হল। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে পেশোয়ার স্টেশনটি প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে নিজে নেওয়া হল। আর ঐ বছরের শেষের দিকে লাহোর স্টেশন চালু হল। ১৯৩৮ সালে লখনউ আর মাদ্রাজে দুটি স্টেশন খোলা হল। ১৯৩৯ সালে হল দ্বিচিনাপল্লী আর ঢাকার। মোট সংখ্যা হল নয়।

বোম্বাই-কলকাতা-দিল্লী স্টেশনে শর্ট-ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসিয়ে তাদের প্রোডাকশন বাড়ানো হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই হচ্ছে আসল কাহিনী।

এর সঙ্গে যোগ হবে দেশীয় রাজ্য-গুলির কাহিনী। ১৯৩৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মহীশূর রাজ্যে স্থাপিত হয়েছিল একটি বেতারকেন্দ্র। ১৯৩৯ সালে বরোদার গায়কোয়াড়ও বরোদা বেতারকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় নিজামের অধীনে হায়দরাবাদ আর ঔরঙ্গাবাদে দুটি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছিল। ট্রান্সমিটার মহারাজার সরকারও ঐ বছর দ্বিচিনাপল্লীতে একটি ট্রান্সমিটার বসাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের সময় দেশীয় রাজ্যগুলিতে মোট পাঁচটি রেডিও স্টেশন ছিল—মহীশূর, বরোদা, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ আর দ্বিচিনাপল্লী। দেশ বিভাগের ফলে ভারত পেল। ঐ পাঁচটি আর আগের নটির মধ্যে ছিটি। ছিটি বলতে বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, লখনউ আর দ্বিচিনাপল্লী—লাহোর, পেশোয়ার আর ঢাকা পড়ল পাকিস্তানে।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে—ইন্সটলেশন আর রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে, প্রোগ্রামের মানের দ্রুত উন্নতি করা হয়েছে, পল্লী-অঞ্চল আর স্কুল-কলেজের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সংবাদ আর বহির্দেশীয় প্রচাব চালু করা হয়েছে।... তখন মিডিয়ম-ওয়েভের সার্থকতা উপলব্ধি হতেও শুরু করেছে। আর তার ফলে রেডিও-সেটের সংখ্যা আটগুণ হাজার থেকে বেড়ে চারাত্তর হাজার হয়েছে।

স্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতার-সম্প্রচারের সম্প্রসারণ ছিল বন্ধ—ঐ সম্প্রসারণ বলতে নতুন স্টেশন খোলা আর স্টুডিওর উন্নতিবিধান। কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরুর হয়ে যাবার পর রেডিওর গুরুত্ব আরও ভালোভাবে অনুভূত হল। সংবাদ আর তথ্য পরিবেশনে এবং দেশের সীমার বাইরে প্রপাগান্ডা চালানোর একমাত্র শক্তিশালী অস্ত্র বলে পরিগণিত হল। ...সংবাদ বিভাগ আর বহিঃপ্রচাব অনেকখানি সম্প্রসারিত হল, সুগঠিত ভিত্তির উপর দাঁড়াল।...

ঐ হচ্ছে ভারতের বেতার-সম্প্রচারের গোড়াব মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু “ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস” “অল ইন্ডিয়া রেডিও” হল কবে? কে দিল এই নাম?

দিল্লীতে নতুন স্টেশন চালু হল

১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারি, আর ঐ বছর ৮ই জুন “ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস”র নতুন নাম হল “অল ইন্ডিয়া রেডিও”। ঐই সুন্দর নামটির জন্য প্রশংসা খাঁর প্রাপ্য তিনি হলেন লায়োনেল ফিল্ডেন। সেক্রেটারিয়েট নাম পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। ফিল্ডেন তখন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর কাছে গেলেন, কারণ তিনি বরোদা ছিলেন, ভাইসরয়ের অনুমোদন পেলে আর কারও আপত্তি টিকবে না।

“ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস” কি করে “অল ইন্ডিয়া রেডিও” হল, সে কাহিনী ফিল্ডেনের আত্মজীবনী থেকেই উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

I cornered Lord Linlithgow after a Viceregal banquet, and said plaintively that I was in a great difficulty and needed his advice. (He usually responded well to such an opening.) I said I was sure that he agreed with me that ISBS was a clumsy title. After a slight pause, he nodded his long head wisely. Yes, it was rather a mouthful. I said that perhaps it was a pity to use the word broadcasting at all, since all Indians had to say ‘broadcasting’—broad was for them an unpronounceable word. But I could not. I said, think of another title; could he help me? ‘Indian State’, I said was a term which, as he well knew, hardly fitted into the 1935 Act. It should be something general. He rose beautifully to the bait. ‘All India?’ I expressed my astonishment and admiration. The very thing. But surely not ‘Broadcasting’? After some thought he suggested, ‘Radio?’ Splendid, I said—and what beautiful initials. The Viceroy concluded that he had invented it, and there was no more trouble. His pet name must be adopted. Thus All India Radio was born.

কিস্তিবদ্ধ ঋণে ট্রানজিস্টার

২৫৫ টাকা মূল্যের ও

ব্যান্ড অল-ওয়াভ

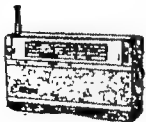
পোর্টেবল ট্রানজিস্টার

“এসকর্ট” মাসিক ২৫

টাকা কিস্তিবদ্ধীতে ক্রয় করুন।

Japan Agencies (BW-77)

Post Box 1194, Delhi-6.



বঙ্গদেশে ওদেশে শিল্পীরা এক এদেশে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

থিয়েটার অব দি এ্যাবসার্ড

জাতীয় জীবনে এক-এক যুগে যখন বিশেষ বিশেষ সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় তখন তার অদ্ভুত প্রতিফলন দেখতে পাই জাতীয় সাহিত্যে। এ সাহিত্য চিরন্তন সাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে পারে না— কারণ এ সব সমস্যার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এ সাহিত্যের আর কোন আবেদন থাকে না। তবে সাময়িক সাহিত্যেও যতটা পরিমাণে চিরন্তনের স্পর্শ থাকে সেই অনুপাতেই তার স্থায়িত্ব নিরূপিত হয়। এই কারণেই ইব্‌সেনের তদানীন্তন সমস্যামূলক নাটকগুলো ডেটেড হয়ে যায় নি, যেমন হয়েছে রিয়ার নাটকগুলো। ইব্‌সেনের নাটকে সমস্যা ছাড়াও চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্যের বস্তু বা গুণাগুণ আছে, যা এ সব নাটককে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে—রিয়ার নাটকে তা নেই— তাই তারা বাঁচে নি বার্নার্ড শ'-এর বিরাট পরিপোষকতা সত্ত্বেও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেসব সোস্যাল ফোর্সেস দেখা দিয়েছিল সারা পৃথিবীতে, তার ফলে শব্দ হয়েছিল অস্তিত্ববাদী (Existential) সাহিত্যের স্রষ্টার। কাব্যের ক্ষেত্রে পাউন্ড, এলিয়ট, স্পেন্ডার, অডেন, ফ্রাই প্রমুখের লেখা এর উদাহরণ। নাটকের ক্ষেত্রে চাপেক, জর্জ কাইজার, টোলার, এল্‌মার রাইস প্রমুখ।

ইওরো-আমেরিকায় ১৯২৪ সালে এই মডার্নিস্ট শৈব হয়ে যায়—আমাদের দেশে আরও কিছুদিন এর প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, মৃত্যুধারা, রথের রাশি প্রভৃতি নাটক আসলে অভিব্যক্তিবাদী স্টাইলে রচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে যে হতাশা, আশাহীনতা এবং জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা এবং আদর্শ-শূন্যতার ভাব দেখা দিয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ফল এই এ্যাবসার্ড নাটক। ১৯৫০ সাল থেকে এর শব্দ এবং ১৯৬২ সালেই এর সমাপ্তির আভাস আমরা দেখতে পাই, কারণ এ সময়ের ভেতরেই ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো অনেকটা মিটিয়ে নিয়েছে। এ্যাবসার্ড নাটকের বেশির ভাগ রচয়িতাই—যথা বেকট, ইউনোস্কা প্রমুখ ফ্রান্সকেই তাদের স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং ফরাসীদের জীবন-দর্শনকেই নিজদের জীবনদর্শন হিসাবে নিয়ে তার রূপায়ণ করেছেন নাট্যরচনায়। পিণ্ডার জাতে ইংরাজ—অসবর্ন—এর 'লুক ব্যাক ইন্' এ্যাংগার' থেকে ইংল্যান্ডে যে নতুন ফ্রান্সেটেড জাতের নাটকের আরম্ভ তার পরিণতি পিণ্ডারের সব নাট্যরচনায়—এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ডি ডাম্' ওয়ে-টার'। এডাম্ জাতে রাশিয়ান—বসবাস করেন ফ্রান্সে। কয়েকটি ভাল এ্যাবসার্ড

নাটক লেখবার পর কিন্তু তাঁর মনোভাব বদলে যায়—এখন তিনি রেক্টের মস্তাশিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং এপিক থিয়েটারের স্টাইলে নাট্যরচনা করছেন।

আমেরিকা প্রাচ্য এবং ইওরোপ দেশ—এ দেশের ভূমি থেকে এ্যাবসার্ড ফসল ফলানো ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই মার্কিনী নাট্যকার এল্‌বির লেখা এ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেন—

“Flirting with Absurd Plays.”

এ্যাবসার্ড নাটকের আবির্ভাবের আর একটা বড় কারণ আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুগে ইওরোপে ওয়েল-মেইড প্রে'গুলো এত একত্রে এবং বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে যার ফলে দর্শকেরা ক্রমশ থিয়েটারের নেশা হারিয়ে ফেলেছিল। এসব নাটকে স্ট্রাকচারের দিক থেকে গতানুগতিক সব কিছুই ছিল—যথা, বিগিনিং, মিডল্ এবং এন্ড, চরিত্রচরণ ইত্যাদি—ছিল না শব্দ সত্যিকার নাট্যরস। এই একত্রেই দূর করবার জন্যও দরকার ছিল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা—সেই ধাক্কাটা এল এ্যাবসার্ড নাট্যকারদের তরফ থেকে। এই আঘাতের ফলেই আবার ইওরোপের নাট্যরচনার গতি সহজ, সরল, স্টেইট প্রজেক্ট দিকে মোড় ফেরাবে এবং অচিরে আবার ভাল ভাল নাটক রচিত হতে থাকবে।

আমাদের দেশের সয়েল এ্যাবসার্ড নাটকের পক্ষে “উপযোগী কি-না?” এ প্রশ্ন আজকাল কারও কারও মনে উঠছে। আমি মনে করি—“না”। কারণ আমাদের দেশ এখনও আন্ডার-ডেভেলপড এবং এখানে ডেভেলপমেন্টের বহু সুযোগ-সুবিধা এবং রাস্তা রয়েছে—বর্তমানে যে কারণেই হোক ভারতবর্ষ ঠিকমত নিজেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেশ হিসাবে প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারে নি—সুতরাং সাময়িকভাবে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের করাল ছায়া দেশের উপর পড়লেও, আসল হতাশা বা নৈরাশ্যের কারণ আমাদের নেই। সুতরাং বাংলা ভাষার যেসব এ্যাবসার্ড নাটক লেখবার প্রচেষ্টা আজকাল দেখা দিচ্ছে তা আমার কাছে হাস্যকর বলেই মনে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অলডাস্ হাক্সলির একটি কাহিনী মনে পড়ে গেল—‘দেইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ’ উপন্যাসে তিনি এই কাহিনীটি দিয়েছেন—ইউনোস্ বারনেক্ এপিকউ-রিয়ান—তিনি মধ্যবয়সী। তাঁর ধনী শাশুড়ী এত বস্ত্রা হয়ে পড়েছেন যে দরামায়া, কোমলতা, শোকদুঃখ প্রভৃতি বস্তুগুলো তাঁর হৃদয়ে আর দাগ কাটে না। মহিলার দু-একটি বাতিক আছে—একটি হোল মিডিয়ামের দেহে মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব ঘটানো। জামাই ইউনোস্ হঠাৎ একদিন করোনার প্রবাসিসের

মারা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তাঁর শাশুড়ীর দঃখের থেকে আসলে আনন্দ হল অনেক বেশি—কারণ অনেকদিন নতুন কেউ মারা যান নি—সুতরাং কোন নতুন আত্মার আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব হয় নি মিডিয়ামের দেহে। বখানময়ে ইউস্টেসের আত্মাকে অনা হোল মিডিয়ামের দেহে—ধরুন এই মিডিয়ামের নাম হল এক্স। আত্মার আবির্ভাবের পর এক অশুভ ব্যাপার ঘটল—সে না হোল এক্স, না হোল ইউস্টেস—হয়ে দাঁড়াল এক তৃতীয় সত্তা। অর্থাৎ ইউস্টেসের আত্মা এক্স-এর দেহে ঢোকাতে সে এক কিস্তৃতীক্ষ্মাকার তৃতীয় সত্তায় পরিণত হল। বাংলা এ্যাকসার্ড নাটকের বেলাও ঠিক এমনিভাবে একটা অশুভ কিস্তি ঘটবে। যে জিনিষ ইওরোপে চলে, ভারতীয় দেহমণ্ডিত হয়ে তা হয়ে দাঁড়াবে একটা ভজকট ব্যাপার। ইওরোপের বিশেষ ধরনের আর্টফর্ম এশিয়ার পক্ষে উপযোগী নয়। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও তাই—সুর্রিয়ালিজম, কিউবিজম, ডাডাইজম প্রভৃতির ক্ষেত্রে গেলে আমাদের দেশের চিত্রকরেরা সৃজনশীল হতে পারবেন না—তাদের এগিয়ে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু এবং যামিনী বাবুর পথ ধরে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য অনুবাদটা চলতে পারে—তার থেকে এদের দেশের শিল্পের গতিপ্রকৃতির ধারাটা বোঝা যাবে সহজে। খুব কম ইওরোপীয় নাটককেই ইন্ডিয়ানাইজ করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এ কথাটা আমরা সহজে বুঝি না বলেই রবীন্দ্রোত্তর ধুগে কিস্তৃতীক্ষ্মাকার কাব্য এবং নাটকের সৃষ্টি হচ্ছে বাংলা ভাষায়। কে বা কারা এসব পড়ে? ছাপার খরচ ওঠেই বা কি করে? তাও জানি না। অথচ দেখুন বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায় মহাশয়কে। নিভেজাল ভারতীয় গল্প নিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাষা তুলে আজ পৃথিবীর সেরা পরিচালকের খ্যাতি পেয়েছেন—বিত্তিতবাবুর কাহিনী নিয়েই তাঁর বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল—তারপরে সময় সময় রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, তারা-শঙ্করবাবুর কাহিনীর ওপর ছাঁচ করেছেন। এসব কাহিনীতে আধুনিক পশ্চিমী সেন্স-প্রাধান্যের চিহ্নও কোথাও দেখবেন না। অথচ ভারতের বাইরের জগৎও সত্যজিৎবাবুর প্রতিভাকে শীর্ষে তুলে ধরে সম্মান দিয়েছে। আর একদিকে দেখুন হিন্দী ছবি হলিউডের তৃতীয় শ্রেণীর যৌনপ্রধান ছবির অনুকরণে তোলা। বিকৃতির অনুকরণে শিল্প সৃষ্টি হয় না—কিস্তৃতীক্ষ্মাকার অনাসৃষ্টি হয়—হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছে।

আগে বলেছি, বর্তমান ইওরোপে



জন অম্বল

কন্ভেনশনাল নাটক অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে যাওয়াতেই তার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে এ্যাকসার্ড নাটক। এই একটি কারণেই বোধ হয় বাংলায় এই এ্যাকসার্ড নাটক লেখবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আমাদের এক পরিচিত ভ্রমলোক “এক” নামধের তৃতীয় শ্রেণীর তথাকথিত করেকটি নাটক লিখেছেন এবং কোন-না-কোন উপায়ে ঐ সব নাটক মণ্ডস্থ করেছেন পাবলিক স্টেজে—অবশ্য দর্শক সমাগম লা হয়েছে সে সব নাটকে তা নিয়ে আর আলোচনার দরকার করে না। আমি শুধু ভাবি এই নাট্যকার যশপ্রার্থী ভ্রমলোককে যদি “এক” চামচ নাট্যরস পান করিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো, তাহলে বাংলার নাট্যরসিকেরা এঁর হাত থেকে উদ্ধার পেতেন। এই ভ্রমলোকের নাটক দেখেই বোধ হয় বাদল সরকার মশায় বাংলা রংমঞ্চে এ্যাকসার্ড নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। বাদলবাবুর লেখা স্ট্রেইট প্রে-ও আমি দেখেছি—ভাল লেখা। আমার অনুরোধ চিরাচরিত প্রখ্যাত লেখা

বিশ্বী নাটক দেখে তিনি এ্যাকসার্ড ড্রামা-টিস্ট-এ পরিণত না হয়ে, কন্ভেনশনাল নাটক রচনাতেই মনোনিবেশ করুন—তবে ফলেই বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করবে।

আবার ইওরোপের এ্যাকসার্ড নাটকের আলোচনার ফিরে আসি।

এ্যাকসার্ড নাটকের রচয়িতাদের—মথ্য বেকেকট, ইউনেস্কা, এডামড্ এরাবেল, এল্‌বি, পিস্টার প্রমুখ—বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এঁরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাটক লিখেছেন। আগেই বলেছি এডামড্ অবশ্য এখন রেখটের মন্ত্রশিষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং এ্যাকসার্ড পন্থতিতে লেখা পরিত্যাগ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত হল, উপরি উক্ত নাট্যকারেরা মানবজীবনের ওপর ভিত্তি করেই অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশন করেছেন নিজেদের নাটকে—কিস্তি তাঁদের রচনাপন্থতি অত্যন্ত ঘনীভূত, ভাস্কর্যক এবং বিমূর্ত। সেই কারণেই এঁরা আধ-বিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) নাট্যকার—এঁরা

মানবজগৎ এবং যশুজগতের অন্তঃসারকে আবিষ্কার করেন নিজেদের রচনায়। এ্যাবসার্ড বলতে বোঝায় এমন অবস্থা যখন মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমন্বয় হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় পড়লে জীবনের ভিত্তিতে কৌমরকরোর যুক্তি আছে বলে মনেই হয় না।

ইউনেস্কোর মতে এ্যাবসার্ড বলতে বোঝায়—

Man cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots.

এ্যাবসার্ড প্রেক্ষাপটের মনে করেন জগতের ঘটনাবলী মানে কোন যুক্তিবাদ নেই—সাধারণ লোক জগৎকে ঠিক এর রূপেই চিন্তা করে—সুতরাং তারা যাকে অসংলগ্ন পরিচিত পৃথিবী বলে মনে করে, আসলে তা হচ্ছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এ্যাবসার্ড থিয়েটারকে অনেক এ্যাপি-থিয়েটারও বলে থাকেন—কারণ সাধারণ থিয়েটারের দর্শক বিষয়ে গভীরগতিকতার একধরনের প্রতিক্রিয়াবশতই এর আবির্ভাব।

এ্যাবসার্ড নাটকের ওপর অলঙ্কৃত প্রভাবঃ

জেমস জয়েসের 'স্ট্রীম অব কন্সাস-নেস', সুব্রিয়ালিজম, ক্যফকার রচনা (বিশেষত ক্যফকার মেটামরফোসিস গল্পটি—পাশাপাশি রেখে ইউনেস্কোর রাইনোসেরস নাটকটি পড়লেই বোঝা যাবে) অধুনালুপ্ত মিউজিক হলসের কন্সেডিয়ান এবং স্ট্রুজ-চার্লি চ্যাপলিন, বাক্সটার কর্টন প্রমুখের যারা এক সমগ্র মিউজিক হল অর্টিস্টস ছিলেন—প্রসঙ্গত জাইমলাইট ছবিতে চ্যাপলিনের সেই মিউজিক হলের দৃশ্যটিও স্মরণে আসে।

খুলনামূলক সমালোচনা

ডাল নাটক

- ১। সুগঠিত কাহিনী
- ২। চরিত্রচিত্রণে সূক্ষ্মতা
- ৩। বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত থিম
- ৪। প্রকৃতি প্রতিবিশ্বিত
- ৫। সহজ সূত্রের বোধগম্য যুক্তিপূর্ণ সংলাপ

এ্যাবসার্ড নাটক লেখা শুরু হয় ১৯৬০ সালে। বিশ্বের পটভূমিকায় প্রত্যেক মানুষই একটা বিপজ্জনক পরি-স্থিতিতে অবস্থান করছে—এই হচ্ছে এই প্রণয়ীর নাট্যকল্পের আন্তরিক বিশ্বাস। তবে এঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি এবং অননুভূতির ভেতর প্রভেদ দেখা যায়।



হ্যারল্ড পিন্টার

১৯৬২ সাল থেকে এই আন্দোলনে যেন ডাটার টান দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক এ্যাবসার্ড ড্রামাটিস্টই নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে পৃথিবীকে দেখেন—এই জনাই তাঁদের রচিত নাটকগুলো অত্যন্ত

অবতারণা করে ব্যাখ্যা করা যায় তা যেই ব্রুটিপূর্ণ হোক, তবু সে আমাদের পাব-চিত জগৎ। কিন্তু যে বিষয় হঠাৎ মাঝ-মোহে বিজ্ঞত এবং সম্পূর্ণ আলোকের দ্বারা স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, সেখানে মানুষ নিজেকে অন্ধ কোনও জগতের লোক বলে মনে করতে থাকে—এখানে সবই যেন তার কাছে অশরীতিত বলে মনে হয়। নিজেকে সে আশাহীন, উদ্দেশাহীন, প্রতিকারহীন প্রবাসীর মত, নির্বাসিতের মত দেখতে থাকে। দেশভূমি, জন্মভূমির সব পার্শ্ব তার মানসগত থেকে মুছে যায়, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়ভূমির আশাও তার মন থেকে লুপ্ত হয়। মানুষ এবং তার জীবন অভিনেতা এবং তার সেটিং-এর ভেতর এই যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় তাই থেকেই সৃষ্টি হয় এ্যাবসার্ডটির অননুভূতি।

এ্যাবসার্ড নাটক

- ১। কাহিনী এবং প্রচুর অভাব
- ২। চরিত্র বলতে কিছু নেই—যান্ত্রিক পটুলের সমাবেশ
- ৩। আদি অথবা অন্তের অভাব
- ৪। স্বপ্ন এবং ভয়াবহ নিশাস্বপ্ন প্রতিবিশ্বিত
- ৫। অর্থহীন সংলাপ

বিশিষ্টাব্ধিকৃতি হতে পারে। অন্যরা যখন ভাষা করেন, ভাষা ভাষা মিল হয় না।

এ্যাবসার্ডের কান

স্বপ্ন বলেছেন—“যে জগৎকে যুক্তি

[সমস্যা]

আকাশবাণী



পরিভ্রমণ

মেঘদূত

অনেকদিনের অনেক প্রেমের ফল ভাইকিটা গান শিখেছে। এক বন্ধু এসেছে, ভাইকির গান শুনতে চাইলো। সে গাইলো ‘আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী’। গান শেষ হতে বন্ধু ভাইকিকে উদ্দেশ্য করে বলল, গান তো ভালই হলো; তবে ওই ‘হেরে’-র জায়গাটার যে হেরে গেলে, ওটা হবে ‘হ্যারে’। ভাষাগুলো বেশ আশ্চর্য্যের সঙ্গে গার্জেনি মেজাজে বলা। কাকার বন্ধু যখন কবাবে না কেন।

থাকে না গেরে বলতে হলো, সে কি! তা তো নয়, ভাই।

বন্ধু মুচকি হেসে পকেট থেকে বার করলো ভাজ করা কোন এক প্রখ্যাত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের একখানা ছেড়া পাতা। বলল, দেখ, তোমার ভাইকির গলা সুস্বাদু হবে উচ্চারণে এসব ছুল না থাকলেই ছিল ভালো। আমি তো এই কদিন তিন-চার জনের উচ্চারণ শুধরে দিয়েছি আর প্রতিশ্রুতি করেছি কি অকাটা ব্যক্তি নাকের ডগায় কাঁপিয়ে ধরি—হ্যাঁ বাবা,—হাতে মগুর এসে গেছে আর ওস্তাদি করো না।

আমি ভয়ে-ময়ে কাগজখানা খুলে পড়তে লাগলাম, পড়া শেষ হলে ভাইকি জিজ্ঞেস করল, কাকু তাহলে—?

বললাম, তাহলে আবার কি?—যেমন আইছো, গাইবে।

দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যক্তি হচ্ছে, উচ্চারণে ‘হেরে’ নয় ‘হ্যারে’ এবং এই জ্বলে এই ক্রিয়াপদটি এইভাবেই উচ্চারিত হওয়া উচিত। এই ব্যক্তির ওপব নিজ-ব-শীল বন্ধুর তাই এত জোর।

তবে বেতারে যে-যে শিল্পী এই গানে উচ্চারণে ‘হেরে’ গেয়ে থাকেন তাঁরা নিছক উচ্চারণ করেন বলে মনে করি। রবীন্দ্র-জ্যেথের ব্যবহার রচনার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আদ্যকরে ‘এ’ উচ্চারণে ‘অ্যা’ হলে মন্থনে একর পাওয়া যাবে, মাত্রাহীনরূপে। জা ছাড়া এ এবং অ্যা সম্বন্ধে একটি নিয়মও আছে অবশ্য সে সম্পর্কে এখানে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। শব্দ-মাত্র মন্থিত গানগুলিতে আদ্যকরের চিহ্ন দুটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলেই যথেষ্ট। গীতবিতান, স্মরণবিতান থেকে ভাইকিকে প্রতীক দুটির পার্থক্য দেখিয়ে দিলাম যাতে তার মনে কোন সংশয় থেকে

না যায়। সুতরাং উচ্চারণ ‘হেরে’ না ‘হ্যারে’ কি হবে এ গবেষণা অবাস্তব। শব্দ শব্দ পাঠক প্রোভা এবং সর্বোপরি শিল্পীদের বিভ্রান্ত করা। এখানে গাফিলতি কার শিল্পীর না সংস্কৃতিঅভিমাত্রী সমালোচকের?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ সম্পর্কে দু’একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ২৫-৮-৬৬ এবং ৩১-৮-৬৭ এক বছরের ব্যবধানে বামা-কণ্ঠে দু’জন শিল্পী গাইলেন, ‘আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী’। আরো অনেকে এ-গানটি বেতারে গেয়েছেন এই সময়ের মধ্যে। তবে ওই শিল্পী দু’জন মেঘদূত বতদূর জানে শান্তিনিকেতনে গান শিখে-ছেন। দু’জনার উচ্চারণে পাওয়া গিয়েছিল ‘হেরে’। তবে ‘মন’ শব্দটি একজনার উচ্চারণে ‘মন’ এবং অপর জনার গানে ‘মোন’ রূপে পাওয়া যায়। কবি তাঁর শব্দভাণ্ডার প্রবল বলেছেন, ‘শব্দকর বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মধুশ্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী’ অকার ‘ও’ হইয়া যায়; যথা, ‘মন মন জন মন মণ গণ ক্ষণ।’ মনে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণে অথবা পরিবর্তন না ঘটানো প্রায়। উচ্চারণে রবীন্দ্রক এবং সর্বসম্মত হওয়া বিধেয়। রবীন্দ্রক বলতে মেঘদূত মনে করে, কবি উচ্চারণে যেমনটি চাইতেন। উচ্চারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের ‘জ’ এবং ‘ঙ’ সম্পর্কে আর একটু সতর্ক হলে কীত কি।

১-৭-৬৭ সকালে শ্রীলা সেন গাইলেন, ‘কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে’। তাঁর উচ্চারণেই ‘মনই’ তিনভাবে পাওয়া গেল : মন-ই, মনো-ই এবং মোনো-ই। যাদের কানে পার্থক্য ধরা পড়ে তাদের অনেক সময়ে একটু মাথা চুলকাতে হয়।

৩০-৭-৬৭ সকাল ১০টার কৃষ্ণ গৃহ-ঠাকুরতা গাইলেন, ‘আজ কিছতেই যার মা মনের ভার’ এ গানে অনাদ্য আছে, ‘বাদল-দিনের দীর্ঘম্বাসে’, ‘দীর্ঘম্বাস’ উচ্চারণে হবে দিরঘোশাশ। কিন্তু শিল্পীর উচ্চারণে পেলাম ‘দিরঘোশাশ’। বাঙালীর উচ্চারণে বানানের ‘ঈ’ হয়ে যায় ই’।

১০-৮-৬৭ সকালে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় গাইলেন, ‘কিছু বলব বলে এসেছিলাম’।

ওই গানের একাট কাল ‘মেঘ-ছেড়া’ আলো এসে.....’ শিল্পীর উচ্চারণে বেরিয়ে গেল ‘মেঘছেড়া’। অনুমানিক ধ্বনিটি মুছে গেল আর কি। অনুমানিক ধ্বনিগুলি সম্পর্কে বেতারশিল্পীদের সজাগ হতে অনুরোধ করি।

১৪-৯-৬৭ সকালে গাইলেন ঋতু গৃহ। তিনি গাইলেন, ‘প্রতিদিন আমি, হে জীবন-স্বামী’; তাঁর উচ্চারণে ‘তোমার বিচয় এ ভবসংসারে’ কানে শোনালো ‘ভবো-শংসার’ মত। আমরা কি ‘শংসার’ বলি? বলি—‘শোংসার’। বানানের অ উচ্চারণে যতদূর বখাখথ রাখাকে সাংস্কৃতিক উচ্চারণ বলে মনে করা বোধ হয় ঠিক হবে না। বাঙালার বানান এবং উচ্চারণ সর্বদা মেলে না, বানান উচ্চারণের গাইড নয়। উচ্চারণে অকারণ ক্রিয়মতা এসে গেলে গানের মধ্যে প্রাণের যে পরশ থাকে তা প্রোভাদের মরমে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন ক্রিয়ম আচার-ব্যবহার কি মনোজয়ী হতে পারে? ক্রিয়মতা নিজের চারদিক ছাপিয়ে শব্দে নিজেকে মনে করায়। কিন্তু সঙ্গীত তো তা নয়, সঙ্গীত যে আত্মসমর্পণের ব্যালাড।

জনৈক বন্ধুর মুখে শুনেছি, একদা কোন এক বিখ্যাত প্রবীণ গায়ক একটি সভায় গেয়েছিলেন,

মিলন রাতি পোহালো,

রাতি নেভার বেলা এল—

ফুলের পালা ফুরালো

ডালা উজাড় করে ফেলো।

শিল্পীর উচ্চারণে ‘ফেলো’ হয়ে গিয়েছিল ‘ফ্যালো’। সভার উপস্থিত একজন লক্ষ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সেদিন শিল্পীকে তাঁর উচ্চারণের ত্রুটিটি সংশোধন করে নিতে অনুরোধ করেছিলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে আবার বলা হবে। কথা-প্রধান সঙ্গীতে উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে একথা শিল্পী এবং সঙ্গীত-শিক্ষক সকলের জানা চাই। বিশুদ্ধ (অর্থাৎ standard colloquial) সম্মত উচ্চারণ করেন এমন কজন বেতার শিল্পীর নাম প্রকাশ করলে জানি না কেমন হবে। অন্তত মনে হয়, তাঁদের উচ্চারণ শুনে

অনেকে নিজেদের 'দুটিপদ' মনোভাব করে নিতে পারবেন। মেঘদূতের হাতে একটি তালিকা রয়েছে; পাঠক এবং শিল্পীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের নাম (পাঁচ জনের নাম ক্রমিক ধারায়) পাঠালে তা' সমস্ত গৃহীত হবে। দুটি তালিকাই আমরা 'আকাশবাণী-পরিচরমা'-র প্রকাশ করব।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে। একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে হয়েকরকম ভাষাতে মানে মানে গাওয়া হয়ে থাকে। গত তিন বছরের একখানি সংকলিত ডায়েরি যাকে আকাশবাণী প্রচারিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি প্রামাণিক নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারবে আমার কাছে আছে ডায়েরিখানি 'আকাশবাণী পরিচরমা'-র পাঠক-প্রোতা-শিল্পীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল।

অনেকে 'সজনি সজনি রাধিকা লো' এবং 'না সজনী না, আমি জানি' গান দুখানিতে 'সজনী'-র উচ্চারণ ঠিকমত করেন না। পাই হয় 'স' না হয় শকারস্ব উচ্চারণ। প্রথম গানটি পদ্যবলী চণ্ড-এ উচ্চারিত হওয়া বাঙালীর তাই উচ্চারণ হবে 'সজনী'। আর দ্বিতীয় গানে উটিটি উচ্চারিত হবে আধুনিক বাংলার মত, যেমন 'শজনী'। এখানে হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, আচ্ছা, পরে ইকার থাকলো কেন? শব্দধর্মের অ বানানে ও হোল না কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, 'সজনী' উটিটি মত পেনডানটিক আর কথা ভাবার একে পাওয়া যায় কি? আকাশবাণী প্রচারিত বিশ্বভারতীর একটি অনুষ্ঠানে (২৬-১১-৬৬) কোন এক মহিলা শিল্পীর কণ্ঠে দ্বিতীয় গানখানির উচ্চারণ নিম্নে হতে পেরেছিল।

মনে হচ্ছে, আবার সেই পুরোনো ভাষাটি ধরখানা ডাক দিয়েছে। ১৭-৯-১৯৬৭-র পুনশ্চ অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান' শোনানো হলো। সঙ্গীতিক-প্রতিভা, সায়র থেলা, শ্যামা ইত্যাদি করেখানা রেকর্ডের অংশ বাজল। যা অত্যন্ত আপছড়া আবোল-তাবোল শোনালো। পূর্বেও বলিছি আবার বলিছি, দোহাই, আমাদের সবই প্রায় যেতে বসেছে, হাতে আছে শব্দ রবীন্দ্রনাথ; সেটুকুও কেড়ে না নিলেই কি নর! এভাবে 'পুনশ্চ' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-তামাসা চললে আমাদের বুকে নিতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথকে 'লাসকাটা ঘরে' পাঠানো হবেই হবে। অনুষ্ঠান প্রযোজনা নিম্ন-স্তরের।

২০-৯-৬৭ মহিলামহলে শোনা গেল :

'লোকথমে' মেয়েরা! মনসামগল।
কথিকাটি পাঠের ভাষা সবোত্তম হয়েছিল।
বাংলার 'লোকথমে' একদিন যে বাঙালী সংস্কৃতির ওপর কত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং এই 'লোকথমে' রক্ষা পেরেছিল মেয়েদের হাতে—বহুব্যাক্ত বহু সুলভ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কথিকাটির পাঠ সাঙ্গ হলে লোকগীতির মাধ্যমে বেহুলার কাহিনী বর্ণনা শুনতে ভাল লাগছিল। শহরের 'ই'টের 'পরে' 'ই'ট-এর ফাঁক দিয়ে অতীতের মেঠো বাংলার জীবন হাতছানি দিচ্ছিল—কণিকের হলেও, এ সুযোগটুকু করে দেওয়ার জন্য মহিলামহলের কণ্ঠ-পক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

কাপালিন্দর, ২৪ পরগণা থেকে প্রীতভাস প্রামাণিক লিখছেন, গত ৪-৬-৭৪ তারিখের 'দার্শনিক বসুধাতী'-র আকাশবাণী-পরিচরমার মেঘদূতের মতামত পড়ে অত্যন্ত ভাল লাগল। তিনি যে আনন্দে অর্ধোচ্চ কণ্ঠে বলেন না তা' এই মতামত পড়েই জানলাম। এক্ষণে তিনি বলেছেন, "একালে পাই জনগণের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেতারাে দ্বিরিমে আনার লড়াই; অপরূপে দেখি অন্তত এক প্রেমীর কিশোর-বৃষকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা টিপে জলে-হাল্কা হিন্দী গানের প্রতি অহেতুক মোহ।" শব্দ এক প্রেমীর স্বকণ্ঠ-কিশোর কি? এক প্রেমীর স্বকণ্ঠ-কিশোরীও আছে। মাঝে মাঝে ভাবি শিল্পীর মান নিচেতে নেমে গেলে দেশের এই অবস্থা হয়। কিন্তু পূর্বে বাংলার শিল্পীর মান আমাদের তুলনায় এতই বা কি উচু? তবুও ভাষা তো আমাদের তুলনার অনেক বেশি নিজেদের ভাবকে ভালবাসে।.....

আটপুড়ে, ২৪ পরগণা থেকে প্রীতভাস-কান্তি লিখছেন, আকাশবাণীর আমলা-প্রাণিক কণ্ঠ-পক্ষের বিদ্যারকে মেঘদূত যেমন করে জনমতের জর বলে চিহ্নিত করেছেন তার সাথে আমি এ বিষয়ে একমত না হলেও, বাংলা দেশের একটি দৈনিক পত্রিকা তাঁর প্রতি যে কটাক্ষপাত করেছেন তা' কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ মেঘদূত "আকাশবাণী - পরিচরমা"-র অঙ্গলীল কাবানটিক প্রচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। আমরা সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আকাশবাণীতে এমন নাটক হারুশাই হয়, যখন নাটক দু'পুড়ে কিম্বা রাত্রি সপরিবারে বসে শোনা যেত না। যখন এ'র নাটক পরিবেশন করেন তখন মনে হয় সারা বাংলাদেশে কি গুটিকতক বিব্রীতবিবেক নাট্যকার ও উপন্যাসিক ছাড়া আর কেউ নেই? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি রেডিওতে অপারেশন? মানিক-

বাবুর কোন গল্প বা উপন্যাসের নাটক 'প রেডিওতে শুনছি কি-না তা' আমার মনে পড়ে না। কিন্তু ঘটনার ঠনক্কে প্রেমের নাটক প্রায় নিয়মিত শুন।

আকাশবাণী কণ্ঠ-পক্ষ তাঁদের প্রোতা-দের ক্ষতিশক্তির ওপর এত অবিশ্বাস করে বসে আছেন যে তাঁরা ভেবেছেন প্রোতাদের অনায়াসেই ধোঁকা দেওয়া যায়। না হলে হেমন্ত মনোপাধ্যায়ের ১৯৬৫ সালের ৬ই ডিসেম্বরের টেপ রেকর্ডটা ২৪-৯-৬৭ নিয়ে ঘোষ হয় ঝর-ঝর-সাত বাজানো হলো। এর আগে গত বছর 'ঘোষরা' নভেম্বর বাজানো হয়েছিল এটা মনে আছে। আকাশবাণীর কণ্ঠ-পক্ষের হেমন্ত মনো-পাধ্যায়ের নাম করে এমনতরো ধোঁকা দেবার কোন অর্থ হয় কি? আশা করি এ-ব্যাপারে মেঘদূত কিছু বলবেন।

মেঘদূত ইতিপূর্বে অনুষ্ঠানের শব্দ-কৃতির উল্লেখ করেছে। যতদূর মনে পড়ে, আকাশবাণী প্রচারিত বিশ্বভারতীর সর্ব-শেষ অনুষ্ঠানটি পূর্বের একটি অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি এবং তা' উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে। টেপ রেকর্ড বাজানো হলে গ্রানোফোন রেকর্ডের মত কোন প্রতীক চিহ্নের উল্লেখ থাকলে ভাল এবং ঘোষণাতেও তা' উল্লিখিত হলে বুঝির মিক থেকে বলার কিছু থাকে না।

২৭-৯-৬৭ সকাল ৬-৩০ মিঃ পিটার বাজনার অনুষ্ঠানের ঘোষণায় বলা হলো, পিটারে বাজানো হচ্ছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর'; দ্বিতীয়বারে বলা হলো 'লব্ধ সুর'। ঘোষণা কি 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর' এবং 'লব্ধ সুর'—এক ঘরানার বলে মনে করুন। ঘোষণা জেনে রাখুন রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি বিশিষ্ট স্কুল; ঘরানা বলতেই বা গির কি। আর যদি ঘোষণার আদানোযোগিতা বা অনামনস্কতার জন্যে এ ভুল হয়ে থাকে তা-ও অত্যন্ত বেদনার বলে প্রোতাদের মনে হবে।

(৩০।৯।৬৭)

লব্ধ লোক সবার প্রিয়

দীক্ষল চেহারা লাভ করুন
এবং আমাদের সম্পূর্ণ
বৈজ্ঞানিক প্রশালীতে চট-
পটে স্মার্ট দেখতে হউন
(স্মার্টেরকান পারিকেশন)
মূল্য ১০।৫০ ইংরাজীতে
অর্ডার পাঠান।



Tajco (India) (WBC-10)
P. Box 1383, Delhi-6.



রেডিওতে বিজ্ঞাপন

সিনেমা দেখতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণব্যাপী বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেই বিজ্ঞাপনের বিরতি থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক দর্শক বিজ্ঞাপন চলাকালীন বাইরে থাকেন; ছবি শুরু হতেই প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন। এ কারণে ছবির শুরুর্তে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। সিনেমায় গিয়ে এই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতালান্ধের পরে এবার ঘরে বসেও নিস্তার পাওয়া হবে না দেখছি—রেডিওর কল্যাণে। আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে রেডিওতে ব্যবসায়ীদের পণ্যের বিজ্ঞাপন শুরু হবে। সকাল, বিকাল, রাতি ভাগে ভাগে এই বিজ্ঞাপন শোনান হবে। সুতরাং কেউ যদি মনে করেন শুনবো না—তবে তাকে রেডিও বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিনেমায় গিয়ে দেখেন সুন্দরীর সাবান বিলাস, এখন রেডিওতে শুনবেন সাবানবিলাসের বর্ণনা। শ্রোতা যখন রাঁধনশ্রমিকের বাজনা বা তাঁর প্রিয় শিশুপীর সঙ্গীত শুনেন আনন্দে বিস্তার হয়ে উঠেছেন, গান থামতেই শুনলেন সাবান, লিপিস্টিক বা প্রসাধনীর গুণাবলী। তখন মধ্যাজটী কিরকম হতে পারে—ভাববার কথা।

রেডিওতে কমাশিয়াল বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ভারত সরকার সিংহাস্ত নিয়ে ফেলছেন। এতে বিলম্ব করা, দেশের সুখীসমাজের মতামত জানা তাঁরা উচিত করে করছেন না। কারণ এই বিজ্ঞাপন সরকারের অর্থভাণ্ডারে কিছু বাড়তি আয় এনে দেবে। আপাতত সরকার বোম্বাই, পুনা ও নাগপুর থেকে আরম্ভ করছেন, এবং বিবিধভারতীর সময়ের ১০ ডাগ অর্থাৎ প্রায় পঁচাত্তর মিনিট সময় এ কাজে লাগাবেন। তিন মাস পরীক্ষামূলক কাজ চালাবার পর সারা ভারতের রেডিও স্টেশনগুলি থেকে বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু হবে। নিশ্চিত মনে করা যায় যে তিন মাস পরে সব স্টেশন থেকে একাজ হবে, এই তিন মাসের সময় নেওয়া কেবলমাত্র ঠিকভাবে প্রচারকৌশল আয়ত্ত করার জন্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে. কে. শাহ বোম্বাইতে জানিয়েছেন এরূপ বিজ্ঞাপনের দ্বারা সরকারের আয় হবে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা; সারা ভারতে কাজ শুরু হলে বিজ্ঞাপন থেকে তাঁরা পাঁচ কোটি টাকা আয় করবেন। এই পাঁচ কোটি টাকার জন্য সরকার শিক্ষা ও চিন্তাবিনোদনের মাধ্যমকে পণ্য প্রচারের মাধ্যম করলেন। ভারতে পঁয়তাল্লিশ লক্ষের অধিক লাইসেন্স গ্রহণ করা রেডিওর গ্রাহক আছে। লাইসেন্সহীন রেডিওর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ বলে মনে করা হয়। সুতরাং ব্যবসায়ীরা রেডিওকে প্রচার মাধ্যম করতে পারলে আশা; এবং বড় ব্যবসায়ীদের একটা চাপ এর জন্য রয়েছে। তবে ছোট ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে হয়ত পারবেন না, কারণ এখানেও একচেটিয়া কারবারীদের প্রাধান্য থাকবে। একচেটিয়া কারবারীদের বিজ্ঞাপন এজেন্সীগুলিই এখানে দালালী করবে। রেডিওর মত প্রতিষ্ঠানও মনোপলির ধাবা থেকে রেহাই পেল না। যদিও বিজ্ঞাপনের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি রচিত হয়েছে, কিন্তু ফিল্ম সেন্সরকে যেমন বন্ধাঙ্গুষ্ট প্রদর্শন করে প্লাই, নাইটক্লাব, বিভিন্ন জাতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রবিরোধী ছবি ছাড়পত্র লাভ করে ভারতীয় দর্শকদের চিত্তবিনোদন করছে, তেমনি রেডিওর আচরণবিধিকে অগ্রাহ্য করা এমন কোন নতুন কথা হবে না। সরকারী বড় আমলাদের জাতির প্রতি কৃতবাজ্ঞান আমাদের জানা আছে, মনোপলি ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা সম্পর্কেও বহু নকচের কথা দিয়ে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। সুতরাং রেডিওর ভবিষ্যৎ ও আদর্শচর্চা সম্পর্কে এখনই প্রকাশ করলে অন্যায় হবে না।

কমে কমে রেডিওর শ্রোতারা অনেক বিজ্ঞাপন শুনতে পাবেন; সে বিজ্ঞাপন কি কেবল কাপড়, জামা, প্রসাধনে থাকবে? একালে আমাদের অনেক কিছতে টান পড়েছে, এবার রেডিও শোনার আনন্দ নিয়েও টানটানি। —সুজন।



সখ্য রায়

নাটকের কথা

মেঘ

প্রেক্ষাপট নামে এক নতুন আপেশাদার নাট্যসংস্থা গঠিত হয়েছে। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সকালে বিশ্বরূপা মঞ্চে 'মেঘ' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে একথা জানতে পারা গেছে। এই নবজাত নাট্যসংস্থা প্রথম নাটকভিনয়ে যে শক্তি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছে—তাতে নিঃসন্দেহে মলা চলে এই সংস্থা শহরের সহস্র সংস্থার মধ্যে কেবলমাত্র গাণিতিক সংখ্যা না বাড়িয়ে—একটি মধ্যার্থ নাট্যসংস্থারূপে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিশ্রুতি রেখেছে। আমরা এই নবজাত সংস্থাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'মেঘ' নাটকের লেখক উত্তপল দত্ত। একই নামে এই নাট্যবিষয় চলচ্চিত্ররূপ লাভ করেছে। ছবিটির বক্স অফিস সাফল্য না হলেও রসিকজনের প্রশংসা লাভ করেছিল। 'মেঘ' যদিও বহিরগণে অপরাধমূলক নাটক, আসলে মনোজগতের রহস্য-কাহিনী। এই রহস্য বিস্তার লাভ করেছে এক জনচিত্তবিনোদক কাহিনী লেখক সমরেশ ও তার পরিচিত জগৎকে কেন্দ্র করে। লেখক সহজে আর্থিক সাফল্যের জন্য অপরাধমূলক কাহিনীর প্লট বিস্তার করতে থাকে মনে মনে; এই কল্পনার সঙ্গে তার ব্যক্তিজীবন জড়িত হয়ে পড়ে, সে তখন শিকার হয় হ্যালুসিনেশন বা অলীক কল্পনার। তাহ

জীবিত জীবনের স্রষ্টা হয়ে সে তার বান্ধবী সৃজাতাকে খুন করে বসে, এবং এই খুন সীমলাবার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। খাপাটে জ্যোতির্বিদ তারাপদ ও তার শ্বশুরবৃদ্ধি পুত্র প্রণব এবং পুত্রিশ ইনস্পেক্টর প্রভৃতি চরিত্রগুলির উপস্থিতিতে কাহিনীর রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। চরম মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রহস্যজাল ছিন্ন হয়েছে সমরেশের দ্বিতী মাধুরীর সাহচর্যে।

সাধারণ মনস্তত্ত্ব ও রহস্যাবৃত এই কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কিছুটা শ্লেষ, কিছুটা ইঙ্গিত। গণজীবন ও সমাজের ভালমন্দ সম্পর্কের বাইরে থেকে যারা কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-বিলাসী ও ভাবজগতে বাস করে তারা সমাজকে যেমন কিছু ফিরিয়ে দিতে পারে না, নিজেদের জীবনেও দেখা দেয় শূন্যতা। এদের জীবনে চলে আলো-আধারীর লুকোচুরি। এই লুকোচুরি খেলার ওদের বাইরের জীবন এক, **অবহৃত জীবন** আর এক রকম। এই দুয়ের **ভাবসম্মত** রক্ষা করতে যখন পারে না তখন জীবন হয়ে ওঠে জটিল। নাটকটির এই মনস্তাত্ত্বিক বিস্তৃতি সেরগুপীর নাটকের মেজাজে গঠিত। তাই এখানে অভিনয় অন্যান্য আঙ্গিক অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অভিনয় সার্থকতার ওপর নির্ভর করেছে নাটকের সাফল্য।

আনন্দের কথা যে নাটকটি উপভোগ্য ও সফল হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য প্রথম প্রশংসনীয় পরিচালক সুনীল ব্যানার্জী। যদিও তিনি মূল চিত্রনাট্যের বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে সাধারণ অঙ্গীক রূপনার দিকে নাটককে পরিচালিত করেছেন, অর্থাৎ গোঁবাচ্ছক মেজাজে নাটক উপস্থিত করেন নি। কিন্তু এই সরল বিশ্লেষণ দর্শকরা গ্রহণ করেছেন এবং রস উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই দর্শকরা ছিলেন সর্ব।

সমরেশের চরিত্র নাটকের মেরুদণ্ডের মত। এই চরিত্রে সুনীল ব্যানার্জী যে অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর অভিনয়ে সেরগুপীর নাটকের মেজাজ সৃষ্টি হয়ে নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। সুনীল ব্যানার্জীর সাজ-সজ্জা ও বাচনভাষাতে উৎকল দস্তুর ইমেজ এসেছে, সম্ভবত তিনি ইচ্ছা করেই তা এনেছেন। এতে নাটকের আঙ্গিকে কোন-রূপ কৃত্রিমতা অনুভব করা যায় নি। বরঞ্চ তিনি যে শক্তিশালী অভিনেতা সেকথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ্যভাবে অভিনয় করে নাটকে রহস্য ঘনীভূত করে তুলেছেন সৃজাতার চরিত্রে সুদর্শনা শ্রীমতী সীমন্তিনী রায়। শ্রীমতী রায় যে শরিয়তী অভিনেত্রী এই



‘মেঘ’ নাটকে সৃজাতার ভূমিকায় সীমন্তিনী রায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ‘সহাস্রবতা’ ছবিতে তাকে একটি চরিত্রে দেখা বাবে।

চরিত্র-চিত্রণে তা উপলব্ধি করা গেছে। সন্নীর লাহড়ী (তারাপদ), অজয় শ্রীমানী (প্রণব) এবং গোপাল দত্ত (ইনস্পেক্টর) যথাযথ অভিনয় করেছেন, তবে প্রথমোক্ত দু’জন একটু মোটা দাগে। মাধুরীর চরিত্রে শ্রীমতী নলিনী দে প্রথমে আড়ষ্ট ছিলেন—পরে সামলে নিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—সত্য চৌধুরী ও স্বাধাচরণ ঘোষাল। দলগত অভিনয়ের সার্থকতার নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মণ্ডপরিচালনা, আলো, শব্দক্ষেপণ ও সঙ্গীত নাটকের রসোত্তীর্ণতার সহায়ক হয়েছে এবং শিল্পরূচির পরিচয় রয়েছে।

খিয়েটার ওয়াকশপ

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে খিয়েটার ওয়াকশপ নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা।

এক বছরের মধ্যেই তিনটি নাটক ললিত, জংলী ও ভিয়েতনাম মঞ্চস্থ করেছে। আগামী অক্টোবরে খিয়েটার ওয়াকশপের নবতম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা ‘ছায়ার আলোয়’ মঞ্চস্থ হবে। নাটকটি প্রখ্যাত আইকিন নাট্যকার শন ও কেসীর ‘জুনো গ্র্যান্ড ও পেকক’ অনুসরণে রচিত। প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছেন : মারা ঘোষ, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মধোপাধ্যায়, তাপসী গুহ, অরুণ ঘটক, অমর সরকার, অজিত সরকার, দীপঙ্কর ধর, বিমলেন্দু ঘোষ, মণিক রায়চৌধুরী, লক্ষ্মী মন্ডল, মহেশ সিংহ, সৌরেশ দত্ত, নিমাই ঘোষ ও সত্যেন্দ্র বিশ্বাস। মণ্ডলী : বিমল চক্রবর্তী, স্বরূপ মন্ডল-পাধ্যায় ও শক্তি সেন।

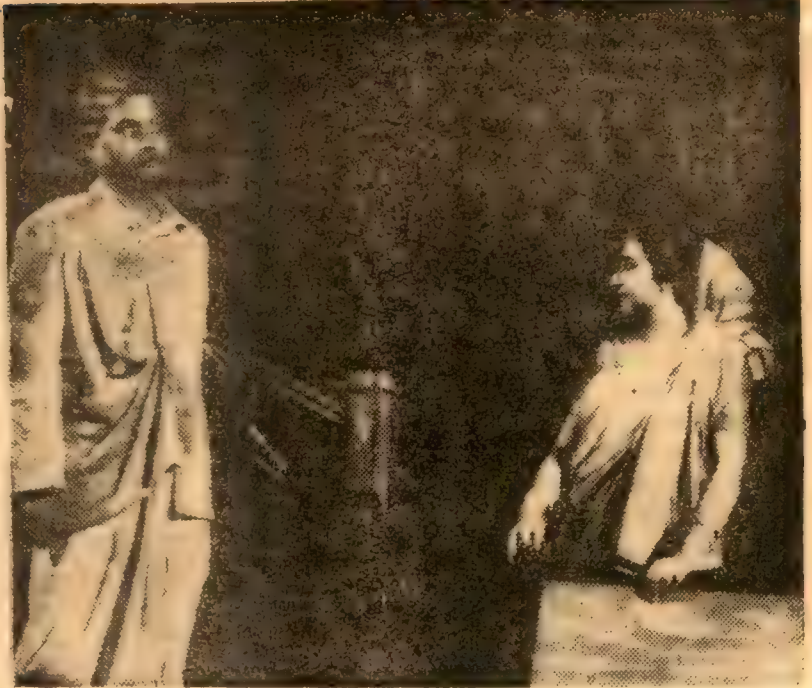
স্টুডিও থাট

পলাতক ও বালিকা বধূ

‘পলাতক’ ও ‘বালিকা বধূ’ হিন্দীতে সুপরিচিত হচ্ছে। পলাতক-এর হিন্দী নাম হয়েছে ‘রাহ-গির’। ছবিটির সঙ্গীত প্রযোজক হয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী ও তরুণ মজুমদার, গীতাজলি-চন্দ্রদীপ প্রতিষ্ঠানের নামে। বোম্বাইতে ইতিমধ্যে ‘রাহ-গির’-এর চারটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করছেন : বিশ্বজিত, সন্ধ্যা রায়, শশিকলা, নিরুপা রায়, কানাইলাল, কুমারী গঙ্গা।

ছবিগার

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হিন্দুস্থান ফিল্ম লিঃ-এর প্রধান প্রযোজক ডাঃ নীহার-রঞ্জন গুপ্তের লেখা “ছবিগার” শব্দ-মহরৎ ক্যালকাটা স্টুডিওতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উল-



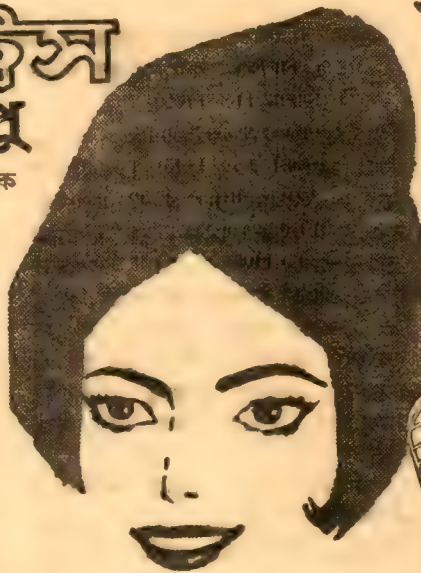
লেক-এর একটি দৃশ্যে নমীর ব্যাহিতী, নাসিমতা দে

লকে বহু নামী পরিচালক ও শিল্পী উপস্থিত হয়েছিলেন। যথাক্রমে সর্বশ্রী

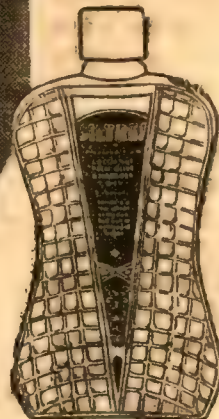
প্রাদেবকীকুমার বসু, ক্র্যাগস্টিক মোনা তরুণ মজুমদার, অজয় কর, সুবোধ মিত্র

সিলট্রেস শ্যাম্পু

সিলট্রেস শ্যাম্পুতে থাকে ছ’ বরকমের অকৃত্রিম তেল। কেন? না, ভাল শ্যাম্পুতে মাথা ঘষা ছাড়াও চুলের যত্নোচিত যত্ন নেওয়ার উপাদান থাকে দরকার।



আপনার চুলের যত্ন নিন—সিলট্রেস শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। নারিকেল আর নিম—এই দুটি পুষ্ক অকৃত্রিম তেলে তৈরী সিলট্রেসে বেথতে বেথতে অচূর মিতকর স্নেহ হয় এবং ধূলোময়লা আর খুশকি দূর হয়ে যায়। সিলট্রেস ব্যবহার করলে আপনার চুল বাহারে আরুণে বলবল করে উঠবে।



সিলট্রেস শ্যাম্পু

সুন্দর রেশমী কোমল কুন্তলের জন্যে

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল
কোঃ লিঃ

CTC-2 BEN,



ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ারের সঙ্গীত পরিবেশন

মান্দ সেন ও সত্যজিৎ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব

নিরেছেন শ্রীসুনীল ব্যানার্জী, সঙ্গীতে আছেন নচিকেতা বোষ। উত্তমকুমারকে এবারে নায়িকা অনুজার বিপরীতে মৈত্রেয় জমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে।

শিবেন মজুমদার, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সবিভা চৌধুরী ও সলিল চৌধুরী প্রমুখের অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর রেকর্ডিং রুমে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়ুথ কয়ারের পক্ষ থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ঘোষণা করেছেন। অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরী রচিত গণমাটের গান ও স্বাধীনভোক্তারকালে জনপ্রিয় ফিল্মী গান পরিবেশিত হবে যাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি ও লোকনৃত্যের সমন্বয় হইবে। লোকনৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অসিত চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদিকা

ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার

এন, ওয়াই, সি বা ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী ৭ই অক্টোবর রবীন্দ্র সঙ্গনে এই সংস্থা কয়ার রীতিতে সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান করছেন। এই অনুষ্ঠানে চম্পকজেন সঙ্গীতশিল্পী ও বারজন নৃত্যশিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন। সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে কয়ার গীতিতে হেমন্ত মজুমদারী, সূচিমা মিত্র, শ্যামল মিত্র,

ভারতের কয়ার রীতিতে সঙ্গীত পরিবেশন গণনাট্য আন্দোলনের এক বিশেষ অবদান। সারা ভারতের আঞ্চলিক লোকগীতিসমূহকে সমবেত কণ্ঠে সিন্ধু-ফনি সঙ্গীতের রীতিতে পরিবেশন ইয়ুথ কয়ারের বৈশিষ্ট্য। কয়ারের সূচনা গীটার সমবেত সঙ্গীতে—কিন্তু ক্রমে এই রীতি কমিউনিস্ট বা শ্রমসঙ্গীতে রূপ গ্রহণ করে। ভারতে এই রীতিকে গণনাট্য সঙ্গ গ্রহণ করেছে।

কুমারেশ
লিভার ও পেটের
পীড়ায়

সালফা-ডারমিন

কাটা পোড়া
ব্রণ ও চর্মরোগে

রেসপেরোসিন
সর্দি ও কাশিতে

ও-আর.সি.এল. হাওড়া-৬

সঙ্গীত কথা

খিদিরপুর সঙ্গীতালোক

কৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় বালী কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে উত্তরপাড়া লাইব্রেরী হলে এক লব্ধ সঙ্গীতের আসর বসে। এই আসরে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত টম্পা গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক। এই অনুষ্ঠানে ত্রৈমাসিক আবিবেশনের এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এককজন শিল্পীর গান সঞ্চালের প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের মধ্যে ছয় বৎসর বয়স্ক শিল্পী শ্রীবাবুল কুন্ড, বরুণ ভট্টাচার্য, মিতালী গাঙ্গুলী, তপন মধুশোপাধ্যায়। এ ছাড়া আরও বারান সঙ্গীতরঞ্জে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সর্বাঙ্গী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক ভট্টাচার্য, সর্বাঙ্গীতা মধুশোপাধ্যায়, চন্দ্রা মধুশোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ্ত রায়, ইইসাবেলা দাস, কুমকুম বেনেয়াপাধ্যায়, উত্তমারানী চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সরকার, পুণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য অংশগ্রহণ করে সীমা রায় ও অরুণী বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও পরিচালনায় ছিলেন শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী, ভগবতীশঙ্কর ঘোষ ও অরবিন্দ সিংহ।

খিদিরপুর সঙ্গীতালোক গোষ্ঠী গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে বালী গানের কর্ম-বিকাশ (গীতিত আলোচনা) ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে "পদ্মিনী" নৃত্যনাট্যের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। স্থানীয় ও সংস্থা-অন্তর্ভুক্ত খালিকারা নৃত্যনাট্যকার শ্রীবি বিশ্ববাসের পরি-কল্পনায় এবং সন্দীপ্ত ও নৃত্যপরিচালক শ্রীযোগেন নারায়ণের পরিচালনায় নৃত্যের মাধ্যমে কে স্বকৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। সন্দীপ্ত গায়ক শ্রীঅরুণ দত্তের পরি-চালনায় বালীর পক্ষি ও কবিবিলাসের রচিত গানগুলি বালী গানের কর্মবিকাশ (গীতিত আলোচনা) সন্মুখরভাবে পরিবেশিত হয়। শ্রীদেবপ্রসাদ মধুশোপাধ্যায়ের গ্রন্থনায় আরো প্রাপকৃত হয়ে ওঠে।

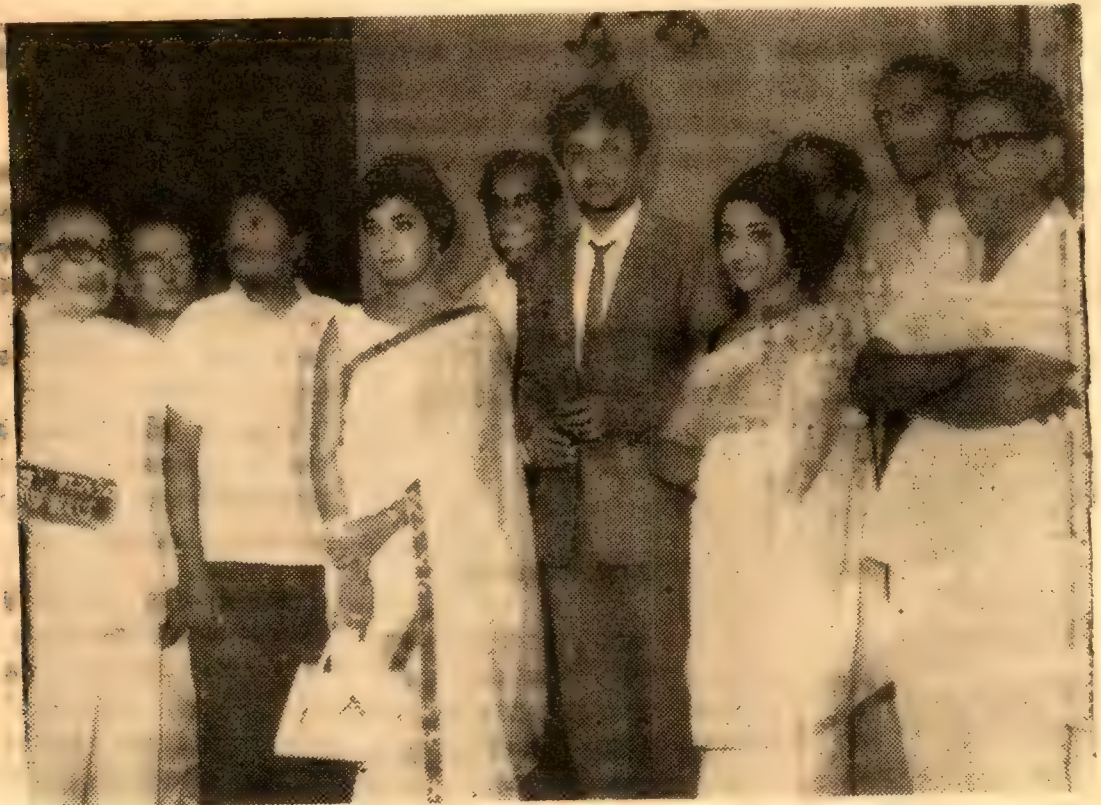
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি "খিদিরপুর সঙ্গীতালোক"-এর কর্মবৃন্দের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন যে, এই জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দেশের প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

"খিদিরপুর সঙ্গীতালোক" যে গীতিত আলোচনা ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন উপস্থিত সকল শ্রোতা ও দর্শকই তার গুণগান করেন।

পরিশেষে সাধারণ সম্পাদক শ্রীতুবান বসু সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

আমন্ত্রণ

বঙ্গের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা কল্লোল-এর আমন্ত্রণে বঙ্গের মুকাদিমতা শ্রীযোগেশ দত্ত ও আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমানবেন্দ্র মধুশোপাধ্যায় এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমদ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৮ই অক্টোবর ৬৭ বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করবেন। কল্লোলের অনু-ষ্ঠানের পর শ্রীদত্ত আরো কয়েকটি স্থানে একক মুকাদিমের পরিবেশন করবেন। পরিশেষে তিনি দিল্লী ও এলাহাবাদে অংশ গ্রহণ করবেন।



খিদিরপুর-এর শ্রুত মহরং উপলক্ষে কালিকাটা মিউজিওতে 'হিন্দুস্থানী ফিল্মসের' এস, বোস, প্রযোজক সন্দীপ্ত মধুশোপাধ্যায় নবাগতা জাতীয় বিজয় ঘোষ, উজ্জয়কুমার, ডেইলী ইরানী, নটিকতা ঘোষ, পরিচালক সন্দীপ্ত মধুশোপাধ্যায় ও কাহিনীকার ডাঃ নীহাররঞ্জন দত্ত।



যে এন আর-এর দীপক দাসকে ইস্টবেঙ্গলের সারমাদ বার পায়ের ওপর থেকে বল ফুলে নিয়ে একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে।

ফাইনালে দুই প্রধান

দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছে শীল্ডের ফাইনালে। ১৯৬৭ সালের লীগ ফুটবলের শূন্য ভাগ্যকে পূর্ণ করার জন্য ফাইনালে মোহন-বাগান আর ইস্টবেঙ্গল লড়বে। এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে মোহনবাগান ফাইনালে উঠেছে একদিক থেকে, আর অন্যদিক থেকে ময়দানের ডব্লিউ হর্স বি, এন, রেলকে পরাস্ত করে ইস্টবেঙ্গল হাজির। মোহন-বাগান এ পর্যন্ত শীল্ডের ফাইনালে উন্নীত হয়েছে মোট উনিশ বার এবং তার মধ্যে বিজয়ী আটবার। আর ইস্টবেঙ্গল মোট বোলবার উপনীত হয়েছে আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনালে এবং ন'বার শীল্ড-বিজয়ী হয়েছে।

মহামেডান-রাজস্বান খেলায় মাঠে হালগামার পর কয়েকদিন বিরতি এবং শেষে বি, এন, রেল-ইস্টার্ন রেলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা দিয়ে আবার আই-এফ-এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়। দুই রেলের প্রথম দিনের খেলা ৩-০ গোলে অসমীয়াসিতভাবে শেষ হয়। প্রথমে দুটি গোল দিয়ে অগ্রগামী থেকেও শেষে ৩-০ গোলে খেলা জ্ব করতে বাধ্য হয় ইস্টার্ন রেল। ফিরতি খেলার বি, এন,

রেল জয়ী হয় ২-০ গোলে। প্রথমার্ধে কিন্তু ফলাফল ছিল গোলশূন্য।

মহামেডান-রাজস্বানের ফিরতি খেলা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। অবশ্য দক্ষিণ এবং সরলকদর অসন্তোষের কোন কারণই ঘটে নি, কারণ মহামেডান একটা-দুটো নয় একেবারে চার-চারটে গোল দিয়ে দেয়। মহামেডানের আক্রমণভাগের প্রচণ্ড চাপে রাজস্বানের রক্ষণভাগ একেবারে ভেঙে

প্রীতিমিত্রতা

পড়ে। এইদিন রেফারী শ্রীমসিংহ চ্যাটার্জী প্রশংসনীয়ভাবে খেলাটি পরিচালনা করেন।

মরশুমের অপরাধিত দল লীগ বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে মোহনবাগান পরাজিত করে ১-০ গোলের ব্যবধানে। কিন্তু গোলের সংখ্যা দেখে প্রাধান্যকে বিচার করলে ভুল হবে। এইদিন মোহন-বাগান খেলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। চমু গোস্বামীর অনবদ্য ক্রীড়াধারা এখনও এই কথাই পরিচয় দেয় যে মোহন-বাগান দলের পক্ষে এখনও তিনি অগরি-হার্য। সত্যি কথা বলতে কি মোহনবাগান দলগতভাবে এইদিন সুন্দর ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করে। গোলে বহুদিন পরে আবার

প্রদত্ত বর্মণ খেলতে নামেন। বর্মণের দোষে দু'বার মহামেডান সুন্দর গোলের সুযোগ লাভ করে। মোহনবাগানের বর্ত-মান নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষক কমল সরকার পাজাব পুলিশের বিপক্ষে আহত হওয়ার মাঠে নামতে পারেন নি। ফাইনালেও কমলের পক্ষে খেলা বোধ হয় সম্ভব হবে না, কারণ ডাক্তার বর্তমানে তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। এইদিন মোহন-বাগানের রক্ষণভাগের বোলোরাডুয়া সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন এবং পুরোভাগে

‘গুলাবি চ’।

তাজা ও সেরা। একবার
থিয়ে দেখুন।

৪৫নং ক্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের
পথ)।

সমান ভালে বিপক্ষ গোলে হানা দিয়েছে। কামন বিরতির পর পি, গ্যাংগুলীর পরিবর্তে খেলতে নামেন। বহুদিন পর কামন আবার মাঠে নামলেন। অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন তাঁকে খেলার মাঠের দূরে থাকতে হয়েছিল। দিনের সহজতম সুযোগে অপচয় করেন কামন গোলের বাইরে স্ট্র মেরে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে। অবশ্য খেলা হবার মাত্র চার মিনিট পূর্বে দলের একমাত্র বিজয়সূচক গোল করে তিনি দলকে ফাইনালে উন্নীত করেন।

ফাইনালে ওভার পথে ইন্সটেব্গলস বি, এন, রেলকে পরাজিত করে ৫-০ গোলে। ইন্সটেব্গলের অতিবড় সমর্থকও বোধ হয় এইদিন ভাবতে পারেন নি যে ময়দান ফুটবলের অন্যতম শক্তি বি, এন, রেলের এই শোচনীয় পরাজয় ঘটবে। বি, এন, রেলের পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী গোলরক্ষক দীপক দাস। দীপক দাস শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়েছেন গোলে দাঁড়িয়ে আর একের পর এক গোল খেয়েছেন। অবশ্য ইন্সটেব্গলের পুরো-ভাগ এদিন সুন্দর ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করেছেন, বিশেষত উল্লেখযোগ্য হল তাঁদের দ্রুতগতিতে আক্রমণধারা রচনার প্রয়াস। খেলার শব্দ থেকেই আক্রমণ চালিয়ে ইন্সটেব্গল প্রথম গোল করে প্রথমার্ধের ত্রিশ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে। পরিমল দে জোরালো সটে প্রথম গোলটি করেন। দশ মিনিট বাদেই প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে মাটিঘেঁষা সটে মৌলিক করে দ্বিতীয় গোল। দ্বিতীয়ার্ধে ইন্সটেব্গলের আক্রমণের চাপে ভেঙে পড়ে বি, এন, রেলের আক্রমণভাগ। পরের তিনটি গোল করেন সারমাদ, শর্মা এবং অসীম মৌলিক। এই পরাজয় বোধ হয় বি, এন, রেলের ইদানীংকালের অন্যতম শোচনীয় পরাজয় এবং শীল্ডের সেমি-ফাইনালে ৫-০ গোলে জয় ইন্সটেব্গলের স্মরণীয় বিজয়।

খেলার ফলাফল:

কোয়ার্টার ফাইনাল:

মহামেডান স্পোর্টিং	০, ৪
বি, এন, রেল	০, ২

সেমি-ফাইনাল:

মোহনবাগান	১
ইন্সটেব্গল	৫

কলকাতায় এবার পূর্বাঞ্চল বিশ্ব-বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য খেলায় যাদবপুর এবং বিহার দলের মধ্যে খেলা হবার কথা ছিল। কিন্তু বিহার দল এসে উপস্থিত না হওয়ায় যাদবপুর ওরাক ওভার লাভ করে। পরবর্তী দৃষ্টি খেলাতেও ওরাক ওভার লাভ করেছে বেনারস এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়। এদের বিপক্ষে পাটনা এবং ভাগল-



মাজেন সান্যাল

পুর বিশ্ববিদ্যালয় দল মাঠে আসেন নি। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সময়ের এক সিদ্ধান্তে শুবই সপ্তকে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে এ বছর চাকুরে কোন ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলতে পারবে না। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই চাকুরে। ফলে নতুন করে দল গঠনের তোড়জোড় করতে হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। গত চার বছরের সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ অক্ষয় রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কটকে জাতীয় ফুটবলের সন্তোদ ড্রাফট খেলা শব্দ হচ্ছে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে। উড়িষ্যার সর্বপ্রথম এই সন্তোদ ট্রাফট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। উড়িষ্যা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং প্রস্তুতিপর্বও শেষ হয়েছে।

এ বছরের প্রতিযোগিতায় মোট ঊনিশটি রাজ্য অংশ গ্রহণ করবে। খেলোয়াড়সহ প্রায় চারশ জন অতিথি কটকে উপস্থিত থাকবেন। খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বরবাটি স্টেডিয়ামে। গ্যালারী ঘরে। খেলাগুলিও অনুষ্ঠিত হবে এই বরবাটি স্টেডিয়ামেই এবং প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শব্দ প্রচেষ্টা

আগামী ক্রিকেট মরশুমে প্রথম ডিভিশনের খেলাগুলি দু'দিন করে অনুষ্ঠিত হবে। ক্রিকেট অনুরাগী মহলে সি-এ-বি'র এই নব প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে নানান ব্যাপ্তি-প্রতিবাদে ঢেউ উঠেছে। কিন্তু আমার মনে হয় অন্তত বাংলার ক্রিকেটের মঙ্গলের জন্য সি-এ-বি'র এই নব প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। দু'দিন করে লীগের খেলা চালু করার পেছনে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে পরিচিত শ্রী এম. দত্তরায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকারও প্রশংসা করতে হয়।

এতদিন আমাদের ক্রিকেট লীগের খেলাগুলি ছিল একদিনের, ফলে এক ইনিংসের এই খেলা বেশির ভাগ সময় হু হুত। অনেক ক্লাব আবার পুরোপুরি রক্ষণাত্মক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামত। সব বোলাররা বেশির ভাগ সময় নিজেদের কুশলতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতেন না আর শেষ দিকের ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করার সুযোগ পেলে অপার সৌভাগ্য মনে করতেন। কিন্তু এই মরশুমে দু'দিনের খেলায় দুই ইনিংসে দলের বোলাররা বল করতে পারবেন উল্লেখযোগ্যভাবে এবং সকলেই অন্তত বাটিং ক্রীজে দাঁড়িবার সুযোগ পাবেন ব্যাট হাতে।

লীগের খেলা দু'দিন করে অনুষ্ঠিত হলে ময়দানের প্রথম ডিভিশনের বেশ কিছুসংখ্যক দল অবশ্য একটু অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। অন্যান্য বারের মত, প্রীতি খেলার অংশ গ্রহণ করা একটু মুস্কিলই হবে এই সব দলের পক্ষে। কারণ আর্থিক দিকের কথা প্রধান চিন্তার



মহামেদান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান দলের আই-এফ-এ শীল্ডের খেলায় দু'দল গোলাবর্মীকে বল দিয়ে এগুতে দেখা যাচ্ছে।

বিষয়। ময়দানের প্রথম ডিভিশনের দলের সংখ্যা একেবারে কম নয়। দু'টিমের দল ছাড়া অন্য সব দলগুলির মরশুম কাটে খুবই টানটানিতে। বর্তমানে এই দু'ম'লের বাজারে লাগের আয়োজন করা ছোট দলগুলিকে ক্রিকেট সপ্তকের সম্পাদন করবে।

চাকুরে খেলোয়াড়রা এতদিন লীগের খেলা রবিবারে বা ছুটির দিনে হওয়ায় বিনা বাধাতেই কাটিয়েছেন, কিন্তু এ বছর প্রথম ডিভিশন লীগে অন্তত একটা দিনের সমস্যা কাটান চাকুরে খেলোয়াড়দের পক্ষে মুশকিল হবে। আর কলকাতা ময়দানে খাঁদের সংখ্যা উপেক্ষা করার মত নয়।

যাই হোক নতুন নিয়মের ফলে এ বছর শুধুমাত্র প্রথম ডিভিশনের লীগের খেলাগুলি দু'দিন করে অনুষ্ঠিত হবে। খেলা হবে দু'টি ইনিংসের এবং খেলা ছয় গেলে প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী দল পাঁচ পয়েন্ট এবং অন্য দল তিন পয়েন্ট। দু'খের বিষয় যে লীগে ওঠা-নামা কিন্তু ভাল থাকবে।

পূর্বাঞ্চল ক্রিকেট দল

মজীপ গ্রীষ্মে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে খেলার জন্য পূর্বাঞ্চল দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক করছেন বিহারের রাজেন সান্যাল। বাংলার টেস্ট খেলোয়াড় সুরভ গহে দলের সঙ্গে যেতে পারছেন না কারণ

হাটুতে অগারেশনের পর বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। স্টেটব্যাঙ্কের কোন খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয় নি কারণ, আমেদাবাদে আঞ্চলিক স্টেটব্যাঙ্ক প্রতিযোগিতার জন্য স্টেটব্যাঙ্কের খেলোয়াড়েরা সেখানে থাকবেন পূর্বাঞ্চলের খেলার সময়। দিল্লীতে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে খেলা শুরু হচ্ছে ৬ই অক্টোবর থেকে।

পূর্বাঞ্চল দলে আছেন:

রাজেন সান্যাল (বিহার) অধিনায়ক;
শ্যামসুন্দর মিত্র, অম্বর রায়, পি, সি.
গোন্দার, দীপঙ্কর সরকার, দেব মদ্যার্জী,

রসী জিজিরে, এম, নাম, জীবন ঘোষ (বাংলা); রমেশ সারেনা, আনন্দ শূক্লা, দলজিৎ সিং এবং চৌহান (বিহার); এম, পি, বড়ুয়া (আসাম) এবং অশোক জেনা (উড়িষ্যা)।

প্রাক্ অলিম্পিক হকি

প্রাক্ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা শুরুর হচ্ছে লন্ডনে আগামী ১৪ই অক্টোবর থেকে। ১৯৬৮ সালের মেরিকো অলিম্পিকের পূর্বে শক্তি পরীক্ষার জন্য এবং প্রস্তুত হবার জন্য এই প্রতিযোগিতার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অংশ গ্রহণ করবে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলের অধিনায়ক করছেন বাংলার পূর্ববঙ্গ সিং এবং সহ-অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন ভারতসেনের শাকর লক্ষণ।

জনারণ্যে ইডেন উদ্যানে অথ ক্রীটবল

জনারণ্যে ইডেন উদ্যানে শনিবারের বার বেলায় ময়দানী ফুটবলের যে হাল দেখা গেলো, তা শুরু অভাবনীয় নয় দর্শকদের একেবারে নাজেহাল করে তুলেছিলো। ময়দানী ফুটবলের সব চেয়ে বড় আসর আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা আবার নতুন করে বাতাবী লেবুর বলে খেলার কথা মনে পাড়িয়ে দিলো আমায়! কিন্তু দু'খের বিষয় খেলা-না-খেলা এ খেলে-খেলায় চলচ্চিত্রই নাকি এবার বাংলাদেশের স্কুলে স্কুলে ক্রীটবল খেলার উত্তির জন্যে দেখানো হবে।

মাঝ মাঠে বস রেখে আর অমীমাংসাকে কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ মন্বই মিনিট ধরে একটানা আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে দর্শকদের স্নায়ু দুর্বল করে তুলেছিলেন দু'দলের খেলোয়াড়রা। যেমন ছিলো মাঠের অবস্থা তেমনি ছিলো খেলার ধারা। সেই সঙ্গে ছিলো

বি, সি, যাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং
করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :- ৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কালি-১২। ফোন : ০৪-০১৭০
৩, রামচন্দ্রান পাল কলন, কালি-১২। কার্জন-ফোন-০৪-৪৮৪৬

বহিরাগত রেফারীর কোন রিস্ক না নিয়ে
খেলা পরিচালনা করার ঐকান্তিক ইচ্ছার
কসল—শুধু ফাউল আর ফাউল!

বিক্রমাদিত্য দেবনাথ

ভারতীয় ফুটবলঙ্গনের অবহেলিত
খেলোয়াড় বিক্রমাদিত্য দেবনাথ! দেবনাথ
অবহেলিত হতে পারেন, কিন্তু অবলুপ্ত
তিনি নন। তার প্রমাণ এখনো দৈনিক
বসুমতীর পুরোন সংখ্যাগুলোর পাতায়
পাতায় ভরা।

গত বছর ভারতীয় দলে স্থান লাভ
করতে পারেন নি দেবনাথ। অথচ যোগ্য-
তার মাপকাঠিতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়
তালিকার সবার আগে ওঠা উচিত ছিলো
দেবনাথের নাম! কিন্তু কি এক অজ্ঞাত
কারণে বাদ পড়লেন দেবনাথ। ভারতীয়
ফুটবল দলে স্থান হলো না তাঁর।

আর তারই প্রতিবাদে ফুটবলরসিক
মহলে উঠলো ঝড়! কিন্তু সে ঝড়ে
বিশাল বটবৃক্ষের মতো শক্তিশালী ভার-
তীয় ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষরা নুয়ে পড়েন না।
গণতন্ত্রের দেশের খেলার মাঠে এমন গণ-
তান্ত্রিক অপমৃত্যুর তুলনা মেলা ভার!
ভর্য দৈনিক বসুমতীর পুরোন সংখ্যা-
গুলোর পাতায় পাতায় এখনো আছে
দেবনাথের অভাবনীয় জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর।

দেবনাথের এই জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে তাঁর আন্তরিকতায় ভরা ক্রীড়া-
নিপুণ্য।

খেটে খেলেন দেবনাথ। দলের
স্বার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রাণান্ত পরিশ্রম
করেন জয়লাভের জন্যে। শুধু মাত্র পরি-
শ্রমই নয়! দেবনাথের খেলায় আছে অশ্রুত
আত্মবিশ্বাস! আর তার সংগে মিলে
মিশে একাকার হয়ে আছে সূতীর আক্রমণী
মনোভাব। এগিয়ে যাবার আকুল স্পৃহা।

তবে এগিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য
দেবনাথের আছে। অফুরন্ত দমের সংগে
দেবনাথের আছে চূড়ান্ত গতি আর পায়ের
আছে জোরালো সট!

খেলোয়াড়ী চেহারা দেবনাথের—না
মোটা, না রোগা। শরীর মাঝারিমানার
জ্যো সীমাবদ্ধ হলে কি হবে, পায়ে তার
অসীম শক্তি! আর সেই শক্তিই ফুটবল
খেলোয়াড়দের প্রেরণার মূল উৎস।

ইছামতী যেখানে বাঁক খেয়ে সুন্দর-
স্থানের দিকে নেমে চলেছে, সেখানেই ছোট
সুন্দর সাতাখিরে। ছোটবেলায় সাতাখিরেকে

পরিচিয়ত্তে

আমরা চিনতাম কাঁচাগোজার জন্যে।
আমাদের টাকীর বাড়িতে সাতাখিরের
কাঁচাগোজা প্রায়ই আসতো! আজো মৃধে
লেগে আছে সেই স্মৃতি।

সাতাখিরের কাঁচাগোজার লোভে
আমাদের যখন জ্ববে জল আসতো, ঠিক

শান্তিপ্রিয় বঙ্গোপাধ্যায়

তখনই সাতাখিরের একটি ছেলে বাতাবি-
লেবু কিস্বা রাবারের বল পায় নিয়ে স্বপ্ন
দেখতো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। স্বপ্ন



বিক্রমাদিত্য দেবনাথ

দেখতো নামী ফুটবল খেলোয়াড় হবার!
হঠাৎ অস্বাচিতভাবে সাতাখিরে ছাড়ার
ছাড়পত্র এসে গেলো! রাজনৈতিক দাবার
চালে একটা দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো
হয়ে গেলো। যতোদূর জানি দেবনাথ
পরিবার সাতাখিরে ছেড়ে এসে ঘর বেঁধে-
ছিলেন বসিরহাটে।

তারপর স্কুল-কলেজের আঙিনায়—
বছরগুলো যেন চলে গেলো বড় তাড়াতাড়ি।
সাতাখিরে স্কুলের ছেলে বিক্রমাদিত্য হলো

কলকাতার কলেজ দলের ফুটবল
অধিনায়ক!

ওদিকে বেনেটোলায় খেলছেন তখন
দেবনাথ। বেনেটোলা থেকে ১৯৫৭ সালে
দেবনাথ এলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। ঘেরা
মাঠে আর প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র
পেলেন তিনি!

লেখা-পড়াতেও পিছিয়ে নেই
দেবনাথ! গ্র্যাজুয়েট হবার পর ইতিহাসের
ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখালেন
তিনি। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত
দেবনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের
প্রতিনিধিত্ব করলেন।

১৯৫৯ সালে ইন্সট্রু মেন্টে চলে
এলেন দেবনাথ। সেখান থেকে এলেন
খিদিরপুরে। আর খিদিরপুরে খেলার
সময়ই দেবনাথের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ
প্রশস্ত হলো!

খিদিরপুরে একটা বছর কাটিয়ে
দেবনাথ চলে এলেন ইন্সট্রু মেন্টে।
১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত
ইন্সট্রু মেন্টে খেলার পর মোহনবাগানের
আহবানে ১৯৬৪ সালে ইন্সট্রু মেন্টে ছাড়লেন
তিনি।

মোহনবাগানে দু'বছর খেলার পর
১৯৬৬ সালে ক্লাবের হাওয়া বদল করবার
জন্যে দেবনাথ এক বছরের জন্যে ঘরে
এলেন ইন্সট্রু মেন্টে! এ বছর দেবনাথ
আবার ফিরে এসেছেন মোহনবাগানে।

রাইট ব্যাকের নিপুণ খেলোয়াড়
হিসেবে দেবনাথের প্রতিশ্রুততার সংখ্যা
খুবই অল্প। ভারতীয় দলেও প্রতিনিধিত্ব
করবার মতো যোগ্যতা দেবনাথের অনেকের
চেয়েও বেশি। কিন্তু আজো দেবনাথের
ভাগ্যে সে সুযোগ জোটে নি।

হয়তো এ বিষয়ে দেবনাথের ভাগ্য
সহায় নয়, আর তা যদি না হয় তাহলে
এই অধটনের জন্যে দায়ী তাঁর ঐ একাধিক-
বার দল পরিবর্তনের হিড়িক।

তবু এ কথা বলতে আজ আমাদের
এতোটুকুও ভাবতে হয় না যে, দেবনাথের
মতো নিপুণ খেলোয়াড়ের সংখ্যা আমাদের
দেশে খুবই কম। কিন্তু তার চেয়েও বড়
অপরিসীম দুঃখের বিষয় হলো—দেবনাথের
মতো খেলোয়াড়ও আমাদের দেশে
অবহেলিত.....!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে প্রিন্টকুমার গুহমহম্মদের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

(১)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময় ।
বিশুদ্ধ সংস্করণ । জুন্সার বোর্ডে বাঁধা । মূল্য : ২-০০ টাকা ।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাংশসার । হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবনুজি, ঘড়ুজ, হংস, মক্তি, গীতাঙ্গার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশৌকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্গীতাঙ্গার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ । রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য : ৫-০০ টাকা ।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠকা, নসিংহতাপনী ।

২য় খণ্ড : শ্বেতাস্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরক্ত, চলকি, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আশ্ব, ঘটচক্র, ভৃগু, শিফা, বৃদ্ধবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়া-তীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ) ।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাণ্ডপত-ব্রহ্মা, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন গরুড়, শ্রীরামপূর্ব-তাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালিগুরুত্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তর-তাপনীয়, কৌষীতকা, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ । কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা ।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদ্যের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত । মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ । মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ । শঙ্করাচার্যের মহাভাষা, শঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ । তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ । ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । মূল্য—৬-০০ টাকা ।

সাম্ব্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত : উপেক্ষনাথ যথোপাধ্যায় অনুদিত ।
সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।
মূল্য—২-০০ টাকা ।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত । বোর্ডে বাঁধা । মূল্য—৩-০০ টাকা ।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভায়োর ভাষ্য-নুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শৌক-বাতিক ও তন্ত্রবাতিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সম্মিলিত । পণ্ডিত ভক্তনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনুদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা ।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম :

(বিবিধ তন্ত্র ও পরাশদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্য-কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, জ্যোতি, পরম্পরায় প্রভৃতির আপর্ক সম্বলন ।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মহাশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত । মূল্য—৩-০০ টাকা ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতন্ত্র-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সম্মিলিত বৃহদায়তন দর্লভ গ্রন্থ । তন্ত্রশাস্ত্রের সার । পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত । কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য—১০-০০ টাকা ।

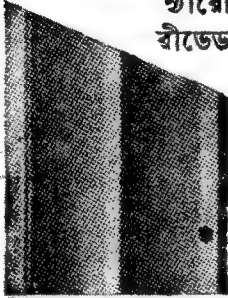
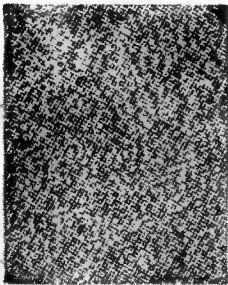
হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ । শ্রীমৎ স্বামীরাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত ।) মূল্য—৩-০০ টাকা ।

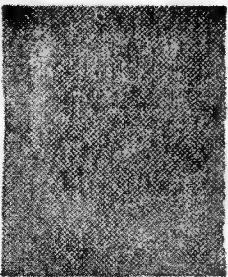
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২



মরেক

চারো
ব্রাডেড

মরকো পিন্‌হেড



রাফকাস্ট



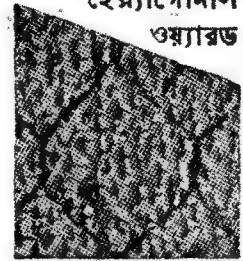
হামার্ড

আজকালকার স্বপতির গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

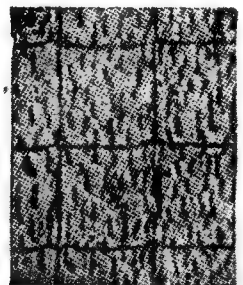
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইন্ড্র ও হালপাতালে অধিক ইঞ্জিনিয়াররা লক্ষ্যই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিবৃত্ত মান বহার রেখে তৈরী হয়। বিশ্বে শতাব্দিক কলয়ের কাচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন গ্রাহাম-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা যাবেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হেম্যাগোনাল
ওয়ার্ড

শিট গ্লাস

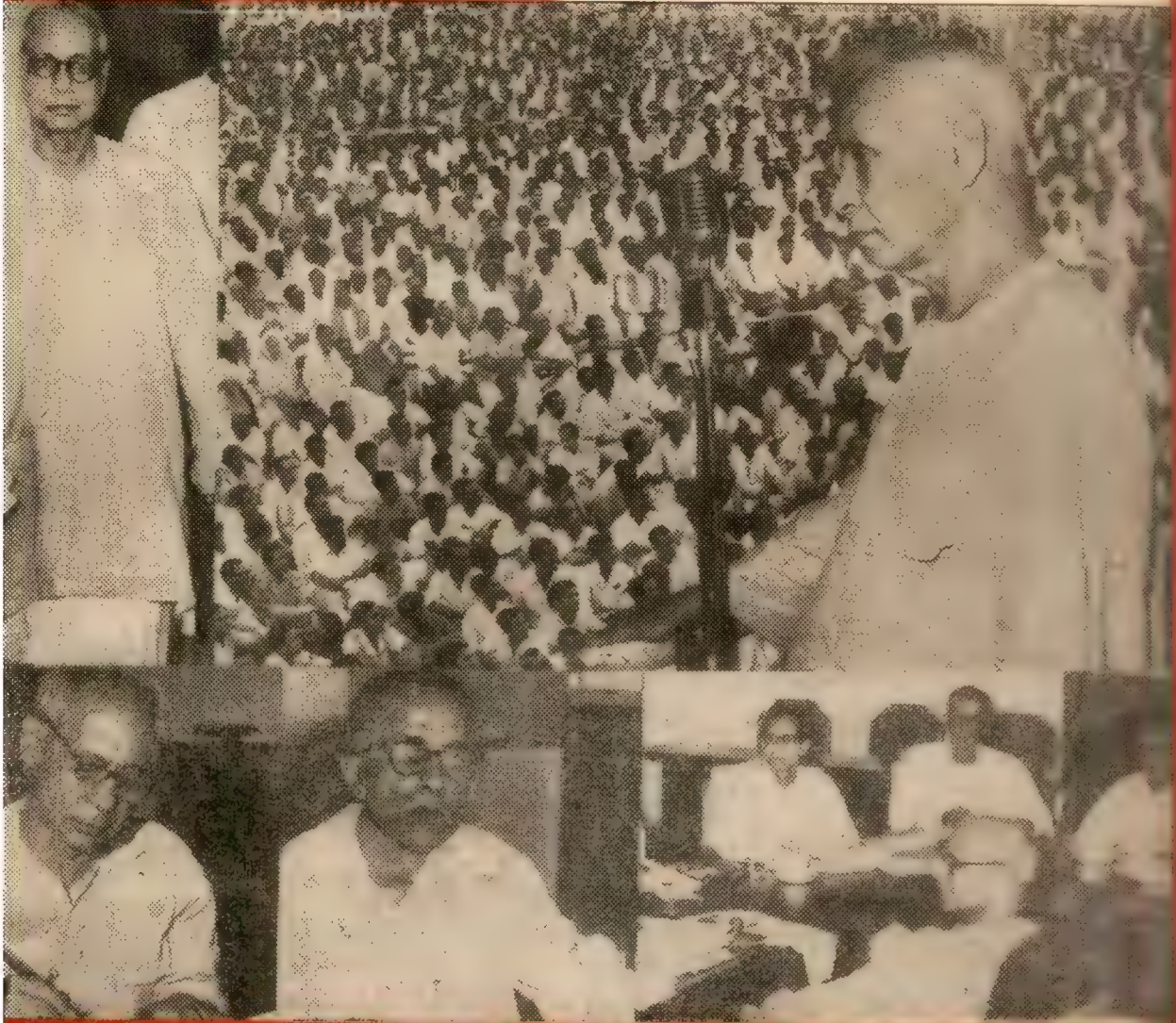


জজিয়ান ওয়ার্ড

ফার্নেস এজেন্টস
ডালুকদার ল'
অ্যান্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিড়িঙ্গ
৫, চিত্তরঞ্জন আর্কেনিট,
কলিকাতা-১০

প্ৰতীক সুমতি

যুক্ত ফ্রণ্টের সংকট অবসান
অজয় মল্লিসভা চলছে চলাবে



১৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

12th Oct., 1967 * Vol. 72, No. 18



হাবির মত মদ্য বার তাকেই বলি চিরময়ী।

ফার্মিলা প্রাণ

ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।

বোম্বোলীন হাউস, কলিকাতা



বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০৯৮
জাহ্নকের মন	১০৯৯
স্বপ্নদর্শন	১১০০
ভারতদর্শন	১০৯৭
আন্তর্জাতিক	১১০০
অজয় অজয় রইলেন	— প্রীসংবাদিক
মা দেখোছি, মা পেয়েছি (স্মৃতিচরন)	— সুধীরজন দাশ
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানকে বলে, সাবাস (কবিতা)	— উল্লেখ
অবশ্য গভীরে (কবিতা)	— প্রফুল্লকুমার দত্ত
ইউরোপা	— হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
এ শতাব্দী শেষ হোল (কবিতা)	— মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ্য—

“যদিও মা তোর দিবা আলোকে
 বেলে আছে অজ্ঞ আঁখির মোহ,
 কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিম
 ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
 আমরা শুচর মা তোর দৈন্য।
 মানুষ আঁখরা নহি তো মেঘ।
 দেবী আমরা! সাধন! আমরা!
 পবন! আমরা! আমরা দেশ!”

মাতৃমন্দের স্বত্বিক, অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের
 স্বপ্নদর্শী কবি, স্বপ্নপ্রবর্তক নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড :

জাহ্নকান, সিংহলবিজয়, সোরাব রক্তম, পরপারে।

মূল্য—৬.০০

দ্বিতীয় খণ্ড :

বিরহ, সীতা, ভীষ্ম, বঙ্গনারী, আনন্দবিদায়।

মূল্য—৬.০০

তৃতীয় খণ্ড :

চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, কলিক অবতার।

মূল্য—৬.০০

(প্রতিটি খণ্ড মূল্য পাঁচপাচো ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কাপড় ও মোড়ক বাধা। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুন্দর আর্ট পেপারে প্রচ্ছদ।)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সেতুর ওপারে মৃদু (কবিতা)	— অশোক ভট্টাচার্য	১১১৪
নদী জপমালা (দ্রমণ-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১১১৬
অগ্নিস্থলের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১১২১
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— ডঃ বৃন্দদেব ভট্টাচার্য	১১২৬
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১১২৮
লুপ্তের উপলব্ধি (গল্প)	— রেবন্ত বসু	১১৩১
সেভেনটিন আপ (কবিতা)	— সুশীলকুমার রায়	১১৩৬
কণামণ্ড—ওয়েশে এবং এদেশে	— শিলালি	১১৩৮
কল্পজগৎ	— ...	১১৪২
পাঠকমল	— ...	১১৪৭
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১১৪৯
পরিচরিত	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৫২

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলোক। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নিষ্পীড়িত বাস্তবচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনারিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যস্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসামক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীৰ্তন, রিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবিরাজীবনী।

একরে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিন্তাজরী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণাঙ্গোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুধাসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যমজ্জবণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-ভিলক, শৃঙ্গার-রসাস্টক। ৮-০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শত্ৰুঘোষ, শ্বাশিৎশৎ-পুত্তলিকা। কালিদাস-প্রশান্তি। ৮-০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—

সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—

রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অমরদাম্ভল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপণ্ডাশং, বসমজরী, সত্যপীর, ষেড়েভেড়ের কোঁতুক, ফদরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাঙ্গা, চণ্ডী, নাগাস্টক, সংস্কৃত, পাশী, হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা



৭২ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা বাংলা ভাষায় সর্বাত্মক প্রচারিত
বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সাম্পাদিকা

PRICE : 25 PAISA
Thursday, 12th October, 1957

পতন ঘটেলেই কি সমস্যার সমাধান হবে

সময় তারিখ সুনির্দিষ্ট। শুধু এক-
বার বা দু'বার নয়—বৃহস্পতি সরকার
গঠিত হবার পর বাববার তারিখ নির্দিষ্ট
করা হয়েছে। কেউ বেউ ঘাড় ধরে তার
ফাটার দিকে আসন্ন সহরের জন্য অপেক্ষা
করেছেন। জনসাধারণ রুম্মানিশ্বাসে
অপেক্ষা করেছেন—কি ঘটে! কি ঘটে।
একদিকে চাণ্ডাল্য, আর একদিকে প্রতীক্ষা-
রত ধৈর্য। মাঝখানে টলটলারমান পশ্চিম-
বঙ্গের রাজনৈতিক ভাণ্ড।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, কম্পনা বা
পরিবর্তনের বিবাত বেলুন অপেক্ষমাণ
দিনটিতে চূপসে গেছে। জনসাধারণ
স্বান্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। কারণ দীর্ঘ-
কাল ধরে যারা অসহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ জানিয়েছেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক
পদ্ধতিতে, তাঁরা চান না যে, নানা সমস্যার
জড়িত বৃহস্পতি সরকার বাববার রাজ-
নৈতিক পরীক্ষার সম্মুখীন হোক। তাঁদের
বক্তব্য—এই সবাবসরে অর্থনৈতিক সমস্যা
সমাধানের জন্যে সময় ও সুযোগ দেওয়া
হোক।

বৃহস্পতি সরকারের পরিবর্তন সাধন
করার চেয়ে সবকিছুর অর্থনৈতিক সমস্যা
সমাধান করার জন্যে যথার্থ সাহায্যলাভই
বিরোধী দলের কাছ থেকে কাম্য ছিল।
স্বভাবতই জনসাধারণ প্রশ্ন করেছে যে,
পরিবর্তন সাধনের আসল উদ্দেশ্য কি?

এবার সর্বাপেক্ষা চাণ্ডাল্যের দিন গেছে
২৫ অক্টোবর। অধিকাংশ সংবাদপত্র
নিঃশব্দ। একমাত্র দৈনিক বঙ্গুমতী মাঝে
জনসাধারণ অবিশ্বাস্য সংবাদটুকু পেয়েছে।
কারো মতে গুজব, কারো মতে আভ্যুত্থান।

কিন্তু পূনরাগ শোনা গেল, সুনির্দিষ্ট
সময়, সুনির্দিষ্ট তারিখ। রাজনৈতিক
জগৎ চঞ্চল, দিল্লী ও কর্মতৎপর, রাজ্যপালের
পূর্বনির্দিষ্ট তারিখে দার্জিলিং যাত্রা
স্বাগিত। কাবণ এবার স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগপত্র
দাখিল করেছেন। আকাশে আবার যেন
রাজনৈতিক বেলুন উড়লো। রাস্তায়
সংশয় পুড়ল, এমন কি, মিলিটারী
পর্বন্ত।

পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে অনেক
কিছুর আয়োজন। অর্থাৎ পরিবর্তনটা
জনসাধারণ মনে নিতে চাইবে না—তাব
জন্যে সতর্কীকরণের ব্যবস্থা। কিংবা
এমনও বলা যায়, পুড়ল ও মিলিটারীর
সাহায্যে গণতন্ত্র রক্ষার অভিনব পদ্ধতি।
আমরা অভিনব বলছি এই কাবণে যে,
পশ্চিম বাংলায় যা ঘটে গেলে, ইতিহাসে
এব জড়ি নেই। তবু শেষ পর্যন্ত বেলুন
চূপসে গেল। স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী জানানলেন,
তিনি পদত্যাগ করেছেন না। বরং নিজেকে
নিঃসঙ্গভাবে যাদের পবামর্শে যে ব্যবস্থা
গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তা অকপটে ব্যা-
করলেন সহকর্মীদের কাছে। সহকর্মীরা
বলেছেন, যে অজয়কুমারের জীবন দেশ এবং
দলের জন্যে উৎসর্গীকৃত, সেই ব্যক্তিটিকে
ফাঁদে ফেলবার পথ তৈরি করা হযোঁছিল।
সহকর্মীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন মধ্যমন্ত্রীর
কাছে তাঁরা হস্তক্ষেপ ত করবেনই না,
বরং যখন আহ্বান আসবে তখনই তাঁর হাত
দৃঢ়তর করা হবে। সফলত একমাত্র,
জনসাধারণের ইচ্ছার বৃহস্পতি সরকার টিকে
থাকবে।

তবু যেন জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই
কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলে, কোনো
কোন সংবাদপত্রে। এখনো আশা আছে,
আছে ভরসা। আবার সেই তাবিত। ওই
অক্টোবর। সময় : রাত দশটা নয়, আটটা।
মধ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে কি বলেন তাই
নিষে তখনো কারো কারো মনে সংশয় ও
প্রশ্ন। মধ্যমন্ত্রীর বিবৃতি ততক্ষণে পৌঁছে
গেছে। তিনি জানিয়েছেন, "আমি এতদূর
বোধ্য কবতে আনন্দ বোধ করছি না,
বৃহস্পতি সরকার থাকবে এবং জনগণের
সেবা করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা
যাবে।"

জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতি যথার্থ
মর্ষাদা দিবেই উপবিষ্ট মন্তব্য করেছেন
মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মণ্ডে যে
নাটক অভিনয় হোল সেখানে একজনকে
মুখ আমবা দেখতে পেলেও নেপথ্যবাসীরাই
এবার অধিকতর প্রকটিত হলেন। হয়তো
নেপথ্য থেকে সম্মুখে তাবা আবার
আসবেন। আবার নির্দিষ্ট করা হবে সময়,
তাবিত। কিন্তু এ কথাটাই মনে রাখা
দরকার, জনসাধারণ অভিনয় করে না, তাঁরা
রক্ত-মাংসের জীব—অসাধারণ দর্শক।
সমস্যাপীড়িত তাঁদের ইচ্ছার মূল্যই
দিরেছেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজ্যভাষা বড় হবার দু'টো সহজ পন্থা : হয় জুয়া খেলো, নয় তো রাজনীতি করো। প্রীঅতুল্য ঘোষকে অবশ্য প্রচলিত অর্থে জুয়াড়ী বলা যাবে না, যদিও রাজনীতি করতে গিয়ে যে ঝুঁকি নিয়েছেন যা যে-কোনো দঃসাহসিক ফাটকাবাজকেও লজ্জা দেবে। সামান্য অবস্থা থেকে অভুল্যাবাদ বড়, বিরাট বড় হয়েছেন। ক্ষমতার রাজনীতি করতে করতেই অভুল্যাবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ডিক্টেটরের পদগৌরব লাভ করেছেন। সে-গৌরব কি এখন অস্তাচলে চলেছে? না, তাঁর রাজনৈতিক জীবনাকাশে শব্দ সাময়িককালের জন্যে কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হয়েছে মাত্র এবং সে-মেঘের ঘন আস্তরণ ভেদ করে আবার তিনি পুরোনো মর্যাদার প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন? এই বিরাট ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে এ্যাড হকস্কারা কি খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন?

হুগলী জেলায় ১৯০৪ সালে একটা মাধারণ পরিবারে অতুল্য ঘোষের জন্ম। আর্থিক দুরবস্থার জন্যে লেখা-পড়ায় তিনি বেশিদূর এগোতে পারেন নি। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত দেশপ্রেমিক জমিদার শ্রীমেন মধুজ্যোতির অনগ্রহে একটা ব্যাংক সামান্য একটা কাজ জোটে অভুল্যাবাদের। তারপর সুরু হয়ে যায় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। তরুণ অতুল্য তখন রাজনৈতিক গুরু বা দাদাদের সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর দিয়ে তাঁদের সাহায্য করতেন। বয়সে তরুণ হলেও অতুল্যের ধর্মিক ও পুণ্ডিতশক্তি অত্যন্ত প্রখর। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হয়ে গেলেন তিনি নেতাদের তাগিদে। তারপর ১৯২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্যপদও লাভ করলেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছর কংগ্রেস দলে থেকেও নেতৃত্বহলে তিনি বিশেষ পাতা পান নি, খবরের কাগজের এক কোণে মাঝে-মাঝে পাঁচশো জনের নামের তালিকায় তাঁর নাম স্থান পেলে দেশ-বিভাগের পরে, স্বাধীন ভারতে। কারণ মতুন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস গঠন করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ সতর্কতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জাঁদরেল ও বান্দু রাজনীতিকদের অপাঙ্কিত্য করে দেওয়া হয়, ক্ষমতার

আসন দখল করলো পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে পূর্ববঙ্গবাসী-বিশেষত অভুল্যাবাদের হুগলী-সৈদীনীপুর গ্রুপ।

পটুগত, বিদ্যা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাপ যদি অভুল্যাবাদের না থাকে তো সে-অভাব তিনি শতগুণ পূরণ করে নিয়েছেন তাঁর চাতুরী, রণকৌশল এবং সর্বোপরি সাংগঠনিক প্রতিভা দেখিয়ে। ১৯৫০



অতুল্য ঘোষ

সালে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কার্যটির প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করলেন, আর সুযোগ পাওয়া মাত্র রাজ্যের সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মূহূর্ত বিলম্ব করেন নি। বিদ্যায়, অর্থবলে বা বুদ্ধিতেও তাঁর চেয়ে দক্ষ লোকের অভাব প্রদেশ কংগ্রেসে কখনো ছিলো না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে তাঁর কথায় রাজ্যের সমস্ত কংগ্রেস নেতা-ও কর্মীকে উঠতে-বসতে। বসীয়া নেতার ক্ষমতা হয়েছেন, তাঁর নীতি বা মত অপছন্দ হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস হয়েছে কি কারো?

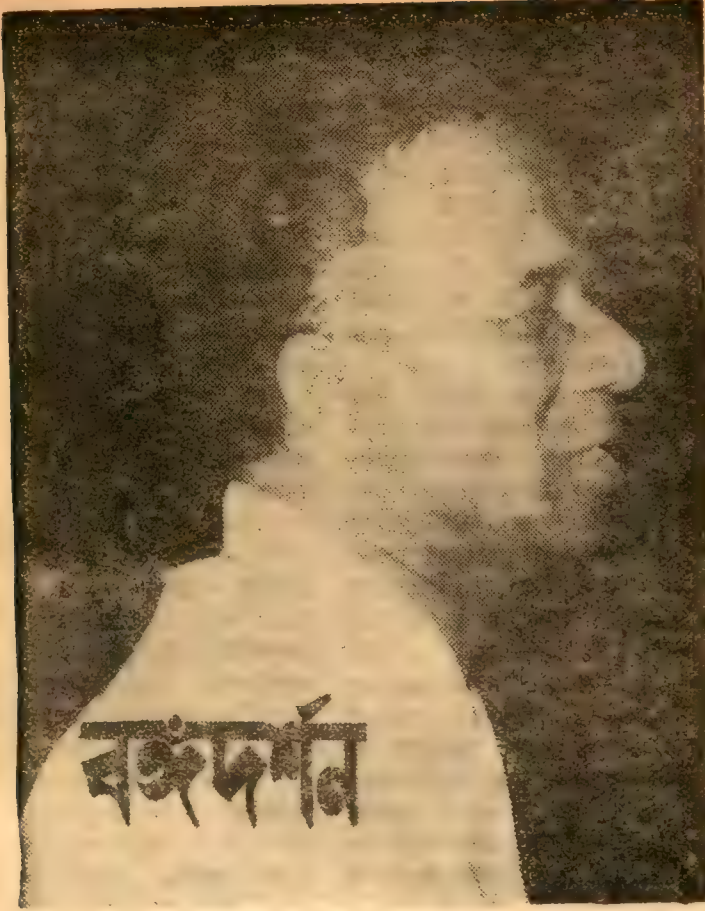
অতুল্য-অপসারণের কোনো চেষ্টা কোনো কালে যে আদৌ হয় নি তা নয়, বহু উপদলীয় কোন্দল, জিজ্ঞাসার গ্রুপের মাধ্যমে অভুল্যাবাদের ক্ষমতা লোপের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে শত্রুরা অপদস্থ ও হতশ্রান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন, অভুল্যাবাদের শক্তি দিন-দিন বেড়েছে। এজন্য অভুল্যাবাদকে কঠোর হতে হয়েছে, নিষ্ঠুর হতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। শত্রুকে তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি, একবার যিনি তাঁর কোন কাজ বা মতের প্রতিবাদ করেছেন

তাঁকে আর তিনি ওপরে উঠতে দেন নি, সর্বশক্তি কৌশল ও অপকৌশল প্রয়োগ করে বিরোধী শক্তি ও প্রভাব খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শৃঙ্খল করে দিয়েছেন। শত্রুদের খতম করে, বিরোধীদের পথের কাটাও মতো অপসারণ করেই অভুল্যাবাদ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছেন, কংগ্রেসে তাঁর একচ্ছত্র আধিকার ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অথচ অভুল্য ঘোষ কোন রাজ্য-ভ্রমের হয়ে বসেন নি, কখনো মন্থিত পন্থা নেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্লিং কার্যটির সদস্য তিনি প্রায় '৫০-৫১ সাল থেকে। নির্বাচনের গোড়া থেকেই পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। নৈজে মন্ত্রী হবার বাসনা তাঁর নেই, তিনি মন্ত্রা পান রাজ্য-উজ্জয়, মন্ত্রী বানানো খেলায়। দাবা-বোড়ের চাল দিয়ে কিস্তিমাংস কবেছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভায় কে কে স্থান পাবেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বা পশ্চিমবঙ্গের কোন এম-পি-কে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে সেটাও ঠিক করতে চান অভুল্যাবাদ। ডাঃ রায়ই কেবল সে প্রভাব অস্বীকার করার হিম্মৎ দেখিয়েছিলেন : 'অতুল্য আবার গভর্নমেন্ট নাক গলাচ্ছে কেন, ও থাক না অর্গানাইজেশন (কংগ্রেস) নিয়ে'—ডাঃ রায় নাকি শলোঁছিলেন।

বাস্তবিক অভুল্যাবাদের সাংগঠনিক শক্তি প্রশ্নাতীত, কিন্তু তবু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর সর্বনাশা অপকৌশলের জন্যে কংগ্রেসে আজ সংলোকের স্থান নেই। অজয়-মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করা হয় তাই কি কোন তুলনা আছে? অভুল্যাবাদ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নেই বহুদিন থেকেই, কিন্তু কে না জানে যে সমস্ত ব্যাপারে কংগ্রেসের হয়ে কথা বলার একমাত্র অধিকার তাঁর ছাড়া নেই আর কারো? এ-আই-সি-সি-র তিনি একজন সদস্যমাত্র হয়েও এখানে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি, কয়েকজন সমধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল নেতাকে নিয়ে সিপিএকে গ্রুপের তিনি অন্যতম স্তম্ভ। কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর পরিচয় প্রতিক্রিয়াশীল, দক্ষিণপন্থী হিসেবে।

অভুল্যাবাদের প্রভাব কি বিন্দুস্তর পথে? গত নির্বাচনে অখ্যাত একজন শ্রমিকনেতার কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছে। বাংলার মানুষ বেন রাহুদ্রিত ঘটেছে বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। তারপর অভুল্য-বিরোধী কংগ্রেসীরা অগ্রসব হয়েছেন বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে এ্যাড হক কমিটি গঠনে। শ্রীলঙ্কাকে দিয়ে এই এ্যাড হক কমিটির প্রস্তাব আনা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ্যাড হক পন্থীরা কি সফল হবেন? অভুল্যাবাদ কি এ-পরাজয় মেনে নিতে রাজী হবেন?



শ্রীহরমায়ন কবির

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে আজ কদিন ধরেই দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে, বিগত সপ্তাহের প্রতিটি দিনই জনসাধারণ উদগ্র উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, এই বৃষ্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। সর্বত্রই ধুমধামে আবহাওয়া। পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে দেশটাকে ছেয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, ভগবান জানেন কার হুকুমে এদের ডাকা হয়েছিল, এবং কেনই বা হয়েছিল; সরকার তো ভারতের বহু জায়গাতেই উল্টেছে, পশ্চিমবঙ্গেও হয়ত তা ওল্টাত, কিন্তু তার জন্য আগে থেকে এত সাজগোজ অন্যত্র চোখে পড়েছে বলে আমাদের তো মনে হয় না।

বঙ্গদর্শন লেখার সময় সংবাদে জানা গেল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ফাঁড়া কেটেছে।

আমরা প্রতি সপ্তাহেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক জীবনে কিভাবে দুর্যোগ ঘনিষে আসছে তার ইংিত পাঠকদের দিয়ে এসেছি। গত সপ্তাহের লগদর্শনে লেখা হয়েছিল:

“গত বিশ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিগত নির্বাচনে যুক্ত-

ফ্রন্ট সরকারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গত কয়েকসালের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট, আকাশ হোয়া মূল্যবৃদ্ধি, চার টাকা কিলো চাল, এত কিছু সহ্য করেও জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েকদিনে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়ী সম্পর্কেই একটা গভীর সন্দেহ সর্বত্র উঁকিঝুঁকি মারছে...নানা রকম গভ্য ও অর্থসভ্য রটনায় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা যায় অবস্থার সংকট। দরিদ্র জনসাধারণ বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়, কংগ্রেস ভবনে ও জনজান্তি দলে অসম্ভব তৎপরতা। মন্ত্রীরা রাইটাস বিন্ডিংসে আসছেন চোখে মুখে অনিশ্চয়তার ছাপ নিয়ে—ক বলতে পারে আগামীকাল তারা আছেন কি না?... শ্রীজয় মূখোপাধ্যায়কে এও নাকি বোকানো হয়েছে যে, শ্রীজতীলা বোধ প্রমুখ কংগ্রেস নেতা একদা তাঁর অসম্মান করেছিলেন, কিন্তু অ্যাড হক কমিটি গঠন করে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে তাঁদের হাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই ঘরের ছেলের ঘরে কিরতে দোষ কি, এমন কি তাঁর মূখ্য-মন্ত্রিত্বও কংগ্রেস স্বীকার করে নিতে রাজী।

আর যদি একান্তই তাঁর চক্ৰলঙ্কার বাত তাহলে তিনি কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করুন। পাশাপাশি তাঁকে এ কথাও বোকানো হয়েছে যে, যদি তিনি এই প্রস্তাবে রাজী না হন তাহলে বাংলা কংগ্রেস থেকে জান্তি দল কিছু সদস্য বার করে এনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে কংগ্রেস-জান্তি দল সম্বন্ধে নতুন সরকার গঠন করা হবে। ফলে শ্রীমূখোপাধ্যায়ের সম্মুখে এক উজয় সংকট দেখা দিয়েছে। যদি তিনি কংগ্রেস-জান্তি দলের চৌপ গিলে অ-কমিউনিষ্ট কোয়ালিশন সরকারের মূখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন, তাহলে জনসাধারণের চোখে তাঁর যে ইমেজ এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে তা বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি তিনি এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তাহলে বাংলা কংগ্রেস থেকে ভেঙে জান্তি দলে যোগদানকারী সদস্যরা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবে। এই উজয় সংকটের মধ্যে পড়ে মূখ্যমন্ত্রী আজ বিভ্রান্ত।” (সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শন, ৫ই অক্টোবর ১৯৬৭)

আমরা মনে করি যে, পশ্চিমবঙ্গে যে পারিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে অপরাপর সংবাদপত্র কি ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন পাঠকদের তারও কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই আমরা এই বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সমীক্ষা এখানে প্রকাশ করছি:

সবচেয়ে লাভবান বাম কমিউনিষ্টরা

‘মনে হচ্ছে অজয় মূখোপাধ্যায় দ্বিতীয় থান্ড পিললাই হতে বাঁচলেন। কিছু কংগ্রেসী তাঁর জন্য ঐ ভূমিকা বাজাই করেছিলেন। পিললাই ছিলেন কেরল পি এস পি-র নেতা। তাঁর লক্ষ্য ছিল কমিউনিষ্টদের থেকে দূরে রাখা এবং জনগণের উপর থেকে কমিউনিষ্ট প্রভাব মুছে ফেলা। অজয়বাবুর লক্ষ্যও যেন তা-ই।

পিললাই আঁচরেই মর্শ্বাকলে পড়ে ছিলেন। তাঁর মূখ্য ঘোচবার জন্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে রাজ্যপাল করে দিয়েছিলেন। আঘাত লেগেছিল কেরল পি এস পি-র বুকে, মার ক্ষত এখনও শুকায় নি। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সরকার পরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে বোকাপড়ায় আসার সময় অজয়বাবু নিশ্চয়ই সমস্যার সকল দিক বিবেচনা করে দেখেছেন।

প্রবীণ কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি অনেকদিন ধরে আলোচনা করে আসছেন। সোমবারের নির্ধারিত ক্ষেপে প্রত্যাশিত ঘটনা যদি না ঘটে থাকে তাহলে তার মানে এই নয় যে, অজয়বাবু পিছন হটে আসতে চেয়েছেন। তিনি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা

মিলিয়েছেন। তাঁর দলের সদস্যরা যখন ঐ আলোচনার কথা জানতে পারলেন তখন ধরেকজন স্পষ্টই ব্যক্তি করে দিলেন যে, তাঁরা অজয়বাবুর সিদ্ধান্তে খুশি নন।

এর ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে অজয়বাবুর বোঝাপড়া একেবারে যে বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়। তিনি মন্ত্রিসভা থেকে যত শীঘ্র বাম কমিউনিস্টদের বাদ দিতে চান—এ কথা তিনি বন্ধুস্বাক্ষরকে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধী-চাষন সমেত অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাকেও বলেছেন। অজয়বাবুর মতে তা করার একমাত্র উপায় হল মন্ত্রিসভার কংগ্রেসকে না নিয়ে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সমর্থন পাওয়া।

অজয়বাবু যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন তিনি বাম কমিউনিস্টদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না; অন্তত প্রকাশ্যে তো নয়ই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মনের গতি পালটে গিয়েছে। তার জন্য বাম কমিউনিস্টরা নিজেরাই অনেকাংশে দায়ী। বাম কমিউনিস্ট দলের অনুচরদের অনেকে যে সুবিধাবাদী মনোভাব নিয়েছেন কেন্দ্র তা কাজে লাগিয়েছে অজয়বাবু ও বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজনে। কেন্দ্রের এই প্রয়াসে আরও সুবিধা করে দিয়েছে মন্ত্রিসভা ও যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত পি এস পি ও এস এস পি।

সাত মাস আগে অজয়বাবুর মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর থেকেই কমিউনিস্টদের অংশীদারী সম্পর্কে কেন্দ্রের ভাবনার শেষ নেই। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার অভাবের সোর-গোল তুলেছেন। তাদের কাছে ঘেরাও এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন অন্যত্র সরে যাচ্ছে বলে কথা উঠেছে। শিল্পপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এই অবস্থা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তবে এটা শুধু যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই ঘটে নি, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলেও অনুরূপ অবস্থা ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অনেক আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়ে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। পার্থক্য হল : সম্প্রতি সাবধানতার ভাষা অধিকতর কঠিন। তবে একটা কথা সর্বোচ্চই যেন এড়িয়ে যেতে চান। তা হল—পশ্চিমবঙ্গ মহারাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মাদ্রাজের তুলনায় শেফাল্যবর্ধনের ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে যাচ্ছে তার জন্য দোষটা পশ্চিমবঙ্গের নিজের নয়—স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রীয় সর-

কারের স্বেচ্ছাকৃত নীতির ফলেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের এই হাল।

প্রায়োগিক অর্থব্যাঘ্র গবেষণার জাতীয় পরিষদ পরিচালিত সমীক্ষার তারতের উন্নয়নের ঐ চিত্র ধরা পড়েছে। আর এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের প্রাপ্য অধিক দোষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকার থেকে কমিউনিস্টদের বিভাঙন এবং তাদের রাজনীতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন একে রাজনীতির খেলা বলেই গণ্য করতে হবে।

কেন্দ্রীয় নেতারা—বিশেষ করে গুলজারিলাল নন্দ—এমন ভান বজায় রাখতে চাইছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেন মন্ত্রিসভার স্ববদল প্রয়ানের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁরা যা বলেন নিজেরা তা করেন তো! আসল কথাটা হল—দু' পক্ষের কী কী করণীয় তার খুঁটিনাটি ঠিক করা হয়ে গিয়েছে—অজয়বাবু যে-মুহুর্তে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘোষণা করবেন কংগ্রেস পরিষদীয় দল তখনই অজয়বাবুর নতুন অ-কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর যে পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে তার মোকাবিলায় জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কী করণীয় তাও স্থির হয়ে গিয়েছিল।

সোমবার রাতে অজয়বাবুর যে-পদত্যাগপত্র পেশ করার কথা ছিল তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর ওয়াকেবহাল রয়েছে বলে মনে হয়। কংগ্রেস নেতাদের মতামত নিয়ে ঐ বিবৃতি তৈরি করা হয়েছিল এমন কথা বিশ্বাস করারও হেতু রয়েছে। বিবৃতিতে বাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অন্যাঙ্গার হবার কথা। তাতে নকশালবাদের চরম-পন্থীদের সঙ্গে অন্যদের কোন ভেদ করা হয় নি। সোমবার রাতে নয়াদিক্রীতে বসে যা ইংগিত পাওয়া গিয়েছে তাতে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য সরকার তৈরি হচ্ছিলেন।

পরিচলনটা কাজে আসে নি। কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি খুব বেশি সবল করে ফেলেছেন। তিনি বোধ হয় মনে করেন যে, কমিউনিস্টদের কথা বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তাঁর এবং অজয়বাবুর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার বিষয়।

এ কথা অজয়বাবুর নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, এক সময় কংগ্রেস ডঃ প্রফুল্ল বোষকে মধ্যস্থত্ব করে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা করছিল। সোমবার অজয়বাবুর পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের মনে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র এখনও অজয়বাবুর সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষপাতী। তা সম্ভব না হলে কংগ্রেস সম্ভবত ডঃ বোষকে সমর্থন করে লক্ষ্য শৌছাবার চেষ্টা করবে।

সোমবার রাতের ঘটনাবলীর পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা রাজধানীতে শোনা গিয়েছে। অজয়বাবু যদি পদত্যাগ করেন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে না চান তাহলে ঐ পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অন্য কাউকে পাওয়া না গেলেও কেন্দ্র সম্ভবত বিধানমণ্ডলী বাতিল করবে না। তাতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লাভবান হবে। কংগ্রেসীরা আশা করেন যে, কিছু সদস্যকে তাঁরা দলে টানতে পারবেন।

অজয়বাবু যদি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার আঙ্গুর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন তাহলে তাঁর পক্ষে বাংলা কংগ্রেসকে আরও রাখা কঠিন হবে। অজয়বাবু এবং হুমায়ুন কবিরের সহকর্মীরা নাকি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কংগ্রেস নামক সম-শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁরা গত বছর হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু আজ কংগ্রেসের প্রতি দু'জনের মনোভাব ভিন্ন। কংগ্রেসও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক জটিলতা থেকে বিজয় পতাকা বহন করে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে মনে হয় না। অ্যাড হক কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রদেশ কংগ্রেসে দারুণ চিড় ধরিয়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান অস্থির জিয়াকলাপের দ্বারা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন বাম কমিউনিস্টরা।

অজয়বাবু বড় বেশি দুর্দিক সামলাবার চেষ্টা করছেন। এক দিকে তিনি সরকার ও যুক্তফ্রন্টকে তাঁর সহ-গামীদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি সরকারের পরিবর্তনের কথা ভাবছেন—অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন কি স্বরাষ্ট্র দফতর পর্যন্ত মনে করেন যে, অজয়বাবু নিজের সুবিধার জন্য এক পক্ষকে আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা বজ্রিত দৃঢ়চেতা মানুষ হিসাবে অজয়বাবুর যে সন্ধান বহুদিন ছিল, তা খুবই নাড়া খেয়েছে। মনে

হচ্ছে, তিনি কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না।"

—আনন্দবাজার, ৪ঠা অক্টোবর

স্থিতপ্রজ নেতৃত্ব চাই

"পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং এত গভীর উৎকর্ষিত যে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিতুল সিদ্ধান্তে আসা এই মুহূর্তে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

গত সোমবারের কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বৃহত্তর মন্ত্রিসভার অপমৃত্যু আসন্ন। বিকালের দিকে খবর রটরাছিল, রাষ্ট্র আটটার প্রীতজয় মুখার্জী রাজ্যস্থলের কাছে লক্ষ্যগণ্য পেশ করিবেন এবং রাজ্যস্থলের অনুরোধে তিনি কংগ্রেস সমিতিত কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন।

ঠিক একই সময়ে কংগ্রেস ভবনেও কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক বাসরাছিল। অন্য কারণে, কিন্তু উভয় ঘটনা কাক-তালীয়ক কাব্যকারণ পরস্পরসম্মুখে দৃষ্ট হইয়া যায়। এই নতুন রাজনৈতিক গরুর গাড়ির চলার জন্য, প্রীগল্জারিলাল নন্দা অশ্বাভিন দ্রুততার সহিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভাঙিয়া দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ ও কল্পের মেঠো পথ তৈরি করিয়া দিয়া যান। কিন্তু দেখা গেল, সেই গরুর গাড়ির জীব চাকা দুটি ইতিপূর্বেই কোথায় আটকাইয়া গিয়াছে! প্রীনন্দার তৈরি পথের কাছ পর্যন্তও তাহা আসে নাই!

মুখ্যমন্ত্রী প্রীতজয় মুখার্জীকে কেন্দ্র করিয়া এই আশঙ্কিতা, এই আশঙ্কিতা পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফল শুভ কি অশুভ হইবে, ইহার একমাত্র নাম সন্তা সুবিধাবাদ' কি না, এবং ইহার মধ্যে ক্ষমতার লোভের লালাসিক্ত জিহবার নন্দন প্রকাশ হইয়াছে কি না—এ প্রশ্ন আমরা এই আশঙ্কিত মুহূর্তে তুলিতে চাই না। সম্ভবত এই দুর্বীর রাজনৈতিক স্রোতের বিরুদ্ধে, শূভবুদ্ধি এবং স্থির লক্ষ্য জইয়া দৃঢ়চিত্তে আগামীকালের দিকে অগ্রসর হইবার মত ব্যক্তির অভাব বর্তমান কংগ্রেসীদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। নেতৃত্বের প্রেণী নির্ণয়ে গান্ধীজীর একটি সংজ্ঞা, আমাদের আজ মনে পড়িতেছে। বাঁহারা সাময়িক প্রয়োজনের সন্তা চাহিদা মিটাইবার কাছে আত্মসমর্পণ করেন, জইহারা নিম্ন স্তরের নেতা। বাঁহারা সাময়িক প্রয়োজনের বিরুদ্ধে এবং তথাকথিত জনপ্রিয়তার স্রোতের বিরুদ্ধে সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হন, তাঁহারা প্রথম প্রেণী নেতা। ঠিকা ভাষাটি হয়ত এইরূপ নয় কিন্তু উদ্দেশ্যটা এই বকম। গান্ধীজীর

সারা জীবনের ইতিহাসে এই সন্তা জনপ্রিয়তা ও স্রোতের কাছে অক্ষম ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকে অস্বীকার করার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। দেশ বিভাগকে তিনি অন্যায় মনে করিয়াছিলেন এবং সে কথা কংগ্রেসের জনপ্রিয় অভিমতের বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া জীবনের নিঃসঙ্গ দিনান্তে নিবিড় বিষম-তার মধ্যে তিনি দিন কাটাইয়াছেন।

তের্মান আজ আমাদের মনে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক স্রোত এখন কংগ্রেসের কিছুটা অনুকূলে বালিয়া যে আভাস উচ্চারিত, তাহার পৌরগাম কি, তাহা কল্যাণবহু কি না এবং তাহা কংগ্রেসকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবে কি না, এই প্রশ্নগুলি সম্ভবত কোন কোন নেতার কাছে এই বর্তমান পরিস্থিতির চেতন-ধামিনো উজ্জলতার স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সেই জন্যই আমাদের আশঙ্কন, আগামী দিনের দিকে তাকাইয়া, কংগ্রেসের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে তাকাইয়া এবং সত্য ও ন্যায়ের দিকে তাকাইয়া, লব্ধ নির্বাচন করুন। চলমান স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, সত্যের কাছে, নিষ্ঠার কাছে আত্মসমর্পণের প্রার্থনা আজ বিশুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হোক।

অতএব একদিকে বৃহত্তর সরকারের নৈতিক এবং রাজনৈতিক মৃত্যু এবং বাম কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত গৃহযুদ্ধের পোপন প্রস্তুতি অন্যদিকে কংগ্রেসের মধ্যে আশঙ্কিততা, মতপার্থক্য এবং নেতৃত্ব কমল, পশ্চিমবঙ্গকে এক অপ্রতিরোধ্য সঙ্কটের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

এখন আমরা সেই স্থিতপ্রজ নেতৃত্ব চাই—যাঁর হাতে ক্ষত্র-বিদ্যুৎ নিমজ্জমান তরণীর হাল নিভয়ে তুলিয়া দেওয়া যায়, যাঁহার দৃষ্টি আশ্রয় ফল লাভের ক্ষমার উজ্জল নয় এবং যিনি মন্ত্রিত্বের লোভের কাছে নিঃশর্ত সমর্পিত নন।

অজের বিনোদ রাষ্ট্র শোকে একটি নির্ভর প্রভাতে আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিব।"

—জনসেবক, ৪ঠা অক্টোবর

বাংলার চরান্ত

"পটভূমি ঠিকমতই তৈরি করা হয়েছিল, শব্দ বা বাকি ছিল তা বোধ হয় 'ফিউজ'-টিকে জ্বলে দেওয়া।

"এটা স্বাভাবিক যে সংশ্লিষ্ট সকলেই বৃহত্তর স্তরে দেবার চরান্তে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে। যদি এই চরান্ত সামলানো করতে তাহলে চরান্ত-

কারীদের প্রতি জনগণের ক্ষোভের আঁড়-বাতির ভাঙটা নিশ্চয়ই খুব মনোবহু হত না।

"কিছুকাল আগে প্রধানমন্ত্রী মুখ্য-মন্ত্রী সম্মেলনে বলেছিলেন যে, তিনি অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে উল্টে দেবার গুরুপাতী নন। সে পার্টি নেতা পার্টির ওপর জনগণকে স্থান দেবার বিষয়টি করার কথা হিসাবেই বলেন তাঁর পক্ষে এই জাতীয় উক্তিই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের কংগ্রেস যে উপদলীয় রাজনীতি ও কারেমী স্বার্থের চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, সেই নীতির সঙ্গে এই বক্তব্য খাপ খায় না। এই কারণেই এটা আজ সুস্পষ্ট যে ইন্দিরা গান্ধী আজ পশ্চিম-বঙ্গ থেকে বৃহত্তর সরকারকে উজ্জ্বল করার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চরান্ত-কারীদের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন।

"বৃহত্তর সরকারের কিছু কিছু এডভেঞ্চারধর্মী কার্যকলাপ সেই কারেমী স্বার্থবাদী প্রেণীর হাতকেই শক্ত করেছে। কিন্তু বৃহত্তর সরকারের পতন ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দলান্ত সংবাদপত্রগুলির সহায়তায় কংগ্রেসী শিপমন্ত্রকের অফিসারেরা পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে বাবার এক ইন্দ্র-নিদারক রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। তার পর রাজ্যের মার্কসী কমিউনিস্ট উপ-মুখ্য-মন্ত্রী প্রীতজয়িত বসুকে অশ্লীলতার নিন্দা-দিলীতে দ্রুত আহ্বান করে সাবধান করে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রেণীর দালালরা স্ট্রীটের অন্য ধরনের গতি দিতে শুরু করে যাতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী ও সুবিধাবাদী অ-কংগ্রেসীদের মেলবন্দন ঘটে।

"বাংলা কংগ্রেসের একটি প্রেণী, আমাদের সঙ্গে বৃহৎ ব্যবসায়চক্রের যোগ আছে, মুখ্যমন্ত্রী প্রীতজয় মুখোপাধ্যায়ের ওপর এই ধরনের চাপ দিতে শুরু করে যাতে মুখ্যমন্ত্রী দুই কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁতে করেন। তাকে এক জানালা দেওয়া হয় যে, যদি তিনি তাদের এই আইন ধরে চলতে রাজী না হন তাহলে তারা বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে অপরাধের নির্দলীয় সদস্যদের নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প

আধুনিক চলচ্চিত্র লাভ

হাল সমাজে একটি অত্যাবশ্যকীয় সখ। এক মাসে এই শব্দভাণ্ডার সাহায্যে বিনা শিক্ষকতায় গৃহে বসিয়া আধুনিক সকল প্রকার চলচ্চিত্র লাভ শিখুন। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ২ টাকা।

GEMINI BOOKS (WBC-8)
P. Box 1607, Delhi-6.

মন্ত্রিসভা গঠন করবে। কবির চাতুৰ্য্য, জাহাঙ্গীর এবং হুমায়ুন, এই বিষয়ের পুরোধা হলেন। অজয় মুখার্জীকে ভয় দেখানোর জন্য জাহাঙ্গীর সেইদিন নিজীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন যে দিন জ্যোতি বসুর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। অপর দিকে হুমায়ুন কবির ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস ভেঙে আসা নবগঠিত ভারতীয় জাতি দলের বাংলা কংগ্রেসকে ভিঙিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। অজয় মুখার্জী জানতেন যে, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হবে, কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তিনি কংগ্রেস ও বহু ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে গেছেন।

“কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে গুলজারিলাল নন্দা কলকাতায় এসে দেখলেন যে, অতুল্য ঘোষ প্রভাবিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেবার, অতুল্য ঘোষ প্রভাবিত আসাম সাংগঠনিক নির্বাচন ব্যাভিল করার, এবং পার্টি চালাবার জন্য একটি এ্যাড হক কমিটি গঠন করার দাবি দু'বার হয়ে উঠেছে। নন্দা তখন ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন-সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে পে দেবার সুপারিশ করলেন। ঘোষ বিম্বাহের ভান করলেন, কিন্তু তিনি জানালেন যে, তিনি তাঁর অনুগামী-দের নিয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক যদি এ্যাড হক কমিটি অজয় মুখার্জীর বর্তমান সরকার থেকে পদত্যাগের পর এবং কংগ্রেসের মদতে একটি অ-কমিউনিষ্ট সরকারের নেতৃত্ব করতে রাজী থাকার পর গঠিত হয়। কিন্তু নন্দা নিশ্চিত ছিলেন যে, এ্যাড হক কমিটি গঠিত হলে অজয় মুখার্জী সন্তুষ্ট হবেন, কাজেই তিনি নিজ মুখেই তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন, যদিও বুদ্ধিমানের মত নতুন কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ স্বাগত রেখে। অবশ্য সর্বসম্মত একটি নামের তালিকা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মারফৎ তাঁর হাতে দেওয়া হয়, কিন্তু এই তালিকায় এমন কয়েকজনের নাম থাকে যারা বহু বণিকস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাদের এমনভাবে সংগঠনের মধ্যে স্থান দেওয়া যাতে সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকে।

“নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে নন্দা সেই তালিকাটি এ-আই-সি'র সম্পাদক সাদিক আলির হাতে অর্পণ করেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে সমস্ত বিষয় জানান। এ্যাড হক কমিটির সদস্যদের নাম অবশ্য ঘোষণা করা হয় নি যেহেতু তা কামরাজের অনুমোদন সাপেক্ষ, কেন না গঠনভঙ্গ অনুযায়ী একমাত্র কংগ্রেস সভাপতিই

প্রদেশ কংগ্রেস ব্যাভিল করে তপারেন। কামরাজ টেলিফোনে সাদিক আলিকে ওই তালিকা প্রকাশ করতে নিবেদন করেন কেন না নন্দা নিজ অধিকারের সীমা কিয়দংশে লঙ্ঘন করেছেন, এবং তালিকাটি কামরাজের নিজেদেরও খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। অতুল্য ঘোষের সঙ্গে কামরাজের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের এরকম রদবদলে প্রস্তুত নন যাতে এক শ্রেণীর বহু ব্যবসায়ীদের মুরব্বীদের বদলে, অনুদ্রুপ আর এক শ্রেণীকে বাসিয়ে দেওয়া হয়।

“কংগ্রেস সহযোগিতায় অ-কমিউনিষ্ট সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ডিগবাজী খাওয়ানোর প্রচেষ্টা হল। কিন্তু বহু ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কুক্ষিগত বাংলা কংগ্রেস, প্রদেশ কংগ্রেস এবং প্রাক্তন কংগ্রেসীদের যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার অপচেষ্টা এখানেই থেমে রইল না। তাই প্রধানমন্ত্রীকে “আমাদের আত্মা বাঁচাও” এই টেলিগ্রাম করে কামরাজকে নয়াদিল্লীতে ডাকতে হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।”

—(লিংক, ১লা অক্টোবর)

ঘটনার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল

শেষ পর্যন্ত কিছু যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বোধ্য কেটে গেছে। যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বিভিন্ন দলের নেতারা প্রচুর ছুটোছুটি করেছেন, দফায় দফায় বিভিন্ন ধরনের বৈঠক বসেছে। শেষ মূহুর্তে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটতে দেওয়া মানেই জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

গত বুধবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের সম্মুখে এক সম্মেলনীয় স্বীকারোক্তি করেছেন যার ফলে সকল জটিলতার অবসান ঘটেছে। রাজনীতির ইতিহাসে বোধ হয় এ রকম স্বীকারোক্তির তুলনা নেই। এবং এ থেকেই বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী নিজ প্রত্যয়ে কতটা আন্তরিক ছিলেন। গান্ধীবাদী সভ্যনিষ্ঠা ও সারল্যের যদি কেউ কোন মূল্য দিলে থাকেন, তা সে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, এবং এই স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ।

মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই বলেছেন যে, তিনি জেনেশুনেই কংগ্রেস সমর্থনে অ-কমিউনিষ্ট দলগুলিকে নিয়ে সরকার গঠন করতে বলেছিলেন। তিনি এটা ভালভাবেই জানতেন যে, যে কর্ম তিনি করতে যাচ্ছেন

তাতে তাঁর নিজেরই সর্বাধিক ক্ষতি হবে, তাঁর মনোনয়ন নষ্ট হবে, জনসাধারণের চোখে তাঁর যে ইমেজ গড়ে উঠেছে তা ভূমিসাৎ হবে এবং তাঁকে লোকে দালাল ও বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা দেবে। তথাপি তিনি ওই পথই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন পশ্চিম-বঙ্গের বৃহত্তর কল্যাণের মূখ চেয়ে।

তিনি একের পর এক গত দু'মাসের ঘটনাবলী বলে গেছেন, কাজ করতে গিয়ে তিনি কি ধরনের অসহযোগিতার পরিচয় পেরেছেন তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে গত দু'মাস ধরে, এবং কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মার্জিস্ট কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে ভুল বুঝিয়েছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিতে তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দিনের পর দিন ঘটছে, কোন ধরনের কর্মদক্ষতার অভাবে দিনের পর দিন জিনিসের মূল্য আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিজেকেই উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেছেন, আমরা জনসাধারণকে কথা দিয়েছিলাম যে, আমাদের সরকার তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, প্রবাসীকে স্থিতিশীল করবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনটাই হয় নি, বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরে থাক, দু'লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এটাও বুঝিয়েছেন যে, তাঁর কনকুসন বা সিদ্ধান্তে হরত ভুল ছিল, কিন্তু প্রেসিডে কোন ভুল ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মেলনীয় স্বীকারোক্তিতে উপলব্ধি সকলেই অভিজুত হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেকটি দলের নেতাই স্বীকার করেছেন যে, তাদেরও আত্মসমালোচনা করা উচিত, এবং দলমতানির্বাণে প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে অকুণ্ঠ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সম্মান্য রাজভবনে রাজ্যপালকে জানিয়ে এসেছেন যে, তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।

আমাদের মনে হয় এই ঘটনার ফল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে ভালই হবে। সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক দলই অতঃপর একাবন্ধ হয়ে কাজকর্ম করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে জানা গেছে, এই ঘটনার পিছনে একটি পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর। যারা এই চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিল তারা এবারেও বার্থ হল। কিন্তু ভবিষ্যতে তারা যে এ চেষ্টা আর করবে না তা নয়। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি শেষ মূহুর্তে ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তা যদি আগে থেকেই দেখাতেন তাহলে আজকের এই সম্ভবতের সৃষ্টি হত না।

ভারত দশান

গান্ধীজী স্মরণে

দোসরা অক্টোবর সেই স্মরণীয় প্রভাতে আমরা দেশপূজ্য গান্ধীজীর ৯৮তম জন্ম-দিবস স্মরণে উদ্‌যাপন করছি। আপামর জনসাধারণ এই দিনটি সেই পুণ্যস্থান কথা স্মরণ করেন, যিনি দেশ ও জাতির স্বার্থে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে শিখিয়ে-ছিলেন এমন একটি জাতিকে, দু'শ বছরের গোলামী বাদের প্রত্যেক ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। অথচ এই মহান নেতার শূভাশিষ্যে শৃঙ্খলিত ভারতবাসী সৈদিন কত সহজে সর্বস্ব সাপে দিয়েছিল জাতীয় স্বার্থের খাতিরে। আজ চরম দুর্ভাগ্য, এমন নেতা আমাদের মধ্যে নেই, যিনি নিজেকে কিঞ্চিৎমাত্র স্বার্থত্যাগ করে জাতিকে হীন স্বার্থ-পরতার একমুখীন পথ থেকে প্রত্যাবর্তন করিয়ে আনতে পারেন। বুলি আওড়ান সবাই। গান্ধী-জন্মবার্ষিকীতেও বড় বড় বুলির স্টক উজাড় করে দিয়ে অনেকেই সংবাদপত্রে স্থানাদিকারের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু জনগণের ওপর সেসব বুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আজ বারা নেতা, তাঁরা ক্ষমতালোভী। দেশের জমিদারি নিয়ে হীন চক্রান্তে সবদা ব্যস্ত। আর দেশবাসী অসহায়ের মত তাঁদের স্বার্থব্ধের শিকার। দোসরা অক্টোবর তাই গান্ধীজীর মত মহান নেতার অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে।

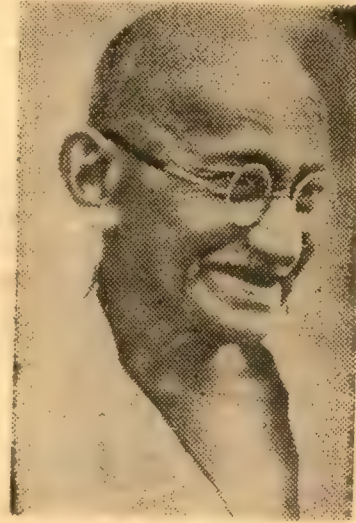
কতকগুলি স্বার্থান্বেষীর হাতে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়ে গান্ধীজীর মত নেতারা যেদিন সমগ্র জাতিকে অকুলে ভাসিয়ে গেলেন, সেদিন থেকেই স্বার্থ নিয়ে উন্মত্ত কামড়া-কামড়ি সমগ্র জাতির মনে প্লাবিত ও হীন আত্মপরতার জন্ম দিল। আজ পিতৃহীন সংসারে অসহায় নাবালকের মত শোষিত অবস্থা সমগ্র দেশবাসীর। দোসরা অক্টোবর এই নিঃসহায় অবস্থাটা আরও প্রকট করে চোখের সামনে মেলে ধরে। বর্তমান নেতাদের উপদেশের বুলি এদিন কারও ভিত্তিভরে শোনার কথা নয়। এই দিনটি একবার স্মরণে আন, আমরা লী হারিয়েছি; অর্থাৎ গান্ধীজীর মত স্বার্থত্যাগী নেতারা আমাদের কতখানি ভরসা এবং নির্ভরতার আশ্রয়চ্ছাদন ছিলেন।

আমরা সেই স্বার্থত্যাগী নেতাদের প্রতি দোসরা অক্টোবর সপ্তস্ব অভিবাদন জানাই, আমাদের প্রগাম সেই সব নেতাদের পায়ে এই পবিত্র দিনে আনন্স পূজাঞ্জলি করে

পড়ে। দেশবন্ধু আর নেতাজীদের স্মরণ করে আমরা পুনশ্চ ভরসা করব বোধি। দেশকে ক্ষণিকের জন্য ভালবাসতে শিখি। দেশবাসীর জন্য আপোষহীন আত্মপরতাকে মূখ্যবিকৃত করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় অধোবদন হই।

গান্ধীজীকে নিয়ে কেন সাজানো নেতার বহুতার প্রয়োজন করে না। গান্ধীজীর বাণী শুনিয়ে কথকঠাকুরের ভূমিকার তাঁদের দেখে আমরা বেদনা অনুভব করি।

গান্ধীজীর জীবনই গান্ধীজীর বাণী, আমরা সেই মহান জীবনের মহিমার কথা স্মরণ করে আজকের দেশব্যাপী ক্ষুদ্রতার চেহারাটা উপলব্ধি করে শিহরিত হই। আপন মনের পচন লক্ষ্য করে এই মুহূর্তে ভাবতে পারি, আমাদের মনের



গান্ধীজী

গলিত কুণ্ডের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার আশু প্রয়োজন। আমরা নশ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমরা মৃত্যু হয়ে পড়েছি। আমাদের বহুতার কাজ নেই। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ দরকার।

তিন প্রধানের আহ্বান

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দুই প্রধান স্বর্গত হয়েছেন, নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজী। তৃতীয় প্রধান বর্তমান, ইন্দিরাজী (বাংলায় বদখল শোনালেও জবরদখলকারী ব্রাহ্ম-ভাষায় শ্রীমতী গান্ধীকে 'ইন্দিরাজী' সম্বোধনই আপন করা হয়)। এই তৃতীয়

প্রধান পূর্ববর্তী দুই প্রধানের মতই আমাদের মধ্যে মধ্যে আহ্বান জানাবার (পদাধিকারবলে) দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পরলা অক্টোবর 'ভারত ছাড়' ডাক-টিকিট প্রকাশ উপলক্ষে, সুদূরায়, তিনি বোম্বাই থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন: এ দিন বিশেষ দিন। বলেছেন, যে স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি বহুতা করছেন, সে স্থান পবিত্র স্থান। কেন না এ স্থানেই ১৯৪২ সালে মাত বাহাদুর জনে শত্রু করেছিলেন ঐতিহাসিক অন্দোলন: 'ছোড়ো হিন্দুস্থান'! সে ডাক প্রতি-ধ্বনিত হয়েছিল হিমালয়-পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত কছের নাক থেকে আসামের কান অবধি। তা' সেই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে, পবিত্র দিনে ইন্দিরাজীর মনে হয়েছে (পূর্ববর্তী প্রধানরা-ও মনে করতেন), অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নিরসন ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অর্থহীন।

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের দুই পূর্বব গিয়ে তৃতীয়ে এসেও এসব কথা যে মনে হচ্ছে তা' জেনেও দেশবাসী পুলকিত। অর্থনৈতিক মুক্তি জিনিসটা অবশ্য পবিত্র স্থান এবং পবিত্র দিনে উচ্চারিত হলেই অর্থনৈতিকশৃঙ্খল বিচূর্ণ করেন। তবে তৃতীয় প্রধানও যে এসব কথা এখনও মনে করেন, অর্থাৎ দেশব্যাপী স্বার্থের ঝগা-বাত্যা সত্ত্বেও এসব কথা যে তাঁর স্মরণ-পথে আসার সুযোগ পায়, সাধারণ মানুষ তাই জেনে এবং ভেবেই পুলকিত। শুনলে জানলে জ্ঞানোদয় হয়ে থাকে। শুনতে শুনতে বোধোদয় হচ্ছেও। আর সেই বোধ বিকোভেরও সৃষ্টি করেছে। বহুতা দেওয়ার এই মারাত্মক ফলাফলের বিষয়টাও নেতা-দের স্মরণ রাখা উচিত। অর্থনৈতিক মুক্তি ভিন্ন স্বাধীনতা যে অর্থহীন। এট বোধো-দয় অবশ্য দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রতই আছে। নেতাকুল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলে সমস্যারও সুরাহা হতে পারে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, নেতাদের বোধো-দয় বিলম্বে ঘটে থাকে। তৃতীয় প্রধানের কাছে তাই নিবেদন: জনসাধারণ জ্ঞান-সমৃদ্ধ প্রায় নিমজ্জমান: কুটো-কটা ফেলে আপনারা তাঁদের বাঁচান দয়া করে। অন্যথা আরও কয়েক বছর এই রেটে কেবলমাত্র জ্ঞানবৃষ্টি চলতে থাকলে জনসাধারণ সেই বন্যার তোড়ে ভেসে যাবেন, সমগ্র জাতির ভাগ্যে ঘটবে জীবন্ত সলিল-সমাধি।

শাস্ত্রী স্বরূপে

নিষ্কলুষ স্বার্থভ্যাগী ছিলেন স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী। অতি অপকাল ভারতের টেলিফোন তরগীটির হাল তিনি শক্ত মূঠিতেই ধরেছিলেন। যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বদাই অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত, লালবাহাদুর সেই পাকিস্তানকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত অর্থাৎ অপদস্থ করেও ছেড়েছিলেন। কিন্তু তাস-খন্দ ছাড়ে নি। পাকিস্তানের গর্বের বেলুনটি তার হাতে পূনরুপ করিয়েছিল তাসখন্দ। শাস্ত্রীজী তাসখন্দেই দেহরক্ষা করেন। শাস্ত্রীজী জর করে বিজিত হয়ে-ছিলেন, আর তাই অকস্মাৎ বিদায় নিয়ে সরেও গেলেন। কিন্তু আমাদের মন থেকে সরে যান নি তিনি। স্বাধীন ভারতের জন্মের পর শাস্ত্রীজীর আহবানেই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত (মানসিকভাবে) চকিতের জন্য জাতির সমগ্র রক্ষার মন্ডে দীক্ষা গ্রহণ করে বহিঃশত্রুকে রুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল পবিত্র জাতীয়তাবোধে উদ্ভূত হয়ে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, কেউ সরে থাকেন নি। সরে থাকেন নি কোন রাজনৈতিক দল দাবার ছক বাড়ির চাল সাজিয়ে। পণ্ডিত জমিতে শাস্ত্রীজী আবার ফসল বুনিয়েছিলেন। পরবর্তী অক্ষম নেতৃত্ব সেই পাকা ফসলের সোনার বরণ রূপটিকে ধরে রাখতে পারে নি। সাজানো মায়ান আবার শুকিয়ে এসেছে। ক্ষমতার খরার পড়ে খসে হচ্ছে চতুর্দিক।

দোসরা অক্টোবর শাস্ত্রীজীকে স্মরণ করতে গিয়ে এই সর্বগ্রাসী দাবানলের বিভীষিকাকে বড় বেশি স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করলাম।

নিজাম কলেজে রক্ত

বেতনবন্দি প্রভিবাদে ধর্মঘট চালা-ছিলেন হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজের ছাত্ররা। ৩০শে সেপ্টেম্বর ছিল ধর্মঘটের বর্ষা দিবস। এদিন কয়েক হাজার ছাত্র কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হন বেতনবন্দি প্রভিবাদ জানাতে।

মহারাজি পুলিশ উপস্থিত হলে, সংবাদে প্রকাশ, পুলিশের ওপর ইন্ট-পার্টেকল চলে। মারমুখী পুলিশ ছাটে গিয়ে তখন এমনি কড়া আক্রমণ চালান যে অধ্যক্ষ অধ্যাপকরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকেন। যে হতভাগ্য ছাত্ররা পুলিশের লাঠি থেকে তাদের বেওয়ারিশ মাথা বাঁচাতে পারে নি কলেজ করিডরে তাদেরই চাপ চাপ রক্ত বারে পড়ে। আর এক হতভাগ্য কাড়ুদার, বার পুলিশ-পেটাই-করা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে কিছু-

মাত্র বোম্ব নাই, সে গুরুতর আঘাতে ধরাশায়ী হয়।

পুলিশকে ইন্ট মারলে পাটকেলটি খেতে হবেই। কিন্তু প্রাঙ্গণে ইন্ট মার-মারিটা মহাবিদ্যালয়ের অন্দরমহলে গিয়ে ছাত্ররক্তে শিক্ষানিকেতনের শানের মোখে রক্তে ধরে দেবে এমন ব্যবস্থা স্বয়ং ইংরেজ সরকার বাহাদুরও করেন নি। বর্তমান পুলিশের বিকারবৃদ্ধি তাও করেছে। অধ্যক্ষ আর অধ্যাপকদের লগ্নুড়-ভাড়িত করেছে, একজন কাড়ুদারের প্রাণ নিয়ে হোলি খেলেছে।

ছাত্ররা বেতনবন্দি প্রভিবাদ করলে পুলিশ তাদের পিটিয়ে মারবে, এই সভ্যতা-বিরোধ ব্যবস্থাটার বিপক্ষে প্রভিবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। খুশিমত মানব ঠান্ডানোর এই বেপরোয়া ক্ষমতাটা উপ-



শাস্ত্রীজী

নিবেশিক শাসকদেরই ব্যবহার করতে দেখা যায়। এদেশী শাসকদের চেহারাটা ডোট-কুড়নো দেশসেবকের। মেজাজটা কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক শাসকের। এই বাইরের চেহারা আর অন্তরের রূপের মধ্যে আসমান জমিন ফারাকটা ঘুচিয়ে একটা সামঞ্জস্য করা না হলে, এদেশের মাটি প্রতিদিন তরুণ ভারতের তাজা খুঁদে লাল হয়েই থাকবে। কেন না ঔপনিবেশিক শাসকের উৎখাতের জন্যই শাসিতেরা বার বার খুন ঢেলে দেয়। এ-পথ জাতীয় সরকারের সূচাসনের পথ নয়। নয়া পথ আবিষ্কারের ক্ষমতা না থাকলে খুন-শিকারী শাসককেও অবশেষে পথ দেখতে হয়।

মণিপুরে মন্ত্রি বঙ্গ

বিগত দশ বছর একটানা কংগ্রেসী শাসনে অভ্যস্ত মণিপুরেও মণিপুরী যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের দখলে চলে গেল।

হারাকলের দশটি ছেলে খসে পড়ার মত টপাটপ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যে পতন শূন্য হয়েছে, চীফ কমিশনারের অধীন মণিপুরেও সেইভাবে কংগ্রেসের পতন ঘটল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৈরং সিং তাঁর পঞ্চসদস্য কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে চীফ কমিশনারের কাছে ঠাঠা অক্টোবর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

যুক্তফ্রন্টের ভাবী-মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, শ্রীলোংজাম থাম্বো সিং।

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর মণিপুরে বিধানসভার স্পীকার শ্রীসালাম তোম্বি আটজন কংগ্রেসী সদস্য নিয়ে দলত্যাগ করেন। সংবাদে প্রকাশ, গত সাধারণ নির্বাচনে কৈরং সিং ও তোম্বি সিং-এর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। শ্রীতোম্বি সিং-এর পদত্যাগ তাই ফলশ্রুতি।

অবশ্য মণিপুরে কংগ্রেসী পতন আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। বর্তমান সদস্যকৃ বিধানসভার ১৭-১৫ হারে সংখ্যালঘু হয়েও গদি ছাড়ে নি কংগ্রেস। মন্ত্রিসভা এতদিন তারাই জবরদখল করছিল যদিও যুক্তফ্রন্টের সদস্যসংখ্যা ছিল দু'জন বেশি। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী কৈরং সিং অনেক পরিশ্রম করেও দলত্যাগী আটজন কংগ্রেসীকে পুনরো ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। শেষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি, ম্যানিয়েন গিয়ে-ছিলেন দলত্যাগী প্রাক্তন স্পীকার সালাম তোম্বি সহ আটজন কংগ্রেসত্যাগীকে আপোষে ফিরিয়ে নিতে। ব্যর্থ তিনিও হলেন। সুতরাং গদি আঁকড়ে থাকার পথ আর রইল না।

মণিপুরের রিভলভিং স্টেজে মন্ত্রিসভা দু'বার দৃশ্যপট পরিবর্তন করল।

বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল বোলটি আসন। পরে নির্দল সদস্যদের দলে ভিড়িয়ে বা ভাগিয়ে এনে পঁচিশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রি দফল করে। কিন্তু বিধি বিমুখে। কংগ্রেস তার কারচুপি মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে পারল না।

সাতশ দফা সূচী

এ পর্যন্ত গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম সর্বনিম্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অধিক সম্যাসীতে কর্মসূচী রূপায়ণের গাজন ঠিকমত বাজছে না। তা ছাড়া বিশ বছরের প্রশাসনকে বাণী-সফটুটনমাত্রই রূপায়িত

করার বাস্তব অসুবিধাও আছে। আর সে- কারণে বহুতর অসুবিধার মধ্যেও জন-সাধারণ অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে দেশব্যাপী আজ অপ্রত্যা-শিত শান্তি বজায় রেখেছেন। নির্বাচন পূর্ববর্তী অশান্ত ভারতের সঙ্গে নির্বা-চন পরবর্তী ভারতের চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ট্রাসের এটাই সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

কিন্তু জনগণের এই সর্বসহ মতিটী দেখে কেউ যদি ভাবেন ভারতবর্ষ সর্ব-প্রকার দখল-কণ্টকেই মেনে নিচ্ছে, তবে নিশ্চয় সাধারণের সংগ্রামী শক্তিকে সঠিক-ভাবে গণনা করা হবে না। কাজ করতেই হবে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে। নচেৎ তাদের নবলব্ধ জনপ্রিয়তা পুনশ্চ আর আর এক ফুৎকারে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যাবে।

একটি অসচেতন নির্বাচনও দেশের হাল পরিবর্তনে কী অপরিমিত ক্ষমতার পরিচয় রেখেছে তা দেখে সাধারণের মনে সাধারণের ক্ষমতা সম্পর্কেও আজ নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে। সুতরাং আজকে কেবলমাত্র গদি ভোগ করার দিন গেছে। মণিপুরের ভাবী-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলোং-জাম থাম্বো সিং নতুন মন্ত্রিসভায় সাতাশ কক্ষ কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাজ্যশাসন শুরুর করবেন বলে জানিয়েছেন। এই সাতাশ কক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যোগ হবে মণিপুরকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

নতুন মন্ত্রিসভায় ছজন পূর্ণাঙ্গ এবং দুজন উপমন্ত্রী থাকবেন। পূর্বে এই হার ছিল, যথাক্রমে পাঁচজন ও দুজন। কংগ্রেস তার পনোরাজন সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক পরিসরে বিরোধী দলের ভূমিকা সুত্বভাবে পালন করবে বলে ঘোষণা করেছে।

জনসংখ্যা এবং ট্রানজিস্টার

ভারতে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টি ফলাও প্রচারের জন্য বহুতর অর্থব্যয়ের নিরন্তর ব্যবস্থা হচ্ছে। নেতাদের বক্তৃতায় যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে হয়েছে তখন সাধারণের সম্মুখে নানা রকম প্রলোভনও তুলে ধরা হচ্ছে। সম্প্রতি একটি করে ট্রানজিস্টার প্রদানের প্রলোভনও রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন দপ্তর সাধারণ কর্মীদের চাকরিগত সর্বোত্তম-প্রদর্শনের স্বারাও এই পরিবার ছাঁটাই পরিকল্পনাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন। মেটরনিটি লীড শীতলের সাকুলার ছাড়া হয়েছিল।

এ-সবই করতে হচ্ছে দেশের জীবন-

ধারণের মানোন্নয়নের জন্য, প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার স্থান সঙ্কুলানে অসুবিধা দূরীকরণের জন্য, বিশেষত খাদ্যসমস্যার সমাধানের নিমিত্ত। পরিবার পরিকল্পনা যে আশু প্রয়োজন, সুতরাং এ-বিষয়ে শ্রমজীবীর অবকাশ নেই। আমরা পতিত জমি আবাদ করতে না পারি, পি-এল ৪৮০-তে ভাগ বসাবার মত পেটের সংখ্যা হ্রাস আমাদের করতেই হবে, অন্যথা সবংশে ধ্বংস অনিবার্য।

প্রতি বছর এদেশে এক কোটি কুড়ি লক্ষ শিশুর জন্ম হচ্ছে। অথচ আনুমানিক মৃত্যুর হার গেছে কমে। ফলত ভয়াবহ অবস্থা। এইভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয়ও আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দশ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে বাৎস-রিক ২০৮ শতাংশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন, জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে দেশের জায়গার বাড়ছে ৮.২ শতাংশের হারে। তাও আবার

দাবির নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ-সম্মুখে “ফলগত”-এর “অবলম্ব” এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর “পাক-ভারতের উপরেখা” প্রকাশ করা গেল না। —সম্পাদিকা

অসমবর্তনের অর্থনীতিতে ধনীরাই ধন-বৃদ্ধির কারণ ঘটছে।

এমত অবস্থায় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার রোধ করা প্রত্যেকের নাগরিক কর্তব্য।

বলা বাহুল্য এ কর্তব্য নতুন শিক্ষিত জেনারেশনের বেশ কিছু মোটা অংশই উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। তারা ছোট পরিবারেরই পক্ষপাতী। জীবন-ধারণের মান উন্নীত করে গাঁছিয়ে বাঁচার প্রবণতা তাদের মধ্যে দ্রুত লক্ষিত হচ্ছে। এমন কি অথচ সন্তানের সংখ্যাধিকা পিতামাতার লজ্জার কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এটা একমাত্র সচেতন, শিক্ষিত সমাজের কথা। প্রকৃতপক্ষে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে এদের হার নিতান্তই নগণ্য। সমস্যাটা তাই এদের বাদ দিয়ে অন্যর জল খোলা করছে। অথচ পরিবার পরিকল্পনার প্রচারের ধরন-শালগণ ও এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সেইমত প্রচেষ্টার পরিবর্তনের দিকে কি যথার্থ নজর দেওয়া হচ্ছে।

সমস্যা আজ অনালোকিত গ্রাম এলাকায় এবং শহর শহরতলী ও গ্রাম-দেশের অন্তর্গত শ্রেণীর মধ্যেই অত্যন্ত প্রকট। শিক্ষিতসমাজে মানুষের সংখ্যা

জীবনধারণের মানোন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু কারিকল্পমের ওপর নির্ভরশীল সমাজ মনে করে পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধিতেই আর-বৃদ্ধি। সন্তানের জন্মদানের পরেই বছর পাঁচেক তাকে প্রকৃতির কোলে মানুষ হতে ছেড়ে দিয়ে ছয় বছর থেকে পরিবারের অন্যতম রোজগারী মানুষের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে তারা। তাদের কাছে সন্তান ধারণের ও পালনের দায়িত্ব অনেক কম।

আমাদের দেশে বড় বড় শহরের রাজ-পথে প্রতিদিন যে অগণিত সন্তান জন্ম-গ্রহণ করছে, সরকার তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি বেন একই রকম দায়িত্বজনক বিব-জিঁত। গণনায় এদের তৌ ধরাই হয় না। পিতৃপরিচরহীন এই বিপুল সংখ্যা কিন্তু পি-এল ৪৮০-র ওপরও মোটা কামড় বাসিরে যাচ্ছে। পরাজিতোজী শ্রমজীবীর এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে?

বাঁরা পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধিই আশ-বৃদ্ধির উপায় বলে মনে করেন এবং বাঁরা সন্তানের জন্মদানের পর ভূমিষ্ঠ জীবনটির কোন দার-দায়িত্ব গ্রহণেরই বালাই রাখেন না, পরিবার পরিকল্পনার ট্রানজিস্টারী প্রচার তাদের কতদূর স্পর্শ করেছে।

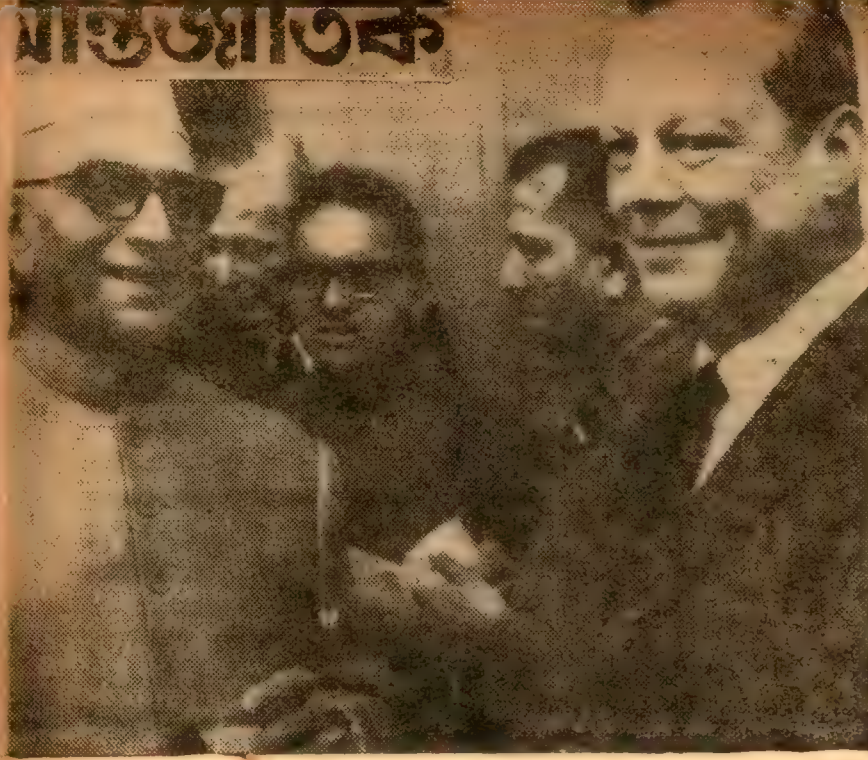
অথচ সমস্যা এইখানে ভীতিপ্রদ আকৃতি গ্রহণ করেছে।

সংবাদপত্রে (নেতাদের বক্তৃতাই যেহেতু এদেশে সংবাদ বলে পরিগণিত) অবশ্য অনেক প্রচার নিরমিত চলাচ্ছে। কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীর হাতে কটা সংবাদপত্র পৌঁছয়। এদের জন্য একটি সুদৃষ্ট পরিকল্পনা রচনাই এই সমস্যা সমাধানের পথে প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপরূপে গণ্য হওয়া দরকার। আমাদের সরকার ঘুরিয়ে নাক দেখতেই অভ্যস্ত। সুতরাং বহু-রম্ভে লঘুভ্রিয়া যথারীতি পরিবার পরি-কল্পনার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে।

রাজপথের মানুষকেও যদি এই সর-কার জাতীয় সম্পদরূপে (মানুষ অবশ্য এদেশে সম্পদ নয়) গণ্য করতেন তবে সমস্যার এইদিকটার নজর পড়ত। কিন্তু সব সমস্যা আমরা অট্টালিকার আকর্ষণে দেখে থাকি। কাজে-কাজেই সমাধানের পথ খুঁজেও আমাদের জাহাজ-বোঝাই ট্রান-জিস্টার আনাতে হয়।

সত্য সেনেকেন্দ্র কী বিচিত্র এই দেশ।

১৬-১০-৬৭



মোরারজী দেশাই-উইলিয়াম সাক্সাংকার

দক্ষিণ আরব :

বৃটিশ উপনিবেশ এডেন ও শেখ-শাসিত ১৭টি ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে বৃটিশ সরকার যে দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিল, তা এখন তাদের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। প্রায় সব ক'টি রাজ্যই বিদ্রোহীদের দখলে, শাসনকর্তারা হয় বন্দী, নয় বিদেশে পলাতক।

ইংরেজ বুঝেছে, এডেন বা দক্ষিণ আরবের এই অঞ্চলে তাদের আর থাকা চলবে না। প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে হ্যারল্ড উইলসনের সরকার ঘোষণা করেছেন, ১ই জানুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখের মধ্যে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে।

কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, দক্ষিণ আরবের জাতীয়তাবাদীরা বিভক্ত এবং এরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে মত্ত। এখানকার জাতীয়তাবাদীরা দু'টি দলে বিভক্ত। একটি দলের নাম 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' বা এন-এল-এফ, আর অপরটির নাম 'ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব সাউথ ইয়েমেন' বা সংক্ষেপে 'ফ্লিস' (Flosy)।

এন-এল-এফের নেতা কুয়াত্তান আসাবি ফ্লিসতেই ছিলেন, ফ্লিস'র নেতা আবদুল কোয়াউই ম্যাকাউই-এর তিনি রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ম্যাকাউই ও ফ্লিস'র অন্যান্য নেতাদের মতভেদ হওয়ায় তিনি দলত্যাগ করে নতুন

সংস্থা এন-এল-এফ গঠন করেন, গত বৎসর আসাবি কারাগারে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাকে আটক করে রাখা হয়, এবং তাঁর ওপর কিছু অত্যাচারও করা হয়। শেষ পর্যন্ত, ম্যাকাউই-এর নেতৃত্ব মেনে কাজ করেন, এই সত্তে তাকে ছাড়া হয়। এই ঘটনার পর থেকে তিনি অত্যন্ত বেশি নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরোধী হয়ে পড়েছেন।

এডেনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কোয়াউই ম্যাকাউই ও প্রমিক নেতা আবদুল্লা আসনাগের নেতৃত্বে ফ্লিস দল নাসেরের সমর্থক। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া, ইরাক, আলজিরিয়া প্রভৃতির সঙ্গে ফ্লিস সম্পর্ক রক্ষা করে কাজ করছে।

দুই দলের মধ্যে কিন্তু এন-এল-এফের শক্তিই বেশি। এই দল আলজিরিয়ার বিপ্লবীদের কায়দার সংগ্রাম পদ্ধতি চালাচ্ছে, এবং এখানকার অধিকাংশ আরব এই দলের সমর্থক। ফ্লিস'র বিরুদ্ধে এদের রাগও প্রচুর। কিছুদিন আগে এদের লোকেরা এডেনে ম্যাকাউই-এর বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে এবং ম্যাকাউই-এর তিন ছেলেকে হত্যা করে।

এন-এল-এফ জনসাধারণের আস্থা-ভাজন ও বিপ্লবী দল হওয়া সত্ত্বেও চিন্তাধারার দিক থেকে এরা বিশেষ প্রগতিশীল নয়। নাসেরের বিরোধী হওয়ায় এরা ফয়জাল ও সৌদি আরবের

দু'দলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছে। ইংরেজদের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ রয়েছে। ইংরেজরা জানে তারা এখানে থাকতে পারবে না, তাই বাতে দেশটা এখন নাসেরের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে তার জন্যই তাদের যত চেষ্টা। এই কারণেই ফ্লিস'র বিরুদ্ধে এন-এল-এফকে তারা সমর্থন করছে। এন-এল-এফের সম্ভাব্য-বাদীরা যখন একের পর এক রাজ্য দখল করছিল, তখন বৃটিশ হাই কমিশনার হামফ্রে টেভলিন এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি, এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কি আছে!

যাই হোক, এখন এই দুই বিবাদমান দল ঐক্যবন্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উভয়েই বুঝেছে, ইংরেজের ভেদনীতির শিকার না হয়ে, দেশের স্বাধীনতার জন্য সকল জাতীয়তাবাদী ঐক্যবন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

২৬শে সেপ্টেম্বর দুই দলের নেতাদের এক বৈঠকে ঠিক হয়েছে, উভয় দল ঐক্যবন্ধভাবে কাজ করবে। প্রত্যেক দল থেকে ১০ জন করে সদস্য নিয়ে, ২০ জন সদস্যের একটি 'ন্যাশনাল কমিটি' গঠন করা হবে। এখন থেকে ইংরেজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার আলাপ-আলোচনা এই কমিটি করবে। ভবিষ্যতে স্বাধীন সরকারের ভিত্তিও হবে এই কমিটি। আরও স্থির হয়েছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দুই দলের প্রতিনিধিরা একটি বড় সম্মেলনে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

জাতীয়তাবাদী শক্তির এই মিলনে সবচেয়ে অশুভি আঙ্গ ইংরেজ সরকার এবং আরব জগতের প্রতিভ্রাংশীল শক্তিসমূহ। কারণ, এই মিলনের মধ্য দিয়ে নাসেরের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল আরব-শক্তির সঙ্গে একত্র কাজ করার আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। এন-এল-এফের নেতা কুয়াত্তান আসাবি ইতিমধ্যেই সৌদি আরব ও বাটেনের ভূমিকার সমালোচনা করে কড়া করেছেন।

জাপান :

জাপান কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে? সম্প্রতি টোকিও'র বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'আসাহি সিমবুন' প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে সে-কথাই মনে হয়।

'আসাহি সিমবুন' সংবাদে প্রকাশ, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও মিকি সারাসারি উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মারফৎ এ ব্যাপারে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তর ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক গোপন আলোচনা সূত্র করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

তাকেও মিকি কিছুদিন আগে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব যুরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। যে-সব দেশে জাপান ও উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর দেশের কূটনীতিক প্রতিনিধিরা আছেন, সেখানে তাকেও মিকি জাপানের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য।

তাকেও মিকি তথা জাপান সরকারের এই প্রচেষ্টা সফল হবে কি না পরের কথা, কিন্তু এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ আছে এই ব্যাপারে। জাপান সরকারের ওপর মার্কিন প্রভাব খুবই বেশি। সুতরাং এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ মতই জাপান এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তবে হ্যানের বর্তমানে কোন আলোচনার রাজী হবে বলে মনে হয় না। কার্দিন আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন জনসন উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। হ্যানয়ের সরকারী মুখপত্র 'নান দান' এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের বক্তব্য, মধ্যে শান্তির কথা বললেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণাত্মক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আলোচনার বসা নিরর্থক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই কোন মীমাংসা চায়, এবং এর জন্য উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে চায়, তবে প্রথমে তাকে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে আনতে হবে। তার আগে কোন আলোচনা সম্ভব নয়। এ কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং যারা তার মধ্যস্থ হয়ে কাজ করবে, তাদের সবাইকে বুঝতে হবে। না হলে, সবটাই প্রচার বলে মনে হবে, পেছনে আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

কম্বোডিয়া :

চীন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিভাবে তার সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিবাদে মত্ত হচ্ছে। এবার কি কম্বোডিয়ার পালা?

কম্বোডিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কেবল নিরপেক্ষ নয়; আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বরং একটু কমিউনিস্টপন্থেই ঝুঁকি আছে কম্বোডিয়া ও কম্বোডিয়ার রাষ্ট্র-প্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে কম্বোডিয়া এখনও চীনের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে নি। ভিয়েতনামের ব্যাপারে কম্বোডিয়া বরাবর মার্কিনগামীদের পক্ষে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের বিচারে নরোদম সিহানুক কমিউনিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়।

এই নরোদম সিহানুককেও আজ চীনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া কথা বলতে হয়েছে। রাজধানী নম্‌পেনে এই অক্টোবর নরোদম সিহানুক চীনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে, এবং বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে গোলাবোম্ব সৃষ্টির চেষ্টা থেকে চীন যদি বিরত না হয়, তবে কম্বোডিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে। তিনি অভিযোগ করেছেন, হংকং-এর মত চীন কম্বোডিয়ার ভেতরেও গোলাবোম্ব করার চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে তিনি কম্বোডিয়ার দু'জন কমিউনিস্ট নেতার বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন। এ'রা হলেন, আইনসভার সদস্য হু লিম, এবং স্টেট ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার কুক চে। এ'রা চীনাাদের সাহায্য দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত।

নরোদম সিহানুক বলেছেন, এই অবস্থা যদি চলে থাকে, তাহলে তিনি বাধ্য হয়ে সৈন্যবাহিনীর হাতে সকল ক্ষমতা তুলে দেবেন। তারপর হয়তো রাজতন্ত্র থাকবে, জাতীয়তাবাদও থাকবে, কিন্তু নিরপেক্ষতা থাকবে না; সৈন্যবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করবে, এবং শেষ পর্যন্ত কম্বোডিয়া মার্কিন প্রভাবে চলে যাবে।

কতটা বিরক্ত ও বিপন্ন বোধ করলে নরোদম সিহানুকের মত ব্যক্তিকেও এমন উক্তি করতে হয়, তা সহজেই বোঝা যায়। চীনের রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে, নরোদম সিহানুকের এই মন্তব্য সে-কথাই প্রমাণ করে।

বুটেন :

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনে উইলসন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর এবার খাস শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলনেই একই ব্যাপার ঘটেছে। গত সপ্তাহে স্কারবরোতে শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে একের পর এক প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে উইলসন সরকারের অর্থনৈতিক নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা করেছেন। বুটেনের বর্তমান বেকার সমস্যা ও মূল্যবৃদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে তারা প্রশ্ন করেছেন : রক্ষণশীল দলের সরকারের চেয়ে শ্রমিক দল তাহলে নতুন কি নীতি গ্রহণ করল? সেই একই নীতি চলছে। বামপন্থী শ্রমিক নেতা জ্যাক কজিনস ও মাইকেল ফুট সরকারের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের নেতৃত্ব করেন। আরও উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন বলে পরিচিত প্রাক্তন নৌ-মন্ত্রী ক্রিস্টোফার মোহিউ-ও প্রায় একই সুরে কথা বলেন। স্কারবরোতে উইলসনের বিরুদ্ধে দলের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সকলে একাবাক্ষ্য হয়েছিলেন।

এই সমালোচনার বিরুদ্ধে অবস্থা দু'দু'তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী জেমস্‌ কাল্যাভান, এবং প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন স্বয়ং। উইলসন বলেছেন, সমস্যা রয়েছে, এবং এই সমস্যাতে সবাইকে ত্যাগ স্বীকার করার জন্য তারা আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস রয়েছে, তারা এই সমস্যা পার হতে পারবেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রতিনিধিরা সরকারপক্ষের অর্থনৈতিক প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পাড়েছে ৩,২১০,০০০ আর বিপক্ষে ৩,০১১,০০০। দলের কোষাধ্যক্ষপদে অর্থমন্ত্রী কাল্যাভানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে-

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বত্র হইতে সংগৃহীত। সংবিত, সংশোধিত ও সংস্কৃত সংস্করণ)

বহু আরাণ্য ও অধ্যবসারে আহুত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুক্তি, আর্থ-সংকর্মানুষ্ঠান সঞ্চীর বাবতীর তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থাংশ প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও যত্নপূর্ব্বক বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত্ত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মূর্ত্তা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

ছিলেন বামপন্থী নেতা মাইকেল ফুট।
কুট কালামানের প্রায় অর্ধেক ভোট
পেয়েছেন। এর থেকেই প্রমাণ হয়, দলের
আধিকাংশ সদস্য এখনও সরকারের অর্থ-
নৈতিক নীতির পশ্চাতে রয়েছেন। বিপ্লব
ভোটাদিক্যে প্রতিনিধিত্ব করে বৃটেনের 'কমন
মার্কেটে' যোগদানের প্রস্তাবও সমর্থন
করেছেন।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কিন্তু একই
কথা বলা যায় না। স্কারবেরা সম্মেলনে
গৃহীত প্রস্তাবে, বৃটেনকে অবিলম্বে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতানাম নীতির
সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করার জন্য আহ্বান
জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন
প্রতিনিধির কাছে বিশেষভাবে আবেদন
করেন, এই প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্য।
কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি ভোটাদিক্যে
গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট
পড়েছে ২,৭৫২,০০০ আর বিপক্ষে
২,৬৩৩,০০০।

আর একটি প্রস্তাবে সম্মেলন দাবি
করেছে, গ্রীসে যতদিন সামরিক শাসন
থাকবে, ততদিন 'ন্যাটো' থেকে গ্রীসকে
সাম্পেদ করে রাখতে হবে। এই
প্রস্তাবটিও নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও
পাশ হয়।

পশ্চিম জার্মানী :

ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী
শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর দীর্ঘ বিদেশ

সফরের শেষ পর্বে পশ্চিম জার্মানী
যান।

বনে শ্রীমোরারজী দেশাই পশ্চিম
জার্মানীর চ্যান্সেলর কুর্ট জর্জ কিসিংগার,
পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলি ব্রান্ড, অর্থনৈতিক
সহযোগিতামন্ত্রী হান্স জুর্বেগান উইস-
নেস্কি প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা
করেন।

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ভারতের
ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের

বিজ্ঞাপ্তি

শারদোৎসব উপলক্ষে আগামী
১৯শে অক্টোবর "সাংবাদিক
বঙ্গবন্ধু"র প্রকাশন বন্ধ থাকবে।
—সম্পাদিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিম জার্মানী
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ
খ্যাপারে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা
কিভাবে আরও বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কে
শ্রীদেশাই জার্মান নেতাদের সঙ্গে আলো-
চনা করেন।

পররাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার
পর ভারতকে সাহায্যের জন্য একটি নতুন
চুক্তির খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা

হয়। এই চুক্তি সম্পন্ন করে শ্রীদেশাই
কোলোনে গিয়ে জার্মান শিল্পপতি
ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত
হন।

শ্রীদেশাই ভারতে আরও অর্থ বিনি-
য়োগ করার জন্য শিল্পপতি ও
ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন করেন। তিনি
বলেন, ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের
প্রচুর ও লাভজনক সম্ভাবনা রয়েছে।
তিনি তথ্য পরিবেশন করে দেখান, গত
২০ বছরে কোন বিদেশী কোম্পানী
ভারতে কোনরূপ লোকসান করে নি।

শ্রীদেশাই-এর আলাপ-আলোচনার
ফলে জার্মান শিল্পপতিমহলে উৎসাহের
সৃষ্টি হয়েছে। এবং ভারতে নতুন করে
বিনিয়োগের জন্য তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা
দেখা দিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত
শ্রীঅর্থনৈতিক দৈনিক 'হানডেনসব্ল্যাট'
শ্রীদেশাই-এর ভ্রমসী প্রশংসা করে বলেছে,
তিনি হচ্ছেন 'বিদেশী মূলধন নিয়োগের
প্রধানতম সমর্থক'।

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর কুর্ট
জর্জ কিসিংগার শ্রীদেশাই ভারত
সফরে আসছেন। শ্রীদেশাই-এর সঙ্গে
কিসিংগারের ভারত সফরের বিষয় নিয়েও
আলোচনা হয়েছে। কিসিংগারের ভারত
আগমনের পূর্বে শ্রীদেশাই-এর পশ্চিম
জার্মানী সফর ভারত-জার্মান সহযোগিতার
দিক দিয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।



অজয় অজয় বইলেন

শ্রীসংবাদিক

গত পঞ্চকাল রাজ্যে সর্বাপেক্ষা উৎসাহ আর উৎকর্ষের সৃষ্টি করেছিল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গ। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করছেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসের সমর্থনে রাজ্যে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করছেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে কংগ্রেসের মধ্যে হাত মिलाচ্ছেন। এই সংবাদগুলির দ্বারা হিসাবে আরো অনেকগুলি সংবাদও জনমনে নানা প্রতিভিন্দ্রা সৃষ্টি করছিল। এই সংবাদগুলি ছিল, রাজ্য কংগ্রেসের বদলে এ্যাড হক হচ্ছে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দুইজন বিপরীতমুখী নৌকার চড়েছেন, ভারতীয় স্বাধীন দলের সদস্যরা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করছে। এই সংবাদগুলির যে-কোন একটি সংবাদই প্রায় সমগ্র সংবাদ জনগণকে গরম রাখতে পারত, কিন্তু এতগুলি রোমাঞ্চকর সংবাদকে এক সঙ্গে বহন করে গত পঞ্চকাল রাজ্য রাজনীতির আসর সাম্প্রতিককালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল।

বহুস্পর্তিবার রাতে সব উত্তাপ আর উত্তেজনার শেষ হল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব ঘোষণার পর যে যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছে—চলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়া সংবাদগুলি সব আলোতে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কল্পনা করতে পারে না, কোয়ালিশন সরকারের কথা, কেউ কল্পনা করতে পারে না, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জাড়া অন্য কোন ব্যক্তির মুখ্যমন্ত্রী হবার কথা, কংগ্রেসের এ্যাড হল কি না হল সেই কথাও জ্বলো হরে গেছে। আজ সম্ভবত মানবের মনে একটি মাত্র প্রশ্ন সামান্য উর্ধ্বি মারছে এবং প্রশ্ন হল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কেন পদত্যাগ অথবা নতুন সরকার গঠন করছে চেষ্টা-ছিলেন। চেষ্টাছিলেন অত্যধিক দৃঢ়তার সঙ্গে, দৃঢ়তার মধ্যে কারো মন জয়, কারো মন ভাঙানো, কারো কাছে অঙ্গসমর্পণ বা কাউকে ব্র্যাকমেল করার কোন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা ছিল না। আন্তরিকভাবেই চেষ্টাছিলেন বর্তমান সরকার ভেঙে যাক, নতুন পথে যাত্রা শুরু হোক তার জন্য যে-কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনেও তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। পুলিশ, মিলিটারী থেকে শত্রু করে—সবদিকই প্রস্তুত করেছিলেন। স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাতে যে যে পথ গ্রহণ প্রয়োজন সব পথ-ই তিনি করেছিলেন। এই পথ গ্রহণের মধ্যে দুইটি বিষয় ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক হল স্বাক্ষর একক

যাত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর নতুন যাত্রাপথেও কোন সঙ্গী নিতে চান নি, কোন ব্যক্তি বা দলকে ভাঙাতে চান নি, এমন কি তাঁকে সমর্থনের জন্যও কারো উদ্দেশ্যে নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন নি। আর এই একক যাত্রার জন্য কোন কাজই করতে ব্যক্তি রাখেন নি কিন্তু সেটাও নিঃশব্দে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সঙ্গে কথা বলেছেন, শ্রীমদ্যর সঙ্গে কথা বলেছেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে কথা বলেছেন, রাজ্যপাল ধরমবীরের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু কথা বলেন নি সর্বসময়ের বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীসুশীল খাড়ার সঙ্গে, পরম সহৃদয় শ্রীসত্যীশ সামন্তের সঙ্গে, ভিন্ন রাজনীতি হলেও প্রচুর চির আবদ্ধ শ্রীকিশোরী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, একান্ত মনের মানুষ শ্রীসুকুমার রায়ের সঙ্গে, রাজনীতির উৎসাহ রাখতারা আবদ্ধ শ্রীহেমন্তবাবুর সঙ্গে, মান্তীর মশার ও সহকর্মী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে।

তাই সব ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই কাজ করতে চেষ্টাছিলেন? বিগত কয়েকদিনের কাজগুলি বিচার করলে এক কথায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বিশ্বাস-ঘাতক, শঠ, জালিয়াৎ, ভিলেন, অভিনেতা, মিথ্যাবাদী সহ বহু অখ্যাতি আর দুর্নামে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। অথচ, এই সব কাজের কথা জেনে ও বুঝে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ তাঁকেই ভো নেতৃপদে বরণ করে নিল, শ্রদ্ধা বরণ করে নেওয়া নয়—গত মার্চ মাসের শুরুর্তে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের আসন উক্ত নেতৃবৃন্দের কাছে বসতা উঠে ছিল—সেই উঠেই রয়ে গেল। রাজনীতি মাজিক নয়, কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মাজিকের মত ভাবড় ভাবড় রাজনীতিদেবের চোখে জল এনে দিলেন, উক্ত নেতৃবৃন্দ শ্রীমুখোপাধ্যায়কে নিজেকে মধ্যে ফিরে পেয়ে আনন্দে গর্বে উৎফুল্ল হলেন—এই অঘটন কি করে সম্ভব? এমন ঘটনা সাম্প্রতিককালে কখনও ঘটে নি যে, একটি সংবাদ একসঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীজ্যোতি বসুকে একই সঙ্গে আনন্দ দিয়েছে। এতবড় অঘটন ঘটে কোন যাদুকরীতে?

দীর্ঘ এই ১৫ দিন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মন ও কর্মধারা অনুসরণ করলে বোঝা যায়, এই যাদুর পিছনে একটিমাত্র কৌশল আছে, সেই কৌশল হল অকপট দেশপ্রেম, সকল কিছুর উর্ধে দেশকে স্থাপন করা। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের

এই সাফল্যের পক্ষে দেশপ্রেমই তাঁকে অকলঙ্ক রেখেছে। যারা বড়বন্দ করছে আর যারা বড়বন্দ বর্ষ্য করতে চেষ্টাছে, সকলেই মনে মনে বুঝেছে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মনের সামনে দেশ ও দেশের মানুষ এত দৃঢ়ভাবে আসন দখল করে আছে যে, সেখানে পৌঁছানো বা সেই স্থান থেকে তাঁকে নামিয়ে আনা কোন-ভাবেই সম্ভব নয়। গত বৃহস্পতি শ্রীমুখোপাধ্যায় যখন যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা ও মন্ত্রীসভার কাছে তিনি কি চেষ্টাছিলেন আর কি করেছিলেন বিবৃত করেন, তখন ঘরে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে চিন্তা করেছিল—একটা রক্তমাংসের মানুষ কিভাবে এমন নিঃসন্দেহ স্বীকারোক্তি করতে পারে। এতটুকু কঠোর নেই, এতটুকু আড়ম্বর নেই, এতটুকু বিশ্বাস নেই। পর পর সব বলে গেলেন—তিনি কি করেছেন। হ্যাঁ, প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে রাজভবনে থানা থেকে কথা বলেছেন, হ্যাঁ, শ্রীমদ্য, শ্রীমতী ইন্দিরা ও শ্রীচ্যবনের সঙ্গে কথা বলেছেন, হ্যাঁ, মিলিটারি প্রস্তুত করেছেন, পুলিশ প্রস্তুত করেছেন, হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে শ্রীজ্যোতি বসুকে জেলে পুরতেও আপত্তি ছিল না, হ্যাঁ জানি কংগ্রেস আমার হাতে ডামাক খেতে চায়, হ্যাঁ, জানি দেশে অরাজকতা নেমে আসতে পারে, জানি বহু প্রাণহানি ঘটতে পারে।। শেষে বলেছেন, কিন্তু কেন এই পথ নিয়েছিলাম, এই পথ নিয়েছিলাম দেশকে বাঁচাতে, দেশের মানুষকে রক্ষা করতে। ছয় মাস সরকার গঠন করে কি করেছি, নতুন সরকার করে মানুষকে খেতে দিতে চেষ্টাছিলাম। খেতে দিতে পারি নি, পাঁচ টাকা চালের কিলো হয়েছে, লোককে চাকুরি দিতে চেষ্টাছিলাম, ছয় মাসে বাট-সস্তর হাজার মানুষকে বেকার করেছি, দেশকে সম্মত করতে চেষ্টাছিলাম, ছয় মাসে ছোট-বড় তিনশত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, দেশের অর্থভান্ডার শূন্য, খাদ্যভান্ডার শূন্য, আইন-শৃঙ্খলা, ধন-সম্পত্তি জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই—তবে কার জন্য আপনারদের সঙ্গে সরকার কার জন্য আপনারদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট? আর আপনারা কি আমার দেখেছেন, আপনারা কি আমার মনেছেন। সেইদিন ওরা আগষ্ট মহাকরণে সরকারী কর্ম-চারীরা যখন আমার অপমান করল, নিগ্রহ করল, (তাঁরা তো, এই যুক্তফ্রন্টেরই কোন শরিকের অনুগামী) কই সেইদিন তখন তো শ্রীজ্যোতি বসু এগিয়ে এসে বললেন না—অজয়বাবু, আপনার অপমান, আমার অপমান। আমি আপনার পাশে আছি।

দায়িত্ববোধ

যেদিন গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে কয়েকশত
অতিথির সামনে খাবার টেবিলে জল দিয়ে
ধাবার দিতে অস্বীকার করে যে কর্ম-
চারীরা অমানবিকভাবে আমায় অপমান
করল, কই সেদিন তো কেউ এসে বললেন
না, এসব যারা করেছে অন্যায় করেছে,
আমরা এই অন্যায়ের প্রতিকার করব।
রাজ্যে এত খুন, এত ঘেরাও, এত অব-
রোধ হচ্ছে—সবই কি ন্যায়ভাবে হচ্ছে?

যদি অন্যায়ভাবে হয়ে থাকে, কই
তো জোর গলায় বললেন না—এই অন্যায়
আমরা বরদাস্ত করব না, এই অন্যায়ের
আমরা প্রতিবাদ করছি।

না, কথা বলতে পারেন নি সেইদিন
অনেকে, বরং স্বীকার করেছেন—মুখ্য-
মন্ত্রীর মনোভাবকে, আর বলেছেন
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ভুল করেছেন,
অন্যায় করেছেন, দুর্বলতার পরিচয়

দিয়েছেন, কিন্তু সব কিছুর করেছেন
একটিমাত্র ভাবনায়—সেই ভাবনা হল—
দেশের মানুষের ভাল হবে। হতে পারে
সেই পথ ভ্রান্ত, হতে পারে সেই পথ
সুফলবাহী নয়, হতে পারে সেই পথে
বিপদ আরও বাড়ত; কিন্তু তিনি দেশের
মানুষের মঙ্গলের বাইরে কিছু ভাবেন নি।
তাই অজয়—অজয় রয়ে গেলেন, দেশের
মানুষের কাছে, যুক্তফ্রন্টের দলগুলির কাছে।

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে করে কাচে



সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে
দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়।
দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার
জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হবে।

ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর
সেই ফেনা কাপড়চোপড় অন্যায়সে হৃদয় পরিষ্কার
ঝলমলে করে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই
সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার

প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখ্যমন্ত্রীর দায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর।]

■ দ্বিতীয় ■

শরৎ বোস সাহেবের চেম্বারে আমি বেশ ক'বছর ডেভেলিং করেছিলাম। তাঁর কাছে কাজ করে আমার যে সত্যিই উপ-
কাব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। শরৎ বোস সাহেবের আর্জি'র মনোবিদ্যা-
যাকে চলিত ইংরেজী ভাষায় বলে ড্রাফ্টিং ওয়ার্ক—তা আমার খুব ভাল লাগত। এই ড্রাফ্টিংয়েব উপরেই নিষ্ঠ'র
কবাবে মামলাটার ফলাফল। ড্রাফ্টিংয়ের দোষ হলে ভাল মামলাও কে'চে যেতে
পাবে। সেইজন্যে আর্জি'টা এমনভাবে লিখতে হবে যে সেটা হবে সংক্ষেপ এবং
সমৃদ্ধ। তাব ভাষাটা এমন হওয়া চাই যে, প্রয়োজনবোধে কেসটাকে সামান্য একটু
অদল-বদল কবে নেওয়া যায়। শরৎ বোস সাহেবের ড্রাফ্টিংটা ছিল ঐ ধরনের।
তাঁর ডেভিলদের প্রতি মমতা খুবই ছিল। অনেক সময় তাঁর জন্যে আর্জি'র যে একটা
খসড়া করে রেখেছি সেটা দেখে এবং ব্রীফটা পড়ে হেসে হেসে বলতেন—“সুখী,
তোমার খসড়াটা ঠিক লাইনেই হয়েছে। আচ্ছা, এই প্যারাটা এই রকম করে একটু
বদলিবে দিলে তুমি যা বলতে চেয়েছ সেটা আবো স্বচ্ছভাবে বলা হয় না?”
এইরকম স্তোত্রবাক্য দিয়ে খসড়াটার খোল নল্চে সবই বদলিয়ে দিতেন। শেষের
দিকে অবিশ্যি এই অদল-বদল বেশি হোত না। তাঁর কারণ আমার ড্রাফ্টিংয়ের
উৎকর্ষ, না, শরৎ বোস সাহেবের সময়ের অভাব তা কে বলবে। শরৎ বোস সাহেবের
সংশোধিত আমার লেখা অনেকগুলি আর্জি'র খসড়া আমার কাছে জড় করা
ছিল। আমার নিজের কাজে সেগুলি খুব কাজে লেগেছিল। শরৎ বোস সাহেবের
সঙ্গে কাজ কবতে গিবে আমার আব একটা উপকার হয়েছিল। বেশ ক'জন
এটেনীদেব সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল যাঁরা পরে আমাকে কাজ দিতে সুরু
করেন।

শরৎ বোস সাহেবের চেম্বারে কাজ

করায় আমার কৌলীনা নিশ্চয়ই বেড়েছিল। কিন্তু অর্থগত তেমন বেশি কিছু হয়
নি। শরৎ বোস সাহেব আমার পারি-
বারিক অস্বচ্ছলতার কথা জানতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁর উডবান' পার্কের
বাড়ির আফিস ঘরে অন্য কেউ ছিলেন
না। তিনি আমাকে বললেন—“সুখী,
আমি ত' তোমার কোনো কাজে আসতে
পারছি না। কি করা যায় বল ত'?” আমি
বললাম—“কেন, বেশ ত' আছি। পাঁচ
দিনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে।। মন্দ
কি?” হেসে তিনি বললেন—“সুখী,
আলাপেই ত' পেট ভরবে না। কিছু
পরসাতালা কাজ চাই ত'।” তাবপর
অনেকক্ষণ ধবে আলোচনার পরে তিনি
বললেন—“খৈতান কোম্পানীর কাজের
অন্ত নেই এবং কালীপ্রসাদ খৈতান ব্যারি-
স্টার কাজ সামলিয়ে উঠতে পারছেন না।
তুমি তাঁর চেম্বারে কাজ করলে ছিটেফোঁটা
কিছু পেলেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।
আমিই কালীর সঙ্গে কথা বলবখন।”
তিনি কে. পি. খৈতান সাহেবকে আমার
কথা বলে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে
দিলেন। আমি খৈতান সাহেবের সঙ্গে
ডেভেলিং সুরু করলাম। খৈতান পরিবার
তখন হ্যারিসন বোডের একটা ভাড়া বাড়িতে
থাকতেন। আমি সপ্তাহেব পাঁচ দিন
খৈতান সাহেবের চেম্বারে যেতাম। খৈতান
কোম্পানী'ব এটেনী আফিসের সংলগ্ন
একটা বেশ মাঝারী ধরনের ঘরে। কি
কাজের ভিড়। কমার্সিয়াল স্টুট'ব আর্জি'
কি জবাব-দাওয়া খসড়া করা, রিসিভার,
ইনজাংশন, আববিট্রেশনের আর্জি' কি
জবাব লেখা চলেছে ত' চলেইছে। মক্কেল
ঘরে গিচ্ছ' গিচ্ছ' কবত। খুব চাপের উপর
কাজ করতে হোত খৈতান সাহেবকে। বোজ
সন্ধ্যায় চেম্বারে বসেই পাঁচটা, ছটা
ড্রাফ্টিং কাজ সেয়ে নিতেন। সকালে আবার
বাড়িতে বসে মক্কেলের কাজ করতেন।
আমি ছুটির দিন সকালে খেবে দেয়ে
খৈতান সাহেবের বাড়ি যেতাম এবং সেখানে
সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম।

দুপুরের খাওয়াটা ঠিকই সঙ্গে হোত।
প্রথমে যেতাম হ্যারিসন বোডেব ভাড়াটে
বাড়ি। তার পর যেতাম সৈয়দ আলি
লেনের ভাড়াটে বাড়ি এবং শেষে যেতাম
জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের ঠিকের নিজস্ব বাড়িতে।
সেটাকে প্রাসাদ বললেও অত্যাড়ি হবে না।
খৈতান সাহেব কাজ করবার জন্যে কয়েকটা
আর্জি' ও জবাব-দাওয়ার মডেল ছকে বেখে
ছিলেন। ঐ ধরনের ব্রীফ এলে বাদী
ও প্রতিবাদীর নাম ও ঘটনার দিনক্ষণ
পাশে সেই ছকের মধ্যে ফেলে কাজ নিষ্পন্ন
হোত। যখন কাজের চাপ বেশি হোত
তখন আমিও অনেক সময় মামলা' গান-
লার আর্জি' কি জবাব-দাওয়া ঐ ফর্ড
অনুসারে লিখে দিতাম। তাতে কয়েক
খৈতান সাহেবের একটু সাহায্যও হোত।
খৈতান সাহেব আমাকে যথেষ্ট স্নেহই
করতেন। অনেকে বলে যে খৈতান সাহেব
খুবই খিটখিটে মানুষ, পান থেকে চুণ
খসলেই আগুন হয়ে যান। কাজেব সময়
জুনিয়াবরা বা এটেনীরা যদি তৈরি হয়ে
না এসে সময় নষ্ট করেন তবে যে কোন
কাজের কৌশলী'রই মেজাজ খারাপ
হবারই কথা। সে যাই হোক, খৈতান
সাহেব কিন্তু আমার সঙ্গে সর্বদাই হাসি-
মুখেই কথা বলেছেন এবং আমার প্রতি
বিস্তর হৃদয়তা দেখিয়েছেন। একদিন তিনি
আমাকে একটা দু' শ' টাকার চেক দিয়ে
বললেন—“দাস, তুমি এটা নাও। তুমি
গতব খাটিয়ে আমাকে যে ব্রীফগুলি সেবে
ফেলতে সাহায্য কবেছ তাব হা'সেব থেকে
তোমাকে এইটুকু দিচ্ছি।” আমি এর
জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম না। বললাম—“সে
কি, খৈতান সাহেব। আপনার ফীসের
মধ্যে আমি কি কবে ভাগ বসাব? না, না
সে হয় না।” তিনি ছাড়লেন না। বললেন
যে এতে আনপ্রফেসন্যাল কিছুই নেই।
বিলেতেও নাকি সিনিয়াবরা তাঁদের
ডেভিলকে এই রকম অস্প-বিস্তর দিয়ে
থাকেন। আমি এটা নিলে তিনি খুশি
হবেন। অগত্যা নিতে হোল। এব পরের
মাসেও একটা চেক দিয়েছিলেন। নিয়ে-

ছিল। বটে কিন্তু আমার মনের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সে সময়ে আমার কাছে মাসে দু'শ' টাকার মূল্য ছিল খুব বেশি। কিন্তু মনে বাধল। খেতান সাহেবকে বললাম মনের কথাটা। শুনে তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। তবে দেখলাম যে খেতান কোম্পানী থেকে মাঝে মাঝে সহজ দু'একটা করে ড্রাকটিং ব্রীফ আসতে লাগল। তাইতে মনে অনেকটা শান্তি ও ভরসা পেলাম।

এই খেতান পরিবারের চন্দীপ্রসাদই ছিলেন ল কলোজে আমার ছাত্র বীর কথা আগেই বলেছি। খেতান সাহেবের বড় ভাই লক্ষ্মীপ্রসাদ এটনসী ছিলেন না কিন্তু আফিসের সমস্ত কাজকর্মই তিনি শুদারক করতেন। দ্বিতীয় ভাই দেবীপ্রসাদ ছিলেন পাকা এটনসী। বস্তুত খেতান কোম্পানীর আফিস দেবীাবাবুই গড়ে তুলেছিলেন নিজের চেষ্টায়। বেশ নুসরণ ছিল তাঁর চোখা। অত্যন্ত ভয় ছিল তাঁর ব্যবহার এবং গভীর ছিল তাঁর আইনজ্ঞান ও বিষয়বোধ। খেতান সাহেবের পরের ভাইয়ের নাম ছিল দুর্গাপ্রসাদ। দেবীাবাবু ফার্মের কাজ ছেড়ে বিড়লা কোম্পানীতে যোগ দিলে দুর্গাবাবুই এটনসী ফার্ম চালাতেন। তিনি বেশ হাসি-খুশি মানবুই ছিলেন। আমাকে তিনি কি করে ওড়িয়া মনে কবলেন জানি নে কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে “দাস পো” বলে ডাকতেন। আমি যখন খেতান সাহেবের সঙ্গে কাজ করি তখন ভগবতীপ্রসাদ এটনসী আফিসে ছিলেন কি না মনে নেই। তবে তাঁর সঙ্গে পরে আমার যে বন্ধুত্ব হয়েছিল আজও সে বন্ধন অটুটই আছে। ভগবতীপ্রসাদ কথার খেলাপ করেন না এবং সবদাই তাঁর উপরে নির্ভর করা চলে। লক্ষ্মীাবাবুর বড় ছেলে মতি কিছুদিন খেতান কোম্পানীতে কাজ করে বাটা কোম্পানীর কাজে যান এবং এখন বোধ হয় তাঁর প্রধান ডিরেক্টর। লক্ষ্মীপ্রসাদের ছোট ছেলে কৃষ্ণপ্রসাদ ওরফে কৃষ্ণ আমার সময়ে ছেলমানুব ছিলেন কিন্তু পরে তিনি বেশ বিচক্ষণ এটনসী হয়ে খেতান কোম্পানীতেই কাজ করছেন।

খেতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলপ আমার খুব বেশি দিন চলে নি। আমার ঘাড় থেকে তাঁদের বাড়ি ছিল অনেকটা দূরে। অনেকক্ষণ খালি পেটে থেকে আমার শরীর খারাপ হতে লাগল। সে সময়ে আমার পেটে একটা ডাউন্ডিয়াল বাধা আরম্ভ হয়ে গেল। মেজর সর্টেন বলে আই. এম. এস. এক ডাক্তারের হায়ারটেন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে এক-রে করে দেখা গেল যে পেটে আলসার দেখা দিয়েছে। আমি ত ভয়ে কণ্ট। ডাক্তারদের পরামর্শে খেতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলপ

আমাকে ছাড়তেই হোল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার মনের বিচ্ছেদ হয় নি কখনো। আজ পর্যন্ত তাঁকে আমি “Boss” বলেই ডেকে থাকি।

খেতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলপ ছেড়ে আমার প্রধান প্রচেষ্টা হোল শরীরটাকে মোরামত করে নেওয়া। আমাদের প্রথম সমতান সুরজন কুমিল্ হরো ছিলেন বাইশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' বিশ সালে। আমার খুবই ভয় হয়ে গিয়েছিল যে যদি ল্যাম্বাডাঙ্গ হয়ে আমি কাজের বাইরে চলে যাই তবে আমার বাপ-মায়ের, আমার স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোনের কি গতি হবে। আমাদের দিদিমা (ভরলা)-র জামাই ডাক্তার খগেন ঘোষ বীর কথা আগেই বলেছি এবং যাকে আজো প্রাণ্যের সঙ্গে স্মরণ করি তিনি আমার নিয়মিত চিকিৎসা সুরু করলেন। ওষুধ ত ছিল কিন্তু। কিন্তু খাবার কড়াকাড়ী ছিল তার চেয়ে বেশি। এক সময়ে দু'ঘ সাবুই ছিল আমার বরাদ্দ। সকালে দু'ঘ সাবু খেয়ে যেতাম ল কলোজে। সেখান থেকে হাই-কোর্টে এসে এক প্লাস দু'ঘ সাবু, দু'পরে কোর্ট বিরতির সময় আবার দু'ঘ সাবু, বিকেল চারটেতে নিত্যদার চা ও কিছুটা এবং তারপর বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় মায়ের বা বুকের রম্মা পোলের নরম ভাত ও গাদিলা পাতা দিয়ে চুনা মাছের কোল। এই ছিল আমার অদৃষ্টে একটানা মাস তিন-চারেক। খগেনবাবুর চিকিৎসায় এবং মা ও বুকের শুশ্রূষায় আমি আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম। সেই ইস্তক আমার আর কখনো পেট ব্যথা হয় নি।

১১. তিন

এই অসুখের সময়টাতে আমার ষেটুকু সামান্য কাজ আসত আমি তাই নেড়ে-চেড়ে দিন কাটাতাম। চারু বোস, জে. কে. সরকার ও টি. বি. রায় তখন ছিলেন আমার অবলম্বন। এই সময় জে. কে. সরকারের আফিসের তিনটি এটনসী প্র্যাসিক্টেণ্টদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সুরেন ঘোষাল জঙ্গ বয়সেই মারা গেলেন। সতীশ পালিত ও গৌরী বোস আমার খুবই শ্রুভাষী ছিলেন। এরা পরে নিজদের আফিস খুললে আমাকে বেশ কাজকর্ম দিতেন। অসময়ের বন্ধু-বের সাহায্যটা ভোলবার নয়। খুব ছোট-খাট ড্রাকটিং এবং ছোটখাট ব্রীফ তখন আসত। মাঝে মাঝে আসত লড়ুরে মামলার তৃতীয় কৌসুলীর ব্রীফ। সে সময়ে ঐ ব্রীফের চলন ছিল। তৃতীয় কৌসুলীর কাজ ছিল কোর্টে বসে মাফিরা কি বলছেন, দু' পক্ষের কৌসুলীদের বচসা ও জজ সাহেবের

টিপ্পন-সম্বা হাতে এই সব কিয়দর নোট লেখা। অনেক সময়ে ঐ নোট থেকে বলা যেত দু' মিনিট আগে সাক্ষী কি কথা বলেছেন। এই জন্যে ঐ নোটের দাম ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সটহ্যান্ড বেশ ভালভাবে চালু হোল এবং কোর্টের কার্যবলীর সটহ্যান্ড নোট পরসা দিয়ে পাওয়া যেতে লাগল তখন এই নোট টেবিল-এর ব্রীফের রেওয়াজ উঠে গেল। এতে অব্যচীন জুনিয়ারদের ক্ষতিই হয়েছে। আমরা জুনিয়াররা সে সময় যে টুকটাকি ব্রীফ পেতাম সেগুলি আমরা তন্ন তন্ন করে পড়তাম, আইনের নজির খুঁজে ভাল করে নোট করে রাখতাম। মোসনের ডাক হলে দু'দিকের কৌসুলীই প্রস্তুত থাকতাম এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে বহাস করতাম। আমাদের সওয়াল জবাবের মান মাঝে মাঝে বেশ উচুই হোত। জজ সাহেবকে এবং পেছনে দণ্ডার-মান এটনসীকে অভিভূত করে নিজে থেকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টায় অনেক সময় কোর্টের সময়ও বেশ লেগে যেতো। ব্যাকল্যান্ডের কোর্টে বহাসটা জমত না ডয়ের ঠেলায়। কিন্তু গ্লাউন্স বা পিয়ার্সন বা ম্যাকনোয়ার সাহেবের কোর্টে জুনিয়াররা প্রাণ খুলে সওয়াল জবাব করতে পেরতেন। অনেক সময় বড় বড় সিনিয়াররাও তাঁদের সময় বুঝা নষ্ট হচ্ছে দেখে ‘অটর্স’ হয়ে এমন মূখের ভাব করতেন যে স্পট বেকা যেত যেন তাঁরা বলছেন—‘এ মেড়ার লড়াই আর কতকাল চলবে।’

একবার টি. বি. রায়ের আফিস থেকে একটা ছোট মোসন ব্রীফ আমার এসেছিল। সেটা বোধ হয় ছোট আদালতের এক জজের অর্ডারেব বিবুদ্ধে রিভিউন পিটিসন। খুব স্বস্তি কবে নোট কবলাম। মেজর সিভিল প্রসিডিয়র কোডের একশ' পরেরো ধারা ও ডামাম টিপ্পন পড়ে ফেললাম এবং আমার হাসানের কেস থেকে আরম্ভ করে বিস্তার নজির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নোট করলাম। মনে হোলো একটা বেশ সরেস বহাস করা যাবে। অকস্মাৎ দু'সংবাদ পেলাম যে অপর পক্ষ স্যার বিনোদ মিটারকে ব্রীফ দিয়েছে। জুনিয়ার নয়, মাফারী নয়, বিল ফাইভের কেউ নয়, একেবারে খোদ স্যার বিনোদ! আমার যেন হাত পা পেটে সোঁথিয়ে গেল। কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। কোন রকম ছতো হবে ব্রীফটা ফেবল দিতে পারলে বোধ হয় মনেব শান্তি হোতো। প্রথম এই ভাবি কৌসুলীর সঙ্গে লড়াই। টি. বি. রায়ের ম্যানেজিং ক্লাক শৈলেন দে অল্প উৎসাহ দিয়ে আমার মনের নির্বোধশুধ প্রদীপ শিখাকে উসকে দিলেন। আমি আমার নোটগুলি আরো ফলাও করে লিখে ফেললাম। সেটা আর নোট রইল না,

হয়ে গেল বড় একটা সওয়াল জবাব। সেইটে নিয়ে বারবার পড়ে প্রায় মস্তকশই করে ফেললাম। ফলাও করে ববকে শুনিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। বঙ্গলাম গিয়ে গ্রীভস সাহেবের ঘরে। নতুন সেনস কোর্টের পর বড় সিঁড়িটা পেরিয়ে যে বড় ঘরটা ছিল সেই ঘরে তখন বসতেন গ্রীভস সাহেব। যে সব নজির কাজে লাগবে তা আগেই বার-লাইব্রেরী থেকে আমার বিশ্বাস নিয়ে এসে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলির উপর চোখ বুলিয়ে কৌসলীদের টেবিলের সামনের শ্রেণীর একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। একা স্যার বিনোদে রক্ষা নেই, তার আবার গ্রীভস সাহেবের ঘর। যুগ্ম-জাজে বন্ধ ছাগশিশুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে বসে রইলাম। মোসন ডাক হোলো। উঠে বিসয়টা সংক্ষেপে বুলিয়ে দিলাম তাইনের তরফে পৌছান গেল। দেওয়ানী কার্যবিধির একশ' পনের খারটা প্রয়োগের নীতি সম্পর্কে ফলাও করে সওয়াল জবাব করতে করতে কয়েকটা নজিরও উদ্ধৃত করে দেখালাম। বক্তৃতার উপসংহার করে 'চিপ' করে বসে পড়লাম। উঠলেন স্যার বিনোদ বহাস করতে। আমি মস্ত-মস্তের মত শুনতে লাগলাম। তার বক্তৃতার বৌদ্ধিকতার মধ্যে কিছু কিছু গলদ ছিল মনে হলো এবং ভাল হয়েছিল সে সওয়াল জবাব। তিনি বসে পড়তেই জজ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—“তার কিছু কি বলবে?” রায়গারটা যে সংগীন সেটা বোঝবার সুবুদ্ধি তখন আমার হারছে। বেশ বঙ্গলাম আমি ভাবছি। কি আস করা যাবে। মস্তকশ করা পুরানো লেখাটার চর্চিতচর্চণ করে হাস পড়লাম। জজ সাহেব অতি সংক্ষেপে বাস দিলেন—This is not a case for this Courts' interference. Dismissed with costs.” হাম দিল্লি জুর ছাড়ল। স্যার বিনোদ তড়িৎ উঠে অন্য কোর্টের দিকে ছুটলেন। বাবাব পাখি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—“থবে লাভেই ছোকরা। বাঁচোয়া যে এর থেকে আপিল চলবে না।” টি. বি. রামের আফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক বাঙাল ঠাণ্ডা দেন আমাকে স্টোকেবাক্য শোনালেন—“গ্রীভস সাহেবের কোর্ট না হলে দেইখা লম্বা হত।” যে স্ট্রীফ দিয়েছেন তিনি সন্তুষ্ট আছেন জেনেই মনে মনে খানিকটা আশ্বাস লাভ করলাম।

আমার তখন যা প্রাক্টিস তাতে করে একজন ভারি কৌসলী বাছা ডেভেলিং করায় কোন অসুবিধাই হোতো না। দাদাবাবুর জামাই সন্ধ্যার তখন বেশ পশার জমে গেছে এবং স্যার বিনোদের চেম্বারে আর যেতে পারেন না। তিনিও

বললেন যে, স্যার বিনোদের চেম্বারে গেলে আমার উপকার হবে। বাবাকে বললাম—“তুমি ত স্যার বিনোদের লগে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ো। একবার তানরে জিগাহয়া দেখলে পার আমারে তিন চেম্বারে নিবেন কিনা।” বাবা জবাব দিলেন—“হ পড়তাম ত ঠিকই। তবে এখন সে আমারে চিনব কি না কে জানে। আহুচ্ছা, দেখুস অনে।” কদিন পরে বাবা একদিন বললেন যে তিন স্যার বিনোদের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ আপ্যায়িত করেই বরাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি নাকি ঠিক ধবতে পাচ্ছেন না বাবা কব কথা বলছেন। তবে শেষে বললেন—“একটি ছোকরা নতুন এসেছে। বেশ ভাল খাটিয়ে ছেলে। সেদিন কি বেগই না দিয়েছিল আমাকে। সে ছোকরা যদি তোমাব ছেলে হয় তবে আমি তাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিও একবার।” বাবা আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“সাব কথা কইল রে?” আমি তখন গ্রীভস সাহেবের ঘরে মোসনটার কথা বললাম। বাবা বেশ খশি হয়ে বললেন—“হা, একবার দেখা কইরা আস।” পরের দিনই চলে গেলাম স্যার বিনোদের ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। দক্ষিণের গাড়িবাহানার উপরে তিনি বসে ছিলেন। বোয়ারা গিল খবস দিতেই ডাক পড়ল। সিঁড়ি শেষ উপরে উঠে ডান দিকে গাড়িবাহানার উপরে বসে। তিনি বসে-ছিলেন সেখানে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়িলাম। “আরে, তুমি লখ্যালব ছেলে? বেশ, বেশ। কোস।” ববে কিরলাম বিলেত থেকে, কি পদ কিরলাম, কারো চেম্বারে কাজ করেছি কি না ইত্যাদি সব প্রশ্নেরই বধ্যবধ জবাব দিলাম। শেষে বললেন—“জা হলে তুমি লেগে যাও। আমার বেশ সুবিধেই হবে। এখন নিয়মিত কেউ আসছে না। কাল থেকেই এসো।” নমস্কার করে হার্টচেসে বাড়ি ফিরে এলাম। লোগে গেলাম ডেভেলিং করতে নতুন উদ্যোগে।

আমি বসতাম সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই যে বারান্দাটা ছিল সেইখানে একটা টেবিলে। স্যার বিনোদ বসতেন দোতলার গাড়িবাহানায়। সেকালের ব্যারিস্টারবা গড়গড়ার তামাক খেতেন কনসাল্টেনেব সময। স্যার বিনোদও খেতেন রপার দখ নল লাগান লবা একটা গড়গড়ার নল দিয়ে। দবকার পড়লে-ডাকলেই আমি বারান্দায় গিয়ে বসতাম। শরৎ বাস সাহেবের সঙ্গে ডেভেলিং করায় আমার নোট করাটা দোরস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমেই ঘটনার দিনকণের একটা তালিকা

লিখ নিতাম—যেটা পড়লেই মামলাটির সব ইতিহাসটা চম্বকের মত জানা যেত। তারপর এক দুই করে আনের প্রশ্ন ও তার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের নজির যদি কিছু থাকে তাই সংগ্রহ করে টুকে দিতাম। আমার নোট লেখাব ধরটা স্যার বিনোদের বেশ পছন্দসই বলেই মনে হোলো। প্রথম সপ্তাহের শনিবার ও রবিবার আমি সারা দুপুর বসে স্যার বিনোদের জন্যে নোট লিখলাম। তিনি রবিবার দিন চোখ বুলিয়ে দেখলেন। বললেন—“দেখ, কাল সকাল সকাল এসো। কনসাল্টেন হবে—এটনীর আসবে। তুমিও এসো। কনসাল্টেনে থাকলে আলোচনায় তুমিও যোগ দিতে পারবে। এই করেই ত এটনীদের সঙ্গে আলাপ হয়।” আমি ত প্রমাদ গণলাম। খুবই বিনীতভাবে বললাম যে সোমবার সকালে আমাকে ল' কলেজে যেতে হবে বলে আমাব ড আসা চলবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি ল' কলেজে মাস্টারী কর নাকি?” মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বললাম। তিনি শূন্যলেন—এখন সেখানে কত মাইনে দেয়?” দু'শ টাকা পাই শূন্য বললেন—“দেখ, মাস ল' কলেজে বোজ সকালে গেলে তোমার ত অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সময়টা তুমি আমার এখানে কাজ করলে দু'শ টাকার বেশিই পাবে। শুটা তুমি ছেড়ে দাও। আমিই দেখব যাতে তোমার লোকসান না হয়।” বাবাকে এসে বললাম স্যার বিনোদের মত লোক যদি ভরসা দেন তবে আর ভয়টা কি? যাই হোক ভেবেচিন্তে ল' কলেজে লম্বা ছুটি নিলাম এবং পরমানন্দে ডেভেলিং করতে লাগলাম সকালে ও বিকেলে। একদিন স্যার বিনোদ বললেন—“ওহে, দাস,

কিন্তু বন্দীতে ট্রানজিস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের
জগৎ বিখ্যাত ও ব্যাপ্ত
অল ওয়াল্ড পোর্টেবল
ট্রানজিস্টার “উইন্ড-
সোর-হিটাচী” মাসিক
২৫ টাকা কিন্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।
আবেদন করুন।



Swiss Television Co.
(BW-55) P.O. Box 1320,
Delhi-6.

হুঁসি সকাল সকাল স্নানটান সেরে চলে এসো। আমবা একসঙ্গে খেয়ে কোটে বাবা।” কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিলাম। সেই থেকে নিত্য সকালে স্নানটান সেরে চা খেবে পোষাক পরে এ্যাটাসী কেসটা হাতে নিবে আমি হাজিরা রোড থেকে প্রায় পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি ২নং লাউডন স্ট্রীটে যেতাম পদব্রজে। প্রায় দুটি মাইল মনিং ওয়াক। গরমের দিনে যে হাতটাকে ঝুলিয়ে নিতাম এ্যাটাসী কেসটা সেই হাত বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ত। দু’ একটা ফিটন গ্যাড্‌গ্যাডোয়ান—‘চালিয়ে না সাব’ বলে বলে কতকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে এসে ফিরে যেতো। রোজ বায় আনা কি একটা টাকা গ্যাড্‌ ভাড়া খরচা করার অবস্থা তখনো আমার হব না। বোজ় সকালে আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে গেরে তাঁরই ক্যাডিল্যাক গ্যাড্‌ করে কোটে যেতাম। পশ্চিম-বঙ্গের লোক হয়েও স্যার বিনোদের বাড়ির লোকেরা বড়টা ঝাল খেতেন তা পূর্ববঙ্গের বাঙালকেও প্রায় হার মানিয়ে দিত। বলাই বাহুল্য যে খাওয়ারটা হোতো খুবই মন্থবাচক।

লম্বা ছুটিটা শেষ হয়ে গেল। আবার যেতে হোলো ল’ কলেজে। প্রথম দিনেই স্যার বিনোদ কোটে বললেন—“কই হে, আজকে তুমি এলে না ত? অসুস্থতাপ করে নি ত?” লজ্জিত হয়ে বললাম—“না, স্যার। আমার ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার ল’ কলেজে গিয়েছিলাম।” তিনি অবাক হয়ে বললেন—“সে কি, ওটা তুমি ছাড় নি? না, না। ওটা তুমি ছেড়ে দাও। তোমার লোকসান হবে না।” সেইদিনই মধ্যাহ্ন বিরতির সময় গেলাম স্যার আশু-তোমের চেম্বারে। তাঁর চেম্বারটা ছিল হাইকোর্টের উত্তর-পশ্চিম কোণের দক্ষিণ খোলা বড় ঘরটার। আরো ছুটির জন্যে স্নাবদন কবলাম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—“আমি খবর রাখি। তোমার কাজকর্ম হচ্ছে। কাজে মন দাও। আব ল’ কলেজে গিয়ে কাজ নেই।” ছুটি দিতে তিনি রাজী না হওয়ার কপাল ঠেকে কাজে ইস্তফা দিলাম বাবা ও বদুব সঙ্গে পরামর্শ করে। স্যার বিনোদ খুশি হলেন। বললেন—“কোন চিন্তা নেই। তোমাব পুঁথিরে যাবে।” আবার মাথা গুঁজে কাজে লাগলাম। দিন সাতেক পরে টেলিগ্রাম এল যে স্যাব বিনোদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীবচন্দ্র মিটার বিলেত থেকে বাড়ি আসবার পথে বম্বে পৌঁছে গেছেন। ভাগ্যের পানিহাস একেই বলে। ল’ কলেজের চাকরীটাও গেল আর প্র্যাকটিসের মদতও ঘটল। ছেলে থাকতে আর কি আমার কথা বলবেন তিনি এটনীরদের কাছে? - সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করবই যে সুধীরের দেশে ফেরায় আমার

প্রতি মমতা স্যার বিনোদের এতটুকুও কম নি। সুধীর যখন হাইকোর্টে ভর্তি হলেন তখন অনেক এটনীর স্যার বিনোদ খুশি হবেন বলে তাঁর ছেলেকে যে একটা জুনিয়ার ব্রীফ মাঝে মাঝে গুঁজে দিতেন তাতে ভুল নেই। অনেক সময় স্যার বিনোদের কাছে ব্রীফ পৌঁছবার আগে-ভাগেই তাঁর মন্থবী—বোধ হয় তার নাম ছিল সুশীল—সুধীরের জন্যে একটা তৃতীয় কোঁসুলীর ব্রীফ জুটিয়ে আনতেন। এটা আশা করা যায় না যে স্যার বিনোদ এটনীরকে চতুর্থ একজন কোঁসুলীকেও ব্রীফ দিতে বলবেন বা সুধীবাব ব্রীফটা খসিয়ে সেই ব্রীফটা আমাকে পাইয়ে দেন। এ সবই ঠিক। কিন্তু আমার জ্ঞানমতে স্যার বিনোদ নিজে সুধীরের হয়ে ব্রীফের সুপারিশ করেছেন বলে আমি ত জানি না।

পরস্পর্য আমার কাছে খুব আসত যে স্যার বিনোদ এটনীর ও জজদের কাছে আমার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতেন। এতে করে আমার মর্নও বেড়েছে এবং ধনাগমও হয়েছে তবে পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে খুব কমই ব্রীফ পেতাম। আমার চেয়ে সুধীর তাঁর সঙ্গে জুনিয়ার হয়ে অনেক বেশি হাজির হয়েছেন কোটে। কিন্তু স্যার বিনোদের কাছে আমাব গুণগান শুনে দু’ চারজন এটনীর আমাকে মাঝে মাঝে একটা-দুটো ছোটখাট ব্রীফ দিতেন। এইগুলি ছিল আজি দাওয়া লেখা বা মামলার মোসন জাতীয় কাজ। এগুলি আমাব নিজেই করত হোতো। এই সব ব্রীফ আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভে খুবই কাজে লেগেছিল। তা ছাড়া এই সব ব্রীফ আমার মাস গেলে দু’ শ’ টাকার বেশিই হয়ে যেতো। আমার এই ক্রমোন্নতির পথে শরৎ বোস সাহেবের আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদও সহায়তা করেছে অনেকখানি।

বর্ধাসময়ে সুধীব কলকাতায় পৌঁছলেন। সুধীর স্যাব বিনোদেরই মত বেটেখাট, ফবসা মানব। হাত পায়ে গড়ন একেবারে বাপেবই মতন। এবং ধরণ-ধারণ চলন-চালনও সেই একই রকমের। সবসুখ সুধীরের মুখে একটা বুদ্ধির ওজ্জ্বল্য বরাবরই দেখেছি। আমার সঙ্গে তাঁর নতুন করে পরিচয় করতে হয় নি। কেন না আমি যখন স্যার বিনোদের বড় ভাই এটনীর মন্থ মিত্রের সঙ্গে ছেলে সুশীলের সঙ্গে মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর রাঞ্চে এক ক্লাশে পড়ি তখন সুধীরও সেই স্কুলেই আমাদের ঠিক নিচের ক্লাশে পড়তেন। সুধীর আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হবেন। বখারীতি প্রথা অনুসারে সুধীব হাইকোর্টে ভর্তি হয়ে প্রথমে বটু ঘোষ সাহেবের

সঙ্গে ডেভেলিং শুরু করলেন। পরে তিনি স্যার বিনোদের সঙ্গেই কাজ করতেন। তখন আমরা দুজনেই ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে টেবিলটা ছিল তাইতে দুই ধারে দুইজন বসে কাজ করতাম। স্যার বিনোদ, আগেই বলছি, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম খোলা গাড়িবারান্দার উপরে বসে কাজ কবতেন। সুধীরের একতলাতেও একটি অফিস ঘর ছিল। তাঁর নিজের মক্কেলের কাজ তিনি সেই-খানেই করতেন। যখন নিজের কাজ থাকত না তখন সুধীর উপরে আমার সঙ্গেই বসতেন। কত না গল্পগুজব ও সুখদুঃখের কথা হোতো। তখন আমরা দুজনেই শুবক এবং আমাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-নৈরাশ্য নিয়ে নানা রকমের আলোচনা হোত। তার উপরে ছিল স্যার বিনোদের ব্রীফ যে সব আইনের প্রশ্ন উঠত তার বিশ্লেষণ ও তর্ক। আমরা ছিলাম একই আস্তাবলের দুই ঘোড়া। বস্তুত স্যার বিনোদের অনেক ডেভিলদের মধ্যে আমবাই ছিলাম শেষ দুইজন। সুধীর গর্ব করে নিজের “লাস্ট টু অব দি রোমান্স” বলে যথেষ্ট আত্মপ্রশংসা লাভ করতেন। গুণগুণেরাই তাঁর এই দাবির বিচার করবেন। আমাদের দুজনের মধ্যে সুধীরই আগে কোটে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। সুধীরের কাজের ধরণও ছিল ভাল। সুধীর যখন খুবই জুনিয়ার ছিলেন তখন পিয়ার্সন সাহেবের ঘবে একটা বড় সিগারেটের Passing off মামলা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে আরম্ভ ও শেষ করে-ছিলেন যে সমকদার বড় কোঁসুলী বি এল মিত্র সাহেব তাঁর খুবই তারিফ কবেছিলেন। সেই কেসটা—বোনান বনাম ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী ল’ রিপোর্টে ছাপার অঙ্কের সুধীরের কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয় এখনো। যদিচ সুধীর আমার কাছে তাঁর উপচে-পড়া কোন ব্রীফ কখনো পাঠান নি বা কোটে তাঁর হয়ে তাঁর কাজ করে দিতে অর্থাৎ ব্রীফ হোল্ড কবতে অনুরোধ করেন নি—সেগুলি যেতো নির্মল চ্যাটার্জির কাছে—একথা বলবই যে সুধীর আমার সঙ্গে ব্যবহারে কখনো কোন ক্ষুদ্রতা দেখান নি। একই সঙ্গে একই টেবিলের দুই পাশে বসে কাজ করতে করতে সুধীরের সঙ্গে আমার যে হৃদ্যতা হয়েছিল জীবনের এই অন্তিম সময়েও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখনো দেখা হলে, কি টেলিফোনযোগে পুরানো দিনের কত কথাই না হয়। কাজ থেকে অবসর নিয়ে সুধীর এখন শুনছি নানা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করছেন;

আমার উপর স্যার বিনোদেব মমতার দৃষ্টি একটা উদাহরণ এইখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন রবিবার, অনেক বেলা পর্যন্ত স্যার বিনোদের ব্রীফের নোট তৈরি করে প্রায় দুই মাইল পথ পায়ে হেঁটে ৮৮এ, হাজরা রোডের বাড়ি ফিরে স্নান ও আহার সেরে সবে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করছি এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিল যে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে। মনে মনে বেশ কিছু তিক্ততা বোধ করলেও উঠতে হোল। জুনিয়ার কোর্সদার এই দশাই হয়ে থাকে। কে জানে, হয়ত বা একটা ব্রীফ পাঠিয়েছেন কোন দবদী এটনীর। আফিস ঘরে এসে দেখি টি. বি. রায়ের আফিসের শৈলেন দে। “কি শৈলেনবাবু, খবর কি?” বলে প্রশ্ন করতেই তিনি জানান যে তাঁদের আপিসেব এক মক্কেলের যে আর্জি-দাওয়া আমি লিখেছিলাম সেই মামলাতেই রিসি-ভারের দখল হতে সোমবার এবং আমার শীড়ার হবেন স্যার বিনোদ। আজই কন-সাল্টেশন হবে এবং স্যার বিনোদ বসে আছেন। এক্ষুণি যেতে হবে। সকাল বেলাতেও তো স্যার বিনোদের নাম লেখা ঐ মামলাব কোন ব্রীফ দেখি নি এবং তিনি নিজেও তো কনসাল্টেশনের কোন কথা বলেন নি। তা ছাড়া টি. বি. রায়ের আফিস থেকে এই রিসিভারের দরখাস্তের কোন ব্রীফই তো আমাকে পাঠান হয় নি। কাগজপত্র তো পড়ি নি কিছু। কি করে কনসাল্টেশন করব? শৈলেনবাবু আমাব মনের ভাবটা বুকেই বললেন যে আপাতত তাঁর কাছে যে কাগজপত্র আছে তাই দিয়েই কাজ চলুক। বিকেলেই ব্যাকসীট-ওয়ালার ব্রীফ বাড়ি পেঁচে যাবে। কি রকম খটকা লাগল। যাই হোক, গোলাম সেই আড়াইটে না তিনটের সময় শৈলেনবাবুর সঙ্গে স্যার বিনোদের বাড়ি। স্যার বিনোদ গাড়িবারান্দাব উপর বসে ছিলেন। মক্কেলরা অপেক্ষা করছিলেন ভেতরে আমার টেবিলে। বারান্দার ঢকতেই স্যার বিনোদ বললেন—“দাশকে কাগজপত্র দিয়েছ? ব্যাকসীট?” শৈলেন প্রশান্তভাবে বললেন যে সে সব ঠিকই হয়ে গেছে। স্যাব বিনোদ তখনো বললেন—“তোমরা যে কি ভাব, বুঝি নে।” ব্যাপারটা কি হোল? পরে বা জানলাম তা সংক্ষেপে এই: যদিচ আমি মামলাটার

আর্জি লিখেছিলাম, তবু রিসিভার দর-খাস্তের ব্রীফটা আমাকে না দিয়ে সুধীরকেই পাঠান হয়েছিল। কাগজপত্র খুলে আর্জিতে “drawn by Sudhi R. Das” দেখে স্যার সেই দরখাস্তে জুনিয়ার কে জিজ্ঞাসা করায় শৈলেন বললেন—“আজ্ঞে, ছোট সাহেব।” তিনি ভেবেছিলেন যে স্যার বিনোদ খুব খুশি হবেন। হয়ে গেল উচ্টো বুদ্ধিবিলাস। স্যার বিনোদ চটে গেলেন। বললেন—“যে ড্রাফটিং করেছে আর্জিটা—ব্রীফ তাকে না দিয়ে নতুন জুনিয়ারকে দেবার মানেটা কি? তুমি কি ভেবেছ যে আমার ছেলেকে ব্রীফ দিলে তোমার ব্রীফ আমি তিনবার পড়ব? বাও, দাশ জুনিয়ার না হলে এ ব্রীফ আমি নেবই না।” তখন আর শৈলেনবাবু করেন কি। সোজা আমার বাড়ি গিয়ে আমাকে এনে হাজির করিয়ে দিলেন। সুধীর ও আমি দুজনেই সেই দরখাস্তে স্যার বিনোদের জুনিয়ার হলাম। টি. বি. রায়ের আফিস থেকে আমার কিছু কিছু কাজ আসত এবং এই দরখাস্তের ব্রীফটাও আসত। কিন্তু শৈলেনবাবু বললেন যে স্যাব বিনোদের ক্লাক সুধীরের প্ররোচনায় ব্রীফটা সুধীরের কাছে চলে গিয়েছিল। এতে সুধীরের কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু তবু ব্যাপারটার গতিক দেখে সে বেচারা খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কিন্তু দেখবার জিনিস ছিল আমার উপর স্যার বিনোদের মমতা। খুবই অভিভূত হয়েছিলাম এই ঘটনায়।

একদিন বিকেলের দিকে বসে আছি আমার টেবিলে স্যার বিনোদের ২নং লাউ-ডন স্ট্রীটের বাড়িতে। আস্তে আস্তে উঠে এলেন বিখ্যাত নিমাই বোসের আফিসের তখনকার কর্তা তাঁর ছেলে অক্ষয় বোস। পরণে ফিনফিনে খুঁত, তার উপর কলার-হীন সাদা জামা-সেটা কোট, বা বড় হাতার ফতুয়াও হতে পারে—পায়ে কালো বার্নিশের জুতো, হাতে একটা ব্রীফ এবং পেছনে কয়েকটি মক্কেল। উপরে উঠেই বললেন—“বিনু, আমার এই জরুরী প্রেণ্ট ও পিটিশনটা এক্ষুণি করে দিতে হবে।” স্যার বিনোদ একটা মোটা আপিল ব্রীফ নিয়ে কাজ করছিলেন। বললেন—“অক্ষয়, আমার একটুও সময় নেই। তুমি অন্য কোথাও যাও।” অক্ষয় বোসও নাছোড়-বন্দা। মক্কেল স্যার বিনোদকেই চায়। কাজটা করতেই হবে। অপারগ হয়ে স্যার বিনোদ বললেন—“আমি একটা কাজের মধ্যে পড়ে গেছি। তুমি এক কাজ কর।

ওখানে দাশ রয়েছেন। তুমি তাকেই কাগজপত্র বন্টিয়ে দাও। সে সম্বন্ধে আমাকে বন্টিয়ে দেবে। তুমি কাল সকালে এসে প্রেণ্ট ও পিটিশন নিয়ে যেকো।” কি আর করেন অক্ষয় বোস। আমার টেবিলে এসে বসে আমাকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বোঝাতে লাগলেন। যতদূর মনে আছে ওসমান জামালের নাম শুনিয়েছিলাম। কে যেন একটা ভুবা চেক দিয়ে অনেক হাজার টাকা দামের মালের ডেলিভারি অর্ডার নিয়ে গেছে। এবং তেঁকেটা ব্যাংক থেকে dishonour হয়ে ফিরে এসেছে। এক্ষুণি স্টুট ফাইল করে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে ডেলিভারি অর্ডারটা বন্ধ করতে হবে। আমি যখন কাগজপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ছি স্যার বিনোদ একবার ভেতরের দিকে যাবার সময় আমার টেবিলের দিকে চেয়ে অক্ষয় বোসকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“হ্যাঁ, বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দাও। দাশকে চেন? খুব কাজের ছোকরা তোমার কোন চিন্তা নেই।” অক্ষয় বোস খুব খানিকটা হেসে বললেন—“দাশকে আর চিনি না। হাবের টুকবো ছেলে।” আবার আমরা কাগজপত্র নিয়ে পড়লাম। ভেতর থেকে ফিরতি মুখে স্যার বিনোদ বললেন—“ওহে অক্ষয়, বোঝাচ্ছ তো খুব। ওকে একটা ব্যাকসীট পাঠিয়ে দিও। তুলো না, বুঝলে?” অক্ষয় বোস কিছুতেই দমবার পাত্র নন। মুখ তুলে স্যার বিনোদকে বললেন—“দেব বৈ কি। সে আর তোমার ভাবতে হবে না।” একটি আসন্ন ব্রীফের আশায় আমি আদা-জল খেয়ে লেগে গোলাম প্রেণ্ট ও পিটিশনের খসড়া খাড়া করতে। আমার কাজ শেষ হলে স্যার বিনোদের যখন ফরাসং হোল তখন সেই খসড়া দুটো তাঁর কাছে পেশ করলাম। তিনি দুটো একটা জায়গায় একটু বদলিয়ে আমার মুসাবিদার উচ্ছৃঙ্খল প্রশংসা করে আবার অক্ষয় বোসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—“ব্যাকসীটটা তুলো না যেন।” অক্ষয় বোস মাথা নেড়ে কাগজ ও মক্কেল নিয়ে চলে গেলেন হুস্টচিস্তে। পরদিনই প্রেণ্ট ফাইল হোল। কোর্টেও দরখাস্ত করে একটা ভাল অর্ডার পাওয়া গেল। কিন্তু আমার সেই ব্যাকসীটটা আকাশকুসুমই রয়ে গেল। খেটে মরলাম, ব্যাকসীটও জুটল না। কিন্তু স্যার বিনোদের সৈনিকার শ্রুতগ্হা কথা ভোলবার নয়।



স্বপ্নাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদ্যা বাউলীর হৃদয়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১১ উনিশ ৪

কয়েক মন্ড কিভাবে যে গাছের ওপর ছিল মদন জানে না।

ওর ভাল করে জ্ঞান ছিল না। দু'হাতে একখান মোটা ডাল বৃকে-পেটে চেপে ধরে উপড় হয়ে ছিল। কতক্ষণ ওর ভাল করে মনে নেই।

বখন ও তাকাল, তখন দেখল, ধরগুলো দিক দিক করে জ্বলছে। মানব-জন এদিকে নেই। দূরে তখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঘন কালো অশ্বকার সর্বাঙ্গ ছেয়ে রয়েছে। শেরালের ডাক ব্যাঙের ডাকও শোনা যায় না। তারাও বোধহয় মনিষ্যদের এই পাগলা-জীতে ভর পেয়েছে।

বৃষ্টিতে পারছে ও। কাইজা লেগেছে। মদন এখনকার হাওয়া-খাতাস জানে না। পশ্চিমদিকই খবরটা তাদের প্রথম দিবেছিল।—শুনছ নি খবর? ফইলকাতার জ্বর-কাইজা হইয়া গ্যাছে। শ্যাখোগো সব কাইট্যা কুচিকুচি করছে। এখানে শ্যাখের পো'রা খেইপা গ্যাছে। তারা জোট বাইন্না জটলা করত্যাছে। লইগ্যা গেছিল। খামাইয়া দিছে দুই-জন কত্তার। আমগো বাবু বদনচাঁদ আর ওয়াগো ছাদেক ফকির। ছাদেক ফকির নি কইছে, এউপা হিন্দুও য্যান পিটি না খায়! হ, মানষের মত মানষ ছাদেক ফকির।

পশ্চিমদিকের মৃদুটা শূন্যে গিরেছিল।
—আমার নি ডর করে তো। ধড়ে আমার

সত্যিই পরাণটা তার থাকল না। তার চোখের সমুদ্রে আজ পশ্চিমদিকে পিটিয়ে মেরে ফেলল ওরা।

হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। সাত-জন্মেও শোনে নি ওরা। কলকাতার দাঙ্গা হয়েছে তা এখানে কি? তাদের জমটা কি?

পশ্চিমদিক বলেছিল,—আলা তুমি এক্সারে বোগদা। হাট-বাজার বন্ধ। দুরো পক্ষ বালু দিয়া রামদাওরে শাণ দিত্যাছে।

কর কি কথা। দু'পক্ষ রামদারে শাণ দিচ্ছে।

পশ্চিমদিক হুকু কথাই করেছিল। তার ধড়ে সত্যি এখন আর প্রাণ নেই।

কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে নেমে পড়েছিল মদন। উদ্‌বাসে ছুটে এসেছিল কুমির ঘরে।

আসতে আসতে ওর চোখ পড়েছিল একবার বিদ্যাধরীর ঘরের দিকে। মাঠের ধারে বকুলতলায় ওই ছাপরাটার বিদ্যাধরী একা থাকে। গোটা দুই শেখের পো এসে যে কোন সময়ে ওর ঘরে ঢুকতে পারে। তারপরে কি করতে পারে না পারে সে কথা ভাবা যায় না।

বিদ্যাধরীকে যদি ওখানে পিটিয়ে মেরে বকুলতলার ঘাটের পাঁকে পুতে ফেলে কেউ জানতেও পারবে না। কাইজা কাকে বলে মদন জানে না। বিদ্যাধরীও নিশ্চয় জানে না। কুমিও জানে না। আজ নিজের চক্ষে সে যা দেখল, তারপরে তার কোন সন্দেহ নেই যে এ গাঁওরে একটা হিন্দুরও ধড়ে মাথা থাকবে না।

চর দখলের কাইজা হয় দু'জমিদারে। তারা বরকন্দাজ লাইঠাল পাঠায়। লাইঠালে লাইঠালে কাইজা হয়। রামদা, সড়কি, তলোয়ার নিয়ে আন্দা-আন্দা রব তুলতে তুলতে এগোয়। একদল চর দখল করে। অব একদলের কিছুর নিকাশ হয়। কিছুর জখমী হয়।

এ কাইজা তামন নব। তামাম দ্যাশের শ্যাখ-হিন্দুবা কি কাইজা করবে? একি সম্ভব?

কুমির ঘবেব দু'বারের সমুদ্রে এসে দু'বারে দু'মাদুম ধাক্কা মারল মদন।

—কেডা? কেডা আইল?

কুমির গলাব আওয়াজ শোনা গেল।

—আমি মদন। সকালে দু'বার খোল।

মদনের গলাব আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমি দু'বার খুলল। মদন ঘরে ঢুকে মাটির ওপর বসে পড়ল। অনেকটা পথ উদ্‌বাসে ছুটেতে ছুটেতে এসেছে। হাঁপাতে লাগল মদন।

—কি আইল, কোখানে গেছিল। আমন করে ক্যান?

মদন হাঁপাচ্ছিল। কথা বলতে পার-ছিল না।

কুমি দু'বারটা ভাল কবে বন্ধ করে দিয়ে মাটিতে ওর পাশে বসে পড়ল।

—শুনলাম নি কাইজা লাগছে। ভাইবা মরি আমি। কোরানে গ্যালা, কি আইল।

দম নিয়ে মদন বলে উঠল,—পশ্চিমদিকের নিকাশ কইবা দিছে। ওয়াগো ঘরে আগুন লাগাইছে।

—কও কি কথা!

কুমি হাঁ করে রইল। মৃদু আর ওর কথা নেই। ও শুনেনিছিল, কাইজা লেপেছে। কিন্তু এর ভেতর যে এত কারখানা হবে গেছে ও ভাবতেও পারে নি। পদ্মাদিকে মেরে ফেলেছে। ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ! অখনো চোখে ভাসে। ধূমা-ধূম পিটাইয়া মাইবা ফালাইল। লাঠির একশান বাড়ি পড়ল মাথায়। মাথাডা দুইখান হইয়া গেল যেন নারকোলের মালা ফটাং কইরা ফাইটা গেল।

—ইস! এক্সরে মাইরা ফালাইল। মদন জিরিয়ে নিল একটু। বৃকের কম্পন তখনো সমানে চলেছে। গলাটা শূন্যে কাঠ হয়ে গেছে।

—এটু জল দে আমারে। কুমি তাড়াতাড়ি উঠে কলাইঘের গেলসে এক গেলস জল ভরল মাটির কলসী থেকে। জলের গেলস হাতে নিয়ে জলল,—খাইছ নি কিছু?

—না। —রইস। এটু গুড় দিয়া জল খাও। উঠে একটা মাটির ভাঙ্গ থেকে হাতে করে গুড় এনে ওর হাতে দিল। গেলসটা হাতে তুলে দিল। গুড় আর জল খেয়ে মদন একটু বেন ঠান্ডা হোল।

কুমি ভাবছিল, মদনকে কি খেতে দেয়া যায়। রান্না-কান্না কিছু কবে নি কুমি। কদিন ধবেই দেহে ওর বশ নাই। রাঁধতে ইচ্ছে করে না। যা হোক কিছু খেয়ে শূয়ে পড়ে থাকে। কি খেতে দেবে মদনকে! নিশ্চয় মদনের খুব খিদে পেরেছে।

মদনের মৃদুখানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবার জন্যে কুমি লণ্ডনের আলোটা কাড়িয়ে দিল। ইস, দেখছ নি কান্ড! মদনের বা হাতের কনুইয়ের ছাল উঠে রক্ত কস বেরোচ্ছে। মৃদুখানা ঘামে ভিজছে। শূন্যে আমচরের মত হচ্ছে গ্যাছে। মাথার বড় বড় কেশরের মত চুল ভর্তি ধূলা ময়লা।

কাছে এগিয়ে এল কুমি। মদনের মাথার চুল বিলি দিয়ে আঁচড়ে দিল। হাঁ হাতখানা তুলে ধরে বলে উঠল,—ইরে, কাঁটা গ্যাল কি কইরা?

মদন নিজেও জানে না। বোধভাষি কিছুই ছিল না ওর। দেখবার পরে একটু জ্বালা-জ্বালা করতে লাগল। বলল,—গাছের ঘরসানীতে ছাল উইঠা যাচ্ছে। হাইবাব দ্যাও।

হাতখানা নামিয়ে নিল মদন। —ঘরে চিড়া আছে। খাইবা? মদন মাথা নেড়ে জানাল, দিতে পারে। খিদে পোয়েছে ঠিকই। কিন্তু জুঁত করে বসে চিড়ে-গুড় চিবিয়ে চিবিয়ে রসিয়ে

রসিয়ে খাবার মত অবসর নেই। সব সময়ই মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি এলো। কান পেতে ছিল মদন।

না। এদিকে তায়ন গোলমাল শোনা যাচ্ছে না।

এদিকটার আসবেই বা কেন? পাড়া বলাতে এখানে কিছু নেই। বাবুদের বাড়ির পেছনে মস্ত পচা পুকুর। তারও অনেকটা পেছনে বাবুদেরই এই বিরাট চালভেবাগান। এখানে একটু স্থান দিয়েছে কুমিকে এক-খানি চালা ঘর তুলে থাকবার জন্যে। পচা পুকুর থেকে বকুলতলা পর্যন্ত এত বড় চত্বরে মাত্র দুটি চালাঘর। একটি কুমির। আর একটি খেপী বিদ্যধরীর। আর জনমানব নেই এদিকে।

তাই এদিকে দল-দলগল নিয়ে কাইজা করবে কার সঙ্গে?

একটু বেন নিশ্চিন্ত হোল মদন। হস্তো এদিকে কোন গোলমাল সহজে হবে না।

—দে, একমুঠো চিড়া-গুড় দে।

ঘরে চিড়ে বেশি ছিল না। আধ ডালা ছিল। দুদিন ধরে বাজারে হাটে যায় নি কুমি। চিড়া-মুড়ি-গুড় কোন কিছুই আনা হয় নি। আজ রাত্রে ও ভেবেছিল ওই চিড়ে কটা চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শূয়ে থাকবে। তা আর হবে কি করে?

মদনের সামনে চিড়ে আর গুড় আধ ডালা এগিয়ে দিল।

বেতের ছোট ডালাটা নিয়ে মদন খেতে লাগল। কুমি দেখতে লাগল। দেখতে কি ভাল লাগছে। কি তৃপ্তি। মদন খাচ্ছে। কুমির মনে হচ্ছে যেন ওর মনখানা তৃপ্তিতে ভরে উঠছে। ওর খিদে তেঁটাও বেন মিটে যাচ্ছে। কি অবাক কারখানা।

ভবে অবাক লাগে এমন তো তার কখনো হয় নি? নিজের খাওয়া নিজের দেহের তরুজুত নিয়ে ব্যস্ত ছিল এতকাল। এখন কি হয়ে গেল, কুমি।

—পরানডা যদি ছিড়া ব্যাখাইবার পার-তাম।

কুমির চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। মদন নীরবে খাওয়া সেরে চৌকির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শূয়ে পড়ল।

কুমিও কোন কথা বলল না। এক ঘটি জল ঢকঢক করে খেয়ে একটা চ্যাটাই পেতে বাঁ-হাতখানার ওপর মাথা বেধে শূয়ে পড়ল। ডান হাতটা বাড়িয়ে লণ্ডনটা নির্ভয়ে দিল।

কিছুতেই ধূম আসছে না। থেকে থেকেই বৃকের ভেতরটা কেমন করে উঠছে। অন্ধকার ঘরখানার তিলে তিলে সময় কাটছে। রাইতখান পোরালে বাঁচন। আশ্বাসে মিশকালো একটা ছায়ার স্তম্ভের মত মাটির ওপর পড়ে রয়েছে কুমি

চালতে বাগানে একটা পাখী বিস্ময় ডাক তুলছে—কক্কর-র-র—

কাঠোঁকরা না কি কে জানে! মদন পাশ ফিরল। ঘবে বড় গরম। ডাপসানী গন্ধ ঘরের ভেতর।

হঠাৎ কানে এল অনেক মানুষের চিংকার। দূর থেকে চিংকারটা রমেই যেন কাছে আসছে। মদন লাফিয়ে উঠে বসল। বৃকের ভেতরে ঢোক পাড় দিচ্ছে। হাত-পা অবশ লাগছে।

কুমির গলা শুনতে পেলে।—চিকর কিরের?

মদন কথা বলতে পারছে না। দমটা বেন বন্ধ হয়ে আসছে।

—চিকর এই দিষ্টে আসে মনে লয়। কুমি তাড়াতাড়ি মদনের পাশে চৌকিতে উঠে বসল।

হ্যাঁ, চিংকার এই দিকেই আসছে। মদনের বৃকে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। ও যেন বোবা হয়ে গেছে।

চালতে বাগানে অনেক মানুষের পারের ধপধপানী কানে আসে। অন্য রকম নাই।

—হালা মদন কইবে! অই হালা মদন!

মদন চোখ বড় বড় কবে তাকায়। পরিস্কার শুনতে পায় মনছব মিসার চিংকার। তারই সম্মান কবছে মনছব। তার সম্মানেই এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কেন, সে কি অপরাধ কবেছে?

—অই হালা মদন, বাইর হ ঘর থিক্যা। কুমি মদনকে দু'হাতে চেপে ধরে।

—দুয়ার খোল হালা। তোফাইরা হালা—



গৌর মোহন দাস এন্ড কোং
২৩৩, ওল্ড সীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬০৮০

মানকে বলে, সাবাস!

[শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কৃমিকা]

উদ্ভাস

বোস বলেন বোসকে
শিঁড়ি পেতেছি, বোসো হে!
খানাপিনা করো
কলম ধরো
বিশ্বের চেয়েও দড়ো
গল্প একটা ছেই দাদা....
উড়াও ধলো, ছোড়ো কাবা!

বোস বলেন, সাবাস ভাই;
মেতে যে বলো, শব্দেও চাই
শব্দ বোভলে
আর কী চলে....
বাঁদী না লাখে সচীও চলে!
দুপাশে দুটি চাই দাদা;
গল্প একটা লিখবো যা!

আমরা দুটি ভাই.... বাহারে বাহা!
কেশকে বেচে খাই.... বাহারে বাহা!
ভাইয়ের মাথা খাই.... আহা রে আহা!
বোনের মনু খাই.... আহা রে আহা!
নন্দাম গড়াই
বাহারে বাহা! আহা রে আহা!

আমরা বাংলা দেশের কুলাঙ্গার-ই;
তাই তুলেছি দশটা বাড়ি!...
সাবাস!

অরণ্যগভীরে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

আরম্ভকৃতবনাজোকা, দেবর্ষিপত্নমানবা—পরিহৃত্ত হবেন যে-রসে
তার অন্তঃকরণে এই মায়াময় অরণ্যগভীরে
সেই কেন প্রভুবে ঢুকেছি!
হে সূর্য, হে দার্শনিক, চেয়ে দ্যাখো—এতোক্ষণে বেরবার পথ
হারিয়ে কেলেছি, কী যে অসহায়! সন্ধ্যা হয়ে আসে—
জীবন-রসের চাহিদার
কী নীরল কান্ট সংগ্রহের পরিহাস!
এখানে প্রবেশ তবে পুরোপুরি ব্যর্থ? আমি নে-রস কোথায় খুঁজে
পাবো—
আরম্ভকৃতবনাজোকা, দেবর্ষিপত্নমানবা—পরিহৃত্ত হবেন যে-রসে?

অভিশপ্ত সিসিফাস এ-আমি, আমৃত্যু এই অরণ্যগভীরে থাকতে
হবে!

বেরবার কোনো পথ কখনো পাবো না।
অতৃপ্ত আত্মার কাছে বাগদত্ত, দন্তকুলোদ্ভব
কবি, শ্রেষ্ঠ-জনগণ মনোনীত আমি প্রতিনিধি,
রাসের মায়াময় পূর্ণ স্বর্ণ-নদী-জীবন সম্মানে
এখানে এসেছি! ফিরে যাবো কেন? আরব্য মরুতে?
জল ব্যতিরেকে মৃত্যু, জলের আরেক নাম জীবন! জীবনে
রসের সম্মানী! বখা এখানে এলাম? তবু জানি—
অভিশপ্ত সিসিফাস এ-আমি, আমৃত্যু এই অরণ্যগভীরে থাকতে
হবে!!

দুরারে দুমাদুম ঘা পড়ে। মদনের
সব শরীর খরখর করে কাঁপছে। বুকে
চকির পাড় পড়ছে। কুমি ওকে ছাড়িয়ে
চপে ধরে কানের কাছে মূখ এনে বলে,—
ওই ছুপিটা দিরা পাকের ঘরে বাও।
পাকের ঘরে এটু পিছদুয়ার আছে।
সেইডা খুইলা পলাও। সন্ধ্যা পলাও।
খোপী ঘরে বাও।

মদন চৌকি থেকে নেমে পড়ে।
দরজায় তখন ধমামম আওয়াজ।

কুমি চিংকার করে ওঠে,—কেডা দুয়ার
ভাঙে! বাইবে কেডা?

একটা কুৎসিত গাল শোনা যায়
উত্তরে।

মদন কুমির দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস
করে বলে,—তুমি বাইবা না?

—না, আমি ওয়ানগো আটকাইয়া
রাখুম। তুমি সন্ধ্যা পলাও।

মদন ঘরের বেড়ার ছোট কাঁপটা খুলে
সন্ধ্যাঘরে ঢোকে। ওখানে অন্ধকারে
হাতড়ে দেখে চালতে বাগানের পিছনের

দিকে একটা ছোট পিছদুয়ার। ওখান
থেকে ঘাটে যাবার পথ।

মদন দাঁড়ায় একটু সময়। পা দুটো
ঠক ঠক করে কাঁপছে।

—মদন হালা কোয়ানে। ক' সন্ধ্যা।
মনছুরের গলা। কুমিকে বোধহয়

শাসাচ্ছে মনছুর। কুমি কি দরজা খুলে
দিয়েছে, না দরজা ভেঙে ফেলেছে ওরা?
মনছুরের কাছে কি অপরাধ করেছে ও!
অপরাধ করেছে। সেদিন কালাকাল্মিতে
মনছুরকে মেরেছিল সে আর সে পরমার
বন্ধু। পরমাকে না পেয়ে তাকেই মারতে
এসেছে।

মদন পিছনের দুয়ারটা খুলে অন্ধ-
কারে চালতে বাগানে বেরিয়ে পড়ে। ঘন
অন্ধকার। অন্ধকারে পা টিপে টিপে
এগোয়। এদিকটায় জনমিনিষ্য নেই।
ভিড় সব ঘরের আগদুয়ারের কাছে।

চালতে বাগান পেরিয়ে সরু রাস্তাটা
ধরে দৌড়োতে থাকে মদন বকুলতলার
দিকে।

কানে আসে কুমির গলাচেরা একটা
আতনাদ। আতনাদের ভাষাটা বোঝা
যায় না। একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস আত-
নাদ। কে জানে ওর পেটে সর্ডিক বা কোচ
বসিয়ে দিয়েছে কি না! না কি রামদা
দিয়ে কোপ বসিয়েছে কাঁধে।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে বকুলতলায়
কাছাকাছি এস পড়ে মদন।

কুমির ঘরের ওদিক থেকে ভয়ঙ্কর
চিৎকার ভেসে আসে। অন্ধকারে বন্য
উজাসের গর্জন। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
কুমির ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা।

ঘামেভেজা দেহখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে
পড়ে মদন। শ্বাস ফেলতে পারছে না।

কুমি আর নাই। কুমিকে ওরা
নিকাশ করে দিয়েছে।

দূরে ঘরজ্বলা আগুনের দিকে
তাকিয়ে মদন হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

[ক্লমশ]

ইয়োবোপা

হিরন্ময়
ভট্টাচার্য

‘হোম সুইট হোম’। বলবেন ছোট-বেলায় কবিতায় পড়েছি বটে, ভালই লেগেছে। কিন্তু আমাদের প্রাসাদ ত’ শূন্য। আর ধরণীর বুকে যা আছে তা বাসা। কবিগুরু দরদী। আমাদের মনের ব্যথা জানিয়েছেন -

ধন নয় মান নয়,
ওকটুকু বাসা
মনে ছিল আশা।

তা’ পেলেই জীবন ধন্য। কথায় বলে রুটির লড়াই। এখন মাথা গোঁজার ঠাই নিয়ে মারামারি। যদি রা জুটল, ভাড়া জোগাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমাদের আবাস ‘হোম’। তার জন্য ভাবনা। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে লন্ডনের মত শহরে মধ্যবিত্তরা নিজের বাড়ি কিনতে পারে। বাড়ি তৈরিব খরচা এদেশে আমাদের দেশের চেয়ে বেশি। তবু কি করে সম্ভব? বাড়ির দাম ত’ জমির দামে। আমাদের দেশে বিশেষ করে কলকাতার ৩৩ শহরে জমি বোধহয় সোনা দিয়ে

মোড়া। আকাশ ছোঁয়া মাশুল। ধারে-কাছে বেসতে গেলে গায়ে আঁচ লাগে।

টাকা জমিয়ে বাড়ি করা। রিটারার করার পর প্রতিভেট ফাণ্ডের টাকার সম্ভব। মাইনের টাকার সংসার চলে না তার বাড়ি উঠবে কোথা থেকে? যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকত, যে ন্যায্য সুদে টাকা ধার দিত। মাসে মাসে শোধ দাও। সমস্যার একটু সমাধান হত। দেশে সে সুবিধে কোথায়

ইংল্যান্ডে বিল্ডিং সোসাইটি নামে বহু প্রতিষ্ঠান আছে। তারা দান-ধ্যান করে পরসে বিলিয়ে দেয় না। পুরোদস্তুর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। তারা শতকরা চার, সাড়ে চার সুদ দিয়ে জনসাধারণের কাছে টাকা ধার নেয় এবং সাড়ে ছয়, সাত সুদে টাকা ধার দেয়। বাড়ির দামের শতকরা আশি থেকে-নব্বই ভাগ পর্যন্ত ধার পাওয়া যায়। কুড়ি-পঁচিশ বছরে শোধ করে। যার বছরে মাইনে দশ হাজার টাকা সে মোট তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার পেতে পারে।

এক লক্ষ টাকার মধ্যে এদেশে মোটো-

মুঠি ভালো বাড়ি পাওয়া যায়। সাধারণত পাঁচখানা ঘর। নিচের তলায় দু’খানা। একটা বাইরে ঘর অন্যটাকে বলে লিভিং রুম। খাওয়াদাওয়া ও বসে বিশ্রাম করা চলে। নিচের তলায় রান্না ঘর। দোতলার তিনটে শোবার ঘর। বাথরুম ও টয়লেট। তাছাড়া সামনে একটু বাগান, দু’চারটে ফুলগাছ লাগান যায়। পেছনে বড় বাগান। ফুলের সংগে ফল। উদ্যোগী পুরুষ হলে শাক-সব্জি ফলান যায়।

টাকার অক্ষ গুনে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। আমাদের দেশে অক্ষটা আকাশ ছোঁয়া বলে মনে হবে। তবে এদেশে সাধারণ লোক যা উপায় করে, তাতে তাদের নাগালের বাইরে না। এ দেশে বিষয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রী দু’জনে চিন্তা জমাতো শুরুর করে। নিজের বাড়ি কিনে সংসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

বাড়ি কেনার হাঙ্গামা কম নয়। মনোমত বাড়ি খুঁজে পাওয়াই দুঃসাম্য। বাড়ি পছন্দ হয় তো দাম বেশি। আবার দায় জুতসই হলে বাড়ি দেখে মন খুঁতখুঁত করে। তারপর, সার্ভেয়ার ডাক সলি-সিটারের কাছে খণা দাও। বাড়ি হলে আজ্ঞা এটা সারাও কাল জানলা-দরজা রত কর। তবে নিত্য বাড়ি খোঁজার হাঙ্গামা থাকে না। বাড়ি ভাড়া পাওয়া বেশ মুশকিল। বিশেষ করে লন্ডনের মত শহরে।

ভাড়া বাড়ির রকমফের আছে। কিছ আছে ফার্নিশড। অর্থাৎ মোবায় কাপেট, শোবার বিছানা বালিশ চাদর থেকে ডিনার টেবল, কুকার, ফ্রিজ সব থাকে। আনফার্নিশড অবশ্য নেড়া বাড়ি, সব আসবাবপত্র নিজের। আর আছে ডিগ। সাধারণ ছাত্র বা একা মানুষ হলে থাকা যায়। কোন পরিবারের সংগে সংসারের একজন হয়ে থাকা। সে পরিবারে খায় দায় থাকে। গৃহিণী মার মত ঘর খাটি দেশ বিছানা করে জামা পাবস্কার করে দেয়। অনেক বড় বড় বাড়িতে বহু লোক এক-একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে রান্নাবান্না ছোট গ্যাস রিং এক কোণে হাত-মুখ ধোবার বেসিন। দু’চারটে ঘর মিলে একটা টয়লেট ও বাথরুম। এই ধরনের ঘরে অনেক স্বামী-স্ত্রীও থাকে। নিঃস্বাট। কিন্তু যেই জানা গেল তাদের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যান্ডবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - গোহাটী

দুঃখজনক আইডি

‘বিশ্ববাসিনাথকে মনে রেখে’
অশোক ভট্টাচার্য

কড় বৃষ্টি শেষ হোলো। এ-জমির বৃক থেকে ‘দূষিত রক্তের ধাম’
নিঃশেষিত মূছে গেছে; এখন পবিত্র মাটি সরস উর্বর
মৃত্যু চারার জন্য প্রতীক্ষিত; এই ক্ষেত শেষ শতাব্দীর।

বীজ বুনবার বেলা চাষী যারা সকালের কিশোর আলোয়
প্রান্তরে মিলিত হবে, যারা সার দেবে জল দেবে শ্রম দেবে
জীবনের স্বৈদ রক্ত মৃত্তিকার এ-উৎসবে সব ঢেলে দেবে,
তাদের এবার ডাকো; স্বজের সমিধ তৈরি। সমাপ্ত প্রস্তুতি।

আকাশ মৃত্তিকা জল অরুণ-ওষধি তৃণ উদ্ভিদ জগৎ
প্রাণময় পৃথিবীর সব স্তম্ভ প্রসারতা, সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো,
মৃত্যু প্রাণের বীজ এখন বোনার কাল, শতাব্দীর শেষে
নবযুগ উদ্বেষিত; আমি তার জন্মারম্ভের বৈধ অংশীদার।

যাত্রারে কসল তোলা শেষ হলে, একদিন সন্ধ্যার নিজর্নে
মনে কোরো, এই স্বপ্ন যারা দেখেছিল তারা কবে অশ্রুকারে
মাঠের মাটির সঙ্গে মিশে গেছে; মরুপ্রান্ত তাদের বেদনা
ঘরসের পাতার বৃকে শিশুর অশ্রুর মতো এখন নীরব।

আমাদের সভ্যতার ভিত্তি ভাঙে বাকুড়ার মন্দিরের মতো,
দুর্ভিক্ষের ভয়ে কাঁদে জীবনের মল্লগার জীর্ণ পুরুলিয়া;
আমাদের বা শিলচরে কিংবা বৃষ্টি ঢাকায় নিহত
শহীদ ভাষারা বলে : বেছে নাও জোড়াসাঁকো নয় চরুলিয়া।

জানো কী বিপদ আছে সাথবাহ, পদ্মা দিয়ে গেলে,
প্রলোভন সত্য নয়—ভূমি এসো, আমাদেরই উজান বন্দনা।
এপার ওপার গঙ্গা আশ্রভোলা সওদাগর সহজে কী মেলে,
ভুবনভাঙার মাঠে বিস্তীর্ণ মিমেষেতে জড়ো অজ্ঞান নন্দনা।

কেন যে প্রসন্ন থাকো আপনার বিশ্বকর্মা হাতের সৃষ্টিভে-
দিতল পক্ষজের জাতিভেদ ক্রমান্বয়ে অস্বীকার করো!
সম্মত কী সম্ভব? তবু নিত্য নিখিলের আশিস বৃষ্টিতে
জালকমল নীলকমল জীবনের এক বৃষ্টিতে ফুল্ল করে গড়ো।

ঘোরাও ঘোঁরকে ইচ্ছে; জীবনের এজিনের ক্ষিপ্ত পাখসাটে
সেতুর ওপারে মৃত্তি : জোড়াসাঁকো সে বিশ্বাস বেড়ালাল কাটে।

সংসারে আসবে নতুন সন্তান আর রক্ষে
নেই। বাড়ি পাওয়া অসাধ্যসাধন। মোটা
পরস্যা দিতে হয়। নানান মূঢ়লেকা দিতে
হয়। তাও চোরের মত থাকে। কোথায়
ছেলের ল্যাপি শোকাবে? ছেলে রাজভোর
চিৎকার করে কাঁদলে পাশের ঘরের লোক
ঘুমোয় কি করে! তাদেরও কাজকর্ম
আছে। পরের ছেলের জন্যে ঘুমের
ব্যাহত সহ্য করবে কেন।

তাই সংসার বাড়িবার আগে লোকে
চেষ্টা করে বাড়ি কেনবার। জন্ম দেবার
মত টাকা হলেই কাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাংক
অনেক সময় জন্ম দেবার জন্যে টাকা ধার
দিয়ে সাহায্য করে। মাঝে কাউন্সিল কাউ-
ন্সিল সব টাকা ধার দিতে শুরুর করে। এক
পরস্যা জন্ম না দিয়ে বাড়ি কেনা। তবে
কাউন্সিলের ভ্যালুয়েশন সাধারণ নামের
চেয়ে একটু কম হয়। সরকার পক্ষ চির-
কালই সাবধানে পা ফেলে। এদেশে বহু
লোক নিজের বাড়িতে বাস করে। এগু-
লোকে বলে ওনার অকুপারাই হাউস।

এদেশে পাশাপাশি বাড়ি সব এক
খাঁড়ের। নম্বর না জানলে নিজের বাড়ি
চেনা মুশকিল। অনেক রকম বাড়ি আছে
যেমন, টেনাসড হাউস। গায়ে গায়ে
জাগান বাড়ি, দু’পাশের বাড়ির একটা
দেওয়াল। অন্য ঘরগের বাড়ি হল সেমি
ভিট্যাচড অর্থাৎ একদিকে দু’পাশের
সাধারণ দেওয়াল অন্যদিকে নিজস্ব

দেওয়াল তার পাশে খানিকটা খালি
জায়গা। ভিট্যাচড বাড়ির দু’পাশে-
কাঁকা জায়গা। নিত্যন্ত বড়লোক না হলে
বা বন-বাদাড়ে না থাকলে এ ধারণের বাড়ি
বড় দেখা যায় না।

এ দেশে আর এক বিশেষ ধরনের
বাড়ি হল কাউন্সিল হাউস। লোকাল
অধিরিটি বড় বড় ক্ল্যাট করে বাড়িও করে
এবং সন্তান ভাড়া দেয়। বাড়িগুলো
কিন্তু আধুনিক কেতাদুরস্ত বাড়ি।
ওদের লম্বা ওয়েটিং লিস্ট। হয়ত
পেতে চার-পাঁচ বছর সময় লাগে। তবে
একবার ঢুকলে স্থায়ী বাসিন্দা। নিজেরা
তো থাকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেরাও
বাস করে। এর ভাড়া কম। অন্য লোকের
ট্যাক্স থেকে এদের সাহায্য করা হয়।

এর পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। যাঁরা
সত্যি দরিদ্র ভালো বাড়িতে থাকার
সামর্থ্য বাঁদের জীবনে হবে না—তাঁদের
জন্যে এই সুব্যবস্থা। এ হল সোশ্যাল
সার্ভিস—সমাজকল্যাণকর কাজ। কিন্তু
এখন দেখা যায়, তাদের অনেকে পরে
মোটা টাকা-পরস্যা উপায় করে। অনেকের
ভালো ভালো দামি বাড়ি আছে। কোন
পরিবারে দু’টো বাড়ি। নতুন কাউন্সিল
হাউসে গ্যারেজ সমেত বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

অনেকের বক্তব্য, যাদের বাড়ি কেনার
সামর্থ্য আছে তাদের কাউন্সিলের বাড়ি
দেওয়া হবে কোন সুবাদে। এমন বহু

লোক আছে যারা সত্যি দরিদ্র কাউন্সিলের
বাড়ি পায় নি। বেশি ভাড়া দিয়ে আধা
গোঁজার ঠাই করেছে। উপরন্তু কাউন্সিল
হাউসের বাসিন্দাদের জন্যে টাকা গুণছে।
এ কি সুবিচার!

প্রস্তাব উঠছে, কাউন্সিলের বাড়ির
ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যারা সত্যি
দরিদ্র তারা আবেদন করুক। গ্রান্ট দেওয়া
হবে। এদেশের এক-ভূতীয়ংশ লোক
কাউন্সিলের বাড়িতে থাকে।

এখন টোরির আর লেবার পার্টিতে
স্নায়ুদ্রব চলেছে এই কাউন্সিল হাউস
নির্নে। ইংলন্ডে কেন্দ্রে লেবার পার্টি,
কিন্তু অধিকাংশ লোকাল কাউন্সিল
বর্তমানে টোরি পার্টির হাতে। তাদের
উদ্দেশ্য কাউন্সিল হাউসের বাসিন্দারা
ইচ্ছে করলে তাদের বাসা কিনে নিতে
পারে। তাহলে করদাতারা ব্যয়ভার থেকে
অব্যাহতি পেল। ভাড়াটে এখন বাড়ি-
ওয়ালা এবং স্বাবলম্বী। বাড়ি বিক্রি করে
কাউন্সিলের হাতে টাকা আসবে। তাই
দিয়ে আরও নতুন বাড়ি হবে। লেবার
পার্টি বন্ধপরিষদ এ ব্যবস্থা রদ করবে।
তাদের মতে ষত দিন যাবে বাড়ি তৈরির
খরচ বাড়বে। সুতরাং কাউন্সিলের হাতে
বাড়ির সংখ্যা যাবে কমে এবং সমস্যা
আরও জটিল হবে। স্বায়ত্তশাসন বনাম
কেন্দ্রীয় সরকার। দেখা যাক কোন পক্ষের
জয় হয়।

বন্যাত'গণকে সাহায্য করুন

"অতুতপূর্ব খরার ফলে আমরা যে বিপুল সঙ্কটের সম্মুখীন হই, গত দুই বছরে জাতীয় পর্যায়ে প্রাণ অমানুষিক উদ্যমে পরিশ্রম করে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হই। এখন আবার আমাদের দেশের বহু জায়গায় ভীষণ বন্যা হওয়ায় বহু লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এদের অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন। যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা নিদাক্ষণ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের যাতে অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায়, সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

— ইন্দিরা গান্ধী

প্রধানমন্ত্রীর
জাতীয় সাহায্য তহবিলে
মুক্তহস্তে
দান করুন।

নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠান
দি সেক্রেটারি
প্রাইম মিনিস্টার্স ন্যাশনাল রিলিফ ফাও
প্রাইম মিনিস্টার্স সেক্রেটারিয়েট
নতুন দিল্লী।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১ ১০ ৪

প্রজন্মে যখন ভাঙে খোঁয়ার গম্ভীর।
কাঁচা কাঠে আগুন ধরিয়ে নিচের তলার
হুটুটি বানাচ্ছে রাজস্থানীরা। ঘরের বাইরে
এসে দাঁড়াই। হনুমান চাঁট ইতিমধ্যেই
জেগেছে। নবীন উৎসাহে যাত্রীরা প্রস্তুত
হতে শুরু করেছে। এই ধর্মশালার
প্রযোজন ওদের ফুরিয়ে এসেছে। এ যেন
জংশন স্টেশনের ওয়েটিংরুম। গাড়ি আসা
পর্যন্ত বসে দরকার। তারপর আর মনে
রাখবার প্রয়োজন নেই। জীবনের ধর্ম-
শালাতেও বুঝি সেই একই নিয়ম। শৃঙ্খল
ধর্মের অপেক্ষা। ফেলে-আসা দিনগুলো
আর কি কোনও কাজে লাগবে? আত্মীয়,
পরিজন, বাড়ি-ঘর দেশ সবই পড়ে থাকবে
পেছনে। সঙ্গে কেউ তো যাবে না। যাবে
বৈকি। নিশ্চয়ই তারা সঙ্গে যাবে। সেই
সোনার দিনগুলো ভুলবো কি করে? কিছু
ভুলতে তো আঁগি চাই না। সংস্কার হয়ে
ধর্মের স্মৃতিগুলো আমার আত্মায় মিশে
থাক। সেদিন ফিরে আর আসবে না।
ওরা থাকুক আমার মনের মণিকোঠায়,
এগিয়ে চলবার পাথের হয়ে।

হনুমান তীরে বসে থাকি সকালের
মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে। ফেনিল উচ্ছ্বাসে
নীল জলরাশি একটানা কলস্বরে কত কি
বে শোনায়। ছোট ছোট ঢেউয়ের ফাঁকে
উঁকি দিয়ে হাসে সাদা নুড়িগুলো।
কোপের আড়ালে কিংকিপোবারা ক্রম
ক্রম শব্দে তাল যোগায়। কত হাসি
কত গান আর নুপুরের ঝঙ্কার। মধুর
আবেশে বিহ্বলা সূন্দরীর লীলা
অভিযান। পাখাণকারার বাঁধন কেটে
চলেছে নদী কোন্ সূন্দরের টানে।

যাত্রীরা তাড়া দেয়। দৌর ক'রো
না। এগিয়ে চলো। যাবো বৈকি। আমিও
যাবো। সকলের পেছনেই যাবো। যাত্রার
শেষ যে করতেই হবে। যদি না পারি,
পথের ধারে পড়ে থাকবো। আমার অন্ত-
রের কামনা-বাসনা ফুল হয়ে ফুটেবে
পাথরের খাঁজে। করে পড়বে জলের বুকে
দেবতার চরণে আমার পদ্পাঞ্জলি।

জুলাই মাসের প্রথম দিনে আকাশ
একেবারে নিমল। বাতাসে শীতের
আমেজ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার
ফুট ওপরে আছি। ধূলিকণামুক্ত আকাশে

মাতৃদেব প্রবল প্রতাপে কিরণ বর্ষণ
করছেন। অঙ্গ মেশানো পাথরের দেওয়ালে
প্রতিফলিত সূর্যের রশ্মি চোখ ধাঁধিয়ে
দেয়। গাছের ছায়ায় সর্বদাই স্নানস্থ
শীতল হাওয়া। একটু বসলেই শবীর
জুড়িয়ে যায়। শৃঙ্খল বড় বড় পাহাড়
মাছিগুলো একটু জ্বালাতন করে। শূন্য
ওদের কামড়ে না কি যা হয়। প্রকাণ্ড
হরীতকী গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে
চলি। আশেপাশে কত রকমারি ফুল,
অর্কিড আর ফার্নের সমারোহ। সাদা,
গোলাপী, লাল, নীল আব কোনটা
চিহ্নিত সাপের ফণার আকৃতি। কে তাঁর
করলো কে সাজালো এই স্বর্গোদ্যান? এই
বুঝি অমরার চিত্রশালা। হর-পার্বতীর
মিলনকুঞ্জ! যুগে যুগে মাটির মানুষের
শোক-দুঃখ-হরা মোক্ষলাভের পথ! ঋষি,
মনীষী আর মহাকাবিদের বর্ণনায় শেষ
নেই যার, দেবভূমির বর্ণসূচী তো
আকাশে ঝোলানো মবীচিকার স্বপ্নমায়া
নয়।

বিসর্পিল পথ চলেছে ঘন জঙ্গল,
বাগান আর ক্ষেতের পাশ দিয়ে। জঙ্গলে
হরীতকী গাছে প্রচুর ফল ধবে আছে।
কাঁচা হরীতকী হাতে দু-চারটে হনুমান
গাছের ডালে বসে আমার নিবীক্ষণ করে।
ক্ষেত-খামারে কর্মরতা তবুণী দূর থেকে
পরমা চায়। ছবি তোলার প্রস্তুতি
পেছন ফিরে বড়ো অঙুল নাচায়। বহু
নিচে যমুনায় নীল জলধারা। কখনও
চলোঁছ নদীগর্ভের একেবারে পাশে ঝাড়া
পাহাড়ের রুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে টিক-
টিকির মতো। মাঝে মাঝে দু-একটা
ধূস পার হতে হয় সাবধানে। শীতের
জমাট বরফ গলে বর্ষার জল পেলে। সেই
সঙ্গে মাটি আর পাথর গাড়িয়ে ধূস নেমে
পথঘাট ভেঙে সে অশ্রুতের চেহারাই
পাল্টে যায়। ভাঙা-গড়ার এই খেলা
চলেছে অবিরত হিমালয়ের বুকে।

পথে কদাচিৎ দু-একজনের দেখা
মেলে। কাছে এলে যাত্রীরা বলে 'যমুনা-
মাইকি জব', আর স্থানীয়রা 'কিতনি
টেইম হ্যায মহারাজ'। প্রায় আড়াই
মাইলের মাথায় একটা বড় নদী যমুনায়
মিশেছে। এমনি পথে হনুমান চাঁট
থেকে চাব মাইল হেঁটে বেলা এগারটার
ফুল চাঁট। সার্থক নামটি। চারদিকে
শৃঙ্খলই ফুল। নদী অনেকটা এগিয়ে
এসেছে পাথের কাছে। ওপারে পাহাড়ের
মাথাখ আলাসের মতো পশুচারণক্ষেত্র
'খারক'। সবুজ ঘাসে ঢাকা আলপস্।
দূরে আকাশের গায়ে তুষারমোলাই হিম-
গিরির শৃঙ্গগুলি সগবোঁ দাঁড়িয়ে
অভ্যর্থনা জানায়। বন্দরপুণ্ড পর্বতমালার
নিম্নভাগে জঙ্গলাকর্ণিগ সবুজ পাহাড়ের
শ্রেণী। ওপরে সুনীল আকাশে পঁজা
ভুলোব মতো হালকা কয়েক টুকরো
মেঘ আর নিচে সূর্যকিরণে সবুজের গায়ে

অলপ ভায়েলেটের খেলা। সব ভোলা-
নোর আয়োজন সম্পূর্ণ!

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ফুল চটিতে।
দোতলা ধর্মশালার কাঠের বারান্দায়
বিগ্রহময়। আর হর চোখ ভরে দেখা।
মহাশিখরীর হাতে অঁকা অপূর্ণ মন্দির
ছবি। সামনে মাইল দূরেক দূরে গাহা-
ড়ের কোলের মধ্যে একটা গ্রাম। ছোট
ছোট বিন্দুর মতো বাড়ি-ঘর। এখানেই
আজকের মতো যাত্রার বিরতি। অতএব
কোন তাড়া নেই। দোকানী দিয়ে যায়
পুত্রী আর তরকারি। খেতে খেতে শুন
কোন কোন যাত্রী ফুল চটিতেই রাতিবাস
করেন। এখান থেকে খুব ভোরে রওনা
হয়ে যমুনোত্রী দর্শন শেষে আবার
সন্ধ্যায় এখানেই ফেরেন তারা। যমুনোত্রী
এখান থেকে ছয় মাইল। অত্যন্ত ঠান্ডা
আর স্থানান্তর দেখানে। এইসব কারণে
পান্ডারা চেষ্টা করেন সাধারণ যাত্রীদের
যমুনোত্রী থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিরা-
পন্ন আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে। অশিক্ষিত
এই যাত্রীদের তীর্থক্ষেত্রের মন্দির দর্শনই
একমাত্র লক্ষ্য। নৈসর্গিক শোভায় রুচি
নেই। আর পান্ডারাও পূজা, দর্শনার
ব্যবস্থা হলেই দায়মুক্ত হতে চান। বেদ-
পুত্রাদের আলোচনা সময়ে এড়িয়ে চলে
এরা। দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।
যুগান্তের অবহেলিত এই দুর্গম অঞ্চলের
অধিবাসীরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে
আছে। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের কবলে
শব্দ ওরা কেন, সারা ভারতের আর্থ-
সংস্কৃতি বিস্তারিত অতলে হারিয়ে গেছে।
কদাচিত্ত কোনও বিদ্যমজ্ঞানশিগাস হরত
অতীতের জীর্ণ পুঁথি খাটেন আর তত্ত্ব-
জ্ঞানের মহাজ্যোতিতে আত্মসমাহিত হয়ে
যান। কচিং কেউ ভুলে কিছু প্রকাশ করে
ফেলেন। মুখ খুললেই বিপদ। হয় রাচী
নয় ত' মিউজিয়ামের ব্যবস্থা করবেন
সবাই!

প্রায় দেড়শ বছর আগে তখনকার
ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট
জর্জ ফ্রানসিস হোয়াইট হিমালয়ের বিভিন্ন
অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। তার লেখা বই
'Views In Indi' লন্ডনে প্রকাশিত
হয় ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে। হরিদ্বার, ফরী-
কোশ, মুসুরী, যমুনোত্রী, গাংগোত্রী
প্রভৃতি অঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্যবলীর
হাতে অঁকা স্কেচ-সমূহ সেই বই-
খানিতে পাওয়া যায়, সেখানে ইংরেজদের
চোখে দেখা প্রাচীন ভারতের বিস্ময়কর
মহা-সম্পদের বর্ণনা। তখনকার দিনে
পথ-ঘাট কিছুই ছিল না। হিমালয়ের
গভীরাঞ্চলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের
অবাধ রাজত্ব। প্রায় জনশূন্য এইসব দুর্গম
অঞ্চলে অনন্ত সৌন্দর্যময় নৈসর্গিক
শোভায় তারা আকুল হয়ে ছুটে বেড়ান



ফুল চটি—যমুনোত্রীর পথে

শত বিপদ ভুগ্ন করে। শাস্বত সুন্দর
হিমালয়ের স্থানগম্ভীর রূপ বিদেশীদের
প্রাণে নতুন জগতের সন্ধান এনে দেয়।
ভুবন-ভোলানো এই মহা ঐশ্বর্যের সন্ধান
তারা লেপ করেন সভ্যজগতের দরবারে।
সুদীর্ঘকালের পরাধীনতায় আত্মবিস্মৃত
আমরা আবার দেখতে শিখি আর্ব-
ভারতের মূল স্তম্ভ দেবতাত্মা
নগাধিরাজকে। আজকের দিনে বিশাল
হিমালয়কে দেখবার, জানবার ইচ্ছা তরাই
আবার ফিরিয়ে আনেন এটা অনস্বীকার্য।
হাজার হাজার বছর ধরে যে ঐতিহ্য গড়ে
উঠেছিল হিমালয়কে কেন্দ্র করে, নদী-
মাতৃক এই মহাভারতের প্রাণধারার উৎস
সম্প্রদানে এগিয়ে আসেন তারা। আসেন
সায় ফ্রানসিস ইং হাজব্যান্ড, লংস্টাফ,
সোরেন হেভিন, বিশপ, মারে, টিলম্যান
আর বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ। অভিমাত্রীর
বেশে তারা শুনিয়ে যান নতুন করে
প্রাচীনতম বেদের বাণী।

'From the High Himalayas,
amongst the blazing Panorama
of snow clad mountains, the
River sprouts, like the stem of
Lotus from the feet of Lord
Vishnu.'

সারা বিশ্বে ধনিত হয় সত্য শিব
সুন্দরের জয়গাথা।

'আ বে ধার্মানি দিব্যানি তত্ত্বং।'

আমি দেখেছি, সেই দিব্যধাম আছে।

* * *

ফুল চটি পেরিয়ে পথ দু'ভাগ হয়ে
গেছে। ডানদিকের পারে চলা সড়ক
নদীর এপার দিয়ে খুরশালী অভিমুখে
চলেছে। আর বাঁ-হাতি পথটি নদী পার
হয়ে যমুনোত্রী যাবার। কাঠের সেতু পার
হয়ে দু' মাইল দূরে 'বীক্ষণ'। ছোট
গ্রামটিতে কারুকার্যখচিত কাঠের বাড়ি-
গুলো এক জারগার সাজানো রয়েছে।
গ্রামটি ঘিরে ফলের বাগান। একপ্রান্তে
কাঠ আর পাথরে তৈরি মন্দির। সুউচ্চ
মন্দিরের গঠনে তিস্তাতী ডাব সুস্পষ্ট।
কাঠের বাড়িগুলোতে দোতলা অলিন্দে
বসে সুন্দরী নারীরা আমার পর্ববেক্ষণ
করে একদৃষ্টে। গন্ধর্ব, কিম্বদন্তি অথবা
অপ্সরাদের বংশোদ্ভূত কি না জানি না,
কিন্তু আশ্চর্য রূপ এই দুর্গমতম দেশের
নারীদের। যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান
নেই। রোগের চিকিৎসা আর বিলাসের
উপকরণ এদের অজানা। সবার ওপরে
আছে পর্বতের কঠিন জীবন, বছরের মধ্যে
সুদীর্ঘ আট মাসই পুরু বরফে ঢাকা
থাকে এ অঞ্চল। গরু-হাগল আর
মানুষ একই ঘরে অতি কষ্টে শীতের
কটা মাস কাটায়। তবু কতো রূপ
এদের দেহে। যমুনোত্রী পথের শেষ
লোকালয়। এরা কি মানুষ?

বীফ্‌গা ছাড়িয়ে ২।১ ফার্লং এগিয়ে
জানকীবাসি চাট একেবারে যমুনার কূল
ঘেসে। বোম্বাইয়ের কোন এক শেঠের
স্ত্রী তীর্থযাত্রায় এসে এই ধর্মশালা
প্রতিষ্ঠা করেন যাত্রীদের সুবিধার্থে।
তাইই নামানুসারে এই চাট। একটি ধর্ম-
শালা আর আশেপাশে কয়েকটি কুটির।
ওপারে পর্বতের উচ্চভূমিতে প্রাচীনকালের
সমৃদ্ধ গ্রাম খুরশালী। যমুনোত্রী পাণ্ডা-
দের আবাস। লেফটেন্যান্ট হোয়াইটের
বর্ণনায় খুরশালী একটি বিশিষ্ট স্থান
অধিকার করে আছে। কিছুদিন আগে
পর্যন্তও পরিব্রাজকের পথ ছিল নদীর ওপার
দিয়ে। খুরশালী হয়ে আসতেন যাত্রীরা।
নদী পার হতেন কাঠের ভাঙুর সেতুর
ওপর দিয়ে। সেসব এখন অতীতের
কাহিনী। দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে
পথ-ঘাট আর সেই সঙ্গে পর্বতের
নিঃশাংশ।

ধর্মশালার সামনে দোকানে বসে
গাতের আহার সমাধা করি সন্ধ্যার আগেই।
এখানে অন্ধকার হয় আটটার পরে। প্রায়
আট হাজার ফুট উঁচু। সূর্যাস্তের সঙ্গে
সঙ্গেই দূরন্ত শীত নেমে আসে। স্থানীয়
পুলিশ চৌকির জমাদারজী পাশে বসে
গল্প করেন। আর সেই সঙ্গে দেখি
বিচিত্র রংয়ের খেলা বন্দরপুণ্ডের মাথায়।
অস্তাচলগামী রবিরশ্মির আভাষ তুষার-
কিরীটে লক্ষ মণিক জ্বলে। ছন্দপতন

হয় শেঠজীর চিংকারে। দোতলার বারান্দা
থেকে চেঁচাচ্ছেন সহযাত্রী সুরেকাজী।
এক গোরা দুধের দাম আট আনা! এ কি
মগের মূল্যদূক যে যা খুঁশি দাম হাঁকবে!
বীফ্‌গায় দাম ছ' আনা আর এখানে আট
আনা! গজগজ করতে থাকে বড়বাজা-
রের আড়তদার। মনে পড়ে তেরশ'
পঞ্চাশের মন্বন্তর। রাজধানীর পথে পথে
হাজার কণ্ঠের করুণ আত্ননাদ 'একটু
ফ্যান দাও গো!!' বড়বাজারের আড়তে
সেদিন চালের দাম বাড়ছিল মিনিটে
মিনিটে। যমুনোত্রীর এত কাছে এসেও
কালোবাজারী বরদাস্ত করতে পারছেন না
শেঠজী। এ তো আর কলকাতা, বোম্বাই
নয়। এ যে সাক্ষাৎ দেবতার স্থান! নিঃশব্দ
তাঁছিলো দোকানদার সবলে এগিয়ে দেয়
ঘটি ভরে গরম জল বৃষ্টি যাত্রীগণকে।
দুঃস্থ তীর্থযাত্রীদের সেবা করা পরম
পুণ্যকাজ।

ধর্মশালা থেকে কিছুটা তফাতে সদ্য
নির্মিত একটি বাড়ির দোতলাটা অধিকার
করি এক টাকার বিনিময়ে। মালিক
বীফ্‌গায়ের অধিবাসী। হিমাচল ভ্রমণে
নির্জনতার সুখ আছে। অনভূতি আর
চিন্তার প্রখরতা বাড়ে একলা হলে। হয়ত
বিপদ আর অসুবিধাও আছে অজানা
পাহাড়-জঙ্গলের বিপদসংকুল পথে। তেমনি
প্রকৃতির সান্নিধ্যও পাওয়া যায়। বৈদিক-
যুগের সাধু-মহাত্মারা সেটা বুঝতেন।

এমন কি আধুনিক যুগের স্মৃতিস্তম্ভ
টিলম্যান প্রমুখ বিখ্যাত পর্বতারোহীরাও
সে কথা মস্তকশ্রেষ্ঠ স্বীকার করে গেছেন।
আজ রাতের মত এই বাড়িটার আমি একমুঠ
নিভৃত নিরালস্য একান্তে শুনিন সূর্যসুভাষ
কালিন্দীর গান। পাহাড়, জঙ্গল আর
আমি। আর যমুনা—

* * *

॥ ১১ ॥

দারুণ শীত স্লিপিং ব্যাগের মায়া
কাটিয়ে উঠতে হয়। দরজা ঠেলাঠেলি
করে বাড়ির মালিক। গরম দুধটুকু ঠান্ডা
হয়ে যাবে যে! বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহা
আলোর বেলা হয়েছে বোকা যায় না।
একে একে রাজস্থানীরা আমার ঘরের
সামনে দিয়ে পাকদণ্ডী পথে এগিয়ে যায়।
ওদের সংগী তীর্থপাণ্ডা যেতে যেতে
আমায় সাবধান করে, সামনে কঠিন চড়াই,
বাদল নামলে মূর্ছকল হবে। সার্ন দিয়ে
বীফ্‌গায়ের অধিবাসী বলে, 'যমরাজার
ভগ্নী যমুনার জন্মস্থান যে সাক্ষাৎ
যমপুরী!' হেসে বলি, 'জ্যান্তশরীরে
যমপুরী দর্শন ভ' ভাগ্যের কথা।

জঙ্গল ভ্রমেই ঘন হয়ে আসে। সরু
পায়ে-চলা পথ পাকদণ্ডী হয়ে ঘুরে ঘুরে
পাহাড়ের ওপরে উঠছে। বনবিভাগের
সুসজ্জিত ডাকবাংলোর সা— দিচ্ছে



যমুনোত্রীর কাছে খুরশালী (বেড়শ) বহর আগের স্কেচ থেকে)

সাপ্তাহিক বসন্ত

এগিয়ে চল। পথের ভীষণতার অনেক কাহিনী শোনা আছে। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে আকাশে মেঘের রাজ্যে কোনও ফাঁক দেখি না। শরশালী ঘন কুয়াশার আড়ালে চাকা পড়ে গেছে। কবীতি হাড়ি দিয়ে লাঠি হাতে ধীর পায়ে সাবধানে হাঁটি। পিছল মাটির পাহাড়ি পথ। সঙ্গী পুলিশ ফাঁড়ির জমাদার। সীমান্তের শান্তি, লুৎফলা আর বিহঃশহুর অন্ধপ্রবেশ সব কিছুর দায়িত্ব এঁদের ওপর। তাছাড়া আছে দুর্গম ভীষণস্থানে বাড়ীদের খবর-কারী। প্রত্যহ একবার করে ওদের যেতে হয় ওপরে। দুঃখ করে বলে, সামান্য বেতন আর বড়ীর ভাতার পেট চলে না। রোজ আট হাজার ফুট ওঠা-নামার খোরাক যোগানো মুশকিল। তাছাড়া সীমান্তে পরিবার সঙ্গে রাখা নিষেধ। হ' মাসের বনবাসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। চব্বাম্বলের উদ্ভগতি ক্রমে এদের অসন্তোষ বাড়িয়ে চলেছে। সরকারী স্বল্প বেতনে দুটো সংসার চালানোর সমস্যায় কাতর। আদর্শ কর্তব্য আর ধর্মের দুলিতে যে পেট চলে না। বুঝি ওদের কথা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় যে আমার জানা নেই। স্বপ্নের জানেন আমলাতন্ত্রের কোন মন্তবলে ৭ মূল্যমানের স্থিতি-শীলতা আসবে।

একই পাহাড়ের আশ্রয় চক্রে হবে। প্রায় চার হাজার ফুটের চড়াই। গভীর অরণ্যের বড় বড় গাছগুলো ক্রমেই খর্বাকার হতে থাকে। পর্বতের উচ্চভূমিতে বড় বড় হাওয়ার তীব্রতায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মত ওপরে উঠি, বিরাট মহীরুহ ক্রমে কোপ এবং সবশেষে মাটি কামড়ানো লতায় পরিণত হয়। আরও ওপরে সবুজের স্পর্শবিহীন রুদ্ধ কঠিন পাথরের বুকে চির তুষারের আস্তরণ। এই নিরমই হিমালয়ের সর্বত্র। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লাডাখ, লাহুল, স্পিতি প্রভৃতি অঞ্চলে সাইবেরিয়ার শৃঙ্খলো হাওয়ার ফলে অনুর্বরতার গন্ডী কিছুটা বেশি।

পাহাড়ের গা বেয়ে সামান্য পলটুকু ক্রমেই ভীষণতর হতে থাকে। একে-বোঁকে উদ্ভদম্বী পাকদণ্ডী। কোন কোন জায়গায় ৭০০ ডিগ্রীর মতো খাড়াই। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টি চলেছে এক-ভাবে। পা হড়কালো নিশ্চিত মৃত্যু। পাহাড়ে উচ্চস্থানের বাতাসে অলঙ্কারের স্বপ্নভায় হাঁফ ধরে। মাথা ঘোরে। তার সঙ্গে শব্দই চড়াই। দু' পা সাই, একটু ঘামি। আবার চল। কোপের ধারে বসে হাঁফান যাবোঁরা। এমনি ভয়ঙ্কর পাথে দেখি একজন নন্দদেহী বাড়ী দণ্ডী কাটছে। অর্থাৎ সাম্প্রাণ প্রণামের ভীষণত্রে শূন্যে দেহ প্রসারিত করে হাত দিয়ে দাগ কাটে। তারপরে উঠে আবার দাগ কাটা

জায়গা থেকে সাফল্য। এইভাবে সবটা যাওয়ার নামই দণ্ডী কাটা। শরীরকে সব-রকমে কট দিয়ে ইশ্বর প্রাপ্তি। জানি না কোথায় এই বিধি লিখেছে।

বাবুজী, আমার দাদী মরে গেছে? আত্মস্বরে কানে রাজপুত মেয়ে। কোপের ধারে মৃতপ্রায় বৃষ্টির হিমশীতল হাত দুটো চেপে ধরি। বুকের ওপরে কান পেতে শব্দ শুনতে চেষ্টা করি। সামান্য একটু বুকবুক শব্দ বুঝি শোনা যায়। ফ্রাঙ্কের হাঁপ শুনে মূগ্ধ গালি জাভী মেশান জল। কান বেয়ে গাড়ির পাক। কিছুটা ভেতরে যায়। চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কান স্বর কোটে, 'বন্দনা'। শী, মেয়েটি সাব্রহে বুক পড়ে। আরও একটু জাভী-জল ঢেলে দিই। অনেককাল পরে

ধীরে ধীরে উঠে বসে বৃষ্টি। সিঁপাহীজী! কানে জর দিয়ে কোনওরকমে হটনে টেনে চলে। পথের মধ্যে থামলে অনেক বিশ্রাম। শরীর গরম রাখা দরকার। বৌশাকণ বসলে ঠান্ডায় হাত-পা জমে যায়। তাছাড়া ভালবের উপদ্রব ভো আছেই। কোনও একটা আশ্রয়ে বেতেই হবে। ক্রমে চাপগা হয়ে ওঠে বৃষ্টি। লাঠি ধরে একাই এগিয়ে চলে। আশ্রম কন্টসহিকতা আর কঠিন শরীর এই রাজস্থানীদের। অথবা একাকী?

কতকাল চলেছি জানি না। সময়ের হিসেব আর শরীরের চিন্তা অনেক আগেই ত্যাগ করেছি। কন্ট জন্মভয়ের শক্তিও বোধ-হর বৃষ্টিয়ে গেছে। চকিত এই দুঃসাগর বন্দনভিত্তে। সেই মশে অস্বস্ত কণ্ঠে 'বন্দনা মাইকি মরা' মল্লোবধির মতো



তল কাঁচা... লাবনি

আপনিও পেতে পারেন বৈকি
নিয়মিত ভাবে রোজ রাত্রে মাখুন



প্রিয়া

কোড ক্রীম

বঙ্গল কেমিক্যাল

(কলিকতা ও বোম্বাই
কানপুর ও দিল্লী)



যমুনোত্তরী

চলার গতিও আপনি বেড়ে যায়। বাক
দূরে একটা ছোট মন্দির দেখতে পাই।
ভৈরববাঁটি। মন্দিরের আশেপাশে গাছের
ভালে অসংখ্য কাপড়ের টুকরো নানা

ফোর্ড ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের আবশ্যক নাই। আমেরিকান
মডেল। চোর এবং জ্যানোয়ার হইতে
আত্মরক্ষা করুন।
পিকনিক, ভ্রমণ
এবং ড্রামার জন্য
প্রশস্ত। স্বয়ংক্রিয়
৫০ শটের ব্যবস্থা
সহ। হাফকা ওজন
এবং চোখ-ঝলসান আগুন বিপদ হইতে
আপনাকে রক্ষা করে। মূল্য ৫০ শট
৩৩নং ১৩.৫০ টাকা। জার্মান মডেল
৯৯নং ১৫.৫০ টাকা। ডি, পি, পি, মূল্য
২.৫০ টাকা। চামড়ার কেস ৩.৫০ টাকা।
স্বতন্ত্র শট একশত ৫.০০ টাকা।



GEM ARTS (WBC-15)
Post Box 1325, Delhi-6.

রংয়ের। শত্রুরা মানত করে নেকড়া বাঁধে।
যার বাঁধে। ভৈরবনাথের অনুমতি বিনা
যমুনোত্তরী দর্শন মিলবে না। মন্দি-
পথের স্মারক। 'জয় বাবা ভৈরবনাথ,
পার করে দাও।' আর কিছু কামনা যে
ছাই মনে আসে না! পাহাড়ি মেয়েরা
মানত করে 'দ্রৌপদীর মতো অফুরন্ত
কাপড় হোক।' আমার তো বস্ত্রহরণের
বালাই নেই। চড়াই পার হওয়া ছাড়া
কাম্য কিছুই নেই।

* * *

ভৈরববাঁটি ছাড়িয়ে পথ কিছুটা
সমতল। ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে চলছি
এঁকে-বেঁকে। ডানদিকে বহু নিচে
যমুনার নীল ধারা মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে
চিকমিক করে। ভৈরববাঁটি পেরিয়ে
বৃষ্টি আর পাই নি। আকাশ পরিষ্কার।
দু'পাশে খাড়া প্রাচীরের মতো পাহাড়।
পাহাড়গুলোর মাথার বরফ জমা হয়ে
আছে। তাদের গা বেয়ে বরফের ধারা

প্রপাত অনেক নিচে যমুনায় পড়ছে
সশব্দে। পথের পাশে জঙ্গলে অজস্র
কুল ফুটে আছে। শ্বেত-করবী, বন্য-কো-
ফুল, যুই, সাদা, লাল রংয়ের পাহাড়ি
গোলাপ। সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভেঙে
আসে। প্রায় মাইলখানেক চলে পাহাড়ের
বৃকের মধ্যে যমুনোত্তরীর মন্দির নজরে
পড়ে। দূরে নীলাভ পর্বতরাজির মাথা
বন্দরপুণ্ডের শ্বেতশুভ্র শিখর। চির
তুষারের গলার মৃত্তা-মালায় মতো তিনটি
ক্ষীণ ধারা নেমে এসে একত্রে মিলি
হয়েছে। ত্রিশূলাকৃতি ধারাটি মন্দিরে
পেছনে উন্নত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অন্ত
হিত। আরও কাছে এগিয়ে দেখতে পা
যমুনোত্তরীর সিংহস্বর। কালো পাথরে
দেওয়াল ভেদ করে সংকীর্ণ পথে কটি
বরফের নদী। চম্পাসর হিমবাহ
মন্দিরের ঠিক পেছনে বরফের তলা দি
যমুনায় প্রকাশ। ভাস্করসূতা কালিন্দী
মর্তে আবির্ভাব। পুরাণে দেখি কশ্য
আর অদিতির পুত্র সূর্যের ঔরসে য
যমুনায় জন্মবৃত্তান্ত। আদিত্যের সংভ
রাজ্যী, প্রভা ও ছায়া নামে চারটি স
ছিল। সংজ্ঞার গর্ভে মন্দ (বৈবস্বত
রাজ্যীর গর্ভে যম-যমুনা ও রেব
ছায়ার গর্ভে সার্বর্গ, শনি, তপতী
বিদিত এবং প্রভার গর্ভে প্রভাত।

“তপনস্য সূতা দেবী ত্রিষু লোবে
বিশ্রুত
সমাগতা মহাভাগ যমুনা তত্র
নিমগ্ন
যেনৈব নিঃসূতা গঙ্গা তেনৈব
যমুনায়
যোজনানাং সহস্রেষু কীর্তনাং
পাপনাশিন
তত্র স্নাতা চ পীত্বা চ যমুনায়
নিঃসূ
সর্বপাপবিনমূক্তঃ পুণ্যাত্মা
সপ্তমং কুলম

—কর্মপরা

* * *

মাগো, তোমার দেওয়া এই
তোমার বৃকের দূর্ধে পদত শরীর। যে
রই দেওয়া চোখ দিয়ে তুমি দেখো।
আনন্দ, তৃপ্তির তুমিই পাও।
মন্দিরে যমুনাদেবী ও গঙ্গা
মর্তির মাঝে যেন নিজ জননীকে দে
পাই।

১৯

আমরা যাক একটি মহাযাত্রা



দুর্ভাগ্যের মানবচরিত্র

জালালাবাদ যুদ্ধের পর অশ্বিকাদা, বিনোদ চৌধুরী এবং যুব-বাহিনীর প্রায় অর্ধেক অংশ মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে বিভিন্ন পথে নানা অভিজ্ঞতা ও কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। প্রধানবাহিনীর অপর অংশটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োচ্ছিল। লোক-নাথ বল, কালী চক্রবর্তী, রক্ত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায়, নারায়ণ সেন, রণধীর দাশগুপ্ত, সহায়রাম দাস, বনবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ প্রমুখ আরও কয়েকজন যুবক অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে সেই রাতে অরণ্যপথে অন্যদিকে এগিয়ে গেল। দুই প্রধান দলের দুর্ভাগ্য ক্রমেই বেড়ে চলল—পরস্পরের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দু'টি দল দুই বিপরীত মুখে এগিয়ে গেল।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানা, গ্রামের অবস্থান ও গ্রামাঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে কালী চক্রবর্তী-রই সবচেয়ে বেশি জানা ছিল। কালী চক্রবর্তী ১৮ই এপ্রিল যুব-বাহিনীর সঙ্গে শত্রুঘাটি আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। জালালাবাদে শত্রুর সঙ্গে সে শেষ-পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে; চাঁদপুরে আই, জি, পুলিশ মিঃ ক্রেগের পরিবর্তে ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীর হত্যার দায়ে স্বাক্ষরীকৃত দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আন্দামানে জেল ভোগ করেছে এবং এখন সে চট্টগ্রামেই (পূর্ব-পাকিস্তানে) আছে।

লোকনাথ তাদের দলে কালীকে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সেই রাতে রণকালন্ত বিপ্লবী সৈনিকেরা আর বেশিদূর এগোতে পারে নি। ভোর হবার আগেই তারা একটি নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিল। নিজেদের বহু কণ্ঠে টেনে-হিঁচড়ে সকলে পাহাড়ের ওপরে উঠল। পাহাড়ে উঠে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। যে

যেমন পেরেছে—কাত হয়ে চিৎ হয়ে পাহাড়ের বৃকে নিজেদের দেহ এলিয়ে দিয়েছে। সামরিক শৃঙ্খলা বা অত্যধিক আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহারার ব্যবস্থা প্রতীত কিছু করার মত মনের অবস্থা বা শারীরিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। প্রত্যেকে হাতে রিভলভার ও পাশে বন্দুক নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন সকাল আটটা। কারো কারো ঘুম ভেঙেছে। একজন অপরের দিকে মিটিমিটি চাইছে, হাই তুলছে, এক-আধটা গা মোড়ামুড়িও দিচ্ছে। ২২শে তারিখ রাতে কি যেন হয়ে গেল—কত সাথীকে চিরকালের মত বিদায় দিতে হল। আজ ২৩ তারিখে এখানে তাদের অর্ধেক অংশ। অন্যরা এখন কোথায়, তাদের কি হচ্ছে, আবার যুদ্ধ হয়েছে কি-না—এইসব নানা কথা ঘুম ভাঙার পর সকলের মনে ভিড় করে এল।

সকলেই প্রায় উঠে গেছে। এখন কুখা ও তুকার জুড়ালার সমাই অস্থির। কুখার এমনই তাঁর জুড়ালো যে, নারায়ণ সেন যুদ্ধের মধ্যে প্রলাপ বকেছে—আম, কাঠাল, পোলাও, মাংস ও বিভিন্ন মদ্যরোচক খাবার খাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। ছোটদের ভিতর যারা যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে রণধীর অন্যতম—পনেরো বছর বয়স, সবোচ্চ মাত্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। সদা-হাস্যমুখ, তার যেন কোন ক্রান্তি নেই, কুখা-তুকাও যেন নেই। অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান ধনী পরিবারের ছেলে। কবিরাজ জয়ন্ত দাশগুপ্তের অদূরে ছেলে। রণধীর। জ্যেষ্ঠত্বো দাদা ক্যাপ্টেন পি, কে, চৌধুরী (I.M.S.) ডাক্তার। একই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর দোনলা বন্দুক রণধীর বাড়ির অস্ত্রাগারে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। বাড়ি-ঘর তার কাছে অতি তুচ্ছ; মা-বাবার স্নেহ-ভাল-বাসা, মায়ার-মমতা, কিছুর আকর্ষণই রণধীরকে সেদিন ঘরে বসে রাখতে পারে নি। জালালাবাদ পাহাড়ে তার হাতের

বন্দুক শত্রুর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সজ্জা করে গেছে। এই নির্ভীক বালক তাদের দলের সকলের কাছে যেন আদর্শ স্থানীয়।

রণধীর সবার চাইতে ছোট হলেও তার দায়িত্ববোধ ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পেয়ে লোকনাথ মুগ্ধ হয়েছে। সকলেই যখন কুখা তুকার ব্যাকুল, তখন রণধীর এই কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য কালী চক্রবর্তীকে বলল—“পশ্চিমদা (কালী চক্রবর্তীকে সবাই পশ্চিমদা বলেই ডাকত) আমাদের শারীরিক শক্তি অটুট রাখতে হবে, তবেই আমরা যে-কোন অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হব। আপনি চেনে দেখুন, সবাই ক্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এখনই সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে-কোন উপায়েই হোক এই সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।”

কালী চক্রবর্তীও রণধীরের সঙ্গে একমত—কালীবল্লভ না কবে পেটপুজোর যত্নোবস্ত করা চাই। লোকনাথের কাছে প্রস্তাব করা হল, কাছপিঠে বাজার যা কোন দোকান যুঁজে পাওয়া চাই এবং খাদ্যবস্তু যা পাওয়া যায় তাই কিনে আনা হোক। এই প্রস্তাবের বৌদ্ধিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবে কথা হল, কে কিভাবে কোথায় যাবে?

লোকনাথ নিজেই কালীকে নিয়ে পাহাড়ের নিচে এল। পাহাড়ের গা বেঁবে একটি পায়ের-হাঁড়ি সরু গ্রাম্য পথ চলে গেছে। এই পথের ধারে গাছের নিচে তারা যে-কোন একজন পাখিকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কি এ পথে আসা-যাওয়া করে না? নির্জন পথ। বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই। তবু তারা নিরুপায় হয়ে কোন একজন পাখিকের সম্মানে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। তেমন কোন আগন্তুকের সাহায্য নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে একজন

পাখিককে তাদের দিকেই আসতে দেখা গেল। লোকনাথ ও কালী সেই পাখিকের দৃষ্টির অগোচরে একটি গাছের আড়ালে সতে দাঁড়াল। পাখিক আপন মনে চলেছে। সে লোকনাথদের সামনে এসে পড়তেই গাছের পেছন থেকে কালী ও লোকনাথ হঠাৎ রিভলভার হাতে তার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। পাখিকের বুক লক্ষ্য করে রিভলভার দু'টি ধরা দেখে স্বভাবতই সে হতবাক্য ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে— এই বুকি মর্ছা যার।

লোকনাথ পাখিককে অভয় দিয়ে নম্র ভাবে বলল—ভাই, তোমার ভয় নেই। তোমার কোন অনিচ্ছাই আমরা করব না। বিপদে পড়ে আমরা তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি আমাদের সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে চল, তোমাকে সব বলছি। ভাই, আমাদের অনেক সাহায্য করতে হবে তোমার। চল, আমাদের প্রয়োজনের কথা তোমাকে সব বলব। আগন্তুক লোকনাথের কথা শুনে আশ্বস্ত হল। কিন্তু সে পাহাড়ের ওপর উঠতে চাইছিল না। তবু সে যখন বুঝল যে তার এই আপত্তি টিকবে না, তখন আর কথা বাস্তব্য না করে সে লোকনাথের সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে এল। পাহাড়ের ওপরে আরও প্রায় আঠারো-বিশজনকে বন্দুক, রিভলভার হাতে ও থাকী পোষাকে দেখে পাখিক লজ্জাই বুঝল এরা কারা। সকলেই তার মধ্যে মিষ্টি ব্যবহার করেছে। এদের সম্পর্কে এসে পাখিক বুঝেছে এরা স্বদেশী—ইংরেজ এদের শত্রু, দেশবাসী এদের ভাই।

ক্রমেই পাখিকের ভয় কেটে গেল। অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে সে লোকনাথকে জিজ্ঞেস করল—“আপনি তো আমাকে বলছেন না আমরা কি করতে হবে? আমি নেহাই সাধারণ লোক, আমাকে দিয়ে আপনাদের কি উপকার হবে? বলুন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?”

লোকনাথ—“দেখুন, আমরা এই এলাকা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। রাজার বা খাবারের দোকান কোথায় পাওরা যাবে তার নির্দেশ আপনাকে দিতে হবে। তা হাড়া আমাদের সবার থাকী পোষাক। এই পোষাকে আমাদের কারো লোকালয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তাই ভাই যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার লুপ্তি, টুপী ও কামিজটি আমাদের কারও থাকী পোষাকের সঙ্গে বদল করতে হবে। সাধারণ মুসলমানের বেশে যদি আমাদের কেউ বাজারে যায় তবেই লোকে তাকে দন্দে করবে না এবং আমাদের অস্তিত্বের খবরও পাবে না। তা হাড়া? আপনাকে ভাই রাত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে

অনুরোধ করছি। আপনিই এই অঞ্চলের পথ-ঘাট দেখিয়ে আমাদের নিরাপদ স্থানে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন.....”

মুসলমান পাখিক বিপ্লবীদের সবার ব্যবহার দেখে বুঝেছিল যে, তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জাতি ভেদাভেদ ছিল না—কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাদের স্পর্শ করে নি। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব জন্মে গেল। পাখিক বন্ধু মানন্দে লোকনাথের প্রস্তাব মেনে নিল। সে কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তার পোষাক বদল করল।

কালী মুসলমান বেশে পাখিকের নির্দেশ অনুযায়ী নিকটস্থ এক বাজার হতে চিড়ে, গুড়, কলা, প্রভৃতি নিয়ে এল। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে। পাখিক বন্ধু ও তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়ার তানন্দ উপভোগ করেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মিলে স্থির করল যে, সন্ধ্যার পর, একটু অন্ধকার হলেই, তারা এই পাহাড় পরিত্যাগ করবে। পাখিকের কাছে লোকনাথ জেনে নিল, সমুদ্রতীরে কাটলি গ্রামের মাইল তিন চারের মধ্যেই বর্তমানে তারা অবস্থান করছে। এই কাটলি গ্রামের ধনী জমিদার ও কপ্তারীর প্রাণহরি দাসের কথা হঠাৎ লোকনাথের মনে পড়ল। তাইই ছেলে সুরেন দাস চাকরি ছেড়ে ১৯২১-২৩ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এর পর থেকেই তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।

সেই দিনকার কংগ্রেসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন খতম করার জন্য সুরেন দাস সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস পথ সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের মতের অমিল ছিল। অহিংসার পথ Policy হিসেবে মানায় যদিও পেরেছি—কিন্তু গান্ধীজীর আদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস ধর্মকে Greed হিসেবে মানা অর্থোক্তিক ও অবাস্তব (Utopian) বলেই আমরা মনে করেছি। আমাদের বাস্তব যদিও বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে “অহিংস নীতি” যে খাটে না, তা ১৯২১-২২, ১৯৩০ ও ১৯৪২ সালে বাস্তব সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে—জনগণের সংগ্রাম কখনও অহিংস থাকতে পারে না। তাই আমাদের “হিংসার” বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে সুরেন দাসের সঙ্গে অমিল থাকলেও, তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান অক্লান্ত কর্মী ছিলেন বলেই লোকনাথের সঙ্গে তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত মিল ছিল। সুরেন দাস সঙ্গীতবদ ছিলেন। তার মধ্যে “বন্দে মাতরম” গান চটলাল লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সুর ও সঙ্গীতের ডুব পোকতেন। লোকনাথের

সঙ্গীতচর্চার দিকেও সামান্য ঝোঁক ছিল। এই বিশেষ গুণের অধিকারী লোকনাথ সুরসাধক মুরেন দাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনিও লোকনাথকে সঙ্গীতে আগ্রহশীল দেখে খুবই স্নেহ করতেন। সুরেন দাস তার ঐকান্তিক চেষ্টায় “আবঙ্গীত মিউজিক এ্যাসোসিয়েশন” স্থাপন করেন। তিনি চট্টগ্রামবাসীর অতি প্রিয় ও আপনাত্মক ছিলেন। লোকনাথ নিজেদের এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছিল যে, প্রাণহরি দাসের বাড়িতে তারা নিশ্চয়ই উপেক্ষিত হবে না।

প্রাণহরিবাবুর বাড়ি থেকে জালা-কাপড় ও টাকা-পয়সার সাহায্য গ্রহণ করার কথা লোকনাথ ভেবেছিল। তাই সে পাখিক-বন্ধুকে অনুরোধ জানাল তাদের প্রাণহরি দাসের বাড়ি নিয়ে যেতে। রাত প্রায় দশটা—এগারোটার সময় পাখিক-বন্ধুর পরিচালিত পথে সদলবলে লোকনাথেরা প্রাণহরি দাসের বাড়িতে উপস্থিত হয়। সুরেন দাস তখন বাড়ি ছিলেন না। দীন, জীর্ণ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সামরিক থাকী পোষাকে বিশ-বাইশজন যুবককে বন্দুক হাতে বাড়ির কম্পাউন্ডে প্রবেশ করতে দেখে বাড়ির লোকেরা বিস্মিত ও নিদারুণ শঙ্কিত হল। লোকনাথ এগিয়ে গিয়ে পবিচয় দিল। লোকনাথকে অনেকই চেনে। একি চটলাল শীর যুবক সৈনিকেরা আজ তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে পদার্পণ করেছে। এ যে তাদের পরম-সৌভাগ্যের কথা, গর্বের কথা। বাড়ির সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অভিনন্দন জানাল। বিজ্ঞবী বিদ্রোহী সৈনিকদের সাদরে বরণ করে ঘরে আনল।

সেই রাতে প্রাণহরি দাসের বাড়ির লোকে যা পেরেছে তাই রক্ষা করে ওই অসময়ে স্বতঃস্ফূর্ত সন্তব বিপ্লবীদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। তাদের সবার জন্য জালা-কাপড় এবং নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পথের খরচা বাবদ লোকনাথ বা টাকা চাইল। জও বিনা বিধায় দিল। তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের গভীরতা বিপ্লবী তরুণেরা উপলব্ধি করেছেন—এই নিঃস্বার্থ আতিথ্যের পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ে। ক্ষণিকের এই অমূল্য স্মৃতি বহন করে বিপ্লবীরা সেই বাড়ি থেকে বিদায় নিল। ক্ষণিকের দেখা এই বিপ্লবী অতিথি দলের সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। কতটুকুই বা তাদের সান্নিধ্যে এসেছে। শুধু বিদায়ের সময় বাড়ির সকলের চোখ জলে ভরে গেল। কেউ ভাবাবেগ সামলাতে পারল না। বৃষ্টি ও বৃষ্টির আশীর্বাদ জানাল—“ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। দীর্ঘজীবী হও। জয়ী হও।” তাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে লোকনাথেরা আবার সদলবলে সমুদ্র

উপকূল ধরে বিভিন্ন গ্রামের পথ অভিক্রম করে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একস্থানে একটু বসে পরস্পর আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিল—যাদের নিরাপদ স্থানে যাবার সুযোগ আছে তারা দুর্ভাগ্যজন করে এক একটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সেই স্থানে চলে যাবে। এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে ছোট ছোট বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হল। লোকনাথ প্রত্যেকটি গ্রুপকে প্রয়োজন অনুযায়ী পথের খরচা দিল। পথিক-বন্ধুর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব শহরে পৌঁছবার পথ ও পথের খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে গ্রুপগুলি একে একে বিদ্যার নিল।

লোকনাথের গ্রুপে রইল—রজত, মনো-রঞ্জন, দেব, স্বদেশ, সুবোধ ও ফণী। পথিক-বন্ধুকে তারা ডখনও ছেড়ে দিতে পারে নি। লোকনাথ বহুবার তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে থেকে পথ-নির্দেশ দিতে তাকে বারে বারে অনুরোধ করেছে। এতে পথিক কখনও অমত করে নি বা একটুও বিরক্তির ভাব দেখায় নি।

এখন সমস্যা লোকনাথ তার ছ'জন সাথীকে সঙ্গে করে কোথায় যাবে? গ্রামাঞ্চলের সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সাময়িক নিরাপদ আশ্রয় তাদের একান্ত প্রয়োজন। রজত সেনের বাড়ি কোরেপাড়া গ্রামে। তার মা ও বাবা শহরের বাড়িতে থাকেন। গ্রামের বাড়িটি অন্যান্য আশ্রয়ীদের তত্ত্বাবধানে আছে। রজত প্রস্তাব করে, সকলকে তাদের গ্রামের বাড়িতেই সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে। সবাই এই প্রস্তাবে এক মত।

পথিক-বন্ধুকে এবারে লোকনাথ অনুরোধ জানাল, সে যেন কোরেপাড়া যাবার জন্য তাদের একটা নৌকার ব্যবস্থা করে দেয় এবং কিভাবে বা কোন পথে নিরাপদে কোরেপাড়া যাওয়া যাবে তার একটি বিশদ নির্দেশও যেন দেয়। “বন্দী” পথিক-বন্ধু এবার খুব সন্তোষের সঙ্গে লোকনাথকে বলল—“দেখুন, নদী-তীরে খালি নৌকা পড়ে আছে। এ একটার মধ্যেই আপনারা আশ্রয় নিল। এত রাতে আপনাদের সাতজনকে একসঙ্গে যদি কেউ দেখে, তবে তার মনে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। আব যদি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহলে বৃষ্টিতেই পারছেন বিপদের সীমা থাকবে না। কাজেই একটা খালি নৌকোতেই লুকিয়ে থাকুন। আমাকে যেতে দিন; আমি ইতিমধ্যে আমার মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। কারণ, মামা আমার চাইতে অনেক ভালোভাবে নৌকোর ব্যবস্থা করতে ও

আপনাদের কোরেপাড়ার পথের নির্দেশ দিতে পারবেন। মামাকে বললে তিনি আমার অনুরোধ অবহেলা করতে পারবেন না। আমি গেলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।”

পথিকের নির্দেশমত তারা সাতজন একটা পরিত্যক্ত খালি নৌকার মধ্যে লুকিয়ে রইল। কিন্তু “বন্দী পথিককে” তারা কোন ভরসায় ছেড়ে দেবে? পিস্তল দেখিয়ে পথিককে বন্দী করেছে; সে জাতিতে মুসলমান—তার পরিবেশ বঙ্গ খাকী পোষাকের পরিবর্তে বেশ পরি-বর্তনের জন্য তারা নিয়েছে; সকাল থেকেই পথিককে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। কিন্তু এত সবের পরেও তার মনোভাব বা ব্যবহারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। এবং লোক-নাথেরাও তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। তবে, সে জাতি মুসলমান এবং এতক্ষণ খুব বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে থাকলেও সে যে তাদের বন্দী—এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করা যায় না। এমন অবস্থায় তার প্রস্তাব—সে গিয়ে মামাকে নিয়ে আসবে এবং মামাই সব ব্যবস্থা করে দেবে—এ কি মেনে নেওয়া সম্ভব? সাধারণত এইরূপ ক্ষেত্রে মুসলমান পথিক-বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে মামাকে আনতে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

আমার মনে হয়, যার কাছ থেকে এত সাহায্য পেয়েছে, যে এত দীর্ঘ সময় বিপদ সাধার নিয়েও তাদের সঙ্গে আছে—

সেই বন্ধুকেও যদি বড়বঙ্গমূলক কাজে অবিশ্বাস করা হয়, তাতে কোন অন্যাস হত না। কিন্তু লোকনাথ এক বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিল। বিপদ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও লোকনাথ পথিক-বন্ধুকে তার মামার কাছে যাবার অনুমতি দিল—“ভাই তুমি মজ; তুমি ভাই যাও, কিন্তু যত শীঘ্র পার ফিরে এস। আমরা এখানে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।”

এ কি? আমাকে হিন্দু ঘৃণকেরা এত-খানি বিশ্বাস করছে? আমি তো তাদের ধরিয়েও দিতে পারি? এতখানি তাদের বিশ্বাস আমার ওপর—এত আস্থা?—পথিক-বন্ধুর অন্তর বিগলিত হল। লোক-নাথ এই ঘটনার বিবরণ দেবার সময় আমাকে বলেছিল—“পথিকের দুই চোখে প্রাণ ও ভালবাসার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। সে বর্তমানে মুক্ত—একেবারে মুক্ত; কিন্তু লোকনাথের বন্ধুত্বের সুস্মর গ্রন্থিতে সে যে এখন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ” মামার খোঁজে ও মামাকে নিয়ে আসতে সে চলে গেল।

লোকনাথ ক্ষণিকের এই বন্ধুকে বিশ্বাস করেই মুক্তি দিয়েছে। এখন সে ইচ্ছে করলেই শত্রুতা করতে পারে। মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই। কখন কি ঘটবে—এই আশঙ্কায় তারা সাতজন সর্ব-ক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সে জ্বলে হঠাৎ কি ঘটবে? সশস্ত্রচিহ্নে অনিশ্চয়-তার মধ্যে নিদারণ উৎকণ্ঠার তায় প্রতীক্ষার সময় কাটাতে লাগল। বন্ধু

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

॥ প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রিত ॥

[রেক্সিন ও বোর্ড বাঁধা মনোরম সংস্করণ]

প্রথম খণ্ড	...	...	১৬.০০
দ্বিতীয় খণ্ড	...	...	১০.০০
তৃতীয় খণ্ড	...	...	১০.০০
চতুর্থ খণ্ড	...	...	৮.০০
পঞ্চম খণ্ড	...	...	৮.০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা-১২

বিশ্বাসঘাতকতা করলে যে-কোন সময়ে তাদের পুলিশের অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। তবু উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত তাদের দেখতেই হবে। দুর্দাট ঘণ্টা অতিবাহিত হল, তবু বন্ধু ফিরে এল না। শত্রুতা না করলেও সাহস তো হারাতে পারে। অবশেষে তাদের নানা চিন্তার সমাধান করে বন্ধু তার মামাকে নিয়ে ফিরে এল।

পূর্ব। এইরূপ আদর্শ চরিত্রের ইতিহাস পৃথিবীতে খুবই বিরল। স্বদেশ-প্রেম, বন্ধুত্ব ও মানবতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে নিশ্চয় সমৃদ্ধিশালী করেছে। ধন্য কণিকের বন্ধু। ধন্য তুমি বিপদের সাথী। তোমার দেশভক্তি, তোমার মহত্ব, তোমার নিষ্ঠা ও মানবতার ধর্মকে প্রণাম জানাই।

পাথক-বন্ধু ও তার মামা লোকনাথদের কোরেপাড়া ঘাবার সব ব্যবস্থা করে দিল। মামা-ভাণে নৌকো করে তাদের সঙ্গে নদীর ওপর পর্যন্ত গেল। লোকনাথেরা বন্ধুর কাছে বিদায় নিল। মৃদুসলমান তারা—কণিকের বন্ধু। আর কখনও হয়ত পরস্পরের দেখাও হবে না। তবু কেন এত মমতা? কেন তারা বন্ধু-বিচ্ছেদের গভীর বেদনা অনুভব করছে? যুগ যুগ একত্রে বসবাস করেও হয়ত প্রকৃত বন্ধুত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, আবার কখনও কণিকের সান্নিধ্যও মনে হয় যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে পরস্পর অতি আপন অতি নিকটতম বন্ধু।

চট্টগ্রামের ডবলমুড়ি জেটির দুই মাইল পশ্চিমে, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, রাত দুটোর সময় এই ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ এই ঘটনার স্মৃতি উল্লেখ্য-চরিত্রের জন্য বেঁচে আছে কেবল সুবোধ চৌধুরী। আর সেই অনামী কণিকের বন্ধু ও তার মামা যদি বেঁচে থাকে তবে তারাও এই ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারবে। ১৯৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল, লোকনাথের জীবিতকালে, আমি হিন্দুস্থান ট্যাগার্ডে ধারাবাহিকভাবে “Chitta-

gong Heroes Fight for Freedom” শিরোনামায় যে লেখা পরিবেশন করেছি, তাতে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি।

ভোরের আলো দেখা দেবার আগেই লোকনাথেরা সাতজন রক্তের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিল। রক্তের মা-বাবা শহরেই থাকতেন—কালোভদ্রে কখনও হয়ত গ্রামের বাড়িতে যেতেন। কাজেই এই খবর তাঁরা কিছুই জানলেন না। আবার আমরাও যে ওদিকে এপ্রিলের ২০-২১ তারিখে রক্তের শহরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম এবং তারই বাবা-মার সাহায্যে পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করে রক্ষা পেয়েছি—এ কথাও রক্তের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। রক্ততদের দেশের বাড়ি তাদের আশ্রয়ের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। কারণ, পুলিশ যখন রক্তের পোঁছে তাদের শহরের বাড়িতে অনুসন্ধান করেছে, তখন গ্রামের বাড়ি বাদ দেবে ভাবটা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু যাই হোক না কেন, উপস্থিত এই গ্রামের বাড়িতেই তারা সাময়িকভাবে আশ্রয় নেবে বলে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। রক্ততদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর বিভিন্ন সূত্রে চেষ্টা করে দু’দিনের মধ্যেই বিনয়দার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হল।

বিনয়দা তাদের সাতজনকেই নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বিনয়দার বাড়ির সকলেই আমাদের সমর্থক। কাজেই এখানে আশ্রয়গোপন করে থাকার সুবিধে ছিল। কিন্তু সমস্যা হল লোকনাথ। সে চট্টগ্রামের একান্ত পরিচিত। কাজেই তার পক্ষে নিরাপদে আশ্রয়গোপন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া তার দেহাকর্তা, গৌরবর্ণ মুখশ্রী, সব মিলিয়ে মনে হোত সে যেন সূভাষচন্দ্রেরই ছোট ভাই। তেমন অসাধারণ চেহারার লোক সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোকনাথের উপস্থিতিতে অন্যান্য ছয়জন সাথীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে দেখে বিনয়দা লোকনাথকে অন্য স্থানান্তারিত করার আশ্রয় প্রয়োজন মনে করলেন। আমাদের পার্টির একজন খুব বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল যুবক সৈনিকের (জালালাবাদে একসঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে) সঙ্গে লোকনাথকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন বিনয়দা।

ভোর হবার আগেই লোকনাথকে নিয়ে সেই বীর সৈনিক তার নিজ বাড়িতে গেল। আমাদের দলের গোপন অংশের সভ্য বলে যুব-বাহিনীর এই দায়িত্বশীল সদস্যকে গ্রামের সকলের পক্ষে চেনা বা জানা সম্ভব ছিল না।

লোকাদাকে সঙ্গে নিয়ে যুবক-সাথী নিজ বাড়িতে প্রবেশ করল। নিচের তলায় একটা ঘরে লোকনাথকে বাসিয়ে সে ওপরে

বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বলতে গেল। এই যুবক-সাথী নির্মল লাল, পুলিন, টেগরা, রণধীর ও সুবোধ রায়দের মত অসম্পর্কক বাঙ্গালক নয়। সে কুতী ছাত্র—বি-এ, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। তার জ্ঞান, বিদ্যাভিক্ষা ও বিচক্ষণতার অভাব ছিল না। এইরূপ যুবকের দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর না করলে আর কার ওপর লোকনাথের নিরাপত্তার ভার দেওয়া যায়? বিনয়দা অগাধ বিশ্বাস নিয়ে যুদ্ধ-ফেরৎ এই সাহসী যুবক-সৈনিককে লোকনাথের নিরাপদ আশ্রয়ের দায়িত্ব নিতে নির্বাচিত করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেই যুবক-সাথী নিজে থেকে এই দায়িত্ব না নিলে তাব ওপর জোর করে এই ভার চাপিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গ্রামের রাস্তাঘাট ও দলের বিভিন্ন কর্মীদের ঠিকানা তার জানা ছিল। এই যুবক-সাথীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই লোকনাথ তাদের বাড়িতে এসেছে। সে লোকনাথকে নিচের একটা ঘরে বাসিয়ে রেখে গেলেও এখানে তার আশঙ্কা বা উৎকণ্ঠার কোন কথাই ওঠে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল, লোকনাথ একা বসেই আছে, সাথীদের দেখা নেই। নিচের তলায় কতক্ষণ আর বসে থাকি যায়? কত লোক আসতে পারে, ভোর হয়ে গেছে—হাতমুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করা, সবই তো প্রয়োজন। তা ছাড়া হল কি? সে তো একবার এসে বাড়ির সকলের অবস্থা ও তাদের প্রতিভিক্ষা সম্বন্ধে লোকনাথকে জানাবে? লোকনাথ তার সঙ্গে সব বিষয়ে পবামর্শ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরেও যখন যুবক-সাথীটি এল না, তখন লোকনাথ অস্থির হয়ে নিচে থেকেই তার নাম ধরে বাবে বাবু ডাকতে লাগল। কোন উত্তর নেই। হল কি? লোকনাথ অবাক! সে আরো জোরে চিৎকার করে ডাক দিল।

এমন সময় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মনে হল সিঁড়ি দিয়ে কে যেন নামছে। কিন্তু এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল—সে নয়, আর কেউ হবে। এই পদধ্বনি বাড়ির অপর কোন লোকের। তাই ঠিক-বিপ্লবী সাথী নিজে এলেন না, এলেন—মামাবাবু।

লোকনাথকে এই মামাবাবু হয়ত বহুবার বিভিন্ন সভায় বা শক্তি ও দ্বিগ্ন প্রদর্শনীর সময় ময়দানে দেখেছেন। কাজেই লোকনাথকে চেনা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের যুবক-সাথীর মামা হলও, তিনি নিজের পরিচয় দেবার আগে লোকনাথ তাঁর সঠিক পরিচয় জানতে পারে নি।

কিশ্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ২৫ টাকা কিশ্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারটি ছোট সাইজের অভয়ঙ্গর প্রাস্টিক ক্যাবিনেটে ফিট করা। মূল্য ১৬৫ টাকা মাত্র। ২ বৎসরের জন্য গ্যারান্টি প্রদত্ত। আবেদন করুন:

Tokyo Television Co.,
(W. B. C.)

Post Box 1307, Delhi-6

আশ্চর্য মানব চরিত্র। মামাবাবু নিম্ন পরিচয় দিয়ে লোকনাথকে সমস্মরণে বললেন—“দেখুন, আমরা বিপদে যেতে সাহস করি না। আমরা সাধারণ গেরস্ত লোক—নির্বাক্ষাটে থাকতে চাই। আপনি তো বুদ্ধভেই পারছেন পুঁলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আপনি কোন কারণে যদি এখানে ধরা পড়েন তবে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। তাই আপনাকে আমাদের সর্বনয়র অনুরোধ—আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন না।.....এখন তবে আপনি আসুন।”

লোকনাথ এইরূপ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কি আর হবে। লোকনাথ তখন মামাবাবুকে অনু-রোধ করল অস্তিত তার ভাঙ্গেন যেন এক-বার তার সঙ্গে দেখা করে। মামাবাবু গম্ভীরকণ্ঠে জানালেন—“না, তার সঙ্গেও—আপনার আর দেখা হবে না। রিভলভারটি নিন।” এই বলে মামাবাবু তার ভাঙ্গনের রিভলভারটি লোকনাথকে ফিরিয়ে দিলেন।

লোকনাথ বৃদ্ধল, বিপ্লবীসাধী তার সঙ্গে আর দেখা করবে না এবং তাকে এই বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে। কিন্তু দিনের আলোতে পরিচিত গ্রামে ঘরের বাইরে আসা লোকনাথের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উপাযান্তর নেই দেখে মরিয়া হয়ে লোকনাথ দুত্ভার সঙ্গে কঠোরকণ্ঠে বলল—“দেখুন, আমি জোর করে এখানে থাকব না, আমি নিশ্চয়ই চলে যাব। কিন্তু রাতের অন্ধকারের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। কাজেই, সন্ধ্যার পর পর্বন্ত আপনাদের বাড়িতেই আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।”

মামাবাবু লোকনাথের এই প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলেন না। রাত আটটা পর্বন্ত লোকনাথ সেই বাড়ির নিচেবতলার সেই ঘরেই ছিল। মদুপরের খাওয়া থেকে সে অবশ্য বাঞ্ছিত হয় নি। কিন্তু সেই বীর বিপ্লবী সাধীর সঙ্গে লোকনাথের আর দেখা হল না। রাত আটটায় লোকনাথ সেই বাড়ি থেকে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল। অগত্যা নির্মলদার মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে লোকনাথ রওনা হল।

বিচিত্র মানুষের মনস্তত্ত্ব! যে কয়েক-দিন আগেও একসঙ্গে জালালাবাদ পাহাড়ে লোকনাথের কন্ঠাঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তার কি করে এই আশ্চর্য পরিবর্তন হল? বিপ্লবী দলে যোগ দেবার সময় কত প্রতিজ্ঞা—“আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা শুধু জাতি জন্মভূমি স্বর্গাদিগ গবায়সী।” এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার কি করে এত পরিবর্তন দেখা

দিল? মায়ের আঁচল, বাড়ির বন্ধন, মামার স্নেহ-শাসন কি করে তার বিপ্লবী নিষ্ঠাকে স্তান করে দিল!

এই তথ্য, গবেষণা করে ভাবীকালের বিপ্লবীদের বুদ্ধিতে হবে। জালালাবাদের যুদ্ধ-চারিদিকে রক্ত আর রক্ত! সাধীরা গুলীবিষ্ম অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণায় কাউরাচ্ছে। সেই মৃত্যু-বিভীষিকার বাস্তব-তাকে হৃদয়ঙ্গম করে যদি Subjective mind তৈরি না হয় তবে, তখন বিপ্লবী-দেরও এই পরিণতি হতে বাধ্য। বিপ্লবের কথা মনে আঙড়ানো আর রক্তাক্ত বিপ্লবের

সম্মুখীন হওয়া—এই দুয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও এইরূপ চবিত্তের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিপ্লবে ইতি-হাস কেবল সাহস ও আত্মত্যাগের পীঠ-স্থান নয়—ভীরুতা ও কাপুরুষতা সংগঠনকে কতখানি দুর্বল করে, তাও এই ইতিহাসের একটি শিক্ষণীয় ও গবেষণার বিশেষ অধ্যায়।

[চম্পা]

জবপ্রিয়তার পুরোভাগে বঙ্গমতীর চিরসমাহত গ্রন্থরাজি

DAVID HARE—Peary Chand Mitra

॥ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনাবদে। অনবদ্য ইংরেজিতে

লেখা ॥ মূল্য : ৪-০০

ANANDAMATH—Sri Aurobinda

॥ মহাভাগবতীঅরবিদ্য কর্তৃক ঋষি বক্তিসচন্দ্রের আনন্দমঠের ইংরেজী

অনুবাদ ॥ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৪-০০

কবিকঙ্কণ চন্দ্রী:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এই বইতে আছে মূলকাব্য, কবির জীবনী, কাব্য পরিচিতি, কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (বক্তিসচন্দ্র লিখিত) কাব্য সমালোচনা, অপ্রচলিত শব্দের অর্থ, বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী অধ্যাপক ডক্টর বিজিতকুমার দত্ত লিখিত অবুহৎ ভূমিকা। সূর্য রায় অঙ্কিত স্ফুট প্রচ্ছদপট। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৪-০০

ভারত প্রতিভা

মতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত।

(যুগপ্রবর্তক মনীষিগণের জীবনী ও প্রতিভা বিশ্লেষণ)

ঐশ্বরীরামকৃষ্ণদেব, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বৃন্দাবন কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ গুরুবংশি মহাপুরুষের অনবদ্য জীবন-আলেখ্য। বোর্ডে বাঁধা বৃহদায়তন গ্রন্থ। মূল্য : ৫-০০

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—দীনেন্দ্রকুমার রায়

(এ্যাবটের বিখ্যাত গ্রন্থ অবলম্বনে বিশ্বের দুর্ধ্বতম যোদ্ধার রোমান্সকর কাহিনী ও তৎকালীন যুরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের

আলেখ্য।) বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৫-০০

সায়ক কমলাকান্ত—বলাইদাস ভক্তিবিনোদ সাহিত্যরতন।

বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ২-৫০

গত্যাচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

প্রতাপাদিত্য—বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৩-০০

মহারাজ নন্দকুমার—বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৩-০০

ছত্রপতি শিবাজী—বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৩-০০

জালিয়াং ক্রাইড—বোর্ড বাঁধাই। মূল্য : ৩-০০

বিক্রমাদিত্য—(ভবেশ সজুমদার) ৩-০০

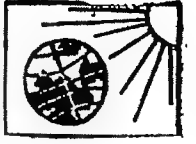
বিসমাক—সরোজনানন্দ ঘোষ ২-০০

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—আজ্ঞাজীবনী— ৩-০০

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিঃ, ১৬৬, বিপ্লববিহারী থাণ্ডলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

খাদ্য বনাম ক্ষুধা

১১ দ্বিতীয়

বাঁচতে গেলে জীবনসংগ্রাম অপরিহার্য। কিন্তু ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম করছি আমরা, তার ব্যক্তি আর তুলনা নেই। আজকের দিনে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত করা কি আদৌ সম্ভব?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে খাদ্যের কথা ভাবতে হয়। তাকাতো হয়, কোন বিশেষ দেশের দিকে নয়, সমগ্র পৃথিবীর খাদ্যব্যবস্থার দিকে। সোদিকে তাকালে আমরা দেখি, পৃথিবী আজ দুটো খাদ্য-শিবিরে বিভক্ত। শিবিরগুলোর একটিতে গোলাভরা খাদ্য, আর অপরটিতে টরি-সেলীয়ান ড্যাকুয়াম-এর অপারিসমী রিক্ততা।

গোলাভরা খাদ্য নিয়ে সুখে আছে পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ-গুলো। এরা হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এখানে বাস করে আর একশত কোটি লোক, যা পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। অপরদিকে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোকের বাসভূমি হল ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, পাকিস্তান, চীন, ভারত-স্বয়ং এবং প্রাচ্যে বিভিন্ন দেশ। এ দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষই দু'বেলা পেট পূরে খেতে পার না। অপটুর্জিনিত রোগে ভোগে ওয়া। প্রোটিন বা 'ক্যাট' যা ওয়া পায়, তা' দিয়ে দেহরূপ এজিনটা চালু রাখা যায় না। 'ক্যালরি'-র ভাগে হ্যামেশাই টান পড়ে ওদের; তাই বেঁচে থাকা সম্বন্ধে ওদের অধিকাংশই স্তব্ধ। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর চির সম্পর্ক আলাদা রকমের। চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছে ওরা; তাই ওদের জীবনীশক্তিও বাড়ছে দ্রুত তালে। 'ক্যালরি'-র চাহিদা মিটছে বলে ওদের দেহশক্তি সতেজ থাকছে। আর পটুর্জিন খাদ্যের দৌলতে ওরা হয়ে উঠছে সতেজ, বলিষ্ঠ ও জীবনসংগ্রামী।

কিন্তুদিন আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে সমগ্র পৃথিবীর কৃষিগোপযোগী জমির একটি হিসেব বেরিয়েছিল। তা' থেকে আমরা জানতে পারি, বর্তমান পৃথিবীতে মোট ৩৫০ কোটি একর কৃষিগোপযোগী জমি আছে। জাতিপুঞ্জ পরিষদের এই পরি-সংখ্যান সঠিক হলে বলতে হয়, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যে এখনও এক একরের চেয়ে বেশি জমি বরাদ্দ আছে।

কিন্তু মনে মনে রাখি, গড় বরাদ্দের কথাই এখানে বলা হয়েছে; আসলে যে পরিমাণ জমি আছে, সেকথা নয়। আসলে উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে জনপ্রতি আছে দেড় একরের চেয়েও বেশি জমি। আর অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের বেলান্ন আছে এক একরের চেয়ে কম।

এ ছাড়া অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশ-গুলোর জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় জলবায়ু সে সব দেশে প্রতিকূল। সেখানকার অধিবাসীরা জমিতে সার ব্যবহার করে যৎসামান্য এবং চাষাবাস করে মাথাভার আমলের অবৈজ্ঞানিক প্রথায়। কেন না আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চাষ করতে গেলে যে অর্থ, শিক্ষা ও দক্ষতার দরকার তার কোনটাই ওদের নেই। বরং ওদের আছে অন্য এক সমস্যা—ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ। এই চাপ ক্রমশ মারাত্মক হয়ে উঠছে এবং স্পষ্টই আমরা লক্ষ্য করছি, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক দ্রুতহারে বাড়ছে ওইসব দেশের লোকসংখ্যা। কিন্তু লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, খাদ্যের উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। অপরদিকে উন্নত দেশগুলোর অবস্থা ঠিক এর উল্টো। সেখানে লোকসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন অনেক বেশি হচ্ছে। কতটা বেশি হচ্ছে, সে তথ্যও আমরা জানতে পেরেছি। আমরা জেনোঁছ, মিত্তর মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালের তুলনায়, সেসব দেশে জনপ্রতি খাদ্যের উৎপাদন শতকরা ২৬ হারে বেড়েছে। কিন্তু আতঙ্কের কথা হল এই যে, জনপ্রতি খাদ্যের উৎপাদন শতকরা ৩ হারে কমে গেছে পৃথিবীর অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলোর। অতএব উন্নত দেশগুলোর

থেকে খাদ্য আমদানী করতে না পারলে ওদের অধিকাংশেরই আজ আর চলে না।

কিন্তু প্রশ্ন, এভাবে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে সমস্যার সমাধান করা কি সম্ভব? উত্তরে বলব,—না, সম্ভব নয়। এ থেকে সাময়িকভাবে হয়তো সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়িত্বাবে নয়। কেন না, ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলোকে ৭৫ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে। অর্থাৎ এই বছরে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আরও ৩০ কোটি টন বেশি খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে ওদের। কিন্তু এই খাদ্য-শস্য আসবে কোথেকে? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিশ্চয়ই নয়? কারণ, সমগ্র উন্নত আমেরিকা ও ইয়োরোপ মিলিয়ে বর্তমানে প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয় তার পরিমাণ হল ৭৫ কোটি টন।

অতএব এ সমস্যার সমাধান করতে হবে অন্য পথে। মনে রাখতে হবে, অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলোর খাদ্যে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া সমাধানের আর কোন পথ নেই। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আত্মনির্ভরশীলতা আসবে কেমন করে? এর উত্তরে সকলেই বলবেন, খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে নিশ্চয়ই।

এদিকে উৎপাদন বাড়ানোর দু'টি উপায়,—কৃষিগোপযোগী জমির পরিমাণ বাড়ানো, আর বাড়ানো একর প্রতি জমির ফলন। কৃষিগোপযোগী জমির পরিমাণ অধিকাংশ দেশেই সীমাবদ্ধ। অতএব অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলোকে ফলন বাড়ানোর দিকেই বেশি জোর দিতে হবে। অর্থাৎ, লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ে। তবে এই ব্যাপারে সকলের আগে দরকার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা। আত্মবিশ্বাস নিয়ে যদি কাজে নামা যায় এবং প্রচেষ্টা যদি হয় দৃঢ় ও সম্ভবমুখ, তবে সমস্যার অনেকখানি সমাধান অচিরেই হতে পারে। সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এরই মধ্যে আমরা পেরেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উন্নতিশীল ২৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১২টি রাষ্ট্রই খাদ্যোৎপাদনে উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই সব দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে বছরে ৪

কে. ১০ হারে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে গেলে উন্নয়ন ব্যবস্থা আরও অনেক দ্রুত হওয়া দরকার। কিন্তু তবু একথা ভুলে গেলে চলবে না, এই ১৫ বছরে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে যতটা উন্নতি ওরা করেছে, তা' ঠিক একই সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলোর উন্নতির তুলনায় কম নয় মোটেই, বরং বেশি। অর্থাৎ, আজকের সমৃদ্ধ দেশ-গুলো ওদের উন্নয়নপর্বের গোড়ার দিকে যে গতিতে এগোচ্ছিল, এই ১২টি রাষ্ট্র এগিয়েছে সে তুলনায় দ্রুতগতিতে। সমৃদ্ধ-কামী ও উন্নয়নশীল এই ১২টি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সুদান, মেক্সিকো, ফিলিপাইন, ট্যাঙ্গানাইকা, তুরস্ক, ইসরাইল, ভেনিজুয়েলা, থাইল্যান্ড ও ব্রাজিল।

উল্লিখিত দেশগুলোর অবস্থান, আয়-তন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, লোকসংখ্যা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে পূর্বপর্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কিন্তু একটি দিক দিয়ে ওদের মধ্যে অম্লভূত মিল। ওরা সকলেই অপবিসমীম আত্ম-বিশ্বাস ও অনন্য দৃঢ়তাকে সম্বল করে খাদ্যসমস্যার সমাধানে রতী হয়েছিল। ওদের কোনটি খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে পতিত জমিকে উৎসাহ করে; কোনটি আবার জোঁব দিচ্ছে একব প্রতি ফলন বাড়ানোর উপায়।

কার্যত দেখা গেছে, চাষবাস যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলে, যদি উপযুক্ত পরিমাণ সাব পায় জমি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়িয়ে বিধবাসী পোকা-মাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায় তবে জমির উৎপাদনশক্তি বাড়ে অতি তাড়াতাড়ি। কতক বছর আগে একদল মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গেছে, ১ টন রাসায়নিক সার যে পরিমাণ ফসল বাঁধ করতে পারে তা' হল ১০-৭ একর জমির উৎপাদনশক্তির সমান।

সাব ব্যবহারের দিক দিয়ে এখনও পৃথিবীর উন্নত ও অনন্নত দেশগুলোর কৃষিকার্যে আসমান-জমিন ফারাক। উদাহরণ হিসেবে ১৯৬০-৬১ সালের একটি পরিসংখ্যানের কথা ধরা যাক। ঐ সময়ে শব্দ-মাত্র উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপে ১৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছিল। অথচ ঠিক এই একই সময়ে পৃথিবীর অনন্নত দেশগুলোতে ব্যবহার করা হ'ল মাত্র ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন সাব। খাদ্যোৎপাদনের দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর সাফল্যেরমূলে কী আছে, এই পরিসংখ্যান থেকেই তার খানিকটা আঁচ করা যাবে। এদিকে কৃষিবিজ্ঞানীরা হামেশাই বলছেন, ১ পাউন্ড সার ব্যবহার করলে শস্যের পাইয়া যাবে তার ১০ গুণ,

অর্থাৎ ১০ পাউন্ড। অতএব দেখা যাচ্ছে, শব্দমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও পৃথিবীর অনন্নত ও অধোন্নত দেশ-গুলো খাদ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল, এই সার সংগ্রহ করতে গেলে যে সঞ্জতির প্রয়োজন, অনন্নত দেশগুলোর তা' আছে কি? এর উত্তরে সকলেই একবাক্যে বল-বেন,—না নেই; সঞ্জতি নেই অনন্নত দেশগুলোর; এবং নেই বলেই আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওদের অনেকে রাসায়নিক সার যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না।

এ উত্তরের সম্পূর্ণটা মেনে নিতে পারলে খুশি হতুম। কিন্তু তা' যে পারলুম না সেজ্ঞেয় আমাদের ভারতবর্ষের মত কয়েকটি দেশ দাবী। এই সব দেশের দিকে তাকালে দেখি, অভাবগ্রস্ত এরা ঠিকই; কিন্তু স্বভাবটাকেও এরা এখনও ঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন করে তুলতে পারে নি। ভারতবর্ষ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে সার আমদানীর ব্যবস্থা করছে; অথচ স্বদেশে সার উৎপাদনের প্রচুর সরঞ্জাম পড়ে আছে অকেজো অবস্থায়। অবশ্য অস্বীকার করব না, ভাবতবর্ষেরও এ ব্যাপারে বিদেশ থেকে কিছু সাহায্য নেবার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির। কিন্তু সাহায্য নেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, তা' যেন নিজের দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগধ করে। আর তা' যদি না হয়, যদি সার-আমদানীর আশায় চিরকাল বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, তবে খাদ্যের জন্যেও আমেরিকার দরজায় হতো দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু আমেরিকার ক্ষমতা কতটুকু? একটু আগেই বলছি, অবস্থা যদি এখনকার মত চলতে থাকে তবে ১৯৮০ সালে আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের সমগ্র খাদ্যকে একত্র কবলেও অনন্নত দেশগুলোর ক্ষুধা মিটবে না।

অতএব অপেক্ষার সময় নেই আর। সমস্যা এরই মধ্যে জট পাকিয়ে উঠেছে। এখন পৃথিবীর প্রতিটি উন্নয়নশীল জাতিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জন-সাধারণ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করতে পারে। যাতে শিশু, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায়। আব এ ব্যাপারে সকলের আগে নজর রাখা উচিত শিশুদের উপর। কারণ, 'প্রোটিন'-এর প্রয়োজন ওদের বেগাতেই সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ৪ বছর বয়সের মধ্যেই এসে

সম্পূর্ণ মস্তিস্কের শক্তক্বা ৯০ ভাগ গড়ে ওঠে। এ সময়ে 'প্রোটিন' খাদ্যের বিশেষ দরকার। যদি উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন শিশুরা না পায়, তবে ওদের মস্তিস্কও কোনমতেই সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা উল্লিখিত প্রোটিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংহত করে এ ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছেন। অনন্নত দেশগুলোর অপদৃষ্ট শিশুদের জন্যে এই 'প্রোটিন'-খাদ্যকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন ওরা। কিন্তু প্রশ্ন, অল্প বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে এই মহামূল্যবান 'প্রোটিন' গ্রহণের ক্ষমতা ভাবতবর্ষের ক'টি শিশুর আছে?

অতএব 'প্রোটিন'-খাদ্যের জন্যেও বিদেশের দিকে নয়, তাকাতে হবে স্বদেশের দিকেই। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস হবে ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রামের দায়িত্বটা নিজেরদে ঘাড়েই নিতে হবে। আর তা' যদি না পারি আমরা, যদি নিজেরদের রসদ নিজেরাই সংগ্রহ করতে না পারি, তবে ক্ষুধাপ পরাক্রান্ত শত্রুর কবল থেকে আগাদের জীর্ণ ও মৃদুর্ভদ্র দেহ-শিবিরগুলোকে আর ক'দিন রক্ষা করা সম্ভব হবে?

নতুন!

'ইকনমি স্ট্রাকচার'

টিনোপাল



তাছাড়া 'এক বালতির এক প্যাকেট' এবং 'রেগুলার প্যাক'

সর্বাধিক শুভতার জন্য টিনোপাল

মুখদ গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

১৯৬১/৬২

বিশ্বম্যাহিত্যের * প্রাদিপর্ষ

॥ ২৯ ॥

প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য :

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে চৈনিক সভ্যতা অন্যতম একথা ঐতিহাসিক-মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন, এবং সেই হিসাবে চৈনিক সাহিত্যের উৎপত্তি অতি প্রাচীন যুগেই হয়েছিল। চীনা কিংবদন্তী অনুসারে চৈনিক সাহিত্যের আদি প্রমুখ মহাত্মা কনফুসিস। কিন্তু চৈনিক সাহিত্য বাস্তবে কনফুসিস-র চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন, এবং কনফুসিস-পন্থীরা তাঁদের গুরুত্ব উপর সমস্ত প্রাচীন রচনার লেখককে আরোপ করেছেন, যেমন আমাদের দেশে হয়েছে বেদব্যাসের ক্ষেত্রে। অনুদ্রুপ-ভাবে চীনদেশে বারী “তাও” ধর্মের অনুসারী ছিলেন তাঁরা কনফুসিস-র পবিত্র-তাও-এ-কে চৈনিক সাহিত্যের আদি প্রবক্তা বলে মনে করেন। চৈনিক বৌদ্ধদের মধ্যেও নিজ সম্প্রদায়ের নির্দ্বন্দ্ব অনুদ্রুপ দাবি আছে।

কনফুসিস সাহিত্য :

কনফুসিস-পন্থীরা আদি চৈনিক সাহিত্যকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—দ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও অপরাপর রচনা। দ্রুপদী সাহিত্য বলতে পাঁচটি গ্রন্থকে বোঝায়। এই পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে সব-প্রাচীন হচ্ছে ই-কিং, যার অর্থ হল পবিত্রতন বা বিবর্তনের গ্রন্থ। কিংবদন্তী অনুযায়ী আদিতে মার্কি এই গ্রন্থটি হলদ-নদীর জলে ভেসে-গুটা কোন জীবের পৃষ্ঠদেশে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই গ্রন্থটি প্রথমে আঠারোটি ভাগে বিভক্ত ছিল, পরে আরও ছোটখাট অধ্যায় যোগ করা হয়। গ্রন্থটি নকল করে-ছিলেন পৌরাণিক সম্রাট ফু-সি, নকসা দিয়ে সম্বলিত করেছিলেন ওয়েন-ওয়াং, পরিশিষ্ট রচনা করেছিলেন চেন কিং এবং ভাষা রচনা করেছিলেন থোদ কনফুসিস।

দশটি অধ্যায়ে। গ্রন্থটির তারিখ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না তবে তা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত। দ্বিতীয় গ্রন্থটির সূ-কিং বা ঐতিহাসিক নাম। বইটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত—তাং, ইউ, যিয়া, সাং এবং চৌ, রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। তৃতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে সি-কিং অর্থাৎ ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। চতুর্থ রচনাকাল সাং বংশ থেকে চৌ বংশ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। চতুর্থ হচ্ছে প্রাচীন যুগের আচাৰ-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির সংকলন, বৈদিক গৃহ্যসং-গুলির মত; নাম লি-কিং, রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী। পঞ্চম গ্রন্থটি হচ্ছে প্রাচীন চীনের ইতিহাস, নাম চুন চিউ, রচনাকাল ৪৭৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মতো, যার লেখক কনফুসিস-র উপর আরোপিত হয়েছে। কনফুসিস দর্শন ও নীতিতত্ত্বকে অবলম্বন করে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বে চারখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। (১) লুন-ইউ-কনফুসিস শিষ্যবর্গ কর্তৃক তাঁর রচনাবলীর সংকলন; (২) তা-শু-চি-বি কর্তৃক সম্পাদিত জনৈক অজ্ঞাত লেখকের নীতিতত্ত্বমূলক রচনা; (৩) ফুং-চি এবং (৪) সেন-সি-গ্রন্থ দুটির নাম আসলে লেখকদেরই নাম, বিষয়বস্তু কনফুসিস ধর্ম-নীতিতত্ত্ব, শেষোক্ত গ্রন্থটি সাত খণ্ডে রচিত।

“তাও”-পন্থী সাহিত্য :

চীনদেশে “তাও” ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন লাওৎসে। কনফুসিস (৫৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং লাওৎসে (৬০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—৫০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রায় সমকালীন, কিন্তু প্রথমজন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বেখানে নীতি-শাস্ত্রমূলক, দ্বিতীয়জন প্রবর্তিত ধর্ম সেখানে অতীন্দ্রবাদী। “তাও” কথাটির সমতুল্য প্রতিশব্দ কোন ভাষায় নেই। “তাও” বিশ্বত নয়। ব্রহ্ম বলতে আমরা যা বুঝি

সেরকমও কিছু নয়; লাওৎসে-র মতে এই “তাও”-কে বোঝার চেষ্টা বিভ্রম, অথচ এই “তাও”-তেই নিজে-কে বিলীন করে দেওয়া মানুষের কতব্য, এবং তার জন্য কয়েকটি গৃহ্য পন্থা আছে যেগুলি আমাদের দেশের তন্ত্রসাধনার অনুদ্রুপ। লাওৎসে তাঁর মতামতসমূহ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার নাম তাও-তে-কিং। মৃত্যুর কিছুকাল আগে জনৈক শিষ্যের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। লাওৎসে প্রবর্তিত মতবাদ-সমূহের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন পরবর্তী কালের এক দার্শনিকগোষ্ঠী বাঁদের মধ্যে সব-প্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কোয়াং সে। ইনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের লোক ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন যথাক্রমে হান-ফেই-সে (২০০ খ্রিঃ পূঃ), হাই-নানের রাজকুমার লিউ-আন (১২২ খ্রিঃ পূঃ) এবং হু-মা-খিন (৮৫ খ্রিঃ পূঃ)। প্রকৃতিতে রহস্যবাদী হবার দ্রুপ “তাও”-ধর্মের চর্চা সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণে বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারে নি। এই কারণেই আমরা দেখি যে হান বংশের রাজত্বকালে কনফুসিস মতবাদই চৈনিক রাজসভার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বংশেরই রাজত্বকালে শেষ দিকে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয়। লাওৎসে এবং তাঁর অনুসারীদের সমগ্র রচনার ইংবাজী অনুবাদ করেছিলেন লেগী, তাওইস্ট টেক্সটস্ এই নাম দিয়ে। অনুসন্ধিসূ পঠক বইটি পড়লে ভারতীয় তন্ত্রসাধনার সঙ্গে “তাও”-পন্থীদের গৃহ্য ধর্মচর্চার কয়েকটি দিকের আশ্চর্যকর সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারবেন।

চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্য :

চৈনিক সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের অবদান সুবিশাল। খ্রিস্টীয় ৬৫ অব্দে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। কথিত আছে হান-বংশীয় রাজা মিং-তি স্বপ্নে একজন সোনালী মানুষকে দেখেন যিনি গৌতম

হুয়ান ছাড়া আর কেউ নন। সম্রাটের আদেশে তখন চতুর্দিকে দূত প্রেরিত হয়, এবং তাঁরা বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক ধর্মরত্ন এবং কশ্যপ মাতৃগকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করে। এঁরা হুয়ান বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এবং সম্রাট কর্তৃক নির্মিত “শ্বেত অম্ব সংঘারামে” তাঁরা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন গ্রন্থগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করে। এই সংঘারামটি কালক্রমে বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলন এবং গুণগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই মহাযা সো-কাও (লোকোত্তম) বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছিলেন খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। তৃতীয় শতকে সো-হুয়ান (সংঘভদ্র) নানকিং-এ একটি সংঘারাম স্থাপন করেছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র-সমূহের অনুবাদে তাঁরও যথেষ্ট অবদান আছে। ফা-হু (ধর্মরক্ষ) সংস্কৃত মহাযানী ধর্মগ্রন্থগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইনি ছাতিশ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনিও তৃতীয় শতকের লোক।

এই সকল পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকের চেষ্টার অচিরেই চীনে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মো-হুয়ান একটি গ্রন্থে কনফুসীয় এবং তাও ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন। এইভাবে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দেখার জন্য চৈনিক ভক্ত ও সাধকেরা অনেকেই আগ্রহশীল হন। ২৬০ খৃস্টাব্দে চু-সে-হিং প্রথম ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, অবশ্য ভারতে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। পশ্চিমমুখে খেটোনেই তাঁর দেহান্ত হয়। ৩৯৯ খৃস্টাব্দে ফা-হিয়ান পাঁচজনের একটি দল সমেত ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তিনি একাই শেষ পর্যন্ত ভারতে আসতে সক্ষম হন। ভারত সম্বন্ধে তিনি একটি বিশদ বিবরণী রচনা করে গেছেন, নাম কো-কু-কি। তাঁকে অনুসরণ করে ভারতে এসেছিলেন পাও-উন (৪০৪ খৃঃ), ফা-হুগ (৪২০ খৃঃ) এবং আরও অনেকে। তাৎ বংশের রাজত্বকালে বিখ্যাত হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন। তিনি যাত্রা করেছিলেন ৬২৯ খৃস্টাব্দে এবং ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি চীন দেশে ফিরে যান ৬৪৫ খৃস্টাব্দে। তাঁর বিখ্যাত ভারতবৃত্তান্তের চৈনিক নাম সি-ইউ-কি। এ ছাড়াও তিনি ৭৪টি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ভারত থেকে বহু গ্রন্থও চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আবও ৬০ জন চৈনিক পণ্ডিত ও ধর্মজ্ঞ ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

হুয়েন ই-সিং ৬৭০ খৃস্টাব্দে সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন। দশ বছর নালন্দায় বাস করার পর তিনি ৪০০ সংস্কৃত পান্ডুলিপি চীনে নিয়ে যান, এবং সেগুলি থেকে কয়েকটির অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আচরিত বৌদ্ধধর্মের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া যে ৬০ জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের সকলের জীবনীও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান।

ভারত থেকে যে সকল পণ্ডিত খৃস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে চীন দেশে গিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কুমারজীব, সংঘভূতি, গৌতম সংঘদেব, পুণ্যদ্রাভ, বিমলাক্ষ বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মবশ, গুণ-বর্মী ইত্যাদি, ষষ্ঠ শতকে জিনগুপ্ত, পরমার্থ, ধর্মগুপ্ত ও বোধিধর্ম; সপ্তম ও অষ্টম শতকে প্রভাকরমিত্র, বোধিরুচি, বজ্রবোধি, অমোঘবজ্র ইত্যাদি। সত্য বলতে কি এত ব্যাপক আকারে অনুবাদ প্রচেষ্টা কোন যুগে কোনকালে দেখা যায় নি। মহাযানী বৌদ্ধদের বিপুলায়তন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্বের কথা হয়ত আমরা জানতেই পারতাম না যদি না সেগুলির চৈনিক অনুবাদসমূহ থাকত। চীনা ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সর্বপ্রাচীন তালিকা খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল। ওই তালিকায় ২,২১০ গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। ওই শতকেই সম্রাটের আদেশে যে তালিকা রচিত হয়েছিল তাতে ৫,৪০০ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাৎ যুগে আরও একটি তালিকা প্রণীত হয়েছিল। কাঠের রকে গ্রন্থগুলি ছাপা হতে শুরুর করেছিল ৯৭২ খৃস্টাব্দ থেকেই।

ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও অপরূপ ভারতীয় গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ নবগ্রহ-সিদ্ধান্ত, এটি তাৎ যুগে রচিত হয়েছিল। ৪৫৫ খৃস্টাব্দে রচিত একটি চৈনিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলে পাণ্ডিতেরা মনে করেন। একাদশ শতকে রাবণকুমারচরিত নামক শিশু-চিকিৎসা বিষয়ক একটি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল খৃস্টীয় একাদশ শতকে। বলাই বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত চৈনিক গ্রন্থসমূহের শতকরা নিরানব্বই ভাগই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ।

নাটকঃ

চীনা নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিত-

দের মধ্যে মতভেদ আছে। চীনভাষে বিখ্যাত পণ্ডিত ডায়ার বল লিখেছেন যে চীনা নাটকের সবটাই বহিরাগত এবং তাৎ গড়ে উঠেছে গ্রীক নাটকের প্রভাবে। চীনা নাটকের বিবর্তনকে তিনটি বিশেষ যুগে ভাগ করা হয়—তাৎ বংশের যুগ (৭২০-৯০৬ খৃস্টাব্দ), সুং বংশের যুগ (৯৬০-১১২৬) এবং মঙ্গোল বংশের যুগ (১১২৬-১৩৬৭)। তাৎ বংশের যুগের কোন নাটক এখন পাওয়া যায় না, তবে কথিত আছে যে এই যুগে রচিত নাটকসমূহের বেশির ভাগই ছিল ঐতিহাসিক। সুং বংশের যুগে সকল নাটকেই ছন্দে রচিত হত, এবং কোন নাটকেই পাঁচ জনের বেশি অভিনেতা থাকত না।

প্রকৃতপক্ষে মঙ্গোল বংশের যুগই হচ্ছে চীনা নাটকের স্বর্ণযুগ। চৈনিক সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গাইলসের মতে এই যুগে রচিত নাটকগুলি প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের সকল চাহিদাকে পূরণ করে। এই যুগের মোট ৮৫ জন নাট্যকারের নাম পাওয়া গেছে বাঁদেব মধ্যে আবার চারজন মহিলা। প্রাপ্ত নাটকের সংখ্যা ৫৬৪টি এবং এগুলির মধ্যে ১০৫টির লেখকের নাম অজ্ঞাত। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বহু ও বিচিত্র—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি। ট্রাজেডি ও কমেডির কোন নির্দিষ্ট ধারা অবশ্য ছিল না। নাটকে সকল রকম চরিত্রই থাকত, এবং সংলাপের ভাষা হিসাবে চলিত ভাষাই ব্যবহৃত হত। সচবাচব নাটকগুলি চারটি অথবা পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত থাকত। তা ছাড়া প্রতিটি নাটকেরই কোন-না-কোন নৈতিক বক্তব্য থাকত। নাটকের প্রটে বিশেষ কোন জটিলতা থাকত না।

মঙ্গোল বংশের যুগে রচিত চৈনিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পি-পা-কি, বা বাঁশীর গল্প। নাটকটিতে মোট চরিত্রটি দৃশ্য আছে। পণ্ডিতদের মতে এই বিয়োগান্ত নাটকটি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে একাসনে স্থান পাবার যোগ্য। তবে চীন দেশে ঐতিহাসিক নাটকেরই চাহিদা ছিল বেশি। মঙ্গোল যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের নাম হানলৈ দত্ত। এই বিখ্যাত নাটকটির কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

নাটকটির পটভূমিকা খৃস্টীয় প্রথম শতকের চীন তখন দুর্বল ও তাড়ারদের প্রভাবাধীন। প্রথম দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে, তাড়ারদের খান (রাজা) ঘোষণা করছেন যে তিনি চীন সম্রাটের নিকট একজন রাজকুমারীকে বিবাহের জন্য দাবি করেছেন প্রচলিত শর্ত অনুযায়ী। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে, চীন সম্রাট তাঁর হারেমের জন্য একটি সুন্দরী মেয়ের

অনুসন্ধানের দায়িত্ব তাঁর মন্ত্রী উপর দিয়েছেন। মন্ত্রী একটি পরমাসন্দরী ময়ে খুঁজে বার করেছিল, কিন্তু সে উকোচ হিসাবে ওই মেয়ের বাবার কাছে যে অর্থ দাবি করেছিল তা সে দিতে অপারগ হওয়ায়, ওই মন্ত্রী সন্নাটের হারমে মেয়েটিকে এমন জায়গায় রেখে দেয় যাতে সে সন্নাটের দৃষ্টিপথে না পড়ে। এক ভাগ্যক্রমে সন্নাট একদিন সেই সন্দরীকে দেখে ফেলেন এবং উভয়ের মধ্যে সুনিবিড় প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে এই মন্ত্রীর উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু যে কোন গতিতে পালিয়ে গিয়ে তাতার রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে এবং ওই মেয়ের জীব দেখিয়ে তাতারের খানকে প্রদর্শন করে। প্রচলিত শত অনুযায়ী তাতারের খান চীন সন্নাটের নিকট ঐ মেয়েটিকেই দাবি করেন এবং সেই দাবি পালিত না হলে তিনি চীন আক্রমণ করবেন এই কথা ঘোষণা করেন। তাতাররা চীনাগের তুলনায় শক্তিশালী হবার দরুণ, চীন দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত মেয়েটিই প্রস্তাব করে যে তাকে তাতারদের খানের নিকট পাঠানো হোক এবং সভাসদদের পরামর্শে আনুজ্ঞাত সত্ত্বেও তাকে পাঠাতে বাধ্য হন। তাতারের খানের সামনে উপস্থিত হয়ে সেয়েটি জানার যে সে চীন সন্নাটকেই ভালবাসে এবং এই কথা ঘোষণা করে স্বজনসমক্ষেই সে বিবাহপাশে আবদ্ধ হয়। এই দৃশ্য দেখে তাতারদের খান ব্যথিত হন এবং দৃষ্ট পাঠিয়ে চীন সন্নাটের সঙ্গে চিরকালীন শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন। বিশ্বাসযাতক ওই মন্ত্রীটিকে চীনে ফেরৎ পাঠানো হয় এবং সেখানে তার প্রাণদণ্ড হয়। মোটের উপর নাটকীয় উপাদানের কোন অভাব নেই এখানে।

চীনা মণ্ড খুবই সরল ধরণের, কয়েকটি মণ্ড করা মাদুর দিয়েই দৃশ্যপট রচনা করা হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা খুব জম-কালো ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। বেশির ভাগা খিষেটারই ছিল ভ্রাম্যমাণ, তবে পিকিং ও আরও কয়েকটি শহরে পাকাপাকি মণ্ড ছিল। আরও একটি কথা জানাবার আছে। তিন দিনের কমে কোন নাটক শেষ হত না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে নাটকগুলি খুব দীর্ঘ। আসলে নাটকের এক-একটি অংশ এক-এক দিনে দেখানো হত এবং এটাই ছিল চীন দেশের প্রচলিত রীতি।

কবিতা:

অন্যান্য সকল দেশের মত চীন দেশের আদি কবিতাও লোকসঙ্গীতের পর্যায়ের

পড়ে। সেগুলির প্রথম সংকলন হয়েছিল চৌ রাজাদের আমলে, নাম ওয়াং হুয়েছিল সি-কিং। কনফুসি রচিত শ্লোকসমূহও কবিতার পর্যায়ের পড়ে। কিন্তু তাং রাজবংশের আমলেই চীনা কবিতার স্বর্ণ-যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগের কবিদের মধ্যে ষাঁর নাম সর্বপ্রথম করা উচিত তিনি হচ্ছেন ওয়াং-উই (৬৯৯-৭৫৮ খৃস্টাব্দ)। ইনি ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রকর, তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের পরম অনুগামী। তাঁর কবিপ্রকৃতি ছিল রোমান্টিক। পক্ষান্তরে ভিন্ন মেজাজের কবি ছিলেন লি-পো অথবা লি-তাই-পো (৭০৫-৬২ খৃস্টাব্দ) ষাঁর সমগ্র রচনায় একটি করুণ বিষাদের ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল। চীনা গীতিকবিতা লেখকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাধর, জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলেন অসীম, লোকে তাকে বলাত স্বর্গপ্রসূত দেবিশিশু; বেশির ভাগ সময়েই তিনি নৈশাগ্রস্ত থাকতেন এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর সৃষ্টি হয়। এরপর ষাঁর নাম করতে হয় ভিনি হচ্ছেন তু-কু। প্রাচীন চীনা সাহিত্যের ইনিই ছিলেন একমাত্র রিমালিস্ট কবি। এর জীবনকাল ৭১২ থেকে ৭৭৬ খৃস্টাব্দ। তাং যুগের শেষ প্রতিনিধিমূলক কবি ছিলেন পো-চিন-ই (৭৭২-৮৪৬ খৃস্টাব্দ)। ইনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তৎপ্রচিত কবিতাসমূহ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সু রাজবংশের যুগে অনেক কবিই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রচনা পূর্ববর্তী তাং যুগকে গুণগত দিক থেকে অতিক্রম করতে পারে নি। সু রাজবংশ ৯৬০ থেকে ১২৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে সু-মা-কুয়াং, ওন-ইয়াং-যিন এবং ওয়াং-মান-শি বিখ্যাত। শেযোজেন একই সঙ্গে কবি, প্রাবলিক ও দার্শনিক ছিলেন। ১২৮৬ থেকে ১৩৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চীন দেশ মঙ্গোলদের আধিকারে ছিল। ১৩৬৯ থেকে ১৬৪৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মিং বংশের রাজারা চীনে রাজত্ব করেছেন। এরা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মিং আমলে পূর্বতন কবিদের রচনাবলীর বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এরপর মাঙ্গু বংশের রাজারা চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মাঙ্গু আমলে কাব্যসাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি হয় নি, যদিও এই বংশের দু'জন সন্নাট কাং-শি এবং চিয়েন-সুং কবি ছিলেন।

অপরাপর রচনা:

চীন দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসচর্চার রীতি ছিল সেকথা বর্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে। সু-কিং নামক গ্রন্থের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কনফুসি রচিত চুন-চিউ তাঁর নিজ প্রদেশের ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থটির টীকা ওসো-চুয়ান খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সু-মা-চিউ সে-চি নামক গ্রন্থে ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন পরবর্তীকালের ইতিহাসিকদের নিকট তা আদর্শ হয়েছে। এই গ্রন্থটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—রাজবৃত্ত, কালানুক্রম, ষাঁতত্ত্ব বিবরণ, সামন্তরাজবৃত্তান্ত এবং জীবনী। চীনের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা ঘটেছিল খৃস্টীয় একাদশ শতকে। গ্রন্থটির নাম ওং-চি-কুং-চিয়েন বা ইতিহাসের দর্পণ। এই গ্রন্থটিতে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত চীনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থটি সংশোধন করেছিলেন চু-সি (১১০০-১২০০)।

চীনা সাহিত্যের আদিপর্বে উপন্যাস লেখা খুব কমই হয়েছে। নাম করবার মত উপন্যাস একটিই আছে এবং তা 'মঙ্গোল আমলে রচিত। গ্রন্থটি হচ্ছে লান কুয়ো-চি-ইয়েন-ই। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এর-ইয় নামে একটি অভিধান সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু চীনা ভাষার প্রামাণ্য অভিধান রচিত হয়েছিল অনেক পরে সপ্তদশ শতকে সন্নাট কাং-শির অনুপ্রেরণায়। কবি ও অপরাপর প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত প্রাচীন যুগের তথ্যসমূহ সংকলিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকে নুং-চেং-চুয়ান-সু গ্রন্থে। চিকিৎসা বিষয়ক ওই রকম একটি সংকলন, পেন-লোও-কং-মু, ওই একই সময়ের রচনা। আধুনিক যুগের হলেও এগুলিতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ প্রাচীন-কালের, যে কারণে এই গ্রন্থগুলি এখানে উল্লিখিত হল।

মুন্টব্য-ইংরাজী 'সি-এইচ' এবং 'কে' চীনা ভাষায় সমধর্মান্বাচক। এই কারণে বিভিন্ন ইংরাজী গ্রন্থে একই চীনা নামের দু'রকম বানান দেখা যায়, যেমন, ই-কিং/ই-চিং। বর্তমান রচনার এই ক্ষাতীক্স বিভ্রান্তি এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে হয়ত দু'একটি ক্ষেত্রে তা স্মরণ হয় নি।



স্বপ্ন নুষ্করি উপন্যাস

দ্বিধ বছর বয়স হলো সুকুমারের।
থরে স্ত্রী, দু' বছরের ছেলোট, রিটার্ড
বাবা, স্নেহময়ী মা ও কলেজে-না-পড়া
যুবতী অনুচা বোন, আপিসে ছোট্ট মাইনে
ও গুরুদায়িত্ব—ভবু মাকে মাঝে সে
কেমন আনমনা হয়ে যায়। বিশেষ করে
তার জন্মটীকা দীর্ঘ অবসরের ঘটনা-
গুলিতে যখন মনটা তার সংসারের সব ভাব
ও দৃষ্টিভঙ্গি বেড়ে ফেলে বিরাট লঘু
অথচ ভাবী হয়ে যায়, মনের সেই অবস্থায়
সুকুমার বড়ো বিপন্ন বোধ করে। কি
করলে যে এই হঠাৎ-স্কেপে-ওঠা কুকর্বাটিকে
অথবা প্রভুটিকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করা যায়
তা সে বুঝে উঠতে পারে না। কখনো সে
নিজেকে কিছুর বৈচিত্র্য দেবার আকাঙ্ক্ষায়
একাই নাইট-শোতে সিনেমা বাষ চৌরঙ্গী-
পাড়ায়, ফেরার পথে কখনো ভাবে সে
মার্শাল ব্র্যাডো—ফিরিঙ্গি-বাঙালি সব
মেয়ে তার হাতেব মঠোয়, কখনো-বা হয়ে
যায় জীবনানন্দ দাশ—প্রবাসীর মন নিয়ে
রাভের কলকাতাব নিজের পথে হাটতে
হাটিতে এক আশ্চর্য বোমাগে শরীর-মন
পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আজ
সাময়িক। বরষ বাড়ি ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গে
যাক্সর কামা ও বাবার কাশির শব্দ
শুনেই মন বলে ওঠে, 'ও, আমার সঙ্গে

ইয়াক'! ছেলেমানুষের মতো বাবোস্কোপ
দেখিয়ে আনা হলো? তুমি জানো না আমি
কি চাই?' সুকুমার জানে না। তার মনও
খোলাখুলি কিছু বলে না। কাজেই
অশান্তি ও অসোয়াসিতা সারা রাতই
থেকে যায়। পরদিন সকালে দৈনন্দিন গদ্য-
ময় কাজ দিয়ে মনকে আবাব বশীভূত
করে ফেলে সে। কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা
ছাদে একা ইজিচেয়ারে বসে বসে মন
হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠে বলে, 'দুস্তোর!'।
'বাচ্চকে ভাকি?' সুকুমার বলে। 'খবর-
দার না।' গর্জে ওঠে মন। 'তবে তার
মা? সে-তো তোমার ভালোবেসে বিয়ে
করা বৌ!' ভালোবাসা! পড়ো নি
লরেন্সের কবিতা? ফুলের মতই সে
ফোটে, ফুলের মতোই হয়ে পড়ে যায়।

যদি চিরন্তন হয় তবে সে-লে কাগজের
ফুল।' 'তবে! কি চাও তুমি বলে, কাকে
চাও?' 'জা কি আমিই জানি ছাই।'।
সুকুমার লক্ষ্য করে অগুণতি তারা তার
মনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—সে তাকে
সেখানে নিয়ে যায়। উধালোকে ছায়া-
পথ দিয়ে খুব খানিকটা হাটাইটি করে
দার্শনিক আব কাম্পনিক সব প্রশ্নের স্তব্ধ
ও কঠিন হোঁচট খেয়ে আঁচড় লেগে মতায়
হয়ে যায় তার মন, ভালোর ভালোর আবাব
তাকে দেহের ও প্রত্যাহার খোলাসে পুরে
শুশ্রূষা করতে হয় সুকুমারকে। তাই
বলহিলাম, থেকে থেকে সুকুমার যেন
কেমন হয়ে যায়। অথচ সে বকাটে নয়,
মদ খেতে ঘোমা বোধ করে, গণিকাদের
ওপর কোনো প্রায়োক্ত নেই, টাকা-টাক

করে মাথা কুটে মরবার মতো বোকাও সে নয়। সে শুধু বোকা নয় হঠাৎ-হঠাৎ এমন আনমনা হয়ে যায় কেন সে, কেন বাবা-মা-স্বামী-পুত্র-চাকরি সব বৈচিত্র্যে থাকা সত্ত্বেও তার মনে এক দারুণ শোক ও ধ্বংসগার আলোড়ন হয়।

একদিন দুপুরবেলা আপিস-পাড়ার আদিত্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুকুমারের। আদিত্যের বাড়ি তার বাড়ির কাছেই কিন্তু আদিত্য চাকরি করে বিদেশে আর তার বোন সুধারও বিয়ে হয়ে গেছে—কাজেই ওদিকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না তাই। এখন তো আর সে ছেলেমানুষ নয় যে সম্ভাবনামূলক আশার হাওয়া খেতে ও সুসম্মিত কুমারীদের দেখতে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াবে; এখনো তো আর সে তেমন বন্ধু নয় যে লাঠি হাতে রোজ মাইলখানেক বেড়িয়ে না এলে ক্ষিপ্ত হবে না! দুই বন্ধু ও চারের দুটি ফাপ সামনাসামনি বসে রইল কিছুক্ষণ। একথা-সেকথা বলতে বলতে সুধার কথা এসে পড়ল একসময়। 'সুধা রয়েছে যে আমাদের বাড়ি এসে!' আদিত্যের এই কথাটা শুনেই সুকুমার হঠাৎ কেমন উদাসীন হয়ে গেল, মুখে বলল, 'তাই নাকি? কবে এলো?' 'এই-তো, আমি এলাম গত শুক্রবার আর ও এলো রবিবার। একদিন' এসো না সময় করে! সুধা সেদিন তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল, আমি এসে অবধি এত ব্যস্ত যে তোমার সঙ্গে দেখা করার সময়ই করে উঠতে পারি নি। তাছাড়া ভূমিও তো ব্যস্ত! এসো একদিন, কেমন? 'বাবো!'

তাঁরপর আর আপিসের গুরুদায়িত্বও মন তার নিতে চাইল না। সামনে ফাইল রেখে সে অন্তরের চিন্তাগুলি নিয়ে খেলা করতে লাগল। কিন্তু ফেলে-আসা পথের ছড়ানো ফুল কুড়োতে কুড়োতে ধারবার বাধা পেতে কার আর ভালো লাগে—রোমন্থনের মতো আরামের আর আনন্দের জিনিস গরু আর মানুষের কাছে আর কিছুই নেই। কাজেই বিরক্ত হয়ে জরুরি কাজগুলিকে পাঁচ মিনিট বসতে বলে সুকুমার বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কবির মতো মনে মনে বলল, 'আমি সমস্ত জগতের থেকে পৃথক হবো গেলাম, এখনো আমি আমার।' সুধার সঙ্গে তার পরিচয় বহুদিনের। কম করে দশ বছর আগেকার। তখন ও এম. এ. পড়ে আবার সুকুমারকে ভালোবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে। সুধা তার ক্রাশের মেয়ে, আদিত্য তার ক্রাশের ছেলে। কিন্তু প্রেম মানুষকে এতই ভীত ও দুর্বল করে দেয় যে মনের কথাটা আদিত্যকে জানানো হলেও সুকুমারকে বলা হয় নি। সুধা ছিল শান্ত ধরণের মেয়ে, কারো সঙ্গেই সে বেশ

মেলামেশা করত না। সুকুমারের করুণ চাউনি সে 'বকনের' প্রবন্ধের চেয়ে ভালো বক্তৃত্ত্ব কিনা সে বিষয়ে সুকুমারেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অথচ মৃদু ফুটে যে কিছু বলবে সে সাহস ও সুযোগ সে পেত না। কাজেই বই-এর পাতার সুধার খোঁপার ছায়া দেখেই তার সম্মুখলো কান্ড, ক্রাশে অধ্যাপকদের বক্তৃতা তার বেশ ভালো লাগত কারণ সুধা সেগুলো আগ্রহভরে শুনত আর সুকুমার সেই অবসরে প্রাণভরে দেখে নিত তার মানসীকে। কিন্তু ক্রমে তার অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে মনের কথা কাউকে না রিসিয়ে রিসিয়ে কবিত্ব করে বললে তার শাবীরিক অসুখ হয়ে যেতে পারত। কারণ সে শেলী-কাট-সের মতো কবিতা লিখতে পারত না কিন্তু রঙিন করে ভাবতে পারত। ভালো সে সত্যিই বেসেছিল সুধাকে কারণ ঐরকম বোকাম মতো প্রেমে পড়া সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে সে নিয়েছিল গুরুতরভাবেই এবং বিয়ে পর্যন্ত সেটাকে গাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা কবে তবে সে ঐ বিব্রীত রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। ছেলেবেলা থেকেই সে এমনি সিরিয়াস ধবংস ছেলে। বেশি বন্ধু-বান্ধব আঙাটাঙা তাই কোনোকালেই ভালো লাগত না। এই সব ধরণের ছেলেদের যখন ঐ রোগ হয় তখন যে কি তার উদ্ভাদনা আর গভীরতা আর প্রশান্তি আর বন্ধু—এই সব আপাতবিবোধী অনুভূতিগুলির মিলিত অভিজ্ঞতা যে কি ক্ষতি একটি তরুণের করতে পারে, কি অমূল্য আশ্বাসের আমেজ এনে দিতে পারে তার মনে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। বাই হোক, সুকুমারের একমাত্র বন্ধু আদিত্য ছিল অন্য প্রকৃতির—ইংরেজীতে এম. এ. পড়লেও সাহিত্য বা প্রেমের চেয়ে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাই ছিল তার কাছে অধিক আকর্ষণীয়। সুকুমারের মনোবদনটাকে সে ঠাট্টা করত না কিন্তু অপরপক্ষে অন্য কিছুও করত না অর্থাৎ সুকুমার চোখের আড়াল হলেই ব্যাপারটাও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত; একদিন শুধু কথায় কথায় সুধাকে বলেছিল, 'জানিস, আমা-দেব সুকুমার প্রেমে পড়েছে।' 'কার গো দাদা?' মেয়েটি সুধিবেছিল। 'আমাদেরই ক্রাশের মেয়ে সুধার।' তুই আবার বলিস নি যেন ওকে—এসব বিষয়ে ও ভীষণ টাচি।' সুকুমার মাঝে মাঝে তখন আদিত্যের বাড়ি যেত—কখনো প্রয়োজনে, কখনো এমনি। আদিত্য প্রায়ই বাড়ি থাকত না—দরকারি জিনিস বা কথার ভার সুধার ওপর দিয়ে যেত। জীবনে অন্যায়ীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার সুযোগ না হলেও সুকুমার সুধার কাছে

বিশেষ আড্ডট বোধ করত না। তার কারণ সুধাকে সে ছেলেবেলা থেকেই আলাপ না হলেও চিনত, দু-একটা কথাবার্তাও বলত—দোহার ধরণের কালো এই আই. এ. পড়া মেয়েটির সম্বন্ধে সে কখনো কোনো দুর্বলতা অনুভব করে নি। একদিন সম্মুখলো আদিত্য বাড়ি নেই, তার বাবা-মা দু'জনে ওপরে বসে পিঠো-পিঠি খেলছেন, রাধুনী রান্না বেলছে রান্নাঘরে, নিচের বসবার ঘরে সুকুমার সুধাকে একটা কবিতা বুকিয়ে দিচ্ছে ও অপেক্ষা করছে আদিত্য ফিরবে বলে—এমনি সময়ে দারুণ এক ব্যুটি এলো। পড়ানো শেষ হলো, ব্যুটির শেষ হলো না। বিরক্ত হয়ে সুকুমার সাহসী হয়ে উঠল, পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে বসল। কার্ফ হাউস ছাড়া সাধারণত সে সিগারেট খেত না কারণ সে সময়ে বাবার পয়সার সিগারেট খাওয়াটা অন্যায় ও লজ্জার ব্যাপার ছিল।

'আপনি সিগারেট খান নাকি সুকুমারদা?'

'খাই। কেন, আমার দেখে তা মনে হয় না, না?'

'না না তা কেন। লাভ আর সিগারেট ছেলেরা সাধারণত একসঙ্গেই শুরু করে।'

'লাভ মানে?' সুকুমার সত্যিই বোঝে নি কথাটা।

'লাভ মানে লাভ।' সুধা হেসে বলেছিল, 'আমি সব জানি।'

'কে বলেছে—আদিত্য, তাই না?'

সুধা চুপ করে ছিল। কথাটা এমন অতীকৃতি তার মূর্খ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে পরের মিথ্যাগুলি সে ভেবে রাখার সময় পায় নি। সুধার এবং সুকুমারের ধারণা ছিল যে সুকুমারের খুব রাগ হবে কিন্তু আশ্চর্য—সে রকম কিছুই হলো না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে সুকুমার কোর্চে ঠেসান দিয়ে অলসভাবে বসে রইল। তখন সুধার ভর গেল কেটে, চিবুকে হাত রেখে চোখে কৌতূহল মেখে সে নীচবে অপেক্ষা করতে লাগল সুকুমারের মৌনভঙ্গের প্রত্যাশায়। আব সত্যিই সুকুমারেরও এমন একটা মানসিক অবস্থা হয়েছিল যে সুধা না শূখোলেও সে ছলছল করে নিজেই হয়তো কোনোদিন কথাটা পেড়ে বসত তার কাছে। তবে এমন আকস্মিক হয়তো হতো না, বাড়ি থেকে দু-চার বার রিহার্সাল দিয়ে এসে সে কথার নদীটাকে চেনা পথে নিয়ে এসে সুধার জগতে এসে ফেলত। কিন্তু সেদিন যে বর্ষার ঘনঘটা, বন্ধ শাসিতে বারবার বাদলের নিরুপ বাতাসের হা-হুতাশ; এ ছাড়া আদিত্য নিরুদ্ভাপ, সুধা আগ্রহের প্রতিমূর্তি। অতএব ধীরে ধীরে

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
মধ্যে বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোকফাইও
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

কি কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা? 'অ্যাসপ্রো' বিসফ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোকফাইও বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোকফাইও বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপায়গুলি 'অ্যাসপ্রো'তে সেশানো হয়, তা ৩০-৩৫ মিনিটের মধ্যে করা হয়েছিল। এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি দ্রব্য কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করার ক্ষমতা বিগতের চেয়ে বেশি। শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুদূর পর্যন্ত ব্যথা-বেদনা দূর করে।

সুদূর পর্যন্ত ব্যথা-কাত শুষ্ক হয়ে যায়—অনেকজন ধরে কাজ চলতে থাকে : নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার ক্ষমতা উপায়গুলি অতি সহজেই এবং খুবই শীঘ্রই শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইসঙ্গেই মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে এবং তার ফল অনেকজন স্বাস্থ্য হয়।

অতি সহজেই আপনি বেডে পারেন : নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো' আপনি বেডে খুঁচি পেতে পারেন—চকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের ব্যথা-বেদনা নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো' দ্বারা :
ব্যথা-বেদনা, মাথাব্যথা, গা-ব্যথা, হাতব্যথা, গাটে বেদনা-অব-অব-ভাব-নু-ভেদ-অব, গলাব্যথা।

আজ : প্রাপ্তবয়স্ক : ছোট ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খানেক। শিশুদের জন্য : একটি ট্যাবলেট বা আপনাদের ডাক্তারের নির্দেশমত।

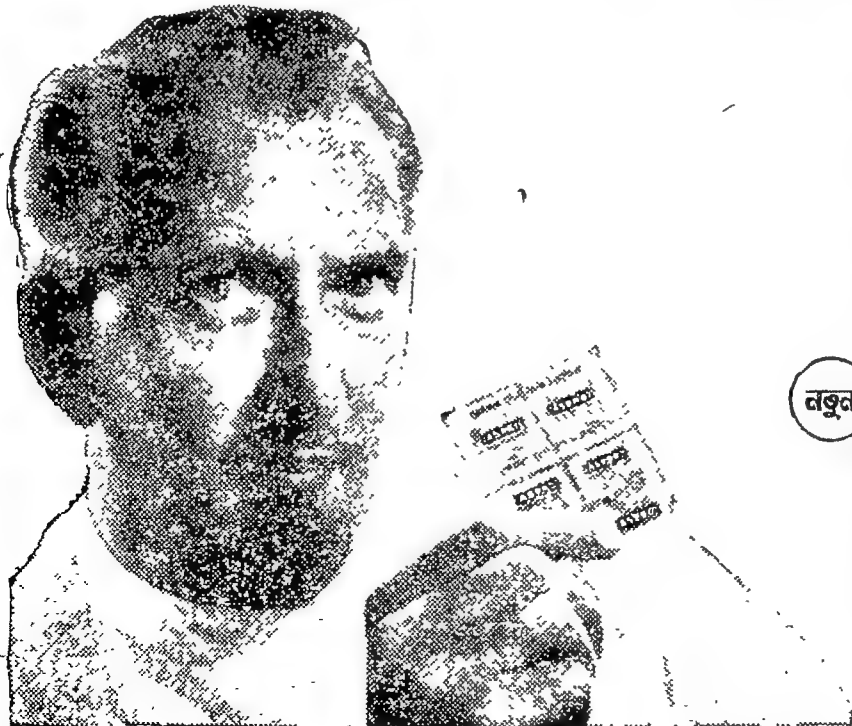
নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন



ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার বড় বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেখা দেয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোকফাইও হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো'র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি দ্রব্য কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সহজে-সহজে মিশে যায় এবং খুব তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে।

নতুন মাইক্রোকফাইও 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন

মাইক্রোকফাইও
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে।

নিকোলাস-এন (জি) স্ট্রী

সাপ্তাহিক বসন্ততী

কথা আসতে লাগল তার মূখে, পক্ষ লিখিরের মতো সাধারণ ঘটনাকে সে অসাধারণের পর্বে নিয়ে গেল, সুরমার সঙ্গে তার যে দু-চারটি তুচ্ছ ধাক্কালাপ হয়েছে সেগুলিকে নাটকের সংলাপের মতো সুন্দরভাবে সে প্রয়োগ করতে লাগল। সুধা ঠাট্টা করল না, প্রশ্ন করল না, বাধা দিল না, শুধু শুনে গেল। হৃদয় ধামলে সুধার মূখের দিকে তাকিয়ে সুরমারের হঠাৎ কখন লজ্জা বোধ হলো। 'আজ চলি' বলে উপন্যাসের একটি অধ্যায় সে সমাপ্ত করে বিদায় দিল। যে কাহিনী সে সেই বর্ষার সন্ধ্যার আশ্রয় করেছিল সুধার সামনে তাকে সে এরপর রচনা করে চলল অনেকদিন ধরে সুধার কাছে। ক্রমে তার ভাষার বহুদূরী আর নাটকীয়তা কমে কমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধীরে ধীরে ভাবাবেগের এক প্রবল কন্যার— সুরমার তার সমস্ত অন্তরের নিগূঢ়তম প্রবেশ থেকে বাধা এনে সুধাকে উপহার দিল, অজলি দিল, সুধা তা গ্রহণ করত— 'হৃদয়ে তারা চলে যেত এমন এক সন্ধ্যা' মনোনে সাংসারিক ধরা-খাধা জীবনের হলাকদের প্রবেশাধিকার নেই, স্থান চলেই আদিত্যের মতো লব্ধচিন্তের ছেলে-ছদ্ম। সুরমারের মাঝে মাঝে মনে হতো সুধাও বৃষ্টি তার মতো সুরমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে অথবা তারও মনে বৃষ্টি অমনি একটি গোপন ভীতি ভিজে প্রেমের কোনো চিহ্ন আছে। সে বাই হোক, সে এ বিষয়ে কখনো সুধাকে প্রশ্ন কবে নি, এমন কি সুধা যখন তার এত কাছে চলে এলো যে সেও তার সঙ্গে উপন্যাস রচনার হাত-মিলোলো, তখনও না। সুধার পরামর্শ মতো সুরমার সুরমার মনে সিঁখ কাটবার বর্ষাধি চেষ্টা করতে লাগল এক প্রায়ই গিয়ে গিয়ে সুধাকে রিপোর্ট দিয়ে আসতে লাগল। শেষে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে সুধার পরামর্শ ছাড়া তার চলে না। আদিত্যের সামনে সে সুধার সঙ্গে গম্ভীর মুখে কথা বলে, কথা তার, কলতে গেলে, স্বাভাবিক স্রোত হারিয়ে চলে—আর সবচেয়ে আশ্চর্য, রাতে তার নির্জন মানসপটে সুরমার পাশে সুধার ছবিটিও সমান উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকে। ...তারপর একদিন ভীষণ ঠান্ডা—সুরমার, সুধা আর আদিত্য ছুটির শো-য়ে সিনেমা দেখে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। হাটের মতলবটা আদিত্যের—শরীর গরম রাখার ঐ নাকি অব্যর্থ ওষুধ! সুরমার চিনে-কলাম কিনে রাখতে দিয়েছিল সুধাকে তার কাড়িগানের পকেটে; সুধা নিজে কাঁচিল আর যে যখন চাইছিল তখন তার হাতে দিচ্ছিল। ভীষণ কুয়াশা হরোছিল চারদিন, কলকাতার কুয়াশা অর্থাৎ তাতে সুরমার ভাগই বেশি। পথ-ঘাট প্রায়

একবারে নির্জন আর অস্পষ্ট—বড়ো রাস্তার এ ফুটপাথ থেকে ও ফুটপাথ ভালো দেখা যায় না, রাস্তার আলো-গুলো যেন কোনো অশরীরীর প্রভাবে আচ্ছন্ন। তখন ও রাস্তার বাস চলত না, লোকেরও বাস ছিল না বেশি—দুই বন্ধু সুধাকে মাঝে রেখে পথ হাটাইল। আদিত্য বলছিল সিনেমাটার কথা আব সুধা ও সুরমার নীরব থেকে যেন পরস্পরের হঠাৎ আরো কাছে এসে গিয়েছিল। সুরমারের হঠাৎ মনে হরোছিল সুরমার যে দারীয়ে সে মৃদু সুধাও যেন তারই অংশীদার; আর তাই চিনেবাদাম নেবার জন্যে সুধাকে কাড়িগানের গভীর পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে সেই হত চুর্কিবে-ছিল সুধার পকেটে। সুধা দু'বার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল, তারপর নিশ্চয় হয়ে রইল। তখন সুরমারই হাত ছাড়িয়ে নিল। কারণ আদিত্যের থেকে তার শরীর তখন অনেক গরম হয়ে উঠেছিল, এত গরম যে কানের পাশে দু'ফোটা ঘামও যেন জমল সেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রে। দু-চার দিন পরে সুরমারীতি আবার সে সুধার কাছে গেল এবং দেখল যে সুধার কোনো ভাবান্তরই হয় নি। বরং সুধাই শুরুর করল পুরোনো কাহিনীটি : 'তার-পর, সুরমার কি খবর? আজ দেখা হরোছিল?' দিন আর কাহিনী এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু তার পরই এক দুর্ঘটনা ঘটল। সুধা বিবর্তীতবার আই-এ ফেল করল এবং আরো খানিকটা মোটা হয়ে গেল। তখন তার মায়ের মৃদু-জামটা খেয়ে বাবা বেচারি লক্ষ্যে-এর এক উকিলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। সুরমারের পরীক্ষার কিছুদিন আগে সুধার বিয়ে হয়ে গেল। সুরমারের বিয়ে হলো তার বেশ কয়েক বছর পরে। এম-এ পাশ করে সুরমা যে কলেজে অধ্যাপিকা হয়ে চুকল সে দু-চার মাসের মধ্যেই সেই কলেজে একটা অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে নিল। এক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী তাকে সাহায্য করেছেন বলতেই হবে। তখন সে নিজে রোজগার করছে, তাকে দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, মায়ের সামনে সিগারেট খাচ্ছে—সিঁদকাটা গতে আর হামাগুড়ি না দিয়ে সোজা সুরমার দরজার কড়া নেড়ে জানাল মনের বাসনা; সুরমা তাব সজাগ চোখে অনেক দিন ধরেই চোরটিকে দেখেছে—ঘোরাঘুরি করতে, গান্ধীবীরের দেয়ালে দিনের পর দিন পড়িছিল ধা—এখন সেও সব ভেঙে-চুরে সুরমারের হাত ধরে তার কাছে বাসা বদল করল। তারপরে কালক্রমে সুরমা মা হয়ে চাকরি ছেড়ে দিল আর সুরমার মোটা মাইনেতে চুকল এক শুভা-গরি আপিসে তার শব্দর মশারের প্রভাবে।

আজ দু'ঘণ্টা আগেও ছিল সুরমার অফিসার, সুরমা মা, সুধা লক্ষ্যে। আর এখন সুধা বাপের বাড়ি, সুরমা প্রশ্রয়ী, সুরমার অস্থির। অথচ এখন ভর দুপুর ও সংবত পাগলামী করার সময় নয় এটা তার মনের, টেবিলে অসংখ্য ফাইল ছড়িয়ে রেখে বাথরুমে দাঁড়িয়ে থাকটা হাস্যকর—কিন্তু সুধার আগমনবার্তা হঠাৎ যেন এই কর্মময় দিনকে করে দিল নিশীথ রজনী। গভীর রাস্তাতাই যেন হাতে করে নিয়ে এলো একখন্ড অবসরের চাহিদা। বাথ-রুমের দরজা সুরমার খুলল কিন্তু পবিচিত্র জগতে সে প্রবেশ করতে পারল না।

অসুস্থতার অজুহাতে সুরমার বিকেল থাকতেই বাড়ি ফিরল। সুরমা শুধোল, 'আজ এত সকালে যে!', 'এমনি চলে এলাম। রোজ কি আব গাধার খার্টনি ভালো লাগে?' সুরমার নেকটাই খুলে সুরমার হাতে দিল : 'একটু শুনো না!'

দাঁড়াও—ছেলেটাকে নিয়ে আসি! যা দ্রুত হরোছে—মা সামলাতে পাবেন না, ঠাকুরকি রামাঘরে...'

অতএব ছেলে এলো। তাকে কোলে নিয়ে সুরমারের অসোয়াস্তিই শুধু বাড়ল। এইজন্যে সে আজ ভাড়াভাড়ি বাড়ি আসে নি—সে এসেছে সুরমাকে আবার পুরোনোচোখে দেখবার জন্যে, সুধার কাছে শাবার জন্যে।—'জানো, সুধা এসেছে!'

কোথায়...

'ওদের বাড়ি। অনেকদিন বাপে আদিত্যের সঙ্গে দেখা হলো।'

'একদিন দেখা করে এসো।'

'তা যাব এখন।' সুরমারের বলতে লজ্জা করল যে সে এখনই যেতে চায়। এতদিনে সে কবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছে তার মনের আকাঙ্ক্ষার।

ছেলের কি এলো; তারা দু'জনে একলা হলো। সুরমার জলখাবারের থালা থেকে একটা মিষ্টি তুলে পাশে-বসা সুরমার মুখে তুলে দিল : 'তুমি এটা খাও।' সুরমা অর্ধেক খেল, বাকি অর্ধেক সুরমার মুখে পুরল। তারপর সুরমাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা চন্দন করল, গালে নিম্বাস ফেলল। আশ্চর্য, সুরমার মুখ লাল হলো না, সুরমারের নিজেরও নিম্বাস হলো না গরম। কাগ-জের কুলের স্থায়িত্ব আছে নেই গম্ব।

সন্ধ্যার পর সুরমার আসিছে একটু খলে সোজা গেল সুধাদের বাড়ি। তাদের নিচের বসবার ঘঁটা এখন একজন শেফ-নারী দোকানদার ভাড়া নিয়েছেন। কাজেই ওপরে গিয়ে বসতে হলো। আদিত্য ছিল না, সুধার মা বললেন, 'তারপর সব ভালো

তো? আজিকাল তো আর আসেই না।
বড়োবড়ি রইলাম কি গেলাম দেখতে
হয় তো!

‘আজ্ঞে সময় পাই না মোটে। তবে
খবর সব পাই।’

‘সুদমা ভালো আছে? বাচ্চাটা কত
বড়ো হলো?’

সুকুমার সংক্ষেপে জবাব দিল।

‘বসো বসো। সুধা আসছে।’ সুধার

মা স্থানান্তরে গেলেন। সুধার বাবা

পায়জার করতে করতে একবার বরের মধ্যে

উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন কে এসেছে।

সুকুমার দেখল, পরম নির্ভাবনায় ভর-

লোক আরো বড়ো হয়ে চলেছে নিশ্চিন্তে;

তার চোখের দৃষ্টিতে যেন মৃত্যুর ধসরতা

এখনই ছায়া মেলাতে শুরু করেছে। খানিক-

পরে সুধা ঘরে এলো। আরো মোটো

হয়েছে তার শরীর, বয়সের আর অভিজ্ঞ-

তারি ছাপ তার সমস্ত অবরবে।

‘সিঁথিতে চওড়া সিঁদুরের দাগ,

ছেলেবেলার বিন্দুনি খোঁপায়

আবশ্য। সুধা যেন সুধা-দি ইয়ে গেছে

‘ইই ক’ বহবে। এর আগে, সুধার বিয়ের

পরে বার চারেক সুকুমার তাঁকে দেখেছে

কিন্তু সে দেখা পাঁচজনের মধ্যে দেখা,

অন্তত আদিত্যের উপস্থিতিতে, আব

তাছাড়া যেটা সবচেয়ে আসল কথা সেটা

এই যে সবমার মতো সুধাকেও যে আজ

সে পর্বোদ্যোগে দেখতে চেয়েছিল!

সুদমা চার-বছরের বিবে করা বো—তার

কাছে বার্ষ হযে সে অভ্যস্ত—এখানে

এসে প্রথমই ধাক্কা খেয়ে তার বড়ো

লাগল।

‘কি খবর?’ সুধার গলাটাও কেমন

বুড়ি হবে গেছে।

‘তুমি খুব বদলে গেছ সুধা।’ সুধার

সর্বাপেক্ষা চোখ বুলোতে বুলোতে সুকুমার

বলে।

‘সে-তো আপনিও!’ সুধা হাসে।

আর সুকুমার ভাবে, মানুষের ‘চোখের

সামনে যদি ‘দিবারাত একটা আঘাত

ঝোলানো থাকত তাহলে মানুষ অনেক

মুখতার হাত থেকে নিস্তার পেত।

—‘অনেকদিন পরে এলে এবার।’

‘হ্যাঁ। কি করব বলুন—বাবা-মা

ছাড়তে চান না, ননদের আবার

পড়াশুনো...’ সুকুমারের মনে হলো এ

যেন সুদমারই আর এক সংস্করণ।

‘মিস্টার ধর এলেন না যে! নাকি

পরে আসবেন?’ সুকুমার নিজেরই বিপক্ষে

ব্রথ চালায়।

‘নাঃ, ও আর কি করে আসবে!—ওখানে

ওর তো ভীষণ পশাব—ভকীলসাব বলাতে

লোকে ঠেকেই বোকে। তাছাড়া অন্য

বিষয়-সম্পত্তিও আছে—সেইসব তো

ঠেকেই দেখতে হয়। বাবা আবার অন্য

ছেলেদের ওপর তেমন ভরসা করেন না।’

‘ও। তা কতদিন থাকবে এবার?’

‘মাসকয়েক থাকতে হবে!...সুদমার

কি খবর? বাচ্চাটা ভালো আছে?’ সুধা

অথবা সুধার মা শুধোল।

সুকুমার সংক্ষেপে জবাব দিল।

তারপর বলল, ‘আদিত্য কখন আসবে?’

‘ঠিক বলতে পারি না।’

তারপর খানিকটা— নীরবতা।

রোম্যান্টিক নয়, কন্টকর; যেন দুজন

অপরিচিতকে একসঙ্গে বাসিরে মধ্যস্থ

কেউ অনুপস্থিত।

সুধাই উঠে দাঁড়াল : ‘আমি আসছি

একটু।’

‘আমিও উঠি।’

‘একটু বসুন।’ আর সুধার গতি-

শীল শরীরটির দিকে তাকিয়ে সুকুমার

হঠাৎ আবিষ্কার করল সে এখনো কি

ভীষণ অনভিজ্ঞ। সুধা যে মা হতে

চলেছে!—একা একা বসে এই প্রথম সে

নিজের মনের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু

করতে লাগল : ‘নাও, হলো তো এবার।

বড়ো সাধ ছিল উন্টোরখে চড়ে আবার

পেছনে ফেরবার, আবার সেই সব কবিতার

মতো পরিবেশ রচনা করবার, আবার সেই

দিনগুলিকে স্পর্শ করবার যখন প্রেম

ছিল সুদুর্ভাগ্যে তাই তীর, গোপন তাই

মায়াবী। চেয়েছিলে সুধাকে উপলক্ষ করে

আবার ডুব দিতে সেই রসসমুদ্রে, সেই

সময়কার পাগল হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে,

সেই তাজা ফুলের আশ্রায় নিতে। রখই

বলো আর জেনই বলো আর মানুষের

জীবনই বলো—পিছ-হঠাৎ-ধম নয় কারো।

আমি এবার বুঝেছি তোমার এই আকাঙ্ক্ষা

অস্বাভাবিক ওষুধ কি। আর কিছুই

নয়—একটা আয়না, শুধু একটা আয়না।’

মন-তার আধাবদন হয়ে থাকে। লজায়

নয়, দৃষ্টিতে। এক পরমপ্রিয়ের মৃত্যুবেদনায়

সে যেন মূহুমান।

ধুমায়িত চা আর মিষ্টির প্রেট নিয়ে

সুধা-ঘরে ঢুকল। তার পেছনে আদিত্য।

আদিত্য বলল, ‘এই যে সুকুমার—কতকণ?’

‘অনেককণ।’

‘একা-একা গম্ভীর হয়ে কি ভাব

ছিলেন—সুদমার কথা?’ সুধা ঠাট্টা

করল।

‘না, সে কথা নয়। আমি ভাবছিলাম

কি জানো, ভাবছিলাম, আমরা যত বাঁচি

তত বেশি কবে মরিছ, কেবলই মরিছ।’

সুকুমার গম্ভীরমুখে কথাগুলি বলে।

আর সুধা ও আদিত্য অবাক হয়ে

পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

কাশির যন্ত্রণায় কেন কাতর হবেন



ট্যাপানল থাকতে!

কেন বুকফাটা কাশিতে ভ্রমাস্ত কষ্ট পাবেন? আর কেনইবা শ্বাস
প্রশ্বাসের সংগ্রামে বিনোদিত রক্তাণী বাপন করবেন? ‘ট্যাপানল কাশ
দ্রব্য’ ব্যবহার করুন। অচিরেই শ্রোণ তরল করে কষ্টনশীল
কষ্ট লাঘব করে; আর শ্বাস প্রশ্বাসকে সহজ ও স্বাভাবিক করে
তোলে। আপনি আবার নিজেকে পূর্বের মতই সুস্থ বোধ করবেন।



মার্টিন ও হ্যারিশের বিশিষ্ট উৎপাদন

Lam MH.10 BN

সেভেনটিন আপ

পদ্মশীলকুমার রায়

চটকলে পাঁচটার বাজলো ভোঁ
খোলা স্পাইক্‌ গেট—প্রবাহের পর প্রবাহ ;
বস্তীর পেছনে লম্বা ঝিল কচুরীপানা
খোঁয়াটে আকাশ লাল হয়ে উঠছে ;
মেঘে মেঘে রঙ—নীল বেগুনি সোনালি
আতসবাসিঁ জ্বলছে যেন ;
পাশের নোঙরা নন্দমায় মাছি উন্‌উন্‌
শুন্যে চার পা তিনদিনের বাসি মড়া কুকুর
জীবনের ভগ্নদুরতার বিজ্ঞাপন।
সামনের দেওয়ালে সিনেমা পোস্টার 'ক্যানক্যান' ;
কালো কালো বস্মা মাথা নাড়ছে
স্মারার দলে তবল্‌চির মত থেকে থেকে।
নোনা জলে হলুদের ছোপ,
ছাওড়ার পোল কে'পে কে'পে উঠছে
খাটিয়া শোয়া বড়ো রামভক্তনের পাঁজরের মত—
ওর অপারেশন হল আজ চারদিন।
ছটা দশের ট্রেন প্রাটফরমে
সেভেনটিন আপ—ব্যাণ্ডেল লোকাল।
ছটোছটো হটোপাটি আফিসের ভিড়,
পান বিড়ি সিগ্রেট চাই চানাচুর—
ঝড় ঘড়িটার নিচে দাঁড়ানো মেয়েটা -
আঁকাভূরু—ঠোটে লিপস্টিক
বয়েস উনিশ বিশ—
মনেতে ষাট বছরের ক্রান্তির ছাপ
টানা টানা চোখে ওব কি অভূত তৃষা
স্বাধের সবুজ চোখে রক্তের পিপাসা ;
কি ভাবছে ও কে জানে
কত ঝড় বয়ে গেছে ওর মনে
কত সাজানো কুঞ্জবীথি কতবার ভেঙে গেছে
কত মরসুমী তুল ফুটেছে
নতুন রঙে কত নতুন রূপে ;
স্বামনাম সত্য হায়, রাম নাম সত্য হায়
গুভার ব্রীজের সরু গলিপথ
সাদা কাপড় ঢাকা খাটিয়া চলে
গাঁদা ফুলের মালা বুলছে চারদিকে
স্বাম নাম সত্য হায়।

হিস্ হিস্ ঝিক্ ঝিক্ ঝক্ ঝক্ কক্
পয়েন্টের পর পয়েন্ট—খট খট খট ;
দূরে সিনেমা হল বিজলী ব্যতির মালা
আরো দূবে খড়ের চালার মিটমিটে হারিকেন ;
ডোবার সৌদাগন্ধ, বুনো ফুলের তীর সুবাস,
ঝলকে ঝলকে কয়লার ধোঁয়া ;
টেলিগ্রাফের তারে লেজ-ঝোলা পাখির সারি ;
মাঝের বেণ্ডে গোর্ফ ছাটা হবু লীডার
বহুতা দিচ্ছে—বিষয় : সাম্যবাদ ;
গাড়ির কোণে তেবঁকা বড়ো
বিড়িতে টান দিয়ে কাশছে খক্ খক্
শেঠজী খইনি ডলা হাতে টোকা দিয়ে
কগড়া বাধায় বুকি ;
খুকী কে'দে কে'দে ঘুমিয়ে পড়লো।
জানলার ধারে তম্বী মেয়েটি
ওর দৃষ্টি দিগন্তরেখার ওপারে অনেক দূরে
কি ভাবছে ও কি দেখছে ?
তেপান্তরের অপার মাঠে আব্‌ছা অশ্বকারে
কালো ঘোড়ার পিঠে কিশোর রাজপুত্রের স্বপ্ন
ছোট্ট স্টেশন
লাল কার্কর বিছানো প্রাটফরমে যাত্রী খুবই কম ;
বাইরের ভাঙাচোরা পথে
সাইকেলরিক্সা চলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং ;
মহেশ মদীর মেয়ে ডাক নাম বঁচি
চল তার আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ
দাঁত বেলফুল কুণ্ডি
বাবুদের খাস ধোবী রাখুর হাতের
ইশ্‌তী করা যেন তক্তকে ঝক্‌ঝকে রূপ
টোল পড়া গালে তার ছেলে বড়ো সব
খায় হাবুডুবু।

সাইডিং-এ দাঁড়ানো মালগাড়ি
টিবি রোগীর মত হাঁপাচ্ছে
খাবার ডাক কখন আসবে জানা নেই।
সিগন্যাল আপ—লাল আলো ;
পোলের ওপর দিয়ে চকচকে লাইন
মিশে গেছে অন্ধকারে ;
বালিভরা ছোট নদী—এদিক ওদিকে ক্ষীণ স্রোত
শেয়াল কি কুকুর একটা জল খাচ্ছে
মাঝে মাঝে মুখ তুলছে—
চাঁদের আলোতে চিকচিক করছে সোনালি রোম ;
লাল আলো হয়ে গেল নীল
হুস করে কানে তালা লাগিয়ে
মিলিয়ে যায় মেল গাড়ি
তীর আলোর বলকে চোখ খাঁধিয়ে ;
গরম চা, চা গ্রাম চাই গরম চা
চানাচুর সল্টেড বাদাম ;
অন্ধ ভিখিরি গান ধরে খজনীর তালে।
সামনের বেষ্টিতে ওরা দুইজন
সবে বিয়ে হল যেন
এখনো আঁখির পাতে স্বপ্নের রেশ
এমনি অনেক সন্ধ্যা কত শুল্লো রাত
মাধুরী মিশায় হিয়া রাখিবে মুকুলি ;
দু-স্টেশন পরে গেল নেমে ;
কাছেই হয়তো বাড়ি
আঁকাবাঁকা পথে পথে পার হয়ে সীকো
হাতে হাত রাখি
মিশে গেল আঁধারের ঘন আবরণে ;
অকারণ কত কথা
কানে কানে কতবার বলিবার ছলে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে মুখ নির্জন প্রান্তরে।

নামলো অনেক লোক, যাত্রী কমই ওঠে
ধীরে ধীরে গাড়ি হয় খালি।
টেলিগ্রাফের তারে বাতাসের সন্সনানি
পথ আসে কুরিয়ে
শুল্লো একাদশীর চাঁদ চলে দূরে দূরে
শালবীথি অন্তরালে।
স্টেশনের পর স্টেশন পড়ে রইল পিছনে
শিউলি করা প্রভাত, কত শান্ত সন্ধ্যা
বর্ষণকালত স্তিমিত স্মৃতি অনেক
কতবার আসবে যাবে
ফেলে আসা প্রাটফরমে প্রাটফরমে—
কত যাত্রী নামবে উঠবে আরো কত,
কত বিগত আশা অতীতের কত সঙ্গিত বাধা
পড়ে থাকবে পথের ধলায় ধলায়।
পরিভ্রান্ত দূরান্তের দীর্ঘ পথে পথে
এলো গেল কতজন
দীপ কত নিভে গেল কত পাতা ঝরি
পথেরথা বারবার গিয়েছিল ঢাকি
মজরি কত ফুল আখো ডোলা মুখ
মুকুলেতে করে পড়া কত ভালোবাসা ;
বাকের শেষে এখনো দূরে অস্পষ্ট অংশন
দেওয়ালীর দীপ বলমল ;
সারি সারি সিগন্যাল
নীল আলো, লাল আলো ;
সামনের লাল আলো হল নীল
গাড়ি আজ দশ মিনিট লেট ;
লোকাল ট্রেনের যাত্রী নেই মোটেঘাট
গেল সবে নামি
হাতে টুকিটাকি ভরা রেশনের ব্যাগ
মিষ্টিমুখে বলি—
আফসোসে দেখা হবে কাল দশটার।
লোকশেডের চিমনির ঠিক ওপরে একাদশীর চাঁদ
স্টেশনের বড় ঘড়িতে সাড়ে বারোটো—
রেল ইয়ার্ডে গাড়ির পর গাড়ি অন্ধকার নিশ্চল
লাসখরে টেবিলে শোয়ানো শীতল দেহের স্মৃতি
ওদেরি ভিড়ে মিশে গেল বাতাসে
সেভেনটি আপ।

বঙ্গবন্ধু তেমন জনপ্রিয় শিল্পী এক এদেশ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

খিয়েটার অব দি এ্যাবসার্ড

ইউজিন ইউনেস্কো—জন্ম ১৯১২ সালে। নাট্যকার। জাতিতে রুমানিয়ান—লেখেন কিন্তু ফরাসী ভাষায়। খিয়েটার অব দি এ্যাবসার্ডের নাট্যকার হিসাবে ইনি একজন নেতৃস্থানীয়। ইউনেস্কোর শৈশবের বেশির ভাগটাই স্যুটে-প্যারিসে—তার মা ছিলেন জাতি ফরাসী। প্রথম ঘোষনে রুমানিয়াতে ছিলেন ইউনেস্কো—সেখানেই লিখতে শুরু করেন—এই সময়ই আবার ফরাসী ভাষায় শিক্ষাদান ব্যক্তি হিসাবে নেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সে ফিরে এলেন একটি থিসিস লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে—কিন্তু এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে পারলেন না। হঠাৎই নাটক লিখতে আরম্ভ করে দিলেন—এই সময়টায় তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করছিলেন:

The nonsensical flat statements of undeniable facts in his teach-yourself course set him off, sketching a 'tragedy of language' which would illustrate the extreme difficulty of communication in words.

এর ফলে ১৯৪৮ সালে লেখা হল 'দি বোল্ড প্রাইম ডান্না' নাটকটি প্রথম

রচনা হল—১৯৫০ সালে—তেমন জনপ্রিয় হল না। এই সময় পর্যন্ত ইউনেস্কোর খিয়েটার সম্বন্ধে যথেষ্ট বিরাগ এবং নিরতি ছিল—কিন্তু এবার বুঝলেন তার আসল বিরতির কারণ ছিল দর্শকদের স্বাধীন সত্যমতকে চোখে দিয়ে তাদের জোর করে কিছু বোঝানোর প্রচেষ্টায়। এই জন্যই ইউনেস্কো এমন এক শব্দ জাতের খিয়েটারের প্রতিষ্ঠা চাইছিলেন বা দর্শকদের জাগিয়ে তুলবে, একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে পারবে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের ভেতর বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করতে পারবে। এই ধরনের খিয়েটার তৈরি করার জন্যই তিনি কয়েকটি একাঙ্ক নাটক লিখে ফেললেন—এ সবের বিষয়-বস্তু হল ভাষার অসম্পূর্ণতা, বস্তু সংখ্যাধিক্য, মানুষের অর্থহীন অসহায়তা—ভেতর এবং বাইরে থেকে তার নানা ধরনের বিপদ। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কো রচনা করলেন 'দি লেশন' নাটকটি। প্রধানত ভাষার ব্যাপার নিয়েই এটি লেখা—শেষটার আছে শিক্ষক ছাত্রকে হত্যা করলেন। 'ওর্বিভিয়াস' লেখেন ১৯৫০-এ এবং তার উপসংহার হয় আর একটি নাটক 'দি ফিউচার ইজ ইন এগস্ট' ১৯৫১ সালে—প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে রাজ্যবিশেষকে কিভাবে বাধ্য করা হয় জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে—

আর দ্বিতীয়টিতে মানুষ কিভাবে সংখ্যা-ধিক্যতার পেয়ণে পিষ্ট হয়। ১৯৫১ সালে 'দি চেয়ারস' রচিত হয়—এতে আছে এক বৃদ্ধ দম্পতি ঘরে সার-সার চেয়ার সাজিয়ে রেখেছে—অদৃশ্য অতিথিরা এসে তাতে বসছে—তারা বৃদ্ধের বস্তুতা শুনতে এসেছে—কিন্তু বস্তুতা হবার পর বোঝা গেল তাতে যুক্তিপূর্ণ কোন বস্তু নেই—উন্মাদের প্রলাপের মতই বস্তুটি অর্থহীন—শূন্যতার পেয়ণের শক্তি এবং জীবনের অর্থহীনতাকেই যেন বোঝাবার এক ধরনের প্রচেষ্টা ছিল এই বস্তুতার। 'দি ভিভিস অব ভিভিট' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে—সাতের অস্তিত্ববাদ এবং তার বিপরীতধর্মী ফ্রয়ডিয়ান সাইকো-এনালিসিসের প্রতিই বিদ্রূপ করা হয়েছে এ নাটকে—বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে খিলার এবং সাইকো-লজিক্যাল ড্রামা একই শ্রেণীর রচনা।

এইসব একাঙ্ক নাটক লেখবার পর ১৯৫৩ সালে ইউনেস্কো তিক করলেন একাট তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখবেন—এরপর রচিত হল তাঁর বিখ্যাত নাটক 'এমিড' বা 'হাউ টু গ্রেট অব ইট'—এ নাটকের বিষয়বস্তু হল এক মধ্য-বয়সী দম্পতির বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা—এই ব্যর্থতার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে একটি শব্দেহ। শব্দেহটি পেছনের একটি ঘরে রয়েছে এবং সেটি ক্রমশ আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে। আরও কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এর পর ইউনেস্কো রচনা করেন চ্যাপলিন জাতীয় একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে—ইউনেস্কো এই চরিত্রটির নামকরণ করেছেন বেরোগার। প্রথমে একে দেখে ১৯৫৭ সালে রচিত 'দি কিলার' নাটকে। ১৯৫৮ সালে বেরোগারের পুনরাবির্ভাব ঘটে 'রাইনোসেরস' নাটকে—পরে আবার সে আবির্ভূত হয় ১৯৬১ সালে 'এক্সিট দি কিং'-এ। তবে ইউনেস্কোর একাঙ্ক নাটকগুলি বেশি জনপ্রিয়। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে 'এমিড'-র মত সর্বাঙ্গ সন্দর্ভ নাটক আজকালকার দিনে খুব কমই রচিত হয়। এ্যাবসার্ড নাটকগুলো পড়তে গিয়ে সাধারণত বড় একঘেয়ে লাগে এবং মনে একটা বিস্তীর্ণ ক্রান্তির ভাব আসে। ইউনেস্কোর 'রাইনোসেরস' এবং 'এমিড'-এর ব্যতিক্রম।

ইউনেস্কোর রচনা প্রহেলিকার ভরা—যথেষ্ট অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা বা রচনা প্রণালী নিয়ে কেউ তাঁকে আঘাত করলে তিনি আশ্চর্য সমর্থনে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করতে পারেন—সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নিজের মনের ভাবধারা এবং চিন্তাধারাকে। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৮ সালে বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক কেনেথ

টাইনান যখন 'অবজার্ভার' পত্রিকায় ইউ-নেস্কোর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সমালোচনা লিখতে শুরু করেছিলেন।

রয়েল কোর্ট থিয়েটারে সে সময় ইউ-নেস্কোর 'দি চেয়ারস' ও 'দি লেশন' নাটক-এর পুনরুত্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। টাইনান তাঁর পাঠকদের সাবধান করে দেবার জন্য লিখলেন—থিয়েটারে বাস্তবতার মারা বিরোধী ইউনেস্কো তাদের একজন গুরুস্থানীয়ের মত। রঙ্গমঞ্চে অথিয়েটারী রচনার পরিপোষক হিসাবেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন—তাঁর নিজের রচনা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব—মোটাই জীবনধর্মী নয়। ইউনেস্কোর মতে ভাষা বলতে আমরা বা বুঝি তা সম্পূর্ণ অর্থহীন—ভাষার সাহায্যে একের মনোভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করা যায় না। টাইনান অবশ্য স্বীকার করেছেন যে ইউনেস্কো নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন দর্শনকে অকটোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন—কিন্তু বিপদ দেখা দেয় তখনই যখন সাধারণ দর্শক বা পাঠকের কাছে এইসব মতবাদকে গ্রহণীয় বস্তু হিসাবে উপস্থিত করা হয়। অথবা তাঁর রচিত নাটককে ভবিষ্যৎ থিয়েটারের প্রবেশদ্বার হিসাবে দেখতে বলা হয়। এই বিপদের কারণ হল এই—এ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মতানুসরণ করলে ভবিষ্যৎ জগতের চেহারাটা হবে অত্যন্ত বিকৃত ধরণের—সেখানে মস্তিষ্ক দ্বারা কোন কিছুর ব্যাখ্যা চলবে না, মানুষ নিজের সম্বন্ধেও কোন বিশ্বাস রাখতে পারবে না। টাইনান বলেছিলেন যে ইউনেস্কো ক্রমশ বাস্তবের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন—তাঁর নাটকের চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগসূত্র দেখা যায় না। বিখ্যাত বাস্তববাদী নাট্যকারদের সঙ্গে—যথা, গ্যোকী, চেখভ, আর্থার মিলার, টেনেসি উইলিয়ামস্, ব্রেখট, ও'কেসী, অসবর্ন এবং স্যাট্র—তাঁর লেখার কোনরকম সাদৃশ্য নেই (লন্ডন অবজার্ভার ২২শে জুন, ১৯৫৮)। টাইনান এইভাবে আঘাত করতে হবে আকর্ষণীয় বাদ-প্রতিবাদের শত্রু হয়। ইউনেস্কো জবাবে বলেন তিনি নিজেকে গুরুস্থানীয় হিসাবে কখনও প্রতিপন্ন করতে চান নি—কারণ গুরুবাদে তিনি বিশ্বাস করেন না এবং সাহিত্যিক বা নাট্যকারের পেশার সঙ্গে গুরুবাদের কোন সম্পর্ক-ই থাকতে পারে না। তাঁর মতে মিস্টার টাইনানই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরু বা গ্রন্থকর্তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পৃথিবীর লোকেরদের বাণী দেওয়া, পৃথিবীকে পরিচালিত করবার ইচ্ছা, পৃথিবীর পরিগ্রহের প্রচেষ্টা—এসব হচ্ছে গুরুবাদের কাজ, বা নীতিবিদদের বা রাজনীতিকদের.....নাট্যকার নাটক লিখেই



কেনেথ টাইনান ও জে. বি. প্রিন্সলে

কান্ত, তাতে তিনি প্রামাণিক সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু উপদেশাত্মক বাণী দেওয়া তাঁর কাজ নয়.....যে শিল্প শব্দ আদর্শবাদী—অন্য কিছু নয়—তার কোন মূল্য নেই। আদর্শবাদী নাটকে আদর্শকেই ছোট করা হয়। তিনি অ-বাস্তববাদী এ অভিযোগের বিরুদ্ধে ইউনেস্কো প্রতিবাদ জানান—এ কথাও অস্বীকার করেন যে “তাঁর ধারণা ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করা যায় না।” তিনি যে নাটক লিখছেন এবং তা মণ্ডস্থ করছেন তাতেই বোঝা যায় ও অভিযোগ উঠতে পারে না—কারণ নাটকের মাধ্যমেই তো তিনি তাঁর ভাবধারাকে দর্শকদের মনে সম্ভালিত করতে চাইছেন। তিনি শব্দ এই কথাই বলতে চান একের মনোভাব অন্যকে বোঝানো খুবই শক্ত—তবে শক্ত হলেও তা একেবারে অসম্ভব নয়। এরপর তিনি স্যাট্রকে একটু খোঁচা দিয়েছেন রাজনীতিক মেলোড্রামার রচয়িতা বলে। অসবর্ন, মিলার, ব্রেখটকে বলেছেন বামপন্থীদের প্রতি-নিধি—ইউনেস্কোর মতে বামপন্থী, দক্ষিণ-পন্থী দুই দলই অনুদার এবং ভ্রান্ত। ইউনেস্কোর ধারণা সমাজই মানুষের ভেতর যত রকমের বাধার সৃষ্টি করে—সত্যিকার জনসংঘ মানুষের সমাজের থেকে অনেক বেশি উদার এবং প্রশস্ত। কোন সমাজই মানুষের দৃষ্টি দূর করতে পারে নি—কোন রাজনীতিক পন্থাই মানুষের বেদনা এবং মৃত্যুভয়ের উপায় আবিষ্কার করে নি, বা পরমরক্তকে জানবার পথ দেখায় নি। মানুষের অবস্থাই সমাজের গঠন সৃষ্টি করে—সমাজ মানুষকে তৈরি করে না।

Hence the need to break

down the language of society, which is nothing but cliches, empty formulas and slogans. That is why the ideologies with their fossilized language must be continually re-examined and their congealed language...relentlessly split apart in order to find the living sap beneath.

ইউনেস্কো বলেছেন—মানবজীবনের সব থেকে বড় সমস্যা কি আবিষ্কার করতে হলে, আমার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে আমার নিজের জীবনের প্রধান সমস্যা কি এবং আমার জীবনে সব থেকে বড় ভীতির—যে ভীতিকে উচ্ছেদ করা অসাধ্য—কারণ কি? এর উত্তর পেলেই অন্যান্য প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা এবং ভীতির কারণ আমি জানতে পারব। এবং এর ফলে আমার জীবনের—আমাদের সবার জীবনের—অধিকারাদ্বারা দিকের আসল পথের সম্ভানি পাওয়া যাবে—সেই পথকেই আলোকদীপ্ত করে তোলবার প্রচেষ্টাই আমার জীবনের রত। প্রত্যেক শিল্পবস্তু হচ্ছে, যা অন্যকে বোঝানো যায় না এমন এক বাস্তব সত্যের রূপায়ণ—শিল্পী চেষ্টা করেন এই রূপায়ণের মাধ্যমে ঐ বাস্তব সত্যকে অন্যের বোধগম্য করতে—সময় সময় এই কাজে তিনি সফলও হন। প্রত্যেক শিল্পের ভেতরই এই আত্মবিরোধী ভাবটা থাকে—অর্থাৎ নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করবার জন্যই সে সৃষ্ট—কিন্তু কচিৎ-কদাচিৎ তার সত্যরূপ অন্যের কাছে বিকশিত হয়ে ওঠে। শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যের আসল পরিচয় হল এই।

ইউনেস্কোর প্রকল্পটি বিরাট আলো-
ডনের সৃষ্টি করে এবং নানাদিক থেকে
নানাভাবে এর উত্তর আসতে লাগল—এর
থেকে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে ইউ-
নেস্কো এবং টাইনান একটি অতীব
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনার
অবতারণা করেছেন। প্রচলিত খিড়ির অব
‘সোস্যাল রিয়ালিজমের’ প্রতিবাদে এই
প্রকল্পটি লেখবার জন্য অনেকে ইউনেস্কোকে
সম্বর্ধনা জানালেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-
কথাও বললেন—ইউনেস্কো তাঁর প্রকল্পটিকে
যেমন স্পষ্ট এবং জ্ঞানগর্ভভাবে লিখেছেন
তার কিছুটা অংশ যদি তাঁর নাট্যরচনার
ঢোকাতে পারতেন, তাহলে তিনি মহৎ
নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেন।
এই দলের ভেতর ছিলেন এইচ, এফ,
গার্টেন, ইনি আধুনিক জার্মান নাটকের
বিশেষজ্ঞ এবং সমালোচক। কেনেথ টাই-
নানের স্বাভাবিকশীরা—যেমন মার্কিন শিল্প-
সমালোচক জন বার্জার লিখলেন যে—
রাজনীতিকে পরিবর্জন করাও আর এক
ধরনের রাজনীতিক আদর্শ। রয়েল কোর্ট
থিয়েটারের শিল্প-পরিচালক জর্জ ভেভিন
ইউনেস্কোর সম্বর্ধন করলেন বটে, তবে
জোর দিয়ে বললেন আর্থার মিলার, জন
অসারন এবং গ্রেগেট শ্বেদমার সমাজ
সংস্কারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নাট্য-
রচনা করেন নি—

‘The framework of these
plays is consciously social but
the core of them is human.’

ফিলিপ টয়ানবি কিন্তু ইউনেস্কোকে
হাল্কা নাটকের রচয়িতা বলে আখ্যা
দিলেন—তাঁর মতে আর্থার মিলার ইউ-
নেস্কোর তুলনায় অনেক উচ্চশ্রেণীর
নাট্যকার।

অবজারভার গঠিকার ঐ সংখ্যাতেই
টাইনান ইউনেস্কোর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে
জবাব দিলেন। তিনি যদি দেখালেন—
ইউনেস্কো বলছেন শিল্পের রূপারূপ
মানুষ জগতের আবশ্যিকতা এবং সর্ববিধ
আদর্শবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সময়ে
সময়ে এ-সবের অনেক উচ্ছেদ তার স্থান।
কিন্তু শিল্প এবং আদর্শবাদ অনেক
ক্ষেত্রেই পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে
—এর কারণ এর দুয়েরই উদ্ভব একই
উৎস থেকে। মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা
আহরণ করেই এই উভয়ক্ষেত্রে মানবজাতি
বিষয়ক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা করা হয়।
এরা ভাই-ভাইয়ের মত—পিতাপুত্রের
সম্পর্ক এদের নয়। ইউনেস্কো আত্ম-
কেন্দ্রিক—নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার
পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয়স্থান। এর ফলে
তিনি সাবজেক্টিভিজমের দিকে নিজেকে
অপসৃত করেছেন—সুতরাং তাঁর নাটকের



রেনী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে

কোথাওই বাওয়া ... তাড়াতাড়ি বাওয়া ... বা আপনার সহ না, এমন বালা
বাওয়া... এই সবের কলেই পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড স্রুটি হয়। এই
অতিরিক্ত অ্যাসিডই বদহজমের কারণ—সেই পেট ‘ভার-ভার’ অবস্থিবেশ,
পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা, পেটে আলাবোখ। ডাইজেষ্টিভ রেনী ট্যাবলেট বদহজ-
মের যন্ত্রণা ও অবস্থি তাড়াতাড়ি দূর করে।

কিভাবে রেনী ‘ড্রিপ ডোসেজ’ বদহজমের যন্ত্রণা বন্ধ করে :
আপনি যখন ডাইজেষ্টিভ রেনী ট্যাবলেট চুষে খেতে থাকেন তখন এর শক্তি-
শালী অ্যাসিডমাশক উপাদানগুলি আপনার মুখে গলে গিয়ে বীরেবীরে আপ-
নার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌছয়। এই নিয়ন্ত্রিতভাবে বীরেবীরে পড়ার কলে স্বাভা-
বিক ভাবে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিষ্কৃত করে দেবে, তাতে অ্যাসিডের কোন
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না এবং তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

সবসময় রেনী সঙ্গে রাখবেন :
বদহজমের যন্ত্রণা যে কোন সময় শুরু হতে পারে। তাই সবসময় ডাইজেষ্টিভ
রেনী ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

বদহজমের
যন্ত্রণায়
ভুগাবেন না—
ডাইজেষ্টিভ
রেনী
ট্যাবলেট
ব্যবহার করুন—



নিকোলাস-এর ঐ তৈরী

RG.3-67BW

সাপ্রাণিক জীবন

অবজেক্টিভ জীবনের বিষয়ে কল্প প্রায় অসম্ভব—লিখছেন টাইনান। এম ইউ-নোস্কা স্বীকার করেন যা না করুন প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিচারযোগ্য নাটকেরই একটা দৃষ্টব্য থাকে।

"It is stament addressed in the first person singular to the first person plural, and the latter must retain the right to dissent... If a man tells me something I believe to be an untruth, am I forbidden to do more than congratulate him on the brilliance of his lying?" (Kenneth Tynan)

পরের সংখ্যা অবজার্ভারে আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি—যথা, অর্দন ওয়েলস (সমালোচকের ভূমিকা এবং সমালোচনার বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাণ্ডার্ড), জি-ডব্লিউ এ্যাডারসন এবং তরুণ নাট্যকার কিথ জনস্টোন প্রমুখ—এ-বিষয়ে নিজেদের মূল্যবান মতামত লিপিবদ্ধ করলেন। ইউনেস্কোর দ্বিতীয় প্রতিবাদ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হল না, হল Cahiers des Saisons-এ কিছুদিন বাদে। এই প্রবন্ধে ইউনেস্কা তর্কবিতর্কের পেছনের মূল কল্পটি নিয়ে আলোচনা করেছেন—এই মূল কল্পটি হচ্ছে রচনার আকর্ষিত এবং বিষয়-কল্পের সমন্বয়। ইউনেস্কা লিখেছেন: "কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠতে পারে অবজেক্টিভ রিয়ালিটি বলতে কি মেনা? তার মতে আমি প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে এত মাথা ঘামাই যে অবজেক্টিভ রিয়ালিটির কথাটা আমার মনেই থাকে না। সাদা কথায়, আমার মনে হয় আমাকে ফর্মালিজমের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার ভো মনে হয় শিল্প বা সাহিত্যের ইতিহাস বলতে প্রধানত প্রকাশভঙ্গির ইতিহাসকেই বোঝায়। সাহিত্যের সমস্যা বন্ধুতে গেলে প্রকাশভঙ্গির নানাদিককে ভালভাবে জানতে হবে—তা করতে পারলেই ব্যাপারটার মূলে যাওয়া বাবে—সাহিত্যসারকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করা হবে।

ইউনেস্কা-টাইনানের ব্যক্তিগত মতামত ইউনেস্কা বলেছিলেন—সমালোচকের আসল পরিচয় হচ্ছে শিল্পের পরগাছা হিসাবে। রেগে গিয়ে টাইনান জবাব দেন—তাই যদি হয়, তবে শিল্পীও হচ্ছেন জীবনের পরগাছা। এখানে কু-এই হল মন্তব্য করেছেন—আসল জীবন

শিল্পী বা সৃজনশীল সমালোচক পরগাছা হতে পারেন না—সামান্য শ্রেণীর শিল্পী বা সমালোচককেই একথা বলা চলে। হ্যাঙ্কলিট যেভাবে শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তারপর কি ভাবে পরগাছার শ্রেণীতে ফেলা যায়? না, শিল্প-পীরের রচনা পড়ে বলা যায় যে তিনি জীবনের উপলব্ধিত পরগাছা? এই প্রশ্নে ওয়াডসওয়ার্থের সেই লাইন-গুলো মনে পড়ে যায়—

To add the gleam
The light that never was
on sea or land,
The consecration and the
poet's dream.

আসল শিল্পী বা সমালোচকের কাজ হল তাঁদের সৃষ্টির উপর এই স্বর্ণীয় আলোকের প্রক্ষেপণ।

প্রতিভাবান সমালোচক সাহিত্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার ভেতর নতুন-ভাবে প্রাণসঞ্চার করেন। প্রতিভাবান শিল্পী—যেমন বালজাক—তার পরিচয় দিতে গিয়ে অস্কার ওয়াইল্ড বলে-ছিলেন—

He created life, he did not copy it.

আকাডেমিক শেপ্টিং-এর মত ইমি-টেটিভ থিয়েটারকেও "শিল্প" বলা চলে না—

That is why no play which imitates life outlives the life it imitates.

ইউনেস্কোর 'দি কিলার' নাটকের আর্কিটেক্ট এক জায়গায় জোর গলায় ঘোষণা করেছেন—“বাস্তবতা”—স্বপ্নময়-তার সঙ্গে বার আশমান জমিন তফাৎ—ভরাবহ নিশাবলের আকৃতি ধারণ করতে পারে। ইউনেস্কোর রচনায় এই বিরাট আত্মবিরোধী ভাবটিকে বিশেষ একটি স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে Cahiers Libres de la Jeunesse-এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ইউনেস্কা এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: আমার সত্যি সত্যি মনে হয় আমাদের জীবনটা একটা বিকট নিশাবল বিশেষ। জীবনে বস্তুগত ভোগের শেষ নেই—এ যেন একটা অসহনীয় দুঃস্বপ্ন বিশেষ। নিজের চারপাশে চেয়ে দেখুন—বৃক্ষবিগ্রহ, সর্বশাশা রিপোর্ট, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৃশ্য, অত্যাচার এবং মৃত্যু আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রয়েছে দেখবেন..... আমরা স্মৃতি হেরিয়েছিলাম অমর হবার জন্য—অথচ আমাদের মরণে হয়। এ এক অতি ভয়াবহ ব্যাপার, সত্যরূপ

জীবনকে কি করে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করব?

উপরিউক্ত মতবাদ থেকে বোঝা যায় ইউনেস্কা প্রধানত দৃষ্টবাদী এবং নৈরাশ্যবাদী এবং এই বেদনাবোধ এবং হতাশার ছায়া সেই কারণেই অভ্যন্তর প্রচ্ছন্নভাবে পড়েছে তাঁর লেখা প্রহসনগুলোতে—যদিও চাঁড়ামির একটা অবরণ থাকে রচনার উপরদিকে। ইউনেস্কোর লেখার ভেতরে সারা চকুতে পেরেছেন, তাঁরই জন্ম কর-বেন তাঁর নাটকের একমাত্র বিষয়বস্তু হচ্ছে “মৃত্যু এবং মৃত্যুভয়”—এটিই প্রধান স্বভাব—অপ্রাধান্য বস্তু হচ্ছে “বাস্তবতার লয়প্রাপ্তি”, “অজ্ঞতার পেরণে জ্ঞানের রিলোপ”, “পাশবিক ঔদাসীন্যের ফলে আশার অপসারণ”, “বিবাহের দ্বারা প্রেমের সমাপ্তি”, “শূন্যের উদয় আদর্শবাহ, নারীর নীচতা এবং ক্রুরতার দ্বারা আহত এবং অবলুপ্ত।

In life, in language and in art, he showed how the meaningful was conquered by the meaningless and at every level, how spirit was assumed by matter.

এই মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে মনে হয়। সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদী লেখকের সাধারণতই সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচনী শিল্পী বলে বিবেচিত হন। অথচ তাঁর রচনার নানা রকমের নৈরাশ্যের বৈশিষ্ট্যতা ধাক্কা সত্ত্বেও ইউনেস্কোর নাটক রসগমনের ওপর যে বিরাট আঘাত-সংঘাতের সৃষ্টি করেছে তাকে নেতিবাচন আখ্যা দেওয়া চলে না। একথা মনেতে বাধা নেই যে তাঁর নাটক একটি দৃশ্য বা একটি অঙ্কন বা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হয়তো একটি চরিত্রকে নেতিবাদের শ্রেণীতে ফেলা যায় এবং এই ধরনের নেতিবাদে শিল্প সৃষ্টি না হয়ে শিল্পের ধ্বংস সাধনই হয়ে থাকে—কিন্তু তেমনি আমার তাঁর বৈরাগ্য নাটককে সমগ্রভাবে বিচার করলে—অর্থাৎ নাটকটির সঙ্লাপ এবং মৌলিক, দৃশ্য-সম্ভা, আলোকসম্ভা ও চরিত্রসমষ্টি সব মিলিয়ে দেখলে—স্বীকার করতেই হবে নাটকটি পজিটিভ কিছুই বলতে চাইছে। এই জন্যই বলা হয় ইউনেস্কোর নাটক প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে একটা আপাত-বিরোধের ভাব—এই দিকটি নিয়ে সমালোচকরা অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে পাবেন।

এরপর ইউনেস্কোর কয়েকটি নাটক নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।



শিশুদের চলচ্চিত্র

শিশু-চলচ্চিত্রের বিকাশের মধ্যে বোকা যায় দেশের আর্থিক উন্নতি, যে দেশ শিশুদের প্রতি যত বেশি নজর দেয়, শিশুদের লালন-পালন থেকে, শিক্ষা ও আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখে সে দেশ তত বেশি উন্নত মনে করা হয়। বনতান্ত্রিক দেশগুলি অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিশুদের প্রতি বেশি মন দেওয়া হয়। বনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় যেভাবে শিশুদের বিকাশের সন্ধান দেওয়া হয় আমাদের দেশ এখনো তা ভাবতেও পারে না। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের শিশুদের সংগে ছবি তুলে কাগজে জাতির করেন শিশুপ্রীতি। এ দেশে ঘটা করে বাল্যবিবস পালন করা হয় নেহরুর জন্মদিনে। কিন্তু কিছই যে আন্তরিক নয় তার প্রমাণ শিশুদের প্রতি অবহেলা, শিশুদের বিকাশের পথে অনেক অন্তরায় ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত ভারতে শিশু-চলচ্চিত্রের কথা মনে পড়ছে। দিল্লীতে শিশু-চলচ্চিত্র সমিতি আছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির কাজ শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা, নির্মাণ করতে সাহায্য করা এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। বেশ মোটা টাকা এই সমিতির হাতে আছে। কিন্তু এই সমিতি যে সব ছবি করেছেন—তার মধ্যে বিনয়ের শিশু-চলচ্চিত্র সমমানের ছবি খুবই কম। মোটা দাগের মোটা ডাবের ছবিগুলি শিশু-মনেও যে খুব রেখাপাত করতে পেরেছে তা মনে হয় না। এই সমিতির আনলাভাত্মিক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও অনেক অভিযোগ শোনা গেছিল। প্রকৃত গুণী লোক নাকি শিশু-চিত্র নির্মাণে সাহায্য পেতে না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সমিতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাজের বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে চোখে পড়ে না।

পশ্চিমবঙ্গে শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির একটি শাখা রয়েছে। অনেক 'গুণী' লোক নিয়ে এই সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই সমিতির উদ্যোগে একটিমাত্র ছবি নির্মিত হয়েছে। ভাল হোক মন্দ হোক সেই একটিমাত্র ছবিতেই প্রকাশ হয় পশ্চিমবঙ্গের সমিতির কৃতিত্ব সমিতি হয়ে রয়েছে। অথবা বলা যায় রাজপুত্রের সোনার কাঁঠির ছোঁয়া না পাওয়া পর্যন্ত হুমিয়ে আছে। এই সমিতি কবে জাগবে, কবে আবার একটি ছবি করবে সে কথা লোকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু জবাব দেবে কে?

শিশুরা মাঝে-মাঝে বিদেশী শিশু-চিত্র দেখে, যারা কলকাতায় বাস করে এবং তাদের অভিভাবক সংগতিসম্পন্ন। মফস্বলের এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিশু-চলচ্চিত্র দেখার কোন সুযোগই নেই। বিদেশী ছবিগুলির সংলাপ তারা বুঝতে পারে না, তাই দেখার আনন্দের মধ্যেও না বোকার দুঃখ থেকে যায়। কে তাদের এই দুঃখ হ্রাসাবে। পণ্যচিত্র প্রযোজকরা শিশু-চলচ্চিত্র করবে না, তাতে পরশা হয় না। একমাত্র সরকারী সহযোগে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারাই সম্ভব। আর সম্ভব হতে পারে শিশু-চলচ্চিত্র সমিতিতে সক্রিয় করলে। পশ্চিমবঙ্গের শিশু-চলচ্চিত্র সমিতি একারণে পুনর্গঠিত করা প্রকার। —সুমন।



সীমানাকীর্তন গায়িকা শোভনা চৌধুরী
সংগীত প্রভাকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয়েছেন।

চিত্র-আলোচনা

শারদীয় উৎসবে তিনটি ছবি

শারদীয় উৎসবের প্রাকালে তিনটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। এই তিনটির মধ্যে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'। একে সত্যজিৎ রায়ের ছবি, এ ছাড়া অপরাধমূলক ছবিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দর্শকদের কৌতূহল রয়েছে। নাকি দু'টি ছবির একটি পিনাকী মুখার্জীর 'মহাশেবতা' এবং শ্যাম চক্রবর্তীর 'দুর্দু: প্রজাপতি' তারপরে আসছে 'এ-টনী ফিরিঙ্গী'।

চিড়িয়াখানা

সত্যজিৎ রায় হঠাৎ ফ্রাইম ছবি করতে এলেন কেন এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকে আলোচনা করছেন। এ ছাড়া ছবির কাহিনীর এমন কোন বিশেষত্ব নেই, বলিষ্ঠ বক্তব্য বা মানবিক আবেদন নেই। যে কাহিনীর তিনি চিত্রনাট্য লিখে দিলেই যথেষ্ট হত, সে কাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া কেবলমাত্র কি জীবিকার ব্যাপার। এর জবাব হতে পারে ভিন্ন রসে বৈচিত্র্যের সম্মান, অথবা সাধারণ দর্শকদের সন্তুষ্ট করার উপযোগী একটি ছবি করা।

সাধারণত ফ্রাইম ছবি বলতে আজ-কাল যা বোকা যায়, হিন্দী ও ইংরেজীর অনুকরণে যেসব বীভৎস দৃশ্যাদি দিয়ে

দশকদের চমক, ব্যথান, হর, চিড়িয়াখানা (কাহিনী-শ্রীমদ, বঙ্গোপাধ্যায়) সৈনিক থেকে স্বতন্ত্র। বাঙালী জীবনের টলে-ঢালা গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে, অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা চমক দৃষ্টির কোন চেষ্টা এতে নেই। 'চিড়িয়াখানা'র প্রধান এক অবসরপ্রাপ্ত জজ। একদিন তিনি গোয়েন্দা ব্যোম-কেশের কাছে এসে অশ্রুত এক ব্যাপার তদন্ত করার জন্য বললেন। তিনি এক অভিনেত্রীর সম্মান চেয়েছিলেন যে বিষবৃক্ষ ছবিতে গান গেয়েছিল 'ভালবাসার তুমি কি জান'। তাঁর ধারণা সেই অভিনেত্রী হুম-নামে তাঁরই কলোনীতে আছে। একটা খুনের পরে সেই অভিনেত্রী উষাও হয়ে-ছিল। ব্যোমকেশ কাজে অগ্রসর হয়। কলোনীর নাম গোলাপ কলোনী। বাইরে এর গোলাপ সম্ভ্রা হলেও ভিতরে নানা গোলমেলে লোকের বাস। তদন্তকালে অকস্মাৎ একদিন জজ সাহেব নিহত হন, কিছুদিন পরে আরেকটি খুন হয় ফাকী নষ্ট করার জন্য। বহু বছর আগে যে অভিনেত্রীকে উপলব্ধ করে একটা খুন হয়েছিল সেই অভিনেত্রীর সম্মান করতে গিয়ে গোয়েন্দা ব্যোমকেশের কাজের মধ্যে আরো দু'টি খুনের মামলা এসে পড়ে। ঘটনার আবরণ উন্মোচন করতে করতে জানা গেল জজ সাহেব যাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়েছেন আসলে সে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আর যারা আছে প্রত্যেকের অতীত অস্বাভাবিক। কিন্তু সবাই এখানে জজ সাহেবের উদারতার বা মনস্তত্ত্বের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে বাস্তবিক গোলাপ কলোনী একটি চিড়িয়াখানা। ব্যোমকেশের তদন্ত-পার্শ্বীতে শেষ পর্যন্ত খুনের অপরাধী যারা পড়ল এবং সেই সঙ্গে পুরনো দিনের অভিনেত্রী সুনন্দার স্থান মিলল। দেখা গেল দু'জনাই একই গোলাপ কলোনীতে রয়েছে।

খীর গতিতে কাহিনী প্রথমে রহস্য-জাল বিস্তার করার মত কলোনীর লোকগুলিকে উপস্থিত করেছে। ব্যোমকেশ জাপানী অতিথি সঙ্গে সকলের পরিচয় জেনে গেছে। এই সঙ্গে দশকরা দেখলো বিষবৃক্ষ ছবিয় একটি দৃশ্য যে দৃশ্যে অভিনেত্রী সুনন্দা সেই গানটি গেয়েছিল। পর পর দু'টি খুনের পর শত্রু হল রহস্য-জাল গুলিয়ে ভালার পালা। দশকরা এক এক জন করে প্রায় সকলকে খুনী হিসাবে সন্দেহ করে বাজে, আর সুনন্দাকে ছবিতে দেখেও অনুসন্ধানী চোখে মহিলা চরিত্রগুলিকে লক্ষ্য করেছে। তারপরে এক সময় ব্যোমকেশের নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দশকরা নিশ্চিত হল আসল খুনী কে। কারণ দশকরা রোম-



পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত 'মহাশ্বেতা' ছবিতে অজানা ভৌমিক

কেশের দৃষ্টিতেই ঘটনার উদ্ঘাটন করছে। এই রহস্যময়তা ঘনীভূত করার জন্য ক্যামেরার কাজ, (সৌমেন্দ্র রায়) করেকটি বিশেষ দৃশ্য সৃষ্টি, সম্পাদনা (দুলাল দত্ত) এবং তার সঙ্গে সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট সঙ্গীত বিশেষ সহায়ক হয়েছে। খুনের রাতে আবছা অন্ধকারে চরিত্রগুলির চলা-ফেরা এমন কি গরুর চোখের চাহনী পর্যন্ত, এবং বারে বারে একটি সাপকে দেখানো রহস্যময়তাকে গাঢ় করে তোলে, সেই সঙ্গে উদ্বেগ ও প্রচণ্ড কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। পুরনো দিনের ছবির রীতিতে বিষবৃক্ষ ছবির দৃশ্য উপস্থাপন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ।

ছবির প্রধান চরিত্রে ব্যোমকেশ-কে রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। সত্যজিৎ রায় পর পর দু'টি ছবিতে উত্তমকুমারকে দিয়ে এমন অভিনয় করালেন—যা তাঁকে 'ম্যাটিনী আইডল' থেকে সত্যিকার অভিনেতার সম্মান দিয়েছে। এই ছবিতে উত্তমকুমার চমৎকার অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন তাকে মানিয়েছে বিভিন্ন ছদ্মবেশে, তেমনি সাধক তাঁর অভিব্যক্তি। গীতালাী রায়, মণিকা মজুমদার, সুশীল মজুমদার, শ্যামল ঘোষাল, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, সুব্রতা চ্যাটার্জী, কালিদাস চক্রবর্তী, প্রসাদ মুখার্জী, নীলোৎপল দে, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুবীরা রায়, শ্রীমদ চট্টোপাধ্যায়, কলিন মোন্ডিজ প্রমুখ প্রত্যেকে সুঅভিনয় করেছেন। চরিত্র অনুরূপ যথার্থ শিল্পী নির্বাচনে সত্য-

জিৎ রায়ের ক্ষমতা সর্বদা স্বীকৃত। অপরাধমূলক কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে 'চিড়িয়াখানা' একটি নিখুঁত ছবি।

মহাশ্বেতা

পুজোর বাজারে 'মহাশ্বেতা' একটি সুপারহিট ছবি হবে আশা করা যায়। ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনী, ধর্ম-অধর্মের মূল্য এবং বিবিধ রসের উপাচারে এই ছবির ভালি সাজানো হয়েছে। জরাসন্ধ রচিত কাহিনী চিত্রনাট্যের অবলম্বনে পরিচালনা করেছেন পিনাকী মুখার্জী।

ছবির সূচনার দেখা যায় বিদ্যাজিৎয়ের আন্দোলনের একটি মিলিল। তারপরে আর রাজনৈতিক ঘটনা নেই, শত্রু হল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কন্যা মহাশ্বেতার জীবননাট্য। এক জমিদার মহাশ্বেতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্য সম্পর্ক স্থির করে। কিন্তু রিয়ার রাতে বর পালিয়ে বাঙলার কনে লন্ডন হই। জমিদার সতীনাথ এতে মনোব্রত পায়—কিন্তু তার ভাই প্রতিভাধর কিছুদিন পরে সপরিবারে এবং উপরি হিসাবে শাস্ত্রভী এবং মামাম্বশুরকে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়, এবং সম্পত্তির ভাগ দাবি করে। ভোলানাথ প্রকৃতির সতীনাথ তাদের নীচতা ও জরালয় অশ্লিষ হরে কাশীতে যায়। সেখানে আকস্মিকভাবে দেখা হয় মহাশ্বেতাদের সঙ্গে, এবং পিসিরার অনুরোধে ব্রহ্মলন্ডনকে বিয়ে করে বাড়ি ফেরে। ছোট ভাই রতিভাষের প্রতি সতী-



সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চিড়ি মাখানা' ছবিতে কণিকা মজুমদার

মাখ স্নেহপরায়ণ হলেও সে তাকে ভুল বোঝে এবং অপমান করে। এভাবে এক-দিন সতীনাথের মৃত্যু হয়। সতীনাথের প্রথম বিবাহের সন্তানকে নিয়ে মহাশ্বেতা টিকে থাকতে চাইলেও রতিনাথ তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত করে। এ সময় মহাশ্বেতার পিতৃবন্ধুর ছেলে প্রাক্তন রাজবন্দী নির্মল এসে পাশে দাঁড়ায়। রতিনাথ সদলে নির্মলকে লাঞ্ছিত করে এবং মহাশ্বেতাকে অপমান করে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেয় সতীনাথের কিশোর সন্তান সূদীন; এবং পিতৃবাকে হত্যার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগের পর রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মধুজীর অনুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করে।

শরৎ সাহিত্যের প্রভাবে ছবির চরিত্রগুলি গঠিত; স্নেহশীল বড় ভাই, ঝাটে ছোট ভাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, বিশ্বস্ত কর্মচারী, কুটিল শাস্ত্রী এবং সর্বদুঃখসহ্য বন্ধু ইত্যাদি। এই সপ্তে ভোগ হয়েছে হত্যাকাণ্ড ও জেলের ঘটনা এবং রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্য। যেহেতু কাহিনীর লেখক জরাসন্ধ। পরিচালক এই ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনী ও বাস্তবতার পরিচিত চরিত্রগুলিকে রঙে রঙে উপস্থিত করেছেন। তা করতে গিয়ে প্রয়োজনমত গান, নাচ, কবিতা, দৃশ্য, দেশপ্রেম ও স্নেহ-প্রীতি মিশিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনী চিত্র নির্মাণ করেছেন। ছবিটি মাতিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে

পারবে। দর্শকদের কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্য।

ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক,

অনিল চ্যাটার্জী, কান্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, জহর রায়, শমিতা বিশ্বাস, গীতা দেবী, উৎপল দত্ত, সিমিত্তনী রায়, মাঃ সৌমিত্র, মাঃ মলয়, মলিনা দেবী, আনন্দ মধুজী, সুনেন দাস, আশা দেবী প্রমুখ আরো অনেকে। চিত্রগ্রহণের কাজ যথার্থ।

দৃষ্ট, প্রজাপতি

নামে প্রকাশ পাচ্ছে 'দৃষ্ট' প্রজাপতিঃ এক হাসির ছবি। বিদ্যায়ক ভট্টাচার্য লিখিত 'রাধা-মধুরা-আধা মধুরা' অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখিত। ছবিতে আকর্ষণীয় অভিনেতা রয়েছেন হিন্দী চিত্রজগতের কিশোরকুমার ও তনুজা এবং এঁদের সঙ্গে সবিতা চ্যাটার্জী।

সংসারের বোঝা বয়ে হয়রান কান্দু চক্রবর্তী মায়ের ফরমাস অনুযায়ী বাড়ি কিনতে গিয়ে একদল তরুণীর সম্মুখীন হয়। তাদের মধ্যে একজন তার মনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কোন মেয়ের স্নেহের স্পর্শ পেলে সে তাকে তার প্রথম দেখা মেয়ে শিবানী মনে করে। শিবানী বাড়ি হতে বিতাড়িত হলে এক বাড়লেকের বাড়িতে আশ্রয় পায়, সেখানে কান্দু গানের মাস্টার, সত্যরাজ পদনবীর তাদের দেখা হয়। শিবানীর মধ্যেও কান্দু প্রতি যখন অনুরাগ জন্মেছে তখন মাঝ-



কানাডিয়ান স্বপ্নদৈবের ছবি 'প্যাডল টু নীল' একটি দৃশ্য

শাসনে এসে দাঁড়ায় আর একজন। শিবানী অপেক্ষাও তার গহনার প্রতি লোভ বেশি ওর। কান্দুর বন্ধুর বর্ষা ও সাহচর্যে কিভাবে সেই চোরের সঙ্গে শিবানীর বিয়ে ভণ্ডুল হল এবং কান্দুর সঙ্গে বিয়ে হল সে কথা ছবিতে দেখান হয়েছে।

ছবিটিকে হাসির রসের অপেক্ষা বলা চলে অশ্রুত রসের। কিছুই এখানে বিশ্বাস্য নয়, গানগুলিও অশ্রুত রচনা। অভিনয়ে প্রথমোক্ত তিনজনের সঙ্গে গঙ্গা দেবী, ভারতী দেবী, কেষ্ঠ মৃধাজী, অসীমকুমার, মাঃ শান্তনু চ্যাটার্জী, কান্দু মায় প্রমুখ আছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী।

নাটকের কথা

আলমগার

গত ১০ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে তালুকদার ল রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ইতালীর কনসাল জেনারেল ডঃ জি, রিজিডি এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৃতীদের পুরস্কার দান করেন মিসেস রিজিডি। ক্লাবের প্রধান পুস্তকপোষক মিঃ পি, এন, তালুকদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার দান অনুষ্ঠানের পরে ক্লাবের উদ্যোগে ফিরোদপ্রসাদের 'আলমগার' নাটক অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন প্রীকান্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারী কে, চাকলাদার আমান্নত কর্তি ও সভ্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকার ব্যঙ্গসজ্জা, ছাপা ও সম্পাদনা প্রশংসনীয়।

ফিংগার প্রিন্ট

সেপ্টেম্বর শ্যামনগর ক্রীড়ামি" সাংস্কৃতিক সংস্থার ২য় বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক চৌধুরীর "ফিংগার প্রিন্ট" নাটকটি অভিনীত হয়েছে। নাটকটির পরিচালনার ও নির্দেশনার ছিলেন অমল রায় ও বিমল ব্যানার্জী। নাটকে



ললিত সেন পাঁচালিত 'অজানা শপথ' ছবিতে শিবানী বসু

যারা রূপদান করেন তাঁদের দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয় প্রশংসা অর্জন করেছে। রূপদানে ছিলেন—মিহিরকুমার ঘোষাল, অপূর্ব মৃধাজী, মধুসূদন চ্যাটার্জী, রীতেশনাথ ব্যানার্জী, রাধারমণ চ্যাটার্জী, সরোজ ব্যানার্জী, সুহাস চ্যাটার্জী শব্দদের চ্যাটার্জী, সমীর মৃধাজী পূর্বী চ্যাটার্জী, করবী চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বীথিকা, জ্যোতি, শব্দা ও মাধুরী চ্যাটার্জী।

সুদারোপ করেন—সজয় ব্যানার্জী, লক্ষ্মী মিত্র, তপন চ্যাটার্জী ও তপন বৈদ্য।

অংশদক

কানডা চ্যাটার্জী উৎসব

কানাডা ফেডারেল স্টেটের শতাব্দী (১৮৬৭-১৯৬৭) উপলক্ষে ২৯শে সেপ্টেম্বর হতে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত কানাডার ছবির এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল ভারতীয় কানাডার হাই কমিশনার এবং সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা। মার্জিনাল



সত্যব্রত অপেরার নতুন নাটক 'একটি পয়সা'তে সাহানা বোল, শিবদাস মদ্যাজী

সিনেমায় গ্রেট টা রবার্ট, সিরিটি সাই-কলস, সেরী ওয়াল্ড অব লিওপোল্ড, সিলেব্রেশন, ব্রাইল্যান্ডার্স, রেলরোডার, সি প্রাগ, এডভেঞ্চার ইন নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি ম্বলস দৈর্ঘ্যের ও পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখান হয়েছে।

মুকুলবীথির শারদীয়া উৎসব

গত ১লা অক্টোবর মুকুলবীথি শিশু-বিদ্যালয়ের শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে

অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষিকারা বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রথমে মুকুলবীথির কিশোর সভ্যরা যন্ত্রসঙ্গীতে বিভিন্ন সুরে একতান বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দেয়। শেষে অধ্যাপক শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়ের লেখা "অনন্দ" নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকে অংশ গ্রহণ করেন মুকুলবীথির সভ্য-

সভা, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষিকা-গণ।

শিয়ারীলাল বাজ

বিমল করে লেখা কাহিনী অবলম্বনে শান্তকর্ষী শিল্পীগোষ্ঠী নতুন নাটক 'শিয়ারীলাল বাজ' আগামী ৩০শে অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করবে।

একক অভিনয়

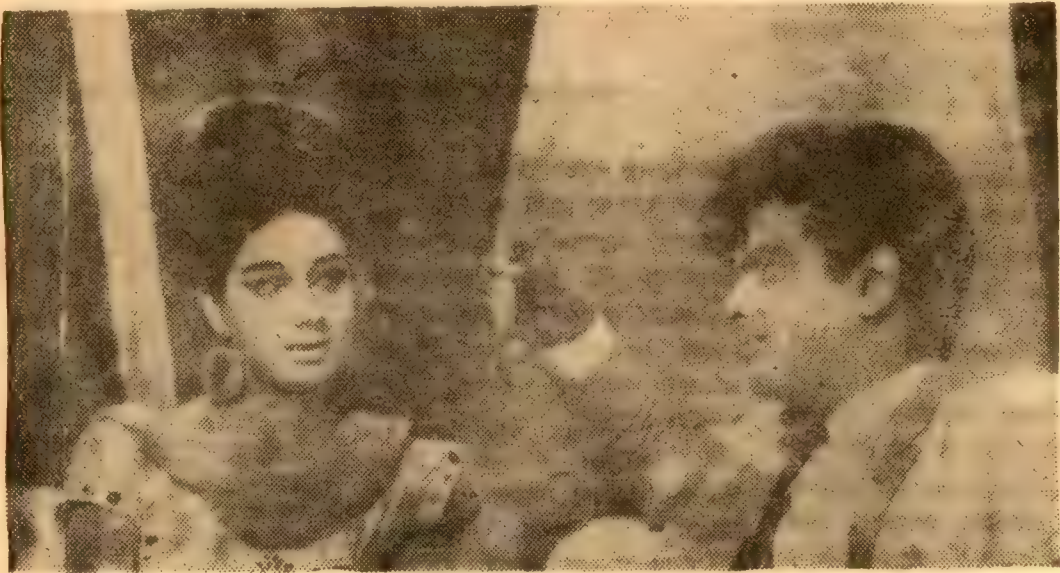
সাহস্রাত হোসেন নামক তরুণ সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি একক অভিনয় করে থাকে। ষোণাঘোষের ঠিকানা-৩৬ এফ, ব্রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭।

নজরুল সংঘ

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গৃহে নজরুল সংঘের অধিবেশন হয়েছে। এই অধিবেশনে কবিকে গান শোনান বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ। তিনি কয়েকটি অপ্রচলিত নজরুল সংগীত গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

কাজী নজরুলের ভাতা বৃদ্ধি

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাসিক ভাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার একশত টাকা বৃদ্ধি করেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে থেকে কবিকে মাসিক দু'শ' টাকা ভাতা দেওয়া হত। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি ও নজরুল স্মরণগণ দীর্ঘকাল কবির ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করছিলেন। গত জুন মাসে নজরুল একাডেমির এক প্রতিনিধি দল যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন।



কর্মী ছবিতে ববিতা ও জিতেন্দ্র



১৪ই ভাদ্রের সাপ্তাহিক বসন্তমতীতে “ভাষারবোধ কায়েরী স্মার” বিরুদ্ধে আপনার বিক্ষুব্ধ লেখনীর পরিচয় পেলাম। ভালই হল, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের একটা সূত্র পাওয়া গেল।

আপনি লিখেছেন, “ভাষারবোধ কার্য-কাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে ভাষার সাহেবরা ক্ষেপে গেছেন।”

আপনারা এ-মন্তব্যও করেছেন যে “যেহেতু তাঁদের (ভাষারবোধের) পরস্যা দেওয়া হয়, সুতরাং তিনটে পর্বন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে।”

নির্দেশনামাটি কি আপনারা পড়েছেন? পড়লে দেখতে পেতেন “তিনটে” নয়, সকাল সাড়ে আটটা থেকে চারটে পর্বন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এই সাড়ে সাত ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া অর্থোডিক নয়, এই আপনার অভি-মত। আপনার কেন আরো অনেকেই তাই মনে করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে নির্দেশনামায় সাড়ে সাত ঘণ্টার পরেও যখন জরুরী প্রয়োজন হবে তখন আসতে হবে এবং তার জন্যে কোন রিলিফ বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চাওয়া চলবে না এ-কথাও লেখা আছে? ভাষার করতে হলে তা আসতে হয়, এখনো হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের নির্দেশনামা চালু করার সাহস কি সরকারের আছে? সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা মালিকের অধীনে কত ঘণ্টা কাজ করেন বা করতে রাজী আছেন, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

আপনার অবগতির জন্যে আরো জানাতে চাই যে পশ্চিম বাংলার শতকরা ৮০ জন সরকারী ভাষার সাড়ে সাত ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য হন। এবং সেইজন্যে সেই শতকরা ৮০ জনকে নির্দেশনামার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তাদের ডিউটির ঘণ্টা কমিয়ে সাড়ে সাত করা হবে না, স্বাস্থ্যমন্ত্রী একথা সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই চমৎকার নির্দেশনামাটি একটি মনভোলান ভুলবোঝান মত্বেস মাত্র।

এই নির্দেশনামায় অসুস্থ দেশবাসীর কোন উপকার হবে কি? স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন হবে, আমরা মনে করি হবে না। কারণ বেশির ভাগ রোগী আসে সকালে। ভিড় সেই সময়ই বেশি হয়। সেই ভিড়ের সময় বেশি কর্মী না দিয়ে, ওষুধ ও অত্যা-বশ্যকীয় বস্তুপাতিত ব্যবস্থা না করে,

নাস ও টেকনিসিয়ানের এবং অন্যান্য কর্মীর সংখ্যা না বাড়িয়ে ভাষারকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে রোগীকে চারটে পর্বন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য করে তার কী উপ-কার হবে?

আউটডোরগুলিকে উন্নত করার জন্যে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটি স্বল্পম্যেয়াদী পরিকল্পনা মন্ত্রী-দপ্তরে তিনমাস আগেই দেওয়া হয়েছে। তার কোন জবাব আজও আসে নি। বিক্ষিপ্তভাবে সমাধান হতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের নেই। আমরা মনে করি আগে চাই ওষুধ ও বস্তুপাতিত, তারপর আর সব। এ সম্পর্কে আপনারদের মতামত পেলে আমরা উপকৃত হব। সপ্তে একটি খসড়া কর্মসূচী পাঠালাম।

আপনাকে আর একটি খবর দিচ্ছি। বাদ দিলে স্পেশালিস্ট মাগ্রেই চিকিৎসার বাদ দিলে স্পেশালিস্ট মাগ্রেই চিকিৎসার কালোবাজারী।” আপনার বোধ হয় জানা নেই যে বর্তমানে এই রাজ্যের বহু স্পেশা-লিস্ট নন-প্র্যাকটিসিং শোপটে আছেন, প্র্যাকটিসের সুযোগই তাঁদের নেই। সুতরাং এই বস্তু্য অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট হয়ে গিয়েছে। কালোবাজার কেন চলছে, কারা এই কালোবাজারের সমর্থক, কী করে তা বন্ধ করা যায় সেটা পৃথক বিষয়।

আমি বরং আপনার একটা ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করি। ধরুন কোন ইমার্জেন্সী অপারেশন করতে করতে পাঁচটা বেজে গেল। সার্জন কি সেক্ষেত্রে চারটে বাজার সপ্তে সপ্তে ছুঁরি ফেলে হাত ধুতে যাবে? রাত্রে যদি রোগীর অবস্থা খারাপ হয়, সার্জন কি আসবে না? না কি তাকে ওভারটাইম দেওয়া হবে? ছুটির দিন-গুলিতে কী ব্যবস্থা হবে? নির্দেশনামায় এসব ব্যাখ্যা করা নেই। শতকরা ৮০ জন যারা ৮ ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের বাদ দিয়ে শুধু সাপ্টাডায়ে সাড়ে সাত ঘণ্টা ডিউটির হুকুমনামা এসেছে। সেই জন্যেই এই নির্দেশনামাকে আমরা অর্থোডিক, ভেদপন্থী, অদ্বন্দ্বনীয় এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মনে করি।

—শ্রবণী দত্ত

পত্রটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ। আমাদের মনে হয় যে, তিনি বিক্ষিপ্তভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনাটি পড়েছেন, কেন না আমরা ইতিপূর্বে বহুবার চিকিৎসকদের নানা সমস্যার কথা বঙ্গদর্শনে তুলে ধরেছি এবং সেখানে সেই সব প্রসঙ্গেরই আলোচনা করা হয়েছে বেগুনির কথা পরে বলা হয়েছে। একটু কষ্ট করে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি পড়ে দেখলে দেখবেন যে, তাঁদের ছুটি, বেতন, বস্তুপাতিত অভাব, সংখ্যাল্পভা, অতিরিক্ত রোগী ইত্যাদি নানারকম সমস্যা ও অসুবিধার প্রতি আমরাই প্রথম জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসেসে নিযুক্ত ভাষাররা যে সাড়ে সাত ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন সে কথাও আমরা পূর্বে বহুবার লিখেছি। আমাদের কথা হচ্ছে শতকরা আশির সম্বন্ধে নয়, শতকরা কুড়ির মধ্যে সেই অংশটিকে নিয়ে যারা চিকিৎসার কালো-বাজারী করেন হাসপাতালকে উপলব্ধ করে, এবং সকলে না হলেও বেশির ভাগ হোমরা-চোমরা ভাষারই এই শ্রেণীতে পড়েন, এবং যারা পড়েন না তাঁদের নামের তালিকা আমরা হয়ত দিতে পারি। ভাষারদের সম্বন্ধে আমরা সাবিকভাবে কেন মন্তব্য করেছি তার জবাবে এটুকু বলা যায় যে কতিপয়ের পাশ সাক্ষরের উপরেই বর্তায়।

আকাশবাণী-পরিভ্রম প্রসঙ্গে

১৯৬৭ তারিখের সাপ্তাহিক বসন্তমতী পত্রিকার মেঘদূত বিভাগ আকাশ-বাণী-পরিভ্রমার একটি মন্তব্য পড়ে বিস্মিত হলাম। তিনি লিখেছেন—“একই শিল্পী অত্যন্ত ঘনঘন প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। ২২-৮ এবং ২৬-৮-৬৭ মাত্র কদিনের ব্যবধানে পূর্ববর্তী দত্ত তিনবার রবীন্দ্রসংগীত এবং একবার নজরুল-গীতি পরিবেশন করলেন।”

এই প্রসঙ্গে আমি জানানো প্রয়োজন মনে করছি যে, কলকাতা বেতার কেন্দ্রে পূর্ববর্তী দত্ত নামে দু'জন শিল্পী আছেন। ওপরে আলোচ্য দু'দিনের অন্তর্ভুক্ত দু'জন শিল্পী তারা পরিবেশিত। প্রত্যেক শিল্পীরই কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য আছে।

—শ্রবণী দত্ত

(২২-৮-৬৭ তারিখের শিল্পী)

সাপ্তাহিক বসুমতীর (২৩-৯-৬৭)
পাতার 'মেঘদূত' আকাশবাণীর কলকাতা
কেন্দ্র থেকে 'বিবিধ ভারতীয়' ও 'হিন্দী-
ভারতীয়'-র প্রচারের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ
প্রতিবাদ জারিয়েছেন সেজন্য আমাদের
অভিনন্দন জামাই।

আমাদের একটা ধারণা হয়েছে যে,
আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে বাংলা

দেশের একটা বিশেষ বয়সের ছেলেমেয়ে-
দের সাংস্কৃতিক মান নিচু, স্তরের নিরে
বাঙালি জন্য প্রয়োগ পাচ্ছে। তা না হলে
বিবিধ ভারতীয় আলাদা মিটার থাকা
সত্ত্বেও এবং পাটনা থেকে নিরমিত বিবিধ
ভারতীয় গান প্রচারিত হওয়ার পরেও
কলকাতা কেন্দ্রে এই একই অনুষ্ঠান প্রচারিত
করার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?
'দাবনয় নিবেদনে' এক ভগ্নমহিলা খুব
শুন্দের করে একটা কথা শ্রোতাদের মনে
করিয়ে দিয়ে থাকেন যে রুচি ব্যাপারটি
আপেক্ষিক অর্থাৎ কারুর কাছে যা ভাল,
লাগে না—অন্য অঙ্গের কাছে ভাই হরত
খুব ভাল লাগে। এই একটি যুক্তির
আড়ালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ লোকের
থেকে শ্রোতাদের রুচির উপর পীড়ন
চালান। ওদের যুক্তিটা উড়িয়ে দেওয়া
যায় না—সত্যিই তো রুচি ব্যাপারটা
আপেক্ষিক। কিন্তু এই-ই কি রুচি সম্পর্কে
শেষ কথা? সুদূরচি ও কুরূচি কথা দুটো
কি কথার কথা মাত্র? যদি এটাই সত্য
হয় যে বাংলা দেশের অনেক বৃদ্ধ-যুবতী
আজ বিবিধ ভারতীয় গান শুনতে ভাল-
বাসে তাহলে আমরা বলব যে ওদের এই
রুচি সম্বন্ধে গড়ে তুলতে বিরামহীন
প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আকাশবাণীর কলকাতা
কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ। অথচ তারা এই অপ-
কর্মটি না করে অন্য কোনও উচ্চমানের
প্রোগ্রাম দিয়ে প্রতিদিনের এই সময়টা সং-
কাজে লাগাতে পারতেন। তাই বলছিলাম
ওরা জেগে ঘুমুচ্ছেন—ওদের জাগাবে
কে?

কিন্তু কতদিন আমরা এই ঘটনাটা
সহ্য করব? হিন্দী ভাষার সাথে আমাদের
কোনও বিরোধ নেই। বিরোধ আমাদের
সহজবোধ্য হিন্দী ভাষার প্রচারিত কুৎসিত
গানসমূহের বিরুদ্ধে।

যা হোক—এ বিষয়ে আমরা একটা
বাস্তব প্রস্তাব আপনার পত্রিকা মারফৎ
সাধারণো উপস্থিত করতে চাই।

বাংলা দেশে কয়েকজন সর্বজন প্রণেয়
সাহিত্যিক ও কবি আছেন। তাঁদের কাছে
আপনারা একটা প্রশ্নের উত্তর চান। প্রশ্নটা
হবে এই রকমঃ—

“আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্র থেকে
প্রচারিত বিবিধ ভারতীয় গান বাংলা
দেশের সাংস্কৃতিক মানকে অপমানিত
করছে কিনা?”

এই সাহিত্যিক ও কবিসমূহ আমাদের
আলাদাভাবে জে উত্তর দেন—সংগৃহীত
আমাদের পত্রিকার প্রকাশ করুন। এই

পাঠ্যটিতে যে জনমত তৈরি হবে—তার
চাপে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃ-
পক্ষ সম্ভবত বাধ্য হবেন তাঁদের বিকৃত
রুচির সংস্কার সাধন করতে।

—বারীন ঘোষ

অযোধ্যাগঞ্জ বাজার (পূর্ণিয়া)

ধর্মাস্থতার বিরুদ্ধে জয়

গত শনিবার (২০-৯-৬৭) শকাব্দে
ঢাকা রেডিও থেকে গান হচ্ছিল ‘আজি
শারদপ্রসাদে মোর রাত পোহালো’। সত্যিই
রাতের অবসান হলো, ১৯৬২ সালের
মতো ১৯৬৭ সালেও তাঁরা ধর্মাস্থতার
বিরুদ্ধে জয়ী হলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত
থাকলো। কিছুকাল আগে খবরের কাগজে
পড়েছিলাম যে, ঢাকায় ‘মহানগর’ ভবীট
দেখার জন্য এমন ভিড় হয়েছিল যে
পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও অবশ্য
সেরকম হয়, তবে সাধারণ হিন্দী ছবির
ক্ষেত্রে। বাংলা ছবিরা যেন হরিণ, হিন্দী
ছবিরা বাঘের মতো সিনেমাহলগুলি
পাহারা দেয়, তাদের চক্রে দিতে চায়
না। আমরা বাঙালী তরুণেরা হিন্দীতে
(যা কি না সিনেমাতে আমাদের প্রিয়
চিত্রতারকারা বলে থাকেন) কথা বলতে
পারলে গর্ব অনুভব করি। রবীন্দ্র-
সঙ্গীত কেন, কোনো বাংলা গানই আমাদের
শুনতে ইচ্ছা হয় না যদি রেডিওতে তখন
শক্তিশালী ট্রান্সমিটারগুলি ‘হিন্দী-
ভারতীয়’ সঙ্ঘে বরণ করতে থাকে। আর
আমাদের নেতারা হিন্দীর সঙ্গে তাদের
প্রজন্ম নাচান নাচেন, কেউ কেউ
‘প্ৰী’ বা ‘ভূষণ’র আশায় আর
কেউ বা গদির মোহে। বাংলা বই এখনও
আমরা পড়ি বটে, কিন্তু সে শুধু হিন্দী
পড়ার এখনও তেমন রপ্ত করতে পারি নি
বলেই। সৈদিনও আর দূর নেই বোকাহর
যখন বহু খরচা করে ছাপা হয়ে আসে
চকচকে হিন্দী বইয়েরাই আমাদের মন
কাড়বে।

ওপারের মানুষদের আমরা অস্তি-
নন্দন জানাতে চাই, কিন্তু হায়, কি করে
তা পৌঁছাবে?

—অশোককুমার দাশগুপ্ত,
ভিলাই।

সেক্সপীয়রের নাটক সাগররথ,
কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বিক্রমচন্দ্র

গণপাশের সংকিশ্ণসার নহে; মহাকবি
নাটকসমূহের মূল্যগ্রহী অনুবাদ।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

- ১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
 - ২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
 - ৩। আটলী ক্রিওস্টো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু।
 - ৪। জোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
 - ৫। ভেরোনার ভদ্রবৃদ্ধ—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
 - ৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা।
মূল্য সাড়ে চার টাকা
(দ্বিতীয় ভাগ)

—এই ভাগে আছে—

- ১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু। (নটকবিচ্ছিন্নাংশ গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
 - ২। ম্যাচেস্ট অর ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
 - ৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক এ
 - ৪। সিম্বোলিন—অনুবাদক এ
 - ৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ।
 - ৬। ট্রয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পদ্মপতি ভট্টাচার্য।
- কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা।
মূল্য সাড়ে চার টাকা
বসুমতী পাইন্ডেট লিমিটেড
৩৬, ত্রিপুরাবাজারী পাণ্ডুরঙ্গী স্ট্রীট, কলি-১১

শীলের পর শীল্ড আর শীল্ডের পর ফলকাতা ময়দানের ফুটবল এই মরশুমের মত বিদায় নেয়। কিন্তু এবার এখনও হাই-হাই করেও ফুটবলের শেষ রেশটুকু লেগে আছে ময়দানের বৃকে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম দিনের শীল্ড ফাইন্যাল গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর বর্তমানে শীল্ডের ভাগ্য অনিশ্চিত!

ফলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের শীল্ড ফাইন্যালে লাক্ষ্যকারে যে খেলার মান আমরা দেখেছি ইডেনের মাঠে তা' বর্ণনা করতে সত্যিই লজ্জা লাগে। অগণিত দর্শক গিটের পরস্পর খরচ করে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে তাদের দুই প্রিয় দলের খেলা দেখতে এসে নিরাশ হয়েছেন। অনেকের মনেই এই সপ্তাহের সৃষ্টি হয়েছে যে, খেলার ফলাফল বোধহয় পূর্ব-নির্ধারিত ছিল।

ভারতের দুটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল যথা মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। এদের বেশির ভাগ খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সব সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দের খেলার বহর দেখে বৃদ্ধিতে এতটুকু কষ্ট হয় না যে বাইরের মাঠে আমাদের হাল কি আর কেনই বা ভারত এগারোটি দলের মধ্যে নবম স্থান দখল করে।

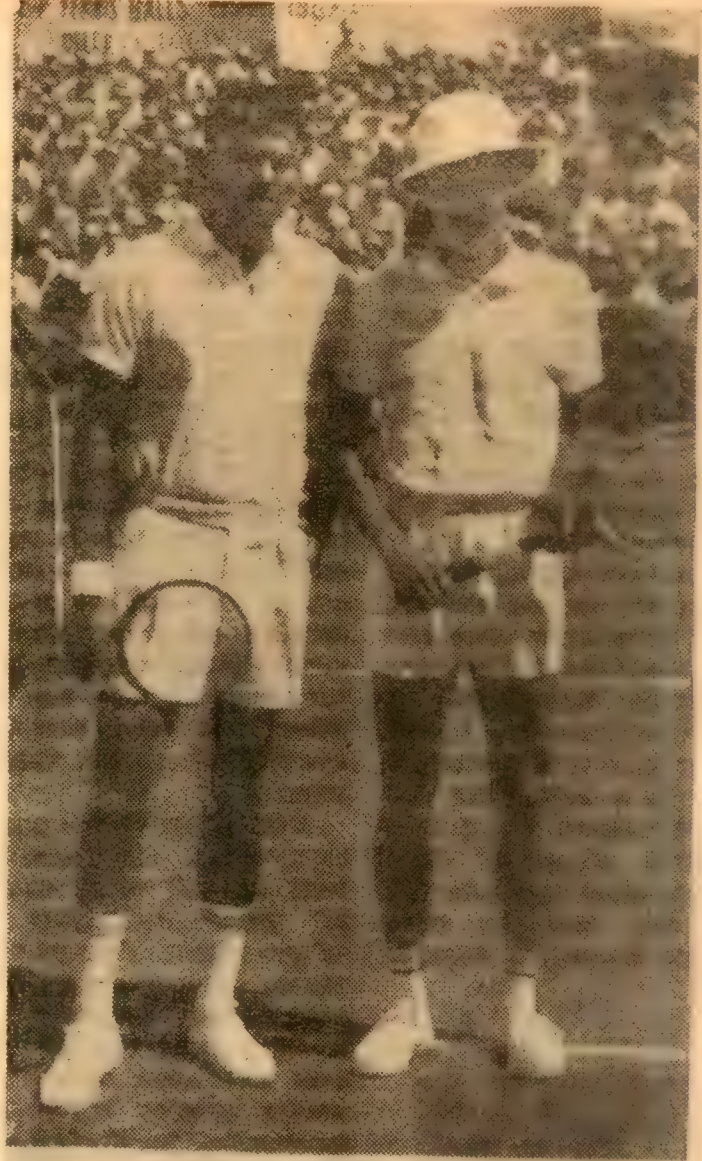
ইডেন উদ্যানে খেলা হবার পর দর্শকসন অনেক বেশি বৃষ্টি পেয়েছে। কিন্তু তবুও টিকিটের জন্য এত হাহাকার কেন? আর ব্যাকের টিকিট এত আসে কোথা থেকে। শীল্ড ফাইন্যালের দিন খেলার আগে দেখেছি চড়া দামে গোছা গোছা টিকিট বিক্রি হচ্ছে রাজত্ববানের নামনের ফুটপাথে প্রকাশ্যে। আমাদের প্রশ্ন এত টিকিট এই সব ব্যাকেরা পায় কোথা থেকে।

আই, এফ, এ শীল্ডের জৌলুশ একেই কমে এসেছে; তারপর ফাইন্যালে এই নিম্নমানের খেলা দেখে শঙ্কা জাগে। বিশেষে যখন ফুটবলের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে তখন দিনে দিনে আমাদের ফুটবল মান নিম্নগামী হচ্ছে।

নব্বই মিনিট ফাইন্যাল শূন্যমাত্র উল্লেখযোগ্য সুযোগ নষ্টের কাহিনীতে ভরা। আর খেলার গতিও ছিল অত্যন্ত মন্থর।

তবুও বলতে গেলে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের মধ্যে কিছুটা গতি ছিল, কিন্তু মোহনবাগানের পুরোভাগ মোটেই স্বাভাবিক খেলতে পারে নি।

গোল করার সুযোগ দু'দলই পেয়েছে তবে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে জুটেছে বেশি সুযোগ। মোহনবাগানের দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন অশোক চ্যাটার্জী।



খেলোয়াড়ী

ভেঁড়স কপের পূর্বাঞ্চল ফাইন্যালে ভারতের প্রেমলিং তাল এবং জাপানের কোজি ওয়াটানাবে।

ইস্টবেঙ্গলের স্টপার নঈম এবং মোহনবাগানের চম্পেশ্বর প্রসাদ দু'জনের সংঘর্ষে খেলেছেন। আর ইস্টবেঙ্গলের

ভাগে সুশীল সিংহ এবং দেবনাথ তাল খেলেও দু'টি হাফ নিভা স্ক্রু এবং অমল চক্রবর্তী ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন। ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগে হাবিব বৃষ্টি খাট্টের খেলেছেন। অন্যান্য খেলোয়াড়দের খেলা গতানুগতিক হয়েছে।

প্রীতিমিত্র

রক্ষণভাগে তাল খেলেছেন শান্ত নিম্ন এবং দু'দলী ভট্টাচার্য। মোহনবাগানের রক্ষণ

শীল্ডের ভাগ্য অনিশ্চিত। শীল্ড ফাইন্যালের ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত। দুই দল মোহনবাগান এবং

দয়দানে রেফারী ধৰ্মঘট

ইষ্টবেংগল ক্লাবের প্রাতিনিধিস্বরের উপস্থিতিতে টুর্নামেন্ট কমিটি শীল্ড ফাইন্যাল পুনরনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ করেছেন। হাওয়া বর্তমানে যে রকম তাতে মনে হয় শেষ পর্যন্ত দু' দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে।

আই, এফ, এ-র সভাপতি ব্রীসেনহাংশু আচার্য জানিয়েছেন যে ১লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর ময়দান বন্ধ বলে এবং পরে মাঠ পাওয়া যাবে না বলেই শীল্ড ফাইন্যাল পুনরনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সেইজন্য দু' দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে আই, এফ, এ-র পক্ষ থেকে। আগামী ২১শে অক্টোবরের মধ্যে দুই দলের পক্ষ থেকে এই সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ মতামত আই, এফ, এ-কে জানান হবে।

শীল্ডের খেলা সুরু করে শেষ করতে না পারা আই, এফ, এ-র পক্ষে শুধু লজ্জারই কথা নয় চরম অক্ষমতার পরিচয়। সবিশেষ সেরাবরে খেলা অনুরূপিত হওয়া কি সম্ভব নয়। আর আই, এফ, এ-কে একটু শক্ত হতে হবে। বাংলার ফুটবলের পরিচালক হিসাবে যে তাঁদের অনেক বেশি দায়িত্ব আছে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। একেই ভারতের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যশালী আই, এফ, এ শীল্ডের মান-ইজ্জত অনেকটা কমে গিয়েছে। তার পরও যেটুকু আছে তাও দেখছি এখন যাবে আই, এফ, এ-র খামখেয়ালী-পনায়।



রমানাথন কৃষ্ণন

চারদিকে ঘেরাও আর ধর্মঘটের খুম। বোধহয় তার সঙ্গেই তাল রেখে কলকাতার রেফারীরাও শীল্ড ফাইন্যালে ধর্মঘট করলেন। শীল্ড ফাইন্যালে তাই রেফারীর সঙ্গে দু'জন লাইন্সম্যানকেও আনতে হল বোম্বাই ও উড়িষ্যা থেকে। আই, এফ, এ-র সভায় ইষ্টবেংগল ক্লাব বাইরের রেফারী আনার জন্য আবেদন জানান এবং ক্যানকটো রেফারীজ এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি সানদেই এই আবেদনকে সমর্থন করেন। কিন্তু পরে রেফারীজ এ্যাসোসিয়েসনের সভাগণ একযোগে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দেন এবং ফাইন্যাল খেলা বন্ধকটের হুমকী দেন। ফাইন্যাল খেলা কলকাতার রেফারীরা বন্ধকট করেছেন আর লাইন্সম্যান দিয়েও সাহায্য করেন নি আই, এফ, এ-কে। ফলে আই, এফ, এ বোম্বাইয়ের এল ডে সাকে আনালেন রেফারীং করার জন্য এবং তাঁকে লাইন্সম্যান হিসাবে সাহায্য করতে এলেন শ্যামাকান্ত পট্টনায়ক উড়িষ্যা থেকে এবং কুটিনজো বোম্বাই থেকে। ডে-সা ফাইন্যাল খেলাটি কুতিজের সঙ্গেই পরিচালনা করেছেন।

ফাইন্যাল খেলার কলকাতার রেফারীদের বাদ দেওয়ার বোধহয় তাঁদের মনে হয়েছে একটি কথাই 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে.....'। একেই বাইরের দল গুলির কলকাতার রেফারীং সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ, যার জন্যে অনেক বাইরের দল কলকাতার শীল্ডের খেলায় খেলতে আসেন না। এবার একেবারে ঘরের দলই সন্দেহ প্রকাশ করল যোগ্যতা সম্বন্ধে, ফলে কলকাতার রেফারীদের অভিমান এবং ফাইন্যাল বর্জন। দোষ তাঁদের খুব একটা দেওয়া চলে না।

গম্ভীৰ ট্ৰফিৰ খেলা সুরু

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সন্তোষ ট্ৰফিৰ খেলা সুরু হয়েছে কটকের বরবটি স্টেডিয়ামে। প্রথম খেলাতেই গোলের ছড়াছড়ি; উন্মোখনী খেলায় উড়িষ্যা ১০-০ গোলে পরাজিত করেছে গুজরাতকে। হ্যাটট্রিক করেছেন উড়িষ্যার বিজয় দাস একাই পাঁচটা গোল দিয়ে। পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় মধ্যপ্রদেশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে উড়িষ্যা পৌঁছে গিয়েছে একেবারে কোয়ার্টার ফাইন্যালে। অন্যদিকে অম্বুপ্রদেশ কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠেছে উত্তরপ্রদেশকে ২-০ গোলে পরাজিত করে।

এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে সোট উনিশটি রাজ্য দল। এবার



বিদ্যুৎ মজুমদার

কোন দল যে জয়ী হবে তা বলা খুবই শক্ত; অবশ্য গভব্বারের বিজয়ী রেল দল লক্ষ্মান হাতছাড়া যাতে না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নিঃসন্দেহে।

খেলাৰ ফলাফল

উড়িষ্যা ১০	গুজরাত ০
অম্বুপ্রদেশ ২	উত্তরপ্রদেশ ০
উড়িষ্যা ৩	মধ্যপ্রদেশ ১
ফাসাম ১	রাজস্থান ০

সন্তোষ ট্ৰফিতে বাংলা দল

সন্তোষ ট্ৰফিতে বাংলা দলের নেতৃত্ব এবার করবেন মহামেডান দলের প্রবীণ খেলোয়াড় বিদ্যুৎ মজুমদার। বাংলা দলের আঠারজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইষ্টবেংগল ক্লাবের হাবিবকে অতিরিক্ত রাখা হয়েছে, কারণ তাঁর চোট না কি এখনও সারে নি, তবে তিনি সুস্থ হলেও বাংলা দলে তাঁকে স্থান দেওয়া হবে কটকের খেলায়। বাংলা দলে মোহন-বাগান থেকে আছেন হুজ্জান খেলোয়াড়, ইষ্টবেংগল এবং মহামেডান থেকে পাঁচজন করে এবং এরিসাসের আছেন দু'জন খেলোয়াড়।

গোল:—মুস্তাফা এবং বলাই দে।

ব্যাক:—আলতাফ, দেবনাথ, শান্ত মিত্র, সুনীল ভট্টাচার্য, সি প্রসাদ এবং জন।

মাক :—নন্দম, বিদ্যাৎ মজুমদার, এস
ফোনাজী।

ফরোয়ার্ড :—সীতেশ দাস, অ্যাটর্নি
এমরোজ, পাম্পানা, অশোক চ্যাটার্জী,
পারিমল দে, শর্মী।

এবার সাউথ আফ্রিকা

পরবর্তী বাধা বেশ শক্ত, এটা অতিক্রম
করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করেন
ভারতীয় ডেভিস' কাপ বাহিনীর সেনাপতি
ম্বরঃ কৃষ্ণান। পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে
জাপান হেরেছে ৪-১ ম্যাচে, কিন্তু ফলা-
ফলটা জানাই ছিল, কারণ টেনিসে শক্তির
দিক থেকে জাপান ভারতের থেকেও এখনও
বেশ কিছুটা তফাতে।

কিন্তু সাউথ আফ্রিকা শক্ত ঠাই।
জুইসডেল আর বব হিউইট হলেন সাউথ
আফ্রিকার সিংগলস খেলোয়াড়। এঁদের
দু'জনকে বর্তমান বিশ্বের প্রথম সারির
দশজনের মধ্যে ধরা হয়। জুইসডেল
উইমবলডেন এবং অন্যান্য কয়েকটি খেলার
আসরে যথেষ্ট খ্যাতি বজ্রন করেছেন আর
বব হিউইটের নাম টেনিস মহলে খুবই
পরিচিত। ডাবলসে হিউইট এবং
ম্যাকমিলান দু'টি শক্তির দিক থেকে বিশ্বের
অন্যতম শক্তিশালী বলে স্বীকৃতি লাভ
করেছে।

আমাদের প্রধান ভরসা হলেন রমানাথন
কৃষ্ণান। গত বছর রেজিলের বিপক্ষে
খেলার ভারতের জয় হয়েছে একমাত্র
কৃষ্ণানের অনবদ্য ক্রীড়াধারার জন্যই।
কিন্তু প্রধান সমস্যা হল কৃষ্ণানের পেশী
সঙ্কোচন, অবশ্য বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ
সুস্থই আছেন। প্রেমজিৎ এবং জয়দীপের
মধ্যে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে কে খেল-
বেন বর্তমানে বলা শক্ত। কারণ প্রেমজিৎ
এখন খুবই ভাল খেলছেন এবং জয়দীপের
সাময়িক ব্যাধা হচ্ছে হাতের পেশীতে।
মাই হোক আমরা আশা করব গতবারের
মত এবারও সাউথ আফ্রিকাকে পরাজিত
করে ভারত এবারও চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রে-
লিয়ার সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন
করবে।

প্রথমদিনের সিংগলস খেলার প্রেম-
জিৎলাল স্ট্রেট সেটে ৬-২, ৬-৪, ৬-২
ফলাফলে কোজী ওয়াটানাবেকে পরাজিত
করে এবং জয়দীপ কোনিশীর বিরুদ্ধে
জয়ী হয় ৩-৬, ৬-৩, ৫-৭, ৯-৭, ৬-৩



কলকাতার রেফারী ধর্মশর্মা; ফলে ফাইনাল খেলা পরিচালনা করতে এদেহেই
বাইরের রেফারী এবং লাইন্সম্যান।

ফলাফলে। ডাবলসে কৃষ্ণান-প্রেমজিৎ
দু'টি কোজী ওয়াটানাবে এবং ইসাও ওয়াটা-
নাবেকে পরাজিত করে। কিন্তু শেষ দু'টি
সিংগলস খেলার একটিতে জাপান বিজয়ী
হয়। কোজী ওয়াটানাবের কাছে পরাজয়
স্বীকার করেন জয়দীপ মজুমদারী, কিন্তু
প্রেমজিৎ স্ট্রেট সেটেই জয়ী হন কোনি-
শীর বিপক্ষে।

ফাইনালে কলকাতা-বাদবপুর্

পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের
ফাইনালে উঠেছে বাদবপুর্ এবং কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় দল। বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছেলেদের খেলা দেখে মন ভরে নি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরাই আমাদের ফুটবল
মাঠের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়। কিন্তু
আশ্চর্যের বিষয় যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
সম্পন্ন কোন খেলোয়াড়ই চোখে পড়ল না।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল মনুভানু

গড়তে হয়েছে চাকুরে খেলোয়াড়দের বাদ
দিরে। ফলে গত চারবারের বিজয়ী
কলকাতা দলের শক্তি বহুলাংশে খর্ব
হয়েছে। কিন্তু বাদবপুর্ দলের তরুণ
খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ভাল খেলা আশা
করেছিলাম। কিন্তু এক অনশীলনের
পর সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে বাদব-
পুর্ জয়ী হয়েও যে ক্রীড়াধারা প্রদর্শন
করেছেন তা অত্যন্ত মামুলী ধরণের।
আমার মনে হয় বাদবপুর্ের অনশীলনের
চাপটা হয়ত বেশি হয়েছিল এবং তাদের
উচিত ছিল বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলা।

বাদবপুর্ সৌমিকফাইনালে ৩-১ গোলে
সগরকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।
প্রথমে তারা এক গোলে পেছিয়ে ছিল।
ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নঈম বাদব
পুর্ের পক্ষে দু'টি গোল করেন।

উৎকলের সঙ্গে সৌমিকফাইনাল খেলা
কলকাতা জয়ী হয় ২-১ গোলে। উৎকর
কিন্তু প্রথমে গোল দিলে অগ্রগামী ছিল।

পরিচয়

নিত্য ঘোষ আমাদের চোখে পড়ে ছিলেন এরিয়ান্স ক্লাবে থাকতেই।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ১৯৬২-৬৩ সালের সময়কার হবে ঘোষ হয়। এরিয়ান্স ক্লাবের পক্ষে খেলতে দেখলাম কালো রং খাটো চেহারা আর মজবুত গড়নের একটি ছেলেকে।

তখন তার খেলায় ছিল অনতিজ্ঞতার ছাপ। শেখার তখন বাকী ছিল তার অনেক কিছুই। কিন্তু আন্তরিকতার সে ছিল অতুলনীয়। খেলার শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে খেলে সহজেই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতো।

খেলা আরম্ভ হবার আগেই খেলোয়াড়দের নামের তালিকা এসে যায় আমাদের কাছে। দেখলাম নাম তার এন ঘোষ! পুরো নাম লিখতে কেউ লেখেন নিত্য ঘোষ, কেউ বা আবার নেত্যা ঘোষ।

আগেই বলেছি যে নিত্য ঘোষের খেলায় আছে অশূভ আন্তরিকতার ছাপ। সেই সঙ্গে আছে অফুরন্ত দম, আর শক্তিসান-জ্ঞানের অভিজ্ঞতা। আর এই গুণগুলিই, নিত্য ঘোষকে আজ অনেক গুণের টেনে এনেছে।

আজ নিত্য ঘোষ কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান দল মোহনবাগানের রক্ষণ-ভাগের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। এরিয়ান্স ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, নিত্য ঘোষ তার চরে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছে মোহনবাগানে আসার পর।

খেলোয়াড় হিসেবে নিত্য ঘোষ এখনো সাক্ষরিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, দলের প্রয়োজনের খাতিরে নিত্য ঘোষের দাম অনেক। কারণ দলের জন্যে স্বেচ্ছা করে, নিত্য ঘোষের মতো খেলেন কলকাতা ময়দানের খুব কম খেলোয়াড়ই।

নিত্য ঘোষের বয়স খুব একটা বেশি নয়। তবে জন্ম স্বাধীনতা লাভের আগেই। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে। সেই ছোটবেলা থেকেই নিত্য ঘোষ খেলা-পাগল। তবে ফুটবল খেলাই

শান্তিপ্রিয় বঙ্গোপদ্রাঘ্য

আসল। তাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই উঠতি খেলোয়াড় হিসেবে নিত্য ঘোষের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বালিগঞ্জ স্টেশনের লেবেলজিসিং পার হয়ে কসবায় গিয়ে খোঁজ করলে আজো সে খবর জানা যায়।

তাই মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে নিত্য ঘোষকে দেখা গেল বাংলা স্কুল দলের পক্ষে ফুটবল খেলার অংশ গ্রহণ করতে। তেরো বছরের ছেলে নিত্য ঘোষ ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে সেদিন হাজির হয়েছিলেন ফুটবলপাণে, আজ তেইশ বছরের নিত্য লাভ করেছেন তার অনেক কিছুই।

১৯৫৭ থেকে ৫৯-কিস্বা বয়সের হিসেবে তেরো থেকে পনেরো—এই দুটি বছরের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছিলেন নিত্য ঘোষ! ১৯৫৯ সালে নিত্য ঘোষকে খেলতে দেখা গেল কালীঘাট দলের পক্ষে। কিন্তু সে মাত্র এক বছরের জন্যে! বছর দুইতে না বছরভেই নিত্য ঘোষ চলে এলেন ইয়ং বেঙ্গলে। সেখানে কাটলো দুটো বছর।

কিন্তু তারপরই যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে নিত্য ঘোষের খেলোয়াড় জীবন ভরে উঠল ফলে-ফুলে।

১৯৬২ সালে নিত্য ঘোষ ঘোষ দিলেন এরিয়ান্স ক্লাবে। শুরুর এরিয়ান্স ক্লাবেই যোগ দেওয়া নয়, নানা কারণে ঐ বছরটি নিত্য ঘোষের জীবনের পরম স্মরণীয় সাল।

১৯৬২ সালে নিত্য ঘোষ জুনিয়র বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে বার্নপুর্নে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পেলেন।

আর বার্নপুর্ন থেকে ফিরতে না ফিরতে এলো বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। পেনাং-এর বিশ্ব যুব-ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে গেলেন নিত্য ঘোষ।

এরিয়ান্স ক্লাবের পক্ষে আরো দুটো বছর কাটল নিত্য ঘোষের। তার মধ্যে অবশ্য ফুটবল রিসকমহলে নিত্য ঘোষ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ফেলেন।

তার পরই পুরস্কার স্বরূপ ১৯৬৪ সালে নিত্য ঘোষ হলেন এরিয়ান্স ফুটবল দলের অধিনায়ক। অধিনায়ক হলে কি হবে, সেটিই ছিল এরিয়ান্স ক্লাবের পক্ষে নিত্য ঘোষের শেষ বছর।

পরের বছর নিত্য ঘোষের সামনে এল আরো বড় আহ্বান, আরো বড় সুযোগ। কলকাতা ময়দানের অন্যতম সেরা দল মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণে এরিয়ান্স ছাড়লেন নিত্য ঘোষ।

আজ নিত্য ঘোষ মোহনবাগান ক্লাবের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। পরিশ্রমী নিত্য ঘোষ মোহনবাগানের রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ।

রোভার্স, ডুরান্ড কিস্বা জাতীয় ফুটবলের আসরে যোগদান করলেও নিত্য ঘোষ আজো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে জ্বল জ্বল করছেন। নিত্য ঘোষের আরো সাফল্যের আশায় আমরা তাই চলেছি দিন গুণে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে প্রীতকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

কালিদাস গ্রন্থাবলী — ১ম	—	কেন্দ্র ও বোর্ডে বঁধাই	৮-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—১ম	—	বোর্ডে বঁধাই	—	৮-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ২য়	—	"	৬-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—২য়	—	"	—	৮-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ৩য়	—	"	৮-০০	নপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ১ম	—	"	৮-৫০	প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ২য়	—	"	৮-০০	বিভূতিভূষণ মুখোঃ গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—উপন্যাস	—	১ম	৮-৫০	রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	—	২য়	৮-৫০	শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	—	৩য়	৮-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ১ম	—	"	—	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—সাহিত্য	—	১ম	৮-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ২য়	—	"	—	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	—	২য়	৮-৫০	মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থাঃ ১ম	—	"	—	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	—	৩য়	৮-৫০	মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থাঃ ২য়	—	"	—	৩-৫০
হিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বঁধা। কবির প্রতিকৃতি				অসম্ভব গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-০০
অমনিত আর্ট পেপারের সূদশা প্রচ্ছদ)	১ম	৬-০০		সংসাহিত্য গ্রন্থাঃ — ১ম	—	"	—	৮-০০
" " " " " "	২য়	৬-০০		সংসাহিত্য গ্রন্থাঃ ২য়	—	"	—	৮-০০
" " " " " "	৩য়	৮-০০		সংসাহিত্য গ্রন্থাঃ — ৩য়	—	"	—	৮-০০
সেঙ্গপীয়ার গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বঁধা)	১ম খণ্ড	৮-৫০		সংসাহিত্য গ্রন্থাঃ — ৪র্থ	—	"	—	৩-০০
সেঙ্গপীয়ার গ্রন্থাবলী	২য় খণ্ড	৮-৫০		রামপদ মুখার্জির গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-০০
ত্রৈলোকা গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০		হেংলেন্ড রায় গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-০০
ত্রৈলোকা গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০		মতিল ল দাসের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০০		জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০০		বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী	১ম	৮-০০		যদুনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী	—	৩য় খণ্ড	—	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী	২য়	৮-০০		শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	—	২য় ভাগ	—	৩-০০
দায়াদার গ্রন্থাবলী	১ম	৮-৫০		শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	—	৩য় ভাগ	—	৩-০০
দায়াদার গ্রন্থাবলী	৪র্থ	৮-০০		স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-০০		সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৩য়	—	"	—	৮-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৮-০০		সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৫ম	—	"	—	৮-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০		বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বঁধাই)	—	"	—	৬-৫০
যোগেশ গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০০		কথাসরিৎ সাগর	—	১ম ভাগ	—	৮-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—	—	৩-৫০		কথাসরিৎ সাগর	—	২য় ভাগ	—	৮-০০
রত্নলাল গ্রন্থাবলী	—	৩-০০		চারণকবি বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থাবলী—	—	"	—	৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী	—	৩-০০		রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী— ১ম (বোর্ডে বঁধাই)	—	"	—	৮-৫০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী	—	৩-০০		রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী ২য়	—	"	—	৮-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—	—	৫-০০		অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	—	"	—	৩-০০
দিশুর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড	—	৫-০০		জ্যোতিবিন্দুনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—	—	"	—	৮-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—	—	৩-০০		১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম — প্রতি খণ্ড	—	"	—	৮-০০
৪টি গ্রন্থাবলী	২য়	৩-০০		কীরোদ গ্রন্থাবলী ৩য় হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড	—	"	—	৩-৫০
৪টি গ্রন্থাবলী	৩য়	৩-০০		ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৩-৫০
				চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী	—	"	—	৮-০০

7 NOV 1967



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের বস্তু নিতে শেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসার্বভৌমায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-টাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

S.P. 4/67

সাপ্তাহিক বসুমতী

পূর্ব যুরোপ সফরে
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী



বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

26th Oct., 1967 * Vol. 72, N



...কিন্তু, এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিত—

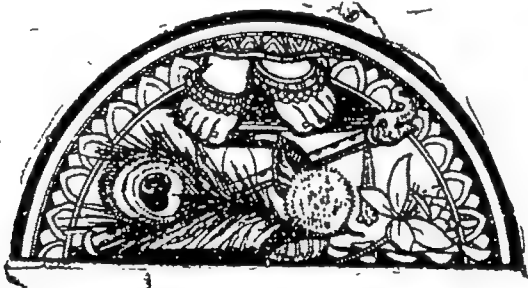
বোরোলীন

—কাটা-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শুকনো, খসখসে কিংবা বর্ণহীন ত্বকে
যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্টিক

বোরোলীন হাউস, কলকাতা



বিষয়	লেখক				মূল্য	
জন্মদাকী	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৫৫
আজকের মানব	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৫৬
মঙ্গলদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৫৭
অবতাব্য	১০০	—	চন্দ্রগুপ্ত	১০০	১০০	১১৬২
ভারতবর্ষ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৬৪
আন্তর্জাতিক	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৬৭
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচারণ)	১০০	—	সুখীরঞ্জন দাস	১০০	১০০	১১৬৯
সম্রাটের বোকা	১০০	—	কুন্তিবাস ওয়া	১০০	১০০	১১৭৫
এ-বসন্তে (কবিতা)	১০০	—	সরিত শর্মা	১০০	১০০	১১৭৬
অগ্নিযুগের একটি অব্যয়	১০০	—	অনন্ত সিংহ	১০০	১০০	১১৭৭
গ্রন্থমেলা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১১৮১



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলিকনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিরসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য ষোল টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমদীপলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণলাল গ্রন্থাবলি

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩.৫০

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩.৫০

দ্বিতীয়াংশের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-

কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ঘাতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরুগণ—ইংরেজ ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে

বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য

ইংরেজদের বিক্রম করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে

তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ৪ মূল্য টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অশ্বের রেখা (গল্প)	— দিব্যেন্দ্র দাশগুপ্ত	১১৮০
বৈদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৮৬
নদী জপমালা (ভ্রমণ-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১১৯০
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— ডঃ বৃন্দদেব ভট্টাচার্য	১১৯০
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১১৯৬
স্বপ্নমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাল	১২০০
আকাশবাণী-পরিভ্রম	— মেঘদূত	১২০৩
গজগণ	—	১২০৪
খেলাধুলা	— প্রীতমিতান্ত	১২১৩
পরিচীর্ণত	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১৬

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বয়ের কাষ

বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিশ্ববন্ধ, স্বপ্নলাগদুরী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাখারাগী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩ টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকহরস্যা, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মূর্চিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সুদৃশ্য কাপড় ও বোডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)

মূল্য প্রতিখণ্ড ৪-৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোডে বাঁধাই)—সাতের চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, বীররাগনা কাব্য, চতুর্দশগদ্য কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ার কানন, হেকটর বধ। (বোডে বাঁধাই) চার টাকা

কবি রিতারীলাল চক্রবর্তীর

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রাণসঞ্চারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুদের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাংলায় নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু, ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবহু গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বাণেশ্বরী গাংগুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



৭২২৭ : ১৯৭ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পরস্যা
বৃহস্পতিবার, ৮ই কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 26th October, 1967

বিজয়া উপলক্ষে

বিজয়া উপলক্ষে আমরা আমাদের শূভানুধ্যায়ী, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠ-পোষক, লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রীতি নমস্কার ও শ্রুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সারা বছরের কতো কলহ, কোলাহল বিজয়ীর জয়যাত্রার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন চেতনা লাভ করি—তা হচ্ছে পরস্পরকে নিকটতর ও সম্মিলিত করার। বর্তমান কালের চরম আর্থিক সংকট ও দৈন্যকে ভুচ্ছ জ্ঞান করে এই সম্মিলিত হবার বাসনা জাগরূক হয়ে ওঠে বাঙালী জাতিতে। বাঙালী জাতি ঘর ও বাহিরকে তখনই আপন করে নেয়। এবং একটা শূভ ইচ্ছা চারিদিকে বিরাজ করে। আগামী দিনগুলি যাতে পারস্পরিক সূখ-সৌহার্দ্য ও বিজয়গৌরবের মধ্যে কেটে যায়—সেই আশা করেন সবাই।

পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনগুলি কি-ভাবে কাটবে—সেই প্রশ্ন কিন্তু বিজয়ীর পরই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শোনা যাচ্ছে, এ বছর না কি ধান্যের ফলন খুব ভালোই। আউশের ফলনও তো ভালো হয়েছিল—কিন্তু সরকার ক' ছটাক ধান বা চাল আদায় করতে পেরেছে? আমন ধানের সংগ্রহের ব্যাপারে সেই একই দশা হবে কি না কে জানে। জনসাধারণের খেয়েরও সীমা আছে। আংশিক রেশন অংশে খোলা বাজারে বিক্রয়যোগ্য চালের দর ত' সরকার বেঁধে দিয়েছে—কিন্তু বিক্রেতার বড়ো আঙুল দেখিয়ে তা চার টাকার অধিক দরেও বিক্রি করেছে। উপরন্তু কর্ডনিং ভেদ করে বিধিবদ্ধ রেশন অংশে যে চাল এসেছে—তা আরো বেশি দরে বিক্রি করা হয়েছে।

রেশনে যে পরিমাণ চাল ও গম দেওয়া হয়, তাতে পেট ভরানো যায় না—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সামর্থ্যের বাইরে হলেও কিছু লোক চোরা-বাজারেই চাল কিনতে বাধ্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও পুলিশ কর্তব্য পালন করতে পারে নি,—খাদ্যনীতির পাশাপাশি, সেই কারণে, চোখের সামনেই চোরাকারবারী ও মজদুদারদের দুনীতি প্রদর্শন পেয়েছে। জনসাধারণের একাংশও প্রশ্ন দিয়েছে এই কারণে যে, জীবনধারণের জন্য মোটা ভাত তাদেরও দরকার। আর এক শ্রেণীর লোক বাধ্য দিতে চায় নি এই কারণে পাছে উগ্র-পন্থীদের কীতি বলে যুক্তফ্রন্ট সরকার অন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। জনসাধারণ চাষ যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতে বিপদাপন্ন না হয়।

যাহোক আগামীদিনের খাদ্যনীতি কোন পথ গ্রহণ করবে জনসাধারণ তা লক্ষ্য রাখছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, রাজ্য সরকারের পক্ষে ধান সংগ্রহ করার জন্যে এখন যেমন আপদকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে এগিয়ে আসা দরকার, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আন্তর্জাতিক ও বহির্জাতিক নাস্ত থাকায় এ সরকার আগামী দিনগুলির জন্য কি পরিমাণ খাদ্য-শস্য দেবে তারও চূড়ান্ত হিসাব কাছে রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে প্রয়োজন।

অন্যান্য জিনিষের দাম ক্রমাগত উর্ধ্ব-গতিতে চলেছে। মূল্য স্থিতিশীল রাখার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়; কিন্তু বেশি দাম যারা আদায় করে—তারা কেন তা করছে সেই বিষয়ে সম্যক তদন্ত না কবে গাড়ির পেছনে ঘোড়াকে জুড়ে দিলে যে অবস্থা হয়,

মূল্য স্থিতিশীল রাখার অবস্থাও তাই দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপার ত' আমরা বরাবর লক্ষ্য করে আসছি—পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার ইচ্ছে হলেও কিছুদিন তা বাজার থেকে উধাও হয়, তারপর সরকার দায় বাড়ার ঘোষণা করলে ও তার ওপর ট্যাক্স নির্ধারণ করলে বাজারে সেই পণ্যের পুন-রায় আবির্ভাব হয়। জনসাধারণ কিছুদিন খুচরো বিক্রেতার ওপর চোখ রাখলেও আসল লোকটির পাত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারের ধরা-হোয়ার বাইরে কি সেই মজদুদার ও মূনাফালোভী?

এই সব সমস্যাই এখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। দূর্তাগ্যের ব্যাপার মানুষের অর্থনৈতিক সংকটের বিষয় চিন্তা না করে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যান্বেষী কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করছেন। এ কথা মনে রাখা দরকার, জনসাধারণ নেতাদের এমন অধিকার দেয় নি যে তাঁরা যা ইচ্ছে তাই বলবেন। গণতন্ত্রের অবসানে রাজ্যপালের শাসন বা সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা কয়েক হোক তাও জনসাধারণ কোনোমতেই চাব না। এর প্রমাণ এই যে, অগ্ররিক্ত মানুষ এখনো চোখ বুজে সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে।

এরপরও কোনো কোনো নেতার যদি মনে হয়, তাঁরা যা ভাবেন তা-ই ঠিক তাহলে জনসাধারণ তাঁদের কমা করবে না। জনসাধারণের শারদোৎসবের সংকল্প ও বিজয়ীর জয়যাত্রার কামনা মিথ্যা হতে পারে না।

সম্পাদকীয়

হোজকের মানুষ

পীর-পয়গম্বর তো নন যে সত্য-নিষ্ঠার বালাই থাকবে। ভয়-ভর থাকবে বিচারের দিন সম্বন্ধে। মাপ-জোক্ করে কথা কইবেন বা দেখে-শুনে পথ চলবেন। ইমান রাখার জন্যে জান কবুল করতেও এতটুকু ম্বেধা করবেন না। হুমায়ূন কবি বাজনাতি করছেন, ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতেছেন তিনি; তাঁকে ন্যায়-নীতি নিয়ে মাথা ঘামালে, ভালোমন্দ বিচার করলে চলবে কেন? আজকের দিনে তিনিই তো সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক বিনি নিজেই মতকে আর পাঁচজনের ওপর কৌশলে চাপিয়ে দিতে পাবেন, পাঁচজন সরল লোককে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্যে রাষ্ট্রপতিব্য শাসনরূপ প্রেসক্রিপশন দিয়ে কবির সাহেব কি নিজেই একজন বান্দু রাজনৈতিক বলেই জাহির করতে চান নি? রাষ্ট্রপতির শাসনের কথা বলে অধ্যাপক কবির একটা 'স্ট্যান্ট' বা চমকের সৃষ্টি করেছেন, শুধু এ রাজ্যে নয়, গোটা ভারতের রাজনৈতিক মহলে। কবির দোঁহা ধরেছেন : ফেব্রুয়ারীতে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন, এই কামাস রাষ্ট্রপতির শাসন।

কিন্তু কবির সাহেবকে স্ট্যান্টসব-স্তার অপবাদ দেওয়া হবে না। তাঁর আত্মবিশ্বাস, রাজনৈতিকতা তাঁর গভীর জ্ঞান বিশেষত লোকচরিত্র বোঝার তাঁব যে বিশেষ ক্ষমতা আছে তার পরিচয় তিনি ইতিপূর্বেই দিয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত : নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনিই প্রায় রাজ্যব্যব একমাত্র কংগ্রেস-বিবোধী নেতা বিনি জোর দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, রাজ্যে কংগ্রেসেব পরাজয় ঘটবে, গণ-সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে এখানে।

স্ট্যান্ট বা শস্তা চমক বা বুলিকে তাঁরাই আপন উন্নতি বা স্বাধীনসিদ্ধির পুঞ্জি কবেন, যাঁদের ভিত্তি কাঁচা, গণসমর্থন নেই যাঁদের পেছনে। রাজনৈতিক নেতা হতে গেলে গণসমর্থন বা গোষ্ঠী সমর্থন না থাকলে চলে না। শ্রীকবিরের কি তা নেই? ভোটের ফলাফল যদি জনপ্রিয়তা মাপার নির্দিষ্ট হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে বিপুল জনসমর্থন তাঁর পেছনে রয়েছে। রাজনীতি তো তিনি আশ্রয় থেকে করছেন না। তিরিশ দশক থেকে তিনি বাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সম্পর্কে এসেছিলেন।

তাঁর কৃষক-প্রজা দলের অন্যতম নেতা হলেন। বিদ্বান, গদ্যগদ্যন বলে নেতৃত্বের আসন পেতে অসুবিধা হয় নি কবিরের। সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয়ও দিয়েছেন ছাত্র-বয়েস থেকেই। নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। বিলেতের অক্সফোর্ড ম্যুনিয়ন সোসাইটির সেক্রেটারীও। পালামোটাবিমান-জীবনে তাঁর প্রথম প্রবেশ ১৯৪১ সালে, উচ্চতর পরিষদ বা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ পেয়ে। রেল কর্মচারীরা শ্রীকবিরের কাছে বিশেষভাবে ধনী। ইংবেজ আমলে রেলকর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে তিনি লড়েছেন, সংগঠিত করেছেন সারা ভারতের হাজার হাজার মজদুর-কর্মচারীকে। সারা ভারত রেল বিবোধ (১৯৪৬) সংক্রান্ত সালিশীর তিনি ছিলেন এ্যাসেনব, ভারতীয় রেল



হুমায়ূন কবির

তদন্ত কর্মটিতে তাঁকে সদস্য করা হয় পরের বছরে।

সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর পড়া-শুনো ও প্রজ্ঞা প্রগাঢ়। ছাত্র হিসেবে কবির যাকে বলে 'জুয়েল' তাই ছিলেন। স্কুল-কলেজ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কবিরকে নিয়ে গর্ববোধ করতো। ইংবেজীতে তাঁর দখল অসামান্য বলে বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্মানের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করার পর বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলেত যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি-এ পাশ করে তিনি অধ্যাপনার রত নিনেন। অধ্যাপনা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাইরে এমন কি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিজিটিং প্রফেসরের সম্মান পেলেন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চললো। প্রচুর কবিতা লিখেছেন, উচ্চ-দরের প্রবন্ধ লিখেছেন অসংখ্য।

কিন্তু শিক্ষাজগতে থেকে তাঁর বেশ আশ মিটিছিল না। কিংবা তিনি নিজেই আরো বেশ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে রাজনীতির বঙ্গ-মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রথমে শ্রমিক আন্দোলন। পরে কিন্তু আবার শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়েই ফিরে গেলেন। অর্থাৎ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, শ্রীকবির ছিলেন তাঁর সেক্রেটারী। কিছুকাল তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের সচিব পদেও কাজ করেছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে স্থান পান। প্রথমে অসামরিক বিমানদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৭-৫৮), পরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী। শাস্ত্রী মন্দিরভায় কবিরকে দেওয়া হয় পেট্রোলিয়াম এবং কেমিক্যালস দপ্তর। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত করলেন তখন পশ্চিম-বঙ্গের শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে শ্রীকবিরকেও মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এর পরে শ্রীকবিরের এক উজ্জ্বল, নতুন রূপ দেখা গেল। কংগ্রেস ত্যাগ করলেন তিনি, যোগ দিলেন অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেসে। দলেব একটা বড় অভাব মিলল, তাত্ত্বিক, দার্শনিক তথা ইনটেলেকচুয়ালের অভাব। শ্রীকবির ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইর জন্যে বাংলা কংগ্রেসকে নিত্য-নতুন কৌশল জোগালেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী ফলল, কংগ্রেসের হার হল নির্বাচনে এবং তাঁরই পবামর্শে ১৪টি বিবোধী দল যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেন পশ্চিম-বঙ্গে। নতুন প্রাণের বন্যা বইল। পালামোটে গিয়েও শ্রীকবির বললেন কংগ্রেস এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রেও ক্ষমতা হারাতে।

কংগ্রেস বিরোধিতার জন্যেই শ্রীকবির অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে ছিলেন। আজ তিনিই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কোন মূখে তিনি বলছেন যে একদিন যেমন তিনি কংগ্রেসকে বাজ্য থেকে হটিয়েছিলেন তেমনি প্রয়োজন হলে সেই কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করবেন? অধ্যাপক কবিরের মতো মর্ষাদাসসম্পন্ন লোককে এত অল্প সময়ের মধ্যে ডিগবাজি খেতে দেখে সাধারণ লোক বিভ্রান্ত। তারা জানতে চায়, কবির সাহেব কী চান?



সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর পাঠক-পাঠিকাদের 'বিজয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবারের বঙ্গদর্শন' শুরুর করি। 'বঙ্গালীর জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব এবার যেন নিঃশব্দে এল এবং নিঃশব্দেই গেল, অন্তত বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের জালে আবদ্ধ আমরা-সাংবাদিকরা ঘাইরের প্রকৃতির রং বদলানো দেখা থেকে ঘণ্ডিত হয়েছি। এ কথাটা বিশেষ করে মনে পড়েছে। এই কারণেই যে, প্রতিবার 'টিক-দুর্গা' পূজোর সপ্তাহটিতে আমরা বঙ্গদর্শনের পাতাগুলি-রাজনীতির জঞ্জাল দিয়ে ভরাই না, কিন্তু এবারেই সেই মীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে।

পেশাদার রাজনীতিবিদদের, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক-দের ধন্যবাদ এবার পূজোর কটা দিন শান্তিতে জনসাধারণকে থাকতে দিয়েছেন। শান্তিতে থাকতে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে পূজোর সময় বাজার সস্তা হয়েছে, বরং এবারের যা বাজারের অবস্থা তা' সর্ব-কালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত বছরের ভুলনায় প্রতিটি পণ্যের মূল্য চার গুণ চড়ে গেছে। এই বিষয়ে সরকারের নির্লিপ্ততাও দেখাব মত। 'যে সরকার নিজেকে জন-দরদী বলে পরিচয় দেয় সেই সরকারের অন্যের ডগায় অসামান্য ব্যবসায়ীরা মেজাবে মিনেব পর দিন প্রতিটি পণ্যের দাম চাড়িয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের জনদরদের মুখে। 'সবকার কোথায়?' 'অদৌ তা' আছে কি? কাজেই আমরা এখন দাঁও মাবব না কেন? এক বছরের লাভ আমরা এক মাসেই 'ভুলতে পারছি। এমন মওকা আর কোথায় মিলবে?' এই হচ্ছে ব্যবসায়ী শ্রেণীর সোজা কথা।

তথাপি পূজোর সময় যুক্তফ্রন্টের শরিকরা যে জনগণকে শান্তি দিতে

পেবেছিলেন যে বলো, তার কারণ 'হরা অক্টোবরের ঘটনার পর জনসাধারণের মনে সরকার যে আছে এই 'বিশ্বাসটা ফিরে এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নাটকীয় ঘোষণা যে 'যুক্তফ্রন্ট চলছে, চলবে' জনসাধারণের মনে নতুন আশার কিছুটা সঞ্চার করেছিল। কেন না যুক্তফ্রন্ট সরকারের শত অকর্মণ্যতা এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্ত্বেও লোকে কংগ্রেসকে এখনো হারানো গাঁদিতে ফিরে পেতে চায় না। কাজেই জনসাধারণ, এবং সেই সূত্রে আমরাও আশা করেছিলাম যে, এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক দুর্যোগের পরে হয়ত সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে, হয়ত প্রত্যেকের এবার অন্যান্য হয়ে যুক্তফ্রন্ট প্রস্তাবিত আঠার দফা কর্মসূচী পালনে তৎপর হবেন।

আশা মরীচিকা

কিন্তু আবার বুঝি সেই প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটতে চলল। দোসরা অক্টোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগের সংকল্প পরিচয়গ করবতে সর্বত্র যে স্বস্তির আবহাওয়া দেখা গেছিল, তা' বুঝি এখন আর মইল না। 'মুখ্যমন্ত্রী প্রীতজিৎ মুখোপাধ্যায়কে যুক্তফ্রন্টের অপবাপব শরিকরা কি বুঝিয়েছিলেন 'খোদার মালমে, তবে সংবাদপত্র মারফত যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় তিনি বোধ হয় এইরকম আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, আইন ও শৃংখলা বক্ষার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহুমুখী কর্মে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন এবং যা হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর 'মাতামিত কববেন না। এই সব বিপটি থেকে আমাদের মনে হইবে যে বুঝি মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচলিত এল, এবং এর পর থেকে তাঁরা পারস্পরিক কাদা ছোড়াছড়ি থেকে বিরত

হয়ে নিজেদের আব জনগণের কাছ সার্কাসের ক্লাউন বানাবেন না। কিন্তু আশা মরীচিকা।

দু' সপ্তাহও কাটে নি, মার্কসীয় কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরোর আধিবেশনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রীতজিৎ বঙ্গ ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে 'সংসদ' সরকারের তরফ থেকেই নাকি হ'ল প্রচেষ্টা চলছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই নাকি 'সৈন্যবাহিনী ও বাইবে থেকে অন্য পলিশ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাঠ্য এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানানেন যে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্বই নেই 'তিনি নিজেই তা' আনিয়েছিলেন এবং তা সম্পূর্ণ নিজেই দায়িত্ব। কাজেই এ বিষয়ে খামাকা অন্যকে জড়িত করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

এই বিবৃতি ও পাঠ্য বিবৃতি ফলে আবার একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হল এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে আবার কাবা হোলকুডির পালা শুরুর হল। 'হা ইন্দো এনা কি একটা মূর্ত্তও জনগণের শান্তিতে থাকতে দেবে না? গত দশ মাসে যে যুক্তফ্রন্ট জনসাধারণকে অপর লক্ষ্যে ভিন্ন আন 'কিছু দেখিয়েছে বলে মনে হয় না। এই 'লক্কেটিং' রাজনীতির গ'ঠ এরা কোন ইচ্ছা থেকে নিয়েছেন জানলে হয়ত আমরা দুঃখিত হতাম। নিঃসন্দেহ এবং পোড়ানো ভিন্ন এতে আর ক'র কি লাভ হচ্ছে?

অজয়বাবুর নেতৃত্ব এরা সম্পন্ন করলেন না কেন

অনাবশ্যক জ্যোতিবাব পলিটবুরোর বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে পলিশ-মিলিটারী

মোতাসেন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে সোষারোপ করেছেন, কেন না তারা অস্বাভাবিক স্বীকারোক্তিতে অজয়বাবু খোলাখুলিই বলেছিলেন যে, পুলিশ-মিলিটারী আনয়ন করার দায়িত্ব তাঁরই। হ্যাঁ তিনি জ্যোতিবাবুকেও গ্রেপ্তার করবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

যদি জ্যোতিবাবু এ বিষয়ে এতটাই নিঃসন্দেহ যে, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টকে উচ্ছেদ করা এক ঘৃণ্য চক্রান্তে নিমগ্ন, এবং অজয়বাবু জেনেশুনেই সেই চক্রান্তের সামিল হয়েছেন তাহলে এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নীচতার কাজ যিনি করেছেন সেই অজয়বাবুর মত লোকের নেতৃত্ব তিনি মেনে নিলেন কেন তিনি বা তাঁর দল তো প্রকাশ্যেই বলতে পারতেন যে, যে লোক এই বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে তার সঙ্গে সহাবস্থান অসম্ভব। তাতে হয়ত যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যেত কিন্তু বিবেকের কাছে তারা নির্মল থাকতে পারতেন।

এটা তাঁরা করতে সাহসী হন নি বিশ্বাস্য বাজনৈতিক কারণে। প্রথমত অজয়বাবু যে সব কারণে জিম্মা পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে সত্যতা যে নেই তা নয়। অততঃপক্ষে মধ্যমশ্রী হিসাবে মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যদের কাছ থেকে তিনি যে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন তা যে তিনি পান নি এটাকে সত্য বলে মেনে নিতে অনেকেরই কোন আপত্তি নেই। বিগত সাত মাস ধরে যুক্তফ্রন্টের শরিক রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক খিস্তি-খেউড়ের যে নিদর্শন আমরা পেয়ে এসেছি তাতে মধ্যমশ্রীর এই অভিযোগটি যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত নিজেদেরও চামড়া বাঁচানোর সমস্যা ছিল। যুক্তফ্রন্টের সার্বিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও জনসাধারণের গভীর আগ্রহই তাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং যুক্তফ্রন্ট না থাকলে সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলির অনেকেরই রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অশঙ্কর। অফিসিয়াল লেফট কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পার্টির স্নায়ক এন্ড ফাইলের বারো আনাই নকশাপন্থী, যাদের কাছে বর্তমান নেতৃত্ব নরা শোষণবাদী নামে চিহ্নিত। ফলে এদের এখন শ্যাম রাশি না কাল রাশি বা সাপের হুঁচো গেলার মত অবস্থা না পারেন যুক্তফ্রন্টকে গিলতে না পারেন ওগরতে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে এদের যে কি পার্থক্য তা এরা পার্টির স্নায়ক এন্ড ফাইলকে বোঝাতে সমর্থ হন নি। ফলে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গেলেও সেখানে তাঁরা গ্রহণীয় হবেন না; বিশ্বাসভঙ্গ মার্কিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মাথোই

তাদের থাকতে হবে। আর তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট থেকে তারা বেরিয়ে গেলে যুক্তফ্রন্টের পতন অবশ্যই ঘটবে এবং তারপর যে নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসবে তারা নিশ্চয়ই এদের স্পেলার করবে না। এই কারণেই অজয়বাবুর সমস্ত কীর্তিকলাপ জেনেও তাঁর নেতৃত্ব মানা ভিন্ন কোন গতি নেই। একথা সকল বামপন্থী দল সম্বন্ধেই সত্য।

তবে ইতিমধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যেই আবার পুরোনো কাসাদি ঘাঁটার প্রবৃত্তি যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুই শরিককে পেয়ে বসেছে। এরা আপাততঃ নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে কোন অ-কংগ্রেস-অ-কমিউনিস্ট কোয়ালিশন অজয়বাবুর নেতৃত্ব ছাড়া হতে পারে না, এবং সেই অজয়বাবুই যখন জিম্মা পথে যাওয়া থেকে বিরত হয়েছেন তখন যুক্তফ্রন্ট আপাততঃ আর ওপ্টাচ্ছে না। অতএব পারস্পরিক দোষারোপের পুরাতন পালাগান আবার নতুন করে গাইতে আপত্তি কোথায়?

শুধু কি বাম কমিউনিস্টরাই

কিন্তু একতরফা বাম কমিউনিস্টদের দোষ দিয়েই বা কি লাভ? আসলে রাজনীতির নামে গত কয়েক মাস ধরে যে নোংরা জুয়াখেলা চলছে তার জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা চলে না। এই প্রসঙ্গে পি-এস-পি'র ভূমিকাটিও লক্ষণীয়। ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের পুরাতন অভ্যাসটি এরা এখনো পরিত্যাগ করতে পারেন নি এবং মধ্যমশ্রী-উপ-মধ্যমশ্রীর পরস্পরবিরোধী বিবৃতির সুযোগ নিয়ে এরা আবার রাজনীতির বাজার সরগরম করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিছক কমিউনিস্ট বিশেষকে পুঁজি করে রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা যায় না, শুধুমাত্র কিছুটা উপপাত সৃষ্টি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই সব দলগুলির পারস্পরিক তলার আদৌ কোন মাটি আছে কি? খোলাখুলি বলতে গেলে দেশজোড়া সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরে একমাত্র দুই কমিউনিস্ট পার্টির আছে। বাকি দলগুলির প্রভাবের ক্ষেত্র একান্তই আঞ্চলিক ও ঝাঁজকেশ্মিক এবং কারো ঘাড়ের ভর না করে অন্য দলগুলির নিবীচনে সাফল্যের আশা সুদূরপর্যায়। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আসল সংঘর্ষ হচ্ছে বাম কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের, এবং বর্তমানে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে এই উভয় দলের অবদানই সর্বাধিক।

বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রটি বিশ্বাস্য। এই দলের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা কংগ্রেসে পাড়া না পেয়ে এসে জুটেছে, এবং নির্বাচনের

পূর্বে এই বেনোজিলকে ঠেকিয়ে রাখার সামর্থ্য অজয়বাবুর ছিল না। অজয়বাবুর সমর্থকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাসী এবং মাঝামাঝিভাবে কৃষক-শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে অনুকূল, যদিও তারা কমিউনিস্টদের মত বামপন্থার তুঙ্গে অবস্থান করেন না। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের অপর দিকটি একান্তই প্রান্তিকীর্ণাশীল ও দক্ষিণপন্থী এবং কংগ্রেস থেকে অন্যান্য প্রদেশে যারা বেরিয়ে এসেছেন এবং যারা মতামতের দিক থেকে এদের অনুকূল তাদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বিরোধী পার্টির সত্তার নিজেদের উৎসর্গ করতে রাজী। এই পার্টিটি হচ্ছে ভারতীয় ক্রান্তি দল যার নেতৃত্ব কবিব সাহেবের হাতে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিবরণে যদি আস্থা রাখতে হয় তাহলে এই কথাটা অবশ্যই স্বীকার যে এই নবগঠিত দলের পিছনে বিগ-বিজিনেস আছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করার পিছনে কবিব সাহেবের প্রচেষ্টাও বড় কম ছিল না, গত দু'মাসের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে যা জানা যায়। কিন্তু যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তাঁর অনুগত সদস্যদের যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থনকে সরিয়ে আনবার ভয় দেখিয়ে অজয়বাবুকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন সে কাহিনী বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সকলেই একটি রাজনীতির জুয়াখেলার মেতেছেন, এবং নিজেদের সত্যিগণা জাহির করবার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছেন। এক্ষেত্রে আমরা যুক্তদেবের উপদেশটিই সকলকে দিতে পারি : অপরের চোখের কুটোটি দেখার আগে নিজের চোখের ভিতরে পড়ে থাকা কড়িকাঠটি দেখ।

গলিত শব ও শকুনিরা

বস্তুতই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার যেন একটি গলিত মৃতদেহে পরিণত হয়েছে এবং সেই মৃতদেহের মাংস নিয়ে উদ্বিগ্নদের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরূপী শকুনিরা তার উপর ঝুঁকি পড়েছে। আর কংগ্রেসরূপী শেরালটি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সুযোগের প্রতীক্ষার রয়েছে কোন মওকাদ মড়াটাকে টেনে এনে নিজের গর্তে ঢোকান যায়।

আমরা এখানে কাউকেই ছেড়ে দেব না, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে জনস্বার্থকে পদদলিত করে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির অধিকার কে তাঁদের দিয়েছে? ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে এই মওকাদ যে যা পারো গুছিয়ে নাও,

কেউ জুটেছে, বঙ্গদাদা-প্রমিকদের পিছনে, কেউ জুটেছে জ্যোতদার-মালিকদের পিছনে, এই সূত্রে যে যা পারছে দলের শক্তি বাড়ছে। আগামী নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যে কি দৃশ্যের অভিনয় হবে তা ভাবতে বৃক শূন্যে আছে। ভাগচাষীদের বোঝানো হচ্ছে তোমরা জমির ধান কেটে ঘরে তোল, জ্যোতদার বাধা দিতে এলে তাদের সাবাড় কর, আমরা তোমাদের পিছনে আছি। অপর দল জ্যোতদারদের বোঝাচ্ছে যে আগে থেকে লোকজুটিয়ে ক্ষেতের সব ফসল কেটে এনে ঘরে তোল, ভাগচাষীরা বাধা দিলে গদুশা লাগিয়ে সাবাড় কর আমরা তোমাদের পিছনে আছি। সবটাই প্রতি-রোধ বাহিনী তৈরি হচ্ছে, কোথাও জ্যোত-দারদের, কোথাও বঙ্গদাদারদের, এবং প্রতিটির পিছনেই কোন না কোন রাজ-নৈতিক দল রয়েছে। এই খেলায় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-বাংলা কংগ্রেস-এস-এস-পি সবলেই সমান হিসাবদার। নকশালবাড়ীই বলুন আর চব্বিশ পরগনাই বলুন, সবটাই দুর্ভাগ্যবশত শক্তির সংঘাত ঘটেছে এবং প্রত্যেকের পিছনেই কোন না কোন রাজনৈতিক দল রয়েছে। যেমন নকশালবাড়ীর ক্ষেত্রে বাম কমিউনিস্ট ও এস-এস-পি। অসহায় মধ্যমশ্রেণী কোন শব্দকে চাট্টে আইন ও শংখলা বজায় রাখবেন?

সবচেয়ে কৌতুককর দৃশ্যের তখনই অবতারণা হয় যখনই দেখি সেই বুদ্ধজন্টের শরিকরা কলকাতায় বসে আসন্ন ফসলের প্রকৌশলমণ্ডল নীতি নির্ধারণ করছেন, কৃষকদের বলছেন তাঁরা যেন সরকার প্রস্তাবিত মূল্যেই সরকারকে ফসল বেচে। ওদিকে তাঁদের দলের ক্যাডাররাই গ্রামে গ্রামাঞ্চলে বলে বেড়াচ্ছে যে এক ছটাক চালও সরকারকে দিও না। ফলে ভবিষ্যৎ সহজেই অনশ্রমে। প্রমিকজন্টের ব্যর্থতার শেষ কৃষকজন্টে তোলবার চেষ্টায় সকল দলই কোমর বেঁধে লেগেছে। এখন দেখা যাক কে জেতে কে হারে।

আর সেই সঙ্গে আসন্ন বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলায় ঘণ্টা-আসন্নটিকে জমিয়ে তোলা হয়েছে। পার্টিগনদের আভ্যন্তরীণ সংকটই এই রাজনৈতিক জুয়াখেলায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। মার্কসীয় কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে শিথিলীভূত হয়ে গেছে। আভ্যন্তরীণ সংকট, নেতৃত্বের মন্ডল আঙ্গ বাংলা কংগ্রেসের মধ্যেও প্রকট। এখানে সংঘাত লেগেছে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে অজয় মথোপাধ্যায়ের আর সেই সংঘাতই প্রতিফলন হচ্ছে বাংলা কংগ্রেস ও ভাবতীয় জামিন দলের সম্পর্কে - প্রাপকটি। কবির দ্রুতব্র জীমথোপাধ্যায়ের উপর

অত্যাধিকার বিবিস্ট হয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে একজন জ্যোতি বসুর মধ্যমশ্রেণীও মনে নিতে রাজী।

বীজগণিতের এক্স

কিন্তু এই সকল পেশাদার রাজনীতি-বিদদের চোখে জনসাধারণের স্থান কত-টুকু। মনে আছে আর্থার কোয়েসলারের একটি উপন্যাসে এই পেশাদার রাজনীতি-বিদদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, তোমরা জনসাধারণকে মনে কর একটা বীজগণিতের এক্স, যার অস্তিত্ব তোমরা শুধু মনে নিয়েছ, এবং যা দিয়ে তোমাদের রাজনৈতিক সমীকরণসমূহের সমাধান কর। কিন্তু, ওই এক্সটিকে বোঝবার কোন চেষ্টাই তোমাদের নেই। যেখানে রাজনীতি শুধু মাত্র ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা সর্বস্ব, জনগণের সুবিধা-অসুবিধার প্রসঙ্গ সেখানে একটা গোণ ব্যাপার মাত্র। শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের নাম করে ক্ষমতা দখল করার পর যে মই বেয়ে উপরে ওঠা হয়েছে সেটাকে লাথি মেরে ফেলে দিতে বোম্বহার কারুরই আটকানো নেই।

কংগ্রেস আমলে আমরা এই জীলা দেখেছিলাম। মনে আছে বিগত ১৯৬৬

সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনৈক কংগ্রেসী এম-এল-এ তৎকালীন মধ্যমশ্রেণী-কাছে গিয়ে কাদো কাদো স্বরে বলেছিলেন "স্যার আমার এলাকার জন্য অন্তত কিছু করুন, সেখানে এককণা খাদ্য নেই। আমি সেখানে ঢুকতেই পারছি না।" জবাবে তৎকালীন মধ্যমশ্রেণী ক্লোথের সঙ্গে বলেছিলেন, "তোমাকে ওখানে যেতে কে মাথার দিবা দিচ্ছে? বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।" অথচ ক্ষমতায় আসার আগেও এদের চিত্র দেখেছি, বটিশ আমলেও দেখেছি। কংগ্রেসের সেই বিপুল জনসমর্থন আদেত আসতে কিভাবে ফাঁপ হয়ে গেল। কিভাবে নেতারা জনসংযোগের সকল রাস্তাই হারালেন সবই আমাদের চোখে দেখা।

কিন্তু বুদ্ধজন্টও কি সেই একই আশ্রহনের পথ নিয়েছে? একটাও এমন কোন ক্ষেত্র পাওয়া যায় না যেখানে বুদ্ধজন্ট সরকারের জনদরদী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তাঁরা নিজেরা অত্যাচার করেন নি, কিন্তু জনগণকে কায়দা স্বাধীন হাতে অত্যাচারিত হতে দেখে তাঁরা কোন প্রতি-কার করতে পাবেন নি। অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে গেলেও যেতুক পৌরুষ লাগে তারও কোন পরিচয় এদের কাছ

উৎসবে এবং উপহারে চাই মফতলালের কাপড় কেন না?

যেমন টেকসই তেমন রকমারি রং ও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ডিজাইনে পছন্দমত পাওয়া যায়



মফতলাল

(নিউ শরক, নিউ চায়না, সাসদন, মফতলাল ইত্যাদি)

গ্রুপের দশটি মিলের কাপড়

সর্বদা মিলের নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায়

সুবিধা দরে কাটপিস পাওয়া যায়

একমাত্র মনোনীত রিটেল শো-রুমস্—

উত্তর কলিকাতায়

পার্বতী স্টোরস

২৭, গিরিশ এভিনিউ (যতীনমোহন এভিনিউ ও ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ-এর সংযোগস্থলের নিকট) কলিকাতা-৩

(৫৫-৯৫০৮)

বাল রুট ১-২বি, ১ এবং ৩২ নম্বর বাসে রাজকল্যাণপাড়া স্টপেজে নামুন।

দক্ষিণ কলিকাতায়

গড়িয়াহাট সোসাইটি

পি- ১১, গড়িয়াহাট রোড,

গোল পার্কের নিকট

কলিকাতা-২৯ (৪৬-৭৪০৮)

থেকে পাওয়া যায় নি। নারীসুলভ কলহপ্রিয়তা ও অপর দলকে দোষারোপ করার সহজাত প্রবৃত্তি ভিন্ন এরা আর কিছুই অধিকারী হন নি।

জনসাধারণের বহুদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার যৌদীন ক্যামেম ছিল সেই সরকারের সেদিনের ইমেজের সঙ্গে আজকের ইমেজের এই দূতর ব্যবধান কেন? গত সাত মাসে প্রতিটি পণ্যের দাম চতুর্গুণ হয়েছে, সরকার নির্বিকার কেন? এ পর্যন্ত একজনও কালবাজারীকে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রেরণ করেছিলেন কি? আজ তো প্রতিটি পণ্যের বাজারই কালোবাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন পণ্যেই নির্দিষ্ট মূল্যমান নেই, যে দোকানদার যে রকম ইচ্ছা দাম হাকি, ইচ্ছা হয় নাও, না ইচ্ছা হয় চলে যাও। প্রতিবাদ জানিয়ে কোন ফল নেই। পুলিশকে জানালে পুলিশ আসবে না। কংগ্রেসী আমলে লোকে গভর্নমেন্টকে ভক্তি না করুক কিছুটা ভয়ও করত, এখন সে সবার কোন গাঠই নেই, সরকার আছে কি না কেউ জানে না, মন্ত্রীরা নিজেরাও জানে না। যুদ্ধের পরে তাঁরা আছেন কি না।

রাইটস' নিউজপেস কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, মহাকরণের ভিতরে কোন চাপল্য নেই। পদস্থ কর্মচারীরা নামেমাত্র হাজিরা দিচ্ছেন, করণিকমহল তো

একেবারেই নিশ্চুপ। প্রতিটি জেলায় সরকারী অফিসগুলিতেও কাজকর্ম শিকের উঠেছে। ফাইলগুলো আর এ টেবিল থেকে ও টেবিলে যায় না। একেই কি নৈরাজ্যবাদ বলে? সারা দেশব্যাপী সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের গোঁষাবারো হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের একটি বেলঘরিয়া আজ সর্বত্র উৎকীর্ণিকি ঘরছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যে আজও বহাল রয়েছে তার একমাত্র কারণ জনসাধারণের মধ্যে এখনো কংগ্রেসবিশেষ আছে, নতুবা আর তিলাধিকাল থাকবার কথা নয়। কোন মন্ত্রীই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন না, সবাই গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার আসীন হবার পর জিনিসপত্রের দাম কমে আরম্ভ করেছিল, অসাধু ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরিত্র বুঝে নিয়েছে, বুঝতে পেরেছে যে এরা চোঁড়া সাপ, শৃঙ্খল ফোস ফোসই করতে পারবে, দংশন করার ক্ষমতা নেই। খাদ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আছেন, অথচ যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে যোগদান করেন না বা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। একটা বাস্তব-সম্মত প্রাদানীতি আজও পর্যন্ত তাঁরা গড়ে তুলতে পারলেন না। স্বাধীনমন্ত্রী ফতোয়া দিলেন ডাক্তারদের সাত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, ডাক্তারেরা তাঁর নির্দেশকে

বৃথাগুণ্ঠে প্রশর্শন করলেন। নাতকে কার্যকরী করার মত শক্তি ও যোগ্যতা তাঁদের নেই তাঁদের মধ্যে বড় বড় বৈদ্রবিক বুলি শোভা পায় না। শৃঙ্খলায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করলেই সমস্যা মেটে না, লোকও আর ওই একঘেয়ে বুলি শুনতে নাযায়। তিলে তিলে প্রত্যাশার অপমৃত্যু দেখতে দেখতে জনসাধারণের মনে যে নৈরাশ্যবোধ এসেছে তা বুলি আর দূর করা যাবে না। এই অবস্থাটা যে কেন যুক্তফ্রন্ট নেতারা বুঝতে পারছেন না সেটাই আমাদের বৃদ্ধির অগম্য। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বার্থ হবার ফলাফল যে কতদূর সুদূরপ্রসারী হবে, এবং সেই ব্যর্থতার ফলে নতুন যে নেতৃত্ব আগবে তার প্রতি-ক্রিয়াশীল চরিত্রটি নিশ্চয়ই আজকের বামপন্থী নেতাদের অজানা থাকবার কথা নয়, এবং তার তোড়ে বর্তমান বামপন্থী দলগুলিও যে ভেঙ্গে যাবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং সেটারই সম্ভাবনা অধিক। এখনো সম্মত আছে সাবধান হবার, এখনো যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার দলাদলি ভুলে তাঁদের বোঝিত আঁটার দফা কর্মসূচী পালনে তৎপর হন তাহলে তাঁরা আবার জনগণের আস্থা ও রাজনৈতিক স্খামিষ্টি ফিরে পাবেন। একটাও ভাল কাজ অতীতের অনেক ভিত্তি কাহিনীকে ভুলিয়ে দিতে পারে।



যদি আগনার কোন লাভজনক গরীবানা,
প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান এবং
আবশ্যকীয় দক্ষতা থাকে



আমরা আগনাকে অর্থসাহায্য
করব যাতে আগনি নিজের
ক্ষুদ্রায়তন শিপের গুণন করতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য কাছাকাছি স্টেট
ব্যাঙ্কের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

সকলের সেবায় স্টেট ব্যাঙ্ক

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

সাহিত্য জীবন যৌনতা

একজাতীয় নিষিদ্ধ বইয়ের কথা শুনেছি বা গোপনে কলকাতার এক পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় শহরে বিক্রি হয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত পাঠকমহলে নাকি এর সমান চাহিদা। মধ্য-কলকাতার কোন কোন-অঞ্চলের কথা শুনেছি, যেখানে এ বইগুলি বিক্রি হয়। বছর পনেরো আগে আমার এক বন্ধুর হাতে অল্প সময়ের জন্য একবার এ ধরনের একটি বই এসেছিল। তার কাছে বইটির মারাত্মক চেহারা-চরিত্রের কথা শুনে-ছিলাম। দীর্ঘকাল ধরে সম্প্রতি সেই বন্ধু কারোকে আমার কাছে এসে-ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি সমকালীন কথাসিঙ্গের উল্লেখ করে বললেন, তাই মাঝে মাঝে এমন সব গল্প উপন্যাস চোখে পড়ে, যিব্যবস্থাতে ও প্রকাশতলপীতে বা নিষিদ্ধ কুখ্যাত বইকেও হার মানায়। তারপর হেসে বললেন, কলকাতা পড়ার সময় যে-জাতীয় জঙ্গল বই মা-বাবার চোখ এড়িয়ে পড়েছে, এখন তার চাইতে শতগুণ জঙ্গলী রচনা অবলীলাক্রমে সাহিত্যকৃত বলে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজের সমাদর পাচ্ছে।

বন্ধুর কথামতে ফেল ফটে উঠল। বললেন, মধ্য-কলকাতার যে-সব নিষিদ্ধ বই বিক্রি হয়, বোধ করি তাদের পাঠকসংখ্যা কমে এসেছে, কারণ এখন খোলাখুলিভাবেই ও-সব জিনিস তথাকথিত সাহিত্যপট-পটিকার মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। আর এই নিষিদ্ধ বইগুলির লেখক কারা এখন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

বন্ধুর কথার ভাষাতে হয়। আশ্চর্য, দশ-পনেরো বছর আগেও বাংলাদেশের কথা ভারতবর্ষের এই দুর্দশা ছিল না। দেশে তখনও রুচি শালীনতা-বোধ ছিল, জঙ্গলী বইয়ের পাঠক নিজেকে মনে মনে অপরাধী বোধ করত। আর আজ! জীবনের অন্য নাম যৌনতা, সারা দেশ জুড়ে sexercise-এর কুৎসিত বাহ্য। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, সংস্কৃতির ধারক-বাহকগণ, সমাজরক্ষীরা নিশ্চিন্ত নিষ্প্রতিবাদ। এক-এক সময় প্রশ্ন জাগে, দেশব্যাপী এই সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের পিছনেও রাজনীতির হাত আছে কি না;

এবং চন্দ্রশুভ্র প্রায় নিঃসন্দেহ একটি দুর্দ-স্তর অঙ্গ নৈশ্চল্যে দেশকে সাংস্কৃতিক সংকটের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এই সংকট মোচনের মহান দায়িত্ব কাদের? রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষিত মহাজন বা সমাজের উচ্চ বাসিন্দারা এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন এমন কিংবদন্তি চন্দ্রশুভ্রের নেই। অতএব তাঁর একমাত্র আশাভরসা জনসাধারণ, যাদের শ্রুতবুদ্ধিতে চন্দ্রশুভ্রের গভীর জ্ঞান।

গত সংখ্যার অবসরে প্রান্তবন্ধকদের জন্য একটি মৌল প্রশ্ন উপস্থাপন করে-ছিলাম: অপ্রান্তবন্ধকদের ধর্মাসিক স্বেচ্ছায় জন্য তারা তাঁদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করছেন? অপ্রান্তবন্ধকদের কোন আচরণকে জন্যার বলে ঘোষণা করার পূর্বে তাঁদের আত্মনিঃসন্ধান করা উচিত নয় কি? যৌবনেদগমের বিভিন্ন মুহূর্তগুলিতে কিশোর-কিশোরীদের যদি ব্যাপক উপচারে বৌন-উত্তেজক রচনাবলী বা চিত্রাদি পরিবেশন করা হয়, তবে তার ফল কি হতে পারে তা অজ্ঞেই অনুমেয়। অথচ আজ পথে-ঘাটে মত্তে-বেতরে সিনেমার সাহিত্যে সর্বত্র সেক্সের সংক্রাম। শুল্ক-কলেজের ছেলেমেয়েরা এ সব জিনিস দেখবে শুনবে, অথচ কিছু বলবে না করবে না, এ আশা মতের, প্রকৃতিস্বের নয়। বেড়ালের নাকের সামনে মাছ দোলাব, ম্যাও করলেই বেড়ালকে ঠেঙাব এ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে চন্দ্রশুভ্র তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আমাদের সংস্কৃতিস্থান প্রবীণর বর্তমান পর্বন্ত না সাংস্কৃতিক দূর্নীতির অবসান ঘটাতে পারছেন, ততদিন পর্বন্ত কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের নিন্দা করার কোন অধিকার তাঁদের নেই।

যে-কথা বলছিলাম। জীবনে সেক্সের অন্তিম অবশ্য-স্বীকার, কিন্তু জীবন ও সেক্স নিশ্চয়ই সমার্থক নয়। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়, তবে সে দর্পণে শব্দ সেক্স প্রতিবিম্বিত হবে কেন? যে-রচনার আবহমান জীবনের হাসি-কান্নার হারা-পাজা দর্শিত হয় না, তা আর বাই হোক সাহিত্য নয়। যৌনজ্যোতিষিক রচনা যদি যৌনতাভিষারী না হতে পারে, তবে

তা কাদের বিচারে সাহিত্যের ঘরান পাবে না। সাম্প্রতিকের প্রচারনৈশ্চল্য অসাহিত্যকে সাহিত্যের আসনে বসাতে গিয়ে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে।

কথাগুলি নতুন কিছু নয়, তবু গম্য-মান বাংলা সাহিত্যের শিল্পী ও পাঠকদের নতুন করে শোনার প্রয়োজন হয়েছে।

অবাক লাগে যখন দেখি, পর্বন্ত অর্থ-কীর্তি-কর্মতার অধিকারী হয়েও কিছুসংখ্যক প্রবীণ সাহিত্যপ্রস্তুতা যৌনতার মোহে কান্ড-কলমের অপব্যয় করছেন। প্রশ্ন জাগে, কেন এরা এ কাজ করছেন? বিকৃতমূর্তি তরুণ লেখক ও পাঠকদের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য? আর্থিক লাভের জন্য? সমালোচনার মাধ্যমে অধিকতর আত্মপ্রচারের জন্য? কোন একটি নয়, সম্ভবত বিভিন্ন কারণেই করেকজন প্রবীণ সাহিত্যিক আজ শিং ভেঙে বাহুরের দলে ভিড়ছেন বা ভিড়তে চাইছেন, বাহুরেরা স্বদেশ টেনে আড়ালে হাসছে, বড়োর সাধ দেখে না।

তরুণদের অপ্রীতিভাজন হওয়ার আশংকাতেই আজ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সাহিত্যিকরা সাহিত্যের টিপছাপে সমস্ত জঙ্গলীলতা মেনে নিচ্ছেন। মুখে ভীরা জঙ্গলীলতার বিরোধী, লেখার ভীরা নিষ্প্রতিবাদ। তারালক্ষ্যক বন্দ্যোপাধার বা প্রেমেন্দু মিত্রের মতো নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিকদের কাছে বাংলাদেশ তাহলে কি আশা করে? যে-তরুণ কথাসিঙ্গপী অকারণ অর্থহীন যৌনতাকে নিরাপত্ত বলব করছেন, তারাসংস্কর বা প্রেমেন্দু মিত্র কি তাঁকে স্বধর্মে কিরিয়ে আনার শূভ চেষ্টা করতে পারেন না? অন্য সহকর্মীর সমালোচনার অপব্যয়্য করতে পারেন পথপ্রদর্শক সেই শিল্পী, কিন্তু তারালক্ষ্যক প্রেমেন্দু মিত্রের উপদেশ-পরামর্শে এ ধরনের লক্ষ্য অনুপস্থিত।

সাহিত্যিকদের দরজায় নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয় পাঠকদের কাছে। সেকালে সাহিত্যিক পাঠকসৃষ্টিতে মৃদা ভূমিকা নিতেন, একালে পাঠকরাও সাহিত্যিক-সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। রামবাবু যদি দেখেন সাহিত্যের মোড়কে তাঁর অসাহিত্য বাজারে বিকোতে শুরু করেছে তাহলে তিনি এক সময়ে চাহিদা মেটাতে গিয়ে মোড়কটুকুও ফেলে দেবেন। এ ক্ষেত্রে রামবাবুর চরিত্রহীনতার জন্য পাঠকরাই কি মৃদাত দায়ী নয়? বিবেকের নির্দেশে পাঠকরা যদি রামবাবুর বই না কিনতেন রামবাবুকে নিয়ে আলোচনা না করতেন, তবে একসময় রামবাবু তাঁর রচনার মোড় ফেরাতে বাধ্য হতেন। শেষ পর্বন্ত রামবাবু একাই পাঠকরচিত ক্ষতিকারক হলেন না, রামবাবুর সংক্রামক জনপ্রিয়তায় একাধিক রামবাবু উপ-রামবাবু সাহিত্যের

সাংস্কৃতিক বন্দনতী

আসরে নেমে পড়লেন, ফলে সাহিত্য এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি কুৎসিত ক্ষতান্ত হয়ে পড়লো।

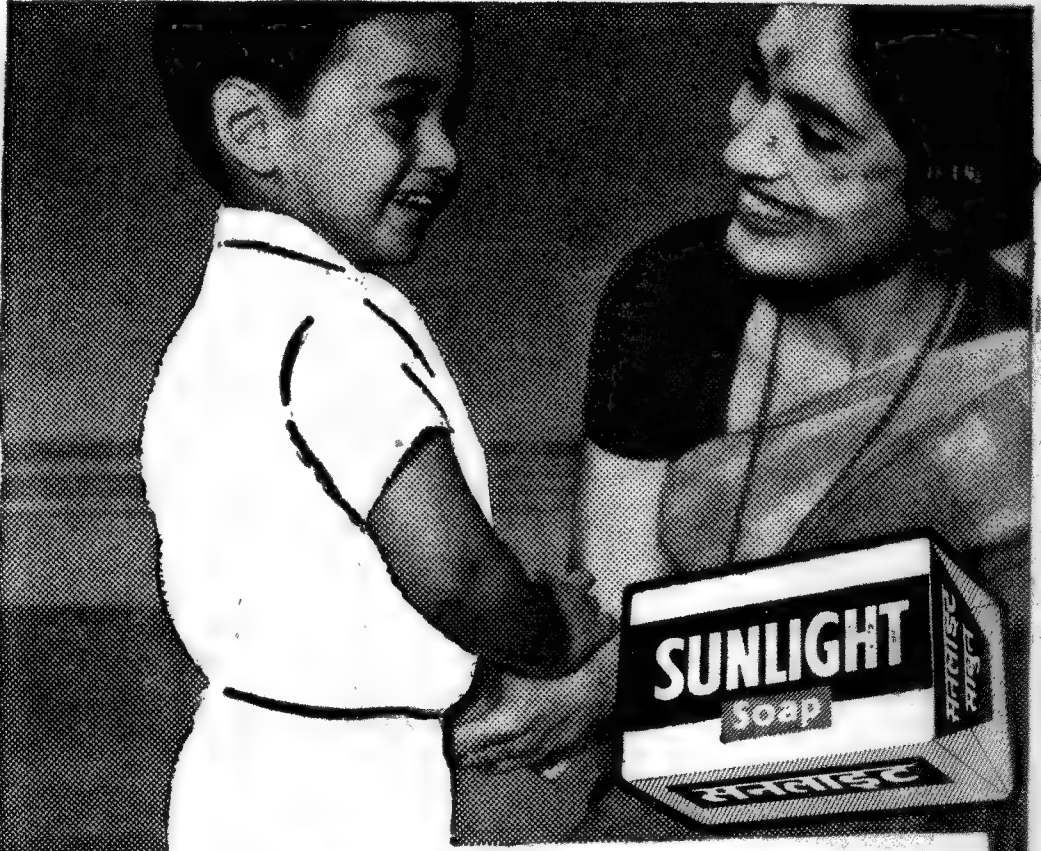
সন্দেহ নেই, বর্তমান বাংলা সংস্কৃতি প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলাময়ন-রচনার বন্যা ভয়াবহভাবে বিপদ-লীলা অতিক্রম করতে চলেছে। আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই তবে আমাদের আত্মিক মৃত্যু অনিবার্য। অবিলম্বে

প্রয়োজন সম্প্রদায় শক্তির। বাংলাদেশে যে জনসাধারণ স্বতন্ত্রতার জন্ম সম্ভব করেছেন, তাঁদের কাছে চন্দ্রগুপ্তের বিনীত আবেদন, তাঁরা অবিলম্বে সর্ববিধ কলাময়ন-রচনার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ গড়ে তুলুন। ইতিমধ্যে ভিন্ন ক্ষেত্রে খেরাও মাওয়াইয়ের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খেরাওয়ার সঙ্গে পোড়াও নামে আর একটি মাওয়াই যুক্ত

হোক। অযৌক্তিক অশ্লীল অসাহিত্য রচনা করে খারি অহরহ পাঠকদের বিভ্রান্ত ও অপমানিত করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন তাঁদের খেরাও করা হোক আর তাঁদের অপরাধ-গুণি তাঁদের বাড়ির সামনে কিংবা কোন বড় রাস্তায় জড়ো করে পোড়ানো হোক। খেরাও-পোড়াও নীতিই সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য অবসানের একমাত্র পথ বলে চন্দ্রগুপ্তের আন্তরিক ধারণা।

সানলাইটে

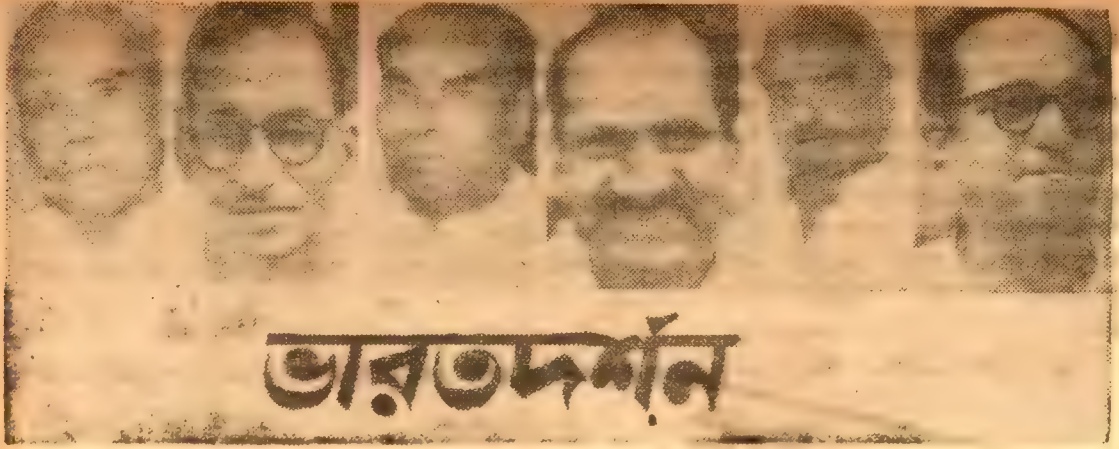
প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে করে কাচে



সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'বে

ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অল্পস অল্পস কেনা হবে, আর সেই কেনা কাপড়চোপড় অন্যায়সে মন্দের পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

**সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন**



উত্তরপ্রদেশের পাকত্যাগী সন্তান

জাতীয় সংহতি

ভারতের রাজ্যে রাজ্যে, দলে দলে এবং দলের অভ্যন্তরে স্রান্ত নেতৃবৃন্দের দরুন জাতীয় সংহতিনাশক ক্রিয়া-কলাপ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংহতিরক্ষার নামে বক্তৃতার খই-ও ঠিক সেই পরিমাণেই ফুটেছে ছড়াচ্ছে ফাটছে।

জাতীয় সংহতি দিবস নামক একটি টাঙানো সাজানো কাল্পনিকের তারিখ উপলক্ষে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই আন্তরিকতাহীন বক্তৃতাসর্বস্ব আহ্বান বারো মাসে চেতনা পার্বণের মতো এদেশে তারে-বেতারে ছাপার হরফে জানানোকেই বঙ্গে নেতা-মূলত দায়িত্বপালন। সেই দায়িত্বপালনে কোনো ত্রুটি রাখেন না আমাদের নেতারা। ত্রুটি রাখেন নি প্রধানমন্ত্রীও।

তার সংহতি বিষয়ক বক্তব্য মূলত চীনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার অবশ্য মূল সমস্যাকে বড়িচাপা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংহতি দিবসে আমাদের প্রধান চিন্তা যেখানে হওয়া উচিত খণ্ডিত-বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসঙ্গে গ্রন্থিত করার জন্য সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে আসা; যেখানে নিজে একাবল্যভ্রমে বলশালী হলে বহিঃশত্রু বিভাজন যে আশঙ্কক নিয়মেই মূলত কামা; সেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রচারই মূলত কামা, সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মূল বক্তব্যকে অপ্রধান বক্তব্যের ভায়ে নাকচ করেছেন।

চীন আক্রমণের সময় ভারতীয় একা কেমনভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল তিনি সেই স্মৃতির রোমন্থনে খুশি হতে চেয়েছেন। কিন্তু এ প্রশ্নটি গোণ। বহিঃশত্রু গৃহের স্বারদেশে উপস্থিত হলে বিবাদমান গৃহবাসী এক হবেই নিজের নিজের ধনপ্রাণ রক্ষার্থে। সেটাই একমাত্র সংহতির মনোভাবকে প্রকাশ করে না।

সংহতির জন্য আমরাও বারম্বার কহিঃ-শত্রুর আক্রমণ নিশ্চয় আকাঙ্ক্ষা করি না। জাতীয় সংহতি সীমান্ত আক্রমণ নিরপেক্ষ একটি জাতীয় চেতনা, সংহতি দিবসে সেই চেতনাকে জাগরু করি, দরম্বর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সমস্যাটিকে ছুরিয়ে নাক দেখানোর মতো করে উপস্থাপন করেছেন, যা অর্থীদের ঠিক মনপড়ে নয়।

সংহতির প্রশ্নে আমরা এক জাতি এক প্রাণ একপ্রাণ কহাই কহব। এ সংহতির বন্ধন চীন বা পাকিস্তানের আক্রমণের খেসারতে লাভ করতে যাব না। অর্থাৎ জলরে স্বচ্ছভাবেই দেখব, জল ছোলা করে আমাদের কর্তব্যকে অপরের চাপে স্বীকার করতে যাব না।

সংহতি দিবসে আসল সমস্যাকে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় গুরুত্ব দান করেছেন। বসেছেন: আভ্যন্তরীণ শত্রুরাও বিপাকজনক। গুরুত্বরূপ শত্রু মৈত্রীশা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, আঞ্চলিক স্বার্থবর্ধন। সংহতি চেতনাকে বিনষ্ট করে। প্রধানমন্ত্রী, সৌভাগ্যের বিষয়, এই সব আত্মহননকারী মনোভাব বজ্রমেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

আসলে জাতীয় সংহতির জন্য প্রধান করণীয় ঐগলিই আর সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারী নীতিগলিও এমনভাবে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন কদম্বা উপরোক্ত কতবা সম্পাদনা ব্যাহত না হয়ে স্বরাশ্রিত হয়। সরকারের কর্তব্যরূপে তারে-বেতারে আহ্বানটাই কয়েকটনয় বরং এসক মূলোহীন ফালতু বাগাড়ম্বর। সরকারকে জাতীয় সংহতির অন্বেষণে দেশের আবহাওয়া জৈয় করতে হবে।

কিন্তু আমরা সে দিকও মাড়তে চেষ্টা না আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারী নীতিগলি রূপায়ণের কালে।

‘হিন্দী’ নিয়ে তামাম হিন্দুস্থানে যে লেঙ্কা-বিদ্বেষের জন্মনান করা হয়েছে তার গর্ভধারিণী কি এই কেন্দ্রীয় সরকারেরই

অহেতুকভাবে ব্যস্ত বাগ্গ হিন্দীভাষা নীতি নয়? আমাদের পার্বত্য জাতিদের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় গড়িমসিই পরতীয়াদের মতো সংহতিবিরোধী চেতনাকে পরোক্ষে উদ্বেষ করে ফুটে না? রাজ্যে রাজ্যে অসম কণ্টনের নীতি অনুসরণ করে অব-হেলিতে রাজবাসীর মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করার দায়িত্ব কি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বত্বদেশ? থেকে থিনা বিভক্ত নামিয়ে দেওয়া সম্ভব? কাপোর ব্যাপারে উদ্বেগ ও হাটতি রাজ্যের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির চেতায় কল্পা অগ্রহ প্রকাশ না করে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করার দ্বারা আন্তঃরাজ্য সংহতি চেতনাকে কি কেন্দ্রই নষ্ট করছে না?

শত্রু সরকারই বা কেন; তথাকথিত ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিও কি বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যস্বার্থকেই জনপ্রিয়তার লোভে মদত দিয়ে সংহতিবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন না? বিভিন্ন দলের দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রু আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যেই ভীরা; রাজনীতির প্যাচ কয়ে ক্ষান্ত নম, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেও ন্যাকারজনক জেনবুদ্ধির সঞ্চার করে থাকেন। কুটিল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সামগ্রিক সংহতিকে অবাধে ঘাঁরা এইভাবে হত্যা করছেন দিনের পর দিন তারা কেন স্নেহ এবং কোন উদ্দেশ্যে শূন্যে সংহতিবিষয়ক বক্তৃতার মালিকা রচনা করেন তা দুর্বোধ্য। জাতীয় সংহতি জিনিসটা কোন ব্রোডমড অস্ত্র নয় যে প্রয়োজনমাত্র ফরমাগেস, করলেই জনমনে ভর, রসক্ষরণ হতে থাকবে, বহু সাধনায় ভিত্তিকার এবং স্বার্থভাগের মধ্য দিয়ে এই মহাশক্তিকে অর্জন করতে হয়, এ জিনিস কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ।

জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে আমরা তাই উঠে আহ্বান জানাই (জন-গণের তরফে) সেই সমস্ত কুটিল রাজ-নৈতিক স্বার্থাশ্রয় দলমতকে ঘাঁরা জাতীয়

সামাজিক কলমে

সংহতি হ্রাস করেও দেশের প্রভাব বৃদ্ধি-
টাকেই মূখ্য কর্তব্য বলে গণ্য করেন।
তাদের ও তদীয় নেতাদের আহ্বান
জানিয়ে বলি: আসুন, দলীয় এবং উপ-
দলীয় স্বার্থ সময় ও অবস্থা বিশেষে
ত্যাগ করে জাতীয় সংহতির জন্য চিন্তা
এবং কাজ করি। দেশসেবাই যখন
আপনাদের পেশা, অর্থাৎ দেশসেবার নামে
গদি দখলই যখন আপনাদের কেরিয়ারের
একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তখন দেশ নামক
বস্তুটিকে জিইয়ে রাখবার জন্যই দলীয়
স্বার্থেও জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর করে
তোলার কাজে আপনাদের এগিয়ে আসতে
হবে। অন্যথা বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল একটা
দেশের গদি নিয়েও শেষে তা রক্ষা করতে
মহা বেগ ও উন্মেষে সময় অতিবাহিত
করতে হবে। স্বর্ণভিষের লোভে
ডিম্বপ্রসাবীকেই অজানতাবশত বতর
করে ফেলবেন না! জাতীয় সংহতি
দিবসে দল-উপদল এবং নেতাদের কাছে
সামান্য আলোকপ্রাপ্ত দেশবাসীর এই
অ-সামান্য প্রার্থনা।

আশান :

নাশকতা

নাশকতামূলক কার্যকলাপের দ্বারা
ট্রেনগাড়ি লাইনচ্যুত করে নিরপরাধ যাত্রী-
দের প্রাণহরণের অনেকগুলি ঘটনা ইতি-
পূর্বে ঘটে গেছে, পাতিল সাহেবের রেল
দপ্তর কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তর এই
নাশকতামূলক কার্যকলাপকে পর্বদলিত
করতে পারে নি। সম্প্রতি আসামে
কতিপয় অজ্ঞাতপরিচয় বড়বন্দুককারী যে
নাশকতামূলক কার্যক্রম লিঙ্গ হরেছিলেন
এবং বিস্ফোরকের দ্বারা আসাম সেক্রে-
টারিয়েট ভবন উড়িয়ে দিতে প্রয়াস পেয়ে-
ছিলেন, এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ারমাত্র বিশ্বে
এবং বিতর্কিতকার সমগ্র দেশ হতভাক হয়ে
পড়েছে। বড়বন্দুকীরা এমনভাবে বোমা
লাজিয়েছিলেন যা তেমনভাবে বিস্ফোরিত
হলে মন্ত্রীদের কক্ষগুলি উড়িয়ে দেওয়া
যত এক বলাই বাহুল্য করেকজন মন্ত্রী-
কেও অসমীয়াগণ চোখের জলের সঙ্গে
ছায়াতে বাধ্য হতেন। সৌভাগ্যত তেমন
ঘটনা দৈববশতই ঘটে নি। কিন্তু
অবাক হতে হয় সেক্রেটারিয়েটের সিকিউ-
রিটি ব্যবস্থার বহর দেখে। আসাম ও
কংপান্সবর্তী অঞ্চলে নাশকতামূলক
কার্যকলাপ নতুন কোন ব্যাপার নয়। নাগা
মিজো সমস্যার সঙ্গে এ সমস্যাও
গাভানোই আছে। বিশেষ, সেক্রেটারিয়েট
দুর্ঘটনার পূর্বে দিনই পূর্তবিভাগের
মহকুমা অফিসারের অফিস ঘরটি উড়িয়ে
দেওয়ার বড়বন্দুক চৌকিদারদের তৎপরতার
ধরা পড়ে। এর পরেও যে সেক্রেটারিয়েট
ভবনের সিকিউরিটি ব্যবস্থার শৈথিল্য
থেকে গেছে এটা বলাই বাহুল্য।
মিজো সম্প্রদায়বাদের নাশকতামূলক

চক্রান্তের সংবাদও যখন ইতিপূর্বেই কিছু
কাগজপত্রে ধরা পড়ে তখন সাবধান হওয়ার
আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

ডঃ লোহিয়া

আমরা সেই ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর আর
শুনতে পারো না।

যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তা
সে যার স্বার্থই অনুরোধিত হোক না কেন,
ডঃ লোহিয়া তারই বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে
সোচ্চার হয়ে উঠেন। অপচয় এবং
অনাচারকে তিনি আন্তরিকভাবে তীব্র
ঘৃণা করতেন। দারিদ্র্য বিমোচন করে
বিশাল ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক
দেশে পরিণত করার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডঃ লোহিয়া
ত্যাগ করতে পারেন নি। মহারাজা
গদানক এই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার
জন্য তাঁর আমরন বৃদ্ধ ডঃ লোহিয়াকে
দরিদ্র কল্যাণে দেশে এক বিশিষ্ট দেশ-
সেবকের প্রতিষ্ঠা দান করেছে। ডঃ
লোহিয়া বৃকোঁছিলেন, এ হতভাগ্য দেশ
আপনার ভালোটি যথার্থ বোঝে না,
বুঝতে চায় না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও
তাই এখানে বহু সাধনার কাজ। কিন্তু
ডঃ লোহিয়া এজন্যই একটি ঘরিত সমা-
ধানের দ্বারা দেশের পর্বতপ্রমাণ অসম-
বন্দনের অন্যায় থেকে দেশবাসীর মুক্তি
চেষ্টাছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, দেশে
ব্যক্তিগত আরের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে
দিয়ে ভোগের ও দুর্ভোগের সীমানাকে
ছোট করে আনতে। কিন্তু অনুসারীদের
ওপর তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ার কর্তব্য
ছেড়ে দিয়ে একপ্রকার অকালেই তিনি
পরলোক যাত্রা করলেন। এ কতি
আমাদের তাঁর আদ্যাত হেনে গেছে।

ডঃ লোহিয়ার স্মৃতির সঙ্গে তাঁর
আদর্শনিষ্ঠা এবং নির্ভীকতা চিরজীবী
হোক!

উত্তর প্রদেশ :

ভাটনের মূলে স্বতন্ত্রতা

প্রীচরণ সিং-কে যুক্তরাষ্ট্র করে উত্তর
প্রদেশে যে স্বতন্ত্র সরকার গঠিত হয়েছিল
এতদিনেও জনগণের সরকাররূপে জন-
হিতকর কোন পরিকল্পনা রূপায়ণে সেই
ফ্রন্ট সরকার সাফল্য অর্জন করতে
পারেন নি। বরং ভাতার দাবিতে যে
দলবদ্ধ সরকারী কর্মীরা আন্দোলনে নেমে-
ছিলেন জনগণের সরকারের বেশ ধরে এই
ফ্রন্ট সরকারই আজ পর্বত ভাঁদের
কায়াস্তরালে আবদ্ধ রেখেছে। এই ফ্রন্ট
সরকারের আমলই কালাগড়ে চরম
পুলিশী নৃশংসতা হয়ে গেছে যার জন্য
কোন বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিকেও
সরকারের শরিকদলগুলি আমল দেন নি।
সরকার গঠনের সময় জনগণকে ফ্রন্ট যে
কিছু প্রতিশ্রুতি দান করেছিল চরণ সিং

তার কথাগুণ্ডও পালন করতে পারেন নি।
অথচ তখনও গদি আঁকড়ে জনস্বার্থ ও
সুবিধাবাদী প্রাজ্ঞ কংগ্রেসীদের শরীরের
উত্তাপ মেখেই সহাবস্থান করছিলেন
সমাজতন্ত্রী এবং দক্ষিণী কমুনিস্টরা।

তাই সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময়
জাগতে পারে এই ভেবে যে, গদির জন্য
যে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী এবং দক্ষিণী
মার্ক্সিস্টরা জনস্বার্থের মতো দলকেও
বরদাস্ত করে নিয়েছিলেন, চরণ সিং-এর
মতো দলত্যাগীকে নেতা বানিয়েছিলেন,
আজ অকস্মাৎ তাঁরাই ঘটা করে পদত্যাগ
করতে এমনভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন
কেন। যে সরকারে জনস্বার্থের মতো গোড়া
দক্ষিণপন্থীদের দাপট সমাজবাদীরা কি
সেই সরকারের কাছে সত্যই কিছু আশা
করেছিলেন! ভারতের অপ্রস্তুত নাগরিক-
বৃন্দ ভৌটিকার প্রয়োগে দিশাহারা হয়ে
জনস্বার্থবিরোধী দল-উপদলের মধ্যে
ভেঁট বটন করে দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে
কিন্তুত সরকার বানাতে চাইছেন। সুসভে
গদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় রাজনৈতিক দল-
গুলিও কি গদি নিয়ে একই ভুল করছেন?
আর গণ-আন্দোলনকেই পশ্চাদদৃষ্টী করে
দেবেন?

আজ হঠাৎ সমাজবাদী নামে কথিত
কতিপয়ের টনক নড়ল আর উত্তর প্রদেশে
মন্ত্রিসভা সঙ্কট দেখা দিল। এ সবই তোকা
রাজনৈতিক ভানুমতীর খেল নয় কি?
সরকার সরকার খেলাটো নিশ্চয় কচিকচির
পড়ুল খেলা নয়। আজ ভাক-ভালবাসা,
তাই সব মানলুম, কাল বিবাদ তাই
পড়ুলের সংসার ভেঙে দিলাম। ভারতের
রাজনীতিটো এমন এক পড়ুল খেলার
প্রহসনেই পরিণত হয়েছে। জনগণের
মনেও সৈজন্ম নবগঠিত সরকারগুলির
প্রতি আশা শিথিল হয়ে পড়েছে। গদিতে
কে (?) এ প্রশ্ন তেমন করে আর তাঁদের
বিচলিত করছে না। সংবাদপত্র কিছু
কেরিয়ার-মেকারের কেজা বলে মনে হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশে সমাজবাদে বিশ্বাসীদের
অনেক আগেই চরণ দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে
সহাবস্থানের মোহ ত্যাগ করা উচিত ছিল।
সে কর্তব্য বিলম্বিত হয়েছে।

আজ রাজ্যের সমগ্র সমস্যাগুলিকে
একহাতে আড়াল করে, আপনাপন চামড়ার
বাচানোর জন্য সমাজবাদ প্রচার করা দুটি
আপাত জনপ্রিয় দাবির ভিত্তিতে মনিয়ে
ইন্তকা দিচ্ছেন। না দিয়ে নিরুপায়।
পার্টির আখের বাঁচবে না সুবিধাবাদকে
স্পষ্ট করে সঙ্গো নিয়ে ফিরলে।

এস এস পি আর দক্ষিণী কমুনিস্টরা
তাই ছয় একরের অনধিক পরিমাণ জমির
খাজনা রহিতকরণ এবং কারারুদ্ধ রাজ্য
সরকারী কর্মচারীদের মুক্তির দাবিতে
পদত্যাগের খেলার মেতেছেন। কিন্তু
এতদ্বারাই কি রাজ্যের সমস্যাগুলির শেষ

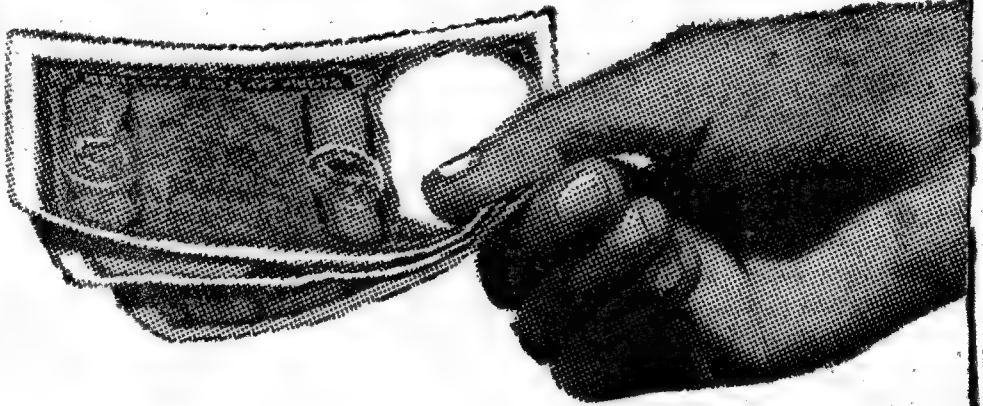
হ'ত। চরণ সিং সরকার যদি অকস্মাৎ বদলায় হয়ে এ দৃষ্টি দাবি মেনেই নিতেন, জনসংঘ যদি খাজনারহিত করণের ঘোর প্রতিবাদী না হতেন, তবেই কি সমাজ-বাদীরা চরণ সিং সরকারকে আদর্শ সরকার বলে গাথায় তুলে নিতে পারবেন। অবশ্য যদি তাই না পারবেন তবে এতোকাল যদি আঁকড়ে ছিলেন কেন। কিন্তু এমনি-

ভাবে চাপ সীলিত করে যে সরকারের দ্বারা জনহিতকর কাজ করাতে হয়, মন্ত্রিস্ব সংকট উপস্থিত না হলে যে সরকার গণ-স্বার্থ দমনের কদাচিপ্রায় থেকে একচলে সরে দাঁড়াতে ইচ্ছা থাকেন না, সে সরকারের সঙ্গে মন্ত্রিসভার একাসনে বসে থাকার বিচিত্র অর্থ উপলব্ধি করা কষ্ট-সাধ্য।

আদর্শ না মন্ত্রিস্ব, আজকের ভারতে এ প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। মন্ত্রিস্বের জন্য যাঁরা আপোষে বসবেন তাঁদের স্মরণ রাখতেই হবে, পি'পড়ে টিপে মিস্ট আহরণ দুষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাতে পণ্ড-প্রমের অধিক ফললাভও অসম্ভব।

(২১।১০।৬৭)

সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাবেন!



হ্যাঁ। আমাদের সহজ সরল টেলার সিস্টেমে
আপনার চেক সঙ্গে সঙ্গে ভান্সান যাবে।

সারা ভারতে আমরাই প্রথম টেলার
সিস্টেম প্রবর্তন করেছি। কোন
টোকেনের দরকার নেই। অপেক্ষা
করে করে বিরক্ত হতে হবে না। থাকে
আপনি চেকটি দেবেন তিনিই সঙ্গে
সঙ্গে টাকা ভান্সিয়ে দেবেন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ভিয়েতনাম সপ্তাহ উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে-শহরে অতীতপূর্ব যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ শোভাযাত্রা দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন ইত্যাদি ৩০টি শহরে হাজার হাজার মার্কিন তরুণ ও ছাত্র যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে প্রধান প্রধান সড়কগুলো পরিভ্রমণ করেছে। শুধুই দিন যাচ্ছে ততই বিক্ষোভ প্রদর্শন-কারীদের শক্তি বাড়তে দেখা যাচ্ছে। আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে ন্যাশনাল মিলিটাইজেশন কমিটির উদ্যোগে যার নেতা হচ্ছেন মিঃ ডেভ বেলিংগার এবং যিনি দু'বার উত্তর ভিয়েতনাম ঘুরে এসেছেন। এ ছাড়াও রয়েছে আর একটি সংস্থা যার নাম হলো 'রেজিস্ট্যান্স' বা প্রতিরোধ।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি হলো প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করুন, ভিয়েতনামের সমস্যা ভিয়েতনামীদের হাতে ছেড়ে দিন, মার্কিন সৈন্যদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনুন। জনসনের ভিয়েতনাম নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে হাজার হাজার মার্কিনী তরুণ কামানের শিকার হতে অস্বীকার করেছেন। তারা সৈন্য নিয়োগ আকিসে-আকিসে পিঁয়েছেন, সেনাবাহিনীতে যোগ-দানের নির্দেশ বা ড্রাফট পুড়িয়েছেন কিম্বা আকর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে-ছেন। ক'কিটা কম নয়। কারণ ওই ড্রাফট নষ্ট করার অর্থ ১০ হাজার ডলার জরিমানা বা ৫ বছরের কারাবাস কিম্বা চিরজীবন মার্কিন মজুর থেকে বহিস্কার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে হাজার হাজার নির্ভীক তরুণকে ওই ড্রাফট ঘূসা-ডরে ছিঁড়ে ফেলতে, কিম্বা নিয়োগকেন্দ্রে জমা দিতে।

পুলিশ অবশ্যই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে নি। জনপ্রিয় গায়িকা জোয়ান বেজজ সহ শতাধিক বিক্ষোভ-কারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মার্কিন প্রতিরক্ষাদপ্তরের বড় ঘাঁটি পেপ্টাগনকে যেভাবে ছত্রীবাহিনী অসামরিক পুলিশ ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে ইদানীংকালে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর কখনো সরকার নেন নি।

আন্দোলনকারীরা অহিংসায় বিন্যাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, ওয়াশিংটন জড়িমুখে যেভাবে কাতারে কাতারে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকারীরা এগিয়ে চলেছেন এবং যেভাবে পুলিশ অটোম্যাটিক রাইফেল উদ্যত করে রেখেছে তাতে প্ররোচনার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতির



ইন্দ্রা—নালের বৈঠক

প্রতিবাদধারী শব্দে মার্কিন মজুরকেই উল্লিখিত হচ্ছে না, ইংল্যান্ড, সোভিয়েট রুনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী, জাপান এমন কি ভারতের মার্কিন দূতাবাসের সামনে পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জনসন কি তাঁর বার্ষিক ভিয়েতনাম নীতি পরিবর্তনে রাজী হবেন? আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নির্বাচন হবে। রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকরা মনে করেন, সাম্প্রতিক একটা গ্যালপ পোলেও দেখা গিয়েছে যে, মারমুখী ভিয়েতনাম নীতির জন্যে প্রেসিডেন্ট জনসনের জনপ্রিয়তায় বেশ ভাটা পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন? রাষ্ট্র-সংঘের সাধারণ অধিবেশনেও ৫০টি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েতনামে অবিলম্বে বিনা সর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে। সে-আবেদনে কণপাত করবেন কি প্রেসিডেন্ট জনসন?

লাতিন আমেরিকা : বলিভিয়া

নটেগাছটি যখন শেষ পর্যন্ত মূড়োলো, কথাও তবে ফুরোলো। সহস্র রূপকথার লায়ক 'চে' গুয়েভারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে লাতিন আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় যে গল্প গাথা কাহিনী রূপকথা তৈরি হয়েছে ছত্রিশ রকমের ভাষায়—তার বোধ হয় সমাপ্তি ঘটলো। বলিভিয়া সরকার দাবি করেছেন যে, সরকারী সেনা-বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে গেরিলা নেতা আর্নেস্টো 'চে' গুয়েভারা নিহত

হয়েছেন। সে-সংবাদ যখন গুয়েভারার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কমরেড কিউবা প্রেসিডেন্ট ফিডেল কাস্তো সমর্থন করেছেন, তখন খেরিলা যুদ্ধের একটা রোমাণ্টিক অথচ বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ ঘটলো বলে ধরে নিতে অসুবিধে কোথায়?

চে-কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকার সরকারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির অন্ত ছিলো না। কারণ, কিউবার ফিডেল কাস্তোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লব সমাধা করে 'চে' লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যেও 'কিউবা ইতিহাসের পুনরাবর্তি' করতে চেয়েছিলেন। লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ রাজ্যেই ডিকটের শাসন চলছে। যেমন একদিন কিউবার ছিলো। তাঁর কৌশল ছিলো গেরিলা যুদ্ধ বা আন্দোলন পর্বতমালার বিস্তৃত অরণ্যানী জুড়ে 'চে' গড়ে তুলে-ছিলেন লাতিন আমেরিকার রাজ্যে রাজ্যে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'চের' মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছদিন না যেতেই 'চের' পুনরাবর্তিবাদ ঘটছে সংশ্লিষ্ট সরকারকে বেকুব করে। আসলে 'চে'কে ধরার জন্যে অপ্রাপ্য চেষ্টা করেছে সরকারী সেনাবাহিনী। তাঁর মাথার ওপর লোভজনক পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। তাঁকে ধরার জাল পাতা হয়েছে বার বার, বার বার তিনি হাতের মটোর এসে গিয়েছেন, কিন্তু আবার সরকারের সূচতুর সেনাধাক্কের চোখে খুলো দিয়ে তিনি গহন বনে অন্তর্হিত হয়েছেন।

জন্ম আর্জেন্টিনার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবার লাইব্রেরীতে প্রচুর

ই ছিলো যাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। তরুণ আর্নেস্টো সহজেই আকৃষ্ট হলেন সে-আদর্শে। তাই ভাষারী পাশ করলেও তিনি চিকিৎসাকে পেশা করেন নি। গোড়ার তিনি গেলেন গুয়াতেমালা সরকারের অধীনে কাজ করতে—কারণ জ্যাকোবো আরবেনজ-এর নেতৃত্বে এখানে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাকে দেখতে হলো আরবেনজ-বিরোধী অভ্যুত্থান, যে অভ্যুত্থান সি-আই-এর সাহায্যপুষ্ট বলে অনেকের ধারণা।

তারপর অবশ্যই কিউবা। ফিডেল কাস্তোর হাতে হাত দিয়ে তিনি গেরিলা যুদ্ধ লড়লেন, নগণ্য সিয়েরা মেস্ট্রার গাবত্যা অঞ্চল থেকে বিপ্লবীদের রাজধানী হাভানার বৃক্কে পরিচালনা করে নিয়ে গেলেন। কাস্তো যদি কিউবা বিপ্লবের গুরোবা বা প্রধান নেতা হন তাহলে গুয়েভারারা ছিলেন তাঁর দার্শনিক গুরু। কিন্তু যুদ্ধের অমিলও ছিল। 'চে' চেয়েছিলেন কিউবাকে রাতারাতি শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে, কিন্তু সোভিয়েট উপদেষ্টারা তাতে আপত্তি জানান। লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলোর প্রতিও সোভিয়েট সাহায্য যথেষ্ট উদার নয় বলে গুয়েভারারা অনুযোগ করতেন। কাস্তোর মত গুয়েভারার মার্কিন বিদ্বেষ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন কাস্তোর ঠিক উল্টো। অর্থাৎ গুয়েভারারা ছিলেন ধীর, শান্ত এবং যুক্তি-নির্ভর। কাস্তো কিউবায় রাষ্ট্রপ্রধান হবার পর দেশের অর্থনীতি, কৃষি, সামরিক ট্রেনিং সর্বোপরি রাজনীতি নিয়ে গুয়েভারার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে। তারপর হাভানায় আর গুয়েভারাকে দেখা যায় নি। বরং দেখা মিলেছে কখনো ভিয়েতনামে, কখনো কম্বো আবার কখনো বা লাতিন আমেরিকার কোনো গভীর জঙ্গলে। কাস্তো তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাঁর ভ্রমণকারী দূত হিসেবে 'চে' গুয়েভারারা সে সব ধনতান্ত্রিক দেশকে মূগু করার কাজে বিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্যে দেশে-দেশে ঘুরছেন।

পূর্ব ইয়োরোপ:

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৪ দিনের সৌজন্য সফরে পূর্ব ইয়োরোপ এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে গিয়েছিলেন। তাঁর সফর তালিকায় ছিল পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমিনিয়া এবং সংযুক্ত আরবের রাজধানী কায়রো। মস্কো তাঁর সফর-তালিকায় না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী কোর্সিগনের আগ্রহে শ্রীমতী গান্ধী পূর্ব ইয়োরোপের পথে

কয়েক ঘণ্টা মস্কোর থেকে সোভিয়েট নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী হবার আগেই শ্রীমতী গান্ধী পিতা জওহরলালের সঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশই সফর করেছেন। তবে বুলগেরিয়া ও রুমিনিয়া এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেল। শ্রীমতী গান্ধী প্রতিটি রাজধানীতেই বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। অবশ্য না পাবার কোন কারণও নেই। কারণ ভারতের সঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির বা সংযুক্ত আরবের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি সামাজিক ক্ষেত্রে অমিল থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিলও রয়েছে। অর্থাৎ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ভারতের মতো পূর্ব ইয়োরোপের এই দেশগুলিও জোটনিরপেক্ষতা এবং



কাস্তোর সঙ্গে গুয়েভারারা (১৯৬১)

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। সংযুক্ত আরবও তাই।

আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে-সমস্যাগুলি রাষ্ট্রনায়কদের ভাবিয়ে তুলেছে তার প্রধান হলো ভিয়েতনাম, পশ্চিম এশিয়া, নিরস্ত্রীকরণ ও চীনের আগ্রাসী মনোভাব। শ্রীমতী গান্ধী সব ক'টি দেশেরই রাষ্ট্র ও পার্টি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের প্রধানমন্ত্রীরা আলাদা আলাদাভাবে যে যৌথ ইস্তাহার দিয়েছেন, তাতে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অবিলম্বে বিনা শর্তে হ্যানয়-হাইফং বা উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। ভিয়েতনাম সমস্যাটি কেবল ভিয়েতনামীরাই

সমাধান করতে পারে এবং বহিরাগতের সেখানে নাক গলাবার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এই রাষ্ট্রনেতারা মনে করেন না। কেবল ১৯৬৫ সালের জেনেভা চুক্তির ওপর ভিত্তি করেই এখানে শান্তি আলোচনা হতে পারে বলে তাঁরা মত দিয়েছেন।

পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে ভারত ও পূর্ব ইয়োরোপের প্রধানমন্ত্রীরা বলেছেন যে, ইস্রায়েলকে তার যুদ্ধজয়ের ফল ভোগ করতে দেওয়া হবে না। ইস্রায়েলকে যুদ্ধপূর্ব সীমারেখায় ফিরে যাবার চাপ সৃষ্টির জন্যে সংশ্লিষ্ট সরকার-গুলোর প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। ভারত মনে করে যে আরব রাষ্ট্রগুলির উচিত ইস্রায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

চীনের প্রশ্নে রুমিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি এতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নেই। কারণ রুমিনিয়া রুশ-চীন বিরোধে কোন পক্ষ অবলম্বন করে নি। চীনের সঙ্গে সে সম্ভাবও বজায় রেখেছে।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর শ্রীমতী গান্ধী বৃক্কে পেরেছেন যে, পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাটা সহজে মিটছে না। অর্থাৎ আরব রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত না ইস্রায়েলের অন্যায় দাবির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ততক্ষণ সে যুদ্ধের দ্বারা যে আরব ভূমি দখল করে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে না।

পররাষ্ট্রীয় বিষয় ছাড়াও শ্রীমতী গান্ধী পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে যাতে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন এবং বুলগেরিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করার কথাও বলেছেন।

নিবন্ধ নিবেদন

৭২ বর্ষ ১৭শ সংখ্যায় (১৮ই জানুয়ারি, ১৩৭৪) প্রকাশিত 'মঙ্গল-ভের' 'আকাশবাণী' পত্রিকায় প্রথম স্তরের ৩৯শ পর্ভাভিতে মূদ্রণ প্রমবশত হয়েছে "মূদ্রণ একর পাওয়া যাবে, মাতাহীনরূপে।" বলা বাহুল্য, ঐ পর্ভাভিটি অবশ্যই হবে "মূদ্রণে একর পাওয়া যাবে না মাতাহীন-রূপে।"

উপরোক্ত সংখ্যায় জয়তী রায়ের 'সৈন্য আসছে' কবিতায় "মাঠের কৃষক আর মিলের মালিক" পর্ভাভিটির শৃঙ্খল রূপ হবে "মাঠের কৃষক আর মিলের শ্রমিক।"

—সম্পাদিকা

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুদ্রীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একবার একটা অরিজিন্যাল সাইডের খুব ভারী-মামলায় বড় বড় কৌশলীরা লবাই এপক্ষে নয়ত ওপক্ষে ব্রীফ পেয়েছিল। দুটো পরিবারে মিলে একটা মস্ত ল্যাজেদারী ফর্ম। এই ষোথ ফর্মের নামটা ভুলে গেছি। রামনিরঞ্জন দাস মদ্যরকাব পারিবারিক কাববার মহালি রামরামজী দাস এবং রামপ্রভাপ পোন্দার-বাবুদের পারিবারিক কারবার দুয়ে মিলে হয়েছিল এই ষোথ ফর্ম। শ' ওয়ালেস না কি একটা বড় তেল কোম্পানীর সোল সেলিং এজেন্সী নিবেছিলেন এই ষোথ ফর্মটি। পরে ভাগীদারদের মধ্যে মনো-মালিন্য হওয়ায় ফর্ম উঠিয়ে দেবার মামলা এল কোর্টে। এবং পার্টনারশীপ সম্পত্তি রিসিভাবেব হাতে রাখবার জন্যে দরখাস্ত হোল। দু' পক্ষই শাসালো এবং মামলাটা ছিল খুব জ্বিদের। কেউ কাউকে সচ্যগ্র জমি ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত রিসিভার দরখাস্তেই সেই মামলাতে একটা প্রিলিমিনারী ডিক্রি হয়ে হিসেব নেবার জন্যে কোর্টের রেফারী কাছে না গিয়ে একজন স্পেশাল রেফারী নিয়োগ কববার কথা হোল। কে হবেন স্পেশাল রেফারী? সতীশদাদা তখন এ্যাডভোকেট জেনাবেল। তিনি করলেন কে, পি. বাসু'ব নাম। ল্যাংফোর্ড জেমস' কার যেন নাম করলেন। স্যাব বিনোদ বললেন যে এমন একজন জুনিয়র কৌশলীকে দিতে হবে যাব প্র্যাকটিস থাকা চাই কিন্তু খুব বেশি মা. যে বেশ ওষাকিবহাল কমার্সিয়াল মামলায় এবং যে আইন বোঝে। তিনি দড়াম কবে আমার নাম করে ফেললেন। সতীশদাদা ওজ্ব করলেন না। ল্যাংফোর্ড জেমসও বাজী হয়ে গেলেন। আমি হলাম স্পেশাল রেফারী—দক্ষিণা প্রতি দুই ঘণ্টা সিটিংয়ে দুই গোন্ড মোহর এবং আমার ক্লার্ক বিধুভূষণ হবেন স্পেশাল রেফারীর ক্লার্ক। তিনি পাবেন মাস গেলে পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি। সবাই বললেন—দায়ের বরাত ভাল। রেফারেন্সটা চলবে

অনেকদিন এবং টাকাও পিটবে বিস্তর।" ঘটা - করে প্রথম সিটিং করলাম। Direction দিলাম Statement of Fact একমাসের মধ্যে ও Counter Statement of Fact তারপর তিন হস্তার মধ্যে ফাইল করতে হবে। দু'পক্ষই তাদের স্টেটমেন্ট দাখল করবার পর পরস্পরের কাগজ ইনস্পেকশনের অর্ডার দিলাম এবং ইস্যু সেটল করলাম। মাস তিনেক পরে যেদিন হিসেব নেওয়া সুরু হবে সেদিন দেখি একদিকে রেফারেন্স কোর্টের তখনকার দিনের রাজা শিশির মল্লিক ও অপরাপক্ষে শৈলেন ব্যানার্জি হাজির হলেন। কে আগে সাক্ষী দেবে—অর্থাৎ কার উপর onus এই নিয়ে চলল তুমুল লড়াই। Lendley on Partnership, Daniel's chancery Practice ও কত নজির আমাকে দুইপক্ষই দেখালেন। একদল বলছেন যে, হিসেব মাঝে মাঝে বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং সেগুলিকে আর আগ্রাহ্য করা চলবে না। অন্যদল বলছে হিসেব যে বোঝাপড়া হয়েছে সেটার প্রমাণ কই? অন্য দল পাল্টা জবাব দিচ্ছে, কেন সে ত বইতে স্ট্যাম্পের উপর দুইপক্ষের কিংবা তাদের গোমস্তাদের সই দেখলেই বোঝা যাবে। কিন্তু সেই সইগুলিও ত প্রমাণ করতে হবে? বোঝাপড়া হয়েছে যে বলছে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, বোঝাপড়াটা হয়েছে। অর্থাৎ বোঝাপড়ার onus তারই উপরে। তারপরে যে বলবে যে ওই বোঝাপড়া যদি হয়েছে থাকে, তবে সেটা ভাওতা দিয়ে করা হয়েছে এবং সেইজন্যে সেই বোঝাপড়াটা কাঁচিয়ে দিতে আদ্যোপান্ত নতুন কবে হিসেব নিতে হবে। একই issue-র উপরে onus এইবকম করে একবার এর ঘাড়ে আর একবার অন্যপক্ষের ঘাড়ে হয় কিনা সেটাই হলো বিবেচ্য। আসল ব্যাপারটা হলো কেউ আগে সাক্ষীর কাঠগড়ায় যেতে চান না জেরার ভয়ে। সব শুনতে-নে বললাম

যে ভেবে রায় দেব। অনেক খেটেখুটে আইন ঘেঁটে রায় দিলাম যে প্রথমে onus হবে যে বলছে বোঝাপড়া হয়েছে তার উপরে। সেটা প্রমাণ না হলে গোড়া থেকে হিসেব নিতে হবে। কিন্তু বোঝাপড়াটা প্রমাণ হলে তখন onus পড়বে যে বলবে যে বোঝাপড়াটা ভাওতা মেবে করিয়ে নেওয়া হয়েছে তার উপরে। প্রথম onus-টা যার ঘাড়ে পড়ল সে পক্ষ কিছুতেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে রাজী হলেন না। মামলাটা আপোষেই মিটে গেল। আমি পেলাম চারটে সিটিংয়ে আট মোহর অর্থাৎ একশ' ছত্রিশ টাকা আর আমার ক্লার্ক বিধুভূষণ পেলেন চার মাসে পঞ্চাশ টাকা কবে দু'শ টাকা। শৈলেন ব্যানার্জি বললেন—“খুব আইন শিখেছ? হলো? আহাম্মক কি গাছে ফলে?” অগাধ টাকা আমার পেটা হলো না। উপোসী ছারপোকাই আমি হয়ে রইলাম তখনকার মত। কিন্তু স্যার বিনোদ যে আমাকে ঐ বড় reference-টা পাইয়ে দিয়েছিলেন সে বোধটুকু থেকেই যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম।

II পাঁচ II

সেই সময় বরাবর প্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা—একজন মাড়োয়ারী যুবক— ছিলেন একজন উদীয়মান এটর্নী। তিনি ম্যানুয়েল আগবওয়ালা ফর্ম ছেড়ে নিজেই সবে অফিস খুলেছেন ওনং ওন্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বার্সে। খুব হু হু করে তাঁর নাম ও পশাব বেড়ে চলেছিল। পরস্পরায় শোনা গেল যে প্রভুদয়ালবাবু অফিসে একটি চেম্বার খালি আছে। জুনিয়ার ব্যারিস্টারমহলে রব উঠেছে যে সেই চেম্বার পাবে তার আর ভাবনা থাকবে না ভবিষ্যতে। বিস্তর জুনিয়ার সেই চেম্বারের জন্যে লালায়িত। আমার জানা একজন বড় কৌশলী বীর উপর প্রভুদয়ালবাবুর খুবই আস্থা ছিল

তিনি তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের জন্যে প্রভুদয়ালবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেটা আমি জানতাম না। যাই হোক, যেই চেষ্টারের খবরটা পেলাম তার পরদিন সকালেই কথার কথায় স্যার বিনোদকে বললাম চেষ্টারের কথাটা। তিনি শুনে বললেন—“এ আর কথা কি?” প্রভুদয়াল নতুন এটর্নী, কাজও আছে। আমি আজকেই ওকে বলে দেব খবর।” মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিন সকালে কাজ সেরে যখন সূর্য্য আর আমি খাবার ঘরে গেলাম তখন খবর পেলাম স্যার বিনোদের একটু জ্বর এসে গেছে। তিনি আর কোর্টে যাবেন না। এক মৃদু হৃদে সব আশা নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেল। চেষ্টার ত’ আর বসে থাকবে না। কি আর করা যাবে। সেদিন মধ্যাহ্ন বিরতির সময় মনমরা হয়ে বার লাইব্রেরীতে নিজের জায়গায় বসে আছি। এমন সময় আমাদেরই এক পেয়াদা একটা চিরকুট কাগজ দিয়ে গেল। খুলে পড়লাম—“Mr. Das, when are you coming to see your chambers? P. D. H.” মনটা যখন বিকল ছিল তখন এই ভাল খবরটা আচমকা এসে পড়ার স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করে দিয়েছিল বলে আজও মনে আছে। সেই যে P. D. H. নাম সেই দেখলাম সেই থেকেই তাঁকে আমি P. D. H. বলেই সম্বোধন করে থাকি। লিখেছেন, “When are you coming...” “When” আবার কি? এক্ষণি যাচ্ছি। উঠে কাল কোর্ট ও ব্যান্ড শুলে, টাইটা ও অন্য কোর্টটা পরে গেলাম ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিসের Temple Chambers বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যা শুনলাম সংক্ষেপে তা এইরকম। স্যার বিনোদ অসুস্থ বলে কোর্টে আসতে পারেন নি। তাঁর বাইরের বাড়ির বিশ্রামকক্ষের বিছানায় শুয়েই তিনি প্রভুদয়ালকে টেলিফোন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। ব্যাপারটা শুবই জরুরী বলে একটু তাড়া-জাড়াই তাঁকে আসতে বাধ্যকেন। স্যার বিনোদের মত ভারী কৌশলী ডাক পড়াষ প্রভুদয়ালবাবু তক্ষণ তাঁর ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়ি যান। সেখানে বেয়াবা তাঁকে স্যার বিনোদের কাছে নিয়ে যেতেই স্যার বিনোদ বললেন—“ওহে প্রভুদয়াল, তোমার অফিসে একটা নাকি চেষ্টার খালি হয়েছে। আমি একটা ভাল জুনিয়রের নাম বলতে পারি।” প্রভুদয়ালবাবু আমতা আমতা করে বললেন—“হ্যাঁ, স্যার, আছে বটে; তবে একজন কৌশলী বন্ধু ধরেছেন—চক্ষুদল্লজা এডোন শঙ্ক।” শুনে স্যার বিনোদ বললেন—“তোমার নতুন অফিস। একজন নির্ভর-

যোগ জুনিয়র তোমার দরকার। তুমি কাজের লোক যদি চাও তবে আমার চেষ্টারে আছেন যে দাশ তাঁকেই নাও। আমি বলছি তুমি কাজ পাবে তাঁর কাছ থেকে। তাঁরও লাভ হবে, তোমারও লাভ হবে।” কি আর করেন প্রভুদয়ালবাবু। “হ্যাঁ” বলে রাজী হয়ে চলে এসেই ঐ চিরকুট লিখে পাঠিয়েছেন। আমার জন্যে স্যার বিনোদের ভাবনা ও সহৃদয়তার কথা ভাবলেও মন ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়।

চেষ্টার দেখলাম। ঘর ত’ নয়—একটা বড় হলে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট খুপরি। চেষ্টারটা তখন ছিল হলটার একেবারে উত্তর-পূর্ব কোণে। অল্প কদিন পরেই একেবারে দক্ষিণ খোলা একটা খুপরি পাওয়া গিয়েছিল। সেইখানে আমি নিয়মিত যেতাম কোর্টের পর-প্রায় আমার স্বজ্ঞ হওয়ার আগে পর্যন্ত। প্রভুদয়াল-বাবু আমার কেউই ছিলেন না। তিনি হলেন ম্যাডোয়ারী এবং আমি একজন বাস্তালী। তাঁর সঙ্গে কি তাঁর ডাইটাই কারুর সঙ্গেই আমি স্কুল-কলেজে কখনো পড়ি নি। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কোন যাতায়াতও ছিল না। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে আমার দাবি করবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন একসঙ্গে বসে আমরা কাজ করেছি চেষ্টারে বসে। আমি খুব মন দিয়েই তাঁর ড্রাফটিং কাজ করতাম এবং বৃহত্তে পারতাম যে সেগুলি প্রভুদয়ালবাবুর পছন্দসই-ই হতো। ছোটখাট মোশন নিজেই করতাম। গ্রীভস এবং পরে ম্যাকনোয়ার সাহেবের একলাসে আমি আস্তে আস্তে সামান্য প্রতিষ্ঠাও গড়ে তুলছিলাম। গেরো ছিল বাকল্যান্ডের কোর্টে। প্রভুদয়ালবাবুকে লীডার দেবার কথা বললেই বলতেন—“কেন, আপনিই করুন না।” জবাব দিতাম—“দেখছেন ত’ জহাদের ঘর। কি হতে কি হবে। তখন মজেলটা মরবে।” প্রভুদয়ালবাবু বলতেন—“এ কেসে আমবা হারতেই পারি না। আপনি শীরভাবে কাজটা করুন। হার জিতের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনাল কোর্ট ত’ আছে।” এইরকম করেই প্রভুদয়ালবাবু আমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। প্রভুদয়ালবাবু যাকে বলেছেন এমন বিস্মৃত লোকের কাছেই শুনোঁছি যে প্রভুদয়ালবাবু তাঁকে বলেছেন যে—“দাশ সাহেবের কাছে ব্রীফ দিতে পারলে মনে হয় টাকটা আপন লোকের ঘবে গেল।” এইরকম মমত্ববোধ জন্মে ছিল প্রভুদয়ালবাবুর আমার উপরে। প্রভুদয়ালবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সুরু হয় এটর্নী ও ব্যারিস্টারের সম্পর্ক দিয়ে। কিন্তু সেই সম্পর্কটা অল্পে অল্পে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল একটি গভীর আত্মীয়তার মাধ্যমে। আমাদের পেয়াদারী

সম্পর্কে ছাপিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা দু’জনেই পরস্পরের সখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি। আমার জীবনসংগ্রামের গোড়া থেকেই প্রভুদয়ালবাবু আমাকে চরম সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। প্রভুদয়ালবাবুর মত নিরহংকারী, স্বার্থবিহীন বন্ধু জগতে দুলভ। জীবনের এই অন্তিম লগেন স্মরণ করি প্রভুদয়ালবাবুর কাছ থেকে যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছি।

স্যার বিনোদের চেষ্টারে কাজ করবার সময়ই আর একটি এটর্নীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর কাছেও আমি অনেকখানি শিখি। তাঁর নাম সূশীল সেন। উচ্চতায় খুব বেশি নয়, মোটামোটা মানুষ তিনি ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ছিল তাঁর কর্মক্ষমতা। মজেল নিয়ে বসা, অর্জির কসড়া করে কৌশলীর কাছ থেকে সেটা শুষিয়ে নেওয়া, সকাল সন্ধ্যায় কৌশলীর সঙ্গে কনসালটেশন করা, দুপুরে কোর্টে হাজির থাকা কেস থাকলে মরত অফিসে বসে কাজ করা—এই সমস্ত সূশীল সেন অবলীলাক্রমে করে যেতেন ওই মোটা শরীর সত্ত্বেও। টেনিস খেলতেও দেখেছি গোড়ার দিকে। পরে আর সময় পেতেন না। সরকার সাহেব যখন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের ল’ মেম্বর তখন সূশীল সেন তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিলেন কোম্পানী আইনটাকে সংশোধন করতে। সূশীল সেন জজের সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টার দরখাস্ত খুবই নিপুণ রকমে করতেন। এমন কি সাকল্যান্ড সাহেবও সূশীল সেনের কাজ পছন্দ করতেন। এটা কম কথা নয়। তা ছাড়া সূশীল সেন কোন বিষয়ে কৌশলীর মতামত নিতে হলে যে “case for opinion” লিখতেন সেটা হতো পড়বার মতন। যে আইনের প্রশ্ন উঠেছে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু নজর রাখেন আছে সব নোট করে সূশীল সেন নিজের মতামতও লিখতেন। কৌশলীর বিবেচনার জন্যে। স্যার বিনোদের কাছে সূশীল সেনের আইনজ্ঞান ও ব্যক্তিগত অনেক প্রশংসা শুনোঁছি। আমার মধ্যে আলাপ হবার পর সূশীল সেন তাঁর “Dutt and Sen” অফিসের কিছু কিছু কাজ পাঠাতে লাগলেন। এটা স্যার বিনোদেরই সৌজন্যে। তবে সেই সঙ্গে সূশীল সেনের স্বজাতিবাংসল্যও ছিল অনেকটা। আমার আগেও সূশীল সেন নিশীথ সেন, অরুণ সেন প্রমুখ বাদ্য ব্যারিস্টারদের কাছেও ব্রীফ পাঠাতেন। আস্তে আস্তে সূশীল সেনের সংশ্লিষ্ট বিস্তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সূশীল সেন অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে পড়েন

আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে ডেভোলিং
করেছি তিনি বিলেতে প্রিন্সিপালসিলে
স্বাগত পর্বস্বত। নিত্য তাঁর সঙ্গে প্রাত-
রাশ সেরে তাইই সঙ্গে সূধীর ও আমি
তাঁরই ক্যাডিল্যাক গাড়ি করে হাইকোর্টে
যেতাম এবং কোর্টে নিজেব কাজ না
থাকলে স্যার বিনোদের সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে
কোর্টে ঘুরে বেড়াইতাম এবং শিখতামও
অনেক জিনিস। পুরানো ল' রিপোর্ট
বিশেষ করে **Moore's Indian**
Appeal স্যার বিনোদের নন্দনপণে
ছিল। কোন ভলুমের কত পাতার
ডাইনে না, বাইরে—কি একটা প্যাসেজ
আছে তা তিনি অক্লেশে বলে দিতেন।
এমন তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্মরণশক্তি।
শুনছি **Moore's Indian Appeal**
এর চ্যাম্প volume তিনি তন্ন তন্ন
করে পড়ে তাঁর পিতা স্যার রমেশচন্দ্রকে
সম্মুখ করিয়ে বিলেত যাবার অনুমতি
পান। স্যার বিনোদের আইন ছাড়া অন্য
কোন জিনিসে অনুরাগ ছিল না। অর্থাৎ
“Hobby” বলতে তাঁর কিছু ছিল না।
সেইজন্যে মধ্যে মধ্যে বলতেন—“চিন্ত
প্র্যাকটিস ছেড়ে পলিটিজ ধরেছে, সাহিত্য-
চর্চাও করতে পাবে। কিন্তু আমার ত’
কোন Hobby-ই নেই। না জানি সাহিত্য,
না কারি শিকাব। এমন কি বাগানও
করতে জানি না। Retire করে করব
কি?” গ্রীষ্মকালে তাঁর খুবই কষ্ট হতো।
তখনো হাইকোর্টে লিফট হয় নি।
একদিন আমরা হাইকোর্টে পৌঁছিলে
ব্যারিস্টারদের গোল সিঁড়িটা দিয়ে উপরে
উঠছিলাম। দেখলাম স্যার বিনোদ পা
ষসটে ষসটে, হাঁফাতে হাঁফাতে উঠছেন।
আমার কি রকম মায়া লাগল। বললাম
—“স্যার, আপনি গরমের সময় কলকাতার
মাইরে চলে গেলেই পারেন। এখানে
খাটকাই এটন, মস্কেলেরা আপনাকে ছাড়বে
না এবং কোর্টে নিয়ে আসবেই।” স্যার
বিনোদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন মারপথে।
আমার দিকে চেয়ে খীর কণ্ঠে বলেন—
“দেখ দাশ, আমি যদি কোর্টে না আসতে
হাই, তবে কারো সাঁধ্য নেই আমার আনে।
আমারই লোভ, বুকে, নেহাৎ লোভ।”

সারার বিনোদের সংগে ডেভেলিং করবার সময় থেকেই আমার কাজ আসতে আরম্ভ কবেছে। এই সময় ববাবরই নন্দ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে দু' বছর পড়ে প্লাসগো গেলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। তারপর বুধা গেলেন ল' পড়তে। বুধার যাবার প্যাসেজ ইত্যাদির অনেকটাই বাবাই দিয়েছিলেন। নন্দকে বেশি টাকা দিতাম গোড়া থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন বলে। বুধাকে কিছু কম পাঠান হতো। নন্দ মাঝে লিখলেন যে তাঁকে অত টাকা না পাঠিয়ে বুধাকে সেই টাকাটা দিলে ভাল হবে। নন্দর বুধার উপর ববাবরই মায়ী দেখে এসেছি। আর তা ছাড়া কথাটাও ঠিকই বলেছিলেন। সেইরকমই ব্যবস্থা করা গেল। ব্যারিস্টারের পেশায় আয়ের ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কোনো মাসে বেশি, কখনো কম। দুই ভাইয়েব খরচাটা পাঠাতে মাঝে মাঝে কষ্টই হতো। এমনও হয়েছে যে আসছে মাসেব দজনের খরচাটা এ মাসের শেষে দিতে পারি নি এবং আসছে মাসেব গোড়ায় cable করে পাঠাতে হয়েছে। কিন্তু দুগবানের অসীম দয়ায় টাকাটা জুটে যেত। জগদ্ব জীবনে আরো বহুবার ভগবানের দয়াময় পরিচয় পেয়েছি। একদিন খবর পেলাম হুগোদেব মেজমামা বর্ষকম মরণাপন্ন অসুস্থ। টাকা না হলে ডাক্তারই ডাকা যাবে না। বাড়িতে কি ব্যাঙ্কে কিছুই নেই। ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে ধার পাই-কি-না। মিনটা বুঝুর ও আমার খুবই খাবাপ হয়ে পড়ল। এমন সময় বালমকুন্দ রুইয়া বলে জে কে সরকারের অফিসের এক পুরনো মক্কেল খড়ের মত আমার অফিস ঘবে ঢুকে বললেন যে, এক্ষণেই তাঁর একটা প্লেন্ট লিখতে হবে, কেন না সেটা নিয়ে তাঁকে সেদিন সম্মার পাজাব মেলে পাটনায় গিয়ে কালাই ফাইল করতে হবে। বললাম—“কই, ব্রীফ কই”। তিনি কতকগুলি কাগজ ও নগদ একাশ টাকা টেবিলে রেখে বললেন, “কাজটা সুদূর করে দিন”। সেদিন য কী সফল হইয়েছিল সে একাশ টাকা পরে তা আমিই জানি। তাড়াতাড়ি প্রণত লিখে দিলাম। মামলাটা ছিল প্যারেন্ট ভগ্ন করার বিরুদ্ধে। প্লেন্ট যাতে নিয়ে বালমকুন্দ রুইয়া চলে গেলেন। আমি উঠে টাকাটা বুঝকে দিলাম। দুজনেই মনে মনে ভগবানকে নমস্কার করে টাকা নিয়ে সোজা চলে গেলাম মেজমামা খুশানে ছিলেন। ডাক্তারও ডাকা হলো।

पञ्चाविंश अध्यायः

н с в

६६९६

উপকার হয়েছিল তাতে সন্দেহই নেই। এঁরা আমাকে যে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করতেন তাতে আমার সন্মান আস্তে আস্তে প্রসার পেতে লাগল। এঁরা যে আমাকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে খুব বেশি কেসে জড়ানবার স্বীকৃতি পাইয়ে দিয়ে আমার আয়ের ব্যবস্থা কবেছেন তা ঠিক নয়। তবে এঁদের শ্রুভেচ্ছা কখনো এঁদের সঙ্গে এবং বেশির ভাগ সময়ে স্বাধীনভাবে ছোটখাট কাজ আমার আসতে লাগল। এই শেষোক্ত কাজগুলি আমার নিজেকেই করতে হতো এবং তাতে করে আমার নিজের উপর বেশ আস্থা হতে লাগল। তাছাড়া ক্রমশ আমার পৃষ্ঠপোষক এটর্নী আফিসও বাড়তে লাগল। টি বি রায়, জে কে সরকার, প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা, ডাট এ্যান্ড সেন, মনমথ দত্ত, শিবদাস-সেট, সত্যীশ পালিত, মল্লিক এ্যান্ড পালিত, ধৈর্য কাম্পানী, এন সি গুপ্ত এ্যান্ড কোম্পানী, এন সি বড়াল এ্যান্ড পাইন প্রমুখ ছোট-বড় ফার্ম থেকে কাজ আসতে লাগল। দেখলাম যে দু'টি বড় আফিস একজন জুনিয়র কৌশলীকে ভাল করে মন দিলে সেই কৌশলীর মধ্যে পদার্থ থাকলে তার ভবিষ্যৎ একেবারে পাকা হয়ে যায়। দু'টো-চারটে একতরফা মামলা বা ছোট মামলা মনসাবিদার কাজ বা মর্গেজ সুদের decree absolute-এর স্বীকৃতি বাপের বা শ্বশুরের বা আর কারো খাতিরে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রকম প্রাকটিস ধোপে টেকে না। বাস্তবতা ও ফিটফাট চেহারাতে শানিকটা সাহায্য নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সব চেয়ে দরকার হয় কৌশলীর শারীরিক ভাল স্বাস্থ্য, একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চলনসই আইনজ্ঞান, ভদ্র ব্যবহার ও অনেকটা বরাত জোর। আর সাহায্য করে যাদের সিনিয়রদের আশীর্বাদ, এটর্নী'দের শ্রুভেচ্ছা ও সত্যীর্থদের সঙ্গে সম্ভাব।

আমি যখন মন দিয়ে, পরমানন্দে ডেভেলপ করছিলাম এবং নিত্য আমার চেষ্টা করে গিয়ে ব্রীফের জন্যে হা-পিডোশ করে বসে থাকতাম সে সময়ে যে দু'টো বেগাব মামলা করেছিলাম তাব উল্লেখ না করলে আমার এই স্মৃতিচরন অনস্পর্শই থেকে যাবে। সেই দুই মামলার বা অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলাম তা ভোলবার নয়। প্রথমটা হোলো ফৌজদারী কোর্টে। জে কে সরকারের আফিসের এ্যাসিস্টেন্ট সুদেন ঘোষাল আফিসে আসতেন এক ঘোড়ার পালকী গাড়িতে। একদিন নাকি সি এস পি সি-এর এক সার্জেন্ট সুদেন ঘোষালকে চালান দিয়েছে তাঁর ঘোড়ার ঘাড়ের বা সঙ্গেও সে ঘোড়াকে গাড়িতে বোতা হয়েছে এই অভিযোগে। আমি জীবনে কখনো ফৌজদারী কোর্টের

ত্রিসীমানার মধ্যে পা দিই নি। কিন্তু সুদেন ঘোষালের অনুরোধ এড়ান গেল না। হাজার হোক সে আফিসের কাজকর্ম পাই ত' কিছুর। গেলাম ব্যাকসাল স্ট্রীটের কোর্টে। শুনলাম যে মামলাটা হবে রেজিস্ট্রারের ঘরে। রেজিস্ট্রার তখন ছিলেন সুবোধ গুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে জানলাম যে তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার যোগেশ গুপ্তের দাদা। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, মোটর গাড়ির ড্রাইভার, পুলিশ ও অন্যান্য লোকে কোর্ট ভর্তি। ন স্থানম্ তিল-ধারণম্। শুনলাম রেজিস্ট্রার সাহেব একটা না দেড়টা পর্বন্ত এই সব পেটি কেস শোনেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে এতগুলো মামলা কি করে শুনানী হবে বুঝলাম না। কৌশলী বলে একটা চেষ্টার বসতে পেলাম। মামলার ডাক শুরুর হোলো। আসামীর নাম পড়া হতেই সে উঠে হাত জোড় করে মনঃস্বরে বলে—“হুজুর, কসুর ত' নেই কিয়া” আর কোর্টের ক্লার্ক বলে—“প্রিন্স গিলটি, স্যার” আর হাকিম অমনি “পাঁচ টাকা”, “দশ টাকা” কি “পনের টাকা” জরিমানা বয় দেন। অন্য কেসের ডাক পড়ল। ঐ একই কাৰ্যবিধি। কোর্টের কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনার কোন কেসটা, স্যার?” বললাম কেসটার নাম লোকটি চলে গেল। এই রকম কর হু হু করে চলল কেসের পর কেস—গিলটি—আব জরিমানা। যেই আমার কেসটা ডাক হোলো আমি উঠেই জানিবে দিলাম আসামী নিরপরাধ। হাকিম সাহেবকে সেই লোকটি কি বললেন। হাকিম তাঁর নাজিরকে ইসাবা করাতেই সে বললে—“কেস উইথড্রন!” আসামী বেকসুর খালাস। আমি বিজয়গর্বে সেই অশ্বকৃপ কোর্ট থেকে তাজা বাতাসে বের হয়ে বেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। কৃতজ্ঞতার প্রতীকস্বরূপ সুদেন ঘোষাল আমাকে খুব সরু এবং ছোট একটি কাউন্টেনপেন দিয়েছিলেন মনে আছে। এই অভিজ্ঞতার পর পুলিশ কোর্টে আর যাই নি কখনো।

স্বভাবীয় কেসটি ছিল শৈলেন সেন ব্যারিস্টারের ড্রাইভারের ছোট আদালতের মামলা। সেই ড্রাইভারের নাম ছিল উমেশ। তিনি ড্রাইভারের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আখটু ডেকোরতি ব্যবসা করতেন। ছোঁকরাবাবুদের বেশি সুদে টাকা ধার দেবার কারবারে নাকি বেশ দু' পয়সা এসে যায়। মাঝে মাঝে দু'একটা লস্করী টাকা মারাও যেত। কিন্তু আখেরে নাকি মনোফার অশ্বকৃটাই হতো বেশি। সেই উমেশ কোন ছোঁকরাকে হ্যান্ডনেটে ক' শ' টাকা ধার দিয়েছিলেন। ছোঁকরা কলকাতার কলেজে পড়ত এবং বলেছিল যে অগামী মাসের মাসোহারার টাকাটা বাড়ি থেকে

এলেই দেনাটা চুকিয়ে দেবে। আগামী মাস ত' গেলই, বেশ আরো ক' মাসও গেল। টাকার দেখা নেই। তবে উমেশেরও তখন গা ছিল না, কেন না উ'চু হারেই সুদ জমাছিল। তারপর তার মনে হোলো যে অনেক টাকা জমে গেলে আদায়ের অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং সে ছোট আদালতে নালিশ ঠুকে দিয়েছে। এই মামলায় আবার হাই-কোর্টের কৌশলীর কি দরকার? এর আবার ডিফেন্স কি হবে? এস কে সেন—বাক্যে আমরা শলদ্রা-বলতাম—তিনি বললেন—“ও বে, ডিক্রি ত' হবেই। তবে যাতে ইনস্টলমেন্টটা খুব কম না হয় তাই দেখতে হবে।” কি আর করা যাবে। শলদ্রার খাতিরে গেলাম ছোট আদালতে। কার কোর্টে গিয়েছিলাম মনে নেই। কোর্টের লিস্টটাও বেজায় লম্বা। বসেই রইলাম অনেকক্ষণ। কোর্টে বিস্তর লোক—উকিল, মক্কেল, পুলিশ, পেয়াদার ভরা। কোর্টে হাকিমের উপস্থিতি সঙ্গেও উকিল-দের গুঞ্জন চলেইছে। এমন সময় দেখা গেল যে হার্ভি হোস্টেলের একটি পড়ুয়া ছেলেকে বডি ওয়ারেন্ট করে কোর্টে ধরে এনেছে ডিক্রি জারি করে। তখনো ডিক্রি জারি করে খাতকদের জেলে পাঠান যেত। সিভিল প্রসিডিউর কোডটার অদলবদল তখনো হয় নি। বেশ কাঁচা বয়স ছেলোটর। লম্বা তার মুখখানা একটু স্লান হয়ে গিয়েছিল। ডিক্রি হোল্ডারের উকিল দাঁড়িয়ে বললেন যে ছেলোট ধারে মেঠাই খেয়ে টাকা না দেওয়ার নালিশ করে তার বিরুদ্ধে যে ডিক্রি হয়েছিল সেই ডিক্রি জারি করে তাকে ধরে আনা হয়েছে। ডিক্রির টাকা কিছু কিছু উশুল দিয়েছে বটে তবে এখনো একশ' কত টাকা বাকী রয়েছে কস্ট ছাড়া। পাশের এক উকিল বেশ শোনা যায় এমন গলায় মন্তব্য করলেন—“আজ্ঞা লোক ত' আপনি। ভদ্রলোকের ছেলে খাবার খেয়েছে। দোষটা কি কবেছে? দেড় শ' টাকার জন্যে ভদ্রলোকের ছেলেকে বডি ওয়ারেন্ট করে ধরে এনেছেন। লম্বাও করে না।” ডিক্রি হোল্ডারের উকিল অন্য উকিলটির দিকে বক্তৃষ্টতে নিঃশব্দে চাইলেন যেন ছার কথাকে ধরাট না করি ভাব। স্বভাবীয় একজন উকিল বললেন—“ডিক্রির কতক ইনস্টলমেন্টও ত' দিয়েছে, মশায়। এও কি তাড়া।” চতুর্থ উকিল বললেন—“হোস্টেলের পড়ুয়া ছেলে। এর বাপের কাছে লিখেই ত' টাকাটা ফেলে দিত। কস্ট বাড়াবার জন্যে ডিক্রি জারি না করলেই কি হতো না?” ডিক্রি হোল্ডারের উকিলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি হিংস্রভাবে সমালোচক উকিল বন্ধুদের শাসলেন—“ফ্যাট ফ্যাট করবেন না,

ISN'T SHE
BEAUTIFUL?
OF COURSE,
SHE IS!



she owes her beauty to **AFGHAN SNOW Beauty Aids**.
the aids to beauty that have aided millions of
maidens to glamour and irresistible charm.

AFGHAN SNOW—AN EXCELLENT ALL ROUND COMPLEXION AID.

AFGHAN SNOW—AN IDEAL SKIN TONIC THAT VANISHES
PIMPLES AND WRINKLES. PRESERVES THE PETAL SOFT DEWY
COMPLEXION. AVAILABLE IN 4 SIZES.

AFGHAN FACE POWDER—AVAILABLE IN 4 SHADES FOR
FLAWLESS COVERAGE AND SMOOTHNESS.

AFGHAN LIPSTICK—A WIDE RANGE OF SHADES TO KEEP
YOUR LIPS LUSTROUS AND MOIST.

AFGHAN NAIL POLISH—IN SPARKLING COLOURS FOR EVERY
TASTE. IT HELPS PROTECT BRITTLE NAILS.

AFGHAN CREAM CAKE—A CREAM BLENDED POWDER IN A
HANDY COMPACT. AN INSTANT BEAUTY AID THAT ADDS A
SOFT MATTE FINISH TO ANY MAKE-UP, IMPARTING DELICATE
NATURAL BEAUTY

AFGHAN SNOW BEAUTY AIDS

E. S. PATANWALA BOMBAY-77 (INDIA)



মশায়। ইচ্ছা যদি করেন তবে হাজির হয়ে যান না। তখন লড়ে দেখব।" এই সব কথাবার্তা কোর্টের হাকিমের সামনে বেশ উচ্চ গলায় চলেছে দেখে আমি ত' কেমন হকচকিয়ে গেলাম। ভাবলাম— "বাবা, এদের কি সমীহজ্ঞানও নেই?" শুদিকে দেখি আমার মক্কেল, শলুদার ড্রাইভার উমেশ, পাশ কাটাতে কাটাতে কাঠগড়ায় যেখানে ছেলেরিট দাঁড়িয়ে সব শুনছিল তার কাছে পৌঁছে গেলেন। গজগজ করে তার সঙ্গে কি কথা হলো। ছেলেরিট হাকিমকে বললে— "হুজুর আজকে আমি একুণি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা মাসে পঞ্চাশ টাকা কিস্তিতে দিয়ে দেব।" বাদীপক্ষের উকিলও খুশি হলেন, কেন না ডিক্রি জারির মামলাটা ত' কল্লেই রইল এবং আরো একদিনের খরচা পাওয়া যাবে। ছেলেরিট তার পকেট থেকে সোনার ঘড়িটা উমেশকে দিয়ে দশ টাকার পাঁচখানা নোট পেল। উমেশ ঘড়িটার একটা রসিদ বোধ হয় দিয়ে দিলেন। ছেলেরিট তখন সেরেস্তাদারের টেবিলে পঞ্চাশ টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে হাসি মুখে কোর্ট থেকে বের হয়ে গেল। আমার মক্কেল উমেশ একটা তেজস্বী কারবার হাকিমের শোন ঘড়ির তলায় অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে সম্পন্ন করে নিলেন দেখে আমি ত' অবাক। ছোট আদালতে এই রকম ঘড়ি, ফাউন্টেন-পেন ইত্যাদি বাঁধা দিয়ে নাকি বেশ transaction হয়ে থাকে। আমার মামলাটার ডাক হতেই উমেশ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেই হলফ নিয়ে সাক্ষী দিয়ে হ্যান্ডনোটের সইটা প্রমাণ করে কোর্টে দাখিল করলেন। মামলাটার বিবাদী— মামলাটা লড়লেনই না। তার উকিল ইনস্টলমেন্ট প্রার্থনা করলেন মাসে পাঁচ টাকা। তাতে যে ডিক্রির সুদও উশুল হবে না বলে আমি বললাম প'চাত্তর টাকা হলোই ন্যায্য হবে। এর মধ্যে তর্কাতর্কি বিশেষ কিছুই নেই। হাকিম বললেন— "ইনস্টলমেন্ট পঞ্চাশ টাকা।" মামলা শেষ হলো। উমেশ খুব খুশি। তিনি ভেবেছিলেন যে ইনস্টলমেন্টটা পাঁচিশের উপর উঠবেই না। আমি হাঁক ছেড়ে

বাঁচলাম। মনে মনে বললাম— "ছোট আদালতের মামলা, হে ভগবান, শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" জীবনে আর কখনো ছোট আদালতে যাই নি।

॥ ২ ॥

কলকাতা হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল সাইডে নানা রকমের কাজ হয়। কমার্সিয়াল কাজ, কোম্পানী ল, বিষয়-সম্পত্তি কেনা-বেচা বা ভাগ-বাঁটোয়ারা, যৌথ কারবারের winding up ও হিসেব-নিকেশ Insolvency এবং আরো কত কি। মাঝে মাঝে Election Petition ও হোতো। ভারতীয় নতুন সংবিধানের দৃশ্য ছাষিশ ধারা মতে যে সব রকমারি রিট পিটিশন হয়ে থাকে বলে কাগজে দেখি সে সব সে আমলে হোতো না, কেন না তখন ঐ সংবিধান হয়-ই নি। তখন কঠিন-কদাচিৎ Writ Petition হোতো বড় জোড় mandamous বা certiorari-এর জন্যে। আমাদের সময়ে ওরিজিন্যাল সাইডের কাজ মোটামুটি এক ধরনেরই হোতো। অবিশিষ প্রত্যেক মামলার ঘটনাবলী ভিন্ন রকম থাকত এবং সাক্ষী-সাবুদের জেরায় উপর অনেক সময় মামলাটা নির্ভর করত। সুক্কা আইনের তর্ক প্রারম্ভ উঠত এবং কৌশলীদের বহাস শোনবার মত হোতো। এক এক সময় সালিশী মামলার হিড়িক লেগে যেতো। সালিশদের award নাকচ করবার দরখাস্ত, সালিশ বদল ইত্যাদি ছোট ছোট মোসনে জর্নিয়ারদের খুব সুবিধে হোতো। অনেক মোসন ও মামলা নিজেই করেছি এবং অনেকগুলিতে জর্নিয়ারও ছিলাম। সবগুলির কথা মনে নেই। পুলিশ কোর্ট ও ছোট আদালতের দুটি বেগার মামলার অভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি। হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল সাইডের দু-চারটে মামলা যা মনে পড়ছে এইখানে তা বলে রাখছি।

হিন্দু ল-তে হিন্দু পরিবারের বিধবাদের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা আছে। অনেক সময় অব্যবস্থার পরিবর্তনে, যেমন বিধবার শারীরিক অসুস্থতা, বা বাজারে মহাধর্তা ইত্যাদি কারণে বিধবার মাসোহারা বাড়ান হয়েছে বলে নজির আছে। এখন হয়েছে কি, বাংলাদেশের এক রাজপরিবারের বিধবা রাণীর মাসোহারা বরাদ্দ হয়েছিল হাইকোর্টের অনেক কাল আগের এক কনসেন্ট ডিক্রিযোগে। তখনকার রাজা সবে সাবালক হয়ে যখন গদিতে বসেছিলেন যখন সেই রাজার সং মায়ের জন্যে মাসোহারার ডিক্রি হয়। রাজার সং মা মাসোহারার শপে যৌথপদর শহরে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। রাজার মনে হোলো যে মাসোহারার টাকাটা মায়ের ভোগে না এসে তাঁর ভাইদের ও

বাপের বাড়ির অন্যান্য পোষাদের কাছে লাগে। রাজার এটা খারাপ লাগল। রাজা তাঁর এটর্নী মন্মথ দত্তের শরণাপন্ন হলেন। মন্মথবাবু ধীরস্থির মানুষ ছিলেন। মক্কেল নিয়ে মন্মথবাবু একদিন আমার বাড়ি এলেন। পুরনো সুটের কাগজপত্র ও পুরনো ডিক্রিটার কাঁপ পড়লাম। Mulla ও Maine-এর হিন্দু-ল ঘাটলাম। গোলাপ সরকার ও যোগেন ঘোষের বইও বাদ গেল না। রাজা সাহেব ও মন্মথবাবুকে বললাম— "মশায়, অবস্থার পরিবর্তনে মাসোহারা বাড়াবার নজির ত' রয়েছে দেখছি। কিন্তু মাসোহারা কমানোর ত' নজির পাচ্ছি নে।" মন্মথবাবু বললেন— "অবস্থা পরিবর্তনে যদি মায়ের মাসোহারা বাড়তে পারে তবে অবস্থার উল্টো পরিবর্তন হলে কখনে না কেন, স্যার?" আমি তবু বললাম— "হুজুর দিক থেকে নীতি-গতভাবে মাসোহারা কমান যদি বা চলে, কোন ক্ষেত্রে কমেছে বলে ত' নজির দেখছি না।" রাজা সাহেব বললেন— "যদি ব্যাপারটা একেবারে হাস্যকর না হয় তবে মামলাটা ঠুকে দেওয়াই ভাল, কেন না পরে একটা মিটমাট করে নেওয়া যাবে।" মক্কেলের এই রকম শব্দ বৃষ্টি দেখে মন্মথবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন— "দাশ সাহেব, আপনি একটা প্রেন্ট ত' লিখে দিন, পরের কথা পরে। যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।" আমি বললাম— "তা প্রেন্ট লিখতে ত' দেরি হবে না। কিন্তু ডার আগে জনা দরকার যে রাজা সাহেবের বা তাঁর মায়ের আর্থিক বা পার-মার্থিক অবস্থাটার কি পরিবর্তন হোলো।" কনসাল্টেশনে যা শুনলাম তা এই— যখন রাজি খুশিতে ডিক্রি হয় তখন রাণীমার বয়স ছিল অল্প, এখন তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন এবং তাঁর ধর্মকর্মের খরচা ছাড়া জাকজমক কমেই গেছে। রাজা সাহেব তখন সবে সাবালক হয়ে গদিতে বসেছিলেন এবং তখনো তাঁর সন্তানাদি কিছুই হয় নি। এখন রাজা সাহেবের দুইটি কুমার বাহাদুর হয়েছেন এবং তাঁরা দু'জনেই সাহেবী স্কুলে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্যে গৃহশিক্ষক চাই গোটা দুই এবং তারপর গানের মাস্টারও লাগবে। রাজকুমারদের ঘোড়া এবং মোটর গাড়িও চাই। তা ছাড়া জমিদারীর আয় কমে গেছে, সেরেস্তার কর্মচারীদের মাইনেও বেড়েছে। এবম্বিধ অবস্থার আগে যে স্বচ্ছল হারে মাসোহারা দেওয়া সম্ভব হয়েছে তা এখন আর হচ্ছে না। সব শুনতে-টুনে বললাম— "প্রেন্ট ত' আমি লিখে দিচ্ছি তবে জজ সাহেব যদি মামলার খুঁজি শুনেন হেসে আমাদের বিদায় করেন তবে আমি কিছু জ্ঞান নে, মশায়।" মন্মথবাবু বললেন— "অতদূর গড়াবে না, স্যার।" প্রেন্ট লেখা হোলো এবং ফাইলও হোলো।

[ক্রমশঃ]

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
এম্বাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া,
কুমারার চর ও পূর্ণিমাশিলন।

মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

[কংগ্রেস নেতার জবানবিত্ত—মুখ্যমন্ত্রীর
পদত্যাগের নৈপথ্যচিত্র]

- * অধ্যাপক হুমায়ূন কবির ছয় মাসের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন।
- * সময় মত এ্যাড হক কংগ্রেস হলে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করতেন এবং বর্তমানে সংখ্যালঘু সরকার, পরে জানুয়ারী মাসে পুরো কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করতেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ প্রসঙ্গ এবং তার জের রাজ্য রাজনীতিতে এখনও উত্তাপ সৃষ্টি করে চলেছে। বিবৃতি আর পাল্টা বিবৃতিতে খবরের বোঝার কাগজগুলির প্রাণান্তকর অবস্থা। অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ, আস্থা আর অনাস্থা—প্রভৃতি ঘটনার রাজনীতির মোড় ঘুরছে অহরহ। কিন্তু এই সব কিছুর মূলে আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের গত ২রা অক্টোবর রাতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ও পরে প্রত্যাহার প্রসঙ্গটি। সকলেই ব্যস্ত একে অপরের সমালোচনা আর ঘটনার নৈপথ্য রহস্য সম্বন্ধে। কিন্তু গত এই পক্ষকালের সংবাদের বোঝার মধ্যে—এই নাটকের মূল গায়নের কিন্তু আওরাজ পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ—রাজ্যের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস যে বক্তৃষ্ট সরকারের পতন ঘটানোর প্রধান হোতা বা স্বার্থক—তাদের ভূমিকা ও বক্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে না। অর্থাৎ মাছ, ছিপ, বড়িশ, ফাতনা এই সব নিয়েই সকলে মসগুল। কিন্তু ছিপ ধরে বসেছিল যে ব্যক্তিরূপী সংগঠনটি তারা কিন্তু পদার অন্তরালেই রয়ে গেল। তাই সব নাটকের মূল হোতার বক্তব্য জানার লোভে মিলিত হয়েছিলেন রাজ্যের জনৈক সর্বপ্রধান কংগ্রেস নেতার সঙ্গে। গত ৫ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী বেমন অকপটে মন্ত্রিসভা ও বক্তৃষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করেছিলেন তাঁর পদত্যাগের নৈপথ্যচিত্র। ঠিক এই কংগ্রেস নেতাও অকপটে বল গেলেন কংগ্রেসের দিকের নৈপথ্যচিত্র। জানি না সেইদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সহকর্মীদের কাছে যে সকল তথ্য রেখেছিলেন তার মধ্যে কোন ভেজাল ছিল কি না আর কংগ্রেস নেতার বক্তব্যে যা প্রকাশ পেল জানি না তার মধ্যেও কোন ভেজাল আছে কি না। আমাব কংগ্রেস নেতার সঙ্গে সমস্ত আলোচনাটি প্রশ্ন-উত্তরের আকারে পেশ করছি।

[স্থান—কলকাতার অভিজাত পল্লীর একটি ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলায় একখানি ঘর। বিজয়ার প্রীতি-আলিঙ্গন বিনি-

স্ট্রাইট বোকা

কৃতিবাস ওয়া

ময়ের পর—সন্দেশের ঠিক সামনে এলো। জিজ্ঞাসা করলেন কংগ্রেসের নেতা রাজ্যের নানা খবর আর কমিউনিষ্টরা কিরকম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে সেই প্রশ্ন।

পরে এল আসল প্রশ্ন।

প্রশ্ন—আজ্ঞা অজয়দা এমন করে শেষ মর্মেতে সব কিছুর ভেস্তে দিলেন কেন বলুন তো।

উত্তর—শ্রদ্ধে সময়মত এ্যাড হক কংগ্রেসটা না-করায় কামরাজ আর ওড়ুমো টালবাহানা করলো আর কাগজগুলো সব উন্টোপাল্টা লিখতে শুরুর করলো—তাতেই অজয় ভয় পেয়ে গেল। আর বৌদি; সত্যি, হেমন্ত নানাজনে গোলমাল করে দিল।

প্রশ্ন—অতুল্যাবাহুই বা এমন করলেন কেন?

উত্তর—ওর মাথার গোঁ চাপল—এ্যাড হক করতে সে রাজী কিন্তু সে এ্যাড হক সে নিজে করবে। ২০শে সেপ্টেম্বর রাতে টেলিফোনে তাঁকে সবই বলা হল। আদি—বিজয় দুই জনেই কথা বললাম, কিন্তু কিছুতেই বুঝল না। আবার অজয়েরও এক কথা আগে এ্যাড হক চাই। তারপর নন্দ অনেক চেষ্টা করলো কামরাজকে ধরতে, কোনভাবেই পাওয়া গেল না—তবে ইন্দিরাকে সব বলাতে তিনি বললেন—গো এ্যাডহক।

প্রশ্ন—আজ্ঞা অজয়দার সঙ্গে আপনাদের এই যোগাযোগ কত দিন থেকে চলছে?

উত্তর—যোগাযোগ চলতে শুরুর হয়েছে জুন মাস থেকেই—এই সময়েই বাংলা কংগ্রেস আর ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আদ্যার কাছে কেউ কেউ এসে কিছু প্রস্তাব দেয়। সেই কথা ময়দানের সভায় বলা হয়েছিল। তবে পরে বাংলা কংগ্রেসের একজন

প্রধান ব্যক্তিই বিনষ্ট যোগাযোগ রেখে কথাবার্তা চালান।

প্রশ্ন—তিনি কি শ্রীরামনগিনী চক্রবর্তী?
—উত্তর নেই।

প্রশ্ন—কবে অজয়দার সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হয়—আর মোটে কতবার কথা হয়েছে।

[এই প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতা এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যের সার কথা হল :]

বেলগাছিয়াতে এক জমিদার পল্লী-বারের বাড়িতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তরদাতার ৯ই সেপ্টেম্বর প্রথম দেখা হয় এক ভোজসভায়। তারপর অনেকবারই দেখা হয়েছে। রাজ্যে ১৬ই সেপ্টেম্বর ভোজসভায় দু'বার কথা হয় একবার খাবার আগে একবার পরে। শ্রীমন্ড কলকাতায় থাকতেও ২০শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে এক ভোজসভায় তিনি, শ্রীমন্ড ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মিলিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন—আপনার এই বাড়িতে কি অজয়দা কখনও এসেছেন?

[এই কথাটারও জবাব দেন নানা কথার মধ্যে, তবে তার সার কথা হল :]

হ্যাঁ, দু'বার এসেছেন এবং দু'বারই গভীর রাতে—পুলিশ ও সিকিউরিটিকে ঘাঁকি দিয়ে।

প্রশ্ন—অজয়দার পদত্যাগের কথাটা পাকা হল কবে?

উত্তর—পদত্যাগের কথা নানাভাবেই নানা সময়ে উঠেছে। প্রথম কথা হয়েছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর বৈদিন কংগ্রেস লক্ষ মানুষের শোভাযাত্রা নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস ঘাবে—সেইদিন তিনি পদত্যাগ করে লক্ষ জনতার সামনে এসে দাঁড়ান আর কংগ্রেস থেকে তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করা হবে। তারপর নন্দা আসবার পর ঠিক হয় ২রা অক্টোবর পদত্যাগ করবেন।

এ-বসন্ত

সরিৎ শর্মা

আশ্চর্য নতুন সুরে এ-বসন্ত ডেকেছে আমায়—

ভোরের ভৈরবী গানে মীড় আর গমকের রাগ-মুহূর্তনাম,
আকাশ উধাও-করা দিবসের গানের শিখার,
রাত্রির আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের দীপ্ত সুষমায়,
সে-সুরে সর্বত্র যেন পূজক-স্পন্দন তুলে হৃদয় জাগায়।

আশ্চর্য নতুন সুরে এ-বসন্ত ডেকেছে আমায়—

রৌদ্রের ভরলগা ওঠে, বাতাসে কাঁপন—
তখন সে-সুরে যেতে মনে হয় সবই তো আপন,
উজ্জ্বল নদীর ঢেউয়ে রৌদ্রের সে-বান
উচ্চকিত করে যায় সে-সুরের গান;

দিগন্ত-লম্বন করা প্রান্তরের শ্যামল প্রসার—

পাতা-ঝরা অরণ্যের আরম্ভিত শিখার সঞ্চার—
হুলিতে মাটিতে ঘাসে জীবনের অখ্যত বিস্তার
—সবি যেন সে-সুরের বসন্ত-বাহার;

মানুষ বেঁধেছে ঘর, ফুটিয়েছে পৃথিবীর ফুল,
পরিণত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সহস্র হৃদয় আজ

সমাবেশে হয়েছে আকুল—
কল্লোলমুখর কোনো দিনের মিছিলে
শিশুর চরণচিহ্নে ভরে বাবে সমস্তের নব উপকূল;
—এ-সব আশায়

আশ্চর্য নতুন সুরে এ-বসন্ত ডেকেছে আমায়—

এসেছে ভোরের আলো মনে হল তুমি দিলে জেনলে
কৈকিল ডেকেছে বনে মনে হল তুমি ডেকে গেলে
বাতাসে কেঁপেছে বন মনে হল তুমি যেন এলে
নদীতে লেগেছে দোলা মনে হল তুমি সাড়া পেলে।

সাগরে লেগেছে টান মনে হল সে তোমারই প্রাণ
আশায় জেগেছে বান মনে হল সে তোমারই গান;

অনেক বসন্ত গেছে কত যন্ত্রণায়—

তোমারই আশ্চর্য সুরে এ-বসন্ত ডেকেছে আমায়।

পদত্যাগের পর যে বিবর্তিত দেবেন
সেটা বাংলায় লিখে আমাদের কাছে
পাঠিয়ে দেন ইংরাজীতে সাইক্লো
করবার জন্য। পদত্যাগের পর
সেই বিবর্তিত প্রচারের উদ্দেশ্যে
বহু কাঁপ সাইক্লোস্টাইল্ড করা
হয়েছিল।

প্রশ্ন—সেই বিবর্তিত কোথায়?

উত্তর—সাইক্লো করে ১লা অক্টোবর রাত
আড়াইটার একটা বড় ব্যাণ্ডল করে
সেটা সুশীল ধাড়ার কাছে দিয়ে
আসা হয়।

প্রশ্ন—আচ্ছা—অজয়দার সঙ্গে আপনার
যা কথা হয়েছিল তাতে মন্তিসভা
কেনমন হতো?

উত্তর—মন্তিসভা সম্পর্কে সব ডার
অজয়ের উপর ছিল—আপাতত সে
যা করলে ভাল হয় তাই করতো—
তবে একথা ঠিক জানুয়ারী মাসে
অজয় কংগ্রেসে যোগদান করতো
আর কংগ্রেসকে নিয়েই মন্তিসভা
গড়তো।

[আরো অনেক কথার পর উঠলো
কবির প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে তিনি
জানালেন হ্যাঁ, দুই কবিরের সঙ্গেই তাঁর

এই নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে—আর
তার ক্যাটেও তাঁরা এসেছেন।]

প্রশ্ন—আচ্ছা অধ্যাপক কবির কি চেয়ে-
ছিলেন?

উত্তর—সে অনেক কথা—তবে কবিরের
প্রস্তাব ছিল যে, তাঁকে হয় মাসের
জন্ম রাজ্যের মধ্যমস্ত্রী করা হোক।
হয় মাস সে এম-পি-এর আসন
ছাড়বে না, হয় মাস পরে সে
সেন্টারে ফিরে যাবে—ইন্দিরার
সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

প্রশ্ন—এই কথা কখন উঠেছিল?

উত্তর—যখন থেকে দেখলে বাংলা কংগ্রেস
থেকে ক্লান্তি বেরিয়ে আসবার
উদ্যোগ করছে।

প্রশ্ন—এই ব্যাপারে কবিররা দুই ডাই
কি একমত ছিল?

উত্তর—না—ছোট ডাই আর মেজদার
মধ্যে কিছু মত-বিরোধ ছিল, তবে
সেই মতবিরোধের সঙ্গে আমার
কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রশ্ন—আচ্ছা—২রা রাতে অজয়দা যখন
পদত্যাগ করলেন না তখন
কবির কি বলল?

উত্তর—আরে কবির আর মহতাব তো

রেগে আগুন—মহতাব তো মৃত্যু
যা এলেছিল তাই বলেছিল।

প্রশ্ন—এর পরও কি মনে করেন আবার
নতুন করে কিছু হতে পারে?

উত্তর—সবই ঠিক আছে। বললাম তো
অজয়ের রাগ আর ভয় শূন্য
ওত্থোকো নিয়ে। অজয় যেদিন
বুকেবে ওত্থোকো ওর কিছু করতে
পারবে না তখনই ও ফিরে আসবে।

প্রশ্ন—সেইরকম অবস্থা কতদিনে হতে
পারে?

উত্তর—ডিসেম্বরের বেশি লাগবে না
আর যা হোক অজয় কমিউনিস্টদের
সাথে থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন—কবির?

উত্তর—ওকে তো মধ্যমস্ত্রী করলে বা
সেন্টারে একটা ব্যবস্থা হলে
কালই.....

প্রশ্ন—ডঃ বোম?

[একটু হাসলেন—ভাবখানা এই
তিনি তো তাঁদেরই লোক।]

আরো অনেক কথার পর বেরিয়ে
এলাম— মনে শূন্য একটা প্রশ্ন—যা
শুনলাম সব সত্যি?

আমুখোশ একটি মহাযাত্রা



কলার পোল যুদ্ধের পূর্বাভাস

“বিপ্লবী বন্দু” বিচিত্র ব্যবহার ও তাঁর দূর্বোধ মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং “মামাবাবু”র অনুন্নয়নমূলক “আদেশ” ও মনোবাহার স্বরূপ বিবেচনা করে সম্মার পর লোকনাথ “বন্দু” গৃহত্যাগ করলো। লোকনাথ নির্মলদার মামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। উপস্থিত লোকনাথ সাময়িকভাবে মাস্টারদা ও অন্যান্যদের সংস্পর্শ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

বিনয়দার বাড়িতে রজত, মনা, দেবু, স্বদেশ, ফণী ও সুবোধ একত্রে আছে। কিন্তু এই ছ’জন সাথী নিষ্কিন্ধভাবে বসে থাকতে একেবারেই নারাজ। গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে—আক্রমণের নতুন নতুন প্রায়ন নেওয়া চাই। নিরবচ্ছিন্নভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে হবে। নিষ্ঠুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর হৃদয়-শোণিতে তপ্পন করা চাই। যুব-বিদ্রোহের দিন ইউরোপীয়ান ক্লাবে নিষনযজ্ঞ। আমরা সম্পন্ন করতে পারি নি। জালিয়ানওয়ালা-বাগের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ তখনও নেওয়া হয় নি। প্রতিশোধ নিতেই হবে—প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাতেই হবে। জালালাবাদের শহীদদের আহ্বান এই ছ’জন বিপ্লবী সৈনিক যেন প্রতিদিনই পাচ্ছে—ইংরেজের পরিচয় নেই, প্রতিশোধ চাই। এই সাথীরা মৃত্যুসংকল্পে দৃঢ় ও বুদ্ধিপরিপূর্ণ। এরা সক্রিয় প্রায়ন গ্রহণ করলো।

পাহাড়তলী ও কর্ণফলী নদীতীরে সদরঘাট জেলার কাছে ব্যালেনটাইন ঘাটে সাহেবদের দুটো ক্লাব ছিল। রেল ও সরকারী বড় সাহেবদের প্রমোদভবন হ’ল এই ক্লাব দুটি। ক্লাব আক্রমণের জন্য নিখুঁতভাবে বিস্তারিত প্রায়ন করার প্রয়োজন তারা মনে করে নি। শহরে পুলিশ ও মিলিটারীর রাজত্ব চলছে। বসে

থসে বহুদিন ধরে শান্ত পরিবেশে গোপনে প্রায়ন করার পরিস্থিতিও বর্তমানে আর নেই। সশস্ত্র আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাই এখন প্রয়োজন অশ্বকারে গা ঢাকা দিয়ে ক্লাব-গৃহের কাছে এগিয়ে যাওয়া এবং অতর্কিতে সাহেবদের আক্রমণ করে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর হাতে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ নেওয়া।

অল্প সময়ের মধ্যে ~~যুব-বিদ্রোহের সতেরো দিন পরে~~ অবস্থার নিখুঁত সংবাদ পাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা’ ছাড়া সরকার-পক্ষ নিতানতুন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে—আজ যা আছে কাল তার পরিবর্তন হচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থার সম্যক উপলব্ধি আছে বলেই তারা দুটি ক্লাবকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বলে ধরে নিয়েছিল—একটাতে অসুবিধে থাকলে অন্যটিকে যেন বিধ্বস্ত করতে পারে। বিনয়দার মারকুত এই প্রায়নটি তারা মাস্টারদার কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠায়। মাস্টারদা তাদের এই প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সমর্থন জানালেন।

যুব-বিদ্রোহের সতেরো দিন পরে সম্মার অশ্বকারে ওই ছ’জন বিপ্লবী সাথী গ্রাম থেকে শহরে এল। বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে তারা বুঝেছে যে, সরাসরি ক্লাব আক্রমণ করতে যাওয়া সম্ভব নয়। পথে মিলিটারী ও পুলিশের বাধা আছে। কাজেই শহরে কোন নিরাপদ স্থানে একটু অপেক্ষা করে অবস্থাটা সম্যকভাবে বুঝে নেওয়াই তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। এই কারণে, তারা ছ’জন সম্মার অশ্বকারে যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে রজতের শহরের বাড়িতে প্রবেশ করে। বলাই বাহুল্য বাড়ির সামনের প্রবেশপথ তারা পরিহার করেছে। কিন্তু এত সাবধানতা ও সতর্কতা কোনই কাজে এল না।

যুব-বিদ্রোহের সতেরো দিন পরে রজতের বাড়ি বা আমাদের অন্যান্য বিশেষ পরিচিত সাথীদের শহরের বাড়ি আর নিরাপদ ছিল না। পুলিশ প্রতিটি বাড়ি ও সন্দেহজনক প্রত্যেকটি বাড়ির স্থানীয় দৃষ্ট লোকদের গুরুতর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। উপযুক্ত ভাষার ব্যবস্থা করে ও অতিরিক্ত পদস্কারের লোভ দেখিয়ে ওই সব দৃষ্ট লোকদের বিপ্লবীদের গতিবিধির ~~কর্তৃত্ব~~ সংবাদ সত-বরাহের ঘণ্টা কাজে টেনে এনেছিল।

রজতের বাড়ির চারপাশে, স্থানীয় ওই সব লোকেরা সর্বক্ষণ গোয়েন্দাগিরিতে বহাল থাকতো। রজতের বাবাও এই গোপন পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিলেন এবং ছ’জন বিপ্লবী সাথীও এইরূপ অবস্থা সম্বন্ধে আগে থেকেই কিছু অনুমান করেছিল। এই জন্যই বিপ্লবী সাথীরা ও রজতের বাড়ির সকলেই সাধারণভাবে সাবধান ছিল। রজতেরা পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রজতের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা নিজ বুদ্ধিতে বাড়ির চারদিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

দাদা এসেছে—দাদার সাথীরা এক সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফিরেছে, ছোট ভাই-বোনেরা কি আনন্দ! কি উৎসাহ!—“দাদা, তুমি এসেছ! তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি নি। তোমরা যাও, ভেতরে যাও। মা-বাবা এখন বাড়িতে আছেন। বাইরের লোক কেউই নেই। কোন ভয় নেই—আমরা এখানে পাহারায় আছি। পুলিশ এলে আমরা আগেই জানাবো—তোমরা প্রস্তুত হবার সময় পাবে।” রজত ভাই-বোনের আবেগভরা আন্তরিক সাড়া পেয়ে বুঝেছে যে, তারা কেউই ভয় পায় নি—বিপ্লবের পথে দাদাকে সব রকম সাহায্য করতে তারা সব সময় প্রস্তুত। রজত গলার স্বর একটু নামিয়ে

বোনকে জিজ্ঞেস করলো—“হ্যাঁ রে, শোন—বাবা কি খুব রেগেছেন? বন্দুক নিয়ে গোঁহি বলে কি চটেছেন? পদলিশ কি হামলা করেছে? আমরা ভেতরে যাব? আমাদের দেশে ভয় পাবেন না তো? হঠাৎ চটে গিয়ে বেরিয়ে যেতে বলবেন না তো?” ভাইবোনেরা প্রায় একসঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—“দাদা, তোমার একটুও বৃদ্ধি নেই। কেবল সাহেব মারতে আর যুদ্ধ করতেই পার। বাবা-মা তোমাদের ওপর কখনও রাগ করতে পারেন? যাও, যাও, তাড়াতাড়ি বাবা-মার সঙ্গে দেখা কর—তখন বুঝতে পারবে, তোমাদের নিয়ে তাঁদের কত গর্ব!”

রক্ত অপর পাঁচজন সাধীর সঙ্গে বাড়ির অন্তরমহলে প্রবেশ করলো। মা ছেলেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে নিজের ঘরে দেখে ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন—এ কি স্বপ্ন না বাস্তব! রক্ত ছুটে গিয়ে মাকে প্রণাম করলো। না, এ তো স্বপ্ন নয়? মা রক্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—মায়ের অন্তরের কত স্নেহ, কত ভালোবাসা, কত আশীর্বাদ! রক্ত জিজ্ঞাসা করলো—“মা, সত্যি বল, তুমি বৃদ্ধি হলেছ? আমরা অন্যায় করেছি—একথা একবারও ভাব নি? বাবা কি.....?” মা বাধা দিয়ে বললেন—“কি যে বলিস বাবা! দেশবাসী আজ তোদের প্রশংসা পুষ্টমুখ। চট্টলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক তোদের নিয়ে গর্বিত। আমরা কি কখনও তোদের ওপর রাগ করতে পারি? তোরা আজ আমাদের কাছে কত বড় গবেষক! তোদের এই বিপদের সময় আমরা তোদের সামান্য কাজে লাগলেও মনে করবো স্বাধীনতা যুদ্ধে কিছুটা অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলাম। গণেশ অন্তরাত্ম চারজন আমাদের এখানে ছিল। পদলিশের আকস্মিক আক্রমণ থেকে কোন-মতে তারা বেঁচেছে। বা, তোর বাবার কাছে সব শুনবি.....!”

রক্ত এই প্রথম জানলো যে, আমরা চারজনও তাদের শহরের এই বাড়িতে ছিলাম। রক্তের সঙ্গে বাকী পাঁচজন সাধীও একে একে মাসীমার পারের ধুলো নিল। রক্তের বাবার কাছেও তারা ছজন বীরোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা পেলে। রক্তবাবুর পারের ধুলো মাথায় নিয়ে তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন।

মাসীমা রাস্তাঘরে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি কিছু রেখে তাদের নিজ হাতে সামনে বসে যাওয়াতে। অপর দিকে তাদের অজান্তে শহরপক্ষের তৎপরতাও সমানে চলেছে। দৃজন দৃষ্ট লোক থানায় গিয়ে খবর দেয় যে, রক্তকে পাঁচ ছজন সাধীর সঙ্গে নিজ বাড়িতে প্রবেশ

করতে তারা দেখেছে। কোতোয়ালি রক্তের বাড়ির খুব কাছে—সিকি মাইলও বোধহয় হবে না। সদর থানায় ডি এস পি আসানুজ্জা স্বয়ং উপস্থিত ছিল। এই মূল্যবান সংবাদ পাওয়া মাত্রই আসানুজ্জা পদলিশ সাহেব, ডি আই জি ও কনেষ্টেবল স্মিথকে টেলিফোনে খবর দিল যেন ফোঁজ নিয়ে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি হাজির হন। আসানুজ্জা নিজে থানার একদল কনেষ্টেবলের সঙ্গে রক্তের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হল। কোতোয়ালি ইনচার্জ আজমী সাহেব দেখলেন যোগ্যতার পুরুষকার খাঁ সাহেব আসানুজ্জা একাই লাভ করতে চাইছে। আজমী সাহেবের পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। তিনিও আর একদল সশস্ত্র কনেষ্টেবল সহ ভিন্ন পথে বেরিয়ে পড়লেন ছজন বিপ্লবীকে জীবিত অথবা মৃত ধরবার অভিপ্রায়ে।

কোতোয়ালিতে সংবাদ পাবার পরেই খুব ক্ষিপ্ততার সঙ্গে যদি তারা রক্তের বাড়ি ঘিরে ফেলতে পারতো তবে হয়ত রক্তবাবুর বাড়িই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো। আসন্ন যুদ্ধ ও মৃত্যু-বিত্তীকর্কি যে আসানুজ্জা ও আজমী সাহেবের ক্ষিপ্ততার গতি মন্ডর করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে মাসীমা রাস্তা সেরে টেবিলে ছ'খানা থালা সাজিয়ে রক্তদের ডেকে পাঠালেন। তারা সকলে খেতে বসেছে। কিন্তু খাওয়া আর তাদের হ'ল না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিনিদ্র রক্তনী বাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য, গুপ্ত সপের হ্রস্ব ফণা যাদের দংশনে উদ্যত, মা-বাবার স্নেহ, বাড়ির স্বপ্নে তারা বহুদিন ধরেই বাঞ্ছিত, তাদের পক্ষে থালা সাজানো বাড়ি ভাত স্বাভাবিক নিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাত্র।

পাহারার নিম্ন রক্তের ভাইবোনেরা হঠাৎ সঙ্কেতধ্বনি করলো—“পদলিশ! পদলিশ!” ছজন বিপ্লবীর হাত সঙ্গে সঙ্গে কটিবদ্ধ রিভলভারের ওপর নিবদ্ধ হ'ল। ভাতের থালা অনাদৃত পড়ে রইল। তারা উঠে মাকে প্রণাম করলো—মা অজ্ঞান আশীর্বাদ করলেন। রক্ত বলল—“মা, ভেবো না, ভয় কোর না—আমরা জম্মী হব।” রক্তের বাবা বাস্তব হয়ে পড়লেন। তিনি রক্তকে ডেকে বললেন—“শাহজীর নৌকো-খাট দিয়ে নদী পার হওয়া সহজ হবে। ওই দিকের পথই সহজ এবং দ্রুতও কম। তোরা ওই পথে যেতেই চেষ্টা কর; ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন।” রক্তের পিতার নির্দেশ ও আশীর্বাদ শিরোধার্য করে তারা দ্রুত রওনা হ'ল।

পদলিশ খাওয়া করে আসছে; দাদা চলে যাচ্ছে, দাদার সাধীরাও অনির্দিষ্টের পানে পা ফেলেছে—রক্তের ভাইবোনেরা

বাথাজুর নদনে রক্তদের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। রক্তের বাবা অসহায় অবস্থার অন্তর উজাড় করে চট্টলার সন্তানদের কল্যাণ ও বিজয় প্রার্থনা করলেন। মা বিনোদিনী শান্ত, ধীর, গম্ভীর—এক অপূর্ব মাতৃরূপা বীর বাঙালী রমণী বিপ্লবী সন্তানদের বিদায়-কালে দুঃহাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

রিভলভার হাতে বিপ্লবীরা বাড়ির সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পদলিশের দল যখন এসে পৌঁছেছে, তারা তখন নদীর ঘাটে। পদলিশ খবর পেয়ে পেছা নিয়েছে, সহজে হার মানবে না—তবে সরাসরি পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসে পৈতৃক প্রাণটা হারাতে তারা রাজী নয়। সৈন্যবাহিনী আসা পর্বন্ত দূর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে বিপ্লবীদের অনুসরণ করা বেশ বুদ্ধিমানের কাজ। খাঁ সাহেব আসানুজ্জা ও সদর থানা ইনচার্জ আজমী সাহেব বুদ্ধিমানের মত সেই কৌশলই অবলম্বন করলেন।

আমাদের মামলার জাজমেন্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

“A useful map of the entire area has been prepared. It is Ex. III. On the night of 6th. May about 8-30 or 9 p.m. S. I. Abdul Azim and D. S. P. Khan Bahadur Ashanulla were sitting in Kotwali P.S. along with several other police officers when they received certain information about some persons suspected to belong to the raiders and hastened towards Shahaji Ghat on the Karnafuli river at the end of Feringhee Bazar.”

“Abdul Azim went to Abdul Haq Dubhas's Jetty where he found no suspects but got some more information and saw a ‘Sampan’ (boat) putting out across the river from the Jetty. He called out but there was no reply. In the meantime Khan Bahadur Ashanulla had found a ‘Sampan’ at Shahaji Ghat and in it he and S. I. Hem Gupta, S. I. Fazlur Rahaman, S. I. Pande Ali and two youths from Feringhee Bazar, one of whom was their informer, set out across the river in pursuit.”

Abdul Azim had some difficulty in securing a 'Sampan' but a little later he succeeded in finding one and on it he accompanied by Inspector Heramba Ghosh, S. I. Abdur Rahim, S. I. Jogendra Das and S. I. Rohini Bhoomik, followed Ashanulla's party across the river."

[জজ সাহেব লিখছেন, এই ছড়নের সঙ্গে যে বৃষ্টিপাতা হয়েছে, সেই রণক্ষেত্রের সম্পূর্ণ এলাকার একটা নক্সা প্রস্তুত হয়েছে। এই নক্সাটি তিন নম্বর একজি-বিট। রাত সাড়ে আটটা বা নটার সময় কোতোয়ালিতে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা ও আজমীরের সঙ্গে আরো কয়েকজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে এক খবর এল, শাহজাদী ঘাটের দিকে বিদ্রোহীদের একটা দল ছুটে চলেছে। ফিরিশ্চা বাজারের শেষপ্রান্তে কণকদুলী নদীতীরে এই ঘাটটি অবস্থিত।

কোতোয়ালি ইন-চার্জ আবদুল আজীম আবদুল হক দোভাষীর জেটির দিকে ছুটে গেলেন। সেখানে বিদ্রোহীদের কাউকে দেখতে পেলেন না; কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করলেন। তিনি অদূরে একটা "সাম্পান" (নৌকা) নদী পাড়ি দিচ্ছে দেখতে পেলেন। দেখে তিনি হাঁক দিলেন কিন্তু কোন উত্তর মিললো না। ইতিমধ্যে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা সদলবলে—সাব-ইনস্পেক্টর মহোদয়, হেম গদগু, পাণ্ডে আলি, ফজলুর রহমান ও দু'জন ফিরিশ্চা বাজারের বৃদ্ধ শাহজাদী ঘাটে একটা সাম্পানে চাপলেন। শেষোক্ত দু'জন বৃদ্ধের মধ্যে একজন গোয়েন্দা। তারা এই নৌকা নিয়ে বিদ্রোহীদের পেছনে ছুটলেন। আবদুল আজীমের নৌকা জোগাড় করতে কষ্ট হয়। অবশেষে তিনিও তাঁর দলে ইনস্পেক্টর হেরাম ঘোষ এবং তিনজন দারোগা—আবদুর রহিম, যোগেন্দ্র দাস ও রোহিণী ভৌমিককে নিয়ে আর একটা সাম্পানে চেপে আসানুল্লা সাহেবের নৌকা অনুসরণ করেন।]

সরকার পক্ষ রেখে ঢেকে রাখা স্বীকার করেছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, রজন-বাবুর বাড়িতে পুলিশদল পৌঁছবার আগেই বিদ্রোহীরা উধাও হয়েছে এবং এই পুলিশদল দুই পাটিতে বিভক্ত হয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে নৌকাযোগে তাদের অনুসরণ করেছে। খাঁ সাহেব ও আজমীর সাহেব—এই দু'জনেই প্রাণের ভয়ে বিদ্রোহীদের গুলীর পাল্লার বাইরে থাকার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু জজ সাহেব কুখ্যাত খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার স্মৃতি করেছেন।

ইংরেজ রাজপুত্রেরা এই ভাবেই ভারতীয় অফিসারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। জজমেন্টে মিঃ ইউনী লিখছেন—

"When Ashanulla's 'Sampan' had reached the middle of the river, an electric torch-light was flashed upon them from the southern bank and they rowed towards it. When they were within 50 or 60 cubits distance of the bank, they turned their torch-lights on it and saw some six persons sitting there who immediately got up and began to hasten south-eastern over the fields. Ashanulla's companions raised their rifles to fire at them but he forbade them as he was not certain that these were the same persons they were looking for."

[আসানুল্লার সাম্পান মারনদীতে এলে কণকদুলী দক্ষিণ তীর থেকে তাদের নৌকার ওপর ইলেকট্রিক টর্চের আলো পড়ে। আসানুল্লার পাটি নৌকা বেয়ে ওই দিকেই গেল। নদীতীরে পৌঁছবার পঞ্চাশ-ষাট হাত বাকী থাকতে টর্চের আলোতে তারা তাঁদের ওপর ছ'জনকে বন্দে থাকতে দেখে। আলো ফেলা মাত্রই সেই ছ'জন ভড়িপাড়িতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাঠের ওপর দিকে ছুঁড়ে আরম্ভ করে। আসানুল্লার সঙ্গীরা মুহূর্তে রাইফেল তুললো তাদের গুলী-করতে; কিন্তু এতক্ষণ তারা তাদের অনুসরণ করে আসছে এই ছ'জন লোক যে তারাই—এ সম্বন্ধে একেবারে সন্নিশ্চিত নয় বলে আসানুল্লা গুলী ছুঁড়তে বাধা দিল।]

অহো! কি মহান ভব খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা! জজসাহেব মিঃ ইউনী তার গুলিগানে মৃত্যু। যে কুখ্যাত ডি.এস.পি আসানুল্লা অসহযোগ আন্দোলন দমন করার সময় নিরীহ নিরস্ত্র লোকের ওপর বেপরোয়া লাঠি ও গুলী চালায়েছে; সেই বৃটিশ খেতাবধারী খাঁ বাহাদুর অস্ত্র-সংবরণ করেছে পাছে অপর কোন নিরীহ লোক আহত হয়! মিথ্যা প্রকল্পনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। বিদ্রোহীদের গুলীর পাল্লার মধ্যে রাইফেল দাগা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা আর কেউ বৃদ্ধক বা-না বৃদ্ধক খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার সেই বোধ-শক্তির অভাব ঘটে নি—তারা যে গান্ধীবাদী নয়; হাতে পিস্তল আছে, এত কাছে রাইফেল ফাটারের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁটি বা বারোটি পিস্তল গর্জন করে উঠবে। এই

অব্যগম্যভাবে নিম্নরূপ পরিণতির কথা ভেবেই আসানুল্লার পুলিশী চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটলো। মহান ভবতার মুখোমুখি পুলিশদের ভীতুতা, কাপুরুষতা ও অকর্মণ্যতাকে মামলার সমর জেরা করে আমরা লোকচক্ষে প্রকাশ করে দিই। বৃটিশ পুলিশ খাঁ বাহাদুর কত সংবত, কত বিবেচক, কত উদার?—পাছে ভুলে নিরীহ মানুষ জখম হয় তাই আর গুলী ছুঁড়লো না—বিদ্রোহীদের দ্রুত মাঠ অভিক্রম করতে সুযোগ দিল। কিন্তু সেই ছ'জনকে নিরীহ লোক বলেই যদি মনে হয় তবে বীরপদাংকের দল ইটের পাল্লার পেছনে গা ঢাকা দিতে গেল কেন? আমাদের মামলার জজমেন্টে মিঃ ইউনী লিখছেন—

"The party then landed near brick-field and waited there for ten or fifteen minutes to see if they could find anybody who could show them any way by which they could go round and intercept the fugitives...."

[তারা ইটখোলার মাঠে নেমে পড়ে এবং সেখানে দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে। কারণ, তাদের এমন একজন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল, যার সাহায্যে ঘোরা পথে গিয়ে পলাতকদের গতি অবরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।]

প্রথম সাক্ষী—গুলী ছুঁড়তে পারলো না পাছে তারা আততায়ী না হয়। দ্বিতীয় সাক্ষী—ঘোরা পথে গিয়ে পলাতকদের ধরবার জন্য একজন Guide-এর (পথ-প্রদর্শক) সম্মানে তাদের দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হল। অর্থাৎ—কাজ কি বাবা বিদ্রোহীদের গুলীর পাল্লার মধ্যে থাকা-দশ-পনেরো মিনিটে রিপবীরা অনেকদূর চলে যাবে।

বৃটিশ পুলিশ মরতে চায় না—নিজেরা বেঁচে থেকে বৃটিশ প্রকুর কাছ থেকে সুনাম ও পুরস্কার আদায় করবে। আসানুল্লা চৌকিদার, দফাদার, গ্রামের মোড়ল, ডিস্ট্রিক্ট ও ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর এবং প্রেসিডেন্ট গ্রামথেকে জড়ো করতে চাইল। এই সব সরকারী সংগঠনের লোকদের সাহায্যে গ্রামবাসীদের এক অংশকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। ছ'জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহীর সামনে নিরীহ গ্রামবাসীদের শিখণ্ডী খাড়া করে তাদের পেছন থেকে অনুসরণ করবার কৌশল অবলম্বন করলো খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্মুখ-মুখো অবতীর্ণ হবার সাহস বা ক্ষমতা এই ছোট পুলিশ পাটির ছিল না। কাজেই তারা গ্রামবাসীদের একটা

জমকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইল।

ভাড়াটী, হাকিমী ও চিকারের অসংখ্য গ্রামবাসীকে তারা একত্র করে নানা প্রলোভন ও বিভিন্ন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে উত্তেজিত করতে লাগলো। অনেকে যেমন পুলিশের প্রভাবে প্রত্যা-বাস্তব হল আবার বহু লোক তাদের প্ররোচনা বশত প্রত্যাখ্যান করেছে—এও বাস্তব সত্য। সরকারী স্বীকৃতি থেকে সামান্য একটি নজির দিচ্ছি—

“...they heard shouts to the west of the house and came out to see what the trouble was. As they stood there, six persons came along the path and made entry into the yard of the house but they stood in their way. Where upon all the six levelled at them the pistols which they had in their hands and told the terrified Malekjjama and his father-in-law that they would not kill them if they showed them the way out of the 'bari'. Abdul Latif showed them the path and ran off eastward towards the house of Ismat Ali Khalifa.” (Judge-ment, Chittagong Armoury Raid Case No. I.).

[পশ্চিম দিকে চীৎকার শুনে তারা দেখতে এল ব্যাপারখানা কি? তাদের বাড়ির উঠানে ছ'জন রিভলভার হাতে প্রবেশ করল। তারা বিদ্রোহীদের পথরোধ করে দাঁড়াল। বিপ্লবীরা ছ'জন রিভলভার

বাগিরে ধরে এবং সশস্ত্র মালেকজামা ও তার স্বশ্রুকে নির্ভর দিচ্ছে। তাদের বাড়ির বাইরে বাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলে। আব্দুল লতিফ পথ দেখিয়ে দিল। বিপ্লবীরা পূর্ব দিকে ইস্‌মৎ আলী খলিফার বাড়ি অভিমুখে ছুটে পালালো।]

সরকারী তথ্য থেকে আমরা আগাগোড়া সত্য বিবৃতি আশা করতে পারি না। আমাদের সাথীরা জাজ্‌মেন্ট কাগজে উল্লিখিত ওই পরিবারের কাউকে বিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখায় নি। পুলিশী নির্বাচনের ভয়ে তারা সাফাই পেয়েছে—রিভলভার দেখিয়ে তাদের সহযোগিতা বিদ্রোহীরা আদায় করেছে। বাস্তবে এই পরিবার তাদের আশ্রয় দিতেও কুঠাবোধ করত না। কিন্তু কিছু সংখ্যক ক্ষিপ্ত উত্তেজিত গ্রামবাসী পুলিশের সঙ্গে ছুটে আসছিল বলেই বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পুলিশের প্রভাবে গ্রামবাসীর যদিও উত্তেজিত হয়েছে তবু বিপ্লবীরা এইরূপ সমর্থন অনেকের কাছেই পেয়েছে। পেছনে যে গ্রামবাসীর দল এদের ধাওয়া করে আসছিল তারা অনবরত ঢিল ও ইন্ট-পাথর ছুড়েছে। কিন্তু পেছনের চেঁচা-মোচিতে সামনের দিকে যে-সব লোক জড়ো হয়েছে, তাদের মধ্যে শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন ছিল। এদের অনেকেই মালেকজামার মত সহযোগিতা করেছে আবার অনেকে পুলিশ দলের সঙ্গেও যোগ দিয়েছে।

এইরূপ একটি বাস্তব অসুবিধার জন্য বিপ্লবীদের খুব বেশি দশ দিতে হয়েছে। সরু পথ ধরে ছ'জনে চলেছে। একজনের পেছনে একজন। প্রত্যেকের হাতে খোলা রিভলভার। এদের ছ'জনের দলের পুরোভাগে আছে মনোরঞ্জন সেন এবং সকলের পেছনে দেবপ্রসাদ গুপ্ত। সামনে গ্রামবাসীর একটা ছোট দল একত্রিত হয়েছে। এমনি ধরনের বহু দল তারা অতিক্রম করে এসেছে। অন্যান্য দলগুলির মতই এই দলটিও প্রায় পাশ ঘেঁষেই বিপ্লবীরা যাচ্ছিল। প্রথম পাঁচজন দলটিকে অতিক্রম করে গেল। সর্বশেষে দেবু যখন যাচ্ছে, তখন একজন বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একটা ধারালো দা দিয়ে দেবুর বাড়ি লক্ষ্য করে আঘাত করে। ভাগ্যে দেবু একপলকে অবস্থাটা উপলব্ধি করে। শাণিত অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য নিমেষে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইল। মাথাটি কোনমতে ভূ-লুপ্তিত হল না বটে, কিন্তু দায়ের প্রচণ্ড কোপ এসে পড়লো দেবুর কাঁধে। জন কাঁধে গভীর ক্ষত হয়। আঘাত এত গুরুতর যে তার ডান হাতখানা একেবারে ঝুলে পড়েছে। অথচোরে রক্ত ঝরছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই আঘাত সহ্য করা কান্ধে

পক্ষ কখনই সম্ভব নয়। যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কত অসম্ভব ও অসাধারণ জিনিসও যে বাস্তবে পরিণত হয় তা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। এইরূপ গুরুতর আঘাতেও দেবু জ্ঞান হারাম নি—বন্দীদের সঙ্গে তবু কদম ফেলে চলেছে।

এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে ওই অবস্থায়ও দেবু কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নি। দেবুর পিস্তল আততায়ীর বুক লক্ষ্য করে গজ্জন করে উঠল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গুলীবিষ্ম হয়ে মাটিতে শুটিয়ে পড়ল। আর যারা ছিল, যে-যেদিকে পারল ছুটে পালাল। অপর পাঁচজন সাথী এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অতর্কিত আক্রমণের বিষয় জেনে প্রতিশোধ নিতে ক্ষেপে গেল। কিন্তু কিভাবে প্রতিশোধ নেবে? পুলিশ গুলীর পাল্লায় বাইরে আর গ্রামবাসী সকলে এমনভাবে মিশে আছে যে, শত্রু-মিত্র প্রভেদ করা যাচ্ছে না।

আমাদের মামলার রায় থেকে এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ করছি—

“...Presently they heard several shots being fired by the fugitives and on reaching the path leading to the house of Ismat Ali Khalifa they found Ali Hussein lying wounded... they saw near the house of Ismat Ali Khalifa six persons running eastward along the village path, pursued by a number of villagers who were shouting 'Dharo, Dharo (catch them, catch them)'. The six fugitives ran past them and Ali Hussein made after them whereupon one of them turned and shot him and he fell down.”

[.....এখন তারা আততায়ীদের পিস্তলের শব্দ শুনেতে পার এবং ইস্‌মৎ আলি খলিফার বাড়ির গলিপথে আলি হোসেনকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে।.....তারা ইস্‌মৎ আলি খলিফার বাড়ির কাছে ছ'জন বিদ্রোহীকে দেখতে পায়। বিদ্রোহীরা গ্রাম্যপথে পুলাদিকে দৌড়চ্ছিল। তাদের পেছনে গ্রামবাসীও 'ধর, ধর' চীৎকার করে ছুটেছে। ছ'জন পলায়মান বাস্তি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আলি হোসেন তাদের অনুসরণ করে। বিদ্রোহীদের একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে গুলী করায় সে পড়ে যায়।]

বাঙালার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক

ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়ের

হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

বড় ও বরা পাতা

(কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা

সুদৃশ্য সংস্করণ)

মূল্য—৩.০০ টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপ্লববাহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এক মেলা

দশক—৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
সম্পাদক—রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬,
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
মূল্য—১.০০ টাকা।

চিত্রকলা, স্থাপত্য, সমাজ, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা, সংগীত প্রভৃতি বিষয় পত্রটিতে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ও নবীন লেখকদের রচনার সমীক্ষিত হয়েছে। এই সংখ্যার প্রতিটি প্রবন্ধই গভীর গননশীলতার পরিচয় রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ-জ্ঞানের মনোরঞ্জন করবে এই পত্রিকাখানি। প্রখ্যাতনামা দেশী ও বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত কয়েকটি দৃশ্যপ্রাপ্য চিত্র এই সংখ্যাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

শারদীয় একতান (১৩৭৪)—
সম্পাদনায় চিত্ত ভট্টাচার্য। সংস্কৃতি সংসদ।
বর্ধমান। দাম—এক টাকা।

বুদ্ধিবান সাহিত্যরসিকদের মনোরঞ্জন করার মতো সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাখানি। এ সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন কবিতায়—অবুগ চক্রবর্তী, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, অলোক সামন্ত, কৃষ্ণ ধর, শ্রীমতী কেকা সবকাব প্রমুখ। কয়েকটি গল্প লিখেছেন সঞ্জীব সেন, শ্রীমতী কলি ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ ভট্টাচার্য ও চিত্ত ভট্টাচার্য। দেবপ্রসাদ দে—এর অনূদিত শাল বোদলেয়ারের গল্পটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ছাড়া কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। ‘অমিগ্রাক্ষর ছন্দের পঙ্ক্তি গঠন’ একটি ডিক্সনারীর জন্ম’, ‘রাসেলেব ক্ষমতাতত্ত্ব’, ‘আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতি : মরম্ব সঙ্গীত’ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যথাক্রমে গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সিংহ, গোপালচন্দ্র দাস, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

এ আলোচনাগুলি যেমন মনোজ্ঞ তেমন তথ্যবহুল। মোট কথায় ‘একতান’—এর মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্রের সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র প্রসঙ্গ—শারদ সংকলন। সম্পাদক—শ্রীপ্রদীপকুমার বসু। ৯।১ থি, এফ্‌ কিউ বাটনগর, ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত।

আলোচ্য সংকলনটি মাত্র কয়ে-

কটি প্রবন্ধ ও একটি স্কেচ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বভাবতই ক্ষীণ কলেবর হয়েছে পত্রিকাটি। কিন্তু রচনাগুলি প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। রচনাগুলির দ্বারা সাধারণ পাঠক-বর্গ দেশ-বিদেশের চিত্রশিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এ সংখ্যায় ‘চিত্র ও সাহিত্য’ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছে বার্ণিক রায়। ‘চিত্র প্রসঙ্গ’-এর মত পত্রিকার প্রচার সাধারণমনে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আগ্রহ সঞ্চার করবে। আমবা কাগজটির অব্যাহত পরমায়ু প্রার্থনা করি।

বিচিত্রা—শারদ সংকলন। সম্পাদক—
নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা জীবন
ভৌমিক। ৬৫, তর্ক সিংহাস্ত লেন,
বাগি, হাওড়া। মূল্য—২.০০।

‘বিচিত্রা’ এবারকার শারদীয় সংখ্যায় এক উচ্চ দরের সাহিত্য রচিব স্বাদ পাওয়া যায়। প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও কবিতাগুলি সুনির্বাচিত ও সুখপাঠ্য। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে নবীন লেখকদের সমন্বয় করা হয়েছে। একটি পরিচ্ছন্ন সংকলন।

এককালীন—শারদ সংকলন, ১৮৮৯।
সম্পাদিকা শিবানী সেন। ৭৮।১, মহাত্মা
গান্ধী রোড, কলিকাতা। দাম—১.৫০
পয়সা।

‘এককালীন’ শাবদ সংকলনটি সুসম্পাদিত। সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-মাত্র বর্তমান সংখ্যাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে আমার উত্তর যথার্থতা স্বীকার করবেন। এই সংখ্যায় বহু বিশিষ্ট লেখক-কয়েকটি মূল্যবান গল্প, কবিতা ও নাটক উপহার দিয়েছেন। ‘সাম্প্রতিক ছোট গল্পে দার্শনিকতা ও অলৌকিকতা’ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই তৃপ্তিকর। এ সংখ্যায় যারা গল্প লিখেছেন তাদের মধ্যে আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, শিবানী সেন। সংখ্যাটি বুদ্ধিবান পাঠকদের দ্বারা সমাদৃত হবে।

আভ্যাস : (শারদীয় সংখ্যা) সম্পাদক :
শ্রীনিত্যগোপাল সামন্ত, পোঃ বিষ্ণুপদ, ১১৮১

ভাষা : কলিকাতা-২৭, ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।

ট্রেমাসিক সাহিত্যপত্র হিসাবে আভ্যাস ইতিমধ্যে পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে। এর শারদীয় সংখ্যার গল্পগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি। গল্প লিখেছেন সর্বশ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হবেন ঘোষ, বীবেন মিত্র প্রমুখ। হবেন ঘোষের ‘সাপ’ গল্পটি ভাল লাগল। প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন সর্বশ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, জয়ন্তী সেন, সুশীল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস সরকার, আশিস সান্যাল প্রমুখ।

ব্যায়ামচর্চা : (শারদীয়া)—সম্পাদক :
শ্রীহাবান চক্রবর্তী। ৮-বি, ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম :
দু’ টাকা।

‘ব্যায়ামচর্চা’ পত্রিকাটি চাব বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। যারা শরীষচর্চা করেন, তাদের তো বটেই এমন কি দেশের প্রতিটি তরুণের পত্রিকাটি পড়া উচিত। এ বর্তমান শাবদীয়া সংখ্যাটি শরীষচর্চা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। লেখক-সুচীতে আছেন সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ সাহা, বিশ্বদেব বিশ্বাস, শৈলেন ঘোষ, দিলীপ দত্ত, মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এ ছাড়াও ক্রিকেট ও ফুটবল সংক্রান্ত নানা তথ্য ও ছবি পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ছন্দিতা—(তৃতীয় বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা)।
সম্পাদক গৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯ বরীন্দ্র
নগর, কলিকাতা—১৮ হতে প্রকাশিত।
দাম—এক টাকা।

সম্পাদকীয়তে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে বর্তমান সংখ্যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন শান্তি-রঞ্জন চক্রবর্তী, বেলা দে ও লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সাহিত্যিক অগ্নিনেব পুরস্কার প্রাপ্তির সম্পর্কে’ শান্তি-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—এবং একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—এর ‘মরমী শিল্পী তাবাগৎকব’ তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ। কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত। যারা কবিতা লিখেছেন, তাদের মধ্যে আছেন—শান্তি চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, শান্ত দাস, নচিকেতা ভরস্বাজ প্রমুখ। এ ছাড়া গল্প আছে জ্ঞানরঞ্জন ঘটক, রবীন্দ্র গুহ, অর্নিমেধ চট্টোপাধ্যায়, কণা বসু ও ভেঙ্কটলাল মজুমদার।

সাত্ত্বিক—(শারদীয়া সংকলন)। সম্পাদনা বরুণ মজুমদার। ১২০।১, বামুণ্ডপদুর লেন, শিবপদুর, হাওড়া হতে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

মনে রেখাপাত করার মতো নব-

প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'সাহিত্যিক' পত্রিকাখানি অন্যতম। নিভেজাল ও পরিচ্ছন্ন এই সাহিত্যপত্রিকাখানির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই নতুন নাম। কিন্তু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ মানের বিচারে অনেকেরই প্রতিভা সম্পাদনাপূর্ণ। প্রকৃত সাহিত্যরসিকদের কাছে এই সাহিত্য পত্রিকাখানি সমাদর লাভ করবে।

শারদীয়া ধরিত্রী—সম্পাদক—শ্রীদাশ- রথি রায়। বর্ধমান হতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

বর্ধমান হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ধরিত্রীর এই শারদীয়া সংখ্যাটি বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায় পুষ্ট। এই সংখ্যায় প্রত্যেকটি রচনা মনোজ্ঞ হয়েছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীগোকুলবিহারী রায়, বনফুল, শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারদরজন মল্লিক, কবিশেখর কালিদাস রায়, অধ্যাপক শ্রীবেঙ্কটুল করিম, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রমুখ। সাংবাদিক শ্রীদাশরথি রায়ের সম্পাদিত শারদীয়া 'ধরিত্রী' পত্রিকাখানিতে সন্মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাবেশ—শারদ সংকলন। সম্পাদক— শ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। আগড়াপাড়া ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত। দাম—১.৫০।

মফস্বল শারদীয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে সমাবেশ শারদ সংকলনটি নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে সেটা নিঃসন্দেহ। এই পত্রিকায় লেখকদের মধ্যে রয়েছেন—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, হরিশংকর ভট্টাচার্য, সাধন সেন, শান্তি-নারায়ণ দত্ত, বাণী সাহা, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নচিকেতা ভরস্বাজ, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ রায়, চন্দন মুখো-পাধ্যায়, অগ্নিমা দাশ প্রমুখ।

তরঙ্গ—প্রথম সংকলন। সেণ্টাল রোড, আনন্দপুরী ব্যারাকপুর ২৪ পরগনা। মূল্য—৬০ নং পং।

অখ্যাত অবজ্ঞাত তরঙ্গ লেখকদের নিয়ে আলোচ্য পত্রিকাখানি প্রকাশিত। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নচিকেতা ভরস্বাজ, কীর্তিচাঁদ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। সাহিত্যসৃজনে রতী ছোট পত্রিকাখানির রচনা ও আঙ্গিকে রুচি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

রূপধ্বজ—সপ্তম সংকলন ॥ আশ্বিন ১৩৭৪ ॥ সম্পাদনায়—দীপক সরকার, রণেন্দ্র চক্রবর্তী ॥ ৪১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ ॥ দাম—এক টাকা।

'রূপধ্বজ' (সপ্তম সংকলন) সাহিত্য-পত্রটি খুবই সুসম্পাদিত। এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা। দীপক সরকারের বিষ্ণু দেব কাব্যে শিল্প

প্রকরণ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতার ধর্ম', ডঃ অজিতকুমার ঘোষের 'টেনেসি উইলিয়ামসের নাটক', শ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'ভাষাতত্ত্ব শেখা দরকার' ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'নায়মাস্ত্রা বলহীনের লভা' প্রবন্ধগুলি তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। সম্পাদনা সুদৃঢ়চিস্তা। পত্রিকার প্রচ্ছদপটও সুন্দর হয়েছে।

শারদীয়া বর্ধমানের বাতী। সম্পাদক— শ্রীসরল সেন। বর্ধমান হতে প্রকাশিত।

সুনির্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার এই সংখ্যাখানি সাহিত্যরসিকদের আনন্দ দেবে। বর্ধমান সম্বন্ধে রচনাগুলি তথ্য-বহুল। চর্চক কবিতাগুলি পত্রিকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। এ সংখ্যার ঝাঝা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—কবিতার কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, দুর্গাদাস সরকার, অমিরকুমার হাটি; গল্পে—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শ্রীসুমন্থনাথ ঘোষ, রঞ্জিতকুমার সেন; প্রবন্ধে—নকুলচন্দ্র দত্ত, অজিত ভট্টাচার্য, ভূপতি হোড়, কামাখ্যা মুখো-পাধ্যায়, উত্তর পণ্ডানন মন্ডল, দুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিচিত্রতা—শারদ সংকলন। সম্পাদক— নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১এ, নেতাজী সড়কা রোড, কলিকাতা—১ হতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

বিচিত্রতা শারদ সংকলনটি সুপাঠ্য রচনায় গুণে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার পূজা। সংখ্যায় সম্মানের উপযোগী। এ সংকলনে কয়েকটি আকর্ষণীয় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা ও নিকুঞ্জবিহারী ভৌমিকের 'বৈষ্ণবতীর্থ পানিহাটি' রচনা, সংখ্যাটির মূল্য বাড়িয়েছে বলা বাহুল্য। ডাছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে রঞ্জিতকুমার সেনের গল্প, কল্যাণ সেনের 'ভারত সাধিকা নিবেদিতা' ও তারণকুমার বিশ্বাসের 'প্রাচীন পোড়া-মাটির পুতুল প্রসঙ্গে' আলোচনা। মোট কথা প্রত্যেকটি রচনা সুধপাঠ্য। পত্রিকাখানি পড়লে ভালই লাগবে।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদনা— শ্রীদিলীপকুমার বাগ। ৫৩, গোপাল বয়নাঙ্গী লেন, হাওড়া হতে প্রকাশিত। মূল্য—১.০০।

কিশোরদের জন্য প্রকাশিত শারদীয়া 'অভিনব অগ্রণী' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কিশোর সাহিত্যিক-দের রচনার দ্বারা এ সংখ্যাটি পুষ্ট না হলেও নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়ে ছোটদের মনোরঞ্জে সক্ষম হবে।

বেদুইন—শারদীয়া সংখ্যা—সম্পাদক— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা। তমলুক রাজবাটী, তমলুক মেদিনীপুর হতে প্রকাশিত। মূল্য—৫৬ পয়সা।

মাসিক 'বেদুইন'র এই শারদীয়া সংখ্যাটি শ্রীকৃষ্ণানন্দ গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ, কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক, ডঃ ভবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবারকার সংখ্যাটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। মেদিনীপুর জেলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও এই সংখ্যায় বিদ্যুত হয়েছে কয়েকটি রচনায়।

উষা—শরৎসংখ্যা। সম্পাদিকা— বাণী চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ বি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ হতে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

উষা শরৎসংখ্যাটিতে প্রবন্ধ, কবিতা, নক্সা, রম্যরচনা, গল্প ও উপন্যাস অন্যান্য-বারের মতোই অনবদ্য হয়েছে। এই সংখ্যায় তরঙ্গ লেখকদের রচনাগুলি সুন্দর হয়েছে। সাহিত্যরসিকগণের কাছে এই সংখ্যাটি স্বভাবতই আদৃত হবে। এই সংখ্যায় জাপানী প্রাচীন কবিতাগুরু অনন্দাব করেছেন সুধীর গুপ্ত।

বাংলা গল্প : দ্বিতীয় সংকলন— সম্পাদনায়—রঞ্জিত রায়চৌধুরী। ৯এ, সর্দার শংকর রোড, কলিকাতা—২৬। দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

বাংলা গল্পক্ষেত্রে নতুন কিছু গড়ার প্রয়াসে পত্রিকাখানির আবির্ভাব। সাহিত্যের গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী হয়ে এই পত্রিকা-খানি আত্মপ্রকাশ করেছে। চিন্তার, ধ্যান ধারণার অভিনব তরঙ্গ লেখকেরা যে একটি নতুন রূপান্তর ঘটতে পারে গল্পক্ষেত্রে তারই স্বাক্ষর বহন করছে এ সংখ্যায় সংযোজিত কয়েকটি গল্পে। এ সংখ্যায় গল্পকারদের মধ্যে আছেন সুধ-রঞ্জন চক্রবর্তী, মণিলাল খান, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুব্রত নিয়োগী ও অনিমেধ চট্টোপাধ্যায়।

শিবম : (পূজা সংখ্যা)—সম্পাদক : শ্রীশচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীকেশরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১, মহেশ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—২৫ থেকে প্রকাশিত। দাম : দেড় টাকা।

ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে এতে প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীর পত্রিকা হিসাবে শিবম-এর এই শারদীয়া সংখ্যাটি সকলের কাছে সমাদর লাভ করবে বলে আমরা আশা করি। লেখকসমূহে আছেন সবশ্রী শান্তশীল দাস, হিরণ্ময় বন্দ্যো-পাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, অবদ্যত প্রমুখ।

‘আমার একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু
কসে করো না অরুণ।’

‘না, মনে করবার কি আছে?’

‘এই তো তুমি রাখ করেছো। বলা
যাগ করো নি?’

‘তুমি ভাবি ছেলেমানুষ।’ বলল
অরুণ। একটা লোক সেই পাঁচটা থেকে
খাঁড়িয়ে, আর এখন? এখন বাজ্ঞে কটা?’
বলে হাতবাড়ির দিকে তাকাল। ‘সাতটা।
আমি বেহারা বলেই দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি
আমি ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছি শিপ্রা।’

‘বেহারা! বলো তো দিকি আর এক-
বার? বেহারা বলেই তুমি অপেক্ষা
করাছিলে, ভালোবাসো বলে নয়? ইস।
যেই গেছে আমার।’

‘তার পরেই এক মোহিনী কটাক-
মোক্ষম।’

‘তোমার ওপর রাগ করা অসম্ভব।
এবারের মত মাপ করা গেল। মনে থাকে
কেন।’

‘আত্মসমর্পণ করল অরুণ। না করে
উপায়ও নেই।’

‘হাত ধরে পুরুষালী ভাণ্ডাতে
আকর্ষণ করল শিপ্রা। ‘এসো।’

‘সমানে মনুষ্যে। তার পেছনেই
বিস্তীর্ণ মাঠ। লোভনীর অন্ধকার, নিজের
শান্ত পরিবেশ আর খোলা বাতাসের মধুর
প্রাণে। এককথায় মন দেয়া-নেয়ার
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান। সেইখানে গিয়ে
মসল দু’জন। দূরে বড়ের মত বেগে ট্রাম
হুটেছে অন্ধকার ভেদ করে। বেশ লাগে
দেখতে।’

‘উক, আজকে কি গরমটাই না পড়ে-
ছিল, তাই না?’

‘হিউমিডিটি আজকে বেশি।’

‘তোমাকে বস্ত্র ক্রান্ত দেখাচ্ছে অরুণ।’

‘হ্যাঁ, আজকাল শরীরটা আমার খুব
ভালো যাচ্ছে না। তুমি কিন্তু আরো
দুন্দুর হচ্ছ দেখতে, দিনকে দিন। তাই
তো ভয় হয়।’

‘ভয় হয়? কাকে? ও, বুঝতে
পেরেছি। তুমি ভয়ানক হিংস্র।’

‘হিংস্র, কি জানি।’

‘সব পুরুষমানুষই একরকম।’

‘ক’জন পুরুষ দেখেছো?’

‘অনেক, অনেক। আচ্ছা, আজকে
তোমার কি হয়েছে বল তো? মন খারাপ?

‘শরীর ভাল লাগছে না? না কি চাকুরিটার
আবার কোনো গন্ডগোল হয়েছে?’ উদ্বেগ
থরে পড়ে তার কণ্ঠে।

‘তুমি ঠিক ধরতে পেরেছো।’ গলাটাকে
একটু কেশে পরিষ্কার করে নিল অরুণ।
কেমন বেন ফ্যাসিয়েসে। ভাঙা ভাঙা।

‘কোনটা? চাকরি?’ বলতে কি চেষ্টা
করে ও গলাটার কাঁপন রোধ করতে পারলো
না।

‘যদি তাই হয়, তাহলে খুব নিরাশ
হবে কি?’



ডেলিভ রেখা

নিখিল দাস

‘হব না?’ গলাটা মিইরে গেল।

‘কি হয়েছে বলো না হে-মাণী ছেড়ে?’

‘তোমার বাজার আজকাল কেমন
চলেছে?’

‘বাজার? মানে?’

‘কিছু মনে করো না।’ আমতা আমতা
করে বলল। ‘মানে আমি ঠিক ওইভাবে
বলতে চাই নি। ইয়ে—তোমার হাতে এখন
কটা কাজ আছে?’

‘প্রচুর—প্রচুর। বলতে কি সময়ের
অভাবের জন্য আজকাল প্রায়ই ছেড়ে দিতে

হচ্ছে। অথচ মনে আছে, দু’বছর আগেও
একটা কিছু জোটাবার জন্যে হনো হয়ে
যুগেছি। ভাবতাম দিই ছেড়ে। কি হবে।
আমার দ্বারা কিছু হবে না। আর এখন?
ইচ্ছে করলে সহ-নারিকার ভূমিকাতে যে
কোনো সময়ে নামতে পারি। একজন তো
আমার সেদিনকার শো-টা দেখে মদুশ হয়ে
গেছে।’

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল শিপ্রা।

‘নামছে না কেন, তাহলে?’

‘কেন? তুমি তো জানো অরুণ, এ

লাইনটা বন্ধ নোয়া। বিশেষ করে আশ-
নয় পক্ষে। তাই ভুল করে।’

ভয় করে? ন্যাকামি। এখন ভয় করে
না, না? থিয়েটারের লাইনটাই বা এমন
কি ভালো? মনে মনে ভালো সে।

‘তুমি আজকাল অনেক টাকার স্বপ্ন
দেখছো, না?’

‘কেন, দেখা কি খারাপ? তুমি দেখো
না?’

‘না, আমি তো জানি আমার ক্ষমতা
কতটুকু। তোমার মতো প্রতিভা আমার
নেই।’

‘তুমি অপেক্ষেই বন্ধ মনুষ্যে পড়ো
কেন বলো তো?’

‘আমি বোধহয় আজকাল হতাশায়
ভুগছি শিপ্রা। বন্ধ ডিপ্রেসড।’

অরুণের বাহুরে মৃদু চাপ দিল
শিপ্রা। ‘তুমি কদিন ছুটি নিয়ে বাইরে
থেকে ঘুরে এসো।’

কয়েক মৃদুত দৃষ্টিতেই চপচাপ।
হৃদয়কে হাওয়ার বেগটা বেড়ে গেছে।
শিপ্রার আঁচলের একটা অংশ বারবার মুখে
এসে পড়ছে। নরম। তার দেহের মতই।
শিপ্রার দীর্ঘ বর্ণীটা খুলে হাতে নিয়ে
খেলতে লাগল। একবার গন্ধ শুকল।
কি মিষ্টি গন্ধ! জ্বাকুসুম? লক্ষ্মী-
বিলাস? একটা পুঁজিশ সন্নিপথ দৃষ্টিতে
তাকতে তাকতে সরে গেল আরো গভীর
অন্ধকারে। হয়ত আপত্তিজনক কোনো
কিছুর আবিষ্কারের আশায়।

‘একটা কথা বললে তুমি কি খুব
শ্রদ্ধা করবে?’

‘কি?’

‘আমি চাকরিটাতে রেক্রিমেন্টেশন
দিয়োছি।’ খুব নিরুত্তর গলায় বলল।

‘দিয়োছো? কেন? খুব ভাল হল
কি এ বাজারে এমন একটা চাকরি.....
তুমি বন্ধ জেদী।’ ক্ষুদ্র গলায় বলল
শিপ্রা। তোমার মুরোদ জানা আছে।
নিজের চেম্বার তো একটা চাকরি জোটা-
বার ক্ষমতা নেই। তা-ও এটা আমি সুশো-
ভনকে দিয়ে করিয়ে দিচ্ছিলাম বলে। ভাল
সে।

‘তোমার সেই এ্যামেরিকান সাহেবটাকে
বলে তার কার্মে নিতে অনুরোধ করো
না?’

কি নিলক্ষ্মী! বিকার দিল মনে মনে।
এরই জন্যে, ভয়ানক জরুরী কথা আছে
বলে দৃ-দৃ-বার ফোন করেছে। আজকে
একটা ফাইন্যাল রিহাসাল ছিল। সেটাকে
অর্ধেক করে শরীর খারাপের অজুহাতে
চলে এসেছে এই সংবাদ শুনবে বলে?
হঠাৎ যেন ঘৃণা জমতে শুরু করল।
মুখেও সে ছাপ পড়ল। কিন্তু অন্ধকার
তাদের নন্দিতার বাহ্যিকপ্রকাশকে আড়াল
করে রাখল।

‘দেখি বলে। কিন্তু এক কথায় তো
আমি চাকরি হবে না?’

আহা, আমি আর জানি নে। ইয়াকবী-
টা তো তোমার হাতের মুরোদ। ইচ্ছে
করলেই তো ওই ব্যাচলরটাকে বাদর
নাচাতে পার। তুমি একটি পাকা
অভিনেত্রী। ঠিক তোমার পেশার মতো-ই।
চক্ষুদলঙ্গর জন্যে না এসে পারলে না।

তোমার আন্তরিকতা কতটুকু তাতে আমি
সন্দেহ আছে। যতই সতীর্ণনা দেখাও
কেন, তুমি আর আগের শিপ্রা নও। পর
পর কথাগুলো মনের আকাশে মেঘের মত
ভেসে গেল।

‘তা ঠিক। যদি সুযোগ ও সময় হয়
একবার বলে দেখো।’ একটা সিগারেট
ধরল।

শিপ্রা তার ঝোলানো ব্যাগ থেকে
দুটো ক্যাডবেরী বের করল। এগিয়ে
দিল একটা অরুণের দিকে।

‘তোমার কি এয়ার হোস্টেসের
চাকরিটা হবার চান্স আছে?’ অরুণ প্রশ্ন
করল।

‘খুব সম্ভব অগাস্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট
পাব।’

একটা গোপন ঈর্ষা ছোঁল মারল
জ্বাপে।

‘সত্যি? আঃ। একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত
হওয়া গেল।’

‘নিশ্চিত? নিশ্চিত বলতে কি
ভাবছে অরুণ? বিয়ে? সত্যি বলতে কি
সেটা আজকাল শিপ্রা আর ভাবছে না।
অন্তত অরুণের সাথে নয়। তার এক-
কালীন এই মাস্টারমশায়কে আজকাল আর
কেন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। করুণা
করতে ইচ্ছে হয়। কেনাও, এমনি কি!
অথচ মন্সিকল, একথা বলা যায় না।

আকাশে মেঘ জমেছিল অনেকক্ষণ
আগে। উজ্জ্বল তারাগুলো মেঘের কালো
সর্বগ্রাসী আক্রমণের কাছে পরাস্ত হয়ে
আত্মসমর্পণ করছে একটা একটা করে সেই
তখন থেকে। দৃ-এক ফোঁটা জলও পড়ছে
গারে মাথায়। মন্দ লাগে না।

‘ভাবছি কোনো গ্রামে চলে যাব কি না
মাস্টারী নিয়ে।’

‘তাই যাও না কেন? তোমার এ ছাড়া
অন্য কোনো পথ নেই। দৃশ্যে টাকার
মাস্টারীই তোমার মানাবে ভালো।
অপদার্থ। মুখে বলল, ‘কি লাভ?’

কড়কড়.....কড়া করে বাজ পড়ার
শব্দ হল। আর সেই বিদ্যুতের আলোয়
শিপ্রার কানের পাখরটার দৃষ্টি ঝিলিক
দিয়ে উঠল এক মৃদুতের জন্যে। সুন্দর।
এরকম সুন্দরী সঙ্গিনী নিয়ে বিকেলে
গড়ের মাঠে বসে হাওয়া খাবার সৌভাগ্য
সবার হয় না। সে হিসেবে অরুণ
ভাগ্যবান।

‘না, লাভ আর কি! বসন্ত বলেছিল
তাদের গ্রামের স্কুলটা দেখাশুনোর আর
ভালো হেডমাস্টারের অভাবে নষ্ট হয়ে
যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে আমি ওটা নিতে
পারি। মাইনেপত্তর হয়ত বিশেষ লাভ-
জনক কিছুর নয় কিন্তু অন্যান্য সুযোগ-
সুবিধে আছে অনেক।’

প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাগপুর

বেঙ্গলহাডা - শ্রীমঙ্গল - গোহাটী

‘জল পড়ছে, না?’ অন্য অর্থে প্রকারান্তরে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল দৃষ্জনের এখন ওঠা উচিত—বৃষ্টি আসার আগে।

‘জল? পড়ুক না। কেন ভালো লাগছে না? কতদিন ভিজি নি বৃষ্টিতে জানো? হাতে উঠে ভিজতে গেলে অন্য ভাড়াটেরা পাগল ভাববে। কলেজ ছাড়া ইম্তক নিজের খুশিমত বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ পাই নি।’

‘আচর্য লোক, সত্যি। তাই এখন তিনি ভিজবেন। ওর কি? একটা খন্দরের পাঞ্জাবী ভিজলে কি আর এসে যায়? কিন্তু আমারটা তো আর তা নয়। এই দামী সিমেন্টা ভিজলে গোলে বিচ্ছিন্ন দাগ পড়ে যাবে সে সাধারণ খেলাটুকুও তো নেই লোকটার।’

‘এসো আজকে দৃষ্জনে ভিজি হচ্ছে-মত। তোমার কি মনে হয় বৃষ্টি আসবে সত্যি-সত্যি? তাহলে খুব মজা-হয় তাই না?’ বলতে বলতে অরুণের আবেগ এসে গেলো। ডান হাতটা দিয়ে পেঁচিয়ে আকর্ষণ করল শিপ্রাকে। জিনিষটুকু শরীরটা তার কোন সাড়া দিল না। তেমনি শব্দ হয়ে বসে রইল। তার মনে হল যে নাটকটোতে সে অভিনয় করছে তাতেও এরকম একটা দৃশ্য আছে। পার্থক্য এই, সে নাটকটা মিলনান্ত।—এটা মিলনান্ত হবে না। অথচ মৃদুস্কল, এই বাস্তব নাটকে নায়ককে যদি সে একথাটা বলতে পারতো তাহলে সবটাই চুকে যেত। তা পারছে না বলে শিপ্রা সঙ্গের লোকটির জন্যে তার মনের পারে আরো খানিকটা মৃদু সগুণ করল।

‘একটা গান গাইবে গুনগুন করে?’

‘গান? এখন? কি বে বল?’

‘কেন, এখন সমুদ্রটা এমন কি খারাপ?’

‘তোমার মাথা, নাও ওঠো তো!’

উঠতে চেষ্টা করতেই অবুণ হাতের বাঁমনটা আরো শক্ত করে রাখল। ‘লক্ষ্মী তো, লক্ষ্মীটি, আর একটু বসো, প্লিজ।’

‘ঠিক আছে, আর পাঁচ মিনিট। তার বেশি নয় কিন্তু। আমার মাথাটা ধরেছে জীবন সেই তখন থেকে। তাছাড়া শরীরটাও ভাল লাগছে না।’

‘এই খোলা মাঠে নির্ভেজাল হাওয়া খেয়ে তোমার মাথা ধরল? হ্যা-হ্যা-হ্যা। ঠিক আছে উঠে পড়া যাক। চলো একটা ভালো বেস্টোরাতে যাই। খিদে পেয়েছে ভয়ানক।’

যেন বেঁচে গেল। উঠে পড়ল ওরা। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটার শাড়িটা অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্জনেরই চুল উড়ছে বাতাসে।

‘পা চালিয়ে এসো। জল এসে পড়তে পারে।’

দ্রুত হেঁটে ওরা রাস্তা পার হয়ে একটা ভাল বেস্টোরাতে ঢুকল।

‘কি খাবে বল?’

‘কিছু না, শুধু কফি এক কাপ।’

ওয়েটারটা চলে গেলে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলল অরুণ। স্থান হেসে বলল, ‘মহা একটাই আছে।’ তারপর সেটাকে ধরিয়ে একরাশ খোঁয়া নাকমুখ দিয়ে ছেড়ে বলল, ‘বাই হোক, তোমার সাথে আসল কথাটাই বলা হয় নি: এক-কশ। আমি বলছিলাম কি, আমাদের দৃষ্জনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভেবেছো কি? আমার তো মনে হয় আমাদের আর দৌঁড়া করা উচিত নয়।’

চোখের সামনে একটা কিলবিলে হেলো সাপ দেখল যেন শিপ্রা।

‘কি দৌঁড়া করা উচিত নয়? কি?’

ভগবান, বেকার এই হতভাগা লোকটা কি বলছে? ‘পাগল হয়ে যায় নি তো? উজর দেবার আগেই ওয়েটারটা এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলো অস্ত্রত কিছুক্ষণের জন্যে।’

কক্ষিতে চমক দিয়ে আঙুল সেঁপে তাকাল অরুণ। ‘তুমি কিছু বলছো না যে?’

‘কি বলব বল? তুমি দমাম্ভম বে মর কাজ করে বেড়াছো তাতে একদুটি একদুটি হুট করে কড়কি নেয়াটা কি বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে?’

‘খুব সম্ভব ঠিকই বলছ।’ একটু যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। তুমি যে এরকমটা বলবে তা আমি আগেই জানতাম। ‘তুমি কি এখন সোজা বাড়িতে ফিরবে?’

‘হ্যাঁ, মাথাটা বন্ধ ধরেছে।’

‘চলো ওঠা যাক।’

ফুটপাথে পা দিয়ে অরুণ বলল,

‘তোমার কাছে শ’ খানেক টাকা হবে এখন?’

‘না।’

‘ও। তুমি তো ট্যাক্সিডে ফিরবে? চলো একসাথেই যাওয়া যাক। আমি পার্ক সার্কাসে নেমে পড়বো।’

একটা ট্যাক্সি ডাকল সে। ধূসর কয়ে বেরিয়ে গেলো সেটা তাকে আকুল না দিয়ে।

‘দাঁড়াও, আমি এক প্যাকেট লিগারো কিনে আনছি দোকানটা থেকে।’

আসলে এটা সম্ভবত তার সঙ্গের পক্ষের অহিলা। টাকা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে দারুণ অপমানিত বোধ করছিল।

শিপ্রারও আর ভাল লাগছে না। এ সুযোগে সবে পড়বে কি সে? তাতে দেখতে না পেলে অরুণ প্রথমে হতভম্ব হয়ে যাবে। তারপর কি ভাববে? বুদ্ধিমানের মত তৎক্ষণাৎ সবে পড়বে তো? নাকি খোজাখুঁজি সুরু করবে আহাম্মক লোকের মত? না, সে যা ভাবছে ততটা বোকা অরুণ নয় নিশ্চয়। রাস্তার জন-প্রোত হঠাৎ বেড়ে গেল। তাকিয়ে দেখে সে তার সামনের সিনেমা হলটার দিকে ভেঙেছে। এই সুযোগে গ্যা ঢাকা দেয়া যায়। এই লোকটার বিরক্তিকর সঙ্গ যেহেতু মদ্রি পাওয়া-যায় এবং আজকে, একদুটি এটা করতে পারলে এই একাত্তিক নাটকটায় পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও সেটা তার কাছে মোটেই বিরোগান্ত লাগবে না। আশা করা যায় অরুণের কাছেও। তাই পেশাদার অভিনেত্রীদের মতই হচ্ছে করেই শিল্প রাস্তার চলমান প্রবাহে দ্রুত হেঁটে মিশে গেল জনারণ্যে। যেখানে অরুণ, ইচ্ছে থাকলেও, আর কোনোদিনই খুঁজে পাবে না।

বি, সি, যাইতি এও কোং

—ইলেকট্রো প্লাটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ভাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং

করিবার জন্য ব্যবসায়ী সামগ্রীর আদি-সরবরাহক।

শৌ রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কালি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭০

৩, রায়সাহন পল সেন, কালি-১২ :

অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬



স্বপ্নাজ্ঞান প্রদ্যোদ্যাত্রা ॥ বিদ্যা বাউলীর বড়ো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ কুড়ি ॥

প্রাণপণে ছুটে চলেছে মদন আর বিদ্যাধরী। ওপরে কালো আকাশ আর সামনে ধূ-ধূ অন্ধকার রাত। সামনে সারদেয়া নারের পাটাতনের মত কঠিন কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। পথের দিশা শূন্যে যায় না। পায়ের নিচে আগাছা কাঁটার জগল পড়ল কি না বোঝা যায় না। তবু চলতে হবে। যেমন করে হোক ছাদেক ফকিরের আস্তানায় পৌঁছতে হবে।

বিদ্যাধরীর একটা হাত ধরে রয়েছে মদন। ভয়ে শক্ত চিপিতে হাতখানা চেপে ছুটে চলেছে।

দূ-পাশে ক্ষেত। - কিছু-দূরে দূরে মিশকালো, ছায়ার-মত গাছ-গাছালীর ভেতরে বসতি। এ-সর ছোট ছোট বসতি-ঘরো, শালত ঠান্ডা। একটু-আওয়ার্জ পর্যন্ত নেই। - কৃষ্ণ অওয়ার্জ এখনো ভেসে আসছে-দোয়াইল গাঁও থেকে। ওখানে বাবু বদনচাঁদ সরকারের বাড়ি। তা ছাড়া হাটবাজার, খোট বৈঠক সবই ওখানে। - ওখানে গোলমালটা বেধেছে আজ।

বিদ্যাধরী দাঁড়াল। মদনও দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখল বিদ্যাধরী দোয়াইল গাঁওয়ের কোথাও কোথাও আকাশটা মালচে। আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরে। কে পালিয়ে বেঁচেছে আর কে মরেছে কে জানে! দেখনের ভাবনের কোন সময় ছিল না।

হা হা রব শুনে বিদ্যাধরী তখন ঘর

থেকে উঠেনে বোরিয়ে এসে - বোঝবার চেষ্টা করছিল। ব্যাপারখানা কি! এত ডাকচিকর কি কামে? হুনা হুনা ওর কানে এসেছিল যে শ্যাখরা সকাল থেকে ঘোঁট পাকাচ্ছে। পরমা হালদইকরের কাশুটা নিয়ে বেশ গন্ডগোল হয়ে গেছে বিষাদনে হাটখোলায়। বিদ্যাধরী সবই শুনেছিল। এ মহল্লার কোন বাতী তার জানতে বাকী থাকে না। পাঁচ দুয়ারে যায় সাইয়ের নাম নিতে নিতে। পাঁচ দুয়ারের পাঁচ কথা তার কানে আসে। ও রাতে ঘর থেকে কোঁরয়ে এসে ভাবল, কি হলো? কাইজা কি লাগল না কি?

মনখানা হুসু করে উড়াল দিল মদনের সম্মানে। মদনটা এখানে নতুন মানুষ। কে জানে কোথায় যেতে কোথায় যাবে, লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে থাকবে ঘাপটি-ঘুপটিতে। ও জানে মদন আবার গেছে কুমির ঘরে। কুমির খাচার গিবা বন্ধ হইয়াছে। এউগা খাচার ভিতর আবেক খাচার বন্ধ হইল নি। কে জানে। পাখীর সম্মান পাইল না। খাচার খোঁচার জখম হয়ে না যায়। বেচারী কালা মদন!

তবু রাতে ডাকচিকর শুনে আত্মা রব শুনে ওর মদনের কথাটাই মনে হয়েছিল আগে। মানুষটা ভাল থাকে তবেই ভাল। গাঁয়ের ঘাপুঘাপু জানে না। কি করতে কি হয়ে না যায়।

এরি ভেতবে ছুটে এসেছিল কালা মদন।

আখালি-পাখালি অবস্থা। চকু তারা তারা। গলার জোর দমের জোর একদারে শেষ হয়ে এসেছে।

এসেই ওর হাতখানা চেপে ধরে বলল, -সকালে পলাও। আলারা আইলু বইল্যা।

—আইল কেডা? কি অইছে?

বিদ্যাধরী চমকে তাকাল।

—মনছুরের দলবল। অরা কুমিরে মাইয়া ফালাইছে। এই দিগেট ধাওয়া করছে।

বিদ্যাধরীর বড় বড় চোখদুটো ধমকে রইল। কুমি নেই। কুমির খাঁচাটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভয়-ভরাসের কারখানা চলেছে। কি কথা শোনাল মদন।

হাত ধরে টানল মদন। -চলো পলাই। হে হে চিষকারের শব্দটা ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। অন্ধকারে

বাতাসে বাতাসে বুকে কস্প উঠছে।

বিদ্যাধরী শ্বির হয়ে রইল কিছু সময়।

কোথায় যাবে? বাবুদের বাড়ি? না বাবুদের বাড়ি গেলে কোন লাভ হবে না। কে জানে যে বিষ ওদের কণ্ঠ ছাড়িয়ে মাথায় উঠেছে সে বিবে জ্বালিয়ে দেবে কি না বাবুদের বাড়ি। এ বিষ নামানর রোজা আছে একটি এ তজ্জাটে। ছাদেক ফকির। ছাদেক ফকিরের কাছেই যাবে বিদ্যাধরী। তাকে গিয়ে জানাবে সব। একমাত্র ছাদেক ফকিরই পাবে এ বিষ বাদেক মনকে জারিয়েছে—তাদের দেহ থেকে বিষ নামাতে।

চোখদুটো জ্বালা করছিল বিদ্যাধরীর। ছাদেক ফকির থাকতে এমন কারখানা ঘটে গেল।

মদনকে বলল,—যামু! ছাদেক ফকিরের কাছে যামু!

মদন ভয়ে কাঁট হয়ে গেল।—শ্যামের বাড়ি যামু? কও কি?

—হ, তাই যামু। ফকির দাদু নাইলে এ ব্যাড়া আগুন বাঁচনের পথ নাই।

বিদ্যাধরী টানল মদনকে।

ওদিকেব আশ্বা আওয়াজ যেন এদিকে এগিয়ে আসছে মনে হোল। আর দেরি কবা কাজেব কথা নথ। ওরা ছুটল ওখান থেকে। বকুলতলা ছাড়িয়ে মাঠে নামল। ছুটছে তো ছুটছে। মাঠ পেরিয়ে একটা বিঘাট বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ল সড়কে। সড়ক ধরে ছুটল। দু-ধারে শব্দ অন্ধকার। ওপরে কালো আকাশ।

ছুটতে ছুটতে একজারগার এসে দাঁড়াল বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরী হাঁপাচ্ছে। মদন হাঁপাচ্ছে তার চেয়েও বেশি। পিছন ফিবে তাকাল বিদ্যাধরী। দু-বে দোয়াইল গাওয়ের কোথাও কোথাও আকাশটা লালচে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বিদ্যাধরীর ঘরখানা নিশ্চয় পুড়ে থাক হয়ে গেছে। আর ক'খানা ঘব জ্বলছে কে জানে।

মনটাব ভেতবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিদ্যাধরী। একটা জবাব খুঁজছে। কেন ওরা মানুষ মারছে। কেন ওরা ঘরে আগুন দিচ্ছে। কি চায় ওরা? কি চায় ওরা নিজেবো বোধহয় জানে না। রক্ত যদি বিধিবে যায়। সে বিধি যদি মাথায় ওঠে, তবে পাগলের মত চারদিক সে লণ্ড-ভণ্ড করে বেড়াব। কেন যে করছে তা নিজেও জানে না।

কুমিটাকে মেরে ফেলেছে। কেন? ওরা কুমিকে কেন মারল? কুমি ওদের কাছে কি অপরাধ করেছিল? ওরা জানে না। ভাবন-চিন্তনের মন ছিল না। এখানেই এর শেষ নয়। পরমায়া বখন শুনবে এ সব কথা, ওরাও হয় তো মনছুরের দুটো বাচ্চার মা নাজমাবিবিকে এমনি করেই মেরে ফেলবে। একবারও ভাববে না নাজমাবিবির কি অপরাধ!

—কোরানে আইলাম?

ভার-ভাব গলার বিদ্যাধরী বলে,—বিলের কাছে।

ব্যাঙেব ডাক কানে আসছে। অন্ধ-কারে ভাল করে তাকালে সামনে দেখা যাচ্ছে চিকচিকে জ্বল।

বিদ্যাধরী বড় বড় চোখদুটোর জ্বালা ধরেছে।

এই বিলেব ধারেই তার বাবাকে মেরে-ছিল নাটা জুড়ান। নাটা জুড়ান কেন তার বাপকে মেরেছিল নিজেও জানত না। বিঘ উঠেছিল নাটা জুড়ানের মাথায়। এ যে কিসের বিঘ সবাই জানত। কে না

জানত নাটা জুড়ান কেন মেরেছিল দাস খ্যাপাকে!

আজ মনছুরের মাথায় সেই একই বিঘ চড়ে উঠেছে। মনছুর নিজেও মরবে। এ বিঘ থেকে ওর নিজেরও নিস্তার নেই।

—উই ডাইনমুড়া ফকিরদাদুর ঘর। লও যাই।

মদনের হাত ধরল বিদ্যাধরী।

ওরা ডানদিকে ঘুরে আরও কিছুটা পথ হাটল। জোলাদের ঘর ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে একটা মাঠের মধ্যে ছাদেক ফকিরের আস্তানা। চার-পাঁচখানা মস্ত মস্ত ছনের ঘর। একটা ঘরে আলো জ্বলছে। চাপা কথাবার্তা আওয়াজ কানে আসছে। একটা আলোব নড়াচড়া দেখল ওরা।

ধমকে দাঁড়াল মদন।

—কি অইল?

মদন ভয়ে ভয়ে বলল,—আমি যামু না।

—ক্যান?

—ছাদেক ফকিরেরে তুমি চিন?

বিদ্যাধরী বিরক্ত হোল।—আজাইরা ভয় পাইও না। ফকিরদাদুবে শ্যাখ-হিন্দু ভাইব না। ফকিরদাদু মানুষের সাদন করে।

মদনের ভয়ে অবিশ্বাসে বিদ্যাধরী ক্ষুব্ধ হয়েছে। ফকিরদাদু মসলমান নয়, হিন্দু নয়, ফকিরদাদু মানুষের সাধন করে। মানুষ জানে, মানুষ চেনে। মানুষ তার কাছে সর্বস্ব।

মদনকে টানতে টানতে নিয়ে আসে বিদ্যাধরী।

মস্ত উঠানে দু-চারজনের কুপি নিয়ে আনাগোনা দেখতে পায়।

—কেডা?

বিদ্যাধরীর সামনে একটা লোক আসে। গারে আলখালা, মদে দাড়ি। মদন ভয়ে পেছনে দাঁড়ায়।

আমি বিদ্যাধরী। ফকিরদাদু কোয়ানে।

লোকটা বলে,—ঘরে।

বিদ্যাধরী মদনকে নিয়ে এগোয়। ঘরে আসে। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালাল। ছাদেক ফকির একটা কবলের ওপর বসে রয়েছে। সাদা লম্বা দাড়ি। গলার একটা মস্ত মালা। আলখালা পরণে। চোখদুটো বড় বড়। বিষম দৃষ্টি।

—কেডা?

—আমি বিদ্যাধরী।

—দাস খ্যাপাব মাইয়া। বইও।

মদন আর বিদ্যাধরী বসে ঘরের এক-পাশে। বিদ্যাধরীর মুখখানা শান্ত হয়ে আসে। মদন বিদ্যাধরীর গা থেকে বসে।

—ছাদেক ফকির দাড়িতে হাত বোজায়।

আসে আসে কথা বলে। গলার স্মারটি মিহি মিঠা শোনায।

—হাবিব মোল্লারে কত কইয়া কইলাম, আগুন জ্বালাইও না। কথা শুনল না। ধম্মের জিগীর তুইল্যা কইজা বাখাইল। কি করুম কও দেহি। পারলাম না। বাঁচাইবার পারলাম না।

গলার স্বরটা নবম ভেজা ভেজা মনে হোল।

মদন আর বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে বলল ফকির।—তোমরা পলাইয়া আইহ?

—হ।

—বুঝছি। নাজিরবে পাঠাইছি তোমাগো গাওয়ে। আরও পাঁচজন গেছে।

বুধ ছাদেক ফকির চোখদুটো বোজে।

—জানি, এ আগুন নিবনের না। জ্বাইল্য পুইড়া থাক কইয়া দিব।

বিদ্যাধরীর চোখদুটো টলমল করছে। কথা বলতে পারল না ও।

ছাদেক ফকির আপন মনেই বেন বিড় করে।—সাইয়ের আমদান সাইয়ে জমিন, এয়া লইয়া ঘানজে ক্যান কামড়া-কামড়ি কইয়া মরে।

লণ্ঠনের নেভা নেভা আলোয় ছায়ে ফকির ধরা গলার বলে আবার।—মামমেয় থিক্যা বড় অইল জাইত? আজব কাম-খামা।

বিদ্যাধরীর চকু দুটোর চকচকামি নেই। কেমন বেন বোবা হয়ে গেছে থেপী। হায়রে থেদের কথা! মানমো চেরে বড় হোল জাত! ছাদেক ফকিরেয় কথা কটা বৃকের ভেতর নড়াচড়া করে। আর কোন কথাই ও ভাবতে পারে না, কিছু বলতেও পারে না। বোবা হয়ে গেছে বিদ্যাধরী।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২০৩, ৩নং টীনা বাজার কলিকাতা-১

কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০



রেনী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে

কেনীযাত্রার ব্যাঘাত... তাড়াতাড়ি ব্যাঘাত... যা আপনার সর্ব... এমন ব্যাঘাত... এই সবের কলেই পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড সঞ্চিত হয়। এই অত্যধিক অ্যাসিডই বদহজমের কারণ—সেই পেট 'ভার-ভার' অস্বস্তিবোধ, পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা, পেটে জ্বালাবোধ। ডাইজেস্টিভ রেনী ট্যাবলেট বদহজমের যন্ত্রণা ও অস্বস্তি তাড়াতাড়ি দূর করে।

কিন্তু রেনী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা বন্ধ করে : আপনি যখন ডাইজেস্টিভ রেনী ট্যাবলেট চুষে খেতে থাকেন তখন গুরু শক্তি-শালী অ্যাসিডমাক উপাদানগুলি আপনার মুখে গলে গিয়ে ধীরেধীরে আপনার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। এই নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরেধীরে গড়ার কলে স্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিষ্কৃত করে দেয়, তাতে অ্যাসিডের কোন অতিরিিক্তা দেখা দেয় না এবং তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ রেনী সজে রাখবেন :

বদহজমের যন্ত্রণা যে কোন সময় শুরু হতে পারে। তাই সবসময় ডাইজেস্টিভ রেনী ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

বদহজমের
যন্ত্রণায়
ড্রাগবেতনা—

ডাইজেস্টিভ

রেনী

ট্যাবলেট

ব্যবহার করুন



নিকোপাস-এর (N) চিহ্ন AG-3-5789

তার কালা মদন ফিরে এসেছে। কিন্তু কি যন্ত্রণা বন্ধ করে এল মদন!

মদনের হাতটা ধরল বিদ্যাবতী।

খেপীর হাতখানা ঠাণ্ডা। থরথরিয়ে কাঁপছে। খেপীর চোখে খুশি নেই, বুকো উজান রসের স্রোত নেই। খেপী আজ বোবা হয়ে গেছে।

ছাদেক ফকিরের কথা শুনে মদনের পরাণটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে। মানুষের চেয়ে বড় হোল জ্ঞাত?

কথায় কথায় এমন কথা তো কেউ কয় না।

—ভয় নাই। তোমরা ঘুমাও এখানে।

বলে ছাদেক ফকির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লণ্ডনের আলোটা দু'বার দপ দপ করে উঠল। তেল ফদরিয়ে এসেছে বোধ হয়। ব্যাতি নিভে যাবে।

বাইরে লোকজনের চাপা গলার আওয়াজ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। আর কোন সাড়া শব্দ নেই। লণ্ডনটা এবার সত্যিই দপ করে নিভে গেল।

মদন খেপীর একখানা হাত জড়িয়ে ধরল। মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সর্বদেহ বিম্বিত করে এল। চোখের পাতাদুটো টেনে আসছে। এতক্ষণের দাফাদাফি ভয়-তরাসের পরে দেহটা যেন এলিয়ে পড়তে চায়।

খেপীর হাতখানা টেনে নের বুকের কাছে।

রাত পোয়াতে আর দেহের নেই। এর মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মদন।

খেপীও তার মাথার কাছে শুয়ে ছিল।

খেপীর হাতখানা তার হাতে ধরা ছিল। হাতে টান পড়তেই খড়খড়িয়ে উঠল মদন। খেপী উঠে বসেছে। ভোর বিরানোর ফুরফুরা বাতাস আসছে। বাতাসে ভেসে আসছে কানে ছাদেক ফকিরের গলার আওয়াজ। 'মিহি সুতার মত তিরতির করে ভেসে আসছে আওয়াজের রেশ'।

"তোমার পথ চাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে। অ-তর ডাক শুনিন্যা সাই চলতে না পাই। আমারে বুঁধা দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে। তোমার পথ চাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।"

ছাদেক ফকিরের আওয়াজে যেন কাঁদনের কম্প তোলে। ভোর বিরানে পাখীর কিচিরমিচির। হাওয়ায় হাওয়ায় ডাল-পাতার ঝিরঝিরানি।

ফকিরের আওয়াজ যেন মনডারে মোচড় দায়।

বড় খেদ, বড় দুঃখের কথা। সাইয়ের দরবারে কাঁদনের নালিশের মত শোনায়।

বিদ্যাধরীর চক্ৰ দৃষ্টোয় নাচন নাই।
রস-খুশির টলটলানি নাই। বোবা হয়ে
গেছে খেপী। চক্ৰ দৃষ্টোয় দিষ্ট নাই।
ফ্যাল ফ্যালফ্যালানি চাওন।

ঘরের বাইরে এল বিদ্যাধরী।
উঠানের একটা কোণে মস্ত এক কাপড়া
চাঁপা গাছের নিচে ঘাসের ওপর বসে
রয়েছে ফকির। সাদা লম্বা দাড়ি।
চক্ৰ দৃষ্টো বোজা। আওয়াজে বৃকের
ভিতরের কাদন-বেদন জানাচ্ছে ফকির।
দুঃখ-বেদের নালিশ জানাচ্ছে।

ঠান বসে রইল বিদ্যাধরী দাওয়ার
বাঁশের খুঁটিতে ঠাসান দিয়ে। মদন বসে
রইল ঘরে।

বেলা বাড়ল। আইসজ্জন-বইসজ্জন
কেউ নাই। মানুষের গতাগতি নাই
বলেই চলে।

সব যেন কামন ধমধমা। ডালপাতায়
জোর বাতাস দিলে বৃকে কম্প লাগে।

ফকির বলল বিদ্যাধরীকে—পাঁচ-
দশ গাও নিকাশ হইয়া গ্যাছে। এ
আগুন আব নিভনের না। তোমাগো
গায়েব মনছুর রহিমদুন্দিরে মারছে।
আগুন জ্বলছে ভাল মতে। এ আগুন
আর নিভনের না।

বোবার মত চেয়ে রইল বিদ্যাধরী।
মদন তারা তাবা চোখে তাকাল ফকিরের
দিকে। তার কাছে না এলে এতক্ষণে
তাদেরও নিকাশ হয়ে যেত।
মনছুর মরেছে। রহিমদুন্দিরে মরেছে। কে
মেরেছে। নিশ্চয় পরমা হালদৈকর।
তাকে আবার মারবে হয়তো মোবারক।

ফকির কি করে কি জানল কে জানে।
বললে—সে সব জানে। এও জানে যে এর
পরে মদন আর বিদ্যাকে বাঁচান যাবে না।
তাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।
ইস্টিমাবে নিরাপদে তুলে দেবে ফকিরের
লোকজন। তারা চলে যাক। এখানে
থাকলে প্রাণে বাঁচবে না।

বিদ্যাধরী এতক্ষণে যেন একটা বড়
শ্বাস ফেলার মত বলল,—কোথানে যাম?

ফকিরের টানা টানা চোখ দুটো ভিজে
ভিজে মনে হোল। খেপীর মাথায় হাত
বোলাল। কোন কথা বলল না। বোধহয়
বৃকের হাওয়া কণ্ঠে এসে আটকে ছিল।
কথা বলতে পারল না।

আর কোন কথা নয়। বেলা থাকতে
থাকতে মাঠ ভেঙে চলল ওরা। সঙ্গে
ফকিরের দু'জন মানুষ। ওদের পোঁছে
দেবে স্টিমার ঘাটে। সেখান থেকে স্টিমারে
ভাসবে ওরা। কোথায় যাবে জানে না।

পড়ন্ত বেলায় ঘাটে এসে পৌঁছল
ওরা। ফকিরের মানুষ দু'জন ওদের টিকিট
কেটে উঠিয়ে দিল স্টিমারে। ভাইটাল
স্টিমার। যাবে সিরাজগঞ্জ। সেখান থেকে

রেলগাড়ি। তারপর? তারপর পাইয়ের
নাম ভরসা।

ইস্টিমারে ফিসফিসানি গুজগুজানি
ছিল, কিন্তু তেমন কোন তরাস ছিল না।
গুজগোল যা কিছু বেধেছে এই মজ্জাকে,
অন্যদিকে ত্যামন লাঠিলাঠি বাধে নি।
মানুষে মানুষে গজলা ছিল। ঘোঁট পাকান
ছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ভেঁ দিয়ে ছাড়ল ভাইটাল। সন্ধ্যার
পবে পৌঁছবে সিরাজগঞ্জ।

বিদ্যাধরী মদনের হাতখানা ধরে ছিল।
শুকনো লিচুর মত দুটো-মস্ত মস্ত চোখ
ওর খির পাখের হয়ে গেছে। মুখে আওয়াজ
নেই। বৃকের ছলবলানী নেই। বৃকের
হাওয়া ধম্ ধরে রয়েছে।

মদন ওকে নিয়ে এল ইস্টিমারের এক-
তলায় ইঞ্জিনের পাশে মোটা কাছির ধারে।
বিরাট মোটা কাছি দাড়ি পাকান রয়েছে
সাপেব মত। তারই পাশে উবু হয়ে বসল
ওরা। তারা তারা চোখে তাকায় মদন
এধারে ওধারে। না, ত্যামন মানুষ-জন নেই
এদিকটায়। বসে রইল কিছুক্ষণ।

কোথায় চলেছে কে জানে। সঙ্গে
কিছু নেই। শূন্য বিদ্যাধরীকে নিয়ে আজ
ভেসে চলেছে। ত্যানা নেই, কাম্বা নেই।
পোটলা নেই, পরমা নেই, কিছুই নেই।
কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, প্রাণদুটি
নিয়ে ভেসে চলেছে তারা, কোথায়, তাও
জানে না।

বিদ্যাধরী ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকায়
মদনের দিকে।

কি করতে কি হয়ে গেল। তার
সারিগ্যা, একভারা, ডুবকি, কিছুই আনা
হয় নি। সেগুলো কি আব আছে। ঘরের
সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেছে। বকুলতলার
ছাপরাখানা চোখের সন্মুখে দেখতে পায়
খেপী। বকুলতলার পুরুত্বের জলে হিঙে
আর ফলমীব সবুজ পাড়ের ঘাসের
সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে গ্যাছে পশ্চিম
কোণে। চুপ্ টাপ, বকুল ফল পাতা ঝরে
পড়ে নিখর জলে। ধু-ধু মাঠের শেষ
কিনারায় গাছ-গাছালীর মাথার ওপর মস্ত
আকাশ।

বিদ্যাধরীর চোখের পাতা দুটো
ধরখরিয়ে কাঁপে।

মদন বড় একটা শ্বাস ফ্যালে। কুমির
চোখ দুইটা অথনো জ্বলতে পারে নি মদন।
অথনো সেই মরা মাছের চোখের মত
দুঃখে-ভরা চোখ দুইটা মনের ওপর ভাসে।
তার দুঃখখানি দুঃহাতে ধবেছিল কুমি।
তারপর কাদন-কাদন গলায় কহেছিল—
পরগড়া যদি ছিড়্য দ্যাখাইবার পারতাম।
তুমি গোসা কর্তা না।

নদীর ফনফনে বাতাসে সেই গলার
কাদন কানে শুনতে পায় মদন।

উঃ বৃকখান বৃকি ভাইগ্যা গুড়া হয়ে

গেল। চোখদুটো জ্বালা করে। এলে ভস্লে
আসে।

রামদায়ের কোপে বেটে ফেলেছে
কুমিকে। কুমিও অম্বকাবফাটা আত্ননাদ।
মদনকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের পরগড়া
দিল কুমি।

ইস্টিমাবেব চাকাব কনকনানি ছাপিয়ে
কানে আসে কুমির আত্ননাদ।

বিদ্যাধরীর কাঁধে হাত রাখে মদন।
মস্ত মস্ত চোখদুটোর নদী টলমল।
বাধাল বৃকি মানে না আর।

উপবে আসমান, নিচে নদীর টান,
দুব জমিনে কোথায় সই নিশানা বেধেছে
কে জানে।

মানুষে মানুষ চিনল না! মানুষে
মানুষেব খপর পাইল না।

তুফান উঠল বন্ধে। বন্ধ-ভাঙা হাওয়ার
উথাল-পাথাল।

খেপী বিদ্যাধরীর গলায় আওয়াজ
উঠলঃ

এ সংসারে কেউ নি হাব বে
মানুষ চিনল না।

অ সাই তোমার সম্মান পাইনা না

গুন-গুনা-গুন আওয়াজ ওঠে।
হাওয়ায় কাদনের কম্প লাগে। বন্ধ
ভাইগো যায়। বন্ধ ভাইস্যা যায়।

খেপী বিদ্যাধরীর মস্ত চক্ৰ বেয়ে
দরদরায়ীয়া জল নামে।

কেউ বা ডাকে আল্লা কইব্যা,
কেউ ডাকে কালী-কিষ্ট-হইয়া।
দেহ-পিঞ্জরে পক্ষীভাবে কেউ নি
চিনে না।

অ সাই নিজের ফান্দে নিজে মরে—
অ সাই জাইত বিচাবে নিজে মরে—
বন্ধ দুঃখের যন্তনা—অ সাই

বন্ধ মনের কপনা।
এ সংসারে কেউ নি হাব বে

মানুষ চিনল না।
অ সাই তোমার সম্মান পাইল না।

মানুষ চিনল না।
বিদ্যা খেপী কইন্দা মবে, হাব রে

ভবেব দাবখানা।
অ সাই মানুষ চিনল না।

॥ সমাপ্ত ॥





[শব্দ-প্রকাশিতের পর]

১২৮

দৃশ্য হয়ে আসছে। ডাকবাংলার লামনে বাগানে বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখি। বরফের গায়ে রংবের খেলা। মন-বিভাগের এই সুসজ্জিত কাঠের বাড়িটা মন্দির থেকে কিছটা তফাতে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের মাথায় কৌশলে স্থাপিত। পাশে আর একটা চেয়ারে বসে আছেন সদ্যপরিচিত সেচ বিভাগের ওভারসিয়ার বীরেন্দ্রকুমার জৈন। তরুণ যুবকটি এখানে এসেছেন মন্দিরের মেরামতি কাজে। যমুনায় প্রবল স্রোতে মন্দিরের ভিত্তি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মন্দির-সংলগ্ন গরম জলের উষ্ণ প্রস্রবনে স্নানের ব্যবস্থাও বড়ই প্রাচীন। মজবুত পাথরে আগাগোড়া স্থানটি পুনর্নির্মাণের জন্য সরকার বাহাদুর সজাগ হয়েছেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বীরেনবাবু আলোপ করেন। উত্তরপ্রদেশবাসী সমভূলের শিক্ষিত যুবকটি পাণ্ডববর্জিত পাহাড়ের দেশে হাঁপিয়ে উঠেছেন। ভারি সঙ্গে উঠেছিলুম চম্পাসর হিমবাহ ধরে সামনে পাহাড়ের অপরপ্রান্তে। যেখানে যমুনা

আবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় পাহাড়ের গা বেয়ে প্রপাতের মতো চম্পাসরের উৎস-মুখে পড়ে বরফের তলায় অদৃশ্য হয়েছে। হিমবাহটি দৈর্ঘ্যে এক ফালিঘরের কিছু বেশি হবে। মন্দিরেব অভিমুখে সামান্য ঢালু। বরফের ওপরে পড়ে আছে অসংখ্য শুকনো কঁচা পাতা। চাঁর আর ভুজপত্র। দু'পাশে রক্ত কালো পাথরের দেওয়াল। প্রসারতা গ্রিশ-চল্লিশ হাতের বেশি নয়। ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে বরফের ওপারে। প্রপাতের স্থানটি বড় মনোরম। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, বীরেনের সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো সম্পূর্ণ অজানা হিমবাহ অতিক্রম করার সাহস হতো না।

যমুনোদ্রীর একমাত্র আশ্রয়স্থান কালিকমলী ধর্মশালা কয়েক বছর হলো বরফের ধস নেমে প্রায় বিধ্বস্ত। ভাঙা কাঠের বাড়িটার একটা অংশে অতিকণ্টে বাস করছিল বীরেন। যমুনোদ্রীতে থাকবার স্থানান্তর। এর ওপরে যাত্রীদের ভিড় তো আছেই। আমার নিমন্ত্রণে রেন্ট-হাউসে দু'রাত বাস করে বোটার কিছটা স্থানান্তর পেয়েছে। সমভূলের লম্বা

আনন্দ আর বিলাসের ব্যবস্থা এখানে দুঃপ্রাপ্য। সামান্য ক'টা দিন তবু সহর-বাসীর সঙ্গে কথাবার্তার মন একটু প্রফুল্ল হয়। ওর কাছে শূন্য স্থানীয় লোকদের জীবনব্যাপার আর রীতিনীতি। শ্রমশালী, বীফগাঁওয়ের অধিবাসীরা আজও যেন স্বাপরমুগেই বাস করছে। দ্রোপদীর দেশে পণ্ডস্বামী নিয়ে ঘর করেন স্থানীয় মেয়েরা। পালা করে প্রতিরাতে একজনের সেবা করা আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পণ্ডায়েতের বিচারে পিতৃ নিধারিত হবে। গর্ভবতী নারীর বড় কষ্ট। সন্তান জন্ম হলে পক্ষকাল গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে একতলার নোংরা ঘরে নিজনে বাস। গৃহেব অন্যান্য পরিজনদের অসুস্থ্য আঁতুড়ে পুষ্টির অভাবে আর রোগের আক্রমণে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ। সম্প্রতি সরকার থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের নিষমকানুন অম্লভূত। সত্যিই সংজ্ঞাও বিচিত্র। কন্যা যে কোনও পরপুরুষের সঙ্গে করতে পারে। গৃহিণীর বেলাষ যত দোষ।

মন্দিরের পাশে তপ্তকুণ্ড থেকে ফটন্ত জল পড়ছে। যাত্রীরা চাল, ডাল, আলু-সেদ্ধ করে দেবতার ভোগ দেয়। পাহাড়ের থাকে থাকে দু'টি চৌবাচ্চায় সেই জল পড়ে। দ্বিতীয়টিতে জলেব তাপমাত্রা স্নানের উপযোগী। জলে গন্ধকের ভাগ অত্যন্ত বেশি, তবে স্নানে শরীরেব ফলপ্রসূ হয়। পাশাপাশি বরফ আর গরম শ্যাম্প শব্দ হিমালয়েই দেখা বাব। তপ্ত-কুণ্ডের পাশে পাহাড়ের গুহায় এক সাধু বাস করেন। বীরেনের সঙ্গে গোলমুখ তাকে দর্শন করতে। প্রৌঢ় সম্যাসীর জন্ম বাংলায়। এখানে আছেন গত দশ বছর ধাবৎ। কথাবার্তা হলো কিছু। বিকেলে বাগানে বসে বীরেনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। বাবাজীর প্রসঙ্গে বীরেনের কাছে শুনলুম জগলেব কাঠ ইত্যাদির ব্যবসা ছাড়াও সম্পন্ন যাত্রীদের আহ্বারাদি সরবরাহ করেন অর্থের বিনিময়ে। আর প্রতি রাতে প্রেম বিতরণ করেন স্থানীয় নারীদেব। সম্যাসীর আসক্তি না কি পরম কাম্য ওদের কাছে। মনে হলো, দু'টি সুন্দরী তরুণীকে দেখেছিলুম আজ সকালে বীফগাঁওয়ের কাছে যমুনা পার হয়ে এই দিকে আসছিল। সুসজ্জিত রঙীন শাড়িপরা মেয়ে দুটিকে দেখে মনে হরে-ছিল বুঝি কোনও উৎসবে চলেছে ওরা। মন্দিরেব কাছে মন্দির দোকানে তাদের বসে থাকতেও দেখেছি। সাধারণত কুমারী মেয়েরাই সাধুসেবার উপযুক্ত। অবশ্য পুত্রহীনা নারীবাও কদাচিত এ অধিকার পায়।

মনটা বিষিয়ে গেল। বেশ ছিলুম আমার স্বপ্নের জগতে। আদিম অরণ্যের



সেকেন্দর নগর আগের চম্পালার বিদ্রোহ—জর্জ জার্মান হোয়াইটের স্কেচ থেকে

ঐনসার্গিক শোভার মন আমার ভরে উঠেছিল। কেন জানি না সে আনন্দে ছেদ পড়ে গেল। বীরেনকে পাঠিয়ে দিলুম সন্ধ্যার আগেই তার বিছানাপত্র এখানে নিয়ে আসতে। একটু একা থাকবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ডাকবাংলার পেশন দিকে পাহাড়ের গায়ে বরফ জমা হয়ে আছে। তার ঢল দিলে একটা ঝরনা সশব্দে নিচের দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রপাতের কাছে একটা পাথরের ওপরে বসেছিলুম এলোমেলো চিন্তার রাশি নিয়ে। চমকে উঠি মানুষের সাড়া পেয়ে। প্রায় পিচের কাছে অতি সূক্ষ্ম স্বরে কে আমার ডাকে। রাজস্বানী মেয়েটি কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভোজ্য পাত্রায় হুড়ে কিছু মিষ্টি আর ছোট ছটিতে দুখ এনেছে আমার খাওয়াতে। প্রশ্নভরা চোখ তুলে তার দিকে তাকাই। মন্দিরে পজো দিয়ে আমার খুঁজে ফিরছে। তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করি। 'যমুনা', নতুনভাবে উত্তর দেয় মেয়েটি।

চাঁপার কলির মতো শুষ্কাকণ্ঠবর্ণের সুগঠিত মুখখানির ওপরে দীর্ঘ আরত জোঁতা চোখদুটি মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে। প্রশান্ত কপালে তার রক্তচন্দনের তিলক সন্ধ্যাবেলার স্বরূপ আলোতে জ্বল-জ্বল করে। যমুনার নীল-জলধারার দিকে চোখ ফেরাই। সাদা বরফের ওড়না গায়ে চপলা স্রোতস্বিনীর আনন্দমুখ

নবীন জলোচ্ছ্বাসের সাথে উজ্জ্বলবোঁকা রাজশূভতরঙ্গীর সাদৃশ্য কি করা পড়ে?...
* * *

দুটি সাতের মধুর স্মৃতি বদলিতে ভরে যমুনোদীর মায়া কাটাতে হলো। এখনও যে ঢের থাকি। প্রায় এগারো হাজার ফিট উচুতে কুনোদী। স্নাত প্রচণ্ড শীত থাকলেও দিনের বেলায় বৃষ্টি পাই নি। এখানে আশ্বিন মাস থেকে কৈশাখ মাস পর্যন্ত বরফে ঢাকা থাকে। প্রায় হনুমান চাঁচি পর্যন্ত ফিত্তীর্ণ অশ্বল জুড়ে বরফ থাকে বছরের মধ্যে সাত মাস। তারপরে মন্দির খুললে বাঘী সমাগম আরম্ভ হয়। কোলার-বদরীর তুলনার এপথে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। তাদের অধিকাংশই দেহাতী। শিক্ষিত প্রমথকারী এদিকে বড় একটা আদেন না। প্রধানত পথের দুর্গমতা আর আহাৰ্যের দুর্প্রাপ্যতা। যমুনা উপত্যকার উর্বরতা প্রচুর। অথচ সামান্য আলু আর গম ছাড়া এ অঞ্চলে কিছুই পাওয়া যায় না। কেন যে এরা কপি, টমাটো, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি ফলার না কে জানে। জগলে ভালুক, কম্বুরী হরিণ, ডুরাল (পাহাড়ী ছাগল জাতীয়) প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। আর আছে অক্লান্ত বন-সম্পদ। এদিকে সরকারের দৃষ্টি ভাল-ভাবে পড়লে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বৃদ্ধি হবে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে সূর্যবিক্রমের দায়িত্ব আর অগণিত কল্যাণ থেকেও

স্থানীয় অধিবাসীরা মুক্তি পাবে। 'অসীম প্রাচীন ঐতিহ্যও যুঁছে যাবে' নিঃশব্দে। ভালমন্দ বিচারের ভার রইলো আগামী-কালের বংশধরদের জন্য।
* * *

ফেরার পথে গড়গড় করে ক্রমে চলোছি। জনকীবাই চটিতে গজিত ভারী জিনিষপত্র সংগ্রহ করে আবার ঢলা শূন্য। ফুল চটি আর হনুমান চটি পেছনে ফেলে সানা চটিতে হাজির হলাম যখন কাম্বুর আগতপ্রায়। এখান থেকে গাংমানী বারু মাইল। ধর্মশালাটি যাত্রীসমাগমে পরিপূর্ণ। কোথাও ভিলাধারপথের স্থান নেই। এবং এ পথের নিরমমায়িক বৃষ্টিও ধীরে আসছে। ক্রান্ত সন্ধ্যা চাঁদের সৌন্দর্যে বনে ভারছিলুম রাত্রিবাসের কি হবে। অশ্রুতপক্ষে ঘামে-ভেজা জামাকাপড় খুলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। সমস্যার সমাধান অচিরেই হয়ে গেল। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের স্থানীয় দায়িত্ব চিকিৎসকসহ চিৎরী ধর্মশালায়। দোস্তলার সেই ঘরটিতে কর্মচারী মাধো সিং জীবনরে নিমন্ত্রণ করলেন। স্নাতটা তার ঘরে দিখি জেটে গেল। বৃষ্টির জল গায়ে পড়ে ঘুমের কিছুটা ব্যাঘাত হয়েছিল যাত্র। শূন্যে শূন্যে গল্প করলুম মাধো সিংয়ের সঙ্গে। কুমারসে আলমোড়া জেলার অধিরমী মাধো সিং সূর্যবিক্রম ইংরেজ সৈন্যদলে সিপাহী ছিল। বৈচিত্র্যপূর্ণ তার জীবনকাহিনী। বিগত মহাযুদ্ধের

সময় বরাবর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সেনাপতি তাঁবুতে পানাহাররত স্বজাতীয়দের সঙ্গে গল্পচ্ছলে 'ব্রাউন ইন্ডিয়ান' বলার অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে গল্পে গুলে ওঠে। উন্নত সঙ্গীদের মধ্যে উক্তি প্রত্যাহারে বাধ্য করে প্রবল-প্রতাপ বৃষ্টি প্রভুকে। তারপর একজন বাঙালী ডাক্তারের অধীনে অন্যতর বদলী হয়ে যায়। ডাক্তার সাহেবের কথা বলতে তার মুখচোখ প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, ওষুধপত্র আর চিকিৎসাবিদ্যা যেটুকু শিখেছে সবই তার কৃপায়। সেই সুবাদে আমারও আজ রাতে আগ্রয় জুটে গেল। বাঙালীদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংশয়ের ধারণা বিশাল। তার মতে ভারতবর্ষের উন্নতি একমাত্র বাঙালীদের দ্বারাই সম্ভব।

* * *

১৩

যমুনায় চাঁদ থেকে আলোপ হই একদল নেপালী যাত্রীদের সঙ্গে। আমায় মতো যমুনোত্রী দর্শন শেষে ওরাও চলেছে গঙ্গোত্রীর পথে। সুদূর নেপাল থেকে আগত গ্রাম্য চাষীগৃহস্থের দলটিতে আছে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ। অভিভাবক তাদের গ্রামের পুরোহিত। সংস্কৃত ভাষা এবং আর্থশাস্ত্রের বেশ দখল আছে তাঁর। প্রতি বছরই নেপালের হিন্দু

অধিবাসীরা উত্তরাঞ্চলের তীর্থপরিক্রম আসেন বলে বলে। রত্নপুরীতে চার-ধামের মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকালের ব্যবধান ঘুচিয়ে তাঁদের বেষ্ট্রে রেখেছে একসূত্রে। শিবভক্ত গুরা আসেন হিমালয়, বারাগসী আর প্রয়াগে। আমরা যাই বাগমতী তীরে পশুপতিনাথ আর কালিগন্ডকী তীরে মুক্তিনাথ দর্শনে। ভগবান বৃন্দে পবিত্র জন্মভূমি ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত হিমালয়ের পাদদেশে লুন্সিনী বা লম্বিনীতে। ওদের আমি চিনি। ওরা যে আমার আপন জন। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে জড়িয়ে আছে পরমাত্মীয়রূপে।

গাংনানীর ধর্মশালায় যাত্রা বিরতি করি আজকের মতো। এ স্থানটি একটু ঘুরে-ফিরে দেখা দরকার। নদীপথের দুই পাশে সবুজ পাহাড়গুলো দূরে সরে গিয়ে অধিকার্য সুন্দর রূপ এনে দিয়েছে। বিস্তীর্ণ বালুকারাশিতে ভরা নদীতীর, ছায়াচ্ছন্ন উপবন আর দূরে দূরে ইতস্তত শ্যামল শসাক্ষের পাহাড়ের ধাক্কা থাকে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কুটীরে গ্রামের বসতি। ধর্মশালার সামনে দিয়ে নামা পথে নদীতীর অভিমুখে চলি। প্রাচীন একটি কুন্ডের ধারে ছোট একটি মন্দির আছে নদীগর্ভের অঙ্গদূরে। অদূরে বড় বড় গাছে অজস্র আম-খেরে আছে। মন্দির সংলগ্ন ছোট কুন্ডটি আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো। অ-গভীর কাকচকু পরিষ্কার জলে ছোট ছোট মাছ খেলা করে। কুন্ডের তলদেশ বালি মেশানো ছোট কঁকরে ভরা। প্রচ্ছন্ন শীতল জলের প্রস্রবণ এটি। চৌবাচ্চার আকৃতি কুন্ডটি থেকে উদ্ভূত জল পাশের নালা দিয়ে বেরিয়ে অঙ্গদূরে নদীতে পড়ে। সিঁড়ি বেয়ে কুন্ডে অবগাহন স্নান করে সবাই। পাথরে তৈরি ছোট মন্দিরটির ভাস্কর্য প্রাচীন। তার দেওয়ালে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্তি। প্রবাদ এটি না কি পৌরাণিক যুগে জন্মদান মন্দির আগ্রহ ছিল। বার্ষিকের ভায়ে অশঙ্ক মহর্ষি নিজ গঙ্গাস্নানের জন্য যোগবলে এইখানে গঙ্গাকে আনেন। প্রাচীন কিংবদন্তির সত্যাসত্য নিরূপণের উপায় নেই। তবে এখান থেকে একটি পথ পাহাড় ডিঙিয়ে গঙ্গোত্রী অভিমুখে গেছে। উত্তর কাশীর দূরত্ব এ স্থান থেকে কুড়ি মাইলের মতো। মোটর-বাস চলাচলের আগে, যাত্রীরা যেতেন সিঁড়ির চড়াই ভেঙে সেই পথে উত্তর কাশী হয়ে গঙ্গোত্রী। মোটর-বাসে যাবার সঙ্গতি যাদের নেই, আজও তাঁরা সেই পথেই যান।

সতৃষ্ণনে বারবার ফিরে তাকাই বন্দরপুঞ্জের দিকে। হিমালয়ের শৈল-শিখরে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। অজানা রহস্যের কোন বাদু লুকিয়ে আছে

ওখানে। মাটির মানুষের স্বপ্নভরা অমৃত-লোক। যুগে যুগে উদ্ভাসিত অশান্ত পৃথিবীতে বহন করে আনে পুণ্যলোকের বাণী। হিমগিরির করুণাধারার প্রাবল্য হয় ভারতভূমি। গঙ্গা-যমুনায় ঘাটে ঘাটে গড়ে ওঠে বিশাল ভারতের অসংখ্য জনপদ। আর্থসভ্যতার পবিত্র তীর্থস্থানে মন্দিরে মন্দিরে বাজে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় গম্ভীর ওস্করনাদ। নাড়ীর টানে বাঁধা মন বারে বারে ফিরে চায়।

* * *

যমুনোত্রীর পথে মোটর-বাসের শেষ সীমানা আপাতত বড়কোট পর্যন্ত। গাংনানী থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বড়কোট একটি সমৃদ্ধ স্থান। জর্জ ট্যানিসস হোয়াইটের লেখায় বড়কোটের উল্লেখ আছে। বর্তমানে আধা সহর বড়কোটে সরকারী বন-বিভাগ, পুর্ন-বিভাগ প্রভৃতির কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে মসুরী বাবার পথও আছে। সম্প্রতি যমুনোত্রীর পথ আরও প্রসারিত হচ্ছে। বাক্সিংও অবধি সব ক্ষুত্রে মোটর-বাস চলাচলের সড়ক নির্মাণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২১ বছরের মধ্যেই সমাধা হবার কথা।

সকালের ঠান্ডা হাওয়ার কাউবনের পাশ দিয়ে পদরজে হাজির হয়েছি বড়কোট। ষষ্ঠী দেড়েক লাগে প্রায় সমতল এই পাঁচ মাইল পাড়ি দিতে। শ্রীমন্ত ষষ্ঠী-থানেক আগেই প্রথম গেটের বাস চলে গেছে। আবার দ্বিতীয় গেট খুলবে বেলা একটায়। অগত্যা স্নানাহারের ব্যবস্থার তৎপর হতে হয়। এ জায়গায় উচ্চতা তিন হাজার ফিটের মতো। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে মাছির আক্রমণ। তাদের তাড়নার অন্যদিকে মন দেওয়া মুশ্কিল। পাশাপাশি দুটি সংস্থার বাসভিটো। নির্দিষ্ট সময়ে একটি বাসে চড়ে বড়কোট ত্যাগ করি। গন্তব্য স্থান উত্তর কাশী। গাড়িতে তুলে দিয়ে লাফ সিং ছুটি নেন। গভীর কৃতজ্ঞতার হাত-দুটো তার চেপে ধরি। স্বপ্নভরা লাফ সিং হাসিভরা মুখে চোখ তুলে তাকান। দূরগত দৃষ্টিতে তার আবার ফিরে আসার আশ্রয়। যমুনাত্রয়ীকে বিদায় জানাই। হাত তুলে প্রণাম করি বন্দরপুঞ্জকে। গর্বোন্মত্ত রূপালী পোষাকে ঝলমল করে তার শিখরদেশ। মায়ার ভরা যমুনায় জন্মপূরী...

[কম্প]

নতুন!
ইকনমি প্যাকে 'টিনোপাল'



তাছাড়া 'এক বালতির এক প্যাকেট' এবং 'রেগুলার প্যাক'

সর্বাধিক গুণভার জন্য টিনোপাল

মুহুর গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

১৩১/১৬৭



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

শনিগ্রহের নতুন খবর

নতুন খবরই বলবো। তবে পাছে পুণ্ড্রাতনের সঙ্গে কেউ ওয়াকিবহাল না থাকেন, সেই ভয়ে নতুন-পুণ্ড্রাতনে মিশিয়ে বলার আয়োজন।

খবরটি শনিগ্রহকে নিয়ে। সম্প্রতি এই গ্রহটি সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য জানা গেছে। খবর পাওয়া গেছে, শনিকে ঘিরে থাকা বলয়ের সংখ্যা তিন নয়, চার।

বলয় বলতে ইংরেজীতে আমরা 'রিং' বুঝি। আমরা জানি যে, এইরকম কয়েকটি 'রিং' শনিগ্রহকে ঘিরে আছে এবং এদের কোনোই সৌরজগতে গ্রহটির বিশিষ্টতা।

এই বিশিষ্টতা হালে আরও বাড়ল। শিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী ফেইবেলম্যান-এর কাছ থেকে জানা গেল, শনির নতুন আর একটি 'রিং' বা বলয় তিনি আবিষ্কার করেছেন।

শনিগ্রহের বলয়কে ঘিরে রহস্য সাড়ে তিন শো বছর আগে থেকেই দানা বাঁধছে। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) তার দূর-বীণের ভিতর দিয়ে প্রথম বোদিন সাক্ষাৎ পেলেন এদের সেদিনই রহস্যের গোড়াপত্তন হল। কিন্তু তিনি এই বলয় সম্বন্ধে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি: এদের অস্তিত্বের কথা উপলব্ধি করে বিস্মিত চরেছিলেন শুধু।

এই বিস্ময়ের ঘোর কাটল ৪৫ বছর পরে, ক্রিস্টিয়ান হিগিনস-এর (১৬২৯-১৬৯৫) গবেষণায়। হিগিনস জানালেন, গ্যালিলিও বাদে দেখে বিস্মিত হয়েছেন, আসলে তারা হল এক জোড়া বৃত্তাকার পদার্থ। শনিগ্রহকে অঙ্গুরীর মত ঘিরে রেখেছে তারা। ঘিরেছে এমনভাবে যে দেখলে মনে হয়, কেন্দ্র আছে কোথাও এবং সেই কেন্দ্রকে মধ্যমণি করে অঙ্গুরীয় দু'টি পাশাপাশি অবস্থান করছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় আর একটি অঙ্গুরীয় বা বলয়ের কথা জানা গেল। ফলে, বিজ্ঞানীমহলে নতুন করে প্রশ্ন উঠল আবার—কি এরা? কেমন করে এদের সৃষ্টি হল?

এ সব প্রশ্নের একেবারে সঠিক জবাব আজও অবধি পাওয়া যায় নি বটে: তবে শনিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কিছু রোমাঞ্চকর লংবাদ এই মতো আমরা পেয়েছি। এতই

মধ্যে জেনেছি আমরা যে, শনির মত সহস্রাব্দে বস্তু মহাকাশের বৃক্কে খুব অল্পই আছে। খুব অল্প বস্তুই এর মত ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের আকর।

সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বের হিসেব নিলে দেখি, শনির স্থান ষষ্ঠ। এর তুলনায় সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আছে যথাক্রমে বৃহস্পতি, শুক্রে, পৃথিবী, মঙ্গল ও বৃহস্পতি। আর আরতনের দিক দিয়ে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ এই শনি। একমাত্র বৃহস্পতি ছাড়া অন্য সব গ্রহই এর তুলনায় ক্ষুদ্রাকার।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনিয়ার আবিষ্কৃত হবার আগে অবধি সকলের ধারণা ছিল, শনি হচ্ছে সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দৌলতে এই ধারণা এবং কালক্রমে আরও অনেক ভুল ধারণা বদলাল। শনির বলয় বা চক্রে স্পষ্টই দেখতে পেল বিজ্ঞানীরা। দেখল, ফিকে হলুদ রঙের আশ্চর্য এক পদার্থ। আলোক-প্রতিফলনের ক্ষমতা মূল গ্রহটির চেয়েও বেশি এর বেশি।

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শনির ২৯.৬ বছর সময় লাগে। অর্থাৎ, শনির এক বছর আমাদের সাড়ে উনত্রিশ বছরের চেয়েও সামান্য বেশি। গ্রহটি যখন সূর্যের খুব কাছে থাকে, সূর্য থেকে তখন দূরত্ব দাঁড়ায় ৮০৭,৭২৬,০০০ মাইল। আর যখন থাকে দূরে, এই দূরত্ব তখন ৯০৬,৫৫৪,০০০ মাইলকে স্পর্শ করে। অতএব, সূর্যের কাছে থাকবার সময় গ্রহটি যদি পৃথিবীর মুখোমুখি হয়, তবে পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ১ কোটি ৯০ লক্ষ মাইল কমে বাওয়ার কথা।

এইভাবে দূরত্ব-কমার সুযোগ খোঁজেন বিজ্ঞানীরা; এবং সুযোগ বুঝেই দূরবীক্ষণকে গুঁরা শনিগ্রহের দিকে ঘুরিয়ে থাকেন।

শনির আকার-প্রকার সম্বন্ধে অনেক কিছু, হিসেব ওদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। এরই মধ্যে জেনেছি আমরা যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে গ্রহটির ব্যাস ৭৪৫০০ মাইল। জেনেছি, সৌরজগতের সবচেয়ে চ্যাপ্টা গ্রহ এই শনি; মেরু অঞ্চল বরাবর এর ব্যাস নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় ৭,৮০০ মাইল কম। পৃথিবীর তুলনায় শনির উপরিভাগ ৮১ গুণ বড়; আর এর আরতন হল পৃথিবীর ৭০৫ গুণ। অর্থাৎ

৭০৫ টা পৃথিবী একত্র জুড়লে শনির সমান হবে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, সমান হবে শুধু আরতনের দিক থেকে; ওজনের দিক থেকে নয়। কারণ, আরতনের তুলনায় শনির ওজন খুবই কম; পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র। অর্থাৎ, রাক্ষুসে একটা 'ব্যালেন্স'-এর একদিকে যদি শনি থাকে তো অপরদিকে ৯৫টা পৃথিবী চাপিয়ে দিলেই ওজন সমান সমান হবে। 'ব্যালেন্স'-এর কাটা এক চুলও নড়বে না।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, গ্রহটির ওজন আমরা মাপলুম কি করে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওজন মাপা দূরত্ব মোটেই নয়। শনির উপগ্রহগুলোর হালচাল লক্ষ্য করোঁ আমরা। আর লক্ষ্য করোঁ, প্রতিবেশী গ্রহ বৃহস্পতির ওপর তার প্রতিক্রিয়া।

গ্রহ-পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলেই এদের একের প্রভাবটা অপরের ওপর খুব বড় রকমের হয়। এবং ফল দাঁড়ায় এই যে, এরা উভয়েই নিজ নিজ উপগ্রহ-কার পথ থেকে খানিকটা করে সরে আসে। পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের টানেই এইরকম করে সরে এরা, এবং কতটুকু সরে, বিজ্ঞানীদের হিসেবের খাতায় তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা থাকে। গ্রহের ওজন মাপবার সময় এই হিসেবটা 'ব্যালেন্স'-এর কাজ করে এবং স্পষ্টই ধরা পড়ে তখন যে, শনিগ্রহের বনয় মাত্র ৭২। অর্থাৎ, জলের চেয়েও অনেক হালকা এই গ্রহটি। অর্থাৎ, তেমন জুতসই কোন সাগর যদি পাওয়া যেত, শনিগ্রহকে রাখা যায়, তেমন কোন সাগর, তো দেখা যেত, গ্রহটি ওতে ডুবেই না, ভেসে থাকে।

এই গ্রহের মডেল গড়েছিলেন রিউ-পার্ট উইল্ডার্ট। তিনি দেখিয়েছিলেন, এর ভিতরকার কঠিন অংশের ব্যাসার্ধ ১০,০০০ মাইল। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোহা ও নিকেল আছে এখানে। আর এর ঠিক ওপরেই আছে ৮,০০০ মাইল গভীর তুষারের স্তূপ।

এই তুষার-স্তূপকে ঘিরে রেখেছে ১৫,০০০ মাইল জোড়া সংকোচিত 'গ্যাস'। বর্ণালী-বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এই 'গ্যাস'-এর অধিকাংশই হল 'মিথেন' ও 'অ্যামোনিয়া'।

সম্প্রতিক কালে শনিগ্রহ সম্বন্ধে

আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে, পৃথিবী যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পায় তার শতকরা মাত্র এক ভাগ পায় সে। ফলে, প্রচণ্ড শীত সেখানে; হিমাকের চেয়েও ১৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। হেনরী এন. রাসেল বলছেন, গ্রহটির প্রকৃত তাপাংক আরও কম হবে। অর্থাৎ, শীতের দাপট ওখানে হয়তো হবে আরও বেশি। এবং তাই যদি হয় তো যে ধরণের জীবজন্তুর সঙ্গে আমরা পৃথিবীতে পরিচিত, শনিগ্রহে ওদের খুঁজে পাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু অস্বীকার করি কী করে যে, রহস্যের ইন্ড্রজাল পাতা আছে শনিতে। তার বলয়ের মধ্যে বিস্ময়ের হাজার উপকরণ লুপ্ত হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা যুগে যুগে সেই উপকরণ-সংগ্রহে তৎপর।

এতদিন পর্যন্ত শনিগ্রহের তিনটি বলয়ের কথা জানা ছিল; এবং তিনটি অক্ষর A, B ও C দিয়ে বোঝান হত ওদের। A বলতে বোঝাত সবচেয়ে বাইরের দিক-কার বলয়টি। সেটি ১০,০০০ মাইল চওড়া এবং মাঝখানের বলয় B-র তুলনায় অনুজ্জ্বল। A ও B-র মাঝখানে ২,৫০০ মাইল জায়গা অনেকটা খেন ফাঁকা মতো। ওই হল ক্যাসিনিপ্রদেশ। ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্যাসিনি আবিষ্কার করে-ছিলেন প্রদেশটি, এবং সেই থেকেই এই নাম চালু হয়ে যায়। B বলয়টি চওড়ায় প্রায় ১৬,০০০ মাইল; অর্থাৎ, প্রথমটির তুলনায় অনেক বড় সে। C বলয়ের সঙ্গে তার সীমানা বরাবর ১,০০০ মাইল জায়গা 'নো রিংস্ ল্যান্ড'; অর্থাৎ কোনো বলয়ের অস্তিত্ব নেই সেখানে। বিজ্ঞানীরা সেখানকার নামকরণ করেছেন 'ক্রেপ জেন'। এই জেন-এর পাশেই আছে C বলয়। চওড়ায় সেটি ১১,৫০০ মাইল এবং শনির উপরিভাগ থেকে তার দূরত্ব ৭,০০০ মাইল মাত্র। এ ছাড়া বলয়গুলো পুরু নয়

মোটাই। বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় জোরে ১০ মাইল ওদের গভীরতা। আর ওদের মোট ওজন শনির ২৭,০০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।

কিন্তু কি আছে বলয়গুলোতে? কি দিয়ে ঐ রহস্যময় চকগুলো গড়া?

এক শত বছর আগে বেনজামিন শিয়ার্স এবং জেমস ক্রাক ম্যাকসওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) জানিয়েছিলেন, নিরেট কোনো কঠিন পদার্থ নিশ্চয়ই ওখানে নেই। এ ছাড়া তরল পদার্থ থাকারও অসম্ভব। যদি থাকত এইরকম কিছু তো বলয়গুলো স্থায়ী হত না; খণ্ড খণ্ড হয়ে কবে মহাশূন্যের বুকে মিলিয়ে যেত। কিন্তু সুবাই জানি আমরা, মিলিয়ে ওয়া যায় নি। বরং বখারীতি শনিগ্রহের শোভাবর্ধন করেছে।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ম্যাকসওয়েল ঠিকই বলেছিলেন, এই শোভা স্থায়ী। ঠিকই বলেছিলেন তিনি যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ দিয়ে বলয়গুলো গড়া বলেই ধরলে হয় নি ওরা; যুগ-যুগান্ত কাল ধরে কঠিন পদার্থ।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড রবার্ট গবেষণা সমরপীর। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে প্রমাণ করেছিলেন তিনি যে, কোনো গ্রহ ও তার উপগ্রহের ঘনত্ব যদি সমান হয় এবং উপগ্রহটি যদি থাকে গ্রহের প্রায় আড়াই গুন (২.৪৪) ব্যাসার্ধের মধ্যে, তবে আর যা কিছু দিয়েই হোক না কেন, গ্রহাণুজটি অন্তত তরল পদার্থ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, সে তরল পদার্থের হলে গ্রহের এই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আনা যায়ই ভেঙে চুরমার হবে। গ্রহের জোয়ার-ভাটা যারাক্ষক বিকোমল সৃষ্টি করবে তার মধ্যে। এদিকে পর্যাক্ষর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, শনির বলয়গুলোর সব কটিই আছে তার আড়াই

গুনের চেয়ে কম (২.৩০) ব্যাসার্ধের মধ্যে। অপরাধকে সবচেয়ে কাছে উপগ্রহটি শনি থেকে যে দূরত্বে আছে, তা হ'ল গ্রহটির ৩.১ গুন ব্যাসার্ধের সমান। অর্থাৎ বিপদ-সীমানার মধ্যে উপগ্রহদের একটিও নেই; কিন্তু বলয়গুলোর সব কটিই আছে। এ থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন, সৃষ্টির উষাকালে শনির উপগ্রহদের একটি কী দৃষ্টি এই গ্রহের ২.৪৪ গুন ব্যাসার্ধের মধ্যে এসে পড়েছিল; এবং আসবার পর ধ্বংস হয়েছিল ওরা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে শনি-প্রদক্ষিণ সুরু করেছিল সেই আদ্যিকাল থেকে।

প্রদক্ষিণের গোড়ার দিকে খণ্ডগুলোর একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষ বাধ্যত প্রায়ই। প্রায়ই আড়াআড়ি পথে চলতে গিয়ে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হ'ত। ফলে আরও খণ্ড খণ্ড হ'ল ওরা। ক্ষুদ্র গ্রহকণিকাগুলি ক্ষুদ্রতর হ'ল; এবং ওদের কক্ষপথও হল আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যত্যাকার। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এইরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কালক্রমে শনির বলয়গুলো গড়ে উঠেছে। আর বলয়ের উপকরণগুলো হয়েছে খণ্ড-বিখণ্ড।

এই সব উপকরণ সম্বন্ধে হাল আমলের বিজ্ঞানীদের কাজ থেকে অনেক নতুন খবর মিলেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নিজ নিজ কক্ষপথ ধরে বিস্তৃত অনুচরের মত শনি-প্রদক্ষিণ করছে ওরা। শনিগ্রহের কাছে আছে যে খণ্ডগুলো, ওরা দ্রুতগতির দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রদক্ষিণ করছে। দ্রুতগতির গতি সেক্ষেত্রে ১০ মাইল; আর কাছের গুলোর সেক্ষেত্রে ১২ মাইল। গতির এই হেরফেরের জন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, শনিগ্রহের বলয়গুলো খণ্ড খণ্ড কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থগুলো যে গতিতে ছোটে, উপগ্রহের ছোটের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায়। অর্থাৎ, শনি থেকে যতটা দূরে আছে ওরা ঠিক ততটা দূরে যদি কোন ছোটো উপগ্রহ থাকত, তবে সে ঠিক ওদের সমান গতিতেই শনির চারিদিকে ঘুরপাক খেত। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই গ্রহের বলয়গুলো ছমছাড়া পথে চলছে না; চলছে মহাকাশেরই নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে। তবে ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয় ওদের। B-বলয়ের উপাদানগুলো অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবিষ্ট ও অস্বচ্ছ। অপরাধকে A-বলয়টি বেশ স্বচ্ছ। এ থেকেই মনে হয়, শনিগ্রহে প্রাণী থাকত যদি, এই বলয়-বৈচিত্র্যের তারিফ করতে পারে এমন কোন প্রাণী যদি থাকত, তবে নিশ্চয় আমরা ওদের হিংসে করতুম। কারণ, সারাদিন আর রাত্রি ধরে ওরা বলয়গুলোর যে সৌন্দর্য প্রদর্শন করত সমগ্র সৌরজগতে তার কোন তুলনা নেই।

দীপালাতে বিনামূল্যে উপহার



বিখ্যাত কাম্মীর শাল, প্রমাণ সাইজ,
মন্ডেরম ডিজাইন ও রং। ১খানি ৮ টাকা,
২খানি ১৫ টাকা, ৩খানি ২১ টাকা,
ডিম্বাক কোয়ালিটি ১২ টাকা, ২খানি ২২
টাকা, ৩খানি ৩১ টাকা, ৪খানি ৪০
টাকা।

দ্রষ্টব্য: ২খানি শালের অর্ডার দিলে
বিনামূল্যে সিল্কের স্কার্ফ/লেডী পার্স
পাঠানো হয়। স্টক সীমাবদ্ধ।

MAHALAXMI (SHAWLS-22)
G. B. Road, Delhi-6.



এদিকে শনি নিয়ে গবেষণা এখন অনেককেই ভাবিয়ে তুলছে তখন ফেইবেলম্যান নতুন খবরটি দিলেন। বললেন, এই গ্রহের বলয়ের সংখ্যা তিন নয়, চার।

চতুর্থ বলয়টির অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা অনেকদিন ধরেই চলাছিল। তবে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এ নিয়ে বিশেষভাবে কেউ ভাবেন নি। আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বার্নার্ড একবার বললেন, চতুর্থ বলয় থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু গবেষণায় নেমে এ সম্বন্ধে মতুন কোন আলোকপাত করতে পারেন নি তিনি। বরং একে ঘিরে গড়ে ওঠা সন্দেহ এবং সংশয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শেষ অবধি এই সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটল ফেইবেলম্যান-এর প্রচেষ্টায়। গত বছরের শেষদিকে শনিগ্রহের বলয়কে পাশ্চাত্যে বরাবর পরীক্ষা করলেন তিনি। এই ধরনের পরীক্ষার সুযোগ প্রায় প্রতি ৯৫ বছর (৯৪.৭৮) অন্তর একবার করে আসে। তখন গবেষণা চালানো যায় বলয়ের পাশ্চাত্যে বরাবর এবং পশ্চিমবর্তনেরও হয় সুবিধে।

এইরকম সুবিধাজনক পরিবেশ গত বছরের শেষদিকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ফেইবেলম্যান তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন। তবে চতুর্থ বলয়ের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করতে অনেকটা সময় লেগেছিল তার। কারণ, ঘোষণার আগে আবিষ্কার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন তিনি। এ ছাড়া 'ফটোগ্রাফ-প্লেট'-এ চতুর্থ বলয়টিকে ধুঁজে পেতেও কয়েক মাস সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। বিলম্বের কারণ, এই D-বলয়টি অন্যদের তুলনায় শনিগ্রহ থেকে দূরে আছে এবং বেশ ছাপসা হয়ে আছে সে। তাই 'ফটোগ্রাফ-প্লেট'-এ তার স্পষ্ট ছবি ওঠে নি। ফেইবেলম্যানকে ছবি তুলতে গিয়ে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এবং আমরাও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হতে বছর ঘুরে এসেছি।

এদিকে গত শীতে ফেইবেলম্যান এখন শনির চতুর্থ বলয়ের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণায় নিমগ্ন, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তখন এই গ্রহের দশম উপগ্রহটি আবিষ্কার করলেন। উপগ্রহ বলতে চাঁদ; অর্থাৎ বলতে পারি, শনির দশম চাঁদটি আবিষ্কার করলেন ওরা। এই চাঁদের নাম দেওয়া হল 'জেনাস'।

এর আগে অবধি শনির ৯টি উপগ্রহের লগ্নে পরিচিত ছিলুম আমরা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল 'টিটান'। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিগিন্স আবিষ্কার করেছিলেন এটি। এই হল সৌরজগতের একমাত্র

উপগ্রহ যার মধ্যে বায়ুমণ্ডল আছে। শনির উপগ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র 'টিটান'-ই আরওসে আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়। এর ব্যাস ২৬০০ মাইল।

শনির অন্যান্য উপগ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আরওসের দিক দিয়ে খুবই ছোট ওরা।

কিন্তু শনির বলয়? যতবারই বাজ না কেন, বায়ুমণ্ডল ওদের মধ্যে নেই, তবু চিরকালই ওরা রহস্যের আঁকর হয়ে থাকবে। আজকের আমাদেরই মতো আগামীদিনের মানুষরাও সাক্ষাৎ তাকাবে ওদের দিকে। হয়তো বা আমাদেরই মতো সন্দেহ-সংশয়ে দিশাহারা হবে ওরাও।

সাদনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাদনা ঔষধালয় রোড, সাদনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অধ্যাপকগণ, এফ.সি.এস. (লণ্ডন), এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের ব্রহ্মচর্যসম্মত ভূতপূর্ব অধ্যাপক। কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি.) অধ্যাপক

বিশ্বসাহিত্যের * তৃতীয় ভাগে প্রাচীন জাপান

১৯০৮

জাপানী সাহিত্য

উন্নয়মান সূর্যের দেশ নিম্পন বা জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রেরণা কিন্তু চৈনিক। খৃস্টের জন্মের বহু পূর্বে থেকেই কোরিয়ান পথ দিয়ে চৈনিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ জাপানে ঘটেছিল। এমন কি জাপানী বর্ণমালাও চৈনিক সভ্যতার অবদান। কনকুসি প্রবর্তিত ধর্মমত জাপানী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। জাপানে বৌদ্ধধর্মেরও প্রবেশ ঘটেছিল চীনের মারফৎ। জাপানী বৌদ্ধধর্মকে বলা হয় জেন বৌদ্ধধর্ম। জেন শব্দটি চৈনিক চান থেকে এসেছে, আর চান এসেছে সংস্কৃত জ্ঞান থেকে। এ ছাড়া জাপানের একটি নিজস্ব ধর্মমতও আছে, যার নাম শিণ্টো। শিণ্টো দেবদেবী সংক্রান্ত কাহিনীগুলির সঙ্গে প্রাচীন চৈনিক দেবকীর্তি কাহিনীগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এই কারণেই বলা হয় আদি জাপানী সাহিত্য আসলে চীনা সাহিত্যই। জামিলের সঙ্গে আদি মালয়ালমের যতটুকু প্রভেদ, এখানেও প্রভেদ তার চেয়ে বেশি নয়।

জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসকে মোট পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়—উদ্ভবের যুগ (৫০০—৭৯৪ খৃস্টাব্দ), গৌরবময় যুগ (৭৯৪—১১৯২ খৃস্টাব্দ), অবক্ষয়ের যুগ (১১৯২—১৬০০ খৃস্টাব্দ), নবজাগরণের যুগ (১৬০০—১৮৬৭ খৃস্টাব্দ) ও আধুনিক যুগ (১৮৬৭—বর্তমান কাল পর্যন্ত)। আমাদের আলোচনার এলাকার মধ্যে অবশ্য প্রথম তিনটি যুগ পড়ে, এবং সেই হিসাবে আমরা উপরি-উক্ত বর্ণবিভাগ ধরেই জাপানী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা করব।

উদ্ভবের যুগ (৫০০—৭৯৪ খৃস্টাব্দ)

অপরূপ সকল দেশের সাহিত্যের মতই লোকসাহিত্যই জাপানী সাহিত্যের

প্রাথমিক পুষায়। ফসল বোনা ও ফসল কাটার গান ও বিভিন্ন লোকসঙ্গীত এই পুষায়টিকে চিহ্নিত করেছে, যদিও লিখিত আকারে এগুলিকে খৃস্টীয় অষ্টম শতকের আগে আমরা পাই নি। প্রাচীনতম জাপানী সাহিত্য বলতে তিনটি গ্রন্থকে বোঝায়—কোজিক (৭১২ খৃস্টাব্দ), নিহোশ্যু (৭২০ খৃস্টাব্দ) এবং কুমোজিক। এগুলি আসলে পূর্ববর্তী যুগের কথা ও কাহিনী, ইতিবৃত্ত ইত্যাদির সংকলন। প্রাচীন জাপানী সংস্কৃতিকে জানবার জন্য এই তিনটি গ্রন্থ একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা প্রথমেই নাটক নিয়ে আলোচনা করব, এবং উপরি-উক্ত তিনটি গ্রন্থই আদি জাপানী নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে। জাপানী নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে কোজিক গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। কথিত আছে জাপানের সূর্যদেবী (দেব নয়) আমাতেরসু-ও-মিকামি-নো-মিকোটো তার ভাই বায়ুর দেবতা সুসা-নো-ওর উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে একটি পর্বতগৃহের আগ্রয় নেন। ফলে বিক্ষোভের অশ্রুকার হয়ে যায়, এবং অপরূপ দেবতার বহু সাধা-সাধনা করেও সূর্যদেবীর মানভঞ্জন করতে সমর্থ হন না। তখন অমৎসু-উজুমেনো-মিকিকো নামক একজন যুবক দেবতা একটি নাটকে দল গঠন করেন, ও সূর্যদেবী যে গৃহের লুকিয়েছিলেন তার সামনে নাটকের অভিনয় শুরু করে দেন। দেবী তখন কোতুলী হয়ে গৃহের বাইরে আসেন, ফলে আবার সূর্যের আলো পৃথিবীতে দেখা যায়। যে নাটকটি সেখানে অভিনীত হয়েছিল তার নাম আমেনো-ইওয়ানো-নো-কাগারে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে কোন কিছুর উদ্ভব সম্বন্ধে এই জাতীয় পৌরাণিক কাহিনী তৈরি করার রীতি বহু স্থানেই ছিল। নিহোশ্যু গ্রন্থে তামাই নামক এক জাতীয় নাটকের উল্লেখ আছে, কোজিকের বিষয়বস্তু শস্য-সংক্রান্ত দেবদেবীদের কাহিনী, এবং কোজিক অভিনব হোত ফসল কাটার সময়। কুমোজিক নামক পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাঁচ

শতের উপর লোকসঙ্গীত আছে যেগুলির সঙ্গে গ্রাম্য নাটকগুলির নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

৭০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত কোন জাপানী গদ্যসাহিত্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম গদ্য গ্রন্থের নাম মরিতো। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে শিণ্টোধর্ম অনুমোদিত প্রার্থনাসমূহ। মূল গ্রন্থটি অবশ্য এখন পাওয়া যায় না, তবে ওই গ্রন্থের অনেকটা অংশই পরবর্তীকালে ৯১৭ খৃস্টাব্দে রচিত ইগিগাসিক নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাচীন জাপানী গদ্যসাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে সেমো, যার বিষয়বস্তু অষ্টম শতকের জাপানী সম্রাটদের অনুশাসনাবলী।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই জাপানে কবির অভাব নেই, যদিও লিখিত আকারে প্রাপ্ত প্রাচীন জাপানী কবিতার সংখ্যা খুবই কম। প্রাচীনতম জাপানী কাব্যগ্রন্থের নাম মানোঙ্গু। এটি আসলে ৪৫০ জন কবির ৪৫০০ কবিতার সংকলন। এই সংকলনটি রচিত হয়েছিল ৭৫৯ খৃস্টাব্দে। এই সংকলনে যদিও কবিতা স্থান পেয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে। প্রথমেই শীর নাম উল্লেখ পাণ্ডিত্যের করে থাকেন তিনি হচ্ছেন মহাকবি কাকিনোমোটো-নো-হিতোমারো (৬৫৫—৭১০)। অপরাপর কবিদের মধ্যে ইয়ানবে-নো-আকাহিতো (মৃত্যু ৭৩০), ওতোমো-নো-তাভিত (৬৫৫—৭৩১) এবং তামানোই-নো-ওকুরা (৬৫৯—৭৩০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিরিকধর্মী কবিতা লিখেই এরা যশস্বী হয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই ওয়াকা নামক ছন্দ ব্যবহার করতেন, এবং পরবর্তী সহস্র বছরে এই একই ছন্দ জাপানী কবিতার ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মানোঙ্গু-র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪০-এ।

আগেই বলেছি জাপানী সংস্কৃতির মূলে চৈনিক অবদান যথেষ্ট। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতবর্ষে যেমন অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মাতৃভাষাকে অবহেলা এবং

বন্ধ্যাত'গণকে সাহায্য করুন

"অভূতপূৰ্ণ ধরার ফলে আমরা যে বিপুল সঙ্কটের সম্মুখীন হই, গত দুই বছরে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় অমানুষিক উদ্যমে পরিশ্রম করে আমরা এই সময়টির সমাধান করতে সমর্থ হই। এখন আবার আমাদের দেশের বহু জায়গায় ভীষণ বন্যা হওয়ার বহু লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এঁদের অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন। যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা নিদারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের যাতে অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায়, সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে নুজহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

—ইন্দিরা গান্ধী

প্রধানমন্ত্রীর
জাতীয় সাহায্য তহবিলে
নুজহস্তে
দান করুন।

নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠান
দি সেক্রেটারি
প্রাইম মিনিস্টার্স ন্যাশনাল রিলিফ ফাউন্ডেশন
প্রাইম মিনিস্টার্স সেক্রেটারিয়েট
নতুন দিল্লী।

ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজীমানার প্রতি অত্যন্ত আসক্তির প্রবণতা দেখা গেছে, প্রাচীন জাপানী অভিজাতদের মধ্যে সেইরকম চীনা সংস্কৃতির প্রতি দর্বার মোহ, এবং নিজের ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলার মনোভাব ছিল। এরই প্রকাশ দেখা যায় ৭৫০ খৃস্টাব্দে রচিত কাইফুসু নামক একটি কবিতা সংকলনে। এটি জাপানী কবিদের দ্বারা রচিত চীনা কবিতার সংকলন। অবশ্য এই মনোবৃত্তি জাপানী-দের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

গৌরবময় যুগ (৭৯৪—১১৯২ খৃস্টাব্দ)

অষ্টম শতকের শেষের দিক থেকেই জাপানী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির যুগের সূত্রপাত হয়। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে জাপানের সম্রাটরা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সেই সময়কার জাপানের রাজধানী কিয়োটো শহরকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তদুপরি কোনো নামক একটি-নতুন শব্দগঠনরীতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জাপানী ভাষা ভাব-প্রকাশের সাধক বাহন হতে সক্ষম হয়।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালত্বিকই জাপানী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। অভিজাত্যগবী মৃদুটিময় কয়েকজন লেখক অবশ্য চীনাভাষাতেই সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু

সে প্রচেষ্টা অনেকটা মিল্টনের ল্যাটিন কবিতার মতই অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এই যুগের কবিতার পূর্ববর্তী যুগের ওয়াকা ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে এই ছন্দটি দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। একটি ধারার নাম তসকা, অপরটির নাম চোকা। প্রথমটিতে দীর্ঘ কবিতা রচিত হত এবং দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রতর কবিতা রচনার জন্য ব্যবহৃত হত। তবে শেষ পর্যন্ত তসকা ছন্দই জয়ী হয়েছিল। এই যুগে রচিত কবিতাবলী কোকিনসু নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল ৯০৫ খৃস্টাব্দে। যারা সংকলনের কাজে লিপ্ত ছিলেন তারা হচ্ছেন কি-নো-ৎসুরাই (মৃত্যু ৯৪৬ খৃঃ), চি-নো-মিসুনো (৮৫৯-৯২৬ খৃঃ), মিলু-লো-তদামিনে (৮৬৭-৯৬৫ খৃঃ) এবং কি-নো-তোমো-নোরি। স্বয়ং সম্রাটের আদেশে এই কবিতাবলীর সংকলন হয়েছিল। কোকিনসু-র ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে ১৯২২ সালে।

জাপানী গদ্যসাহিত্যও এ-যুগে পিছিয়ে ছিল না। এ-যুগে রচিত গদ্যসাহিত্য বেশির ভাগই কাহিনীমূলক। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাকেতারি মনোগাতারি নামক বিখ্যাত গ্রন্থটির। বাংলা ভাষায় করলে এর নাম দাঁড়ায় বাণ-কাঠুরের গল্প। রচনাকাল আনুমানিক ৮০০ খৃস্টাব্দ। ৯৫০ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছিল আইসে মনোগাতারি বা আইসের গল্প। এই দুটি গ্রন্থই কিছুটা রূপকথাময় হলেও এগুলি রচনার পিছনে লেখকদের নৈতিক আদর্শ কাজ করে। প্রমথব্রতান্তও প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে অপরিচিত নয়। আমাদের আলোচ্য যুগে, আনুমানিক ৯০৫ খৃস্টাব্দে রচিত এই রকম একটি প্রমথকাহিনীর নাম তোরা-নিকি, লেখকের নাম কি-নো-ৎসুরাই-নিকি।

জাপানী গদ্যসাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল জান্নাল বা ডায়েরী রচনা। দশম ও একাদশ শতকে রচিত এই রকম বেশ কয়েকটি ডায়েরীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। সাধারণত অভিজাত প্রেণীর মহিলারাই এই রকম ডায়েরী রাখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাপানী সাহিত্যে মহিলা-লেখকদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি, এ নজীর বোধ হয় অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। একজন অভিজাত মহিলার রচিত প্রকৃতই বিশেষ সাহিত্যগুণসম্পন্ন এই রকম একটি ডায়েরীর নাম কাগেরো-নিকি, রচনাকাল ৯৭৪-৭৭ খৃস্টাব্দ। অপরূপ ডায়েরী লেখিকাদের মধ্যে ইজুমি সিকিন্দু এবং মারাসাকি সিকিন্দুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এই ডায়েরী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়-

কর ও মনোগ্রাহী নিদর্শন হচ্ছে সেই সোনাগন রচিত ইকাউরা-না-সিশি; রচনাকাল ১০১৫ খৃস্টাব্দ।

আলোচ্য যুগে একটি বিস্ময়কর উপন্যাসও রচিত হয়েছিল, নাম গৌজি মনোগাতারি, লেখিকা মারাসাকি সিকিন্দু, রচনাকাল ১০১০ খৃস্টাব্দ। উপন্যাসটি সে আমলে এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, কথিত আছে, এই গ্রন্থ রচনার পর বহুকাল কেউ উপন্যাস লিখতে সাহস করেন নি। বিশালকার এই উপন্যাসটির ইংরাজী অনুবাদ হয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, অনুবাদ করেছিলেন আর্থার ওয়াল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাপানী সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির যুগে কোন নাম করবার মত নাটক রচিত হয় নি।

অবসরময় যুগ (১১৯২-১৬০০ খৃস্টাব্দ)

দ্বাদশ শতকের শেষের দিক থেকেই জাপানী সাহিত্যের অগ্রগতিতে আবার ভাটা পড়তে শুরুর করে। সাহিত্যের জগতে এই মন্দাভাব সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলছিল। ১২০৫ খৃস্টাব্দে আরও একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, নাম শিকোকিনসু। বিভিন্ন কবিদের রচিত এই সংকলনটির সম্পাদনা করেছিলেন তুজিওয়ারা-নো-তেইকা (১১৬২-১২৪৯ খৃঃ)। তিন লাইনের যে জাপানী কবিতাগুলি পরবর্তীকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলির নাম রেগ্যা। এই বিশেষ রীতিটি প্রচলিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতক থেকে।

দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থও জাপানী ভাষায় রচিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হেইকি মনোগাতারি বা হেইকির কাহিনী। এটি উপন্যাসধর্মী। হেইয়ান যুগের শেষের দিককার যুদ্ধসময়কে অবলম্বন করে এই গ্রন্থের কাহিনী রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খৃস্টাব্দ। প্রথম ইংরাজী অনুবাদের তারিখ ১৯১৮। উপন্যাসধর্মী আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে হোজোকি; রচনাকাল ১২১২ খৃস্টাব্দ; লেখকের নাম কামো-নো-চোমেই (১১৫০-১২১৬)। এই গ্রন্থে একজন সাধুর জীবনকথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে বোধ প্রভাবের পরিচয় মথেন্ট। এই দুটি গদ্যগ্রন্থ ছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচয় আমরা চতুর্দশ শতকের জাপান থেকে পাই। গ্রন্থটির নাম ৎসু-রেজু-রেগুসা বা আলস্যের প্রবন্ধাবলী। এই প্রবন্ধাবলীর লেখক হোশিদা কেনকো (১২৮০-১৩৫০ খৃঃ)।

পূর্ণাঙ্গ নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠতে রীতিমত বিলম্ব হয়েছিল। জাপানী নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী

কুমারেশ
নিভার ও পেটের
পীড়ায়
সালফা-ডারমিন
কাটা পোড়া
ব্রণ ও চর্মরোগে
রেসপেরোসিন
সর্দি ও কাশিতে
ও-আর.সি.এল. ২৩৫-৬

প্রচলিত থাকলেও প্রয়োজন শতক পর্যন্ত মঞ্চে নাচ-গান-আবর্তিতই চলত। প্রয়োজন শতকের পর থেকে জাপানে একটি বিশিষ্ট ধরনের নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় মূলত বৌদ্ধ প্রভাবে। এগুলিকে বলা হয় নো নাটক। এই জাতীয় নাটকের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এইগুলিকে সাধারণত দু'জনে জাগ করা হয় উচিৎ এবং শোভে। প্রথমেই ধারণাটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বিবরণসহ অনুবাদী নো নাটকগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) কাহিনী নো অথবা শিনজি নো, দেবতাদের কীর্তি-কলাপ অবলম্বনে এই নাটকগুলি রচিত হত; (২) সুগেন নো বা সদিচ্ছার নাটক, সং এবং অসন্তের সংগ্রামের কাহিনী এবং পরিশ্রমে সং-এর জয়লাভ দেখানোর বিবরণসহ; (৩) ইউরোই নো এবং সেইরোই নো, এগুলির চরিত্র হত সাধারণত ভূত-প্রেত অপদেবতারা; (৪) গেনজাই নো, বা সমসাময়িক নাটক। নাটকগুলির নামের তালিকা পেরী দিচ্ছেন দূরপ্রাচ্য সংক্রান্ত ফরাসী চর্চাকেন্দ্রের বরলোটির নবম খণ্ডে। নো নাটকের পাশাপাশি বৌদ্ধ প্রভাবিত আরও একধরনের নাটক প্রচলিত ছিল। এগুলি ছিল প্রহসনময়ী, নাম কিয়োজেন। একই ধরনের উত্তর নাটকেরই অভিনয় হত, তবে নো অভিনেতারা যুগোপ বনহার করতেন।

উপরিউক্ত দুই প্রকার নাটকই কিন্তু অভিজাত মহলে প্রদর্শিত হত। কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজের নিকট নাটকের আবেশন জাপানে যিনি পৌঁছে যেন তিনি হচ্ছেন একজন মহিলা যার নাম ইজুমো-নো-ওকুন। ১৫৬১ খৃস্টাব্দে নাগাসাকি ভিত্তিই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ নাটকবলী প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে শুরু করেন। তাঁর প্রদর্শিত নাটকবলীর সাধারণ নাম শিবাই, কিন্তু কালক্রমে তা কাবুকি নামে পরিচিত হয় ওকুনির ইচ্ছা অনুযায়ী। কাবুকি শব্দটির দ্বারা নাটক ও নাট্যশালা দুইই বোঝায়। অজ্ঞ ও তৌকিও শহরে কাবুকি-মো নামক একটি রাজপথ এবং কাবুকি-মো নামক একটি প্রেক্ষাগৃহ আছে।

কিন্তু ওকুনির পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অভিজাত প্রেমী প্রতি পক্ষেই তাঁর বিরোধিতা করেছে, এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরে ১৬২৯ খৃস্টাব্দে আইন করে মহিলা-দের অভিনয়ে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। ওকুনি তাঁর কাজে সহায়তা পেয়েছিলেন তাঁর বরকনিষ্ঠ প্রণয়ী নাগোয়ার কাহ

থেকে, এবং ১৬০৪ সালে নাগোয়ার মৃত্যুর পর ওকুনি অভিনয়-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উন্নয়নের যাবদ্বয়ে অভিনয় প্রদর্শনের ওকুনির একটি ছবি আছে যাতে দেখা যায় দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয়ও রয়েছে। মনে রাখতে হবে জাপানে ওকুনির আত্মপ্রকাশের যুগে ইংল্যান্ডের নাট্যজগতে সেরাধারারের স্রাব চলছে, কিন্তু কোন ইংরেজ তখন জাপানে যায় নি, যে সমস্ত ইউরোপীয়ের সঙ্গে সে-যুগে জাপান পরিচিত হয়েছিল তারা ছিল স্পেনীয়, এবং স্পেনীয় নাট্য-সাহিত্য বোড়িশ ও সন্তান শতকে বিশেষ সমাদ্দ ছিল। কাজেই অনুকরণপ্রিয় জাপানি, ইউরোপীয় নাটককার কিং কিং গ্রহণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কল্লুত ওকুনি ও নাগোয়া বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক গ্রহণ করেছিলেন বলে পরিভ্রমণ মনে করেন।

ঠিক কোন কোন নাটক ওকুনি প্রদর্শন করতেন সে-কথা বলা যায়। সম্ভবত প্রাচীন জাপানী বীরগাথা ও প্রেমোপাখ্যানসমূহ তাঁদের প্রদর্শনের বিবরণসহ ছিল। এইগুলি কোনদিনই লিখিত আকারে ছিল না, চারণকাবিরের মুখে যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছে। এই জাতীয় একটি বিখ্যাত প্রেমোপাখ্যানের নাম জোরুরি, যা একটি চরিত্র অর্থাৎ ঘোঁষাধরুনে নামক একজন অভিজাত মহিলাকে ঘিরে কয়েকটি কাহিনীর সমষ্টি। ওজা নবনাগা নামক জনৈক বিন্দু ব্যক্তি, যিনি ওকুনির একজন পুত্রপোষক ছিলেন, সবপ্রথম এই জোরুরি উপাখ্যানগুলির লিখিত আকারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেন, এবং তাঁর প্রণয়ী ওনো-নো-ও-বন্দ ১৬০০ খৃস্টাব্দে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন। কাবুকি নাট্য-সাহিত্যের এই হচ্ছে প্রথম লিখিত সৃষ্টি। জোরুরি উপাখ্যানগুলি নিয়ে পরে অবশ্য আরও অনেক নাটক লিখিত হয়েছিল। সাধারণ রণাঙ্গনের উপযোগী কাবুকি নাটক এর পরে আরও রচিত হয়েছিল। ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে ইরোদো নাট্যশালার তক্ষ থেকে সোমা-কো-বান-কিরি নামক একটি কাবুকি লেখানো হয়েছিল বা ওই নাট্য-শালার নিরমিত প্রদর্শিত হত। এ ছাড়া ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে কাওয়ারা জোনোসুকে একটি বিখ্যাত কাবুকি রচনা করেছিলেন, নাম সোমা-নো-কিয়োজেন।

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহরিশঙ্কর কল্যাণাখ্যায় রচিত স্মারকনামের পূর্বপদ্যে বইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপদ্যের পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। [১২-০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীজামিনকুমার বসুপাখ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির মন্দির পরিচয়। ৪৭টি আর্ট প্রেট। [১৫-০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহরিশঙ্কর কল্যাণাখ্যায়ের উত্তর বিদ্যার প্রাকল ব্যাখ্যা। [৭-০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা

ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাশবাণী পুস্তকালয়ে প্রকাশিত। [১৫-০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যের শ্রীহরিশঙ্কর কল্যাণাখ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫-০০]

ডেটিনিউ

'অমলেন্দু দাসগুপ্ত' রচিত। শ্রীকৃষ্ণেন গুপ্তের ভূমিকা। [৫-০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ কের গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১০-০০]

মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ কের গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজি সহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫-০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগল সম্পাদিত। ১ম খণ্ড—সমগ্র উপন্যাস। [১২-০০]
২য় খণ্ড—সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৫-০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড [১২-০০]
২য় খণ্ড [১৫-০০]

প্রতি রচনাবলীতে
জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

০২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলি-৯

বঙ্গদেশে মিলন



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইউজিন ইউনেস্কো : ১৯০৯ সালে ইউনেস্কো তাঁর ডায়ারীতে লেখেন—তখনও তিনি লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন নি—“আমি লিখছি.....লিখছি..... লিখছি। সারা জীবন ধরে আমি লিখে চলেছি। অন্য কোনও কাজ করবার সময় আমার নেই একথা আমি বুঝেছি। ...আমার এই রচনা পড়ে দেখবার জন্য কারও কি কোনও রকম আগ্রহ হবে? আমার অন্তরের বেদনা, আমার তীব্র হতাশা—এ সব কি অন্যকে বোকানো হবে? এ নিয়ে মাথা ঘামাবার মতও কেউ নেই। আমাকে কেউই জানে না। আমার কোন বিশেষ পরিচয় নেই। আমি যদি লেখক হতাম, পাবলিক ফিগার বলে যদি আমার পরিচিতি থাকতো—তাহলে আমার রচনা সাধারণের আগ্রহের উদ্রেক করতো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যথেষ্ট মিল আছে—আমার ভেতর তারা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারতো।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ইউনেস্কো ছিলেন মার্সাইতে। পরে তিনি প্যারিসে চলে আসেন এবং একটি পার্লিশিং হাউসের প্রডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজে লাগেন। তাঁর মেয়ে মারী

ফ্রান্সের জন্ম হয় ১৯৪৪ সালে। ইউনেস্কো বিয়ে করেছিলেন ১৯০৬ সালে পূর্ব ইউরোপীয় রোডিকা বিউরিলিয়ানো নামে ছোটখাট দেখতে সুন্দরী একটি মেয়েকে—ওদেশী মেয়েদের মুখভাবে সময় সময় যেমন ওরিয়েন্টাল ভাব দেখা যায়, রোডিকারও তাই ছিল। এই কারণেই বোধহয় একটা মিথ্যা গুজব মাঝে মাঝে শোনা যায় যে ইউনেস্কোর স্ত্রী জাতে চাইনিজ। যুদ্ধ বন্ধ শেষ হল তখন ইউনেস্কোর বয়স তেরিশ। এখন পর্যন্ত কোন দিক থেকেই কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি যে অল্প দিনের ভেতরই ইউনেস্কো বিরাট নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন। সত্যি কথা বলতে কি তখন পর্যন্ত থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা তীব্র বিরূপ ভাব ছিল। এই সময়কার মনোভাব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—“আমি অলীক উপন্যাস পড়তাম, প্রবন্ধ পড়তাম, বেশ খুঁশি মন নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতাম। সময় সময় সঙ্গীতের আসর এবং আর্ট গ্যালারীতে গিয়েও চুকতাম। কিন্তু যতোটা সম্ভব থিয়েটারকে এড়িয়ে চলতাম।”

কিন্তু কেন তিনি থিয়েটারকে অপছন্দ করতেন? বালা বয়সে তিনি অভিনয়

দেখতে ভালবাসতেন, কিন্তু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। তিনি লিখেছেন—“Having acquired a critical sense, I became aware of strings, the crude strings of the theatre.” ছবিকাভিনেতাদের অভিনয় তাঁকে বিরত করতো, তাদের সম্বন্ধে তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন—“Going to the theatre to me meant going to see people, apparently serious people, making a spectacle of themselves”. অথচ ইউনেস্কো উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন। এমন কি বিশ্বাস করতেন যে অলীক উপন্যাসের থেকে আহরিত “সত্য,” “বাস্তব সত্যের” থেকে উচ্চস্তরে স্থান পাবার যোগ্য। সিনেমার অভিনয়ও তাঁর খারাপ লাগতো না। কিন্তু থিয়েটারে গিয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর আসল রক্তমাংসের মানুষ দেখে তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন। তাদের বাস্তব উপস্থিতিটাই যেন কল্পনার মারাজালকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। তাঁর মনে মনে হত তাঁর চোখের সামনে দূরকম বাস্তবতার স্তরকে এনে হাজির করা হয়েছে—একটি হচ্ছে সীমিত-বাস্তবতার স্তর অর্থাৎ স্টেজের উপর কতকগুলো লোক কথা বলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা রক্তমাংসের দেহধারী, নানা ধরণের দারিদ্র্যের স্ভারা পিণ্ড, জড়জাতীয়—দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে কল্পনা-উদ্ভূত বাস্তবতা। দুটি স্তরকে মূখোমুখি রাখা হয়েছে—তাদের ভেতর মিলন সংঘটিত হচ্ছে না—তারা সমস্ত রকমের সম্পর্ক বর্জিত—two antagonistic worlds incapable of being unified, of merging.

দ্বি কন্ড প্রাইমা ডোয়া (১৯৪৮)

থিয়েটার সম্বন্ধে বিরূপতা থাকলেও, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইউনেস্কো এবার একটি নাটক লিখে ফেললেন। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছিল—১৯৪৮ সালে তিনি ঠিক করলেন যে তাঁর ইংরাজী শেখা দরকার এবং এই উদ্দেশ্যে একটি ইংরাজী কোর্সে নিতে লাগলেন। এ বিষয়ে ইউনেস্কো লিখেছেনঃ “কাজ শুরু করে দিলাম। প্রাইমার থেকে পুরো সেনটেন্স-গুলো খাতায় কপি করে নিতাম মুখস্থ করবার জন্য। মন দিয়ে এগুলো পড়ে দেখলাম—ইংরেজী শিখতে পারি নি বটে, তবে কতকগুলো বিস্ময়কর সত্যকে আয়ত্ত করেছি—যথা, এক সপ্তাহে সাতটি দিন—এ ব্যাপারটা অবশ্য আগেই আমার জানা ছিল। ঘরের মেঝেটা থাকে নিচের দিকে আর সিলিংটা উপরে—এ সবও আমার আগের জানা ব্যাপার। পাঠকর্মের পাঠ-গুলো জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি

চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল—মিস্টার ও মিসেস স্মিথ:

“আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে মিসেস স্মিথ তাঁর স্বামীকে জানানেন যে তাঁদের বেশ কয়েকজন সন্তান আছে—তাঁরা শিশুদের কাছাকাছিই থাকেন। তাঁদের পারিবারিক নাম স্মিথ, মিস্টার স্মিথের পেশা কেরানিগারি, তাঁদের একটি ছুতাত আছে—নাম ম্যারী—তাঁদের মত সেও জাতে ইংরাজ...মিসেস স্মিথ চরিত্রটি এমন জোরের সঙ্গে কথা বলছেন যেন তাঁর সব উক্তিগুলো অকাটা এবং স্বতঃসিদ্ধ আর আমার ইংরাজী প্রাইমারের লেখকের মনোভাবটা যেন দার্শনিক ডেকার্টের মত। যাইটিতে সব থেকে নজর করে দেখবার জিনিস হচ্ছে—একটা সুস্থ শরীর প্রণালী অনুসারে এটি সত্যের অনুসন্ধান নিয়ে গঠিত। বইটির পাঁচ-এর বেশি দৈর্ঘ্যে দেখা যায় স্মিথদের বন্ধু মার্টিনরা এসে হাজির হলেছেন—চারজন এবার কথাবার্তা বলতে শুরু করেন—মূল স্বতঃসিদ্ধ সত্যের থেকে আরম্ভ করে অপেক্ষাকৃত জটিলতর সত্যগুলো নিয়ে এঁদের আলোচনা এগিয়ে চলে: ‘বড় শহরের থেকে গ্রাম অনেক শান্ত’.....”

সংলাপের ভেতর দিয়ে এক হাস্যকর পারিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এখানে। এঁরা চারজন একে অন্যকে যে সব কথা জানাচ্ছেন তা প্রত্যেক মানুষেরই আগে থেকেই জানা থাকে। তারপর ইউনেস্কো মন্তব্য করেছেন—এব পব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটল—আমি পাঠ্যপুস্তক থেকে যা কপি করছিলাম আমাব চোখের সামনেই সে সব যেন কেমন বিকৃত এবং হাস্যকর আকার নিয়ে বদলে যেতে লাগল।

এরই ফলে রচিত হল ইউনেস্কোর প্রথম নাটক ‘দি ব্লড প্রাইমা ডোমা’—a kind of play or anti-play; that is, a parody of a play, a comedy of comedy.

ইউনেস্কো নাটকটি তাঁর একদল বন্ধুকে পাড়ে শোনালেন। তিনি মনে করেছিলেন লেখাটি হয়েছে গাম্ভীর্যপূর্ণ ‘ভাব্যবিষয়ক ট্রাজেডি’—বন্ধুরা বললেন—বেশ মজা লাগল এই কৌতুকপূর্ণ নাটকটি শুনে।

এই দলের এক বান্ধবী, নাম মন্ট সেন্ট কোম—ইনি রুম্যানিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ করতেন এবং সে সময় এক দল আভান্ট-গার্ড অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন। এঁদের নাট্যপরিচালক ছিলেন নিকোলাস ব্যাটায়েল—ইউনেস্কোর কাছে নাটকের পাণ্ডুলিপিটি চাইলেন।

নিকোলাস ব্যাটায়েল—তাঁর তখন বয়স তেইশ বছর—পাণ্ডুলিপিটি গড়ে ভাল

লাগাতে ইউনেস্কোর সঙ্গে আলাপ করে নাটকটি মণ্ডস্থ করলেন।

এ নাটক এ্যাষ্টি-প্লে হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালের ১১ই মে Theatre des Noctambules-এ এর উদ্বোধন হয়। নাটকটি দর্শকদের দ্বারা গৃহীত হয় নি। এমনও কয়েকবার হয়েছে যে তিনজনের কম দর্শক থিয়েটারে আসাতে তাদের টিকেটের টাকা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অভিনেতারা রণগৃহ ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। ছ’ সপ্তাহের পর কতৃপক্ষ বই তুলে নিয়েছেন বাধ্য হয়ে।

কিন্তু প্রাণবন্ত রণগৃহের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর ইউনেস্কোর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য মোড় পরিবর্তন হল। যেসব জায়গায় তিনি মানুষের জীবনের করুণ দিকগুলো দেখিয়েছেন তার অভিনয়ের সময় দর্শকরা হেসে উঠত—আর তাই দেখে ইউনেস্কো অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর কল্পনাজাত চরিত্রেরা যখন প্রাণবন্ত হলে মণ্ডের ওপর বিচরণ করত ইউনেস্কোর অন্তর ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। তিনি লিখেছেন:

যে লেখক একবার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মণ্ডের ওপর এনে দাঁড় করিয়েছেন—যে চরিত্রগুলো তাঁরই দ্বারা আবিষ্কৃত এবং পরে যারা আসল মানুষের মত পৃথক সত্তাবিশিষ্ট এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—তাঁর পক্ষে নাটক লেখার আকাঙ্ক্ষাকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। চরিত্রেরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে—আমাদের চোখের সামনে তারা জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠবে—এব ভেতর যে সৃষ্টি করার আনন্দ তাকে কি চেপে রাখা যায়। আমার কল্পনাজাত অলীক ছায়ামূর্তি-গুলো দেখারই হয়ে উঠছে, জীবনের স্পর্শ পেয়ে তারা সত্যিকার প্রাণবন্ত মানুষ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে—এ অনুভূতি এক অতি আশ্চর্য অনুভূতি—নাট্যকারের পক্ষে এ যেন এক অতুলনীয় অভিব্যক্তির মত। এর প্রভাব যে কত গভীর তা’ প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম আমার প্রথম নাটকের রিহাসাল দেখতে গিয়ে—হঠাৎ দেখলাম আমার মন থেকে উদ্ভূত চরিত্রগুলো স্টেজের ওপর হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে—ভয়ে ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলাম। এ কাজ করবার অধিকার কার কাছ থেকে পেলাম? এ অধিকার কি ন্যায়সঙ্গত?...আমি কি শয়তানের উত্তর-সাধক হতে চলছি?

[এখানে লেখক একটি খুব বড় সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টি করবার অধিকার দেবতার—আর মানুষ যখন divinely inspired হয়, তখনই সে সৃষ্টি করবার অধিকারী—তা’ না হয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে এক ধরনের

অন্যধিকার হস্তক্ষেপ করা হয়, যা শয়তানীরই সামিল।]

অকস্মাৎ ইউনেস্কো উপলব্ধি করলেন রণগৃহের জন্য লেখাটাই যেন তাঁর ভবিষ্যতের মত। তিনি আগে অভিনেতাদের নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অভিনয় করবার প্রচেষ্টা দেখে অস্বস্তি অনুভব করতেন (তাঁরও আগে বেরটল্ট ব্রেকটেরও ঠিক এই অনুভূতিই হত)—ব্রেকটিয়ান রীতির অভিনয়ও তাঁর কাছে একই বকম বিরক্তিকর লাগত—কারণ এই রীতিতে অভিনয় করবার সময় অভিনেতাকে দাবা খেলার বড়ের মত হয়ে যেতে হয়। এইবার তিনি উপলব্ধি করলেন অভিনয় দেখে কেন তিনি এত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

.....থিয়েটার দেখে আগে বিরক্ত হতাম এই কারণে যে প্রত্যেক ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্বময়ের দিকটাকে বড় করে দেখানো হত রণগৃহে—এখন শূন্যতে শিখলাম এ বড় করে দেখানোটা স্বাধাভাবে বড় করা হয় নি—তাকে আরও অনেক বেশি বড় করে দেখালেই দেখতে ভাল লাগত। যাকে মনে হোত অপরিণত তাকে আরও বেশি করে অপরিণত করতে পারলেই সত্যিকার মণ্ডোপযোগী হত। যা দেখে মনে হোত অতিরিক্ত সূক্ষ্ম কিছু করা হয় নি—আসলে তা’ অত্যধিক সূক্ষ্ম হয়ে পড়তেই মণ্ডের পক্ষে অনুপযোগী হোত। থিয়েটারের সার কথা হল আরোপিত প্রভাব-গুলোকে বড় করে দেখানো—সেই কারণে এইসব প্রভাবকে আরও বড়, আরও অনেক বড় কবতে না পারলে কার্যকরী হয় না। যে দাঁড়িগুলোর দ্বারা পদতুলগুলোকে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে, সেগুলোকে অদৃশ্য অবস্থায় না রেখে সবার দৃষ্টির সামনে এনে দেওয়া—এজন্য প্রায় অসম্ভব বা অস্বাভাবিক মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হতে হয় নাট্যকারকে, ক্যারিকচারের স্তরে এবং তার ফলেই তিনি ফ্যাকাসে বিদ্রোহীক ড্রিং-রুম কমেডির পরিবেশকে নিচে রেখে উচ্চমার্গে উঠবার শক্তি অর্জন করবেন..... ট্রাজেডির উলস অধিকার

কিশোরবন্দীতে ট্রান্স জস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের

জগৎ বিখ্যাত ৩ ব্যান্ড

অল ওয়াল্ড পোর্টেবল

ট্রানজিস্টার “উইন্ড-

সোর-হিটাচী” মাসিক

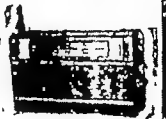
২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন!

আবেদন করুন।

Swiss Television Co.

(BW-55) P.O. Box 1820,

Delhi-6.



করতে হলে বিরাট বেদনার খাবার দিতে হবে—

To create a theatre of violence—violently comic, violently dramatic.

ইউনেস্কোর মতে এই মতের পোঁছতে হলে থিয়েটারকে নিদারুণ আঘাত হানবার রত নিতে হবে। বাস্তবতা, দর্শকের সচেতনতা, তার চিন্তার উপাদান—যথা ভাষা—এ-সবকে বর্জন করতে হবে, সরিয়ে রাখতে হবে, সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিতে হবে—তার ফলে দর্শক নতুনভাবে মুখোমুখি হয়ে বাস্তবকে দেখতে শিখবে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক মার্টিন এসলিন বলেছেন—ইউনেস্কো, যিনি ক্রমাগত রেখটের সমালোচনা করে চলেছেন, তিনিই আবার রেখটের থেকেও অধিকতরভাবে এলিয়েনেশন এক্শনের জন্য সারি জারিয়েছেন। রেখটিয়ান অভিনয়রীতি ইউনেস্কোর বিবিক্তকর মনে হয়েছে এই কারণে যে, এতে সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে—এবং তাব ফলে এর থেকে সত্যাকার বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না যা হতে পারে না, অর্থাৎ বাস্তবের অনুকরণ বাঁতি রেখটিয়ান রীতিতেও যথাযোগ্যভাবে বর্জিত হয় না।

[ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য রেখটিয়ান স্টাইল অব এ্যাক্টিংয়েই বিশ্বাসী—যতটা দরকার তিক ততটাই এলিয়েনেশন হয় এই পদ্ধতিতে। 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক্ সার্কেলের' অভিনয় আমি বারকরেক দেখেছি—অভিনয় করেছিলেন 'বালি'নার অ্যাসেম্বল পাটি', অর্থাৎ রেখটের নিজের দল। এঁদের অভিনয়ে স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বিচ্ছিন্নতার ভাবটা।]

ঐদ বন্ড প্রাইমা ডোমো নাটকটি এরপর বছর ইংলন্ড এবং আমেরিকায় অভিনীত হয়েছে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখন প্রায় সর্বজনবিদিত—যেমন বোয়ালখড়িটা, জীবনে বৈপরীত্যের প্রভাব বোঝানোর জন্য যে খড়ি সব সময়েই সঠিক সময়ের উল্টো সময়ের নির্দেশ দেয়, অথবা সেই খড়ি যেখানে বিবাহিত যুগল অশ্রুতভাবে নিজেদের চিনতে পারেন এবং ন্যায়সঙ্গত

বিশ্লেষণের ফলে এই বিশ্বয়কর উপসংহারে আসেন যে, যেহেতু একই রাস্তায়, একই বাড়িতে, একই তলায়, একই ঘরে থাকেন ও একই শয্যায় নিদ্রা যান, সেই হেতু তারা নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী। এই দৃশ্যটির মূলে আছে এই বাস্তব ঘটনাটি—ইউনেস্কো এবং তাঁর স্ত্রী একবার দুটি বিপরীত দরজা দিয়ে মেট্রোর একই কামরাতে ঢুকেছিলেন এবং মুকাদ্দিসের সাহায্যে দু'জনে দু'জনকে দেখতে পেরেছেন একথা বুঝিয়েছিলেন।

[ইউনেস্কোর নাটকের কোন মণ্ড-মুপায়ণ আমি দেখি নি—তবে তাঁর নাটকগুলো এবং অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত পড়ে মনে হয় এসব বিষয়ে তিনি অতি-বিস্তার পদ্ধতির পরিপোষক। এইখানেই রেখটিয়ান রীতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।]

এ নাটকটিকে একটি বিবাদ-হাস্যপূর্ণ জীবনের ছবি বলা যেতে পারে—এবং সময়টা হচ্ছে তখন, যে-যুগে আমরা নিজের প্রশ্ন না করে পারি না, পৃথিবীতে আমরা কি করছি—এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন আমাদের কোন গভীর জ্ঞান নেই—কি করে আমরা বাস্তব জগতের তাঁর পেশন সহ্য করছি..... এমন যখন হবে যে খাবাপ হবার কোন সুযোগ থাকবে না, প্রত্যেকেই ভাল হয়ে যাবে—সেই অবস্থায় ভাল হওয়া, নির্দোষ হওয়া, নির্লোভ থাকা, পক্ষপাতহীন হওয়া, এসবের আমাদের কি সুবিধা হবে? এ নাটকের লোকদের কোন ক্ষিদে নেই, কোন সচেতন কামনা-বাসনা নেই, এরা একঘেরেমুঠে ভরা। এদের অনুভূতি শুধুই অস্পষ্ট ধরনের, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটে একটা বিক্ষোভ—তারও অবশ্য কোন সাধকতা দেখা যায় না, কারণ চরিত্রগুলো সবাই স্বেচ্ছা—এবং সহজেই একে অন্যের জায়গায় আসতে পারে এবং তার ফলে কোন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না, —আর প্রত্যেক জিনিসটাই, যেখানে শব্দ হয়েছিল, সেইখানেই শেষ হয়।

সর্বব্যাপী কারেমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়কে আঘাত করেই এ নাটক রচিত। প্রচলিত ভাবধারা এবং দলগত জিগির দেওয়া, বিস্তারিত আনুগত্যের ভাব—এ সবের প্রতিও তিনি আক্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত অবলোপ, জনসাধারণের শ্রেণীগোত্রের স্বাভাবিক প্রভাবিত হওয়া, তাঁর করা চিন্তাধারার সাহায্যে জনশ্রেণীকে ক্রমাগত যতমানমুখে পরিণত করার প্রচেষ্টাকেও ইউনেস্কো ঐদ বন্ড প্রাইমা ডোমো-তে সমাজদেহের অস্বাস্থ্যকর চিহ্ন হিসাবে আঁতুড়ে করেছেন।

তিনি বলেছেন স্মিথ এবং মার্টিনরা আর ঠিকমত কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করতে পারে না—কারণ তাদের চিন্তা-

শক্তি লোপ পেয়েছে। তারা চিন্তা কবতে পারে না, কারণ তাদের আর অনুভূতির ক্ষমতা নেই, তাদের অন্তরে কোনরকমের আবেগ আসে না। তারা পৃথক সত্তা হিসাবে নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তারা অন্য যে-কেউ বা যা-কিছু হতে পারে। কারণ নিজের পৃথক সত্তা না থাকার ফলে তারা অন্যদের সত্তাকে গ্রহণ করে—সেই জন্যই অতি সহজে তারা একে অন্যের স্থানে আসতে পারে।

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যার আধিবিদ্যক (metaphysical) বিস্তার নষ্ট হয়ে গেছে—সেই জন্যই এই পৃথিবীকে আমাদের আর রহস্যময় বলে মনে হয় না। এই রহস্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে গেলে আমাদের শিখতে হবে অতি সাধারণ জিনিসকেও তার ভেতরকার সমস্ত ভরাবহতা সহ পরীক্ষা করে দেখতে।

To feel the absurdity of the common place, and of language—its falseness—is already to have gone beyond it. To go beyond it we must first of all bury ourselves in it. What is comical is the unusual in its pure state; nothing seems more surprising to me than that which is banal; the surreal is here, within grasp of our hands, in our every day conversation.

এই নাটকটি মণ্ডস্থ হবার পর ইউনেস্কো আবার যেন তাঁর বাল্যবয়সের থিয়েটার-প্রীতি ফিরে পেলেন। এমন কি তাঁর নাটকের পরিচালক নিকোলাস ব্যাটালেল এবং থিয়েটার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং পরিচালক আকাকিয়া ভারেলার আমন্ত্রণে ডব্লিউভিস্কির 'দি প্রজেন্স' থেকে গৃহীত অনুবাদ নাটকে স্টেপান ট্রীফমোভিচ্ চরিত্রে অভিনয় করতে রাজী হলেন। অভিনয় করতে গিয়ে ইউনেস্কো নিজের এবং অন্যান্য লোকদের ব্যক্তি সম্বন্ধে নানা ধরনের নতুন জ্ঞান অর্জন করলেন—নাট্যকার হিসাবে এই নবলব্ধ জ্ঞান পরে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। অভিনয়শিল্প সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনেক বাড়ল।

এরপর ইউনেস্কোর কয়েকটি বাছাই করা নাটক নিয়ে আলোচনা করবো।

[কম্বাঃ]

আধুনিক বল-কল্প নাট্য

হাল সমাজে একটি অত্যাবশ্যকীয় সখ। এক মাসে এই পুস্তকের সাহায্যে বিনা শিক্ষকতায় গৃহে বসিয়া আধুনিক সকল প্রকার বল-কল্প নাট্য শিখুন। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ২ টাকা।

GEMINI BOOKS (WBC-8)

P. Box 1607, Delhi-6.

আকাশবাণী

পরিচয়

..বাঙালির আশা...বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক

হ্যাটদের গ্রন্থাগার। তাদের একটি উৎসবে আমার ডাক পড়লো—সভাপতি হ'তে হবে। সভায় জাতীয় সংগীত গাইলো একটি কিশোরী। গাইতে লাগলো বিচিত্র ভঙ্গীতে। গান শেষে নামটা চুপি চুপি জানতে চাইলাম। মেরেটি বাঙালি। মনের সন্দেহ তখনো যেতে চায় না, আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বাঙলাদেশেই কলাবর আছে তো? হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ, বাবা-মা আমি সকলে কলকাতায় থাকি। এবারে বিস্ময় আরো বেড়ে গেল, জিজ্ঞেস করলাম, এ গান তুমি শিখলে কোথায়?

কেন, রেডিওতে—রবিবারের শিশু-মহলে।

অর্থাৎ মেরেটির গান শুনে আমার ধারণা জন্মেছিল, হয় সে হবে একজন অবাঙালি অথবা প্রবাসী বাঙালি। নইলে বাঙালীগানের এমন উচ্চারণ করবে কেন।

১০. ১০. ৬৭ রবিবার বেতালে শিশু-মহলের সংগীত শিক্ষা শুনছিলাম। সে তো শোনা নয়, বেদনার আছাদান—! বাঙলাদেশের রাজধানী বাঙালি সংস্কৃতির পদ্যাদৃশি কলকাতা, কলকাতা বেতারকেন্দ্রে সংগীত শিক্ষা দিচ্ছেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি সংগীত শিল্পী, সেখানেই বাঙালি শিশুপ্রোডাক্টের বাঙালি কবির গান—শিখতে বসেছেন অবাঙালি উচ্চারণে।

শিল্পী শেখাচ্ছেন ভারতের জাতীয় সংগীত : জনগণমন—অধিনায়ক জয় হে। হোক জাতীয় সংগীত, গানটি তো বাঙলা, উচ্চারণও নিশ্চয়ই বাঙলা। বারে বারে শিল্পী বোঝাতে চাইছেন, আমরা উচ্চারণ করি এইমতো অর্থাৎ বাঙলার মতো, উচ্চারণ হবে এমনতিরো.....অর্থাৎ হিন্দির মতো। 'সিসু' সম্পর্কে বসেছেন যে, বাঙালি 'শ' হবে না, উচ্চারণে হবে 'সিসু'। 'জনগণমন' ইত্যাদির 'জ' উচ্চারণে হিন্দির মতো হবে তাঁর মতে। তাহাড়া 'পজাব' শব্দটিকে ভুলে শেখানো হলো 'পাঞ্জাব' বলে। শিশুদের নিয়ে শিশুদের বস।

'জনগণমন' জাতীয় সংগীত হয়েছে বলে বাঙালি ছেলেমেয়েদের তা হিন্দি

উচ্চারণে কেন গাইতে হবে বোঝা গেল না। রবীন্দ্রসংগীত জাতীয় সংগীত বলে কোন হুজুতে গানের কথার বাঙলা উচ্চারণ উলটে পালটে হিন্দি করে নিতে হবে! শিক্ষক বেখানে অবাঙালি সেখানে বলার কিছু নেই। হিন্দিভাষীরা 'রবীন্দ্রনাথ' মেভাবে উচ্চারণ করেন, এবার থেকে কি আমরাও তেমন উচ্চারণ করবো? পৃথিবীর একজন বিশ্ববাবু কবির মাতৃভাষা অবমানিত হলো কবিরই কোন এক মাতৃভাষীর হাতে। জাতীয় সংগীতকে হিন্দিমার্কা হতে হবে এমন ভরৎকর ফতোয়া জারির অধিকার সংগীত শিক্ষককে কে দিয়েছে? মেঘদূতের বিনীত অনুরোধ সন্মোহন অজ্ঞান শিশুদের থেকে মুছে দেওয়া হোক।

অবিশ্বাস্য বিকৃত উচ্চারণে 'রবীন্দ্র-সংগীত' শেখানো অশোভন বলে মনে করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মানবরা জাতীয় সংগীত মেভাবে উচ্চারণ করেন কবন আমরা উচ্চারণ করবো বিশ্বদুশ বাঙলা ছাড়ে। উচ্চারণ বিকৃতি কোন সন্দেহমূলের রচন বাঙালির পক্ষে মেনে দেওয়া কঠিন। তাই বেদনাভারাক্রান্ত মনে করজোড়ে 'বিশিষ্ট' শিল্পীর কাছে মেঘদূতের নিবেদন, বাঙলা গান বাঙলা উচ্চারণে শেখানো হোক, ভয় নেই তাতে শিক্ষার মান একটুও কমবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাচ্ছে, আমাব শৈশবের সংগীতগুরু, বিশ্বভাবতীর সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অনাদিকুমার দস্তিদার মশায় যিনি একদিন এই রকম বলেছিলেন, নদীর ছোট্ট ঢেউগুলোর রিমঝিম সুর আমাদের কানে পৌঁছায় না, তবে নিষ্ঠার সঙ্গ কান পেতে শুনলে ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে যে সুর তুলছে তা কানে ধরা দেবেই। সংগীত জগতের চাবিকাঠি হলো শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা। দস্তিদার মশায়ের উজ্জ্বল পুনরু-স্নেহ কবে বলি, যেতারের সংগীত শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যাপারে একটু বেশি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা কামনা করি, তাহলে উজ্জ্বলিতে অনিচ্ছাকৃত ভুলও সংশোধিত হবার সম্ভাবনা থাকতো। বাঙালি সংগীত ভালোবাসে, সংগীত শিল্পীদের হাতে গানের ওপর স্টিমরোলার চললে তাদের মনে বড়ো বাজে। মেঘদূত জানে, শিল্পীরা কতো স্পর্শকাতর শিল্পীকে আঘাত হানো মেঘদূতের উদ্দেশ্য নয়। তবে

জাতীয় সংহীতর নামে হিন্দি টঙ-এ রবীন্দ্রসংগীত শেখানো বা গাওয়ানো আত্মমর্যাদাহানিকর বলে মনে করা যেতে পারে। শিল্পচেতনাবোধ প্রার্থনীয়।

ভেবেছিলাম রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে, অন্তত কিছুদিন কোন কথা বলবো না। সম্পাদিকা তো সেদিন বলেই বসলেন, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আপনার অনুভাব কিছু বেশি, অন্যান্য সংগীত হয়তো তেমন গুরুত্ব করেন না। পার্থক্যবোধ কেউ কেউ নাকি বলছেন, এ-গানের প্রতি মেঘদূতের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব।

কি করি বলুন তো! আমার ধারণা নিশ্চয় আপনাদেরও, রবীন্দ্রসংগীত বাঙালিমনের এনসাইক্লোপেডিয়া, তার কাম্বোজালি, সাধী। বাঙালির আদরের মন, আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক। আমরা যারা সাধা-মাত্রা আটপোরে মানুষ যারা মনের কথা গুছিয়ে বলতে শিখি নি তাদের কথাই তো কবির কথায় আর সুরের দ্যোতনার সুরের কলকলি হয়ে উঠেছে। কবির মতো করে বললে বলতে হয়, কবির গানে মতখানি আছেন তিনি মতখানি আছি আমরাও।

৩০. ১০. ৬৭, মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুন্দরমর্দিনী' অনুষ্ঠান প্রচারিত হলো। অনুষ্ঠানটির একটি বিশেষত্ব আছে। ইচ্ছে থাক বা না থাক ঘরে ঘরে ওই সময়টিতে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। যে খুলতে চাইবে না পাশের বাড়ি থেকে আওয়াজ আসবে তার কানে। রেডিও খুলে বিছানায় শুয়ে পড়া যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শোনা আর ঘুমানো, ঘুমানো আর শোনা। অনুষ্ঠানটি চলছে বোধ হয় গত ত্রিংশ বছর ধরে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিমধ্যে কত উত্থান-পতন কত পরিবর্তন ঘটে গেল, কিন্তু আকাশবাণী প্রচারিত 'মহিষাসুন্দরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের রচনায়, প্রযোজনায় সংগীত-পরিচালনায়, গ্রন্থনায় কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে। একই গোষ্ঠী কটা যুগ ধরে কেমন সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছেন। আরও কতোকাল চালাবেন তা শব্দ জানেন স্বয়ং তাঁরা আর জানেন সেই জ্যোতিষী যিনি তাঁদের কৃষ্টি-ঠিকুজির বিচার করে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষে একজন প্রোডা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, 'আচ্ছা, কায়মী স্বার্থ'

কাকে বলে?’ কাঁকিয়ে উঠলো অপর একজন, ‘এগুলো থেকে এখনো বন্ধন নে? যা সব হয়ে গেল তাই তো কালেক্টর স্বার্থের আভিধানিক অর্থ।’

মহিবান্দুর নিয়মমাফিক বছর বছর ঘুম না ভাঙতে আমাদের ওপর ভর করছেন। অথচ মজার কথা হচ্ছে, যন্ত্র-চালিতের মতো মহিবান্দুরের আদিখ্যাতাকে নিয়তির মতো আমরাও মেনে নিয়েছি।

পাঠের দাপটে ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়। চিৎকার, শব্দ, চিৎকার—। বাঙলাদেশে তিরিশ বছরের মধ্যে চণ্ডীপাঠ করতে বিত্তীয় কোন পাঠক পাওয়া গেল না—যিনি সুদলিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে প্রাশ্ণ্যর সঙ্গো মহলেয়ার প্রভাবে অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনার এবং পাঠের দায়িত্ব নিতে পারেন।

১০. ১০. ৬৭ কোন এক মহিলা শিল্পীর কণ্ঠে ‘চরণের খা তব যে পাখে দিলে লেখি’ এবং পৌরী রাগে ‘হৃদয়-নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে’ রবীন্দ্র-সংগীত দু’খানিতে সংবেদনশীল মনের ছাপ থেকেছে।

ওই একই দিনের সকালে শ্রীমতী পূর্বী দত্তের কণ্ঠে নবরত্নসংগীত বারিগচায় বুলবুলি তুই’ সুন্দর উত্থাছিল। তবে ১২. ১০. ৬৭ সকালে শ্রীমতী মীরা সঙ্গদলের অত্যন্ত চাপাগলার নবরত্ন-গীতি একেবারে খুললো ম্য।

৮. ১০. ৬৭ সন্ধ্যা এবং ১০. ১০. ৬৭ সকালে অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন শ্রীমতী বানানী ঘোষ ও শ্রীমতী গায়ত্রী মধুপাধ্যায়। গান তো বেশ ভালোই লাগলো। কথা হচ্ছে, অতুল-প্রসাদের গানে শব্দ স্বরলিপি আঙ্গকাল খুঁড়ো কম শোনা যায়, সুতরাং মধ্যে গায়ক-গায়িকারা নানা মিশ্রণ এনে ফেলেছেন।

১০. ১০. ৬৭ শ্রীমতী মেখলা পালের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত মন্দ লাগে নি। জয়গায় জয়গায় শিল্পীর স্বকীয়তা প্রশংসনীয়।

১৭-১০-৬৭ তারিখে রায়ে পুস্তক পর্যালোচনা করলেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচনার বিষয় ছিল শারদীয়া পত্রিকা সম্পর্কে। ধরে ধরে অনেকগুলি পত্রিকা এবং সেই সমস্ত পত্রিকার গল্প-উপন্যাস লেখক এবং প্রবন্ধকারদের নামোল্লেখ করলেন। তাঁর মূলে ভার-শব্দের বন্দোপাধ্যায়, প্রেমেশ্বর মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বনফুল প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকদের গল্পের এবং বিজ্ঞানচর্চা

সত্যোদ্ভাষ বঙ্গ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী এমনি ক’জন পণ্ডিতের নাম শোনা গেল। বেসব সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারদের তিনি নাম করেছেন তাঁরা সাধারণত ভালই লিখে থাকেন এবং আলোচ্য নামগুলি সকলের সুপরিচিত। শারদীয়া উপন্যাস সম্পর্কে নারায়ণবাবু বিশেষ কিছু উল্লেখ করতে রাজী নন, তাঁর মতে, এগুলি বর্ধিত কলেবরে ‘সংসার সাহিত্যের’ রূপ নিয়ে আগামীদিনে হাতে আসবে,—সমালোচনা ততদিন স্থগিত থাক।

সমালোচক ‘স্মারও অনেক অনেক চাম্চল্যকর’ জাতীয় কোন গল্পকে বেতারের মারফৎ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চান নি, ফলে তাঁর সুদৃষ্টি এবং সুস্বমনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আর সৌজন্যবোধের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য সমালোচক তাই সময়ে আপন নামটি অনুজ্ঞিত রাখলেন। আমি তাঁর আলোচ্য নামের ডালিকর তাঁর নামটি যোগ করে দিতে চাই।

স্বরের ভেতর-ভূত

১৮-১০-৬৭-র সকাল ৭-৪৫ মিঃ শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত গাইলেন,

‘আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে
হেরে মাধুরী।’

‘হেরে’-র জায়গায় তাঁর উচ্চারণে শোনা গেল ‘হ্যারে’। বেতারের শিল্পীদের কারুর কারুর উচ্চারণে মাঝে মাঝে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, বারবার তো আমি উল্লেখও করছি যাতে তাঁরা ভুলগুলি সংশোধন করে নেন। অথচ সন্তোষবাবুর মতো একজন প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী কি বলে উচ্চারণে এমন মারাত্মক ভুল করে বসলেন! শুনিয়ে সন্তোষবাবু নাকি একটি বিখ্যাত গ্রন্থোক্ত কোন কোম্পানীর বাঙলা গানের পরিচালন অধিকর্তা। সাপ্তাহিক বঙ্গ-সভার ‘আকাশবাণী-পরিগ্রহমা’-র ৫-১০-৬৭-তে কোন এক প্রখ্যাত বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রের বেতার-সমালোচক ‘হেরে’ নিয়ে যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। তিনি যদি একটু কষ্ট করে সাপ্তাহিক বঙ্গসভার অন্যান্য সংখ্যার আলোচনাগুলোর স্বরাদেবর রাখতেন তাহলে এতবড়ো ভুলটা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হতো না। এ অত্যন্ত লজ্জার এবং ধর্মাস্তিক দৃষ্টেয় বলে মনে করি।

আমাদের সর্বাঙ্গিকভাবেই গোড়ায় গলায় থেকে গেছে—স্বরের ভেতর ভূত। সমস্যা জটিল। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং সংগীত পরিচালককে আকাশবাণীতে ভুল উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে

শুনিয়ে একথা মনে করতে কষ্টবোধ হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বেতারের সংগীত বিভাগ, সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সংগীতশিল্পীদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা উচ্চারণ সম্পর্কে একটু বেশি সজাগ হোন। যেখানে উচ্চারণে ভুল থাকছে শব্দ, শব্দের গানের কৌলিন্য বজায় রাখতে পারে না। তা ছাড়া, আলোচ্য গানে ‘হেরে’ এবং ‘হ্যারে’-র তারতম্যে অর্থও ভেদ উল্লেখ-পাল্লেখ আছে।

* * *

নরাদিক্সী থেকে শ্রীসঞ্জয়কুমার দত্ত লিখেছেন : ৪টা আশ্বিন সংখ্যার ‘আকাশবাণী-পরিগ্রহমা’-র মেঘদূত কোন্ড প্রকাশ করে বলেছেন,

“.....অন্তত এক শ্রেণীর কিশোর-যুবকের রবীন্দ্রসংগীতের গলা টিপে জলো ছাড়া হিন্দী গানের প্রতি অহেতুক মোহ! যুবকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে না কি।

.....বিবিধভারতীও তেমনি দেশের ছেলেদের ওই বংশীবাদকটির মতো কোষায় যে নিয়ে যাচ্ছে, ভালো আঁতকে উঠতে হয়। জেন পাইপ, ক্লারিট, হিন্দী ছবি, বিবিধভারতী—মোক লাভের চোরগণী!”

লেই শ্রেণীর মধুপদ্য হিসাবে বা ভালোই একজন হয়ে যদি প্রতিবাদ করি তা শব্দতা বলে মনে হতে পারে। তবে আমি না বলে থাকতে পারছি না। রবীন্দ্র-সংগীতের রস গ্রহণ করতে না পেরে শব্দভার পরিচয় তো আমরা দিয়েছিই আরো কিছু দিলে বোধহয় আমাদের স্বভাব হিসাবে তা ধরে নিয়ে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আমাদের স্বভাব নাকি বদ। আমাদের স্বভাব বদ কেন, তা আমরা জানি না। কেউ যে বলে দেবে কিংবা আমরা যে তার কথা শুনবই তার কোনো মানে নেই।

জান হবার পর থেকে আমরা অনেক রকম গানই শুনতে আসছি—রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ বা স্নিজেন্দ্রজালের গান, বাংলা ছায়াছবিব গান, হিন্দী ছায়াছবিব হাঙ্কা জলো গান এবং আবার কত কি। গানটান যেমনই হোক ছোটবেলায় আমাদের ভালই লাগত। আমবা আপনমনে কখনো কখনো গাইবার চেষ্টাও করতাম। তারপর আরো বড় হয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গান মধুপদ্য করে গাইবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমোক্ত গানগুলি যখন প্রথম শৈশবের বশে অনভ্যাসের বেসুরো গলায় গাইতাম, বড়দের কাছ থেকে বেশ লাঞ্ছনা পেতে হত। ঐ সব গান ঐ গলায় গাইলে আমরা হাণ্ডির শোরাক হয়ে দাঁড়াতে বড়োদের কাছে।

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ন্যাথ-বেদনা তড়াতাড়ি দূর
করবার আধুনিক উপায়

নতুন

মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' বিসার্ফ ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'তে যেশানো হয়, তা ৩০ ও ৭৫ বৈদ্য করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন আর ১৫ কোটি দৃশ্য করা হয়েছে। এর ফলে বেদনা দূর করার শক্তি বিজ্ঞপেরও বেশী দ্রুত। শরীরে হজিরে পড়ে এবং দ্রুতের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

দ্রুতের মধ্যে কাক শুরু হয়ে যায়—অনেকজন ধরে কাক লেতে থাকে : নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'র ব্যথা দূর করার শক্তির উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই দীর্ঘদিন শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইকালেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার ফল অনেকজন জানে।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—ওকনো, কলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত একাত্তরের অধীনে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' থাকেন :
ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-জ্বর • হু
তেজু জ্বর • গলাব্যথা।

সতর্কতা : প্রাপ্যবয়স : দুইটি ট্যাবলেট : প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের
সহ : একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিতাবে কাক করে দেখুন



ট্যাবলেটের কণাগুলি থাকার খণ্ড খণ্ড
হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেয়।
হয়—আপনার আরাম খেতেও অন্য
কোনো।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'র প্রতিটি ট্যাবলেটে আর ১৫ কোটি দৃশ্য করা
হয়েছে। ততই শরীরের সঙ্গে মিশে-মিশে গিয়ে দ্রুত এক
দৃশ্য তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।



নতুন
মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'

তড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

বিসংলগ্ন-এ (৬) ১৯৫১

৩.৯৫/৬.৯৯

তারপর ওগুলো তখন লক্ষ্যের গাইতাম না। তাই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গান গায়ার বদ অভ্যাস ছেড়ে দিল। কেউ কেউ লড়কিয়ে গাইতে শুরু করল। সবাই তো আর ভাল গান ভাল করে শেখার সুযোগ পায় না। শেষ পর্যন্ত হল কি প্রথমোক্ত ভাল ভাল গানগুলিকে আমরা রসের চোখে না দেখে ভয়ের চোখে দেখতে লাগলাম। ওগুলোর চারপাশে যে একটা গম্ভীর গম্ভীর আবহাওয়া ছিল তাতে মনে হল ওগুলো আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হিন্দী গান তো আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রেডিও সিলোন বা বিবিধভারতীয় মাধ্যমে রাস্তায়-ঘাটে চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে শুনতে পেতাম। এ সব গানের বই বাজারে সস্তার কিনতে পাওয়া যায়। এগুলি সহজলভ্য। যারবার শুন শুন (repeated method of learning) এগুলো শিখে নিতে অসুবিধা হয় নি। হিন্দী ছায়াছবির গান তাই ভাল লাগে। এই গানগুলোই যেন আমাদের অনেক কাছে। স্বাক্ষর করে তাদের আমরা দু'র থেকেই লক্ষ্য করি। আর বাংলা ছায়াছবির গান? বাড়িতে রেডিও খুললে—“না, না ও সব ছায়াছবি গান শুনতে হবে না।” আর রেডিও-তে হয়ই-বা কতটুকু বাংলা ছায়াছবির গান! হলে বরং এগুলিও হিন্দী ছবির মত আমাদের কাছাকাছি এসে পরিচিত হয়ে যেতো। কখনো কখনো হয়ে থাকলে তার মধ্যে মাকে মাকে যে হিন্দী ছায়াছবির গান থাকে তা শুনতেই যেন ভাল লাগে। সেগুলো অনেক শুনছি বলে পরিচিত মনের জিনিস। রাস্তায়-ঘাটে বাংলা ছায়াছবির গান তো হয় না ভ্রমণ। রবীন্দ্রসংগীত, বিজয়লক্ষ্মী-অতুল-প্রসাদও সহজলভ্য নয়। আমাদের এবং রাস্তার লোকদের বা অন্যকথায় জন-সাধারণের মধ্যে যারা সংগীত-প্রেমিক—এক কথায় যারা সাধারণবুদ্ধি সংগীত-প্রেমিক—তাদের কাছে অতি-পরিচিত হিন্দীগানই আনন্দ দেয়। আমরা অনেকে হিন্দী ছবি দেখি কেবল গানের জন্যই। ছবি হিসাবে গণ্যগুণ বিচার করবার মতো আর্টের জ্ঞান জনসাধারণের নেই। আমা-জরও নেই। তাছাড়া সিনেমাহলগুলো আমাদের গুরুজনসম্প্রদায়েরই খুলেছেন। আমরা নয়। বাংলা ছায়াছবির সব কিছই আমাদের বাড়ির সবকিছুর মতো মিইয়ে গেছে বলে মনে হয়। আমরা চাই লক্ষ্যবস্তুর বা হিন্দী-ইংরাজী ছবিতে আছে। জানতা বলতে আপনারা কি বোঝান আমরা জানি না। তবে একটা জিনিস জানি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা জরাজীর্ণ করে মেয়েদের দেখলে। জলের হাট? সে তো বাবা-কাকার আল-

বোট কেটে বকুনি খেয়েছেন। আমরা হু-কাট করে বকুনি খাই। ড্রেন পাইপ? দাদু-ঠাকুরদার কোঁচানো গিলেকরা ধুতি পাঞ্জাবী পরে বকুনি খেয়েছেন। আমরা ড্রেনপাইপ পরে খাই।

মেঘদূত আরো অনুযোগ করেছেন বিবিধভারতীয় হিন্দী প্রচার-বাহুল্য দেখে। একথা ভুল যে বিবিধভারতী থেকে কেবল হিন্দী গানই প্রচার করা হয়। সব ভাষার গানই প্রচার করা হয়। প্রধানত থাকে হিন্দী ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত। কিন্তু হিন্দীর প্রচার-বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকার তো নিজেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে কর্তব্য করে যাচ্ছেন। সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকেই সর্বত্র হিন্দী চালু হওয়ার কথা। আমাদের ইস্কুলে হিন্দী শেখান হয়েছে সেই কারণেই। সেই কারণে হিন্দী গানের জন্য সরকার এতো তৎপর। বিচ্ছিন্নতার সহিত কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী প্রচার করে যাচ্ছেন। আর আপনারা সরকার বিরোধী ধুরো ভুলে বাধা দিচ্ছেন। এটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি! হিন্দীর স্টীম রোলারকে ভয় পান কেন? সেটা তো অবশ্যম্ভাবী। আজ নয় কাল সে তো আসবেই। পরে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য তৈরি হয়ে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়।

যদি আপনি সত্যিসত্যি বাংলা ভাষাকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন; যদি মনে করেন হিন্দীর একজুর আধিপত্যের ফলে আপ-নার আদরের বাংলা ভাষার অবমাননা হচ্ছে তবে হিন্দী-অলাদের কড়া ব্যব-হারের স্টীম রোলারের বিরোধিতা করুন কড়া জবাবের প্রতিরোধ খাড়া করে। হিন্দী-অলারা বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে আর আপনারা করতে পারেন নি বলে প্যান-প্যান করে কেঁদে কোনো লাভ নেই। ইতি।

জনৈক ছাট ড্রেনপাইপ-হিন্দী-প্রেমিক।

১/১১ খ্রি বঙ্গমতী রোড, কলকাতা-২৮ থেকে শ্রীঅরুণা ভট্টাচার্য লিখছেন: সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর “আকাশ-বাণী পরিকল্পনা” শীর্ষক আলোচনার আপনি রবীন্দ্রসংগীতে উচ্চারণের দৃষ্টি সম্বন্ধে যে নিবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে এক জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে যে, “রবীন্দ্রনাথের ধাতবীয় রচনায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আদ্যাকরে “এ” উচ্চারণে “আ” হলে মূল্যে একরূপ পাওয়া যাবে, মাদ্যহীন মূল্যে।” কিন্তু নিচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে ঘটনাটা ঠিক বিপরীত।

“মেথার ব্যাকুল বন্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ ঢালা।”
“পতিতা”

.....“রাজমাতা তুমি
কেন হেথায় একাকিনী—এ হে
রণভূমি”
“কর্ণ-কুন্তী সংবাদ”

“খেপার মতন কেন এ জীবন”
“অন্তর্বাণী”

“বেড়া দেওয়া উপবন
দেখে পথিকের মন আকুলে”
“দিনশেষে”

“.....হেলার হেলিয়ার তরুণের
প্রসারিত পদব্দ নবতৃণস্তরে।”
“বিজয়িনী”

মনে হয় মূল্যের কোন দৃষ্টি হেতু আপনার অভিমত স্বাধীন প্রকাশিত হয় নি। আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় ভুলটুকু সংশোধন করে দেবেন। না হলে আপনার বর্ণিত বন্ধটি কোনো একটি দৈনিক সংবাদপত্রের অভিমতকে ধুব সত্য মনে করে যে বিজ্ঞান দৃষ্টিবোধিত আপনার কোনো অনুরাগী পাঠকও এমন আপনার প্রকাশিত বন্ধটিকে ধুব সত্য মনে করে তেমনি কোনো নতুন বিজ্ঞানিত দৃষ্টিতে ভুলবেন।

কালীঘাট (কলকাতা) থেকে শ্রীরজত রায়চৌধুরী লিখছেন: গত রবিবার (ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬৭) সকালে ও রাতে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীহেমন্ত মল্লখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান অনেকদিন পর শুনতে পেলুম। সত্যি কথা বলতে কি শুন শুন নিরাশ হয়েছি। প্রথমত গানগুলির প্রত্যেকটিরই রেকর্ড আছে এবং রেকর্ড নেই এমন দু-একটা গান শ্রোতার শুনতে নিশ্চয় আশা করেন। দ্বিতীয়ত ঐ সকল গানগুলি যে নির্দ্বা আন্তরিকতা এবং মাধবমণ্ডিত হয়ে রেকর্ডে পরিবেশিত—রবিবারের অনুষ্ঠানে তার বেশ অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ ব্যাপারে মেঘ-দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তিনি আলোচনা সাপ্তাহিক করে থাকেন।

সমগ্রই, বর্ধমান থেকে শ্রীশান্তিনাথ মল্লখোপাধ্যায় লিখছেন: আধুনিক গানের স্রোত বিশেষ করিয়া দেশের কিশোর-

সাপ্তাহিক বসন্তভী

কিডনারী, হৃদক-হৃদযীবল। আকামকানী
কলিকাতা গ্রামোফোন রেকর্ডের কব্ধ
অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন, কিন্তু উপ-
হৃত সময়ে প্রচারিত না হওয়ার সন্দেহ
যে কারণে শব্দ বাধা হয়, তাহাই আমি
জানাইতে চাই।

সকাল ৯-১৫ মিঃ-এ প্রচারিত
আধুনিক গানের অনুষ্ঠান। ইহা ৩৫%

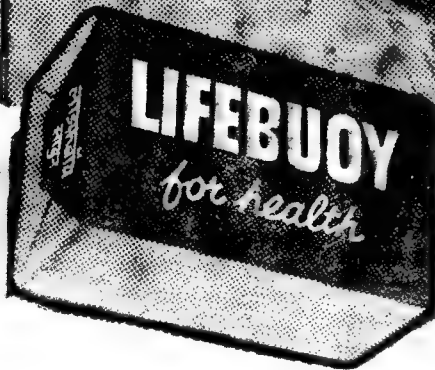
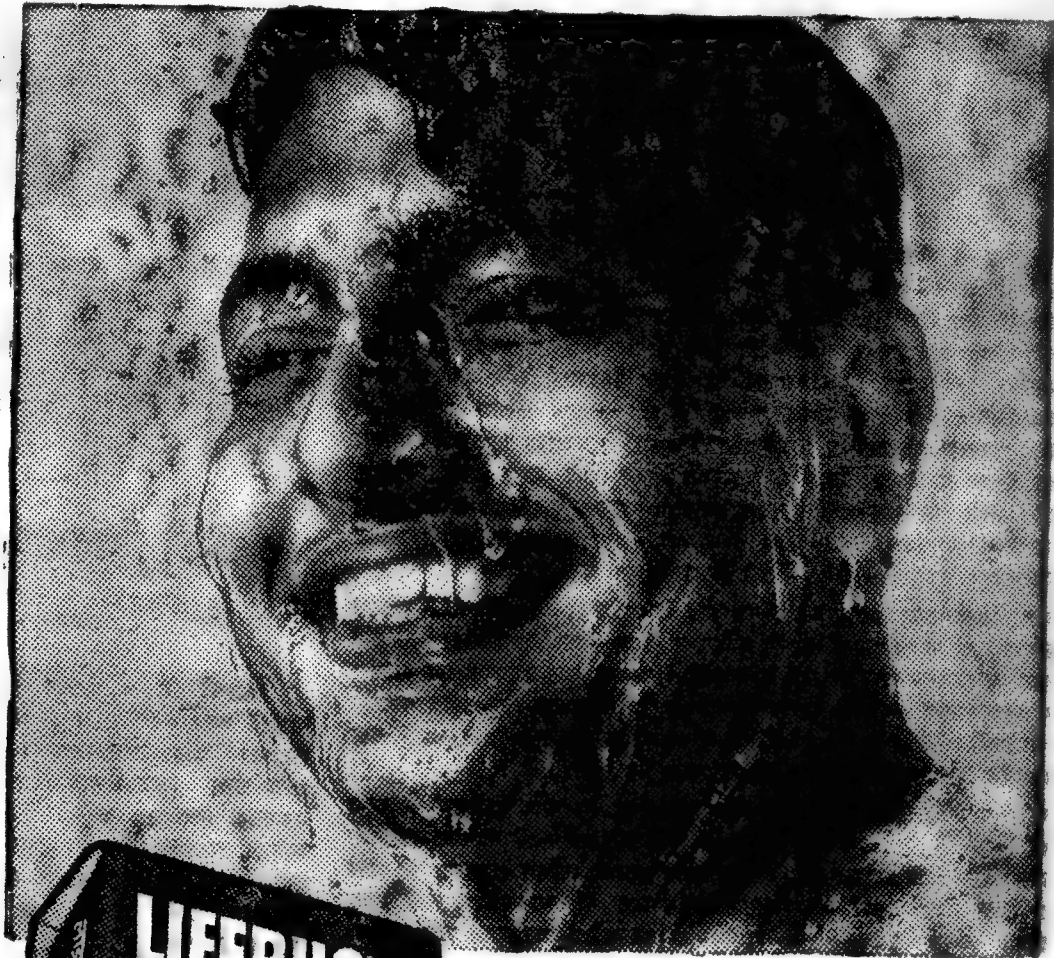
লোকে জানেন না, কারণ ১-০০-টী হইতে
কলেজের প্রাণ শব্দ হয়।

বেলা ১২-০০ মিঃ-এর প্রবীণ-
সংগীতানুষ্ঠান। একই কারণে বাধা।

বেলা ২-০০ টায় 'পীতিকা' একই
কারণে প্রোডাক্ট আনন্দ দান করিতে
পারে না।

সোমবারে বেলা ৩-০০ মিঃ-এর
'অনুরোধের আসর' কাজল লোক শ্রমিতে
পার।

এইসক মিক বিবেচনা করিয়া অধি-
কর্তা মহাশয়কে বিবেচনা করিতে অনুরোধ
করি, অন্যথা কথা সত্য কি না।



লাইফবুয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবুয় মেখে স্নান করলেই তাজা বরষারে হবেন। এই

চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের

সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবুয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবুয় ধুলোময়লার রোগবীজাদু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান সিডারের তৈরি

পিসিএল-১১-১৫-৪০



মিনার্ভা সিনেমা বন্ধ কেন ?

নিউ মার্কেট সংলগ্ন মিনার্ভা সিনেমা দীর্ঘকাল ধাবৎ বন্ধ রয়েছে। শহরের দ্বন্দ্ববলে অবশ্রিত এই সিনেমা একটি আকর্ষণীয় প্রেক্ষাগৃহ হিসাবে পরিগণিত হত। এই সিনেমাটি বন্ধ থাকায় একটি পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন সিনেমায় আনন্দ উপভোগ হতে দর্শকরা বাঞ্ছিত হলেন। যখন আরো বেশি সংখ্যক সিনেমার প্রয়োজন ; এবং চলচ্চিত্রকারীরা যখন আরো বেশি সংখ্যক সিনেমাগৃহ নির্মাণের দাবি করছেন তখন এই সিনেমাটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে কেন ? গত ২৬শে এপ্রিল রবীন্দ্রসম্মানে অন্মুখিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য, চলচ্চিত্র, সংগীতশিল্পী ও কর্মীসম্মেলনের দাবি করা হয়েছিল কলকাতায় অন্তত ছয়টি এবং জিলা সদরগুলিতে অন্তত ১৫টি নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণ করা হোক। এই দাবিসমূহ স্মারকপত্রের আকারে রাজ্যের মধ্যমস্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছিল। তারপরেও দেখা যাচ্ছে নতুন সিনেমাগৃহ খোলা দূরের কথা—পুরাতন ও সুপরিচিত এই মিনার্ভা চিত্রগৃহটি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

যতদূর জানা গেছে কলকাতা কর্পোরেশনের খামখেয়ালীই এই বন্ধ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। এই সংগে অবশ্য সিনেমা মালিকের শতভায়ে দায়ী করা যায়। সিনেমাটি বন্ধ থাকায় কর্পোরেশন এবং সরকার উভয়পক্ষই টাকার ব্যবস্থা আয় থেকে বাঞ্ছিত হচ্ছে ; অন্যদিকে কিছুসংখ্যক কর্মচারী বেকার হয়েছেন। মালিকপক্ষের লোকসানও যথেষ্ট। সিনেমা কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে এই অচল অবস্থা অবসানের জন্য আন্দোলন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনো অচলায়তনের দরজা খোলে নি।

সরকার, পৌরসভা, কর্মচারী, মালিক এবং নাগরিক সকলের স্বার্থ বিবেচনা করেই এই সিনেমাটি অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কলকাতা কর্পোরেশনকেই সর্বাগ্রে অগ্রসর হতে হবে। হয়ত যেভাবে মালিক এককাল সিনেমাটি চালু রেখেছিল সেভাবে কাজ চলবে, নতুবা পৌরসভার পরিচালনায় সিনেমাটি চালু করতে হবে। যদি পৌরসভা এই সিনেমার পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে অলাভজনক সিনেমা প্রদর্শনের গৃহ হিসাবে ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্য এই সিনেমাকে ব্যবহার করতে দিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শহরবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে সহায়তা করা হবে। এই সংগে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি সমিতিগুলির মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং তাদের অনুষ্ঠানের জন্যও এই গৃহকে ব্যবহার করা যায়। শহরে শিশুদের জন্য একটা সিনেমাগৃহের অভাব দীর্ঘদিনের। প্রেক্ষাগৃহের অভাবে শিশু-চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলে না। অলাভজনকভাবে, অথবা ব্যবসায়িক দিক থেকে কোন রকমেই শিশুদের ছবি দেখার উপায় নেই। কর্পোরেশন যদি এই প্রেক্ষাগৃহকে শিশু-চলচ্চিত্রগারে পরিণত করে তবে শহরের আর একটি অভাব মেটে, এবং এজন্য তাঁরা ধন্যবাদাজ্ঞা করেন।

আসল কথা হল কর্পোরেশন সংলগ্ন এই প্রেক্ষাগৃহটিকে অচল অবস্থায় না রেখে অবিলম্বে কাজে লাগানো। অনর্থক জেদাজেদি না করে এমন ব্যবস্থা করা যাতে সিনেমাটি চালু হয়। যদি মালিকপক্ষ সিনেমাটি চালু করে তবে ফিল্ম সোসাইটি ও শিশুদের চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থার জন্য সর্ব আশ্রয় করতে হবে। আর যদি কর্পোরেশন পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে তাঁদেরও এই দৃষ্টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি সিনেমাকে এমনভাবে অচল করে ফেলা রাখা চলবে না। —স.জ্ঞান।



‘আরো একটু কাছে’ ছাঁবতে নবাগতা
মিতা চৌধুরী।

চিত্রশ্রোতা

এন্টনী ফিরিঙ্গী

(সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিদেশী সংস্কৃতি-ইতিহাসে নাম রেখে গেলেন। তাঁর বাংলা সংস্কৃতি প্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে বাঙালীরা রাস্তার নামকরণ করেছে এন্টনীবাগান লেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা-দেশে কবিগানের বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। সে সময় রাষ্ট্র ও সমাজে বৃগসম্মিলকাল। কোম্পানীর অনুগ্রহীত বাবু ও পল্লী-অঞ্চলে জমিদাররা সমাজের নেতৃত্ব করছে। উচ্চতর সাহিত্যের পরিবর্তে তাঁরা শব্দ-চাতুর্য ও আদিরসাত্মক খেউড়ে বেশি আনন্দ পেতেন। এঁরাই ছিলেন কবিগানের উৎসাহদাতা। এক শতাব্দীকাল বাংলাদেশে কবিগানের উদ্ভেজনা ছিল। চলিত কথায় স্বচ্ছন্দে চলিত ঘটনার উপর গান রচনা ও ধর্মশিক্ষামূলক প্রশ্ন ও উত্তর রচনা করতেন বলে জনসাধারণের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা ছিল। এই এক শতাব্দীকালে বাংলাদেশে কবিত্বশাস্তিসম্পন্ন কয়েকজন কবিবালেরও জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম এন্টনী ফিরিঙ্গী। তিনি জাতিতে পূর্ভগীজ ছিলেন। এদেশে তাঁর জন্ম, এবং হিন্দুর মত আচার-ব্যবহার করতেন।

এই এন্টনীর ফিরিঙ্গীর জীবনী অব-
লম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। চিত্রনাট্য
শব্দে হয়েছে এন্টনীর বাঙালী জীবনের
প্রতি এবং হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট
হবার মূহুর্ত থেকে। সঙ্গীতরসিক
এন্টনীর শাকিলার বাঈজীর গানে মুগ্ধ হয়ে
রাতের পর রাত লুকিয়ে লুকিয়ে গান
শোনে। গানের মাধ্যমেই তাদের পরিচয়
ঘটে, পরিচয় থেকে প্রণয়। এ সময়
এন্টনীর জানতে পারে শাকিলার জীবনকথা।
আজ সে শাকিলা বাঈজী, কিন্তু কয়েক
বছর আগে সে ছিল ব্রাহ্মণঘরের বধূ,
নিরুপমা। নিষ্ঠুর সহমরণ থেকে
পালিয়ে গিয়ে যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার
কথা ভেবেছিল, তার বিশ্বাসঘাতকতার সে
বিক্রীত হয়ে গ্রহণ করেছে বাঈজীর
জীবন। এন্টনীর নিজের ব্যবসা, জাতি,
ধর্ম ত্যাগ করে নিরুপমাকে নিয়ে ঘর
বাঁধে। আর দেশে দেশে কবিগান গেয়ে
বেড়ায়। কিন্তু সনাজের অম্বতা তাদের
এই স্নেহের জীবনকে ভেঙে দিল।
দুর্ঘটনায় নিরুপমার মৃত্যু হল; ক্রমে
ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে এন্টনীকে পৃথিবী
থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু
কবিগান এন্টনীকে আজও বাঙালী
ভোলে নি।

‘এন্টনীর ফিরিঙ্গী’ চিত্র প্রযোজনা
এক প্রশংসনীয় উদ্যম। আঠারো থেকে
উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়,
সেকালের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবন
ও রুচি ইত্যাদি প্রতিফলিত হবার
সুযোগ এরূপ চিত্রনাট্যে থাকে। কবিগান
আজও জনপ্রিয়তা হারায় নি, এদিক
থেকেও দর্শকদের কৌতুহল কম থাকার
কথা নয়। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটিকে কেবল-
মাত্র কবিগান এন্টনীর ফিরিঙ্গীর মধ্যে
সীমিত রাখেন নি; কিছুটা পূর্ব
পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য
এত ব্যাপক ঘটনার মধ্যে না গেলেও
চলত। ছবির সর্বাধিক উপভোগ্য অংশ
কবির লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি। এ সময়
প্রশ্ন, জবাব ও পাল্টা প্রশ্নে দর্শকরা
চমক বোধ করেন। এন্টনীর হরঠাকুর,
রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রমুখের কিছু
কিছু গান সংযোজিত হয়েছে এবং এই
গানগুলি গাওয়ার সময় যথেষ্ট উত্তেজনা
সৃষ্টি হয়। এন্টনীর ব্যক্তিগত জীবনের
অংশ এই তুলনায় গতানুগতিক।
সেকালের বাংলাদেশের জীবনের অংশে
পরিচালক আরও সতর্ক হলে ছবিটির
পটভূমি যথার্থ হয়ে উঠত। কিন্তু গানে
গানে ছবিটি দর্শকদের আনন্দ দেবে, কবি-
গানের সঙ্গে কয়েকটি রাগসঙ্গীত এতে
মিলেছে এবং গানের জন্য সঙ্গীত পরি-



‘নলদময়ন্তী’ ছাবর নামক ও নায়িকা অসীমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চালক অনিল বাগচী ধন্যবাদভাজন।
গানের জন্য ছবিটির উপভোগ্যতা বেড়েছে।

এন্টনীর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন উত্তম-
কুমার। তিনি জনপ্রিয় শিল্পী, সুতরাং
এই ছবিতেও তিনি দর্শকদের আনন্দ
দিতে পেরেছেন। নিরুপমার চরিত্রে রূপ
দিয়েছেন বোস্বাইয়ের তনুজা। অভিনয়
তার ভালই, তবে উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ।
উচ্চারণের দোষে বাঙালী গ্রাম্যবধূ হয়ে
উঠতে পারেন নি। ভোলা ময়রারূপে
অসিতবরণকে এবং রাম বসুরূপে হরিধন
বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল লাগে। অন্যান্য
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ললিতা
চ্যাটার্জী, ছায়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়,
অসীমকুমার, তরুণকুমার, জহর রায়,
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা,
বীরেন চ্যাটার্জী, অজিত চ্যাটার্জী প্রমুখ।

চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের কাজ
যথায়োগ্য।

চেকোস্লোভাক পাপেট ফিল্মস

চেকোস্লোভাক পাপেট ছবির সুখ্যাতি
বহুদিনের। চেকোস্লোভাক পাপেট
কাহিনীচিত্র যখন দর্শকদের তেমন দৃষ্টি
আকর্ষণ করতে পারে নি, পাপেট ফিল্মস
তখন জনপ্রিয় হয়েছে। পাপেট
ফিল্মসকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব হারসিনা
তারেরলোভা, কারেল জেসান এবং জিঁরি
ট্রানকার। যাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব
স্টাইল এবং নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার
করে পাপেট ফিল্মসকে বৈচিত্র্যময় করে-
ছেন। হারসিনা তারেরলোভা সাংসারিক
শিশুদের অকৃত্রিম বন্ধু থেকে গেছেন।
তার ছবির গল্পগুলি বিভিন্ন দেশে
পুরস্কার পেয়েছে, ছেলেমেয়েদের কল্পনা-
শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

গটওয়াল্ড স্টুডিওতে হারসিনা তারের-
লোভাকে ঘিরে অনেক শিশ্য রয়েছেন।



‘শীলা’ ছবিতে সান্ধীয়া চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষের

ভাইদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত জে. বুদ্ধদেবের। যার পুত্রস্বর্গদেব বুদ্ধদের এবং ছোটদের একই সঙ্গে আনন্দ দেয়। ছোটরা পায় নিমলি আনন্দ, বড়রা দেখেন এই আনন্দের মধ্যে শ্রেণি। যাতে অনেক মুখোশ খুলে পড়ে।

কারেল জেসান আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শিল্পী। টিক পাপেট ফিল্মস তৈরির জন্য তাঁর সন্ধান। তাঁর ‘স্মুটমাস ড্রিম’ ছবিতে একটি ছোট বালিকা স্মুটমাস উপহার পেয়েছে একটি উলের পুতুল। যাতে পুতুলটি জীবন্ত হয়ে ওঠে; তারপরে কত কাণ্ড।

জিরি ট্রানকার নাম সকলের কাছে পরিচিত। তাঁর পুতুলের ছবি পৃথিবীর সবদেশে সমাদৃত—মানবিক আবেদনের জন্য। তাঁর এমন একটি ছবিও নেই—যেটি পুরস্কার পায় নি। তাঁর ‘হ্যান্ড’ ছবিটি কয়েক মাস আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এই ছবিতে শিল্পীর নিকশের পথে ব্যাধি এবং তার প্রতিরোধ সংগ্রামকে রূপায়িত করা হয়েছে। ছবিটি আমাদের দেশে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

ট্রানকার মতে চলচ্চিত্রশিল্প জাতীয়করণ করা না হলে প্রকৃত শিল্পীর প্রতিভার বিকাশ হতে পারে না। চেকোস্লোভাকিয়া ফ্যাসিস্ট দখলমুক্ত হওয়ার পরে চলচ্চিত্রশিল্প জাতীয়করণ করা হয়। তার পর থেকে পাপেট ও কার্টুন ছবিতে নবযুগের সূচনা হয়েছে।

নাটকের কথা

বিনয় রিক্রিয়েশন ক্লাবের ‘বলাকা’

সম্প্রতি নেতাজী সন্মার ইনস্টিটিউটে বিনয় রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক

সম্মেলনে তরুণ নাট্যকার শ্যামল ঘোষের ‘বলাকা’ নাটকটি মণ্ডস্থ হল।

অনুষ্ঠান প্রারম্ভে সভাপতি কুমার কৃষ্ণ রোহতগী সংস্থার কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। শিবানী ঘোষের রবীন্দ্রসংগীতের গুরে ‘বলাকা’ নাটকটি মণ্ডস্থ হয়—নাটকে অংশ গ্রহণ করেন—অনুপ সেনগুপ্ত, শঙ্কর দাস, বিনয় পুরকায়েত, মৃত্যুঞ্জয় নাথ, কল্যাণ মুখার্জী, নিমাইলাল মণ্ডল, তপন চ্যাটার্জী, মহাদেব হালদার, ষষ্ঠী চক্রবর্তী, শ্যামল ঘোষ, কল্পনা রায়চৌধুরী, জয়ন্তী সরকার, কল্পনা ভট্টাচার্য, পারুল চন্দ্র, কৃষ্ণ দফাদার, প্রভাত বসু।

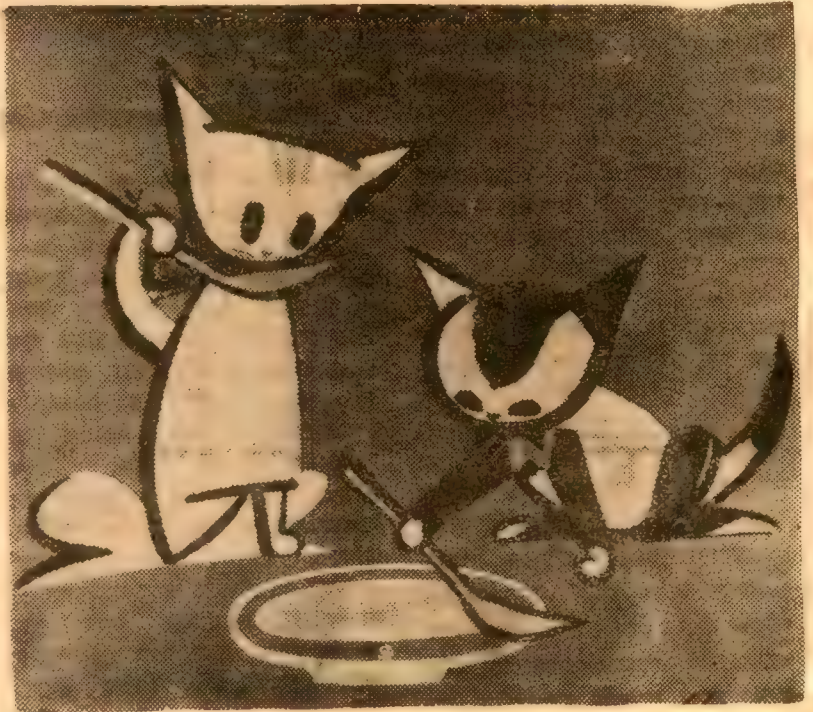
আবহ-সংগীতে ছিলেন—এস রাজেশ সম্প্রদায়।

মণ্ড ব্যবস্থাপনায় সজল ঘোষ ও অশোক চক্রবর্তী।

জার্মানীর জনপ্রিয় ‘শিশু শিল্পী’

শিশু জার্মানীর জনপ্রিয় শিশু শিল্পী যাকে বলা হয়, তার নাম সেবাইন মিনজেন, বয়স এখন পাঁচশ। তবে সংবেদনশীল, লাজুক ও ক্ষীণতনু সেবাইনের বয়স যখন সবেমাত্র চোদ্দ তখন থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন।

‘মধুর নিপাপ’ চরিত্র চিত্রণে তাঁর জড়ি নেই। সেবাইন বিয়ে করেছেন তাঁর



একটি চেকোস্লোভাক পাপেট চরিত্র চিত্রণ

চেয়ে পঁচিশ বছরের বড় পরিচালক বৃত্তকে। বৃত্তে তাঁকে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে টেলিভিশনে আকৃষ্ট করে তোলেন। এক সময় সেবাইনকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে সন্মত করানো যায় নি। পরে অবশ্য জার্মান নব-তরুণ ধারার পরিচালক উলরিখ শ্যাম্মোন তার "ইট" ছবিতে সেবাইনকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী করান। শিশু শাস্ত্রী থেকে সেবাইন যে একজন কুশলী অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন এই ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সেবাইনকে পশ্চিম জার্মান চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়।

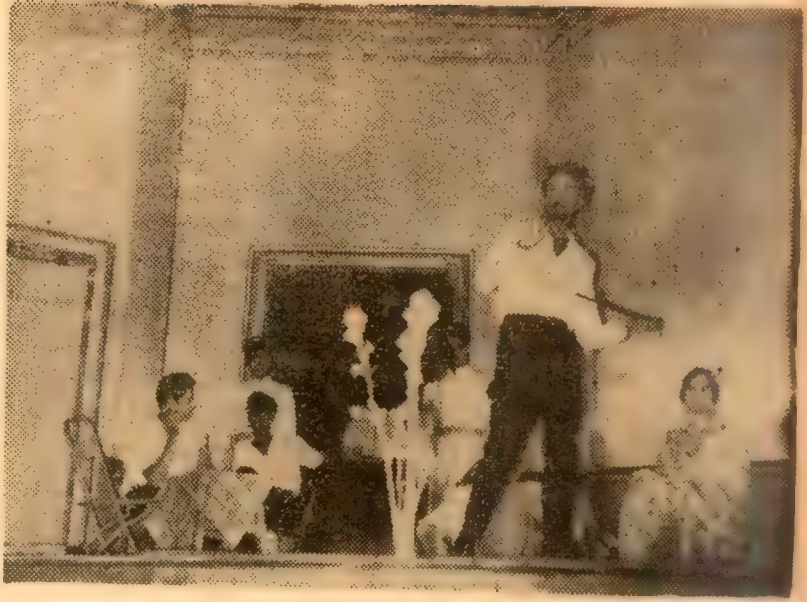
এরপর সেবাইন কিছুদিন মধ্যে অভিনয় করেন কিন্তু বর্তমানে আবার তিনি শ্যাম্মোনের চেষ্টায় "এভার ইয়ং স্যানিয়ার" ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

নৃত্যনাট্য 'পশ্চিমী'

খিদিরপুর সংগীতালোক কর্তৃক ফাইন আর্টস একাডেমি হলে বাংলা গানের রম্যবিকাশ গীতি আলোচ্য ও 'পশ্চিমী' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে।

'বারোঘণ্টা' নাটক অভিনয়

হাওড়া লিচুবাগান গভঃ কোয়ার্টারের অধিবাসিবৃন্দ গত ১৪ই অক্টোবর পূজা-মন্ডপে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীকরণ



'ঘলাকা'র একটি নাট্যধনসমৃদ্ধ শ্যামল ঘোষ ও কম্পনা সারথী

মৈত্রেয় "বারোঘণ্টা" নাটকটি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন অনিলের ভূমিকায় শ্রীহরিপদ দাস, রাজেশ্বরের ভূমিকায় শ্রীনারায়ণ ভাদুড়ি এবং গোপালা চরিত্রে শ্রীশিবপ্রসাদ বসু। অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী নির্মল মজুমদার, অমর সিংহ, প্রণব সেন, মৃকুল বোস, মৃদুয়া বোস, স্বপন এবং রমলা নাগ ভাল অভিনয় করেন।

স্টুডিও থার

"অজানা শপথ"

সরকার প্রোডাকশন্স-এর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছবি "অজানা শপথ" বর্তমানে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর বহু চিত্রগৃহের পরবর্তী আকর্ষণরূপে মূর্তি প্রতীক্ষিত। "মণিহার"-খ্যাত সলিল সেন রচিত "সন্ন্যাসী" অবলম্বনে তোলা ছবিটি তিনিই পরিচালনা করেছেন। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন দিলীপ সরকার। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন মাধবী মৃধাজী, সৌম্য চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, রেবা দেবী, জহর রায়, হরিধন মৃধোপাধ্যায়, প্রসাদ মৃধাজী, রেণুকা রায়, বসিকম ঘোষ, নবাগত সোমেন চক্রবর্তী ও নবাগত শিবানী বসু প্রমুখ। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমণি ঐক্যচন্দ্র।

শোক:সংবাদ

জর্জ সাদুলের জীবনাবলী

ফরাসী চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও পর্যালোচক জর্জ সাদুল প্যারিসে পরলোক গমন করেছেন। সারা বিশ্বে চলচ্চিত্র কর্মী ও পর্যালোচকদের কাছে এই নামটি বিশেষ পরিচিত। চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকরূপে তিনি বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন, এবং তাঁর গ্রন্থের জন্য তত্ত্ব সংগ্রহের কাজে বহু চলচ্চিত্র কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি 'পথের পাচালী'কে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেন। পশ্চিমবঙ্গের স্বাধিক ঘটকের 'অসাম্প্রদায়িক' ছবিটিকেও তিনি প্রশংসা করেছিলেন।

রত্নবৃন্দার বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রস্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, উপপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পথ, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানদণ্ড, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



পশ্চিম জার্মানীর চিত্রতারকা সেবাইন

সঙ্গীত কথা

চারিদিকে সবুজের বন, তারি মাঝে
অকিবাঁকা সেতী পল, এতাসেনো বান-
ক্কেত, ছোট ছোট কোণকাড়, মাঠ-নদী,
বন-প্রান্তর—এ হেন প্রাকৃতিক পরিবেশে
আকাশ-বাতাসে যে সুদূর ছাড়িয়ে থাকে তাই
এসে আপনি ধরা দেয় সেই সব মানুষের
কণ্ঠে 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'। এ
গান তাঁরা নিজেরাই বাঁধেন—নিজেরাই
মনের আনন্দে কাজের ফাঁকে গেয়ে চলে।
তাঁদের এ গানকে আমরা লোকসংগীত
বলে থাকি।

এই লোকসংগীতগুলির মধ্যে এমন
অনেক গানই আছে যার রচনাকৌশল
দেখে মনে হয় যে, এ গানের রচয়িতা
মেয়েরাই। এ ধরনের গানগুলিকে মেয়েলী
গান আখ্যায় দেওয়া হয়েছে। এই মেয়েলী
গানগুলি ভারী সুন্দর ও রসসিক্ত। এ গান
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঞ্জীর হিন্দু-মুসলমান
মেয়েদের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়।
এ সব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে
বাংলার নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদিও
এ গানগুলির রচনা যে বাংলার পঞ্জী
মেয়েদেরই এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ
পাওয়া যায় নি—তবুও এগুলির রচনা-
কৌশল দেখে স্থির করা যায় যে, এগুলি
মেয়েদের রচনা। আরব দেশের শোক-
সংগীতের রচনাকৌশল দেখে পাঁড়িতেরা
স্থিত করেছেন যে, এই শোকসংগীতগুলি
আরব মেয়েদের রচনা। আমাদের দেশের
মেয়েলী গানগুলির রচনাকৌশলও এ একই
কথা প্রমাণ করে।

এ গানগুলির বিবরণসমূহ, রচনাভাঙ্গি,
উপহার ব্যবহার মেয়েদেরই মতন—তাই
থেকে স্বতঃসিদ্ধের মত গ্রহণ করা যায়
যে, এই মেয়েলী গানগুলির রচয়িতা
বাংলার পঞ্জীর হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা।

পঞ্জী বাংলার বিশেষ করে উত্তর ও
পূর্ব-বাংলার বহুদিন থেকেই বিভিন্ন
অনুষ্ঠানে মেয়েদের সংগীতে বোগদান
করতে দেখা গেছে—তাই মনে হয় মেয়েদের
গান গাইবার রীতি পঞ্জী বাংলার বহু
প্রাচীন।

তুলসীদাস প্রণীত রামায়ণে রামচন্দ্রের
বিয়ের সময়ে পুরনারীদের গানের উল্লেখ
আছে। চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্যদেবের
বিয়ের সময় নৃত্যগীতেরও উল্লেখ পাই।
তারপর মৈমনসিংহ গীতিকারও নায়কদের
বিয়ের সময় গান গাইবার কথাও পাওয়া
গেছে। তাই বলছিলাম যে গান গাইতে
পারলে গান রচনা করা আর অসম্ভব কি?

বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে
প্রচলিত মেয়েলী গানগুলিতে মুসলমানী
প্রভাব ও রেওয়াজ প্রবল। মুসলমানী
শব্দের ব্যবহার, মুসলমানী অনুষ্ঠান-
গুলির ছবি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে
প্রচলিত অলঙ্কারের কথা—পাওয়া যায়

মুসলমান মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া
মেয়েলী গানগুলিতে।

এই মেয়েলী গানের প্রচলন খুব বেশি
পরিমিত হয় উত্তর বাংলার রাজসাহী,
দিনাজপুর, শাবনা ও বগুড়া—পূর্ব-বাংলার
ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর আর পশ্চিম
বাংলার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি
অঞ্চলে। হাওড়া জেলা থেকে কোন
মেয়েলী গান সংগৃহীত হয় নি। আমি
রাজসাহী জেলার পঞ্জী অঞ্চল থেকে
সংগৃহীত কয়েকটি মেয়েলী গান নিচে
উদ্ধৃত করলাম—

গান (ক)

‘সাধুরে তুমি যাচ্ছেন বাণিজ্যে,
বানিয়া দিয়া যাও, আশি’ আলালত,
কলকে আলা বজু’,
সেমলাইরে বাড়ীতে থাকল চাকর আর নকর
বান্দিয়া লইও আটচালা চৌয়ারী,
বান্দিয়া লইও চারচালা চৌয়ারী,
সেখানে বসাইও সোনাতে সারি সারি
বানিয়া লইও আশি’ আলালত
বানিয়া লইও কলকে আলা বজু’।

উপরোক্ত মেয়েলী গানটি মুসলমান
মেয়ের রচনা—তাই গানটিতে মুসলমানী
শব্দের ব্যবহার, মুসলমানী অলঙ্কারের
কথা ও ঐ সময়কার গৃহ নির্মাণের
পদ্ধতির স্পষ্ট ছাপ আছে। গানটি রাজ-
সাহী জেলার ভীমপুর গ্রামের মহিউদ্দিন
গ্রাম্য চাবীর নিকট থেকে সংগৃহীত।

(খ)

মনের মানুষ তাল্লাস কররে মন,
জবে পাবে সেইরূপ দরশন,
মনের মধ্যে আরাক মন আছে,
সেই মনের গঠন আছে এই মনের সাথে।
ও ফুলের আগা কাটা মাকরী ছাটে
মধ্যে আছে মহাজন,
মনের মানুষ তাল্লাস কররে মন।

উপরোক্ত গানটি রাজসাহী জেলার
কালীগামের মদান মন্ডলের কাছ থেকে

সংগৃহীত। এই মেয়েলী গানটিতে বাউল
বা শেহজাদার প্রভাব লক্ষণীয়। মাকরী
একটি মেয়েলী অলঙ্কার। গানটির রচনা
কৌশল দেখলে মনে হয় গানটি রচনা
করেছেন মেয়েরাই।

(গ)

পোড়ামুখী কলিকনী রাই গো,
তোর মতন কেউ কুল মজানী গোকুলেতে
নাই লো!

যমুনার জল আনতে গেলে,
রসের খেলা কদম তলে,
দেখে এসে লোকে বলে
সকল শুনতে পাইলো॥

উপরোক্ত গানটি রাজসাহী জেলার
পলসা গ্রাম থেকে সংগৃহীত। এই মেয়েলী
গানটিতে রাখাকে যেভাবে বিদ্রূপ করা
হয়েছে তা নিতান্তই মেয়েলী ধরনের।
পঞ্জী মেয়েরা এইভাবেই নিজেদের মধ্যে
বিদ্রূপ করে থাকেন।

আগমনী গান পঞ্জী মেয়েদের অতি
প্রিয় গান। দুর্গাপূজার আগে থেকেই
এ গান পঞ্জীর ঘরে ঘরে মেয়েদের কণ্ঠে
শুনতে পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলার
তাহেরপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি
মেয়েলী আগমনী গানের কয়েকটি পংক্তি
নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

(ঘ)

আরে দুগ্গা আইসুবে বছর পর
তোরা সবাই মিলিয়া আর,
বাজার থিকা সেয়া খাবার
কিন্যা নিয়া আর॥
ঢাকাই শাড়ি, আর হাতের ককণ,
তিন জোড়া আনিস্
লক্করী, সরস্বতী ছেমরী দুইটার,
হাতে পরায়ে দিস।

দীর্ঘ এক বৎসর পর কন্যার আগমন
উপলক্ষে মাতার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।
আদরের মেয়ে ঘরে ফিরছেন—তাই পঞ্জী-
গৃহিণীর মন অস্থির হয়ে উঠেছে।

গানটিতে মেয়েলী আবেগের পূর্ণ
ছবিটি ফুটে উঠেছে। মাতৃহৃদের মনের
ছবি খুবই স্পষ্ট উপরোক্ত এই মেয়েলী
গানটিতে।

মেয়েলী গান অন্যান্য অঞ্চলেও
আছে। তবে এই নিবন্ধে কেবল উত্তর
বাংলার রাজসাহী জেলার কয়েকটি
সংগৃহীত গানের নমুনা দেওয়া হল।

—বৃন্দাবন রায়

কটকের জাতীয় ফুটবল

কটকের জাতীয় ফুটবলের প্রধান বিস্ময় হল উড়িষ্যা কাছে শান্তিশালী অস্ত্রের পরাজয়। সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা যে দু-গোলে পেঁছিয়ে থেকেও উড়িষ্যা দল শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জয়ী হয়ে সেমি-ফাইনালে উপনীত হয়। যোগা দল হিসাবেই উড়িষ্যা জয়ী হয়েছে অস্ত্রের বিপক্ষে।

ফুটবলে উড়িষ্যা কোনদিনই আশ্চর্যজনক কোন সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কলকাতা ময়দানের বাতিল করা কোচ অমল দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রমে উড়িষ্যা দল আজ ভারতীয় ফুটবলের প্রথম সারিতে পৌঁছে গিয়েছে। কথায় আছে যে, 'গ'গো যোগী ভিখ পায়ে না'—তাই অমল দত্তের মত সুযোগ্য কোচের কলকাতা ময়দানে স্থান হয় নি। কলকাতা ময়দানে তাঁর স্থান না হবার বোঝার প্রধান কারণ হল তাঁর স্পষ্টবাদিতা, নিষ্ঠুরীক আচরণ এবং তৈল প্রদানে এবং কর্তাব্যক্তির মন রক্ষার অপটুতা। আমাদের ফুটবলের কর্তাব্যক্তিরদের এতই বিরাগভাজন ছিলেন অমল দত্ত যে প্রথমে তাঁকে একবার ভারতীয় যুব-ফুটবল দলের কোচ নিযুক্ত করে শেষ সময়ে ধামাধরা এক অপদার্থ ব্যক্তিকে কোচ হিসাবে বিদেশে ভারতীয় যুব-দলের সপো পাঠান হয়। অমল দত্ত যখন দলদলির প্যাঁচে পড়ে একধরে তখন উড়িষ্যা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন সালরে আমন্ত্রণ জানালেন অমল দত্তকে। এবার জাতীয় ফুটবলে উড়িষ্যা দলের সাফল্য এই কথাই প্রমাণ করছে যে, অমল দত্তের এখানে কত অবিচার হয়েছে। কত বড় দুঃখের কথা যে অমল দত্তের মত কোচ অবহেলিত; আর ভারতীয় ফুটবল পরিচালকদের বংশবদ কয়েকটি কোচের কেরামতিতে ভারতীয় ফুটবলের নাভিস্বাস।

খেলা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং যখন এই লেখা প্রস্তুত করছি তখন সেমি-ফাইনালের প্রথম লেসের খেলাও হয়ে গিয়েছে। সেমি-ফাইনালে খেলেছে বাংলা-সার্ভিসেস এবং মহাশূর-উড়িষ্যা।

মহাশূর কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয় আসামকে ৫-১ গোলে পরাজিত করে। অন্যদিক থেকে গতবারের বিজয়ী রেল দল কেরালাকে ২-০ গোলে পরাজিত করে মহাশূরের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ৩-১ গোলের ফলাফলে পরাজিত হয়ে রেলকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। এবং মহাশূর উপস্থিত হয় সেমি-ফাইনালে।

মাদ্রাজ কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায় দিল্লীকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে। শান্তিশালী বাংলা দল প্রথম খেলার জম্মু ও কাশ্মীরকে নয় ৩-১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার



হেলসল্ড ওল্ডার্ট ট্রিক গ্রহণ করছেন রানাদেব কলান

ফাইনালে পৌঁছায়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিপক্ষে বাংলার কলার মান খুবই নিম্ন করণের হয়। অবশ্য পরবর্তী খেলার বাংলা দলের খেলার উন্নতি হয় এবং বাংলা মাদ্রাজকে ৫-১ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে পৌঁছায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে উড়িষ্যা এবং অস্ত্র দলের খেলা প্রথমদিন সোলশনোভাবে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় দিন অস্ত্র দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকলেও শেষ পর্যন্ত দলগতভাবে অবদম্য ক্রীড়নৈশূদ্য প্রদর্শন করে উড়িষ্যা ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

গত বছরের রানার্স সার্ভিসেস পাজাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে এবং মহারাষ্ট্র দল ৫-১ গোলে ক্বিয়ারকে

পরাজিত করেছে কিনে এসেছে তারা। আমাদের ব্যাটসম্যানদের কথ'তার জন্যেই পূর্বাঞ্চলের পরাজয় ঘটেছে। যখন রানের প্রয়োজন তখন অবিবেচকের মত অযথা খুঁকি নিয়ে উইকেট ছেড়ে দেবার কি কোন অর্থ আছে।

দলীপ ট্রিকর এই খেলার উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক করেন রাজেন সান্যাল। টেসে জয়ী হয়ে অধিনায়ক সান্যাল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ দেন উত্তরাঞ্চলকে। পূর্বাঞ্চলের বোলারবাও উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্ত ঘটাতে সক্ষম হন ৩২০ রানে। কিন্তু প্রচুরতর পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসে মাত্র ২১১ রান সংগ্রহ করে। পূর্বাঞ্চলের বোলারদের মধ্যে একমাত্র সতের বৎসর বয়স্ক ভারতীয় স্কুল দলে খেলোয়াড় দীপঙ্কর সরকার উত্তরাঞ্চল ব্যাটিং শক্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হন। দলীপ ট্রিকর খেলার দীপঙ্কর এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। দীপঙ্করের লেগ স্পিন বল খুবই কার্যকরী হয়—তিনি একাই ছয়টি উইকেট দখল করেন।

উত্তরাঞ্চলের ৩২০ রানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিজয় মেহেরার শত রান এবং সুদীপার অমরনাথের ৮৫ রান। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটার সুবিন্দু বের ব্যাটিং উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসার দাবি রাখে। সুদীপারের সত্যীর্থ ব্যাটসম্যানের দীপঙ্করের বল সমীহের সঙ্গে খেললেও সুদীপারের কিন্তু দীপঙ্করের বলকে এতটুকু সমীহ না করে খেলতে থাকেন এবং রাজেন সান্যাল সুদীপারের সামনে থেকে দীপঙ্করকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে

দ্বিতীয়মাত্র

পরাজিত করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। মহারাষ্ট্র দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থেকেও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। সার্ভিসেস ৫-৩ গোলে জয়ী হয়ে সেমি-ফাইনালে পৌঁছায়।

বাংলা দল সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে সার্ভিসেসকে পরাজিত করে ১-০ গোলে। বিজয়সূচক গোলাটি করেন সীতেশ দাস। অন্য সেমি-ফাইনালে উড়িষ্যা পরাজিত হয় ১-০ গোলে মহাশূর দলের কাছে। উড়িষ্যা এবং মহাশূর দলের খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়।

পূর্বাঞ্চল পরাজিত

পূর্বাঞ্চল ক্রিকেট দল দিল্লীর মাঠে পরাজিত হতেই গিয়েছিল এবং যথার্থীতি

একমাত্র অম্বর রায় এবং আনন্দ শত্ৰু ভবুও কিছুটা খেলতে পেরেছেন। অন্যান্য শ্যাটসম্যানরা একেবারেই ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন। এঁদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল দায়িত্ববোধের অভাব, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব এবং বুদ্ধিহীনতার মত ঘট্টিক নৈবার চেষ্টা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করতে পূর্বাঞ্চল পারবে না একদম তা আগেই জানা ছিল। তবে প্রতিবারই পরাজিত হতে দেখে সত্যিই দুঃখ হয়।

খেলার অবশিষ্ট সময়ে ৪ উইকেটে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে উত্তরাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫৭ রান সংগ্রহ করলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়।

পতৌদি অধিনায়ক

বোম্বাইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্যরা যখন আগামী অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য অধিনায়ক নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ঠিক সেই সময় এক উড়ো খবর এল যে পতৌদির নাবাব অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না। সংবাদটি অবশ্য একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বোর্ডের সভাপতি, সম্পাদক এবং নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যরা একেবারে চমকে গেলেন; কেউ ঘৃণাকরে এরকম

কোন খবর পান নি, কেউ কেউ আবার কিংবদন্তি উদ্ভাও প্রকাশ করলেন। এই সময় পতৌদির নাবাব ভূপালে শিকারে ব্যস্ত। সংবাদপত্রের খবরটি পেয়ে ম্বয়ং পতৌদির চোখ ছানাবড়া। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিগ্রাম করলেন বোর্ডের সম্পাদক শ্রীরামকে যে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাওয়া যাবে। কালক্ষেপ না করে বিমানে পতৌদি শহরীয়ে হাজির হলেন বোম্বাইয়ে নির্বাচকমন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবার দিন।

নির্বাচকমন্ডলীর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পতৌদির নাবাব মনসুর আলি খাঁ আগামী অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক খেলোয়াড় পতৌদি এ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে চব্বিশটি টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৬২ সালে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময় নারি কন্ট্রোলার মাধ্যমে চোট খাবার পর থেকে পতৌদি ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ করেন এবং একুশটি টেস্ট ম্যাচে একটানা অধিনায়ক হিসাবেই খেলে আসছেন পতৌদি।

নির্বাচকমন্ডলী আগামী সফরের জন্য বিশজন খেলোয়াড়কে পুণার এক ট্রায়ালে আহ্বান জানিয়েছেন। গত ইংল্যান্ড সফরে যে সব খেলোয়াড়েরা গিয়েছিলেন তাদের



পতৌদির নাবাব

গলার ব্যাথা ও কাশি দ্রুত উপশম করে

পিউমিলেট

(থ্রোট লজেন্স)

ডেবজগুণ সম্পন্ন এই থ্রোট লজেন্স গলার ব্যাথা ও কাশিতে আরাম দেয়। ফ্যারাজাইটিস ও ল্যারাজাইটিস জনিত প্রদাহকে উপশম করিয়া শ্বাসযন্ত্রকে স্নিগ্ধ করে এবং শ্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে।



BENGAL CHEMICAL
CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR • DELHI



মধ্যে দু'জন মিডিয়াম পেস বোলার সূত্রত গৃহ এবং সদানন্দ মোহলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য নির্বাচকমন্ডলীর সভাপতি শ্রী এম দত্তরায় জানিয়েছেন যে, সূত্রত গৃহ সন্মত হয়ে উঠলে তার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

নির্বাচকমন্ডলীর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থতার জন্য সব দোষ দুই মিডিয়াম পেসারদের। নতুন পেস বোলার দেশ থেকে খুঁজে বার করতে হবে বলে লম্বা চণ্ডা বুলি বাড়ছেন কন্ট্রোল বোর্ডের লোকেরা। ভারতীয় স্কুল দলের দু'জন সূত্রদার, অমরনাথ এবং দীপকর সরকার ট্রায়ালে আমন্ত্রিত হয়েছেন। চূড়ান্ত বোলজন্ম নির্বাচিত হবেন আগামী ৭ই নভেম্বর। পুণায় ন্যাশন্যাল ডিফেন্স এ্যাকাডেমিতে ট্রায়াল হবে ২৫শে থেকে ২৭শে অক্টোবর।

সাংবাদিক বসুমতী



চুনী গোস্বামী

পূণ্য প্রয়াগে নিম্নলিখিত বিশজন খেলোয়াড় আছেন : পতৌদির নবাব, চান্দ বোরদে, অজিত ওরাদেকার, চন্দ্র-শেখর, প্রসন্ন, ডেক্টরায়বন, রুসী সূতী, দিলীপ সরদেশাই, বিজয় সিং বেদী, হুদি কুন্দেরন সুরঙ্গারাম, ফারুক ইঞ্জি-নীয়ার, হনুমন্ত সিং রমেশ সায়েরনা, আব্বাস আলি বেগ, সেলীন দুয়াধী, জয়সীমা, ইন্দ্রজিৎ সিংজী, ভি ভি কুমার, বিজয় মল্লেরকার, অম্বর রায় (বাংলার বাম হাতের ব্যাটসম্যান), রাজাগোপাল (মাদ্রাজের ওপনিং ব্যাটসম্যান উইকেট-রক্ষক), আকাশলাল (দিল্লীর ওপনিং ব্যাটসম্যান), সুবিন্দার অমরনাথ (ভারতীয় স্কুল ব্যাটসম্যান), চক্রবর্তী (সার্ভিসেসের ওপনিং বোলার), আবদ আলি (হায়দ্রাবাদের ওপনিং ব্যাটসম্যান), গোবিন্দ রাজ (হায়দ্রাবাদের স্পিন বোলার), এ ফার্নান্ডেজ (বরোদার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার), দীপকর সরকার (ভারতীয় স্কুল দলের লেগ স্পিনার), ডি ভোস্ট (বোম্বাইয়ের ব্যাটসম্যান লেগ স্পিনার)।

ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক ভেটিস কাপের খেলা স্পেনের বার্সেলোনাতেই অনুষ্ঠিত হবে, নির্ধারিত দিন হল আগামী ১০ই থেকে ১২ই নভেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকার সপ্তম ভারতের কোন কুটনৈতিক যোগাযোগ নেই বলেই নিরপেক্ষ দেশে খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু স্পেনে খেলার ব্যবস্থা হওয়াতে মোটেই সন্তুষ্ট

নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেটিস কাপ খেলোয়াড় ড্রাইসডেল বলেছেন যে, এই খেলায় জরী হয়ে তাদের স্পেনের সঙ্গেই খেলতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার অনুশীলন এবং খেলা দেখে স্পেনের সুবিধাই হবে। এবং স্পেনের দর্শকরা আঞ্চলিক ফাইনালে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসাবে ভারতকেই দেখতে চায়, সেই জন্য দর্শক পক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেশ বেগ দেবে। তবে ড্রাইসডেল বলেছেন ভারতের বিপক্ষে



দীপেশ দাস

ভারী জরী হবেনই এবং চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে তাদের খেতে হবেই।

চুনীর নতুন সদস্য

চুনী গোস্বামী অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দুইই আনন্দের কথা যে চুনী গোস্বামীর মত একজন বোগা ব্যক্তিকে সদস্য করা হয়েছে। আমাদের দেশের খেলা-হুলার প্রসার এবং উন্নতির ক্ষেত্রে চুনী গোস্বামীর ন্যায় একজন জাত খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। শুনতে একটু কষ্ট লাগলেও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কাউন্সিলের সদস্যপদ চুনীকে আরও কিছুদিন পর দিলে ভাল হত,

অবশ্য চুনীর বোগাতা সম্বন্ধে আরি বিন্দুমাত্র কটাক্ষপাত করছি না। চুনী গোস্বামীর খেলাধুলার ক্ষেত্রে অবদান কম নয় এবং এখনও তিনি খেলছেন। কিন্তু খেলাধুলার ক্ষেত্রে মোস্তাফিজ, কদুনা ভট্টাচার্য এবং শৈলেন মাসা প্রমুখের অবদানও কম ছিল না।

সম্রাটের দর্শন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের পূর্ব-শ্রমে বিজয়ী হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩-০ গোলে দাদবপুরকে পরাজিত করে। মঙ্গলভভাবে কলকাতা দল দুইই ভাল খেলে এবং দাদবপুরের হাফিমান দুইই সাধারণ হয়।

বাংলার উন্নত স্টেট খেলোয়াড় সুরত গুহ পূণ্যর অনুশীলন শিবিরে বোগাদান করছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন। বাংলার তিনজন খেলোয়াড় সুরত গুহ, অম্বর রায় এবং দীপকর সরকার ২১শে অক্টোবর পূণ্য অতিমুখে যাত্রা করছেন। ইটিংটে অস্ট্রোপচারের পর সুরত বর্তমানে সুস্থ আছেন এবং কয়েক দিন মাঠে অনুশীলনও করেছেন।

ফোর্ড ৫০ শিল্লর পিস্তল

লাইসেন্সের আবশ্যক নাই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং জানোয়ার হইতে আত্মরক্ষা করুন। পিকনিক, ভ্রমণ এবং ভ্রাম্যমাণ জন্য প্রাপ্ত। স্বয়ংক্রিয় ৫০ শটের ব্যবস্থা সহ। হাল্কা ওজন এবং চোখ-বলসান আগুন বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মূল্য ৫০ শট ৩০নং ১০-৫০ টাকা। জার্মান মডেল ১১নং ১৫-৫০ টাকা। ডি, পি, পি, মূল্য ২-৫০ টাকা। চামড়ার কেস ৩-৫০ টাকা। স্বতন্ত্র শট একশত ৫-০০ টাকা।



GEM ARTS (WBC-15)
Post Box 1325, Delhi-6.

সুনীল ভট্টাচার্য

সুনীল ভট্টাচার্যের জন্যে মাঝে মাঝে দঃখ হয়। দঃখ হয় কুড়ি বছরের ঐ তরুণ খেলোয়াড়টির জন্যে! বিস্তী লাগে যখন বার বার দেখি ঐ উঠতি খেলোয়াড়-টিকে আহত হতে!

নেহাংই ভাগ্য খারাপ। তা নাহ'লে কেনই বা সে বার বার আহত হয়ে বসে থাকবে খেলা ছেড়ে? কিন্তু সুনীলের ভাগ্যকে আবার খারাপই বা বলি কি করে।

ভাগ্য যদি সহায় না হতো তাহ'লে সুনীল আজ সুনীল ভট্টাচার্য হতো না! কলকাতা ময়দানের সেরা দল ইন্সটেব্গেলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হতো না, আর খেলার জন্যে এই বয়েসেই তার দেশ-বিদেশ ঘোরার সুযোগ আসতো না।

তবু বার বার আহত হবার হাত থেকে কিছতেই রেহাই পায় না সুনীল। এই তো সেদিন আই-এফ-এ শীশু ফাইনালে মোহনবাগান-ইন্সটেব্গেলের খেলাতেও আহত হয়ে বসেছিলো সে! ভাগ্য ভালো, সে আঘাত গুরুতর ছিলো না।

তবু এই বয়েসে সুনীল ভট্টাচার্য মতোবার আহত হয়েছেন, কলকাতা ময়দানের অনেক পুরনো খেলোয়াড়কেই সহ্য করতে হয় নি ততো কষ্ট।

অল্প বয়েসে এতোটা পথ পেরিয়ে এসেছেন এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা কলকাতা ময়দানে খুবই কম! তবে যে ক'জন আছেন তাঁদের তালিকায় সবার ওপরেই বোধহয় লিখতে হবে সুনীল ভট্টাচার্যের নাম!

বয়স কতো? সবে কুড়িতে পা দিচ্ছেন সুনীল। কি সৌভাগ্য সুনীলের। শূদ্ধ স্বাধীন ভারতেই জন্মলাভ করেন নি, তাঁর জন্মের বছরটিও যে সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণঃস্মরণীয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই শহর কলকাতাতেই জন্ম সুনীল ভট্টাচার্যের।

তারপর কুড়িটি বছরও এখনো পোরে নি—কিন্তু সুনীল ভট্টাচার্য পেরিয়ে এসেছেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের অনেক জ্যোয়ার-ভাটা!

অথচ ঘেরা মাঠে আর সুনীল

পরিচায়ত্বে

খেলছেন ক' বছর! বছর তিনেক হবে বোধহয়! কিন্তু মাত্র এই তিন বছরে সুনীল যা করেছেন, সুনীল যা হয়েছেন—অনেক নামী ও দামী খেলোয়াড় পারেন নি সেই অসাধ্য সাধন করতে।

ময়দানী ফুটবলের আসরে সুনীলের পদাৰ্পণ এ্যালেন লীগের খেলাকে কেন্দ্র করে। তারপর এলো আন্তঃকলেজ ফুট-

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বল লীগ আর শীশু খেলার সুযোগ। আজো সুনীল আশুতোষ কলেজ ফুটবল দলের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়।

কলেজ দলের পক্ষে খেলার পর একটা



সুনীল ভট্টাচার্য

বছর কাটতে না কাটতেই সুনীল পেলেন ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ। এ সেই ১৯৬৪ সালের কথা। প্রথম বিভাগীয়

দল কালীঘাটে খেলোয়াড় তালিকা উঠলো আর একটি নাম—সুনীল ভট্টাচার্য।

সুনীলের বয়েস তখন ষোল! কিন্তু ষোল বছরের ছেলে সুনীল ভট্টাচার্য খেলার দেখা গেলো সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছাপ! তাই সেই বছর জুনিয়ার বাংলা দলের পক্ষে সহজেই পেলেন প্রতি-নিধি করার সুযোগ। পরের বছর সুনীল হলেন জুনিয়ার বাংলা দলের ফুটবল অধিনায়ক!

ওদিকে সুনীলের খেলা তখন চোখে পড়েছে অনেকেরই! উঠতি খেলোয়াড়-দের মধ্যে সুনীল ভট্টাচার্য তখন একটি নাম! আর সেই নাম আরো ছড়িয়ে পড়লো যখন ১৯৬৬ সালে ইন্সটেব্গল ক্লাবের আহবানে সুনীল চলে এলেন কালীঘাট ক্লাব ছেড়ে!

সেই বছর আরো বড় সুযোগ আরো বড় সম্মান লাভ করলেন সুনীল! জুনি-য়ার বাংলা দলের অধিনায়ক সুনীল ভট্টাচার্য হলেন ভারতীয় যুব-ফুটবল দলের অধিনায়ক। সেই প্রথম তাঁর বিদেশ যাওয়া। বিদেশ যাওয়া বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে!

কিন্তু ঐ বে সহায়-ভাগ্যের সংগে রয়েছে একটুখানি খুঁত। বিদেশে গিয়েও আহত হবার হাত থেকে তাই রেহাই পেলেন না সুনীল ভট্টাচার্য!

আর এই আহত হওয়াই আজ সুনীলের সবচেয়ে বড় অন্তরায়, সব চেয়ে বড় বাধা।

জ্যোতিষ জানলে বলতাম হয়তো শনির স্থানে একটু খুঁত, কিম্বা বৃহস্পতি দিচ্ছে বাধা—পাথর-টাথর নাও—ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু জ্যোতিষি তো নই—কীড়া-সাংবাদিক!

তাই পারি শূদ্ধ আশা করতে। অবশ্য কুড়ি বছরের সুনীল ভট্টাচার্য যে অনেকেরই অনেক আশার ফসল—সে কথা আজ বোধহয় আর কেউই অস্বীকার করবেন না! হয়তো খুব শীঘ্রই আমাদের সমস্ত আশা সফল করে সুনীল ভারতীয় দলে প্রতিনিধি করার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

বন্দোবস্ত :

কাশীরাজ পণ্ডিত ব্যাসাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত।
এক অঙ্কসে তাত্ত্বিকের প্রাচীন কলাপা পৃথিবী সংগ্রহশালা।
কাশীর কুটনস কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহাদ্বারের বিশাল
গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈদ্যসংগ্রহ :

ঐযৎ পরমহংস সনাতন যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মপাঠ
প্রচার-বৃত্তী উপেন্দ্রনাথ বুঝোপাধ্যায় অনুলিপি (অবোধিনী-
টিকা সংযুক্ত)। বেদের এই অংশই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান
বহুবিদ্যার দ্বিবার্তাভাষি: বিবাহিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোন্নয়ন :

বিশিষ্টানন্দ পরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিষয়-প্রসঙ্গ-সংগ্রহ :

ভারতীভীর্ষ বিরচিত। সুপণ্ডিত ঐপ্রমথনাথ তর্কতথ্য
অনুলিপি। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পদ। মূল্য—প্রতি
খণ্ড—১-০০ টাকা।

কল্যাণচর্চের প্রসঙ্গালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত
বাখ্য ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-০০ টাকা।
২য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগসাধন :

বিষয়সংহিতা, কেরণসংহিতা, বুদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-
সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, কতাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্,
পরমহংসপ্রোক্ত যোগোপদেশ। মূল্যপা সাতখানি যোগ
গ্রন্থের সন্নিবেশ। কাগজ ও বোর্ডে বঁধ।
মূল্য—৫-০০ টাকা।

ঐশ্বর্যবৃদ্ধিকার্য :

ঐশ্বর্যবৃদ্ধি পরমহংসদেবের ঐশ্বর্যনিঃসৃত অমিত
মিথ্যামিথী বাণী তত্ত্বপ্রবর উমাপদ বুঝোপাধ্যায় সঙ্কলিত।
মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ডে বঁধাই মূল্য—২-৫০
পয়সা।

সাক্ষ্যসংগ্রহ :

উপেন্দ্রনাথ বুঝোপাধ্যায় অনুলিপি—২-০০ টাকা।

জিহ্বাকাত-বারিষি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, গৃহি ও সর্বভূত হইতে সঙ্কলিত।
সংবোধিত সংশোধিত ও সংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু অঙ্গান ও অবদানসহ আহুত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে
বুদ্ধিত অর্থ সংকলনস্থান সঙ্কলিত বাহ্যতীয়া তথ্যপূর্ণ এই
বিষয়টি গ্রন্থপাঠ প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও মূল্যমূল্যে কিন্ত
হইতেছে। শীকা প্রকরণ, নিভ্রাকতা প্রকরণ, পূজা
প্রকরণ, ধ্যাননি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত্ত প্রকরণ,
যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মূত্রা প্রকরণ-সম্মিত মূল কিন্ত-
মূল্যে ৮৬০ পৃষ্ঠার সম্পদ প্রবর বহু। মূল্য—১০-০০
টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (বহুখণ্ড)।

তৃতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (বহুখণ্ড)।

পদ্য-বিষয়-সংগ্রহ :

বাহু জয়ই যে পর প্রো সাধনা। জুলোতিক সঙ্কত
নির্দেশক যোগক্রিয়ায় গ্রন্থ। মূল্য—১-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিদ্যার ঐসংকলার গারভোদয়ী প্রবীণ
দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—১-০০ টাকা।

আত্মসংস্কার :

ঐশ্বর্যবৃদ্ধিকার্য যোগের প্রবীণ। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-
নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুস্তক-উপদেশ :

(মূল্য তাত্ত্বিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)।
মূল্য—১-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য :

যোগীপ্রবর মহর্ষি ঐযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত,
বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসম্মিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ সাহায্য :

ঐকাশীমাহাত্ম্য, ঐগঙ্গামাহাত্ম্য, ঐবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য
ঐপ্রয়াগ মাহাত্ম্য, ঐকুল্লারন মাহাত্ম্য। মূল সংস্কৃত
পণ্ডিতপ্রবর ঐকাশীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—১-০০
টাকা।

সাদনা রবীন্দ্র সাদনা রবীন্দ্র



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
জকের যত্ন নিতে দেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপূরণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-টাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য



সাধনা
বিউটি
ক্রীম

সাপ্তাহিক বাসুমতী

কর্মব্যস্ত কলকাতার বিগত

সপ্তাহের একটি চিত্রকূপ



২০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ



2nd Nov., 1967 * Vol. 72, N

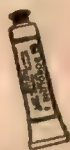
শীত

প্রতিদিন

বোরোলীন

ব্যবহার করুন

আপনার ত্বক মসৃণ, কোমল এবং নিরাপদ রাখুন
এই অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম।



বোরোলীন হাউস, কলকাতা-৩



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১২১৯
আজকের মানব		১২২০
সংগদর্শন		১২২১
অবজ্ঞা	— চন্দ্রগুপ্ত	১২২৪
সম্ভারের বোঝা	— কুন্তিবাস ওকা	১২২৬
নিবেদিতা (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	১২২৭
লোকমাতা নিবেদিতা (কবিতা)	— নন্দিতা ভৌমিক	১২২৭
ভারতদর্শন		১২২৮
সাম্প্রতিক		১২৩৩
বিশ্বমন্ডল দিনগড়াল	— হৈলোকানাথ চক্রবর্তী	১২৩৫
অমর্ত্যের নিবেদন (কবিতা)	— কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	১২৩৮
হা দেবেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরজল দাস	১২৩৯

—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অধ্য—

“যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
 ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
 কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
 ভাতিবে আবার লনাটে তোর;
 আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।
 গান্ধুয আমরা নহি তো মেঘ।
 দেবী আমরা! সাধন! আমরা!
 স্বর্গ! আমরা! আমরা দেশ!”

মাক্তমন্ডের স্বত্বিক, অপরাভেয় মানবমাহাত্ম্যের
 স্বপ্নদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড :

সাজাহান, সিংহলবিজয়, সোরাব রক্তম, পরপারে।

মূল্য—৬.০০

দ্বিতীয় খণ্ড :

বিরহ, সীতা, ভীষ্ম, বঙ্গনারী, আনন্দবিদায়।

মূল্য—৬.০০

তৃতীয় খণ্ড :

চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, কলিক অবতার।

মূল্য—৮.০০

(প্রতিটি খণ্ড মঙ্গল পারিপাটে ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কাপড় ও
 বোর্ডে বাধা। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যাকিট।)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২



বিষয়	লেখক	দাঁড়া
গ্রন্থমেলা		১২৪৪
ইয়েরোপা	— হিরশম ভট্টাচার্য	১২৪৬
ধারা-বর্ষণে (কবিতা)	— নীহারকান্ত ঘোষদাস্তিদার	১২৪৮
অনিয়তের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১২৪৯
পাক-ভারতের রূপরেখা	— প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	১২৫৩
নদী জপমালা (স্রমণ-কাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১২৫৬
প্রতিমূর্তি বিষয়ক (গল্প)	— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১২৬১
রংগমণ্ড—ওয়েশে এবং এদেশে	— শিলালি	১২৬৫
রংগজগৎ		১২৬৮
পাঠকমন		১২৭৩
খেলাধুলা	— প্রীতমিতান্ত	১২৭৭
পরিচয়	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৮০

বিভাদায়ের বই

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধের বিপ্লবাবলোনের স্মৃতিকথা

বিপ্লবের সন্ধান ১৩'০০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১০'০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫'০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পাণ্ডুরাম রাষ্ট্রসুন্দর ৮'০০

সুপ্রকাশ বারের

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ

ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ

প্রথম খণ্ড ১৬'০০

মোহনলাল গুপ্তের

ভারত মহিলা ৩'৮০

মোহিতলাল মজুমদারের

কবি শ্রীমধুসূদন ১০'৫০

সাহিত্য-বিচার ৮'৫০

বাংলার নবযুগ ৮'০০

সাহিত্য-বিধান ৯'৫০

বঙ্গ-বরণ ৬'৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

[১৮১৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত] ১০'০০

প্রকাশিত হল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা উপন্যাস

গোয়েন্দা হলেন

পরশুর বর্মা ৪'৫০

আগামী প্রকাশ

অনন্ত সিংহের লেখনীতে

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

নগেন্দ্রনাথ সোমের বহুশতাব্দী মহাগ্রন্থঃ

মহাকবি মধুসূদনের বিস্তারিত জীবনী

মধু-স্মৃতি

পূর্বে প্রকাশিত

নেপাল মজুমদারের

ভারতে জাতীয়তা ও

আন্তর্জাতিকতা এবং

রুবীন্দ্রনাথঃ প্রথম খণ্ড ১০'০০

আনা লুইস্ স্ট্রং-এর

শ্যালিন যুগ ৩'২৫

অবনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩'৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস ও গল্প

ড্যাগনের নিঃশ্বাস ২'২৫

শুদ্ধে যাত্রা গিয়েছিল ৩'০০

গল্প আর গল্প ২'২৫

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত ২'৫০

সুখলতা রাও-এর গল্পসংকলন

আলিভুলির দেশে ৩'০০

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পসংকলন

আমার ভালুক শিকার ৩'০০

চোরের পাল্লায়

চক্রবর্তি ৩'০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বড় গল্প

নাবিক রাজপুত্র ও

সাগর রাজকন্যা ২'০০

স্বপনবুড়োর গল্পসংকলন

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী ২'৮০

গোপেন্দ্র বসুর উপন্যাস

স্বর্ণমুকুট ২'৫০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা ২'৫০

শ্রীকথকাকুরের গল্পের বই

অথ ভারত কথকতা [মূলগ্রন্থ]



২২ নং : ২০শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
মহাসপাতবার, ১৫ই কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISA
Thursday, 2nd November, 1967

কৃত্রিম অভাব ও মজুতদার

পূর্ব রেলের একটি প্রেস নোট অভ্যন্তর চাওল্যকব। এতে কারবারী মজুতদারদের কারসাজি ফাঁস হয়ে গেছে। প্রেস নোটে কারবারীদের কীর্তিকলাপের কথা না বলা হলেও, এবং তাতে গুদাম থেকে মাল খালাস করে নেবার অনুরোধ থাকলেও এ ব্যাপার আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয় যে, মজুতদাররা অত্যধিক মুনফা লাভের আশায় পুজোর মরশুমে বিগত পনের দিন বেলের গুদামজাত মাল খালাস নেয় নি।

বলাবাহুল্য, মজুতদারের এ ধবনের জঘন্য কার্যকলাপ নতুন নয়। কয়েক বছর আগে তারা এভাবে পুজোর মরশুমে কাপড়ের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা লাভ করেছিল। অন্য সময়ে সরিষার বীজ ও খালাস কবে না নিয়ে সরিষার তেলের দাম বাঁধি করে দিয়েছিল।

আগের সপ্তাহেই (২৬/১০/৬৭) আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মজুতদার মুনফালোভীদের স্বাধা পণ্যবাহ্য মজুত করার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছিলাম। পূর্ব রেলের প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের তথ্যকে আরো দৃঢ় কবলো।

পূর্ব রেল প্রেস নোটে জানিয়েছেন যে, কয়েক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ, মধ্য এবং দক্ষিণ মধ্য রেলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে হাওড়ার জন্য বৃক কবা হয়েছিল—ডাল, জন্ডা, চুনি, জাগরি, গুড় প্রভৃতি। গত তিন সপ্তাহ ধবে এই সব দ্রব্য ভর্তি প্রত্যাহ ২৫০টি ওয়গান হাওড়ায় খালাসের জন্য জমা হচ্ছে। কিন্তু দৈনিক গড়ে ১৫০টি করে খালাস হচ্ছে। স্বভাবতই স্থানাভাবে ৮৫০টি ওয়গান মাল খালাস না

হওয়া অবস্থায় হাওড়া স্টেশনে জমে আছে। এর কোন কোনটিকে পনের দিনের বেশিও ফেলে রাখা হয়েছে। প্রেস নোটে এমন কথাও জানানো হয়েছে যে, ৬,৪৫০ টনেব বেশি মাল রাখার জায়গা নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁরা বাধ্য হয়ে দৈনিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার টন মাল রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গের লোক যখন অনাহারে ও অর্ধাহারে, বাজারে চালের দর কিলো প্রতি চার টাকা এবং ক্ষুধার্ত মানুষ চালে-ডালে কিংবা গমে-ডালে মিশিয়ে কোনোমতে প্রাসাচ্ছাদন করে বেঁচে থাকতে চাইছে, তখন মুনফা-জন্মেরীরা সমস্ত বৃক মাল খালাস কবে না নিয়ে যোগান ও চাহিদার সূত্র অনুযায়ী যোগান কম দেখিয়ে লাভের জন্য বর্ববোচিত কাজে লিপ্ত। অথচ এই সব অসামাজিক লোকের অমানুষিক কাজের বিবৃদ্ধে সরকারী তৎপরতা দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত আমবা ধন্যবাদ জানাই, পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষকে, কারণ তাঁরাই মজুতদারের মজুত করার বহস্যকাহিনী উন্মোচন করে দিয়েছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, পূর্ব রেল মজুত-কথা ফাঁস করে দিলেই মুনফালোভীরা আমদানী কবতে চাইবে না। অথচ এ কথা সবাই জানে, অন্যান্য রাজ্যে এবার ডাল সরিষার বীজ প্রভৃতি শস্যের ফলন খুব ভালো। সুতবাং এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে খাদ্যশস্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী হতে হবে। নচেৎ শিল্পপতিরা যেমন যখন-তখন কারবার গুটোবার কথা

বলে থাকে, মজুতদার ব্যবসায়ীরাও সেই-ভাবে সরকারকে ভয় দেখাবে। ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। মনে রাখা দরকার, গত বিশ বছর ধরে কৃত্রিম ঘাটতি দেখিয়ে অতি লাভ করতে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের মতিগতি রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব নয়।

আমাদের সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত কবতে পাববেন—এ কথা এক্ষণি ভাবা যায় না। কিন্তু পাবস্পর্শিক লেনদেনের ব্যাপারে জড়িত রাজ্যগুলি যদি ব্যবসায়ীদের উপর কড়া নজর রাখেন তাহলে—মুদ্রিকল আসান কিঞ্চিৎ পরিমাণে হতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা কববে কে? বিড়ালের গলার ঘণ্টা বেধে গৃহস্থকে সতর্ক করার কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য ন্যস্ত। কিন্তু যে সরকারেব এক বিরাট দল রয়েছে এবং সেই দল ধনিকের অর্ধদক্ষিণার উপর নির্ভরশীল সেই সরকার কাজের কাজ কতটুকুই বা কবতে পারবে?

আপাতত পশ্চিমবংগ সরকারেব কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা : তাঁরা কি মজুত কবাব কাহিনী কিছই জানেন না? খাদ্যশস্যের মতো নিত্যব্যবহার্য জিনিসকে যাবা গুদামে ভরে বেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি কবে তাদের কি পি, ডি, অ্যাঙ্কে ধবা যায় না, অথবা ঐ গুদামজাত মাল বাজ্যেপ্ত কবাও অসম্ভব?

সম্পাদকীয়

গোপালগোয়া

সিংহল ম্বাপ

সিংহল টিপ।

সমুদ্র-মেখলা সিংহল, নারিকেল
কুঞ্জবীথিতে ভরপুর সিংহল। অপরূপ
ভায় ছন্দ। আশ্চর্য সুন্দর। কবি
বলেছেন—

‘সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যান্ডি-
দলের নাচ’;

সেই ক্যান্ডিরই একজন শান্ত সৌম্য
মানুষ উইলিয়াম গোপালগোয়া। গোপালগো-
ওয়ার ভারতভ্রমণে তাই ভারতবাসীর
কাছে অত্যন্ত সুখের, গভীর আনন্দের
ব্যাপার। তিনি সিংহলের গভর্নর
জেনারেল। তবু রাজনীতি নিয়ে তাঁর
তেমন মাথা ব্যথা নেই। খুঁজে ফিরছেন
সিংহলের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন মিলন-
সূত্র; দুই দেশের ভৌগোলিক নৈকট্যের
জন্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

সিংহলের ‘ষে’ দিকেই চোখ মেলা
যায়, দেখা যায় বৌদ্ধমন্দির। সেই কবে
রাজর্ষি অশোক পাঠিয়েছিলেন মহেন্দ্র
আর সম্মিগ্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য।
কতো রাজ্য এলো গেল, তবু বুদ্ধের
দাণী খোঁদিত আছে বৌদ্ধমন্দির। হিন্দু
ধর্মও পরিভ্রান্ত হয় নি। সিংহলের
উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধমন্দিরও স্থান পেয়েছে
হিন্দুদেবতা। সেখানে মন্দিরের মধ্যে
দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গণে বুদ্ধমূর্তি, বাম
দিকে হিন্দু দেবতার উপাস্য মূর্তিসমূহ
প্রতিষ্ঠিত।

তাই দেখা গেল সিংহলের রাষ্ট্রপ্রধান
শ্রীগোপালগোয়ারকে রাজনীতি নিয়ে তুল-
কামাল করার পরিবর্তে বুদ্ধভক্তের ন্যায়ের
ভারতভ্রমণে নিরলসরত। গোপালগোয়া
স্বয়ং বোধি বুদ্ধের শরণ গচ্ছামি যিনি
উদ্ধারণ করতে পারেন, তিনিই যেতে
পারেন হিন্দুধর্মে একনিষ্ঠ ভক্তের মতো
বারণসীতে—যার একাদিকে বিস্বনাথ,
আর একদিকে সারনাথের মন্দির।

শ্রীগোপালগোয়া যে রাষ্ট্রের প্রধান
সেখানের প্রায় চতুর্থাংশও হিন্দু তামিল।
সমগ্র সিংহলের প্রতিভুরূপে তাঁর ভারত-
দর্শন তাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি
আমাদের কাছে ধর্মীয় পরিব্রাজকই নন,
রাষ্ট্রীয় পরিব্রাজকও। অন্যান্য সম্মানীয়
ভারতসফরকারীদের সঙ্গে শ্রীগোপালগো-
ওয়ার ভারতভ্রমণের পাখ্যকা, বৈশিষ্ট্য ও
তাপস—এসই মধ্যে অন্তর্নিহিত।

সিংহলের গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম

শ্রীগোপালগোয়া তাঁর এই সফরকালীন এক
সংবর্ধনার উস্তরেও বলেছেন : বহু
শতাব্দীর চেষ্টায় ভারত ও সিংহলের
ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বান্ধবতা
গড়ে উঠেছে। একথাও তিনি বলেছেন যে,
দুই দেশের ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্যই
সিংহলবাসীরা ভারতীয় জীবনধারার মূল
প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সিংহলের
সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে।

বস্তুত শ্রীগোপালগোয়া একটি পরি-
শীলিত মনের মানুষ। তিনি সংস্কৃতি-
চেতনাসম্পন্ন, ঐতিহ্যবাদী। এবং



শ্রীউইলিয়াম গোপালগোয়া

সাংসারিক আবর্তের মধ্যে থেকেও বলতে
পেরেছেন : বুদ্ধের শরণ গচ্ছামি।

এতদসঙ্গেও এমন মানুষকেও দেখা
গেল একদিন রাজনৈতিক জগতে
জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্যমান। শুধু কি
তাই, এই জ্যোতিষ্কটি সর্বোজ্জ্বল।
কারণ সিংহল রাষ্ট্রের কর্তব্য হতে হল
তাকেই। এই ‘হওয়ার কাহিনী’টিও কম
বিস্ময়কর নয়—যা সিংহলের ইতিহাসে
রাজনৈতিক উত্থান-পতনের এক চমকপ্রদ
কাহিনীরূপে বিরাজ করবে।

১৯৬২ সাল। জানুয়ারি মাস।
শ্রীমতী বন্দরনায়ক তখন প্রধানমন্ত্রী।

ঠিক এ সময় ফাঁস হয়ে গেল সামরিক
অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র। একে একে ধরা পড়ল
অনেক হোমরাচোমরা পুলিশ ও সামরিক
অফিসার। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন
গভর্নর জেনারেল সার অলিভার গুন-
ভিলকের নামও দেখা গেল অভ্যুত্থান-
কারীদের মধ্যে। তাকে গভর্নর জেনা-
রেলের পদ থেকে অপসারিত করা হল।

সেই পদে এলেন শ্রীউইলিয়াম
গোপালগোয়া।

রাষ্ট্রপ্রধান হলোই যে তাকে একমাত্র
তক বিশেষজ্ঞ হতে হবে এ ধারণা
ভুল। বরং রাষ্ট্রপ্রধান হবার বোগ্যে
তাঁরই সবচেয়ে বেশি যিনি জনজীবনের
ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সুখ
দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গোপালগোয়া
সবগুণাবিশিষ্ট এবং তাঁর মতো রাষ্ট্রপ্রধান
হবার যোগ্যতা খুব কম লোকেরই আছে।

সত্তর বছর বয়স্ক সৌম্যদর্শন এই
সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি ধাপে ধাপে উঠে এসে-
ছেন তাঁর দায়িত্বপূর্ণ বিশাল কর্মক্ষেত্রে।

অথচ তিনি কর্মক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ
হন, তখন রাজনীতি তাঁর আগ্রহ ছিল না।
দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন লেখাপড়ার
জগতে। নিজে লেখাপড়া শিখেছেন
ক্যান্ডির ধর্মরাজ্য কলেজ ও সেন্ট
এ্যান্টনীর কলেজে। তিনি সিংহল বিশ্ব-
বিদ্যালয়, বিদ্যালয়কার বিশ্ববিদ্যালয় ও
বিদ্যোদয় বিশ্ববিদ্যালয়—এই তিনটি
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

১৯২৪ সালে অর্থাৎ সাতাশ বছর
বয়সে শ্রীগোপালগোয়া সুপ্রীম কোর্টে
প্রাক্তর হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তারপর
দীর্ঘকাল ধরে তিনি পৌর প্রতিষ্ঠানের
কাছে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৭
সাল থেকেই তিনি পরোপদীর পৌর-
সেবক। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সাল
পর্যন্ত তিনি ছিলেন মেটলির আয়বান
কার্ডিনালের সদস্য। এবং এখানেই তিনি
ছিলেন ছ’ বছর ধরে চেয়ারম্যান। ১৯৩৯
সালে তিনি ক্যান্ডির মিউনিসিপ্যাল কমি-
শনার নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে
তাঁর উপর কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির
দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত
সেখানে তিনি কমিশনার হিসেবে কর্ম-
দক্ষতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন
করেন। তারপর এল ষাট বছর বয়সে তাঁর
অবসর। কিন্তু অবসর তাঁকে দেবে কে?
ডাক এল তাঁর কাছে কূটনৈতিক জগতের।
১৯৫৮ সালে তিনি চীনে গেলেন
সিংহলের রাষ্ট্রদূতরূপে। সেখানে তিন-
বছর অতিবাহিত করার পর তাঁকে পাঠানো
হল রাষ্ট্রদূতরূপেই ওয়াশিংটনে। সেখানে
ছিলেন মাত্র এক বছর। এরপর বৃহত্তর
জগতে তাঁর প্রবেশ। তিনি ১৯৬২ সালে
রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হলেন সিংহলের। তাঁর
নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসান হোল রাজ-
নৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও আকস্মিক উত্থান-
পতনের।

তিনি ভারত-হৃদয় জয় করেছেন মৈত্রী
ও সম্প্রীতির বাণী নিয়ে। আর তাঁকে
অন্তর দিচ্ছেন তাঁর সহধর্মিণী। যিনি
স্বামীর সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে যিনি
এসেছেন ভারত-ভ্রমণে।



পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় আবার স্থিতিবস্থা এসেছে। বিগত এক মাসের রাজনৈতিক ক্রশকারেন্টের জের এখন অনেকটা মন্দীভূত হয়েছে। গত শুক্রবার ২০শে অক্টোবর তারিখে মধ্যাহ্নসময়ী প্রীতিক্ষয় মন্থোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের এক সভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অটুট রেখে পূর্ণোদ্যমে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার এক সিদ্ধান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কোন কোন মহল থেকে এ ধরনের প্রচার শুরু হয়েছিল যে, মন্ত্রিসভায় নাকি আবার সংকট এসেছে। মধ্যাহ্নসময়ী ও উপমধ্যাহ্নসময়ীর পরস্পর বিরোধী বিবৃতি এই জাতীয় জল্পনা-কল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই কারণেই ফ্রন্ট পুনর্বীর আনুষ্ঠানিকভাবে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করে।

যুক্তফ্রন্টের ওইদিনকার সভায় মন্ত্রিসভায় গৃহীত খাদ্যনীতি সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা হয়। মন্ত্রিসভা বিশেষ কতকগুলি কারণে খাদ্যনীতি প্রণয়নের সময় ফ্রন্টের পূর্বতন সুপারিশগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। ফ্রন্টের অধিকাংশ দল মন্ত্রিসভার বক্তব্য শোনার পর মন্ত্রিসভায় গৃহীত নীতির প্রতিই মোটামুটি গম্ভীর জ্ঞাপন করেন। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ কলকাতার না থাকায় তাঁর তরফ থেকে সেচমন্ত্রী প্রীতিবিনাথ মন্থোপাধ্যায় মন্ত্রিসভায় গৃহীত খাদ্যনীতিটি যুক্তফ্রন্টের সভায় পেশ করেন।

মন্ত্রিসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, কতকগুলি বাস্তব অনুরোধ দেখা দেওয়ায় ফ্রন্টের সুপারিশের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নতুন খাদ্যনীতিতে চালকলগুলিকে শুল্কহার ডিসপেন্স সেলের জন্য ডি পি এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ, সীমিত ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসা করার সুযোগ এবং

প্রয়োজনের ভিত্তির নীতি বাদ দিয়ে জমির পরিমাণ ভিত্তিক লেডি ধার্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনুপাতিক লেডির হার পরে স্থির করা হবে।

যুক্তফ্রন্টের সভায় সুপারিশ জানানো হয় যে, ভাগচাষীদের লেডির আওতা হতে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে এবং ধার্য ভাগে চাষ করান তাদের ভাগের জমিতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের উপর লেডি ধার্য করতে হবে। ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সকল দলের সদস্যরাই জোতদাররা লেডি না দেবার জন্য যে চক্রান্ত শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট সুপারিশ করেছেন। নিবর্তনমূলক আটক আইনই হোক বা অন্য যে কোন প্রকার শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার স্বারা হোক জোতদারদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে না পারলে এবারের সংগ্রহ অভিযান সফল করা কঠিন হবে বলে সকলেই অভিমত দিয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট মনে করে যে, এই বৎসর সরকার নির্দিষ্ট দশ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের লেডি পূর্ণ করা সম্ভব।

জেলা শাসকদের প্রদত্ত বিবরণ

আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন খাদ্যনীতি ঘোষিত হবে ২৪ নভেম্বরের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর। তার আগে জেলা শাসক-গণের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। বুধবার ২৫শে অক্টোবর এই উদ্দেশ্যে রাইটার্স' বিল্ডিংয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে জেলা শাসকদের একটি আলোচনা সভা বসেছিল। জেলা শাসকদের প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায় যে, এই বৎসরে বন্যা ও খরা সত্ত্বেও ফলন আশাতীত ভাল হয়েছে। কিন্তু লেডি ব্যবস্থা কার্যকরী করার ব্যাপারে তিলমাত্র বিলম্ব ঘটলে এবারে আর উৎপাদকদের

হাত থেকে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব না।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা সরকারের খাদ্যনীতি সমর্থন করে কোন ক্ষেত্রে তাঁদের আপত্তি বহন করেনি, এবং কিছু নতুন সুপারিশও করেছেন। সাতজন জেলাশাসক তাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। এদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে, বাজার দর বাড়িয়ে না আনলে সবকিছু ঘোষিত নতুন সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেউ স্টেট সুপারিশ জানিয়েছেন যে, ২৫ই জানুয়ারীর মধ্যে যারা লেডি দেবে তাদের যেন মণ প্রতি চার টাকা বোনাস দেওয়া হয়।

জেলা শাসকরা প্রায় সকলেই কঠোর কড়িনং এমন কি জেলার মধ্যে ঘাটতি ও বাড়তি এলাকায় মধ্যে কড়িনং-এবং জন্য সুপারিশ জানান। বর্ধমানের জেলা শাসক ওই জেলার চাঁড়াকলগুলিকে নিদ্রা করার সুপারিশ জানান। চাঁচল পরগনার জেলাশাসক ধান ভানার জন্য তেঁকিকে কাজে লাগানোর জন্য খাদ্য দপ্তরের নিকট অনুরোধ জানান। প্রায় সকল জেলা-শাসক লাইসেন্সবিহীন হাঙ্গিং ঘোশিন-গুলিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কনিষ্ঠরা বলেন, সুন্দরবনের মত যে সকল দুর্গম স্থানে ফুড কর্পোরেশন, ডি পি এজেন্ট বা কো-অপারেটিভ কেউই পৌঁছাতে পারবে না, অন্তত সেখানে চালকলগুলিকে লেডির ধান সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হোক। জেলা শাসকদের কয়েকজন ফুড কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, ওই প্রতিষ্ঠানের মনোভাব সহযোগিতামূলক নয়। কো-অপারেটিভগুলি ১৯৬৫-৬৬ সালে যে ধান সংগ্রহ করেছিল তার

বাবদে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা ফুড কর্পোরেশন এখনো শোধ করেন নি।

বৃহস্পতিবার ২৬শে অক্টোবর তারিখে জেলাশাসক ও পদলিখ সদ্যপারদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় আমন ফসল সংগ্রহ কার্যে সম্ভাব্য বাধাগুলি নিয়ে আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে, খাদ্য সংগ্রহের কাজে যে কোন বাধাই আসুক না কেন কড়া হাতে তার মোকাবিলা করা হবে। আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে লৌহি অর্ডার জারী করা হবে। খানচাল সংগ্রহ মূল্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ধার্য মূল্য ছাড়া অন্য কোন মূল্য দেবার উপায় নেই, তবে বোনাসের ব্যাপারটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

খাদ্য সংগ্রহের কাজে জেলাগুলির চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্স বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা সংগ্রহকার্য সফল হলে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার চালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে। তাহলে গ্রামের চালের চোরা পথে শহরে আসা বন্ধ হবে এবং চালের দামও ঠিক রাখা সম্ভবপর হবে।

জোতদার-বর্গাদার প্রসঙ্গ

ধান তোলার সময় যে সকল জেলায় হাঙ্গামার আশংকা করা হচ্ছে, তার মধ্যে নদীয়া জেলার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর জেলার আইনশৃঙ্খলার এক শোচনীয় চিত্র মন্ত্রিসভার কাছে রেখেছেন। চাক্ষুশ পরগণা ও মালদহ জেলার শাসকেরাও আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, জোতদার ও বর্গাদারদের সংঘর্ষ থেকে মাঠের ফসল রক্ষার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা অনুযায়ী সরকার ফসল দখল করে মাঠ থেকে ফসল তুলে ফুড কর্পোরেশনের হাতে দেবেন এবং তারপর আদালতের মারফত ফসল বিক্রীর টাকা যার যা প্রাপ্য তদনুযায়ী জোতদার ও বর্গাদারদের দেওয়া হবে।

ফসল কাটার আগে ও ফসল কাটার মধ্যে যদি কোন দল বা ব্যক্তি সরকারের খাদ্যসংগ্রহনীতিকে বাধাচাল করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ও ১১৭ ধারা অনুযায়ী পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করার জন্য মধ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া ভূমি বিরোধ সমস্যা সমাধানের জন্য শিলিগুড়ির মত প্রতিটি জেলার ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনাস্থলে বিরোধী মাংসার জন্য ভূমিরাজস্বমন্ত্রী ক্যাপ্ট

কোর্টের সাহায্য নেবার প্রস্তাব করেছেন। জোতদার-বর্গাদারদের বিরোধ আপোষে মীমাংসা না হয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

খাদ্যদপ্তরের কমিশনারের বক্তব্য

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্মেলনে রাজ্য খাদ্যদপ্তরের কমিশনার মন্ত্রী বি আর গুপ্ত জানিয়েছেন। লৌহি ধার্য করার আগে অত্যাব্যবসায়িক পণ্য আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অনুমোদন প্রয়োজন তা এখনো রাজ্য সরকারের হাতে এসে পৌঁছায় নি। তবে মন্ত্রিসভার বক্তব্য এই যে, এই অনুমতি অত্যন্ত মামুলি ধরনের বলে পেতে কোন অসুবিধা হবে না। বাই হোক এই বিষয়ে খাদ্যদপ্তর তৎপর হয়েছেন। খাদ্য বিষয়ে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বর্ণনা করে শ্রীগুপ্ত বলেন যে, খাদ্যদপ্তর বর্তমান বৎসরে সেচ এলাকার মোট ৫,৯৭,০০০ মণ এবং অসেচ এলাকার ৮,০০,৮০০ মণ এই মোট ১৩,৯৮,০০০ মণ ধান লৌহি হিসাবে আদায় করবেন। জেলা শাসকেরা এই লক্ষ্যকে অব্যাহত বলে মনে করেন না। বাকি অংশটা ফুড কর্পোরেশনের দ্বারা সংগৃহীত হবে। শ্রীগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার চালের খুচরা বিক্রয় মূল্য বাড়তি এলাকার ১-০৮ পরসে কেজি এবং ঘাটতি এলাকার ১-৫০ পরসে কেজি হিসাবে ধার্য করেছেন। তিনি জানান যে, সরকার চাক্ষুশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ, কোচবিহার, পদলিখা ও বর্ধমানের আসানসোল মহকুমাকে ঘাটতি এলাকা বলে মনে করেন। তিনি আবও জানান যে, এইবারে সংগ্রহকারী এজেন্টদের কমিশনের হারও কিছু বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ১৮ পরসার স্থলে ১-০৫ পরসে করা হয়েছে।

খাদ্যনীতি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডীলারগণ কুড়ি টন পর্যন্ত চাল মজুত রাখতে পারবে। অবশ্য এক সঙ্গে দশ টনের বেশি ক্রয় করতে পারবে না। এই ডীলারগণ হাসপাতাল, হোটেল প্রভৃতি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ও মন্দির দোকানে চাল সরবরাহ করতে পারবে। নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও খাদের উপর চাল বিক্রয়ের ভার দেওয়া হয়েছে তারা হল লাইসেন্স ডীলার ও রেজিস্টার্ড ডীলার। এই ব্যবসা কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ রেশন বহির্ভূত এলাকায় চলবে।

— রেশন বহির্ভূত অঞ্চলের মফস্বল

শহরের ক্রেতাগণ মন্দির দোকানে চাল ক্রয় করতে পারবেন এবং গ্রাম অঞ্চলের ক্রেতাগণ মন্দির দোকান অথবা চাষীর নিকট থেকে চাল ক্রয় করতে পারবেন। কোন ব্যক্তি খোরাকের জন্য পাঁচ মণের বেশি ধান মজুত রাখতে পারবেন না।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এও স্থির হয়েছে যে, ভাগচাষীর উপর লৌহির নোটিশ দেওয়া হবে না। তবে কোন ভাগচাষী যদি বার একরের বেশি জমি চাষ করে, তবে তার উপর লৌহির নোটিশ পড়বে। আগামী জানুয়ারী মাস থেকে রাজ্যের ঘাটতি জেলা ও উদ্ভূত জেলার ঘাটতি এলাকাগুলিতে আংশিক রেশন চালু করা হবে। রাজ্য সরকার যত শীঘ্র সম্ভব সপ্তাহে মাথা পিছু বাইশ শত গ্রাম খাদ্যশস্য সরবরাহ করবেন।

[উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করেই এবারকার খাদ্যনীতি পাকাপাকিভাবে রচিত হতে চলেছে। জনসাধারণকে খাদ্যনীতির খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমরা এখানে সরকারী বক্তব্যসমূহ বিনা মন্তব্যে প্রকাশ করলাম। এই বিষয়ে আমাদের অভিমত কি তা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে জানানো হবে।]

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২১শে অক্টোবর তারিখে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে প্রতিপালিত হয়েছে। ১৯৪৩ সালের এই দিনটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে প্রথম আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মেই এই দিনের স্মৃতি জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুবই দূরত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে, আজাদ হিন্দ সরকার দিবস উদ্‌যাপন করার জন্য যে উদ্দীপনা জনসাধারণের নিকট থেকে আশা করা গিয়েছিল বাস্তবে ততটা ঘটে নি। জাতি হিসাবে এটা আমাদের নিকট খুবই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। ক্ষাণ্ণশক্তিতে যে দীক্ষা নেতাজী বসু জনগণকে দিয়েছিলেন, তার মর্যাদা রাখা সম্ভবপর হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন পার্টির উদ্যোগে এই বিশেষ দিবসটি বিভিন্ন স্থানে প্রতিপালিত হলেও সামগ্রিকভাবে কোন কিছুই করা হয় নি। নেতাজীর মত মানুষকেও যেন রাজনীতির দলের মাঝে ছেঁটে কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সভ্য দেশেই সেখানকার জাতীয় বীরদের কীর্তিকলাপের স্মৃতি বিশেষ বিশেষ দিবসে দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণ উদ্‌যাপন করেন। গত বিশ বছরে

আমাদের মানসিকতা যেন বক্ষা হয়ে গেছে। কাদের পাশে যে তা হয়েছে তার হিসাবনিকাশ করার সময় বেধ হয় গাভ্র সমুদ্রপাশ্চাত্য।

ন্যাশনাল মোভিক্যাল কলেজ

ন্যাশনাল মোভিক্যাল কলেজের পরিচালনা দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে গ্রহণ করা পর বিভিন্ন মহল থেকে এই বিষয়ে সরকারকে হেম কবাব প্রবণতা দেখা গেছে। অত্যন্ত সংগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কলেজটির পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং তা ফলে এখানে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত কাবোনি ম্বার্থ একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে। সংপ্রতি কয়েকজন চিকিৎসক-অধ্যাপকের উপর কর্মচ্যুতির নোটিশ আনাতে সেই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল কিছুটা সোরগোল ভোলাব প্রয়াস পেয়েছে। অথচ যাদের উপর কর্মচ্যুতির নোটিশ এসেছে সংগত কারণেই তা এসেছে, কেন না সরকারী আইন অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর প্রত্যেককেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। যাদের এভাবে অবসর নিতে বাধ্য করা হবে তাহলে তাদের বোগ্যভাব প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন কটাক্ষপাত করা হয় না। কিন্তু নিবনমাত্রিক কাজ করতে গেলে কাজের নিষমটাকে অবশ্যই মেনে নিতে হয়। তা ছাড়া অথর্ব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থল আঁকড়ে বসে থাকব অতীত কীর্তির দোহাই দিয়ে, তরুণতবদের জন্য কোন পথ করে দেব না এ দৃষ্টিভঙ্গীটা কদাপি সমর্থনযোগ্য নয়। উনগ্রন্থন এ হেন ব্যক্তিকে নাচিখে যারা জল ধোলা করার প্রয়াস পাচ্ছেন তাঁরা কিন্তু হতাশাই হবেন। এই বলিষ্ঠ নজীরটি সৃষ্টি করা জন স্বাস্থ্যদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে ধন্যবাদ।

তদন্ত চাই

বিজ্ঞানদশমীর রাতি থেকে এই সৈনিক সর্ঘন্ত ভাটপাড়া - জগন্মল - কাঁকিনাড়া অঞ্চলে যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে গেল সে বিষয়ে তদন্ত সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে জাতীয় নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করেছেন তা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। সমাজবিরোধীদের লীলাখল হিসাবে এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরেই কুখ্যাত। দিনে-দুপুরেও সাধারণ মানুষের পক্ষে অঞ্চলটি কোনদিন নিরাপদ নয়। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি এখানকার নিত্য-নিমিত্তিক ব্যাপার। স্থানীয় অধিবাসীদের তরফ থেকে ইতিপূর্বে এই সকল বিষয়ে কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল বহুবার, কিন্তু কোন প্রতিকার

হয় না। বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই বহিরাগত এবং যারা স্থানীয় তাহাই সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত। বহিরাগত লোকেরা স্থানীয় চটকলগুড়ির সঙ্গে কর্মসূত্রে সম্পর্কিত এবং তা ছাড়া শিকড়বিহীন অবস্থায় এখানে বাসকালে নানা প্রকার সমাজ-বিরোধী কাজেও অভ্যস্ত। প্রধানত ছিনতাই, রাহাজানি, লুটপাট, ওয়াগল ভাঙা এবং চোলাই মদের কারবারে এরা বর্তমানে শুবই সন্মুক্ত। স্থানীয় লোকেরা এদের অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবারেই নিগৃহীত হয়েছে, কেন না সংখ্যাগুরু দাগটে সংখ্যালঘুরা অসহায়। তদুপরি কংগ্রেসী আমলে এই সব সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে রাজনীতির খেলোয়াড়দের দাখিয়ারি হয়েছে, স্থানীয় পুলিশের সঙ্গেও এদের মহরম মহরম। গত বিজ্ঞানদশমীর রাতে চিকিৎসা উদ্দেশ্যে এবং কেন তা বলা যায় না এরা হাঙ্গামা

শুরু করে এবং স্থানীয় বহু লোক এদের শিকার হয়। তার পর থেকে এ পর্যন্ত এই দাঙ্গায় একশতের কাছাকাছি লোক নিহত হয়েছে। হত্যাকাণ্ডগুলির বীভৎসতা ১৯৪৬ সালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুসন্ধানের জন্য গেছে যে, ওখানকার চটকলগুড়িতে স্থানীয় অধিবাসীরা কর্মসূত্থানের জন্য দীর্ঘকাল ধরেই দাবি জানাচ্ছেন, ফলে ওই বহিরাগত লোকেরা, যারা চটকলগুড়ি পূর্ণ করে আছে, নিজেদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হবে বলে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাড়িয়েছে, প্রতিমা নিঃশন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, কেন না এটি একটি আতিবিশেষের নোচনীয় পরিণতির নিদর্শন এবং এর প্রতিক্রিয়া অন্যত্রও যে শীঘ্র দেখা দেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এটা শূন্য শেষ নয়।

(২৫-১০-১৫)



গৃহে নিয়মিত যক্ষ্মা-প্রতিষেধক ঔষধের পরিচর্যা চিকিৎসা স্যানিটোরিয়ারে ঐ সকল ঔষধ ব্যবহারের ন্যায় সমান ফলপ্রসূ। রোগীদের এই সকল ঔষধ ক্রয়ের ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বিনামূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে যক্ষ্মা-প্রতিষেধক ঔষধ দিতে হইবে। ইহা জন্য নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ অতাবশ্যক :—

- ১। প্রচুর পরিমাণ ঔষধ সমন্বিত সুসজ্জিত ও উপযুক্ত ষ্টাফ সমেত টি বি ক্লিনিকের সেবা। ক্লিনিকের ষ্টাফ দ্বারা গৃহের চিকিৎসা পরিদর্শন করাইতে হইবে ও ঔষধ অবশ্যই নিয়মিত গ্রহণ করিতে হইবে।
- ২। ক্লিনিকের সহিত প্রাইভেট ডাক্তার, অন্যান্য স্বাস্থ্য সংস্থা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।
- ৩। প্রধানতঃ ক্লিনিকের প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করা ও দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য দানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও রোগের সময়ে ও রোগোত্তীর্ণ কালে সেবা সংস্থাসমূহের সেবা।



বাধিক টি, বি, সীল বিক্রয় অভিযানে ইহা সময়। টি, বি, সীল ক্রয় করণ ও টি, বি, ব সহিত লড়াই করিতে সাহায্য করণ। একটি সীলের দাম মাত্র ১০ পয়সা।

১৮শ টি, বি, সীল বিক্রয় অভিযান

(ভারতের যক্ষ্মা এসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত)

স্বান বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক প্রদত্ত।

অবজ্ঞা

চন্দ্রশুভ্র

শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র ও পত্রিকা প্রসঙ্গ

মাথা না ধরলে আমি সিনেমায় বাই না, কারণ সুস্থ অবস্থায় সিনেমায় গেলে আমার মাথা ধরে। অন্য পক্ষে, সিনেমায় গেলে আমার মাথা ধরা সেয়ে যায়। দেশী-বিদেশী সব সিনেমা সম্পর্কেই আমার এই উক্তি সাধারণভাবে সত্য এবং খুব কম চলচ্চিত্রই অদ্যাবধি আমার বদ্বিষ্ণু ও বোধিকে সমান তৃপ্তি দিতে পেরেছে। সাহিত্য-চিত্র প্রভৃতি মহৎ শিল্পের সঙ্গে সংজ্ঞাভাজনের অধিকার সিনেমা কখনই পাবে না। সিনেমা আদ্যাত-ক্লান্ত, তাতে আর্টের ছোঁয়া লাগতে পারে, মাঝে মাঝে তাকে আর্ট বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু তা আর্ট কখনই নয়।

সম্প্রতি একটি বাংলা ছবি দেখতে হয়েছিল জনৈক বন্ধুর অনুরোধে। ছবির নাম 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'। আঠারো-উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবিবাল এণ্টনীর জীবন অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রকে অনেক দময়েই স্থিরচিত্র বলে মনে হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্যের কৃতিত্ব স্বয়ং পরিচালকের; কাহিনী দুর্বল, চিত্রনাট্য দুর্দৃষ্টি-পূর্ণ। স্বীকার্য, এণ্টনী কবিবালের জীবনচরিত্রের উপাদান সীমাবদ্ধ, হয়তো নগণ্য। তার লেখা কিছু গান, জনপ্রতি কিবদন্তী ও কিছু ঘটনা এই উপকরণের সাহায্যে বিস্মৃতপ্রায় এণ্টনীর জীবনকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র-কর্মী নয়। জীবনালেখ্য রচনা নগণ্য শিল্পকর্ম হলে লিটন স্ট্র্যাচী বা এমিল লাভিগের আবির্ভাব সম্ভব হতো না, অর্থে মরোয়ার শেলীর চরিত্রকথা পড়ে আমবা পরিতৃপ্ত হতাম না।

আলোচ্য ক্ষেত্রে চিত্র-পরিচালক স্বয়ং এণ্টনীর জীবনচরিত্র রচনার দূরূহ রত উদ্‌যাপন করতে গেছেন। তার ব্যর্থতার পরিচয় ছবিটিতে পরিব্যাপ্ত। ছবির শব্দরূপে এণ্টনী দর্শককে তার বংশপরিচয় জানাচ্ছেন। ছবি শেষ হচ্ছে 'এণ্টনী আজও মরে না, এণ্টনী তার নিরুপমাঙ্কে খুঁজে চলেছে'। ত্যাকার নেপথ্যভাষণে। এণ্টনীর বংশ-পরিচয় যেটুকু নাটকে প্রয়োজন, দর্শককে

অন্য ভাবেও জানানো যেত; আর নেপথ্য-ভাষণের মাধ্যমে কোন শিল্পীর ব্যা-বেদনাকে যে মূর্ত করে তোলা যায় না, পরিচালকের এ সামান্য শিল্পবোধের অভাব আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। নেপথ্যভাষণ দিয়ে যদি বেদনাবোধ ফোটাতে হয়, তবে 'দেবদাস' ছবির অন্তে নেপথ্যভাষণ করতে হয়, 'হে দর্শকগণ, আপনারা হতভাগ্য দেবদাসের জন্য একটি চোখের জল ফেলবেন।'

চলচ্চিত্রে চন্দ্রশুভ্রের আকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর, চলচ্চিত্র-সমালোচনা চন্দ্রশুভ্রের অধিকার কিস্থা ক্ষমতার বাহুবৃত্ত। কিন্তু সংস্কৃতি-কর্মী হিসাবে আলোচ্য চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে এবং সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র-স্রষ্টাদের জন্য চন্দ্রশুভ্রের কিছু 'অবজ্ঞা' আছে। জীবনী-লেখকের কাছে পাঠকের প্রাথমিক দাবি তথ্যনিষ্ঠা। দ্রুত তথ্য পরিবেশন বা তথ্য-বিকৃতি চরিত্র-কারের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' ছবিতে এণ্টনী একটি গানে বলছেন, ভোলা ময়রাকে বিদ্যাগার মাথায় ঠাই দিয়েছেন। এণ্টনীর কোন গানেই এই উক্তি নেই, কারণ ১৮৩৬ সালে এণ্টনী যখন মারা যান বিদ্যাগারের বয়স তখন ১৬ এবং স্বভাবতই বিদ্যাগার তখন 'বিদ্যাগার' হন নি। ভোলা ময়রার উদ্দেশ্যে বিদ্যাগারের প্রশংসাবারীর উচ্চারণকালে এণ্টনী পরলোকে—(বিদ্যাগারের উক্তি: 'বাংলা দেশের সমাজকে সঞ্জীব রাখবার জন্য মধ্যে মধ্যে রাম-গোপাল ঘোষের ন্যায় বজ্র, হুতোম পাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালায় প্রাদুর্ভাব হওয়া নিত্যান্ত আবশ্যক')। এণ্টনীর গানে এ উক্তি তাহলে কি করে সম্ভব? উত্তর মেলে ছবির টাইটেল বা নামালিপি থেকে। এই টাইটেল থেকে জানা গেল, চলচ্চিত্রখ্যাত একজন আধুনিক গীতিকারকে দিয়ে কিছু কিছু কবিগানের পাদপূরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত গীতিকারের চিন্তানৈপুণ্যে এণ্টনী ভোলা ময়রা এবং ঈশ্বরচন্দ্র

এককালে একসময় এসে বসতে বাধ্য হয়েছেন।

এইখানেই চন্দ্রশুভ্রের তীর প্রতিবাদ। 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' চিত্রের পরিচালক এবং আধুনিক গীতিকার মহেশ্বরকে প্রাচীন কবিগানে হস্তক্ষেপ কর্তৃক অধিকার কে দিল? প্রাচীন সাহিত্যকৃতিকে অবিকৃতভাবে উদ্ধার করার পরিশ্রম প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকমাত্রেরই সহজ অভিজ্ঞতা। যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু গবেষকের প্রচেষ্টায় প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধৃত হচ্ছিল, সেখানে প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধৃত হচ্ছিল ও হচ্ছে, সেখানে বিস্মৃতির স্বত্ব থেকে উদ্ধৃত কবিগানকে তাৎপর্গবেষক ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামনে আড়ালটারেট করার দৃশ্যহাস 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' নির্মাণেরা কোথা থেকে পেলেন? আর 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'-র অনেকগুলি কবিগান শুনে মনে হয়েছে, ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালক না থাকলেও চলত। চিত্র-পরিচালক ছবির এণ্টনী ফিরিঙ্গী বা ভোলা ময়রাকে যদি বলতেন, আপনারা আপনারা শ্রুতিমত গান করে যাবেন, তবে তাতে কিছু একটা ক্রান্ত হতো না। কে জানে, হয়তো তাতে লাভও হতে পারত।

'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' প্রসঙ্গে অনিবার্য-ভাবেই অকাল-মৃত সাহিত্যিক মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ছে। তিনিই প্রথম এণ্টনী কবিবালকে ইতিহাস ও কাহিনী-কিবদন্তীর আবহা-আলো প্রদেশ থেকে উদ্ধার করে জীবন্ত মূর্তিতে বাস্তবী পঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শব্দ করে সুনীলকুমার দে পর্যন্ত একাধিক গবেষকের পরিশ্রমের ফলে বাংলা কবিগানের ও কবিবালদের ইতিহাস আজ অনেকটা স্পষ্ট এবং তাঁদের সেই পরিশ্রম হয়তো মদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যগ্রাহ্য কল্পনার সাহায্যে 'কবিবাল এণ্টনী ফিরিঙ্গী' রচনায় উৎসাহিত করেছিল। মশে এবং চলচ্চিত্রে এণ্টনী ফিরিঙ্গীর আবির্ভাবের পূর্বে প্রকাশিত স্বগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটাই যে আলোচ্য মশে ও চলচ্চিত্র-শিল্পগোষ্ঠীর প্রধান প্রেরণা ও আকর্ষণ বলে তাতে সন্দেহ করার কারণ দর্শি না। এবং স্বতন্ত্র মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে কারা যেন মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-অবলম্বনে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আলোচ্য চলচ্চিত্র-গোষ্ঠী পূর্ণত অথবা অংশত জড়িত ছিলেন কি না জানি না।

যদি আসবে, কবিবাল এণ্টনীর জীবন অবলম্বনে শিল্পকর্ম রচনার অধিকার কারও ব্যক্তিগত নয়। আপাত-গ্রাহ্য এই যুক্তির উত্তরে চন্দ্রশুভ্র বলবেন, এণ্টনীকে সাহিত্যমূর্তি দেওয়ার কৃতিত্ব যেহেতু মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা পালিত্বের, সে কারণে স্বগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির কাছে আলোচ্য মশে

এবং চলচ্চিত্র-গোষ্ঠীর স্বর্ণ স্বাকার অবশ্য ফর্তব্য ছিল। স্বর্ণ স্বাকারে মহত্বেরই প্রকাশ এ কথা তাঁরা অনায়াসেই দর্শক-জাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন।

কবিগান জ্যাডালটারেশনের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে মনে হচ্ছে, কি জৈবিক কি মানসিক সর্ববিধ খাদ্যেই আজ ডেজাল, হুসহ ডেজাল। রেকর্ডে রৌডিওতে পল্লী-শব্দিত নামে যা শোনা যায়, তাতে কিশোরীয়া গানের সুরের ডেজাল; বাংলা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে উপন্যাস নামে যা পরিবেশিত হয় তা আসলে ডেজাল বড় গল্প; ‘আধুনিক’ মলে যে-সব কবিপদ্যগব চীৎকৃত, তাঁরা আসলে কবি না প্রচার-শিল্পী আর তাঁদের মনো কবিতা না কবিতা-গবিতা কোন বিচিত্র বস্তু হীমান পাঠকের তাতে লম্বেহ; সাহিত্য-সমালোচক সমালোচনার নামে পাঠকদের যা উপহার দিচ্ছেন তা না-সাহিত্য না-সমালোচনাজাতীয় এক উদ্ভট ডেজাল, তাতে নতুন আরবিকার বা পুরনোর মূল্যায়নের ক্ষণভঙ্গ চেপ্টাও অনুস্পন্দিত। অতএব আমার পূর্বের একটি মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলি : বাংলাদেশ আজ যথার্থই সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য প্রদেশের কথা বলতে পারব না, বোম করি সে সব জায়গার সাংস্কৃতিক অবস্থা এখানকার চাইতে খুব একটা ভালো নয়।

অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষে শিল্প-সাহিত্যের উন্নতির জন্য সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। সাহিত্য আকাদেমী ললিত-কলা আকাদেমী ইত্যাদি হরেক শিল্পোন্নয়ন-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; রবীন্দ্র-পুর্স্কার আকাদেমী পুর্স্কার, লেখিত-পুর্স্কার ইত্যাদি নানা পুর্স্কারের সলো সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য অসংখ্য বৃত্তি প্রবর্তিত হয়েছে। এব সংগে যুক্ত হয়েছে নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পপোষকতা যেমন, জ্ঞানপীঠ সাহিত্য-পুর্স্কার বা পশ্চিমবাংলাব নানা পত্র-পত্রিকা প্রবর্তিত সাহিত্য-পুর্স্কার। কিন্তু সরকারী বেসরকারী এত শিল্প-পোষক প্রচেষ্টার সত্ত্বেও ফলে কুড়ি বছর আগের অবস্থা থেকে ভারতীয় শিল্পসাহিত্য কতদূর এগিয়েছে? নৈরাশ্যজনক শোনাতেও চন্দ্রগুপ্ত বলতে বাধ্য আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতি—আশাহতরকমের আকিঞ্চৎকর।

এই দুর্ঘটনার দুটি প্রধান কারণ, সাহিত্য-আকাদেমী জাতীয় সরকারী

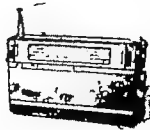
সংস্থাগুলি মানসিকভাবে (অনেক দৈহিকভাবেও) জরাগ্রস্ত অকর্ষণের জীবা-কল্প। এই সব সংস্থায় যিনি-বা কখনও দু-একজন তরুণ বা তবুদ্যমী প্রেরের অনুপ্রবেশ ঘটে, তাঁরাও দু-চারদিনের মধ্যে স্থবির হয়ে পড়েন। এই সব সংস্থার সদস্যগণ কিভাবে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের দক্ষিণ্য বিতরণ করেছেন, জনসাধারণের কাছে হীত্বাঘ্যে তা নানাসূত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ফলত সাহিত্য বা ললিতকলা-আকাদেমী এতাবৎকাল সাহিত্য-শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব করার পরি-বর্তে কিছু কিছু ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নতির কারণ হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। স্বতীয়ত, যাদের যথার্থ আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন, সেই তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রতি এই আকাদেমীগুলি আশেব পরাম্ভুষ। মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে একটি বেতার সাক্ষাৎকাব্যে আকাদেমী পুর্স্কার কবি বিষ্ণু দে সাহিত্য-আকাদেমীর পুর্স্কার দানের নীতি পবিত্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, আকাদেমী পুর্স্কারের ৫০০০ টাকা যদি ৫ জন তরুণ সাহিত্যিককে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে তারা নানাভাবে উৎসাহিত হতে পারে; যেমন এতে গ্রন্থপ্রকাশে অক্ষম কোন কবি তার গ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হবে। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শে দিল্লী কলকাতার কর্তারা কান দেন নি। ফলে আকাদেমী বা রবীন্দ্র-পুর্স্কার আজও বিগতক্ষম জরিস্ত সাহিত্যিকমীদের মধ্যে বিতর্কিত হচ্ছে। দৈবাৎ দু-একজন সুভাষ মন্থোপাধ্যায় বা উপল দত্ত সাহিত্য বা সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর পুর্স্কার পেয়ে যান, কিন্তু সে পুর্স্কার দানের পিছনে শিল্প-বহির্ভূত কারণই সক্রিয় ছিল বলে শুনছি। পুর্স্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও মোটামুটিভাবে সরকারী নীতি অনুসরণ করে থাকেন, ফলে অদ্যাবধি খুব কম তরুণ শিল্পীই সে সব পুর্স্কার পেয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে এ সব পুর্স্কার প্রবীণদের ‘বনসোলেশান প্রাইজ’, আকা-দেমী রবীন্দ্র ইত্যাদি বৃহৎ পুর্স্কার অর্জনে ব্যর্থ বা অদূর ভবিষ্যতে পাবার আশা রাখেন না এমন প্রবীণরাই এ সব পুর্স্কার পেয়ে থাকেন।

পুর্স্কার প্রদানের নীতি প্রায় হাস্য-কর হয়ে দেখা দিয়েছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সত্যজিৎ রায় প্রতি বছরই চলচ্চিত্র-পুর্স্কার অর্জন করেন। সত্যজিৎ রায়ের বিশিষ্ট অনুরাগী হওয়াও চন্দ্রগুপ্ত বলতে বাধ্য, প্রতি বছর সত্যজিৎ রায়ের লেখিত-পুর্স্কার লাভ একদিকে যেমন বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের দৈন্য সূচিত করে, অন্যদিকে তেমনই আগামী দিনের চলচ্চিত্রের নিরুৎসাহের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। পাঠক কল্পনা করুন, গোবল পুর্স্কার কমিটি বর্নিত শ বা এলিয়টকে তাঁদের জীবিতকালে বারংবার প্রাইজ দিয়ে চলে-ছেন। ‘ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের আদন প্রস্টার মন্ডলে’ (যদিও প্রতি বছর নিয়মমাত্তিক চিত্রনির্মাণের যান্ত্রিকতায় সত্যজিৎ রায় সেই মন্ডল থেকে চমক দু-সরে আসছেন বলে চন্দ্রগুপ্তের ধারণা) এ কথা স্নেহেও বলব, সরকারের যেমন প্রতি বছর সত্যজিৎ রায়কে পুর্স্কার দেওয়া উচিত নয়, কখনও কখনও সে পুর্স্কার প্রত্যাখ্যানে সত্যজিৎ রায়ের শিপিগনের পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যে-শিল্পকর্মে সত্যজিৎ প্রস্টা হিনাবে তুট নন, কিন্তু যা সরকার কর্তৃক পুর্স্কার, সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ যদি পুর্স্কার প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি মহৎ শিল্পী বলেই নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ পাবেন। কারণ এ মহা-মান্যরা তাঁকে পুর্স্কার দিচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশের বিচার-বুদ্ধির পরিচয় সত্যজিৎের অজানা নেই। সত্যজিৎ জ্ঞান, তাঁকে তাঁরা পুর্স্কার দিচ্ছেন তাঁর ধ্যানের মোহে এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য লোকভায়ে অর্থাৎ পুর্স্কার না দিলে পাছে নোকে তাঁদের বিচার-বুদ্ধিতে সন্দেহ করে। এক এক সময়ে শঙ্কা হয়, যে-বছর সত্যজিৎ কোন ছবি করবেন না, সেই বছরও এই মহামান্যরা সত্যজিৎ রায়কে পুর্স্কার না দিয়ে বসেন।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

২৫৫ টাকা মূল্যের ৩ ব্যান্ড অল-ওরাল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার “এসকর্ট” মাসিক ২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।



Japan Agencies (BW-77) Post Box 1194, Delhi-6.

মস্তাহের বোঝা

হুত্তিবাস ওয়া

হুত্তিবাস সরকারের নতুন খাদ্যনীতি প্রসঙ্গে

“হাজার চাষী লাঠি আর কাস্তে নিয়ে মাঠে নামল, ক্ষেতের সব ধান কেটে খামারে নিয়ে এল, প্রথম সংগ্রামের ধান ছিল ‘তেভাগা’—ফসলের তিন ভাগ, কিন্তু ভাগচাষীরা লাঠির জোরে পুরো ফসল আদায় করে নিল। এতকালের শোষক, উৎপীড়িত জোতদারগোষ্ঠী আর লাট-দারেরা অনেকে লাট ছেড়ে পালাতে লাগল এবং চাষীরা সমস্ত জমিজমা দখল করে ফেলল। লয়ালগঞ্জ আর বৃন্দাখালিতে ক্ষেতমজুরেরা লাঠির জোরে জমি দখল হবে তাদের বাঁশের ঘর তৈরি করল।..... সমস্ত কাকশ্বীপের লাটদার আর জোতদার গিয়ে ইংরেজ শাসকের পাষে মাথা কুটে হাগল বাঁচবার জন্য—বিরাত পুলিশবাহিনী এসে কাকশ্বীপ ছেড়ে ফেলল; লালগঞ্জ, চন্দনপাড়ি, রাজনগর, বৃন্দাখালি আরো অনেক জায়গায় সশস্ত্র পুলিশক্যাম্প করা হল। ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরেরা সাঠি-ক্সম আর তাঁর-ধনুকের জোরে

জোতদার-মহাজনদের জমি আর ঘরবাড়ি দখল করে নিল। তাদের পোষা গুঁড়ারাও ভয়ে পালিয়ে গেল। দাঁড়িপত্র পড়িয়ে চাষীরা তাদের দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করে দিল। এমনি করে নেতাদের সাহায্যে চাষীরা বাড়ি জমি-স্বত্বিকছুর মালিক হল—কিন্তু তারা জানত জোতদার-মহাজনেরাও চুপ করে থাকবে না—আসবে পুলিশ, আসবে রাইফেলধারী মিলিটারী। উত্তম পক্ষই মুখোমুখি সংগ্রাম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। একদিন হল সেই দিন—সেই মুখোমুখি দাঁড়বার দিন। প্রথম দিনে চাষীদের ভয়ঙ্কর মর্তি দেখে মাপ চেয়ে পালিয়ে গেল পুলিশবাহিনী। পুলিশ আর গুঁড়া সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরল অশ্বিনী, বাতাসী আর উত্তমী, মরল গভর্ভতী অহল্যা। তবুও মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। কুক্কের রক্তের স্রোতে ধানের ক্ষেত পর্বন্ত লাগ হয়ে গেল। পুলিশ আর গুঁড়ারা আধমরা

আর মৃতদেহগুলিকে রাইফেলের সঙ্গীনে গেথে টেনে নিয়ে গেল।...পরদিন আরও কুড়িটি মেয়ে সকালবেলায় মাঠে নামল—প্রথম সূর্যের আলোয় ধারালো কাস্তের ফলাগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল—পুলিশ গুঁড়াদের কেউ তাদের কাছে এগোতে সাহস করল না। প্রত্যেকে এক অঁটি করে ধান কেটে নিয়ে ঘরে ফিরল। এ বছর চন্দনপাড়িতে এই একটি দিনই মার ধান ঘরে গেল।.....”

উপরের এই দীর্ঘ বিবরণটি কোন বাস্তবধর্মী হাল আমাদের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রহণ করা হয় নি অথবা কল্পনা আশ্রয়ী কোন ঘটনার বিবরণও নয়। এই বিবরণটি একদা দক্ষিণ বাংলার কাকশ্বীপ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন করে যে সংগ্রাম শুরুর হয়েছিল তারই বিবরণ। তেভাগা আন্দোলন শুরুর হয়েছিল ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে—শেষ হয়েছিল স্বাধীনতা পাওয়ার দুই বছর পরে। অর্থাৎ কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম যে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল সেই বিদ্রোহ ঘটেছিল কাকশ্বীপের লয়ালগঞ্জ সহ কয়েকটি গ্রামে। যে গ্রামগুলিকে সোঁদিন প্রায় মৃত্যুশূল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। লয়ালগঞ্জের নাম পাণ্ডে রাখা হয়েছিল লালগঞ্জ।

আজ এই পুরনো দিনের রিপোর্ট ও রিপোর্টাজগুলি চোখের সামনে রেখে এই কথাই মনে পড়ছে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কি এই নতুন ফসল ওঠার মধ্যে এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হবে? সোঁদিনও নতুন সরকার গাঁদিতে বসে ভাগচাষীর সংগ্রামের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল, ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে। বর্তমান সরকারকে কি একইভাবে ভাগ চাষীদের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে? এ প্রশ্ন নিতান্ত আকস্মিকভাবে মনে আসে নি। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথম ফসল উঠবে—দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সব চুটি ও ডুলকে ক্ষমা ও সহ্য করেছে এই নতুন ফসলের কথা চিন্তা করে। দেশের মানুষ জানে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল খাদ্যশস্যের শূন্য ভান্ডার হাতে নিয়ে। তাই গত আটমাস মানুষ পাঁচ টাকা কিলো চাল কিনেছে—অনাহারে কুকড়ে থেকেছে—তবু এই সবকাবের বিরুদ্ধে কোন বড় রকমের উগ্মা প্রকাশ হবে নি। শৃঙ্খল একটিমাত্র কারণে। সে কারণটি হল এই

দীপালীতে বিনামূল্যে উপহার



বিখ্যাত কাম্মীর শাল, প্রমাণ সাইজ,
মনোরম ডিজাইন ও রং। ১খানি ৮ টাকা,
২খানি ১৫ টাকা, ৩খানি ২২ টাকা,
ডিল্যুজ কোয়ালিটি ১২ টাকা, ২খানি ২২ টাকা,
৩খানি ৩১ টাকা, ৪খানি ৪০ টাকা।

দ্রষ্টব্য: ২খানি শালের অর্ডার দিলে
বিনামূল্যে সিলেক্ট স্কাফ/লেডী পার্স
পাঠানো হয়। স্টক সীমাবদ্ধ।

MAHALAXMI (SHAWLS-22)

G. B. Road, Delhi-6.



নিবেদিতা

জয়ন্তী সেন

চির অনির্বাক্য শিখা দীপ্তিময় অনন্ত সবিভা
শতাব্দীর অন্ধকারে সূর্যভেজে আত্ম-নিবেদিতা
বিভাসিত পুঞ্জজ্যোতি দৃষ্টনেত্র বিশ্বাসে সজীব
ছন্দয়ের অমঙ্গল কল্পনায় তুমি মূর্ত শিব
কল্যাণে সৃষ্টিস্থ রূপ—প্রেমে মগ্ন—বিষাদে করুণ
আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত স্মৃতিশেষে দীপ্ত নবায়ন
আশীর্বাদে রেখে গেছো—রূপভ্রষ্ট বিশীর্ণ প্রান্তরে
হৃষ্টহীন প্রতীকার অবসান সত্য প্রহরে।

সজীবন বীজমণ্ড-আলোকিত—সে তোমার নাম
জ্ঞানিতে আহত যুগ প্রত্যাশায় জানায় প্রণাম।

লোকমাতা নিবেদিতা

নিমিত্তা ভৌমিক

হে ভারতবর্ষ, তুমি জেগে ওঠো। আজো কি জাগর
কেউ নয়! কী আশ্চর্য! কোটি কোটি অস্পৃশ্য অশ্রুতি
আহরিত বিষভাণ্ডে হাত রেখে আত্মার অশ্রুতি
আচরিত ধর্ম বিগলিত প্রাণ। শতাব্দীর পর।
সাংবাদিক দিগন্তে। রাজনীতিবিদ স্বয়ম্ভর।
কে আর কল্পনা করে কালিদাস কিংবা বরহমিহ
অথবা রবীন্দ্রনাথ। স্মরণ্য প্রবন্ধ নেগুটি।
কোথায় জাগ্রত মন্ত, মানুষ্যের বরাভয় বর?

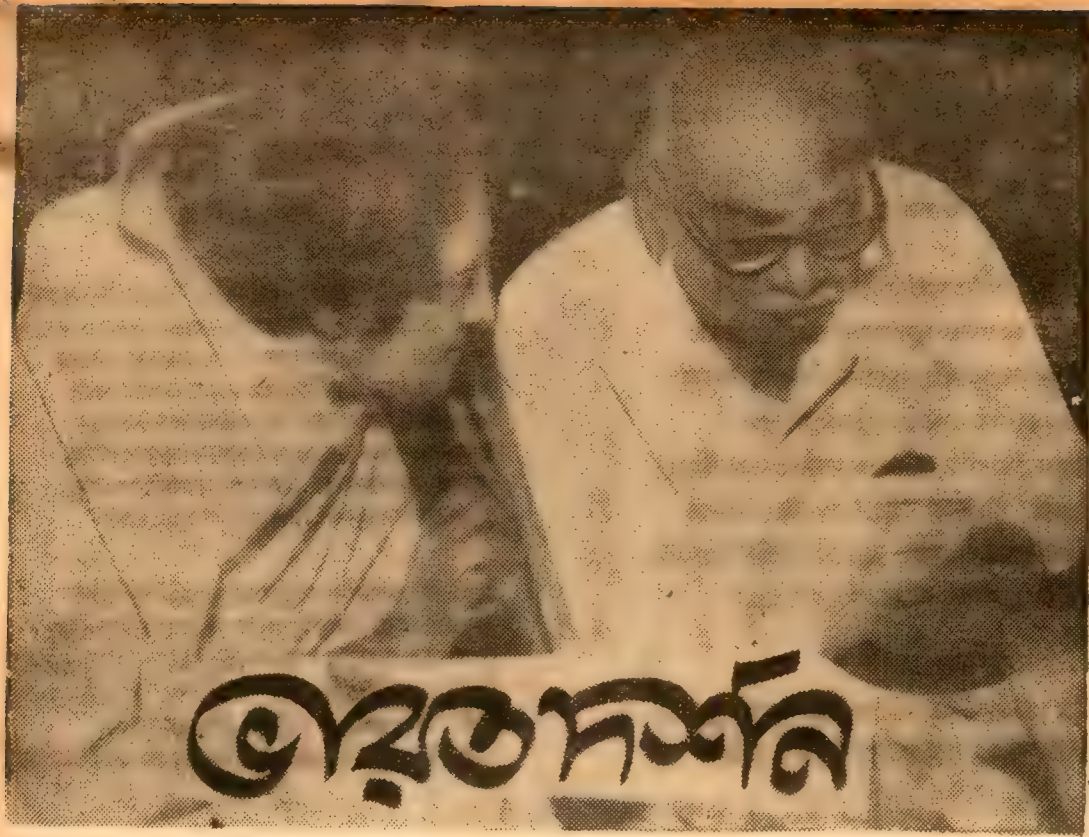
সবচেয়ে বিশ্বাস বা আমাদের কালে—ইতিহাস
লেখে ভাড়াটে লেখক, গায়ো গণতন্ত্র নামাবলী।
যতো লোক বৃষ্টি হয়—ততো বাড়ো যুগা অশ্রুতি।
ভিক্ষা আছে শিক্ষা নেই, অর্থ স্বার্থ চালিত, উল্লাস।
এই যে ভারতবর্ষ—তাকে হারা রক্তের অঞ্জলি
দিল তারা কে? কে যেন গ্রন্থ করে, কে সে নিবেদিতা!!

নতুন ফসল ওঠা পর্বত সরকারকে সম্ম
দেওয়া। নতুন ফসল উঠছে—আর মাত্র
কয়েকদিন পরেই নবায়ন। যুক্তফ্রন্ট সর-
কারে ভাগ্যগুণে এবার ফসল হয়েছে
বিগত বহু বৎসরের তুলনায় অনেক ভাল।
যদি এই ফসল ঠিকভাবে চাষীর ঘরে
ধায়, ন্যায্য দামে চাষীর কাছ থেকে সর-
কার সংগ্রহ করতে পারে তবে দীর্ঘদিন
পরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কয়েকমাস
পেটভরে খেতে পাবে। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট
সরকার সম্ভবত মানুষের এই চিন্তা-
ভাবনাকে রূপ দিতেও কম আগ্রহী নন।
কিন্তু সদিচ্ছা থাকলেই যেমন সব সময়
রূপায়ণ সম্ভব হয় না, তেমনি বহু পাগল
থাকে যারা কোনক্রমে নিজের ভাল বোঝে
না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে
যুটি উপগ্রহই প্রকট। সদিচ্ছা রূপায়ণে
অসম্মতা বাধা। এ বাধা আছে চোন্দ দলের
সরকারের শরিকী ভাবনা-বৈচিত্র্য ও বিবাদ
এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার মধ্যে। রাজ্যের

যুক্তফ্রন্ট সরকার জানেন তাঁদের জীবন-
কাঠি আছে এই খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের
মধ্যে। কিন্তু নতুন ধান কাটা শুরু হয়ে
গেল। অথচ খাদ্যনীতি এখনও পর্বত
সঠিকভাবে স্থির করা হল না। যদিও
বহু টানা পোড়েনের মধ্যে নীতি একটা
স্থির হল সে নীতি ব্যাখ্যার আবার এক-
এক দলের এক-এক মত। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী
জোর গলায় বলে দিলেন বিরোধ দেখা
দিলে ধান পণ্ডায়েতের খামারে তোলা হবে।
মন্ত্রিসভার মধ্যে থেকেই এই প্রস্তাবের
বিরোধের সুর ধ্বনিত হল—আবার মন্ত্রি-
সভার একটি শরিকের কিছু অনুগামী
কৃষক সম্মেলন করে প্রায় ঘোষণা করলেন
জ্যোতদারের ন্যায্য পাওনা কোনক্রমে এদিক-
ওদিক করা চলবে না। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট
পার্টির নামে পরিচয় দিয়ে নকশালবাদী-
পন্থী কম্যুনিষ্টরা ঘোষণা করলেন পণ্ডা-
য়েতের খামার মানেই জ্যোতদারের খামার
—অতএব একদানা ধানও পণ্ডায়েতের

খামারে তোলা হবে না—সব ধান ঘাবে
চাষীর ঘরে। জ্যোতদাররা আবিহমান কাল
ধরে চাষীকে বঞ্চিত করে ধান ঘরে তুলছে
—এবার চাষী নিজের ঘরে ধান তুলবে।
যারা সরকার চালাবার নামক এ হল
তাঁদের দোদুল্যমান মানসিক অবস্থার
রূপ। এরপর আছে ব্রিটিশ আমলের
পূর্বনো জং-ধরা অকেজো প্রশাসন যন্ত্র
—যে যন্ত্রকে নাড়তে গেলে সরকার নড়ে
ধায়, কিন্তু যন্ত্র নড়ে না। লেভি অর্ডার
থেকে শুরু করে ধান সংগ্রহ পর্বত সমস্ত
কাজ যে প্রশাসনের পরে নির্ভর করে সেই
প্রশাসন এমনই অচল যে শত সদিচ্ছা
থাকলেও তাঁদের দিয়ে জনকল্যাণমূলক
কাজ করানো প্রায় অসম্ভব। এই বিভিন্ন-
মুখী প্রতিকূল অবস্থা সম্মুখে নিয়ে
যুক্তফ্রন্ট সরকারের নতুন খাদ্যনীতি চালু
হতে চলেছে। তাই বারে বারে মনে পড়ছে
সেইদিনের লালগজের কথা।

[চলবে]



জনগণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মন কামরাজ ও ইন্দিরা গান্ধী

ভাষতদর্শন

জনগণের নির্বাচনী রায়কে তোরাক্ষা না করে ইচ্ছে মত এবং সুবিধা মত দল-বদল করার হিড়িক দেশে শাসন সংকটকে কোন পর্বায় টেনে নিয়ে যেতে পারে, সীমালত রাজ্য মণিপূরে উপহার দিয়েছে তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

প্রথম কংগ্রেসছোট সদস্যরা যে বৃত্ত-ফ্রন্ট গঠন করলেন তার সদস্য সংখ্যা ছিল সতের, বিরোধী কংগ্রেসের বইল পনের। কিন্তু দলবদলের মারাত্মক সুবিধাবাদ পুনশ্চ জনৈক ফ্রন্ট সদস্যের সামনে অধিক-তর লোভের 'চার' ফেলায় তিনি পুনরায় একটি লক্ষ্য প্রদান করে কংগ্রেসী জালে আশ্রয় নিলেন। এই মত হুপ হাপ উল্লেখ্যদের ফলে বিধানসভার দুইপক্ষের শক্তি হল সমান সমান।

গদির জন্য টাণ্ড অব ওয়ার সূত্রায় নতুন আমেলা পাকিরে তুলল। কংগ্রেস বললে হাতশক্তি পুনরুদ্ধারের পর ফ্রন্টকে আর মল্লিঙ্গ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আনো অনাস্থা প্রস্তাব। কংগ্রেসী প্রস্তাব অতঃপর স্পীকার মশায় সভাস্থ করলেন আর সপে সপেই অতীতপূর্ব পরি-স্থিতিতে দম নেওয়ার জন্য অধিবেশন

তেইশে অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা হল। কিন্তু অহিরাবণ মহীরাবণের মধ্যে রেফারীর কাজ করবেন কে। স্পীকার ডেপুটি স্পীকার প্যানেলভুক্ত সভাপতি-বৃন্দ খড় খড় পদত্যাগ করে চম্বিশে তারিখ একটি কান্ডারীহীন সভার ইতিহাস সৃষ্টি করতে বাধ্য হলেন। তাজব ব্যাপার। এমন লাইনবন্দী পদত্যাগের হিড়িকে বিমূঢ় সভার আর অধিবেশন চলে না।

মণে এলেন চীফ কমিশনার। সভা চালাতে হলে সভাপতি চাই। হটগোল যথা নিয়ম। অর্থাৎ সেই যে:

কি রি কাচা কাচা
কি রি কাচা কাচা :
খালি কেন মাচা
খালি কেন মাচা,
সভাপতি কৈ ?

সভাপতি চাই। চীফ কমিশনার উভয় পক্ষকে নাম প্রস্তাবের অনুরোধ জানিয়ে বিফল হলেন। কিন্তু নাম প্রস্তাব করবেন কোন পক্ষ। নিশ্চিত পরাজয় সামনে নিয়ে কেউই নাম প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। সুভাষা চীফ কমিশনার মশায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একাধ দ্বারা আইন অনুসারে মণিপূরে ছমাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিয়ে নিলেন। উত্তর নির্বাচনী বিপাকে পড়ে আর একটি

রাজ্যের কপালে রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে এসেছিল, রাজস্থানে। কিন্তু রাজস্থানে, সেটা ছিল কংগ্রেসী জবরদস্তির নমুনা। মণিপূরে এ অপবাদ সরাসরি কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপানোর উপায় নেই। কারণ, সেখানে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ। বারম্বার দল বদল করে তথাকথিত জননেতারা (কেরিমার মেকাররা) রাষ্ট্রপতি শাসনের পথ নিজেরাই প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

দলবদলের এই দুর্নীতিকে ভারতের বিভিন্ন দলই আজ অদ্ভুত সহনশীলতার সঙ্গে জিইয়ে রেখেছেন। তেমন প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না। অথচ সাধারণের তরফে তথাকথিত স্বার্থান্ধ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এজন্য নিদারুণ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় ভারতের সবকটি রাজনৈতিক দলকেই সাধারণে গণবিশ্বাসহতা রূপে চিহ্নিত করলে বলবার কিছুই নেই। এ'রা যেন দেশের তাবৎ শূভাশুভ নিয়ে মগের মল্লুকের ছেলেখেলা শুরু করেছেন। স্বার্থের কুটিল আবর্তে এ'দের মুখ সমান-ভাবেই পুড়বে এবং জনগণের আস্থা থেকে এ'রা সমভাবেই বঞ্চিত হবেন। যদি অসহায় জনগণের ভাগ্য নিয়ে লক্ষ্যভাগের এই ঘৃণ্য ক্রিয়া থেকে কেউ সরে না দাঁড়ান।

রাজস্থানের ঘটনাকাল থেকে এই ভারত দেশের পাতার আমরা পুনর্নির্বাচন কিংবা Recall প্রথা প্রবর্তনের জন্য কলসের দাবি তুলে আসছি। আমাদের সহজ প্রতিপাদ্য হল, গণবিশ্বাসকে সম্বলার্থে 'বলি' দিয়ে গদি নিয়ে এই নিলম্ব দাপাদাপি রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের বন্ধ করতে হবে। অন্যথা চরম গণবিশ্বাসের সম্মুখীন হয়ে এদের এই সুবিধাবাদী রাজনীতি একদিন জনগণ নির্মমভাবে খতম করে দেবেন। এখন রাজনীতির প্রাণগণে যাঁরা খড়িয়ে হাটার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান জেনে সতর্ক হতে পারেন। অন্যথাক্ষে তাঁদের পুরোপুরি পঙ্গু হতে হবে এবং 'করে খাওয়া'র বাজারটি লাটে উঠবে। এদেশের মাটি খুঁড়লেই মীর-জাফরের অস্থি পাওয়া যায় ঠিক কথা, তা বলে ভুলে গেলে চলবে না যে, তাবৎ ঠাণ্ডাই মীরজাফরের বিচরণভূমি নয়।

আজকের মতো জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নি। কমতার এতাদৃশ কামড়া-কামড়ি আমাদের একটি লোলুপ অসভ্য অরাজকতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, এই দুরবস্থার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সত্যকার ও সং একদল দেশ-সেবকের অভ্যুদয় হবেই, আর সেদিন আজকের লোভী রাজনীতি যে ভীষণভাবে পিষি-দস্ত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রাখি না।

জব্বলপুর কংগ্রেস

জব্বলপুর কংগ্রেসে যে বিধা এবং সংশয় সম্পূর্ণ অধিবেশনটিকেই একটি অহেতুকী আড়ম্বরে পরিণত দান করবে তার আয়োজন শুরু হয়েছিল অধিবেশনের প্রাক্কালেই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবিত দশ দফা কর্মসূচী সরকার কর্তৃক রূপায়ণের বিষয়টি জব্বল-পুর অধিবেশনে আলোচ্য হবে জেনে দশ দফার পক্ষে-বিপক্ষে সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়া-শীল চক্র আপন আপন শক্তি সঞ্চয় আরম্ভ করেছিলেন। শক্তিজোটের তৎপরতা লক্ষ্য করেই বোকা গেছিল যে জব্বলপুরে মধ্যাত কোন মূল প্রশ্নেরই সমাধান হবে না। আর সে কারণেই দশ দফা কর্মসূচীর অবিলম্ব রূপায়ণের পক্ষে যে সমুদয় কংগ্রেস এম পি আছেন তাঁরা দশ দফা কর্মসূচীর বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ক্যাবিনেট থেকে বিতাড়িত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সকাশে একটি কড়া নোটও পাঠিয়েছিলেন।

কংগ্রেস ফোরাম ফর সোস্যালিস্ট এ্যাকসন প্রধানমন্ত্রীকে জব্বলপুর যাওয়ার আগেই এই বলে সতর্ক করে দেন যে, দশ দফা কর্মসূচী গ্রহণে সরকারকে বিরত করার জন্য যে কজন ক্যাবিনেট সদস্য কোমর বাঁধছেন, প্রধানমন্ত্রী বেন ক্যাবিনেট থেকে তাঁদের সরিয়ে দেন, কারণ কংগ্রেসের মর্মানী রক্ষা করতে হলে পূর্ব প্রস্তাবিত দশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। কংগ্রেসকে রক্ষা করতে হলে রূপায়ণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমাও বাঁধতে হবে। একটি যুক্তিবিবর্তিতে এই কর্মসূচীর গোড়া বিরুদ্ধবাদী শ্রীপাতিলের বক্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন, ফোরামের সবশ্রী অর্জুন অরোরা, বিদ্যালঙ্কার, মালব্য প্রমুখ প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ।

পাতিলের পুনরুদ্বোধ

পাতিল সাহেব নির্বাচনে বসে গিয়েও জনপ্রিয় হওয়ার জন্য আপন স্বাধীনতাকে



শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত

পথে বসান নি। কারেমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা তাই দশ দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে। ফোরাম তাঁর ভায়াম পাতিল-গোষ্ঠীর এই বিরুদ্ধাচরণের প্রতিবাদ করে বলেছেন, আলোচ্য দশ দফা কর্মসূচী এমন কিছু একটা যুগান্তকারী বা বিপ্লবী প্রচেষ্টা নয়। তবু নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল নির্বাচনে বিরাট পরাজয়ের পরও তাকে রূপায়িত না করলে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ-ই নষ্ট হতে বসবে। সুতরাং, পাতিল সাহেবদের কারেমী স্বার্থ পরিপোষণের বাহ্যে কংগ্রেস-ক্রেত কতিগ্রস্ত করবে।

হারান কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রস্তুত দশ দফার ইস্তাহার যে কংগ্রেস-পুঞ্জেরই ঘটবে, কংগ্রেসী এম পি-দের এই নিয়ে জোর জোটবদ্ধ আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণই তার সূচনা করেছে। একদিকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত সহ অটন কংগ্রেসী এম পি দশ দফাকে ঘাটলে তোলার জন্যই আওয়াজ তুলেছেন এই বলে যে, ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ বা রাজনা-কর্ষের ভাষা বিলোপ প্রকৃতি প্রশ্নগুলি দেশের আসল সমস্যাকে ঝামাচাপা দিচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা চান, এই তিন অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে আলোচনার আসর থেকে সরিয়ে রাখতে। বলেন, ১৯৭৬-৭৬-এর মধ্যে বরং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে এদের প্রস্তাবে মন্ত বড় সাধ, উপদেশের ছদ্মবেশ চোখের সামনে ভৌতিক পদক্ষেপ করে বটে। কিন্তু শ্রীঅরোরা প্রমুখ বিপক্ষ এম পি অন্যথাক্ষে এই বিরুদ্ধতাকে কারেমী স্বার্থের পক্ষে বিচ্যুতিবির প্রচার বলে দলকে সাবধান হতে আহ্বান জানান। বস্তুতপক্ষে রাজনাবগের স্বার্থ-রক্ষীদের বকধার্মিকরূপটা জনগণ এমনিই উপলব্ধি করতে পারেন। মহারাজসাহাবও সক্রিয় হয়েছেন মোটা মাসোহারা বজায় রাখার জন্য। যে দেশে হাজার হাজার অকৃত মানুষ পথে-ঘাটে দৈনিক ক্ষয়ে কংকালসার এবং অনাহারজনিত ক্ষয়ে মৃত্যুর আলোকে শান্তি খোঁজে সে দেশে মহারাজা নামক এক প্রকার জীব উত্তরাধিকারী সূত্রে কেন যে দেশের তাবৎ সম্পদ আরাম ও বিলাসের জন্য অপচয় করবেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর দলবল তার কোন যুক্তিসংগত কারণ নিশ্চয় দর্শাতে পারেন না। নিশ্চয় তাঁরা বলতে পারেন না এক-চোটিয়া বাণিজ্যের পরিপোষণ স্বারা কোন জনহিতকর কাজটি তাঁরা উদ্ধার করবেন। এজন্য কায়দা করে কারেমী স্বার্থের ওপর আঘাতকে এ'রা ধামাচাপা দিয়ে জন-স্বার্থেরই ক্ষতিসাধনে তৎপর আছেন।

দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা যখন একবাক্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে রায় দেন, তখন উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গ্রহণ করতে অনগ্রহ প্রকাশ করে কারেমী স্বার্থের পরিপোষণই করেন। চেষ্টার অব কমার্সগুলিও চাগে উঠেছেন, তাঁরা বলছেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণ দিয়ে জনসাধারণের কী এমন হাতী-ঘোড়া উপকার হবে। প্রধানমন্ত্রী দু'দিকে ভাল রাখার নীতি গ্রহণ করে তাঁর রাজ-নৈতিক চাল দিতে বাস্তব। তিনি মৌখিক-ভাবে জানিয়েছেন দশ দফাকে কার্যকরী করতে তাঁর তো বিমত নেই, তবে কিন

উপ-প্রধানের (দেশাই সাহেব) ওপরই ব্যাপারটা নির্ভরশীল। তিনি যদি বেঁকে বসেন। বলা বাহুল্য যে, শ্রীদেশাই কারেমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনই সোজা হয়ে দাঁড়াবেন না, আর ব্যাপারটি সজ্ঞানে জেনেও প্রধানমন্ত্রী এ চাল চলেছেন। কিন্তু কেন?

সভাপতি নির্বাচনের রাজনীতি

না, এই দশ দফা নিয়ে টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়েই পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের রাজনীতিটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেশাই-এর না কি শ্রীমতী গান্ধীর প্রার্থী, টাগ অব ওয়ারটা এ নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ওদিকে শ্রীকাম-রাজও স্বস্থানে অবস্থানের প্রয়াস পাচ্ছেন। দেশাই-ইন্দিরা প্রার্থী নির্বাচনে চলে পাকাচ্ছেন কেন না শ্রীকামরাজকে নিয়ে ঠুঁদের আর কাজ চলবে না।

কিন্তু শ্রীচাবন ও শ্রীজগজীবন রাম আবার কামরাজ সমর্থক। তারই সংগে শেনা যাচ্ছে, সবশ্রী পাতিল, অতুল্য ঘোষ ও বিজু পট্টনায়কের নাম। এঁরাও কামরাজকেই শিখণ্ডী খাড়া করে রাখতে চান। কিন্তু যে দশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার প্রশ্নটি শ্রীকামরাজ একটা ইস্যুতে দাঁড় করাবেন বলে সম্প্রদায়, ওঁরা সে কর্মসূচীর পক্ষে এমন ধারণা মনের কোণেও স্থান পাবার কারণ সৃষ্টি করেন নি।

কামরাজ শিবিরের সেনাপতি স্বয়ং কামরাজ জোর দিয়েই বলেছেন, দশ দফাকে এড়িয়ে যাবার ফিকিরগুলিকে তিনি বরদাস্ত করবেন না, প্রশ্নটিকেই একটা ইস্যুতে দাঁড় করাবেন।

২৭ তারিখের অধিবেশন

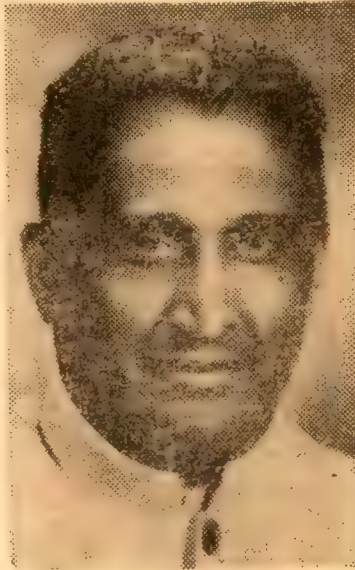
জম্বলপুর অধিবেশন পরিসমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সাপ্তাহিক বসুমতীর ছাপাই বঁধাই শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র ২৭শে তারিখের অধিবেশনটির রেকর্ড এখানে উপস্থাপনের সুযোগ মিলল।

এদিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ ব্যাংকের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (ব্যাংক জাতীয়করণ নয়) প্রবর্তনের সরকারী পরিকল্পনাটির অনুমোদন এবং বাঁমা রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার নীতিগতভাবে বাঁমা জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেছেন, তবে এখন এই নীতির বাস্তব রূপায়ণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। রাজন্যবর্গের ভাতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এখনো সুদূর পরাহত। কেন না সরকার রাজাদের আবার বৈঠক বসিয়ে

নরম করার প্রয়াস পাবেন (সে গড়ে বালি)।

এইভাবে ব্যাংক জাতীয়করণের দাবিটি গোজার দেওয়া হল। ব্যাপার দেখে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম হতাশ। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী চন্দ্রশেখরের উক্তিঃ ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটা হা য় ব র ল বিষয়। কারণ, তাঁর মতে, জাতীয়করণ ছাড়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। কিন্তু উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী গৌ ধরেছেন, তাঁর এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (সোনার পাথর বাটি!) পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার সুযোগই দেওয়া হোক।

রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপের ব্যাপারটিও আলোচনার ফিকিরে টাঙিয়ে রাখা হল। কংগ্রেসের সংসাহস যে অঙ্গনে



শ্রীপাতিল

এর দ্বারা তার পরিচয় আরও একবার প্রমাণিত হল। রাজন্যবর্গের সংগে ফালতু আলোচনায় কাজ আর কতদূর এগোবে। ১৯৫৩ সালে নেহরুজীও আলোচনার মাধ্যমে রাজন্যবর্গের চেতনা সত্তার প্রয়াস করেছিলেন। বার্থ হয়েছেন। যা শ্রীনেহরুতে সম্ভব নয়, তা কি হবে কেবল কয়েকজন সাধারণ শ্রীষুতের দ্বারা। সুতরাং ও ব্যাপারটাও শিকের উঠ

উত্তর প্রদেশঃ

নাকের বদলে নরুণ

উত্তর প্রদেশের পদভাগী মন্ত্রীর আবার ফিরে এসেছেন। ওঁরা ছিলেন

সাতজন। এস এস পি আর দাঁকশী কম্যুনিস্ট। মধ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ঠুঁদের দাবি পুরোপুরি মিটিয়ে না দিলেও আশ্বাস দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ আলোচনার পাকা কথা দিয়েছেন। অর্থাৎ নাকের বদলে অন্তত নরুণটি জুটেছে। সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকবর্গ টলমলে মন্ত্রিসভায় পুনশ্চ সুস্থির হয়ে বসতে পেয়ে রাজ্যে নবরূপছটা দেখা যাচ্ছে বলে আনন্দ প্রকাশও করেছেন। আটক বন্দীরা কিন্তু এখনো যে কে সেই কারারুদ্ধ। কংগ্রেস আমলের দুঃশাসন আজও তাঁদের বুক জগদল। তা হোক, এস এস পি, দঃ কম্যুনিস্টরা আবার মন্ত্রিসভে আসতে পারলেন। মধ্যমন্ত্রী বদল্য। দু টাক পূর্বত খাজনা মকুবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চাষীদের বরাত আর এস এস পি, দঃ কম্যুনিস্টদের হাতঘষ। অবশ্য সব মিলে উত্তর প্রদেশে যে গোঁজামল, তাতে হেঁ হেঁ করার মতো কিছু একটা ঘটে নি। নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্ন পুনরায় মধ্যমন্ত্রীর বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দিয়ে রাখা হলঃ নতুন, একটা সাব-কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবেন। সেই ব-বে-বা, অর্থাৎ 'কিউচার টেন্স'। আরও অবশ্য,—রিশস্যের মরশুমে সওয়া ছয় একর পূর্বত জমির ওপর ভূমি-রাজস্বের অধিক পরিমাণ হ্রাসের সিদ্ধান্তও একই সংগে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এস এস পি, দঃ কম্যুনিস্টরা যে নরুণটি লাভ করলেন তার পাঁচশ মোটামুটি চকচকেই। সওয়া ছয় একর পরিমাণ জমির ওপর ধার্ম অধিক সংগৃহীত রাজস্ব আবার গরীব কৃষকদের জন্য শিক্ষণ তহবিলেই মজুত করা হবে। আনুমানিক, এই সংগ্রহের সংখ্যা এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। তহবিল গঠিত হবে সাড়ে তিন কোটি টাকার। তহবিলের বাকি অংশ সরকার পূরণ করবেন।

মনে রাখতে হবে, ভূমি-রাজস্বের এই প্রশ্ন দুটি কোন মৌলিক বা নতুন প্রশ্ন নয়। এস ভি ডি সরকার আগেই দু কোটি টাকা ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ মকুব আর খরিপ শস্যের মরশুমে থেকে সোয়া তিন একর পূর্বত জমির অধিক খাজনা মকুবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

এই মত ব্যবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে অকস্মাৎ উত্তেজিত মন্ত্রীদের ফিরে পাওয়া গেল। ফাঁড়া কাটল যুক্তফ্রন্টের। এখন অনেকে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছেন।

অতঃপর কৌন্দল মিটল। জনসম্মু জনকংগ্রেস সহ জনগণের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাই চলবেক।

বন্যাত'গণকে সাহায্য করুন

"অতীতপূর্ব বরষার কালে আমরা যে বিপুল সঙ্কটের সম্মুখীন ছিলাম, গত দুই বছরে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় অমানুষিক উদ্যমে পরিশ্রম করে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম ছিলাম। এখন আবার আমাদের দেশের বহু জায়গায় ভীষণ বন্যা হওয়ায় বহু লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এঁদের অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন। যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের বাঁতে অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায়, সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

— ইন্দিরা গান্ধী

প্রধানমন্ত্রীর
জাতীয় সাহায্য তহবিলে
মুক্তহস্তে
দান করুন।

নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠান
পি সেক্রেটারি
প্রাইম মিনিষ্টার্স ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড
প্রাইম মিনিষ্টার্স সেক্রেটারিয়েট
নতুন দিল্লী।

এস এস পি অধিবেশন

দলের অধিবেশনে রাজ্য পার্টি চেয়ারম্যান শ্রীসালিগ্রাম জয়সরাল ক্ষুধা ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবং জনসংঘ দলের সমালোচনা করে বলেছেন যে, ন্যূনতম প্রতিশ্রুত কর্মসূচী রূপায়ণে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ব্যর্থ হলে তার ফল হবে মারাত্মক। উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী এবং জনসংঘ কোনরূপ পরিবর্তনেই ভীত হলে পড়েন। এটা অস্বাভাবিক লক্ষণ। জনসংঘ মনে করে, শ্রীজয়সরাল বলেন, উচ্চ ক্ষমতা হস্তান্তরেই ব্যর্থ অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার দায়িত্ব শেষ। জনসংঘ হঠাৎ ধর্মিত রাজনৈতিক দল, (যাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কস্মিনকালেও কোন সংযোগ ছিল না) সুতরাং পরিবর্তন-প্রসঙ্গী সমাজকে উপলব্ধি করা এহেন দলের সাধ্যাতীত।

শ্রীজয়সরাল আরও বলেছেন যে, জনসংঘ যেখানে সরাসরি রাজস্ব মকুবের দাবির বিরোধিতা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে প্রশাসনিক অসুবিধার খোঁড়া ব্যক্তি সাজিয়ে একই কায়মী স্বার্থের প্রত্যাশারূপে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

এই অধিবেশনেই এস এস পি এবং সি পি আই (দক্ষিণ) মন্ত্রীদের “নীতিহীন” ভাবে পদত্যাগ প্রত্যাহারের বিষয়টি তাঁর ভাষায় আলোচিত হয়। শ্রীঅর্জুন সিং ভাদোরিয়া এতৎ বিষয়ক একটি প্রস্তাবও আলোচনার জন্য উপস্থিত করেছেন। আশা করা যায়, প্রস্তাবটি আলোচনার সময় তাঁর বিতণ্ডার সৃষ্টি হবে।

ডঃ লোহিয়ার মরদেহ পশ্চত্বে ফিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডঃ লোহিয়ার দীর্ঘতিকে কবরস্থ করেছেন এই সমস্ত মন্ত্রীরা তাঁদের “নীতিহীন আপোষের” মাধ্যমেঃ শ্রীভাদোরিয়ার প্রস্তাবে এই কঠোর উক্তি এস এস পি-র নীতিনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মনোভাবকে রূপায়িত করেছে।

হরিয়ানা :

না, না, সব ঠিক হয়

বিগত ২৮শে অক্টোবর রাজ্যের উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীপরতাপ সিং দৌলতা এক চাঞ্চল্য-কর বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, হরিয়ানা সংযুক্ত দল মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নিকট পদত্যাগ পেশ করেছেন। কিন্তু এতাবড় চাঞ্চল্যকর সংবাদটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে পাণ্ডা বিবৃতি দিয়েছেন স্বয়ং বীরেন্দ্র সিং এ একই তারিখে রাণিবেলা।

পদত্যাগের কারণ হিসেবে শ্রীদৌলতা জানিয়েছিলেন যে, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ

সম্পর্কে মন্ত্রীগণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একমত না হওয়ার পদত্যাগ করেছেন। রাও বীরেন্দ্র সিং এই বক্তব্যকেও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভা বদল-বদলের আদৌ কোনো প্রশ্নই ওঠে নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেবলমাত্র আতঙ্ক সৃষ্টিই এজাতীয় প্রচারের উদ্দেশ্য।

একটি ঘোষণা

আগামী সপ্তাহ থেকে
ধারাবাহিক ভাবে
প্রকাশিত হবে

জ্যোতিরিন্দ্র বন্দীর

একটি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

বাড়

তিনি নিজে সংযুক্ত দলের সম্পূর্ণ আস্থা-ভাজন এবং তাঁর মন্ত্রীরা তাঁর বিশ্বস্ত।

হরিয়ানার এই চমকপ্রদ ঘটনাটি আজকের ভারতের একটি সহজবোধ্য চিত্র-রূপ তুলে ধরেছে। এই ঘটনা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, ভারতে সাম্প্রতিক যে ‘উজ্জ্বল’ রাজনীতির খেল চলছে হরিয়ানার অরই চূড়ান্ত রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বস্তুত একই দিনে সাংবাদিকদের



শ্রীচরণ সিং

কাছে বিবৃতি মারফৎ এই যে মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়া হয়ে গেল, এটা উত্তর প্রদেশী চমকের চাইতে অধিকতর মজাদার।

দেশব্যাপী আজ তবে বস্তুত চলছে কি? মন্ত্রীরা কী নিয়ে সব চেয়ে বেশি মশগুল? সাধারণে তা বেশ ভালই

বুঝছেন, সেটা হল মন্ত্রিসভা। দু’শ বছরের বিদেশী পদানত একটা জাত, যে জাত আবার কুড়ি বছর কংগ্রেসী বোঝার কাঁধ দিয়ে আসছে, অকস্মাৎ নির্বাচনী হেরফেরে সে জাতের রাজনীতিওয়ালাদের এখন উর্ধ্ববাহু গোরাক্ষ অবতারের অবস্থা। মন্ত্রিসভাকে কোথায় রাখি; আহা মন্ত্রিসভা নিয়ে কী করি এই চিন্তাতেই বছর কাবার হতে চলল। দেশের চিন্তা দেশের চিন্তার আর সুযোগ কোথায়। রাজনীতির চিন্তামণি এখন সেক্রেটারিয়েটের চার দেওয়ালের মধ্যে ভেপসে উঠছে। মন্ত্রিসভার মোহিনী রসে মশগুল পায়মিশ্র। এখন দল ও কোঁদলই সারাংসার। পশ্চদলের মন্ত্রিসভেই যদি দেশপ্রাণতার মূড়া এইভাবে মুড়িয়ে যায়, ভবিষ্যতের জন্য তবে আর অবশিষ্ট থাকবে কি।

জনগণ বলবেন, ছি ছি। ক্যাডাররা বলবেন, ছি ছি। পুরো কেরিয়ারটাই শেষে হাপাস নয়নে পথে বসবে।

এই বেলা বরং দুর্বল মনের বাছাই ছাঁটাই শুরুর করে বস্তুত যে সব দল আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে দেশসেবা করতে চান, দল পুনর্গঠন করে ফেলুন। অন্যথা কংগ্রেসের চেয়ে কারো ভবিষ্যৎই ‘গ্রেসফুল’ হবে না।

ইংরেজ যেদিন ভারত ছাড়ল সেদিন ভারতের কোন কোন সং আদর্শনিষ্ঠ নেতার এই চিন্তাই হয়েছিল যে, এতোকাল দেশ-মাতৃকার সেবায় যাঁরা আত্মবিসর্জিত ছিলেন, অতঃপর গদি কামড়া-কামড়িতে দিশেহারা হয়ে তাঁরাই দেশব্যাপী কেলেকারীর হাট বাসিয়ে দেবেন। বলা বাহুল্য, আশঙ্কা আক্ষরিক সত্যে অনুদিত হয়েছিল।

এখন চিন্তা, ভারতের যেখানে যেখানে কংগ্রেস গদিচ্যুত, সেখানে এতোকাল—নির্লোভী বিরোধীরা যে নির্লজ্জ গদি-সম্বন্ধের উন্মাদনাকে প্রকট করে তুলছেন তাতে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির আশংকাই হচ্ছে।

তাহলে তাবৎ ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কি?

যতদূর দেখা যাচ্ছে, প্রেফ অন্ধকার। অন্যতর কোন কাণ্ডারীর জন্য অপেক্ষা ভিন্ন কি গতান্তর নেই আমাদের!



পেন্টাগনের বাইরে বিক্ষোভরত এক ব্যক্তি বিক্ষোভ দমনে আনীত মিলিটারী পুলিশের উদ্দেশ্যে থক্কর জানাচ্ছে

পশ্চিম এশিয়া :

বিগত আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের পর থেকেই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে আছে। আরবশক্তির শোচনীয় পরাজয় আরব জাতির অন্তর্গত সমস্ত দেশ-গুলিরই মর্মস্থল বিদ্ধ করে আছে। যে সকল স্থান ইসরায়েল দখল করতে পেরেছে সেগুলি থেকে তার সরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বলাই বাহুল্য ইসরায়েলের পিছনে পশ্চিমী শক্তিজোটের মদত রয়েছে এবং রাষ্ট্রসংঘও এখানে নির্বাক দাঁড়।

একটা আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ-বিরতি হবার পরেও অঘোষিত যুদ্ধের কিন্তু বিরতি হয় নি। ইসরায়েল এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে যে সংযুক্ত আরব যন্ত্রশাস্ত্র বিগত বৃহৎ লড়াই-এর ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, প্রাক্-যুদ্ধকালীন মনোবলও তার এখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি, কাজেই এই অবসরে যতটা পারা যায় অশান্ত সমুদ্রে মাছ ধরে নেওয়া যাক। সম্প্রতি ইসরায়েলের তৎপরতার পিছনে কিছুটা মার্কিনী আশীর্বাদ আছে বলে অনেকে মনে করেন। ইসরায়েলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা এবনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসনের গোপন সাক্ষাতের ব্যাপারটাকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে।

গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে

ইসরায়েল সুয়েজ বন্দরে যে হামলা চালিয়েছে তা থেকেই ইসরায়েলের মনো-ভাবটা সহজে বোঝা যায়। ঘটনাস্থলে রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকগণ জানিয়েছেন যে, ইসরায়েলী প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করে, পরে উভয় পক্ষ হতে পাল্টা গুলী চলে এবং ভারী অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। মিশর অভিযোগ করেছে যে, ইসরায়েলীরা সামরিক লক্ষ্যসমূহ বাদ দিয়ে মিশরীয় অসামরিক ও শিল্পসংস্থার উপর নিয়মিত আক্রমণ চালাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসংঘের চীফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল ওডবুলের রিপোর্টের বর্ণনা করে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট বলেছেন যে, রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধ-বিরতি আহ্বানে মিশর সাড়া দিতে সম্মত হলেও ইসরায়েলী কতৃপক্ষের নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

২৪শে অক্টোবরের ইসরায়েলী হামলায় মিশরের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে। তিন ঘণ্টা গোলাবর্ষণের ফলে মিশরের দুটি প্রধান তৈল শোধনাগারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সুয়েজের গভর্নর হানিফ মহম্মদ জানিয়েছেন যে, এই অগ্নিকাণ্ডে একটি তৈল শোধনাগার সম্পূর্ণ এবং অপরটি অর্ধেক ধ্বংস হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি জি পাথসারথি নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী

বৈঠকে সুয়েজ এলাকায় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ওপর ইসরায়েলী আক্রমণের সমালোচনা করেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে, মিশরীয় অঞ্চল হতে ইসরায়েলী সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেখানে ইসরায়েল তার অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার জন্য কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না, এবং তার সে ইচ্ছাও যখন নেই, বিশেষ করে যখন সে এই বিষয়ে পশ্চিমী শক্তিশালীর সমর্থন পাচ্ছে, তখন মধ্যপ্রাচ্যের আগুন সহজে নেভবার নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সুয়েজের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইসরায়েলকে আক্রমণকারী বলে নিন্দা করার দাবি জানিয়েছিল কিন্তু স্বস্তিপরিষদের ছয় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে এই পর্যন্ত স্থির হয়েছে যে, বর্তমান সংঘর্ষে প্রথম আক্রমণকারী হিসাবে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ করা হবে না, অর্থাৎ সোভিয়েটের দাবি নস্যাত করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে প্রস্তাবের মধ্যবর্তী বর্তমান সংঘর্ষ সম্পর্কে উ থাণ্টের রিপোর্ট সন্নিবেশ করা হবে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উ থাণ্ট রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ইসরায়েলই গত ২৪শে অক্টোবর গ্রীনউইচ সময় বেলা ১২টা ৩১ মিনিটে

তৌফিক বন্দরে ইউ. এ. আর তৈল শোধনাগারের উপর প্রথম গোলাবর্ষণ শুরু করে।

স্বস্তিপরিসদে ইসরায়েলকে বিশেষ করে নিন্দা করে কোন প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা আমেরিকা অগ্রাহ্য করার সমগ্র আরব সাধারণতন্ত্রে আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব আবার তীব্র হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করছেন যে ইসরায়েলকে দিয়ে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে প্রেসিডেন্ট নাসেরের অবস্থা আরও অস্বস্তিকর করে তোলাই আমেরিকার উদ্দেশ্য। স্বস্তিপরিসদে আমেরিকা যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আপোষের চেষ্টা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে বলে আলেক্স-এশীর কূটনৈতিকমহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এদিকে প্রেসিডেন্ট নাসের মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী গ্রীআলেক্সি কোসিগিনের এক জরুরী বার্তা পেয়েছেন, এই বার্তার বিষয়বস্তু অবশ্য প্রকাশ করা হয় নি। সোভিয়েট নৌবহরের কয়েকটি ইউনিট সুয়েজ খালের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত সৈয়দ বন্দর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। পর্যবেক্ষক-মহল সোভিয়েট নৌবহরের এই অভিযানকে ইসরায়েলের প্রতি হুঁসিয়ারী বলে মনে করছেন। সোভিয়েট উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চারদিনব্যাপী মিশর-সফর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (নতুন দিনগণী অনুসারে ৭ই নভেম্বর) হল রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তারিখ। ওই দিনই রাতে বিপ্লবীরা “শীত প্রাসাদ” অধিকার করে নিখিল-রুশ বিপ্লবী সোভিয়েট কংগ্রেস গঠন করে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী প্রথম সোভিয়েট সরকার গঠন করেছিলেন এবং দুটি হুকুমনামার একটিতে সমস্ত বুদ্ধব্রত দেশগুলির কাছে বন্ধুত্ববন্ধের ও একটি গণতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানিয়েছিলেন এবং অপরটিতে জমিদারদের জমি বিনা কতিপয়রূপে বাজেয়াপ্ত করে তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন।



গ্রীণার্মার্মি

কিন্তু বিপ্লবোত্তর সোভিয়েটের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে প্রতিবিপ্লবীরা তেতরে ও বাইরে থেকে তরুণ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল, এবং বাইরের ১৪টি রাষ্ট্র সোভিয়েটবিরোধী রণসজ্জায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে তরুণ সোভিয়েট ইউনিয়নকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

বাইরের এই বিপদের বোঝাকে অতিক্রম যেমন এই নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে করতে হয়েছে একদিকে—অপর দিকে তেমনি আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে তাকে লড়াইতে হয়েছে। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র রাশিয়ান কৈদারিকরণের জন্য তৈরি

হল পোয়েলরো পরিকল্পনা, ১৯২৫

সালে সোভিয়েট জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হল, ১৯২৬-২৮ সালেই শিল্পায়নের প্রথম ফল দেখা গেল স্টালিনগ্রাদের কারখানায়, নিপারের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, তুর্কীস্থান ও সাই-বেরিয়ান মধ্যে রেল যোগাযোগের মধ্যে, ১৯৩০ সালে সারা দেশে বৌদ্ধ খামারের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৬,০০০, যে দেশে জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ নিরক্ষর ছিল সেখান থেকে নিরক্ষরতা দূর হল, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিপ্লব এল, যেখানে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩২ বৎসর তা দাঁড়াল ৭০-এ, প্রাক-বিপ্লব যুগের তুলনায় শিশু-মৃত্যুর হার কমল দশ গুণ।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সোভিয়েট যুদ্ধরাষ্ট্র নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছে, বিপ্লবী মহাযুদ্ধে তার যে কতি হয়েছিল তারও তুলনা নেই, ২ কোটি লোকের মৃত্যু হয়েছে, জাতীয় সম্পদের ৩০ শতাংশ ধ্বংস হয়েছে ১,৭১০টি শহর ধ্বংসিত, ৭০ হাজার গ্রাম ভস্মীভূত ও ৩২ হাজার কলকারখানা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে সোভিয়েট যুদ্ধরাষ্ট্র এই ক্রতিক্রমে সামলে উঠেছে। ১৯৪৮-এ সোভিয়েট শিল্পোৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ১৯৫০ সালে কৃষিতে যুদ্ধের ক্রতিক্রমে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েটের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ইতিহাস। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়েছে, ১৯৬১ সালে প্রথম মহাকাশচারী মহা মহাকাশযান ক্ষেপণ করেছে, ১৯৬৭-তে তার রকেট শক্তগ্রহে পৌঁছেছে।

এই বহুদুর্ধ্বী কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্যের মূলে যে প্রাণশক্তি তার উদ্ভব হয়েছে ওই ৫০ বৎসর পূর্বের ঐতিহাসিক সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা, কাজেই যথাযোগ্য আড়ম্বর সহকারে এই বিশেষ দিনটি যে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে পালিত হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক কথা।

মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্র :

গত সপ্তাহে খোদ মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। গত একুশে অক্টোবর তারিখে যে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল খোদ মার্কিন সমরদপ্তর পেণ্টাগনের ওপর চড়াও হয়েছিল আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। নিছক কমিউনিস্ট বিরোধিতার ধূস্রে তুলে মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্রের

গ্রীষ্ম গোষ্ঠী পরিচিত

বিদগ্ধ-মাধব

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগ্রীষ্মাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলায় স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই গ্রীষ্ম গোষ্ঠীর দ্বারা গ্রীষ্মদ্ব-মাধব নাটক রচনা করায়াইছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালংকার।

এইহে কবিতা বিনা নহে রসের প্রচার॥”

মূল্য : চার টাকা

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোরাঙ্গ ও প্রফুল্ল

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য তিন টাকা মাত্র

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিগিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২



পেট্রোগনের সিড়ির নিচে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের পুলিশ বেপরোয়া হারধোর করছে

সাধারণ মানুষকে আর ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না, কেন না এই যুদ্ধে এত মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে যে তাদের কথা পরিজনবর্গ ভুলতে পারছে না। এই যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ওপর যে আর্থিক চাপ এসেছে তার জ্বালাও প্রশমিত হবার নয়, কাজেই ভিয়েতনামের জন্য যাদের মূল্য দিতে হচ্ছে তাদের পক্ষে ভিয়েতনামকে ভোলা অসম্ভব। এবং এই মনোভাবেরই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ঘটেছে ২১শে অক্টোবরের বিক্ষোভে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বক্তব্য হচ্ছে যে ভিয়েতনামের যুদ্ধ তাদের কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপেরই একটি অঙ্গ এবং তারা ঠিক সেইভাবেই দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সাহায্য করছে যেভাবে তারা ১৯৪৬ সালে ইরানকে, ১৯৪৭ সালে গ্রীস এবং তুরস্ককে, ১৯৫০ সালে ফর-মোজা ও কোরিয়াকে সাহায্য করে এসেছে,

অর্থাৎ বিগত দুই দশক ধরে তারা যে গণতন্ত্রের (?) স্বপক্ষে কমিউনিস্ট দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়ে আসছে বর্তমান ভিয়েতনাম যুদ্ধ সেই কর্মপন্থারই অঙ্গ। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই বক্তব্যের সঙ্গে অধিকাংশ আমেরিকানই আজ একমত নয়। আমেরিকার বৃদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মধ্যেই আজ ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়েছে।

সম্প্রতি রিচার্ড এনফিল্ড ইয়েল রিভিউ পত্রিকায় লিখেছেন : ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট শক্তির যে কোন বিস্তারই সোভিয়েট শক্তির বিস্তার বলে মনে হওয়ার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু আজ অবস্থার বদল হয়েছে। চীন, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থে চলতে শিখেছে, এবং জাপান, ভারতবর্ষ ও পশ্চিমী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিসমূহও জাতীয় চরিত্র রক্ষণ অর্জন করছে। তাই তাঁর মতে এই যুদ্ধের

দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের মত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকেই দুর্বল করছে, চীনকে নয়। তিনি আরও বলেছেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট বা চীনা সম্প্রসারণবাদকে দুর্বল করেছে এর চেয়ে হাস্যকর বৃদ্ধি আর কিছুই নেই, কেন না দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনামের করতলগত হলেই অপরাপর এশীয় দেশগুলি কমিউনিস্টের পদানত হবে এই “ডমিনো মতবাদ” এখনকার যুগে অচল, এবং যদিও তা ঘটে তাহলেও আজকের যুগের স্বাভাবিক্যামী রাজনৈতিক পরিবেশের নিরিখে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না।

রিচার্ড এনফিল্ডের এই বক্তব্য আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষেরই মনের কথা। কিন্তু এই সোজা কথাটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও সমরদপ্তরের কর্তাদের মাথায় ঢুকবে কি?

ক্রিয়াজ্ঞান দিনগুণে

শ্রীমানক্যনাথ চক্রবর্তী

তোমরা সম্ভবত মনে কর আমি কেন শাকিস্তানে আছি। আমার রাজনৈতিক মন্থরাও মনে করেন, আমি কেন শাকিস্তানে পড়িয়া আছি। আজ আমার জীবনের সমগ্রকে সেই কথাই বলিতেছি। ভাল করিয়াছি কি ভুল করিয়াছি, সে বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই। আমি এখন মৃত্যুপথের যাত্রী, কখনম্বাধ্য লইয়া দিন কাটাইতেছি। আমার যৌবনে, ১৯১১-১২ সনে, আমার শ্রমতক অবস্থায়, আমার নামে তখন ১১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, আমি তখন বড় ঘাসি নৌকার মাঝি ছিলাম, কালীচরণ মাঝি নামে পূর্ব-বঙ্গের বড় বড় নদীতে নৌকা চালাইয়াছি, আমার সঙ্গে থাকিত 'বীরেন চ্যাটার্জি', 'ললিত বাড়রী', সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), 'টুন্দ দাশ-গুপ্ত', 'গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য'। আমি ১৯১১ সনে সিরিষাবাড়ি ডাকতিতর পর, পুলিশের ভাড়া খাইয়া, পদব্রজে টাঙ্গাইল হইয়া দুইদিনে ৮০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তিরী গ্রামে যোগেন্দ্র সায়ের বাড়িতে উঠি, রাস্তার মাত্র তিন পয়সার বটে ভাজ খাই। ১৯১১-১২ সনে আমি কিছুদিন আগরতলার অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে ছিলাম, আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইতাইল, আমি একদিন প্রাতে একশ' ডিগ্রী জ্বর লইয়া, ৩২ মাইল পাহাড়িয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৮টার সময় কুমিল্লা সহরে রমেশ ব্যানার্জির বাসায় উঠি, আমার সঙ্গে ঢাকা কলেজের বি-এসসি ক্লাসের একটি ছাত্র, সতীশ দে ছিল। এখন সবই স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে। খাড়ি হইতে কুলিয়ার চর স্টেশন, এক মাইল, হাটীয়া যাইতে অক্ষম।

আমি ১৯৪৬ সনে পরাধীন ভারতের দমদম জেল হইতে মুক্তি লাভ করি। ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থাওরা খুব গরম ছিল, যাহাতে সাম্প্রদায়িক কোন গড়গোল না হয়, সেজন্য আমি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিস্থাপনের জন্য

বিভিন্ন স্থানে যাইতে ছিলাম। ইতি-মধ্যে সংবাদ পাইলাম নওগাঁর (শ্রীহট্ট) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। আমি নওগাঁ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া কুমিল্লা গিয়া কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত দেখা করি, তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া হবিগঞ্জ রওনা হই। আমি পূর্বে কখনও হবিগঞ্জ যাই নাই, সেখানে আমার পরিচিত কোন লোকও ছিল না। আমি শারেন্তাগঞ্জ স্টেশন হইতে হবিগঞ্জের গাড়িতে উঠিলাম, তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে। গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়, তিনি হবিগঞ্জ সহরে থাকেন, তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমার হবিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাও

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) একটি দর্শক নাম। তিনি কি করছেন, কোথায় আছেন—এই সংবাদ অনেকেই জানতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গ চক্রবর্তী পর পর কয়েকটি নিবন্ধে স্মৃতিস্মৃতি কিং, চাঞ্চল্য-কর কাহিনী লিখে জানিয়েছেন। আমরা তা 'বিশ্বমতরা দিনগুণে' নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম।

—সম্পাদিকা

বিলিলাম, হবিগঞ্জে আমার পরিচিত কেহ নাই এবং উঠারও কোন স্থান নাই। তিনি আমাকে তাহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং বৈকালে কংগ্রেস নেতা ও এম-এল-এ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেই দিন রাতে এক ঘরেয়া বৈঠক হয়, প্রায় ৪০।৫০ জন লোক উপস্থিত ছিল। আমি দাঙ্গা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বিলিলাম, আগামীকলা প্রাতে আমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইব, এখন আমার সঙ্গে কে কে যাইবেন? সকলেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুরেশচন্দ্র দিকে চাহিলেন, সুরেশ-

চন্দ্র বলিলেন, "আমার অনেক শত্রু আছে, আমার যাওয়া উচিত হইবে কি?" আমি বলিলাম, আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আর কে কে যাইতে প্রস্তুত? আমি ৩।৪ জন সঙ্গী চাই। সভা নিম্নতঃ। তখন ছিল বর্ষাকাল, দাঙ্গা কয়েকদিন পূর্বে হইয়াছে, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে লোক চলাচল বন্ধ, নৌকাযোগে যাইতে হয়। এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে এক ভদ্রলোক নীড়াইয়া বলিলেন, "আমি যাইতে প্রস্তুত, যদি আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়া যান।" তিনি বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, আমার গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে, আমার ভাই আহত হইয়াছে। পরে জানিতে পারিলাম, তিনি ভাদ্রিগিরার জমিদার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদ বর্ষের রাজ। বিনোদবাবু আমাকে গোপনে বলিলেন, "আমার নিজের নৌকা আছে, পাশ করা বন্দুক আছে।" বিনোদবাবুকে পাইয়া আমি খুব খুশি হইলাম, বন্দুকের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি বিনোদবাবুকে বলিলাম, যত বেশি পারেন কাতুজ সঙ্গে লইবেন। পরদিন প্রাতে আমরা রওয়ানা হইলাম, সঙ্গে যথেষ্ট কাতুজ আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা ভাদ্রিগিরায় যাইবার পথে দুই-একটা বিধ্বস্ত গ্রামের সংবাদ লইয়া বৈকালে ভাদ্রিগিরার বিনোদ-বাবুর বাড়ি পৌঁছিলাম। বিনোদবাবুর ছোট ভাই, সাব-রেজিস্ট্রার আহুত হইয়াছিলেন, গ্রাম বিধ্বস্ত। পরদিন প্রাতে যাওয়া-দাওয়ার পর নৌকাযোগে নওগাঁ রওয়ানা হইলাম। আমরা বৈকালে নওগাঁ পৌঁছিলাম। নৌকা ঘাটে ভিড়ার পূর্বে দেখিলাম একজন গুর্খা সিপাহী বন্দুক কাঁধে করিয়া টানে টেল দিতেছে, আমরা চিন্তিত হইলাম, নৌকা ঘাটে ভিড়িল, এমন সময় গুর্খা সিপাহী বিনোদবাবুকে সেলাম দিল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে টানে উঠিলাম। বিনোদবাবু বখন সিলেট সহরে হাকিম ছিলেন, গুর্খা সিপাহী তাহাকে দেখিয়াছে, এখন পূর্বভাসবশত তাহাকে সেলাম দিল।

অপরিচিত দুইজন ভদ্রলোক দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদিগকে এক জায়গায় বসাইলেন, গ্রামের কিছু লোক উপস্থিত হইল। আমবা আমাদের পরিচয় দিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে চাহিলাম, কিন্তু তাহারা আমাদের নিকট বিশেষ কিছু বলিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে একটি যুবক উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ সময় আনন্দ-বাজার পত্রিকার “স্বাধীনতা সংখ্যা” যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের ফটো বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার ফটোও ছিল। ঐ যুবকটি কলিকাতা কলেজে পড়িত, বাড়ি আসার সময় এক কপি স্বাধীনতা সংখ্যা ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, সে আমার পরিচয় পাইয়া স্বাধীনতা সংখ্যার ফটোর সহিত আমার চেহারা মিলাইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল এবং বলিল ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহারা তখন সকল ঘটনা ব্যস্ত করিল। ঘটনার বিবরণ এই :

ঘটনাটি অতি সামান্য। দুই সম্প্রদায়ের দুই জনের ব্যক্তিগত ঝগড়া গ্রাম্য-বিবাদে পরিণত হয় এবং গ্রাম্যবিবাদ সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। গ্রাম্য ঝগড়ায় কৈবর্তরা একটা মুসলমান পড়ার আগুন লাগাইয়া দেয়; ফলে কয়েকটা বাড়ি পুড়িয়া যায়। এই সংবাদ অতিরঞ্জিতভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং একটা ভয়ানক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চারিদিকে নানাপ্রকার গুজব রটিতে থাকে। উত্তেজনা বৃদ্ধি করার লোকের অভাব হয় না, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরা তিলকে তাল করিয়া প্রচার করিতে লাগিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, দলে দলে লোক নৌকা বোঝাই করিয়া নওগাঁ দখল করার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে নওগাঁর কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিশ্চিন্ত ছিল না, ভাবী বিপদের আশঙ্কা তাহারাও করিতে ছিল। তাহারা তখন দেশত্যাগেব কল্পনা করে নাই, তাহারা স্থির করিল গ্রামে থাকিয়াই আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবে, গ্রাম রক্ষা করিবে। তাহারা ব্যহরচনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। নওগাঁ একটি স্বাধীনের মত ক্ষুদ্র গ্রাম, চারিদিকে জল। গ্রামবাসীরা গ্রামের চারিদিকে জলের মধ্যে, পাড় হইতে ১৫-২০ হাত দূরে, বাঁশ পুতিয়া ব্যহরচনা করিল, বাঁশ ও সুপারী গাছের ফালি করিয়া বস্তু তৈয়ার করিয়া ও ইটের টুকরা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীর ইচ্ছাতে-হঠাৎ চারিদিকে শব্দ

ঘন্টা বাজিয়া উঠিল, গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি সকলেই চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া গেল, তখনও স্থিপ্রহর হয় নাই, আকাশ পরিষ্কার ছিল। কয়েক সহস্র আক্রমণকারী প্রায় এক শত নৌকায় নওগাঁ আক্রমণ করিল। খন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোন পক্ষেই বন্দুক ছিল না। আক্রমণকারীদের অসুবিধা ছিল, তাহাদের প্রত্যেক নৌকা বোঝাই লোক ছিল, নিক্ষেপ করার মত অস্ত্র বিশেষ কিছু ছিল না। গ্রামের লোক বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া কুইচ, বজ্রম, ইটের টুকরা প্রভৃতি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, নৌকা বোঝাই লোক থাকায় আক্রমণকারীরা আহত হইতে লাগিল। কৈবর্ত মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি নাই, কাহারও মধ্যে গ্রাসের চিহ্ন নাই, সকলেই গ্রাম রক্ষার কাজে ব্যস্ত। সংগ্রাম যখন চলিতে ছিল, মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা চারিদিকে ঘুরিয়া সংগ্রামকারীদিগকে পান-তামাক খাওয়াইয়াছে, জল খাওয়াইয়াছে, চিড়া মুড়ি খাওয়াইয়াছে, অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। মধ্যাহ্ন অতিবাহত করিয়াছে, আক্রমণকারীরা নৌকা পাড়ে ভিড়াইতে পারিতেছে না, প্রবল বাধা পাইতেছে, তাহারা আহত হইতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, অবশেষে আক্রমণকারীরা রণে ভগ্ন দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা চলিয়া যাওয়ার সময় কয়েকটা গ্রাম বিধবস্ত করিয়া চলিয়া গেল। নওগাঁর অধিবাসীরা সম্মুখের পর তাহাদের অর্থ দলিলপত্র এবং মেয়েলোকদিগকে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাইয়া দিল, পাহারা দেওয়ার জন্য বৃন্দ-বৃন্দার দল এবং কিছু যুবক গ্রামে রহিল। ইতিমধ্যে গভর্নমেন্টও কিছু বন্দুকধারী গুর্খা সিপাহী নওগাঁ গ্রামে পাঠাইয়া দিল। গুর্খা সিপাহীর আগমনে গ্রামেব লোক আশ্বস্ত হইল। কৈবর্তদের আত্মরক্ষার বীরত্ব কাহিনী, বিশেষত মেয়েদের বীরত্ব কাহিনী, ঐ সময় আমার বিবৃতিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ পাইয়া ছিল। অবশ্যই ঐ ঘটনার দুই বৎসর পর নওগাঁ বিধবস্ত হইয়াছিল। আমরা বিধবস্ত মুসলমান পঞ্জীতে যাইয়া ক্ষতি-গ্রস্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা করি। আমরা কয়েকজন মৌলবী এবং হাজী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আমরা হিন্দু-মুসলমান, সকলের সহিত দেখা করিয়া শান্তিতে বাস করার উপদেশ দিলাম। আমি নওগাঁ হইতে লাখাই যাই এবং জরুর্বাড়ির শচীন চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠি। কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ দাসের বাড়ি লাখাই। এই দাঙ্গা উপলক্ষে শ্যামাচরণ

দাস এবং আরো কিছু কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি শচীন চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া শ্যামাচরণবাবুর বৃন্দ পিতাকে দেখা আসিলাম। আমি ইহাব পর সন্ধ্যাইবা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নীতিমুদ্রন সাহেবের সহিত দেখা করিয়া দাঙ্গা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করি। ইহার পর আমি কলিকাতা যাই।

নোয়াখালি দাঙ্গা সুদূর হইয়াছে, প্রতিক্রিয়া বিহাবে দেখা দিয়াছে, আমি তখন কলিকাতায়। আমি বৃন্দেব সহিত পরামর্শ করিয়া নোয়াখালি বওনা হইলাম। দত্তপাড়া দেওয়ানজী বাড়িতে কেদারেশ্বর গুহ নামে আমাদের দলের একজন সভ্য ছিলেন, আমি দত্তপাড়া পৌছিলাম। তখন দাঙ্গা বন্ধ হইয়াছে, লোক চলাচল সুদূর হয় নাই। স্থানে স্থানে রিফিউজী ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছে, ক্যাম্পে সশস্ত্র পলিশ পাহারা দিতেছে। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী সদলবলে দত্তপাড়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন তাহার নাতিন মন্মথ গান্ধী, নাতিন-বো আভা গান্ধী, প্যারিলাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বিভিন্ন সংবাদপত্রের দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিগণ। মহাত্মা গান্ধীর দেহরক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী এবং হাবিলদার প্রভৃতি পাঠাইলেন। পলিশের গুপ্ত বিভাগেব লোকও কিছু ছিল। সমগ্র ভারত এবং পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ সমূহেব নজর নোয়াখালির উপর পড়িল। মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়া কয়েকদিন অবস্থানের পর ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রত্যেকদিন পদযাত্রা একটি করিয়া দাঙ্গা-বিধবস্ত গ্রামে যাইবেন এবং এক রাত্রি বাস করিবেন। শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপভাবে দাঙ্গা-বিধবস্ত অঞ্লে ঘুরিতে থাকিবেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করিবেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে, এই শীতকালে, তিনি খালি গায়ে খালি পায়ে প্রত্যহ প্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরো বহু দল দাঙ্গাবিধবস্ত অঞ্লে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সত্যীশ চন্দ্র দাশগুপ্তের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাজিরখিল। নাম গান্ধী ক্যাম্প।

অমর্ত্যের নিবেদন

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সূর্যও উত্তপ্ত হয় দহনও প্রচণ্ড দম্ব হয়
ঈর্ষার আবেগে স্নেহে কখনো কখনো এই মর্ত্য
ব্যক্তির তেজে, দীপ্ত দেবোত্তর মানবতা দেখে,

মার্গারেট, তুমি সেই মানবতা ব্যক্তি দৃষ্টি,
তুমি স্থির জয়সম্পন্ন স্নেহ-দর্প-দম্বের আবেগে;
অমর্ত্যের নিবেদন তুমি ধ্রুব মর্ত্যের বিবেকে;

দেশান্তরে তুমি পাও স্বদেশ, ভারতে এসে পেলে
বৃদ্ধি বিশ্ব-জননীর, এ দেশ জননী মনে তুমি
এ দেশের কন্যা হও, মাতা হও একত্রে সবার,

স্বদেশের সৌন্দর্য দৃষ্টি উন্মেষল অপালা তুমি এলে
গান্ধী-মৈত্রীর দেশে—বন্ধ ঘরে সমুদ্র-মোসুমী,
দণ্ডারিণী সেবা হলে পথে পথে রক্ত-কলকাতার;

চেনালে দেশকে দৃষ্টি নিজাগারে অমল্য রতন,
দেখালে বাগানে তার ফুল সব বিশ্বের কুসুম-ই,
বোঝালে দেশকে জানতে বিদেশেরও আছে প্রয়োজন।

লৌকিকে বিদেশী তুমি অলৌকিকে তুমি লোকমাতা,
নিবেদিতা তোমাতেই জ্ঞানলাভ জননী জন্মভূমি,
তুমিই প্রকৃতি, তাই চরিতার্থ পুরুষ-বিধাতা॥

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র ছিল চোমকুদনী, সেক্রেটারী ছিলেন হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী। আমার প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়গ। জয়গ জমিদার বাড়িতে একটি রিফিউজি ক্যাম্প ছিল। এই গ্রামের প্রতুল চৌধুরী আমাদের দলের সভ্য ছিল। বিভিন্ন দাঙ্গা-বিধবস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল।

মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে রওনা হইতেন, তাহার সঙ্গে প্রায় দুইশত লোকের শোভাযাত্রা চলিত। মহাত্মা গান্ধী ও তাহার সহ-চরগণ ব্যতীত সঙ্গে থাকিতেন, বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ, ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী, হাবিলদার, জমিদার, পুলিশ অফিসার, ভলান্টিয়ার ও দর্শকবৃন্দ। খাবার-থাকবাব ব্যবস্থা প্রত্যেকের নিজের। মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে পৌঁছিতেন, তখন সেই গ্রামের সংখ্যালঘুরা মনে করিতেন ভগবান আমাদের মন্দির জন্য দ্বারকর্তা পাঠাইয়াছেন। দৃষ্টান্তকারীরা পুলিশ ও বন্দুকধারী সিপাহী দেখিয়া ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রত্যহ বৈকালে উভয় সম্প্রদায়ের লোক হইয়া প্রার্থনা সভা হইত এবং প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতেন। সফল ফলিমাছে, অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন আমার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সেইদেশী কীর্তনের ব্যবস্থা করিলাম। মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল স্ত্রীলোক খোল করতাল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গাহিতে লাগিল, মহাত্মা দশ মিনিট দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালি ছিলেন

তখন পশ্চিম জংহরলাল নেহরু, সর্দার বলভভাই প্যাটেল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা মাঝে মাঝে দাঙ্গা-বিধবস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিতেন। বাংলা দেশ হইতেও শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গা-বিধবস্ত অঞ্চলে গিয়াছেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবও দস্তপাড়া যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। আমি তখন দস্তপাড়া উপস্থিত ছিলাম।

কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী তাহার সংগীদগকে নির্দেশ দিলেন, সকলে একত্র থাকিতে পারিবেন না, প্রত্যেকে এক-একটি খালি গ্রামে, পোড়া বাড়িতে, নারিকেল পাতা দিয়া ঘর উঠাইয়া একা থাকিবে। তিনি প্রথম নির্দেশ দিলেন তাহার ১৬ বৎসর বয়স্ক নাতি মন্মথ গান্ধীর উপর। মহাত্মার এই নির্দেশেব জন্য সকলেই চিন্তিত ভীত কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অচল-অটল। মন্মথ গান্ধী এক খালি গ্রামে, পোড়া বাড়িতে, নারিকেল পাতার ঘরে রাতে একা কাটাইতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন, প্রত্যেকে এক এক খালি গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। লোকের মনে সাহস সঞ্চার হইল, যাহারা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহারা আবার নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। সচেতা কুপালনি, জীবন সিং, প্যারীলাল প্রমথ বিভিন্ন গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিতে লাগিলেন। কাজের মধ্যে ছিল, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও চরকা প্রচলন।

জয়গ জমিদার বাড়ির অপর হিস্যার মালিক ছিলেন হেমন্তকুমার ঘোষ ব্যারিস্টার। তিনি লক্ষ্যে থাকিতেন, তাহার পরে ছিল না, দুই কন্যা ছিল, তিনি দেশে আসিতেন না, তাহার ভ্রমশ্রী পতি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। হেমন্তবাবুর ভাগিনেয়গণ আমাদের দলের সভ্য ছিল। আমার কেন্দ্রে হেমন্তবাবুর বাড়িতে ছিল। জয়গ রিফিউজি ক্যাম্পে আসকী গ্রামের যশোদাকুমার দে, কবিরাজ সপরিবারে ছিলেন। যশোদাবাবুর স্ত্রী আমাকে ধর্মের বাপ ডাকিলেন এবং যশোদাবাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। হেমন্তবাবু মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাহার সম্পত্তি গঠনমূলক কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দান করিবেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহার পর হেমন্তবাবুর ভ্রমশ্রীপতি এবং ভাগিনেয়গণ প্রস্তাব করিলেন, আমি যেন এই সম্পত্তি গ্রহণ করি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল, নিজ গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। ইহার পর সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় হেমন্তবাবুর সহিত ব্যবস্থা করিয়া এই সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া নেন। আমার জয়গ ত্যাগ করার পর সতীশবাবু তাহার কেন্দ্রে কাজরিখল হইতে জয়গ গ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

দাঙ্গার পর বিধবস্ত অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেন্সারী ছিল না। আমার ঠাট কেন্দ্র ছিল, আমি প্রত্যেক কেন্দ্রে স্কুল এবং হোমিওপ্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম।

[ক্রমশঃ]

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

শ্রীসুপ্রভাচন্দ্র দাস

স্মৃতিচয়ন

[পূর্ব-প্রকাশিতের ...]

রাণীর হয়ে হাজির হলেন এটর্নী ও সি গান্ধুলী গ্র্যান্ড কোম্পানী। বেশ দ্রুত করে জবাব দাওয়া ফাইল হলো। জমিদারীর হিসেবপত্র এবং রাণীমায়ের খরচার হিসেব দাখিল হলে ইন্সপেকশন চলল বেশ কিছুদিন। দুই এটর্নীর খরচার বিল বেশ ভারী হয়ে উঠল। তারপর হোলো কমিশনের দরখাস্ত। রাণীমায়ের সাক্ষী নিতে হবে। একে ত' মেরেমান্দুব, তার রাজপরিবারের রাণী এবং তার উপরে তিনি থাকেন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পাঁচ শ' মাইলের অনেক বেশি দূরে। আমি কমিশনের অর্ডারে রাজী হয়ে গেলাম। দুই পক্ষের সম্মতি-ক্রমে কমিশনার হলেন অমল সরকার সাহেব। অমল আমার চেম্বারে ডেভোলিং করতেন এবং কাজ সেরে প্রায়ই রায়ে শেখ ট্রামে আমার বাড়ি থেকে বাগবাজারে যেতেন। ইনিই পরে কলকাতা হাইকোর্টের এবং আরো পরে সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং আরো পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। দু' পক্ষের এটর্নী, কৌশলী আমরা একই ট্রেনে চললাম যোধপুরের দিকে। বাদী রাজাব তরফে গেলেন এটর্নী মন্মথবাবুর স্বলা-ভিষিক্ত হুঁই শিবদাস শেঠ ও কৌশলী হয়ে আমি। প্রতিবাদী রাণীর তরফে চললেন ও সি গান্ধুলী মশায়ের ছেলে ও তাঁর অফিসের ম্যানেজিং ক্লাক এবং কৌশলী এস কে দত্ত সাহেব। দুটো কম্পার্টমেন্ট দু' পক্ষ রিজার্ভ করেছিল। কমিশনার সাহেব রইলেন আমারই কম্পার্টমেন্টে। সেই রেলযাত্রাটা হয়েছিল খুবই উপভোগ্য গল্পগুজবে ও ভোজন-বিলাসে।

আমরা যখন আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছলাম তখন আগ্রা হোটেল থেকে এক বাঙালী প্রতিনিধি আমাদের তাঁদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে স্বলোকবলি করতে লাগলেন। কি করে যে তিনি জানলেন কলকাতার নামকরা ইঞ্জিনিয়ার

সি কে সরকার আমাদের কমিশনার সাহেবের খুঁড়ো তা ভগবানই জানেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে বোঝান গেল যে আমরা আগ্রাতে নামব নু এবং সেরতা রোডে জংশন হয়ে যোধপুরের দিকে যাব। তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হোলো যে যদি কখনো পরে আগ্রা যাই তবে আমি তাঁর হোটেলেই যাব। সে প্রতিশ্রুতি ভুললোক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যখন সপরিবারে আগ্রা স্টেশনে নেমেছিলাম বহু বছর পরে। সন্তোষের বিষয় এই যে আমার সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। যা বলছিলাম, আমাদের ট্রেনটা যেমোছিল আগ্রা ফোর্টের প্রকাণ্ড উচ্চ প্রাচীরের নিচে। যমুনার বাঁক দিয়ে দূরে তাজমহল দেখা যাচ্ছিল। ও সি গান্ধুলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ক্লাক গল্প-জুড়ে দিলেন তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস সম্বন্ধে। খুব সম্ভবত তিনি তাঁর মনিব অর্ধেন্দুবাবুর কাছ থেকেই গল্পটা শুন-ছিলেন। গল্পটা সংক্ষেপে এইঃ সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশমত ইরান না কোথা থেকে এক পুৰীণ বাস্তুকারকে আমন্ত্রণ করিয়ে আনা হয়েছে। সম্রাট নিজে তাঁকে সম্রাটের তাজমহলের স্বনাম ব্যাখ্যা করে নির্দেশ দিলেন। ব্যস্ত বাস্তুকার বলেন যে এই রকম বড় জিনিষ করতে স্তম্ভের দিন-রাত, টাকার ত' কথাই নেই। সম্রাট তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে টাকার জন্যে ঠেকবে না। বেশ কিছুদিন ধরে তাজমহলের প্রকল্পের মনোরম নকসা করা হোলো কয়েকটা। একটা সম্রাটের পছন্দ হোলো সেই বাস্তুকার গিয়ে বাসা বাঁধলেন যমুনা নদীর বাঁকের মধ্যে যেখানে এখন খাড়া আছে শাহজাহানের স্নানের মণি-মাণিক্যচিত্রিত শূদ্র মর্মর স্মৃতিসৌধ। একদিন সেই ব্যস্ত বাস্তুকার বলে পাঠালেন একটা বাড়ি খলেতে স্তম্ভের সহস্রাধিক আসরফি পাঠিয়ে দিতে। সম্রাটের হুকুম তামিল করতেই হোলো। ব্যস্ত একটি একটি আসরফি যমুনার জলে ফেলতে লাগলেন,

টুপ, টুপ। জলে ছোট ছোট আঁটি মত গোল গোল চকু দেখা দিবেই খানিক পরেই মিলিয়ে যায়। আবার আসরফি পড়ে—টুপ, টুপ। এই রকম করে সহস্রাধিক আসরফি যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে সেই বাস্তুকার আর এক খলে আসরফি চেয়ে পাঠালেন সম্রাটের কাছে। পাঠ-মিত্র অমাত্যের সম্মুখে বলে উঠলেন শাহান শাহ এক পাগলের পাজার পড়েছেন। সময় থাকতে সেই পাগলকে ইরানে পাঠিয়ে দিতে আজ্ঞা হয়। কারো কথা না শুনে সম্রাট দৃঢ় কণ্ঠে বললেন যে, যা তিনি চেয়েছেন তাই তাঁকে দেওয়া হোক। সম্রাটের হুকুম, তামিল করতেই হোলো। যখন সেই শ্বিতীয় খলে আসরফি পৌঁছল তখন ব্যস্ত বাস্তুকার দাঁড়িয়ে উঠে আশ্রয় ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে হ্যাঁ, এই বাদশাহের তাজমহল তাঁর করবার যোগ্যতা আছে। গল্পটা বলেই সেই ম্যানেজিং ক্লাক টিপ্পনি কাটলেন—“চাটখানি কথা নয়, স্যার, তাজমহল খাড়া করা। দিল থাকা চাই, স্যার, ছাতি বহর চাই।” চোখের সামনে তাজমহলের দিকে তাকলাম। যমুনার জলে যেন আসরফি পড়ছে টুপ টুপ আব জলের মধ্যে বাস্তুকার চেউয়ের গোলাটা যেন বেড়ে বেড়েই চলল। আমার মনে শাহান শাহ সম্রাট শাহজাহানের মূখ্যস্থানি ভেসে উঠে আমাকে অভিভূত করে দিল। হ্যাঁ, দিল দরিয়াই বটে। অকস্মাৎ গাড়ের হুইসল বাজল ট্রেন ছেড়ে দিল। ভেঙে গেল আমার তাজের স্বপ্ন। আমরা চললাম যোধপুরের উদ্দেশে। মেবতা রোড-এ ট্রেন বদলিয়ে তার পরদিন ভোবের বেলা যখন সম্রাটের লেকের পাশ দিয়ে ট্রেনটা চলছিল তখন নোনা জলের হিম-শীতল হাওয়ায় আমার সর্বাগে যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল সে রকম ঠান্ডা বিলেতেও পাই নি এবং আজও তার কং মনে আছে।

যোধপুরে পৌঁছে আমরা দুই পক্ষ

দুই জায়গায় গেলাম, কেন না এইবার
ধৃষ্ট দেখি শূদ্র হবে। যদিও আমরা
দুঃসমনের দলে তবু রাণীমা কিন্তু আমাদের
জন্মে নানাবিধ মিস্টার ও মেঠাই পাঠিয়ে
রেখেছিলেন এবং তাঁর অনুচরেরা আমাদের
সে করাধীন খুব তত্বতালসও করতেন।
রাণীমা থাকতেন লাল পাথরের উচু
প্রাচীর ঘেরা শহরের অনেকগুলি অলিগলি
পেরিয়ে একটা ছোট রাস্তার উপরে তিন-
তলা বাড়িতে। আমরা গোটা-দশেকের
সময় যেতাম রাণীমার জবানবন্দী নিতে।
প্রথমে এস, কে, দস্তায়েব রাণীমাকে পরীক্ষা
করলেন। রাণীমা বলে যেতে লাগলেন
যে এই বৃদ্ধ বরসে তাঁকে অনেক ধর্মকর্ম
করতে হয়, তীর্থ দর্শনেরও খরচা অনেক,
তাঁর স্বশ্রদ্ধকুলের কল্যাণে তাঁকে মন্দিরে
নিত্যপূজা দিতে হয় ইত্যাদি। প্রথম
দিনে যে ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম তা
স্মরণে আছে। ঠিক বেলা একটার সময়
সমস্ত বাড়ি কর্পিয়ে এবং দরজা জানালায়
সার্সিগুলি স্ববন্ধনিয়ে সে কি তোপের
আওয়াজ। শুনলাম প্রত্যহ একটার সময়
ঐ তোপ দাগা হয়ে থাকে। আমরা একটার
সময় কাজ বন্ধ করে উঠে পড়তাম।
শ্বিতীয়, না, তৃতীয় দিনে আমার জেরা
আরম্ভ হোলো। আন্তে আন্তে যে
ছবাব পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে
রাণীমার খরচেই তাঁর ভাইয়েরদের সংসার
চলেছে, নিত্যপূজা নেহাৎ স্বসামান্যমাত্র
এবং রাণীমা এ পর্যন্ত তীর্থদর্শনে বের-ই
হন নি, কিন্তু বাসনা আছে ইত্যাদি।
এতেই কাজ চলবে জেনে আমি আর বেশি
তাঁকে ঘটিলাম না। আমাদের কাজ সেরে
আমরা আবার একই সপ্তে কলকাতায়
রওনা হলাম। আমাদের প্রত্যেককে রাণীমা
বেশ পেজাতুলোর মজবুত সেলাই করা
পা পর্যন্ত লম্বা ড্রেসিং গাউন উপহার
দিবেছিলেন। তাঁর সৌজন্যে মজ্ব হয়ে-
ছিলাম। সে ড্রেসিং গাউনটা আমার
ব্যবার খুবই কালে লেগেছিল অনেক বছর
শীতের দিনে। বিদায় দিনে সবাই খুশি।
রাণীমা খুশি হলেন তাঁকে বেশি ঘাটিন
হয় নি বলে। এটনীর খুশি হলেন
অনেকগুলি “Attending client”
তাঁদের কস্টের বিলে খরচাখাতে দেখা-
হোলো বলে। কৌসলীরা ও কমিশনার-
মোট ফিস পাবেন বলে খুবই খুশি
হলেন। আর সবাই একবাক্যে খুশি হলেন
রাণীমার সৌজন্যে। শেষ পর্যন্ত মামলাটা
জজ পর্যন্ত আর পৌঁছল না। মিটে গেল
খাইরে বাইরে। আমাদের ফিসের টাকা
আদায় করতে অসুবিধে হোলো না।
কমিশনারের ফিসটা নিয়ে কথা উঠেছিল
কে দেবে। তবে তখন ওরিজিন্যাল
সাইডের মিনিয়ার জজ স্যার চারচন্দ্র
ঘোষের নির্দেশক্রমে যে পক্ষ কমিশন অর্ডার

নির্দেশিত তাঁকেই দিতে হোলো এবং
কমিশনার সাহেব বেঁচে গেলেন।

৩৩

সে এক সময় ছিল যখন বাংলা দেশ
এবং আসামে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের
প্রকোপ ছিল দুর্দান্ত। হাজারে হাজারে
স্বাী, পদ্রুথ, শিশুরা মৃত্যুমুখে পতিত
হোতো প্রতি বছরই। অনেক পরীক্ষা-
নিরীক্ষার পর ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন
তো বের হোলো। কিন্তু কালাজ্বরের
তখন কোন ওষুধই ছিল না। ইংরেজ,
বাঙালী ডাক্তাররা কালাজ্বরের নিয়ে গবেষণায়
লেগে গেলেন বিভিন্ন হাসপাতালে বা
ল্যাবরেটরিতে। এইসব গবেষকদের মধ্যে
অগ্রণী ছিলেন স্বনামধন্য ডাক্তার উপেন্দ্র-
নাথ ব্রহ্মচারী। সরকার তাঁকে বৃত্তি দিলেন
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল-এর (অধুনা
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ)
ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে যাতে কালা-
জ্বরের একটা নিরামক ঔষধ বের করতে
পারেন। বৃত্তির সর্ত হোলো যে যদি
সত্য-সত্যই কোন ওষুধ বের করতে পারেন
তবে সে ওষুধ তাঁর করার পশ্চাতির বিবরণ
মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে
যাতে করে জনসাধারণ এবং ডাক্তাররা সবাই
সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে ওষািকবহাল
হতে পারে। বহুদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে
ডাক্তার ব্রহ্মচারী মাথা গুঁজে গবেষণা করে-
ছিলেন। অবশেষে তিনি একটি Anti-
mony Compound আবিষ্কার করলেন।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সেটিকে
কালাজ্বরের অব্যর্থ নিরামক ঔষধ বলে
দাবি করলেন। যথাসময়ে ওষুধের ফল-
মূল্যটা মেডিক্যাল জার্নালে বের হোলো।
অভিজ্ঞ মহলে হৈ-হৈ পড়ে গেল যে
অবশেষে একটা মহাব্যাধির কবল থেকে
পীড়িত লোকেরা বেঁচে গেলেন ডাক্তার
ব্রহ্মচারীর জয়জয়কার উঠল-শতমুখে।
ডাক্তার ব্রহ্মচারী: “স্যার” উপাধি ও মান
তো পেলেন-ই, তিনি তখন ধনাগমের
প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর কনওয়ালিশ
স্বাীটেব প্রকাশ-বাড়িতে মস্ত ল্যাবরেটরী
বসল। দুজুবেগে এগিয়ে চলল কালা-
জ্বরের ওষুধ তৈরি। ওষুধ যখন তৈরি
হোলো তখন ডাক্তার ব্রহ্মচারী তার নাম-
করণ করলেন “Urea Stibamine”
এবং সেই নাম ধরে সেই ওষুধ বাজারে
বিক্রির জন্যে বের হোলো। বাংলাদেশ
ছাড়িয়ে আসামে, আর অসংখ্য চা-বাগানে
এবং পার্বত্য অঞ্চলে সে ওষুধ ছড়িয়ে
পড়ল। ভারতবর্ষ পেরিয়ে সে ওষুধের
চাহিদা হোলো মিশর দেশের নাইল
উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা কালা-
জ্বরে জরুরিত হয়ে উঠেছিল। এই ওষুধে

যে কত লোক বেঁচে গেল অকালমৃত্যু
থেকে তার ইয়ত্তা নেই। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর
সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধনভান্ডারও
উপহিয়ে উঠল। এমতাবস্থায় যা হয়ে থাকে
তা-ই হোলো। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের টনক
নড়ল। ওষুধটা তৈরির প্রকাশিত প্রণালী
অনুসারে যে-কেউ-ই তো ওষুধ বানাতে
পারে এবং বাজারে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ
টাকা উপায় করতে পারে। একটা নতুন ওষুধ
কোম্পানী রেজিস্ট্রি হোলো “Union
Drug Company Limited” বলে।
তার মধ্যে বিচক্ষণ কেমিস্ট ছিলেন
লন্ডনের উপাধিপ্রাপ্ত ডাক্তার বি, এন,
ঘোষ। তিনি ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ফরমুলাটা
অনুসরণ করেও অনেককাল সেই সল্টটা
বের করতে পারেন নি। তাঁর মতে ফর-
মুলাটার দুই-এক ধাপ অক্ষ নাকি উহাই
ছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ঘোষ অধ্য-
বসায়গুণে সেই সল্টটা পেয়ে গেলেন।
তক্ষণ সেই ওষুধ পাইকারিভাবে তৈরি
করে ইউনিয়ন ড্রাগ কোম্পানী বাজারে
ছাড়ল Urea Stibamine বলে। হঠাৎ
বাজারে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির
হওয়ার ডাক্তার ব্রহ্মচারী স্বভাবতই
অস্বস্তিবোধ করলেন।

একদিন সকালে স্যার বিনোদেব বাড়ি
বসে কি কাজ করছি, এমন সময় প্রবীণ
এটনীর জে, এন, মিথ ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে
নিরে এলেন স্যার বিনোদের পরামর্শের
জন্যে। বড় হয়ে সেই প্রথম ডাক্তার ব্রহ্ম-
চারীকে কাছাকাছি চাক্ষুষ দেখলাম। বেশ
ছোট বয়সে আমার যে ভাইটি ডিপার্থিরমায়
মারা গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দিনে
তিনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু
তাঁকে আমার মনে ছিল না। স্যার বিনোদের
সঙ্গে অল্পক্ষণ কথাবার্তা করে স্বতীনবাবু
ওপনিয়ন ব্রীফখানা স্যার বিনোদের
টেবিলে রেখে চলে গেলেন। তাঁরা চলে
যেতে স্যার বিনোদ সেই ব্রীফটা আমাকে
ও সুধীরকে দিলেন দেখে রাখতে এবং
বললেন যে আগামী শনিবার কনসাল্টেশনে
যেন আমরা তাঁর হয়ে আসি। দুজনে
আদা-জল খেয়ে লেগে গেলাম ব্রীফটা
পড়তে এবং তারপর “Passing off”
সম্বন্ধে “Halesbury's Laws of
England” ও অন্যান্য Tot-এর বই
এবং অবশেষে “Bullen and Leake”-
এর বিখ্যাত খসড়া ও নোট পড়ে ফেললাম
ও নোট করলাম। নির্ধারিত দিনে কন-
সাল্টেশন বসল। সবচেয়ে বড় কথা হোলো
এই যে “Urea Stibamine” নামটা
ওই ওষুধের গুণের সংজ্ঞাসূচক (Des-
criptive) নাম, না, একটা মনগড়া
(Fancy) নাম। যদি ওটা প্রথম পর্যায়ে
পড়ে তবে প্রকাশিত ফরমুলা অনুসারে

ওষুধ তৈরি করে সেই ওষুধের নাম ব্যবহার করতে সবাই অধিকারী। অর্থাৎ তৈরিই যদি করতে পারে তবে সেই ওষুধের সমস্ত অধিকার আসল নামটা না দিয়ে অন্য নাম দিলে তো জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই হবে। যদি নামটা স্বতন্ত্র পর্ষায়ে পড়ে এবং যে ব্যক্তি ওই ওষুধ তৈরি করে তার এক মনগড়া নাম দিয়ে সে ওষুধ বাজারে বিক্রি করে তবে দেখতে হবে যে জনসাধারণ যখন ঐ নামে ঐ ওষুধটা দোকানদারদের কাছে চায় তখন ওই ব্যক্তির হাতের তৈরি ওষুধই চায় কি-না। এ ছাড়া দুই পক্ষের ওষুধের প্যাকিং-এর মধ্যে বিভ্রান্তকর সাদৃশ্য কিছু আছে কি-না ইত্যাদি। কনসাল্টেশনে সাব্যস্ত হোলো যে কেসটা ভালই এবং যখন অনেক লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে তখন ডাক্তার ব্রজচাঁদর কোর্টের শরণাপন্ন হওয়াই বিধেয়। স্যার বিনোদ যতীনবাবুর দিকে চেয়ে বলে বললেন—“দাশ, তুমি একটা খসড়া করে ফেল।” পরদিনই একটা ব্যাকসীট এলো এবং কানজপুত মোটে ঘণ্টে “Bullen and Leake” দেখে একটা চলনসই খসড়া তৈরি করলাম। পরে আবার কনসাল্টেশন বসল। স্যার বিনোদ সেটা দেখে শ্রোণে এখানে-ওখানে সামান্য একটু অদলবদল করে পাশ করে দিলেন। যতীনবাবু ও ডাক্তার ব্রজচাঁদর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমি গিয়ে আমার টেবিলে বসলাম। পর মহাতেই দেখলাম ডাক্তার ব্রজচাঁদর এবং তাঁর পেছনে এটর্নী যতীনবাবু আমার উঠে আসছেন। কি হোলো আবার? ডাক্তার ব্রজচাঁদর স্যার বিনোদের সামনে গিয়ে বললেন—“স্যার বিনোদ, আমার কেসটা ভাল তো?” স্যার বিনোদ বললেন—“ভালই তো মনে হচ্ছে।” ডাক্তার ব্রজচাঁদর তবু বললেন—“আপনার কোন মনেই নেই তো? যদি এতটুকুও সন্দেহ থাকে তবে আমি কোর্টে গিয়ে ধাড়াই করতে চাই নে।” স্যার বিনোদ বললেন—“মামলার ফলাফলে তো গ্যারান্টি করা চলে না। তবে যা বুঝছি তাতে মনে হয় যে আপনার কেসটা বেশ ভালই।” খুশি হয়ে ডাক্তার ব্রজচাঁদর ও যতীনবাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করছেন স্যার বিনোদ একটু এগিয়ে উঠে এসে বললেন—“একবার নেপেন সরকারকেও প্রেস্টটা দেখিয়ে দাও।” যতীনবাবু “বেশ” বলে মজল দিয়ে চলে গেলেন। পরে টেলিফোনে যতীনবাবুর আফিস থেকে খবর পেলাম যে সরকার সাহেব সময় দিয়েছেন দু’দিন পরে বিকালে। তাঁর কাছে বসে খসড়াটাকে চূড়ান্ত করে নিতে হবে। গোলাম সরকার সাহেবের এলাগিন রোডের বাড়িতে। বেশ মনে আছে সেখানে এ কে দার সাহেবও এসেছিলেন। আমি ইতিমধ্যে আবার

আইনের নজিরগুলি দেখেছিলাম। “লিনোলিয়াম” কেসটা নজরে পড়েছিল। কেসটা ছিল সেভেন চ্যান্সারি ডিভিসন-এ। নাম করা জজ মিস্টার জাস্টিস ফ্রাই বলেছেন যে যখন কোন লোক রাসায়নিক কোন একটা নতুন পদার্থ তৈরি করে সেই পদার্থটার একটা নাম দেয় এবং তারপর পেটেন্ট বের করে একলাই সেই জিনিষটা তৈরি করে সেই নামে হয়ে গেলে সে ব্যক্তি সেই নামের একচেটিয়া হয়ে গেল সে ব্যক্তি সেই নামের একচেটিয়া ব্যবহার করার অধিকার দাবি করতে পারে না। অর্থাৎ সেই জজ সাহেবের মতে যদি একটি নতুন পদার্থের আবিষ্কারক তার আপনার তৈরি নতুন জিনিষটার একটা নতুন নাম দেয় যে নামটা সেই জিনিষকেই বোঝায় এবং অন্য কিছু বোঝায় না তখন সেই জিনিষটার সেইটেই

হোলো একমাত্র নাম এবং পেটেন্টের মেয়াদ ফুরোলে অন্য যে কোন লোক সেই পদার্থ তৈরি করতে পারে ফরমুলা অনুসারে এবং সে সেই নামটাও ব্যবহার করতে পারে, কেন না সেই পদার্থটার সেইটেই হোলো একমাত্র নাম। সরকার সাহেবকে আমরা জুনিয়াররা খুবই সমীহ করে চলতাম—ভয় করতাম বলাও চলে। তিনি কংগ্রেস পত্র পড়ে এবং স্যার বিনোদ প্রেস্টটা সম্মার্জিত করে দিয়েছেন দেখে কিছু অদলবদল না করেই বললেন—“প্রেস্ট ঠিকই আছে।” বসেই সরকার সাহেব তাঁর রীফটা বেঁধে ফেলতে লাগলেন। তখন সাহসে ভর করে সেই “লিনোলিয়াম”-এর কেসটা—সেভেন চ্যান্সারি ডিভিসন—সরকার সাহেবের সামনে দিয়ে বললাম—“এই কেসটা একবার দেখবেন?” তিনি কেসের হেডনোটটা দেখেই বললেন—

বেঙ্গল কেমিক্যালেন্স



মুবাগিত **ব্রাক্সী**
হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়
আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণ সম্বলিত



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

© 1928/29

“ওটা ত’ এলপারাদ’ প্যাটেট-এর কেস। আমাদের কেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।” বলেই কেসটা বন্ধ করে বইটা মাটিতে ফেলে দিলেন। খুবই অপ্রতুত লাগল। বাইরে এসে এ কে রায় সাহেব বললেন—“দাশ, তুমি ত’ কম আশঙ্কিত নও হে। জান না যে সরকার কোন প্রদান না করলে কনসাল্টেশনের সময় জুনিয়ারদের কিছু বলতে হয় না?” একটা অভিভূততা হোলো। তবে মনে হোতো লাগল যে জুনিয়ার যদি তার মনের বিশ্বাস বা আশঙ্কা সিনিয়রকে না বলবে তবে বলবে কাকে?

প্রেস্ট ফাইল হোল এবং সেইসঙ্গে অস্থায়ী ইনজাংশন চেয়ে নেওয়া গেল। সেই ইনজাংশনের মোসনটা খুব ঘটা করে স্যার সি সি ঘোষের কোর্টে হোলো। বিদ্যার তরফে জিলাম স্যার বিলোদের সঙ্গে এন এন সরকার, এ কে রায়, আমি ও সুধীর মিটার। প্রতিবাদীর পক্ষে ল্যাংফোর্ড জেমস, বি এন ঘোষ, ওয়ালটার পেজ ও রবি ঘোষ। আমাদের এটর্নী জে এল মিটার-ওদের এটর্নী লেসলী গ্র্যান্ড হাইডস। প্রাক্ষরীয় কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক স্যার সি সি রায় এবং অন্যান্য অভিভূত কেমিস্টরা এ্যাক্সিডভেট ত’ করেই ছিলেন কোর্টেও এসেছিলেন। সাক্ষী দিয়েছিলেন কি না মনে নেই। স্যার বিনোদ আইন সম্বন্ধে বহিস করে অন্য কোর্টে ছুটে গেলেন অন্য কাজ করতে। সরকার সাহেব বিজ্ঞানের ছাত্র বলে সেই এ্যাক্সিডভেট কেমিস্টার

কেমিক্যাল ফরমুলার ব্যাখ্যা করে জজ সাহেবকে বোঝালেন যে ওই সল্টটার লম্বা একটা কেমিক্যাল নাম আছে এবং “ইউরিয়া স্টিবামিন” একটা মনগড়া (ফ্যান্সী) নাম বই আর কিছু নয়। কতটা শেব করে সরকার সাহেবও চললেন অন্য কোর্টে। আমাদের লাজির বাকী রইলেন এ কে রায় সাহেব। তিনিও মনে পড়লে আমার আর সুধীরের কি দশা হোতো কে জানে। ল্যাংফোর্ড জেমস সাহেব খুব লড়িয়ে কোর্সুলী ছিলেন। বহুক্ষণ জজের সঙ্গে যত্না-যসিত হোল। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে সেই কম্পাউন্ডটা একটা নতুন পদার্থ এবং ইউরিয়া স্টিবামিন ছাড়া ওই পদার্থটার অন্য কোন নামই নেই। দিন তিনেক চলছিল সেই মোসনটার শুনানী। জজ সাহেব রায় মূলত্ববী রাখলেন। অবশেষে কদিন পরে খুব প্যাঁড়প্যাঁড় এক রায়ে অস্থায়ী ইনজাংশনটাকে মামলার শুনানী পর্বন্ত বহাল করলেন এবং মামলার শুনানীটা এগিয়ে দিলেন। বিবাদী কোম্পানী তাদের তৈরি ওষুধটার একটা নতুন নাম “স্টিবুরিয়া” দিয়ে বেচেই চললেন। প্রথম দানে আমাদেরই জয় হোলো।

ইনজাংশন পাওয়ায় মামলার দেরি হোলো আমাদের মক্কেলের কোন ক্ষতিই নেই। আসাম গভর্নমেন্ট ডাক্তার ব্রহ্মচারীর “ইউরিয়া স্টিবামিন”-এর একেবারে পাইকারী খন্দের ছিলেন এবং ওই নামেই সেই ওষুধের জন্যে অর্ডার

পাঠাতেন। আসাম গভর্নমেন্টের এই বিভাগীর দপ্তরের মন্ত্রী ডবন ছিলেন প্রমোদ নন্দ মশার। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, মন্ত্রীবরের সাক্ষ্য নেবার জন্য একটি কমিশনের আজ্ঞা হয়। দরখাস্ত মঞ্জুর হোলো। কমিশনার হলেন সেন্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কুদিরাম বসু, মশারের ছেলে কিরণ বোস ব্যারিস্টার সাহেব। ঘটা করে আমরা চললাম শিলং সহরে। কমিশনার সাহেব এটর্নী যতীনবাবুর অফিসের পার্টিনাম বা এ্যাসিস্টেন্ট সতীশ বোস যতীনবাবুর ছেলে ও আমিও সঙ্গে জুটলেন ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ছোট ভাই যিনি জামালপুরে ওকালতি করতেন। তিনি চললেন তাঁর দাদার স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে এবং সেই তরুে কিছু রোজগারও করবার উদ্দেশ্যে। আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন বেশ খাইয়ে লোক। পথে তিনি হঠাৎ একবার রে-টাইম-চারের অর্ডার দিয়ে বসলেন দেখে আমাদের মক্কেলের ভাই সেই টিপনীর করেছেন—“এখন আবার চা”—কমিশনার সাহেব এমন চোখ ঘুরিয়ে চাইলেন তাঁর দিকে যে সে চাহনীতে যদি মানুষ ভুল্য হেতো তবে আমাদের মক্কেল সেই মুহূর্তেই তাঁর ভাইটিকে হারাতেন। বিপদ গুলে ভাইটি অন্য বার্থে গিয়ে বসলেন। যখন খানসামা বিল নিয়ে এল তখন কমিশনার সাহেব বড়ো আঙুলটা মক্কেলের ভাইয়ের দিকে করে বললেন—“ম্যানেজারবাবু কো পাশ লে যাও।” তারপর সে ভদ্রলোক আর শ্বিতীরবার কমিশনার কিরণ বোস সাহেবকে ঘাঁটান নি।

আমরা শিলংয়ে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার মিশরার উপক্রম করেছে। চারিদিকে একটা কুয়াশার ঢাকা। আমরা গিয়ে উঠলাম এটর্নী অফস বোসের বাড়িতে। সেখানে আমাদের থাকবার ও খাবার সুবন্দোবস্ত করাই ছিল। কোন অসুবিধেই হোলো না। পরের দিন আমাদের কাজ আরম্ভ হোলো। আমি মন্ত্রী প্রমোদ নন্দকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে কটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমরা প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মশার বললেন যে আসামের চা বাগানে ও অন্যান্য পাবিত্র অঞ্চলে ভীষণ কালাজ্বর হয়ে বহু লোক প্রতি বছর মারা যায়। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধটা বাজারে বেরুন ইন্তক আসাম সরকার তাঁর তাঁর সে ওষুধ কিনে প্রদেশময় সমস্ত হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও চা-বাগানেও সরবরাহ করে থাকেন। তাঁরা তাদের অর্ডার দেন “ইউরিয়া স্টিবামিন” বলেই কেন না তাঁর কেবল ডাক্তার ব্রহ্মচারীর তাঁর ওষুধই চান এবং “ইউরিয়া স্টিবামিন” বলতে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্র্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - লাহোর

বেঙ্গলুরু - শ্রী নগর - গোয়াটা

ডাক্তার ব্রহ্মচারীর তৈরি ওষুধ বলে মনে করেন। জেরা করতে উঠলেন অপর পক্ষের উকিল দাশরথি ঘোষ। “এই ডাই আমার সঙ্গে বঙ্গবাসীতে পড়তেন। দাশরথি ঘোষ দেখতে-শুনতে সুপুরুষ এবং ফিট-ফাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পৰা। স্প্রিং-এর চশমায় একেবারে আধুনিক দেখাত তাকে। আমাদের মামলাটা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে যেখানে তখনো সব উকিলদের আনাগোনা সুরু হয় নি। কমিশনে উকিলদের হাজির হতে বোধ হয় বাধা ছিল না। বাই হোক, শতদূর মনে আছে একটা কাগজে-কলমে ওজর রেখে দিলাম। জেরা বোধ হয় দুদিন চলেছিল। তার পর আমি গোটা দুই প্রশ্ন করে কমিশন শেষ করলাম। তার পরদিন আমরা শিলং সহরটা গাড়ি করে ঘুরে এলাম। শিলং-এ আমার এই প্রথম আসা। বেশ ভালই লেগেছিল সহরটা। পবের দিন আমরা কলকাতার দিকে রওনা হলাম।

কলকাতার ফিরবার পর মামলার শুনানীর ভেড়াজোড় সুরু হলো। ব্রীফ এলো আমাদের সবাইয়ের। কনসাল্টেঁসন হলো স্যার বিনোদের বাড়িতে। নূপেন সরকার সাহেব, এ কে রায় সাহেব, আমি আর সুধীর মিশ্র সেখানে ছিলাম। শরৎ বোস ছিলেন কি না মনে নেই। কনসাল্টেঁসনে নানা নজির দেখা হলো। আমি স্যার বিনোদের হাতের কাছে সেভেন চ্যাম্পারি ডিভিশন-এর “লিনোলিয়াম” কেসটা রেখে দিলাম। একেস ও-কেস দেখে স্যার বিনোদ ওই রিপোর্টটা খুলে পড়তে লাগলেন। মৃধ দেখতেই বদলায় যে তিনি যেন ভাবিত হয়ে উঠেছেন। সরকার সাহেব এ কে রায় সাহেব দেখলেন কেসটা। যদিচ কেসটা এক্সপার্সড প্যাটেন্ট-এর কেস তবু যে নীতি এই কেসে বলা হয়েছে সে নীতিটা আমাদের কেসে লাগবে না কেন? নীতিটা হচ্ছে যে যদি কেউ একটা নতুন পদার্থ আবিষ্কার করে তাকে একটা নাম দেয় এবং সে নাম যদি সে পদার্থ-পদবাচ্যই হয় এবং অন্য কোন পদার্থকে না বোঝায় তবে অন্য কেউ যদি সে পদার্থটি তৈরি করার অধিকারী হয়—যেমন প্যাটেন্টের মেয়াদ ফুরালে বা যেমন আমাদের কেসে প্রকাশিত ফরমুলা দিয়ে—তবে, সে সেই নামটাও ব্যবহার করতে পারে, কেন না সেই নাম ছাড়া ওই পদার্থটার আর কোন

সংজ্ঞাই নেই। সুতরাং ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধটার যদি বিজ্ঞানসম্মত অন্য নাম না থাকে তবে সবাই “ইউরিনা স্টিবামিন” নাম ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের কেসটা আগে যেমন জোরদার মনে হয়েছিল সে রকম মোটেই নয় বলেই মনে হলো। ঠিক হলো যে কোন রকমে মামলাটা মিটিয়ে নিতেই হবে। কিন্তু ল্যাংফোর্ড জেমস সাহেব কিছুতেই মামলা মেটাতে রাজী হলেন না।

বাকল্যান্ড সাহেবের ঘরে কেস উঠল। ঠিক হলো যে আমরা ঐ এক কারণে আর নতুন মামলা করব না প্রতিশ্রুতি দিয়ে মামলাটা তুলে নেব। খরচা ত’ দিতেই হবে। জুনিয়ারের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে। আগে শুনলে খরচাও হতো না এবং খাটোমিটাও বেঁচে যেতো। আমরা সব ক’টি কোঁসুলী বাকল্যান্ড সাহেবের কোর্টে হাজির হলাম কেন না গরহাজির হলে ফী হয়ত দেবে না। মামলা ডাক হতে স্যার বিনোদ মামলা তুলে নেবার প্রস্তাব করে আদালতের অনুমতি চাইলেন। লড়ুইয়ে ল্যাংফোর্ড জেমস সাহেব কন্সালি নেই ছোড়তা।

তিনি বললেন—যে তিনি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করবেন যে “ইউরিনা স্টিবামিন” একটা মনগড়া নাম নয় এবং সেটা ওই পদার্থেরই নাম। বাকল্যান্ড সাহেব বললেন ওটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হবে। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি রেকর্ড ক’বলেন যে ঐ একই কারণে আমরা আর মামলা আনব না এবং মামলা প্রত্যাহার করবার অনুমতি দিলেন। বাদীকে প্রতিবাদীর ষাণ্ডা খরচা দিতে অর্ডার দিলেন। আমরা পাঁচ কোঁসুলী, মৃধে পান্ডুর হাসি, মনে লাজ নিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম। বড় বারান্দাটার শুনলাম ডাক্তার ব্রহ্মচারীর গলার আওয়াজ। তিনি বেশ রোগে বললেন—“যখন আমার ইনজাংশনের মোসন হয় তখন এ কোঁসুলী আসে ত’ ও আসে না। আর আজকে মামলা তুলে নেবার সময় পণ্ড পান্ডবই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। কাউকে এক পরসো দেব না।” কথাটা যেন শুন নি এই রকম ভাব দেখিয়ে বার লাইব্রেরীতে ফিরলাম। শেষ পর্যন্ত ফীসটা কারুরই মারা যায় নি।

[কল্পনঃ]

কাশির যন্ত্রণায় কেন কাতর হবেন



টাপানল থাকতে!

কেন কুঁকড়া কাশিতে ক্রমাগত কষ্ট পাবেন? আর কেনইবা ঘাস গ্রাসের সংগ্রামে বিনয়ি রজনী বাগম করবেন? “টাপানল কাক সিরাপ” ব্যবহার করুন। অচিরেই রেবা তরল করে কষ্টনাশী কষ্ট লাঘব করে; আর ঘাস গ্রাসকে সহন ও স্বাভাবিক করে তোলে। আপনি আবার নিজেকে পূর্বের মতই সুস্থ বোধ করবেন।



মার্টিন ও হ্যারিশের বিশিষ্ট উৎপাদন

47M M.H.10 DN

ঐশ্বর মেলা

নিশিলাতা—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।
বার্ষিক। ১৪, মদন বড়াল লেন।
কলকাতা—১২। দাম সাত টাকা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপন্যাস লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত লাভ করেছেন ও নিজের স্থান করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত পরিবেশ ও তার চরিত্রই তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকা।

শিবপূজা উপলক্ষে গড়ে ওঠা মেলাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস রচিত। সেই মেলার পানওয়ালী ও তার ভাইবোঁ নিশিলাতাই হচ্ছে এই উপন্যাসের দুইটি প্রধান চরিত্র। এই চরিত্র দুটিকে ঘিরেই অন্যান্য চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠে।

বিগতযৌবনা বিনোদিনী কিসের মাদকতার এক মেলা থেকে আর এক মেলার ঘুরে বেড়ায়, কাদের আকর্ষণে সে ঘুরে দুদিন বেশি মন বসাতে পারে না—সেটাই তার কাছে রহস্য বলে মনে হয়। তবু মনে হয় ইদানীং কিসের বেন অভাব হয়ে গেছে। অতীতের আহ্বানের মতো এখন বেন তেমন আহ্বানের উত্থাপ নেই। ভাই এবারে নব উল্লেখ্যযৌবনা তার ভাই-ঝিকে নিয়েই মেলার পসরা খুলে বসল। সপ্তে সপ্তে তার পসরা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিনোদীপসারী মত নিশিলাতা এখনও ব্যবসায় দক্ষতা অর্জন করতে না পাবলেও, তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যেককে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এমন কি গোখরো সাপ গোবরাও পর্যন্ত তার বশীভূত হয়ে পড়েছে। সে তার সপ্তে আন্তরিকতার সপ্তে ব্যবহার করেছে এবং তাকে ভালবেসে পর্যন্ত ফেলেছে। এই ভালবাসাই গোবরাকে তার কলুষিত কার্যবলীর জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মবিকার ও আত্মবিলাপের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। নিশিলাতার এই ব্যক্তিত্ব কোনদিন স্থান হয় নি। তবে

তার মধ্যে স্বপ্নের অস্তিত্বই গল্পের শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে। মেলার সে বিভীষ চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছে ও নানাব্যপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। গ্রাম্য বলিকা সাবিঘীর দেহ কলুষিত হয়েছে এই মেলায়। গোখরো সাপ গোবরার মতনই ব্যক্তিহীন মোহনও নিশিলাতার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে কসর করে নি। তাছাড়া রয়েছে মেলার তত্ত্বাবধায়ক শিবজি, ঘোষাল, ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্র।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গী চমৎকার। মেলার বিভিন্ন চরিত্রগুলি স্বাভাবিক বর্ণনার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাস হিসাবে হয়ত কিছু দুটি আছে। তবে কাহিনী ও চরিত্রের বাস্তবতা—যা বহু উপন্যাসে দুর্বল—শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। সব মিলিয়ে এই উপন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে—এটা নিঃসন্দেহ।

শারদীয় গণবার্তা — সম্পাদক :
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭, রিপন স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬। দাম : দুই টাকা।

শারদীয় গণবার্তার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র দুর্বল। এই পত্রিকার বহু রচনাই 'রেফারেন্স' হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। প্রবন্ধ এবং আলোচনাসমূহের সংকলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখক এবং নেতৃবৃন্দের সমাবেশ হয়তো একমাত্র শারদীয় গণবার্তাতেই সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিতে স্বদেশের ও স্বরাষ্ট্রের সমস্যার আলোচনা করেছেন হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ('নির্বাচন পরবর্তী অবস্থার কতব্য'), ভবানী সেন ('বৃত্ত-চক্রের আশু কাজ'), নরেন দাস ('জিজ্ঞাসা' এতে আছে বিশেষভাবে নির্বাচনোত্তর সমস্যার কথা), মাখন পাল

('নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও আমাদের কতব্য')। একেক দলের মত্বপাত্রে লিখিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও তা সকলেরই জানা উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সব লেখার বিস্তৃত আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এ ছাড়া প্রবন্ধ-গুলির বিষয়বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। যেমন ডাস ক্যাপিটাল, রক্তাক্ত অক্টোবর, গোপিক, ভাবতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মার্কিনী অনুপ্রবেশ, প্যান-আমেরিকান আন্দোলন, ল্যাটিন আমেরিকা, মাদুরাই দিগদর্শন প্রভৃতি। - লিখেছেন হিদিব চৌধুরী, নারায়ণ চৌধুরী, অরবিন্দ পোন্দার প্রমুখ মোট সাতজন লেখক। গল্প দুটি— লিখেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ ও অমল দাশগুপ্ত। রুশ বিপ্লবের অর্ধশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে নটি ও অন্যান্য কবিতা লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উপরন্তু আছে নিগো কবিতা ও ভিষেত-নামের লোকগাথার অনুবাদ। পত্রিকার সর্বাপেক্ষা চমৎকার বিষয় হচ্ছে একটি ছবি : 'আত' শিরের গুপ্তের কাম্যায় ধনিত মাটি ও আকাশ। এঁকেছেন সিকেইরোস। পাঠকদের সত্যিকারের কিছু দেওয়ার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদার্থ।

চতুষ্কোণ—সম্পাদক : শিবপ্রসাদ চক্র-বর্তী। ১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-১৪। দাম : দুই টাকা।

আম্বিন সংখ্যা চতুষ্কোণ গতানুগতিক শারদসংখ্যার প্রভাবমুক্ত একটি বিশিষ্ট উচ্চমানের সংকলন। বুদ্ধিজীবী বিদ্য-চিন্তাশীল পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন মনে হয়। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আছে। কিন্তু বিশেষভাবে প্রবন্ধের দিকেই নজর দেয়া হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রবন্ধ পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ভালো কবিতা লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, সুশীল রায়, আবুলকাশেম রহিমুদ্দিন। মানবেন্দ্র পাল ও ধর্মদাস মৃধোপাধ্যায়ের গল্প ভালো লাগবে।

রাষ্ট্র—সম্পাদক : নির্মল বসু।
৪৭।২এ, ব্রহ্মদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলি-৪।
দাম : এক টাকা (বার্ষিক : চার টাকা)

সাপ্তাহিক বঙ্গদূত

রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার এই দ্বৈ-মাসিক পত্রিকাটি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা বাহুল্য-মাত্র। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পত্রিকা আর নেই। দেশের মানুষ যে সময় দেখে-শুনে জেনে রাজনীতিসচেতন হচ্ছে—ঠিক সেই সময় এই ধরনের পত্রিকা তাদের কাছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আলোচনা, মতাদর্শ এই পত্রিকা মারফৎ পড়ে রাজনীতির সঠিক পথ কি—তা নির্ধারণ করা যায়। অপিচ রাষ্ট্রনৈতিক ছাত্ররাও এখান থেকে পাবে আলোচনামূলক বহু তথ্য, সর্ব-মুদ্রিত মতামত ও প্রাচীন তত্ত্বসমূহের প্রাপ্ত অনুবাদ। আলোচ্য সংখ্যায় আছে—অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতি : উৎপত্তি, ক্রম-বিকাশ, ভারতের শাসনব্যবস্থায় দর্শনীতি ও নানাবিধ দুর্বলতা সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য, নারীজাগরণে টমাস পেনের সংগ্রাম, জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক বিতর্কমূলক আলোচনা। লিখেছেন অতীন্দ্র মজুমদার, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুস্তাফিজ, অশোককুমার মদ্বোপাধ্যায়, বিমলেন্দু বল্লভোপাধ্যায়। গ্রন্থ পরিচয়ে অধ্যাপক নির্মল বসুর সমালোচনাটি আদর্শস্থানীয়। মল্লয়শঙ্কর দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক।

প্রগতি—সম্পাদক : মৃণাল চট্টো-পাধ্যায়। ৩৯ বি, ডেন্ট মিশন রোড। কলিকাতা—২৩। দাম দুই টাকা।

এতে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটিকা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এটা একটা আকর্ষণীয় সংকলন। ডবানী মদ্বোপাধ্যায়-এর উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, প্রবন্ধগুলি তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। এক কথায় এই সংখ্যাটি সুসম্পাদিত।

পল্লব—সম্পাদক : প্রীতমিয় মাজী। ৭৯, কলীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। মাহার্য—৭৫ পরমা।

গতানুগতিক ধরনের একটি পত্রিকা। অধিকাংশ লেখকই নবীন। তবে রচনাগুলি একেবারেই অপাঙ্কস্তের নয়। সাহিত্যজগতে এদেরও মূল্য অনস্বীকার্য।

শারদীয় প্রবাহ — সম্পাদনা—বিনয় চৌধুরী। ৭/৪, বনমালী ঘোষাল লেন। কলিকাতা-৩৪। মূল্য : দুই টাকা।

প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের সমাবেশে আলোচ্য সংকলনটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। পরিমল গোস্বামী, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ ও অরুণ সেনের প্রবন্ধ এ সংকলনের সম্পদ। মোট কথা সাহিত্যের সকল বিভাগেই বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা আলোচ্য সংখ্যাটিকে একটি মূল্যবান সংকলনে পরিণত করেছে।

আরোহী—শারদ সংকলন—সম্পাদক—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সত্যচন্দ্র কর। ৫/২৫, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য : এক টাকা।

আকৃতির দিক দিয়ে ছোট হলেও গল্পের দিক থেকে পত্রিকাখানি সাহিত্যরসিকদের খুশি করতে পারবে। এ সংখ্যায় ঝাঁরা লিখেছেন তাদের মধ্যে আছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার সেন প্রমুখ। এদের রচনাগুলি সুপাঠ্য।

ক্রান্তি—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম ৪ এক টাকা।

প্রখ্যাত মেক্সিকান চিত্রশিল্পী সিকেইরোসের আঁকা ‘আত্মপ্রকৃতি’ ও ‘ধরাশায়ী তবু পরাভূত নয়’ দুটি বিস্ময়কর ছবি দিয়ে এই পত্রিকার আবহ। এবং প্রারম্ভেই বলা যায়, এই পত্রিকা বিষয়বৈচিত্র্য, লেখকদের পার্শ্বতাপ, আলোচনা বুদ্ধিজীবীদের চমৎকৃত করবে। রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও সাহিত্যিক ও শিল্পী প্রবন্ধগুলির উপজীব্য বিষয়। প্রিন্নতোষ মৈয়ের ‘ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশ’ প্রবন্ধে ধনিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য কি—তা তুলে ধরেছেন। অবশ্য সেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কিরকম হওয়া উচিত—তাও ইংগিতাকারে বলেছেন। লীফ জোহান-সেনের ‘মার্ক্সবাদ ও গাণিতিক বিদ্যা’, অরবিন্দ চক্রবর্তীর ‘মার্ক্সবাদের স্বপক্ষে’, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ‘আইজাক ডয়েটশার’, মানস রায়চৌধুরীর ‘ইলিয়া এরেনবুর্গ’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিকেইরোসের ‘শিল্প প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধটি মূল্যবান। পত্রিকাটিতে যে আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে, তার জন্যে সম্পাদক ডক্টর ভট্টাচার্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

টেকনোলজির ছাত্র ও সাধারণের জন্য

যন্ত্র আবিষ্কার গরিচিতি

বি, আর, বরুয়া, B. Sc. (CAL.), B. Sc. (EDIN.)
A. M. I. C. E. (LOND.) কর্তৃক প্রণীত।

মিশর, চীন, গ্রীক, বাইজেন্টাইন ও ইউরোপের মস্তপাতি এবং বর্তমান যুগের স্টীম, ইন্টার্নেল কম্বাসশান ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ও নিয়ন আলো, জল ও স্টীম টারবাইন, টারবোজেট, আগবিক রিএক্টর, অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বম্ব, রকেট প্রকৃতির আবিষ্কার ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : ১০-০০ টাকা (দশ টাকা) মাত্র।

আবিষ্কার প্রকাশনের পক্ষে লেখক কর্তৃক ৪৭-বি, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত।

মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও অত্রান্ত পুস্তকের দোকানে প্রাপ্য।

ইয়োহোপা

হিরন্ময়
ভট্টাচার্য

ইংলন্ডের সমুদ্রতীরের শহরগুলো ছবির মত সাজান। এগুলো ছোট্ট শহর। সিন্ধু পড়লে পিঁপড়ের সারির মত লোক হাজির হয়। আবার হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে সব শূন্য হয়ে আসে। হোটেল ফাঁকা। সোকানদাররা ব্যবসা গোটাতে সুরু করে। সেই অবসরে রাজনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলন বসে। সভারা এক টলে দুই পাখী মারে। ঠিক হল না উপমাটা বরং বলি—রথ দেখা আর কলা বেচা দুই হবে। সম্মেলনে যোগ দেওয়া গেল আবার হলিডে হল। বস্তার কচকচানি ভালো না লাগলে, সমুদ্রের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা যায়। স্বাস্থ্য পরিবর্তন হয়, মনটাও হালকা হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া যা বোলাটে—কর্তাব্যস্তির কি ঘুরলেই মন হালকা করতে পারবেন। না পোড় খাওয়া নেতার মন বলতে কিছু নেই। যা থাকে তা একটা জম্বাট বাঁধা স্ট্যাটিসটিস্ট। তবে সূচ্যাত্মি শুনলে সব সমস্ত আনন্দ। সম্মেলনে সাধারণ সভারা কি মাথা নিচু করে বলবে ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার!

তা মনে হয় না। বরং তুফান ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। এবং দুর্ঘটনা না ঘটলেই স্বখেট। কর্ণধারদের শনির দশা চলছে। সরকারী নীতির নোকে সম্মেলনটা পার হতে পারলেই নোভাগ্য।

আসল কথাই বলা হয় নি। লেবার পার্টির সম্মেলন বসেছে স্কারবরা শহরে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হচ্ছে না। বিদেশে বুটেনেব তৈরি জিনিসপত্র অন্য দেশের সঙ্গে এঁটে উঠতে পাচ্ছে না। তাই সরকার ইচ্ছে করে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে অর্থনীতি সংশোধন করার জন্যে। বেকার বাড়ছে কিন্তু ব্যালেন্স অফ ট্রেড যে কে সেই।

ব্যালেন্স অফ ট্রেড নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর বা বাসনা সাধারণ লোকের নেই। তবে বেকার সমস্যা দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করে। সুতরাং তারা ছেড়ে কথা বলবে বলে মনে হয় না। নেতাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

অনেকে ভাবছে এই নিয়ে না লেবার পার্টি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

উপোখ্যাত বক্তার পার্টি চেয়ারম্যান জন বয়েড বেকারের সংখ্যা নিয়ে উল্লেখ প্রকাশ করেন। তবে আশ্বাস দেন অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হচ্ছে এবং জিনিসের দাম কমের দিকে। এমনই দুর্ভাগ্য সেইদিন কাগজে বেরোল ইলেকট্রিসিটি গ্যাস-এর দাম বাড়ছে, ব্রিটিশ রেল, লন্ডনের বাস ও টিউবের ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে।

লোকে ভাবল প্রধানমন্ত্রী উইলসনের কি বলবার থাকতে পারে। ১৯৬৪ সালে নির্বাচনের আগে বলেছিলেন টোরি পার্টি ভাবের ঘরে দেউলে হয়ে গেছে। নতুন কিছু দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। দেশ রসাতলে চলেছে। একমাত্র লেবার পার্টি পাবে দেশকে উদ্ধার করতে। চিকিৎসার ফর্মুলা তাদের মস্তুর মধ্যে। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক করা হবে। মানুষের বদলে মেশিন কাজ করবে। প্রডাকশন বাড়বে জিনিসের দাম কমবে। কোন বেকার থাকবে না। সবার জীবনে আসবে প্রচুর। বলা বাহুল্য কোন প্রতিজ্ঞা সফল হয় নি। বরং দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সুতরাং নতুন করে উইলসনের কি বলার থাকতে পারে।

সবার ভবিষ্যাবাণী ভুল হল। উইলসন বিজয়ী বাঁরের হাততালি কুড়োলেন। সংখ্যাভেদে ফিবিবিসি দিয়ে বক্তাব শুরু। বোঝালেন এই ক'বছর লেবার সরকার যা করেছে তা আগে কেউ কোনদিন কবে নি। টোবি পার্টিকে প্রচুর গালিগালাজ করলেন। তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-মসকরা কবলেন। দশ-পনের বছর আগের টোবি মন্ত্রীদের বক্তা তুলে ধবে তাদের উপহাস করেন। তারপর বেকারদের দৃষ্টিতে চোখের জল ফেললেন বেকারদের দৃষ্টিতে চোখের জল ফেললেন। একজন বেকার থাকলেও সে যা দৃষ্ট ভোগ করে, তিনি নিজে তার চেয়ে বেশি ব্যথা উপলব্ধি করেন। লেবার সরকারের অধীনে একজনও বেকার থাকবে না। বেকার কথাটা লোকে চিরদিনের জন্যে ভুলে যাবে।

আর একটা নতুন কথা তিনি শোনালেন, New Industrial Frontier. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, নিউ ফ্রন্টইয়ারের কথা। কথাটা আবেদন করেছিল দেশবাসীর মনে। উইলসনের কথাও লেবার পার্টির সভ্যদের নাড়া দিয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর সমর্থন মিলবে কি?

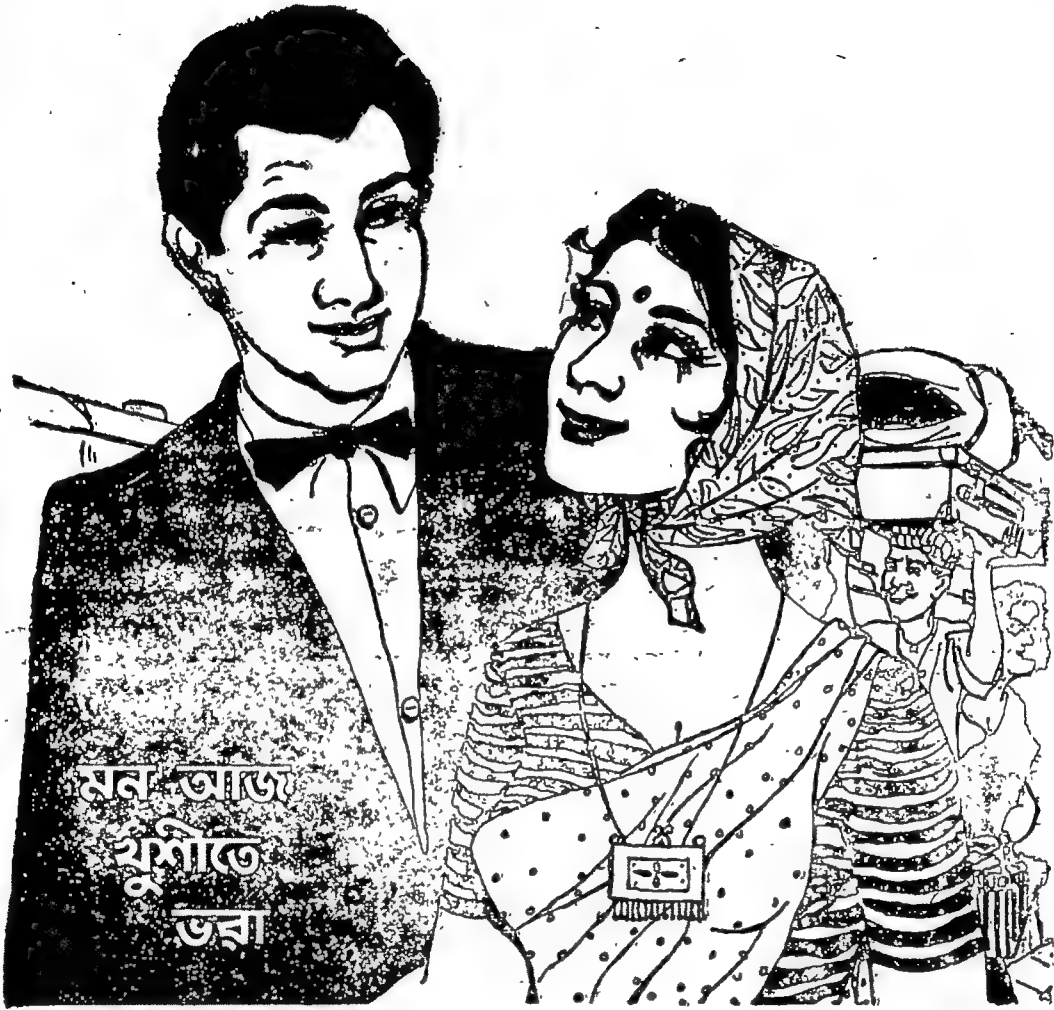
এক সভা উইলসনের বক্তার পর হাত তুলে বললেন প্রি চিয়ারস ফর উইলসন। কিন্তু তিনি মাত্র দেড়খানা হিপ হিপ হুর-রে পান।

পরদিন এক দৈনিক পত্রিকা লিখেছিল উইলসন একজন সুদক্ষ সেলসম্যান। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জিনিস হরত লোকে চায় না। ডেলিভারি দেবার তারিখ অনেক পরে। জিনিসটাও খারাপ। উইলসনকে সেলসম্যান করে পাঠালে সব বিক্রি হবে। কোন লোকের দরজার পা দেবার সুযোগ পেলে তিনি এসকিমোদের কাছে রেফ্রিজারেটর বিক্রি করে আসবেন। গরম দেশে গরম জলের বোতল বিক্রি করবেন।

মাইকেল লেবার পার্টির নাম করা বামপন্থী নেতা, তাঁকে কিছু উইলসন সম্বন্ধে কবতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—উইলসনের নাড়' দেখে আমি আশ্চর্য হইছি। তার সবচেয়ে কদাকাব বোনকেও বক্তার জোরে, "সিন্ডেরেলা" সাজিয়ে দেবেন। সিন্ডেরেলা রূপকথার রাজকন্যা।

লেবার পার্টি সম্মেলন নিয়ে কাগজে যা ছাপা হয়েছে তার চেয়ে বেশি জায়গা অধিকার করেছেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন। কেউ কেউ লোককে আনন্দ দিতে ভালোবাসেন। জর্জ ব্রাউন তাঁদের একজন। তবে ব্রাউন সেজে লোক হাসান মন্ত্রীর পক্ষে কি শোভা পায়। জর্জ ব্রাউনকে অত্যন্ত সাদাসিধে আমদে মানুষ বলে মনে হয়—হৈ হৈ ভালোবাসেন। ব্রিটিশ এটিকেটের সঙ্গে তা যদি খাপ না খায়। দেশকে কমপ্রমাইস করতে হবে।

অল্প করেকদিন আগে আমেরিকা যাবার পথে "কুইন মেরী" জাহাজের পার্টিতে তিনি প্রাণ খুলে নেচেছিলেন।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ম
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ম।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ম সাধনার
অব্যর্থ মহোদয় প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মুন্ডসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাফারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাম্রাট প্রমথলাল ডাকা



অধ্যক্ষ ডাঃ বোসেন চন্দ্র বোষ, এম-বিসি,
আই-বিসি, এফ.সি.এস. (কেন),
এম.সি.এস. (আমেরিকা), তাম্রপুত্র
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের কৃতপূর্ণ
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ মনোজ চন্দ্র বোষ,
এম-বি. বি-এস. আই-বিসি, এফ.সি.এস.

৩৬, মাখনা গুপ্তদালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

ধারা-বর্ষণে

নীহারকান্তি ঘোষদণ্ডিতবার

তোমাকে বলোছি, যখন-ব্যাকুল কৃষ্টির ঝরে পড়ে
ধারা-বর্ষণে আকাশ আকুল করে—
বাতাসে হৃদয় ভেসে ভেসে যায় উদাসী মেঘের মতো—
রাত্রির কোলে কাছে নিয়ে আসে কতো
উষ্মবকের নিশ্বাসে ভরা মমতায় অঁকা মন-
কদম্ব-বনে হঠাৎ যখন সুদূর হয় গুঞ্জন
নুপুংসের মতো সুদূরলোকের দিশাহারা আঁতলায়
তখন তোমায় বড় মনে পড়ে এ জীবনে ব্যর্থবার।

কিরিঝিরি নদী কোমল খুঁশির জলে
সবুজ বনের পথ বেয়ে যেন চলে
মনে হয় এই ধারা-বর্ষণে। তুমি তার কলতান।
তুমি তার সেই মৌসুমীভরা গান।
তুমি তার সেই সজল রূপের আলো।
তুমি তার সেই সঘন আকাশ, মেঘে মেঘে ভরা কালো।

তোমাকে বলোছি, বর্ষা-ব্যাকুল তারা-হারা নিশিরাতে
হঠাৎ যখন মত্ত দাদুরী মাতে
মেঘের আদরে ছায়া ছায়া নিরালায়—
ভিত্তি বাতাস আকাশের সারা গায়
শিহরণ আনে রতি-রোমাঞ্চে সঞ্চিত অনুরাগে—
কেলা-নিকুঞ্জ স্বপ্ন-বাসর জাগে—
লক্ষ্যায় কাঁপে সুদূরভরা সব বৃষ্টি-কামিনীর বনে—
ভাবতে তোমায় তখন আমার বড় ভালো লাগে মনে।

বর্ষণ হোক। হোক ঘন বর্ষণ।
মনে পড়ে যাক কোনোদিন দেখা দূরন্ত ঝাউবন।
মনে পড়ে যাক নিজন কোনো মেয়ে।
মনে পড়ে যাক রয়েছে এখনো নিরিবিলি একা চেয়ে
মজুলা সেন। জানলা, আকাশ, মাঠ।
জলে জলে ভরা ধারা-বর্ষণে দিগন্ত, পথ-ঘাট।

অপবয়স্ক যুবকের মত। নানান পোজে
তারি নাচার ছবি ছাপা হয়। চোখ পাকিয়ে
ঠোটে ঠোটে চেপে, হাতে ঘূঁসি পাকিয়ে
নাচ। বাই হোক লেবার পার্টি কনফারেন্স
আসা যাক। সভার পর সম্মেলনে এক
নাচের পার্টি হয়। জর্জ ব্রাউন নিয়মিত
উজ্জ্বাস নিয়ে নাচতে শুরু করেন। এক
নম্বর ওয়েস্টেস, দু' নম্বর তিন নম্বর।
সেখানে সবাই নাচতে যায় নি। প্রেস
রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররাও ছিল। হয়ত
সংখ্যায় কিছু বেশি হবে। মিনেস ব্রাউন
বলেন, জনা পঞ্চাশেক ফটোগ্রাফার নাকি
তাকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করেন। প্রেস
ফটোগ্রাফারদের আদ্যপ্রাশ্ন করে অনুষ্ঠান
শেষ-হবার আগেই ব্রাউন দম্পতী হোটেল
ফিরে আসেন। এই নিয়ে হে-টে। কেউ
বলে জর্জ ব্রাউনকে এবার বিদায় নিতে
হবে। ইভনিং নিউজ পাঠা ভীতি হেড
লাইনে কবিতা ছাপা হলঃ

Go Go
Quick Quick
Go

এ অনেকটা ওয়ান টু চা-চা-চা চণ্ডে
লেখা। ল্যাটিন আমেরিকার নাচের তাল।
পরদিন ব্রাউন ফটোগ্রাফারদের দেখে
বলেন—ভদ্রমহোদয় আমি আপনাদের খুব
ভালবাসি। এবং বক্তৃতা দিতে উঠে
শুরুতে বলেন—“দি চেয়ারম্যান...জেন্ডস
এবং প্রেস ফটোগ্রাফারস।” রসজ্ঞান আছে।
পরদিন টেলিভিশনে প্রশ্নোত্তরে জর্জ
ব্রাউন বলেন, স্বীকার করি আমি মদ
খাই। কিন্তু আবার কঠোর পরিশ্রম করি।
এবং কোন অন্যান্য কাজ করি না। কেউ
অস্বীকার করবে না উইনস্টন চার্চিল
পান করতেন। কিন্তু সোঁদিন অলিখিত

আইন ছিল, সে বিষয়ে কেউ আলোড়ন
সৃষ্টি করে নি। কিন্তু আজ এই সব
ঘটনাই বেশি করে ছাপা হয়।

প্রেস তাঁর ওপর কতখানি ন্যায়বিচার
করেছে তার উত্তরে বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী
বলডুইনের মন্তব্য তুলে ধরেন—

“Power without respon-
sibility has been the preroga-
tive of the harlot through the
ages.”

আমি আমার অভ্যাস বদলাব না দেশ
যদি আমার বৈদেশিক মন্ত্রী হিসেবে না
চায় আমি বিদায় নেব। তবে এও জানাই,
আমার দোষ থাকতে পারে, তবে আমার
মত ভালো বৈদেশিক মন্ত্রী পাওয়া
দুস্কর।

হয়ত তাই। শেষদিন ব্রাউন কমন
মার্কেট নিয়ে এমন বক্তৃতা দিলেন যে,
তার জয়জয়কার। তিনি প্রতিপক্ষকে
কচুকাটা করেছেন। পক্ষে দুজন
নামকরা লোক ছিলেন রে গাস্টার ও
ইমানুয়েল শিনওয়েল। শিনওয়েল রসিয়ে
রসিয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ১৯৬২
সালে উইলসন কমন মার্কেটে যোগ দেবার
বিরুদ্ধে ছিলেন। রাতারাতি তিনি কমন
মার্কেটের টোপ গিলে খান্স হন নি,
ফাতনা, সুতো সমেত ছিপটা খেয়ে
ফেলেছেন।

সবচেয়ে ভালো বক্তৃতা দিয়েছেন
অর্থমন্ত্রী কাল্যাণান। মিথ্যে আশ্বাস
দেন নি। বরং সাবধান করে দিয়েছেন।
অবাধ স্বাধীনতা, যে যত পারে মাইনে
বাড়িয়ে নেবে তা চলেবে না। তাহলেই
মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রাস্ফীতি, অমনি
ব্রেক কবে ধরতে হবে, বেকারের সংখ্যা
বাড়বে। একমাত্র নীতি বেশি পরসা

উপায় করতে হলে প্রডাকশন বাড়াতে
হবে।

বামপন্থীরা চিরকাল একটু হে-টে
করে। মনে আছে হিউ গেটস্কেল
একবার এই সম্মেলনে নরকের জলে চোখের
জলে হয়েছিলেন, এক তরফা আণবিক
বোমা বিসর্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস হলে
তিনি বলেন—

“We will fight, fight and
fight again.”

ভিরেতনাম নিয়ে কি আজ সেই
অবস্থা হবে। বামপন্থীদের দাবি, এই
যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন করা বন্ধ
করুক। স্কারবারা কনফারেন্স সরকারী
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। গ্রীসের
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা অস্থিতি
প্রকাশ করেছে। প্রস্তাব পাশ করেছে
গ্রীসকে নেটো থেকে তাড়িয়ে দেওয়া
হোক।

বর্তমান লেবার সরকার কি এই সব
বিরুদ্ধ প্রস্তাবে চপ্পল হবে। আমার ভা
তা মনে হয় না। বেশি হে হে করলে
উইলসন ধমক দেবেন। তাতে কাজ না
হলে বলবেন, লেবার কনফারেন্স মতামত
দেয়, দেশ শাসন করে না। পার্লামেন্টারী
লেবার পার্টি যা করছে বিশ্বশান্তির
জন্যে তা প্রয়োজন।

বর্ষাবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ
হয়েছে। ১৯৬৫ সালের Race Rela-
tions Act-কে আরও বাড়ান হোক।
যাতে চাকরি, বাড়ি ও বীমার ক্ষেত্রে বর্ণ-
বৈষম্য আইন বিরোধী কাজ হয়।

সবাই ভেবেছিল সভা না দক্ষিণ
পরিণত হয়। না তেমন কিছুই হয় নি।
হুন্টার্সটে বাড়ি ফিরেছেন নেতারা।

আমরাও একা মুখ্য



আনন্দ চিত্র

ঘরে ঘরে আছে পরমাস্ত্রী

বিশ্বাসঘাতকেরা উচিত মূল্য দিয়েছে—বিপ্লবীদের গুলীতে একজন আহত ও অপরজন নিহত হয়েছে। গ্রামবাসীরা (যারা বিপ্লবীদের পিছু ধাওয়া করেছিল) এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে, দেশ-দ্রোহিতার প্রতিশোধ নিতে বিপ্লবীদের হাত একটুও কাঁপবে না। পুলিশবাহিনী লক্ষ্য সমূহের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। তাদের সহায়তায় শহর থেকে সৈন্য এসে পৌঁছায় নি। এই অবস্থায় নিরাপদ দুর্গ থেকে গ্রামবাসীদের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া বর্তমানে পুলিশের আর কিছুই করণীয় ছিল না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সহকারী প্রেসিডেন্টের সাহায্যেই গ্রামবাসীদের প্ররোচিত করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যেই একজন নিহত ও অপরজন আহত হওয়ায় শত্রু-চরেরা মিথ্যা প্ররোচনা দেওয়ার আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে। শান্তি দা দিয়ে অতীকর্তে মুগ্ধভাবে আঘাত করার প্রতিফল-বন্দুপই যে সেই দু'জনকে উচিত মূল্য দিতে হয়েছে তা গ্রামবাসীরা কেমন করে জানবে? “ডাকাতেরা দু'জনকে হত্যা করেছে। তাদের ধর মার হত্যা কর”—এইভাবে চিংকার করে জনতাকে উত্তেজিত করেছে চৌকিদার, দফাদার আর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি।

ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করতে বিপ্লবীদের একজন খুব জোর গলায় গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে বলল—“ভাই সব, আমরা স্বদেশী। ইংরেজ আমাদের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করছি। স্বাধীনতার জন্য আমরা জান কবুল করছি। আমরা আপনাদের কাছে সাহায্য চাই, সমর্থন পাবার আশা রাখি। পুলিশের প্ররোচনায় আপনারা উত্তেজিত হবেন না। তারা আপনাদের ভুল পথে আপনাদের সহানুভূতি আমাদের কাম্য।

চালিত করছে—দেশদ্রোহিতার প্রদর্শন করছে। তাদের কথা শুনবেন না, বিশ্বাস করবেন না—আপনারা ফিরে যান.....।” বিপ্লবীদের এইরূপ প্রচারে কিছুটা কান্ন হল। অনেকে নিরস্ত হল; আবার কিছু সংখ্যক জনতা বাড়ির উদ্দেশ্যে মূখ ফেরালো।

পুলিশ এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই দু'জন কথ্যাত প্রেসিডেন্ট ও সহকারী প্রেসিডেন্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রমাদ গুললো—এই বুঝি গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদের আবেদনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। তারা মরিয়া হয়ে প্রাণপণে সাধারণ লোকদের উত্তেজিত করতে লাগল; গুলী করে হত্যা করার প্রতিশোধ নেবার জন্য ‘ডাকাতদের’ ধরতে নানাভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। পক্ষপাতিত্ব দোষে প্রভাবান্বিত বলে সরকারী তথ্যে সঠিক বিবরণ পাওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে বিপ্লবীরা গ্রামবাসীর কাছে সাহায্যের আশায় সত্যিই আবেদন করেছে এবং এই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্যেরা গ্রামবাসীদের মনোবল (morale) অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্যের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বন্দুক আনার চেষ্টা করেছে। আমাদের মামলার রাক থেকে পাওয়া যায়—

“... They each carried a pistol in hand. He asked them where they were going and whence they came. Some of them replied that in the town the ‘Shahebs’ had been killing Hindus and Musalmans and they had run away from the town. They added—‘we are your people—we would go towards the east...’ They had gone a little away from the tank when they saw coming

running along the path towards them, six persons, who as they approached, the each side of the road with the intention of getting him and his gun to help them... ”

[তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল ছিল। একজন গ্রামবাসী তাদের জিজ্ঞেস করে, তারা কোথা থেকে আসছে ও কোথায় যাচ্ছে। বন্দুকদের মধ্যে কেউ একজন উত্তর দিল—শহরে সাহেবেরা হিন্দু ও মুসলমানদের হত্যা করছে বলেই তারা শহর থেকে পাালিয়ে এসেছে। তারা আরও বলল—‘আমরা তোমাদের আপনজন, আমরা পূর্বদিকে যাব.....।’ তারা (গ্রামবাসীরা) পুঙ্কুর ছাড়িয়ে একটু এগোতেই দেখতে পেল, ছ’জন যুবক সরু হাটা-পথে ছুটে তাদের দিকেই আসছে। তারা তখন পূর্বদিকের রাস্তা দিয়ে গিয়ে তাতে (ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট) ও তার বন্দুকটি আনবে ভেবেছিল।]

এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে বিপ্লবী-যুবকেরা তাদের উদ্দেশ্য ব্যস্ত করে সাহায্য লাভের আশায় গ্রামবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, আবার অপরদিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে কিছু লোক বিপ্লবীদের আক্রমণ করার জন্য বন্দুক সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। আর একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তা থেকেও জানা যাবে যে, প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা বন্দুক সংগ্রহ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে—

“... He was standing at Omra Mia’s ‘Ghata’ waiting for Abdul Wadud, who lived in the house, to bring the gun out of him when he saw six persons coming eastward...”

[একজন গ্রামবাসী আব্দুল ওমরা মিয়া (প্রবেশদ্বার) অপেক্ষা করছিল। আব্দুল

ওয়ারদ তখন বাড়ি ছিল। ছ'জনকে পূর্ব-দিকে অগ্রসর হতে দেখে সেই লোকটি তার (আব্দুল ওয়ারদদের) বন্দুকটি আনতে গেল।]

এই ছয়জন বিদ্রোহী যুবকের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়েই গ্রামের দুই স্থানে কগড়া মীমাসার জন্য সালিশ বসেছিল। সালিশী বিচার দেখতে ও শুনতে সেইসব স্থানে অনেকে উপস্থিত ছিল। গ্রামের মাতব্বররা 'ডাকাত' ধরবার এই সুযোগ ছাড়ল না। তারা উপস্থিত সাধারণ গ্রামবাসীকে বিদ্রান্ত করে 'ডাকাত' ধরবার জন্য উত্তেজিত করেছে। গ্রামের মোড়ল এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সহকারী প্রেসিডেন্টের মিলিত চেষ্টায় অবস্থা ক্রমেই বিপ্লবীদের প্রতিকূলে গেল। সরকারী স্বীকারোক্তি থেকে এইসব বৃত্তান্ত আমরা জানতে পারি—

"...That night President Omra Mia and some 40 or 50 villagers had assembled at Nur Hossain's house to settle a dispute... After 9 p.m. they heard the reports of guns... Omra Mia formed them into two parties and directed one party among whom were Nur Hossain and Adu Mia to go to the south while with the other party he himself went westwards with the intension of getting his gun.

"In the meantime Rohim Ali, the Vice-President of the Union Board had been setting out from the house to attend the 'Shalis' (austration) when he heard the firing... so he went to Omra Mia's house to get his gun."

উপরের সরকারী বিবরণ থেকেই পাচ্ছি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ওমরা মিঞা ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট রহিম আলি চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক নিয়ে সালিশ-মীমাসার জন্য বসেছিল। তারা নিজেদের বন্দুক এনে সাধারণ লোকদের 'ডাকাত' ধরবার জন্য প্ররোচিত করেছে।

উত্তেজিত জনতা সারা পথ বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়েছে। গ্রামের সালিশে উপস্থিত জনতাকেও তারা একত্রিত কবেছে এবং প্রেসিডেন্ট ও সহকারী প্রেসিডেন্টের প্রবোচনায় বন্দুকও বাগাড় করেছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সমেত একটা স্টীম-জল অদূরে নদী-ঘাটে এসে ভিড়েছে। মারমুখো গ্রামবাসীর সাহস এবং আক্র-

মণের তীব্রতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিপ্লবী যুবকেরা অগত্যা বাধ্য হয়ে ক্রিষ্ট জনতাকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল। সরকারী ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"On the District Board Road they found a crowd of excited villagers assembled and Kala Mia lying dead near Anti Mahamud Ghat. On the road also they were overtaken by Azim and Hem Gupta and the other police officers hastened along the District Board Road... On the road also they were overtaken by Azim and his party; and the whole force of Ashanulla and Fazlar Rahaman got into Police launch which then arrived with the Dy. Superintendent of Police and Inspector MacDonald and an armed force on board and proceeded in it up the river and into the Shikalbaha Khal. Abdul Azim and Hem Gupta and the other police officers hastened along the District Board Road."

উপরের ভাষ্য থেকে পাচ্ছি, বিপ্লবীদের গুলীতে কালামিঞাকে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং পুলিশবাহিনী শ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছ'জন বিদ্রোহী যুবককে মর্দুক থেকে আক্রমণ করতে চলেছে। আজিমের দল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে অগ্রসর হচ্ছে, আব শিকলবাহা খাল দিয়ে আসানুল্লাহর সশস্ত্র বাহিনী স্টীমলঞ্চে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে চলেছে বিপ্লবীদের গতিপথ আগে থেকে অবরোধের উদ্দেশ্যে।

আলিত মামুদ নৌকা-ঘাট থেকে পটিয়ে থানা পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গেছে। এই রাস্তাটি একটা বড় কাঠের সেতু অতিক্রম করে গেছে। এই সেতুটি 'কালার পোল' নামে খ্যাত। কালার পোলের সন্নিকটে একটা পুলিশ বিট আছে। চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এই বিটে প্রায় বিশ-পঁচিশজন সশস্ত্র কনস্টেবল সর্বফণ পাহারার নিযুক্ত থাকত। তাদের বেশির ভাগই এই সম্বন্ধের খবর পেয়ে পেট্রল ডিউটিতে চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছে। বিপ্লবী যুবকেরা পুলিশ পার্টি, উত্তেজিত জনতার বেড়া-ছাল এবং কালার পোল বিটের সামনের রাস্তা পরিহার করে শহরের দিকে এগোবার জন্য শেখবারের মত মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল। বাস্তব অবস্থার পরি-

প্রেক্ষিতে তারা ছ'জন সিমান্ত নিল বাচবার যখন কোন আশাই নেই তখন বিপক্ষে পরিচালিত গ্রামবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মিথ্যা শক্তিক্রয় না করে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শত্রুর ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে প্রাণপণে শহরের দিকে ফেরবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের মামলার জাজমেন্টে দেখতে পাচ্ছি—

"Six men hailed him from the bank and three of them got into his 'sampan' and requested him to row the six of them to the 'char' near 'Freimukh' promising him fifty rupees if he did so. Just then he heard the villagers shouting that decoits had come and persons were being killed and he also heard Munshi Mia calling him not to let the decoits into his 'sampan' and that they had shot his brother Ali Hossain. He noticed that the three persons who had got into his 'sampan' had each a pistol in their hand and so inspite of their entreaties he refused to take them to the 'char'. They got out of the 'sampan' and went towards Anti Mahamud Ghat."

[তারা ছ'জন তাঁর থেকে সাম্পানের মাঝিকে ডাক দিল এবং তিনজন ইতিমধ্যে নৌকায় চড়ে বসলো। মাঝিকে তারা অনুরোধ করে পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বিনীময়ে তাদের নদীর অপর পারে 'ফ্রেমুখ' মন্ডের চরে (অর্থাৎ, চরচাকতাই) নিয়ে যেতে। এই সময় গ্রামবাসীরা চিংকার করে সম্মুখে বলে, ডাকাতেরা গ্রাম আক্রমণ করে লুণ্ঠনরাজ্য ও খুনখাখাপী করেছে, মুন্সি মিঞা তাকে ডেকে বলে যে, তার ভাই আলি হোসেনকে ডাকাতরা গুলী করে মেরেছে সে যেন ওদের সাম্পানে না তোলে। নৌকার উপর ওই তিনজন যুবকের হাতেও পিস্তল দেখে মাঝি তাদের অনুরণ সত্ত্বেও নদীর ওপারের চরে তাদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। অগত্যা নৌকা থেকে নেমে যুবকেরা আলিত মামুদ ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়।]

খোলা পিস্তল হাতে তিনজন যুবক নৌকায় উঠেছে, আর অন্য তিনজন ঘাটে দাঁড়িয়ে। তারা বিপদে পড়ে মাঝিকে বহু অনুরণ করল তাদের নদীর অপর পারে নিয়ে যেতে। কিন্তু মাঝি তাদের সব অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করল—

কোনমতেই মাঝিকে রাজী করানো গেল না। চারিদিকেই ডয়ানক প্রতিকূল অবস্থা—ক্ষিপ্ত জনতা পিছা নিয়েছে, গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন অকস্মাৎ দেবকে আঘাত করায় সেই গভীর ক্ষত থেকে সমানে রক্ত ঝরছে, দু'দিক থেকে সেপাইদের গলা শোনা যাচ্ছে, সর্বোপরি এই সংকট মুহূর্তে নদী পার করতে মাঝির অক্ষমতা জ্ঞাপন—এইসব মিলে সে এক নিদারুণ অবস্থা! কিন্তু বিপ্লবী যুবক ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভাড়াটে সৈন্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বিপ্লবীদের অস্ত্রবে দবদ বেদনা ও অনুভূতি আছে। বিপদে পড়েও তাদের বিচার-বুদ্ধি লোপ পায় নি। বাস্তব দৃষ্টিতে বিপ্লবী যুবকেরা নৌকার মাঝিও অসহায় অবস্থা বুদ্ধিতে পেরেছে—সে যদি গ্রামবাসীদের আশ্রয় উপেক্ষা করে তাদের নৌকার তালে তবে তার গ্রামে একত্রে থাকা মুসলিম হবে এবং পদলিখের হাতে তার নির্বাসিতের সীমা থাকবে না। মাঝির ইচ্ছা থাকলেও ভয়েই যে সে তার অক্ষমতা জ্ঞানতে বাধ্য হয়েছে, সেকথা বিপ্লবী যুবকেরা সহজেই বুঝেছিল। তাই নিজেদের মাথার ওপর শত বিপদ থাকা সত্ত্বেও মাঝির লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের কথা ভেবে তার ওপর জোর-জবরদস্তি করা অথবা তাকে গুলী করে মেরে ফেলবার কথা তারা ভাবতেও পারে নি।

সাম্পান না হবে যদি সাধারণ দাঁড়-টানা নৌকা হত, তবে তারা নিজেরাই দাঁড় টেনে নিশ্চয়ই ওপারে যেতে পারত। চট্টগ্রামের সাম্পান জাতীয় নৌকার বিশিষ্ট ধরণের একজোড়া দাঁড় সবাই ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই সাম্পান ছেড়ে তাবা মাঠে নেমে পড়ল। এই সময় দুই পক্ষে সামান্য গুলী বিনিময় হয়। যুবকেরা মাঠ দিয়ে একজনের পেছনে একজন হেঁটে যাচ্ছিল। গোলমালে ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সরকারী বিবৃতি—

"The pursuit however was maintained by Omra Mia (President) and Rahim Ali (Vice-President) and their companions. Getting further information from Rahim Ali Oli Mia and Abdul Ali as to the direction in which the fugitives had gone, they went along the bank of the tank to the south of the house and there they found the fence broken down. They went through the breach south-

eastwards towards a 'Godha' (bounded khali) nearly, and as they approached two men on the other side of the 'Godha' called out that there was something black in the jungle towards the east and after running some distance turned and fired at them. He ran towards the houses of Torab Ali and Munsar Ali which stand beside the Shikalbaha Khal and then he disappeared. Although these houses were surrounded and the neighbourhood searched, no trace of him could be found."

এই বিবরণে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট সদলবলে সমানে বিপ্লবী যুবকদের তাড়া করে চলেছে। এই হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বৈশিষ্ট্য। ভারতের মত এত বড় দেশ মাত্র কয়েক লক্ষ ইংরেজ দু' শ' বছরের অধিককাল শাসন করেছে। তাদের শাসনপদ্ধতির চাবিকাঠির মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতবাসীর সাম্প্রদায়িক দুর্বলতা এবং ভারতবাসীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা সৃষ্টি করেছে খাঁ সাহেব ও রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর ও রায় বাহাদুর, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট; আর সংগঠিত করেছে বাছাই করা গ্রাম-বাসীদের নিয়ে চৌকিদার ও দফাদারদের সাম্রাজ্যবাদী রক্ষী দল।

এই দুই কথ্যাত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলি মিক্রা ও আব্দুল আলির কাছ থেকে পলাতকেরা কোন দিকে গেছে জানতে পেরে, পদকুরের খার দিয়ে অগ্নিসর হয়ে একস্থানে বাড়ির কম্পাউন্ডের বেড়া ভাঙা দেখতে পায়। এই ভাঙা বেড়া অতিক্রম করে প্রেসিডেন্টের দল খালের সামনে এসে পৌঁছল। সেই সময় খালের অপর পার থেকে দুই ব্যক্তি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, বোপের আড়ালে তারা কালমত কি একটা দেখতে পাচ্ছে এবং সেটা পূর্বদিকে গুলী ছুঁড়ে পালাচ্ছে—এও তারা দেখলো। ওই দুই ব্যক্তি আরও জানালো যে, সে শিকলবহা খালের অদূরে তোরাব আলি ও মনসর আলির বাড়ি দিকে ছুটে গেছে এবং তারপর থেকে আর সেই যুবককে দেখা যাচ্ছে না। এই খবর শুনে, প্রেসিডেন্টের পার্টি সেই সব বাড়ি এবং সমগ্র এলাকাটি ঘিরে ফেলে ব্যাপক ও নিখুঁত অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছে। কিন্তু এ যেন ভৌতিক কাণ্ড!—তাকে

(ফণীন্দ্র নন্দীকে) আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই হ'ল সরকারী সাক্ষীদের বর্ণনা।

সত্যিই তারা শত চেষ্টা করেও সেই রাতে ফণীন্দ্র নন্দীকে খুঁজে পায় নি। তাঁর থেকে বহুদূরে মাঝ সমুদ্রে যখন কোন দুর্ঘটনাবশত জাহাজ ডুবি হয়, তখনও আশা-নিরাশার মধ্যে কোন কোন বাহী হযত লাইফবয়্যার সাহায্যে ভেসে থাকে। হিংস্র বন্য জন্তু বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যের মধ্যেও হযত কখনও কোথাও নিরাপদ গৃহ বা আশ্রয় বিরাজ করে। যু-যু মরুভূমি—চারিদিকে কেবল উত্তপ্ত বালুরাশি; তবু বৃক্ষফাটা তৃষা নিবারণের উদ্দেশ্যে মরুদ্যানের সম্মানও পাওয়া যায়। সেইরূপ 'প্রেসিডেন্ট' পরিচালিত উত্তেজিত ক্ষিপ্ত জনতার বহুই বেটনীর মাঝেও কে জানতো ফণীন্দ্র নন্দীকে আশ্রয় দেবার জন্য কোল পেতে রেখেছে এক অজানা-অচেনা স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান পরিবার।

রাত তখন প্রায় আড়াইটা হবে। ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে পরিগ্ৰাণ পেয়ে, একা এক মুসলমান পাড়ার প্রবেশ করে। উত্তেজিত জনতা 'প্রেসিডেন্টের' নেতৃত্ব সমস্ত এলাকাটি ঘিরে ফেলার আর কোন উপায়ান্তর না দেখে ফণী নন্দী এক মুসলমান পরিবারের বাড়ির কম্পাউন্ড ঢুকে পড়ে।

আশ্চর্য! হেঁ-ঠে ও হল্লা শুনে গৃহ-স্বামী ও তাঁর স্ত্রী উঠানে বোরলে এসেছেন। ফণীন্দ্র নন্দীর হাতে রিভলভার। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকেছে। তাকে দেখেই যে কোন কেউ বুঝবে সে পলাতক এবং তাকেই ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র জন্তুর মত প্রেসিডেন্টের দল তেড়ে আসছে। গৃহস্বামীর কোমল অন্তর ফণী নন্দীর অসহায় অবস্থা দেখে অভিভূত হল। তিনি মুসলমান—গরে জেনেছি তাঁর নাম মনসর আলি। বৃক্ষ মনসর আলি ও তাঁর স্ত্রী ফণীন্দ্র নন্দীকে এই অসহায় অবস্থায় ক্ষিপ্ত জনতার হাত



মিস্ত্রীকে কল্যাণী

থেকে বঁচানো ধর্ম বলে মনে করলেন। ফণীন্দ্র নন্দী তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। বৃন্দ্র অত্যন্ত মমতার সঙ্গে তাকে সম্বোধন করে বলল—“বাউ, উইক্যা খাইং পাইরতাক্ ন—ধরা পড়ি আইবাক্। আর লয় আসতক্”—(বাবু, এদিকে গেলে আপনি ধরা পড়ে যাবেন। আমার সঙ্গে আসুন)। এই বলে মনসর আলি আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন—ফণীন্দ্র নন্দী মস্তমুগ্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করলো। ফণীন্দ্র আমাকে নিজ মূখে তার এই অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। সে বলেছে—“আমি মনসরকে এক মূহুর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারি নি। তাঁর সৌম্য চেহারা, মমতাভরা গলার স্বর এবং আমার এই বিপদে তাঁর অস্থিরতা দেখে আমি একে-বাবে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে যন্ত্রের মত অনুসরণ করে গেছি।”

মনসর আলি তাঁর নিজ বাড়ির বাইরের একটা ঘরে ফণীকে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরে নানা জিনিসপত্র রাখা আছে। ঘরের ভেতর একটা মাচার ওপর কিছু খড়ের গাদা, মাটির কলসী, হাঁড়ি-পাতিল, ইত্যাদি সব বোকাই করা ছিল। মনসর আলি সেই মাচার নিচে ফণীন্দ্রকে লুকিয়ে থাকতে বলল। শ্ববুদ্ধি না করে ফণীন্দ্র সেখানে আগ্রহ নিল।

কয়েক মিনিট বাদেই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী

হেঁ-হেঁ করে যথারীতি মনসর আলির বাড়িতেও প্রবেশ করলো। তারা অন্যান্য বাড়ির মত ‘এই বাড়িও’ উল্লাসী করবে যদি কোথাও সেই পলাতক যুবক লুকিয়ে থাকে। জনতা বাড়িতে ঢুকেই প্রশ্ন করে—

—“মনসর ভাই, পোয়া ইবা খাইয়ারে কন্ মিক্যা গেল?” (মনসর ভাই যুবকটি পাগিয়ে কোথায় গেল)।

মনসর—“আই ত এংডে থিয়াই আছি। এদিকে আসে নি। তবু চলুন চাই—ঘুরি আরে দেহি—কনকাইতু লুম্মাই আছে নি!” (আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে আসে নি। তবু চলুন ঘুরে দেখি, কোথাও লুকিয়ে আছে কি না)।

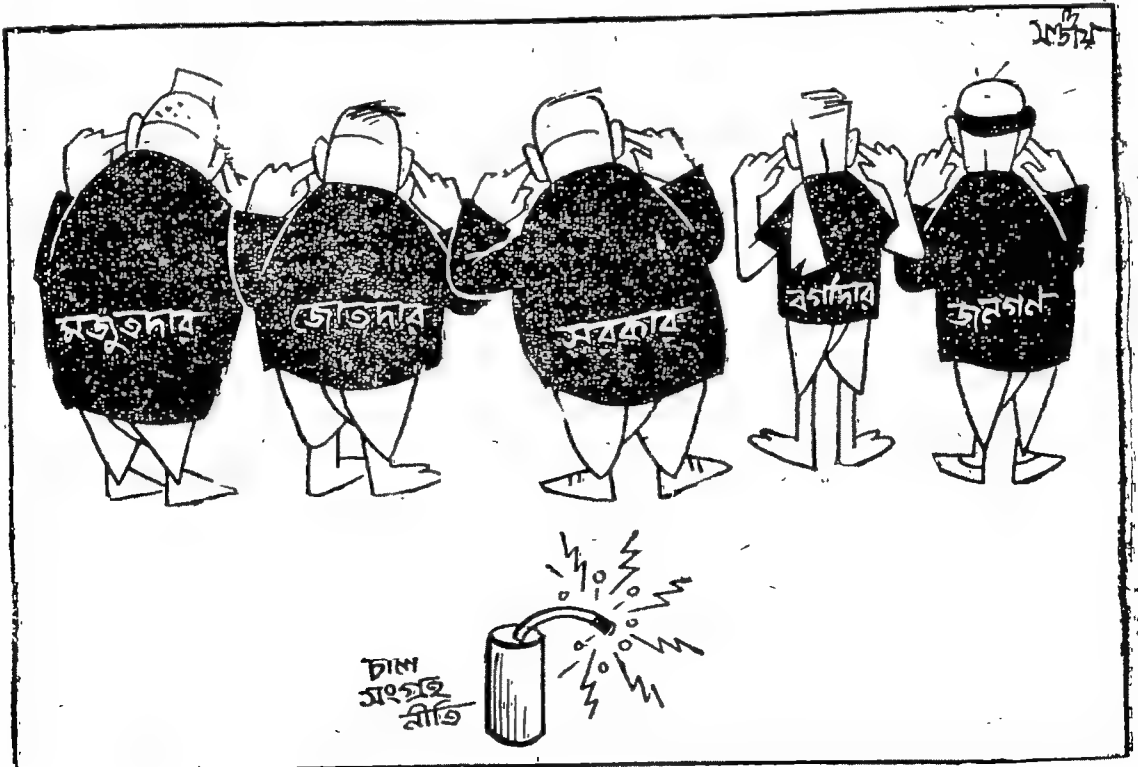
মনসর আলি এইসব বলে লোকদের নিয়ে বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখাল। ফণীন্দ্র নন্দী আমাকে বলেছে, মাচার নিচে নিশ্বাস বন্ধ করে নিঃশব্দে দ্বিগারে আঙুল স্পর্শ করে সে বসে আছে। লোকদের কথাবার্তা সব সে শুনতে পাচ্ছিল। এমন কি মনসর গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেই ঘরের দরজা পর্বন্ত এসেছে এবং সে নিজে না জানার ভান করে উঁকি মেয়ে ঘরের ভিতর দেখে সঙ্গীদের বলেছে—“মরার পোয়া, আরার চোখতু খুইল দিয়ারে খাইরে।” আইছা দেইখামু খারি ক’ডে? খবা ন পড়িবি না?”—(আমাদের চোখে

খুলো। দিয়ে মরার ছেলো পালো কোথায়? আম্মা দেখবো—পালাবি কোথায়? ধরা কি পড়িবি না?)।

মনসর আলির সুদক্ষ অভিনয় জনতাকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহ হল মনসর আলির বাড়িতে কারও লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর কালবিলম্ব না করে ডাকাত খুঁজে বার করবার জন্য জনতা হেঁ-হেঁ করে পাশের বাড়িতে প্রবেশ করলো। বিপদসাগরে মনসর আলির মাচার নিচে ফণীন্দ্র নন্দী পিস্তল হাতে বসে রইল, আর ক্ষিপ্ত জনতা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সমস্ত পাড়াটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

যদিও অবিশ্বাস্য মনে হবে, তবু এই বর্ণনার প্রতিটি অক্ষর সত্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে মনসর আলির স্থান কোথায়? ইতিহাসবিদের গবেষণার জন্য মনসর আলির স্বদেশপ্রেমের অবদান (যা আমার জানা সম্ভব হয়েছে) এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। মনসর আলি কোন সম্প্রদায়ের লোক—এই বিচার আমাদের কাছে কখনও বড় হয় নি। মনসর আলির মানবতাবোধ ও স্বদেশপ্রেমই তাঁকে মহামানবের মর্যাদাসম্পন্ন করেছে—তাঁর আদর্শে বিশ্ববী ভারত গর্বিত।

[কম্বোজ]



পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

II দ্বিতীয় পর্ব II

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের বাজনা বেজে উঠেছে। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ মাসেই সাধারণ নির্বাচন সুরু হবে। বাজনা বাজতেই, রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙা-গড়া ও নতুন নতুন দল গড়ে ওঠার তোড়জোড় আরম্ভ হয়। ১৯৫৪ সাল, যথা নিম্নমই আসে। সাথে করে আনে, রাজনৈতিক কর্মচঞ্চল। এতদিন ‘মুসলিম লীগ’ দল ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। জনাব ফজলুল হক সাহেব অবশ্য ১৯৩৭ সালের ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জনাব জিন্নাহ সাহেবের ও তাঁর পরিচালিত মুসলিম-লীগ দলের বিরোধিতা করেই নির্বাচনে গৌরবের স্নাতকে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারেই দেখা যায়, জয়ের পরে তিনি তাঁর পরিচালিত মুসলিম লীগ-বিরোধী দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি অবশেষে মুসলিম লীগ দলেই যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর জনাব ফজলুল হকের ‘কৃষক-প্রজা’ পার্টির যে সদস্যরা মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে যদি ‘কংগ্রেস’ দলের নির্বাচিত সদস্যরা মিলিত হতে পারতেন, তাহলে ঐ দুই দলের সদস্য সংখ্যাই বাংলার বিধানসভায় (বেঙ্গল এসেম্বলিতে) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতেন এবং বাংলার সরকার-পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা অনায়াসেই নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে পারতেন। তা’ যদি হত, তাহলে, বাংলার জিন্নাহ সাহেবের শত চেষ্টাতেও মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী কোনও রাজনৈতিক দল হিসাবে কখনই গড়ে উঠতে পারত না; আর, বাংলাদেশে মুসলিম লীগ দল যদি একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে না উঠতো, তাহলে সারা ভারতবর্ষেই ঐ দল কোনও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হতে পারত না। বাংলাদেশ ছিল মুসলমান-প্রধান দেশ। এখানে মুসলিম লীগ দলের চারাগাছটি যদি শেকড় গাড়ে না-পারত,

তাহলে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশই মুসলিম লীগ দলের গাছটি জমি থেকে রস-সংগ্রহ করে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হত না। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে বাংলা-দেশ ও পশ্চিম সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই দুইটিই ছিল, মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হয় কংগ্রেস সরকার। ‘মুসলিম লীগ’ সেখানে কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেব ও তাঁর ভাই খান আবদুল গক্ফুর খানের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত ও পরাস্ত হয়। পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ দল, হিন্দু-শিখ-মুসলমানের সম্মিলিত অ-সম্প্রদায়িক ইউনিয়নিস্ট দলের কাছে পরাস্ত হয়। সেখানেও হয়, ইউনিয়নিস্ট দলের সরকার। সেই অবস্থায় বাংলা-দেশে যদি ‘কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেস’ দলের বোধ সরকার গড়ে উঠতে পারত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’ নামক দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কিছতেই হত না। অশুভ ভারতবর্ষই একদিন স্বাধীন হত। কিন্তু তা’ হল না। হতে পারল না। কংগ্রেস-কতৃপক্ষ অন্য কোনও দলের সাথে যুক্ত হয়ে বোধ দায়িত্বে কোথাও ‘সরকার’ গঠনের অনুমতি দিলেন না। বাংলার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত কংগ্রেস দলও, জনাব ফজলুল হক সাহেবের পরিচালিত মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐ রাজনৈতিক দলের সাথে বোধ দায়িত্ব নিয়ে ‘সরকার’ গঠন করতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই জনাব হক সাহেব, তাঁর দলবল নিয়ে মুসলিম-লীগের সাথেই হাত-মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গড়লেন। এই-ই কি ছিল, দেব-ভূমি ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতার ইচ্ছা, না, মানুষের ষড়যন্ত্রই সৌন্দর্য বিধাতার ইচ্ছাকেও বানচাল। কবে দিয়েছিল? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার মস্ত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে দেওয়ার চেষ্টা হলো ব্যতুলতা বা ষড়্যেতা হবে; তাই, আমি নিজে তার উত্তর দিতে চেষ্টা না-করে, শ্রম্যক ডাঃ রমেশচন্দ্র

মজুমদার মহাশয়ের মত ঐতিহাসিক গবেষক সূধীজনের কাছ থেকেই এর সঠিক উত্তরের জন্য তাঁদের কাছেই প্রশ্নটি তুলে বরাহ। কেবলমাত্র তাঁরাই পারেন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গড়েন এবং অবশেষে যখন তিনি মুসলিম লীগেরই সদস্য হয়ে যান, তখন তাঁর কৃষক-প্রজা দলও বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষক-প্রজা দলে, কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এমন কিছু মুসলমান সদস্যও ছিলেন। ফজলুল হক সাহেব, মুসলিম লীগে-যোগ দিলেও তাঁরা মুসলিম লীগে যোগ দিলেন না। কৃষক-প্রজা দলের সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেসপন্থী কুষ্টিয়ার জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ ও রংপুরের গাইবান্ধা শহরের জনাব আব্দ হোসেন সরকার প্রমুখ কৃষক-প্রজা-দল হিসাবেই সরকার-বিরোধী দলে থেকে যান।

পরে কিন্তু জনাব হক সাহেবও শেষ পর্বন্ত জনাব জিন্নাহ সাহেবের একনায়কত্ব আর সহ্য করতে পারেন না। এই সময়েই বিরোধী দলের দলপতি শ্রম্যক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য হক সাহেবকে পদ-ত্যাগ করে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলের সদস্যদের নিয়ে হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত সরকার গঠনের জন্য বাজী করান। কথা ছিল, সেই সরকারে শরৎ-বাবুও থাকবেন কিন্তু ইংবেজ সরকার তো তা’ চান না। তাঁরা চান, মুসলিম লীগকেই শক্তিশালী করে গড়ে তাঁদের স্বাবাই ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার দাবি তোলাতে; সুতরাং হক সাহেব যখন নতুন মন্ত্রিসভা গড়বেন ঠিক করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে শরৎবাবুকে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার করে বাংলার বাইবে পাঠান হয়। দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা তাঁর গ্রেপ্তারের সময়ই তাঁর অনুবর্তীদের নির্দেশ দিয়ে যান যে তাঁরা যেন পারকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে (শরৎ-বাবুকে) ছাড়াই নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যান। তাই-ই হল, ফলে নতুন যে মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে তাকে মুসলিম লীগের জরঢাক —‘আজাদ’ পত্রিকা ‘শ্যামা-হক’ মন্ত্রিসভা

আখ্যা দিবে মুসলিম সম্প্রদায়কে হক-বিরোধী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মুসলমানকে হক-বিরোধী করা 'আজাদ' পত্রিকা কেন, খোদা জিন্নাহ সাহেবেরও ক্ষমতার বাইরে, কারণ মুসলমানদেব মধ্যে হক সাহেবের প্রভাব অতুলনীয়। বাংলার মুসলমানসমাজ জানেন যে বাংলার মুসলমানের যদি কেউ কোনও উপকার করে থাকেন, তাঁদের কেউ যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অধঃপতনের গভীর গহবর থেকে তুলে থাকেন, তবে তা করেছেন হক সাহেবে-ই; জিন্নাহ সাহেবও নয়, মুসলিম লীগ দলও নয়। তার উপর হক সাহেবের সাধাবণ মানুষের পর্যায় থেকে এসে তাঁদের ছেড়া চাটাইয়ে বসে তাঁদের দেওয়া 'সান্না'কে-তে তাঁদেরই সাথে খাওয়া-দাওয়া করে তাঁদের সাথে একদম সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া আর অন্য কোন নেতার পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। জিন্নাহ সাহেবের তো নয়-ই, নাজিমুদ্দিন সাহেবের বা সুরাবদি সাহেবের পক্ষেও তা সম্ভবপর ছিল না। ফজলুল হক সাহেবকে সবাই মনে করতেন তিনি গরীবের 'ব্যপ-মা', দরিদ্রের অর্কাগ্রম বন্ধু। এই গরীবের-দরিদ্রের দলে মুসলমানই যে ছিলেন তাই নয়। তাঁদের মধ্যে হিন্দুও ছিল।

আমি ষটটা হক সাহেবকে দেখেছি, জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে আসলে কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতই সর্বভারতীয় নেতা হয়েও একজন খাঁটি বাঙালী। তাঁদের-ই মত জনাব হক সাহেবও বাংলাদেশকে ও বাঙালীকে প্রাণ দিয়েও ভালবাসতেন। আমি দেখেছি, বাংলাদেশের বিভাগকেও তিনি মনে-প্রাণে কোনদিন মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত পারেন নি। তাঁর সামনে বাংলা বিভাগের কথা উঠলেই তাঁর দৃষ্টি চোখ থেকে অশ্রুস্রাব নেমে এসে তাঁর বিশাল বক্ষ ভাসিয়ে দিত। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। তাই আমার মনে হয়, জনাব হক সাহেব কখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না; তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক নেতা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন কিন্তু হক সাহেব বোধ হয় পাক-ভারত উপ-মহাদেশের সবচেয়ে বেশি ভাবপ্রবণ নেতা ছিলেন; সেই জন্যই তাঁর ভাবের মণিকোঠায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরীবের দুঃখ-দৈন্য ও বেদনা যেমন আঘাত করত, তেমনই তাঁর কোন-রূপ বিরূপ সমালোচনাও তাঁকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলত। এই ভাবপ্রবণতার জন্যই

দরিদ্রের দৃষ্টিতে তাঁর নীরব দানও অনেকই ছিল বলে শুনছি এবং সেই দানের মধ্যে জাতি ও ধর্মের কোনও পার্থক্য তিনি করতেন না; আবার সেই অ-সাম্প্রদায়িক লোকই আবার তাঁর বিরূপ সমালোচনার ক্ষিপ্ত হয়ে কখনও হাজার জওহরলালকে তাঁর পক্ষেতে পুত্রতেন (!) এবং কোনও হিন্দুকেই বিশ্বাস করা যায় না এমন কথাও বলতেন!

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে সেখানে তিনি-ই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' তুলেছিলেন, সেই সভায় তিনি যে কতটা করেছিলেন যাকে সেই সময়কার বাংলার অনেক পত্র-পত্রিকায় হক সাহেবের "সাতানা" বক্তৃতা বলে বর্ণনা করেছিলেন, তা ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে 'জৈহাদ' ঘোষণার বিবে ভরপূর। তিনি অতিরিক্ত রকমের ভাবপ্রবণ ছিলেন বলেই কোনও রাজনৈতিক দলেই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেন নি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শূন্য হয় তখনকার দিনের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে এবং তিনি সেই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ পর্যন্ত পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ছাড়েন। মুসলিম লীগে যোগ দেন কিন্তু মুসলিম লীগেও তিনি অনেকবারই যোগ দিয়েছেন, আবার ছেড়েছেনও। তাঁর নিজের হাতে গড়া 'কৃষক-প্রজা' দলেও তাঁর অব্যবস্থাপিতচিত্ততার জন্যই ভাঙন ধরেছিল যখন তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাঁর ভাবপ্রবণতা তাঁর চিন্তকে সর্বদাই অস্থির করে রেখেছিল কিন্তু একটি জায়গায় মাত্র তাঁর চিন্তের স্থিরতা কখনই বিপর্যস্ত হয় নি, সেই জায়গাটি হচ্ছে দারিদ্র জনসাধারণের ও বন্ধুদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা সর্বদাই খোলা থাকত এবং অতি নিম্ন অবস্থার সাধারণ মানুষের সাথে তিনি আহা-বিহারে, চাল-চলনে ও ব্যবহারে একেবারে মিশে যেতে পারতেন, যা আর কোনও নেতাই পারতেন না। এই জন্যই তিনি ছিলেন বাংলার মুসলমান জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়—সকলেই মনে করতেন তাঁকে আপন জন। এ ছাড়াও তাঁর অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি ছিল। বাংলা, ইংরাজি ও উর্দুতে সমান দখল—সমানভাবেই অত্যন্ত জোরালো ছদ্মগ্রাহী বক্তৃতা করতে পারতেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে দেখিছি ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে তিনি যখন চাব-সদস্যের একটা কাঠামো (skeleton) মন্ত্রিসভা পূর্ব-পাকিস্তানে কবেছিলেন, সেই সময় ইরানের "শাহ" করাচিতে (তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিল) এলে জনাব হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিসভার অপর তিন

সদস্য (জনাব আব্দুহোসেন সরকার, জনাব আব্রাহাম চৌধুরী ও জনাব আজমুল হক ওরফে নম্রা মিত্র) মহামান্য আতিথ 'শাহের' সাথে দেখা করতে যান এবং হক সাহেব আরবীতে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং "শাহ" তাঁদের তরবারি উপহার দেন। এটা পরবর্তীকালের ঘটনা; তবে এখানে তুলেছি এই জন্যই যে হক সাহেব যে নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তাই দেখানোর জন্য। এত গুণের অধিকারী যে ব্যক্তি নেই হক সাহেবের বিরুদ্ধে "আজাদ" পত্রিকায় দিনের পর দিন "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভার বিষয় কুৎসা প্রচার করা সত্ত্বেও কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে হক সাহেবের জনপ্রিয়তা খুব বেশি ক্ষুদ্র হয় না; তবে কিন্তু তথাকথিত "শ্যামা-হক" মন্ত্রিসভা বেশিদিন টিকেতে পাবল না। কেন যে পারল না, সে কথাটা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

১৯৪২ সাল। হিজলী বন্দীশালা স্থিতীয় বিশ্ববিক্ষেপের কারণে বন্ধ করে দিতে হওয়ায় ঐ বন্দীশালায় আমরা ১০৫ জন বন্দী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যেতে বাধ্য হই। বন্দীদের মধ্যে দুইজন তৎকালীন বাংলা বিধানসভার (এসেম্বলির) সদস্যও ছিলেন। একজন হলেন ঢাকার শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী (বর্তমানে পরলোকগত) ও অপরজন মৈমনসিংহের শ্রীজ্ঞান মজুমদার (বর্তমানে মৈমনসিংহে আছেন। পাশপোর্টে না পাওয়ার তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেখতেও আসতে পারতেন না)। জ্ঞানবাবু আমাদের দলের সাথেই ঢাকায় যান; আর প্রতুলবাবু যান মেদিনীপুরে। আমরা ঢাকা জেলে থাকাকালে আমাদের চোখের সামনেই জেলসুপার (সাহেব)-এর হুকুমে 'গুন্ডা এ্যাঙ্কে' যেসব লোককে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক করে রাখা হয়েছিল, তাদের উপরে অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে পুঁলিশ গুলী চালান এবং অন্তত ২৫ জনকে নিহত ও বহু বন্দীকেই আহত করে। আমরা সে ঘটনার আদ্য-পান্তই দেখেছি। সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখে মমাহত হয়েছি কিন্তু আমরা তো নিরুপায়—আমরাও নিরাপত্তা বন্দী। অন্য কিছু করতে না পেয়ে আমাদের সকলের অনুবোধ জানিয়ে বিধানসভার সদস্য জ্ঞানবাবু মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেবকে ও অপর অত্যন্ত প্রভাবশালী জন-দরদী মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয়কে আবলম্বে ঢাকা জেলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। জনাব হক সাহেব ডঃ শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের সেই তারবর্তী পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে পৌঁছান। তখন আমরা দুই নেতাকেই ঐ গুলীচালনা

করার ঘটনার পিছদ বিবরণ দিই এবং কোথা থেকে কিভাবে গুলী চালিয়েছিল এবং নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করেছিল পুলিশে তা' বাল। আমাদের কাছে সব শুনে হক সাহেবকে সৌদন শিশুর মত কাঁদতে দেখেছি। তিনি আমাদের বাবেব বাচ্চা বাবা' ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে সব বলতে বলেন। তিনিও সবই শোনে। এই ঘটনাটি হয় বেঙ্গল এসেম্বলির অধিবেশন আবম্ভ হওয়ার ঊষ্মপ কিছুদিন আগে। এসেম্বলির অধিবেশন আরম্ভ হলে মৃত্যু-মন্ত্রী জনাব হক সাহেব ঢাকা জেলের ইত্যাকাদের একটা বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করেন যে ঐ ব্যাপারের বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এই তদন্ত করার ঘোষণায় ইংরেজ সরকার একেবারে মহা-ক্লিপিত হয়ে ওঠে এবং ইংবেজ শাসক দলের প্রতিনিধি বাংলাদেশের গভর্নর (সম্ভবত তাঁর নাম স্যাব জন হার্বার্ট) জনাব ফজলুল হক সাহেবকে 'গভর্নমেন্ট হাউসে' ডাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর 'রিডলভার' রেখে হক সাহেবকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশমত কাজ কবতে হক সাহেবকে বাধ্য করেন। এটা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভার পতনের কাণ। 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভার পতন হোল। হক সাহেব আগেই মুসলিম লীগ দল ছেড়েই ঐ মন্ত্রিসভা গঠন কবেছিলেন।

এই সবই হল ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরের ঘটনা। এইসব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়েই জনাব ফজলুল হক সাহেবের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তিনি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তা-ও কিছু কিছু বলতে হয়েছে। না বললে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ হত না বা অসম্পূর্ণ থাকত।

যাক এই জনপ্রিয়তাকে সম্বল করেই হক সাহেব আবার ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল-বল নিয়ে নির্বাচন-প্রার্থী হন। ক্ষমতাসীন বিদেশী সরকারের অনুকম্পায় মুসলিম লীগ দল ইতিমধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে হক সাহেব দুইটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে উভয় স্থান থেকেই মুসলিম লীগের চূড়ান্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্মানে নির্বাচিত হন কিন্তু তাঁর দলের আব বিশেষ কোনও সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি। মুসলিম লীগ দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হল এবং ঐ দলের নেতা জনাব সুরাবদী সাহেব তাঁর মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গড়েন। হক সাহেব বেঙ্গল এসেম্বলিতে একেবারে নিপ্রভ হয়ে থাকেন। তিনি কীচং কখনও এসেম্বলিতে গিয়ে

১০।১৫ মিনিটকাল মাত্র থাকতেন। মুসলিম লীগ দল তাঁর দিকে ক্ষুধেপও করতেন না। তিনিও নিঃশব্দেই আসতেন আবার নিঃশব্দেই চলেও যেতেন। এই অবস্থাই চলছিল। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ দল "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" (সম্মুখ সমর। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়—হিন্দু বিরুদ্ধে) ঘোষণা করে কাজে রূপায়িত করলেন। কলকাতার রাস্তায় রক্তের গঙ্গা বয়ে গেল, বহু বস্তী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বাড়িও অনেক-ই পুড়ল। সমস্ত রাতি ধবেই আমরা "আল্লা-হো-আকবর" ও "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি কয়েকদিন ধবেই শুনলেন। আমি তখন শিশুভূষণ দে স্ট্রীটে 'স্যাভব হোটেল' থাকতেন। এসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। পরে যখন আবার 'এসেম্বলি' ডাকা হয় তখন বিবোধী কংগ্রেসপক্ষ থেকে সুরাবদী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা (no confidence) প্রস্তাব আনা হয়। সেইদিন দেখি এক অভিনব অবস্থা। জনাব ফজলুল হক সাহেব ধীরে পাদক্ষেপে 'এসেম্বলি হাউসে' ঢুকতেই মুসলিম লীগ দলের কয়েকজন পাশাঙ্গানার ব্যক্তি ছুটে গিয়ে হক সাহেবকে ধরে নিয়ে গিয়ে একেবারে মন্ত্রীদের আসনে (Treasury bench) বসালেন। আমরা তো একেবারে তাক্তব। যে হক সাহেব এতদিন মুসলিম লীগের কাছে একেবারে অপারক্তের ছিলেন, আজ হঠাৎ তিনি এত 'পেয়ারের' হলেন কি করে? হক সাহেব ধীর-স্থিরভাবে বসে থাকেন। যথারীতি অনাস্থা প্রস্তাব তুলে কংগ্রেস পক্ষের কেউ কেউ এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বক্তৃতা করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ অগ্নিময় বাক্যবাণ সুরাবদী সাহেব সহ মুসলিম লীগ দলকে ধরাশায়ী করে তোলে। সেই অবস্থায় 'স্পীকার' সাহেব জনাব ফজলুল হককে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করেন। হক সাহেব উঠে দাঁড়াতেই মুসলিম লীগ দল প্রায় ৫ মিনিটকাল ধরে টেবিল চাপ-জিয়ে তাঁদের আনন্দ জ্ঞাপন করেন। সভা শান্ত হলে জনাব হক সাহেব ধীরে ধীরে তাঁর ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর ভাষণে তিনি সেদিন বলেন যে তিনি নিজেকে দেখেছেন হিন্দুবাড়ি (একটি রাজার বাড়িও তার মধ্যে ছিল) কিভাবে মুসলমান গদ্দা বা লুট করেছে এবং সেই লুটেরাদের মধ্যে 'সরকারের' পুলিশও কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে ও লুটের মালপত্র নিয়ে গিয়েছে। হিন্দুবা সেখানে সম্পূর্ণ নিরুপায় ছিল। কোন বাধা দিতেই পারে নি। তিনি নিজে বার বার পুলিশের ও

সরকারের কর্তৃপক্ষের কাছে বারে বারে 'ফোন' করে সংবাদ দিয়েও তাঁদের কারোই অস্তরের সাড়া পান নি। এই অবস্থা দেখে তাঁর বৃদ্ধকালের শিথিল স্নায়ু ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় মৃত্যু সংস্থার আধার ঘনিয়ে এলে প্রতি অল্প ঘণ্টা পর পর গদ্দা বা তাঁর বাড়িতে হামলা করতে থাকে। তাদের অত্যাচারে সেদিন সবারাত তিনি একটুও ঘুমুতে পারেন নি। এই অবস্থায় তাঁর শিথিল স্নায়ু একদমই ভেঙে পড়ে। তিনি আত্ম-রক্ষার কোনও পথই আব খুঁজে পান না। অবশেষে ঐ গদ্দাদের দাবি-ই তাকে মেনে নিতে হয়। তাদের দাবি ছিল মুসলিম লীগের সদস্যপদের আবেদনপত্রে তাঁকে সই করতে হবে। তিনি কবলেন এম্ম মুসলিম লীগের সদস্য হলেন।

হক সাহেবের ঐ বক্তৃতার পর মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দ একেবারে চুপ। আমন বিরোধী দল থেকে তখন টেবিল চাপতিও তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানালেন।

হক সাহেবের ঐ বক্তৃতা পূর্ব তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হলেও মুসলিম লীগ দল যে কোনও পাশা দেবেন না তা তো জানা কথা। কেউ তাঁকে তা 'পাশ' দিলেনও না। সেই অবস্থায় এতদিন দে। বিভাগ হয়ে গেল। জনাব হক সাহেব পূর্ববঙ্গ এসেম্বলির সদস্য হন ঢাকা গেলেন। তিনি ঢাকা হাইকোর্টে 'প্রাক-টিস'-ও শুরু করেন। পূর্ববঙ্গ এসেম্বলি ভেতরে তিনি খুব কমই প্রবেশ কবতেন; করলেও ১০।১৫ মিনিটেই বোঁশ সন্ম। তিনি সেখানে থাকতেন না। সকলে পেছনে গিয়ে একস্থানে চুপ কবে বসে থেকেই আবার চলে যেতেন। এইভাবে বাংলাদেশের মুসলিম লীগের একটি প্রকাণ্ড বড় প্রাচীর—সর্বশ্রেষ্ঠই বলা বোঁ: পারে—ধ্বংসে গেল।

হক সাহেব ছাড়াও মুসলিম লীগে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আর। দু'টি স্তম্ভ ছিল। তার একটি হলেন জনাব শহীদ সুরাবদী সাহেব এবং অপবটি হলেন জনাব আব্দুল হামিদ খা ('ভাসানী' নামে সমধিক পরিচিত) তাঁদের সম্পর্কেও কিছু বলা বিনো প্রয়োজন; কারণ পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে এই তিন প্রধান মিলেই মুসলিম লীগ বিরোধী 'যুক্তফ্রন্ট' গড়েন। পরের সংখ্যায় এই দু' নেতারও ব্যক্তিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নব কিভাবে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ে ওঠে সে-বিবরণ বলব।

[চন্দ্রনাথ]



[পূর্ব-প্রকাশিতের পঃ]

[চৌধুরী]

মিয়ার বললেন—

‘ভাবতঃ ভারতীশাপাৎ আজগাম
সুরেশ্বরী।

বিক্রমস্বরূপা পরমা স্বয়ং বিক্রমপদী সতী ॥’
—প্রকৃতিপঙ্কজম্

বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিক্রম-
প্রেরসী গঙ্গাদেবীর মর্তে আগমনের
কাহিনী। দুই সতীনের ঝগড়া। গঙ্গা
আর সর্বস্বতী পরস্পরকে শাপ দিলেন,
‘নদীরূপে মর্তে যাও!’ শারদা আগে-
ভাগে নিজের শাপমোচনের ব্যবস্থায়
ধরাধামে অবতীর্ণা হলেন। পবিত্রভূমি
নদীর তীরে বসে আশ্বখাষরা রচনা
করলেন বেদ বেদাঙ্গ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের
কণ্ঠে গায়ত্রী ব্যক্ত হলেন কুরুক্ষেত্রের নিকটে
সম্মানবর্তে—সর্বস্বতী নদীব তীরে।
এখন গঙ্গাদেবী কিভাবে আসবেন?
গঙ্গাবতরণের প্রস্তুতিপর্বে দেখতে পাই

কপিল মূর্ধনির কোপে সগর রাজার ঘাট
হাজার পুত্র ভস্মীভূত। তাদের উদ্ধারে
সগরপুত্র অসমঞ্জ, তাঁর পুত্র দিলীপ, তাঁর
পুত্র অংশুমান এবং সবশেষে তাঁর পুত্র
ভগীরথ সূদীর্ঘকাল ধরে ভগবান বিষ্ণুর
আবাধনা করতে লাগলেন। ভগীরথের
তপস্যায় প্রীত ভগবান তাঁকে দেখা দেন
মুদলীধর গোপবালকের মূর্তিতে।
শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করে বললেন,—

‘ভারতঃ ভারতীশাপাৎ গচ্ছ শীঘ্রং
সুরেশ্বরী।
সগবস্য সূতান সর্বান পুত্ৰং কুরু
মম-জ্ঞয়া ॥
তৎস্পর্শবায়ুনা পুত্ৰা যাস্যন্তি
মমমন্দিরং।
বিস্রতো দিব্যমূর্তিস্তে দিব্যসান্দন
গামিনঃ ॥

যমুনোদ্রী পরিক্রমা শেষে বড়কোট
থেকে মোটর-বাসে চেপে চলোঁছ উত্তরকাশী

অভিমুখে। প্রথমে-ছবিগশ মাইল দূরত্বতী
ধরাসু বেতে হয় গেট বদলের জন্য।
নিচের অর্ধাং টিইরী আর উপরের মানে
উত্তরকাশী এবং বড়কোটের গাড়িগাড়ি
এখানে মিলিত হয়। ধরাসুতে প্রায়
দু’ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। নদীর
ধারে বসে থাকি। মাত্র কাদিনেব মধ্যেই
জল অনেকটা বেড়েছে। যাবার সময়
যেখানে বসে স্নান করেছিলুম সে জায়গা
এখন জলের তলায়। বর্ষাকালে নদীর
কলেবর প্রতি ঘণ্টায় বদলায়। বেলা প্রায়
ছটায় গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে এবার চলা শুরু
জাহ্নবীর তীর ধরে উত্তরকাশী। ধরাসু
থেকে মাত্র আঠার মাইল। বরমখালে
যমুনোদ্রীর পথ অতিক্রম করি। চলোঁছ
গঙ্গার অববাহিকা ধরে এঁকে-বেঁকে, ঘুরে
ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে মাটি আর পাথরে
তৈরি মোটরগাড়ি চলাচলের পথে। সদা-
নির্মিত এই সড়কে মেরামতিও চলেছে
অনবরত। ঝরো মাটি আর পাথরের
চাপড় গাড়িয়ে পড়ে হরদম। নেপালী
শ্রমিকরা অবরোধ সরিয়ে পথ করে দেয়।
অসমান ভাঙা পথ পার হয় গাড়ি অতি
সন্তপণে। গাড়ির চাকা চলেছে পথের
কিনারা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে।
মাঝে মাঝে যেভাবে কাত হয়, ভাবি টাল
সামলতে না পারলে একেবারে নদীগর্ভে
গিয়ে পড়বে। আড়চোখে ছাইভারজীকে
দেখি সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভাবলেশহীন
মুখে, সামনের দিকে চেয়ে আছে স্টীয়ারিং
আঁকড়ে। নিচে পড়লে একেবারে স্বর্গ-
প্রাপ্তি! উন্মত্ত নদীর দূরন্ত স্রোতে
যাত্রী আর মালপত্র বোঝাই গাড়ির চিহ্নও
ঝুঞ্জে পাওয়া যাবে না। এর চেয়ে হেঁটে
যাওয়া বোধকরি ঢের ভালো ছিল।
সুখের চেয়ে স্বস্তি পাওয়া যেত।
অসহ্যের মতো মনে মনে মাতৃনাম স্মরণ
কবি। আর কিই বা করবার আছে?—

নয় মাইল দূরে ডুন্ডা। সদ্যগঠিত
উত্তরকাশী জেলার সদর মহকুমা। সাব-
ডিভিসনাল হেডকোয়ার্টার্স। স্কুল, ডাক-
ঘর, পশুচিকিৎসালয়, সীমান্ত উন্নয়ন
বিভাগের অফিস ইত্যাদি ছোট উপত্যকা-
টিতে কর্মচাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। আমাদের
বাসটি ডাকগাড়ি। মেলব্যাগ নামের আবার
চলা শুরু। এবারে আর কোথাও না থেমে
একেবারে সোজা উত্তরকাশী। চারিদিকে
বিশাল পর্বতশ্রেণী। মধ্যে অতি বিস্তৃত
উপত্যকার বৃক চিহ্নে সাপেব মতো কুন্ডলী
পাকিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত। ও-পাশের
বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রায় সমতলের আকৃতি।
গঙ্গা এখানে বাকি ঘুরে উত্তরবাহিনী।
অর্থাৎ উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। প্রবল
মোলাজলের স্রোত। শস্যশ্যামলা উপত্যকা
ঘিরে সবুজ পাহাড়। শান্ত, সুন্দর পরি-
বেশ। দৃষ্টি কোথাও ব্যাহত হয় না।
সমতলের জীবনে অভ্যস্ত চোখে বহুদূর



ব্রহ্মলোক : শতাপথ ও ভগীরথ

পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। পাহাড়ের মাথায়, গায়ে হালকা মেঘ আটকে আছে। সেকালের সাধু-সন্ন্যাসীদের পছন্দের তারিফ করতে হয়। একসঙ্গে পার্বত্য-জীবন আর সমতলের সুবিধা, উচ্চভূমির নির্মল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সবই মিলবে এখানে। উচ্চতা ৩৬৪০ ফিট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে।

প্রায় সওয়া সাতটায় গাড়ি এসে থামলো অতি প্রশস্ত রাজপথের ধারে বাস ডিপোতে। সন্ধ্যা আগত প্রায়। এখন সকলের আগে আশ্রয় প্রয়োজন। বাস ডিপোর সামনেই বেশ বড় একটা খেলার মাঠ। তাকে ঘিরে ঘন বসতি। ময়দানের পাশ দিয়ে পথ গেছে বাজারের দিকে। বাস ডিপোর সামনে বিড়লা ধর্মশালার প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। পথের ধারে সারি সারি হোটেল আর চায়ের দোকান স্টেশন-নারী আর সাইকেল মেরামতের বিপণি। তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাই কাল-কমলী ধর্মশালার দিকে। বিশাল ধর্ম-শালাটির দোতলায় একটা ঘর জুটেছে। লাইট আর পাখাও আছে। তবে বড় নোংরা। রাজস্থানীদের দলটির দেখা মিললো। আমায় দেখে সবাই খুশি। বৃন্দ দলপতির সঙ্গে কথাবার্তায় এগিয়ে যাই উঠানের ওপারে। এরা গাংনানী

থেকে পদরজে নাকুরী হয়ে গতকাল এখানে পৌঁছেছে। ডুন্ডা আর উত্তরকাশীর মাঝখানে নাকুরী মোটরবাসের পথেই পড়ে। আজ সারাদিনটা ওদের গেছে পারমিট-এর হাঙ্গামায়। সীমান্তবর্তী গণ্যোত্তরী যেতে হলে সবাইকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় এখান থেকে। প্রথমে থানাতে নাম-খাম ইত্যাদি লিখিয়ে এলে, শ্বিপ্রহরের পরে আদালত থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের সই হয়ে পারমিট মেলে। বর্তমান যুদ্ধের প্রাকালে এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি। তবে তীর্থ-যাত্রীদের অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধা হয় না, ভারতীয় হলে।

ঘরের দিকে পা বাড়াই। সারাটা দিন পদরজে আর গাড়িতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে গায়ে অনেক ধূলা জমেছে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ধামতে হয়। ভেতর থেকে যমুনা আদেশ করে একটু অপেক্ষা করতে। উঁকি দিয়ে দেখি কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাটা হাতে সে জঙ্গল পরিষ্কারে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই বিছানা খুলে জিনিষপত্র গুছিয়ে ঘরখানার চেহারাই বদলে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তেই সে বেরিয়ে এসে শ্বিতীয় আদেশ জারী করে, 'শিশুগিরি স্নান করে এসো।' বিনা প্রতিবাদে আদেশ গালন করি। উঠানের একপাশে কলের জলে স্নান সেরে ঘরে ফিরতেই, সামনের দোকান

থেকে গরম চা আর জিলাপী এসে গেল। এদিকে ধূলোকাদা মাথা জামা-কাপড়-গলো কেচে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এসবই যমুনা দেবীর কৃপা। অতঃপর পথে বেরিয়ে পড়ি একটু ঘুরতে। এখানে এ সময় অন্ধকার হয় রাত আটটার। পথে ইলেকট্রিক আলো। দোকানে রেডিও সংগীত, সারি সারি বাড়ির তলায় সর্ব-ভারতীয় গণ্যাসামগ্রী আর লোকের ভিড়। ধর্মশালাটি বাজারের একপ্রান্তে। প্রথমেই একটা সেলুনে ঢুকি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত দাড়ি-গোফের জঙ্গল পরিষ্কার করি। সুশ্রী চেহারার একটা ছোট্ট বালক যখন ধারালো কুরখানা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলি, 'সে দাড়ি কামাতে পারবে তো?' অল্প হেসে গালের ওপর কুর চালাতে থাকে। আহা, যেমন নরম হাত, তেমনি মোলায়েম হাতের কাজ। বোঁচে থাকো বাবা! বিনা রক্তপাতে এবং অশ্রুপাতে এই কাজটা কোনদিনই বড় একটা হয়ে ওঠে না। কিশোর ছেলেরটির বাহাদুরি আছে। পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরা বাউন্ডুল বেশ ছোড়ো দোকানের বাইরে আসি সভ্য হয়ে। কালকে আবার হাকিম সাহেবের দরবারে যেতে হবে।

বিড়লা ধর্মশালার গায়ে সারি সারি

দুর্শরিতের মধ্যে খোঁজ করে একটাতে ঢুকে পড়ে। মাংস আর রুটি পাওয়া বাবে। তার সঙ্গে স্পেশাল তরকারি—এঁচড়ের ডালনা। দীর্ঘদিন সংযমের পরে এবার একটু মদ্য বদলানো গেল। পাহাড়ের হাটবার গুরুতর শ্রম আর তার সঙ্গে প্রোটিনহীন খাবার এ কদিনে বেশ দুর্বল করে ফেলেছিল। কেবলমাত্র শহরামল ছাড়া উত্তরাঞ্চলের তীর্থস্থানগুলিতে আমিষ-আহার পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম শব্দ স্বীকৃতি। সেখানে মিউনিসিপাল এলাকার আমিষ আহার নিষিদ্ধ। পাহাড়ীরা নিরামিষ হাঙ্গল-ভেড়ার মাংস খায়। কিন্তু দোকানে মেলে না। তার প্রধান কারণ দরিদ্র দোকানদার মনে করে এতে তার ব্যবসার কতি হতে পারে। বেহেতু অধিকাংশ তীর্থযাত্রীরা নিরামিষাশী, আমিষের গন্ধ পেলে আর সেখানে ঢুকবে না। শহরামলে নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রুতির লোকেরা যাত্রা-রাত করে। যাত্রীরা ছাড়াও খরিশারের অভাব হয় না। তবে ভাঙ্গারদের প্রাণ এখানে অচল।

আহার সমাধা করে দোকানের বাইরে পা বাড়াই। পারের দোকানে সম্মান পানও জোটে। আকাশছাড়া মেঘ করেছে। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি গারে পড়ে। রাতের ভেড়ায় ফিরে আসি। পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি নামতে দেরি হয় না। আর এ সময়টাও বর্ষাকাল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে বৃষ্টি বড় একটা দিনের বেলায় পাই নি। পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ ছয়-সাত হাজার ফিট উচ্চস্থান পর্যন্ত বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। পঞ্চালা শব্দই কণ্টকর হয়ে পড়ে। তার ওপরে মনুস নামে অবিরত বৃষ্টির ফলে। পঞ্চাট ভেঙে দারুণ বিপাক ঘটায়। এইজন্যই বর্ষাকালে পাহাড় বেড়ানো সব সময়ে নিরাপদ নয়। আর আছে পেটের অসুখের ভয়। বর্ষায় পাহাড় ঘোওয়া নদী, ঝরণার জলে অঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থের অধিকা হজমের গোলমাল ঘটায়। এই-সময় জলে একজাতীয় ক্রিমও জন্মায়। সামান্য অসতর্ক হলেই বিপন্ন। নিরাপদ হওয়া যায় কি না বলা শক্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সঞ্জীবনী হিমালয়ের হাওয়ার মোশানো আছে। আছে স্বাস্থ্যকর দীর্ঘজীবনের আশ্বাস।

[পনের]

উত্তরকাশী কালিকামালা ধর্মশালা

দরজা ঠেলাঠেলিতে ভোরের মৌসুমটা ভেঙে গেল। রাতে বৃষ্টি হওয়ার বেশ ঠান্ডা পড়ছিল। আরামে গভীর নিদ্রার কোন্‌খান দিয়ে রাতটা কেটেছে জানি না।

দরজা খুলে দেখি এক গেলাস পরম জা হাতে সামনের দোকানের এক ছোকরা দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন করি—টা দিতে কে বললে? উত্তর দেয় 'বাইনজী'। আরও ঘোণ করে, স্নানটান সারা হলে বেন জানলা দিয়ে ডাক দিই, দুধ মিষ্টি এসে যাবে। যমুনারা আজ সকালে গঙ্গোত্রীর পথে রওনা হয়ে গেছে। ঝাবার আগে আমার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বতটুকু সম্ভব করে গেছে। তার জন্য কোনও ভণিতা বা আড়ম্বর নেই। ভাবি, ঝণের বোকাটা ক্রমশই ভারী হয়ে যাচ্ছে। একতরকা পাওয়া যে এ যুগে প্রায় দুর্লভ।

উঠানের ওপরে দুমহল আতিথশালা আর রান্নাবাড়ি। তার পেছনেই গঙ্গা। ধর্মশালার নিজস্ব স্নানের ঘাট আগাগোড়া পাথরে তৈরি। জলের ধরে সিঁড়িতে বসে স্নান করি। প্রবল প্রোভের মধ্যে জলে নামতে সাহস হয় না। স্নান বরফের মতো ঠান্ডা তেমনি জলের বেগে স্বল্প-পরিসর নদীর ওপারে ছোট্ট ম্পীপের মতো একফালি জমিতে আগেলের চাষ হয়েছে। মেঘশূন্য নির্মল আকাশ আর প্রচুর রোদ। দুপাশে উচ্চ পাহাড়গুলোর গারে আর নিচে খেলাধুলার মতো কুদ্র বাড়ির চাল ভেঙে দেওয়া উঠেছে। শহর উত্তর-কাশী সারাদিনের কর্মব্যস্ততা নিয়ে জেগে উঠেছে। আপিস-কাছারী বেতে হবে। বাবার চেলাদের তো আর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে চলেবে না।

পথে বের হয়ে প্রথমেই যেতে হয় থানায়। পারমিটের দরখাস্ত নাম-খাম ইত্যাদি লিখিয়ে দিই। গঙ্গোত্রী বর্তমানে নটিফাইড এরিয়া, সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বিনানুমতিতে সেখানে যাওয়া চলবে না। থানা অফিসারটি অত্যন্ত ভদ্র। বিনীতভাবে জানিয়ে দিলেন, ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলবে না। থানার গচ্ছিত রেখে যেতে হবে। এখানে আসবার অনেক আগে থেকেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চিঠিপত্র লিখেছিলুম। শুনলাম তিনি বিশেষ কাজে অন্যত্র গেছেন। মুশ্কিলে পড়া গেল। কোর্ট বসতে কিছু দেরি আছে। পূর্বাভাসের অফিসে চলি। সেখানেও দুঃসংবাদ। একসিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেছেন সম্প্রতি। বাঙালী ভদ্রলোকটি শূন্যেই অত্যন্ত অসাময়িক এবং নানাভাবে সাহায্য করেন সবাইকে। তাঁকেও চিঠিপত্র লিখেছিলুম। তাঁর জয়গায় যিনি এসেছেন, তিনিও ট্যুরে বেরিয়েছেন। অতএব সারাপথে স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থাও বানচাল। 'দূর হোক গে ছাই'। এ সব ছেড়ে দিয়ে মন্দির দর্শনে মন দিই। প্রথমেই 'বিশ্বনাথের মন্দির'। এর সম্মুখে অনেক কিংবদন্তি আছে। টিহরীজের স্থাপিত

মন্দিরটির ভাস্কর্যে প্রাচীনত্বের পরিচয় পাই নি। প্রবাদ, কলিতে দেবাদেব বারানসীয়ার ভাগ করে শব্দ এখানেই নাকি প্রকট। চব্বরের একপাশে নাটমন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য আতিথশালা। সদর ভোরের বাইরে রাস্তার জলের কলে দুর্দাট মেরুযাত্রী জল নিয়ে বগড়া করছে। গলার জোর বারি বেশ, দুধের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, তিনি বঙ্গসন্তানই হবেন। ভাষার পূর্ববঙ্গের টান বেশ বোকা যায়। অঙ্গদুরের ব্যবধানে পরশুরাম, অঙ্গপূর্ণা আর জয়পুর মহারাজের স্থাপিত সোনার বিশুল শোভিত শিবমন্দির। এককালে উত্তরকাশী ছিল শব্দই তীর্থক্ষেত্র। আজকের প্রয়োজনে তাকে সাজতে হয়েছে বাস্তবসম্মত সীমান্ত শহর। সৈন্য আর রসদ চলাচলের বিশিষ্ট ঘাঁটি। দেবস্থানের আশেপাশে গজিরে উঠেছে ব্যারাক আর বাড়ি। দোকান-পসার আর পেট্রোল ডিপো। পথে মোটরগাড়ি আর জীপ গজন করে ছুটেছে অবিরত। শান্ত সমাহিত ভাবটি অন্তর্হিত, অন্তত শহর অঞ্চলে।

সরকারী আদালত প্রভৃতি অফিসগুলি মরদান ছাড়িয়ে অঙ্গদুরে ভারের বেড়া দেওয়া এলাকায়। ইতস্তত করে কখনো বাড়ি, আগাগোড়া করগেট টিন দিয়ে তৈরি, অস্থায়ী বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে রাতারাতি। গ্রীষ্মকালে এই ঘরগুলোর মধ্যে কাজ করা বেশ কণ্টকর মনে হয়। সহকারী শালক এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। অতি সদালাপী ও ভদ্র মিঃ গুপ্ত। তাঁর কাছে ক্যামেরার কথা বললুম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ফাইলে আমার কোনও চিঠি পাওয়া গেল না। নিজের কথায় শব্দ বললুম গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে যাওয়ার ইচ্ছা দীর্ঘকালের। এবং ক্যামেরা ছাড়া যাওয়া চলবে না। সহদয় ভদ্রলোক শেষ করে আমার সব কথা শুনলেন। তারপরে একটি গোপনীয় দলিল বের করে দেখালেন সৈন্যবিভাগ থেকে সম্প্রতি কড়া নির্দেশ জারী হয়েছে, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সমন্বিত এই সব এলাকায় ক্যামেরার প্রবেশ নিষেধ। জেলার দায়িত্ব সাময়িকভাবে তাঁরই উপরে ন্যস্ত। আমার বললেন বেলা তিনটোর পরে আসতে। তখন প্রায় একটা বাজে। এসময়টা মধ্যাহ্নভোজের ছুটি।

আমিও চলি দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে। গত রাতের দোকানে সবকিছুই বাড়ন্ত। চেয়ার-টেবিল উঠে গিয়ে খোঁরাধরি চলছে। এসব অঞ্চলে বেলা বারটার পরে আর বড় একটা হোটেল বাড়ানো পাওয়া যায় না। খুঁজে-পেতে কিছু মিললো বটে, তবে আরও নিকট। এদিকে রোদের বাঁজও প্রখর, আর তার সঙ্গে মাছি। অহার সমাধা করে ডকঘরে গেলুম। পথে

কোথাও খবর নেমে টেলিগ্রাফের লাইন স্থানচ্যুত। তার করা গেল না। দূর-একখানা চিঠি লিখে আবার ফিরি আদালতের দিকে। মিঃ গদুপ্তর কামরার মামলা চলাছিল। একখানা চেয়ারে বসতে বসলেন।

পাহাড়ীদের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র সমস্যা। আসামী পাহাড়ের মাথায় ভেড়া-বকরী চরায়। সরকারী ট্যাক্স চাইতে গেলে মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ডেকে পাঠালে উপস্থিত হয় না। গদুপ্তর অপরাধ। হাকিম সাহেব

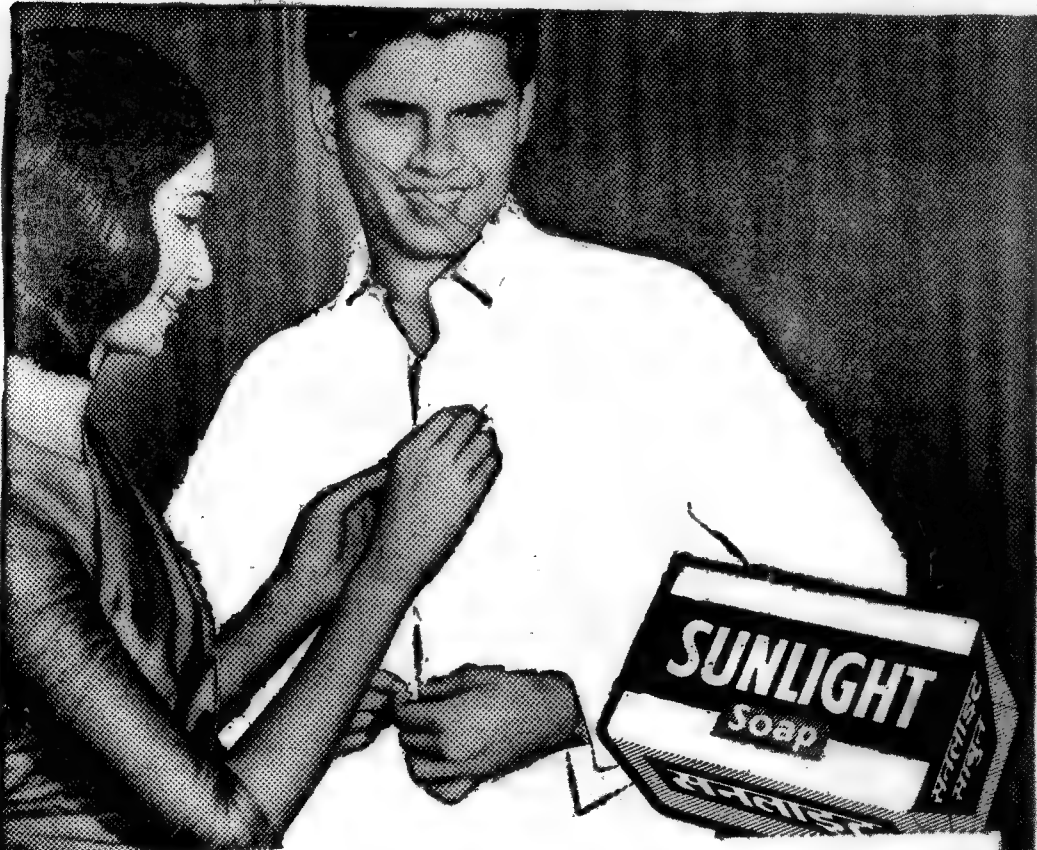
গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করলেন এমনি হরকৎ (শাস্তিভঙ্গ) বন্ধ করবে, না হলে জেল খাটতে হবে। কি বলবার আছে তার উকিল সাহেব বলবেন। উকিল দেবার ক্ষমতা থাকলে তো খাজনাই দিয়ে দিত। বিচারকের সামনে তার বক্তব্য সে নিজেই

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে করে কাচে



সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। সেখান থেকে, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অল্প একটু যত্নেই অল্পসে ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অন্যদলে হৃদয়ের পরিকার ঝলমলে করে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার

প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন



দেবু' বছর আগে দেখা গান্ধী

বলবে। লোকটির কোন স্থায়ী ডেরা নেই। গাছতলায় আর পাহাড়ের গুহায় রাত কাটায়। জঙ্গলের ঘাসপাতা খায় পরিবারবর্গ। সরকারী কোন জমি সে দখল করে নি। মারপিট করেছে কেন? মহাবিস্ময়ে উত্তর দেয়, শৃঙ্খল শৃঙ্খল গাল-গালাজ করে কেন? তাইতো তো মাথা ঠিক থাকে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের হুকুম শোনে নি কেন? হাত দুটো প্রদর্শিত করে সে বলে ওঠে, পঞ্চায়েত তার ভেড়া-বকরীদের কোন উপকারটা করেছে? পঞ্চায়েতের পাঠশালার কি লেখাপড়া করতে যাবে তার পেশারা যে ট্যাক্স দিতে হবে? হাকিম সাহেব ফাইলখানা সামনে তুলে ধরেন। হাসি চেপে রাখাই দক্ষর। গুপ্তসাহেব মৃদু-স্বরে, ধীরভাবে তাকে বোঝান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপকারিতা আর সরকারী আইন। ভেড়া-বকরী চরবার স্বাধীনতা দিতে হবে। ট্যাক্স না দিলে এতবড় দেশটা চলবে কি করে? অনুতপ্ত পাহাড়ী মাপ চেয়ে অব্যাহতি পায়। স্থিতীয় মামলা, বৃদ্ধা অভিযোগকারিণী এসেছে সমর্থ ছেলের নামে নালিশ জমাতে। জোয়ান মরদ কোনও কাজকর্ম করবে না। নেশা-ভাও করবে আর আড্ডা দিয়ে বেড়াবে। বাড়িতে ফিরে তাঁর খাবার না পেলে হাঙ্গামা বামায়ে। গুপ্ত সাহেব

ছেলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, অকি-যোগ ঠিক কি না। নিরুত্তর আসামী। আবার প্রশ্ন, নিজের মা কি না। বৃদ্ধির বৃকের দৃশ্য সে পান করেছে কি না। নত-মুখ আরও হেঁট হয়ে এলো। উত্তেজনার গুপ্ত সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মার বৃকের দৃশ্য ওই জোয়ান শরীর, তাঁর সেবা করা যে মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম। দুর্নিয়ম সবচেয়ে বড় দেবতা নিজের মা। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে যুবক মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ে। সজল চোখে বৃদ্ধা জড়িয়ে ধরে তাকে। উপস্থিত সকলের চোখে জল এসে যায়। অন্য গুপ্ত সাহেব। সার্থক তোমার জেলা শাসন। সামান্য এই লেখক দুই হাত তুলে তোমায় নমস্কার জানায়। আর দেবতার চরণে প্রার্থনা করে 'হতভাগা দেশটাতে গুটিকতক গুপ্ত সাহেবের জন্ম দাও ঠাকুর, আবার আমরা উঠবো!'

আদালতের নাজির কয়েকখানা টাইপ করা কাগজ নিয়ে এলেন। গুপ্ত সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, চিঠিপত্র ছাপতে একটু দেরী হয়ে গেল। দীর্ঘ হুকুমনামাতে আছে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি, ক্যামেরা সঙ্গে রাখবার জন্য। আর আছে নির্দেশ, চলার পথে প্রতি পদলিখ চৌকিতে ক্যামেরাগুলো দেখিয়ে সেখানকার জমাদারদের সহি নিতে হবে।

প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, শ্রীজ প্রভৃতির ছবি তোলা হবে না ইত্যাদি। ছয় কপি হুকুমনামায় সহি দিতে হলো। মিলিটারী, পদলিখ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষাবিভাগ প্রভৃতি নানাস্থানে একটা করে কপি চলে গেল। কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। কত অল্প সময়ের মধ্যে আমার সম্বন্ধে বিশ্ব সিংহাসনে পৌঁছে চিঠি ড্রাফট করেছেন। সামান্য এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার জন্যে কুণ্ঠিত হয়েছেন। এবং বিনা বিবরণ মিলিটারী নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমার আচরণের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা যে বাহাদুরী দেখানো বা স্মরণ-বাণী উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে আর একটা কথাও বললেন না। শৃঙ্খল জন্মানো, মাত্র কয়েকদিন আগে আমার গন্তব্যস্থানে একটা শোচনীয় দৃশ্যটো ঘটে গেছে। তরুণ যুবক গোব্রাণ চৌধুরীর অপঘাত মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে আমার শৃঙ্খল বললেন, আমি যেন সাবধানে থাকি। অজানা বিপদসংকুল বরফের পাহাড়ে অভিজ্ঞ গাইড অবশ্যই যেন সঙ্গে রাখি। তাঁকে বলে এগুদম, তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে, ফিরে এসে। [কম্বো]



শ্রীমতী বিষ্ণু

শ্রীমতী মুস্তাফা জিন্নাহ

শহরের মাঝখানে চৌমাথার কেন্দ্রে
ওরা স্থান দিতে চেয়েছিল দেশপ্রী
দীনেশচন্দ্রকে। কয়েক বর্গফুট চতুর্ভুজ
জমির চারপাশে অলঙ্কৃত রেলিঙ থাকত
—যাধে দেশপ্রী প্রতীকিত। সাত ফুট
উচ্চ বেদীতে একটি জ্বলন্ত প্রেরণার
প্রতীক। চারদিক থেকে এসে চারদিকে
যে মানবগুলো চলে যেত, সকলের
চোখেই ওই প্রেরণার তাপ সঞ্চারিত না
হয়ে পারত না। পৌর কর্তৃপক্ষের একটি
কমিশন সাক্ষরিত জিন মাল ধরে অল্প
বৈঠকের পর স্থান নির্বাচন করেন।

জাতিরই সুপারিশে চীফ এঞ্জিনিয়ার
স্থানের যাপ্যজোকও চুকিয়ে ফেলেন।
ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে অসুবিধার
কথা বলা হয়েছিল। এবং সেই অজুহাত
নিয়ে কারা-কারা বিরোধী মিছিলও বের
করেছিল। শেষে ঘটনা এত দূর গড়াল
যে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও মিথো
পুলীর আওয়ালে পুলিশ ক্রুদ্ধ জনতা
হতভম্ব করে। দেশপ্রী ভাষা ভালো,
সেই সময় দূর বিদেশে কোন দেশপ্রী
দূতাবাসের কর্মীরা আকৃষ্ট হলেন,
দূতাবাসের সম্পত্তিতে নাকি আশ্রয়

সংযোগ করা হয়েছিল, জাতীয় অপমানের
রুশ্ট জনসাধারণ স্বভাবত নিজেদের শহরে
সেই বিদেশের দূতাবাসটির দিকে অগ্রসর
হল। দেশপ্রী রুশ শরীরে শয়্যাগত
ছিলেন—তার মতামত জানাতে চেয়ে
খবরের কাগজওয়ালাদের ডাকলেন।
বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ দীনেশচন্দ্র জানতেন,
বাড়ির চেয়ে সেরা একটি হোটেলের নামই
কাডে' থাকা দরকার। সুতরাং কাগজ-
ওয়ালারা ব্যাপারে এল বললেও ভুল হয়
না। 'মরকো' হোটেল প্রচার জোড়া ও
পানীয় ছিল। তার ফিকে তাঁর সচিবসভা

মতামতের নোট য়র করে তারা নিল।
নেবার সময় মুখ নামিয়ে চাপা গলায়
একজন কমবয়সী সাংবাদিক পাশের
দাদাকে দেশত্রীর নামে কী গান দিয়েছিল,
তাও সর্গ সতর্ক দেশত্রীর অগোচর ছিল
না। সে যাই হোক, খানাপিনা মৌজের
লোভ, পরস্পর মৌলাকাতের সুযোগ—
নিউজ এডিটর বুকেই যোগ্য লোক পাঠান,
এসবের প্রতিদান নির্ভর করে কনফারেন্সের
ইসূর উপর। ইসূটি গরম কি না, এই
দেখাই যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, ইসূ গরম
ছিল। জাতীয় সার্টিফিকেটে আঘাত।
সুতরাং দেশত্রীর জীবৎকালীন প্রতিমূর্তি
নির্মাণ ও স্থান নির্বাচন নিয়ে কেউ আর
মাথা ঘামাল না। মূর্তি তৈরির আগে
প্রথামত জায়গা ঘিরে ফেলা হল। ত্রিপলের
ঘেরাটোপে শহরের সেরা ভাস্কর তাঁর
হাত নিয়ে ঢুকে গিয়েছিল।
দিনের পর দিন নেপাথ্যে সাজঘরে কী
ঘটেছে, জনসাধারণের ঔৎসুক্য সেদিকেই
নিবন্ধ থাকল। পাকা ফলের দিকে চেরে
গাছের নিচে অপেক্ষমাণ বালকের মত
তারা চারপাশে ঘুরঘুর করত এবং
সেই চৌকণা ঘেরাটোপের রহস্যে অভিভূত
কোন কোন মানুষ ফের রংস ও শয্যাসায়ী
দেশত্রীর জন্যে সমবেদনাও বোধ করছিল।
অতঃপর কোন বিশৃঙ্খলা দেখা
যাচ্ছিল না। কেবল কোন কোন বিব-
নন্দকে কাগজ দেশত্রীর জীবিতাবস্থায়
মূর্তি নির্মাণ নিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা
বলছিল, কাটুন আঁকছিল। কিন্তু
সেগুলো জনসাধারণের রসবোধকেই
চরিতার্থ করছিল মাত্র। অজস্র জ্বলন্ত
ইসূর মধ্যে এটা স্বভাবত তুচ্ছ। যুগপৎ
শব্দ ও বন্যা, শসহানি, দর্ভীকাক্ষা,
সীমাস্তের হাস...দীনেশচন্দ্রের অমৃত সাধ
নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? ফলত,
গ্রীষ্মক পলিশেরাও বলছিল—একসিডেন
হোবে তো হোবে, এ শহর তো একসি-
ডেনকা গান্ধীপূর চেপে আসে!...হাম
ষায়সা হাত উঠতা, ওইসি উঠাবো, দেখা
না দেখা উনলোগ্যিক মরজি!.....

বরং চৌমাথার এ্যাকসিডেন্টের পূরনো
অঙ্ক আরো নিচে নামছিল। উচু
ঘেরাটোপ মধ্যে থাকার সব গাড়ি অতি
সাবধানে কম স্পীডে যাতায়াত করছিল।
গ্রীষ্মক কর্তা বলছিলেন অটোমোবাইলস
আর নাও গেটিং দি রিয়াল অটোমোবাইলস
ইতাবসরে হঠাৎ এই কান্ডটা ঘটে
গেল। সারা শহর ভেঙে পড়ল চারপাশে।
বুশ দেশত্রী দীনেশচন্দ্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের
মত পরাশররূপী সজয়ের মারফৎ মৃদু-
মৃদু খবর নিতে থাকলেন। দৃষ্টি
অন্যদিকে চোখে তাঁর মাথার অবশিষ্ট
চল কাশফলের বর্ণ ধারণ করল। আর
ভাস্কর অনিমেষ? তাকে কেউ দেখতে

পাচ্ছিল না। যাদুটপীর ভিতর বিপন্ন
পায়রার মত হয়ত সে বিবর্ণ বিবর্ণ শরীরে
স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছিল। তার
সহকারীগণ, প্রমিক ও রাজমিস্ত্রীরা প্রথম
রণেই ভগ্ন দিচ্ছে। চারপাশে কয়েক
বর্গফুটের মধ্যে কারুর যাবার সাধ্য নেই।
বন্দুকের আগরাজ পটকা আদি বিস্ফোরক
দ্রব্য ব্যবহার, কাঁদানে গ্যাস ফায়ার ব্রিগেড
—কোন কিছুতেই ওই আশ্চর্য চক্কাকার
ঘূর্ণমান ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বাহু খণ্ডিত
হচ্ছিল না। ভাস্কর অনিমেষের বন্দুকা
বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে চিক্কার করছিল—
অগ্ন মরে গেছে, অগ্ন মরে গেছে! হা
ঈশ্বর, আমাদের শোকসভার আরোজন করা
ছাড়া উপায় নেই! শিশুপের খাটি সমঝদার
একটি পত্রিকা লিখল—যে শিল্পী সারা
জীবন অনোর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছেন,
অবিলম্বে তাঁর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা
উচিত। কারণ, 'ওই সহস্রাব্দীবেষ্টিত
ভয়ঙ্কর অন্ধকারবর্ণ বাহু থেকে এখন
আমরা বীরশিশু অভিনয়র শব ছাড়া
আর কিছু আশা করি না।' দেশত্রীর
বিরোধী একটি কাগজ তো খোলাখুলি
হেঁড়িৎ দিল : দীনেশচন্দ্র নিপাত যাও।
ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা লিখল :
একটি ঐশ্বরিক দৃষ্টান্ত। অলৌকিক
তোমাদের রিস্মত হয় নাই। আধুনিক
কবিদের মুখপাশে লেখা হল : প্রতি-
মূর্তিতেও আছে, কাকেও আছে।

কাক! হ্যাঁ, প্রত্যক্ষত কাক—মসীক
ককশকণ্ঠ শব্দভোজী বায়সকুল! পথিমধ্যে
বহুনির্দিষ্ট, পরভূৎ সুতরাং নিবোধ,
কলহপ্রিয়, সেই কাক। যারা মাত্র কয়েক
বছর আগে পশুশালায় একটি হরিণকে
হত্যা করেছিল, তাদেরকে দীনেশচন্দ্রের
উপর কিন্তু দেখা গেল, এই এক রহস্য!
আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য, দেশত্রী দীনেশের
শব্দেই নয়, তিনি জীবিত; কিন্তু তাঁর
নির্মায়মান প্রতিমূর্তির উপর তাদের
জোখের কারণ কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না।
সহস্র সহস্র ব্রহ্ম কাক ঘূর্ণির আকারে
ঘেরাটোপের চারপাশে উড়ছিল। তারিখ
২রা সেপ্টেম্বর, প্রত্যুষকাল থেকে হঠাৎ
আরম্ভ এই বাহু গঠন, এবং সেদিনই
দেশত্রীর জন্মদিন এবং সেদিনই দুপুর
১টা ১৫ মিনিটে (জন্মকণ) প্রতিমূর্তি
উন্মোচিত হবার কথা। স্বয়ং রাজ্যপ্রধানকে
দিয়ে উন্মোচন করার সাধ ছিল—রাজ্য-
প্রধান প্রধানদুসারে কোন জীবিত নেতার
প্রতিমূর্তি উন্মোচন করতে অপারগ। তাই
বিকল্পে এই শহরের সবচেয়ে বৃহৎ মানুষ,
একান্ত দীনহীন অভাজন নগণ্য প্রমিক,
আবদুল মিয়া কে বেছে নেওয়া হয়েছিল।
কেন আবদুলকে বাছা হয়েছিল, তার
কারণ সুস্পষ্ট সবার কাছে। সে মেহনতী

জনগণের একজন, যাদের জন্যে দীনেশ-
চন্দ্র সারাজীবন ডাংগ স্বীকার করেছেন।
কিন্তু কাক দুঃখময় ভূমিকা নিল।
আবদুল মিয়া দাঁড়িতে মেহেদী রাঙিয়ে
চোখে সুরমা চেনে ঘোড়াবাগানের বস্তীতে
প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ এই দুঃসংবাদ!
সে কিছটা ক্ষোভে কিছ কোতুকে ফ্যাক
ফ্যাক করে হেসে বলে উঠল—হালার
কাউরা!

মধ্য শহরে দীনেশচন্দ্রের পৈতৃক
বাড়ি একটা আছে। লালকেসার ছাঁদে
তৈরি বিরাট প্রাসাদ—তার চারদিকে ছোট-
বড় গেট। কেজা ছাঁদের উচু পাঁচিল
ডিঙিতে মাথাবীলতা উঁকি মারে। স্বভাবত
তার নিচে, ফুটপাতে উন্মুল মানুষেরা
কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে। সেই উন্মুল
মানুষদের কেউ—সে নারী হলে ঘোমটার
ভিতর মুখ রেখে, কচিং পাশে স্ফীতদর
উলগা শিশু, হাত বাড়িয়ে পা ছুঁতে
আসে পথচারীদের। কেউ রাস্তার দিকে
পিঠ ফিরিয়ে দু'হাটুর ফাঁকে মন্ডু
ঝুলিয়ে বসে। সামনে খড়ির লেখা: আমি
বৃদ্ধ ও কমচ্যুত। বেশির ভাগ লেখাই
ইংরেজী এবং তাদের মধ্যে হঠাৎ এসে গেল
কোথেকে এক শিল্পী, পাগল-পাগল
বেশভূষা, রঙীন চক বা কল্যা ঘষে দেব-
দেবীদের মূর্তি আঁকে।.....

সেকারগেই কি না কে জানে, চার
গেটের যে একটিতেই শব্দ দারোয়ান
রাখা ছিল, সেটি বেশ কিছুদিন খুলতে
দেখা গেল না সেবার। পরে শোনা গেল,
দেশত্রী এদের কথা ভাবছেন। শহরে বড়
আবজনা। একটা কমিটি তৈরি হয়েছে।
সেই কমিটির কয়েকটা সাব-কমিটিও হয়ে-
ছিল। সমীক্ষা চলছিল। সমীক্ষাতেই থরচ
হয়ে যায় লাখখানেক টাকা। ফলে কাজ
আর এগোয় নি। বিরক্ত উভয় দীনেশচন্দ্র
তখন পৈতৃক বাড়িটা সমাজকল্যাণে দান
করলেন। শহরতলীরও শেষপ্রান্তে
প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর নতুন বাড়ি তৈরি
হল। সেখানেই চলে গেলেন। এদিকে
সমাজকল্যাণ সংস্থা ফের কমিটি বসালেন,
এতবড় বাড়ি কি কাজে লাগানো যায়।
কমিটির সদস্যদের নানা জনের নানা মত
কেউ বললেন—দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা
প্রচুর, সুতরাং এখানে একটা বয়স্ক শিক্ষা-
কেন্দ্র খোলা হোক। কারুর মতে—
বৈজ্ঞানিক গবেষণা হোক এখানে। কেউ
বললেন—দেশে খাদ্যসমস্যা ভয়াবহ।
এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি (খাদ্য) নিয়ে একটা
কিছ করা যেতে পারে। যাই হোক,
দীর্ঘ এক বছর পরে কমিটি মতামত
দিলেন—বাড়িটা পূরনো। আজকাল এমন
চত্তর বাড়ি দিয়ে কোন কাজ হয় না।
প্রচুর জায়গা আছে—অথচ কাজে লাগবে
না। সুতরাং আগে এটা ভেঙে ফেলা

হোক। একজন বিদেশী স্ফূর্তির পরা-
ম্পত্তিও সঙ্গে দেওয়া হয়। তাঁর মতে এই
বিশ্ব-একর জায়গার একটা মাল্টি-স্টোরিড
বিল্ডিং হতে পারে, যার মধ্যে শহরের সব
জোকের বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা
সম্ভব। বস্তুত এই সমস্যাটাই এখন
জরুরী। লোকে মাথা গোঁজার জায়গা না
পেলে নিজের শক্তি রাষ্ট্রের কল্যাণে লাগাবে
কোনো করে?

কমিটির সুপারিশ দীনেশচন্দ্রের মনঃ-
পূত হয়েছিল। কথা ছিল, এ বছর তাঁর
জন্মদিনেই এ সংবাদ সম্মারনে ঘোষণা
করা হবে।

অন্যবারের মত খুব ভোরে উঠে
দীনেশচন্দ্র এই ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে
নিয়েছিলেন। জীবিত মানুষের ওই প্রতি-
মূর্তির পিছনে যে তাঁর কোন হাত নেই,
শহরের কৃত্তর অধিবাসীরাই এর মূলে—
সাদৃশ্যের ঘোষণা করা হবে। মেম্বারটিও
পড়েছিলেন। দু'এক জায়গায় সংশোধনও
করে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি তাঁর
পৈতৃক বাসভবন শহরের অধিবাসীদের
দান করছেন—এ ঘোষণার পাতাতেও
দীনেশচন্দ্র চোখ বুলিয়েছিলেন। খানিক
পরে অজস্র মানুষ আসবে অজস্র কল
আর উপহার-সামগ্রী নিয়ে। বাইরের ঘরে
একটা প্রস্তুতি চলছিল। বাথরুমে ব্যায়ার
আগে তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে তাঁর পর-
বর্তী কার্যক্রম ভাবছিলেন। এই তাঁর
অভ্যাস। হিসেব করে তিনি পা ফেলেন।
তাই কোনবারই পা খানায় পড়ে না।
হঠাৎ এই দুঃসংবাদ!

প্রথমে খুব হেসেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ
মুখ বেগা বাড়তে থাকল, তাঁর হাসি ক্রমশ
অস্তগত হতে থাকল। ফুল ও উপহারের
ভিড় ঠেলে তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লেন।
চুকলেন, কিন্তু টেলিফোনে গোপন
স্থান থেকে বিস্মিত পরাশর ভৌমিক
অনবরত তাঁকে নগ্নশবের রিপোর্ট দিচ্ছিল।
রিঙ শুনলেই তাঁর হাত রিসিভার স্পর্শ
করাইল। এই টেলিফোন নাম্বারটি তাঁর
গোপনীয়। বিস্মিত দু'জরজন ছাড়া
কারুর জানা নেই। প্রকাশ্য ফেলের
সামনে প্রাইভেট সেক্রেটারী নিধিবাণু বসে
রয়েছেন। দিল্লী-বোম্বে-কলকাতা যেখান
থেকেই রিঙ হোক, তাঁর জবাব স্যার
অসম্ভব।

ঠিক একটা পনেরর ফের পরাশর
জানাল—অসম্ভব উষ্মি হয় নি। ব্যাট-
ছেলেরা চারপাশ ঘিরে রেখেছে। অজস্র
হারামজাদা রিতলে বসে আছে। চারপাশের
বেড়ায় পাহারা দিচ্ছে। সূচ গলানোর
সূচনা নেই। কেউ পা বাড়ালে মাথায়
টোকার খেয়ে পালিয়ে আসছে। নাও নয়র,
হোয়াট টু ডু?

দীনেশচন্দ্র কালেন—নিউ ইট। ছেড়ে
বাত। চলে এস।

—কাল হবে বলে ঘোষণা করে দিই?

—না। কাল কি হবে, ঠিক নেই।

কল, অনিশ্চিতকালের জন্য স্থগিত থাকল।

দীনেশচন্দ্র ফের রেখে জানামার
পাশে বসলেন। ভাবলেন, এর পিছনে
কাদের ষড়যন্ত্র নেই তো? সত্তা কর্ম-
জীবন তাঁকে বহু ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি
পড়তে হয়েছে এমন করে। অসম্মানিত
হতে হয়েছে। বহুদিন আগে একবার
নির্বাচনের সময় তিনি ভোট সংগ্রহে
বেরিয়েছিলেন, মনে পড়ছিল। তাঁর নির্বা-
চন এলাকার এক কুখ্যাত বিশেষ নারী-
অধ্যয়িত মহিলায় সর্বাধিক ভোট পাবার
আশা ছিল। বখন তিনি খোলা গাড়িতে
সে পাড়ায় ঢুকলেন—দেখা গেল অজস্র
রাস্তার ছেলে গাড়ির চারপাশে ভিড় করে
চেঁচাচ্ছে। কান খাড়া করে শুনলেন, তারা
তাঁকে হাত তুলে বলছে: বাবা, বাবা!

সঙ্গে ছিল অবনী আর সত্য। তারা
ধমক দিল—হতভাগারা, কে তোদের বাবা!

অজস্র ক্রন্দন কলম্বরে এবং আঙুল
তুলে বলল—ওই যে আমাদের বাবা! বাবা,
আমাদের পোষাক চাই। বাবা, আমাদের
লজেন্স কই? বাবা, এ্যাটর্নি আসো নি
কেন?

ন্যাংটা বছর পাঁচেকের মোহরা একটা
বাচ্চা গাড়ির পাদানীতে উঠে নাকে কেঁদে
বলল—বাবা, পরস দাও, বিস্কুট কিনে
খাবো?

হারামজাদার দল! কেমন শিখিয়ে
ঠেঁরি করেছিল দুখের বাচ্চাদের! এক
সেবছরই কাগজে বিবৃতি দিলেন—যারা
কিছু শিশুদেরও নির্বাচনের কাজে ব্যবহার
করে, তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

যা দেশের অবস্থা, এতদিনে শিশুরাও
রাজনীতিতে পরিপক হয়ে গেছে। সূতরাং
শরতেনারা ভালভাবেই জানে, তাদের আর
কাজে লাগানো অসম্ভব। সূতরাং অন্য
ধরনের কোন ষড়যন্ত্র.....

কিন্তু কাক.....নিতান্ত পাখি! পাখি
হলেও মরু-টিয়া-কাকাতুয়া নয়। যতই
বদ্বন্দ্বিতা হোক, মানুষের শেখানো কিছু
থলে না বা করে না। সমস্যাটা এখানেই।
হঠাৎ শিউরে উঠলেন দীনেশচন্দ্র।

...কেন? অধুনা বিজ্ঞানে অনেক
আপাত-অসম্ভব সম্ভব করে তুলছে।
এমনও তো হতে পারে, কোন ওরিনজো-
লজিস্ট কাকের ভাষা ও আচরণ আয়ত্ত
করে তাদের.....আরও চমক খেলল মাথায়।
কেন সম্ভব নয়?

দেখা যাচ্ছে, এই কাকগুলোর রঙ যত
এদেশীই হোক, এদেশী কাকের মত
গলী-বারুদে গ্যাসে ভর পায় না। কানে-
স্তারায় শব্দ গ্রাহ্য করে না...হুম, কানে-

স্তারায় শব্দ-গ্রাহ্য এদেশীই ব্যাপার। এ-
দেশের কাক এতে অবশ্য ভর পাবে না।
নিছিমিছিম পরাশর এ-বাবদ মোটা টাকা
খরচ করে বসল!

তাহলে দেখা যাচ্ছে.....কোন দেশের
কাক গলী, বারুদ, গ্যাসে ভর পায় না।
কোন দেশে অনবরত এদেশের পুজো-
পার্বণের মত গলী-গোলা-গ্যাস চলেছে?
কোথায় অবিস্মৃত যুদ্ধ হচ্ছে? ভিয়েত-
নাম? আরব-ইস্রায়েল সীমান্ত?...আরব
আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। সেখানে যুদ্ধমি
কিন্তর। কাক থাকে অসম্ভব। থাকলেও
সে কাক মধ্যবর্তী। আবহাওয়ার কাক।
আধুনিক অবস্থার উপযোগী হওয়া তাদের
পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি ইস্রায়েল?
আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মারাত্মক ভুল
অবশ্য ইস্রায়েল ব্যাপারে হয়েছে। কিন্তু
ইস্রায়েলী কাক এল কেন? পথো? ভারী
আমেরিকা?...আমেরিকা হাজার চটলেও
এ কর্মটি করবে না। কারণ, আমাদের
মিত্রতা সে যে কোনভাবে কামনা করে।
...নাঃ, পাকিস্তানী কাক নয়। পাকিস্তান
এখন শান্ত। তবে কি.....

নড়ে বসলেন দীনেশচন্দ্র। ইউরেকা!
হেরার ইউ আর মি: এর! লাফিয়ে
উঠলেন দীনেশচন্দ্র। ছুটে গিয়ে পরাশরের
খাঁটিতে রিঙ করলেন—হ্যালো পরাশর,
আমি বলাই।

- অবস্থা একই স্যার।
- শোনে, কাকগুলোর মত কি!
- ব্রেক কালো।
- পরশর, একটা কাক বরা বায় না!
- অসম্ভব স্যার।
- কেন অসম্ভব? জ্যান্ত কাক মর



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬০৮০

দলী ছুঁড়ে হোক বা ঢিল মেরে একটি
কাক আমার চাই।

—কি হবে স্যার? ঘোষণা দেওয়া
হয়ে গেছে। যেতে দিন।

—শাট আপ! যা বললুম, করো।

—দেখছি।

অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকলেন
দীনেশচন্দ্র। পুরো আধঘণ্টা পরে পরাশর
ব্রিঙ করল।

—হ্যালো, স্যার!

—কাক কই?

—পড়েছে। কিন্তু আনব কি করে?

—কেন? লম্বা বাঁশ দিয়ে টানো।

—চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কোথেকে
আরো কয়েকশো এসে তাড়া করল
আমাদের।

—অপদার্থ!

—সত্যি স্যার, অসম্ভব।

—মরা কাকটা কোথায় আছে?

—ট্রিপলের গারে আটকে আছে।

—ঠিক আছে। আর কিছুর করে না।

ফেটে ইট বি অলরাইট দেয়ার।

—ইয়েস স্যার।

সারা দিনটা পায়চারী করে কাটল।
লম্বা হল। সম্মা রাত্রি হল। রাত্রি গভীর
হল। গভীরতর হল। তখন দীনেশচন্দ্র
বের হলেন। পায় হেঁটে, অতি সাধারণ
বেশে, পকেটে টি নিয়ে চললেন। সেন্ট-
মন্ডের শিশিরবরা শান্ত রাত্রে দীনেশচন্দ্র
অকস্মাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ফারারিগেড যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন
চুপচাপ শরে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না
ভাস্কর অনিমেষের। তারা মুখোস ও
পোষাকে সারাদেহ ঢেকেও অগ্রসর হতে
পারে নি। কাকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়-
ছিল। শহরের সব কাক, শহরতলীর সব
কাক এবং শেষে গ্রামাঞ্চলের হাজার
হাজার কাক হানা দিচ্ছিল। কাকের
কিরল ঘণীসকুল সমুদ্র—সমুদ্র
নয়, ভরাবহ বন্যার চারপাশের অঞ্চলের
অধিবাসীরা ঘরে খিল-কপাট এঁটে দিয়ে-
ছিল। কেউ বেরতে পারছিল না।
মগরপ্রধানেরা বিশেষজ্ঞদের তারবার্তা পাঠা-
চ্ছিলেন। এমন কি বাইরের রাষ্ট্রও তার-
বার্তা পাঠানো হচ্ছিল। আসামের তৈলখানির
আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে রুশ
বিশেষজ্ঞদের কৌশলে। স্বভাবত রাশিয়ার
সবার আগে তারবার্তা গেল। মারীর মত
মন্ত্রণাক কাকপক্ষী সম্পর্কে তারা ছাড়া
আর কে অধিক জানে? কাক দলবদ্ধ
থাকে। দল, কিন্তু একটিমাত্র দল। কোন
উপদল নয়। এককথায় সব কাক সাড়া
দয় একসঙ্গে।

এবং এইসব কাকের তীক্ষ্ণ চন্দ্র
আঘাতে ফারারিগেডের লোকজন—যাদের
পোষাক ফুঁড়ে মাংস ও রক্ত বেরিয়ে এসে-
ছিল, তারা হাসপাতালে শূন্যে যখন স্বপ্নে
কাক দেখছে, অলৌকিক সেই সব কাক—
হ্যাঁটিতে যাদের ছায়া পড়ে না, অনিমেষ,
ক্রান্ত বিমূঢ় ভাস্কর অনিমেষ রায়, প্রতি-
মূর্তির বেনীতে হেলান দিয়ে, তখন ঘুমের
মধ্যে, অন্য একটা স্বপ্ন দেখল।

অজস্র, সংখ্যাতীত মৃত কাকের উপর
পা ফেলে সে হাঁটছে। কেবলই হাঁটছে,
কোথাও পালাতে চায়, অস্থির বিপন্ন
অনিমেষ, কেবলই লাফ দেবার চেষ্টা করে,
হেঁচট খায়, পিছিয়ে আসে, ফের লাফ
দেয়, ফের পড়ে যায়...শেষে দু'হাতে
মাথার চুল ছিঁড়তে থাকল। বেল্ট খসে
প্যাণ্ট খুলে পড়ল। জামাও ছিঁড়ে ফেলল।
ভারপর পুরো উলঙ্গ হয়ে কাকের শবের
উপর গড়াগড়ি খেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে,
কখনও মৃত কাক বৃকে চেপে সে কাঁদতে
থাকল। আর, কাকের স্বচ্ছ চোখে (কাক-
চন্দ্র দীঘির জল!) সে নিজের প্রতিবিম্ব
দেখল। অস্বাভাবিক, ভয়ানক, বিকৃত
ভার দেহ। নিজেকে চিনতে পারল না
অনিমেষ। সে সুন্দর শিল্পীজনোচিত
মনঃস্বাদেহ কোথায় গেল?...সে প্রচণ্ড
আতনাদ করে বলে উঠল—আমার সেই
শরীর কে চুরি করল? হা ঈশ্বর, আমি
দৈত্য নই, দানব নই। আমি মানব।
আমার মানব শরীর আমাকে ফিরিয়ে
দাও! সেই সময় অনিমেষ দেখল, কাকের
চোখের ভিতর, ভয়ানক বিশাল ব্যাপক
স্বচ্ছতম চোখের ভিতর, কে বা কী হেঁটে
আসছে!...একটি শিশু! উলঙ্গ শিশু!
না জানি এ কোন নদীর তীর, কোন গ্রাম্য
পথ, কোন রাঙাচিটাবেড়া ঘেরা উঠোন...
শিশু খেলা করতে করতে আসছে। তারপর
সে তাকে সামনে দেখে পাখির মত ঝিট
কুটে বলল—আমার পুতুলটা হারিয়ে
গেছে, দেখেছ?...কেমন পুতুল তোমার?...
রাঙা পুতুল, টুকটকে সুন্দর। ঠিক আমা-
রই মত দেখতে...বসো, অপেক্ষা কর।
তোমার পুতুল তৈরি করে দিচ্ছি।...
অনিমেষ তার ছোট বাটারি হাতুড়ি
খুঁজতে থাকল।...সোনা আমার, মাণিক
আমার, তোমার পুতুল গড়ে দিই। ঠিক—
অবিকল তুমি!

মুঠোর হাতুড়ি—অনিমেষের ঘুম
ভেঙে গেল। কোথায় শূন্যে আছে সে?
কর প্রতিমূর্তির পায়ের নিচে? মনে
পড়ে গেল সব। শব্দবস্ত্রে সে উঠে বসল।
ফাটা ট্রিপলের বাইরে রাত কত হল কে
জানে! ভিতরে আলো জ্বলে নি অন্য

মাতের মত। ক্যাম্পফাট ব্যালি বৃকে পড়ে
আছে। কেউ নেই, কোন লোক। কেবল
ফাটা ট্রিপলের ফাঁকে বাইরের আলোর
দেখল, একটা মরা কাক পড়ে আছে। হুটে
গিয়ে সে কাকটা তুলে ধরল। ছাদে দেয়ালে
চারপাশে হয়ত অজস্র ঘুমন্ত জীবিত
কাক। এই সুযোগ বেরিয়ে পড়ার। সে
কাকটা একবার দেখে নিয়ে রাখতে যাচ্ছিল।
হুঠাৎ শব্দ—ওটা আমাকে দাও।

—কে?

—আমি!

—আপনি এলেন?

—হ্যাঁ। কাকটা আমাকে দাও।

—কী হবে?

—ওটা নিয়ে যাবো।

—কেন বলুন তো?

—পরীক্ষা করে দেখব।

—কী দেখবেন?

—ওটা দেশী না বিদেশী?

—বেশ, নিন।

—তুমি এখানেই থাকবে নাকি?

—না!

—ঠিক আছে, চলে এস।

—বাইরে কাক এখনও আছে
দেখলেন?

—না তো! সব পালিয়েছে। শেখানো
ব্যাপার, কতক্ষণ চলতে পারে? বাই দি
বাই, কালই এটা খোলা হবে। তুমি থেকো।
আর দেখ, বিলের বাকী টাকটা কাল
সকালেই নিয়ে নিও। পরাশরকে বলে দেব।
গুড নাইট!

দীনেশচন্দ্র চলে গেলেন পকেটে
কাকটা নিয়ে। অনিমেষ তার ব্যাগটা
প্রতিমূর্তির পায়ের কাছ থেকে নিতে
গিয়ে হঠাৎ চমকাল। হেসে ফেলল। ক্রমশ
সে জোরে হা-হা-হা করে হাসতে থাকল
পাগলের মত। একটা মরা ইঁদুর পড়ে
আছে। হরারবল! একটা ইঁদুরের
জন্য.....

হাসতে হাসতে মরা ইঁদুরের গলায়
লম্বা দাড়ি বেঁধে—ঠিক মেডেল বা মালা
গঠনে, টুলে উঠে পরিণত দিল প্রতিমূর্তির
গলায়। তারপর জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে,
ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরল। হন হন করে
হাটতে থাকল। শহর ছাড়িয়ে শহরতলী
ছাড়িয়ে গ্রাম পেরিয়ে কোথাও যাবার মত
তীর হাটার ভগ্নী—অথচ কোথায় যাবে,
জানে না। স্বপ্নের শিশুর জন্য বৃষ্টি
তার যাত্রা।

এদিকে সকালে মরা ইঁদুরের মালা
পর্য্যাপ্ত প্রতিমূর্তির উন্মোচন করা হবে।
ঘুমন্ত শহরে রাত শেষ হয়ে আসছে।

বঙ্গবন্ধু ওদেশে মিলানি এক ওদেশে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দি লেশন (১৯৫০)

এ নাটকটি রূপস্বয় হয় ছোট রূপস্বয় থিয়েটার দ্য পেশ' ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সালে। একঘণ্টা ধরে শিক্ষাদান বিষয়ক এই নাটকটিতে এক বয়স্ক অধ্যাপক ব্যক্তিগত শিক্ষা দিতে থাকেন এক যুবতী ছাত্রীকে। শিক্ষার বিষয় বহুবিধ—ভূগোল, গণিত, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি। মূলত ভাষার সাহায্যে অর্থবোধ করানো যে প্রায় অসম্ভব একথা বোঝাবার প্রচেষ্টা হয়েছে এই উদাহরণটি দিয়ে—একজন ইটালীয়ান 'মাই কান্ট্রি' বললে বোঝাবে ইটালীকে। কিন্তু একজন ওরিয়েন্টাল ও কথা বললে ওরিয়েন্টকেই বোঝা যাবে—সুতরাং একই কথার কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে যেতে পারে।

ছাত্রীটি বোঝ করতে জানে—বিয়োগ করার অর্থ বোঝে না—আবার বড় বড় গুণ করে দিতে পারে। কারণ সে সমস্ত মার্টিপ্লিকেশন টেবলসগুলো মৃদুস্থ করে ফেলেছে। অথচ এদিকে আবার সে গুণতে জানে মাত্র বোল অবধি।

ভাষার দুর্বোধ্যতা ছাড়াও ভাষার আরও দিক আছে—এ কথাটাও 'দি লেশন' নাটকে দেখানো হয়েছে। ভাষা হচ্ছে শক্তির হাতিয়ার। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, যে ছাত্রীটিকে প্রথমে দেখা গিয়েছিল কোতুহলী, প্রাণবন্ত এবং সচকিত—

সে যেন ক্রমে ক্রমে প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। আর অধ্যাপক, যিনি প্রথমে ছিলেন নান্দাস এবং ভীড় স্বভাবের, ক্রমশ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং ক্ষমতা-প্রবণ হয়ে ওঠেন।

ছাত্রীটি শেষ পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে—তার অসহ্য দাঁত ব্যথা শুরু হয়। এই দাঁত ব্যথার ব্যাপারটার দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে :

(১) ছাত্রীটি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে

(২) তার আর ভাষাবোধ নেই

(৩) মনের উপর (অধ্যাপকের শিক্ষা দেওয়া ব্যাপারটি) দেহের (ছাত্রীর দাঁত-ব্যথা) আধিপত্য। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক ছুরিকাঘাতে ছাত্রীকে হত্যা করেন।

এক লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সমালোচক এ নাটকের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—ডিক্টেটররা যখন দেখেন যে জন-সাধারণের উপর তাদের আধিপত্য এবং প্রভাব কমে এসেছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের উপর তাঁরা মারাত্মক অত্যাচার শুরু করেন—কিন্তু এর ফলে তাঁদের নিজেদেরই ক্ষমতা কমে আসতে থাকে (P. A. Touchard, La Loi du Theatre, Cahiers des Saisons, No. 15)। এ যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে নাটকের

শেষে পাঁচচারকার অধ্যাপককে স্বাস্থ্য-হস্তবন্দনী দেওয়ার ব্যাপারটার।

এই নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে আমার বারবার আমাদের দেশের বিগত অর্থমূল্য হ্রাসের সমস্যাটার কথা মনে হচ্ছিল। ভারতবর্ষের বিখ্যাত তিন নেতা—শ্রীঅশোক মেহতা, শ্রীসুব্রাহ্মণিয়াম এবং শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী হঠাৎ ডলারের তুলনায় আমাদের টাকা মূল্য প্রায় সাতাশ পারসেন্ট কমিয়ে দিলেন। দেশের রাজ-নীতিক নেতারা চিরকাল দেশের প্রধান লোকশিক্ষক—আমাদের এই তিন লোক-শিক্ষক আমাদের উপদেশবাণী বর্ষণ করলেন যে এর ফলে দেশের বিদেশীয় রপ্তানির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে তাতে ভারতের বিদেশী অর্থ অভাবের পরিমাণ অত্যাশ্চর্যরূপে বেড়ে যাবে। আমরা জনসাধারণ—অর্থাৎ ছাত্রের দল, অর্থাৎ বাদ্যের ত্রেনে ধূসরবস্তুর পরিমাণ কম—ভেবে পেলাম না এটা কি করে সম্ভব। কারণ এই অর্থমূল্য হ্রাসের ফলে এরপর আগের তুলনায় দ্বিগুণের উপর রপ্তানির পরিমাণ বাড়তে পারলে তবেই আগে যা বিদেশী অর্থ অভাব করতাম তার সঙ্গে পার-এ আসা যাবে। তারও থেকে বেশি বিদেশী অর্থ অভাব করতে গেলে তিনগুণ চারগুণ রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধির দরকার। সেটা কি করে সম্ভব হবে আমরা মূর্খ দেশবাসী অর্থাৎ ছাত্রের দল তা না বুঝতে গেলে হতভম্ব হয়ে রইলাম—কিন্তু আমাদের পাতিত এই তিন নেতা জোরগলার বললেন—টাকার নাম এভাবে কমাতে দেশের রপ্তানি আমাদের তুলনায় এমন বৃদ্ধি পাবে যে বিদেশী অর্থ আমাদের কোষাগার একেবারে ফেঁপে উঠবে। অর্থমূল্য হ্রাসের সত্যিকার ফল আজ কি দাঁড়িয়েছে? জন-সাধারণ এ 'দি লেশন' নাটকের ছাত্রীর মত সবাই প্রায় মস্তশুলের ব্যথার ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়ে উঠেছে—দেশমাতৃকার নাতিশ্রবাস দেখা দিয়েছে।

'দি লেশনের' পর ১৯৫০-এর গ্রীষ্মকালে ইওনোস্কা 'জ্যাকস বা ওর্বিডিয়েনস' নামে আর একটি নাটক লিখলেন। বিশেষ ব্যক্তি কিভাবে সমষ্টির চাপে সমাজের মোড়াজালে আবদ্ধ হয় (এয় পেছনে যৌন জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকে) তাই দেখানো হয়েছে নাটকটিতে। অতীতে যে ছেলে ছিল যাবাবর জাতীয় সে শেষ পর্যন্ত বজ্রোয়া ক্রীড় গ্রহণ করে সংসারী হয়ে চলে গিয়ে বিয়ে করে।

'দি ফিউচার ইজ ইন এগস'—১৯৫১ সালে রচিত। এ নাটকে দেখানো হয়েছে যে কোন বিশেষ একজন মানুষ পৃথিবীর বিরুদ্ধে, রাশি রাশি বস্তুশিঙ এবং ক্রম-বর্ধমান মানুষের সংখ্যা দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে—আসলে প্রত্যেক মানুষই ভেতরে

ভেতরে একা—বহুজন সমাবেশ বা বিরাট সৃষ্টিবীর মাঝে সে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

দি চেয়ার্স (১৯৫১, এপ্রিল-জুন) একটি স্বীপে এক গোলাকৃতি টাওয়ারে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করে—স্বামীর বয়স ১৫, স্ত্রীর ১৪। পুরুষটি বোধ হয় ওখানকার ব্রক্ষীর কাজ করেন। বৃদ্ধ তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সে বিষয়ে আজ জীবনের অন্তিমে একটি বক্তৃতা করতে চান—বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এই বক্তৃতা শোনবার জন্য। দম্পতি নিমন্ত্রিতদের আসবার জন্য অপেক্ষা করছেন। বৃদ্ধ নিজে বক্তৃতা করতে পারেন না বলে একজন পেশাদার বক্তাকে তাঁর হয়ে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর বাণী সবার কাছে বলবার জন্য নিষ্পত্তি করেছেন। অবশেষে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন—দর্শকরা তাঁদের দেখতেও পায় না, তাঁদের কথাও শোনা যায় না। বৃদ্ধ দম্পতি কিন্তু এঁদের জন্য সার সার চেয়ার সাজিয়ে যাচ্ছেন। একতরফা তাঁদের মধ্যে বিনয়নম্রভাবে আলাপ-আলোচনাও করছেন। ক্রমশ এত লোকের ভিড় বাড়তে লাগল যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্ষে সহজভাবে নড়াচড়ার ব্যাপারটাও কষ্টকর হয়ে উঠল। এরপর ঘরে ঢুকলেন স্বয়ং সন্ন্যাসী—বক্তা এলে পরই কাজ শুরু হবে। এবার বক্তাও এলেন—তিনি কিন্তু অন্যদের মত অদৃশ্য ব্যক্তি নন, তাঁকে দর্শকরা সত্যি সত্যিই দেখতে পাবে। বৃদ্ধ এবার নিশ্চিন্ত হলেন যে তাঁর মেসেজ এবার সবাই জানতে পারবে—জানল্য দিলে তিনি স্বাধীন পড়লেন সমুদ্রের বৃকে মরবার জন্য—তাঁর স্ত্রীও তাঁর অনুসরণ করলেন। বক্তা চেয়ারে উপবিষ্ট অদৃশ্য অতিথিদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—কথা বলবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু বোঝা গেল তিনি কালা এবং বোঝা—তাঁর মুখ দিয়ে শুধু ‘ব্রক্ষ’ ‘ব্রক্ষ’ ‘আওয়ার’ হতে লাগল—এবার ব্রাকবোর্ডে কি লিখলেন—দেখা গেল যা লিখেছেন তা হচ্ছে অর্থশূন্য কৃতকগুলো, শব্দ এবং অক্ষর। জীবনের শূন্যতা এবং অর্থ-হীনতা মানুষকে কিভাবে পিষে মারে তারই একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এ নাটকে। লেখকের নিজের নাট্যিক জীবনের ব্যর্থতার একটা আভাসও পাওয়া যায়। খালি চেয়ারগুলো দেখে মনে হয় ইওনেস্কোর নাটকগুলো যখন লেফট ব্যাংক অভ সেইনের ছোট থিয়েটার-গুলোতে অভিনীত হত, প্রেক্ষাগৃহের চেয়ারগুলো ঠিক এইরকম খালি থাকতো—কারণ এ্যাবসার্ড থিয়েটার দেখতে জন-সমাগম হত না।

‘ভিকটিমস অভ ডিউটি’—এটি হচ্ছে



এত আগস্ট মাসে তোলা ইওনেস্কোর একটি ছবি

নাট্যকারদের জন্য লেখা নাটক—সমস্যা-মূলক নাটকের অনুকূল এবং প্রতিকূল যুক্তিগুলোর আলোচনা করেছেন ইওনেস্কা এই রচনাটিতে। তাঁর মতে প্রাচীন গ্রীস থেকে আধুনিককাল অবধি যত নাটক রচিত হয়েছে সবই হচ্ছে ধর্মীয়-শ্রেণীর। এভাবে খালি রিয়ালিস্টিক নাটকেই লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক রচনাতে একটি ডিটেকটিভ পাওয়া গেছে। প্রত্যেক প্লেতেই দেখা গেছে একটা অনুসন্ধানের প্রয়াস এবং তার সার্থক পরিণতি হয়েছে শেষটায়—অর্থাৎ প্রত্যেক নাটকেই দেখা দিয়েছে কোন না কোন সমস্যা যার সমাধান হয়েছে শেষ দৃশ্যে। ‘ভিকটিমস অভ ডিউটি’র নায়ক সুবের এক জামগার মন্তব্য করেছেন “ফ্রেঞ্চ ক্লাসিকাল ট্রাজেডী গুলোকেও সুক্কাশ্রেণীর গোয়েন্দা নাটক বলা চলে।”

এমিডি (১৯৫০)—এটি তিন অঙ্কের একটি চমকপ্রদ নাটক। মধ্যবয়স্ক এক

দম্পতিকে কথাবার্তা বলতে দেখা যায় একটি ঘরে—গেছনের আর একটি ঘরে বহু বছর ধরে একটি শব্দেই পড়ে রয়েছে—এর আকৃতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বোধ হয় এই দম্পতির ব্যর্থ বিবাহিত-জীবনের প্রতীক হিসাবেই দেখানো হয়েছে শব্দেটিকে।

The corpse might evoke the growing power of past mistakes or past guilt, perhaps the waning of love or the death of affection—some evil in any case that festers and grows worse with time.

দি নিউ টেনেন্ট : এ নাটকে সংলাপের অভাবটাই লক্ষ্য করবার মত। প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বস্তুপুঞ্জকে—বস্তুরাশি যে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। চরিত্র-চিত্রণ, সংঘাত; প্রট টেরি করা—এ সবকে

যেন ইচ্ছে করেই নাট্যকার বর্জন করেছেন। তবুও নাটকটিতে সাসপেন্স এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করার বস্তু আছে।

নাটকটির বক্তব্য কি? খালি ঘরটি আসবাবপত্র ভরে উঠেছে—প্রথমে ধীরে ধীরে। তারপর দ্রুতগতিতে—এর দ্বারা কি এই কথাই বোঝায় যে মানুষের জীবনটাও প্রথমে একেবারে খালি থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি দ্বারা তা কানায় কানায় ভরে ওঠে?

দ্বি পিকচার—অতি অদ্ভুত ধরণের নাটক। প্রথমেই দেখা যায় একজন মোটা খনী ভদ্রলোক এক শিল্পীর থেকে একটি ছবি কিনতে চান। ছবির দাম নিয়ে দু'জনে দরাদরি শুরু হয়। শিল্পী ক্রোতাক্ত বলেন দাম ঠিক করার আগে তিনি ছবিটা একবার দেখে নিন—কিন্তু মোটা ভদ্রলোক আগে দামের ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে চান। শিল্পী প্রথমে দাম হাকেন পাঁচ হাজার ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু ক্রোতাক্তির অন্তরে এতটুকু দরমামা নেই—শেষ পর্যন্ত সে বলে চারশ ফ্র্যাঙ্কে রাজী হলে সে ছবিটা কিনতে পারে। এইবার ব্যবসায়ী ক্রোতাক্তি ছবিটির দিকে নজর দেয়—ছবিটি হচ্ছে একজন রাণীর। ক্রোতাক্তি এরপর এমন বিশ্রীভাবে ছবির সমালোচনা আরম্ভ করেন, যে শিল্পী তাঁকে সানুনয়ে অনুরোধ জানান বিনা পরিসায় ছবিটি নিয়ে যেতে—এমন কি ছবিটি তাঁর কাছে রাখবার জন্যে শিল্পী মোটা ভদ্রলোককে একটা ফী দিতে রাজী হন।

এরপর এসে হাজির হন মোটা ভদ্রলোকের বংশা কুৎসিত বোনটি—জাই বোনের সঙ্গে অত্যন্ত রুদ্ধ ব্যবহার করেন। কিন্তু শিল্পীর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত বদলে যায়। ভদ্রা এ্যালিস উগ্রমতি ধারণ করেন এবং মোটা ভদ্রলোক স্কুলের দুর্বল স্বভাবের ছাত্রের মত হয়ে পড়েন। বোন এবার চলে যান—একক অবস্থায় মোটা ভদ্রলোক সৌন্দর্য-পিয়াসীতে পরিণত হন এবং ছবিটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন। আবার বোন আসেন—ভদ্রলোক আবার দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন—বোনকে একটি বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গুলী করেন। গুলী লেগে বোন কিন্তু মারা যান না—সুন্দর ছবিটির মত তিনিও একটি সুন্দর নারীতে রূপান্তরিত হন। প্রতিবেশী আর একজন কুৎসিত বংশা নারী এসে অনুরোধ করেন তাকেও গুলী করে সুন্দরী নারীতে পরিবর্তিত করতে। ভদ্রলোক আবার গুলী করেন এবং এই মহিলা পরিবর্তিত হন সুন্দরী রাজকুমারীতে। এবার শিল্পী ফিরে আসেন—তার পেটন যে অত্যাচার আক্রমণের

সাহায্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তার সৃষ্টি করেন এবং নিজের গুলীর আঘাতে প্রিন্স চার্মিং-এ পরিণত হন। মোটা ভদ্রলোকটি ঘরটির ভেতর আলো কয়েকবার গুলী ছোঁড়েন এবং ঘরটি পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণে রূপান্তরিত হয়।

এর পর মোটা ভদ্রলোকটি, যিনি তখন পর্যন্ত আগের মতই কুৎসিত এবং মোটা দেখতে রয়েছেন, দর্শকের কাছে আবেদন জানান তাঁকে গুলী করতে। এইখানেই নাটকের শেষ।

ইওনেস্কা নিজে এই নাটকটিকে পাণ্ডা এন্ড জুডি প্লের স্রোতীতে ফেলেছেন (পাণ্ডা এন্ড জুডি প্লে হচ্ছে এক ধরণের প্যাপেট শো—১৮০০ সালে এর প্রথম উৎপত্তি)। নাটকটির সত্যিকার বক্তব্য কি বোঝা দুস্কর? মানসিক নীচতা, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা এবং এসবকে ছাপিয়ে উঠে শিল্পের সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করা—এই জাতীয় একটা অর্থ কেউ কেউ করেছেন বটে, তবে এ ধরণের ভাবার্থও ঠিক মত নাটকের সঙ্গে খাপ খায় না।

‘মাইনোসেরসের’ আলোচনা করে ইওনেস্কা পূর্ব শেষ করবো এবং তার পরে ধরবো স্যামুয়েল বেকেক্টের নাটক-গল্প। কিন্তু আগে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নাট্য সমালোচক কেনেথ টাইনান যে অভিনব ধরণে ইওনেস্কার ‘এমিডি’ নাটকটির রিভিউ করেছেন তার কিছুটা আভাস দিচ্ছি :

“জেমস এ্যাগেট বলতেন অনেক ভাল নাটকই দোতলা বাড়ির মত—গ্রাউন্ড ফ্লোরটা হচ্ছে রিয়ালিজমের, আর ফার্স্ট ফ্লোরটা সিম্পলিজমের। এম ইওনেস্কা ‘এমিডি’ নাটকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন—তাঁর নাটকটি হচ্ছে ফার্সিক্যাল এ্যাট স্ট্রীট লেভেল এবং উপরতলার ট্রাজিক।

Amedee is a perfect example of this unique architectural audacity.

গ্রাউন্ড ফ্লোরে এক ভয়াবহ প্রহসন অনুষ্ঠিত হচ্ছে—এক বিবাহিত দম্পতি এক অনন্য সাধারণ সমস্যা নিয়ে বাতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অপর একটি ঘরে একটি শবদেহ পড়ে রয়েছে। দম্পতি স্মরণ করতে পারছেন না কি করে দেহটি ওখানে এল—কে তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু এটি ওখানে থাকাতে সন্দিগ্ধ ১৫ বছর এঁরা ঘরের বাইরে যেতে পারেন না। লিভিং রুমের এক কোণে এমিডি বসে রয়েছেন এবং একটি নাটক রচনা করছেন—(average annual output : one-word)। অপর কোথায় তাঁর স্ত্রী তার স্বপ্নে চিত্রকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে

বলতে টেলিফোনের সুইচ বোর্ডে কান্না করছেন। এর মধ্যে শোবার ঘরে অবস্থিত শবদেহটি বাড়তে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেয়ালগুলোতে বিবাক্ত ব্যক্তির চামড়া ভরে গেছে।

উপরে তলার অর্থাৎ নাটকের সাংস্কৃতিক স্তরে উঠলে দেখা যায়—কাহিনীতে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে বুজোঁয়া বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার পরিণতি এইভাবে হয়। কিন্তু শবদেহটি আসলে কি?

What has died is the creative spark that was the real Amedee, and the tragedy is that he doesn't know it. In the love-less hot house of his marriage the dead tissue has flowered into a cancerous life of its own, which eventually destroys him. Only as he dies does he realize that the corpse in the bedroom was himself.”

[কথনয়]

নতুন!
‘ইকনমি প্যাকে’
টিনোপাল



তাছাড়া ‘এক বালতির এক প্যাকেট’
এবং ‘রেঙুলার প্যাক’

সর্বাধিক শুভতার জন্য টিনোপাল

মুহমদ গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

Regt 31/67 BN

বঙ্গভঙ্গ

বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয় না কেন

বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার দাবি দীর্ঘদিনের। গত বার-তের বছর মাঝে চলচ্চিত্র-কর্মী, বাংলা ছবির প্রযোজক ও চলচ্চিত্র-দর্শকরা এই দাবি করে আসছেন। বাংলা ছবির সংকট শুরুর হবার সময়ে এই দাবি উঠেছিল। অনেক স্মারকপত্র, সভা-সমিতির প্রস্তাব ইত্যাদিতে রাইটস-এ ফাইল মোটা হয়ে উঠেছে। যখন এই দাবি তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন রাজ্য সরকার কখনো চলচ্চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে, কখনো চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই দাবি ধামাচাপা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ছয়-সাত বছর আগে বিধানসভায় এই দাবির ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছিল। তখন সরকারের বিরোধী দলের শ্রীগণেশ ঘোষ এই দাবি উত্থাপন করে চলচ্চিত্র সংকট সমাধানের কথা বলেছিলেন। সেদিন বিধানসভায় দর্শক-রূপে আমি উপস্থিত ছিলাম। মনে পড়েছে বিরোধী পক্ষের বক্তব্যের পরে তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীমতী গুরবী মুনাজী এবং কয়েকজন সদস্য (যাদের বিদ্যা-বৃষ্টির জন্য খ্যাতি আছে) লবিতে এসে বক্তাকে হ্যান্ডসেক করে অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন।

তার পরে দেশে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। সেদিনের বিরোধী পক্ষ আজ সরকার পক্ষ। কিছু কাজ করার সুযোগ তাঁদের হাতে এসেছে। বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে না পারলে সে না পারার কারণ কি তা জনসাধারণকে জানিয়ে আসল বাধা চিনিয়ে দেবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু গত ছয়-সাত মাসের মধ্যে তার কোনটাই হয় নি। রাজ্যের চলচ্চিত্র-কর্মী ও শিল্পীদের পক্ষ থেকে (সংযুক্ত সংসদ) এক প্রতিনিধিদল মধ্যমন্ত্রীসহ সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদলে নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রা জগতের বিশিষ্ট লোকেরা ছিলেন। প্রতিনিধিদল অন্যান্য দাবির সংগে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে জন্মত তের সপ্তাহ বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার দাবি পুনর্ব্যবহার করেছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় মধ্য-মন্ত্রীর সংগে আরো মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন; এবং রাইটস-এর বাইরে অপেক্ষা করছিলেন কয়েক শত সংস্কৃতিকর্মী। যারা আশা করেছিলেন মধ্যমন্ত্রী নিজে এসে তাঁদের সংগে কথা বলবেন, বক্তৃকণ্ঠ গঠনের জন্য সংস্কৃতিকর্মীদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাবেন। কিন্তু মন্ত্রীরা কেউ আসেন নি। মধ্যমন্ত্রী বলেছিলেন স্মারকপত্র রেখে যান বিবেচনা করে দেখুন। মধ্যমন্ত্রীকে বলা হয়েছিল—বার্ষিকে বম্বী ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। যদিও বম্বী ছবি সংখ্যায় এবং গুণগত দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা সে ছবি না দেখিয়ে পারে না। আরব রাষ্ট্রগুলিও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমন কি পাকিস্তানের মত দেশেও পাকিস্তানী ছবি অগ্রাধিকার পায়। আমাদের দেশেই কেবল বাংলা ছবি নিজের দেশে বিদেশী হয়ে রয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হিন্দী ছবির অগ্রাধিকার চলছে। হিন্দী ছবির প্রযোজকদের আর্থিক ক্ষতি বহুগুণ বেশি, সুতরাং হাউস গ্যারান্টি, শোপন জর্থ, অগ্রিম দান ইত্যাদি নানা দুর্নীতির পথে তারা প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের বাধ্য করে হিন্দী ছবি দেখাতে। এইভাবে কলকাতায় আজ বাংলা ছবির রিলিজ-চেন বা প্রথম প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কমাতে কমতে এমন অবস্থায় এসেছে যে, যে সামান্য কমিটি বাংলা ছবি প্রতিষ্ঠা করে তাও হতে পারছে না। বহু প্রযোজক এই দুর্নীতির শিকার হয়ে পথে বসছেন। ধর্মাবলম্বী বলে করে ছবি নির্মাণ করে শেষ পর্যন্ত হুন্ডি কেটে, ছবি বন্ধক রেখে রিভাইভে বাড়ি ফিরছেন। এই কারণে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে স্বাধীন প্রযোজকসংস্থা গড়ে উঠতে পারছে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আশা করা হয়েছিল—বাংলা ছবির ব্যাপারটা তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে কিছু বাধা নিশ্চয় আছে; সব থেকে বড় বাধা একপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের। কিন্তু জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের স্বার্থ অপেক্ষা এই বাধাকে কি বড় হতে দেওয়া উচিত? তের সপ্তাহ বাংলা ছবি প্রদর্শনে যদি প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা লোকসান হবে মনে করেন, তিন সপ্তাহ করতে আশ্রয় কোথায়? আরো কস সময়ের জন্য বাধ্যতা থাকলেও বাংলা ছবির চাহিদা অতে বৃদ্ধি পাবে; এবং বাংলা দেশে বসে বাস করে বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করার সুযোগ কারো থাকবে না। —সুজন।



সাবিত্রী

চিত্রশ্রমালোচনা

স্মিপিং বিউটি

বিশ্বায় ও আনন্দেভরা রূপকথার জগতের প্রতি ছোট-বড়ো সকলের আকর্ষণ রয়েছে। তবে ছোটদের প্রবেশাধিকার এ-রাজ্যে সবার আগে; বড়োরা তাকে রক্ষাব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের ঠাকুরমার ঝুলির সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শে দৈত্যপুত্রীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙার গল্প কোন্ শিশুকে আনন্দের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে না যায়? দৈত্যপুত্রী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার চড়ে আভ্যানে যাবার সময় শিশুদের মনও ছুটে চলে রাজপুত্রের সংগে। জগতের সবদেশের রূপকথার গল্পগুলি প্রায় একসুরে বাঁধা। সোঁতিলেই রাশিয়ার এক রূপকথার নাম স্মিপিং বিউটি। এই রূপকথার রাজকন্যা আরো দৃষ্ট পরীর কোপে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল যোগ বছর। তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল লাইলাক পরী।

যোল বছর পরে যখন সে যুবতী তখন কত দেশের কত রাজপুত্র এল তাকে বিয়ে করার বাসনা নিয়ে, কিন্তু কেউ তার মন পেল না। এমন এক উৎসবের দিনে আবার হাজির হল সেই দুষ্ট পরী; এক বড়ির ছন্দবেশে। আরোকে সে এক কুলের তোড়া উপহার দিল, যাতে লুকনো ছিল বিষাক্ত ছুরি। আরো অহত হয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচলেও গভীর ঘূমে অচেতন হয়ে রইল। এই সঙ্গে রাজপুত্রীর সবাই ঘূমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, রাজকন্যার পাণি-প্রার্থী রাজপুত্ররাও যে-যেখানে ছিল ঘূমে অচেতন হয়ে রইল। আনন্দময় রাজপুত্রী আরোরার সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যপুত্রীতে পরিণত হল।



সোভিয়েত বয়লে ফিল্ম 'স্টিপিং বিউটি-তে লাইলাক পরীর ভূমিকায় সুদশনী নৃত্যশিল্পী ইরিনা বাকেনোভা

অনেক বছর পরে সু-পারিষদ এক রাজপুত্র এল বনে মৃগয়া উৎসবে। ভাল পরী লাইলাকের সহায়তায় রাজপুত্র ডিজারার দেখতে পেল রাজকন্যার প্রতিচ্ছবি। প্রথমদর্শনেই সে অভিভূত হয়ে পড়ল, এবং রাজকন্যাকে উল্কারে জন্ম লাইলাক পরীর নৌকায় করে রাজপুত্রীর দিকে রওনা হল। রাজপুত্রীতে যাবার পথে দুষ্ট পরীর সমস্ত বাধা অপসারণ করে রাজপুত্র ঘুমন্ত রাজকন্যাকে চুম্বন করল। দুষ্ট পরীরা ধ্বংস হল, ঘুমন্ত রাজপুত্রীর সবাই জেগে উঠল, আবার আনন্দ উৎসব শুরু হল যেমন শতাব্দী পূর্বে হচ্ছিল। এমন কি পাণি-প্রার্থী রাজপুত্ররাও তর্ক করছিল, কিন্তু রাজকন্যা আরোরা তাকেই ভালবেসেছে যে তার ঘুম ভাঙিয়েছে।

এই রূপকথা অবলম্বনে রচিত

সোভিয়েতের বিখ্যাত ব্যালে নাচ 'স্টিপিং বিউটি'র চিত্ররূপ এই ছবি। এই ব্যালে রচনা করেছেন জগন্নিবখ্যাত সুদার পি, আই, চাইকোভস্কি। নাচের অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে আশ্চর্যমধুর সংগীত এই ব্যালেকে পরম উপভোগ্য করেছে। নাচে আর সংগীতে দর্শকদের সামনে এমন এক রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করে, যেখানে স্বর্গীয় আনন্দ, সাহস, বীর্য ও ভালো-বাসার জীবন পূর্ণ। সোভিয়েত ব্যালের ধর্মাত জগৎময়; দেশ-বিদেশের মানুষ সোভিয়েতে যায় ব্যালে দেখার বাসনা নিয়ে। এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যালে পর্দায় দেখতে পাওয়া কল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। এই

ব্যালেকে মধুরতায় ভরে তুলেছে চাইকোভস্কির সংগীত। সংগীত এই নৃত্যনাট্যের প্রাণসঞ্চার করেছে; প্রাণভরে এই সংগীত শোনার মত। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ বিস্ময়কর সংগীত না থাকলে নৃত্যনাট্যটিতে এত প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যেত না।

ব্যালে নাচের সৌন্দর্য অর্জননীয়। মনে হয় চোখের সামনে পালকের মত হালকা দেহগুলি লঘুহলে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। আনন্দময় রাজসভা, মানুষের সন্তোষ, দুষ্ট পরীর পদক্ষেপে কড়ো হাওয়া, লাইলাক পরীর প্রতিরোধ দৃঢ়তা, আরোরার নাচের মধ্যে রূপকথার রূপ-গুলির চরিত্র এবং রাজপুত্র ডিজারারের পবিত্র ভালবাসা ও বীর্য নাচগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নাচ দেখতে দেখতে মনে হয় সত্যিই ওরা রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যা। রাজকন্যা আরোরারপে আলো সাইবোভার নৃত্যসুন্দর হালকা দেহের ভঙ্গী অপূর্ণ মাদকতা জাগিয়ে তোলে। এই সঙ্গে রাজপুত্র ডিজারারের চরিত্রে ইয়ুরি সলোভিনের গৌরব, প্রেম ও নিষ্ঠুরতার জাগিয়ে তোলে অশ্রুত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা। ভালো পরী লাইলাকের ভূমিকায় দেহ-লালিত্যে পরিপূর্ণ ইরিনা বাকেনোভা স্নেহ-মমতা ও মণ্ডলময় শক্তিকে মূর্ত করে তুলেছে। দুষ্ট পরীরপে নাটালিয়া ডুভিনাস্কায়া ঝড়ো হাওয়ার মত অশ্রুত শক্তিকে প্রকাশ করেছে, যার পদক্ষেপে শঙ্কা জাগায়। রাজা ও রাণীরপে সেভোলভ উখোভ এবং ওলগা বাবোৎকিনা অপত্যস্নেহ এবং সকল মানুষের প্রতি দরদ প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলি ভরাট করে তুলেছে রূপকথার রাজ্যের পরিবেশ। যনের ছায়াময় পরিবেশ, রাজপ্রাসাদের জটিলত্ব, দুষ্ট পরীর অলৌকিক জগৎ সৃষ্টিতে



এডুকেশনয়াল ফিল্মস ক্লাবের প্রথম ছবি 'রূপকথার সুবচনী' ছবিতে শিশু-শিল্পী শিখিনা মত।



জয়দীপ পিকচার্সের 'ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও পাহাড়ী সান্যাল।

শিল্প-নির্দেশকের কৃতিত্বে ছবিটি বিস্ময় জাগায়। রূপে, রসে, ছন্দে ও সঙ্গীতে 'স্মিপিং বিউটি' এক দুর্লভদর্শন ব্যালে নাচের ছবি। যা সব বয়সের মানুষ এক-সঙ্গে বসে উপভোগ করতে পারে।

এনোলিনারি ডুডকো এবং কনস্টান-টিন সার্গিয়েভ পরিচালিত এই ছবিটি এলিট সিনেমায় মূল্য লাভ করেছে। নৃত্য, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রসিক দর্শকদের ছবিটি দর্শনীয়, কিশোর-কিশোরীরা ছবিটি দেখে আনন্দ পাবে।

কথা। আবার সময় সময় কল্পনা-রাজ্য থেকে তার মন বাস্তবে নেমে এসেছে।

কল্পনাপ্রবণ এই শিশুর চিন্তা-মুহূর্তের মধ্যে কিছুটা রূপকের প্রবেশ ঘটেছে, এবং শিশুর চিন্তার মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বের আকাংক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

পরিচালকগোষ্ঠী নবাগত, এবং যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে ছবিটি করেছেন। বিস্ময়কর ফটোগ্রাফি ও সম্পাদনা কৃতিত্বে ছবিটি প্রশংসনীয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর

দিক থেকে জটিল হয়ে উঠেছে। শিশুদের সরল চিন্তার বা প্রকাশ হতে পারত তাকে অতিবাস্তব করতে গিয়ে কৃত্রিমতায় বিরস করা হয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে শৃংখলবন্ধ হাতী ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য প্রশংসনীয়।

ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ করেছেন যথাক্রমে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভি বালসারা কৃত সঙ্গীতের কাজ ছবির মূড়কে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে।

এডুকেশনাল ফিল্ম ক্লাবের এটি প্রথম ছবি। শিক্ষামূলক ছবি করার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন গঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা ভবিষ্যতে শিক্ষামূলক আরো ছবি করতে ইচ্ছা রাখেন। বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশে শিক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রে এ যাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নি, সুতরাং এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য।

নাটকের কথা

নয়াদিল্লীতে নাটক প্রতিযোগিতা

নিউ দিল্লী বিনয় নগর বেঙ্গলী ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এবারও নাটক প্রতিযোগিতা হয়েছে। এবার ছয়টি পূর্ণাঙ্গ নাটক

রুণকির সুবচনী

এডুকেশনাল ফিল্ম ক্লাব নামক সংস্থা শিশু মনস্তত্ত্বের উপর দৃ-রীলের একটি ছবি করেছেন। 'সৌভিক' গোষ্ঠী ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন।

চিড়িরাখানাকে কেন্দ্র করে এক কল্পনা-প্রবণ শিশুর চিন্তারাজ্যকে ছবিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এক এক জন্তু-জানোয়ার দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে মূর্ত্ত জীবনের চিন্তা। মূর্ত্ত বিহগের জীবনের সঙ্গে সে ভেবেছে মোমার, বিমানের বারুদের ধোঁয়ার আচ্ছন্ন জগৎ। বন্দী বন্যজন্তুদের দেখে তার মনে উদয় হয়েছে তাদের মূর্ত্ত বন্যজীবনের



বিজয় বসু পরিচালিত 'আরোগ্য নিকেতন' ছবিতে রবি ঘোষ

প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে শচীন ভট্টাচার্যের 'সন্ধ্যার মৃত্যু'।

মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে এই নটক। এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতার তাকে এক নতুন চেতনার উপলব্ধি ঘটে। নাটকের দলগত অভিনয় এবং ব্যক্তিগত অভিনয় প্রশংসনীয়। অভিনয় করেছেন : ফণী রায়, প্রভাস মুখার্জী, তিলক চক্রবর্তী, নিয়তি দত্ত, ইরা মুখার্জী, জনক বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, শিশির কস, সুবোধ পাল, রাখাল আচার্য, অশোক ভড়, অমল ভট্টাচার্য, প্রসন্ন খান্নাজী, মাণিক মুখার্জী।

সোনাই মাধব পালা

নৃত্যশিল্পী অসিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা ও পরিচালনায় মৈমনসিংহ গীতিকার 'সোনাই মাধব পালা' নৃত্যনাট্য রূপে নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কলকাতার মৃত্ত অঙ্গনে মণ্ডস্থ হবে। এই নৃত্যনাট্যের নাট্যরূপ লিখেছেন ভাস্কর কস; সংগীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দীনেন চৌধুরী; এবং আবহ সংগীত রচনা করছেন দীনেশ চন্দ্র।

সুটি ও শব্দ

বিদ্যারামের কান

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবসারামের কাব্য' ছবির সহিদৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে পুরুর সমগ্রায়ণকালে। চিত্রগ্রহণের জন্য পরিচালক নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিশাল ভৌমিক, মাধবী মুখার্জী, অজমা ভৌমিক, অনন্ডা গুপ্তা, বসন্ত চৌধুরী, কানক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে পুরুর গিয়েছিলেন। শিমুলতলার ছবির আরো কিছু দৃশ্য তোলা হবে।

উভয় অধ্যায়

এসএফ ফিল্মসের গীতন অধ্যায় ছবির চিত্র গ্রহণ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শৈলেন

অমিয়ূর প্রথম নারী-বিপ্লবী
ত্রিমিতী মাতিদার

অমিয়ূর

[বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ]

II নৃত্য গ্রন্থ টীকা II

বিপ্লবী-বাংলার আদি-কবিতা ডাঃ বাসুদেবপাল মুখার্জী :

"বিষয়বস্তু রোমাঞ্চকর অথচ প্রকৃত—একদম বাস্তব। মল্লার জগৎ পরিপাটি, অনভিযোগ্য। ভাষা চমৎকার। ঘটনা সমিগতের কারণে অতি সুন্দর। প্রকৃত ব্যাপার পড়ছি কি রূপ-কথা পড়ছি ভ্রম হয়ে যায়।"

সমালোচনা-সাহিত্যের সব্যসাচী নজনীকান্ত দাস :

"ইতিহাস অধিকন্তু কবি লেখিকার শিল্পমনের ভিন্নানে হয়ে উঠেছে মনোহারী কাব্য।"

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় :

"জীবনময় প্রকাশ মাধুর্য়ে বইখানি ইতিকথার গম্ভীর অতিরিক্ত করে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।"

কবি-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় :

"এক নিশ্বাসে বইটি পড়িয়া ফেলিলাম। চমৎকার লেখা। প্রাণের যে দুর্বীর গতিবেগে একদিন লেখিকা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে বাঁপ দিয়াছিলেন, সেই গতিবেগে এই বইটির হয়ে হয়ে জীবন-স্পন্দনের মত ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে।"

রবীন্দ্রচরিত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় :

"বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের কথা বাদ দিলেও নিছক সাহিত্যিক রচনা হিসাবে পুস্তকখানি অনবদ্যরূপে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।"

কোট কথাসিংশী মনোজ বসু :

"অরুণ-বহি' পড়তে পড়তে ভাবি সেই অশ্লীলকন্য়ার মধ্যে এতখানি সাহিত্য-শক্তি নিহিত ছিল! কানিকায় জীবনাবসান হলে এ-বস্তু প্রকাশ পেত না। ভাষা অক্ষর, সুন্দর ও স্নেহময়, বর্ণনা সংযত। 'অরুণ-বহি' বিপ্লবকালের কোন এক বিশেষ বিবরণ মাত্র নয়, বিপ্লবীচিন্তের আশ্চর্য উন্মাদনে রীতিমত সাহিত্যিকর্ম হয়ে উঠেছে।"

বেঙ্গল—

"অরুণ-বহি' বিপ্লব যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস নহে। ইহা পূর্ণাঙ্গ আত্ম-জীবনীও নহে। যে নারী একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা তাহারই জীবনের অংশ-বিশেষের চিত্র-রূপায়ণ। এই চিত্রে আতিশয়া নাই, আত্মপ্রচারের চেষ্টা নাই, চমক লাগাইবার দুর্বলি নাই। ইহাই এই রূপায়ণের সৌন্দর্য।"

বিপ্লবী জীবনের এমন সহজ সুন্দর ও স্বচ্ছ বর্ণনা সচরাচর চোখে পড়ে না।"

বিদ্যারামের বাগান—

"বইখানির মধ্যে যে সব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে তাহার ফাঁকে ফাঁকে যেন একটি শূন্য পরিধি অথচ দৃঢ় হৃদয়ের মাধুর্য়ে খেলা করিয়া ফিরিতেছে। লেখার ভঙ্গী চমৎকার, হৃদয়বেশের প্রকাশ সংযত এবং অধিকাংশ স্থলে বিস্তারের অপেক্ষা সৌভাগ্য এবং ইলিটাই বেশি কার্যকরী হইয়াছে।"

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিনির্নবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'তিন অধ্যায়' ছবির একটি দৃশ্যে অজয় গাঙ্গুলী, বাব্বু ঘোষ, জহর রায়, অনুপকুমার।

দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী, গোপেন মল্লিক সংগীত পরি-

চালনা করেছেন। অভিনয়ে আছেন: উত্তম-কুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, জহর রায়, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, সীতা মুখার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, সুপর্ণা প্রমুখ।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার বিঘ্নমাবলী

	ট. প.
বার্ষিক টাকা (সডাক)	১৪-০০
মাসিক " "	৭-০০
ত্রৈমাসিক " "	০-৬০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না।
গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা
জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে
হবে। —কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার বিঘ্নমাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে
যে অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা
সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন।
লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ
আমরাই বখাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম
ঠিকানা সহ ডাকটিকিটসহ খাম থাকলে
একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার
চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো
সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

অন্যদিক

শ্যামা নৃত্যনাট্য

গত ২২শে অক্টোবর পার্ক সার্কাস
বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটির
ব্যবস্থাপনায় পার্ক সার্কাস ময়দানে পূজা-
মণ্ডপে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
পরিচালনায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনর্দিত
হয়।

পাপড়ি রোসের 'কথাক', কৃষ্ণা রায়ের
'ভরতনাট্যম', কৃষ্ণা হাঙ্গারের ও নীলেন্দ্র-
নাথের 'ভারতবর্ষের কথ' সূচরিতা ঘোষ,
মানসী ঘোষ, রত্নাবলী ঘোষ, গীতা
মজুমদারের 'কথাকলি বিশ্বপ্রণাম', মহা-
ভৌমিক, শেলী দাস, শত্রু গাঙ্গুলী,
মীতা হোপের 'রাজস্থানী লোকনৃত্য',
শিপ্রা সেন ও মীতা পালের 'পুতুল বিয়ে',
'নৃত্যনাট্য' উমা দত্ত, কানাই মজুমদার,
অনুপশঙ্কর, সূতপা দত্ত, যথাক্রমে—
শ্যামা, বহুসেন, কোটাল ও উত্তীরের
ভূমিকায় দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন
করেন। সংগীত পরিচালনা করেন বিপ্লব
ঘোষ।



ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে শ্যামা ও উত্তীর



শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্তের 'ইতিহাসের উপাদান' রচনাটির পরিপ্রেক্ষিতে লেখা আমার 'স্বিতীয়' (১৫-৬-৬৭ সাঃ বঙ্গমতীতে প্রকাশিত) পত্রের জবাবে মণিবাবুর তৃতীয় পত্রটি পড়লাম। আলোচনা সূর্য হয়েছিল ভূপেনবাবুর লেখা 'ইতিহাসের উপাদান' সভাই ইতিহাসের উপাদান কি না, কামাখ্যাবাবুর এই সন্দেহ থেকে। কামাখ্যাবাবুর নিবন্ধে এবং পরে আর যা লেখা হয়েছে তার জবাব দিতে আমার কাছে লেখা চিঠিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভূপেনবাবু, কারণ অনেক কথাই বিবেচ্য প্রসূত। মণিবাবু অবশ্য সে কথা প্রথমে অস্বীকার করেন কিন্তু তার ২৭-৭-৬৭ এর সাঃ বঙ্গমতীর চিঠিতে শেষে ৬ এবং ৭ নম্বর বক্তব্যের ৫টি প্যারাগ্রাফে খোলাখুলিই কথা তুলেছেন কোন দল বা ব্যক্তি কি করেছেন এবং তাও খুব শান্ত সংযতভাবে তোলেন নাই। বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন দলের লোক যদি এভাবে পরস্পরের কার্যকলাপ নিয়ে কথা কাটাকাটি সূর্য করেন তাহলে বিবোপাশ্রয় আনবার্হ। ভূপেনবাবু কথা কাটাকাটির মধ্যে যান নাই, সে হিসাবে ভাবার অশোভনতা এক তরফা। কেবল ভূপেনবাবু যেখানে অপরের কথা Quote করেছেন (উদ্ধৃতি দিয়েছেন) সেখানকার কথা ভিন্ন।

মণিবাবুর এই পত্রটি পড়ে মনে হল ভূপেনবাবুর উপর তাঁদের কিছু পুরোনো রাগ আছে। রাগ বা রিবেস থাকলে আমরা ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাব না। মণিবাবু তার চিঠির শেষের প্যারাগ্রাফে লিখেছেন যে সূভাষচন্দ্রকে যারা চিনতে পেরেছিলেন সেই ১৯২৮ সাল থেকে এবং যারা পারেন নি (অবশ্যই তাঁদের মধ্যে ভূপেনবাবু হবেন) তাঁদের মধ্যে প্রথম দলের অকৃত প্রশংসা এবং স্বিতীয় দলের উপর এক হাত নিরেছেন। ইতিহাসে দেশ সূভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রথম থেকেই তাঁদের সর্গো যোগাযোগ তাঁদের মধ্যে যুগান্তরগোষ্ঠীভূত লোকই বেশি। এ বিষয়ে 'বিপ্লবী' শ্রীঅনন্ত সিংহের "সূভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা" প্রবন্ধে (সাঃ বঙ্গমতী ২৬-১-৬৭) দেখি ১৯২০ সালে "বলা বাহুল্য বাংলা কংগ্রেসে যুগান্তর পার্টি দেশবন্দু ও সূভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলত। ১৯২৪ সালে সূভাষচন্দ্র কলকাতা কংগ্রেসের Chief Executive Officer নির্বাচিত হন। মধ্যাহ্ন যুগান্তরখ্যাত বিপ্লবীদের সাহায্যে। আবার ১৯২৫-এ ঘটনামোহন ও সূভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের বিরোধে—"বলা বাহুল্য যুগান্তর পার্টির অন্যান্য নেতারা তাঁদের গ্রুপ প্রাধান্য বজায় রেখেও সূভাষকে সমর্থন করে চলে-

ছিলেন। তাদের মধ্যে ভূপেনদা ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মোটেই ঘনিষ্ঠ ছিল না।" এ প্রবন্ধেই অনন্তবাবু যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছেন যে, ১৯২৮-৩০ সালেও যুগান্তর দলই সূভাষচন্দ্রের বড় সমর্থক। এই সময় ঘটনামোহনের সমর্থক ছিলেন অনুশীলন দল। আবার চট্টগ্রাম অগ্নিগার লুণ্ঠনের গলাতক কর্মীদের আগ্রয় ব্যবস্থাদি করেছেন এই যুগান্তর দল।

১৯৩১-৪০ সালে যেমন ভূপেনবাবুরা সূভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন সমর্থন করেন নি, উত্তর ভারতেও এই সময় বিপ্লবী যোগেশ চাট্টোজী (অনুশীলন) প্রমুখ নেতারা সূভাষের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন নি। এমন কি পঞ্চ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও বেতে পারেন নি। (In Search of Freedom by Jogesh Ch. Chatterjee (1967)

পৃঃ ৫২০-৫৩০)। কিন্তু এর জন্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় মণিবাবু বা কামাখ্যাবাবুর চেয়ে কম বিপ্লবী এ কথা বলা চলে কি? ১৯৪২-৪৪ ১৪৫ এ যারা আগস্ট বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ভিতর বহু যুগান্তর কর্মী ও নেতা ছিলেন যেমন ছিলেন অন্যান্য জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কর্মীরা একথা ঐতিহাসিক সত্য (অবশ্য তখন সবাই কংগ্রেসকর্মী—যুগান্তর দল ১৯৩৮ সালে ভেঙে দেওয়া হয়)। সূভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাতে গিয়ে যারা কংগ্রেসের গণভিত্তিক নেতৃত্বকে স্বীকার করতে রাজী হন নি তারা সকলেই বিপ্লব-বিরোধী ছিলেন একথা বলার অর্থ সত্যের অপলাপ করা।

মণিবাবু বা কামাখ্যাবাবু ভূপেনবাবুর উপর রাগ করে ১৯৩৯-এর পরে ১৯৪২-৪৪ ১৪৫ সালে ভারতের ভিতর নিরস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের জাগ্রত রূপটি দেখতে রাজী নন বলেই মনে হচ্ছে। নতুবা ১৯৪২-এ বিহার সেফ্টারিয়েটে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য একের পর এক নিরস্ত্র বিপ্লবীর আত্মদানের ইতিহাস অস্বীকার করতে পারতেন না। যে মার্টিনডম স্কুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশের মধ্যে দেখেছেন সেই একই মার্টিনডম দেখতে পেতেন অনামী এই

নিরস্ত্র বিপ্লবীদের ভিতর, মাতাঙ্গিনী হাজরা, শচীন মিত্র, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামেশ্বরের ভিতর। জন-আধারিত বিপ্লবের প্রকৃষ্ট রূপটি ধরা পড়ত যদি মণিবাবুরা প্রকৃত বিপ্লবী মন নিয়ে শ্রদ্ধামাত্র Action নয়, এই গণ-অভ্যুত্থানের Motive spirit-ও দেখবার চেষ্টা করতেন। সূভাষচন্দ্রের মধ্যে বিরাট বৈপ্লবিক নেতৃত্বের আবিষ্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু তাতে সমকালীন ইতিহাস ধরা পড়ে না। শ্রীঅনন্ত সিংহ এবং আরও অনেক সক্রিয় বিপ্লবীই এ কথাই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, সূভাষচন্দ্রকে তৎকালীন বহু বিপ্লবীরাই ঘনিষ্ঠভাবে জানার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাঁরাও বিপ্লব-দোলানে যথোপযুক্ত স্থান অধিকার করে ছিলেন।

ইতিহাসের গতিপথে মাঝে মাঝে ২।১ জন অসাধারণ পুরুষের দেখা মেলে। দৃষ্টান্তের কারণ ঘটে তখনই যখন এই বৈপ্লবিক নেতৃত্ব-বিকাশের পশ্চাৎপট বিচার না করে কথা বলা হয়। সূভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব-বিকাশের পশ্চাৎপটে দেশবন্দু ও তৎকালীন বিপ্লবীগোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতার কথা ভুলে-চলে না, এবং নিঃসন্দেহে দেশবন্দু স্বরাজ্য পার্টি গড়ার আগে ১৯২১ সাল থেকেই বাংলার যে বিপ্লবীগোষ্ঠীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন সেই গোষ্ঠী যুগান্তর নামেই খ্যাত ছিল। ১৯১৪ ১৫ সাল থেকে ১৯২৮ ২৯ পর্যন্ত সূভাষচন্দ্রকে অন্তরঙ্গভাবে জানার দাবিও ভূপেন দত্ত অন্যায়সে করতে পারেন; আর ইতিহাসও তাই-ই বলে। আমরা ১৯৬৭ সালে নিশ্চয়ই অনুশীলন, বি-ভি, শ্রীসম্ম, যুগান্তর বা অন্যান্য বিপ্লবী দল বা গোষ্ঠীর কীর্তিকাহিনী, কর্মপ্রচেষ্টা, তার ফলাফল, ইতিহাসের কণ্ঠ পাথরেই বিচার করব, শ্রদ্ধামাত্র উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হব না। রুশীর বিপ্লবের ইতিহাসে ১৯১৭। ১৮ সাল কোন একটি একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এর পশ্চাৎপট রচনায় নিহিলিস্ট, নারোদানক প্রভৃতি দল, মাইকেল বাকুনীন, হারজেন, পিসারেভ, পিটার লাভরভ, প্লেখানভ, বুখারীন ইত্যাদির দান গ্রন্থার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। লেনিনের মস্ত বা বিরাট প্রকাশ করতে গিয়ে যদি লেনিনের পূর্বসূরীদের বা সমকালীন পটভূমিকার কথা অস্বীকার করি, সেটা আর যাই হোক ইতিহাস হবে না। তেমনি আগস্ট বিপ্লবের ভারতে গান্ধী বা সূভাষের স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে যেন মাঠা না হরাই। যে কোন একজনের বিরুদ্ধে যুগান্তর প্রকাশ করতে গিয়ে যেন ঐতিহাসিক মূল্যায়নে ভুল না হয়।

ইতিহাসের উপাদান বলতে যদি

একমাত্র Direct evidence বোঝাত তাহলে বোধ হয় প্রীতুপেন্দ্রকিশোর রায়ের "সবার অলঙ্কার" মত "সুন্দর গ্রন্থটিতেও কামাখ্যাবাবু ইতিহাসের উপাদান কম পাবেন। কারণ রক্ষিত মহাশয়, যে সব রিপোর্টের উপর নির্ভর করেছেন সেগুলির সবই Historical Documentation-এর পর্যায়ে পড়ে না। অথচ বাংলা তথা ভারতে বিপ্লবান্দোলন চলেছে অতি সংগোপনে, সুদীর্ঘকাল ধরে। ঐ ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে গেলে জীবিত ষাঁরা এখনও আছেন, যাঁরা দলসাহসিক এ্যাকশনগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছেন, অথবা পারদর্শন্য তৈরি করেছেন বা গুরু cell-গুলির নেতৃত্ব নিয়েছেন, তাঁদের স্মারাই সম্ভব। তাঁদের স্মৃতিচরন, এখানে-ওখানে হাড়িরে থাকা টুকরো টুকরো বিবরণীগুলি—আমাদের একমাত্র না হলেও অন্যতম সম্বল বা ভরসা।

ইতিহাস কাকে বলব? এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Beneditto Croce-এর মতটি উদ্ধৃত করলে অনায়াস হবে না। কারণ আধুনিক যুগে ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মতটিই সর্বজনগ্রন্থ। ক্রোশে বলেন—

"History, consists essentially in seeing the past through the eyes of the present and in the light of its problems, and that the main work of the Historian is not to record but to evaluate" (B. Croce in "History The Story of Liberty" (1941). Page 19).

ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাবে সেই সব বিবৃতি বা বিবরণীতে যা কেবলমাত্র কতকগুলি এ্যাকশনের তথ্য পরিবেশন করা ছাড়াও আরও কিছু জানায়। ইতিহাস: ঘটনার, ঘাত-প্রতিঘাত, ছাড়াও আরও বেশি কিছু। ঐতিহাসিক বিবরণী শুধুমাত্র তথ্যপঞ্জী নয়, শুধু ঘটনা সংঘাতের কুশীলবদের জীবনীমাত্র নয়। ঐ বিবরণীতে যেমন তথ্য থাকবে তেমন থাকবে কার্যকারণ সম্বন্ধ। ইতিহাসে ঘটনা স্বতন্ত্রানি মূল্যবান; ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ, পশ্চাৎভূমিকা এবং সমকালীন পরিস্থিতি গঠনে তার অবদান কতখানি, সে বিচারও ততখানিই মূল্যবান। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে ভূপেনবাবুর ইতিহাসের উপাদান স্মৃতিচরন হলেও তার থেকে সমকালীন বিপ্লবান্দোলনের একটি রূপরেখা পাওয়া যাবে। শুধু স্বর্গত প্রবেশ সত্যভূষণ গুপ্তের উদ্ধৃতি দেখিয়ে

সমস্ত লেখাটিকে অনৈতিহাসিক বলাটাই দাম্ভিকতার পরিচয়।

মণিবাবু তাঁর পয়ে ২ নম্বর বক্তব্যে লিখেছেন—“স্বতীয় বিশ্বব্দ্য না ঘটাইয়া ...বিশ্বগুলি কিছুতেই রাত্ৰমুহুর্ত হইতে পারিত না।” অর্থ কি? কে বিশ্বব্দ্য ঘটিয়েছে? Objective Condition যদি তৈরি না হয় দেশের বা দেশের কারও রাত্ৰমুহুর্ত ঘটে কি? “আজাদ হিন্দ ফৌজের চরম আঘাত” যে ভারতের মুক্তিতে কাজ করে, নাই এ কথা কে বলেছে? স্বতীয় বিশ্বব্দ্য, তখন উপস্থিত না হলে “মহাশ্মার আন্দোলনের অবদান” এবং “আজাদ হিন্দ ফৌজের চরম আঘাত” এর কোনটার জন্যই objective condition সৃষ্টি হত না। সমস্ত পরি-স্থিতির পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছে ১৯২১ সাল থেকে গান্ধীজীর জন-আধারিত আন্দোলনের অবদান। এবং সেই অবদান হচ্ছে গোটা জাতির ভিতর, বিপ্লবী মনোভার সৃষ্টি করা, জাতীয় আত্মসম্মান-বোধকে স্ফূর্তিত করা। তারপর স্বতীয় বিশ্বব্দ্য, তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ। এই পরস্পর এবং এই পরস্পর-নির্ভর কার্যকারণগুলির প্রকৃত মূল্যায়ন উপেক্ষা করলে ষড়্ধি বা দাঁড়ায় তাকে আমাদের ছড়ায় বলে, “আগে ইলাম আমি, পিছে হল মা, হাসছে হাসতে দাদ, হল, বাবা হল না।”

৪নং বক্তব্যের স্বতীয় প্যারায় মণিবাবু কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছ করেছেন। “রুশীয় গণ্যাজল ছিটারার” কথা নয়। ভূপেনবাবুরা যখন জেলে (১৯৪১—৪৬) তখন বাংলা কংগ্রেসকে ঐ Democratic solution of partition demand খোজার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ইত্যাদি যে সব চিঠি পাঠিয়েছিলেন (১৯৪৬।৪৭ সালে ঐ সব চিঠির কয়েকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়) তার একখানি পত্র পাই—

“ভারতীয় রাজনীতিতে আজও উচ্চস্বার্থ ও মধ্যস্বার্থের প্রাবল্য এতখানি রয়েছে যে, Reformist point of view-কে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস এখনও উপেক্ষা করে উঠতে পারছেন না। মধ্য এশিয়াতে অবশ্য এর ব্যতিক্রম কিছু হয় নি। ইব্রাহিম ও আনোয়ারের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়ার পর যখন প্রাবনের বান ডাকল তার মধ্যে উচ্চস্বার্থের লোকের সাথ মধ্যস্বার্থের লোকেরা, এমন কি ছুতপূর্ব বিপ্লববাদীরাও সব সরে গেল, বিপ্লবের বিপক্ষে গেল।

“...অখণ্ড বঙ্গ রাবার উপায় কি? দুটো উপায় ভাবতে পারো। একটার

দৃষ্টান্ত...বর্তমান গান্ধী-জঙ্গ। আলোচনা। আর একটা উপায় আছে, সে সংগীনি। এর কথা ভাবছেন হিন্দু মহাসভা মনো-ভাবাপন্ন প্রায় সকল দল; সকল রাজনীতিক—যদিও একথা ভাবছেন না যে, দু-চারটা ভেসিলা মিলিটারি প্রুজ করে একটা জাতের বিরাট একটা অংশকে সংগীনি দিয়ে আটকে রাখবার কথা ভুলবার দিন এসেছে, বিশেষ করে পোলাণ্ড; চেকো-স্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের ইতিহাসের জীবন্ত পাতা দেখবার পর্ব। এ ছাড়া যারা আজ গান্ধীজীর আপোষ চেষ্টায় আপসি করছেন—তাঁদের মনে রয়েছে ইংরেজের সংগীনি। সেই সংগীনি আমাদের এক করে রাখুক, আমাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে রাখুক তাতে গোটা জাতের কপালে যা থাকে হোক। সেখানে তিনি (গান্ধীজী) বরং পাকিস্তান বেছে নেবেন তবু ইংরেজের সংগীনের আওতায় অখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইবেন না। গান্ধীজী সেখানে বলছেন—

“Should partition become the fashion, either we shall have partition or partitions rather than foreign rule.”

এই দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের বা পরবর্তী যুগেরও কোন বা কয়টি রাজনৈতিক দলের ছিল জানা নাই।

ঐ প্যারায় মণিবাবু বলছেন, “অপর-পক্ষে কাক্সাকিস্তান বা উত্তরোত্তর প্রভৃতি দুর্বল আঞ্চলিক নেতৃত্ব থাকার দরুই নাকি লেনিনের পক্ষে ঐ সূত্র দেওয়ার বিপদ হয় নাই—দেশগুলি U.S.S.R. এর বাইরে যায় নাই। বোধ হয় মণিবাবু ভুলে যাচ্ছেন যে, সেদিন সমস্ত মধ্য মুসলমানদের বিশেষ করে ঐ সব উপজাতিদের মধ্যে “বাসমচি” বলে আমাদের পিছাভীদের মডই বহুলোক ও মলকে সুবিধায় প্যান-ইসলাম নেতা এনভার বা আনোয়ার পাশা কিভাবে সংগঠিত করে তুলেছিলেন। আর তাদের পিছনে ছিল সম্মিলিত মিশ্রশক্তি সুসজ্জিত সৈন্যদল—ইরাক, সেনাপতি ইবারতন ও White Russian সামরিক নেতা দ্যভের নেতৃত্ব। কিন্তু ঐ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশক্তিকে নষ্ট করে দেয় লেনিনের গণতান্ত্রিক সূত্রঃ

It is for the majority to stress separation, it is for the minority to stress unity.

এই সূত্রের প্রচারক ছিল উৎসাহী রুশীয় কম্যুনিষ্ট কমিউনিস্ট। আর আমাদের দেশে কি হয়েছে? এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরোত্তর জের দিয়েছে অখণ্ডের উপর; তাতে সংখ্যালঘু উত্তরোত্তর ক্ষিপ্ত হয়েছে আর জের দিয়েছে

বিচ্ছিন্নতার উপর। ফল যা হবার তা হচ্ছে। ইংরাজ এই মনোভাবের সুযোগ নিয়েছে চিরদিনই, কেনই বা নেবে না?

এই লেখকের গত প্রবন্ধেই ছিল ভারত বিভাগের প্রশ্ন বহন ওঠে তখন ভূপেনবাবুরা জেলে। সুতরাং Democratic solution of Partition demand-এর কথা জনসাধারণের কাছে বলার সুযোগ তাঁদের ছিল না। ইতিমধ্যে যা হবার হয়ে গিয়েছে। গান্ধীজীকে তাঁদের এ মত জানানোর প্রয়োজনও হয় নি। Cripps প্রস্তাবের পর ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি গান্ধীজীর মসাবিদা। তাতে তাঁর মতটি সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

“The Working Committee can not think in terms of compelling the people of any territorial unit to remain in an Indian Union against their declared and established will.”

এই প্রস্তাবে আরও স্পষ্ট করেই বলা হয় দেশের কোন contiguous (একত্রে লাগালাগ) area-র অধিবাসীরা চাইলে তারা পুরো Sovereign independent State (সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র) গড়তে পারবে। কিন্তু অমূলক নেতারা দেশ বিভাগের বিরোধিতা করেন নাই একথা যারা আজও মনে করেন, তাঁদের মতে গায়ের জোরেই এই বিভাগ ঠেকানো যেতো। এই রকমের গায়ের জোরে বিন্ধাসীরাই এক মাসের ভিতর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নাকচ করে এলাহাবাদে বাবু জগৎ নারায়ণ লালের প্রস্তাব পাশ করিয়ে মুসলিম লীগেরই শক্তি প্রবল করে তোলেন।

ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন হয়, মণি-বাবু লিখছেন। সেই সময়কার Forward Bloc সাপ্তাহিকের প্রায় সব কয়টি সংখ্যাই আমার কাছে আছে। সাপ্তাহিকটি আশল ভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির মুখপত্র। এই পত্রিকার আন্দোলনের যে বিবরণী পাই তাতে দেখা যায় এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে নি। অন্তত এই পত্রিকার প্রকাশিত খবরগুলি এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা বা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদগুলি থেকে যেতদূর আমার জানা আছে) এ প্রমাণ পাই না। বাংলা দেশেও এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। প্রমথ শরৎবাবুর Sovereign Bengal প্রচেষ্টা মূলত শরৎচন্দ্র-সত্য বঙ্গী ইত্যাদির Socialist Republican Party-রই পরিকল্পনা। যত দূর স্মরণ হয় এই পরিকল্পনা সে সময় গণ-সমর্থন

পায় নি এমন কি বাংলাদেশেও, যাদও উদানীন্দন মুখামশ্রী সুরাবাদী সাহেবও এই পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন। বরং এই সময় সম্ভবত প্রমথ শ্যামাপ্রসাদের ইচ্ছাতে A.I.C.C. কার্যালয়ে পূর্ব বাংলা থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) চিঠি এসেছিল বঙ্গীয় হিন্দুদের জন্য Hindu Homeland-এর দাবিতে।

মণিবাবুর পত্রের ৬ এবং ৭ নং বক্তব্যের ৫টি প্যারাগ্রাফে শব্দ-অহেতুক বিম্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। দুটি পূর্ণ ভাষা বা দাম্ভিকতার দোষে ভূপেনবাবু দোষী নন। অপরের মতের কথা যেখানে যেখানে Quote করা হয়েছে সেইখানেই হয়েছে বিপদ। ভূপেনবাবু নিজে কাকেও নাবালক কবেন নি বা কাকেও কুপাপাত মনে করেন নি। উক্তিগুলি বাদে, মতামতও তাঁদেরই নিজস্ব। ভূপেনবাবু কাকেও কুচক্রী আখ্যা দেন নি; তবে মণিবাবুর মতে যদি ও টুপি কারও মাথার মাপ-মাক্ষিক হয়ে যায়, ভূপেনবাবু নাচার। দেখে শুনে মনে হয় এ বেন সেই বাইবেলের গল্প—হাতখানা এসোর বটে কঠম্বরটি জোসেফের।

মণিবাবু বৃন্দ, খৃষ্ট, চৈতন্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলেছেন অহিংস-বিপ্লবের কথায়। এই মহাপুরুষদের মেনে নিতে আপত্তি কেন থাকবে? কিন্তু অহিংসকে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এ নিজের পৃথিবীর ইতিহাসে গান্ধী ছাড়া আর কোথাও নাই। আবদুল গফ্ফার খাঁ কিন্তু গান্ধীর রাজনৈতিক চেলা। মণিবাবু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গোলমান করেছেন। অহিংস বা সঁহিংস কোন বিপ্লব ব্যতিক্রমকেও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে কারণ process of decolonisation সূর্য হয়েছিল ১৯৪৫-এর আগে থেকেই।

আমি বলছিলাম রাষ্ট্রবিপ্লব শব্দটি আজকের দিনে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়

পাদে উনিবিংশ শতাব্দীর মম ও ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে ব্যবহার করা চলে না বা উচিত নয়। আজ Palace Revolution বা Military Coup-কে রাষ্ট্রবিপ্লব সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কারণ বিপ্লবের বর্তমান লক্ষ্য শব্দমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা নয় আরও বড়—Devolution of Power to Common men.

মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে এসেছেন মণিবাবু নতুবা দেখতেন আমার ১৬-২-৬৭ সাঃ বঙ্গমতীতে প্রকাশিত পত্রে কোথাও “রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা”র কথা লেখা হয় নি। বলছিলাম “জন-আধারিত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিশেষ বিশেষ স্তরে অস্ত্রের প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।” আমাকে লেখা ভূপেনবাবুর পত্রের মূল বক্তব্যও তাই ছিল। “শব্দ অহিংস বিপ্লবের” কথা কোথাও বলা হয় নি। ভূপেনবাবুর চিঠিতে ছিল (১৬-২-৬৭ সাঃ বঙ্গমতী) ভারতের সত্যগ্রহ আন্দোলন আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে জাতীয় আত্মসম্মান বোধ জাগিয়েছে। বিপ্লবের সূচী এখানে। অস্ত্রের ব্যবহার যা দেখা গিয়েছে সেটাই যুগধর্ম যা এসেছে Dialectics এর Interpenetration of opposites থেকে। ইতিহাসে কোন কাম্য বা অকাম্য বস্তুই ইহাৎ এসে থেমে যায় না। জেমো-কেনিয়াটার আন্দোলন ও মাও-মাও আন্দোলন এক নয়। ভারতেও যেমন গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন মিশে গেছে।

মণিবাবু সম্ভবত ইতিহাস বলতে ঘটনা-সম্ভাব্য মাত্রই বোঝেন (Episodes or actions)। পৃথিবীর কোন দেশেই কোন মহৎ সংগ্রামই প্রথম থেকেই সশস্ত্র রূপ ধারণ করে নি। পৃথিবীর যেসব দেশে বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা হয়েছে, পূর্ব-সুদুরী সর্বক্ষেত্রেই নিরস্ত। ফরাসী বিপ্লব থেকে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত একই ইতিহাস। এই যে নিরস্ত মননশীল মানুসগুলি তিলে তিলে ক্ষেপ প্রস্তুত করে যান—Encyclo-

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং

কারিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শৌ রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ০৪-০১৭০

০, রাধামোহন পাল রোড, কলি-১২।

অফিস-ফোন-০৪-৪৮৪৬

paedists, Voltaire, Russean, টেনিসন, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, এরা কেউ সশস্ত্র আকর্ষণে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু জনমানসে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন এরাই। বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাসে এদের অবদান অনস্বীকার্য নয় কি? আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয় আত্মসম্মান বোধ জাগাল ভারতের যে গণ-আন্দোলন (যার টেকনিক ছিল সত্যগ্রহ—এইটাই বোধ হয় পার্থক্য), যা না ঘটলে কিছই হয় না কোন দেশে, সেই আন্দোলন বা টেকনিকের প্রগতি বা ভারতবর্ষে সেই টেকনিকের প্রয়োগের কোন অবদান নেই? একদেশদর্শিতা আর কাকে বলে? “যার জন্য রামের মা তাকেই তেমরা চিনলে না”—পাড়ার গল্পে কথা। ভারতে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহের গণ-আন্দোলনে পরিণত লাভেরও ইতিহাস আছে যেমন আছে সশস্ত্র বিপ্লবের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস। কান্দীরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে বা সেই ১৮৯০ সাল থেকেই শ্রম আন্দোলন ফোঁজ গঠনে পরিণত তেমন চম্পারণ থেকে শ্রম ক্রমশ ব্যাপ্তির শ্রম সত্যগ্রহের—তারপর বারদোলী, কান্দি, মহিষা-দল (মোদীনাপুর), ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৪২ সালে আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত (অবশ্যই দুটি থাকতে পারে)। ভারতের গণ-অভ্যুত্থানে নিরস্ত্র বিপ্লবীদের অবদানকে ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে না।

মণিবাবু তাঁর তিন নম্বর বক্তব্যে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পয়ে অভ্যুত্থান ছিল ভূপেনবাবুরা পাকিস্তানে কিছই করেন নি। আমি তার উত্তরে আমার ১৫।৬।৬৭ সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুতে প্রকাশিত পত্রের ৫ম প্যারায় বলেছিলাম ভারত বিভাগের পর মৃত্যুভয়হীন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীরাও দলে দলে দেশ ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের খ্যাতিনামা নেতাদেরও অধিকাংশই দেশত্যাগ করেছেন। মুদ্রিমেঘ বারী ছিলেন তাঁরা সংগঠনহীন, কর্মীবাহীন নিরস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী কয়েকজন এম-পি, এম-এল-এ—সুতরাং ভূপেনবাবুদের মত কয়েকজনের পক্ষে দেশভাগের পর সর্বনাশা অবস্থায় কোন বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে যখন আশুতল গফুর খানের খুদাই খিদমতগারের একজনও পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করেন নি। সুতরাং আমার বক্তব্য ছিল উভয়ের মধ্যে তুলনা যুক্তিহীন। আমার প্রশ্ন ছিল মুসলিম লীগের ফ্যাসি টেকনিকের সঙ্গে লড়াইতে সশস্ত্র বিপ্লবীরাই বা দিশাহারার মত চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? এবং মণিবাবুকে বঙ্গবন্ধুত্বকে এই অবস্থার

কার্যকারণ বিশ্লেষণের জন্য কলঙ্কাক্রান্ত করেছিলেন। তিন আমার মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে লিখেছেন, “আশুতল গফুর খানের মত বৈপ্লবিক রোল.....ভূপেন-বাবুরা লইতে পারেন নাই বলিয়া ইহা বোঝায় না যে, তাহারা অদ্যাবধি পাকিস্তানেই পড়িয়া থাকিবেন।” মণিবাবু আমার বক্তব্যের মূল সূত্রটিকে একটি প্যাঁচ মেরেছেন, অর্থবিবৃতি ঘটেছে। কোন গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী একটি মৌলিক প্রশ্নকে এভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন না। পাকিস্তান যখন একবার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি একমাত্র তার ভেতর থেকেই চলতে পারে। সেখান থেকে সরে এসে নয়। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে ভূপেনবাবু পাকিস্তান ছেড়েছেন। এখানে পূর্বে বা পরে ভূপেনবাবু কি করেছেন বা করেন নি সেইটুকু দেখিয়েই বাংলার পূর্বাঞ্চলে যেসব গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসীর জন্ম তাঁরা তাঁদের বিবেককে বুঝ দিতে পারেন না। শ্রম, এইটুকু নয়, আমি আরও গভীরে যেতে চাই ভারত বিভাগ প্রশ্নটির। ঐ সময় সশস্ত্র গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক দলগুলি একক বা সম্মিলিতভাবেও ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের ফ্যাসিবাদী কর্মপন্থাটিকে বাধা দিতে পারেন নি। বরং সমকালীন ইতিহাসের পাতা থেকে প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে, বাংলা তথা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীরা আগ্রাসী ফ্যাসি রণকৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মতই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি ইদানীংকালের গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীর কাছে বিরাট মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার আর একটি চিহ্ন দেখুন নোয়াখালিতে গান্ধী। জাতি না কামাখ্যাবাদ বা মণিবাবুরা বিপ্লবের ইতিহাসে এই নোয়াখালি পরিক্রমার কোন মূল্যায়ন করেছেন কিনা। নিরস্ত্র, জন-আধারিত গণ-বিপ্লবে বিশ্বাসীর চোখে এই পরিক্রমাটি একটি Master Programme in action. বিপ্লবীর চোখে ইতিহাসকে দেখলে এ ছবি স্পষ্ট হবে। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা (অনেক খ্যাতিনামা অহিংস কর্মীও এই দলে) দলে দলে দেশ ছাড়তে চলেছেন, অন্যদিকে এক নিরস্ত্র বিপ্লবী দূরসাহসের সঙ্গে চললেন সেই এলাকায় যেখানে ফ্যাসি কর্মকৌশলের সবচেয়ে নমনপ্রকাশ ঘটেছিল। ভূপেন দত্তকে ধন্যবাদ, অখনোদুপ ইংরাজী সাপ্তাহিক Forward-এ সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই পরিক্রমাটিকে নিরস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর অনবদ্য রচনা A Lonely Trek-এ। মুসলিম লীগের

ফ্যাসিবাদের শিকার পূর্বে বাংলার মানুষ যখন Dehumanised, যখন চারিপাশে হত্যাশার কাল মেঘ, যখন সশস্ত্র বিপ্লবী ও জননেতারা দিশাহারা; ঠিক সেই সময় প্রকৃত বিপ্লবীর বা কাজ—গণতান্ত্রিক শক্তিকে বাঁচানর কাজ—সেই কাজের দায়িত্ব ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ নিরস্ত্র বিপ্লবী পালন করেছেন পরম নিষ্ঠাভরে। বৈষ্ণবীয় পাদ-পরিক্রমা আর এই পরিক্রমা এক নয়। ইদানীংকালে জন-আধারিত বিপ্লবের কীর-মাণ গণতন্ত্রশক্তির দীপশিখাটিকে প্রস্ফু-লিত রাখবার এর চেয়ে বড় পরীক্ষা কেউ করেছেন বলে জানা নেই, অন্তত ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। Dehumanised humanity-র মধ্যে মানুষের পুনরু-জীবনের কাজ ছিল গান্ধীজীর, কারণ গণতন্ত্রের বীজ থাকে ওইই মধ্যে। মুস-লিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের টেকনিকটি যে নিঃসন্দেহে ফ্যাসিপন্থী ছিল আশা করি মণিবাবুরা সে কথা স্বীকার করবেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মুচ গোড়ামি সমকালীন ইতিহাসের সর্বাধিক জীবন্ত পৃষ্ঠাকে বুদ্ধিতে অস্বীকার করেছে। ফ্যাসিবাদ যে শ্রম ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়েই আসবে তা নয়; সশস্ত্র বিপ্লবের নামেও এক ধরণের ফ্যাসিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় ইতিহাসে তার নজির আছে। Rape of the Masses শ্রম যে হিটলারের জার্মানীতেই হয় তা নয়। Social Democrats-রা যে সশস্ত্র প্রচেষ্টাতেও ফ্যাসিবাদকে ঠেকাতে পারেন নি ১৯১৮ থেকে ১৯২৬-এর জার্মানীতে, পরে পোল্যান্ডে, চেকো-স্লোভাকিয়ায়, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বড় বেদনাদায়ক সে ব্যর্থতার ইতিহাস। ভারতবর্ষের আকাশেও হয়ত বা সেই কাল মেঘ দেখা দিবেছে। ভারতের বিপ্লবী গণতন্ত্রী এ বিপদ সর্বশেষে কতখানি অবহিত জানি না। সুচিন্তিত কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এর সাথে মোকাবিলা করার কোন প্রস্তুতি আছে, এ প্রমাণ আশ্রয় পাই নি। বরং প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে, ইচ্ছার বা অনিচ্ছায় ভারতীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রশক্তি আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের খপ্পরে পড়তে চলেছেন। যখন সচেতনতা আসবে তখন হয়ত দেখা যাবে ১৯৪৬-এর মতই ভারতের সমাজ-বাদী গণতন্ত্রী অসহায়। সেটা হবে চরম দুর্ভাগ্য। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৭-গণায় অনেক জল গাড়িয়ে গেছে। বিপ্লবীদের কাছে বিনীত প্রার্থনা, আসুন পরস্পরকে দোষারোপ না করে আত্মবিশ্লেষণ করুন। পথ তখনই পাওয়া যাবে।

—সবীর মুখোপাধ্যায়
গান্ধী গ্রন্থাগার
গেট বাঁশবাড়িয়া (হুগলী)।

মহাশূর জাতীয় ফুটবল বিজয়ী

ভারতীয় ফুটবলের পাঠস্থান বলতে এখনও কলকাতা মহানগরকে বোঝায়! ভারতীয় ফুটবল দল তাঁরই হর কলকাতা মহানগরের খেলোয়াড় নিয়েই; এখানে ফুটবল ভারতের হৃদয়ভূমি। কিন্তু অতীতের গৌরবকে ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে, ভেতর যে একেবারে ফাঁশা হয়ে গেছে; একথা বুঝতে বাংলার ফুটবলের কর্তা-ব্যক্তিদের এত দৌর কেন হয় বুঝি না।

১৯৬২ সালে সন্তোষ ট্রফিতে শেষ বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে বাংলা এবং পরবর্তী সময়ে তিনবার ফাইনালে উন্নীত হয়ে তিনবারই বাংলা পরাজিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে ফাইনালে বেল দলের কাছে, ১৯৬৫ সালে অম্বের কাছে এবং এবার ১৯৬৭ সালে মহাশূরের কাছে। ১৯৬২ সালে বাংলা এই মহাশূরকে পরাজিত করেই শেষ সন্তোষ ট্রফি জয় করেছিল এবং এবার ফাইনালে কটকের মাঠে বাংলাকে পরাজিত করে মহাশূর শূর পরাজয়ের প্রাতিশোধ গ্রহণ করল।

মহাশূর রজ্য দল ফাইনালে উন্নীত হবার পথে গতবারের বিজয়ী রেল দলকে পরাজিত করে ৩-১ গোলে। শক্তিশালী রেল দলকে এভাবে পরাজিত করা সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সন্তোষ ট্রফিতে মহাশূর দলের সাফল্যের খতিয়ান উপেক্ষা করার মত নয়। সবচেয়ে মজার কথা হল এই যে আজ পর্যন্ত মোট ছ'বার সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে মহাশূর উন্নীত হয়েছে এবং ছ'বারই বাংলার বিপক্ষে খেলে বিজয়ী হয়েছে তিনবার—১৯৪৬ সালে, ১৯৫২ সালে এবং ১৯৬৭ সালে।

ফাইনালে বাংলা মহাশূরের কাছে পরাজিত হয়েছে ১-০ গোলে। একমাত্র বিজয়সূচক গোলাট করার কৃতিত্ব অর্জন করেন আমজাদ খান। প্রথমার্ধের বিরাট চার মিনিট পূর্বে দলগতভাবে বাংলা দল ফাইনালে মোটেই তাদের সুন্দাম অনুযায়ী খেলতে পারে নি। এবার সন্তোষ ট্রফিতে কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেমি ফাইনালের দুটি পর্বের খেলার ধারা দেখে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে বাংলা হয়ত দীর্ঘ পাঁচ বছর পড়ে অবসর সন্তোষ ট্রফির হাতমোরব উদ্ধারে সক্ষম হবে।

কিন্তু এ বছর ফাইনালে মহাশূর দলের সুন্দর ক্রীড়াধারা বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে যে যোগ্য দল হিসাবেই তারা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। বাংলা দলের পরাজয়ের কারণ হল তাদের পুরোভাগের লক্ষ্যম্রস্ফুটতা এবং রক্ষণভাগের দুর্বল ক্রীড়াধারা। মহাশূরের পুরোভাগের দুর্জন খেলোয়াড় আমজাদ খান এবং নিরদার খান বাংলার রক্ষণবাহে ব্যর্থ



সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী মহাশূর রজ্য দল

ভেদ করেছেন আর মহাশূরের রক্ষণভাগে কড়া গ্যারান্টি দিয়েছে কুচ্ছী রাও এবং আরেকিরা দান।

আমজাদ খানের গোলাটির জন্য দারী বাংলার স্টপার জন এবং গোলরক্ষক বলাই দে। মহাশূরের স্টপার কলব্যাক নগেশ্বন

সার্থক হয়েছে। অবশ্য বাংলা দলের দুঃখ করার কিছুই নেই কারণ তাদের কোচ হিসাবে একজন কটকে গিয়েছেন বটে কিন্তু কোচিংয়ের বলাই এখানে নেই সবাই বড় খেলোয়াড়। উজ্জ্বলার মুখ্যমন্ত্রী আর এন সিংকেও সুরক্ষণ মাঠে খেলা দেখেন এবং খেলার শেষে মহাশূর দলের হাতে সন্তোষ ট্রফি তুলে দেন; মহাশূর দীর্ঘ পনেরো বছর পর লাভ করে ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

সেমি ফাইনালের ফিরতি খেলাটির একাধিত মহাশূর এবং উড়িষ্যা দলের খেলা গোলাশূন্যভাবে শেষ হয় এবং অন্য-চিহ্নিত বাংলা সার্বসৈমকে পরাজিত করে ৪-১ গোলে।

সম্প্রতি কলকাতার প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্রে বাংলা দলের ম্যানেজার এবং কোচ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সবদে প্রকাশ যে, বাংলা দলের ম্যানেজার এবং কোচ খেলোয়াড়দের সুখ-সুবিধার দিক দিয়ে মাত্র দৃষ্টি দেন নি। এমন কি অধিনায়ক বিদ্যুৎ মজুমদার এবং গোলরক্ষক মুনতাকা আহত হলেও তাদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা

গ্রীষ্মকাল

বাংলার গোলের সামনে একটি বল লব করে পাঠালে জন এবং বলাই দে একটু ম্বিখাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু মহর্ষের মধ্যে সুযোগসন্ধানী ফরোজ আমজাদ নেটের কোণে বলটি ঝেঁলে দেন।

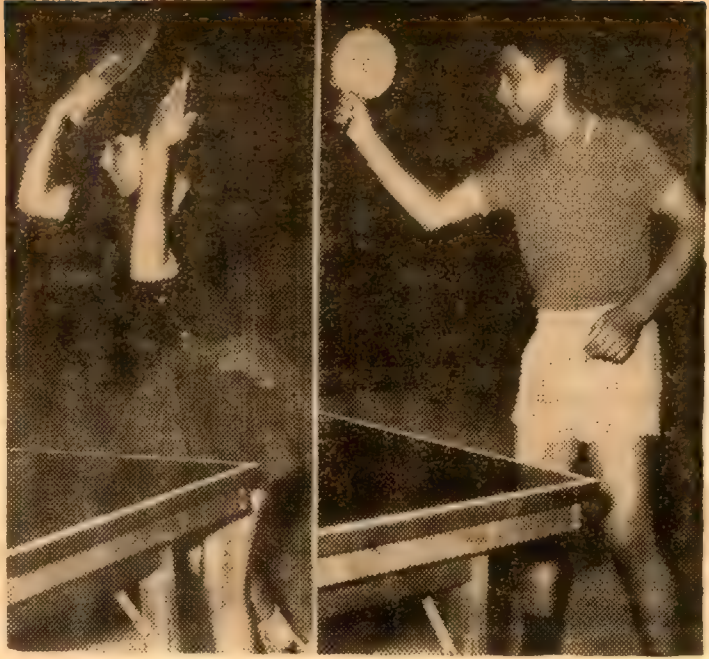
বাংলা দলের সুযোগ অপচয়ের মহা উল্লেখযোগ্য হল সীতেশ দাসের দুটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট। বাংলা দলের দুর্বল্য কারণ দু'বার গোল লাইন থেকে নিশ্চিত গোলরক্ষা করেছেন কৃষ্ণাপা।

খেলার শেষে মহাশূরের কোচ গ্রীবাদার চোখে দেখা যায় আনন্দাশ্রু, কারণ তাঁর দীর্ঘ তিন মাসের পর প্রথম

ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি কোচ অথবা ম্যানেজার। শেষকালে উড়িষ্যা কোচ অমল দত্ত এসে বিদ্যুৎ মজুদারকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং আহত মস্তত্যাকে পি. এম. জি-র গাড়িতে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। কোন সময়েই বাংলা দলের ম্যানেজার বা কোচ ছিলেন না। অবশ্য তাঁরা থাকবেনই বা কি করে। কারণ তখন তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন প্রমোদ ভ্রমণে। আই. এফ. এ-র সভাপতির কাছে আমাদের অনুরোধ যেন তিনি এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং প্রয়োজনে কোচ এবং ম্যানেজারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

হকিতে ভারত কোন পথে

একটা সোনা অথবা রূপোর মেডেলের মূল্য প্রায় লাখ তিনেক টাকা। শুনে হয়ত খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছেন, ভাবছেন তা কি করে সম্ভব; যদিও অবশ্য সব জিনিসেরই আকাশছোঁয়া দাম, তাহলেও লাখ তিনেক টাকা কি সোজা। কথাটা অসম্ভব বলে হয়ত হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু



পূর্বাঞ্চল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রূপা মৃধাঙ্গী এবং জুনিয়র সিঙ্গলস বিজয়ী লাক্ষ্মী মৃধাঙ্গী।



গুডেনের প্রাক অলিম্পিক হকিতে স্পেনের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণধারা রচনা করছেন ভারতের লেফট ইন ইন্ডার সিং।

ঘটনাটা একেবারে ষোল আনা সত্য, এক ভরিও খাদ নেই। ১৯৬২ সালে জাকার্তার এশিয়ান গেমসের আসর থেকে ভারতীয় হকি দল এনেছিল রৌপ্যপদক। আর সেবার ভারতীয় হকি দলের পেছনে প্রস্তুতিপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছিল তা লাখ তিনেকের বেশি তো কম নয়। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, অত্যন্ত হেনস্থা এবং অবহেলার মধ্যে ভারতীয় ফুটবল দল জাকার্তায় প্রেরিত হয়ে ঘরে ফিরেছিল এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক সঙ্গে নিয়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হকিতে ভারতের প্রধান শত্রু ছিল পাকিস্তান। কারণ পাকিস্তান প্রথম গোল এ্যাভারেজে টোকিওর তৃতীয় এশিয়ান গেমসে হকি চ্যাম্পিয়ান হয় এবং জাকার্তায় পুনরায় মাঝখানে ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকেও তারা হকির সম্মান ভারতের কাছ থেকে হিনিয়ে নেয়। অবশ্য অনেক চেষ্টার ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে হকির গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় ভারত।

বর্তমানে কয়েক বছরের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক হকি আসরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে একথা বেশ ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে যে হকিতে সম্মানের লড়াইয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের সংগেও আরও কয়েকটি দেশ সমানে সমানে লড়াবার মত শক্তি ইতিমধ্যেই সঞ্চার করে ফেলেছে। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রাক-অলিম্পিক

२२९२

কলকাতা ময়দানে তরুণ অখচ প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ভবানী রায় অন্যতম।

বয়েস অল্প হলে কি হবে ভবানী রায় কলকাতা ময়দানে খেলছেন অনেকদিন ধরে। বেশ কয়েক বছর ধরেই মাঠে-ময়দানে দেখাছি ভবানী রায়ের খেলা।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে আছে। আর আছে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। ভবানী রায় এখনো খেলা শেখার দলের। শেখার শেষ নেই—শেষ নেই জানার! তাই ফুট-বলঙ্গনের ভাবী তারকা ভবানী রায় আজ শিখছেন, আরো জানছেন।

ভবানী রায়ের খেলার একটা গলদ কিন্তু প্রায়ই চোখে পড়ে। আচমকা এগিরে গিরে কিম্বা নিজের জায়গাটি সম্বন্ধে সচেতন না থেকে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ভবানী রায় হঠাৎ নিজের স্থানটি ফাঁকা ফেলে রাখেন। ফলে সেই গ্যাপের সুযোগে প্রতিপক্ষ দল গোল করার সুযোগ পেয়ে যান।

জানি এই দোষটুকু শুধরোতে বেশি সময় লাগবে না ভবানী রায়ের। কারণ অল্প বয়সে অনেক খেলে ভবানী রায় সপর্যব করেছেন অনেক অভিজ্ঞতা।

অখচ হিসেব করলে দেখা যাবে যে এমন কিছ্র আর বয়েস নয় ভবানী রায়ের। নবীরা জেলার বীরনগরে জন্ম ভবানীর ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে। বয়েস কম হলে কি হবে ভবানী খেলছেন অনেকদিন থেকে।

ছোটবেলার কথা আর স্কুলের খেলার বিষয় ছেড়ে দিলাম। সবাই তো আর অগ্ন্যরাজ কিম্বা পঞ্চজ রায় নয় যে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলতে খেলতে হঠাৎ ভারতের এক নম্বর গোলরক্ষক হয়ে যাবেন, কিম্বা আউটে খেলতে খেলতে হঠাৎ ফুটবল ছেড়ে ভারতের ওপনিং ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। সুতরাং ফুটবল যে ছোটবেলা

পরিচয়

থেকেই ভবানী রায়কে টেনেছিলো, এ কথা বোধহয় না বললেও চলে।

১৯৬০ সালে ভবানী রায় সিটি দলের পক্ষে খেলতে লাগলেন। পরের বছরই চলে এলেন ওয়াই. এম. সি. এ-তে। আর তার পরের বছর পেলেন ঘেরা মাঠে খেলার প্রবেশাধিকার। ১৯৬২ সালে ভবানী রায় যোগ দিলেন বালী প্রতিভার।

আর প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়েই বাজী মাং করলেন ভবানী রায়। বালী প্রতিভার পক্ষে দু'টো বছর খেলতে না খেলতেই ভবানী রায়কে দলে টানলেন

শান্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়

ইস্টার্ন রেল। বালী প্রতিভা ছেড়ে ১৯৬৪ সালে ভবানী রায় চলে এলেন ইস্টার্ন রেল দলে।

১৯৬৪ থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত এই তিনটি বছর ভবানী রায় ইস্টার্ন রেল দলের রক্ষণভাগের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে যেমন দিয়েছিলেন উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়, তেমনি বাড়িয়েছেন তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা।

আর তারই প্রমাণ হিসেবে ১৯৬৭ সালে ভবানী রায়ের কাছে এলো আরো বড় আহ্বান। মোহনবাগান ক্লাবের ডাকে ইস্টার্ন রেল ছেড়ে, রেলের চাকরি ছেড়ে চলে এলেন ভবানী রায়।

মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে এ বছর তাঁর খেলায় আমরা পেরেছি পরম নিষ্ঠার পরিচয়। দলের জন্যে পরিশ্রম করে খেলে ভবানী এরই মধ্যে দিয়েছেন যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয়।

দিয়ে সুনাম কেনা ভবানী রায়ের কাছে কিছ্র আর নতুন নয়। এর আগে অনেক বার অনেক ভাবেই ভবানী অর্জন করেছেন সুনাম, পেয়েছেন প্রশংসা। আর পেয়েছেন ছোট-বড় অনেক প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ।

১৯৬০ সালে ভবানী রায় জুনিয়র বাংলা দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়। ১৯৬৬ সালে ভারত সরকারী রাশিয়ান ফুটবল দলের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন ভবানী রায়। আর সেই বছরই জাতীয় ফুটবলে সন্তোষ ট্রফির খেলায় ভবানী রায় রেলওয়ে দলের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রথম দিকে ভবানী রায় খেলাতেই ব্যাকের জায়গার। কিন্তু ইস্টার্ন রেল আসার পরই তাঁর স্থান বদল হলো। ব্যাক থেকে এক ধাপ উঠে এসে হলেন হাফ ব্যাক।

অবশ্য এটা হয়েছে ইস্টার্ন রেলের বাবা সোমের দূরদর্শিতার জন্যে। ভবানী রায়কে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন যে ওর আসল জায়গা ব্যাকে নয়, আসলে ও হাফ ব্যাকের খেলোয়াড়।

আর বাবা সোম যে সে বিষয়ে এতোটুকুও ভুল করেন নি তার প্রমাণ ভবানী রায়ের আজকের খেলা। হাফ ব্যাক পজিসানে ভবানী রায়ের নিপুণতা আজ অনস্বীকার্য।

কিন্তু ভবানী রায়ের কাছে আমাদের চাহিদা আরো অনেক বেশি। আমরা চাই ভবানী রায় আরো ভালো খেলবেন, আরো নাম করবেন। ভারতীয় ফুটবলপানে বাংলা দেশের আরো অনেকের মতো ভবানী রায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবেন।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

[illegible]

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
হকের বস নিয়ে দেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের স্বক পরিচর্যা তার এই অপূরণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসার্থিনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনাস্থান, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ বোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (মওন)
এম.সি.এস. (আমেয়িক) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের দূতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলি:)
আয়ুর্বেদচর্চা

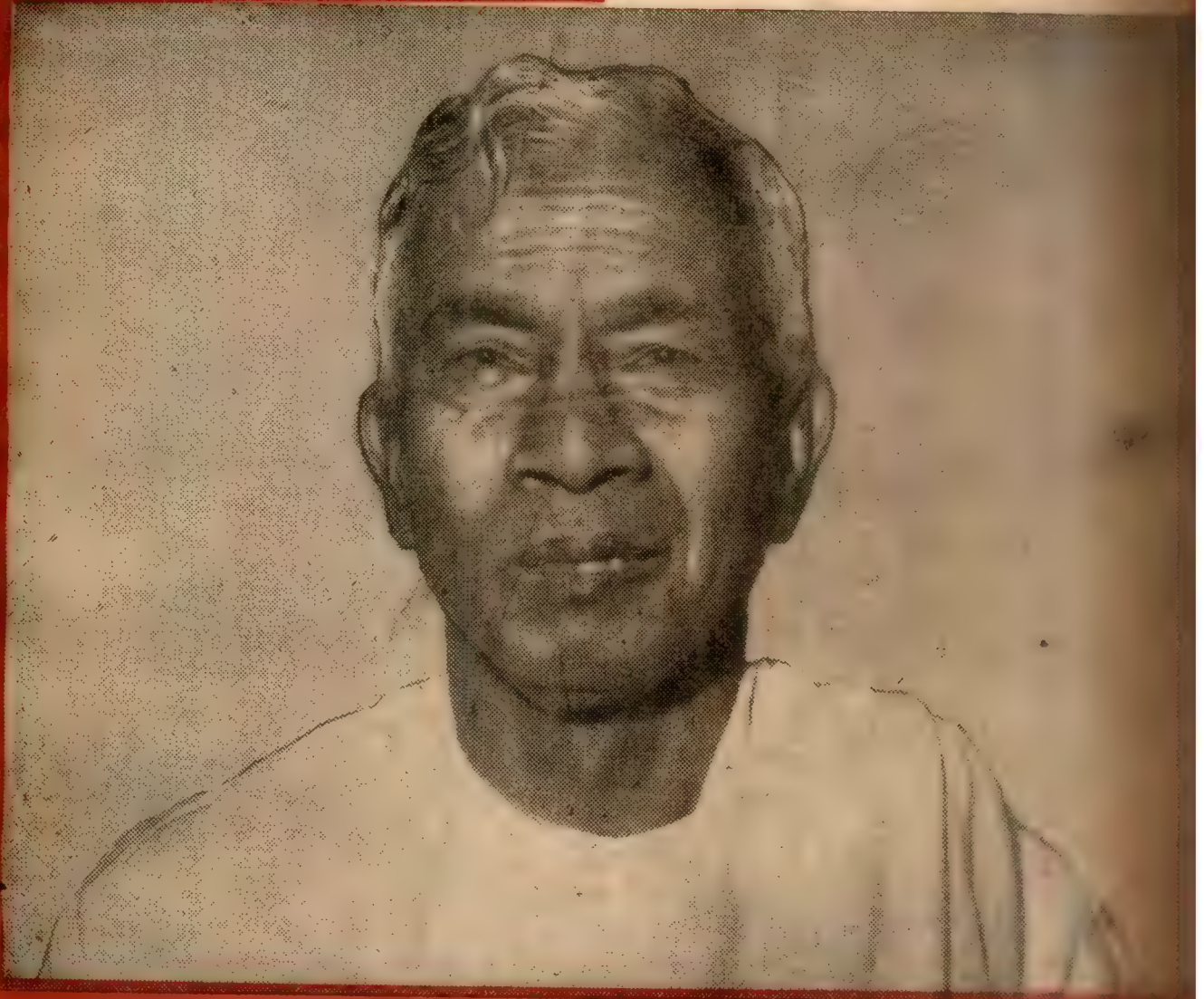


**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

সাপ্তাহিক বসুমতী

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আর একটা
ফাঁড়া কাটল

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগঃ
নতুন কোয়ালিশন সরকার
গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ ?



বর্ষ : ২১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

*** ● ***

9th Nov., 1967 * Vol. 72, No.

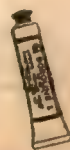
শীত

প্রতিদিন

বোরোলিন

ব্যবহার কমন

আপনার হৃদ মস্তিষ্ক, কোমল এবং নিরাপদ রাখবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম।



বোরোলিন হাউস, কলিকতা-২



বিষয়	লেখক	দাম
সম্পাদকীয়		১২৮০
আজকের মানদণ্ড		১২৮০
সংগদর্শন		১২৮০
অবস্থাব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	১২৮১
সম্রাটের বোকা	— কুন্তিবাস ওয়া	১২৮২
পায়ের নিচে (কবিতা)	— জয়ন্ত সাহা	১২৮০
ভারতদর্শন		১২৮৩
আন্তর্জাতিক		১২৮৪
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচারণ)	— সুধীরজন দাল	১৩০১
গ্রন্থমেলা		১৩০৫
অনিষ্টগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৩০৭

সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্গদেশের সর্বমুখ্য লেখক

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিশ্ববৃক্ষ, যুগলাঙ্গদারী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারামণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মদ্যচিরাম গড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সদৃশ্য কাণ্ড ও বোডে' বাঁধা (রাজ সংস্করণ)

মূল্য প্রতিখণ্ড ৪.৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীররাগনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই ফি বলে সভ্যতা? (বোডে' বাঁধাই)—সাতটি চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিস্টা নাটক, ভিলোভমা-সম্ভব কাব্য, রজনীগন্ধা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়ী কানন, হেকটর বধ। (বোডে' বাঁধাই) চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রবারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুস্বাদু মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

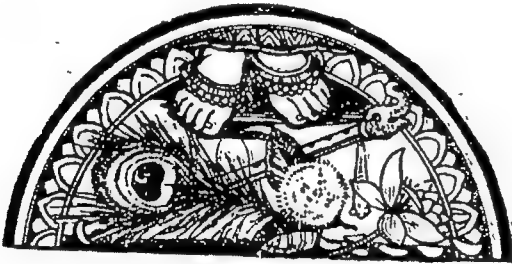
বাংলায় নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু, যিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

মসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কড় (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১০১৯
বিশ্বময়ডরা দিনগড়লি	— ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১০১৫
বিজয়িনী (গল্প)	— ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	১০১৯
নদী জপমালা (দ্রমণকাহিনী)	— জ্যোতি চৌধুরী	১০২২
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	১০২৬
ব্রহ্মমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পালি	১০৩০
আকাশবাণী-পরিচয়	— মেঘদূত	১০৩৩
স্বপ্নজগৎ	—	১০৩৬
পাঠকমন	—	১০৪০
খেলাধুলা	— শ্রীসমিতা	১০৪১
পরিচীর্ণতে	— শ্রীশান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪৪



শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেশনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মঙ্গলিকনী

প্রেমের অলকানন্দা

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাপ্রস্থ আর নাই

চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ

মূল্য বোলা টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাণিলাল প্রবালনা

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃ—৩.৫০

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃ—৩.৫০

বিস্কমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ঘাতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গদ্রগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে:

বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাস্বা এই রাজ্য

ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে

তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



১২ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
মহাসম্পাদিত, ২২শে কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 9th November, 1951

ডঃ ঘোষের পদত্যাগে যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট

মহাসম্পাদিত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ একসময় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের এই পদত্যাগ একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ ২রা নভেম্বর মন্ত্রিসভায় যখন খাদ্যমন্ত্রী চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমন এক মুহূর্তে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ ও যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার বহু তর্কবিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন খাদ্যমন্ত্রী গ্রহণ করতে পেরেছেন। অধিকন্তু ডঃ ঘোষ স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী থাকায় ঠিক এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে পাবেন—একথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

ডঃ ঘোষের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তা আরো অভাবনীয়। কারণ সতের বা আঠারজন (যে সংখ্যা হলে যুক্তফ্রন্ট সরকার সংখ্যা-অধিকার পেতে পারত) যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত সদস্যও যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ে বিভিন্ন তারিখে রাজ্যপালকে না কি পত্র দিয়েছেন। যুক্তফ্রন্টত্যাগীদের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত কতো হয়েছে, তা জানা সম্ভব নয়। তবে চিঠিপত্রের তারিখ থেকে বন্দুর জানা গেছে এঁরা আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। ২রা অক্টোবরের আগে থেকেই এঁরা মধ্য-মন্ত্রীর অগোচরে ডঃ ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন হলে বা রাজ্যপাল ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সঙ্কট আরো

জটিল হবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে রাজনৈতিক পর্ববৈষ্ণবগণ অনেক কিছুই অনুমান করছেন। তাঁদের অভিমতে, এই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা অসম্ভব নয়। কারো কারো মতে, কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টত্যাগী সদস্যগণ কোমালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন।

অথচ এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত এমন কোনো সংবাদ আসে নি যে, যুক্তফ্রন্ট-ত্যাগী সদস্যগণ ফ্রন্ট ত্যাগ করলেও বর্তমান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন না। তবে একথা সত্য যে, বর্তমান পরিস্থিতির মতো জটিল পরিস্থিতিতে যাই ঘটুক না কেন—প্রতিটি পর্ব্বয়েই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আছে। রাষ্ট্রপতির শাসন আশু বিপদ কাটবার দাওয়াই হলেও পরবর্তী অবস্থায় যে কোনো দিন কোনো একটি দল শাসন-কার্য হাতে নিতে পাবে, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপতির শাসন ছ'মাস চালু থাকার পর আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু জনমানসে এমন ধারণা যদি সৃষ্টি হয় যে, বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অন্যায়ভাবে অপসারিত করা হয়েছে, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল কি রকম হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট-ত্যাগী সদস্যগণ মন্ত্রিসভা গঠন করলে, সেখানেও সেই এক প্রশ্ন উঠবে যে, উক্ত মন্ত্রিসভাও কি স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাবেন? কারণ যারা দলত্যাগ করে, তারা যে আবার অন্য দল ত্যাগ করবে না, তার প্রতিশ্রুতি কোথায়! এখন ভারতের রাজনীতিতে একই সদস্যকে দু'দিন অন্তর এদল-ওদল করতে দেখা

যাচ্ছে। দু'দল দিগে বলা যায়, হারিসাম্রাতে এ ঘটনা ঘটছে।

সুতরাং এই ধরনের মন্ত্রিসভার সংস্কার যদি লেগেই থাকে তাহলে দেশের আর্থিক সঙ্কট দূর আর কোনোদিনই হবে না।

সঙ্কটের অবসানই এখন একমাত্র কাম্য। অথচ এমনই দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপার, সঙ্কট অবসানের জন্য যা করা দরকার, একবার নির্বাচিত হয়েই সদস্যগণ তা ভুলে যান। দলত্যাগ করাও পর্ব, সেই কারণে, সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হবার নাম করেন না, এমন কি প্রচণ্ড জনবোধ্য থেকে বন্ধা পাবার জন্যে তাঁরা গোপন আশ্রয় গ্রহণ করেন। জানি না, এইভাবে গণতন্ত্রের মহিমা কতটুকু রক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রীর রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন নাকি আহ্বান করতে বলেছেন। মধ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে তাঁর কাছে চিঠি দিতে বলেছেন। ইতিমধ্যে এমন ঘটনাও শোনা যাচ্ছে যে, দু'চারজন সদস্য যারা দল-বদল করেছে বলে খবর বের হইছিল, তা সত্য নয়! এ সম্পর্কে একজন সদস্যের লিখিত চিঠিটি মধ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে দেখিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এইভাবে এবং ঠিক এই মুহূর্তে যখন খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে, তখন তাদের বিরত করার কারণ কি?

সংবাদকীর্ষ

গোড়ার মানুষ

আলোর আলো, সর্বশক্তিমানের প্রতি-
বিন্দু, আল্লাহর প্রতিনিধি, নিখিল বিশ্বের
কেন্দ্রবিন্দু, আর্থজাতির আলোকবর্তিকা,
রাজার রাজা, শাহনশাহ আরিয়ামেহর—
শেষ নেই রাজস্বত্বের। এই ভাগ্যবান
রাজপুরুষটি কে? ইরান-অধিপতি আবার
কে? মহম্মদ বেজা শাহ পহলভী প্রজা-
পুঞ্জের হুদন-রাজা, তাঁর অভিষেক উৎসবে
তারই প্রমাণ দেবার জন্যে সাবা দেশে
সর্বপ্রণীর নরনারীর মধ্যে এই প্রতি-
যোগিতাই প্রত্যক্ষ করা গেল।

২৬শে অক্টোবর তাঁর ৪৮তম জন্মদিনে
চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো উৎসব আড়ম্বর
ঐকজমকের মধ্য দিয়ে রেজা শাহের
আনুষ্ঠানিক অভিষেক হলো। রেজা ইরানের
সিংহাসনে অবশ্য সৈদিনই আরোহণ
করলেন না, তিনি রাজতন্তু পেয়েছিলেন
২৬ বছর আগে, ১৯৪১ সালে, বয়স
মখন তাঁর মাত্র ২২। কিন্তু সৈদিন তিনি
রাজমুকুট শিরে ধারণ করতেন রাজী হন
নি: It's no fun to be the ruler

পহলভী)-র সিংহাসন ত্যাগের পর
ইরানের শাসনভার পেলে রেজা শাহ।
স্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। পিতার
সমর্থন ছিল জার্মানীর প্রতি, যার জন্যে
বুটিশ ও সোভিয়েট সৈন্য ইরানে ঢুকে
পড়ে শাহকে চিটু কবার জন্যে। শাহ
গেলেন পালিয়ে। সিংহাসনে বসে মজ-
লিস (পার্লিয়েন্ট)-এর কাছে শপথ নিলেন।
কিন্তু সৈদিন তরুণ শাহ-ব আগ্রহ দেশ
শাসনের প্রতি ছিল না, ছিল বিলাসিতার
প্রতি, নিত্য-নতুন দ্রুততম গাড়ি চড়ার
সখ ছিল তাঁর প্রচণ্ড। কিন্তু সেই ফুর্তি-
বাজ শাহ-র মনে দারুণ পরিবর্তন এল
সৈদিন, যেদিন তাঁর জাতীয়তাবাদী প্রধান-
মন্ত্রী মোসাদ্দেক তাঁকে বিদেশে নির্বাসনে
যেতে বাধ্য করেছিলেন। সাল তখন
১৯৫৩। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাহ হাল
ছেড়ে দেন নি, যেন-তেন-প্রকাষণ স্বদেশে
ফিরে রাজদণ্ড হাতে দেবার জন্যে তিনি
এখানে-ওখানে সাহায্য-সহায়তা খুঁজে
বেড়ালেন। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলো,

যেব কাছে বাধা এসেছে, এসেছে গোড়া
সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষত যখন তিনি
সমাজ সংস্কারে হাত দিলেন। নরসিদ্ধির
জন্যে রেজা শাহ-র অবদান অবিস্মরণীয়
হয়ে থাকবে। ইরানে মেয়েদের কোন
মর্যাদা ছিল না, তাদের “মগজেব চেষ্টে
বেশি চুলয়ালী জীব” বলে করুণা করা
হতো। কিন্তু রেজা শাহ তার আমলে
পরিবর্তন ঘটালেন, এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে
তার অমতে স্বতীয় স্ত্রী গ্রহণ স্বামীদের
পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, ‘তানাক’
বললেই আর স্ত্রীকে বর্জন করা গেল না।
গোড়াপন্থীরা তাই প্রতিবাদ করলেন,
দাওয়া বাধালেন, সরকারী অফিসে-সপ্তরে
আগুন দিলেন। কিন্তু শাহ পহলভী
শক্ত হাতে সবই দমন করলেন, বিরুদ্ধ-
বাদীদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন,
প্রাচীনপন্থী সেনানায়কদের জারগার তরুণ
প্রগতিবাদী অফিসার নিয়োগ কবলেন।
এককথায় রেজা শাহ ইরানকে পুরো-
দস্তুর বিংশ শতাব্দীর স্ৱারপ্রান্তে এনে
দিলেন।

বেজা শাহ-র ভিন বিয়ে—প্রথম দিকে
তাঁর বিবাহিত জীবন সুখে কাটে নি।
তাঁর প্রথমা স্ত্রী মিশরের ফারুকের বোন,
এ’র গর্ভে একটি কন্যাসন্তান হযোছিল
কোন পুত্রসন্তান না হওয়াতে বেজা শাহ
দুঃখভারাক্রান্ত মনে তাঁর সঙ্গে বিবাহ-
বিচ্ছেদ ঘটান। স্বতীয় সুরাইয়া ছিলেন
অপুর্ব সুন্দরী, কিন্তু তিনিও স্বামীকে

রেজা শাহ পহলভী

of a poor people—একটা গরীব
দেশের শাসক হওয়ার মধ্যে বাহাদুরি নেই
কোনো—বলেছিলেন সৈদিন তিনি। তা
ছাড়া সৈদিন তাঁর কোনো পুরুষ উত্তরাধি-
কারী না থাকায় শাহনশাহ-র ক্ষোভের
হাত ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর সে-
দুঃখ ভাব্য অন্তর্হিত, দেশের আর্থিক
অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, পেয়েছেন
ছেলে—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আজ
তাই তাঁর মাথার হীরে-মাণিক্যচূড়ার মুকুট
পরতে বাধা কোথায়?

এই ২৬ বছরে বেজা শাহ তাঁর দেশ-
বাসীকে কম দেন নি। না, দেশে সমাজ-
তন্ত্র কায়েম করেন নি তিনি, রাজতন্ত্রই
অটুট রয়েছে, তবে গণতান্ত্রিক শাসন
দিয়েছেন। অভাবনীয় ভূমি-সংস্কার
করেছেন এবং রেজা শাহ আবশ্যক করেছেন
নিজেকে দিয়ে। সম্রাটের নামে যত খাস
তালুক ছিল অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন
তিনি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে, জমিদার
হুস্বামী রাজার অনুগ্রহীত যত অমাত্য
আভিজাত্যপ্রণী ছিলেন তাদের বাড়তি
জমিও ভূমিহীনদের নামে লিখিয়ে দিয়ে-
ছেন। তা ছাড়া শিল্পায়ন ঘটিয়েছেন।

১৯৪১ সালে পিতা (রেজা শাহ

মার্কিন গোয়েন্দা চক্র সি-আই-এ’র সাহায্যে
মোসাদ্দেককে অপসারণ করলেন শাহ।
সগৌরবে ফিবে এলেন তিনি, দখল কর-
লেন সিংহাসন। তাঁর জীবনের ঢাকা
ঘুরল।

১৯৬০ থেকে শাহ পহলভী সম্পূর্ণ
নতুন মানুষ। ইঙ্গ-মার্কিন আনুকূল্যে
তিনি দেশের চেহারা পাষ্টাতে মন
দিলেন। দেশের হাজারখানেক ধনী অভিজাত
পরিবার যারা এতদিন ইরানের
রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মাতাম্বারি
করেছেন—তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত কবে “শ্বেত
বিপ্লব” ঘটালেন তিনি। তারপর ভূমি
সংস্কারের বৈপ্লবিক কর্মসূচী। একটার
পর একটা আদেশ জারী করে রেজা শাহ
ইরানের বিপুল বনসম্পদকে রাষ্ট্রায়ত্ত
করলেন, শিল্পপতিদের ওপব হুকুম জারী
করা হল তাঁদের লভ্যাংশের শতকরা ২০
ভাগ শ্রমিকদের দেবার। জলশক্তিকে
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো, কৃষক গরীবেরা যাতে
সুবিচার পান তার জন্যে গ্রাম-আদালতের
সংস্কার করলেন।

কিন্তু রেজা শাহ বিনা বাধায় তাঁর
লক্ষ্যে এগুতে পেরেছেন মনে করলে ভুল
হবে, কায়েমী স্বার্থের প্রভাবশালী ব্যক্তি-

সন্তান দিতে অকম হওয়ার রেজা
শাহ তাঁকেও ত্যাগ করেন। তাঁর ভো
পুরুষ উত্তরাধিকারী চাই। ১৯৫৯ সালে
একজন সামান্য সামরিক অফিসারের কন্যা
ফাবা দিবার পাণিগ্রহণ করলেন তিনি
একটিমাত্র আশা নিয়ে—কেবল একটি পুত্র-
সন্তান—ইরানের সিংহাসনের উত্তরাধি-
কারী। ফারা চালেজ গ্রহণ করলেন,
পরের বছরই তাঁর কোলে এল ফুটফুটে
এক ছেলে। যুবরাজ রেজা শাহ-র বয়স
আজ ৭।

অভিষেক উৎসবেও বিপ্লব ঘটিয়েছেন
বেজা শাহ। নাবালক যুবরাজের প্রতি-
নিধি হিসেবে রাণী ফাবা দিবাকে সিংহ-
সনে বসিয়ে ও রাজমুকুট পরিয়ে ২৫১৩
বছরের ইরানের (পারস্য) ইতিহাসে তিনি
নতুন নজীর স্থাপন করলেন। ফারাকে
এ সম্মান দেবার আবেকটি অর্থ তাঁর
অবর্তমানে যেন সম্রাটের দেশ শাসনে
কোন আপত্তি না ওঠে। নিজের জীবনের
ওপব যখন ইতিমধ্যে দু’বাব আরম্ভ
হয়েছে তখন সে-জীবনের নিরাপত্তা
কোথায়? শাহনশাহ-র ব্যবহারিক জ্ঞান
কত প্রখর!



শনিবার ৪ঠা নভেম্বর প্রভাত। সংবাদ-পত্রে এমন একাট সংবাদ আকস্মিকভাবে পরিবেশিত হল যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ঠিক এমন সময় বিষয়টি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এসে পড়ল যখন মাঠে মাঠে আমন ধান পেকেছে, ফসল তোলার সময় উপস্থিত হয়েছে, এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার আগামী বছরের খাদ্যনীতি রচনা করে প্রকিওবমেন্টেব কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চলেছেন। এমন একটা সময়ে খাদ্য-মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন যখন অনেক চূড়ি-বিচ্যুতি, ব্যর্থতা, সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী সব সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা অটুট, এমন একটা সময়ে, যখন জনসাধারণের অনেক প্রত্যাশা ব্যর্থ হলেও যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা জনসাধারণের বিশ্বাসের শিখর হয় নি।

স্ববিবার ৫ই নভেম্বরের সংবাদপত্রে দেখা গেল কংগ্রেসের সমর্থনে ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি চলছে, কেন না তাঁকে অনুসরণ করে ১৯ জন বিধানসভার সদস্য না কি পদত্যাগ করেছেন এবং যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। ডঃ ঘোষ রাজ্যপাল শ্রীধরগারীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের সমর্থনে ও দল-ত্যাগী ১৯ জনের সহায়তায় তিনি নতুন একটি সরকার গঠনে সমর্থ। কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীখগেন দাশগুপ্তের সঙ্গে ডঃ ঘোষের একটি দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে।

বিবরণটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে ও সাবা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে। শনিবার রাতে

যুক্তফ্রন্টের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে “সরকার যখন রাজ্যের খাদ্য ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে মনোনিবেশ করেছেন ঠিক সেই সময় এই ধরনের কাজ কি কয়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুর বলা যায় না।”

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, “ডঃ ঘোষ কেন পদত্যাগ করছেন তা তিনি জানেন না। তিনি খাদ্য সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সব বৈঠকেই যোগ দিয়েছেন। তাঁরা খাদ্যনীতি চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন। কাজেই পদত্যাগ বিস্ময়জনক। এই পদত্যাগ যুক্তফ্রন্টের উপর এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের প্রতি বিরূপ আঘাত।” আইনমন্ত্রী শ্রীঅমর চক্রবর্তী বলেছেন, “ডঃ ঘোষের পদত্যাগ জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। জনসাধারণই এবিচার করবেন।” মৎস্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বলেন, “ডঃ ঘোষের পদত্যাগ এবং যেভাবে তিনি পদত্যাগ করেছেন তা বিশ্বাসভঙ্গ ছাড়া আর কিছুরই নয়। এ যুক্তফ্রন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের পিছনে ছুরিকাঘাত। সবকাজের যথাযথ চালু থাকার সকল সংবিধানসম্মত অধিকার আছে। সকল প্রকার চক্রান্তমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র জয়ী হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ।” ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহবেকুশ কোন্ডাব বলেছেন, “পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পতন ঘটাবার জন্য কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার এখনো যে তৎপর এই ব্যাপারে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই যড়যন্ত্র যদি সফল হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ব্যাহত হতে পারে। এই পরিস্থিতির

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ, সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল চলবে।”

এক ভারতীয় হ্রাসিত দল ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলই এই ব্যাপারে তাজব্ব বনেছে। পি. এস. পির সাধারণ সম্পাদক প্রেম ভাসিন বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সমর্থনে কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তাঁর দল তাকে সমর্থন করে না। প্রাণমন্ত্রী নিশীথনাথ বসুও বলেছেন প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোন কোয়ালিশন করবে না। এস. এস. পির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীজুলসী বেবোও মন্তব্য করেছেন। এস. এস. পির পশ্চিম-বঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান ডঃ ভূপাল বসু ডঃ ঘোষের পদত্যাগকে বিনামূল্যে বজ্রাঘাতের ন্যায় বর্ণনা করেন। তিনি এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, “এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপের সহায়ক হবে।”

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের মতে ডঃ ঘোষের পদত্যাগও যুক্তফ্রন্ট সরকার চলবে। সোচমন্ত্রী শ্রীবিধনাথ মুখোপাধ্যায় এই কথাই বলেছেন। শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুদীপ দাড়া বলেছেন, “ডঃ ঘোষের পদত্যাগ বড় রকম কিছু রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে না। আমরা এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ।” উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীজাহাঙ্গীর কবির জানিয়েছেন যে, যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ বন্ধন কোন অভ্যপ্রায়ই তাই নেই।

যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখা হয়েছে : “আমাদের কাছে এই খবরও এসেছে যে, কংগ্রেস-এম. এল. এ. রাজ্যপালকে জাদিবেছেন

চার-যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে দিয়েছেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনে তাঁরা সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। এই সব এম. এল. এ. কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং এখন আবার কংগ্রেসে যোগ দিতে কংবা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করতে চাইছেন। আমাদের দাবি, তাঁদের পদত্যাগ করে আবার নিজেদের আসন থেকে নতুন করে জনগণের নির্দেশ নিতে হবে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট চলতেই থাকবে কোন অন্দর-মহলের অপচেষ্টার যুক্তফ্রন্ট সরকার অপসারিত হবে না। যে অশান্ত শান্তি সরকারের পতন ঘটতে চাইছে, যুক্তফ্রন্ট জনগণকে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে ডাক দিচ্ছেন।"

এই সংবাদে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণাপং ক্রোধ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। রাজভবনের আশেপাশে জনসাধারণের ভিড়। সাবা দেশজুড়ে একটা ধমধমে আবহাওয়া বিরাজ করছে। সর্বত্রই উত্তেজনা। আসন্ন ঘটনাচক্রে মোড় কোন দিকে ফিরবে তা এখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ডালের কৃত্রিম অভাব

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কোন পণ্যকে বাজার থেকে বেমালুম অদৃশ্য করে তাবপর আস্তে আস্তে চোরা-গোপ্তা পথে বিগড়ণ, ত্রিগড়ণ বা চতুর্গড়ণ মূল্য আদায় করা ব্যবসায়ীদের একটা বরাবরের রেওয়াজ হয়ে গেছে। এ দেশের ব্যবসায়ীরা এক মণের লাভ এক সেরে, এক বছরের লাভ একদিনে তুলতে চায় এবং তা তোলেও। সরকার, কি কেন্দ্র কি রাজ্য, নির্বাক দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করেন। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ দেখা গেল একটি পণ্যের দাম হ্র হ্র কবে বাড়ছে। সরকার হুঁসিয়ারী দিলেন, দাম বেঁধে দিলেন কিন্তু বাজার থেকে সে মাল অদৃশ্য হল। তারপর তা অল্প অল্প করে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল আগের দামের তিনগুণ দামে এবং শেষ পর্যন্ত তা আগের দামের দ্বিগুণ দামে স্থিতি হল। এ খেলা আমরা দেখেছি বিশেষ করে সরষের তেলের ও বেবী ফুডের ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি ডাল নিয়ে এই জাতীয় জঘন্য খেলা শুরুর হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ডালের এক কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বছরে যে ডালের উৎপাদন এ দেশে কম হয়েছে তা নয়। অল্প-

প্রদেশে এ বছর মূগের ফলন প্রাচুর্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে এ বছর বিভিন্ন শ্রেণীর ডালের যা ফলন হয়েছে দীর্ঘকাল তেমন হয় নি। ফলে সর্বত্রই ডালের দাম রীতিমত কমে গেছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্নরূপ এবং ব্যবসায়ীদের অসাধুতা এই ডালকে কেন্দ্র করেই এত নগ্ন ও ন্যাকার-জনকরূপে এখানে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা নেই। এখানকার ডালের বড় বড় ব্যাপারীরা প্রেরিত ডাল ওয়ানগন থেকে খালাস করছে না। খজাপটুরে প্রতিদিন ছয় শত ওয়ানগন খালাসের অভাবে পড়ে থাকছে। শালিমারেই চার হাজার টন ডাল এভাবে পড়ে আছে। যারা এইভাবে মাল খালাস না নিয়ে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে গলাকাটা দাম আদায় করছে তাদের খুঁজে পাওয়াও দুস্কর। মালের চালানে ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম না দিয়ে "সেলফ" বা নিজস্ব লেখা হয়। মাল খালাস হয় ব্যাকের মারফত, এবং ব্যাকের কতৃপক্ষও এদের নাম প্রকাশ করে না। ফলে এই সব মোটা পরস্যা-ওয়ালা স্বাণ্য সমাজবিরোধীরা মানুষের ভাগ্য নিয়ে পরমানন্দে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পায়।

সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্য সরকার এদের দমন করার জন্য সিংস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নাকি বিভিন্ন রেল-গুদামে মজুত ডাল 'সীল' করা এবং তার মালিকদের গ্রেপ্তার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি চরে পাঠিয়েছেন। সংবাদটিতে যতটা আশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল ততটা হওয়া গেল না, কেন না যেখানে অত্যাচার্য্যকর পণ্য আইন অনুসারে দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষার বসে থাকতে হয়, যে দেশের সংবিধানে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ, সেখানে 'ফাঁদ' পাততে পাততেই পাখী যে উড়ে যাবে তাতে বোধ-হয় সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

নতুন প্রমনীতি

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে যে অশান্তি দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য রাজ্য সরকার শ্রমিক, মালিক ও সরকারের এক-একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি স্থায়ী সালিশী সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছেন। এই সালিশী সংস্থার কাজ হবে লক-আউট, লে-আফ, ছাটাই, কারখানা বন্ধের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানের সূত্র উদ্ভাবন। এই ব্যবস্থা হবে

স্বৈচ্ছাসম্মত। প্রয়োজন হলে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যেখানে এই সালিশী ব্যর্থ হবে সেইখানেই সরকার হস্তক্ষেপ করবেন।

সকল দলই এ বিষয়ে একমত হন যে, মন্দাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তির মূল কারণ হলেও মালিকপক্ষ এই মন্দার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের ঘাড়েই সকল বোকা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এভাবে শিল্পে শান্তি স্থাপন করা যাবে না। শৃঙ্খলা ছাটাই করে মন্দা ঠেকান যায় না, অথচ মালিকপক্ষ এই পথই অনুসরণ করছে। তবে মন্দার দরুন মালিকপক্ষ যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তা দূর করার জন্য রাজ্য সরকার সব রকম সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেবে। এ বিষয়ে রাজ্যের হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে তার সবটুকু প্রয়োগ করতে সরকার সিদ্ধান্ত করবে না। উৎপাদন ব্যর্থতার জন্য কলকারখানাগুলিকে নানাভাবে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কাঁচামাল, মূল-ধন, এমন কি উৎপাদন পণ্যের জন্য অভাব সংগ্রহের জন্য কারখানাগুলিকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সুপ্রচেষ্টার মালিকপক্ষের যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ মালিকশ্রেণী গোড়া থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নিজেদের শত্রু হিসাবে ঠাঙের নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কিছুটা বামপন্থী চরিত্র আছে সেটাকেই তারা সহ্য করতে নারাজ এবং সেই কারণেই তারা গোড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ঘেরাও প্রসঙ্গ নিয়ে তারা যে ধরনের হেঁচো তুলেছিল সে কথাটা নিশ্চয়ই ভোলার নয়, কেন না কংগ্রেসী আমলেও ঘেরাও ছিল, তা নিয়ে মালিকদের মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন হয় নি। কংগ্রেসী রাজ্য মহারাষ্ট্রেও ঘেরাও-এর প্রাচুর্য্য স্বত্ব, কিন্তু তা নিয়ে মালিকপক্ষ উবেগবোধ করে নি। কিন্তু যত গন্ডগোল পশ্চিমবঙ্গের বেলায় কেন না পশ্চিমবঙ্গের সরকারের চরিত্র কিছুটা বামপন্থী, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার মালিকপক্ষের বিশুদ্ধ দালালরূপে চিহ্নিত হতে কিছুটা অনিচ্ছুক।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশ পাঠানো হবে না, বা পুলিশবাহিনীকে মালিকপক্ষের ভাড়াটে গুন্ডা হিসাবে ব্যবহার করার যে নীতি এতাবকাল প্রচলিত ছিল তার বিলোপ করা হবে। এটা কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ব্যাপার নয়, ইংল্যান্ডের মত উন্নত-তর পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে কোথাও শ্রমিক-মালিক বিরোধে পুলিশকে মালিকপক্ষের ভাড়াটে গুন্ডারূপে ব্যবহার করতে দেওয়া

আমাদের কলকাতা



ঐবান্দ্র-জয়ন্তী, সার্বভৌমত্ব পূজা, জলসা অবি অসংখ্য
উৎসবের ভেতর দিয়ে আমাদের কলকাতার সব
জায়গায় ছড়িয়ে আছে সংস্কৃতির স্পর্শ। অর্থনৈতিক
দিক থেকেও একই ভাবে ইউ. বি. আইর অসংখ্য
শাখা ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে।
এটাই স্বাভাবিক। কারণ কলকাতাতেই আমাদের
মূল শিকড়। ব্যাক সংক্রান্ত কাজের ক্ষমতা আপনার
অবিদ্যুত মত, যে কোন শাখা বেছে নিতে পারেন :

- ১১ আলিপুর : ১০ বোম্ব বেইং
- ১২ বি. ই. কলেজ
- ১৩ বি. ই. কলেজ (নিবন্ধন)
- ১৪ বাগবাড়ি
- ১৫ বাগবাড়ি
- ১৬ বাগবাড়ি
- ১৭ বাগবাড়ি
- ১৮ বাগবাড়ি
- ১৯ বাগবাড়ি
- ২০ বাগবাড়ি
- ২১ বাগবাড়ি
- ২২ বাগবাড়ি
- ২৩ বাগবাড়ি
- ২৪ বাগবাড়ি
- ২৫ বাগবাড়ি
- ২৬ বাগবাড়ি
- ২৭ বাগবাড়ি
- ২৮ বাগবাড়ি
- ২৯ বাগবাড়ি
- ৩০ বাগবাড়ি
- ৩১ বাগবাড়ি
- ৩২ বাগবাড়ি
- ৩৩ বাগবাড়ি
- ৩৪ বাগবাড়ি
- ৩৫ বাগবাড়ি
- ৩৬ বাগবাড়ি
- ৩৭ বাগবাড়ি
- ৩৮ বাগবাড়ি
- ৩৯ বাগবাড়ি
- ৪০ বাগবাড়ি
- ৪১ বাগবাড়ি
- ৪২ বাগবাড়ি
- ৪৩ বাগবাড়ি
- ৪৪ বাগবাড়ি
- ৪৫ বাগবাড়ি
- ৪৬ বাগবাড়ি
- ৪৭ বাগবাড়ি
- ৪৮ বাগবাড়ি
- ৪৯ বাগবাড়ি
- ৫০ বাগবাড়ি
- ৫১ বাগবাড়ি
- ৫২ বাগবাড়ি
- ৫৩ বাগবাড়ি
- ৫৪ বাগবাড়ি
- ৫৫ বাগবাড়ি
- ৫৬ বাগবাড়ি
- ৫৭ বাগবাড়ি
- ৫৮ বাগবাড়ি
- ৫৯ বাগবাড়ি
- ৬০ বাগবাড়ি
- ৬১ বাগবাড়ি
- ৬২ বাগবাড়ি
- ৬৩ বাগবাড়ি
- ৬৪ বাগবাড়ি
- ৬৫ বাগবাড়ি
- ৬৬ বাগবাড়ি
- ৬৭ বাগবাড়ি
- ৬৮ বাগবাড়ি
- ৬৯ বাগবাড়ি
- ৭০ বাগবাড়ি
- ৭১ বাগবাড়ি
- ৭২ বাগবাড়ি
- ৭৩ বাগবাড়ি
- ৭৪ বাগবাড়ি
- ৭৫ বাগবাড়ি
- ৭৬ বাগবাড়ি
- ৭৭ বাগবাড়ি
- ৭৮ বাগবাড়ি
- ৭৯ বাগবাড়ি
- ৮০ বাগবাড়ি
- ৮১ বাগবাড়ি
- ৮২ বাগবাড়ি
- ৮৩ বাগবাড়ি
- ৮৪ বাগবাড়ি
- ৮৫ বাগবাড়ি
- ৮৬ বাগবাড়ি
- ৮৭ বাগবাড়ি
- ৮৮ বাগবাড়ি
- ৮৯ বাগবাড়ি
- ৯০ বাগবাড়ি
- ৯১ বাগবাড়ি
- ৯২ বাগবাড়ি
- ৯৩ বাগবাড়ি
- ৯৪ বাগবাড়ি
- ৯৫ বাগবাড়ি
- ৯৬ বাগবাড়ি
- ৯৭ বাগবাড়ি
- ৯৮ বাগবাড়ি
- ৯৯ বাগবাড়ি
- ১০০ বাগবাড়ি



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪ রাইট বাট প্রিট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৯০টিরও অধিক শাখা আছে

হয় না। বস্তুত এই ঘোষণার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন অন্যায় করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মালিকপক্ষ এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং সরকার ঘাটে এই ঘোষিত নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় তার জন্য চেষ্টার চেষ্টা করছে না। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এদেশে আইনের চক্ষে সকলের সমান অবিকার কাগজে কলমে স্বীকৃতি হলেও কার্যক্ষেত্রে মালিকপক্ষের কোন অন্যায়কেই অন্যায় বলে ধরা হয় না বা তার জন্য শাস্তিও হয় না। ঘেরাও বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে, এবং যদি কোন স্থলে শ্রমিকেরা মালিককে ঘেরাও করে তাহলে পদূলি গিয়ে শ্রমিকদের উপর পাইকারী হারে লাঠি চালাতে পারে, তাদের গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু মালিকপক্ষ যদি ছাটাই লে-অফ, লুক-আউট করে, যদি তারা ট্রাইবুনালের রাষ্ট্রদলিকে ব্যাধগ্ৰস্ত প্রদর্শন কবে তাহলে তাদের কোন দণ্ডই নেই। এদেশে আইনের এগনই মহিমা।

বাই হোক মালিকপক্ষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট কনসেনস দিতে রাজী হয়েছেন। রাজ্যের শ্রমিক অসন্তোষ মীমাংসা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকারী হ্রাস ইত্যাদি বা শ্রমজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই ত্রিপাক্ষিক সালিশীর প্রস্তাব করেছেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এতে অবশ্য আপত্তি করবে না, কিন্তু আমাদের ধারণা, মালিকপক্ষ এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। তাদের মনোভাব খুবই স্পষ্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরের দিন থেকেই তারা প্রতিটি বিষয়ে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে চলেছে এমন কি এই সরকারকে উচ্ছেদের প্রতিটি প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকেই সামিল করেছে। এদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে দুষ্কর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, বর্তমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, উৎপাদন হ্রাস বা বেকারীর মূলে শ্রম-বিরোধ কোন কারণই নয়। বর্তমান মন্দার মূল কারণ তিনটি—কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, যে সব শিল্প প্রত্যক্ষ বা পোষকভাবে রপ্তানী বাজারে চাহিদা যোগাচ্ছিল সেগুলির রপ্তানী বহুলাংশে কমে যাওয়া এবং চাহিদারও হ্রাস পাওয়া, এবং তৃতীয়ত বিদেশী সাহায্যের ব্যাপক-তব ব্যবহার, যাব ফলে দেশী পণ্যের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই কথাগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন-গড়া কথা নয়, বিশিষ্ট শিল্পপণ্ডিতদের কথা। অথচ অপর একদল শিল্পপণ্ডিত সব-জেনে শনেও শ্রমিকদের ঘাড়েই সব দায়

চাপিয়ে দিচ্ছেন, এবং বিশেষ করে এই জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসংকট

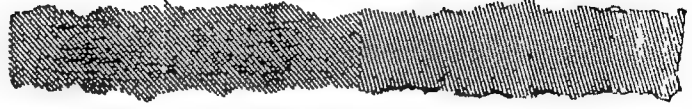
পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ায় রাজ্য মন্ত্রিসভা এই বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করার একটা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যার ফলে স্বাস্থ্য মৎস্য, দুগ্ধ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং সেচদপ্তর প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এই সংকটের অবশ্য বহুবিধ কারণ আছে। বিগত বাজেটে বিপদাগণের ঘাটতি বজায় রাখা হয়েছিল, এবং তা উদ্ভূত করার জন্য কোন কর বসানো হয় নি। তা ছাড়া সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি বাবদ সরকারকে মোটা টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। তৃতীয়ত গত বছরের খরার ধাক্কা পশ্চিম-বঙ্গের একশততায়োশ বলতে গেলে দুর্ভিক্ষ করলিত হয়েছে যাতে গ্রানকার্স বাবদ বেশ মোটামুটি ব্যয় হয়েছে, মোদিনী-পুর্নে বন্যার ফলেও গ্রানদপ্তরকে বহু ব্যয় করতে হয়েছে। বিগত বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে যথোচিত সাহায্য পেলে কোন কর না বসিয়েই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব-পর হবে, এবং এই কারণেই সমাজকল্যাণ-মূলক বিষয়ে আগের থেকে অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উপভ্রমস্ত করতে নারাজ, বিশেষত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরাবজী দেশাই স্পষ্টতই রাজ্যগুলিকে ঘাটতি বাজেটে না করতে পবামর্শ দিয়েছেন, এবং একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন বাড়তি অর্থ দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলিকে ওভারড্রাফট দেওয়াও বন্ধ করেছে, এবং এই বন্ধ করার পিছনে হয়ত কোন রাজনৈতিক স্বার্থও কাজ করছে। অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে হাতে না মারতে পাব ডাতে মার। কিন্তু তার ফল পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শোচনীয় হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক সঞ্চিত পশ্চিম-বঙ্গের ভান্ডাব শূন্য প্রায়। কাজেই আপাতত সরকারকে বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাতে হচ্ছে। এর ফলে পশ্চিম-বঙ্গের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ রীতিমত ব্যাহত হবে।

ট্যাক্স ধর্মঘট

সমাজজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করার শক্তি যার যেটুকু আছে, দাবি আদায়ের নামে তা চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করা একালের যেন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত শনিবার থেকে সোমবার অর্থাৎ ২৮ থেকে

৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত আকাশময় ট্যাক্স ধর্মঘটে এই কথাটা আবার প্রমাণিত হল। কলকাতা শহরের যানবাহন একেই প্রয়ো-জনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়, তদুপরি এই জাতীয় আকাশময় ধর্মঘটের ফলে জন-সাধারণকে তিন দিন ধরে অসমী বিড়ম্বনা ভোগ করতে হল। যে উদ্দেশ্যে ট্যাক্স চালকেরা ধর্মঘট করবেছিলেন, তা ধর্মঘট না করেও অল্পেই সিদ্ধ হত। তাদের ধর্মঘট করার মূল কারণ হচ্ছে যে, কেন্দ্র-জন ট্যাক্সিচালক দুর্ভৃতদের হাতে নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে গোকাবহ এবং এই জাতীয় ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পদূলি বিভাগ ও গভর্নমেন্টের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরেই চোর-ডাকাত গন্ডা-বদমায়েসের দ্বারা মাঝে মাঝে হত্যাকাণ্ড ও অপরাধের অপরাধ ঘটে, এবং সেজন্য অপরাধের নাগরিকেরা সরকার বা পদূলিশের কাছ থেকে যতখানি নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন ট্যাক্সিচালকেরাও তার চেয়ে বেশি কিছু দাবি করতে পাবেন না। কখনো কোন ট্যাক্সিচালক দুর্ভৃতের হাতে প্রাণ হারাবেন না এ গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না, এমন কি যে কোন মস্তাভি দুর্ভৃতের হাতে প্রাণ হারাতে পারেন। কিন্তু এই দাবির জন্যই ধর্মঘট করে ট্যাক্সিচালকেরা জন-জীবনে বিপুল ব্যাধিয়েছিলেন। তাদের এই হঠকারিতার জন্য জনগণকেই মূল্য দিতে হয়েছে, সংবাদে প্রকাশ, জনৈক আশঙ্কপ্রসবী নারী ট্যাক্সির অভাবে রিক্সা করে হাসপাতালে যাবার পথে রিক্সাতেই সন্তান প্রসব করেন। অর্থাৎ তাদের হঠকারিতার দাবি মেটাতে গিয়ে অন্যের জীবনান্তের যোগাড়। ট্যাক্সিচালকদের নিকট আমাদেরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। এমন কি ঘটনা কখনো ঘটে নি যে ট্যাক্সি-চালক কর্তৃক যাত্রী নিহত হয়েছে এবং তার সঙ্গের জিনিসপত্র টাকা-কাঁড়ি অপহৃত হয়েছে? এমন কি ঘটনা পাওয়া যায় না যে, ট্যাক্সিচালক যাত্রীকে কিছুটা নির্জন জায়গায় নিবে গিয়ে ছুরি দেধিয়ে তার সঙ্গের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে? বরং এই রকম ঘটনার জো বিবরণই বেশি পাওয়া যায়। যে-কারণে সগে টাকাকাড়ি নিয়ে বা সালস্কারা কোন মহিলাকে নিয়ে অনেকে ট্যাক্সিতে উঠতে ভয় পান। যাত্রীদের উপর কোন কোন ট্যাক্সিচালকের গন্ডামারী বিরুদ্ধে তাঁরা সম্ভবমতভাবে কি করেছেন? যে হতভাগ্য ট্যাক্সিচালকেরা গন্ডাদের হাতে নিহত হয়েছেন তাদের জন্য আমরা অবশ্যই দুঃখিত, ব্যাপারটা সত্যি শোকা-বহু, কিন্তু বিনিময়ে জনজীবনে বিপদ সৃষ্টি করে তাঁরা কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছেন?

আবজ্ঞা



চন্দ্রশুশ্রূষা

অক্সফোর্ডের গ্র্যান্ডরেট তবুশ বাঙালী
অধ্যাপক বন্ধুব বৈঠকখানায় কালীর ছবি
দেখে সবিষ্টপে বললেন, 'এ কালের
লোক হয়ে তুমি এখনও স্বভাবে-বুচিত
সেকলে রয়ে গেলে! বৈঠকখানায় এমন
প্রকটা প্রিমিটিভ হিরবল্ ছবি টাঙিয়েছ।'
'তোমাদের কলচর্চ' মুরোপীয়ানের
ধরে যীশুখ্রিস্টের মূর্তি' যা ছবি থাকতে
পারলে আমার বৈঠকখানায় কালীর ছবিও
আশ্চর্য' সুন্দর। সত্য কথা বলতে কি,
এ ছবি আমার গৌরব।'।

১৯৬৬ সনের একটি সেপ্টেম্বরের
বিকেলের এ দুঘণ্টা আজ এই ২৮শে
অক্টোবরের পূণ্যপ্রভাবে নিয়ে এল এক
মহীয়সী নারীর উজ্জ্বল সান্নিধ্য,
বিদেশিনী বৈ মহিলা কালীমূর্তি'ব অপূর্ব
শাখ্যা শুনিয়ে গেছেন ভাবতীরদের।
'কালী দি মাদারের' রচয়িত্রী নিবেদিতার
জন্মশতবর্ষ উৎসবের সূচনার মাত্র এক মাস
আগে এক শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মুখে
কালী-নিন্দা—কালস্যা কুটীলা গতিঃ, ইতি-
হাসের বিচিত্র প্রকৃতি!

উনবিংশ অক্টোবর : সংবাদপত্রে
দেখলাম কলকাতার নানা জায়গায় মহা-
সমাবাহে নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিক
উৎসবের অমৃত্যুপর্ব উদ্‌যাপিত হইছে
(গ্রামাঙ্গলের উৎসবের খবর পেলাম না-বাংলা
সংবাদপত্র তো মুখ্যত কলকাতা-কেন্দ্রিক,
আড়ম্বর ও উত্তেজনাপ্রিয়!)। কোন
উৎসবেই চন্দ্রগুপ্ত যোগদান করেন নি, কোন
উৎসব-সমিতির কাছ থেকে তিনি
নিমন্ত্রণ পান নি, কাবণ তিনি
চমক-দেওয়া কোন কীর্তিখ্যাত পুরুষ
মন! ব্রহ্মতত্ত্বভবে চন্দ্রগুপ্ত অবশ্য
দুঃ-একটা সভায় গিয়ে চন্দ্র-কর্ণ সার্থক
কবাবে পাবতেন, কিন্তু তা না করে কেন
তিনি আটশে অক্টোবরের শতদিনে নিবে-
দিতার রচনাবলী পড়েছেন, পড়েছেন
কসাকটি মল্যাবান প্রবাস ও শ্রুতি-স্মৃতি
কলিতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারী নিবেদিতা জন্ম-
শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থটি (পঞ্চম
কর্পূর-সংস্করণ) বসু ও সুনীল-
নিহারী ঘোষ সম্পাদিত), তার উত্তর স্বয়ং
নিবেদিতা—মর্ত্যমর্ত্য ভাবতের চৈতন্য-
অক্ষর লোকমাতা নিবেদিতা।

নিবেদিতার সঙ্গে আসার প্রথম পবিত্র
ঐগ্যাব বছর বয়সে আমি যখন সপ্তম
শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর গুরুজল টেলস অফ
হিন্দুইজম' ব্যাপিত বীজাব যা দ্রুতপঠন-
গ্রন্থ হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। যদিও গান্ধব
গল্পগালি প্রায় সবই আমার জানা ছিল,
তবু সেই জানা গল্পগালিই কেন সেদিন
প্রত্যক্ষভাবে আমি নিবর্তিত হইলাম পাড়াজাম,
লেখক ভগ্নী ভাষার যাদু সার্বিক হার্দয়গুণ
না কি এ সবেব অনন্য যোগফল—সেদিন

কোন অভিজ্ঞতা আমার কিশোরচিত্তকে
আবিস্ট করেছিল আজ পবিত্র বয়সে তা
কিছুতেই বলতে পারব না।

ইতিমধ্যে একাধিক দশক পেরিয়ে
গেছে। নিবেদিতার মর্ম-জীবনের সঙ্গে
পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। মাঝে মাঝে
অবাক হয়ে ভেবেছি, ভাবতবর্ষের মাটিতে
জল-হাওয়ায় এমন কি বাদু
আছে, সুন্দর অতীতে বা এক
রাজপুত্রকে মানবমুষ্টিব সম্মানে
পথের ধূলায় টেনে এনেছিল, নিকট অতীতে
বা এক আইরিশ নন্দিনীকে নিয়ে এলো
দুঃখদারিদ্র্য-জাঙ্ঘিত পরাধীন ভাবতবর্ষে।
সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কেন এই
আইরিশ বিদুষী এলিজাবেথ মার্গারেট
নোবেল ভাবত-মায়ের পায়ে এমন আশ্চর্য-
ভাবে নিজেই সম্পূর্ণ নিবেদন করে
নিবেদিতা হলেন? আমাব মনে হয়,
আমাদের অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয়ের মতো
নিবেদিতাও আমাদের জাতিগত পুণ্যের
ফল।

ভাবতবর্ষ এই মহীয়সীকে বিবেকা-
নন্দের মাধ্যমে লাভ করেছিল। বিবেকা-
নন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ দৈবাধীন
ছাড়া আর কি বলব! নিবেদিতা লিখছেন,
'যদি স্বামীজী লন্ডনে না আসতেন, যদি
তিনি হিমালয়শৃঙ্গে ধ্যানসীন থাকতেন,
আমি নিশ্চয় এখানে থাকতাম না... আমি
জানতাম ডাক আসবে।' আর স্বামীজীও
তাঁর ধ্যান-মুষ্টিতে আবিস্কার করেছিলেন
'ভারতবর্ষের জন্য তাঁর অনুপম উপহার'
লোকমাতা নিবেদিতাকে (উদ্ভূতাংশ রাম-
কৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ)
প্রথম বৈদ্য মার্গারেট নোবেল স্বামীজীর
কাছে তাঁর কাছে আশ্রয়দানের ইচ্ছা প্রকাশ
করেন, সেদিন স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন :
'হাঁ, তোমার স্থান ভারতবর্ষে, তবে এখনও
সময় হয় নি। তৈরী হও।' দেশে ফিরে
এসে স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে লিখলেন :
'আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে ভাবতবর্ষের
কাছে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হবে।
ভাবতের জন্যে, বিশেষত আমাদের নাবী-
জাতির জন্যে—পরম্ব অপেক্ষা নারীব—
একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভাবত-
বর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে
পারে নি। তাই অন্য জাতি থেকে তাকে

অগণনবৃন্দ গ্রহণ করতে হবে। তোমায়
শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম
প্রীতি, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধর্মনীতি
প্রবাহিত কৈলটিক রক্ত তোমাকে সর্বভাবে
সেই উপযুক্ত নাবীবপে গঠন করেছে।'

মার্গারেট-নিবেদিতার জীবনপঞ্জীর
সূত্রবৃন্দ : ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানু-
আরি প্রথম ভারত আগমন : ১৮৯৮
খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ বিবেকানন্দের কাছে
দীক্ষা গ্রহণ ও 'নিবেদিতা' রূপে পরিচিতি।
১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন প্রকাশিত
সঙ্গে পাশ্চাত্য গমন : ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের
ফেব্রুআরিতে প্রত্যাবর্তন : ১৯১১
খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিং-এ জন্ম
১৮৯৮ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত কলিকাতা
নিবেদিতার কর্মবর্তুল ইতিহাস। অন্য
পাঠক লিজেল বেক প্রভাঞ্জিনা চৌধুরী,
প্রভাঞ্জিকা আশ্রয়প্রাপ্ত প্রমুখের নিবেদিতা
চরিত্রগ্রন্থগুলি দেখতে পারেন। নর্তনীর
নিবন্ধ সংকলিতপত্রের শ্রদ্ধাার্চ্য মাত্র।

নিবেদিতাকে দেখেছি ছাত্র-এমন
বাল্লিঙ্গদীপ্ত সুন্দরীনা বিবলদর্শন। পত্যক-
দর্শী অবনীন্দ্রনাথ আর্ট সোসাইটির এক
সভায় উপস্থিত নিবেদিতার বর্ণনা কবেছেন
এ ভাবে : 'সন্দেহ হয়ে এল, এমন সময়ে
নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সত্ৰ, গদ্যায়
বদ্রাক্ষের মালা মাথার চুল ঠিক সোনালি
নয়, সোনালি বাপালিতে হেশানা উচ্চ
কবে বাঁধ। তিনি যখন এসে বসলেন
সেখানে, কি নলব যেন সন্দেহজনী
মধ্যে চন্দ্রাদয় হল। সুন্দরী মেয়ে তিনি
কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাতীন হ'য়ে
গেল। 'সুন্দরবী' 'সুন্দরী' শব্দে বলা
তোমরা জানিন। আমার কাছে সুন্দরীর
আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরবীর রাসদেবতার
বর্ণনা—সেই চন্দ্রাবলি দিয়ে গড়া গতি
যেন মর্ত্যমর্ত্য হ'য়ে উঠল। সাত্যগাহ
ছিল না পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো
পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি
তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইতে গলে
বল পাওয়া যেত। কি করে তোমাই দে
কেমন চেহারা। দুটি যে দেখলে আর
উপমা দেব কি?'

শ্রদ্ধা আর্কাততে নয়, প্রকৃতিতেও নিবেদিতা। নিবেদিতার উপমা নিবেদিতা স্বয়ং।

জন্মসূত্রে বিদেশিনী এই অলোক-সামান্য নারী ভারতবর্ষকে তাঁর জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁর কর্মভূমিই শ্রদ্ধা নয়, আদ্যন্ত মর্মভূমিও ছিল। ভারতবাসী ছিল তাঁর আপন জন, তাই তিনি তাঁর গর্বকে বলতে পেরেছিলেন, তোমার দেশবাসী আমারই দেশবাসী।

ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতার অজীবন পরিশ্রম এক কথায় নিঃশব্দ আত্মোৎসর্গ, অবনীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলতে হয়, 'দৃষ্টি যে দেখিলে আর, উপমা দেব কি?'

এই আত্মোৎসর্গের মূলে ছিল এক প্রচণ্ড ভালোবাসা যে ভালোবাসা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। নিবেদিতা ভালোবেসেছিলেন স্বামীজীকে, স্বামীজীর দেশকে, দেশের অগণ্য জনসাধারণকে, দেশের আবহমান সংস্কৃতিকে।

সেই কাৰণে পরাধীন ভারতের রাজ-নৈতিক মুক্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তিনি ভারতীয়দের নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধা প্রেৰণা দানেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও যে সক্রিয়ভাবে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণায় তা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^১ এবং এ কথাও হরতো অনেকের অজানা, নিবেদিতা সব সময় অহিংসাব পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রয়োজন-বিশেষে বা স্থান-বিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক মনে করতেন।

শ্রদ্ধা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিও ছিল নিবেদিতার অশ্বিনী। নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা, মানসিক জড়তা। এই দুরবস্থা ও চিন্তাজড় দূর করার জন্য তিনি বিবর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার পিছনে অনলস কর্মীর দুরূহ রত উদ্যোগে ব্যাপ্ত হয়েছেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্রেগেব প্রাদুর্ভাব হ'লে তিনি কলকাতার অলিতে-গলিতে বাসায়-বসিতে 'সংগঠন' সবার মতো

আতের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। অশিক্ষার বন্ধ ঘরে ভারতীয় নারীর নিঃশব্দ কান্নায় বিচলিত হয়ে তিনি তাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, অভিভাবক-দেব দরজার দরজায় গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, 'আপনার মেয়েটিকে আমাকে ভিক্ষা দিন, আমি তাকে পড়াবো'; অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু তাতে দমেন নি। যাদের পেয়েছিলেন, তাদের নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন। তাঁর অন্যতম ছাত্রী প্রব্রজিকা ভাবতীপ্রাণার স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, কি অসাধারণ শিক্ষায়ত্নী ছিলেন নিবেদিতা, আর শিক্ষার্থিনীর উন্নতির জন্য কি অসামান্য পরিশ্রমই না তিনি করতে পারতেন। ইতিহাস ভূগোল থেকে শ্রদ্ধা করে আলপনা, সেলাই, ড্রিল, বিভিন্ন বিষয় তিনি নিজে শেখাতেন। স্কোপারি, 'সেই অল্প পাশ্চাত্য অনুকরণের যুগে... ছাত্রীদের মধ্যে স্বদেশানুবাগেব প্রেরণা' জাগাতে নিবেদিতাব অসীম আগ্রহের কথা প্রসঙ্গে প্রব্রজিকা ভারতীপ্রাণা বলেছেন : 'কোন ছাত্রী একটি নিত্যব্যবহৃত ইংরাজী কথার মাতৃভাষায় প্রতিশব্দ বলতে অক্ষম—এটি তাঁর কাছে চড়াইত অগম্যের কথা। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে আমার ছাত্রী-জীবনের একটি আদর্শতার কথা আজ বলব। সিন্টার আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষের রাণী কে বল। আমরা উত্তর দিলাম সিন্টার, আমাদের রাণী কুইন ভিক্টোরিয়া। মনে হল কে যেন তাঁর শব্দশূন্য মুখে সিদ্ধাব ঢেলে দিয়েছে। ভারতবর্ষের মেঘেরা তাদের ইতিহাসেব প্রেষ্ঠ বগণীক্কেব নাম জানে না। এ কি শোচনীয় অধঃপতন! তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, তোমাদের রাণী কে তাও তোমরা জান না? আমাদের বিদ্রোহ ও বিমূঢ় দেখে তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, ইংলন্ডের অধীশ্বরী—কুইন ভিক্টোরিয়া কখনই তোমাদের রাণী হতে পারেন না। তোমাদের রাণী সীতা। সীতা শব্দটি অত্যন্ত জোব দিয়ে তিনি বাববার উচ্চারণ করতে লাগলেন।'

রাজনৈতিক মুক্তির চাইতে মানসিক বা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এক হিসাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিবেদিতা নানাভাবে ভাবতচিন্তকে স্বদেশপ্রেমে সিস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। সকলেই রাজনৈতিক আন্দোলনে খাঁপিয়ে পড়ুক নিবেদিতা তা কখনই চান নি। ফলত ভারত-শিল্পেব পুনরুজ্জীবনে তিনি পথিকৃতব ভূমিকা নিয়েছেন।^২ ভারতীয় শিল্পীরা যখন

পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যাপ্ত, নিবেদিতা তখন ভারতের শিল্পবৈভবের দিকে আমাদের চোখ ফেরান। তাঁরই প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ অজন্তার চিত্রাবলী পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে শিল্পচর্চাব পথনির্দেশ পান। অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, 'নিবেদিতা আমাদের প্রায়ই বলতেন, ছবি আঁকা ছেড়ে রাজনীতিতে কখনও মতো না; তোমাদের উপর ভারতশিল্পের নবজাগরণ নির্ভর করছে আর জাতীয় চেতনার উন্মোচনে শিল্পের এই নবজাগরণ হবে তোমাদের সবসেরা দান।' যুগগায় ভ্রমণকালে নিবেদিতা স্বদেশীয় সরকারকে বর্গেছিলেন, 'কোন বিদেশী শক্তির কাছেই কখনও তোমাদের পতাকা নত করবে না; জীবনের যে ক্ষেত্রেই তুমি কাজ করো না কেন, সব ক্ষেত্রে সেখানে মাথা উচু করে দাঁড়াও, চেষ্টা করবে, কোন বিদেশী মহাজনের কাছে মাথা নিচু করার কিংবা কোন বিদেশী আদর্শের অনুকরণ করার চেষ্টা করবে না।' ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাসবোধের উন্মোচনের জন্য তিনি একদল ছাত্রকে হিমালয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল, প্রতি বৎসর ছাত্ররা যেন দেশভ্রমণে বেরোয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে নিবেদিতার নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলিব ব্যাপক প্রচাবে তাঁর সর্বপ্রকার সাহায্য ও অনলস চেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীর নাম সন্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'

নিবেদিতাব জীবন-চরিত দুটি শাস্বত সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে : প্রথম, মানবতাব মানচিত্র নেই; এবং দুই, স্বাভাভাব্যে, অন্যভাবে দেশপ্রেম, বিশ্ব-মানবতার ভিত্তি। আইরিশ কন্যা মার্গারেট নিবেদিতারূপে ভাবতকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে প্রথম সত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং দ্বিতীয় সত্যের পুনরুজ্জীবনে ভারতবাসীর শিক্ষায়ত্নরূপে নিজেই নিয়োজিত করেছিলেন। খুব কম বিদেশীই নিবেদিতাব মতো ভাবত-সংস্কৃতিকে এত সার্থকভাবে বুদ্ধেছিলেন, ভারতবর্ষকে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এবং

১। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের Militant Nationalism in India এবং 'ভাগিনী নিবেদিতাব রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারা' (ভাগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মবক-গ্রন্থ প্রথম পর্ষায়) প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য।

২। নিবেদিতার প্রাসংগিক উক্তি : An must be reborn. Not the miserable travesty of

would-be Europeanism that we at present know. There is no voice like that of art to reach the people... And art will be reborn for she has found a new subject—India herself

বেহেতু তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে আগ্রাস্ত ভারতীয়, সেজন্যই তিনি ভৌগোলিক ভারতবর্ষে আবহমান ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করার পুণ্যরূপে আত্মদান করেছিলেন।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এই মহীরসী ভারত-নন্দিনীর জন্ম-শতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে আমার আনন্দিত হবারই কথা। কিন্তু আনন্দিত হ'তে পারছি কই? আর দশটা উৎসবের মতোই কি এই উৎসব নয়? 'পশ্চৎ ধপে মাল্যে আর সর্বজ্ঞের বিবর্ণ ভাষণে' কি নির্বেদিতা আজও আমাদের কাছে নামমাত্র নয়? নির্বেদিতার কোন গুণাবলী কোন উপদেশ আমরা জীবনে ও কর্মে রূপায়িত করতে পেরেছি? নির্বেদিতা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন; ঘটনাচক্রে সে স্বাধীনতা আমাদের এসেছে। কিন্তু ভারতীয়দের স্বাভাব্যবোধে দীপিত করার যে আত্মবিশ্বাস চেষ্টা তিনি করে গেছেন, তা কতটা সফল হয়েছে? যদি সফল হতো, তা হ'লে অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট বাঙালী অধ্যাপক কালীর হবি দেখে হ্রস্বগুণ করবেন কেন? এ ধরনের দু-একজনকে দিয়ে সাধারণ মন্তব্য করা সম্পূর্ণ সঙ্গত না হ'লেও চন্দ্রগুপ্তের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃঢ় প্রত্যয় (আশা করি আরও অনেকের এবং এ কথা তিনি ইতিপূর্বেও জানিয়েছেন) এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের মানসিক পরাধীনতা রুম্মাশ বেড়ে চলেছে, এবং উপরিউক্ত অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯০৬ সনে নির্বেদিতা লেখনে বলেছিলেন: 'দেশের মধ্যে বহু কাজ বিশেষে পরিচালিত হচ্ছে, রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাধারাও অসম্বন্ধ। তার কারণ ভারতীয় রাজনীতি অনেকাংশে অনুকরণ-প্রবণ এবং মন্দ জিনিস অনুকরণের দিকেই

ভারতীয় বোধ।' নির্বেদিতার এই সঙ্কোচ মন্তব্য ১৯৬৭-র ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার কি আরও বেশি সত্য নয়?

এই কারণেই সন্দেহ জাগে: নির্বেদিতার জন্ম-শতবর্ষ-উৎসব পালনের কতখানি যোগ্য আমরা? এইজন্যই গত আটশে অক্টোবরের একটি সভার আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা বলেছেন: 'আমার কাছে তার যথার্থ্য সর্বাধিক। আচার্য বসুর মতে, 'মনীষীদের নিয়ে কেবল আলোচনা বা প্রচার করলেই চলবে না। তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে হবে।'

তবে কি আমরা মহাপুরুষদের স্মরণ করব না? নিশ্চয়ই করব, কারণ ভারত-

বর্ষের মতো একটি মহাদেশ—বিশবাস্যেই—কখনই মানসিকভাবে মরে যেতে পারে না। ভারতবর্ষে আজও ভারতীয় আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এবং এঁদের জন্যই আছেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ নির্বেদিতা। মহাপুরুষদের মৃত্যু নেই; ইতিহাসের পর্বে পর্বে মানুষকে তাঁর পথনির্দেশ দেন, এগিয়ে নিয়ে যান হ্রুবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।

সাত্ত্বিক সভ্য নয়, প্রাকৃতিক জীবনে, কর্মে পুণ্যশ্লোক নির্বেদিতার শৃঙ্খলিত জীবনের একান্ত কর্তব্য।

লোকমাতা নির্বেদিতার চরণে আমাদের কতচিহ্নাঙ্কিত জীবনের প্রশাস। লোকমাতার আশীর্বাদ আমাদের উপর নিত্য বর্ষিত হোক।



ভালতল কাঁচা...লা বনি

আপনিও পেতে পারেন বৈকি
নিয়মিত ভাবে রোজ রাত্রি মাখুন



বেঙ্গল কেমিক্যাল

প্রিয়া

কোল্ড ক্রীম

কলিকাতা ৬ বোম্বাই
কানপুর ৬ দিল্লী

ঐশ্বর্য বোকা

কৃষ্ণবাস ওমা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগের সংবাদ রাজ্য সরকারের মতন খাদ্যনীতি সম্পর্কে যে সংকটের আভাস গত-লক্ষ্যের বোকাতে অসমাপ্ত রেখেছিল তারই সফল পরিণতি। রাজ্য সরকারের নতুন খাদ্যনীতি দুটি বিপরীতমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হবে এই আশংকা প্রতিফলিত করে গত সপ্তাহে উগ্র বামপন্থী মহলেবু মনোভাব ও তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন। উগ্র বামপন্থীরা ক্ষেত্রের সব ফসল নিজেরের খামারে নিয়ে তুলবে, জমির মালিককে কোন ভাগ দেবে না এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে তেভাগা আন্দোলনের লজ্জালঙ্কারে লালগলে পরিণত করার মত একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন লালগল সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই হঠকারী রাজনীতির পা-ডানের মত প্রায় সমান দুর্ভিক্ষভোগে ক্ষোভের ও মজ্জাদারদের তালিবাহক হুমকেশী রাজনীতিবিদগণ একই ভাবে সংকট সৃষ্টি করবেন এ কথা জানা ছিল। ডঃ ঘোষের পদত্যাগ এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার এই যে নতুন সংকট দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার—এবং উভয় দৃষ্টিকোণেই মূল লক্ষ্য নতুন খাদ্যনীতি। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে এবং তার নীতিগত সম্পর্কে উগ্রপন্থীদের বক্তব্য—এই সরকার প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার অপেক্ষা সামান্যও জনস্বার্থের অনুরক্ত নয়, এই সরকার প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের মতই মজ্জাদার কালোবাজারী মনোফাখোরদের তোষণকারী। এই বক্তব্য মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির উগ্রপন্থীরা, যারা নিজেরের সি-পি-এম বলে পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের বক্তব্য তো বটেই—সমগ্র বিশেষে আরও অনেক দলও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাটি বলে থাকে। কিন্তু ভাষার বিচারে যারা একেবারে নিখাদ বামপন্থী নন অর্থাৎ রাজ্যের ক্রান্তি দলগোষ্ঠী তাঁদেরও বক্তব্য কিন্তু প্রায় এই একই সূত্রে তবে সামান্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ক্রান্তি দলের সেরসরকারী মুখপাত্রের চোখে “কংগ্রেস আমল থেকে যুক্তফ্রন্টের আমলে জনস্বার্থ

পাড়নের কোন তফাৎ নেই।” ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করেছেন এই দুই সংখ্যাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু রাজনীতির সবই তত্ত্ববিচারে বাড়ির কাঁটার চলে না। ডঃ ঘোষের পদত্যাগ কিন্তু বিধানসভা সদস্যের যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার, যদিও আজ অনেক ভালো কথার আড়ালে বলা হয় তবু নিশ্চিতভাবে বলা যায় ডঃ ঘোষের পদত্যাগ এবং বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংকট কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। দীর্ঘ-দিনের চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়স্তরের রূপ প্রকাশ শেষেই এই পদত্যাগজনিত সংকটে। গত ২৬শে জুলাই ডঃ ঘোষ একবার পদত্যাগপত্র পেশ করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। সেদিনের সেই পরিকল্পনা আজও অপ্রকাশ্য রয়ে গেছে। সেদিন কথা ছিল ডঃ ঘোষ বিধানসভার পদত্যাগ করবেন আর পনেরো-বিশজন বিধানসভা সদস্য জোর তৃষ্ণ করে কংগ্রেস দলে চলে আসবেন। পতন হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের। কিন্তু বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে বিধানসভার বাইরে এবং সারা দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন রোধে জনগণের মধ্যে যে বিপুল সাজা পড়ে যায়, সাধারণ মানুষ যেভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষার জন্য আইন, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধ্যধরা গাঙী অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয় তা দেখে ভয় পেয়ে-ছিলেন সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের উৎসাহী কর্মীরা। সেদিনের উৎসাহী সদস্যরা জোর তৃষ্ণ করতে ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন তাঁরা নির্দল হবেন—সরাসরি কংগ্রেসে না গিয়েও সরকারের পতন ঘটাবেন। কিন্তু ডঃ ঘোষের পদত্যাগ-পত্রটি ২৬শে জুলাই বেলা ৩টা বিধান-সভা ভবনে মধ্যাহ্নের কক্ষে হিঁড়ে ফেলার পর, সেদিনের উৎসাহী কর্মীরা সাময়িক-ভাবে বসে পড়েন। ডঃ ঘোষ প্রথম থেকেই অখুশি ছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ওপর। এই অখুশির পেছনে দুটি কারণ প্রথম থেকে কাজ করছিল। প্রথম কারণ—তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন যদি না অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই ব্যাপারে মার্ক্সবাদী

কম্যুনিষ্ট পার্টিরও সমর্থন তাঁর প্রতি ছিল। এই কথা ভেবে তিনি আরও বেশি ক্রোধান্বিত হতেন। কিন্তু এরই আবার বিপরীত কারণে তিনি অজয় মুখোপাধ্যায়ের ওপর ক্রোধান্বিত। অজয় মুখোপাধ্যায় দেশটাকে কম্যুনিষ্টদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ডঃ ঘোষকে কেন্দ্র করে দিল্লী ও কলকাতার একটি মহল বরাবরই তৎপর ছিল। এই তৎপরতা এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁচেছিল যেখানে অজয় মুখোপাধ্যায়কে সোজাসুজি বলা হয়েছিল, আপনি যদি কম্যুনিষ্টদের ত্যাগ না করেন আমরা ডঃ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করব। আচার্য জে বি কৃপালনীর, সুব্রহ্মণ্যমোহন ঘোষ, দিল্লীতে জে বি কৃপালনীর বাড়ি আর কলকাতার রাজভবন,—বিগত কয়েক মাস নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল, যে যোগা-যোগ এক শক্তিতে অজয় মুখোপাধ্যায়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলছিল অপর শক্তিতে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের কাছে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করছিল।

অনেকগুলি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যে ঘটনাগুলি প্রমাণ করে ডঃ ঘোষের আজকের এই পদত্যাগকে কোন আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম যেদিন ডঃ ঘোষ শ্রীসুব্রহ্মণ্যমোহন ঘোষকে বলে-ছিলেন, ‘অজয় গোজার গেছে—ওর কাছে দেশ বড় নয়’—সেইদিন থেকে সূর্য করে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন ডঃ ঘোষ আর ডঃ ঘোষের পাশে পাশে বাংলাদেশের জনৈক এম-পি। ডঃ ঘোষ প্রতিটি ঘটনার ছায়ায় মতন উপস্থিত হয়েছেন দৃশ্যগটে, এম-পি ভুলোকও ঠিক তাই। তবে একজন নীরব আর একজন সরব। রাজভবনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে খানা খেতে বসেছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—কিন্তু খাবার আগে এবং পরে দু’বার আলোচনা করেছেন ডঃ ঘোষের সঙ্গে।

২রা অক্টোবর। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন না, কিন্তু অনেকগুলি শক্তি একসঙ্গে ঘিরে ধরল—তিনিই এক-মাত্র পারেন নতুন সরকার গঠন করতে। ৩রা অক্টোবর সকালে রাজ্য কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা আছড়ে পড়লেন ডঃ ঘোষের কাছে—‘অজয় মুখোপাধ্যায় পিছিয়ে পড়লে আপনাকেই কাঁড়ারী হতে হবে।’ ১৬ই অক্টোবর—নয় জন এম-এল-এ বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। ক্রাহাঙ্গীর করির, হরেন মজুমদার, গঙ্গাধর পরামণিক, অজয় মুখোপাধ্যায়কে খিঙ্কার দিয়ে দলত্যাগ করলেন। ২২শে অক্টোবর নতুন ক্রান্তিগোষ্ঠী গঠিত হল। নেতা কে হবেন? ডঃ ঘোষ। মাঝে ১ই অক্টোবর ডঃ ঘোষ নিজের বাড়িতে নির্দল সহ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ৩০শে অক্টোবর ভারত সভা ভবনে ক্রান্তিগোষ্ঠীর সভায় উপস্থিত হলেন ডঃ ঘোষ। এই সভায় ঠিক

পায়ের নিচে

জয়ন্ত সাহা

এমন সময় হাতটা কেন খালি লাগছে।
হাতে কিছড় ছিল না কি।
কোন দিনই হাতে কিছড়ই থাকে না তো
তবে কেন হাতটা এমন খালি লাগছে।
আজকে বুঝি পয়লা তারিখ?

ঊনত্রিশটা দিনই এমন হাতটা আমার খালি থাকত
ঊনত্রিশটি সূর্য বেচে একটি দিনই কিনেছিলাম
হা-পিতোশ, দিনটি আমার।

ভীমরাতি আর কাকে বলে
সাগ্র আমার বেচা-কেনা
সূর্য ওরা আর নেবে

বুকেটা আমার ভালই আছে
বাথা এখন পায়ের নিচে।
ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে জটিল হল
পায়ের নিচের মাটি আমাব সবে গেছে।

এই দুর্নিবাস অনেক মাটি
যেন একটা মাটির ঢিবি
নোনা মাটি, কাঁকর মাটি, কাদা মাটি
অথচ নেই পায়ের নিচে দু'পা মাটি।

ঊনত্রিশটি সূর্য বেচে একটি দিনই কিনেছিলাম
সূর্য ওরা আর নেবে না;
ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে জটিল হল
পায়ের নিচের মাটি আমার সবে গেছে।

হল ডঃ ঘোষ ক্রান্তি দলের নেতা হবেন।
একই ভাবে এম-পি ভদ্রলোকের
ভূমিকা আকর্ষণীয়। ২রা অক্টোবর সম্মত
ছটার অতি স্পষ্টভাবে একটি প্রশ্ন রাখা
হয়েছিল যে গত ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী
পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের জন্য
তিনি যে উদ্যোগ ও তৎপরতা চালিয়ে-
ছিলেন আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন
নিশ্চিত জেনে তিনি সরকারকে রক্ষার জন্য
তৎপর নন কেন? বাম্পী পিণ্ডিত তাকিক
অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অনেক কথা বলে
শেষ কথা বলেছিলেন—“বোজগনেশন অব
অজয় মুখার্জী ইজ সার্টেন”। হ্যাঁ, এম-পি
মহাশয় অত্যধিক নিশ্চিন্ত ছিলেন
অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের জন্য।
আর একজন নাকি নিশ্চিন্ত ছিলেন—তিনি
উড়িষ্যার ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব। ২রা অক্টো-
বর রাতে রাজ্যভবনে অজয় মুখোপাধ্যায়ের
পদত্যাগ ও পরবর্তী সংখ্যালঘু সরকার
গঠনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সম্ভবত
উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন ডঃ মহতাব।
যেমন ১লা মার্চ রাজ্যভবনে যুক্তফ্রন্ট
সরকারের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এম-পি
ভদ্রলোকের ‘সার্টেন’ কিন্তু ‘সার্টেন’ হল না।
২রা অক্টোবর পদত্যাগ কবলেন না অজয়
মুখোপাধ্যায়, ওরা অক্টোবর আবার
দেখা হয়েছিল এম-পি’র সঙ্গে।
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হস্টেলের চাবতলার
ঘরে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ঘুমোতে
চাই—কদিন ঘুম হয় নি।’ কিন্তু ঘুমোতে
পারেন নি এম-পি ভদ্রলোক। সকালবেলাই
প্রাণ্ডন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এলেন
তাঁর কাছে। তিনি শ্রীসেন ও অন্য রাজ্যের
প্রকজন প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তিন

ঘণ্টা রুম্বাম্বারে আলোচনা করলেন।
এই ঘটনা সম্পর্কে একটি
পত্রিকার রিপোর্ট ছবছর ভুলে ধরাছি—
“যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আজ
নতুন রূপে সূত্র হয়েছে। জানা গেল
অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বাধীন
ক্রান্তিগোষ্ঠী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে
মুখ্যমন্ত্রী করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোষা-
লিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ করেছেন।
প্রকাশ, আজ রাত দশটায় জনাব হুমায়ুন
কবির উড়িষ্যার ক্রান্তি দলনেতা ডঃ হরে-
কৃষ্ণ মহতাব রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে
দু’ ঘণ্টারও বেশি সময় আলোচনা করেন।
গতকাল রাতে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্য-
মন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে অবলম্বন
করে এই সমস্ত সদস্য আহত মর্বাদার
মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায়
জানান, মুখ্যমন্ত্রীর উপরে তাঁদের কোন
আস্থা নেই। তাঁরা দাবি করেন যে,
তাঁদের দলে ১৬ জন সদস্য আছেন,
কংগ্রেসের সঙ্গে এই ১৬ জন সদস্য হাত
মিলিয়ে ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে নতুন
মন্ত্রিসভা গঠন কববেন।” গত ৩রা অক্টো-
বর উপরোক্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত
হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট
গতিতে এগিয়ে এসেছে সকল ঘটনাগুলি।
বাংলা কংগ্রেসেরই একদল সদস্য ১৬ই
অক্টোবর বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক
ছেদ কবে ঘোষণা কবেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি
আস্থা নেই। পাবে এই সদস্যবা আরও
সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৬ জন ১৮ জনে পবি-
গত হন। ৩১শে অক্টোবর ভারত সভা

ভবনের এক সভায় ডঃ ঘোষকে নেত্র
হিসেবে বরণ করেন।

এম-পি ভদ্রলোক কলকাতার ঘুরোতে
চেয়েছিলেন। তাঁর ঘুম ভাঙল ইন্দোরে
গিয়ে। তিনি ঘোষণা কবলেন,
পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকার নেই। পশ্চিম-
বঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসনই চান।
বুধবার ডঃ ঘোষ তাঁর পদত্যাগপত্রটি
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপালের কাছে।
বৃহস্পতিবার নিঃশব্দে কেটে যায়। শত্ৰু-
বার এম-পি ভদ্রলোক রওনা হয়ে গেলেন
কলকাতা ছেড়ে। সকালবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর
টেলিফোন বেজে উঠল—দার্জিলিং থেকে
ধরমবীর কথা বলছেন—মুখ্যমন্ত্রীর
ধরমবীর জানানলেন ‘ডঃ ঘোষ পদত্যাগ
কবলেন, তাঁর সঙ্গে নাকি আর্থ ১৬।১৭
জন আছেন। আপনি কি কববেন?’ পাবে
রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘ঠিক আছে—
আমি শনিবারই কলকাতা ফিরাই।’ রাজ্য-
পাল তাঁর দার্জিলিং অবস্থান সংক্রান্ত
কবে কলকাতা ফিরে আসেন।

সবই বেন ঘড়ির কাঁটার এগিয়ে
চলছে। কোথায় গিয়ে এর চরম পরিণতি
হবে তা এখনও বলাব সম্ভব আসে নি।
রাজ্য সরকারের নতুন খাদ্যনীতি বাস্তবায়নে
উগ্র বামপন্থীদের তৎপরতায় ২৫ পবদন
জেলার আধাপাকা ধান জমি থেকে লুটে
হচ্ছে। সংঘর্ষ ইতিমধ্যে দুটি খুন হয়ে
গেছে। এবই বিপবীত দিকে ডঃ ঘোষ
পদত্যাগ করেছেন, কংগ্রেসের বিধানসভা
সদস্য যুক্তফ্রন্টের প্রতি তাঁদের সমর্থন
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, দুই তরফেই
লক্ষ্য একই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাবে। মো
হল রাজ্য সরকারের নতুন খাদ্যনীতি।
(৪।১১।৬৭) (চাববে)

ভারত দর্শন

হরিমানায় 'রাখো হরি' রব

তথাকথিত বিদ্রোহী কংগ্রেসীরাই (যাদের বিদ্রোহের কারণ গদিলাভ) বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার হয়েছেন তুরূপের ভাস। যে হাতে এই প্রায়শ্চন্দ্র কান্ড অবধারিত গণ্ডি তাঁরা আর জনাকরনক 'বিদ্রোহী' এই হিসেবে তাঁদের অমিত্যবিক্রমের অশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই দাঁড়ের পাখির মতো একবার বামে আরবার ডাইনে-নেচে নেচে ফিবছেন আর লাভাচ্ছেন। যেখানে এমন নতুন-কুদনে 'বিদ্রোহী'রা অবিচলিত, সেখানেও এক বা একাধিক এম এল এ নাচিয়ে তাঁরা পাটি গড়ে তুলেছেন। অকংগ্রেসী রাজ্যে কংগ্রেস আর কংগ্রেসী রাজ্যে বিরোধীপক্ষ মন্ত্রিসভার রণমঞ্চে বাইরে থেকে নারদ মারদ করে পুতুল নাচ নাচাচ্ছেন। জন-সাধারণ তথাকথিত বোহায়া নেতাদের বেল্পলাপনা দেখছেন। আর এই হ ব ব ল-এর রাজত্বে 'হিজ বিজ বিজ'রা হেসে খন।

মাত্র গত সপ্তাহে বীবেন্দব সিং-এর আত্মবিশ্বাসের সংবাদ ভারতদর্শনে হাজির কবতে পেরে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু মন্ত্রিসভাগর্ভেই যে মোবাদ এখন মূহুর্তমাত্রো দাভিস্বাস তুলছে। তাই, হরিমানা রাজ্য সম্পর্কে এ সপ্তাহেও বা এ পর্যন্ত সংবাদ, পাঠকের হাতে ভাবতদর্শন পৌছানোর পূর্বেই তার মধ্যে বিবাত ভেস্তানি ওলট-পালট হতে পারে। হরিমানা রাজ্যে লব্দলে এখন 'রাখো হরি' ভাব। তুরূপ ভাস দেবীলালই (তথাকথিত 'বিদ্রোহী' কংগ্রেস-নেতা) বর্তমানে সিংহাসনমলক উপাদান। তাঁকে ভজিবে-ভজিবে রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিং ছুটেছিলেন দিল্লী পর্বন্ত। ইতিমধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহান্ত্রী শ্রীও নাথ পদত্যাগ কবে মসলেন ধাঁ করে। অন্যদিক থেকে সগো লগে বণধীর সিং সাঁ কবে এসে জনসম্মে থেকে পড়লেন 'পুনশ্চ'। পাল্লার সতবাং এক বিযোগ এক যোগ হ'ল। ওদিকে হরিজন এম এল এ গুলালা একবার কংগ্রেসী শিবির থেকে পাযচাচি কবে ফিবে আসতেই মুখ্যমন্ত্রী টপ কবে তাঁকে পাল্লা-মেডারী সেরেটাবী নিমুক্ত কবে দিখেছেন। গুলালাল এই পোস্টটা হাতালেন খুব অল্প সময়ের শিবিবাল্লর পদচারণার মধ্য। গত সোমবার ইনি ছিলেন দেবীলাল গ্রুপে। ঐ দিনই সে দল ত্যাগ

করেন ও বৃধবার কংগ্রেসে নাম লেখাবেন এই মর্মে সংবাদ শোনা গেলে তাঁর কাছে 'পোস্টার অফার বার (?)। ব্যাস, গুলা-লাল ফিরে এলেন সংযুক্ত দলেই ঐ বৃধবার রাতে। এ বেন শেমার বাজার, দল চড়ছে, দর মামছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী কাল ফকির।

পরলা নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিধানসভায় 'রাখো হরি' অবস্থা ছিল এই রকম : সংযুক্ত দল-উনচাল্লিশ। কংগ্রেস-পঁত্রিশ। দেবীলাল গ্রুপ-চাব। এবং স্বতন্ত্র সদস্য মহান্ত্রী শ্রীও নাথ-এক।

দোসরা নভেম্বর সংবাদ কংগ্রেসী নেতা ভগবৎদয়াল শর্মা রাজ্যপালকে জানিয়েছেন যে, এই সময় ক্ষমতাসীন দলের অবস্থা বিধানসভায় কাহিল। একাধি সদস্যক সভার বিরোধীদের সংখ্যা চল্লিশ এবং দুটি আসন শূন্য। অতএব এয়ার মন্ত্রিসভা কংগ্রেসীদের ভাগে। শ্রীদয়াল দাবি করেছেন : রাজ্যপালের উচিত রাও মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া।

কিন্তু রাজ্যপাল মহোদয়ের বিড়ম্বনা বেশ উপলব্ধি করা যায়। তিনি জানেন, আর সকলের মতই তিনি জানেন, ঠিক যে সময় শ্রীভগবৎদয়াল তাঁকে কতব্যজ্ঞান বিতরণ করছেন, হয়ত সেই মুহূর্তেই আবার কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে উনচাল্লিশে। তাহলে রাজ্যপালকে দোয়াতে কলম ডুবিয়েই বসে থাকতে হবে পুনশ্চ মন্ত্রিসভার হের-ফেবের জন্য।

রাজ্যের তাবৎ কার্যাবলী এবং বিভিন্ন সমস্যা একই তিমিরে পড়ে থাকবে। যে রাজ্যে সবকারের স্থিরতা নেই সেখানে তো সবাই বাজা। তাই আর শাসন কানুনের বালাই রাখা কেন। দেদার শোষণেরই রাজত্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। সব এলোমেলো হয়ে গেছে, এখন লুটেপুটে খাওয়ার বিরাট সুযোগ। যে যেমন খুশি চল। কেন না রাজা তাঁর রাজত্ব সামলাতেই প্রতি মুহূর্তে 'গলদঘর্ম'। ভাগের মা'ব গুলালাল বাসনাখ ঘটি ঘটি করপোবেশমেব জল।

হরিমানার এই 'রাখো হরি' অবস্থা কিন্তু রাজ্যের সমুদয় সাধারণ মানুষকে যে অনিশ্চিতব সমুদ্রে ভাসমান রেখেছে তার বিষাক্ত ফলাফল ভবিষ্যতের অঙ্কে দোল খাচ্ছে।

গদি কাড়ানিয়া নেতাকুল যদি এখনো তাঁদের অস্ত্রের নোঙরা গোবর জলে নিকিবে সাফা না করেন তবে দেশব্যাপী

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সৃষ্টিতে অদূর ভবিষ্যতে ভীষণভাবেই নিজেদের নেত্রে পড়বে হবে। নেতাকিরি চিরতরে খতম হয়ে যাবে। আজকের নেতাকী এবং সংকট তাবৎ নেতাকী ফুলের মারা সৃষ্ট। এর সমুচিত জবাব ভয়ানক। সে দিন দূরে থাক।

কাশ্মীর :

শ্রী বি পি গজেন্দ্র গদকারের সভাপতিত্বে রাজ্যে অসাম্য এবং আঞ্চলিক আবাসীদের অভিযোগের তদন্ত করার জন্য একটি অননুস্থান কমিটি গঠন করেছেন কাশ্মীর সরকার। এই কমিশনের অন্যতম দূজন সদস্য হলেন কাশ্মীর বিষয়ক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সচিব শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ ও শ্রী বি এস এস সারাদজী। শেখোজজন ছিলেন ভারতের জাপানস্থ ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত।

কাশ্মীরের হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীপুরুষনাথ কাউল ১০ই নভেম্বর দিল্লী বা শ্রীনগরে আশ্রিত আত্মবিসর্জন কববেন বলে ঘোষণা কবেন। তাঁর দাবি জাম্মু ও কাশ্মীরে বাহুপতির শাসন চালু করা হোক। শ্রীকাউলের এবম্বিধ ঘোষণার তারিহ জীবনবন্ধার্থে সবকার তাঁকে আটক আইনে গ্রেপ্তার কবেছেন।

আটক শেখ আবদুল্লাহর মৃত্তি সম্পর্কে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক জানিয়েছেন, এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনও কেন্দ্রীয় সিংহাসন গ্রহণ কবা হয় নি। বঙ্গী গোলাম মহম্মদের রিষবটিও আরেগার কমিশনের বিচার্যধীন। বঙ্গাব ক্রিয়া-কলাপের প্রতি রাজ্য সরকারের কড়া নজর আছে।

পর্বতীয়া সমস্যা

ভারতের পূর্ব-সীমান্তে মিজো বিদ্রোহীদের অস্ত্রবাতমূলক কার্যকলাপ পুনরায় শুরুর হয়েছে। প্রকাশ, মিজো পার্বত্য জেলাব সদব আইজল শহবে তারা একমাত্র মহাবিদ্যালয়টিতে আশ্রি সংযোগ করে শহবে ইতস্তত গুলীবর্ষণ করে। কলেজ ভবন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মিজো বিদ্রোহীরা মিজো নাগবিকদেরও অপহরণ কবছে। সরকার নাগা-মিজো সমস্যাকে এবং তৎসহ পর্বতীয়া সমস্যাকে টাঙিয়ে রেখে দেশের মধ্যে নিয়ত অস্ত্রবাতী কার্য-কলাপের সম্ভাবনাকে জিইরে বেখেছেন। ফলত অনাগত মিজোবাও নিরাপত্তার অভাবে আতঙ্কিত হয়ে আছেন। এই সমস্যার আশ্রু সমাধানের জন্য আর কাল

বিলম্ব না করে চেষ্টা করা দরকার। ফোঁড়া পেকেছে, এখন অপারেশন হিল প্রব-
লেমস' দ্বারা দ্রুত না করলে বিপর্যাস
পরিব্যাপ্তি লাভ করতে পারে।

এ আই সি সি-র ঐতিহ্য লোপ

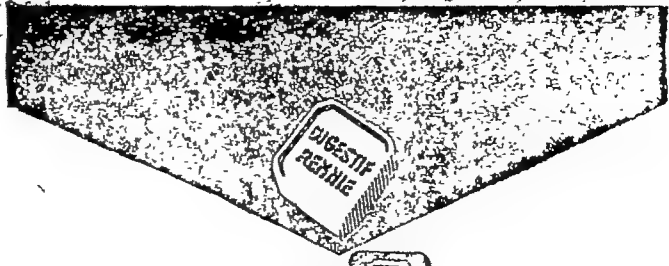
কংগ্রেস যে কেবলমাত্র দেশের শাসন-
কর্তৃক হাতে পেয়ে জনগণকে 'ন'-গণ্য
করেছেন, তাই নয়, আপন সংগঠনের
মধ্যেও সাধারণ সভাদের একেবারেই পাত্তা
দিতে চান না। ফলত সংগঠনে ভাঙন
ধরেছে। কাঁরা নেতা নন, গদিত্তে অনাধি-
কাবী তাঁদের কংগ্রেস সম্পর্কে কোনো বক্তব্য
গ্রহণ হচ্ছে না। তাঁরা কেবলমাত্র খন্দরে
এবং গান্ধীটপিতে কংগ্রেস; এ আই
সি সি'তে নির্বাক দর্শক, আঞ্চলিক
কংগ্রেসে আত্মবাহী। কংগ্রেসের এই
নেতা-সর্বস্ব রূপটি সম্প্রতি তুলে ধরেছেন
উড়িষ্যা থেকে নির্বাচিত এ আই সি সি
সদস্য শ্রীগদাধর দত্ত। শ্রীদত্ত কংগ্রেস হাই
কমান্ডের বিবৃতিতে এনেছেন ফ্যানসিমেস
অভিযোগ। তিনি বলেন, নেতাপদানত
কংগ্রেস তার ঐতিহ্য হারিয়ে, গুজ্জরল্যা
হারিয়ে ফ্যানসিস্ট সংগঠনে পরিণত লাভ
করেছে।

উদাহরণস্বরূপ তিন জব্বলপুর
অধিবেশনের টাটকা নিদর্শনও তুলে
ধরেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ এইরকম :

সদস্যদের অধিবেশনে কোনই মূল্য
দান করা হয় না। তাঁরা না পারেন আলো-
চনার অংশগ্রহণ করতে, না পারেন নেতাদের
ফ্যানসিস্ট নির্দেশের সমালোচনায় নামতে।
প্রস্তাবেব ওপর কোন সংশোধনী আনবার
অধিকারও সদস্যদের নেই। কেন না কোনও
সংশোধনী থাকলেও তা উত্থাপন না
কবেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জানিয়ে
দেন যে, প্রস্তারগুলি উত্থাপিত হয়েছে
বলেই ধরে নিতে হবে। এমত অবস্থায়
এ আই সি সি-র অধিবেশন অধুনা প্রাণ-
হীন আড়ম্বর মাঠে পরিণত হয়েছে।

শ্রীদত্তের এহেন পার্টি সমালোচনায়
ভারতের সাধারণ জনগণ হয়ত কিছু
সান্না লাভ করবেন এই ভেবে যে, সাধারণ
জনগণের চেয়েও কংগ্রেসী 'সদস্যগণ'
অধিকতর মনঃকোড়ে পীড়িত। সাধারণের
ভোটে নেতা বনে ভারত-অরণ্যে যে সমুদয়
কংগ্রেসী নেতারা পৌরুষহীন সিংহের
ন্যায় দাপাদাপি করে থাকেন তাঁদের ঘরে
বাইরে একই রূপ। অর্থাৎ তাঁরা আপন
কংগ্রেসী বিবরণেও অনুদ্রুপ ভোটে নির্বা-
চিত অবগ্যবাজ। ভোটদাতারা অসহায়
মেয়দুশ।

ভারতবাসীর এই মেয়-মনোভাবই
কতিপয় ব্যক্তির মনে অহংবোধকে উত্তপ্ত
শিখরে ন বধো ন তস্তা অবস্থায় গদিয়ান
থাকার সুযোগ দিয়েছে। ভারতীয়দের
মজ্জার মজ্জায় যে বাদশাহী তথ্যের আসন



রেন্নী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে

রেন্নীমাত্রই খাওয়া... তাড়াতাড়ি খাওয়া... যা আপনার সয় না, এমন ব্যক্তি
খাওয়া... এই সবের ফলেই পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এটি
অত্যধিক অ্যাসিডই বদহজমের কারণ—সেই পেট 'ভার-ভার' অবস্থিতিবোলে
পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা, পেটে জ্বালাবোধ। ডাইজেস্টিভ রেন্নী ট্যাবলেট বদহজ-
মের যন্ত্রণা ও অবস্থিতি তাড়াতাড়ি দূর করে।

কিন্তাবে রেন্নী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা বন্ধ করে :
আপনি যখন ডাইজেস্টিভ রেন্নী ট্যাবলেট চুষে খেতে থাকেন তখন ওব শক্তি-
শালী অ্যাসিডনাশক উপাদানগুলি আপনার মুখে গলে গিয়ে ধীরেধীরে আপ-
নার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরেধীরে পড়ার ফলে স্বাভা-
বিক ভাবে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় ক'বে ফেলে, তাতে অ্যাসিডের কোন
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না এক তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

ঐকসময় রেন্নী সঙ্গে রাখবেন :
বদহজমের যন্ত্রণা যে কোন সময় শুরু হতে পারে। তাই সবসময় ডাইজেস্টিভ
রেন্নী ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

বদহজমের
যন্ত্রণায়
ভুগবেন না—

ডাইজেস্টিভ
রেন্নী
ট্যাবলেট

ব্যবহার করুন—



নিকোলাস-এন্ড-সন্স লিমিটেড

RG 3-67&3

পাতা আছে, নামে গণতন্ত্রের আড়ালে তাই এখনো শির এবং অনড়। এজন্যই গদিতে একবার যিনি উপবেশনের সুযোগ পান তিনিই ধরাকে সরা জ্ঞান করে জগদীশ্বরোবা হয়ে যসেন আর আমরা তাই ঐতিহ্যানুসারে মেনে চলি।

কংগ্রেসী নেতাদের অহমিকা তো স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় নি। বাসশাহীতোষক প্রভাবকবন্দই তাঁদের অহংবোধকে এযাবৎকাল উৎসেক দিয়ে আসছেন। গদিকে এ দেশের মানুষ বড় ভীতির চোখে দেখে থাকেন। তাই গদি তাঁদের ঘাড়ের চেপে ধরে।

ভারবাহীর মনোভাব বর্তমান সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছাধীন ভরত স্বভাবে আবদ্ধ রাখছে ততদিন প্রকৃত গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ ঘটবে না। পাঁচ বছরে একবার ব্যালট বাস্তবে এক টুকরো অস্থ-ইচ্ছার মারা মসীলিপ্ত ভোটপত্র ফেলে দিয়ে আসলেও মুক্তি সম্ভব হবে না।

এটা মেনে সত্য ভারতের সাধারণ মানসিকবল্লবের ক্ষেত্রে, তেমন সত্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির বোকাবাহী ক্যাডারদের ক্ষেত্রেও।

অস্থিত এবং অপপ্রভাবকে মন থেকে তাড়াতে পাবলে চোখের ওপর মোহাজন অপসৃত হয়। জাগে আত্মবিশ্বাস ও সত্য-মিথ্যা নির্বাচনের মানসিক বল। এই সাহস ও সদাচার না থাকলে ক্যাসিজমের কবলে যে কোনো মুহূর্তেই ভাবতবর্ষকে দাসত্ব লিখে দিতে হবে।

ভারতের নাগরিকগণকে সুস্থ চিন্তা থেকে বঞ্চিত করে, বিভিন্ন সমস্যায় উৎপীড়িত করে, মুখ এবং অজ্ঞান, ভীত এবং দুর্বল করে রাখার চক্রান্ত তাই দেশের তাবৎ বাজনারীতিকবন্দ এক যোগেই করে আসছেন, এটাও সর্বশেষ লক্ষণীয়।

নেতারা বহুতব সমস্যার কথা বলেন, ভাষা নিয়ে দাঙ্গাবাজী করেন। আঞ্চলিক সমস্যার দাবানল প্রজ্বলিত করেন এবং গদি কাড়াকাড়ি করে জাতির জীবনের অমূল্য সময়ে অপচয় করেন। কিন্তু ভুলেও কখনো দেশের সব-বাড়ী সমস্যা শিক্ষার প্রতি অগ্রাধিকার দান করেন না। বাগিয়া চীন প্রভৃতি দেশের মুক্তি খুব বেশি দিন ঘটে নি এবং যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিউডাল আবহাওয়া থেকে সে সব দেশ মুক্ত হয়েছে ভারতের মুক্তি-পূর্ব অবস্থা তদপেক্ষা শোচনীয় ছিল না। কিন্তু সময়ের ব্যবহারের যদি তুলনা-মূলক হিসাব করা যায় তবে এদের আশ্চর্য অগ্রগতি দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। এসব দেশে সাধারণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার বিস্তারই জাতির আত্মবিশ্বাসকে সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবীতে যে কোনো বৃহৎ

শক্তির সমকক্ষ করেছে আপন আপন দেশকে।

ভারতের নেতৃবৃন্দ জাতির উন্নতি চান নি, চেয়েছেন তখতের বিলাস। তাই জাতি গঠনের দিকে নজর নেই তাঁদের, মজর জাতি-অবদমনে।

বস্তুত ফ্যাসিস্ট মনোভাব ম্যারাই আমরা পরিচালিত এবং ফ্যাসিস্ট দাস-শিববই আমাদের মতো দুর্বলচেতার উপযুক্ত স্থান।

দাসশিবির বললেই যে রকম মন্দীশালা বোঝায়, আমরা তেমন কোনো মন্দীশালায় নেই, সত্য কথা। কিন্তু আমরা অভাব, সমস্যা, উৎপীড়ন, পর-পদপীড়ন, অশিক্ষার চাবুক নিয়ত সহ্য করছি। বাঁধা গরু আর ছাড়া গরুতে যে তফাৎ, দাসশিবিরবাসী ও ভারত-বাসীতে সেইটুকু মাত্র উনিশ-বিশ। চারদিকে উভয়েই এক।

শ্রীগদাধর দত্ত কংগ্রেসীদের দাসত্বের বা অন্যভাবে বললে কংগ্রেসী নেতাদের দাসত্ব যে পরিচয় হাজির করেছেন, ভারতের সর্বত্র সব সংগঠনের চেহাবাই তেমনি, কারণ মূলত আমরা আমাদের মজাগত দাসত্বের বিবর থেকে আজও প্রকৃতপক্ষে মুক্তি পাই নি। সেই মুক্তি আন্দোলন আজও অপেক্ষায় দিন গুণছে।

সাম্প্রদায়িকতা এবং নেপো-রাজনীতি

কংগ্রেসের জন্মলপূর্ব অধিবেশনে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাগুলিকে বঠোর হস্তে দমনের জন্য যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সে প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন শ্রী এস কে পাতিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রবলে আসার আগে প্রস্তাব শ্রী মারা উত্থাপিত হ'ল, আলোচনা তাঁকে নিষেই শব্দ করা উচিত। ভারতদর্শনকার তাই কিছুকাল পিছিয়ে গিয়ে এ প্রশ্ন শব্দ করার পক্ষপাতী।

পাতিল সাহেবের মারা সাম্প্রদায়িকতা নামক ঘৃণ্য মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবটি এতদর্থে ঐতিহাসিক বটে। কেন না, কে না জানেন আর কেই বা অস্বীকার করবেন যে, মাত্র প্রায় বছর-খানেক আগেই সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাতিল সাহেবের আনুজ্যে কী মারাত্মক সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থান ঘটে বোম্বে শহরে যেখানে শিবসেনা নামক ছুই-ফেড় রাতারাতি প্রভূত অর্থবলের মালিক একটি সাম্প্রদায়িক দল গাজবে ওঠে কেবলমাত্র বোম্বে শহর থেকে দক্ষিণী খেদাও আন্দোলন করার জন্য। মূল উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণী হটাওয়ার নামে নেহরু-শিষ্য দক্ষিণ ভারতীয় শ্রীমুক্তি ডি কে কৃষ্ণমেননকে হটানো। শ্রীমুক্ত মেননের

পয়লা নম্বর শব্দ কয়েমী স্বার্থের সংরক্ষক এই পাতিল সাহেবেরই সমর্থন। কি সেদিন পদীর আড়াল থেকে শিবসেনা ও তস্য নেতা বাল ঠোকরে লাভ করেন নি।

শিবসেনা কোনো ধর্মীয় দল নয়, কিন্তু ঘৃণ্য আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ ছাড়িয়ে এই দল সেদিন যে তাড়ব নৃত্য করেছিল তার পেছনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের নিক্রিয়তার নামে সমর্থনই ছিল। আর এই সমর্থন রাখা হয়েছিল পাতিল সাহেবের পয়লা নম্বর প্রতিপক্ষ মেননকে নির্বাচনে পরাভূত করার জন্য। পাতিল সাহেবের মনোবাহা পুরণের জন্য কেবল-মাত্র বাল ঠোকরেই নয়, জনসংঘও শিবির খাড়া করেছিল। পাতিল সাহেব নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য (তার মনোনীত প্রার্থীকে পার করা বাব জন্য) সাম্প্রদায়িক শক্তির সহায়তা যে গ্রহণ করেছিলেন, বহু আলোচনার পর আজ তা আর অস্বীকারের উপায় নেই। শিবসেনার উগ্র ফ্যাসিজমকে নীরবে সেদিন মদত দিয়েছিল পাতিল সাহেবেরই বি পি সি সি। আজ পাতিল সাহেব সেই নোঙরা হাত মুছে ফেলার জন্যই কি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রস্তাবটা স্বনামে উত্থাপন করে হুতগৌরব পুনবর্জনের চেষ্টা পাচ্ছেন। ভারতবর্ষ অবশ্য এমনই এক দেশ যেখানে, মেননরা মাসাধিক কালের মধ্যেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান এবং পুনরুত্থান ঘটে পাতিলদেবই। সুতবাং পাতিল সাহেব এখন নতুন করে নামাবলী চাপাবেন বৈ কি। আবার রাজনীতির প্রাক্কণে সুবিধা লোটার ব্যবস্থা পাকা করতে হবে। জন্মলপূর্ব সে মওকা তাঁর হাতে তুলে দিল। দোসব হলেন ক্ষরুদ্দিন আজি সাহেব, যিনি কুট রাজনীতিতে বেশ সিম্বলভ করেছেন। সুতবাং পাতিল সাহেব আনাত এই প্রস্তাবের আলোচনায় নেমে অপরাধ বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বলতে এ দেশে যে ভুল ও প্রাপ্তি জমা করা হচ্ছে কতিপয় নেতার গদি রক্ষার তাগিদে—সেই কু-চক্রীদের মনোগত অভিপ্রায়ে সাধাবণের সামনে তুলে ধরার বিশেষ দায়িত্ব অস্বীকার করা গেল না।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আমরা বড়োতাম হিন্দু-মুসলিম রেখাবোধকে, কারণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাত তখন আজকের মতো তীব্র ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা অর্থে আজ বড়োতে হবে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পর্কের কথাই। আজ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নেই, আছে রাজ্য। এ কারণ

সাংবাদিক বহুমতীর মূল্য বৃদ্ধি

সাংবাদিক বহুমতীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম বাংলা, শহরকিল এবং বহির্বঙ্গেও সাংবাদিক বহুমতীর কথা এখন সর্বত্রের জনসাধারণের মুখে মুখে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাংবাদিক পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র সাংবাদিক বহুমতীই জনসাধারণের মনের দ্বার অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করে আসছে।

ইতিমধ্যে আমরা পত্রিকার কলেক্টর বৃদ্ধি করেছি, বহু বিচিত্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংযোজন করেছি। এর ফলে আনুমানিক দ্বায় বৃদ্ধি পেলেও পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নি।

১৯৬৩ সালে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হওয়ার পর সংবাদপত্র শিল্প একটার পর একটা গভীর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি হাল, নিউজ প্রিন্ট সরবরাহের আত্যাতিক কড়াকড়ি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে অন্যান্য পত্রিকার মত এই পত্রিকাও আর্থিক দুর্গতির মধ্যে চলেছে। তবু পাঠক সাধারণের অবস্থার কথা ভেবেই আমরা এতোদিন উন্নতির ঝুঁকি নিয়েও ২৫ পরগা মূল্যে পত্রিকা নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করেছি। কিন্তু দীর্ঘদিন এই ঝুঁকি নিলে পত্রিকার মানোন্নয়ন কণু হবে—এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না।

একতাবস্থায় আমরা আগামী ডিসেম্বর মাস, ১৯৬৭ থেকে পত্রিকার নামমাত্র মূল্য বৃদ্ধি করে পঁচিশ পরগার পরিবর্তে ত্রিশ পরগা করতে বাধ্য হচ্ছি।

আশা করি, অনুরাগী গ্রাহক ও পাঠক সাধারণ পত্রিকার আর্থিক অবস্থা বিবেচনাস্তে আমাদের সঙ্গে পূর্ববৎ সহযোগিতা দান করবেন।

কর্মীবাংক, সাংবাদিক
বহুমতী

(৫১১১৬৭)

প্রাদেশিকতার নামান্তরে বহু হচ্ছে আঞ্চলিকতা। কিন্তু আঞ্চলিকতা শব্দটি একই স্রোতের মধ্যে দুই অঙ্গুলের মানসিক বিচ্ছেদেরও দোষাতনা করতে পারে। অর্থাৎ প্রাদেশিকতার পূর্ণ ব্যাখ্যা ঐ শব্দে অনুপস্থিত। তাই প্রসঙ্গ অর্থে আঞ্চলিকতাকেও সাম্প্রদায়িকতাই বলায় হই। ভাষা এবং আচার-ব্যবহারের এবং ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানা ভেদে ভারতীয় বিভিন্ন নাগরিকগোষ্ঠীকে (বাঙালী, বিহারী, উৎকল প্রভৃতি) ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক 'সম্প্রদায়' হিসেবে গণনা করলেই অবস্থাটির পূর্ণ বিবরণ মেলে। এজন্যই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে কংগ্রেসী কর্তারা শিবসেনা, স্বরম সেবক সঙ্ঘ, তামিলনাড়ু ক্রীড়ম পার্টি, কুকী, মিজো, নাগা সম্প্রদায়কে গণ্য করেছেন। এই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলেরও (বাম কমিউনিস্ট পার্টির) নামোচ্চারণ দেখে অবশ্য উপাত্ত হাসি চাপতে হয়েছে। এরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ততা স্বার্থ উপলব্ধি করতে পারি নি। বিশেষত যে পাতিল সাহেব সাম্প্রদায়িকতা (ধর্মবিভেদের ক্ষেত্রে) রোধ করার মহৎ (!) ইচ্ছা নিয়েও জনসংঘের মত ধর্মীর গোড়ামীর দ্বারা পরিচালিত দলকে চিহ্নিত করতে অস্বাভাবিক বেগ পেয়েছেন, তাঁরই দলভুক্তরা বাম কমিউনিস্টদের সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞার ফেলে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন কী করে! গায়ত্রীলাল কোন পর্ব্বারে উঠলে এমনটা সম্ভব!

যাই হোক, অধীনের বক্তব্য, আজ আর সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় অসহনীয়তাকে বুঝি না। বুঝি এক গোষ্ঠীর ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর নাগরিকের সম্পর্ক। এই বৃহদর্থেই সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করলে দেখা যাবে, সাধারণ মানবের অন্তরে এই গোষ্ঠী-বিশেষ আদৌ ক্ষুণ্ণতা লাভ করে না, কুটিল রাজনীতি ব্যবসায়ীরাই এই বিশেষকে জোর করে একটি গুণ্ডা-সম্প্রদায়ের দ্বারা সাধারণের ওপর আরোপ করে থাকেন। সাধারণে বিম্বষ্ট না হলেও এখন একটি নির্বিচার বুদ্ধিবৃত্তের আয়োজন হয়ে থাকে তখন নিতান্তই আপন আপন ধন-প্রাণ রক্ষার জন্যই তাঁদেরও সে যন্ত্রের সৈনিক হতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে। দেশের মধ্যে আজ ধর্মীয় অসহনীয়তা সাধারণ মানবের মধ্যে অনেক কমে গিয়ে থাকলেও রাজনৈতিক চক্রান্ত জোর করে সেই ছাইচাপা

আগুন উজ্জ্বল দিয়ে দলীয় স্বার্থ নিশ্চয় করেন। কোথাও জনগণই উৎকট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে মারাত্মক হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছেন এমন নাজির মুসলিম লীগের 'ডাইরেট এ্যাকসান ডে' থেকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। সেদিনও রাজনৈতিক খেলই মানবের রক্তে পা ধরেছিল। সাম্প্রদায়িকতার মূলে যে দুর্বল কুটনীতির খেলা এই মধ্য-যুগীয় অশিক্ষিত দেশে অবশ্যই চলতে পারে তার জন্য সবটুকু অপরায়ণ চাপানো যায় দেশের সেই সব ভালোমানুষ নেতাদের ওপর যারা অবশ্যে বিশ বছর রাজত্ব করেও মানবকে রাজনীতির স্বার্থে সেই মধ্য-যুগীয় অন্ধকারের মধ্যেই নির্মমিত রেখেছেন এবং সেই অজ্ঞান অশিক্ষার সুযোগে নিজেদের পশু নেতৃত্বকে টাঁকিয়ে রাখার চেষ্টা পেয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, কমতাসান সরকার ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলি নিষ্ক্রিয়তার ছদ্মবেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেশে সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক বিশেষকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার অবাধ সুযোগ দিয়ে এসেছেন। এই কুট রাজনীতিটো সম্ভবত ইংরেজ সরকারের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকবে। প্রবাদ আছে, 'নেপোর দই মারা' নিয়ে। রাজনীতি এখন কতকগুলি দলীয় মোড়লের দুর্বলতার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন রাজনীতির মধ্যে বুদ্ধি বুদ্ধি শূন্য ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে; সে রাজনীতি হয়ে পড়ে দুর্বল 'নেপো-রাজনীতি'। নারদ নারদ করে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে একের বিরুদ্ধে জোঁড়িয়ে দিয়ে সেই বহু উচ্চারিত নেপোর মতই অক্ষম নেতারা এলোমেলো অবস্থার সুযোগে দখলভাঙ করায়ত্ত করে নিয়ে যান। ভারতে সাম্প্রদায়িক বিশেষ জ্বিয়ে রাখার মূলেও ঐ নেতারা নেপো-রাজনীতিই সক্রিয়। তাই পাতিল সাহেব তাঁর পূর্ব কীর্তি ঢাকার জন্য যে প্রস্তাবই আনন্দ না কেন, সেটাও একটা রাজনৈতিক চাল। তার দ্বারা দেশজোড়া মূখতার উনিশ-বিশ হবে না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও এভাবে রোখা যাবে বলে মনে হয় না। একমাত্র সং রাজনীতি এবং গণশিক্ষাই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে নেপো-রাজনীতি এবং সাধারণ মানবকে রক্ষা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক

অক্টোবর বিপ্লব-জয়ের পর লেনিন জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন

সোভিয়েট ইউনিয়ন : মস্কো

“অক্টোবর বিপ্লব মানুষ তৈরি এবং সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট নিরীক্ষার সূচনা করেছে। গত ৫০ বছরে সোভিয়েট জনগণ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে এবং সারা পৃথিবীর সম্রাধ প্রাংশসা অর্জন করেছে। অনেক বাধাবিপত্তি ও চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছে কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নাৎসীবাদের হাত থেকে আবিষ্যম্য চড়া মূল্যে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন—” সোভিয়েট অক্টোবর বিপ্লবের ৫০তম উৎসব বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট সরকার ও তার জনগণের কাছে এই অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেছেন।

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে সারা সোভিয়েট দেশে উৎসবের বন্যা বইছে। মস্কো নদীর তীরে ক্রেমলিনের সর্ববৃহৎ পার্ক ইভানস্কায়্যা স্কোয়ারে বিপ্লবের নেতা লেনিনের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে সাতদিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘোষন করা হলো। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী লিওনিদ ব্রেজনেভ। দেড় মিটার উঁচু পেডেস্টাল বা ছুঁটির উপর সাড়ে তিন মিটার উঁচু ধূসর রঙের মূর্তিটির আবরণ বধন উন্মোচন করা

হলো তখন উপস্থিত হাজার হাজার নরনারী করতালিধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

উৎসবে যোগ দেবার জন্যে সারা পৃথিবী থেকে বিশিষ্ট শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, পার্লামেন্টারিয়ান, শান্তি বোম্বার এসেছেন। সমস্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র থেকে সরকারী কর্তারা এসেছেন, এসেছেন আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকেও। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, মস্কোস্থ প্রাক্তন ভারতের রাষ্ট্রদূত কে-পি-এস মেনন, দুই এস-এস-পি নেতা শ্রী এম এম বোশী এবং শ্রীমধু লিয়ারে এসেছেন।

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে মস্কোর ‘ফ্রেণ্ডশিপ হাউস’-এ একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হলো। এতে শ্রীমেনন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি তাঁদের ভাষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের প্রতি অক্টোবর বিপ্লবের অবদানের উল্লেখ করেন। অক্টোবর বিপ্লব শব্দ রাশিয়ার বা শব্দ ইয়োয়োরোপেরই একটা ঘটনা নয়, এ-ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সারা পৃথিবীর পক্ষেই সীমাহীন। অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গঠিত হয়, শোষিত ও অত্যাচারিত জনগণের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তামাম দুনিয়ার মেহনতী মানুষ অক্টোবর বিপ্লবের মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত থেকে

অফুরন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে আসছে—বলে বিভিন্ন বক্তা ওই সভায় উল্লেখ করেন।

৬ হাজার প্রতিনিধির বৌধ অধিবেশনের উদ্‌ঘোষন করলেন সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পদধারী। এই সভাই উৎসবের প্রথম প্রধান ঘটনা। সভায় পার্টি সেক্রেটারী মিঃ ব্রেজনেভ গত ৫০ বছর সোভিয়েট বিজয় ক্ষেত্রে কী কী উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তা বর্ণনা করে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। বিশ্বের সর্বহারা সংগ্রামী মানুষের কাছে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে একটা উজ্জ্বল আশার প্রতীক—মিঃ ব্রেজনেভ জয়েন্ট সেশনে তাই বলেছেন। এ ছাড়া তিনি বিশ্বের ঘটনাবলীরও উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েটের আদর্শ ও সাহায্যে চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্প্রতি এখানে যে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে জঙ্গী কার্য-কলাপ চালিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ব্যাহত করছে তার নিন্দা করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান সহজ হতো যদি চীন উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েত কংদের কাছে সোভিয়েট সাহায্য প্রেরণে বাধা না দিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। চীনের নিন্দাধ্বনি শুনে চীনা প্রতিনিধিরা সভাস্থল ত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিত রাষ্ট্র হলো আলবেনিয়া, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি।

মিঃ ব্রেজনেভ একটা নতুন বিশ্ব

কমিউনিস্ট সম্মেলন আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করেন তাঁর ভাষণে। তিনি বলেন এ-সম্মেলনের জন্যে তাঁর সরকার ও পার্টি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন, কিন্তু সম্মেলনটি হবে কোথায় হবে সে-সম্পর্কে তিনি কোন ইঙ্গিত দেন নি।

বিশ্বের সেরা অস্ত্র সোভিয়েটের আছে—এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মিঃ ব্রেজনেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দেন যে ভিয়েতনামে যদি নাৎসী ধরণের অত্যাচার বন্ধ না হয় তবে তার পরিণাম তাঁদের ভূগতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত আছে বলে পার্টি সেক্রেটারী সকলকে জানিয়ে দেন।

আফ্রিকা : কঙ্গো

ভাড়াটে শ্বেতকার সৈন্যদের উৎপাত এখনো শেষ হলো না। কাতাঙ্গার কিনশাসা বেতার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সম্প্রতি পতু'গীজ আঙ্গোলা থেকে নতুন করে এক "বর্বরোচিত আক্রমণ" শুরু হয়েছে। আঙ্গোলাকে ওই বেতারে বিংশ শতাব্দীর বোম্বেটের জঘন্য বাসা বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এখান থেকে কয়েকটি ট্রাক বোম্বাই ভাড়াটে সৈন্য কাতাঙ্গার ডিলোলো শহরে আক্রমণ চালিয়েছে। একটি অসমর্থিত লেখানো ভাড়াটে সেনাদের হাতে জাজোভিলের পতন ঘটেছে বলে বলা হলো যে বেতার বলেছে যে সম্ভাব্য ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে কঙ্গোলী সেনা-বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কঙ্গো প্রেসিডেন্ট জোসেফ মবুতু

ঘটনাটির প্রতি রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পতু'গালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আবেদন করেছেন। আফ্রিকাতে সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রদেরও এই আক্রমণের কথা জানানো হয়েছে।

কঙ্গোর বৃকাতুতে গত তিনমাস ধরে প্রায় একটানা হাঙ্গামা উৎপাত চলাচ্ছে ভাড়াটে শ্বেতকার সৈন্যরা। তাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, এবং বৃটেনের সৈন্যরা। নেতৃত্ব কোথাও বেলজিয়ানের হাতে কোথাও বা ফরাসীর। ফরাসীর স্বার্থ এখানে রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিউবা থেকে বহিস্কৃত কৃষ্ণ সৈন্য আছে। আর কৃষ্ণকার বিদ্রোহী কাতাঙ্গান তো রয়েছেই। যাই হোক, এদের মিলিত শক্তি হাজার-বারোশ'র বেশি হবে না, যা নিয়োজিত পনের হাজার কঙ্গোলী সেনা বাহিনীর কাছে কয়েক মূহুর্তেও দাঁড়াতে পারতো না। কিন্তু এরা দখল করেছে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ, আর মনোবলও অটুট রয়েছে এদের নেতা কর্নেল শ্রাম-এর। ভাড়াটে সৈন্যদের নিজস্ব কোন লক্ষ্য অবশ্যই নেই, এরা কাজ করছে বিতাড়িত ও গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট শোম্বের জন্যে যিনি এখন আলজেরিয়াতে বন্দী জীবনযাপন করছেন। কিন্তু কর্নেল শ্রাম-এর মনোবল যতই অটুট থাকুক বা তাঁর আত্মবিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, প্রবল সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়ার শক্তি কতটুকু? বাস্তবিক আদর্শহীন ভাড়াটে সৈন্যরাও এভাবে অনিশ্চয়তার পেছনে অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে ছুটে বেড়াতে আর ইচ্ছুক নয়। কাতাঙ্গা সরকার যদি তাদের ওপর শাস্তিপ্রস্তাব কোন সম্বন্ধে গ্রহণ

করবেন না বলে আশ্বাস দেন তবে এখনি অস্ত্র সংবরণে রাজী হবে বলে মনে হয়।

ইরান : তেহরান

জাকজমক যদি একটা অন্তর্ধানের সাফল্যবিচারের নিরিখ হয়ে থাকে তবে মহম্মদ রেজা শাহ পহলভীর অভিষেক উৎসব বোধ হয় অক্টোবর বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তীকেও হার মানায়। তাঁর ৪৮তম জন্মদিনে ইরানের আধিপতি রেজা শাহ ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর অভিষেক চিহ্নিত করলেন রাজত্ব লাভের ২৬ বছর পরে। এ-অভিষেক বহু আগেই সম্পন্ন হতে পারতো কিন্তু রাজপ্রাসাদ থেকে বলা হয়েছে যে একটা গরীব দেশের রাজা হয়ে মাথায় মুকুট পরার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। বেদিন দেশবাসীর দারিদ্র্য তিনি ঘোচাতে পারবেন, মুকুট ধারণের যোগ্যতা সেদিন অর্জন করবেন তিনি।

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিলো। ৭ বছর আগে পর্যন্ত ইরান-সম্রাট ছিলেন অপূর্ণ। তাঁর দু-রাণীর কেউই তাঁকে পুরুষ উত্তরাধিকারী উপহার দিতে পারেন নি। তৃতীয়া ফারা দিবাই তাঁকে পুত্র সন্তান দিয়েছেন, আজ শুবরাজ রেজা ইরানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ২৬ বছরে শাহ পহলভী দেশে বিরাট অর্থ-নৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছেন। ভূমিসংস্কার ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দেড় কোটি ইরানীর জীবনে নতুন প্রাণবন্ততার সঞ্চার করেছেন। কাজেই আজ তিনি অভিষেক উৎসবের যোগ্যতা অর্জন করেছেন বৈকি! কিন্তু মূল অন্তর্ধানটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সকাল ৭টার ১৫ বাটাগুলির



মহম্মদ রেজা শাহ পহলভীর অভিষেকের পরে গৃহীত আলোকচিত্র

সেনা বাগ-এ-শাহ সেনানিবাস থেকে যাত্রা করলো তাদের নির্দিষ্ট জায়গার পাহারা দেবার দায়িত্ব নিয়ে। বেলা ১০টার শাহ পহলভী সন্মাজী ফারাকে নিয়ে একটা স্বর্ণশঙ্কটে মার্বেল প্রাসাদ থেকে অনুষ্ঠানক্ষেত্র গুলিস্তান প্রাসাদে যাত্রা করলেন। সেখানে অভিষেকমণ্ডে শাহনশাহ আসন গ্রহণ করলেন বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসনে, তাঁর ডান পাশে সন্মাজী ফারা, বাম পাশে ৭ বছরের বুঝরাজ রেজা পহলভী। গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে তেহ-রানের ইমাম শাহনশাহকে পবিত্র কোরাণ চুমন করলেন। এরপর শাহ একটা বিশেষ কেবলে পরলেন কোমরে, হীরক-খচিত তরবারি আঁটলেন কারদাদকস্ত-ভাবে। তারপর থালা থেকে মণি-মাণিক্য-খচিত মুকুটটি তুলে নিয়ে ধারণ করলেন মাথায়। ১০১ বার তোপধ্বনি হলো, কাজানাকাড়া বহু বাদ্য বাজলো, উড়ো-জাহাজ থেকে গোলাপের শাহনশাহর আর সমান ১৭৫০২টি গোলাপ বৃষ্টি হলো। প্রজাকুল হুটু গোড়ে 'জাবিদ শাহ' (শাহ দীর্ঘজীবী হোন) ধ্বনি মিলো। কাস, উৎসব শেষ। এর পর

মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করা হলো শাহর দীর্ঘজীবন, শানাপনা চলাতে লাগলো শহরে নগরে প্রান্তরের প্রান্ত-সীমানায়।

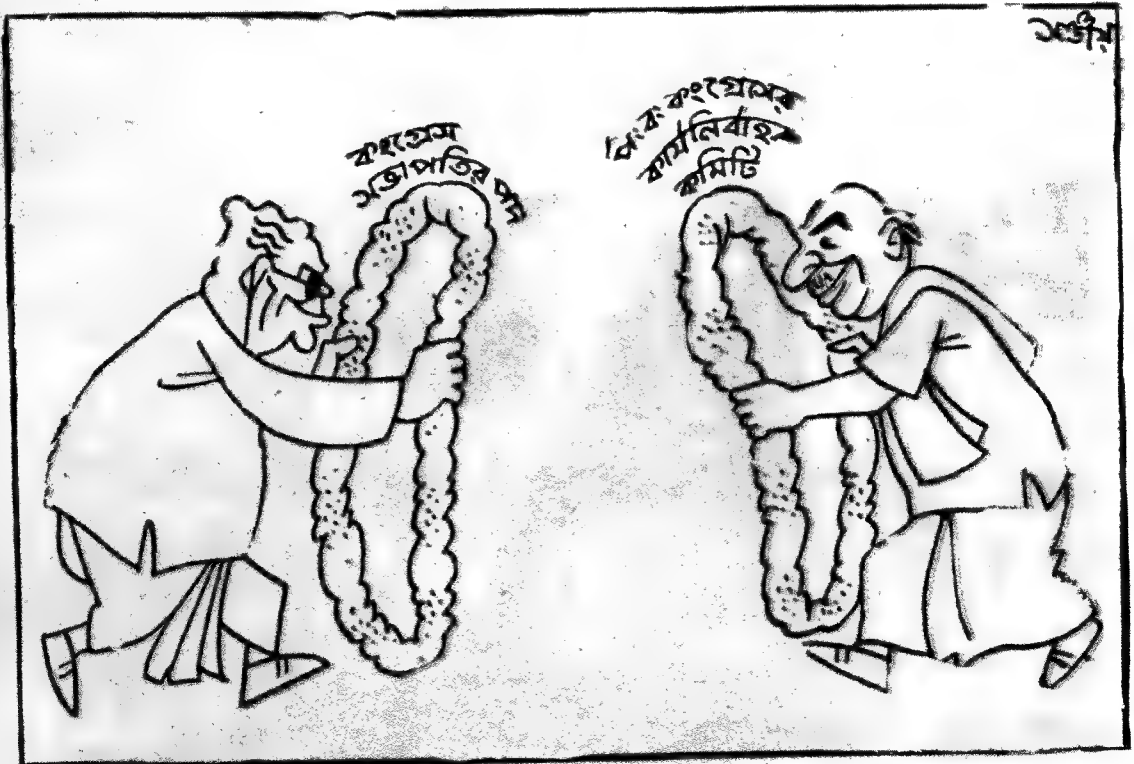
জাঁকজমকের কথা যা বলছিলাম। একটি মাত্র অনুষ্ঠানে এতটা জাঁকজমক আমাদের মতো ছুঁছ রিপোর্টার দূরস্থান অনেক বড় বড় রাজামহারাজারও দেখার সুযোগ হয়েছে কি না সন্দেহ। ৩৭৫৫টি হীরা, মণি-মুক্তা খচিত তাঁর মুকুট চোখ ঝাঁপিয়ে দেয়। যে ঐতিহাসিক ময়ুর সিংহাসনে তিনি উপবেশন করলেন সেটি ছিল ২৬,৭০০ হীরা, চুণি, পান্না দিয়ে তৈরি। ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠ করার সময় এটা হস্তগত করে-ছিলেন। ফরাসী স্বর্ণকাররা সন্মাজীর জন্যে যে মুকুট তৈরি করেছে তাকেও রয়েছে ১৪৬২টি হীরা, ২০৫টি মুক্তা, ৩৬টি চুণি ও ৩৬টি পান্না। যে স্বর্ণ-শঙ্কটে চড়ে রাজকীর যাত্রা হলো তার ৭টি ধূসর রঙের অশ্ব আনা হয়েছে হাংগারী থেকে, হীরা চুণি দিয়ে তৈরি শকটটা ভিয়েনার তৈরি।

এ উপলক্ষে সন্মাজ রেজা একটা

ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করলেন, সন্মাজীকে রাজসিংহাসনে বসার অধিকার দিয়ে যা ইরানের ২৫১৩ বছরের রাজ-তন্ত্রের ইতিহাসে কখনো ঘটে নি। রেজা শাহ ফারাকেই বুঝরাজের বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি (Regent)-এর সম্মান দিলেন।

অভিষেক উৎসব কেবল রাজপ্রাসাদেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, সারা ইরানে ১৭ হাজার ভোজ উৎসব হয়েছে, বাজী পুড়েছে কোটি কোটি টাকার। উৎসবের আনন্দ থেকে যাতে সাধারণ কয়েদী পর্যন্ত বাঞ্ছিত না হয়, সেজন্য শাহনশাহ প্রায় ৫ হাজার অপরাধীকে ক্ষমা করেন ও মুক্তি দেন, প্রায় ২ হাজার বিচারপ্রার্থীর ওপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন। অভিষেকের দিনে সন্মাজীর জন্মভূমি গিলান প্রদেশে যে সমস্ত শিশুর জন্ম হবে তাদের সবাইকার জীবনসীমার খরচ ইরান সরকারই বহন করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া অভিষেক উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে এদিন শত শত স্কুল, কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করা হলো। এমন উৎসব প্রত্যাক করার সুযোগ কখনের হয়েছে?

ডেট—



যা দৈখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখীবজ্রন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১ চার ১

লর্ড উইলিয়ামস এখানে জজ হবার আগে বিলেতে যখন প্রাকটিস করতেন তখন K. C. অর্থাৎ Kings Counsel হয়েছিলেন। তিনি হাইকোর্টে বিলাতী জজদের মত মাথার পরচুলা (উইগ) লাগিয়ে বসতেন। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে কি করে ওই ধূতুনীর মত জিনিষটা মাথার পরতে ও রাখতে পারতেন জানি না। যেম্নে মাথার ব্রহ্মতালটো নিশ্চয়ই জল হয়ে যেত। দৃষ্ট জর্নিয়াররা বলতেন যে ওই ঘামেই জজ সাহেবের গরম মাথাটা ঠাণ্ডা থাকত। লর্ড উইলিয়ামস সাহেব যখন চেম্বার দরখাস্ত শুনতেন তখন তিনি এজলাসের উপরে না বসে নিচে যেখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেকর্ডাররা বসেন সেইখানে বসতেন। জজ অত কাছাকাছি বসলে কৌশলীদের একটু অসুবিধাই হয়, কেন না দূর থেকে কৌশলীদের বহাসের আশ্বাসন হতটা সম্ভব হয় অত কাছে বসলে তা হয় না। এতে করে চেম্বার দরখাস্তগুলো খুবই সংক্ষেপে অল্প সময়েই হয়ে যেতো। একবার লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের মাথার ঢুকল যে এই দিশী ব্যারিস্টার সাহেবগুলোকে ঠিক মত প্লেট লিখতে শিখিয়ে দিতেই হবে। তার হুকুম মত সব প্লেট তাঁর কাছেই দাখিল করতে হতো। তিনি তক্ষুণি সেগুলি ছেঁটে কেটে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। কোথায় লাসে “Bullen and Leake” এর প্লেটের নমুনা। তিনি বলতেন আজি দাওয়াটা খুব সংক্ষেপ করাই হবে, নইলে আবলতাবল বাজে কথা ঢুকে গিয়ে মামলাটার আসল সারাই ঢাকা পড়ে যায়।

একটা মজার কথা মনে পড়ছে। আমীর আলি সাহেব তখনো জজ হন নি। তিনি একটা প্লেট লিখেছিলেন। সেই প্লেটে একটা প্যারার আমীর আলি সাহেব কি যেন একটা আইনের সতের উল্লেখ

করে একটা বিকল্প দাবি (alternative claim) করেছিলেন। লর্ড উইলিয়ামস সাহেব ঝট করে সেই প্যারাগ্রাফটা কেটে দিয়ে মন্তব্য করলেন “প্লেটে খালি ঘটনাবলী (facts) সংক্ষেপে বলতে হবে কিন্তু প্লেটে আইনের সতর উল্লেখ করা অবিধেয়, কেন না আইন যা আছে তা আছেই; তুমি লিখলেও আছে, না লিখলেও আছে।” আমীর আলি সাহেব যে এতে খুব বেশি রকম নম্রাহত হয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। হাই হোক, কিছু দিন পরে হবি ভ হ সেই মামলাটার জবাব-দাওয়াটা লেখবার জন্যে রাফ এলো আমার কাছে। বাদীপক্ষের এটর্নী প্লেটের যে কপি আমার এটর্নীকে দিয়ে-ছিলেন সেটা ছিল প্লেটের আদি রূপ এবং তার মধ্যে লর্ড উইলিয়ামস সাহেব যে কাটাকুটি করেছিলেন তার হুবহু নকল। অর্থাৎ সেই আপত্তিজনক প্যারাটো ছিল এবং তার উপর দিয়ে দৃষ্টো ত্যারছা-কাটা দাগও ছিল। ঐ ধরনের বিকল্প দাবি আমরা হামেশাই লিখে থাকি। কোন জজেরা তা আগে আইনের সতের উল্লেখ আপত্তি তোলেন নি। যে আইনের সতের উপর নির্ভর করে আমীর আলি সাহেব বিকল্প দাবিটা করেছিলেন আমার মতে সেই আইনটা আমাদের কেসে লাগু হতে পারে না। কি করা যার ওই কাটা প্যারাগ্রাফটা নিয়ে? কোন জজের কাছে সে মামলা শেষ পর্যন্ত উঠবে তা কে জানে। সে জজ যদি ধরে বসে যে বিবাদী তা বলে নি যে ঐ আইনটা এ কেসে খাটে না। তখন একটা কারদা করতে হোলো। সেই কার্ড প্যারাটা যেন কাটাই হয় নি এই ধরে নিয়ে তার জবাবে আমার জবাবদাওয়াতে একটা প্যারাগ্রাফে লিখলাম যে বাদীর বিকল্প দাবি একেবারে অচল, কেন না যে আইন বলে তিনি ঐ দাবি করছেন সে আইনটা আমাদের কেসে প্রযোজ্যই নয়। লিখে আমিও জবাবদাওয়ার সেই প্যারাটা

দৃষ্টো ত্যারছা লাহন দিয়ে কেটে দিলাম। জবাবদাওয়া দাখিল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মামলাটার কি হোলো মনে নেই। খুব সম্ভব মিটেই গিয়েছিল।

লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের একটা প্রবল ন্যার-অন্যার জ্ঞান ছিল। যদি তাঁর একবার ধারণা হতো যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে ঠকাচ্ছে তবে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যে কোন রকমে সুবিচার করতে। আইন তিনি ভালই জানতেন। আইনের বিধান জজও অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে সুবিচারের স্বার্থের তিনি দোষীপক্ষ ও তার সাক্ষীদের জেরায় হয়রান করে মোটা ঘটনাগুলিকে বের করে এনে আইনের পাশ কাটিয়ে ন্যায় মত রায় দিতেন। আপীল কোর্টে জজের “findings of facts” উল্টানো সহজসাধ্য হতো না। একবার ঐ রকম একটা কেস আমার কাছে এসেছিল। আমার জর্নিয়ার ছিলেন শংকরদাস ব্যানার্জি যিনি পরে এ্যাজডেকেট জেনারেল হয়েছিলেন। ঘটনাটার মধ্যে মারপাট ছিল না। ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে মিউনিসিপ্যাল অপিসের দিকে গেছে গ্র্যান্ট স্ট্রীট, না, অন্য কি একটা রাস্তা। তার উপর ছিল একটা মসত পুরনো বাড়ি। সেটা খুবই জীর্ণ হয়ে পড়ার তার আদ্যোপান্ত মেরামত দরকার হয়। বাড়িটি ছিল একটি ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। মাতৃস্বামী সেই বাড়ি মেরামত করবার জন্যে বাদীকে কন্ট্রোল নিষ্পত্তি করেন। বাদী বেশ তড়িৎবলি করে সেই মেরামত কাজ শেষ করলেন এবং সেই একই কন্ট্রোল বলে অনেক জিনিষপত্রও সরবরাহ করলেন, যেমন মূখ মোবার বোল, অয়না, টাওয়েল ব্যাক এবং আরো কত কি। বাদী কন্ট্রোলার মাঝে মাঝে কিছু টাকাও পেয়ে-ছিলেন। তিনি ফাইনাল বিল পাঠালেন বড়ী টাকার জন্যে। নানা টালবাহানা করে মাতৃস্বামী আর টাকা দেন নি অনেক তাগাদা সত্ত্বেও। বেচারী কন্ট্রোলার আর

কি করেন তিনি ওয়াকফ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা করলেন বাকী টাকা হারানো। টাকার অক্ষটাত্ত ছিল বেশ ভারী রকমের। স্বাধীনতা সময়ে জবাবদারী দাখিল হোলো এই মর্মে যে মাতুলসালীটি অতি জোড়ার এবং সে ওয়াকফ সম্পত্তি চুরি করে ফাক করে দিয়েছে। এ হেন মাতুলসালীর দেনার জন্যে ওয়াকফ এস্টেট দায়ী হতে পারেন না। ওয়াকফ এস্টেটটা ছিল মুসলমান আইনে থাকে বলে wakf-alal-aulad অর্থাৎ সম্পত্তির উপস্থিত বর্তমান পর্যন্ত ওয়াকফের বংশ-ধরেরা থাকবেন ততদিন তারাই পাবেন এবং ওয়াকফ নির্বংশ হলে সেটা আমার নামে গরীবদের দান খরচাতে ব্যয়িত হবে। এই রকম ওয়াকফ সম্পত্তি মানুসের স্বাধীনতাই সন্দেহ থাকে যে এটা করা হয়েছে কেন পাওনাদারদের ঠিকানর জনেই। কেন না গরীবদের কাছে কবে যে দান পৌঁছাবে তার স্থিরতা নেই। কিন্তু মুসলমান আইনে এই ধরনের ওয়াকফ সিম্ব বলেই করা হয় এবং অনেক ধর্মিক মুসলমান খুব ভক্তির সঙ্গেই এই রকম ওয়াকফ করে গেছেন। বহুদিন হোলো, আইনের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই নেই, চর্চা ত' নেই-ই। তবু যেটুকু মনে আছে এ বিষয়ে আইনটা খানিকটা এই ধরনের—মাতুলসালী ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক নয়। এক রকম ম্যানেজার বলেই চলে। যে যখন ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে বাইরের কারো সঙ্গে কোন চুক্তি করে সে চুক্তিটা মাতুলসালীর ব্যক্তিগত চুক্তি—অর্থাৎ ওয়াকফ সম্পত্তি সেই চুক্তিতে কোন রকমে আবদ্ধ নয়। বাইরের পাওনাদারের দাবি হবে মাতুলসালীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে। যদি মাতুলসালী সংলোক হন এবং এস্টেটের ল্যাঞ্চে যদি মাতুলসালীর বাইরের লোকের কাছে দেনা হয় তবে সেই দেনার জন্যে মাতুলসালী ওয়াকফ এস্টেটের কাছে খেসারত পাবেন। মাতুলসালীর ওয়াকফ এস্টেটের বিরুদ্ধে এই দাবির নাম হচ্ছে right of indemnity মাতুলসালীর যদি right of indemnity থাকে তবে মাতুলসালীর পাওনাদার মাতুলসালীর এই right of indemnity-র সুযোগ পান মাতুলসালীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। একে বলে পাওনাদারের right of subrogation এখন কথা হোলো যে আমাদের এই কেসে মাতুলসালী, যার সঙ্গে বাদী কণ্ট্রাক্টরের চুক্তি হয়েছিল, তার ওয়াকফ এস্টেটের বিরুদ্ধে right of indemnity আছে কি না। যদি থাকে তবেই বাদী ওয়াকফ এস্টেট থেকে সরাসরি টাকা পাবেন। কিন্তু মাতুলসালী নিজেই যদি ওয়াকফ এস্টেটের কাছে খণী থাকেন আপন অসং কর্মের ফলে তবে তার

right of indemnity থাকতে পারে না এবং মাতুলসালীর right of indemnity না থাকলে পাওনাদার বাদীও ওয়াকফ এস্টেট থেকে এক পয়সাও পাবেন না। এ রকম অবস্থায় বাদীকে মাতুলসালীর ব্যক্তিগত নামে ডিক্লি পেয়েই সম্পূর্ণ থাকতে হবে। সে ডিক্লি কোন মূল্যই নেই। কেন না মাতুলসালী বেশির ভাগ সময়েই নিজে কপদক'হীন। এই সব কথা যখন ডাবিহিলাম তখন আগের কেসটা শেষ হোলো। এইবার আমাদের কেসটার ডাক পড়বে। জুনিয়ারের দিকে তাকালাম। তিনি জজের দিকে চাইলেন এবং ইঙ্গিত করলেন যে জজই তরসা। মুখে বললেন—“দাদা, তুমি আরম্ভ ত' কর। দেখ না কি হয়। মরার বাড়ি ত' গাল নেই।”

খুব আস্তে আস্তে ফলাও করে কেসটা আরম্ভ করলাম। জীর্গ বাড়টার স্বর্ণনা দিয়ে জরুরী মেরামতের প্রয়োজন দেখিয়ে বাদী কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে ওয়াকফ এস্টেটের তরফ থেকে কণ্ট্রাক্টরের কথা বললাম। মাতুলসালীর সেই করা এস্টেটটা জজ সাহেবকে দেখালাম। বাদী কি রকম খেটেখুটে মেরামতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে দিয়েছে এবং মাতুলসালীর ইঞ্জিনিয়ারের কর্মপ্রসন সার্টিফিকেট পেয়েছে তা বললাম। তাছাড়া বাদী কি কি স্যানিটারী জিনিষপত্র সরবরাহ করেছে এবং তারই বা দাম কি তা-ও জজ সাহেবকে জানালাম। তারপর আজি'দাওয়া ও জবাবদারীটা পড়লাম। বিশেষ করে জজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে ওয়াকফ এস্টেটের কোনই অভিযোগ নেই যে মেরামতের কাজটা সুচারু রকমে হয় নি বা স্যানিটারী জিনিষপত্র সরবরাহ করা হয় নি বা সেগুলির মধ্যে কোন গলতি আছে। এই সব বলে আমার মামলার প্রারম্ভিক বহাস শেষ করলাম যে সব কথা বলে তার চম্বক হোলো—“মাই লর্ড, বাদীটা খেটে পয়সা খরচা করে একটা প্রায় পড় পড় ব্যাডিকে কি চমৎকার করে মেরামত করে ছবির মত দাঁড় করিয়েছে তা একবার চেয়ে দেখুন। বাদী কত না মূল্যবান বাঁহা বাঁহা স্যানিটারী জিনিষপত্র সরবরাহ করেছে যেগুলি দেখুন এ ব্যাডির শোভা বর্ধন করছে আজকেও। বাদীর কোন দোষ নেই তবু বিবাদী বাদীকে না দিচ্ছে বাকী টাকা, না ফেরত দিচ্ছে সেই দামী স্যানিটারী সাজসরঞ্জামগুলি।” যখন আমি বললাম তখন বেশ বৃদ্ধিতে পারলাম যে জজ সাহেবের মন ভিজছে এবং তিনি বাদীর পক্ষে ষোল আনা।

অপর পক্ষে ছিলেন প্রবীণ কৌশলী পি এন চ্যাটার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অরুণ সেন সাহেব, না, অন্য কোন কৌশলী মনে নেই। চ্যাটার্জি সাহেব

ভেঁষে মামলাটার কি ইস্যু হবে অর্থাৎ কি কি প্রশ্ন উঠবে তা-ই একটা কাগজ থেকে ভেঁড়ে আরম্ভ করলেন। জজ সাহেব ঠাকে বললেন—“মিঃ চ্যাটার্জি। ইস্যুটিসু পরে হবে। বলুন দোখ বাদী মেরামতের কাজটা করে কর্মপ্রসন সার্টিফিকেট পেয়েছে কি না?” চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—“তা, হয়ত পেয়েছে।” জজ সাহেব আবার বললেন—“হয়ত কি মিঃ চ্যাটার্জি? এতেও কি আপনার সন্দেহ আছে নাকি?” চ্যাটার্জি সাহেব স্বীকার করলেন—“হ্যাঁ, পেয়েছে।” জজ সাহেব তখন আবার প্রশ্ন করলেন—“স্যানিটারী জিনিষপত্রগুলি বাদী সরবরাহ করেছে কি না?” চ্যাটার্জি সাহেব এবার আর “হয়ত” না বলে সোজাই স্বীকার করলেন—“হ্যাঁ, করেছে।” জজ সাহেবের পরের প্রশ্ন হোলো—“মালগুলি যে নমুনাসই না বা কোন রকম খারাপ তার ত' কোন উল্লেখ দেখছি না আপনার মক্কেলের জবাব দাওয়ার?” চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—“সে রকম কোন ওজর তিনি তুলতে চান না।” জজ একটু তিসারা করে বললেন—“চান না কি মশায়? জবাবে যখন নেই তখন চাইলেও তুলতে পাবেন না।” চ্যাটার্জি বললেন—“তাই ধরেই নেওয়া হোক।” জজ পুনরায় প্রশ্ন করলেন—“বাদীর কন্ট্রের কাজটা ওয়াকফ এস্টেট ভোগ করছে না কি এখনো? বাদী কতক সরবরাহ করা স্যানিটারী সাজসরঞ্জাম ওয়াকফ এস্টেট এখনো ভোগ করছে না কি?” চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—“ব্যাডীটা যখন এস্টেটের তখন সেখানে বা কিছু লেগেছে সবই এস্টেটের ভোগে আসবে বই কি? জজ সাহেব তখন চ্যাটার্জি সাহেবের দিকে সোজা চেয়ে টেবিলের উপর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন—“তবে দাম দিচ্ছে না কেন এস্টেট?” চ্যাটার্জি সাহেব ইডেন গার্ডেনের দিকে চেয়ে বেশ ভারি কী চালে বললেন—“ওয়াকফ এস্টেট এক পয়সা দিতে আইনত বাধ্য নয়।” লর্ড উইলিয়ামস সাহেব তাঁর বড় চেয়ারটার পিঠে ঠেসান দিয়ে প্রায় শূন্যেই পড়লেন হাসতে হাসতে। “আমার জুনিয়ার শংকর ব্যানার্জি আমার কনুইয়ে মর্দ খোঁচা দিয়ে বললেন—“কি দাদা, হোলো ত? তুমি কেসটা চালিয়ে ষাও। দেখ না কি হয়।”

তারপর শূন্য হোলো জজ সাহেবের সঙ্গে পি এন চ্যাটার্জি সাহেবের ধমতান-ধমন্তি। ইস্যু সাব্যস্ত হোলো। সাক্ষী ডাকা হোলো। বাদীকে জেরা করবার বেশ কিছুই ছিল না চ্যাটার্জি সাহেবের, কেন না বাদীর দাবিটা যে ন্যায্য তাতে ভুল নেই। ওয়াকফ এস্টেটের বই খাতা উল্লেখ করা হোলো। বিবাদীর অর্থাৎ

ইতি অফিসে চাকুরী করেন আর সঞ্চয়ও করেন!

ইনি যেমন আর্থ করেন... তেমনি সঞ্চয়ও করেন।
ইনি একজন আধুনিক মহিলা। ইনি পরিপূর্ণ
আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকান।
আর এটাই স্বাভাবিক। ইনি জানেন যে
যাচ্ছে ওর সঞ্চয় বীজের মতো বেড়ে উঠছে।

সকলের সেবায়
স্টেট ব্যাঙ্ক



S. 229 BM

ওয়াকফ এস্টেটের কর্মচারীদের আমি
বত না জজ সাহেব তার শ্বিগুন জেরা
করলেন। দিন শেষে বিবাদীর কৌশলী
সাক্ষীরা সবাই জেরার টেলাম জরুরিত।
সোদান ছিল বোধ হয় শুরুর। শংকর
ও আমি বসে ওয়াকফ এস্টেটের খাতা
থেকে নানা ধরনের রকমারি চার্ট তৈরি
করলাম জজ সাহেবকে দেখাবার জন্যে।
যদি এই রকম ধরা যায় তবে মাতুলজীর
ওয়াকফ এস্টেট থেকে এত টাকা পাওনা
হবে। আর ধর যদি মাতুলজীকে এই কটা
খাপারে দায়ী করা হয় তবে মাতুলজীর
কমসে কম এত টাকা পাওয়া হবে। সে
কটা চার্ট তৈরি করা হোলো প্রত্যেকটাতাই
মাতুলজীর টাকা পাওনা এস্টেটের কাছ
থেকে। এই সব চার্টের সুবিধে এই যে
চোখের সামনে এস্টেটের একটা ছবি ভেসে
ওঠে। তা ছাড়া আরো একটা চার্ট করা
হোলো এস্টেটের বই খাতা থেকে যার
রকম এক মুহুর্তে দেখা যাবে কোন
কোন মাসে কোন কোন দিন মাতুলজী
এস্টেটের মুনোফা থেকে তার অংশ বাবদ
তার টাকা নিয়েছেন। মাতুলজী যদি
এতই জোড়ের তবে তাঁকে সরান হয়
নি কেন, এবং কেন তার প্রাপ্য অংশ থেকে
তার তথাকথিত ঋণ কেটে নেওয়া হয় নি।
এই সব চার্ট থেকেই প্রমাণ হবে যে
মাতুলজীর ওয়াকফ এস্টেটের উপর
right of indemnity আছে এবং
পাওনাদার তার right of subroga-
tion-এর বলে ওয়াকফ এস্টেট থেকেই টাকা
পাবে। এই ঠিক হোলো আমাদের রশ-
কৌশল।

সোমবার দিন চেম্বার ও মোশনের পর
আমাদের আধা-শোনা মামলার ডাক
হোলো। পি এন চ্যাটার্জির দেখা নেই।
পরে জানলাম যে জজের তাম্বির টেলাম
বিরক্ত হয়ে এ কোর্টে কিছু হবে না বলে
স্বীকৃতি ফেরত দিয়ে ফেলেছেন। প্রশান্ত-
মুখে মদ্য হেসে আমাদের বারওয়াল
সাহেব উঠে জানালেন—“জজ সাহেব
অনুমতি দিলে তিনি বিবাদীর হয়ে হাজির
হবেন।” লর্ড উইলিয়ামস সাহেব নির্বি-
চারভাবে বললেন—“কোনই আপত্তি নেই।”
জামি স্বগতভাবে শংকর ব্যানার্জিকে বললাম—
“ও শংকর, এ আবার কি উৎপাত হোলো
হে। তার বোধ হয় সামলান যাবে না।”
শংকর কখনো মগেন না। চুপি চুপি
বললেন—“দাদা, চালিয়ে যাও। দেখই
না কি হয়।” কেস চলল। সাক্ষী অল্পই
বাকি ছিল। তাদের জবানবন্দী হয়ে
গেল। জজ সাহেব আগের দিনের মতই
মারমতো। আমি বিনীতভাবে জজ
সাহেবের হাতে চার্টগুলি তুলে দিলাম
এবং প্রত্যেক চার্টের একটি করে কপি বার-
ওয়াল সাহেবকে দিলাম। বারওয়াল এত-

গুলি চার্ট আচমকা পেয়ে কেমন যেন হক-
চকিয়ে গেলেন। তা ছাড়া হিসেবের অঙ্কে
বারওয়াল সাহেব যে বেশ ওয়াকিবহাল
ছিলেন তা বোধ হয় নিজেও দাবি করতেন
না। সওয়াল জবাবের সময় এলো।
আমাকে সওয়াল জবাব দিতে না বলে জজ
সাহেব বারওয়াল সাহেবকে বললেন—“মিঃ
বারওয়াল, বলুন আপনার কি বলবার
আছে।” পাশ থেকে শংকর বললেন—
“দাদা, হোলো ত’? তুমি গ্যাট হয়ে বসে
থাক। দেখ না কি হয়।” আমাদের
বারওয়াল সাহেব ছিলেন অগতির গতি।
কোন কেসই খারাপ নয় তাঁর মতে।
একটা লড়ুইয়ে বহাস তিনি সব সময়েই
করতে পারতেন। তা ছাড়া ইংরেজী
ভাষাতে তাঁর অগাধ দখল ছিল। তিনি
তার কাগজপত্র ঠিকঠাক করে বহাস আরম্ভ
করলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল ধরে বারওয়াল
সাহেব যে বহাস করলেন তার ভাবার্থ

জানন্দ-সংবাদ

প্রখ্যাত নাট্যবিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক
শ্রীমশোক দেনকে এবার সোভিয়েত
বেশ নেহরু, পুরস্কারে সম্মানিত করা
হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। আরো
আনন্দের ব্যাপার এই যে, সে সোভিয়েত
নাটক, নাট্যকার ও নটদের নিয়ে
লিখিত নিবন্ধসমূহের জন্য ঐ পুরস্কার
পেয়েছেন, সেই নিবন্ধগুলি ধারাবাহিক-
ভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে শিল্পালির
স্বপ্নমণ্ড এদেশে ও ওদেশেতে প্রকাশিত
হয়েছে। —সম্পাদিকা

১৯৪৬

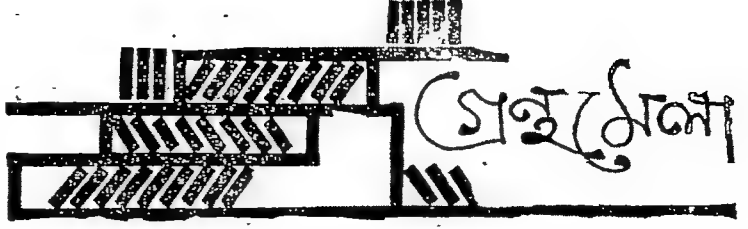
সংক্ষেপে হোলো এই—“ধর্মাবতার, আমি
বেশ বুদ্ধিতে পারছি আপনি আমার
মক্কেলের প্রতি বিমুখ বোধ করছেন।
আমার নিজের অবস্থাটাও যেন সঙ্গীন
বোধ করছি। একজন জেনারেল যখন
পর্বতোপরিস্থিত শত্রু ক্যো দখল করতে
উদ্যত হয় তখন সেই পাহাড়ের চড়াই
তার বিপক্ষীয় জেনারেলকেই সচরাচর
দেখে। কিন্তু সেই বিপক্ষীয় জেনারেলের
পাশে যদি আবার জজ সাহেব নিজে
দাঁড়িয়ে থাকেন তবে সে পর্বতারোহণ
শ্বিগুন শক্ত হয়ে ওঠে। তখন পাহাড়ের
চালু গাটা প্রচণ্ড চড়া (steeply rises)
হয়ে দাঁড়ায়।” যেই না একথা বলা অর্মানি
জজ সাহেব টিপ্পনী কাটলেন—“মিঃ
বারওয়াল, আপনি পাহাড়ের গাটাকে
প্রচণ্ড চড়াই (shift Incline)
বলছেন? আমি ত’ মনে করি সেটা
এক্সারাই খাড়াই (perpendicular)

অন্য যে কোন কৌশলী মুহুর্তে যেতো।
কিন্তু বারওয়াল সাহেব দমবার পাত নন।
তিনি নানা বই থেকে পাঠ উদ্ধার করে
জজ সাহেবকে বোকাতে লাগলেন যে
ওয়াকফ আলাল আউলাদটা নিছক ভূয়ো
নয়। মরুমর আরব দেশে খাবার অনটন।
মরুভূমির মাঝে মাঝে মরুদ্যান। সেখানে
খেজুর কি যৎসামান্য অন্য কিছু খাবার
পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপন সন্তান-
সন্ততিদের ভরণপোষণের জন্যে ব্যবস্থা
করা খুবই প্রসংগীন এবং সেটা
ভগবানেরই কাজ। বারওয়াল সাহেব
wakf-alal-aulad-এর নিহিতার্থ
ব্যাখ্যা করেই চলেছেন। বারওয়াল
সাহেবকে খামান সব জজের কর্ম নয়।
তবে লর্ড উইলিয়ামস সাহেবও কম যান
না। তিনি ইডেন গার্ডেনের দিকে চেয়ে-
ছিলেন। ইঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বারওয়াল
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—“মিঃ বার-
ওয়াল, আপনি কি এখনো আরব দেশের
মরুভূমিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন?” স্মিত-
হাস্যে বারওয়াল সাহেব জবাব দিলেন—
“মাই লর্ড, আমার বহাসের এ অংশটা প্রায়
শেষ হয়ে এসেছে।” জজ সাহেব বললেন—
“বন্ধুতে পৌঁছলে আমাকে খবর দেবেন।”
বলেই আবার ইডেন গার্ডেনের দিকে মুখ
ফেরালেন। সব জিনিষেরই শেষ আছে,
এমন কি বারওয়াল সাহেবের বহাসেরও।
অনেক বাক্যবিশৃঙ্খলার পর বারওয়াল সাহেব
বসে পড়লেন। জজ সাহেব আমার দিকে
তাকিয়ে বললেন—“মিঃ দাশ, আপনাকে
আর বিরক্ত করব না।” শংকর পাশ থেকে
বললেন, “দাদা, হোলো ত’?” বারওয়াল
সাহেব বসে পড়লেই জজ সাহেব রায়
দিতে শুরু করলেন। বিবাদীর সব
সাক্ষীগুলিকে ঠেসে অবিশ্বাস করে,
ওয়াকফ এস্টেটের খাতাপত্রগুলিকে
স্বকৃতভাবে বিশ্লেষণ করে জজ সাহেব
বললেন যে বর্তমান মামলার সাক্ষীদের
জবানবন্দীতে বেশ প্রমাণ হয়েছে যে
মাতুলজী ওয়াকফ এস্টেটের কাছে ঋণী
নয় মোটেই এবং বাদী তার right of
subrogation-এর বলে মাতুলজীর
right of indemnity-র সুযোগ ও
সুবিধে পাবেনই। সুদসমেত পুরা টাকার
ডিক্রি হোলো মায় দোতরফা মামলার কস্ট।
বাদী, এটর্নী ও আমরা হুর্টাচতে কোর্ট
থেকে বের হয়ে এলাম। বড় বড় খিলেন
দেওয়া চণ্ডা বারান্দার দাঁড়িয়ে শংকর
ব্যানার্জি বললেন—“তোমাকে বলেইছিলাম,
দাদা চালিয়ে যাও। কেমন? হোলো ত’?”
জবাবে বললাম—“হ্যাঁ, তা-ত’ হোলো।
কিন্তু আপলিটা তুমি ঠিকও।” শংকর
একটু হেসে বললেন—“আপলি না-ও ত’
হতে পারে।” বতদুর মনে পড়ে, আপলি
হয়-ই নি। [কমণ্ড]

নবজাতক—সম্পাদিকা : মৈত্রেয়ী দেবী ১০১৯, পাম এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১১। দাম : দু' টাকা।

শারদীয় নবজাতক : হয়েছে অত্যন্ত উন্নত মানের। এক শ্রেণীর জঘন্য তথাকথিত কবি ও ঔপন্যাসিক বাংলা ভাষাকে যখন সাহিত্যের নামে জাহান্নামে নিয়ে যেতে বসেছে, তখন নবজাতকের মতো পত্রিকার লেখা পড়ে মনে হয়, বাংলা দেশটা উদ্ধার যায় নি। কারণ এই পত্রিকা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে সোচ্চার, ব্যবসায়িক শ্রেণী সাহিত্যিকদের ভীতিপ্রদ, এবং আন্তর্জাতিক দ্রাব্যবোধে বিশ্বাসী। এই পত্রিকার কাজে রতী আছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহজন্য ও স্বয়ং কবিসাহিত্যিক শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। আমরা কিছুকাল আগে থেকেই লক্ষ্য করছি যে, সং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সভাসমিতিগুলিতে নবজাতক থেকে বহু রচনা পাঠ করে শোনান হচ্ছে। এমন কি কোনো সংরক্ষণশীল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান থেকেও নিরুপায় অবস্থার 'নবজাতক' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার সেখানে বেমানন্দ নবজাতকের নামটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপার নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

শারদীয় নবজাতকের সবাপেক্ষা উল্লেখ্য বিভাগ "ডাকঘর"। পূর্ববঙ্গের সম্পাদক ও সাহিত্যিকবৃন্দ সম্পাদিকাকে যে চিঠি লিখেছেন তারই অংশবিশেষ এখানে আছে। চিঠিগুলি পড়লে পশ্চিমবঙ্গের পচনশীল সাহিত্যিকদের মাথা ঘুরে যাবে। বাংলা ভাষার জন্যে ও রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মনের খবর পড়ে বিস্মিত হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'ম-বাবু' নবজাতক পত্রিকার খবর জানেন না—এমন বিশ্বয়কর খবর দিয়েছেন শ্রীঅমরনাথ রায়। 'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদ প্রবাহ' বিভাগটিও চমৎকার। পূর্ব পাকিস্তানের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে কী—তা এই বিভাগটি পড়লেই মাথা নত হয়ে আসে। সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিগণের কাছে এবারের সম্পাদকীয়টি অবশ্যপাঠ্য। দুই বঙ্গের সাহিত্যিকদের গল্প-কাহিনী, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ এই শারদীয় সংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৈত্রেয়ী দেবী অনূদিত প্রথম একাই কাব্যগুচির তিব্বতে তিন বৎসর শৃঙ্খলিত প্রমথকাহিনীর যোগ্যতালাভের যোগাই নয়, এতে চাম্ফল্যকর অজানা তথ্যও পাওয়া যায়। হীরেন দাশগুপ্ত তাঁর জেলে থাকার অভিজ্ঞতার নামী নামী নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হয়, না জানি আমরা কি ধরনের সমাজবাদী নেতাদের উপর নির্ভর করে আছি। উপন্যাস লিখেছেন আবদুল আজীজ আল-আমান; কবিতা—জসীর-



উদ্দীন, বঙ্গদে, মৈত্রেয়ী দেবী, সানাউল হক, আবদুল কাদীর, দুর্গাদাস সরকার, মাহমুদ রহমান চৌধুরী, গোপাল ভৌমিক, নচিকেতা ভরসাজ, অরুণা দেবী হালদার প্রমুখ, নাটক—মুখ্য রায়, প্রবন্ধ—অমরনাথ রায়, গৌরী আর্য। গল্প (একটি অনুবাদ সহ) মোট দশটি। লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী, আনিসুজ্জমান, বাণী রায়, গিরিবালা দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শঙ্কর মিত্র প্রমুখ। দু-একটি গল্প সম্বন্ধে সম্পাদিকার আর একটু সতর্ক হওয়া দরকার ছিল। তবে এতে যে সব খ্যাতিমান লেখক লেখেন, তাঁদেরও কিছুটা দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। নবজাতকে প্রচ্ছদ অনন্য সাধারণ।

লন্ডন—সীমা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত। ১৭২১০, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২১। দাম : ০.৫০ টাকা।

আরও অনেক বহু, অলঙ্করণে শোভিত, বহু রচনায় সমৃদ্ধ এই কিশোরোপযোগী পত্রিকাটি যে কোনো পাঠকের মনোহর প্রাণসা লাভ করবে। তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, লিখেছেন নলিনী দাশ (টোয়ার হিলের রহস্য), ও সত্যজিৎ রায় (কৈলাস চৌধুরীর পাখর), বিমল দত্ত (পাখী জাগানী গান)। তাছাড়া আছে সত্যজিৎ রায়ের একটি গান—যা ছেলেদের মধ্যে মধ্যে একদিন ঘুরবে গুপী গারেন ও বাবা বারেন ছায়াচিহ্নের মাধ্যমে। সত্যজিৎ রায়ের 'সিনেমার কথা' প্রবন্ধটি থেকে কিশোর দল অনেক খবর জানতে পারবে। ধারাবাহিক উপন্যাস আছে একটি—প্রভাতরঞ্জন রায়ের 'তুষার মানবের সম্মানে'। উপন্যাসটির পূর্বভাসটুকু দেওয়ায় উপন্যাসটির গোড়াকার অংশ সম্যক জানা যায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের চট্টক গল্প, সুকুমার রায়ের গল্প, পদ্যলতা চক্রবর্তীর ছোটদের জন্য ছোট গল্প, বাংলাদেশের আর কোনো পত্রিকায় আছে কি না জানি না। তবে যে পত্রিকায় এঁদের লেখা থাকে সে পত্রিকা ছেলেরা নিজেরাই জোর করে পড়ে। বহু মনমাতানো লেখার মধ্যে আছে ঐতিহাসিক গল্প, মাজিক কবিতা, প্রমথকাহিনী, একাধিক নাটিকা, ছড়া, কবিতা, সচিত্র কবিতা, বিজ্ঞানের আসর, চিঠিপত্র, কীড়া-জগৎ, চেনো কি প্রতিযোগিতা, বহু ধর্মীয় উত্তর, পুস্তক পরিচয়, রূপকথা, মজার

খবর এবং আরো অনেক কিছু। ছেলেদের এবং বড়দের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী রায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সীমা মজুমদার, সুবিনয় রায়, স্বপনবুড়ো, সুধরঞ্জন রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ। ছেলেরা এই শারদীয় সংখ্যাটিই শৃঙ্খলিত করে রাখবে না, পত্রিকাটির সংগে নিয়মিত যোগ রেখে পৃথিবীর সব খবর জানবার চেষ্টা করবে। তারা যা চায় তাই পাবে সম্প্রদে ও কথা বলাই বাহুল্য।

রোশনাই—সম্পাদিকা : গীতা দাশ। এ ১০২, ১০০ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

যে কটি কিশোর সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে শারদীয় রোশনাই ছেলেদের মন জয় করে নেবে। দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, একাধিক একটি, মজার মজার গল্প মোট বারোটি, বাইশ ধরনের বাইশটি ছড়া ও কবিতায় ভরা এবারের এই রোশনাই। অধিকন্তু আছে 'তোমাদের পাঠ্য', 'নতুন ধর্ম' ও সম্পাদকীয় দপ্তর। আর আছে নানারকম প্রবন্ধের মধ্যে বিশ্বের পরীক্ষা (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), আদিম সমুদ্রের প্রাণী (প্রমোদ মিত্র), এক ঘরে জানোয়ার, চিড়িয়াখানা, কিন্নর মুন্সে ডুবুরী, স্টেথোস্কোপ, স্কুদে দাবার। প্রতিটি লেখাকে অলঙ্কৃত করে ছেলেদের চিন্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছে। লেখায় আছেন—শিবরাম চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মিহির সেন, আশা দেবী, স্বপনবুড়ো, অমিতাভ চৌধুরী, মনোজিৎ বসু, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শঙ্কুনাথ চট্টোপাধ্যায়; রেখাকন্যে—শৈল চক্রবর্তী, বিমল দাস, সুব্রত ত্রিপাঠী, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক শিশুসাহিত্যী (১৩৭৪)—সম্পাদিকা : শ্রীমতী দাশগুপ্ত। বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৫, বক্ষিৎ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ—১২। দাম : চার টাকা।

ছোটদের মনের মতো লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারও বার্ষিক শিশুসাহিত্যীকে। কিন্তু দাম বাড়ানো হয় নি। অথচ আছে অনেক লেখা, বহু বিচিত্র

ছবি। শব্দ সংগ্রহ করে রাখার জন্যেই ময় উপহার দেবার মতন উপযুক্ত গ্রন্থ দ্বিবার্ষিক শিশুসাহিত্য, বিদ্যালয়ের প্রতি-
ষ্ঠাপিতামূলক পুরস্কারের ক্ষেত্রেও এ গ্রন্থ উপহার দেওয়া উচিত। এতে স্নানার, শেখার অনেক কিছুই আছে। তাছাড়া আছে অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটিকা, ছড়া, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গিক, সত্য ঘটনামূলক গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, জ্বালান্যবিধি, রূপকথা, শিকার কাহিনী, ঐতিহাসিক গল্প এবং অনেক রকম আশ্চর্য কাহিনী। যেমন আরসোলার ঘোড়-
দোড়, ছাঁটা গোফ ও ঝাঁটা গোফ, সিংহ কবলিত যাত্রী-ট্রেন, জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ মোরগ, ডাকটিকিতে নতুন আফ্রিকা প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে শ্রীদুর্গার প্রতিষ্ঠা, কার্টুন ও রেখাচিত্র। লেখকদের মধ্যে আছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বিশদ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনন্দা দাশগুপ্ত, কালিদাস রায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, হুম্মত রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, আশা দেবী, প্রাণতোষ ঘটক, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ মোট ৪৯ জন লেখক-লেখিকা। ছবি প্রস্তুতকরেন—সুদীপ, ধীরেন বল প্রমুখ। প্রচ্ছদপট সুন্দর। এ ধরনের একটি উৎকৃষ্ট সংকলনের জন্যে সম্পাদিকা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ লাভ করবেন।

বৈতানিক—সম্পাদক : ভবানী মুখো-
পাধ্যায়, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স
প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চারুজ্যো স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২। দাম : দু' টাকা।

এই শারদ সাহিত্য সংকলনটির সম্পাদনায় বিদগ্ধ পাঠক খুঁশি হবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'উনিশ শো সাতবার্ষিক' দিয়ে পত্রিকারম্ভ। যুগমানসের প্রতিচ্ছবি অসাধারণভাবে এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'যেমন, 'একটা পা আছে/পেট ফাটা বাসের পা-দানিতে/আর একটা তে-শুন্যো' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও মনোজ বসু লিখেছেন অত্যন্ত দিনের স্মৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, মনোজ অধিকারী, ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এ ছাড়া আছে বারোটি গল্প—যাতে কোনো গল্প লেখকই রুচি বিকৃতি (হালে এই ঘটনা ঘটছে বলেই একথা বলতে হোল) ঘটান নি। গল্প লেখক-
দের মধ্যে আছেন মিহির আচার্য, দেবরত মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায় প্রমুখ। এ ছাড়া আছে মণীন্দ্র রায় অনুদিত কয়েকটি রূপ কবিতা, দু'টি মৌলিক দীর্ঘ কবিতা ও একটি বিদেশী কাহিনী। মন্দলাল বসুর মহিষাসুন্দরমর্দিনী শিল্পশোভার গায়, একথা বলাই বাহুল্য।

নরনারী—সম্পাদক : সুবোধ মিত্র।
সহঃ সম্পাদক : মোহন মিত্র॥ ৭, নবীন
কুন্ডু লেন, কলিকাতা—৯। দাম : দু'
টাকা।

কিছু পত্র-পত্রিকা সাহিত্যের নামে একালে অঙ্গলীল রচনা বাজারে ছাড়ছে। এজন্যে তথাকথিত ঘোনিবজ্ঞানের নামে হঠাৎ আবিষ্কৃত দু-একটি পত্রিকাই দায়ী নয়, নামকরা কিছু সাহিত্যপত্রও এই দৃষ্কার করে চলেছে। এরকম করার কারণ অর্থ উপার্জন। অর্থ আসবে প্রথমত বৈদেশিক গোপন প্রচারবস্তুগুলি থেকে, দ্বিতীয়ত পাঠকদের অখাদ্য গিলিয়ে মোটা রকম লাভ করাও সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড় লাভ হবে এই যে, পাঠকদের যদি মনটাকে ঐভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা অভাব-দৈন্যের সুযোগ নিয়ে বিপ্লব করবে না।

বলা বাহুল্য এজাতীয় হীন ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্য নিয়ে যারা পত্রিকার কারবার করে আমরা তাদের ঘৃণা করি।

প্রসঙ্গত 'নরনারী'র আদর্শ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। পত্রিকাটির সম্পর্কে প্রথমে এক কথা বলা যায় যে, এটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো কাগজ নয়। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে পত্রিকাটি চলেছে। দেশের অবস্থা তখন এমন ছিল না এবং পাঠক-
দের বিপক্ষে চালিত করাও উদ্দেশ্য ছিল না। নবনারীর বর্তমান সম্পাদকগোষ্ঠী সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পত্রিকাটি চালাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক চেতনার জনমন গাথা করাই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য সব সময় সার্থক হয় না। কারণ এমন কিছু লেখক আছে যারা অপপ্রয়াসে লেখার মধ্যে বাজে মাল ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়, বিবেকানন্দ মুখো-
পাধ্যায় প্রমুখের নিবন্ধ পড়ে শিক্ষাও লাভ হয় স্বস্তিও লাভ করা যায়। এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে মোহন মিত্রের দুঃসময়। বর্তমান অর্থসংকটে মানুষ কোন পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে তার করুণ কাহিনী তিনি ভুলে ধরেছেন। তাঁর লেখা বলিষ্ঠ। চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ অরুণকুমার রায়-
চৌধুরী, ডঃ মদন রাণা, ডঃ অরুণকুমার মিত্র, ডঃ জনকীনাথ দেসরকাব, ডঃ মানস রায়চৌধুরী। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এই সব প্রবন্ধেই প্রসিক্ত হয়েছে। প্রচ্ছদপট রুচিসম্পন্ন।

সাহিত্য তীর্থ—সম্পাদক : রমেন্দ্র
মল্লিক। ৩৭, পাথারিয়াঘাট স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬। দাম : দু' টাকা।

শারদীয় উৎসবোপলক্ষে সাহিত্য তীর্থ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এবার হোল চতুর্দশ বর্ষ। প্রবন্ধ, কবিতা,

প্রমণকথা, নাটিকা, গল্প ও রসরচনা এর উপজীব্য বিষয়। অর্ধশতাধিক লেখক এতে লিখেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্ব, সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত সেন, বাণী রায়, কুমুদরঞ্জন, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, দুর্গাদাস সরকার, শ্যাম রায়, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, মল্লিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্কেট, চিত্রপর্বাণে এক রঙ। তিন রঙা ব্যঙ্গচিত্র চিত্তাকর্ষক। দেবরত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ অস্কন সুন্দর।

শারদীয় ষড়দহ বার্তা—সম্পাদক :
নীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। ষড়দহ জনকল্যাণ
সমিতির পক্ষে প্রকাশিত। মূল্য : এক
টাকা।

একটি বিশেষ আদর্শকে অনুসরণ করে পত্রিকাটি প্রকাশিত। স্বভাবতই চিরাচরিত বকুনির পরিবর্তে লেখাগুলিতে বজ্রবাই প্রধান। তবে উল্লেখ্য বা লেখকদের কৃতিত্ব এই যে, প্রতিটি লেখাই বনানীত। কালের রঙ গল্প বা কবিতার গায়ে লেগেছে কিন্তু তা সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শে উজ্জীবিত। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য নিবন্ধ লিখেছেন বনফুল, হির-
নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না সিংহরায়, কুমুদ দাশগুপ্ত, শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। খেলাধুলা ও চিত্রালোচনা বেশ বলিষ্ঠ।

আমাদের গ্রাম—সম্পাদক : শতদল
গোস্বামী, মঞ্জু আচার্য। ৬।২,
কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা—৫০।
দাম : দেড় টাকা।

শ্রীপরিমল গোস্বামীর উপদেশনার প্রকাশিত 'আমাদের গ্রাম' পত্রিকার এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যা বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার জগতে বিরল। দশ-বিদেশের গ্রামের কথা জানা যাবে পত্রিকাটির বিভিন্ন রচনা থেকে। যেমন, ফরাসী গ্রামের মিউ-
জিয়াম, রুম্যানিয়ার গ্রাম, মফস্বল ডাক্তারের রোজনাগাচা ইত্যাদি। পরিমল গোস্বামীর পঞ্জীজীবনশিষ্টপটী শ্রৈলোক্যনাথ মুখো-
পাধ্যায় মূল্যবান আলোচ্য রচনা। কথা ও কাহিনী, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, অশ্লিষ্টতার কাহিনী ও একগুচ্ছ কবিতাও এই পত্রিকার উপজীব্য বিষয়। লিখেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, দিলীপ মালিকাব, বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, বনফুল, সুনীল রায়, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। একটি তামিল ছোট উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন বোমানী বিশ্বনাথম।

আমুখোকা একা শ্রমিক

তানয় টাই

আগম কালারপোলশ্রমিকের ১০০মকা

ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনসর আলির বাইরের ঘরের মাচার নিচে আগ্রয় পেয়ে সাময়িকভাবে ক্ষুধা জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। সে জনে না অপর পাঁচজন সঙ্গীর তখন কি অবস্থা বা তারা কোথায়। ফণীন্দ্র স্বপ্ন দল ছাড়া হয়ে পড়ে, তখন বাকী পাঁচ বন্দু তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হবে উঠল। কিন্তু তারা হতাশ হ'ল। কোনমতেই ফণীন্দ্রর সঙ্গে তারা আর যোগাযোগ রাখতে পারলো না। অগত্যা পাঁচজনে মনস্ধ করলো নদী পেরিয়ে তারা শহবে যাবেই এবং মনে মনে তাদের আশা হ'ল এই পথে হয়ত ফণীন্দ্রর সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। এই মনস্ধ করে মেঠো পথ পরিত্যাগ করে তাবা আবাব রাস্তা ধবে এগোতে লাগলো। এই রাস্তা আন্তিমামুদের ঘাট থেকে পটিয়া ধানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথের ওপর কালারপোলটি অতিক্রম কবা সম্ভব হলেই শ্রব সংক্ষিপ্ত সমবে শহরে পৌঁছনো সহজ হবে। তবে এই ক্ষেত্রে পদলিখ বিটের সম্মুখে ছোট পথটির সুযোগ নিতে হবে।

নানা বিপদ, ঝুঁকি ও কত অজানা অনিশ্চয়তা যে চলার পথ আচ্ছন্ন কবে রেখেছে তার খবর কে বলতে পারে? গেরিলা যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের বহু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ফলাফল আগে থেকে কেউই সঠিক বলতে পারে না—তবু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাহসের সঙ্গে এগোবার চেষ্টা করতেই হয়। তাই এই পাঁচজন বিপ্লবীও বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও, বর্তমান অবস্থার আর পেছনে না ফেরে।

সুবোধ চৌধুরী সবার আগে আগে চলেছে। বাকী চারজন পাঁচজন হাত পেছনে তাকে অনুসরণ করে আসছে; এই অবস্থায় সকলে পদলিখ বিটের প্রায়

সামনে এসে পড়েছে। একজন সৈন্য বন্দুক কাঁধে বিট পাহারা দিচ্ছে এবং অন্যান্যরা পেটল ডিউটিতে সব বাইরে গেছে। গাড়-রুমে তিন-চারজন সশস্ত্র কনস্টেবল তখন উপস্থিত ছিল। সম্মুখ যুদ্ধের সম্ভাবনার সোজাসুজি সামনের পথ দিয়ে চলবার ইচ্ছে বিপ্লবীদের ছিল না। তারা ঠিক করেছিল কোন ছলে বা কৌশলে সাধারণ পথিক সেজে সশস্ত্র প্রহরীদের বিভ্রান্ত করে পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করবে এবং আশা করেছিল তারা সফল হবে। কিন্তু হয় রে দুর্ভাগ্য। ইতিমধ্যে পদলিখ বিটে খবর ও নির্দেশ এসে গেছে বিদ্রোহী পলাতকদের গতি-বিধির ওপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং সম্ভব হলে তাদের গতি অববোধ করতে।

পাঁচজন যুবককে পথের ওপর দেখা মাত্রই সৈন্য হাঁক দিল—“কে তোমরা?” সুবোধ চৌধুরী জবাব দিল—“আমরা পথিক।” প্রহরী আগেই খবর পাওয়াতে সে সুবোধকে দাঁড়াতে হুকুম দিল। সুবোধ তো দাঁড়াবেই—প্রহরীর সঙ্গে কথা বলবে, তবেই না প্রহরীকে বিভ্রান্ত করে নিষ্কৃতি পাবে! সুবোধ চৌধুরী কথা বলতে বলতে বন্দুক কাঁধে দাঁড়ানো সেপাইয়ের খুব কাছে গেল। সুবোধের দৃষ্টি সৈন্যের দিকে স্থির নিবন্ধ—তার কাঁধের বন্দুক সুবোধ কোনমতেই তাকে হাতে নিতে দেবে না। সাংঘাতিক উত্তেজনা-পূর্ণ একটি সঙ্কট-মহত! এমন সময় খালি হাতে একজন কনস্টেবল পদলিখ বিটের ঘর থেকে বেরিয়ে সুবোধের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। সুবোধের দৃষ্টি তখনও সশস্ত্র প্রহরীর দিকে—খালি হাতে তার কাছে দাঁড়ানো কনস্টেবলটির প্রতি সুবোধের দৃষ্টি পড়ে নি।

সুবোধ চৌধুরী খুব বলিষ্ঠ এবং তার দৈহিক আকৃতিও সাধারণ লোকের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। তাই বোধহয় সুবোধ মহতের জন্য নিজের

শরীর সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আত্ম-সচেতন হয়ে পড়েছিল। সেপাইটি সুযোগ বুঝে নিম্নে সুবোধকে জাপটে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন সেপাই ছুটে এসে সুবোধকে কাবু করতে ধস্তাধরিত শব্দ করে দিল। সুবোধ দু-তিনজন কনস্টেবলকে কোন মতে কায়দা করে, রিভলভার সন্ধ নিজে হাতটি মুক্ত করেই গুলী ছুড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু এমনই বেগতিক যে ট্রিগার টিপতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হ'ল। সমস্ত পরিস্থিতিই যেন সুবোধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কবেছে। বিপদের একমাত্র সাথী, সঙ্কট-মহতের একান্ত বন্ধু এই রিভলভারটিও বিশ্বাসঘাতকতা করলো! সুবোধের অসহ্য অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিল পদলিখের মিলিত শক্তি—সুবোধ শত্রুর হাতে বন্দী হ'ল।

আমাদের মামলার জাজমেটে ট্রাই-ব্রুনালে প্রেসিডেন্ট লিখছেন—
“In the meantime after 3 a.m. constable Prasanna K. Dey, as he stood sentry on the road outside the beat house, caught sight of five persons coming along the road towards him from the bridge; one of them was a little ahead of the others who were following about 5 or 6 cubits behind him.”

“As the first stranger approached, Prasanna cried, ‘who are you?’ and he replied, ‘a passerby’ — where-upon Prasanna ordered him to halt. Prasanna ordered him to halt. Just then constable Prasanna Kumar Barua came out of the house, went forward and caught hold of him. And

they struggled constable Lalit Mohan Choudhury also went forward and caught him from behind."

—সরকারী ভাষ্যে বলা হচ্ছে, প্রহরী প্রসন্নকুমার দে ও প্রসন্ন বড়ুয়াই প্রথমে সুবোধ চৌধুরীকে ঘায়েল করেছে। বিপ্লবীদের পটভূমিকে আসতে দেখে প্রসন্ন দে সর্বাগ্রে যে ছিল, তাকে দাঁড়াতে হুকুম দেয়। সুবোধ সৈন্যের সামনে এসে দাঁড়াল এবং ইতিমধ্যে প্রসন্ন বড়ুয়া বিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুবোধকে জাপটে ধবলো। কনস্টেবল লালিতমোহন চৌধুরীও পেছন থেকে এসে সুবোধকে বন্দী করতে সাহায্য করেছে।

সরকারী ভাষ্যমত অত সহজে অবশ্য তারা সুবোধকে বন্দী করতে পারে নি। সুবোধ তাদের কবল থেকে রিভলভার ধরা হাতটা মুক্ত করে। কিন্তু যখন কোনমতেই সে রিভলভারটি ফায়ার করতে পারলো না, তখনই সেপাইরা তাকে কাবু করে।

সরকারী পক্ষ এটা স্বীকার করেছে—
"...they (constables) immediately proceeded to the beat house and there found accused Subodh Choudhury and near him constable Prasanna Barua lying seriously wounded... The revolver taken from him (Subodh) by Lalit Choudhury was a .455 Webley Revolver. Ahasanulla tried to open it but it was jammed with mud and he could not do so but Col. Dallas Smith or some other military officer present succeeded in opening it. Inside the chamber were three .45 Govt. cartridges, two live and one fired..."

শ্রী বাহাদুর পুলিশ বিটে এসে সুবোধকে বন্দী ও কনস্টেবল লালিতমোহনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। সুবোধের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রিভলভারটি আসানুলা কোনমতে খুলতে পারে নি—কাদা-মাটিতে একেবারে ঠাসা ছিল। কর্নেল ডাল্লাস স্মিথ বা আর কোন সাহেব রিভলভারটি খুলতে সমর্থ হয়। রিভলভারের চেম্বারে ৩টি তাজা ও একটি ব্যবহৃত কার্তুজ পাওয়া যায়।

সুবোধকে কনস্টেবলেরা যখন মিলিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটা প্রচণ্ড মলমল চলতে থাকে, তখন বাকী চারজন সঙ্গী, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফায়ার করেছে। পাছে

সুবোধ আহত হয়, এই ভয়ে সাধীদের পক্ষে বেপরোয়া গুলী চালানো সম্ভব হয় নি। খুব সতর্কতার সঙ্গে গুলী ছুড়েছে, লক্ষ্য ভেদ হয়েছে—কনস্টেবলের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দু' পক্ষে সামান্য গুলী বিনিময় হয়েছে। গভীর রাতে বিপ্লবীদের গুলীর আওয়াজ গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পুলিশ ও মিলিটারীর মনে ঘাসের সগুয়ার করেছে। সবাই তো সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বেতনভোগী ভাড়াটে লোক—হোক না কেন সে পুলিশ বা মিলিটারীর অফিসার বা সাধারণ সৈনিক—মরতে কেউই চায় না। কোনমতে বেঁচে থেকে সুদাম ও পুরস্কার অর্জন করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই বীর-পুঙ্গবেরা দু'র থেকে যখনই গুলী বিনিময়ের শব্দ শুনছে, তখনই আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া দেখে শিউরে উঠেছে। সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে যেখানে পেরেছে কোন-না-কোন ছতো করে নিরাপদে কাল অতিবাহিত করাই প্রের মনে করেছে। আমার নিজের কথায় না বলে সরকারী পক্ষ সেই রাতের যুদ্ধের কথা বেটুকু বলতে বাধ্য হয়েছে, তারই কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করে পুলিশ ও মিলিটারীর ভীত-ব্রন্ত অবস্থার বিবরণ দিচ্ছি—

"...the captive crouched down with Lalit still holding on to him while Prasanna Kumar Barua stood in front of him holding his hands. Just then the four others began to fire and Prasanna Barua cried out that he had been shot and fell forward on top of the prisoner. The sentry Prasanna K. Dey immediately opened fired on them and they retreated behind the tea shop on the south side of the road firing as they went. The sentry continued firing on them... Meanwhile the four strangers continued to fire at intervals from behind the tea shop until about 4-30 a.m., after which all was quiet."

[সৈন্য বলছে যে, পেছন থেকে লালিত ও সামনে থেকে প্রসন্ন বড়ুয়া সুবোধকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় চারজন যুবক ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলী চালানো। 'আহত হয়েছে' বলে চীৎকার করে লালিত সুবোধের গায়ের ওপর পড়ে গেল। সৈন্য তক্ষুণি গুলী ছুড়লো। ওই যুবকেরাও একটা চাক্ষু

দোকানের আড়াল থেকে পালাটা গুলী চালানো। সৈন্য ক্রমাগত গুলী ছুড়েছে এবং বিদ্রোহীরাও সমানে জবাব দিচ্ছে। তোর সাড়ে চারটার সময় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।]

পুলিশ বিটের সুবাসিত দেয়ালের আড়াল থেকে সৈন্যের ফায়ার করবার যে সুবিধে ছিল, থোলা মাঠ বা চায়ের দোকানের কাঁচা ঘরের দেয়ালের আড়াল থেকে গুলী ছুড়বার সেরূপ কোন সুবিধে বিপ্লবীদের ছিল না। তবু বাঁশের ঘরের আড়ালে অশ্বকারের সুযোগটুকু নিয়ে নিজের অস্তিত্ব গোপন করে বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত পালাটা গুলী চালিয়েছে। পুলিশ বিটের সামনে এই সম্বর্ধের সংবাদ মাস্কোভি ও রিভলভারের আওয়াজে চতুর্দিকে ঘোষিত হয়েছে। এই বিট থেকে যারা পেট্রল ডিউটিতে গ্রামের ভেতরে গিয়েছিল রিভলভারের আওয়াজে তারা সহজেই অনুমান করলো যে বিট আক্রান্ত হয়েছে। তাই তারা ভাবলো, বীরকে আর কাজ নেই বাবা—যা হচ্ছে হোক সেখানে, আমরা এখানে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকি। পেট্রল ডিউটির কনস্টেবলদের বিট রক্ষার্থে সেই রাতে ফিরে না আসার দরুন অজ্ঞাহতের অভাব হল না—তাদের মোটরে যে তেল নেই। উপরন্তু মাস্কোভি যে খারাপ, ভাল ফায়ার করা যায় না—কি করে এই অসহায় অবস্থায় বিটে ফিরে যাবে?

মামলার জাজমেন্টে মিঃ ইউনাই সাহেব লিখেছেন—

"One musket was given to each of these parties... Then ... set out in a taxi... when the petrol gave out and the taxi driver went back to Kalarpole for more, they remained sitting in the car. Shortly afterwards hearing fire from the direction of Kalarpole, and as the musket they had with them was not in good order, they got out of the car and hide on the bank of a tank near the road and did not venture back to the beat house until after day-break."

[পেট্রল ফুরিয়ে গেল। ট্যাক্সিচালক গাড়ি রেখেই আর কিছু পেট্রলের সন্ধানে গেছে। কনস্টেবলেরা গাড়িতে বসে আছে। হঠাৎ তারা কালারপোল বিটের দিক থেকে গুলীর আওয়াজ শুনতে পেল। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারলো (পেট্রল ডিউটিতে আসবার সময় বুঝতে পারে নি) তাদের

বন্দুকগুলি অকেজো। অগত্যা ঠিক আর করা যায়। রাস্তার ধারে এক পুকুর পাড়ে যশে প্রাণটি হাতে নিয়ে শিব নাম জপ করতে লাগল। তারপর রাত ভোরে দিনের আলোতে যখন বিপদ কেটে গেছে মনে হল, তখন বোধ হয় তারা আবার উপলব্ধি করল যে, তাদের বন্দুকের জড়তা কেটেছে—অতটা অকেজো, নিশ্চয়ই নয়। বীরদর্পে তারা আবার বিটে ফিরে এল।]

সামান্য বৈতনভোগী সৈপাইদের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। বৃটিশের জন্য দেশবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা প্রাণ দেবে কেন? সাহসের অভাবেই হোক বা স্বদেশ-প্রীতিবশতই হোক, রণাঙ্গনে তাদের উপস্থিত না হওয়াই সমীচীন হয়েছে। তবু ভাবীকালের বিপবীদের অবগতির জন্যই তাদের কথা লিখলাম। ভরহীন দৃঢ়তার সঙ্গে ছোট্ট একটা দলও যদি আক্রমণ চালায় তবে শত্রুশিবির সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তারা নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে যার বলেই শত্রু শিবিরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অসমান শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রধান হাতিয়ার বিপবী মানসিক দৃঢ়তা—morale. কালারপোল যুদ্ধের শহীদদের morale শত্রুপক্ষকে হস্ত ও ভীত করে তুলেছে—শত্রুশিবিরকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে গেছে। দিনের আলোতে প্রচুর মিলিটারী আসবার পর তবুই তারা চারজন বিপবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমরা সামান্য সৈপাইয়ের ভীরুতা দেখে আশ্চর্যস্রাব লাভ করব না। বৃটিশ-পোষা যে খাঁ বাহাদুরের বাহাদুরী সম্বন্ধে ইউনাই সাহেব প্রশংসার পঞ্চমুখ—এই আসানুজ্জার বিপবীদের সঠিক পরিচয় বুলতে না পেরে পলিশ পার্টিকে গুলী ছুড়তে নিরস্ত করেছে, সেই বীর বাহাদুর রাত তিনটার সময় কালারপোল থেকে গুলীর শব্দ শুনে কি করলো তা জানবার ইচ্ছা স্বভাবতই আমাদের সকলেরই আছে। জাজমেন্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

“After unsuccessfully searching for the fugitives on both sides of the Khal at Kuler-math pole Ahasanulla, Abdul Azim and the other officers with them had taken shelter in an outhouse by the side of the Khal. After 3 a.m., they heard sound of firing from the direction of Kalarpole and started off towards the beat house.”

[খাঁ বাহাদুর আসানুজ্জার পার্টি-পলাতকদের অনুসন্ধানের পর ব্যর্থ-

মনোরথ হয়ে খালের ধারে একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিল। তখন রাত প্রায় তিনটে হবে। কালারপোল পলিশ বিটের দিক থেকে গুলীর আওয়াজ শুনে তারা সৈদিকে এগিয়ে গেল।]

ক্রমেই গুলীর আওয়াজ প্রখর হতে লাগল আর খাঁ বাহাদুরের গতিও গুলীর শব্দের সঙ্গে তাল ফেলে মন্দ্র হইল। খাঁ বাহাদুরের পা যেন সামনে চলতে বিমোহ করছে। মৃত্যু যে একেবারে শিয়রে। এতক্ষণ দূরে দূরে গুলীর আওয়াজ বাইরে ডিউটি কবেছে—এখন যে একেবারে ফায়ার লাইনে যেতে হবে। কাজেই খাঁ সাহেব ভাবল—সাহসিকতা অপেক্ষা বিচক্ষণতাই শ্রেয়।

সরকারী ভাষ্য পাচ্ছি—

“As they approached Kalarpole shots were fired in their direction and they took cover first behind the bank of a tank and then in the house of a Mohamedan nearby.”

[ওরে বাবা! এ যে আসানুজ্জার পার্টির দিকেই গুলী আসছে। ঊষ্মাস্তর নেই দেখে প্রথমে একটা পুকুর পাড়ের পেছনে আড়াল নিল। তারপর সেখানেও যদি বিপবীরা তাদের দেখে ফেলে—এই ভেবে কাছাকাছি কোন এক মুসলমানের বাড়িতে ঢুকে প্রাণ বাঁচাল। খাঁ বাহাদুরের সাহস ও বিক্রমের প্রশংসা করতে না পারলেও বিচক্ষণতার তারিফ না করে কি পারা যায়?]

সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়েছে। ফণীন্দ্র নন্দী তখনও মনসুর আলির মাচার নিচে বসে আছে। ফণীন্দ্র গুলীর শব্দ শুনেত পাচ্ছিল; কিন্তু যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না।

ফণীন্দ্র ভাবছে কোথায় যাবে—কি করবে। খুব বোধিষ্ণু অবস্থা তাকে ভাবতে হল না। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠিত স্তরে যুগে যুগে জয়চাঁদ, উমিচাঁদ, মীরজাফর প্রমুখের আঁবর্তণি হয়েছে এবং হবেও। শত্রুশিবিরে ফণীন্দ্র নন্দী অজানা-অচেনা কাছ আপনজনের সাহচর্য পেয়েছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত ফণার ছোবল থেকে রক্ষা পেল না।

মনসুর আলির আশ্রয় তোরাব আলির বাড়িটি মনসুরের বাড়ির খুবই কাছে। ফণীন্দ্রকে খুঁজে না পেয়ে তোরাব তার বাড়ির লোকদের মনসুরের বাড়ির ওপর নজর রাখতে বলে কালারপোল পলিশ বিটের কাছে থুত যুবকটিকে দেখতে গেছে। সেখান থেকে ফিরে তোরাব দেখল তার বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। এমন সময় মাচার নিচে ফণীন্দ্র নন্দীর গোপন অবস্থান তোরাব আলির দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর

বিশ্বাসঘাতকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হাত থেকে ফণীন্দ্র নন্দীকে বাঁচানো গেল না। মনসুর আলি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে ‘ভাইয়ের’ শত্রুতা দেখেছেন। ব্যাখ্যাত নয়নে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে মনসুর গোপনে চোখের জল মুছেছেন—মনসুরের শ্রী অস্ত্রার কাছে ফণীন্দ্র নন্দীর শ্রুত কামনা কবে কতই না প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিন্তু কোন ফল হল না। শত্রুপক্ষ দিনের আলোতে এখন সুযোগ পেয়েছে। একেবারে অসমান শক্তির সঙ্গে Running Battle-এ রাতের অন্ধকারে যেটুকু আশ্রয়স্থান সুযোগ বিপবীরা পেয়েছিল, দিনের আলোতে সেটুকু তারা হারিয়েছে। সর্বোপরি তোরাবের শত্রুতা তো আছেই। ফণীন্দ্র নন্দী রিভলভার হাতে মাচার নিচে থেকে বেরিয়ে এল।

আমাদের মামলার বায়ে টাইবন্ডনালের প্রেসিডেন্ট ইংরেজ জজ লিখছেন—

“The President Omra Mia and other villagers and the police came and searched the area but could not find the fugitive. In the early morning after sunrise he (Torab Ali), hearing that somebody had been caught at Kalarpole, went there and saw a Hindu youth under arrest at the beat house. On his return home he found a number of villagers assembled beside his house and then he noticed a man lying under the ‘mancha’ of Mansar Ali’s fuel shed. Presently there came a shout from the villagers from the south; ‘he was a runaway—and going to the north of Mansar Ali’s house he saw a Hindu youth running off towards the north-west. He at once gave chase and Mobarak Ali did likewise, followed by the other villagers. They caught him a little further on, on a narrow path between two tanks, and took from him the revolver which he had in his hand.”

[ডিভিট্র বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ওমবা মিঞা পলিশ ও গ্রামবাসীর সাথে মিলে সমস্তটা এলাকা অনুসন্ধান কবেও পলাতককে ফণীন্দ্র নন্দীকে খুঁজে পায় নি। তারপর সকালে সুবোধের পর তোরাব আলি থুত যুবককে দেখতে কালারপোল বিটে যায়। সেখান থেকে ফিরে তাব বাড়ির অদূরে কিছু জনতার সমাবেশ

লক্ষ্য করে। সেই সময় তেঁর আলি মনসরের জালালান রাখার বগে মাচার নিচে একজন যুবককে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে অন্যান্য লোকেরাও চোঁটসে উঠলো—“ওই তো পলাতক!” তোবাব মনসরের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পায় একজন হিন্দু যুবক উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটে যাচ্ছে। তোবাব পিছু নিল। মোবাবক আলি ও আরো অনেকে তোবাবকে অনুসরণ কবল। ফণীন্দ্র নন্দী দ্রুত পুরুরের মাঝ দিয়ে একটি মস্কীণ পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিল। অনুসরণ-সাবীবা এই স্থানে তাকে ধবে ফেলে ও তার রিভলভার ছিনিয়ে নেয়।]

ফণীন্দ্র নন্দী ধবা পড়েছে—বন্দী হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। তার রিভলভারও যে তারা কেড়ে নিয়েছে তাও মিথ্যা নয়। তবে বাস্তবে যা ঘটেছিল তার বথার্থ বিবরণ এইরূপ—অভূত, ক্রান্ত, ফণীন্দ্র নন্দী বিনীত রজনী বাপন করেছে। মাচার নিচে থেকে বোঁবরে বখন আশ্রয়কার শেষ চেষ্টা কবতে গেল, তখন সে যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। তবু সর্বশক্তি নিয়ে সে ছুটে চলেছিল। আন্দামান জেলে আমাদের প্রায় চারশ’ রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে ফণীন্দ্র নন্দীই দৈহিক গঠন, শারীরিক শক্তি, খেলাধুলায় তার দক্ষতা দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম। কি সুন্দর সৌম্য মুখাকৃতি ও উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ ছিল তার! কিন্তু বলিষ্ঠ ফণীন্দ্র নন্দীর সেই শক্তি কোথায় এখন? অভূত, ক্রান্ত ও ক্ষুধাত’ ফণীন্দ্র নন্দী পা পিছলে পুরুরের মধ্যে পড়ে গেল। হাতের রিভলভার খসে পড়েছে; হাঁটুতে আঘাত লেগেছে, ডান হাতের কনুই কেটে গিয়ে রক্ত বরছে। ফণীন্দ্র নন্দী এইরূপে এক অসহায় প্রতি-কূল অবস্থায় বন্দী হয়েছিল। কিন্তু এ সত্য কথা ইংরেজ সরকারের জাঙ্গশেট করিপতে লেখা নেই।

ভোর হয়েছে, সূর্য উঠেছে। দু’জন

বিদ্রোহী যুবক ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। বাকী চারজন নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙ করে কালাবপোল পুলিশ বিটের সশস্ত্র কনস্টেবলের সঙ্গে সম্মুখ লিপ্ত। ভীত-সম্ভ্রান্ত পুলিশের দল নানা অজু-হাতে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যস্ত। ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে পুলিশ লগে একদল সৈন্য রাত তিনটের সমব পৌছন সত্ত্বেও বিচক্ষণতার সঙ্গে শত্রু-পক্ষ সম্মুখ সমর পবিহার করে চলেছে। যাদের শত্রির অফুরন্ত উৎস—যাদের অজস্র সৈন্য, তারা ভীত বা ব্রুত হবে কেন? জালালাবাদে তারা অদূর ভবি-ষ্যতের আশাষ বণে ভগ্ন দিয়ে এসেছে। প্রযোজন হলে আজও সম্মুখ-সমর পরি-হার করবে—সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জয় সুনিশ্চিত জেনেই আক্রমণ করার সুযোগ নেবে। এই তো বণকৌশল।

তাই হল; সর্বশেষে পুলিশ ও সমর-প্রধানেরা বহু সৈন্য নিয়ে আসরে অব-তীর্ণ হলেন। কিভাবে তাঁরা সৈন্য সমা-বেশ করেছেন সরকারী তথ্য থেকে তা’ আমি উদ্ধৃত করছি—

(1) “While Ahasanulla was writing up the list, the police and some of the Eastern Frontier Rifles, went out in separate parties in search of the other fugitives.”

(2) “Between 7 and 8 a.m. on getting certain information he along with S. I. Abdur Rahim, Col. Dallas Smith and some men of the E. F. Rifles ran towards Kilnirja, about three quarters of a mile from Kalarpole on the west side of the Khal.”

(3) “In the meantime on

receipt of information another party consisting of the D.I.G. Mr. Farmer, Inspector Macdonald, Abdul Azim, S. I. Hem Gupta, eight men of the Eastern Frontier Rifles and four constables had gone south from the beat house to Uttardewan, a village about two miles from Kalarpole.”

অসানুল্লা সৈন্য পবিবোধিত হয়ে কালাবপোল পুলিশ বিটে ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে পাওরা জিনিসেব লিস্ট করছিল এবং বাকি কিছ, সৈন্য ও কনস্টেবলদের বাকি পলাকতদের খুঁজে দেখতে পাঠালো।

সকাল প্রায় ৭টা-৮টার সময় একটা খবর পেয়ে আসানুল্লা আবদুর বাহিম, কর্নেল ডালাস স্মিথ ও ইন্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের একদল সৈন্য নিয়ে কিল-মিরজাব দিকে ধাওয়া করে। এই স্থানটি খালের পশ্চিমে কালাবপোল বিট থেকে প্রায় পোনে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

ইতিমধ্যে এই সংবাদ পেবে অপরে একটি সামরিক দল স্বয়ং ডি, আই, জি, —মিঃ ফারমারের নেতৃত্বে কালাবপোল থেকে দক্ষিণে দুই মাইল দূরে উত্তর-দেওয়ান গ্রামের দিকে গেল। ডি, আই, জি-র সঙ্গে গেল ইন্সপেক্টর ম্যাক-ডোনাল্ড, আবদুল আজীম, হেম দাবোগা ও ইন্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের মাত্র (১) আটজন সৈন্য এবং চারজন কনস্টেবল।

জালালাবাদ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ নিজ পবা-জয়ের দ্রুতি ঢাকতে সাফাই গেয়েছে—তারা পাঠিয়েছিল মাত্র ছাপ্পানজন সৈন্য। চারজন বিদ্রোহী বীরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ শোভন নয়—ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি প্রশ্ন! তাই নাইটদের মধ্য বীর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রধান মিঃ ফারমার মাত্র সামান্য সৈন্যবল নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিলম্বমাত্র স্বেচছা বোধ করে নি। ইংরেজ জজ মিঃ ইউনাই বদি প্রচুর সৈন্য সমাবেশের সত্য তথ্যও লিপিবদ্ধ করতেন তাতেও আমরা কিছ, মনে করতাম না। বেতনভোগী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন ভারতের বৃকের ওপর শত শত বছর শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। তাই আজ শাসক প্রধানেরা নাইটের ভূমিকার অবতীর্ণ না হলেও এটা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিচক্ষণতার দ্রুতি বলে মনে করতাম না।

কালাবপোলের সন্নিকটে জলুদা গ্রামে মরণযুদ্ধ সমাপ্ত! শত্রুপক্ষ প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে। মৃত্যুর প্রতীক্ষণে চারজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী—প্রাণ দেবে তবু আত্মসমর্পণ নয়।

[চল্য]

দীপালাতে বিনামূল্যে উপহার



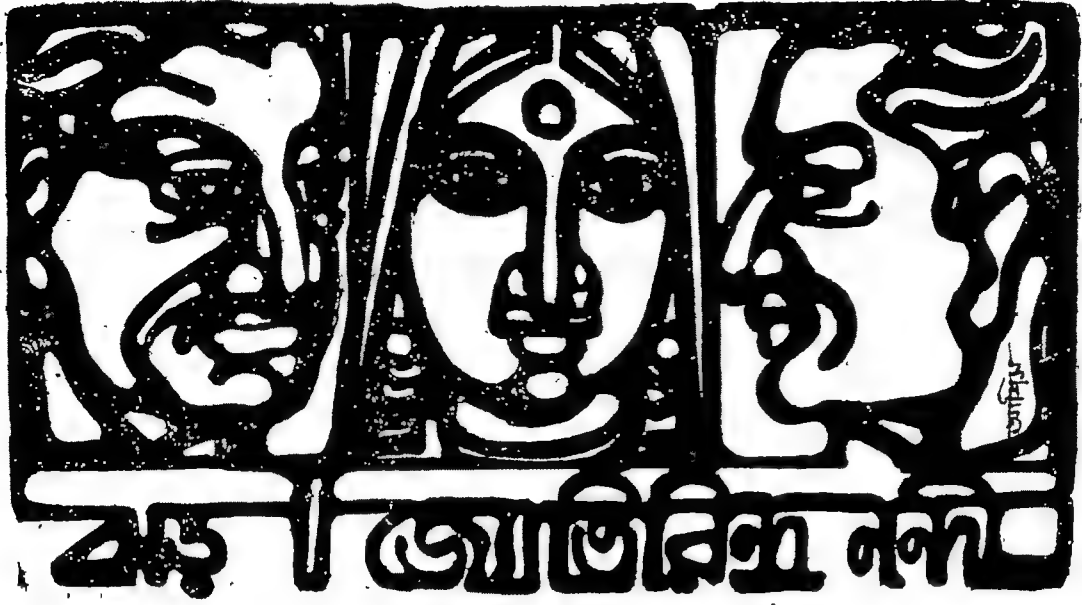
বিখ্যাত কাশ্মীরী শাল, প্রমাণ সাইজ, মনোরম ডিজাইন ও রং। ১খানি ৮, টাকা, ২খানি ১৫, টাকা, ৩খানি ২২, টাকা, ডিলাক্স কোয়ালিটি ১২, টাকা, ২খানি ২২, টাকা, ৩খানি ৩১, টাকা, ৪খানি ৪০, টাকা।

দ্রষ্টব্য: ২খানি শালের অর্ডার দিলে বিনামূল্যে সিলেক্স স্কার্ফ/লেডী পার্স পাঠানো হয়। স্টক সীমাবদ্ধ।

MAHALAXMI (SHAWLS-22)

Ch. B. Road, Delhi-6.





[ধারাবাহিক উপন্যাস]

ওবেলা ভাতে জল দিয়ে রেখেছিল সে। কাজেই এবেলা নতুন করে উনুন ধরিয়ে ছাত ফটাবার হাঙ্গামা করতে হবে না ভেবে সে খুশি হল।

নিজের জন্য কে এত পরিশ্রম করে।

সময় সময় ওদিকে গেলে রেলস্টেশনের স্টল থেকে সে পাউরুটি কিনে আনে। মর্দি পেলো মর্দিও নিয়ে আসে।

কতদিন তেলমর্দি চিবিরে বা একটু চিনি দিয়ে পাউরুটি খেয়ে রাতের আহারটা সে সেরে নেয়।

তার অর্থ দু'বেলা উনুন ধরিয়ে রাখতে বসা পোষায় না। কোনো পুরুষের শব্দই তা সম্ভব না।

উনুন গর্তোগর্দিত করা হাঁড়ি ঠেলা মেয়েদের কর্ম।

ওবা এসব-সব পারে। ভালও বাসে।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। পুরুষের মতন রান্নার ব্যাপারটাকে যমের মতন ভয় করে এমন মেয়েও আছে। সে নিজের চোখে দেখেছে।

বাই হোক, কোন মেয়ে রাখতে ভাল-বাসে কোন মেয়ে বিছানায় শুয়ে কেবল নভেল পড়তে কি সেজেগুজে জানালার পাশে চুপ করে বসে থাকতে পছন্দ করে বেশি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় ছিল না।

সূর্য গাছের মাথায় নেমে এসেছে।

তার মানে বড় জোর আর এক ঘণ্টা বেলা আছে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাবে। কার্তিক মাস। যেন এখন থেকেই একটু ঠান্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। সকালের দিকে তো বটেই, বেলা পড়ে এলেও ঠান্ডাটা বেশ অনুভব করা যাচ্ছে।

বৃষ্টি করে ঘরে কিছু শুকনো মাছ রেখে দিয়েছে সে। আর উঠানের গাছে তো লম্বা আছে-ই। কাজেই রাতে ফিরে এসে খাওয়ার জন্য কোনোরকম হাঙ্গামা তাকে করতে হচ্ছে না, শুকনো মাছটা পুড়িয়ে নিলেই হবে। মোটের ওপর সম্ভ্যার আগেই সে ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে চায়। তা ছাড়া আজ শনিবার। রণধীর নিশ্চয় সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে।

হুঁ, রণধীর বাড়ি ফিরেছে জেনেই সে এখন ওখানে যাবে। রণধীর বাড়ি না থাকলে সে যেত না, পারতপক্ষে সে যায়ও না।

কথাটা চিন্তা করে মনে মনে সে হাসল। তার বন্ধু। বাল্যবন্ধু। অথচ কত বেন পর হয়ে গেছে। তাই হয়। রণধীর বিয়ে করেছে। টুকটুকে বৌ রয়েছে ঘরে। আর সে এখনো 'ভেরেন্ডা ভাজছে।' এটা অবশ্য রণধীরের কথাই।

বাই হোক, ব্যাচেলার মানুস, হুটহাট ওদের আস্তানায় ছুটে যাওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়। বেশ একটু সন্মোচবোধ করে সে। শুনলে অবশ্য ওরা দু'জনেই হাসবে। এবং রণধীর যে তার পিঠে তৎক্ষণাৎ একটা কিল বসিয়ে দিয়ে 'হাম্বাগ, স্কাউন্ডেল-তোমার পেটে পেটে এত-ইত্যাদি বলে গালিগালাজ শুরু করবে তাও সে জানে। এবং আর একজনও, গালি-গালাজ করবে না, তবে রণধীরের মতন প্রথমটার এক দফা হেসে নেবে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবে, ভুরু দুটো ঈষৎ টান করে কালো চোখের দৃষ্টি খরতর করে তার মুখটা দেখবে, তার চোখ-মুখ পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষা করা হয়ে যাবার পর

দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলবে। ছবিটা কতদিনই কল্পনা করেছে সে।

অবশ্য ঐ ছবি ঐ মুখ কল্পনা করতে তার ভালই লাগে।

কেবল মুখ না চোখ না, গোটা মানুসটাই যেন যখন-তখন ছবির যতন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, কথা বলে হাসে, আবার গম্ভীরও হয়, দীর্ঘশ্বাসও ফেলে সময় সময়।

সত্যি, রততীর কালো চোখ যখন হাসির রৌদ্র লেগে ঝকঝক করতে থাকে আবার মূহুর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে যাবার পর সেই চোখ সেই মুখই মেঘলা আকাশ হয়ে ধমধম করতে থাকে তখন যে তার কি ভাল লাগে সেই মুখ দেখতে।

এটা তার ভিতরের কথা, মনের গভীরের গোপন কথা। রততীর হাসি তার কাছে যেমন সুন্দর তেমনি তার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলার দৃশ্যও তার কাছে সুন্দর। আশ্চর্য্য হয়ে যাবার মতন অবস্থা ঘটে তার।

তখন সে নিজেকে ধমক দেয় হাসন করে, ছি, তোমার বন্ধুপত্নী রণধীর তোমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন বিশ্বাস করে, ভালবাসে, রততী তোমাকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, এই অবস্থায় একটা স্রোত একটা বাসনা ভিতরে লুকিয়ে রেখে ওখানে আনাগোনা করা এবং হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। পাপ বলা যায় এটা। হতে পারে যুবতী, সুন্দরী, অগ্নিশের রৌদ্র-স্নান। পাকা খড়ের মতন তার গানের চামড়া উজ্জ্বল, আঁটসাতো

শরীর ফুলেব ডাঁটের মতন দীর্ঘ ঋতু, অনবদ্য হাত-পায়ের আঙুল মাথার চুল ভুরু। তা হলই বা, পৃথিবীতে কি আর রূপসী নেই যুবতী নেই। তুমি ওদের দিকে যতক্ষণ খুঁশি তাকিয়ে থাক, ওদের ছবি যত খুঁশি মনের পটে আঁকতে থাক, তাতে দোষ নেই, কিন্তু এখানে—

সে দমে যায়। এমন কি একটা অনু-শোচনা নিয়েও সে মাঝে মাঝে ওখান থেকে ফিরে এসেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই মন নিয়ে, এই দৃষ্টি নিয়ে আর সে ওদের কাছে যাবে না। যাওয়া উচিত নয়। হয়তো রণধীরও পাশেই বসা ছিল তখন। রততী চা করছিল। রণধীর যেমন তার সঙ্গে গল্প করছিল, তেমনি রততীও চুপ করে ছিল না। চুপ করে সে কখনই থাকে না। ফোয়ারার মতন তার মুখ থেকে অনঙ্গল কথা স্রব-ছিল, হাসি উপছে পড়ছিল। ওদিকে তার হাতও যে অবসর ছিল এমন না, কেটলিতে চা ভিজিয়ে সে রুটি সেঁকছিল, সেঁকা হয়ে যাবার পর প্রত্যেকটা রুটির টুকরোর যত্ন করে মাখন মাখাচ্ছিল, হয়তো ঘুরে বসে সে হাতের কাজ শেষ করে যাচ্ছিল। আর এদিকে রণধীরের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে চোরের মতন চোখটা এক-একবার আড় করে সে রততীর সুন্দর শরীরটা দেখেছে চাঁপার কলির মতন তার আঙুলগুলির নড়াচড়া দেখেছে। রণধীরও তখন স্ত্রীর দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল কিনা। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে সে। রণধীর যেইমাত্র তার দিকে চোখ ফিরিয়েছে সে-ও রততীর দিক থেকে চোখটা সরিয়ে এনেছে বা রততীর সঙ্গে যদি ঐ অবস্থায় চোখাচোখি হয়ে গেছে তো তৎক্ষণাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে অনেকটা অপরাধীর চেহারা নিয়ে সে অন্যদিকে তাকিয়েছে।

এই নীচতা কেন, এই জনন্য মনো-বৃত্তি কেন তার। রণধীর বুঝতে না পারুক। রততী মেয়ে-মেয়েদের দিকে একটি পুরুষ চুরি করে কখন তাকায় কেন তাকায়, পর পব কদিনই রততীর কাছে ধরা পড়ে যাবার পব রততী কি তার সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে আছে বলে সে আশা করতে পারে। না, তা আর কি করে সম্ভব।

কিন্তু বৃন্দমতী রততী যে সেই জিনিস তাকে ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে দেবে না এ-ও ঠিক। তাই তো সে দেখে আসছে।

এই জনাই তার অস্বস্তি বেশি।

এই জনাই সময় সময় ভয়ঙ্কর অনু-তাপ হয়। রততীর হাসি তাকানো কত নিস্কলুষ, কত সরল সহজ তার কথা বলার ভঙ্গি। কত নির্মল আন্তরিকতার ভরা তার আদর-আপ্যায়ন।

যদি একদিনও এর একটু ব্যতিক্রম দেখতে পেত সে তবে বুঝি তার ভিতরের অপবাদের বোকাটা লাঘব হত।

তাই এক-এক দিন ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে তাব মনে হয়েছে আর একদিনও সেখানে তার যাওয়া হবে না।

তারপর দু'-তিন দিন হয়তো যায়ও নি।

কিন্তু দেখা গেল তিন দিন পার হবার পর চতুর্থ দিন সম্যাবেলা রণধীর নিজে তার ডেরায় এসে উপস্থিত। চা-বাগান থেকে হয়তো বাড়িও ফেরে নি। সেখান থেকে মোটর সাইকেলে চড়ে সে সোজা তার এখানে চলে এসেছে। চোখেমুখে একটা ব্যস্ততা একটু যেন উদ্বেগও লেগে রয়েছে।

‘কি হল ইঠাৎ এমন ডুব দিয়ে আছিস যে?’

রণধীর তার কাঁধে হাত রেখে প্রথমেই এই প্রশ্ন করবে। করেছে। আর তখন ‘কাজের চাপ ছিল’ ‘পরীটটা তেমন ভাল ছিল না’ ইত্যাদি মিথ্যা কথা তাকে বলতে হয়েছে। এ ছাড়া আর কি বলত সে।

রণধীর তাই বিশ্বাস করেছে।

বেশ তো, আজ নিশ্চয় আর তেমন কাজ নেই, আজ বোধ করি শরীর ভালই আছে, চল আমার সঙ্গে।’ শিশুর মতন চমৎকার হেসে এমন একটা আশ্বাসের ভঙ্গি নিয়ে রণধীর তার কাঁধ ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়েছে যে ‘যাব না’ এমন কথা মুখ দিবে বার করতে সে লজ্জাবোধ করেছে। অগত্যা তখন গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে বসেছে, তারপর জামা-কাপড় পরে ঘরের জানালা-টানালা বন্ধ করে দরজার তালা ঝুলিয়ে রণধীরের সাইকেলের পিছনে চেপে বসেছে। তার নিজের মোটর সাইকেল নেই, ওই জিনিস চালান তার অভ্যাসও নেই, রণধীর যদি দু’ চাকার গাড়িটা নিয়ে তাকে কোনোদিন ডাকতে এসেছে তো তাব গাড়ির পিছনে বসেই সে রাণীবাগ রণধীরের আস্তানায় চলে গিয়েছে। এখান থেকে দূর কম না। তিন মাইলের বেশি পথ। তা ছাড়া সব জায়-গায় রাস্তা ভাল না। একটা বড় নালা আছে, ভাঙন আছে খানিকটা জায়গায়। তখন আর গাড়ি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। দু’দিক থেকে কাঁটলতা এগনভাবে এসে গায়ে মাথায় লাগে, পায়ে হেঁটে সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে জায়গাটা পার হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তেমনি বাঁশের সাঁকের ওপর দিয়ে নালাটা পার হবার সময়ও মোটর বাইক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা দু’এক জায়গায় এ-ধরণের অসুবিধা থাকলেও গাড়ি চড়ে যাওয়া আর হেঁটে এতটা পথ যাওয়ার অনেক তফাৎ। একলা যেদিন তাকে হেঁটে

হেঁটে রাণীবাগ যেতে হয় সোদিন সে পথের দু’রহটা বিলক্ষণ টের পায়।

এমন তো হয়েছেই। তিনদিন সে তার এই জগালের ডেরায় দাঁতমুখ খিঁচি চুপ করে বসে আছে। রাণীবাগ ছুটে যাবার প্রবল ইচ্ছা তাকে ঝড়ের মতন এক-এক সময় নাড়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু প্রলোভন জয় করতে হবে, কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে দেবে না—কথাটা মনে হওয়া মাত্র পাথরের মতন সে স্থির হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতবে কষ্ট হয়েছে, যন্ত্রণা পেয়েছে—তা হলেও নিজে কে বুঝিয়েছে, আজ কষ্ট হবে কাল কষ্ট হবে, কিন্তু তারপর এই জিনিস সহ্য হয়ে যাবে—একটি মানুষকে ভুলতে, একটি মুখ চিরদিনের মতো ভুলে যেতে বেশি সময় লাগার তো কথা নয়, বিশেষ করে এই মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী—কদিন সে তাকে দেখেছে? এক বছর দেড় বছর? না, দেড় বছর হবে না, আশ্বিনে আশ্বিনে এক বছর—তার আগের এক শ্রাবণের তেইশ তারিখ রণধীর বিয়ে করেছিল। ভরানক দুর্বারের রাত ছিল। তার পরিস্কার মনে আছে। তাদের কলকাতার পটল-ডাঙার মেস থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রণধীর বিয়ে করতে রওনা হয়েছিল। রণধীরের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সে-ও বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিল বৈকি। তাকে তো থাকতেই হত, বিয়ের আলাপের সূত্রপাত থেকে পাকা দেখা পর্বস্ত অগ্রণী হয়ে তাকেই সব করতে হযেছিল না? মেসেব অন্য বন্ধুরা আর কদিনের, সেই ছেলেবেলা থেকে রণধীরের বন্ধু সে। সুকিয়া স্ত্রীটোব অ্যাডভোকেট নিবারণ চক্রবর্তীর কলেজে-পড়া মেয়ে রততীর সঙ্গে রণধীরের বিয়ের প্রস্তাবটা ঠিক কে তাদের সামনে এনে তুলে ধরেছিল আজ আব তার ভাল মনে নেই, মনে থাকার কথাও নয়, ডাক্তারী পাশ কবেছে, স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে শুনতে চমৎকার, সচ্চরিত্র—এমন ছেলের পাঠী জোটাবার জন্য কত ঘটক না ছুটোছুটি করেছিল সোদিন। যাই হোক, এক শ্রাবণের বিকেলে রণধীরের সঙ্গে সুকিয়া স্ত্রীটো গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এসে-ছিল সে। রততীকে তার এই প্রথম দেখা। দেখে তার ভাল লেগেছিল। একটু রোগা বলে রণধীর প্রথমটা একটু খুঁত খুঁত করেছিল যদিও। কিন্তু বন্ধুকে সে তখন বার বার বুঝিয়েছিল, এই রোগা চেহারা থাকবে না মেয়েব, বিয়ের পব সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই অবশ্য হয়েছিল, বিয়ের দু’ মাস পরেই ‘আশ্চর্য’ সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল রততীর। না, মোটা নয়, যেন একটি লতা, বৃষ্টিব অভাবে সামান্য শুকনো চেহারা ধরেছিল যা, কিন্তু যেই বর্ষা নামল, ঝুপ ঝুপ করে পুরুষের

ভালবাসার বৃদ্ধি পড়তে আরম্ভ করল। অর্মান দেখতে দেখতে শীর্ণ লতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, সতেজ লাবণ্য নিয়ে অমিত আবেগ নিয়ে সুখেলাস্যে রততী যেন ধরধর করে কাঁপছিল। বিয়ে করে রণধীর বেলগাছিয়া পোলের কাছে আলাদা বাসা নিয়েছিল।

রণধীরের জন্য এই বাসা সে-ই খুঁজে দিয়েছিল। এই জন্যও তাকে কদিন কম হাটাহাটি করতে হয় নি। অবশ্য তারপর কলকাতার রণধীরকে আর বেশি দিন থাকতে হয় নি। মাস তিনেক পরেই নতুন চাকরি নিয়ে এখানে চলে আসে। তাদের সেই বেলগাছিয়ার বাসার রততীকে দেখে কথটা তার প্রথম মনে পড়েছিল। হুঁ, তার নিজের দূরদর্শিতার কথা। তার ভবিষ্যৎবাণী কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। যেন চৈত্রের ক্ষীণতোয়া নদী ভাঙের শেষে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। সেদিন তার খুব ইচ্ছা হয়েছিল রণধীরকে কথটা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ইচ্ছা পূর্ণতাই— এই সম্পর্কে রণধীরকে কিছু বলতে আর যেন সে সাহস পায় নি। তাই তো, বিয়ের আগে রততী সম্পর্কে অনেক কিছু মন্তব্য করার অধিকার তার ছিল, মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখা, তার রূপ যৌবন গায়ের রং মাথাব চুল যাচাই করা, তার হাঁটা পরীক্ষা করা, গলার স্বর কেমন সেই সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করার পথে তার কোনো বাধাই ছিল না। এবং রণধীর তার কাছে তাই আশা করেছিল। কাজেই গলা বড় করে সে-ও তার মতামত ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের বিয়ের পর্বদিন থেকেই তো সে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে গেল। হতে পারে রণধীর তাব বন্ধু, কিন্তু বন্ধুপনীর রূপযৌবন নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার তার ছিল কি। ছিল না।

চা-বাগানের ডাক্তার হয়ে রততীকে নিয়ে রণধীর রাণীরবাগ চলে আসার প্রায় ছ' মাস পর সে এখানে আসে। অবশ্য বলতে গেলে রণধীরই গরজ করে তাকে এখানে আনিচ্ছে। কাঠের ব্যবসা করবে বলে সে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। জায়গা পছন্দ হচ্ছিল না। জঙ্গল থাকবে, জঙ্গলে বড় বড় গাছ, যেমন শাল, সেগুন, সুন্দরী ইত্যাদি থাকবে, আবার শূন্য গাছ থাকলেই হল না, গাছ কাটতে পারে, চিবতে পারে এমন লোকজন হাতের কাছে পাওয়া চাই, তারপর সেসব শহরে বাজারে গল্পে পাঠাবার জন্য লরী ওয়াগন বা নৌকার সুবিধাও থাকতে হবে, তবে তো কাঠের ব্যবসা চলবে। এখানে প্রায় সব ষ্টা সুবিধা রয়েছে দেখে রণধীর তাকে থবর দিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে আসে।

এবং সে এসে চারদিক দেখে-শুনে খুঁশি হয়েছিল। এমন জায়গাই সে মনে মনে এককাল খুঁজেছিল। অবশ্য প্রথম দু-তিন মাস তাকে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। জঙ্গল ইজারা নেওয়া, লোকজন যোগাড় করা, একটা ট্রাক সংগ্রহ করা, তারপর কারখানার জন্য চালা তোলা, নিজের থাকার মত একটা ঘর তোলা—রণধীরও নানাভাবে তাকে সাহায্য করেছে এবং চিঠি লেখালেখি করে রণধীর যখন জানতে পারল সীতাংশু এখানে চলে আসতে রাজী তখন রণধীর খুবই খুঁশি হয়েছিল। এমন কি একই থামে করে সে এবং রততী পরের ডাকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতায় চিঠি দেয়। চিঠি দুটো সে স্বস্তি করে তার স্টুটকেন্স-এ রেখে দিয়েছে।

এটা অবশ্য তার অনুরোধ। এখানে আসার পর আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কেও রণধীরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে সাহস পায় নি। রততীকে তো নয়-ই।

তার কেন জানি কেবল মনে হয়েছে কলকাতায় বেলগাছির টিমটিমে কাঠের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সরাসরি জঙ্গলে এসে ভাল করে সীতাংশু ব্যবসা ফেঁদে বসুক, রণধীরকে এই বৃদ্ধি রততীই যেন দিয়েছিল। তাই কি?

কথটা এত গোপনীয় যে এ জিনিস মুখ থেকে বার করা যায় না। এই নিয়ে রঙিন কম্পনার জাল বুনতেই ভাল। এবং ততক্ষণই জিনিসটা সুন্দর থাকে। মুখ থেকে বের করলেই তা অশোভন অশালীন হয়ে পড়বে। সীতাংশু তা বোঝে। এই নিয়ে সে সময় সময় নিজেকে শাসনও করেছে। এটা তোমার নিজের কম্পনা। রণধীর তোমার ব্যাল্যবন্ধু, এক সঙ্গে বড় হয়েছে এক জায়গায় থেকে দুজন লেখাপড়া করেছে। দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেও একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পার নি। আজ রণধীর তার কর্ম-স্থলে গিয়ে যদি তোমাকেও কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায় তো তাতে অবাধ হবার কিছুই নেই। এটাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে তোমার শূদ্ধাকাঙ্ক্ষী। চাকরির দিকে তোমার মন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভই তোমার চিরদিনের কাম্য। কলকাতায় থাকতেও সে তোমাকে সাহায্য করেছে। রণধীর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কাঠের ব্যবসা করার মতন পুঁজি তোমার হাতে ছিল না। রণধীরই টাকা-পয়সা দিয়ে প্রথমটার তোমাকে সাহায্য করেছিল। আজ যদি রণধীর মনে করে রাণীরবাগ কি তার ধারে-কাছে কোথাও কাঠের ব্যবসা খুলে বসলে তুমি সকাল সকাল উন্নতি করতে পারবে এবং এই নিয়ে সমস্ত বিষয় খুলে-মেলো তোমার পর পর সে চিঠি দিয়ে থাকে

তো সেটাই তো একমাত্র সত্য, এম সঙ্গে রততীকে তুমি জড়াতে চাইছ কেন? রততী হয়তো এ-ব্যাপারে হ্যাঁ, না, কিছুই বলে নি। একমাত্র রণধীরের ইচ্ছায় তুমি এখানে চলে এসেছ। রণধীরের লেখা চিঠিগুলিও তো তোমার স্টুটকেন্স-এ রয়েছে। কাজেই—

কম্পনাটা রঙিন এবং সুখকরও বটে। আবার এইজন্য বিবেকের দংশনও সে কম অনুভব করছে কি?

যেন রততী তাকে মনে মনে ভালবাসে! যেন রণধীরের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে আসার পর সীতাংশুর আদর্শনে সে শূন্য হয়ে মরছিল। তাই স্বামীকে ছাপিয়ে জাপিয়ে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে সীতাংশুকে সে এখানে নিয়ে এসেছে।

ছি, এমন একটা চিন্তা তার মনে উদয় হয় কেন সে বুঝতে পারে না! তাদের বিয়ের পর বেলগাছিয়ার বাসায় সীতাংশু কদিনই তো গিয়েছিল। রততীর চোখে চেহারায় এমন কোনো জিনিস কি সে দেখতে পেয়েছিল?

কাজেই এই অসুস্থ আঙ্গুণি ভাবনা-টার জন্য তার নিজের ওপব অনেক সময় রাগ হয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে সে। এই পাপ চিন্তার প্রভাব দিয়ে রততীর ওপব আবিচার করবে না এমন প্রতিজ্ঞাও মনে মনে কতবার সে কবেছে, কিন্তু কতক্ষণ? অবশ্য দামাল শিশু যেমন সহজ নিষেধ সন্তোষ আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে চায়, তেমনি তার অব্যাহত অশান্ত ঘন আবার সেই চমৎকার বর্ণাঢ্য চিন্তায় বেলুনটা নিয়ে লোফালাফি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং.
২০০, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

কাজেই তার চিন্তা অপরাধের বোঝা
সে বেড়েই চলাছিল।

হুঁ, যে কথা হাছিল, তিনদিন রাগারি-
বাগ গেল না সে, চতুর্থ দিন রণধীর
মোটর বাইক নিয়ে ছুটে এল। আর বলা-
মাত্র সীতাংশু তার গাড়ির পিছনে চেপে
বসল।

‘বুঝলি সীতাংশু?’ রাস্তায় রণধীর
একসময় কথাটা বলে ফেলল। ‘ব্রততী,
ভরানক মন খারাপ করে বসে আছে।’

‘কেন?’ সীতাংশুর বুদ্ধির ভিতর
হয়তো টিবি করে উঠল। ‘হঠাৎ মন খারাপ
কেন?’ উৎসুক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে
প্রশ্ন করেছে।

রণধীর হেসেছে।

‘তুই অনুমান কর দিকি নি কেন মন
খারাপ?’

সীতাংশু চুপ করে থেকে রণধীরের
মাথার পিছনটা দেখাছিল। তার বেন মনে
হল ভাঙারের মাথায় শীগগির টাক
পড়বে। মাথার পিছনে খানিকটা জায়গায়
চুপ ইতিমধ্যে বেশ পাতলা হয়ে এসেছে।
বস্তুত এই বয়সেই যদি রণধীরের মাথায়
টাক দেখা দেয় তো ব্রততী মন খারাপ
করবে কি না? সীতাংশু চিন্তা করতে
লাগল।

‘কি হল, আমার কথা উত্তর না দিয়ে
চুপ করে আছিস যে?’ এবার ঢালদর পথে
গাড়িটা হঠাৎ নেমে যাচ্ছিল তাই বাস্তব
লগে রণধীরের কাঁধ দুটো ঝুঁকি নেড়ে
উঠল। বিন্দু কাঁধ। একটু বেঁটে হলেও
অত্যন্ত আঁটসাঁট শরীর তার। রণধীরের
প্রশ্নে পিঠ ও মজবুত ঘাড়ের ওপর চোখ
রেখে সীতাংশু ভাল অল্প বয়সে মাথার
টাক পড়ুক কি এখনই দাঁত পড়তে আরম্ভ
করুক রণধীরের লোহার মত শক্ত পিটানো
শরীরটা ভাঙতে অনেকদিন লাগবে। যেন
সত্তর বছর বয়সেও এই শরীরের কিছুই
হবে না।

সীতাংশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
এবং আর চুপ করে থাকা অশোভন হচ্ছে
চিন্তা করে সে ঝুঁকি হাসল।

‘কেন, খুব ঝগড়া-টগড়া করে বাড়ি
থেকে বেরিয়েছিলি নাকি, হঠাৎ ব্রততী মন
খারাপ করতে থাকে কেন! সব সময় হাসি-
খুশি থাকে যে মানুষ?’

রণধীর এবার শব্দ করে হেসে উঠেছে।

‘তোমার যেমন মাথা, যেমন তোমার চিন্তার
ধারা, ব্রততীকে তুই যতটা নরম ননীর
পদতুল মনে করিস আসলে সে তা নয়।
বরং তার উল্টো। কেন না আমার চেয়ে
তোমাকে আর কেউ বেশি চেনে নি।’

‘আমি জানি বেশ শব্দ ধাতুর মতো সে।
আমি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে
এলে মন খারাপ করে সে গালে হাত দিয়ে
বসে থাকে, মানুষ মোটেই নয়। বরং
দেবী। খুশি হয়ে খেয়ে-দেয়ে লম্বা হয়ে
বিশ্রাম শূন্যে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠবে।’

‘হ্যাঁ, সীতাংশু ছোট করে একটা থমক
দিল। ‘মোটেই ব্রততীকে দেখে সে ধরনের
মেয়ে মনে হয় না। মনে হয় অত্যন্ত
মায়াময়। ভরা তার মন, সম্পর্কাতর
এবং অভিমাত্রিক বটে।’

‘ওফ, যেন আমার চেয়ে তুই মানুষটাকে
বেশি চিনে ফেলেছিস।’ যেন রণধীর আর
হাসল না, ভেঁচি কাটল। রাস্তা সমান
পেয়ে তার গাড়ি দুতবেগে ছুটছিল।

কাজেই হঠাৎ সে চুপ করে রইল।
সীতাংশু কথা বলাছিল না। দেখতে
দেখতে লেই কাটা-জগলে ভরা রাস্তাটা
এসে গেল। এবার গাড়ি ধামিয়ে দুজনকে
নামতে হল। রণধীর পকেট থেকে রুমাল
বের করে কপাল মুছছিল। সীতাংশু
গাড়ির হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়েছিল।
জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। কিছু
ডাকেছিল। এলোমেলো বাতাস বইছিল।
গাছের পাতার সরসর শব্দ হাছিল। যেন
দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে রণধীর
হাঁটতে আরম্ভ করল। সীতাংশু সাই-
কেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

‘না, আমি আর ব্রততীকে তেমন করে
কি করে চিনব।’ যেন সীতাংশু হার
মানল। ‘আমার চেয়ে তুমি ডাকে অনেক
বেশি চেনা জান। সে তোমার স্ত্রী।’

যেন কথাটা শূন্যে রণধীর খুশি হল।
হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুকে এক-
বার দেখে নিল। সাইকেল নিয়ে সীতাংশু
পিছনে হাঁটছিল।

সামনের দিকে চোখ রেখে রণধীর
হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘সব স্বামীই যে
তাদের স্ত্রীকে বোল আনা চিনতে পারে,
বুঝতে পারে আমার কিন্তু তা মনে হয়
না।’

চমকে উঠে সীতাংশু বন্ধুকে দেখ-
ছিল। মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মাথার
পিছনটা যেখানে চুল পাতলা হয়ে এসে-
ছিল সেই জায়গাটাই সে আবার দেখাছিল।

‘তা অন্য সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে
সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায় জানি
না, কিন্তু সেসব স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে
তোদের দুজনের তুলনা করলে তোমার
না।’

‘কেন চলে না?’ মুখ না খুলিয়ে
রণধীর প্রশ্ন করল।

‘যেহেতু তোদের দুজনকে আমি সর্বদা

দেখছি—কেন্দ্রে গলাটা একটু পরিষ্কার
করে নিয়ে সীতাংশু বলল, ‘তোদের মধ্যে
ভালবাসা একটু বেশি।’

এবার রণধীর দাঁড়িয়ে পড়ে হো-হো
করে হাসতে আরম্ভ করল। সীতাংশুকেও
দাঁড়াতে হল। হাসতে হাসতে রণধীরের
চোখে বাকি জল এসে গেল। আবার
পকেট থেকে রুমাল বার করে সে চোখ
মুছটা মুছে নিল। তারপর সীতাংশু
কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘এবার আমি হার
মানলাম তোমার কাছে—এবার তুই জিতে
গেছিস—সত্যি তোমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া
আমার তো নয়—ই ব্রততীরও সাধ্য নেই—
হুঁ, মন খারাপ করছিল সে কেন শোন—
পুরন্দ্র সারা দুপুর বসে বসে এত ক্ষীর-
পুদি তৈরি করেছিল বেচারী।’

‘হুঁ, তারপর?’ সীতাংশু ছুঁত
রইল।

‘আগের দিন তুই বাস নি, ভেবোছিল
পুরন্দ্র রাবি—গেলি না, পুরন্দ্রও তোমার
পাশে নেই, কাল পর্যন্ত কাটা পুদি তোমার
জন্মে রেখে দিয়েছিল। আজ সকালে
সেগুলো পড়ে উঠতে কুকুরটাকে দিয়ে
দিয়েছে।’

কেন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে
সীতাংশু হাসল।

‘ও, এই জন্যই ব্রততীর মন খারাপ
স্বাভাবিক।’ রণধীর মাথা কাঁকাল।
‘রোজ না হোক একদিন অন্তর তো তোকে
আমরা কাছে পাই—আত্মীয়-বন্ধু বলতে
এখানে আর আমাদের কে আছে, অথচ
তিনদিন তোমার দেখা নেই—ওদিকে তোমার
নাম করে ব্রততী নিজের হাতে কাটা পিঠে
তুলে রাখল, সেগুলোও নষ্ট হল। আমার
পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই
তো আজ ছুটে এলাম। ভালবাস কি জানি
বেঁচে আছিস কি মরে গেছিস।’

সীতাংশু অন্যদিকে চোখ ফেরাল।
বিড়বিড় করে বলল, ‘শরীরটা ভাল ছিল
না—’ তারপর রণধীরের চোখে চোখ রেখে
বলল, ‘ঠিক আছে, এখন তো তোমার সঙ্গে
যাচ্ছি, আজ ব্রততীকে গিয়ে বলব আবার
পিঠে ভাজতে, পেটভরে তার হাতের পিঠে
থেকে আসব।’

‘আজ অন্য রকম মেন্দ।’ রণধীর ক্ষীণ
গলায় হাসল। ‘আজ যেন হরিণের মাংস
রাখা করছে।’

সীতাংশু লম্বা করে বাড়ি কাণ করল।

‘বেশ তো, হরিণের মাংসই পেটভরে
খাওয়া যাবে।’

বিশ্বযাত্রা

এলোক্ত্যনাথ

দিনশুলি

চক্রবর্তী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমি জয়গ কেন্দ্রে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলাম এবং উক্ত গ্রামের অপর্ণা ঘোষকে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের বই শেট-পেন্সিলের ব্যবস্থা করিলাম। আমি জয়গ গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী স্থাপন করিলাম, দাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র হেরম্ব ভট্টাচার্যের নিকট হইতে আমার কেন্দ্রসমূহের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। জয়গ কেন্দ্রে ডাক্তার নিযুক্ত হইল, আমাদেরই দলের সভ্য ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র সাহা। আমকী কেন্দ্রে যশোদাকুমার দে কবিরাজের বাড়িতে আমার গ্রামের পরিমল রায়কে শিক্ষক-ডাক্তার এবং কমরী হিসাবে বসাইলাম। আমার গ্রামের রাজেন্দ্র চক্রবর্তীকে এক গ্রামে বসাইলাম। কাজ চলিতে লাগিল, সফল ফলিতে লাগিল। আমি বিধবস্ত অশ্বলেব প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পাষে হাট্টয়া গিয়াছি, হাইখচর গিয়াছি, দল্লালবাজার গিয়াছি। সতীশবাবু তাঁহার কাজিরখিল কেন্দ্রে বাঁশের চরকা তৈয়ারির ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাঁশের অভাব নাই, কাঠের চবকা অপেক্ষা বাঁশের চরকায় খরচ খুব কম পড়ে। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে কাজিরখিল পাঠাইয়া বাঁশের চরকা তৈয়ার করা শিখাইলাম, উদ্দেশ্য আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিব। আমি নোয়াখালিতে প্রায় দেড় বৎসর ছিলাম।

দেশ বিভাগ যখন হয় তখন আমি দাঙ্গাবিধবস্ত অশ্বলে ছিলাম। ঐ সময় পাক-ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। দেশভাগের হিড়িক চলিতে লাগিল, রাজনৈতিক নেতা এবং কমরীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি স্থির করিলাম আমি দেশত্যাগ করিয়া যাইব না, আমি

পাকিস্তানেই থাকিব, পাকিস্তানের জাগরণের সূচ-দুখের অংশগ্রহণ করিয়াই থাকিব। এই দেশ পূর্ববঙ্গ, আমার দেশ; আমার পিতৃপিতামহের স্মৃতিজড়িত সোনার বাংলা কেন আমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব? আমাদের ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করিলে চলিবে না, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করিতে হইবে। দেশে থাকিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি বাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার দেশত্যাগ চলিবে না, আমার এই দেশেই থাকিতে হইবে।

আমি স্থির করিলাম, আমি আমার গ্রামে থাকিয়া গঠনমূলক কাজ করিব, আমার গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমি গান্ধী ক্যাম্পের সহযোগিতায় কাজ করিতাম। একদিন আমি সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে বলিলাম, নোয়াখালির অবস্থা এখন স্বাভাবিক হইয়াছে, এখন এখানে আপনার এবং আমার, দুইজনের থাকার কোন প্রয়োজন নাই, আমার প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার হাতে দিয়া আমি নিজ গ্রামে গিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। আমি একদিন আমার ৪ কেন্দ্রের কমরীদিগকে সতীশবাবুর নিকট ডাকাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম, তাহাব মধ্যে আমকী গ্রামের যশোদাকুমার দে ছিলেন। আমার জয়গ কেন্দ্রের তহবিলে ৮০ টাকা ছিল, অন্যান্য কেন্দ্রেও কিছু টাকা ছিল, আমি সব টাকা এবং কমরীদিগকে সতীশবাবুর হাতে দিয়া মুক্ত হইলাম। আমি পরিমল রায় এবং রাজেন্দ্র চক্রবর্তীকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম। মহাত্মা গান্ধী যখন নিহত হন, তখন

আমি জয়গ ছিলাম। মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমি তৎক্ষণাত কাজিরখিল রওনা হইলাম, ১২।১৪ মাইল রাস্তা পায়ে হাট্টয়া গেলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান, বহুলোক সমবেত হইয়াছে, কাহারো মধ্যে শব্দ নাই, সকলেরই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। কি করণ দৃশ্য!

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি কিছু করিতে পারি বা না পারি আমার বক্তব্যে কোন মহলে বলিয়া আসিতে পারিব। আমি কোনস্থানেই বাধা পাই নাই। লীগ মন্ত্রিমন্ডলীর আমলে যখনই প্রয়োজন বোধ করিয়াছি, মন্ত্রিমন্ডলী নূরুল আমিন সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আমার বক্তব্য বলিয়া আসিয়াছি। ব্রিটিশ আমলের মৈদীনীপুরের বিখ্যাত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামসু দোহা লীগ মন্ত্রিমন্ডলীর সময় পুলিশের আই, জি, পি, ছিলেন। সম্ভবত ১৯৫২ সনে আমি ফণী মজুমদার, দেবেশ ঘোষ প্রভৃতির মুক্তির জন্য ডি, আই, আ, বি, এফ, আর, খন্দকারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন খন্দকার সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, দোহা সাহেব আপনার সহিত দেখা করিতে চান। আমি রাজী হইলাম, তখন খন্দকার সাহেব দোহা সাহেবকে ফোন করিলেন, তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তখন খন্দকার সাহেব তাঁহার গাড়ি এবং একজন অফিসার সঙ্গে দিয়া আমাকে ইডেন বিল্ডিং-এর দোহা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দোহা সাহেব আমাকে দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন, বহু বৎসর পূর্বে আই, বি, অফিসে বসিয়া আমি আপনার ইতিহাস লিখিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, তাই খবর দিয়াছিলাম। আমিও বলিলাম, আপনাকে আমি বহু বৎসর পূর্বে হইতেই নামে জানি, এখন সাক্ষাৎ-পরিচয় হইল। তখন চারিদিকে

সাম্প্রদায়িক উদ্বেজনা চলিতেছিল, আমি বলিলাম, আমি নানাস্থানে যাই, যদি প্রয়োজন হয়, আশা করি আপনার সাহায্য পাইব। দোহা সাহেব বলিলেন, আপনার যখন প্রয়োজন হইবে, আমার নিকট আসিবেন, আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করিব।

১৯৫০ সনের দাঙ্গার পর আমি ঢাকা গিয়া মোলানা আকরম খান সাহিত দেখা করি। ১৯২১ সনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মোলানা সাহেবের সহিত যে পরিচয় হইয়াছিল, তাহার পর আর দেখা হয় নাই। তখন শহরের যা অবস্থা, আমাকে হত্যা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া রাখিলে কোনই খোঁজ হইত না। তখন আজাদ আফিস ও মোলানা সাহেবের বাড়ি এত বড় ছিল না। মোলানা সাহেব একতলা দালানে বাস করিতেন। আমি বেলা তিনটার সময় মোলানা সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম, লোকজন কেহ ছিল না, গেট খোলা ছিল। আমি কিছুক্ষণ মোলানা সাহেবকে ডাকাডাকি করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মোলানা সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। আমার পরণে ধূতি ছিল। একজন অপরিচিত হিন্দুকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি রাগতভাবে বলিলেন, বাড়িতে মেরেছেলে আছে, ভিতরে ঢুকিয়াছেন? আমি বলিলাম, “আপনার বাড়ির মধ্যে আমি ঢুকিতে পারি।” বৃদ্ধের রাগ অর্ধেক কমিয়া গেল। তিনি বলিলেন, পরিচয়? আমি আলিপুর জেলের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পাশে চেয়ারে বসাইলেন। আমি বলিলাম, মোলানা সাহেব, দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এখন জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে, তবে জাতির ভবিষ্যৎ কি? মোলানা সাহেব বলিলেন, পূর্বে রাজা-বাদশাবা ছিল চরিত্রহীন, স্বার্থপর, জাতিকে গাড়িয়া তুলিয়াছে সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির। আমি সময় সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া গাছতলায় বসিব কিন্তু আমি তা সব ছাড়িতে পারিতেছি না। এজন্য আমি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু করার আপনারাই করিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন, ঐসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা বাস করিতে পারিল না, দুর্নিয়র সম্মুখে ইসলামের এই কলঙ্ক হইতে দিব না। এখনই কোন গণ্ডগোলের আভাস পাইবেন। আমাকে সংবাদ দিবেন, আমি গণ্ডগোল বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা

করিব, প্রয়োজন হইলে আমি নিজে সেইখানে যাইব।

কাপাসাটীয়া পল্লী গঠন কেন্দ্র

আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত, হয় গভর্নমেন্টের অধিন, নয় বন্ধু-বান্ধবদের অধিনে প্রতিপালিত হইয়াছি, বাড়ির ভাত খুব কমই খাইয়াছি। আজ সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পর বাড়িতে বসিলাম, গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করার জন্য। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এখন সংগ্রাম বিদেশী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নয়, সংগ্রাম নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, বারিদের বিরুদ্ধে, বৃশংস্কারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এখন আর ফাসিকার্কে কুলিতে হইবে না, জেলে-স্বািপান্তরে পাচিত হইবে না, এখন গভর্নমেন্টই হইবে সহায়ক। স্বাধীনতা লাভের পর দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য হইবে জাতির সকলপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া জাতিকে সবল করিয়া গাড়িয়া তোলা, জাতীয় চরিত্র গঠন করা। চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড। একটা জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতি থাকে, তবে সেই জাতির ভবিষ্যৎ অশুভ। আমি স্থির করিলাম, আমার গ্রাম এবং আমার অঞ্চলকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমার অঞ্চলে কেহ অশিক্ষিত থাকবে না, বেকার থাকবে না, অনাহার অচিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইবে না, মামলা-মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইবে। আমি আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ারের কারখানা স্থাপন করিলাম, চরকা তৈয়ারেব হস্তশিল্পী চরকা করিলাম, পরিমল ও রাজেন্দ্র চরকা তৈয়ার করিতে লাগিল। গ্রামে বাঁশের অভাব নাই, কিছু বাঁশ ক্রয় করিলাম, কিছু সংগ্রহ করিলাম। আমি আমার গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলাম, লাইব্রেরী স্থাপন করিলাম, দুইখানা তাঁত বসাইলাম। আমি রাজেন্দ্র চক্রবর্তী এবং পরিমল রায়ের হাত খরচ বাবদ মাসিক ৩০ এবং ২০ টাকা ধার্য করিলাম। চরকা তৈয়ার হইতেছে, সপ্তে সপ্তে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ হইতেছে। তুলা সংগ্রহ করিয়াছি, তুলা বিতরণ করিতেছি, পরিমল ও রাজেন্দ্র সকলকে সূতাকাটা শিখাইতেছে, মেয়েদের মনে খুব উৎসাহ। গ্রামে একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল ছিল, আমি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, গ্রামের একটি মহিলাকে মাসিক ১০ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলাম। ছাত্রীদের পুস্তক, শেলেট-পেন্সিল আমি ক্রয় করিয়া দিলাম,

স্কুলের কাজ চলিতে লাগিল। আমি মহেশ ভট্টাচার্যের দোকান হইতে অর্থ-মূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ ক্রয় করিলাম, গ্রামের ডাক্তার সতীশচন্দ্র রায়কে দিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলাম। আমি জেলে এলাউন্সের টাকা হইতে বহু পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলাম, আমার বইগুলি গ্রামের লাইব্রেরীর জন্য দান করিলাম। গ্রামের লোক লাইব্রেরীর নাম রাখিল “ট্রেনকা পাঠাগার”। এই পাঠাগারের কলিকাতা হইতে মাসিক বঙ্গবন্ধু, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা আসিতে লাগিল, আরো অনেকে অনেক বই পাঠাইল, দুই আলমারী বই হইল। আমার কেন্দ্রে প্রায় এক শত চরকা তৈয়ার হইয়াছে, কর্মীরা খুব উৎসাহের সহিত সূতা কাটিতেছে। কর্মীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চরকা সঞ্চের নিয়ম অনুসারে সূতা কাটার মজুরীর টাকা দিয়া সূতা আমি ক্রয় করিয়া লইলাম। আমি তাঁতের স্কুল খুলিলাম, আমার কেন্দ্রে দুইখানা তাঁত বসাইয়াছিলাম, আমার এক রাজনৈতিক বন্ধুর সাহায্যে তাহার আত্মীয় যতীন্দ্র দে-কে তাঁতের মাস্টার নিযুক্ত করিলাম, সে আমার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করিবে, তাহার হাত খরচের জন্য মাসিক ৩০ টাকা দিব। আমি চিত্তরঞ্জন কটন মিরে কর্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হইতে এক মণ পাঁজ করা তুলা আমার কেন্দ্রের জন্য দান হিসাবে সংগ্রহ করিলাম। আমার কেন্দ্রের কর্মীদেরকে আমি চরকা এবং তুলা বিনামূল্যে দিয়াছি।

২২শে বৈশাখ গ্রামের লোক খুব উৎসাহের সহিত আমার জন্মতিথি পালন করিত। বৎসরের মধ্যে এই দিনটি ছিল গ্রামের ছেলে-মেয়েদের খুব আনন্দের দিন। এই জন্মতিথি উপলক্ষে বৈকালে সভা হইত, কর্মীরা এবং গ্রামের লোক একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনা করিত। চরকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের খতিয়ান করা হইত। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল, মাঠের ফসল—সকল বিষয়েই আলাপ-আলোচনা হইত। গ্রাম হইবে একটি আদর্শ পরিবার। গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ-সুবিধা দেখিবে। আমার গ্রামে যদি কেহ চরিত্রহীন বা দুর্নীতি-পরায়ণ হয়, যদি কেহ সমাজবিরোধী কাজ করে, তবে আমিও সেজন্য দায়ী, কারণ আমার গ্রামের উপর আমার একটা সাধারণ কর্তব্য আছে আমি সেই কর্তব্য পালন করি নাই। সভায় সূতাকাটা হইত, বাঁহারা ভাল সূতা কাটিতেন

ବାହୁବା

মাইক্রো-মাইণ্ড 'অ্যাসথ্রো'

কোনো ব্যক্তি কোনো আত্মবোধের সমস্যা 'আত্মপ্রাণ' বিলাস ইনসিটিউটের বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক গবেষণার পর বাধ্য-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন।
নতুন বাইবোকাইও 'আত্মপ্রাণ' আরো তাকাতকি বাধ্য-বেদনা দূর করার
নতুন উপায়।

সাইকোকাইও কলভেজি বোকার ? মাইকোকাইও বলাভ বোকার যে, বাবা-
বোনরা দু' কবার যে উপাখ্যানগুলি 'অ্যান্ড্রো' জে বেশানো হয়, তাও শুণ বেশী
হয়ে কাজ হয়েছে। এক বিশেষ দৃষ্টিতে প্রবীণ একজন টাফলেটে এমন প্রায় ১৫
কাজ করা হয়েছে। এর ফলে বোনরা নাক-করবার পক্ষি নিগুণেও বেশী
ল্যাবা পরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলভেজি মাথা ব্যথা বোনরা গল্প করে।

পুষ্করের মধ্যে কাক শুক করে বার—অনেকক্ষণের কাক লাতে থাকে :
কতক মাইকাকাইও 'আমসো'র বাখা'র স্তরের সক্রিয় উপাধানেই অতি কমেই
এক দুই শিশির শরীরের সন্নিবিষ্ট দিয়ে ও থেকে ১ মৃত্যু পূজা শরীরের
মধ্যে থাকে। সেইকমেই মাইকাকাইও 'আমসো' আরও ভাঙা ভাঙি বাখা বেহনা
স্বপ্নের দেয় এতে আরও কলকোলকল বাখা'র।

অতি সহজেই অংশনি বেতে পারেন; নতুন হাইকোকাইড 'আম্ব্রো' আদিনি
 বেভাবে খুবী বেতে পারেন—চকনো, কলের সঙ্গে বিশি্রে অথবা এক গ্লাস-কল বা
 একে কোনো সহজ পাকিয়ার সঙ্গে।

সিহ্নোক্ত কথারের অর্থটি কতক দাঁড়িকোলাইও 'আসুতো' মাতন :
 বাধা-বেদনা • বাধাধা • পা-বাধা • দাঁড়বাধা • গাটে বেদনা-ধর-ধর-ভাব-কু
 তেন অর • ললাবাধা ।

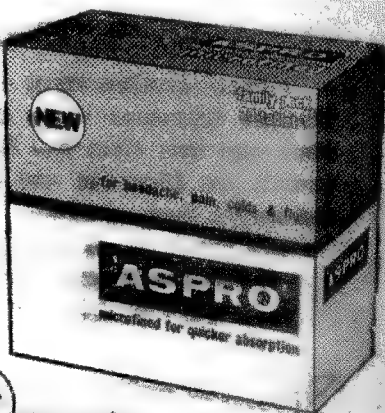
জাতি : প্রাপ্তবয়স্ক : দুইটি ট্যাবলেট : প্রয়োজন হলে আবার খাবেন : বিত্তময়
 স্বাস্থ্য : একটি ট্যাবলেট ৭। আশানার ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততা :

মাদ্রাস মাইনস্‌কাইও 'ম্যাগাজিন' কিতাবে কাক করে দেখুন



ডায়াকসেটের স্বর্ণাঙ্কণের ক্ষেত্রে বর্তমান ডায়াকসেটের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে।

कमल बाहिरकावाहेतु 'ज्यातुआ' राधा-देवना मृत करार मरीचिक विचार।



बहुल

माहेट्याकारि३

‘অসাম্প্রদায়িক’

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

निकोबाम-२३ (३०) ठेकी

তাহাদের পুরুষের দেওয়া হইত। সভা শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইত। কুলিয়ারচর বাজারে তখন দুধ খুব সস্তা ছিল, দুই আনা সের, মিষ্টানের চাউল কেনার প্রয়োজন হইত না, কাজেই খরচ খুব বেশি হইত না, উৎসবের ব্যয়ভার গ্রামের কয়েকজন বহন করিতেন। আমারও চাঁদা ধরা হইত। ব্যবস্থা প্রচুরই থাকিত, গ্রামের বউ-ছেলে-মেয়ে সকলেই মিষ্টানের অংশগ্রহণ করিত। সভা শেষে গানের ব্যবস্থা থাকিত। আমি প্রথম প্রথম আমার কর্মীদেরকে আমার জন্মতিথি পালনে উৎসাহ দিয়াছি, আমি মনে করিয়াছি, একটা উপলক্ষ করিয়া গ্রামের লোকের একত্ব হওয়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু পরে যখন আমার কেন্দ্রের দুর্দিন দেখা দিল তখন আমিই আমার জন্মতিথি পালন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি মনে করিলাম, আমার জন্মতিথি পালন করা ভাঙামা ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ জন্মোৎসব পালনের যোগ্য ব্যক্তি আমি নই। যার প্রতি কাজের মধ্যে ব্যর্থতা, তার আবার জন্মোৎসব কি?

ইতিমধ্যে আমার কেন্দ্র নানা সংকট দেখা দিয়াছে, প্রথম সংকট অর্থনৈতিক। আমি আমার কর্মীদের হাত খরচের টাকা নিয়ম মত দিতে পারিতোঁছি না, আমার ব্যয় হইতেছে কিন্তু আয় নাই।

শ্রীশ্রী গোপবাসী বিরচিত

নিদর্শন-সংগ্রহ

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা সহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাগ্যাক্ষের অপ্রাকৃত প্রেম-লালার স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্যই শ্রীশ্রী গোপবাসীর দ্বারা শ্রীবিদ্য-মাধব নাটক রচনা করা হইয়াছিল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালংকার।

এছে কবিতা বিনা নহে রসের প্রচার।”

মূল্য : চার টাকা

বীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোরাঙ্গ ও প্রফুল্ল

প্রথমখণ্ড মজুমদার বি-এল প্রণীত

৥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য তিন টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১১

আমার তাঁতের মাস্টার বতীশ কয়েক দিনের জন্য বাড়ি গিয়াছিল কিন্তু সে আর ফিরিল না। আমার কেন্দ্র সূতা অনেক মজুত হইয়াছে কিন্তু তাহা আমি কাজে লাগাইতে পারিতোঁছি না। আমার একজন তাঁতের মাস্টার রাখিতে হইলে মাসিক ৩০।৭০ টাকা বেতন দিতে হইবে, সে ক্ষমতা আমার নাই। আশার আলো দেখা দিল।

কুলিয়ারচর বাজারে বৃটিশ আমল হইতে প্রায় ১০।২২ বৎসর যাবৎ একটি সরকারী ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় ছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না, সরকারী কর্মচারীরা বসিয়া বসিয়াই বেতন পাইতেন, তাহারা ছিলেন বেকার। কুলিয়ারচর আমার বাড়ি হইতে এক মাইল দূর। সরকারী কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কেন্দ্রে আসিয়া কাজ দেখিতেন। তাহারা আমাকে পরামর্শ দিলেন, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়টি আমার গ্রামে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করিতে অথবা উপর হইতে অনুমতি আনিলে তাহারা প্রত্যহ আমার কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মীদেরকে কাজ শিখাইবেন। কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়ের সরকারী কর্মচারীরা আমার কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মী ছেলে-মেয়েদেরকে কাজ শিখাইতে খুবই উৎসুক ছিলেন। আমি টাকা রওনা হইলাম এবং ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রীজ সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। ডিরেক্টর সাহেব সহানুভূতির সহিত আমার কথা শুনিলেন, আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় আমার কেন্দ্রে ৬ মাস থাকিলে আমি এক দল কর্মীদেরকে কাজ শিখাইতে পারিব, ভবিষ্যতে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার সাহেব আমার কেন্দ্রে দুই কিস্তিতে ৬ ড্রাম পাউডার মিল্ক দান করিয়াছিলেন, পরিমল এবং রাজেন্দ্র প্রত্যহ দুধ তৈয়ার করিয়া গ্রামের এবং পাশের গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিত।

মাঝে মাঝে বাহিরের লোক আমার কেন্দ্রে কাজ দেখিতে আসিতেন। একদিন এক ভদ্রলোক আসিলেন, তখন আমার কেন্দ্রে প্রায় এক শত চরকা চলিতোঁছিল, কারখানায় আরো চরকা তৈয়ার হইতোঁছিল। তিনি চরকা তৈয়ার, সূতাকাটা, মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী, সবই দেখিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে এত টাকা খরচ করিয়া এই সব করিতেছেন, আপনার লাভ কি? আমার কি লাভ কি উত্তর দিব। আমি ত ব্যস্তগত

লাভের জন্য কিছু করিতেছি না। আমার দেশের আর্থিক দরিদ্র জনগণ যদি উন্নত হয়, ইহাই ত আমার বড় লাভ। দেশপ্রেমের স্বাদ বাহারা পায় নাই, ব্যস্তগত স্বার্থ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা বাহাদের মনে স্থান পায় না, তাহারা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, পাকিস্তানে একজন হিন্দু বিনাপ্রার্থে কি করিয়া এই সব জনহিতকর কাজ করিতে পারে? তাহারা জানে না দেশ-প্রেমের জাত-বিচার নাই। তাহাদের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই ইহার পিছনে কোন মতলব আছে, নতুবা টাকা খরচ করিয়া কেন এই সব করিবে? কি স্বার্থ? অবশ্যই কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছিলেন, অর্থ ব্যয় করিয়া কেন এখানে পণ্ডশ্রম করিতেছেন? আপনার কর্মক্ষেত্র এখানে নয়। বাহা হউক আমি আগন্তুক ভদ্র-লোককে বলিলাম, আমার অঞ্চলের লোককে স্বাবলম্বী করিব ইহাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জনগণের সেবার জন্য এই সব করিতেছি। তখন লীগ মন্ত্রী-মন্ডলী চলিতোঁছিল।

আমার বিশ্বাস ছিল আমার কেন্দ্রে স্বাবলম্বী হইলে, তাঁতের উপরই আমার বিশ্বাস ছিল বেশি। আমি মাঝে মাঝে টাকা বাই, হেমেন্দ্র দাস রোড হইতে মিটো রোড পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া বাই, ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রীজ আফিসে গিয়া তাগিদ দিই, একবার শিল্পমন্ত্রীর সহিতও দেখা করি, সকলেই সহানুভূতি দেখায় কিন্তু আমি কাজে কিছুই দেখিতোঁছি না। অবশেষে ডিরেক্টর সাহেব বলিলেন, হালদ্রাঘাট অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট উপদ্রব দেখা দিয়াছে, কুলিয়ারচর ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় হালদ্রাঘাট যাইবে। আমি বলিলাম, আপনাদের অনেক তাঁতের মাস্টার রিজার্ভ আছে, তাহাদের মধ্য হইতে ৬ মাসের জন্য আমার কেন্দ্রে একজন লোক দিতে পারেন। তিনি রাজী হইলেন। ইহার পর ৪ মাস অতীত হইল, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয় কুলিয়ারচরেই রইল, আমি তাঁতের মাস্টার পাইলাম না। পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, কুলিয়ারচর ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় হালদ্রাঘাট রওয়ানা হইতেছে। এদিকে তাঁতের মাস্টার না পাওয়ায় আমার কর্মীদের উৎসাহ কমিয়া গেল, সূতা কাজে লাগাইতে না পারিলে সূতা কাটিয়া কি লাভ হইবে? আস্তে আস্তে আমার তাঁতের স্কুল, চরকা তৈয়ারের কারখানা এবং সূতাকাটা বন্ধ হইয়া গেল।



কজয়না

ভক্তিমাদ মল্লিক

: আপনার ঘুমোবার সময় হলো।
শুয়ে পড়ুন। আর তো আমি এ্যালাও
করতে পারছি না।

: সিস্টর, আর একটু যে বাকি
এখনো, শেষ হলো বলে—রোগী মাথাটা
অপা টেনে কথাকটা বলে। তার দাঁধ-
পান্ডুর মখে পড়ন্ত হাসির করুণ আভা
ছড়ালো। কলম চলেছে—যেন এখনি শেষ
করতে হবে, নইলে আর হলো না—।
নার্স দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশটিতে,
আড়-চেখে তার লেখাদুলোর ওপর চোখ
বোলায়। রুগীর ক্লান্তমুখে দুটি

জ্বলজ্বলে চোখ আর চিকালো নাকের
ওপর নার্স পলকহীন চোয়ার চেয়ে
রইলো।

দুটি দুই একটানা লেখা। শেষে
ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে দিল বিছানাতে।
কম্বলখানা তার গায়ে লম্বা করে টেনে
দিয়ে নার্স অন্য কেবিনে ঢুকে গেল।
নিজের অজান্তে রুগীরা শ্বাসটুকু ধরে
পড়লো। যদিও রুগীর কানে জা ধরা
পড়লো না।

রুগী যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হলো
সেদিন থেকেই তো তার এমনতরো

আচরণ। সে তো লেখে না, কলমে
মাথায় ছোট্টে। করুণ আকৃতি : আর
একটু, একটু, সবদর—। লেখা শেষ হলো
বিশ্বের ক্লান্তি নেমে আসে তার ওপর।
আর নার্স বড়ো যত্নে কম্বলখানা টেনে-
টুনে রুগীর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আলো
নিভিয়ে কেবিনের বাইরে চলে যায়।

বিশেষের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিত
জুটিয়ে নিয়েছে অধ্যাপনার কাজ।
ছটি থাকলে সে ঘরে বসে থাকতে

চায় না। ঘুরে বেড়ায় নানা জায়গায়। একদিন দেখতে গেছে একটি প্রাচীন গির্জা। প্রতিটি থাম করে জীর্ণজরা। কত-কালের যে পুরনো তা ঠিক অনুমান করা যায় না। প্রাঙ্গণের চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে পড়লো। কাছে-পিঠে কোন লোক নেই। নিজের চুপচাপ, শব্দ ঘুরে পাইনগাছের মাথায় একটা নাইটিগেল থেকে থেকে ডেকে ওঠে।

হঠাৎ যেন দূর থেকে বেহালার মিষ্টি সুর কানে ভেসে এলো। এমনতরো কে বাজায়! সুরের মূর্ছনায় অমিতের মন আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ছুটির দুটো দিন ঘুরে বেড়িয়ে অমিত ফিরে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠিতে আলাপ হয়েছিল এথিক্সের অধ্যাপিকার সঙ্গে। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্ব পেয়েছিলো। বক্তা মৃদু স্বভাবের মেয়ে, কোথাও নেই বিদ্যের এতটুকু বাঁক আর দম্ভ। দিনে দিনে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো। সিনেমায়, থিয়েটারে, পাঠিতে, পাকের কোণে দু'জনােকে দেখা যায়। অধ্যাপিকা হামেশা অনুবোধ করে তার বাড়ি যাবার জন্যে। অমিতের ভারতীয় বন্ধুরা ঠাট্টা-ভাষা করতে ছাড় না। অমিত বলে, ওসব কিছু নয়, শব্দ বন্ধুত্ব। অমিত নিজের মনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে, কোন উত্তর পায় নি। মেয়েটিকে বন্ধু বলে মনে করতে তার তো ভালোই লাগে। ভালোলাগার কারণও তো রয়েছে—দরদভরা মন কার না ভালো লাগে! মমত্ববোধটুকু অমিতকে অধ্যাপিকার কাছে টানছে। তার কাছে অমিত অবহেলিত নয়।

অধ্যাপিকার সাধাসাধনায় অমিতকে একদিন যেতে হলো তার বাড়িতে। মাঠ পেরিয়ে দূরের পল্লী-বাড়ি খুঁজে বার করলো অমিত। সেখানে পেঁছে শুনলো, কোথায় দূরে সে চান করতে গেছে। তবে ফেরার সময় হয়েছে। এলো বলল। অমিত অপেক্ষা করছে বসবার ঘরে। মোটা চুরুট ধরিয়ে একটা বই টেনে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

অধ্যাপিকা এসে হাজির। হঠাৎ দেখার আনন্দে ভ্রূভ্রূ করে উপচে পড়তে চাইছে। সে বলে, ভারি দুশুট, এমনি না জানিয়ে কেন এলে?

চুরুটটায় জোরে টান দিয়ে অমিত গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকে।

হে-হে করে নিজের হাতে অমিতের জন্য খানার ব্যবস্থা করলো। সঙ্গে ইন্ডিয়ান কারি। খেতে খেতে গল্প, খাওয়া শেষে গল্প। কথায় পরে কথা, মনে হয় এমনি করে কেটে যাক দিন আর রাতগুলো। কথায় ফাঁকে অধ্যাপিকা

'আসছি' বলে উঠে দাঁড়ালো। চলে গেল পাশের একটা ঘরে। ফিরে এলো, হাতে একখানা বেহালা। বিনা ভূমিকায় বেশ সহজ করে বললো, অমিত, বাজাবো শুনবে?

নিশ্চয়ই। তুমি বেহালা বাজাও? রিমরিকম রিমরিকম বেহালাখানা তারের ওপর ছড়ির টানে বেজে উঠলো। বাজনা শেষ হতে অমিত মেশানো সুরে অমিত বলে, তোমার সঙ্গে আমি তো আর কথা বলবো না। এত সুন্দর বাজাও অথচ কখনোতো বলো নি। অমিতের কথায় বিজয়িনীর উল্লাস অধ্যাপিকার মুখে-চোখে চাপা থাকে না।

অমিত বলে, জানো, সেদিন গির্জায় বেড়াতে গেছি, দূরে কে একজন বেহালা বাজাচ্ছিলো, বড়ো মিষ্টি হাত। মানুষটাকে দেখি নি; সুর সৃষ্টি মনে রাখবার মতো।

অধ্যাপিকা মিটমিট হাসে শব্দ।

এবার ওঠার পালা। মেয়েটি অমিতের সঙ্গে অনেক পথ হেঁটে এসে তাকে বাসে তুলে দিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে অমিতের সে-রাতের আর ঘুম আসতে চায় না। দু'টি নারীর আসা-যাওয়া। এঘর কথা ভেবে মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়, আর বিদেশিনীর জন্যে তা করুণায় টলটল করে। বিদেশিনীর সোহাগমাখা দৃষ্টির পাশটিতে তেজোদীপ্ত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে এষা। বাচাই করে মনের কণ্ঠিপাথরে। বদলো, অসম্ভব। এষা-শূন্য চিন্তা এ জীবনে সম্ভব নয়। এবারের মতো বসন্ত হয়তো গত হলো। উপায় কি! বিদ্যাবিধুর বেদনায় বুকটা টনটন করে। শুনতে পায়, এষা বলছে, তোমার কথাগুলো কি সুন্দর.....উঃ আর হাসতে পারছি না—। ওর হাসির হিজলোল যে সুর ছড়াতো আজো যে কানের কাছে তা অহরহ বাজছে।

কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল। একটু তর্ক মাত্র; ভুল বোঝাবুঝির দুর্জয় প্রাচীর দু'জনার মাঝে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

অমিত কারুর স্বাধীনতার হাত দিতে চায় নি। সে ভেবেছিল, দেশ ছেড়ে চলে গেলে এঘর মনের ওপর চেষ্টা-থাকা পাথরটা হয়ত থসে পড়বে। পৃথিবীটা তো নেহাৎ ছোট নয়। তাই অমিত একদিন চলে এলো বিদেশে। সঙ্গে এনেছে একখানা গ্রুপ ফটো, স্মৃতির টুকটাকি দৃ-একটা স্বাক্ষর আর ডায়েরিখানা। বাস।

অমিত মনস্থির করলো কথায় কথায় অধ্যাপিকাকে জানিয়ে দিতে হবে। সে একদিন বললো, দেখো, আমি বিবাহিত নই, আর—বিয়ে করার ইচ্ছেও নেই।

অধ্যাপিকা ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে, কি-কাউকে ভালোবাসো নাকি?

হতেও তো পারে, বলে অমিত হেসে ফেলল।

কপট অভিমানের ভান করে অধ্যাপিকা বলে, না, না, তুমি ঠাট্টা করো না, আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

শেব পর্যন্ত অমিত তাকে বিশ্বাস করিয়ে ভবে ছাড়লো। পরম বিশ্বাস প্রস্থার ভাব নিয়ে বললো, কোন বিদেশীকে সে কখনো যে এমন করে বলতে শোনে নি। কতো বিবাহিত লোক দেশে তাদের বড়ি আছে, এমন কি ছেলেমেয়েও আছে, তা গোপন করে কতো মেয়েকে মজিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে এদেশ থেকে। তুমি একেবারে স্বতন্ত্র। অমিত, তুমি দেশে ফিরে যাও।

অমিতের আশ্রয় এলো আর একটি দেশ থেকে। তরীখানা আবার ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়ি বাইবে, কোথাও রাত যেন না পোয়ায়। চলে যাবার দিন অধ্যাপিকা দেখা করে গেল। নীরব ভাববিনিময়, কারুর কোন কথা নেই। এয়ারপোর্টে এসে বিদায় জানিয়ে গেল। আকাশের বৃকে স্নেহখানা উঠে গেল। ভারাক্রান্ত মন অমিত সিনে বসে বাইরে আকাশপানে দেখছে, দেখছে মেঘের খেলা, সেখানে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া!

মাসকতক কেটে গেছে। অধ্যাপিকার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল অমিত। ছোট চিঠি, গভীরতায় মোড়া। চিঠির শেষ টেনেছে এই বলে, যদি ইচ্ছে করো উত্তর দিও।

কার এ্যাকসিডেন্টে জ্ঞান হারিয়ে অমিতকে ভর্তি হতে হলো হাসপাতালে। বারো-তেরো বছরের একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। যদিও প্রাণে বেঁচে গেছে, তবে পাজিরার কটা হাড় বোধহয় আশুত রইলো না। কোমর থেকে বুক পর্যন্ত প্লাস্টার করা হয়েছে। চুপচাপ পড়ে আছে, যেদিন ক্ষমতায় কুলোয় কিছু পড়ে বা লেখে। একটি বাঙালীর ছেলে এদেশে এসেছে পি-এইচ-ডি করতে, প্রতি-দিন হাসপাতালে অমিতকে দেখতে আসে, গল্প করে, অমিতের মুখে নানা প্রশ্নের নানা গল্প শোনে। মুখে মুখে অমিতের গল্প বলার ক্ষমতা দেখবার মতো।

নাসিটি অমিতের খুব বেশি নয়। বিদেশী লোক, এদেশের একটি মেয়েকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। সেজন্যে হয়তো বা দরদেব মায়ী কিছু বেশি। অমিতের আপনজন

বলতে এদেশে যখন কেউ নেই, তাকে নিজের বলে মনে করতে ক্ষতি কিসের! মনে এইরকম একটা ভাব নিয়ে নার্স অসুস্থ অমিতের সেবা করে। বলা যায়, হাসপাতালে সে অমিতের গার্জেন। অমিত তাকে ভয় করে। বকুনির ভয়ে বেশিকণ লেখাপড়া করতে সাহস পায় না। অমিত কতদিন হাসতে হাসতে বলেছে, সিস্টার, আমি কখনো কাউকে ভয় করি নি, মায়ের আদরে ছেলে ছিলাম; প্রথম ভয় করলাম তোমাকে। সিস্টার কপট স্বাগত জান করে তর্জনী তুলে বলে, মতাদর্শ হাসপাতালে আছে, লক্ষ্মী-ছেলের মতো আমার শাসন মানতে হবে।

নার্স অমিতের ডায়েরিখানা একদিন ওলটাতে-পালটাতে থাকে, সলাজ হেসে অমিতকে নিচুগলায় বলে, রয়, সেরে উঠে তুমি আমাকে রাঙলা শেখাবে? মূল ভাষার তোমাদের টেগোর পড়ার ইচ্ছে—

ঃ তুমি টেগোর পড়েছো?

ঃ করাসী অনুবাদে অল্প-সল্প; কবির মিস্টার্সিজম আমাকে এ্যাপিল করে। কেউ যদি বুকিয়ে দেয়। তোমাকে দেখে ভারতবর্ষের মিস্টার্সিজম সম্পর্কে আবছা ধারণা আসছে, প্রতিমূর্তিটা বুকতে দাও।

ঃ আচ্ছা, আমাকে সেরে উঠতে দাও, তখন দেখাবো—

প্রায় দুটো মাস এমনিভাবে হাসপাতালে কাটালো। গরম দেশের মানদণ্ডে প্রভাবে পড়ে আছে—হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে, বকে অল্প প্যাচ দেখা দিল। অল্প অল্প জ্বর হয়েছে। তার ওপর অনর্গল লিখে যাচ্ছে, বুকতে পারে গা পড়ে যায়, মাথার শিরগলো যন্ত্রণার হিঁড়ে যাবার মতো। ক্রান্তিতে অমিত মাথাটা এলিয়ে বিছানার পড়ে রয়েছে। ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাঙালী ছাত্রটি এসে গেছে। নার্স শব্দ দিয়ে গেছে পড়াশুনো করতে দেখে। অমিত তার কথা শোনে নি; ফল পেতে হচ্ছে বোল জানা। ডায়েরিখানা খোলা পড়ে আছে, অমিত তন্দ্রাচ্ছন্ন, খোলা পাঠ্যখানার বাঙালী বন্ধুটির চোখ লজ্জলো, তারিখটা বর্তমানের নয়

.....মনে আছে, তোমাকে বৌদিন খাড়ির দরজা বরাবর পেঁপে দিলাম, আমার কানের কাছে মূখ এনে বললে, 'অরুণদীন শুনিয়ে বাব এ মোর নিবেদন'। তা তো নিষ্ঠুর সঙ্গে সার্থক করে

তুললে। তবে এখানে শেষ-রেখা টানা চলবে না। একজন সাধারণ চিত্রশিল্পীর থেকে অনেক ওপরে তোমাকে উঠতে হবে। তোমার মধ্যে রয়েছে একজন স্কলার—। সে যেন সাধনার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়.....। তোমার সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিকিৎসক মিনি সবে মারা গেছেন Albert Schuritzer-এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে, You can burn a candle at both ends if it is long enough. তোমার যে দুই পক্ষ: আমাদের দেশের দু'জন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর একজন তোমার চিত্রশিল্প নৈপুণ্যের অপরজন তোমার প্যাঁড়ভোর প্রশংসা করেছিলেন আমার কাছে। তবে খুব সাবধান কিন্তু দম্ভ যেন অজান্তে কোনদিন তোমার কীভাবে মালিনা এনে না দেয়।

দেশ ছাড়বার আগে তোমার আঁকা কখনো ছবি শোতে দেখেছি। ছবি-গুলো মনে ধরবার মত। আমার আনাড়ি মতামত কোন মান চায় না তোমার কাছে।

তুমি আমাকে এমন করে ভুল বুকলে কেন! মনে পড়ে, যেদিন কলকাতার তাপমাত্রা সর্বোচ্চ উঠেছিল ঠিক দুপুর-বেলা, তুমি ছুটে বোরিয়ে গেলে আমার ঘর থেকে। জমজম করে না গেলে কি চলতো না। তোমার মন থেকে আমার সম্পর্কে সংশয়ের অবসান হোক। পরের লিখন, পরের ভাষণ—যেন আমাকে দেখার আয়না না হয়। পাঁচ বছর ধরে নিজের চোখে যা দেখেছে, ভালো বা মন্দ আমি শব্দ তাই-ই।

আজ ভাবতে মজা লাগে, তুমি আমার বোকার মতো প্রশ্নে কেনন হেসে দিয়েছিলে, শহরের ছেলে গাছপালা সম্পর্কে জ্ঞানটা প্রায় ধানগাছে তত্তা বানানোর মত ছিলো। গাছ-গাছড়া চিনি না সত্য, তবে ফল তো ভালোবাসি, নাকি, এটা তো তোমার জানা। ফাওয়ার শোতে যেতে পারলে না, বললে, তাইপোর অল্প-প্রাশন। বললাম, এ তো শব্দ এ্যাভয়েড করা। তুমি রাগ-মাগ করে বলেছিলে, কথখনো নয়। বিদেশের ফাওয়ার শো-গুলোতে গেলেই মনে পড়ে যায়, সেদিন তোমাকে পাই নি।

অভিমানিনী তুমি, তা তো জানি। আমার অভিমান কি কিছু কম; আমার মান রাখতে দু'টি হাতের আঙুল দিয়ে সকলের চোখে হলো ছিটিয়ে দি-টি

টোটেই ফাঁকে সুন্দর করে হেসে দিয়েছিলে; কি দু'শুটুরে, আমি তো একেবারে তাজব! সেদিন আমার কি মনে হয়েছিল তা জানো, তুমি জাতশিল্পী।

বিদেশে পড়ে আছি; তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে তা জানি না। হলে তা হবে আকস্মিক। কি করে নিজেকে সামলাবো কি কথা বলবো তা ভাবতে কেনন লাগে। ক'বছরের অ-দেখার মনটা কত সময়ে যে হু-হু করে তুমি যদি তার এক কণাও বদলে! এদেশে মিস্ এ্যানি বেসান্তের এক বন্ধু থিয়োজফিস্ট ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁকে সেদিন জিজ্ঞেস করছিলাম, আচ্ছা, জন্মান্তরবাদ কী সত্য? এ সবে যদিও আমার বিশ্বাস বড়ো কম, তবুও কেন যে জানতে চাই, তা কি তুমি জানো!

যার উদ্দেশ্যে এই চিঠির খসড়া তার হাতে এটি পৌঁছেছিল কিনা তার কোন হিন্দী ডায়েরির পাতায় নেই।

নতুন!

'ইকনমি প্যাকে'

টিনোপাল



ভাড়াটা এক বালতির এক প্যাকেট এবং 'রেগুলার প্যাক'

সর্বাধিক ওজ্রতার জন্য টিনোপাল

হুদুদ গারগী লিমিটেড, বোম্বাই-১

১৯৬৭



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ভারতবর্ষের মাঝার ওপরে নেপাল ও ভূটান বাদে সমগ্র উত্তর ভূ-ভাগের গঠন-প্রকৃতিতে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। সমতলের পরেই Foot Hills বা তরাই অঞ্চল। তার পরেই মহাসমুদ্রে অসংখ্য ঢেউয়ের মতো মধ্যভাগ—ক্রমশ উচ্চতর সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, Inner Lines, অপর ও উত্তরে, অবশেষে চিরতুষারাম্বল, Snow Lines। পৃথিবীর উচ্চতম তুষারমৌলী পর্বতমালা প্রাচীরের মতো আড়াল করে রেখেছে গোটা দেশটাকে। ওপরের তিস্ত, চীন, আর সাইবেরিয়ার শূন্যকোঠা ভাঙা বাতাস এপারের আসতে পারে না। বাকি তিনাধিক বেটন করে সমুদ্রের জলকণাভরা মোসাম্বী বায়ু, হিমালয়ে প্রতিহত হয়। তারপর উচ্চতার তারতম্যে বরফ আর মেঘ হয়ে করে পড়ে। ওপারে ধূ-ধূ মরুভূমি আর হিমশিতল বৃক্ষ কঠিন পাহাড়। এপারে সজলা, সুফলা, নদীমাতৃক পদ্মভূমি। ফলে, ফলে আর ফসলে ভরা উপত্যকার বৃক্ষ চিরে বহু

উচ্চস্থান থেকে অসংখ্য নদী সমতলের দিকে ধাবিত হয়। সরস করে তোলে বিশাল ভারতের মাটি। ইতিহাসের উষাকাল থেকেই হিমালয় ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যেও হিমালয়ের গুরুত্ব অসাধারণ। প্রাচীনকাল থেকেই আর্য মনীষীর সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যই তাঁরা নগাধিরাজকে দেবভাষা আখ্যা দিয়েছেন। বুকেছিলেন ইংরেজ-রাও। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁরা সমগ্র হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে জরিপ করে, সঠিক মাপ তৈরি করেন এবং পর্বতের গভীরাম্বলের পথ-ঘাটও কতকটা সুগম করে তোলেন। এ পথে চলবার সময় বরাবর ফ্রাঙ্ক স্পাইথের কথা মনে পড়ে। উত্তরাঞ্চলের তীর্থস্থানগুলিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'Threshold of The High Himalayas' বলে। মস্ত-বিস্ময়ে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি কাটিয়ে গেছেন এখানে। বৈদিক যুগের

এই মহা তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য বাদে বরাবরই অক্ষর আছে কিন্তু যোগাযোগ এবং ভ্রমণের অন্যান্য সুখ-সুবিধা কোন-দিনই হয় নি। তবে দেবস্থানগুলিতে মন্দির, স্নানের ঘাট এবং কিছু আশ্রয়-স্থান নির্মাণ করেছিলেন প্রধানত পুণ্যবতী ব্রাহ্মী অহল্যাবাসি আর জয়পুরের মহারাজা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে সেই সাবেককালের ব্যবস্থাই চালু ছিল। লালচীনের আক্রমণে সরকার বর্তমানে এদিকে প্রখর দৃষ্টি দিয়েছেন। যোগাযোগ এবং অন্যান্য সংগঠনের কাজও ত্বরান্বিত হয়েছে। আর হয়েছে সারা ভারতব্যাপী শিক্ষিতসমাজ পর্বতারোহণের আগ্রহ। বাংলার দার্জিলিঙে, কুঙ্গু উপত্যকার মানালীতে আর উত্তরকাশীর স্থাপিত হয়েছে Mountaineering Institute আধুনিক পদ্ধতিতে পর্বতারোহণ শিক্ষা ব্যবস্থা। কলকাতা, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ের কয়েকটি সংস্থা ইতিমধ্যেই কয়েকটি দুরূহ শৃঙ্গে বিজয় করে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষত সরকারী দলটির এভারেস্ট শৃঙ্গে একই অভিযানে পর পর চারবার আরোহণ একটি বিশেষ কীর্তি।

উত্তরকাশীর বাস্‌জিপো থেকে সকাল ৬-৫০ মিঃ গেট ছাড়লো। গঙ্গোত্রীর পথে বর্তমানে আঠার মাইল দূরবর্তী ভাটোয়ারী পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। গঙ্গার ধার দিয়ে পথ। ছবির মতো সুন্দর উপত্যকা। পথের ধারে, পাহাড়ের গায়ে চাঁড় আর দেবদারু গাছ। আর অজস্র ফুল। লাল, নীল, হলুদে, সাদা, রকমারী ফুলে ঢাকা গাছ। কোন কোনটির উচ্চতা পেরা গাছের মতো। দু' মাইল এগিয়ে গঙ্গোত্রী। আদিগঙ্গার সংগমে ছোট্ট জায়গায় একটিমাত্র পুলিশচৌকি। এখানে সবাইকে অনুমতিপত্র দেখাতে হয় (Permit Check Post)। স্বল্প বিবর্তিত পরে আবার চলা শুরু। গঙ্গার আমাদের ডানদিকে। অর্ধাং ভাগীরথীর বাম তীর ধরে এগিয়ে চলছি।

সহযাত্রী আজ পাঁচমেশালী। সস্তীক সুদৈর্ঘ্য যমুনোত্রী পরিভ্রমণ শেষে চলেছেন গঙ্গোত্রী দর্শনে। সঙ্গে গঙ্গোত্রীর পাশ্চাত্য বালকপুত্র আর বিহার প্রদেশবাসী ভৃত্য যাবাবর গুরুজর জাতের একটি মেঘপালকও ফিরে চলেছে পাহাড়ের মাথায়, তার ডেরায়। ফিকে হামরংয়ের আজানুলব্ধিত আটোঁসাঁটো কামিজ, সাদা কাপড়ের মস্ত পাগড়ি মাথার নন্দনপদ আর হাতে শক্ত কাঠের একগোছা দীর্ঘ লাঠি। পাঠানদের মতো দাড়িগোঁফ সঙ্গে বোঝা যায় মুসলমান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাস্মীর থেকে শব্দ করে মধ্য হিমালয়ের গাড়ওয়াল পর্বত পর্বতের উচ্চস্থানে দাঁটি প্রামাণ্য যাবাবর সম্প্রদায় দেখতে

পাওয়া যায়। গান্ধি আর গান্ধীজর। বহু শতাব্দী আগে মধ্য এশিয়া থেকে ওরা এসেছিল। হিমালয়ে পশ্চিমেরই এদের প্রধান উপজীবিকা। পর্বতের তের-চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চস্থানে ভেড়া ও ছাগল চরায়। উঁচু পাহাড়ের গায়ে আল্পসের মতো পশুচারণক্ষেত্রে বলে খারক (Alps)। সেখানে পাথরের বৃক্কের এককম অতি পৃষ্ঠিকর ঘাস জন্মায় পাহাড়ী ছাগল আর ভেড়ার খাদ্য। প্রকৃতির প্রয়োজনে তাদের গায়ে দীর্ঘ লোম হয় কারণ শীতনিবারণের তাগিদে। সেই লোম বিকি করে ঘাসঘরে সম্প্রদায় কেনে নিজ-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। শীতের কয়টা মাস তারা নেমে আসে পর্বতের অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশে। সভ্যজগতের সঙ্গে শব্দ কেনা-বেচার সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্পর্ক তারা রাখে না। সমতলের জীবন ওদের অসহ্য। ভারতের মুসলিম আক্রমণকারীদের সংস্পর্শে কিছু সংখ্যক শাসাবরপ্রেরণী মুসলমান হয়। আবার হিন্দু দেব-দেবীর পূজাও করে কেউ কেউ। কিন্তু নিজস্ব আচার, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিতে ওদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী আপন আপন গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। দুর্গম পাহাড়ের রাজ্যে ওরা থাকে মস্ত প্রকৃতির আদিম জম্মশালায়। পাহাড়, জঙ্গল, পশু-পাখীদের ওরা চেনে। আপন আনন্দে মগন হয়ে থাকে তাদের মাঝখানে। ওদের পোষাক দেখে চেনা যায় কে কোন সম্প্রদায়ের। গান্ধীদের পরনে ভেড়ার লোমে তৈরি সাদা রঙের কুর্তা। আর কোমরে জড়ান থাকে কালো রঙের এক-গাছা দড়ি। এই শব্দ পশমের দড়ি মৈথিল্য প্রায় গ্রিস হাত। নিজের পরিচ্ছদ বোনে নিজেরাই। ছাগলের কাঁচা দুধ আর ভুট্টার ছাত্ত দিয়ে তৈরি মোটা রুটি এদের খাদ্য। মাংসও খায়।

দশ মাইল অতিক্রম করে 'মানেরী'-তে গাড়ি এসে থামলো। চা-পানের বিরতি। বেশ সমৃদ্ধ ছিল এককালে। ধর্মশালা আছে। অধিবাসীদের জন্য বর্তমানে একটি স্কুল হয়েছে। সদানির্মিত আধুনিক কারদার স্কুলবাড়িটা দেখলে বোকা যায়, সরকার উন্নয়নের কাজে বিশেষভাবে আগ্রহ নিয়েছেন। সামান্য দু-চার বছর আগে পর্বত এ পথে গাড়ি চলতো না। সে সময়ে যাত্রীরা গাতি বাস করতেন এখানে। তাদের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল দোকান-পসার আর চটি। দীর্ঘ মন্থর পদযাত্রার অবসান হয়েছে এখন। কুর্নিয়ের পেছে এদের প্রয়োজন। বস্ত্রবানের কণিক বিগ্রাম ঘাঁটিতে পাওয়া যায় শব্দ চা আর বিড়ি-সিগারেট। দোকানের সামনে রাখা কাঠের বেঞ্চে বসেছিলাম এক গেলাস চা

নিরে। গান্ধীর লোকটিকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চা নিতে বললাম। মাথা নেড়ে প্রত্যখ্যান করে ইপিণ্ডে জানায়, আমার সিগারেট একটা ও চায়। এতক্ষণ বৃষ্টি দেখাছিল কি করে আমি সিগারেট তৈরি করি। তামাকের মশালা আর কাগজ দিয়ে ওর জন্য একটা বানিয়ে ফেলি। গভীর আগ্রহের সঙ্গে বানানোর কারদা লক্ষ্য করে। তারপর দুই আঙুলের ফাঁকে সেটি রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে পরম পরিতোষের সঙ্গে ধূমপান চলে।

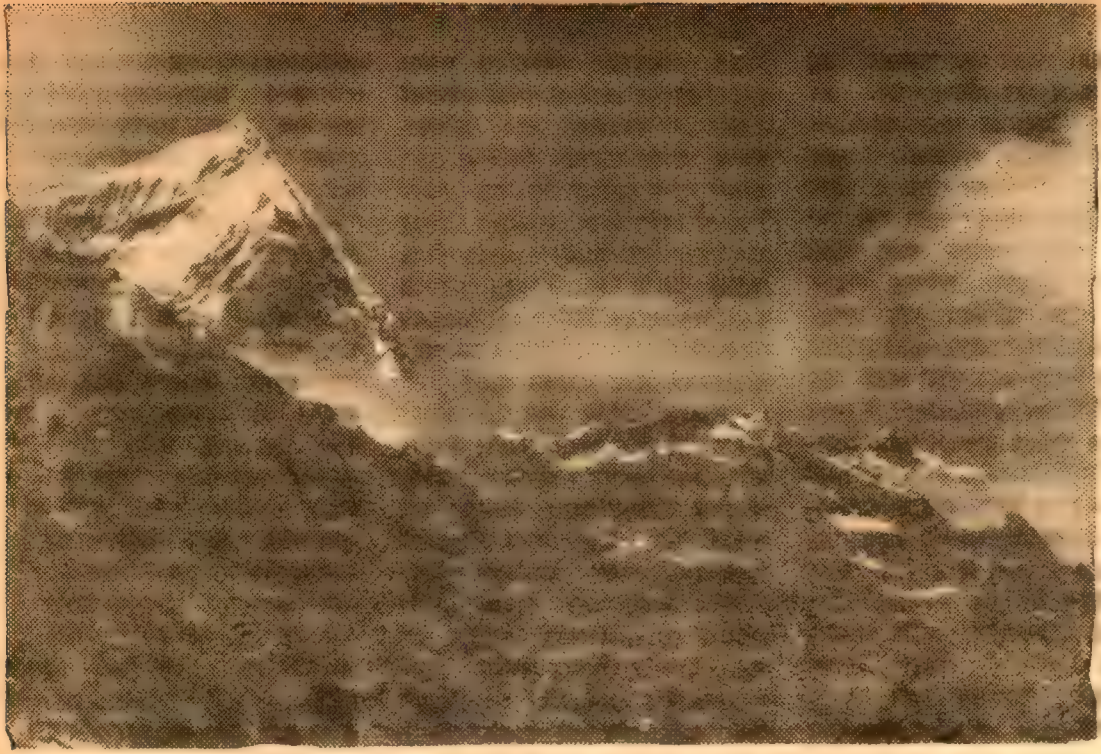
স্বল্প বিরতির পর গাড়ি ছাড়ে। এখানে গেট বদল হলো। অর্থাৎ উপরের গাড়িগুলি এখানে আমাদের গাড়ি-গুলিকে অতিক্রম করে। আবার সেই পাহাড়ী পথ। ঘুরে ঘুরে পাহাড়কে বেটন করে ক্রমশ উন্নতমুখে চলা। মানেরীর উচ্চতা প্রায় ৪,০৮০ ফুট। নদীগর্ভ থেকে অনেকটা ওপরে পথে পাহাড়ের সারি পেরিয়ে চলেছি। বেলা সাড়ে আটটার ভাগেয়ারী। ওপারে বড় একটি নদীর জল এসে পড়েছে ভাগীরথীর জলে। এপারে আরও দুটি বড় খরগা (Gad) মিশেছে গঙ্গায়। বড়ো জায়গা। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। বন-বিভাগ এবং পূর্বাঞ্চলের কার্যালয় বিশ্রামগৃহ প্রভৃতিও আছে। গাড়ি চলা-চলের শেষ ঘাঁটি হিসাবে বাগিচা ও পণ্য চলাচলের বড় বড় আড়তও রয়েছে। পথ আরও অগ্রসর হয়েছে কয়েক মাইল। কিন্তু পরিবহন চালু হয় নি এখনও। শুনছি আর মাত্র এক বছরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী থেকে মাত্র নয় মাইল নিচে, জঙ্গলচাটি পর্বত গাড়ি চলবে। ইতি-মধ্যেই একটি বেসরকারী জীপ যাত্রী নিয়ে যাওয়া শব্দ করেছে। বিবাহের বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসার জন্য সেটির দেখা পেলুম না।

বাস ডিপোতে মালপত্রগুলো রেখে চললাম পূর্বাঞ্চলের অফিসে। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কুঠী বাস ডিপো থেকে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে, পথের ধারে একটা পাহাড়ের মাথায়। গাড়োয়ালের অধিবাসী গায়েরোলা সাহেব বর করে বসালেন। তাঁর স্বহস্তে তৈরি কফি পান করতে করতে কথাবার্তা হলো। পথের সব বর্তমানে কয়েক দল উচ্চপদস্থ কর্মচারী সফররত। অতএব স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা কিছু হলো না। শব্দ গঙ্গোত্রীতে কর্মরত তাঁর ওভারসীরকে একটি পত্র দিলেন। আর একটা মাল বহনের ট্রাকে শব্দখী পর্বত যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর কাছে শব্দলুম পাহাড়ে বর্ষা নেমেছে। নান্যস্থানে ধূস নেমে পথ-ঘাট ভাঙছে। কয়েকদিন আগে শব্দখীর কাছে গঙ্গার ওপারে লোহার

সেতুটা ভেঙে যাওয়ার ফলে নতুন সেতু এখন বন্ধ। প্রকাণ্ড সেতু মেরামত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আবহাওয়ার সম্বন্ধে কোনও ভরসা দিতে পারলেন না। পাহাড়ে বর্ষা অতি মারাত্মক বাধা। প্রবল বৃষ্টির ধারায় মাটি আর পাথরের ধূস নেমে গোটা অঞ্চলের চেহারা ই পাল্টে দেয়। কঠোর পরিপ্রমে তৈরি পথ-ঘাট ভেঙে নিশ্চয় হয়ে যায়। আবার নতুন করে পাথর ফাটিয়ে, গাঁহীতি আর শাবল দিয়ে পাহাড়ের গায়ে পথ কেটে বার করে মানব। হয়ত সামান্য এক-আধ ফালং দূরত্ব নতুন করে গড়ে তুলতে গিয়ে অনেকটা ঘুরে ওঠা-নামার পরিমাণও বেড়ে যায়। শুনছি গত বছর এমনি ধূসের মুখে আটকে গিয়ে যাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্টে পড়তে হয়েছিল। নির্জন পথের মাঝে আহা ও বাসস্থান জোটে নি। অনেকেই যাত্রা স্থগিত রেখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল এখানে থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গঙ্গানীতে অন্তত একটা রাত কাটাতে। শুনছি সেখানে একটি উচ্চ প্রস্তর আছে। পাহাড়ের মাথায় রেন্ট হাউস। আর আছে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, আমার ইচ্ছা হলে গঙ্গানীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কিন্তু পাহাড়ী বর্ষাকে বিশ্বাস নেই। কয়েকদিন অত্যাচারের পর মাত্র গতকাল বিকেল থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু আবার মেঘ ঘনিয়ে আসতে কতক্ষণ? মন স্থির করে বললাম, গঙ্গানীতে না থেমে এগিয়েই যাবো। কি জানি, ছোট পাওয়া পেতে গিয়ে যদি বড় পাওয়া হাতছাড়া হয়!

ফিরে চললাম বাস ডিপোতেই। সেখানে আমার জন্য ট্রাক পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

ভাটোয়ারী থেকে নেপালী শ্রমিক পাওয়া যায়। এ পথে মালবাহী এবং পথনির্মাণে কেবলমাত্র নেপালীদেরই দেখতে পাই। স্থানীয় অধিবাসীরা দোকান করা ছাড়া অন্য কোনও প্রকার কার্যিক শ্রমে তৎপর বলে মনে হয় না। সরকারী চাকুরিতে নিম্নপ্রণীতে অবশ্য ওরাই কাজ করে। তবে গুরুতর পরিপ্রমের কাজ এড়িয়ে। একটি কাজে ওরা বেশ পারদর্শী। নিছক আত্ম দেওয়া আর মেয়েদের ঘাড়ে সংসারের যাবতীয় কাজের বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্তভাবে আলসেমিতে দিন কাটানো। কর্মতৎপরতাও নেই, উচ্চাশাও নেই। গল্প করতে গেলে আর কিছুই চায় না। তাও যদি বুদ্ধতাম দেশের বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে ওরাকিহালা। নিজের দেশ সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ আর উদাসীন বড় একটা অন্যতর দেখা যায় না। তবে সাধা-



নেত্র পর্বত—গোন্দুখের পথে

রূপ। এরা ভদ্র, বিনয়ী আর দেবান্বিত।
চিহ্ন পরায়ণ। সনাতন-হিন্দুধর্মের প্রাচীন
আত্মবান।

পাশের দোকানে আহার সমাধা করে
অশেষকার আহি, কখন গাইরোলা সাহেবের
ট্রাক আসবে আমার নিতে। অন্যান্য
যাত্রীরা একে একে হাটপথে রওনা
দিয়েছেন। শেঠজী আমার গাড়িতে স্থান
শাওয়ার আশায় অপেক্ষা আছেন। পূর্ন-
বিশ্রামে আগেই বলে এসেছিলাম, আমি
যদিও একা স্বল্পবয়স্ক শেঠপত্নী কিছটা
পথ গাড়িতে গেলে বাঁচবেন। কষ্টকর
পথে কান্ডী চেপে তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়ে
তিনি বিশেষ কাতর। ভারবাহী একটি
লোকের পিঠে বাঁধা বসিয়ে পুড়ুলি
হয়ে বসে থাকে মোটেই আরামদায়ক নয়।
করুণা হয় বাহিত এবং বাহী উজরই
জন। খালি হাত-পা নিয়ে দু'পা যেতেই
হাঁক ধরে, সে পথে পিঠে অতকৃৎ একটি
তিনমণি বোকা-পুণ্যসঞ্চারে মাসুল
দিতে প্রাণান্তকর অবস্থা।

কাঠের ঘরখানির একাংশে পুর্নালয়
চৌকি। জমাদারজী যাত্রীদের পারমিতা
ইত্যাদি পরীক্ষা করা ছাড়াও
শ্রমশীল প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্ব পালন
করেন নিষ্ঠুর। সপ্তাহে সেরায়ে বসে
থাকতে থাকতেই একটি ছোট নাটকের

অকস্মিক হতে দেখলাম। অভিনয়শেষে
একটি প্রৌঢ় নারী কোলে তিন বছরের
শিশুসহ এলো পুর্নালয়ের কাছে তার
নালিশ জানাতে। তীর্থপরিক্রমায় এসেছে
সুন্দর বিহার প্রদেশের বিলাসপুর থেকে।
তার আদরি দলের অন্য একটি নারীর
প্রতি বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তার
সুখ-সুবিধা ইত্যাদির দিকে নজর নেই।
এমতাবস্থায় অভিযোগকারিণী আর দলের
সঙ্গে তীর্থপরিক্রমায় যাবে না। তাকে
বুঝিয়ে শুনিয়ে হয়রান হয়ে পড়লেন
জমাদারজী। প্রৌঢ়া অবিচল। ডাক দেওয়া
হলো প্রতিবাদীকো। লোকটি পুর্নালয়কে
দেখালো অভিব্যক্তি একটি পড়শী নারীকে
কঠিন পথে যত্ন নেওয়ার অপরাধে
এই বগড়ার উপপাতি। প্রৌঢ়ার হাত ধরে
সব্বন্ধে সে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টায় চন্দন-
রত্ন প্রৌঢ়া মোক্ষম অশ্রুটি ছাড়ল।
চোখের জলে বসে বড় গলায় জানালে যে এ
লোকটির পরোচনায় একদিন সে স্বামী-
পত্নীভরা সংসার ত্যাগ করেছিল।....
একেবারে ক্রাইমাঙ্ক! ছন্দপতন ঘটালেন
জমাদারজী। দুচক্রে তিনি বললেন,
'বহিনজী, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভূমি
বগড়ার ফরসালা করবে। কলহপটু
নারীর অভিযোগ বিস্মিস।

জমাদারজী থেকে প্রত্যহ চান্দবার

নিচের পথে গাড়ি ছাড়ো। সকাল সাতটার
১০-৫৫ মিঃ ২-৫৫ মিঃ এবং সবশেষে
গেট খোলে বিকের উপানে পাঁচটার। এখান
থেকেই যাত্রীরা কেদারের পথে শেক ঘাঁটি
কুন্ড চিট পর্বত টিকেট কাটতে পারেন।
অধিকাংশ যাত্রীরা একবার তীর্থপরিক্রমায়
বেরিয়ে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার ও
বদরীধাম দর্শন শেষ করেন। সর্বভারতীয়
এই যাত্রীদের অধিকাংশই জীবনের শেষে
অধ্যয়ে দুঃস্থ কঠিন পথে প্রচুর ক্রেশ
স্বীকার করেন। আসেন ভারতের
একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে বিহার,
মাদ্রাজ, মহীশানা, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র,
গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, রাজস্থান,
পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলবাসীদের সঙ্গে কথা
বলে দেখছি, একই কথা বলেন সবাই।
সংসারজীবনের গরভার দায়িত্ব পালনের
মধ্যে ছুটি বড় একটা মোহে না। অগত্যা
শেষজীবনেই শ্রদ্ধা নিজের আধ্যাতিক
চিন্তার অনসরণ। সুদীর্ঘকাল ধরে গভীর
অধ্যবসায়ে জমানো অর্থ সম্ভব হয়
তীর্থযাত্রা ভাবি, দেহ যখন বিকল হয়ে
আসে, তখনই কেন মানুষ ঈশ্বরচিন্তায়
মন-দেয়? অশ্রুপূর্ণমায়া অন্তরায়। কি
শ্রদ্ধা জীবকেই কষ্টভোগেরই ভাগীদার।
আমাদের দেহ-মনের সকল সুখ-দুঃখ

তারই ওপরে গিয়ে পড়ে। দৈহিক ক্রেশ-
কি আনন্দ মেলে?

বেলা প্রায় একটার পূর্বাভাগের
টুক এলো। প্রকাশ্যে একটি কম্প্রেশনার
বস্ত্র বোকাই লরীতে আমাদের জন্য অতি
অসম্মানই অবশিষ্ট আছে। বস্ত্রটি
চলেছে পথে কোথায় পাহাড় ফটানোর
কাছে। সরকারী লোকও দু-চারজন
দুয়েছে সঙ্গে। খানিকটা ইতস্তত করে
গওনা হলুম। ট্রাকটির অবস্থা সুবিধা-
জনক নয়। চলতে চলতে থেমে যায়।
ইঞ্জিনে তেল আসছে না। ড্রাইভার আর
সহকারীর চেষ্টার খেমে খেমে চলেছি।
সদ্য তৈরি হয়েছে পথ। খাড়া পাহাড়ের
গায়ে মাটি আর পাথর বিছানো, বৃষ্টির
অসমান। দু'পাশে পাহাড়গুলোর ফাঁকে
সম্পূর্ণ নদীর গর্জ (George)। সোঁদকে
তাকাতেই ভয় হয়। উত্তাল, উদ্দাম
ফেনোজারাসে অনন্ত জলরাশি পাথরের
গায়ে আছড়ে পড়ে-প্রচণ্ড বেগে খেঁচ
চলেছে। ইঞ্জিনের-আওয়াজ-ছাপিয়ে
নদীর গর্জন পাহাড়ের গায়ে-প্রতিধ্বনিত
হয়। মনে পড়ে কত হাজার বছর আগে
লেখা মহাবী বাঙ্গালীর গঙ্গাস্রোতঃ—

“নৈবান্যত মদাম্-সিন্ধু-বৃষ্টি-সম্বৃতি-
ব-শ্চ-র-প-ক-র-হ-স্ত-স-ম-স্ত
বৈ-রি-ব-নি-তা-ল-অ-স্ত-তি
ভূ-প-তিঃ॥
কাইর্নিকুযিতং শ্বভিঃ কবলিতং
গোমারুজ্জলুঠিতং
স্রোতোভিচ্চলিতং ততাম্বলুঠিতং-
বীতিভিন্নালোলিতম্॥”

প্রায় নয় মাইল গিয়ে গঙ্গানী। বেশ
বড় জাঁবগা, ধর্মশালা, ডাকবাংলো প্রভৃতি
সবই আছে। চা-পান করে আবার চলা
শুরু। ক্রমশ উত্তরগতি। গাড়ি চলবার
উপযোগী পথের চড়াই ততটা মারাত্মক
নয়। বর্ষার অত্যাচার সর্বত্র বিদ্যমান।
মাটি আর পাথরের রাশি-সরিয়ে কোনও
রকমে গাড়ি পার করবার ব্যবস্থাও করছে
শ্রমিক। প্রকাশ্যে দেড় টন ওজনের কম্প্রি-
সার সমেত গাড়িটা যখন একপাশে কাত
হয়, চোখ বুজে আসে ভয়ে। শেঠজী রাম
রাম বলে ডেকে ওঠেন। সম্পূর্ণ পথের
ধারে অবরোধের কোনও ব্যবস্থা নেই।
জলে পড়লে বানের মুখে ষড়কুটোর অবস্থা
হবে। অবশ্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও হবে, সন্দেহ
নেই। সরকারী ড্রাইভারটি হাসিমুখে
জাহ্নবী জোগায়। আর একটু বেশি কথাও
বলে। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সমানে
গল্প করে চলে। মাঝে মাঝে অবস্থিত
বোধ করি। চাকা দুটো সামান্য ঘুরে
চলে গল্প করা যে চিরকালের মতো থেমে
যাবে। কিছু বলতেও পারি না। খাতিরে

পাওয়া গাড়ির ড্রাইভারকে কি বলবো?
কীংকণ্ঠে খুঁটাই আর কতটা পথ এমনি-
ধারা? হেসে বলে সে, সামনে আরও
ভাঙা পথ আছে। গাড়িটা ভাল থাকলে
অবশ্য পরোয়া করতো না। একটানা
বকতে থাকে, দিন-রাত ডিউটি। সরকারী
গাড়িগুলোর মেরামতি করবার অবসর
পাওয়া যায় না। মনে মনে সম্পূর্ণ ঠিক
করে ফেলি, বেগতিক দেখলেই গাড়ি থেকে
নেমে পড়বো পা-গাড়ি এ পথে ঢের
ভালো।

মাইল চাবেক এগিয়ে লোহারিনাগ।
লোদ আর শোন (Sone gad) নামে দুটি
পাহাড়ী নালা এসে ভাগীরথীতে পড়েছে।
অতি ক্ষুদ্র চটি। একটি মাত্র চারের
দোকান। সারাদিন প্রচণ্ড রোদের পরে
এখানে পেলুম প্রবল বাদলা হাওয়া আর
অস্পৃশ্য। আরও মাইল দুয়েক গিয়ে
এ পথের বিখ্যাত সূর্য্যখীর চড়াইয়ের
দেখা পেলুম। লোহারিনাগের পরে
লোহার সেতু পার হয়ে চলেছি। গঙ্গা
এবার এসেছে আমাদের কাছে।
ওপরে পাহাড়ের চাড়ার বরফ। তার
মাঝখানে দিয়ে একটা বড়-প্রপাত নেমে গেছে
খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। পথের গায়ে খাড়া
পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে। কাঁচা
মাটির পেছনে পথ ইংরাজী বর্ণমালায় শেব
অক্ষর জেড-এর মত। আগুপে পড়ে করে
ওপরে ওঠা। একে বোকাই গাড়ি। তার
ইঞ্জিনে তেল যাচ্ছে না। গাড়ি বিদ্রোহ
ঘোষণা করে। ওপরে উঠবে না। সবাই
মিলে নেমে পড়ি। কিছুটা হালকা হয়।
হাত দিয়ে পেট্রোল পাম্প চালায় ড্রাইভারের
সহকারী। আবার কিছুটা চলে। এমনি
ঘণ্টাখানেকের ধস্তাধস্তি আর উবেগ নিয়ে
দুর্ভোগের শেষ হলো। মিলিটারী
সীমানা ছাড়িয়ে চড়াইয়ের প্রায় শেষ।
পূর্বনো পায়ে-চলা পথটির পাকদাঁড়ি পথে
অস্পৃশ্য ওপরে ধর্মশালা আর-দোকানপাট।
গাড়ি চলবার নতুন পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।
পাহাড়ের গা বেঁটন করে একেবারে নদী-
গর্ভের ওপরে লোহার সেতুটি পর্বন্ত
চলেছে। ট্রাকটি সেখানেই বাবে। কিছু
ওপরে পূর্বনো পথের কাছে নেমে পড়ি।
ড্রাইভারজীকে একটি দশ টাকার নোটই
বকশীস করে ফেলি। পৈয়িক প্রাপটা
এখনও আছে, এই আনন্দে।

বেলা প্রায় পাঁচটা হবে। পায়ে-চলা
নামা-পথে এগিয়ে চলছি। ভাটোয়ারী
থেকে গঙ্গা নদীগর্ভের-সম্পূর্ণ পাথরের
সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে চলেছে।
সূর্য্যখীর থেকে বিশাল বিস্তৃত বালুচরের
ওপরে শান্তধারা। দু'পাশে পাহাড়ের
গায়ে গভীর জঙ্গল। আমরা চলছি

পাহাড়ের গায়ে শস্মাক্ষেত্রের ধার দিয়ে।
অস্পদুরে কালাগ্রাম। নদীধারে ছোট
পাহাড়ের মাথায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে
কয়েকটা কাঠের বাড়ি। কাঠের দেওয়াল
আর কাঠের চাল। প্রায় মাইলখানেক
গিয়ে রাহিবাসের আশ্রয় জুটলো। পাশা-
পাশি দুটো ধর্মশালা একটি সিন্ধুপাঞ্জাব,
অন্যটি কালিকমালি ক্ষেত্র। দুটো
দোকানও আছে। ধর্মশালা দুটির
অবস্থা বড়ই খারাপ। যেমন নোংরা
তেমনি জীর্ণ। যেন নাভিস্বাস উঠেছে।
নতুন সড়ক সূর্য্যখীর থেকে নদী পার হয়ে
ধরাশি অভিমুখে চলে গেছে। নিত্যন্ত
আকস্মিক দৃষ্টান্তের সেতুটি বিপন্ন হবার
ফলে, সাময়িকভাবে আবার পূর্বনো পথটি
চালু হবে। এবং এবছবেই কালাব
পথে শেষ যাত্রা। ভাঙা ধর্মশালাব অন্ধ-
কার ঘরে শূন্যে পড়েছি ক্রান্ত হয়ে।
গণেশপ্রায় পাশা খবর দিলেন সামনের
স্কুলঘরটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং
ঘরের চালে এখানকার মতো ফটো নেই।
কিন্তু আর ওঠবার ইচ্ছে নেই। সাবা-
দিনটা আজ রোদে-জলে আর অস্বস্তিতে
কেটেছে। সামান্য জ্বরভাবও আছে।
শেঠজীর সঙ্গী পাশাডাকীকে অনুরোধ
করলুম চারের দোকান থেকে এক গেল্যাস
চা পাঠিয়ে দিতে।

কালাগ্রাম থেকে অস্পদুরে এই
চটিতে ছোট্ট একটা মন্দিরনার দোকানে
চাল আটা পাওয়া যায়। যাত্রীদের
পারামিত অর্থাৎ অনুমতিপত্রে রেশন পাবার
প্রথাও এপথে হয়েছে। রন্ধনকারীটি
যাত্রীদের আবশ্যিক কর্তব্য। অতএব
মাতৃনাম স্মরণ করে চাপর মুড়ি। সংসার
সমাগত। শেঠজীর ব্যবস্থায় রাতে কিছু
অখাদ্য খিচুড়ি জুটতেছিল। তন্দ্রার বোঝে
হয়ত কিছু খেয়েছি। কিন্তু আর কিছু
মনে নেই... [ক্লমশঃ]

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের
জগৎ বিখ্যাত ও ব্যান্ড
অল ওয়াল্ড পোর্টেবল
ট্রানজিস্টার “উইন্ড-
সোর-হিটচী” মাসি
২৫ টাকা কিস্তিবন্দীতে ক্রয় করুন।
আবেদন করুন।



Swiss Television Co.
(BW-55) P.O. Box 1320,
Delhi-6.

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র নাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একদিন বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ জন্মগ্রহণ করবেছিল কিন্তু তার দেহে প্রাণ ছিল না—শুধু কঙ্কালটাই তার পড়েছিল। ১৯০৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জনাব ফজলুল হক সাহেব বাংলার মুখ্য-মন্ত্রী হন এবং মুসলিম লীগে যোগ দেন। কি অবস্থায় মধ্যে তিনি মুসলিম লীগেব বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ও সদলবলে নির্বাচিত হলেও অবশেষে আবার মুসলিম লীগ দলেই যোগ দিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পরে মুসলিম লীগের কক্ষালে তিনিই প্রাণসম্ভার করেন এবং মুসলিম লীগ প্রাণ পেয়ে ক্রমশ পুষ্ট হয় ও যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে, তখন প্রথমেই নেতা শ্রীশংকর বসু মহাশয়ের চেষ্টায় হক সাহেব মুসলিম লীগ ছেড়ে বেগিয়ে গিয়ে ‘লীগ’ দলকে বাদ দিয়েই নতুন এক মন্ত্রিসভা গড়েন। লীগের যৌবন তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হক সাহেবের নতুন মন্ত্রিসভা যদি কিছুকাল টিকে থাকতে পারতো, তাহলে হয়তো লীগের যৌবনের উদ্দামতা তিনি কিছুটা শান্ত ও সংযত করতে পারতেন কিন্তু তাব আর তিনি সযোগ্য পেলেন না। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি বাংলার গভর্নর হার্বার্ট স্যারেবের অন্যান্য ও অবৈধ হস্তক্ষেপে জনাব হক সাহেবকে বিদায় নিতে হল। শাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে আবার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাই ক্ষমতায় এলেন। ব্রিটিশনীতি এইভাবেই পাকিস্তানের পটভূমি প্রস্তুত করেছে। যাক, এই অবস্থায় মধ্যে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন আসে। হক সাহেব আবারও মুসলিম লীগেব বিরোধী ভূমিকায়-ই দলবল নিয়ে নির্বাচনে নামেন কিন্তু তিনি ও তাঁর দুই একটি সহকর্মী ছাড়া আর তাঁর দলের বিশেষ কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি। সর্বত্র মুসলিম লীগেবই জয়-জয়কাব হয়। নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগেব আর একটি সন্তান ও নায়ক—জনাব সুবাবদী মাওলানা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গড়েন। জনাব সুবাবদী সাহেবের প্রেরণায় মুসলিম লীগের

উদ্দাম ও উন্মত্ত যৌবন রক্ত-পাগল হয়ে দাঁড়ায়। তাবই ফলে হয় মুসলিম লীগ-ঘোষিত সক্রিয় সম্মুখ সমর (ডাইবেস্ট অ্যাকশন। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নয়, অ-মুসলমানের বিরুদ্ধে) উপলক্ষে কলকাতায় হয় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতায় সুবিধা করতে না পেরে ভেদবৃদ্ধিসম্পন্ন মোল্লা-প্রধান নোয়াখালি জেলায় সুবাবদী সাহেব পাকা পরিকল্পনা করে সংগ্রামক্ষেত্র পরিবর্তন করেন। সেখানকার বীভৎস ও নৃশংস অত্যাচারের নায়ক হয় মোল্লাভি গোলাম সারওয়ার সাহেব। তাঁরই নির্দেশে জমিদার শ্রীরাঙ্গেন্দ্র রায়ের বাড়ি আক্রান্ত হয় এবং রায় মহাশয় বীরের মত সেই সংগ্রামের সম্মুখীন হন এবং জনৈক ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ দিতে বাধ্য হন। রায় মহাশয়ের মাথা কেটে নিয়ে একটা খালার উপরে সাজিয়ে নিয়ে তা নাকি সংগ্রামের নায়ক সারওয়ার সাহেবকে উপহার দেওয়া হয়! তৎকালের সংবাদপত্রে এইরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। সাবা ভারতবর্ষে ঐ লোমহর্ষক বীভৎসতাব কথা প্রচার হয়ে পড়লে বিহারে তার পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দুবা মুসলমানের উপর অত্যধিক বীভৎসতায় ও নৃশংসতায় স্মৃতি-পুরুষ ও শিশু, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ২৫।৩০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। দেশ-বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের গোড়ায় আছে এইরূপ তথাকথিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গৃহদাহ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীহরণ ও নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি সমাজবিবোধী কাজ। ‘ডাইবেস্ট অ্যাকশন’ পরিকল্পনা করে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান এবং তার পৈশাচিকভাবে বাংলাদেশে রূপায়ণ করেন শহীদ সুবাবদী সাহেব; আর এইটাই কংগ্রেস নেতাদের কাছে দেশ-বিভাগ করে স্বাধীনতা লাভের তথা সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। আমি এই মনোভাবকে কংগ্রেস নেতাদের একটা ‘অজুহাত’-ই বলতে চাই; কারণ ইংরেজ শাসকের ভারত ছেড়ে যেতেই হত এবং তাঁরা বাবনও ঠিক করেছিলেন।

তার পেছনের প্রধান কারণ ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকারের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশসেবক বীরের মত প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম। আজাদ হিন্দ বাহিনী সৈনিক বৃদ্ধে জেতেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁরা যে মরণঞ্জয়ী আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন তা ভারতবর্ষের নৌ-স্থল ও বিমানবাহিনী সৈন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসেব স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন—তাঁরা আব এদেশে ইংরেজ সরকারকে চান না। তবু ইংরেজ সরকার টিকে ছিলেন তাঁদের অধীনের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীভরসার উপর নির্ভর কবে। শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে স্থানে স্থানে পুলিশ (বিহারে পুলিশের তৎকালীন হাবিলদার শ্রীরামানন্দ তেওয়ারীর নেতৃত্বে পুলিশ দল। আজ সেই তেওয়ারীজী-ই বিহার সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী) ও সৈন্যবাহিনী (বোম্বাইয়ে নৌ-বাহিনী) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন এবং সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বদেশপ্রেম একটা প্রকাশ্য নাড়া দিয়েছে। তাঁরা কেউ-ই আব বিদেশী সরকারকে চান না; সুতরাং ইংরেজের ভারত ত্যাগ করা ছাড়া আর পথ নেই। তাঁরা ভারত ছেড়ে যাওয়াই শ্রীর। করলেও শেষ চেষ্টা করে যান যে ভাবতকৈ বিভাগ কবে দুর্বল করে রাখা যায় কি না। সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা যে ফাঁদ পেতে ছিলেন, তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা ভারতবর্ষকে বিভাগ করে স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্ব বসার অতি আগ্রহে সেই ফাঁদেই পা দিলেন। ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিলেন বটে, কিন্তু দেশের সম্মুখে ‘অজুহাত’ দেখালেন—‘সাম্প্রদায়িক শান্তি’ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ-ই ছিল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাণ; আর সেই প্রাণকেই ছোঁবা মেরে হত্যা করা

দেশ-বিভাগ করে; আজ তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্রমশই যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। দুরদর্শী রাজনীতিক গান্ধীজী এই অবস্থা যে আসবে, তা অনুমান করেই তাঁর নিহত হওয়ার মাত্র ঐ ঘণ্টা আগে যে তাঁর শেষ নির্দেশ লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসকে বিলোপ করে তাকে সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে। তা' হয় নি। আজ সারা দেশই তার ফল ভোগ করছেন। এই সব দুর্ভাগ্যের মূলে কে? মুসলিম লীগেব জাতীয়তা-বিরোধী স্বীকৃতিভুক্ত নীতি ও তাব সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার জনাব শহীদ সুরাবদী। কাশেদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেব মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন; আর বাংলাদেশে জনাব সুরাবদী সাহেব সারা বাংলায় রক্ত ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে তার সাধক রূপায়ণ করেছিলেন; তাই তিনি মুসলিম লীগেব-ই শব্দে একটি স্তম্ভ ছিলেন না, 'পাকিস্তান' সৃষ্টিবও তিনি ছিলেন অন্যতম মহা-নাযক। আমাব মতে জনাব জিন্নাহ সাহেব ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে 'এটর্নি-জেনারেল' আব 'শহীদ সুরাবদী' সাহেব ছিলেন সংগ্রামেব 'ফিল্ড মার্শাল'। জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে নীতি নির্ধারণ করেছেন, দেশে-বিদেশে যুক্তিতর্ক দিয়ে তাব পক্ষে 'সওয়াল' করেছেন; আর জনাব সুরাবদী সাহেব করেছেন সংগ্রাম পরিচালনা। এই-দুই নেতার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানেব সৃষ্টি হতে পাবত কি না সে বিষয়ে আমাব মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রেও ভাবীকালের নিবপক্ষে ঐতিহাসিকদের উপব-ই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তুলে ধরাছি।

যাক, আমি বলতে চাই যে জনাব ফজলুল হকের পবে বাংলার মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে জনাব সুরাবদী সাহেব ছিলেন স্বেতীয় স্তম্ভ। কিন্তু এই দুই নেতাব ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতালেব ব্যবধান। পরস্পর উভয়েই উভয়েব ছিলেন বিপরীতধর্মী। হক সাহেব আতীব্রত ভাবপ্রবণ ও হৃদয়বান; আর সুরাবদী সাহেব, কঠোর বাস্তববাদী ও হৃদয়হীন। শুনোছি তাঁর হৃদয়হীনতার স্বাক্ষর তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনেও রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতিক জীবনে আমি একাধিকবার তাঁর হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েছি। দেশবাসী সকলেই অল্প-বিস্তর কিছু কিছু পেয়েছেন। তাঁর কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক সময়ই আমার মনে হয়েছে, তাঁর রক্তের মধ্যেই হযতো অপরাধপ্রবণতা মিশে ছিল। কেন যে এমন হয়েছিল, সেইটে আমি

কিছুতেই বুঝতে পারি নি। তিনি ছিলেন, বাংলাদেশের এক অতি সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত উচ্চ-শিক্ষিত এক মুসলমান পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের সকলেই বাংলাদেশে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সৌজ্ঞেয় জ্ঞান অত্যন্ত সুপরিচিত এবং জনাব সুরাবদী সাহেবও অতি শিক্ষিত। তিনি ছিলেন, একজন বিলেত-ক্ষেত্র ব্যারিস্টার; তবু যে সুরাবদী সাহেবের চরিত্রে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কীভাবে, এসেছিল, তা' গবেষণার বস্তু। তরুণ ব্যারিস্টার সুরাবদী সাহেব এক সময়ে আইন-কলেক্সে অধ্যাপকের কাজও করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তী-কালে অনেকেই আইন ব্যবসারে বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো কাছে শুনোছি যে, তিনি ছাত্রমহলে বিশেষভাবে তখন জনপ্রিয় ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁর সব ছাত্রগাই নাকি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে বিশেষভাবেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এহেন সুরাবদী সাহেব অবশেষে একদিন রাজনীতিতে এসে যোগ দেন। যে প্রতিষ্ঠানে সৌদীন তিনি যোগ দিয়েছিলেন, "কংগ্রেস"ই ছিল সেই প্রতিষ্ঠান এবং দেশবন্দু শ্রীচিন্ত-রজন দাশ মহাশয়ই তাঁকে কংগ্রেসে এনে-ছিলেন।

"দেশবন্দু" তখনকাব দিনেব দুইজন তরুণ বর্মীকে তাঁর পার্শ্বচর হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুই-জনকেই মহাশক্তিধর নেতাবূপে দেশবাসী সকলেই ও আমরাও দেখেছি। এই দুই-জনেব একজন ছিলেন, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়, যিনি পরবর্তীকালে "নেতাজী" নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক ও রূপকার বূপে বিশ্ব-বিস্তৃত হয়েছেন; আর অপবজন ছিলেন, জনাব শহীদ সুরাবদী। এই দুইজনের মধ্যেই ছিল জ্বলন্ত আগুন। এক-একজন যেন এক-একটি আশ্রয়গিরি। কিন্তু দুইজনেব ভেতরের আগুন, ভাবতবর্ষের ইতিহাসে দুই বিপরীতধর্মী ক্লিরা প্রকাশ করেছে। সুভাষচন্দ্রের ভেতরেব আগুন, বিদেশী ইংরেজ-শাসনের বিনাশদ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আব সুরাবদী সাহেবের ভেতরের আগুন, ভাবতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে ডম্ব করে দিয়ে অতীতের বিদেশী শাসকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সভা মানুষেব হাতে আগুন পড়লে, তা' সমাজের বহু উপকারই করে; আবার অসভ্য সমাজ-বিরোধীর হাতে সেই আগুনই তাম্ভব সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের হাতের আগুন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে;

আর সুরাবদী সাহেবের হাতের আগুন দেশকে খণ্ডিত করেছে।

সৌদীনেব সেই দুই তরুণ দৃঢ়চেতা নেতাই ছিলেন সংক্ষেপে অটুট। সংস্কার-সিদ্ধি পথে কোন বাধাকেই তাঁরা বাধা বলে মনে করতেন না—চলার পবে তাঁরা উভয়েই দেখিয়েছেন তাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প এবং সংকল্প-সিদ্ধি জ্ঞান তাঁদের ইম্পাত-কঠিন মন। কিন্তু এই সব গুণের অধিবাবী হযেও দুই নেতার কাজ বিপরীতমুখী ও বিপরীতধর্মী পথেই গিয়েছে। সুভাষ-চন্দ্র চেয়েছিলেন, অখণ্ড ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা; আর সুরাবদী সাহেব চেয়েছিলেন আগে ভারত-ভাগ, পরে স্বাধীনতা। 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগেব' এই বিপরীতমুখী আদর্শই তাঁরা ব্যাপণ করতে চেয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অর্থাৎ কংগ্রেসেব আদর্শ 'আত্মা-কংগ্রেস-সেবকরা ও নেতাবা-সমাক ব্যাপণ করতে পারি নি, 'যেন তেন প্রকাশেণ' এবং সে প্রকারেবই হোক না কেন, স্বাধীনতালভার জন্য আমাদের অতি উগ্র ও অধীর আগ্রহেব জনাই। সুরাবদী সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম-লীগেব দেশ-বিভাগেব আদর্শ ব্যাপিত হযেছে। কিন্তু সুরাবদী সাহেব এত কবে পাকিস্তান সৃষ্টি কবও কিন্তু ভাবত-বর্ষেব খণ্ডিত অংশ, অর্থাৎ পাকিস্তানে মুসলিম লীগের শ্রেষ্ঠ নেতা কাশেদ-ই-আজম জিন্নাহর আমলে তাঁব কাছে মোটেই পাত্তা পান নি। এটাই তাঁব ছিল অদৃষ্ট-লিপি বা কর্মফল। কোনও এডনাটক শাসকই (Dictator) তাঁব সম্প্রদান কোনও কর্মীকেই অত্যাধিক ক্ষমতাস্বামী ও জনপ্রিয় হতে দেখলেই তাঁকে দমিত করেন। সুরাবদী সাহেবের মধ্যে আতীব্রত ক্ষমতা-প্রিয়তা ও তাঁব বাংলাদেশেব মুসলমান সম্প্রদায়েব মধ্যে জনপ্রিয়তার আভাষ পেয়েই তাঁকে দুর্বে সবিষে বাধেন, যেনও-রূপই পাত্তা দেন না। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানেব প্রেসিডেন্ট জনাব আবে খান সাহেবও তাঁব সহকর্মী ও সাক্ষরিক অভিযানেব সাধী—লেঃ জেনারেল আত্ম খান সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তানেব গভর্নর হিসাবে অত্যাধিক জনপ্রিয় হতে দর্শই তাঁকেও দুর্বে ঠেলে ফেলেয়ে। এডনাটক শাসক সর্বদাই হন বাস্তববাদী। তাঁদের কাছে ভাবপ্রবণতা'ব স্থান থাকে না। জিন্নাহ সাহেব ও আবে খান সাহেব উভয়েই বাস্তববাদী বাস্তবনীতিব, গতবাং জিন্নাহ সাহেবও সুরাবদী সাহেবও অসভ্য খান সাহেবও আজম খান সাহেবও দুর্বেই ঠেলে ফেলেন। সুরাবদী সাহেব তাঁর এই অপমান ও তাজিল্য ভল্যেত পাবেন নি। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব যত-দিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি তাঁর অন্তবের ক্ষোভ অন্তরেই লুকিয়ে রেখে-

ছিলেন। মুসলিম লীগের অন্যসাধারণ নেতা কয়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবের কাছে কারোরই মাথা তোলার ক্ষমতা ছিল না। সুরাবদী সাহেবও পারেন নি। তিনি সময়ে সময়ে যে এক-আধটুকু প্রতিবাদ করেছেন, তা জিন্নাহ সাহেবের সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনমনে তাঁর জীবিতকালে বিশেষ কোনও রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে নি। কেন যে পারে নি, সে সম্বন্ধে একটা কথা বলি। জনাব মহম্মদ আলি সাহেবকে (বগুড়ার) ধন বার্মার রাষ্ট্রদূত করে জিন্নাহ সাহেব পাঠান, তখন আমি তাঁকে দেশের বাইরে না বেতে বলার তিনি, তার উত্তরে আমাকে যা বলেছিলেন, তার মধ্যেই ঐ “কেন”র উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি (মহম্মদ আলি সাহেব) বলেছিলেন,— “আপনারা যারা কংগ্রেসের লোক, তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন। আপনাদের মূলধন ছিল, ত্যাগ ও দেশের জন্য দৃষ্ণ-কন্ঠ বরণ করে নেওয়া কিন্তু আমাদের তো ত্যাগও নেই, কোন দৃষ্ণ-কন্ঠও আমরা বরণ করি নি। আমরা যে এসেমবলির সদস্য হয়েছি, মুসলিম লীগের নামের জোরে আর, মুসলিম লীগ মানেই জিন্নাহ সাহেব। জিন্নাহ সাহেবই লীগের প্রাণ। সেই জিন্নাহ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে গেলে আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।” মহম্মদ আলি সাহেবের ঐ কথা একেবারে খাঁটি সত্য ছিল। সুতরাং সুরাবদী সাহেবও জিন্নাহ সাহেবের জীবিতকালে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। কেবল মনে মনে গম্মরিরেছেন— ক্রান্ত পোষণ করেছেন। এইভাবেই কয়েক বছর তাঁকে সুযোগের প্রতীক্ষায় কাটাতে হয়। তিনি নিঃশব্দে কাটানও। স্বাভাবিকভাবে নেতার চরিত্রে বৈশিষ্ট্যই ঐশানে। তাঁরা কখনই তাঁদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে চলেতে অধৈর্য হয়ে পড়েন না, যেমনটি হন ভাবাবল্যসী নেতারা। ভাবপ্রবণ নেহবু অধৈর্য হয়েই খণ্ডিত ভাবভের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে-ছিলেন। সুরাবদী-চরিত্র ছিল ঠিক এর বিপরীতমর্মী। তিনি সুবিধাবাদকে সামনে রেখেই পরিণাম চিন্তা করতেন এবং নির্দিষ্ট সন্তব্য পথে এগিয়ে যেতেন। এই চলার পথে তিনি ইতিহাসও সৃষ্টি করতেন। “দেশবন্ধু” চিত্তরঞ্জনের দই গার্বচরই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সুভাষচন্দ্র করেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস; আর সুরাবদী করেছেন ভারতবর্ষের বহুদৈর্ঘ্য, বহু আশ্রমে গড়া জাতীয়তাবাদের অপমাত মৃত্যুর ইতিহাস। সুরাবদী সাহেব যে ইতিহাস

সৃষ্টি করেছেন, তা অপকীর্তির ইতিহাস। বহু ঘটনাকে উপলব্ধ করেই তিনি জীবনে অনেকই অপকীর্তির ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আমার জানা কিছু কিছু ঘটনার ইতিহাস আমি ক্রমশ বলবো। আপাতত এখানে তাঁর রাজনীতিক্ষেত্রে আসার পর থেকে দেশ-বিভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যকার দুইটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করছি।

“দেশবন্ধু” আনলেন, সুরাবদী সাহেবকে কংগ্রেসে। ১৯২৪ সালে দেশ-বন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল কলকাতা কংগ্রেসে দখল করেন এবং “দেশবন্ধু” তার প্রথম মেয়র ও জনাব সুরাবদী সাহেব প্রথম ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁদের ঐ জয়ের গর্বে সারা বাংলা-দেশ-বন্ধু বাংলাদেশই বা কেন, সারা ভারতবর্ষই আনন্দে মাতোয়ারা হন। বাংলাদেশের তো কোনও কথাই নেই। মুসলমানসমাজের অতি সম্বৎসর শিক্ষিত একজন সন্তান জনাব সুরাবদী সাহেব ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার বাংলা-হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণীর মানুসের মধ্যেই ধন্য ধন্য রব পড়ে যায়—সকলেই খুব খুশি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করে বসলেন। রাজনীতিক জীবনে নেমে এই-টেই তাঁর প্রথম কীর্তি বা অপকীর্তি। কলকাতা কংগ্রেসের পরিচালিত “মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে” (তখন হগ সাহেবের বাজার বলে পরিচিত ছিল) একজন “পীর” মারা গেলে (এলেকাল করলে) ডেপুটি মেয়র হিসাবে তিনি, তাঁর প্রধানকে অর্থাৎ মেয়রকে না জানিয়েই ঐ মার্কেটের মধ্যেই পীরের দেহকে কবরস্থ করার আদেশ দেন এবং তাঁকে এখানেই কবর দেওয়া হয়। সুরাবদী সাহেবের সেই কীর্তিস্তম্ভ আজও ‘মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে’ থেকে তাঁর জয় ঘোষণা করছে। সেকালের কলকাতার সব সংবাদপত্রেই সুরাবদী সাহেবের ঐ অপকীর্তির বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা করেন। সুরাবদী সাহেব ঐ একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এর পরে, তিনি ক্রমশ “কংগ্রেস” থেকে দূরে সরে যেতে যেতে একদিন দেখা যায় তিনি নিঃশব্দেই “কংগ্রেস” ছেড়ে “মুসলিম লীগে” গিয়ে ভিড়েছেন।

মুসলিম লীগে এসে তিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মুখ্য-মন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর শাসনকালে বাংলা-

দেশের শহর-বন্দরে ও গ্রামে গ্রামে অ-মুসল-মান সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন-কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। সেদিনের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক-দের মধ্যে আজও যারা বেঁচে আছেন, তাঁরাই জানেন যে, কিভাবে তখন তাঁদের দিন কেটেছে। সুরাবদী সাহেবের রাজ-শক্তির দাপটে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোবল তখনই ভেঙে পড়েছিল। তার-পরে আসে—“ডাইরেক্ট অ্যাকশন” (সক্রিয় সমর)। মুসলিম লীগ দলই অবশ্য তাঁদের নীতি হিসাবে “ডাইরেক্ট অ্যাকশন” ঘোষণা করেন। সুরাবদী সাহেব বাংলা-দেশে তার সম্যক রূপায়ণ করেন বহু ও অশ্রুর বন্যার মধ্য দিয়ে। সেদিনের সেই দৃষ্টদৃষ্টক স্মৃতি আজও অনেকের মনেই বিশেষভাবেই জাগরুক আছে। এবারেও তিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এখানে তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেন, তা হচ্ছে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার ইতিহাস। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের বনিয়াদ এখানেই গড়ে ওঠে। কয়েদ-ই-আজম জিন্নাহ সাহেবও সুরাবদী সাহেবের শক্তিমত্তার পূর্ষ পরিচয় পান; তাই তাঁকে আর বাড়তে দেন না—তাঁকে দূরেই ঠেলে রাখেন।

এইবার এতদিনে সুযোগসন্ধানী সুরাবদী সাহেবের কাছে সুযোগ এসেছে। ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এখন আর জিন্নাহ সাহেব বা তাঁর একান্ত অনুগত মন্ত্রিসভা লিলাকত আলি সাহেব নেই। তাঁরা উভয়েই পর-লোকগত। তাই এইবার সুরাবদী সাহেব মুসলিম লীগকে একহাত দেখে নেওয়ার জন্য কোমর বাঁধতে লাগলেন।

বাংলাদেশে মুসলিম লীগ যে স্তম্ভ-গুলোর উপর গড়ে উঠেছিল, তার সর্ব-প্রধান দুইটি স্তম্ভই টলায়মান হয়েছে। জনাব ফজলুল হক সাহেব তো আগেই মুসলিম লীগ দল ছেড়েছিলেন; আর তিনি তো ১৯৩৭ সালে ও ১৯৪৬ সালেও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন; সুতরাং তিনি যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও ‘লীগের’ বিরুদ্ধেই দাঁড়াবেন, এটা তো মুসলিম লীগের পক্ষে একরূপ জানা কথাই ছিল। কিন্তু সুরাবদী সাহেবের মনোভাবই এতকাল পর্যন্ত তাঁদের কাছে কতকটা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সেখানেও দেখা দিল ফাটল।

[ক্রমশঃ]

‘মুক্তকেশের’ মুক্ত মেয়ে

মুক্তায় এসেছি



সাধনার

মহাভূক্তরাজ তৈল

মেয়ের মত ঘন কুণ্ডল কেশবাস নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
“চল তার কবোয় অন্ধকার বিনিশ্যার নিশা”
সেইজন্য সৌন্দর্য বিনাসিনী সাত্রেই ব্যবহার
করেন সাধনার মহাভূক্তরাজ তৈল
বিশুদ্ধ আরবের মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও
শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর
কাজ নেই।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৩.সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. অধ্যাপকদামস্রী, এফ.সি.এস(লণ্ডন)
এম.সি.এস(আমেট্রিকা) ডাঙলপুর কলেজের রূপায়নশাস্ত্রে
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস(কলি) অধ্যাপকদামস্রী

বর্তমান ও দেশে মিলন এক এদেশ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রাইনোসেরস (১৯৫৮)—ইউনেস্কোর শব্দ থেকে বেশ জনপ্রিয় নাটক এইটি। এ নাটকে নাট্যকার ১৯৩৮ সালে রুমানিয়া ছাড়বার সময় তাঁর মনে যে ভাবানুবৃত্তি হয়েছিল তারই রূপাংগন করেছেন। সেই সময়ে তাঁর পরিচিত সাধারণ দল সবাই প্রায় ফ্যাসিস্ট মডেমেন্টের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সমসাময়িক প্রচলিত হুজুগে লোকে কিভাবে প্রভাবিত হয়, কিভাবে সম্মোহিতের মত আচরণ করতে থাকে, নাৎসী এবং ফ্যাসিস্ট মতবাদ কিভাবে তৎকালীন জনগণকে সংক্রমক রোগের মত ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছিল তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। ইউনেস্কো বলেছেন—At such moments we witness a veritable mental mutation. When people no longer share your opinions, when you can no longer make yourself understood by them, one has the impression of being confronted with monsters-rhinos, for example.

কাশিমবাজারের কুমার গ্রীসোমেন মন্ডী মহাশয় ইউনেস্কোর রাইনোসেরস নাটকের বঙ্গানুবাদ এবং বঙ্গীকরণ করেছেন গন্ডার নাম দিয়ে। এ নাটকটি

তিনি দৃষ্টান্ত করেছেন, তবে সে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সোমেন-বাবুর অনুবাদ এই গন্ডার নাটকটি এখন ছাপার জন্য বন্ধস্ত হয়েচে। আমার অনুরোধে 'গন্ডারের' কিছুটা অংশের পাণ্ডুলিপি তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তাঁর এই সৌজন্যের জন্য গন্যবাদ জানিয়ে সেই অংশটির কিছুটা আমাদের পঠিক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি। এটি পড়ে পাঠকদের ইউনেস্কোর লেখার খাঁচা বুঝতে যথেষ্ট সুবিধা হবে। অবশ্য অনেকেই রাইনোসেরস নাটকের ইংরাজী ভাষন দেখেছেন—কিন্তু বাংলা অনুবাদে নাটকটি কেমন দাঁড়ায় সে বিষয়েও পাঠকদের যথেষ্ট কৌতুহল আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

গন্ডার

নিম্নলিখিত অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

বার্তাবহ—এসব বাজে কথা—ভাঁওতাবাজী—একবারে বানানো।

পুষ্প—কিন্তু আমি দেখছি। নিজের চোখে দেখেছি গন্ডারটাকে।

দুর্গাদাস—এই তো কাগজে পত্রিকায় লিখেই, অবীকার করবেন কি? এই রকম ঘটনা কি নিত্য ঘট।

বার্তাবহ—বাজে কথা—

দুর্গাদাস—এই তো এখানে লিখেই সমস্ত। এমন কি বেড়াল মাড়িয়ে যাবার কথাটাও লিখেছে। আপনি পড়েছেন স্যার? “গতকাল সকাল বেলায় গীর্জার চৌরাস্তার মোড়ে একটি ভারী চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের তলায় পিষ্ট হইয়া একটি বিড়াল মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”

পুষ্প—ঠিক চৌরাস্তার মোড়ে নয়, আর একটু এদিকে, রাস্তা ঠিক চায়ের দোকানের একটু, আগেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

বার্তাবহ—যত বাজে কথা—ফুঃ

দুর্গাদাস—এ তো খুব স্পষ্টই লিখেছে।

বার্তাবহ—আমি ওই সাংবাদিকদের কখনো বিশ্বাস করি না। ওরা সবাই খালি মিথ্যাকথা বলে। ওরা আবার ভণ্ডও। উপদেশ দেয়—যেন আমার নিজের ভাববার ক্ষমতা নেই। ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। কম দিন তো আর স্কুলমাস্টারি করি নি। আমি যা নিজের চোখে দেখি কেবল তাই বিশ্বাস করি। আমার চিন্তা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক—সেজন্য বিজ্ঞানসম্মত না হলে, তাকে আমি খাঁটি মনে করি না।

দুর্গাদাস—গন্ডারের ঘটনার সঙ্গে আপনার নিয়মতান্ত্রিক চিন্তার সম্পর্ক?

পুষ্প—কাগজে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট করেই লিখেছে।

বার্তাবহ—স্পষ্ট করে লিখেছে না ছাই। চতুষ্পদ মানে কি? বেড়ালটা সেখানে গেল কি করে? সেটাকে খুন করা হল না দুর্ঘটনা ঘটল তাও পরিষ্কার নয়। বেড়ালটা শব্দী না পুরুষ তাও কোথাও লেখা নেই। বেড়াল বলতেই যা সাংবাদিক কি বোঝেন—সে সব আগে জানা দরকার।

দুর্গাদাস—বেড়াল মানে কি তা সবাই জানে।

বার্তাবহ—অত সহজ নয় ব্যাপারটা। কোন জাতের বেড়াল সেটা, কি রং, কিরকম চেহারা, চালচলন? কৃষ্ণবর্ণদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি।

দুর্গাদাস—কৃষ্ণবর্ণ আবার কোথা থেকে এল? গায়ের রং নিয়ে বা জাত নিয়ে কোন কথা তো হচ্ছিল না। আপনি বোধহয় অন্য বিষয়ে কিছু বলছিলেন।

বার্তাবহ—কমা করবেন দুর্গাদাসবাবু। এই রকম একটা ঘোরতর সংকটময় প্রশ্নকে এড়িয়ে আপনারা কিছুতেই যেতে পারবেন না। আজকের সব থেকে বড় সমস্যা হোল এই গায়ের রঙের সমস্যা।

দুর্গাদাস—কি বিপদ, আমরা তো কেউ আপনার কথা অস্বীকার করছি না।

...কিন্তু তাব সঙ্গে এই ঘটনার.....

বার্তাবহ—এত সহজে চাপা দিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য বারবার প্রমাণ করেছে যে যখনই পৃথিবীর বুকের ওপর মানুষের মানুষের জ্ঞাত নিয়ে হানাহানি শুরু করেছে.....

দুর্গাদাস—ওকথা সম্পূর্ণ অালোচনা—এখানে কোন রকমেই আসছে না।

বার্তাবহ—নিশ্চয় আসছে। রংয়ের বিভিন্নতা, জড়ের বিভিন্নতা বিরোধ সৃষ্টি করেছে.....

পুষ্প—আমাদের আজকের আলোচনা বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে নয়।

বার্তাবহ—সুযোগ পেলেই আমাদের উচিত এই বিশ্লেষণ ব্যবহারের নিন্দা করা।

পুষ্প—আমরা কেউ বর্ণবৈষম্য গৃহস্থ করি না এ তো সবাই জানে। আপনি সব গুলিকে ফেলেছেন। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি ভারী চতুষ্পদ, একটি বেড়ালকে চেপে মেরে ফেলেছে। এই ভারী চতুষ্পদটা হল একটা গন্ডার।

বার্তাবহ—কিন্তু লোককে জানি বাদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বলা বাহুল্য এরা সবাই এক দেশের লোক—নাম করে শত্রু বাড়তে চাই না। আসলে হয়তো একটা ইঁদুর একটা মাছিকে মাড়িয়েছে। কিন্তু এঁরা কল্পনায় তাকে গন্ডার আর বেড়াল করে ফেললেন। আসলে তাকে ভাল করা এদেশের স্বভাব আর ব্যবস্থা। আপনি কি নিজের চোখে গন্ডারটাকে দ্রাস্তার ঘরে বেড়াতে দেখেছেন?

পুষ্প—ঘরে বেড়াতে দেখি নি দৌড়তে দেখেছি।

দুর্গাদাস—আমি অবশ্য নিজের চক্ষে দেখি নি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছে শুনেছি।

বার্তাবহ—এটা যে বানানো গল্প সেটা খুবই স্পষ্ট। আপনারা খবরের কাগজের কথা খুব বিশ্বাস করেন বলেই উদ্ভট উদ্ভট ঘটনা ভাববার সাহস করেন। আর এই অসম্ভব ঘটনা খুব বিকি হয়, কাগজের মালিকরা খুশি হয়ে আরো অদ্ভুত আরো বিকট ঘটনা লিখতে বলে—হা—হা—হা। পুষ্প মেয়েহলে, সে ভুল করবে বুঝতে পারি। কিন্তু আপনি দুর্গাবাবু একে আইনজ্ঞ, তার পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ, আপনিও যে ওদের ধাপ্পার ভিজে গেছেন তা দেখে সত্যি হাসি পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ.....

পুষ্প—কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি শপথ করে বলতে পারি।

বার্তাবহ—চেপে বান, চেপে বান। আমার ধারণা ছিল আপনি বুদ্ধিমত্তা নিয়ে।

পুষ্প—বেশুন, আমার চোখে চলছে পড়ে নি। তাছাড়া একা আমি দেখি নি, আমি ছাড়া আরো অনেক লোক দেখেছে।

বার্তাবহ—যত বাজে, ফঃ। ছুটির দিনে সবাই অনামনস্ক হয়েছিল—কতক-গুলো কাজ ফাঁকি দেওয়া রকবাজ চিকার কবে উঠল—ওই গন্ডার গেল—বাস অর্থাৎ সবার গন্ডার দেখা হয়ে গেল।

দুর্গাদাস—কালকের সকালের ঘটনা—এখনও খুঁজলে হয়তো পারেন ছাপ-টা পাবা বাবে।

বার্তাবহ—রবিবার আমাকে কাজ করতে হয়। সকাল-বিকলে টুইশানি আছে। পরসার তাকিরায় হেলান দিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে চায়ের কাপে চমক দিতে আমি শিখি নি।

[প্রজ্ঞাপতির প্রবেশ]

প্রজ্ঞাপতি—কি বললেন?

বার্তাবহ—ক্ষমা করবেন। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মনে ছিল না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সত্যকে চেপে রাখা যায় না। ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে আপনি যা বলছেন তা সত্য। এভাবে বলুন দেখি গন্ডারটাকে কেমন দেখতে।

পুষ্প—খুব বড় কাল বিশ্রীমত।

বার্তাবহ—তাহলে আপনি কি করে বুঝলেন যে আপনি গন্ডারই দেখেছেন। শুনুন গন্ডার হচ্ছে—

প্রজ্ঞাপতি—গন্ডাব সম্পর্কে এখন বক্তৃতা করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। এটা আপনার স্কল নয়।

বার্তাবহ—হলেই ভাল হোত—

প্রজ্ঞাপতি—যাক এগারটা বাজল। এবার কাজ শুরু করা যাক। পুষ্প তুমি রেজিস্টারগুলো আমার ঘরে দিয়ে এস—

[বরেন্দ্র সন্তপণে পুষ্পের কাছে যায়]
বরেন্দ্র—আমার আসিতে খুব দেরি হয়ে গেছে?

বার্তাবহ—চিরঞ্জীবন আমি অশিক্ষার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছি।

পুষ্প—(বরেন্দ্রকে) তাড়াতাড়ি সই করুন, এখনি রেজিস্টারী উঠে যাবে।

বার্তাবহ—ধনীর রাজপ্রাসাদেই হোক, কিংবা গরীবের কুণ্ডেতেই হোক যেখানে তাকে পাব.....

প্রজ্ঞাপতি—এবার বাড়াবাড়ি হচ্ছে—

দুর্গাদাস—আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার।

প্রজ্ঞাপতি—আপনার কি ধারণা বার্তাবহ-বাবু আমার সুযোগ্য সহকারী দুর্গা বোকা? মনে রাখবেন সে আইন পাশ করেছে, আর কাজে অত্যন্ত দক্ষতা আছে।

বার্তাবহ—আমার বলার কথা এই ছিল যে স্কুলের শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষার থেকে অনেক ভাল।

প্রজ্ঞাপতি—হুঁ, কই রেজিস্টারগুলো নিয়ে এস।

পুষ্প—এই যে নিয়ে যাচ্ছি স্যার।

বরেন্দ্র—নমস্কার স্যার—বেশ সকালটা আজকে (কোন উত্তর না পেয়ে ফের বলে) নমস্কার স্যার—বেশ সকালটা। আমার প্রায় দেরি হয়ে গিয়েছিল।

প্রজ্ঞাপতি—এই যে বরেন্দ্র। তোমার ভাগ্যে কি গন্ডার দেখা হটেছে?

বরেন্দ্র—আমি একটাকে দেখেছি স্যার—

বার্তাবহ—(সজোরে ঘুরে দাঁড়ালে) বাজে কথা ফঃ।

পুষ্প—দেখলেন তো আমি সত্যিকথা বলছিলাম।

বার্তাবহ—ও তোমার মধুরস্কার জন্য তোমার কথাই বলছে। ওকে ওই রকম দেখতে হলে কি হবে, ও মেয়ে-দের সম্মান কি কবে রাখতে হয় জানে। দুর্গাদাস—গন্ডার দেখেছে একথা বলার মধ্যে সম্মান বাঁচাবার কি হল আমি ত খুব বুঝতে পারছি না।

বার্তাবহ—যথেষ্ট যথেষ্ট। একটা আজ-গুণি গল্প বলেছেন উনি। আপনাবা সেই অসম্ভব ব্যাপারকে সমর্থন করে ওর মধুরস্কার করেছেন। এ তো খুব সহজ। পুরুষদের মেয়েদের প্রতি এই দুর্বলতা আসা যে আবো বেশি স্বাভাবিক তা বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে।

প্রজ্ঞাপতি—কথার মাঝপ্যাচ কববেন না। বরেন্দ্র কি করে জানবে আমরা কি আলোচনা করছি। ও তো এই-মাত্র এল।

বরেন্দ্র—(পুষ্পকে) কিন্তু আপনি তো দেখেছেন—তাই না? আমবা দুজনাই দেখেছি।

বার্তাবহ—ফঃ, বাজে কথা। তবে হ্যাঁ, বরেন্দ্রবাবু কল্পনায় গন্ডার দেখে থাকতে পারেন। কারণ হে হে হে ওঁর কল্পনাশক্তি খুব প্রখর। ওঁর পক্ষে অনেক কিছু দেখা সম্ভব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ.....

বরেন্দ্র—আমি তো একা দেখি নি—আরো অনেক লোক সেখানে ছিলেন—তার

সবাই দেখেছেন গাড়ারকে—না, না, গাড়ার দাঁটকে।
বার্তাবহ—উনি কটা গাড়ার দেখেছেন তাও জানেন না।

বরেন্দ্র—আমি তখন আমার বন্ধু জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলছিলাম—বেশ কিছু লোক ছিল তখন।

দুর্গাদাস—আমি কিন্তু শুনেছি গাড়ারটার দুটো খজা ছিল।

এইভাবেই অনুরাদটি বেশ সহজ, সবল, অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে—তবে নাটকটিকে সোমেনবাবু ইন্ডিয়ানাইজ করলেন কেন—অর্থাৎ পরিবেশ এবং নাম-ধামে বাঙালী ব্যাপার না করলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বরং যে উদ্দেশ্যে মূল নাটকটি লেখা অর্থাৎ নাসীরাদ এবং ক্রিভাবে সাধারণ লোকে নাসী মতবাদে দীক্ষিত হচ্ছিল তার একটা চিত্র দেওয়া সেই তাৎপর্যবিশিষ্ট বজায় থাকতো।

এখন কথা হোল এ ধরনের নাটক দর্শককে কতোটা আনন্দ দিতে পারে—বসে বসে এ নাটক দেখা বা পড়া যে কত কষ্টের তা ভুক্তভোগী মাঠই জানেন। নাটকের যা রক্তবা তা হয়তো খুবই মূল্যবান—কিন্তু যেভাবে সে বক্তব্যকে বলা হয় তা কি শিল্পপরিসরদের প্রাণে সাজা জাগাতে পারে। এই নাটকের বিষয়বস্তুটিই যদি সহজ-সরলভাবে স্টেইট প্লেজের মাধ্যমে পরিবেশিত হত তবে লোকে সে নাটক পড়ার বা দেখার সময়ও মনপ্রাণ দিয়ে

উপভোগ করতো এবং এর থেকে যা শিক্ষণীয় তাকেও আধিক্য করতো—তারের গলদসমূহ হতে হতো না।

গাড়ারের পাশাপাশি রেখে সোমেনবাবুবই অনুরাদ করা ইউজিন ও'নিলের নাটকগুলো পড়ুন—দেখবেন অনুরাদও যেমন ভাল, পড়তেও তেমনি সুন্দর লাগে। মূলের সৌন্দর্য বজায় রেখে অনুরাদ করা তো সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সোমেনবাবু সত্যিই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কিছুকাল আগে ধনঞ্জয় বৈরাগী কৃত ইউজিন ও'নিলের Great God Brown-এর বাংলা অনুরাদটি আমার হাতে এসেছিল। এ ভুললোকটির মৌলিক নাটকও (?) যেমন তৃতীয় শ্রেণীর, এ অনুরাদটিও হয়েছিল সেই জাতীয়। ভুললোক এবার নাকি আর একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে যৌথভাবে রচনা করেছেন, 'আগন্তুক' বলে এক নাটক। এখনও নাটকটি দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয় নি। সময়মত দেখে নিয়ে পাঠকদের জানানো বোম্বাষ্ট ফ্লোর এবং বেনেট নবলকের পর এই নতুন যৌথ প্রচেষ্টাটি কি রকম উৎকর্ষ—এসব পূর্ব-গামীদের কতোটা পেছিয়ে ফেলে বৈরাগী গশায়রা এগিয়ে যেতে পেরেছেন তা অবশ্য কয়েকদিন বাদে এঁদের হাত-থরা কাগজ-গুলোতে দেখতে পাবেন। যেহেতু এঁদের দৌলতে আমরা জানতে পেরেছিলাম শিশিরকুমার অহীন্দ্রবাবুর সাজাহানকে পেছনে ফেলে তিনি সাজাহানের নব-রূপাণ করছিলেন।

কাগজে দেখছিলাম 'এক পেয়লা কফি' নামে বৈরাগী মশায়ের রহস্য নাটকটি বোম্বাইয়ের কি এক চিত্রব্যবসায়ী কিনেছেন ছবি করবার জন্য—জহুরী জহরং চেনে। সুতরাং এবার বৈরাগী মশায়কে আর আটকে রাখবে কে—এবার সত্যি-সত্যিই বোম্বাই-এর ছবির জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাহিনীকার নীহাররঞ্জন গুপ্তের একজন সত্যিকার প্রতিপক্ষ দেখা দিলেন। আমরা ভাবি—আহা, এরা দুজনে যদি যৌথভাবে নাট্যরচনা করতেন সেক্ষিপায়ার-মারলোর যৌথ প্রচেষ্টা সম্ভব হলে তাও কি এঁদের সমকক্ষ হতো।

সোমেনবাবু ইউরোপীয় এ্যাবসার্ড নাটকের অনুরাদ করছেন বোধহয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে—ওদেশের নাট্যপ্রগতির আনাচ-কানাচগুলো যেন আমাদের অজ্ঞাত না থাকে। কিন্তু একটা কথা কি তিনি বিস্মৃত হয়েছেন?—যে নীহার গুপ্ত মশায় এবং বৈরাগী মহোদয়ের নাটকের এ্যাবসার্ডিটি বরেকট-ইউনেস্কোর এ্যাবসার্ডিটিকে বহু পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে—নাট্যরচনার কদম কদম চসকে চসকে

এই দুই মহারথী যে কত কদমের সৃষ্টি করেছেন তা বোধহয় সোমেনবাবুর জানা নেই। থাকলে তিনি ইউনেস্কোর অনুরাদ হবে বাঙালী নাট্যনুরাগীদের এ্যাবসার্ডিটি-কথা বোঝাতে যেতেন না।

২৬শে অক্টোবরে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে ইউনেস্কোর 'দি লেশন' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের লোকশিক্ষক-ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলাম। কয়েকজন নেতা ক্রিভাবে বাণী দিচ্ছিলেন যে 'অর্থমূল্য হ্রাস করলেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে এবং আসলে এর ফলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সে কথাও লিখেছিলাম।

৩১শে অক্টোবরের স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখলাম দি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিস্টার বি, পি, প্যাটেল একাদশ সাধারণ বার্ষিক মিটিং-এ দিল্লীতে ২৮শে অক্টোবর ১৯৬৬-তে তাঁর ভাষণে বলেছেন :

In June, 1966, hardly two months after the beginning of our financial year, the rupee was devalued. The event was of far-reaching significance for the foreign trade of the country and its impact on the economy was profound. For a variety of reasons, (কারণগুলো দেখাতে বাধা ছিল কি?), including the time taken by the trade and industry to readjust itself to the new conditions and be prepared to work without export incentive scheme, devaluation has not yielded the desired results in the shape of giving a lift to our exports. The export earnings in the twelve months from June, 1966 to May, 1967 have amounted to only 1,520 million dollars showing a decline of 189.0 million dollars from 1,709.0 million dollars in the period June, 1965 to May, 1966.

ভিভ্যালুয়েশনের দুই কড়া ভোটমুখে পরাজিত হয়ে অপসারিত হয়েছেন গদি থেকে। বাকীজন অর্থাৎ যিনি ছিলেন পালের গোদা, তিনি এখন পর্যন্ত কি করে গদি আঁকড়ে, আছেন তাই ভেবে আশ্চর্য লাগে। অবশ্য আমাদের দেশে বোধ হয় সবই সম্ভব।

কুমারেশ
লিভার ও পেটের
সীড়ায়
মানস ডারমিন
কাটা পোড়া
এন ও চর্মরোগে
রেসপেরোসিন
সর্দি ও কাশিতে
ও-আর.সি.এল.হাওড়া-৬

আকাশবাণী



পরিক্রমা

মেঘদূত

চৌকি স্বর্গে গেলেও ধাম তাল।
কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলে-কি হবে
সম্পাদক আর অনুসন্ধান; বাঙলাদেশের বাইরে
বসেই আকাশবাণী-পরিক্রমার জন্য নিয়মিত
লেখা পাঠাতে হবে। বঙ্গসার-এলাহাবাদ
করিছি আর ফাঁক পেলে কিছুমিছা লিখছি।
সঙ্গে রয়েছে ট্রানজিস্টর সেট।

মেঘদূতকে সম্বোধন করে লেখা
ক'খানা চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। তাব
একখানায় লিখছেন বোম্বাই থেকে
শ্রীস্বপ্না ঘোষাল, ... 'বাংলাদেশ থেকে
অনেক দূরে আমরা রয়েছি। দেশের
সঙ্গে বোগাযোগ রেখেছি সংবাদপত্র-
পত্রিকা এবং বোডিও মারফৎ। সাপ্তাহিক
বসন্তমতীর আকাশবাণী-পরিক্রমার আমি
একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনাব অম্ল-
মধুর বেতাব সমালোচনা পড়তে খুব মজা
পাই। শেখবারও অনেককিছু পাই।
বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালিদের বাংলা
উচ্চারণ ঠিক করতে আপনাব সূচিন্তিত
আলোচনা সাহায্য করছে। আধুনিক গান
নিষে কলম ধরছেন না কেন, এ ব্যাপারে
মৌবব থাকার কারণ জানতে পারি কি?
আপনি এত বিবিধভারতী এবং হিন্দি-
বিরোধী কেন? বিবিধভারতীর সমালোচনা
একটু কম হলে ভাল। রবীন্দ্রসংগীত
সম্পর্কে আপনাব মন্তব্য এখানেই রবীন্দ্র-
সংগীত শিল্পীদের পছন্দ হয়েছে। আমি
নিজেও উপরূত সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

আধুনিক গান সম্পর্কে এতকাল কলম
ধরি নি তা সত্য। আধুনিক গান বললেই
চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি বিশেষ
গাছের চেহারা। আলিপুরে এগ্রি-হিট-
কলচরে একটি গাছ আছে, বটানিকল নামটা
মনে নেই, এ খেয়ালী গাছটা আপনাদের
অনেকের হাতের দেখা আছে; বাদির
দেখা নেই অথচ উৎসাহ আছে, সুযোগ
পেলে দেখে নিতে পারেন। পাগলা
গাছটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাতাগুলোর মধ্যে
সাংঘাতিক অমিল। পাতাগুলো দেখলে
মনে পড়ে যায়, যত মত তত পথের কথা।
উদ্ভট গাছটা পাগলের মতো মাথা উঁচিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক গানের এলো-
মেলো দিকগুলোর কথা ভাবলে মনে
পড়ে যায় ওই গাছটার কথা। কতকগুলো
পরিচিত শব্দকে-সাজিয়ে বা না সাজিয়ে
খাড়া করে, দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ঢালু, পাহাড়ের গা বেয়ে জল যখন গাড়ির
পড়ে তা কোথাও দাঁড়ায় না তেমনি শব্দ

আধুনিক গান দেখবেন মনের কোথাও
এতটুকু দাগ কাটলো না। কি করে হবে!
মনে করুন, গীতিকারকে বাঘনা দেওয়া
হলো, চারখানা গান চাই চব্বিশ ঘণ্টার
মধ্যে! বানাতে হলো কাবখানার শ্রমিকের
মতো। এবার সুবর যোজনার পালা।
সুন্দর যোজনা কালে সংগীতলেখকের
হয়তো বলার কিছু থাকতে পারে,—তবু
তাব সঙ্গে কোন পবামর্শ না করে সুবর
ঢালা হলো। তাবপর? তারপর—রিহর্সল
না নিবে হয়তো শিল্পী গাইলেন;
রিহর্সলের সময় নেই, জায়গা নেই!
বর্তমানে কাব্যসংগীতের হাল ইথেকে
এমনতরো। এবার একবার দেখুন তো
আলোচ্য কাব্যসংগীতের সঙ্গে হিট-কল-
চরের খেয়ালী গাছটার কোথাও কোন মিল
থাকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

গীতিকার, সরকার, প্রযোজক, শিল্পী
প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে।
দায়িত্ব ঠিকমতো পালিত না হলে গানের
জগতে আধুনিক গানের হরিজনস্ব প্রাপ্তি
ঘটতে বাধ্য। অথচ এটুকু বঝতে
অসমর্থ হয না যে, এ জাতীয় সংগীতের
কি বিপুল সম্ভাবনাই না রয়েছে। সেদিকে
কেউ তো তাকান না। তাকান না বলেই
তো একবার দুঃখ করে রবীন্দ্রসংগীতের
কেন এক নবীন শিল্পীকে অনাবোধ করতে
বাধ্য হয়েছিলাম। দয়া করে কখনো
আধুনিক গান গেলো না।

আধুনিক গান তেমন ভাবগম্ভীর
হচ্ছে না। ছন্দ-ভাষা-ভাব-সুন্দর এদের
মিলিত প্রচেষ্টায় গান যদি প্রাজল এবং
শিল্প চিকীর্ষিত না হয়ে শুধুমাত্র
অনুকরণসর্বস্ব হয় তবে তা কখনো
রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। বাঙলাদেশ
গানের দেশ, শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরে
বাঙালি তাব গানের ডালি ভরিখে তুলেছে।
বর্তমানে আধুনিক গানের লেবেল এটে
বাজারে যে-বস্তুটি চলছে তা অল্প চাখলে
এ-গানের প্রতি মোহ একেবারে কাটিয়ে
ওঠা যাবে।

আমাদের বিশাল দেশে, কত না জাতি
কত সংস্কৃতি চারিদিকে রয়েছে। বিভিন্ন
জাতির সংগীতের সরের মধ্যে কত বৈচিত্র্য
লক্ষ্য করা যায়। আদিম জাতিগুলির
লোকসংগীত মনকে কি দোলাই না দেয়।
সাঁওতাল খাসী নাগা নানান জাতির গানের
সবের আকর্ষণীয় দিক থেকে কিছু কিছু
অন্যায়ের বাঙালি গানে প্রয়োগ করা যেতে

পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছন্দকে সুন্দর
উপযোগী করে তুলতে হবে। পবাক্তা
নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে নোতুনের স্বাদ
পাওয়া যাবে। যে কোন ছন্দে না
ভেবেচিন্তে যে কোন সুন্দর বোজনা
অনুচিত। সুন্দরকারের ছন্দ সম্পর্কে গভীর
জ্ঞান থাকা চাই। আজ আমরা হালকা
কাব্যকে চটুল সুবে চুবিখে বর্তব্য ফুটে
বাচ্ছি। তাই আমাদের প্রয়োজন এমন
সংগীতবেত্তা যিনি হবেন ব্রহ্মাও। এমনি
করে সংগীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন-
প্রদান সংহতিতে সহায়ক হবে। শুধুমাত্র
একটি ভাষার স্টিমরোগার কোনদিন সংহতি
আনবে না।

আবিষ্কারের ঝোঁক কমে আসলে,
চলছে অনুকরণের মাতামাতি। অল্প
অনুকরণে সংস্কৃতির খিলটি ভরে ওঠে না,
কেবল সম্ভাবনা থেকে যায় ফুটো হবার

ইচ্ছে থাকলে বেতাব কর্তৃপক্ষ এবং
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি
আধুনিক গানকে জাতে তুলতে পারেন
কৃতী গীতিকার সুবকার এবং পণ্ডিত
জনের সাহায্য দাবি করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কণ্ঠ গীতিনাটে
বিদেশী সুন্দরোপ করেছেন, তাছাড়া আবও
কিছু গানও রয়েছে যেখানে কখনো সুন্দর,
কখনো ছন্দ এবং ভাব বিদেশ থেকে
এসেছে। আব সে সব গান পরিবেশিত
হয়েছে সম্পূর্ণ নোতুনের অঙ্গে।
পরদেশী সংস্কৃতি মনীষার গুণে স্বদেশী
হতে পেরেছে।

তাই বলি, গ্রহণ করা অপরাধের নয়,
গ্রহণ তো করতে হয়। অন্যথায় সাংস্কৃতিক
শ্রীবৃদ্ধি হবে কেমন করে? গ্রহণের
সাধকতা নির্ভর কবছে যিনি গ্রহণ করড়ে
চলেছেন তাঁর জ্ঞান নিষ্ঠা এবং সততার
মান তিনি কোন স্কেলে বেধেছেন।

*

৬নং তারকনাথ মুখার্জি রোড,
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা ৩৫ থেকে
২৪।১০।৬৭ তারিখে প্রতাপচন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় লিখেছেনঃ “আকাশবাণী সম্পর্কে
একটি-দুটি বিষয়ের দিকে আপনাব মনো-
যোগ আকর্ষণ করছি। ১ম, গত শনিবার
(২১।১০।৬৭) সম্মার পব অজ্ঞাত হিন্দ
গভর্নমেন্ট স্থাপনের ব্যাপারে যে বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, তাতে
সবই ছিল, যথা, বড় ন্যাতাদের বস্তুতা,
গান, ব্যান্ডের দাপট, কিন্তু ছিল না, যা

পাদ্যাহিক বসুমতী

হয়ত সবারই ভাল লাগতো—নেতাজীর কণ্ঠস্বর। তাঁর বাণীর কোন record কি A. I. R-এর নেই?

২য়, গত রবিবার (২২-১০-৬৭) শিশু মহলে, একটি অভিনব জিনিষের আমদানি—রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন অধিনায়ক হে” জাতীয় সংগীতের হিন্দিতে প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ বাঙালী ছেলে-মেয়েরা এখন থেকেই বাংলা উচ্চারণ, স্বর, সুর সব ভুলে যাক, হিন্দি ভাষাতে নাচতে ফুঁদতে শিখুক। এইটাই ঐ অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। খুব সাধু আকাশিকা।

*

সগড়াই, বর্ধমান থেকে ২৬-১০-৬৭ তারিখে শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: “আমি নিচে একটু মন্তব্য পাঠাচ্ছি, যদি প্রকাশযোগ্য হয়, তবে আপনাদের আকাশবাণী পরিচরমায় প্রকাশ করবেন।

আমি পর পর কয়েক সপ্তাহেই অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে দেখছি যে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১১ ঘণ্টা ৬ মিনিট করে রবীন্দ্রসংগীত, ১০ ঘণ্টা ৫১ মিনিট করে আধুনিক, ১৭ ঘণ্টা ২৬ মিনিট করে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত ও ১০-০০ করে উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়। যদিও রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক শ্রোতার সংখ্যাই বেশি, তবুও এত অসাম্য কেন? তাই অনুরোধ করছি সব কয়টি (উপরোক্ত) অনুষ্ঠানই সপ্তাহে গড়ে ১০ ঘণ্টা ৬ মিনিট অর্থাৎ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট করে প্রচারিত হোক।”

*

৩২নং ডাক্তার লেন, কলকাতা-১৪ থেকে ২৬-১০-৬৭ তারিখে সুধীর বসু লিখেছেন: “গত ২১শে অক্টোবর শনিবার সকাল ৮টা, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট এবং রাতি সাড়ে আটটায় শ্রীবৃন্দদেব রাব ও সহ-শিল্পিবন্দ কতৃক পরিবেশিত পল্লীগীতির অনুষ্ঠানটি শুনে খুব ভাল লাগল। আজকের নকল পল্লীগীতিও ভিড়ে আসল ও অবিকৃত পল্লীগীতি শোনা খুবই ভাগ্যের কথা। খুব কম শিল্পীই আজকাল অবিকৃত পল্লীগীতি গেয়ে থাকেন। ২১শে অক্টোবর বৃন্দদেব রাব ও সহশিল্পিবন্দ কতৃক পরিবেশিত সকাল, বিকাল সব কয়টি অনুষ্ঠানেই পল্লীগীতির অবিকৃত রূপটি ধরা পড়ল। আকাশবাণীর মাধ্যমে এ ধরনের পল্লীগীতি আরও বেশি পরিবেশিত হোক, আমরা আকাশবাণী কতৃকগণকে অনুরোধ জানাই।”

*

কাশানগর, ২৪ পরগনা থেকে প্রভাস প্রামাণিক লিখেছেন: গত ৪টা আমিন সংখ্যায় মেঘদূতের প্রবন্ধের প্রতিবাদে

জনৈক ব্রহ্মাট, ড্রেনপাইপ, হিন্দি-প্রেমিকের (বাংলার বাইরে) প্রবন্ধটি পড়লাম। পড়ে অবশ্য বিস্ময় ও হতাশার গভীর অন্ধকাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলি নি—কারণ লেখক নিজেকে ব্রহ্মাট, ড্রেনপাইপ, হিন্দি-প্রেমিক বলেই পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং এই সব কিম্বদন্তি-কিমাণির কাছ হতে এব চেয়ে আর কি বেশি আশা করা যায়? কিন্তু তবুও জাতির বহুস্তব কল্যাণের দিকে চেয়ে আমি এই উদ্ভট ব্যক্তিগণ এবং নিলম্ব প্রবন্ধটির তীব্র প্রতিবাদ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

অবশ্য এ প্রতিবাদে মিস্টার ড্রেনপাইপ কর্ণপাত না করতে পারেন কারণ তিনি পুবেই, “আমাদের স্বভাব বদ কেন? তা আমরা জানি না। কেউ বলে দেবে কিংবা আমরা যে তার কথা শুনবই তার কোন মানে নেই” বলে “চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী” প্রবাদের সাথকত জানিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক তিনি শুনুন আর নাই শুনুন তাতে আমার বিলম্বিত মতাব্যথা নেই। আমার আবেদন গৃহ্য তাদির কাছে যারা নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে নিজের মায়ের মতন ভালবাসেন: তাঁরা যেন প্রেমিক মহাশয়ের প্রেমের অন্তর্ভুক্ত বিকৃত মিস্ত্রের চিন্তাপ্রসূত এই অহেতুক প্রলাপে না ভোলেন

একথা অবশ্য সত্য বাংলার তরুণ সমাজ যে দিন দিন মিস্টার ব্রহ্মাটের মত অধঃপাতের চরমসীমায় নেমে যাচ্ছেন তার প্রধান কারণ রাস্তা এবং সমাজ ব্যবস্থা এবং কিছুর অধঃপতিত পরিবারও। কিন্তু তাই বলে ব্রহ্মাট, ড্রেনপাইপ, হিন্দি-প্রেমিকের মত এসব বন্ধেও নিজের কার্যের পক্ষে নিলম্ব ওকালতী করা কি ভীরুতার নামান্তর নয়?

হিন্দি প্রেমিক মশাই লিখেছেন, “বাংলা ছায়াছবি সব কিছুরই আমাদের বাড়ির সব কিছুর মত মিথিবে গেছে বলে মনে হয়। আমরা চাই সজীবতা যা হিন্দি-ইংবাজী ছবিতে আছে।” তিনি সজীবতা বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছেন? নাইটক্লাবের নশনচিহ্ন, হিন্দিছবির তরল উত্তেজনা-অবাস্তব রোমান্স, এইগুলিই কি জীবনের সজীবতা? আর পথের পাঁচালী, চারুলতা, নাথক, অতিথি, সুবর্ণরেখা, ছুটির মত ছবির মাঝে জীবনের যে সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিফলন পাওয়া যায় তা কি সজীব নয়? সত্যি! একেই না বলে যুঁটি!

এর পরেই তিনি আবার লিখেছেন, “বৌনতা বলতে আপনাবা কি বোঝান আমরা জানি না। তবে একটা জিনিস জানি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ লাফালাফি করে মেয়েদের দেখলে।” জঘন্যতম নিলম্ব মিথ্যা ওকালতী। পড়লে গা-টা

বেন ঢুগায় ঘিন ঘিন করতে থাকে। যে কল্যাণারদের জন্য ভদ্রমহিলারা রাস্তায় চলতেই পারেন না—যাদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মা-বোন ছাড়া অন্য ভদ্রমহিলারা ঘৃণায় নিজেকে তফাতে রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট, প্রকাশ্য রাস্তায় যাদের লজ্জা-হীনতার প্রতিবাদের জন্য বহু সময় অনেক বয়স্ক ভদ্রলোককেও লজ্জিত হতে হয় তাঁদেরই একজন মুখপাত্র বলছেন কিনা “একটু লাফালাফি হবে।” সত্যি, মুখের কথাটা যদি দয়া করে কাছে দেখান ভদ্রমহিলারা একটু হাসি ছেড়ে বাচেন।

তারপর এই বিকৃত মিস্ত্রের আরো প্রলাপ, “সব ভাষার গান বিবিধভারতীতে প্রচার করা হয়।” একি জেগে ঘুমানো? না অন্য কিছুর? না সত্যি-সত্যিই পাগলের প্রলাপ?

এর পরের উক্তি, “বিচক্ষণতার সহিত কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি প্রচাৰ করে যাচ্ছেন আর আপনাবা সরকার বিবোধী ধূষো তুলে বাধা দিচ্ছেন। এটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি?” সত্যি কেন্দ্রীয় সরকারের অপূর্ব বিচক্ষণতা! একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্বল ভাষাকে অনিচ্ছুক সংখ্যাগরিষ্ঠের কাঁখে চাপাবার জন্যে কৌশলে বৌনাত্মক ছবি, জলো গান প্রচার করে দেশকে দিনে দিনে ধ্বংসের পথে পাঠিয়ে দেওয়া অন্য সমৃদ্ধ ভাষার অগ্রগতিকে সুকৌশলে ব্যাহত করা, কি সুন্দর বিচক্ষণতার পরিচয়! তিনি মনে হয় তাঁর ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করার জন্য এইরূপ “তেলা মাখার তেল দেওয়ার” মত কথা বলেছেন!

মেঘদূতের ভাষাতেই বলি, “মহৎ কিছুর জোরজবরদস্তির স্বারা কি গ্রহণ করানো সম্ভব?” অথচ সেই অগণতান্ত্রিক জোরজবরদস্তির ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করতে গেলে হিন্দি প্রেমিকের ভাষায় তা হয়ে দাঁড়ায়, “সরকার বিরোধী ধূষো। আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।”

সত্যি, “তুমি মহাবাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।”

সব শেষে একটা কথা বলে আমার প্রবন্ধের শেষ করতে চাই, মেঘদূত তো কেবলই দুই বাংলার চিত্র দেখাতে গিয়ে বাংলা দেশেরই ড্রেনপাইপ, ব্রহ্মাট, হিন্দি-প্রেমিকদের কথা বলেছেন। তবে নয়! দিল্লীর এই বাঙালী হিন্দিপ্রেমিকটি এখ খেপলেন কেন? নয়াদিল্লীতে থেকে এ সামান্য বকুনির পরিবর্তে যে পরিবার সং সাজা যায় সেখানে তিনি তো অবশ্য একটা হিন্দিপ্রেমিক এবং সং-ই হবেন বাবা-কাকারা তবু রচিতসম্মত ও জাতীয় পোষাক পরে বকুনি খেতেন। কিন্তু তাঁরা.....?

বুজুয়া

বিদেশী ছবির নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন

আমরা সব সময় শুনে আসছি বিদেশী ছবির অসংযম প্রদর্শনের কথা। বাইরে এখন নিষ্পত্তি দেবার ব্যবস্থা করা ওঠে তখন ঘাটতিতে মোহাই দেওয়া হয়। কিন্তু বিদেশী ছবির আমদানীর সময় এই ঘাটতির মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ভারতে বছরে প্রায় পাঁচ শত মত বিদেশী ছবি আমদানী হয়। বিদেশী ছবি দেখার লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশীরা অর্জন করে। এই টাকা বিদেশী মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের বিদেশী মূল্যের ঘাটতিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এ সময় কিছু ভারত সরকার উৎসাহ করেন না, বরঞ্চ সংস্কৃতি অনুরাগী হয়ে এমন ডাব দেখান যেন সাংস্কৃতিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির জন্য বিদেশী ছবিগুলি অপরিহার্য।

আমাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি ও চিত্রবিনোদনের জন্য যে বিদেশী ছবিগুলি দেখান হয় সেগুলি কি ধরনের ছবি সে কথা মন্ত্রীমহোদয়ের দায়িত্ব। অর্থ-সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, অপরাধ এবং সেন্স সম্পর্কিত ছবিগুলিই দেখান হয়। তার মধ্যে যোগ্য হয়েছিল নাইট ক্লাবের ছবি; যা দর্শকচিহ্নকে হীনতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অনেক সমালোচনা ও বিক্ষোভের পরে সেই ছবিগুলি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তার জায়গায় গ্রহণ করেছে স্পাই-সেক্স ছবি। উদ্ভট অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে নারীদেহের প্রদর্শনী ও যৌন প্ররোচনামূলক ছবি সম্প্রতি দেখান হচ্ছে। বিদেশী মূল্য বন্ধ করে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কি অপূর্ণ চেষ্টা। এই ছবিগুলি সাংস্কৃতিক উন্নতি দূরের কথা মানুষকে অবনতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এই ছবিগুলি প্রদর্শন করা হয় ভারতের মত দেশ, এশিয়া আফ্রিকার পশ্চাদবর্তী দেশগুলিতে দেখাবার জন্য। এ সব ছবির পেছনে ব্যবসায়িক ছাড়াও এক জঘন্য মতনব রয়েছে। এ সব ছবি দেখিয়ে দেশের জনচিত্তকে কলুষিত করা এবং বিভ্রান্ত করা ওদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের নিরপেক্ষ সরকারের এমনিই উদারতা যে তারা বিদেশী-মূল্যের সর্বনাশ করে, জনচিত্তকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ সমাজতান্ত্রী দেশের ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

স্বাভাবিক চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষ থেকে বহুবার আবেদন করা হয়েছে বিদেশী ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। তারা ভারতে এমন বহু সিনেমা হাউস রয়েছে যেখানে ভারতীয় ছবি দেখান হয় না। যেমন কলকাতার মেট্রো, এমিটি, লাইট হাউস, গ্লোব, টাইগার প্রভৃতি হাউসে। অথচ প্রেক্ষাগৃহের অভাবে দেশী ছবি মুক্তিলাভ করতে পারে না। ভারতীয় ছবিকে কোর্টানো করে ভারতীয় বিদেশী মূল্যের সর্বনাশ করে বিদেশী ছবির প্রতি এই প্রীতি কেউ ভাল কোথেকে দেখে না। কিন্তু সরকারী আয়না-দেয় খেলাল-খালিতে এ রকমই ঘটছে।

বিদেশী ছবি যদি দেখাতেই হয়, এবং কিছু সংখ্যক বিদেশী ছবি দেখানো উচিত। তা এমন ছবি আসা উচিত যা ভাল ছবির পর্যায়ে গণ্য হয়। হালিউডের যৌন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ছবি ছাড়াও এমন ছবি বিদেশে তৈরি হয় যা বাস্তবিকই দেখা উচিত। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানি, সুইডেন, ইতালী ও ব্রুজেনে অনেক ভাল ছবি তৈরি হয়, যা এ দেশে কেবলমাত্র কিছু সোসাইটি সদস্যরা দেখতে পারেন। বিদেশী মূল্য যদি বন্ধ হবে তবে এই ধরনের ছবি আমদানী হয় না কেন?

বিদেশী ছবির ব্যাপারে আমেরিকার একচেটিয়া ব্যবসা চলছে ভারতে। পাঁচ শ'র মধ্যে মাত্র তিন শ' মত আমেরিকান ছবি প্রদর্শিত হয়। সব ব্যাপারে যেমন ছবির ব্যাপারেও আমেরিকার সরকারের আমেরিকা-প্রীতি একটু বেশি। অবশ্য সেন্সর বোর্ড নামক একটা সরকারী সংস্থার দায়িত্ব এ ব্যাপারে কম নয়। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। ছবির আমদানী মর্মেতির ব্যাপারেই অগাধত আয়ত্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

গতবার আমি লিখেছিলাম প্রত্যেক অঞ্চলে আঞ্চলিক ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হোক। সেই সঙ্গে বিদেশী ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেওয়া এবং প্রত্যেক সিনেমায় ভারতীয় ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হোক। দেশ স্বাধীন হবার পরও বিদেশী ছবির দাপটে ভারতীয় ছবির দাবি থাকবে—তা অসম্ভব। —সুজ

সাংবাদিক সম্মেলন

গান্ধী ৪ঠা নভেম্বর ফরাসী দূত-বাসের সাংস্কৃতিক দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক লুই মালো দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। ফরাসী চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের জবাব তিনি দেন। নিজের ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'লে ফো ফোলে' শীর্ষক ছবি এবং নৈরাসের মেজাজে গড়া। তবে এর মধ্য থেকে দর্শকরা বেছে নেবেন বাঁচার দিকটা। ছবিটি পটভূমির বাইরে তোলা।

ফরাসী ছবি দেখার জন্য দর্শকদের আগ্রহ দেখে তিনি বিস্মিত। কলকাতার দশ হাজার কিম্বা সোসাইটি সদস্য আছেন এই সংবাদও তাঁকে বিস্মিত করেছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'কমা-শিরালা প্রদর্শনীর জন্য তিনি ছবি করছেন। তাঁর ছবি আর্ট থিয়েটারগুলিতেই দেখান হয়েছে। ফরাসী দেশে কমার্শিয়াল ছবির এবং আর্ট ছবির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলী আছে। কমার্শিয়াল ছবিগুলি এককভাবে চলে, আর্ট ছবি বা মন-কমাশিরালা ছবিগুলি আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে চলে। ফরাসী সরকার আর্ট থিয়েটারগুলির টাকার কিছুটা কীভাবে দিয়েছে এবং অন্যভাবে সাহায্য করে।

সত্যজিৎ রায়ের পাথের পাঁচালী তিনি দেখেছেন এবং দেখে তিনি মুগ্ধ। ফরাসী দেশে ভারতীয় ছবি সাধারণত দেখার সুযোগ নেই। একমাত্র ফিল্মফেয়ার ও আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে যোগ্য ছবিগুলি দেখান যেতে পারে।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

গাট দশকের আটজন পরিচালক

গত ৩রা নভেম্বর ন্যাশনাল সিনেমার ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ এবং ফরাসী দূতাবাসের যুগ্ম উদ্যোগে ভারতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতার পর বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব হবে। এই উৎসব উপলক্ষে ফ্রান্স থেকে পরিচালক লুই মালোর নেতৃত্বে তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন দিনে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোর অঙ্কিত চিত্র, ভাস্কর্য ও কারুকার্যের প্রামাণিক ছবি, এবং লুই আলো পরিচালিত 'লে ফো ফোলে' নামক পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখান হয়।

এই উৎসবে আটটি পূর্ণাঙ্গ ও আটটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শন করা হবে। এই আটটি মধ্য রয়েছে 'লে ফো ফোলে', অ আজার বালখাজার, লে মপির, পিয়ের



ফরানী ছবি 'লা গয়েরে রেং ফিনি'-তে ইনাগ্রিড বালিন

লা ফু, লা পো দূসে, লা গয়েরে রেং ফিনি, লা ভি দ্য সাতো, আঁ আসে এং উনে ফিমে। এই ছবিগুলির যথাক্রমে পরিচালকদের মধ্যে লুই মালে পঁচিশ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে প্রথম ছবি নির্মাণ করেন। তিনি পেশাদার ফিল্ম নির্মাতা এবং কলা-কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ছবিগুলি প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু, মেজাজ এবং টেকনিকের দিক থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণত অপ্রচলিত বিষয়বস্তুর ওপর ছবি করার দিকে তাঁর ঝোঁক। বর্তমানে তিনি ফ্রান্সে প্রতিশ্রুতিবান পরিচালকদের অন্যতম।

রবার্ট ব্রেসন তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের জন্য স্বীকৃত। তিনি পুরাতন চিন্তাধারার লোক বলে পরিচিত। এ পর্বন্ত তিনি ছয়টি ছবি করেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি স্টাডিও সেট অপেক্ষা বাহ্যিক অর্থায়ন ঘটানোয় গিয়ে ছবি করা বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং স্টাইলের ওপর বেশি জোর দেন। নিজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপোষ করে তিনি ছবি করেন না, একারণে তাঁকে দীর্ঘদিন ছবি না করে বসে থাকতে হয়।

পায়েরে এতাল ব্রেসন এবং তাঁটির মধ্যে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রথম জীবনে তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিল্ম কমেডিয়ান অথবা ক্রাউন হওয়ার। তিনি সার্কাস, মিউজিক হল এবং টোল-চিশনে কাজ করেছেন ছবিতে অভিনয়ও

করেছেন। নিজের ছবি লে সপিরী-তে তিনি প্রধান অভিনেতা।

জাঁ-লুদ গডার্ড নবীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের-মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

তিনি এ পর্বন্ত নয়টি পূর্ণাঙ্গ ছবি করেছেন। পাঁচটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবিও করেছেন। ব্যক্তিজীবনের জটিলতা এই ছবিগুলিতে প্রতিকলিত; এই রূপায়ণের মধ্যে গডার্ডের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। গডার্ড যদিও ধারাবাহিকরূপে ছবির চিত্রগ্রহণ করেন কিন্তু সব সময় স্ক্রিপ্টের ওপর নির্ভর করেন না, চিত্রগ্রহণের সময় স্ক্রিপ্ট বাড়ান-কমান এবং সে সময় সংলাপ রচনা করেন। সে সময় নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেন।

ফ্রান্সইসে ক্রফোঁ নিউ ওয়েভ চিন্তা-ধারার অন্যতম পুরোধা। তাঁর প্রথম ছবি ১৯৫৭ সালে প্রদর্শিত হয়। ক্রফোঁ ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শিল্পী গ্রহণ পর্বন্ত নিজের পছন্দমত করে থাকেন। ছবিতে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও স্টাইল প্রতিকলিত। তাঁর ছবিতে যদিও কাহিনীর বড় ভূমিকা থাকে, কিন্তু সময় মত কমেণ্টারি ব্যবহৃত হয়—সংযোগ হিসাবে।

আলা রেসনে একালে ফ্রান্সের একজন বিশেষ দক্ষ পরিচালক বলে গণ্য। তিনি দলিল চিত্রজগৎ থেকে কাহিনী-চিত্রের জগতে এসেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ফিল্ম এডিটর এবং ১৬ মিঃ মিঃ ফিল্ম নির্মাতা হিসাবে তিনি ছবির জগতে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি হিরোসিমা মন আমোর



'মিলান কী রাত' ছবিতে শর্মিষ্ঠা ঠাকুর ও অরুণ

(১৯৫৮)। এই ছবিতেই তাঁর নামডাক হয় বেশি। তার পরে তিনি আরো দুটি ছবি করেছেন। সব ছবিতেই স্ক্রিপ্ট রচনার ব্যাপারে তিনি ঔপন্যাসিকের সাহায্য নিয়েছেন।

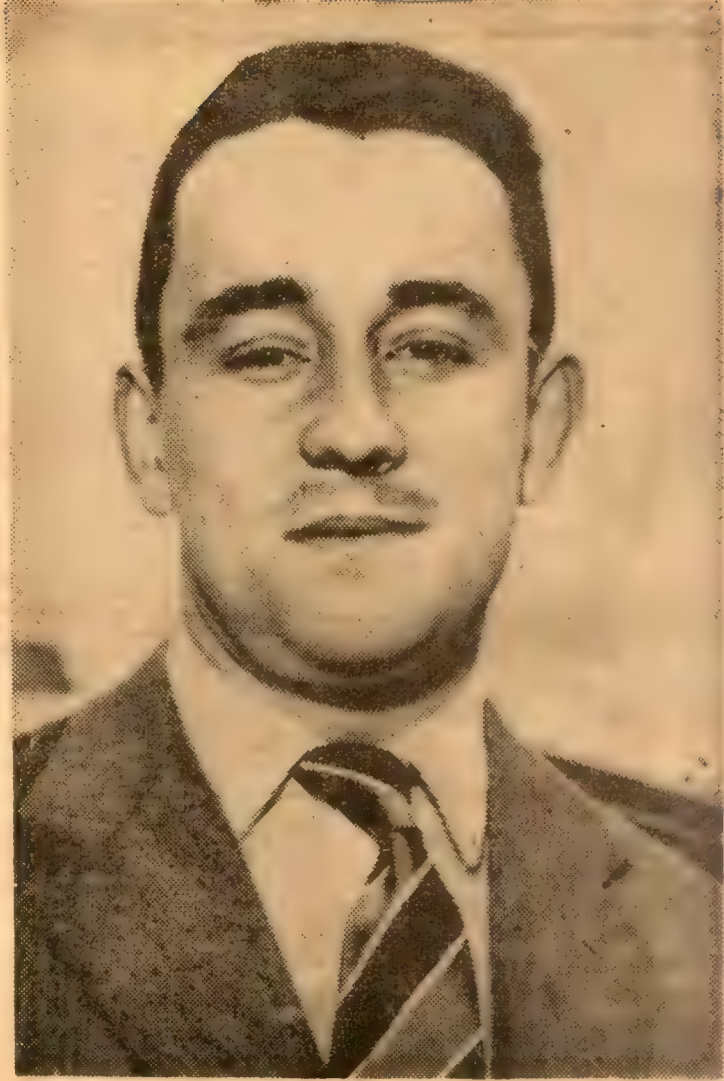
জাঁ-পল রাপেস্কে স্ক্রিপ্ট লেখক হিসেবে প্রথমে নাম করেন। লুই মালের সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। নিজের ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন : '১৯৪৪ সালে যখন আমার বয়স মাত্র বার তখন আমি গ্রামে নিকটবর্তী বনাঞ্চলে থাকতাম। আমার ছবিতে যে যুদ্ধের দৃশ্য তা একটি ছেলের চোখ দিয়ে দেখা যুদ্ধ।'

কুডে সেলুচের প্রথম ছবি ১৯৬১ সালে মুক্তিলাভ করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। প্রথম ছবিতেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে জানালেন প্রত্যেকেরই জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে।

এই আটজন পরিচালকের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ষাট দশকের ফরাসী ছবির অবস্থা, এবং ফরাসীদের জীবনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য বেশির ভাগ নগর-জীবন নিয়েই এই ছবিগুলির কাজ হয়েছে।

নজরুল সংখ্যা

গত ২৯শে অক্টোবর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গৃহে নজরুল সংখ্যার অধিবেশন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গের নজরুল একাডেমি। প্রতি মাসের শেষ শনিবার অথবা রবিবারে নজরুল একাডেমির উদ্যোগে নজরুল সংখ্যা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অসংখ্য কবিকে গান শোনাতে।



ফরাসী চিত্র পরিচালক লুই মালে



ফরাসী ছবি 'লে ফো ফোলে' ছবির একটি দৃশ্যে লেনা কার্লা ও মারিস রোনে

এবারের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন : শ্রীমতী সন্নিধ্যা ঘোষ শ্রীমতী অনুরাধা মৃধাজী এবং শ্রীপ্রভাত মৃধাজী। কবিতা আবৃত্তি করে শ্রীমান কল্যাণ ব্যানার্জী। তবলা সঙ্গত করেন শ্রীমদুরারি দে। দৃষ্টিহীন এই তবলাবাদক অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলেন তাঁর সুসংযত সঙ্গতে। প্রভাত মৃধাজী এবং সন্নিধ্যা ঘোষের গানে প্রোত্তারা পরম আনন্দলাভ করেন।

সুডিও থার

জান্নিৎগের কাহিনী ছবির শ্রুতাক্ষ

শুক্রবার ১০ই নভেম্বর রাধা ফিল্ম



‘বহু বেগম’ ছবিতে জেব রহমান, প্রদীপকুমার ও মীনাকুমারী

স্টুডিওতে ‘অগ্নিবাহুর কাহিনী’ ছবির শুভারম্ভ ও চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে। নিউ ওরা পিকচার্স পতাকাতলে ছবিটি প্রযোজনা করছেন মল্লিকী বসু ও ধীরা মল্লিকপাখ্যায়। লোকসভার সদস্য বীরেন রায় এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন লক্ষ্মপ্রতিভা সাহিত্যিক বিপ্লবপালক বসু। ছবিটি পরিচালনা করছেন ‘বহু’ ও ‘মহাতীর্থ কালীঘাট’ খ্যাত পরিচালক ভূপেন রায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত মহাপুরুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের জীবন নিয়ে তৈরি এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে রূপারোপ করেছেন : মাধবী মল্লিকপাখ্যায়, বিকাশ দাস, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, মিলিপি রায় ও সুলতা চৌধুরী।

দার্জিলিং-এ ‘অম্বিতীয়া’ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ

সংগীতবহুল ছবি ‘অম্বিতীয়া’-র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ছবির পরিচালক মনোদ্য চট্টোপাধ্যায় শিল্পী ও কন্ঠকগুলীদের নিয়ে বিমানযোগে দার্জিলিং রওনা হচ্ছেন ১০ই নভেম্বর।

ত্রিচট্টোপাধ্যায় এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। পরিচালনা ইনিই করছেন। দার্জিলিং-এ ছবির দৃষ্টি গান চিত্রায়িত করা হবে। গান দুটি

গোরেছেন হেমন্ত মল্লিকপাখ্যায় ও লতা মল্লিকশঙ্কর। মাধবী মল্লিকপাখ্যায়, সর্বেশ্বর গীতা দে ও শর্মিতা সেন দার্জিলিং যাচ্ছেন।

এ আর সি প্রোডাকসনের পতাকা-তলে ছবিটি প্রযোজনা করছেন অরুণ রায়চৌধুরী। ভূমিকালিপিতে আছেন : মাধবী মল্লিকপাখ্যায়, সর্বেশ্বর, লিলি



মাধবী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ বর্ষ’ মত্যানাট্যের একটি দৃশ্য



মুক্কাভিনেতা যোগেশ দত্ত বোম্বেতে প্রশংসা অর্জন করেছেন

অম্বাদকতা

ইয়াদেবের সম্মান লাভ

পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে ভারতের 'ইয়াদেব'। 'ইয়াদেব' পরিচালক অভিনেতা সুনীল দত্ত। এই উৎসবে এশিয়ার পনেরটি দেশ যোগদান করে। ২০টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র ও ২২টি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়। ভারত থেকে পাঁচটি কাহিনী-চিত্র ও চারটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি পাঠানো হয়েছিল।

খিরগিজিস্তান এবং উজবেকিস্তানের দুটি ছবি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

ভেনিস উৎসব

এবার ভেনিস উৎসবে ভারতের 'আখরী খত' ছবিটি পাঠান হয়েছিল, কিন্তু উৎসব কর্তৃপক্ষ ছবিটি বাদ দিয়েছে। বার্লিন উৎসবেও নাকি এই ছবিটি স্থান পায় নি।

চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ডেইজী ইরানী (বোম্বে), দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, প্রেমাংশু বসু, গীতা দে ও শর্মিতা সেন।

সংগীতে সহযোগিতা করেন প্রীনারেন ঘোষ।

শ্রীমানবেন্দ্র মৃধোপাধ্যায়ের বাংলা সংগীত পরিবেশনের ধারা দেখে সমস্ত দর্শক মুগ্ধ হন।

বোম্বে. সফরান্তে বংগের দুই শিল্পী

প্রখ্যাত মুক্কাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত এবং সংগীতশিল্পী শ্রীমানবেন্দ্র মৃধোপাধ্যায় বোম্বের অধিবাসীদের নিকট হতে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

শ্রীদত্তের প্রত্যেকটি মুক্কাভিনয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে 'চোর', 'চল', 'বাস প্যাসেঞ্জার' এবং 'জন্ম থেকে মৃত্যু' এই কটি শিল্পকর্মে প্রশংসা লাভ করে। প্রত্যেকটি ঘটনাই যেন দর্শকদের কাছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুক্কাভিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত বলেন, মহারাষ্ট্রের "অজন্তা" ও "ইলোরা" দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভারতের এইসব শিল্পকলা থেকেই মুক্কাভিনয়ের আদি ভাব ও ভঙ্গিমার সীট। মুক্কাভিনয় অনুষ্ঠানে আবহ-

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীবনগর - গোহাটী

পূজো সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “নির্জন শিখর”
উপন্যাসটি পড়ে খুবই ভালো লাগলো।
এক কথায় বলা যায়, পড়ে মগ্ন হইলাম।
মনে হয়েছে যেন দেবনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে
সঙ্গে আমরাও উঠে যাচ্ছি নির্জন
শিখরে।

নারায়ণবাবু সাহিত্যজগতে সুপ্রতি-
ষ্ঠিত। তাঁর রচিত “সন্ন্যাস ও শ্রেষ্ঠা”
ফলতে গুলে বাংলা সাহিত্যে একটা ল্যান্ড-
মার্ক। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু
বলা শ্রুততাম্য। তবুও ভালো লাগলে
মুহুর্তকণ্টে স্বীকার করার অধিকার সব
পাঠকেরই আছে এবং আশা করি কল্পের
এই শ্রদ্ধাঞ্জলি উনি হৃদয়চিহ্নেই গ্রহণ
করবেন।

সকলের চেয়ে ভালো লাগলো তাঁর
সং সাহিত্য সৃষ্টির অপূর্ব প্রয়াস।
র্তমানের বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ ধারা চলছে।
কোনরকমে সেই ধারার সঙ্গে মিল রেখে
যেন তেন প্রকারে জোর করে যৌন চেতনার
মূলে আঘাত দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলাই
স্থিরবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেক
রচনা ইদানীংকালে চোখে পড়েছে বেগুনো
ছলে-মেয়েদের হাতে পড়বার ভয়ে
কেনামাঠই শিশি-বোতলগুলোকে বিক্রি করে
দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে নারায়ণ-
বাবুর উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটা



অমূল্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে প্রাচী-
ইচ্ছে করলে সং অশচ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য
সৃষ্টি করতে পারেন।

উপন্যাসটি আকারে খুব বড় নয়।
একই জিনিস অহেতুক বারবার ফেনানোর
কোন চেষ্টাই নেই এতে। যা আছে সবই
পড়তে ভালো লাগে। কোন ক্ষণসাই
পড়ার সময় বিরতি উপস্থাপন করে না।
চরিত্র সংখ্যাও খুব বেশি নেই উপন্যাস-
টিতে। স্বাী চরিত্র দুটি। মাধুরী
এসেছে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। বিদ্যুৎ
বিদ্যুতের চমক নিয়ে এসেছে একেবারে
শেষের দিকে এবং আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে
দিয়ে সরে গেছে। মাধুরী লেখকের এক
অপূর্ব সৃষ্টি। ধনীকন্যা মাধুরী এবং
বারানীর মা মাধুরী দুটোই আমাদের
আকৃষ্ট করে। মাধুরীকে নিয়ে দেবনাথের
অন্তর্লব্ধ অনবদ্য। কোন খবর না দিয়ে
দেবনাথের কলকাতার বাসায় আসার
ক্ষণটি চরম নাটকীয়তার মূর্ত হয়ে
উঠেছে।

সিদ্ধার্থ নিজের নামের তাৎপর্য বহন
করে একটা অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছে।
বারানী একটা কালকে পুরোপুরি ধরে
রেখেছে। দেবনাথের সম্বন্ধে অল্প কথায়
কিছু বলা কঠিন। লেখকের অপূর্ব শক্তি-
শালী লেখনীর স্পর্শ পেয়ে লগ্ননিক
দেবনাথ যেন আমাদের চোখের সামনে
ঘোরাফেরা করে। দেবনাথের ঘটনাবহুল
জীবন আমরা চোখে দেখি সঙ্গে সঙ্গে
অনুভব করি একেবারে হৃদয়ের মর্মস্থলে।
নির্জন শিখরে যাবার অধিকার বোধ হয়
একমাত্র দেবনাথের মত মানুষেরই থাকে।
কালের কোলাহলে তারা যেন বেমানান।
হেড মাস্টার মশায়ের চরিত্রটিও মনে
রাখার মত।

উপন্যাসের নামটিও সার্থক। রবীন্দ্র-
নাথের কবিতার লাইন গাল্টে অন্য লাইন
বসানোর কথা যেমন চিন্তা করা যায় না
তেমনি এ উপন্যাসের অন্য নাম চিন্তা
করাও কঠিন।

এই উপন্যাসটিকে সার্থকসৃষ্টি
উপন্যাসের প্রতীকরূপে সামনে রাখলে
মনে হয় ইদানীংকালের লেখকরা সং এবং
সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন।
যদিও এই সম্বন্ধে এখন একমাত্র
সাহিত্য সৃষ্টি করে নারায়ণবাবু, বর্ত-

মানের লেখক সম্প্রদায়ের তথা বাংলা
সাহিত্যের প্রভূত উপকার করেছেন।

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়,
৮১১, অম্বিকা ঘোষাল লেন, শিবপুর
(হাওড়া)।

আমি ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ পত্রিকার
একজন নিয়মিত পাঠক। গত ৮ই কার্তিক-
এর পত্রিকায় ‘সংগীত কথা’ বিভাগে
উত্তর বাংলার ‘মেয়েলী গান’ প্রসঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণদেব রায় যে তথ্য বিকৃতি
ঘটিয়েছেন তা পাঠক-পাঠিকাদের নজরে
আনছি সন্নিবেশে।

কতকগুলি সংগীত-এর উদ্ভূতির
মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করেছেন—“এই
মেয়েলী গানগুলির স্রষ্টারাই বাংলার
সরসী হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা।” গান-
গুলির ‘রচনাকৌশল’-ই মাকি লেখককে
একথা মনে করতে প্ররোচিত করেছে।
কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্মার্থ্যতা সন্দেহ-
জনক। মেয়েলী-এই প্রমাণ করে না যে তা
মেয়েদের স্বারা রচিত। লেখকের উদ্ভূত
সংগীত ‘পোড়ারমুখী কলংকিনী রাই লো’
সংগীতটিই আমার বস্তুরের সমর্থনে
উপস্থাপিত করছি। লেখক কৌশলে
অথবা অজ্ঞানভাবে গানটির ভূমিতা
দেন নি। গানটির ভূমিতা দিয়েই প্রমাণ
করিছি যে, উটি পূর্ববঙ্গের রচনা। ভূমিতার
আছে :—

আঁকা বাঁকা অংগক্ষমা

ভংগী দেখে মন ছোঁয় না

দাস পীতাম্বর সেই সাধন

করছে সদাই গো

‘পোড়ারমুখী কলংকিনী রাই গো’

—তপন মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

*

আমি ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র
গ্রাহিকা ও ভক্ত পাঠিকা। আপনাদের
মতামতকে পরম শ্রদ্ধা করি। বিশেষতঃ
২৬-১০-৬৭ (৮ই কার্তিক, ১৩৭৪) ১১শ
সংখ্যায় প্রকাশিত ‘চন্দ্রপুস্তক’ ‘অবস্ফা’
প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ
ধন্যবাদ জানাইতেছি। সুপ্রভূত অভিনন্দন।

যত জোরের সঙ্গে কুৎসিত সাহিত্য
প্রচার করা হইতেছে ও তরলমতি অপরিণত-
বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মনে কলুষিত ভাব-
প্রবাহ সঞ্চারিত করা হইতেছে, তাহাতে
জাতির ও দেশের সর্বনাশ সূনিশ্চিত।
কর্তার হস্তে আপনারা ইহার প্রতিবন্ধন
করুন—এই প্রার্থনা।

—শ্রীমতীবালা বোধজায়া

১. হৃদয় সরকার লেন, বর্ধমান।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	ট. প.
বার্ষিক চাঁদা (সডাক)	১৪.০০
মা-মাসিক " "	৭.০০
ত্রিমাসিক " "	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না।
গ্রাহক হতে হলে আপিসে আগ্রিম টাকা
জমা দিতে অথবা গ্রানিঅর্ডারে পরামতে
হবে।

—কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

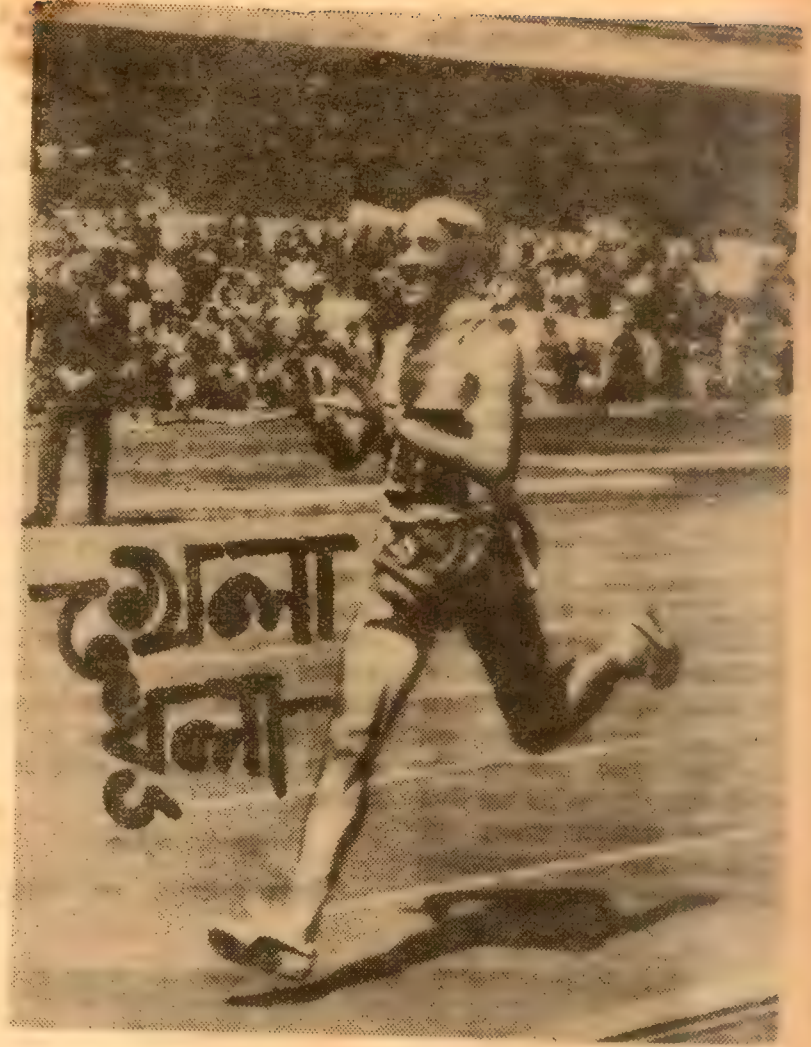
লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে
যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা
সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন।
লেখা মনোনীত হলে পর লে-সংবাদ
আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম
টিকানাসহ ডাকটিকিটসহ খাম থাকলে
একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠানোর
সুযোগ করা হয়। করিতা ফেরৎ পাঠানো
সম্ভব নয়। —কর্মসূচক

দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফি বিজয়ী

দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলা পতোদির ম্যাচ বললে কিন্তু খুব বেশি বলা হবে না। পরাজয়ের মদ্য থেকে জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছেন দলকে, নিজে করেছেন একটি চিত্তাকর্ষক ডাবল সেঞ্চুরী এমন কি জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হিটও করেছেন স্বয়ং তিনি। এর পরও কি তাঁকে এই খেলার নায়ক না বলে পারা যায়।

একমাত্র এই দলীপ ট্রফির খেলাতেই পশ্চিমাঞ্চলের একচ্ছত্র প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করতে পেরেছে দক্ষিণাঞ্চল। এবার নিয়ে উপধূ-পরি তৃতীয়বার দলীপ ট্রফি বিজয়ী হল জয়সীমার নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চল। সম্মান এবার কিন্তু ফস্কে গিয়েছিল বলে আর কি! পতোদি শক্ত হাতে হাল না ধরলে দলীপ ট্রফি এবার পশ্চিমাঞ্চলের ঘরে গিয়েই উঠত। অবশ্য পতোদিকে সাহায্য করেছেন আবিদ আলি, সুরক্ষানিয়ম এবং জয়সীমা। চান্দু বোরদের ব্যর্থতা খেলার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইংল্ড সফরে ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান চান্দু বোরদের শোচনীয় ব্যর্থতায় ভারতের পরাজয়ের পথ অমরও প্রশস্ত হয়েছিল। আশা ছিল আগামী অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সফরের পূর্বে হয়ত তিনি তাঁর পুরাতন খেলা ফিরে পাবেন। অন্যদিকে প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক নরি কণ্ড্রাক্টরের সেঞ্চুরীও উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কণ্ড্রাক্টর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেঞ্চুরী করেছেন। বর্তমানে ভারতীয় টেস্ট দলে ওপনিং ব্যাটসম্যান সমস্যা শেষে মদ্যে কি কণ্ড্রাক্টর এই স্থানের দাবিদার হবেন? অবশ্য সবই নির্ভর করছে আমাদের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের মজির ওপর। মাদ্রাজের উইকেট রক্ষক ওপনিং ব্যাটসম্যান রাজাগোপালকে পুন্যর ট্রায়ালে আহ্বান জানান হয়েছে। এ বছর রাজাগোপাল ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে বেশ সাফল্য প্রদর্শন করেছেন এবং দলীপ ট্রফির পূর্ব-বর্তী খেলার মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে তিনি ভালই খেলেছেন। কিন্তু ফাইন্যাল খেলায় ব্যর্থতা তাঁর টেস্ট দলে আসার সম্ভাবনাকে অনেকটা ফিকে করে দিল।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলায় প্রথম ব্যাট করতে মাঠে নামে পশ্চিমাঞ্চল দল। খেলার প্রথম দিনের শেষে পশ্চিমাঞ্চলের মনে আশার আলো: তিন উইকেটে ৩০৪ রান। দুটো সেঞ্চুরী নরি কণ্ড্রাক্টরের অপরাধিত ১০৯ এবং অজিত ওসাদেকারের ১১৬ রান। এ ছাড়া সরদেশাই বোগ করেন ৫৫ রান, কিন্তু বোরদে এসেই শূন্য হাতে ফিরে যান। দ্বিতীয় দিন ১৩০ রান রান আউট হলেন নরি আর নাদকানী করলেন ৮০ রান; শেষ পর্যন্ত ৪২০ রানে ইনিংস শেষ হল। চন্দ্রশেখর নিলেন চারটি



নরি কন্ড্রাক্টর লিটল অলিম্পিকে একটি দৌড়ের শেষ সীমার দৃশ্য

উইকেট এবং ভেঙ্কটরাঘবন এবং প্রসন্ন দুটো করে উইকেট।

দক্ষিণাঞ্চলের সদরুতেই প্রাথমিক বিপর্যয়; দিনের শেষে ৮১ রানে তিন উইকেট। কিন্তু মদ্যরক্ষা করতে হাল

পতোদি সেঞ্চুরী করলেন তার পর শেষে ১২৫ রানে অপরাধিত জয়সীমা সঙ্গে সুরক্ষানিয়মও ৫২ রানে রান নট আউট। বোর্ডে দক্ষিণাঞ্চলের রান সংখ্যা ৪ উইকেটে ২৭৭ রান।

চতুর্থ ও শেষ দিন দক্ষিণাঞ্চল কণ্ড্রাক্টর নামল হাতে দুটি উইকেট হারিয়ে রান প্রয়োজন মাত্র ১৪৭ রান। কিন্তু পতোদি তখন টাইগার হয়ে ওঠেন। ৮৪ রান করে আউট হলেন, পতোদি আলি এসেও কড়া হাতে রান টেনে লাগলেন। কিন্তু টিক জয়ের জন্য রান মাত্র পাঁচ রানের প্রয়োজন আবিদ আলি প্যাডেলিয়ানে ফিরলেন গুলান্দা ৫৭ রান দলকে দিলে। এলেন ভেঙ্কটরাঘবন রান দিতে: ইতাবসরে পতোদি রান করে বলে স্কোরার কাটে বাউন্ডারি মনে দলকে জিতিয়ে দিলেন, মানে দক্ষিণাঞ্চলের রান অতিক্রম করল পশ্চিমাঞ্চলকে। এর পর জয়সীমা পতোদির ডাবল সেঞ্চুরী

প্রীতিমিত্র

ধরলেন পতোদি এবং জয়সীমা। দক্ষিণাঞ্চল শিবিরে তখন খুবই আনন্দম-জার সুর।

তৃতীয় দিন মরা গাঙে বান ডাকল। খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন পতোদির নবাব। রানের ফুলবুদরি ছুটল তাঁর ব্যাট থেকে, জয়সীমা ফিরে গেল ৬৬ রান করে। পতোদি জয়সীমার বিদায়ের পরই ৯৭ রানের মাধ্যমে দেশাইয়ের বলে একটা লোপ্পাই ক্যাচ তুললেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ফেলেন, দিলেন সহজ ক্যাচাট। কদ

ঐতিহাসিক বসন্ত

জন্মেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক ছাব্বল সেপ্টেম্বর কোঠায় পৌঁছে আউট হলেন পতৌদি। উইকেটে ৪৪০ রানে দক্ষিণাঞ্চলের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন জয়সীমা।

অবশিষ্ট সময়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করল পশ্চিমাঞ্চল। ৬টি উইকেট হারিয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করল পশ্চিমাঞ্চল এবং খেলার নির্দিষ্ট সময়ও উত্তীর্ণ হল। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী হল দক্ষিণাঞ্চল। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার ভরা; তার কিছু প্রমাণ মেলে এই দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলাটির গতি এবং মেজাজ বিশ্লেষণ করে দেখলে।

ভারত সফরে আমেরিকান ফুটবল দল

আমেরিকা ফুটবল খেলত না; কিন্তু এখন ফুটবল খেলছে আর খেলাচ্ছে। মাঝে ফুটবল খেলুড়ে জগতে একটা রব উঠেছিল টাকা যদি পেতে চাও, আমেরিকা যাও। ইতালী, ইংল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং লাতিন আমেরিকা থেকে দ্বিতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা টাকার লোভে এসে ভিড় করতে থাকলেন আমেরিকার মাঠে। ফুটবল খীয়ে খীয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আমেরিকায়। আমেরিকান ছেলেরা যদি ফুটবলে আসক্ত হয়ে ওঠে তবে আর দু-তিন বছরের মধ্যেই আমেরিকা প্রথম সারির দেশ-

গুলির সঙ্গে টেকা দিতে পারবে। কারণ অন্যান্য খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে আমেরিকার অগ্রগতি-এই কথাই প্রমাণ করে যে, তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

আমেরিকার একটি খ্যাতিনামা পেশাদার ফুটবল দল ডালাস টর্নেডো ক্লাব ভারতে আসছে কয়েকটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করার জন্য। সতেরো জন খেলোয়াড় সমন্বিত এই ডালাস টর্নেডো দলে মাত্র একজন খেলোয়াড় আমেরিকান। খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংল্যান্ডের আর্টজেন, হল্যান্ডের দুজেন, সুইডেনের দুজেন, নরওয়ের চারজন এবং ডেনমার্কের একজন। দলের কোচ বব কাপ হলেন হাঙ্গেরীয়। দলের খেলোয়াড়দের বয়সের গড় হল কুড়ি বছর এবং গড় উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। এর মধ্যে দুজেন খেলোয়াড় আবার ছ ফুট লম্বা। ভারত সফরে টর্নেডো ক্লাব মোট ছটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। কলকাতা ছাড়া দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং ব্যাংগালোরেও এই দলটি খেলবে। কলকাতায় আই এফ এ'র বিপক্ষে টর্নেডো দলটি রবীন্দ্র সরোবরে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করছে এই নভেম্বর।

প্রদর্শনী ফুটবল

ইতিমধ্যে ইন্সটেব্গল দল রবীন্দ্র

সরোবরে দুটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে অংশ গ্রহণ করল। প্রথমটি বাটিরা পারিক লাইব্রেরীর সাহায্যার্থে আই এফ এ সভাপতির একাদশের বিপক্ষে এবং দ্বিতীয়টি জওয়ানদের কল্যাণ তহবিলের জন্য সার্ভিসেসের বিপক্ষে। আই এফ এ সভাপতির একাদশের সঙ্গে খেলায় ইন্সটেব্গল ২-০ গোলে পরাজিত হয়, কিন্তু সার্ভিসেসের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী হয়।

সার্ভিসেসের বিপক্ষে খেলা পরিচালনার জন্য কালকাটা রেফারীজ এ্যাসোসিয়েশনের কাছে রেফারী পাঠাতে অনুরোধ করা হয় কিন্তু সি আর এ সে অনুরোধ রক্ষা করে নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এস আর এর রেফারী খেলাটি পরিচালনা করেন। জওয়ানদের কল্যাণ তহবিলের জন্য একটি প্রদর্শনী খেলায় রেফারীজ এ্যাসোসিয়েশন রেফারী না পাঠিয়ে পূর্বন্যে রাগের কাজ মিটিয়ে কি খুব ভাল কাজ করলেন!

বার্সিলোনার কে জয়ী হবে

বার্সিলোনার টেনিস কোর্টে ভারতীয় টেনিস বাহিনী কি সাউথ আফ্রিকাকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে? প্রশ্নটার উত্তর একমাত্র আসতে পারে রমানাথন কুড়ানের র‍্যাকেট থেকে। বার্সিলোনার কোর্ট,



পাক-ভারত সীমান্তের পেত্রাপোলে আমেরিকান ফুটবল দলের কয়েকজন খেলোয়াড়

পাণ্ডাহিক বসন্ত

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে অপরিচিত নয়। ভারতীয় ডেভিস কাপ বাহিনী বাসিলোনাতে পৌঁছে গিয়ে রীতিমত অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে রয়েল টেনিস ক্লাব কোর্টে।

সাউথ আফ্রিকার খেলোয়াড়রাও বসে নেই। তাদের ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড় জুইসডেল, অস্ট্রেলিয়ার জাত-খেলোয়াড় বল হিউরিট, মড এবং মুরও বাসিলোনায় পৌঁছেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দলের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন কোচ হিসাবে খ্যাতনামা জরপ্রাড জুবনী এবং নন-প্রেসিং ক্যাপ্টেন লিস্টার।

ভারতীয় দলে আছেন রমানাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল, শ্যাম মিনোয়া এবং ম্যানেজার এবং নন-প্রেসিং ক্যাপ্টেন সামসের সিং।

সাউথ আফ্রিকা ঠিক স্পেনের মাটিতে খেলাতে ইচ্ছুক ছিল না। যদিও তারা ভারতের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জয় হ'বে বলে মনে করে। তাদের ধারণা স্পেনের দর্শকরা খেলার সময় সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই ক্যারিক করবে। আর সবচেয়ে বেশি চিন্তা হল যে, বেশ কয়েকদিনের অনুশীলন তাদের দেখে ফেলেবে স্পেনের খেলোয়াড়রা এবং তাতে স্পেনের খেলোয়াড়দের লাভ



পভোঁদর নবাব

ক্ষরণ ভারতকে পরাজিত করে তাদের স্পেনের সঙ্গেই খেলাতে হবে! যাই হোক গভবার ব্রেজিলের বিপক্ষে খেলায় ভারত একেবারে আশা ছেড়েই দিয়েছিল কিন্তু শেষ সময়ে কৃষ্ণনের অলৌকিক টাচ ভারতকে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার পৌঁছে দিয়েছিল। এবারও সেই কৃষ্ণনই উরলা।

জুনিয়ার এশিয়ান টেনিস

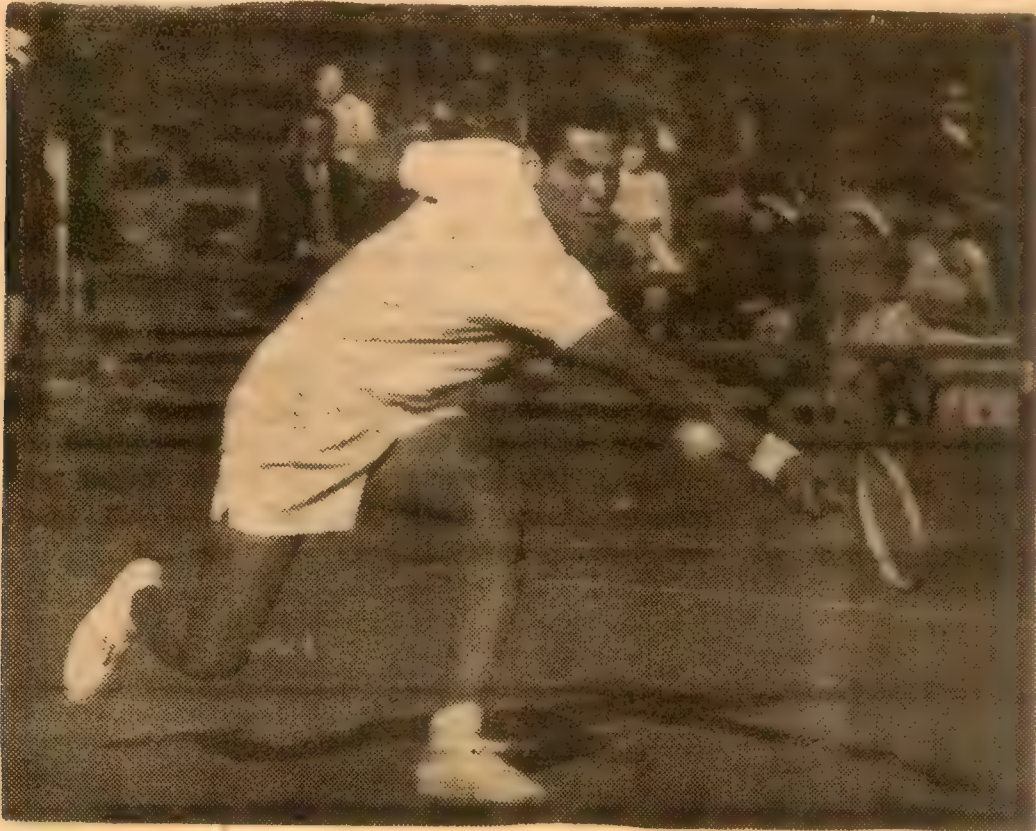
কুলালামপুরে জুনিয়ার এশিয়ান টেনিসের সিঙ্গলসে খেলা হয়েছে 'অল-ইন্ডিয়ান'। ভারতের গৌরব মিশ্র সতীর্থ আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করেছে ১২-১০, ২-৬, ৯-৭ খেলায়। ১৬৮ মিনিটের এই টেনিস যুদ্ধ দর্শকরা বেশ উপভোগ করেন। কিন্তু ডাবলস ফাইনালে গৌরব মিশ্র এবং আনন্দ অমৃতরাজ হংকংয়ের জুটির কাছে পরাজিত হন।

সম্মান দর্শন

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল পঠনকল্পে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৩৬ জন খেলোয়াড়ের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেছে। ইরানী ট্রফির চার দিনের খেলাটি মোম্বাইয়ে শেষ হবার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করবেন।

* * *

আবার অস্ট্রেলিয়া দলের ডেভিস কাপ দলে নন-প্রেসিং অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন হ্যারী হপম্যান। হপম্যানের বর্তমান বয়স ৬১ বৎসর। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে হপম্যানের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া এ পর্বন্ত মোট পনেরো বার বিজয়ী হয়েছে।



রমানাথন কৃষ্ণন

পরিচয়

হাওড়া ইউনিয়ন থেকে দুলাল মন্ডল যখন মোহনবাগানে এলেন, তখন সত্যি-সত্যিই মোহনবাগানের সমর্থকরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তরুণ খেলোয়াড় দুলালের নাম তখন খুব। বাজারে খবর ছড়ালো যে পি. কে. ব্যানার্জী, সমাজপতির স্থান নাকি নিতে বেশি দিন লাগবে না দুলালের।

আমরাও আশান্বিত! বাংলা দেশে নিপুণ আউট খেলোয়াড়ের অভাব বড় বেশি। যদি দুলাল সেই অভাব কিছুটা মেটাতে পারেন!

দুলালের প্রথম দিককার খেলাগুলো দেখে অনেক স্বপ্ন দেখতাম। তাঁর খেলার গলদগুলো দেখে ভাবতাম, বয়েস অল্প, ও ঠিক শ্রুত্রে যাবে!

কিন্তু গেলো কই! আজো তো দুলালের মধ্যে অনেক অভাবই বড় বেশিভাবে পরিস্ফুট হয়ে তাঁর উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রদীপটি নিভু নিভু করে তুলছে। আজো দুলালের মধ্যে রয়ে গেছে সেই গলদগুলো। আজো দুলাল চার্জ করতে ভয় পান, আজো দুলালের রিসিভিং-ডিস্ট্রিবিউশন নিখুঁত হয় নি, আজো দুলালের দমের অভাব।

কিন্তু এমনটি তো হবার কথা নয়, সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে বাঁজ দুলালের মধ্যে নিহিত ছিলো, আজো তো তা ফলে-ফলে ভরে উঠলো না। দুলালকে কেন্দ্র করে যে আশার আলো আমরা দেখেছিলাম—কই আজো তো আমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হলো না!

অবশ্য সে সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায় নি একেবারে। এখনো দুলালের খেলোয়াড় জীবন ফলে-ফলে ভরে ওঠার সম্ভাবনা আছে! বয়েস তো বেশি নয়। শ্রুতরাং.....!

দুলাল স্বাধীন ভারত থেকে মাস

তিনেকের বড় অর্থাৎ দুলালের জন্ম ১৯৪৭ সালের মে মাসে। তাই দুলাল এখনো আমাদের বড় আশার ঘন, বড় প্রত্যাশার, বড় ভালোবাসার খেলোয়াড়। সেইজন্যই আমরা চাই দুলাল ভালো খেলুন, আরো ভালো—দুলালের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, বাস্তবে রূপান্তরিত হোক আমাদের সেই আশা!

জানি দুলালের মধ্যে এখনো সে সম্ভাবনা আছে—এখনো আছে অনেক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়। তাই আমরাও আছি আকুল প্রত্যাশায় উদ্ভূত হয়ে।

দমদমের বেকার স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষেই দুলালের খেলোয়াড় জীবন শুরু। সেখান থেকে কুমারটুলি ঘুরে দুলাল খেলতে এসেছিলেন বেনেটোলার। আর সেখান থেকেই ১৯৬৪ সালে দুলাল এলেন হাওড়া ইউনিয়নে।

প্রথম বিভাগের ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ এলো দুলাল মন্ডলের। আর সব থেকে মজার বা প্রশংসার বিষয় হলো যে প্রথম আবির্ভাবই বাজী মাং করলেন দুলাল মন্ডল।

দুলালের খেলার ধারা দেখে চমৎকৃত হলেন সকলে। নাম ছড়িয়ে পড়লো দুলালের। ফুটবলরসিকরা চিনে ফেললেন ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষেও খেলার সুযোগ পেলেন দুলাল। আর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার

দুলালই সে বছর সব থেকে বেশি গোল দিয়েছিলেন।

ওদিকে হাওড়া ইউনিয়ন কিন্তু দুলালকে রাখতে পারলেন না! মোহনবাগান তাঁকে দলে টেনে নিলেন। প্রথম বিভাগে একটা বছর খেলতে না খেলতে দুলাল এক লাফে চলে এলেন একেবারে মোহনবাগানে। এমন দুর্লভ ভাগ্য খুব কম খেলোয়াড়েরই হয়েছে।

দুলাল তখন বিশ্ব যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে গেছেন। মনে আছে সেখানে দুলালের গোল করার কিস্তি ভালো খেলার খবর এলে মোহনবাগানের সমর্থক কেমন উল্লসিত হয়ে উঠেন!

তাঁদের যে তখন অনেক আশা দুলালের ওপর। অবশ্য সে বছর তাঁদের সে আশার অনেকটাই পূরণ করেছিলেন দুলাল। মোটামুটি ভালোই খেলেছিলেন দুলাল। ফলে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের পক্ষে খেলার সুযোগও লাভ করলেন।

কিন্তু তারপর.....! তারপর দুলাল যেন সকলের প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে পারলেন না। দুলালের খেলার চুটিগুলো রয়েই গেলো।

দু বছর মোহনবাগানে থাকার পর দুলাল এ বছর যোগ দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে! খুব যে একটা খারাপ খেলেছেন, সে কথা বলবো না! তবে এ কথা বলবো যে দুলালের খেলা আমাদের মন ভরায় নি। আমরা দুলালের কাছ থেকে আরো অনেককিছু আশা করি।

আমরা চাই দুলাল আরো ভালো খেলুন, আরো নাম করুন। দুলালকে ঘিরে আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই প্রত্যাশা বাস্তবে রূপায়িত হোক! জানি সে সম্ভাবনা দুলালের মধ্যে আছে—তাই দুলালের ওপর এখনো আমাদের অনেক আশা.....!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

জয়ন্তী প্রেস: লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

জয়ন্তী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহেমজদেবের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থসাজি

কালিদাস গ্রন্থাবলী — ১ম — বোর্ডে বঁধাই ৮-০০	শীমন্ত রায় গ্রন্থাবলী—১ম — বোর্ডে বঁধাই — ৪-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ২য় — " " ৬-০০	শীমন্ত রায় গ্রন্থাবলী—২য় — " — ৪-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী — ৩য় — " " ৮-০০	মুশেকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী " — ৪-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ১ম — " " ৪-৫০	প্রভাক্তী দেবী গ্রন্থাবলী — " — ৩-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী — ২য় — " " ৪-০০	বিভূতিভূষণ মুখোঃ গ্রন্থাবলী — " — ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—উপন্যাস — ১ম " ৪-৫০	স্বাধীন বিশ্বাস গ্রন্থাবলী — " — ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " — ২য় " ৪-৫০	শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী — " — ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " — ৩য় " ৪-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ১ম — " — ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—সাহিত্য — ১ম " ৪-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী — ২য় — " — ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " — ২য় " ৪-৫০	মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থঃ ১ম — " — ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী " — ৩য় " ৪-৫০	মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থঃ ২য় — " — ৩-৫০
বিজ্ঞানমাল গ্রন্থাবলী (কাগজ ও বোর্ডে বঁধাই) কবির প্রতিকৃতি	অনন্ত গ্রন্থাবলী — " — ৪-০০
সমন্বিত আট পেন্সনের কুশলা প্রচ্ছদ) ১ম ৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থঃ — ১ম — " — ৪-০০
" " " " " ২য় ৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থঃ ২য় " — ৪-০০
" " " " " ৩য় ৮-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থঃ — ৩য় — " — ৪-০০
সেনগুপ্তের গ্রন্থাবলী (কাগজ ও বোর্ডে বঁধাই) ১ম খণ্ড ৪-৫০	সংসাহিত্য গ্রন্থঃ — ৪র্থ — " — ৩-০০
সেনগুপ্তের গ্রন্থাবলী " ২য় খণ্ড — ৪-৫০	জমপদ মুখার্জির গ্রন্থাবলী — " — ৪-০০
জৈনোক্ত গ্রন্থাবলী— — ১ম — ৩-০০	হেমেন্দ্র গগ গ্রন্থাবলী — " — ৪-০০
জৈনোক্ত গ্রন্থাবলী— — ২য় — ৩-০০	হরিনন্দন দাসের গ্রন্থাবলী — " — ৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী — ১ম — ৩-০০	জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী — " — ৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী — ২য় — ৩-০০	বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী — " — ৩-৫০
দানিক গ্রন্থাবলী — — ১ম — ৪-০০	যদনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী — ৩য় খণ্ড — ৩-০০
দানিক গ্রন্থাবলী — — ২য় — ৪-০০	পটীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী — ২য় ভাগ — ৩-০০
দারোয় গ্রন্থাবলী — — ১ম — ৪-৫০	পটীশ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী— ৩য় ভাগ — ৩-০০
দারোয় গ্রন্থাবলী — — ৪র্থ — ৪-০০	স্বর্ধকরী দেবীর গ্রন্থাবলী— — ৩-০০
অনুভূত গ্রন্থাবলী— — ১ম — ৪-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৩য় — ৪-০০
অনুভূত গ্রন্থাবলী— — ২য় — ৪-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ৫ম — ৪-০০
অনুভূত গ্রন্থাবলী— — ৩য় — ৪-০০	বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (কাগজ ও বোর্ডে বঁধাই) — ৬-৫০
কোরেশ গ্রন্থাবলী — — ২য় — ৩-০০	কণাসরিৎ সাগর — ১ম ভাগ — ৪-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী— — — ৩-৫০	কণাসরিৎ সাগর — ২য় ভাগ — ৪-০০
বঙ্কমান গ্রন্থাবলী — — — ৩-০০	চারুকবি রুক্মিণীদাসের গ্রন্থাবলী— — ৩-০০
উল্লেখ বন্দোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী — — ৩-০০	স্বাভাব্য রায়ের গ্রন্থাবলী—১ম (বোর্ডে বঁধাই) — ৪-৫০
স্বাধীনসাহ সেন গ্রন্থাবলী — — ৩-০০	স্বাভাব্য রায়ের গ্রন্থাবলী ২য় " — ৪-৫০
স্বাধীনসাহ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী— — — ৫-০০	অরবিন্দ নন্দের গ্রন্থাবলী— — ৩-০০
ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড — — ৫-০০	জ্যোতির্দেবনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— — ৪-০০
ভদ্রভট্টের গ্রন্থাবলী— — — ৩-০০	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম — প্রতি খণ্ড — ৪-০০
ভট্ট গ্রন্থাবলী — — ২য় — ৩-০০	কীর্ত্তন গ্রন্থাবলী ৩য় হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড — ৫-০০
ভট্ট গ্রন্থাবলী — — ৩য় — ৩-০০	ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী — ৩-৫০
	চাক্র বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী — ৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বাণেশ্বরবাজারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

14 NOV 1967



যেহেতু ছোটবেলা থেকেই
ছকের বস নিতে দেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য।



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলিকাতার রসায়ন-শাস্ত্রের কৃতপূর্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

সাপ্তাহিক বসুমতী

মস্কোয় রেড স্কোয়ারে অক্টোবর (নভেম্বর)
মহাবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উৎসব



বর্ষ : ২২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

16th Nov, 1967 * Vol. 12

শীত

প্রতিদিন

বোরোলিন

ব্যবহার করুন

আপনার বুক মসৃণ, কোমল এক নিরূপদ রাখবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম।



বোরোলিন টাউস কলিকাতা



বিবরণ	লেখক						পৃষ্ঠা
সংগামকীর	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০৪৭
আজকের মানুষ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০৩
হৃৎগদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০৬
প্রজাপতির মৃত্যু	১০০	— গঙ্গাধর বাগদত্ত					১০০৩
ভারতদর্শন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০৬
আন্তর্জাতিক	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০০
মা দেবোহি, যা পেরোহি (স্মৃতিচয়ন)	১০০	— সুধীরজন দাস					১০০৬
মদী রূপমালা (হুমণকাহিনী)	১০০	— জ্যোতি চৌধুরী					১০০৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	১০০	— অনন্ত সিংহ					১০৭০
ইয়োহোপা	১০০	— হিরন্ময় ভট্টাচার্য					১০৭৫

—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ধা—

“যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
যেহে আছে আজ আবার মোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার লগাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।
মানুষ আমরা নহি তো মেঘ।
দেবী আমরা! সাধন: আমরা!
স্বর্গ! আমরা! আমরা দেশ!”

মাতৃমন্দের স্বাক্ষর, অপরাধের মানবমাহাত্ম্যের
স্বপ্নদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড :

মাজাহান, সিংহলবিজয়, সোরাব রুস্তম, পরপারে।

মূল্য—৬.০০

দ্বিতীয় খণ্ড :

বিরহ, সীতা, ভীষ্ম, বঙ্গনারী, আনন্দবিদায়।

মূল্য—৬.০০

তৃতীয় খণ্ড :

চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস, কালক অবতার।

মূল্য—৮.০০

(প্রতিটি খণ্ড মূল্য পাঁচপাচো ও গ্রন্থন সৌকর্ষে মনোহর। কাগজ ও
বোর্ডে বাঁধা। কবির প্রতিষ্ঠিত সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যোতির্ভাষা।)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোমার আলো, আমার আঁধার (গল্প)	— মঞ্জু আচার্য	১৩৭৭
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৩৮৩
অক্ষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১৩৮৭
বিশ্বময়তর দিনগুলি	— প্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১৩৯১
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	— ডঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য	১৩৯৪
বাঙলা দেশ (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	১৩৯৫
বিশ্ববে কে প্রাণ দিবি (কবিতা)	— অমিয়কুমার হাটি	১৩৯৬
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	১৩৯৭
রূপমণ্ড—ওয়েস্ট এন্ড এয়েস	— শিলালি	১৩৯৮
রূপমণ্ড	—	১৪০১
বেলাহুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৪০৬

বিভাদয়ের বই

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সন্ধানে ১৩০০

এ গ্রন্থে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন সন্যাসবাদী ও বিপ্লবী দল-উপদলের গত পঞ্চাশ বৎসরের বিভিন্ন আন্দোলন ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষাতে বর্ণিত হয়েছে। অদূর অতীতের এই রাজনৈতিক ইতিহাস প্রতিটি রাজনীতি-কর্মীর জন্য একান্ত প্রয়োজন, তাই এই গ্রন্থখানিও তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও শ্রমতান্ত্রিক সংগ্রাম : প্রথম খণ্ড ১৬০০

‘বঙ্গবন্ধু’ শ্রীমদগোপাল সেনসম্পাদিত : “একখানি অভিনব বই। ভারতে বৃটিশ শাসনের শব্দ থেকে দেশের কৃষক ও শ্রম-প্রাণী মানুষ্য পবমান্যতা শিকল ভাঙার জন্য যেসব বিদ্রোহের আয়োজন করেছেন, তার ধারাবাহিক ও প্রমাণ ইতিহাস এতে গ্রথিত হয়েছে। লেখকের তথ্যানুসন্ধান ও রচনা শক্তি দুইই উচ্চ মানের। বইটির যোগ্য আদর কাম্য।”

প্রমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ উপন্যাস

গোয়েন্দা হালেন

পরশুর বর্ষা ৪৫০

একধারে অসাধারণ গোয়েন্দা ও আধুনিক কবি পরশুরের জীবনের রোমাঞ্চকর অসামান্য সব কীর্তি-কাহিনী সকলেই হয়ত পড়েছেন। কিন্তু কী করে এবং কোন্ অপ্রত্যাশিত প্রহেলিকায় জড়িত হয়ে পড়ে তিনি জীবনে প্রথম গোয়েন্দা-গিরি শব্দ করলেন, তাব বোমা-শিহব-তোলা রহস্য-বিভীমকাম অসাধারণ কাহিনী এই প্রথম প্রকাশিত হল।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস

মধুমতা ৬০০

জীবনের প্রথম প্রেম ৪৫০
মরুভূমি ৪০০
গৃহকপোতী ০০০
সোমলতা ৪০০

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

পুরুষিকা ৩২৫

মনীশ ঘটকের উপন্যাস

কনখল ৭০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

‘বঙ্গবন্ধু’ শ্রীমদগোপাল সেনসম্পাদিত : “...একখানি মূল্যবান বই এবং এই বই রচনা করে প্রবীণ সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন।...একটি বছর ধরে (শিশু ও কিশোরদের পঠনোপযোগী সাহিত্য-বচন) যে অনুশীলন চলেছে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ধরে দিয়েছেন লেখক এই বইয়ে।...আলোচনা তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল। অনেকগুলি মূল্যবান ছবিও বইয়ের আকর্ষণ বাড়িয়েছে।” বর্তমান সংস্করণে ১৪১৮-১৯৬০—এই মেডেল বছরের বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তানসহ) শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দাম : ১০.০০।

অনন্ত সিংহের

আগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

উপন্যাসের মতো করে বলা অবিস্মরণীয় চট্টগ্রাম বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর সেই কাহিনী অগ্নিগর্ভ পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে গ্রন্থাকারে অতি শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ বিদ্রোহের অন্যতম প্রখ্যাত নায়ক গণেশ ঘোষের দীর্ঘ জীবিকা সম্বলিত।



৭২ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা-মূল্য : ২৫ পরস্যা বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
মহাসপ্তাহিক, ২১শে কার্তিক, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 16th November, 1967

দলত্যাগ বন্ধ করা হোক

সারা ভারতের রাজনীতিতে এখন এক গভীর সংকট শুরু হয়েছে। এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে বাজ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলত্যাগ নিয়ে। দলত্যাগ-জনিত সমস্যার ফলে গণতন্ত্রেরও সংকট। কারণ জনগণের কাছে এক রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট ভিক্ষা করে পরে বহুবৃপী আকার ধারণ করার মধ্যে জনগণের বিশ্বাসের মূলেই কুঠারঘাত করা হয়। আমাদের দেশে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যাতে বিপক্ষগামী নির্বাচিত সদস্যকে সঠিক পথে আনা যায় বা বিশ্বাসহীন করার জন্য তাকে পথে বসান সম্ভব হয়। সোভিয়েট দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে 'রিকল'-এর সাহায্যে বিপক্ষগামী সদস্যকে যে কোনো সময় জনগণ পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হতে বাধ্য করতে পারেন। আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে দৃঢ় করার কথা বলা হলেও উক্ত ধরনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় যে কোনো সদস্য নির্বাচকমণ্ডলীকে নির্বাচিত হবার পর বড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরো পাঁচ বছর বহাল তব্বিতে থাকতে পারেন। জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ আমাদের সংবিধানে সে বকম কোনো ব্যবস্থার কথা নেই।

এখন দলত্যাগের যে হিড়িক পড়েছে, তার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তেই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ইতিপূর্বে আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দলত্যাগের বিরুদ্ধে যখন একটা কিছু করার জন্যে কিছু বলেছিলাম, তখন দলত্যাগের ব্যাপার এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করে নি। এ

প্রবন্ধে আমরা ভারতের নির্বাচন কমিশনারের কাছে সর্বদা অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, সদস্যদের দলত্যাগ বন্ধ করার জন্যে তিনি যে কোনো একটা আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আনন্দের ব্যাপার, ভারতের নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা এই দলত্যাগের ব্যাপার উত্থাপন করে বলেছেন যে, সংসদে ও বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বর্তমান আতঙ্কজনক অবস্থা চলতে থাকলে এম বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের মধ্যে দলত্যাগের বিরুদ্ধে আপোষমূলক চুক্তি সম্পাদন করার কথাও উল্লেখ করেছেন।

আমাদের মনে হয় আপোষমূলক চুক্তির পরিবর্তে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বাধিক শ্রেয়। দলত্যাগ যারা করে তাবা আদর্শবিচ্যুত ও নীতিবিচ্যুত হয়েই তা করে। যদিও তারা মুখে বলে যে, জনগণের কল্যাণের জন্যেই দলত্যাগ করছে, আসলে পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জনগণের সম্মুখীন হবার সাহস তাদের থাকে না। আমাদের দেশে নানা সামাজিক সমস্যার মধ্যে এখন জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের কথা উঠছে। কিন্তু জাতির কাছে আদর্শ কারা? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক নেতারা। তারা জনগণের প্রত্যেকের মধ্যে থাকে। অথচ এই সব নেতাদের স্বাধীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দলত্যাগ নিবারণ করতে না পারলে, জাতীয় চরিত্র আরো গোলাৱ যাবে। দলত্যাগ নিবারণের জন্যে তাই চাই

আইন। ইংল্যান্ডে আছে দলীয় শাসন, কিন্তু উন্নত জাতীয় চরিত্র অক্ষয় রাখার উদ্দেশ্যে সেখানে এদল-ওদল করার হিড়িক নেই, তাই সেখানে আইন প্রণয়নও নিঃপ্রয়োজন। আফ্রিকায় দলত্যাগের সমস্যা একদা গভীর সংকট সৃষ্টি করেছিল বলে সেখানে বহু রাজ্যে আইনের সাহায্যে তা নিবারণ করা হয়েছে।

এদল-ওদল যারা করে তাবা দলের সর্বনাশ করে, জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে এবং আমাদের দেশের যে নির্বাচনপ্রথা শুরু থেকেই বিশ্বজনের গভীর আস্থা লাভ করেছে সেই নির্বাচনেরও ভাবভূমি ঘটায়। কারণ নির্বাচনে দাঁড়িবার সময় দলের যে ছাপ নেওয়া হয়, পবে তা মুখে ফেলালে নির্বাচনপ্রথার প্রতি সাধারণ নাগরিক আস্থা হারায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, নির্দলীয় প্রার্থীরূপে যাঁরা ভোট-প্রার্থী হবে তাদের জন্যেও বিধিনিষেধ থাকা চাই। নির্দলীয় প্রার্থীরূপে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি যাতে কোনো দলে যোগ দিতে না পারেন সে ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা ধন্যবাদ জানাই নির্বাচন কমিশনারকে, যিনি ভারতের গণতন্ত্রের সংকট অনুধাবন করে দলত্যাগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করেছেন। আশা করি, অনতিবিলম্বে দলত্যাগ বন্ধ করার জন্যে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

সম্পাদকীয়

হাইকোর্টের হাইকোর্ট

কাজটা মোটেই সহজ নয়, বহু চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে তবে লক্ষ্যে পৌঁছানো। বিন্দের বাধা, প্রচুর বিপত্তি। রায় হাই দেওয়া হোক না কেন, সুপারিশ হাই করা হোক না কেন, দু'পক্ষই যে তাতে সমান খুশি হবে না একথা জানাই ছিল। কিন্তু তবুও কিছু বলতে হবে, পালন কবতে হবে অর্পিত দায়িত্ব। ওই কঠিন দায়িত্বভার নেবার মত অভিজ্ঞ লোক তো খুব বেশি নেই। সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে মেহেরচাঁদ মহাজন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ২০ বছর আগে ১৯৪৭ সালে পাক্সাব সীমানা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি যথেষ্ট বোগ্যভার পরিচয় দিয়েছিলেন, কাজেই ১৯৬৬ সালেও মহাশূর, মহারাজ ও কেরালার মধ্যে সীমানা বিরোধ সীমাংসার জন্যে

আইনকানুন নিয়ে শ্রীমহাজন পড়ে আছেন আজ অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে। পাক্সাবের ধরমশালা জেলা আদালতেই তাঁর ওকালতি জীবনের শুরুর ১৯১০ সালে। পরের ৪ বছর ছিলেন গুরুদাসপুর আদালতে। ২৫ বছর ধরে প্রাকটিস করেছেন তিনি লাহোর হাইকোর্টে। ১৯৪০ সালে লাহোর হাইকোর্টেরই অন্যতম জজ নিযুক্ত হন।

স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্থসমাজের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েই কলিত নেই তিনি, সমাজের জন্যে নিরলসভাবে কাজও করে চলেছেন। সারা পাক্সাবে যে ইঙ্গ-বেদিক প্রতিষ্ঠানে ছেয়ে গিয়েছে শ্রীমহাজন যুক্ত রয়েছেন তার সঙ্গে। স্বামী দয়ানন্দ বা আর্থসমাজের মতাদর্শে তিনি বিশ্বাসী, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-

মূল। জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা মহাজনেব বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বিদ্যানুভূতি এবং আইনে পারদর্শিতা দেখে মহারাজা হরি সিং তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদ দেন। ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের যোগদানের প্রশ্নে শ্রীমহাজনই মহাবাজের পক্ষ থেকে ভাবত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। বছরখানেক বাদে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর থেকে মহাজন গেলেন বিকানারী, এখানকার মহারাজার শাসনতান্ত্রিক বা আইন উপদেষ্টার সম্মানীয় পদ নিয়ে। কিন্তু মেহেচাঁদ মহাজন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান পেলেন সোদান বোদান তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হল।

মহাজন কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে মহাশূর ও মহাবাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ মহাবাজে সমিতি মহাবাজে ওই বিপোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাঁদের আন্দোলন মাঠ-মবদান-রাজপথের সীমা ছাড়িয়ে বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে বহু এম-এল-এ-কে সাসপেন্ড কবেছেন স্পীকার। স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী শ্রী

মেহেরচাঁদ মহাজন

ভারত সরকার শ্রীমহাজনেবই নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেন। সে কমিশনেব রায় বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূর-মহারাজ রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু শ্রীমহাজনের অপবাধটা কোথায়? উনি সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যের ইতিহাস ঘেঁটেছেন, সরেজমিনে তদন্ত কবেছেন, আমিনদের জরীপ, পুরোনো দলিল নথিপত্র দেখেছেন। তিনটি রাজ্যেরই বহু লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কবেছেন তিনি, তাঁদের ভাষা শুনছেন। আধিবাসীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন, ধৈর্য ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত শুনছেন, সমস্ত পক্ষের দাবি ও পাশ্টা দাবি সবোভেই কান পেতেছেন। সব দেখা ও শোনার পর এই প্রবীণ বিচারপতি তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা ও স্তানমত বে রায় দিয়েছেন তা যদি সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে সে দোষ কি মহাজনের?

ধারাও তাই ওই আদর্শে সঞ্জীবিত। কিন্তু তাই বলে সান্ত্বয় রাজনীতির আবর্তে তিনি পড়তে চান নি কখনো।

নিজে শিক্ষকতা না করলেও শিক্ষাবিদ এবং বিদ্যানুরাগী বলেও শ্রীমহাজনের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। ১৯৪০-৪৭ সাল পর্যন্ত পাক্সাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' এবং সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন তিনি, ৪৭-৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাক্সাব বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি সদস্যপদে বৃত্ত ছিলেন। তাছাড়া স্বামী দয়ানন্দের অনুগামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেনই। বস্তুত সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে শ্রীমহাজনকে বরাবরই আগ্রহী ও উৎসাহী দেখা গিয়েছে। এক সময় তিনি পাক্সাব ন্যাশনাল ব্যাংকেরও অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে মহাজনের কর্মজীবনে বিরাট পরিবর্তন

ডি পি নায়েক বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মহাজন কমিশনের রায় অগ্রাহ্য করার জন্য। ক্ষুব্ধ মহাশূর বাসীও।

তাঁর বিপোর্ট থেকে যে সমস্যার আঙ্গ উন্মত্ত হয়েছে তার সমাধান করার দায়িত্ব শ্রীমহাজনের নয়। তাঁকে সবকিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বিবদমান পক্ষগুলি সে রিপোর্ট মেনে নেবেন এ আশাই হয়তো তিনি করেছিলেন, কিন্তু তা যদি সকলের পক্ষে গ্রহণের যোগ্য না হয়ে থাকে তো তিনি নাচাব। কাজের লোক কাজ করেই খালাস, তার ফলাফল বিচার করার তিনি কে? রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন একদিন তিন বাজোর সীমানা চিহ্নিত করে সমস্যার সৃষ্টি কবেছিলেন, হাঙ্গামা, অশান্তি, রক্তপাতের ফলে মহাজন কমিশনেব জন্মলাভ। সে জন্ম যদি ব্যর্থ হয় হোক, কিন্তু তাই বলে মহাজন বিচারপতির আসন থেকে একবার যে রায় দিয়ে ফেলেছেন তা ফিরিয়ে নেবেন কী করে।



সময়বলে মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যত্বনে গেছেন

১১

শনিবার ৪টা নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে যে সংকটের সূত্রপাত হয়েছে তা আজও এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত এমন অবস্থায় রয়েছে যা থেকে আদৌ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। যদিও কোন কোন মহল থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সোমবার ৬ই নভেম্বর সকাল দশটায় রাজ্যপালের সঙ্গে মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাতের পরেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আনিবার্য হয়ে উঠবে, কিন্তু কার্যত তা হয় নি।

রাজ্যপাল ওই দিন মধ্যমন্ত্রীকে যথাসম্ভব শীঘ্র বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরে পত্র মারফৎ ওই একই অনুরোধ করেন। মঙ্গলবার ৭ই নভেম্বর মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সাব্যস্ত হয় যে, আগামী ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভা আহ্বান করা হবে, কেন না ধান কাটার মরশুমে ও খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে বিধানসভা সদস্যদের বাস্তব থাকতে হবে বলে ওই তারিখের আগে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান উচিত নয়।

সংবাদে প্রকাশ যে, মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে রাজ্যপাল খুশি হন নি, এবং পরদিন তিনি “যথাসম্ভব শীঘ্র” বিধানসভা আহ্বানের জন্য মধ্যমন্ত্রীকে চাপ দেন, কিন্তু তাতে মধ্যমন্ত্রী নরম হন নি। ৮ই নভেম্বর মধ্যমন্ত্রী ইন্দোর যাত্রার পথে নাগপুরে সাংবাদিকদের নিকট বলেছেন যে, আগামী ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভা আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে তিনি কোন বে-আইনি কর্ম করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, বিহার ও হরিয়ানা যদি

যথাক্রমে চার ও তিন মাস সময় নিতে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়ে এমন কি অনায়াস করেছে? ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও কংগ্রেস দলের ইচ্ছামত কিংবা রাজ্যপালের খুশিমত মধ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশন নভেম্বর মাসে ডাকতে রাজী না হওয়ায় এখন চেষ্টা চলছে কিভাবে ওপর থেকে চাপ দিয়ে এই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেওয়া যায় এবং রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে গত শুক্রবার ১০ই নভেম্বর তারিখে দৈনিক বঙ্গমতীর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে, “আমরা এই প্রকার অপচেষ্টাকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করি, কারণ বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার পূর্বে জোর করিয়া মন্ত্রিসভাকে বাতিল ও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিলে উহা হইবে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসনকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলবার মত। যুক্তফ্রন্ট এখনো সত্য-সত্যই সংখ্যাগুরু দলে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে বিবদমান পার্টিগুলি নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে চূড়ান্তরূপে শক্তিপরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত মেজারিটি-মাইনিরির শব্দ ও দাবি নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায় না। গবর্নর, কংগ্রেস পার্টি ও ঘোষ-কবিরের দল ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ধৈর্য ধরিতে অনিচ্ছুক কেন? দল ভাঙাভাঙির এই কুৎসিত খেলা কি ততদিনে খতম হইয়া যাইবে—এই ভয় কি যুক্তফ্রন্ট-বিরোধীরা করিতেছেন? মধ্যমন্ত্রী শাসক পার্টির সুবিধা অনুসারে এসেমবলীর বৈঠক অধিকবেন

ইহার মধ্যে অন্যায় কি? বিদ্যোদী দল যদি সত্য-সত্যই মেজারিটি হইয়া থাকেন, তবে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখেই তাঁরা তাঁদের হিম্মত প্রমাণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁরা ততদিন অপেক্ষা করিতে রাজী নন। ইহার দ্বারা ই প্রমাণ হয় যে, ঘোষ-কবিরের দল ও কংগ্রেস পার্টি তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন। সুতরাং তাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য আশঙ্কিত থাকিতেছেন। কারণ, যুক্তফ্রন্টকে জব্দ করিব না এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। আমরা বিদ্যোদী কর্তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী প্রদান করিতেছি। এই সোজা এবং জাঁতি পিচ্ছিল পথে তাঁরা যেন পা না লাড়ান। কারণ, সেই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের একান্ত বিপজ্জনক সম্ভাবনা বাঁচিয়াছে। তাহারা কি চোখ খুলিয়া দেখিতে পারিতেছেন না যে, এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পিছনে জন্মভূমি কিভাবে লাড়াইয়া আছে? পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পাহারা দিতেছে। ৬ই নভেম্বরের অসম্ভাবনীয় ঘটনাবলী কি কর্তারা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন? তাহারা কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, রেশনে এই সপ্তাহে কোন চাউল দেওয়া হয় নাই। এমন অভাবনীয় ঘটনার পরেও জনতার পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ, কোন বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয় নাই? লোকের আধিপত্য খাইয়া যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানাইতেছে। আর আইন ও শৃংখলা? অস্তিত্ব মহানগরী কলিকাতার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক এবং বাকি দেশে বাহা ঘটিতেছে কংগ্রেসী আমলেও তাহা ঘটিত। কিন্তু কংগ্রেস-পক্ষপাতী দৈনিক পত্রিকাসমূহ সেই সমস্ত ঘটনার তেমন পারিসিটি দিত না—

এইটুকু শব্দ, তফাৎ। কিন্তু যদি ধরিয়াও গাই যে আইন ও শৃংখলার পতন ঘটয়ছে, তথাপি উহার প্রতিকার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন নয়। কারণ, জোর করিয়া সেই শাসন চাপাইতে গেলে সারা দেশে অগুন জনাইবে। গবর্নরের সাধ্য নাই পুলিশ ও মিলিটারি দিয়া সেই অবস্থা আরও আনিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কু-মাংসব ত্যাগ করুন এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় অনুসরণ করুন।”

১২

৮ই নভেম্বর নাগপুরে মধ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, গভীরভাবে বিবেচনার পর বিধানসভা আহ্বানের দিবস ঘাষ করা হয়েছে, সুতরাং ওই তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না। রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল মধ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন তা আইন ও সংবিধান মার্কিত। রাজ্যপাল বিধানসভা ডাকতে সরকারকে বাধ্য করতে পারেন না। বিধানসভার শক্তিপরীক্ষা না করে এই সরকারকে গদিচ্যুত করার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

উপমধ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বৃহস্পতিবারে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের ওপর মন্তব্য করে বলেন যে, “কংগ্রেস দল এখন সরাসরি রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য ওকালতি করছেন, কেন না তারা নিশ্চয় তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তাই গণতন্ত্র হত্যা করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার জন্য তারা দাবি তুলেছেন।” শ্রীবসু আরও বলেছেন যে রাজ্যপাল নিজে বিধানসভা ডাকতে পারেন না। সংবিধানে সেরকম কোন ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয় নি। কংগ্রেস দলের প্রস্তাবে রাজ্যপালকে সংবিধান-বিরোধী কাজ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পতন ও অন্য দলের সঙ্গে কোমালিশন সরকার গঠনের প্রস্নে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড মতবিরোধে কংগ্রেস পরিষদ দলের চীফ হুইপ শ্রীজগন্নাথ কোলে ওই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সোমবার ৬ই নভেম্বর। ওই দিন কংগ্রেস পরিষদ দলের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট আর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি নয়, অতএব যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং এই বিষয়ে কংগ্রেস অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করবে। ১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ডঃ ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেসের কোমালিশন সরকার গঠনে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ সম্মতি দিয়েছেন।

১১ই নভেম্বর ইন্দোরে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সম্মেলনে মধ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেছেন যে, “আমার স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য রাজ্যপালকে আমি ইতিমধ্যে যে পরামর্শ দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।” তিনি আরও বলেছেন যে, বিবৃতি পাঠা বিবৃতির দ্বারা অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করা হবে না। ১৮ই ডিসেম্বরের আগে কোন বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হতে পারে না তার দুটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন। প্রথমত এখন তাঁদের খারিফ শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত, এখন শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা চলছে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় দৃষ্ট প্রকাশ করে বলেন যে, “রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মূলে রয়েছেন হুমায়ুন কবির। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর নিকট থেকেই এই সংকট এসেছে।” তিনি বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তা তিনি আলোচনা করতে চান না। তিনি অবশ্যই এটা বলতে চান যে, যুক্তফ্রন্টের পিছনে প্রবল জনসমর্থন রয়েছে, এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হলে জনগণ চোখ বুজে থাকবে না।

বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হলে রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে রাজ্য সরকারের আশংকা। রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে উপমধ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, তাঁদের সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার লম্বা একাধিক শক্তি যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটানোর চেষ্টা করছে।

আইনমন্ত্রী শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেছেন, “যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তা মেনে নেবে না, এবং রাজ্যে রক্তগণ্ডা বয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃংখলা ভেঙে পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীবসু বলেন, বাংলাদেশ ইতিপূর্বে কখনো এত শান্ত ছিল না। রেশনে চাল নেই, অত্যাধিক চালের দর, তবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিকোভ নেই। রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর মতেও পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলার অবস্থা স্বাভাবিক।

রবিবার ৫ই নভেম্বর অপরাহ্নে রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মাস্তাবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সুবিশাল জনসমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, রাজ্যের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে একটি নতুন মন্ত্রিসভা নিয়োগ বা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কার্যেমের গভীর চক্রান্ত যে মহত্বের কার্যকরী করা হবে সেই মহত্বের সমগ্র দেশের জীবনবাটাকে হরতাল ও ধর্মঘটে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। যে মহত্বের রাষ্ট্রপতি শাসন অথবা মন্ত্রিসভা বাতিলের বাতী শোনা যাবে সেই মহত্বেরই কোন আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে সাধারণ ধর্মঘটে সব সচল চাকাকে যেন অচল করে দেওয়া হয়।

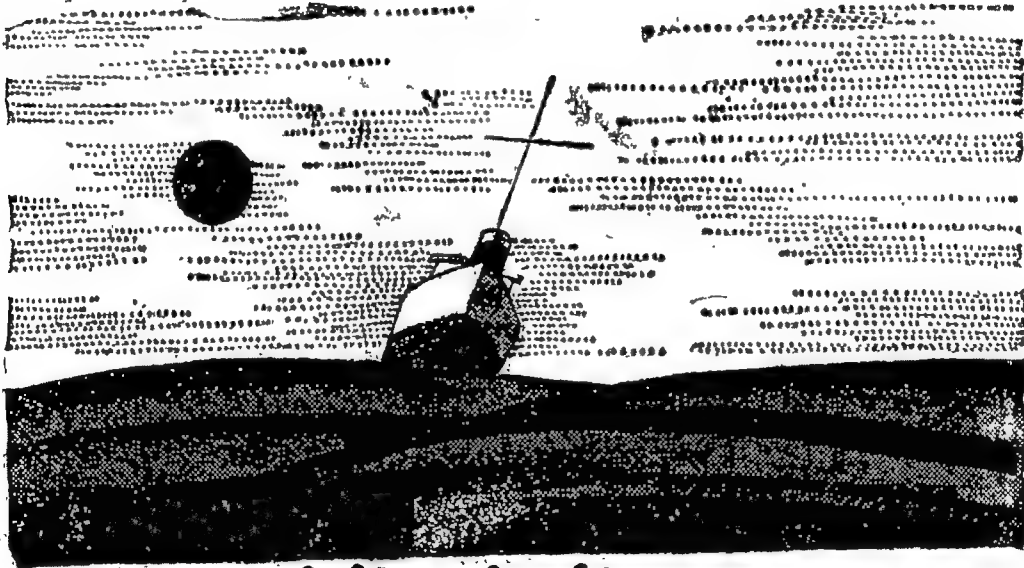
পরদিন সোমবার সকালে রাজভবন ও রাইটাস বিল্ডিংয়ের দ্বারে সহস্র সহস্র মানুষ উপস্থিত হয়ে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য যে সর্বভৌমদ্বী অভিযান চলছে তার বিরুদ্ধে বিরাট এক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যুক্তফ্রন্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার প্রথম ধাপ হিসাবে আগামী ১৫ই থেকে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী এক প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা হবে। রাজ্যের জেলা শহরগুলিতে ২০টি বড় সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, কোচবিহার, মালদহ, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রায়গঞ্জ, বসিরহাট, শ্রীরামপুর, বোলপুর এবং কলকাতায় এই জনসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কেন্দ্রের অব্যাহত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট পালীমেণ্টে তাঁদের প্রতিবাদ পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট এম পিদের সঙ্গে শলাপনামাশ ও আলাপ-আলোচনার জন্য ফ্রণ্টের আহ্বায়ক শ্রীসধীন কুমার ১১ই নভেম্বর নরাদিয়ারী যাঁতা করেছেন। ১৩ই থেকে পালীমেণ্টের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পি এস পি ও এস এস পি লোকসভায় তমূল সোরগোল তুলবেন স্থির করেছেন।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চাপা উত্তেজনা ও খমখমে ভাব বিরাজ করছে। নানা প্রকার গুজবে দেশ ভরে গেছে এবং নেতারাও দেখা যাচ্ছে এই গুজবের

রপ্তানীকারকেরা এখন বিদেশে মাল পাঠাবার
পূর্বেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বিেষ
অর্থনৈতিক সুবিধা পাবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ও
মেটালার্জি বিষয়ক মালপত্র রপ্তানীকারকেরা
শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা এবং অন্যান্য সমস্ত
রপ্তানীকারকেরা শতকরা ৮ টাকা হারে সুদের
লাভজনক সুবিধা পাবেন। * বিশদ বিবরণের
জন্য ইউবিআইর যে কোন শাখার বোঁজ নিন।

বিদেশে আদনার রপ্তানী ব্যাঙ্ক?



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ক্লাইভ হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-২

naa/UBI

পশ্চিমবঙ্গে ২০টিরও অধিক শাখা আছে

ওপর নির্ভর করে অনেক উড়ো কথার মনে হতে উদ্ভেজনায় আরও ইন্ধন পাচ্ছে। এই রকম একটি গল্পের উল্লেখ ছিল যে মঙ্গলবার শ্রীদাশরথি তা একটি সভা থেকে ফেরবার সময় অপহৃত হয়েছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে তিনি বহালতবিয়তেই আসানসোলে আছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁর স্ত্রী এই অভিযোগ এনে-ছিলায়।

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের রাজত্ববনস্পদ বাসভবনের চতুর্দিকে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। ডঃ ঘোষ এতেও নাকি সন্তুষ্ট নন। তিনি টেলিফোনে পুলিশ কমিশনারকে তাঁর ভরসনা করে বলেছেন যে, পুলিশ থাকতেও তাঁর বাড়ির সামনে হৈ চৈ হচ্ছে। ডঃ ঘোষের বাসভবনের সম্মুখে এক জনতা কর্তৃক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা মধ্যমন্ত্রীর জ্ঞানানো হলে তিনি পুলিশ কর্তাদের বলেন যে, বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনগণের আছে, এটা একটা মৌলিক অধিকার যা সর্ববিধান-স্বীকৃত। দলত্যাগী এম এল এ-দের নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে তমূল

বিক্ষোভের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হবার জন্য জনতা তাঁদের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

১৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির দৃশ্যপট এখন কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ১১ নভেম্বর রাজ্যপাল দিল্লীতে পৌঁছেছেন। একই বিমানে গেছেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীহরেন মজুমদার ও কংগ্রেসের তরফ থেকে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। রাজ্যপাল গোয়েন্দা দপ্তরের একটি দীর্ঘ 'রিপোর্ট' নিয়ে গেছেন যাতে এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, এই রাজ্যে নাকি আইন ও শৃংখলা বিপন্ন। একই সঙ্গে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি দিল্লী রওনা হয়েছেন। তাঁদেরও দাবি, এখনি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা চাই।

নয়াদিল্লীতে যে কান্ডকারখানা চলছে তার ভিত্তিতে আজকে বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। রাজ্যপাল সম্মেলনের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তার নিগলিতার্থ হল যে তিনি মধ্যমন্ত্রীর বিধানসভা আহ্বানের তারিখ ১৮ই ডিসেম্বর ধার্য না করার জন্য বম্বপরি-কর। তিনি বলেছেন, "রাজ্যপাল কারো নির্দেশ মত কাজ করেছেন, কেউ যাতে এরূপ মনে না করতে পারেন, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার।" অর্থাৎ অজয়বাবুর দেওয়া তারিখ মেনে নিলে রাজ্যপালের "স্বাধীনতা" নাকি ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তিনি তা হতে দেবেন না। এটা শুক্রবার ১০ই নভেম্বরের ব্যাপার।

ওইদিনই ডঃ ঘোষ ও ডঃ চন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পশ্চিম-বঙ্গে দশ দিনের মধ্যে বিধানসভা আহ্বানের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন যে কংগ্রেস সমর্থনে পশ্চিম-বঙ্গে অকংগ্রেসী-অকমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব কিনা? কেন না প্রথমত, কামরাজ অন্য কোন দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠনের এখনো বিরোধী বলেই সকলে জানে। দ্বিতীয়ত ক্রান্তি দলের চেয়ারম্যান শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ঘোষণা করেছেন যে, ক্রান্তি দল কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে না। অথচ ডঃ ঘোষের অনুগামীদের অনেকই ক্রান্তি দলের সদস্য।

কেন্দ্রীয় ন্যায়সভার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিটির আবেশন সোমবারের আগে অর্থাৎ ১৩ই নভেম্বরের আগে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। ১০ই নভেম্বর অপরাহ্নে প্রধানমন্ত্রী বোম্বাই চলে গেছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও দু-চার দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটবে। ডঃ চন্দ্র ১০ই রায়ে যখন কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের সঙ্গে কথা বলেন, তখন কামরাজ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, এই ধরনের কোয়ালিশনের আগে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কোয়ালিশনের বিরোধী নন, তবে তিনি একটু চার-দিকের অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে চান। অপর পক্ষে উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোয়ারজী দেশাই ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে হবেই। এর প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন।

মনে হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ মূলত নির্ভর করছে ক্রান্তি দলের জাতীয় সম্মেলনের ফলাফলের ওপরে। ১০ই নভেম্বর জাতীয় ক্রান্তি দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে পার্টির চেয়ারম্যান বিহারের মধ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের কোন অংশে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য বিবেচ্য ডি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ রফায় যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে, বিহার ও উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসকে কোন-ক্রমেই পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হুমায়ুন কবীরের গ্রুপ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর জন্য বম্বপরি-কর। কাজেই এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হয় শ্রীকবীরকে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ক্রান্তি দল ত্যাগ করে অন্য দল গড়তে হবে, না হয় অজয়বাবুর সঙ্গে আপোষে আসতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তি দলের কবীর-পন্থী এম এল এ-রাই ডঃ ঘোষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের ক্রান্তি দলের প্রতি আনুগত্য স্পষ্টতই স্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে, কিছু সদস্য মূল দলের সঙ্গে থাকবেন এবং কিছু ডঃ ঘোষের দিকে যাবেন। এই অবস্থাটা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে আর একটা সুযোগ এনে দিয়েছে বলা আমাদের ধারণা।

১১/১১/৬৭

নতুন!

'ইকনমি প্যাকে'

টিনোপাল



জাহাড়া 'এক বালতির এক প্যাকেট' এবং 'রেগুলার প্যাক'

পরিধািক শুভ্রতার জন্য টিনোপাল

হুদদ গায়গী লিমিটেড, বোম্বাই-১

কল্যাণ ৪১/৪৭

অজান্তার হৃদয়

গণপ্রিয় দামোদর

হাংলা সাহেব মারিয়াছে, মারিয়া ছুত হইয়াছে, ছুত হইয়া দেশময় দাপাইয়া বেড়াইতেছে।

স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যটির শেষাংশ ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতেছি, সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের শাখায় সেক্স নামক যে ছুত আন্তানা গাড়িয়াছে, তাহাকে বিভাড়ন করা কোন একজন ওয়ার কর্ম নহে। এজন্য শত শত ওয়ার প্রয়োজন।

এবারে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার শারদ সংখ্যা পাড়িতে পাড়িতে এই কথাই মনে হইতেছিল।

মূল প্রসঙ্গে আসিবার আগে দুইটা কথা বলি। প্রথম, খ্যাত-অখ্যাত সকল পত্রিকার শারদ সংখ্যাতেই আজকাল দুই-তিন বা ততোধিক 'উপন্যাস' ছদ্মনামেয় বড় গল্প দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে পত্রিকা-সম্পাদকদের মধ্যে রীতিমত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। আজ হইতে কয়েক বছর আগে একটি বহুলপ্রচারিত সিনেমা-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যখন তাঁহাদের পত্রিকার শারদ সংখ্যাতে তিনটি করিয়া উপন্যাস প্রকাশ করিতে শুরুর করেন, তখন তথাকথিত সাহিত্য-পত্রিকার মালিক এবং/অথবা সম্পাদকরা ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শেষ পর্যন্ত ম্যামেরা-এর শিকার হইবেন তাহা সোদন হুঁকিতে পারেন নাই। আর আজ? বহুল-প্রচারিত কৌলীন্যভিমানী তথাকথিত সাহিত্য-পত্রিকা আজ অন্ত্যজ রূপে বিবেচিত সেই সিনেমা-পত্রিকার অশ্ম অনুরোধে তিনখানা করিয়া উপন্যাস ছাপাইতে শুরুর করিয়াছেন। বাংলা সাময়িক সাহিত্যে সিনেমা-পত্রিকাটির এই দান অবশ্য-স্বীকার্য। স্বভাবীয়ত, গত তিন-চার দশকের হইতে দেশময় অশ্লীল রচনার কিছুটা আকস্মিক প্রাবল্য দেখিয়া মনে হইতেছে, এই জোয়ারের পিছনে বিদেশী চম্পের অলঙ্কার আকর্ষণ আছে। এবারের দু-একটি পত্রিকাতে বিশেষ জাতীয় রচনা পাড়িয়া এই সন্দেহ আরও ঘন হইয়া

উঠিল। যে বিশেষ দু-একজন লেখক এবারে পুজার বাজার মাত করিবার জন্য আসরে--নামিয়াছেন, তাহারা নিজের সাহিত্যিক বিশ্বাসে না অন্যের আর্থিক আশ্বাসে নিজের উপলব্ধিতে না চমক-গভ খ্যাতির আশায় এই সব কু-রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন, সে প্রশ্ন স্বভাবই উদ্ভূত হয়।

যে-মাটি একজনের হাতে কাদা অন্যের হাতে তাহা প্রতিমা নির্মাণের উপাদান। জীবনের ভিত্তি যে-সেক্স তাহা লইয়া জাত শিল্পী মহৎ সাহিত্য চিত্র বা ভাস্কর্য রচনা করিতে পারেন, অশিক্ষিত মূঢ় তাহাকে নিষিদ্ধ ঘন্য বস্তুতে পরিণত করেন। এবারকার শারদ সাহিত্যে এমন কিছু কিছু নির্দেশের সাক্ষ্য পাইয়াছি, যেখানে সেক্স ভরাবহ মূর্তি লইয়া হাজির হইয়াছে। বহুলপ্রচারিত একটি পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি উপন্যাসে সেক্সের এই মূর্তি ভরাবহতম। আপাতত এই উপন্যাসটি লইয়া দু-চার কথা বলিলে বোঝা বাইবে, বাংলা সাহিত্য মরিয়া ছুত হইয়া দেশময় দাপাইয়া বেড়াইতেছে, এই কথা কতদূর সত্য।

আলোচ্য উপন্যাসটি কৃতী লেখকের ছবানীতে সুধেন নামক একটি মফস্বলী গুন্ডার চরিত্রকথা (কাহারও কাহারও কাছে হয়তো চরিত্রমূর্ত)। সুধেনরা তিন ভাই; বাবা বড় চাকুরে, অতএব মেজাজী, 'দারুণ ক্রুরেল'। কিন্তু সৈয়গ (লেখকের ভাষায় 'খাই ছিল বাবার ওষুধ ... বাবার নেশা ছিল বড়')। এমন অমানবিক পিতার তিন সন্তান; তাবাও দুই যাকে বলে 'বাপকা বেটা' : বড় ছেলে--সুধেনের বড়দা--একটি রাজনৈতিক দলের নেতা 'সামু চোর' হ'লে ঘেরকম হয় অনেকটা 'সেরকম', 'তুখোর খুচর', 'শুধু মেয়েরা না, অনেক বড় যুবতী বিবাহিতারাও ওয় কাছে আসে, আঙা দেয়' ইত্যাদি; মেজ ছেলে--অর্থাৎ মেজদা, সেও রাজনীতি করে, অন্য একটি দলের নেতা।

নারীদের ব্যাপারে বড়দারই মতো দুর্বল লেখকের ভাষায়, 'হ্যাংলা কুকুরের মতন, যা পাখ, তাই খায়'; আর সুধেন--সুধেনরূপী লেখক--তাহার গুণগণনা সাগরপ্রমাণ, ঠাসবুনোন লাইনোতে ক্রাউন কোয়ার্টে সাইজের মোট ৫৫ পাতা বিজ্ঞাপনের ও অলংকরণের জন্য ৫ পাতা বাদ দিলে নীট ৫০ পাতা) লাগিয়াছে এই ভারতরত্নের চরিত্রমূর্ত রচনাতে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় হঠাৎ এই চরিত্রমূর্তের মধ্যে নিখিল বিশ্বাসের 'খ্যাপা ঘোড়া' নামে একটি রঙিন ছবি জুড়িয়া দিলেন কেন, বন্ধিত্তে পারিলাম না। এই খ্যাপা ঘোড়া (?) কি সুধেনরূপী লেখক স্বয়ং? মকারভক্ত এই সুধেন গুন্ডা, অতএব সে কি না পারে? রাজনীতি করে, মারপিট করে, পিতার টেবিলের তল্লাস অকারণে প্রস্রাব কবে (লেখক একস্থানে তাহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'আমাব মধ্যে একটা কুকুর আছে', আব সেইজনাই বোধ করি বস্তুবাদী লেখক সুধেনকে দিয়া কুকুরের যাবতীয় অপকর্ম কবাইয়াছেন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার বা ভাবভঙ্গী না করিয়া এক মূর্তও থাকিতে পারে না, চাই কি পিতা-মাতার সম্পর্ক বা তাহাদের চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করিতেও স্বেচ্ছা কবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। সুধেনের জগতে একটিও লোক নাই, বাহার মধ্যে সামান্যতম ভালোবাসা সাক্ষ্য মেলে। যেমন, গুন্ডা হিসাবে যে কারখানায় সুধেনের খাতির, সেই কারখানার ম্যানেজার লেবার আডডাইসাব ইত্যাদি সকলেই 'অমানুষ'। তাহাদের স্ত্রীবা 'খাই খাই করে বেড়াচ্ছে' আর সুধেনের সপ্ত-কামনায উদগ্র ব্যাকুল, তাহাদের কন্যারাও তথৈবচ, সুধেন-কাকু' বন্ধিতে জগ্নান (এই সুযোগ সুধেন হাতছাড়া করে নাই)। সুধেন যে-কলেজে পড়িত, অর্থাৎ গুন্ডামি করিতে বাইত, সেই কলেজের শিক্ষকরাও ছিল সব বড় : যেমন, যশোদাবাবু ছিলেন 'দুর্মুখো চ্যামনা সাপ', দলাদলিতে ওস্তাদ

পরীক্ষার হলে স্বদেশের ছাত্রদের চৌকা-টুকিতে সাহায্য করেন, নটা ছেলে-মেয়ের বাবা জতএব সু-সুখেনের মতো মুচিবান ছাত্রের অগ্রগণ্যক মন্তব্য-স্বল; যশোদাবাবুর মতো বর্ণীবাবুও দলদলি করেন (ছাত্র সুখেনের ভাষায় 'বচ্চর'); আরেকজন শিক্ষক রামকেশবাবু পুরুষ হিসাবে তিনি এমনই অপদার্থ যে, তাহার 'নতুন বিয়ে-করা বউ'কে লইয়া ছাত্র সুখেনের বড়দা অনারসে 'বেলেপাণা' করিতে পারে; আর সুখেনের সহপাঠিনীরা?—তাহারা তো সুখেনের জন্য জন্ম হইতেই বলিপ্রদত্ত। দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া বলি, বিকৃতরুচির এ-হেন 'সব-পেরোছির দেশ' ইংলণ্ড ব্যতীত, বলা যায় মৃত বাতাস, একটি মেয়ে, শিক্ষা, যাহাকে সুখেন মাঝে-মাঝে 'প্রেম' নামক মানবিক মূল্য দিয়া ফেলে; মঞ্জরী নাম্নী অধ-গণিকা আর শিক্ষা যে এক নয় এই সম্বোধ তাহার মধ্যে কখনও কখনও জাগিয়া উঠে। এই শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া সুখেনরূপী লেখক সাহিত্যের শেষ রক্ষা করিতে চাইয়াছেন : রাজনৈতিক সম্বন্ধে মারাত্মক আহত সুখেন শিক্ষা উক্ত কোমল কল্যাণমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ মানব হিসাবে উত্তীর্ণ হইতে চাইয়াছে। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে শেষ করেকটি 'ভালো' মূল্য পণ্ডিত এতই খাপছাড়া, এতই অবিস্বাস্য, এতই হাস্যকর যে বুদ্ধিমান পাঠক সুখেনরূপী লেখকের উদ্দেশ্যে বলে, 'এও কি সম্ভব, তুমি নিজেই বলেছ, তোমার মধ্যে কুকুর আছে, সারা উপন্যাসে তোমার কুকুর-চরিত্র এত পরিষ্কার যে বিশেষ 'লোহার' লোভ তোমার কিছুতে 'ঝেতে পারে না।'

আলোচ্য উপন্যাসটি এক কথায় নসিরেটিং, অর্থাৎ পড়িতে পড়িতে বমি আসে। আপনি বলিবেন তাহা হইলে তুমি পড়িলে কেন কঁকি কঁকিয়াই বা শেষ করিলে? আমি বলিব, যে-কম্টি সহ্য করিয়া ডাক্তার, দুঃস্থ-মৃত-দৃষ্টকৃত অপারেশন করিয়া বোগীকে নিরাময় করেন, দেশের কল্যাণের জন্য সেইরূপ কম্টি সহ্য কঁকিয়া আমিও এই অপরাধনা পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। আমি উপরে এই অপরাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, এই গুণ্ডাচারিতামতে এমন একটি অংশ নাই যেখানে পাঠক এক মৃদুতের জন্য একটি পূর্ণ প্রশংসা গ্রহণ কঁকিতে পারেন। বিকৃতরুচির দিক দিয়া ইহা 'সব-পেরোছির দেশ'। এখানকার প্রত্যেকটি হাসিন্দা শয়তান, কিন্তু কাহারও শয়তানীতে বলিষ্ঠতা নাই; বলিষ্ঠতা দুরের কথা, 'শয়তানগুণ' মেরুদণ্ড পর্যন্ত নাই। যেনো বিজ্ঞানীরা বলেন, পরিবেশ মানবকে

গ্রহণ অথবা নীচ করে কিন্তু কোন মানবই অবিমিশ্র ভালো বা খারাপ হইতে পারে না। উপন্যাসের গোড়া হইতেই সুখেন গুণ্ডা, কেন গুণ্ডা তাহার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নাই। সুখেনের দুই ভাই বাহ্যত গুণ্ডা নয়, কিন্তু বদমায়েসিতে সুখেনের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। যদিচ লেখক বলিয়াছেন 'বড়দা একটা লোক, মেজদা একটা লোক, আমি একটা লোক। সব যে যার আলাদা' তবু শেষ পর্যন্ত তাহার মনের কাবখানা হইতে তিন ভাই হুবহু এক চেহারা এক চরিত্র লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, কাহারও মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব। নারীচরিত্রের ক্ষেত্রেও সুখেনরূপী লেখক একেশ্বরবাদী, সব মেয়েই জন্ম হইতে পুরুষের জন্য বান্দিত আর সব মেয়েই একাধিক পুরুষের জন্য কাগনাবাজ, সাহার ফলে সুখেনের প্রণয়িনী শিক্ষাও মাঝে মাঝে স্পটচরিত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। মেয়েদের সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ ক্যাসানোভা বা বাইরনও এমন তথ্য বা তত্ত্ব রাখিয়া যান নাই, বাইরন উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে-কোন পুরুষ যে-কোন মেয়েকে বা যে-কোন মেয়ে যে-কোন পুরুষকে যখন শূদ্রি যেমন শূদ্রি ভোগ করিতে পারে। এই উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হইলে একালের ক্যাসানোভা-বাইরনরা সুখেনের মহামূল্য-স্বর্গে 'দলে দলে আসিতে শুরুর করবে। তাহাতে আমাদেরও বেশ কিছু ফরেন একশেজ উপার্জন হইবে, মদ কি।

ইংরেজী বসু মনে পড়ে আমার এক বিন্দু বসু কথ। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, শতকরা পঁচানব্বইজন (আমার ধারণা ততোধিক) বাঙালী উপন্যাসিক ও গল্পলেখক দুঃসহবকমের অশিক্ষিত। তাহারা ইংরেজী বা অন্য কোন যুরোপীয় ভাষা তো জানেনই না, পরন্তু মাতৃভাষাও সব সময় শূদ্র কারখা লিখিতে পারেন না। অর্থাৎ অজ্ঞতার দিক দিয়া মাতৃভাষা ও বিদেশী ভাষাতে তাহারা 'মথার' সবাসাচী। আলোচ্য উপন্যাস পড়িয়া মনে হইয়াছে, লেখক তাহার কোন ইংরেজী-বিশ বসুর কাছে হেনরী মিলারের 'ট্রিপিক অফ ক্যানসার' ট্রাপিক অফ ক্যানসার' ইত্যাদি অশ্লীল নিষিদ্ধ রচনাদিব কথা শুনিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ হয়তো তিনি পাইয়াও থাকিবেন, কিন্তু পড়িবার দৈর্ঘ্য, ক্ষমতা ও সময় কোথায়। বসুর কাছ হইতে বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী যেটুকু জানিয়া লইয়াছেন, তাহাই বর্তমান উপন্যাসে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে মিলাবর্ণন্য এই লেখক শেষ পর্যন্ত সাহা রচনা করিয়াছেন

তাহা 'পেরোছাফী' বা অশ্লীল কুরচনা ছাড়া কিছুই নয়। দশ-পনেরো বছর আগে ইহা অপেক্ষা অনেক ভারী রচনার জন্য লেখককে সরকারের বা আদালতের কাছে শাস্তি পাইতে হইয়াছিল। আর আজ, স্বাধীনতার বিশ বছর পরে, পরিপতন বাংলা দেশে ভারতবর্ষে এমন রচনার জন্য লেখককে দেশগোব উপাধি দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক তাহার ইংরেজী-বিশ বসুর কাছে 'সিস্মলিজম' সম্পর্কেও কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তাই উপন্যাসের শুরুর ভাগে, মাঝে কয়েকবার, এবং শেষে 'প্রজাপতির প্রতীক' ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রজাপতি নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের, অন্যভাবে, জীবনবোধের প্রতীক। তাই শুরুর ভাগে সুখেনের হাতে যখন প্রজাপতির মৃত্যু ঘটিতে দেখি, তখনই উপন্যাসের 'ধর্ম' পরিষ্কার হইয়া যায়। বাকি, বাংলা দেশে যেটুকু জীবন-বোধ বা মানবিক মূল্যবোধ অবশিষ্ট আছে, তাকে লেখক ও তাহার সাংগো-পাঙ্গরা হত্যা করিতে বশ্যপরিবর। বহুল-প্রচারিত পরিষ্কার মাধ্যমে এইরকম আর গোটা কয় উপন্যাস নম্রমের পেরোছাফীক রচনা প্রকাশিত হইলে পুরো দেশটাই বীট-পাড়া হিপি কলোনী হইয়া যাইবে।

আমি যে উগ্র নীতিবাগীশ নই, সমালোচনার সূচনাতেই তাহা স্পষ্ট। ডি. এইচ. লবেন্সের মতো লেখক তাহার নাম না শুনিলে তাহার কোন বসুর কাছে জানিয়া লইবেন) আমাবও প্রতীতি, সেক্স জীবন, সৌন্দর্য চৈতন্য; সেক্স আগুন, সৌন্দর্য দীপ্তি। আমি মনে করি, সেই মানবই জীবন্ত সাহার মধ্যে সেক্স অঙ্গ-ভাবে জ্বলন্ত; সাহার মধ্যে সেক্সের আগুন নিভিয়া গিয়াছে, তাহার মতো পক্ষতরল ব্যক্তি আমায় প্রচণ্ড বিরূপতা।

অর্থাৎ সেক্স জীবনের ভিত্তিভূমি এবং সেই হিসাবে মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু ভিত্তি অথ যেমন গৃহ নয়, সেক্সও তেমনই সম্পূর্ণ জীবন নয়। এ প্রসঙ্গে ২রা নভেম্বরের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে চন্দ্রগুপ্ত তাহার 'অবস্তাব' শীর্ষক রচনাতে সাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

'জীবনে সেক্সের অস্তিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য, কিন্তু জীবন ও সেক্স নিশ্চয়ই সমার্থক নয়। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়, তবে সে দর্পণে শূদ্র সেক্স প্রতিবিম্বিত হবে কেন? যে-রচনার আবহমান জীবনের হাসি-কান্নার হাঁরা-পান্না দ্রুতিত হয় না, তা আর বাই হোক সাহিত্য নয়। যৌনতাকেন্দ্রিক রচনা যদি

যৌনতাভিমানী না হতে পারে, তবে তা কালের বিচারে সাহিত্যের মর্যাদা পাবে না। সাম্প্রতিকের প্রচলনপন্থ্য অসাহিত্যকে সাহিত্যের আসনে বসাতে গিয়ে ব্যর্থতার ব্যর্থ হয়েছে।

এই জনাই মকরভক্ত সেরসর্বস্ব লেখেন গুণ্ডার জীবনচরিত সাহিত্যভিমানী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলেও সাহিত্যপদবাচ্য রচনা বলিয়া গৃহীত হইবে না। রূপকল্পের বিচারে তাহা সাংবাদিকের রিপোর্টার মাত্র, তাহার রচনা একটি পর্নোগ্রাফী রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সেই উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ হইয়াছে; 'সম্পূর্ণ' না বলিয়া 'অনেকখানি' বলিতেছি এই জনা, পর্নোগ্রাফী হিসাবেও তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের, দেশ-বিদেশের পর্নোগ্রাফীক রচনার সঙ্গে বাঁহার পরিচয় আছে, তিনি এই উপন্যাসের করেক গুণ্ডার বেশি পড়িতে পারিবেন না।

অথচ ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, আলোচ্য উপন্যাসের প্রণেতা এক সময় সত্যই কিছু ভালো গল্প ও উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়াছিলেন। সেই সময় তাহার কল্পনারী উত্তরণ প্রাণগঙ্গার ঐশ্বর্যে আমরা কণকাল মগ্ন ও আশাব্যস্ত হইয়াছিলাম। তখন তাহার সাহিত্যগঙ্গার যে-সমস্ত আবর্জনা ভাসিতোছিল, সেইগুলির প্রতি স্মার্টাবিকভাবেই দৃষ্টিপাত করি নাই। তখন কি একবারও ভাবিয়াছিলাম, এই সকল আবর্জনার বাহুল্যে ও লেখকের জীবনস্রোতের অভাবে একদিন এই গঙ্গা কর্মমগ্ন ডোবার পরিণত হইবে?

তবে এই লেখক সম্পর্কে আমি প্রথম হইতেই বলিতাম, লেখাপড়া না থাকার জন্য (লেখাপড়া অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নয়) ইনি বেশিদূর যাইতে পারিবেন না, অচিরেই মৃৎ ধুবড়াইয়া পড়িবেন। মানবের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ এবং শৃঙ্খল-অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়া যদি সাহিত্যরচনা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক শৃঙ্খল মাতাল লম্পট খুনী এক-একজন কীর্তিধন্য সাহিত্যিক-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেন (বর্তমান উপন্যাস পড়বার পর শানিতোঁছ বাংলা দেশের এই জাতীর লোকদের অনেকেই এখন লিখিতে উৎসাহিত বোধ করিতেছেন)। আলোচ্য লেখকের সাহিত্যপদবাচ্য রচনাতেও আমি চিন্তার বা বাস্তব পরিচয় কোনদিন পাই নাই, তাহার

সাহিত্য জীবনের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য সেই সব রচনা আমার মন্দ লাগে নাই। বর্তমান উপন্যাসও নিশ্চয়ই তাহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত, ফলে তাহার মধ্যে সত্যও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই সত্য কি সর্বজনগ্রাহ্য সর্বজনপাঠ্য? লেখককে বলি, সহজ করিয়াই বলি, সত্য ধুব স্বাধার কোন বস্তু নয়, দেশ ও কালের পরিসরে তাহা নিত্যচলনশীল, ফলে সত্যের আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। গণিকালের সত্য কি গৃহস্থবাড়িতে চলে, মারবাদী কমিউনিস্টদের সত্য কি কংগ্রেসারী গ্রহণ করেন? অথচ অস্তিত্ব বিশ্লেষণে এই সকল সত্যের মধ্যে কি মৌলিক মিল নাই? সব সত্যই যদি নিশ্চল ধুব এক-চেহারার হইত তাহা হইলে সসারের বিচিত্র ব্যাপক নাটকে এত পারশায়া থাকিত কি? এই মিল সত্ত্বেও কেন এত পার্থক্য, কেন একজন সত্যমন্ডীর পথ অন্যজনের পথ হইতে এত ভিন্ন?

যৌনতাকেন্দ্রিক রচনা যদি যৌনতাভিমানী না হতে পারে, তবে তা কালের

বিচারে সাহিত্যের মর্যাদা পাবে না। চন্দ্রগুপ্তের এই মন্তব্যের আশ্রয়ে বলি, আলোচ্য উপন্যাসে যৌনতা বা সের হইতে উত্তরণের কোন আভাস নাই, গুণ্ডা হইলেও সন্ধান যে আদ্যন্ত মানব তাহার কোন পরিচয় নাই। লেখক নিজে বইপত্র নাই বা পড়িলেন, কিন্তু তাহার কোন শিক্ষিত বন্ধু-বান্ধবের কাছ হইতেও কি কখনও কোন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবের কথা শোনেন নাই? গুণ্ডার কিংবা তাহার চারপাশে তাহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের কাহারও মধ্যে কখনও কি কোন সদৃশ্যের প্রকাশ দেখেন নাই?

ভূমি হইতে ভূমার দিগন্ত হইতে দিগন্তেরে বাঘার নামই শিল্প। আবহমান মানবের হাসি-কন্সার হীরা-পারার দ্যুতির নামান্তর সাহিত্য।

বর্তমান উপন্যাসের লেখকের সহজ উপলব্ধির জন্য অতিলৌকিক উপহার সাহায্যে বলি, আমরা সকলেই বাধরুমে যাই, কিন্তু সারাদিন বাধরুমে বসিয়া থাকি না। আমাদের লেখক কি করেন?

প্রজাপতি হত্যার কৃত্তিরে কৃত্তিবাহু লেখকের কথা অবশ্য স্মরণ্য। স্-সন্ধান গুণ্ডার অ-সাধারণ চরিত্রকার হরজো সারাদিন বাধরুমেই বসিয়া থাকেন। এবং এই দূর্লভ কমতার জন্যই বোধ করি তিনি এক হিসাবে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

মধুর সুরভি

প্রিয়া

প্রিয়ান নীধারী বসন্তোলাস,
সুগন্ধ আপনাকে সারাদিন
প্রাকুর রাখবে। প্রসাধন,
প্রিয়া তাই অপরিহার্য।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী



ভারতদর্শন

সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত গ্রীপেগভ ভারতীয় বিপ্লবী গ্রীরাফিক আহমেদকে পদক প্রদান করছেন

শতাব্দীর চাক্রে ফুটো

গত কুড়ি বছর ধরে আমাদের এই মহান ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা একটিমাত্র মার্ক্সের চাক গলায় ঝুলিয়ে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করেছি। জয়ঢাক নয়। কারণ ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত নয়, প্রদত্ত। আমাদের জয়ঢাক তাই বাজে নি। কিন্তু নেতারা একটা পর্বতপ্রমাণ ঢাক তৈরি করেছিলেন কুড়ি বছরের নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসরে, সে ঢাকে এজাবৎকাল বেজে এসেছে গণতন্ত্রের জয়-দামামা। বিদেশী কৌতুকপ্রিয় রাজনীতিও সময়ে-দুঃসময়ে ভারতীয় স্বাধীনতার জয়ের জন্যই সেই বিরেশি-সিকের ঢাকে দু-একটি মোলায়েম চপেটাঘাত সহযোগে তায়াক করে আসছেন এই স্মৃতিবাদ করে যে, খেতে পাক না-পাক, শিকে-দীকের বহর কিছু বেড়ে থাক বা নাই বেড়ে থাক, ভারতবর্ষ একটা 'বেড়ে' গণতন্ত্র খাড়া করেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের সরাসরি নির্বাচনে ভারতের সরকার তৈরি হচ্ছে। গোলমাল-গাউগোল নেই। বস্তুবিক অবাক কাণ্ডই বটে!

কিন্তু ভারতের যে নেতৃবর্গ সেই জয়ঢাকাটি গলায় বেঁধে দেশ-বিদেশের উপরি-উক্ত মোলায়েম চপেটাঘাত সংগ্রহ করে ফিরছিলেন তাঁরা হরত লক্ষ্য করেন নি যে, দুনিয়ার তাবৎ সচেতন মানুষ

এই ঢাকের বাদ্য শব্দে নেপথ্যে হেসে লুটোপুটি হয়েছেন। প্রথমাবধিই সাধারণ সচেতন মানুষের বেশ মালুম হয়েছিল যে, ঐ প্রকাণ্ড ঢাকাটিতে যে ঢপ ঢপ শব্দ নির্গত হয়, তাই যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে, ঢাকাটির দুই পিঠেই দুটি জুড়সই ছিদ্র সযত্নে আবৃত করে রাখা ছিল। তাই ঢাকের বাদ্যতে ফাঁক ধরা পড়ে গেছিল অপেক্ষাকৃত সচেতন মানুষের প্রবর্ণেশ্রমে।

তারা তাঁর পেয়েছিলেন, জনগণের সরকার অর্থে বা ব্যোঝায় ভারতে তার প্রাতিষ্ঠার জন্য তখনও তের ব্যাক, অন্তত বেশ ওলট-পালট এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে ঐ সাজানো গণতন্ত্রের মূখ্যস-টিকে আর খসানো যাবে না।

যায়-ও নি। পাক্সা, কুড়িটি বছর মূখ্যসাবৃত গণতন্ত্র পর পর তিনটি নির্বাচনে বাজিয়াছে করে বোঁরয়ে গেছে। দেশের লোক আকাট মূর্খ। 'ভোট' নামক এক বিচিত্র কস্তুর সন্ধ্যা পরিচয় করতেই পনেরটা বছর তাদের কেটে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনে ভো শোনা গেছিল বলদের প্রতিকৃতি দেখে অজ্ঞান ভারত নাট্যাঙ্গে প্রলিপ্যাত করে ঢাকা বরের বন্ধ বায়ে কাগজের টুকরো (ব্যালাট পেপার) ফেলে এসেছেন। তাঁদের কাছে ঐ ভোট ভোট খেলা এক নতুন অভিজ্ঞতার রাঙা হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন ছিল, বন্ধ বাশার,

কাগজটা ফেলেদেই যেতে পাব, পরতে পাব, দুঃখ দুঃখ? তাঁদের নিঃসঙ্গ দীন প্রশ্নে শিক্ষিত সচেতন ভারতের দুঃখ চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। লজ্জার অশ্রু-বদন সচেতন ভারতবাসী এঁদের বাক্যের দিতে পারেন নি যে, তোমাদের নিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রহসনের চক্রান্ত চলছে ঢে, এ বড় মজার সাকাস। ভোট বাতের সামনে তোমাদের নাচিয়ে বিশ্বদর্শককূলের হাততালি কুড়ুচ্ছে আর এক দল এং-নাগাড়ে কুড়ি বছর ধরে। সচেতন ভারত চীৎকার করে কখনই বলেন নি : চলাব না অন্তঃসারশূন্য ভোট ভোট খেলা, বন্ধ বা দেশের মানুষকে নির্বাচনের গুড় তস্থ উপলব্ধি করার মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সঙ্গে সঙ্গোই প্রয়োজন ছিল, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাধিকারকে হাতে-কলমে রূপ দেওয়া। শিশু রাষ্ট্রের নামে এই প্রথম ও প্রথম কর্তব্যটিকে সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথচ ঐ ষোঁড়া বুদ্ধি কত অসামান্য মনে হয় যখন তাকিয়ে দেখি : ১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর (অর্থাৎ ১৯২০ সালেই কার্যত) মহামতি লেনিন সোভিয়েট জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ডিক্রিতে স্বাক্ষর দেন আর ১৯৩৭ সালের মধ্যেই সোভিয়েট বুদ্ধরাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ হয়ে ওঠেন সাক্ষর। মনে রাখতে হবে, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্ববর্তী জারশাসিত রাশিয়ায় সাক্ষরের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা সাড়ে আঠাশজন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের বিপ্লব জনগণের হাতে ক্ষমতা দান করার পর এই দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব করতে বসে মহান লেনিনকে কিন্তু একবারও শিশু রাষ্ট্রের দুঃশিক্ষিতার কাহিল হতে দেখা যায় নি। কিন্তু শিশু রাষ্ট্রের শ্লেগান আজও আমাদের অক্ষয় সাজিয়ে নিশ্চিন্ত ডানলোপিলোর আরামে বস করে রেখেছে।

ভারতের অর্জনিত নিরক্ষর অবস্থা মানুষের হাতে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে যারা ভেবেছিলেন, জগন্নাথের রথ এই ভেল্কিতে আপনি গড়গড়িয়ে চলবে, তারা অন্তত কুড়িটা বছর কোনরূপ দুর্ভাবনার সম্মুখীন হন নি। বস্তুতই জগন্নাথের রথ গড়িয়েছে এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধির ওপর দিয়েই গড়িয়েছে।

কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের কালে গণ-তন্ত্রের জয়ঢাকাটির বেসুরো বাজনা অকস্মাৎ আতনাদ করে উঠল। কেন না স্বাভাবিক নিয়মেই খাঁচার পাখি ঠোকরায়, বলির পাঠাও গুতোতে চায়। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হল না। দলিত পিণ্ড দলা পাকানো নিরক্ষর মানুষেরা তিন-তিনবার ভোটপত্র বাজে ফেলে বোধ হয় বানিকটা অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, তাই ভোটপত্রে একই জায়গায় ছাপ দেওয়ার একঘেয়েমি পানোঁ বন্ধ জগন্নাথের যেখানে যেমন যোঝাতে

পারলেন, সাধারণ মানুষও সেখানে জেমন ছাপ মেলে এলেন। কোথাও একটা ছাপ দেওয়া নিয়েই যখন কথা। সে ছাপ কার, কি বা তার বিকটাকার পরিচয় ছাপদাতার অতীত জ্ঞানের প্রয়োজন কি। চেনাযুগ বাবু মাশারাই ভরসা।

কুড়ি বছরের কতাদের পালঙ্ক টলে উঠল। হুড়মুড় করে সব ধরাশায়ী হন আর কি। হারে রায়, এ কেমন কথা। মুখ্যমন্ত্রীর কি মানুষ হতে চলল? ইলি-দিল্লী পোস্ট নির্বাচনী গবেষণা কমিটি জানা গেল: না, সাম্প্রতিক ভয়ের কোনও কারণ নেই। সবচেয়ে বড়ের কুড়ি বছর ধরে অশ্বকারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তাঁরা যথাস্থানে অশ্বকারেই আছেন। কোনও ভানুমতীর কুপার ভাঁদের জ্ঞানালোক দর্শন ঘটে নি।

তবে এমনটা কেন হ'ল?

না, বহু ক্ষেত্রে টাকার খেলা হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প মানুষ শূন্য বলদ পাণ্ডে অন্যতর কিছু সাহায্যে নিষ্ফল। অমিত্যে ফল বোনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। অনেক ক্ষেত্রে ভালো মানুষের নামাবলী গায়ে দিয়ে মাকামারা কিছু বলদপ্রায়ী মাকী পাণ্ডে লোক ঠিকিয়ে ভারতবর্ষে বিবর্তী ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক প্রত্যয়গার চাল চাললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বলদ ছাপের বিচরণভূমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

গণতন্ত্রের জয়চাকটি অতঃপর সর্বদলে ভাগ করেই গিটেতে শুরু করলেন। জন-গণের ওপর বিরাট ভরসা এবং আশায় কথা কেউ কেউ তারম্বরে প্রচার করতে নামলেন, যাকে ভিন্নার্থে গণতোষণী গণ-বুধ বলা যেতে পারে। কেন না এরা নিষ্পন্নাকারী অবশ্যই বুঝতে পারছিলেন যে, চতুর্থ নির্বাচনের খেলাটাও নেপথ্যেই অন্তর্নিহিত হয়েছে। তাতে জনগণের হৃদয়ের স্পর্শ নামমাত্র। জনগণ শূন্য অসন্তোষের শিকার। আর সেই অসন্তোষটুকু ভাঙিয়ে এবার কতিপয় বাবু মশায়ের তথ্য-ই-তাইস ভিন্ন ভিন্ন বাবু মশায়ের দখলে গেছে। বোকা জনগণের মাথার কিন্তু কঠিনটি ভাঙার আয়োজনে কিছুমাত্র রদবদল হয় নি। এক দলে ভেঙে আসছিলেন। অতঃপর পঞ্চ দলে ভেঙে টুকরো টুকরো করলেন। সাধারণের ভিত্তিমারিডসারে যতি পড়ে নি কিছুমাত্র।

বাবু মাশারায় তখন 'ভাগ করে খেতে হবে' সর্বদলে অতঃপর, বুঝে যে যার জায়গাট গুহুহুতে বসলেন।

কিন্তু গোড়ার গলদ। বীরের 'ভদ্র' সেই গা' কোথায়! বঁজে দেখা গেল, তারা একই বিষয়ে পিঠ কুজো করে হটি, হুসুড়ে বসে আছে। তখন বাবু মাশারায় মিচকি হাসলেন। গণতন্ত্রের জয়চাকটি

নিরীকণ করে এডোমিনের প্রায়িকটি আরও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে বললেন, তোবা, তোবা! এই তোমার গণতন্ত্র। মা জৈ! চল সব মন্ত্রী হই তাহলে!

প্রশ্ন: সবাই মিলে মন্ত্রী হলে জনগণ কী ভাববে? জনগণ? সে আবার কী বস্তু! কতকগুলি ভোটপত্র তো? তা সে সময়কালে ম্যানেজ করা এমন কি শব্দ। স্বতঃস্বে নিরক্ষরের দল। বহু সেই বিচিত্র জয়চাকটিতে প্রচণ্ড প্রহার করে ব্যাজিয়ে দাও।

তাই হ'ল। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাতারা জয়চাক কীয়ে নেমে এলেন। চোঁড়া পেটানো হস্ত: গণতন্ত্র মানে দুই প্রতিপক্ষের বহু-তন্ত্র। ছলে বলে কৌশলে প্রতিপক্ষকে কাত করাই এই গণতন্ত্রের একমাত্র করণীয়। গণতন্ত্রে, বণে এবং প্রেমে সোহভেদ নেই। তিন ক্ষেত্রেই কুচকাটুরের সঙ্গে প্রতি-পক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। তাহলেই মার্ক কতবা পালন হ'ল।

বিভিন্ন রাজ্যে সদস্যগণ গণতন্ত্র নামের নামে রাতারাতি এবং কটীর কটীর

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সভায়ে 'চন্দ্রগুপ্ত' 'অবতরণ' এবং কৃত্তিবাস ওবার 'পদ্মাহের বোঝা' প্রকাশিত হওয়া না।

—সম্পাদিকা

দল পাণ্ডে মন্ত্রী হওয়ার জন্য নাপাদানি শুরু করলেন। জয়চাক হেঁকে হেঁকে বলল: গণতন্ত্রে এসবই বিধিমান। কে দিল ভোট—এ প্রশ্ন তুচ্ছ। কাকে দিল ভোট—এ প্রশ্ন ফালতু। ভোট দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। এখন গণ-তন্ত্র যাতে বজায় থাকে, তার জন্য হুহুত মাথো ভেব পাটানোর স্বেচ্ছা জনসেবা করাই নিষেধ।

বাবু মাশারায় আবার মিটিং করে বসলেন যে, ভারতবর্ষে যেহেতু অসংখ্য অশ্বকারের জীব ভোটদানের অপেক্ষায় মজুত করে রাখা হয়েছে, সুতরাং নির্বাচন জিনিসটা নিয়ে মাঝা মাঝানো বোকামি। শাসন দলটি বহুদলীয়তায় চলে রাখতে পারলেই হ'ল। মাঝে মাঝে গণতন্ত্রের ফুটো জয়চাকে কাটি পিটে জানিয়ে দিতে হবে, যাঁরা শাসন করছেন সবাই টিকিট-হারী। সুতরাং গণতন্ত্র বজায় আছে।

জনগণ বললেন: বাবু, বেশ মজা তো, আমি 'অমূল্য ভুললোক'কে টিকিট দিই নি, দিইনিহলাম 'অমূল্য দলকে। এখন ভুল-

লোক দল বললোছেন কিন্তু আমার টিকিট দলেরই মনোনয়ন আছে। এমন কি এই বিশেষ ভুললোকটি যে আসলে সত্যিই 'ভুললোক', টিকিট দেওয়ার সময় আমি তো সেটাও খতিয়ে দেখি নি। আমি দল-টাকেই দেখেছিলাম। ভোটপত্র যে ট্রান্স-ফারবেল বা হস্তান্তরযোগ্য আমাকে তাও বলে দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ 'ক'বাবুকে ভোট দিলে 'ক'বাবু, ইচ্ছামত সেই ভোটটি 'খ'বাবুকে দিয়ে দেবেন এমন কোন কথা ছিল না। কিন্তু 'ক'বাবুর ভোট নিয়েই যখন 'খ'বাবুর বেনামদার হলেন তখন কার্যত আমার ভোটটা 'খ'বাবুকেই দেওয়া হল। অর্থাৎ 'খ'বাবুকে আমি ইচ্ছামতসে খেলা করি। এ কি রকম জবরদস্তি। এ কেমন গণতন্ত্র।

বাবু মাশারায় মিচকি হাসে বললেন, তোমরা শিশু ছে। সব অশ্বকারেই অভ্যস্ত। আসলে গণতন্ত্রের মানে বোঝো? গণতন্ত্রের নতুন ধারণাত আমায় তৈরি করছি। শূন্য সেইটা পড়তে শেখো। কে তোমাদের মাথার দিক দিয়ে সরকায় তৈরি করার ক্ষমতা দিয়েছে। এদেশে অনেক লোক, বুঝলে না। সরকার তৈরি জন্য তো ইংটারকা নেওয়া যায় না। তাহলে সাড়ে এককোটি লোক মন্ত্রী হওয়ার জন্য লাইন দেবে। এতবড় একটা সমস্যার হাত এড়ানোর জন্য রাছাই-এর ব্যবস্থা এভাবে করা হয়েছে। এরপর তোমরা যদি মনে কর, তবে স্বভাবের চরিত্র দেখে মানুষ রাছাই করে দিও। এটা বাসমতী রন্ধের দেশ। এখানে একটা করে লোক ঠিক করে দেবে, সে তার খুশিমনস্ক মন্ত্রী হবে, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হবে, ছুড়িগাড়ি বাড়ি হাকারে। এইজন্য আর কি। দল ফল নয়, দল দিয়ে কি গণতন্ত্র হয়। এবার থেকে 'গণ' মানে 'জটিল' বুঝবে। সাড়ে এককোটি লোক মানুষ যেহেতু এক সঙ্গে মন্ত্রী হতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা। এই যে জয়চাক: গণতন্ত্রের জয়চাক; শূন্য এটার আওরাজ হলে কি না তাই দেখবে। যদি দেখে, সাড়ে এককোটি লোক একসঙ্গে মন্ত্রী হয়েছেন, বুঝবে জয়চাক একেবারে ফেঁসে গেছে। যদি দেখে, একটি মাত্র লোক সমগ্র ভারতে একা বাঁহিবাঁ করে লাঠি ঘোরাচ্ছে, বুঝবে, ফুটো জয়চাক বাজানো কষ্টকর। আর যদি দেখে, গ্রুপ করে কিছু কিছু লোক কতিপয় জটিলকে মাঝা পরিয়ে একটা রাজসভা বানাতে পাঠাচ্ছে, বুঝবে গণতন্ত্র টিকে আছে।

এর বেশি কিছু দাবি কর তো এই

দেখা, কানে দিয়েছি তুলো। যদি রেখে গিয়ে আঁচড়াতে আসে, তাহলে তোমাকে নির্ধাৎ ফ্যানসিষ্ট বলে শাস্ত দেওয়া হবে। তখন কেঁদে কুল পাবে না; কেন না তোমার কামা কেউ শুনতে পাবে না। গণতন্ত্রের জয়চাক বেঁধে মনোভবে পেটানো হবে আর তারই শব্দে সহস্রের সতীর মতো তোমার আত্মনাশ চাপা পড়ে যাবে। গণতন্ত্রের ফটো চাক বডকাল বেঁচে আছে, ততদিন শব্দ দেখে যাও।

মেকী গণতন্ত্র দল (ক্রান্তি দল)

চতুর্থ নির্বাচন যে মেকী গণতন্ত্রের হাফি হাতে এসে ভেঙে দিয়ে গেল তাতে কুড়ি বছরের পচা ভাত ছিল। মাটির স্পর্শ পেয়েই সেই পচা সারের কাজ করল অদৃষ্ট ভাবে। চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালেই সে সার নতুন নতুন দলের জন্ম দান করে নয়া সুবিধাবাদের প্রতিষ্ঠা দিল। দেশের সারবন্দী দলে যাকে ভাইসে উত্তরতই জ্ঞান। উত্তরতই নব নব উপদলের সৃষ্টি। ভারতের দুই জ্বরদন্ত পক্ষ— যাকে কম্যুনিষ্ট, ডানে কংগ্রেস। ডানল।

কংগ্রেস ভেঙে যারা বেরিয়ে পড়লেন, মাঝারণে তাদের দেবাদিদেব পরিচয় রাষ্ট্র হয়ে গেল, কেন না গোটা দেশের বিক্ষোভটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই।

অকংগ্রেসীরা দু' হাত প্রসারিত করে কংগ্রেসভাগী নেতাদের আহ্বান জানালেন। বিশেষ করে নীতিনিষ্ঠরা বললেন: প্রকাশ কুল হতে যাচ্ছে, সুবিধাবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভরসার একটা ভবিষ্যৎকে জালিলান করে নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু কেউ কণ্ঠস্ব পাঠ করলেন না সে কথার। সবাই বললেন, সে সব কথা পরে ভেবে দেখা যাবে, আগে কংগ্রেসকে নিঃশক্তি কর। রাজ্যে রাজ্যে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গড়ে ফেল। তাই হল। কিন্তু কংগ্রেসকে নিঃশক্তি করা গেল না। একে তো সংবিধানের বলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী তাম্র ভারতের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে বসে আছে কংগ্রেস। অন্য দিকে চতুর্থ নির্বাচনের জোয়ারে অন্তরে কংগ্রেসী বাইরে বিদ্রোহীরা অকংগ্রেসীদের দাবল ফাঁটিগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। অকংগ্রেসী দু'গু সত্তরাত্তর আসের ধরের মতো ফংকারের অপেক্ষায় দলতে লাগল। পতন অলদয়ে নড়বড়ে অবস্থা। এরই রকম ফাল্গুন এসে লাগল পশ্চিমবঙ্গে। যেখানে ফ্রন্টের আসন সংখ্যা বেশ ভারী, সেখানেও দলভাগ্যত্রেই গোলমাল পাক দিয়ে উঠল।

দশ জোড়া রাজনৈতিক গরুপাকে

এক এক সময় মনে হতে পারে, চতুর্থ নির্বাচনের অনিবার্য পতন সম্ভাবনার কথা জেনেই কি তবে পোক্ত কংগ্রেসীরা রাতারাতি কংগ্রেসভাগী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল (?) মওকা পেলেই অকংগ্রেসী দু'গু বিস্তারিত ঘটিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পুনশ্চ কংগ্রেসকে গদিত ফিরিয়ে আনা (?)। অসম্ভব নয় এই কটনীতি। তবে একথা কেউ প্রকাশ্যে বলেন নি। বিকল্প ঘটনার এমন আবক্ষ্যার ইঙ্গিত মিলেছে মাত্র। যেমন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের চীফ হুইপ পদে ইস্তফা দেবার সময় শ্রীমত জগন্নাথ কোলে বলেছেন, প্রাক্তন মধ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কাছে ভর দিয়ে 'পেছনের দোর দিয়ে কমতার আসতে চেষ্টা করছেন।'

কংগ্রেসভাগীদের ইতিপূর্বে সর্বভারতীয় বিকল্প কংগ্রেস স্থাপনার চেষ্টা হয়েছিল পাটনার। এখন সেটা ইন্দোরে পূর্ণাবয়ব রূপ পরিগ্রহ করল। প্রধানত বিহার, উত্তর প্রদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসভাগী নেতারা প্রতিষ্ঠা দিলেন ক্রান্তি দলের। উড়িষ্যার উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীপরিমোহন প্রধান এবং ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাভাবের মত নেতারা উড়িষ্যার প্রতিনিধি দেন। বিহার থেকে স্যার মহামায়াপ্রসাদ সিংহ, উত্তর প্রদেশ থেকে চরণ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে অজয় মুখার্জি নতুন দলে মধ্যমন্ত্রীদের হাত বসিয়ে দেন।

কিন্তু ক্রান্তি দলের অস্তিত্ব অকস্মাৎ কেন যে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল অনেকে মাথা ঘামিয়ে তার প্রকৃত কারণটাই আজ অবধি বুঝে উঠতে পারলেন না। এ দল কী চান। এ দলের আদর্শগত লক্ষ্য কী! সমাচিত জবাব নেই। কংগ্রেসে গান্ধীবাদ লোপ পেরেছে তাই কি এ'রা গান্ধীবাদের পুনরুদ্ধান চান? কংগ্রেস মুখে তো গান্ধীবাদকে অস্বীকার করেন না, এ'রা কি কাজের মাধ্যমে তাঁর স্বীকৃতি দেবেন? কিন্তু তাই যদি হয়, তবে গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সংকর্মে আত্মনিয়োগই তো এ'দের প্রকৃত পথ ছিল। এ'রা বিভিন্ন রাজ্যে পাটিসেশলী ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা নিয়ে দলের জন্মলগ্ন থেকেই বিতর্কিত মাতছেন কী হিসেবে। গান্ধীবাদী রাজনীতি করেছেন কিন্তু রাজ্য বনতে চান নি। তিনি তাঁর কৌপিন ভাগ করেন নি ভারত সাম্রাজ্য কংগ্রেসের করায়ত্ত হওয়ার পরও। তবে সেই মহাত্মার নাম ভাঁড়িয়ে ক্রান্তি দল এসব কী কীতি করতে চলেছেন। অনেকে বিস্ময় মানলেন।

ক্রান্তি দলের মধ্যে কারা আসন পাতেছেন তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল, ইন্দোরে ক্রান্তি দলের বৈকালিক অধিবেশনে সভাপতি মহামায়াপ্রসাদের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই কবির-সমর্থক শ্রীশিবকুমার শর্মার

কণ্ঠস্ব হাফি জারালে। যাকে দেখে গেল।

প্রহসনটা এই যে, যেখানে হচ্ছে একটা সর্বভারতীয় গান্ধীচরণের দল গঠন, সেখানে শ্রীমতেরই হাতাহাতী শব্দ হল মন্ত্রিষের ব্যাপারে।

সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা ভেঙে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য শ্রীমদারন কবিরের অনুরোধীরা বিনিময় হয়ে উঠেছেন। এই কবির সাহেবও গান্ধীবাদী (!) এবং কংগ্রেসবিরোধী (!)।

শিবকুমার শর্মা বা কবির সাহেবরা অবশ্য বিশেষ পাতা পেলেন না ইন্দোরে। সভাপতি মহামায়াপ্রসাদ, চরণ সিং-সহ দলের অধিকাংশ সদস্যই এক সুরে বললেন, ক্রান্তি দল কংগ্রেস কোয়ালিশন কিছুতেই সম্ভব নয়। বটেই তো। যে কংগ্রেসের কেছা করে কবির সাহেবরা গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করে গণপ্রতিনিধিদের টিকিট সংগ্রহ করেছেন কমতার লোভে সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই হাত মেলান কোন ব্যক্তিতে?

কবির-সমর্থকরা এই আপত্তিবিরোধী কাজের সপক্ষে কিন্তু জবর হাফি পাড়া করেছেন। তাঁদের কথা, কংগ্রেসবিরোধীতা তো বটেই। কিন্তু সেটা তেমন গুরুত্ব নয়। বিরোধিতা কোথাও ব্যক্তিগত কোথাও রাজ্য সমসংগত কোথাও বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনশ্চ ক্ষমতালোভের ভঙ্গিমা থেকে উদ্ভূত। ওখানে কোনো চরিত্রগত বিরোধ নেই। চরিত্রগত বিরোধ অসম্ভব কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে। তাঁরা প্রথম কম্যুনিষ্ট-বিরোধী, পরে কংগ্রেসের কমতার অধিষ্ঠিত নেতাদের বিরোধী। তাই 'মহামায়া চান বা না চান', পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভা থেকে কম্যুনিষ্টদের হঠাতেই হবে।

প্রসঙ্গত ভুলে গেলে চলবে না, পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ নির্বাচনের সময় দক্ষিণ কম্যুনিষ্টদের শক্তি নিয়েই কংগ্রেসভাগীরা নির্বাচনে জিতে বেরিয়েছেন। সভ্য বললে, সে সময় দক্ষিণ কম্যুনিষ্টরা যেমন নীতি-হীনভাবে অকম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আঁতু করে কম্যুনিষ্ট নীতির প্রতি বিবস্ততার শৈথিল্য দেখিয়েছেন; তেমনি আজ তাঁদেরই শক্তি ধার করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পর কম্যুনিষ্ট খেদাও আন্দোলনে যে কংগ্রেসভাগীরা মাতছেন, তাঁরাও বিবস্ততার ভদ্রতার ধার ধারেন না। মোন্দা কথা তাই সে-ই একই জায়গায় দাঁড়াচ্ছে, নীতি-ফাঁতি ফাল্গু কথা রাজনীতি আসল। ক্রান্তি দল আগামীকাল কংগ্রেসে মিশে গেলেও তার পক্ষে রাজনৈতিক হাফি প্রদর্শনে বেগ পেতে হবে না তাঁদের।

আন্তর্জাতিক



অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মস্কোর রেড স্কোয়ারের প্যাংক্রেডে যোগদানকারী অশ্বারোহীদের একাংশ

ব্রাহ্মসংঘ :

পশ্চিম এশিয়া

পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাটা সমাধানের পথে এক ধাপও আর এগাতে পারে নি। বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন আরব-ইসরায়েল সম্পর্কটা তিক্ততর হচ্ছে। ইসরায়েলী মনোভাবও দিন দিন কঠোর হতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ স্পষ্টতই সে লক্ষ্যের মাল পুরোমাত্রায় ভোগ করতে চায়, যুদ্ধ করে যে আরব-ভূমি দখল করেছে তা ছেড়ে আসতে রাজী নয়। এমন কি পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লেভি এশকল সদর্পে বলেছেন যে, ইসরায়েলী সৈন্যরা যুদ্ধ করে যে আরব-ভূমি জয় করেছে সেখানে ইসরায়েলের দখলদারী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট থাকবেন। এ যুদ্ধকে ম্যায়ের যুদ্ধ বলেও তিনি আখ্যা দিয়েছেন, কারণ আগে নাকি ওই জমি অন্যায়ভাবে আরবদের ভাগে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষকে তিনি আরবদের সামরিক আক্রমণ বলেছেন এবং সেই যুদ্ধের ফলে যে সীমানা স্থিরীকৃত

হয়েছিল তাকে নাকচ করে দেওয়া নাকি ইসরায়েলের পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল।

ইসরায়েল পশ্চিম এশিয়া সমস্যার সু-মীমাংসার জন্যে একটা বিষয়ের ওপরেই জোর দিচ্ছে। সেটা হলো : আরব-ইসরায়েল প্রত্যক্ষ শান্তি আলোচনা। উদ্দেশ্য আর কিছই নয়, ইসরায়েলের মতলব হলো ওই শান্তি আলোচনার নাম করে আরব রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে ইসরায়েলকে পূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হোক। সেজন্যেই ইসরায়েল দু' পক্ষের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে কোনরকম উদ্যোগও উৎসাহ দেখাতে চায় নি।

তাই বলে রাষ্ট্রসংঘ নিষ্ক্রিয় নেই। স্থিতিপরিষদে দু'টো প্রস্তাব ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে। একটি এসেছে ভারত, মালি ও নাইজেরিয়ার পক্ষ থেকে, অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ভারতীয় প্রস্তাবে প্রথমেই যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে, তারপরে ইসরায়েলকে ওই জুনের পর্ববর্তী সীমারেখার তার সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। ইসরায়েল এ প্রস্তাব মেনে নিলে তবে সুয়েজ এবং

আকাবা দরিয়ায় ইসরায়েলী সাধারণ জাহাজ চলাচলের অধিকার মেনে নেবার কথা বলা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব স্থিতিপরিষদে রাখা হয়েছে তাতে কোন পক্ষের নাম না করে দখলদারী সৈন্যদের সরিয়ে নেবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসরায়েলকে পুষ্টাপুষ্ট আরব-ভূমি ত্যাগের নির্দেশ মার্কিন প্রস্তাবে নেই। এখানে বরং আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দু' পক্ষকেই একই বন্ধনীর মধ্যে ফেলা হয়েছে। স্বভাবতই এ প্রস্তাব সংযুক্ত আরব মেনে নিতে পারে নি। অপর পক্ষে ইসরায়েলও ভারতের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। ফল হয়েছে এই যে, স্থিতিপরিষদে পশ্চিম এশিয়া আলোচনা সুদূর হবার আগে পরিস্থিতি যা ছিল, আলোচনার পরেও ঠিক তাই রয়ে গিয়েছে। স্থিতিপরিষদে ভারতের কিম্বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন প্রস্তাব গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত তা খোপে টিকতো কি না সন্দেহ। কারণ, সেক্ষেত্রে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফরমোজা ভেটো প্রয়োগ

করতো কিম্বা সোভিয়েট ইউনিয়ন। স্বাধীন-পরিষদ থেকে প্রস্তাবদ্বিটি সাধারণ পরিষদে গেলেও অবস্থার বিশেষ হের-ফের হবার আশা কম এজন্য যে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র সর্বোচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সেই স্বাধীনপরিষদ যেখানে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের ওই দুই প্রস্তাবের কোনটিতেই একমত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

এ-অবস্থায় সমাধান কোন পথে? কাম্মার সমস্যা থেকে পশ্চিম এশিয়া সমস্যা পর্যন্ত কোন বড় রকমের প্রশ্নেরই মীমাংসা রাষ্ট্রসংঘ করতে পারে নি। ফলে এই বিশ্ব সংগঠনের মর্যাদাই আজ ক্ষুণ্ণ হতে চলছে। ইসরায়েল যে অন্যায়ভাবে অপর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর আঘাত করেছে, আক্রমণ চালিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র গ্রাম করে নিয়েছে তা দিবাংলার মত স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ ইসরায়েলকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। তবে কি রাষ্ট্রসংঘ লুটেরাকেই প্রশংসা দেবে? সাম্প্রতিক আরব-মনে এ প্রশ্নটাই বড় করে দেখা দিয়েছে। তারা হয়তো রাষ্ট্রসংঘ এর পরে সরাসরি এ প্রশ্নই হাজির করবে যে, আক্রমণকারী কোন দেশকে তার আক্রমণ বা লুটের মালকে ভোগ করতে দেবে কি না। অবশ্য সেখানেও আবার যুক্তিতর্ক উঠবে, আক্রমণ, লুট এ সব কথা থেকে প্রস্তাব থেকে বাদ দেবার চেষ্টা চলবে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ যদি বার বার তার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় তবে তো প্রশ্নটির মীমাংসার ভার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। শান্তি আলোচনার মাধ্যমে তা যে সম্ভব নয়—এ কথা বলি না। কিন্তু তার চেয়েও বেশি সম্ভাবনা আবার শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। বারদ তো সুয়েজের উভয় তীরেই শূন্যে রয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

রশ্মি

প্রচণ্ড বাধা, ঘোর বিপত্তি, চরম শত্রুতা সত্ত্বেও ৫০ বছর টিকে থাকার গৌরব ও কৃতিত্ব অসামান্য বৈকি। তাই সোভিয়েট বিপ্লবের সুবর্ণজয়ন্তীতে লাখ লাখ রুশ তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, শিশুর দল আনন্দে ফেটে পড়েছে। স্বাধীনতা বিপ্লবী সরকারের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা কামেনভ বলেছিলেন, 'আমরা সরকার টিকিয়ে রাখতে হয়তো পারবো না'। স্মরণ

লেনিন গোড়ার দিকে ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েট সরকার হয়তো ৭২ দিনের প্যারিস কমান্ডেরই মত স্বল্পস্থায়ী হবে। কিন্তু 'আশ্চর্য' রুশ প্রমিত কৃষক সাধারণ লোকের মনোবল। আন্তর্জাতিক বিরোধিতা ও বাইরের শত্রুতার বাধাকে চূর্ণ করে সোভিয়েট বিপ্লব আজ ৫০ বছরে পড়লো। সারা পৃথিবীর ওপর অক্টোবর বিপ্লবের যে প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে এমনটি আর কখনো হয় নি। কারণ দুনিয়ার নিপীড়িত নিষ্প্রাণিত অত্যাচারিত শোষিতের দল ওই সোভিয়েট বিপ্লবের দৃষ্টান্ত থেকেই নিজদের দেশে স্বর্গ ক্ষমতার প্রেরণা লাভ করে আসছে।

এই ৫০ বছরে সোভিয়েট রাশিয়া বৈশ্বিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে তা এক কথায় কল্পনাতীত। জাতির আমলে রাশিয়া ছিল একটা পোছিয়ে পড়া সামন্ততান্ত্রিক দেশ, আর এই ৫০ বছরে সে মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে শিক্ষণ, কৃষি বিজ্ঞান, শিক্ষা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেরা প্রমাণিত হয়েছে। তার সমকক্ষ আজ ভামাম দুনিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কে আছে। সমাজতন্ত্রের এই অভূতপূর্ব সাফল্যই এই অদর্শের প্রতি মানুষকে প্রাশংসনীয় করে তুলেছে।

কাজেই আজ অক্টোবর বিপ্লব উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে পৃথিবীর কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক এবং জোট-নিরপেক্ষ ও অকমিউনিস্ট ৯৫টি দেশ থেকে রাষ্ট্রনেতারা এসেছেন এ-উৎসবে যোগদান করে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্যে সোভিয়েট বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন সাফল্য। যুগোশ্লাভিয়া থেকে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট টিটো, রুম্যানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই কিউসেস্কু, ফিনল্যান্ডের উরহো কেকোনেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী কোসিগিনের বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। সোভিয়েট বিপ্লবের গৃহগান এবং উৎসবের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছেন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রনেতাই—এমন কি চীনও এক বাক্যের একটা বাণী পাঠিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

উৎসবের বর্ণাঢ্য শোভা দেখে শ্রীমতী গান্ধী মুগ্ধ বিস্মিত। আনন্দ্যানিক সভায় শ্রীমতী গান্ধীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন সোভিয়েট সরকার। সভামঞ্চে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ছিল প্রেসিডেন্ট টিটোর পাশেই। শ্রীমতী গান্ধীই হচ্ছেন এশিয়ার অ-সমাজতান্ত্রিক দেশের একমাত্র সরকার-প্রধান অতিথি। আবার ফিনল্যান্ড ছাড়া অ-কমিউনিস্ট দেশেরও তিনিই একমাত্র সরকার-প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। বিচিত্র রঙে সজ্জিত সভামঞ্চে একমাত্র

সাংগঠনিক বসুমতীর মূল্য বৃদ্ধি

'সাংগঠনিক বসুমতী'র জনপ্রিয়তা

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম বাংলা, শহরাকল এবং বহির্বর্ষেও সাংগঠনিক বসুমতীর কথা এখন সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মুখে মুখে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাংগঠনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র সাংগঠনিক বসুমতীই জনসাধারণের মনের খবর অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করে আসছে।

ইতিমধ্যে আমরা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করেছি, বহু বিচিত্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংযোজন করেছি। এর ফলে আনুমানিক দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নি।

১৯৬৩ সালে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হওয়ার পর সংবাদপত্র শিল্প একটার পর একটা গভীর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস, নিউজ প্রিন্ট সরবরাহের আত্যন্তিক কড়া কড়ি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে অন্যান্য পত্রিকার মত এই পত্রিকাও আর্থিক দুর্গতির মধ্যে চলেছে। তবু পাঠক সাধারণের অবস্থার কথা ভেবেই আমরা এতোদিন ভরসার ঝুঁকি নিয়েও ২৫ পরমা মূল্যে পত্রিকা নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করেছি। কিন্তু দীর্ঘদিন এই ঝুঁকি নিলে পত্রিকার মানোন্নয়ন ক্ষুণ্ণ হবে—এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না।

এমতাবস্থায় আমরা আগামী ডিসেম্বর মাস, ১৯৬৭ থেকে পত্রিকার নামমাত্র মূল্য বৃদ্ধি করে পঁচিশ পরমার পরিবর্তে ত্রিশ পরমা করতে বাধ্য হচ্ছি।

আশা করি, অনুরাগী গ্রাহক ও পাঠক সাধারণ পত্রিকার আর্থিক অবস্থা বিবেচনাস্তে আমাদের সঙ্গে পূর্ববৎ সহযোগিতা দান করবেন।

কর্মীদ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক
বসুমতী

বিশিষ্ট অতিথিদেরই বসার সুযোগ ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। ক্রেমলিনের সভার পর মিঃ কোসিগিন শ্রীমতী গান্ধীকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আলোকমালা এবং বিচিত্র সজ্জা দেখালেন। সমস্ত প্রধান প্রধান সোভিয়েট পত্র-পত্রিকায়ও ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

অক্টোবর বিজয় সপ্তর্ষজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে লুক লুক সোভিয়েট তরুণ-তরুণী শোভাযাত্রা করেছে, প্রতিরক্ষার তিনটি শাখারই প্রতিনিধিরা সভ্যদের সামনে দিয়ে মার্চ করে গিয়েছেন। আর দেখানো হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বাধুনিক ও প্রচণ্ড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ট্যাঙ্ক, রকেট থেকে শত্রু করে ক্লেপগাস পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তাঁর বক্তৃতায় ৫০ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েট সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার শপথ নেন। তিনি প্রসংগত পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত ও সংগ্রামী মানবের পাশে তাঁর দেশ দণ্ডায়মান বলেও ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশগুলোকেও সাবধান করে দেন যে তাদের চক্রান্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে।

বুটেন:

লন্ডন

প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন একটা ঘোর প্রতিকূল অবস্থায়ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন লর্ডস সভার ক্ষমতা হ্রাসের প্রস্তাব করে। মাত্র গত সপ্তাহে ফিনটি উপনির্বাচনের দুটো নিরূপাদ আসনই শ্রমিকরা হারিয়েছে, ওদিকে বুটেনের সংবাদপত্র জগন্দের চুড়ামণি লর্ড উইলসনের সঙ্গে কণ্ঠা-বাধিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন অহেতুক সরকারের মর্ষাদাহানি ঘটিয়েছেন। কমন মার্কেটেও তার প্রবেশ এখনো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কাল্পনিক প্রেসিডেন্ট দ্য গল শাসিয়েছেন যে, বুটেনের প্রবেশপথে তিনি আবার কাটা বসাবেন। কিন্তু চারদিক থেকে সরকারের সমালোচনার ঝড় উঠলেও তারই মধ্যে মিঃ উইলসন ঘোষণা করেছেন যে হাউস অফ লর্ডস-এর ক্ষমতা খর্ব করা হবে। হয়তো



উইলসন

বুটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার জন্যই প্রধানমন্ত্রী নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

একথা সত্যি যে লর্ডস সভা আজকের গণ-জাগরণ বা গণতন্ত্রের যুগের পক্ষে অচল, একটা প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। অস্বীকার করি না যে একদিন ১২১৫ সালে ম্বরাচারী রাজা জন-এর কাছ থেকে ওই হাউস অফ লর্ডসই বিখ্যাত ম্যাগনা কার্টা বা মহাসনদ আদায় করেছিলেন। গোটা উনিশ শতক পর্যন্ত এই সভার প্রভাব-প্রতিপত্তি



লর্ডস

১০৬২

অপরিসীম ছিল। কিন্তু দিন বদলেছে। সে জামান আর নেই। এখন নির্বাচনের যুগ, জনগণ ভোটের দ্বারা স্বাদের নির্বাচিত করবেন রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের ভারও তাঁদের ওপর নাস্ত দেখতে চায়। তাই দাবি উঠেছে লর্ডস সভার ক্ষমতা হ্রাসের। এ দাবি আংশিকভাবে প্রথম মীটানো হয়েছিল ১৯১১ সালে যখন প্রথম আন্দোলনের মধ্যে কমন্স সভা বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিম্নতর পরিষদে পাশ-করা বিল লর্ডস সভায় দু' বছরের বেশি ফেলে রাখা বন্ধ করা হল। তারপর ১৯৪৯ সালে ওই বিশেষ পদবিধা আরো এক বছর হ্রাস করা হল। ১৯৫৮ সালে যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতার আসীন তখন শিক্ষা, বিজ্ঞান বা বিশেষ ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি নারী-পুরুষকে চিরদিনের জন্য লর্ড সভার সদস্য করার জন্যে আইন পাশ করা হয় শ্রমিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও।

কিন্তু এ-দাবি বুটেনে বরাবরই সোচ্চার ছিল যে, আজীবন লর্ড সভার সদস্যপদ দানের প্রথা বন্ধ করা হোক। তার ক্ষমতা আরো কমানো হোক, লর্ডদের বিশেষ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হোক। আজ লর্ড সভার মোট সদস্য হচ্ছেন ১০৪৫ জন। এদের মধ্যে আরম্ভের আজীবন সদস্য হলেন ৮৬৫ জন, স্বাদের পুত্র-পৌত্রাদি পূর্বদানক্রমে লর্ড সভার সদস্যপদ পাবেন। এ ছাড়া চার্চ অফ ইংল্যান্ডের ২৬ জন বিশপ আধ্যাত্মিক লর্ড হিসেবে এ-সভায় স্থান গ্রহণ করেন, ১৯৫৮ সালে আইনের দ্বারা ১৫৪ জনকে আজীবন লর্ড করা হয়েছে।

মিঃ উইলসন প্রস্তাব করেছেন যে, লর্ড সভা এখন থেকে ৬ মাসের বেশি কোন বিল আটকে রাখতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত বংশানুক্রমিক লর্ডও আর কেউ থাকতে পারবেন না, সরকার ব্যক্তিগতভাবে গণগণণ বিচার করে লর্ড সভার সদস্যপদ দেবেন। ফলে লর্ড সভা থাকলেও তার সদস্যসংখ্যা ৩০০-র নৈমে আসবে বলে মনে হয়।

ভারতবর্ষে যখন প্রাক্তন রাজা-মহারাজাদের রাজন্যভাষা ও সুযোগ-সুবিধেগুলো হরণ করার পথে হিমসিম খাচ্ছে তখন বুটেনে লর্ড সভার বিরুদ্ধে শ্রমিক সরকারের ব্যবস্থা লক্ষ্য করার মত। তবুও বুটেনে কিন্তু আজও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, আর আমাদের ভারত নাকি সর্ববহু গণতন্ত্রের দেশ।



যেহেতু ছোটবেলা থেকেই
জন্মের দৃষ্টিতে দেখান।

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!

প্রতিদিনের স্বক পরিচর্যা তাঁর এই অপূরণ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।

সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসর্ধিনায় অনন্য



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ বোগেশ চন্দ্র বোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের কৃতপূর্ণ অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডঃ নরেন্দ্রচন্দ্র বোষ,
এম.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদচর্চা



**সাধনা
বিউটি
ক্রীম**

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীমুখারঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পাঠ ॥

লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের ঘরে ইন্সওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করা ছিল খুব সহজ। আমার জ্ঞানমতে লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের ঘরে কোনো কেসেই ইন্সওরেন্স কোম্পানী জ্বলাভ করতে পারে নি। লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের মতে পলিশিটা গছাবাব সমস্ত কোম্পানীর এক্সেটরা এসে লোকের হাতে পায়ে ধবে এবং নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু তাবপর যখন বীমাকারীর মৃত্যু হয় তখন টাকা না দেবার নানা ফাঁকড়া তুলে হরবান করে দেয়। লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের মনোভাব দেখে জর্নিয়াররা—কেউ কেউ অনুমান করতেন যে কোন সময় কোন ইন্সওরেন্স কোম্পানী জঙ্গ সাহেবকে বোধ হয় ঠকিয়ে থাকবে। যে কারণেই হোক, সব কৌশলীই ব্যগ্র হয়ে থাকত যে তাব ইন্সওরেন্স মামলাটা যেন লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের ঘবেই ওঠে। উঠতও তাই। কেন না ইন্সওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাবি সর্বদাই “Liquidated claim” বলে মার্ক করা হতো এবং লর্ড উইলিয়ামস সাহেব নিতেন “Commercial ও Liquidated claim” এর সব মামলা। আমি কবেকটা ইন্সওরেন্স কেসে লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের কোর্টে হাজির হয়েছিলাম। দুটো কেসের কথা যা অল্প অল্প মনে আছে তা এইখানে বলে রাখি।

প্রথম কেসটা ছিল ফায়ার ইন্সওরেন্সের কেস। সেটাতে আমি ছিলাম শৈলেন ব্যানার্জী সাহেবের জর্নিয়ার। উত্তর কলকাতায় অনেক পাটের গদাম আছে। একটা গদামে অসংখ্য পাটের কাঁচা কি পাকা বেল রাখা হয়েছিল। তাব মালিক সেই পাটের বেলগুলির জন্যে একটা ফায়ার ইন্সওরেন্স পলিসি নিয়েছিলেন। পাটের গদামটা ছিল পেঞ্জার

উঁচু এবং অনেকগুলি খুপবী ভাঙে ছিল। খুপবীগুলোর মাঝে খুব চওড়া পার্টিশন দেয়াল একেবারে ছাদ পর্যন্ত। প্রত্যেক খুপবীর চারিদিকে ফুটোগুলি সীসে দিয়ে সীল করা জলের পাইপ লাগান। আগুন লাগলে গবমে সেই সীসে গলে গিয়ে আপনি জল পড়তে আরম্ভ করবে যাতে করে সামান্য আগুন হলে সহজেই নিভে যাবে। সেই গদামেব সব কাঁচা খুপবীতেই টান টান পাটের বেল সাজান ছিল একেবারে ছাদ পর্যন্ত। পলিসি বেরবার অল্প পবেই একদিন রাতে সেই পাটের গদামে লাগল আগুন এবং সব কাঁচা খুপবীই সমস্ত পাটের বেল পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ক্ষতিপূরণের দাবি পড়তেই কোম্পানীর লোকজনেবা গদাম চড়াও করে ফেলল “Salvage” কববার দোহাই দিয়ে। Salvage-এব কোন প্রশ্নই ছিল না, কেন না জিনিসটা দাঁড়িয়েছিল সব পুড়ে (total loss) পর্যায়ে। কোম্পানী টালবাহনা কবে টাকা না দেওয়ার বীমাধারীকে কোর্টে আসতেই হোলো টাকা আদায়ের জন্যে। কোম্পানীও মামলায় হাজির হোলো। জবাবদায়ার কোম্পানী দুটা ওজর তুলল যে বীমাধারী তাব বীমার দখলান্তে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছেন দুই বিষয়ে। প্রথম দফা হোল যে বীমাধারী তাব দখলান্তে বলেছিলেন যে, পাটের গদামে সীসে দিবে বজ্রানো জলের ফুটো করা পাইপ আছে। সেটা মিথ্যে কেন না জলের পাইপ ছিল না কিংবা থাকলেও তা কাজের লাগেই ছিল না। দ্বিতীয় দফা হোল যে বীমাধারী তাব দখলান্তে বলেছিলেন যে, গদাম-গুলির খুপবীগুলি একেবারে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ একটা খুপবী থেকে অন্য খুপবীতে যাতায়াতের কোন দবজা, জানালা বা ফাঁক নেই। এই আশ্বাসও মিথ্যে, কেন না গদামটার খুপবীর মধ্যে যে পার্টিশন দেয়াল আছে তার মাঝায় ছাদের কাছ

বরাবর একটা কবে ঘুলঘুলি ছিল এবং সেই ঘুলঘুলি দিয়ে এক খুপবী থেকে আগুন অন্য খুপবীতে প্রবেশ করেছে এবং সারা গদামটা পুড়ে গেছে। প্রথম ওজরটার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া শস্ত হোল না। যে কন্ট্রাক্টর ওই গদাম করেছিলেন তাঁদের আফিসের লোকেরা সাক্ষী দিয়ে গেল যে ফুটো করা জলের পাইপ গদামের প্রত্যেক খুপবীতে লাগান ছিল। তাব উপর প্রমাণ করা গেল যে হামেশাই সেই সব পাইপ ইন্সপেকশন কবে দেখা হয়েছে যে, পাইপের ফুটোগুলি সীসে ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ ছিল না এবং আগুনে পোড়া পাইপের টুকরো থেকেই দেখা গেছে যে ফুটোগুলোর সীসে গলে গিয়েছিল। গেরো হোল দুই দফা ওজর নিবে। কোম্পানীর সাক্ষীবা বলে গেল যে, দুই খুপবীর মাঝখানে যে পার্টিশন দেয়াল ছিল তার মাঝামাঝি জায়গায় একেবারে প্রায় ছাদের কাছ বরাবর একটা করে গোল ফুটো ছিল। আমবা ত’ প্রমাণ গণলাম। গোল ফুটো যদি থেকেই থাকে, তবে ত’ তাই দিয়ে আগুন এক খুপবী থেকে অন্য খুপবীতে যেতেই পারে এবং তাহলে ইন্সওরেন্সের দখলান্তে যে বলা হয়েছিল একটা খুপবী থেকে অন্য খুপবীতে যাতায়াতের কোন পথ বা ফুটো (inter communication) ছিল না সেটা তবে ত’ মিথ্যেই হয়ে গেছে কেস যায়। এমন সময় শৈলেন ব্যানার্জী সাহেব জেরা করে চলেছেন। প্রত্যেকটা পার্টিশন দেয়াল ছিল দাবুণ চওড়া। গদামটা ছিল ভীষণ উঁচু। খুপবীগুলি ছিল অপ্রশস্ত, ছোট বলজেই হয়। কোম্পানীর সাক্ষী এসব মেনে নিলেন। তখন শেষ প্রশ্ন হোল : “দুই খুপবীর মাঝখানের পুঁদু পার্টিশন দেয়ালের ঐ উঁচু মাঝায় যে সৌন্দর্যের জন্যে (ornamental) গোল ঘুলঘুলির মত ফুটো চুন বালিতে দেখান হয়েছিল সে ফুটোগুলি দেয়ালের এ-পাঠ-ও-পাঠ

চলে গিয়েছিল কি না তা সাক্ষী অপবিসয় খুঁপবীর মেঝেতে দাঁড়িয়ে কি দেখতে পেয়েছিলেন?" সাক্ষী বললেন যে ফুটোটা এপিঠ থেকে ওপিঠ ফুড়ে গিয়েছিল কি না তলা থেকে তা দেখা সম্ভব নয়। তবে যখন ঘুলঘুলি ব মত খাঁজ ছিল তখন গিবেই থাকবে। অমনি জজ সাহেব বললেন, "গিয়েই থাকবে বলে সাক্ষীর অনুমান করবার দরকার নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ফুটোগুলি এপিঠ-ওপিঠ ফুড়ে গিয়েছিল কি না তা তিনি তলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলেন কি? এর ত' সহজ ছবাব হ্যাঁ, কি, না। কি বলতে চান আপনি?" সাক্ষী কি বলবেন? খানিকটা ধতমত থেমে বললেন "তলা থেকে তা দেখা বেতে পারে না।" জেবা শেষ হলো। কোম্পানির আব কোন সাক্ষী নেই। কোম্পানির কৌসলী অনেক বহাস কবলেন যে ঘুলঘুলি কেন করা হয়েছিল, যদি না হাওয়া চলাচলের জন্যে হয়ে থাকে? ঘুলঘুলি যখন ছিল তখন সেটা নিশ্চয়ই এপাব ওপার ফুটো ছিল। জজ সাহেব তখনই রায় দিলেন যে প্রথম দফার ওজরের কোনো ভিত্তিই নেই এবং বাদীর সাক্ষীতে বেশ প্রমাণ হয়েছে, এবং সে সাক্ষীদের জজ সাহেব বিশ্বাস করেন—যে সাক্ষী দিয়ে বন্ধ করা ফুটো জলের পাইপ সারা গদামেই ছিল। তিনি আরো বললেন যে, যে সাক্ষীসাব্দ কোর্টের কাছে আনা হয়েছে তাতে কবে বিশ্বাসহীন হয়ে বলা যায় না যে খুঁপবীরগুটির মধ্যে এপাব-ওপার কোন ফুটো ছিল। বাদীর স্বপক্ষে ভিত্তি হোলো পুরা টাকার জন্যে মায় মামলার যাবতীয় খরচা।

দ্বিতীয় কেসটাখ আমিই ছিলাম বড় কৌসলী। সেটা ছিল জীবনবীমার কেস। আমাব সঙ্গে জুনিয়র ছিলেন কে মনে নেই। অপব পক্ষে ছিলেন স্বয়ং এ্যাড-ভোকেট জেনারেল স্যার সুধাংশু বোস। সে কেসটাতে কোম্পানির জবাবদাওয়ার ওজর তোলা হয়েছিল (১) যে বীমার দখলান্ত বীমাধারী একেবারে চেপে গিয়েছিলেন যে, অন্য কি একটা কোম্পানি তাঁর বীমাব দখলান্ত মঞ্জুব করে নি। এবং (২) যে তিনি অন্য দুটো কোম্পানিতেও জীবনবীমা কবেছিলেন। প্রথম জিনিষটা জানালে এই কোম্পানি হয়ত এ বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হতেন না এবং দ্বিতীয় কথাটা বললেই দেখা যেত বীমাধারী তাঁর আর্থিক সামর্থ্যের বেশি প্রিমিয়াম দিয়ে জীবনবীমা করেছিলেন। দুটোই মোক্ষম "non-disclosure of material fact". তার উপর বীমাধারী কদিন পবেই মারা গেলেন। কোম্পানির বক্তব্য হোলো যে সত্য গোপন করে একটি-মুদ্রার ব্যক্তি

দিয়ে জীবনবীমা করা হয়েছিল টাকার লোভে। আমার এটর্নী ছিলেন টি, বি, রায় বোধ হয়। তাঁর আফিসেব শৈলেন দে মামলাটাব তদ্বির কবতেন এবং কোর্টে আমাকে পরামর্শ দিতেন। একটা জিনিষ খুব মনে আছে। আমাদের মক্কেল, যাকে বীমাধারী পলিশিটাকে দান করে গেছেন, তিনি রোজ লর্ড উইলিয়ামস সাহেবের ঘরে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েই থাকতেন। কপালে তাঁর থাকত বড় কবে ফোটা আঁকা কালীঘাটের তেল-সিঁদুর এবং তিনি সারাটাক্ষণ জজসাহেবের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন। মনে মনে মন্ব পড়তেন কি না কে জানে। মামলাটা যখন চলছিল কোম্পানিব ছোট কৌসলী আমাকে ভয় দেখাতেন যে, আমার মক্কেলটি জেলেই যাবেন। যায ত' মক্কেলই যাবে। আদি কি করতে পারি। ব্রীফ ফেলে ত' পালাতে পারি নে। সাক্ষীর জবাববন্দী সুরু হোলো। দেখা গেল যে খুব কাছাকাছি মৃত বীমাধারী বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে জীবনবীমা কবেছিলেন। ঘটনাটা একটু সন্দেহজনক বটে কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি বীমা করায় আইনেতে কোনো বাধা নেই। একটা কোম্পানি যে তাঁর বীমার দখলান্ত অগ্রাহ্য কবেছিল সেই অগ্রাহ্যের চিঠিটা তিনি পেয়েছিলেন বিবাদী কোম্পানিতে বীমার পলিশি বের হবার পরে। সুতরাং এই ঘটনাটা চেপে যাবাব প্রশ্নই ওঠে না, কেন না এই মামলার বিষয়ভূক্ত বীমাটাব দখলান্তেব সময় এবং এমন কি পলিশি বেরবার সময় পর্বন্ত সেই অন্য দখলান্তটা অন্য কোম্পানি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় নি।

সুতরাং কোন সত্য গোপন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হোলো মামলাটা কোম্পানিতে যে ইন্সওরেন্স করা হয়েছিল সে কথা চেপে যাওয়া হয়েছিল দখলান্তের মধ্যে সত্য-সত্যই নেই। বলা হয় নি। তবে? অন্য কোম্পানির সাক্ষীদের ডাকলাম। তারা বক্তব্য দে বীমাধারী তাদের কোম্পানিতে জীবনবীমা কবেছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য প্রমাণ কবেছেন তাঁর ঠিকুজী-কুঠি দিয়ে। ঠিকুজী-কুঠিটা দেখিবে জিজ্ঞাসা করা য়ে, এইটেই কি সেই ঠিকুজী? সাক্ষী ঠিকুজীটা নেড়েচেড়ে বললেন— "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ত' আমাদের কোম্পানির সীলমোহব। যখন বয়স মেনে নেওয়া হয় ঠিকুজীর ভিত্তিতে তখন ঠিকুজীর উপরে কোম্পানিব সীল ও তারিখ দেওয়া হয়। একজিবিট করা গেল সেই ঠিকুজীটা সীল সমেত। অন্যান্য কোম্পানির দোকান দিয়ে তাদের নিজ নিজ কোম্পানিব সীলগতি প্রমাণ করা হোলো। তারপর সেই প্রমাণ হয়ে গেল যে বিবাদী কোম্পানি কাছের এই ঠিকুজীটাই সব সীল সমেত দাখিল করা হয়েছিল এবং বিবাদী কোম্পানিব সীল ও তারিখ হেরে পপটাই দেখা গেল যে, যখন ঠিকুজীটা বিবাদী কোম্পানিতে দাখিল হবেন তখন তাতেই সেই ঠিকুজীটাতে অন্যান্য সব সীল কোম্পানির সীল পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং বিবাদী কোম্পানি নিজের পলিশি দেওয়া আগেই জেনেছিল এ সব ইন্সওরেন্স কোম্পানিতে জীবনবীমার কথা। এই সব জেনেশুনেও বিবাদী কোম্পানি বীমাধারীর কাছ থেকে দু-দুবার প্রিমিয়াম

সুদলিত ভাষায় সম্মোপযোগী আইনের বই

পরেখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভারতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সঙ্গতি ও নাগরিক অধিকার

(কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুব্রজচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত)

মূল্য : ৪

পরেখ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য বই

১। ন্যায় পণ্ডাৎ ও ফৌজদারী মামলার বিচার

৪

২। A Handbook of Industrial Employment (Foreword by Justice Arun Kumar Mukherjea Bar-at-law)

Rexine bound

Rs. 6/-

৩। Evidence in Criminal Cases (with full text of Indian Evidence Act 1872).

Ordly.

Rs. 8/50

Rexine Bound

Rs. 7/50

৪। After School.

Rs. 0/50

ডাক মাশুল লাগিবে না

PURNA PUBLISHING HOUSE

P-10/261, Kalyani, Nadia, (W. Be)

নিয়মে। প্রিমিয়ারমেন রাসদগলো দাখিল
করলাম সওয়াল-জবাব হোলো। আমার
বক্তব্য হোলো যে বামাধারী বেশি
লেখাপড়া জানে না। ক্রমে ক্রমে
অক্ষরে দরখাস্তের মধ্যে কি লেখা
ছিল সে নিশ্চয়ই জানত না। তা ছাড়া
কোম্পানির এজেন্ট যেমন yes কি no
বলেছে সেই রকমই লিখেছে। কোম্পানির
এজেন্টগলো এই বকম কবেই ফর্ম ভর্তি
কৰিবে নেয তাড়াহুড়ো কৰে। তা ছাড়া
যদি কোন কথা গোপন করা হবেই থাকে,
তবে সে কথা যখন কোম্পানি জানল
তখনও জেনেশুনে কোম্পানি প্রিমিয়ার
নিয়মে এবং তাতে কবে কোম্পানি কথা
গোপন করাব অপরাধ আপাই (waive-ই)
করেছে। বসে পড়লাম। কোম্পানির তরফে
এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব সওয়াল-
জবাব করলেন। জজসাহেবের রায়ে বাদী
জিতে গেল ওই waiver-এই অজুহাতে
পুরো টাকা ও খবচার ডিক্রি হোলো
আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।
ইন্সপেক্টর জেনারেল কেসের মজাই হোলো যে
একবার হেরে গেলে কোম্পানি পারংপক্ষে
আপালি করে না, ইন্সপেক্টর জেনারেল
কলকাতা হাইকোর্টে এক জজ ছিলেন
আর্থার পেজ যার সঙ্গে একবার শরৎ
বোস সাহেবের ভীষণ সন্ধ্যা হয়েছিল।
সে কথা শু' আগেই বলেছি। সেই আর্থার
পেজকে নাইটহুড দিয়ে রেংগুন হাইকোর্টে
বদলী করা হয়েছিল চীফ জাস্টিস কবে।
রেংগুন হাইকোর্টে এক জজ ছিলেন
John Cunliffe বলে। তিনিও Sir
উপাধিভূষিত ছিলেন। বিলেতে Cunliffe
পরিবার বেশ নামকরা পরিবারই ছিল।
সেই স্যার জন কানলিফ সাহেবের সঙ্গে
চীফ জাস্টিস স্যার আর্থার পেজ
সাহেবের নাকি বনিবনাও হোতো না এবং
এমন কি একেবারে আদার কাচকলার
হলেও চলে। বাইবে থেকে স্যার জন
কানলিফের ব্যাডের উপর দিয়ে উড়ে এসে
চীফ জাস্টিস হবে পড়োছিলেন বলেই
হয়ত স্যার আর্থার পেজকে কানলিফ
সাহেব অপছন্দ করতেন। ঝগড়া যখন

খুব জোর হয়ে উঠল তখন স্যার জন
কানলিফকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলী
করে নিয়ে আসা হোলো। তখনকার
রেওয়াজ অনুসারে কানলিফ সাহেব
কলকাতাব সব ক'জন জজের নিচে স্থান
পেলেন সিনিয়রিটি হিসেবে। এতে করে
কানলিফ সাহেবের মন-মেজাজ যে খুব
সরিফ থাকবে না তাতে আর সন্দেহ কি।
তিনি তেমন কাজে মন দিতেন না।
দিনের প্রথমার্ধে যাও বা কান পেতে
অন্তত কৌসূলীদের বহাস একটু
শুনতেন, বিকেলের দিকে তিনি প্রায় চোখ
বুজেই থাকতেন। দুপুরের পানাহাবটার
আধিক্যের জন্যেই বোধ হয়। বাই হোক
সেই কানলিফ সাহেব এসে কলকাতা হাই-
কোর্টের আদালত বিভাগেই বসলেন।

জুনিয়ারদের মধ্যে খুব চাপলা পড়ে
গেল। নতুন জজ। যদি কোন কৌসূলী
কোন রকমে জজের নেকনজরে পড়ে যান
তবে আর তাঁকে পাৰ কে। একবার একটা
দেবোত্তরের মামলা এল কানলিফের
এজলাসে। ঐ ধরনের মামলা তখন হাই-
কোর্টে অনেক হিছিল। ঠাকুরের নামে
সেবাসেবত পরিবাসেব এত অব্যবসায়িক
ছোকরাকে কিবা ঠাকুরের মন্দিরে পূজা-
অর্চা করে থাকেন পরিবাসের এমন কোন
নিরক্ষর মহিলাকে নেক্স্ট ফ্রেণ্ড বলে
দাঁড় করিয়ে নালিশ করা হোতো যে
সেবাসেবতটা অভ্যন্ত জোড়োর এবং সে
নিজের খেয়াল খুশিমত দেবোত্তর
সম্পত্তি বেচে বা মর্ডগেজ দিয়ে ঠাকুরকে
ঠিকিয়েছে। সুতরাং সে সব বিব্রি বা
মর্ডগেজ-এব জনো ঠাকুর দায়ী নন এবং
ঠাকুর দাবি করেন যে সে সব দলিল নাকচ
করা হোক। ঐ ধরনের ছোকরা নেক্স্ট
ফ্রেণ্ডকে সে সময় বলা হোতো—
“Moral Jon of an immoral
father.”

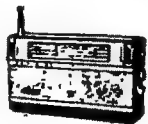
কানলিফ সাহেবের হয়ে যে দেবোত্তরের
মামলাটা এলো তাতে বাদী ছিলেন ঠাকুর
শ্রীশ্রী. কি যেন ঠিক মনে নেই
এবং ঠাকুরের নেক্স্ট ফ্রেণ্ড ছিলেন স্বয়ং
সেবাসেবতবই এক ছেলে। বিবাদী
ছিলেন অনেকগুণি লোক যাঁরা সেই
সেবাসেবতকে টাকা ধার দিয়েছে দেবোত্তর
সম্পত্তি বঙ্গক বেথে বা যাঁরা ন্যায্যমূল্যে
দু-একটা দেবোত্তর সম্পত্তি খরিদ
করেছেন। সবাই উদ্গ্রীব বে, তাঁদের
টাকাটা মাঝাই বা যাৰ বৃষ্টি। এই সব
মামলার কোর্টকে দেখতে হয় যে,
দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা মর্ডগেজ
করবার কোন বৈধ জব্ববী কাবণ
(legal necessity) ছিল কি না,
কিবা যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন তাঁরা শুম্ম
মনে ন্যায্য খোঁজখবর নিয়ে সম্মুখ হয়ে-
ছিলেন কি-না যে সেবাসেবতের দেবোত্তর

সম্পত্তি হস্তান্তর বা মর্ডগেজ করার বৈধ
জব্ববী কারণ ছিল। প্রথম বিবাদীর পক্ষে
ছিলেন সুপরিচিত ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ
প্রবীণ ও সর্জন শ্রমেশ্বর কৌসূলী
হরিদাস বোস অর্থাৎ এইচ, ডি বোস
সাহেব। দ্বিতীয় বিবাদীর পক্ষে ছিলেন
তখনকার দিনের ওরিনজিনাল সাইডের
খ্যাতিমান কৌসূলী বিমলচন্দ্র ঘোষ—
বিগ ফাইভেব বি, সি, ঘোষ। তৃতীয়
বিবাদীর কৌসূলী ছিলেন অবুগ সেন।
চতুর্থ বিবাদী ছিলেন আমার মক্কেল।
আমার মক্কেলের পরেও আরো দুই কি
তিনজন বিবাদী ছিলেন সে মামলার।
তাঁদের তরফে কে কে কৌসূলী ছিলেন
ভুলে গেছি। ঠিক হোলো যে বিবাদীর
তরফে আইনের উপর সওয়াল-জবাব
করবেন এইচ, ডি, বোস সাহেব এবং বাদীর
সাক্ষীদের জেরা এবং রিচ-এর উপর
বহাস করবেন বি, সি, ঘোষ সাহেব।
আব আমরা নিজের মক্কেলের যদি কিছু
বিশেষ বলবার কথা থাকে তা নিয়ে বাদীর
সাক্ষী জেরা করব এবং নিজের সাক্ষী
ডাকব।

মামলা আবশ্য হোলো। বাদীপক্ষে
কৌসূলী মামলাটার ঘটনাগুলি সংক্ষেপে
বিস্তৃত করলেন। কৌসূলী দেবোত্তর
দলিলটা পড়া যেই সুব্দ করবেন ডক্টর
জজসাহেব প্রথম প্রশ্ন করলেন—“স্নাই
স্নাইটা কি?” তাঁকে বোঝান গেল যে,
ওটা বাঙলা দেশের সব দলিলের মাথাতেই
থাকে, কেন না শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়েই
দলিলটা সম্পাদন করা হয়েছে। ওটা
ইংবেজীতে যাকে বলে “invocation”
তাই। জজসাহেব “ও বৃথেকি” বলেই
আবার প্রশ্ন করলেন “দেবোত্তর” কথাটার
মানে কি। তাঁকে বলা হোলো যে মোটা-
মুটভাবে ওটার মানে হবে “dedicated
to God.” বাই হোক ব্যাপারটা এইচ,
ডি, বোস সাহেব তাঁর শেষ সওয়াল-
জবাবে বুঝিয়ে দেবেন। মামলা চলল।
সাক্ষী ডাকা হোলো, প্রথমে বাদীর তরফে।
ঠেসে জেরা করলেন বি, সি ঘোষ সাহেব।
আমরা সামান্য সামান্য ইশ্বন যোগালাম
নিজ নিজ মক্কেলের স্বার্থে যেটুকু বিশেষ
কথা বলবার ছিল সে সম্বন্ধে। বলাই
বাহুল্য যে সেবাসেবতটি উহাই হয়ে
বইলেন। বোধ হয় বাদীর এটর্নী
অফিসেই গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিলেন।
বিবাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষী দিলেন তাঁরা
নিজে বা তাঁদের মনিব গোয়স্তাবা। কি
পরিব্রাতিতে কি খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা
সেবাসেবতকে টাকা দিয়েছিলেন সব অকপটে
জজসাহেবকে বললেন। যদিচ ঠিক ছিল
যে এইচ, ডি, বোস সাহেব এবং বি, সি,
ঘোষ সাহেবই বাদীর বিরুদ্ধে সুব্দ
সওয়ালজবাবটা করবেন আমরা চুনো-

কিস্তিবদ্ধ ট্রানজিস্টার

২৫৫, টাকা মূল্যের ও
ব্যাণ্ড অল-ওয়ান্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টার
“এসকট” মাসিক ২৫.



টাকা কিস্তিবদ্ধে ক্রয় করুন।

Japan Agencies (BW-77)
Post Box 1194, Delhi-6.

টোটা সবাই তাঁর হয়ে এসেছিল। যে একটা বহাসের মত বহাস করব ভেবে। বাপীর কৌশলীর সওয়াল হয়ে গেলে এইচ, ডি, বোস সাহেব দেবোত্তর জিনিষটা কি তাই বোঝাতে আবশ্য করলেন একেবারে গোড়া থেকে। Means Hindu Law, Moores Indian appeal থেকে অদন্ত করে একেবারে হাল নজির পর্যন্ত সব দেখালেন। প্রথমে সঙ্কল্প, পরে সম্পর্ক একে একে জলের মত বোঝা গেল। মোটের উপর কথা হোলো যে মালিক যখন নিজেব সকল স্বার্থ একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্পত্তি ঠাকুরের সেবার নিগূঢ় স্বার্থে সমর্পণ করেন তখনই সে সম্পত্তি দেবতার সম্পত্তি হয়ে যায় এবং তাকেই বলে দেবোত্তর। সেবায়ত্ত সে দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন ঠাকুরের হাথে। সেবায়ত্ত ঠিক মাতৃভাষীর মত ম্যানেজার নন। তাঁর ক্রিষ্ণু বোশ ক্ষমতা আছে, কেন না বৈষ্ণবের অকম্পন সেবায়ত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বা মর্ডগেজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিবাদীরা কড়কড়ে টাকা দিয়েছে সেবায়ত্তকে ঠাকুরের হিতার্থে। বি, সি, ঘোষ উঠে সাক্ষীর জবানবন্দী থেকে এবং দেবোত্তরের হিসেবের খাতা থেকে দেখালেন যে যখন বিবাদীরা সেবায়ত্তকে টাকা দেন তখন ঠাকুরসেবা প্রায় বন্ধই হবার যোগাড় হয়েছিল। সেবায়ত্তের দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা মর্ডগেজ কববার খুবই বৈধ জরুরী প্রয়োজন ছিল। অন্তত বিবাদীরা শ্রদ্ধাচিতে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে যে বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েই টাকা দিয়েছিল। দুই বহাসে বেশ সময় লেগেছিল। ষতদ্ব মনে আছে একদিনেবও বেশ।

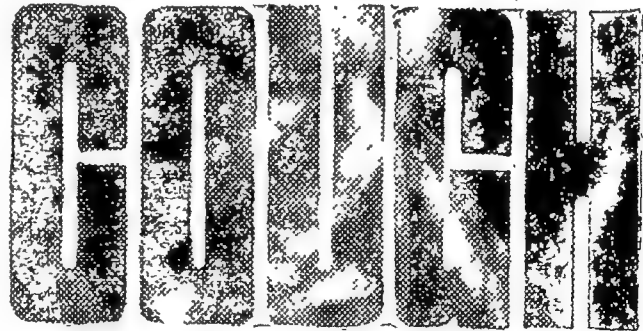
বি, সি, ঘোষ সাহেব বসে পড়তেই তরুণ সেন সাহেব উঠে বেশ ফলাও করে সওয়াল-জবাব সুরু কবলেন। তিনি যখন বহাস কবতে উঠলেন তখন বিকেল হবে গেল। যখন তরুণ সেন সাহেব বহাস কবছিলেন ক্যানালফ সাহেব বাঁ হাতে তাঁর রুমালটা দিবে চোখটা ঢেকে ডান হাতের কঙ্গটা তাঁর নোট বইয়ের উপর রেখে নিনেন। যখন অরুণ সেন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল জবাব কবলেন তখন কানালফ সাহেব, অগাদেব মনে হোলো, যেন ফিক কবে একটু হাসলেন। অল্প পবেই বলেন—“সিঃ সেন, আপনি আমাকে অনেক দিনেব পুরনো একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমি তখন ছোকরা ছাত্র। সবে রেজিডেন্ট এসেছি। অস্পদিন পবেই তখনকার চীফ জাস্টিস আমাকে এক ফলবেগ কোর্টে বসিয়ে দিয়েছিলেন অন্য দু'জন মাগী জজের

সাঙ্গে। আমি খুব মন দিয়ে কেসটা পড়েছিলাম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট নিয়েছিলাম। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব—সে কি লড়াই। সব পয়েন্টগুলি লিখে নিলাম, কেন না সব ক'টাই তা বিবেচনা করতে হবে, কিছুই তা বাদ নেওয়া যাবে না সওয়াল-জবাব শেষ হলে এল জাজমেন্টের পালা। সেই মাগী জজ দু'টো একজনের পর আর একজন লম্বা-চওড়া জাজমেন্ট দিয়ে গেল। যখন তাঁরা জাজমেন্ট বলেই চলেছেন আমি মনে মনে ভাবছিলাম—দাঁড়াও না আমার মওকা আসুক। এমন একটা জাজমেন্ট দেব যা একটা ঐতিহাসিক দালিলের মত ল বিপোর্টে ছাপা হয়ে চিরকালের মত একটা নজির হয়ে থাকবে। সেই বড়ো, দু'টোর জাজমেন্ট যেন আর শেষই হয় না। অবশেষে তা শেষ হোলো এবং আমি আমার কাগজপত্র ঠিক-ঠাক করে আমার চেয়ারে একটা নড়ে-চড়ে বসে গলা খেঁকু দিয়ে আমার জাজমেন্ট বলে বেতে লাগলাম। বেশ আবশ্যতা হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার নিজেবই কানে বাজতে লাগল যে আমার আগে সেই দু'টো মাগী (blokes)

যা বলে গেছে আমি যেন সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি জাজমেন্টটা মাওগ ববে ফেললাম এই বলে যে যে কারণে আমার বিশ্বাস সত্যিখ ভ্রাতা দু'জন যে অর্ডার কবলেন আমিও তাই বলতে চাই। আমি তাদের সঙ্গে একেবারে একমত। সিঃ সেন, আপনার কি আর কিছু বলবার আছে?” জজ সাহেব রুমালটা চোপ থেকে নামিয়ে অবুণ সেন সাহেবের দিকে চাইতেই অবুণ সেন সাহেব বললেন—“না, মাই লর্ড, আমি এইচ, ডি, বোস ও বি, সি, ঘোষ সাহেবদের বহাসের সবদা সমর্থন কবি।” আমি ছিলাম চতুর্থ বিবাদীর কৌশলী। আমি বিনীতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ডাইনে বাঁকে ঘুরিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমার নতুন কিছুই বলবার নেই। আমার পবে আর যে দু'তিনজন কৌশলী ছিলেন তাঁরা আর দাঁড়ালেনও না—বলে বসেই মাথা নাড়লেন। বেশ শেষ হোলো। জজসাহেব খুশি হবে রানটা গুলতুবী করে উঠে পড়লেন সে দিনের মত। ফলাফলটা কি হয়েছিল ঠিক মনে নেই।

[চলবে]

কাশির যন্ত্রণায় কেন কাতর হবেন



টাস্পানল থাকতে!

কেন কষ্টকাটা কাশিতে ক্রমাগত কষ্ট পাবেন? আর কেনইবা বাস প্রবাসেব সংগ্রামে বিনীত রজনী বাগন করবেন? “টাস্পানল কাশি দিবাগ” ব্যবহার কখন। অচিরেই শ্রেষ্ঠ তরল ক'রে কষ্টনালী কষ্ট লাঘব কবে; আর বাস প্রবাসকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলে। আপনি আবার নিজেকে পূর্বের মতই সুস্থ বোধ করবেন।



মার্টিন ও হ্যারিশের বিশিষ্ট উৎপাদন

lam m.h. 10 (10)



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সতেরো ॥

...ভারমস্ত বারময় শবীবে ভেসে চলেছি। মৃদু নীলালোকে উদ্ভাসিত ইষারতবর্ণে ক্রমশ উধ্বগত। কতদূরে কে জানে! ইন্দ্রিয়-গুস্তিবিহীন শবীরে শব্দ চেতনা জাগ্রত। চিববহস্যময় নীল আকাশে জাগে অসংখ্য দ্ব্যতিমান্ তাবকা-গাজি। বিভিন্ন স্তর আতিক্রম কবে ক্রমেই যেন এক অজানালোকের দিকে এগিয়ে চলেছি। হাল্কা মেঘের রাশি ইতস্তত ভেসে বেডায়। তাদের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি। সাদা বরফের রাজ্য এগিয়ে আসে। পাহাড়, নদী, ঝরণা, মাটি, গাছপালা সবই সাদা, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় আলোকিত অচ্ছদ সরোবরে শব্দবর্ণের রাজহংস জলে ভাসে। তাবৈ শ্বেত-পাথরের বেদীমূলে ধ্যানগম্ভা দেবীমূর্তি। চোখ খুলে মূর্তি তাকায় আমার দিকে। মৃদুহাসি ফুটে ওঠে শ্বেতপদ্মের মতো মুখখানিতে। কে? কে তুমি? বিস্মৃতির অশ্কার ভেদ করে ওই মুখখানি বৃকি

ওঠে স্মৃতিপটে। অতি ধীরে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার অবয়ব। হারিয়ে-যাওয়া অতীতের কোন সে মধুর স্বপ্ন-কাহিনী বারবার মনেব মূকুবে উর্কি দেয়? অব্যক্ত যন্ত্রণার কাতর হয়ে ওঠে বারময় শবীর। ভাষা নেই, ইঙ্গিত নেই, নেই কোনও চাপল্যা। শব্দ অনুভূতি। গভীর আবেগে হৃদয় যেন মূচাড়িয়ে ওঠে। ওগো দেবি, বলো তোমার পরিচয়। আমি যেন তোমায় চিনি। কে তুমি, কে আমি? কোন জন্মের সাথী ছিলে তুমি? কত পরিচিত ওই মুখখানি, ওই চোখ দুটি, ওই হাসি। স্বচ্ছবসনা দেবীমূর্তি ধীরে ধীরে উঠে আসে। আমার হাত ধরে এগিয়ে চলে। অনতিদূরে পাহাড়ের তলায় গহবর অভ্যন্তরে একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠ। খাড়লগঠনের গতো বরফের বুরি নেমে এসেছে ছাদ থেকে। বরফের দেওয়াল, বরফের হর্ম্যভল। যেন স্ফটিকের প্রাসাদ-কক্ষ। বেষ্টর ওপরে দৃষ্টিতে পাশাপাশি বসি। মুখে কোনও ভাষা নেই। মনে মনে কত আলাপন, অবিপ্রান্ত ধারায় দীর্ঘ

অদর্শনের বিরহমিলন কথা। সামনে হাত তুলে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পেন্ডা তুলোর মতো হাল্কা মেঘের পরদায় ফুটে ওঠে ধোঁয়াটে ছবির মতো জীবন্ত চিত্র। মাটি, গাছপালা, পাহাড়-জঙ্গল আর দুটি যুবক-যুবতী। তীর-ধনুক কাঁধে পুবুষ আর ফুলের সাজে সজ্জিত নারী। পট বদলে যায়। যুগ্ম-ক্ষেত্রে রণসাজে সজ্জিত হাতী, ঘোড়া, বথ আর পদাতিক। আবও প্রসারিত হয় চিত্র-খানি। দিগন্ত থেকে অগ্নিত অস্মারোহী উন্মত্ত কৃপাণ হাতে উন্কায়ে ছুটে আসে। সব লম্ভস্তম্ব হয়ে পবদাব বকে অশ্বকাব নামে। পবক্ষণেই ফুটে ওঠে অমর একখানি চিত্র। দেবতার মণিদবে মর্মব বিগ্রহের সামনে পূজারিত। দেবদাসী নৃত্য কবে নানা ছন্দে। জগমোহনের চতুর্দিক আলোকিত। কাব্যকাব্যচিহ্নিত থামে হেলান দিয়ে তবুণ ব্রহ্মচারী অপলক মৃদুদৃষ্টিতে চেয়ে আছে নৃত্যপরা সুন্দরীর পানে। সঙ্গীতের গুছনায দ্রুতলয়ে আন্দোলিত হতে থাকে নতকীর দেহ। পরদাব গায়ে আব একখানি চিত্র ফোটে। সোনার সিংহাসনে সমাসীন রাজা—বিশাল সভাকক্ষ পরিপূর্ণ। শৃঙ্খলিত তেজস্বী যুবাপুবুষ বারবার সতৃষ্ণ নয়নে অলিন্দের দিকে চোখ তুলে তাকায়। চকিতের মতো একখানি সন্দর মুখ দেখা যায় ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে। চারি-চক্ষের মিলনে আকর্ষিত হয়ে ওঠে সুন্দরীর আনন। ছবি মুছে যায়। দৃশ্যান্তরে দেখা যায় দুটি কিশোর-কিশোরী খেলা করে নদীবা ধাবে বালুচবে। মেবোটি খেলাচ্ছলে ফুলের মালা পরিরে দেয় ছেলেটির গলায়। হে আকাশ, তুমি সাক্ষী। হে নদী, তুমি সাক্ষী। আকাশের চন্দ্র সূর্য তারা, তোমরা সাক্ষী হয়ে থাকো আমাদের মধুমিলনের। বালুচরে ঝড় ওঠে। অশ্বকাবে ঢেকে যাব চারিদিক। আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে আব একখানি চিত্র। পদ-পুষ্প-আলোকমালায় সুসজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপে বধবেশে তরুণী, অপরিচিত যুবকের গলায় মালা পরিবে দেয় নত-মুখে। সবার অলঙ্কিতে অশ্বকারে দাঁড়িয়ে তবুণ চেয়ে থাকে স্নানমুখে। সাক্ষী হবে থাকে তার জীবনের চবম নিষ্ফলতায। আবার দৃশ্য বদলায়। দুর্গম পাহাড়ের দুবোরোহ শিখরদেশেব আভিমুখে চলেছে সন্ন্যাসী। অপবিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে ভরা দেহ মন। আশাহীন, আনন্দহীন জীবনের মৃষ্টি-সম্মানে

ছোট জানালা দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যায়। পূর্বদিকটা লাল হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে আব গাছের মাথায় রঙের ছোঁয়া লাগে। অপ্রাকৃত এক স্বপ্নের জগৎ থেকে নেমে আসি খুলোর

ধরণীতে। ভাষা ঘরে কাঠের মোবেরে
শূন্যে আছি। ঘরের বাইরে ধূমজড়িত-
কণ্ঠে কারা যেন কথা বলে। ভাবতে চেষ্টা
করি আমি কোথায়। কি করে এলুম
আর কেন এসেছি? মনে পড়ে সব।
শয্যাভাগ করে ঘরের বাইরে আসি।
শরীরের ভেতরটা যেন অত্যন্ত হালকা
বোধ হয়। প্রথমেই নজরে পড়ে বারান্দার
একপাশে বসে আছেন জটাঞ্জটধারী এক
সম্মাসী। “হরি ঐ”, মৃদু হেসে সম্ভাষণ
জানালেন। আশ্চর্য যোগাযোগ। এক
সম্মাসীকে দেখে স্বপ্ন ভাঙলো। জেগে
উঠেই আবার আর একজনের সাক্ষাৎ।
কি যে তাৎপর্ষ্য আছে ঈশ্বর জানেন।
সাধুটি ডেকে কাছে বসালেন। তারপর
প্রশ্ন করেন, কি উদ্দেশ্যে চলেছি। বললুম
পূরাকালের মনি-স্বাধারা যে স্বপ্নরাজ্যের
বর্ণনা করে গেছেন, দেববাহিত সেই
স্বপ্নলোক দর্শনই আমার কাম্য। মাথা নেড়ে
সাধুবাবা বললেন এমনিভাবে ঘুরে বেড়ালে
তো তত্ত্বজ্ঞান মিলবে না। এক জায়গায়
ঘসে পড়তে হবে। ভাবি, নাই-বা হলো
তত্ত্বজ্ঞান। গঙ্গা-বন্দনার ঘাটে ঘাটে দেখে
বেড়াবো আর স্বপ্নদের তপস্যার স্থান।
শূন্যে চেষ্টা কববো শাস্বত ভারতের
মমবাণী। পতিতপাবনী সূরধনীর অপ্রাপ্ত
ধারার মিশে মহাজীবনের উৎস সন্ধান
করবো। যুগে যুগে কত লোকেই ত'
করেছে। সম্মাসী আমার দিকে চেয়ে-
ছিলেন একদণ্টে। আমার মনের কথা কি
ঘুসলেন জানি না। মৃদু হেসে শূন্য
ঘললেন, ‘হুঁসিয়ার রহো বেটা’, কিনারে
প’হুছ কর ফির পিছে না হঠেনে পড়ে।’

ঝালা ছাড়িয়ে পথ পাহাড়ের গা-বেয়ে
সন্মুখী। প্রায় মাইলখানেক চলে শ্যাম
প্রয়াগ। বাদিক থেকে শ্যামগঙ্গার ধারা
এসে ভাগীরথীতে মিশেছে। উত্তরাখণ্ডের
অধিকাংশ পাহাড়ী ভরণ্য আর ছোট-বড়
নদীগুলোর নামের শেষে ‘গঙ্গা’। এমন
কি সূর্যের সিংহলেও নদীগুলির নামে
গঙ্গা শব্দের প্রচলন দেখা যায়। পবিত্র
জলধারাকে ‘গঙ্গা’ নামে অভিহিত করার
প্রাতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে
আসছে। এবং আর্যসভ্যতার প্রধান ধারক
হিসাবেও গঙ্গা একটি বিশিষ্ট স্থান
অধিকার করে আছে। সাহিত্য, দর্শন,
পূজার্চনা প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেকটি
ক্ষেত্রে গঙ্গা হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ।

শ্যামগঙ্গার ওপরে কাঠের সেতু পার
হয়ে বিস্তীর্ণ জললাকাপী বন্দুর নিম্ন-
ভূমি। ক্ষণেকের শেষে ভাগীরথী তীরে
স্বর্গস্থ টাট। একটা ছোট বৃদ্ধি ছাড়া

লোকালয়ের চিহ্নও দেখা না। বৃদ্ধিভে
টাটকা গরম দুধ পান করে চলতে শূন্য
করি পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথে।
ভানদিকে অতি প্রশস্ত নদীগর্ভ। সমতলের
মতো বিস্তীর্ণ বেলাড়িমির ওপর দিয়ে
অগভীর জলের মৃদু-মন্দ গতি। দুই
পারে গাছে-চাক্ষ পাহাড়ের প্রাণী।
সবুজের সমারোহ। নির্জন পায়-চলা
পথ। নিঃশব্দ বনভূমি। হয়ত শ্বাপদ-
সঙ্কুল। কিন্তু চিন্তাভাবনাহীন মনে
আশঙ্কার রেখাপাত করে না। নিতান্ত
নির্লিপ্তের মতো পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে
নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। যারে যারে
শূন্য সম্মাসীর সাবধান বাণী কানে
বাজতে থাকে। ‘কিনারে প’হুছ কর ফির
পিছে না হঠেনে পড়ে।’

ঝালা থেকে দু’ মাইল দূরে হরিশল।
গ্রামে ঢোকবার আগেই তিস্ততীপাড়া।
এক জায়গায় কতকগুলো কাঠের বাড়ি
আর বৌদ্ধস্তুপ ‘চোরতেন’। নোয়া
প্রীহীন এই বস্তুতে কয়েকশ’ তিস্ততী
পূরুষানুক্রমে বাস করছে। ভারত-তিস্তত
সীমান্তবর্তী নেলাং গিরিবন্ধ (Pass)
নিকটেই। চিরকালের সেই বাণিজ্যের
পথটি সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে রাজনৈতিক
কারণে। মাত্র কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের
সর্বগ্রাসী দস্যুতার পাপে হাজার হাজার
বছরের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে ব্যবধান
রচিত হয়েছে। তার ফলে সীমান্তবর্তী
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জীবনে নেমে এসেছে
ঘোর দুর্দিন। প্রধানত পশমের আমদানী
করতো তিস্তত থেকে। এখানে কম্বল,
গালিচা, পটু প্রভৃতি হস্তশিল্পের কার-
খানা প্রতি ঘরেই আছে।

হরিশলে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী
ভরণ্য, কয়েকটা ছোট ছোট ধারার বিভব
হয়ে গঙ্গার মিশেছে। উচ্চ পাহাড়ের
ছোট অধিকারটির সরস ঘাটিতে আপেল
নাসপাতির অল্প ফলন। তিস্ততীদের
পাড়া ছাড়িয়ে খরণার ওপরে কাঠের ছোট
সাঁকো। ওপারে হিন্দুপাড়া। বনবিভাগের
বিশাল বিশ্রামগৃহ, দোকান, হাসপাতাল,
স্কুল প্রভৃতি অনেক কিছু সুবিধা রয়েছে
এখানে। সরকারী বনশিল্পের একটি
কেন্দ্রও আছে। গঙ্গা উপত্যকার সবচেয়ে
উল্লেখযোগ্য স্থান হরিশল। উচ্চতা প্রায়
আট হাজার ফিট। প্রাকৃতিক শোভা
আর আবহাওয়া পরম রমণীয়।

হরিশল ছাড়িয়ে আরও দু’ মাইল
এগিয়ে ধরালি। পার্বত্য খাঁড়ওয়াল
জাতির বাস এখানে। জলপূর মহাবাজার
তীর ধর্মশালা আছে। আর আছে মাটির
মধ্যে বসে যাওয়া শিবের মন্দির। পাথরে
তীরে সূর্য্যক মন্দিরটি নদীগর্ভেব অঙ্গ-
দূরে অবস্থিত। এখন শূন্য জেগে আছে
১০-১২ হাত উচ্চ কাঠের ছাউনী সমেত
চুড়াটুকু। মন্দিরের পাশ দিখে একটা
পাহাড়ী ভরণ্য সশস্ত্র মিশেছে ভাগীরথীর
জোতে। নদীর ওপারে পাহাড়ের গারে
গ্রাম দেখা যায়। শূন্য গঙ্গোত্রী পান্ডা-
দের বসতি এখানে।

ধরালিতে চারের দোকানে আলাপ
হলো স্থানীয় অধিবাসী কৃপাল সিংয়ের
সঙ্গে। তরুল যুবক কৃপাল সিং মাত্র
মাসখানেক আগে ডাঃ পট্টবর্ধনের গঙ্গোত্রী
অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর
নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়ে হরিশলের
হাসপাতালে পড়েছিল। সম্প্রতি দু’-এক-
দিন হলো সেখান থেকে ছাড়া পেয়েছে।

[ক্রমশঃ]

বি.সি. মাইত এও কোং

—ইলেকট্রো প্লাটং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেশিন এবং প্লেটিং

করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো. ক্রম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কলি-১২। ফোন : ০৪-০১৭০

০, রামমোহন পাল সেন, কলি-১২।

অফিস-ফোন-০৪-৪৮৪৪

আমরা যাক প্রকাশ মধ্যম



আনন্দ মিহ

অবিষ্মরণীয় কালারপোল যুদ্ধ

দিকচক্রবালে কালো মেঘের ঘটা।
কালো মেঘমালা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।
আর দেরি নেই—এখনই চতুর্দিক ছেয়ে
কাল-বৈশাখীর তান্ডব সুর হবে।

মিলিটারী ও সশস্ত্র কনস্টেবলে আশ-
পাশের গ্রাম সব ছেয়ে গেছে। বিদ্রোহী
চারজন যুবকের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা
করতে হবে। শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের
খবর বিপ্লবীরা আগেই পেয়েছে—বিপ্লব
সৈন্য, প্রচুর অস্ত্র—রাইফেল, মেশিনগান,
ঝাঝার হেলমেট, বীরদর্পে রাজপথ কাঁপিয়ে
তারা চলেছে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংবাদ
পাওয়া মা গলে এত সৈন্য সমাবেশ এত
আয়োজন কি কাজে লাগবে—তাদের সব
চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ভাব হয়ে আসছে। চারজন বিপ্লবী
যুবককে সূর্য ওঠার আগেই কোন না
কোন নিরাপদ আশ্রয় একটা খুঁজে নিতে
হবে। ব্যাপক শত্রুসৈন্যের সঙ্গো যুদ্ধ
করতে হলে চাই অম্বকারের সুযোগ, চাই
মারাত্মক শক্তি। দিনের শেষে সম্মুখ গাঢ়
হবে আসা পশ্চিম কোথায় তারা অপেক্ষা
করবে, কে তাদের স্থান দেবে এবং
সামান্য কিছু আহাধের ব্যবস্থা করবে?
কালারপোলের কয়েক মাইলের ভেতর
শিকলবহা খালের মাইলখানেক দক্ষিণের
জুলা গ্রাম তাদের পবিচিত নয়। কাজেই
গ্রামের বাস্তাব্যতা বা লোকজন কিছুই তারা
জানেন না। গ্রামটি হিন্দুপ্রধান না
মুসলমানপ্রধান অঞ্চল তাও তাদের
অজ্ঞাত। দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীরা এক
শ্রেণীর, আর দেশদ্রোহী ইংরেজের পোষা
গোলামেরা অন্য জাতের। তাই বিপ্লবী
যুবকদের কাছে জাতি ভেদাভেদের কোন
প্রশ্নই আসে না। রাত ভোর হল।
দিকে দিকে গ্রামের বিজয় বাড়তে হাঁচি
ফাসি ও কথাবার্তা আওয়াজ পাওয়া
যাচ্ছে। এই তো সুযোগ। গভীর রাতে
যে জোর হওয়ার আগে শেষ রাতে আশ্রয়ের

জন্য কোন বাড়িতে ঢুকে কাউকে ডেকে
তোলার মারাত্মক ফলাফল সম্মুখে সচেতন
ছিল বলেই বিপ্লবীরা এই বিশেষ সময়ে
গ্রামের লোকদের কারো না কারো কাছে
সাহায্য পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছিল।
উদ্বেগে উৎকণ্ঠার অধীনে হয়ে আমাদের
যুব-বিদ্রোহীরা সদ্য-জাগে-ওঠা কয়েকটা
বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। একটা
বাড়ির সামনের কম্পাউন্ডে তারা এক
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। কোন
পরিচয় বা ইকিডাকের অপেক্ষা না রেখে
তারা চারজন একেবারে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার
সামনে এসে দাঁড়াল। হিম মলিন বেশ,
ব্রহ্ম চহরার চারজন যুবককে
অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে একেবারে সামনে
দাঁড়িতে দেখে কার না মনে প্রশ্ন জাগবে
—কেই বা আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পারে?

বৃদ্ধ আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—
“কে তোমরা? কি চাও?” বৃদ্ধের
প্রশ্ন সুর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি
কতখানি ভীত ও বিহ্বল হয়েছেন। তিনি
আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন;
কিন্তু তাঁকে আর কণ্ট করতে হ’ল না।
যুবকেরা তাঁর সব ঔৎসুক্যের নিরসন করে
নিজেদের পবিচয় ও উদ্দেশ্য বৃদ্ধের কাছে
বিস্তারিত করে বললো। যুবকেরা বললো—“চাচা,
আমরা বড় বিপন্ন। আমাদের আক্রমণ
করতে পেছনে ছুটে আসছে পুলিশ ও
মিলিটারী। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক
—ইংরেজ আমাদের শত্রু, দেশবাসী
আমাদের ভাই। আমরা এখন আপনার
আশ্রয় চাই।” সখে পশ্চিম নিরাপদে
আপনার এখানে থাকার ব্যবস্থা করে
দিন.....!”

ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কথা
সবাই মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে
পড়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র
বিদ্রোহ আজ চট্টগ্রামবাসীর গর্বের বিষয়।
ইংরেজ-পোষা দেশদ্রোহী ব্যতীত অন্য
সকলেই বিপ্লবী-যুবকদের অন্তর থেকে
ভালবেসেছে। বীর যুবকদের স্বাধীনতাগ,

বীরত্ব ও তাদের দেশভক্তির কাহিনী বাংলার
বিশেষ করে চট্টগ্রাম নর-নারীকে মুগ্ধ
করেছে, আকৃষ্ট করেছে—দেশপ্রেমের বন্ধনে
আবদ্ধ করেছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নির্বাক
বিশ্ময়ে যুবকদের বক্তব্য শুনলেন। এক-
মুহুর্তে তারা বুঝে নিলেন, কি ভয়ানক
সমস্যা—কি কঠোর দায়িত্ব। যুবকদের
বাঁচাতেই হবে—দেশের বিপ্লবী সন্তানদের
রক্ষা করতেই হবে। পুলিশ ও মিলিটারী
তাড়া করেছে—একদৃশই হয়ত এসে
পড়বে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ভাবছেন, কিভাবে
সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব। তাঁদের
নিজ বাড়িতে বহু লোক। পাড়ার লোকের
আনাগোনা তো লেগেই আছে। সবার
চোখের আড়ালে নিজ বাড়িতে আশ্রয়
দেবার মত নিরাপদ স্থান কোথায়? বৃদ্ধ
বৃদ্ধা কালক্ষেপ না করে বিদ্রোহীদের
বললেন—

—“দেখ বাবা, তোমাদের আমার
বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারলে নিজেদের
ধন্য মনে করতাম। কিন্তু এখানে অন্যের
সম্পর্কে দৃষ্টির আড়ালে একান্তে তোমরা
থাকতে পারবে না। আমার বাড়িতে বহু
লোক। তারা তোমাদের দেখে ফেলবে
এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অস্তিত্ব শত্রু-
পক্ষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।
এরকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তোমরা
ওই পক্ষের পাড়ে শরণাগতের কোপে গিয়ে
আত্মগোপন কর। সেখানে হয়ত তোমরা
অনেক বেশি নিরাপদে থাকতে পারবে।”
বৃদ্ধের যুক্তিপূর্ণ সং পরামর্শ উপেক্ষা
করা যায় না। যুবকেরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার
আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শরণাগতের
দিকে পা বাড়াল। হাবার সময় রত্নত:
বললো—“চাচা, আমরা অভুক্ত—পুত্রো
একদিন আমাদের কিছু খাওয়া হয় নি।
তুমি বৃদ্ধের হাত থেকে ফেটে যাচ্ছে—কিদের
জুলায় পেট চোঁ চোঁ করছে—”

বৃদ্ধ তাদের বাধা দিল—
“তোমরা কথা না বলে যত
শীঘ্র পার দেখানো গিয়ে ঠিকিয়ে

পড়। আমি তোমাদের জন্য জল ও খাবার যা' পাবি নিয়ে যাচ্ছি।" তাবা চলে যাবার সময় কি ভেবেছিল আর বৃন্দ ও বৃন্দা আঙ্গুর কাছে কত প্রার্থনা জানিয়েছিল তা' অন্তবেব গভীর উপলব্ধি দিবেই মাত্র ভাবা সম্ভব। এই বৃন্দেব সহৃদয়তাব বিশদ পাঁচয পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সেই পাবপ্রসিক্তেই আমি লিখছি। কিন্তু আনন্দ দুর্বল হস্তের লেখনী বান্ধবে ঘটনাকে সঠিকভাবে পরি-
বাহনে সক্ষম হলে না বলই আমার ভাবনা।

দুটি বছর আমাদের মামলা চলছিল। রক্তের বাবা উকিল—গ্রামের জমিদার; তবু তিনি রক্তের বাবা—তাই সরকারের চোখে অপরাধী। কাজেই তাকেও আমাদের সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজ সাহেবের রাবের জন্য দুটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মামলা চলকালীন প্রতি-
দিন আদালতে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। তিনি ও মাসীমা জলুদা গ্রামে, তাঁদের বীর সন্তানদের ধর্মক্ষেত্র কুরক্ষেত্রে, অন্তবেব শ্রম ও ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। জলুদা গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান গ্রাম-
বাসী তাদের অন্তব উজাড় করে বজতের মা-বাবাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছে। এই মুসলমান বৃন্দ দম্পতি বজতের মা-
বাবাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন—
আদরবস্ত্র করে খাইয়েছেন। এই সহৃদয় বৃন্দ মুসলমান দম্পতি বঙ্গনবাবকে (বজতের বাবা) আগাগোড়া এই কাহিনীর বর্ণনা দেন। মেসোমশাই আমাদের কাছে, আদালতের কাঠগড়ায়, এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। মেসোমশাই যখন রক্তদের কথা বলছিলেন, তখন আমি নিশ্বাস বন্ধ করে বৃন্দেব সাহস, বেদনা, দুঃখ এবং যুবক-বৃন্দাদের শেষমুহূর্তের বীরেব ইতিহাস শুনছি। আজও আমার মনে সেই মধুর চিত্র ও বীরেব গাথা স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। বঙ্গনবাব এজন বালীগঞ্জে থাকেন। মেসোমশাই ও মাসীমা এখনও আমার এই বর্ণনাব সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু জানি না সেই বৃন্দ দম্পতি এখন কোথায় বা কেমন আছেন! দুঃখের বিষয় আজ আমি সেই বৃন্দেব নামটি ভুলে গেছি।

পুকুর পাড়ে মানুষের চাইতেও বড় শগগাছেব ক্ষেতে গিয়ে বিপ্লবী যুবকেবা চাবজন আত্মগোপন করেছে। তাদের নিদ্রাহীন ক্রান্ত অভুক্ত দেহ বিশ্রাম চাইছে। দেবুব গুবুতর আঘাত ও তাব থেকে রমাগত বস্ত্রবর্ণের যার বর্ণনা আমরা সুবোধ ও ফণীন্দ্র নন্দী'ব কাছে জেনেছি) ফলে দেবু যে কতখানি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তা' সহজেই অনুমান করা

যায়। বৃন্দ তাদের শত্রুকে মুখ দেখেই বৃক্কেছিল যাই হোক কিছু একটু তাদের খাওয়া একান্ত দরকার। কিছু সু-
ওঠার আগে ভাবেব আবছা অশ্বকাবে তাদের জন্য খাবারের কি ব্যবস্থা করা যায়? বৃন্দা ছুটে গেলেন রাস্তাবে। রাস্তাবে পান্ডা ভাত ও শট্টকীর তবকারী ষেটুকু ছিল কলাপাতায় মুড়ে, তিনি এনে দিলেন বৃন্দকে। পান্ডা ভাতের পেটীলা ও জলপাত্র নিয়ে বৃন্দ যুবকদের চুপি চুপি দিয়ে এল। মহানন্দে তারা ষে সেই খাদ্য উপভোগ করেছে তা' বলাই বাহুল্য। তাদের ভোজনের প্রত্যক্ষদর্শী কাক-পক্ষী কলবব করে শবন মুখরিত করেছে—অভূত বিপ্লবীদের তপ্তিতে বনের পাখীও কত খুশি কত প্রীত? কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র ডাক্তারকে ভাবতীকে বলতে শুনছি—
'এদেশের সাপেবও ধর্মজ্ঞান আছে—তাবা তো আব বিদেশ থেকে আমদানী হয় নি! বিপ্লবীদের এদেশেব সাপও ভালবাসে—
আব কাক-পক্ষী তাদের সুখে সুখী হবে না!

ইংরেজ-পোষা ভাবতী'ব গোলামেরা বিদেশ থেকে আমদানী না হলেও নিজে-
দের বিবেককে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রি দিয়েছে। তারা ডি, আই, জি, মিঃ ফারমাব সাহেবের অগ্নিলির্দেশে মিলিটারী ফৌজের পুরোভাগে দেশ-
দ্রোহিতাব কাল নিশান হাতে চলেছে।

আমাদের মামলার রায় থেকে উদ্ভূত করছি—

"There (village Uttar Dewan) they met the Union Board President, Abdus Sabur and obtained further information, and crossing to the west side of the Shikalbaha Khal went south about a mile and a quarter accompanied by Abdus Sabur and some villagers to Fakirmirhat where they got more information and from which a villager (Ahmad Mia) led them to Junda, about a quarter of a mile further, and pointed out a bank of a tank on which there was that-
ching grass and bamboos growing, and there they saw four youths lying close together between two bamboo clump."

ভিস্ট্রিষ্ট বোর্ডের কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবদুল সাবুর পলিশকে সংবাদ সববরাহ করল। তারপব একজন বিশ্বাসঘাতক—
আহমদ মিঞা, পলিশ ও মিলিটারী

ফৌজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই পুকুর পাড়ের শগগাছেব কাছে। সেই চারজন বিপ্লবী যুবকের অবস্থানটিও অগ্নিলির্দেশে আহমদ মিঞা পলিশ-
পার্টিকে দেখিয়ে দিল।

মিলিটারী ও পলিশ দুর্ভেদ্য শণ বনেব আড়ালেব পেছনে দুবপত্রাব রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে পজিশন নিল। দূরপাল্লার অস্ত্র থাকলেই ষে সব সময় দুবে পজিশন নিতে হবে তাব কোন অর্থ নেই। শক্ত দুর্ভেদ্য আড়াল থাকা চাই, যেন বিপক্ষের গুলী আড়াল ভেদ করে কাউকে হত বা আহত করতে না পাবে। শণক্ষেত যুবকদের শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পাবে কিন্তু রাইফেল বা মেশিনগানের গুলী বার্ষ কবতে শণক্ষেত কতটুকু কাজে আসবে?

সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্য উপযুক্ত আড়ালের পেছনে আর বিপ্লবী'ব শণক্ষেতের মাঝে শত্রুর বন্দুকের গুলে প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে প্রস্তুত হলে বসে আছে। গ্রামবাসী এই আসন্ন যুদ্ধের পরিণতি ভেবে মনে মনে প্রমাদ গুণেয়ে। সহৃদয় বৃন্দ চাচা নির্বাক দর্শকেব ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যুবকদের মংগলেব জন্য আঙ্গুর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। বৃন্দা রমণী অধীব উৎকণ্ঠায় চবম মুহূর্তের বিভীষিকা কল্পনা কবে আব নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। বৃন্দ তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত কবে বঙ্গনবাবকে বলছিলেন—
"বাবু, চোখের সামনে সব ঘটে যাচ্ছে। তিন দিক থেকে সৈন্য এসে তাদের ঘিরে ফেলেছে। যুবকদের পলাবাব কোন পথই নেই। আমবা দুজন পাগলের মত ছটফট করছি—কেবল বলতে ইচ্ছা করাছবা—
তোমরা অকাবণে প্রাণ দিও না। এই অসমান যুদ্ধ করে তোমাদের কি লাভ? তোমরা আত্মসমর্পণ কর। অকাল কুসুমের মত ঝরে যেও না। তোমাদের আত্মা মরতে দেব না।" শুধু চিন্তা কবাই সার—আমাদের আর কিছু করার ছিল না বাবু। ছেলেরা মববার জন্য প্রস্তুত। কিছুই কবা গেল না। আমরা কেবল দু'হাত তুলে আঙ্গুর কাছে তাদের মংগল কামনা করলাম।" বঙ্গনবাব বৃন্দেব কথা আমাদের জানাবার সময় চোখের জল সামলাতে পারলেন না। বৃন্দ যখন ছেলের এই মরণ-পণ যুদ্ধেব বিবরণ দিছিলেন, তখনও তাঁর দু' চোখের ভনের ধারা বধে গেছে।

দেবু, রক্ত, মনা ও নবদেশ—চার মাস্কটিয়ার্স! তাবও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মিলিটারী তাদের ঘিরে ফেলেয়ে। হুইসেলের শব্দ, তাদের কথাবাতী ও গ্রামবাসীদের সমাবেশ নিদারণ অবস্থার

আমি যত্নে গ্রহণ করছি নারী-বিপ্লবী জীবনী মার্গদর্শক অনুভূতি

[রক্তবিপ্লবের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়]

॥ মৃত্যু চায় ঢাকা ॥

বিপ্লবী-বাংলার আদি-ঐতিহ্যিক ডাঃ বাদুগোপাল মল্লিক :

“বিষয়বস্তু রোমাঞ্চকর অথচ প্রকৃত—একদম বাস্তব। বলার ভঙ্গী পরিপাটি, অনভিযোগ্য। ভাষা চমৎকার। ঘটনা সমিপাতের কায়দা অতি সুন্দর। প্রকৃত ব্যাপার পড়ছি কি রূপ-কথা পড়ছি ভ্রম হয়ে যায়।”

সমালোচনা-সাহিত্যের সব্যসাচী সজনীকান্ত দাস :

“ইতিহাস অধিকন্তু কবি লেখিকার শিল্পমনের ভিষ্মানে হয়ে উঠেছে মনোহারী কাব্য।”

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :

“জীবনময় প্রকাশ মাধুর্যে বইখানি ইতিকথার গম্বীকে অতিক্রম করে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।”

কবি-সম্পাদক বিবেকানন্দ মল্লিক :

“এক নিম্নবাসে বইটি পড়িয়া ফেলিলাম। চমৎকার লেখা। প্রাণের যে দুর্বীর গতিবেগে একদিন লেখিকা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেই গতিবেগে এই বইটির ছত্রে ছত্রে জীবন-স্পন্দনের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।”

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় :

“বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের কথা বাদ দিলেও নিছক সাহিত্যিক রচনা হিসাবে পুস্তকখানি অনবদ্যরূপে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।”

শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী মনোজ বসু :

“অরুণ-বহি” পড়তে পড়তে ভাবি সেই অগ্নিকন্যার মধ্যে এতখানি সাহিত্য-শক্তি নিহুস্ত ছিল। ফাঁসিমাণ্ডে জীবনাবসান হলে এ-বস্তু প্রকাশ পেত না। ভাষা স্বচ্ছন্দ, সুন্দর ও মোহনীয়, বর্ণনা সংযত। ‘অরুণ-বহি’ বিপ্লবকালের কোন এক বিশেষ বিবরণ মাত্র নয়, বিপ্লবীচিন্তার অশ্চর্য উদ্ভাসনে রীতিমত সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে।”

দেশ—

“অরুণ-বহি” বিপ্লব যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস নহে। ইহা পূর্ণাঙ্গ আত্ম-জীবনীও নহে। যে, নারী একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা তাহারই জীবনের অংশ-বিশেষের চিত্র-রূপায়ণ। এই চিত্রে আতিশয্য নাই, আত্মপ্রচারের চেষ্টা নাই, চমক লাগাইবার দুর্বৃত্তি নাই। ইহাই এই রূপায়ণের সৌন্দর্য।

বিপ্লবী জীবনের এমন সহজ সুন্দর ও স্বচ্ছ বর্ণনা সচরাচর চোখে পড়ে না।”

রবিবারের যুগান্তর—

“বইখানির মধ্যে যে সব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে তাহার ফাঁকে ফাঁকে যেন একটি শূন্য পবিত্র অথচ দৃঢ় হৃদয়ের মাধুর্য খেলা করিয়া ফিরিতেছে। লেখার ভঙ্গী চমৎকার। হৃদয়বোনের প্রকাশ সংযত এবং অধিকাংশ স্থলে বিস্তারের অপেক্ষা দে এবং ইঙ্গিতই বেশি কার্যকরী হইয়াছে।”

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

শাস্তা দিচ্ছে। বিপ্লবীরা প্রত্যেকে রিভলভার খুলে দেখে নিল চেন্নারে টোটো ভর্তি আছে কি না। তারপর প্রশ্ন—কে আগে ফায়ার সুরু করবে? মিলিটারী যদি দূর থেকে পাহারা দিয়ে চূপ করে বসে থাকে, তবে না হয় তারাও সম্মুখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু অবস্থার মোড় ঘুরে গেল। যুদ্ধেরা অনুমান করেছে মিলিটারীরা বুকে হেঁটে দু’দিক থেকে এগিয়ে আসছে। গাছপালা কোপ-জগল নড়ছে—থস্ থস্ থস্ থস্ শব্দ তাদের কানে আসা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মামলার সময় সাক্ষী দিতে এসে সেই ‘সব সেপাইদের মধ্যে (যারা সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করোঁছিল) কেউ কেউ আমাদের বলেছে, তাদের বুকে গাড়িরে আসবার আওয়াজ পেয়ে বিপ্লবীরা তাদের দিকে আন্দাজে আগে ফায়ার করে।

পাঁচ-দশ মিনিট পর্যন্ত দুই পক্ষেই অজস্র গুলীবর্ষণ চলেছে। তীর, তীক্ষা, স্বপ্নকালস্বার্থী যুদ্ধ শেষ হল। মিনিট দশেক পরেই জুলুনা রণপ্রাঙ্গণ একেবারে শান্ত—গ্রামবাসীদের কোলোহল ধেমে গেছে, সেপাইরা আর কম্‌চগুল নয়, বিপ্লবীদের পিস্তলের আগুন আর দেখা যাচ্ছে না এবং সৈন্যদের মৌশনগান ও রাইফেলও এতক্ষণে একেবারে স্তব্ধ।

কতৃপক্ষ বিদ্রোহী যুদ্ধের অবস্থা জানতে ব্যস্ত হল। ডি, আই, জি-র নির্দেশ মত হেম দারোগা কয়েকজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে খুব সন্তর্পণে ঝোপের কাছাকাছি গেল, যেখান থেকে চোঙা মূল্যে চিংকার করে বললে তাদের কথা বিপ্লবীরা শুনতে পাবে। হেম দারোগা উচ্চস্বরে চোঁচিয়ে বিদ্রোহীদের ডি, আই, জি, ফারমার সাহেবের আদেশ ঘোষণা করে—

“There is order for you to surrender. Lay down your arms. It is useless for you to fight. To continue fight means death for you.”

(তোমাদের হুকুম জানানো হচ্ছে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অর্থ তোমাদের সৃনিস্টিত মৃত্যু।)

সকলেই উত্তর শুনতে উদ্গ্রীব—কান খাড়া করে আছে। ডি, আই, জি, ভাবল এক্ষণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে একে একে চারজনই মাথার ওপর হাত তুলে বেরিরে আসবে শব্দেতে থেকে। হেম দারোগাও নিশ্চিত ছিল যে, আত্মসমর্পণ ছাড়া বিপ্লবীদের গত্যন্তর নেই।

ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের আশা নিমূল করে হেম দারোগার রঙিন স্বপ্ন

চুরগার করে বস্ত্র-কণ্ঠের স্বরে মনোবজনের কথা শোনা গেল—

"Monoranjan does not know how to surrender ! I want to be Jatin Mukherjee of Balasore !"

(মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না। আমি বালেশ্বরের যুদ্ধে যতীন মুখার্জীর মত শহীদের ভূমিকা গ্রহণ করব)।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হেম দারোগা আদালতগৃহে সমবেত শ্রোতাদের এই বিবরণ শুনিয়ে বিস্মিত কবেছে এবং আত্মসমর্পণের বদলে মনোরঞ্জনের এই দৃষ্ট ঘোষণা শুনে আমাদের বুক গর্বে ভরে উঠেছে। মনোরঞ্জনের দৃঢ় ঘোষণায় ডি, আই, জি, হতভম্ব হয়ে গেলেন। মাত্র "চারজন মাস্কেটিয়ার্স" শত শত উদ্যত রাইফেল উপেক্ষা করল! এ কি—তাদের প্রাণে কি ভয় নেই? তাদের কি জীবনে কোন সন্ধের বাসনা নেই? কতৃপক্ষ ভাবতে লাগলো—কি করা যায় এদের নিয়ে?

পুলিশ ও মিলিটারী প্রধানেরা, যাবা সেখানে উপস্থিত ছিল, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারাছিল না। কতৃপক্ষকে দুর্ভাবনা থেকে বিদ্রোহীরাই রেহাই দিল। শগন্ধে থেকে তাদের আলোচনা ভেসে আসছিল। একজনকে বলতে শোনা গেল—“আমরা প্রাণ ধাক্কাতে ধরা দেব না।” অপর একজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—“না, না,—নিশ্চয়ই না, আমরা মরব তবু ধরা দেব না।” তারপর আবার কঠিন, আরো দৃঢ়, আরো দৃষ্ট কণ্ঠে বাণী ধ্বনিত হল—“মনা, আমি দেবুকে গুলী করছি। সে ভীষণ কণ্ঠ পাচ্ছে, হাত নাড়তে পারছে না। আমি তাকে গুলী করছি—তুই আমাকে গুলী করবি—বুঝলি?”

এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'বার পিস্তল গর্জন করে উঠল। তারপর?—সাক্ষ্যে হেম দারোগা বলেছে, সে রক্তের গলার স্বর চেনে এবং রক্তই দেবুকে গুলী করেছে। হেম দারোগা সাক্ষ্য দেবার সময় আবার বলেছে, রক্ত আহত অবস্থায় মনোরঞ্জনকে উত্তেজিত করেছে তাকে গুলী করতে—

“মনা, গুলী কর—গুলী কর—শীগগির গুলী কর। আমরা জীবন্ত ধরা দেব না। আমি যে হাত নাড়তে পারছি না—গুলী লেগেছে। কি ভাবছি? হাত কাঁপছে? আমি বলছি গুলী কর আমাকে মনা?”

বন্দুর প্রতি বন্দুর এ কি নিদারুণ গাফিলত! বন্দু চিরতরে বিদায় নেবে—

আর সেই বিদায়ের রথ নিজ হাতে সাজাতে হবে বন্দুকেই? মনোরঞ্জন রক্তকে গুলী করে—বন্দুর বিপ্লবী মৰ্যাদা রাখতে মনোরঞ্জন শিখা করে নি—সে রক্তের আঙ্গা পালন কবেছে।

পিস্তলের দু'টি আওয়াজ হল—গুড়ুম্, গুড়ুম্। তারপর দু'এক সেকেন্ড পরে শেষবাবের মত আবার রিভলভারের একটা আওয়াজ হয়ে জুলুদার সেই শগের বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনোরঞ্জন দু'বার বন্দু রক্তকে গুলী করল, তাবপব শেষ গুলীটি সে করে নিজের বুকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অস্ত্র সৈন্য, মেশিনগান, রাইফেল, সব কিছুকে উপহাস ও উপেক্ষা করে—চারজন বিদ্রোহী বীর ভাবীকালের তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী শত্রু-চক্রান্ত ধ্বংসের বহিঃশিখা জ্বালিয়ে চিরবিদায় নিল।

আমাদের মামলার রায় থেকে লিখছি—

“...As soon as Ahmed Mia said where they are, the youths opened fire to which the D. I. G. party replied. The engagement lasted three or four minutes after which the firing from bamboo clumps ceased. Then the D. I. G. and other went forward and found three youths lying dead and the fourth mortally wounded. Abdul Azim and Hem Gupta found that two of the dead were Rajat Sen and Monoranjan Sen and the other wounded youth was Deba Prasad Gupta. They know all three of them before. They did not know the fourth youth. Ex. LVII (3) has been identified by Jagadish Roy as being a photograph of his younger brother Swadesh Roy. ...Deba Prasad Gupta expired within an hour.”

আহমদ মিঞা, ঝোপের আড়ালে বিপ্লবীদের অবস্থান পুলিশকে দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীরা গুলী ছোঁড়ে। তারপর তিন-চার মিনিট ধরে উভয়পক্ষে গুলী বিনিময় হয়। যুদ্ধ শেষে ডি, আই, জি-র পাটি সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজনের মৃতদেহ (রক্তত, মনা ও স্বদেশ) দেখতে পায়। দেবু তখনও বেঁচে ছিল।

হেম দারোগা আবার আদালতকক্ষের সবাইকে স্তম্ভিত করে দেবপ্রসাদ গুপ্তের

শেষ কণ্ঠ মৃদুহৃৎের বিবরণ দিল। এই বিবরণ নিদারুণ সত্য, তবু অসম্ভব মনে হয়। যুদ্ধের আগের ব্যস্ত বিশ্বে—ঘাতকের দাবের আঘাতে দেবু গুলুদের আহত হয়েছে; নম্র রাত ধরে কতখান হতে অবিরত বস্ত্র কবেছে; অবসান দেহে শগঝোপেব পঞ্জিসন নিয়ে তবু সে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে। অবশেষে যখন অপব হাতটিও শত্রুর গুলীতে এখন হয়ে সম্পূর্ণ অচল হল, তখন দেবু কণ্ঠ নিবারণেব উদ্দেশ্যে নিজের আহত অবস্থায়ও রক্ত তাকে গুলী করে। কি আশ্চর্য? দেবু তখনও বেঁচে আছে? তখনও কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প তার? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে কি তীক্ষ্ণ ঘৃণা, কি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা জীবনের শেষ মৃদুহৃৎেও দেবু পোষণ করে বেঁচে ছিল তার বর্ণনা হেম গুপ্তের (দারোগা) মুখে শুনে আদালতগৃহে উপস্থিত দেশ-প্রিয়কেরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেই অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীর পোষা গোলামদের অন্তরে ঘাসের সঞ্চার হয়েছে।

মামলার জজসেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

“...Deba Prasad Gupta was mortally wounded. I knew him from before. I could well recognise him. When I saw him I found him gasping for breath. Mr. Farmer (D. I. G.) followed me. I spoke to Deba Prasad, ‘Bara Saheb ekhare achhen, tanke ki kichin ba-ben?’ Thereupon in a semi-delirious condition, but in a distinct clear voice, Deba Prasad went on to say—‘Bara Saheb? Ke bara saheb? Lowman? Lowman? My arms are shattered, otherwise I would have shot him down.’ Then with a deep sigh he sank....”

(দেবুর জীবনের একেবারে চরম মৃদুহৃৎ। মিঃ ফার্মার (ডি, আই, জি) এবং হেম দারোগা দেবুকে দেখে, দেবুর নিবাসের খবর কণ্ঠ হচ্ছে। সেই অবস্থায় হেম দারোগা দেবুকে জিজ্ঞাসা করে—বুঁ সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁর কি কিছু বলবেন? দেবু প্রায় প্রত্যাপের ঘোরে কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কে বড় সাহেব? লোম্যান? আমায় হাত দু'টি অচল হয়েছে, নইলে আমি

তাকে একা গুলী করতাম ?...এই কথা বলে দেবু মারা যায়)।

নাভা, অবাক হতে হয়। সাধারণের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে! জালালাবাদ যুদ্ধে রক্ত দেখে গাছের ছালের সামান্য স্পর্শেও কারো মনে হয়েছে রাইফেলের গুলী বিদ্ধ হয়ে সে মারা যাচ্ছে। আবার বিচ্ছিন্ন দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে দেখা গেল একমাত্র অমরেন্দ্র ছাড়া আর কেউ ফিরে এল না। আরো দেখা গেল যুদ্ধের স্বাদ পাওয়ার পর কেউ কেউ আবার অস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। বিপ্লবীদের মধ্যেও সাহস ও বিক্রমের তারতম্য আছে। অলস মনে বিলাসের স্বপ্নে বিপ্লব ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মৃত্যু স্বপ্ন শিল্পের প্রতিনিয়ত বিভীষিকার সৃষ্টি করে, তখন স্বপ্ন-বিলাসীর বিপ্লবের আখ-প্রবণতা তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়। আমরা সেই যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে মরণ-যুদ্ধে স্বপ্ন নেমিছিলাম, তখন রাতদিন আমাদের নিজেদের মনের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়েছি। শরীরচর্চা করে যেমন মাংসপেশী শক্ত করতে হয়, তেমনি মনের জোর এবং হৃদয়ে সাহস ও স্বাধীন-ত্যাগের শক্তি অর্জন করতে হলেও প্রতি-দিন রীতিমত মানসিক exercise যদি না করা যায় তবে মনের ও হৃদয়ের psychic 'muscles' বা 'waves' কখনও সবল সুস্থ এবং দৃঢ় হতে পারে না। সেই যুগে আমরা বিপ্লবের তত্ত্বকথা কতটুকুই বা আর জানতাম। পরাধীন ভারতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—মরণ-পণ যুদ্ধ করতে হবে, এইমাত্রই জানতাম। যুব-বিদ্রোহের সৈনিকেরা কিভাবে রাতদিন মৃত্যু-প্রোগ্রামের বাস্তব রূপ অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে—কতখানি গভীরতা নিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে, তা আমরা আমাদের তরুণ বন্ধু-দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে বুঝেছিলাম।

কালারপোলের যুদ্ধের শহীদরা আমার আদর্শ—তাদের সাহস বিক্রম ও আত্মত্যাগ আমার অন্তরকে বারে বারে আলোড়িত করে, তিরস্কার করে—এবং অতীতকে স্মরণ করিয়ে আমার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি অগ্নিদলিনীর্দেশ করে।

কালারপোলের অতুলনীয় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য জানানো প্রয়োজনবোধে সরকারী তথ্য থেকে একটা বর্ণনা দিচ্ছি—

“The Deputy Magistrate held an inquest on the four corpses and in the inquest reports described the injuries, on Rajat Sen 7-8 gunshot

injuries, on Monoranjan Sen six gunshot injuries and on Swadesh Roy five gunshot injuries. He could not say exactly by how many bullets the wounds on each has been caused as his examination was completely extended, nor he could say whether they had been caused by rifle or revolver bullets....”

ডাক্তারের বড় রিপোর্টটি এখানে দিয়ে কলেবর বৃদ্ধি করলাম না। এখানে যা পাচ্ছি তাই যথেষ্ট। প্রত্যেকের শরীরে পাঁচ ছয়টি গুলীর চিহ্ন। ডাক্তারের রিপোর্টে আছে—যুব কাছ থেকে রিভলভার গায়ে ঠেকিয়ে গুলী করেছে বলেই ক্ষতস্থানের মূর্ধের চারপাশ আগুনের শিখার পুড়ে গেছে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ অসমসাহসিক সংগ্রামের অনেক কাহিনী জানি, কিন্তু কলারপোলের ঘটনার মত কোন ঘটনা আমার জানা নেই। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ অসম্ভব জেনে পরস্পর গুলী বিনিময় করে নিজেরা প্রাণ দিল, তবু আত্মসমর্পণ করল না।

গজনবাবুকে সেই দরদী দেশপ্রেমিক যুদ্ধ মঙ্গলমান গ্রামবাসী এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির বর্ণনাও দিয়েছেন। সেই যুদ্ধ দম্পতি বিপ্লবী যুবকদের প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তিনি বলেছেন—“বাবু একেবারে কাঁচি তারা—অকালে মরে গেল। আমার স্বামীকে তারা মা বলে ডেকেছিল, আমাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করেছে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় খেতে চেয়েছিল—আমরা তাদের পান্ডা ভাত ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। বলে এসেছিলাম রাতে মাংস ভাত খাওয়াব—আমরা আমাদের সেই সুযোগ দিলেন না। প্রাণ ঢেলে আমাদের কত ডেকেছিল, তবু তারা বাঁচলো না—তাদের কোনমতে বাঁচানো গেল না। বাবু, তোমাদের সন্তানদের তোমাদের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। বিন্দুসম্মতক ইংরেজ গোলামেরা তাদের মহামূল্যবান জীবন অশ্রুতেই বিনষ্ট করল। আজও তাদের মৃগদলি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ভাবতেও বাবু কষ্ট হচ্ছে—কেন তারা মরলো—কেন আমাদের মধ্যে বেঁচে রইল না?”

দরদী বন্ধু! তুমি আজ কোথায় জানি না। তোমার নাম আমার জানা নেই। তবু তুমি আমাদের একজন ‘অনামী’ বন্ধু। শোন বন্ধু শোন—তোমার প্রার্থনা অমরা অবহেলা করতে পারেন নি। তুমি

তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে—চেনে ছিলে তারা বেঁচে থাকুক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তারা মরে নি—বিপ্লবী ভারতে তারা কখনও মরবে না, মরতে পারে না। কালারপোলের জ্বালায় রণ-প্রাণগণ সুস্পষ্টভাবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে ভাবব্যং ইঙ্গিত দিয়ে গেছে ইতিহাসে তা অমর হয়ে থাকবে—সেই আলো অন্ধকারে পথ দেখাবে।

জ্বালায় রণ-প্রাণগণ স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে—

“We believe that it is an inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have necessities of growth. We believe also that if any Government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it.”

—Independence Pledge.
Indian National Congress,
January, 1942.

[কমলা:]

সাপ্তাহিক বসুমতী

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	ট, প.
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক) ১৪.০০
ষাণ্মাসিক	৭.০০
ত্রৈমাসিক	৩.৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মসূচক

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানা সহ ডাকটিকিটসহ খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদক

ইয়োহোপা

হিরন্ময়
ভট্টাচার্য

ভূরিভোজের পর মনটা উদার হয়। তখন ঠিক গালভারী রাজনৈতিক বক্তৃতা খাপ খায় না। হাসি খুশি ঠাট্টা তামাসা বেশ গল্প বেশ লাগে। কোথাও বা পান ভোজনের পর নাচ গান হৈ হুজুড় হয়। খাওয়া-দাওয়া আর নাচ গান অনুষ্ঠানের প্রধান পর্ব। মাঝে স্যান্ডুইচ করা কল্পিত। যত ছোট হয় ততই ভালো। অবশ্য একটু বক্তৃতা না হলে নেড়া নেড়া লাগে। তাই নামকা ওয়াসেত রাখা। আমাদের দেশের নেতারা জনসাধারণের দৃষ্টি দারিদ্র্য দেশে দিন কাটান। তাই তাঁদের বক্তৃতা মানেই গালভারী কথা। ইমোশনে ভরা। হাসি ঠাট্টার ফাঁক নেই।

এদেশে অ্যান্ড্রুস্টেট সোসাইটি। ব্যাড্ড, গ্যাড্ডি, ওয়াশিং মেশিন আর রেফ্রিজারেটরের ছড়াছড়ি। সাধারণ ঘরের মেয়েরা এমন স্ককমকে পোষাক পরে মনে হয় বৃষ্টি বা রাজকুমারী। প্রাচুর্যের দেশ তাই নেতারা মন খুলে হাসির কথা বলতে পারে।

ইংলন্ডের সহকারী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ব্রাউনের বয়স ষাই হোক এনার্জি যুবকের মত। খেতে ভালোবাসেন। পান করতে আরও ভালোবাসেন। আর এমন নাচতে পারেন মনেই হয় না। বয়স হয়েছে। কদিন আগে নিজেই স্বীকার করেন, তিনি কখন সখন একটু রেশি পান করেন। তাতে হয়েছে কি উইনস্টন চার্চিলও খেতেন আমাদের দেশের শিবও নেশাভাজ করতেন। ভোলানাথ শিবের রুমমার্তি লোকের অজানা নয়। ভোজন-সভা শেষে না দক্ষ্যস্তে পরিণত হয়। তাহলে কি পানের মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। না মোমাইছির হুল খেয়ে সাপের ফণা তুলে এগিয়ে গেলেন জর্জ ব্রাউন।

পার্টি হচ্ছে লন্ডনের বিখ্যাত স্যাক্সন হোটেল। সংবাদপত্র ব্যবসায়ের ম্যাগনেট লর্ড টমসন পার্টি দিয়েছেন। ইংলন্ডের ও আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা এসেছেন। উদ্দেশ্য দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার প্রসার। জর্জ ব্রাউন বক্তৃতা দিতে উঠে তাঁর হোস্ট টমসনকে প্রায় দেশের শত্রু বলে প্রমাণ করলেন। এ যেন চর্যচর্য খেয়ে যাবার আগে গৃহকর্তাকে সবার সামনে গালমন্দ করা। গোলযোগ সৃষ্টি করতে অবশ্য জর্জ ব্রাউন সিন্ধবন্ত।

তিনি গোলযোগ পাকান না গোলযোগ তার পিছদ খাওয়া করে বলা মুশকিল।

কদিন আগে স্কারবারা শহরে লেবার পার্টির বাৎসরিক সম্মেলন হয়। সে সময় একদিন সম্মেলনবেলা কোন নাচ-গানের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে জনা পঙ্কশেক প্রেস ফটোগ্রাফার নাকি তাঁকে ঘিরে ব্যহ রচনা করেছিল। একি অন্যান্য সময় আরোজন। অভিনন্দন ব্যহ রচনা করেছিল। মাত্র সম্ভরণী। এ যে সন্তসন্ত। তবু তাদের ক্যামেরা আক্রমণ ব্যহ হল। জর্জ ব্রাউন উত্তেজিত হয়ে হোটেলের ফিরে এলেন। হৈ চৈ করলেন প্রেসের অসংখ্য আক্রমণের জন্যে।

এ বছরের প্রথমে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিলেতে বেড়াতে এসেছিলেন। বৃটিশ ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে তাঁকে ভোজনে আমন্ত্রণ জানান হয়। জর্জ ব্রাউনও সেখানে ছিলেন।

হঠাৎ ব্রাউন কিসগিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি যে পিচ ফল খাচ্ছেন তা রাশিয়ার জর্জিয়া থেকে আসে নি। এসেছে আমেরিকা থেকে। কিসগিন একেবারে উল্টো ধাঁচের লোক। কখন রাগেন না। মন দিয়ে লোকের কথা শোনেন। ধীরে উত্তর দেন। তিনি এমন ভাব দেখালেন বেন কিছু ষোঝেন নি। বলেন—খাওয়ার তাঁর বাদ বিচার নেই সব খেতে পারেন।

জর্জ ব্রাউন আবার ফোঁচা দেন। এই পিচ ফল খাওয়া মানে ভিন্নজাতামের যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করা। কোন সাড়া না পেয়ে হতভম্ব হয়ে বলেন—কিসগিন যদি এমনভাবে অবহেলায় আমদানি করেন তাহলে আজকের মধ্যে আমাকে লেবার পার্টির সভ্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। খদ্দুচেত হল হস্ত সেই উপলক্ষ্যে হাত-হাতি হয়ে যেত। কিন্তু কিসগিনকে রাগায় এমন সাধ্য কাব।

খদ্দুচেত ভাসেন। ব্রাউনের কথায় মনে পড়ল ১৯৫৫ সালের ঘটনা। বুলগারিন ও খদ্দুচেত ইংলন্ডে বেড়াতে এসেছেন। লেবার পার্টির তরফ থেকে ভোজন সভার আয়োজন জানান হল। শুরুর্তে মাখামাখি। হাসিঠাট্টা দুচারটে শেল্য। ক্রমে মর্মান্তর শেষে। প্রাণ হাতাহাতি। রাশিয়ার বিনা বিচারে লোককে বন্দী রাখা হয় এই নিয়ে বিস্ফোরণ। এই বিবাদের একজন

পাণ্ডা ছিলেন জর্জ ব্রাউন। অবশ্য অ্যান্ড্রুস্টেট বিভাগ, ডাঃ সামারস্কল, গোট স্কেল ইত্যাদি আরও অনেকে এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। খদ্দুচেত টেবল চাপড়ে সপ্তমে গলা চড়ালেন। ইংরেজের ইতিহাসের পাতা উল্টে পাল্টা ছবাব দিলেন।

সাদর সম্বর্ধনায় যার শত্রু মহাপ্রলয়ে তার শেষ। খদ্দুচেত বলেছিলেন, ইংলন্ডে জন্ম নিলে তিনি টোরি পার্টির সভ্য হতেন। কখনই লেবার পার্টির ধারে কাছে যেতেন না। তিনি জর্জ ব্রাউনের ওপর এমন রোগে যান যে বিদায় বেলায় ক্রমদর্শন করতে অস্বীকার করেন।

বর্তমানে ফিরে আসি। লর্ড টমসন জর্জ ব্রাউনের পরিচয় প্রসঙ্গে হাল্কা সুরে কিছু বলেন। সেটা অবশ্য মধুমাখা নয়, একটু হুল ছিল। তিনি বলেন,—ভাঙার জর্জ ব্রাউনকে উপদেশ দিয়েছে, ধূমপান, মদ্যপান ও মহিলা ত্যাগ করতে। তাহলে তাঁর পরমায়ু একশ বছর হবে। জর্জ ব্রাউন তা নস্য্য করেছেন। তিনি একশ বছর বাঁচতে চান না। তবে যা করে যাবেন তা একশ বছরের কাজ।

জর্জ ব্রাউন উত্তর দিতে উঠলেন। বললেন, আপনি সূর্যোদয়ের পূর্ণ সম্ভাবহার করেছেন। আমি কেবল বলতে চাই আপনি আমাকে প্রতারণা করেছেন।

লর্ড টমসন বাধা দিয়ে বলেন—ঠিকরে যদি পার পাওয়া যায়।

জর্জ ব্রাউন বলেন—আমি ঠাট্টা করছি না। পরম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন।

টমসন কি উত্তর দিতে যান। ব্রাউন বলেন, তাঁকে বাধা না দিতে। টমসনের বক্তৃতায় তিনি বাধা দেন নি। এবার শত্রু হল বক্তৃতার ভাঙার নৃত্য। ব্রাউন বলেন—আমার ধারণা আপনি সানডে টাইমস পত্রিকার মালিক। আমরা খুশি হতাম যদি আপনি একটু সংযম দেখাতেন। আগের দিনে “ডেইলি এক্সপ্রেস”, “মিরর” বিশেষ খবর ছাপিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। এখন “সানডে টাইমস”, “অবসারজার” ও “টেলিগ্রাফ” পত্রিকা তাদের পথপ্রদর্শক হয়েছে। ধ্যান আজ আমি আপনার অতিথি তবু পরিষ্কার করে বলি, ওই সব উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপান বন্ধ করা প্রয়োজন। আপনার সমস্যা

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পত্রিকার প্রচার। কিন্তু কিছু লোকের হাতে দেশের ভাল-মন্দ দাঁড়ায়। সুতরাং উগবানের দোহাই ওই সব ছাইপাশ লেখা ছাপান বন্ধ কবুন।

জর্জ ব্রাউনের বক্তৃতা শেষ হলে টমসন ছোট্ট উত্তর দিলেন—সব সময় জর্জের কথায় আমরা গুরুত্ব দেই না। আপনাবা নিজেই বিশ্বাস্যত গ্রেটব্রিটেনের বৈদেশিক মন্ত্রীর রূপ দেখলেন—রাইট অনারেবল জর্জ ব্রাউন।

তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে জর্জ ব্রাউনের এক হাত লড়াই হয়। তারা জর্জ ব্রাউনকে ঘিরে ধরে। তাঁর বক্তব্যের বিশদ বিবরণ চায়।

ডবল এজেন্ট কিথ ফিল্ডবির ওপর “সানডে টাইমস” বড় প্রবন্ধ ছাপায়। ফিল্ডবি ইংলন্ডের গুরুত্ব ছিলেন আসলে তিনি বরাবর রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করেছেন। সে কথা ফাঁস হবার আগে রাশিয়ান পালিয়ে যান। সেইটে নিয়ে কি ব্রাউন ক্ষুব্ধ হবেন।

এবার ব্রাউন সাংবাদিকদের এক হাত নিলেন। “শাট আপ” এবং “ব্রাডি”

বললেন অনেকবার। লেবার পার্টির বিশ্বাস্যত বামপন্থী নেতা অ্যান্ড্রিউ ব্রিডান একবার বলেছিলেন—“Most prostituted Press in the world” সে কথার উল্লেখ করেন। শেষে বলেন, ব্রিটিশ প্রেসের সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করে দিলেন। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ব্রিটিশ প্রেস ও লেবার সরকার এখন আদায়-কাঁচকলায়। প্রথম “পি ডি নোটিশ” নিয়ে ডেলি এক্সপ্রেস ও প্রধানমন্ত্রী উইলসনের সঙ্গে তলোয়ার খেলা চল। দেশের নিরাপত্তার জন্যে সরকার সংবাদপত্রকে কোন বিশেষ খবর না ছাপাতে অনুরোধ করেন। সেগুলো পি ডি নোটিশ। তবে তা না ছাপানর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কমিশন বসেছিল, তারা রায় দিয়েছে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় নি। উইলসনের তবু এক কথা। নিরাপত্তা গেল।

শ্রবতীয় দফায়। লর্ড চ্যামলমন্টের “Non-attributable” বক্তৃতা। লর্ড চ্যামলমন্ট ব্রিটিশ সরকারের ভরফ থেকে

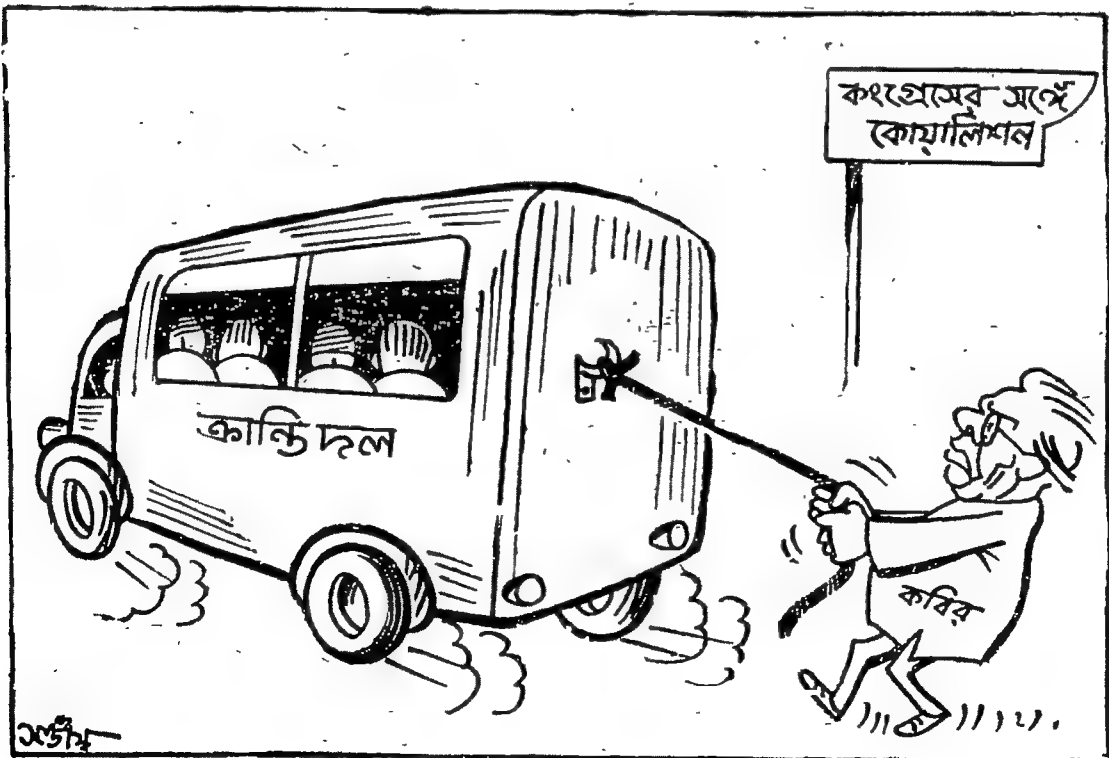
কমন মার্কেটে যোগ দেবার কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এদিকে ফ্রান্স হুমকি ছাড়ছে, ওসব চলবে না। ইংল্যান্ড ইয়োরোপীয় নয়। তার বৈদেশিক মন্ত্রীর অভাব। পাউন্ডের মূল্যমান বেশি। এ বিষয়ে ফ্রান্সের ভেটো আছে। তাই মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন ঠিক আছে ইংল্যান্ড নেটো থেকে বেরিয়ে আসবে, জার্মানী থেকে সৈন্য তুলে নেবে। Non-attributable মানে খবরটা যেন গুরুত্ব হিসেবে রটুক কে বলেছে কেউ জানবে না। এই খবর নিয়ে খুব হেঁ হেঁ। মন্ত্রী মশাই পশ্চাৎ অপসরণ করলেন। দোষ পড়ল সাংবাদিকদের মাথায়। লেবার সরকার বলে যত দোষ এই পত্রিকার।

বারুদে আগুন লাগাল ফিল্ডবি উপাখ্যান।

দেখা যাক লেবার সরকারের সঙ্গে সাংবাদিকদের আশ্রু শান্তি চুক্তি হয় কি না।

(৬।১১।৬৭)

পিচ টান—





তোমার আলো, আমার ঘোঁরি মুখু আচায়

ওভাবে লেখা ছাড়া উপায় ছিল না
বকুল! মাপ কোবো। বন্ধুতে পাবিছ
চিঠিটার তোমার মনের অবস্থা কি হবে।
মুখেবও। রঘুনাথ পড়ে শোনাবে।
তোমার মনের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের
মনেব মধ্যে মোচড় দিবে উঠবে। তুমি
তা দেখবে না বকুল। তুমি দেখতে পাও
না।

তুমি আমার কেউ হও কি না সন্মিমা
জিজ্ঞাসা করেছিল। সবরকম গল্পেব মধ্যে
তোমার গল্প হযতো বেশিই করে ফেলে-
হিলাম। বলেছিল 'যাঃ। এতো কথা মনে
আছে। বলতে বসে ফুঁবোতে চায় না।
এমন কবে মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে যে
সে আমার কেউ হয না?'

সত্যিই বকুল আমার কেউ না। মাস-
ছুতো বোন রাখার বন্ধু। পূর্ববাংলার
চলে ভেজা, রোদ লাগা, মাটি মাখা মেয়ে।
স্বর্গ জলে বেড়ে ওঠা চারাগাছের মতো
চিকন। বকুল কি ফসফা? লোকে

তাই বলতো। আমার মনে হতো নিচোল
একটি মৃত্যু। শাদা অথচ একটু ধূসর
রঙ জড়ানো। কেমন তা বুকিয়ে বলা
যায় না।

সে কতোদিন আগে। ভালো করে
মনেই পড়ে না। এক এক করে সে দিন-
গুলো হারিয়ে গেছে। করে গেছে; বিবর্ণ
হয়ে গেছে। দিনই নেই যেন আর
সেগুলো। স্মৃতি হয়ে গেছে। সেই

'অনেকদিন আগে'র কোঠায় পেঁছে গেছে।
বয়সটাকেও কি আর হাত বাড়ালে পাওয়া
যায়? মনে দিয়ে কি ছোঁওয়া যায়? একটু
রঙ, একটু গন্ধ, একটু কিসের যেন আবহা
আভাস হঠাৎ মনে চলে আসে। আবার
হারিয়ে যায়।

সবে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছি।
বকুলের বয়স তখন দশ কি এগারো।
কৈশোর ছুই ছুই করেও থমকে দাঁড়িয়ে।

র মেনেছে ওল চঞ্চলতায়। বাহার সূত্রে
আমি ওর দাশ। মা-বাবার একই সন্তান।
দাদা শব্দ মেটাতে চেয়েছিল, আমাকে দিয়ে।
বহন একবার-দুবার ছুটিছাটায় মাসীমার
ওখানে যেতাম। যেতে হত। নইলে
বকুলের সাতজন্মের আড়ি।

বাধা মাঝে মাঝে অসন্তুষ্ট হত।
বলতো, "বাধা! তুই কি রে বকুল? দাদা
কি দিনসাত তোব সংগে মাঠে-ঘাটে ঘুরে
বেড়াবে? বলবাতাব ছেলেকে তুই জ্বালি
ঝানিয়ে ছাড়িলি?" চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বকুল
বলতো, 'তোবাও আঁব না। চল আজ
বলিমন্দীর বাড়ি আঁথের বস জ্ঞান দিচ্ছে।
এই আঁথো বড় বড় আঁথ।' কিছটা ঈর্ষার
ভাব থাকলেও বাধা প্রায়ই যেতো আঁথ,
কাচারিমে আম কি চালতাব খোঁজে। রাধা
আবার বেশি পাড়া বেড়ালে বকুল
খতো।

বকুলের সে বালাই ছিলো না। সব
কিছ চেনাতে, জানাতে ওর উৎসাহের
বাড়াবাড়ি দেখে কৌতুকবোধ করছি।
তবে এটা ঠিক আমি গ্রামকে যেন নতুন
কবে আবিষ্কার কবি বকুলের চোখ দিয়ে।
মেঘটা বখন অবাক হয়ে বলছে, 'মা!
এও জানো না? দ্যাখো নি... বন?'
পূর্বো বাহাদুরিটা ওকেই নিতে দিতাম।
পোড়োবাড়ির ভাঙা ইট-কাঠের আড়ালে
ফোটে জুইচাপা। ভাল নেই, পাতা নেই।
মাটি কুড়ে বেরোনো হাফকা বেগুনী
রঙের, মিষ্টি গন্ধমাখা শুদ্ধ কটি
পার্পাড়। কালো টিপ পবা লাল টুকটুক
কুচফল। ছেলেবেলা থেকেই আমাব পরম
বিস্ময়। স্যাকরার দোকানে দেখেছি,
মান কাছে দু-একটা দেখেছি। ভেবেছি
অনেকগুলো যদি একসঙ্গে পাওয়া যেতো।
সেই দুর্লভ সম্পদ যে পথেই থাকে বন-
বাদাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে প্রথম
দেখলাম।

ভাবনায চমক লাগে। আসানবানব
বন, পাহাড় আর ধু-ধু মাঠের কোলে
তুমি দাঁড়িয়ে আছো বকুল? ওখানেও কি
তুমি মানিয়ে নিয়েছো? মনে পড়ে বেত-
ফল দাব, কবচাব সেই আয়োজন?
কাসুন্দার সংগে জড়ানো পাকা বেতফল?
করমচার মধ্যে ভরা কালোজিবে আর নুন?
জিভে জল আসে। তোমাব কাছেও কি
সোঁদিন স্মৃতি? দাঁড়িয়েই থাকো বকুল
আসান বন আর পাহাড়ের বহুসোর মধ্যে।
মনকে জেনেছো তুমি মনবে আলোয়।
সেই আলোর চোখে না দেখার অন্ধকার
তোমাব কণন সরে গেছে। আজ বন্ধুছো
না কিন্তু একদিন তুমি বন্ধবে বকুল।

কত পাঁখি বন্ধনাথের বাড়ি। ময়না,
বাকাতুয়া, মুনিয়া, চন্দনা। কত ফুল
বাগানে। বকুল ভালোবাসে। বকুলকে
খাশি কববার আয়োজন। আমিও তো

জানি ও ভালোবাসে ফুল, ভালোবাসে
পাখি। আঁশ্বনের কাকডাকা ভোবে,
শিশিবে পা ডুবিয়ে সেই যে এক পাড়া
থেকে আরেক পাড়া। সান্নি ভরে ওঠে,
জলা ভবে ওঠে, কোঁচড় ছাপিয়ে যায় তবু
মন ওঠে না। আর সেই হাছধরা? নল-
খাগড়াব বনের মধ্যেকাব বিলে ভর্তি মাহ,
ছিপ ফেললেই ওঠে। তুমিই তো বলে
দিগেছিলে বকুল। হাব, শিব, খোকন
আর আমি। তুমিও সংগে থাকতে। বড়-
নিতে টোপ গেঁথে দিতে; টোপ জোগাড়ও
করতে তুমি।

রামাবাড়ি, ঘবকমার বেলা নয়। বনে-
জংগলে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোই
নেশা। এলোমেলো কোঁকড়া ঢুল পিঠে
ফেলে, ডুরে শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে,
বোদের রঙ আর গাছের ছায়া গারে মেখে
ও যখন বন-জংগলের ভিতর দিয়ে পথ
হাটতো, ওকে আমার মনে হতো বনলক্ষ্মী।
সবচেয়ে ভালো লাগতো ওর চোখ। রহস্য-
লোকেব আভাস যেন ধরা দেখানে। এতো
কথা মনে আছে এজন্য যে বকুলকে আমিও
খুব ভালোবাসতাম। ওর বয়স আরো
দু-চার বছর বেশি হলে হয়তো প্রেমেই
পড়ে যেতাম। তবে সে কথা ভেবেছি।
তখন ওসব কিছই মনে হয় নি।

তারপর তুলেই ছিলাম বকুলের কথা।
স্বাভাবিক নিয়মেই। জীবনটা তো ছোট
নয়। খেসেও থাকে নি। এসেছে কত
সমস্যা, দিনগত হাজার চিন্তা, কত নতুন
মুখ। তাই মাঝে মাঝে খবর কানে এলেও
আব পাঁচটা জিনিসের মধ্যে মিলিয়ে
গিয়েছে। পারিস্তান হবাব অর্পদিনেব
মধ্যেই ওরাও সব ছিটকে চলে এসেছে।
পূর্ববাংলার পথও অচেনা হয়ে গেছে।
খোঁজ নিতে পারি নি। আমি তখন অনেক-
দূরে। ডাক্তারী বিদ্যাব উচ্চ শাপে ওঁঠবার
জন্য তিন-চার বছরের মতো বিদেশে।

মাসীমারা চলে এসেছিলে। ওঁদের
কাছেই প্রথম দিকে একটু-আধটু খবর
গেতাম। বাধা লিখতো মাসীমাও লিখ-
তেন। কলকাতাব কাছেই কোনো একটা
কলোনীতে ওবা চলে এসেছে। সব স্মৃতি,
অসহায় অবস্থা। তারপর কিছুদিনের
মধ্যেই জানলাম বকুলের বাবা মারা গিয়-
ছেন। বকুলের বিয়ে না দিলে কলোনীতে
থাকা মন্সির ওব মাব পক্ষে। রাধা
জিবেছিল বকুল দেখতে যা সুন্দর হয়ে
উঠেছে। কিন্তু রূপ থাকলে কি হবে।
বড় দেমাক। কত সম্পদ আসছে, কাউকেই
মনে ধবে না। কী এমন বাজপুস্তর
আসবে ওর জন্য? মনে আছে রাধার
চিঠির মধ্যে বকুলকে একটুকরো চিঠিও
দিগেছিলান এ নিয়ে। উত্তর পাই নি।

ভালোই কবেছিলে বকুল। রাজপুস্তর

অপেক্ষার ছিলে। রাজার ঈশ্বরই তোমাকে
সে দিবেছে।

চার বছর পরে। দেশে ফিরলাম
বিলাতী ডিগ্রীর ডকমা লাগিয়ে। খুবই
ব্যস্ত। সমাজজীবনে, সংসারজীবনে
প্রতিষ্ঠার তাড়া। বকুল মানিয়ে গেল
পশ্চাৎ পটভূমিকার।

তাবপর কত বছর কেটে গেল।
এলাহাবাদে থাকি এখন। ডাক্তার হিসেবে
ঘরে ঘরে নামডাক। দেশের সংগে সম্পর্ক,
কালে-ভদ্রে। মনে এলেও খেঁড়ে ফেলে
দিই।

সুঁমিরা কিন্তু বাংলাদেশ বলাতে
পাগল। ছেলেদের গল্প কবে বোঝাতে
চার আগেকার বাংলার রূপ। আমি পারি
নে। মূর্খে আটকে যাব। 'সেদিন' বলে
সত্যিই কিছ ছিল? সে তো আমাব কাছে
স্বপ্ন আজ। গল্প শ্রুনে ওবা তাব কটকট
বুঝবে।

সুঁমিরার ইচ্ছেতেই সেবার কলকাতা
এসেছিলাম। তখন শুনোছিলাম। বকুলের
মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন। বকুল আছে
আসানসোলেব কাছে কোথায় যেন তার
এক কাকার বাড়ি। বিয়ে হয় নি। হবোও
না আর। টাইফয়েড হবোঁছিল। বোগ
যতখানি কঠিন ততখানি যত্ন নিয়ে
চিকিৎসা হয় নি। তবু বকুল ধাক্কা
শামলে উঠেছিল। কিন্তু চোখে ঝাপসা
দেখতে আরম্ভ করে। কাকামারা বলতেন
ও সব ন্যাকামী। কাজে ফাঁকি দেবাব ছিল।
ছিল যে নয় অর্পদিনেই বোকা গেল।
বকুল চোখ দুটি হাবালো।

আবো অনেক খবর ইচ্ছে কবলেই
ধানতে পারতাম। কিন্তু এ কথা শোনার
পব আব কিছু শ্রুনেতে ইচ্ছে হল না।
বকুল অন্ধ? সেই আশ্চর্য সুন্দর দুটি
চোখ? যা কখনো বাগে ঝলসে উঠতো,
অভিমানে কালো হয়ে আসতো,
কৌতুকে নেচে উঠতো? ক্ষণে ক্ষণে
যাব বড় বদল মনে পড়তো পম্পাপারের
আকাশকেই? নিটোল মন্থো বঙে গভীর
দুটি কালো চোখ।

আগে যখন গল্প কবেছি সুঁমিরা
হেসেছে। বাল্যপ্রেম নিষে ঠাট্টা করেছে।
এবার বকুলের জন্য মন খাবাপ দেখে ওসব
কিছই কবলো না। বয়ঃ প্রস্রাব কবে
বসলো বকুলকে নিয়ে চলো না কেন
এলাহাবাদ! ভেবে পেলান না কী করে
তা সম্ভব। সাঁত্যাকারের কোনো সম্পর্ক
তো নেই। রাজী হনেন কেন ওব কাকা,
কাকীমা? তা ছাড়া কাকা-কাকীব কথা
এ পর্বন্ত যা শুনছি তাতে মনেমুখি
হবাব সাহসই কুলোবে না। সুঁমিরার
প্র্যান কাজে লাগানো অসম্ভব।

বকুলের দুর্ভাগ্য বেশ কিছু
আমাকে আচ্ছন্ন কবে রাখলো।

সেই সে মিলিয়ে গেল নানান লোকের
ভিড়ে। বছরের পর বছরও নিবিঁবাদের পার
হয়ে গেল।

তুমি বোধহয় ভাবতে পার নি বকুল।
চিরকালের সরল বিশ্বাস তোমার মনে।
ভবেছিলে হয়তো খোঁজ নেবো। হয়তো
নে রাখবো। যেমন তুমি রেখেছো। কিন্তু
যদি মনে রাখি নি। রাখতে পারি নি।

সেদিন চেম্বার থেকে ফিরে
বারান্দার ইজিডোরে বিশ্রাম করছি।
সন্ধ্যার আকাশে তখন রঙের ছড়াছড়ি।
কখন তন্দ্রা এসে গিয়েছে জানি নে।
সন্ধ্যার ডাকে চমকে জেগে গেলাম। চা
আর খাবার বারান্দায় নিয়ে এসেছে। সংগে
ক'খানা বিকেলের ডাকে আসা
চিঠি। একটা খামের চিঠিতে ছাপ

দেখলাম রামপুরহাট। ওখান থেকে আবার
কে লিখলো? ভাবতে চেষ্টা করলাম।
হল না চিঠিটা খুলতেই ভূঁইচাপা, যাই
মালতী'ব মিস্ট গন্ধ। শালিক, ময়না,
দোয়েল, চন্দনার শিস্। পশ্চিম পাড়ভাঙা
চেউয়ের শব্দ। কতকাল পাবে?
বকুল লিখেছে। সেই ছোট্ট মেয়ে
বকুল। সেই অন্ধ মেয়ে বকুল; সেই

উন্নী এত বিরক্ত কেন?



হারণ ওর টেলিগ্রামটি সময় মত পৌঁছায়নি। হয়তো ডাক ও তার বিভাগের দোষেই
তার বার্তাটি সময় মতো যায়নি। অথবা হয়তো ঠিকানাটি ঠিক দেওয়া হয়নি।

● কোন অরুচী খবরের জন্যই টেলিগ্রাম করা হয় এবং সেই খবরটি নির্দিষ্ট স্থানে
তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার, তা না হলে টেলিগ্রাম করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

● তারবার্তা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পাঠানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ যথেষ্ট
যত্ন নেন। কিন্তু টেলিগ্রাম বা চিঠি তাড়াতাড়ি বিলি করতে হলে সঠিক এবং সম্পূর্ণ
ঠিকানা অত্যন্ত দরকার।

● সব সময়ে পুরো ঠিকানা দিন - তাছাড়া সঠিক এলাকাটি যাতে তাড়াতাড়ি
জানা যায় সেজন্য অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে দিন - টেলিগ্রামে অঞ্চল সংখ্যা দিলে তার
অন্য অতিরিক্ত মানুষ দিতে হয়না।



আগবাদের আরও সেবা
করার জন্য
আমাদের সহায়্য করুন

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

হারিয়ে যাওক বকুল। তার প্রথম চিঠি। আমার ডাকনাম যে ভুল তাই বা কে মনে রেখেছে?

বকুল মনে রেখেছে। ভুলনা তার প্রথম বোঁবন যে ওর স্মৃতিতে অক্ষর। রঘুনাথকে আমার বর্ণনা যা দিয়েছিল কত বদল হয়ে গেছে ও জানতে পারবে না। ভালোই করেছে বকুল। কুড়ি-একশ বছরের 'আমি'কে হঠাৎ আমার কাছে হাজির করে দিয়েছে। রঘুনাথকে বলেছিলে হাসলে চোখ ছোটো হয়ে যায়, কপালের পাশে কাটার দাগ; চলে তেল নেই। কপালের উপর এসে পড়া চুলগুলোকে মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে সারিয়ে দিই। এখন দেখলে বন্ধুতে কাটার দাগ প্রায় মেলানো। চোখে পড়েই না প্রায়। ব্রীল ক্রিম দেওয়া চুল সমস্ত পরিপাটি। হাত দিয়ে 'চুল সরাবার দরকারই হয় না। অনেক বদলে গেছে আমি।

চিঠি পড়ে কিন্তু অবাকই হলাম বেশ। বকুলের স্মৃতি—স্মৃতি! অসম্ভবের তালিকার মধ্যরই একটা ব্যাপার। তাও আবার দুমকার আসানবানিতে। একান্ত অনুরোধ আমাকে সেখানে যেতে হবে। সন্মিষ্টাকে বললাম, “বন্ধুরে দাও ব্যাপারটা। এতোকাল পরে আমাকে স্মরণ কেন? এখন ঘরপাী গৃহিণী। মন্সিকল আসানের লোক হাজির। কী এমন গুরুতর দরকার থাকতে পারে?”

“দরকার নিশ্চয়ই। নইলে ডাকবে কেন? কিংবা স্বামীর সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চায়।” আবার কটাক্ষও হল সন্মিষ্টার—“অর্থাৎ জানাতে চায় তাকে আদর করে নেবার মতো লোকও আছে। সবাই তো আর তোমার মতো নয়। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়ে পস্তাবে!”

“গেরোর মধ্যে প্র্যাটিনামও তো থাকতে পারে। পস্তাবে কোন দুঃখে? প্র্যাটি-থায় তো শোনা যায় সবচেয়ে দামী।”

“আহা মরে যাই। শুব হয়েছ। এখন বাও, শুনো এসো বালাসখীর প্রয়োজন। ফরসালা করে দিয়ে এসো।”

“কিন্তু রুগীরা?”

“দু-চার দিনের বিরহে ভুবন অন্ধকার দেখবে না।”

মনে খানিকটা কৌতূহলও। রঘুনাথ হালদার বলে এক ভদ্রসন্তান বকুলকে বিয়ে করেছে। অর্থ মেয়েকে বিয়ে করলো কেমন সে লোক?

চিঠিটা আবার আগাগোড়া পড়লাম। “এসো কিন্তু ভুলনা। সত্যিই ভীষণ দরকার। এলেই সব জানতে পারবে। কবে আসছো—কটার ট্রেনে আসছো জানিও। স্টেশনে লোক থাকবে।”

বকুলকে অনেকদিন পর দেখবো ভাবতে গিয়ে খুশি হতে পারলাম না।

আমার চেনা বকুলকে আর খুঁজে পাবো না। অসম্মে খোঁজ নিই নি সেটাও একটা সংকোচ। কেমন একটা বিরতই বোধ করতে লাগলাম। তবু উত্তর দিতে হলো। বাবার আয়োজনও করতে হলো। খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা অস্বাস্ত নিয়ে রওনা হলাম।

বকুল প্রণাম করে দাঁড়াতেই দেখি চোখে জল। কী সান্থনা দেবো? রঘুনাথ শুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো—“কামা কেন বকুল? এনে দিলাম তো দাদাকে। কোথায় খুঁজিতে লাফাবে, তা নয়—। চা-টা দাও। গল্প-গুজব কর। আমি যাই মাকে বলি খাবার সাজাতে।”

কথাবার্তা, ব্যবহারে শুবই ভদ্র রঘুনাথ। বকুলকে যে কতখানি ভালো-বাসে তার প্রমাণ এর মধ্যে আমার পাওয়া হয়ে গেছে। ভারি ভালো লাগলো। তবু খচ করে বিখঁহিল অসংগতি। ভুলতে পারছিলাম না প্রথম চমক।

শুধু তোমার কাছেই মাপ চাইছি নে বকুল। রঘুনাথের কাছেও। লোক চিন্তার গর্ব আমাদের সাজে না। মানুষের মনের পরিমাপ করা কি এতোই সোজা?

রামপুরহাট নেমে ভাবছি কেউ এসেছে কি না। সন্টেকেস হাতে প্র্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে শুনলাম—“নমস্কার। আপনি নিশ্চয় ডাঃ মিত্র। বকুলের ভুলনা? আমি রঘুনাথ।”

ফিরে তাকিয়ে প্রতিনমস্কার করতে দেরিই হল। রঘুনাথ? বকুলের স্বামী? বরসে আমার চেয়ে ছোটই। শক্ত সমর্থ চেহারা। ভরাট গলা। কিন্তু বকুলের পাশে কী করে মেলানো? শুব রঙই কালো নয়। মুখ-ময় বসন্তের দাগ, খসখসে চামড়া। গর্তে ঢোকানো দুই চোখ, উঁচু দাঁত। এক কথায় বকুলের পারের নখরও যোগ্য নয়।

রঘুনাথ বলে চলেছে—“যা বর্ণনা দিয়েছে সবটা না মিললেও ধরতে ঠিকই পেরেছি। দাদা যেন ধাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে? প্রথমটা সবাই অমন যায়। ঈশ্বর-দত্ত চেহারা মশাই। খাঁটি, নির্ভল্লাভ। চলুন বাসের দিকে এগোই। আমাদের এক বাসই ভরসা। ট্যাক্সির বালাই নেই।”

সন্টেকেসটা হাত থেকে টেনে নেয় রঘুনাথ। ব্যস্ত হয়ে বলি—“আপনি কেন? ভারী তো নয় আমিই নিচ্ছি।”

“ওটি হচ্ছে না দাদা। ‘আপনি’ বললে লজ্জা পাবো। চলুন না এগিয়ে। ঐ তো বাস স্ট্যান্ড।”

বাস চললো। দুখারে বিরাট মাঠ, জংল, ছোট-বড় পাহাড়, শাল, পিয়াল, মহুয়াবন। ছাড়িয়ে চললো, তুসনি,

বেলবানি, মহুয়াবানি। একবার বাস বন্ধ করে পৌঁছলাম আসানবানি। ওদের বাড়ি যখন পৌঁছলাম সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। পাহাড়ের মাথায় আর আসানবানের ফাঁকে ফাঁকে জড়ো হয়ে আছে চাঁদের আলো। প্রচুর আসানগাছ। গ্রামের নাম তাই আসানবানি। বাড়িটা ওদের মোটের ওপর ভালোই। সামনের জমিতে ফুলের বাগান। পেছনে তরি-তরকারি। গরু, মোষ, মুরগীও রয়েছে দেখলাম।

এমনভাবে যে বকুলের সংগে দেখা হবে তা কি জানতাম? তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ওর চোখের দিকে—যে চোখে বিদ্রোহ খেলতো। বললাম, “বকুল এইবার বল কী তোমার ভীষণ দরকার?”

হা হা করে হেসে উঠলো রঘুনাথ, “বুঝলেন না দাদা? দরকার না লিখলে আসবেন কেন? আপনি কাজের লোক, এতদূর এই পাড়াগানে আসতে ইচ্ছেই বা করবে কেন?”

“সত্যি বকুল?”

কুণ্ঠিত গলার বকুল বললো, “না তা ঠিক নয়। অকারণে ডেকে পাঠাবো কেন? আগে তো কোনোদিন ডাকি নি। যাক গে, সে কথা আমার আর দাদার মধ্যে।”

রঘুনাথ যেন অবাক হল : “তা তো বল নি তোমার সত্যিসত্যিই কোনো দরকার আছে? আমি ভালোমতে অনেকদিন দেখ নি তাই। আমাকে জানাবে না কী এমন কথা?”

“বললামই তো ও কথা এখন থাক। হাতামুখ ধুয়ে নাও ভুলনা। এলেই দেখবে চা রেডি।”

রঘুনাথকে কেমন গম্ভীর মনে হল। হয়তো কোনো গোপন কথা রঘুনাথকে জানাতে চায় না। তাই বললাম, “আর কোনো কথা আজ নয়। আজ আমরা শুব সেই ছেলেবেলার গল্প করবো। তোমাদের বিষের গম্পটা অবশ্য আজই শুনবো। নৈমন্তিকের স্বপ্ন বাদ পড়েছি।”

এটা অবশ্য বললাম না বিয়েতে গেলে বর দেখেই পত্রপাঠ বিদায় হতাম। বিয়ে পর্বন্ত অপেক্ষা করতাম না।

“আমার বিষের নৈমন্তিকের কথা বলছো? সন্যোগে পেলাম কোথায়? আচ্ছা ভুলনা শুব অবাক হয়েছো তো? আমিও কি ভাবতে পেরেছি। একদিন কত সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছি। পছন্দ হয় নি। তারপর? আমাকেই কেউ পছন্দ করতে চাইলো না। অন্ধকে পছন্দ করে কেউ?”

“ও কথা আর বলতে পারো না। কেউ কেউ করে। প্রমাণ তোমার হাতের কাছেই।” হেসে বলি।

“সেই তো আমার অবাক লাগে। ও কী করে পছন্দ করলো? কী দেখলো আমার মধ্যে? আর এমন করে আমি যেন

কোথাকার মহারাণী! আমার মধু, আমার আরামের জন্য এতো ব্যস্ত হয় যে আমার লক্ষ্যই করে। আবার বলে কি জানো? ওকে নাকি বিদ্রোহ দেখতে। আচ্ছা বল চোখে দেখি নে বলে কি সত্যি-মিথ্যেও বুঝতে পারি নে? তুমি তো দেখলে ভুলদা, বল ওর কি খুবই খারাপ চেহারা?"

কী বল বকুল? সত্যি কথা তোমাকে তো কেউ জানায় না। জানাতে পারে না। রঘুনাথ সত্যি বলবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাও রেখে-ঢেকে। আমার মধু থেকেই কি বেরোবে?

“কি বল বকুল। তাও কখনো হয়? রঙ ময়লা হলেই কি তুমি কাউকে খারাপ দেখতে বলতে পার?”

“আমি জানি ভুলদা। সব ওর মধ্যে কথা।”

রঘুনাথের ছোট ভাই শিবনাথ এসে বললো, “বোঁদি, মা ডাকছেন। দাদা রাগে ভাত খাবেন না লুচি? আর সব ওঁদিকে তৈরি। তুমি একবার এসো। তোমার পাখিদের ঘরে তুলতে হবে।”

কুলের মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাগি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। অন্য সবাই শূন্যে পড়েছে। রঘুনাথ আমি আর বকুল বাগানের মধ্যে মাদুর পেতে বসে। কিছুক্ষণ পরে রঘুনাথ কি কাজে যেন উঠে গেল। তখন বকুল কথাটা পাড়লো।

“শুনবে তো ভুলদা আমার দরকারের কথা? হেসে উড়িয়ে দেবে না?”

“শুনবো বলেই তো অতোদূর থেকে এলাম। কিন্তু একটা কথা বকুল। রঘুনাথকে গোপন করে কি কিছু করবার মতলব তোমার?”

“দূর তা কেন? ওকে গোপন করে কিছু করি নাকি আমি। তা নয়। ও জানে। তবু কেন ওর সামনে বলতে চাইছি নে সে তোমার ব্যাকারে বলাই। ও ভাবে আমার মনে কষ্ট হবে। একটা আশা তো? যদি না হয়। নইলে শূন্যে ওরই তো বেশি আনন্দ হয়েছে। ওই তো সব করবে বলেছে। তবে ঐ যে ভয়। তাই আরো কিছুদিন দেখতে চাইছে। কিন্তু আমার যে ভর সইছে না।”

“কী ব্যাপার বকুল?”

“চোখে দেখতে পাই নে। সে কষ্ট আমার সেরে গেছে। তার জন্য নয়। ওকে দেখতে পাই নি পাবোও না কোনোদিন, সে কষ্ট মনে কাঁটার মতো বেঁধে। সেদিন দুমকার ডাক্তার যখন বললেন তাঁর মনে হচ্ছে এ চোখ হয়তো ভালো হতে পারে। অবশ্য খুব আশা তিনি দেন নি। কিন্তু সেট দিন থেকে আমার মনে ঐ একটি কথা। আর কিছুর জন্য নয়। পৃথিবীকে তো স্পন্দনকাল থেকে দেখছি। ওকে তো দেখি নি। যদি একদিনের জন্যও হয়—

ভারভেও আমার কী যে লাগছে ওকে দেখবো; আবার রোদ দেখবো, দিন দেখবো, চেনা পৃথিবীর রূপে দৃষ্টিতে ভরে উঠবে। তুমি তো ডাক্তার, তাই তোমাকে ডেকেছি। ও যদি শূন্যে রাগ করে তাই ওকে আগে থাকতে কিছু বলি নি। তাছাড়া তুমি যত ভালো ব্যবস্থা করতে পারবে ও কি আর তা পারবে? কত বড় বড় ডাক্তারের সংগে তোমার জানাশুনা।”

দৃষ্টিহীন চোখে ধরে পড়ে অজ্ঞান মিনতি।

হায় বকুল। চোখ ফিরে পেতে চাও? দরকার কি তোমার? চোখের আলোর দুনিয়া যদি আরো ভালো হয়ে যায়? কথা পাট্টাবার জন্য বলি—“তোমার কথাটা ভেবে দেখবার। কাল বরং সবাই মিলে আলোচনা করা যাবে। রঘুনাথকে না জানিয়ে তো কিছু করা যাবে না। এখন তোমাদের বিয়ের গল্প শুন।”

শুনলাম। মামুলী প্রেমই। আসান-সোলার কলিয়ারীতে কাজ করতো রঘুনাথ। কাকার কাছে দরকারে যেতে-আসতে হতো। বকুলকে দেখে ভালো লাগে। বকুলের অসহায় নিঃসঙ্গ জীবনে হঠাৎ আসে যেন পরম বন্ধু। তারপর গোপনে কলকাতায় এসে রেজিস্ট্রি করে ওদের বিয়ে হয়। সেখান থেকে সোজা আসানবানি।

“তাহলে রঘুনাথের চাকরি।”

“চাকরির দরকার কোনোদিনই ছিল না। অনেক জমি-জমা বিবরণ-সম্পত্তি আছে এদের। নেহাৎ বাড়িতে ভালো লাগতো না তাই—।”

“এখন ভালো লাগে?”

বকুল হেসে মাথা নিচু করলো।

পরদিন দৈর্ঘ্য বকুলের মধুচোখ ফুলো ফুলো। অনেক কাঁদলে যেমন হয়।

“কী বকুল? খুব মান-অভিমানের পালা চলেছে মনে হচ্ছে?”

“ও কেন হঠাৎ এমন করলো ভুলদা? কোনোদিন তো এমন ব্যবহার পাই নি। চোখ দেখাতে কলকাতায় নিয়ে যাবার কথায় রাগ করলো কেন? ওর নিজেরি তো নিয়ে যাবার কথা ছিল। তোমার সংগে যাবার কথায় বিরক্ত হল কেন?”

“হয়তো ভেবেছে এ আমার অনাধিকার চর্চা। হয়তো তোমার সব কিছু ও নিজের কর্তৃত্ব চায়। তোমরা দুজনেই এখনো বস্ত্র ছেলেমানুষ আছো বকুল। অতো উতলা হলে কি কোনো কিছু হয়? কোথায় রঘুনাথ? দৈর্ঘ্য ওর সংগে কথা বলি। আমি এলাম কত বছর পর আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিলে। দেখছি না এলেই ভালো হত।”

“তুমিও রাগ করছ ভুলদা? বেশ আমি যাবো না, তাহলেই তো হল।”

বকুলের চোখে জল এসে গেল।

রঘুনাথেরই বা এতো রাগের কী

আছে? দেখতে না পাওয়ার কষ্ট কতখানি সে কি বুঝতে পারে না? এই ছেলে-মানুষীর কোনো মানে হয় না। অথবা মেয়েটাকে দৃষ্টি দিয়ে কি লাভ হচ্ছে? রঘুনাথকে কথায় কথায় বললাম, “বস্ত্র আশা করেছে। নিয়েই যেও একবার কলকাতায়। আমি না হয় আমার চেনা স্পেশালিস্টকে চিঠি দিয়ে দেবো।”

“রাগারাগি করা আমার বাত নয় দাদা। আমি বিরক্তি হচ্ছি যে আমাকে বকুল বিশ্বাস করতে পাবছে না কেন? আপনাকে এখানে আসতে বলার আসল উদ্দেশ্যটা আমার কাছে লুক্কানো কেন? তাই একটু কি বলেছিলাম কেন দেই অস্থির। আমি তো বলেছিছি নিয়ে যাবো।”

জেন তোমার সেই একইবন্ধন কাছ গেছে বকুল। সেই একগুঁয়ে স্বভাব। হাব তুমি সহজে মানতে চাও না। তাই আবারও বললে প্রেসক্রিপশন আমাকে দেখাতে। ডাক্তারের অভিমতে আমার কি বতাব আছে সেটা তুমি শুনতে চাইছিলে।

সেটাও কি একান্ত জরুরী? এক্ষণি দেখাতে হবে? অসম্ভবত গলায় বলল রঘুনাথ,—“আমি এখন বাজারে যাবো। তাবপন দাদাকে নিয়ে বেড়াতে বেবোবো।”

“নাইবা দিলে। আমি কি আর জানি নে কোথায় আছে আমিই পারবো দিতে।”

রঘুনাথ যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। বকুল তখন পাশের ঘরের ভ্রূষা খুলে ঘাঁটছে।

হঠাৎ কি হল। রঘুনাথ ছুটে গিয়ে বকুলের হাত চেপে ধরে এ ঘরে নিয়ে এলো।

“এতো জেন কেন? তুমিও তো কখনো এমন কর না? বললাম পরে দেখাবো। না কি তাও বিশ্বাস হচ্ছে না!”

তখনকার মত চুপ কবা উচিত ছিল তোমার বকুল। তা তুমি রইলে না। এক খটকায় হাত ছাড়বার চেষ্টা করল। পারলে না। প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলে, “হাত ছেড়ে দাও। আমি কি কিছু অন্যায় কাজ করছি? যাও তো ভুলদা ওঘরের ভ্রূষার থেকে ওটা নিয়ে এসো।”

রঘুনাথের মা এসে দাঁড়ালেন উদ্ভ্রমিত মুখে—কী হল বোঁমা? হ্যাঁবে রঘু কি হয়েছে?” রঘুনাথ সংগে সংগে বকুলের হাত ছেড়ে দিয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রঘুনাথের মা গজ গজ করতে লাগলেন—“এ আবার কী কান্ড! এতোদিন বিয়ে হয়েছে কোনোদিন তো দুটো কথা কাটাকাটিও হয় নি এদের। আজ একেবারে দাদার সামনেই—। কী হয়েছে বোঁমা?”

তুমি উত্তর দিতে পার নি বকুল। চোখে জলের ধারা বইছে তখন।

প্রেসক্রিপশন, ওষুধ সবই দেখে-ছিলাম। আর আমার থাকবার দরকার

নেই। রঘুনাথের স্ত্রী, যা শ্রীশ ও কনক। আমি কেন মিথ্যা এর মধ্যে জড়াই। মানুষকে আমরা কতটুকু চিনি। মনের হৃদয় পাওয়া কি এতই সোজা। যে মনুষ্যে আমরা চিনেছি বলে নিশ্চিন্ত হই, ছোট একটি কথা, ছোট একটি কাজ আমাদের সব ধারণা পাশে দেয়। আমারও তাই হয়েছিল। তবে তখন নয়। আমার যেন কেমন গোলমাল লাগছিল। রঘুনাথের চেহারা যতো খারাপই হোক, মনটা ভালো বলেই মনে হয়েছিল। প্রেসক্রিপসান না দেখানোর কারণ জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু পরিষ্কার নয় প্রেসক্রিপসান আর ওষুধ।

বকুলকে কিছুই বললাম না। শুধু বললাম, “সব দেখলাম বকুল। তবে ব্যবস্থা করতে হলে আগে যাওয়া দরকার। আমি বরং আজ বিকেলেই চলে যাই।”

“আজই?”

“কলকাতার দু-একদিন দেরি হবে তো। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।”

বকুল শ্রীশ হয়ে উঠলো—“আচ্ছা, তাহলে তাই। এবারকার আসা কিন্তু আসা হল না। এর পর বৌদি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেশ কদিন থাকতে হবে। নইলে কিছুতেই ছাড়বো না।”

বকুলকে শ্রীশ দেখতে আমার শব্দ ভালো লাগে। মস্তুর পড়ে যেন রোদের ঝিলিক।

বিকেলের অনেক দেরি। শিবনাথের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম সাঁওতালদের পাড়ার দিকে। ভিলাবনী, দহমুর্গা পার হয়ে, ধান, জোয়ার, গম, অড়হড়ের আল বেয়ে, নদীর ধার দিয়ে আবার ধরলাম গানের পথ। বেলা ক্রমে বেড়ে উঠলো।

ফিরে ঘরে ঢুকতেই খিলখিল হাসির শব্দ। বকুল হাসছে। রঘুনাথ একরাশ-ফুল এনে ঢেলে দিয়েছে বকুলের মাথার গায়ে। কিছু ফুল আটকে আছে খোলা চুলের রাশে, কিছু শাড়ির সঙ্গে। বাকী-গুলো লুটোছে মাটিতে। কি যেন বলে চলেছে রঘুনাথ, বকুল হেসে আকুল।

যাক বাবা-দুর্ভাবনা-ঘটলো। নিশ্চিন্ত মনে ওদের কাছে গেলাম। রঘুনাথ-একটু যেন অপ্রতিভ। সামলে নিয়ে আমার সঙ্গে বারান্দার এলো। টিয়া আর ময়নার খাঁচা একটু দোলা দিয়ে, একটু সময় নিয়ে কি যেন বলতে যেতেই বকুল, ওপাশে এসে দাঁড়ালো।

রঘুনাথ বললো, “আমার জন্যই বোধ হয় এতো শীগগির আপনি চলে যাচ্ছেন। অস্বীকার করলে শুনবো কেন? আমি জানি। আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ নেই। তবে আরো দুদিন থেকে গেলে ভালো লাগতো। বকুলও দুঃখ করছিল। আর কি আসবেন কোনোদিন? এলে কিন্তু

সাত দিনের কমে ছেড়ে দেবো না। মাসাঞ্জোর, বড় বাঁধ, কেরাইয়া বাঁধ, লেক কিছুই তো আপনাকে দেখানো গেল না।”

রঘুনাথ তোমাকে বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছিল। ভালোবাসা অথচ তার ইচ্ছেটা এমনভাবে এড়াতে চাইছো। এ কেমন ভালোবাসা? চোখ নাও সারতে পারে আশংকাকে বকুলের আশার চাইতে বড় করে তুললে? কিন্তু সে এমন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে কেন? তাই তো প্রশ্ন রয়ে যায়—

বিকলে বিদায়ের পালা। আর হয়তো কোনোদিনই দেখা হবে না। জানা হবে না দুঃখের ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান কতটা কাজে লাগলো। জানা হবে না বকুল কলকাতার গেল কি না। সুযোগ পেলে স্পেশালিস্টের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো। কিন্তু নিজেকে আর জড়াবো না। রঘুনাথ স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গা নিল। শ্রীশই আপনি জানিয়েছিল। টিকলো না। বাস ছাড়তে আশ্বিনাটাক দেরি। রঘুনাথ কি যেন বলবার জন্য উসখুস করছে মনে হোলো। এতোকণ দৃষ্টির কেউই কথা বলি নি। ব্যস্ত ছিলাম যে যার চিন্তা নিয়ে।

সুদূর আয়ত করে শুনতে আসবে বকুলের কথা। ও যদি সঙ্গে আসতো হয়তো রঘুনাথকে বৃত্তান্ত, বকুলকেও বৃত্তান্ত। সুদূর কেমন সহজে সব বুঝে ফেলে।

হঠাৎ রঘুনাথ বলেই ফেললো—“একটা কথা। বকুলকে কিছু বলেনি তো?”

“তোমার কী মনে হয়?”
“বলেন নি। ওর মনে কষ্ট দিতে আপনি চান না। আমারও তো ঐ-মুশ্কল। কিন্তু বড় কঠিন। জীবন-ভরই তো দুঃখ, কষ্ট; হতাশা। কদিন বাঁচতে পারবো ওকে এসব থেকে।”

কেন জানি সে জবাব দিতে ভালো লাগছিল না।

“আপনি কেন বুঝতে চাইলেন না দাদা? আমি তো ভেবেছিলাম বলতেই হবে না কিছু।”

এক তিরস্কার? কিন্তু কেন? রঘুনাথের মূখে স্নান হাসি। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে আবার বলতে লাগলো—

“প্রেসক্রিপসান ছিড়ে ফেলে শাদা কাগজ রেখেছি। ওষুধের বদলে এনে দিয়েছি সুদূর আর সোলাপজন। কিন্তু কেন? ওর চোখ ভালো হলে আমার কি আনন্দ হবে না? আপনার কাছে তক্ষণি ধরা পড়তে লজ্জা হচ্ছিল। ও বোঝে না, বারে বারে আপনাকেই সব ব্যবস্থা করতে বলছিল। তাই ওকে থামাতে না পেয়ে

চটে গিয়েছিলাম। নইলে ওর উপর যাক আমি কোনোদিন করি নে।”

কিন্তু একটা শোনবার আশার আমার মূখের দিকে চেয়ে রইলো রঘুনাথ। বৃত্তান্ত চেপ্টা করতে গিয়ে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ওর দিকেই জিজ্ঞাসাভাবে তাকালাম।

“আমার চেহারা দেখে সত্যি বলুন চমকে গিয়েছিলেন কি না? জ্ঞান হবার পর থেকে কত বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, অপমান সয়েছি। নিজেকে আয়নার দেখে মনে হয়েছে কেন জন্মেছিলাম। বড় ছিলাম। মনের গায়ে তো কোনো কলঙ্ক নেই। সেখানে আর পাঁচজনের মতোই আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ। অসম্ভব জেনেও মা-বাবা বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কি রাজী হতে পারে? নতুন করে পেলাম শ্রীশ ঘৃণা, বিদ্রূপ, ভর। মানুষ বলেই মনে হতো না নিজেকে। তারপর বকুল আমাকে তুলে নিল। চোখ নেই তাই মন দিয়ে আমার মনকে ও বুঝলো। আমি নতুন করে যেন বেঁচে উঠলাম। সব ক্ষোভ প্লানি ও আমার মুছে দিল। সেই বকুল আমার দিকে তাকিয়ে আঁকে উঠবে, ঘৃণা করবে আমি সহিবো কী করে? সত্যি কথা বলবার চেষ্টা করছি, পারি নি। আমি স্বাধীন, ওকে ঠিক রেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন সে ওকে ভালোবাসি বলেই। একে আশ্বস্ত থেকে বাঁচাবো বলেই।”

সত্যিই এতো বড় নিম্ন সত্যকে বোঝবার চেষ্টা করি নি। অশ্ব বকুল নয়, আমিই। বকুলের দুঃখে কাতর হইলাম। তাকাই নি রঘুনাথের মনের দিকে।

তাই বকুল শ্রীশ তোমার কাছেই মাপ চাইছি নে, রঘুনাথের কাছেও।

রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “ভয় নেই রঘুনাথ। তুল আমার ভেঙে গেছে। বকুল কোনোদিনও একথা জানবে না।”

“কিন্তু ওকে যে বলে এলেন কলকাতার গিয়ে—”

“সেও আমি ঠিক করে ফেলছি। চোখ ভালো হতেও পারে আবার নাও হতে পারে তো? বিশেষজ্ঞরা এ ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। আমি গিয়েই করেকদিনের মধ্যে চিঠি দিচ্ছি।”

রঘুনাথের মূখে লজ্জা, কুণ্ঠা, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরো দেখলাম এক অপূর্ব শ্রী যা আগে হয়তো কোনোদিনই চোখে পড়তো না।

ভূমি দাঁড়িয়ে থাকে বকুল আসানবানির পাহাড়ের কোলে, মাঠের বিস্তারের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকে। ফাঁকি দিলাম তোমাকে, উপায় নেই। চোখের আলো আর ফিরে চেও না। মনের নরম স্পন্দন আলোর প্রেমের আর্তি চলুক তোমার।

সত্যিই কি তোমাকে ফাঁকি দিলাম? ঠকলাম কি?

বিশ্বসাহিত্যের * ৩ঃ নব্বৈ ভট্টাচার্য প্রাদীপ

॥ একটি ॥

প্রাচীন শ্লাভ সাহিত্য

শ্লাভীয় বা শ্লাভনিক ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্গত এবং লিথুয়ানীয়, ল্যাটভীয়, প্রাচীন প্রুশীয় প্রভৃতি বাল্টিক অঞ্চলের ভাষা-সমূহের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানীর কিবদংগ, পোল্যান্ড, চেকো-শ্লেভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে শ্লাভভাষী। তেরটি জীবন্ত শ্লাভীয় ভাষাকে তিনটি ভ্রূগোষ্ঠে ভাগ করা হয় :

- (ক) পূর্ব শ্লাভীয়-রুশীয় (বহু রুশ), ইউক্রানীয় (ক্ষুদ্র রুশ বা রুথেনীয়) এবং বাইলো-রুশীয় (স্বেত রুশ)।
- (খ) পশ্চিম শ্লাভীয় — পোল, শ্লেভাক, চেক এবং উচ্চ ও নিম্ন সোবীয় (ক্ষুদ্রাভাষী-ওয়েল্শীয়)।
- (গ) দক্ষিণ শ্লাভীয় — শ্লেভোন, সার্বোক্রোট, ম্যাসিডোনীয়, বুলগেরীয় এবং চার্চ-শ্লাভ।

সোবীয় উপভ্রূগোষ্ঠী থেকে নির্গত দুটি বাড়তি ভাষাবও পরিচয় পাওয়া গেছে— পোলাবীয় এবং পোমোরানীয়। অবশ্য এতগুলি ভাষার সব কটিরই নিজস্ব সাহিত্যসম্পদ নেই বা কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল না। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত শ্লেভাক সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। একথা উচ্চ ও নিম্ন সোবীয়, শ্লেভোন ও ম্যাসিডোনীয় ভাষার ক্ষেত্রেও খাটে।

পূর্ব শ্লাভীয় সাহিত্যের প্রথম যুগ

আগেই বলাই, পূর্ব শ্লাভীয় পরিবারটি তিনটি ভাষা নিয়ে গঠিত—বহু রুশ, ক্ষুদ্র রুশ ও স্বেত রুশ। আমবা বর্তমান রুশ ভাষা বলতে বা বুঝি তা আসলে বহু রুশ, এবং এই ভাষার উদ্ভব একাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। লিখিত আকারে স্বেত রুশ ভাষা চলন হয়েছে খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের পর

থেকে, এবং ক্ষুদ্র রুশ বা ইউক্রানীয় ভাষার লিখিত পর্যায় শুরুর হয়েছে মাত্র দুই শত বৎসর আগে। কাজেই পূর্ব শ্লাভীয় সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে রুশ সাহিত্য, কিন্তু আজকের জগৎসিখ্যাত রুশ সাহিত্যের অতীত পর্যায়টি খুব গৌরবজনক নয়, এবং সম্ভবতঃ শতক পর্যন্ত রুশ সাহিত্যের নাবালক অবস্থা দূর হয় নি।

রাশিয়ান খৃস্টধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্যের বিকাশ শুরুর হয় সেটা হচ্ছে খৃস্টীয় একাদশ শতকের কথা। বস্তুতঃ অঞ্চলের চার্চ-শ্লাভনিক ভাষাই একটি বিবর্তিত রূপ হিসাবে রাশিয়ার প্রথম সরকারী ভাষা গড়ে ওঠে। এই চার্চ-শ্লাভনিকেরও বরস বেশি নয়, খৃস্টীয় নবম শতক। বুলগেরীয় ভাষারীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত এই চার্চ-শ্লাভনিকই কালক্রমে রাশিয়ার শিক্ষিত মানুষের লেখ্যভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাষাতেই গ্রীক থেকে খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্র-সমূহ অনুদিত হয়। ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ ও ভাষাচর্চা করে যারা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ইলাবিখন (মৃত্যু ১০৫৩) যিনি ছিলেন কিয়েভের মেট্রোপলিটান, এবং অপরজন হচ্ছেন সিরিল (মৃত্যু ১২০০) যিনি ছিলেন তুরোভের বিশপ। কিন্তু এরা উভয়েই চার্চ-শ্লাভনিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। কথা রাশিয়ান বা খাঁটি বহু রুশ ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম ধর্মগ্রন্থে জোরালো কলম চালিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন জনৈক ধর্ম-যাজক যার নাম আভ্ডাকুম। তার সময় রুশীয় খৃস্টান শিবিরে মতবাদগত বিভেদ দেখা দেয় এবং তিনি নিজেও একজন উপদলীয় নেতা ছিলেন। বিপক্ষ উপদলগুলির মতবাদসমূহকে যুক্তিহীন বলে দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন করার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আক্রমণাত্মক রচনা ছাড়াও তিনি একটি আত্মজীবনী লিখে গেছেন যা রুশ সাহিত্যের একটি গৌরবময় সম্পদ। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে, এবং জেন হ্যারিসন ও

হেপ প্রবলীকৃত স্টেট ইংল্যান্ডী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে।

রুশ সাহিত্যের আদি পর্যায়ের প্রধান উপাদানই ছিল লোকসাহিত্য। এগুলিকে বলা হত বাইলিনা বা চারণকাব্যরা দেশের বিভিন্ন অংশে আবৃত্তি করে বেডাত। প্রকৃতিতে কবিতাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ছন্দ বা বিন্যাসের দিক থেকে এগুলি বোন নিয়ম মেনে চলে নি। সাধারণতঃ এগুলির বিষয়বস্তু হত কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা, কোন সাধুর জীবন অথবা বীৰগাথা যেনগুলিকে বলা হত বোগাতাইরি। কখনো বা একটি চরিত্রকেই কেন্দ্র করে অনেকগুলি উপকথাব চত আবর্তিত হত বৃট্টেনেব বাজা আখ্যায়িকার মত। এই বকম একটি চরিত্র ছিলেন রাজকুমার ভাদিগিবা। অবশ্য সব বীর-গাথাই যে মূখে মূখে প্রচারিত হত তা নয়, লিখিত আকারেও কয়েকটির পথিচব পাওয়া যায় যেনগুলির প্রতিনিধিস্থানীয় হচ্ছে ইগোরগাথা। ইগোরের চরিত্র ঐতিহাসিক, বীরত্ব ও মানবিকতার অপ-রূপ সমন্বয়ে যিনি রাশিয়ার জনমনে আর্মেনীয় ডেভিডের মতই স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইগোরগাথা সংক্রান্ত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে ও ছাপা অক্ষবে তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০০ খৃস্টাব্দে (বাশিমা প্রথম ছাপাখানার সৃষ্টি হয়েছিল ১৫৬৫ সালে মস্কোতে)। ইগোরগাথার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ষোড়শ শতক, এবং এই রচনার অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও অনেক বীৰগাথা লিখিত আকারে প্রবর্তিত হয়েছিল।

বাইলিনার কথা আবার ফিরে আসা যাক। লোকপদ-পরাণ প্রচলিত ঐতিহাসিক উদ্ভবের কাল সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কোনটি হযত খুবই প্রাচীন, সহস্র বছরেরও বেশি পুরনো, কোনটি আরও নোহাই অব্যবহৃত। যাই হোক, এই বাইলিনা ভাষা থেকে ঐতিহাসিক আখ্যান নিয়ে প্রথম সংকলন প্রকাশিত

হয়েছিল ১৬২০ সালে। এই কাজটি যিনি করেছিলেন তিনি একজন ইংরাজ। নাম রিচার্ড জেমস। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ক্রমশা ড্যানিলভ সাইবেরিয়া থেকে অল্প বয়সে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। উনিশ শতকে উত্তর রাশিয়া থেকে আরও যত্ন এই জাতীয় রচনা সংগ্রহীত হয়েছে। সেগুনি প্রকাশিত করেছেন রাইবানকভ (১৮৬১-৬৭), হিলফার্ডিং (১৮৭০), মারকভ (১৯০১), ওগুসভ (১৯০৪) এবং ট্রিগোরিয়েভ (১৯০৪-১০)। উত্তরাঞ্চলের জেনেদের মধ্যে যুগপন্নপন্নায় প্রচলিত লোকসংগীতসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন মারসোভ (১৮৭২), ধর্মমূলক ও অপর্যাপ্ত প্রাচীন সংগীতের সংগ্রাহক ছিলেন সোবোলভেভ (১৮৯৫-১৯০২) এবং রুশীয় রূপকথাসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন আফানাসিয়েভ (১৮৭০) এবং ওগুসভ (১৯০৩)। বঙ্গবীরের মধ্যে দেওয়া তারিখ-গুলি প্রকাশকালের। এগুলি ছাড়া আর এক শ্রেণীর রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। লিখিত আকারে যেগুলি প্রায় একাদশ শতকে থেকেই বর্তমান আছে। এগুলিকে মজা হয় লেটোপিশি বা প্রাচীন বৃত্তান্ত-সমূহের সংকলন; জনকলধর্মী এই জনাগুলি জাপানী কোজিকি, চৈনিক ই-কিং বা আমাদের দেশের পুরাণ সাহিত্যের মত। ইতিহাস নয়, তবে ঐতিহাসিক উপাদানে ভরপুর, সাহিত্য-মূল্যও এগুলির বড় কম নয়। যুগের পর যুগ ধরে এই প্রাচীন বৃত্তান্তসমূহ লোকপন্নপন্নায় চালু ছিল, লিখিত আকারে এগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছে একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে।

রুশ সাহিত্যের দৈন্যদশার অবসান হয় রাশিয়ার পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কে আসার পর। ১৬৫০ সাল থেকেই ল্যাটিন সংস্কৃতি ইউক্রেন, বাল্টিক রাশিয়া হয়ে মস্কোয় অনুপ্রবর্তিত হয়। সম্রাট পিটারের আমলে রাশিয়ার নিকট যে পশ্চিমের স্বাধীনতা যুদ্ধে যায় তারই ফলে প্রকৃতপক্ষে রুশ সাহিত্যে ক্লাসিক যুগের সূত্রপাত হয়। আসলে পঞ্চদশ শতকই হচ্ছে রুশ সাহিত্যের ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী পয়েন্ট। এই শতকেই একদিকে যেমন প্রাচীন রচনাবলী সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রয়াস পরবর্তী-কালের বিশ্ববাসিত রুশ সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

পশ্চিম শাস্ত্রীয় সাহিত্যের প্রথম যুগ

পশ্চিম শাস্ত্রীয় পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ আমরা পোল ভাষা ও সাহিত্যের কথা উল্লেখ করছি। বর্তমান পোল্যান্ডেই মোটামুটি পোল ভাষা

সীমাবদ্ধ। পোল সাহিত্যের বয়স খুব বেশি নয়, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে যার শুরুর। অপর্যাপ্ত দেশের মত আদি পোল সাহিত্যও চরিত্রের দিক থেকে ধর্মীয়। আদিম পোল গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শনমূলক দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে যেগুলিকে চতুর্দশ শতকের রচনা বলে মনে করা হয় এবং যেগুলির ইংরাজী নাম হোলি বুক সারমেনস এবং স্মার্টের বুক-সেন্ট ক্লোরিয়ান। সর্বপ্রাচীন পোল কবিতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে বোগুগোশ্চিন্কা, মাতা মেরীর সম্মানে রচিত একটি দীর্ঘ স্তোত্র। কথিত আছে এই স্তোত্রটি রচনা করেছিলেন সেন্ট এডালবার্ট দশম শতাব্দীতে, কিন্তু সর্ব-প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি পাণ্ডিত্যে আবিষ্কার করেছেন তাতে তারিখ দেওয়া আছে ১৪০৮।

পঞ্চদশ শতকের পোল কাব্যসাহিত্যের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দুটি চরিত্রই আমরা দেখতে পাই। এই যুগের ধর্মীয় কবিতা-সমূহে ল্যাটিন ও চেক প্রভাব অন্তর্ভুক্ত বেশি, এবং ওই দুই ভাষার লেখকের অভাব পোল্যান্ডে ছিল না। এ বিষয়ে গেলনোর ল্যাডিসলাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ পোল কাব্যসমূহ ব্যালাডধর্মী, যেগুলির বিষয়বস্তু মূলত ঐতিহাসিক। এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে পোলদের বিজয়লাভ, ভায়ার যুদ্ধে তুরস্কের হাতে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর পরাজয়, তাতার আক্রমণ, ইত্যাদি। পঞ্চদশ শতকে অ্যান্ড্রু গালকা নামক একজন প্রসিদ্ধ কবির পরিচয় পাওয়া যায়। জন ওয়াইল্কফের মতবাদ-সমূহ ইনি কবিতার মাধ্যমে জোরাল কলমে প্রচার করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকে পোল গদ্যসাহিত্যের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয় নি। রাশী সোফিয়ার আগ্রহে ১৪৫৫ সালে বাইবেলের অনুবাদ হয়েছিল পোল ভাষায়।

কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে পোল সাহিত্যের সৃষ্টির আগে থেকেই পোল্যান্ডে ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল। অবশ্য ল্যাটিন ভাষার চর্চা বিশ্ববাসমাজেই প্রচলিত ছিল এবং তার কেন্দ্র ছিল ক্যাকো বিশ্ববিদ্যালয় যা রাশী জাদুইগা এবং তাঁর স্বামী ডিউক জাগিয়েজোর অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকে গ্যাসাস নামক জনৈক বিদেশী পোল্যান্ডের একটি ইতিহাস রচনা করেন যাতে ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিবৃত্ত সংকলিত হয়েছে। শতাব্দী পরে ক্যাকোর বিশপ তিনসেন্ট কডলুবস্ক ওই গ্রন্থে পরবর্তীকালের ঘটনাবলী সংযোজন করেন। কিন্তু

পোল্যান্ডের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন জোহান্নেস (দে) জুগুন্স বা ল্যাংগিনাস (১৪১৫-১৪৮০)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হিস্টোরিয়া পোলনোয়ে। ল্যাটিন কবিতা বলতে অবশ্য প্রার্থনার স্তোত্র এবং ক্যারল (ক্রেটিস ভাগাস্টেস) ছাড়া আর কিছু পোল্যান্ডে রচিত হয় নি।

পোল্যান্ডে মূল্যবান স্থাপিত হয়েছিল ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে, এবং সেযুগে ছাপা অক্ষরে যে কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি চালু জনপ্রিয় আখ্যানসমূহের সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন আলেকজান্ডারের অভিযানের কাহিনী, গেম্ভা রোমানোরোমে উল্লিখিত কাহিনী-গুলির পোল অনুবাদ বিয়ারনাং লুবালিন কৃত ইশপের গল্পগুলির অনুবাদ, কোসজরাইরংস্ক-র জন রচিত মারচোলট, পৌরাণিক রাজা সলোমনকে কেন্দ্র করে গোপাল ভাড় জাতীয় রসিকতা) ইত্যাদি। গুরুগম্ভীর গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল মার্টিন বিয়েল্‌স্কি রচিত পৃথিবীর ইতিহাস (১৫৫১) এবং ওই একই লেখক রচিত রূপকথাসমূহ কলিন্টন ও কনস্টান্টাইন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পোল সাহিত্যে পড়েছিল। ষোড়শ শতকে পোল্যান্ডে অনেক চিন্তানায়কের আবির্ভাব হয়েছিল, যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রে মার্টিন ক্রোমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রাইফস-মোদ্রজিউস্কি, ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় এরা সকলেই ল্যাটিন ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এই যুগে পোল সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়েছে। ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম করতে হয় নিকোলাস রেজ-এর (১৫০৫-১৫৬৯)। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নামের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় একটি লং মানবৎ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ ছাড়া তিনি একটি গদ্যগ্রন্থও লিখেছিলেন যার নাম আয়না। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইনি ক্যালাভিন-পন্থী ছিলেন, কাজেই তাঁর রচনার নৈতিকতার আবেদন খুব বেশি। এর পরেই আসছে বিখ্যাত কবি জন কোচানাউস্কির কথা (১৫৩০-১৫৮৪)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ক্রাসজারকি বা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতার সংকলন। তাঁর দীর্ঘ কবিতা অপদেবতা সমসাময়িক পোল্যান্ডের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। এ ছাড়া তিনি আরও একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন যার নাম লোবোউকা অর্থাৎ সেন্টজনের সম্মতি। এটি একটি ইউরোপীয় সৌন্দর্য উৎসবের নাম। একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন, নাম ওড্রাওয়া পোলসো স্ট্রিগ অর্থাৎ গ্রীক দূতবর্গের পদচ্যুতি। এই নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন নোয়েস এবং

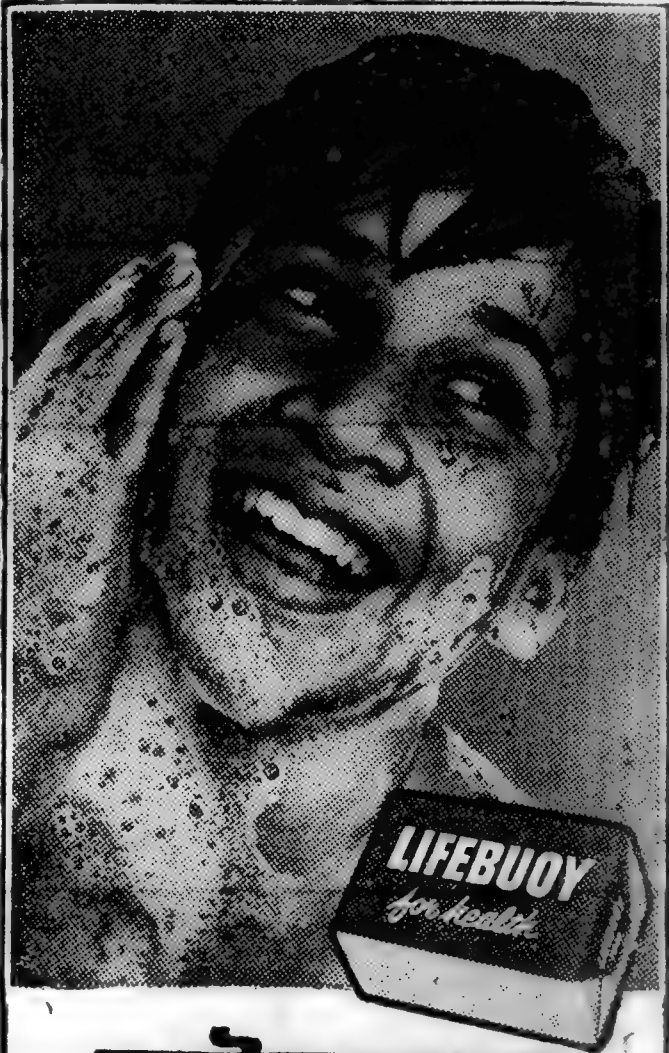
মেরিল এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। তা হাড়া ধর্মীর স্টোভসমূহের কাব্যানুবাদ এবং টেনি নামক অপর একটি কাব্যগ্রন্থ যা তাঁর কন্যা উরশুলায় মৃত্যু-শোকে রচিত (ইংরাজী অনুবাদ ১৯২০, অনুবাদক প্রল) পোল কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে অমর করেছে। পোল কবিতায় যিনি প্রথম সনেট আমদানী করেন তিনি হচ্ছেন নিকোলাস সেপ স্জনারজাই-মস্কি (১৫৫০-১৫৮১)। অপরূপ কবিদের মধ্যে সেবাস্টিয়ান ক্রোনোউইৎস (১৫৪৫-১৬০২) এবং সাইমন স্জনারজাইমোউইৎস (১৫৫৪-১৬৪২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকের পোল গদ্যসাহিত্যের বিষয়কত্ব একান্তই ধর্মীয়। এই যুগের গদ্যসাহিত্যের মধ্যে কাস্টি-লিওনের ইল কোর্টোগিয়ানোর পোল অনুবাদ (অনুবাদক লুকাস গোনিস্কি, ১৫৬৬) এবং পিটার স্কাগারি রচিত সাধুদের জীবনী ও অনুশাসনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত লেখকের জীবনকাল ছিল ১৫০৬-১৬১২ খ্রিস্টাব্দ।

শ্লোভাক ও চেক এই দুটি ভাষাকে মিশ্র করে বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়া নামে গড়ে উঠেছে, কিন্তু ম্বিতীয় ভাষাটির তুলনায় সাহিত্যসম্পদে প্রথমটি একান্তই দীনহীন। দুটি ভাষার মধ্যে সাধুশা ও আত্মীয়তা থাকলেও শ্লোভাক সাহিত্য গড়ে উঠেছে এই সৌন্দর্য, প্রথম মহাবাহুধর পর। সোব'ভাবীরা বাস করত স্যান্সিনর পূর্বপ্রান্তে এবং প্রাশিয়ার কোন কোন অংশে। এদের কোন সাহিত্যসম্পদ ছিল না।

চেক সাহিত্যের সূচনা হয়েছে চতুর্দশ শতক থেকে। অপরূপ সাহিত্যের মতই ধর্ম ও প্রাচীন যুগের কথা ও কাহিনী চেক সাহিত্যের ভিত্তিভূমি গঠন করেছিল। পশ্চিম ইউরোপের বীরগাথাসমূহও চেক সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চাটিলনের ওয়াল্টার রচিত আলেকজান্ড্রিড (১০১০) এবং জার্মান রচিত জার্মান-বিরোধী দেশাত্মবোধক গাথাসমূহ আদি চেক সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। সন্ধ্যা চতুর্থ চার্লসের রাজত্বকালে (১০৪৭-৭৮) চেক সাহিত্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। তাঁর যুগে রচিত দুটি গ্রন্থ প্রাচীন চেক সাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ। প্রথমটি হল সেন্ট ক্রাথারিনের উপাখ্যান যা আগাগোড়া কবিতায় রচিত, এবং ম্বিতীয়টি হল গদ্যে লেখা সাধুদের জীবনী। চতুর্দশ শতকে স্মিল ভ্রাসকা নামক জনৈক লেখক (১০৪৯-১৪০০) স্যাটায়ারধর্মী রচনার সারা চেক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

চতুর্দশ শতকের শেষ থেকেই চেক সাহিত্যে নতুন সুর শুনতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ধর্মবাক্য এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সামাজিক বিপ্লব শুরুর হয়েছিল সাহিত্যেও তার বিশেষ প্রভাব পড়ে। ওয়াইক্রিফের শিক্ষায় চেক-রিফর্মেশন

আন্দোলন শুরুর হয়, যাকে স্থানীয়ভাবে হাসাইট আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের ফলেই প্রকৃত চেক গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয় এবং তার স্রষ্টা ছিলেন স্টিটনে-র টমাস (১৩০১-১৪০১)। তাঁরই শিষ্য ছিলেন জন হাস যিনি ১৪১৮



লাইফবুয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবুয় মেখে মান করলেই ভাজা খরখরে হবেন। এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু শুণ্ডে আছে। লাইফবুয়, তারচেয়েও বেশী কি হেন আছে!

লাইফবুয় ধুলোময়লার রোগবীজাদু ধুয়ে দেয়

লিফটাইল ১১-৪০ ৪৫

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরি

সঙ্গে রক্ষণশীলদের হাতে শহীদ বরণ করেন। হাস ছিলেন সুনিপুণ পদ্য-লেখক এবং নিজ মতামতসমূহ জন-সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করে প্রকাশ করতেন। টমাসকে যদি রামমোহনের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে হাস ছিলেন বিদ্যাসাগর, এবং শেখের ব্যক্তির মত তিনিও চেক ভাষার সংস্কার করে তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলে-ছিলেন। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাঙ্কর হু, ইস্তাহার তিনি রচনা করেছিলেন। কবিতা রচনাতেও তাঁর হাত ছিল এবং তাঁর রচিত রক্ষণশীল (ক)-দোজ (দে)সেত মোজ, মোজোভর্নিস পরবর্তী কালের শতক ধরেই জনপ্রিয় ছিল।

রেনেসাঁসের প্রভাবে ল্যাটিন ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটা সত্ত্বেও চেক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। রেনেসাঁসের যুগে বোহেমিয়ার ভিকটোরিন বোনেল এবং মোরাভিয়ার (দে)টিখোর জেভাকোভস্কি অনুসরণ গড়ে প্রচলিত আইনসমূহকে সংকলিত করেছিলেন। এ ছাড়া জন রাহোলাভ নামক জনৈক পণ্ডিত (১৫২৬-৭১) চেক ভাষার ইতিহাস, ব্যাকরণ ও সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বহু পণ্ডিতের মিলিত চেষ্টায় সমগ্র খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্র চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ১৫৮৮ খৃস্টাব্দে যা কালিসের বাইবেল নামে খ্যাত। সপ্তদশ শতক থেকে রেনেসাঁসের প্রভাব জনজীবনে অধিকতর বৃদ্ধি পায় যার ফলে পরবর্তীকালের বহু-মুখী চেক সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রাচীন চেক সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন রচনাই অত্যন্ত কম।

গ্রীক, লাতিন সাহিত্যের প্রথম যুগ দক্ষিণ স্লাভীয় পরিবারটি স্লোভেন, সার্বোক্রোট, ম্যাসিডোনিয়, বুলগেরীয় এবং চার্ট-স্লাভ ভাষা নিয়ে গঠিত। এগুলির মধ্যে স্লোভেন ও ম্যাসিডোনিয় ভাষার বিশেষ কোন সাহিত্যসম্পদ নেই। বুলগেরীয় সাহিত্যও উনিশ শতকের স্বাধীনতার আগে গড়ে ওঠে নি, যদিও এই ভাষার একটি প্রাচীন পর্বীর ছিল যাকে অবলম্বন করেই বলতে গেলে চার্ট-স্লাভনিক গড়ে ওঠে এবং যাতে বাই-জাভাইন সংস্কৃতিতে উল্লেখ্য খৃস্টীয় সংস্কৃতি কিছু কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ হয়ে-ছিল নবর শতাব্দীতে। চার্ট-স্লাভনিক ভাষা সম্ভবত একটি আঞ্চলিক স্লাভ উপভাষা যার উদ্ভব সম্ভবত দক্ষিণ ম্যাসিডোনিয়ার এবং বাকো পরিমার্জিত এবং গ্রীক ভাষার লেখা ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনুবাদের উপযোগী করেছিলেন দুজন ধর্মবাক্য, নিরিল ও মেথোডিয়াস।

বর্তমান যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম প্রধান ভাষা সার্বোক্রোট আসলে দুটি পৃথক অষ্ট সহস্রাব্দ ভাষার মিলিত রূপ। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ক্রক শ্বাপের একটি গাঁজার পাওয়া একাদশ শতকের একটি লেখমালা থেকে। দ্বাদশ শতকের একটি পাণ্ড-লিপিও সার্বোক্রোট ভাষাভাষ্যের প্রাচীন পর্যায়ের একটি নিদর্শন যার নাম মিরোস্লাভস্‌জেভা জিভান্দজোলজে (মিরোস্লাভের সন্সনাচার)। আদিতে সার্ব ভাষা সাইরিল বর্ণমালার এবং ক্রোট ভাষা স্লাবোগোলিক বর্ণমালার লিখিত হত।

দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে সার্ব ভাষার কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ তির

আর কিছুই রচিত হয় নি। চতুর্দশ শতকে সেন্ট সাজ সার্ব ভাষায় তাঁর পিতা নিমাজের জীবনী লেখেন। চতুর্দশ শতকে জ্যানিলো সার্বীয় রাজা ও আর্কবিশপদের ধারাবাহিক জীবনী লিখেছিলেন যা থেকে ওই অঞ্চলের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকেও এই জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা দুজন লেখকের নাম পাই প্রিগোরিজে এবং কলভানটিন। এই সময় সার্বিরা ও স্লোভাশিরা বিশেষ শক্তির পদানত হয়। তুর্কী অধিকারে থাকার দরুন সার্ব ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পঞ্চদশ শতকে ইটালীতে যে রেনেসাঁস এসেছিল কালক্রমে তার প্রভাব সার্বোক্রোট সাহিত্যেও পড়েছিল। সার্বোক্রোট ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রেনেসাঁস দুরোভ্যকে বা যুগোশীয় রেনেসাঁস নামে খ্যাত যার ফলে ষষ্ঠমান ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইটালীয় প্রভাব বহুলাংশে কার্যকরী হয়েছিল। ইটালীয় গীতিকবিতার অনুকরণে কবিতা লিখে সেখানে বারি বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন সিস্কো মেনসেটিক (১৫২৭) এবং (দে)-জোরদজে (দে)জিভিক (১৫৬১)। ফ্লোরেন্স দেশীয় কার্নিভাল কবিতার অনুকরণে আন্দ্রিজ ক্রানোভিক (১৫৩০) রচনা করেছিলেন জেবজ্‌শকা (জিপসী)। সার্বোক্রোট ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্য জুভিভা (জুভিভ) রচনা করেছিলেন মার্কো মারুলিক (১৫২৪)। বাইবেলে বর্ণিত জুভিভের কাহিনী এই রচনার বিষয়বস্তু। প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ নাটক রোবিজা (ত্রীতদাসী) রচনা করেছিলেন হানিগল লিসিক (১৫৫৩)। ইটালীয় ভাষাতে ভ্রমণ ও নৃত্যমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিটার হেকটোরভিক (১৫৭২) রচনা করেছিলেন রিবজে-ই-রিব্‌স্কা প্রিগো-ভারজে অর্থাৎ মৎস্য শিকার ও জেলেদের বৃত্তান্ত। ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে মারোতি ভেরানিক (১৫৭৬) রচনা করেছিলেন রেনেতা (সন্ন্যাসী)।

সার্ব সাহিত্যের গৌরবময় যুগের শুরুর ছয় বোড়শ শতকের শেষের দিক থেকে। এই যুগের সূচনা করেছিলেন আইভান গুদুললিক (১৫৮০-১৬৩৮)। ইনি ছিলেন মধ্যযুগ কবি ও নাট্যকার। গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে ইনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বোরাডকা। তা ছাড়া তিনি ওসমান নামক একটি মহাকাব্যও রচনা করেছিলেন যাতে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্ব জাতীয়তাবাদের জাগরণের পথপ্রদর্শক পাওয়া যায়।

দীপালীতে বিনামূল্যে উপহার



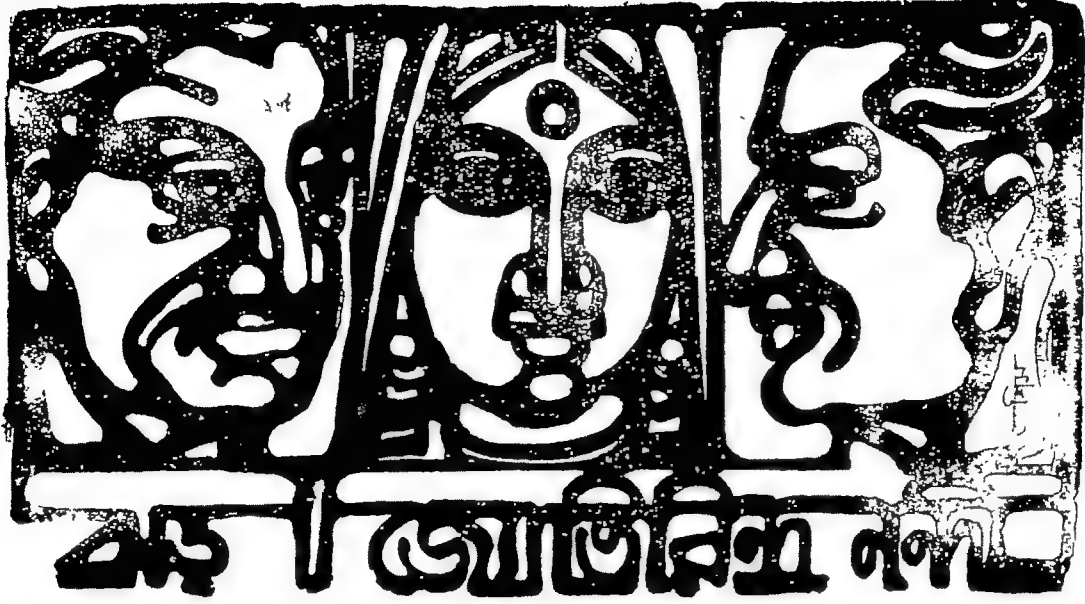
বিখ্যাত কাস্মীর শাল, প্রমাণ সাইজ, মনোরম ডিজাইন ও রং। ১খানি ৮ টকা, ২খানি ১৫ টকা, ৩খানি ২১ টকা, ডিলাক্স কোয়ালিটি ১২ টকা, ২খানি ২২ টকা, ৩খানি ৩১ টকা, ৪খানি ৪০ টকা।

দ্রষ্টব্য: ২খানি শালের অর্ডার দিলে বিনামূল্যে সিকের স্কার্ফ/লেডী পার্স পাঠানো হয়। স্টক সীমাবদ্ধ।

MAHALAXMI (SHAWLS-22)

G. B. Road, Delhi-6.





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিণের মাংসই রান্না করোঁছিল ব্রততী।
মাংস দিয়ে ভাত খেতে খেতে সোঁদিন চোখ
আড় করে কতবার যে সে চুরি করে
ব্রততীকে দেখল। তিন দিন দেখে নি, তাই
চতুর্থ দিন রণধীবীর পাশে খেতে বসে
কদিনের অদর্শনের অভাবটা কড়ায়-গন্ডায়
সে পূরণ কবে নিল। তারপর ওখান
থেকে বেরিয়ে নিজের আস্তানায় ফেঁবাব
সময় শব্দ হল দুঃসহ অশ্রুজ্বালা।
এমনও হয়েছিল, যেন পঞ্চ চলতে তার কণ্ঠ
হাচ্ছিল, একটা গাছেব নিচে বসে পড়েছে
সে। তারপর চিন্তা কবেছে, এখানে থেকে
তাব সবে যাওয়াই ভাল, কলকাতা ফিরে
যাবে, কেন না সে পবিত্র দেখতে
পাচ্ছিল, টিয়াটুলির এই জংগলে কাঠেব
বাবসা সে চালাতে পাবুক না পাবুক,
রাণীববাগের একটি শান্তি বনীড়ে সত্যি
একদিন আগুন ধাক্কা দেবে হয়তো।

আগুনের স্বপ্ন কি সে দেখছে?
আগুন নিয়ে খেলতে কি তাব বুক ছট্-
ফট্ কবছে!

প্রতিনিয়ত নিজেকে শাসন কবছে সে।
কিন্তু তাব ভিতরের অব্যাহা পশু সেই
শাসন শুনছে কি?

পরিবেশন করতে কি দুই বন্ধুকে
খেতে দিয়ে তাদের গল্প শুনতে যতবার
রণধীবীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ততবার
পশুটা চম্পল হয়ে উঠেছে। যেন ব্রততীর
শরীরের গন্ধ, নিশ্বাসের গন্ধ, হাসি কথা
ও তাকানোটাই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠে-
ছিল—পাতের জ্বিনিসগর্দালি দিকে
একেবারেই মন ছিল না।

তাই ভয় করছিল সীতাংশুর।

কমেই যেন জ্বিনিসটা বেড়ে যাচ্ছে।
বলা যায় কি, টিয়াটুলি থেকে রাণীববাগ

মোটে তিন মাইল পথ। কবে সে সেখানে
গিয়ে একদিন উপস্থিত হবে তারপর
একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। নিজের ওপর
শখন তাব হাত নেই। কাজেই তার সয়ে
যাওয়াই উচিত। যে-কোন একটা অজুহাত
দেখিয়ে সে কলকাতা ফিবে যেতে পারে,
এখানকার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না,
টিম্বাবেব ব্যবসা তেমন ভাল জমছে না—
একটা কিছু বললেই হল, রণধীবী বিশ্বাস
কববে, ব্রততী বিশ্বাস করবে।

একমাত্র ঐ দুটি মানুষের কাছেই তো
জবাবদিহি দেবাব প্রয়োজন হবে। আর
তাকে কে চেনে এখানে।

এভাবে একদিন, তার পবিত্রকার মনে
আছে, রাণীববাগ থেকে ফিরে আসবার
সময় বাসতার পাশে একটা গাছেব নিচে
বসে সে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল, এখানে
তার কিছুতেই থাকা উচিত হবে না।
অন্ধকার বনের পিছনে তখন চাঁদ উঠতে
আবম্ভ করেছিল। তার যেন হঠাৎ মনে
হয়েছিল, ঐ পবিচ্ছন্ন সুন্দর চাঁদটা হল
ব্রততী।

আব নিচের এই জংগলের অন্ধকার
চল তাব, সীতাংশুর বাগচীর মন। কেবল
স্বাপদ ও সরীসৃপের আনাগোনা
যেখানটায়।

স্বাপদ সবীসৃপ চাঁদের কিছু ক্ষতি
করতে পারে কি? পারে না। একথাও
সে চিন্তা করেছিল।

চাঁদ তার রূপ নিয়ে হাসি নিয়ে
পরিঘটা নিয়ে আকাশে জ্বলবে। আর
পৃথিবীর যত প্লানি অন্ধকার ও অপরিষ্কার
নিয়ে সীতাংশুর এখানে মাটি কামড়ে গড়ে
থাকবে।

তার বন্ধু, রণধীবী, কত কাছের

মানুষ, অথচ কত দূরে আজ সে। চাঁদের
দেশে বাস তার এখন। তাকে ঘিবে
বুপালি চাঁদ একটা উজ্জ্বল বৃত্ত বচনা
করে বয়েছে। না, সীতাংশুর সাধ্য নেই
রণধীবীর দিকে হাত বাড়াবাব। সেই
আলোব বৃত্ত ভেদ করা তার পক্ষে কঠিন।
অথচ বণধীবী দেখাচ্ছে, কত যেন সে আপন-
জন, তিন দিন সীতাংশুর দেখা নেই,
তাই পাগল হয়ে সে ছুটে এসেছে। তার
জংগলের ডেবায়, অথচ এই বণধীবীই সব-
চেয়ে বেশি সচেতন, সীতাংশুর ও তাব
মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

যেন এই জন্যই বণধীবী চাইছে সীতাংশুর
ছুটে ছুটে তাব রাণীববাগের আস্তানায়
গিয়ে দেখুক সে কত সুখী, কত তৃপ্ত,
কত সম্পূর্ণ।

সীতাংশুর যেতে না চাইলেও বণধীবী
জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

এই পর্যন্ত চিন্তা করে সে একটা
গভীর নিশ্বাস ফেলল।

বস্তুত এ-ধবণের চিন্তা এর আগে
তাব মাথায় আসে নি। অন্ধকার গাছ-
তলায় বসে সোঁদিন সমস্ত জ্বিনিসটা যেন
সে নতুন কবে দেখল। এবং সোঁদিনই
প্রথম একটা ঈর্ষাব কাঁটা তার বৃক্কেব
ভিতর খচখচ কবে উঠল।

রাত বাড়িছিল। চাঁদটা আকাশেব
অনেক উচুতে উঠে গিয়েছিল। গাছেব
মাথায় একটা রাত-ছাগা পাখিব ডানাব
ঝাপটা শুনতে পেয়ে তাব খেয়াল হল
ঘরে ফিরতে হবে। আস্তে আস্তে সে
উঠে দাঁড়াল।

পরদিন, তার মনে আছে, ঘুম থেকে
উঠে দরজার বাইরে চোখ পড়তে সে

চমকে উঠল। কোথাও অন্ধকার, বনের ভিতর বোধ ঢুকে পড়ে সব কেমন ঝলমল করছে, ক্ষুদ্র তৃণটি পর্বন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, শিশিরের ফোঁটা মাথায় নিয়ে প্রত্যেকটা ঘাসফুল হাসছে, হলুদ ঠোঁট আর হলুদ পা নিয়ে কুচকুচে কালো রঙের দুটো শালিক ঘাসের বৃকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে, ঘাসফুলের মতন ছোট সাদা প্রজাপতির ঝাঁক ঘুরে ঘুরে নাচছে।

দৃশ্যটা দেখে সীতাংশু নিশ্চিন্ত হল। অনেকটা আবামবোধ করল। স্বাপদ সরাস্রের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না সে।

অবে আর ভয় কি। তার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। এই বনের মতন তার মনের মধ্যেও রৌদ্র ঝলমল করে উঠতে পারে, ফুল ফুটতে পারে, পাখি গান গাইতে পারে।

না, কলকাতা ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। রাতে তার মন দুর্বল হয়েছিল, সকালের আলো দেখে মন সতেজ হয়ে উঠল।

সে এখানে নিজের কাজ করে যাবে। চিরদিনই তো কাজপাগলা সে। ব্যবসারাজ্য তার প্রাণ। যে জন্য বিস্ময় থাকে সন্নিহিত হয়ে সংসার পেতে বসতে আজ পর্যন্ত তাব হয়ে উঠল না।

সেই মানুষ আর একটা সংসারের দিকে তাকিয়ে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলবে?

সেই সংসারের ছবি দেখতে সেখানে ছুটে ছুটে যাবে?

না, এতটা মূর্খ সে নয়।

এই টিয়াটালির জঙ্গলেই সে থেকে যাবে—ভুল করেও রাণীরবাগের দিকে পা বাড়াবে না। হ্যাঁ, রণধীর যদি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে ভাল। বন্ধুকে যেমন আপ্যায়ন করার কববে, তার সঙ্গে বেড়াবে, তার সঙ্গে বসে গল্প করবে। কিন্তু তার রাণীরবাগের আস্তানায় সে যাবে না। কবুক সাধাসাধি। তাকে ফিরিয়ে দেবে সীতাংশু। তেমন মনেব জোর তার আছে। যদি তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয—হবে।

কথাগুলি সে চিন্তা করছিল আর ঘুরে ঘুরে বনের গাছ-লতা গুল্ম দেখছিল। এমন সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল। কবাতীদের একটি ছোট ছেলে হাসতে হাসতে তাব কাছে ছুটে এল। ছেলেটিব নাম মাধব। খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল মাধবকে। দূর থেকেই সীতাংশু লক্ষ্য করছিল, মাধবের হাতে সাদা মতন একটা কী যেন রয়েছে। বৃকের কাছে জিনিস-টাকে ঝাঁকড়ে ধরে পাড়মরি করে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছিল। কাছে আসতেই দেখা গেল একটা খরগোসের ছানা ধরে নিয়ে এসেছে সে।

দেখে সীতাংশু খুশি হল। খরগোস তার চিরদিনের প্রিয়। ‘কোথা থেকে ধরে আনলি?’ এক গাল হেসে সে প্রশ্ন করল।

‘হুই জঙ্গল থেকে।’ আনন্দেব আতিশয্যে মাধব ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। আঙুল দিয়ে দূরেব পলশ ঝোপটা দেখাল।

‘চমৎকার দেখতে!’ সীতাংশু হাত বাড়িয়ে খরগোসটাকে ধরতে গেল। মাধব তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটাকে তার হাতে তুলে দিল। ‘তোমার জন্যে নিয়ে এলাম বাবু, তুমি এটাকে পুষবে।’

শুনে সীতাংশুর আরো ভাল লাগল। সাদা ধবধব করছে গরুর রং, পাঁরক্ষর ঝকঝকে দুটো চোখ। কী মোলায়েম শরীর। বৃকের কাছে তুলে খরগোস শাবকের গায়ে গাল ঘষতে লাগল সে।

এবং তার মনে হল তার অস্তরের ইচ্ছা ঈশ্বর পূরণ করল। হয়তো এমন কিছু একটা সে চেয়েছিল। আদর করবে স্বয়ং করবে, ভালবাসবে। তা খরগোস মন্দ কি। কাঠেব ব্যবসা দেখাশোনা করা ছাড়াও তার হাতে কখনো কখনো প্রচুর সমব থাকে। সেই সময়টা একটা কিছু নিয়ে তাকে কাটাতে হয়। ব্রততীর কালো চোখ ঝকঝকে শরীর লম্বা ছিপ-ছিপে আকৃতি বার বার ঘুরে ঘুরে কেবল চোখের সামনে উপস্থিত হয়। এ বড় বিস্তী! এবার এই জিনিস বন্ধ হবে। মনে মনে করাভীদের ছেলেটাকে সে আশীর্বাদ জানাল, বেঁচে থাক বাবা, তোর দীর্ঘজীবন লাভ হোক, অসময়ে তুই আমার এমন উপকার করলি।

একটা খাঁচা তৈরি করে ফেলল সে। নিজের হাতে কাঁচ কাঁচ ঘাস ছিঁড়ে এনে বাচ্চাটাকে খাওয়ান, গরম জল ও সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেখ কোনো কোনো দিন। ঠান্ডা পড়ছিল। খড়ের ওপর তুলো বিছিয়ে চমৎকার গরম বিছানা তৈরি করে দিয়েছে ওটাকে। এসব কাজে মাধবও তাকে প্রচুর সাহায্য করছিল। বাবু খরগোস পুষছে। তার উৎসাহটাও দেখবার মতন ছিল। মোটের ওপর খরগোস ছানাটাকে নিয়ে মাধবের মতন সেও কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল কদিন। এবং এই কদিন একবারও রাণীরবাগের কথা তার মনে হয় নি।

একটা চামড়ার কেট-এব গায়ে ঘুড়ুর বেঁধে বাচ্চাটার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল সীতাংশু। খুব সবুজ হালকা চামড়া, যাতে বাচ্চাটার কণ্ঠ না হয়। ওটা ছুটো-ছুটি করলেই চমৎকার ঘুড়ুরের বোল শোনা গেছে। বাচ্চাটা যখন ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করত, তখন সীতাংশু ও মাধব

এক সঙ্গে হাততালি দিত, শিস দিত, যেন তাতে উৎসাহ পেয়ে খরগোস শাবক আরো বেশি ছুটোছুটি করত।

এভাবে দিনগুলি চমৎকার কেটে যাচ্ছিল। কেটে যেত। একদিন হঠাৎ আবার রণধীর এসে হাজিব। প্রায় দশ দিন পব। ব্রততীর হাতেব রাঁধা হরিণের মাংস খেয়ে অন্তার পর কি কবে দশটা দিন কেটে গিয়েছিল সীতাংশুর খেয়াল ছিল না।

রণধীর তাকে কথাটা মনে করিয়ে দিল। এবং সেই সঙ্গে বন্ধুকে একটু গালমন্দও করল। ‘এত কাছে থেকে এভাবে ডুব দিয়ে থাকাব কোনো মানে হয় না। এদিকে আমরা দুজন ভেবে মরাছি অসুখবিসুখ হল কি না—এখন দেখছি বেশ সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে আছিস—খরগোসের বাচ্চা নিয়ে দিবা খেলাধুলো করছিস—’

কথাটা মিথ্যে বলে নি সে।

তার ডেরাব বাইরে বড় নিম গাছটাব কাছে রৌদ্রে বসে সীতাংশু ও মাধব খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলাচ্ছিল।

রণধীর বলল, ‘কদিন ঠায় ব্রততী আমায় তাড়া দিচ্ছিল, যাও, একবার গিয়ে দেখে এসো, একলা জঙ্গলে পড়ে থাকে—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে থাকলেও কি আমবা জানতে পাবব, যতক্ষণ না কেউ এসে খবর দেবে—’

‘বিপদ-আপদ কিছু ঘটলে খবর ঠিকই পেতে—’ রণধীরের চোখের দিকে তাকিয়ে সীতাংশু অল্প শব্দ করে হাসল। ‘তা ছাড়া আমি এখানে একলা আছি কি না তুই তো দেখাছিস—কুলীবা আছে করাভীরা আছে, কাঠরীসাবা আছে, ব্রততী নিশ্চয় তোব কাছে শুনছে।’

‘ও তো আজ আমার সঙ্গে প্রায় চলে আসছিল, সীতাংশু-বাবুর নিশ্চয় আবার শব্দ কোনো অসুখবিসুখ হবে—সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠল—এতদিন হয়ে গেলে আসছে না কেন, এমন তো বড় হয় না। ভীষণ চিন্তা করছিল সে কাল থেকে।’

সীতাংশুর বৃকের ভিতর ঝলক দিয়ে উঠল। সে রাণীরবাগ যাচ্ছে না, দৃশ্চিন্তায় কাতব হয়ে পড়েছে একটা মানুষ। মূহূর্তের জন্য তাব কপালে কটা বেখা জেগে তখনি আবার মিলিবে গেল। আগেব যাত্রা তিনদিন পর যখন সেখানে গিয়েছিল সে, ইনফ্লুয়েঞ্জাব কথাই অবশ্য বলতে হয়েছিল তাকে। ইচ্ছা কবে আমি আসি নি—রণধীরের স্ত্রী কি রণধীরের মতবেব ওপর কথাটা বলতে কেমন বাথো বাথে ঠেকছিল সেদিন।

কি হল, আজ যাবে আমার সঙ্গে?’

রণধীর তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল।

সীতাংশু মাথা নাড়ল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আজ একটু ব্যস্ত থাকব আমি, ওষাগন বন্ধ কবা হয়ে গেছে। বেলা দুটোর মধ্যে স্টেশনে ট্রাক পাঠাতে হবে।'

রণধীর চুপ করে গাছেব পাতা দেখতে লাগল। একটু যেন ক্ষুধা হয়েছে বোঝা গেল। চেহারাটা দেখে সীতাংশুর কণ্ঠ হল।

'দু-একদিনের মধ্যে আমি যাচ্ছি,— এদিকেব কাজ একটু হাল্কা হলেই—'

সীতাংশুকে কথা শেষ করতে দিল না। রণধীর মাথা ঝাঁকাল। যেন অভিমান হল তার। গলার স্বরটা সেবকমই শোনাল।

'সেটা তোর ইচ্ছে, খোঁজখবর না পেলে মনটা খাবাপ হয় তাই ছুটে আসি—এখন তুই যদি ওদিকে যাবার মতো একেবারেই সময় না পাস তবে আর বলার কিছু থাকে না। চল—'

রণধীর ঘরে দাঁড়াল। সীতাংশু ব্যস্ততার ভাব দেখাল।

'সে কি, চা-টা কিছাই খেলি না?'

'এইমাত্র চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আব খাব না।' ওদিকে বেড়াব খারে মোটরবাইকটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে সে। সেদিকে চোখ রেখে রণধীর একটু সময় চুপ করে বইল।

'নে সিগারেট খা।' পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে সীতাংশু বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল। রণধীর তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সিগারেট নিল না। ডুরু কুচকে বলল, 'আমার এখন মনে হয় কি, তুই আমাদের একটু এড়িয়ে চলতেই ভালবাসিস।'

'কেন!' সীতাংশু যেন অবাক হল।

'তাই তো দেখছি। হাজার মাইল দূরে থাকি না আমরা চট্রিশ মিনিটেব রাস্তা। একদিন অন্তর কি দুদিন পর পরও একবার সেখানে বেড়াতে বেড়াতে অন্যায়সে চলে যাওয়া যায়। তা ছাড়া, আমি যতটা জানি, রাতে কাঠ কাটা হয় না, চেরাও হয় না, ট্রাক বোঝাই করে বেলাবেলি স্টেশনে মাল পাঠাবার কথা। কাজেই সম্ভ্যের পর হাতে কাজ আছে বললেও আমি বিশ্বাস কব না।'

সীতাংশু চুপ করে ছিল। রণধীর চুপ থাকল না।

'এই জনাই বলছিলেন রাণীরবাগে যাবার সময় হয় না কথাটা ঠিক না, তোর ইচ্ছে করে না, তাই যাঁস না—নিজেকে নিয়ে থাকতে তুই ভালবাসিস।'

'না, এভাবে আমাকে বিচার করা তোর অন্যায়।' সীতাংশু ক্ষুব্ধ হল। যেন লম্বাও পেল। এটা তার বাইরের চেহারা। কিন্তু কেন যাচ্ছে না—বার বার তার মন রাণীরবাগের পথে ছুটে যেতে চাইছে, অশ্রু কেন মনকে সে সংযত করছে শাসন

করছে—বাল্যবন্ধুর আস্তানায় যেতে তার বাধা কোথায়, এ কথা আর মধু ফুটে সে বলে কি কবে। তাই এভাবে আমাকে বিচার কবা তোর অন্যায়—' বলতে আরম্ভ করেও বেশি দূর সে অগ্রসর হতে পারল না। একটা সলজ্জ হাসি মুখে বুলিয়ে কেমন যেন বোকা বোকা চেহারা করে সিগারেট টানতে লাগল।

'যা বলছি ঠিকই বলেছি।' রণধীর বলে চলল, 'কলকাতা থাকতে বোকা যায় নি, বাইরে এসে বোকা যাচ্ছে, হুঁ, যেখানে আমাদের কাছে প্রায় সবই অপরিচিত সবই নতুন, তা ছাড়া একটা বিশেষ বয়সে এসে না পৌঁছন পর্যন্ত মানুষের মনের আসল চেহারাটা প্রকাশও পায় না। সেই বয়সে আমরা পৌঁছে গেছি, এখন বোকা যাচ্ছে বন্ধুর প্রতি তোর কত দরদ আর তোর জন্য আমারই বা কতটা টান, তাই তো রততী সেদিন বলছিল, তুমি আমি সীতাংশুবাবুর জন্যে ছটফট কবলে কি হবে, আসলে সীতাংশু-বাবু একা একা থাকতেই ভালবাসেন— আত্মীয়তা বন্ধুর বড় একটা ধার ধারেন না।'

'আমি বাব, ঠিকই বাব', সীতাংশু যেন জোর করে হাসতে আরম্ভ কবল। 'কাল যদি সময় করতে না পারি পরশু ঠিকই বাব—গিয়ে রততীকে বুলিয়ে আসব আমার সম্পর্কে কত বড় একটা ভুল ধারণা নিয়ে সে বসে আছে—'

কিন্তু তার হাসি রণধীরের মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমার আর সময় নেই, এখনি একবার বাগানে যেতে হবে—যাক গে, অসুখবিসুখ যখন কিছু হয় নি, সুস্থ আছি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম—'

রণধীর বেড়ার কাছে গিয়ে মোটর-বাইকে চেপে বসল। তারপর ফটফট আওয়াজ তুলে জঙ্গলের সরু পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সীতাংশু হাল্কা নিশ্বাস ফেলল।

তাবপর ক্রমাগত তিনদিন ধরে সে ভেবেছে। রাণীরবাগ যাবে কি যাবে না। কাল বিকেলে খরগোসের বাচ্চাটা মরে গেছে। এক টুকরো কাঠ এসে ছটকে পড়েছিল গায়ে। কুড়াল দিয়ে একটা কুলি কাঠ চিরছিল। খরগোসটা ছুটেতে ছুটেতে সেখানে চলে গিয়েছিল। নবম শরীর। কাঠের টুকরোটা ছটকে এসে গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর একটু সময় ছটফট করে পরে চোখ বুজল। মাথব কেঁদে ফেলে-ছিল। সীতাংশু কাঁদে নি। তবে তার খুব কষ্ট হয়েছিল। মাথব জলটল দিয়ে

বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিছু ফল হয় নি।

কাল সকালে এই দুখটনা ঘটে। কাল সারাদিন সীতাংশু মন খালি করে ভুল ডেরায় বসে ছিল। কুলি বা মিস্ট্রি'র কাজকর্ম দেখতে একবারও বাইরে যায় নি।

তার যেন মনে হয়েছিল কোনো অভিযাপ লেগেছিল। না হলে এমন দুরন্ত সজীব ছটফটে বাচ্চাটা হুট করে মরে যায়। পনেরো দিনের বেশি হলে গেল, সে তাব সমস্ত উৎসাহ মনোযোগ প্রীতি স্নেহ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গিয়েছিল। আব তার মনোযোগ অন্য কোনোদিকে বিক্ষিপ্ত হবে না, ভালবাসার একটি তিনিস পেয়েছে সে, হোক না খবগোসহানা, শিশু যেমন খেলনা নিয়ে মেতে থাকে তেমনি খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে সে মেতে উঠেছিল। পৃথিবীর আর কোনো সুন্দর জিনিসের কথাই তার মনে পড়ে নি। রাণীরবাগের চা-বাগানের ডাঙার কূর্তিতে এক রূপসী বসে আছে, তার হা' মাস ধরে সে টিয়াটুলির জংগলেব একটা মানুষকে আকর্ষণ কবছে—এই অবাঞ্ছিত জিনিসটা চাপা দিতে সীতাংশু কি ব্যা চেষ্টা করেছিল। পাবে নি। দুদিন তিনদিন, দম খিচে থেকেছে। রাণীস-বাগের কথা মনে হলেই হাত দিয়ে মার্ছন মতন সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনদিন পর আবার শাল সেগুনের ছায়া ধবে ধরে কাঁটাগুন্ডের ঘন গন্ধ শব্দেতে শব্দতে আকাবাকা অসমান পথেব লায় ধুলো উড়িয়ে ডার্বি জুতোর দুপদাপ শব্দ তুলে রাণীরবাগ ছুটি গেছে।



গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

২৩৩, ওল্ড ঢীনা বাজার ফ্রিডি:

কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৬৫৮০

তারপর হঠাৎ সেদিন, ঠিকই ভেবে-ছিল সে; ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন একটা কিছু তার হাতে এসে পড়েছিল। মাধবের কাছ থেকে খরগোসের বাচ্চাটা উপহার পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা রইল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল রাণীরবাগের কুঠিতে বসে সেই মানুষটি প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে রাতদিন অভিশাপ দিচ্ছিল বাচ্চাটাকে। হুঁ, তার প্রতিশ্রুতী হয়ে দাঁড়িয়েছিল একরাস্তা খরগোসটা। সীতাংশু যে আর কোনদিনই ওটাকে ছেড়ে টিয়াটুলির জঙ্গল থেকে নড়বে না সে বুদ্ধিতে পেরেছিল। অভিশাপ ঠিক লাগল। বাচ্চাটা মরে গেল।

এবাব?

কাল বিকেল থেকে সীতাংশু বঙ্গ চলে গেছে। বেশ, না হয় যাবে সে সেখানে। রণধীর খুশি হবে, ব্রততীর্থ মূখে হাসি ফুটেবে। কালা চোখে হাসির রোদ লেগে সরসীর মতো ঝলমল করে উঠবে। উঠুক। রণধীরের সঙ্গে বসে সে চা খাবে গল্প করবে। তারপর এক সময় উঠে চলে আসবে। একবারও চুরি করে সেই মানুষটিকে দেখবে না। তার আবেগ উৎসাহ মোহ বিস্ময় খরগোসের মরা বাচ্চাটার সঙ্গে কবরের নিচে চলে গেছে। সীতাংশুর ডেরার পিছনে বড় ঝাউগাছটার নিচে মাধব বাচ্চাটাকে কবর দিয়েছিল। এমনি ফেলে রাখলে কাক শকুনে ছিঁড়ে খেত; পুড়িয়ে ফেলতেও কষ্ট হয়েছিল তাদের। তার চেয়ে কবর দেওয়া ভাল। ওপরে মাটি চাপা দিয়ে তারা সেখানে কটা ক্রিস্টমাসমামে চারা পুতে দিয়েছে। এবং চারদিকে ঘিরে মাদারের ডাল দিয়ে বেড়া তৈরি করে দিয়েছে। মাধব ও সে ঠিক কবেছে বেড়াব গায়ে অপবাজিতা লতা বাইবে দেওয়া হবে। বর্ষার ঘননীল অপবাজিতা ফুটেবে, শীতে ফুটেবে ক্রিস্টমাসমাম। টিয়াটুলির জঙ্গলে এটাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হবে একদিন। সীতাংশুর সবচেয়ে আদরের একজন এখানে ঘুমিয়ে আছে।

আজ সকালে কথাটা শুনে মাধব একটু অবাক হয়েছে। কাল এত বড় একটা শোক পেল বাদু, আর আজই কি না রাণীরবাগ বেড়াতে যাচ্ছে।

‘আমি যাব আর চলে আসব।’ মাধবের নিম্ন চোখেরা দেখে তার বলতে ইচ্ছা হল, ‘এই শোকের খবরটা দিতেই আমি বন্ধুর কাছে বন্ধু-বন্ধুর কাছে যাচ্ছি।’ তালা জানকী অমি কতটা রিক্ত শব্দ হতে গেলাম। একটা খরগোসছানাও যে হারিয়ে গেলো— ‘আমি যেসেছিলাম, তাব মৃত্যুতে আমি কী নিদারুণ আঘাত পেয়েছি আমার চোখ দেখে তারা বুঝবে।’ তাই তো, মন মনে ছিটকা করলাম, শেখটা এক

জায়গায় ধরে রাখতে মানুষের কষ্ট হয় বেশি, শোক চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারলে বুকের ভিতরটা অনেক হালকা হয়, এই জন্যই শোকের খবর পাওয়া মাত্র আত্মীয় বন্ধু এবং পড়শীরা নিজে থেকে ছুটে আসে, এটাই নিয়ম। তার অর্থ তারাও কিছু কিছু কবে শোকের ভাগ নেয়, বিলাপ করে, দরকার মত দু’ ফোটা চোখের জল ফেলে। তাতে শোকাত মানুষ শান্তি পায়, মাটির শয্যা ছেড়ে সে উঠে বসে, কেবল মৃত্যুর অশ্রুকারের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ না রেখে জগতের দিকে জীবনের দিকে আবার একটু সময়ের জন্য চোখ তুলে তাকাতে পারে। এখানে রণধীর ছুটে আসছে না তার স্ত্রী ছুটে আসছে না। তারা সীতাংশুর খবরগোছানার মৃত্যুসংবাদ পায় নি। কাজেই সীতাংশুকে সেখানে যেতে হবে। আমার শোকের ভাগ-দুজনকে কিছু কিছু দিয়ে আসি। তার একটু লাঘব হবে।

অবশ্য এত সব কথা যে করাতীর ছেলেটি বুঝবে না সীতাংশু জানত। বাদু প্রলাপ বকছে মনে করে ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুর মূখ্যটা কেবল দেখতে সে, একটাও শব্দ করত না। তবে বাদু যে রাণীর-বাগ বেশি সময় থাকবে না এই জিনিসটা মাধব নিজেও খুব বুঝত।

সীতাংশু বতটা সম্ভব নিবাস্ত্র থেকে সকাল ও দুপুরের খানিকটা সময় কবাতী-দের কাজকর্ম একটু দেখল, কুলিদেব এটা ওটা ফরমাসেস করল। তারপর স্নান খাওয়া সেরে একটু গাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। গাছের মাখাম লাগি বোধ দেখতে দেখতে সে রাণীরবাগ চলে যেতে চায় এবং সম্ভাব্যতা লাগাব সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ফিরে আসবে এই মতলব। ফিরতে তাকে হবেই। এবং ঘরে এসে খাবে। কেন না সতেরোদিন পর সেখানে যাচ্ছে সে। ডাক্তার গিন্নী-মাছ মাংস পিঠে পায়েস যা-হোক একটা কিছু ভাল জিনিস রান্না কবে তাকে খাওয়াতে চেষ্টা করবে, ডাক্তারও খুব পীড়াপীড়ি করবে। কিন্তু অবিচল থাকবে সে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কবে না সীতাংশু। তা ছাড়া ক্রান্ত বিধবস্ত শোকাহত সে। অন্যবাবের সঙ্গে এবাবের তুলনা হয় না। বন্ধু-বন্ধু রক্ষা করতে একটু চাই খাবে শব্দ। দশ পনেবো মিনিট ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করবে। তারপর অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

তার যেন মনে হল খরগোসের বাচ্চাটা মরে গিয়ে ভালই হল। একটা শোকের অঙ্গ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। কোনোরকম দুর্বলতা তাকে অগ্রসর করতে পারবে না। আবেগ মোহ লোভ লাগসা রোমাঞ্চ— ব্রততীর্থ সম্মানে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র চক্ষু

মত সব তার বুকের ভিতর এই ক’মাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ সব ক’মে গেছে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিভয়ে সে সেখান থেকে একবার ঘুরে আসতে পারে।

টর্চ দেশলাই ও সিগারেটের প্যাকেট পকেটে পরে দরজায় তালা দিয়ে সে যখন বাইরে ঘাসের ওপর পা রাখল তখন মাধব এসে সামনে দাঁড়াল। রুদ্ধ চুল শকুনের মূখ্য। পার্শ্ব এক গাদা ধুলো। হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

‘কোথায় ছিলি সারাদিন?’ সীতাংশু প্রশ্ন করল। সকালের পর থেকে ছেলেটাকে যেন আর সে একবারও দেখতে পায় নি। তার বাপও তাকে তখন খোঁজাখুঁজি করছিল।

‘চাঁপাডাঙার হাটে গেছলাম বাদু।’

‘কি আনলি?’ সীতাংশু একটু অবাক হল। আজ হাট বসার কথা নয়, তবে সেখানে দুটো একটা দোকান আছে। হাটের দিন ছাড়া এটা-ওটা কিনতে হলে চাঁপাডাঙার সেসব দোকান ছাড়া গতি নেই। এখানে দু-তিন মাইলের মধ্যে ঘরবাড়ি দোকান বলতে কিছু নেই। সবটাই জঙ্গল। মাধবের হাতের কাগজের মোড়কটা লক্ষ্য করে সীতাংশু বলল, ‘কি ওটা?’

‘মোমবাতি।’ মাধব অল্প হাসল। যেন একটু লজ্জাও পেল।

‘কি হবে মোম দিয়ে? তোদের ঘরে কেরাসিন ফ্যুরিয়েছে বাদু?’ সীতাংশু হবসল।

মাধব আস্তে মাথা নাড়ল।

‘ঘরের জন্যে আনি নি।’

‘তবে কার জন্য?’ সীতাংশু একটা চোক গিলল।

‘সম্মোবেলা ওখানে। পিরাদিম দিতে হবে।’ আজু দিয়ে মাধব ঘরের পিছনের ঝাউগাছটা দেখাল।

সীতাংশু বুঝল। এক সেকেন্ড স্তম্ভ হয়ে রইল। বাচ্চা খবরগোছটার কবরের ওপর সম্মোবেলা মোমবাতি দেওয়া হবে। এই দুপুরে স্নান নেই খাওয়া নেই চাঁপাডাঙায় ছুটে গিয়েছিল ছেলেটা মোম কিনে আনতে।

‘ঠিক আছে।’ ঝাউগাছটার দিকে চোখ রেখে সীতাংশু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ‘ফিরে এসে তোর মোমেব পয়সা দেব। আমি সকাল সকাল ফিরব।’

সীতাংশু আর দাঁড়াল না। তাই তো! তার খবরগোছ। কবরে সম্মোবাতি জ্বালবার কথা তারই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যে। জঙ্গলের বাস্তু ধরে হাটের সম্মানে তার মনে হল মাধব ঠিক অপেক্ষা করবে। সম্মোবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাদু যাচ্ছে রাণীরবাগ থেকে ফিরে আসে। তাই ফিরতে হবে তাকে। [চমক]

বিশ্বায়ত্ত্ব এলেক্সান্দ্র দিনগুলি

[পূর্ব-অংশের পর]

আমার বালিকা বিদ্যালয়টি ৫।৬ বৎসর ছিল। ইহার মধ্যেও গন্ডগোল। গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব আমার নিকট মাঝে মাঝে আসিয়া অনুযোগ করিতেন, তাঁহার স্কুলে কোন মেয়ে যায় না, এজন্য তাঁহার স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, আমার স্কুল রাখার ত' কোন প্রয়োজন নাই। অবশেষে স্থির হইল বয়স্কা মেয়েরা আমার স্কুলে থাকিবে, ছোট মেয়েরা সরকারী স্কুলে যাইবে। আমার স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল মেয়ে, হাতেব কাজ কিছু শিখান হইত, বিশেষত বই, খাতা পেন্সিল আমি দিতাম, এজন্য সহস্র কৈন মেয়ে আমার স্কুল ছাড়িয়া ঘাটতে চাহিত না। আমার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে ক্রমে লাগিয়া, কাহারও বিবাহ হইল, কেহ তনয় চলিয়া গেল, অবশেষে শিক্ষার্থী ক্যান্সাস বোগে মারা গেলেন, বিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়া গেল। গ্রেলোক্যা পাঠাগার-এবং অকালমৃত্যু ঘটিল। একদিন দেখিলাম, আলমারী দইটা প্রায় খালি, বই, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলি চুৰি হইয়াছে এবং খাজারে সের দরে বিক্রি হইয়াছে। অবশেষে যখন আমি দেখিলাম, ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। আমার গঠনমূলক কাজের জন্য কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আমার গঠনমূলক কাজের স্বপ্ন লাগিয়া গেল।

ইলেক্সন

১৯৫৪ সন, আমার গঠনমূলক কাজের ব্যস্ততা নাই, বাড়িতে প্রায় বেকার অবস্থায়ই আছি। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের কথাবার্তা চলিতেছে, পৃথক নির্বাচন, আমারও ইচ্ছা হইল নির্বাচনে দাঁড়াই। আমার গঠনমূলক কাজ ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাদে-

শিক আইনসভার সভ্য হইলে ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, সেই সুযোগে জনগণের সেবা করার সুযোগ পাইব। ইলেক্সন বড়লোকের কাজ, এখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, আমি বড়লোক নই, এখন ইলেক্সনে খরচের টাকা আসিবে কোথা হইতে? আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিলাম, তাহাদের আশ্বাস পাইলাম, মনোনিবেশ করিলাম, নির্বাচনে দাঁড়াইব। নির্বাচন সংগ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা একমত হইতে পারেন নাই, তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল নির্বাচন সংগ্রামে মাঠে অবতীর্ণ হইলেন। সংযুক্ত প্রগতিশীল দল, (United Progressive Party) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন হইতে এবং স্বতন্ত্রভাবে বহু লোক নির্বাচনে দাঁড়াইলেন। আমি সংযুক্ত প্রগতিশীল দল হইতে দাঁড়াইলাম। এই দলের নেতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—কামিনীকুমার দত্ত, গ্রেলোক্যা-নাথ চক্রবর্তী, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, সাগ্রাম মাঝি, ফণী মজুমদার, রমেশ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, হাবিগন্দ ঘোষ-চৌধুরী, পুলিন দে, ডাঃ গৈলেন সেন, আশুতোষ সিংহ প্রমুখ। আমি পূর্বে মরণসিংহ হইতে দাঁড়াইলাম। আমার নির্বাচন এলাকা ছিল নেত্রকোণা মহকুমার ১২টি থানা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার ৮টি থানা। এই এলাকা হইতে আমরা ৬ জন প্রার্থী ছিলাম। এই ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে দই জন পূর্বে আমদদের দলভুক্ত ছিল, একজন পবে কনিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়াছিল। অপরিজনকে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসেব সেক্রেটারী আমাব বিরুদ্ধে দাঁড় করায়া দিয়াছিল, আমি অবশেষে তাহার বিরুদ্ধে লোক দাঁড় করাই নাই।

আমি পদক্ষেপে ভোট ভিক্ষায় বাহির হইলাম এবং প্রায় দেড় মাসে নির্বাচন সফর শেষ করিলাম। প্রায় প্রত্যহ খাও-

য়ার প্রচুর ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে অনুবোধে অতিরিক্ত ভোজনের জন্য পেটের অসুখও হইয়াছে। নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামের সকল বাড়িতে ঘাইতে হইয়াছে, যে যে বাড়িতে বসিয়াছি, পান-তামাক এবং চা লইয়া আসিয়াছে। আমি তামাক খাই না, এজন্য তামাক খাওয়া হইতে বন্ধ পাইলাম কিন্তু পান এবং চা খাইতে হইয়াছে। আমি প্রত্যহ ৪০-৫০ কাপ চা এবং পান খাইয়াছি। আমার অবস্থা এবুপ হইয়াছে, চা-এব কাপ দেখিয়া বর্মব উদ্বেক হইত, পান খাইতে হইত জিহবার ছাল গিয়াছে, খাওয়ার কোন স্বাদ পাই না। গ্রামের লোক আগ্রহ করিয়া চা লইয়া আসিয়াছে, চা পান না করিলে মনে বাধা পাইবে এবং ইহাও ভাবিতে পারে, মহাবাজারে যোফ হইয়াছে, আমি গরীব, এজন্য আমার বাড়িতে চা খাইল না। ইলেক্সনে দাঁড়াইয়াছি, কাহাকেও অসম্ভবত নির্বাচন পাবি না। আমি যখন ববহারি, বই, আমার কর্মীদের অবস্থা দেখিয়া তখনও অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং মনে মনে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। আমার প্রতিনিধি ডাঃ সভ্যগুণ চক্রবর্তী নিকট জানিতে পারিলাম তিনি মোট ৪ জন কর্মী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা কৃন্দাকীকিয়া গ্যামে বসিয়া আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার করে, তাহারা নিজ নিজ বাড়িতেই প্রচার দাওয়া করে, তিনি শ্রুতি তাহারা চা খাওয়ার জন্য দৈনিক জনপ্রতি দই টাকা দায়া করিয়াছেন। আমার বাকী ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমি যখন তিন তম্বলে গিয়াছি, তখন দেখিলাম, হুমান ল্যাবর (Human Labour) হিসাব অপচয় হইতেছে। গ্রামের লোকের বর্ষার ছয় মাস কোন কাজ থাকে না, তাহারা বেকার অবস্থায় কাটায়। এখন গ্রামে গ্রামে যদি কুটিবর্ষণ প্রবর্তন করা হয় তবে দেশেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহাদেরও অর্থ লাভ হয়। আমি

গ্রামবাসীদের সহিত কুটিরশিল্প প্রবর্তন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিলাম, চাহারা খুব উৎসাহ দেখাইলেন। আমি নির্বাচন সফর শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। আমার নির্বাচনকেন্দ্র ছিল ৬০টি। নির্বাচনের দিন ভোটারদের মিষ্টমুখে করাইতে হয়, এজন্য প্রার্থীর কিছু অর্থব্যয় হয়। আমি স্থির করিলাম, আমার প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ঐ দিন ১০ টাকা করিয়া খরচ করিব, ইহাতে আমার ৬০০ টাকা খরচ হইবে। অবশ্যই শেষ পর্যন্ত আমার সব কেন্দ্র টাকা দিতে হয় নাই, কোন কোন কেন্দ্র হইতে আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের টাকার প্রয়োজন হইবে না, পরে জানিতে পারিলাম, তাহাবা নিজেরাই টাকা খরচ করিয়া ভোটারদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। আবার দুই-এক জায়গায় এরূপও হইয়াছে, আমার কোন প্রতিনিধি ছিল না, ভোটাভাগ ভোট দিতে আসিয়া, আমার কোন প্রতিনিধি না দেখিয়া, নিজেরাই পরস্পর পরস্পরকে পান-বিড়ি খাওয়াইয়া আমাকে ভোট দিয়া গিয়াছে।

নির্বাচনে আমাব সর্বমোট ২৮শ' টাকা খরচ হইয়াছে। আমি জয়ী হইয়াছি। আমি যুক্তফ্রন্টের যুগে সরকার পক্ষের এম-পি-এ ছিলাম কিন্তু নিজের অক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য আমার এলাকায় ২৪টা টিউব-ওয়েল বসান ছাড়া বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমার ভোটার এবং কর্মীগণ আমার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, —প্রতিদানে আমি তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। আমি প্রধান দূর্ভিক্ষ। আজ আমি জীবনের দায়িত্বে তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এবডো, (EBDO) মামলা

মিলিটারী শাসন সূত্র হইয়াছে ১৯৫৮ সন, ২৭শে অক্টোবর। আমি তখন আমার নির্বাচনী এলাকায় ছিলাম। পরস্পর সংবাদ পাইলাম, আমাদের এম-পি-এ চাকুবি নাই, আমরা বখাস্ত হইয়াছি। আমি বাড়ি ফিবিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম, স্বাস্থ্যবিক্রী আমরা বরখাস্ত হইয়াছি। আমরা যে কি অপরাধ করিয়াছি, কেন বরখাস্ত হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একদিন নোটিশ পাইলাম, আমি এবডো-তে (EBDO) পাড়িয়াছি। আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আমি যদি এরূপ

প্রতিশ্রুতি দিই আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে কোন নির্বাচনে দাঁড়াইব না, তবে আমার বিরুদ্ধে কিছু করা হইবে না, নতুবা আমাকে ট্রাইব্যুনালে, সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। আমি নির্বিবাদে এই হুকুম মানিয়া লইতে রাজী হইলাম না, ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি নির্দিষ্ট তারিখে ঢাকা গিয়া Tribunal-এর সম্মুখে হাজির হইলাম। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন জাস্টিস আক্লাম। মামলা সুরু হইল। আমাব বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, আমাকে পাড়িয়া শোনান হইল। আমার উত্তর আমি পূর্বেই বাংলা ভাষায় লিখিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, আমি একে একে প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তর পাড়িয়া শুনাইলাম এবং জাস্টিস আক্লামের সহিত তর্ক করিতে লাগিলাম। আমি দাবি করিলাম, আমার বিরুদ্ধে যাহারা রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করিতে হইবে, আমি তাহাদিগকে জেরা করিব। জাস্টিস আক্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করা হইবে না। আমি বলিলাম, তাহাদিগকে জেরা না করিলে আপনি কি কব্বা বঝিবেন, তাহাদের রিপোর্ট সত্য না মিথ্যা? তিনি আমার প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি একটি সোস্যালিস্ট কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম, সেই কনফারেন্সে এম-পি-এ কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা পাকিস্তান-বিরোধী। আমি দাবি করিলাম, তাহাদের নাম কোর্টে প্রকাশ করা হউক। উত্তর : তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে না। আমার বিশাল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব ভাষণ-এর এক কপি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। আমাব বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি কলিকাতার আশেপাশে এক সোস্যালিস্ট সভায় বক্তৃতা দেওয়াব সময় বলিয়াছি, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি প্রশ্ন করিলাম : সেই সভা কোন সনে এবং কোথায় হইয়াছিল? উত্তর : তাহা বলা হইবে না।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি দুই বাংলা এক করার চেষ্টা করিয়াছি। আমি প্রশ্ন করিলাম : প্রমাণ কি? উত্তর : বলা হইবে না।

আর একটি অভিযোগ ছিল, গোপনে নশকতামূলক (Subversive) কাজেব চেষ্টা করিয়াছি। আমি উত্তরে বলিলাম, পূর্বে পাকিস্তানের প্রথম আই, জি, পি, জ্যাকির হোসেন সাহেব, শ্যামসুন্দার সাহেব হইতে আরম্ভ

করিয়া হাফিজুদ্দীন সাহেব পর্যন্ত সকল আই, জি, পি'র সহিত আমার পরিচয় আছে এবং মাঝে মাঝে দেখা হইয়াছে। আমার যদি সাবভারসিভ এজিটিভিটিজ থাকিত তবে তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে সাবধান করিতেন। এতকাল আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন? তখন তৃতীয় বিচারক, বাড়ি সিলেট, বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ, এজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ, আমি গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়া বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছি। আমি মাসিক বেতনের টাকা বেশি নিয়াছি, গাজিতে নিন্মশ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিল কব্বা টাকা নিয়াছি। উত্তরে আমি বলিয়াছি, আমি প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিল কব্বিয়াছি। ইহার পর সবকারপক্ষেব উকিল সওয়াল-জবাব কবেন। তাহার পূর্ব আমাকে উত্তর দিতে বলা হইল। আমি বলিলাম, ৯৬ বড় রাজনৈতিক নেতারা, পূর্বে দেশে স্বাধীন সনাম ছিল, অবস্থাব পরিবর্তনে, আজ সকলেই “এবডো”-তে পাড়িয়াছেন। পলিটিক্যাল লীডারদের পলিটিক্যাল ফিল্ড হইতে দূরে সবাইয়া রাখার ইহা একটি কৌশল কি না? আমি ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানাইতেছি ইহারও অনুসন্ধান করা হউক। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর আমি লিখিতভাবে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। ট্রাইব্যুনালের কাজ যখন শেষ হইল, তখন জাস্টিস আক্লাম হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, আপনি ত' সোস্যালিস্ট? আমি—হ্যাঁ। Then you are not un-social। আমি—Surely not. তখন দ্বিতীয় বিচারক, একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী-ম্যান বলিলেন,—Are you a Socialist? আমি, Yes sir, হাসিমুখে সভাভঙ্গ হইল। আমাব নির্বিত্ত সারমর্ম স্টেটসম্যান কাগজে বাহির হইয়াছিল।

ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায় আমার বাড়ির ঠিকানাধ ভাকযোগে জানাইয়া দেওয়া হইল আমি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি, আমার সাজা ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমি কোন নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিব না। নির্বাচনে দাঁড়ানোর আমাব আর কোন প্রয়োজনও নাই, বয়স ৭২ বৎসর পার হইয়াছে, এখন অবসর গ্রহণ করার সময়। মিলিটারী শাসন, বাড়িতেই আছি, এক দিন সবকারী খামেব চিঠি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আবার কোন বিপদ ঘনাইয়া আসিল? তাহাতা

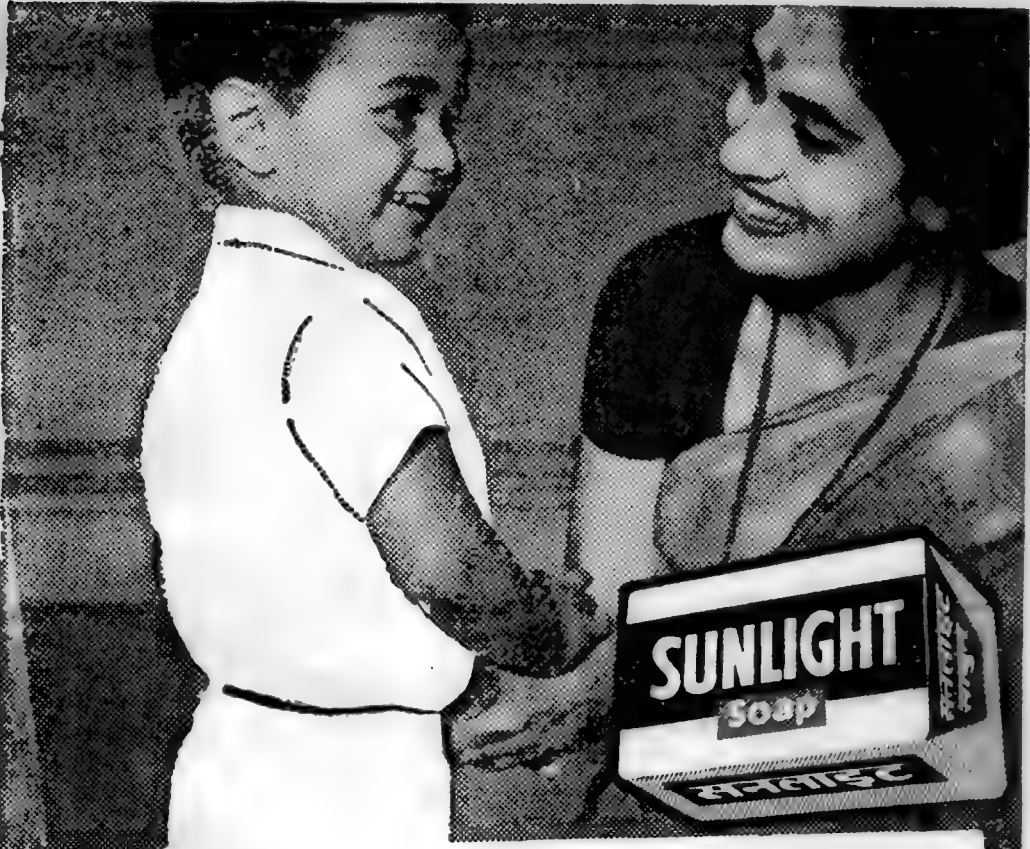
চিঠি খান্না পাড়িয়া দেখিলাম, একট
বড় অংক, সরকারী হিসাব যাহা আমি
বেতন ও এন্ডাউস বারদ সরকারকে
ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত গণণ করিয়াছি,
তাহা অবিলম্বে সরকারী ট্রেজারীতে
জমা দিতে হইবে। এরূপ স্ট্যাটিশ শব্দ
একা আমার নয়, অনেক এম-পি-এ-র
উপবহি জ্ঞান হইয়াছে। তাহারা আমাদের
বন্ধ ও এন্ডাউসের টাকার বিল

করয়াছি, এ-জি অফিস পরীক্ষা করিয়া
তাহা গণ্য করিয়াছে এখন আমরা
বিভাব যে গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়া
অতিরিক্ত টাকা লইয়াছি তাহা বুঝিতে
পারিলাম না। যাহা হউক, মিলিটারী
শাসন, আমি হিন্দু, হুজুম পালন
করিতেই হইবে, টাকা দিতে হইবে।
আমার হাত শান্য-টাকা কোথা হইতে
দিব? আমি কখনও কল্পনা করি নাই,

আমার এম-পি-এ-গারী চাকরি চলিল
যাইবে, আমি মাসিক ২০০ টাকা
যাহা পাইতাম, সবই খরচ করিয়া
ফেলিতাম, ভবিষ্যতের জন্য কিছু
জমাই নাই। অবশেষে পৈত্রিক জরি
বিক্রি করিয়া সরকারের দাবি পূরণ
করিলাম, এম-পি-এ হওয়ার পাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিলাম

সানলাইটে

প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে করে কাচে



সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে
দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়।
দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার
জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর
সেই ফেনা কাপড়চোপড় অন্যায়সে হৃদয়ের পরিষ্কার
ঝলমলে করে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই
সানলাইটে কাচুন।

**সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন**



বিজ্ঞান-বিচিত্রা



ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

শুকতারা সংবাদ

কোটি কোটি বছরের বিজ্ঞান ঘটল এইবার। প্রতিবেশী গ্রহ শূন্য থেকে সরাসরি সংবাদ এসে পৌঁছল পৃথিবীর ঘরে। পার্শ্ববর্তী বহু শূন্যতারাও স্পর্শ করল; জানিয়ে দিল সে দেশের অনেক রহস্যময় খবর। ১৯শে অক্টোবর যম থেকে উঠে আমরা জানলাম, ক্যাসিওপেইন সোজিত্রে মহাকাশযান ভেনাস-৪ শূন্যে মন্দর-অবতরণ করেছে।

শূন্যে মহাকাশযানের এই প্রথম মন্দর-অবতরণ। এর আগে রাশিয়া আর একবার ওখানে মহাকাশযান প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তা' ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে শূন্যে সন্দেশে অসমর্থ হয়ে ফেরে হয়। এছাড়া রাশিয়া-প্রেরিত আরও ৬টি মহাকাশযান শূন্যে যাত্রার পথে লক্ষ্যভেদে হার অথবা জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যায়। এই হিসেবে সুদীর্ঘ ব্যর্থতার পর এই সাফল্য সত্যি অভিনন্দনের বোঝা।

অভিনন্দন জানাবার পথ সর্বপ্রথম লুপ্ত করে দিয়েছেন সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী তাস। ওরা ঘোষণা করেছেন, ভেনাস-৪ শূন্যে বারমুন্ডল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করেছে। এছাড়া যটনের জটরেল ব্যাকের মহাকাশ গবেষণাগারের যন্ত্রে ভেনাস-৪-এর সাফল্য ঘটা পড়ে। জটরেল বদলের মানমন্দিরের ডিরেক্টর স্যার বার্নার্ড লোভেল বলেন, ভেনাস-৪ শূন্যে বহুপাতি নামিয়ে দিয়েছে।

মহাকাশযান থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, তথ্য-গ্রহণের সময় শূন্যতারার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী থেকে ২৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছিল। সেখানকার বারমুন্ডলের চাপ পৃথিবীর বারমুন্ডলের সমান চাপ থেকে শূন্য করে ১৫ গুণ অবশিষ্ট বেশি। শূন্যে বারমুন্ডলের আধিক্যশই জড়ো আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। বারমুন্ডলের মাত্র দেড় শতাংশ হল হাইড্রোজেন ও অন্যান্য বাষ্প। মাইটোজেনের কোন চিহ্ন সেখানে দেখা যায় নি।

শূন্যে পৌঁছতে সোভিয়েট মহাকাশ-যানের ৪ মাস সময় লেগেছে।

বটনের আন্তর্গ্ৰহ সমিতির সভাপতি ডঃ এল আর শেফার্ড সোভিয়েট-সময়কে পূর্বই অর্থপূর্ণ এবং বিজ্ঞানের অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, শূন্যে প্রচণ্ড তাপমাত্রার বহুপাতির অবতরণ যখন সম্ভব হয়েছে তখন সেখানে মহাকাশচারীর প্রথমও একদিন সম্ভব হবে। এ সম্পর্কে মার্কিন মহাকাশ বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন, শূন্যে মহাকাশযানের মন্দর-অবতরণ রাশিয়ার গ্রহ-গবেষণা কর্মসূচীর বিরাট অঙ্গন।

এ অবদান সত্যি যে বিরাট সে বিষয়ে আমাদেরও কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রায় আড়াই কোটি মাইল দূর থেকে ছাটে গিয়ে মানবের তৈরি একটি মহাকাশযান শূন্যতারা মস্তিককে স্পর্শ করেছে।

রাশিয়ার এই মহাকাশ-অভিযানের কথা ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার ম্যারিনার-২ শূন্যে যে বিবরণ দিয়েছিল, তা খরিজ হয়ে গেল। 'ম্যারিনার-২' প্রতিবেশী গ্রহটির এতল হাজার মাইল দূরের পথ দিয়ে উড়ে ফলার কালে বলেছিল, শূন্যস্থলের তাপমাত্রা ৪২২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সৌরীয় স্রোতবতই এত দূর থেকে সঠিক সংবাদ নেওয়া মার্কিন মহাকাশযানের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

অথচ মজা এই যে, এতকাল ধরে বসেই শূন্যে সম্বন্ধে খবর নিচ্ছিলাম আমরা। প্রথম খবর নিয়েছিলেন গ্যালিলিও। ১৬১০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন জোতির দিক থেকে সূর্য-চন্দ্রের পরেই শূন্যে স্থান। খালি চোখে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখলে স্পষ্টই গণে হয়, চন্দ্রের মতো শূন্যে কলারও হাস-বৃষ্টি ঘটে থাকে।

এদিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখতে দেখতে শূন্যে মনোবের ঘরের কাছে নিয়ে এল। জানা গেল, সর্ব-প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে সে যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মাত্র ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল, আর যখন সবচেয়ে বেশি দূর বার, তখন এই দূরত্ব ১৬ কোটি মাইলকে স্পর্শ করে। অক্টোবরের মাকামাফি শূন্যে পৃথিবীর সব চাটতে কাছে চলে আসবে জেনেই রাশিয়া এ আমেরিকা তার দিকে মহাকাশ-যান পাঠিয়েছে।

এতকাল পৃথিবীর এই নিকটতম গ্রহটি রহস্য-ঘেরা ছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল, বিশ্লেষণ চলল বর্ণালীর:

কিন্তু রহস্যের কবানকা উন্মোচিত হল না কিছুতেই। কারণ, নানা বাষ্পের আবরণে শূন্যতারা নিজেকে ঢেকে রেখেছে।

বিজ্ঞানীরা বললেন, এই বাষ্পীয় আবরণই হল শূন্যের মেঘপুঞ্জ। সূর্যের আলোক পড়ে ওখানে এবং পড়ে বলেই শূন্যে এই অপরিপূর্ণ সৌন্দর্য। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তরালে কী আছে, এতকাল তা আমাদের জানা ছিল না। আমরা জানতাম না, শূন্যে মটি সমতল, অথবা উঁচুনিচু, পাহাড়-পর্বতে ভরা; জানতাম না, সেখানে জীবনের অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব কি না।

সোভিয়েট মহাকাশযানের সাফল্যের ফলিতে এই রহস্য অনেকখানি ভেদ করতে পেরেছি আমরা। আমরা জেনেছি, যে ধরনের জীবনের রূপে আমরা পৃথিবীতে পরিচিত, সে রকম কিছু সেখানে অসম্ভব। কারণ, সেখানকার গাঢ় কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে জীবনের বিকাশ আদৌ সম্ভবপর নয়। এছাড়া পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের মত কোন চৌম্বক-ক্ষেত্র শূন্যে নেই। আর আমাদের চারিদিকে যে বিকিরণ-বলয় পৃথিবীকে একটি অদৃশ্য মালার মত জড়িয়ে রেখেছে, সে রকম কিছুও শূন্যের চারিদিকে অনুপস্থিত। এদিকে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস জানিয়েছেন, শূন্যের পৃষ্ঠদেশে কোয়ার্টজ-স্ফটিক পদার্থ দিয়ে গড়া। এই সব নতুন সংবাদ পর্যালোচনা করে মস্কোর সেটোনবুর্গ মানমন্দিরের ডায়াক্ট ডিভিটি রাটিনোভ বলেছেন, 'ভেনাস-৪' বা' কিছু জানিয়েছে আমাদের, সেগুলোই মধ্য দিয়ে শূন্যে সম্বন্ধে আমাদের পূর্বের ধারণা অশ্রুত প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর মতে, অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণাও হয়তো কালক্রমে নির্ভুল প্রমাণিত হবে।

এদিকে ভেনাস-৪-এর শূন্যে অবতরণ সম্পর্কিত চাপলাকর সব সংবাদ আমরা পেয়েছি। আমরা জেনেছি, মহাকাশযানটি ঠিক পূর্ব-পরিকল্পনা মার্কিন শূন্যে বৃকে নামতে থাকে। মস্কো সময় ভোর ৪টা ৫২ মিনিটে মহাকাশযানটির স্বয়ং-চালিত বহুপাতির সঙ্গে একদিকে প্রতিবেশী গ্রহের এবং অপর দিকে পৃথিবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মহাকাশযানটিকে যথামত জারণার রাখবার জন্যে ছোটখাটো কয়েকটি রকেটের সাহায্য নেওয়া হয় এই

বেণু দত্তরায়

অমিয়কুমার হাটি

হাঁড়ের মধ্যে মহরনের রাজনা বাজে।
আমি সেই কবে ছোটবেলা হারিয়ে ফেলেছিলাম।
এখন বৃকের ভিতরে গাড়ি গাড়ি
বৃষ্টি পড়ে শুদিকে বোম্বার চুম্বকি দিচ্ছে
খালে-বিলে ঢাকারীরা সব
বাদ্যি তোলে, আশ্বিনের ডালোবাসায়
এখন খুঁশ হয়ে ঘরে ফেরা চলে।

ছোটবেলা হারিয়ে ফেলেছিলাম
মনের মধ্যে ছোটবেলা এমন করে কেন।
বাঁচোখের পাতা কাঁপে কেন। মন্দিরে
প্রতিমা নেই কেন। এত কাঁটা কোণ
জ্বলিলতা কেন।

দুর্ব্বাসর দারুণ দুর্ব্বাসর। সিঁদুবে চর্চিত্ত
প্রতিমা হারিয়ে যাচ্ছে বৃকের ভিতবে
ছোটবেলা কদী রেখেছিলাম—
আমার সোনার প্রতিমা গা কাড়ে না কেন।
আমি কোন দিক দিয়ে যাব কোন দিক দিয়ে
বাগানে যাব আমাকে বলে দাও।

জীবনে বিশ্বাস আছে। কিন্তু এক মরণ-বিপ্লব
দগ্ধগর্জনে আসে। ভেসে যেতে হবে সেই স্রোতে,
ডুব তরঙ্গবঙ্গে। তার জন্যে দঢ় করি মন,
কারণ মৃত্যুর সঙ্গে বৃষ্টি হবে দর্শন প্রথম।

তাই তো রক্তের মধ্যে প্রতিপলে জাগে কলরব—
রক্তের তান্ডব নৃত্য! পতঙ্গের আসে কোথা হতে
প্রেরণা আগুনে পোড়া? আগুনকে প্রিল্লাব মতন
বেসেছি ভীষণ ভাল। বন্দগার হবে উপশম
অকর আহুতি রতে।

তার জন্যে আকুল ঐ স্তব.
রক্তের সমুদ্রে স্নান। শূচি হব। এই কাঠামোতে
দখীচি স্বপ্নের রক্ত। মৃত্তি দেবে অম্লান মরণ
মস্ত বন্দন হ'তে। জাড়া হ'তে। আধার-বিভ্রম
বিলুপ্ত যৌবন-ভীষণে।

ঐ মরণ জীবন জাগায়।
জন্মের অন্য পূণ্য। বিপ্লবে কে প্রাণ দিবি আর!

সময় এবং এই সময় থেকেই 'ভেনাস-৪'-এর
মহাশূন্য পরিক্রমার পূর্বসূচক খবর
পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে থাকে।

সকাল ৭টা নাগাদ মহাকাশযানটির
ওপর শূন্যের আকর্ষণ প্রবলতর হয়।
গতিবেগ বাড়তে থাকে 'ভেনাস-৪'-এর।
সে শূন্য থেকে মাত্র ১৫,০০০ কিলো-
মিটার দূরে পৌঁছয়।

সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে পৃথিবীর
কন্ট্রোল রুম-এর সর্বশেষ নির্দেশ মহা-
কাশযানে যায় এবং তারপর থেকেই ঐ
যানটি পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংচালিত হয়ে
পড়ে। বোঝা যায়, বহুসংখ্য গ্রহ শূন্যে
এবার সে নিজের চেষ্টাতেই অবতরণ
করবে। এদিকে অবতরণের উদ্যোগ-
আয়োজন আঁচবেই শূন্য হয়। মহাকাশ-
যানটি শূন্যের ৪০০ থেকে ৫০০ কিলো-
মিটার দূরে গিয়ে পৌঁছয়। অবশেষে
১৯শে অক্টোবর সকাল ৭টা ৩৪ মিনিটে
ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে। শূন্য-প্রদক্ষিণ-
কারী মহাকাশযান থেকে একটি বৃত্তাকার
বৈজ্ঞানিক প্রাতিবেশী গ্রহের বায়ুমণ্ডলের
মধ্যে নেমে পড়ে। এবার পূর্ব-পরিকল্পনা
অনুযায়ী অতিক্রমকারী মহাকাশযানটি

জ্বলপুড়ে ছাই হয়ে যায় পৃষ্ঠদেশের
দিকে। অবশেষে বাশিষানবা ভবিষ্যৎবাণী
কথা প্রায় ৮ মিনিট পর শূন্যের বৃকে ঠিক
নামে সে। নামে ভাবতীয় সময় সকাল
১০টা ৮ মিনিটে। নামবাব কিছক্ষণ
আগেও 'ভেনাস-৪'-এর গতিবেগ ছিল
সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটার। তবে শূন্য-
গ্রহের খুব কাছাকাছি আসবার পর এই
গতিবেগ অনেকখানি কমে আসে। কারণ,
একটি প্যারাসুটের সাহায্য নেওয়া হয়
এই সময়। লক্ষ্য রাখা হয়, স্বাস্থ্যসম্ভব
মন্দ্র-অবতরণ করিয়ে মহাকাশযানের বন্দ-
পাতিগুলোকে যাতে অবিকৃত রাখা যায়।
এদিকে শূন্যে অবতরণের সময় মহাকাশ-
যান যে খবর পাঠিয়েছে তা থেকে স্পষ্টই
ধরা পড়ে, উল্লেখযোগ্য কোনো বৈদ্যুতিক
ক্ষেত্র বা বিকিরণ-বলয় ঐ গ্রহে নেই।
হাইড্রোজেনের পরিমাণও সেখানে নগণ্য।

এদিকে শূন্যগ্রহের রহস্য-অনুসন্ধান
আমেরিকাও খুব বেশি পিছিয়ে নেই।
রাশিয়া 'ভেনাস-৪'-কে শূন্যে অভিযুক্ত
পাঠিয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১২ই জুন।
আর আমেরিকা এর ঠিক দুদিন পরে
১৪ই জুন 'ম্যারিনার-৫'-কে পাঠিয়েছিল

শূন্যের দিকে। তবে 'ম্যারিনার-৫'-এর
শূন্যে অবতরণ করবার ব্যবস্থা ছিল না।
ঠিক ছিল; ২১২০ লক্ষ মাইল পথ পরিক্রমা
করবার পর সে প্রাতিবেশী গ্রহের ২৫০০
মাইল দূরে দিয়ে যাবে।

২১শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ,
ম্যারিনার-৫ যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী
শূন্যগ্রহকে পাশ কাটিয়ে গেছে। যাবার
সময় শূন্যের উদ্ভাসে হাইড্রোজেন ও
অক্সিজেনের পরিমাণ মেপে নিয়েছে সে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা বলেছেন,
এই পরিমাণ থেকে শূন্যগ্রহের কার্বন ডাই-
অক্সাইড-এর ঘনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হবে
এবং 'ভেনাস-৪'-এর প্রেরিত তথ্যাদি
নির্ভুল কি না, তাও জানা যাবে।

আমরা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ
জানবার জন্যে সব সময়েই উৎসুক।
কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এত উদ্যোগ-
আয়োজন এবং এত অর্থব্যয় সত্ত্বেও শেষ
অবধি রহস্যময় শূন্যতাবার কতটুকু
জানবো আমরা? কোটি কোটি চন্দ্র-
সূর্যে ভরা এই বিশ্ব-রাজ্যের কতটুকু
জন্মের সঙ্গে পরিচিত হবো?

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র নাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এখন বাকী থাকলো আর একটি স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ হলেন, মোলানা আব্দুল হামিদ খান। জনসাধারণের কাছে আজ তিনি সর্বত্র “মোলানা ভাসানি” বা “ভাসানিব মোলানা” নামে সুপরিচিত। “ভাসানি” হল, আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি চরের নাম। এই চরে দেশ-বিভাগের আগে তিনি যে কীর্তি করেছিলেন, তার ফলেই তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে, ঐ ‘ভাসানি’ শব্দটি। চরটির নাম ‘ভাসানি’ কেন হয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস জানি না। আমার মনে হয়, বর্ষার জলে “চর” ডুবে যায়; আবার জল কমলে তা ভেসে ওঠে। এই ভেসে-ওঠা থেকেই চরটিব নাম ভাসানি হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। এই ভাসানির চরের সাথে মোলানা সাহেবের নাম কিভাবে যুক্ত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে রংপুর জেলার অধিবাসী একজন পদস্থ মুসলমান সরকারী কর্মচারীর কাছে আমি যা শুনিয়েছিলাম, তাই এখানে বলছি। আসামের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘বসন্তকুমার দাশ মহাশয়ের কাছেও মোলানা ভাসানি সাহেব সম্পর্কে কিছু কিছু শুনিয়েছিলাম। মোলানা সাহেবের কর্মক্ষেত্র, দেশ বিভাগের আগে ছিল আসামে। তখন তিনি ছিলেন একজন অতি উগ্রপন্থী, মুসলিম লীগের সমর্থক ও সদস্য। মুসলিম লীগের নীতি অনুসারেই তিনি সেদিনে স্ব-জাতি-তত্ত্বের একজন গোড়া সমর্থক ও প্রবক্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর কার্যকলাপ ভারতবর্ষের অখণ্ডতার বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধীও ছিল। সেই কারণেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসন্তবাবুর সাথে তাঁর নৈতিক সংঘর্ষ ও হয় এবং বসন্তবাবু তাঁকে জেলে বন্দ করে রাখতেও বাধ্য হন। এই তো গেল বসন্তবাবুর কথা। এখন আমি মুসলমান কর্মচারীটির কাছে যা শুনিয়েছিলাম, সেই কথাটাই বলছি।

চরের জমি নদীগর্ভ থেকে ভেসে উঠলেই তার দখল নেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণীর চাষাই, বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। চরের জমির উর্বরভাষিত

জন্য। এই দখল নেওয়ার ব্যাপারে দাঙ্গাও হয়। ষাণ্মাল ও ফরিদপুরের নমঃশত্রু শ্রেণীর চাষীরাও ‘লাঠিবাঁজতে’ বোধহয়, মুসলমানদের চেয়েও অধিক কষ্টশালী; তাই তাঁরা ছাড়া অন্য কোনও হিন্দুই চরের জমির দখল নিয়ে টিকে থাকতে খুব কমই পারেন। আমি রাজসাহী জেলার পশ্চিম চরেরও বহুবীর ঐরূপ দাঙ্গা হয়েছে বলে শুনিয়েছি। রাজসাহী জেলার চরে, ‘চাই-মন্ডলরাও’ মুসলমানদের চেয়ে কম শান্তিশালী ছিলেন না; তাই সমানে সমানে একটা বোকা-পড়াও হতে পেরেছিল এবং উভয় সম্প্রদায়েরই লোক সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন কিন্তু দেশ বিভাগের পরে সরকারী সাহায্যপুষ্ট মুসলমানগণের দাপটে শেষ পর্যন্ত সেই সব চরে চাই-মন্ডলরাও আর থাকতে না পেরে মুর্শিদাবাদ জেলার (পশ্চিমবঙ্গের) সংলগ্ন চরে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই তো গেল পশ্চিমবঙ্গের চরের কথা। ব্রহ্মপুত্র নদের ‘ভাসানির চরের কথা একটু অন্যরকম। দেশ বিভাগের আগেই ইরোজ আমলে আসামে যখন কংগ্রেসের সরকার ছিল, তখনই সেখান থেকে হিন্দুবা উৎখাত হয়েছিল। তাদের উৎখাত কবেছিল, মোলানা আব্দুল হামিদ খান সাহেব, এক অভিনব পন্থাভিড়ে একেবারে অহিংস উপায়ে বিনা রক্তপাতে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চাষীরাই এগিয়ে গিয়েছিলেন, ভাসানির চরের দখল নেওয়ার জন্য। মুসলমানের চেয়ে সেদিনে হিন্দু চাষীর সংখ্যাও এ চরে কিছু কম থাকলেও নেহাৎ কম ছিল না। এই অবস্থার মোলানা সাহেব ঘোষণা করেন যে সব মুসলমান চাষীই তাঁদের হাল লাঙল ও চাষের সরঞ্জাম নিয়ে একটি নির্দিষ্ট তারিখে এ চরে উপস্থিত হয়ে জমি চষে নেবেন, তাঁরাই সেই জমির দখল পাবেন এবং যে সব চাষী উপস্থিত হবেন, তাঁদের ঐ দিন ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করা হবে। এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারে কতকগুলো গো-কোবাঁনি হবে, তাও মখে মখে প্রচার হয়ে যায়; ফলে নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই ভাসানির

চরে লোকের ও গরু-বলদ-মহিষ প্রভৃতির যেন একটা মেলা বসে যায়। অবস্থা এমনই দেখা যায় যে হিন্দু চাষীরা আশঙ্কা করেন, তাঁরা বাধ্য দিলে, অর্থাৎ নিজেরা কোন জমি চাষ করতে আরম্ভ করলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যেতে পারে; সুতরাং তাঁরা ঐ চরে শান্তিরক্ষার জন্য সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন; ফলে নিঃশঙ্কেই চর ছেড়ে চলে যান। কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না এবং বিনা রক্তপাতেই চরটি মুসলমান চাষীদের দখলে আসে। এই চর দখলের ব্যাপার থেকেই মোলানা আব্দুল হামিদ খান-এর নামের সাথে “ভাসানি” শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। কেউ বা তাঁকে বলেন, “ভাসানিব মোলানা”, কেউ বা আবার বলেন, “মোলানা ভাসানি”। মোলানা সাহেবের ‘ভাসানি’ পদবীর এই ইতিহাসই আমি শুনিয়েছিলাম, সেই সরকারী পদস্থ কর্মচারীটির কাছে। দেশ বিভাগের আগে তাঁর ‘জৈহাদী জিগের’ অনেক কথাই সেদিনের সংবাদপত্রের মাধ্যমে শুনিয়েছিলাম।

দেশ বিভাগের পরে তিনি, তাঁর কর্মক্ষেত্র পূর্বপাকিস্তানকেই করে নেন। পূর্ব পাকিস্তানে আমি কখনই তাঁর মখে বা কাজে-কর্মে কখনই সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাটও দেখি নি; বরং দেখেছি তাঁকে ভারতের ও ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সংগ্রামী নেতাদের প্রতি একটা গভীর প্রেম ও প্রীতির ভাবই পোষণ করতে। সেজন্য তাঁকে কখনও কখনও তাঁর কোনও কোনও মুসলমান অতীতের সহকর্মীদের কাছেও কিছু কিছু লাজুক ভোগ করতেই দেখেছি। বিশেষ করে তাঁর আরোজিত ও তাঁরই প্রেরণায় সম্পাদিত কাগমারির মহা সম্মেলনের পরে যখন তাঁর দল “ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি” নামে সুদূরবর্ষী সাহেবের “আওয়ামি পার্টি” থেকে আলাদা হয়ে যায়।

দেশ বিভাগের আগের ও পরের ‘ভাসানি’ সাহেবের মানসিক এই পরিবর্তন সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা করেছি। অনেকে মনে করেন তিনি এখন প্রগতিবাদী

‘কম্যুনিষ্ট’ হয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁর ভেতরে সাম্প্রদায়িকতা আর নেই। তাঁর সাথে আমি গভীরভাবেই মিশেছি এবং সীমান্তগামী খান আব্দুল গফ্ফার খানের সাথেও মৌলানা ভাসানি সাহেবের সম্পর্কে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে বৈদেশিক নিষ্পত্তি পরিচালিত কোনও কম্যুনিষ্ট পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সদস্য তিনি তখনও হন নি, এখনও হন নি। যদিও তাঁর দলে (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে) পূর্বে পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য বা সেই মতাবলম্বী সদস্যই সকলেই ছিলেন। তার কারণ পূর্বে পাকিস্তানে কম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ দল; সুতরাং সেই দলের সদস্যরা নিজ দলের নামে আইনত চলতে পারেন না। তারা তাই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মৌলানা সাহেবের জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রগতি-পন্থী মনোভাব দেখে তাঁদের কাক্সের সুবিধার জন্য তাঁরা মৌলানা সাহেবের নেতৃত্বে আসেন, আর মৌলানা সাহেবও দেখেন, তাঁকে রাজনীতি করতে হলে তাঁরও একটা দল থাকা একান্ত দরকার। আমার ধারণা, উভয়পক্ষই নিজ নিজ সুবিধাবাদের তাগিদেই একত্রে মিলিত হয়েছেন। আমার এই ধারণার কারণ, মৌলানা সাহেব নিজেই আমার কাছে তাঁর দলের সদস্যদের সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, তা কোনও দলপতির পক্ষেই তাঁর দলেবই সদস্যদের সম্পর্কে বলা মোটেই শোভনীয় নয়। মৌলানা সাহেব সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে যে তিনি দৃষ্টি ও শোষিত লোকের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হওয়াতেই দেশ বিভাগের পূর্বে, দৃষ্টি ও শোষিত মুসলমান জনসাধারণের প্রতিই ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। হিন্দুরাই সোদানে ছিলেন, শিক্ষায় দীক্ষায় ধনে ও মানে ‘কুলীন’। মুসলমান অধিক সংখ্যকই ছিলেন অশিক্ষিত ও শোষিত; তাই তিনি সোদানে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী, আজ কিন্তু চাকা ঘুরে গিয়েছে। পাকিস্তানে হিন্দু আজ ভীত, সন্ত্রস্ত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। পাকিস্তানে হিন্দুর আজ আর প্রাক-স্বাধীনতাকালের হিন্দুর অবস্থা নেই। তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মৌলানাও আজ আর সাম্প্রদায়িক নয়। তাঁর ভেতরে এখন আর সাম্প্রদায়িকতাবাদ আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে এখনও তাঁর ভেতরে কিছুটা সুবিধাবাদ থাকতে পারে। পাকিস্তান থেকে পূর্বে পাকিস্তানের গভর্নর মির্জা ইসকান্দার সাহেবের তাল্লা খেয়ে তিনি কিছুকাল ভারতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে সুবাবদী সাহেব তাঁকে আবার পূর্বে

পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে মৌলানা সাহেবকে দেখেছি, ভাভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে; আবার আয়ুব খাঁ আমলে তাঁকে চীনদেশে সরকারী একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে ঘুরিয়ে আনার পথে, এখন দেখছি তিনি ঘোরতর চীনপন্থী। চীন সফর শেষ করে এসে তিনি বলেছিলেন যে—“বেহস্ত দেখে এলাম।” মৌলানা সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এটাই আমার ধারণা হয়েছে। আমার ধারণা ভুল কি ঠিক তা বিচারক আমি হতে পারি না। বিচারক হবেন, জনসাধারণ ও এই লেখার পাঠকগণ। তাঁদের উপরেই আমি আপাতত বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি-ভকের মাধ্যমে একটা সঠিক মীমাংসা মেনে নিতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত থাকবো।

মৌলানা সম্পর্কে আমার ধারণা যাই হোক, মুসলমান জনসাধারণের উপর মৌলানা সাহেবের দাবু প্রভাব। এটা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি একে তো একজন “মৌলানা”—মুসলমান ধর্মের একজন ‘উল্লেখ্য’। তার উপর তিনি ‘বুদ্ধরূপ’ও। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের ‘কাড়ফুক’ ও জলপড়াও দিয়ে থাকেন। অনেকের বোগমুক্তিও নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে তিনি যেখানেই যান, শূন্যেই ঐক্য ব্যাধিগ্রস্ত লোক বা তাঁদের আত্মীয়স্বজন পাগ্রে জল নিয়ে সাবিত্ত্যভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মৌলানা সাহেব চলতে চলতে কোরাণের ‘সূর’ আওড়ান, আর সুদীর্ঘ ‘ফ’ দিয়ে বলেন, লোকের এই বিশ্বাসই বা হবে কেন? তাঁর ভেতরে ‘আল্লাহ’র মেহেরবাণী নিশ্চয়ই আছে, যে জন্য মুসলমান জনসাধারণ তাঁর একান্ত অনুগামী এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সম্পন্ন।

এহেন শক্তিসম্পন্ন মৌলানা সাহেবও পূর্বে বাংলার তথা পূর্বে পাকিস্তানের মুসলিম লীগের একটি স্তম্ভ ছিলেন। পূর্বে বাংলার মুসলিম লীগের বিবর্ত সৌধ দাঁড়িয়েছিল চারটি স্তম্ভের উপরে। মুসলিম লীগ দল নিজেই তার একটি স্তম্ভ এবং আর তিনটি স্তম্ভ হলেন—(১) জনাব ফজলুল হক সাহেব, (২) জনাব সুবাবদী সাহেব ও (৩) মৌলানা ভাসানি সাহেব। ইলেকশনের বাজনা বাজতেই শেষোক্ত তিনটি স্তম্ভই ‘নড়বড়ে’ হ’ল এবং অবশেষে একদিন মুসলিম লীগের বিবর্ত সৌধের তলদেশ থেকে একদমই ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ কোনও রকমে দাঁড়িয়ে থাকে, মাত্র একটি স্তম্ভের উপর। সেই সময়কার অবস্থা দাঁড়ায়, পূর্বে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ যেন ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান! শূন্যের উপর ঝুলতে থাকে।

আগে সকল মুসলমানেরই একটি মাত্র রাজনীতিক দল ছিল। সেই দলটিই মুসলিম লীগ। এখন নির্বাচন আসতেই দেখা দিল নানা দল। ‘হক-সুবাবদী-ভাসানি’ মুসলিম লীগ দল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং জাওহর কবির, নতুন দল দেখা দিল। মৌলানা ভাসানি ও জানাব সুবাবদী সাহেব যে মুসলিম লীগ ছাড়লেন, তা কোনও আদর্শগত পার্থক্য বা বিভেদের জন্য নয়। হক সাহেব তো আগেই মুসলিম লীগ ছেড়েছিলেন। সুবাবদী-ভাসানির মুসলিম লীগ ছাড়ার কারণ আদর্শের সাথে বিরোধ নয়, নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ। যেমনটি হচ্ছে এবারে পশ্চিমবঙ্গে খ্রীষ্টিয় মুখার্জীর কংগ্রেস ছাড়ার মধ্যে। উভয় বাদ কংগ্রেস আদর্শের বিবর্তে বিভ্রান্ত ক’বেন নি—ক’বেন, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! সুবাবদী সাহেব ও ভাসানি সাহেবও প্রথমে তাই ক’বেছিলেন। তাঁরা মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে এসেও তাদের দলকে সেই সাম্প্রদায়িকতা-গম্ভীর নামই রাখলেন, অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের দলের নাম রাখলেন, “আওয়ামী মুসলিম লীগ”। দলের নামের সাথে ‘মুসলিম’ কথাটা তাঁরা প্রথমে জড়িয়ে রেখেছিলেন। পশ্চিম বাংলার খ্রীষ্টিয় মুখার্জীর ‘বাংলা কংগ্রেস’ ও ‘ফুক্তফ্রন্ট’ সবক’ব পূর্বে পাকিস্তানের জনাব ফজলুল হকের ‘ফুক্তফ্রন্ট’ সবক’বের অনুসরণ করে আমার আশঙ্কা হয়, একই পবিত্রত্ব দিয়ে ক’ব এগিয়ে চলেছে।

যাক এখন আগামীবারে, অন্যান্য যে সব দল গড়ে ওঠে তাদের কথা এবং বিভাগে নির্বাচনের আগেই, “ফুক্তফ্রন্ট” দল গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

[সমাপ্ত]

বাঙালার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-মাহিতি

তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়ের
হৃদয়গ্রাহী উপক্ৰাম

ঝড় ও ঝরা পাতা

(কাপড় ও বোড়ে বাঁধা
সুদৃশ্য সংস্করণ)

মূল্য—৩.০০ টাকা

বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

বঙ্গবন্ধু ওদেশে শিল্পীরা এক ওদেশে

প্যাম্‌য়েল বেকেট : জন্ম ডাবলিনে ১৯০৬ সালে—অস্‌কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ' এবং ইয়েটসের মত প্রটেষ্ট্যান্ট আইরিশ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান প্যাম্‌য়েল বেকেট। চোদ্দ বছর বয়সে এ্যাংলো আইরিশ ঐতিহাস্যপন্ন পোরটোরা রয়েল স্কুলে ভর্তি হন বেকেট। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা প্রথম জেমস'। এক সময় অস্‌কার ওয়াইল্ড এখানকারই ছাত্র ছিলেন।

বেকেটের লেখা পড়ে মনে হয় তাঁর মনটা হচ্ছে অত্যন্ত নিপীড়িত এবং সুক্ষ্ম অনুভূতিশীল (অর্থাৎ সাধারণ জাগতিক জীবনের সঙ্গে মেলামেশা করবার মত মানুষ তিনি নন। অথচ ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয়: স্কুলার হিসাবেও তাঁর প্রচণ্ড নামডাক ছিল তখন থেকেই। এদিকে খেলাধুলাতেও তিনি গণ্ধেট নাম করেছিলেন—ক্রিকেটে বাঁ হাতে ব্যাট করতেন এবং এবং ডান হাতে বল দিতেন, রাগবী খেলাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

১৯২৩ সালে পোরটোরা ছেড়ে তিনি ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৯২৭ সালে ব্যাচলর অভ আর্টস ডিগ্রীতে ভর্তি হন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি এল ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে প্যারিসের বিখ্যাত Ecole Normale Supérieure-এর সঙ্গে ব্যবস্থামত এক্সচেঞ্জ অভ লেকচারার স্কিমে বেকেট প্যারিসে গেলেন ইংরাজী ভাষার শিক্ষক হয়ে।

ভবিষ্যৎ জীবনে বেকেটের প্যারিসের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ এবং দীর্ঘকালের যোগাযোগ স্থাপিত হয় তার শুরুর হয় এইভাবে। প্যারিসেই জর্জেসের সঙ্গে বেকেটের আলাপ হয় এবং তিনি গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে পড়েন। কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখেন বেকেট এই সময়ে। প্রথমবার প্যারিসে এসে তিনি একটি কবিতার বই প্রকাশ করেন এবং এই বইটির জন্য দশ পাউন্ড পুরস্কারও পান। তারপর তিনি মাস্টার অভ আর্টস ডিগ্রী পান।

১৯৩১ সালে তিনি প্রস্টেব উপর একটি বই লেখেন। প্যারিস থেকে ফিরে

ট্রিনিটি কলেজে চাবটি টার্ম তিনি অধ্যাপনা করেন। ক্রমশ গভান্দগতিক বাঁধাধরা কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। চাকরী ছেড়ে তিনি যাবাবরবন্দি গ্রহণ করলেন। কবিতা লেখেন, গল্প রচনা করেন, টুকটাকি কাজ করেন—আব ঘুরে বেড়ান ডাবলিন থেকে লন্ডনে, লন্ডন থেকে প্যারিসে, ফ্রান্সের নানা জায়গা এবং এবং জার্মানীতে। এখন থেকেই বেকেটের মনে ধারণা হয় যে শিল্পীর জীবন হচ্ছে নৈঃসঙ্গের জীবন—সামাজিক মেলামেশাটা একটা মায়াজালের সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্যারিসে এলেই বেকেট জর্জেসের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। দুজনেই স্বভাবত নিস্তব্ধতাপ্রিয়। তাই অনেক

সময় এমনও হত যে পাশাপাশি বসে থেকেও দুজনেই চুপচাপ থাকতেন। বেকেট বোধহয় বিষমভাবে জগতের কথা ভাবতেন, আর জর্জেস নিজের কথা। এই সময় জর্জেসের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল। দু-একদিন তিনি 'ফিনিগ্যানস ওয়েকেব' কিছু কিছু অংশ মধ্বে বলে যেতেন এবং বেকেট তা লিখে দিতেন। এই ব্যাপার থেকেই পরে গুজব রটে যে বেকেট একসময় জর্জেসের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। আসলে এ গুজবের মূলে কোন সত্য নেই।

জেমস জর্জেসের মেয়ে লুসিয়া বেকেটের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন—লুসিয়া ছিলেন অত্যন্ত হাই স্ট্রাং এবং নিউরটিক—বেকেট মাঝে মাঝে লুসিয়াকে বেস্টোবাঁ এবং থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। ক্রমশ লুসিয়া যেন আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং বেকেট সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সবার কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এবার বেকেটও খোলাখুলিভাবে তাঁকে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁদের বাড়িতে আসেন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য—অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। পরে বেকেট পেগী গাগেনহাইমকে বলেছিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁকে লুসিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়হীনের



প্যাম্‌য়েল বেকেট

মত ব্যবহার করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে—কারণ তাঁর অন্তরের মানবিক এবং কোমল প্রবাসীগুলো অনেক আগেই শূন্য হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই তিনি লুসিয়ানার প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন নি। পেগী গাগেনহাইম ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং অধুনিক চিত্র-কলার বিখ্যাত সংগ্রাহক। তিনি তাঁর সম্রাটচরণে লিখেছেন যে তিনি নিজেকে এর কয়েক বছর বাদে বেক্টের প্রেমে আত্ম-হারা হয়েছিলেন। বেক্টের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—“মনোমুগ্ধকর যুবক। কিন্তু কেমন যেন অনুভূতিহীন এবং উদাসীন ভরা”—সময় সময় দু'দু'র অবাধি বিছানা থেকে ওঠেন না। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানো একটা দু'বুহ ব্যাপার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে—এবং তার সঙ্গে তাকে ঘণ্টে মধ্যপান করতে হয়—তাকে প্রাণচঞ্চল করে তুলতে। তবেই তিনি মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন। পেগী গাগেনহাইমের মতে বেক্ট বলতেন যে মাড়গর্ভে থাকাকালীন ভরবহ অবস্থার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। এ ধরনের অনন্ত মনোব্য-কশ—একমাত্র গ্যাব্রি়েল শিম্পীদেব পক্ষে সম্ভব। বেক্টের পক্ষে এ চিন্তাতী একটা অবসেশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং মাসে মাসে তাঁর অবস্থা এগুন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে যে মনে হতো যেন তিনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন। তিনি পেগীকে বলতেন একদিন অমানে জীবন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে যাবে—কিন্তু যখনই পেগী তাকে বিবেক ব্যাপারে একটা স্পিরিট সিম্বলিতে আসতে বলতেন, অর্থাৎ বেক্ট আগেকার সমস্ত কথা স্মরণে নিতেন।

বেক্ট ‘মার্সলী’ প্রকাশ করেন ১৯৩৮ সালে—এ বইটি বচনায় চারটি স্তরে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল—পেগী সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এই বইয়ের নায়ক এবং তার বান্ধবী সিলিয়াস সম্পর্কের কাহিনীর ভেতর—যেহেতু ক্রমাগত চেষ্টা করে মতে নায়ক স্থায়ী চরিত্র নিয়ে তাকে নিষেধ করে। কিন্তু নায়ক কোন না কোন উৎসাহে নিজেকে সারিয়ে নেয়।

বেক্টের প্রথম নাটক ‘এলিউথে-বিষাভে’ (ফ্যাসী ভাবের লেখা—এখন পর্যন্ত ছাপা বা মঞ্চস্থ হয় নি) আছে একজন যুবক আপ্রাণ চেষ্টা করছে সাংসারিক এবং সামাজিক দায়িত্বের পেরণ থেকে রেহাই পেতে।

‘মাবকী’ এবং ‘এলিউথেবিষাভে’ প্রতি-বিস্মিত হয়েছে বেক্টের মস্তিষ্ক অন-সন্ধানের প্রয়াস এবং নিজের জীবন

নিজের ইচ্ছামত কাটানোর ন্যাসসঙ্গত আধিক্যের কথা। আন্দলে এবার সত্যিই বেক্ট একটি স্বাধীন বস্তুমি পেয়ে প্যারিসে। ১৯৩৭ সালে মোপাসানের সীমান্তে একটি ফ্ল্যাট-বাড়ির উপরতল ঘর ভাড়া করলেন—এখানেই তিনি বন্ধুকালালি এবং যুগ্মকালের সময়ের অনেক বছর কাটান।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটে যা বেক্টের রচনার বর্ণিত কাহিনীগুলোর মতই অদ্ভুত। একদিন প্যারিসের রাস্তায় একটি গুন্ডালাতীর লোক তাকে টাকা দিতে বলে এবং তিনি রাজী না হওয়াতে তাকে ছুঁচ মারে—ফুসফুসে আঘাত পেয়ে বেক্টকে হাসপাতালে সোপাইয়ে দেওয়া হয়। সুস্থ হবার পর বেক্ট ছেলে গিয়ে তাঁর আত্মতন্ত্রের সঙ্গে দেখা করেন। তাকে এভাবে আঘাত করার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে গুন্ডাটি বলেছিল ‘je ne sais pas, Monsieur’ (অর্থৎ ‘আমি জানি না’)। Esslin বলেছেন :

If might well be the voice of this man that we hear in Waiting for Godot and Molloy.

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ লাগে সে সময় বেক্ট গিয়ে-ছিলেন আয়ারল্যান্ডে তাঁর বিধবা মাকে দেখতে। যুদ্ধের খবর পাওয়া মাত্রই তিনি প্যারিসে ফিরে এলেন। বহুকাল থেকেই তিনি ছিলেন জার্মানীর ন্যাশনালিস্ট নোস্যালিস্ট পার্টির বিরোধী—এদের পার্শ্বিক রাজনীতি এবং ইহুদী বিরোধী স্বর আচরণের জন্যই তিনি নাৎসীদের অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন।

আম্বারের নাগরিক বলে বেক্ট নির-পেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতেন এবং জার্মান-প্রেম প্যারিস আধিক্যের পরও তিনি সেখানে থাকতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি একটি রেজিস্ট্রেশন গ্রুপে যোগ দেন এবং ডাম্পিংগ্রাউন্ড ম্যাডগেস্টার সদস্য হিসাবে বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত জীবন-যাত্রা শুরু করেন।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে একদিন ফ্রান্সে ফিরে দেখেন ফ্রান্স গণ-সংবাদ পত্রানো হয়েছে যে তাঁদের দলীয় কয়েক-জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তখনই তিনি ঘর ছেড়ে কোঁচের পিছনে এবং জার্মান অনধি-কৃত একটি জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেন—এখানে তিনি কয়েককাজ করে জীবন-ধারণ করতে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি ‘ওয়াক’ নামে উপন্যাসটি রচনা করতে শুরু করেন। এতে একটি চরিত্র আছে যে অত্যন্ত একা এবং উদ্ভট স্বভাবের—সে গ্রামে এক বাড়িতে গিয়ে চাকরের কাজ নেবে। এ বাড়ির কতী অত্যন্ত রহস্য-জনক, খামখেয়ালী—তার দেখা পাওয়াও

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঠাকুরবাড়ীর কথা পূর্বপত্রের ইহতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপত্রের পর্বন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। [১২-০০]

বাঁকুড়ার মন্দিরে

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাঙালার মন্দিরগুলোর সচিত্র পরিচয়। ৬৭টি আর্ট পেট। [১৫-০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত বিস্তারিত প্রাক্তন ব্যাখ্যা। [৭-০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা

ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫-০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যের শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকবরগুণ। [২৫-০০]

ডেটিনিউ

‘অনুলেখ্য’ দাসগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন দত্ত ভূমিকা। [৩-০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ ফের গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১০-০০]

মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ ফের গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজি সহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫-০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীমোঃগোবিন্দ বাগচী সম্পাদিত। ১ম খণ্ড—সমগ্র উপন্যাস। [১২-০০] ২য় খণ্ড—সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৫-০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড [১২-০০] ২য় খণ্ড [১৫-০০]

প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

০২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : কলিকতা

হাস্যভব। এই কতটা অসাধারণ মিস্টার নটের সঙ্গে বেকটের পরের রচিত মিস্টার গোডোয় চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্যারিসের মুক্তি পাব ১৯৪৫ সালে বেকট কয়েকদিনের জন্য প্যারিসে ফিরে আবার ফ্রান্সে যান—এখানে রেল ক্রশে যোগ দেন। ফ্রান্সে ফিরে আসেন ১৯৪৫ সালের শবৎকালে এবং কিছুদিন সেইস্ট লোর হাসপাতালে স্টোবাকিপার ও ভাষ্যকাব রূপে কাজ করেন। ঐ বছরই শীতকালে বেকট প্যারিসে নিজের পুরনো ঘরে ফিরে এসে দেখলেন সব কিছুই আগের মত অবস্থায় রয়েছে—যেন ঘরটি তাঁর ফিরে আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এই সময়েই পাঁচ বছরের ভেতর বেকটের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যথা—মলয়, ম্যালন ডাইজ, দি আন-নেমেবল প্রভৃতি এবং নাটক—যথা, এলিউথোয়িয়া, ওয়েটিং ফর গোডো ও এন্ড গেম রচিত হয়।

১৯৫২ সালে ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেকটের নাম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের পাঁচই জানুয়ারী নাটকটি Theatre de Babylone-এ মঞ্চস্থ হয়—জ্যাঁ আনুইল, জনস্টন ওয়াইল্ডার, টেনেসি উইলিয়ামস, উইলিয়াম সারোয়ান প্রমুখ নাটকটির উচ্চরসিত প্রশংসা করেন। আত্মপৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায় এ নাটকটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে।

বেকটের এই নাটকটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল যে আমি নিজে যত এ্যাবসার্ড নাটক পড়েছি সেগুলোর বেশির ভাগই আমার একঘেয়ে লেগেছে। এমন কি বেকটের লেখা অন্য নাটকগুলোও ভাল লাগে নি। তবে লন্ডনে ১৯৫৬ সালে এই নাটকটির কথা আমি প্রথম শুনি আমার এক বালকবন্ধু মিস্টার কাইজার আমেদেব কাছে। আমেদ সাহেব লন্ডনে চার্টার্ড একাউন্টেন্টসী পড়তে গিয়েছিলেন এবং পরে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করে এসে কলকাতাতেই বড় কাজ করছেন। হিসাব-নিকাশের বইয়ের থেকে ইংরাজী এবং বিদেশী সাহিত্যের প্রতিই মিস্টার আমেদের টান ছিল বেশি। তাঁর সঙ্গে যখন আমার গোডো বিষয়ে কথা হচ্ছিল সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সিনহা—ইনি লন্ডনের বি-এসসি ইকন’ এবং বার-এট-ল’, কলকাতা হাইকোর্টে বর্তমানে প্র্যাকটিস করেন। সিনহা সাহেব পরদিনই এক কপি ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ আমাকে উপহার দিলেন। নাটকটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং তার বঙ্গানুবাদ শব্দ করে দিলাম। ১৯৫৭ সালে কলকাতায় আমারই পরিচালনায় নাটকটির বঙ্গানুবাদ মঞ্চস্থ হয়—পরে সে কথা বলব।

নাটকটি প্রথম পড়বার পর ব্রিটিশ ড্রামা সোসাইটির প্রিন্সিপাল মিস ম্যাকগিলের কাছে জানলাম—যে বেশ কয়েক বছরের ভেতর লন্ডনে এ-ধরনের অসম্মত এবং উদ্বেজনা-

পূর্ণ নাটক আর দেখা যায় নি। ১৯৫৬ সালের এক সন্ধ্যায় এর প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে। নাটকটি ছিল ফরাসী ভাষায় লেখা এবং ওখানে বিরাট এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের পর তিন বছর বাদে এর ইংরাজী অনুবাদ প্রথম মঞ্চস্থ হয় লন্ডনের আর্টস থিয়েটারে। পরে ক্রাইটোবয়ানেও বেশ কিছুকাল নাটকটি প্রদর্শিত হতে থাকে। ওয়েস্ট এন্ড দর্শক, সমালোচক এবং শিল্পীগোষ্ঠী সকলেই স্বীকার করেন যে বহুদিন বাদে আবার এক প্রথম শ্রেণীর নাটকের সঙ্গে পরিচয় হল ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ দেখতে গিবে। ‘Its form is unusual; its contents weird; its chief themes are madness, boredom, suffering, cruelty! Yet the effect of its inspired cross-talk is hilarious.’

‘একঘেরেমিকে’ বিষয়বস্তু কবে তার ভেতরকার কবুণ আবেদন এবং হাস্য-কর পরিণতিটাই বেকট গোডো নাটকে সবার কাছে তুলে ধরেছেন।

কোনো কোনো সমালোচক এ নাটকটির সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা কবেছেন এইভাবে—দুর্দশাগ্রস্ত ভবঘুরে দুটি হচ্ছে বর্তমান যুগের পথদ্রান্ত মানুস। তাদের মনের অনিশ্চয়তা, আশা, ভীতি, নৈবাশ্য সব কিছুই আজকের দিনের মানুসের স্বাধা-সংশয়পূর্ণ অস্তিত্বের একটা সুন্দর ছবি আমাদের সামনে তুলে ধবে। তবুও ডিডি এবং গোগো অন্য দুটি চরিত্র, অর্থাৎ পোজো এবং লাকি থেকে অনেক ভাল। ডিডি ও গোগোব ভেতর চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে। পোজো এবং লাকি হচ্ছে সংসারের তথাকথিত কাজের লোক। পোজো জাতীয় লোক চায় সবার ওপর কর্তৃত্ব চালাতে। ইংরাজীতে যাকে বলে ‘বুলি’, এরা হচ্ছে অনেকটা সেই জাতীয়। আর লাকি চিরন্তন দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন। পোজোব ভেতর নিঃসিনে সূপাবম্যানের ক্যারিকচার কবা হয়েছে।

আর একটা ব্যাপার নজর করবার মত। ডিডি এবং গোগোব মধ্যে একটা স্নেহ এবং বিবেচনার সম্বন্ধ আছে। পোজো এবং লাকির সম্পর্কটা হচ্ছে ঘৃণা এবং ভীতির। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে এদের দুর্দশাও উত্তবোত্তর বেড়ে চলেছে। ডিডি এবং গোগোব মধ্যে একটা স্নেহ গেলেও খারাপের দিকেও যাচ্ছে না। শেষ অবধি তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শব্দ আশাব ওপর নির্ভর করে যে এক-দিন গোডো আসবে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিম্বিটেড

কালকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - বাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীবনগর - পোতাচী



বাড়তি কর ও প্রমোদকর

হুজুর্গট সরকার ঘাটতিপুত্রের জন্য চার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা নতুন কর বৃদ্ধি করেছেন। রাজ্য সরকারের বাজেটে যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে তাকে সামাল দেওয়ার জন্য করবৃদ্ধির যৌক্তিকতা হয়ত কেউ অস্বীকার করবে না। বিশেষত কর-বৃদ্ধির সময় লক্ষ্য রাখা হয়েছে নিম্ন আয়ের লোকদের উপর যেন চাপ না পড়ে।

এই বর্ধিত করের ব্যাপারে প্রমোদকরের মধ্যে সিনেমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও সিনেমার সর্বনিম্নপ্রেক্ষী, অর্থাৎ পঞ্চাশটি পয়সার টিকেট বর্ধিত করের আওতা হতে বাহ্য গিয়েছে, আমরা মনে করি এক টাকা পর্যন্ত কর বৃদ্ধি না করা উচিত ছিল। এক টাকার টিকেটের উপর বর্তমানে চল্লিশ পয়সা কর দিতে হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা এই এক টাকা চল্লিশ পয়সার টিকেটেই ছাঁচ দেখেন। একারণে নিচের তলার সব সময় দর্শক সমাগম হতে থাকে। এই পর্যন্ত কর না বাড়িয়ে যদি এক টাকার উর্ধ্ব পর্য্য করা হত তবে নিম্ন আয়ের লোকদের আভির্ভূত দশ পয়সা কর দিতে তহত না।

সিনেমার মালিকদের উপর যে প্রদর্শনী কর ধার্য করা হয়েছে তা সমর্থনীয়। চলচ্চিত্র-শিল্পে সিনেমার মালিকরা সৌভাগ্যবান। শিল্পের কোন সংকট তাদের স্পর্শ করে না, বরং তারাই সংকট সৃষ্টি করেন। বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করে রাখা থেকে, হাউস গ্যারান্টি, ব্ল্যাকস্মান ইত্যাদি অনেক পথেই তারা আয় করেন। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রডিউসার লক্ষের টাকাটা পর্যন্ত তুলে আনতে পারেন না, সেখানে সিনেমার মালিক নিশ্চিন্তে ৬০।৭০ ভাগ টাকা পকেটস্থ করেন। সুতরাং তাদের লাভের টাকার কিছু অংশ যদি রাজ্য সরকারের ঘাটতিপুত্রের আসে, তবে তা সিনেমা মালিকদের পক্ষে 'দেশের কাজ' হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা তারা এত সহজে রাজস্বী হবেন না। এই বর্ধিত করের টাকটা যাতে টিকেটের দাম বাড়িয়ে দর্শকদের কাছ থেকে আদায় করা যায় তার জন্য সরকারের উপর চাপ দেবার সভাবনা আছে। এ নিয়ে তারা আপোদালন সৃষ্টি করতে পারেন, এবং দর্শকদেরও লগ্নে চৌনবার চেষ্টা করতে পারেন। তবে গ্রামাঞ্চলের সিনেমাগৃহগুলির উপর এই ট্যাক্সের হার আরো কিছুটা কম হলে ভাল এবং ট্যাক্সিং সিনেমাগৃহলিকে রেহাই দেওয়া উচিত।

প্রমোদকরের ব্যাপারে কেবলমাত্র সিনেমাকে টানা হয়েছে, কিন্তু ক্যাবারে, নাইট ক্লাব, বার, ইত্যাদিকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। বোড়বোড়কে এই করের মধ্যে টানা হয়েছে কি না সংবাদে তা স্পষ্ট নয়। অথচ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদ ও ছাত্র সংস্থা এবং বিভিন্ন সভায় দাবি করা হয়েছে নাইট ক্লাব, ক্যাবারে নাচ, বার, বোড়বোড় ইত্যাদির উপর ট্যাক্স ধার্য করা হোক। কয়েক বছর আগে বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ থেকে শ্রীগণেশ ঘোষ এরূপ দাবি করেছিলেন। কিন্তু এবার বর্ধিত কর ধর্মের ব্যাপারে এসব বিষয়ে কেন বিবেচনা করা হল না আমরা বুঝলাম না। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশ থেকে ক্যাবারে নাচের নর্তকীদের আনা হয়। হোটেল ও নাইট ক্লাবগুলিতে এসবের নাচিয়ে ভাল ব্যবসা হয়। উচ্চবিত্তপ্রেক্ষীর লোকেরা এসব স্থানে ভিড় করেন। বাড়তি করের অঙ্ক বৃদ্ধির জন্য সিনেমার এক টাকা পর্যন্ত আওতা মৃত রেখে ক্যাবারে ও নাইট ক্লাব থেকে টাকটা তুলে আনা উচিত ছিল। সমাজে বর্তমানে একদল লোকের আয় বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই বাড়তি আয়ের টাকটা ক্যাবারে, নাইট ক্লাব ও বারে তারা খরচ করছে; যে করণে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বার ও নাইট ক্লাবের সংখ্যা বাড়ছে এবং দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতার তা বিস্তৃত হচ্ছে। এই হঠাৎ বড়লোকদের পক্ষে থেকেই করের টাকা তুলে আনার যত বেশি চেষ্টা হবে—জনসাধারণ তা সমর্থন করবে।

—সুজন



ফরাসী চিত্র

স্বাভাবিকতা

আটটি ফরাসী চলচ্চিত্র

ফরাসী ছবির ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। বহু কৃতী চলচ্চিত্রশিল্পীর অবদানে এই ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। ফরাসী চলচ্চিত্র জগতে বহুবিধ চিন্তা ও রীতি-পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এ কারণে ফরাসী চলচ্চিত্র দর্শকসমাজে সব সময় আলোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে। যুদ্ধোত্তর-কালে এক সময় বিশ্বব্যয় বিরাট ওলট-পালট এবং ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সময় ফরাসী চলচ্চিত্রে অবসাদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এসময় একদল তরুণ পরিচালক 'নবতরঙ্গ' রীতি ও নতুন চিন্তা নিয়ে উপস্থিত হন। নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র জগতের স্বাভাবিকতার বিরূদ্ধে বিরাট চাপুল্য সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যয় এই তরুণের দোলা লাগে। নবতরঙ্গ প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সূত্র, অতি বাস্তবতার চিত্র প্রতিকর্ষিত হয়। যা শেষ পর্যন্ত অতি বাস্তবতাকে সঙ্গে স্বভাববাদের মিলন ঘটায়। স্বভাববাদ উর্নাবংশ শতাব্দীর শিল্পরীতি বলেই এককালে বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে ধনাত্মিক জগতের পিপ্প-জগতের সংকটের কালে নতুন ভাষাতে স্বভাববাদ নতুন মর্মেতে প্রকাশ লাভ করে। রূপ বিপ্লবের পরে বহু



ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত 'আঁ অমে রেং উনে কেমো' (নর ও নারী) ছবিতে আনন্দ আইমী ও জাঁ লুই ট্রিনিটিগ্রাণ্ট

সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম বা সমাজতান্ত্রিক মানবতা শিল্প সংস্কৃতিতে আশাবাদের স্বাক্ষর তোলে। যখন ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিতে নিয়ে শিল্পভাবনাকে মূর্ত করে তোলে, তারই কয়েক বছর পরে নবতরঙ্গ শিল্পভাবনাকে অগ্রগতির লক্ষণ বলে গণ্য করা চলে না। নবতরঙ্গ নিত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিজীবনের মূর্ত, সাময়িক ঘটনা, হতাশা ও অস্থিরতা অথবা মানবের জীবনের স্থিতিমুখী ভাবনা এতে মধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই হতাশা, এই অস্থিরতা ও স্থিতিমুখী চরিত্র যে সংকট থেকে উদ্ভূত সেই সংকট এবং তার কারণকে এরা প্রকাশ করতে পারেন নি। সুতরাং নবতরঙ্গে নত বেশি ভাণ্ড আছে তত বেশি আবেদন নেই। নবতরঙ্গের মোহ আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে।

গত ওরা থেকে ১ই নভেম্বর পর্যন্ত ফেডারেশন অব ফিল্মস সোসাইটিজ ও ভারতে ফরাসী দূতাবাসের যুগ্ম উদ্যোগে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে ম্যাজেস্টিক সিনেমার আর্টসি পূর্ণাঙ্গ ফরাসী ছবি ৫ আর্টসি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এই উৎসবে কেবলমাত্র নবতরঙ্গের, ষাট দশকের ফরাসী চলচ্চিত্র-

স্রষ্টাদের বিভিন্ন শিল্পভাবনার ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে।

উৎসবের প্রথম দিন প্রদর্শিত স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি পাবলো পিকাসোর চিত্র ও ডাস্কবের প্রামাণিক চিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিকাসোর সারা জীবনের সৃষ্টিকার্যের মধ্যে দশকিলা পরিচিত হতে পেরেছেন এই ছবির মাধ্যমে। পিকাসোর ছবির সঙ্গে পরিচর ঘটবার জন্য ধারাবিবরণীটি দর্শকদের কাছে সহায়ক হয়েছে। পিকাসোর শান্তি কপোত ও বিখ্যাত কয়েকটি ছবি কেন দেখা গেল না বুঝতে পারলাম না। যে সব ছবিতে পিকাসো বিশ্বশান্তির বোধ্যা হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন।

লুই মালের পূর্ণাঙ্গ ছবি 'লে ফু ফোলে' (জীবন মরণের সময়) এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির শেষ সময়ের ৪৮ ঘণ্টার সময়কে প্রতিফলিত করেছে। স্টার সঙ্গে তার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটছে, জীবনের সুখ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছে। তার বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। স্টার বাস্তবী এসে তার সঙ্গে রাত্টিবাস করে তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে; কিন্তু বাস্তবতা কেউ উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে, কেউ তার ব্যর্থতার জন্য করুণা

করে। কিন্তু কিছুতেই সে বেঁচে থাকার সার্থকতা বুঝতে পারে না। পরিকল্পনা মত ৪৮ ঘণ্টা পরে সে পিস্তলের গুলীতে জীবনের শেষ করে। ছবিটি ধীরগতিতে একটা নৈরাশ্যের মডকে ফুটিয়ে তুলেছে। উদ্দাম জীবনব্যাপনের ফলে এই নৈরাশ্য, সুতরাং এই নৈরাশ্যের মধ্যে একটা সত্যকতার সন্বেদ রয়েছে। ফটোগ্রাফি, আলোর ব্যবহার, পরিবেশ রচনার পরিচালকের দক্ষতা পরিস্ফুট।

পিয়েরে এতেং-এর 'লে সোপেরা' (বিবাহ প্রার্থী) একটি হাসির ছবি। ছবির প্রধান ভূমিকার পরিচালক স্বয়ং অভিনয় করেছেন। নায়ক গভীরভাবে পাঠে নিমগ্ন স্বরূপ। আর কোন বিষয়ে ভাবার মত অবসর দ্বার নেই। বাড়িতে রয়েছে অতিথি সুইডিস বৃত্তী। বিয়ের জন্য মা-বাবার তাগিদে হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গা হল। সে সুইডিস বৃত্তীর পাণি প্রার্থনা করল। কিন্তু ফরাসী না জানায় তরুণী জবাব দিতে পারল না। আরপরে রাবে রেলতরঙ্গি অনেক নারীর পেছনে ছুটে সে তিন অভিজ্ঞতা সত্তায় করল। বিখ্যাত গায়িকা স্টেলার প্রতি সে আসক্ত হল। কিন্তু বহু চেষ্টার পরে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানল স্টেলার তার বয়সী



ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত 'লা ভি দ্য শাতো (দুর্গের জীবন)' ছবিতে ক্যাথরিন ডেন্ডুভে, পিয়েরে রাশের, ফিলিপ নইরে, হেনরি গার্টিন, মারি মারওয়েং এবং কার্লস থমসন।

ছেলে রয়েছে। এবার ছুটে এল সে বাড়িতে, ঠিক সে সময় সুইডিস তরুণী তাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং বিদায় মূহুর্তে সে ফরাসী ভাষায় তার কাছে বিদায় নিল। সেই তরুণীকে প্রেম জানাতে সে ছুটে গেল স্টেশনে।

পিয়েরে এতেও বাস্তববাদী দৃষ্টিতে চমৎকার রংগরসে বাস্তবে যা ঘটে তাকে রূপায়িত করেছেন সমাজচেতনাবোধ নিয়ে। এই রূপায়ণে যেমন শ্লেষ আছে, তেমন আছে কৌতুকবোধ। চার্লি চ্যাপলিনের প্রভাব তাঁর উপর রয়েছে, সার্কাসের প্রভাবও যথেষ্ট। ছবিটি বাস্তবিকই উপভোগ্য।

ফ্রান্সের নবীন চিত্র পরিচালকদের মধ্যে জাঁ-লুক গডার্ডের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। রূপায়ণ রীতিপদ্ধতিতে তাঁর নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে যার জন্য তাঁর ছবিতে এক নতুন স্বাদ অনুভব করা যায়। তাঁর ছবি 'পিয়েরো লে ফো' (নির্বোধ পিয়েরো)-তে তিনি সমকালীন সমস্যা এবং ব্যক্তিজীবনের বৈচিত্র্য চরিত্র উন্মোচন করেছেন। জগতে এমন অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটেছে যার কথা সাধারণ মানুষ ভাবছে না, আবার ব্যক্তিজীবনে বাইরে বা ভিতরে ভিন্ন চিন্তা। ছবির নায়ক ফার্ডিনান্ড নিজের বিলাসপূর্ণ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, বৈচিত্র্যের সম্মানে মারিয়ানার সঙ্গে পলায়ন করে। একটির পর একটি গাড়ি

চুরি করে, সম্ভ্রাসবাদী দল ইত্যাদির মূখোমুখী হয়ে অবশেষে সমুদ্র ঘন আর পাখীর শান্তিরাজ্যে উপস্থিত হয়। সেখানে এসে মারিয়ানার স্বরূপ বৃক্কে পারল। তার গুলীতে তখন মারিয়ানার মৃত্যু হল। নিজের শ্মশানে সে নিজেকে শেষ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক সে মূহুর্তে তার বাঁচার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তখন আর সময় পেল না—ডিনামাইট তাকে শেষ করে দেয়। হিসাবের ভুলে সময় তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। গডার্ড বাস্তব ও কল্পনাকে মিশিয়ে, রূপকের সাহায্যে সমসাময়িক ভিয়েতনাম সমস্যা থেকে ব্যক্তিজীবনে সুখ-শান্তির কামনা ও অতৃপ্তিকে উপস্থিত করেছেন। এর রূপায়ণে গডার্ড এবং সত্যকাজ্ঞাপক সংকেত রয়েছে। কড়া রং ব্যবহার করে এবং রঙের প্রতীকে তিনি বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। তবে এত ঘটনা সমাবেশ, এত কথা কিছুটা দূর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দূর্বোধ্যতা সত্ত্বেও গডার্ডের বুদ্ধি-দীপ্তি অনুভব করা গেছে।

ফ্রাসোয়া গ্রুফোর কয়েকটি ছবি ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। নবতরঙ্গের পুরোধা বলে সমাজ-সমস্যা তাঁর ছবিতে স্পষ্ট। এবার তাঁর লা পী ডুসে (নরম দেহ) সেই সূন্য অঞ্চল রেখেছে। এই ছবির প্রধান চরিত্র এক পত্রিকার সম্পাদক পিয়েরে লাচেলে মধ্যবয়সী লোক। স্ত্রী-

কন্যা নিয়ে তার সংসার। একবার কৃত্তক দিতে লিসবনে বাবার পথে সে এক এয়ারহোস্টেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে গোপনে দু'দিনের জন্য সে এয়ারহোস্টেস নিকোলের সঙ্গে সখ্য উপভোগ করে। বাড়িতে আসার পর স্ত্রীর কাছে সব ঘরা পড়ে এবং সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে। নিকোলে থেকে নিয়ে সে নতুন করে বাস করতে চায়, কিন্তু নিকোলে তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছা জানায়। এবার অন্তঃসত্ত্বা লাচেলে স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়, অথচ ঠিক সেই মূহুর্তে স্ত্রী রক্তরসি এসে স্বামীকে গুলী করে। গোপন আনন্দ উপভোগ, বিবাহিত জীবনে বৈবাহিক আনন্দ উপভোগ ইত্যাদি যেমন ফরাসী জীবনে নতুন নয়, তেমন এ ঘটনা বিশ্বব্যপ্ত রয়েছে। কিন্তু এই সরল কাহিনীকেও আলোচনার বিষয় করে তুলেছে ছবির সমাপ্তি দৃশ্য। গ্রুফোর নায়িকা আপোষ করে না, প্রেমের দাঁষ্টে দেখে না, বিশ্বাস নষ্ট করার প্রাতিশোধ নেয় গুলী করে। গতানুগতিক পথে না গিয়ে গ্রুফো দর্শকমনে একটা খান্না দিলেন, এই মানসিকতার প্রাতি আরো দাঁষ্ট আকর্ষণের জন্য। গ্রুফো সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল, তাই এখানে তিনি কঠোর। ছবিটির মধ্যে সহজবোধ্যতা এবং সরল গতি রয়েছে। আঁপাকে তিনি সংবত।

আলা রেনের 'হিরোসিমা মন আমোর' দেশে-বিদেশে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।



রাবি বন্দু পরিচালিত 'প্রথম প্রতি প্রতি' ছবিতে নির্মলকুমার ও নবাগত দীপক চ্যাটার্জী।

এই ছবিতে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। 'হিরোসিমা মন আমার'-এ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা প্রতিফলিত। তাঁর একই রাজনৈতিক চিন্তা এই ছবিতে বিদ্যমান। রেনে মৃদুবে বিশ্বাস করেন না, তা সাম্রাজ্যবাদী মৃদুবে হোক বা মৃদুবে মৃদুবে হোক। রেনের 'লা গুয়েরে রেং ফিনি' (মৃদুবে শেষ হয়েছে) ছবির নায়ক ডিয়োগো এক স্পেনিশ রিফিউজি। প্যারিসে বাস করছে। জাল প্যাশপোর্ট নিয়ে ছদ্মবেশে সে তার দলের হয়ে স্পেনে যাত্রা শুরু করে সেখানে বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য। প্রতি মৃদুবে সে মৃদুবে মৃদুবে মৃদুবে। প্যারিসে রয়েছে তার স্ত্রী মারিয়ানা—তার কাছেও অনেক ঘটনা গোপন রাখে। ডিয়োগো দীর্ঘ ক্রান্তি বছরের অভিজ্ঞতায় ক্রমে দলের মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারছে না; সে মনে করে সেখানে বিপ্লবের পরিস্থিতি নয়, এমন কি জেনারেল স্ট্রাইকের সাফল্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না। তরুণরা সমস্ত সংগ্রামের পক্ষে। এতে সে বিরোধী। তবে পার্টির নির্দেশে সে স্পেনে যায়। রেনে সে সময় নেপথ্য সংগীত দিয়েছেন—শোকসংগীত।

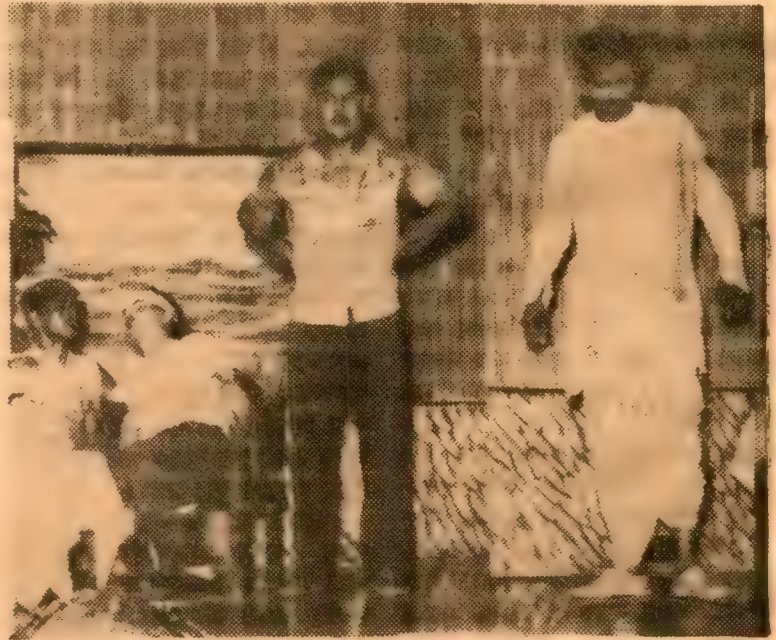
এই ডিয়োগো একজন বিপ্লবী, কিন্তু কমরেডের ষোড়শী কন্যা যে তাকে বলে তুমি আমার পিতা হতে পারতে এবং বীরের প্রতি আহুতি দেবার মানসিকতায় যে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাকে সে দৈনিক উপভোগ করে। আবার বাড়িতে গিয়ে মারিয়ানার প্রেমের সাগরে সে অবগাহন করছে। স্বভাবতই মনে হয়

রেনের বিপ্লবী বীরের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক নয়।

রেনে দুটি সঙ্গমের দৃশ্য উপস্থিত করেছেন। একবার কমরেডের কন্যার আত্মসমর্পণের দৃশ্যে। আর একবার মারিয়ানার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমের। এই

দৃশ্যে সঙ্গমের পারদূর্ণ একটা ছবি তিনি উপস্থিত করেছেন। যদিও শুবই কাব্যিক মেজাজে; কিন্তু এই দৃশ্য ছবির বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে এমন কি সাহায্য করেছে? রাজনৈতিক বক্তব্যের আবরণে স্বভাববাদী চিন্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ছবিতে যৌন আনন্দের আকর্ষণ বেড়েছে। এখানে রেনের মৃদুবে। রাজনৈতিক বক্তব্যের দিক থেকেও রেনে বিপজ্জনক; অন্তত যারা ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তাদের কাছে।

জাঁ পল রানোর 'লা ভি দ্য শাতো' (দুর্গে জীবন) ছবির নায়িকা স্বামীর সঙ্গে এক পুরাতন দুর্গে বাস করে। স্বামী থাকে বাগানের কাজ নিয়ে। মারির একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না। সে প্যারিসে যেতে অস্থির। এমন সময় প্রতি-রোধ আন্দোলনের এক ক্যাপ্টেন তাদের বাড়িতে সবার অলক্ষ্যে আশ্রয় নেয়। মারি তাকে আবিষ্কার করে। দুর্জন্য প্রেম হয় এবং তাকে প্যারিসে নিয়ে বাস করার আশ্বাস দেয়। সে সময় জার্মানরা তাদের দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং জার্মান অফিসারের দৃষ্টি পড়ে মারির উপর। একদিন প্রতিরোধের পর জুলিয়েন ও মারি পালিয়ে যায়। কিন্তু জুলিয়েন ধরা পড়ে। জুলিয়েন তখন মারিকে জামানের কাছে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়, কিন্তু



আরবান হেলথ সেন্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় 'হাম্মা নাটিকা' নাটকের একটি দৃশ্য।

মাসিক বসন্ত

মারি পালিয়ে যায়। আর একটিকে তার স্মারী হঠাৎ একটা বন্দুক নিয়ে জার্মানদের ভয় দেখায় এবং অকস্মাৎ গুলী বার হয়ে বিপর্যয় ঘটায়। সে তখন তার স্বামীর ও মা-কে মৃত করে—অকস্মিকভাবে বীর হয়ে যায়।” ওদিকে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এসে উপস্থিত হয় এবং মারির স্মারির হৃদয়তে জার্মানদের ধ্বংস করে। মারি তখন তার স্বামীর কাছে ফিরে আসে।

এই ছবিটি স্যুয়াসন কমার্শিয়াল ছবির মেজাজে নির্মিত। পারচলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের বিষয়ে কেমন প্রশংসালীন নন, তেমন বীরকে তিনি আকস্মিক ঘটনা মনে করেন।

রুড লেলুচের ছবি ‘আঁ অমে য়ে উনে ফেম’ (নর ও নারী) একটি ছোট-কাহিনীর বর্ণ-রাঙন বর্ণনা। নায়ক বিপর্যয়, নায়িকা বিধবা। নায়ক মোটর রেসের চ্যাম্পিয়ন, তার এক দুঃখিনীর বদর পেয়ে স্ত্রী বিবাহ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। নায়িকার স্বামী ফিৎসের স্ট্যান্ডম্যান, সুটিং-এর সময় মারা যায়। এদের ছেলে ও মেয়ে একই বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। সেই উপলক্ষে দুজনার পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। এই প্রণয় মূহুর্তে দুজনে এক হোটেলে রাতি বাস করে। সহবাসের সময় নায়িকার মনে পড়ে যায় তার পূর্ব স্বামীকে। তার স্মৃতি তখন তাকে অভিভূত করে রেখেছে। সকালে উঠে সে বিবাহ মনে বিদায় নেয়। কিন্তু পরে নায়ক তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং অতীতের স্মৃতির চেয়ে বর্তমানের প্রেম বড় হয়।

ছবিটি কমার্শিয়াল মেজাজের। কিন্তু রঙের ব্যবহারে অতীত ও বর্তমানের ঘটনাকে প্রকাশ করা হয়েছে, যেভাবে ল্যান্ড-স্কিন মেজাজ ফুটে উঠেছে তাতে পরিচালকের শিল্পদৃষ্টি প্রশংসনীয়।

এই আর্টটি ফরাসী ছবি জিব ভিম রস ও বতবোর। কোন একটি সূরে ছবি-গুলি গ্রীষ্মিত নয়। তবে নবীন পরিচালক নরনারী যৌনজীবনের গোপন দিকটাকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশপ্রসারী বা ভূতীয় জনের দেখার কথা নয়, একান্তভাবে যা দুজনার তাকে পদ্য প্রকাশ করার অর্থ ফরাসী চলচ্চিত্রে স্বভাববাদের প্রভাব বেশি।

দুগের কাহিনী” হাবির শব্দ মহৎ হয়েছে। নিউ এক পিকচার্সের পতনাতলে ছবিটি প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী মঞ্জুরী বসু ও শ্রীমতী ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার সদস্য, শ্রীবীরেন রায় এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সাহিত্যিক বিপ্লবশালক বসু। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে সমস্ত মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের অবিস্মরণীয় জীবিকাহিনী অবলম্বনে ছবিটির কাহিনী রচিত হয়েছে। ছবিটির প্রধান চরকটি চরিত্র রূপদান করছেন—বাহবা মৃধাজী, অমর গাঙ্গুলী, দিলীপ রায়, সুলভা চৌধুরী এবং বিকাশ রায়।

বোর্দিং হাবির চিত্রগ্রহণ সমাহার

পূর্ণেশ্বর রায়চৌধুরী প্রযোজিত পূর্ণেশ্বর প্রোডাকশন্সের সম্পর্কিত ঘরোয়া ছবি “বোর্দিং”-র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক দিলীপ বসু। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতরচনা করেছেন—প্রশ্ন রায়। সূত্রসৃষ্টি করেছেন—রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন বহুদূর—দেওজীভাই ও অমির মৃধাজী।

চরিত্রচিত্রে আছেন—সম্মারাদী, কালী ব্যানার্জী, অমরকুমার, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, জহর রায়, সুধেন দাস, নৃপতি চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমতী, বৃন্দ গাঙ্গুলী, অশোক মৃধাজী, অমল্য সান্যাল, শ্রীমান শঙ্কর, শ্রীমান বাপী, কনানী চৌধুরী, মলিনা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী, কালীদাস চক্রবর্তী, প্রসাদ মৃধাজী এবং অনিল ব্যানার্জী ও লিলা চক্রবর্তী।

গীত অমর

কমল চক্রবর্তী পরিচালিত অঙ্গরা ফিল্মসের গীত অমর ছাবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পেন্সন দে রচিত সাড়া জাগানো উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কমল চক্রবর্তী। সূত্রসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন গোপেন মায়িক। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মামা দে। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত ও কিংবাথ নায়ক। চরিত্রচিত্রে আছেন : উত্তমকুমার, সুপ্রিয় দেবী, অমরকুমার, জহর রায়, নৃপতি সেন, রবীন মজুমদার, হুন্দা দেবী, অমর গাঙ্গুলী, ইন্দিরা দে, বিকাশ রায়, বিদ্যা চৌধুরী, মিতা দত্ত, জ্যোত্স্না ব্যানার্জী, মীরা চ্যাটার্জী, লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, উমানন্দ বসু, হারা দেবী, মা জয়লীপা ব্যানার্জী,

বিদ্যা রায়, “গীতা মৃধাজী”, বীরেন চ্যাটার্জী, সদানন্দ চক্রবর্তী।

অঙ্গরা ফিল্মস ছবিটির পরিচালক।

অঙ্গরায় নিকেতন

ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস অবলম্বনে কিংকর বসু পরিচালিত অঙ্গরায় “অঙ্গরায় নিকেতন” ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীকার। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীকান্ত স্বয়ং। সূত্র-সৃষ্টি করেছেন রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন বহুদূর—কক চক্রবর্তী, বিম্বনাথ মিত্র ও সত্যেন রায়চৌধুরী।

কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন সন্ধ্যা মৃধাজী, অরতি মৃধাজী, মানবেন্দ্র মৃধাজী ও হেমন্ত মৃধাজী।

চরিত্রচিত্রে আছেন : বিকাশ রায়, হারা দেবী, হুন্দা মৃধাজী, সন্ধ্যা রায়, শম্ভুচন্দ্র চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, বিক্রম ঘোষ, হুন্দা দেবী, হুন্দা দাস, ইন্দিরা দে, ধীরাজ দাস ও কালী সরকার।

অঙ্গরায় ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ ছবিটির বিশ্ব পরিবেশক।

নাটকের কথা

বাল্যবর্ত নাটকসমিতির তত্ত্বাবধীত অভিনয়

গত ০১শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-০০ টি বাল্যবর্তের নাটকসমিতি তত্ত্বাবধীত হরিমন্ডন মৃধোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পাখীর বাসা, শেষ থেকে শুরু ও নাট্যকারের সম্মানে, ছবিটি চারি স্থানীয় নাট্যসমিতিতে অমৃত সাক্ষর সঙ্গীত মঞ্চস্থ করেন। রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশ্ন রায়, উপলক্ষ্য রায়, প্রভাস সমান্তর, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, হেনা মজুমদার, রতন ঘোষ ও পরিচালক স্বয়ং হরিমন্ডন মৃধোপাধ্যায় প্রমুখের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের বিপুল আনন্দ দিয়েছে।

অমরকুমারী

চিকামো উৎসবে চোশম

চিকামো চ্যাকট উৎসবে ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চোশম দেবান হচ্ছে। এই উৎসব ১১ই নভেম্বর শুরুর হয়েছে।

সুইড ও শ্রব

অসিদ্ধের কাহিনী

গত ১০ই নভেম্বর শুরুর বিকেল ৫টার রাগা ফিল্মস স্টুডিওতে “অসি-



রাজ্যপাল গ্রীধরমবীর ডালাস টর্নেডো দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

মার্কিনী ফুটবল

হবে না হরে না করেও শেষ পর্যন্ত খেলা হল। অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ষষ্ঠীক সমাগমের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। মাঠে প্রচুর লোক হয়েছিল। রেডিও-র ঘোষণায় অবশ্য অনিশ্চয়তার মেঘ কেটে গিয়েছিল। মার্কিনী ফুটবল দল সবে হাতে-খড়ি শেষ করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। এদের খেলা দেখতেও কলকাতার দর্শকদের আগ্রহের কোন শৈথিল্য ছিল না। তবে ডালাস টর্নেডোর খেলা বিশেষ চোখে লাগে নি। এদের নিজের জিনিষ বিশেষ কিছু নেই একমাত্র বলিষ্ঠ পুংগঠিত দেহ ছাড়া। ক্রীড়া-কৌশল সবই বকল করা। একথা ঠিক যে “ফুটবল” আমেরিকানদের ধাতে সয় না। টেনিস, বেসবল, বাস্কেটবল ওদের মাতামাতি। অলিম্পিকে দৌড়কাঁপে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জের মেডেল ওদের একচেটিয়া। ফুটবলের এই নবজাতকের খেলা দেখবার জন্য তাই এত ঔৎসুক্য।

ডালাস দল হয়ত আরও ভাল খেলতে পারত। কিন্তু তাদের ওপর দিয়ে বেশ ধকল গিয়েছে। সীমান্তে তাদের রাত কাটাতে হয়েছিল কারণ বেনাপোলের কর্তৃপক্ষ রাতে তাদের ভারতীয় এলাকায় ঢুকতে দেয় নি। খেলার অনিশ্চয়তা, নতুন পরিবেশ, বিজ্ঞানের অভাব নিশ্চয়ই তাদের সাবলীল ক্রীড়াধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় করেছে। তবে এটা খুবই প্রশংসার কথা যে রক্ষণভাগ ভারতীয়

আক্রমণকে সুন্দরভাবে রুখেছে। খেলা অসমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে—ভারতীয় দলের আক্রমণভাগের ব্যর্থতা ও ডালাস দলের রক্ষণভাগের সাফল্যের জন্য। এটা খুবই পরিতাপের কথা যে আই এফ এ একাদশ সব রকম সুবিধা—নিজেদের দেশ, নিজেদের মাঠ, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি—পেয়েও বিপর্যস্ত ডালাস দলকে হারাতে পারল না।

ডালাস দলের খেলায় কণ্টিনেন্টাল ফুটবলের ছাপ। ভারতীয় ফুটবলের যেমন একটা নিজস্ব রূপ—খালি পায়ের

গ্রীষ্মমিতাভ

যুগে চোখ জুড়ানো বল কন্ট্রোল—অপূর্ব চাতুর্যের সঙ্গে বল টানা—পরবর্তী যুগে বৃষ্টির চলন এবং নতুন নতুন টেকনিকের আমদানি—এসব কিন্তু মার্কিনী ফুটবলে নেই। তাদের খেলার শিকড় স্বদেশে নেই বিদেশে। বিদেশ থেকে রস টেনে আমেরিকান ফুটবল হয়ত বেঁচে থাকবে কিন্তু বড় হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আরও দু-একটা জিনিষ দৃষ্টিকটু লাগল। রেফারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি, সুবিধা পেলেই গায়ের জোর ফলানো, মারাত্মক ফাউল করা। এগুলি খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পক্ষে অনিষ্টকর।

খেলায় কোন গোল না হলেও ভাল ভাল সুযোগ আই এফ এ বেশি পায়। পাম্পানার পাশ থেকে চুনী গোম্বামীর

ভাল স্ট দর্শনীয়—বল বার ছুঁয়ে যায়। কাজল মুখাজির নিখুঁত পশুশক্তি নষ্ট করলেন। ফাঁকা থেকেও ঠিকমত গোলে মারতে পারলেন দিনের সহজতম সুযোগ এটি।

খেলার আগে রাজ্যপাল গ্রীধরমবীর পক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় হল। খেলা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ মাঠে ছিলেন। রাজ্যপালের ফুটবল প্রীতি অনুরাগ প্রশংসনীয়। সম্মুখীন এক-এর তরফ থেকে ডালাস খেলোয়াড়দের চায়ের নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আগন্তুক খেলোয়াড়দের আই এফ এ'র স্মারক ও হাতীর দাঁতের তৈরি জিনিষ উপহার দেওয়া হয়। আই এফ এ'র খেলা ও রেফারী লাইসেন্সমানরা পান উপহার।

ডালাস দলের ২য় খেলা হল নভেম্বর দিল্লীতে। এই খেলায় ডেবুটের একাদশ ১ গোলে জয়লাভ করে কলকাতার খেলার ভারতীয় দলের উচিত ছিল। যা হোক দিল্লীর খেলা ভারত তার সম্মান বজায় রেখে আগন্তুক দল ২য় খেলায় উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান—পরিচালিত আক্রমণ এবং গোল লক্ষ্য করে তীব্র সতর্কতায় সবই বেশ ভাল হয়েছিল। ভারত গোলাকীপার যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে তিন মিনিটের মধ্যে ৩টি তীব্র স্ট্রাইক হত করে দলের পতন রক্ষা করে ভারতীয় দলের পক্ষে গোল করে যোগেন্দ্র সিং। এর পরে গোম্বামীর ২টি প্রচেষ্টা অসম্পন্ন ব্যর্থ হয়।

মার্কিন দলের ৩য় খেলাটি হবে নভেম্বর বোম্বাইতে। আরও উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য এই তরুণ দলটির কাছ থেকে আশা করা অসম্ভব হবে না।

ইরানী কাপ

আবার বোম্বাই দল। এবার পঁচবার। ইরানী কাপ ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে চালু হওয়ার পর একবার বোম্বাই পরাজিত হয় অবশিষ্ট দল কাছে। বোম্বাই যে ক্রিকেটের ইরানী কাপের খেলায় তা আর এক প্রমাণ করল।

চারদিনের খেলা। অসম্পন্ন জেনো ইনিংস শেষ হল না। অবশিষ্ট দল আর্টস্ট্রাইকট পড়ে গিয়েছিল। তখন ১৭০ রান পেছনে। পরোক্ষ দীপংকরের হাতে ব্যাট। রজনী অসম্পন্ন করছেন প্যাভিলিয়নে। রেস্ট দল গেল গেল ভাব। ঘড়ির কাঁটা শেষ পাঁচিয়ে দিল। খেলা জু। প্রথম ইনিংস ফলাফলে বোম্বাই ইরানী কাপ পেল।

শেষের দিন বোম্বাই দল ১৫ মিনিট ব্যাট না করলে হারত খেলার নিশ্চয়তা হত। আরও ১৫ মিনিট সময় পেলে বোম্বাই দল শেষের ২টি উইকেট ফেলে দিতে পারত। ৭ উইকেটে ২৫৯ রানের পর অধিনায়ক ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেই বাধহীন ভাল করতেন।

প্রথম দিন অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর—বোম্বাই-এর পদক্ষেপ শূন্য। টেস জিত। প্রথম ব্যাটিং রান তোলবার পক্ষে ভাল। ২৯৯ রানে শেষ হল ১ম ইনিংস। এই রান সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন এ মানকড়, হারাদিকর ও ইনজিনিয়ার। তাঁদের রান সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯, ৬৫ ও ৪৬। ২য় দিনে রেস্ট দল আরম্ভ থেকেই অসুবিধায় পড়ে। ১৬৬ রানে ৭টি উইকেট পড়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ সিংজি এবং রাজাগোপাল এই বিপর্যয়ের মুখে কিছু নৈপুণ্য দেখান। তাঁরা যদি ৬০ ও ৪৯ রান না করতে পারতেন তাহলে দলের অবস্থা হত আরও শোচনীয়। দলের অধিনায়ক পতৌদি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না—মাত্র ২ রানে তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল। বোম্বাই-এর দেশাই ও কুলকার্নি ভাল বল করেন। দেশাই ৪৫ রানে ৩টি ও কুলকার্নি ৫১ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রাক্কালে দেশাই ও কুলকার্নির নৈপুণ্য তাঁদের ভারতীয় দলে স্থান পাওয়ার পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিল।

৩য় দিনে রেস্ট দল মাত্র ১৮ রান যোগ করে ১৮৪ রানে আউট হয়ে গেল। বোম্বাই দল ২য় ইনিংসে ধীরে ধীরে রান তুলে দিনের শেষে ৭ উইকেটে ২৫৯ রান তুলল। এই ইনিংসেও অশোক মানকড়ের খেলা প্রশংসনীয়। মাত্র ৩ রানের জন্য কিল্লি মানকড়ের সুযোগ পূত্র অশোক শত রান লাভে বঞ্চিত হন। ভারতীয় দলে অশোক নির্বাচিত হবে কিনা বলা যায় না—তবে এই তরুণ ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। ৩য় দিনে রেস্ট দলের বোলার শ্রীচক্রবর্তী বোম্বাই ব্যাটসম্যানদের বেশ নাজেহাল করেন। মাত্র ৪৮ রান দিয়ে তিনি ৪টি উইকেট দখল করেন।

খেলার শেষ দিন। ৩৭৪ রানে অগ্র-গামী। সবাই ভাবছে বোম্বাই দল ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে রেস্ট দলকে খেলার সুযোগ দেবে। খেলার সরাসরি জয়-পরাজয়ের একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু অধিনায়ক হারাদিকর এ পথে গেলেন না। তিনি চাইলেন কিছু সময় নষ্ট করে দান ছাড়বেন। তার ফলে রেস্ট দলের জিতবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। খেলা শুরু হলেও প্রথম ইনিংসের ফলে ইরানী কাপ বোম্বাই দল পাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য খেলাটি



আই এক এ ও ডালান টর্নেডো দলের খেলার একটি দৃশ্য

শু হ'ল। এই জেতা খেলা শুরু করার জন্য রেস্ট দলের অধিনায়ক পতৌদির কিছু কেরামতি আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত একটি প্রান্ত সমানে আটকে রাখেন। শেষ দিকে নতুন বল নিয়ে বোম্বাই দল খেলা প্রায় শেষ করে এনেছিল। কিন্তু অধিনায়ক হারাদিকরের একটা উল্টো চালে বোম্বাইকে শুরুতেই সন্তুষ্ট হতে হল।

ডি নি এম প্রতিযোগিতা

আর একটা নতুন নাম। মফংলাল। দিল্লীর ডি নি এম ষ্ট্রিকার বিজয়ীদের তালিকায় যুক্ত হল। গত ৫ই নভেম্বরের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল বেশ নাটকীয়। হাক টাইমের আগে পর্যন্ত কেউ কল্পনা করতে পারে নি জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব ৫ গোলে হারবে। বিশ্রামের আগে পর্যন্ত

১ গোলে হারলেও লীডার্স ক্লাবের খেলার বথেষ্ট শক্তি ও সম্ভাবনার স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু বিশ্রামের ঠিক পরেই লীডার্স ক্লাব খেলার পদ্ধতি বদল করল। ফলে আবার একটি গোলে। ২টি গোলে খেয়ে টাইমের মাথা গেল বিগড়ে। গোলে শোধ করার জন্যে সবাই বেপরোয়াভাবে এগিয়ে খেলতে লাগল। সচতুর মফংলালের ফরোয়ার্ডরা দুর্বল রক্ষণভাগকে বিদীর্ণ করে পটাপট গোলে দিয়ে ফেলল। রাইট আউট শংকর, লেফট-ইন মধ্যার্জি এবং লেফট আউট ইনাস চমৎকার সুযোগ-সম্মানীর পরিচয় দিয়ে মফংলালের জয়ের পথ সুগম করেছেন। লীডার্স ক্লাবের দুর্ভাগ্য তাঁদের স্টার সেন্টার ফরোয়ার্ড ইন্দার সিং খেলার যোগ দিতে পারেন নি এবং তাঁদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সার্থক রূপায়ণে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে।

এশিয়ান কাপে ভারতীয় দল

রেলওয়ে দলের অরুণ ঘোষের ওপর এবার নেতৃত্বের ভার পড়েছে। রেশমদে ৯ই নভেম্বর থেকে প্রাতিযোগিতা শুরু হবে। ভারতের প্রথম খেলা ১২ই নভেম্বর বর্মার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় খেলা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৫ই নভেম্বর। শেষ খেলাটি কাম্বোডায়ার বিরুদ্ধে ১৮ই নভেম্বর। ১৫ জন খেলোয়াড়ের এই দলটি ৯ই নভেম্বর কলকাতা থেকে গ্লেনে রেশমদে রওনা হবে। এবার ম্যানেজার হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের এস আর দেব। অরুণ ঘোষ



বাপু নাদকার্নি

হাড়া দলে থাকবেন—খঙ্গরাজ, জানকীরাম, এস সি বোস, আলতাফ আমেদ, নঈম, প্রসাদ, জিতেন্দ্র, অশোক চ্যাটার্জি, কামান, কৃষ্ণজি রাও, সুরেন্দ্রানিয়ম, প্রেসিয়াস, ঘমর বাহাদুর এবং ইন্দার সিং। ম্যানেজার দেবের যাত্রা দৈবানুগ্রহে শূদ্র হোক।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফর

জলপনা-কপনার অবসান হয়েছে। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ১৬টি নাম ঘোষণা করেছেন। বাংলার ভাগ্যে এবার আর শঙ্কে ছেড়ে নি। বাংলার আশা তরুণ

দীপংকর বাদ পড়েছেন। ইংল্যান্ড সফরের পাঁচজন ছাড়াই হয়েছেন। এঁদের নাম সুরত গুহ, এস এল মোহল, বি কে কুন্দরন, হনুমন্ত সিং ও ডেভেট রাঘবন। শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন—রমাকান্ত দেশাই, উমেশ কুলকার্নি, ইন্দ্রজিৎ সিংজি, বাপু নাদকার্নি ও সৈয়দ আব্বিদ আলি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দলীপ ট্রফি, ইরানী কাপ কত রকম খেলা হল। নির্বাচন এদের ধার দিয়েও গেল না। আমাদের আশা ছিল লেগেরেক বোলার দীপংকর স্থান পাবে। তার বয়স কম বটে তবে স্কুল দলের পক্ষে ইংল্যান্ড সফরে সে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বেদীকে বাদ দিয়ে তরুণ দীপংকরকে নিলে সবিচার হত। বেদীর ওপর নির্বাচকমণ্ডলী বেশ একটা দূর্বল। তাছাড়া সুরেন্দ্রানিয়মকে সুযোগ দেওয়ারও যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কুলকার্নি ও ইন্দ্রজিৎ সিংজিকে সুযোগ দিয়ে বোর্ড ভালই করেছেন।

ভারতীয় দল ১৭ই নভেম্বর মাদ্রাজ থেকে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। ভারতীয় ক্রিকেট দল পার্থে প্রথম খেলবেন ২২শে নভেম্বর। প্রথম টেস্টের আগে পুরো একটি মাস ভারতীয় দল বিভিন্ন ম্যাচ খেলে নতুন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া অনেকটা ভাল সুতরাং ভারতীয় দলকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এই দলকে মোট ২৩টি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে ১০টি প্রথম শ্রেণীর দলের সঙ্গে খেলতে হবে। টেস্ট ম্যাচ হবে ৫টি। নিউজিল্যান্ড খেলবে ৪টি টেস্ট ম্যাচ। ১৯৬৮ সালের ১২ই মার্চ এই সফর শেষ হবে। অধিনায়ক পতোদীর নবাবের সঙ্গে থাকবেন—সি জি বোরদে সহ-অধিনায়ক। অন্যান্য খেলোয়াড়দের নাম যথাক্রমে—এফ এম ইনজিনিয়ার, ইন্দ্রজিৎ সিংজি, ওয়াদেকার, সারদেশাই, রমেশ

সাকসেনা, সুরেন্দ্রানিয়ম, নাদকার্নি, সূতি, বেদী, আব্বিদ আলি, প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর দেশাই, কুলকার্নি। দলের ম্যানেজার গোলাম আমেদ ও কোচাধ্যক্ষ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

ডেভিস কাপ

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ডেভিস কাপের বার্তা। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা অনর্দিত হবে বাসি লোনার মাঠে। ১০ই নভেম্বর শুরুর



রমাকান্ত দেশাই

শুরুত উদ্বেগ। খেলার তালিকা অনুযায়ী ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান বব হিউইটের সঙ্গে খেলবেন প্রথম সিংগলস্ ম্যাচ। ২য় সিংগলসে জয়দীপ খেলবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ক্রিফ ড্রাইসডেলের সঙ্গে। ডাবলসে কৃষ্ণান ও জয়দীপ খেলবেন বব হিউইট ও ম্যাকমিলান জুটির সঙ্গে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে স্পেন। তবে ডেভিস কাপের শেষ খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ায়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী পাণ্ডুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন আজ
খুশীতে
ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জন্মের জন্ত
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার
অব্যর্থ মহোষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে চ'চামচ মুভসজীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাজাকারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্রান্তি দূর করে,
বিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।

সাম্রাট উষ্মপ্রাণ চাকা



অব্যর্থ ডাঃ যোগেন চন্দ্র বোস, এম-এ,
আনুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের তৃতীয়
অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্দ্র বোস,
এম-বি, ডি-এস, আনুর্বেদচর্চক।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
বাহাদুর নগর, কলিকাতা ৯৮